সূচিপত্র

৫ম বর্ষ] কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

প্রবন্ধের নামানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী—কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চিত্র

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী



শরতের ফুল

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী - শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র গোস্বামী ।



৫ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৩ [১ম সংখ্যা

উপাসনা

উপাসনা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কোন প্রকার উপাসনা করে না, এরূপ মানব পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে, অথবা নাই বলিলেও চলে। তবে উপাসনার প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, কেহ পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য, কেহ বা ঐহিক ভোগলালসা বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই যে স্বার্থসাধনতৎপর ব্যক্তি আপনার অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে অহরহঃ ব্যক্তিবিশেষের আরাধনা করিতেছে, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতেছে, অথবা চাটুকারপ্রিয় অধম ব্যক্তির চিত্ত-বিনোদনার্থে অযথা অসার স্তুতিবাদ করিয়া আপনার মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতেছে, কিংবা পরপ্রতারণামানসে আপনার অন্তর্নিহিত অসদভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়াইতেছে, এ সকল কি উপাসনা নহে? মনে হয়, এ সকল কার্য্যে যেরূপ ক্লেশ, সহিষ্ণুতা ও মনোনিবেশ আবশ্যক হয়, প্রকৃত উপাসনায় তদপেক্ষা অধিক হয় না। তবে এরূপ উপাসনায় আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক মঙ্গলের লেশমাত্রও নাই। কিন্তু প্রকৃত উপাসনায় সে সমস্তই আছে! আমরা এখানে সেই উপাসনার কথাই বলিব যাহা ঐহিক ও পারলৌকিক এবং শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ অভ্যুদয়লাভের অদ্বিতীয় উপায়, সর্ব্বপ্রকার পাপ-সন্তাপের অবসানভূমি মুক্তিরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র সহায়, যাহা সাধনা করিলে সকল চিন্তা চলিয়া যায়, সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্রে একবাক্যে প্রশংসিত সেই অপূর্ব্ব মহিমান্বিত উপাসনার সম্বন্ধে আমরা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনেকে মনে করেন—'উপাসনা' শব্দটি যখন 'উপ+আ+আস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তখন উহার সহজ অর্থ হইতেছে—'নিকটে উপবেশন করা।' দুঃখের বিষয় যে, ব্যাকরণসম্মত এরূপ অর্থ ব্যক্তিবিশেষের সন্তোষকর হইলেও, আর্য্য ঋষিগণ কিংবা প্রাচীন আচার্য্যগণ কোথাও এরূপ অর্থ গ্রহণও করেন নাই এবং অনুমোদনও করেন নাই; অধিকন্তু এরূপ অদ্ভুত অর্থ তাঁহারা কল্পনা-পথেও আনিতে

পারেন নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ এ বিষয়ে অনুকূল বা প্রতিকূল মত প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের উক্তি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, কোন দেবদেবীর নিকটে কেবল আসন করিয়া বসিলে, অথবা শূন্যগর্ভ মন্দিরমধ্যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে উপাসনা হয় না, তাহা তাঁহারা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জানিতেন যে, প্রকৃত উপাসনা অন্তরের বস্তু; অন্তরেই উহার উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিপুষ্টি; বাহিরে তাহার অনুকরণ হইয়া থাকে মাত্র। এই জন্যই তাঁহারা উপাসনাকে এক প্রকার মানসিক ব্যাপার বা চিন্তাবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"উপাসনং নাম সগুণ-ব্রহ্মবিষয়কো মানসঃ ব্যাপারঃ।"

সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে যে মানসিক ব্যাপার বা একাগ্রভাবে চিন্তা, তাহার নাম উপাসনা। এই উপাসনাই মানবকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে পারে এবং পরম মঙ্গলময় শান্তির পথ দেখাইতে পারে।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অশেষ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর রাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া তরুতলশায়ী অকিঞ্চন দরিদ্র পর্য্যন্ত এবং নানা বিদ্যার আকর মনীষী হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর পামর পর্য্যন্ত সকলেই অশান্তির অনলে সন্তপ্ত হইতেছে। এত প্রাপ্তিতেও অভাব ঘুচিতেছে না। প্রত্যেক ব্যক্তির মনই যেন কোনও অবিজ্ঞাত বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত; কিন্তু মন যাহা চায়, তাহা বুঝিতে পারে না, বলিতে পারে না এবং তাহার পরিচয়ও জানে না। অথচ সেই অবিজ্ঞাত হারানিধির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অলক্ষ্যে ভ্রমণ করিয়া কাতর হইতেছে; কিন্তু কোথাও আপনার অভিমত বস্তু পাইতেছে না। তাই রাজা রাজ্যে সন্তুষ্ট নয়, ধনী ধনে পরিতৃপ্ত নয়, ভোগী ভোগসুখে কৃতার্থ নয়। সকলেই লক্ষ্যহীন অবস্থায় অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসে বদনমণ্ডল মলিন করিতেছে। আলোচ্য উপাসনাই সেই অশান্তি অপনয়নের অসাধারণ উপায়। উপাসনাই চঞ্চল চিত্তকে একাগ্র করিয়া দুঃখ-ক্লিষ্ট মানবকে সেই লক্ষ্য-পথে লইয়া যায়।

এই সনাতন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই যত প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। প্রসিদ্ধ মুণ্ডকোপনিষদ্ এ কথাটি অতি সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"

শীকারী যেমন অগ্রে লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়, পরে ধনুতে শরযোজনা করে, অনন্তর শরটিকে লক্ষ্যাভিমুখে স্থির-নিশ্চল করিয়া এবং নিজেও সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক লক্ষ্যবেধে প্রবৃত্ত হয়, সাধক পুরুষও তেমনই প্রণবরূপ ধনুতে আত্মাকে শরের ন্যায় সংযোজিত করিয়া তন্ময়ভাবে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করিবেন, অর্থাৎ পরম লক্ষ্য ব্রহ্মের দিকে তন্ময় বা একাগ্র হইয়া আপনাকে ব্রহ্মের সহিত সংযোজিত করিবেন, ইহাই উক্ত উপনিষদ্বাক্যের অভিপ্রায়।

এখানে প্রণব মন্ত্রটিকে ধনু, আত্মাকে শর এবং ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্যমাত্র বলা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মর্ত্ত্য মানবের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই চরম লক্ষ্য ও অমৃতলাভের উপায়।

মুমুক্ষু মানবকে সেই লক্ষ্য বস্তু লাভ করিতে হইলে প্রসিদ্ধ প্রণব মন্ত্র বা তদনুরূপ কোন একটি 'আলম্বন' গ্রহণ করিতে হয় এবং তদবলম্বনে উপাসনায় অগ্রসর হইয়া সেই লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে হয়। উক্ত বাক্য হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, পরিদৃশ্যমান জগতে জীবগণের যদি কিছু পরম প্রিয় ও লোভনীয় বস্তু থাকে, তবে তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মই সর্ব্বজীবের একমাত্র শাশ্বত শান্তির নিকেতন পরম প্রিয় বস্তু। তাঁহাকে পাইবার জন্যই—অন্তরে অনুভব করিবার জন্যই জীবগণের চিত্ত এত ব্যাকুল ও এত চঞ্চল। অবোধ বালক যেরূপ শরীরগত রোগের নিদান নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতীকারের প্রকৃষ্ট পথ ধরিতে পারে না, দুঃসহ যাতনায় দিনযামিনী অতিবাহিত করে, সেইরূপ মোহান্ধ বিশ্বমানবও আপনার অশান্তির মূল কারণ অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া তৎপ্রতীকারের উপায়পথ স্থির করিতে পারে না, দুঃখময় সংসারারণ্যমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাহারা দুঃখময় দাবানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিতেছে, সেই সকল লোকের নিকট শান্তিময় সুধাস্বাদের আশায় নিরন্তর ধাবিত হয়। ফলে চিরকালই তাহারা নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাসে মুখমণ্ডল মলিন করিয়া স্বভাবলব্ধ মানসিক চঞ্চলতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী, আপনার প্রকৃত হিতাহিত

চিন্তায় অভ্যস্ত, তাঁহারা কখন ঋষিজ্ঞসেবিত পথে চলিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জীবনের যাহা যথার্থ লক্ষ্য—চিরতরে বিশ্রামস্থান, তাহার অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েন এবং যে উপায়ে সে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারা যায়, তাহার দিকে অগ্রসর হয়েন। জীবহিতৈষিণী শ্রুতি তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে", হে জীবগণ, ব্রহ্মই তোমাদের লক্ষ্য—তাঁহাকে পাইলেই সর্ব্বসন্তাপের উপশম ও পরম শান্তি অধিগত হইবে। উপাসনাই সে শান্তিলাভের একমাত্র পথ। তোমরা উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ কর।

চিত্তের বিশুদ্ধি ও তীব্র একাগ্রতা ব্যতীত উপাসনায় অধিকার জন্মে না; সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডেরও আশ্রয় লইতে হয়। এই কারণে হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্ম ও উপাসনা অবিযুক্তভাবে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইলে উভয়েরই তুল্য প্রয়োজন। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত যেমন উপাসনা হয় না, তেমনই উপাসনা ব্যতীতও শুষ্ককর্ম্মে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই কারণেই জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশক উপনিষদের মধ্যেও কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্ম যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে মানবকে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে (ব্রহ্মে) লইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং নিত্য নিরাময় শান্তি-সুখও প্রদান করিতে পারে না, তথাপি কর্ম্মানুষ্ঠান কখনই নিষ্ফলবোধে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। শাস্ত্রসম্মত নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সেই কর্ম্মই মানবের স্বভাবচঞ্চল ও রাগাদি-দোষদূষিত মনকে ক্রমশঃ একাগ্রতার দিকে অগ্রসর করে এবং রাগাদি দোষ অপনয়নপূর্ব্বক শুদ্ধ স্ফটিকবৎ বিমলতাসম্পন্ন করে। এই ভাবেই উপাসনার সঙ্গে কর্ম্মরাশি ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়াই ঋষিগণ কর্ত্তৃক যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি কর্ম্মপদ্ধতি মানবের অবশ্যকরণীয়রূপে বিহিত হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে অতি অল্প পরিমাণেও মনের একাগ্রতা ও বিশুদ্ধি সাধিত না হয়, সেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কখনই মনস্বী সাধকমণ্ডলীর অবলম্বনীয় বা আদরণীয় হয় না ও হইতে পারে না। কারণ, সেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে পণ্ড পরিশ্রম বা লোকপ্রতিষ্ঠালাভ ব্যতীত উপাসনার কোন উপকার হয় না।

আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মই উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য; কিন্তু লক্ষ্য হইলেও ব্রহ্মের অবাঙমনসগোচর—গুণাতীত নির্ব্বিশেষ ভাবটি উক্ত উপাসনার বিষয়ীভূত নহে, পরন্তু তাঁহার সগুণ বা সবিশেষভাবই উপাসনার বিষয় বা উপাস্য হয়। কারণ, 'উপাসনা' কথার মর্ম্মই ঐরূপ, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সগুণ ভিন্ন নির্গুণে উপাসনা হয় না ও হইতে পারে না বলিয়াই তন্ত্রশাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে,—

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্।"

উপাসকগণের উপাসনাকার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়াই ব্রহ্ম নিজে নিজের বিবিধ রূপ (আকার) কল্পনা করিয়াছেন। জগৎই ত তাঁহার কল্পনা। বিবিধ উপাস্য রূপও তাঁহারই ইচ্ছাপ্রসূত, উহা মানবের কল্পনাপ্রসূত নহে। কেবল তন্ত্র বা পুরাণশাস্ত্রই যে এ কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে, স্বয়ং শ্রুতিও তাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপভেদের কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি এক দিকে যেমন ব্রহ্মকে বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" ইত্যাদি। তেমনই আবার ব্রহ্মের সগুণ সবিশেষভাব নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে কথিত আছে যে,—

"দ্বে বা ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ দুই প্রকার;—এক মূর্ত্ত, অপর অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত রূপটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর অমূর্ত্ত রূপটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। জগৎকারণ ব্রহ্ম উক্ত উভয় প্রকার রূপে বিরাজমান।

এরূপ স্বভাববিরুদ্ধ উভয়বিধ ভাব একই বস্তুতে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এ বিস্ময়কর প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। এ বিষয় প্রাচীন আচার্য্যগণ শ্রুতির সাহায্যে সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, জাগতিক বস্তুতে যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির এক একটি শক্তি থাকে, তেমনই ব্রহ্মেও একটি বিচিত্র শক্তি আছে। তাহার নাম মায়া। মায়া অঘটন-ঘটনপটীয়সী। তোমরা যাহা অসম্ভব মনে কর, মায়ার নিকট তাহাও সুসম্ভব হয়। সেই অচিন্ত্যপ্রভাব মায়ার সাহায্যেই ব্রহ্ম এক থাকিয়াও অনেক, অমূর্ত্ত বা অরূপ হইয়াও মূর্ত্ত বা সরূপ হয়েন

এবং নির্গুণ হইয়াও আবার সগুণভাবে প্রকটিত হয়েন। প্রাকৃতিক জগতে এ সকল বিষয় অসম্ভব মনে হইলেও অচিন্ত্যমহিম ব্রহ্মের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁহার প্রভাব ও মহিমা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের চিন্তার অতীত; সেই জন্যই মানব সামান্য জ্ঞান-প্রদীপের ক্ষীণালোকে তাঁহার মহত্ত্ব ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিতে যাইয়া স্বতই বিস্ময়বিমোহিত হয় এবং পদে পদে সংশয় ও অসম্ভাবনার ভীষণ ছবি দেখিতে পায়। তাহাদের সেই বিস্ময় ও সংশয়ের মোহ বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রুতিই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সগুণ ভাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥"

একই বায়ু যেমন বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই বস্তুর আকারে আকারিত হয়, ঠিক তেমনই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্মই বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন আকারে প্রকটিত হয়েন এবং সেই সকল বস্তুর বাহিরেও বিদ্যমান থাকেন। বায়ু ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পরিচ্ছিন্ন বায়ু যাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ হয়েন না, তিনি যাহার মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়েন, তাহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তুল্যরূপে বর্ত্তমান আছেন,—

"স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।"

ব্রহ্মের এবংবিধ সগুণ ভাব বা মূর্ত্তাবস্থা যে মনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত একটা উৎকট কল্পনামাত্র, তাহা নহে, পরন্তু পরমেশ্বরই জীবহিতার্থে অচিন্ত্য মায়াশক্তিযোগে বিবিধ বিচিত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তাঁহার এই মায়াময় মূর্ত্তাবস্থার মধ্যে আমরা দুইটি ভাব দেখিতে পাই। একটি তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বা বিভূতি-সম্পদের আংশিক বিকাশক্ষেত্র, অপরটি কেবল তাঁহার নাম, রূপ বা মহিমার স্মারকমাত্র। প্রথমটিকে বলে 'সম্পদ্' ও দ্বিতীয়টিকে বলে 'প্রতীক।' উভয়েরই উদ্দেশ্য এক— তাঁহার মহিমা ও পরমৈশ্বর্য্য স্মরণ করাইয়া বিষয়াসক্ত জীবগণকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করা। তাঁহার এইরূপ রূপভেদ অনুসারে উপাসনাও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—এক 'সম্পদুপাসনা', অপর 'প্রতীকোপাসনা।' তিনি বিশ্বহিতার্থে যে সকল লীলাময় রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক জগতে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপ অবলম্বনে যে তাঁহার উপাসনা, তাহার নাম সম্পদুপাসনা।

সম্পদুপাসনাস্থলে ক্ষুদ্রকে অবলম্বন করিয়া মহতের উপাসনা করিতে হয়, যেমন রাজপ্রতিনিধিকে রাজা বলিয়া সম্মান করিতে হয়। ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব তখন আবৃত থাকে, তাহাতে আরোপিত মহদ্ভাবই একমাত্র চিন্তাপথে বিদ্যমান থাকে। অবলম্বিত ক্ষুদ্র বস্তুর ন্যূনতা চিন্তাপথে আনিলে মহতের চিন্তা তখন হৃদয়ে থাকিতেই পারে না। অথচ উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে মহতের সেই মহদ্ভাব হৃদয়ে জাগরূক রাখা। যেখানে সে ভাব না থাকে, তাহা প্রকৃত সম্পদুপাসনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রচলিত শ্রীশ্রীদুর্গা, কালী প্রভৃতির উপাসনা এই সম্পদুপাসনারই অন্তর্গত। ঐ সকল দেব-বিগ্রহ মৃৎকাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও, উপাসক যদি অলৌকিক ভাবময় বিগ্রহ চিন্তা না করিয়া সম্মুখস্থ মৃৎকাষ্ঠ-পাষাণের চিন্তা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্গাপূজা বা কালীপূজা হইল না। তিনি যখন উপাসনায় বসিবেন, তখন তাঁহাকে ঐ সকল দেব-বিগ্রহের পার্থিব স্থূলভাব ভুলিয়া যাইয়া অলৌকিক চিন্ময়ভাব মাত্র চিন্তা করিতে হইবে। প্রতীকোপাসনাস্থলেও এই নিয়ম। শালগ্রাম-শিলায় বিষ্ণুর উপাসনা নামে ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি 'প্রতীক' উপাসনার উদাহরণ। ঐ সকল উপাসনাতেও উপাসককে ঐ শালগ্রামকে ও প্রণবাদি নামকে ব্রহ্মভাবে চিন্তা করিতে হইবে। শালগ্রামকে পাষাণ, আর নামকে অক্ষরমাত্র মনে করিয়া উপাসনা করিলে, তাহা পাষাণের ও অক্ষরেরই উপাসনা হইল; বিষ্ণুর উপাসনা হইল না। এরূপ উপাসনা 'সম্পদ'ই হউক, আর 'প্রতীক'ই হউক, কিছুতেই জীবের পরমপ্রিয় ও চরম লক্ষ্য শান্তিময় ব্রহ্মলাভের সহায়তা করিবে না, সুতরাং সেরূপ কার্য্য প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের উদ্দেশ্যবহির্ভূত ও অনর্থকর। অতএব আত্মহিতার্থী ব্যক্তি কখনই তাদৃশ কার্য্যে সময়ক্ষেপ না করিয়া প্রকৃত উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া চিরকৃতার্থ হইবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (মহামহোপাধ্যায়)।

পোলাণ্ড



ক্রাকো—ভিসচুলা নদের বাঁক

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যে সকল দেশ নির্দ্দিষ্ট রাজ-শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সাধারণতন্ত্র শাসনের অন্তর্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে পোলাণ্ড অন্যতম। পোলাণ্ড পূর্ব্বে রুসিয়ার অন্তর্গত ছিল। এখন জনতন্ত্র সেখানকার মূলমন্ত্র। পোলাণ্ডের বিস্তৃতি ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইল। উহার রাজধানী বা প্রধান সহর ওয়ারস। রাজপথগুলি দর্শকের মনে তেমন আনন্দ দান না করিলেও সমগ্র নগরের চারিদিকে মনোরম প্রমোদোদ্যানের সংখ্যা কম নহে। এখানকার অট্টালিকাগুলি সুবৃহৎ, কিন্তু সুদৃশ্য নহে। দর্শকের মন অট্টালিকাগুলির গাম্ভীর্য্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সহরের বহির্ভাগের দৃশ্য চন্দ্রালোক-শূন্য রজনীতেও অপ্রীতিকর নহে, কিন্তু বিরাটাকার অট্টালিকা-শোভিত সহরের রাজপথে দর্শকের চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।



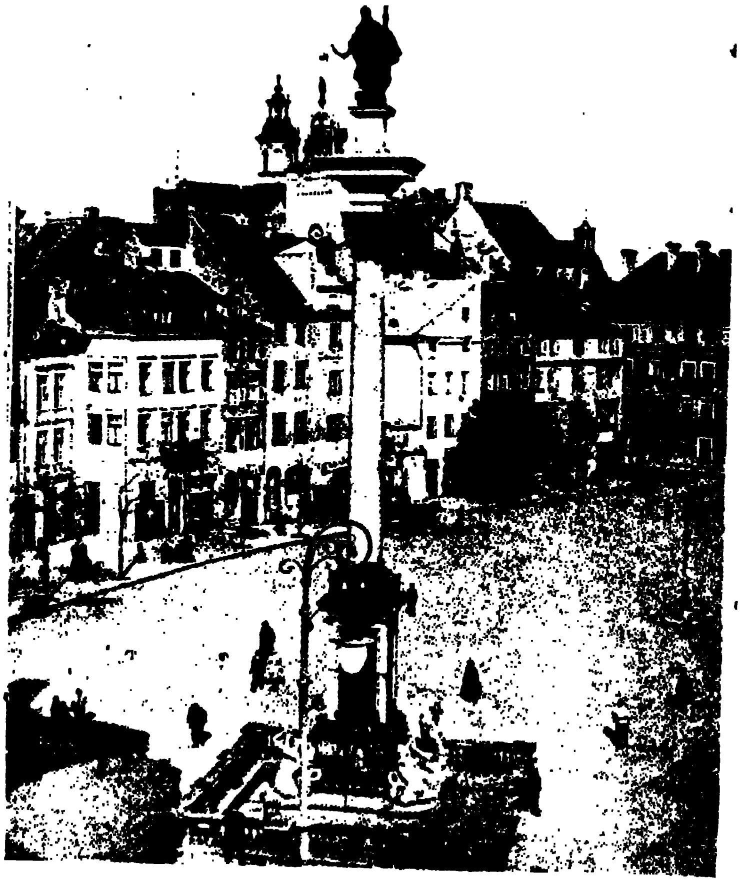
ফলের দোকানের একাংশ

পোলাণ্ডের নারীদিগের সৌন্দর্য্যের

।মর পরিত্রাতার উদ্দেশে প্রত্যেক পথচারী মাথার টুপী খুলিয়া লইয়া থাকে। এমন কি, মোটর-চালকও তাহার একখানি হাত তুলিয়া শূন্যে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তবে সে স্থান অতিক্রম করে।

ওয়ারস নগর বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকদীপ্ত হইলেও এখনও এখানে অশ্বের প্রাচুর্য্য সমধিক। পুলিস প্রহরীরা সুদৃশ্য অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজপথে শান্তিরক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত। অসংখ্য অশ্বযান প্রতি মুহূর্ত্তে রাজপথ অতিক্রম করিয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বেও অশ্ব-যোজিত ট্রাম গাড়ী এখানে বিদ্যমান ছিল।

রাজপথগুলির সর্ব্বত্রই সংবাদপত্র বিক্রয়ের দোকান দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্র-নিচয় ক্রয় করিয়া পাঠকগণ লইয়া যাইতেছে। অসংখ্য চিত্রশোভিত সাময়িক-পত্রসমূহ দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। জোসেফ কনরাড এবং হেনরী সায়ানকিয়েজ



ওয়ারস নগরের রাজপথ

খ্যাতি আছে। পোলগণ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর্ত্তক বলিয়া বিদিত। রাজধানীতে অসংখ্য উপাসনা-মন্দির বিদ্যমান। তন্মধ্যে বহু নির্ব্বাসিত পোল নেতার স্মৃতিফলক দেখিতে পাওয়া যাইবে। রুস সম্রাটের শাসনকালে দেশের জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাদের স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করিবার উপায় ছিল না। রাজধানীর মধ্যে এক স্থানে যীশুর একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, সেখান দিয়া



পোলাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় বিক্রীত হইলেও হেনরী ফোর্ডের "My life and work" এবং ক্লড ফেরীর উপন্যাসগুলির কাট্‌তি তত্ অধিক।

রাজপথের ইতস্ততঃ সিগারেটের দোকান, পানালয় বিদ্যমান। বিক্রেতা অনেক সময় স্কন্ধদেশে সিগারেটের বাক্স ঝুলাইয়া ক্রেতার নিকট উপস্থিত হয়। পানালয়গুলিতে নানাবিধ সরবৎ সর্ব্বদা বিক্রীত হইয়া থাকে। শাক-সব্জী ও ফল-ফলের বাজরা লইয়া পথের ধারে অথবা প্রাঙ্গণে বিক্রেতারী বসিয়া থাকে।

রুস সম্রাটের শাসনকালে রাজধানীর মধ্যস্থানে একটি ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই উপাসনা-মন্দির অত্যন্ত সুদৃশ্য ও কারুকার্য্যখচিত ছিল। যে জমীর উপর এই মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছিল, পূর্ব্বে তথায় পোলাণ্ডের নৃপতিগণ দরবার করিতেন। পোলগণ রুস সম্রাটের নির্ম্মিত এই ধর্ম্ম-স্থানকে অধুনা চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

য়ুরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুস সম্রাটের জন্য ওয়ারসতে একটি প্রাসাদ



ধর্ম্মমন্দিরে যাইবার পথে



বাজারের বাহিরে কৃষীরা কাঁসের প্রতীক্ষা করিতেছে

ছিল। সেই প্রাসাদ এককালে এমনই রমণীয় ছিল যে, ভার্শেলসএর প্রাসাদই শুধু তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এখন পোলাণ্ডের জাতীয় জীবন উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য সমস্ত বিলাস-বৈভবই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক দিন প্রাসাদকক্ষে কত ষড়যন্ত্র চলিত, কত জাতীয় নেতার সর্ব্বনাশসাধনের ব্যবস্থা এই প্রাসাদকক্ষে সম্পন্ন হইত।

পোলাণ্ডের নারীরা একদা স্বহস্তে পশম বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিত। কিন্তু ইদানীং সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া ব্যবসায়ের হিসাবে পশম রঙ্গ করা হইয়া



ওয়ারস নগরের ধর্ম্মমন্দির—নবজাগ্রত পোল ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে

থাকে। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থভবনে তাঁত আছে। সেই তাঁতে রেশমনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। লোয়িজের বস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ।

পোলাণ্ডের উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী নগর উইল্নো। অনেক বড় বড় জমীদার এখানে বাস করেন। তাঁহাদের ব্যবহারে আধুনিকতার ছাপ বিশেষভাবে দেখা যায় না। এখনও তাঁহারা মধ্যযুগের জমীদারদিগের ন্যায় প্রতাপশালী এবং সহজ জীবনযাপন-প্রণালীর পক্ষপাতী।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন বাথোরী একটি ছোট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে বহু প্রতিভাশালী পোল যুবক অধ্যয়ন করিত। মহাযুদ্ধের প্রভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী উপস্থিত হওয়ায় লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এই বিদ্যালয় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে উইল্নোর অধিবাসীরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে তাহারা পৌত্তলিক ছিল। লিথুনিয়ার গ্রাণ্ড প্রিন্স ভ্লাডিস্লস জাগেলো পোলাণ্ড রাজকন্যা যাদিগাকে বিবাহ করেন এবং তাহারই ফলে তিনি পোলাণ্ডের রাজা হয়েন।



গ্রাম্য বালিকা



লোয়েব্দ সুন্দরীগণ

যাদিগার এই বিবাহে পোলাণ্ড-বাসীরা বিশেষ সুখী হয় নাই। কারণ, লিথুনিয়ার প্রিন্স পৌত্ত-লিক, পোলাণ্ড রাজকন্যা প্রেমের স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে বিবাহ করায় লিথুনিয়ার তথা-কথিত অসভ্য জাতি প্রুসিয়া এবং টিউটনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল। যাদিগার এই সুবৃহৎ ত্যাগ-স্বীকারের ফলে লিথুনিয়া ও পোলাণ্ড সম্মিলিত হইয়া একই রাজার শাসনাধীন হইয়াছিল। ইহার ফলে



পোলাণ্ডের পল্লীভবন

গ্রনওয়াল্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পোলাণ্ড বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ এই রাজ-বংশ অসাধারণ শক্তিশালী হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দেশের জন্য যাদিগা ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রেমকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ফলে পোলাণ্ড উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। এই রাজকন্যা পোলাণ্ডের ভাগ্যবিধাত্রীরূপে পরিণামে পূজিতা হইয়াছেন।



মন্থননিরতা গোয়ালিনী



হাঁস-বিক্রেত্রী



ভারসহ মুটে



বিচিত্র-বেশধারী পুরুষ ও নারী

রাজ্যের দীর্ঘকালের শত্রুতা তিরোহিত হইয়া উভয় জাতিকে পরস্পরের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, সর্ব্বত্র

দেশের মঙ্গলের জন্য পরাক্রান্ত লিথুনিয়ারাজবংশের সহিত বিবাহিত হইবার পর যাদিগার ব্যবহারে উভয়



পল্লীসুন্দরী



অশ্বপৃষ্ঠে বলিষ্ঠকায়া নারী

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পোলাণ্ড দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রী ও হ্রী ত্যাগ করিয়া অবশেষে পরপদানত হয়।

ক্যাগেলো রাজবংশের দুই জন শুদ্র— জারটোরিসকি ভ্রাতৃযুগল স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হওয়ায় অন্যান্য পোল সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের ঈর্ষার উদ্রেক হয়। স্বদেশের স্বজাতীয়ের হস্তে পরাজয়ের অপমান ও লাঞ্ছনা অত্যন্ত ভীষণ ও অসহনীয় মনে করিয়া ভ্রাতৃযুগল



সোকোলোকার তরুণী ও বালক

রুসিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয়। পিটার দি গ্রেটের মন্ত্রশিষ্যা ক্যাথেরিণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তিনী হইয়া এই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই।

বন্দুক-বেয়নেট সহ রুস সৈন্য ওয়ারস নগরে পদার্পণ করিল এবং যাহারা জারটোরিসকি ভ্রাতৃযুগলের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিল, তাহাদিগকে 'ডায়েট' বা মন্ত্রণাসভা হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। পোলাণ্ডের রাজ-সিংহাসনে ক্যাথেরিণের প্রিয়পাত্র অধিরোহণ করিল।



বীজ-বিক্রেতার দোকান

ক্রমে জারটোরিসকেরা এমন দেশহিতৈষণার পরিচয় দিতে লাগিল যে, প্রিন্স এডাম জারটোরিসকিকে রুসিয়ার প্রতিভূস্বরূপ রাখিতে না পারিলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে ক্যাথেরিণ তাঁহাকে রুসিয়ায় রাজ-অতিথিরূপে লইয়া গেলেন। প্রিন্স এডাম পরিশেষে ক্যাথরিণের পৌত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেকজান্দারের পার্শ্বচরপদে উন্নীত হয়েন।

রুসের মন্ত্রশিষ্যা রুসিয়ার সিংহাসন অধিকার করিয়া



গ্রাম্য মহিলা, ছবি তুলাইবার পূর্ব্বে



শীতকালের জন্য আলু সংগ্রহ

উইলনোর বিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন এবং তাঁহার পার্শ্বচরকে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। জারটোরিসকি অচিরে উহা শিক্ষা এবং প্রচারকেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল—পোলাণ্ডের স্বাধীনতা-সংস্থাপন। কিন্তু জারটোরিসকি ও পোলাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় অবিলম্বে আলেকজান্দারকে পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ৭০ হাজার পোল যুবক পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনার বেশ ধারণ করিল।

মস্কো নগর অগ্নিসাৎ হওয়ায় যখন নেপোলিয়ানের গৌরব-নক্ষত্র ধূমজালে সমাচ্ছন্ন হইল, তখন পোল ভদ্র সম্প্রদায় বুঝিতে পারিল, তাহারা পুনর্ব্বার ভুল করিয়াছে, যে ঘোড়া বাজী লইতে পারিবে না, তাহার উপর সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিয়াছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানের পর উইলনো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ উহার দ্বারে তালা লাগাইয়া দেন। বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পোলবাসীদিগের চেষ্টায় আবার সেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে এবং যে



কৃষকমহিলা



উইলনোর ধর্ম্মমন্দির



উত্তর-পোলাণ্ড সাট্ ভি মীর।

বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। রুসিয়া, জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া এই ত্রিশক্তির অত্যাচারের চাপে পোলাণ্ডবাসীরা সত্যই জাতীয় জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখনও সকল বিষয়ে তাহার উদ্বোধন হয় নাই।

পোজনান্ সহরে কিছু দিন বাস করিলে পোল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। ওয়ার্‌স বা লো. প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদিগের তুলনায় এই স্থানের অধিবাসীরা কায়মনোবাক্যে পোল। সমগ্র জাতির মধ্যে ইহারাই অধিকতর অগ্রসর।

শিক্ষাপ্রচার এত দিন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল. আবার তাহার পুনঃপ্রচার হইতেছে।

সিলেনিয়া ভিসচুলা নদ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। পোলাণ্ডের প্রান্তসীমায় এই নগর বিদ্যমান। এখানে নগরের ঐশ্বর্য্য তেমন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্দর আছে, তাহাতে ধীবরদিগের নৌকার সংখ্যাই বেশী। এখানে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিকতর পরিশ্রম করিয়া থাকে।

পোল সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত নগরগুলির মধ্যে পোজনান্ অত্যন্ত সভ্য—আধুনিকতার ছাপ এই নগরের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে। জার্ম্মাণ কাইসরের একটি প্রাসাদ এখানে আছে। অধুনা তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। প্রতাপশালী জার্ম্মাণ সম্রাট যে প্রাসাদ-কক্ষে বসিতেন—যাহার শীর্ষদেশে এক দিন জার্ম্মাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইত, এখন সেই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে পোল ছাত্রগণ বসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে লেখকগণ পোলাণ্ডকে 'নবজাগ্রত পোলাণ্ড'

পোলাণ্ড সীমান্তে কার্পেথিয়ান অদ্রিমালা বিরাজিত। উহার একাংশ টাট্রাস্ পর্ব্বতপুঞ্জ নামে কথিত। টাট্রাসে জাকোপেন্ নামক পল্লী অবস্থিত। এখানকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত চমৎকার। যাহারা হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের পীড়ায় কষ্ট পান, এখানকার স্বাস্থ্যনিবাসে আসিয়া তাঁহারা নিরাময় হইয়া থাকেন। পর্ব্বতপুঞ্জের মধ্যে একটি হ্রদ আছে। তাহার জল কাকচক্ষুবৎ নির্ম্মল। হ্রদটি পরম রমণীয়। গোয়াল্ নামক পার্ব্বত্য জাতি জাকোপেনে বাস করে। ইহাদের বেশভূষা বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল এবং সুন্দর। পোলাণ্ডের কুত্রাপি যুবকদিগকে এত সুন্দর দেখা যায় না। যেমন



জোয়েজের কৃষকমাতা ও তাহার পুত্র

সুগঠিত দেহ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, তেমনই সুন্দর। নাসিকা, কান, মুখ সমস্তই মনোরম।

ক্রাকো নগরই পোলাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্থান। ব্যবসা-বাণিজ্য হিসাবে এই নগরই প্রধান। রাজধানী ওয়ারসতে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং নানাবিধ মহামারীর প্রকোপে এই ধনজনবহুল বাণিজ্যকেন্দ্রের শ্রী বহু অংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নগরের চারিদিকে সুরচিত উদ্যান এখনও বিদ্যমান। এমন চমৎকার উদ্যান য়ুরোপের মধ্যে কমই দেখিতে পাওয়া যায়।



পোলপুর কৃষকপরিবার

পান্না ম্যারিয়া গির্জ্জা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতশীর্ষ—সমগ্র পোলাণ্ডে এমন উন্নতচূড় গির্জ্জা আর নাই। ক্রাকো এবং 'ছোট পোলাণ্ডের' সর্ব্বত্রই একটা উজ্জ্বলভাবের স্বাধীনতা অনুভব করা যায়। ক্রাকোর জাতীয় মিউজিয়মে সাইমিরাডকির সুপ্রসিদ্ধ চিত্র, "নিরোর মশাল" রক্ষিত আছে। এই চিত্রে রোমসম্রাট মদ্যপান এবং সুসজ্জিত আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। নিউমিডীয় ক্রীতদাসগণ সেই চেয়ার বহন করিতেছে। সম্রাটের পার্শ্বে তাঁহার প্রিয় পোষা ব্যাঘ্র অবস্থিত। সমগ্র দৃশ্যটি উদ্যানমধ্যে ঘটিতেছে। সম্রাট দেখিতেছেন,



কল হইতে জল সংগ্রহ

অদূরে দাহ্য পদার্থে আবৃত খৃষ্টান দেশপ্রেমিকগণ দণ্ডায়মান। তাঁহার লোকজন মশাল সহযোগে দাহ্য পদার্থে অগ্নিসংযোগ করিতেছে। পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও চিত্রকর সায়ানকিয়েজের অঙ্কিত চিত্র। তিনিও নিরোকে অনুসরণ করিয়া রুস সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা ও বর্ব্বরতার ... অঙ্কিত করিয়াছেন। পোলাণ্ডের জাতীয় মিউজিয়ম ... পোলজাতির দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া ...

...লো নগরের বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ... স্বাধীনতার অবস্থায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ...পকর্ষ প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ... ক্যমেনীয় ছাত্রবৃন্দের জন্য আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় ...ই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

লো নগরের মৎস্যের বাজার দুর্গন্ধপূর্ণ হইলেও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক স্থান। সর্ব্বপ্রকার মৎস্যই প্রায় সজীব অবস্থায় জলপূর্ণ আধারে রাখা হয়। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, সে সেই মৎস্য কিনিয়া লয়।

যুদ্ধের ফলে জেবি পল্লীর বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। অধিবাসীগণ নগ্নপদে টাট্টু ঘোড়ায় গতায়াত করিয়া থাকে। পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্য দেখিলে মন আনন্দরসে প্লাবিত হইবে। এখানকার নারীরা দীর্ঘাকার—দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ ফুট হইবে। কিন্তু শারীরিক গঠন ও বর্ণসৌন্দর্য্য অতুলনীয়। আরবদিগের ন্যায় ইহারা মাথায় বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিতে ভালবাসে। পরিহিত বস্ত্র শুধু বর্ণবৈচিত্র্যবহুল নহে—রুচিকর। অঙ্গে শুভ্র ব্লাউজ—কারুকার্য্যবর্জ্জিত। শীতকালে ব্লাউজের উপর কৃষ্ণবর্ণের কোট পরিধান করে। কোন কোন নারী মেষচর্ম্মনির্ম্মিত কোট ব্যবহার করিতে ভালবাসে। এখানকার নারীরা বেশ সপ্রতিভ; লজ্জা থাকিলেও সঙ্কোচের মাত্রা তেমন অধিক নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

জন্মভূমি

জানি না জননি!—
স্বর্গ কভু আসে কি না নামিয়া ধরণী?
কিন্তু, মা, রচেছি আমি যে স্বর্গ আমার—
অয়ি তোর রম্য বক্ষে,—মর্ত্ত মাঝার—
মুক্ত নীলাকাশতলে পল্লবচ্ছায়ায়,
শ্যাম শষ্পে,—কুসুমিত লতা-বীথিকায়—
যে স্বর্গ রচেছি তোর কাননে, কান্তারে—
গন্ধবহ সঞ্চারিত সুরভি-সম্ভারে,—
তটিনীর নর্ম্ম লাস্যে, বিহঙ্গ-কূজনে—
তুলনা তাহার বুঝি নাহিক নন্দনে!
অমরার স্বর্গ-পিক, মন্দারের শাখে,
গাহে না তেমন বুঝি, রসালের ফাঁকে
বসন্ত-সখার মত; বুঝি মন্দাকিনী
জাহ্নবীর মত নহে পীযূষবাহিনী!
পারিজাত বুঝি তোর বনফুল সম,
নহে স্নিগ্ধ সুরভিত কান্ত মনোরম!

অজানা সে অতীতের অন্ধকার হ'তে
প্রথম যে দিন আমি আলোকের স্রোতে
ভেসে এসে উঠেছিনু এ ধরার কূলে,—
তোরি ধূলি যত্নে মোরে নিয়েছিল তুলে!

তোরি বায়ু বাধাহারা চঞ্চল উদাস
দিয়েছিল জীবনের প্রথম নিশ্বাস;
তোরি আলো দিয়েছিল নয়নে আমার
নবীন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঘুচায়ে আঁধার।
তোরি বন-ফুল-হাসি মধুর সুন্দর
দিয়েছিল এই হাসি চুমিয়া অধর;
তোরি বল্লীবিতানের পত্রের মর্ম্মর
তোরি পাখী-কলতান নির্ঝর-ঝর্ঝর
এই মূঢ় মূক কণ্ঠে দিয়েছিল ভাষা,
তোরি নীলাকাশ মোরে দিল ভালবাসা;

এ আমার হাসি খেলা, এ আমার গান
এ আমার শক্তি, আশা, অন্তহীন প্রাণ
সবই অয়ি জন্মভূমি জননি আমার,
গড়িয়া তুলেছে তোর পূত স্নেহধার!
শৈশবের স্বর্গ মোর কৈশোরের হাসি,
যৌবনের উপবন-ভরা ফুলরাশি—
শান্তিময়ী বারাণসী জড় বার্দ্ধক্যের—
জীবনের পরপারে মুক্তি মরণের,
স্বর্গাদপি গরীয়সী সর্ব্বতীর্থসার—
জন্মে জন্মে কোলে যেন আসি মা আবার!

শ্রীব্রজমাধব মণ্ডল



কবির স্ত্রী



"ও ক'রে কি ছাই মাথামুণ্ডু হবে?" বলিয়াই শেফালি তাহার স্বামীর কবিতার খাতাখানা মুড়িয়া ফেলিল।

"আহা হা—করলে কি? কাঁচা কালি সব জেবড়ে গেল।" সুধাংশুর মুখের উপর একটা অবর্ণনীয় কাতরতার চিত্র ফুটিয়া উঠিল এবং সে চিত্রে যে বিরক্তির রেখারও দুই একটা টান ছিল না, তাহা নহে।

"গেল গেল, বয়েই গেল। কেবল কালি, কাগজ আর সময় নষ্ট বৈ ত নয়! তার চেয়ে ও-বাড়ীর সেজ-ঠাকুর যে দেশলাইয়ের বাক্স করছেন, তাই কর না কেন? হাজারটা ভাঙলে এক টাকা! তবু কিছু ঘরে আসবে—তা না যত বাজে কায।"

"বাজে কায! তা বলবেই ত! উঃ, এর মর্ম্ম তোমরা কি বুঝবে?—বোঝেন এক মেজদা। কারও একটা অসুখ হ'লেও আমাকে বলেন না যে, ডাক্তার-বাড়ী যাও। জানেন, আমার কাযের দাম কি! বাজে কায! পদ্মের কদর ভ্রমরই বোঝে—ব্যাং কি বুঝবে?"

"ব্যাং যা বোঝে, সেই হচ্ছে ঠিক। বোঝে যে 'পাপড়ি'-গুলোকে এমনই ক'রে ধ'রে ছেঁড়াই—"

শেফালি তাহার স্বামীর খাতাখানার গোটাকয়েক পাতা টানিয়া ছিঁড়িবার উপক্রম করিল।

"আরে আরে—কি সর্ব্বনাশ—দাও বলছি—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—ও কি! সত্যিই যে—করো কি? আমার যথাসর্ব্বস্ব—ওগো তোমার পায়ে পড়ি—ওগো, ওগো—"

"আচ্ছা, আজ আর ছিঁড়লুম না, কিন্তু এক দিন আমি ছিঁড়বোই, তা ব'লে দিচ্ছি। রাত বারোটার সময় তেল পুড়িয়ে হিজিবিজি দাগ টানা হচ্ছে। দু' ঘণ্টা হ'ল খাওয়া হয়ে গেছে—তার পর আমরা খেলুম, ঝি-চাকররা খেলে—সারাটা বাড়ী নিশুতি হয়ে গেল, তবু কর্ত্তার হুঁস নেই—ভাবেই মত্ত। নাও, শোবে এসো। এর পর খোকা কেঁদে উঠুক, ভাল ক'রে ঘুমিও এখন।" এই বলিয়া শেফালি সেই দেশবন্ধু মার্কা খাতাখানা সুধাংশুর কোলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সুধাংশু খাতাখানির সদ্য লিখিত পৃষ্ঠাটি বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "না, নষ্ট হয়নি। ভগবান্ রক্ষা করেছেন। এত কষ্টের লেখা কি আর—" বলেই মনে মনে কবিতাটা আওড়াইতে লাগিল এবং খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই শেফালিকে বলিল, "তুমি যাও না, আমি যাচ্ছি।"

"বাঃ, এখনও যাচ্ছি? ওঠো ওঠো—নৈলে আবার চেপে ব'সে যাবে! তখন সারারাত্রেও—ও কি, আবার দোয়াতে কলম ডুবোচ্ছ যে?"

"না, আমি উঠলুম ব'লে। কেবল আর দু'টো লাইন-মাত্র বাকী আছে কি না—"

"থাকুক বাকী, ওঠো। লিখলে যদি ডান হাতের ব্যাপার চলত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। জোর লোকে বলবে বেশ বেশ—তার পর? মাইকেল মরলেন হাঁসপাতালে—রজনী সেন সাগু-বার্লি অভাবে কেঁদে মরলে। সাথে সেজঠাকুর, মা সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দেন না। তাঁর চেলাদের উপর মা লক্ষ্মীর চিরকেলে আক্রোশ।

উপরি-উক্ত কথা বলিতে বলিতেই শেফালি টেবলের উপরকার ল্যাম্পের পলিতা ঘুরাইয়া নামাইয়া দিতে লাগিল।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও—নিভিয়ো না—সব তুলে রাখি আগে। মা লক্ষ্মীর চেয়েও যে তোমার আক্রোশটা বেশী!"

"হবে না আক্রোশ? হবেই ত। ঐ খাতাগুলো আমি দেখতে পারি না।"

"কেন, এমন সুন্দর কাগজ—এমন সুন্দর মলাট—"

"হোক্ সুন্দর—সতীন সে" বলিয়াই শেফালি ফুঁ করিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবা দ্বিপ্রহরে শেফালি ঘরে শুইয়া একখানা নামজাদা মাসিকপত্রের একটা ছোট গল্প পড়িতেছিল। গল্পটা সে বোধ হয় এই দশবারের বার পড়িতেছে।

"এ বাড়ীর ন'বৌ বাড়ীতে আছেন?" বলিয়াই একটি তরুণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে আরও দুইটি সহাস্যমুখী তরুণী। শেফালি তাড়াতাড়ি মাসিকপত্রখানি লুকাইয়া উঠিয়া বসিল; কিন্তু অশোকা 'দেখি ভাই কি পড়ছিলে' বলিয়া মাসিকপত্রখানা এমন টানিয়া বাহির করিয়া সোজাভাবে বসাইয়া খুলিয়া ফেলিল যে, ঠিক্ যে পাতার মধ্যে শেফালির সমস্ত লজ্জা ও লোভ ঘনীভূত হইয়াছিল, সেই পাতাটা বাহির হইয়া পড়িল।

"দেখ, দেখ, কা'র লেখা শেফালি পড়ছিল," বলিয়াই অশোকা একটা নামের নীচে অঙ্গুলী দিয়া মাধুরী ও প্রভার চোখের সামনে ধরিল। মাধুরী সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া শেফালির লজ্জারুণ গালে আস্তে একটা ঠোনা মারিল এবং প্রভা "তাই ত বলি, নৈলে আর কাঁথা শেলাই ভুলিয়েছে।" বলিয়া এমন মুখ-টেপা চোখের হাসি হাসিতে লাগিল, যাহা উচ্চ হাসি হইতেও মানুষকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলে।

অশোকার নিকট হইতে বইখানা কাড়িয়া লইয়া শেফালি প্রভার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ বেশ, তা হয়েছে কি? তোমরা বুঝি আর কখনও পড় না?"

"কি ক'রে পড়বো? আমরা ত আর কবির গিন্নী নই। কবির লেখা সব বুঝতে পারছিলে, না, বুঝি না বুঝি—তবু প'ড়ে সুখ? আচ্ছা, ঐ দেড়শো পাতার মধ্যে দেড়খানি পাতা ছাড়া আর বোধ হয় কিছু পড়বার সময় হয়নি? তা নাই হোক্ গে, এবারকার সংখ্যাটা সোনার জলে বাঁধিয়ে তুলে রেখো, ঠাকুরঘরে।"

"হাঁ গো হাঁ, তোমার আর জ্যাঠামী করতে হবে না।" বলিয়া শেফালি প্রভার ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিল।

"ও ডাক্তারের বৌ কি না, তাই ছুঁচ-ফোটানো বিদ্যেটা বেশ শিখেছে।" বলিয়া মাধুরী অশোকার গা টিপিয়া হাসিল।

"আর তুমি হাকিমের বৌ ব'লে রায় দিয়ে দিলে?" প্রভার চোখে দুষ্ট প্রতিভার আলো চমকিয়া উঠিল।

"দেবে না? হাকিমের কাছে ডাক্তার যে কেঁচোটি। আর কেরাণী যে কেন্নোটি।"

"না, ওর সঙ্গে কথায় কারও পারবার জো নেই—তার চেয়ে পান খাইয়ে মুখ বন্ধ ক'রে দিই।" শেফালি পানের বাটা খুলিয়া সকলের হস্তে এক এক খিলি পান দিল।

"ঘুস? ডাক্তারকে ঘুস? বল না হাকিম, কবির এ অপরাধের কি শাস্তি?" প্রভার এই কথার উত্তর মাধুরী দিবার পূর্ব্বেই অশোকা দিয়া বসিল;—"এর শাস্তি ডাক্তারদের পকেট কেটে ছোট ক'রে দেওয়া, যা'তে বেশী না ধরে।"

"কেরাণী হাকিম হ'লে এমনই রায়ই দেয় বটে। পকেট না কাটলে তা'দের সংসার চল্‌বে কেন?"

অশোকার মুখের উপর একটা কালিমার রেখাপাত হইল, যেমন রৌদ্রদীপ্ত মাঠের উপর দিয়া উড়ন্ত মেঘের ছায়াপাত হয়। "ছিঃ, ভাই, ওঁদের ঠেস দিয়ে কথা কেন?" শেফালি নতমুখে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু প্রভার সে কথা কর্ণে পশিল না, সে তখন বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল। অশোকারও কর্ণে সে কথা পশে নাই, কেন না, তাহার কর্ণমূল তখন আরক্ত। হঠাৎ অশোকা বলিয়া উঠিল; "কেরাণী না হয় গরীব ব'লে পকেটই কাটে, কিন্তু গলা ত আর কাটে না—যা ডাক্তারদের চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবসা। দিলে ছুরী চালিয়ে; তার পর কান্নার রোল উঠুক, ভিজিট না নিয়ে নড়বে না।"

"তা ঠিক, কিন্তু ডাক্তারদের যে সাত খুন মাপ। তারাও কেরাণীর মত বাঁচাও বাঁচাও ব'লে পুলিসের পায়ে তেল দেয় না।"

ব্যাপারটা বড়ই অপ্রিয়তার দিকে গড়াইতেছে দেখিয়া মাধুরী গম্ভীরভাবে বলিল, "কি হ'ল তোদের বল্ ত? তোরা যে মেড়ার চেয়েও বাড়ালি। এই একসঙ্গে চরছে—এই তাল ঠুকে দাঁড়াল। শিং দিয়ে রক্তারক্তি না হ'লে ছাড়বে না। খুব বেড়াতে এসেছিলুম যা হোক্।"

"তা অশোকার দোষ কি ভাই? ইটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়"—শেফালি তেজের সহিত এই কথা বলিল।

"থাম্, কবি, থাম্! তোর ও পচা মামুলী কবিত্ব শিকেয় তুলে রাখ। তোরা যার দিকে ঢলিস্, তার দিকেই ঢলিস্।

কেরাণী তবু পদে আছে—তারা একেবারেই অপদার্থ। তোদের আকাঙ্খীত বস্তু এ কালে আর বিকোয় না—গুরুদাস বাঁড়ুয্যের দোকানে পোকায় কাটে। যা'দের কোন সার আছে, তারা অলস কবি হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে না। পকেট কাটতে হ'লেও একটু বুদ্ধি-সাহসের দরকার; তোদের তা-ও নেই। তোদের আবার মানুষ বলে কে? তোরা একটু কাযে লাগিস কেবল প্রীতি-উপহার ছাপাবার সময়।"

এতগুলো বিশ্রী কড়া কথা প্রভার মুখ দিয়া কখনই বাহির হইত না - যদি না তাহার মস্তিষ্ক ঈষৎ উত্তপ্ত অবস্থায় থাকিত।

যে আঘাতটা অশোকার স্কন্ধেই পড়িত—তাহা পক্ষসমর্থনের দোষে পড়িল শেফালির স্কন্ধে। শেফালি এক মুহূর্ত্তের জন্য গৃহাগত বন্ধুর প্রতি শিষ্টাচারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া দলিতা ফণিনীর মত ফণা উন্নত করিল। এ ত তাহার নিজের উপর আক্রমণ নহে, এ আক্রমণ যে সুধাংশুর উপর। এ আক্রমণ সে কি করিয়া নীরবে সহ্য করিবে? সে স্বামীর যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য গর্ব্বিত কণ্ঠে উত্তর করিল,—"কি বল্লি প্রভা—কবিরা মানুষ নয়? তা ঠিক। তাদের মনুষ্যত্ব বোঝা তোদের মত ডাক্তারের কায নয়। তোরা পেটের চাকর, ইন্দ্রিয়ের দাস, টাকার গোলাম। তোরা জানিস্ সংসারে এক সার পদার্থ আছে জড়। তোদের জড়বুদ্ধি সাধারণ মনেরই সন্ধান পায় না, কবির মনের সন্ধান কি পাবে? তোরা মড়া চিরে চিরে মনে ভাবিস্, স্নায়ু, পেশী, হাড়ই মানুষের সব তার পিছনে আর কিছুই নেই। জানিস্, তোদেরই কত বিদ্যাবিশারদ কবি রবীন্দ্রনাথকে এক মিনিটের জন্য বিনামূল্যে দেখতে পেলেও ধন্য হয়ে যায়? সেই কবির জাতকে নিন্দা করিস্ তুই? তারাই জগতের আলো। তারাই জগৎকে সুন্দর, পবিত্র, মহৎ ক'রে রেখেছে। হোক্ তারা নিঃস্ব, হোক্ তারা নিরীহ, তাদের কলমের প্রতাপে রাজার আসন টলে, অত্যাচারীর হাত থর থর ক'রে কাঁপে। তাদের একটা কবিতার ছত্র মুখে নিয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ জয় করে, তাদের একটা অলৌকিক বাণী শাস্ত্রকারের শাস্ত্র উল্‌টে দেয়। তাদের সম্মান হাকিম, ডাক্তার, কেরাণীর অনেক উপরে। আমার বড় গর্ব্ব যে, আমি কবির স্ত্রী।"

শেফালি নীরব হইবার পর ক্ষণেক সকলেই নীরব রহিল। তাহার পর মাধুরী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"শুনলি ত প্রভা বক্তৃতা? এর আর উত্তর দিতে যাস না, পারবি না। ব্যারিষ্টারেও এমন বক্তৃতা দিতে পারে না।"

অশোকা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—"রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আবার শুনি।"

ইতোমধ্যে প্রভা অনেকটা আত্মসংবরণ করিয়া লইয়াছে। সে তাহার মুখখানাকে কৌতুকোজ্জল করিয়া লইয়া বলিল -"ঠিক বলেছিস্—টুকে নিতে পারলে হতো—ছাপিয়ে দিতুম—নগদ মূল্য এক পয়সায় বিক্রী হতো।"

শেফালি মেঘনির্ম্মুক্ত দিনের মত পরিষ্কার হাসিয়া বলিল,—"তা নাও না টুকে—আমার মনেই আছে।"

"না!—আর এক দিন এসে টুকে নেব। আজ আবার এদের পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরলে তবে সেই গাড়ী নিয়ে ডাক্তার বেরোবে। তা ছাড়া তোর বড় গর্ব্বের কবিও হয় ত এখনই মলয়-পবনের মত হুস্ ক'রে এসে পড়বেন। তুই ততক্ষণ তাঁর জন্যে একখানি সূর্য্যমুখী-ফুলের সোহাগ-মাল্য গেঁথে প্রস্তুত হ।"

"হঃ, সোহাগমাল্য গাঁথবে না আরও কিছু! যে বকুনি-মালা রোজকার বরাদ্দ আছে, সেই যথেষ্ট।"

"এঁ্যা, সে আবার কি? অভিমান? তা করতে পারিস। কেন তিনি সারাটা দুপুর তাঁর মুগ্ধা প্রেয়সীকে এত বিরহ-ক্লেশ দিলেন? সে যে তাঁর গল্প ছাড়া পড়ে না, তাঁর প্রশংসা ছাড়া করে না।"

"নে, রাখ ভাই তোর অন্তরটিপনী। এমনই গা জ্ব'লে যাচ্ছে।"

"কেন কেন? পিত্তিতে না কি? আচ্ছা, আমি ডাক্তারের স্ত্রী, ওষুধ ব'লে দিচ্ছি, চৌবাচ্চার জলে অবগাহন ক'রে ঠাণ্ডা হ।"

"সমুদ্রের জলে অবগাহন করলেও কিছু হবে না। এ ঝক্কি যদি তোদের পোহাতে হ'ত ত বুঝতিস্। দেখ না, সেই ছুট মুখে দিয়েই কোথায় বেরিয়েছে দাবা পিটতে। তার পর সন্ধ্যাবেলা এসেই বসবে খাতা-পত্তর নিয়ে। ব্যস্, চুকে গেল—দাবা আর কবিতা। সংসার ভেসে যাক্, পুড়ে যাক্, ভ্রূক্ষেপও নেই। বলিস্ ত তোদের কর্ত্তাদের, যদি ঐ বেকার ভবঘুরে লোকটার একটা কায জুটিয়ে দিতে পারে।"

"ছি ছি—তা হ'লে কার কবিতা মুখে নিয়ে সৈন্যরা যুদ্ধজয় করবে—কার অলৌকিক বাণী শাস্ত্রকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবে ?"

"ভূতের। আজ যদি আমি তার খাতা-পত্তরগুলো না পোড়াই ত কি বলেছি।"

"সত্যি না কি ?"

"তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা, এই দেখ" বলেই শেফালি তাকের উপর হইতে কতকগুলা বাঁধানো খাতা দুম্ দুম্ করিয়া টানিয়া নীচে ফেলিতে লাগিল।

"তোদের মনের খবর পাওয়া দায়—" প্রভা অভিনয়ের ভঙ্গীতে এই কথা বলিল।

"কিন্তু আরও দায়, যদি না এখনই পালাই। এর পর যখন কবি ক্ষতিপূরণের নালিশ করবে, তখন আমাদেরই উঠতে হবে সাক্ষীর কাঠগড়ায়" এই কথা বলিয়া মাধুরী প্রভা ও অশোকার আঁচল ধরিয়া টানিল।

"ও বাবা, তা আমি পারবো না—বিশেষ ক'রে তোমার কর্ত্তার সামনে।"

অশোকার এই মধুর টিপ্পনীর পর সখীত্রয় হাসিতে হাসিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

*　*　*　*　*

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। সুধাংশুর সমস্ত রচনা-পুস্তক অগ্নিসাৎ হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে শেফালি সেগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া তাকের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে, সেগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

শেফালি ঝাড়ন লইয়া ঘরের ধূলি-জঞ্জাল পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার কপালের ঘর্ম্মসিক্ত চূর্ণ-কুন্তলগুলি বুঝাইয়া দিতেছিল যে, তাহার পরিশ্রম নিতান্ত অল্প হয় নাই।

"বেলা—বেলা—এ দিকে আয় ত"—শেফালি শাণিত গলায় ডাকিল। 'যাই বৌদি' বলিয়া একটি দশ বছরের বালিকা ভয়কুণ্ঠিত পদে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই টুকরো কাগজখানা আঁচলে বেঁধে রাখ ত—তোর দাদা এলে দেখাস্।"

"এ কি বৌদি ? থিয়েটারের টিকিট না কি ?"

"দূর দূর, একখানা বাজে কাগজ।"

"তবে ফেলে দাও না—মিছিমিছি কেন বয়ে নিয়ে বেড়াব ?"

"আঃ—তুই ভারি বদ্ হচ্ছিস্। অত কথা কাটিস্ কেন না ? তোর দাদার হাতের লেখা যে—যদি দরকারী কিছু হয় ?"

"ওঃ, আচ্ছা" বলিয়া বালিকা কাগজের টুকরা লইয়া পলায়নোদ্যতা হইতেছিল, কিন্তু শেফালির সস্নেহ তর্জ্জনে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"তোর কেবলই যাই যাই—সবটা শোন্ আগে। খেলা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যদি উনি জিজ্ঞাসা করেন, এ কাগজ কোথায় পেলি ?"

"বলব, তুমি দিয়েছ।"

"যা ভেবেছি—তা নয় রে বোকা মেয়ে, তা নয়। বলবি, তুই ঘর ঝাঁট দিতে দিতে কুড়িয়ে পেয়েছিস্—কেমন, মনে থাকবে ত ?"

"হুঁ—ভারি ত কথা" বলিয়া বেলা উঠানের দিকে দৌড় দিল।

"দেখিস, যেন ভুলিস না—আর যদি হারাস ত টের পাবি মজাটা।"

শেফালি ঝাড়ন রাখিয়া হাই তুলিল। তাহার পর আয়না, চিরুণী, সিন্দূর-কৌটা, চুলের কাঁটা, ভিজে গামছা প্রভৃতি উপকরণ লইয়া বৈকালিক প্রসাধনে নিযুক্ত হইল। তৈলচিক্কণ কেশের ফিতাটাকে মুক্তাধবল দশনপাতি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া সে ত্রিবেণীর একটি বেণী ক প্রায় রচনা করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় সদ্যোনিদ্রোত্থিত খোকা বাবু গুট গুট করিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া বসিল। নিশ্চিন্ত-চিত্ত মাতাকে নিজের আগমনবার্ত্তার কোনরূপ আভাস না দিয়াই সে নিজের একটি যোগ্য কার্য্য খুঁজিয়া বাহির করিল। পার্শ্বেই হাত-বাক্সের উপর তাহার পিতার একখানি নীল মলাটের খাতা ও সরঞ্জ কলমদানী দেখিতে পাইয়া তাহার কচি মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল। সে বিজ্ঞের মত পা ছড়াইয়া খাতাখানিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল এবং একটা কলমের ভোঁতা মাথাকে দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া কিছুক্ষণ তাহার অসন্দিগ্ধ মাতার অঙ্গুলীলীলা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ সাধু সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া সে খাতার পত্রগুলি উল্টাইতে

লাগিল এবং একটি মনঃপূত পৃষ্ঠার উপর এমন সশব্দে কলম চালাইতে আরম্ভ করিল যে, শেফালি চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

"ও—মা—গো" এই তিনটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া শেফালি ক্ষিপ্র হস্তে তাহার পুত্রের হাত হইতে কলম ও খাতা কাড়িয়া লইল এবং বিস্ময়বিমূঢ় শিশুর নধর গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিল। অমনই একটি সুদীর্ঘ 'ভ্যা' শব্দে সমস্ত ঘরটি মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ভেদ করিয়া উঠিল শেফালির আত্মধিক্কার—"পোড়া চোখে সব দেখলুম, এইখানটাই দেখলুম না।" কিন্তু এ আত্মধিক্কার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, সহসা আত্মধিক্কার এই ভাবে রূপান্তরিত হইল, "আর ছেলেও কি বজ্জাত—ক্ষুদেও যে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সোয়াস্তিতে থাকবো, তার জো-টি নেই।" এমন সময় দালানে জুতার মসমস্ শব্দ শুনা গেল। শেফালি নিজে চুপ করিয়া ছেলের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া বলিল, 'চুপ।' তাহাতে চুপ করা দূরে থাকুক, ছেলে দ্বিগুণ উৎসাহে কাঁদিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে? খোকা কাঁদছে কেন?" সুধাংশু প্রশ্ন করিতে করিতে কক্ষে প্রবেশ করিল।

"কি আবার হবে? মেরেছি।"

"আহাহা—করেছিল কি? গালটা যে একেবারে ফুলে উঠেছে।" শিশু 'মা' বলিয়া সুধাংশুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

"মা—মেরেছে? এস বাবা, কোলে এস।"

সুধাংশু পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার মুখে দুই একটি সান্ত্বনার চুম্বন দিল। শেফালি "করেছিল কি, এই দেখ" বলিয়া খাতার মসীলিপ্ত পৃষ্ঠাটিকে খুলিয়া দেখাইল।

"এঃ—মেরেছে—কলমদানীটাকে তুলে রাখনি? খাতাই বা পেলে কি ক'রে?"

"ও আর পাবে কি ক'রে? আমিই দিয়েছি। বল্লুম, ভাল ক'রে লেখ ত সোনা, তোমার বাবা যেমন ক'রে লেখে। তা এমনই হতভাগা ছেলে, এক পাতা লিখে আর লিখলে না। কাজেই মারলুম এক চড়।"

"নাঃ শেফা, তোমারই জিৎ। আমি আজ থেকে লেখা ছেড়ে দিলুম।"

তুমি ত রোজই একবার ক'রে ছাড়ছো।"

"না, সত্যিই ছাড়লুম। কাল থেকে আপিসে যাব।"

"আপিস! সে আবার কি?"

"একটা চাকরী নিয়েছি। অন্য সময় হ'লে সাধলেও নিতুম না—কিন্তু এখন আর—বুঝেছি, টাকাই সব চেয়ে বড়।"

"মাইনে কত দেবে?"

"এখন দেড়শো—তার পর কায ভাল দেখাতে পারলে—"

"মোটে দেড়শো—দুশোও নয়?"

"আমার মত লোকের আর কত?"

"কেন, তুমি কি একটা ফেল্না লোক না কি? দেশজোড়া তোমার নাম। কটা লোক তোমার মত লিখতে পড়তে—"

"সে সব ত বাজে কায—"

"আচ্ছা আচ্ছা—কতক্ষণ সেখানে থাকবে?"

"সকাল ৯টায় যাব—আসবো রাত্তির ৯টায়।"

"এঁ্যা, বারো ঘণ্টা! কায নেই অমন চাকরীতে।"

"না না, তুমি বুঝছো না—দেখতেই বারো ঘণ্টা—খাটুনি মোটেই নেই—কেবল হাজরে দিয়ে ব'সে থাকা।"

"তোক যে তোমার ব'সে থাকা—নিজের কায করবে কখন?"

"নিজের আর কি কায?"

"এই যা লেখো টেখো।"

"সে সব ত বাজে কায।"

"আঃ, বাজে কায ব'লে কি আর করতে হবে না? অনেক দিনকার অভ্যাস ত। হঠাৎ ছেড়ে দিলে যদি একটা অসুখ-বিসুখই করে।"

সুধাংশু খুব এক চোট হাসিয়া বলিল, "তবে কি করতে বল তুমি?"

"কি আর বলবো? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে সাত তাড়াতাড়ি চাকরী নেওয়া। কেন রে বাপু। এমন নয় যে সংসার চলছে না—রোজগার করতেই হবে যে ক'রে হোক। সব খরচই ত মেজঠাকুর দিচ্ছেন—আজ সাত বছর ধ'রে—বলেছেন কি যে, আমি আর পারব না?—এখন ছেড়ে দেওয়া যায় না?"

"তা আর যাবে না কেন? না গেলেই হ'ল। কিন্তু আমি যে খান দুই বই ছাপাবো মনে করেছি। ছাপালে আর কিছু না হোক্, নাম-যশটা হবেই—আর বরাতে থাকে ত—কিন্তু ছাপাই কি ক'রে? ফি হাত কি মেজদার কাছে চাওয়া যায়? সংসারখরচ দিচ্ছেন, সেই যথেষ্ট।"

"কত লাগবে ছাপাতে, বল না?"

"তিনশো টাকার কম নয়।"

"তিনশো টাকা! আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন? আমার ত দু জোড়া চুড়ী আছে—এক জোড়া তোলাই থাকে। সেই জোড়া নিয়ে বাঁধা দাও গে। গড়তে সাড়ে চারশো লেগেছিল বাঁধা দিলে কি আর তিনশোও দেবে না?"

"না—না—না, কি বল্‌ছো তুমি? তোমার গয়না—ও আমি পারব না—একখানা গড়াতে পারি না—"

"কি মুস্কিল, আমি ত আর বেচতে বলছি না—এর পর বই বিক্রী হ'লে সেই টাকা দিয়ে খালাস ক'রে এনো—গয়না লোকের থাকে কি জন্যে? সময় অসময়ে লাগবে বলেই ত?"

"কিন্তু বই বিক্রীর টাকা যে বড়ই অনিশ্চিত।"

"কি কথাই বল্লে? নিশ্চিত আর পৃথিবীতে কোন্‌টা আছে? চাকরীও নয়—প্রাণটাও নয়। যাও যাও—যা বলি, তাই শোন।"

"কিন্তু চাকরীটা করলে—"

"আবার চাকরী! তোমার মোটেই বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই! কি ক'রে থাকবে? অত কবিতা লিখলে কি আর—তা তুমি ত ও ছাই লেখা ছাড়বে না, আমিও ছাড়াতে পারব না। লাভে হ'তে দুদিনের জন্য ছাড়িয়ে কেন দোষের ভাগী হই। ও পোড়া সতীন নিয়ে আমায় ঘর করতেই হবে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

বিদায়-বাণী

নয়নের জলে বন্ধু তোমারে দিয়েছি বিদায় দিয়েছি;
কই নাই কথা, মনোব্যথা মনে চেপে আমি নিয়েছি।
কি আর তোমায় কহিব, নিদয়ে,
এতটুকু মায়া নাই ও হৃদয়ে,
এত দিন শুধু পাষাণ নিঙাড়ি' তিয়াসার বারি পিয়েছি।
তাই আঁখিনীরে ভাসিয়া নীরবে দিয়েছি বিদায় দিয়েছি।

মনে কর বধু কোনো দিন কেহ চাহেনি তোমার পানে,
তুমি একাকিনী র'তে নিশিদিন-ই পুলক-বিহীন প্রাণে।
মনে কি পড়িবে আজিকে তোমার,
কে আসি প্রথমে খুলিল দুয়ার,
বন্দিল তো'মা 'সুন্দরী' বলি সবুজ হিয়ার টানে?
সেই সে প্রথমে, যখন কেহই চাহেনি তোমার পানে!

এখন না হয় হয়েছে তোমার ভুবন-ভোলানো মূরতি,
মধু সুধা লয়ে অগুত ভক্ত, করে শ্রীচরণে আরতি,
এখন না হয় পুলক তোমার,
ঘিরেছে সুন্দর-নিলয় দুয়ার,
তা ব'লে নিঠুরা, এমনি করিবা স্মৃতি হ'তে যাতো বিরতি?
প্রথম যে জন ধরি' ও চরণ করিল প্রথম আরতি—
তাহার আনন হয় না স্মরণ? ও কি ও নিঠুর মূরতি!

আনো একবার স্মরণে তোমার সে শুভ-রাত্রির কথা,
অশেষ পুলক-আশিসের মাঝে বারেক সে দি'ক বাধা,
সেই সুমধুর গোধূলি লগন,
জ্যোৎস্না-প্লাবন, সুনীল গগন!
মঞ্চে আকুল বাজে নহবৎ জাগিছে চঞ্চলতা!
আনো একবার স্মরণে তোমার সে শুভ রাত্রির কথা।

ত্রিভুবনময় উৎসব হয় সে দিন সাঁঝের শেষে,
একা এক কোণে সঙ্কোচে, লাজে, এল কুণ্ঠিত কে সে?
অবগুণ্ঠিত সরোজ-আনন,
কে জানে কি মনে করিছে 'মানন',
সুনীল নিচোল চঞ্চল হ'ল জ্যোৎস্না আকুল হেসে!
নধর অধরে মাধুরী ভরিয়া কে আসিল ভালোবেসে!

তখনো সে জন শেখেনি কেমন প্রণয়ের কথা কহে,
সুগোপন দুখে, নীরব সরমে মরমে মরমে দহে।
বিবাহ-রাত্রির অমৃত-আলোকে,
'হুলু' ধ্বনি মাঝে শিহরি' পুলকে,
লজ্জা-রঞ্জিন অতুল সুষমা ফুটিয়ে দেহে বহে।
সে যে গো তখন নব-তরুণীর সোনার স্বপনে দহে।
আজিকে তাহার সেই রজনীর দেনটাটি কেহ নহে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বকর্ম্মা দাদা

(প্যালারামের ডায়েরী হইতে)

ভূমিকা

প্যালারামের দাদা বিশ্বনাথ যখন গোটা পঁচিশ বৎসর য়ুরোপ ও আমেরিকায় কাটাইয়া ইংরাজী বর্ণমালার অক্ষর কয়টিই নিজের নামের পিছনে জুড়িয়া এঞ্জিনীয়াররূপে দেশে ফিরিয়া কারখানা খুলিয়া ফেলিলেন, তখন সকলে তাঁহার আসল নাম ভুলিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল।

তিনি দেশে ফিরিয়া দেখেন—পঁচিশ বৎসরে দেশের অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। আগে লোকরা বিনা পয়সায় কায করিয়া যাইত, এখন পয়সা দিয়াও লোক পাওয়া শক্ত। আগে যেখানে পয়সা দিবার লোভ দেখাইয়া বাড়ীতে লোক আনিতে হইত, এখন সেখানে পয়সা দিয়াও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না।

এই সকল নানা কথা ভাবিয়া দাদা মাথা খাটাইয়া এক নূতন কায়দায় এমন এক বাড়ী করিয়া ফেলিলেন, যেখানে অল্প যায়গার মধ্যেই সব কায হইতে পারে এবং যেখানে খাবার দেওয়া হইতে বিছানা করা পর্য্যন্ত সকল কাযই বিনা চাকরে কলের সাহায্যেই সম্পন্ন করা যায়।

এই বাড়ী প্রস্তুত হইবার পর প্যালারাম ও তাঁহার দাদা শুভ ১লা বৈশাখে সেই গৃহে প্রথম পদার্পণ করিলেন। এই ১লা বৈশাখ হইতেই প্যালারামের "ডায়েরী" সুরু হইয়াছে।

ডায়েরী

১লা বৈশাখ। আমাদের এ নতুন বাড়ীটা বেশ সুন্দর দেখছি। এ বাড়ীতে চাকরের তেমন দরকারই হয় না। তাদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে আর মাথাও ধরাতে হবে না। বাঁচা গেল!

কতবার আমি নিয়মিত 'ডায়েরী' লিখব ভাবি, কিন্তু কাযের ঝঞ্ঝাটে তা' আর হয়ে ওঠে না। যাক্, এ বাড়ীতে আসায় এবার থেকে ত' অনেক সময় বেঁচে যাবে—তখন আমি ডায়েরীটা লিখব। আজ কি বিষয় লিখব? বেশ ত', বাড়ীটার বর্ণনাই একটু লেখা যাক।

বাড়ীটা একেবারে সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় তৈরী। চাকরের দরকারই নেই। রোজ রোজ চাকরদের সঙ্গে যে খিটমিটি করতে হ'ত, এত দিনে তা থেকে যা হোক্ নিষ্কৃতি পেলুম। ভাবছিলুম যে, ভোলা, রাজু আর রামাটা কায ছেড়ে চ'লে গেলে, কায চলবে কি ক'রে? যাই হোক্, এত দিনে সে ভয়-ভাবনাটা কেটে গেল। আজই বানর তিনটেকে দূর ক'রে দেব। জ্বালিয়ে মারলে।

ভোলাটা ত' একটা গাধা। বার বার বুঝিয়ে বলি যে, "দেখ্ ভোলা, শাক-চচ্চড়ি আর লাল চালে যা 'ভিটামিন্' আছে, তা' সাদা চালের চোদ্দপুরুষেও নেই।"

তা হবে না, নবাবের সাদা ভাত চাই। আবার ভয় দেখান হয়—'এমন খাবার দিলে কায ছেড়ে চ'লে যাব।'

ভারী ত' তোর তোয়াক্কা রাখি যে, ভয় দেখাস্। 'ভিটামিন্' খাইয়ে উপকার করছি ব'লে কোথায় কৃতজ্ঞ হবি, তা' না, শাক-চচ্চড়ি খেয়ে থাকতে পারব না' ব'লে ভয় দেখান। কলিকাল আর কাকে বলে? মর্ গে যা সব সাদা ভাত খেয়ে!

রাজুটা ত' আস্ত হাঁদা। বাপু, জানিস্ নে কি যে, ঘি আর তেলেতে কি ভয়ানক ভেজাল চলেছে। তাই জন্যেই ত' আলুসিদ্ধ আর ভাতের ব্যবস্থা করেছি। তা নয়! ঐ তেল আর ঘিয়ে রাঁধা খাবার চাই-ই চাই। আচ্ছা, মগজে কি কিছু আক্কেল নেই? আমি যে ডাক্তার হ'তে চলেছি, আমি কি ক'রে কোন্ মুখে ওকে ঐ বিষগুলা খেতে দেব? বাবুর তাই "গোসা" হয়েছে, বাবু আলুসিদ্ধ খেয়ে কাম করতে পারবেন না। বুদ্ধির বলিহারি যাই!

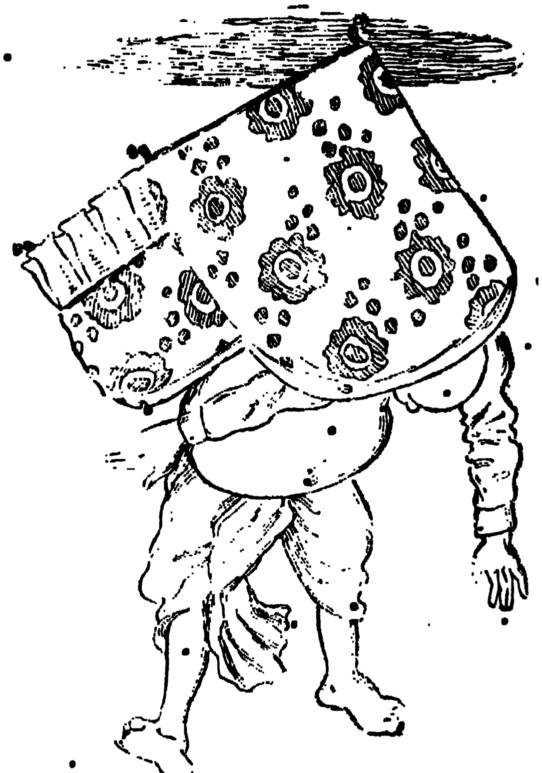
আর রামা? তার কথা না বলাই ভাল। বেটা পয়লা নম্বরের মুখ্খু। তাঁর দু'বেলা ভাত খেয়ে পেট ভরে না, দু'বেলা জলখাবারের পয়সা চাই। দোকানের ধুলো আর বিষে ভরা খাবারগুলা না খেলে কি মনুষ্যজন্মই বৃথা হ'ল?

যাক্ গিয়ে, মরুক্ গিয়ে, না-ই বা রইল কোন চাকর। আমাদের আর চাকরের দরকারও নেই। 'কল'ই চাকরের বাড়া কায করবে। 'কলের ভাবী' এ গরমের দিনেও আমাদের

না জল যোগাবে,মানুষের খাবারও তা যোগাবার সাধ্য নেই। কলেতেই অনায়াসে আমাদের খাবার তৈরী হ'তে পারবে। উনুনও ত কল টিপলেই ধ'রে যাবে। তার পর দিব্যি কলের বিছানায় ঘুম দেওয়া যাবে,—খালি তাই নয়, দরকার হ'লে বিছানাই আবার দরকারমত ঠিক সময়ে 'জাগ সবে জাগ' গান করতে করতে একেবারে মাটীতে দাঁড় করিয়ে দেবে। কি সুন্দর বন্দোবস্ত! চাকরজাতীয় জীবের যে পৃথিবীতে কোন দরকার আছে, তা' আর মনেই হয় না। সত্যই, বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছে বটে!

২রা বৈশাখ। সত্যই, এ কলের বাড়ী পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য। নিত্যই নতুন নতুন কাণ্ড দেখছি। লোককে বসাবার জন্য তোমার আর বৈঠকখানায় যাবার দরকারও নেই। যদি কোন বন্ধু-বান্ধব বা ধনী আত্মীয়স্বজন আসেন ত বৈঠকখানার দরজা কেমন আপনিই খুলে যায়, ডাক-হরকরা এলে কেমন একটা কলের হাত বেরিয়ে চিঠিগুলা নিয়ে আবার ঢুকে যায়, কিন্তু আবার কোন পাওনাদার কিংবা কোন গরীব আত্মীয় টাকা আদায় করতে এলে হাজার ঠেলাঠেলিতেও দরজা কিছুতেই খোলে না। ঠিক মনে হয় যে, যেন দরজা বুদ্ধি করেই এ সব কায করছে। বেশ সুন্দর জিনিষ!

৩রা বৈশাখ। আজ দাদার মেজাজ বেজায় খারাপ। সেটা বোধ হয়, কাল সারারাত তাঁকে কলের বিছানার সঙ্গে না ঘুমিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বলেই হয়েছে। বিছানাটায় ঠিক যে কি দোষ হয়েছিল, বুঝতে পারলুম না, সম্ভবতঃ কোন যায়গার কল বিগড়ে গেছে, কারণ, কলে কাল দাদা যত বার বিছানাটা পেতে শুতে গেছেন, তত বারই বিছান টা গেয়ে উঠেছে 'জাগ সবে জাগ আজি পুণ্যদিনে', আর তার পরই দাদাকে মাটীতে ফেলে দিয়েই আপনিই গুটিয়ে গেছে। এতে মেজাজ খারাপ না হয়ে কি করবে বল? সারাদিন খেটে খুটে ক্লান্ত হয়ে সবে আরাম ক'রে শুয়েছে, একটু একটু তন্দ্রা আসছে, এমন সময়ে মনে কর—'জাগ সবে জাগ আজি পুণ্যদিনে' গানটা সুরু হয়ে হাত ছুঁড়ে তোমায় মাটীতে ঠেলে ফেলে দিয়েই বিছানাটা তৎক্ষণাৎ আপনা আপনি গুটিয়ে গেল। সে দিনের মত আর তুমি শুতে পাচ্ছ না। এতে মেজাজ ভাল থাকে কি ক'রে? দাদা বেচারী ত শেষে অনেক ক'রে হাতুড়ী দিয়ে পিটে ২।৪টা কল ঠিক ক'রে ফেল্লেন, তবে বিছানাটার বিদ্‌কুটে গান বন্ধ হ'ল। কিন্তু ফলে সে রাত্রির মত দাদার ঘুম চ'ড়ে গেল। অবশেষে ভোরের দিকে একটু ঘুম আসাতে শুয়েছেন, এমন সময়ে আর এক কাণ্ড



ফেলে ফেলে দিয়ে বিছানাটা আপনি গুটিয়ে গেল

বাধায় তাঁকে আর ঘুমাতে হ'ল না। আমরা ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য একটা বুড়ী দাসী রেখেছি। এই বাড়ীর এই একটা অভাব—ঝাড়-পোঁছ করবার কল নেই। ঝাড়-পোঁছ হয় নিজেকে, নয় ত দাসী-চাকরকে দিয়ে করাতে হবে। তবে আশা আছে, আর বছর কতকের ভিতর ঝাড়পোঁছের কল বেরোবে। যাই হোক, দাদা ভোরের দিকে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু শুয়েছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আমরা শুনি যে, সে বুড়ী হাঁউ মাউ ক'রে চেঁচাচ্ছে। ব্যাপার কি দেখতে দাদা তক্ষনি ছুটে গিয়ে দেখেন যে, আমাদের বাড়ীর সামনে যে কলের দরোয়ান আছে, সেটা প্রাণপণে বুড়ীকে ঠ্যাঙাচ্ছে। দাদা গিয়ে কল বন্ধ ক'রে দিলেন, তবে সে রক্ষা পায়। বুড়ীটা না জেনে সদর-দরজার হাতল ধরবার

কলের দরোয়ানের কাতন ধরেছিল, তাতেই এই টছে। বুড়ী ত' আর আমাদের এখানে থাকতে চ, সে আর এ রকম ভুতুড়ে বাড়ীতে



কলের দরোয়ান ও বুড়ী দাসী

থাকবে না। দাদা ত' তাই শুনে চ'টে গেছেন। চটবারই কথা—নিজের বোকামীতে মার খেয়ে এখন কি না দাদার বদনাম রটাচ্ছে।

৪ঠা বৈশাখ। আজ মামার আসবার কথা। তাই দাদা তাঁকে আনতে গেলেন। মামা আমাদের এই নতুন রকমের বাড়ী দেখতে আসছেন। বেচারা আর পেরে ওঠেন না—রোজ রোজ মামী চাকরদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামেচি করলে কি আর সহ্য হয়? তাই বিনা চাকরে কায চালাবার দাদার এই নতুন আবিষ্কার তিনি দেখতে আসছেন। কিন্তু তাঁকে আনায় দাদার একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে—সেটা তিনি কেবল আমায় জানিয়েছেন। এই কাযে দাদার প্রায় শ'পাঁচেক টাকা ধার হয়েছে—দাদা আমাকে দিয়ে সেটা শোধ করাতে চান। আর তা ছাড়া আমাদের বাড়ার খরচও আর চলছে না—তার জন্যও শ'দুই টাকার দরকার। মামা লোক ভাল—ধর্ম্মকর্ম্ম, জপতপ, ধ্যান-ধারণা নিয়েই আছেন। টাকাও অগাধ। ইচ্ছে করলেই সাহায্য করতে পারেন; কিন্তু আমাদের যে মামীটি—তিনি বড় সুবিধার নয়। মামা একটি পয়সাও দান করছেন দেখলেই হাঁ হাঁ ক'রে এসে পড়েন। কিন্তু তা হলেও মামা ধর্ম্মভীরু লোক ব'লে লুকিয়ে লুকিয়েও দান করেন। দুজনের স্বভাবে যেমন তফাৎ—চেহারাতেও তাই। মামার হ'ল গোলগাল নাদুস-নুদুস চেহারা—মাথায় টিকি, কপালে তিলক, ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই আছেন। মামী হলেন রোগা শুকনা কাঠি (মামী না জানতে পারেন), দিনরাত চেঁচামেচি নিয়েই আছেন। বলতে কি, মামীই মামাকে চালান। মামা মামীকে বেশ রীতিমতই ভয় করেন।

যাই হোক, দাদা মামাকে আনতে আনতে মামা কি ক'রে মামী আর চাকরদের খেঁচাখেঁচি থেকে উদ্ধার পেতে পারেন, তার উপায় বলতে লাগলেন।

"মামা, এক রাত্রি আমাদের সঙ্গে থাকলেই বুঝবে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। হাঁকাহাঁকি নেই, ডাকাডাকি নেই, চাকরের মাইনের কিংবা খোরাকপোষাকের হাঙ্গামা নেই কেমন সব নিরিবিলিতে চুপচাপ কায হয়ে যাচ্ছে, অথচ এত পরিশ্রমের কায কোন মানুষ-চাকরের সাধ্য নেই যে করে। আমার মতে তুমি আর দেরী না ক'রে অবিলম্বে বাড়ীর সব চাকরকে বিদায় দিয়ে আমাদের মত কলের চাকর রাখ। দেখবে কি আরাম।"

মামা বল্লেন, "এ হ'লে ত ভাল হয়। কিন্তু চাকরদাসী না থাকলে তোমার মামী চেঁচাবেন—মানে মনে দিন কাটাবেন কি ক'রে? তুমি ত' জানই, তিনি একটু আধটু চাকরদাসীদের উপর হুকুম চালাতে ভালবাসেন।"

দাদা বল্লেন, "মামীর কথা ছেড়ে দাও। চাকরদাসী না থাকলেও তাঁর চেঁচামেচির লোকের অভাব হবে না, এটা ঠিক।"

মামা বললেন, "না, বিশ্বনাথ, তোমার মামীর সম্বন্ধে ও রকম ভাবে কথা ব'ল না, তোমার মামী লোক খারাপ নয়।"

দাদা বল্লেন, "হ্যাঁ, তা ত নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি দেখবে যে, যখন বিনা চাকরে কায চলবে, তখন তিনি খুসী হয়েই তোমার দিকে বেশী নজর রাখতে পারবেন।"

মামীর নজর রাখবার এই সুবিধার কথা শুনে মামার

মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আম্‌তা আম্‌তা করতে করতে "তা ঠিক, তা ঠিক" বলতে লাগলেন।

তা' দেখে দাদা বুঝলেন, মামীর নজর রাখবার সুবিধা হবার কথা শুনলে মামা কখনই একটাও কল কিনবেন না। কিন্তু দাদার উদ্দেশ্য মামাকে ভজিয়ে কতকগুলি কল বিক্রী করা। সুতরাং তিনি সুর বদলিয়ে কলের চাকর রাখলে মামার নিজের কত সুবিধা হবে, বুঝিয়ে তাঁকে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে সব দেখে শুনে মামার এত ভাল লাগল যে, তিনি তাঁর নিজের বাড়ীর জন্য তিনটা "জাগ সক জাগ আজি পুণ্যদিনে' বিছানা কিনলেন। "একটায় আমি শোব, একটায় তোমার মামী শোবে, আর বাকীটা আমাদের কুড়ে বাবুদের জন্য—এমন কুঁড়ে যদি আর দ্বিতীয় আছে—রাত ১২টার মধ্যে শুতে গেলেও বাবুর ৫টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না।"

দাদা বল্লেন, "তার জন্যে তা হ'লে 'জাগ রে অলস আজ' বিছানাটা কেনাই ভাল। ও রকম দায়িত্বহীন কুড়েদের জন্য—যাদের চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমেতেও হয় না, তাদের জন্য এই বিছানাই ঠিক। এই 'আলস্যহর শয্যা' কেবল যে তাকে মাটীতে নামিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়—আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় এক গামলা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে ঘুম একবারে তাড়িয়ে দেবে।"

মামা বল্লেন, "বেশ, বেশ, সে-ই ভাল।" কাযেই একটা 'আলস্যহর শয্যাও' মামার বাড়ীতে পাঠান স্থির হ'ল।

এই রকম ক'রে দাদা মামার কাছে "সতর্ক প্রহরী", "মূক পাচক", "রজকরাজ" প্রভৃতি অনেক কিছুই বিক্রয় করলেন।

মামা বল্লেন, "এ যে দেখছি, আমার বাড়ী ভ'রে যাবে।"

দাদা বল্লেন, "কিন্তু যখন এ সব বসান হয়ে যাবে, তখন যা আরামটা পাবে—কি আর বলব। তখন তুমি কথায় কথায় চাকরদের বিদায় দিতে পারবে—চাকর থাক্‌ আর না-ই থাক্‌, তখন আর তাতে ভয় পাবার কিছুই থাকবে না।" কাযেই আরও যন্ত্র কেনা চলতে লাগল। মামার টাকার ফর্দ্দও বাড়তে লাগল। শেষে মামার ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তিনি মামীর 'ক্রুদ্ধমূর্ত্তি কল্পনা' ক'রে রীতিমত ভয় পাচ্ছেন।

অবশেষে তিনি আর থাকতে না পেরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে টাকা দেবার জন্য চেক-বইটা বের ক'রে দাদার কারখানার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সবশুদ্ধ কত টাকা হ'ল ?"

"সাত শত উনআশী টাকা, চারি আনা, তিন পাই মাত্র।"

মামা কাযেই ঐ টাকার চেক দিলেন ; কিন্তু শুনেছি, তখন না কি তিনি হঠাৎ বুঝতে পারেন যে, মামী ব্যাঘ্র-বংশসম্ভূতা এবং তিনি মামাকে কাছে পেলে সহজে ছেড়ে দেবেন না।

তাহার পর দাদা মামাকে নিয়ে মোটরে উঠে আমাদের বাড়ীর দিকে মোটর চালাতে বল্লেন। পথে মামার ভয় যাবার জন্য দাদা বল্লেন, "দেখছ কি মামা, মামী কলের চাকর পেয়ে খুবই খুসী হবেন। আর এ সব আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে কে না খুসী হবে ? এ অষ্টম আশ্চর্য্য। দেখবে, শীঘ্রই আমার এই সব কলের আবিষ্কার পৃথিবীতে এক মহা বিপ্লব আনবে।"

মামা কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে ধরা গলায় বল্লেন, "পৃথিবীতে না আসুক, এই কল যে শীঘ্রই আমাদের দুজনের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিপ্লব আনবে, তাতে সন্দেহ নেই। সত্যই, বাড়ী গেলে যা কাণ্ডটা হবে, তা মনে করতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। বাবা বিশ্বনাথ, আমি মানুষ-চাকর আর তোমার মামীর চেঁচামেচি নিয়েই ত দিব্যি সুখে ছিলুম।—কেন এ সব কিনিয়ে আমার টাকা খরচ করালে ? বাড়ী গেলে এই টাকা খরচের ব্যাপার নিয়ে তোমার মামী আমায় যা করবে, তা মনে করতেও আমার বুক ধরফড় করছে।"

মামা আর দাদা যখন আমাদের ফটকে এসে পৌঁছিলেন, আমি তখন লাইব্রেরীর সুখকরী চৌকীর কাছে ব'সে কাঁদছিলুম। এই "সুখকরী চৌকীর" গুণ হ'লো যে, তুমি এতে বসলেই এটা ধীরে ধীরে দুলতে থাকে, আর তালে তালে 'মুদ আঁখি' গাইতে থাকে। কিন্তু দিন দুই হ'ল, 'সুখকরী চৌকী' আমায় এত দুঃখ দিচ্ছেন যে, আমার পনর বৎসর জীবনের মধ্যে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইনি। কারণটা পরে বুঝা যাবে। যাক্‌।

আমি ত দু' চক্ষু দিয়ে ঐ "চৌকীকে দেখতে পারিনে। চৌকীতে বসলেই 'ধীরে ধীরে' আঁখি বন্ধ করা আর চলে না—এত বেগে সেটা দুলতে সুরু করে, মনে হয় যেন, পদ্মার পানসীতে ব'সে ঢেউয়ের দোলানি খাচ্ছি। তাই আমি যখনই ক্লান্ত হই, "সুখকরী চৌকীতে" বসার বদলে মাটীতেই বসি। আজ সকাল থেকেই আমার কান্না পাচ্ছে। কারণ, সব যন্ত্রই যেন আজ বেতালা যাচ্ছে।

সিঁড়িতে মামার জুতার শব্দ শুনে আমি চুপ করলুম। আমি জানতুম যে, দাদা টাকা ধার নেবার জন্যই আসলে 'মামাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কাযেই দাদা যে মামাকে ধ'রে আনতে পেরেছেন, তাতে আমার আনন্দ হ'ল।

তাঁরা এসেই ধ, আ (ধনী আত্মীয়) নামে ঘণ্টাটি টিপলেন। আমি শুনলাম, মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "ধ, আ'র মানেটা কি?" দাদা উত্তর দিলেন, "ধার্ম্মিক আত্মীয়।"

মামা শুনে খুব খুশী হলেন। নেড়া মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন, "বেশ নাম নির্ব্বাচন করেছ!" ঠিক সেই দরজা খুলে গেল।

দাদা বল্লেন, "দেখেছ মামা, দরজা ঠিক বুঝতে পেরেছে —কেমন খুলে গেল। ও কি প্যালারাম, কাঁদছিস কেন? দেখ রে, মামা এসেছেন। বলি, হয়েছে কি?"

আমি ফোঁপাতেই লাগলুম। কারণ, আমি মামার স্বভাব জানতুম। কান্না দেখলে সহজেই টাকা দেবেন, কাযেই আমি কান্না না থামিয়েই বলতে লাগলুম, "আমি আর এখানে থাকব না। রামাটা সারা সকাল আমায় বিরক্ত করেছে।"

দাদা বল্লেন, "আরে, এই কথা। তা বিদায় ক'রে দিলি নে কেন? দেখছ মামা, চাকরগুলি অসহ্য হয়ে উঠছে।"

আমি বল্লুম, "বিদায় আমি ক'রে দিয়েছি। কিন্তু তুমি আর তাকে রাখতে পাবে না।"

দাদা বল্লেন, "পাগল হয়েছিস? আর তাকে রাখছি!"

মামার দিকে চেয়ে বল্লেন, "দেখছ মামা, কলের চাকরের সুবিধা—আজ এক কথাতেই রামাকে বিদায় দিলুম; কিন্তু কলের চাকর না থাকলে কি আর পারতুম? পায়ে ধরেও রামাকে রাখতেই হ'ত।"

মামা বল্লেন, "কিন্তু তোমাদের ত' বড় অসুবিধা হবে।"

দাদা হেসে বল্লেন, "অসুবিধা কিসের? চল, তোমায় সব দেখাই, আর সেই সঙ্গে তোমার স্নানেরও বন্দোবস্ত ক'রে দিই।"

স্নানের ঘরে গিয়ে দাদা "কলের ভারী" দেখালেন। "ভারী" টা ছাতের একটি চৌবাচ্চার সঙ্গে নল দিয়ে লাগান। একটা শিকল টানলেই দুটা ঘড়া জলে ভর্ত্তি হয়ে মাথার উপরে এসে জল ঢেলে দেবে—শিকল ছেড়ে দিলেই জল পড়া বন্ধ হবে।

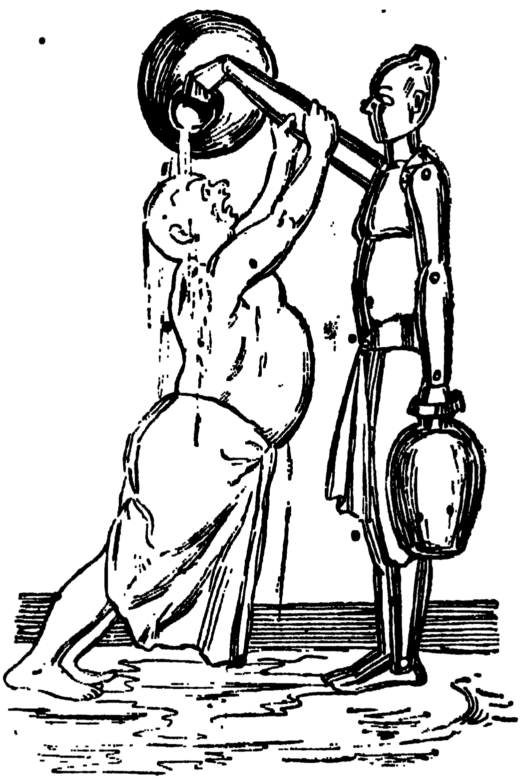
দাদা বল্লেন, "মামা, আর এ বোশেখী গরমে 'ভারী, ভারী' ক'রে জলের জন্য হাঁকাহাঁকি করতে হবে না। শিকল টানলেই জল আসবে। খুব সুবিধা নয় কি?"

মামা ত' খুব খুশী হয়ে স্নান করতে গেলেন। তিনি ত খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে শিকল টানলেন। টানামাত্রই "কলের ভারী" এসে তাঁর মাথায় জল ঢেলে দিলে। কিন্তু বোধ হয়, কোথাও কোন কলকব্জা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ, তিনি শিকল ছেড়ে যেমন গা রগড়াতে যাবেন, অমনই আবার "কলের ভারী" তাঁর মাথায় দু'ঘড়া জল ঢেলে দিলে।

মামা প্রথমে ভাবলেন যে, "কলের ভারী" বুঝি তাঁর সঙ্গে একটু রসিকতা করছে, কাযেই তিনি তাতে আমোদ অনুভব করলেন। কিন্তু যখন তৃতীয়বার "কলের ভারী" দরজা খুলে আবার দু'ঘড়া জল নিয়ে এসে তাঁর মাথায় ঢালবার উপক্রম করল, তখন তিনি বুঝলেন, এটা রসিকতা নয়। তখন তিনি বিরক্ত হয়ে হাত দিয়ে ঘড়া ধ'রে জল ঢালা বন্ধ করতে গেলেন। কিন্তু "কলের ভারী" তাঁর মাথায় জল ঢেলে আবার জল আনতে চলল।

চতুর্থ বার যখন জল এনে ঘড়া দুটো দাঁড়াল, তখন তিনি তা' জোর ক'রে ঠেলে দিতে গেলেন। ফলে স্নানের বদলে "কলের ভারীর" সঙ্গে তাঁর রীতিমত যুদ্ধ লেগে গেল। কিন্তু মামা বেচারী মোটা মানুষ, খানিক ধস্তাধস্তির পর আর না পেরে যেই তিনি হাত সরিয়ে নিয়েছেন, অমনই ঘড়া দুটা তাঁর মাথায় জল ঢেলে মাতালের মত টলতে টলতে আবার জল আনতে চলল। মামা দেখলেন—এভাবে অনন্তকাল স্নান করা এ গরমের দিনেও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সুতরাং মামা এক বুদ্ধি খাটালেন। ঘড়া দুটা যেই জল আনতে বাইরে গেছে, মামা অমনই সেই সুযোগে কলের

ঘরের দরজাটা খিল দিয়ে এঁটে দিলেন—যাতে "ভারী" ফিরে এসে আর ঢুকতে না পারে। কিন্তু 'কলের ভারী' দরজা বন্ধ মানবে কেন? সে ঠিক দুখড়া জল এনে ঢুকতে না পেরে দরজার সঙ্গে ভীষণ ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিলে। শব্দ শুনে আমরা ছুটে এসে দেখি, এই কাণ্ড!



কলের ভারীর সহিত যুদ্ধ

ও দিকে ভিতর থেকে মামা চেঁচাচ্ছেন, "ভারীর হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।" দাদা ত' কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছেন, কি করবেন। এমন সময়ে ভীষণ শব্দ ক'রে দরজাটা আর তার সঙ্গে কলের ভারীটাও মাটীতে পড়ল। তখন মামা সাহস ক'রে বেরিয়ে বল্লেন, "বাবা! এ রকম ভীষণ 'ভারীতে' আমার কায নেই।" যাই হোক, দাদা তাঁকে কলকজার দোষেই যে এটা হয়েছে, সেটা অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলায় তবে মামার ভয় গেল।

মামার স্নানপর্ব্ব শেষ হবার পর আমরা ভাত খেতে গেলুম। খাবার ঘরে গিয়ে আমরা তিন জনে একটা ছোট তেপায়া ঘিরে বসলুম, দেখে মনে হ'ল, যেন আমরা তিন জনে [illegible] এসেছি। দাদা মামাকে হাতল টানতে বল্লেন। কারণ, মামা হলেন অতিথি, আর তা হ'লে 'পরিবেষক' যন্ত্র মামারই পাতে প্রথমে খাবার দেবে। মামা টেবিলের একটা হাতল টানতেই রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল আর ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করতে করতে মাথার নল বেয়ে খাবার শুদ্ধ একটা বাক্স ঘরে ঢুকল। তৎক্ষণাৎ দুটা কলের চিমটে সেই নল থেকে বেরিয়ে বাক্স খুলে তিনটে পিরিচ তিন জনের সামনে রাখল, আর তাহার পর সেই চিমটেই বাক্স থেকে দুটা হাতা বের ক'রে প্রত্যেকের পাতে ভাত, ডাল, ভাজা পরিবেষণ ক'রে অদৃশ্য হ'ল। পরিবেষণটা ভালই হ'ল। কেবল হাতা দুটা একবারমাত্র এক হাতা ডাল দাদার পিরিচে দেবার বদলে দাদার কাপড়ে ফেলে দিয়েছিল। যাই হোক, ডাল-ভাত শেষ ক'রে আমরা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করবার আশায় অনেকক্ষণ ব'সে রইলুম। দেরী দেখে মামা ভাবছেন, কিছু বিশেষ রকমের উপাদেয় খাবার বোধ হয় তৈরী হচ্ছে। এমন সময়ে আবার 'পরিবেষক' ঘড়্ ঘড়্ ক'রে আসছেন দেখা গেল। আসতে আসতে দরজার সঙ্গে খেলেন এক ধাক্কা। দাদা ভ্রূকুটী ক'রে উঠলেন। যা হোক, ধাক্কা খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে 'পরিবেষক' কোন গতিকে ঘরে ঢুকলেন। দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেতে দেখেই মামার সকালের 'কলের ভারীর' কথা মনে ক'রে প্রাণ উড়ে গেল। তিনি উঠে পালাবেন কি না ভাবছেন, এমন সময়ে 'পরিবেষক' টল্‌তে টল্‌তে তাঁরই কাছে হাজির হ'ল। হাজির হয়ে দুই একবার এ-ধার ও-ধার একটু নড়ল, মনে হ'ল, যেন ঠিক করতে পারছে না—কাকে আগে পরিবেষণ করা উচিত। যাই হোক্, এই রকম কাঁপতে কাঁপতে হাতা দুটা বেরিয়েই হঠাৎ মামার নেড়ামাথার ঠিক মাঝখানে দুটা আলু সিদ্ধ ও এক হাঁড়ি মাছের ঝোল উল্‌টিয়ে ঢেলে দিলে। হাঁড়িটা মামার মাথায় টুপীর মত ঝুলতে লাগল।

তাহার পরই চক্ষুর পলক পড়তে না পড়তেই চিমটা দুটা বেরিয়ে ঝনাৎ ক'রে টেবিলের উপর তিনটা কাচের পিরিচ ফেলে দিলে, সেগুলা দু টুকরা হয়ে গেল। তাহার পরই চিমটা দুটা সমস্ত বাক্সটাকে উল্‌টিয়ে টেবিলের উপর দই, ক্ষীর, অম্বল, ডাল, ভাত আদি সব ঢেলে ফেললে। এর পর আর খাওয়া চলল না, মামা আবার স্নান করতে গেলেন। এবার অবশ্য ভোলা জল এনে দিলে, আর রাজু দোকান

থেকে খাবার আনতে গেল। দাদা রেগে পরিবেষককে ৬ টুকরা ক'রে ফেল্লেন। যাই হোক্, শেষে খেয়ে দেয়ে সবাই ঠাণ্ডা হলুম।



হাঁড়িটা মাথায় টুপীর মত ঝুলতে লাগল

মামা খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ী যেতে চাচ্ছিলেন, বল্লেন, এ রকম বাড়ীতে থাকতে আর তাঁর সাহস হয় না। যাই হোক্, দাদা তাঁকে অনেক বোঝালেন যে, মরচে প'ড়ে কলগুলা বিগড়ে গিয়েছিল, তবে তিনি আবার থাকতে রাজী হলেন। তখন দাদা তাঁকে নিয়ে আমাদের লাইব্রেরীটা দেখালেন।

দাদা দেখিয়ে দিলেন, কেমন কল টিপলেই যে বই খুসী কাছে আনা যায়। চৌকীতে কি ক'রে বসতে হয়, তাও দেখিয়ে দিলেন। মামা দিব্য আরামে ব'সে বই পড়তে লাগলেন আর দাদা আমায় মন্ত্রণা-ঘরে নিয়ে গিয়ে কি ক'রে মামাকে অনেকগুলা কল গছিয়েছেন, সেই বিবরণ দিতে লাগলেন। এমন সময়ে হরি বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে বল্ল, "কর্ত্তাবাবু, মামাবাবু লাইব্রেরী-ঘরের চৌকীতে ব'সে দুলছেন আর ভয়ঙ্কর চেঁচাচ্ছেন।"

দাদা বল্লেন, "সর্ব্বনাশ, মামা বোধ হয় অন্য চৌকী কেন? নেমে পড়লেই ত পারেন।" আমি তাই শুনে উঠে পড়েই দাদাকে বল্লুম, "তবেই মাটী করেছে, তাঁকে বারণ করব ভেবে ভুলে গেছি। আজ সকাল থেকে ওটা বিশ্রী বেগে দুলছে, আমায়ও আজ ওটা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। বসামাত্রই এমন দোলে যে, আর নামবার উপায় থাকে না।"

ছুটে গিয়ে দেখি, মামার দু'পা এক বার আকাশে উঠছে আর এক বার মাটীতে ঠেকছে। পদ্মার ঢেউএর দোলানীও তার কাছে হার মেনে যায়। মামার ভুঁড়ীটা এক বার ক'রে তাঁর নাকে ঠেকছে, আবার স'রে যাচ্ছে। সুখকরী চৌকীর আসল কায ছিল যে, "ধীরে ধীরে মুদ আঁখি" গান গাইতে গাইতে লোককে ঘুম পাড়ান; কিন্তু যে তালে দোলা সুরু হয়েছে, তাতে সাত ক্রোশ দূর থেকেই নমস্কার ক'রে ঘুম ত স'রে পড়বে বলেই সন্দেহ হয়।

ভেবে দেখ কাণ্ডটা! মামার নেড়া মাথাটা পাকা বেলের মত এক বার দড়াম ক'রে মাটীতে ঠেকছে, আর এক বার চটাস্ ক'রে পা দুটা মাটীতে ঠেকছে। আর মামা উল্টান কাঁকড়ার মত হাত-পা ছুড়ে নামবার চেষ্টা করছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন্টা কড়ি আর কোন্টা মাটী, সে জ্ঞান হারিয়ে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাথা আর পায়ের ধাক্কায় ছবি, বই, খেলনা, আলমারীর কাচ প্রভৃতি যা কিছু ভঙ্গপ্রবণ আসবাব, সব চুর-মার হয়ে যায়।

যাই হোক্, আমরা ত টেনেটুনে কোন রকমে মামাকে বাঁচালুম। মামার ভাগ্য ভাল যে, তাঁর মাথাটা দুখানা হয়ে যায় নি।

আমার ত' আর এ বাড়ী ভাল লাগছে না। দাদাকে আমি সে কথা বলছিলুম। দাদা তাই ভাবছেন যে, এই রকম সব বিদ্ঘুটে কল বসান'র জন্য সর্দ্দার মিস্ত্রীকে ধ'রে "সুখকরী চৌকীর" উপর বসিয়ে দেবেন কি না।

৫ই বৈশাখ। কাল মামা যা কষ্টটা ভুগেছেন, তাতে আর যে টাকা দেবেন, সে আশা হয় না। দাদা ভাবছিলেন, আর দু' চারটা জিনিষ মামাকে গছাবেন, কিন্তু মামার এখন কলের নাম শুনলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কাযেই দাদার মেজাজ বিগড়ে গেছে; বলছেন, মামা যদি টাকা না দেন ত' সর্দ্দার মিস্ত্রীর দু' মাসের মাইনে কেটে নেবেন। কেন

সর্দ্দার মিস্ত্রীর ছ' মাসের মাইনে হ'ল প্রায় আড়াই শ' টাকা। কাজেই এ টাকাটা পেলেও আমাদের এ মাসের খরচটা মামার কাছে ধার না পেলেও চ'লে যাবে বোধ হয়। দেখা যাক, মামা ধার দেন কি না।

কাল চৌকীর কাণ্ডের পর ভেবেছিলুম যে, যা হোক্ সব গোলমাল মিটে গেল। মাটীর সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে মামার মাথায় বেজায় ব্যথা হয়েছিল। আমি তাই মামার বিছানা ক'রে তিনি কটার সময়ে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা ক'রে সেইমত বিছানার ঘড়ীতে দম দিয়ে চ'লে এলুম।

সকালের ঐ সব কাণ্ডের পর তিনি সহজে বিছানায় শুতেই চাচ্ছিলেন না। তিনি বল্লেন—"কল-কব্জার উপর যে আমার কোন রকম বিশেষ আক্রোশ আছে, তা নয়, কিন্তু তবু কি জানি কেন প্যালারাম, আমার মনে হচ্ছে যে, এই সব যন্ত্রগুলা যদি তোমরা যাদের কয়লার অভাব আছে, তাদের দান কর ত তারা এগুলা দিয়ে উনান ধরাতে পেয়ে নিশ্চয়ই তোমাদের দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে। কিংবা আর এক কাম করতে পার। যারা কখন সমুদ্রে যায় নি অথচ সমুদ্রের ঢেউ কি রকম জানতে চায়, তাদের এনে যদি তোমাদের সুখকরী চৌকীতে বসিয়ে দাও, তা হ'লে তাদের প্রকৃত উপকার করা হবে।"

আমি জানালুম যে,আমিও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অবিকল একমত। কিন্তু তিনি যদি খুব সাবধানে বিছানায় ওঠেন, যদি কোন কলে হাত বা পা না ঠেকে, তা হ'লে আর কোন গোলই হবে না। তিনি দিব্য সারারাত নাক ডাকিয়ে ঠিক্ ভোর ছয়টার সময়ে 'জাগ সবে জাগ আজি পুণ্যদিনে' গান শুনতে শুনতে ঘুম থেকে জেগে উঠবেন। যদি তিনি কোন কারণে ছয়টার সময়ে উঠতে না ইচ্ছা করেন, তবে পাশের বোতামটা টিপলেই হবে।

বেচারী বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, আমার কথা শুনে তাঁর হাসি ফুটল। বল্লেন, "এই সুখকরী শয্যাই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য। তিনি তাঁর সব বন্ধু-বান্ধবকেই একটা ক'রে এই শয্যা কিনতে বলবেন।"

তাঁর কথা শুনে আমি ভাবলুম যে, আমাদের "শয্যা" আমাদের সঙ্গে কি সুন্দর ব্যবহার করছে, তা জানিয়ে ভয় পাওয়াবার আর দরকার নেই। বিশেষতঃ মামার এই শয্যার দাম আমাদের শয্যার চেয়ে অনেক বেশী, কাযেই সম্ভবতঃ, এর কলকব্জা আমাদের শয্যার চেয়ে বেশী মজবুত হবে সন্দেহ নেই। সুতরাং এ শয্যাতে বোধ হয় কোন গোলমাল হবে না।

মামার ঘর থেকে এসে আমি আর দাদা মাটীতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, ফলে শোওয়ামাত্রই ঘুম এল। রাত্রে মামার ঘর থেকে একটা আওয়াজ আসছে ব'লে দু' এক বার মনে হয়েছিল। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ায় আর উঠে দেখলুম না, কি ব্যাপার। স্বপ্ন মনে ক'রে ঘুমাতে লাগলুম।

প্রায় শেষ রাত্রিতে মামার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মামা বলছেন—"তোমাদের অসময়ে জাগালুম ব'লে কিছু মনে ক'র না। বিছানাটার কোথায় একটা কি গলদ হয়েছে, আমি অনেকক্ষণ সহ্য ক'রে আর পারলুম না। তোমরা এসে যদি একটু দেখ।"

দাদা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বল্লেন, "কি হয়েছে? হাত ধোবার গামলাটা বুঝি জলের জন্য বিদ্‌ঘুটে শিস দিতে সুরু করেছে? মাঝে মাঝে ওটা অমন করে জানি। ওর গলায় একটা গামছা বেঁধে দাও না—তা হ'লেই থেমে যাবে।"

এই ব'লে দাদা আমাদের নিদ্রাভঙ্গরূপ মহা অপরাধের কারণ সেই গামলাকে দৃষ্টি হেনে ভস্ম করবার উপক্রম করলেন। কিন্তু দেখা গেল, গামলাটা নির্ব্বিকার—সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

মামা ক্লান্তভাবে বল্লেন, "গামলাটা হয় ত সারারাত শিস্ দিয়েছে—আমি সেটা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু এই বিছানাটা নিয়ে ত' আমি বিপদে পড়েছি। ওটা আমায় মাঝ-রাত্রি পর্য্যন্ত একেবারেই শুতে দেয় নি। যেমনই আমি ওর কাছে গেছি, অমনই ওটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। কি জান, বিশ্বনাথ, যতই আমি তোমার যন্ত্রগুলা দেখছি, ততই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, যন্ত্রগুলা কখনই নির্জ্জীব নয়। জগদীশ বোস যে বলেছেন, 'জড়েরও জীবন আছে', তা এই বিছানার কাণ্ড দেখলেই বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আজ সারারাত আমায় বিছানাটা জ্বালিয়েছে। একটা নির্জ্জীব বিছানার যে এত রাগ থাকতে পারে, তা আমি না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না—যদিও আমি

বুঝলুন না যে, আমার কি দোষ দেখে বিছানাটা আমার উপর এত সাংঘাতিক ক্ষেপে উঠেছে। যা-ই হোক, শেষে আমি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ওকে ঠকিয়ে তবে শুতে পেলুম। যখন আমি দেখলুম যে, রাত দুপুর হয়ে গেল, তবু বিছানা আমায় শুতে দেবার নামটি পর্যান্ত করছে না, তখন আমি ভাণ করলুম, যেন আমার শোবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। আমি ঘরের এক কোণে ব'সে বই পড়তে লাগলুম।"

আমি বল্লুম, "বেশ বুদ্ধি খেলেছেন।"

"বাবা প্যালারাম, আমায় তোমার মামীর সঙ্গে ঘর করতে হয়, কাযেই ও-সব বিদ্যে আমার বিলক্ষণ জানা আছে। যখন আমার কোন জিনিষ কিনতে ভারী ইচ্ছা হয়, তখন আমি তোমার মামীকে বলি, 'ঐ জিনিষ কিনে আর টাকা নষ্ট ক'র না', আর আমি জানি যে,তোমার মামী তখনই ঠিক সেই জিনিষটাই কিনবেই কিনবে। আজ বিশ বৎসর এই বিদ্যে প্রায় নিত্যই আমাকে অভ্যাস করতে হচ্ছে। আর তাতে বেশ ফলও পাচ্ছি, কাযেই এখানেও সেই বুদ্ধিটা খাটালুম। আমি ব'সে ব'সে গান ধরলুম, যেন আমার আর মোটেই শোবার ইচ্ছা নেই। বিছানাটা আমার মতলব না বুঝে ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল, আর আমিও অমনি চুপি চুপি গিয়ে ঝক্ ক'রে শুয়ে পড়লুম।"

দাদা তখন বল্লেন, "বেশ কাযই করেছিলে। তা' এখন আবার কি হ'ল ?"

"প্রায় ১৫ মিনিট অন্তর এই বিছানাটা যাচ্ছে তাই গান গাইছে আর আমায় মাটীতে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এই এক নতুন বিপদ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মামা, তুমি কি এক দিকে চেপে শুয়েছিলে ? বিছানার ঠিক মাঝখানে না শুলে কলের উপর চাপ পড়লে ও রকমটা হ'তে পারে।"

মামা ক্লান্তভাবে বল্লেন, "হ'তে পারে, কিন্তু আমি ত' আর মিস্ত্রী নয় যে, কল-কব্জার ব্যাপার জানব ? আর তা' ছাড়া যাচ্ছে তাই গান সারারাত গেয়েছে যে, কি বলব।"

দাদা তাই শুনে বল্লেন, "প্যালা, ক্যাটালগটা আন্ ত' দেখি, এ বিছানার ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত।"

ক্যাটালগ এনে আমরা এ সবের কারণ বুঝতে পারলুম। ৯১ নম্বরের বদলে সর্দ্দার মিস্ত্রী ভুল ক'রে ১৯ নম্বরের বিছানা পাঠিয়েছে। ১৯ নম্বরের বিবরণে লেখা আছে, "১৯ সংখ্যক শয্যা মাতালদের জন্য—যাহারা দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত মদ ও জুয়ার আড্ডায় কাটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়।"

গানের নমুনা 'বোতলভরা ফুর্ত্তি আন' 'নেশা যত ছুটছে, হাসি তত টুটছে।' 'হায় হায় হায়, সঙ্গীরা কোথায়'।"

দাদা বল্লেন, "যাক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। বড় ভুল হয়ে গেছে, মামা। বাকী রাতটার জন্য তোমার কৌচে বিছানা ক'রে দিচ্ছি।"

মামা ভয়ে ভয়ে বল্লেন, "কৌচ—কৌচ—কৌচ কি গান গায় ?"

দাদা বোঝালেন, "নিশ্চিন্ত থাক, মামা, কৌচ গানটান করে না। কোন ভয় নেই।"

যাই হোক, শেষে মামা বেশ ক'রে পরীক্ষা ক'রে যখন কৌচে কোন কলকব্জা নেই দেখলেন, তখন কৌচে শুলেন।

৬ই বৈশাখ।—আজ মামী মামাকে একটা চার পৃষ্ঠা-ব্যাপী চিঠি দিয়েছেন যে, তাঁকে অবিলম্বে বাড়ী ফিরতে হবে। তাঁদের বাড়ীতে বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একটি কারখানার মিস্ত্রী এক গাদা জিনিষপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে, তার মানে কি ?

মামা মিস্ত্রীর কাছ থেকেও একখানা চিঠি পেয়েছেন। সে লিখছে যে, ভবিষ্যতে সে মামার লিখিত হুকুমনামা বিনা তাঁর বাড়ীর ধার দিয়েও যাবে না। সে জিজ্ঞাসা করেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সে নিজের কায ক'রে যাবে, না ফিরে যাবে ?

কলের বাড়ী আর ভাল লাগছে না ব'লে মামার আজ বাড়ী যাবার কথা ছিল। কিন্তু মামীর চিঠি পাবার পর তাঁর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। ফলে আমাদের বাড়ীর দিকে টানটা তাঁর হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে উঠেছে। কাযেই তিনি আরও দিনকতক থাকবেন বলছেন। বেচারী চিঠি দুখানি পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন; কি উত্তর দেবেন, ঠিক করতে পারছেন না। দাদা বল্লেন—যে মিস্ত্রীকে পাঠান হয়েছে, সে না কি খুব লম্বা-চওড়া আর গায়েও খুব জোর আছে। কাযেই মিস্ত্রীকে লিখে দেওয়া হোক যে, সে নিজের কায শেষ না ক'রে যেন ওখান থেকে

এক পা'ও না নড়ে। তার পর মামীতে আর মিস্ত্রীতে যা হোক বোঝা-পড়া হ'তে দাও।

মামা দাদার কথামতই মিস্ত্রীকে লিখে দেবেন স্থির করলেন।

৮ই বৈশাখ। কাল সারাদিনটা আর আজ বিকাল পর্য্যন্ত কলগুলা বেশ ভালই কায করেছে। এখানে ব'লে রাখা ভাল যে, কলগুলা দু' এক দিন বিশ্রাম ক'রে দম নিয়ে দু' এক দিন পরে আগেকার চেয়েও তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করে।

কিন্তু আজ বিকালে আমাদের নবগৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন করেছিলুম, তার ফলে যা কাণ্ডটা আজ হ'ল, তা' লিখতেও সাহস হচ্ছে না।

গৃহপ্রবেশ উৎসব উপলক্ষে যে অতিথি আজ সব প্রথম আমাদের বাড়ী এলেন, তিনি হলেন আমাদের পূজনীয়া মামী। নিমন্ত্রণ রক্ষা তাঁর আসার একটি উদ্দেশ্য হলেও মামাকে ধ'রে বাড়ী নিয়ে যাওটাই তাঁর শুভাগমনের আসল উদ্দেশ্য।

কিন্তু দরজাটা আজ ভারী বোকামী দেখিয়েছে। মামী আসামাত্রই সে বন্ধ থাকার বদলে সসম্ভ্রমে খুলে গেল।

তিনি আমাদের বাড়ীতে পা দিয়েই মামার খোঁজে এলেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, তিনি সেই দুষ্কৃত-কারী মিস্ত্রীকে ঝগড়ার চোটে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়ে এখন আসল অপরাধীর খোঁজে এসেছেন। মিস্ত্রীর 'জাগ সবে জাগ' বিছানাগুলার কি হ'ল, জানতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। হাবভাব দেখে ত মনে হয় যে, সেগুলা আগুনে দিয়ে পরে তাদের সদ্গতি ক'রে তবে আসছেন।

যা-ই হোক, মামা ত মামীর গলা পেয়েই লাইব্রেরী-ঘর থেকে—যেখানে তিনি বসেছিলেন, সেখান থেকে উঠে বৈঠকখানায় গেলেন। বৈঠকখানাটা একটু দূরে আছে। ব'লে গেলেন "লাইব্রেরী-ঘরের বন্ধ হাওয়ায় ব'সে তাঁর মাথা ধরেছে, তাই বৈঠকখানায় খাওয়া খেতে যাচ্ছেন।" এখানে বলা ভাল যে, আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে লাইব্রেরীর চেয়ে বেশী হাওয়া নেই—বৈঠকখানা লাইব্রেরীর চেয়ে বেশী ব'লে ত মনে হয় না, কারণ, অন্যান্য দিন আমরাই কতবার মামাকে লাইব্রেরী ছেড়ে বাগানে যেতে বলেছি, তাতে মামাই কতবার উত্তর দিয়েছেন যে, তিনি বাগানের চেয়েও লাইব্রেরীতে ঢের ভাল থাকেন।

যা-ই হোক, মামী অনেক খুঁজে শেষে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখেন, অপরাধী সেখানে দরজার আড়ালে ব'সে আছেন। মামীকে দেখেই মামার হঠাৎ দরজার গায়ে আঁকা একটা কুটীরের ছবি খুব ভাল লাগতে সুরু হ'ল। তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে ছবিটা দেখতে লাগলেন। মামী গম্ভীরভাবে যুৎসই হয়ে ব'সে মামা বেচারীকে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শোনাবার উপক্রম করছেন, এমন সময়ে রস-ভঙ্গ!—সেই সন্ধ্যার আর এক নিমন্ত্রিত অতিথি মিষ্টার অগ্নিশর্ম্মা রায় ও তাঁর স্ত্রী মিসেস্ বিহঙ্গমী রায়, তাঁদের দুই ছেলে সলিল ও অনিলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলুম, মামা ও মামী দু'জনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন,—মামা মুক্তির নিশ্বাস ও মামী হতাশার নিশ্বাস।

এখানে অতিথিদের একটু পরিচয় দিচ্ছি।

মিঃ অগ্নিশর্ম্মা পশ্চিমে ব্রাহ্মণ। তিনি অনেক দিন বিলাতে কাটিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতার খুব পক্ষপাতী হয়ে এ দেশে ফিরে মিস্ বিহঙ্গমী রায়কে বিবাহ করেন। মিস্ বিহঙ্গমী দেখতে চলনসই। তবে তিনি ঘামলে বোধ হয় বিনা মূল্যে এক বোতল কালি হয় এবং ওজনে সম্ভবতঃ তিনি দশ মণের কিছু বেশী। মিস্ বিহঙ্গমী রায় যাজপুরের বিখ্যাত জমীদার রাজহংসেশ্বর রায়ের একমাত্র কন্যা।

রাজহংসেশ্বর বিখ্যাত কুলীন, অথচ উন্নতিশীল হিন্দু ছিলেন। সুতরাং তিনি মুর্গী ও গোমাংসের শ্রাদ্ধ করলেও হিন্দু ছাড়া আর কারও সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন না ঠিক করেন। মিঃ অগ্নিশর্ম্মা বিলাত থেকে ফিরে যখন দেখলেন যে, তাঁকে পশ্চিমে ব্রাহ্মণরা দলে নিল না, তখন তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন। কিন্তু যে-ই তিনি শুনলেন, হংসেশ্বরের অগাধ সম্পত্তি এবং এক কন্যা আছে, কিন্তু সেই কন্যাকে বিয়ে করতে সকলেই ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, তখনই তিনি তাড়াতাড়ি একটু গোবর মুখে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে পরম হিন্দু হয়ে মিস্ বিহঙ্গমীর পাণিগ্রহণ করেন। হিন্দু হ'লেও মিঃ অগ্নিশর্ম্মা রায় স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতীই থেকে গেলেন।

স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী মিঃ রায় বলেন যে, কেবল মেয়ে-'রাই কেন স্বামীর উপাধি নেবে ?—এটা ভীষণ অত্যাচার! প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে স্বামীদের এবার থেকে মেয়েদের কৌলিক উপাধি নেওয়া উচিত। সেই জন্যই তিনি স্ত্রীর উপাধি (এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীর সম্পত্তিও) সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁদের ছেলে দুটিও অনেক গুণে গুণী ও অধ্যবসায়শীল—দিন-রাত অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি অভ্যাস করে।

যাই হোক্, আমাদের টাকার টানাটানি হওয়াতে মাত্র এই কয় জনকেই এবার আমরা নিমন্ত্রণ করেছিলুম।

আমরা সবাই গল্প আরম্ভ করবার জন্য বসেছি, এমন সময়ে হঠাৎ দড়াম ক'রে বাজ পড়ার মত একটা শব্দ হ'ল আর ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।

দাদা চেঁচিয়ে উঠলেন—"এ কি! কেউ বুঝি আলোর ব্যাটারির উপর বসেছিল ?" বলেই দাদা সেই অন্ধকারেই হাতড়াতে হাতড়াতে ব্যাটারির দিকে ছুটলেন।

এই অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ চটাস ক'রে শব্দ হ'ল আর মামীর সরু সুরের রাগী গলা শোনা গেল—"কে আমার গালে চড় মারল ?"

কেউই স্বীকার করল না, কে মেরেছে, আর আমিও বিশ্বাসই করতে পারছিলুম না যে, সেই অন্ধকারেও আমাদের কারও সাহস হবে যে, মামীর গালে চড় মেরে চালাকী করি। সকলেই একসঙ্গে নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করতে আরম্ভ করলে। ফলে মনে হ'ল, যেন সেই অন্ধকারে কি এক ভীষণ মারামারি চলেছে। এমন সময়ে আবার আলোগুলা যেমন হঠাৎ নিবে গিয়েছিল, তেমনই হঠাৎ জ্ব'লে উঠল। তখন দেখা গেল, সলিল মামীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর সলিলের মুখ কি জানি কিসের ভয়েতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অনিল সলিলের কাছ থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সলিলের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে আর মামী কারও দিকে না চেয়ে সোজা হয়ে ব'সে এক দুই ক'রে একশ গুণছেন। এটা তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছে শিখেছিলেন। খুব রাগ হলেই যেন তিনি একশ পর্য্যন্ত গুণে তবে কথা বলেন। তা' হলেই আর রাগ আসবে না। এর ফলে আমরা কিন্তু কোনই প্রকাশ না করতে পারায় মামী আরও রেগে যেতেন আর তার ফলে একশ গোণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীকে ধমকের উপর ধমক দিয়ে দমশম খাইয়ে দিতেন। যাই হোক, মামীর পঞ্চাশ পর্য্যন্ত গোণা হ'তে না হতেই মিসেস বিহঙ্গমী রায়, বড় মাথা ধরেছে ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মামী তাই দেখে আর থাকতে না পেরে গোণা শেষ হবার আগেই সলিলের দিকে কট্‌মটিয়ে দেখে মিসেস্ বিহঙ্গমীকে গম্ভীরভাবে আদেশ করলেন—"ব'স।" বলেই আবার গুণতে সুরু করলেন। কিন্তু তাই শুনে কি আর কেউ বসে? মিসেস্ রায় ঐ গুরুগম্ভীর আদেশ শুনে আরও তাড়াতাড়ি মিঃ রায় ও ছেলেদের নিয়ে পালালেন। মামীর যখন একশ গোণা শেষ হ'ল, ততক্ষণে মিসেস্ রায়দের মোটর আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে গেছে।

দাদা তখন মামীকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বল্লেন—"মামী, ছাতে চল—এ গরমে আর ঘরে থাকে না। আমরা ঠাণ্ডায় শোবার বন্দোবস্ত করেছি, দেখবে চল।" এই ব'লে ছাতে নিয়ে গিয়ে মামীকে দেখালেন—কেমন একটি মস্ত গ্যাসের বেলুন ছাতের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেটা খুব উঁচুতে উড়ছে আর তার তলায় একটা দোলনায় বিছানা পাতা আছে। দাদা দেখালেন, কি ক'রে বেলুনকে নামাতে হয়, কি ক'রে তাতে উঠতে হয়, কি ক'রে প্যারাসুট ধ'রে বেলুন থেকে নামতে হয়।

দাদা বেলুনে চ'ড়ে আকাশে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন। তার পর প্যারাসুট ধ'রে নেমে এলেন। তার পর আবার বেলুনটাকে নামিয়ে আনলে মামা তাতে চড়লেন, তার পর আমি চড়লুম। আমরা তিন জন চড়লে তবে মামী সাহস ক'রে বেলুনে উঠলেন। কিন্তু মামীর দুর্ভাগ্যক্রমে এত টানাটানিতে বেলুনের দড়ী যে ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, আমরা তা' লক্ষ্য করিনি। ফলে মামী উঠতেই যেই আমরা অন্য অন্য বারের মত বেলুন ছেড়ে দিয়েছি, অমনই বেলুনটা দড়ি খুলে খুব উপরে উঠে চল্‌লো। আমরা ত' তা' দেখে হতভম্ব—হাসব কি কাঁদব, ঠিক্ করতে পারলুম না। মামী দেখি বেলুন থেকে চেঁচাচ্ছেন—শেষে বেলুনটা এত দূরে চ'লে গেল যে, সেটা দেখতে পেলেও মামীর চেঁচানি আর শোনা গেল না। আমরা যত দূর চোখ যায়, বেলুনটা দেখছি—হঠাৎ

গেলেন ভেবে হায় হায় ক'রে উঠলুম—কিন্তু দেখি, তা' নয়, ওটা একটা প্যারাসুট, মামী প্যারাসুট ধ'রে নামছেন। আমরা তখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। যাক্, মামী বেঁচে গেলেন। মামার মুখ একদম শুকিয়ে গেছে দেখি—শেষে আমরা পরামর্শ করলুম যে, পরদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মামীকে খুঁজে বের করতে হবে। এই স্থির ক'রে আমরা শুয়ে গেছি, এমন সময়ে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের পাগ্লাগারদের বড়কর্ত্তার কাছ থেকে মামার নামে একটা এই মর্ম্মে তার এল যে, "চণ্ডীদেবী নামে যদি তোমার কোন আত্মীয়া থাকে ত' অবিলম্বে এখানে এসে তার সঙ্গে দেখা করবে।" মামীর নামই চণ্ডীদেবী। 'তার'টা পেয়েই আমরা সেই রাত্রিতেই বহরমপুর চল্লুম। ভাবতে লাগলুম যে, মামী পাগ্লাগারদে গেলেন কেন? যা-ই হোক্, সেখানে গিয়ে গারদের বড়কর্ত্তার সঙ্গে মামা দেখা করলে বড়কর্ত্তা বিপজ্জনক (Dangerous) পাগলকে ঘরে বন্ধ না ক'রে রাখার জন্য মামাকে বকলেন। মামা জানালেন যে, মামী পাগল নহেন। তাতে বড়কর্ত্তা রেগে গিয়ে মামাকে বল্লেন যে, পাগল নয়, তাই অত রাত দুপুরে ছাতা মাথায় দিয়ে পাগ্লাগারদের ছাতে হাওয়া খেতে আসে! পাগল নয়, তাই যখন তাকে গারদে একটা থাকবার ঘর ঠিক্ ক'রে দিলেম, তখন ঘরে না গিয়ে ছাতের উপর ব'সে এক দুই ক'রে অঙ্ক গুণতে সুরু করে! সে যা-ই হোক্, মামা যদি মামীকে ঘরে বন্ধ রাখবার গ্যারান্টি না দেন ত' তিনি মামীকে ছাড়বেন না। কাযেই মামা তখন সেই গ্যারান্টি দিতেই বাধ্য হলেন।

* * * * *

দেশে ফিরে মামী মামার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছেন ও আমাদের মুখ দেখবেন না বলেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, আমরা ইচ্ছা করেই তাঁকে এই রকম অপদস্থ করেছি। আর রাগ থামাবার মন্ত্রদাতা গুরুদেবকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন। মামা দেশে গিয়েই পাঁজী খুলে দেখেন যে, তিনি অশ্লেষায় ও মামী মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করেছিলেন। মামার বিশ্বাস, সেই জন্যই তাঁদের এই সব কষ্ট ও দুঃখ ভোগ কর্‌তে হয়েছে। আর তিনি জন্মেও অশ্লেষা বা মঘায় যাত্রা করবেন না, বলেছেন। মামী মারা গেলে দাদাকেই সব দিয়ে যাবেন বলেছিলেন—মামীর রাগ হওয়ায় সেটা ফস্‌কে গেল দেখে দাদা কলের বাড়ীর উপর মস্ত চ'টে পুরান বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। ফলে আমি বেঁচে গেছি।

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদায়ী

নামিয়ে দিলি জন্মভূমি তোর কবিকে কোল থেকে,—
ফলের দিনেই পতন হ'ল বেড়ে উঠে 'বোল' থেকে?
ছিলাম পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে' দাঁড়িয়ে দেউল-দোর ধ'রে,
কর্‌লি আরতির বেলাতেই বন্ধ মা দোর জোর ক'রে?

তবু তোমার আকাশ-বাতাস আমার কেন পাছ ডাকে,—
তৃণের আঙুল কাঁপছে ব্যথায়—হাতছানি দে' পাছ ডাকে!
হাজার সুরে বনের পাখী কইছে কেঁদে—"আয় কবি!"
চোখের জলে ঝাপ্‌সা দেখি—হায় কবিতা!…হায় কবি!…

কোলের ছেলে গেলাম নেমে আজকে মা তোর কোল থেকে,—
দাঁড়ায় পোঁয়ার মন যে বেঁকে প্রবাস-পথে চল্‌তে গে!
জন্মভূমি,—মাতৃভূমি—মা তোর মাটির মনটা কি
কাঁদবে না আর আমায় ভেবে একটি দিনও ক্ষণ লাগি?

বিদায়,—বিদায়,—বিদায় মা গো,—বিদায়, এবার যাই চ'লে,
ভুলব না মা, ভুলব না ত' তোর কথাটি তাই ব'লে।
যেথাই থাকি মনের চোখে দেখব শ্যামল তোর ছবি,—
ধ্যানের পথে আনাগোনা করব আমি তোর কবি!

শস্যময়ী শস্যময়ী মা গো আমার, যাই…যাই…
শেষের দিনে তোমার কোলে একটু যেন ঠাঁই পাই!
বুকের ব্যথা গেলাম রেখে দূর্ব্বা-ঢাকা তোর ধূলে,—
রইল প্রাণের ভালবাসা কানন-ভরা তোর ফুলে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।



হিন্দুর উদারতা

হিন্দুধর্ম্মের অন্য নাম সনাতন ধর্ম্ম। অর্থাৎ এ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই, ইহা নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অমর। যাহা নিত্য সত্য, তাহা কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা বিশ্বমানবের নিজস্ব, এই হেতু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহাকে বিশ্বধর্ম্ম বলা হইয়াছে। যে ধর্ম্মের মধ্যে সকল প্রকার সভ্যতা, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সাধনা, শৃঙ্খলা স্থান লাভ করিয়াছে, উহাই বিশ্বধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। ইহা হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এমন সহনশীল উদার ধর্ম্মকে অধুনা কেহ কেহ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাই দুঃখ।

একটা কোন বিশিষ্ট পন্থাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মের গঠন ও পুষ্টি হয় নাই। ইহার মধ্যে সকল পন্থা, সকল উপায়, সকল প্রকারের সাধনা স্থানলাভ করিয়াছে। কটমট সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধার না করিয়াও দেখান যায় যে, অতি বড় জ্ঞানী অদ্বৈতবাদী হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞ, নিরক্ষর, ভূতপ্রেতপূজকও হিন্দুধর্ম্মের উপাসক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। পৌত্তলিক হিন্দুও মনে মনে জানে যে, যে মূর্ত্তিতে সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার আবাহন করিতেছে, সে মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই সে অদ্বিতীয় ভগবানের আরাধনা করিতেছে। অতি বড় নিরক্ষর অজ্ঞ পল্লীবাসী হিন্দুও জানে যে, ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজিত হইলেও ভগবান্ এক। সেই এক অদ্বিতীয় ভগবান্ যে স্থানেই পূজিত বা আরাধিত হউন, সে স্থান হিন্দুর পক্ষে পবিত্র। তাই হিন্দু সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করে, সকল ধর্ম্মস্থান—মসজেদ, চার্চ্চ, সিনাগগ, অগ্নিপীঠ—সকল স্থানকেই পবিত্র বলিয়া মনে করে। হিন্দুর এই উদারতা যিনি না বুঝেন, তিনি হয় অজ্ঞ, না হয় জানিয়া শুনিয়া স্বার্থের খাতিরে সত্যের অপলাপ করেন।

হিন্দুর পৌত্তলিকতা উপলক্ষ করিয়া কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই পৌত্তলিকতার গূঢ় মর্ম্ম কখনও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পরমজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখনকার কালে এ দেশে ছিল না বলা যায়। সেই পরম পণ্ডিত অদ্বৈতবাদী শঙ্করও গঙ্গার স্তোত্র, গোপালের স্তোত্র ইত্যাদি নানা দেবদেবীর স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একেশ্বরবাদী, পরন্তু জ্ঞানী। তিনি যখন জানিতেন, ভগবান্ এক ব্যতীত দুই নহেন, তখন কি জন্য নানা দেবদেবীর ধ্যানযোগ্য স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন? তিনি কি মুখে এক, মনে আর ছিলেন? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও পরমপণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু জগবন্ধুর পূজা ও আরাত্রিককালে তাঁহার প্রেমোন্মাদ হইত, তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের ধূলায় লুটাইয়া নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেন। কাঠের ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিতের এই ভাবের উদয় হইত কেন? তিনিও কি মুখে এক, মনে আর ছিলেন? ভিতরের এই রহস্যটুকু বুঝিতে পারিলেই এই হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার রহস্য সহজ ও সরল হইয়া যাইবে।

সুতরাং হিন্দু পৌত্তলিক হইলেও সে একেশ্বরে বিশ্বাসী—ভগবানের নানা মূর্ত্তিতে লীলাচেষ্টায় আস্থাস্থাপন করিলেও যে তাঁহার একমেবাদ্বিতীয়ত্বের বিষয়ে অজ্ঞ নহে, এই ধারণা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর মনে বদ্ধমূল হইলে হিন্দুর উদারতার সন্দিহান হইবার কারণ থাকে না। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী একেশ্বরবাদী বলিয়া হিন্দু তাহার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারে—পারাই স্বাভাবিক। কেন না, হিন্দু স্বয়ং প্রকৃতপক্ষে একেশ্বরবাদী।

হিন্দুধর্ম্ম এত উদার যে, জগতের বহু ভিন্নমতাবলম্বীকে আপনার করিয়া লইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিবাদস্বরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিলেও হিন্দুধর্ম্মে বুদ্ধের অবতাররূপে স্থান হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের নাথ যোগীরা যীশু খৃষ্টকে 'ইশাইনাথ' বলিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে মুসলমান সত্যপীরের পূজা ও সিন্নীর ব্যবস্থা আছে। বহু হিন্দু মুসলমানের দরগায় পূজা দিয়া থাকে। মুসলমানের মহরম পর্ব্বে বহু হিন্দু যোগদান করিয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম্মের এই উদারতা বিষয়ে কেবল যে হিন্দুই গর্ব্বানুভব করিয়া থাকে, তাহা নহে। কোন কোন বিদেশীও এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী জেন এলডেন অন্যতম। এই বিদুষী প্রতীচ্যবাসিনী "হিন্দুর শান্তি ও খৃষ্টানের শক্তি" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ। আমরা উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিতেছি, পাঠক উহা হইতে এই বিদেশিনীর হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে ধারণার কথা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমতী জেন এলডেন লিখিতেছেন :—

হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্ম—একত্বত্বয়ের আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচনা,—সে কি বিরাট ব্যাপার! এক দিন বড়দিনের পূর্ব্বদিবসে আমি কলিকাতার কোনও খৃষ্টান মিশন হাউসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক গৈরিক বসনপরিহিত হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁহাদের মঠ (কলিকাতা হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত) হইতে মঠের স্বামীজীর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পত্রে এই কথাগুলি লেখা ছিল :—"আমরা শুনিয়াছি, আগামী কল্য আমাদের বিদেশী বন্ধুদিগের এক বিরাট পূজার পর্ব্ব। এ পর্ব্বে কোন্ দেবতার আরাধনা হইবে, আমরা জানি না, অথবা ইহাও বুঝি না, কেন ঠিক এই সময়ে আপনারা এই দেবতার পূজা করেন। কিন্তু তথাপি আমরা আপনাকে ঐ দিন আমাদের মঠে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি, কেন না, আমরাও আমাদের মন্দিরে আপনার সহিত আপনাদের দেবতাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করি।"

পত্রপাঠ করিয়া আমি ভাবিলাম, হিন্দু না হইলে এমন করিয়া কে

লিখিতে পারে ? পৃথিবীর কোন্ খৃষ্টান সম্প্রদায় এরূপ আশ্চর্য্য উদারতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশস্ততা দেখাইতে পারে ? অথচ তখনই মনে পড়িল, আমাদের দেশীয় খৃষ্টান পাদরীকে। তিনি পূর্ব্বে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সহস্র সহস্র অন্ত্যজ খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে খৃষ্টানধর্ম্ম যেন স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের ন্যায় আশা ও আনন্দ দান করিয়াছে—শিক্ষা দিয়াছে যে, খৃষ্টান শাসকের ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানবই সমান, অন্ত্যজের মূল্য উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। হিন্দু এই সমস্ত অন্ত্যজ অস্পৃশ্যগণের জন্য কি করিয়াছে ? হিন্দু কি খৃষ্টানধর্ম্ম—কোন্‌টা বড় ? আমার উত্তর, কোনটাই বড় নহে, উভয় ধর্ম্মই পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষাদান করিয়া পূর্ণতা প্রদান করিতে পারে।

খৃষ্টান ও খৃষ্টানধর্ম্মের শক্তি চিন্তায় নহে, কার্য্যে বিকশিত হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানব-সেবা খৃষ্টানধর্ম্মের আদর্শ। যদি খৃষ্টান এই আদর্শের সহিত অপর ধর্ম্মের আদর্শের মহত্ত্ব অনুভব করিবার শক্তি সঞ্চয় করিত, তাহা হইলেই খৃষ্টানধর্ম্মের পূর্ণতা ও সার্থকতা সম্পন্ন হইত।

ভারতবর্ষে খৃষ্টান মিশনারীদিগের মানব-সেবা—সমাজের উন্নতি-সাধন তাঁহাদের কর্ম্মশক্তির পরিচয় প্রদান করে। শিক্ষা, রোগের সেবা, পরিচ্ছন্নতা ও আত্মসম্মানের শিক্ষাদান, নারী ও অস্পৃশ্যের উন্নতিবিধান—এক কথায় মানুষের মনুষ্যত্ববিধান প্রধান কর্ম্ম। প্রাচীন কালের ক্রীতদাসের ন্যায় যে সকল হিন্দু তাহাদের সমাজে হেয় ও অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট খৃষ্টানধর্ম্ম মুক্তির বার্ত্তা আনিয়া দেয়,—তাহাদিগকে বলিয়া দেয় যে, তাহারাও মানুষ, তাহারাও স্বাধীন, মানসিক, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সকলভাবেই স্বাধীন। খৃষ্টানধর্ম্মের ইহাই বৈশিষ্ট্য। গভীর চিন্তামগ্ন আধ্যাত্মিক হিন্দু এই মুক্তি দিতে পারে না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মও যে খৃষ্টানকে কোনও কোনও বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে পারে, তাহা বহু খৃষ্টান মিশনারী একেবারেই স্বীকার করেন না। খৃষ্টানরা প্রায়শঃ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা করিয়া রাখে। যদি অন্য ধর্ম্মমত তাহাদের সেই নির্দ্দিষ্ট খৃষ্টানধর্ম্মমতের বিশ্বাসের অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয় না। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের ধর্ম্মে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা অন্য ধর্ম্মে নাই ; যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা খৃষ্টান-ধর্ম্ম হইতে ধার করা। কিন্তু তাহারা এটা বুঝে না যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও জগতে ভাল ও সত্য ছিল।

মিস সেয়ারার নাম্নী এক খৃষ্টান মিশনারী আমাকে বলিয়াছিলেন, "অন্য ধর্ম্মে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহা খৃষ্টানধর্ম্মের মত খাঁটী সত্য নহে।" আমি বলিয়াছিলাম,—"কিন্তু আপনি বুদ্ধ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত সত্যবাণী পাঠ করিয়াছেন কি ?"

মিস সেয়ারার ঈষৎ উষ্ণভাবে বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণের কথা আমাকে বলিবেন না। কৃষ্ণ-উপাসকরা যে সকল আচরণ করে, কালীর মন্দিরে যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান হয়, জগন্নাথের পূজাপার্ব্বণে যে সকল দৃশ্য দেখা যায়, তাহা না বলাই ভাল। আধুনিক হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি দেখিলেই ঐ দুই ধর্ম্মের অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা বুঝা যায়।"

আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে, "অবনতি সকল ধর্ম্মেরই অঙ্গ। খৃষ্টানদের ডাইনীতন্ত্র, ইনকুইজিসন, পুড়াইয়া মারা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনি কি খৃষ্টানধর্ম্মের বিচার করিতে চাহেন ? খৃষ্টানধর্ম্মের অবনতি হয় কি না, আরও ৫ হাজার বৎসর না দেখিলে বলা যায় না।"

মিস সেয়ারার বলিলেন, "খৃষ্টের খাঁটী সত্য বাণীর কখনও অবনতি ঘটিবে না।"

আমি বলিয়াছিলাম, "নিশ্চয়ই। তেমনই বুদ্ধের অথবা শ্রীকৃষ্ণের খাঁটী সত্য বাণীর কখনও অবনতি ঘটিবে না।"

বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের আদিবাণী কি সুন্দর, আর তাহাদের মধ্যে কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে !

খৃষ্টের জন্মের ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন,— "তোমার ভ্রাতাও যে, তুমিও সে, এই সত্য বাস্তব জীবনে নিত্য অভ্যাস কর। মানুষ প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয় করুক, সৎকার্য্য দ্বারা অসৎকার্য্যের প্রবৃত্তিকে জয় করুক। কোন জীবিত প্রাণীর অনিষ্ট করিও না, সদা প্রেম ও দয়ায় অন্তর পূর্ণ করিয়া রাখ।" এমন সুন্দর উপদেশবাণী অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

মিস সেয়ারার হয় ত বলিবেন, "কিন্তু নির্ব্বাণ কথাটা ত উড়াইয়া দিতে পার না। যে ধর্ম্মে জীবনের বাস্তব দিকটা উড়াইয়া দেয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।"

আমি তাহার উত্তরে বলি, বুদ্ধ নিজে কখনও জীবনের বাস্তব দিকটা উড়াইয়া দেন নাই। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "জগতের উর্দ্ধে, অধে, চারিদিকে সকলের প্রতি অবিচারিতচিত্তে নিরপেক্ষভাবে সদিচ্ছা প্রদর্শন কর। হৃদয়ের এই অবস্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই নির্ব্বাণ।" বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন, "অলস জীবন ঘৃণার্হ; উদ্যমশীল জীবনকে সদা ঘৃণা করিবে।" বুদ্ধ কোথাও মানুষকে গৃহহীন হইতে বা সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই ; বরং যে যে অবস্থায় আছে, সে সেই অবস্থায় থাকিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সকলকেই স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে আত্ম-নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তাহা হইলেই মানুষ শান্তি ও আনন্দ পাইবে, এ কথাও বুদ্ধ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দিয়াছেন। সকল মহৎ ধর্ম্মোপদেশকই স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরার্থে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সকলেই আত্মাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, দেহকে দেন নাই।

মিস সেয়ারার ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কেবল মুখে বলিলেই ত হয় না। যদি হিন্দুধর্ম্মে এরূপ মহৎ উপদেশ থাকে, তাহা হইলে আধুনিক হিন্দুরা অবনত, দুঃখক্লিষ্ট ও পরাধীন কেন ?"

আমি বলিয়াছিলাম, "ভারতের হিন্দুর অবনতির মূল কারণ তাহাদের সামাজিক অত্যাচার ও অনাচার। উচ্চ জাতিরা জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহাদের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই অবনতি। কিন্তু আমরা খৃষ্টানরা ধর্ম্মসম্বন্ধে যে অত্যাচার-অনাচার করি, তাহার তুলনা কোথায় ? আমরা মনে করি, আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, উহাই মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে। এই আত্মম্ভরিতার পক্ষে বলিবার কি আছে ? কিন্তু দেখুন, হিন্দুর গীতায় আছে, ভগবান্ বলিতেছেন, 'ধর্ম্মসংস্থাপনের এবং অধর্ম্মের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব।' পুনশ্চ, 'মানুষ যে পথই তাহার রুচি অনুসারে গ্রহণ করুক, আমি সেই পথেই তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিব।' ঋগ্বেদে আছে, 'ভগবান্ এক, সত্য এক, মানুষ তাঁহাকে নানা নামে অভিহিত করে।' কোন্ শিক্ষা ভাল ? যে শিক্ষার বলে, ভগবান্ একবারমাত্র অবতাররূপে দেখা দিয়াছেন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্র একখানি—না, যে শিক্ষার বলে, ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইবেন এবং যে যে পথ দিয়া ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিবে, সে সেই পথেই তাঁহাকে পাইবে ?"

তাহার পর আমি ভাগীরথীতটে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে (বেলুড় মঠে) স্বামীজীর নিকট যে উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার

সকল সংশয় দূর হইয়াছিল। আমি আর একটি ইংরাজ মহিলার সহিত তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। আমি প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা দ্বারা যাহা জানিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :—

মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য আত্মোন্নতিসাধন করা। উহার অর্থ স্বার্থসাধন করা নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা অথবা জ্ঞানলাভের জন্য যোগের অভ্যাস স্বার্থসাধন করা নহে। যতক্ষণ মানুষ উহা করিতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ তাহার জগৎকে দিবার কিছু থাকে না। জগতের সেবা করিতে হইলে, সমাজের দুঃখকষ্ট নিবারণ করিতে হইলে প্রথমে আত্মাকে পবিত্র করা চাই। জনহিতকর অনুষ্ঠান ও সংস্কার দ্বারা এক দিন জগৎ হইতে সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, এ ধারণা ভ্রান্ত। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে উহা হইতেই পারে না। জগৎ মায়ার খেলা, সে মায়া চিরদিনই থাকিবে। তাই জগতে সুখ-দুঃখ চিরদিনই থাকিবে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ যেমন প্রকৃতির নিয়ম, সুখদুঃখও তেমনই মায়ার খেলার নিয়ম। এই হেতু মানুষকে দৈহিক নিম্ন অবস্থা হইতে আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থায় ক্রমশঃ যোগাভ্যাস দ্বারা উপস্থিত হইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সুখের ও শান্তির আস্বাদ পাইবার সুযোগ হইবে। অপরের দুঃখ-নিবৃত্তি (সেবা) রূপ উৎকোচ দিয়া ঈশ্বর সান্নিধ্যে পাওয়া যায় না, মানুষকে নিজের আত্মার উন্নতির জন্য ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয়, অভ্যাসযোগ দ্বারা সে পথে অগ্রসর হইতে হয়, তবেই সচ্চিদানন্দকে পাওয়া যায়।

এই বিদেশী বিধর্ম্মী খৃষ্টান মহিলা যে রামকৃষ্ণ-মিশনের মঠ-স্বামীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই মিশন যাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষ তাঁহার নিজের জীবনে এবং উপদেশমালার মধ্য দিয়া হিন্দুধর্ম্মের উদারতা পদে পদে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সকল ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথ, এ সত্য হিন্দুধর্ম্মে নূতন উপলব্ধ হয় নাই, ইহা হিন্দুর চিরদিনই বিদিত, তবে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব এই সত্যকে নিজের জীবনের আদর্শে বিশেষরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, মানুষ তাহার নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই তাহার 'প্রধান' কর্ত্তব্য। তিনি নিজ জীবনে সকল আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্মের অংশমাত্র। There was not a symbol in India that he had not worshipped, not a worshipper, by whatever route, whose special need he had not felt in his own nature and borne till it was satisfied, not a prayer or ecstacy or vision that he did not reverence or understand যে পথ দিয়া গেলে ভগবানকে পাওয়া যায়, ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব সেই সমস্ত পথ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা না করিলে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইত না। তাঁহার নিকট শাস্ত্রের অন্ত ছিল না—শাস্ত্র তাঁহার নিকট অনন্ত ঈশ্বরবাণী বলিয়া অনুমিত হইত। তিনি বলিতেন, "যদি কেহ বলে, পিপীলিকারা চিনির পাহাড় গর্ত্তে লইয়া গিয়াছে খাইয়া ফেলিবার জন্য—উহা যেমন অসম্ভব কথা, তেমনই কেহ যদি বলে, অনন্ত ভগবান্‌কে কেহ জানিয়াছে বা বুঝিয়াছে, তাহা হইলে উহাও তেমনই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। যেমন জলকে যে পাত্রে রাখ, জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করিবে, তেমনই ভগবান্‌কে যে ধর্ম্মে যে ভাবে ধারণা করিয়াছে, ভগবান্ সেই ভাবেই সেই ধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন।"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সার তত্ত্ব। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব এই সনাতন হিন্দু সত্যতত্ত্ব নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজ সরলভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন, সকল মানুষকে তুষ্ট করিবার একটিমাত্র ধর্ম্ম-মত (formula) থাকিতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজের ধর্ম্ম গঠন করিয়া লইবে। এই হেতু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের সংখ্যা যতই অধিক হয়, ততই বহুসংখ্যক লোকের ধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু তিনি জানিতেন, এই উদারতার মধ্যে আন্তরিকতা না থাকিলে উহার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এই হেতু তিনি প্রত্যেক মানবকে তাহার ধর্ম্মের গভীর মধ্যে আন্তরিকভাবে অবস্থান করিতে বলিতেন। তিনি সহজ সরল উপমা দ্বারা দেখাইয়া দিতেন যে, যত দিন গাছ বড় না হয়, চারা থাকে, তত দিন তাহার বেড়ার প্রয়োজন হয়। তাহার পর গাছ বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে মানুষ প্রথমে নিজের ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত আস্বাদন পাইলে পরে সকল ধর্ম্মকেই আপনার প্রিয় বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইবে। দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন, যেমন গৃহস্থের বাড়ীর বধূ বাড়ীর সকলকেই ভালবাসে, তথাপি স্বামীর জন্য তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলের গাঢ় ভালবাসা সঞ্চয় করিয়া রাখে, তেমনই হিন্দু পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে ভালবাসে বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে নিজের ধর্ম্মের প্রতি গাঢ় ভালবাসা সঞ্চয় করিয়া রাখে।

দুঃখের বিষয়, হিন্দুর অনুমোদিত এই উদারতার কথা অধুনা এ দেশের বহু মুসলমান বুঝিতে চাহিতেছেন না। ইহা হইতে নানা অনিষ্ট সঞ্জাত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিবাদে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দু ও মুসলমান এ দেশে বসবাস করিয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে কোন কোন অত্যাচারী মুসলমান নরপতি হিন্দুর দেবমন্দির ভগ্ন, কলুষিত বা লুণ্ঠিত করিয়াছেন,—বহু হিন্দুকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন, কিন্তু গত কলিকাতা দাঙ্গার সময়ের পূর্ব্বে এমন একটি দৃষ্টান্তও দেখান যায় না, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, হিন্দু প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া মুসলমানের মসজেদ বা দরগা ভগ্ন, কলুষিত বা লুণ্ঠিত করিয়াছে। এই বর্ব্বরতা হিন্দুর ধাতুগত নহে। অবশ্য হজরৎ মহম্মদের এই পবিত্র ধর্ম্মে এ সকল অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়ার কথা নাই, এ কথা বহু মুসলমান মনীষীই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানরা যে অসহিষ্ণু হইয়া নানাক্ষেত্রে পরধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুসলমান নরপতিদের মধ্যে এমন অত্যাচারী একাধিক ছিলেন, এ কথা ইতিহাসেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ অথবা বাঙ্গালার রাজা প্রতাপাদিত্য মুসলমানের মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণের অভাব নাই। ইহা হইতে কি হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সপ্রমাণ হয় না? গত কলিকাতার দাঙ্গায় হিন্দুর শিবমন্দির ভগ্ন ও অপবিত্র হওয়ায় হিন্দুরা প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া মুসলমানের মসজেদ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপবিত্র করিয়াছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু এ সকল ব্যাপারে কোনও বাঙ্গালী হিন্দুর যোগদান করার কথা শুনা যায় নাই। বরং আমরা শুনিয়াছি, যখন ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নীচ জাতি হাড়কাটা গলির শিবমন্দির আক্রমণের প্রতিশোধ দিবার উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজের মসজেদ ধ্বংস করিতে গিয়াছিল, তখন বাঙ্গালী হিন্দুরাই তাহাদিগকে ঐ গর্হিত কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। পরন্তু পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্র মুসলমানপ্রধান স্থানে হিন্দুর দেবালয় বা দেববিগ্রহ অপবিত্র হইলেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান স্থানে কোথাও প্রতিশোধেচ্ছায় মসজেদ অপবিত্রীকৃত হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ যে, হিন্দু (অন্ততঃ বাঙ্গালী হিন্দু) পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকেই আপনার বলিয়া মনে করে—কাহারও প্রতি শ্রদ্ধাহীন নহে।

এই কারণেই পাবনায় বাঙ্গালী হিন্দু নরনারী দুর্ব্বৃত্ত পশুপ্রকৃতি মুসলমান গুণ্ডা দ্বারা ধর্ষিত হইলেও কোথাও বাঙ্গালী হিন্দু তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে নাই। যে বাঙ্গালী হিন্দুর দুই জন যুবক কলিকাতায় উন্মত্ত উত্তেজিত ৫ শত মুসলমান জনতাকে লাঠি হস্তে দূরে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই বাঙ্গালী হিন্দু যে সাহসের অভাবে অত্যাচারের উত্তরে অত্যাচার করিতে অসমর্থ ছিল, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। হিন্দু বাঙ্গালী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপর ধর্ম্মান্ধতার জন্য অত্যাচার করিতে পারে না বলিয়াই এইরূপ সম্ভবপর হইয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু অন্য ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছিল। সত্য বটে, পাবনায় কয় জন বাঙ্গালী হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকের বিপক্ষে অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ঐ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত বলিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। মৌলভী আফতাবুদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তি 'মুসলমান' পত্রে লিখিয়াছিলেন যে কতকগুলি মুসলমান মহিলার উপর হিন্দু ভলান্টিয়াররা অত্যাচার করিয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা এ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কোন নারীর উপর অত্যাচার করা হয় নাই। শ্রীপুরের কয় জন নারী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি হিন্দু তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। দারোগা স্বয়ং গিয়া ঐ অভিযোগের তদন্ত করেন। তিনি কতকগুলি মুসলমান ও হিন্দু ভলান্টিয়ারের সমক্ষে উহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এই বাঙ্গালার নানা স্থানে মুসলমান নরপশু কর্ত্তৃক হিন্দু নারী ধর্ষিতা ও অপমানিতা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে। কিন্তু হিন্দু কর্ত্তৃক মুসলমান নারীর অবমাননা হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সে দিন কুষ্টিয়ায় হিন্দুনারী মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইয়াছিল,—ইহা সরকারী ইস্তাহারেই প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু, নারীর অবমাননা মাতৃজাতির অবমাননা বলিয়া মনে করে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা এই খাতেই আবহমান কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু যখন ক্ষমতাশালী হইয়াছে, তখন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম ও নারীর সম্মান সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়াছে। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, কেদার রায়, রাজা গণেশ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এ পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহা দ্বারাই হিন্দুর mentalityর স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

সুতরাং যাহারা আজ বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান বিরোধে অত্যাচারী হিন্দুকে মুসলমান অত্যাচারীর সহিত সমান আসনে বসাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াস যে বৃথা বাগাড়ম্বর, তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিরদিনই উদার—চিরদিনই অপর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, ইহা ইতিহাসই সাক্ষ্য দিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

গীতা ও দুর্গোৎসব

অনেকে হয় ত মনে করেন, গীতা ভাগবতেরই মত একখানি ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীগীতা পাঠে, আবৃত্তিতে বা শ্রবণে—ভক্তিমার্গে মুক্তি হয়। বিশ্বাসের বলে, শ্রীভগবানের কৃপায়, বিশ্বাসীর ভাগ্যে এরূপ ঘটিলে কাহারও তাহাতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না—সুতরাং আমারও নাই। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, গীতা ছাঁকা উপনিষৎ—বেদান্ত গ্রন্থ—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির ইহা মীমাংসা।

ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুন যখন মোহঘোরে পতিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, যুদ্ধে অর্থাৎ কর্ম্মে যখন তাঁহার আসক্তি ছিল না—প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছিল, কর্ম্মে যখন তিনি ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন, শ্মশানবৈরাগ্যের মত যখন তাঁহার বৈরাগ্য আসিয়াছিল, তখন শ্রীভগবান্ ভক্তকে—সখাকে কিছুতেই কর্ম্মত্যাগ করিতে দেন নাই; আপন কর্ম্ম করিবার জন্যই ভক্তকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া—তবে তাঁহাকে ছাড়িয়াছিলেন। অন্ততঃ প্রবাদ—আখ্যায়িকা ভাগ ত এই প্রকারই।

সোজা কথায় তবেই বুঝিতে হইল, যিনি যতই মহতো মহীয়ান্, গুরোর্গরীয়ান হউন না কেন, কর্ম্ম ভিন্ন কাহারও গতি নাই, আর কর্ম্ম করিতে হইলেই শক্তির আবশ্যক। প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনকে শক্তিমান করিবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতার সৃষ্টি। দার্শনিক বিচারের দ্বারা শ্রীভগবান, অবসাদপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে শক্তিধর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা ভোজবাজির খেলা নহে—গঞ্জিকা-সেবীর অদ্ভুত প্রলাপ ইহাতে কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত, বিচারসম্মত, দার্শনিক তত্ত্বসম্মত একটা অপরূপ সরল সহজ বিশ্লেষণ। এ বিশ্লেষণ বিচারবুদ্ধিতে যিনি বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসে যিনি কর্ম্মনিরত হইতে পারেন, শক্তিলাভ হয় তাঁহারই ভাগ্যে, আর সেই শক্তিতেই সাধকের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অর্জ্জুন শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন—শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত যুক্তি-তর্ক শুনিয়া। নিবিষ্টচিত্তে তিনি যদি তাহা না শুনিতেন, সে সকল যুক্তিতে ভক্তি-বিশ্বাস যদি তাঁহার না থাকিত—না হইত, তাহা হইলে শক্তিসঞ্চয় তিনি করিতে পারিতেন না, আর ভারতযুদ্ধে জয়লাভও করিতেন না। ইহার ভিতর আর "হয় ত" নাই। "হয় ত" থাকিলে শ্রীভগবানের গীতাসৃষ্টি আবশ্যক হইত না। এইরূপ বোধ হয় জোর করিয়া বলিতে পারা যায়, দুঃখ, শোক, অত্যাচার, অনাচারকে দমন করিতে হইলে গীতার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়, গীতা-মাহাত্ম্য বিশ্বাস করিতে হয়। দর্পী, দম্ভী, মূর্খ অসুরা রাজা দুর্য্যোধন বিজিত হইয়াছিল—অত্যাচার-প্রপীড়িত, রাজ্যভ্রষ্ট গীতাপন্থী পাণ্ডবের নিকটে। অসার, অলীক গল্প-কথা বলিয়া মহাভারতের যুদ্ধটাকে যদি কেহ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও গীতামাহাত্ম্যের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কেন না, গীতা বিচারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা দর্শনশাস্ত্র—এ শাস্ত্রের সহায়তায় সকল যুগেই শক্তিলাভ করিতে পারা যায়—ইহার কালাকাল নাই—একনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, বিচারবুদ্ধি ও বিশ্বাস থাকিলে অধিকারভেদও না থাকিবার কথা। বিচারবুদ্ধিতে গীতার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, প্রমাণ হইবে, গীতা সার্ব্বজনীন গ্রন্থ। কারণ, গীতায় সন্ধান পাওয়া যায়, আত্মার রূপ নাই, বর্ণ নাই, জাতি নাই, ক্লেদ নাই—জাতি-বর্ণের বৈষম্য একাকারে ডুবিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন-বুদ্ধিতে যিনিই ভগবানের প্রেরণা বুঝিবেন, তিনিই জয়যুক্ত হইবেন। চেষ্টা করিলেই ফল পাওয়া যাইবে হাতে হাতে। ফল ফলিবে কবে, তাহা জানিবার জন্য জ্যোতিষীর নিকটে যাইয়া কাহাকেও আর উমেদারী করিতে হইবে না। তবে চেষ্টার মত চেষ্টা চাই। সে কথা ত বলিয়াছি। গীতা বুঝিতে হইলে অর্জ্জুন-বুদ্ধির আবশ্যক। নতুবা কিছু লাভ হইবে না; বরং অলাভ হইবে। "গীতা পাঠ বা গীতা শ্রবণ করি" বলিয়া "অহমিকা" যদি ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। গীতাপন্থী হইতে হইলে অর্জ্জুনভাব হৃদয়ে জাগাইতে হইবে—তাহা'ত পরমলাভ। ভগবানের রূপ অনন্ত। ভক্ত তাহা ইচ্ছামত, আকাঙ্ক্ষামত গড়িয়া লইতে পারে,

বিধিব্যবস্থানুসারে পল্লীমণ্ডলীর চিকিৎসক সদস্যগণ স্থানীয় চিকিৎসাদি কার্য্য পরিচালিত করিবেন। চিকিৎসা কার্য্যটি যাহাতে বিনামূল্যে চলিতেছে বলিয়া দেশবাসী বুঝিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে পর ঔষধ-পথ্যের প্রয়োগে রোগীকে রোগমুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে আদৌ রোগে যাহাতে কাহাকেও আক্রমণ করিতে না পারে, যথাসাধ্য ও যথাসম্ভবমতে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসকমণ্ডলীকে কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। ব্যাধির প্রাবল্যে ও প্রকোপে দেশবাসীর স্বাস্থ্য যতই ক্ষুণ্ণ হইবে, জাতির কর্ম্মশক্তি যে ততঃ অসম্ভব হইয়া পণ্য—ফলে অর্থ-উৎপাদনের পথ বিঘ্নবহুল, কণ্টকাকীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিবে, এ কথাটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যসংসাধন জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার ও ব্যাধিপ্রতিষেধের স্থূল নিয়মগুলি দেশবাসিমাত্রেই যাহাতে অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে অবহিত ও তৎপর হয়, কর্ত্তৃপক্ষগণকে সেইমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টি প্রাথমিকাদি সর্ব্ববিধ শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেশবাসীকে স্বাস্থ্যাদিরক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

প্রয়োজনবোধে দেশবাসীরা যাহাতে নিজ নিজ রোগ নিজেরাই নির্ণয় করিয়া নিজেদের ঔষধাদি নিজেরাই প্রস্তুত করত ব্যবহারক্রমে রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপায়, বলবিধায়ক খেলাধূলা ও ব্যায়ামাদি। এই মহাদরিদ্র দেশে ব্যয়মূলক খেলাধূলা বা ব্যর্থ শ্রমমূলক ব্যায়ামাদির বিধান প্রবর্ত্তন না করিয়া পণ্যাদি উৎপাদক সার্থক শ্রমমূলক খেলাদির বিধান প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

শিক্ষাবিভাগে কৃষি ও শিল্প-সম্পর্কিত এমন সব শ্রমমূলক ও আমোদজনক কার্য্যের বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষার্থীরা যাহাতে খেলাধূলাচ্ছলে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে করিতে ফসল ও শিল্পজ পণ্যাদি উৎপাদনপূর্ব্বক অন্ততঃ নিজেদের জীবিকার উপায় নিজেরাই করিয়া লইতে পারে।

দেশবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যায়ামাদির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইলে এমন সব ব্যায়ামাদির বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে সেই ব্যায়ামাদিজনিত শ্রম ব্যর্থ না হইয়া, কোনও না কোনওরূপ পণ্য উৎপাদনপূর্ব্বক সার্থক হইতে পারে।

পল্লীমণ্ডলীসমূহের বিশেষ বিশেষ কর্ম্মশালার প্রয়োজনানুরূপ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার গুরুভার সব চাকাদি ঘুরাইবার বা বাহুবলাদিসাধ্য যে কোনওরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা করিলেই উক্ত উদ্দেশ্যটি সফল হইয়া উঠিবে।

বৃথা খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদে সময় ও শক্তিসামর্থ্য নষ্ট না করিয়া দেশবাসিমাত্রেই যাহাতে স্বাস্থ্যাদিরক্ষাচ্ছলে ও পণ্যোৎপাদক-শ্রমে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেই ভালবাসে, পণ্যোৎপাদক সার্থক শ্রমকেই যাহাতে আমোদজনক খেলাধূলা বলিয়া তাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে নিযুক্ত থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তদনুরূপ শিক্ষায় সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

খেলাধূলা ও ব্যায়ামাদিতে বৃথা শক্তি ও সময় নষ্ট করা ত দূরের কথা, রোগে-শোকে মুহ্যমান হওয়াও সময় নষ্ট করিবার মত অবসর এ দেশবাসীর নাই, এমনই দরিদ্র এ দেশ,—এ কথাটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া দেশবাসীকে কর্ম্মের কঠোর সাধনপথে, অগ্নিলিপ্তপদে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মৃত্যু-দূত

মৃত্যু যখন আসবে নিয়ে—
তোমার পত্রখানি,
দুপুর, সন্ধ্যা মানবো নাক,
বলবো না তায় "এখন থাক,"
প্রাণের টানেই শুনব আমি
তোমার আদেশ-বাণী।

"কায ত আমার হয় নি সারা,
রয়েছে অনেক বাকী;
ডাকি নি তোমা সন্ধ্যা-সকাল,
মিথ্যা কাযেই কেটেছে কাল"—
এমন মিথ্যা মুখে সে এনে—
দিব না তোমায় ফাঁকি।

আমি যা জানি, তাহার অধিক
তুমি যে আমার জান':
কতটা মন দিয়েছি তোমায়,
হিসাব আছে তোমার খাতায়;
তোমায় পূজা করেছি কখন—
সেইটি তুমিই মান'।

নরক স্বর্গ-মোক্ষ-লোভে,
কেবল ভালবেসে,—
আকুল প্রাণে ডেকেছি যখন,
সেইটি মনে রেখেছ তখন;
তোমার পূজায় ভাবিনি তোমা'—
উঠেছ তাতেই হেসে।

ডাক পড়েছে তোমার সভায়,
আমি ত যেতেই রাজি;
চাহি না কাল করিতে হরণ,
আমার যাবার সময়, ক্ষণ—
হোক্ না কেন আজই।



রূপের মোহ

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কনিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অলকগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে করিতে সুরমা বলিলেন, "আচ্ছা টুনি, তুই ইদানীং আমায় পত্র লিখতিস্ না কেন?"

কনিষ্ঠা বলিল, "তুমিই কোন লিখতে, দিদি?"

"আমার কত কায বল্ দেখি। এত বড় সংসার!"

টুনি হাসিয়া বলিল, "ওঃ! মস্ত বড় সংসার!—আপনি আর কপ্নী। তোমার চেয়ে আমাদের সংসারের কায বুঝি বড় কম?"

সস্নেহে ভগিনীর দক্ষিণ করপল্লব মৃদু চাপিয়া সুরমা বলিলেন, "তোদের সংসার বড়, তা বলছি না। তবে অত দেরী ক'রে চিঠি লিখতিস্ কেন, তাই বলছিলাম। আচ্ছা, তোর শাশুড়ী তোকে খুব ভালবাসেন?"

শাশুড়ীর প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র টুনির মুখমণ্ডল যেন হাসিতে ভরিয়া গেল। সে বলিল, "অমন শাশুড়ী জন্ম জন্ম তপস্যা করেও সকলে পায় না, দিদি। তিনি আমাকে ঠিক বুকের পাঁজরার মত মনে করেন।" বলিতে বলিতে তাহার আয়ত নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। সে বলিল, "মায়ের অভাব, তাঁর কাছে থাকলে, এক নিমেষের জন্যও বুঝতে পারা যায় না, দিদি!"

অন্যমনে সুরমা বলিলেন, "তোর বরাত ভাল। আমি কোন দিন শাশুড়ী কেমন, তা বুঝতে পারলাম না।"

সুরমার শ্বশুর, শাশুড়ী কেহই ছিলেন না। তিনি স্বামিগৃহে একাতপত্র রাজ্ঞী।

আলোচনায় বাধা পড়িল। 'মহারাজ' আসিয়া জানাইল, সব তৈয়ার। এখন বাবুজীদিগকে খানার সংবাদ পাচককে আদেশ দিয়া সুরমা কনিষ্ঠাকে বলিলেন, "তুই ব'সে চুল বাঁধ। আমি বাবুদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করি গে।"

টুনি বলিল, "বাঃ! আমি যাব না? জামাইবাবু খাবেন, সেখানে আমার যেতে দোষ কি?"

সুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তোর জামাইবাবু ত একা নন। অন্য ভদ্রলোক আছেন যে! আমি সেখানে যেতে পাব না।"

টুনি বলিল, "কৈ, অন্য কাকেও ত বাড়ীতে দেখছি না? সে ভদ্রলোক আবার কে?"

"ওঁর এক বন্ধু—শিশিরবাবু। তাঁরা দু'জনেই এক-সঙ্গে খাবেন কি না।" বলিয়া সুরমা ভগিনীর প্রতি মুহূর্ত্তমাত্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন।

টুনি বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাও। ঐ ঘরেই ত থাকবে? সেখানে আমি যেতে পাব ত? চুল বাঁধাটা সেরে আমি আসছি।"

সুরমা চলিয়া গেলেন। টুনি প্রসাধনে মন দিল। বৈকালে স্নানের পর এতক্ষণে কেশ শুকাইয়া গিয়াছিল।

চুল বাঁধা শেষ হইলে টুনি ধীরে ধীরে দিদির সন্ধানে চলিল। সম্মুখের দালানে ঠাঁই হইয়াছিল। পুরুষরা আহারে বসিয়াছেন। কোন্ জিনিষের পর কোন্টা যাইবে, সুরমা ঠাকুরকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

নারীর কৌতূহল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। টুনি জানালার ফাঁক দিয়া ভোজনকারীদিগকে দেখিল। সহসা সে স্তব্ধ হইয়া গেল। যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ যেন তাহার হৃদয়ে অনুভূত হইল। সযত্নে হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিয়া সে আবার চাহিল। না, না, ভ্রম তাহার হয় নাই—এ বিষয়ে নারীর ভ্রম অসম্ভব। কিন্তু এ সম্ভাবনা যে

কল্পনারও অতীত। সকলে মিলিয়া কি তাহার সহিত কৌতুক করিতেছে ?

সংযমে অভ্যস্তা, আত্মদমনে শক্তিশালিনী প্রতিভা বাতায়ন-সান্নিধ্য ত্রস্তে পরিত্যাগ করিল। তাহার অঞ্চলস্থ চাবীর গুচ্ছ হয় ত চাঞ্চল্য বশতঃ নড়িয়া উঠিয়াছিল, কর-প্রকোষ্ঠের চুড়ি-বালার রিনিক-ঝিনির শব্দ হয় ত স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া থাকিবে। সুরমা মুখ ফিরাইবামাত্র ভগিনীকে আসিতে দেখিলেন। সম্ভবতঃ বিস্ময়রেখা ভগিনীর আনন হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে পারে নাই।

"কি রে, তোর চুল বাঁধা হয়ে গেছে ?"

দিদির উজ্জ্বল কটাক্ষের সম্মুখে আপনাকে স্থির রাখিয়া প্রতিভা ধীর স্বরে বলিল, "হাঁ।"

জ্যেষ্ঠা হয় ত কনিষ্ঠার নিকট হইতে কোনও প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু সে যখন অন্য কোন কথা বলিল না, তখন তিনি উপস্থিত কার্য্যে মন দিলেন। প্রতিভা অবিচলিতভাবে দিদির সাহায্য করিতে লাগিল।

পুরুষদের আহারাদি শেষ হইলে তাঁহারা বাহিরে চলিয়া গেলেন। ভগিনীযুগলেরও আহারাদি শেষ হইল। অন্য নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে পিত্রালয়ের কথারই আলোচনা হইতে লাগিল—ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। ডাক্তার একবার ভিতরে আসিলেন। বাড়ীর মধ্যে অন্য শয়নগৃহও ছিল; কিন্তু তিনি পত্নীকে বলিলেন যে, আজ তিনি বাহিরের অপর কক্ষে শয়ন করিবেন। বহু দিন পরে দুই ভগিনীর প্রথম সম্মিলন—তাহাদের আলাপে তিনি বিঘ্ন জন্মাইবেন না। সুরমাও সে প্রস্তাবের সমর্থন করিল।

বহু দিন পরে প্রিয়জনকে পাইলে শীঘ্র কথা শেষ হইতে চাহে না। অতীত শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের সহস্র স্মৃতি মনকে আলোড়িত করে। মনোরম অতীতের যবনিকা তুলিয়া দুই ভগিনী সুখস্মৃতিগুলিকে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু শরীর ও মন উত্তেজনার আতিশয্যে আবার শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে উদ্বেগের অবসর অল্প, ক্লান্তি শীঘ্রই সেখানে দেখা দেয়। সুরমার শ্রান্ত নয়ন ও মন ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল—নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে তিনি ঢলিয়া পড়িলেন।

কিন্তু প্রতিভার চোখ নিদ্রাহীন। সে শয্যায় শুইয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। না—তাহার বিন্দুমাত্র ভ্রম হয় নাই, হইতে পারে না। স্পষ্টবাক্যে উচ্চারিত না হইলেও—বিবাহসভায় পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে প্রত্যেক শব্দটি যে একান্তমনেই আবৃত্তি করিয়া গিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা নহে। সেই মন্ত্র, সেই অনুষ্ঠান পবিত্রতম বলিয়া কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়া যাহাকে ইহ-পরকালের একমাত্র সঙ্গী, সখা, সুহৃদ, দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, দৃষ্টিবিনিময়কালে যাঁহাকে অন্তরের নিভৃত সিংহাসনে সম্রাটের ন্যায় বসাইয়াছে, তাঁহাকে কোনও হিন্দুনারী ভুলিতেই পারে না। সহস্র লোকের মধ্য হইতেও অনায়াসে তাঁহাকে বাছিয়া লইতে পারে। সুতরাং ভুল তাহার হয় নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, এখানে তিনি আসিলেন কিরূপে? দিদি ও জামাইবাবু তাঁহার পরিচয় জানেন কি? যদি জানেন, তবে তাঁহাকে শিশিরবাবু বলিয়া উল্লেখ করিলেনই বা কেন? তিনি কি আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছেন? সে প্রয়োজনই বা কোথায়? সে শুনিয়াছিল, রমেন্দ্রনাথ পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার লক্ষ্ণৌএ আসা অসম্ভব নহে; কিন্তু দিদির বাড়ীতে তিনি আসিয়া জুটিলেন কি করিয়া? রহস্য ত গভীর হইয়া উঠিল; কিছুই ত বুঝা যাইতেছে না। ইহার নাম কি?—বিধিলিপি?

প্রতিভা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু এইটুকু বুঝিল, তাহার স্বামী আত্মপরিচয় গোপন করিয়া এখানে আছেন। কত দিন আছেন? দিদিকে কি সে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবে? মন বলিল, না, তাহা সঙ্গত নহে। যদি আলোচনাপ্রসঙ্গে এমন কথা উঠিয়া পড়ে—তাহার সহিত স্বামীর পরিচয় কতটুকু তাহা প্রকাশ পায়! না, না, সে বড় লজ্জার কথা; দীনতার কথা! ভগিনী ত দূরের কথা, পিতা-মাতার কাছেই প্রকাশ করা চলে না। বাক্য ত দূরের কথা, আকার-ইঙ্গিতেও এ পর্য্যন্ত শুধু এক জন ছাড়া তাহার এই দৈন্যের আভাসমাত্রও পায় নাই। তাহাও সহজে নহে, অগাধ স্নেহশালিনী শাশুড়ী স্নেহের পীড়নে বাধ্য করিয়া তাহার বুকের মধ্যে সযত্ন-রক্ষিত ইতিহাসের আভাসমাত্র পাইয়াছিলেন।

স্বামীকে সে বুঝিতে পারে নাই—বুঝিবার অবকাশও পায় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহার রচিত পুস্তিকা পড়িয়া

সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, একটা গভীর অতৃপ্তিতে তাঁহার হৃদয় বিষাদপূর্ণ। যাহা তিনি চাহেন, জীবনে তাহা পান নাই। কাব্যে যদি কবির হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পড়ার কথা সত্য হয়, তবে অতৃপ্ত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস কবিতার প্রতি ছত্রে কি মূর্ত্তি গ্রহণ করে নাই? কিন্তু সেই অতৃপ্তির উৎস কোথায় বা কেন, তাহা ত সে জানে না। স্বামীর সহিত পরিচয় ভাল না হইলেও শ্বশুরবাড়ীর সকলেরই মুখে, প্রতিবেশিনীদিগের নিকট তাঁহার উন্নত চরিত্র, মধুর সুন্দর স্বভাব, উদার হৃদয় সম্বন্ধে যে যে সকল মন্তব্য শুনিয়াছিল, তাহাতে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা হইবারই কথা তাহারও তাহাই হইয়াছিল। বীণাপাণির আরাধনায়, সাহিত্যের সাধনায় তিনি মসগুল হইয়া আছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাধি আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে, পত্নীসম্বন্ধে স্বামীর নির্লিপ্ততার মধ্যে স্বাভাবিক কিছু আছে, ইহা ভাবিতে সাহস করে নাই। পিতামাতার দাম্পত্য-জীবনে যে শান্ত, মধুর ও পবিত্র ছবি সে দেখিয়া আসিয়াছে—পিতামাতার নিকট আশৈশব যে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সংসারের অন্ধকারের দিকটা লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তিই তাহার ছিল না।

তবে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আত্মস্থা নারীর স্বাভাবিক অভিমান যে তাহার নাই, এ কথা প্রতিভা অস্বীকার করিতে পারে না। তাই সে স্বামীর নিকট উপযাচিকা হইয়া কয়েকবার পত্র লিখিয়া উত্তর না পাওয়ায় সে আর সে চেষ্টা করে নাই।

রাত্রির অন্ধকারে আজ সেই সকল কথাই তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু ভাবিয়া সে কোনও মীমাংসায় আসিতে পারিল না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে চা ও জলযোগের পর ডাক্তার হাঁসপাতালের কায দেখিবার জন্য চলিয়া গেলেন। রমেন্দ্রও বায়ু-সেবনের জন্য বাহির হইয়া গেল।

প্রতিভা তপতী দিদির সহিত বাগানের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। প্রায় ৫ বিঘা জমীর উপর বাড়ী ও বাগান—চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের আবেষ্টন। মুসলমানপ্রধান পশ্চিমের নগরগুলিতে আবরু বা পর্দ্দার প্রচলন অধিক। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের অধিকাংশই এখনও পর্দ্দার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন নাই। বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এই প্রথা বিশিষ্টভাবে প্রচলিত। মহিলারা ওড়না ব্যবহার না করিলেও, বাহিরে যাইবার সময় সর্ব্বদা চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন—না করিলে সেটা নিন্দার বিষয়। ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পশ্চিমপ্রবাসী। স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও অন্তঃপুরের শুচিতা ও আবরুর দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেন—নারী পুরুষের শক্তি; নারীর সহায়তা এবং সাহচর্য্য ব্যতীত পুরুষ কখনই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিজয়-মাল্য লাভ করিতে পারে না। সমাজেরও—দেশের মঙ্গল নারীর সহায়তা ছাড়া কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষের ন্যায় নারীকেও সকল বিষয়ে সুশিক্ষা দেওয়া অনিবার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, প্রতীচ্যদেশের আবহাওয়া শুধু নারী কেন, এ দেশের পুরুষের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর নহে। নিজের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বন্ধুবান্ধবদিগের জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁহার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল। পুরুষের সহিত নারীর অবাধ সম্মিলন কোনও মতেই ভারতবর্ষের ধাতুসহ নহে। য়ুরোপের আচার-ব্যবহার ও নীতি এ বিষয়ে উচ্চরবে যতই সাক্ষ্য প্রদান করুক না কেন, তিনি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন। পুরুষ ও স্ত্রীর সমাজসঙ্গত অধিকার—প্রাচীনতম যুগের উন্নত সভ্যতালোকদীপ্ত সমাজধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিত। মুক্তবায়ু ও অবাধ আলোকধারা পুরুষের পক্ষে যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, নারীর পক্ষেও তাহাই, এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিমত ছিল না; কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। তাই তিনি হাঁসপাতালের অনতিবিস্তৃত সরকারী বাসভবন উপেক্ষা করিয়া নগরের এক প্রান্তে, খোলা যায়গায় স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। এ জন্য নিজের তহবিল হইতে তাঁহাকে মোটা টাকা ভাড়া দিতে হইত; কিন্তু তাহাতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না।

তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল বিধানের

ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিবর্ত্তনীয়। আধুনিক প্রতীচ্য মতবাদের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অভিমত তিনি উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণের মতবাদ লইয়া বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে—এখনও হয়; কিন্তু ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ তাঁহার ধারণাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। তিনি বিশ্বাস করেন, যাহা সত্য, তাহা সকল দেশেই—সকল সমাজেই সত্য বটে; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নহে। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া, চিরাচরিত সংস্কার—আবেষ্টনকে বাদ দিয়া দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকভাবে কোনও সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ নিত্য সত্য। সূর্য্য প্রত্যহ সর্ব্বত্র উদিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দেশের পক্ষে তাহা অভ্রান্ত সত্য; কিন্তু তাহার দীপ্তি, তেজ, প্রখরতা সকল দেশে সমান নহে। আফ্রিকার মরুভূমিতে সূর্য্য যেরূপ প্রচণ্ড তেজে উদিত হন, গ্রীনল্যাণ্ড বা আইসল্যাণ্ডে কি তাহাই? সুতরাং আবেষ্টনকে বাদ দিয়া কোনও সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। বৃক্ষ সকল দেশেই উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বাড়িতে থাকে, ইহা একটা সত্য; কিন্তু কোনও বিশিষ্ট দেশের কোনও বিশিষ্ট জাতীয় বৃক্ষ বা লতা ভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে ঠিক তেমনই দ্রুত ও পূর্ণমাত্রায় পরিপুষ্ট হইতে পারে কি? সুতরাং ভারতবর্ষের নারিকেলবৃক্ষকে শীতপ্রধান ভূমিতে আবাদ করিলে একই প্রকার ফললাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে। মানুষের পক্ষেও তাহাই। অস্থি, মজ্জা ও রক্তের ধারায় যে সংস্কার, যে শিক্ষা অনাদ্যন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, রক্তের প্রতি বিন্দুতে যাহা অমোঘভাবে বিদ্যমান, পারিপার্শ্বিক সমাজধর্ম্ম, চিরন্তন বিশ্বাস ও চারি পাশের আবেষ্টনে যাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তাহাকে বাদ দিয়া কোনও সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও নহে, দার্শনিক হিসাবেও নহে।

স্বামীর এই চিন্তাধারার সহিত সুরমা সুপরিচিত ছিলেন। স্বামীর সহিত তাঁহার এ বিষয়ে মতের পার্থক্য ছিল না। স্বয়ং পণ্ডিত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় অভিজ্ঞ পিতার নিকট হইতেও তিনি এই আদর্শে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাদিগকে গৃহে সকল বিষয়ে সুশিক্ষাই দিয়াছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদের সহিত পরিচয় তাঁহারও ছিল। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের জীবনে কোনও দিন অন্ধকারের ছায়া পড়িবার অবকাশ ঘটে নাই।

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রতিভা বলিল, "দিদি তুমি এত বড় বাড়ীতে একা থাক, কষ্ট হয় না?"

সুরমা হাসিয়া বলিলেন, "কষ্ট কিসের, বোন? আমি ত একা থাকি না। উনি প্রায়ই কাছে থাকেন। হাসপাতালে যতক্ষণ কায করেন, সংসারের সব কায দেখতেই আমার কেটে যায়। তার পর উনি আসেন। শক্ত ব্যায়রাম ও জরুরী ডাক না হ'লে উনি বড় একটা যান না। আমাদের ত বেশী টাকার দরকার নেই। মাইনে যা পান, আর রোজ ২।৩ টা ডাকে যে টাকা হয়, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। খরচ করেও টাকা জমা থাকে। সুতরাং তাঁর সঙ্গটা আমি অনেকক্ষণ পেয়ে থাকি।"

প্রতিভা ভাবিল, বাস্তবিক দিদি সুখী। যাহার অভাব বোধ নাই, সংসারে সেই সুখী থাকিতে পারে। সে বলিল, "তবু পাঁচ জনের সঙ্গে না মিশে কি চিরদিন চালান যায়?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা কেন? এখানে অনেক বাঙ্গালী আছেন। তাঁদের মেয়েরা মাঝে মাঝে এখানে আসেন, আমিও সময় সময় যাই। তা ছাড়া যখন কায থাকে না, বই পড়ি, সেলাই করি। আবার এখানে অনেকগুলি সমিতি আছে, সেবাসমিতি তাদের মধ্যে একটা। ওর সঙ্গে সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। গরীব-দুঃখীদের জন্য জামা সেলাই করতে হয়। আরও কত কায আছে। দু' দণ্ড চুপ ক'রে ব'সে থাকবার সময় বড় নেই, টুনি।"

প্রভাতের মৃদু বাতাসে রজনীগন্ধাগুলি দুলিতেছিল। টবের ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিভা কোমল করপল্লবে ফুলগুলিকে মৃদুভাবে স্পর্শ করিল। তাহাদের স্পর্শের একটা স্নিগ্ধতা তাহার চিত্তে মাধুর্য্য ভরিয়া দিল।

সুরমা বলিলেন, "তুই ততক্ষণ বাগানে বেড়া, আমি একবার ভিতরে যাই—কায আছে। নির্ভয়ে বেড়াতে পারিস, এ সময়ে কোন লোক আসবে না।"

কনিষ্ঠার প্রতি একটা উজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সুরমা চলিয়া গেলেন।

প্রতিভা মুগ্ধহৃদয়ে উদ্যানে বেড়াইতে লাগিল। সত্যই জামাইবাবুর বেশ সখ আছে। কত রকমের ফুলগাছ গাঁদা, জবা, যূঁই, মল্লিকা, বেলা, গোলাপ—সকল রকমের ফুলের গাছই আছে। প্রাচীরের অনতিদূরে—সমান্তরালভাবে শ্রেণীবদ্ধ নানাবিধ ফলের গাছ। কোন মুসলমান ধনীর এই প্রমোদভবনটি ইদানীং কোনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক কিনিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করিয়া বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিলেন। বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক বাড়ীটিকে আধুনিকভাবে তৈয়ার করাইয়াছিলেন। প্রতিভা সারা বাগানটি ঘুরিয়া আসিল। কয়েক জন মালী অদূরে গাছের পরিচর্য্যা করিতেছিল। প্রতিভা সে দিকে আর না গিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রভাতসূর্য্যের স্বর্ণালোকধারা গাছে গাছে পাতায় পাতায় যেন স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিতেছিল। প্রতিভা চিন্তাকে সহচরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কতকগুলি লাল ও নীল ফুল—কি ফুল, নাম সে জানিত না—তুলিয়া তোড়ার মধ্যভাগে সুকৌশলে বিন্যস্ত করিল। নীল ও রক্তরাগের উপর রজনীগন্ধার শ্বেত দলগুলি চমৎকার দেখাইল। সে খানিক বর্ণবৈচিত্র্যের এই বিচিত্র শোভা মুগ্ধনেত্রে দেখিল। তাহার হৃদয়ের অবস্থার সহিত কি এই ফুলের তোড়ার বর্ণসমাবেশের কোন সামঞ্জস্য ছিল?

সহসা সন্নিহিত কঙ্করাকীর্ণ উদ্যানপথে জুতার শব্দ শুনিয়া সে চকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। আগন্তুককে দেখিবামাত্র অকস্মাৎ তাহার আননে এক ঝলক রক্তরাগ যেন ফুটিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিতে গিয়া সে দেখিল, পার্শ্বস্থ গোলাপবৃক্ষে অঞ্চল জড়াইয়া গিয়াছে। কি বিপদ! সে নতদৃষ্টিতে, ক্ষিপ্র অথচ নম্রহস্তে অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইল।

আগন্তুক রমেন্দ্রনাথ। সে আজ সকাল সকাল বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। ফটক পার হইয়া বাহিরের ঘরে আসিবার পথে উদ্যানমধ্যে সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। পুষ্পস্তবকনম্রা রজনীগন্ধা ও কচি কিশলয়বহুল গোলাপকলির পার্শ্বে শ্যামশোভার কূলে, তন্বঙ্গী, উচ্ছ্বসিতযৌবনা রমণীর সেই স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চকিতে একবার যুবতীকে দেখিয়াই সে নতমস্তকে গাড়ীবারান্দার দিকে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

প্রতিভা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিবার সময় অলক্ষ্যে রমেন্দ্রনাথের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার আননে বা দৃষ্টিতে পরিচয়ের কোনও আভাস ফুটিয়া উঠে নাই!—শুধু ক্ষণিক মুগ্ধ, চকিত, বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিমাত্র!

মন্থরগতিতে প্রতিভা উদ্যানের অপর অংশ দিয়া—খিড়কীর পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সুরমা তখন ভাণ্ডার খুলিয়া আনাজ প্রভৃতি বাহির করিতেছিলেন। ভগিনীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"কি রে, বেড়ান হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ দিদি, এই দেখ, তোমার জন্য একটা তোড়া বেঁধেছি!"—তরুণী সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাস্য করিল।

"তা বেশ। ওটা ফুলদানীতে বসিয়ে রাখিস—তুই ঘরে যাচ্ছিস্ না কি? আচ্ছা যা, আমি সব গুছিয়ে দিয়ে তোর কাছে আসছি।"

প্রতিভা কোনও মতে এতক্ষণ আপনাকে সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিল। ঘরে আসিয়া সে খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইল। তাহার স্বামী তাহাকে চিনিতেই পারিলেন না? সে ত প্রথম দৃষ্টিপাতেই তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছিল! এতটুকু স্মৃতিও তাঁহার নাই? আশ্চর্য্য তাহার অদৃষ্ট!—কর্ম্মফলের এমনই প্রতাপ!

চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গাঘাতে তাহার মন পীড়িত হইয়া উঠিল; প্রত্যেক তরঙ্গের আঘাত কি তীব্র! আপনার ধর্ম্মপত্নীকে কোন্ স্বামী না চিনিতে পারেন?

মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে—উত্তেজনা ও বেদনার প্রভাব একটু কমিলে সে ভাবিয়া দেখিল, ভুল তাহারই। রমেন্দ্রনাথ বিবাহের কয়টা দিন মাত্র তাহাকে দেখিয়াছিল। তখন সে কিশোরী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরিচয় কতটুকু হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস ত তাহার অজ্ঞাত নহে। যে সকল অনুষ্ঠান না করিলে নয়, কলের পুতুলের মত যেন তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত প্রতিভা তখন

করিতে পারে নাই পরে করিয়াছিল। সে জানে, যোড়ে আসিয়া তাহার পিতার সহিত নির্জ্জনে তাহার স্বামী বলিয়াছিলেন, "৩৪ বছর আমাকে দয়া ক'রে অবসর দেবেন। আমাকে আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। এই আমার শেষ পরীক্ষা। আপনারা জিদ্ করলে আমাকে আসতেই হবে।" দ্বারের আড়াল হইতে সে কথা সে শুনিয়া ফেলিয়াছিল। কন্যাজামাতার কল্যাণ-কামনায় তাহার পিতা এই কয় বৎসরের মধ্যে এক দিনও জামাতাকে আহ্বান করেন নাই। জামাতা এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল; রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ এবং আইন পরীক্ষায় সে সাফল্য লাভ করুক, এ কামনা তাঁহার ছিল। এ জন্য জামাতার অনুরোধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। প্রতিভা তাহা জানিত। মাতাও সে জন্য অনেক দুঃখে সকল সাধ-আহ্লাদ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩৪ বৎসরের পূর্ব্বে দৃষ্ট কিশোরী এখন পূর্ণযৌবনা। এ অবস্থায় সুদূর প্রবাসে স্ত্রীকে চিনিতে না পারা অসম্ভব নহে।

যুক্তির দ্বারা মনকে এক প্রকার বুঝাইলেও, নারীর—পত্নীর স্বাভাবিক অভিমান তাহার হৃদয়মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গুমরিয়া উঠিল।

সহসা দিদির আহ্বানে সে চমকিয়া উঠিল। সুরমা বলিলেন, "নাইবার ঘরে এখন যাবি, না একটু দেরী আছে?"

অত্যন্ত সহজ স্বরে প্রতিভা বলিল, "চল যাই, স্নানটা সেরে আসি।" সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরিয়া সে তাকের উপর হইতে গন্ধ-তৈলের শিশিটা নামাইয়া লইল। জ্যেষ্ঠার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিল বলিয়া সে সহোদরার আরক্ত অধরের মিষ্ট, মৃদু হাসিটুকু দেখিতে পাইল না।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরে প্রবেশ করিয়া রমেন্দ্র সটান শয্যায় শুইয়া পড়িল।

মনকে 'আফিমে' দিয়া রাখা আর সঙ্গত নহে। তাহার চিত্ত যে একান্ত চঞ্চল এবং অত্যন্ত রুগ্ন, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয় নাই। এক বার নহে—দুই বার তাহার চিত্ত তাহার মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিল। অমিয়ার প্রতি তাহার আসক্তির একটা যাহা হউক কারণ ছিল। কিন্তু আবৃত্তি শুনিয়া তাহার মন কোন্ আশায় এমন দুর্ব্বার হইয়া উঠিল? যদি সে মুগ্ধ ও বিচলিতই না হইবে, তবে সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিবে কেন?

বাস্তবিক কি সুন্দর ভঙ্গীতে তন্বী উদ্যানমধ্যে দাঁড়াইয়াছিল! মুখের রেখায় রেখায় কি মাধুর্য্য! গৌরী সে নহে; কিন্তু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে কি চারু শোভা! এ মুখ যেন স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়াই তাহার মনে হয়—অথচ কিছুই যেন মনে পড়ে না! এ মূর্ত্তি কি তাহার অন্তরাকাশের—নন্দনবনের অধিষ্ঠাত্রী মানসী প্রতিমা? তাই কি তাহার মন এই দেহ-লতিকার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে? সে যেন আর আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বিপুল উচ্ছ্বাসে কাহারা যেন অন্তরের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছে! দর্শন-স্পৃহা এমন বাড়িতেছে কেন?

রমেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

না—এ প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া মনুষ্য-সমাজে থাকা নিরাপদ নহে! সে আজই এ স্থান ত্যাগ করিবে। মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই।

সম্মুখে প্রাচীরগাত্রে যে চিত্রখানি ঝুলিতেছিল, রমেন্দ্রের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। যমুনা-কূলে, বংশীবটমূলে শ্যামসুন্দর দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বাঁশী। শিল্পী তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অঙ্কিত করে নাই। শ্যামসুন্দরের দীর্ঘায়ত নয়নে করুণা, আননে হাসির ঈষৎ উন্মেষ। যমুনার স্রোতোধারা, কূলের বৃক্ষলতা যেন সেই অমৃত-ঝরা হাসির সঙ্গে সুর মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে। রমেন্দ্র অনেক বার এই চিত্র দেখিয়াছে, কিন্তু আজ অকস্মাৎ তাহার মন এমন করিয়া উঠিল কেন?

শ্রীকৃষ্ণকে সে আদর্শ পুরুষ বা ভগবান্ বলিয়া সত্যই বিশ্বাস করিত। উহা তাহার আশৈশব সংস্কারের ফল, কিন্তু দীর্ঘকাল সে তাঁহার কথা ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল। ইনি ত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ—যাঁহাকে সমগ্র হিন্দুজাতি ভগবান্ বলিয়া পূজা করে। ভগবান্!—সহসা তাহার চিন্তাশ্রান্ত মন যেন আকুল হইয়া উঠিল। এত দিন এ মধুর নাম এক বারও তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে উদিত হয় নাই ত! সে তাঁহাকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কত কাল পরে সে বিস্মৃত দেবতাকে স্মরণ করিল? শৈশবে, বাল্যে

ঠাকুরের সম্বন্ধে কত আলোচনাই না সে শুনিয়াছিল! আসন্ন বর্ষার সন্ধ্যায় বালক পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া মাতা গম্ভীর বিশ্বাসভরে প্রহ্লাদের ঈশ্বরপ্রেম, ধ্রুবের তপস্যা—ভগবান্‌কে লাভ করিবার গভীর নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতাভরা চেষ্টার কাহিনা বিচিত্র ভাবাবেশে বলিয়া যাইতেন। শিশুহৃদয় সে অমৃত-কাহিনী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িত। মাতার আননে তখন যে দিব্য-জ্যোতিঃ, প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের যে আলোকরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, আজ তাহা লুপ্তস্মৃতির মত রমেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল। যত দিন সে গ্রামের বিদ্যালয় ছাড়িয়া কলিকাতায় যায় নাই, তত দিন প্রায় প্রত্যহই সে এমনই নানা কাহিনী মাতৃমুখে শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তখন সে কায়মনোবাক্যে সে সব কথা বিশ্বাস করিত। তাহার পর বয়োবৃদ্ধি ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন চিন্তা, নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া ক্রমে সে বাল্য ও কৈশোরের উপলব্ধ বিশ্বাসকে হৃদয়ে তেমন করিয়া আঁকড়িয়া রাখিতে পারে নাই। সে দোষ ত জননীর নহে, তাহার। মাতার পূজারতা মূর্ত্তি, ঐকান্তিক ঈশ্বরনিষ্ঠা, ভক্তি সে গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যহই নিয়মিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। ভগবানের প্রতি, সত্যের প্রতি নির্ভর করিবার আগ্রহ তাহার চিত্তে দৃঢ় করিবার জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

আজ বহুদিন-বিস্মৃত সেই সব কথা মনে পড়ায় তাহার দুর্ব্বল চিত্ত একান্ত আগ্রহভরে চিত্রপটপানে ধাবিত হইল। বাল্যের স্মৃতি ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, মনে করাইয়া দিল। সকল চিন্তা, সমস্ত দুর্ভাবনাকে সরাইয়া দিয়া সে নিমীলিতনয়নে, ভক্তিনত চিত্তে অনন্তসুন্দরের ধ্যান করিতে লাগিল। দরদরধারে তাহার নয়নপথে অশ্রু নামিয়া আসিল। কাতরহৃদয়ে সে বাল্যের শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি অন্তরাকাশে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

দারুণ দুর্দিনে, নিদারুণ দুঃখে কাতর হইয়া মানুষ যখন একান্তমনে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করে, আকুল অন্তরে তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হয়—সে ডাক তাঁহার কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় না। অবিশ্বাসী হয় ত এ কথায় বিদ্রূপের হাসি হাসিতে পারে; কিন্তু যাহা নিত্য সত্য, তাহার উজ্জ্বল আলোকপ্লাবনকে অন্ধকার ঢাকিয়া রাখিতে পারে কি?

বহুক্ষণ পরে রমেন্দ্র যেন কতকটা শান্তি অনুভব করিল। তাহার চিত্ত আবার যেন আশার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে মনে সে সঙ্কল্প করিল, এ স্থান সে ত্যাগ করিবেই। ডাক্তারবাবু আসিলেই সে বিদায় প্রার্থনা করিবে। এত দিন যে সুমহান্ কর্ত্তব্যপালনে সে উদাসীন থাকিয়া মহা অপরাধ করিয়াছে, চেষ্টা করিয়া দেখিবে, সে কর্ত্তব্য পালন করা যায় কি না।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া বসিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল,—এত বেলা হইয়াছে? এগারটা বাজে! তিন ঘণ্টা সে এমনই ভাবে কাটাইয়া দিয়াছে।

গাড়ী আসিবার শব্দে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সদাপ্রসন্ন ডাক্তারের স্থূল, দীর্ঘ বপু তাহার সম্মুখে।

গিরীন্দ্রনাথ প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "এখনও স্নান করেন নি, শিশিরবাবু?"

"এই বার যাব। কিন্তু একটা কথা আছে, ডাক্তারবাবু। আমায় বিদায় দিতে হবে। অনেক দিন আছি, আজই আমি যাব।"

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ডাক্তার বলিলেন, "বেশ ত, তার জন্য ব্যস্ত কেন? আহারাদি হয়ে যাক, তার পর কথা হবে।"

রমেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনাদের এখানে অনেক অত্যাচার—"

উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনি যে এখনই বিদায়ের পালা শেষ ক'রে দিচ্ছেন। কবিতা-টবিতা আপনার আসে না কি, শিশিরবাবু?"

রমেন্দ্র অপ্রতিভ হইল। গিরীন্দ্রনাথ তাহার স্কন্ধদেশে দুই চারি বার মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া চুকে যাক, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।"

আহারের পূর্ব্বে সে প্রসঙ্গের আর কোন আলোচনা হইল না।

মধ্যাহ্ন-ভোজের শেষে ডাক্তার কিয়ৎকাল অন্তঃপুরে

রহিলেন। রমেন্দ্র তাহার দিন-লিপির পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে লাগিল।

খানিক পরে ডাক্তার বাহিরে আসিলেন, রমেন্দ্র তখন একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিল। গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার আরজি অন্দরে পেশ করেছি। জানেনই ত, আপনি শুধু আমার অতিথি নন, গৃহিণীরও বটেন। তিন রাত্রি কোন গৃহস্থের বাড়ী বাস করলেই তা'র শুভাশুভ শুধু গৃহ-কর্ত্তার এক্তিয়ারের মধ্যে থাকে না, বাড়ীর গৃহিণীই তখন সকল ব্যবস্থার মালিক। তিনি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, এত দিন যখন দয়া ক'রে আতিথ্য নিয়েছেন, আর ৪টা দিন অনুরোধ রাখুন। আজ সোমবার, শুক্রবারে আপনার ছুটী। তিনি একটা ছোটখাট উৎসব পারিবারিক উৎসবের আয়োজন করছেন। সেটা শেষ হয়ে গেলেই—ব্যস্।"

অন্দর হইতে এমন অনুরোধ যখন আসিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ এখনই চলিয়া যাইবার মত প্রকাণ্ড কোন কারণও সে দেখাইতে পারে না। এত দিন যখন গিয়াছে, বাকী কয়টা দিন সে অপেক্ষা করিতে পারে না, ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নাই। আর তিনটা দিনমাত্র—তা সাবধানে থাকিলেই চলিবে। যে কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণাশ্রয় চাহে, তিনি তাহাকে রক্ষা করেন; মাতার বাল্যের এই শিক্ষা এত কাল পরে যখন মনে জাগিয়াছে, তখন অনুক্ষণ সেই চিন্তাকে মনে জাগাইয়া রাখিতেই হইবে।

রমেন্দ্র রাজি হইল।

ডাক্তার বলিলেন, "চলুন, শিশিরবাবু, আপনাকে এক বন্ধুর ওখানে নিয়ে যাই। তিনি সবে কাল এখানে এসেছেন। তাঁ'র সঙ্গে আলাপ ক'রে আপনি খুসী হবেন।"

রমেন্দ্র বৈচিত্র্য খুঁজিতেছিল, সুতরাং এ প্রস্তাব তাহার ভালই লাগিল।

উভয়ে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরে এক যোড়া কৌতূহলী চক্ষু রমেন্দ্রের ব্যাগ হইতে বাহির-করা দিন-লিপির সবটাই পড়িয়া ফেলিল। প্রথম দিন যে সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল, আজ তাহার কোন অবকাশই ছিল না। অধিকার ও কর্ত্তব্যের দাবী সকল সঙ্কোচকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল বোধ হয়।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"প্রাণাধিকাসু,

অমি,

পত্রে জানিলাম, তোমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছ। রণশ্রান্ত সেনাপতির মত, যুদ্ধ-জয়ের আনন্দ-সংবাদ লইয়া তোমরা ফিরিতেছ ইহাতে আমার সুখ, আনন্দ ও গৌরবের সীমা নাই। সত্যই অমিয়া, তুমি ভাগ্যবতী। আমার ভগিনীও যে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত দেশের সেবা, জীবের পরিচর্য্যা করিয়া ধন্য হইয়াছে, এ জন্য আমার হৃদয়ে আনন্দ ও গৌরব রাখিবার স্থান নাই। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি-পীড়িত রুগ্ন নরনারীকে সেবা করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ। সুরেশ ত তপস্বী পুরুষ। তাঁহার মনের ধারার সহিত আমি সুপরিচিত। তিনি যে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। তাঁহার সাহচর্য্যে যে আসিবে—স্পর্শমণির স্পর্শে সে-ই সোনা হইয়া যাইবে! সুরেশের মত লোক আজকাল দুর্লভ।

তোমার পত্রের মধ্যে সুরেশ ও সরযূর একটু ইঙ্গিত আছে খুব স্পষ্ট নহে, কিন্তু তাহাতেই আশার সঞ্চার হয়। সুরেশকে সংসার বন্ধনে বাঁধিবার মত শক্তি সাধারণ নারীর নাই, তাহা আমি জানিতাম। পিতৃমাতৃহীনা সহোদরাকে একরূপ আমিই পালন করিয়াছি। তাহার ভিতরে নারীত্বের, মনুষ্যত্বের বীজ বহুপরিমাণেই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের আবেষ্টন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রভাব অসামান্য। তাই শঙ্কা ছিল, হয় ত সে সুরেশের উপযুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তোমার পত্রের ভঙ্গীতে আজ যেন একটু আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। এমন স্বামী লাভ করা অনেক সৌভাগ্যের কথা।

তোমাকে এই পত্র আমি কলিকাতার ঠিকানাতেই লিখিলাম। হিসাব করিয়া দেখিলাম, তোমরা যখন ওখানে পৌঁছিবে, পত্রও সেই সময়ে যাইবে। আমি তোমাদের মহৎ কার্য্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম না, সে আক্ষেপ মিটিবার নহে। অবকাশ শেষ হইয়া আসিতেছে; আর কয় দিন পরেই কলেজ খুলিবে। এখন গিয়াও কোন লাভ নাই।

তুমি বোধ হয় কাগজে দেখিয়া থাকিবে, এবার সমগ্র ভারতের 'সায়ান্স কংগ্রেস'—বৈজ্ঞানিক সম্মিলন উৎসবের বৈঠক লক্ষ্ণৌএ হইবে। আমি একটি শাখার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছি। মূল অধিবেশনের পূর্ব্বে পরামর্শ-সভার এক সম্মিলন আছে, তাই সেখানে যাইতেছি। কয় দিন সেখানে থাকিতে হইবে। তোমরা সোজা এখানে আসিও। আবার একসঙ্গে এলাহাবাদ ফিরিয়া যাইব।

তুমি লিখিয়াছ, আমার কাছে তোমার অনেক কথা বলিবার আছে—সেগুলি প্রকাশ করিতে না পারিয়া তুমি অধীর হইয়া পড়িয়াছ—তৃপ্তি পাইতেছ না; কিন্তু আমি, আমি কবি না হইলেও এ কথা বলিতে পারি, তোমার অন্তরের সহিত আমার কি পরিচয় হয় নাই? স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তোমার হৃদয়কে যে আমার হৃদয়েই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। মুখের ভাষা কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে? আমার হৃদয় তোমার সান্নিধ্য হইতে মুহূর্ত্তও দূরে থাকে না। বিজ্ঞান কি শুধু বহির্জগতের তত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকে? আমি তাহা মনে করি না। যে বিজ্ঞান অন্তরের পরিচয়ে সাহায্য করে না, আমার কাছে তাহা নিরর্থক। জড়বিজ্ঞান কূটস্থ চৈতন্যকে বুঝিবার সাহায্য করিয়া থাকে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হয়, এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাহা প্রমাণিত হয় নাই সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রমাণ করিতে না পারিলেও তাহার অনুভূতি মিথ্যা নহে। এ সব কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। আজই লক্ষ্ণৌ যাইতেছি, বেশী লিখিবার সময় হইল না। তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকিব। তোমরা আসিও। ইতি—

তোমার সুনীল।"

স্বামীর পত্র পড়িতে পড়িতে অমিয়ার হৃদয় আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। ভাবের অত্যধিক উচ্ছ্বাস নাই, অথচ লেখকের সমগ্র হৃদয়টির পরিচয় কি সুব্যক্ত! যুক্তকরে সে অনন্তসুন্দরের উদ্দেশে প্রণাম করিল—হৃদয়ের অন্তরতম তলে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম যে অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইয়াছিল, সে মুহূর্ত্ত তাহার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়াই থাকিবে। আজ গ্লানির জ্বালা, বেদনার অস্বস্তি তাহাকে পীড়িত করিতে পারিতেছিল না। যিনি তাহাকে পথের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সে জীবনে ভুলিবে না—ভুলিতে পারে না।

সে দিনের সেই দুঃস্বপ্ন—প্রবৃত্তির সেই লোভনীয়, মুগ্ধ মূর্ত্তির নগ্নতা এখন কি সুস্পষ্ট! পিচ্ছিল গুহামুখে, অতলস্পর্শ ঘনান্ধকারপূর্ণ গহ্বরে পতন হইতে যিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বদেবতাকে সে পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিল। হে রাজরাজেশ্বর, অনন্ত নিখিলের স্বামী! প্রেমময়, করুণাময় চিরসুন্দর! তোমার পুণ্যস্মৃতি অমিয়া যেন কখনও বিস্মৃত না হয়। শিক্ষা তাহাকে আস্তিক করিয়া গড়িতে পারে নাই; কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সে দুহিতা—সে আত্মবোধ তাহার হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতালব্ধ পথে সে নূতনভাবে তাহার জীবনকে পরিচালিত করিবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে সে কখনও যদি সন্তানের জননী হইবার সৌভাগ্য লাভ করে, তবে সন্তানকে সে ভারতবর্ষের নারীর বৈশিষ্ট্যকে ভুলিবার অবকাশ দিবে না। মাতৃত্বের চেতনা যে ভাবে তাহার ভিতরে জাগিয়া উঠিয়াছে, নারীত্বের প্রকৃত গৌরবের অনুভূতি তাহার হৃদয়ে যে ভাবে সাড়া দিয়াছে, সে শিক্ষা সন্তানের জীবনে বিকসিত করিয়া তুলিবে। নারী যদি মাতৃত্বের গৌরব ভুলিয়া যায়, তাহার অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। পুরুষ যদি সেই মাতৃত্বকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে না পারে—মায়ের জাতিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে না পারে, তবে তাহার সকল শিক্ষা, সকল দীক্ষা, সকল সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

"বৌদি!"

সরযূর আহ্বানে অমিয়া বাস্তব জগতে আবার ফিরিয়া আসিল।

নিকটে আসিয়া সরযূ বলিল, "দাদার পত্র পেলাম; আমাদের লক্ষ্ণৌ যাবার জন্য লিখেছেন। তুমি চিঠি পেয়েছ?"

"হাঁ, আমরা কালই রওনা হব। দাদা কোথায় জান?"

"ঠিক জানিনে। বোধ হয়, লাইব্রেরী-ঘরে থাকতে পারেন।"

অমিয়া দাদার সন্ধানে চলিল। [ক্রমশঃ

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পারিস থেকে দেশে ফিরে আসবার মতলব স্থির হয়ে গেলে একটা ট্রাঙ্কে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে বিপ্লবের কাযে আবশ্যক অনেক কিছু পূরে পারিস থেকে কলকাতায় কোন বন্ধুর নামে সেটা মাল-চালানী জাহাজে পাঠিয়েছিলাম। ঐ বন্ধুটি বেশ সুবিধাজনক ছিলেন, কারণ, তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ মাত্র কয়েক দিন আগে পেয়েছিলাম, আর তিনি পুলিস অফিসে কায করতেন। ইহা ছাড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম, একটা ছোট 'ব্যাগ', - তাতে পূরেছিলাম এমন কিছু, যা নাকি খোয়া গেলে তখনকার মনোভাব অনুযায়ী মনে ক'রে ফেলতাম, ভারত উদ্ধারের অর্দ্ধেক মাল-মসলা নষ্ট হয়ে গেল। আর তা যদি আবার কাষ্টমস্ হাউসে ধরা পড়ত, তা হ'লেই ফাঁসী, অথবা তার চেয়েও ভীষণ ব'লে যা তখন মনে করতাম, সেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ছিল নিশ্চিত। যাই হোক্, ট্রাঙ্ক আর ব্যাগ এ দুটোতেই ধরা পড়বার আশঙ্কা ছিল পনর আনা; তা সত্ত্বেও এত সাহস করতে পেরেছিলাম—শুধু স্বাধীন দেশের আব-হাওয়া মাস কতক গায়ে লেগেছিল ব'লে।

কিন্তু নেপলস্ থেকে বম্বে আসবার পথে যে কয় দিন জাহাজ-বাস করতে হয়েছিল, সেই কয়দিনের মধ্যেই ঐ স্বাধীনতার প্রভাব ক্রমে ঘুচে গিয়ে বম্বে যত নিকট হ'তে লাগল, ততই আমাদের পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক অধীনতার উপসর্গ ভীরুতা আমাদের মনকে ক্রমে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল। সব চেয়ে যা আমাদের মনকে বেশী কাবু ক'রে ফেলেছিল, সেই দুর্ভাবনাটা হচ্ছে, ভারত উদ্ধারকল্পে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানরূপ এত বড় গুরুতর ব্যাপারটা ধরা পড়বার মত এমন দারুণ দুর্ভাগ্যের একমাত্র প্রধান ও প্রথম কারণ হওয়া।

বহুদিন পরে বিদেশদর্শনের আনন্দটা কাষ্টমস্ হাউসের বিভীষিকার চাপের মধ্যে উপভোগ্য হয় নি। যাই হোক্, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন এক দিন বেলা ১২টার সময় বম্বের জেঠীতে জাহাজ ঠেকল। তীর্থের পাণ্ডাদের মাসতুত ভাই—হোটেল-ওয়ালাদের এজেন্টরা ছিনে জোঁকের মত যাত্রীদের ধরতে লাগল। আমার জুড়ীদারের সঙ্গে এই পরামর্শ স্থির হয়েছিল যে, যখন ধরা পড়বার সম্ভাবনা এতই অধিক, তখন দুজন একসঙ্গে ধরা পড়া কোনমতে সঙ্গত নয়। তাই তিনি আগে কাষ্টমস্ হাউস পার হয়ে গিয়ে দূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর আমি দুজনের মাল সমেত এক সাহেবী হোটেলের এজেন্টের সঙ্গে কাষ্টমস্ হাউসে ঢুকলাম। আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কিছু না কিছু ছিল। ব্যাগে ত' ছিলই, অধিকন্তু একটা বালিসের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট।

তখন সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হয়েছিল—মুখের ভাবটা সহজ ও নির্ভীক রাখা; প্রাণপণ চেষ্টায় তা করতে গিয়েই যে বরং আরও বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, তা-ও বেশ বুঝতে পারছিলাম। একটা অনুকূল ঘটনা তখন না ঘটলে কি কাণ্ডটাই না হ'ত!

কাষ্টমস্ হাউসে ঢুকে দেখি, দুই জন ইতালীয় পাদরীর সঙ্গে কাষ্টমস্ অফিসারের বেশ হাস্যজনক ব্যাপার চলছে পাদ্রীদের ইংরাজী জানা ছিল না; ঐ অফিসারও ইতালীয় ভাষা বুঝেন না। দুই পক্ষই ব'কে যাচ্ছেন, অথচ কেউ কারও বক্তব্য বুঝতে পারছেন না। অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, আর প্রাণ খুলে হাসছিলেন। ভাগ্যে হাসি পেয়ে গিয়েছিল, তাই আমার আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। এই সুবর্ণ-সুযোগে এগিয়ে গিয়ে কথা ব'লে বুঝলাম, পাদ্রীরা ফরাসী ভাষা বেশ জানেন, তাই অফিসারকে পাদ্রীদের কথা বুঝিয়ে দিলাম। অফিসার নেহাৎ খুসী হয়ে পাদ্রীদের ফরম্ পূরণ ক'রে দিতে আর

ফর্ম্মের লিখিত কোন নিষিদ্ধ বস্তু তাঁদের এক রাশি তল্পি-তল্পার মধ্যে ছিল কি না, জেনে দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁদের ফর্ম্মের সঙ্গে নিজেরও একখানা ফর্ম্ম পূরণ ক'রে দাখিল করলাম। আমার যে কিছুই তদন্ত হ'ল না—সে কথা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু খুব উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ লাভ ক'রে আমিও ধন্য হয়ে গেলাম।

এই রকমে কাষ্টমস্ হাউসের বালাই কেটে যেতেই তখন টের পেয়েছিলাম, কি দুরন্ত ক্ষিদেটাই পেয়েছিল। আমার জুড়ীদার—কোন এক দাতব্য মুসাফেরখানার খোঁজে চললেন। কারণ, যত কমে চলতে পারে, তার বেশী এক কপর্দ্দকও খরচ করা না কি ওঁর বিবেকবুদ্ধি-সম্মত নয়; অথচ দানগ্রহণটাও যে বিধেয় নয়, তা তাঁকে বোঝাতে পারিনি। পরন্তু সে রকম ভীষণ জিনিষ নিয়ে আজে-বাজে যায়গায় থাকা নিরাপদ নয়, এই অজুহাতে আমার নিজের বিবেকবুদ্ধিকে ধামা চাপা দিয়ে বিজয়ী বীরের মত মহাফূর্ত্তিতে গিয়ে উঠেছিলাম এক বড় হোটেলে। বহুকাল পরে যে পরম ভোজনানন্দ উপভোগ করেছিলাম, তা আর কি বলব! স্বদেশ যে কত মনোরম, তা তখনই উপলব্ধি করেছিলাম।

বম্বেতে আমাদের হাতে প্রধান কাষ ছিল দুটি; প্রথমটি বাঙ্গালার সঙ্গে বম্বের গুপ্ত-সমিতির যোগাযোগ স্থাপন ক'রে একটা নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রসমিতি স্থাপন করা; তাহার পর তার অধীন সমস্ত ভারত জুড়ে নানা স্থানে শাখা-সমিতি গ'ড়ে তোলা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মহারাষ্ট্র গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে বাঙ্গালার সমিতির সুরু থেকে আমরা যত সব শুনে আসছিলাম, তা কত দূর সত্য, নিজে দেখা।

পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেখানে ঐ সমিতি খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়নি। তাহার পর কয়েক জন নেতা ও কর্ম্মীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁদের কাছে যা শুনেছিলাম, তার মর্ম্ম যত দূর মনে পড়ছে, তা এই ... ভারতের যেখানে যেখানে মারহাট্টাদের বাস, সেখানে সেখানেই না কি বৈপ্লবিক সমিতির শাখা ছিল। তাহার পর কেন্দ্রসমিতি ছিল নাসিক আর পুণাতে। ভারতের অন্য প্রদেশে সমিতি গঠনের জন্য না কি তাঁদের কোন কোন কর্ত্তা চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হলেও আবার তাঁরা বাঙ্গালীর সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করতে রাজী ছিলেন। তবে এ সম্বন্ধে প্রধান কেন্দ্রের কর্ত্তাদের সঙ্গে যে বুঝাপড়া করা দরকার—তাও বলেছিলেন। তাহার পর বম্বে থেকে বাঙ্গালায় বৈপ্লবিক কর্ম্মী বা শিক্ষার্থী পাঠাতে, আর বাঙ্গালার কর্ম্মীকে তাঁদের সমিতিতে নিতে তাঁরা খুবই রাজী হলেন।

বম্বে হ'তে কয়েক মাইল দূরে উক্ত সমিতির এক জন ধনী নেতার বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রিত হলাম। সেখানে মারহাট্টা সমিতির সংগৃহীত বহুত কিছু দেখবার প্রত্যাশা করেছিলাম। বাঙ্গালা দেশে যে দিন থেকে গুপ্তসমিতির পত্তন হয়েছিল, সেই দিন থেকে অর্থাৎ পাঁচ কি ছয় বৎসর ধ'রে মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির বিশাল অনুষ্ঠান-আয়োজনের গাল-ভরা গল্পই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন বাঙ্গালীকে বিপ্লববাদীতে পরিণত করবার প্রধান সম্মোহন-মন্ত্র।

যাই হোক, সেই ভদ্রলোকের বাড়ীর নিকটে সন্ধ্যার পর রেল-ষ্টেশনে নেমে দেখলাম, জুড়ীগাড়ী নিয়ে কয়েক জন ভদ্রলোক অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁদের বাড়ীতে পৌঁছে যা আদর-আপ্যায়ন পেয়েছিলাম, তার উপর ভূরিভোজনের পারিপাট্য যে রকম ছিল, তা কোন গুরুঠাকুর বা যে কোন নিখিল ভারতীয় নেতার পক্ষেই লোভনীয় হ'ত। আমাদের পক্ষে ঐ সকল একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়েছিল। তাই বড় বড় নেতার মত অহং ব্রহ্ম বা অহং ভারত জ্ঞান (যার মানে আমিই ভারত, ভারতই আমি) আমাদের বুকের ভেতরও জেগে উঠেছিল। সেই নেতৃসুলভ তৃপ্তিতে যা দেখতে গিছলাম, তার নেহাত হাস্যজনক অভাব দেখেও দু একটি বিদ্রূপের মোলায়েম বুলী ঝাড়বার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাও চাপা প'ড়ে গিয়েছিল।

সেই সকল ভারতীয় বিপ্লবের ভাবী যুদ্ধ-সম্ভারের একটা নিখুঁত তালিকা এখানে দিতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু নিখুঁত ক'রে দিতে পারলাম না এই জন্য যে, যা ছিল, তা না থাকারই মধ্যে ধ'রে নিয়েছিলাম। সেগুলি তাই বিশেষ ক'রে না দেখে অন্য কাষে মন দিয়েছিলাম। প্রায় দেড় দিন সেখানে ছিলাম, সমস্ত ক্ষণটা গেছল সেখানকার অতগুলি গুণগ্রাহী ভক্ত শ্রোতাকে

আমাদের সঙ্গের যাবতীয় মাল, বিশদ ব্যাখ্যার সহিত, দেখিয়ে বুঝিয়ে, এই কথাটি তাঁদের স্বীকার করাতে যে, সমগ্র ভারত উদ্ধারের জন্য যে সকল জোড়-জোড় আর হিকমতের দরকার, তার কিছুই আমরা বাকী রেখে বা ক্রটি ক'রে আসিনি। ভারতে তাঁরাই ছিলেন আমাদের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত শ্রোতা।

উক্ত অস্ত্র-শস্ত্রের সম্বন্ধে এইমাত্র মনে পড়ছে যে, রিভলবার আর বন্দুক মিশিয়ে পাঁচ ছয়টার বেশী ছিল না। তা-ও ছিল সেকেলে পুরাতন, ভারতবাসী আমরা পুরাতনের এত বেশী ভক্ত যে, এ বিষয়ে আমাদের জুড়ী এখন দুনিয়ায় আর নাই। এই হিসাবে ঐ পুরাতন অস্ত্রগুলিও ভালই ছিল বলতেই হবে। আর—নানা রকমের কার্তুজ ছিল, আন্দাজ শ-দুই।

বৈপ্লবিক কাযে যা কিছু দরকার, তা যখন খুসী হুকুম করলেই আমাদের কাছে তাঁরা তখনই পাবেন, এই চুক্তি ক'রে আর আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যার লিখিত নমুনা কয়েকখানা, তাঁদের বিশেষ অনুরোধে ফেলতে না পেরেই যেন দিয়ে ফেল্‌লাম। তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বম্বে ফিরে এসেছিলাম।

সপ্তাহখানেক পর আমার জুড়ীদার বন্ধু গেলেন পুণা, আর আমি বাঙ্গালায় ফিরে আসবার পথে নাসিক এবং নাগপুর সমিতির কায-কর্ম্ম দেখবার জন্য বম্বে ত্যাগ করলাম। নাসিক ষ্টেশনে মারহাট্টা গুপ্ত সমিতির এক জন, একাধারে প্রধান কর্ম্মী ও নেতা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বাড়ীতে দু দিন ছিলাম; তাঁর আন্তরিকতা আর অমায়িকতাতে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক সমিতির কাযকর্ম্মের মোটামুটি একটা সঠিক বিবরণ জানতে পেরে তেমনই, এত কালের সঞ্চিত আশা একদম হতাশায় পরিণত হয়েছিল। অগত্যা বুঝে ফেলেছিলেম, আমাদিগকেই অর্থাৎ বাঙ্গালীকেই সমস্ত ভারতে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ভার নিতে হবে। নাসিকে দুই এক জন চরমপন্থী নেতার সহিত আলাপেরও সৌভাগ্য হয়েছিল।

যাই হোক, সুদূর-ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের সহায় হ'তে পারে, এমন একটা বিশেষ জিনিষ সেখানে দেখেছিলাম—যা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে নাই। মেয়েদের পর্দ্দানসীন বল্লে যা বুঝায়, মারহাট্টাদের মধ্যে তা নাই। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের আলোচনায় কয়েক জন মহিলা আমাদের সঙ্গে প্রায় সমানভাবে যোগ দিতে পেরেছিলেন।

খোঁজ ক'রে যত দূর জেনেছিলাম, তাতে তখন মনে হয়েছিল, তথাকথিত ভারত-উদ্ধারের জন্য সেখানেও কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র তখনও সংগৃহীত হয়নি। আমার সঙ্গে যা ছিল, তা দেখে এবং তার কেরামতির বর্ণনা শুনে তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছিলেন যে, ঐ সকল জিনিষ, ভারত-উদ্ধার যুদ্ধের জন্য না হ'লেও বৈপ্লবিক কাযের জন্যও যে আবশ্যক হ'তে পারে—তা তাঁরা আগে কখনও যেন উপলব্ধি করেননি। অথচ এ ধারণাও তাঁদের মধ্যে ছিল না যে, এ দেশে বিপ্লব ঘটাতে হ'লে অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা তা হবে না, অর্থাৎ violent method এখানে খাটবে না, কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই বিপ্লব সিদ্ধ হবে; কিংবা এও ভাবতে পারেননি যে, আপাততঃ দশ বিশ বছর ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতির সেই হেতু অস্ত্র-শস্ত্রের আবশ্যক হবে না, যেহেতু, বিপ্লবের যে অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার আবশ্যক হয়, সে অবস্থায় ভারত আসেনি এবং আসতে যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

অবশ্য বহুকাল যাবৎ বিপ্লববাদ প্রচার তাঁরা করছিলেন, আর লোকমতও বিপ্লবের উপযোগী ক'রে তাঁরা গ'ড়ে তুলেছিলেন ব'লে বলেছিলেন। পরন্তু সেখানকার সব দেখে শুনে যা বুঝেছিলাম, তার সোজা কথা যত দূর মনে পড়ছে, তা এই যে, ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগানর নাম ছিল—বিপ্লববাদ প্রচার। অন্য দিকে অতীত গৌরবে গৌরব অনুভব করতে শেখান, আর হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী বাড়ানর নাম ছিল স্বদেশ-প্রেম জাগান।

বস্তুতঃ এখানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, বাঙ্গালাতে এই দুটি জিনিষের কোন রকম অভাব বা অল্পতা ছিল। বরং সে-কাল থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তা বেড়েই চলেছে। দুঃখ এই, যা কিছু অকল্যাণকর, তার অনুকূল কোন আন্দোলনের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া (reaction) আমাদের দেশে কখনও আসে নি। এরও প্রতিক্রিয়া কখনও আসবে ব'লে এখনও কোন লক্ষণ দেখা দেয় নি।

যাই হোক, এই বিপ্লববাদ আর স্বদেশপ্রেম প্রচারের জন্য সেখানে যে সব নতুন সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে ছিল স্বদেশী গান, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত, মহারাজ শিবাজী, মহাত্মা রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষগণের আর ম্যাজিনী, গ্যারিবল্‌দি প্রভৃতি বিদেশীয় মহাপুরুষদের কীর্ত্তি-কাহিনী, সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি যে, ঐ সকলের কতকগুলি আমি উপহার-স্বরূপ পেয়েছিলাম। আরও পেয়েছিলাম ভারতমাতার এক বিকট রঙ্গীন প্রতিকৃতি এবং চাপেকারদের ফটো।

মোট কথা, মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির আসল ভাবটা ছিল ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে মারহাট্টা প্রাধান্য পুনঃপ্রবর্ত্তনের বাসনা ছিল ব'লে তখন বুঝতে পারিনি।

নাসিক থেকে বিদায় নিয়ে নাগপুরে ক'দিন ছিলাম। মহারাষ্ট্রীয় ভায়াদের মধ্যেই বেশ আন্তরিকতা ও বৈপ্লবিক ভাবের উচ্ছ্বাস সেখানে পেলাম। দু'এক জন বড় নেতার সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপও হয়েছিল। বুঝেছিলাম, কয়েক দিন মাত্র আগে সুরাট কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে অরবিন্দবাবু নাগপুরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার প্রভাবে নাগপুরে শিক্ষিত মহলের রাজনৈতিক মতটা একটু উগ্র হয়ে উঠেছিল। সে বক্তৃতায় বিশেষ ক'রে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী, অর্থাৎ কি না ভারত ভারত-বাসীরই জন্য, আর ইংরাজের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক না রাখা। বিপ্লববাদের সূত্রপাতে বাঙ্গালায় যেমন বৈপ্লবিক গুরু ব'লে মারহাট্টাদের ওপর আমাদের একটা বড় রকমের ধারণা ছিল, নাগপুরে বিপ্লববাদী আর চরমপন্থী যে ক'জন ছিলেন, তাঁদের সেই রকম বাঙ্গালীদের ওপর একটা ভারী আশাপ্রদ ধারণা জন্মেছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে সাধারণ হিন্দু দেবদেবীর পরিবর্ত্তে হনুমানের পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত। বিপ্লবপন্থীদের এক কুস্তির আখড়া দেখতে গিয়ে হনুমানের পূজা, হনুমানকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম, আর হনুমানের প্রসাদ গ্রহণ-রূপ মুস্কিল যখন আমার উপর এসে পড়েছিল, তখন সাধ্য-মত আমার মনোভাব চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার বিদ্রোহীভাব লক্ষ্য ক'রে উপস্থিত সকলে বোধ হয় আমার উপর শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। তাই তাঁরা হয় ত আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারেন নি। হনুমানের প্রতি আমার অভক্তির জন্য আমার পরিচয়পত্রের (introduction letter) উপরও তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। আমাদের ভক্তির দেশ কি না! আমিও তাই আমার ঝুলির মধ্যে যে মূর্ত্তিমান বিপ্লব ছিল, তা তাঁদের দেখাবার সাধ মেটাতে পারি নি

যাই হোক, বৈপ্লবিক ব্যাপার শেখবার জন্য তাঁদের কয়েক জনকে বাঙ্গালায় পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে নাগপুর ত্যাগ করেছিলাম।

পরের দিন মেদিনীপুরে পৌঁছে পিছনে টিকটিকি লেগেছে কি না, তা জানবার যে সকল কায়দা পারিসে শিখে এসেছিলাম, দু তিন দিন যাবৎ তা খাটিয়ে বুঝেছিলাম, তখনও কোন রকম সন্দেহ কেউ করে নি।

কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বাঙ্গালার লাট ফ্রেজার "সাহেবের" গাড়ী বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল আমারই বাড়ীর কাছে। তাই বস্তুতঃ এই খবর পেয়ে একটু ভীত হয়েছিলাম। মেদিনীপুরের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ শুনলাম। বারীনের এও একটা honest attempt; রণনীতির ধারা অনুসারী, জান্ড্রেলের না কি রণক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘটনাস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ; তাই বুঝি বারীন খড়গ-পুরে থেকে শ্রীমান্‌... ... .কে খড়গপুরের প্রায় দশ কি বার মাইল দূরে একটা নির্জ্জন স্থানে রেল-লাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুতে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল। লাট "সাহেবের" গাড়ীটা না কি জখম হয়েছিল। যাই হোক, এই অপরাধের অপরাধীকে ধ'রে দিতে পারলে সরকার থেকে এক হাজার আর বি, এন, রেল কোম্পানী থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে এ ঘটনা ঘটতে পারে, অথবা বিপ্লববাদী কোন জীবের অস্তিত্ব যে বাঙ্গালা দেশে থাকতে পারে, সে ধারণা তখন বেঙ্গল পুলিসের গজায় নি। তার প্রমাণ, তাঁরা নাগপুরী কুলীদের ভেতর থেকে কি রকম ক'রে এক দল আসামী বের ক'রে আইন-কানুন মোতাবেক তাদের অপরাধ সাব্যস্ত ক'রে ফেলেছিলেন।

উক্ত ৬ই ডিসেম্বরের পরের দিন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছিল। তাতে মধ্যপন্থী আর চরমপন্থীদের যে রকম উৎকট ঝগড়া-ঝাঁটি বেধেছিল এবং চরমপন্থীদের পৃথক্ কনফারেন্সে ইংরাজ সরকারকে যে রকম বেশ ক'রে দু কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে না কি মেদিনীপুরের পুলিস কলিকাতা আর মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির গন্ধ পেয়েছিল ব'লে ছ' সাত মাস পরে মেদিনীপুর বোমার মামলার এজাহারে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু গন্ধ পেলে এই ঘটনার অনেক দিন পরে উক্ত কুলী বেচারাদের অকারণ দণ্ড দিয়ে অক্ষয় কলঙ্কের কালী সরকারের গায়ে আর লেপে দিত না। পরে কিন্তু ঐ কুলীদের নির্দ্দোষ ব'লে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সেই ডিসেম্বরের ২৩শে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন (Mr Allen) "সাহেবকে" অকারণে কে পিস্তল দিয়ে গুলী করেছিল। যদিও না কি বিপ্লববাদীদের প্রায় সবগুলি দল এই কীর্ত্তির অধিকারী ব'লে নিজেদের মধ্যে দাবী করেছিল, তথাপি ঐ জন্য কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড পায় নি।

এই ঘটনার সপ্তাহখানিকের মধ্যে সুরাট কংগ্রেসে যে বিলেতী কায়দায় তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়েছিল, তাতে স্পষ্টই লক্ষিত হবার কথা ছিল—বাঙ্গালী এক নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও খড়্গপুরের উক্ত কুলীদিগকে দণ্ড দেওয়াতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুলিস তখনও বৈপ্লবিক সমিতির খোঁজ পায় নি, এমন কি, সন্দেহও করে নি।

এই সব দেখে শুনে নিশ্চিন্তমনে কলকাতায় এসেই—বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম আর শুনলাম, কলকাতার বিপ্লববাদীরা অনেক ছোট ছোট দলে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তার মধ্যে চার পাঁচটা দল প্রধান ছিল। ক-বাবু তখন কলকাতায় ছিলেন না। কাযেই বারীনের কাছে খবর দিতে—বাবুকে অনুরোধ ক'রে অন্য এক জন বড় নেতার খোঁজে গেলাম। এঁকে পূর্ব্বে গ-বাবু ব'লে উল্লেখ করেছি। ইনি ক-বাবুর বিশেষ বন্ধু বলেই সে যাবৎ জানতাম। এঁরই উৎসাহ এবং সহানুভূতিতে আর অনেকটা এঁরই অভিপ্রায়-মত দেশ উদ্ধারের তথাকথিত একটা পাকা পন্থার সন্ধান করতে বিদেশে গেছলাম। ইনি আর এক জন নেতার সঙ্গে থাকতেন। যাই হোক, প্রথমেই অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে এঁরা বলেছিলেন, 'আমি যেন বারীনের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করি অর্থাৎ বারীনের দলের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কও না রাখি। কেন রাখব না, তার একটা খুব সঙ্গত কারণ কিন্তু তাঁরা তখন আমায় বাংলে দেন নি।' এইমাত্র বলেছিলেন যে, ক-বাবু বারীনের কথা ছাড়া আর কারও কথা কানে তোলেন না। আর অন্যে যে suggestion দেয়, ঠিক তার উলটো করাই বারীনের স্বভাব। বিশেষতঃ বারীন না কি গুপ্ত সমিতির বিশেষ গোপনীয় কাযগুলা এমন ভাবে তখন কচ্ছিল, যেন তা সাধারণে প্রকাশ করাই তার উদ্দেশ্য। কাযেই সে অবিলম্বে পুলিসের খপ্পরে যাবেই। আর তার সঙ্গে যারা যোগ দেবে, তারাও সেই খপ্পরে যেতে বাধ্য। ফল কথা, গুপ্ত সমিতির কাযে ক-বাবুর উপর তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু বিলেত যাওয়ার আগে ক-বাবুর প্রতি কেন যে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। তখন গ-বাবুকেই অধিকতর যোগ্য নেতা ব'লে বুঝেছিলাম। অথচ বিলেত থেকে ফিরে এসে সে কথা একেবারে ভুলে গেছলাম। এর বিশেষ কারণ এই ছিল যে, শিষ্য বা চেলাদের যখন নিজেকে বড় ব'লে জাহির করবার সাধ গজায়, তখন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গুরুর হরেক রকম অতিরঞ্জিত মহিমা কীর্ত্তন করলেই অনেক স্থলে সে সাধ পূর্ণ হয়। আমারও দশা তাই হয়েছিল। পারিসে ক-বাবুকে শুধু ভারতের একমাত্র আদর্শ নেতা ব'লে ক্ষান্ত হতাম না, সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব'লে, বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অদ্বিতীয় ব'লে জাহির করতাম, আর লোকের কাছে আমার কদর বেড়ে যেত।

সেই লোকগুলি অবশ্য ভারতবাসী। তার পর বিদেশ থেকে ক-বাবুর যত কাছ পানে আসতে লাগলাম, বোধ হয় সে ততই ভক্তিটাও ক্রমে বেড়ে আসতে লাগল। বিলেত যাওয়ার আগে কুইকজোটসুলভ স্বভাববিশিষ্ট ব'লে বারীনের প্রতিও যে একটা বিদ্রূপের ভাব জেগে উঠেছিল, বিদেশ থেকে দেশে ফিরে সেই সঙ্গে তাও ভুলে গেছলাম। তার কারণ, কলকাতায় যতগুলি বৈপ্লবিক দল ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র বারীনই, ভালই হউক বা মন্দই হউক, বিশেষ কিছু বৈপ্লবিক কায করবার চেষ্টা (যা পরে honest attempt ব'লে অভিহিত হয়েছিল) কচ্ছিল;

দেশে ফিরে তা দেখে মনে হয়েছিল, যা-ই হোক, বারীন ত' তবু কিছু করছে, অন্য সকলে ত' খালি বুকনি দিয়েই ক্ষান্ত আছে। তা ছাড়া পারিসে থাকতে বারীনের এক চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে অনেক কিছু ছিল; সব মনে নাই, খালি এইটে মনে পড়ছে যে, আমি ফিরে এলে "কায" (action) আরম্ভ করতে যত টাকা চাই, তা বারীন দেবে। আমি ফিরে এসে বুঝেছিলাম, আমার পারিসে আঁটা মতলব কাযে পরিণত করতে হ'লে আমার এক জন "গৌরীসেন" দরকার, অথচ আমি বিলেত যাওয়ার আগে নিজের এক কপর্দ্দক থাকতে অন্যের কাছে হাত পাত্‌ব না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় ভারত জুড়ে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে ছেয়ে ফেল্‌তে বিপুল অর্থের ছিল প্রয়োজন। কাযেই রূপিয়া দেনেওয়ালা চাই-ই। বারীন যে টাকার কথা লিখেছিল, তা যে সবটাই ফাঁকী, তা ক'বাবু আর বারীনের প্রতি নতুন ক'রে গজান বাড়াবাড়ি ভক্তির চাপে ধরতে পারি নি।

আরও একটা কথা, মনে মনে একটা বিপুল আশা পুষেছিলাম; বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিকে পূর্ণসাফল্যে মণ্ডিত করব ব'লে যে সকল হিকমৎ শিখে এসেছিলাম, তা নেতাদের বিশেষতঃ ক-বাবু আর তাঁর বিশেষ কর্ম্মী বারীনকে দেখালেই এমন খুসী হয়ে যাবে যে, আমার আশা পূর্ণ করতে তাদের অদেয় কিছুই থাকবে না। সেই জন্যই কলকাতায় এসেই আগে ক-বাবু অথবা বারীনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু অন্য দুজন বড় নেতার বিশেষ নিষেধ শুনে বারীনের সঙ্গে তখনকার মত দেখা না করাই স্থির করলাম। তক্ষুনি—বাবুকে নিষেধ করতে গিয়ে কিন্তু শুনলাম, বারীন পরদিন সকালে দেখা করবে বলেছে। পরদিন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বারীন এসে হাজির।

দেশ থেকে আমার অনুপস্থিতির দেড় বছর যাবৎ সে যে কত শত কায করেছিল, বারীন তার বিবরণ দিতে লাগল। মাণিকতলার মুরারিপুকুর গার্ডেনে প্রকাণ্ড এক বোমার কারখানা খোলা হয়েছে, তাতে সব বোমার খোল ঢালাই হচ্ছে। দেওঘরে না ঐ রকম কোন একটা যায়গায়ও বোমার কারখানা খোলা হয়েছিল, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু শুনেছিলাম।

পূর্ব্বদিন উক্ত নেতাদের কাছেও শুনেছিলাম, বারীনের দ্বারা সে যাবৎ বিদেশীকে সরাবার ও ডাকাতী করবার প্রায় শতাধিক সঙ্কল্প ও চেষ্টা হয়েছে; সবই পূর্ব্বোক্ত honest attemptএ পরিণত হয়েছিল। বারীনের কাছে আমার নিজেরও কাযের হিসাব দিয়ে বারীনকে খুসী করতে কম চেষ্টা করেছিলাম ব'লে মনে হয় না। সে খুব খুসী হয়েছিল ব'লে ত বুঝতে পারি নি। য়ুরোপীয় ধরণে বৈপ্লবিক দল গঠনের কথাতেও তার আগ্রহ একটুও দেখতে না পেয়ে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল।

তার পর আমি সপ্তাহখানেক ধ'রে অনেক দলের নেতাদের মতামত অনুসন্ধান ক'রে বুঝলাম, সবাই নিজেদের দলগঠন প্রণালীতে কোন রকম বিশেষ পরিবর্ত্তন করতে নারাজ। এটি আমার পক্ষে বড়ই হতাশার কারণ হয়েছিল। এটা তখন জানতাম না যে, এ দেশের অতি বড় নেতা হ'তে সুরু ক'রে গেঁয়ে মোড়ল পর্য্যন্ত সকলেই অন্যের প্রদর্শিত কোন নতুন মত বা পন্থা, যতই যুক্তিসঙ্গত হউক, অথবা হাতে কাযে ক'রে ফল দেখিয়ে দিলেও, তা নিতে একেবারে অনভ্যস্ত।

যাই হোক্, এই সব মুস্কিলে পড়েই পূর্ব্বোক্ত ক-বাবুর অভিমত অনুযায়ী পৃথক্‌ভাবে দল গঠন করতে সঙ্কল্প করলাম। বারীন খুব কাযের লোক ব'লে তখন জানলেও কোন্ চেষ্টা সফল কি ক'রে করতে হয়, তা সে কিছুতেই জানতে চায় না অথবা তার সকল চেষ্টা আখেরে ব্যর্থ হয় ভেবে, অগত্যা ক-বাবু ও বারীনকে ছেড়ে দিতে মনস্থ করেছিলাম। অবশেষে সকল দল থেকে কর্ম্মী ভাঙ্গিয়ে নিয়ে একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমিতি গঠন করা স্থির হ'ল। তদনুযায়ী গ-বাবু এক জন ধনী নেতার হাতে আমায় তুলে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চ'লে গেলেন। সেই অতিবড় ধনী মশায় তখন দানশীলতার পরাকাষ্ঠা হঠাৎ দেখিয়ে ফেলেছিলেন, তাই বাঙ্গালা দেশে এক জন বড় স্বদেশপ্রেমিক নেতা ব'লে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছিলেন। তাঁকে আমার সমস্ত মতলব খুলে ব'লে ফেলেছিলাম। বেশ বুঝেছিলাম, তা শুনে তিনি বিলক্ষণ ভয় পেলেন। প্রায় পনেরদিন তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেছি। অনেক

ঘুরিয়ে ফিরিয়েছিলেন, বচনও দিয়েছিলেন অনেক। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ক-বাবুর নিন্দা। অথচ আসল কাযের জন্য টাকাকড়ি দেওয়ার নামটিও করতেন না। তখন বুঝলাম, ইনি সত্যই বারীনের বর্ণিত আরাম-কুর্সীতে ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ভারত-উদ্ধারকারী অকালকুষ্মাণ্ড নেতা।

এই ব্যাপারের পর সদ্য বিলেতে অর্জ্জিত আমার উদ্যম, উৎসাহ, কর্ম্মপ্রবণতা আদি সবই আরও উধাও হয়ে গেছল। এর পরে ধার-কর্জ্জ করেও অত টাকার যোগাড় করতে না পেরে অগত্যা নতুন দল গড়বার খেয়াল তখনকার মত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এই রকম বৃথা কাযে আর তার পর কলকাতায় থাকার ছুতোস্বরূপ একটা ব্যবসার সাজগোজ ক'রে নিতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। ইতোমধ্যে কৃ-বাবুও কলকাতায় এসে পড়লেন। দেখা করতে গেছলাম ভক্তি উপহার দিতে। তিনিই ছিলেন শেষ আশার মূল। দুর্ভাগ্য এই যে, অতি কষ্টে দু' চারটি মাত্র কথার উত্তর দিয়ে বিদায় দিলেন দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। অবিনাশ ভায়াকে আড়ালে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, তিনি ধ্যান-ধারণা নিয়েই না কি সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন, কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না।

যাই হোক, আমি কি করব, জিজ্ঞেস্ করাতে বলেছিলেন—বারীনের কাছে যেতে। অগত্যা বারীনের দলে আবার যোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বারীন কিন্তু এর আগেই কয়েকবার আমার বাড়ী এসেছিল, আর আমার বিলেতে অর্জ্জিত "দিস্তে চটপট মেরে নিতে" স্বনামধন্য উল্লাস ভায়াকেও পাঠিয়েছিল। য়ুরোপ থেকে বৈপ্লবিক কাযের জন্য নিতান্ত আবশ্যক যত সব বই আর কাগজপত্র এনেছিলাম, সে সমস্তই বারীন ক্রমে আদায় ক'রে নিয়েছিল। আমার খুবই আশা হয়েছিল, বারীন ঐ সকল প'ড়ে পাশ্চাত্য প্রথায় তাহার গুপ্তসমিতিকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলবে। কিন্তু তা হ'ল না। একমাত্র বোমা তৈরীর হিকমত ব্যতীত বাকী যত কিছু, এমন কি, বৈপবিক দল গঠনের কায়দা-কানুন পর্য্যন্ত এ দেশের পক্ষে একেবারে নিরর্থক, শুধু তাহা নয়, অনিষ্টকর বলেই শিষ্য-মহলে জাহির করেছিল। তার মতে ও সব জড়বাদীদের দেশেই খাটে। এ দেশ ধর্ম্মের দেশ, এখানে কিছুতেই পাশ্চাত্য কোন কিছু খাটবে না। আমাদের দেশে এবংবিধ dogmaর কাছে যুক্তিতর্ক খাটে না। অথচ বিপ্লবের সমস্ত ব্যাপারটাই বিদেশীয় অনুকরণ।

তবে আমি বারীনের গোঁড়া ভক্ত হ'তে পারলে এই বিলাতী প্রণালীটা নিলেও নিতে পারত। আবার যাকে যে দেখতে পারে না, তাকে সে আমল কি করেই বা দেবে?

এ ছাড়া আমার উপর তার মন্দ ভাবের অনেক কারণও ছিল। রংপুরে ডাকাতীর ব্যাপারে সে বুঝেছিল, আমি তার অন্ধ ভক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তার পর বিলেত থেকে ফিরে এসে একেবারে তার শরণাপন্ন না হয়ে যাঁরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের দলভুক্ত হওয়ার যে চেষ্টা করেছিলাম, তার সমস্ত খবর আমার অগোচরে সে পেয়েছিল। আমার উপর বারীনের বিদ্বেষের আরও একটা বিশেষ কারণ—আমি আসলে ছিলাম মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতির এক জন। মেদিনীপুরের নেতা সত্যেন বসু তার আত্মীয় হ'লেও দু'চক্ষের বালি ছিল। তাই মেদিনীপুরের দলের কাউকে সে দেখতে পারত না। সত্যেনের অপরাধ, সে বারীনকে কলকাতা কেন্দ্র সমিতির এক জন প্রধান উপনেতা ব'লে প্রাধান্য ত দিতই না, অধিকন্তু বারীনের বিরুদ্ধে যার তার কাছে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করত না। সত্যেনের কেন, কারও এ রকম ধৃষ্টতা সহ্য করতে বারীন অভ্যস্ত ছিল না। পরন্ত তার সঙ্গে একযোগে বা পৃথগ্‌ভাবে যখন যে কাযে সত্যেন হাত দিত, তাতেই কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল। মাস দুই আগে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে, শুনেছি, চরমপন্থীদের চেষ্টা না কি যে কতকটা সার্থক হয়েছিল, তার মূলে ছিল সত্যেনের নির্ভীকতা, তার প্রতি লোকের—বিশেষ ক'রে ভলান্টিয়ার এবং বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের একান্ত বিশ্বাস, তার কর্ম্মকুশলতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি। বারীনও না কি সেখানে ছিল। অথচ তার প্রাধান্য সত্যেন স্বীকার করেনি।

এই রকম সুরাটে উক্ত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে যে কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল, তা ভাঙ্গবার তাণ্ডব ব্যাপারেও

সৎসাহস, কর্ম্মসাধন-কৌশল, ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদির পরিচয় না কি সত্যেন বারীনের সামনেই দিয়েছিল। এ হেন সত্যেনের দলের লোক ছিলাম আমি। আমার কাছে খালি বোমার বিস্টেটা মেরে নেবার জন্যে যে বারীন একটু বেশী রকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তার কারণ—বোমা ফাটাতে পারলেই হাজার হাজার টাকা পাবার অঙ্গীকার দু তিন বছর যাবৎ পেয়ে আসছিল, কিন্তু বোমাও ফাটে না, আর টাকাও আসে না। অথচ টাকার অভাবটা হয়েছিল বড় বেশী।

যে সময়ের কথা লিখছি, তার মাস কতক আগে শ্রীমান্ উল্লাসকর প্রেসিডেন্সী কলেজে "সাহেব" ঠেঙ্গিয়ে কোন গতিকে বারীনের হাতে এসে পড়েছিল। আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই গান গেয়ে হেসে-খেলে নেহাৎ আপন জন হয়ে গেছেল। যাই হোক্, আমার মনে হয়, উল্লাসের মত এত সরল, মহৎ, কপটতার লেশমাত্রহীন, ভাবপ্রবণ যুবককে বৈপ্লবিক তাণ্ডবলীলার কর্ম্মী করা যে নিতান্ত হৃদয়-হীনতার ও নির্ব্বুদ্ধিতার কায হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উল্লাস ভায়ার সঙ্গে আলাপের দু এক দিন পরে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অদ্ভুতবেশে দেখা দিলেন। তাঁর শ্রীচরণ দুখানি ছিল পাদুকা-হীন। শ্রীঅঙ্গের অধোভাগ ছিল, মুক্তকচ্ছ ক'রে পরা গৈরিক পাঞ্জাবী, আর সযত্নে মুণ্ডিত-মস্তকে ছিল টিকী। দাড়ী-গোঁফ যে ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এহেন ভণ্ডামীর ঠাট দেখে ভক্তি উথলে না উঠলেও, (সত্য বলতে কি, বরং ভয়ঙ্কর বিটুকেল ব'লে মনে হলেও), একটুখানি আলাপের পর মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, বাঙ্গালাদেশে গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার মানুষ যদি কেউ থাকে ত এই ইনিই তাদের মধ্যে উপযুক্ততম। শেষে দেখেছিলাম, অন্য বিষয়ে যেমন, ভাজনেও ওঁর tolerationএর অন্ত ছিল না। অহিন্দুর স্পৃষ্ট, প্যাজ দিয়ে রাঁধা মাছ-মাংস, কিছুতেই তাঁর অরুচি বলতে শুনি নি।

কলকাতায় তখন যে কটা বৈপ্লবিক দল ছিল, তার কোনটাই কাযের কোন ধার ধারে না। বিপ্লব-সম্বন্ধীয় কাযের মধ্যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বা "আনন্দ মঠ" প্রথায় terroristic কায করবার যাকে বলে প্রাণপণ চেষ্টা, তা বারীনেরই ছিল। দেশে বিপ্লব সংঘটিত করতে হ'লে terroristic কায ছাড়া অবশ্যকরণীয় অন্য সব আবশ্যক কায যে থাকতে পারে, তা হয় ত বারীন মনেই করত না, কাযেই বোধ হয়, ক-বাবুও করতেন না, অথবা করণীয় ব'লে যা কিছু মনে করতেন, তা কেবল সনাতন স্বদেশী আধ্যাত্মিক প্রথায় সুসম্পন্ন হবে মনে করেই মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীতে কর্ম্মীদের ধর্ম্মের সাধন-ভজন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার গুরু নিযুক্ত হয়েছিলেন উপেন ভায়া। এই ব্যবস্থা কতকটা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ Compulsory ছিল।

যাই হোক্, terroristic কর্ম্মের চেষ্টা থাকলেও তা সফল করবার মত ইচ্ছা যে বারীনের খুব ছিল, তার প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায়নি। Honest attempt শুরু করবার অধিকার আমাদের আছে, তার পর "মা ফলেষু কদাচন।" গুপ্ত সমিতির অতি গুহ্য কাযের জন্য মুরারি-পুকুরের যে বাগানবাড়ী মনোনীত করা হয়েছিল, তা এমন স্থানে অবস্থিত ছিল, যেখানে নতুন লোক কেউ গেলে এলে নিকটবর্ত্তী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না! তা ছাড়া সেখানে বসতি এমন বিরল যে, ঐ বাগানে কে কি করছে না করছে, স্থানীয় লোকের তা জানবার কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু আরও অসুবিধা অনেক সেখানে ছিল। তার পর যে সকল জিনিষ সেখানে তয়ের করবার চেষ্টা হচ্ছিল, সে সমস্তই অকারণ কষ্ট ব'লে পরে বিবেচিত হয়েছে। এই সকল কারণে সহরের যেখানে ঘন বসতি, সেইখানে একটা সুবিধামত বাড়ীতে বোমা তৈরীর আড্ডা বা স্কুল করতে বারীনকে অনেক কষ্টে রাজী করা হয়েছিল।

বাড়ী খোঁজা হ'তে লাগল। ইতোমধ্যে চন্দননগরের মেয়রকে মারবার জন্য একটা বোমার ফরমায়েস বারীন ক'রে পাঠাল। প্রথমতঃ আমি কিছুতেই তখন বুঝতে পারি নি যে, নতুন ছাঁচে আমাদের সমিতিকে রীতিমত গড়বার, terroristic কাযে যথেষ্ট লোককে সুচারুরূপে শিক্ষা দেবার, সমস্ত ভারতে ঐরূপ শিক্ষিত লোকের দ্বারা গুপ্ত সমিতি গঠন করবার এবং সকল প্রদেশে একসঙ্গে terroristic work করবার মত সামর্থ্য লাভ করবার আগে কেন বৈপ্লবিক

হত্যা করবার খেয়াল ক-বাবুর মত মানুষের মনে জেগে উঠেছিল। এখন মনে হচ্ছে, ভারতের মত ধর্ম্মের দেশে ঐ সব ব্যাপার যে একেবারে অসম্ভব, সে জ্ঞান তখনও কর্ত্তাদের গজায় নি। গজালে নিশ্চয় তখন তাঁরা বোমা-ব্যাধিগ্রস্ত হতেন না। যাই হোক, মাসকতক পরে কিন্তু তাঁদের সে জ্ঞান বিলক্ষণরূপে হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, এত লোক থাকতে বেচারা ফরাসী মেয়রের উপর পছন্দটা গিয়ে কেন পড়ল? মনে হচ্ছে, তখন এর প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তবু কেন ঐ হত্যা-ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম, তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। সদ্য পারিসে অর্জ্জিত বিদ্যাটি জাহির করবার প্রবৃত্তি এমন উৎকট হয়ে পড়েছিল যে, তার প্রকোপে অন্য সব ধারণা বা আদর্শ অর্থাৎ বিপ্লববাদের উদ্দেশ্য,নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তলিয়ে গেছল। তার পর ক-বাবুর উপর অন্ধ বিশ্বাস, অত বড় জ্ঞানী লোক যখন আদেশ দিয়েছেন, তখন এ উচিত না হয়ে যায় না। কয়েক দিন পরে এই কাযটার অন্যায্যতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গিয়ে শুনেছিলেম, ক-বাবু "আদেশ" পেয়েছিলেন, সেই "আদেশ" বারীন জারী করেছিল। এই "আদেশের" কথা পরে বলব।

যা-ই হোক, আমার তখন খুব জ্বর আর তখনও বোমা তৈরীর তোড়জোড় কিছুই জোগাড় করা হয় নি, অথচ বোমা চাই সন্ধ্যার আগে। যে মাল-মসলা মুরারিপুকুরে ছিল, তাতেই একটা বোমা তৈয়ের হ'ল। বোমা ফেটেও ফাটল না, কিন্তু ফল হ'ল উলটো।

নারায়ণগড়ে লাট সাহেবের গাড়ীর তলায় যে বোমা ফেটেছিল, তার তদন্ত ও আদালতের বিভ্রাট ঐ সময়ের কিছু আগে খতম হয়ে গেছল। আগেই লিখেছি, জনকতক নাগপুরী কুলী অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল। ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের কর্ণধার যারা, তাঁরা ঐ বেঙ্গল পুলিসের নির্দ্ধারণে সন্দিহান হয়ে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে নামক এক জন ভারতীয় পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে বিশেষভাবে তদন্তের জন্য বোধ হয়, এই চন্দননগরের ঘটনার পর পাঠিয়েছিলেন। যা-ই হোক, শশীবাবু বোধ হয় চরমপন্থী নেতাদের উপরই আগে দৃষ্টি-পাত করেছিলেন। রজনী মিত্র কি ঐ রকম নামের এক জনকে, দেশের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ, দেশের জন্য উৎসর্গ করতে ক-বাবুর কাছে না কি পাঠান হয়েছিল। তিনি অতশত ধার ধারেন না ব'লে মুরারিপুকুরে বারীনের কাছে তাকে পাঠান হয়।

এই সময় কলকাতায় যে কয়টা দল ছিল, প্রায় সব দলেরই কর্ম্মী অপেক্ষা নেতা-উপনেতার সংখ্যা অধিক ছিল। তাই কর্ম্মীর জন্য সব দলই হ্যাংলা হয়েছিল। বারীনের দলেরও সেই দশা। বারীন উক্ত রজনীকে পেয়ে লুফে নিয়েছিল; অর্থাৎ "আনন্দমঠে'র সত্যানন্দ কায়দায় সম্মোহিত করবার জন্য দেখাতে লেগে গেছল, কোথায় বোমা মজুত ছিল, কোথায় রিভলবার, কোথায় রাইফেল, কোথায় বোমার খোল ঢালাই হয় আর কোথায় সিদ্ধিলাভের জন্য নাক টিপে সাধনা করা হয়। সে কিন্তু আর দ্বিতীয় বার বাগানে দেখা দেয় নি। তার পর থেকে যারা বাগানে যাতা-য়াত করেছিল, তাদের পিছনে বা বাগানের মানুষরা যেখানে যেখানে যেত, সেইখানেই পুলিসের চর বিরাজমান থাকত।

অনেক চেষ্টার পর ভবানীপুরে একটি বাড়ী পাওয়া গেল; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় মার্চ্চের মাঝামাঝি বোমা শেখাবার স্কুল হ'ল। পাঁচ জন ছাত্র প্রথম জুটে-ছিল। তাহার মধ্যে এক জন কানাইলাল। তার সঙ্গে এইখানে প্রথম আলাপ হয়। মুখে কথা ছিল না বল্লেই হয়, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান্ অথচ বড় রোগা। আর ছিল শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ রায়, যে পোর্টব্লেয়ারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এবং পূর্ব্ব-উল্লিখিত নিরাপদ ওরফে নির্ম্মল রায়। এখানে চাকর-বাকর রাখা হ'ত না। সকলে পালা ক'রে রান্নাবান্নার কাষ সেরে নিত। আমি দু' এক দিন কখনও কখনও ঐ আড্ডাতে থেকে যেতাম। সকালে অদ্ভুত রকমের হালুয়া খানিকটা দিয়ে জলযোগ হ'ত। দু' বেলা ভাতের যা ব্যবস্থা, তার চেয়ে জেলখানার সাধারণ কয়েদীদের যা খেতে দেয়, তা অনেক ভাল বলতে হবে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যা', তা' হচ্ছে থালার প্রতিভূ মাটীর সান্‌কি, খাওয়া হয়ে গেলে সব কয়খানা সান্‌কি তুলে নিয়ে পায়খানা আর চৌবাচ্চার মাঝখানকার সংকীর্ণ স্থানটাতে ফেলে রাখা হ'ত। তরকারী মেখে সান্‌কিগুলো এমনি হয়ে থাকত যে, জলে ধুতে গেলে পরিষ্কার হ'ত না, অধিকন্তু তেলে-জলে মিলে-মিশে বিতীকিচ্ছ্রী হয়ে যেত। তাই একখানি ন্যাকড়া রাখা হয়েছিল, যা' দিয়ে দিন'দিন ঐ সান্‌কিগুলো মোচা হ'ত। তবে একটা বিশেষ সুবিধে

এই ছিল যে, সান্‌কিগুলোর রং ছিল মিশমিশে কালো। যা-ই হোক, এই প্রথা মুরারিপুকুর বাগান থেকে আমদানী করা হয়েছিল।

বোমা দিয়ে মানুষ মারার কেরদানী শেখাবার জন্য বারীনের নিকট দু এক জন যুবক চেয়েছিলাম। প্রথম পাঠিয়েছিল শ্রীমান্ সুশীলকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার আদেশ পেয়ে—বোধ হয়, কর্ত্তারা আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁর অপরাধ—তিনি স্বদেশী মোকদ্দমার আসামীদের দণ্ড দিতেন। সাহেব কোন্ হোটেলে থাকেন, সাহেব কোন্ পথে কখন্ আদালত যান, কোন্ পথে আসেন, আর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়—যাঁকে আমরা গোয়েন্দা বিভাগের আসল মালিক ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম, তিনি কোথায় থাকেন, সন্ধ্যার পর কোথায় যান, তাঁর গতিবিধি ইত্যাদি, অনুসন্ধানের কাজে সুশীল যে রকম বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল, এমন ছেলে বেঁচে থাকলে এক জন প্রকৃত কাজের লোক হবে। তবে কেন এরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যতের আশাস্থল এমন এক জনকে বারীন মনোনীত করলে?

কারণটা যা শুনেছিলাম, তার মর্ম্ম এই—মেদিনীপুর সমিতির এক জন পুরোন সভ্য নিরাপদ ওরফে নির্ম্মল রায় বৈপ্লবিক কার্য্যের কি রকম যোগ্য কর্ম্মী ছিল, তা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বলেছি। যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় সে মুরারিপুকুর বাগানে এক জন বিশেষ কর্ম্মী ছিল। তাকেই প্রথমে আমাদের সমিতির কে কি করছে না করছে, আমায় জানাবার জন্য বৈপ্লবিক দলের গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলাম। এত লোক থাকতে সুশীলের মত ছেলেকে ঘাতুক মনোনীত করবার কারণ তাকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম যে, যারা মুরারিপুকুরের মতে ধর্ম্মসাধনা করে না, তারা যত কাজের লোকই হউক না কেন, বৈপ্লবিক কাজে অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়। সুশীলও কয়েক দিন নাক টিপেছিল, কিন্তু তার ফলাফলটা না কি সহজ সত্য কথায় প্রকাশ ক'রে ব'লে ফেলত। কাজেই তার নাম খরচের খাতায় উঠেছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো।

প্রিন্স বাও-দাই

হিজ ইম্পিরিয়াল হাইনেস প্রিন্স বাও-দাই। ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ। অথচ এই অল্প-বয়সেই ইনি ফরাসী ইন্দো-চীন দেশের আনামের সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনি এখন ফ্রান্সে থাকিয়া পাশ্চাত্য-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি রাজ্য-শাসন করিতে আরম্ভ করিলে আধুনিক প্রথায় স্বরাজ্যের বহু উন্নতিসাধন করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।



ইন্দো-চীন দেশ অর্দ্ধ-স্বাধীন, কেন না, ফরাসী এই দেশের সার্ব্ব-ভৌমত্ব উপভোগ করিয়া থাকেন। তথাপি আনাম ফরাসীর রক্ষিত রাজ্য হইলেও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আনামের দেশীয় সম্রাটের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতপক্ষে আনামকে ফরাসীর উপনিবেশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থ স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশ বলা যায়। সুতরাং প্রাচ্যের এই বৃহৎ রাজ্যে লক্ষ লক্ষ প্রজার মঙ্গলামঙ্গল-সাধনে এই বালক রাজার যে বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু অতি অল্পবয়স হইতেই স্বাধীনতার লীলাভূমি গণতন্ত্র-প্রধান ফরাসী দেশের আব-হাওয়ায় তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার হাতে খড়ি হয় ও তাঁহার রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে। প্রাচ্যের নবজাগরণের দিনে আত্মসুখপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণের মত এই নবীন রাজা যে বাধা হইতে অসংযমে চালিত হইতেছেন না, ইহা আশার কথা।

সাগর-স্বপ্ন

১

কি মেঘমহিমা-মন্থর নভঃ
ঝঙ্কৃত কেকা-গমকে,
শিখি-চন্দ্রক-চন্দ্র-আতপ
বকুল ব্যাকুল গুল্ম পাদপ,
রক্ত-রেখাতে চমকে,
মল্লী-মুকুলে জাগিছে চেতন
দূর দিগন্তে দামিনী দ্যোতনা
গুরু-গুরু মেঘ গরজে গভীর
ধ্বনির গমকে গমকে !
চলে মেঘালোকে চপল চাতক
পুলকে তাহার মন কে ?
ছন্দঃ ছন্দঃ মধুর মন্দ্র
বেদনা-বিধুর বীণার তন্ত্র
স্বর-সঞ্চার ফোটে মন্দার
চারু-চম্পক অলকে।
পথিক-বধূর প্রণয় মধুর
আনন ভুলিবে বল কে ?

কোথা রামগিরি কোথায় অলকা
রমণীয় রাজনগরী,
উর্ম্মি উঠেছে সুদূর সাগরে
জাগো নাগবালা জাগো রে জাগো রে
যতনে বাঁধ গো কবরী,
হের তরুণিত প্রবাল-শয্যা
অরুণ আভারে দিতেছে লজ্জা
মুকুতা মেখলা কত শশিকলা
মণিময় কত গাগরী,
সুখ-বিহ্বল আঁখি উৎপল
কোথা কটাক্ষ নাগরী ?
ধরাতে সুরভি মধুর অধর
খুলিয়া ললিত সুধাময় স্বর
প্রণয় স্বপন করিছে গোপন
অঙ্গ-সুষমা আবরি,
অতল পাতাল রবে কত কাল
কবির হৃদয়-ভ্রমরী।

৩

উঠে হিল্লোল মহা কল্লোল
কাঁপিছে রতনকুঞ্জ।
ইন্দ্র-ধনুর তনুর শোভাতে
মন্দার মালা কাঁপে হাতে হাতে
উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-পুঞ্জ
ওই নাগিচর মহা কুণ্ডল
মদরসাবেশে লীলা মন্থর
শুনিছে রাগিণী গুঞ্জ
মণি-মালঞ্চে সুখচঞ্চলা
গায় রতি-গীতি কনকাঞ্চলা
কবরীতে গাথি কুন্দ,
আজি জ্যোৎস্না পূর্ণিমাতিথি
প্রিয় আজি তব দুয়ারে অতিথি
যৌবন-সুখ ভুঞ্জ,
প্রেমের বেদনা মধুর চেতনা
মর্ম্মিত অলিপুঞ্জ
উঠে হিল্লোল মহা কল্লোল
কাঁপিছে রতন-কুঞ্জ।

৪

রতন-প্রদীপ জ্বাল ওগো জ্বাল,
আন অরুণিত মদিরা
কামকমনীয় কনক-পাত্রে
অঙ্গ হেলায়ে মধুর গাত্রে
পান কর সুধা অধীরা ;
নব মৃগমদ-সুরভি অঙ্গে
চপল নৃত্য-প্রেম-তরঙ্গে
পঞ্চম স্বরে চপলা শিখা
ধ্রুবপদ গাক্ গভীরা।

চন্দ্রকিরণ চারু বসুধারা
পিয়াসী চকোর পানে মাতোয়ারা
প্রেমলেখ পড় নদীরা।
স্তনমজ্জন-চন্দন-রসে
মাতাও মাতাও অমৃত-পরশে
কর কর জয় সব অনুনয়
বিদায়-ভাষণ বধিরা
রতন-প্রদীপ জ্বাল ওগো জ্বাল
আন অকণিত মদিরা।

৫

মাধুরী-জড়িত ভুজ-মেখলায়
কে বাঁধিল সখি বাঁধিল,
কমল-লোচন চুম্বন নত
সরম সোহাগে মরম সতত
বড়স অবশ ললিত তনুর
মাধুরীতে কেবা মাতিল ?
যৌবন-বন-মৌনা বিহগী
ওঠ কুহরিয়া ওঠ ওঠ সখি
চন্দ্র-বদনে সদয় মদন
দোঁহে প্রেমহারে গাঁথিল !
এস এস ওগো বর-অঙ্গনা
আঁখি উৎপলে কর অর্চ্চনা
বাঁধিতে প্রাণেশে চির-প্রেমপাশে
সখি প্রেমফাঁদ পাতিল,
কণ্ঠে প্রণয় মুখর ভাষণ
হৃদয়ে হৃদয়ে কুসুম-আসন
চির-বাসনার ছবি সুকুমার
নয়ন-মুকুরে ভাতিল
বসন অবশ ললিত-তনুর
মাধুরীতে কেবা মাতিল ?

৬

গরজে ঝঞ্ঝা মঞ্জুল রবে
দিশি চিত্রিত ধারাতে,
ধেয়ে চলে নদী সিন্ধু অবধি
স্বপনে আপন হারাতে।
গাহিছে সিন্ধু গলিছে ইন্দু
ঝরিয়া পড়িছে অমৃত-বিন্দু
লক্ষ মুকুতা তারাতে,
মণি ঝল-মল নাগিনীর বেণী
উর্ম্মিমালায় রতনের শ্রেণী
অনিলোচ্ছ্বাসে ফেনিল উৎস
কে যেন কাঁদিছে কারাতে।
গিরি-কন্দরে ঘনাইছে ছায়া
কার কুণ্ডলে কমনীয় মায়া
কোথা বন-ভূমে কেতকী কুসুমে
পরাগ বিছায়ে ধরাতে,
ফুল-শয়নের মৃগ-নয়নের
স্বপন-জড়িত অ'কলে
নবযৌবন মুকুলে
মনোজ মন্ত্র কে লিখেছে সখি
কোন্ কাননের কিরাতে ?

৺ মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।





ত্রিবেণী

একাদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নের আলোকোজ্জ্বল পথের উপর দিয়া একটি শ্রান্ত-শরীরা রমণী আপন মনে চলিতেছিল। এই পথ কত দূর হইতে আসিয়া রাজধানীর বুকের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া, আবার এই নগরপ্রান্তবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র সকল ও তাহার পর প্রান্তরবক্ষ ভেদ করিয়া কোন্ দূরদেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এ পথ এখন নির্জ্জন, কদাচিৎ কোন গৃহাভিমুখী কাঠুরিয়ার দল বা গলঘণ্টার রব তুলিয়া গোষ্ঠগমনশীলা গাভীর পশ্চাতে একটি রাখাল-বালক এই পথ ধরিয়া তাহাদের সুদূর গৃহ পানে ফিরিয়া চলিয়াছিল। তাহারাও এখন অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছে, নারী একাই চলিয়াছিল।

পথে লোকসমাগম নাই, তথাপি সেই মূর্ত্তি যেন কাহাকে দেখিবার জন্য একটুখানি দাঁড়াইয়া, তাহার পশ্চাতে যত দূর দেখা যায়, সেই পথে তাহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি প্রেরণ করিল। তাহার পর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া পুনশ্চ মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু এবার আর তাহার চলনে যেন গতি ছিল না, গন্তব্য স্থান যেন অনির্দ্দিষ্ট; গমনে যেমন অনিচ্ছা, তেমনই অপ্রয়োজনীয়তাও সূচিত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণপরে সেই শ্লথ গতিটুকু রুদ্ধ হইয়া গেল, পথচারিণী যেন গতিহারা হইয়া পথিপার্শ্বে একটা আরণ্যক গুল্মদেশে শিথিল শরীরে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। গৌরবোজ্জ্বল শরতের গোধূলিরঞ্জিত পশ্চিমাকাশ কপিশ-ধূসর বর্ণে ম্লান হইয়া আসিল। অপরাহ্নের শান্ত বাতাসের সঙ্গে কাহার যেন গভীর অনুতপ্ত শ্বাস অজ্ঞাতে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া দিল, কাহার যেন উদাস প্রাণের বেদনা-রাগিণী স্তব্ধ আকাশে মিলাইতে চাহিল। আর সেই উদাস প্রকৃতির ক্ষীণ বিষণ্ণ ঔদাস্যের মধ্যে ডুবিয়া রহিল যে এই উদাসিনী? এ নারী উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলার মনটা আজ বিশেষভাবে আহত হইয়াছিল। এই যে বাড়ীতে বাস করিয়া সে তাহার বাল্য, কৈশোর অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ণ-যৌবনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখানকার আদর-আপ্যায়ন তাহার জন্য ত চিরদিন এই রকমই। ইহা অপেক্ষা যে সে বেশী কোন দিন কিছু পাইয়াছে, তাহাও ত নহে। কাজেই শাশুড়ী-ননদদের গঞ্জনা-লাঞ্ছনা, এমন কি, সময় সময় চড়, কিল, ঠোনাটাও তাহার গায়ে সহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তাহার খুব বেশী ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; তাহাদের ঐ গালির বদলে সে-ও যে তাহাদের ছাড়িয়া কথা কহে, তাহাও ঠিক বলা যায় না, এবং মায়ের মারের শোধ সে-ও তাহার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর দিয়া তুলিয়া এই রকম করিয়াই ত এত বড়টা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ যেন কোথায় কি একটা গলদ ঘটিয়া গিয়াছিল, তাই এই তাহার জীবনের সনাতন বিধিকে সে আজ তাহার চিরাভ্যস্ত পথে সহজভাবে নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সেটা এত দিন তাহার কাছে নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, সেইটাই আজ তাহার অসহিষ্ণু উদ্ধত চিত্তের স্পর্শ পাইয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও একান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিল। তাহার একটুখানি হয় ত পূর্ব্ব কারণও আছে।

সে দিন সন্ধ্যাকালে উজ্জ্বলা একাকিনী রাজদীঘিতে জল আনিতে গিয়া কোন এক ভদ্রবেশধারী যুবা পুরুষের নিকট সেই কয়েকটিমাত্র স্তুতির বাণী শুনিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন হইতেই যেন তাহার জীবনের স্রোত শ্যাম-মুরলী-রবমুগ্ধ যমুনার স্রোতের মতই নিবিড় মুখাবলম্বিনী হইয়া বহিতেছিল। সে রব যেন তাহার চির অজ্ঞাত, অথচ যেন সে সবেরই সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনি তাহারই হৃদয়-কন্দরের গুহ

গুহায় প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়া রহিয়াছিল। এ যেন তাহার অজানা নয়, অশোনা নয়, এই এমনই অজস্র প্রগল্‌ভ প্রণয়স্মৃতি তাহার সমস্ত হৃদয়-প্রাণ যেন সকল সময়েই তাহাকে প্রতিনিয়ত শ্রবণ করাইতেছে। শুধু সে ধ্বনি অস্ফুট, আর ইহা স্ফুটিত। নতুবা ইহার কল্পনা, ইহার গুঞ্জন সে ত তাহার অন্তরে অন্তরেই অনুভব করিতেছিল. সে বিস্মিত হইল না বটে, কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল, সে যেন আর সে উজ্জ্বলা নাই। তাহার যেন কোন্‌খান দিয়া বড় রকম একটা বদল হইয়া গিয়াছে। যখন সংশয়সঙ্কুল চিত্তে ও শঙ্কিতপদে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তাহার মনে হইল, এ ঘর যেন তাহার পক্ষে নিতান্তই ছোট। যেন ইহার মধ্যে তাহাকে আর আঁটিতেছে না। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, সে এত দিন কেমন করিয়া ইহারই মধ্যে তাহার সুখ-দুঃখের নীড় রচনা করিয়া দিন কাটাইয়া যাইতেছিল? কখন্‌ যে তাহার হৃদয়টা তাহার চারিধারে অসংখ্য প্রকারের বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া উঠিয়া তত বড় বিশাল হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন তাহা ঠাওর করিতে পারিল না।

এই বিশালতার প্রভাব তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া তুলিল যে, কর্ম্মপটু কৈবর্ত্ত-বধূ তাহার অনলস কর্ম্ম-শক্তিকে যেন আর কোনমতে গৌরব দিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। রান্না-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার মনে হইল, কেমন করিয়া এইটুকুর মধ্যে সে দণ্ডের পর দণ্ডকাল অতিবাহিত করিবে? বিশু প্রমুখ ছাপ্পান্নটা ছেলেমেয়ে রূপকথার জন্য ছাঁকিয়া ধরিলে, নিজ-কথিত রূপকথার তুচ্ছত্বে তাহার মনটা তিক্ত-তর বোধ হইল। ঘরের কায ও পরের সেবা যেন আর শেষই হয় না! অবশেষে যখন মধ্যরাত্রিতে অবসর মিলিল, তখন ঠেঁটির আঁচলে গা-মাথা ঢাকিয়া অর্দ্ধ-নিদ্রিত স্বামীর পায়ে তেল ডলিতে তাহার আর একটুখানিও শ্রদ্ধা হইতেছিল না। তাহার মনে হইল, শ্রমকাতর নিদ্রালু স্বামীর চরণসান্নিধ্যে বসিয়া একটা অজ্ঞাত তীব্র তাপযুক্ত দুরন্ত ক্ষুধার বশে তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন ঘন তাপে বদ্ধ পাত্রের জলের মতই তাতিয়া উঠিয়া ফুটিতে লাগিল। একটা উদ্দাম ও অতিশয় ক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষার স্রোত তাহার ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত খরতর বেগে চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। নব-বাসনার অনাস্বাদিত অতৃপ্তিতে তাহার সারা চিত্ত যেন তাহার বুকের মধ্যে লুটাপুটি করিতে লাগিল। সে বুঝিল, সে চাহে, সে-ও পাইতে চাহে এবং তাহার এই সর্ব্বপ্রথম মনে হইল যে, সে চাওয়া তাহার পক্ষে এতটুকুও অসঙ্গত নহে।

দীপহীন, জাগ্রত প্রাণীর সাড়াশব্দ-বিহীন, অন্ধকার, বিজন কক্ষে নিদ্রাহীনা যুবতী নারী সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল, তাহার এই রূপযৌবনের ভারে ভরা দেহ, তাহার এই সহস্র বাসনা-কামনায় পরিপূর্ণ মনপ্রাণ সে যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সঁপিয়া দিয়াছে, সেখান হইতে সে কত-টুকুই বা ফিরাইয়া পাইল? আরও অনেক বেশীই যে তাহার পাওয়া উচিত ছিল, সেই চিরকর্ম্মরতা চঞ্চলা হাস্যময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা নারী, যে শুধু এত দিন সকলকে সবকিছু দিয়াই আসিয়াছে, সে আজ সহসা কে জানে, কিসের প্ররোচনায় একটুখানি পাইবার লোভে কাঙ্গাল হইয়া উঠিল এবং সে পাওয়াতেও যেন সে আর বড় বেশী দেরী সহিতে পারিতেছিল না।

তাহার পর স্বামীকে গভীর নিদ্রায় সুপ্ত দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে সহসা একটা বিদ্বেষের বহ্নি ধোঁয়াইয়া উঠিল। রাগ করিয়া সে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। সে স্থানও তাহার মনঃপূত হইল না। অঙ্গন পার হইয়া সব্জীর ক্ষেতের এক পাশে যেখানে সে শিবভবানীর পূজার জন্য নিজের হাতে এতটুকু একটুখানি ফুলের বাগান রচনা করিয়াছিল, পায়ে পায়ে আসিয়া সেইখানেই উন্মুক্ত আকা-শের তলায় দাঁড়াইল। আশপাশের পুষ্পবৃক্ষ হইতে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত ফুলগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে, সম্মুখে ধানের ক্ষেত জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত,—মৃদু বাতাসে ঈষৎ তরঙ্গায়িত নদীবক্ষের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল। সে চাহিয়া রহিল। একবার চোখ তুলিয়া দূরে—ঊর্দ্ধে নক্ষত্রালোকিত আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সহসা দূরশ্রুত বংশীধ্বনির মতই তাহার কানের কাছে আবার বাজিয়া উঠিল, "সুন্দরি! যে চারু-নিতম্বে সুবর্ণমেখলা পরাইতে পাইলে এ জীবন ধন্য বোধ করি, সেখানে এই গুরুভার পূর্ণকুম্ভ প্রদান করা যে একান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য!"

উজ্জ্বলা সর্ব্বশরীরমনে পুলকিত হইয়া উঠিল। সুন্দরী!

সে সুন্দরী! সে রূপসী! সে রূপরাণী? এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষের মুখে তাহার মত এক নগণ্যার সম্বন্ধে এত বড় বড় স্তুতির বাণী! দেহ তাহার 'বল্লরীকোমল,' ভুজ তাহার 'মৃণালসদৃশ', এ কথা ত কৈ কখন সে এত দিনের মধ্যেও জানিতে পারে নাই! এমন করিয়া ত কেহ তাহাকে জানায় নাই। একটা অপূর্ব্ব সুখে তাহার বহিরন্তর ভরিয়া উঠিল। সে সুন্দরী! সে রূপসী! রূপে তাহার ভদ্রসমাজেও স্তুতির মোহিনী বাণী স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠে! সে তুচ্ছ নয়, সে সামান্য নয়!

সহসা তাহার মাথার উপর দিয়া দুই একটা নিশাচর পাখী কর্কশ চীৎকারে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। ঘুমন্ত নিঝুম রাত্রি যেন ইহাদের অমঙ্গলসূচক সতর্ক রবে বারেক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বলাও সেই শব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, সে কোন্ সময় আত্মহারা হইয়া গিয়া তাহার কল্পনালোকে, সেই মধুরভাষী উপকারকের বাণী কয়টি তাহারই নিজের স্বামীর মুখে জানিয়া দিয়া যেন তাহারই সোহাগে গলিয়া দুই কান দিয়া সেই অজস্র সুধাধারা পান করিতেছে।

স্বপ্নভঙ্গে একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস সহকারে সে মনে মনে হাসিয়া আত্মগতই কহিল—"তেমনই আমার বরাত কি না!"

ঘরে ফিরিয়া দেখিল, সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের রাশি এবং তাহারই মধ্য হইতে মাত্র তাহার ঘুমন্ত স্বামীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সমতালধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

ক্ষুব্ধচিত্তা তরুণী সুন্দরী ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার স্বামিশয্যারই এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল। কিন্তু বহুক্ষণ জাগ্রতে এবং তাহার পর স্বপ্নেও তাহার দুই কানের কাছে মধুর রাগিণীতে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল— "সুন্দরি! তুমি কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছ? সুন্দরি!—"

সকালে উঠিয়াই উগ্রচণ্ডা শাশুড়ীর তর্জ্জন-গর্জ্জন ও প্রহার। সে দিন তাহাই উজ্জ্বলার কাছে যেন বেজায় বেসুরা লাগিয়াছিল। তাহার পর ভীম বাড়ী ফিরিয়া যখন মায়ের পক্ষ অবলম্বন করিল, কথায় কথায় আর একটা বিবাহেরও প্রতিজ্ঞা করিতে গেল, তখন একটা নবোদ্ভূত রোষে ও ক্ষোভে তাহার হৃদয়-প্রাণ যেন ভীষণতর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। তাহার অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল। আহত গোক্ষুরের মত গর্জ্জন করিয়া সে তাহাদের দংশন করিতেও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু শেষকালে তাহাও তাহার ভাল লাগিল না। মনটা তাহার এমনই একটা ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল যে, কোনমতেই আর এই সব হীন সঙ্গ তাহার সহ্য হইল না। সে তাই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সংস্রব ছাড়িয়া, যে দিকে তাহার দুই চোখ যায়, সেই পথেই বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইবে, কি করিবে, সে সব কিছুই সে ভাবিয়া দেখেও নাই, ভাবিবার অবসর রাখেও নাই। তাহার পর সারা দিন নিস্ফল ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া গভীরতর বেদনা ও অভিমানের দহনজ্বালায় পুড়িতে পুড়িতে শ্রান্তক্লান্ত অবশ দেহে এতক্ষণে এই প্রান্ত সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইবার যে তাহার পথ কোন্ দিকে, স্থান কোথায় তাহারও কোন নিশানা সে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু এখনই তাহার মনে পড়িতেছিল, আবার তাহাকে যাচিয়া সাধিয়া সেই ঘরেই ফিরিতে হইবে, তখনই একটা প্রবল বিতৃষ্ণায় ও অপরিসীম লজ্জায় তাহার অনাহারশুষ্ক শ্রান্তমলিন মুখখানা প্রদোষাকাশের মতই লাল হইয়া উঠিতেছিল—সে বরং মরিবে, তবু সে ঘরে আর কখনও যাইবে না। তাহার মনে পড়িয়া গেল, কোন্ পাষণ্ড বর্ব্বর এমন নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতে সমর্থ? দুঃখ তাহার যেন সংক্ষুব্ধ সাগরের মতই উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। নিষ্ঠুর! সত্যই সে নিষ্ঠুর! উজ্জ্বলা কি এতই মন্দ যে, তাহাকে একটা ভাল কথাও বলা যায় না? নাঃ, অমন স্বামীর ঘর করার অপেক্ষা বরং মরণ ভাল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেই পথের ধারে একা অসহায়ভাবে বসিয়া উজ্জ্বলা অনেকক্ষণই ভাবিল, সায়াহ্নের শান্ত প্রকৃতি তাহার সমুদয় শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াও কিন্তু তাহার অন্তরের গভীর অশান্তি দূরীভূত করিতে পারিল না। বুকের মধ্যে যেন তাহার একটা ক্ষোভের অনল-ঝড় বহিতেছিল। সেই অনলে

তাতিয়া উঠিয়া তাহার চারি দিক্‌টাও যেন অগ্নিময় বোধ হইতেছিল। সম্মুখে পথের পাশেই দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্র। উজ্জ্বলার মনে হইল, এর মধ্যে যেন এতটুকু কোন কোমলতা নাই, তাহার আশেপাশে বর্ষা-জলধারা-পুষ্ট ঝোপঝাড়গুলা শ্যামলতায় ভরিয়া উঠিলে কি হয়, তাহার বোধ হইল, তাহারাও যেন কৈবর্ত্ত-পরিবারের অনুকরণেই মুখ ভার করিয়া আছে। আকাশে যে সন্ধ্যাছায়ার কাল কাল রেখাগুলা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে উজ্জ্বলা যেন তাহার শাশুড়ীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমাযুক্ত মুখখানা ফুটিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল।

সন্ধ্যার ছায়া ধূসর হইয়া মাঠের উপর নামিয়া আসিল, দুই একটা নক্ষত্র দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় অদূরে একসঙ্গে বহুসংখ্যক অশ্বপদ-ধ্বনি শ্রুত হইল এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় জন দশ বারো অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটাইয়া প্রায় উজ্জ্বলার গায়ের উপরেই আসিয়া পড়িল।

কিন্তু এ কি ? ঐ অশ্বারোহী দলের মধ্যবর্ত্তী, মাথার উপর কাহার মুক্তাখচিত শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতেছে, মস্তকের শিরস্ত্রাণে সূর্য্যদীপ্ত হীরকখণ্ড প্রভা বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে, কে ঐ পুরুষ ? উজ্জ্বলার সর্ব্বশরীর বিস্ময়-কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ কি সেই—যাহার কাছে সে দিন জল আনিতে গিয়া সে উপকৃত হইয়া আসিয়াছে ? যাহার কথা কয় দিন সে ভুলিতে পারে নাই ?

অশ্বারোহী দল সহসা থামিয়া পড়িল। আপনা হইতে থামে নাই, তাহাদের পরিচালকের আদেশেই থামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সেই ছত্রতলবর্ত্তী পুরুষই এই আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বারেকমাত্র চাহিয়া দেখিয়াই দীনবেশিনী উজ্জ্বলাকে চিনিয়াছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিতে নামিতে সানন্দ উৎসাহে উচ্চ ধ্বনি করিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"এ কি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ সুন্দরি ! এ কি সৌভাগ্য আমার ! যদি এমন ভাবে আবার দেখাই পেয়েছি, তবে এস সখি—"

সহসা পশ্চাৎ হইতে আষাঢ়ের মেঘগর্জ্জনবৎ জলদমন্দ্র নিঃস্বনে ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"আমার স্ত্রীকে সখী সম্বোধন করিবার স্পর্দ্ধা ?"

ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। আক্রমণকারী পুরুষদারেক লোভাকুল চক্ষুতে লজ্জা-সঙ্কোচে বেপথুমতী, কুণ্ঠিত কৈবর্ত্ত-বধূর প্রতি কটাক্ষ করিয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া অশ্বারোহিপ্রধান উজ্জ্বলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ছাড়িলেন না। একটু দূরে আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তীকে কহিলেন,—"রুদ্রদমন ! কৈবর্ত্তের ঘর রূপের আলোয় রাজপুরীকে যে লজ্জা দিতে লাগিল, এতে তোমাদেরও লজ্জিত হওয়া উচিত।"

মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়াই বিনীত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর প্রদান করিলেন—"দাসগণ তাদের এ লজ্জা সত্বরই ক্ষালন করিয়া ফেলিবে, মহারাজাধিরাজ !"

ভীম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, উজ্জ্বলা যদিও তাহাকে দেখিয়া মনে মনে খুসী হইয়াছিল, তথাপি সে তাহা প্রকাশ না করিয়া মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া উঠিয়া চলিল। তাহা দেখিয়া ভীম আসিয়া তাহার পথ আগুলিল।

"যাও তুমি, আমায় ছেড়ে দাও—আমায় যখন মরতেই ব'লে দিয়েছ, তখন আর মিথ্যে মিথ্যে আমার পাছুতে ছুটে এসেছ কেন ? তুমি চ'লে যাও, ঐ জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলে বাঘ-ভালুকেও কি আমার দয়া ক'রে খাবে না ?"

ভীম জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

"বাঘে ভালুকে খায় না খায়, মানুষ-বাঘে ত এখনই শিকার করতে রাজী ছিল, তা ত এই মাত্তরই দেখতে পেলে ? ছি, অমন ক'রে জোর করে না, হাতে লাগবে যে ! ভীমের হাত হ'তে কি ঐটুকুন হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবে ?"

"আমি ত গো আর ভদ্দর লোকের ঝি-বউ নই, গা-হাত আমার ননী দিয়ে ত গড়ান নয়। কিন্তু ঐ রকম ছোট ঠাট্টা তুমি ভদ্দর লোকের সম্বন্ধে ক'র না। দেখ, ঐ যে লোকটি, মাথার পাগড়ীতে যার হীরে দপ দপ করছিল, এক দিন রাজ-দীঘিতে উনিই আমার কাঁকালে মস্ত বড় ভারী জলের কলসী তুলে দিয়েছিলেন। ভারী ভাল মানুষ কিন্তু লোকটি।"

শুনিয়া ভীম হঠাৎ অহেতুক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠে একটা দৃঢ় অবজ্ঞার স্বর কঠিন হইয়া প্রকাশ পাইল।

খামোকা খামোকা ওঁয়ার অত গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করলে ?"

নিরতিশয় বিস্ময়ে অভিমান ভুলিয়া গিয়া উজ্জ্বলা তাহার ডাগর চোখ বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, "ও কে ? চিনিনে, কেমন ক'রে চিনবো ? নিশ্চয়ই কোন বড়লোকই হবে—বড়লোক নৈলে কি আর অমন বড় মন হয় গা !"

ভীম ভ্রূকুটী করিল। বারংবার নিজের স্ত্রীর মুখে মানুষ পরের মনুষ্যত্বের গৌরব শুনিতে বোধ করি ভালবাসে না। তাহারও ভাল লাগিতেছিল না; দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিল, তাহার পর কহিল, "ঐ বড়লোকটি কে শুন্বে ? উনিই আমাদের মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহীপালদেব।"

উজ্জ্বলা দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা ! বল কি ! রাজা হয়ে কৈবর্ত্তর মেয়ের কাঁকালে জল-ভরা কলসী তুলে দিলে ! আশ্চর্য্যি ত ! সাক্ষাৎ রামচন্দর !"

এই রাজ-উপকারের আশ্চর্য্য গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃই ভীম ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠিতেছিল; সে এখন স্ত্রীর এই সবিস্ময় শ্রদ্ধাতিশয্যে বিরক্তিতে গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং অপ্রসন্ন পরিহাসে উত্তর করিল, "আমি রাজা হ'লেও এমন সরু মাজার উপর কলসী তুলে দিতে পেলে জন্ম সফল বোধ করতুম। নে, এখন তুই ঘরে আয় ত, সারা দিন না খেতে পেয়ে, আর সারা সহর ঢুঁড়ে ফিরে গা-মাথা আমার ঘুরে পড়তে নেগেচে। আয়, ওঠ, আর কক্ষনো তোরে উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত কৈবো না, দেখিস।"

"আর যখন নতুন বউটি হবে ?"

ভীম বলিল, "হয় যদি ত তুই আঁশবটী দিয়ে তার নাক কেটে তাকে বোঁচা ক'রে দিস্। নে, হ'ল ত ? না হয়ে থাকে, আমায় ধ'রে না হয় ত' খা মার,—শোধ যাবে না ?"

উজ্জ্বলা এবার হাসিয়া ফেলিল, "অবাক্ ! কথার ছিরি দেখ গো !"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সে দিন বৈকালে ভ্রমণোপযোগী বেশে মহাকুমার রামপালদেব অশ্বারোহণে একা বাহির হইয়া গেলেন; কিন্তু প্রতি দিনের নিয়মানুসারে বোধিদেবের গৃহে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আজ বেড়াইতে বাহির হইলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে কিছু দূরে মহীপতি মহীপালের নব-নির্ম্মিত 'মহেন্দ্র-ভবন' নামক সুরম্য প্রাসাদভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মহেন্দ্র-ভবন নামধেয় রম্য পুরীটিও পুরাতন রাজপ্রাসাদের মত নদীর উপরেই স্থাপিত। বর্ষা-বারিরাশি উন্মুখ আগ্রহে বাহু প্রসারিত করিয়া আসিয়া যেন তাহাকে নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে। নদীর প্রশস্ত বিশাল বক্ষে ইহার সুরম্য উদ্যানমধ্যবর্ত্তী সুধা-ধবলিত সৌধকুলের সমুন্নত চূড়াদেশ প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন চিত্রার্পিত হইয়া রহিয়াছে। নদীর কূলোপরি সলিলরাশির অতি নিকটেই অজস্র ফুটন্ত কুসুমভারে সমাচ্ছন্ন বৃক্ষাবলী যেন শৈলনন্দিনীর নিত্য পূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি পাতিয়া রাখিয়াছে। শ্বেত, রক্ত, পাটল, নীল বিবিধ বর্ণের জবাকুসুম প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অজস্র পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়া জবাকুসুম-সঙ্কাশের উদ্দেশ্যে বুঝি আপনাদের অর্ঘস্বরূপ প্রদান করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন চম্পক, চামেলি, কুন্দ, কুরুবক, শ্বেত ও নীল অপরাজিতা, কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণকলি, সন্ধ্যামণি ও কামিনী-কাঞ্চন, কদম্ব, কাহারও অভাব দেখা যাইত না। নদীনীরে ঘাটের পাশে সুসজ্জিত প্রমোদতরণী রাজ আরোহীর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সুপ্রশস্ত সোপানের উপর সুবিস্তৃত প্রস্তর-চত্বর। চতুরস্র সেই সুমার্জ্জিত চত্বরের উপর মূল্যবান্ রক্তাসন সংস্থাপিত, ইহার চারি পার্শ্বে রাজবন্ধুদিগের জন্য আস্তৃত বিশ্রামাসন। মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব অপরাহ্ণের নদীবায়ু সেবন করিতে করিতে সভাগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন।

ইহাদের এক পার্শ্বে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র লইয়া জন কয়েক লোক একখানি সুদৃশ্য আসনের উপর আসিয়া বসিল এবং ইহাদেরই সমভিব্যাহারিণী এক সুন্দরী রমণী আসিতেই সপারিষদ স্বয়ং মহারাজাধিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়

আসনেরই অদ্ধাংশে হাত ধরিয়া বসাইলেন, চারিদিক হইতে একটা প্রশংসাসূচক কলরবও উত্থিত হইল, কিন্তু সে শব্দটা কতকটা জড়িত ও অস্ফুট কণ্ঠের এবং সেই মদমত্ত স্বরলহরী একটা অর্থহীন কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াই অতি সহসা থামিয়া পড়িল।

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব হর্ষগদ্গদ-কণ্ঠে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান কালের নর্ত্তকী-শ্রেষ্ঠা চন্দ্রকলাকে বলিতে লাগিলেন, "সঙ্গীত-বিদ্যার জীবন্ত সরস্বতী! নৃত্যকলার বর্ত্তমান ভরতমুনি! নাট্যলীলার নটরাজ! আপনার আগমনাশায় আমরা এই দেখুন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পথ চেয়ে রয়েছি। আসুন আসুন।"

নর্ত্তকী চন্দ্রকলা তাহার পুষ্পধনুতুল্য ভ্রূযুগলে গুণ চড়াইয়া হাস্য-কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুধালস মৃদু মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "রাজাধিরাজ! কত যে ঠাট্টা করতে পার! আমি কিছুই জানি নে কি না, তাই ও সব ব'লে আমায় গঞ্জনা দিচ্ছো বুঝি!"

মহীপালদেব সুরাপানবিহ্বল কলকণ্ঠে ব্যস্ত হইয়া প্রতিবাদ করিতে গেলেন, "না সুন্দরি! বাস্তবিকই আমি তোমার একান্ত গুণমুগ্ধ! বসন্তলেখা, বিদ্যুন্মালা তোমার তুলনায় কাহাকেও আমি সুকণ্ঠা বোধ করতে পারি না। যে দিন থেকে তোমার গান শুনেছি, আমি মরেছি।"

নর্ত্তকী কহিল, "হাঁ গো রাজাধিরাজ! তারই জন্যই এই সে দিন সিংহলদেশ থেকে মুক্তা আনিয়ে তাকে চরণবিলম্বিত হার পুরস্কার দেওয়া হ'ল!"

রাজপাদসেবী দাস দ্বারা আনীত স্বর্ণপাত্রপূর্ণ পুরস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা চন্দ্রকলার অধরে ধরিয়া উৎসুক আবেদনে রাজাধিরাজ কহিলেন, "এর জন্য আর দুঃখ কিসের? নর্ত্তকীকুলেশ্বরি! তোমার জন্য এক মাসের মধ্যে সাগরের তলদেশ ছানিয়া মুক্তাশ্রেষ্ঠ আহরণ ও তদ্দ্বারা তোমার পদতলে মোহনমাল্য গ্রথিত হবে, এই কথা দিলাম।"

নর্ত্তকী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ও ক্ষণপরে রাজাজ্ঞায় তাহার সমস্ত শিক্ষা ও কণ্ঠমাধুর্য্য দিয়া তাঁহাদের চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া তাহার মধুর কণ্ঠ মুক্ত শুভ্র উদার আকাশতলে ভাসিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন একসঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল আজি-মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া গিয়া তাহাদের সমস্ত কণ্ঠ-সুধাকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া বিশ্ব-সংসারকে সেই মাধুর্য্যের মধ্যে মগ্ন করিয়া দিতেছে। এই সুমধুর সঙ্গীত-সুধাধারা পান করিতে করিতে রাজাধিরাজ তাঁহার সুধাপানোৎফুল্লচিত্তে যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। গানের পর গান আদেশ দিতে থাকিলেন। তখন চন্দ্রকলা উঠিয়া নানা ভাব ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যারম্ভ করিল। বাদ্যকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে বাদ্যবাদন আরম্ভ করিয়া দিল, আর চতুর্দ্দিক্ হইতে সুধাপানবিহ্বল শিথিল করে তালি দিয়া নবীন মহামাত্য, প্রান্তপাল, মহাপ্রতীহার ইত্যাদি রাজবন্ধুবর্গ এই নৃত্যশীলা অপ্সরার অতি অপরূপ নৃত্য-গীতের সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক একটা বিপুল বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া তুলিল। স্বয়ং মহারাজাধিরাজও ইহাদের সহিত যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে কলাভূমি একটা তাণ্ডব-ভূমিতে পরিণত হইল।

ধীরে ধীরে রাজপদসেবী আসিয়া কুণ্ঠিত ভয়ে মৃদু বচনে জানাইল, "মহাকুমার পরমভট্টারক রামপালদেব সমাগত, বিশেষ প্রয়োজনে রাজদর্শন প্রার্থনা করিতেছেন।"

এই আবেদন প্রথমতঃ রাজাধিরাজের কর্ণগোচর হইল না। দুই তিন বার জানাইবার পরে যখন হইল, তখন তাঁহার অবস্থা বিশেষ শোচনীয়, বসিয়া থাকার অবস্থা লোপ পাওয়ায় তখন তিনি তাঁহার প্রশস্ত আসনে প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে তখনও সুধাসার-পূর্ণ স্বর্ণপাত্র তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছিল। অপ্রিয় সংবাদে মুখ বিকৃত করিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, "ব'লে দাও, এখন দেখা হবে না।"

প্রতীহার সবিনয়ে ও সভয়ে পুনশ্চ নিবেদন করিল যে, সে কথা সে ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে জানাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই,—মহাকুমার নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিতেছেন যে, তাঁহার কার্য্য প্রয়োজনীয়, এক বার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ আবশ্যক।

মহারাজাধিরাজ বিরক্তি-বিপন্নভাবে কহিলেন, "তবে তাহাকে এইখানেই ডাকিয়া আন্।"

প্রতীহার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ও ক্ষণমাত্র পরে সমধিক ভীতিবিপন্নভাবে ফিরিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে

দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। পরমভট্টারক, মহাকুমার পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার বক্তব্য তিনি ভট্টারক-প্রধান পরমসৌগত মহারাজাধিরাজকে নির্জ্জনে বলিতে চাহেন।"

মহারাজাধিরাজের মন যদিও তখন সুধাসাগরের অতল পাথারে তলাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার মধ্যে যেটুকু সংজ্ঞা তাঁহার ছিল, সেইটুকু চিত্তই তাঁহার এই একান্ত অবিনীত জিদের বশে অসহিষ্ণু ও অপ্রসন্নতর হইয়া উঠিল। এমন অসময়ে এমন একটা রসভঙ্গ করিতে অকস্মাৎ আসিয়া হানা দিবার তাহার কিসের এতই প্রয়োজন? রাগ করিয়া বলিলেন, "ব'লে আয়, ইচ্ছা হয় এখানে এসে দেখা ক'রে যাক্, ইচ্ছা না হয়, বাড়ী ফিরে যাক্; আমার এখন এখান থেকে স'রে যাবার সময় হবে না।"

সামান্যক্ষণ পরেই ক্ষোভ, লজ্জা ও বিরক্তিতে আললাট রক্তিম করিয়া নত আরক্তনেত্রে অথচ দৃঢ় ও স্থির পদক্ষেপে মহারাজ-পুত্র রামপালদেব সেই সুরা ও সুর-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রঙ্গভূমে প্রবেশ পূর্ব্বক এই দৃশ্যদর্শনে থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজ-ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া রাজামাত্যের দল পূর্ব্বের মতই মহাকোলাহলে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতেছিল। এখন না কি তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাই কেহ কেহ রাজপুত্রকে সম্মান দেখাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া নিজের দেহের ভার সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে ধরাপৃষ্ঠ আশ্রয় করিল এবং সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য না থাকায় তদবস্থাতেই পতিত রহিল। যাহাদের জড়িত জিহ্বা কথঞ্চিৎ বশীভূত হইয়াছিল, তাহারা সমস্বরে উচ্চারণ করিল, "দীর্ঘজীবী হউন, মহারাজ-কুমার।"

রামপালদেব সুগভীর ঘৃণাভরে উহাদের দিকে নিমেষের কোপকটাক্ষনাত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই প্রমত্ত পারিপার্শ্বিক-ব্যূহ ভেদপূর্ব্বক রাজার উদ্দেশ্যে ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নর্ত্তকী-শ্রেষ্ঠা সুন্দরী চন্দ্রকলা তাহার অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম জানাইল। রামপালদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিলেন না। দেখিয়া মানব-শিকারিণী তাহার চটুলহাস্য-বিভাসিত সূক্ষ্ম অধরপুটে কুন্দকলিকাকান্তি শুভ্র দশন দিয়া চাপিয়া ধরিল, কিন্তু চঞ্চলনেত্রে তাহার যে বিস্ময়-প্রশংসার সসম্ভ্রম রেখা দুইটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে দুইটিকে সে মুছিয়া লইতে পারিল না বরং গতিহারা ও গীতহারা হইয়া গিয়া নিস্পন্দলোচনে সেই উন্নত মহিমময় দেবোপম মূর্ত্তি সে নির্নিমেষহারা নেত্রেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহার সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টি বলিতেছিল, মগধ হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত অনেক ত দেখিলাম, কিন্তু এমন ত কোথাও আর দেখি নাই!

মহাকুমার কোনমতে পথ করিয়া লইয়া যখন রাজ-সন্নিধানে পৌঁছিলেন, তখন মহারাজেরও অবস্থা তাঁহার পারিষদবর্গের অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না।

রামপালদেব সবিনয়ে চরণস্পর্শ পূর্ব্বক বন্দনা করিলে কষ্টে-সৃষ্টে চোখ তুলিয়া তিনি একবার কোনমতে কনিষ্ঠের দিকে চাহিলেন, স্খলিতকণ্ঠে কহিলেন, "কি এমন অত্যাবশ্যক পরামর্শের জন্য অনর্থক এমন অসময়ে কষ্ট দিতে আসিলে? নর্ত্তকীকুল-শোভিনী চন্দ্রকলা ইহাতে কি মনে করিবে, তা' একটু বিবেচনা করিলে না?"

রামপালদেবের ভূমিন্যস্ত দৃষ্টি বৃথাই আরক্ততর হইয়া উঠিয়া দারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিশাল বক্ষতলে বজ্রসূচী বিদ্ধ করিয়া দিল, তিনি ক্ষোভকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমার বক্তব্য আমি শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলিতে চাহি, তবে রাজাধিরাজ যদি দয়া করিয়া একটু নির্জ্জন স্থানে গমন করেন, অথবা—"

"অথবা এদের বিদায় দিই? না, সে সব কিছু আমি করছি না। কে জানে যে আমায় একা পেলে তুমি রাজ্যলোভে আমায় বধ করবে না?"

"রাজাধিরাজ!" রামপালদেব এমনই স্বরে এই শব্দটুকু উচ্চারণ করিলেন যে, যেন মনে হইল, সহসা বুকের মধ্যে তাঁহার, রাজাধিরাজের সেই স্খলিত-জড়িত অসংযত রসনা একখানা ক্ষুরধার তরবারি সবলে বসাইয়া দিয়াছিল।

"রাজাধিরাজ! ভুলে যাবেন না, আমি আপনার ছোট ভাই!"

তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতেও সেই একইরূপে নিদারুণ



মা

বসুমতী প্রেস

শিল্পী— শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্ত

আঘাতপ্রাপ্ত আহতের আর্ত্ততা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া ব্যক্ত হইতে চাহিল।

কিন্তু এই করুণামধুর যুক্তিটুকু শুনিয়া পরমভট্টারক মহীপালদেব সবিদ্রূপ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। "সেইটেই ত হচ্ছে. এর ভিতর সব চেয়ে নির্ভুল ও সাঙ্ঘাতিক সত্য! তুমি আমার ছোট ভাই! ছোট ভাই-রাই ত চিরদিন বড় ভাইয়ের সিংহাসনখানিকে নিজের ক'রে নেবার জন্য লুব্ধ হয়ে নানা ষড়যন্ত্র ও চাতুরী প্রদর্শন করে—কোথাও অকৃতকার্য্য, আবার কোথাও কোথাও বা কৃতকার্য্য হয়ে থাকে। তার পর ভাই তুমি আমার বটে, তবে বিমাতার ছেলে। সৎমা যেমন মা, তার ছেলেও আবার তেমনই ভাই। কি বল চন্দ্রকলা? কথাটা আমি ঠিক্‌বলি নাই? সৎমার ছেলে ভাই সৎ-ভাই কি না অ-সৎ ভাই! আর ত নামেই প্রমাণ হচ্ছে যে, সে যে আরও অসৎ!"

নর্ত্তকী চন্দ্রকলা দেখিল, জ্যেষ্ঠের এই ভীষণ ও হীন অভিব্যক্তিতে সেই তেজোদীপ্তশ্রী পুরুষের মুখখানা এক-বার গাঢ় রক্তিমায় ফাটিয়া পড়ার মত হইয়াই পুনশ্চ তাহা কি মলিন শুভ্র-শবমুখের মতই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আজানুবিলম্বিত শালপ্রাংশু মহাভুজদ্বয় মুহূর্ত্তের চঞ্চলতায় অধীর হইয়া উঠিয়াই পুনশ্চ যেন ঘোর নির্ব্বেদবশে অবসন্ন-বৎ দুই দিকে শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি রোষ-ক্ষুব্ধ অথচ বিনীত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার নিকট হ'তে কখনও কি হীনতার পরিচয় আপনি পেয়েছেন, রাজা-ধিরাজ? তবে কেন সুবিধা পেলেই মিথ্যা এ অপবাদ দিতে ছাড়েন না?"

মহীপাল এ অভিযোগের উত্তরে চন্দ্রকলাকে সাক্ষ্য মানিয়া গোলমাল করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এস ত তুমি চন্দ্রকলা! এসে আমার পাশে এইখানে ব'সে এই অজ্ঞ রামপালকে আমার হয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি যে, মানুষ যখন ষড়যন্ত্র করে, তখন সে নিশ্চয়ই যার বিরুদ্ধে সেটা করছে, তাকে জানিয়ে করে না। যখন তার সেই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়, তখন তাই থেকে বার হবার আর কোন পথই যে পাওয়া যায় না। দেখ, ভারত-সম্রাট সেই যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অশোক পর্য্যন্ত সবার নামের সঙ্গেই এই ভ্রাতৃদ্রোহ বিজড়িত, বিশেষতঃ কাশ্মীরের ইতিহাস যদি আলোচনা করতে বসো ত দেখবে, সেখানে পিতৃদ্রোহ আর ভ্রাতৃদ্রোহের নায়ক ত একাধারে সবাই। ভাগ্যে আমার সন্তান জন্মায়নি, তাই ঐ একটা ভয় থেকে আমি বেঁচে গেছি; কিন্তু এই ভ্রাতৃদ্রোহের ভাবনার জ্বালায় আমার মনে এত সুখের মধ্যেও বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। তাহাও আবার বৈমাত্র ভাই! নিজের মা বেচারী তবু ভদ্র ছিল, আমি বই আর কারুকে সে গর্ভে ধরেনি। ভদ্রাদেবী আমার সৎমা কি না, তাই এই বাদটি সেধে রেখে গেছেন! তুমিই বল দেখি চন্দ্রকলা, এটা তাঁর ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়েছে? রাজবংশে এক সন্তান জন্মাবে, এই সঙ্গত।"

নর্ত্তকী চন্দ্রকলাকে সাক্ষ্য রাখিয়া পরমসৌগত মহীপালদেব না জানি রামপালের বুকের উপর আরও কতকগুলি বিষের বাতি জ্বালিতে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার এই নিতান্ত লজ্জাহীন ও নির্দ্দয় ব্যবহারে পতিতা গণিকারও চিত্তে লজ্জার উদয় হইতেছিল। সে এতক্ষণ নির্নিমেষ মুগ্ধচক্ষুতে সেই পাশবদ্ধ গজরাজসদৃশ ক্ষণদৃপ্ত ক্ষণম্লান অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ভাব পর্য্যবেক্ষণে তন্ময় হইয়া ছিল। তাহার এই অসাধারণ আত্মসংযম দেখিয়া সে আশ্চর্য্যানুভব করিল ও সহসা তাহার চিরতরল চিত্ত এই অভূতপূর্ব্ব সংযমের দৃশ্যে যেন একটা গভীরতরভাবে সম্মোহিতপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, পুনঃ পুনঃ রাজা দ্বারা সম্বোধিত হইয়াও সে তাই তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাতও করিতেছিল না। রাজা তাহার নাম ধরিয়া যত বার ডাকিতেছিলেন, এই আগন্তুক শ্রোতার দুই নেত্র তখনই এক বার করিয়া যে আভ্যন্তরিক মহারোষে অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়াই পুনশ্চ তাহা সংহরণ করিয়া লইতেছিল, তাহাও ঐ মানব-চিত্তলেখাপাঠকার্য্যে পটীয়সী চতুরা নারীর অজ্ঞাত থাকিতেছিল না। তবে সেই অনলের সহিত অতি তীক্ষ্ণ যে বিদ্বেষের জ্বালা নিহিত ছিল, তাহার সবটাই যে ভীষণ ঘৃণামাত্রই নহে, আরও একটা তীব্রতর সন্তপ্ত অভিমান, সেই খবরটুকুই শুধু সেই রামপাল-চরিত্রে অনভিজ্ঞা ব্যাপিকা জানিতে পারিল না। তাই রাজা যখন তাহাকে তাঁহার নিজ পার্শ্বে বসিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন, তখন এই [illegible]

নিজের প্রতিপত্তি প্রদর্শনের মহামোহে বারেকের জন্য নর্তকী চন্দ্রকলার ঐশ্বর্য্যভোগ-বিলাসী গর্ব্বস্ফীত চিত্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহার অদূরবর্ত্তী সেই সুঠাম বীরমূর্ত্তিতে যে একটা অকথ্য দাহজ্বালাপূর্ণ উদ্দামতেজ অনুভব করিল, তাঁহার সেই রক্তকমলের মতই আয়ত ও আরক্ত নেত্রে সে সুপ্ত অগ্নিপর্ব্বতের একটা ঝলক নিঃসৃত হইয়া উঠিতে দেখিল, ভয়ে ও বিতৃষ্ণায় তাহার সেই দর্পিত চিত্ত যেন গুটাইয়া এতটুকু ছোট হইয়া যাইতে পথ পাইল না। তাহার পর সে সব চেয়ে চমৎকৃত হইতেছিল,—সে এই এতখানি আগুনের দাহিকা-শক্তিকে ক্রমাগতই অন্তর্নিহিতভাবে সংযত রাখিতে দেখিয়া—যখন প্রতিক্ষণেই সে একটা ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা করিতেছিল। তরলচিত্ত প্রমত্ত নরমগুলী যাহার চিরসহায়, সে এই দৃঢ়চরিত্রকে অনুসন্ধান করিবে কোন্ সম্বল লইয়া? তাই রাজাধিরাজকে মূঢ়ের ন্যায় ক্রমাগতই এই অগ্নিপিণ্ডে হাত দিতে যাইতে দেখিয়া সে আর তাঁহার উপরে নিজের বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাকে গোপন করিতে পারিল না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সহসা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"রাজাধিরাজ! আমায় কেন অপরাধিনী করিতেছেন?"

মহীপালদেব বিস্ময়াহতভাবে একটুখানি উঠিয়া বসিতে গেলেন—অভিযোগটা তাঁহার কাছে যেন সম্পূর্ণ নূতনতর ঠেকিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়ে চারুশীলে! তোমায় অপরাধিনী—"

রামপালদেব এই সময়ে এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে অথচ সম্পূর্ণ দার্ঢ্যসহকারে কথা কহিলেন; বলিলেন,—"আমার কথাটা এইখানেই ব'লে নিয়ে তা হ'লে আমি চ'লে যাই—আমার এই বক্তব্য যে—"

বাধা দিয়া মহারাজাধিরাজ কহিলেন—"তোমার মাসিক বৃত্তি কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে ত? কিন্তু সে সব আশা এখন আর ক'র না, বরং নিজেদের খরচপত্র কিছু কিছু কমিয়ে ফেল। একে ত পট্টমহাদেবীকে হাতে রেখে তুমি ও তোমার স্ত্রী-পুত্ররা আমায় যথেষ্ট দোহন ক'রে নিচ্ছে', তার উপর—"

রামপাল কহিলেন,—"রাজাধিরাজ! আমার নিজের নাই, আর আজও তা করতে আসি নাই। আমার উদ্দেশ্য, প্রজাসাধারণের জন্যই আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে আপনাকে আজ দুই একটি যুক্তিমাত্র দেখাতে চাই।"

তাঁহার এই কথাগুলিতে কি গভীর অভিমান ও বেদনা প্রকাশ পাইল, তাহা যাঁহার উদ্দেশে বলা হইল, তাঁহার বুঝিবার সাধ্য বা প্রবৃত্তি ছিল না বটে, তবে তাহা এখানে উপস্থিত অপর এক শ্রোতার চিত্তে বিপুল বলে আঘাত করিল।

রাজাধিরাজ তখন যেন নিতান্তই নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া গভীরভাবে একটা শ্বাস গ্রহণ ও মোচন পূর্ব্বক অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর করিলেন "তা হ'লে আর সে কথাটা তোমার না বল্লেও চ'লে যাবে, রামপাল! প্রজাসাধারণের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি প্রত্যহ অনেকের মুখেই অনেকবার ক'রে শুন্‌তে পাচ্ছি, এর জন্য তোমায় আর এতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে এত দূরে এসে আমার এই বিশ্রামকালের আনন্দটুকুতে আঘাত না করলেও চল্‌তে পারতো। তা' যা' হ'য়েছে হয়েছে, এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও। প্রজাসাধারণের ভাবনায় মাথা খারাপ করবার তোমার কোন দরকার দেখছি না। কারণ, সে ভাবনাটা আমার, তোমার নয়। তাদের ভাবনা আমি যদি ভাবি ত আমি নিজেই ভাববো, না যদি ভাবি, কেউই তা আমায় ভাবাতে পারবে না, বুঝলে? তোমার বাবাই যখন তা পেরে ওঠেনি, তখন তুমি ত কোন্ ছার! যাও, এখন বাড়ী ফিরে যাও—কৈ, কোথায় তুমি চন্দ্রকলা! প্রিয়ে! এস, কাছে এস, আহা, এমন আকস্মিক রসভঙ্গ! কি নিদারুণ পরিতাপ! আহা হা!"

চন্দ্রকলা সভয় কটাক্ষে অবমানিত মহারাজেন্দ্রকুমারের দীর্ঘশ্বাসস্ফীত ক্রুদ্ধ মূর্ত্তির পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়াই দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধবিরসকণ্ঠে তাচ্ছীল্যভরে প্রত্যুত্তর করিল—"দারুণ শিরঃপীড়ায় আমায় কাতর করেছে, মহারাজাধিরাজ! এখনই আমি বিদায় নিতে চাই।"

মহাকুমার রামপালদেবের পশ্চাতেই নর্ত্তকী তাহার দলবল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

মুখ বিকৃত করিয়া মহীপালদেব তাঁহার পারিষদবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন—"দেখলে ত! হিংসুকটা

রাজবন্ধুবর্গ রাজার মনোরঞ্জনার্থ সমকণ্ঠে সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন—"সৎমার ছেলের কাছে আর কতই ভাল ব্যবহার আশা করেন, মহারাজাধিরাজ?"

রাজা কহিলেন, "তা বই কি! একে ভাই, তা'তে সৎমার ছেলে! দেখ দেখি, আমার নিজের বাড়ীতে আমার স্ত্রীটাকে দখল ক'রে রেখেছে! তাই না হয় রাখুক, তাকে ত আমি এক কাণাকড়ারও গ্রাহ্য করিনে, তার উপর আজ আবার ঐ হঠাৎ এসে প'ড়ে দেখ দেখি অনর্থক এই নর্ত্তকী-কুলেশ্বরী চন্দ্রকলার মাথা ধরিয়ে দেওয়া! ওর মাথাটাকে স্কন্ধচ্যুত না করলে এ অত্যাচারের প্রতীকার হবে না দেখছি! নাঃ, দুধকলা খাইয়ে মহাদেবী একটা কালসাপকে পোষণ করছেন!"

মহাসামন্ত কহিলেন—"এখন কোন দিন না কোন দিন আপনাকে ছোবলটা না বসিয়ে দেয় দেখবেন!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

প্রতীচ্যে বাঙ্গালী নর্ত্তকী

কুমারী নগেন্দ্রবালা দেবী, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় বি, এল মহোদয়ের কন্যা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুর হাজিপুর নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই কুমারী নগেন্দ্রবালার সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কাশীধামে থাকিয়া কুমারী নগেন্দ্রবালা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তৎপর হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা এবং কিছু কিছু ইংরাজী শেখেন। সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীতের চর্চ্চাও চলিতে থাকে।



কুমারী নগেন্দ্রবালা দেবী

অশ্ব চালনাতেও ইঁহার সমধিক দক্ষতা আছে। বঙ্গনারী হইয়াও জড়তা কখনও তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই।

প্রতীচ্যদেশে নৃত্য-কৌশল প্রদর্শনের জন্য কুমারী নগেন্দ্রবালা য়ুরোপ যাত্রা করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম, সুইজারলাণ্ড প্রভৃতি দেশে গিয়া ইনি প্রাচ্য নৃত্যকলার কৌশল দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহার গীত হিন্দী, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু সঙ্গীত শ্রবণে পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ। এ বিষয়ে নগেন্দ্রবালা ভারতীয় নারীগণের অগ্রণী।

বাঙ্গালী নারীদিগের মধ্যে নগেন্দ্রবালাই সর্ব্ব-মোটর-চালকের লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



বিজ্ঞানের মহিমা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রবল অনুরাগ সভ্য জগতে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহকে যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে মানবের যাবতীয় কার্য্যের সহায়তা-সাধনে প্রয়োগ করা হইতেছে, পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে আর কোন সময় যে সেরূপ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি এবং ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া সকল স্থলই অল্পবিস্তর পরিমাণে বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বাষ্পীয় পোত ও তাড়িত বার্ত্তাবহ ইতঃপূর্ব্বে অনেক দেশেই বিজ্ঞানের অগ্রদূতের কার্য্য করিয়াছিল; এখন বেতারবার্ত্তা, বিমানপোত, ডোবা জাহাজ, মোটরগাড়ী প্রভৃতি বিজ্ঞানের জয়পতাকা জল, স্থল ও আকাশমার্গ—সর্ব্বত্রই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

স্বভাবজ দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য

জাতীয় উন্নতিসাধনে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা নূতন করিয়া প্রতিপাদন করিতে যাওয়া বর্ত্তমান সময়ে অনাবশ্যক। ইহা এতই সুস্পষ্ট এবং দৈনন্দিন ব্যাপারে আমাদের চক্ষু-সমীপে এত জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে যে, ঘোর মায়াবাদী ভিন্ন আর কেহই ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কি প্রকারে বিজ্ঞান মনুষ্য-জীবনের সর্ব্ববিভাগে প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে জীবন-প্রণালীতে, সমাজে ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদিতে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাই বরং অধিকতর আলোচনার বিষয়। সেরূপ আলোচনা করিতে হইলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, আজকালকার বিপুল বাণিজ্য, অবিরাম কর্ম্ম এবং অপরিমেয় বিত্ত বিনামূল্যে লব্ধ হয় নাই এবং সেই মূল্য হইতেছে স্বভাবজ দ্রব্যাদির প্রচুর ব্যয়। ফলিত বিজ্ঞান প্রধানতঃ এই ব্যয়জনিত অভাবপূরণের জন্য ব্যস্ত। কয়লার দৃষ্টান্তে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান কারখানা-শিল্প ও ত্বরিত বহনবাহনের যুগে কয়লা অথবা কয়লাজাত তরল ইন্ধন অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ। প্রতি বৎসর যে কি বিপুল পরিমাণ কয়লা জগতের নানা দেশে প্রয়োজন হয়, তাহা শুনিলে বিস্ময় জন্মে। তাহার উপর আবার সামান্য রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া অতিকায় সমুদ্রপোত পরিচালন পর্য্যন্ত যে সমুদয় অশেষবিধ কার্য্যে কয়লা আবশ্যক, তৎসমুদায়ের মাত্রা শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; অথচ কয়লার পরিমাণ বাড়িতেছে না, নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোন দেশে আর দুই শত বৎসর, কোন দেশে ৫ শত এবং কোন দেশে সর্ব্বাধিক ১৫শত বৎসর কয়লার সংকুলান হইতে পারে। কিন্তু তৎপরে কি হইবে? —এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া খনিজ তৈলের ইন্ধনরূপে উপযোগিতা আবিষ্কার হইল। তাহাতেও বৈজ্ঞানিকগণ সন্তুষ্ট না হইয়া নূতন ইন্ধনের অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন এবং তাহার ফলে আবার Methanol অথবা কৃত্রিম বাষ্পসুরার সৃষ্টি হইল। কাষ্ঠ চোয়াইয়া সুরা প্রস্তুত (methyl or wood alcohol) কিছু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। জর্ম্মণীর Baden Anilia & Soda Work যখন কৃত্রিম উপায়ে কাষ্ঠসুরা প্রস্তুত করিলেন, তখন ব্যবসায়-জগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বহুশাখাবিশিষ্ট জর্ম্মণীর এই রাসায়নিক কারখানাটি রং, গন্ধ, ঔষধ প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অনেক স্বভাবজ দ্রব্যমূলক শিল্পের প্রতিযোগিতা করিতেছে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এক মার্কিণের কাষ্ঠচোলাই কারখানা সমূহ বৎসরে ৭০ লক্ষ গ্যালন কাষ্ঠসুরা উৎপাদন করে। উক্ত কারখানাওয়ালাগণ

এখন 'মিথানোলে'র আবির্ভাবে প্রমাদ গণিতেছেন এবং কাষ্ঠসুরা উৎপাদনের অন্যান্য কেন্দ্রেও সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, মূল কথা এই যে, কোন স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্যের মহার্ঘতার জন্য কিংবা আপাততঃ অথবা ভবিষ্যৎ অভাব আশঙ্কা করিয়াই কোন বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইয়া থাকে এবং স্বভাবজ দ্রব্যের উপর নির্ভর না করিয়া গবেষণাগারের মধ্যেই নানাপ্রকার রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ দ্বারা উক্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্ত (Substitute) আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করা হয়। তাহা যে স্থলে ফলবতী হয়, সেখানে সময়ে সময়ে এমন দ্রব্য সৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, উহা উৎপাদন করিতে স্বভাবজ দ্রব্য অপেক্ষা অনেক কম ব্যয় পড়ে। কৃত্রিম দ্রব্য সেই স্তরে উপনীত হইলে উহার প্রচার দ্বারা বহুকালপ্রচলিত ও বহুকালের অবলম্বনস্থানীয় সমশ্রেণীর স্বভাবজ দ্রব্য-শিল্পের উচ্ছেদ সাধিত হইয়া থাকে।

গৃহ ও গৃহসজ্জা

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যও আদিম অবস্থায় বাসের জন্য পর্ব্বতগুহা, অরণ্যতল ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিত। বাসস্থান নির্ব্বাচন ও গৃহনির্ম্মাণ তৎপরে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু স্বাভাবিক লতাকুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ, ইট প্রভৃতি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণের যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের বলেই। সর্ব্বশেষে আজকাল লৌহের কাঠামোর ভিতর মসলা জমাইয়া (Fero concrete) যে ২০।২৫ তল উচ্চ বিরাটকায় ব্যোমস্পর্শী অট্টালিকাসমূহ (Skyscrapers) প্রস্তুত হইতেছে, তদপেক্ষা বিজ্ঞানপ্রভাবের স্পষ্টতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্তরূপ সৌধকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়। গৃহনির্ম্মাণের পর গৃহ আলোকিত করার বিষয়ও ভাবিবার যোগ্য। এই বিভাগে যে কত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, উদ্ভিদ্-তৈল-পুষ্ট ক্ষীণ-শিখা মাটীর প্রদীপের সহিত সূর্য্যালোকসদৃশ উজ্জ্বল আধুনিকতম বৈদ্যুতিক দীপের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। রন্ধনকার্য্যেও অল্পদিবসের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনকার বড় বড় ভোজনাগারসমূহে একসঙ্গে ৫ শত ব্যক্তির আহার প্রস্তুত করা আদৌ কঠিন নহে। তাহাতে তিন ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না এবং আহার্য্য নির্ব্বাচনপূর্ব্বক পাত্রে বোঝাই করা ভিন্ন পাচকের আর সামান্য কাযই থাকে। আজকাল এরূপ গৃহও প্রস্তুত হইতেছে—যাহাতে পাক, কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার অথবা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দাসদাসী না রাখিলেও চলে; সমস্তই কলে নির্ব্বাহ হয়।

আহার্য্য

বিজ্ঞান-সম্রাট বার্থেলো (Berthelot) এক সময় বলিয়াছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এমন দিন আসিবে, যখন আহার্য্যের জন্য কৃষিকার্য্য করিতে হইবে না; খাদ্য অথবা খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদানগুলি রাসায়নিক কারখানাতেই প্রস্তুত হইতে পারিবে। এখনও সে দিন আইসে নাই, কিন্তু বিজ্ঞানের গতি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানবের খাদ্য সম্বন্ধেও মহান্ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ নানা দ্রব্য হইতে আমরা আহার্য্য সংগ্রহ করি; কিন্তু সাধারণ খাদ্যের সমস্তটাই যে আমাদের শরীরগঠন ও রক্ষণের জন্য আবশ্যক হয়, তাহা নহে। খাদ্য হইতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ, শ্বেতসার, শর্করা, বসা প্রভৃতিই শরীরপুষ্টির উপাদান ও ভাইটামিন তাহার সহকারী। বলা বাহুল্য যে, খাদ্য হইতে এই সমস্ত পুষ্টিকর উপাদান পৃথক্ করিয়া লইয়া আহার করিলে পূর্ণ ভোজনেরই কায হয়। এ পর্য্যন্ত এই উপাদানগুলি উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণিদেহ হইতে মানব সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু এইগুলি ভবিষ্যতে রাসায়নিক প্রথায় প্রস্তুত না হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ, নাইট্রোজেনমূলক অণ্ডলাল (Albumen) শ্রেণীয় যৌগিক সমূহের মধ্যে ২১৪টি ইতোমধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ শর্করাও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যদিও তাহা স্বাভাবিক শর্করার সহিত কাযে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে বলা যায় না। পুষ্টির মূল উপাদানগুলি বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত ও ব্যবহারোপযোগী সুলভ হইবার এখনও অনেক বিলম্ব থাকিলেও ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে,

খাদ্য-বিজ্ঞানে যথেষ্ট নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

বর্ত্তমান জগতে আহার্য্য-সংকুলানসমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও প্রধান। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, একটি মনুষ্যের জীবনযাপনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে ছয় বিঘা জমীর ফসল আবশ্যক হয় এবং জগতের লোকসংখ্যা বৎসরে শতকরা এক অংশমাত্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, আর ৮ শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর আপাততঃ কর্ষিত জমী যত সংখ্যক লোক প্রতিপালন করিতে পারে, তাহা পূর্ণ হইয়া যাইবে। কর্ষণ-যোগ্য নূতন জমীর পরিমাণও সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে আহার্য্য দ্রব্যের মহার্ঘতা এখন জগতের সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে দুইটি পন্থা নির্দ্দেশ করে :—

(১) একই জমী হইতে এক অথবা একাধিক ফসল বর্ত্তমান অপেক্ষা বর্দ্ধিত হারে উৎপাদন;

(২) প্রাণিজ অথবা উদ্ভিজ্জ আহার্য্যের অধিক সদ্ব্যবহার ও অপচয় নিবারণ।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য ও পশুপক্ষী পালন করিয়া মার্কিণ, জার্ম্মাণী, বিশেষতঃ হলাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশ আহার্য্য উৎপাদনের মাত্রা যে কত গুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কেহ কেহ বোধ হয় অবগত আছেন। দ্বিতীয় পন্থা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজকাল যত প্রকার দ্রব্য হইতে আহার্য্য সংগৃহীত হইতেছে, তত প্রকার দ্রব্য পূর্ব্বে কখনই ব্যবহৃত হয় নাই। এক তৈল জমাইবার প্রথা (Hydrogenation of oil) আবিষ্কৃত হইয়া তৈল, চর্ব্বি, ঘৃত ও মাখন-জগতে বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ তৈল কেবলমাত্র জ্বালানিরূপে কিংবা সাবান, বাতি প্রভৃতি প্রস্তুতের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত, এখন সেগুলি কৃত্রিম মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি ইত্যাদি প্রস্তুতের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় প্রথম উদ্ভাবিত সয়া অথবা নারিকেল-তৈলসংযুক্ত দুগ্ধ, উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত মাংসের পরিবর্ত্তে খাদ্য, মুরুয়ার ট্যাবলেট, শালগম ও আলুর আটা, কৃত্রিম ডিম্বচূর্ণ ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য স্বাভাবিক খাদ্যের একান্ত অভাবের জন্য প্রচলিত হইয়াছিল, সেগুলি উঠিয়া যায় নাই; বরং পরিবর্ত্তিতরূপে, বিপুল পরিমাণে নব-প্রতিষ্ঠিত বড় বড় আহার্য্য কারখানায় প্রস্তুত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত মধ্য-য়ুরোপের অধিবাসিবর্গের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, খাদ্য সংরক্ষণের ও ত্বরিত বহনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞান যেমন এক দিকে অপচয় নিবারণ করিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় শিল্প-প্রধান দেশের আহার্য্য সংগ্রহের অভাবনীয় সুযোগ করিয়া দিয়াছে। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও বিপরীত শ্রেণীর জল-বায়ুযুক্ত দুইটি দেশের মধ্যে ফল মূল, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতির ন্যায় সহজ পচনশীল আহার্য্য যে অবিকৃত অবস্থায় আদান-প্রদান চলিতে পারে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বপ্নেরও অগোচর বিষয় ছিল। পরিবর্ত্ত খাদ্যসমূহের সৃষ্টি হইয়া যে অবিমিশ্র মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, কিন্তু সংরক্ষণ-প্রণালী সমূহ যে উর্ব্বর, অনুর্ব্বর, উষ্ণ, শীতল এবং কৃষিপ্রধান ও শিল্পপ্রধান দেশনির্ব্বিশেষে সমষ্টিভাবে সমস্ত মনুষ্যজাতির আহার্য্যপ্রাপ্তির অপূর্ব্ব সুযোগ আনয়ন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রস্তুতীকৃত খাদ্য-শিল্প (prepared foods) এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, অদূর-ভবিষ্যতে হয় ত প্রতিদিন গৃহে গৃহে রন্ধন আবশ্যক হইবে না। তরল কিংবা কঠিন সাররূপে অনেক প্রকারের খাদ্য দোকানেই পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রচলিত চূর্ণ দুগ্ধ ও ডিম্ব, মুরুয়ার টেবলেট, মাংস, গোধূম ও তণ্ডুল-সার প্রভৃতি ভবিষ্যতের প্রস্তুতীকৃত খাদ্যশ্রেণীর অগ্রদূত বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

পরিধেয়

সভ্য মানব আর বল্কল পরিধান করে না বটে, কিন্তু বল্কলের হাত একেবারে এড়াইতে পারে নাই। কারণ, তিসি (Flax), রিয়া (Vegetable Silk) প্রভৃতি তন্তু বল্কল হইতেই প্রাপ্ত। অবশ্য পরিধেয় প্রস্তুতের উপাদানসমূহের মধ্যে কার্পাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কার্পাস-বস্ত্রের প্রথম প্রচলন যে কোন্ অতীত যুগে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না; ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভ হইতেই ইহা দৃষ্ট হয়। প্রাণিজগৎ হইতে আমরা রেশম ও পশম পাইয়া থাকি, কিন্তু প্রথমটির ব্যবহার, অর্থশালী

ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টির শীতপ্রধান দেশের লোকের মধ্যে প্রধানতঃ আবদ্ধ। ফলিত বিজ্ঞানের এই তিন প্রকার লোকের উপাদান হইতে পরিধেয় প্রস্তুতের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া বস্ত্রাদি সুলভ হইয়াছে এবং কার্পাস ব্যতীত অন্যান্য তন্তুও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে তন্তুমূলক শিল্পে (Textile Industry) প্রবেশলাভ করিতেছে। অধিকাংশ রঞ্জিত কাপড়ের, মোটা চাদর প্রভৃতির ও চকচকে বস্ত্রাদির উপাদান বিশুদ্ধ তুলা নহে—উহার সহিত পাট, রিয়া, শিমুলতুলা ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ-জাত তন্তু মিশ্রিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে মানবকে পরিধেয়ের জন্য কেবলমাত্র ২।৩টি উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে না। কিন্তু পরিধেয়-বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার কৃত্রিম রেশম। ইতঃপূর্ব্বে আমরা ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি (ভাদ্র, ১৩৩৩)। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন আবিষ্কৃত হইলেও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের মাত্রা এত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে যে, পরিধেয়-জগতে ইহার স্থান চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া বোধ হয়।

পরিধেয়ের সহিত রঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পৃথিবীর সকল স্থানেই সকল জাতিরই প্রিয়। এক শতাব্দী পূর্ব্বেই কতিপয় প্রাণী এবং বহু-সংখ্যক উদ্ভিদ নানাবিধ রঞ্জক পদার্থ উৎপাদন করিত। কিন্তু রং প্রস্তুত আজকাল রাসায়নিক শিল্পের অন্যতম শাখা হইয়া পড়িয়াছে। আলকাত্‌রাজাত (Coaltar) রংসমূহ ভারত ও য়ুরোপের মঞ্জিষ্ঠা ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ রং-ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। নীল এখনও সামান্যমাত্রায় টিকিয়া আছে বটে, কিন্তু ইহাও যে অবশেষে কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না।

চর্ম্ম ঠিক পরিধেয় না হইলেও পরিধেয়ের সহিত সভ্য সমাজে ইহার অটুট সম্পর্ক আছে। কারণ, চর্ম্ম-পাদুকা ব্যতিরেকে কাহাকেও সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। নানা প্রকার কার্য্যের জন্য চামড়ার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ সেই হিসাবে পশ্বাদির সংখ্যা বাড়িতেছে না। কাজেই কৃত্রিম চামড়া প্রস্তুতের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা আংশিকভাবে সফলও হইয়াছে। মোটর গাড়ীর সাজে, গৃহ-সজ্জায়, কোন কোন শ্রেণীর সুলভ পাদুকায় ও কতিপয় সৌখীন দ্রব্যে এখন যে চামড়া ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রায়ই কৃত্রিম। ক্রমশঃ কৃত্রিম চামড়া যে আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া স্বাভাবিক চর্ম্মের ক্ষেত্র অধিক মাত্রায় অধিকার করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

এমন অনেক দ্রব্য যাহা পূর্ব্বে একেবারেই অবিদিত ছিল, সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত তাহাও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। রবর ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ-আমেরিকা ও আফ্রিকার অরণ্যসমূহ হইতে বন্য এবং সিংহল, যবদ্বীপ, মালয়, ভারত প্রভৃতি দেশ হইতে বাগিচাজাত রবর পাওয়া যায়। বন্য রবরের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং সেই সঙ্গে কৃত্রিম রবরের দোষ সংশোধন করিয়া স্বাভাবিক রবরের প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। নানাবিধ শিল্পে রঞ্জন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। উদ্ভিজ্জ রঞ্জনের পরিবর্ত্তে রাসায়নিক রঞ্জনও বাজারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক প্রকারের গন্ধদ্রব্য ও কতিপয় ঔষধও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইতেছে। শিল্পে প্রয়োগ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম কর্পূর সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক কর্পূরের অনুরূপ। সংগঠনমূলক পদার্থসমূহ (Synthetic products) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যে কিরূপ দ্রুতগতিতে নিত্য নব আবিষ্কৃত হইতেছে এবং রাসায়নিক শিল্প দিনে দিনে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া যে কি বিরাট মহীরুহে পরিণত হইতেছে, তাহা শিল্প ও বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতির এবং ফরাসী, জর্ম্মাণী, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের বড় বড় কারখানাসমূহের বিবরণী পাঠ না করিলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায় না।

সখের জিনিষ

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মাণী ভারতের বাজারে কাচের চুড়ি, প্রবাল-ফুল, রঙ্গীন দানা (Beads) প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ নকল সৌখীন দ্রব্যের যে কি বিপুল ব্যবসায় চালাইয়াছিল, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। এখন আবার তাহাই দ্বিগুণ পরিমাণে চালাইবার উদ্যোগ

চলিতেছে। চুড়ি, দানা ও নকল স্বর্ণের আভরণাদি প্রস্তত-প্রণালীর মধ্যে অনেক রাসায়নিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সৌখীন দ্রব্যসমূহের মধ্যে কৃত্রিম রত্নাদি প্রস্তুতেই বিজ্ঞান বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। হীরক, মণি, মুক্তা ইত্যাদি বহুমূল্য রত্ন ও প্রস্তরাদি আজকাল কেবলমাত্র রাজামহারাজার অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করে না। বিজ্ঞানের প্রসাদে কৃত্রিম উপায়ে এই সমুদয় রত্নের এরূপ অনুকরণ করা হইয়াছে যে, সুনিপুণ জহরী ব্যতীত অন্য কেহই ঝুটা পাথর সহজে ধরিতে পারে না। অধিকন্তু ইহাদের মূল্য এত সুলভ যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকও এই সমুদয় ব্যবহার করিয়া ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে পারে। ফ্রান্স ও জর্ম্মণীতে অনেকগুলি কারখানা এই প্রকার নকল রত্ন প্রস্তুতে নিযুক্ত আছে এবং উক্ত কারখানাসমূহজাত দ্রব্যাদি ভারতের বাজারেও অপরিচিত নহে। ধাতুশ্রেষ্ঠ সুবর্ণও নকলের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সামান্য সুবর্ণ ও অন্যান্য ধাতুসংযোগে যে, কয়েক প্রকার কৃত্রিম সুবর্ণের প্রচার কিছু দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন। কিন্তু এখন আরও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। অনেক দিন পরীক্ষার পর বার্লিনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Miethe পারদকে প্রকৃত সুবর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কালে এই আবিষ্কার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপযুক্ত হইলে অর্থ বিনিময়

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

যে সময় হইতে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর (Pasteur) জীবাণু আবিষ্কার করিয়া পচনক্রিয়ার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই চিকিৎসা-শাস্ত্রে নবযুগ আসিয়াছে। লিষ্টার ও তৎপরবর্ত্তী বহু চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের অশেষ উন্নতিসাধন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ভয়াবহ জলাতঙ্ক রোগে আর অল্প লোকেই মরিতেছে।

অতি অল্পদিনের মধ্যে জীবাণুতত্ত্ব (Bacteriology) বিজ্ঞানের একটি প্রকাণ্ড শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমাদের অশন, বসন ও পরস্পরের সহিত মিলনের জীবাণু-বিজ্ঞানের আদেশ মানিয়া চলিতে হইতেছে। সংক্রামক ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হওয়ায় উহাদের নিয়ন্ত্রণ ও নিরাকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সহিত মশকের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া ডাক্তার রস্ যে কত দেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। অন্য দিকে স্বাস্থ্যের উপর ভাইটামিনের প্রভাব, আভ্যন্তরীণ গণ্ডসমূহ-নিঃসৃত রসের (Secretion of internal glands) কার্য্য, বার্দ্ধক্যের মূল কারণ, বানরের গণ্ড বসাইয়া মনুষ্যদেহে পুনর্যৌবনসঞ্চার ইত্যাদি নূতন নূতন আবিষ্কার যে মানবের পরমায়ুর সীমা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুপ্রজননবিদ্যা (Eugenics) আধুনিক বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার ফল, ইহার দ্বারাও যে মানবজাতির বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, তাহা আশা করিতে পারা যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, সেগুলিকে বিজ্ঞানের সংগঠনকারী দিক (Constructive side) বলিতে পারা যায়। ইহার অন্য দিক অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিকও (destructive side) আছে এবং তাহা রাসায়নিক যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে বিজ্ঞানের অপব্যবহার বলিতে পারা যায় এবং সেরূপ অপব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর লোকই দায়ী। অধিকন্তু এ দিকেও বিজ্ঞানের পক্ষে বলিবার কিছু আছে। বিজ্ঞানের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ প্রয়োগের ফলে ক্রমশঃ এরূপ দাঁড়াইবে রণাঙ্গণ বলিয়া আর নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান থাকিবে না, এক পক্ষ অন্য পক্ষের দেশ আক্রমণ করার ফলে সহস্র সহস্র লোক একসঙ্গে ও অল্পকালের মধ্যেই নিহত হইবে; গ্রাম, নগর, লোকালয়ের চিহ্ন শূন্য হইয়া যাইবে। তখন আর কেহ যুদ্ধ করিতে চাহিবে না, কারণ, সময়ে উভয় পক্ষেরই প্রায় নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কা থাকিবে। যুদ্ধ-বিগ্রহে আর কোন লাভ নাই দেখিয়া বিভিন্ন মানবজাতিসমূহ তখন পরস্পরের সহিত শান্তি ও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইবে। সেই ভবিষ্যৎ যুগে হয় ত মানবের মহাসভা ও জগতের মহাসম্মিলনী (Parliament of men Federation of the world) আর কবিকল্পনা থাকিবে না, সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

পথ-লাভ

১

নিশীথ রাত্রির ঝড়-বাদলে নবীন শিকারী পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন ; সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত ঘন অন্ধকাররাশি,—বিরাট দৈত্যের মত পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষণপরে অদূরে ক্ষীণ আলোকরশ্মি শিকারীর মনে তৃপ্তির সঞ্চার করিল।

মগধের প্রতাপশালী বৌদ্ধ-বিদ্বেষী রাজা অজাতশত্রু আজ এই ভীষণ অরণ্যে আশ্রয়ের কাঙ্গাল হইয়া—সেই ক্ষুদ্র কুটীরনির্গত ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন।

ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া রাজা দ্বারে করাঘাত করিলেন —"কে আছ, বিপন্ন পথিককে আশ্রয় দাও।"—ধীরে ভিতর হইতে অর্গল মুক্ত হইল। স্তম্ভিত রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। কে এই নারী ক্ষৌম-বসনপরিহিতা, দীন ভিক্ষুণীর বেশে অতুল রূপরাশি লইয়া এই ভীষণ অরণ্যে একাকী বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা করিতেছে! রাজার গর্ব্বিত আনন নত হইয়া পড়িল। এ প্রদীপ্ত রূপ রাজাকে বিমোহিত করিল।

ক্ষণপরে দৃঢ়চিত্ত সংযমী রাজা নিজেকে সংযত করিলেন, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কে তুমি, আমার পরম শত্রু বুদ্ধের পূজা করিতেছ? তুমি স্ত্রীলোক, নতুবা এই দণ্ডে আমার এই অসি তোমার মস্তকে—"

কথা শেষ হইতে পারিল না, বীণানিন্দিত অথচ সুতীব্র কঠোর স্বরে উত্তর আসিল, "রাজা, পরিচয় চাও? আমি শ্রাবস্তিপুরীর বিখ্যাত ধনকুবের সুদত্তের কন্যা সুপ্রিয়া ; তিনি বুদ্ধের চরণে শরণ লইয়াছেন ও অধুনা তাঁহার নাম অনাথপিণ্ড।"

রাজা টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িলেন। এই সেই বুদ্ধের প্রধান শিষ্য অনাথপিণ্ডদের বিদুষী কন্যা সুপ্রিয়া! সহসা সুপ্রিয়া রাজার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন ; বলিলেন, "উঠুন, রাজা, আমি পিতার আদেশে এই রাজ্যে গোপন অরণ্যে আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব। ভয় নাই, রাজা, তুমি তোমার বৈদিক ধর্ম্ম পালন করিও। আমার বিংশতি বর্ষ বয়স হইয়াছে, বেদ শাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। তোমার ধর্ম্মে আমি হস্তক্ষেপ করিব না।"

রাজা তীব্র অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন,—"কুমারি, জান তুমি, আমি কি হেতু শ্রাবস্তিপুরে আগমন করিয়াছি? সেই পদনখ-চুম্বের পূজারিণীকে মগধের রাজা পাণিগ্রহণ করিবে? দেবি! এ বড় অদ্ভুত প্রার্থনা তোমার।"

ধীর শান্ত স্বরে সুপ্রিয়া কহিল, "জানি, রাজা, তুমি রাজা প্রসেন-জিতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া গোপনে এই বনে শিবির সংস্থাপন করিয়াছ। কে বলিল মহারাজ, আমরা পদনখের পূজা করি? তুমি কেন এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছ? আমরা পদনখকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি-তেছি না—তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এবং তাঁর আদর্শ সর্ব্বদা প্রাণে অনুভূতির জন্য এ সব রাখিয়াছি। মহারাজ, প্রভুর ইচ্ছায় এক দিন তোমারও এ ভ্রম অপনোদন হইবে।"

রাজা শুনিয়াছিলেন, অনাথপিণ্ড তাঁহার কন্যাকে নানা বিদ্যায় ভূষিতা করিয়াছেন, সে মৈত্রেয়ীতুল্যা ব্রহ্মবাদিনী। বহু পণ্ডিত তাহার বিচারে পরাস্ত হইয়াছে। বহু দেশের বহু রাজা তাহার পাণি-প্রার্থী হইয়া উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আজ সে ভিক্ষুণী-বেশে কেন তাহার পিতার চিরশত্রু অজাতশত্রুকে আত্মসমর্পণ করিতেছে! ভাবিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন। শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া গেল, তথাপি স্বধর্ম্মে আস্থাবান দৃঢ়চিত্ত রাজা ঘৃণাভরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে নবীন যৌবনে সন্ন্যাসী হইতে পারিব না। আমার ধর্ম্মে বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি। সুপ্রিয়া দেবি! ইহা অতি হাস্যকর যে, তোমাদের বুদ্ধ বলিয়াছেন—জগৎকে ভালবাসিও না, কাহাকেও হিংসা করিও না। যাহা দেখ, সবই ভুল, সব মিথ্যা, সংসার ত্যাগ কর, সকলে বৈরাগ্য গ্রহণ কর।"

হাসিয়া সুপ্রিয়া উত্তর করিল, "মহারাজ, এ বিচারালয় নহে, প্রভুর মন্দির। প্রভু তথাগতের কৃপায় যে দিন তুমি আমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে দিন তোমার সহিত এ বিচারের মীমাংসা হইবে। মহারাজ, রজনী প্রভাত, ঝড় থামিয়া গিয়াছে ; তুমি স্বস্থানে গমন কর"—বলিয়া সুপ্রিয়া পুনঃ বুদ্ধের মূর্ত্তিসমীপে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্না হইলেন।

রাজা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ও গম্ভীর বদনে পথগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুপ্রিয়ার চিন্তা হৃদয় হইতে কিছুতেই মুছিতে পারিতেছেন না। নিকটে বনমধ্যে এক ঘোর অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনী রমণী কাষ্ঠচয়নে প্রবৃত্তা ছিল, রাজাকে দেখিয়া অতি অশ্রাব্য গালি দিল, মহারাজের কর্ণকুহরে তাহা প্রবিষ্ট হইল না।

এ দিকে মহারাজকে না পাইয়া শিবিরে ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। রাজ-সেনাপতির উৎকণ্ঠার সীমা নাই। সেনাগণের মুখে ভীতি-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজার আগমনে সকলে জয়োল্লাস করিয়া উঠিল।

* * * * *

২

মহারাজা অজাতশত্রু বন্দী। কাশিরাজ করের জন্য যুদ্ধ করিয়া বার বার তিন বার জয়লাভ করিয়া চতুর্থ বারে কোশলের রাজা প্রসেন-জিতের নিকট পরাজিত ও বন্দী।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে "রম্য নিকেতনে" অজাতশত্রু সসম্মানে বাস করিতেছেন। প্রসেনজিৎ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, "মহারাজ যদি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত না হয়েন, তবে তাঁহার মুক্তি নাই।" অজাত-শত্রু বলিয়াছেন, "চিরদিন বন্দী থাকিব, তথাপি বুদ্ধের চরণে শরণ লইব না।"

বন্দী রাজা দিবানিশি বৈদিক ধর্ম্মের গ্রন্থ বিচারে প্রবৃত্ত। বন্দী তিনি—ভ্রূক্ষেপ নাই—রাশি রাশি পুস্তক রাজার লেখনী হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

এক দিন বন্দী রাজা শুনিতে পাইলেন, এক ভিক্ষুণী তাঁহার দর্শনপ্রার্থিনী। কোশলরাজ তাঁহার দ্বার ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত করিবার হুকুম দিয়াছেন। রাজা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সেই বনদেবী অনাথপিণ্ডদকন্যা সুপ্রিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মানা। রাজা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি প্রয়োজন?" সুপ্রিয়া বলিল, "রাজা, তুমি এক বিষয়ে অতি অজ্ঞ! আমি তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি, তোমার প্রধান সেনাপতি দেবদত্ত তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং তারই চক্রান্তে সব সেনা বিদ্রোহী ও তুমি বন্দী।"

রাজার দৃপ্ত আনন জ্বলিয়া উঠিল,—"কি বলিলে, সুপ্রিয়া, দেবদত্ত বিদ্রোহী?"

"হাঁ, মহারাজ, দেবদত্ত বিদ্রোহী।"

দন্তে দন্ত পিষ্ট করিয়া, রাজা বলিয়া উঠিলেন, "আমি বন্দী, কি করিব?"

অতি বিনীতভাবে সুপ্রিয়া কহিল, "রাজা, তোমার বন্দিত্ব আমি

মুগ্ধ রাজা কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় নতবদন হইলেন। বলিলেন, "ভিক্ষুণী. কি করিয়া তুমি আমার বন্দিত্ব মোচন করিতে পার ?"

হাসিয়া সুপ্রিয়া নিকটে আগত রক্ষীকে বলিলেন, "যাও, মহারাজ প্রসেনজিৎকে বল, অনাথপিণ্ডদকন্যা সুপ্রিয়া রাজা অজাতশত্রুর বন্দিত্ব-মোচনের ভিক্ষা চাহিতেছে। ভিক্ষুণী ভিক্ষাপাত্র-হস্তে আগতা।"

তৎক্ষণাৎ রক্ষী চলিয়া গেল ; অবিলম্বে রাজা নিজে আসিয়া বন্দীকে সম্মানের সহিত বলিলেন, "তুমি আজ হইতে মুক্ত, সুপ্রিয়া তোমাকে ভিক্ষা চাহিতেছেন, আমার আর ক্ষমতা নাই যে, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারি।"

বিস্ময়ে রাজা নির্ব্বাক্ ! বিশাল লোচন সুপ্রিয়ার বদনে স্থাপিত করিয়া শান্ত স্বরে রাজা বলিলেন, "কোন্ ধনের বলে আজ তুমি এত শক্তিশালিনী, আমাকে সে ধনের সন্ধান বলিয়া দিতে পার ?"

"হাঁ মহারাজ, পারি।"

"তবে চল, সুপ্রিয়া, আজ হ'তে তুমি আমার পত্নী, তুমি আমার ধর্ম্ম।"

রাজা সুপ্রিয়ার হস্ত ধারণ করিলেন। সুপ্রিয়া বলিল, "এই ধনের বলে আমি শক্তিময়ী, রাজা, একবার বল,—

'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি
শ্রমণং শরণম্ গচ্ছামি
সংঘং শরণম্ গচ্ছামি"।

রোমাঞ্চিতদেহে রাজা সুপ্রিয়ার সহিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আকুল স্বরে সেই বাণী উচ্চারণ করিলেন।

রাজা প্রসেনজিৎ বলিলেন, "আজ বন্ধু সুদত্তের বাক্য আমি যথাযথ পালনে সমর্থ হইলাম। সুপ্রিয়া দেবি, তুমি ধন্যা, তোমার পিতা ধন্য।"

দাসী আসিয়া সুপ্রিয়ার অঙ্গে রাণীর সজ্জা পরাইয়া দিয়া গেল।

অদূরে বটবৃক্ষমূলে তথাগত প্রধান শিষ্য অনাথপিণ্ডদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "ধন্য তুমি আদর্শ পিতা! আজ তোমার পুণ্যে মগধরাজ নির্ব্বাণমুক্তির পথ লাভ করিল।"

শ্রীগিরিবালা রায়।

প্রাচীন কবিদের শরৎ

(ঋতুসংহার, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ হইতে)

নবোঢ়া-বধূরূপে শরৎ এলো, সবে
তোল গো হুলুরব বরণে,
কমলে ফুটে মুখ, মরাল-কাকলীতে
নূপুর বাজে তার চরণে।
পক্ক নব আশুধান্য-পীতিমায়
অঙ্গরাগ তার শরীরে,
কুন্দ চল কাশ-কুসুম সিতিমার
বসনে শোভে কিবা মরি রে ;
রজনী সুধাকরে, কুমুদে সরোবর,
কোষ অংশুকে অবলা,
ছাতিমে বনভূমি, মরালে নদী-নদ,
মালতীফুলে লতা,—ধবলা।
ক্রৌঞ্চযূথে রচি কণ্ঠমালা, পরি'
শফরীগুম্ফিত রশনা,
কাপাসে শ্রোণিভার বিশাল পুলিনের
তটিনী করে রূপ-ঘোষণা।
সমীরে চঞ্চল শুভ্র নির্জ্জল
বারিদমণ্ডল ধাবিত,
গগন নভসৎ ধবল উত্তম
চামরে ঢাকি পরিবাসবিৎ।

সকল তনু ভরি' তারকা-ভূষা পরি'
আজিকে বিভাবরী-ললনা,
ক্রমোপচীয়মান নবীন যৌবনে
রাজিছে কিবা শশিবদনা ;
আজিকে মীনকেতু তেয়াগি শিখিগণে
মরালরাজ সহ বিলসে,
তেয়াগি নীপ-শাল কুটজ অর্জ্জুন
সেফালিকুঞ্জে সে নিবসে।
তরুণারুণ করে প্রভাত সরোবরে
হৃষ্ট বধূমুখ ফুল্ল,
কুমুদী ম্লানমুখে মুদিয়া পড়ে দুখে
প্রোষিতভর্তৃকা তুল্য।
হংস-কলনাদে প্রিয়ার ভূষা-রব
শুনিছে পরবাসী একাকী,
বন্ধুজীবে হেরে অধর-শোভা তার,
ইন্দীবরে হেরে সে আঁখি।
পবন কৈরব-কমল-সৌরভে,
পরাগ-গৌরবে,—মন্দ,
সলিল অকলুষ, পঙ্কহীন ধরা,
শঙ্খ বাজে শুভ্র ছন্দ।

কেদার শালিতৃণে, নিপান নব-মীনে
গোষ্ঠভরা পীন ধেনুতে,
সারসে নদীধারা, নবীন তেজে তারা
শোভিছে অলি ফুল-রেণুতে ;
কনক-ফুলদলে শোভিছে ভুজলতা,
মালতীদামে শোভে কবরী,
সুরভিতনু আজি নাগরী চন্দনে,
কুসুমে মৃগমদে, শবরী।
আজিকে বিধুরূপ ধরেছে মনসিজ
কিরণশর হানে তুষিতে,
বিতরে আজি জলধৌত নভঃ কল-
ধৌত অবিরল নিশীথে :
নিপান পল্বলে এমন জল নাই
যথায় ফুটে নাই নলিনী,
এমন শতদল কোথাও ফুটে নাই
যথায় জুটে নাই অলিনী।
এমন অলি আজ কোথাও নাহি, যার
নাহিক গুঞ্জন বদনে,
এমন গুঞ্জন শোনেনি কোন জন
পটু যা নয় মনোমোদনে।
অলির ধ্বনি শুনি হরিণী আনমনা
হংসরবে ব্যাধ উদাসী,
ছিলায় জুড়ি শর ছুড়িতে ভুলে যায়,
শরৎ সকলেরই শুভাশী।
সঘন গিরিবনে সিংহনাদ প্রতি-
নাদিত হয়ে মুহু বিহরে,
কেশরী তারে প্রতিদ্বন্দ্বিনাদ ভাবে,
সরোষে শটা তার শিহরে।
পলাশপাণি নেড়ে, ভ্রমরে আজি হেরে
ভূষিত কুমুদীর পরাগে,
সরোজ অভিমানে সরোষ দিঠি হানে,
তাড়ায়ে দেয় তারে তড়াগে :
মধুপে শোভাময় অরুণ কুবলয়
স্রোতের ঘাতে রয় কাঁপিতে,
শিখায় চঞ্চল সধূম হোমানল
সমান শোভে তারা বাপীতে।
শ্যামল তটছবি অমল জলে রাজে,
ছায়ায় শোভা হৃত বিচারি',
রুষিয়া তটদেশ শাসিছে শোভাচোরে
স্থলেও শতদল বিথারি'।
জলের ফুল-বন স্থলের ফুল-বন
দোঁহার পানে দোঁহে নিরখে,
নিলীনষট্পদ কুসুম আঁখি মেলি ;
শোভায় কেবা জেতে, হারে কে ?

উজল জলাশয় নয়ন ঝলসায়
হিরণ দ্রবময় উৎপলে,
তরুণ অরুণের কিরণ-মালা যেন
গলিয়া রাশীভূত ভূতলে।
পংক্তিশোভা শালি-গুচ্ছ-দলগুলি
দুলিছে তৃণহীন ভূমিতে,
সফল যৌবন পীবর চিক্কণ,
দেখিলে সাধ যায় চুমিতে।
শৈবালাস্তৃত কাসারে ফুটে ফুল,
ফুল্ল মনে হয় কেদারে,
সহসা শফরীর লম্ফে জাগে নীর
বিভাগ করি ভ্রম দ্বিধারে।
ফেনিল সৈকতে স্রোতের রেখা টানি
পাথার চ'লে গেছে খেলিয়া,
আতপে শুকাইছে দু'কূলখানি যেন
তটিনী, দুই কূলে মেলিয়া।
বপ্রকন্দুকে বিষাণ মণ্ডিত
বিচরে মদভরে ষণ্ড,
স্বেচ্ছাহারে পরিপুষ্ট অরিজয়ী
মর্ত্ত্য মদ যেন চণ্ড।
মরাল সৈকতে পুণ্ডরীকে লীন
সফেন সিক্ত তার সকলি,
বণ হেথা হারে, ধরায়ে দেয় তারে
কর্ণে পশি তার কাকলী।
কিবা শ্রীভঙ্গীতে নবনীমন্থন
চলিছে সঙ্গীত সঙ্গে,
গোপাল বনিতার বিপুল শ্রোণিভার
চপল অনিবার রঙ্গে।
পঙ্ক-ঘন ঋজু আজিকে পল্লীর
বরষা-বঙ্কিম বীথিটি,
দু'পাশে কেশশোভা, শকট-নেমি-রেখা
রচিয়া গেছে তায় সীঁথিটি।
পঙ্কহীনা মহী শঙ্খরুচি দেহে
অঙ্কে ধরে শ্যাম ঋদ্ধি,
বর্ষভরা শ্রম সফল করি' করে
হর্ষকল্যাণ বৃদ্ধি।
আজিকে ব্যোমে নাই বলাকাহার-শোভা
জলদ-জলধনু-লীলা সে,
তবু তা' মনোরম, স্বভাব-সুচারুর
কি হবে কৃত্রিম বিলাসে ?
শ্রাবণপ্রিয়া দিগ্‌বধূর পয়োধরে
দামিনী-হার নাহি বিরাজে,
পাণ্ডু কৃশা তবু অঙ্গ ভরি' তার
বিরহজাত নব শ্রী রাজে।

মরালরব ত্যজি কে শোনে কেকা আজি ?
শিখীরা রয় খেদে নীরবে,
কালের গুণ এই, গুণেরই জয় জয়,
শুধুই পরিচয়ে কি হবে ?
সময়ই বলাবল করে সুনিয়মিত,
নীরব তাই আজ দাদুরী,
নতুবা কেকা কেন আজিকে হেয় হেন
সারস-রবে কেন মাধুরী ?
সহে না অরিভব দারুণ পরিভব
শিখীর শিখা লাজে গলিত,
নদীর তটশির হারায়ে স্রোতোনীর
লজ্জা-ক্ষোভে কাশ-পলিত।
ক্ষেত্রে শোভে হেমবরণা শালিলতা
ইন্দীবর ফুটে নালীতে,
তাহার সৌরভ লাভের লোভে শালি
নমিয়া পড়ে যেন আলিতে
গাভীরা ছুটে আসে আভীর-পুরী পানে
ভিজায়ে মাটী দুগ্ধধারে,
বহিয়া উপায়ন আপীনভরা ক্ষীরে
বৎসগণ লাগি সাদরে।
মৃণালে কোকনদে পঙ্ক শালিতৃণে
জলের শোভা নানা বরণে,
ইক্ষুশরাসন খণ্ড যেন গলি
উজলে ইন্দিরা-চরণে
বৎসতনু আজি লেহন করে ধেনু
পুলক রোমে রোমে উথলে,
যজ্ঞাহুতি, ঋক্‌মন্ত্র সহ যেন
মিলিত বিশ্বের কুশলে।
চপলাভয় নাই, শুভ্র নীরদের
ছত্রছায়াতলে-গগনে,
পাখীরা ছুটে আজি সুরভি সুশীতল
শীকরময় বায়ু সেবনে।
কৃষক-বধূ আজি পাহারা দেয় ক্ষেতে
মধুর গীতি শুধু গাহিয়া,
শস্যলোভ ভুলি মুগ্ধ মৃগগুলি
আয়ত চোখে রয় চাহিয়া।
গগনে উড্ডীন অরুণ নখমুখ
আজিকে পুন শুক-সারিকা,
হরিৎ পল্লবে লোহিত ফুলদলে
গ্রথিত যেন বন-মালিকা।

কপোত-পাঁতি রাঙা চঞ্চুপুটে, পীত
ধান্য মঞ্জরী ভরিয়া,
উড়িয়া যায় নভে ইন্দ্রায়ুধে কিবা
সুনীল দিক্‌সীমা ভরিয়া।
ইন্দ্রবাণ, 'বাণকুসুমে' আছে ফুটে
শোণিত ঝরে, আছে জবাতে,
ঐরাবত গেছে তেয়াগি কঞ্চুক
জলে তা উষারুণ-প্রভাতে।
কুসুমবাস-বারিশীকররেণুহারী
সমীর যাবে কত ছুটিয়া,
ভারে সে টলে পড়ে ধরা সে পড়ে ত্বরা
পথরা লয় সবে লুটিয়া।
বারিদময় নভঃ পলায়ে রবি আজ
আভা করে হ্রদ-সরিতে,
ভরিল ধন যার ভাণ্ডার গুণ তার
দেয় সে ভাণ্ডার ভরিতে।
সপ্তপর্ণজ গন্ধ লভি গজ,
'মত্ত অরি গজ অদূরে',
ভাবি' সে মদ টলে গণ্ড কটে ভালে
শুণ্ডে আ ঘুরিয়া বধূরে।
মাতাল হয়ে মদগন্ধে সমীরণ
মাতায় মধুকর-নিকরে,
বারণগণ পানে যাবে—কি যাবে বনে—
তাহারা দোটানায় কি করে ?
কুম্ভযোনি ব্যোমে উদিয়া যে কলুষ
ঘুচায় আজি নদীকাসারে,
তা আজি বিদ্রোহি-হৃদয়ে পশি ধীরে
মলিন করে তার আশারে।
সুপ্রভরা নদী, পঙ্কহীন পথ
সূর্য্য উজ্জ্বল আকাশে,
বিজয়যাত্রার সময় এলো, বাজে
তূর্য্য সুরভিত বাতাসে।
ত্যজিল শরাসন ইন্দ্র, তুলি নিল
বিজয়-শরাসন নৃপতি,
পুণ্যনীরাজনা বিধানে ভাস্বরা
আয়ুধমালা আজি শ্রীমতী।
ধবল কৈরব ছত্র এক হাতে
অন্য হাতে কাশবাজনী,
বিদায় দিতে ধীরে জ্যোৎস্না-দধিঘট
ধরেছে শিরে আজ রজনী।

শ্রীকালিদাস রায়



রেডিও টেলিফোনি

২

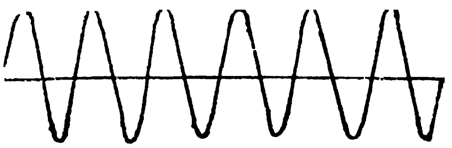
সতার ও বেতার বার্ত্তা প্রেরণ-প্রণালীর প্রধান পার্থক্য তরঙ্গবাহকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। প্রথম ব্যাপারে তাড়িত স্রোতের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারে তাড়িত স্রোতের শব্দতরঙ্গ বাহনের কার্য্য তাড়িত তরঙ্গ সাধন করে। সতার বার্ত্তা প্রেরণ-প্রণালীতে দেখা যায় যে, শব্দশক্তি (sound energy) তাড়িত-পরিচালক তারের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে এবং দুইটি দূরবর্ত্তী স্থান পরিচালক তারের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া তাড়িত চক্র সম্পূর্ণ করিলে তখন বার্ত্তা এক মাইল বা এক শত মাইল প্রেরণ করা সমান সহজ কায। বেতার বার্ত্তা প্রেরণ-প্রণালীতে শব্দতরঙ্গ বহনকারী তাড়িত তরঙ্গ বহুদূর বিস্তৃত হইয়া যায়; এবং বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রের শক্তি অনুসারে অসংখ্য স্থলে তাহাকে ধরিয়া কার্য্যে লাগান যায়।

ইহার বহু বিস্তৃতির জন্য বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্র দ্বারা যথেষ্ট শক্তি (energy) নিম্মুক্ত হওয়া উচিত; আর এই জন্য দ্রুত কম্পনযুক্ত দোদুল্যমান তাড়িত প্রবাহ (High frequency oscillatory current) সৃষ্টিকারী যন্ত্রের দরকার।

এইরূপ তাড়িত চক্রের দুইটি প্রধান ধর্ম্ম থাকা চাই;—তাড়িত ধারণশক্তি (capacity) ও Inductance। পূর্ব্ববর্ণিত "কনডেনসার" দোদুল্যমান তাড়িত প্রবাহ সৃষ্টি-কালে প্রয়োজনীয় হওয়াতে বেতার বার্ত্তা প্রেরণ কার্য্যে ইহা অত্যাবশ্যক। যদি কোন condenserএ তাড়িতের তাহাকে Inductive তাড়িত চক্রের ... ভিতর দিয়া তাহার তাড়িত ভার মুক্ত করিতে দেওয়া হয়, তবে তাহার ফলে দোদুল্যমান তাড়িত প্রবাহ সৃষ্ট হয়। ইহার ক্রিয়া অনেকটা এইরূপ :—যখনই কোন Inductive চক্র 'কনডেনসরের' দুই প্লেটে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তখনই গমনাগমনের পথ পাইয়া, যে প্লেটে তাড়িতের আধিক্য আছে, তথা হইতে তাড়িত অন্য প্লেটে ছুটিয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা তাড়িত প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জড়ত্ব (Inertia) গুণবশতঃ দ্বিতীয় প্লেটে পুনরায় তাড়িতের আধিক্য হয় এবং তথা হইতে তাড়িত আবার প্রথম প্লেটে ধাবিত হয় ও এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ গতি কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। কোন বড় ঘড়ীর বা অন্য কোন দোলকের (pendulum) গতি নিরীক্ষণ করিলেও এ সম্বন্ধে ধারণা কতকটা সহজ হইবে। দোলকটি যখন লম্বমানভাবে স্থির থাকে, তখন তাহাকে এক পার্শ্বে কিছু দূর সরাইয়া ছাড়িয়া দিলে ইহা পুনরায় ইহার স্বস্থানে আসিয়া থামে না, ইহা সেই স্থান ছাড়াইয়া অন্য দিকে ধাবিত হয় এবং এই কার্য্য কিছুক্ষণ চলিয়া পরে থামিয়া যায়।

অনেকে স্প্রীঙের দরজা দেখিয়া থাকিবেন। যখন আমরা ঐরূপ একটি দরজা এক ধারে টানিয়া ধরিয়া থাকি, তখন সেখানে শক্তি (energy) সঞ্চিত করিয়া রাখি এবং পরে ঐ দরজা ঐ স্থান হইতে ছাড়িয়া দিলে উহা পূর্ব্বস্থান ছাড়াইয়া অপর দিকে আরও কিছু দূর যাইবে এবং পুনরায় উল্টা দিকেও পূর্ব্বস্থান ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর যাইবে। ২।৪ বার এইরূপ করিবার পর উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবে। যদি ঐ দরজার নিম্নসংলগ্ন রং-মাখান একটি তুলি তথায় রক্ষিত একখানি কাগজকে স্পর্শ করিয়া

থাকে, উহা আন্দোলিত হইবার সময় সেই দিকে কাগজটিকে ধীরে টানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ দরজার



৯ নং চিত্র

আন্দোলনের প্রতিকৃতি ৯নং ছবির মত কাগজের উপর অঙ্কিত হইয়া যাইবে। এই আন্দোলন দোদুল্যমান তাড়িতের আন্দোলনের অনুরূপ। রেডিও বার্ত্তা প্রেরণ ও বার্ত্তা গ্রহণ যন্ত্রের যে 'কনডেনসর' ও Inductance আছে, তাহার কার্য্য ঐ দরজার আন্দোলন হইতে অনেকটা ধারণা করা যাইবে। দরজাটি যখন এক পার্শ্বে ধরিয়া রাখিয়া সেখানে কতক শক্তি সঞ্চিত করা condenserএ তাড়িত শক্তি সঞ্চিত করার অনুরূপ; এবং ঐ দরজাকে ছাড়িয়া দেওয়া condenserএর সঞ্চিত তাড়িত শক্তি বাহির করিয়া লওয়ার মত। তাহার পর জড়ত্বের (Inertia) দরুণ দরজার পূর্ব্বস্থান ছাড়াইয়া ইতস্ততঃ আন্দোলিত হওয়া তাড়িত চক্রস্থিত Inductanceএর অনুরূপ—যাহার জন্য তাড়িত স্রোত এ-দিক ও-দিক প্রবাহিত হইয়া দোদুল্যমান তাড়িত (oscillatary current) সৃষ্টি করে।

প্রত্যেক দোলকের স্বাভাবিক কম্পনসংখ্যা (natural frequency) আছে, এবং উহা তাহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। ইহা দেখা যাইবে যে, যদি কোন দোলককে এইরূপ ভাবে ঠিক সময়মত অল্প অল্প ধাক্কা দেওয়া যায়, যাহা ঐ দোলকের স্বাভাবিক কম্পনসংখ্যার অনুরূপ হয়, তবে ইহা খুব বিস্তৃতভাবে দুলিতে থাকিবে। অথবা মনে করুন, আপনারা কোন নদীবক্ষে একখান নৌকায় বসিয়া আছেন, এবং ঐ নৌকা নদীতরঙ্গে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে। যদি এখন আপনারা ঐ নৌকাকে এরূপ ভাবে দোলাইতে থাকেন যে, ঐ দোলনের গতি ঐ নৌকার নিজ দোলনের গতির সমান হয়, তবে উহা এরূপ ভীষণরূপে আন্দোলিত হইবে যে, তখন উহার উপর বসিয়া থাকা বিপজ্জনক হইবে।

হয় ও পরে কোন Inductive চক্রের ভিতর দিয়া ইহাকে তাড়িতমুক্ত করা হয়, তবে ঐ দোলকের বা নৌকার স্বাভাবিক কম্পন-গতির অনুরূপ নির্দ্দিষ্ট কম্পনগতিযুক্ত দোদুল্যমান তাড়িতের সৃষ্টি হইবে। এখন যদি ঐ দোলককে বা নৌকাকে ধাক্কা দেওয়ার মত ঠিক সময়মত ঐ 'কনডেনসরে' বিশেষ যন্ত্র দ্বারা ধাক্কা (impulse) দেওয়া হয়, তবে ইহা দ্বারা খুব বেশী ফল পাওয়া যায়, আর বেতার বার্ত্তা প্রেরণ-ব্যাপারে ইহারই ব্যবস্থা থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একটি তাড়িত চক্র দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিতর অপর একটি চক্র ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে বা প্রথমটিতে তাড়িত প্রবাহ-গতি কম-বেশী করিলে দ্বিতীয়টিতে তাড়িত প্রবাহিত হইবে। সেইরূপ যদি পরস্পর Inductance আছে, এরূপ দুইটি দোদুল্যমান তাড়িত চক্র থাকে এবং তাহাদের একটিতে দোদুল্যমান তাড়িত প্রবাহিত হয়, তবে অপরটিতেও সেইরূপ তাড়িত প্রবাহিত হইবে; আর ঐ দুইটি চক্রের স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা সমান হইলে পূর্ব্বোক্ত দোলকের বা নৌকার দোলনের ন্যায় এখানেও বেশী ফল পাওয়া যাইবে।

কোন চক্রের Inductanceও তাড়িত-ধারণ-ক্ষমতা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার স্বাভাবিক কম্পনসংখ্যা পরিবর্ত্তন করা যায় এবং দুইটি চক্রের কম্পনসংখ্যা যাহাতে এক হয়, এইরূপে নিয়মিত করায় তাহাদিগকে একই সুরে বাঁধা (Tuning) বলে। বেতার বার্ত্তা-প্রেরণ কার্য্যে ইহা খুব দরকারী।

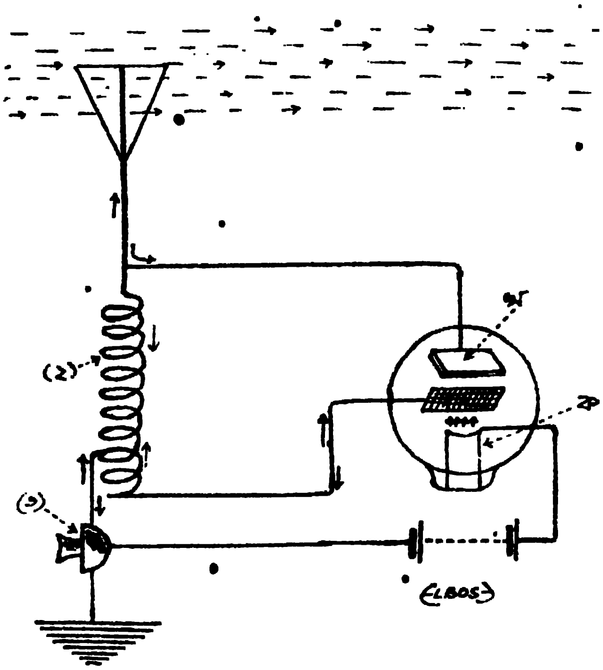
এখন রেডিও টেলিফোনিতে ব্যবহৃত বার্ত্তা-প্রেরণ যন্ত্র ও বার্ত্তাগ্রহণ যন্ত্রের বিবরণ খুব মোটামুটিভাবে বর্ণিত হইবে।

বার্ত্তা-প্রেরণ যন্ত্রে নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকিবে (১০নং চিত্র)

(১) একটি বায়ুস্থ তার (aerial) যাহাতে দোদুল্যমান তাড়িত প্রবাহিত হয়।

(২) বায়ুস্থ চক্রে দোদুল্যমান তাড়িত সৃষ্টি ও রক্ষা করিবার যন্ত্র ও ঐ চক্রের কম্পনসংখ্যা নিয়মিত করার জন্য Inductance.

(৩) উল্লিখিত ভাবে সৃষ্ট তাড়িত কম্পনের বিস্তা



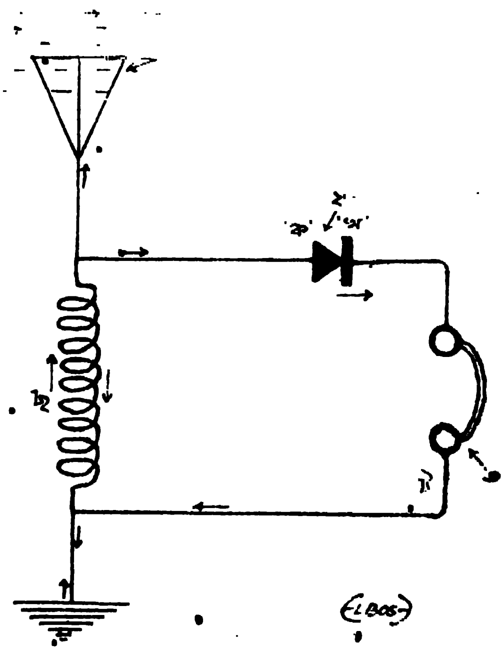
১০ নং চিত্র

(১) পৃথিবীর মধ্য দিয়া তাড়িত পরিচালিত হয়, সে জন্য বায়ুস্থ তার ও পৃথিবী 'কন্‌ডেনসরের' দুইটি প্লেটের কার্য্য করে। এই দুইটি প্লেটের সহিত দোদুল্যমান তাড়িত সৃষ্টির জন্য Inductance সংলগ্ন করা হয় এবং এইরূপে বায়ুস্থ তার হইতে তাড়িত-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

(২) এই কার্য্যের জন্য প্রায় সকল বেতার-বার্ত্তা-প্রেরণ যন্ত্রে "ভ্যাল্‌ভ" (Valve) নামে একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা কাচনির্ম্মিত একটি গোলক। ইহার দুই স্থানে তাড়িত গমনাগমনের পথ আছে। তন্মধ্যে একটি 'ক' অঙ্গার (carbon) বা কোন উপযোগী ধাতু দ্বারা প্রস্তুত, যেমন সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পে আছে। অপরটি 'খ', উহাকে প্লেট বলে। তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ বাধা না দিতে পারে, এজন্য গোলকের ভিতর হইতে সব বায়ু বহিষ্কৃত করা হয়। 'ক'-এর ভিতর দিয়া তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে উহার গাত্রস্থিত ইলেক্‌ট্রনগুলি শিথিল হইয়া যায়, এবং 'খ'-এ যদি পূর্ব্বেই ধনাত্মক তাড়িত থাকে, তবে তাহা 'খ'-এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়; কারণ, সম-তাড়িতপূর্ণ দুইটি বস্তু পরস্পরকে প্রতিক্ষেপ করে ও বিপরীত তাড়িতপূর্ণ দুইটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এইরূপ 'ক' হইতে 'খ'-এ তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়। যদি 'খ'-এ ধনাত্মক তাড়িত না থাকিয়া ঋণাত্মক তাড়িত থাকে, তাহা হইলে 'ক' হইতে ইলেকট্রনগুলি আকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং কোন তাড়িতস্রোতও প্রবাহিত হইবে না। এই জন্য 'ভ্যালভ'-এর ভিতর তাড়িতস্রোত কেবল একই দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। ঠিক নিয়মিত সময়ে তাড়িতস্রোত বন্ধ করার জন্য ইহার ভিতর আর এক উপায় আছে। 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে তারের জালের দ্বারা প্রস্তুত আর একটি তাড়িত গমনাগমনের পথ আছে। যতক্ষণ এই জালে ঋণাত্মক তাড়িত না থাকে, ততক্ষণ তাড়িতস্রোত 'ক' হইতে 'খ'-এ প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু উহাতে ঋণাত্মক তাড়িত থাকিলে উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন প্রতিহত হইয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইয়া যায়। এই উপায় দ্বারা বায়ুস্থ তারে প্রবাহিত তাড়িতস্রোতকে ক্রমাগত নিয়মিতভাবে ঠিক সময়মত ধাক্কা (impulse) দেওয়া হয়।

(৪) এই যন্ত্রের নাম 'মাইক্রোফন'। ইহার কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

এবার নিম্নে বেতার-বার্ত্তা-শ্রবণ-যন্ত্রের (১১ নং চিত্র) প্রয়োজনীয় অংশগুলির বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।



১১ নং চিত্র

(১) বার্ত্তাগ্রহণ জন্য বায়ুস্থ তার।

(২) সংশোধক যন্ত্র (Rectifier)

(৩) বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্র (Telephone receiver)

(১) ইহা পূর্ব্ববর্ণিত বায়ুস্থ তারের ন্যায়। ইহার সহিত একটি Induction কুণ্ডলী সংলগ্ন থাকে, যাহা দ্বারা সমস্ত চক্রের স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যাকে তথা হইতে আগত তাড়িত-তরঙ্গের কম্পনসংখ্যার অনুরূপ করা হয়।

(২) সংশোধক-যন্ত্র—দোদুল্যমান তাড়িতস্রোত একবার অগ্রে, পরে পশ্চাতে, পুনরায় অগ্রে, আবার পশ্চাতে এইরূপে প্রবাহিত হয়; কিন্তু এইরূপ প্রবাহ দ্বারা বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্র কার্য্যকর হয় না।

বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্র কার্য্যে লাগাইতে গেলে ইহার ভিতর তাড়িতস্রোত একই দিকে প্রবাহিত হওয়া চাই। সুতরাং বেতারবার্ত্তা-গ্রহণ-যন্ত্রে প্রবাহিত দোদুল্যমান তাড়িতস্রোতকে কোন উপায়ে একই দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে। যদি কোন বস্তুর ভিতর এক দিক দিয়া অপর দিক অপেক্ষা সহজে তাড়িত প্রবাহিত হয়, তবে সেইরূপ বস্তু দ্বারা উল্লিখিত কার্য্য হইতে পারে। Carborandum, galenos ইত্যাদি কোন কোন ক্রিষ্টালের এইরূপ ধর্ম্ম আছে। এই চিত্র হইতে ইহার কার্য্য কতকটা বুঝা যাইবে। ইহা একটি carborandum ক্রিষ্টাল—ইহার মধ্যে তাড়িতস্রোত 'ক' 'খ'-এর দিকে প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু 'খ' 'ক'-এর দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। চিত্রে দেখা যাইবে যে, যখন তাড়িতস্রোত চ ছ জ-এর দিকে প্রবাহিত হইবে, ইহার এক অংশ ক্রিষ্টালের ও বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে যাইবে, কিন্তু পরে যখন তাড়িতস্রোত জ ছ চ অর্থাৎ উল্টা দিকে প্রবাহিত হইবে, তখন ক্রিষ্টালের জন্য বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্রের ভিতর, তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হইতে পারিবে না এবং ফলে উহার ভিতর তাড়িতস্রোত কেবল একই দিকে অর্থাৎ 'ক' 'খ' 'ট'-এর দিকে প্রবাহিত হইবে।

এখন এই সমস্ত ব্যাপারের কার্য্যাবলীর বিষয় সাধারণ ভাবে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

প্রথমে বার্ত্তাপ্রেরণ যন্ত্র দ্বারা তাড়িত-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং উহা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় ও 'ইথার' দ্বারা দূরে বাহিত হয়। এই তরঙ্গসকল বার্ত্তাগ্রহণ-যন্ত্রের বায়ুস্থ তার স্পর্শ করিলে সেখানে দোদুল্যমান তাড়িতস্রোত সৃষ্টি করে এবং ঐ স্রোত পরে সংশোধক ক্রিষ্টাল দ্বারা বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া একই দিকে প্রবাহিত হয়। যখন আমরা শব্দপ্রেরণ-যন্ত্রের 'মাইক্রোফোনের' সম্মুখে কোন শব্দ করি, তখন ঐ শব্দতরঙ্গ বায়ুস্থ তারে প্রবাহিত দোদুল্যমান তাড়িতস্রোতকে সমভাবে পরিবর্ত্তিত করায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত তাড়িত-তরঙ্গ সমূহ তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। (১২নং চিত্র) এই সংশোধিত তরঙ্গসকল বার্ত্তাগ্রহণ-যন্ত্রে পৌঁছিয়া সেখানকার বায়ুস্থ তারে প্রবাহিত তাড়িত-স্রোতকে একই ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্রের (Receiving system) ভিতরের তাড়িত-স্রোতকে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত করে, যাহার ফলে সেখানকার পাতলা পর্দ্দাটি এমন ভাবে কম্পিত হয় যে, একই শব্দ উৎপন্ন করে।

সকলেই মনে রাখিবেন যে, বেতারবার্ত্তা-প্রেরণ কার্য্যের মূল তথ্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা হইয়াছে মাত্র। আসল কার্য্য—ইহা অপেক্ষা অনেক জটিল এবং তাহাতে অনেক জটিল ও দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার হইয়া থাকে।



দুইটি দূরবর্ত্তী স্থানের ভিতর সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা ছাড়িয়া দিলেও ইহা দ্বারা দুইটি ব্যোমযানের মধ্যে বা ব্যোমযান ও পৃথিবীর উপর কোন স্থানের মধ্যেও সংবাদ আদান-প্রদান করা অনায়াসে চলিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধে ইহাতে প্রভূত উপকার হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যবসায়েরও ইহাতে খুব উপকার হইয়াছে। লণ্ডন ও প্যারী-নগরীতে যে সমস্ত ব্যোমযান প্রত্যহ যাতায়াত করে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতে বেতার-যন্ত্র আছে। অনেক সময় বেতার বার্ত্তা বায়ুমণ্ডলে বহু দূর নীত হয়; মেঘ বা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইলে ব্যোমযানগুলি প্রকৃত স্থান ও দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নের কোন বেতার-বার্ত্তা-প্রেরণ-স্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করে।

অনেক মোটর গাড়ীতে ও রেলওয়ে ট্রেণেও বেতার যন্ত্রের বন্দোবস্ত হইতেছে। চলন্ত মোটর গাড়ীতে যাইতে যাইতে সহর হইতে রেডিও-যন্ত্র-বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতে করিতে যাওয়া যায়। সম্প্রতি কলিকাতায় এই কার্য্যের জন্য একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় তথা হইতে ইংরাজী, হিন্দী, বাঙ্গালা সঙ্গীতাদি চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইয়া থাকে। যাহাদের গৃহে বার্ত্তাশ্রবণ-যন্ত্র (Receiving apparatus) আছে, তাঁহারা উহা সহজেই শুনিতে পারেন।

আমোদ-প্রমোদের কথা ছাড়িয়া দিলেও রেডিও টেলিফোন দ্বারা শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে এবং এক স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক হইতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা জগতের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সমূহের বিষয়-জ্ঞান আহরণ করার খুবই সুযোগ উপস্থিত হইবে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী।



প্রিন্স সুমি-নো-মিয়িয়া। অন্য নাম টাকাহিটো। ইনি জাপান সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার বয়স একাদশ বৎসর। গুরুর নিকট ইনি ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় ইঁহার অসীম অনুরাগ। গুরু—মিঃ মি কাটোহি জাপানের শ্রেষ্ঠ ধানুকী।

প্রাচীন হিন্দু নীতি

আমাদের নীতিশাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্রের অন্তর্গত। 'শুক্র-নীতি' প্রথমেই বলিয়াছে—নীতিচর্চ্চা করার প্রয়োজন মুক্তিলাভ করা। মহাভারতেও রাজনীতির আলোচনা আছে। শান্তি (?) পর্ব্বকে মোক্ষপর্ব্বের একটা অধ্যায় বলিয়া সেখানে বর্ণনা করিয়াছে। রাজনীতি দ্বারা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করা হয়, শাসন করা হয়, দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইলে মানুষকে আপনার প্রবৃত্তি সংযত করিয়া চলিতে হয়।

নীতি শব্দ নি ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নি ধাতু দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়,—(১) চালিয়ে দেওয়া, (২) পাইয়ে দেওয়া। তাহাই নীতি—যাহার দ্বারা লোককে চালাইয়া দেওয়া হয় এবং কিছু প্রাপ্ত করাইয়া দেওয়া হয়। চালাইয়া দেওয়া হয় আচার আচরণ সম্বন্ধে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আর প্রাপ্ত করাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে মোক্ষ। এই জন্য আমাদের প্রাচীনরা নীতিশাস্ত্রকে মোক্ষধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই শাস্ত্রের প্রয়োজন —জীবের মোক্ষলাভ। আমাদের শাস্ত্র ও সাধনার সনাতন বিধানের উপর রাজধর্ম্ম বা রাষ্ট্রধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। মানুষ তাহা করে নাই। কল্পনা বলুন, আরোপ বলুন আর যাহাই বলুন, আমাদের প্রাচীনরা ইহা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে রাজধর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম বলিলেন, আদিতে রাজাও ছিল না, দণ্ডও ছিল না। প্রজারা নিজে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলিত, আপনার প্রকৃতির প্রেরণায় তাহা করিত; সুতরাং দণ্ডের প্রয়োজন ছিল না, এবং দণ্ড ধারণ বা ব্যবহার করিবার কোন ব্যক্তিরও প্রয়োজন ছিল না; কাযেই রাজারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে অরাজকতা উপস্থিত হইল। কতকগুলি মানুষ যখন অলস হইয়া পড়িল, আপন আপন ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পালনে যখন পরাঙ্মুখ হইল, তখন অপর কতকগুলি লোক সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহারা প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের কর্ত্তব্যভার আপন মস্তকে গ্রহণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বত্ব ও শক্তি হরণ করিয়া লইল। এই ভাবে তাহারা অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তাহাতে সমাজ প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। পৃথিবী সেই পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কতকগুলি বিধি-বিধান বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন এবং তাহা চালাইবার জন্য আপন মানস পুত্র সৃষ্টি করিলেন,—যিনি প্রথম রাজা হইলেন।

গল্পাংশ ছাড়িয়া দিলে ভিতরকার সারটুকু এই থাকে—রাজাই হউক আর প্রজাই হউক, একটা সাধারণ বিধানের অন্তর্গত হইয়া উভয়কে চলিতে হইবে। বহু দিন হইতে য়ুরোপে যে রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ঐ ভাবে নহে; য়ুরোপ ছাড়া এসিয়ার সেমিটিক জাতীয় লোকের মধ্যে যেমন হিব্রু, আরব প্রভৃতি দেশে—রাজার ইচ্ছাই প্রজার আইন, রাজা এবং প্রজা উভয়ের অতীত কোন শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান বা রাজতন্ত্র সে সকল দেশে নাই। রাজা যাহা খুসী, তাহাই করিতে পারেন। আমাদের দেশে যে রাজতন্ত্র রাজবিধান বা ধর্ম্ম-বিধান আছে, রাজা এবং প্রজা উভয়কে সেই বিধানের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়। রাজা সেই বিধান চালাইয়া দেন এবং সেই অনুসারে দণ্ড বা পুরস্কার দান করেন; তিনি একজিকিউটিভ অফিসার, কিন্তু তিনি আইন রচনা করেন নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের নীতিতে লেজিসলেটিভ ও একজিকিউটিভ ফাংসান পৃথক হইয়া গিয়াছে, বাস্তবিক ইহাকেই ইংরাজীতে বলে কনষ্টিটিউশানাল গভর্ণমেণ্ট, এখানে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা নাই, তিনি আইনে বদ্ধ হইয়া রাজ্য শাসন করেন।

৩০।৩৫ বৎসর আগে প্রাচীন নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধে আমাদের দেশের লোক বিশেষ কিছু জানিত না। ২৫ বৎসর আগে শুক্রনীতি প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বেশী লোক তাহা পড়ে নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কাহারও জানা ছিল না বলিলেই হয়, কামন্দক নীতি অতিবিরল ছিল, পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা পাঠ করিয়া ছিলেন বটে; কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত

ডিওসফিক্যাল হলে ৩১ শে আগষ্ট তারিখের বক্তৃতা।

ছিল, সুতরাং তখন আমরা মনে করিতাম, আধুনিক যে রাষ্ট্র-নীতিতে য়ুরোপ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা আমাদের দেশে জানা ছিল না। বহু প্রাচীনকাল হইতে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী বিস্তৃতরূপে এ দেশে প্রচলিত ছিল, ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারিতাম না। আমরা মনে করিতাম, রাজতন্ত্র শাসনই আমাদের দেশের মামুলী শাসন প্রণালী। আমার মনে পড়ে, আমি যখন জেলে, তখন এক জন রাজকর্ম্মচারী আমাকে দেখিতে আসেন এবং কথায় কথায় বলেন, রাজভক্তি এ দেশের ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। কেন না, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মনুষ্যদের মধ্যে আমি নরাধিপ, অর্থাৎ রাজা এবং ঈশ্বর এক। তখন আমি তাহার কোন উত্তর দিই নাই। মনুষ্যদের মধ্যে নরাধিপ—ইহা পরের কথা। আগে নরাধিপ বলিয়া কেহ ছিল না। বেদে দুইটি কথা পাই; (১) সমিতি, (২) সভা। বেদে একটি মন্ত্র প্রায়ই উচ্চারিত হয়, তাহার অর্থ এই—তোমাদের মন্ত্র সমান হউক, তোমাদের বুদ্ধি সমান হউক, তোমাদের মন্ত্রণা সমান হউক। এখানে সমান মন্ত্র হউক—মানে সমিতি দ্বারা নির্দ্ধারিত মন্ত্র বা পলিসি সমান হউক, মন্ত্র অর্থ এখানে বেদের মন্ত্র নহে। পলিসি, তোমাদের পলিসি এক হউক। যশওয়ালের এনসেণ্ট হিন্দু পলিটি নামক বহিখানা পড়িলে এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারে।

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী।"

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯১ সূক্তে একটি প্রার্থনা আছে, তাহার অর্থ এই—"আমাদের সমিতি সমান হউক, এক সমিতির অন্তর্ভুক্ত আমরা সকলে থাকি, আমাদের মন্ত্র সমান হউক, আমাদের উদ্দেশ্য সমান হউক, আমাদের চিন্তা সমান হউক।" এখানে আমরা সমিতি শব্দটি পাই। এখনকার ভাষায় সমিতি মানে পার্লামেণ্ট, এই সমিতির উপর তখন রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার, এবং রাজ্যশাসনভার অর্পিত হইত, সমিতিতে রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু সভাপতির মত ছিলেন, সমিতির উপর তাঁহার কোন অধিকার ছিল না। তিনি সমিতির কার্য্যপরিচালনে সাহায্য করিতেন। আমাদের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যেমন কাউন্সিলে কোন এটা ঠিক হইয়াছে, ওটা ঠিক হয় নাই, শুধু বক্তৃতা পরিচালিত করিয়া যান, নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার নাই; উভয় পক্ষে যদিও কোন বিষয়ে সমান ভোট হয়, এদিকে ৫০, ওদিকে ৫০, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজের ভোটের দ্বারা এক দিকে ৫১ করিয়া সেই দলকে জয়যুক্ত করিতে পারেন, ইহা ছাড়া যেমন তাঁহাদের আর কোন অধিকার নাই; অথবা পার্লামেণ্টে যেমন 'স্পীকার' আছেন, তিনি যেমন কোন বক্তৃতা দিতে পারেন না, ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা রাজাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সমিতিতে ছিল। ঋগ্বেদে আছে,—

রাজা নঃ সত্যঃ সমিতীরিয়ান

সমিতিতে রাজা গিয়াছেন, তিনি সত্য রাজা অর্থাৎ রাজার কর্ত্তব্য সমিতিতে উপস্থিত থাকা। এই সকল সমিতিতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত, আমাদের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল বা এসেমব্লীতে যেমন নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়, আলোচনা হয়, বিচার হয়, এই সকল সমিতিতে তাহাই হইত। অথর্ববেদে একটা প্রার্থনা আছে—

"হে ইন্দ্র, আমাদের বিরুদ্ধে যাহারা ডিবেট করিবে, তাহাদের ডিবেট তুমি পরাভব কর, তাহাদের আলোচনায় যেন কোন শক্তি না থাকে। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রতিপক্ষের বাক্‌শক্তি বা বিচারশক্তি নষ্ট করিয়া দাও, তোমার শক্তি দ্বারা আমাদিগকে প্রোৎসাহিত কর, এই বিচারে আমাদিগকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া তোল।" তখনকার দিনে যদি স্বরাজ পার্টি অথবা লিবারেল, নেশনেলিষ্ট বা রেসপন্‌সিভ কো-অপারেশন পার্টি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিবার জন্য এ ভাবে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিত। অতি প্রাচীনকালে বেদের সময় রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা ঐ ভাবে ছিল। সমিতি ছিল, তাহাতে রাজ্যের সমুদয় কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারিত হইত। সেই সমিতির অনেক সভ্য ছিল, কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যই যে সেই সকল সমিতির সভ্য ছিলেন, তাহা নহে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলেই—শূদ্ররা পর্য্যন্ত সেই সমিতির সভ্য হইতেন এবং সকলের সম্মিলিত পরামর্শ দ্বারা রাজকার্য্য সাধিত হইত।

আমরা আজকাল মনে করি, কংগ্রেস, সমিতি ইত্যাদি

এই সকল পারিভাষিক শব্দ যে বেদে আছে, এখনকার অপেক্ষাও ব্যাপক অর্থে আছে, আমরা তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। সমিতি শব্দের ন্যায় সভা শব্দেরও বেদে উল্লেখ আছে, কিন্তু দুইটিতে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র বা রাজ্যের সকলেই সমিতির আসন গ্রহণ করিতে পারিত, সভাতে সকলে তাহা পারিত না। সভা সম্পর্কে বেদে ভাসন্ত শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যাঁহারা উজ্জ্বল, তাঁহারা যেখানে আসিয়া বসেন, তাহাই সভা। সুতরাং সভা সংকীর্ণতর ছিল: সমিতি হইতে বাছাই করা সভ্যরা সভায় গিয়া বসিতেন। সেখানে সকল রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। আমরা যেমন দশ জনে নোটিস দিয়া সমিতি গঠন করিয়া থাকি, আগে তাহা ছিল না। প্রাচীনরা বলিতেন, সমিতি নিত্য। প্রজাপতির দুইটি দুহিতা;—(১) সমিতি, (২) সভা। প্রজাকে পালন করিবার জন্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের রক্ষা ও ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তনের জন্য এই দুই যন্ত্র ছিল—সমিতি ও সভা। তাহার পর প্রশ্ন উঠে—এই প্রজাতন্ত্র শাসন—আমরা এখন যাহাকে স্বায়ত্ত শাসন বা সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট বলি—ইহার ইউনিট্ কি? অর্থাৎ সভা গঠন করা, সভ্য মনোনয়ন করা প্রভৃতি কিরূপে সাধিত হইত? এখন আমরা সংগ্রাম শব্দ লড়াই অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু বেদে সংগ্রাম শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত—সকল গ্রাম মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করা ও সভ্য নির্ব্বাচন করা। গ্রাম ছিল unit of old polity or constitution in India. যশওয়াল বলিতেছেন—ক্রমে এই সমিতি নষ্ট হইয়া যায়, খৃঃ পূঃ ৭ শত অব্দে এই সমিতি লোপপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতকে সমিতির উল্লেখ আছে, সভারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের প্রাচীন রাষ্ট্রতন্ত্রে যাঁহারা সমাজে বয়োবৃদ্ধ বা এল্‌ডারস্ ছিলেন, তাঁহারাই এই সকল সভায় বসিতেন, আমাদেরও সেই রকম ব্যবস্থা ছিল। কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ নহে, যাঁহারা জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়া মতামত দিতেন। সভার সভ্যদের সম্বন্ধে পিতরো পর্য্যন্ত কথা ব্যবহৃত হইয়াছে—হে পিতৃগণ! তোমরা এ বিষয়ে সাহায্য কর—বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং আমাদের দেশে অতিপূর্ব্বকালে কনষ্টিটিউশানেল মনার্কি বা নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল না, তাহার স্থান আমাদের দেশে হয় নাই, কল্পনাও হয় নাই। বেদের সময়ে রাজা ছিলেন; কিন্তু নিয়মতন্ত্র রাজা ছিলেন, স্বেচ্ছাচারী রাজা নহে। তিনি সভার অধীন হইয়া কায করিতেন, সভা ও সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে তিনি রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই সভা ও সমিতি কর্ত্তৃক রাজা মনোনীত হইতেন: সব সময়ে যে রাজার পুত্রকেই তাঁহারা মনোনীত করিতেন, তাহা নহে, মহাভারতে পর্য্যন্ত আমরা তাহার কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শন প্রাপ্ত হই। যে রাজা রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ, যে রাজা প্রজাপীড়ন করেন, তাঁহাকে গ্রামের লোকরা—ভগ্নতরী যেমন কুকুর নষ্ট করে—সেইভাবে নষ্ট করিবে। মহাভারতে আছে, রাজা নির্ব্বাচিত হন। প্রজারা অভিমত দিলে—রাজার অভিষেক হইতে পারে, নহিলে পারে না। এই সম্বন্ধে বেদে যে মন্ত্র আছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রজার অভিমত ব্যতীত রাজার অভিষেক অসম্ভব ছিল। ইহা যে কেবল কেতাবেই ছিল, কার্য্যে পরিণত হইত না, তাহা নহে: দেবাপি নামে এক রাজকুমার ছিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু প্রজারা তাহার অভিষেক করিল না; কারণ, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন। বিধানানুসারে কুষ্ঠরোগী রাজা হইতে পারেন না। রাজার ছেলে বটে, কিন্তু রোগের জন্য তিনি ধর্ম্মে পতিত। সুতরাং তাঁহাকে প্রজারা সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল না, অভিষেক বন্ধ হইয়া গেল। আর মহাভারতের বেণ রাজার উপাখ্যান সকলেই জানেন, প্রজারা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। বেদের সময় রাজা প্রজাতন্ত্রের অধীনে সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার নির্দ্দেশানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। তাহার পর ইংরাজীতে যাহাকে রিপাবলিক বলে, সেইরূপ বহুসংখ্যক রিপাবলিক আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন,—আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর গ্রীক-সাধনা ও গ্রীক ইতিহাসের সঙ্গে যখন আমাদের আদান-প্রদান চলিতে আরম্ভ করিল, যখন তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তখন তাহাদের নিকট হইতে আমরা

মিথ্যা, আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই রিপাবলিক্ ছিল। তাহার নাম ছিল গণ; এখন যাহাকে গণতন্ত্র বলি। গণপতি বলিতে গণেশকে বুঝায়। প্রাচীন ধর্ম্মভাব এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শকে চালিত করিবার উদ্দেশ্যে তিলক মহারাজ গণপতি উৎসব প্রবর্ত্তিত করেন। মিঃ যশওয়াল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন,—গণ শব্দ রিপাবলিক-বাচক। কোন কোন ইংরাজ তাহার অর্থ করিয়াছেন—কমিউনিটী, অর্থাৎ যে রাষ্ট্র সাধারণ প্রজাগণের দ্বারা শাসিত হয়। বেদে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে যেমন সমিতি ও সভা শব্দ পাই, তেমনই বৌদ্ধজাতকে, উপনিষদের ব্রাহ্মণভাগে, কঠোপনিষৎ প্রভৃতিতে গণ এবং সংঘ শব্দ পাই। গণের সমষ্টি সংঘ। আমরা মনে করি, বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা বুঝাইবার জন্য এই সংঘ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা সত্য নহে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে সংঘ শব্দ বুদ্ধদেবের আগেও ছিল, প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব ঐ শব্দটিকে আনিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রহণ করেন ও বৌদ্ধ-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে সংঘ শব্দ লইয়া বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় ব্যবহার করেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুদ্ধোদন বলিতে অনেকে মনে করেন, রাজা শুদ্ধোদন। ইহা সত্য নহে। গণেশ বা গণপতি —যিনি গণকে পরিচালিত করেন, এই অর্থে শুদ্ধোদন শব্দ ব্যবহৃত হইত। যে অর্থে আমরা সভাপতি শব্দ ব্যবহার করি, শুদ্ধোদন শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত—President of the republic of the Sakyas. মিঃ যশওয়াল বলেন —"শাক্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শাক্যগণের প্রেসিডেণ্টের পুত্র ছিলেন।" বৌদ্ধদের সময়ে শাক্যদের আশে-পাশে যে রাজ্য ছিল, তাহাতে দুই প্রকার রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল :—

দ্বৌ রাজ্যানি গণবায়ানি

যেখানে সংখ্যা শাসন করিত, তাহাকে গণরাজ্য বলিত, আমরা তাহাকে গণতন্ত্র বলি। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলে, লোকরা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কত ভিক্ষু?' তাহারা উত্তর দিল, 'আমরা জানি না।' তাহাতে লোকরা বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বুদ্ধদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল—"এ কি কথা! তোমার ভিক্ষুরা বলে, তাহারা কত, জানে না।" তখন বুদ্ধদেব এই নিয়ম করিলেন,—বিশেষ পর্ব্বদিবসে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গণনা করা হইবে। শলাকা দ্বারা শলাকা—ভোটিং টিকেট। এখনও ষ্টীমার প্রভৃতিতে যাহারা মোট বহে, তাহারা একটা করিয়া শলা লইয়া যায় এবং যাহা গণনা হইল, তাহার গায়ে একটি করিয়া শলা দিয়া যায়। আজকাল যেমন ভোটদাতাদের লিষ্টি তৈয়ার হয়, আগে ঐ ভাবে ভোটিংলিষ্টি তৈয়ার হইত। যাহারা রাজ্যশাসনে সাহায্য করিবার অধিকারী, তাহাদের নিকট সংখ্যা গণনা করা হইত। বুদ্ধদেব বলিলেন, সেই ভাবে ভিক্ষুদের গণ-সংখ্যা নির্দ্ধারণ কর। তাহার পর গণপূরক বলিয়া এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, গণ-সভায় যখন সংখ্যা কম হইত, তখন লোকজন ডাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিয়া দেওয়া। আজকাল মিটিংএ কোরম না হইলে যেমন কাজ চলিতে পারে না, ইহাও সেইরূপ ছিল। সেই জন্য এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন, যাঁহার কর্ত্তব্য ছিল—গণপূরণ করা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সভায় যদি সভ্যের সংখ্যা বিধানোপযোগী না হইত,—মনে করুন, তাহাদের সংখ্যা হওয়া উচিত ২০০, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে গণপূরক কর্ম্মচারী লোকজন ডাকিয়া আনিয়া সেই সংখ্যা পূরণ করিয়া দিত। সে যাহা হউক, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে দুইটি রিপাবলিক বা গণতন্ত্র শাসনের কথা পাওয়া যায়। মিঃ যশওয়াল বলেন—Term গণ signifies a form of Government সংঘ signifies a form of State. পাতঞ্জল বলেন, সংঘের মধ্যে একটা ইউনিটি ছিল; সংঘের এক শরীর, এক মন, এক কনসাসনেস্, এক সিদ্ধান্ত ছিল; কেবল তাহাই নহে, সংঘের একটা নিদর্শন ছিল, যাহাকে আমরা হস্তাঙ্ক বলি। প্রত্যেক গণের এক একটা arm ছিল। আমার মনে হয়, যে গণের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, গরুড় ছিল তাহার arms, যাহা হইতে আমরা গরুড়ধ্বজ রথ পাই। ইংরাজের যেমন সিংহ, রুসিয়ার যেমন ভল্লুক, ফ্রান্সের যেমন ঈগল, তেমনই কপিধ্বজ ছিল গণের arms। ইহা হইতে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। বুদ্ধদেবের সময় উত্তর-ভারত হইতে

কতকগুলি ব্যাপারী দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে রাজা কে?" তাহারা উত্তর দিল, "আমরা যে দেশ হইতে আসিয়াছি, তাহার কতকগুলি দেশ গণের অধীন, কতকগুলি রাজার অধীন।" সুতরাং প্রাচীন ভারতে এক দিকে যেমন নিয়মতন্ত্র, তেমনই আর এক দিকে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। তখন যে অনেকগুলি রিপাবলিক ছিল, পাণিনিতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকেও বিস্তর প্রমাণ আছে। পাণিনি কতকগুলি গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যের নাম করিয়াছেন, যথা—বাহ্লীক, দামান, ত্রিগর্ত্ত, শাম্বা, দাণ্ডকী, কৌসকী ইত্যাদি।

কাব্যে, শাস্ত্রে ও সাহিত্যে যাহা পাইয়াছেন, পাণিনি তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। গণতন্ত্র রাজ্যে কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের লোকরাই যে রাজ্যশাসন করিতেন, তাহা নহে, সকল বর্ণের লোকের তাহাতে সমান অধিকার ছিল। এইখানেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের পার্থক্য ছিল। কোন কোন গণতন্ত্রে প্রত্যেক প্রজাকে অনুধাবন করিতে হইত। এক দেশের গণতন্ত্রকে বিদ্রূপ করিয়া অন্য দেশের গ্রন্থে কিছু লেখা হইয়াছে—বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার পর্য্যাপ্ত আভাস পাওয়া যায়। মিঃ যশওয়াল বলেন—A parody of their constitution is thus given in another Buddhist book,"amongst them (the Vaisalians) the rule of having respect for the high, the middle ones, the oldest, the elders, is not observed; every one considers himself to be the raja, I am the raja, I am the raja. No one becomes a follower of another. Evidently in their councils every member had an equal right of speech and voting, and every one wanted to be the next president."

"তাহাদের নিয়মানুগ শাসনতন্ত্রের ব্যঙ্গচিত্র একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে:—বৈশালীদিগের মধ্যে উচ্চ, মধ্যম ও বৃদ্ধদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম নাই। তাহাদের প্রত্যেকেই মনে করে যে, সে রাজা—সকলেই বলে, আমি রাজা, রাজা। কেহ তাহারও অনুগত নহে।

বস্তুতঃ তাহাদের পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের বক্তৃতা করিবার বা ভোট দিবার সমান অধিকার ছিল এবং প্রত্যেক সদস্যই পরবর্ত্তী প্রেসিডেণ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন।"

সুতরাং প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী কতটা পর্য্যন্ত এ দেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

গণতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টকে রাজা বলা হইত; ভাইসপ্রেসিডেণ্টও ছিল, তাহার পরিভাষা পর্য্যন্ত আছে—উপরাজ, জেনারেলসীমো বা সেনাপতি, ভাণ্ডারিকা বা চেনসেলার অব দি একসচেকার,—এ সকল পদও ছিল এবং ৭ হাজার ৭ শত জন অনুরাজা বা গণ-সভার সভ্য ছিলেন; জনসংখ্যাও কত ছিল, জাতকে উল্লেখ আছে—তাহার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৮ হাজার। যিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, পণ্ডিত ছিলেন, কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার বিচার হইত; সেনাপতি, উপরাজা ও রাজা তিন জন স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতেন; সাক্ষী-সাবুদ স্বতন্ত্রভাবে লওয়া হইত। তিন জন একমত হইয়া দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহার শাস্তি হইত। ইহা ছাড়া আর এক জন কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, তিনি ব্যবহারিক—Lawyer Judge, তিনিও রাজ্যশাসনে সাহায্য করিতেন।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধের সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, বেদের সময় রাজতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল, স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্র কখনও এ দেশে ছিল না, রাজা নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন; ইংলণ্ড তখন এইরূপ শাসনপ্রণালী কল্পনায় আনিতে পারে নাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশে কনষ্টিটিউসন্যাল মনার্কি প্রতিষ্ঠিত ছিল; কেবল তাহাই নহে, খৃষ্ট জন্মের ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী এ দেশে ভাল রকম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহারই অনুকরণে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মসমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং সংঘ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মিঃ যশওয়াল তাঁহার হিন্দু পলিটি নামক গ্রন্থে বলেন:—

অধ্যাপক রিস ডেভিড বলেন—গণের শাসন ও বিচার কার্য্য সাধারণ সমিতিতে নির্ব্বাহিত হইত; ঐ সমিতিতে বৃদ্ধ ও যুবকরা উপস্থিত থাকিতেন। কপিলাবস্তুনগরে সন্থাগার নামক সমিতি গৃহ অবস্থিত ছিল; এই সমিতি

বা পার্লামেণ্ট গৃহে রাজা পসেনদির প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। এই পার্লামেণ্ট গৃহেই অম্ভট্ট প্রয়োজনীয় কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। তখন শাক্যগণ পরিষদ্গৃহে মন্ত্রণায় বসিয়াছিলেন। এই পার্লামেণ্ট গৃহেই আনন্দ বুদ্ধের দেহান্তরের সংবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে কাউন্সিলারগণ বুদ্ধের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।

কাউন্সিলারদিগের মধ্য হইতে এক জন প্রধানকে নির্ব্বাচন করিয়া এক মরশুমের অধিবেশনের সভাপতির পদে বরণ করা হইত। তিনি রাষ্ট্রের প্রধানরূপে পরিগণিত হইতেন: কি ভাবে এবং কত কাল নির্ব্বাচন স্থায়ী হইত, তাহা জানা যায় না। সভাপতি রাজা উপাধি ধারণ করিতেন। রোমানদের কন্সাল অথবা গ্রীকদিগের আর্কনের যেরূপ পদমর্য্যাদা ছিল, রাজারও সম্ভবতঃ সেইরূপ ছিল। লিচ্ছবিদিগের রাজা অথবা ভারতের স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের সহিত এই রাজার কোনও সাদৃশ্য নাই। কিন্তু আমরা এক স্থানে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধের এক যুবক আত্মীয় ভাদ্দীয় রাজা ছিলেন, আর এক স্থানে দেখি যে, বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন রাজা ছিলেন। তিনি অন্যত্র সাধারণ নগরবাসী শাক্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাজা কখনও অভিনেরা সিটিজেন, কখনও প্রেসিডেণ্ট এবং কখনও রাজা হইতেন। আলেকজান্দার ও মেগাস্থিনিস প্রভৃতি গ্রীকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বহুসংখ্যক রিপাবলিক দেখিতে পায়েন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।



জাতের গরম—

নারায়ণের নৈবেদ্য
যাচ্ছে পূজোর ঘর,
কে আসছিস্—সর্ সর্ সর্,
এ দিক্ থেকে সর।

শেষ রক্ষা

১

বৈশাখ মাসের প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে সারা পল্লীটার বুকের উপর যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। বাতাসের অভাবে সারি সারি বৃক্ষগুলা যেন নিরাশ নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়াই অগ্নিদেবের সেই বিশাল গর্ভে আত্ম-সমর্পণ করিতেছে। চারিদিকে একটা বিরাট স্তব্ধভাব। মাঝে মাঝে শুধু সেই স্তব্ধতা ভেদ করিয়া কোন তাপদগ্ধ বৃক্ষশাখা হইতে একটা চাতক থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, "ফটিক জল, ফটিক জল!"

এমনই এক অলস মধ্যাহ্নে মণীন্দ্র তাহার ভিজা গামছাখানা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া তাহার ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেটাতে একটু গড়াইতেছিল, আর একখানা মাসিক পত্রের একটা গল্প পড়িতেছিল।

গল্পটা শেষ হইলে সে বইখানা পাশে রাখিয়া দুই এক বার এ পাশ ও পাশ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, তাহার মাতা সুরবালা এই কিছুক্ষণ হইল তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন, বাগানের দিকটাতে একটু নজর রাখিতে—পাড়ার সব ছোঁড়াগুলার জ্বালায় গাছপালায় একটা ফল-পাকড় কিছুই থাকিবার উপায় নাই; দিন নাই, রাত নাই, তাহারা গাছগুলা খালি ঠেঙাইতেছে ও ঢিল ছুড়িতেছে।

মণীন্দ্র আজ চোর ধরিবার সঙ্কল্প করিয়া উঠিল। পাশের দিকের জানালার কবাটটা খুলিয়া এক বার সূর্য্যের উত্তাপটা পরীক্ষা করিয়া লইল। তাহার পর সেই ভিজা গামছাখানা দিয়া সমস্ত শরীরটা এক বার মুছিয়া লইয়া আরশীর সামনে গিয়া এলোমেলো চুলগুলা চিরুণী-বুরুশ সাহায্যে যথাযথ স্থানে সন্নিবেশ করিল এবং গামছাখানা পুনরায় গায়ে জড়াইতে জড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় মণীন্দ্র আজ তিন দিন হইল তাহাদের পল্লীগ্রামের বাটীতে আসিয়াছে। সে কলিকাতায় ছাত্রাবাসে থাকিয়া বি. এ. পড়িতেছে।

মণীন্দ্রের পিতা চন্দ্রনাথবাবু পূর্ব্বে সপরিবারে কলিকাতাতে একখানি বাটী ভাড়া লইয়া থাকিতেন। তিনি কোনও সরকারী আফিসে মোটা মাহিনায় কায করিতেন। সেই কার্য্যোপলক্ষেই তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। গত বৎসর তিনি কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহার এই পল্লীবাটীখানি উত্তমরূপে সংস্কার করাইতেছিলেন, তাহার পর বাসের উপযুক্ত হইলেই তিনি কলিকাতার বাসা উঠাইয়া বহুকাল পরে আবার তাঁহার পৈতৃক ভিটাতেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মণীন্দ্র সেই অবধি ছাত্রাবাসে থাকে। বৎসরের মধ্যে এই গ্রীষ্মাবকাশ আর পূজার বন্ধ এই দুই সময় ব্যতীত তাহার স্বদেশ সন্দর্শন আর বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। তাহার প্রথম এবং প্রধান কারণ—কলিকাতা হইতে তাহাদের বাড়ী আসাটা একটা বিরাট ব্যাপার বলিলেই হয়। প্রথমতঃ রেলপথে, পরে নৌকাযোগে এবং অবশেষে তিন মাইল পথ রাস্তা হাঁটিয়া তবে পৌঁছান যায়। দ্বিতীয় কারণ, কলিকাতার জন-কোলাহল, বন্ধু-বান্ধব, বায়োস্কোপ, থিয়েটার এ সকল প্রলোভন ছাড়িয়া তাহার সেই পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর, জনবিরল, বান্ধবহীন বাড়ীতে যাইবার আদৌ ইচ্ছা হইত না।

চন্দ্রনাথবাবু কলিকাতায় বাসকালীন দেশের বাটীতে বড় একটা আসিতেন না, সেই জন্য মণীন্দ্রের দেশের কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় বিশেষ কিছুই ছিল না।

মণীন্দ্র চোর ধরিবার উদ্দেশে বাহির হইয়াই দেখিতে পাইল, বাগানে জামরুল গাছটার তলায় একটা ৬।৭ বছরের ছেলে, হাতে একমুঠো জামরুল লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খাইতেছে। মণীন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পিছনদিক্ হইতে খপ করিয়া তাহার হাতটা টিপিয়া ধরিল। ধরা পড়িয়াই ছেলেটি ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ফটিক, ওরে ফটিক, এই দুপুর রৌদ্রে আবার কোথায় গেলি বল দেখিন" বলিতে বলিতে একটি ১৩।১৪ বছরের ফুটফুটে মেয়ে তাহাদের বাগানের নীচের সরু পথটা ধরিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনিয়া কিশোরীটি সেই দিকে ফিরিতেই মণীন্দ্র দেখিল, কিশোরীটির বেশ সুন্দর গোলগাল চেহারা, ঝাঁপানো ঝাঁপানো চুলগুলির মাঝখানে একটি আল্‌গা আল্‌গা ক'রে মস্ত 'বেণে' খোঁপা বাঁধা। পরণে একখানি অতি মলিন হরিদ্রাবর্ণের শাড়ী গাছকোমর করিয়া বাঁধা, তাহার ভিতর হইতেই যেন তাহার বর্ণের উজ্জ্বলতা বেশ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

মণীন্দ্র যেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়াই সেই ক্রন্দনরত ছেলেটার হাত ধরিয়া বলিল, "কেমন, আর কোনও দিন চুরি করতে আসবি?" বলিয়া তাহার হাতটা আর একটু জোরে টিপিয়া ধরিয়া এক বার নাড়া দিল, ছেলেটি তখন আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

"খুব বীরত্ব প্রকাশ হচ্ছে ত একটা কচি ছেলেকে মেরে"—বলিতে বলিতে কিশোরীটি মণীন্দ্রর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মণীন্দ্র তখন বালকটির হাতটা ছাড়িয়া দিয়াছিল। হাত সরাইয়া লইতেই মণীন্দ্র দেখিতে পাইল, সে স্থানটা চাপিয়া ধরিয়াছিল, সেখানটায় একটা ফোড়া ছিল, আঘাত পাইয়া সেটা গলিয়া গিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে।

কিশোরীর সে দিকে নজর পড়িতে সে বলিয়া উঠিল, "আহা হা, ফোড়াটা একেবারে গলে গেছে যে!"

মণীন্দ্র যে তাহার ক্ষতস্থানটাই চাপিয়া ধরিয়াছিল, দেখিতে পাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুতভাবেই বলিল, "ওর যে ওখানে ফোড়া ছিল, তা আমি দেখতে পাইনি—"

মেয়েটি তখন তাহার সেই আহত স্থানটায় ফুঁ দিয়া দিয়া হাত বুলাইয়া দিতেছিল, বলিল, "তা দেখতে পাবে কেন; একেবারে ক... বড় ক্ষতিটাই না ক'রে ফেলেছে—ছেলেমানুষ না হয় দু'টো পোকা জামরুলই কুড়িয়ে খাচ্ছিল—"

মণীন্দ্রের তখন অপ্রস্তুত ভাবটা একটু কাটিয়া গিয়াছিল, সে নিজে যে একটু অন্যায় করিয়াছিল, সেটাকে চাপা দিবার জন্যই বলিল

"কুড়িয়ে খাচ্ছিল কি গাছ থেকে পাড়ছিল, কে জানে ; পরের বাগানে চুরি করতে এলেই মার খেতে হয়। চোরকে ধ'রে আর কে কবে রসগোল্লা খাইয়ে থাকে ?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই মণীন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, তাহার কথাগুলি এমনভাবে বলা ভাল হয় নাই, তাহার নিজের কানেই কেমন বিশ্রী শুনাইল।

ফটিকবাবুর তখন দিদির শুশ্রূষায় রোদনের বেগ অনেকটা উপশমিত হইয়াছিল। সে কাঁদ-কাঁদ ভাবেই বলিল, "না দিদি, আমি গাছ থেকে পাড়িনি, তলায় পড়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছি। এই দেখ না, সব শুক্‌নো শুক্‌নো।"

তাহার দিদি, তাহার কথায় কোনও জবাব না দিয়া মণীন্দ্রের কথার উত্তরেই বলিল, "না, তুমি যা বীরপুরুষের কায করেছো, এইটিই ঠিক রসগোল্লা খাবার যোগ্য। একটা কচি ছেলেকে ঠেঙানোই ত বীরপুরুষের লক্ষণ।"

সুন্দর মেয়েটির সাহস দেখিয়া আর তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মণীন্দ্রের রাগের ভাবটা তখন একবারেই কাটিয়া গিয়াছিল। সে তখন কিশোরীর নিকট হইতে আরও কিছু মিষ্ট ভৎর্সনা শুনিবার অভিপ্রায়েই কপট গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া বলিল, "কচি ছেলে যদি চোর হয়, তা হ'লে তাকে ঠেঙাতে হবে বৈ কি—"

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল, "না হ'লে বীরত্বের পরিচয়টা আর হব কা'র উপর দিয়ে—কলেজে প'ড়ে বিদ্যে বেশী হয়েছে কি না—তা ওর বোধ হয় এখনও অতটা শিক্ষা হয়নি যে, কোন্‌টা চুরি আর কোন্‌টা চুরি নয়, সেটা এই বয়সেই একবারে বিচার ক'রে ফেলে ? খাবার জিনিষ দেখলে ছেলেমাত্রেরই লোভ হয়, তোমার যদি একটা পাঁচ বছরের ছোট ভাই ভাঁড়ার থেকে লুকিয়ে খাবার তুলে খায়, তা হ'লে সে চোর হ'ল ?"

মণীন্দ্র দেখিল,—কিশোরীটির এই বয়সে যা বিবেকবুদ্ধিটুকু হইয়াছে, তাহার কাছে সত্যই তাহার কলেজের উচ্চশিক্ষা নত হইয়া পড়ে ; সে মনে মনে যদিও এই মেয়েটির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, তথাপি তর্কে ইহাকে পরাস্ত করিবে, এইরূপ মনস্থ করিল। এই চপলা মুখরা গ্রাম্য বালাটির সঙ্গে এইভাবে তর্কযুদ্ধটুকু তখন মণীন্দ্রেরও কেমন একটু বেশ লোভনীয় হইয়া পড়িতেছিল। মণীন্দ্র তাহার উত্তরে বলিল, "পরের ভাঁড়ার থেকে বার করতে গেলেই তাকে চুরি করার অপরাধে মার খেতে হয়।"

কিশোরীটিও পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্রী নহে, সে-ও তর্কে কম যায় না—সে বলিল, "তোমার মত সকলেই ত আর কলেজের ছাত্র নয় যে, যার এখন আপন পর বিচার করবার জ্ঞান হয় নি, জেনেও তার উপর এমনই ভাবে বীরত্ব ফলাবে—"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মণীন্দ্র বুঝিল যে, কিশোরীটি এইবার তাহার উপর একটু চটিয়া যাইতেছে ; তখন তাহাকে নরম করিবার অভিপ্রায়েই বলিল, "যাক, তোমার জিত। তা এই দুপুর রৌদ্রে ভাইটিকে এমন ভাবে ছেড়ে দিয়েছ কেন ?" সে বলিল, "বুঝতেই ত পারছ, তোমার বাগানের ফল চুরি করবার জন্যে—"

মণীন্দ্র বলিল, "তা হ'লে শাস্তিটা ওর একারই হ'তে পারে না, তোমাকেও তার ভাগ নিতে হয় ?" সে বলিল, "তা দিয়ে ফেল, ওটাই বা আর বাকী থাকে কেন ?"

মণীন্দ্র তখন হাত বাড়াইয়া গাছ হইতে গোটা কতক বড় বড় জামরুল পাড়িয়া কয়েকটি ফটিকের হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও ফটিকবাবু, কেমন বড় বড় জামরুল দেখ।" ফটিকবাবু তখন তাহার দিদির অঁাচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া এক একবার তাহার সেই আহত স্থানটার দিকে চাহিতেছিল আর মাঝে মাঝে ফোঁপাইতেছিল, জামরুল হাতে পাইয়াই খুসী হইয়া তাহাতে একটা কামড় বসাইয়া দিল।

মণীন্দ্র তাহার পর অবশিষ্ট জামরুল কয়টি হাতে লইয়া কিশোরীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই নাও, তোমাকেও খেতে হবে" বলিয়া তাহার হাতের মধ্যে দিতে উদ্যত হইলে সে উহা না লইয়া মুষ্টি শক্ত করিয়া রহিল ; বলিল, "থাও যাও, মেরে শেষে আবার জামরুল খাওয়াতে হবে না।" মণীন্দ্র বলিল, "ঐ দেখ, যাকে মেরেছি, সে আগেই খেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।"

কিশোরী তাহার ভাইয়ের মুখের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "চল্‌, বাড়ী যাবি নি ?"

মণীন্দ্র বলিল, "পালালে চলবে না, জামরুল তোমাকে খেতেই হবে, না নিলে আমি আজ ছাড়ছি না" বলিয়াই তাহার হাতটা ধরিল। সে বলিল, "ছাড় ছাড়, তোমার জিনিষ তুমিই খাও ; তোমার গাছের ফল আবার ক'মে যাবে —"

মণীন্দ্র বলিল, "তুমি এখনও আমার উপর রেগে রয়েছ দেখছি ; কৈ, আমার ত রাগ মোটেই নেই।" তাহার পর বলিল, "নেবে ত নাও, না হ'লে আমি জোর ক'রে খাইয়ে দেব, তা বলছি।"

কিশোরী তখন হাসিয়া তাহার হাত হইতে জামরুল তুলিয়া লইল। সে খাইল না দেখিয়া মণীন্দ্র পুনরায় বলিল, "খেতে হবে এখন, তা হ'লে জানব যে, তোমার রাগ প'ড়ে গেছে।" কিশোরী তখন একটা জামরুলে একটু কামড় দিয়া বলিল, "এইবার হয়েছে ?" মণীন্দ্র বলিল, "যাক্‌, এইবার রাগ পড়েছে তা হ'লে—তোমার নাম কি বল দেখি।" সে বলিল, "তুমি আমার নাম জান না বুঝি ? তা জানবে কি ক'রে ? কল্‌কাতার বাবু পাড়াগেঁয়েদের আর চিনবে কি ক'রে ? আমার নাম 'পারুল'। আমরা তোমাদের বাড়ী ত প্রায়ই বেড়াতে আসি, তুমি ত থাক না, তা আর দেখবে কি ক'রে ?"

ফটিক তখন মণীন্দ্রের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, তাহার সে দৃষ্টিটুকু দেখিয়া মণীন্দ্রের মনে এখন কেমন একটু করুণার উদ্রেক হইল—আহা, ছেলেমানুষ, বড্ড লেগেছে হয় ত—মণীন্দ্র তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, "ফোড়াটায় বড় লেগেছে, নয় ?" সে বলিল, "না, এখন সেরে গেছে।"

মণীন্দ্র তাহার হাত ধরিয়াই বলিল, "এসো, আমাদের বাড়ী যাবে ? গোলাপজাম দেব এখন, আম দেব এখন।" বালক ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

পারুল বলিল, "তবে তুই যা, আমি বাড়ী চ'লে যাই ?"

ফটিকবাবু তাহার দিদির অঁাচলটা ধরিয়া টান দিয়া জানাইল যে, না, তাহার বাড়ী যাওয়া হইবে না।

মণীন্দ্র বলিল, "কেন, তুমিও এসো না।"

মণীন্দ্র চোর গেপ্তার করিয়া লইয়া একেবারে তাহার মায়ের নিকট হাজির হইল। সুরবালা চোরের মুখ দেখিয়া আর তাহার মুখরা বোনটির নিকট হইতে সকল ব্যাপার অবগত হইয়া মণীন্দ্রকেই শেষে বকিতে সুরু করিয়া দিলেন। মণীন্দ্র কপট রাগের ভাণ করিয়া বলিল, "আমায় বলেছিলে, তবে ত গেছলুম, এখন উল্টে আবার বকলে কি হবে ?" বলিতে বলিতে যেন সে রাগ করিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিল।

সুরবালা তাহার পর ভাঁড়ার হইতে ফলের চুবড়ি আনিয়া ফল ছাড়াইতে বসিলেন এবং পারুলের সহিত গল্প করিতে করিতে এটা-সেটা ফটিককে খাওয়াইতে লাগিলেন।

ফটিকবাবুর আহার বেশ চলিতেছিল, সুরবালা পারুলকে বলিলেন, "তুই খা না লো।"

পারুল যেন কত পরিচিতের ন্যায়ই মণীন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, "মণিদা, খাবে না ?—এস না।" মণীন্দ্রের তখন একসঙ্গে বসিয়া খাইবার ইচ্ছা থাকিলেও পারুল আর কিছু বলে কি না, শুনিবার

অভিপ্রায়েই যেন অনিচ্ছা প্রকাশ" করিয়া ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "তোমরা খাও না, আমি আর এখন খাব না।"

পারুল বলিল, "খাব না বল্লে চল্বে না; আমরাই শুধু খাব বুঝি? আচ্ছা, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

মণীন্দ্র অন্যমনস্কভাবে টেবলের উপরকার মাসিক-পত্রখানার পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছিল; ইত্যবসরে পারুল এক রেকাবি সুসজ্জিত ফল লইয়া তাহার নিকট হাজির হইল। মণীন্দ্রের হাত হইতে মাসিক-পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "আগে খেয়ে নাও দেখি।"

মণীন্দ্র বলিল, "তুমি খেয়েছ?"

পারুল তখন টেবলের উপর মাসিক-পত্রের স্থানে রেকাবিটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "তুমি খেয়ে নাও না আগে, তার পর আমি খাব এখন।"

মণীন্দ্র রেকাবিটি আর একটু কাছে টানিয়া আনিয়া তাহা হইতে একটি আম তুলিতে তুলিতে বলিল, "আচ্ছা, এসো দু'জনে ভাগ ক'রে খাই।" তাহার পর একটি আম ও চারিটি গোলাপজাম তুলিয়া লইয়া বাকী সব ফল শুদ্ধ রেকাবিটি সরাইয়া দিয়া বলিল "এই নাও, খাও।"

পারুল হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি ভাগ হ'ল?" তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, তোমার হাতেরগুলো আমায় দাও, আর এই রেকাবির-গুলি তুমি নাও।"

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল যে, মণীন্দ্রের হাতে যাহা ছিল, তাহার উপর আর একটি আম ও দুইটি গোলাপজাম পারুল লইলে মণীন্দ্রের তখন আর বাকীগুলি খাইতে আপত্তি থাকিবে না।

ফটিকবাবু মুখে একমুখ আমের রস মাখিয়া ভাঁড়ারের দাবাতে বসিয়া আমের আঁটি চুষিতেছিল; তাহার দিদিকে এক থালা খাবার লইয়া ঘরের ভিতর যাইতে দেখিয়া আরও কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আঁটিটি শেষ করিয়া ধীরে ধীরে সেইখানে উপস্থিত হইল; তখনও তাহার কনুই বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরিতেছিল। সে আসিয়া মণীন্দ্রের ভাগ হইতে একটি আমের চোক্‌লা এবং তাহার দিদির ভাগ হইতে একটি গোলাপজাম দখল করিল।

এইরূপে ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইলে পর মণীন্দ্র ফটিককে একখানি বই খুলিয়া ছবি দেখাইতে আরম্ভ করিল। ফটিকবাবু বেশ মনোনিবেশ সহকারে সেগুলি দেখিতে দেখিতে তাহাদের লইয়া খুব সমালোচনা করিতে লাগিয়া গেল। পারুলও ঘুরিয়া ফিরিয়া এটা সেটা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে পারুল ফটিককে ডাকিয়া বলিল, "এবার বাড়ী যাই, আয় ফটকে।"

বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া আর ফটকের ছবি দেখিতে স্পৃহা রহিল না, সে ছুটিয়া দিদির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

মণীন্দ্র বইখানা ঠিক করিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "কা'ল দুপুরবেলা এসো না বেড়াতে—"

পারুল বলিল, "আচ্ছা।"

মণীন্দ্র পারুলের ছোট 'আচ্ছা'টিকে আরও দৃঢ় করাইবার মানসেই ফটিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কা'ল আবার এসো ফটিকবাবু, আম পাবে, জাম পাবে; জামরুল পেড়ে দেব—"

ফটিকবাবু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

তাহার পর প্রায় প্রত্যেক দিন ফটিককে সঙ্গে লইয়া কিশোরী পারুল মণীন্দ্রের বাটীতে বেড়াইতে আসিত। পারুলের মাতা

করিয়া যাইতেন। মণীন্দ্রও এখন মাঝে মাঝে পারুলদের বাড়ী যায়। এইরূপে অবাধ মেলামেশার ফলে ঘনিষ্ঠতাও একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

মণীন্দ্র 'তুমি' ছাড়িয়া পারুলকে এখন 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করে।

ফটিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অত্যাচার করে, মণীন্দ্র সে সব হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কিন্তু পারুলের সামান্য দুই একটা অত্যাচারও সে নীরবে সহ্য করিতে পারিত না; তাহার প্রতিশোধ লইয়া তবে ছাড়িত। হয় ত সে ঘরের ভিতর অনন্যমনা হইয়া কিছু করিতেছে, পারুল রঙ্গচ্ছলে এক মুষ্টি ধূলি কুড়াইয়া তাহার অলক্ষিতে দোরের পাশ হইতে তাহার মাথার উপর ফেলিয়া দিল। মণীন্দ্র চমকিয়া চাহিয়া দেখিতেই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মণীন্দ্র তৎক্ষণাৎ অমনই পারুলকে ধরিয়া একটি বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিত, পরে সেই বজ্রমুষ্টি একটি মৃদু ক্ষুদ্র মুষ্ট্যাঘাতে পরিণত হইয়া পারুলের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইত।

এক দিন পারুল পান চিবাইতে চিবাইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগে কতকটা চূণ লইয়া মণীন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, মণীন্দ্র মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। পারুল পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; মণীন্দ্র তাহার আগমন লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু এমন ভাব দেখাইল, যেন সে কিছুই জানিতে পারে নাই। পারুল ধীরে ধীরে তাহার পিছনে গিয়া দুই কোমল করপল্লবের দ্বারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিল। মণীন্দ্র বলিল, "ছাড়, ছাড়, দেখ্‌তে পেয়েছি, এমন কেঠো হাত আর নইলে কার?" বলিয়া তাহার হাত ধরিতে যাইলেই সে অমনই চূণ সমেত অঙ্গুলিটি মণীন্দ্রের গণ্ডদেশে বেশ করিয়া বুলাইয়া দিল। মণীন্দ্রও অমনই উঠিয়া বাম হস্তে পারুলের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সংযোগে তাহার উভয় গণ্ডদেশ নিপীড়িত করিয়া দিয়া চরম প্রতিশোধ লইল।

এইরূপ আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়াই মণীন্দ্রের গ্রীষ্মাবকাশের মেয়াদ ফুরাইল। কা'ল তাহার কলিকাতায় যাইবার দিন।

আজ কিন্তু পারুল মণীন্দ্রের বাটীতে বেড়াইতে আসিল না। তিনটা বাজিল, চারিটা বাজিল, তবুও পারুলের দেখা নাই। মণীন্দ্র এক বার ভাবিল, না, কেন? কা'ল যে আমি চলিয়া যাইব, সে ত জানে; আবার কত দিন দেখা হবে না জানিয়াও তবু আজ একটি বারের জন্য দেখা করিতে আসিতে পারিল না, আর আমি যাচিয়া তাহাকে দেখা দিতে যাইব, তাহা হইতেই পারে না।

কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, কি যেন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, কিসের যেন একটা অভাব হইতেছে, এই রকম অন্যমনস্ক ভাবেই মণীন্দ্রের সে দিনটা কাটিয়া গেল।

রাত্রিকে শয্যায় শুইয়া মণীন্দ্র ভাবিতে লাগিল, হয় ত পারুলের তাহার জন্য মোটেই মন কেমন করে না, তাহা হইলে সে কি অন্ততঃ আজিকার দিনটাও না আসিয়া থাকিতে পারিত? তাহার কিন্তু এই কয়েক দিনের অবাধ মেলামেশার ফলে আজ বেশ একটু মন কেমন করিতেছে; আবার কত দিন বাদে দেখা হবে। কা'ল যাইবার সময় এক বার তাহাদের বাটীতে দেখা করিয়া যাইলে কেমন হয়? না, সেটা যেন কেমন কেমন ঠেকে। সকলে হয় ত কি মনে করিবে—একটা যেন কেমন লজ্জা ও সঙ্কোচের ভাব আসিয়া মণীন্দ্রের মনের মধ্যে উদয় হইল।

পরদিন যথাসময়ে মণীন্দ্র তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া কলিকাতার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

তাহাদের বাগান অতিক্রম করিয়া মাঠের পথে পড়িলেই পাড়ার ভিতর দিয়া পারুলদের খিড়কির কিয়দংশ দেখা যায়। মণীন্দ্র দেখিতে পাইল, পারুল তাহাদের ঘাটের জীর্ণ চাতালটার উপ

মন দেখিয়াও দেখে নাই, এইরূপভাবে মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিল।

মণীন্দ্রের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়াই হয় ত পারুল মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, কা'ল তাহার না যাইবার কারণেই হয় ত মণিদার একটু অভিমান হইয়াছে, তাই সে সেইখান হইতেই বলিল, "মা'র অসুখ, তাই কা'ল যেতে পারিনি; পূজার সময় আসছ ত?"

মণীন্দ্র মুখে কিছু না বলিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া একটু মৃদু হাসিল এবং চলিতে চলিতেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

৩

পারুলের পিতা ভোলানাথবাবু চন্দ্রনাথবাবুর প্রতিবেশী। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্বে বিশেষ অসচ্ছল ছিল না। জমী-জমা যাহা ছিল, তাহাতে এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইত। তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র। পুত্র ফটিক; কন্যাদিগের মধ্যে পারুল কনিষ্ঠা এবং অবিবাহিতা। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুইটি কন্যাকে 'পার' করিতেই তাঁহার স্ত্রীর মূল্যবান্ অলঙ্কার ও জমীজমা অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন অবশিষ্ট যৎসামান্য যাহা আছে, তাহার আয়ে কোনওরূপে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা ছাড়া আর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না।

পারুলের বিবাহের জন্য ভোলানাথ বিশেষভাবেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ করা ছেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। এমন কোনও গৃহস্থ ঘরের ছেলের সন্ধানেই তিনি আছেন যে, বিনা পণে পারুলকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিতে পারে। পারুল কুৎসিতা নহে, তাহার রূপ আছে, গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মও সে জানে; তাহার পিতার নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে। কিন্তু শুধু এই কয়টি সম্বল লইয়াই বাঙ্গালীর মেয়ের ভাল ঘরে-বরে বিবাহ হইতে পারে না। পুত্রের পিতার লুব্ধদৃষ্টি কন্যাপক্ষের অর্থের উপর। সেই অর্থেরই ভোলানাথবাবুর একান্ত অভাব। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র জীর্ণ বাড়ীখানি আর সামান্য জমী জমা, অথচ কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই, না হইলে সমাজ শুনিবে না। অনশন ব্রতই অবলম্বন কর, কিংবা বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ কর, সমাজদণ্ডধারীদের দৃষ্টি সে দিকে পড়িবে না। হাহাকারের করুণ ক্রন্দনেও তাহাদের শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্যই বধির থাকিবে। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের বয়োবৃদ্ধির সংবাদ তাহাদের কর্ণে ব্যাধের শিকার-লব্ধ মৃগের আর্ত্তনাদের মতই তড়িদ্গতিতে প্রবেশ লাভ করে। তাহাদের চঞ্চল চক্ষু শিকার অন্বেষণের আশু আনন্দের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

এই ত সমাজের রীতি। তবে পারুলের যৌবনোন্নত সুগঠিত দেহলতাখানি দর্শনে তাহার পিতার হিতৈষীদের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা ঠেকিবে, রাত্রিতে বিভীষিকা দর্শনে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

পাড়ার হিতৈষিণীগণ মহামায়ার নিকট যাইয়া উপদেশ দিলেন, "যেমন ক'রে হোক্, মেয়েকে পার কর; মেয়ের দিকে যে আর চাওয়া যায় না! এত বড় 'ধিঙ্গি' মেয়েটাকে ঘরে জাইয়ে রেখে মুখে অন্নের গ্রাস উঠে কি ক'রে? ক্ষমতা নেই যখন, তখন রাজার রাজপুত্তুর খুঁজতে গেলে ত আর চল্‌বে না—একটি বয়সী দোজবরে দেখে শুনে কোনও রকমে চার হাত এক ক'রে দাও। অবস্থা বুঝে ত ব্যবস্থা করতে হবে"—ইত্যাদি।

সত্যই ত! মহামায়াও ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, কালের গতি কেমন ধীরে ধীরে পারুলকে তাহার কৈশোর সীমা হইতে টানিয়া আনিয়া যৌবনের জোয়ারের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। একটি দোজবরে টোজবরে গোছেরই সন্ধান কর না; অমন ত কত হচ্ছে। অনেক ত দেখা গেল, মেয়ে পছন্দ হচ্ছে, সবই মিল্‌ছে; আসল যেটা, সেই টাকার কথাতেই বনিবনাও হচ্ছে না, তাই ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

স্বামী বলিলেন, "হাঁ, তাই ভাবছি; মেয়েটাকে ধ'রে বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই দেখ্‌ছি—শেষ তাই দিতে হবে।"

এ সব আলোচনা গোপনেই হইল, পারুলের ইহার কিছুই জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।

পূজাবকাশে মণীন্দ্র বাড়ী আসিয়া দেখিল, পারুলের শ্রী এই কয়েক মাসের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাকে যেন আর সে পূর্ব্বের পারুল বলিয়া চিনিবার যো নাই। যৌবনের মধুর তুলিকাস্পর্শে তাহার দেহের লাবণ্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সে বালিকাসুলভ চপলতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। মণীন্দ্রের সহিত তাহার হাসি-গল্প, রঙ্গালাপ পূর্ব্বের মতই নিঃসঙ্কোচভাবে চলিতে লাগিল।

মণীন্দ্রের সহিত পারুলের এ ঘনিষ্ঠতাটুকু কিন্তু মহামায়ার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। তাহাদের এই ভাব দর্শনে তাঁহার মনের গোপন প্রদেশে এক একবার একটি ক্ষীণ আলোক-রশ্মি যে জাগিয়া উঠিত না, এমন নহে। কিন্তু এ আলেয়ার আলোটিকে তিনি দূরে সরাইয়া রাখিয়াই চলিতেন, সাহস করিয়া নিকটে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। এ যে অসম্ভব! এমন ভাগ্য কি পারুলের হইবে? এ যে তাঁহার বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার দুরাকাঙ্ক্ষা! কিন্তু, তাঁহার এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ গোপন আশাটুকু তিনি বেশী দিন হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; এক দিন কথায় কথায় স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

ভোলানাথবাবুর কর্ণে প্রথমে এটা প্রলাপ-বচনের ন্যায় ঠেকিল। কিন্তু স্ত্রীর অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি চন্দ্রনাথবাবুর নিকট এ প্রস্তাব করিতেও সম্মত হইলেন।

বড় সঙ্কোচের সহিত কন্যাদায়গ্রস্তের এ কাতর প্রার্থনাটুকু ভোলানাথবাবু এক দিন চন্দ্রনাথবাবুকে জানাইলেন।

উত্তরে চন্দ্রনাথবাবু বেশ একটু গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াই বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে এম্, এ পর্যান্ত পড়াইবেন, এম-এ পাশ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না। ছাত্রজীবনে অথবা অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। এ অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া সত্য সত্যই তিনি বড় দুঃখিত, ইহাও জানাইলেন।

চন্দ্রনাথবাবু ভোলানাথবাবুর নিকট যাহা বলিলেন, তাহা কতক অংশে সত্য হইলেও আসল সত্যটি কিন্তু তাঁহার নিকট গোপন রাখিলেন। মণীন্দ্র এম-এ পাশ করিলে পর তিনি কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার হইতে কন্যা বাছিয়া লইবেন, এইরূপই তাঁহার মনের উদ্দেশ্য ছিল, হা-ঘরের মেয়ে তিনি লইতে ইচ্ছুক নহেন। কন্যার সহিত কন্যার পিতার সঞ্চিত অর্থরাশির উপর তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি ছিল।

ভোলানাথবাবু অবশেষে দারুণ হতাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই গৃহে ফিরিলেন।

৪

মণীন্দ্রের কলিকাতায় ফিরিবার দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল। দিন যত সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল, ততই কি যেন একটা অজানা বেদনা তাহার বুকের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া

তবে কি মণীন্দ্র পারুলকে ভালবাসিয়া ফেলিল? না হইলে এমন হয় কেন? স্নেহের টান ত কৈ এরূপ হয় না—তাহার পিতামাতার জন্ম ত এমন কখনও হয় নাই—কটিককেও ত সে যথেষ্ট স্নেহ করে—তাহার জন্ম ত এমন হয় না।

মণীন্দ্র চিন্তা করিয়া দেখিল, না, এ ত ঠিক স্নেহ নয়—এ যে, এ যেন—তাই কি?

তবে কি সত্য সত্যই মণীন্দ্র পারুলকে ভালবাসিয়া ফেলিল? কিন্তু, কোথা দিয়া কেমনে যে পারুল ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়-খানি দখল করিয়া বসিয়াছে, মণীন্দ্র তাহা ত কিছুই জানিতে পারে নাই। সে ত তাহাকে বরাবর বড় স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখিয়া আসিয়াছে। তবে—হাঁ, তবে সে স্নেহটা মধ্যে মধ্যে যেন একটু মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত বটে—তাই কি? তাই কি পারুল সেই কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে নিভৃতে তাহার হৃদয়রাজ্যখানি দখল করিয়া ফেলিয়াছে? অথচ সে এত দিন মনের মধ্যে কিছুই বুঝিতে পারে নাই?

যে গোপন তন্ত্রীগুলি এত দিন হৃদয়ের কোন্ এক অন্ধকারময় প্রদেশে মুকুলিত অবস্থায় লুক্কায়িত ছিল, আজ আশু বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার তড়িৎস্পর্শে সেগুলি অকস্মাৎ আলোকময় স্থানে আসিয়া প্রস্ফুটিত হইল।

তবে পারুলও কি তাহাকে এমনই ভালবাসে?

মণীন্দ্র পারুলের প্রতিদিনকার আচার, ব্যবহার, লক্ষণ মনের মধ্যে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই গ্রীষ্মাবকাশের পর কলিকাতায় ফিরিবার দিনটাও মনে পড়িয়া গেল।

সেই তাহাকে দেখা দিবার জন্ম পারুলের ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকা—সেই পূজার বন্ধে আসিবার জন্ম অনুরোধ—মণীন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম সেই মিষ্ট মিষ্ট কথার কৈফিয়ৎ!

ভাল না বাসিলে কেউ কি অপরের মনের ভাবটুকু ধরিতে পারে? যে যাহার কথা বেশী ভাবে, সেই ত তাহার সেই ভালবাসার পাত্রের সামান্য গোপন খুটনাটিটুকুও নিজের মনের মধ্যে দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়ই ধরিয়া ফেলে, কেন না, তাহার নিজেরই যে কোনও ক্ষুদ্র ত্রুটি হইতেই তাহার অশ্রুপাত।

সে দিন পারুলের উপর মণীন্দ্রের যে একটু অভিমান হইয়াছিল, পারুল কেমন করিয়া সেটা ধরিতে পারিল?

তাহারই সামান্য কোন্ এক ত্রুটি হইতেই যে উহার উৎপত্তি, তাহাও ত সে ঠিক বুঝিয়াছিল। আর সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটুকুর জন্ম যেন কত অপরাধীর মত মণীন্দ্রের নিকট যাইয়া কৈফিয়ৎ দিবারই বা তাহার কি প্রয়োজন ছিল?

তবে ত পারুলও তাহাকে গোপনে ভালবাসে! মণীন্দ্রের সর্ব্ব-শরীরে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল।

যাহাকে ভালবাসা যায়, প্রতিদানে তাহার ভালবাসা লক্ষণে যতই প্রকাশ পাইতে থাকে, ততই প্রিয়জনের মুখ হইতে সেই ক্ষুদ্র দুইটি কথা মুখোমুখী শুনিবার একটা প্রবল বাসনা প্রণয়িমাত্রেরই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, ইহা স্বাভাবিক।

মণীন্দ্রও ভাবিল, পারুলকে কি কোনও উপায়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না? পারুল উত্তরে কি বলে, সেই কথাগুলি তাহার মুখ হইতে শুনিবার জন্ম মণীন্দ্রেরও কেমন একটা বলবতী বাসনা হইল। কিন্তু কেমন করিয়া এ কথা উত্থাপন করা যায়?

মণীন্দ্রের চিন্তাশক্তি অকস্মাৎ আশ্চর্য্য রকমে বাধা পাইল। পিছন হইতে কাহার দুইটি সুকোমল করপদ্ম নিমেষের মধ্যে আসিয়া তাহার দুই চক্ষু আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

মণীন্দ্র দুই হস্তে সেই অদৃশ্য আগন্তুকটির সুগোল মণিবন্ধ দুইটি দৃঢ় [illegible] ধরিয়া সরাইয়া তাহাকে সম্মুখদিকে আকর্ষণ করিতেই পারুল [illegible]

বলিয়া আর একটু জোরে চাপ দিতেই পারুল "উঃ হঃ" করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মুষ্টি ঈষৎ শিথিল হইয়া গেল; পারুল সেই অবসরে তাহার হাত ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "এইবার?"

মণীন্দ্র যেন একটু হতভম্বের মত হইয়া গিয়া বলিল, "আচ্ছা, আবার হাতে পাব—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া পারুল বলিয়া উঠিল, "আর ধরা দিলে ত!" বলিয়া একবার চকিতে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া আরও দুই পা পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইল।

মণীন্দ্রের একবার ইচ্ছা হইল যে, সে খপ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পারুলকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার হাত ধরিয়া 'হিড় হিড়' করিয়া টানিয়া আনিয়া তাহার চপলতার বেশ একটি কঠোর প্রতিশোধ দেয়, কিন্তু সে কথা মনে হইতেই তাহার হৃদয়খানা জুড়িয়া এমন একটা হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হইল যে, সে সহসা উঠিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া বসিয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

পারুল কিছুক্ষণ সেই ভাবে অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে মণীন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, বাবুর রাগ হ'ল না কি?" বলিয়া সে-ও নত দৃষ্টিতে টেবলের উপরিস্থিত অন্যান্য পুস্তকগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

মণীন্দ্র একটু উদাস ভাবেই যেন বলিল, "না, রাগ কেন হবে?"

মণীন্দ্র দেখিল, পারুল সেই ভাবেই পুস্তকগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। তবে ত তাহার সেই গোপন কথাটি জিজ্ঞাসা করিবার এই বেশ অবসর।

তাহার আরও মনে হইল, পারুলেরও যেন তাহাকে কিছু বলি-বার আছে, অথচ সে বলিতে পারিতেছে না। মণীন্দ্র ভাবিল, সে অগ্রে কথা পাড়িয়া তাহার এ সঙ্কোচটুকু যদি কাটাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে পারুলও হয় ত সব কথা বলিতে পারে।

মণীন্দ্র অগ্রে কি কথা পাড়িবে, তাহা মনের মধ্যে অনেক রকম ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 'মন্দ' করিয়া শেষ মুখস্থ পড়া বলার মতই কোনও রকমে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, আমি চ'লে গেলে আমার জন্তে তোর মন কেমন করবে?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের মনে মনে কেমন যেন একটা লজ্জা অনুভব করিল। পারুলের দিক হইতে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মণীন্দ্র তখন লজ্জার ভাবটাকে জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া আর একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "শুনতে পেলি না?"

"যাও।"

"বলবি না?"

"কি?"

"যা জিজ্ঞাসা করলুম!"

"তোমার করে না কি?"

"না হ'লে আর জিজ্ঞাসা করছি—"

পারুল আর কিছু বলিল না, নত মুখে মনোযোগ সহকারে বই-গুলি গুছাইতে যত্নবতী হইল।

মণীন্দ্র পুনরায় কহিল, "বলবি না?"

"আমি জানি না, যাও" বলিয়া পারুল বইগুলি ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

তবে ত মণীন্দ্রের ধারণা ঠিক। পারুল ত তাহাকে ভালবাসে; যদিও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না বটে, তথাপি মণীন্দ্র তাহার চোখে মুখে গভীর ভালবাসার পরিচয় পাইল।

কিন্তু পারুলের ত বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, শীঘ্রই ত বিবাহ

আচ্ছা, তাহার সহিত পারুলের বিবাহ হইলে কেমন হয় ? বেশ হয়, না ? মণীন্দ্র আবার ভাবিল—দূর, তা কি আর হয়, পারুল কি মনে করিবে ! আর এ কথা কি কারও কাছে বলা যায় !

তাহার বিবাহ সম্বন্ধে এক দিন তাহার মাতা-পিতার কথোপকথন সে গোপনে কতক কতক শুনিয়াছিল। পিতা বলিতেছিলেন যে, এম, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দিবেন না।

তত দিন কি আর পারুলের বিবাহ হইতে বাকী থাকিবে ? এইবার ত তাহাকে কলিকাতায় গিয়া দীর্ঘ দুইটি মাস কাটাইতে হইবে। এবার আসিয়া হয় ত শুনিবে, পারুলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে বড়দিনের কয়েক দিন বন্ধ আছে বটে ; কিন্তু সে সময় সে ত কখনও আসে না—এবার এত ঘন ঘন আসিলে সকলে হয় ত কিছু মনে করিবে।

মণীন্দ্রের কিন্তু সুযোগ মিলিয়া গেল। সে আহার করিতে বসিলে সুরবালাই এ কথা সে কথার পর তাহাকে এবার বড়দিনের ছুটীতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অন্য সময় হইলে মণীন্দ্র হয় ত হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিত—এই সামান্য কয়েক দিনের ছুটীতে এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসা তাহার পোষাইবে না ; কিন্তু এবার আর তাহা পারিল না। আসিবে নিশ্চয় জানিয়াও সে একটু অনিশ্চয়তার ভাণ করিয়া বলিল, "দেখি, যদি সুবিধা হয় ত আসতেও পারি।"

পরদিন যথাসময়ে মণীন্দ্র সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। বিদায়কালে পারুলের সেই ম্লান মুখখানি, সেই করুণ কাতর চাহনিটুকু তাহার বুকের মধ্যে বড়ই তোলপাড় করিতে লাগিল।

৫

চন্দ্রনাথবাবুর নিকট নিরাশ হইয়া ভোলানাথবাবু পারুলের জন্য আরও দুই একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটিই টিকিল না।

এক স্থানে কন্যা দেখিয়া পাত্রের পছন্দ হইল, তাহার কোনও অমত রহিল না ; কিন্তু পাত্রের অভিভাবক সেখানে 'মধুর' অভাব দেখিয়া কোনও অছিলায় পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

অপর পাত্রটি দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও তাহার বয়স 'তিনের কোটা' পার হয় নাই, সে কারণ তাহার আত্মীয়স্বজনের 'খাঁই' বড় কিছু কমিল না।

পারুলের বিপদের এইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। তাহার মণীন্দ্রদের বাটী অত ঘন ঘন যাতায়াত, মণীন্দ্রেরও তাহাদের বাটী আসা পাড়ার হিতৈষিণীদের দৃষ্টিতে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। ফলে, পারুলের উপর বেশ কড়া পাহারা রাখিতে এবং যাহাতে আর সে কোনও দিন বাড়ীর বাহির হইতে না পারে, এইরূপ একটা কিছু কঠোর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহামায়াকে সতর্ক করিয়া আসিতে তাঁহারা ভুলিলেন না।

ভোলানাথবাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন, মাঘমাসের মধ্যেই যে কোনও উপায়ে হউক পারুলের বিবাহ দিতেই হইবে।

তিনি আহার-নিদ্রা প্রায় একরূপ বন্ধ করিয়াই পাত্রান্বেষণে ব্রতী হইলেন। অগ্রহায়ণমাসও প্রায় শেষ হইতে চলিল, তিনি তবুও কোথাও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এক দিন তাঁহার কোনও হিতৈষী প্রতিবেশীর নিকট তিনি একটি পাত্রের সন্ধান পাইলেন—পাত্রটি তাঁহাদেরই পরবর্ত্তী গ্রামের প্রৌঢ় সাতকড়ি বসু।

সাতকড়ির নিজের মুখে শুনা যায় যে, সে সম্প্রতি 'চারের কোটা' অতিক্রম করিতে তাহার অধিক বিলম্ব নাই। সম্প্রতি তাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে ; দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র বর্ত্তমান। সংসারে লোকাভাব, সেই জন্য বাধ্য হইয়াই তাহাকে আবার দ্বিতীয় সংসারের আয়োজন করিতে হইতেছে। একটি সুন্দরী বয়স্থা কন্যাই সে খুঁজিতেছে ; কন্যা পছন্দ হইলে দক্ষিণান্তের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

ভোলানাথবাবু অবশেষে হতাশ হইয়া পারুলের ভবিষ্যৎ বিধাতার অদৃশ্য করে সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাতেই রাজী হইয়া পড়িলেন। সাতকড়ি সুবিধামত এক দিন গিয়া তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া আসিতে সম্মত হইল।

পারুল যখন এ কথা শুনিল, সে কোনও রকমে উদ্গত অশ্রু চাপিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া গোপনে অনেক কাঁদিল। বিধাতা তাহার কপালে শেষ এই লিখিয়াছিল ? ইহার অপেক্ষা যে মরণ মঙ্গল ছিল—তাহার মরণ হইল না কেন ?

যে দিন সাতকড়ি সাজ-গোজের পারিপাট্যে যৌবনটাকে ফিরাইয়া আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া পারুলকে দেখিতে আসিয়া মনোনীত করিয়া গেল, সে দিন আসন্ন বলিদানের নিমিত্ত পশুকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া তাহার মস্তকের উপর শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলে তাহার তখনকার অবস্থা যেরূপ হয়, পারুলের মনের অবস্থা সেইরূপই হইয়াছিল। ভোলানাথবাবু কিন্তু মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

৬

অনেক আশা ও আনন্দের উজ্জ্বল কল্পনায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া মণীন্দ্র বড়দিনের ছুটীতে বাটী আসিল।

ইতোমধ্যে যে ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছে, সে তাহার কিছুই জানিত না। কিন্তু বাটী আসিবার পরই সে বুঝিতে পারিল যে, এই অল্পদিনের মধ্যে যেন বড় রকম একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

মণীন্দ্র আজ দুই দিন হইল আসিয়াছে অথচ পারুলের কোনও সাড়া নাই কেন ? তবে কি তাহার কোনও অসুখ-বিসুখ করিল ? না, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই কিছু খবর পাইত।

মণীন্দ্র আবার ভাবিল, পারুলের বিবাহ হইয়া যায় নাই ত ? না, বিবাহ হইলেও কি সে এ কয় দিনে বাড়ীতে কিছু শুনিতে পাইত না ? হয় ত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাই সে লজ্জায় বোধ হয় আসিতে পারে না।

মণীন্দ্র অনেক রকম ভাবিল, কিন্তু স্থিরসিদ্ধান্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। অথচ পারুলের সংবাদ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে যেন কেমন একটা লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব আসিয়া তাহাকে বাধা দিতে লাগিল—কেউ হয় ত কিছু মনে করিতে পারে। অনেক ভাবিয়া মণীন্দ্র অবশেষে পারুলদের বাড়ী একবার যাওয়াই স্থির করিল। কিন্তু যাই যাই করিয়া অগ্রসর হইয়াও সে অনেকবার ফিরিয়া আসিল—এরূপ সঙ্কোচের কারণ সে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। কে জানে, কেন তাহার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার আঁধার একটু গাঢ় হইয়া আসিলে সে স্থিরসঙ্কল্প করিয়া একেবারে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

অনেক দিন পরে মণিদাকে কাছে পাইয়া কটিকের বড় আনন্দ হইল, সে তাহার সহিত নানারূপ গল্প জুড়িয়া দিল। মহামায়াও কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু যাহার আশা মণীন্দ্র প্রতি মুহূর্ত্তে করিতেছিল, সেই

মণীন্দ্র আসিবার সময় লক্ষ্য করিয়াছিল, পারুল রান্নাঘরের দাবায় বসিয়া ছিল. মণীন্দ্রের সাড়া পাইয়া সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সেই ক্ষণেকের দৃষ্টিতেই মণীন্দ্র দেখিয়া লইয়াছিল, পারুলের মূর্ত্তিখানি যেন বিষাদ-প্রতিমারই মত; তাহার সেই ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি যেন কোটরপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; কে যেন সেই চক্ষু দুইটির নিম্নে গভীর মসী লিপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই অল্পদিনের মধ্যে পারুলের দেহের কেন এ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন?

মহামায়ার কথাবার্ত্তার মধ্যে এবং তাঁহার বাহ্য আচরণেও যেন মণীন্দ্র কেমন একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে অনেকবার মনে করিয়াছিল, পারুলকে ডাকিবে, কিংবা তাহার খবর লইবে, কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার কেমন সাহসে কুলাইল না।

মহামায়া ফটিককে রান্নাঘরের ভিতর হইতে খাইতে ডাকিলেন, ফটিক উঠিয়া গেল।

মণীন্দ্রও উঠিবার সঙ্কল্প করিয়া একবার উঠানের মাঝখানে এ দিক ওদিক চাহিয়া পারুলের অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, পারুল সেই অন্ধকারের এক পাশেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মণীন্দ্রের সহিত দৃষ্টি মিলিত হইলে তাহাকে কি যেন ইঙ্গিত করিয়া বহির্দ্বারের দিকে অতি সন্তর্পণে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

মণীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়াই মহামায়াকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

ফটিক তখন ভোজনে বসিয়াছে, মহামায়া উনানে সবেমাত্র কি একটা তরকারী চড়াইয়াছেন।

মণীন্দ্র ধীরে ধীরে বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বার অতিক্রম করিতে গিয়া দেখিল, পারুল এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মণীন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া পারুল জিজ্ঞাসা করিল, "মণিদা, ভাল আছ?"

মণীন্দ্র সে কথার কোনও জবাব না দিয়া বলিল, "পারুল, তোর কি হয়েছে—বল্ দেখি?" বলিতে বলিতে পারুলের হাতখানি আপন হাতের ভিতর লইল।

পারুল বলিল, "সে অনেক কথা, বল্‌তে পারব না, এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখো" বলিয়া একখানি পত্র কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মণীন্দ্রের হাতে দিল।

মণীন্দ্র পত্রখানি হাতে লইতে লইতে বলিল, "আমি এতক্ষণ ব'সে রইলুম তোদের বাড়ী, তুই এক বারও আমার সঙ্গে দেখা করলিনি?"

কথা শেষ না হইতেই পারুল বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে বারণ—এক দিন না এক দিন তুমি আসবেই আমি জানতুম তাই চিঠিখানা লিখে রেখেছিলুম—তবে আসি মণিদা—তুমি যাও; চিঠিখানা পোড়ো!" বলিয়াই পারুল অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তাহাদের এ গোপন মিলনটুকু মহামায়া জানিতে পারিলেন না; তখনও তাঁহার রন্ধনশালা হইতে শব্দ আসিতেছিল—'চট্-পট্ চট্-পট্ চট্ পট্।'

পারুলের কথার স্বরে ও তাহার বাহ্য আচরণে মণীন্দ্রের বোধ হইল, এ যেন পারুলই নয়, তাহারই প্রেতাত্মা যেন আসিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া গেল।

৭

মণীন্দ্র বাটী আসিয়াই একেবারে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আলোটা বাড়াইয়া দিয়া সে পারুলের চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চোখের জলে ভিজিয়া অক্ষরগুলা মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হইয়া গেলেও মণীন্দ্রের পড়িতে বিশেষ কোনও কষ্ট হইল না।

চিঠিখানা পড়া শেষ হইলে মণীন্দ্র যখন সেই চিঠির উপর হইতে তাহার মুখ তুলিল, তখন তাহার মুখের ভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, কেহ দেখিলে তাহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া কিছুতেই ধারণা করিতে পারিত না।

মণীন্দ্র কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া লইল, তাহার পর চিঠিখানা পকেটে গুঁজিতে গুঁজিতে ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঝনাৎ করিয়া সদরের দরজা খুলিয়া যাওয়ার শব্দে মহামায়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে?'

আগন্তুক নিকটে আসিতে আসিতে দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি মণি, পারুল কোথা?"

মহামায়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তার শরীরটা আজ ভাল নেই, শুয়ে পড়েছে।" তাহার পর একটু আশ্চর্য্যভাবেই যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে?"

মণীন্দ্র সেইরূপ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তোমরা মানুষ না কসাই? সবাই মিলে একটা প্রাণ নিয়ে এমন ভাবে জবাই করতে বসেছ কেন? তার চেয়ে ওর গলা টিপে ত একেবারে মেরে ফেলে দিতে পারতে—তা হ'লে আর ওর বিয়ের ভাবনা ভাবতে হ'ত না—"

মণীন্দ্রের কথার ভাবে মহামায়া এতক্ষণে বুঝিলেন যে, সে হয় ত পারুলের এই বিবাহব্যাপার আগে কিছু জানিত না, এইমাত্র কোথাও শুনিয়া আসিয়াছে, তাই তিনি একটু দুঃখিতভাবেই বলিলেন, "যেমন কপাল ক'রে এসেছিল,—চেষ্টার ত কিছু ত্রুটি হ'ল না; এখন ওর বরাতে যা' আছে, তাই হবে।"

মণীন্দ্র বলিল, "কেন, এমন বিয়ে না হয়, নাই হ'ত? বিয়ে না দিলে হয় ত তোমাদের সমাজে গঞ্জনা পেতে হ'ত, কিন্তু ধ'রে বেঁধে একটা প্রাণ নিয়ে এমনই ভাবে জবাই করলে একটা মহাপাপ হয় না কি?"

মণীন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার মায়ের প্রাণে বোধ হয়, একটু ব্যথা লাগিল, তিনি ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "সাধ ক'রে কি আর কেউ নিজের পেটের মেয়েকে বলি দেয়, বাবা? আমি ত বুঝছি, আর পাঁচ জনে বুঝবে, না শুনবে? সমাজে থাকতে গেলে যে সব করতে হয়।"

মণীন্দ্র দীপ্ত স্বরে বলিল, "না হয় একঘরে হয়ে থাকতে? সমাজের চোখে পাপী হয়ে থাকলেও তা'তে ঈশ্বরের কাছে দায়ী হ'তে হ'ত না! আর সমাজের দোহাই দিয়ে মানুষ খুন করলে বোধ হয় ঈশ্বরের কাছেই মহাপাপ করা হবে!"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "এ বিয়ে হবে না!"

মহামায়া বেদনাজড়িত স্বরে বলিলেন, "এর চেয়ে ভাল আর জুটবে কোথায়, বাবা? গরীবের ঘরে কি আর ভাল মন্দ বিচার করতে গেলে চলে? তা'দের সবই সহ্য করতে হয়!"

মণীন্দ্র তেমনই দীপ্ত স্বরেই বলিল, "তোমাদের আর কিছু ভাববার দরকার নেই, সে ভার আমি নিচ্ছি!"

আনন্দের আতিশয্যে তখন মহামায়ার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তিনি হাত দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এমন বরাত কি আমার হবে, বাবা?"

তাহার পর? তাহার পর মণীন্দ্র তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। সে তাহার মাতার হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও সম্মতি গ্রহণ করিল। চন্দ্রনাথবাবুও পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।*

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূতির মা'র মহাষ্টমী



"ও ভূ'ত—ভূতি, মিন্‌ষে আজ গুলির মুখ দেখবে না, না কি? ঘোষেদের বাড়ীর ঢাকের বাদ্যি কানে যায় না?"

"বাবা ত উঠেছে।"

"বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছে বুঝি? পোড়া হুঁকোটা ভেঙ্গে ফেলে দিতে পারিস? আজ মহাষ্টমী, সে হুঁসও নেই? দাঁতে গুড় দিয়ে প'ড়ে রয়েছে—জমীদারী থেকে ভারে ভারে জিনিষ-পত্তর আসবে বোধ করি?"

গৃহিণীর এ প্রকার সাদর সম্ভাষণ নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে দিন মহাষ্টমীর সকাল-বেলাটায় চোখে-মুখে জল না দিতেই কালীতারার ওষ্ঠাধরের ভঙ্গীলাভরা তাণ্ডব নৃত্যে চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মণ্যগৌরব যেন অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, নীলকণ্ঠের একটা বড় গুণ ছিল। শিরার উষ্ণ শোণিতের খরগতি অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে তিনি শান্ত করিতে পারিতেন। এ জন্য তিনি নিজকে মনে মনে শিব তুল্য মানুষ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু কালীতারার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেন। "যে নারী স্বামিগর্ব্বে গর্ব্বিতা হয় না, তাহার জীবনই যে বৃথা! জমীদারী ত নেই-ই। সে থাকলে কপালে ফোঁটা কাটি? আর যা করি না করি, বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে হ'বেলা খাবারের সংস্থানটা মন্দ কি করি? শুধু হাতে যে রকম তালি বাজিয়ে চলেছি—কত জমীদারের তিন পুরুষের মাথা একত্র হ'তে দেখলাম—কেবল ঘুঁটের বোঝা—সার নেই—বুদ্ধির বেলা অষ্টরম্ভা! গিন্নীর সুবিচার থাকলে স্বামীর দারিদ্র্য সম্বন্ধে যাই বলুন, বুদ্ধির তারিপ অবশ্যই তিনি করতেন।" মনের আবেগে এমনই কত কি নীলকণ্ঠ ভাবিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আবার চিন্তার ধারার অভ্যস্ত পথে ফিরিয়া আসিলেন। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিলেন,—"দূর ছাই! দশ হাত কাপড়ের কাছাখোলা বুদ্ধি!—বুদ্ধি নাই বলিয়াই দুর্ব্বুদ্ধিতে চেপে ধরে—স্বামিলোকের এ সকল চোখ-কান বুজে সহ্য করাই উচিত।"

নীলকণ্ঠ হুঁকার জলটা পাল্‌টাইয়া লইলেন, এবং আগুনের মালসার কাছে পুনর্ব্বার বসিয়া কলিকাটি ঢালিয়া ফেলিয়া বাঁশের চোঙ্গা হইতে এক ছিলিম তামাক লইয়া টিপিয়া-টিপিয়া সাজিতে লাগিলেন। সম্মুখে একখানা লোহার চিমটা। একটা সরায় তামাকের গুল স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল। গুলগুলি গণিলে রাত্রিবেলা কতবার তাঁহার হুঁকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

কালীতারা উঠান ঝাঁট দিতেছিল। চক্ষু দুইটি ক্রোধে জ্বলিতেছে—কিন্তু কান দুইটি নীলকণ্ঠের ঘরের দিকে খাড়া ছিল।

হুঁকার ভড়াৎ-ভড়াৎ শব্দ কিছুক্ষণ শুনা যাইতেছে না; মিন্‌ষে কি তবে গাড়ু লইয়া বাহিরে গেল? নিরাকার পরম ব্রহ্ম হইলে সম্ভব হইত বটে। বারান্দার দ্বার ত একটা—চোখে ধূলি দিয়ে যাবে কোন্ পথে?—সে সন্দিগ্ধ হইয়া মেয়েকে ডাকিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"ভূতি, মিন্‌ষে কি হুঁকোয় জল পাল্‌টালে না কি? দড়ি জোটে না?"

মিন্‌ষে ততক্ষণে এক খণ্ড ঘুঁটের আগুন সাজা তামাকের উপর চিমটা দিয়া গুঁড়া করিয়া ফুঁ পাড়িতেছিলেন।

নীলকণ্ঠের তখন ভাবাবস্থা, প্রাণের আবেগে চক্ষু দুইটি বুজিয়া গিয়াছে। ঘোষের বাড়ীর দশভুজার প্রতিমূর্ত্তি তখন তাঁহার অন্তরে জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন,—"বাঘ-মহিষের ঘাড়ে চেপে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এই সকল সাংঘাতিক অস্ত্র যিনি হাতে ধরেছেন, তাঁর মনটাও সেই রকম উগ্র হওয়াই সম্ভব; অথচ লোক তাঁর পদতলে শির অবনত করছে; আর আমি গৃহিণীর ক্ষুর-ধার জিহ্বার নিকটে একটু নত হয়ে থাকতে পারি না?" ঠিক এমনই সময়েই গলায় দড়ি জোটাইবার কালীতারার ইঙ্গিত-বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। নীলকণ্ঠ হাই তুলিয়া—তিনটি তুড়ি দিয়া—'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিয়া গেলেন, এবং বড় বড় দম লইয়া গৃহিণীর দ্বিতীয় বারের বাক্যজ্বালা কুণ্ডলীকৃত ধূমের সহিত ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

এইরূপে কলিকাটি নিঃশেষ হইলে তিনি গাড়ু লইয়া উঠানে নামিয়া, কালীতারা ঝাঁট দিতে দিতে জঞ্জালের স্তূপ লইয়া উঠানের যে কোণটায় স্থিত হইয়াছিলেন, তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। খক্-খক্ করিয়া কয়েকবার কণ্ঠটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া তিনি বলিলেন,—"কালী, অতি সঙ্গত প্রস্তাবই তুমি করেছ। কিন্তু গত সন কোষ্ঠার দর ছিল চব্বিশ টাকা—এবার সস্তা।"

একটু ভাবিয়া আবার নীলকণ্ঠ কহিলেন,—"দড়িটা সহসা জোটাব—একটু সময় দিতে হবে, কালী! তোমার মাছের আপশোষটা মিটিয়ে দেই। নেদোকে দিয়ে কি কি মাছ ভালবাস, বরঞ্চ একটা ফর্দ্দ ক'রে রেখে দিও।"

কালীতারা দাঁত সিটকাইয়া বিকট দৃষ্টিতে এক বার স্বামীর দিকে চাহিল। বলিল,—"ওঃ! কি ভাগ্যবন্ত পুরুষ! সোনাদানা না দিক্, দু'বেলা দু'মুঠো পেট পুরে খেতে দিতে পারে না—তার আবার কথার বড়াই দেখ? সারাটা জীবন চোখ বুজেই কাটালে! ছিঃ! ছিঃ! একটু হায়া নেই!"

নীলকণ্ঠ গাড়ুটা মাটীতে রাখিয়া এক টিপ নস্য লইলেন। বলিলেন,—"ছোট জেতের ডুবুরীরা সোনা পায়—নীলকণ্ঠ চক্কোত্তি চেষ্টা করলে পায় না—এ অসম্ভব। কি জান?—সোনায় চোরের উপদ্রব বাড়ে। আর দানা,—" নীলকণ্ঠ হাসিলেন। বলিলেন,—"তা দিতে পারা যায়। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের যে হিড়িক, দানা খেতে দেখলে কে কোন্ দিন প্রয়োজনে গালে লাগাম দিয়ে আমাকে ভাগ্যহীন ক'রে বসবে। চোখ বুজে কাটালাম, এ কথাটা সত্য বল্‌লি, কালী! চোখ বুজতে ত ইচ্ছা হয়—তোমার মায়ায় পেরে উঠিনে।"

কালীতারার হাঁড়িপানা মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "ভাগ্যটা আমার নেহাৎ মন্দই বা কি! কথায় আছে, 'স্ত্রীর ভাগ্যে ধন—পুরুষের ভাগ্যে জন।' পাঁচ-পাঁচটি রত্ন কোলে ধরেছ, মেয়েও হয়েছে তিনটি—আবার একটি আসছেন। ধনের ভাগ্যটা ত আমার নয়।"

জঞ্জালে চুপড়ি বোঝাই করিয়া কালীতারা তাহা কাঁখে লইল। বলিল, "মা গো, পর্ব্বের দিন প্রাতঃকালে গায়ে প'ড়ে কি ঝগড়া এ? গাড়ু নিয়ে কোথায় যাচ্ছ—যাও না? আমার ভাগ্যের গুণে ওঁর হাতে-পায়ে পক্ষাঘাত হয়েছে—ওরে আমার মরদ রে!"

জঞ্জালের চুপড়ি লইয়া কালীতারা গৃহের পশ্চাদ্ভাগে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠও গাড়ু লইয়া বাহিরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া ভিজা গামছার দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে দেহের এক পর্দ্দা চামড়াই বুঝি তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। ভূতিকে বলিলেন, "চন্দন ঘষেছিস—দে। নামাবলী?"

ভূতি চন্দনের বাটি ও নামাবলী আনিয়া দিল। বলিল, "বাবা, আজ অষ্টমীর উপোস।"

নীলকণ্ঠ আয়না ধরিয়া ফোঁটা কাটিতে কাটিতে বলিলেন, "তাতে আপশোষ নেই। চিঁড়ে চাপাটি ঘরে আছে?"

ভূতি কহিল, "মা বলছিল, চিঁড়ে না, ময়দা গুলে খাবে। নারকেলও ঘরে নেই।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "গুড়ও নেই—দুধও নেই—কলাও নেই। স্বচ্ছলতার মধ্যে একটা হাঁড়ির বৃদ্ধি হয়েছে, দুই চোখ না মুছতেই চোখে প'ড়ে গেছে। বামুনের ছেলে—অষ্টমীর খবরটা অবশ্যই রাখি। পয়সা যে বাতাসের তালে তালে ওড়ে; গরীবের হাতে কি সহসা ধরা দেয়?" একটু থামিয়া বলিলেন, "দেখি, পক্ষাঘাতে হাত-পায়ের জোরে কত দূর কি হয়। তোমার মা বোঝেন

সব—অথচ তলিয়ে বোঝেন না। পক্ষাঘাতের খোঁটা দিলেন—পুরুষকারটা আমিও মানি—তা'তে 'আর কতটা এগোয়? পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে ঘরদশেক যজমান—, তাও গ্রামের বাইরে। তাতে কি পেট-কাপড় চলে? তোমার বাবা ভুঁড়ি দিয়ে তোমাদের রুচিমত খাদ্য দু'বেলা যা জোটাচ্ছে, পাড়ার কোন্ বেটা তা' পেয়েছে? অথচ তোমার মা'র দাঁতখিচুনী যায় না। দে—লাঠিখানা দে।"

শিখাটি দশ অঙ্গুলির দ্বারা টানিয়া টানিয়া পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া ভুঁড়িটার উপর নামাবলী দোলাইয়া কাল গণেশটির মত নীলকণ্ঠ পথে বাহির হইলেন।

২

নীলকণ্ঠের হাতে—গেঁটে পয়সার সংস্রব যত থাকুক না থাকুক, শুধু বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারাই অতি বড় শত্রুর নিকট হইতেও ছোঁ দিয়া অন্ততঃ তিনি কুটাগাছটি লইতে পারিতেন। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য অভাব-অভিযোগের মধ্যেও তাঁহার মুখখানা কখনও অন্ধকার দেখা যাইত না। লোকও তাঁহার চাতুরী বড় একটা ধরিতে পারিত না। তিনি হাসিতে হাসিতে দশ ঝুড়ি মিথ্যা বলিয়া যাইতেন, হাসিতে হাসিতে লোকের চিত্ত বর্ষার বেগবতী নদীর মত নিজের দিকে ফিরাইয়া লইতে পারিতেন এবং শুধু কথার ছন্দ ও সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লোককে অব্যাগতি দিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোন দিন সঙ্কোচ ছিল না। রাজা প্রজা সংসারে ধাপ্পাবাজ কে নহে? স্বার্থের সংঘর্ষ লইয়াই ত সংসার। রাজা-রাজড়ার আজ্ঞামাত্রই যদি আইন আর বিধি হইতে পারে, দরিদ্রের পেট চালাইবার কৌশল বা উপহসিত হইবে কেন? ইহাই ছিল নীলকণ্ঠের অন্তরের ভাব—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের চিরন্তন রূপ।

রামপ্রসাদের একটা মাতৃনাম মনে মনে ভাঁজিতে ভাঁজিতে নীলকণ্ঠ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে গোলোক বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। গোলোক জিজ্ঞাসা করিল, "সকাল সকাল সাজ-সজ্জা ক'রে কোথায় চলেছ, নীলুদা?"

নীলকণ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, "সাজ-সজ্জা আর কি? নামাবলীটা—ওটা শুব্রাহ্মণের লক্ষণ। আচ্ছা, ভায়া! পৃথিবীর মানচিত্রের পরিবর্ত্তন ত অনবরত ঘটছে। আজ যেটা জার্ম্মাণীর দখলে—কা'ল সেটা ফরাসীর; আজ ইতালীর, কা'ল আমেরিকার; আজ চীনের, কা'ল জাপানের। তোমার নীলুদার অধিকারে কি এক ছটাকও আস্‌তে নেই?"

গোলোক হাসিল। বলিল, "গায়ে নামাবলী থাকতে সে সুবিধে হবে না, নীলুদা! ওটা ত্যাগ কর। আর ফোঁটাটার পরিবর্ত্তন কর, হয় ত্রিনয়ন, নয় ত ত্রিশূল-চিহ্ন; স্থানমাহাত্ম্যে হয় ত এ দুটিতে শক্তির সঞ্চার হ'তে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন কমণ্ডলু হাতে ক'র না। তা হ'লে ঐ দুটিই আবার শুধু বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াবে। সকাল সকাল চলেছ কোথায়?"

নীলকণ্ঠ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তুমি, আমি, সবাই ত এক পথে চলেছি, নূতন খবর তোমাকে কি দেব? কেনা আর বেচা এই নিয়েই ত সংসারের লোক মসগুল। কেহ পাপ কেনে, পুণ্য বেচে; কেহ পুণ্য কেনে, পাপ বেচে। লোক যখন ব'সে কাটায়, তখনও ত মনে মনে ঐ দু'টা কায করে। এ ছাড়া ত দ্বিতীয় একটা কায নেই যে, তোমাকে সেই পরিচয় দেব?"

গোলোক বলিল, "অতটা বুঝে দেখিনি। সোজা কথায় শুনতে চেয়েছিলুম, যদি বাধা থাকে ত থাক।"

নীলকণ্ঠ এক টিপ নস্য নাকে দিয়া বলিলেন, "হুঁ, আজ মহাষ্টমী, জান না? গৃহিণীর উপবাস, নীলুদার মহাত্রাস। বালককালে ভাবতাম, পঞ্জিকায় উপবাসের সংখ্যাটা যত বেশী লেখে, তত ভাল; আমাদের গরীব লোকের সাঁঝের চালটা বেঁচে গেলে মন্দ কি! কিন্তু এমন উঁচুদরের উপবাস, তা ত সে সময় জানিনি। চিঁড়ের সঙ্গে দই - দইর সঙ্গে কলা; ময়দার সঙ্গে দুগ্ধ—দুগ্ধের সঙ্গে শর্করা। এক এক খাদ্যে বিংশ উপকরণ। চালের চারটি পয়সা বাঁচাতে চার যোলং চৌষট্টি পয়সা ব্যয়। গুপ্ত-প্রেমের এ গুপ্ত রহস্য বুঝে, কার সাধ্য?"

গোলোক হাসিয়া কহিল, "তা আর কি করবেন, দিদির ত আবার ছেলেপিলে হবে খবর পেয়েছিলুম। এ সময় জিভটা সচল হয়, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। যান, একটু ভালমত যোগাড়বন্তর ক'রে দেন যেয়ে।"

এই বলিয়া গোলোক বসু নীলকণ্ঠকে অতিক্রম করিয়া [illegible]

থামাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদু বিশ্বাসের বিধবা মেয়েটার গুটিকয়েক গাই ছিল। অনেক দিন সে পথে যাইনি। খবর-টবর রাখ কিছু?"

গোলোক বলিল, "কেন, গাই কিনবেন, না দুধের দরকার? তা অত দূর যাবেন? সে ত প্রায় এক ক্রোশের পথ।"

"না যেয়ে কি করব বল; ঢাকের বাদ্যি শুনছ না? গাঁয়ে কি আর দুধ মিলাবার জো আছে? সেখানে গেলে পেতে পারব বলতে পার?"

গোলোক বলিল, "গাই তার আছে, দুধও বেশ হয়, সকাল সকাল যান— বেচে ফেলে না দেয়।"

ঘোষেদের প্রয়োজনে গাঁয়ের দুগ্ধ একেবারে অমিল হয় নাই। রিক্ত হস্তের সন্ধানটা নূতন স্থানে অকাটা হইতে পারিবে, এই প্রত্যাশায় নীলকণ্ঠ খুঁজিয়া পাতিয়া যদু বিশ্বাসের মেয়ে মাতঙ্গিনীকে বাহির করিয়াছিলেন।

মাতঙ্গিনী তখন স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে গামছার দ্বারা চুল ঝাড়িতেছিল, এমন সময় নীলকণ্ঠ তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দন্তপংক্তি বিকাশিত করিয়া বলিলেন, "মাতু, ভাল আছ ত? গরীবের দ্বারের দিকে যে আর পা মাড়াও না! মাঝে মাঝে না দেখলে প্রাণের উৎসাহ নিভে যায়। এলে গেলে একটা সদ্ভাব থাকে। আমিও দু'একবার এসে পায়ের ধুলো দেই। না, কলিকালে বামুনের পায়ের ধুলোয় ঝাঁজ নেই?"

মাতঙ্গিনী জিভ কাটিল। তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি আঁচলে মুছিয়া দাবায় পাতিয়া বসিতে দিল। বলিল, "অমন অকল্যেণের কথা বলেন? আমার আর কল্যেণ কি, তা নয়। কিন্তু মুক্তুরদারী জেতের পরকালের ভরসাই ত আপনাদের পায়ের ধুলো।"

মাতঙ্গিনী গলবস্ত্রে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনি বসুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

সে ঘরে ঢুকিলে নীলকণ্ঠ গোয়ালঘরের দিকে দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গাই কয়টি বাঁধা আছে এবং দুগ্ধের ভরে পালান ফাটিয়া পড়িতেছে। নীলকণ্ঠের মনে ভরসা হইল; তিনি মানসদৃষ্টিতে পালানের মধ্যে দুগ্ধের সাকার রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। দাবার উপর সুমার্জ্জিত বাসনকোসনগুলি ঝক ঝক করিতেছিল। তাহার একটি বড় ঘটীর দিকে দৃষ্টি দিয়া ভাবিলেন, "ঐ ঘটীটা যদি ভর্ত্তি করিয়া দেয়, গৃহিণীর উদর ছাপাইয়া ছেলে-পুলে পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে। সকলই ভগবানের লীলা!"

মাতঙ্গিনী কাপড় ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ দিকে কায ছিল বুঝি?"

"হাঁ, একটু কায ছিল। সেটুকু সেরে যাবার বেলায় ভাবলুম, একবার মাতুর খবরটা নিয়ে যাই। কা'ল রাত্রিতে একটা অতি বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না!"

মাতঙ্গিনী উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বপ্ন—কি স্বপ্ন?"

নীলকণ্ঠ কখন চক্ষু বুজিয়া, কখন বা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "বললে বিশ্বাস করবে না, মাতু, সে অতি অদ্ভুত স্বপ্ন। আজ কত দিন তোমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই, জান ত? বোধ করি ছ'মাসের উপর হবে। কি বল? সেই ত ফাগুন মাসে একবার কচি আম নিতে তোমার বাড়ী এসেছিলাম।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "হাঁ, তার পর আপনি আর আসেন নি। দূরের পথ, একলা মানুষ, আমিও আর যেতে পারিনি।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "কি বিচিত্র স্বপ্ন! এত কাল দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অথচ তোমাকে স্বপ্ন দেখা—আশ্চর্য্য নয় কি?"

মাতঙ্গিনী পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে স্বপ্ন দেখলেন? কি দেখলেন, বলুন ত!"

"বলব বলেই ত এই পথে এলাম। গৃহিণী আসন্ন-প্রসবা, শোননি বোধ করি? তাঁর আজকাল ছেলেপুলে হবে। স্বপ্ন দেখলাম, তুমি সকাল সকাল চান ক'রে, গিন্নীর মহাষ্টমীর পারণের জন্য বড় এক ঘটী দুধ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হয়েছ! অনেক দিন তোমাকে দেখিনি, তোমার কথা মনেও নেই, অথচ এত লোক থাকতে মহাষ্টমীর দিন তুমিই কাছে এগিয়ে গেলে কি আশ্চর্য্য!" একটু থামিয়া বলিলেন, "যাই বল, মাতু, স্বপ্ন আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। কত দিন কত স্বপ্নই দেখলাম, একটাও ত সত্য হ'ল না। কিন্তু এসেই তোমাকে চান করা দেখতে পেলুম, স্বপ্নের একটা অংশ মিলে গেছে।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, "আপনি একটু বসুন, গাই ক'টা দুয়ে আনি, বাকীটাও ফ'লে যাক্।"

নীলকণ্ঠ ঘোরতর আপত্তিসূচক মাথানাড়া দিয়া বলিলেন, "না না, মাতু, অমন কায ক'রনা। এই পথে যেতে যেতে তোমার বাড়ীটা দেখেই মনে প'ড়ে গেল। তাই কৌতূহল হ'ল, মাতুকে একবার দেখেই যাই না কেন? এখন ঢুঁ মেরে সে বিশ্বাস আমার মাথায় পূরে দেবে বুঝি? কা'ল যদি স্বপ্ন দেখি, আমাদের বাগানে গাছের গোড়ায় টাকা পোতা আছে, তোমার এই চমৎকারে হয় ত সমস্ত বাগানটাই আমাকে খুঁড়তে হবে। অত সময়ও আমার নেই, শক্তিও নেই।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, "বাগান খুঁড়ে টাকা না পান, লোকসান হবে না। খোঁড়া জমীতে যে বীজটা ছড়াবেন, আয়পয় দেবে। আপনি একটু বসুন না, আমি এখনই ফিরে আসছি।" এই বলিয়া সে একটা বালতি হাতে করিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ করিল।

মাতঙ্গিনী গো-দোহন করিতে লাগিল, আর নীলকণ্ঠ মুগ্ধচিত্তে বাঁটের ধারার শব্দ শুনিতে লাগিলেন। যখন টগবগ করিয়া শব্দ বেশ জোরে জোরে পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিতে লাগিলেন, "বালতিটা পূর্ণই হ'ল দেখ্‌ছি, আমাকে বা বড় ঘটীটা পূর্ণ ক'রে না দেবে কেন?"

মাতঙ্গিনী সত্য সত্যই বড় ঘটীটা পূর্ণ করিয়া দিল। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "ভাল কায করলে না, মাতু! স্বপ্নের উপর প্রত্যয় জন্মিয়ে দিলে, এখন আমাকে এর পিছু পিছু ঘুরতে হবে।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, "স্বপ্ন ব্যর্থ হ'লে আমাকে গালি পেড়ে ঠাণ্ডা হবেন।"

নীলকণ্ঠ হাসিয়া দুই পাটি দাঁত মেলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "গালিটা কিন্তু আঁধারে পাড়ব না। তোমার এখানে এসে সামনা সামনি পেড়ে যাব। আর যদি স্বপ্নটা সত্যই হয়, অর্দ্ধেক বখরা তোমার।"

মাতঙ্গিনী কহিল, "আর যদি টাকা স্বপ্ন না দেখে দেখেন যে, সাঁড়া গাছ থেকে একটা পেত্নী নেমে এসে আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছে?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "তা হ'লেও অর্দ্ধেক বখরা তোমার। একটা ঘাড় ত খালাস পাবে। সুখের সাথী—দুঃখের সাথী হবে না কেন? যাক্, এ সম্বন্ধে আর এক দিন কথা বলব। আজ তবে উঠি, একা মানুষ, কত কি কায প'ড়ে রয়েছে।"

এই বলিয়া নীলকণ্ঠ দুধের ঘটীটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাতঙ্গিনী আর একবার পদধূলি লইল।

পথ চলিতে চলিতে বাঁকা পথে নীলকণ্ঠ একটু ঘুরিয়া চলিলেন এবং রাম সরকারের বাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম দাবায় বসিয়া কোষ্ঠা কাটিতেছিল। নীলকণ্ঠের দিকে নজর পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "অনেক দুধ সংগ্রহ করেছ দেখি, বাবাঠাকুর! কত ক'রে সের নিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "এই পরিচয় দিতে দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। একবার ভাবি, ঘাড় গুঁজে চোঁচা দৌড় দিই, ঘটাটার মায়ায় পেরে উঠছিনে। বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি, সে ভরসা নেই। একখানা পিঁড়ি দাও—হাঁপ ছাড়ি।"

রামচন্দ্র একখানা চৌকি নাড়াচাড়া করিয়া সরাইয়া দিল।

দুধের ঘটীটা নামাইয়া নীলকণ্ঠ বসিয়া পড়িলেন এবং নামাবলীর সাহায্যে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তামাক খাচ্ছ না?"

পুত্রকে ডাকিয়া রামচন্দ্র বলিল, "ওরে ভোঁদা, তামাক সেজে দিয়ে যা। একখানা কলার পাতা আন্‌বি।"

ভোঁদা আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। নীলকণ্ঠ কলার পাতার একটা নল প্রস্তুত করিয়া কানে গুঁজিলেন। ভোঁদা হুঁকার জল পাল্টাইয়া নীলকণ্ঠের হাতে দিল। নীলকণ্ঠ কয়েক বার দম টানিয়া রামের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "দুধের কথা জিজ্ঞাসা করলে,—দাঁও পেলে কেউ ছাড়ে না। পর্ব্বের গন্ধ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে? চার পয়সার জায়গায় চার পণ্ডা পয়সা সের নিলে। গলায় ছুরি দিবি ত বুকের উপর হাঁটু গেড়ে সামনাসামনি দিবি? অরাজক—অরাজক! সে রামরাজ্য কি আর আছে—রাক্ষসের রাজ্য—অন্নতে কোন শালার পেট ভর্ত্তি হয় না।"

আর কয়েক বার হুঁকাটায় টান দিয়া তিনি বলিলেন, "গরীব বামুনের কথা শুনে ত তোমার কোন লাভ নেই,

রামচন্দর ? কেবল প্রাণের দরদে খট্‌কা নেড়ে দেওয়া। একটি টাকা কোন গতিকে জোট-পাট করেছিলাম, সে ত দুধের মালিকের পায়ের তলায় রেখে এলাম। এ দিকে অষ্টমীর উপবাস। দুধ, গুড়, নারকেল, ময়দা, কলা সবই ওই একটা টাকার মধ্যে গৃহিণীর বরাদ্দ ছিল। এই চার সের দুধের কল্যাণে তা ফুঁকে গেল। আজকের দিনে ধার চাইতেও নেই। দশ মাস পেট—আমি ভিখিরী বামুন—আমি আর কি করব বল; দুধ চুমুক দিয়ে প'ড়ে থাকুক।"

রামচন্দ্র বিজ্ঞের মত বলিল, "শুধু দুধ ব'লে নয়, সকল জিনিষেরই ঐ এক দশা! এর পর মানুষে মানুষ ছিঁড়ে খাবে।"

রামচন্দ্রের এ হিতোপদেশ শুনিবার জন্য নীলকণ্ঠ থাবা গাড়িয়া বসিয়া পড়েন নাই। রামচন্দ্রের বাগানে বিস্তর নারিকেলগাছ ছিল, তিনি জানিতেন। দাবার এক কোণে দেখিলেন, ঝুনা নারিকেলও অনেকগুলি রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এত নারকেল পেড়েছ, নাড়ু করবে না কি ?"

রামচন্দ্র কহিল, "নাড়ু কিছু হবে বৈ কি! বাড়ীতে ত পূজো নেই, এ সব বিক্রী ক'রে ফেলেছি। কা'ল কতক নিয়ে গেছে—আজ বিকালে বাকী সব নিয়ে যাবে।"

নীলকণ্ঠ বেগতিক দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উঠানে দাঁড়াইয়া আর একবার অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন মনে করিলেন। কিন্তু তত কিছু করিতে হইল না। রামচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া তক্তপোষের নীচু হইতে এক জোড়া নারিকেল বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। বলিল, "গিন্নী-মা'র উপবাস—টাকাটা ত দুধের বাবদে দিয়ে এলেন। নারিকেল দুটো নিয়ে যান।"

বগলে লাঠি, এক হাতে নারিকেল ও অপর হাতে দুধের ঘটীটা লইয়া নীলকণ্ঠ টলিতে টলিতে চলিলেন। কিছু পথ চলিয়া বাজারে যাইবার এক তেমাথা রাস্তার ধারে এক গাছতলায় বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই জন কয়েক লোক বাজারে যাইবার জন্য ঝুড়ি মাথায় করিয়া আসিতেছে—তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছোট ছেলে ছিল। তাহার ঝুড়ির পরিপুষ্ট ও সুপক্ক কদলীগুলি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীলকণ্ঠ হাঁক দিয়া বলিলেন,—"ওরে ছোঁড়া, ঝুড়িটা নামা ত দেখি!"

ছেলেটি ঝুড়ি নামাইলে তাহার সঙ্গের লোক কয়টিও দাঁড়াইয়া গেল। নীলকণ্ঠ কহিলেন,—"বাঃ! এত বড় মর্তমান কলা অনেক দিন চোখে পড়ে নি। সুপুষ্ট ফল হ'লে সর্ব্বাগ্রে দেবতার ভোগ দিতে হয়—তা দিয়েছিস ত ?"

ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—"ছেলেমানুষ, জানে না কিছু; তোমরা ত বোঝ! প্রথম আর প্রধান ফলটি দেবতার ভোগে না দিলে পয়সার ঠাঁই হয় না। তোমরা ভাব বৃথা গেল! তা যায় না। গাছে চতুর্গুণ ফলে আর চারগুণ দরে বিক্রী হয়। অবশ্য প্রত্যেক কাঁদির কলাই যে দিতে হবে, তার কিছু মানে নেই। কিন্তু এমন সুপুষ্ট ফল না দিলেই যে মন খুঁৎ খুঁৎ করে।"

সঙ্গের লোক কয়টি বলিল,—"সে আমরা জানি। আমরা দিয়েও থাকি।" তাহার পর ছেলেটিকে বলিল,—"ঠাকুরমশায় কি বলছেন, বুঝেছিস ? এমন ফল ধরেছে গাছে—দেবতার নামে তোর বাপ কিছু উৎসর্গ করেছে ?"

ছেলেটি বলিল,—"না।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—"তা এখনও হাত-পথ রয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ব্রাহ্মণ এক দেবতা। ছেলে-টার ভাগ্যি ভাল, তাই ঠিক সময়েই দেখা হ'ল। আমার ত দুধের ঘটী নিয়ে কোন্ কালে চ'লে যাবার কথা; এখানে বা বিশ্রাম করতে বসব কেন ? দেবতা তুষ্ট হ'লে হয় ত সুফল ফলতে পারে, বুঝলি ছোঁড়া!"

নীলকণ্ঠ ঝুড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন, —"তোমরা হাসছ যে ? শাস্ত্র-টাস্ত্রের খবর রাখ—না শুধু কলা বেচেই বেড়াও ? ব্রাহ্মণকে গোদান, ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান এ সব শোন নি কখনও বড়লোকের বাড়ী ক্রিয়াকাণ্ডও দেখ নি ?"

তাহারা বলিল,—"সে জন্যে হাসিনি, ঠাকুর মশাই! ছেলেটা কিছুই বোঝে না; তাই হেসেছি। বামুনে আর দেবতায় কি তফাৎ আছে ?"

তাহার পর তাহারা ছেলেটিকে বলিল,—"এঁরা দেবতুল্য লোক—ঠাকুর মশায়কে কিছু দিয়ে যা; হয় ত তোর কলা বেশ দরে বিক্রী হবে।"

ছেলেটি এক ছড়া কলা হাতে লইয়া চারিটি কলা ছিঁড়িতে গেল। নীলকণ্ঠ অমনই হাঁ—হাঁ করিয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িলেন। বলিলেন,—"এ কি বেচা-কেনার যায়গা যে, ছিঁড়ে-ছুটে আধখানা ক'রে দিচ্ছিস্? দেবতার স্থান—একটু ভয় রাখিস। ছড়াটা আর ছিঁড়িস নে—ছেলেমানুষ তুই—অখণ্ড জিনিষ ভোগ দিতে হয়।"

ছেলেটি ভ্যাবাচাকা মারিয়া গেল এবং কলা ছড়াটা নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া ঝুড়ি মাথায় তুলিল।

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—"যা ছোঁড়া, কিচ্ছু ভাবিস্ নে। আমার আশীর্ব্বাদে হাসিমুখে ঘরে ফিরতে পারবি।"

ছেলেটির হাসিমুখ নীলকণ্ঠের আশীর্ব্বাদে না হউক, অষ্টমার কৃপায় হয় ত হইতে পারিবে! কিন্তু আপাততঃ সে ঝুড়িটা মাথায় লইয়া ম্লান মুখে চলিয়া গেল।

নীলকণ্ঠ নারিকেলের সহিত হাতে কলা-ছড়াটা কোন রকমে সাপটাইয়া ধরিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে চলিতে লাগিলেন। কষ্টে তাঁহার কপালের ঘর্ম্মবিন্দুগুলি একাকার হইয়া যাইতেছিল। শুধু তাঁহার সংগৃহীত অবস্থার অতিরিক্ত লোভনীয় দ্রব্যগুলির দ্বারা গৃহিণীর জলন্ত ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটি কিছু স্নিগ্ধ হইতে পারিবে ভাবিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ-কাতর অন্তরটি অনেকখানি জুড়াইয়া উঠিতেছিল।

বলির অনেক পূর্ব্বেই ঘোষেদের বাড়ী তখন বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছিল,—বোধ করি, লোক জমাইবার জন্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হিড়িকে পথ চলা দায়। কত রঙ-বেরঙের সাজ-সজ্জা। আবার কাহারও অঙ্গে বা ধড়াচূড়া—লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্রও নাই। অথচ আনাগোনা আনন্দ উৎসাহের কমতি দেখা যায় না। আগমনীর অমৃতময় রসধারায় সকলেরই প্রাণ উৎফুল্ল। তা হউক, কিন্তু দুধের ঘটটা সামলান যে দায়! ছেলেগুলা ঘাড়ের উপর পড়িবে না কি? কি মুস্কিল, তাড়া করিবারও যে উপায় নাই? মুখের কপচানিতে শুধু খিল খিল করিয়া হাসে। নীলকণ্ঠের ঘটী হইতে কয়েকবার দুধ চল্‌কাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাঁহার হুঁসিয়ার হস্ত বলিয়াই রক্ষা পাইল। যাহা হউক, হিন্দুর এত বড় একটা শুভ দিনে কাহারও বাপ-পিতামহের পিণ্ড লোপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হয় নাই—ছেলেদের দুরভিসন্ধিরও পরিচয় কিছু তিনি পান নাই, শুধু তাড়াতাড়ি দিয়া কোন গতিকে দুধের ঘটটা বাঁচাইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। উঠানে পা দিয়া ডাকিলেন,—"ভূতি—ভূতি! দুধের ঘটটা ধর। বোঝাবিড়ে নিয়ে পড়ি কি মরি! পথ কি কম! তেমনই সূয্যি দেবের কৃপা—চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে! নে—নে, ধর, হাতে-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধ'রে গেল।"

ভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাই-বোনরাও বাহির হইয়া আসিয়া নীলকণ্ঠকে খালাস করিয়া লইল। তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দাবায় উঠিয়া জলচৌকিখানার উপর বসিয়া পড়িয়া মেয়েকে বলিলেন, "পাখা দে।"

ভূতি পাখা আনিয়া দিলে নীলকণ্ঠ জোরে জোরে টানিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িবে—সে কৈ? গৃহিণীর মুখখানা কি এখনও ভারী হইয়া থাকিবে? নিঠুর চোর সাজিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়াও কি তিনি দেখিবেন না যে, কি সকল দ্রব্য আসিয়া পৌঁছিল? নীলকণ্ঠের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রাণটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

ভূতি জিজ্ঞাসা করিল, "পা ধোবার জল দেব?"

নীলকণ্ঠ শুষ্কমুখে বলিলেন, "না।"

গায়ের ঘাম মরিয়া গেল, তবুও কালীতারার সাক্ষাৎ নাই। নীলকণ্ঠ উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা কোথায়? দুর্য্যোগটা কেটেছে? শরতের মেঘ ত বেশীক্ষণ থাক্‌বার নয়। এখনও যে অনেক জিনিষ বাকী—পায়ে বল পাই কিসে?"

কালীতারা সত্য সত্যই বেড়ার ফাঁক দিয়া স্বামীর আনীত দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া লইয়াছিল এবং দুধের ঘটটা দেখিয়াই তাঁহার প্রাণের সকল কালিমা দূর হইয়া জুড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার পর স্বামীর সস্নেহ আহ্বানে ঝগড়া-ঝাটি ভুলিয়া গিয়া সে দ্বারের কাছে কবাট ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কৌটা হইতে এক তর্জ্জনী তামাকপোড়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "অনেক দুধই ত এনেছ। বেশী পথ হেঁটেছ বল্‌ছিলে—থাক্, আর কোথাও যেয়ে কাষ নেই। ভূতির আবার কলায় শুধু মিষ্টি হয় না—গুড় না হ'লে জাত যায়।"

ভূতি দাঁত খিচাইয়া কহিল, "বাঃ রে, তোমায় কানে কানে বলেছি না কি?"

গৃহিণী স্বামীর অলক্ষ্যে একটা কিল দেখাইয়া বলিলেন, "কানে কানে বল্‌বি কেন? খেতে ব'সে যে অনাছিষ্টি করিস্।"

ভূতি আর কিছু বলিল না। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "শুধু গুড় কেন, ময়দাও ত আন্‌তে হবে। দেখি—" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

৩

"শীতল, বাড়ী আছ?"

"কে—চক্কোত্তি মশায়? আসুন, প্রাতঃপেন্নাম, কি মনে ক'রে?"

"জল দাও এক গাড়ু, পা-টা ছড়িয়ে বসি। বাবা! তোমার বাড়ী আসতেই আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। জল-কাদার মধ্যে বাস কর কি ক'রে? ঘরের দোরে গগনার বাড়ী এত গুড় রয়েছে, তা রুচল না—স্বরূপ দাসের গুড় চাই। ওদের আর কি? মুখে ফরমাস্ করতে ত আটকায় না; এ দিকে আমার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে যায়। গুড় দিতে হবে যে একখানা।"

শীতল জিজ্ঞাসা করিল, "কলস?"

"হাঁ।"

"গুড়ের দর যে চ'ড়ে গেছে, চক্কোত্তি মশায়!"

নীলকণ্ঠ অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিলেন, "ট্যাঁকের কড়িও চ'ড়ে গেছে। তোমরাও হা কচ্ছ—এ দিকেও খা খা কচ্ছে। একটা সামঞ্জস্য কর—নইলে দাদা! কারও সুবিধে নেই। কত ক'রে বিকচ্ছ কলস?"

"চার টাকা।"

"চা—র—টা—কা?"

নীলকণ্ঠ শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আড়াই টাকা ছিল যে?"

"তা ছিল। পঞ্চমীর দিন হিঁদেলপুরের হাটে চার টাকা ক'রে বিক্রী হয়েছে।"

"গিছিলে না কি সে হাটে?"

"না।"

"যে-তারে কথা শোন, সে-ও একটা ভাল কথা। হিঁদেল-পুরের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের সম্পর্ক কি? এ দাঁতখামুটি একাই কি তুমি এঁটেছ?"

"না চক্কোত্তি মশাই! এ গাঁয়ের সবাই যে খবর পেয়েছে—আর সেই দরেই বিকচ্ছে।"

নীলকণ্ঠ মুখখানা বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ্! আমি ত আড়াইটে টাকা ট্যাঁকে গুঁজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম পাড়ছিলাম যে, শীতলের কাছে গেলেই গুড় একখানা পাব। অষ্টমীর উপবাস—বেলা এতটা হ'ল - এখন কি করি বল ত? ছাপোষা মানুষ আমরা, পাঁচ টাকার যায়গায় দশ টাকা চাইলে তখনই-তখনই ত টাকা গজিয়ে ওঠে না?"

শীতল বলিল, "তা আপনি একখানা ভাঁড় গুড় নিয়ে যান, দেড় টাকায় পাবেন।"

নীলকণ্ঠের ট্যাঁকে দেড় টাকা কি দেড়টা কড়িও ছিল না। শীতল গুড়ের দর চড়াইলে তাঁহার ট্যাঁকের কড়িও কমিত। যাহা হউক, তিনি কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, "শীতল, আমার বাড়ীর অবস্থা জান না, এক ভাঁড় গুড় এক বেলাতেই ফুঁকে দেবে। আয়-পয় না দিলে আমরা গরীব লোক কি বাঁচতে পারি? আড়াইটে টাকার উপর আর দেড়টা টাকা জোগাড় ক'রে তোমার কাছ থেকেই এক কলস গুড় নিয়ে যাব। তোমার বাবা ডাকসেটে গাছী ছিল। স্বরূপ দাসের গুড় নয় ত—মিছরীর দানা! বাবার হাতখানা পেয়েছ ত? ফলেন পরিচীয়তে—খেলেই বুঝতে পারা যাবে। এত বেলায় আর যাই বা কোথায়? আর গেলেই বা কি ফল হবে? সম্বল ত এই আড়াইটে টাকা! তুমি দাদা, বরং এক কায কর বাটিতে ক'রে এক খাম্‌চা গুড় দাও—আজকের এ মুস্কিলের আসান ত হোক্, শেষে কা'ল নাগাদ গুড় এক কলস নিয়ে যাওয়া যাবে।"

শীতল আর কি করিবে—ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। নীলকণ্ঠ বাহির হইতে হাঁক দিয়া বলিলেন, "ভিক্ষের ধন ব'লে যেন ঝোলা-মালা দিও না। আর বাটিটা একটু বড় সড় দিও—ছেলে-পুলে রয়েছে। স্বরূপ থাকতে গুড়ের ভাবনা বড় একটা আমার ছিল না। সেকেলে মানুষের নজরটাও বা কি উঁচু ছিল। বাপের ধারাটা রেখো বুঝলে শীতল! সংসারে নামটাই সার বস্তু। তোমার বাবা চ'লে গেছেন—তাঁর নামটা এখনও আমরা পাঁচ জনে করছি। পয়সা-কড়ি কিছু না—বুঝলে শীতল! চোখ বুজলেই অন্ধকার!"

এত কথার পরে শীতল যাহা আনিয়া দিল, তাহাতে নীলকণ্ঠের প্রাণও শীতল হইল। বড় বগুনা-বাটির এক বাটি গুড় লইয়া—নীলকণ্ঠ গৃহে ফিরিলেন।

এখন ময়দাটা বাকী—দোকানের সামগ্রী। এ গৃহস্থ-বাড়ী নয়—এখানকার পরিচয়টা কিছু গম্ভীর। ফেল কড়ি, মাখ তেল। যাহা হউক, নীলকণ্ঠ হতাশ হইলেন না। 'দুর্গে শ্রীহরি' বলিয়া লাঠি হাতে পুনর্ব্বার তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

নীলকণ্ঠ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,—ময়দার পয়সাটা অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু আজ ত হাত-গাঁট সবই শূন্য। কার দ্বারে যাই, সে লক্ষ্যও শূন্য। নীলকণ্ঠের একটা গানের পদ মনে পড়িয়া কিছু সাহস জন্মিল। "মাতুর কাছে দুধ—রামচন্দ্রের কাছে নারকেল—শীতলের কাছে গুড়—এ সকল পাবার বেশীক্ষণ আগেও ত ভাবিনি যে, কার কাছে পাব। কবি ঠিকই গেয়েছেন,—

'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে।'

দেখি পা-দুখানা কোন্ পথে যায়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নীলকণ্ঠ নন্দ মুদীর দোকানের সম্মুখভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতে হাঁক দিলেন, "নন্দলাল, তামাক খাচ্ছ না কি ?"

ঘরের মধ্য হইতে আহ্বান আসিল, "আসুন, দাদা, সাজাই আছে।"

নীলকণ্ঠ দাবার উপর উঠিয়া চোকাঠের উপর কাচে বাঁধাই একখানা লেখার উপর—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। ট্যাঁক হইতে চশমার খাপটা বাহির করিয়া—চশমা জোড়া নাকে পরিলেন। পড়িয়া দেখিলেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"ধারের জন্য অনুরোধ করিবেন না।"

নীলকণ্ঠ চশমা জোড়া পুনর্ব্বার খাপের মধ্যে পূরিতে পূরিতে বলিলেন, "আসব কি—দোরের গোড়ায় যে টিকিট লটকিয়েছ, ঘরে ঢুকতেই যে ভয় পাই।" ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কৈ, তামাক দাও।"

নন্দলাল ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকাটি বসাইয়া দিল।

নীলকণ্ঠ চক্ষু বুজিয়া টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোরের মাথার ও অক্ষরখানি কি গরীবদের জন্য ?"

নন্দলাল হাসিয়া বলিল, "কেন ?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "তা বৈ কি! ঘোষেদের প্যারী বাবু যদি এসে বলেন,—'এক টিন তেল দাও।' আর তা' মুটের মাথায় নিয়ে স্বচ্ছন্দে চ'লে যান ত জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না,—'বাবু, টাকা ?' আর আমি যদি এক সের নুণ মেপে নিয়ে বলি,—'দাদা, পয়সাটা কা'ল দেব।' তা হ'লে দশের সামনে আমার আঁচল থেকে ঢেলে নিয়ে হয় ত আমাকে হতমানী ক'রে বসবে। কেমন—কথাটা সত্যি কি না ?"

নন্দলাল আমতা আমতা করিয়া বলিল, "সত্য হ'লেও বড়লোকের টাকাটা মারা যায় না।"

নীলকণ্ঠ ধূম উদ্গিরণ করিয়া বলিলেন, "কে বলেছে তোমাকে ? সবে ত আষাঢ়মাসে দোকান খুলেছ—আজও পাকতে পার নি ? মারা যেতে বড়লোকের টাকাই যায়। ছোটলোকের,—পথে ঘাটে মাঠে তাগাদা—শালা বাঞ্চোত গালিগালাজ—শেষের অস্ত্র,—গলায় গামছা। এতে কি টাকা অনাদায় থাকে ? আর বড়লোকের বাড়ীতে ঢোকাই দায়। যদি বা দ্বারবানজীর কৃপা হ'ল, বাবুর সাক্ষাতের সময়ের অভাব। সাক্ষাৎ হ'লে লম্বা ওয়াদা; কড়া তাগিদ করলে—গলাধাক্কা। তার পর নালিশ-ফরেদ ক'রে পয়সা খরচ ক'রে যদি বাবুর সঙ্গে টাল সামলাতে পারলে আর ডিক্রী পেলে ত কতক ভাল, নচেৎ ঐ পর্য্যন্ত। ও-সব লটকা-লটকি তুলে ফেল। লোক বুঝে ধার দাও, তা বড় কি আর ছোট কি! দেবার চারা আছে—ইচ্ছে নেই, এ সকল পায়দ ছেঁচড়া লোক বড়লোকের ভিতরেই বেশী পাবে। কি রকম তামাক দিলে ? সাম্বুকে কি ? অম্বুরী তামাক ? ও-বুঝি কেবল বিক্রীই কর ? মহাপ্রাণীকে এক আধ ছিলুম দিও।" একটু থামিয়া বলিলেন, "সে দিন পথে তোমার ছেলেটিকে দেখলাম। ছেলে নয় ত—হীরের টুকরা। ওর কপালখানা সোজা নয়—নন্দলাল ? তুমি মুদীর দোকান খুলেছ—ও খুলবে জহরতের দোকান। আমি বেশ ধ'রে ধ'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছি। ওর জন্যে পেটে দড়ি দিচ্ছ ? আঃ! আমার কপাল! ও নিজের ভাত-কাপড় নিজেই গোছাবে—যদি বেঁচে থাও—দেখতে পাবে।"

নন্দলাল বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ। কলকেটা দিন—সাম্বুক থেকে এক ছিলিম সাজি।"

নন্দলাল তামাক সাজিতে বসিল। নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘড়ীতে কটা বাজল দেখ ত ?"

বড় একটা ক্লক ঘড়ী দেওয়ালের গায়ে টিক্ টিক্ করিতেছিল। নন্দলাল দেখিয়া বলিল, "বারটা।"

"বা—র—টা ?" চক্ষু দুট ঠিক্‌রাইয়া নীলকণ্ঠ বলিলেন, "অম্বুরী তামাক মাথায় থাক্—আমি উঠলাম, নন্দলাল! দোকানের জিনিষপত্তর যায় নি—আজ আবার উপবাস—গিন্নী হয় ত এতক্ষণ ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিলেন। এতটা বেলা হয়েছে, বুঝতে ত পারি নি। এখন বাড়ী থেকে পয়সা এনে সওদা কো'র্‌ব—জয় দুর্গে।"

নীলকণ্ঠ চৌকাঠের বাহিরে এক পা দিলেন। আবার টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভাবছি কি—ময়দাটা হাতে করেই যাই। গেরস্থ ঘরে আর যা আছে, এ বেলাটা চ'লে যাবে'খন। মেপে দাও ত এক সের ময়দা—হাঙ্গামাটা চুকে যাক্।"

নন্দলাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "পয়সা ?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "ঐ ত রোগ তোমাদের। এতক্ষণ শুনলে কি ? বেলা বারটা যদি না শুনিয়ে দিতে, এখুনি ত পয়সা এনে জিনিষ নিয়ে যেতাম। বুড়োমানুষকে কষ্ট দিতে চাও—বল, না হয় খেতে শুতে বিকেলই হয়ে যাবে।"

নন্দলাল বলিল, "ময়দা দেব না ত বলি নি। পয়সাটা পৌঁছে দেবেন।"

এই বলিয়া সে ময়দা মাপিয়া ঠোঙ্গাটা আনিয়া নীলকণ্ঠের হাতে দিল। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "অম্বুরী তামাকটা আর বৃথা যায় কেন ? আগুন তোল। একটু তেল দাও, মাথায় দিয়ে তেল-তামাক ক'রে যাই।"

তেল-তামাক করিয়া ময়দার ঠোঙ্গাটি হাতে লইয়া নীলকণ্ঠ বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে পর পর তিনটি পুষ্করিণী পড়িলেও তিনি স্নান সারিয়া লইলেন না। কি জানি, অতিরিক্ত বেলার দরুণ কালীতারা যদি আবার চোখে তারা দেখায়। তিনি এক রকম ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ভূতির হাতে ময়দাগুলি দিয়া বলিলেন, "বেলা অতিরিক্ত হয়েছে। তোরা মেখে-জুকে খেয়ে নে। তোর মা যেন আমার জন্যে অপেক্ষা না করেন। আমার স্নান-আহ্নিক সারতে দেরী হবে।"

এই বলিয়া নামাবলীখানা ভূতির হাতে দিয়া গাড়ু-গামছা লইয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। বড় একটা দায় উদ্ধার হইলে লোক যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে, তাঁহার মনটা তেমনই হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। তিনি কোমর-জলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আহ্নিক করিলেন। সকালবেলাকার সমস্ত ব্যাপারটা মনে উঠিতে তাঁহার মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় উঠানে পা দিয়াই তিনি বিস্তৃত নেত্রে কান দুটি খাড়া করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ভূতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ভূতি, ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কি রে ?"

রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া ভূতি বলিল, "আমার একটা ভাই হয়েছে।"

চক্ষু দুইটি কপালে তুলিয়া নীলকণ্ঠ বলিলেন, "অ্যাঁ—বলিস্ কি রে ? ময়দা-গোলাটা খেতে পেরেছে ?"

ভূতি বলিল, "খেতে আর পারলেন কৈ ?—শুনতে শুনতেই ত ব্যথা ধরল।"

নীলকণ্ঠ ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তাই ত! আজ মহাষ্টমীর দিনে এ জোচ্চুরি-বাটপাড়ি—এত যোগাড়-যন্তর—তাও তোমার ভাগ্যে নেই! পুরুষের ভাগ্যে জল—সেইটাই সত্য হ'য়ে গেল!"

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত



নবম পরিচ্ছেদ

শত্রু-কবলে

কালনকির পীড়াপীড়িতে রেবেকা কোহেন যখন তাহার নিকট প্রকাশ করিল, সে অন্যের বিবাহিতা পত্নী, তখন কালনকির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল ; সে স্তম্ভিত-ভাবে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রেবেকাও তাহার জীবনের এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিল।

দুই তিন মিনিট পরে কালনকি প্রকৃতিস্থ হইল; সে রেবেকাকে তীব্র স্বরে বলিল, "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

রেবেকা কালনকির মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "ধন্যবাদ !"

কালনকি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। তুমি আমাকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিলে।"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি, তাহা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা।"

কালনকি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কবে তোমার বিবাহ হইয়াছিল, শুনি ? কাহার সঙ্গে ?"

কালনকির ব্যবহারে রেবেকা অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছিল, তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল ; সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ইহা আমার নিজের ঘরোয়া ব্যাপার।"

কালনকি বলিল, "হইতে পারে, কিন্তু আমার তাহা শুনিবার অধিকার আছে। তুমি মিথ্যা আশা দিয়া দীর্ঘকাল হইতে আমাকে ভুলাইয়া আসিয়াছ, এখন একটা নূতন মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে নিরাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ !"

রেবেকা বলিল, "আমি কোনও দিন তোমাকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করি নাই, এখনও মিথ্যা কথা বলি নাই।"

কালনকি বিকৃত স্বরে বলিল, "হাঁ, তুমি নিশ্চয়ই বলিয়াছ। কোন্ সময় কাহার সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে, জানিতে চাই।"

রেবেকা বলিল, "তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি ! তুমি কি তোমার পরিচারিকার সঙ্গে কথা কহিতেছ ? আমি কি তোমার দাসী ? তুমি সম্মানের সহিত কথা না বলিলে আমি তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর করিব না।"

রেবেকার কথায় কালনকি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তোমারও যে বড়ই স্পর্দ্ধা দেখিতেছি ! তুমি আমার দাসী নহ বটে, কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত মুঠায় পুরিয়াছি, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই ? এই মুহূর্ত্তে যাহাকে টিপিয়া মারিতে পারি, তাহার এত স্পর্দ্ধা ! হাঁ, ইচ্ছা করিলেই আমি তোমাকে চূর্ণ করিতে পারি।" সে উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রেবেকার মুখের উপর আন্দোলিত করিল।

রেবেকা কালনকির ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল, তাহার পর অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলিল, "কালনকি, তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, তোমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে ; তুমি কি মাতাল হইয়াছ ? একটু আগে তুমি সদয়ভাবে কথা বলিতেছিলে, আমার প্রণয়লাভের চেষ্টা করিতেছিলে ; কিন্তু এখন তুমি আমার প্রতি যে আচরণ করিতেছ, কেহ মহাশত্রুর প্রতিও সেরূপ আচরণ করে না ; দারুণ ক্ষতি করিলেও ও রকম নির্ম্মম ব্যবহার করে না। এই রকম জঘন্য তোমার প্রবৃত্তি, অথচ তুমি ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছ, আমাকে তুমি ভালবাস !"

কালনকি বলিল, "তুমি আমার ক্ষতি করিতে বাকী রাখিয়াছ কি ? নির্লজ্জের মত এত দিন আমাকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছ, ইহাতে কি আমার ক্ষতি হয় নাই ?"

রেবেকা বলিল, "কিরূপে তোমাকে প্রতারিত করিয়াছি, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার ?"

কালনকি বলিল, "কিরূপে, তাহাও আবার বলিয়া দিতে হইবে ?"

রেবেকা।—হাঁ, তাহা তোমার কাছে শুনিতে চাই; আমি ত জানি, আমি তোমার সহিত প্রতারণা করি নাই।"

কালনকি।—প্রতারণা করিয়া এখন অস্বীকার করিতেছ ? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই! তুমি কপট প্রেমের অভিনয়ে আমাকে ভুলাইয়া—

রেবেকা বাধা দিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা!"

কালনকি সক্রোধে বলিল, "আমার কথায় বাধা দিও না। আমার কথা সত্য; তুমি আমাকে এ ভাবে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছ যে, আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, কোন দিন আমি তোমাকে লাভ করিতে পারিব।"

রেবেকা।—তোমার ঐরূপ বিশ্বাসের জন্য আমি দায়ী নহি। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমাদের বিবাহে একটা প্রকাণ্ড বাধা বর্ত্তমান, সেই বাধা অতিক্রম করা আমার অসাধ্য।

কালনকি।—হাঁ, প্রথমে ঐ ভাবের কথাই বলিয়াছিলে বটে, কিন্তু শেষে যখন দেখিলে, আমাকে বশীভূত করিতে না পারিলে তোমার কার্য্যোদ্ধার হয় না, তখন আকাশের চাঁদ পাড়িয়া আমার হাতে দিয়াছিলে! স্পষ্ট বলিয়াছিলে, বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব না হইতেও পারে। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যত দিন আমার সহায়তা তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল, তত দিন তুমি এইরূপ কপটতার—এইরূপ ছলনার সাহায্যে তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতেছিলে।

রেবেকা।—তোমার সাহায্যে আমার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ?

কালনকি।—তুমি কি তাহা জান না? না, কার্য্যোদ্ধারের পর সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে। তোমার অনুরোধে আমি জীবন বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই; আমার ভাই গবর্মেণ্টের অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, তাহাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার পাপে লিপ্ত করিয়াছি। তাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছি। এই সকল অন্যায় কায করিয়াছি কেন? কোন্ আশায়? তুমি যাহার প্রণয়ে অন্ধ, সেই নরাধমকে মুক্তিদানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে কি তাহার জীবনরক্ষার সাধু সঙ্কল্পে? না ভবিষ্যতে তোমাকে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিব, এই দুরাশায়? তোমার প্রণয়ীকে মুক্তিদান করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

রেবেকা।—আমার প্রণয়ী? মিথ্যা কথা! জোসেফ কুরেট আমার প্রণয়ী নহে।

কালনকি।—ও কথা তুমি হাজার বার অস্বীকার করিতে পার, আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতে পার, কিন্তু তুমি তাহার প্রতি অনুরক্ত, ইহা তোমার ব্যবহারেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার এরূপ আগ্রহের কারণ কি? জোসেফ কুরেটকে মুক্তিদানের জন্য তুমি কি যথাসাধ্য চেষ্টা কর নাই? তুমি আমাকে আশা দিয়াছিলে, যদি আমি জোসেফ কুরেটের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে; যদি ইহা সত্যই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ও কথা বলিয়া কেন আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলে? এইরূপ কপট ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? আমার সাহায্য ভিন্ন তোমার প্রণয়ী মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না বুঝিয়াই কি আমার সাহায্যলাভের আশায় মিথ্যা কথায় আমাকে প্রলুব্ধ কর নাই? তুমি মনে করিয়াছিলে, আমি মূর্খ, তোমার মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তোমার আবদার পূর্ণ করিব।

কালনকির এই তীব্র তিরস্কার সুতীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় রেবেকার মর্ম্ম ভেদ করিল; ক্রোধে, ক্ষোভে অধীর হইয়া সে কাঁপিতে লাগিল। কালনকির ন্যায় ইতর নরাধমকে মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইল। সে কার্য্যোদ্ধারের জন্য কালনকির সহিত শঠতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিল, মিথ্যা আশায় তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিল, কিন্তু সে জন্য এত শীঘ্র তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে, ক্রোধান্ধ কালনকি তাহার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে চূর্ণ করিবার

চেষ্টা করিবে, তাহার পিতার এক জন সামান্য ভৃত্য তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধাভরে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবে—ইহা সে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। রেবেকা তাহার অসংযত হৃদয়াবেগের অনুসরণ করিয়া যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় সে আতঙ্কে অভিভূত হইল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল।

রেবেকাকে নিঃশব্দে রোদন করিতে দেখিয়া কালনকি নীরস স্বরে বলিল, "আমি বুঝিয়াছি, আমাকে প্রতারিত করিয়া এখন তোমার অনুতাপ হইয়াছে। বিবেকের দংশনে তুমি কাতর হইয়াছ। তোমার এই অন্তর্যাতনার পরিচয় পাইয়া আমি আনন্দিত হইলাম। কিন্তু যদি তুমি আশা করিয়া থাক, তোমার অশ্রুবর্ষণে আমার হৃদয় আর্দ্র হইবে—আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইবে—তাহা হইলে স্বীকার করিব—এখনও তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই। তোমার কপটতায় আমি আর ভুলিব না।"

কালনকির কথায় রেবেকা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, সে সংযম হারাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কাপুরুষ তুমি, পশুর অধম তুমি, তুমি মনে করিয়াছ, আমি সম্পূর্ণ অসহায়, তোমার অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই; এই জন্যই তুমি এ ভাবে আমার অপমান করিতে সাহসী হইয়াছ। তুমি ভদ্রলোক হইলে আত্মরক্ষায় অসমর্থা নারীর প্রতি উৎপীড়ন করিতে তোমার লজ্জা হইত।"

কালনকি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি এখন অসহায়, কারণ, যে তোমার ইজ্জৎ রক্ষা করিতে পারিত, তোমার সেই সাহসী প্রণয়ী এখন সাইবেরিয়ায়। সে এখানে থাকিলে তুমি তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিতে; কিন্তু এখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই।"

রেবেকা আরক্তিম মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, "সে আমার প্রণয়ী নহে; কিন্তু সে যাহাই হউক, তুমি কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও নাই। তাহার ন্যায় সাধুপ্রকৃতি প্রভুভক্ত যুবকের প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল, এই জন্য আমি আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিয়াও তোমার মত ইতর ভণ্ডের সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়াছিলাম।"

কালনকি বলিল, "তাহাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ বলিয়াই তাহার প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে, তাহা কি আমি জানি না?"

রেবেকা।—নির্লজ্জের মত তুমি পুনঃ পুনঃ মিথ্যা কথা বলিতেছ। সে আমার প্রণয়ী নহে, নহে, নহে; এক কথা আর কতবার বলিব? তোমাকে যেমন বলিতেছি, সেইরূপ তাহাকেও বলিয়াছিলাম, সে যদি আমার প্রণয়লাভের আশা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, আমি অন্যের পত্নী।

কালনকি হঠাৎ রেবেকার হাত চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "তুমি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, এ কথা তাহার নিকট স্বীকার করিয়াছিলে?"

রেবেকা সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "না।"

কালনকি।—এ কথা তাহার নিকট না বলিবার কারণ কি?

রেবেকা।—তাহা প্রকাশ করিতে বাধা ছিল; তোমার নিকটেও সে কথা সহজে প্রকাশ করি নাই।

কালনকি।—কিন্তু শেষে ত আমাকে তাহা বলিয়াছ। আমাকে ও কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? জোসেফ কুরেট তোমার প্রণয়ভাজন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; তুমি অবাধে তাহাকে প্রেমের অভিনয় করিতে দিয়াছিলে; অথচ তুমি অন্যের স্ত্রী, এ কথা তখন অবশ্যই তোমার স্মরণ ছিল। বিবাহিতা নারীর কি পরপুরুষের প্রেমনিবেদন প্রার্থনীয়?

রেবেকা অধীরভাবে বলিল, "আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, তোমার কথা সত্য নহে। জোসেফ কুরেট আমার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরুৎসাহ করিয়াছিলাম, দুরাশা ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। আমি অন্যের বিবাহিতা পত্নী, এ কথা তাহার নিকট প্রকাশ না করিলেও তাহাকে বলিয়াছিলাম, তাহাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং ভালবাসার কথা সে যেন আমাকে আর কখন না বলে।"

কালনকি।—কিন্তু সে তোমার উপদেশ নিশ্চয়ই গ্রাহ্য

করে নাই ; উপদেশ দিয়া কাহারও প্রেমব্যাধি আরোগ্য করা যায় না। সে তোমার আশা ত্যাগ করে নাই। আমিও তোমার আশা ত্যাগ করি নাই। তুমি অন্যের বিবাহিত পত্নী, এ কথা সত্য হইতেও পারে ; কিন্তু অন্যের বিবাহিতা পত্নী পরপুরুষকেও ভালবাসে, একাধিক প্রণয়ীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিবাহ নারীর দেহের ও মনের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে, সেই বিবাহ কুসংস্কার।

রেবেকা।—তুমি যে নারীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে তাহার শত প্রণয়ীর সহিত প্রেমলীলা করিতে দেখিয়া তোমার স্ত্রীর সেই অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার জন্য গৌরব অনুভব করিও ; কিন্তু তোমার মত পশুর এই সকল জঘন্য কথা শ্রবণ করা আমি অপমানজনক মনে করি। তোমার মুখদর্শন করিতে আমার ঘৃণা হইতেছে, আমি চলিলাম।

রেবেকা সেই কক্ষ ত্যাগের জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কালনকি তাহাকে বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "শোন রেবেকা, আমার সকল কথা এখনও শেষ হয় নাই। তুমি বলিয়াছ, তুমি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী ; তুমি বোধ হয় আশা করিয়াছ, তোমার এ কথা আমি বিশ্বাস করিয়াছি।"

রেবেকা।—আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। আমার তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই।

কালনকি।—কিন্তু তোমার স্বামী কোথায়? তোমার বিবাহের কথা সকলের নিকট গোপন রাখিবারই বা কারণ কি? তোমার বিবাহ হইয়াছে এ কথা এখানে কেহই জানে না।

রেবেকা।—তোমার কৌতূহল পূর্ণ করা আমি অনাবশ্যক মনে করি। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব না। আমার পারিবারিক সংবাদ শুনিবার তোমার কি অধিকার?

রেবেকা কালনকির ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত না হইলে বুঝিতে পারিত, তাহার এইরূপ উদ্ধত ব্যবহারে তাহার লাভ নাই, অথচ ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তখন তাহাদের ভাগ্যসূত্র কালনকির করধৃত। কালনকির বন্ধুত্বই তখন তাহাদের প্রার্থনীয়।

কালনকি রেবেকার স্পর্দ্ধিত উক্তি শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি স্বীকার করি, তোমাদের পারিবারিক সংবাদ শুনিবার অধিকার আমার নাই। উত্তম, তাহা জানিবার জন্য আমি আর আগ্রহ প্রকাশ করিব না। কিন্তু মনে করিও না—ও কথা আমার নিকট গোপন করিলেই নিরাপদ হইতে পারিবে। তোমার শঠতা বুঝিতে না পারিয়া আমি বড়ই গর্হিত কায করিয়াছি ; যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি তোমার প্রণয়ীর মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমার ভ্রম দূর হইয়াছে ; তোমার প্রণয়ী যাহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারে,—সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, কিন্তু যদি আমার উপদেশে আমার ভ্রাতা তাহাকে মুক্তি দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করা বোধ হয় একটু কঠিন হইবে। তুমি বোধ হয় আশা করিয়াছ—সে দেশান্তরে পলায়ন করিয়া তোমাকে গোপনে সংবাদ পাঠাইবে ; তখন তুমি তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার প্রেম-তরঙ্গে তোমার যৌবন-তরী ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু তোমার সে আশা পূর্ণ হইবে না ; আমাকে প্রতারিত করিয়া তুমি জয় লাভ করিতে পারিবে না। তুমি জান, আমি তোমাকে আমার মুঠায় পুরিয়াছি, তোমার স্বাক্ষরিত যে একরারনামা আমার হাতে আছে—তাহা—"

রেবেকা সভয়ে বলিল, "তাহা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা নিশ্চয়ই তুমি সঙ্গত মনে করিবে না।"

কালনকি মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "সঙ্গত মনে করিব না? কেন, অসঙ্গত মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? তুমি আমার সহিত কপটাচরণ করিবে, আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া তোমার প্রণয়ীকে মুক্ত করিয়াছ এখন গোপনে তাহার সহিত মিলিত হইয়া প্রেমলীলা করিবে, নির্ব্বোধ বলিয়া আমাকে উপহাস করিবে,—আর তোমাদের যে মৃত্যুবাণ আমার সিন্দুকে আবদ্ধ আছে, তোমাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিব না, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? সেই একরারনামার সাহায্যে আমি তোমাদের সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত করিব। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম ; আমার আদেশ পালন করিলে ভবিষ্যতে হয় ত সঙ্গী হইতে, তোমার বৃদ্ধ পিতার [illegible]

শান্তিতেই অতিবাহিত হইত। কিন্তু সে পথ তুমি স্বেচ্ছায় বন্ধ করিয়াছ। বেশ, তাহাই হউক, আমি কি করিতে পারি, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

কালনকির কথা শুনিয়া রেবেকা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিল, সে আতঙ্কে অভিভূত হইল। সে বুঝিল, সেই একরারনামাখানি গবর্মেণ্টের হস্তগত হইলেই নিহিলিষ্ট বলিয়া তাহাকে ও তাহার পিতাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইবে। তাহারা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইবে। হয় ত তাহার বৃদ্ধ পিতার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে। রেবেকা আর ভাবিতে পারিল না, ঘর্ম্ম-ধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল।

রেবেকা কাতরভাবে কালনকির মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "দয়া কর, আমার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা কর। আমি নিজের মন না বুঝিয়া মিথ্যা আশায় তোমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলাম; অন্যায় করিয়াছিলাম—আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। আমার বয়স অল্প, কিন্তু এই বয়সেই আমার সকল আশা, সকল কামনা ব্যর্থ হইয়াছে। এক নরপিশাচের শঠতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় আমার জীবন অভিশপ্ত ও বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়াছে। আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে। আমি নিশি-দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; ইহার উপর আর আমার সর্ব্বনাশ করিও না। অভাগিনীর অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে দয়া কর।"

কালনকি বলিল, "তোমাকে দয়া করিতে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু আমার শত্রু জোসেফ কুরেটের পক্ষপাতিনী হইয়া এবং আমাকে প্রতারিত করিয়া তুমি আমার দয়ার প্রস্রবণ শুষ্ক করিয়াছ।"

রেবেকা ক্ষীণ স্বরে বলিল, "দয়া করিতে না পার, আমার ব্যবহার ভুলিয়া যাও, আমার অনিষ্টচেষ্টায় বিরত হও।"

কালনকি বলিল, "তাহাই যদি করি, তাহা হইলে আর দয়াপ্রদর্শনের বাকী থাকিল কি? তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়াছ, তাহার বিনিময়ে আমার কি দাবী করিবার কিছুই নাই?"

রেবেকা বলিল, "অর্থ চাও? বল, কত টাকা পাইলে তোমার আক্ষেপ দূর হইবে; আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিব।"

কালনকি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি অর্থের প্রার্থী নহি। তোমার পিতার সমগ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও সেই অর্থ দ্বারা আমাকে বশীভূত করিতে পারিবে না।"

রেবেকা হতাশভাবে বলিল, "তবে আর কি দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব?"

কালনকি বলিল, "তোমাকে; তোমাকে লাভ করিতে পারিলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবে।"

রেবেকা বলিল, "কিন্তু আমি ত বলিয়াছি, তোমার এই আশা পূর্ণ হইবার নহে; আমি অন্যের বিবাহিতা পত্নী।"

কালনকি বলিল, "স্বীকার করিলাম, তুমি অন্যের বিবাহিতা পত্নী, কিন্তু তুমি অনায়াসেই আমার উপপত্নী হইতে পার। তোমার মত উপপত্নীকে আমি—"

কালনকির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রেবেকা তাহার দীপ্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "ওরে শয়তান, ওরে বর্ব্বর! প্রভুকন্যার নিকট এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না? তুই কি মনে করিয়াছিস্, প্রাণভয়ে আমি তোর মত কুক্কুরের নিকট আত্মসমর্পণ করিব? তোর সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি! কিন্তু তোর মত কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তোর ভয়প্রদর্শন আমি গ্রাহ্য করি না, তোর যাহা সাধ্য, করিস্। আমার বৃদ্ধ পিতার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করিস, আমাকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিস্; কিন্তু জানিয়া রাখ—আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, তথাপি তোর মত কুকুরকে আত্মসমর্পণ করিব না; আমার সম্মান নষ্ট হইতে দিব না। পরমেশ্বর তোর বিশ্বাসঘাতকতার ও লোভের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। যেন তোর অভিশপ্ত মস্তকে বজ্রাঘাত হয়।"—রেবেকা স্তম্ভিত কালনকির সম্মুখ হইতে ঝড়ের মত বেগে প্রস্থান করিল।

কালনকি কয়েক মিনিট স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "সুন্দরি, তুমি যতই লম্ফঝম্প কর, আমি তোমাকে মুঠায় পুরিয়াছি—তোমার দম্ভ চূর্ণ করিতে—তোমার গর্ব্বোন্নত শির ধূলায় লুণ্ঠিত করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। দেখি, তোমাকে কে রক্ষা করে!"

দশম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর আহ্বান

জোসেফ কুরেট ও ট্রোভিল রুসিয়ার টোমস্ক নগর হইতে পলায়ন করিয়া সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে যখন পথচিহ্ন-বর্জ্জিত অসীম প্রান্তরে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, বিপৎসঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে না। তাহাদের ধরা পড়িবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল; বিশেষতঃ, তাহারা জানিত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেও তাহারা রুসিয়ার কোন নগরে বা পল্লীতে প্রবেশ করিয়া কোন গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় পাইবে না, তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই রুসিয়ার নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে তাহাদের পলায়নবার্ত্তা বিঘোষিত হইবে এবং কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া স্থানীয় পুলিসের হস্তে অর্পণ করিলে তাহাকে প্রচুর পুরস্কারদানেরও অঙ্গীকার করা হইবে। রুসিয়ার এই অঞ্চলের নগর ও পল্লীগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, সুতরাং লোকালয়ে প্রবেশ না করিলেও পলায়নের অসুবিধা হয় না বটে, কিন্তু লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্য ও জলাভূমির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলে—প্রতিপদক্ষেপে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম অপরিহার্য্য! সেই সকল অরণ্য ও জলাভূমি হিংস্র শ্বাপদ জন্তু ও সর্পে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন সুবিস্তীর্ণ নদনদীও তাহাদের গতিরোধ করিবে, কোন উপায়ে তাহা পার হইতে না পারিলে সম্মুখে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা যে আহার্য্য দ্রব্য পাইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইবে, অনাহারে তাহারা কয় দিন পথ চলিবে? এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাহারা হতাশ হইল; অবশেষে সঙ্কল্প করিল—তাহারা বরং অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করিবে, কিন্তু খাদ্যসংগ্রহের আশায় কোনও পল্লীতে প্রবেশ করিয়া ধরা দিবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পুনর্ব্বার নির্ব্বাসিত হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাহারা শ্রেয়স্কর মনে করিল।

ট্রোভিল আর কখন সাইবেরিয়ায় না আসিলেও সাইবেরিয়ার বৃত্তান্ত সে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিল; সাইবেরিয়ার কোথায় কোন্ গ্রাম নগর আছে, তাহা তাহার সুবিদিত; এ কথা শুনিয়া জোসেফ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ সকল সংবাদ জানিয়া রাখিবার কারণ কি?"—ট্রোভিল হাসিয়া বলিল, "আমি বহুদিন হইতে জানি, রুসিয়ার রাজসরকারের অতিথিরূপে এক দিন আমাকে এই অঞ্চলে আসিতেই হইবে। এই জন্যই এই অঞ্চলের সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম; পলায়নের সুযোগ পাইলে ধরা পড়িতে না হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সাইবেরিয়ার সীমান্তে আল্টাই পর্ব্বত অবস্থিত; তাহা অতিক্রম করিয়া মঙ্গোলিয়ার সীমা আরম্ভ হইয়াছে। সাইবেরিয়া পার হইতে হইলে আমাদিগকে আল্টাই পর্ব্বতে উপস্থিত হইতে হইবে; অতএব চল, আমরা সেই দিকেই যাই। সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে আমরা কতকটা নিরাপদ হইব। তাহার পর আমরা চীন-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব, কিংবা দক্ষিণপশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে তুর্কিস্থানের ভিতর দিয়া পারস্যে উপস্থিত হইতে পারিব। পারস্যদেশ হইতে পারস্য উপসাগর-সন্নিহিত কোনও বন্দরে উপনীত হওয়া তেমন কঠিন হইবে না।"

ট্রোভিল পারস্য উপসাগরের তটে উপস্থিত হইবার পথের সন্ধান বলিল বটে, কিন্তু তাহারা দুই জনে নিঃসম্বল অবস্থায় বহুদূরব্যাপী দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কি উপায়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল, মৃত্যু তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকেই মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহারা হতাশ না হইয়া, মেষচর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। টোমস্ক নগরের দশ বারো মাইলের মধ্যে যে সকল গ্রাম ছিল, তাহা তাহারা প্রথম রাত্রিতেই অতিক্রম করিল।

অবশেষে পূর্ব্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইল; অল্প ক্ষণ পরেই সূর্য্যোদয় হইলে শীতের তীব্রতার হ্রাস হইল; তখন তাহারা প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছিল। পথশ্রান্ত তাহারা ক্ষুধিত হইয়াছিল। তাহারা প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল; দেখিল, কোন দিকে জনমানবের সমাগম নাই; তখন তাহারা মৃত্তিকায় মেষচর্ম্ম প্রসারিত করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া কিছুকাল তাহার উপর বিশ্রাম করিল, তাহার পর কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ঝুলির অন্যান্য সামগ্রী পরীক্ষা করিতে লাগিল। সেই

বাণ্ডিলে কয়েকটি ম্যাচ-বাক্স, কিছু তামাক, একখানি ক্ষুদ্র কুঠার, এবং পিস্তলে ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি টোটা ছিল। কুঠারখানি না থাকিলে তাহাদিগকে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; কারণ, বরফ কাটিয়া পানীয় জল ও আগুন জ্বালিবার জন্য শুষ্ক বৃক্ষশাখা সংগ্রহ করিতে হইলে কুঠার সঙ্গে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা বুঝিতে পারিল—ওরজেস্‌কি তাহাদের প্রকৃতই হিতাকাঙ্ক্ষী; পথিমধ্যে তাহাদিগকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, সে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে দেখিয়া তাহাদের হৃদয় তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। জোসেফ তাহার দয়ার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল; কিন্তু ষ্ট্রোভিল বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া জোসেফকে বলিল, "কোন উচ্চপদস্থ নিহিলিষ্ট বন্ধুর অনুগ্রহেই আমরা মুক্তিলাভ করিয়াছি; ওরজেস্‌কি কোন কারণে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করে নাই। নিহিলিষ্টরা কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারে, আমাদের প্রতি ওরজেস্‌কির ব্যবহারই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

ষ্ট্রোভিল দুই তিন মিনিট নতমস্তকে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনের কষ্ট ও যন্ত্রণা, এই ভাবে পলায়ন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। হয় ত অল্পদিন পরেই আমার সকল কষ্টের অবসান হইত। সুখহীন শান্তিহীন ব্যর্থ জীবন লইয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর আমার আগ্রহ নাই। আমি কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, তাহা জানি না। তোমার আশা আছে, সংসারের প্রতি আসক্তি আছে; কিন্তু আমার ত কিছুই নাই! সকল স্থান এবং সকল অবস্থাই আমার নিকট সমান।"

জোসেফ বলিল, "তুমি অদ্ভুত মানুষ! তোমার জীবনও রহস্যপূর্ণ। তোমার অতীত জীবনের কাহিনী শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে।"

ষ্ট্রোভিল বলিল, "আমার তুচ্ছ জীবনের অতীত কাহিনী শুনিতে চাও? কিন্তু তাহা শুনিয়া তুমি আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না। আমার অতীত জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই মর্ম্মভেদী যে, যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, একটু শান্তি পাইতাম; কিন্তু এখন থাক, সে সকল কথা আর এক দিন বলিব। হাঁ, যে দিন বুঝিব, আমার আসন্নকাল উপস্থিত, সেই দিন তুমি আমার অতীত জীবনের কোন কোন কথা শুনিতে পাইবে।"

তাহারা উঠিয়া আবার চলিতে লাগিল। অরণ্য ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা এক সপ্তাহ চলিল। কোন কোন দিন অরণ্যমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দল তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে অস্ত্র ছিল বলিয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন হয় নাই। অবশেষে তাহারা অন্নাভাবে বিপন্ন হইল; তাহাদের নিকট যে খাদ্যসামগ্রী ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইল। তখন তাহারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য কোন গ্রামে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য মনে করিল; তাহাতে ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহারা নিকটে কোন লোকালয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইল না। এক দিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রিকালে তাহারা একটি বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই ভাবে সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়া, প্রভাতে তাহারা বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কিছু দূরে ক্ষুদ্রজাতীয় একটি মৃগশাবক দেখিতে পাইল। তাহারা সেই মৃগশাবকটিকে গুলী করিয়া মারিল, এবং তাহার মাংস আগুনে ঝল্‌সাইয়া পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। অবশিষ্ট মাংস পথের সম্বলস্বরূপ তাহারা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

সেই মৃগশাবকের অবশিষ্ট মাংসে আরও তিন দিন তাহাদের ক্ষুন্নিবারণ হইল; এই তিন দিনে তাহারা দক্ষিণাভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিন তাহারা অতি কষ্টে বহু ক্রোশব্যাপী একটি সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে একখানি গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল। ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা সেই গ্রামে প্রবেশ করিল। তাহারা গ্রামের পথে দুই চারি জন লোক দেখিতে পাইল, এবং বুঝিতে পারিল, গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে দস্যু বা ফেরারী আসামী বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। কেহ কেহ তাহাদের পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তাহারা কোন কথা না বলিয়া একটি সরাইয়ে

প্রবেশ করিল। একটি ভীমকান্তি তাতার সেই সরাইয়ের মালিক। জোসেফ তাহাকে দুই জনের উপযুক্ত ভোজ্য-দ্রব্য আনিয়া দিতে বলিল। তাতারটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অগ্রিম না পাইলে সে তাহাদের 'খানা' যোগাইতে পারিবে না।" জোসেফ কয়েকটি 'রুবল' বাহির করিয়া দিলে তাহার বিনিময়ে দুই জনে কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী পাইল বটে, কিন্তু তাতারটার অজস্র প্রশ্নবাণবর্ষণে তাহারা বিব্রত হইয়া উঠিল। জোসেফের কোন কথায় সরাইওয়ালার সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় স্ট্রোভিল আহার করিতে করিতে তাহার প্রশ্নের উত্তরদানে তাহার কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বলিল, তাহারা দেশ-পর্য্যটনের উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চলে আসিতেছিল, কিন্তু পথি-মধ্যে দস্যুরা তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই সময় কৌশলক্রমে পলায়ন করায় তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। স্ট্রোভিলের কথা শুনিয়া তাতারটা অবিশ্বাসভরে হাসিয়া মাথা নাড়িল। আহার শেষ হইলে স্ট্রোভিল বলিল, তাহারা সেই সরাইয়ে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রস্থান করিবে। যাত্রা-কালে সঙ্গে লইবার উদ্দেশ্যে সে কিছু রুটী ও মাংস ক্রয় করিতে চাহিল। সরাইওয়ালা নগদ টাকা লইয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল, এবং সেই রাত্রির জন্য তাহাদিগকে সরাইয়ে স্থান দিতেও সম্মত হইল। কিন্তু চতুর স্ট্রোভিল তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জোসেফের কানে কানে বলিল, তাহারা গভীর রাত্রিতে পলায়ন না করিলে বিপদ অপরিহার্য্য। অনন্তর সে জোসেফকে সতর্ক থাকিতে বলিয়া, খাদ্যদ্রব্য-বহনোপযোগী চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলী ক্রয় করিবার জন্য গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। জোসেফ একাকী সরাইয়ে বসিয়া রহিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্ট্রোভিল একটি ব্যাগ ও কতক-গুলি আবশ্যক দ্রব্য সহ সরাইয়ে প্রত্যাগমন করিল। সরাই-ওয়ালা তাহাদিগকে দুইটি শয্যা দেখাইয়া সেখানে শয়ন করিতে বলিলে, তাহারা শয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। স্ট্রোভিল জোসেফকে বলিল, তাতারটা শীঘ্রই তাহাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা সে তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার এই অনুমান সত্য বলিয়াই জোসেফের ধারণা হইল; কারণ, তাহাদের শয়নের অল্পকাল পরেই তাতারটা নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল।

স্ট্রোভিল জোসেফকে বলিল, "তাতারটা বোধ হয় পুলিস ডাকিতে গিয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে সরিয়া পড়িতে হইবে।"

জোসেফ বলিল, "তা বটে, কিন্তু পথে বোধ হয় এখনও লোক চলিতেছে। আমরা এখন পথে বাহির হইলে সন্দেহ-ক্রমে তাহারা আমাদের অনুসরণ করিতে পারে। এ অবস্থায় রাত্রি গভীর না হইলে আমাদের বাহিরে যাওয়া উচিত কি?"

কিন্তু তাহারা পলায়নের সুযোগ পাইল না। কয়েক মিনিট পরেই সরাইওয়ালা কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল, এবং তাহারা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিম্ন স্বরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

স্ট্রোভিল তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জোসেফকে বলিল, "জোসেফ, উহারা আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে; আমাদিগকে অবিলম্বে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তাহারা উঠিয়া সেই ঘরটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার একটিমাত্র দ্বার; দ্বারের বিপরীত দিকে একটি বাতায়ন ছিল, স্ট্রোভিল ও জোসেফ জ্বালানী কাষ্ঠপূর্ণ একটি কাঠের বাক্স ঘরের কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া অর্গলরুদ্ধ দ্বারের উপর ফেলিয়া রাখিল; আর তাহারা দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিল না। অনন্তর তাহারা বাতায়নের নিকট গিয়া দেখিল, বাতায়নটি পুরু কাগজের পর্দা দ্বারা আবৃত। তাহারা সেই পর্দা ছিঁড়িয়া বাতায়নটির বহু কালের রুদ্ধ কবাট অতি কষ্টে খুলিতে পারিল; তাহারা বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিল না; তখন গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন; তারকারাজি নিবিড় কুজ্ঝটিকার অন্তরালে অদৃশ্য, এবং তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। সেই গৃহটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর নির্ম্মিত; ইহা দক্ষিণ-সাইবেরিয়ার পল্লীসমূহের প্রত্যেক গৃহের একটি প্রধান বিশেষত্ব। কারণ, উচ্চ ভূখণ্ডের উপর গৃহ নির্ম্মিত না হইলে তুষাররাশিতে তাহা প্রোথিত হইবার সম্ভাবনা।



প্রণাত

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

ষ্ট্রোভিল সেই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জোসেফকে বলিল, "জানালার নীচে কি আছে, জানি না; কিন্তু এই জানালা দিয়া পলায়ন না করিলে আমাদের নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই।" অনন্তর তাহাদের জিনিসপত্রগুলি দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া, তাহারা সেই জানালা দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। জানালার নীচে এক ফুট পুরু হইয়া তুষার জমিয়া ছিল, এই জন্য তাহারা আহত হইল না; কিন্তু তাহারা আততায়ীদের অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারিল না। তাহাদের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আততায়ীরা অতি কষ্টে দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; অতিথিদ্বয় জানালা দিয়া পলায়ন করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি জানালার নিকট উপস্থিত হইল, এবং মাথা বাড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

সেই গৃহের পশ্চাতে বেড়া দিয়া ঘেরা একটি বাগান ছিল; ষ্ট্রোভিল ও জোসেফ তখন বাগান পার হইয়া সেই বেড়া উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা বেড়ার উপর উঠিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত জানালা হইতে দুই তিন বার বন্দুকের আওয়াজ হইল। আততায়ীরা অনুমানে নির্ভর করিয়া বেড়ার দিকে গুলী চালাইলেও ষ্ট্রোভিল আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়ার অপর পার্শ্বে পড়িয়া গেল।

জোসেফ সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি আহত হইয়াছ?"

ষ্ট্রোভিল বলিল, "হাঁ, একটা গুলী আমার কাঁধে ঘাড়ের কাছে বিঁধিয়াছে, কিন্তু আঘাতটা বোধ হয় সাংঘাতিক হয় নাই। চল, আমরা অবিলম্বে পলায়ন করি, নতুবা মুহূর্ত্ত পরেই উহারা এখানে আসিয়া পড়িবে।"

জোসেফ ষ্ট্রোভিলের কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহারা দক্ষিণদিক লক্ষ্য করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা চলিল। তখন প্রবল বেগে তুষারবর্ষণ হইতেছিল, তুষাররাশিতে তাহাদের পদচিহ্ন আবৃত হওয়ায় শত্রুরা যে পদচিহ্ন দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবে, তাহার উপায় রহিল না। কিন্তু অবিশ্রান্ত বরফপাতে ও দারুণ শীতে তাহাদের সর্ব্বশরীর এরূপ অবসন্ন হইল যে, তাহারা আরও অধিক দূর অগ্রসর হইবে, তাহার সম্ভাবনা রহিল না। তাহারা সেই প্রান্তরমধ্যে একটি অরণ্য দেখিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটি গুল্মের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষ্ট্রোভিল অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার কাঁধের বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! আমার হাত পর্য্যন্ত অসাড় হইয়াছে। আঘাতটা প্রথমে যত সামান্য মনে হইয়াছিল, সেরূপ সামান্য নহে, জোসেফ!"

জোসেফ সেই রাত্রিতে ষ্ট্রোভিলের ক্ষত পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইল না। পরদিন প্রভাতে সে সভয়ে দেখিল, গুলী ষ্ট্রোভিলের বামস্কন্ধ বিদীর্ণ করিয়া ঘাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আঘাত সাংঘাতিক বলিয়া জোসেফের ধারণা না হইলেও সারারাত্রি ধরিয়া ক্ষতমুখ হইতে শোণিত-স্রাব হওয়ায় ষ্ট্রোভিল অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার বাম অঙ্গ নাড়িবারও শক্তি ছিল না। তাহার অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু ষ্ট্রোভিল সকল কষ্ট ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের জন্যও সে কাতরতা প্রকাশ করিল না। সে হাসিয়া জোসেফকে বলিল, "তুমি যে আহত হও নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ব্যাঘ্রের গুহা হইতে পলায়ন করিবার সময় তাহার একটা থাবাও খাইব না—ইহা কিরূপে আশা করিব? কত লোককে মিথ্যা সন্দেহে গুলী করিয়া মারিয়াছি; নরহত্যা, নারী-হত্যা করিতে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হই নাই; তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাস ও অভিসম্পাত কি নিষ্ফল হইবে? এখন অন্যের হাতে গুলী খাইয়া অধীর হইলে চলিবে কেন?"

যাহা হউক, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও জোসেফ বরফ খুঁড়িয়া, তাহার ভিতর হইতে জল সংগ্রহ করিয়া ষ্ট্রোভিলের ক্ষত ধৌত করিল এবং রুমাল দ্বারা ক্ষতস্থানে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া দিল। সেই স্থানে তাহারা আরও কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিল।

এইভাবে আর এক সপ্তাহ অতীত হইল। তাহারা তাতারের সরাই হইতে যে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, অল্পপরিমাণে আহার করায় তাহাতেই তিন চারি দিন চলিল, তাহার পর জোসেফ অরণ্যমধ্যে কতকগুলি কাঠবিড়াল শীকার করিয়া তাহাদের মাংসে কয়েক দিন ক্ষুন্নিবারণ করিল। এইভাবে চলিতে চলিতে তাহারা আলটাই গিরিমালায় উপস্থিত হইল, কিন্তু

ষ্ট্রোভিলের যন্ত্রণা হ্রাস না হইয়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সে সেজন্য কাতরতা প্রকাশ না করিলেও তাহার যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; অনাহারে পথশ্রমে কাতর হইয়াও তাহার সেবাশুশ্রূষায় ত্রুটি করিল না। ষ্ট্রোভিলের পুত্র বা সহোদর ভ্রাতা থাকিলেও তাহারা জোসেফের অপেক্ষা অধিকতর যত্নের বা আগ্রহের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিতে পারিত না।

কিন্তু বন্দুকের গুলীতে যে ক্ষত হইয়াছিল, যথাযোগ্য চিকিৎসা ও ঔষধাদি প্রয়োগ ভিন্ন কেবল ধুইয়া 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া দিলে কি আরোগ্যের আশা করা যায়? ক্ষতের অবস্থা ক্রমেই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রোভিলের বুক-পিঠ ফুলিয়া ঢাক হইল। ষ্ট্রোভিল ক্রমে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। জোসেফ তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া, আলটাই-গিরি-মালার সানুদেশে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা স্থানীয় কৃষকগণের কর্ষিত শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাইল। সেই অঞ্চলে শীতের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তুষারপাতেরও আশঙ্কা ছিল না। বায়ুর উষ্ণতায় তাহারা স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা তুর্কিস্থানের বোখারা সহরে উপস্থিত হইবার আশায় সেই স্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিল; কিন্তু ষ্ট্রোভিলের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জোসেফ শঙ্কিত হইল! তখন পর্য্যন্ত ষ্ট্রোভিল চলৎশক্তিহীন না হইলেও, তাহার চক্ষু অস্থিকোটরে প্রবেশ করিয়াছিল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, যেন শোণিত-সংস্পর্শরহিত এবং চলিবার সময় তাহার পদদ্বয় পরস্পর বাধিয়া যাইতেছিল। এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া জোসেফ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "ষ্ট্রোভিলকে বোধ হয় আর বাঁচাইতে পারিলাম না!"

এক দিন সায়ংকালে জোসেফ ষ্ট্রোভিলের পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ষ্ট্রোভিল, তুমি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ। আমি একবার গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসি, তোমার সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি কি না।"

ষ্ট্রোভিল বিষণ্ণভাবে মৃদুস্বরে বলিল, "না বন্ধু! তুমি সে চেষ্টা করিও না। নিকটে গ্রাম আছে বটে, কিন্তু সেখানে গিয়া কোন লাভ নাই, তুমি কাহারও সাহায্য পাইবে না। বিশেষতঃ এই অঞ্চলে আমাদিগকে সতর্কভাবে চলিতে হইবে। আমরা রুসিয়ার সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি; এখানে পাহারার কড়াকড়ি অত্যন্ত অধিক। এখানে একটু অসাবধান হইলেই আমাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে। তীরে আসিয়া তরী ডুবিবে! আমার জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না। দেখিতেছ, আমার আর চলিবার শক্তি নাই, আমার জন্য তুমি কেন বিপন্ন হইবে? আমাকে এই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া তুমি নিরাপদ স্থানে প্রস্থান কর। আমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই?"

জোসেফ রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি হতাশ হইতেছ কেন?"

ষ্ট্রোভিল বলিল,—"অন্ধকার! মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; তিল তিল করিয়া আমার জীবন ক্ষয় হইতেছে, আর অতি অল্পই বাকী; ইহাতে আশা বা নিরাশার কোন কথা নাই।"

জোসেফ বলিল, "তোমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, ইহা আমি স্বীকার করি না। আর তোমার অনুমান সত্য হইলেও, তোমাকে এখানে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিব, আমি কি এতই কাপুরুষ? আমরা একত্র আসিয়াছিলাম, একত্র ফিরিয়া যাইব; মৃত্যু ভিন্ন অন্য কেহ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

ষ্ট্রোভিল চক্ষু মেলিয়া একবার জোসেফের মুখের দিকে চাহিল; তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "জোসেফ, আমাকে এই ফাঁকা যায়গায় ফেলিয়া রাখিও না। রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে পারি, এরূপ কোন স্থান নিকটে নাই?"

জোসেফ উঠিয়া গিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একটি গিরিগুহা দেখিতে পাইল; তাহার ঊর্দ্ধে ছাদের আকার-বিশিষ্ট একটি প্রস্তরস্তূপ। জোসেফ ষ্ট্রোভিলকে অনাবৃত আকাশের নীচে ফেলিয়া না রাখিয়া—সেই স্থানে লইয়া আসিল এবং গুহামধ্যে কতকগুলি শুষ্ক বৃক্ষপত্র বিছাইয়া মেষচর্ম্ম দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যায় শয়ন করাইল।

ষ্ট্রোভিল অতি কষ্টে বলিল, "ইহাই আমার মৃত্যুশয্যা। হিংস্র শ্বাপদ জন্তু যাহা করে—জীবনে তাহাই করিয়াছি; এই নির্জ্জন গিরিগুহাই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত স্থান।"

জোসেফ বলিল, "ও কথা কেন বলিতেছ? তোমাকে সুস্থ করিয়া আমি দেশে লইয়া যাইব। এখন তোমার বিশ্রামের ও পুষ্টিকর পথ্যের প্রয়োজন। তুমি এখানে বিশ্রাম কর, আমি ভিক্ষা করিয়া পারি, চুরি করিয়া পারি, যেরূপ করিয়া পারি, তোমার জন্য পথ্য সংগ্রহ করিয়া আনি।"

ষ্টোভিল অস্ফুটস্বরে বলিল, "না, তাহার প্রয়োজন নাই, বন্ধু! আমার চক্ষুর উপর মৃত্যুর ছাপ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এ সময় আমার অতীত জীবনের দুষ্কৃতির কথা প্রকাশ না করিলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব না। আমার মৃত্যুশয্যাপ্রান্তে কোন ধর্ম্মযাজক উপস্থিত থাকিলে আমার সকল অপরাধ তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতাম; কিন্তু সে সুযোগ ত পাইলাম না। সে সকল কথা তোমাকেই বলি, শোন। আমি মহা-পাপিষ্ঠ, আমি নরহন্তা, আমি নারীহন্তা; যাহারা আমার কোন অপকার করে নাই, আমি মোহে ভুলিয়া, কর্ত্তব্য মনে করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলাম! আমি জানি, আমার সেই অপরাধের মার্জ্জনা নাই; কিন্তু আমার কণ্ঠ চিরনীরব হইবার পূর্ব্বে সকল কথা তোমার নিকট প্রকাশ করি—তাহা না শুনিয়া তুমি কোথাও যাইও না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

প্যাক্ট।



ভাব-প্রবাহ

২

৫০০ খৃঃ পূঃ

খৃঃ ৫০০ খৃঃ পূ.। এই প্রাবনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড, সৃষ্টশক্তিশালী, যুগান্তরকারী এবং সর্বতোভাবে বিশ্বব্যাপী। ইহার আরম্ভ বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল এবং ইহার জীবন্ত ক্রিয়া বহুদিন পর পর্যান্তও চলিয়াছিল। এইটি ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবের যুগ। এই বিরাট প্রবাহে সমগ্র এসিয়া খণ্ডের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত ও অভিনবরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে এসিয়া লাভ করিয়াছিল পারমার্থিক জ্ঞানরাশি, নৈতিক আদর্শাবলী এবং বিবিধ অধ্যাত্মসাধনপদ্ধতি। আর য়ুরোপ লাভ করিয়াছিল অসীম কর্ম্মশক্তি, অপূর্ব্ব সাহিত্য এবং অশেষ কলা-নৈপুণ্য।

যাঁহারা দেবতা বলিয়া আজ পর্য্যন্ত জগতে পূজিত হইতেছেন, (আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর)-এমন চারি জন দেব-প্রতিম মহাপুরুষ যে ঠিক একই সময়ে এসিয়ার তিন স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা কি নিতান্ত অকস্মাৎ-সংঘটিত ব্যাপার? বুদ্ধদেব জন্মিলেন খৃঃ পূঃ ৫৫২ অব্দে। চীনের কংফুসীয় ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক কংফুচু জন্মিলেন খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে এবং ইহার অল্প কয়েক বৎসর আগে জন্মিলেন জৈনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমহাবীর স্বামী। আর ইহার ঠিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন চীনের অন্যতম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা লাওচো। ইনি চীনে তাওধর্ম্ম প্রচারিত করেন বুদ্ধদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই। পারস্যের জোরো-আষ্ট্রীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জরথুস্ত্র কখন্ জন্মিয়াছিলেন, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন পারস্যে জোরো-আষ্ট্রীয় ধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব চলিতেছে। জেন্দ-আবেস্তা এই ধর্ম্মের বেদ। ইহাতে বিশ্বনিয়ন্তা পরমাত্মা পুরুষের নাম অহুর মাজদে। ইহার ছয়টি শক্তি বা বিভূতি—(১) বহুমনঃ অর্থাৎ তিনি মঙ্গলময়। (২) আসা—অর্থাৎ তিনি বিধান-কর্ত্তা। (৩) অরমৈতি—অর্থাৎ তিনি পূর্ণ। (৪) হোর বাতাত অর্থাৎ তিনি অখণ্ড। (৫) ক্ষাথ্র অর্থাৎ তিনি শক্তিমান্ ঈশ্বর। (৬) আমেরতাত অর্থাৎ তিনি অমৃত। ইহাতে অবিদ্যা বা অসৎ শক্তির নাম অংগ্র-মৈন্যু বা দ্রুক্।

বুদ্ধদেবের জন্মের ২০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশে প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পাইথাগোরাসের জন্ম হয়। (খৃঃ পূঃ ৫৩২ অব্দের দুই চারি বৎসর আগে পরে) বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বত্র যে অতি সূক্ষ্ম ও সুনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা-জাল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং তাহা সমস্তই যে গণিতবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এই দার্শনিক তত্ত্ব পাইথাগোরাস প্রচার করেন। ইঁহার মতে সংখ্যা সত্য এবং বাস্তব এবং সংখ্যাই জগৎসৃষ্টির কারণ। ইনিই অনুমান করিয়াছেন যে, ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহ অবিশ্রান্ত ঐক্যতান-সঙ্গীতপরায়ণ।

বুদ্ধদেবের জন্মের ২৫ বৎসর পরে গ্রীসদেশে জগৎবিখ্যাত কবি-নাটককার ইস্কাইলাসের জন্ম হয়। ইহার ২৫।৩০ বৎসর পরে অল্পসময়ের মধ্যে পেরিক্লিস, সফোক্লিস, ফিডিয়াস, ইয়ুরিপাইডিস্, পিণ্ডার, সক্রেটিস, লিওনিডাস, থেমিষ্টক্লিস, ইয়ুরিবায়েডিস—প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুতনামা কবি, জ্ঞানী, শিল্পী, পণ্ডিত, রাষ্ট্রনেতা, বীর ও সেনানায়কগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর আরও বছর তিরিশেক পর প্রাচীন য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর আসেন মহাপণ্ডিত এরিষ্টটল।

এই সময় অর্থাৎ এই খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই পারস্যে একটি মহৈশ্বর্য্যশালী প্রবলপ্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। দরায়ুস, জারেক্সেস্ প্রভৃতি শক্তিশালী সম্রাটগণের কথা যে আমরা নানা গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি, এই মহাযুগেই তাঁহাদের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। ইঁহারা পারস্যের সম্রাট। এই যুগে কিংবা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। নেবোচাদনেজর এই সময়কার বাবিলোনের সম্রাট। তিনি বাবিলোন রাজধানীকে এক প্রকার অমরাবতীতে পরিণত করিয়াছিলেন। তেমন ঐশ্বর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ আজ পর্য্যন্ত খুব কমই হইয়াছে। আসিরিয়া রাজ্যেও এই সময়ে শিল্প-সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল। অসুরবাণিপাল এই সময়ে আসিরিয়ার অধিপতি।

এক সময়ে এমন বিস্ময়কর এতগুলি ব্যাপার পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।

চীনে দুইটি নবীন নীতিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। একটা প্রাচীন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান চীনে পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু ইহা এক প্রকার প্রতিনিধিক Vicarious গোছের ধর্ম্ম ছিল। রাজার কর্ত্তব্য ছিল পরমেশ্বরের পূজা করা—প্রজাগণের পক্ষ হইতে। প্রজাদিগকে পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইত না। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য ছিল—বায়ু, অগ্নি, নদী, পর্ব্বতাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবৃন্দের সাময়িক আরাধনা করা—অবশ্য সাধারণ জনগণের পক্ষ হইতে। তাহাদের নিজেদের এ সম্বন্ধে কিছুই করিবার ছিল না। সর্ব্বসাধারণের শুধু কর্ত্তব্য ছিল পিতৃ-পুরুষগণের প্রেতের পূজা করা এবং ভক্তিপূর্ণভাবে তাহাদের স্মৃতিরক্ষা করা। কংফুচু দেখিলেন, ইহা ধর্ম্ম হইলেও অতিশয় অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হয় না, যাহাতে মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের কোনও ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। তাই তিনি ছোট বড় প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক সুদৃঢ় কর্ত্তব্য-পরম্পরার শৃঙ্খলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পরিপালনের নির্দ্দিষ্ট বিধিবিধান-ব্যবস্থাদিও করিয়া দিলেন। এই ধর্ম্মনীতির মূল কথা হইল পৃথিবীতে মানুষের পাঁচটি প্রধান সম্বন্ধ আছে। (১) প্রজারূপে রাজার সঙ্গে। (২) পুত্র-কন্যারূপে পিতা মাতার সঙ্গে। (৩) ভ্রাতা-ভগিনীরূপে ভ্রাতা-ভগিনীর সঙ্গে। (৪) স্বামী বা স্ত্রীরূপে স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে। (৫) বন্ধু বা সখীরূপে বন্ধু বা সখীর সঙ্গে। এই পঞ্চ সম্বন্ধ-সংযুক্ত পঞ্চ প্রকার কর্ত্তব্য প্রত্যেক মানুষের আছে। এই কর্ত্তব্যের অপালনে মহা অধর্ম্ম হয়। এই সব কর্ত্তব্য সর্ব্বদা সাবধানে যথাযথরূপে পালন করিলে মানুষ সত্য ধর্ম্মকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপে কংফুচু চীনের অপরিপূর্ণ ধর্ম্মকে একটা পূর্ণাবয়ব নৈতিক প্রতিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

লাওচো বোধ হয় কংফুচুর অপেক্ষাও তত্ত্বের গভীরতর ভূমিতে বিচরণ করিতেন। একদা যুবক কংফুচুর সঙ্গে বৃদ্ধ লাওচোর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কংফুচু যদিও লাওচোর কথায় প্রীত হইতে পারেন নাই, তবু তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে 'পক্ষবান্ ভুজঙ্গের মত লাওচো সুদূর আকাশে উড়িয়া যায়, তাহার অনুসরণ করা অসম্ভব।' লাওচোর ধর্ম্মের বা দর্শনের মূল তত্ত্বের নাম তাও। খুব সম্ভবতঃ এই 'তাও' আমাদের সাংখ্যের প্রকৃতি এবং বেদান্তের অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যা। লাওচোর প্রধান শিষ্য চোয়াংচো এই 'তাও' [illegible]

স্বর্গ ও মর্ত্তের সৃষ্টি-কর্ত্রী। ইনি স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুর জননী। ইনিই সমস্ত দেবতা ও উপদেবতার অস্তিত্বের মূল কারণ। কিন্তু ইঁহার কোনও ব্যক্তিত্ব নাই। সাংখ্যমতেও প্রকৃতি হইতেই জগতের দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। যথা সাংখ্যসূত্র ১।৬১।—"প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ। অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং। তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি।" এবং ১।৭৪—"আদ্য-হেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ।" অর্থাৎ যেমন পরমাণু সকল পরম্পরাক্রমে জগতের সমুদয় বস্তুর উপাদানকারণ, তদ্রূপ হেতুপরম্পরারূপে প্রকৃতি জগতের সর্ব্বাদ্য কারণ, কিন্তু প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববিহীনা। যথা—সাংখ্য-কারিকা ১১।—"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসব-ধর্ম্মি-প্রধানমিতি।"—প্রধান = প্রকৃতি। মহানির্ব্বাণতন্ত্র কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন,—

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং।"

এই সব কথা হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে। লাওচোর মতে সকল ধর্ম্মসাধনার মূল ভিত্তি চিত্তের অবিচলিত ভাব। 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।' জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টা পর্য্যন্ত অনর্থের মূল। গীতার মত ইনিও বলিয়াছেন,—কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না। নিজেও উদ্বিগ্ন হইবে না। প্রবৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত ও ব্যতিব্যস্ত না হইয়া তোমার অন্তঃপ্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চল। প্রকৃতির পথই মুক্তির পথ। কৃত্রিম বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠানাদি মানুষের অনিষ্ট সাধন করে। বহিঃপ্রকৃতির আদর্শ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতির জীবনে কোথাও ব্যস্ততা নাই—কোথাও অস্বাভাবিক প্রয়াস নাই। নিঃশব্দে নিরুদ্বেগে প্রকৃতির সকল কার্য্য চলিতেছে। কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কোথাও নিষ্ফলতা নাই। মানুষের জীবন ঐ প্রকার হইবে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে রুশো যে নৈতিক আদর্শ প্রচার করেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাব্যের মধ্য দিয়া যে তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই তত্ত্ব এবং সেই আদর্শ লাওচো সম্যক্‌রূপেই উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য বেদোপনিষদে এ সমস্ত সামান্য কথা।

ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও মহাবীরের সাধন-বলে বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটি বিশাল বিপ্লব-বিদ্রোহ ঘটিয়া গেল। দুইটি অভিনব (?) অধ্যাত্ম-সূর্য্যের উদয় হইল। দশ দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত চমৎকৃত হইল। সর্ব্ববাসনার সন্ন্যাস এবং নিখিল জীবের জন্য অসীম করুণা, দুই মহাবাণী জগতে ঘোষিত হইল। জগৎ মুগ্ধ হইয়া সে মহাভারতী শ্রবণ করিল।

একটা নবধর্ম্ম পাইয়া পারস্যদেশ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পারসিকদিগের মধ্যে একটা দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মের উদ্দীপনা প্রবেশ করিল। তাহারা চারি দিকের ছোট বড় সমস্ত রাজশক্তিকে জয় করিয়া সুসমৃদ্ধ সুসভ্য সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত গ্রীসদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল।

গ্রীসে এমন একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন্ত সাহিত্য রচিত হইল, যাহা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপের সম্মুখে পূর্ণগৌরবে আদর্শের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং যখনই কোনও দেশের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হইয়াছে, তখনই এই গ্রীক-সাহিত্য তাহাকে তিরস্কার করিয়া সত্যকার সৌন্দর্য্যের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। প্লেটোর জ্ঞান কেহ কখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক অন্তর্দর্শনে কাণ্ট হেগেলও প্লেটোর নীচে। ঈস্কাইলাস, ইয়ুরিপাইডিস্, সফোক্লিস এবং পিণ্ডার চিরকালই য়ুরোপের সাহিত্যিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। ফিডিয়াসের গজদন্ত ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি সমূহের অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া জগতের লোক আজিও মুগ্ধ হইতেছে। শৌর্য্য-বীর্য্যে এবং দেশের জন্য অম্লানবদনে প্রাণবিসর্জ্জনের ব্যাপারে এই যুগের গ্রীকরা জগতের আদর্শস্থানীয়। এথেন্সের মত দুই একটি নাগরিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্ষুদ্র শক্তি সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের সমবেত শক্তি-সমুচ্ছ্বাসকে বার বার প্রতিহত পরাভূত করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেওয়ার মত আশ্চর্য্য ঘটনা পৃথিবীতে খুব কমই ঘটিয়াছে। থার্ম্মপাইলি, সালামিস্ ও মারাথন্ প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীকদিগের কীর্ত্তিকাহিনী সভ্য জগৎ কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে সম্রাট্ জারেক্সেস্ ১ হাজার ২ শত রণতরী এবং সৈন্য-সামন্ত, লোকজন ও আসবাবপত্রে পূর্ণ ৩ হাজার নৌকা লইয়া গ্রীস জয় করিতে আসিয়া সালামিসে থেমিষ্টক্লিসের মুষ্টিমেয় গ্রীক সৈন্যের দ্বারা পরাজিত হয়েন। ইহার দশ বৎসর পরে মারাথনের যুদ্ধে ১ লক্ষ পারসিক সৈন্য মিল্‌টিআদিসের অধিনেতৃত্বে দশ সহস্র এথেনীয় সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পলাইয়া যায়।

এ দিকে এই যুগে বাবিলোনিয়া প্রায় স্বর্গসম্পদের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই সুপ্রাচীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু ইহার এমন সৌভাগ্যের দিন পূর্ব্বে কখনও আইসে নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া এই রাজ্য আসিরিয়া দ্বারা উৎপীড়িত ও পদদলিত হইয়া আসিতেছিল। আসিরিয়ার নৃপতিগণ বহুবার ইহার সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানীকে আক্রমণ করিয়া ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে—৫৬০ খৃঃ পূর্ব্বের কাছাকাছি সময়ে ইহার অপূর্ব্ব অভ্যুত্থান হয়। নেবো চাদনেজার ইহাকে ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করিয়াছিলেন। চারিদিকে মনোহর কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বিবিধ রত্নরাজি-বিমণ্ডিত অট্টালিকা ও দেবমন্দির-সকল শ্রেণী-পরম্পরাক্রমে সর্ব্বত্র শোভা পাইত। অশেষ দ্রব্যসম্ভার-পরিপূর্ণ বিপণিশ্রেণী-পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথে জনস্রোতের বিরাম ছিল না। নৃত্য-গীত হাস্য-কৌতুক ভোগবিলাসের অন্ত ছিল না। স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলা বাপী। তাহাতে মর্ম্মর-নির্ম্মিত অবতরণিকা। কোন্ অদ্ভুত-কর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মা যে সে মহানগরীতে শূন্যের উপর দোদুল্যমান উদ্যানরাজি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে? ৫৫ মাইল পরিধি বেষ্টন করিয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিকে এক সুবিশাল উত্তুঙ্গ প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ৩ শত ৪০ ফুট এবং বেধ ছিল ৮৫ ফুট। ইহাতে ১ শত দ্বার সংযোজিত ছিল এবং ইহার উপরে ২ শত ৫০টি বলভী (Tower) গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। ইহা ইতিহাসের কথা, কিন্তু রোমাণ্টিক বা পৌরাণিক বর্ণনার অপেক্ষাও ইহা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

এই যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঁচ পাঁচটি নবধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। প্রথমে পারস্যে জোরো-আষ্ট্রীয় ধর্ম্মের প্রচার। তাহার কিছুকাল পরেই ভারতে ও চীনে একই সময়ে চারটি বিভিন্ন ধর্ম্মপন্থার উদ্ভাবন ও প্রচার—এমন একটা আশ্চর্য্য অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার আকস্মিকভাবে ঘটিতে পারে না। কোনও সুদূর সুমেরু-শৃঙ্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি সুবিশাল মন্দাকিনী-ধারা দুর্নিবার বেগে নামিয়া আসিয়া সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া যায় এবং তাহাতে পৃথিবীর আকৃতি-প্রকৃতি সহস্র প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং পৃথিবী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। বুদ্ধদেব এমনই একটি প্রকাণ্ড প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই একই প্লাবনে আসিয়াছিলেন—এক দিকে লাওচো, কংফুচু, মহাবীর এবং অন্য দিকে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, লিওনিডাস, থেমিষ্টক্লিস্ প্রভৃতি। ভারতে ও চীনে আসিল—জ্ঞান, তপস্যা, সাধনা; বাবিলোনে ও পারস্যে আসিল—অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য

বৈভব আর গ্রীসে আসিল—শৌর্য, সৌন্দর্য্য, সাহিত্য ও শিল্প। এই সমস্ত কার্য্যই একই জগৎজোড়া কারণসম্ভূত।

যীশুখ্রীষ্টের যুগ

ইহার পরের মহাভাবের যুগ—যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের যুগ। ১ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে মুশা এবং অন্যান্য হিব্রু ঋষিগণ তাঁহাদের শাস্ত্র প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। সে সব শাস্ত্রের প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কালসহকারে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম এবং তন্নিহিত জীবন্ত সত্য হিব্রুগণ ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। হিব্রুধর্ম্ম কতকগুলি গতানুগতিক প্রথা এবং কতকগুলি প্রাণশূন্য আচার ও বিধিবিধানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। সমাজে স্বার্থান্ধ ও আড়ম্বরী পুরোহিত ও তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের (Scribes and Pharisees) একাধিপত্য হইয়াছিল। তাহারা চিরপ্রচলিত ব্যবহার-বিধির বাহিরে কোনও সত্য থাকিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতে পারিত না। আমাদের দেশে শাস্ত্রে যাহাকে বলে 'ধর্ম্মের গ্লানি', ঐ দেশে তখন তাহাই হইয়াছিল এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতেছিল। কাযেই একটা ভগবৎশক্তির অবতারের একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। যীশু খৃষ্ট সেই অবতার। পাশ্চাত্য দেশীয়রা অবতারতত্ত্ব-কথা জানিলে যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র না বলিয়া ঈশ্বরের অবতারই বলিত। খৃষ্ট ঈশ্বরের অবতার, ইহা কথার কথা নহে, অতি সত্য কথা। হিন্দুরা খৃষ্টকে জানিলে তাঁহাকে কোন না কোন এক শ্রেণীর অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে: কিন্তু অজ্ঞতা এবং মিথ্যা সংস্কার হইল ইহার প্রতিবন্ধক। যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ হইয়া কর্কশ-কুতর্কাচ্ছন্ন জড়ভাবাপন্ন হিব্রুধর্ম্মের অভ্যন্তরে জীবন্ত ভক্তি-বিশ্বাসের প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। অন্ধ-সংস্কারাপন্ন য়িহুদিগণের অধিনায়ক পণ্ডিত ও পুরোহিত প্রভুগণ সন্ত্রস্ত হইয়া দেখিল,—কোথাকার একটা অজ্ঞাত-নামা অর্ব্বাচীন সূত্রধর-তনয় তাহাদের অতি পুরাতন শৈবালাচ্ছন্ন আচার-প্রাচীর-সমূহের উপর সাংঘাতিকভাবে আঘাত করিতেছে। দেখিল, তাহার কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি, ধারণা ও কল্পনা। গতিবিধি সমস্তই তাহাদের বিপরীত। কিছুদিন তাহারা তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া অবশেষে তাহার প্রাণবধের ব্যবস্থা করিল, কিন্তু তাহাকে বধ করিলে কি হইবে? তিনি যে বিশ্বব্যাপী শক্তি-প্রবাহের অন্যতম অগ্রদূত হইয়া প্যালেষ্টাইনে আসিয়াছিলেন। সে মহাপ্রবাহ লক্ষ পাইলেট্ একত্র হইলেও রোধ করিতে পারিত না। অজ্ঞান ইহুদীরা যীশুকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, অথচ যীশু ক্রমে ক্রমে এসিয়া ভিন্ন প্রায় সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র আধ্যাত্মিক সম্রাট্ হইয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। যীশুর পাঞ্চভৌতিক দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িয়া রহিল। যীশু অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া জগজ্জয়ে বহির্গত হইলেন। মথি-জন লূক্ প্রভৃতি জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, যীশুর জড় দেহই তিন দিন পরে চিন্ময় দেহে পরিণত হইয়া যায়।

যে সময়ে ইহুদীদেশে এই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিতেছিল, সেই সময়ে এই সমস্ত ঘটনার কারণরূপিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রবাহময়ী মহাশক্তি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি সমস্ত অভিনব ব্যাপার সংঘটন করিতেছিলেন, অন্ততঃ তাহার কতক কতক নির্দ্দেশ করা অসম্ভব নহে।

খৃষ্টের আবির্ভাবের যুগই রোমক-সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্ব-গরিমা ও গৌরবময় যুগ। এই সময় দিগ্‌দিগন্তরে দেশদেশান্তরে রোমের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছিল। সমগ্র পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিবার জন্ত রোম বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। জুলিয়স্ সিজার, মার্ক এণ্টনি, সিজার অগষ্টাস্ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরগণ এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া শত শত রাজ্য রোমের পদানত করিতেছিলেন। খৃষ্টের ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ১০।১৫ বৎসর পর পর্য্যন্ত সময় অগষ্টাসের আধিপত্যকাল। এই সময়ে সমগ্র ইটালী, ফ্রান্স, বৃটেন, স্পেন, পশ্চিম জার্ম্মাণী, ডালমেশিয়া, ডেসিয়া, মিশিয়া, রিসিয়া, থ্রেস, মাসিডোনিয়া, গ্রীস, এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, আর্ম্মেনিয়া, আরব, মিশর, আফ্রিকার অন্যান্য দেশ, নুমিডিয়া, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, ক্রীট, সাইপ্রেস প্রভৃতি দেশ সমস্তই রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোমের বিশ্ব-বিজয়প্রয়াসিনী শক্তি ইহাতেও তৃপ্ত ছিল না। দ্রুতবেগে ভারতবর্ষ ও এসিয়ার অন্যান্য দেশের প্রতি অগ্রসর হইতেছিল। রোম মহানগরীর যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের—শত শত মর্ম্মরনির্ম্মিত সৌধ, দেব-মন্দির, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গোদ্যান প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করিতেছে, তাহার অধিকাংশই এই সময়ে অগষ্টাস্ সিজারের রাজত্ব-কালে গঠিত হইয়াছিল।

এ দিকে এসিয়ার সমগ্র মহাদেশ ব্যাপিয়া একটা সুমহৎ উদ্বোধনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পৃথিবীতে বান ডাকিয়াছে, মানুষ কোথাও কি নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে? তাহার ঘরের ভিতর যে জল-প্রবাহ! স্রোতের টানে তাহাকে ইতস্ততঃ ভাসিতেই হইবে। মধ্য-এসিয়ার অবস্থা এ সময়ে এই প্রকার দিকে দিকে ভাসিয়া যাইবার অবস্থা। বিভিন্ন জাতীয় জনগণ গৃহহীন এবং প্রায় উদ্দেশ্যহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতেছে। মারামারি কাটাকাটি হইতেছে—রক্তস্রোত বহিতেছে!

খৃষ্টের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে শতাধিক বৎসর পর পর্য্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপার মধ্য এসিয়ায় ঘটিতেছিল। যুয়েচি নামক একটা খুব বড় যাযাবর জাতি চীনের পশ্চিমাংশ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া তাক্‌লা-মাকান বা গোবি মরুভূমি পার হইয়া আরও পশ্চিম-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এ দিকে আরব-সাগরবাহিনী সীরদরিয়ার উপান্তদেশবাসী শক নামক আর একটি ভ্রমণপ্রিয় জাতিও এই সময়ে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পথে দুই জাতির সাক্ষাৎ হইলে অস্ত্রে অস্ত্রে অভিবাদন হইল। যুয়েচির জয়লাভ করিল। শকেরা ভারতবর্ষের দিকে পলায়ন করিল। যুয়েচিরা শকদের দেশ অধিকার করিল। ইহার কিছু দিন পরে হূণ নামক আর একটি ভবঘুরে জাতি চলিতে চলিতে যুয়েচিদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। ইহাদের বাহুবল ও তেজ দেখিয়া যুয়েচিরা মানে মানে বাড়ীঘর ছাড়িয়া পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিল। প... ইহারা আমুদরিয়ার চারিদিকের দেশসমূহে চিরস্থায়ী বসতির বন্দোবস্ত করিয়া ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী মহাজাতি গঠন করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। ইহাদেরই এক শাখা হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কুশান্-রাজবংশের উদ্ভব। এই কুশানবংশের অবতংসস্বরূপ বিক্রান্ত-কীর্ত্তি মহারাজ কনিষ্ক। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমের দিক দিয়া এই কনিষ্ক ভারতের রাজাধিরাজ।

এ দিকে আরও কতকগুলি পর্য্যটক জাতি পার্থিয়া ও বাক্ট্রিয়ার অধিপতি গ্রীকরাজগণকে দুরন্তবেগে আক্রমণ করিয়া তাহাদি... রাজ্যপাট লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল। এই প্রকারে সমস্ত ... ব্যাপিয়া একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন চলিতেছিল। এক দিক হইতে রোমের বিজয়দুন্দুভি শ্রুত হইতেছিল। আর এক দিকে এসিয়াবাসী গ্রীকগণ তাহাদের আধিপত্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছিল। অন্ত দিকে চৈনিক কুশান-রাজবংশের সৌভাগ...

দীপ্ততেজে উদিত হইতেছিল। আর নানাদিক্ হইতে নানাপ্রকার আধিপত্য-প্রয়াসী অনিশ্চিত-নিবাস জাতি নানারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছিল। এই সব কর্ম্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক দিক। ইহার অনুরূপ ব্যাপার জ্ঞানের রাজ্যেও ঘটিতেছিল।

চৈনিক তুরস্কের খোটান প্রদেশে এই সময়ে চারিটি প্রকাণ্ড সভ্যতার সম্মিলন ঘটিয়াছিল—গ্রীক, পারসিক, চৈনিক ও ভারতীয়। স্বভাবতঃ সকলের সংস্পর্শে সকলেরই বর্ণ ও আকৃতি-প্রকৃতি অনেকাংশে বদলাইয়া যাইতেছিল। ভারতীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম অবশ্য অন্যান্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা জীবন্ত ও শক্তিশালী ছিল। এই সময় হইতেই চীনারা বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অভিনব অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এই সময় গুরু পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইতেছিল। আদি বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল শুধু জ্ঞানপ্রধান নহে—জ্ঞানসর্ব্বস্ব; সুতরাং শুষ্ক ও কঠিন। কঠোর তপস্যা; প্রকৃষ্ট চরিত্রশুদ্ধি ও সর্ব্বাঙ্গ সন্ন্যাস ছিল এই ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব, কিন্তু এই সময়ে এই ধর্ম্মে ভাব ও রস প্রবেশ করিয়া ইহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। আদি বৌদ্ধধর্ম্মে ভগবানের স্থান ছিল না। এখন হইতে বুদ্ধকে সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইল এবং বুদ্ধকে বেষ্টন করিয়া বোধিসত্ত্ব নামক বুদ্ধানুগত দেবতার এক মণ্ডল সৃষ্ট হইল।

এই নবভাবের প্রেরণায় এবং এই নবভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য মহারাজ কণিষ্কের সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে একটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ ভাস্কর্য্য-বিদ্যার সাধন আরম্ভ হয়। এই ভাস্কর্য্যে ভারতীয় আদর্শগুলি গ্রীক আদর্শের সহযোগে অনেকাংশে নূতন রূপ প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধের প্রতিমা সকল এপলোর প্রতিমূর্ত্তির ভাব ধারণ করিল এবং কুবের জিয়ুসের রূপ গ্রহণ করিলেন। পরিচ্ছদ-সংস্থান বিষয়ে ভারতীয় ভাস্করেরা গ্রীকদের অনুকরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে গান্ধারদেশে ভাস্কর্য্য-বিদ্যার একটি উন্নতিশীল সমাজ গঠিত হইয়া উঠে। কনিষ্ক এই সময়ে পুরুষপুর, তক্ষশীলা, মথুরা প্রভৃতি নগরীকে কারুকার্য্য-বিমণ্ডিত অট্টালিকা এবং অতিশয় মনোরম প্রতিমূর্ত্তিসমূহ দ্বারা বিভূষিত করেন। জ্ঞান-বিদ্যার আলোচনায় কনিষ্কশাসিত ভারতবর্ষ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাগার্জ্জুন, অশ্বঘোষ, বসুমিত্র ও চরক প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত, কবি ও জ্ঞানিগণ এই সময়ে কনিষ্কের রাজপ্রাসাদসমূহ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। এ দিকে ভারতের সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য, কেরল ও চোল প্রভৃতি তামিলরাজ্যসমূহে একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল। মদুরা ছিল ইহার কেন্দ্রস্থল।

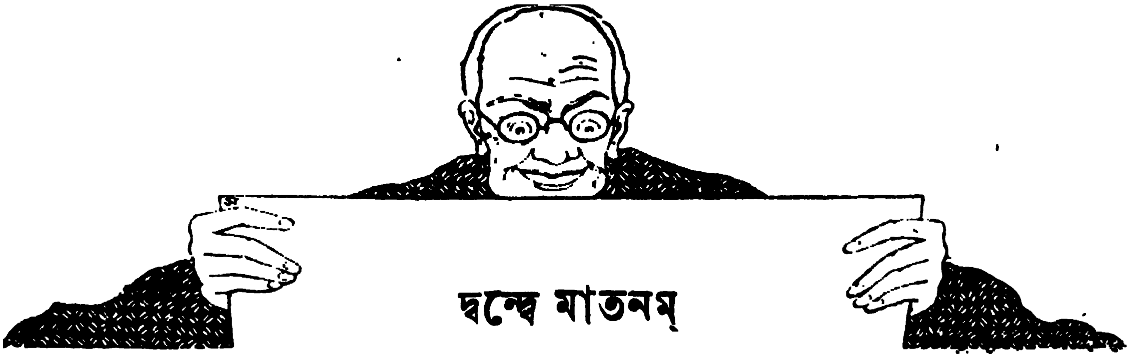
য়ুরোপে এই যুগে অগষ্টাস সিজারের রাজত্বকালে এবং তাহার কিছু আগে এবং পরে লাটিন সাহিত্যের চূড়ান্ত উন্নতিসাধন হইয়াছিল। লুক্রেসিয়াস, ভার্জ্জিল, হোরেস্ প্রভৃতি মহাকবিগণের এই যুগে আবির্ভাব হইয়াছিল। বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো এই সময়ে ওজস্বিনী বক্তৃতাবলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

শ্রেষ্ঠ-অঞ্জলি

হে পথিক! কৃষ্ণ এই তামসী নিশার মাঝে
কোথা যাও ধীরে?
কেন ভ্রান্ত পথ বাহি' মত্ত আশায় ভ্রম'
মরীচিকা তীরে?
বিসর্পিত যেবা পথে চলেছ অসীম বেগে
কোথা শেষ তার?
দূর হ'তে মনোরম তারকা-কুসুম-রাজি—
সৌন্দর্য্য অপার!
কেন কম্প্র-বক্ষ তব উদ্বেলিত প্রাণ—কোন্
আশার ছলনে?
বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ কর বদ্ধাঞ্জলি—কেন
ধারা দুনয়নে?
ধেয়ে আসে প্রভঞ্জন—উঠিবে প্রলয় ঘোর—
হের অন্ধকার!
চুমি মেঘ দয়িতেরে চল চঞ্চলা,—লাজে
লুকায় আবার।
ফিরে এস হে পথিক! কেন বাতুলের প্রায়
প্রলয়ে মিশাও?
অনিশ্চিত দুরাশায় অভিযান—কোথা তব,—
চাও ফিরে চাও!
তুমিও কি মোর সম মরীচিকা তীরে তীরে
ভ্রমিছ নিয়ত?
খুঁজিছ পরশমণি? পেয়েছ সন্ধান তার?
হে বেদনাহত!
পাও নাই—পাও নাই—সন্ধান সে অশেষের?
যাত্রী—এক পথে?
এস তবে মোর পাশে, হই শুভ-লগনেতে
ব্রতী—এক ব্রতে।
শাণিত কৃপাণে তব দীর্ণ করি' বক্ষ মোর
করহ বাহির—
হৃদয়—আত্মার মোর—; বক্ষ চিরিয়া তব
দাও হে রুধির,
সে রুধির-চন্দনেতে—জীবাত্মা-কুসুম মোর
সম্মিলিত করি—
ধনুঃশরে পুষ্প সেই করিয়া যোজন তাহে
ঊর্দ্ধমুখে ধরি'—
উৎক্ষেপিয়া সেই তীর—অকরুণ অভিমুখে
করহ সন্ধান!
প্রাণ-পুষ্প শোণিতাক্ত নীল আবরণ ভেদি'
ভেদিয়া বিমান—
পড়ুক্ সে অচলের পাষাণ চরণতলে
হয়ে শ্রেষ্ঠাঞ্জলি!
দেখি তায় সে জনের কুলিশ-কঠোর প্রাণ
উঠে কি চঞ্চলি'?

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়



দ্বন্দ্বে মাতনম্

স্বস্তিবাচন।

(ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে উপাসক-উপাসিকাগণ)

(গীত)

নারীগণ।

তেত্রিশ কোটির ওপর ঠাকুর তুমি ভোটেশ্বরী।
নারদ ঋষির মানস-কন্যা দম্ভে লম্বোদরী।
আত্ম-বন্ধু-প্রীতি যথা থাকে গলাগলি,
তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি তথা করে দলাদলি,
মদ না খেয়ে পদের ভরে ঢলাঢলি বরাঘরি।

পুরুষগণ।

আমরা দলের পাণ্ডা মেজাজ ঠাণ্ডা কর্‌তে ডাণ্ডা ধরি।
কোথাও পাঠাই দেত্য-দানা, কোথাও পাঠাই পরী॥

নারীগণ।

ভোটেতে যে একটি দিন ছোটোর বাড়ে গর্ব্ব,
মুটের দোরে রাজা লুটে বলে আমি খর্ব্ব,
বিলাত থেকে খেলাৎ ব'লে পর্ব্ব এলো শুভঙ্করী।

পুরুষগণ।

ভোটে ইষ্ট নেতা তুষ্ট দল পুষ্ট কষ্টে কাতরম্।
দ্বন্দ্ব গন্ধে অন্ধ তাই বন্ধ 'বন্দে মাতরম্'॥

সকলে।

বরদে এ বিরোধে পরিয়েছ মা শাদা গরদ,
দেশাদ্বেনীর নাম দে'ছ গো দেশের দরদ,
পূজে তোমার পদ, ক'রে গুরুবধ, নাম কিনেছি মস্ত মরদ।
অ-মুসলমান ব'লে পেয়েছি সম্মান, গেছে হিন্দু পরিচয়;—
অজাত বলিয়া বিখ্যাত জগতে গাই স্বজাতের জয়।
শুধু কুড়াইয়া ভোট হব সব লোট
কোট্ বজায়ে বর ভিক্ষা করি;—
সুহৃদ-মর্দ্দিনী, বিরোধ-বর্দ্ধিনী, বৃটিশ-তোষিণী দেবী ভয়ঙ্করী॥

বোধন।

কলিকাতা—একটি বস্তি-পল্লী।

নিত্য প্রত্যক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃশ্যে নাটোক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর পাত্রীর গমনাগমন ও আহ্নিক-ক্রিয়াদি দ্বারা যাথার্থ্য সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত।

গোবরার মা ঘুঁটে গুণিয়া গুণিয়া ঝুড়িতে ভরিতেছে।

গোব্‌রার মা। নাচ গণ্ডা—নাচ গণ্ডা—ছ'গণ্ডা; ছ' গণ্ডা—ছ'গণ্ডা—সাত গণ্ডা;—সাত গণ্ডা—সাত গণ্ডা—আট গণ্ডা;—আট—আট—

(চমনিয়ার প্রবেশ)

চমনিয়া। এ গোবর কি মাতারি—এ গোবর কি মাতারি

গোব্‌রার মা। এই ন'গণ্ডা;—ন'গণ্ডা, ন'গণ্ডা—

চমনিয়া। আরে শুস্তি নেহি, গোবরকা মাতারি ঢুঁড়াং—ঢুঁড়াং—

গোব্‌রার মা। আরে মর আঁটকুড়ী ভুলিয়ে দিলে আট—না ন'গণ্ডা কি ছাই গুণ্‌নু।

চমনিয়া। আরে কয়ঠো বাবু নে তুহার দরওজা'পর খাড়া হোকে ভুঁকে বোলাতে।

গোব-মা। তোর সাতানীর সাতপুরুষকে বোলাচ্ছে বাবুতে;—আ মর্ নচ্ছার ছুঁড়ী, আমাদের বন কেটে বাস এ পাড়ায়, কেউ কখনও কোন কুচ্ছ ক'রে বল্‌তে পারে না; আমায় বাবুতে বোলাচ্ছে?

চমনিয়া। আরে চিড়্‌তে হো কাহে মায়ী? গালি কাহে দেও; ভালা ভালা বাবু হাওয়াগাড়ীসে উতারকে খাড়ে হ্যায়—

(গোব্‌রার মা উঠিয়া কোমর বাঁধিয়া)

গোব-মা। তবে রে ছুঁচোর বেটী পাজিনী, আমাদের গয়লার বংশকে বাবু দেখাতে এয়েছিস? আ মর্ খোট্টানী, ভেড়ীওলানী, ছোলাভাজানী, ছাতু-কোটানী, তোর দরজায় হাওয়া গাড়ী দাঁড়াক্, জুড়ী গাড়ী দাঁড়াক, ময়লা-ফেলা গাড়ী দাঁড়াক—

চমনিয়া। ভালা! বাঙ্গালীন্‌কো ভালা বাৎ কহে ত চোটা বান্‌কে মার্‌নে ধাওয়ে! বাবুলোক আয়ে ভোট মাঙ্‌নে কে লিয়ে; তুহার একঠো ভোট বাটন।

গোব-মা। কি—কি হয়েছে?

চমনিয়া। আরে তুহার একঠো ভোট আছো—ভোট আছো।

গোব-মা। আ মর্ মাগী! নগদ নগদ ট্যাকা দিয়ে কেনা আমার সব গরু-বাছুর, আর বলে কি না আমার ঘরে ভোট আছে; যত চোরাই মালের আড্ডা তোর ওই ভুনোওয়ালা মিন্‌ষের ঘরে, আমি জানিনি বটে!

চমনিয়া। চোরীকা বাৎ কোন্ কহল? গোয়ালাকা লাইসিনী তুহার নাম্‌মে আছো, না মেরি নাম্‌মে আছো?

গোব-মা। আমার গোয়ালের লাইসিনী আমার নামে থাকবে না ত তোর খাশুড়ীর নামে থাকবে?

(নীরদ ও ক্ষীরোদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে—গোবর বাবুর মা এখানে!

গোব-মা। (মাথার কাপড় টানিতে চেষ্টা করিয়া) ও মা—এরা কারা গো! (প্রকাশ্যে) তা বাবা, আছে ক'টা গরু বটে, লাইসিনী ত দিই, দুধে জল, তা বাবা, এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি—

ক্ষীরোদ। না—না—না, ও দুধে জল-টলের জন্যে আমরা আসিনি। এই খড়-খোলের বাজার চড়া, একটু আধটু কলের জল যদি না দুধে দেবে ত চল্‌বে কেন? আমরা আসছি নির্ব্বাণবাবুর তরফ থেকে।

গোব-মা। না বাপু না, নিবারণ বাবু আমার দুধ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

নীরদ। তা দিন গে। তোমার ভোটটা কিন্তু তাঁকে দিতে হবে। আমরা এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব; তোমার সুখের শরীর, রিক্‌সা চড়তে পারবে না, জুড়ী চাও, মোটর চাও, যা বল, আন্‌ব।

গোব-মা। হাঁা বাছারা, আমার কি বাগান যাবার বয়স আছে? ছিঃ, আমায় ঠাট্টা কর্ত্তে নেই।

ক্ষীরোদ। ঠাট্টা! সে কি? আপনার মুখ ঠিক আমার ন'পিসীমার মতন। তা পিসীমা, গোবর বাবুর কাছেই আসতুম।

গোব-মা। ও মা! আমার গোব্‌রা আবার বাবু হ'ল কবে গো? দুধের মস্ত মস্ত টিনের ওইগুলো হয়েছে, সেগুলো বাঁকে ক'রে বইতে পারে না, তাই একখানা ভাঙ্গাচোরা গাড়ী রেখেছে: তা ব'লে বাবু-ফাবু ব'লে তাকে অপমান্যি করবেন না মশাই!

নীরদ। অপমান! আপনি বোধ হয় পরশুর্কার 'বুকের পাটা' পড়েন নি; গোপ-মাহাত্ম্য ব'লে তাতে একটা দেড় কলম আর্টিকেল বেরিয়েছে, গোবর বাবুর নাম তিন তিন বার সেখানে উল্লেখ আছে—আমি নিজে লিখেছি। তা' এই কথা রইলো; আপনি তৈরী থাকবেন—লাল নিশেন গাড়ী—এইটে মনে রাখবেন। (চমনিয়ার প্রতি) মক্কাপোড়ানি ভগ্নী! তোমার স্বামীকো—আদ্‌মীকো—খসম্‌কো—

চমনিয়া। ও নীলুবাবু পাকাড়্‌ লে গিয়া। পাঁচ পাঁচ বাবু আকর্ উন্‌কো লে গিয়া; ও নীলুবাবুকা ওয়াস্তে ভোটাইয়ে গা।

ক্ষীরোদ। তবে সর্ব্বনাশ হোগা। শুনুন গোবরচন্দ্রবাবুর মা, আপনি নির্ব্বাণবাবুকে ভোট দিলে দুধের লাইসেনী অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। ফুঁকো দেবার ব্যবস্থা যা বেদে আছে, তা' জার্ম্মাণী থেকে বই আনিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবেন আর কসাইকে গরু বেচলে যে তোমাদের গাল দেবে - তার মেয়াদ হবে।

চমনিয়া। আরে মেরি দেওর পান বেচতা, উস্‌কো চোর বোল্‌তা।

নীরদ। ওই নীলুবাবু, ওই নীলুবাবু, নীলুবাবুকে ভোট দিলে, এখন চোর বল্‌ছে, তখন ডাকাত বল্‌বে। আর নির্ব্বাণবাবু একেবারে মাটীর মানুষ! হাজার খিলি পান তার নিত্যি খরচ! তোমার দেওরের দোকান

থাকতে পোলিংএর দিন।তিনি কি আর কোথাও থেকে পান নেবেন ? তবে আমরা চললুম—ঠিক রইল সব।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোব-মা। হ্যাঁলা চামানি ! এ আবার কি গেরো ? জমীদারের খাজানা আছে, টেক্স আপিসের ট্যাকা আছে, লাইসেনীর নুটীশ, ইনিশপিক্চার বাবুর দুধ দই, তা'র উপর ভোট ব'লে কি ঘোঁট ক'রে গেল ?

চমনিয়া। সরকারকে হুকুম।

গোব-মা। মিছে নয় ! হুকুম—চকুম—চকুম, আবার তা'র ওপর ভোটের জুলুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাখালবেশী বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

হা রে রে রে রে রে রে উঠ রে কানাই।
পোলিং এল চল চল ভোটে যাই ॥
সাজাইব তোরে খদরে আদরে,
বেঁধে দিব চূড়া উড়ানী চাদরে,
ওঠ রে ওঠ রে ওঠ ছোটো ভাই।
ডাকে হাম্বারবে যত হতভম্বা ধেনু,
নাহি শুনে কানু মোটরের বেণু,
ভোটে যেতে নাহি চায়—
ওঠ রে গোপাল, খুলেছে কপাল, ডাকে শিশুপাল
করিবারে চাই ॥
হা রে রে রে রে রে রে উঠে কর কেলি,
ছুটে গোঠে গিয়ে খেলি,
খেলা বই ভোটে আর কিছু নাই ॥

[প্রস্থান।

(তামিজ মিঞা ও কলমদ্দীর প্রবেশ)

কলমদ্দী। আরে কইতে পার তামিজ মিঞা, তুমি ত এংরাজের হউসে দপ্তরীর কাম ক'রে মুরগুলা সফেদ ক'রে ফ্যালছ ; এই যে ভোট ভোট কইছে, এর হদিসটা কি আমায় সমঝে দিতে পার ? তোমরা-চোমরা বাবুগার বাড়ীর জবর জোয়ান মরদগুলো নাকে রুমাল না ঠুসে রাস্তা চলে না, আমাকে পায়ে হাঁটা রাহাগিরের সাথে কথা কয় না, আর তা'রা মস্ত মস্ত গাড়ী-জুড়ী থে নেমে এই বস্তির বীচে ধোপা, নাপিত, গয়লা, উড়ে, মেথুরা সবার নাচে নাচে এই ভোট ক'রে বেড়ায়—এতে ওদের মুনাফাটা কি ?

তামিজ। তামসা রে কলমদ্দী, ও এড্ডা বিলেতী তামসা ! মুই 'জান' ছাহেবের মুয়ে শুনছি, মোগার ঢাহা জিলায় খয়রাতি মিঞা যেমন কুঁকড়োর নড়ুয়ে হাজার হাজার টাহা খরচ কইরে তামসা ছ্যাহে, বাগাতে বড় বড় ছাবরা তেমনি মানষির বীচে ঐ ভোটের নড়ুই বেঁধিয়ে তামসা ছ্যাহে। তা এংরাজ সরকার আপনগার জমীদারীতে তানাদের ছ্যাশের ছাতা, জুতা, ফিতে, ইসে বামনগর পৈতে লাগাৎ আমদানী করছে ; বাণ্ডিল খাওয়া, এণ্ডাল খেলা, ঘোরার লাচ, ম্যামের লাচ, ডগা মুড়ান মোচ, বাইস্কোপ সব আমদানী করছে, আর ভোটের তামসাটা আমদানী করবা না !

কলমদ্দী। মোরাও খাজনা দি, ট্যাক্স দি ; লাইসেন দি, মোগার মোছলমানের ঠাই ওনারা ভোট মেগতে আসে না ক্যানে ?

তামিজ। আরে কলমদ্দী, তুই হালা পাঁচ সাঁজ নেমাজ করিস্ ক্যান্ ? তুই মুই যে বাদশার জাত রে হালা বাদশার জাত ! ওই কাফের হাঁদুগুলারে ভুটিয়ে দিয়ে মোরা কি এমানটা খুইয়ে ফ্যালমু ? মোগার মোছলমান মিঞাদের লেগে জুদা বৈঠক বসছে। জান্ সাহেবের কাছে শোনছি, হাঁদুগর আর জাত নেই রে জাত নেই ! লাট ছা'বের ফিরিস্তিথে হাঁদু হালাদের নামই বরখাস্ত অইছে ! এ মুলুকের মালিক মোরা মোছলমান, আর ঐ হাঁদুগুলোর নাম অইছে 'বে-মোছলমান !' মোগার মোছলমান বৈঠকের কোন্ডুলি—ছোলতান অইবার লেগে খাড়া অইছেন মৌলবী আতাউল্লা ছা'ব।

কলমদ্দী। কাগজি সাদেকের পোলা ?

তামিজ। আরে হালা, ছাদেক মিঞাছা'ব পুরানা কাগজ বিগ্রি-শিশি বোতল বিগ্রি ক'রে ছাবালেরে ব্যাংরাজি এলেম শিখিয়ে টেক্স আপিসের নক্সা আঁকা মৌলবী করছে ; তা'তে কি খানদানির এজ্জৎ গিইছে ?

(ফকিরা প্রভৃতি মুসলমান প্রতিবেশীর প্রবেশ)

ফকিরা। ছালাম • আলেকম্ তামিজ মিঞা ; ক

কলমদ্দী, বেয়ান ওক্তে কিসের তগ্রার লাগিয়েছ, কামে যাবা না ?

কলমদ্দী। বাবুদের বয়কট কর্‌ছি—বয়কট কর্‌ছি; আটটায় হাজির হ্যাব, ছয়টায় ছুটী, হ্যাড় রোজা লিখে হ্যাবে, নয়সিকা রোজ, তবে কর্ণিক ধর্‌ব—

ফকিরা। এট্টা শলা নিতে আলাম তোমার ঠাঁই তামিজ মিঞা! বস্তির মধ্যি মুরুব্বি-সুরুব্বি তুমি—তাই তোমারেই শুধুতে আলাম্। আতাউল্লোর তরফ থে তানার বুন্থই আস্‌ছিল কাল সাঁজে মোর বিড়ির দোকানে, ওই ভোটের কথা কইছিল; তা আমাদের বিচে ঠিক হয়েছে, তামিজ মিঞা যা এনসাব কর্‌বে, তাই কর্‌ব। কও, তুমি কারে ভুটুতে বল ?

তামিজ। আরে কও কথা, আতাউল্লো ছা'ব থারা রইতে ভুটুতে যাবা কি ওই রমুনসদ্দারের বাই হিমুল মিঞারে? আতাউল্লোদের খানদানিটা মালুম করিস কি? ওই যেনারে কাগ্‌জি ছাদেক কই, ওনার পরদাদার পরদাদার খাস মোকাম ছ্যাল ইরাণ ছহরে—

কলমদ্দী। ইরাণ ছহরটা কোন্ দ্যাশে চাচা ?

ফকিরা। আরে আরব মুল্লুকে।

কলমদ্দী। আরব! সে আবার কোন্ জিলা ?

তামিজ। ইমন ব্যাকুব এই কলমদ্দীটা! আরব কনে জানে না! ওরে হালা, আর মোরে চাচা কস্‌নে—কস্‌নে; গাজীপুরের পচ্চিম বাগে দে যে সাতক্ষীরে নদীটা গ্যাছে, সেহান থেহে কোশ তিনেক দূরে আরব ছহর; এ আর জানিস্ না ?

(ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে ভাল্লুক-নাচওয়ালার প্রবেশ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোট ছোট বালক-বালিকার দল)

ভা-নাচওয়ালা। ভালুক নাচে—ভালুক নাচে—ঠমুক ঠমুক ঠমুক নাচে—ভালুক নাচে—ভা—আ—আল্—

১ম-বালিকা। ও ভাল্লুকও'লা, দু'টো রোঁয়া দে না!

২য়-বালক। ও ভাল্লুক, হাব্লিকে কামড়া রে কামড়া!

৩য়-বালক। আমাদের বাড়ী আয় না, একটা পয়সা দেবো।

ভা-নাচ। এক পয়সা মে ভাল্লুক নেহি নাচ্‌তা; চার পয়সা, ভালুক—নাচে—ভালুক নাচে—ভা—আ—আল্—

২য়-বালক। ও ভালুকও'লা, তোর ভাল্লুকের কখন জ্বর হবে ?

৪র্থ-বালক। ঐ বৈরাগীদের বাড়ী চার্‌টে পয়সা দেবে; চল—চল—

তামিজ। তোবা! তোবা! এ হালার ভাল্লুক কন্‌থে আলো? মোর হাতে তছবি, আর হালার পো হালা ডগর ডগর বাজা বাজাতে সুরু কল্ল! র' হালা—র' হালা কাফেরের পো, আতাউল্লোছাব সে রোজ মজলিসে ছাফা কইছে যে, উনারে ভোট দে কৌনছিলের ছোলতান কর্‌লে ইমন একটা আইন জারি করিয়ে দ্যাবে; যা'তে মোছলমান মিঞাদের চলবার জন্যি রাস্তার বিচে একটা জুদা ফুটপাতর বনবে; চলতি চল্‌তি কাফেরের ছোঁয়া-ছ্যাপায় খোদার মোবারকে আউলিয়ার জেতের ইমান ভরা দ্যাহে গল্‌তি না লাগে।

ভা-নাচ। আরে নাচে ভালুক—নাচে ভালুক—নাচে ভা—আ—আ—ল্—

কলমদ্দী। আরে এ হালা ভাল্লুকওলা মেড়ুয়াবাদী, নইলে আজ গর্দ্দানাটা—

তামিজ। দিন আস্‌বা কলমদ্দী, দিন আস্‌বা! দুটো রোজ সবুর কর। ফকিরা বাই, দুই একটা বিড়ি-টিড়ি খাওয়াইবা ?

ফকিরা। তোমার এনায়েৎ—তোমার এনায়েৎ, আইস দোকানে।

[মুসলমানগণের প্রস্থান।

(ভাল্লুক-নাচওয়ালার গীত)

নাচে ভাল্লুক নাচে ভাল্লুক
মেরে মুল্লুকচাঁদ ভাল।
জংলা জানোয়ার বাঙ্‌লা আয়া
নাচো খেম্‌টা তাল ॥

বালক-বালিকাগণ। জংলা জানোয়ার বাঙ্‌লা আয়া
নাচো খেম্‌টা তাল।
নাচে ভাল্লুক নাচে ভাল্লুক
মেরে মুল্লুকচাঁদ ভাল ॥

ভাল্লুক-নাচওয়ালা। বাবু নাচে, বিবি নাচে,
নাচে লেড়্কাবালা ;
বুঢ়া নাচে বুঢ়্টি নাচে,
নাচে মিঞা লালা ॥

বালক-বালিকাগণ। বুঢ়া নাচে, বুঢ়্টি নাচে,
নাচে মিঞা লালা ;
বাবু নাচে, বিবি নাচে,
নাচে লেড়্কাবালা ॥

ভাল্লুক-নাচওয়ালা। ভোট ভোট কর্‌কে সব কই নাচে
নাচে ঘাটোয়াল ;—
ভোর্‌সে নাচে পহর রাত
সহর লালে লাল ॥

বালক-বালিকাগণ। সহর লালে লাল
সহর লালে লাল !
জংলা জানোয়ার বাঙ্‌লা আমা
নাচো খেম্‌টা তাল।
মেরে মুল্লুকচাঁদ ভাল ॥

[সকলের প্রস্থান।

(বাজবাহাদুর ও গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গুরুচরণ। প্রতি বৎসর-ই মাকে আনয়ন করি, যথা-বিহিত পূজা হয়, পাঁচ জন বড় লোক কিছু কিছু দেন, তাতেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়; নইলে আমি গরীব ব্রাহ্মণ—কোথায় কি পাব ? কর্ত্তা বরাবর পাঁচটা ক'রে টাকা দিতেন –

বাজবাহাদুর। কর্ত্তার অনেক টাকা ছিল ; আমার এক বোনের পুতুলের বে দিয়েই পাঁচ ছ' হাজার টাকা খরচ করেছেন ;—তাঁ'র কি ?

গুরুচরণ। আজ্ঞে, আপনিও ত দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি করেন—

বাজবাহাদুর। দেবতা মানি, ভক্তিও করি, তা ব'লে ব্রাহ্মণকে মান্‌তে যাব কেন ? ঠাকুর, ও সব জুচ্চুরি আর চল্‌ছে না, চল্‌ছে না। দেখুন, অনেক কাল আপনারা ফাঁকি দিয়ে খেয়েছেন ; উঃ কি ভয়ঙ্কর জুচ্চুরি বলুন দিকিন আপনাদের, একেবারে জুলুম ! শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, তার'পর বছর বছর শ্রাদ্ধ ; বাবা মরেও আপনাদের হাত থেকে নিস্তার নেই ; ইংরেজ যে বেণের জাত, সেও মরার ওপর ট্যাক্স বসায় না।

গুরুচরণ। এ সব ক্রিয়া-কর্ম্ম না হ'লে ব্রাহ্মণের চল্‌বে কি ক'রে ?

বাজবাহাদুর। তা ফাঁকি দিয়ে খাবেন ব'লে কি পরের ওপর জুলুম ? বামুন না হ'লে ঠাকুরপুজো হবে না, এ কোথাকার বিধি ? আমি যদি কখনও বাড়ীতে ঠাকুর আনি ত আমাদের বাড়ীর সরকারকে দিয়ে পুজো করাব। সংস্কৃত না বল্লে কি ঠাকুর বুঝতে পারে না ?

গুরুচরণ। আজ্ঞে, বেদে ব্রাহ্মণের অধিকার।

বাজবাহাদুর। বেদ ? বেদের বুঝেছেন কি ? বেদ পড়েছেন ভাল ক'রে ? বেদ ত সেদিনকার লেখা – অদিতি চক্রবর্ত্তীকে জিগ্‌গেস করুন গে ; ফাইললজি ত জানেন না, তা বুঝবেন কি ? বেদে যা সংস্কৃত আছে, তা বিক্রমাদিত্যের ঢের পরে।

গুরুচরণ। আজ্ঞে, আপনি যখন বল্‌ছেন –

বাজবাহাদুর। আমি বলছি কি ? একখানা 'ভনগ্রাফ বেল্লীগালের' বই আনান, আনিয়ে দেখুন ; আরবদের ভেতর বেডোইন ব'লে একটা জাত ছিল, তারা যে গান গেয়ে লুঠ কর্‌তে যেত, সেই গানগুলো জড় ক'রে 'ব্যাসেৎ' ব'লে এক জন ইহুদী প্রথম পাবলিশ করে—

গুরুচরণ। আশ্চর্য্য গবেষণা আপনার।

বাজবাহাদুর। হিস্ট্রি ফিস্ট্রি কিছুই পড়লেন না, তাই বল্‌ছেন গবার শোনা। বেদে 'সবিতা' ব'লে একটা কথা আছে ত ?

গুরুচরণ। হাঁ, সূর্য্যের আর একটি নাম।

বাজবাহাদুর। সূর্য্য ! সূর্য্যি ছেল কোথায় ? সিরিয়া থেকে সুরীয় ক্রমে বাঙ্‌লায় সূর্য্যি দাঁড়িয়েছে। সবিতা রাসিয়ার সোভিয়েট কথা থেকে হয়েছে, জানেন ? ও সব বামনাই কাম্‌নাই ছেড়ে দিন। জাত টাত আর থাকবে কি ? বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখে নেবেন, বিলেত থেকে যত বেকার লোক আছে, সব এসে বাঙালীর মেয়ে বিয়ে ক'রে আমাদের সংসারে ঢুকে পড়বে। আমাদের উচিত হচ্ছে, এখন থেকে মোচলমানের ঘরে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, ব'

হ'লে ধোঁকাখুঁকির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে; তা না হ'লে একজাত হবার কোন উপায় নেই।

গুরুচরণ। ভাল কথা রাজবাহাদুর! এই যে ভোটের লড়াই চলছে, এর একটা নিষ্পত্তি হ'লে এ হাঙ্গাম-টাঙ্গামগুলো কি মিটে যাবে?

রাজবাহাদুর। নিশ্চয়ই যাবে। গোটা দুই সোজা কায করলেই এদ্দিন গোল মিটে যেত। তা কেউ ত পড়বে না শুনবে না, খালি কাউন্সিলে ঢুকে এ ওকে হারাব, এই নিয়ে মত্ত, আর রাহাখরচ বাবদ একটা উপস্বত্ব।

গুরুচরণ। আপনিও কেন ভোটের জন্য দাঁড়ালেন না?

রাজবাহাদুর। দোরে দোরে খোসামোদ কর্ত্তে যেতে আমার দায়টা পড়েছে! তবে আমি খুব ভাললোকের কাছে শুনেছি যে, যদি ঢোলের ওপর 'ডিউটি' বসে, আর পথে যেতে যেতে যে মুসলমান ভ্রাতা যেখানে সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়ে ঢ'লে পড়ে, তার সেইখানেই গোরের ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে কোন গোলই থাকে না।

গুরুচরণ। তবে যে শুনেছিলুম, চাকরীর ভাগাভাগি নিয়ে একটা কি ঝঞ্ঝাট বেধেছে?

রাজবাহাদুর। বাধবেই ত; সব চাকরী ওদের ছেড়ে দিতে হবে,—লেখাপড়া শিখলে না শিখলে, তাতে কি এল গেল? ওদের সঙ্গে পারবে কেন?

গুরুচরণ। আমি ত এক বিপদে পড়েছি। শম্ভু বাবু ডেকে বলেছেন যে, আমার যজমানদের ভোটগুলো যাতে নীলু বাবু পান, তার তদ্বির করতে হবে, আবার ঐ বাড়ীর মধ্যেই তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্তুর অভয়চরণ বলেন, কে এক জন নির্ব্বাণ বাবু আছেন, তাঁর দলে আসতে।

রাজবাহাদুর। আমার পরামর্শ শুনবেন?

গুরুচরণ। আজ্ঞে, অবশ্য শুনব; আপনাদের দ্বারাই আমরা প্রতিপালিত—

রাজবাহাদুর। এই ত সাম্নে আপনার কালীপুজো, যারা আপনার পুজোয় বেশী প্রণামী দেবে, তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ুন।

গুরুচরণ। কিন্তু সেটা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ হ'বে না?

রাজবাহাদুর। রাজনীতির সঙ্গে আবার ধর্ম্ম-নীতি জড়াতে আসছেন কেন? ঐ ত বামুনদের দোষ! রাজ-নীতিতে একটু রাজ-নীতি দরকার, ধর্ম্মকর্ম্ম এতে ঢোকাতে নেই। এই মোয়াওলী, এগুলো কিস্‌কা মোয়া?

মোয়াওয়ালী। কড়ুই কি হো বাবুজী, পয়সা পয়সা।

রাজবাহাদুর। দু'পয়সামে তিনটে দিতে পারেগা নেই?

মোয়াওয়ালী। নেহি বাবু, গরীব আদমী, চাউলকা দর বড় মাঙ্গা হুয়া—

রাজবাহাদুর। দে—দে, বাসী হ্যায় নেহি ত? টাট্‌কা হ্যায়? (দু'পয়সার মোয়া গ্রহণ)

গুরুচরণ। নাতি-নাতনীদের খাওয়াবেন বুঝি?

রাজবাহাদুর। আঙুর—আঙুর,—বেদানা, পেস্তা, পেলেটীর বাড়ীর কেক্, তারা মুড়ি-মোয়া খাবে? যত কুশিক্ষা দিচ্ছেন বাপ্-মায়ে, এ আমি খাব, যতটুকু পেটে যাবে, ততটুকু রক্ত।

গুরুচরণ। যথার্থ হিন্দুর বংশে জন্ম আপনার, সাত্ত্বিক আহার করবেনই ত।

রাজবাহাদুর। (মোয়া খাইতে খাইতে) তা ভট্‌চায, সন্ধ্যের সময় একবার যেও—কিছু দেব।

[প্রস্থান।

গুরুচরণ। একটু ক্ষ্যাপাটে ভাব, নইলে রাজবাহাদুর মানুষ মন্দ নয়; সরল প্রাণ, শরীরে মোটে রাগ নেই। পরামর্শ ভালই দিয়েছেন। তুমি সদ্দারী করবে, মুড়লী করবে, আর—আর আমরা পাঁচ জন বাজে খেটেই বা মরি কেন?

[প্রস্থান।

(ক্ষীরোদ ও নীরদের পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। গোবিন বাবু কথার মানুষ, যখন বলেছেন, তখন আমাদের দেবেন-ই।

নীরদ। বুড়ো লোকটা ভাল বটে। অত অসুখেও আমাদের সব আর্গুমেন্ট বেশ মন দিয়ে শুনলে। ব্যামোটা যেন শক্ত ব'লে মনে হয়।

ক্ষীরোদ। ওই হিক্কেটাতেই একটু সন্দেহ হচ্ছে; যা হোক, ডি, এন্, ডসকে নিয়ে আজ সন্ধ্যেবেলা একবার আসতেই হবে। দোহাই মা কালী—দোহাই মা কালী, ওয়ান্ রূপী ফোর এনাস্ তোমার পুজো, এই

গোটা দু'-তিন দিন গোবিন্ বুড়োকে বাঁচিয়ে রাখ। পোলিংএর পরদিন যা' হয় হবে।

[প্রস্থান।

(নবীনাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমরা টাট্‌কা ভালবাসি,
তাজা তাজা গরম গরম টাট্‌কা ভালবাসি।
না থাক্‌লে চটক, ঝট্‌কা মেরে
ফেলে দিয়ে লট্‌কে দেবো ফাঁসী॥
'গতকল্য' তৃণ তুল্য, ফুল্ল করে 'অন্ত',
কি সাহিত্য গীতি নৃত্য গন্ধ কিংবা পন্থ,
চোদ্দ হ'তে হই আরাধ্য পঁচিশ পারে বাসি।
নতুন ব'লে বরের সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ,
মায়ের পেটের ভায়ে যেন পুরোনোর গন্ধ,
তাই আনন্দ উট্‌কামও, ছি ছি গয়া কাশী॥
তাই পুরোন পোড়াতে আগুন জ্বেলেছি,
আহা তরুণে ভূষিতে কুসুম তুলেছি,
ঘোম্‌টা খুলেছি, লজ্জা ভুলেছি,
চলেছি সুখের সাগরে ভাসি;—
সুহাসিনী, সুভাষিণী নারী সদা সবুজ পিয়াসী॥

(বোধনান্তে কিঞ্চিৎ বিরাম)

উৎসবারম্ভ

সপ্তমী

অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

(সারদাসুন্দরীর গীত)

কার পুকুরে ঠাকুরপো গো নাইতে গেল ভাই।
বোঠা'ণ ব'লে টান কি প্রাণে একটুখানি নাই॥
ভাতের থালা সাজিয়ে আমি ব'সে আছি একা,
ভাজের বুকের মাঝে কি যে বাজে বোঝে না কি ন্যাকা,
তার দাদা রাগলে,
আগ্‌লে আগ্‌লে আমি কত কি বোঝাই।
(মরি) আমি দিবারাত্তির ক'রে দেওর দেওর,
দেওর চল্লো মোল্লাপাড়া খুঁজে আনতে মেয়র.
রেয়োর মতন ভোট-ভিখিরী
সে যে দোরে দোরে ঘোরে ছাই;—
বাজ পড়ুক এই রাজনীতিতে কায ক্ষতির কি বালাই॥

(শশব্যস্তে প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। এই যে বোঠা'ণ, ভাত হয়েছে না কি?

সারদা। বেলা কত, আকাশ পানে ঠাউরে চেয়ে দেখেছ কি?

প্রকাশ। তাই ত, তাই ত—দাও, দাও—শীগ্‌গির দাও—

সারদা। কাপড়-চোপড়গুলো ছাড়, মুখে একটু জল দাও—

প্রকাশ। সময় নেই, সময় নেই, আবার এখুনি বেরোতে হবে।

সারদা। সময় তোমার কোন্ দিন কবে থাকে? কোন্ আপিসে কা'র চাকরীতে ঘোরো বল দেখি? সেবার হুজুগে মেতে কলেজ ছেড়ে একেবারে ভবিষ্যৎটা নষ্ট করলে, এতেও আক্কেল হ'ল না?

প্রকাশ। কি হতুম উকীল হয়ে? কেবল কা'র ঘরে ঝগড়া বাধবে, কা'র ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন যাবে, আর আমার জুড়ীর ওপর মোটর হবে, এই ভাবতুম বই ত নয়?

সারদা। তা লোকে যদি আপনা-আপনি ঝগড়া ক'রে মরে ভাগাভাগি করতে যায়, তা'তে তোমার দোষ কি?

প্রকাশ। হাঁা, ১৩৩এর A উকীলের বাড়ী বে, ১৩৩এর B এটর্ণীর ভাতে ভাসে ঘি, ১৩৩এর C, D, F, বাড়ী বইয়ে বোঝাই ব্যারিষ্টারের 'সেফ'।

সারদা। সারারাত তোমার মেসোর মত পোষ মাসে পাশ ঘোরে মুড়ি দিয়ে লেপ। আমি বলছিলুম তা'কে, যা'দের জন্ম ঘুরে ঘুরে এই সোনার অঙ্গ—

প্রকাশ। আমার বুঝি আবার সোনার অঙ্গ?

সারদা। সোনা চেনে বেণে গো, সোনা চেনে বেণে। এই অঙ্গ কালি ক'রে ফেলছ, কাষ চুকে গেলে, পা দিয়ে চ'লে গেলেও যে তোমায় তারা চিনবে না। বইএর কথা মুখস্থ ক'রে ক'রে, তিন্ তিনটে পাশ ক'রে

নিজের কথা ভোল কেন? জষ্ঠি মাসের মাঝামাঝি, দুপুর বেলা, ট্রামের ভাড়া পর্য্যন্ত ট্যাঁকে ছিল না, ঢাকুরে থেকে পায়ে হেঁটে চ'লে এসে আক্রান্ত হয়ে ঠিক ঐখানে শুয়ে পড়েছিলে;—আহা, ঘেমে খুন—

প্রকাশ। তোমার গুণ, তোমার গুণ বোঠা'ণ কখনও ভুলি নি; সে যত্ন, সে আদর -

সারদা। চুপ কর। আমার স্তব শোনবার অবসর নেই। দেখা করে নি, দেখাটা করে নি—মনে পড়ছে? কোন উপায় করা দূরে থাক্, দুটো সৎপরামর্শ দেওয়া উদিকে যাক্, একবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম পর্য্যন্ত পাও নি; আট্টার সময় গিয়ে ধন্না দিয়ে দেউড়ীর বেঞ্চির উপর বসেছিলে, বেলা ডেড্ডার সময় এক জন ডেপুটী দেশহিতৈষী দয়া ক'রে খবর দিলেন যে, হেড পেট্রিয়ট তখন এক জন খুলনার মেথরের সঙ্গে কোলাকুলি কচ্চেন, যার তার সঙ্গে দেখা কর্‌বার ফুরসৎ নেই!

প্রকাশ। কি জ্ঞান, কি জ্ঞান বোঠা'ণ, পতিত জাতিকে উন্নত—

সারদা। আর উন্নতকে পায়ে থেঁৎলিত।

প্রকাশ। সে কি বোঠা'ণ, তুমি দেশকে ভালবাস না?

সারদা। বাসি; কিন্তু আপনার জনের মাথার কেশ মুড়িয়ে দিয়ে যে দেশ-ভালবাসা, তা আমার নেই ভাই! আমি যে কোণের বউ, দরকার হ'লে আমিও তোমার মত জেলে যেতে রাজি আছি—যদি তা'তে দশজনের উপকার হয়, কিন্তু তা ব'লে বেলে খেলা হয়ে আমি করব পিকেটিং আর তিনি কর্‌বেন পকেটিং—সে মেয়ে আমি নই।

(পরিধানে লুঙ্গি, গায়ে বাঁ দিকে বন্দ-আঁটা ঝুল কোট, ভয়ানক ঘাড়-ছাঁটা চুল, মুখে বিড়ী করালীর প্রবেশ)

সারদা। (সভয়ে ঘোমটা টানিয়া) ও মা, বাড়ীর ভেতর মোছলমান কেন গো, বাড়ীর ভেতর মোছলমান কেন? (অপসরণ)

প্রকাশ। (আস্তিন গুটাইয়া) আরে দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত! আমার শরীরে এখনও আর্য্য-শোণিত বহমান—

করালী। আরে মুই নহি রহমন। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ করালী-মামা।

প্রকাশ। সর্ব্বনাশ! বোঠা'ণ ত ভয়ে দৌড় দিয়েছেন। ও বোঠা'ণ—ও বোঠা'ণ, একবার করালী মামার সাজটা ভাল ক'রে দেখে যাও।

(সারদার পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। ও মা, ছোট মামা! তা আপনি ত হ্যাট-কোট পরতেন, খাস-নবীশ সাজতে আরম্ভ করেছেন কবে থেকে?

করালী। বিলিতী কাপড়, বিলিতী খানা, বিলিতী কুমড়ো, বিলিতী দেশলাই পর্য্যন্ত আর স্পর্শ করি না; বিলিতী কুকুর ক'টা ছিল, তা' পর্য্যন্ত সিল্‌ভেষ্টর সাহেবকে দিয়ে দিয়েছি।

সারদা। তা খদ্দর পর্‌লেই ত পর্‌তে পারেন।

করালী। মোটরখানা শুধু ছাড়তে পারি নি, খদ্দরের সঙ্গে তা ভদ্দরতায় খাপ খায় না, তাই ইস্‌লামকে দিয়েছি সেলাম।

(কতিপয় প্রতিবেশিনীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(এই) ভোটের কোঁদল দেখে ইচ্ছে করে গোঁদলপাড়ায় যাই।
শ্বশুর ভাশুর ভাই কি জামাই কারুর কামাই নাই॥
(এই) ভোটের ল্যাঠায় বাপে-ব্যাটায় বেঁধেছে লড়াই,
ভায়ে ভায়ে বাক্য বন্ধ দ্বন্দ্বেতে চড়াই,
কি তোমার তেজ, ওগো ইংরেজ, কি বিষের বড়াই;—
কি পড়া পড়ালে, কি বিদ্যা ছড়ালে, বাড়ালে কি বাই;—
ক'রে দেশ দেশ বুঝি অবশেষ চির প্রিয়জনে হায় গো
হারাই॥

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টমী

গঙ্গাতীর—শ্মশানেশ্বরের ঘাট, রাস্তা; পশ্চাতে গঙ্গার ঘাটে স্নানপূজাদি-নিরত নরনারীগণ।

গুরুচরণ। শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামণিবিভূষিতাম্।
ততো ধ্যায়েৎ সুরূপাক্ষ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্॥

প্রথমা স্ত্রী। (শিবের শিরে ফুল দিতে দিতে) নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, ধ্যানেন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনীবং—হ্যাঁ ভচ্চাযি মশাই, 'মহাদেব যে ধেই ধেই ক'রে নেত্য

করেন, তা যাত্রায় দেখেছি, কিন্তু তাঁর কি আবার গিরিণীর ব্যামোও ছিল ?

গুরুচরণ। শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। যখন শিবের একটা শরীর ছিল, তখন ব্যামো-স্যামো অবশ্যই ছিল।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। ব্যামোর কথা ব'লো না বাবা ঠাকুর, ব্যামোর কথা ব'লো না। আমাদের ঐ একটুখানি গলীর মধ্যে একখানা বাড়ী ফাঁক পড়ে নি : কে কা'র মুখে জল দেয়,তার ঠিক নেই : দম বন্ধ হয় আর পা দুখানা ভারী হয়ে উঠে—

গুরুচরণ। হ্যাঁ ভারী হয়ে ওঠে বলেই শাস্ত্রে ওর নাম হচ্ছে বেড়ী : তা ইংরাজীতে 'ড'য়ে শূন্য "ড়" নেই ব'লে সাহেবরা ওকে বেরী-বেরী বলে !

প্রথমা স্ত্রী। এ পোড়া নতুন ব্যামো এল কোত্থেকে ?

গুরুচরণ। নতুন সামগ্রী আজকাল আর কোথা থেকে আমদানী হচ্ছে ?—সবই বিলাত থেকে।

প্রথমা স্ত্রী। আ মর্ গতর-খেগোরা ! নিজের দেশ থেকে ধুতি আনাচ্চিস, শাড়ী আনাচ্চিস, চুড়ী আনাচ্চিস, বোতলের জল, রাজ্যির কল সব আনাচ্চিস, তার ওপর আবার রোগের আমদানী কত্তে সুরু কল্লি কেন ? একবার সেই, তখন আমার বে বুঝি হয় নি, আনিয়েছিল কি না ডেঙ্গো, আবার সেবার আনালে 'পেলেক' আর এবার ও যে কি বল্লে কি ?

গুরুচরণ। বেরী-বেরী !

দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক। (তৃতীয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া) কি গো ন' গিন্নী, আজ যে তোমার দেরা ?

তৃতীয়া স্ত্রীলোক। নাতির দৌরাত্ম্যি দিদি, নাতির দৌরাত্ম্যি ; ছোঁড়া কাল সমস্ত রাত খায় নি, ঘুমোয়নি ; একবার ঘর থেকে বেরিয়ে রকে এসে দাঁড়ায়, একবার বা দুড়্‌দুড়্ ক'রে গিয়ে সিঁড়ি দে উঠে আল্‌সেয় পা ঝুলিয়ে বসে, আর ভোট না মোট কি ব'লে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমি কি ছাই রাতে ভাল ক'রে শুনতে পাই। মনে করলুম বুঝি নোট-ফোট কি হারিয়েছে ; তা বল্লে, আমি এত ক'রে চার চারটে নোট ভাঙালুম আর ঘরের শত্রু দাদা কিনা গিয়ে কেড়ে নিলে ! কর্ত্তাকে গিয়ে কত বকলুম, বললুম, "হাঁ গা, ছেলেমানুষ ক'খানা নোট ভাঙিয়েছিল, তা তা'র ওপর তোমার লোভ হ'ল কেন ?" তিনি ত হেসেই খুন, বল্লেন, "নোট নয় গিন্নী, ভোট ভোট !" তখন বুঝলুম, একটা কিছু খেলার জিনিষ, তার পর—

গুরুচরণ। খেলা নয় দত্ত-গিন্নী, খেলা নয়, 'পেলেগ'—'বেরিবেরীর' মতন ও একটা বিলিতী রোগ ; এ দেশের লোককে যেমন ভূতে পায়, বিলেতের লোককে তেমনি ভোটে পায় ; ইংরাজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ব্যাধিটাও এ দেশে প্রবেশ করেছে। যেমন শীতলার অনুগ্রহ পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি পায়, তেমন ভোটেশ্বরীর কৃপা বাড়ে তিন তিন বৎসর বাদে। রোগের একবার প্রতাপটা বোঝ মায়েরা ! অত আদরের নাতি, যাদের সাতবার খাইয়েও বুড়ো ঠাকুরদাদাগুলোর আশ মেটে না, এই ভোটের রঙ্গে তারই সঙ্গে দাঙ্গা !

কুমোর-মাসী। (অগ্রসর হইয়া) সেই খোট্টানী মাগী দেশ টাট্‌কা-টাট্‌কা ন'টের গোড়া এনেছে দেখে এইছি, তাই তাড়াতাড়ি জপটা সেরে নিচ্ছিলুম, তবে তোমাদের সব কথা কানে যাচ্ছিল। ও ভোট-কোট তোমরা বুঝবে না, আমি ওর সব জানি। নরশু ওই কোণাকার বাবুরা সব দমের গাড়ী চ'ড়ে এসেছিল ; আমাদের ওখানে কাত্তিকের খড় জড়ানো হচ্ছে কি না—দেখ বোন্, তারা সত্যি বড় নোক ; রং করা, চোখ চম্‌কান চুলোয় যাক্, সেই খালি খড়ের কাত্তিক এক খানা নগদ নাচ টাকার নোট দিয়ে নিয়ে গেল !

প্রথমা স্ত্রী। তা এখনকার ছেলেপুলেরা অনেক কারিকুরি হাতের কাষ শিখছে ;—হয় ত বাড়ী গিয়ে, নয় রং-টং দিয়ে আপনারাই গ'ড়ে নেবে।

কুমোর-মাসী। না দিদি, না, কর্ত্তা জিগ্‌গেস করেছিল, তা বল্লে, ঐ মুরৎ নিয়ে মোচ্ছবের দিন মেড়া-পোড়া করবে।

গুরুচরণ। মোচ্ছব কিসের ?

কুমোর-মাসী। ভোটের মোচ্ছব বাবা, ভোটের মোচ্ছব। তাই ত বামুন-দিদিকে বলছিলুম, "তুমি বুঝবে না, আমি ওর সব জানি।" "স্বদেশ" ব'লে কোথাকার এক ঠাকুর উঠেছে, অনেক ইংরাজী-পড়া বাবু তার ভক্ত হয়েছে।

গুরুচরণ। ওঃ, প্রণিধান করেছি—প্রণিধান করেছি।

বাজবাহাদুরের কাছে শুনেছি যে, বেলাতে এই ভোটের দলাদলিতে এ ওর মুরৎ গ'ড়ে পরস্পরের মুখে আগুন দেয়।

দ্বিতীয়া-স্ত্রী। ও মা, কি জ্বালা! পুজো-আচ্ছা করবি, ভক্তি করবি, তা না, মুখে আগুন দেওয়া-দেওয়ি কেন?

কুমোর-মাসী। ও মা, ওরা সব শাস্তর-পড়া বাবু, সব জানে—সব জানে; ওরা যে সেই স্বদেশকে উদ্ধার করবে,—মুখে আগুন না দিলে কি গতি হয়? আগে মুখে আগুন, তার পর ছরাদ, শেষে গয়ায় পিণ্ডি,—তবে ত উদ্ধার! (কয়টি নাগরিকার প্রতি) অ-বাছা, তোমরা যে একেবারে গা ঘেঁসে চলতে আরম্ভ করেছ, এখানে বামুন-সজ্জনের মেয়েরা পুজো-আচ্ছা করছে, দেখতে পাচ্ছ না?

প্রথমা-নাগরিকা। ঠাকুর-দেবতা আমরাও মানি মা, ঠাকুর-দেবতা আমরাও মানি! মানুষে নাক সেঁটকায় বটে, কিন্তু ভগবান্ আমাদেরও পায়ে ঠেলেন না।

দ্বিতীয়া-নাগরিকা। সে নাক সিঁটকানো আর নেই লো হরি, নেই! আমাদেরও মান্যি বেড়েছে; সব বড় বড় লোক, লেকচার-দেওয়া বাবুও আজ ক'দিন আমাদের পাড়ায় ঘুরছেন আর সিঁড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি কচ্ছেন;—এবার আমাদের-ও ভোট হয়েছে।

কুমোর-মাসী। ও মা, সে কি গো, তোমাদের ভোটের সঙ্গে সব বামুন-কায়েতের ভোটের ছোঁয়াছুঁয়ি হবে!

প্রথমা-নাগরিকা। কেন হবে না মা! আমরাও ত মানুষ, আমরাও ত টেক্স-খাজনা দিই।

(রাস্তায় ক্ষীরোদ ও নীরদের প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। জয় বাবা শ্মশানেশ্বর,—জয় বাবা ব্যোম মহাদেব! মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে জোড়া পাঁঠা মেনে এয়েছি, আর তোমায় বাবা পাঁচপো হালুয়া ভোগ দেব, আর তিনটে রুপোর বিল্লি-পত্তর! এই যা'রা যা'রা আমায় কথা দিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করছে, তাদের যেন ঘাড়-মুড় ভেঙ্গে বেরিবেরী হয়, পোলিংএর দিন যেন বিছানা থেকে উঠতে না পারে। (এক জন লোককে দেখিয়া) এই যে শেতলবাবু, চান করতে না কি?—আমাদের কথাটা—

শীতল। গোবিন্ বাবুর অবস্থাটা এক্ষণ যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে; আপনারা ডাক্তার দেখালেন, শেষ কব্‌রেজ—

নীরদ। বত্রিশ টাকা ফি দিয়ে সন্নিপাত সেনকে নিয়ে যাব, ভয় কি?

শীতল। আর মশাই, এখন বাবার চরণামৃতই ভরসা,—তাই নিতে এসেছি।

ক্ষীরোদ। বাবা, কটাক্ষে চেও! গোবিনবাবু বড় ভাল লোক, তাঁর কথার নড়চড় নেই; সে দিন হাঁপাতে হাঁপাতেও আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজী হয়েছেন। নিদেন এই ক'টা দিন বাবা, নিদেন এই ক'টা দিন,—একটা সই আঁচড়ে দিয়ে তার পর পুণ্যবান্ লোক, সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়, সে ত সুখেরই কথা।

নীরদ। হালুয়া বাড়িয়ে দে ক্ষীরো, হালুয়া বাড়িয়ে দে,—আলাদা আলাদা পুজোর বন্দোবস্ত কর; কিছু বায়নাও না হয় দিয়ে যা।

(ঘাটপাণ্ডা অগ্রসর হইয়া)

পাণ্ডা। দু'চার টাকা যা দিব, আমার হাতে দিয়, এক্ষণ বারো দিন আমার পলা অছি; আপনার শত্রুর নাম-গোত্র বল, আমি উল্টা বিল্বপত্র বাবার মস্তকে অর্পণ করব;—সব সুফল হব।

নীরদ। দে—দে, একটা টাকা এইখানেই দে, মা'র ওখানেও ধুনোর সঙ্গে গন্ধক গুঁড়িয়ে দিতে ব'লে এসেছি।

(ক্ষীরোদ কর্ত্তৃক টাকা প্রদান)

ক্ষীরোদ। এখানে একটা ডুব দিয়ে দেব না কি?

নীরদ। না—না—না না! দেরী হ'লে সে নিতাই রায়টা মামলা কর্ত্তে বেরিয়ে যাবে; সেই শালার পায়ে ধ'রে ওইখান থেকে অমনি আহিরীটোলার ঘাটে নেয়ে নেওয়া যাবে।

ক্ষীরোদ। পায়ে ধরার প্যাঁচটা তুই আজও ভাল ক'রে শিখতে পারলি না; আমি যার একবার পায়ে ধরি, তাকে সাত দিন পেট্রোল মালিশ কর্ত্তে হয়।

নীরদ। কজীর জোর ক'মে যাচ্ছে ভাই, কজীর জোর ক'মে যাচ্ছে! ক'দিন পেটে ভাত পড়েনি বল তো?

ক্ষীরোদ। সে ত শুধু তোমার একলার নয়, আমাদের ধর্ত্তে গেলে পাড়াশুদ্ধ লোকের বাড়ী হাঁড়ী চড়ে না।

ভুলোর কাকা বুড়ো ‘মিন্‌ষে, সেও নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে। কেন, তোমার জ্যাঠা কি ক’রে বেড়াচ্ছেন ?

নীরদ। উকীলের চিঠি দেব ব’লে দিয়েছি, বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল পড়বে ব’লে শাসিয়েছি, যদি আমার ভোট কাড়েন জ্যাঠামশাই। জ্যাঠাইমা আমাদের দিকে; মদনমোহনতলায় অনেক বাড়ীর মেয়েদের ঠিক করেছেন।—বাবা, নারী-শক্তি, নারী-শক্তি, পুরুষের যুক্তি-টুক্তি ওর সঙ্গে চলে না।

ক্ষীরোদ। (প্রিয়নাথ ও ভবেনকে দেখিয়া) আরে কে ও, প্রিয়বাবু যে, ভাগ্যি দেখা হ’ল !

প্রিয়নাথ। হাঁ—হাঁ, ভারী ব্যস্ত ভাই, ভারী ব্যস্ত—

নীরদ। আহা, তা ত ব্যস্ত হবেই। কিছু পকেটস্থ করেছ না কি,—কার দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছ ?

প্রিয়নাথ। ও কথা আমায় কেউ বল্‌তে পারে না। দেখ Those who live in Glass-house—

ক্ষীরোদ। The cause to a Bottle must espouse তবে স’রে পড়লে যে ?

প্রিয়নাথ। কি জান ব্রাদার—কি জান,—ফাদার-ইন্-ল অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশাই—

ক্ষীরোদ। তোমার শ্বশুর ! তিনি ত এক জন স্বদেশের কু-সন্তান; বন্যার চাঁদা ব’লে পাঁচ শ’ টাকা পাঠিয়ে দিলেন কি না মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে !

নীরদ। যাক্—যাক্, সে তাঁর আর উপায় নেই, চিরকালটা গবর্মেণ্টের চাকরী ক’রে—তিনি তোমায় ইলেকশনের কাযে মিশতে বারণ করেছেন না কি ?

প্রিয়নাথ। না, বারণ—ঠিক তা—তা—তা—না। তবে তিনি—তিনি অনেক জোগাড় ক’রে, শুনলুম না কি আমি এক জন সবডেপুটী নমিনেট হয়েছি।

ক্ষীরোদ। তা হ’লে তোমার দফা ত একেবারে সেরে দিয়েছে ! ওঃ, দেশের এমনি ক’রে এক একটা লোকের চাকরী জোটে, ওকালতীর পসার জমে, আর এক একটা উদীয়মান ‘পেট্রিয়ট’ কমে। ভবেন বাবু উদিকে স’রে দাঁড়িয়ে যে ?—আমাদের চেনেন না না কি ?

ভবেন। আজ্ঞে, সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ব্যক্তি, ‘পুওর’ কেরাণী, নাম করবার যোগ্য নয়।

ক্ষীরোদ। ইস্, এত অভিমান !

নীরদ। ও ঠিক ঠিক বুঝেছি, আপনার দাদামশায় শোক-সভার—

ক্ষীরোদ। ওঁর ঠাকুরদাদা ! কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ?

নীরদ। সে অনেক দিন,—তখন ওঁর বয়স বছর দশ-এগার।

ভবেন। বাবার তেমন অবস্থা ভাল ছিল না,—আর শোক-সভা হওয়াও তখন চলিত হয় নি—

নীরদ। সেই জন্যে। আর বছর থেকে উনি চা ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু হয়েছেন কি না, মাইনেও দু’শ টাকার ওপর, তাই পিতামহের নামে একটা শোক-সভা—

ক্ষীরোদ। মৃত্যুটা অনেক দিন হয়েছে—তা যাক্, তিনি কর্তেন কি ?

নীরদ। সে কালের টমাসের হাটে নীল ওজন !

ক্ষীরোদ। ওঃ, নীল ওজন ?

“নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল-শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥”

হ’তে পারে, হ’তে পারে, আমিই লেগে ‘ইলেকশনের’ পর সভা ক’রে দেবো, কিন্তু ব্রাদার, টু ডজন ভোট,—চব্বিশটা ভোটের ভার ঠিক যদি নিতে পার—

ভবেন। জন সাত আট এই পাড়ারই ত আমার হাতে, নইলে তাদের চাকরীর মাথা খেয়ে দিতে পারি, আর বাকী গোটা সতেরো আঠারো—তা—তা—

ক্ষীরোদ। শোকসভা হয়েছে, তুমি মনে কর ‘আলবার্ট হল’ যোগাড়,—সুলোচনা সিংহির কাছ থেকে গান বেঁধে এনেছি। চব্বিশ ভোট শোকসভা—চব্বিশ ভোট শোকসভা—বেগে দে তোর ‘সাবডেবুট’—চব্বিশ ভোট শোকসভা !

(উড়িয়া রমণীগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

আস্তরনাথ কেতো দিন বসা ছাড়ি বাঁধিবাকু যায় না।
বাবু সব কাবু, বুলি বুলি, গলি গলি, ঘর ভাত খায় না॥
ভোট সাঁউটী দুয়ার দুয়ার, সুয়ারী বাহিরিছে হজার হজ।
মজার বাজারে আজ কেহি খাইবাকু চায় না।

স্বপনা, বিশাড়ী, উচ্ছব, ঽধা,
গণপতি, দাশরথি, পরশু, পদ্মা,

ঘর বসিকিরি বিঁড়ি খাউছি,
ছপি ছপি মাইপোকু মুহু চাহুছি,
মু আঁসুছি যাউছি,
রই রই গুগুপান খাউছি
ধাঁই কিরি কিরি
নেউট নেউট নেই কিরি দেখুছি আয়না।
চড়ি কিরি মোটরে,
আসল নকল সকল শঠ রে,
কুহু কুহু জয় জয়, ভোট প্রভু বন্ধি রয়
নাচে ধিনি ধিনি ধিনি.যেতে মাইকিনি—
বজা বজা ডঙ্কা, গিনি তের টঙ্কা,
নেবি বয়না, হানি নয়না, হব গয়না—
ঘরে বসি বসি পাউছি ময়না।।

নবমী

রাজপথ

(মা'র গীত)

আমার সোনার ছেলে রয়েছে জেলে
কে জানে কি অপরাধে।
তারে আপন ব'লে করতে কোলে
কার বল হায় প্রাণ না কাঁদে ॥
কিন্তু ভাবি যবে কারাগার,
বাছার আমার মুক্তিদ্বার,
সৌরভ গৌরব হারে সাজায়েছে সোনার চাঁদে ;—
তখন প্রভুদত্ত এ প্রভুত্ব
(ভাবি) তুচ্ছ মিছে মোহে মত্ত
মহত্বে তার আত্মহারা যশ ঘোষি উচ্চনাদে ;—
সে যে সাধে নিজে গেছে বাঁধা বিদায় দিতে গৃহবাদে ॥

(অপসরণ)

(ব্যস্ততার সহিত নাগরিকগণের প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। ভাল হচ্ছে না কিন্তু জ্যাঠামশাই, ভাল হচ্ছে না। এত দিন ত আপনার লোক প্লাকার্ড ছিঁড়ে ক্ষতি করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, আজ আবার ছুটো ছোঁড়া গিয়ে আমাদের ছু'খানা মোটরের টায়ার ফুটো ক'রে দিয়েছে।

জ্যাঠামশাই। কার মোটরের টায়ার কে ফুটো করেছে, তার জন্য তোর জ্যাঠা দায়ী ?

ক্ষীরোদ। ওই বুড়ো—ওই বুড়ো, ও আপনার লোক নয় ? ওই ছোঁড়াগুলোকে শিখিয়ে দিলে, আমি নিজে দেখেছি।

বৃদ্ধ : (জরাকম্পিত স্বরে) আমি বাবা, বাজার ক'রে আসছি, আমি কিছু জানি নি !

ক্ষীরোদ। জান না ? ওই ডেঙ্গোর ডাঁটা তুলে নেড়ে চাকার দিকে দেখিয়ে দিলে ;—ফোকলা বুড়ো মাথায় হোগ্লা বন, মনে মনে এত বজ্জাতি।

জ্যাঠামশাই। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, বুড়ো মানুষ—খুড়ো খুড়ো বলি—

নীরদ। অমন বুড়োর মুখে নুড়ো জ্বাল্তে হয়।

বৃদ্ধ। তা' জ্বালিস ভাই জ্বালিস ;—তখন ছেলেরা ডাকতে গেলে নাতবউ সন্তান-সম্ভবা ব'লে একটা যেন ওজর করিস্ নি। এস শম্ভুবাবু, আমাদের ওই পথ দিয়েই ত যাবে বাবা ! এস এস !

[জ্যাঠামশাই ও বৃদ্ধের প্রস্থান।

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। বাঃ, এখানে দাঁড়িয়ে জটলা হচ্ছে বুঝি ? খাল-ধারের দিকে আমি চারখানা মোটর পাঠিয়েছি। আবার উমাচরণ বাবুর ছু'খানা সে দিকে কে পাঠালে ?

নীরদ। তবে ধীরেন বোধ হয় পাঠিয়েছে, সে ত জানে না, তুমি আগে থাকতে বন্দোবস্ত করেছ !

প্রকাশ। জানে না ত নিজে মুরুব্বী করতে গেল কেন ? 'অর্গানিজেসন' নেই, 'অর্গানিজেসন' নেই ; বাঙ্গালীর কোন কাযে 'অর্গানিজেসন' নেই, সবাই কর্ত্তা—

ক্ষীরোদ। তাই ত হবে, না হ'লে ডিমোক্রেশী কি ?

প্রকাশ। এই রকম ডিমোক্রেশী ক্রমে ডিমনোক্রেশী হয়ে দাঁড়ায়।

নীরদ। একটু সাবধানে কথা কবেন প্রকাশ বাবু, বয়সে বছর ছু'চ্চারের বড় ব'লে মনে করবেন না যে, আমাদের স্বাধীন চিন্তা—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিংকিংএর রাইট নেই।

একটি বালক। প্রকাশ বাবুর জানা উচিত যে, আট

বছরের শিশুরও বিবেক আছে ; তাকেও 'টেক কেয়ার' বলবার সময় যেন একটু সাবধান হন।

১ম যুবক। চলুন, চলুন, আর মিছে আপনা-আপনি কচ-কচিতে কায নেই। অদ্বৈত হোটেলে এক এক কপ্ চা আর কিছু ডেভিল খেয়ে একেবারে 'গেট' আগলে দাঁড়ান যাক্।

২য় যুবক। এখন আর কতকগুলো খেয়ে পেট ভরিও না, কাল রাত্তিরে কিঙ্কর বাবুর ওখানে তুমি একলাই ত দু'টো পাঁঠার মুড়ী মেরেছ। বাবা! রসগোল্লার গণ্ডা গণ্ডা শ্রাদ্ধ!

১ম যুবক। পেটে না খেলে কায করব কি ক'রে? বয়-লারে ভাল ক'রে ষ্টিম হ'লে তবে ত ইঞ্জিন চলবে।

[প্রস্থানোদ্যত।

(শরতের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

শরৎ। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল! আগে আমার সঙ্গে এস ;—গোবিন বুড়ো যায় যায়।

কয়েক জন। সে কি? পরশুও যে গিরিশ ডাক্তার বলেছে, অমাবস্যা কেটে গেলে আবার সেই একাদশী ঘেঁসাঘেঁসি যা হবার হবে।

শরৎ। নাড়ী নেই—নাড়ী নেই শুনলুম।

প্রকাশ। মিছে কথা। ও হাঁপানির ব্যামোয় নাড়ী ছাড়ে না। চল—দেখা যাক্। উইল দেখিয়ে ওর দৌত্তুরকে দিয়ে ভোট দেওয়াব।

[সকলের প্রস্থান।

(বেদনা-কাতর গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া দুই তিন জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রীলোক। আহা—হা, বেন্ধ নোক বেরাম্ভন ; চোখে কানে দেখতে পাস্ নি? এই রাত না পোয়াতেই মদ খেয়ে মরেছিস্? একেবারে বামুনের ছেলের ঘাড়ের ওপর পড়লি—আহা হা—হাঁটুটায় লেগেছে, না দাদাঠাকুর?

গুরুচরণ। আজ প্রভাতে যেই সদর দোরটা খুলেছি আর সম্মুখেই দেখি একাদশী ঘোষাল ; তখুনি জানি, আজ একটা না একটা বিপদ হবেই হবে। এখন এই হাঁটু থেকে রক্তপাত আর দাড়িতে আঘাত—এর ওপর দিয়েই কেটে গেলে বাঁচি। আর শম্ভু বাবুর বরাৎ নিয়ে অন্ন যে দুটি জুটবে, তার আশা বড় নেই।

২য়া স্ত্রীলোক। কেন বাবা, আজকে কোথাও ছেরাদ্দ-টেরাদ্দ করাতে হবে না কি?

গুরুচরণ। আজকে পোল-পার্ব্বণ।

১মা স্ত্রীলোক। এখনও কার্ত্তিক পূজো হয়ে যায় নি, এর মধ্যে পোষ-পার্ব্বণ?

(ফিরিওয়ালার প্রবেশ)

ফিরিওয়ালা। মুড়ীর চাক্‌ৎ—ছোলার চাক্‌ৎ চিঁড়ের চাক্‌ৎ

১মা স্ত্রীলোক। ও মুড়ীর চাক্‌তিওয়ালা, ক'খানা ক'রে রে?

ফিরিওয়ালা। কেতো লেবে?

১মা স্ত্রীলোক। ও মা! তুই খোট্টা না কি? মুড়ীর চাক্‌তি-টাক্‌তি ত বাঙ্গালীতেই বেচতো।

ফিরিওয়ালা। কেনো? খোট্টার হাতের চাক্‌তি কি খাট্টা আছো? বাঙ্গালীকো হাম লোক সব নিকাল দিয়া ; দেখো যাকে তেরি বাঙ্গালী ভোট ভোট করকে পাগল ভয়া, আউর হামারা দেশওয়ালী আদমী কাপড়া ফেরিসে মোটভি ঢোলাই করকে পইসা কামাতা। মুড়ীর চাক্‌ৎ—ছোলার চাক্‌ৎ—বড় লেও ত একটো, ছোট লেও ত দো দো মিলি।

১মা স্ত্রীলোক। দু' পয়সায় পাঁচখানা দিবি না?

ফিরিওয়ালা। লেও ; তেরি হাত বহনি।

১মা স্ত্রীলোক। (পয়সা ভূমিতে রাখিয়া) দেখিস্, দেখিস্, ছুঁসনি ; এই গামছার ওপর রাখ।

ফিরিওয়ালা। ভালা! হামরা বানায়া হুয়া থানে আছে —আউর ছুঁব তো মরবো।

১মা স্ত্রীলোক। তোমার রাত্তিরবাস কাপড় বাছা, তাই বলছিলাম।

ফিরিওয়ালা। মুড়ীর চাক্‌ৎ—ছোলার চাক্‌ৎ—

[প্রস্থান।

২য়া স্ত্রীলোক। তা দাদা ঠাকুর কি আপনি যেতে পারবে, না আমরা এগিয়ে দেবো?

গুরুচরণ। না বাছা, আর কদ্দূর এগোবে ; আমি বস্তিটার ভেতর গিয়ে একবার দীনু সরকারকে সঙ্গে

ক'রে মুচী কটাকে রিক্স চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ভুটিয়ে আসি।

[গুরুচরণের প্রস্থান।

২য়া স্ত্রীলোক। সিদ্ধেশ্বরী প্রণাম হয়েছে তোমার?

১মা স্ত্রীলোক। তা' আর নিজের মুখে কেমন ক'রে বলবো দিদি। এখন ওই রাস-মঞ্চপের সিঁড়িতে ব'সে ছ'খানা মুড়ীর চাক্‌তি গালে দিয়ে নেবো, তার পর—

২য়া স্ত্রীলোক। একেবারে বাড়ী গিয়ে খেলে হোতো না?

১মা স্ত্রীলোক। ওমা! যে রাবণের পুরীতে নাচ খানি চাক্‌তি হাতে ক'রে নিয়ে কা'র মুখে দোবো? মামা-শ্বশুর ছ'টি ভাত দেন ব'লে তাতে'ই কত গিন্নীর ফরমাস। একবার পিত্তিটা রক্ষে ক'রে দিদি— তা' তুমিও ত মদনমোহনের বাড়ী কথা শুনতে আসচ, ওইখানে'ই আবার দেখা হবে। আজ "সীতের সাদ" বলবেন, ভাঙ্গতে বেশ একটা বেজে যাবে।

২য়া স্ত্রীলোক। তা হোক্ বোন্, যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ নিশ্চিন্দি; বাড়ী ঢুকলেই ত "পিসীমা, ঘটাটা দাও না" "ঠাকুরঝি, বাটিটা ধুয়ে দিতে পার্‌বে?" এই বই আর কিছু ত নয়; তবু ছ'টো ধম্মকম্ম—

(নেপথ্যে বামা-কণ্ঠে)

এ-ই-লে-ই-ই-ই—

১মা স্ত্রীলোক। ওরে কি বেচছিস্? টাটকা হয় ত দে দেখি ছ'খানা।

ফিরিওয়ালী। (প্রবেশ) পয়সামে বারাঠো মেলি।

১মা স্ত্রীলোক। ষোলটা ক'রে দিবি না?

ফিরিওয়ালী। দেখ কেইসা ঘুঁটিয়া—শুখা।

১মা স্ত্রীলোক। ওমা ঘুটে! আমি ভেবেছিলুম কোন খাবার জিনিষ। আঃ মর মাগী।

[প্রস্থান।

ফিরিওয়ালী। এ-ই লে-ই ই-ই—

[প্রস্থান।

(বাউলবেশী বালক-বালিকাগণের প্রবেশ)

তার মান বাড়ে কি ভোট পেলে।
গেলে কৌন্সিলে, হিংসিলে কি দংশিলে;—
যার সিংহাসনে রাজার ছাতা, স্বদেশ মাতা
আপনি দেছেন লাল জেলে॥
যার মহত্ব স্বার্থত্যাগে,
হৃৎকমলে আছে জেগে,
নাম ক'রে তার মেগে মেগে;—
নামিয়ে নন্দন থেকে তুচ্ছ বন্ধন-পাকে দিচ্ছ ফেলে॥
এ কর্ম্মক্ষেত্রে চর্ম্মমাত্র বাজায় নিজের নাম;
যার ধর্ম্ম আছে মর্ম্ম আছে
তার পারিজাতে গাঁথা হর্ম্ম্য যথায় দেবের ধাম;
তার কি মহিমা কতই আরাম;—
দেখ যে দেখতে জানো (অ-ভোলামন, যদি দেখতে জানো)
দেখ জ্ঞানের আলো জেলে॥
যে আপনি উঠে সুযশ লুটে রয়েছে ফুটে,
কে তুমি কোথাকার কে (অ-ভোলামন)
কোথাকার কে যাও তারে আবার ভুলতে ঠেলে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোবিনবাবুর দ্বিতল বাড়ীর রাস্তার ধারের একতলা ঘর। ঘরের কোণে রাস্তার ধারে রক ও পাশে পান-সোডাদির দোকান। ভিতরে এক ধারে তক্তপোষ পাতা, মধ্যে একখানি ছোট সাইডটেবিল এবং চেয়ার, অপর পার্শ্বে একখানি বেঞ্চি। তক্তপোষের উপর বসিয়া একটি শিশু বর্ণপরিচয় পড়িতেছে, আর গোবিনবাবুর দৌহিত্র বিমল গালে হাত দিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে।

(বাজার হস্তে এক জন প্রতিবেশী)

প্রতিবেশী। (ফুটপাত হইতে) আজ কি রকম?

বিমল। কই কিছুতেই ত কিছু সুবিধা হ'ল না।

প্রতিবেশী। রাত্তিরে একটু ঘুম হয়েছিল?

বিমল। শুতেই পারেন না ত ঘুমুবেন কি!

প্রতিবেশী। পুরানো ঘিটা—

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে বুকে পিঠে মালিস্ চল্‌ছে, তা'তেই যা সোয়াস্তি বোধ করেন। আপনি একবার হাতটা দেখবেন কি? তীর্থস্থ করবার জন্যে—

প্রতিবেশী। তাড়াতাড়ি ক'র না; আমি বাজারটা পৌছে

একটু বাদে আপিস যাবার সময় দেখে যাব এখন, তার পর পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে।

বিমল। আপনারাই মুরুব্বি ; আমি যে কি করি—

প্রতিবেশী। না—না বিমল, গোবিনবাবুর যে পুত্রসন্তান হয় নি,তা তোমার মত দৌত্তুর পেয়ে সে ক্ষোভ করবার আর হেতু নাই। তুমি যা ক'ল্লে—

বিমল। আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

প্রতিবেশী। সকালে খাওয়া আমাদের কেরাণীদের খালি মুখে গুঁজে দেওয়া মাত্র, জান ত: আমি এখুনি আসছি। পড়ছে উটি কে, তোমার ভাই ?

বিমল। আজ্ঞে না,—ভাগ্নে। তবে দেখে যাবেন !

প্রতিবেশী। নিশ্চয় !

[প্রস্থান।

(অপর দিক্ হইতে আপিসের বেশে রাধানাথের প্রবেশ)

বিমল। রাধানাথ বাবু যে এত সকাল সকাল আজ বেরুচ্ছেন ? এত তাড়াতাড়ি—

রাধানাথ। পালাচ্ছি বাবা, পালাচ্ছি : বাড়ীতে দেখতে পেলেই টেনে নিয়ে যাবে, তাই ভোরে উঠে দু'গাল মুখে গুঁজেই আপিসে দৌড়ুচ্ছি।

বিমল। কে টেনে নিয়ে যাবে ?

রাধানাথ। ওই ভোট ভোট, আবার কে ? কাল দুপুর রাত্তিরে মশাই ডাকাডাকি ক'রে বিছানা থেকে তুলেছে !

বিমল। যা বল্লেন, এক বিপদের ওপর আর এক বিপদ ! আমাদের এই অবস্থা, এর ওপর ও-দল আনছে ডাক্তার, এ-দল আনছে কবরেজ ! কাল এক জন একটা দাড়িওলা লোককে সঙ্গে ক'রে কতকগুলো ব্যাটারী-ট্যাটারী নিয়ে উপস্থিত ; বলে,ইলেকট্রিকের জোরে ওঁকে বত্রিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখব ; দেখুন দিকি মশাই !

রাধানাথ। পাগল হয়ে গ্যাছে হে পাগল হয়ে গ্যাছে, মাথার ঠিক নেই ; নইলে এ দিকে অনেকেই শিষ্ট-শান্ত, বেশ বুদ্ধিমান্।

বিমল। আপনি কাকে দেবেন ?

রাধানাথ। কাউকে নয়, কাউকে নয়। তবে আর তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছি কেন ? আপিসের জমাদারকে ব'লে রাখবো যে, আমায় কেউ খুঁজতে গেলে যেন বলে আমি সাহেবের কাছে ছুটী নিয়ে কোথায় গেছি ; নইলে সেথায় গিয়ে ধরবে।

বিমল। নীলুবাবুকেও দেবেন না ? তাঁর সঙ্গে ত আপনার—

রাধানাথ। ও নীলুবাবুই হোন আর ভুলুবাবুই হোন, জাত ভাঁড়িয়ে দেশোদ্ধার আমি কারুর জন্যে করতে যেতে পারবো না ; পরিচয় দিতে হবে ত আমি **অ-মুসলমান** ! নীলুবাবুর হয়ে যাবেই ; এ পাড়ার সকলেই ওঁকে ভালবাসেন ; বিস্তর লোক তাঁর কাছে উপকৃত। এখন আর দাঁড়াবো না বাবা, ও বেলা একটু ব'সে যাব। [প্রস্থান।

(গৃহের পশ্চাৎ হইতে শীতলের প্রবেশ)

বিমল। কি শীতল, তুমি নেমে এলে যে ?

শীতল। এই দুধটুকু খাওয়ালুম ; যেন একটু আবল্লির মত এসেছে।

বিমল। তুমি যাও যাও, সেখানে একটু বোস গে।

শীতল। মা' দিদি-টিদি সেখানে অনেকেই আছেন, ভয় নেই। বদ্যি মশাই বলেন যে, গঙ্গার হাওয়া লাগলে অন্ততঃ অনেকটা সুস্থ হ'তে পারবেন। আমি চট ক'রে বাজারটা থেকে আসছি, গোটা কতক আঙ্গুর এনে রাখি [প্রস্থান।

বিমল। খোকা, সকালে কিছু খেয়েছিস রে ?

খোকা। ক্ষিদে পায় নি।

(রাজবাহাদুরের প্রবেশ)

বিমল। আসুন বাহাদুর। দু'দিন যে দেখি নি ?

রাজবাহাদুর। আলীপুর। পটলটা জোর ক'রে এসে টেনে নিয়ে যায়, কি করি বল ? আজকের খবর কি ?

বিমল। খবর তো—তো—তো—আপনি তো একবার ওপরে যাবেন ?

রাজবাহাদুর। যাবো বই কি। সে বেদানা একটু আধটু খেয়েছিলেন ?

বিমল। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে রস ক'রে দেওয়া যাচ্ছে। আপনার ত দেওয়ার ত্রুটী নেই ; বেদানা, আঙ্গুর, পাকা আম পর্য্যন্ত ত কোথা থেকে জোগাড় ক'রে দিচ্ছেন ; খেয়ে বড়ই তৃপ্তি পেলেন বোধ হ'ল। আর !

বাহাদুর। ও গরু কি জানো, প্রথমে বশিষ্ঠ ঋষি যখন বেলুচিস্থান থেকে এ.দেশে আসেন, তখন সুরভি ব'লে একটা গরু সঙ্গে আনেন; সুরভি হচ্ছে পার্সিয়ান কথা, দেখতে পাও না, সোরাবজী টোরাবজী সব পার্শীদের নাম আছে; তা গরু এ দেশে ছিল না—

বিমল। তা এসে শুনছি; আপনি এসেছেন, আমি একবার ওপরে খবরটা দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

বাহাদুর। কি গো খোকা, কি প'ড়ছ?

খোকা। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ—

বাহাদুর। ঙটা কিসের চিহ্ন বল দেখি?

খোকা। 'ঙ'তে চাবি।

বাহাদুর। পণ্ডিত ব'লে দেয় নি 'ঙ'টা কিসের চিহ্ন? কিছুই পড় না, তা বলবে কি? চন্দোলিতে ১১৫ ফিট মাটির নীচে থেকে যে একখানা পাথর বেরিয়েছে, তা'তে একটা ব্যাং ক্ষোদা আছে ———

খোকা। ব্যাং আমি দেখেছি। এক দিন বৃষ্টির সময় আমাদের উঠোনে থপ থপ ক'রে লাফাচ্ছিল।

বাহাদুর। ব্যাংটা প্রথম চীনেরা এ দেশে আনে। চীন কোথায় প'ড়ছ?

খোকা। চীনের বাদাম।

(বিরাজ বাবুর প্রবেশ)

বিরাজ। কই বিমল কোথা হে?

বাহাদুর। বিরাজ বাবু যে, বসুন। দেখুন আপনাদের এডুকেশন সিষ্টেম কি খারাপ। এই ছেলেটিকে চায়না কোথায় জিজ্ঞেস কত্তে বল্লে কি না চীনের বাদাম।

বিরাজ। ও হচ্ছে হ'চ্ছে, ও সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে আসছে। আমাদের ওখানে যা কিণ্ডারগার্ডেনের বন্দোবস্ত, তা'তে ওই চীনের বাদামের ছবি থেকে-ই চায়না, আফগানিস্থান, ব্রেজিল প্রভৃতি সব বাদাম-বিডিং ডিষ্ট্রীক্ট আছে—

বাহাদুর। ও-সব শিখিয়ে লাভ কি হয়? হিষ্ট্রিটা ভাল ক'রে শেখান; আগে নিজে পড়ুন, বেশ ক'রে সব হিষ্ট্রি পড়ুন; আপনি মনে করেন, খুব হিষ্ট্রি জানেন, কিছুই জানেন না। অশোকের পিসীর নাম কি বলুন দেখি?

বিরাজ। মেয়ে-পূর্ব্বপুরুষটা এখনো জার্ম্মানরা ঠিক ট্রেস করতে পারে নি বটে, কিন্তু অশোকের মাদার-সাইডে যে গ্রীসিয়ান ব্লাড আছে, তা ডাক্তার রজার্শ অনেক দিন প্রমাণ করেছেন; আমাদের কলেজে——

বাহাদুর। আপনাদের কলেজ এখন উচ্ছন্ন গিয়েছে।

বিরাজ। ওটা আপনার ভুল আইডিয়া। এখন যদি গিয়ে ছেলেদের এক দিন রেসিটেশন শোনেন———

বাহাদুর। ফ্রেঞ্চ পড়ে নি, আবার রেসিটেশন করবে কি?

বিরাজ। আজ্ঞে, রেসিটেশন এ দেশে বরাবরই ছিল, আপনি যাই বলুন, শুনব না; চন্দ্র গুপ্তের টাইম থেকে ঈশ্বর গুপ্তের টাইম পর্য্যন্ত———

বাহাদুর। গুপ্তদের হিষ্ট্রি একবার দেখবেন—

(শীতলের প্রবেশ)

শীতল। মশাই, একটুখানি আস্তে, কর্ত্তার নিশ্বাস নিতে যেন বড় কষ্ট হচ্ছে।

বাহাদুর। চট ক'রে একটু ভেরাট্রাম খাইয়ে দিন দেখি।

বিরাজ। তাতে কিছু হবে না। আমার খুব ভাল ফিজিওলজি জানা আছে, এই দু'খানা হাত তুলে ওপরে বেশ একটা প্যারালেলোগ্রাম ক'রে যাতে পেক্‌টোরাল মশল ———

(ক্ষীরোদ-নীরোদাদির প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। কই কোথায় ডেকে আসুন, মোটর রেডী।

বিরাজ। (নোট বই দেখিতে দেখিতে) "কাশীপুর পোল প্রসারিণী সভা ৩।৹ টে" "চৈতন্য চাউল সংগ্রহ" ৪॥৹ টে, "বালীগঞ্জ ললিত কলা সমিতি ৬টা।"

বাহাদুর। মশাই, বাড়ীতে শক্ত ব্যায়রাম, বেশী গোল করবেন না।

নীরদ। আজ্ঞে, গোল কিচ্ছু নয়, আমরা বেশ ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাব, একটা নাম লিখে বাকসতে ফেওয়া মাত্র; পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাব আসব।

বাহাদুর। কাকে নিয়ে যাবেন—গোবিন বাবুকে? সর্ব্বনাশ! আজকের দিনটা কাটে কি না সন্দেহ—

প্রকাশ। পৃথিবীর পরপারে যাওয়ার পূর্ব্বে যে দেশের

কায ক'রে যেতে পারিবে, তার স্থান—তার স্থান—দেখবেন, এই বীরত্বের জন্যে, গোবিন বাবুর কি জাঁকালো শোক-সভা হবে।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। রাজবাহাদুর, সকলে-ই বলছে বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনও বেশ জ্ঞান আছে—

নীরদ। সকলে শুনে রাখুন, জ্ঞান আছে—জ্ঞান আছে—এর পর না কোন অবজেকশন্ ওঠে।

বিমল। (রাজবাহাদুরের প্রতি) আপনি একটু এ-দিকে আসুন, একটা কথা বলব। (একান্তে রাজবাহাদুরকে লইয়া কানে কানে কি বলিল)।

রাজবাহাদুর। ওঃ, তার আবার কি। এখন এই নাও (দশ টাকার নোট প্রদান), বাড়ী গিয়ে আর-ও যা দরকার হবে, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিমল। আপনি অনেক কল্লেন

রাজবাহাদুর। আমিও ত আর চার বছর বই বাঁচবো না, তখন তোমরা যা হয় ক'র।

বিমল। সে কি মশাই! আপনি থাকলে কত লোকের উপকার।

রাজবাহাদুর। না-না, যাওয়াই ভাল, যাওয়াই ভাল। ক্রমে ক্রমে ব্রড কি রকম ডিজেনারেট হয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার দিদিমা যদি একটি আফগান স্ত্রীলোক হতেন, তা' হ'লে গোবিন্ বাবু কি এত শাগ্‌গীর শাগ্‌গীর—

বিমল। মশাই, একটু যদি এখানে ভীড় ছাড়েন;—আমরা দাদামশাইকে তীরস্থ করবার উদ্যোগ করছি—

নীরদ। বেশ ত, বেশ ত, তা'তে পরকালের কাজ হবে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহকালের—শ'বাজারের মোড় দিয়ে যেতেন, না হয় একটু ঘুরে বাগবাজার ষ্ট্রীট—

ক্ষীরোদ। আমাদের খুব ভাল মোটর, নতুন টায়ার—

রাজবাহাদুর। তোমরা তো দেখছি বড় নির্লজ্জ হে, মানুষ মরে—

প্রকাপ। মরবার আগে লোকে উইল করতে পারে আর ভোটের 'কাণ্ড সাইন' ক'রতে পারে না?

রাজবাহাদুর। সমুদ্র গুপ্তের টাইম্ হ'লে তোমায় শূলে দিত;—সত্যি কি মিথ্যে কৌটিল্য প'ড়ে দেখ গে।

ক্ষীরোদ। মোটরে দিব্যি বিছানা ক'রে—

(পত্র-পুষ্প-শোভিত ছত্রি-ডাণ্ডাযুক্ত খাট, খোল, করতাল, রামশিঙে প্রভৃতি লইয়া প্রতিপক্ষদলের প্রবেশ)

প্রতিপক্ষ যুবক। মোটরে ভদ্রলোকের গঙ্গাযাত্রা! দেখছেন মশাই, ওদের ভোট দিলে কি হিন্দুধর্ম্ম থাকবে? আমরা এই দেখুন একেবারে খাট সাজিয়ে তৈরী ক'রে এনেছি! বক্সী মশায়ের কাছ থেকে শুনে অবধি 'হরেকৃষ্ণ' 'হরিবোল' সব তিন দিন ধ'রে রিহার্সাল দিয়ে রেখেছি, ধর ত হে ধর ত—

(ক্যানভাসারগণের গীত)

এই দোলাইয়ে খাটে
লয়ে যাব ঘাটে
ভাল ঘটা ক'রে
সকল ভোটারে
ভরে আসিবে যারা আমাদের দলে;
হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি হরিবোল ব'লে।
প্রভাতে ছুটেছি ভোটে ব্যাচ, ব্যাচ,
ও-বেলা ফো-খেলা মাঠে জুটে ম্যাচ্;

(সিদ্ধান্ত-সুন্দরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

সব ভূয়ো সব ভূয়ো।
ফুটবলেরি মত ভোট, হার জিতের-ই জুয়ো॥
শূন্য-গর্ভ গোলা,
হাল্কা যেন শোলা,
হাওয়ায় ফুল্‌ছো, পল্কা-খোলা ফোলা,
বোলবোলা তার বেড়েছে আজ বুঝে সুজে ছুঁয়ো॥
ফুটবলে দল আছে দুটো দিকে,
তেম্নি ভোটে গোড়া ভোটের বাতিকে,
কেউ বা বলে নাহনা নাহনা, কেউ জোরে দুয়ো দুয়ো।
খেলার শেষে কাটলে নেশা তিনটি বছর শুয়ো॥

উৎসব শেষ

শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীঅমৃতলাল বসু



টুপীর উপর ঘটিকাযন্ত্র

লণ্ডন সহরে এক প্রকার টুপী ব্যবহৃত হইতেছে। এই টুপীর উপরিভাগে ঘড়ীর চাকতি ও কাঁটা আছে। টুপীর মধ্যে ঘটিকাযন্ত্রের কল-কব্জা কৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই টুপী-ঘড়ী ব্যবহার করায় অন্য ঘড়ী ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। টাইমপীস ঘড়ীর ন্যায় উহা সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অধুনা লণ্ডনে এই টুপী ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে।



টুপী-ঘড়ী

ভাঁজ করা বিমানপোত

[illegible] লংদ্বীপ, রুসভেল্ট ক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, মার্কিণ বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় বিমানপোতকে ভাঁজ করিয়া গ্যারেজে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পোতের পার্শ্বস্থ পক্ষযুগল এমন ভাবে ভাঁজ করিয়া রাখা যায় যে, [illegible] স্থানে উহাকে রাখা যায়। আলোচ্য বিমানপোতখানির প্রসার ৭৯ ফুট; কিন্তু ভাঁজ করায় উহা সাড়ে ১১ ফুট মাত্র দাঁড়াইয়াছে। এই পোতের ব্রেক এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, নিয়ন্ত্রিত করিলে গতি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অতি ধীরে ধীরে উহা নামিয়া আইসে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানের খুব নিকটেই থামিয়া পড়ে। এই নবোদ্ভাবিত বিমানপোত স্বল্পপরিসর স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা হওয়ায় পোতাধিকারীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।



ভাঁজ করা বিমানপোত

সন্তরণ-টুপী



বাতাসপূর্ণ সন্তরণটুপী

রবার-নির্ম্মিত টুপীর মধ্যে বাতাস ভরিয়া মস্তকে ধারণ করিলে সন্তরণ-শিক্ষার্থীর মস্তক উপরে ভাসিয়া থাকিবে। ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থী সন্তরণকালে বৃথা শঙ্কায় শঙ্কিত হয় না। যাহারা ভাল সাঁতার জানে, এই টুপী পরিয়া থাকিলে তাহারা সহজে সাঁতার দিতে পারে। বাতাস-ভরা এই টুপী কান ঢাকিয়া রাখে, কোনও মতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। টুপীগুলি অত্যন্ত আরামদায়ক এবং সহজে ব্যবহার করা চলে।

শিসকারী মৎস্য



জীবতত্ত্ববিদ্ শিস্কারী মৎস্যের মুখবিবর পরীক্ষা করিতেছেন

সমুদ্রগর্ভে এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা শিস দিয়া থাকে। সম্প্রতি এই প্রকার মৎস্য ধৃত হইয়াছে। এই মৎস্য কোন কোন ঋতুতে শিস্ দিয়া থাকে—বহু দূর হইতে সঙ্গীতের ন্যায় মিষ্ট শিস শ্রুতিগোচর হয়। এই মৎস্যের উভয় পার্শ্ব হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইয়া থাকে।

স্নানের নৌকা



নৌকায় ব্যাগহস্তে অবগাহনকারী—নৌকামধ্যে আরোহী

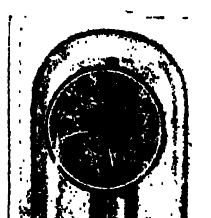
সম্প্রতি স্নানার্থীদিগের জন্য এক প্রকার নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নৌকা ভাঁজ করিয়া একটি ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া সহজে বহন করা চলে। ইহার ওজন মাত্র ২২ সের। নৌকাখানি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। সোলা-জাতীয় এক প্রকার কাষ্ঠ হইতে এই নৌকা নির্ম্মিত। সোলা অপেক্ষাও এই কাষ্ঠ লঘুভার। অবগাহনকালে স্নানার্থীরা এই নৌকা ব্যবহার করিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ মগ্ন হইলে এই নৌকার সাহায্যে অন্ততঃ ৪ জন ব্যক্তি জীবন রক্ষা করিতে পারে। নৌকার সহিত পাইল সংলগ্ন থাকে। ৩ মিনিটের মধ্যে এই পাইল টানাইয়া দেওয়া চলে। পিত্তলের কবজা নৌকার সহিত সংলগ্ন আছে। ভাঁজ করিয়া রাখিলে নৌকার আকার মাত্র ৩ ফুট দীর্ঘ হয়।

কাগজের চশমা



মুখোস পরিলে মানুষের মুখের চেহারা পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ইদানীং পাশ্চাত্যদেশে মুখোসের পরিবর্ত্তে কাগজের চশমা ব্যবহৃত হইতেছে। এই চশমা বা কাগজের চক্ষু নয়নের উপর বসাইয়া দিলে আননের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মুখোস না পরিয়াও কাগজের চক্ষু ধারণ করিলে যে কোনও ব্যক্তি আপনার স্বাতন্ত্র্য গোপন করিতে পারে।

বিচিত্র ঘটিকাযন্ত্র



কোনও ফরাসী ঘড়ী-নির্ম্মাতা এক প্রকার নূতন ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘড়ীতে দম দিবার প্রয়োজন নাই। উহা তাড়িতশক্তি-দ্বারা পরিচালিত হয়। ঘটিকাযন্ত্রে একটিমাত্র ব্যাটারী আছে। এই ব্যাটারী যে তাড়িতশক্তি উৎ-

বৎসরের মধ্যে উহা অভ্রান্তভাবে সময় নির্দ্দেশ করিয়া চলিবে। এই ঘড়ীতে কখনও তৈল দিবার প্রয়োজন হইবে না। পরিষ্কার করিবারও প্রয়োজন নাই। যদি কোনও আকস্মিক কারণে বন্ধ হইয়া যায়, পুনরায় আপনা হইতে চলিতে আরম্ভ করিবে।

আকাশপথে বিজ্ঞাপন



আকাশপথে বিজ্ঞাপন

আমেরিকায় আকাশে বিজ্ঞাপন দিবার অভিনব ব্যবস্থা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের অক্ষরগুলি সূক্ষ্ম জালের উপর রেশমের সূতার সাহায্যে রচিত হয়। প্রত্যেক অক্ষরের পশ্চাতে পাতলা কাঠ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অক্ষরগুলি সোজা থাকে। বিজ্ঞাপনের দৈর্ঘ্য হিসাবে ৩ হইতে ৬ খানা ঘুড়ীর প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনটি ঘুড়ীর সূতায় আবদ্ধ করিয়া আকাশপথে ঘুড়ী উড়াইয়া দেওয়া হয়। বহুদূর হইতে শূন্যপথে এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ছাতার ব্যাগ



ছাতার ব্যাগ—বিভিন্ন অবস্থার দৃশ্য

মার্কিণ মহিলারা রবার-নির্ম্মিত এক প্রকার ছাতা ব্যবহার করিতেছেন। এই ছাতাগুলি দেখিতে সুদৃশ্য। সমুদ্রে অবগাহনকালে এই ছাতা মাথায় দিয়া সুন্দরীরা সমুদ্রকূলে আতপতাপ নিবারণ করেন। আবার উহা আধার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্নানের পোষাক উহার মধ্যে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উহাকে আর ছাতা বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদ্যুতিক রক্ষাকবচ



বৈদ্যুতিক রক্ষাকবচ—মণিবন্ধে সংশ্লিষ্ট

দস্যু-তস্কর প্রভৃতির আশঙ্কা হইতে আত্মরক্ষার জন্য জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার বৈদ্যুতিক রক্ষা-কবচ উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক কবচ ঘড়ীর ন্যায় হস্তের মণিবন্ধে ধারণ করা যায়। গাত্রাবরণের অন্তরালে একটি ব্যাটারী লুক্কায়িত থাকে। তাহার সহিত কবচের তারসূত্র সংশ্লিষ্ট। আক্রমণকারী কবচধারীকে স্পর্শ করিলেই কবচ হইতে ১০ হাজার 'ভোল্ট' তাড়িতশক্তি নির্গত হইয়া স্পর্শকারীকে কিয়ৎকালের জন্য নিস্পন্দ করিয়া ফেলিবে।



অদ্রিগর্ভস্থ খাল

মার্শেলিস্ বন্দরের সন্নিহিত এক অদ্রিগর্ভস্থ খাল বিদ্যমান আছে; এমন বৃহৎ খাল জগতের কোথাও নাই। এই খাল পর্ব্বতমালার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া মার্শেলস বন্দরের সহিত আর একটি বন্দরকে মিলিত করিয়াছে। এই খালের দৈর্ঘ্য ৪ মাইল। চিত্রে প্রদর্শিত স্থানটির বিস্তার ৭০ ফুট এবং উচ্চতা ৫০ ফুট। খালের জলরাশির উপর দিয়া জাহাজ ও ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে।

অভিনব গ্রীষ্মাবাস



পিপানির্ম্মিত গ্রীষ্মাবাস

মিঃ উইলিয়ম ডোনাহি এক জন প্রসিদ্ধ শিল্পী। তাঁহার ব্যঙ্গচিত্র-দর্শনে কোনও পিপার কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রকাণ্ড পিপার সাহায্যে এক গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই গ্রীষ্মাবাস শিল্পীকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। পিপাটি এত বৃহদাকার যে, ২১ হাজার গ্যালন তরল পদার্থ তাহাতে রাখা যাইতে পারে। এই পিপানির্ম্মিত গ্রীষ্মাবাসটি মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে। দ্বিতলের একটি কক্ষের ব্যাস ১২ ফুট হইবে। বৃত্তাকার সিঁড়ির সাহায্যে দ্বিতলে আরোহণ করা যায়। রন্ধনাগারের জন্য আর একটি পিপা পার্শ্বেই সংরক্ষিত। এই পিপার আবাসে দরজা, জানালা প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। মিঃ ডোনাহি গ্রীষ্মকালে এই আবাসে বাস করিবেন।

মৃত্যুর প্রতি

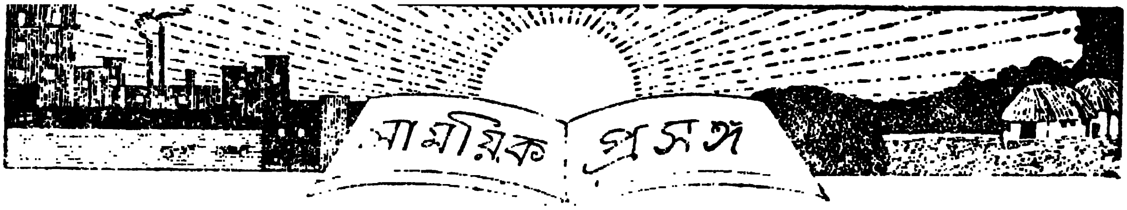
জানি না কেন যে সবে
হে সখে! তোমারে করে ভয়,
আমি কিন্তু তব আশে
ব'সে আছি উন্মুখ-হৃদয়।

কর্ম্মক্লান্ত দেহ কবে
চিরশান্তি লভিবেক হায়!—
ছিন্ন করি মায়াপাশ
মগ্ন রব গভীর নিদ্রায়!

অনন্ত সমাধি কবে
ভুলাইয়া রাখিবে আমারে
সুখ-দুঃখ লাভালাভ
এ সবার যাব পরপারে!

মরণ শরণ লভি
পাব কবে অমৃত সন্ধান,
ভুলে যাব আত্ম-পর—
ভুলে যাব মান অপমান।

মুক্তি-পিপাসিত মোর
অবসন্ন ব্যথিত আত্মারে
হাত ধ'রে নিয়ে যাও
মৃত্যু-হীন স্বরগের দ্বারে।



বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মন্তব্যে অভিনবত্ব আছে। এত দিন যখন দেশের লোক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আন্দোলন করিতেছিল, তখন সে আন্দোলনে বাঙ্গালা সরকার কর্ণপাত করেন নাই। আজ হঠাৎ তাঁহারা তাঁহাদের মন্তব্যে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার প্রাথমিক স্কুল-সমূহের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নহে, স্কুলে ছাত্রের উপস্থিতিও অতীব অল্প, প্রাথমিক শিক্ষাদানের পদ্ধতিও নিন্দনীয়, সরকার যে এতাবৎ ছাত্রপ্রতি ১ টাকা ১৪ আনা শিক্ষার্থে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও অতি সামান্য এবং বাঙ্গালার লোকসংখ্যার শতকরা ৯৯ জন যে লিখিতে ও পড়িতে জানে, ইহাও অতীব দুঃখের বিষয়।" আশ্চর্য্য এই, বাঙ্গালার লোক এ সকল কথা বার বার নিবেদন করিলেও এ বিষয়ে এত দিন পরে সরকারী কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

হঠাৎ বাঙ্গালা সরকারের এই নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, হঠাৎ তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অথবা বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যার বুঝি এত দিনে সমাধান হইতে চলিল। কেন, তাহা বুঝাইতেছি।

সরকার যে প্রজার অজ্ঞতা-নিবারণকল্পে হঠাৎ দয়াপরবশ অথবা কর্ত্তব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মন্তব্য সূক্ষ্মভাবে পাঠ করিলে বুঝা যায় না। কেন না, মন্তব্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, এই শিক্ষার ব্যয়ভার প্রজাকেই বহন করিতে হইবে। সামরিক, পুলিস, শৈলাবাস, ভাতা, দিল্লীনির্ম্মাণ, গভর্ণরের ব্যাণ্ড ও বডিগার্ড (এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারকেও অন্যান্য প্রাদেশিক সংকারের মত ভারত সরকারকে অর্থ যোগান দিতে হয়) প্রভৃতি বাবদে যেমন ব্যয় হইয়া আসিতেছে, তেমনই হইবে, কেবল প্রজার শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বাবদে খরচের কথা উঠিলেই প্রজার উপর নূতন করভার চাপাইবার কথা উঠিবে। সকল সভ্যদেশের সরকারই প্রজার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের দায়িত্ব নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কেবল এ দেশের আমলাতন্ত্র সরকার 'শান্তি ও শৃঙ্খলার' জন্য ব্যয়কেই সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের দায়িত্ব প্রজার নিজের। বিদেশী আমলাতন্ত্র সরকার যদি এ দেশ শাসন না করিতেন, এবং জনমতের উপর যদি তাঁহাদিগকে নির্ভর করিয়া দেশ শাসন করিতে হইত, তাহা হইলে এমন নির্লজ্জ মন্তব্য প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

দেশের লোক অজ্ঞ ও নিরক্ষর বলিয়া স্বায়ত্তশাসনাধিকারের উপযুক্ত নহে, আমলাতন্ত্র সরকার এই যুক্তি যখন তখন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে দেশের লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ হইয়া আছে, এ কথাও তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। দেশের লোক এই জন্য এ দেশেও অন্যান্য সভ্য দেশের মত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আন্দোলন-আবেদন করিয়া আসিতেছে। অথচ এ যাবৎ আমলাতন্ত্র সরকার সেই শিক্ষাবিস্তারের জন্য কি করিয়াছেন? তাঁহারা স্বয়ং মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সে বিষয়ে দেশের অভাব শোচনীয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। গত ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য করিয়াছেন ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা,—আর সরকার ও জিলা-বোর্ড প্রভৃতি একযোগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন মবলক ৩০ লক্ষ ৯৯ হাজার! ইহা কি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নহে?

মন্তব্যে বাঙ্গালা সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জমীর বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া টাকায় পাঁচ পয়সা হিসাবে প্রজার নিকট কর আদায় করা হইবে। কেবল কৃষকদে

এক পয়সা রেহাই দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া খনি ইত্যাদির বার্ষিক আয়ের উপরেও এইরূপ কর ধার্য্য করা হইবে। এই কর হইতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

প্রথম কথা, কৃষক, জমীদার বা খনির মালিকের এই ভাবের অতিরিক্ত কর দিবার সামর্থ্য আছে কি না। অভিজ্ঞ লোকই বলিয়া থাকেন, ভারতের করভার প্রজার অবস্থার হিসাবে অতীব গুরু, উহার উপর আরও বোঝা চাপাইতে গেলে প্রজার প্রাণ যাইবে। যে দেশের লোক দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, সেই দেশের লোকের উপর এই নূতন বোঝা চাপানো কিরূপ ন্যায় ও সভ্যশাসনসম্মত?

স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের শিক্ষা-সচিবত্বের আমলে মিঃ বিস প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতেও তিনি করবৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন, ঐ কর কলিকাতার আমোদ-প্রমোদের স্থল হইতে তুলিতে হইবে। সে বরং সম্ভবপর, কেন না, যাহারা পেটের ভাত জুটাইয়া আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য রাখে, তাহারা অতিরিক্ত কর দিতে পারে। কিন্তু দরিদ্র একাহারী বা অর্দ্ধাহারী কৃষকের পক্ষে অতিরিক্ত কর দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

তাহার পর কথা, যে নূতন কর ধার্য্য হইবে, তাহা কেবল প্রাথমিক শিক্ষা বাবদে ব্যয়িত হইবে কি না? মিঃ বিসের নির্দ্দিষ্ট আমোদকর সরকার আদায় করিতে আরম্ভ করেন নাই বটে, কিন্তু ঐ আয় তাঁহারা এ যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। পূর্ব্বে জমীর উপর পথ ও পূর্ত্ত-কর বসাইয়া ঐ অর্থে প্রজার মঙ্গলজনক পথ-ঘাট নির্ম্মাণ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাবদে ব্যয় করিবার কথা হইয়াছিল। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছে কি? অধিকন্তু উহা দ্বারা লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের বুকে কুঠার হানা হইয়াছে। আবার জমীর উপর বর্ত্তমান শিক্ষা-কর বসাইয়া সরকার দশশালা বন্দোবস্তের আরও একখানি হাড় ভঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সরকার যে তাঁহাদের পক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। তবে খরচাটা কে যোগাইবে, ইহাই হইয়াছিল সমস্যার বিষয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশে অর্থব্যয় সম্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত বাঙ্গালা সরকারের অনেক লেখালেখি হয়। কোন্ তহবিল বা কাহার তহবিল এই খরচা যোগাইবে, ইহা লইয়া নানা কথা-কাটাকাটি হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার যে সাফ জবাব দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের মনের ভাব জানিতে পারা যায়। সেই সময়ে তাঁহারা ঘোষণা করেন, "বাঙ্গালার জনগণকে শিক্ষাদানকল্পে ব্যয়ের ভার যদি সরকারের উপর চাপান হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারত সরকার সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন না।" তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালার লোক যদি শিক্ষা চায়, তাহা হইলে তাহার জন্য তাহাদিগকে ব্যয় যোগাইতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদের উপর কর ধার্য্য করা হইবে। তদানীন্তন ভারত-সচিব ডিউক অফ আর্গাইল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-ডেসপ্যাচে ভারত সরকারের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনি ঐ ডেসপ্যাচে লিখেন,—"ভারতের সামরিক, বে-সামরিক এবং রাজনীতিক শাসন বাবদে যে ব্যয় হয়, ভারতের রাজস্ব তাহাই নির্ব্বাহ করিতে যথেষ্ট নহে।" ভারত-সরকার কথাটা আরও খোলসা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহারা বলেন, "যদি আমাদিগকে বাঙ্গালার প্রজার জন্য পথঘাট করিতে হয়, অথবা শিক্ষাবিস্তার করিতে হয়, কিংবা প্রজার স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান করিতে হয়, তাহা হইলে স্থানীয় জনগণের উপর ব্যয়ের ভার চাপাইতে হয়—যে ব্যয়ভার তাহারা সুযোগমত বহন করিতে পারে।"

সুতরাং পূর্ব্বাপর সরকার প্রজার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতিবিধানে কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা শিক্ষাবিস্তারে সম্মত আছেন, কিন্তু ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন সে ভার বহন করিবে দরিদ্র প্রজা!

বর্ত্তমান সরকারী মন্তব্যেও সেই ভাবের ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সরকারের ন্যায়বিচার বা উদারতার পরিচয় ইহাতে কিছুই নাই। আমরা আশা করি, দরিদ্র প্রজার দুর্ব্বহ করের ভার আরও বৃদ্ধি না করিয়া, যাহাতে শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম হয়, সে বিষয়ে দেশের লোক আন্দো-

প্রজার ন্যায্য অধিকার

মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিপাহী-যুদ্ধের পর যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি যে ঘোষণাপত্র জাহির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও পৌত্র যে ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, উহা ভারতবাসীর 'ম্যাগ্না কার্টা' বলিয়া পরিচিত। উহাতে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে আছে যে, বৃটিশ রাজার অধীনস্থ সমস্ত রাজকর্ম্মচারী এ দেশের নানা শ্রেণীর নানা সম্প্রদায়ের প্রজার ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি মান্য করিয়া চলিবেন, কাহারও ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবেন না, ইত্যাদি। সচরাচর লোকের ধারণা, বর্ত্তমান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরাও সেই ঘোষণা অনুযায়ী এ দেশ রাজার হইয়া শাসন করিয়া থাকেন। আজ বাঙ্গালায় এক সম্প্রদায়ের মনে এ ধারণা টলিবার মত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি।

সকলেই জানেন, কলিকাতায় শিখ-মিছিলের সম্পর্কে মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য উপলক্ষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য লইয়া হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য, বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিয়া আসিতেছে।

কোন কোন মুসলমান যুক্তিতর্ক ও সরিয়তের দোহাই দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, গীতবাদ্যে মসজেদের পবিত্রতা নষ্ট হয় না, মুসলমান রাজাদের আমলেও মসজেদের সম্মুখে শোভাযাত্রা গীতবাদ্য করিয়া যাইত; এমন কি, মসজেদের মধ্যেও গীতবাদ্য হইত। কিন্তু এ সকল যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও যখনই হিন্দুর কোনও বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা মসজেদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য করিয়া গিয়াছে, অথবা মসজেদ ছাড়াইয়া কিছু দূরে গিয়াও গীতবাদ্য করিয়াছে, এমন কি, সামান্য হর্ষধ্বনি করিয়াছে, তখনই মুসলমানরা কোনও কোনও স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লীটন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে ডাকাইয়া এ বিষয়ে একটা রফার বন্দোবস্ত করাইয়া লইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তখন তিনি নিজ হইতে আইন বাঁধিয়া দেন যে, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হিন্দুরা গীতবাদ্য করিয়া মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারিবে, তবে কোনও সময়ে নাখোদা মসজেদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য করিয়া যাইতে পারিবে না। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে, গীতবাদ্য তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ, তাহাতে বাধা পড়িলে তাহাদের ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করা হইবে। কোনও সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে বা সরিয়তে যদি অপর ধর্ম্মের হানিকর গীতবাদ্য নিষেধের নির্দ্দেশ থাকে, তাহা তাহারা মানিতে যাইবে কেন? সকল প্রজারই স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে সমান অধিকার আছে, ইত্যাদি। কিন্তু সরকার তাহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তাঁহাদের সঙ্কল্পে অটল থাকেন। হিন্দুরাও শান্তিরক্ষার আশায় আপনাদের চিরাচরিত প্রথার সঙ্কোচসাধন করিয়া সরকারের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিল। তাহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসের অমর্য্যাদা করে নাই, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয় বার যখন কলিকাতায় শিখ-মিছিল বাহির হয়, তখন সরকার তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিখদিগকে মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া যাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সরকারের শক্তিবিকাশের বহর দেখিয়া সে সময়ে সেই মিছিলে কোনরূপ বাধা দিতে সাহস করে নাই।

তাহার পর রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রা। সরকার প্রথমে সে শোভাযাত্রার অনুমতি দিয়া ও পরে উহাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া শেষমুহূর্ত্তে অনুমতি প্রত্যাহার করেন, ফলে রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা পথে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। হিন্দুরা এই অপমান হজম করিয়াও শান্তিভঙ্গ করে নাই। তাহারা পরে সরকারের নির্দ্দেশমত শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। এমন কি, এ জন্য তাহারা তাহাদের চিরাচরিত প্রথাও পরিত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। অপরাহ্লে প্রতিমাবিসর্জ্জনের প্রথা থাকিলেও প্রভাতে যখন মসজেদে উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তখন পুলিসের নির্দ্দেশমত লোকসংখ্যার সঙ্কোচসাধন করিয়া নিরস্ত্র হইয়া পুলিসের নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া প্রতিমা লইয়া

গিয়াছিল। এ যাবৎ সকল অবস্থাতেই হিন্দুদিগের শান্তিরক্ষার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু মুসলমানেরা কি করিয়াছিল? পুলিসের নির্দ্দেশ সত্বেও তাহারা দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদের সম্মুখে নানারূপে রাজরাজেশ্বরীর শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল। অন্যত্র কোনও কোনও স্থানে তাহারা দল বাঁধিয়া নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শোভাযাত্রা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল।

ইহার পর রথের ও মহরমের সময়েও মুসলমানেরা হিন্দুর শোভাযাত্রায় বাধা দিয়াছিল, হিন্দুদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়াছিল, বহু হিন্দুর গৃহে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া ক্ষতি করিয়াছিল।

মুসলমানের এইরূপ শান্তিভঙ্গের চেষ্টা দেখিয়া দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের সময় সরকার কি ব্যবস্থা করেন, তাহা দেখিবার জন্য হিন্দু আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। মহরমের সময়ে প্রত্যেক তাজিয়ার নম্বর, মহল্লার নম্বর এবং পল্লীর মণ্ডলগণের নামধাম ইত্যাদি অবধারণ করিয়া পুলিস শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল: প্রত্যেক তাজিয়ার সঙ্গে নিশানের অঙ্গে এ সকল বিবরণ লিখিত ছিল। পুলিস সে সময়ে কাহাকেও লাঠি-সোঁটা লইয়া শোভাযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। অথচ মুসলমানেরা সশস্ত্র হইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল এবং স্যার জগদীশের বিজ্ঞান কলেজ, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের গৃহ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ, কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহ প্রভৃতি বহু হিন্দু-গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল, বহু হিন্দু পথিককে প্রহার করিয়াছিল এবং অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। অনেক মুসলমানকে বলিতে শুনা গিয়াছিল "হিন্দু শালা লোককো মারো।"

পুলিসের নির্দ্দেশ হিন্দুরা বরাবর মানিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানরা উহা না মানিয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। তাহারা পরে বলিয়াছিল, তাহাদের উপর ইষ্টক বর্ষিত হওয়ায় তাহারা এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু এ যাবৎ কোন হিন্দু তাহাদের তাজিয়ার মিছিলে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। যাহাই হউক, মুসলমানরা পুলিসের নির্দ্দেশ না মানিয়া লাঠিসোঁটা লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল? মহল্লা ও মণ্ডলগণের নাম পুলিসের জানা ছিল; অথচ শান্তিভঙ্গের জন্য সরকার শান্তিভঙ্গকারীর দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি হিন্দু তাহা জানে না।

এই জন্যই সকলে আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনকালে সরকার কি ব্যবস্থা করেন,—যাহারা শান্তিরক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, আর যাহারা শান্তিভঙ্গ করিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই প্রতি বা কিরূপ ব্যবহার করেন। দুর্গাপূজার সময়ে সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুর মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, মহারাণীর ঘোষণার আশ্বাসবাণী অনুসারে সকল সম্প্রদায়কে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচার সম্পন্ন করিতে দিবার শক্তি বাঙ্গালা সরকারের নাই। কেন না, এবার দুর্গার বিসর্জ্জনে হিন্দুর চিরপ্রচলিত শোভাযাত্রার পথ হিন্দুর পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছিল।

স্থানীয় ইংরাজী দৈনিকের বিবরণে প্রকাশ:—"হারিসন রোডের যে অংশ 'বিপজ্জনক' বলিয়া বিবেচিত, পুলিস সর্ব্বপ্রযত্নে সেই অংশ বাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সে অংশ কলেজ ষ্ট্রীট ও হারিসন রোডের সঙ্গমস্থল হইতে চিৎপুর রোড ও হারিসন রোডের সঙ্গমস্থল। এই অংশে দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদ অবস্থিত, শিয়ালদহের দিক হইতে যে সব মিছিল হারিসন রোড দিয়া গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সকল মিছিলকে কলেজ ষ্ট্রীটে আসিবামাত্র পুলিস কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সরাইয়া দিতেছিল। আর এক দল পুলিস চিৎপুর রোডের ও হারিসন রোডের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত ছিল। তাহারা মিছিলগুলিকে ঘুরাইয়া বিডন ষ্ট্রীট ও নিমতলার দিকে পাঠাইয়া দিতেছিল। অর্থাৎ যাহাতে হারিসন রোড দিয়া কোন মিছিল না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছিল।"

লর্ড লীটন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কেবল নাখোদা মসজেদের সম্মুখে হিন্দুর শোভাযাত্রা বাজনাদি করিয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু হারিসন রোডের দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদ সম্বন্ধে এমন কোন নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ মসজেদে উপাসনার কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত উহার সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা যাইতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তবে হারিসন রোড দিয়া মিছিল যাইবার অধিকার রুদ্ধ হইল কেন?

ইহা দ্বারা কি এইরূপ বুঝায় না যে—

(১) হারিসন রোডে (দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদের সম্মুখে) হিন্দুর শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার অধিকার রুদ্ধ হইল,

(২) সরকারের রাজকর্ম্মচারীদের বিশ্বাস, তাঁহারা এমনই শক্তিহীন যে, সরকারের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা তাঁহারা বহাল রাখিতে পারেন না।

এখন জিজ্ঞাসা, নমাজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হিন্দুকে হারিসন রোড দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে দেওয়া হইল না কেন? লর্ড লীটনেরই নির্দ্দেশ—নাখোদা মসজেদ ব্যতীত অন্য সকল মসজেদের সম্মুখ দিয়া নমাজের সময় ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মিছিল করিয়া যাইতে পারিবে। দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের দিন সে নির্দ্দেশ পালিত হইল না কেন? তবে কি লর্ড লীটনের প্রকাশ্য নির্দ্দেশের পর আর কোনও গুপ্ত নির্দ্দেশ বাহির হইয়াছিল? যদিও হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালার সরকার মুসলমানেতর ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট ইহার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? যদি না হইয়া থাকে, তবে কি বুঝিতে হইবে, পাছে সরকারের নির্দ্দেশ সত্ত্বে মুসলমানরা হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে সরকার এইরূপ করিলেন? এ কথায় বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সরকার ভারতের মুসলমানের ভয়ে নিজের নির্দ্দেশও নাকচ করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিবেন, এ কথা বাতুল ভিন্ন কে বলিবে? যে ব্যবস্থায় লর্ড লীটন ও পুলিস কমিশনার আর্মষ্ট্রং বাঙ্গালা সরকারের মান-ইজ্জৎ ধূলিসাৎ করিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা যে মুসলমানের ভয়ে করা হইয়াছে, তাহা ত মনে হয় না। তবে এ ব্যবস্থা কেন হইল? এ রহস্যের যবনিকা উদ্ঘাটন করে কে?

একটা কথা বাঙ্গালার লাট লর্ড লীটন ও নবাগত পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্টকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। সরকার ও সরকারের পুলিস যে হিন্দুর সম্পর্কে 'বাঁধনকষনের' ত্রুটি করেন নাই, তাহা কলিকাতার দাঙ্গার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ দেখা গিয়াছে। সরকার সকলকে দাঙ্গার সময়ে লাঠিসোটা বা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পথে বেড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং ভরসা দিয়াছিলেন, সকলকে রক্ষা করিবেন। এ জন্য কত হিন্দুর লাঠি, ছড়ি, চাবুক, বেত যে পুলিস সার্জ্জেণ্টদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা দেখিয়াছি, ঠনঠনিয়ার মোড়ে অতি বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের হস্ত হইতেও গোরা সামরিক পুলিস ভ্রমণের ছড়ি কাড়িয়া লইয়াছে। অথচ মিছিলের সময় শত শত মুসলমান বড় বড় লাঠি লইয়া মিছিলের সহিত যাত্রা করিয়াছে, বাজনার তালে তালে লাঠি-তরবারি খেলিয়াছে। সেই লাঠি বহু নিরীহ হিন্দু দর্শক ও পথিকের মাথায় বা বুকে-পিঠে পড়িয়াছে,—অথচ আশ্চর্য্যের কথা, সরকারের শান্তিরক্ষক সেই সময়ে লাঠির কসরতে মোহিত হইয়াই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, লাঠি কাড়িয়া লয় নাই অথবা প্রতিশ্রুতিমত পথিক জনসাধারণকে লাঠির ঘায়ে মাথা-কাটা অথবা অঙ্গহানি হওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তোমরা নিরস্ত্র থাক, কোনও ভয় নাই, আমরা দুর্বৃত্তকারীদিগের হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিব—অথচ কার্য্যকালে আশ্বস্ত নিরস্ত্র নিরীহ প্রজা দুর্বৃত্ত গুণ্ডার হস্তে লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রহৃত হইবে,—এ কেমন ব্যবস্থা? এমন আশ্বাস দিয়া সে আশ্বাসমত কার্য্য না করা যে কোনও সভ্য সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা—কাপুরুষতার কথা, সন্দেহ নাই। লর্ড লীটনের সরকার এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিতে ন্যায়তঃ বাঙ্গালার প্রজার নিকট বাধ্য।

ভারতের প্রতিনিধি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'সমান অংশীদার'গণ এবারও বিলাতে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে 'সমান অংশীদার ভারতের' অন্যতম 'প্রতিনিধি' বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজও বিরাজ করিয়াছিলেন এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মন্ত্রীদিগের সহিত একাসনে বসিয়া তাঁহাদের আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন! এ প্রহসন দেখিলে হাসি পায়, দুঃখও হয়। যৌবনে যিনি এক দিন "Friend and ally of the British Raj" সাজিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার 'রাজ্যের' "friendly and cordi-

তাঁহার সেই স্বপ্ন যে আংশিক সত্যে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার দেশবাসী নিশ্চিতই সুখী। তিনি ভারতের কিরূপ 'প্রতিনিধি' সাজিয়া সাম্রাজ্য বৈঠকে বসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সিসিল হোটেলের বক্তৃতাতেই বুঝা যায়। এই হোটেলে ভারতের 'প্রতিনিধিদিগকে' এক 'সম্মান-ভোজ' দেওয়া হইয়াছিল; লর্ড রেডিং সেই ভোজ-সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজকে stalwart representative of India বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন এবং মহারাজাধিরাজও ভারতে লর্ড রেডিংয়ের শাসনকালের অশেষ গুণগান করিয়া বলিয়াছিলেন, "লর্ড রেডিং দেখিয়াছিলেন যে, বিলাতে অনেকে বক্তৃতায় ভারতকে ফাঁকা আশার কথা দেওয়ায় ভারতের ভাবপ্রবণ কতকগুলা লোক মণ্টেগু রিফরমের কদর্থ করিয়াছিল—সে রিফরম যে আসলে কি, তাহা না বুঝিয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ভারতের চাকুরীতে আপদ-শূন্যতা নাই দেখিয়া সিভিল সার্ভিসের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল; লর্ড রেডিং তাঁহার রাজনীতিক চালে আবার সেই চাকুরীয়াদিগকে চাকুরীতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যে সকল ভারতীয় বৃটিশ শাসনে আস্থাবান্‌, তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই সুশাসনের ফলে ভারতকে এখন আর কেহ Lost Dominion বলিয়া অভিহিত করে না।" এমন না হইলে ভারতের প্রতিনিধি? তাঁহাকে ভারতের প্রতিনিধির পদে মনোনীত করিয়া ভারত সরকার যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার ও রাজনীতিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাঁহার ধারণার দৌড় এই পর্য্যন্ত, তিনি যদি ভারতের প্রতিনিধি না হইবেন, তবে হইবে কে? নাবালক ভারত প্রলয়াস্তকাল পর্য্যন্ত তাহার অভিভাবিকা বৃটেনলক্ষ্মীর অঞ্চল ধরিয়া খেলা করিয়া বেড়াইবে, রিফরম বা সংস্কারের যে ইহাই উদ্দেশ্য, তাহা এই ভারতের প্রতিনিধি মহারাজাধিরাজ বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেডও সে দিন ভারতের কথায় বলিয়াছেন, If we left India tomorrow India would dissolve into anarchy. ইহার পর রিফরমের অন্য কি অর্থ হইতে পারে? কোহাট, মালাবার ও পাবনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেখিয়াও যাঁহারা এমন কথা বলিতে পারেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না। পাবনায় যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, লর্ড বার্কেণহেড ও তাঁহারই মতানুবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ anarchyর নামগন্ধও পান নাই! বৃটিশ শক্তির অপসারণ না হইলেও যখন প্রজা দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর হস্তে ধর্ষিত হয়, যখন অসহায় অবলা নারী সতীত্বরক্ষার জন্য জঙ্গলে অনাহারে সাপ বাঘের মুখে পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তখন সেই শক্তি অপসারিত হইবার পর ভারতের অবস্থা কি অধিক শোচনীয় হইতে পারে, তাহা ত সহজ-বুদ্ধির অগম্য। বৃটিশ Trusteeship অথবা অভিভাবকতার উপর মহারাজাধিরাজের অগাধ বিশ্বাস। পাবনা কোহাটের পরেও তাঁহার সে বিশ্বাস টুটে নাই। তিনি তাই ভাবপ্রবণ স্বদেশবাসীকে রিফরমের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুঃখ এই, স্বাধীন দেশের স্বাধীন মন্ত্রিসম্মিলনে তিনি হংস-মধ্যে বকো যথা শোভা পাইয়া ভারতের কথা বলিতে গিয়াছিলেন!

অযোগ্যতা

গত এপ্রেল ও জুলাই মাসের কলিকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে পুলিস কমিশনার মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং এক সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, যাঁহাদিগের হস্তে নগরের শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে অযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

রিপোর্টের তিনটি অংশই প্রধানতঃ আলোচনার যোগ্য ;—

(১) দাঙ্গা সম্পর্কে মূল অপরাধী নির্ণয়।

(২) দাঙ্গাকারীদের অগ্নিসংযোগ করিয়া পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা সম্বন্ধে মতামত।

(৩) সংবাদপত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত।

(১) প্রথম দফার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, মুসলমান দাঙ্গাকারীরা যে দাঙ্গা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাই পুলিস কমিশনারের অভিমত। রাজরাজেশ্বরী মিছিল আক্রমণ সম্বন্ধে পুলিস কমিশনার রিপোর্টের এক স্থানে বলিতেছেন,—

"In reviewing the regrettable incidents which marked this date and in the light of evidence subsequently obtained, it is impossible to avoid the conclusion that the opposition offered by the Mahommedans to the Rajrajeswari procession was delibarate and pre-arranged." ইহা হইতে স্পষ্ট অভিমত কি হয়, আমরা জানি না। হিন্দুরা পুলিসের নির্দ্দেশমত প্রভাতে (ঐ সময় বিসর্জ্জনের নির্দ্দিষ্ট সময় না হইলেও) নির্দ্দিষ্ট লোকসংখ্যা লইয়া মিছিল করিয়া যাইলেও মুসলমানরা দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদের নিকট এবং অন্যত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক মিছিলকে আক্রমণ করিয়াছিল; তাহারা এই আক্রমণের জন্য পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত ছিল।

১১ জুলাই রথযাত্রা পর্ব্ব উপলক্ষে পাইকপাড়ায় যে গোলযোগ হয়, সেই সম্পর্কে রিপোর্ট বলিতেছে,—"মিছিলের পথে ৫টা মসজেদ ছিল। ...

মুসলমানরা হিন্দুদিগকে বাজনা বাজাইতে নিষেধ করে, হিন্দুরা সেই নিষেধ অমান্য করে নাই। অপর তিনটি মসজেদের সম্মুখে এরূপ নিষেধাজ্ঞা বা অনুরোধ ছিল না, কাযেই উহাদের সম্মুখ দিয়া বাজনা করিয়া মিছিল গিয়াছিল। ইহাতে কোনও হাঙ্গামা হয় নাই। পঞ্চম মসজেদের সম্মুখে মিছিল উপস্থিত হইলে মুসলমানরা বলে, তখন একটা নামাজের সময়, কাযেই বাজনা বন্ধ রাখা উচিত। হিন্দুরা তৎক্ষণাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু মিছিল কিছু দূর নীরবে অগ্রসর হইলেও ৫০।৬০ জন মুসলমান মসজেদ হইতে আবির্ভূত হইয়া মিছিলের উপর ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে। ইহার পর আরও অনেক মুসলমান লাঠি-সোটা লইয়া উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণের সহিত যোগদান করিয়া মিছিলকে আক্রমণ করে। ফলে বহু হিন্দু আহত হয়।"

কমিশনার তাঁহার রিপোর্টের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা যে ছিল, তাহা মুসলমান নেতারা জানিতেন। কেন না, তাঁহা না হইলে মিঃ গজনবি এলাহাবাদ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে শান্ত থাকিবার জন্য 'তার' করিতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি যে বাঙ্গালার জিলায় জিলায় মসজেদের সম্মুখে বাদ্য সম্বন্ধে অযাচিত তথ্যানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফল বিষময় হইবে।"

কমিশনার রিপোর্টে এ যাবৎ বরাবরই স্বীকার করিতেছেন যে, মুসলমানরা পূর্ব্বাহ্ণ হইতে দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তাহারাই প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল, পুলিসের নির্দ্দেশ ও সরকারের আইন ভঙ্গ করিয়াছিল। পরন্তু তাহাদের নেতারাও পূর্ব্ব হইতে দাঙ্গা হইবার কথা জানিতেন। এখন পাঠক বিচার করুন, কাহারা অপরাধী এবং পুলিস এপ্রেলের প্রথম দাঙ্গার ও রাজরাজেশ্বরী মিছিলের দাঙ্গার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াও পরবর্ত্তী দাঙ্গা নিবারণে কিরূপ অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। যেগুলি storm centre (যেমন দীনু চামড়াওয়ালার মসজেদ) এবং যাহারা নেতা সাজিয়া পশ্চাতে থাকিয়া দাঙ্গা বাধায়, সেইগুলিকে এবং সেই সকল লোককে পূর্ব্ব হইতে শান্তিরক্ষায় বাধ্য করিলে কি পরবর্ত্তী দাঙ্গা সংঘটিত হইত?

(২) মুসলমান গুণ্ডারা যে কেবল দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নহে, তাহারা পিশাচ রাক্ষসের মত কোনও কোনও স্থানে হিন্দুগণকে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিস কমিশনারের রিপোর্টে আছে :—

"১০শে জুলাই রাত্রিকালে সেনট্রাল এভেনিউ, নীলমাধব সেন লেন, মুরলীধর লেন, কৃষ্ণবিহারী সেন লেন,—এই কয়টি পথের মধ্যস্থ পল্লীতে অবস্থিত গৃহগুলির দ্বার, গবাক্ষ আদি দাহ্য অংশ তৈলসিক্ত করা হইয়াছিল; গৃহগুলির প্রাচীর ও দেওয়াল প্রায় দুই ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত তৈললিপ্ত করা হইয়াছিল। এই সকল গৃহে মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী গৃহস্থ বাস করেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, মহরমের মিছিল যাত্রাকালে মশাল ফেলিয়া আগুন জ্বালাইবার জন্যই মুসলমানরা এই কায করিয়াছিল। গৃহসমূহের তিন দিকের পথের উপরেও প্রচুর পরিমাণে তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উদ্দেশ্য —পথেও আগুন লাগিলে অগ্নিদগ্ধ গৃহ হইতে গৃহস্থরা পলাইতে পারিবে না এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার অভিপ্রায়ে দমকল লইয়া দমকলওয়ালারাও সহজে গলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এরূপ পৈশাচিক বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত জঙ্গীস খাঁও বোধ হয় দিয়া যাইতে পারেন নাই। আর এ বিষয়ে পুলিসও যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। যে পুলিসের গোয়েন্দা আমাদের হাঁড়ীর খবর রাখে—যাহারা এনার্কিষ্টের আস্ত-নাড়ী-নক্ষত্র বাহির করিয়া শত শত লোককে বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখে বলিয়া গর্ব্ব করে, তাহারা এত বড় একটা পৈশাচিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনের কোনও খবর রাখিল না? যদি বৃষ্টি না হইত, যদি অন্য সূত্রে এই শয়তানীর কথা ধরা না পড়িত, তাহা হইলে কি হইত?

(৩) তাহার পর সংবাদপত্রের কথা। কমিশনার তাঁহার রিপোর্টে এই সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তেজনার অপরাধে দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে দায়ী করিয়াছেন। এই ভাবে দেশীয় পত্রগুলিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা কি বুদ্ধিমত্তার বা পক্ষপাতশূন্যতার পরিচায়ক? 'ফরওয়ার্ড', 'দৈনিক বসুমতী' অথবা 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামলা আনয়ন করা হইয়াছিল, সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় তাহার সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন? সংবাদপত্রের স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া নিজে দায়ে খালাস হইলে হয় না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গার মূল কারণ কি, কাহারা আড়ালে থাকিয়া বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে, দাঙ্গাকারীদিগের পেটের অন্ন যোগাইতেছে কে বা কাহারা, তাহাদের হস্তে অস্ত্র দিয়া দাঙ্গা চালাইতেছে কে বা কাহারা, কাহারা গুপ্ত প্রচারকার্য্য দ্বারা অথবা রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে,—এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধানে তৎপর হইলে সংবাদপত্রের ছিদ্রান্বেষণ করা অপেক্ষা অনেক অধিক কায হইতে পারিত, ইহা কি শান্তিরক্ষকদিগের জানা নাই?



দক্ষিণ-চীনে প্রলয়াশঙ্কা

জগতের মধ্যে বর্ত্তমানে চীন দেশকেই সর্ব্বাপেক্ষা অশান্ত ও অরাজক বলিয়া মনে করা বিচিত্র নহে। ঐ দেশ হইতে আজ কিছুকাল যাবৎ যে সকল অপ্রীতিকর সংবাদ আসিতেছে, তাহা যথাকালে আমরা পাঠকবর্গকে জানাইয়া আসিয়াছি। সে সংবাদের অধিক ভাগ কাল্পনিকাচ্ছন্ন; যাহা কিছু সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া চপলা চমকের মত জগতের অন্তর মাঝে মাঝে বিকসিত হইতেছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, মহাচীনের দক্ষিণাংশে ঘোর অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করিতেছে।



জেনারেল ইয়াং-সেন

কে প্রভু, কে আজ্ঞাবাহক, কে কর্ত্তা, কে মুখাপেক্ষী—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ফল কথা, যিনি যখন কোন এক সৈন্যদলের নেতৃত্ব হস্তগত করিতে সমর্থ হইতেছেন, তিনিই তখন শত্রুবলে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমনে রাখিতেছেন এবং ইচ্ছামত শোষণ ও লুণ্ঠন দ্বারা নিজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই পরস্পর স্বার্থসংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণাবর্ত্তের সংস্রবে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ইংরাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা ও ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চীনের দক্ষিণে ইয়াংসি নদের উপর ইংরাজের নৌ-সেনার সহিত চীনের সেনার যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং যাহার ফলে ইংরাজের ৭টি নৌসামরিক কর্ম্মচারী ও সেনা হত হইয়াছে,—সেই সংঘর্ষের পরেও ইংরাজ এই লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতিশোধগ্রহণে আদৌ উদ্যত হয়েন নাই। ইংরাজের এই সহনশীলতা ও ধৈর্য্য অসাধারণ। অন্য সময়ে দেখা গিয়াছে, ইহা হইতে লঘুতর ব্যাপারেও ইংরাজ চীনের ভূমি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়া অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইয়াছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইংরাজ কেবল কাগজে কলমে প্রতিবাদ করিয়া ও নৌবলের demonstration করিয়াই নীরব। ইহার কারণ কি? ইংরাজ কি হঠাৎ সাধু হইয়া পড়িয়াছেন? তিনি কি নাক টিপিয়া জপে বসিয়া

এক দিন ভারতের ইংরাজের মুখে শুনা গিয়াছিল, "প্রাচ্যে ইংরাজের প্রাণ পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয়।" আরও শুনা গিয়াছিল, "একটি ইংরাজের প্রাণের বিনিময়ে দশটি প্রাচ্যবাসীর প্রাণ গণনীয়।" অথচ সেই ইংরাজের সাত জন নৌ-সেনানী ও সেনার হত্যাকাণ্ডের পরেও ইংরাজ এরূপ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন কেন, তাহা ভাবিবার কথা নহে কি? এ যাবৎ দেখা গিয়াছে, যখনই প্রাচ্যে প্রতীচ্যবাসীর প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, তখনই প্রতীচ্যশক্তি প্রাচ্যের সরকারের নিকট কৈফিয়ত তলব করিয়া ultimatum প্রদান করিয়াছেন এবং পরমুহূর্ত্তে প্রাচ্যশক্তির ভূমি দখল করিয়া লইয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছেন। এবার তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, চীনে যখন কোনও একটা স্থায়ী Government এর অস্তিত্ব নাই, তখন প্রতীচ্যশক্তি কাহার নিকট কৈফিয়ৎ লইবেন বা কাহাকে ultimatum দিবেন? কিন্তু এটা কাজের কথা নহে বলিয়া মনে হয়। কোন স্থায়ী Government চীনে থাকুক বা নাই থাকুক, ইংরাজ ইচ্ছা করিলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ চীনের কতকাংশ ত দখল করিয়া লইতে পারিতেন। তাহা হইল না কেন? সে কথা বুঝিতে হইলে চীনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

ইয়াংসি নদের ঘটনা হাস্য ও করুণরসাত্মক। চীনের দক্ষিণে ইয়াংসি নদতটে হ্যাংকো সহর ইতিহাসপ্রথিত। ইহা হইতে ৬ শত মাইল দূরে ওয়ানসিয়েন বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরে 'ওয়ানটাঙ্গ' ও 'ওয়ানলিউ' নামক দুইখানি ইংরাজ বাণিজ্য-পোত নঙ্গর করিয়াছিল। এই জাহাজ দুইখানি জেনারল উপেইফুর জন্য রণসম্ভার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বিধাতার কি এক অপূর্ব্ব রহস্য-খেলায় ভুলক্রমে এক জাহাজের কাপ্তেন যাহাদিগের হস্তে কামান ও অন্যান্য রণসম্ভার অর্পণ করিতেছিলেন, পরে দেখিলেন, তাহারা উপেইফুর দলের লোক নহে, ক্যাণ্টনের Red Army বা বলশেভিক দলের লোক!

এই ব্যাপার জেনারল উপেইফুর অধীন জেনারল ইয়াংসেনের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ধরিয়া লইলেন যে, ইংরাজ তাঁহার প্রভুর বিপক্ষে চতুরতা অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষের সাহায্য করিতেছেন। কাজেই তিনি ঐ ইংরাজ বাণিজ্য-পোতের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি ঐ দুইখানি ইংরাজ-পোতকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিলেন। এখনও সেই দুই পোত তিনি আটক করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজ এই দুই জাহাজের উদ্ধারের উদ্দেশে বৃটিশ নৌসেনার এক relief party প্রেরণ করিলেন। তখন জেনারল ইয়াংসেনের সহিত ইংরাজ নৌসেনার এক ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই রক্তপাতের ফলে ৭ জন ইংরাজ নৌ-সেনানী ও সেনা নিহত হইলেন। ইহাই দক্ষিণ-চীনে অরাজকতার প্রকৃত সূত্রপাত।

ইংরাজ বাণিজ্য-পোতের কাপ্তেন প্রকৃতপক্ষে এই আন্তর্জাতিক



চীনে বৃটিশের রণসজ্জা

এরূপ ধরণের দেখিয়াছিলেন বলিয়া উপেইফুর দল হইতে ক্যাণ্টনের Red armyর দলকে বাছিয়া লইতে পারেন নাই, তাই এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই ভুলে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরাজ রাজনীতিকরা বলিতেছেন, এই ভুলের ফলে ক্যাণ্টনের বলশেভিক প্রভাবান্বিত দল যে কামান বন্দুক ও অন্যান্য রণসম্ভার প্রাপ্ত হইল, তাহাতে তাহারা অনায়াসে হ্যাংকো অধিকার করিয়া পূর্ব্বমুখে সাংহাই পর্য্যন্ত বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। ক্যাণ্টনের যে বলশেভিক দলকে বাধা দিবার উদ্দেশে ইংরাজ জেনারল উপেইফুকে রণসম্ভার সরবরাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এই ভুলের ফলে সেই বলশেভিক দলই শক্তিশালী হইয়া উঠিল, পরন্তু উপেইফুর দলের সহিত ইংরাজের মনোমালিন্য সঞ্জাত হইল। ইহাই এই ব্যাপারের ভাঁড়ামিসূচক ঘটনা। ইংরাজ সেনানী ও সেনা-হত্যা ও ওয়ানসিনের সংঘর্ষ এই ব্যাপারের করুণরসাত্মক ঘটনা।

বক্সার বিদ্রোহকালে চীনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ছিল। সেই গভর্ণমেণ্ট প্রতীচ্যবাসীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়া পরিণামে চীন হইতে বিদেশী বিদ্বেষের বহ্নি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল, শান্তি-সংস্থাপনে সফলকাম হইয়াছিল। এখন চীনে সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও গভর্ণমেণ্ট নাই। পূর্ব্বে আমরা অন্যান্য সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, চীনে এখন মোটের উপর তিনটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। জেনারল চাংসোলিন ও উপেইফুর সম্মিলিত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ও মধ্য-চীনে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আরও উত্তরে মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে খৃষ্টান জেনারেল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ প্রবল হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে রাজধানী পিকিং সহরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চাঙ্গ সোলিনের সম্মিলিত শক্তি তাঁহাকে পিকিং হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ফেঙ্গ পরাজিত হইয়া সপরিবারে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে রুসিয়ার মস্কো সহরে বলশেভিকদিগের সহায়তা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, তিনি ঐ সহরে শক্তিশালী হইয়া মস্কো হইতে মঙ্গোলিয়া সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সুযোগ ও অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি ইংরাজের উপর সন্তুষ্ট নহেন। এই হেতু ইংরাজ বলশেভিক-বন্ধু এই ফেঙ্গকে দমন করিবার জন্য জেনারল উপেইফুকে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। তাই বোধ হয়, ইংরাজের বাণিজ্যপোত ইয়াংসি নদে উপেইফুকে রণসম্ভার যোগাইতে গিয়াছিল।

এ দিকে দক্ষিণ-চীনে ক্যাণ্টনের দিকে জেনারেল চাঙ্গ-কাইসেক রুস বলশেভিকদিগের সহায়তায় প্রভাবান্বিত হইয়া তথায় এক শক্তিশালী Red Army গঠন করিয়াছেন। ক্যাণ্টন পুরা বিদেশি-বিদ্বেষী; ইংরাজের সহিত জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের একরূপ প্রকাশ্য শত্রুতা বিঘোষিত হইয়াছে। অথচ প্রকৃতির খেলায় ইংরাজের বাণিজ্যপোত, বন্ধু উপেইফুকে রণসম্ভার না দিয়া চাঙ্গ কাইসেকের Red Armyর হস্তে উহা তুলিয়া দিল! ইহাতে কি বিধাতার কিছু নির্দ্দেশ আছে? কে জানে!

বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ শক্তিশালী ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে চীনের সার্ব্বভৌম শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না; কেন না, উহা বলশেভিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। অথচ পিকিং গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে চীনের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া স্বীকার করেন; তাহার কারণ এই যে, এই গভর্ণমেণ্ট বলশেভিকদিগের ঘোর বিরোধী; বিশেষতঃ চাঙ্গসোলিন ও উপেইফু এই গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতেছেন এবং উহারা হইয়া জেনারল ফেঙ্গকে মঙ্গোলিয়ায় বিতাড়িত করিয়াছেন। কিন্তু মজা এই, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ বলশেভিক বিরোধীদের

হস্ত এড়াইবার উদ্দেশে পিকিং গভর্ণমেণ্টের যতই সমর্থন করুন, সেই গভর্ণমেণ্টের প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতা নাই, সেই গভর্ণমেণ্ট চুক্তিমত বৈদেশিক শক্তিগণকে তাঁহাদের বন্দর-গত অধিকার নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে অসমর্থ। পরন্তু দেশের আবহাওয়া বুঝিয়া পিকিং গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিকগণের সহিত বর্ত্তমান বন্দোবস্ত উল্টাইয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। ইহাতেই অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে।

চীনে বর্ত্তমানে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার দুই জন নায়ক। এক পক্ষে দক্ষিণ-চীনের জেনারেল চাঙ্গ কাইসেক, অপর পক্ষে পিকিংয়ের জেনারল উপেইফু। উপেইফু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া কাণ্টনের জেনারেল চাঙ্গ কাইসেকের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি ইতোমধ্যে পিকিং ও কাণ্টনের মধ্যবর্ত্তী ইয়াংসিনদের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছেন; এবং চাঙ্গ কাইসেকের আক্রমণ হইতে হ্যাংকো-ওয়াচাঙ্গ জিলাটিকে রক্ষা করিতেছেন। এই স্থানেই উপেইফুর সৈন্যগণ বৃটিশ বাণিজ্যপোত আটক

চাঙ্গ কাইসেকের দলকে বলশেভিক অভিহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু চাঙ্গ কাইসেক স্বয়ং বলিতেছেন, তার নীতি—'চীন চীনাদের জন্য'। তিনি চীনের জাতীয়তার ধ্বজ বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহার দলের ...ক হংকং বন্দরে ইংরাজের বাণিজ্য বর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়া গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে, ইংরাজ পক্ষ এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ...ন বলেন, ইংরাজ চীনা ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনকারীদিগের ...র প্রথমে গুলী না চালাইলে বর্জ্জননীতি দক্ষিণ-চীনে অনুসৃত ...ত না। যাহাই হউক, এইরূপে ইংরাজ ও চীনে মনোমালিন্য ঘটিত হইয়াছে। এই মনোমালিন্য দুই দিকে দেখা দিয়াছে, (১) ...দের Red Army বড় কর্ত্তা জেনারেল চাঙ্গ কাইসেকের বৃটিশ ...। বর্জ্জন উপলক্ষে, (২) ক্রমক্রমে ইংরাজ বাণিজ্যপোতাধ্যক্ষ ...রল উপেই-ফুর সহকারী জেনারল ইয়াংসেনকে রণসম্ভার ...ন না দিয়া চাঙ্গ কাইসেকের দলকে উহা যোগান দেওয়ায় ...রাজ জাহাজের উপর ইয়াংসেনের গোলাবর্ষণ উপলক্ষে। অথচ ...ই এই, চাঙ্গ কাইসেক ও ইয়াংসেন ঠিক যেন অহি ও নকুল। ...ত বিধাতার খেলা নাই কে বলিবে? ইংরাজ চীনের গৃহবিবাদ ...ইবার চেষ্টা করিতে গিয়া উভয় পক্ষের সহিত নিজেই বিষম বিবাদ ...ইয়া ফেলিলেন।

চীনে ইংরাজের স্বার্থ সামান্য নহে। সেখানে ইংরাজ এ যাবৎ ...কোটি ডলার মুদ্রা কারবারে খাটাইতেছেন এবং অন্যান্য বাবদে ...তেছেন। এক জাপান ব্যতীত চীন মহাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ...ত স্বার্থ অন্য কোনও বিদেশীর নাই। ইংরাজ এই বিরাট ...রক্ষণার্থে কি করিয়াছেন? বোধ হয়, টাইপিং বিদ্রোহের পরে ...ন ইংরাজের সম্মুখে এত বড় সমস্যা আর কখনও উপস্থিত হয় ...। কিন্তু ঘটনার যোগাযোগে ইংরাজ এইবার এ লাঞ্ছনার ...বিধান করিতে যেন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার কয়েকটি ...ণ আছে:—

(১) বর্ত্তমানে ওয়ানসিন পর্য্যন্ত ইয়াংসিনদ দিয়া যুদ্ধ জাহাজ ...ন করা অসম্ভব। কেন না, এই সময়ে উহার জল এত অ-গভীর যে, ...ত বড় বড় গুরুভার জাহাজ হাংকোর পরে আর যাতায়াত ...তে পারে না।

(২) গত ... বৎসর যাবৎ ইংরাজ উপেইফুকে সমর্থন করিয়া ...সিতেছেন। যাহাতে উপেইফু চীনে সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ...রিয়া বলশেভিক প্রভাব নষ্ট করিতে পারেন, ইংরাজ তাহার চেষ্টা

বলশেভিকদিগকে রণসম্ভার যোগাইয়াছিল বলিয়া উপেইফুর সহকারী জেনারল ইয়াংসেন ইংরাজ বাণিজ্যপোতের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছেন। ইংরাজ এখন হঠাৎ উপেই-ফুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন কিরূপে? দাঁড়াইলে বলশেভিক আতঙ্ক দূর হইবার আশা সুদূর-পরাহত হয়।

(৩) কাণ্টনের বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের হস্তে অনেক টাকা মজুত আছে; পরন্তু উহার সৈন্যমণ্ডলীও সুশিক্ষিত ও রণসম্ভারাদিতে সুসম্পন্ন। এই হেতু ইহারা এত দিন উপেইফুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে মস্কোয়ের বলশেভিকরা তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া আসিতেছে। রুশিয়ান সেনানীরা কাণ্টনে থাকিয়া তত্রত্য চীন সৈন্যদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং দক্ষিণ চীনের বর্দ্ধমান শক্তিকে খর্ব্ব করিবার ইংরাজের বিশেষ প্রয়োজন। এই হেতু বর্ত্তমানে উপেইফুর বিরুদ্ধাচরণ করা ইংরাজ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন না।



"বী" নামক বৃটিশ রণপোতের একাংশে গোলার দাগ

এ দিকে আর এক সমস্যা উপস্থিত। বক্সার বিদ্রোহের ফলে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চীনে এক এক অংশে Extraterritorial অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বেলজিয়ামের সেই অধিকার উপভোগের নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই পিকিং গভর্ণমেণ্ট বেলজিয়াম গভর্ণমেণ্টকে ঐ অধিকার ত্যাগ করিতে নোটিশ দিয়াছেন। কালের গুণ এমনই! অল্প সময় হইলে চীন এরূপ সাহস করিতেন কি না সন্দেহ। হয় ত এইরূপে অন্যান্য য়ুরোপীয় ও মার্কিণ শক্তিকে চীন সময় ফুরাইলে নোটিশ দিবেন। তখন কি হইবে?

চীনে এখন এই সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে। এ সকল সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে? ইহার একমাত্র উত্তর,—চীনকে চীনের নিজের ভাগ্য-নিরূপণের অবসর প্রদান করা। বস্তুতঃ যদি পিকিং গভর্ণমেণ্ট

তাহা হইলে চীনের গৃহবিবাদ উপশমিত হইত, চীনও জাপানের মত স্বাধীন শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়া অন্যান্য শক্তির সহিত সমান আসনে উন্নীত হইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। অন্যান্য শক্তির বহু স্বার্থ চীনে সংরক্ষিত; সেই স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারা চীনের স্কন্ধের উপর extra-territorial rights এবং Customs duties চাপিয়া রাখিয়াছে। যত দিন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ কেবল গায়ের জোরে এই সকল rights ও duties চাপাইয়া রাখিবেন, তত দিন চীনের মুক্তি নাই, শান্তি নাই। যদি বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনের Customs duties উপভোগ করিবার অধিকার সীমাবদ্ধ করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে চীনের তহবিলে অর্থের অনাটন হইত না; অর্থের অনাটন না হইলে চীনের শক্তিসঞ্চয়ে বাধা পড়িত না, এবং শক্তিসঞ্চয় হইলে চীনের স্বাধীনতা ও শান্তি আপনিই দেখা দিত। আজ চীন দুর্ব্বল বলিয়া তাহার সমুদ্রোপকূলে এবং নদীসমূহে বৈদেশিকের রণপোত নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার অছিলায় পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে, কথায় কথায় চীনকে চোখ রাঙ্গাইতেছে, চীনের দস্যুতা ও অরাজকতা দূর করিবার অছিলায় নিজ নিজ হস্তেই দণ্ডের ভার গ্রহণ করিয়াছে। যদি কোনও শক্তি অন্য কোন স্বাধীন শক্তিশালী জাতির দেশে এরূপভাবে 'মুড়ুলী' করিতে যাইত, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষিত হইত।

বৈদেশিকগণ দক্ষিণ-চীনের ন্যাশানালিষ্টদিগকে বলশেভিকপ্রভাবান্বিত বলিয়া অভিহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু চীনের বহুসংখ্যক অধিবাসী ক্যাণ্টনের এই Kuomintang Governmentকে চীনের আশা-ভরসা বলিয়া জানে। এই কুওমিণ্টাঙ্গ বা ন্যাশানালিষ্ট দল এক্ষণে বিলক্ষণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের নীতি—"চীনদেশ চীনাদের জন্য।" চ্যাং চাঙ্গ সো-লিন এবং উপেইফু প্রমুখ যে সকল সেনাপতি চীনে বৈদেশিক প্রভুত্বের অনুকূলে শক্তিপ্রয়োগ করিতেছেন, ক্যাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গরা তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেছেন। জেনারল উপেইফু তাঁহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ইয়াংসি নদীতট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু হ্যাংকো নগরে তিনি বিষম বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হ্যাংকো সহরেই উপেইফু তাঁহার দক্ষিণের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুওমিণ্টাঙ্গরা হ্যাংকো অধিকার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং উপেইফুকে উত্তরে হটিয়া আসিতে হইয়াছে।

এই কুওমিণ্টাঙ্গ দল নূতন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা প্রাচীন। রুসিয়ার বলশেভিক শক্তির অভ্যুদয় হইবার পূর্ব্ব হইতেই কুওমিণ্টাঙ্গদের অস্তিত্ব ছিল, এ কথা তাঁহাদের পক্ষীয় লোকরা বলিতেছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনে যখন মাঞ্চুরাজবংশের উচ্ছেদসাধন হয় এবং ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েন, তখন হইতেই অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল হইতেই কুওমিণ্টাঙ্গ দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বয়ং ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন এই দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন দেশের মঙ্গলের জন্য এবং দেশে একতা রক্ষার জন্য স্বয়ং প্রেসিডেণ্টপদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া জেনারল ইউয়ান সিকাইকে ঐ পদে বরণ করেন। স্বেচ্ছাচারী স্বার্থান্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ ইউয়ান হঠাৎ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিলেন এবং আপনাকে চীনের সামরিক নিয়ন্তা (Dictator) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই বিষয়ে বহু বৈদেশিক ধনী তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিল। ডাক্তার সান বাধ্য হইয়া তাঁহার কুওমিণ্টাঙ্গ দলকে লইয়া পিকিং হইতে দক্ষিণ-চীনে পলায়ন করেন। তদবধি কুওমিণ্টাঙ্গরা দক্ষিণ-চীনেই অবস্থান করিতেছে। ডাক্তার সান দক্ষিণ-চীনে ক্রমশঃ এই দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টনে তাঁহার রাজধানী হইয়াছিল। এই দল চিরদিনই ন্যাশানালিষ্ট বলিয়া পরিচিত। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিলে ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে বলশেভিক প্রভাবান্বিত বা বলশেভিক সাহায্যে পুষ্ট বলা যাইতে পারে না। ডাক্তার সান যখন এই দলের সৃষ্টি করেন, তখন বলশেভিকরা কোথায়? ডাক্তার সান স্বয়ং আন্তরিক দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁহার দলকেও তিনি স্বীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেশপ্রেমিক হইতে পারে—স্বদেশে বিদেশীয়ের প্রভুত্ব ধ্বংস করা তাহাদের লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু বলশেভিক হইবে কেন?

চীনাদের স্বার্থপর War Lordরা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ক্যাণ্টনের এই গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এক বার (১৯২২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের ফলে ডাক্তার সানকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থ যে সেনাপতির বিদ্রোহের ফলে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম চাঙ্গ কাই-সেক। বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে আজ এই জেনারেল চাঙ্গই ক্যাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গদলের নেতৃত্ব করিতেছেন।

বর্ত্তমানে জেনারল চাঙ্গ-কাই-সেক চীনের পাঁচটি প্রদেশ কুওমিণ্টাঙ্গদের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিমে তাঁহার মিত্র ও সহায় জেনারল ফেঙ্গ যুসিয়াঙ্গের কুওমিনচুন দল উত্তর-পশ্চিম চীন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে কিছু পূর্ব্বে চাঙ্গ-সো-লিন ও উপেইফুর সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গা সহরে ও পরে রুসিয়ার মস্কো সহরে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তিনিও সম্প্রতি শক্তিসঞ্চয় করিয়া মঙ্গোলিয়া সীমান্তে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন। এখন যদি এই দুইটি জাতীয় দলের যোগাযোগ হয়, তাহা হইলে চীন হইতে বৈদেশিক প্রভুত্ব চিরতরে বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু উহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।



সতীর পতি

(উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ

পুরুষস্য ভাগ্যম্

সে রাত্রিতে গুণ্ডার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, সতীশ নিরাপদে বাগবাজারে তাহার গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। শুনিল, দাঙ্গার পঞ্চম দিবসে তাহার দোকান লুট হইয়া গিয়াছে। তাহার কারবার লোহা-লক্কড়ের নহে—ও কথাটা সে করিমকে মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল। রাধাবাজারে তাহার বৃহৎ কাচের দোকান ছিল, মুসলমানের দল আসিয়া সেই দোকান আক্রমণ করে; টাকাকড়ি যাহা তহবিলে মজুত ছিল, সমস্তই লুঠিয়া লইয়াছে, এক জন দ্বারবানকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, দোকানের মালপত্রও অনেক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সময়ে পুলিস-বাহিনী আসিয়া পৌঁছিতে তাহারা পলায়ন করে। সতীশের ছোট ভাই কুমুদ দোকানে ছিল, সে এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী অল্প-বিস্তর জখম হইয়া, কোনও ক্রমে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। প্রাণভয়ে সেই দিন হইতে দোকানে কেহ আর যায় নাই; তবে খবর পাওয়া গিয়াছে, পুলিসের কর্ত্তারা দোকানে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

শুনিয়া সতীশ আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিছানা লইল। স্ত্রীর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আহার করিল না; অবশেষে দুইটি সন্দেশ ও এক গেলাস জল খাইয়া শুইয়া রহিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সতীশের নিদ্রা হইল না। সে ত এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। অন্য কোন সম্পত্তির আয় নাই—ঐ দোকানখানিই ছিল একমাত্র ভরসার স্থল। আগামী কল্য পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গিয়া রেবতীকে উদ্ধার করিয়া আনা ত দূরের কথা, এখন জীবিকানির্ব্বাহের কি উপায় হইবে? হায় হায়, ইহাকেই বলে পুরুষের দশ দশা—কখনও হাতী কখনও মশা!—যে ছিল রাধাবাজারের এক জন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী, সে আজ সর্ব্বস্বান্ত—কি খাইবে, তাহার ঠিক নাই!

পরদিনও সতীশ বাড়ীতে বসিয়া নির্জ্জনে অনেক চিন্তা করিল। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে দিবা অবসান হইল—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল—ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সতীশ ভাবিল, করিমের নিকট তাহার ওয়াদার কাল ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল—আশাহত ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর গুণ্ডা আজ রাত্রিতেই বোধ হয় রেবতীকে শেষ করিয়া ফেলিবে; ছাড়িয়া তাহাকে কখনই দিবে না—দিলে পুলিস হাঙ্গামার আশঙ্কা তাহাদের আছে ত!

আজও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সতীশ ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রি ১২টা বাজিল, সতীশ মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইল, রেবতী আর ইহজগতে নাই! গুণ্ডাহস্তেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। মনকে বুঝাইল, "ইহাতে আমার আর অপরাধ কি? মনুষ্য-জীবন অনিত্য, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়—এ সকল ত শাস্ত্রেরই কথা। নিয়তি—নিয়তি—সকলই নিয়তি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সহায় হইলেও নিয়তির হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। রেবতীর অদৃষ্টে মুসলমান-হস্তে অপমৃত্যু লেখা ছিল, তাহা খণ্ডন করে কাহার সাধ্য? ইহাতে আমার আর দোষ কি?"

রেবতীর অপমৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে আর একটা কথা সতীশের মনে উদয় হইল। ইহজগতে

রেবতীর তিন কুলে কেহই নাই—মা নাই, ভাই নাই, সন্তান-সন্ততি নাই; এমন কি, এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রায়ই যাহা থাকে—একটা মূর্খ লম্পট "গুরুদেব" পর্য্যন্ত নাই। কে রেবতীর উত্তরাধিকারী হইবে? হয় মিত্রের গলিতে বাড়ীখানি রেবতীর নিজস্ব—তাহারই মুখে সতীশ শুনিয়াছিল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উহা সে পনেরো হাজার টাকায় খরিদ করিয়া দুই তিন হাজার টাকা ব্যয়ে মেরামত করাইয়াছিল, পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয়ে বাড়ীতে বিদ্যুৎ আনাইয়াছিল,—এখন যেমন করিয়া হউক, সে বাড়ীখানির মূল্য বিশ হাজার টাকা। আসবাব-পত্র যাহা আছে, তাহার মূল্য কম করিয়া ধরিলেও দুই হাজার টাকা হইবে। আয়রণ-চেষ্টে কি আছে না আছে, তাহা সতীশ সঠিক অবগত নহে। তবে তাহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজ আছে—ইহা সে জানে। অলঙ্কারও কিছু আছে। সব অলঙ্কার রেবতী ত চুণারে লইয়া যায় নাই। এ সকলের ওয়ারিশ কে হইবে? গভর্ণমেণ্ট? তা কেন? ঐ ধরণের কত স্ত্রীলোক ত মৃত্যুকালে উইল করিয়া তাহাদের প্রণয়িগণকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে। মৃত্যু [illegible] জানিলে রেবতীও হয় ত এইরূপ করিত। একখানা উইল খাড়া করিতে আর কতক্ষণ লাগে? সাক্ষী? টাকা খরচ করিলে সাক্ষীর অভাব? আর সে উইলের প্রোবেট লইবার সময় কেই বা আপত্তি দাখিল করিতে যাইবে? কেহই ত নাই। সতীশ মনে মনে স্থির করিল—"না না—নাহক এতটা সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে কোন ক্রমেই যাইতে দেওয়া উচিত নহে। উইল একখানা খাড়া করাই ঠিক। চুণারে রেবতীর মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই প্রচার করা প্রয়োজন ও নিরাপদ। রেবতীর বাড়ীখানা ও কোম্পানীর কাগজগুলি হাতে আসিলে উহা বিক্রয় করিয়া, আবার নূতন করিয়া ব্যবসায়ের পত্তন করা ছাড়া আর অন্য উপায় কি? কল্য প্রভাতেই রেবতীর বাড়ী গিয়া, ঝি-চাকরগুলাকে কৌশলে বিদায় দিয়া, জিনিষপত্রের চেকাচং করিয়া—তাহার পর একখানা উইল প্রস্তুতের আয়োজন করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সতীশ মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ

একাদশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্।

অতিথি জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই রেবতীর সে দিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিছানার উপর একটি সিগারেট ধরাইয়া সে সেবন আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় ঝি সৌদামিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কা'ল তুমি যে কথা বল্লে, দিদিমণি, শুনে ত আমার বুক ধড়ফড় করতে লেগেছে—বাকী রাতটুকু আমার ঘুমই হ'ল না! কি বিপদে তুমি পড়েছিলে? আর কোনও ভয় নেই ত?"

রেবতী সিগারেট টানিতে টানিতে সংক্ষেপে তাহার বিপদের কাহিনী বর্ণন করিল। এ ব্যাপারে "বাবু" কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং পাশের কক্ষে নিদ্রিত ভদ্রলোকটি তাহার কি পরিমাণ উপকার করিয়াছে, তাহাও রেবতী বলিতে ভুলিল না। আরও বলিল যে, বাবুর মুখদর্শন রেবতী আর করিবে না; সে যদি কালামুখ লইয়া আবার আসিয়া হাজির হয় ত মুড়ো খ্যাংরা মারিয়া বিদায় করিবে, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। শুনিয়া সৌদামিনী সতীশকে গালি দিতে লাগিল।

রাগটা একটু পড়িলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার চায়ের জল কি এখন ঠিক ক'রে দেবো, দিদিমণি?"

রেবতী বলিল, "হাঁ, দে। সে বাবুটি কি উঠেছেন?"

"না, ওঠেন নি। জাগিয়ে দেব?"

"না, ঘুমুচ্ছেন, ঘুমুন না। আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে ফেলি। এখনই হয় ত থিয়েটারের ম্যানেজার বাবু এসে হাজির হবেন। নিস্তার কোথা?"

"সে নীচে রান্না-ঘরে কয়লার আগুন ধরাচ্ছে।"

"হ্যাঁ ধরাক। তুই আমার স্নানের জল ঠিক ক'রে, ষ্টোভটা জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিস। স্নান ক'রে উঠেই যেন আমি চা পাই।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সৌদামিনী প্রস্থান করিল।

আর একটা সিগারেট ধরাইয়া, রেবতী স্নানার্থ একতলায় নামিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়া ডাহিন দিকে এই স্নানাগার। বারান্দাটি উঠানের অপর প্রান্তে অবস্থিত।

রান্নাঘর তখন কয়লার ধূমে আচ্ছন্ন। সৌদামিনী ষ্টোভটি বারান্দায় বাহির করিয়া, প্রথমে সেটি সাফ করিল। তাহার পর জ্বালিয়া জলের কেৎলি চড়াইয়া দিল। নিস্তারিণী তখন কয়লা ধরানো শেষ করিয়া, রান্নাঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, সৌদামিনীর কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি বলিল, "জিজ্ঞাসা করেছিলি, সদু ?"

"হাঁ, করেছিলাম।"

"শুনলি কিছু ?"

"শুনলাম বৈ কি" বলিয়া সে চুপি চুপি রেবতীর নিকট শ্রুত কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

এমন সময় দরোয়ানজী খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিতে করিতে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি তোরা গল্‌বাৎ করছিস ?"—বলিয়া অল্প দূরে সে-ও বসিয়া পড়িল। মনিব একটা কোনও বিশেষ বিপদে পতিত হইয়াছেন, ইহা সে অনুমান করিয়াছিল; বিপদটা যে কি ঘটিয়াছিল, জানিবার জন্য তাহারও প্রাণ ছটফট করিতেছিল। সৌদামিনী দরোয়ানজীকেও চুপি চুপি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল।

রেবতীর স্নান ততক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে গা-মাথা মুছিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় কাহার জুতার শব্দ শুনিতে পাইল। কে আসিল, ম্যানেজার বাবু না কি? রেবতী কান খাড়া করিয়া রহিল। পর-মুহূর্ত্তে তাহার কানে গেল সতীশের কণ্ঠস্বর। ক্রন্দনবিজড়িত, কম্পিত কণ্ঠে সে বলিতেছে—"ওরে সদু, ওরে নিস্তের—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে রে! তোদের মনিব রেবতী বিবি চুণারে মারা গেছে রে—হায় হায় হায়!"

সৌদামিনী বলিল, "এ কি সর্ব্বনাশ, বাবু! কবে? কবে?"

"আজ চারদিন হ'ল রে—আজ চার দিন হ'ল।"—বলিয়া সতীশ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সতীশ বলিতে লাগিল, "চুণারে নিয়ে গিয়ে প্রথম মাসখানেক বেশ উন্নতিই দেখা যেতে লাগলো। তার পর থেকে আবার একটু খারাপের দিকে গেল। ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিচ্ছে করাতে লাগলাম। আবার একটু শোধরালো। মরবার তিন দিন আগেও সে-ও জানতো না—কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, এ সর্ব্বনাশ হবে। এমন কি, থিয়েটারের ম্যানেজারকে 'তার' পর্য্যন্ত করা হয়েছিল যে, আমি অমুক দিন কলকেতায় ফিরবো। বুধবার-দিন সন্ধ্যাবেলা, 'বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা' ব'লে সেই যে শুলো—আর উঠলো না রে সদু—আর উঠলো না। আমি তখনই 'তার' ক'রে এলাহাবাদ থেকে সাহেব ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম—সাহেবের মোটর এসে যখন ফটকে দাঁড়ালো, তখন আমরা বল হরি হরিবোল ব'লে তাকে বের করছি। গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে, দশ মণ চন্দনকাঠে দু'টিন গাওয়া-ঘি ঢেলে তাকে পোড়ালাম। সোনার প্রতিমে বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম রে সদু—হায় হায় হায়! সে ত গেলই—আমাকে শুদ্ধ মেরে রেখে গেল রে! তুই ত সব জানিস সদু—এত বছর, আমি তাকে একটি দিনও চোখের আড়াল করি নি। তাতে আমাতে ছিলাম যেন যোড়ের পায়রা দুটি! এখন, সে-হারা হয়ে আমি কি ক'রে বেঁচে থাকবো!"—বলিয়া আবার হাউ হাউ করিয়া কান্না।

সদু বলিল, "বাবু! বাবু! চুপ করুন, আপনি এত অধৈর্য্য হবেন না—আপনার পায়ে পড়ি! অদেষ্টে যা লেখা ছিল, তা কে খণ্ডাবে বলুন? যান, উপরে গিয়ে বসুন। যতই কাঁদাকাটি করুন, তাকে ত আর ফিরে পাবেন না, মিথ্যে শরীল খারাপ হবে বৈ ত নয়!"

সতীশ বলিল, "আর শরীর! এ শরীর ত এখন ভার বোঝা হয়েছে সদু! কাজের কথা যা বলতে এসেছি—তাই বলি, শোন। মরবার আগে সে একখানি উইল ক'রে গেছে। তাতে আমার দুই ছেলেকে তার এই বাড়ী, আসবাবপত্র, গহনাগাঁটি, কোম্পানীর কাগজ সমস্ত সমান-ভাগে দিয়ে গেছে। তোদের কথাও ভোলে নি। তোকে ৫০৲, নিস্তারিণীকে ৫০৲ আর হরি সিং দরোয়ানকে ১০০৲ দিয়ে গেছে। কা'ল সকালে আমি কলকেতায় এসে পৌঁছেছি। পৌঁছেই আদালতে গিয়ে উইল সাবাস্ত করবার জন্যে দরখাস্ত দিয়েছি। উইলের প্রবেট নিয়ে, জিনিষপত্র বেচে-কিনে, তোদের টাকা দিতে এখন যার নাম ছ' মাস দেরী। এত দিন তোরা এখানে ব'সে কি করবি, আমি বরঞ্চ নিজের পকেট থেকে তোদের টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি—তোরা আপন আপন বাড়ী চ'লে যা। তোদের টাকা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। দশটা বাজলেই আদালতের পেয়াদারা এসে সদরে তালা বন্ধ করবে। তোদের যদি এখানে তারা দেখে, শেষকালে হয় ত সাক্ষীর সফিনে ধরিয়ে দেবে, তোরা তখন ছ মাসের ফেরে প'ড়ে যাবি।"

হরি সিং বলিয়া উঠিল, "সো ত বহুৎ মুস্কিল হবে বাবুজী! আপনি আপনার বাড়ী-ঘর বুঝিয়ে নিয়ে দয়া ক'রে হামাদের টাকা দিয়ে দিন—হামলোক চলিয়ে যাই।"

সতীশ বলিল, "তা দিচ্ছি। সত্যি কথাই ত, তোমরা গরীব লোক, এ সব ফ্যাসাদ তোমাদের কেন? এই নাও হরি সিং তোমার ১০০৲—দশ খানা নোট আছে, গুণে নাও। এই নে নিস্তার তোর ৫০৲, এই সদুর ৫০৲, খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম আর এখানে তোরা করিস নে—বেলা এখন প্রায় ৮টা; হাওড়া ইষ্টিসানে গিয়েই বরঞ্চ খাবার-দাবার কিনে খেয়ে রওয়ানা হয়ে পড়। আমি ততক্ষণ উপরে গিয়ে বসি। পেয়াদারা না আসা পর্য্যন্ত আমাকে ত এখানে থাকতেই হবে। ঘর খোলা আছে কি?"

সদু বলিল, "হ্যাঁ বাবু, ঘর খোলাই আছে—উপরে গিয়ে বসুন। চায়ের জল প্রায় ফুটে উঠেছে—আমি চট

ক'রে এক পেয়ালা চা আপনার জন্যে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—গিয়ে ঘর-দোর সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সতীশ উপরে উঠিয়া গেল।

রেবতী তখন মাথা মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে স্নান-কক্ষের দ্বার মুক্ত করিল। উভয় ঝি তাহার পানে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, "সব শুনলে, দিদিমণি? বাপ রে বাপ—কি ধাপ্পাবাজ জুয়াচোর গো! জলজ্যান্ত মানুষটা তুমি, তোমায় স্বচ্ছন্দে পুড়িয়ে গঙ্গায় দিলে! ও মা, কি ঘেন্নার কথা।"

রেবতী বলিল, "দাঁড়া না, কে কাকে গঙ্গায় দেয়, তাই দেখছি আমি। হরিসিং, তুমি হুঁসিয়ার থেক: উপরে গিয়ে আমি যদি বলি, হরিসিং পুলিস বোলাও, তুমি বলবে, আচ্ছা মাইজী, আভি বোলাতে হেঁ—কিন্তু সত্যি সত্যি পুলিস ডেক না—বুঝলে ত?"

হরিসিং বলিল, "হাঁ মাইজী। হামি বুঝিয়েছে।"

ঠিক এই সময়, উপর হইতে একটা চেঁচামেচি শুনা গেল—"কে রে তুই ড্যাম রাস্কেল, এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিস? কে তোকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিলে? কি মৎলবে এসেছিলি তুই?"—তার পর চটাং করিয়া একটা উচ্চ শব্দ—কে কাহার গালে যেন বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় মারিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ।

হরিসিং বলিল, "মাইজী, হামি উপরে যাব।"

"না, তুমি সদরেই থাক"—বলিয়া রেবতী এলো চুলে, আঁচলটা কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া লইয়া, রান্নাঘরের পার্শ্ব হইতে ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

সতীশ এবং হীরালালে তখন মল্লযুদ্ধ চলিতেছে। শয্যাপার্শ্বস্থ টেবলটা উলটাইয়া পড়িয়াছে—দুইটা ফুলদানী ভগ্ন। সতীশের গালে হীরালালের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়াছে। চক্ষুর নিমেষে হীরালাল সতীশকে মেঝেয় পাড়িয়া ফেলিয়া, তাহাকে প্রহার জন্য বদ্ধমুষ্টি উদ্যত করিল।

রেবতী বলিল, "হীরালাল বাবু—থামুন। ওর শাস্তি আমিই নিজে হাতে দিচ্ছি।"

হীরালাল উঠিয়া দাঁড়াইল। সতীশও দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রেবতীর পানে চাহিল। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু সত্বর সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "রেবী! রেবী! তুমি বেঁচে আছ তা হ'লে?"

রেবতী ভেঙ্গাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "না না—মরা মানুষ কি কখনও বেঁচে থাকে? তুমি চুণারে যাকে বল হরি হরিবোল দিয়ে বের ক'রে নিয়ে গেলে, দশ মণ চন্দনকাঠে আর ছটিন গাওয়া ঘি ঢেলে যাকে পোড়ালে, সে কি কখনও বেঁচে থাকতে পারে? আমি তার ভূত—তবে বিংশ শতাব্দীর নব্য ভব্য সভ্য ভূত—আমি তোমার ঘাড় মটকাবো না—কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম ঝাঁটাভোজন করাব মাত্র—তার পর অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে তোমায় বিদায় করাবো। এত বড় বিশ্বাসঘাতক নরাধম জুয়াচোর তুমি? গুণ্ডারা আমাকে মেরে ফেলেছে এই ভরসায় জাল উইল খাড়া ক'রে তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিতে এসেছ? পাজি ছুঁচো সয়তান কোথাকার!"—বলিয়া রেবতী সপাং সপাং করিয়া দুই তিন ঝাঁটা সতীশের মাথায় ও বক্ষে বসাইয়া দিল।

ঝাঁটা খাইয়া "কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর, তুই আমায় ঝাঁটা মারিস? দাঁড়া হারামজাদী, তোকে আমি আজ খুনই করবো"—বলিয়া সতীশ মালকোঁচা দিতে লাগিল।

"কে কাকে খুন করে দেখাচ্ছি, দাঁড়া!"—বলিয়া রেবতী বারান্দার প্রান্তে গিয়া চীৎকার করিল, "সত, আঁশ বটিখানা নিয়ে আয় ত রে।"

হীরালাল সতীশের কানটি ধরিয়া বলিল, "খবদ্দার—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছ কি মেরে তোমায় গুঁড়ো ক'রে ফেলবো, রাস্কেল।" তাহার পর কান ছাড়িয়া বলিল, "যাও বাপের সুপুত্তুরের মত, আস্তে আস্তে বাড়ী চ'লে যাও। নইলে এখনই পুলিস ডাকবো।"

সতীশ বলিল, "বটে, এরই মধ্যে এতটা গড়িয়েছে? তুমিই বুঝি এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা? বাঃ বেশ আছ ছোকরা!" বলিয়া সতীশ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। এক ধাপ নামিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "রেবা!—খুব কাটিয়ে রাখলি যা হোক ভাই! হুঁঃ—এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রী-লোকের চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, মানুষ কোন্ ছার! দুটো দিন আর তর সইল না, নতুন জোটালি? 'সাধে কি হই গো দিদি'—সেই গানটা একবার গা না—শুনে যাই।" বলিয়া জিভ বাহির করিয়া রেবতীকে ভেঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি সতীশ নীচে নামিয়া গেল।

সদরে পৌঁছিলে হরি সিং সহাস্যে উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "কি বাবুজী! বিবির হাঁথের ঝাড়ুটি মিঠা লাগলো ত?"

সতীশ কোন উত্তর না করিয়া, তাহার দিকে একটা ক্রোধদৃষ্টি হানিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দ্রষ্টব্য—ষাণ্মাসিক সূচী (বৈশাখ হইতে আশ্বিন) আগামী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইবে। মাঃ বঃ সঃ।



"—যথা জলতলে কনক-পঙ্কজ-বনে প্রবাল আসনে,
বারুণী রূপসী বসি' মুক্তা-ফল দিয়া—"



৫ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ [২য় সংখ্যা

রসশাস্ত্র

রসশাস্ত্রের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, রসাস্বাদের অধিকারী সকলে হয় না, যে হৃদয়ে ভাবপ্রবণতা আছে, যে হৃদয় অনবরত শুষ্ক তর্ক বা গণিত প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রের আলোচনায় নিতান্ত কর্কশ ভাব প্রাপ্ত হয় নাই, অথবা যে হৃদয় একান্তভাবে কামক্রোধাদি দ্বারা কলুষিত হয় নাই—সামাজিকগণের এইরূপ হৃদয়ের দ্বারাই রসাস্বাদন হইয়া থাকে। এই রসের আস্বাদন করিতে হইলে, সামাজিকগণের রসাস্বাদনে অধিকারী হইতে হইবে। সে অধিকার কি? তাহা নিরূপণ করিতে যাইয়া আলঙ্কারিক আচার্য্য মম্মট ভট্ট বলিয়াছেন

"শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে॥"

অর্থাৎ কাব্যের নির্ম্মাণ বা কাব্যরসের আস্বাদন করিতে হইলে তিন প্রকার কারণের অপেক্ষা করিতে হয়। প্রথম কারণ—শক্তি, অর্থাৎ জন্মান্তরীয় কবিত্ব-সংস্কার, এ সংস্কার যাহার নাই, তাহার পক্ষে কাব্য-নির্ম্মাণের চেষ্টা বা কাব্য-আস্বাদনের প্রযত্ন এক প্রকার বৃথাই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে কাব্যানুশীলন অনেক

দ্বিতীয় কারণ—'নিপুণতা', এ নিপুণতালাভ কিসের দ্বারা হয়? তাহারই উত্তর দিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন,—

"লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।"

অর্থাৎ স্থাবর বা জঙ্গমস্বরূপ যে লোকসমূহ, তাহাদিগের বাহ্য ও আভ্যন্তর স্বভাবের পরিচয়, ব্যাকরণ, অভিধান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন।

তৃতীয় কারণ—কাব্যশাস্ত্র বুঝিবার যাহার ক্ষমতা আছে, সেইরূপ ব্যক্তির উপদেশ লাভ করিয়া অধিকাংশ সময় কাব্যশাস্ত্রেরই অনুশীলন, এই তিনটি উপায় সমুদিতভাবে কাব্য-নির্ম্মাণ বা কাব্যরসাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে। কাব্যপ্রকাশকারের এইরূপ উক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি কাব্যরসের আস্বাদনে সমর্থ নহে। নানা প্রকার বৈচিত্র্যময় ঘটনাসমূহের বর্ণনা দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে ক্ষণিক উত্তেজনা বা আনন্দ প্রদান করিবার জন্য যে সকল কাব্য বা উপন্যাস প্রভৃতি রচিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা সমাজের বা কাব্যশাস্ত্রের কোনরূপ

উপন্যাসে অনেক স্থলে যাহা রস বলিয়া সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক রস নহে, কিন্তু রসের আভাসমাত্র।

কোন প্রাচীন কবি বলিয়াছেন,—

"পুণ্যবন্তঃ প্রমীণ্বন্তি যোগিবদ্রসসন্ততিম্।"

অর্থাৎ যোগিগণ সমাধিলাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব করিয়া থাকেন, বিশুদ্ধহৃদয় সামাজিকগণও কাব্যরসের আস্বাদনে সেই প্রকার অনাবিল আনন্দের অনুভব করেন। সাময়িক চিত্তের উত্তেজনা কাব্যের ফল নহে, কিন্তু শান্তিময় প্রসাদসমন্বিত স্থায়ী রসাস্বাদজনিত আনন্দই কাব্যের প্রকৃত ফল। কাব্য মানুষকে দেবতার আসনে বসায়, কাব্যের আস্বাদনে মানব-হৃদয়ে সকল প্রকার সাংসারিক দুর্ব্বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়। এই প্রকার আনন্দের অসাধার হেতু যে রসাস্বাদ, তাহা পূর্ব্বোক্ত সামাজিকরূপ অধিকারিগণ কি ভাবে করিয়া থাকেন, সে সময় তাঁহাদিগের চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়া থাকে এবং রসরূপে যাহা আস্বাদিত হয়, সেই ভাবনিচয় পরের বা সামাজিকগণের নিজ হৃদয়েরই বৃত্তি, তাহা বুঝাইবার জন্য কাব্যপ্রকাশকার আচার্য্য মম্মট ভট্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"অভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী ইত্যাদিকো নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোঽপি সাধারণোপায়বলাৎ তৎকাল-বিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃ-ভাববশোন্মিষিত-বেদ্যান্তরসম্পর্ক-শূন্যাপরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা সাধারণ্যেন স্বাকার ইবাভিন্নোঽপি গোচরীকৃত-শ্চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণো বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ পানকরসন্যায়েন চর্ব্যমাণঃ পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্ব্বাঙ্গীণমিবালিঙ্গন্ অন্যৎ সর্ব্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ॥"

(কাব্যপ্রকাশে ৪ উল্লাসঃ)

সামাজিকগণের সংস্কাররূপেই অবস্থিত যে অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়ী ভাব আছে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তঃকরণে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিলেও তৎকালে সাধারণ উপায়ের বলে পরিমিত প্রমাতৃভাব বা ব্যক্তিত্ব তাহা হইতে অপসারিত হইয়া যায়, এবং সেই সময়ে সামাজিক ব্যক্তির অসাধারণ প্রমাতৃভাব বা ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া যায়, রসাস্বাদের অনুকূল যে কয়টি বিষয় কাব্য বা নাটকের দ্বারা তাহার হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়, সেই কয়টি বিষয় ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই জ্ঞান তৎকালে তাহার বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন বোধ হয় যে, নাট্যশালায় বা কবিগোষ্ঠীতে বসিয়া যাহারা রসাস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয় একরূপ বৃত্তিসম্পন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় জ্ঞানের আকার জ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলেও যেমন সেই জ্ঞানের দ্বারাই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানগত আকার এক হইয়া অখণ্ড অনুভূতির বিষয় হয়, সেইরূপ সহৃদয়গণের হৃদয়স্থিত অনুরাগ প্রভৃতি প্রধান ভাবগুলিও সেই সময়ে অলৌকিক সাক্ষাৎকারস্বরূপেই যেন পরিণত হইয়া প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সেই সময় বেদ্য ও বেদনা বিষয় ও বিষয়ী বা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, ভাবগুলি অকস্মাৎ যেন প্রকাশময় অখণ্ড জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। এই প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশ্যভাব-সমূহের অভিন্ন ভাব যতক্ষণ প্রকাশ পায়, ততক্ষণই রসাস্বাদ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত রসের অনুকূল বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি জ্ঞান ঐ অখণ্ড রসাস্বাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন এক হইয়া যায়। এই বিভাবাদি জ্ঞান যদি কোন কারণে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর রসাস্বাদ হয় না। মিছরী, মরিচ, নেবু প্রভৃতি নানাপ্রকার বিভিন্নাস্বাদসম্পন্ন রসনিচয়ের একত্র মিলনে যেমন এক অভিন্ন অথচ ঐ সকল রসের সমন্বয়যুক্ত নূতন রস আস্বাদনের বিষয় হয়, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকার ভাবনিচয়ের এই প্রকার অলৌকিক সমন্বয়ে যে অখণ্ড ও অনির্ব্বচনীয় সুখময় ও প্রসাদময় আস্বাদবিশেষ উৎপন্ন হয়, সেই আস্বাদের সঙ্গে অভিন্নভাবে প্রকাশিত, ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবের যে অখণ্ড আস্বাদন, তাহাই হইল রস। এ রস অন্তঃকরণে জাগরূক হইয়া বোধ হয় যেন, বাহিরের সকল জগৎকে প্লাবিত করিয়া প্রত্যেক সামাজিকের সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকে, আবার সেই বাহিরের নর্ত্তনকারী ভাবনিচয় যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সে যেন সামাজিকগণের প্রত্যেক অঙ্গকে আস্বাদময় করিয়া, নিজের ভাবে আবিষ্ট করিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বাহিরের সব, কিছু রস আবার ...

ইহা যেন গাঢ় বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে একবারে ডুবাইয়া দেয়, ইহা যেন ব্রহ্মাস্বাদকে অনুভব করা। এইরূপ অলৌকিক চমৎকারকারী প্রকাশাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ী অনুরাগ প্রভৃতি ভাবগুলি বাস্তবিক রসস্বরূপ হইয়া থাকে।

মম্মট ভট্ট রসাস্বাদ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। সুতরাং অনেকের পক্ষে তাহা সহজে বোধগম্য নহে। এই জন্য তাহার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। তিনি দেখাইতে চাহেন যে, রসকে আস্বাদ্যও বলা যায়, অথচ তাহা স্বয়ংই আস্বাদস্বরূপ। কাহার আস্বাদ, প্রথম তাহাই দেখিতে হইবে। রস নয় প্রকার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রত্যেক রসেরই আস্বাদ্য পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে, অপর রসের কথা পরে বলিব। প্রথমেই শৃঙ্গার বা আদিরসের আস্বাদ কি, তাহাই দেখাইতেছি।

এই রসের দুই প্রকার আস্বাদ্য আছে। প্রথম—অনুরাগ বা রতি, দ্বিতীয়—সেই রতির সহিত কার্য্যকারণভাবে জড়িত আলম্বন, উদ্দীপন, সঞ্চারী ও অনুভাব প্রভৃতি।

এই রতি কাহাকে বলে, প্রথমেই তাহা দেখিতে হইবে। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—"রতির্মনোহনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্"। ইহার তাৎপর্য্য এই—মন যাহা চাহে, তাহারই প্রতি মনের যে আনুকূল্য অথবা ঝুঁকিয়া পড়া, তাহাই রতি বা অনুরাগ অথবা প্রীতি বা ভালবাসা, এই সকল শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী এই প্রীতির স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"প্রীতিশব্দেন খলু মুৎপ্রমোদ-হর্ষানন্দাদিপর্য্যায়ং সুখমুচ্যতে। ভাবহার্দ্দ-সৌহৃদাদিপর্য্যায়া প্রিয়তা চোচ্যতে। তত্র উল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্। তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদানুকূল্যানুগত-তৎস্পৃহা-তদনুভবহেতুকোল্লাসময়-জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা। অতএবাস্যাং সুখত্বেঽপি পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রীতি শব্দের দ্বারা সুখ অভিহিত হইয়া থাকে। মুৎ, প্রমোদ, হর্ষ, আনন্দ প্রভৃতি শব্দও এই সুখকেই বোধ করায়। ভাব, হার্দ্দ ও সৌহৃদ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রিয়তা অভিহিত হয়। তাহার মধ্যে উল্লাসাত্মক যে জ্ঞানবিশেষ, তাহাই সুখ। যে বিষয়, তাহার প্রতি যে অনুকূলতা, তাহারও নাম প্রিয়তা। সেই প্রিয়তাও জ্ঞানবিশেষ, সেই জ্ঞানেই যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা প্রীতির বিষয়ের প্রতি আনুকূল্য এবং সেই আনুকূল্যের সঙ্গে নিয়তভাবে মিলিত যে অভিলাষ, এবং সেই প্রিয়বস্তুর অনুভব হইতে উৎপন্ন যে সুখ, তাহাও ঐ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এই কারণে এই বিলক্ষণ প্রকাশরূপ যে প্রীতি, তাহা সুখ-স্বরূপ হইলেও কাম হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীজীব গোস্বামীর এইরূপ উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি প্রীতি শব্দের দ্বারা যাহা বুঝাইতে চাহেন, তাহা সুখময়, আনুকূল্যময় ও অভিলাষময় জ্ঞানবিশেষ। এই সুখ প্রিয় বস্তুর দর্শন বা শ্রবণ অথবা চিন্তনাদির দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহার দর্শনে, শ্রবণে বা চিন্তনে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পাইবার জন্য যে ইচ্ছা, তাহাও যদি এই সুখের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এই ইচ্ছা ও সুখের মিলনের সঙ্গে অন্তঃকরণে তৎপ্রবণতা বা তন্ময়ভাব উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রীতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। ইহাই সাধারণতঃ রতি বা ভালবাসা বলিয়া লোকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে সুখময়, ইচ্ছাময়, আনুকূল্যময় যে প্রকাশ বা জ্ঞানবিশেষ, তাহাই হইল শৃঙ্গার বা আদিরসের ভিত্তি।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, এই প্রীতি যখন সুখস্বরূপ, তখন ইহার স্বভাব এই যে, ইহা নিজের আশ্রয়ের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়া থাকে, আবার ইহা যে কারণে ইচ্ছাস্বরূপ, সেই কারণে ইহা ঈপ্সিত যে বিষয়, তাহারই সহিত নিয়ত প্রকাশিত হয়। এই প্রীতি বা ভালবাসা, ইহাই হইল শৃঙ্গার বা আদিরসের প্রধানভাবে আস্বাদ্য, এই প্রীতি আমাদিগের সকলেরই সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি। ইহা দ্বারাই আমাদিগের সকল প্রকার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহা কখনও সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে, অল্পমাত্র উদ্বোধন বা উদ্দীপনের সমাবেশ হইলেই ইহা অভিব্যক্ত বা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। অভিনয় দর্শন করিবার সময় ঐ অভিনয় যদি আদিরস-সম্বন্ধী হয়, তাহা হইলে সামাজিকগণের হৃদয়ে সংস্কাররূপে বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত এই রতি উদ্দীপ্ত বা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, নট বা নটী যাহাদিগের চরিত্র অভিনয়

বা রতি ছিল বা আছে, তাহা সামাজিকগণের আস্বাদ্য হয় না। কারণ, আস্বাদন হইল প্রত্যক্ষজ্ঞান, অর্থাৎ মানস-প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের স্বভাবই এই যে, ইহা অসন্নিকৃষ্ট বা ব্যবহিত কিংবা পরহৃদয়গত বস্তুর প্রকাশক হইতে পারে না। আলঙ্কারিকগণ রসকে যখন সাক্ষাৎকারস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখনই বুঝিতে হইবে, এই রসের যে সকল মনোবৃত্তি সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা সামাজিকগণের নিজ নিজ মনোবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে আরও দেখিতে হইবে যে, সামাজিকগণ যখন অভিনয়াদি দর্শনকালে এইরূপ নিজ হৃদয়স্থিত রতির সাক্ষাৎকার করেন, তখন কিন্তু সেই রতিতে তাঁহাদের আত্মীয়ত্ব বা নিজত্বের জ্ঞান থাকে না। আমি যখন সংসারে লিপ্ত থাকিয়া নিজ প্রিয়জনকে ভালবাসি বা সেই ভালবাসা আস্বাদন করি, তখন কিন্তু সেই ভালবাসার আস্বাদন আমার নিকটে রস বলিয়া গৃহীত হয় না। তাহার কারণ, সেই রতির আস্বাদনে আমার আত্মীয়তা বা নিজত্বের অনুভূতি থাকে। এইরূপ ব্যক্তিগতভাবে রতির আস্বাদন এই কারণে রস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কবির রচনানৈপুণ্য ও স্বাভাবিক বিষয়বর্ণনসামর্থ্য এই দুইটি মিলিত হইয়া অভিনয়াদিকালে সামাজিক-হৃদয়ে একটা অলৌকিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই অবস্থার স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া আলঙ্কারিক আচার্য্য সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন—

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিকগণের হৃদয়ে যখন রসাস্বাদের অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই সময় রসের উপকরণস্বরূপ যে সকল ভাব, বিভাব বা অনুভাব প্রভৃতি আমাদিগের অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে থাকে, তাহাতে সামাজিকগণের—"ইহা পরের বা পরের নহে বা ইহা আমার নিজের বা নিজের নহে, এই প্রকার যে পরিচ্ছিন্ন ভাব, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।" ইহারই নাম হইল সাধারণ্য বা সাধারণীকরণ। ইহাই বুঝাইবার জন্য কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন—

"তৎকাল-বিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃ-ভাববশোন্মিষিত-বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্যা পরিমিতভাবেন প্রমাত্রা সকল-সহৃদয়সংবাদভাজা....."

অর্থাৎ রসাস্বাদনকালে সামাজিক প্রমাতার যে পরিমিত প্রমাতৃভাব, তাহা বিগলিত হইয়া যায় অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়। আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পিতা বা অমুকের ভ্রাতা বা অমুকের বন্ধু বা অমুকের শত্রু, এই প্রকার কোন জ্ঞানই তাহার থাকে না। রসের অনুকূল যে সমুদয় ভাব, বিভাব, অনুভাব বা ব্যভিচারিভাব বিচক্ষণ নটনটী-গণের অভিনয়ের প্রভাবে তাহাদিগের চিত্তে তৎকালে অভিব্যক্ত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাহ্যবস্তুর জ্ঞানও তৎকালে তাহাদিগের হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত হইয়া যায়। তখন বোধ হয়, রঙ্গক্ষেত্রে যত নরনারী মিলিত হইয়াছে, সকলেরই হৃদয় এক হইয়া গিয়াছে। অভিনয়কারী নটের ভাবব্যঞ্জক একটিমাত্র ভ্রূভঙ্গী দ্বারা সকল হৃদয়ে যুগপৎ একবৃত্তির উদয় হইতে থাকে। মানস-সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় যে সকল ভাব আলোড়িত হইয়া থাকে, তাহার পরিণতিস্বরূপ নয়নে অশ্রু, দেহে কম্প, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ, শরীরব্যাপী রোমাঞ্চ, একই সময়ে সকল সামাজিকগণেরই আবির্ভূত হয়, শত শত ব্যক্তির শত শত হৃদয় মিলিত হইয়া যেন এক মহান্ বিরাট হৃদয়রূপে পরিণত হয়, সেই অবস্থায় সকলের হৃদয়ে প্রকাশমান সকলের সহিত সম্বন্ধ অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ নহে, এই ভাবে যে সর্ব্বসামাজিক-হৃদয়গত রতির অনুভূতি, তাহাই হইল রসাস্বাদের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। এইরূপ অবস্থা আবির্ভাবের পর যে সামাজিকগণের ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়দর্শন-সমুত্থিত ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, ঔৎসুক্য, বিষাদ, উদ্বেগ, মালিন্য, হর্ষ প্রভৃতি সাধারণীকৃত মনোবৃত্তিনিচয়, তাহাও ঐ রতির আস্বাদের সহিত মিলিত হয়, এবং সেই মিলনের ফলে বিভিন্ন প্রকার মনোবৃত্তিনিচয়ের যে এক অখণ্ড অননুভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রসাদময় অলৌকিক আস্বাদ বা অনুভূতি, তাহাই শৃঙ্গাররস বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। এ অনুভবে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ প্রকাশ পায় না। বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়, সাংসারিক সুখ-দুঃখের কারণ অহংতা ও মমতা বিগলিত হইয়া যায়। ব্যক্তিত্বের বিলোপবশতঃ

ছুরভিমান সর্ব্বতোভাবে বিগলিত হইয়া পড়ে, অখণ্ডের—ভূমার আনন্দময়, অখণ্ড আস্বাদনের সকল খণ্ডভাব বিদুরিত হইয়া যায়। এই অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় রস আস্বাদন, করিবার সামর্থ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহাকেই সহৃদয় বলা হয়। সহৃদয় ব্যক্তির এই অনির্ব্বচনীয় অতুলনীয় অলৌকিক রসাস্বাদকেই—সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

হারছড়াটি মাটী

সকল লোকেই জানে পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন।
তার পিঠেতে চ'ড়ে মাতা বেড়ান ত্রিভুবন॥
পেঁচার পিঠের পালখগুলি নরমের একশেষ।
তাই পিঠে তার চ'ড়ে মাত আরামও পান বেশ॥
কাযেই মায়ের কাছে পেঁচা নানা প্রসাদ পায়।
পেঁচীকে দেয়, পাঁচুকে দেয়, নিজেও কতক খায়॥

এক দিন মা লক্ষ্মী নিয়ে একটি ছড়া হার।
নিরিবিলি ব'সে ব'সে দেখেন বাহার তার॥
সাদা রাঙা সবুজ রঙের মণি সমুদয়।
ঝক্‌ছে তাতে, চোখ ফিরাতে ইচ্ছা নাহি হয়॥

এমন সময় পেঁচা এসে প্রণাম করে পায়।
আদর ক'রে লক্ষ্মী বলেন হাত বুলিয়ে গায়॥
"কোথাও বাপু বাহির আমি হব না'ক আজ।
করতে হবে তোমায় শুধু একটি আমার কায॥
সবার চেয়ে সুন্দর যে ত্রিভুবনের সার।
হারছড়াটি পরিয়ে তুমি দিবে গলায় তার॥"

বিদায় নিয়ে পেঁচা তখন মা লক্ষ্মীর কাছে।
খুঁজতে চলে সবার চেয়ে সুন্দর কে আছে॥
একে একে তিন ভুবনে খুঁজলে সকল ঠাঁই।
কোথাও ত কই তেমন রকম সুন্দরটি নাই॥
শ্রান্তদেহে ভাবছে তখন ব'সে গাছের শিরে।
কি কর্‌ব আর হার-ছড়াটি দিই গে মা'কে ফিরে॥

কিন্তু না কি তিন তিন দিন খাওয়া-দাওয়া নাই।
বড়ই কাতর—মনে মনে ঠিক কর্‌লে তাই॥
ঘরে গিয়ে আগে মুখে যা হয় ছু'টো দিয়ে।
মা লক্ষ্মীর কাছে পরেই যাব এ হার নিয়ে॥

এই না ভেবে পেঁচা তখন ছুট্‌লো ঘরের পানে।
ছুপুরবেলা হাজির হলো বাসার সমুখখানে॥
কোটরেতে ঢুক্‌তে গিয়েই দেখে চমৎকার।
গোলালো সেই চাঁদমুখ নে' বাচ্ছা ব'সে তার॥
টিকোলো নাক, মটর চক্ষু হীরার মত জ্বলে।
দেখে পেঁচা থ হয়ে রয়, মনে মনে বলে॥
গড়ন-পিটন কেমন আহা কেমন মুখের ছাঁদ।
ঘরের ভিতর রয়েছে মোর এমন সোনার চাঁদ॥
সবার সেরা সুন্দর মোর আলো ক'রে কুঁড়ে।
আমি কি না মলেম মিছে তিন পৃথিবী ঢুঁড়ে॥
আনন্দেতে পেঁচা তখন মা লক্ষ্মীর হার।
আদর ক'রে পরিয়ে দিলে পাঁচুর গলে তার॥
এতক্ষণে ঠিক মানালো, মনে মনে বলে।
মা লক্ষ্মী কেবল আমায় ঘুরাইলেন ছলে॥

তাড়াতাড়ি খেয়ে তখন মা লক্ষ্মীর কাছে।
ছুট্‌লো পেঁচা এখন তার আর চিন্তা কিবা আছে?
প্রণাম ক'রে তাঁরে পেঁচা বল্‌লে—"তোমার বরে।
কায মা তোমার অধম সেবক এলো হাসিল ক'রে॥"
লক্ষ্মী বলেন,—"কোথায় বাপু কারে দিলে হার?"
পেঁচা বলে,—"দাসানুদাস পঞ্চুকে তোমার॥
ঘুরেছি মা তিন তিন দিন ধ'রে ত্রিভুবন।
কোথাও ত কই দেখলেম না সুন্দর এমন!"

হাসেন লক্ষ্মী—"স্নেহের চক্ষে দেখেছ ঠিক খাঁটি।"
মনে ভাবেন, কিন্তু আমার হারছড়াটি মাটী!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।



রূপের মোহ

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"মাধু!"

"আমায় ডাকৃছ, মা?"

"হ্যাঁ, একবার এ দিকে আয় ত, বাবা।"

হাতের-কায ফেলিয়া মাধব বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। রমেন্দ্রের মাতা দুইখানা খোলা চিঠি মাধবের হাতে দিলেন। মাধব বেশী কথার লোক নহে। সে নীরবে পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া মাতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"এখন কি করা যায়?"

মাধব বলিল, "এমন ভাবে তাঁরা দুই জনই যখন অনুরোধ করেছেন, তখন যাওয়াই উচিত। এতে তোমার মান-সম্ভ্রমের কিছু হানি হবে ব'লে আমার ত মনে হয় না।"

মাতা কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কখনও কারও বাড়ী যাইনি, তাই ভাবছিলাম।"

মাথা নাড়িয়া মাধব বলিল, "অন্য যায়গা আর এখানে অনেক তফাৎ, মা। বৌমার বোন ঠিকই লিখেছেন"—বলিয়া সেই স্থানটা অনুচ্চস্বরে পড়িল—"মা, আমিও আপনার মেয়ে। টুনি যেমন আপনার পরম স্নেহের পাত্রী, আমাকেও সেই রকম মনে করিবেন। এ বাড়ী আপনার ছেলের বাড়ী, মেয়ের বাড়ী। আপনি আসিলে আমার ব্রত উদ্‌যাপনের উৎসব সার্থক হইবে। বাবা, মা আসিতেছেন, তাঁহারা আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। আপনি না আসিলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। টুনি মামা বাবুর সঙ্গে আগেই এখানে আসিয়াছে, তাহা আপনি জানেন। জীবনের যাহা পরম দুঃখ, তাহার অবসান হইয়াছে। এখানে আসিলে আপনাকে আর একটা আনন্দের সংবাদও দিতে পারিব।"

এই পর্যন্ত পড়িয়া মাধব বলিল, "এইখানটা কিন্তু বুঝতে পারলাম না, মা!"

রমেন্দ্রের মাতাও বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বধূমাতার ভগিনী ও ভগিনীপতি যেরূপ গভীর আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে অনুরোধ উপেক্ষা করাও ত সঙ্গত হইবে না।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল, যাওয়াই কর্ত্তব্য। মাধব বলিল, "কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, মা।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন?"

"তুমি ত জান, সুরেশ বাবু আমার ঘাড়ে কি রকম দায়িত্বভার চাপিয়ে গেছেন। সে কায ফেলে আমার কোথাও নড়বার যো নেই।"

বৃদ্ধা কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিলেন। মাধব সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন তাহাকে ছাড়িয়াই যাইতে হইবে।

মাধব বলিল, "বড়-বৌ তোমার সঙ্গে যাবে।"

"সে গেলে সংসার দেখবে কে? তোর যে বড় কষ্ট হবে!"

মাধব হাসিয়া বলিল, "সংসারের কায আমি দেখছি, আমিই দেখব, পারব না? খাওয়ার কষ্ট বলছ?—ও আমি কত গ্রাহ্য করি, তা মা, তুমি কি জান না?"

মাতা হাসিলেন। মাধব কি ধাতুতে গড়া, তাহা তিনি ভালই জানিতেন। সুতরাং ও সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া বিধবা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। রাধারাণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছিল। সে কখনও পশ্চিম দেখে নাই। মায়ের সঙ্গে এবার নবাবী আমলের সহর দেখিয়া আসিবে, ফিরিবার পথে কাশীর বিশ্বেশ্বর-দর্শনও হইবে, এই আনন্দে তাহার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

সন্নিহিত বিতরণ-কেন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে, অপরাহ্ণে টেলিগ্রাফ-পিয়ন মাধবের হস্তে একখানি 'তার' প্রদান করিল। মাধব সে অঞ্চলে সর্ব্বজন-পরিচিত। সে পড়িয়া দেখিল, খোকার শ্বশুর 'তার' করিয়াছেন, আজই রাত্রিতে তাঁহারা পৌছিবেন। পড়িয়াই সে বুঝিল, মাকে লইয়া যাইবার জন্ত তাঁহারা আসিতেছেন। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে ষ্টীমার-ঘাটে পাল্কী ও লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিল।

বেহাই ও বেহান—ধনী, সম্ভ্রান্ত জমীদার পত্নীসহ এই প্রথমবার তাঁহার বাড়ীতে আসিতেছেন, ইহাতে রমেন্দ্রের মাতা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে গৃহে পাইবার সম্ভাবনা কোন দিনই ছিল না। আজ স্বেচ্ছায় তাঁহারা আসিতেছেন। হায়! আজ তাঁহার পুত্র গৃহে নাই, বধূ-মাতাও সুদূর পশ্চিমে! যদি আদর-অভ্যর্থনার কোন ক্রটি হয়!

কিন্তু মাধবের ব্যবস্থা-নৈপুণ্যে কোন ক্রটি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সে জমীদারকে যথোপযুক্তভাবে অভ্যর্থনা করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা অল্পসময়ের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু এ সকল ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যাঁহাদের জন্ত এত আয়োজন, এমনই অনাড়ম্বর, সাধারণ-ভাবে তাঁহারা আসিলেন যে, সকলেই তাহাতে বিস্মিত হইল। সঙ্গে এক জন মাত্র পরিচারক, একটি ট্রাঙ্ক ও বিছানা।

রমেন্দ্রের মাতা সমাদরে বেহানকে অভ্যর্থনা করিলেন। রমেন্দ্রের শ্বশুর বলিলেন, "বেহান, আজ আমরা আপনার অতিথি। আমাদের আসবার উদ্দেশ্য বোধ হয় আপনি জানেন?"

মাধবকে দিয়া গৃহিণী বলাইলেন যে, তিনি যাইবার

"কা'ল সকালের ষ্টীমারেই আমাদের রওনা হ'তে হবে, তা হ'লে ঠিক সময় লক্ষ্ণৌএ পৌছুনো যাবে।"

প্রৌঢ়ার চিত্তে সঙ্কোচের যে সামান্ত ছায়া ছিল, বেহাই ও বেহানের অযাচিত আগমন ও পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহারে তাহা অন্তর্হিত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রমেন্দ্র বুঝিল, তাহার মনের পাপ যেরূপ গুরু, আত্মগ্লানি—অনুশোচনা সুযোগ বুঝিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তকে তেমনই কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। এ জন্য দুঃখিত হইলে চলিবে কেন? ইহা ত তাহার প্রাপ্য। যন্ত্রণা? জালা?—আগুনে হাত দিলেই দহনজ্বালা সহ্য করিতেই হইবে। তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনও উপায় নাই।

মনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য সে ডাক্তার বাবুর বন্ধু-গৃহে গিয়াছিল। বন্ধুটি যেমন অমায়িক, সহৃদয় এবং ভদ্র, তেমনই সুশিক্ষিত ও সুপুরুষ। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু কে জানিত; তাহার হৃদয়ক্ষতে সেখানেও বেদনা পাইবার সম্ভাবনা আছে!

প্রথম দিন সাধারণ আলাপের পর সে কিছু খুশী হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিল। ভদ্রলোক যেমন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, আবার তেমনই সাহিত্য-রসিক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। কিন্তু আজ অপরাহ্ণে আলোচনাপ্রসঙ্গে সে জানিতে পারিল, এই ভদ্রলোকই সুরেশের ভগিনীপতি অমিয়ার স্বামী অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র! এই পরিচয় জানিবার পর হইতেই তাহার হৃদয়ক্ষত হইতে আবার গাঢ় শোণিতধারা নির্গত হইল। যাহাকে পথের ধূলিতে টানিয়া আনিতে এক দিন সে উন্মত্ত হইয়াছিল—মানসী প্রতিমা ভাবিয়া প্রেমের অর্ঘ্যে পূজা করিতে করিতে, পাপের পঙ্কিল হ্রদে ডুবাইয়া মারিবার জন্য সে মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল—সেই অমিয়ার স্বামীর সহিত সে আলাপে মগ্ন; হাসিমুখে, ভদ্রসন্তান পরিচয়ে সে তাঁহার সহিত সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছে!

রাত্রিতে রমেন্দ্রের নিদ্রা আসিল না। সে শুধু ভাবিতে

লইয়া কোনও ব্যক্তি যদি তাহারই সহধর্ম্মিণীর প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করিত, তবে সে কি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিত? না—কখনই নহে। তাহার স্ত্রী কেমন, সে পরিচয় সে জানে না, স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ তাহার নাই। তথাপি সে যদ জানিতে পারে, কোনও লোক তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহারই ন্যায় নির্লজ্জভাবে প্রেমের পরিচয়ে কুৎসিত ইন্দ্রিয়লালসার কথা ব্যক্ত করিয়াছে, তবে সে কি করিত? নিশ্চয়ই তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিত না! বিনিময়ে তাহার বলিষ্ঠ বাহুর প্রচণ্ড মুষ্টি সেই পাপিষ্ঠের মস্তকে পতিত হইত।

—প্রেম?—কথাটা মনে হইবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল। এই দ্বি-অক্ষরযুক্ত শব্দটি ইদানীং কি সাধারণভাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। সমগ্র বিশ্বের রসমাধুর্য্য যাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে, তাহার মহিমা কি এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে? প্রাচ্যের প্রাচীন কবিবৃন্দ যাহার মহিমাগানে স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, মর্ত্ত্যবাসীকে ধন্য করিয়াছেন—বৈষ্ণব কবিগণ যাহার রস ও মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিয়া সাহিত্যকে অমরত্ব দান করিয়াছেন, সে প্রেম কি বিনা সাধনায় কেহ পায়? সে-ও কবি সত্য; কিন্তু এত দিন সে শুধু প্রেমের স্বপ্নই দেখিয়াছিল, প্রেমকে জানিতে পারে নাই—সাধনার অভাবে, মনোবৃত্তির বিশুদ্ধির অভাবে সে শুধু দুর্জ্জয় প্রথম রিপুরই দেখা পাইয়াছিল। আজ সে কথা স্মরণ করিতেও গ্লানিতে মন তিক্ত হইয়া উঠে।

রমেন্দ্র জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার উত্তপ্ত ললাটে বাহিরের শীতল বায়ুপ্রবাহ আসিয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক আত্মবিস্মৃতভাবে যেন নৈশ প্রকৃতিকে আদর করিতেছিল। শ্যামা মেদিনী ও রজতশুভ্র চন্দ্রকরলেখার এই বিচিত্র মিলন কি মধুর! ইহাতে লালসা নাই; কামনা, রূপতৃষ্ণার অধীর আগ্রহ কোথায়? ইহাই ত প্রেম।

প্রেম আত্মতৃপ্তি নহে—আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। তবে এত দিন সে জ্ঞান তাহার কোথায় ছিল? হতভাগ্য সে, তাই প্রেমের অমর্য্যাদা করিয়া সে কামকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। রামায়ণ পড়িয়াও সে প্রেমের ধ্যান-মন্ত্র শিখিতে পারে নাই। কালিদাস, ভবভূতি কণ্ঠস্থ করিয়াও সে প্রেমের দেখা পায় নাই। চণ্ডিদাস তাহার চিত্তে কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারেন নাই। সে শুধু অন্ধের ন্যায় অমৃত-উপবনের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে; মধুময় ফলগুলি দেখিতে পায় নাই।

কিন্তু আর সে বিপথে যাইবে না—মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যত দূর কঠোর হইবার হউক, সে সবই সহ্য করিবে, তাহাই তাহার প্রাপ্য। হৃদয় বিদীর্ণ হইবে? তাহাই ত ঔষধ। সে ধ্রুব সত্যের দেখা পাইয়াছে; অরুণদ্যুতির আভাস আসিতেছে না কি?

হ্যাঁ। মনের পাপ কথায় ব্যক্ত করিতে হইবে। সুনীল-চন্দ্রকে সে সব কথা জানাইবে, জানাইতে সে বাধ্য। সে ঘোরতর পাপী। দৈহিক পাপের অপেক্ষাও মনের পাপ ভীষণ। সে মহাপাপ করিয়াছে—তাঁহার কাছে সম্ভ্রম ও আদর পাইবার সে আদৌ যোগ্য নহে।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে অমিয়ার কাছে অপরাধ স্বীকার করা সঙ্গত নহে কি? অভদ্র, ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, ক্ষমা না চাহিয়াই কাপুরুষের মত সে পলাইয়া আসিয়াছে, আত্মগোপন করিয়াছে। তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত হইল না ত। নতমস্তকে তাহাকে আত্মাপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। শুধু অমিয়া নহে, সুরেশের কাছেও তাহাকে পাপ-কথা ব্যক্ত করিতে হইবে। ইহাতে যদি বিশ্ববাসী তাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে থাকে, 'ঐ কামার্ত্ত পশুকে বিশ্বাস করিও না, উহাকে সমাজে স্থান দেওয়াও মহাপাপ', সে বিদীর্ণ বক্ষে সেই শাস্তি গ্রহণ করিবে—কারণ, তাহাই তাহার প্রাপ্য।

হ্যাঁ, সকলে তাহাকে ঘৃণা করুক, সকলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করুক, মনুষ্যসমাজ হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ডই তাহার ভীষণ পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু তাহারা এখন কোথায়? সুরেশ ও অমিয়ার দেখা পাইবার সম্ভাবনা আপাততঃ ঘটিতেছে কৈ?

রমেন্দ্র বক্ষোদেশে হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

গৃহে আলোক ছিল না। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া সে বাহিরের আলোক-প্লাবিত নীরব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার চিন্তার ধারাও ভিন্নপথে চলিল।

যিনি চির-সুন্দর, তাঁহার পরিচয় কি আজ প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে? সে নয়ন [illegible]

বিশ্বনাথ! তুমি তাহার হৃদয়ের সকল জ্বালা, তোমার মধুর প্রেমজ্যোৎস্নাপ্লাবনে ডুবাইয়া দাও। তোমাকে ভুলিয়াই ত তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যৌবনের মত্ততায়, শিক্ষার অভিমানে মাতৃদত্ত উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছিল—মানবজীবনের একমাত্র অবলম্বনকে ত্যাগ করিয়াছিল; সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের—বাঙ্গালার মাটীতে তাহার জন্ম। ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বরনিষ্ঠা যে দেশের লোক জন্মগত অধিকার হিসাবে পাইয়া থাকে, জ্ঞানালোক পাইয়া তাহার কতই না উৎকর্ষ হয়! কিন্তু সে হতভাগ্য, তাই জ্ঞান তাহাকে সত্যের পথে না লইয়া, মোহের গোলক-ধাঁধায় ঘুরাইয়া মারিয়াছে। সে শুধু একা নহে—তাহারই মত শত শত দেশবাসী এমনই ভাবে মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া আত্মহত্যা করিতেছে।

রমেন্দ্র আকুল আগ্রহে মনকে একাগ্র করিতে চাহিল; মানুষ যখন প্রাণ ভরিয়া ডাকে, তুমি তাহাতে সাড়া দাও। অনন্ত চৈতন্য-সমুদ্র হইতে তখন ভক্তের ঈপ্সিত মূর্ত্তি আপনা হইতে গড়িয়া উঠে। কাহারও কাতর আবেদন তুমি প্রত্যাখ্যান কর না। রমেন্দ্র উঠিতে চাহে—মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে; শুধু মাংসপিণ্ডময় দেহ লইয়া এ জগতে সে বাকী জীবন-যাপন করিতে আইসে নাই।

হৃদয়ের অন্তঃপুরপথে সে যেন কাহার আগমনের চরণ-শব্দ অনুভব করিতে লাগিল। প্রতিপদক্ষেপে অন্ধকার যেন সরিয়া যাইতেছে! অমৃত-প্রলেপের স্নিগ্ধতায় ক্ষত-যন্ত্রণা যেন জুড়াইয়া আসিতেছে!—আঃ, কি শান্তি!

অশ্রুপ্লাবনে তাহার বক্ষোদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে শান্ত শিশুর ন্যায় সে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। গভীর সুষুপ্তিতে তাহার শ্রান্ত দেহ ও মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অধিবেশন-সভার কার্য্যবিধি ও আলোচনা শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সুনীলচন্দ্র তাড়াতাড়ি সভাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। আজ তাঁহার পত্নী, ভগিনী ও শ্যালক প্রবাস-যাপনের পর লক্ষ্ণৌএ আসিয়াছেন। ষ্টেশনে তিনি তাঁহা-পূর্ব্বেই পরামর্শসভায় তাঁহার উপস্থিতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কাযেই তিনি বিশ্বস্ত ও পুরাতন ভৃত্য ভদাইকে ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন।

বাসার দরজায় গাড়ী থামিতে না থামিতেই সুনীলচন্দ্র লম্ফ দিয়া নামিলেন। ভদাইকে গাড়ী-ভাড়া দিতে বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া সুরেশচন্দ্র ধূমপান করিতেছিলেন। সাদর-সম্ভাষণ ও সাগ্রহ আলিঙ্গন-বিনিময়ের পর সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "কাপড় ছাড় গে, অধ্যাপক! পরে কথা হবে।"

সুনীলচন্দ্রের পদশব্দ পাইয়া কক্ষান্তর হইতে সরযূ ও অমিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছিল। দ্বারপ্রান্তে দাদাকে দেখিয়া সরযূ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"কেমন ছিলে, সরযূ? বাঃ, তোমার চেহারা বেশ ফিরেছে ত!"

সরযূর আনন লজ্জায় ঈষৎ রক্তিমাভা বিকীর্ণ করিল; নত দৃষ্টিতে সে বলিল, "কাপড়-চোপড় ছাড়, দাদা, আমি তোমার চা ও জলখাবার নিয়ে আসি। বৌদি, তোমার আসতে হবে না।" বলিতে বলিতে সরযূ লঘুগতিতে চলিয়া গেল। সুনীলচন্দ্র ভগিনীর প্রস্থানপথবর্ত্তিনী মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন। মৃদু হাস্যরেখা তাঁহার অধরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অমিয়া স্বামীর সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিল। সুনীলচন্দ্র শশব্যস্তে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোমরা সবাই যে প্রণামের পালা বাড়িয়ে তুলছ! হ'ল কি?"

মৃদুহাস্যে অমিয়া বলিল, "কেন, প্রণাম করা কি দোষের?"

জামা খুলিতে খুলিতে বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যুগে—এ সব কি শোভন অনুষ্ঠান, অমি?"

স্বামীর হাত হইতে জামা লইয়া অমিয়া যথাস্থানে রাখিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "স্বামীর সেবা, গুরু-জনকে প্রণাম করা—এ সব ত সমাজবিধির মধ্যে।"

পত্নীর দিকে প্রীতিভরে চাহিয়া সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "আজকাল ত ছোট, বড়, গুরু, লঘু কিছু নেই, অমিয়া!

নইলে সকলেরই—স্বামি-স্ত্রীর উভয়েরই সমান অধিকার—তা কি জান না?"

অমিয়া বলিল, "হ'তে পারে; কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের লোক, আমাদের আদর্শ অন্যরকম। অধিকার সকলেরই সমান, সে কথা মানি; আবার এও মানি, হিন্দুর মেয়ের কাছে তার স্বামী গুরু, সখা—সব।"

"হিন্দু? বল কি অমি? এই কয় সপ্তাহে শুধু আচার-ব্যবহার নয়, তোমার মতেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে!"

অমিয়া বলিল, "কেন, আমরা কি হিন্দু নই?—আমাদের শরীরে যে রক্তধারা বইছে, তা কি ভারতবর্ষের নয়? এই যে দেহ, এটা কি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জাযুক্ত নয়?"

পলকহীননেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া, দৃঢ়কণ্ঠে সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "নিশ্চয়; কিন্তু আজকাল আমরা সেটা মান্‌তে পাচ্ছি কৈ? সেটা যে আমরা স্বীকার করতে চাই না, অমি!"

"সে ধারণা আমার গেছে; কিন্তু তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ দেখছি!"

কৌতুকদৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "আর তুমিই কোন্ মোটা হয়েছ? তোমার শরীর আগের চেয়ে বরং খারাপই হয়েছে দেখছি।"

আলোচনায় বাধা পড়িল। সরস খাবার ও চা লইয়া আসিল।

"দাদা, হাত-মুখ ধুয়েছ?"

"নাই" বলিয়া সুনীলচন্দ্র স্নানের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

চা-পানে আহূত হইয়া সুরেশচন্দ্রও যোগ দিলেন। দীর্ঘকাল পরে প্রিয়জনসম্মিলনে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া নহে, সাধারণ গল্পগুজবে সন্ধ্যাটা বেশ কাটিয়া গেল। আলোচনায় রাত্রি বাড়িয়া চলিল; কিন্তু দীর্ঘবিচ্ছেদের পর সময়ের হিসাব কে রাখে?

আহারের পর সুরেশচন্দ্র ভগিনীপতিকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তবে তোমার ভগিনীকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করবার অভিলাষ।"

সুনীলচন্দ্র উল্লসিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি সরযূকে জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পাওনি কি?"

সবিস্ময়ে সুরেশ বলিলেন, "পাগল! আমি অবিবাহিতা কুমারীকে জিজ্ঞাসা করব, 'ওগো তুমি আমায় বিয়ে করবে?' না ভাই, ও রকম বিলিতী কায়দার আমি পক্ষপাতী নই।"

"কেন ভাই, এ দেশেও ত স্বয়ংবরপ্রথা ছিল। ওটাকে বিদেশী প্রথা ব'লে তুচ্ছ কর কেন? অর্জ্জুন, সুভদ্রা—"

"তর্ক করতে চাই না, ভাই। আমি ভালবাসি না, তাই করিনি; করবও না।"

সুনীলচন্দ্র ডাকিলেন, "অমিয়া!"

অমিয়ার মূর্ত্তি দ্বারপথে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "আমরা হিন্দুসমাজের নই, কাজেও দোষ নেই—বিশেষতঃ বাদাবাদী। নইলে দোষ থাকলে হ'ত, অমি।"

স্বামীর পরিহাসবাক্যে অমিয়া সহোদরের দিকে চাহিল। সুরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি কঠোরহৃদয়, শুষ্কপ্রাণ বৈজ্ঞানিক কে বলে? কিন্তু তবু তোমার সময়-জ্ঞান নেই।"

"বুঝেছি; মহাদেবের তপস্যা এত কাল পরে ভেঙ্গেছে। এখন আয়োজন-উদ্যোগ কর।"

অমিয়া প্রীতমুখে সে স্থান ত্যাগ করিল।

* * *

দীর্ঘ বিচ্ছেদাবসানে, নিশীথ রজনীতে স্বামি-স্ত্রীর মিলন। এখন বাহিরের কোন বাধা তাহাদের নিভৃত আলাপে বিঘ্ন জন্মাইবে না।

মৃদু কণ্ঠে অমিয়া বলিল, "তুমি যদি সঙ্গে থাকতে—যদি থাকতে!"

বীণাগুঞ্জনের ন্যায় সে কণ্ঠস্বর সুনীলচন্দ্রের কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিল। তিনি পত্নীর করপল্লব লইয়া নীরবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যাইতে পারেন নাই বলিয়া যে আক্ষেপ তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া এখন ত কোন লাভ নাই।

অমিয়া বলিল, "তোমার কাছে এখনও একটা কথা বলা হয় নি। পত্রে সে কথা লিখবার শক্তি আমার ছিল না। তোমার অপরাধিনী স্ত্রীর মহা অপরাধ তুমি ক্ষমা করতে পারবে কি?"

সুনীলের আননে বিস্ময়রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "অপরাধ?—তোমার অপরাধ, অমি? তোমার কোন অপরাধ হ'তেই পারে না—আমি বিশ্বাস করি না।"

"না না, সত্যই আমার অপরাধ হয়েছে, পাপ হয়েছে। সে কথা তোমাকে না জানাতে পারলে আমার মনে শান্তি হবে না। আজ প্রথমে সেই কথাটি বলব। তোমাকে শুনতেই হবে।"

স্বামীর কোনও আপত্তি না শুনিয়া অমিয়া সোজা হইয়া বসিল। সে যে কথা প্রকাশ করিতে যাইতেছে, তাহাতে মিথ্যার স্পর্শমাত্র থাকিবে না, অকপটে সে সবই বলিবে। কিন্তু কোনও স্বামী সে কথা কি অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারেন? অসম্ভব। কিন্তু তথাপি তাহাকে প্রকাশ করিতেই হইবে। তাহার মনের—মোহমুগ্ধ চিত্তের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার ইতিহাস; স্পর্শের ভীষণ জ্বালা দাহিকা শক্তির তীব্রতা তাহাকে কেমন করিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করা মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু যত দূর পারা যায়, তাহাকে সে চেষ্টা করিতেই হইবে। কিছুই বাদ সে দিবে না, দিবার অধিকার বা ইচ্ছাও তাহার নাই। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গোপনীয় কিছুই থাকিতে পারে না। মুক্তকণ্ঠে সব ব্যক্ত না করিলে তাহার নারীধর্ম্ম অব্যাহত থাকিবে না, ইহাই তাহার ধারণা ও শিক্ষা।

ঘটনার কথা অমিয়া অকপটভাবে বলিয়া গেল। কিন্তু রমেন্দ্রনাথের উপর কোনও অপরাধ অর্পণের চেষ্টামাত্র করিল না। অবাধ সাহচর্য্য—যাহা ভারতীয় নারীর পক্ষে অসামাজিক, সেই সাহচর্য্য যে রমেন্দ্রকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেও সে ভুলিল না। শাস্ত্রকারদিগের—মানব-মনোবৃত্তিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন প্রাচীন ঋষিগণের সতর্ক বাণী আধুনিক সাম্যবাদী, উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রয়াসী যুগের মানবদিগের উপেক্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু সেই নিষেধবাণীকে উপেক্ষা করিলে যে ফল অনিবার্য্য, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ভুগিয়াছে। অগ্নিকে ইন্ধন হইতে দূরে না রাখায় তাহাকে যে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার আবেগে স্বামীর সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে কিরূপে সে পথের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহার ইতিহাসও ব্যক্ত করিল।

কথাশেষে অমিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "সব শুনে তোমার মনে হয় ত আমার উপর ঘৃণা জন্মে গেল। হয় ত এ জন্মের মত তোমার মন থেকে আমি নির্ব্বাসিত হলুম! কিন্তু কি করব, তোমার কাছে কোন কথা লুকোতে আমি শিখিনি। তুমি স্বামী, তুমি পূজনীয় সর্ব্বস্ব; তোমার কাছে দেহ ও মনের কোন ব্যবধান নেই। লেখাপড়া যতই শিখি না কেন, পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান ব'লে যতই মানি না কেন, এ কথা ভুলতে পারি না যে, তুমিই আমার একমাত্র পূজ্য। বাঙ্গালীর মেয়ের জন্মগত সংস্কার ছাড়তে পারি নি, পারবও না। বল, একবার বল, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে কি?"

সমগ্র চিত্ত নয়নপথে আনিয়া অধীর আগ্রহে অমিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সুনীলচন্দ্রের শান্ত নয়ন হইতে যেন সহানুভূতির ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। পরম আদরে গভীর প্রেমভরে দুই হাতে পত্নীর সিক্ত আননখানি তুলিয়া ধরিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "অমি, অমি, আমার অমিয়া!"

স্বামীর বাহুমূলে শিথিল মস্তক রক্ষা করিয়া অমিয়া নয়ন নিমীলিত করিল। স্বামীর অন্তরের সমস্ত কথা সেই সুধাপ্লাবিত সম্বোধনে সে কি শুনিতে পাইয়াছে?

যুক্ত কর ললাটে ঠেকাইয়া গাঢ় ভক্তিভরে অমিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান্! তোমার জয় হউক!"

——

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ক্লান্ত দেহের ভার বহিতে অশক্ত রমেন্দ্র পার্কের মধ্যে এক স্থানে বসিয়া পড়িল। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরিয়া সে পদব্রজেই সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। অপরাহ্নের সূর্য্য তখন আকাশপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছিল। সুবিস্তীর্ণ, তৃণাস্তৃত, সুদৃশ্য ভিক্টোরিয়া পার্কে বহু নর-নারী—দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ বায়ুসেবন করিতেছিলেন। রমেন্দ্রের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তৃণশ্যামল গালি-

রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল. তাহার নিজেরই তাহা ধারণা ছিল না।

সহসা পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে রমেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। নয়ন তুলিয়া চাহিবামাত্র বিস্ময়ে তাহার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হইল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? না, প্রকৃতই সুরেশচন্দ্র তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! না না, এ ত স্বপ্ন নহে—মিথ্যা নহে! শুধু সুরেশ নহে, অমিয়া, সরযূ এবং সুনীলচন্দ্র তাহার সম্মুখে সশরীরে বিদ্যমান!

সুনীলচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শিশির বাবু, বেড়াতে এসেছেন বুঝি?"

রমেন্দ্র উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এক বার সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল,—অমিয়ার শান্ত নয়নে যেন বিস্ময়-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সরযূ দুই কোমল পাণি যুক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এখানে? শিশির বাবু কাকে বলছ, দাদা? উনি ত রমেন বাবু!"

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে দৃঢ় কণ্ঠে রমেন্দ্র বলিল, "আপনাদের সকলের কাছে আমার একটা বক্তব্য আছে—একটা প্রার্থনা আছে; কিন্তু এখানে বলাটা ঠিক হবে কি না, বুঝতে পাচ্ছি না।"

রমেন্দ্রের হাত ধরিয়া সুরেশ স্নিগ্ধ মৃদু স্বরে বলিলেন, "চল, রমেন, আমাদের বাসায় চল। এস সুনীল।"

সরযূ বলিল, "দাদা, তুমি বোধ হয় ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, রমেন বাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'ল কি ক'রে? কলকাতায়, পুরীতে আমরা কত দিন একসঙ্গে ছিলুম; কেমন, না বৌ-দি?"

অতি সহজ কণ্ঠে অমিয়া বলিল, "উনি আমাদের অনেক দিনের বন্ধু, যূথিকার কবি রমেন্দ্র বাবু। কেন, দাদার কাছে, আমার কাছে ওঁর পরিচয় তুমি শোন নি?"

সুনীল বলিলেন, "বটে? উনি সেই রমেন বাবু! তা ত জানতাম না। গিরীন্দ্র আমার কাছে বলেছিল, ওঁর নাম শিশির বাবু।"

পথ চলিতে চলিতে অমিয়া বলিল, "রমেন বাবু, আপনাদের দেশে, আপনাদের বাড়ীতে আমরা গিয়েছিলুম, আপনি ছিলেন না; কিন্তু আপনার মা ও স্ত্রীর কাছে কি

রমেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাহার মাতা ও স্ত্রীর সহিত ইহাদের পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু, কিন্তু—রমেন্দ্র আবার ভাবিল, এই নারীর প্রতি সে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহার পরও এমন অকুণ্ঠিতভাবে অমিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে কিরূপে?

সরযূ বলিল, "বাস্তবিক, রমেন বাবু, সে আনন্দের কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে। কিন্তু আপনার বড় অন্যায়—কাকেও কিছু না ব'লে, মন খারাপ—বাড়ী যাচ্ছি ব'লে আপনি একেবারে উধাও হয়ে গেলেন! শেষে লক্ষ্ণৌ এসে হাজির! বেশ লোক আপনি কিন্তু!"

নিকটেই একখানা ফিটন দাঁড়াইয়া ছিল। মহিলা দুই জন এক দিকে বসিলেন, পুরুষ ৩ জন অপর দিকে স্থান গ্রহণ করিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। সরযূ বলিল, "কিন্তু রমেন বাবু, পশ্চিমে বেড়াতে এসে আপনার শরীর একটুও ত ভাল দেখছি না। ভারী রোগা হয়ে গেছেন—মুখে চোখে কালি মেড়ে দিয়েছে। আপনি কি বরাবরই এখানে আছেন?"

উত্তরে রমেন্দ্রের মুখে রসলেশহীন হাস্য দেখা দিল; সে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, সরযূর অনুমানই যথার্থ।

বাসায় গাড়ী পৌঁছিলে যন্ত্রচালিতবৎ রমেন্দ্র সকলের সহিত নামিয়া একটা ঘরে উপবেশন করিল। সঙ্কোচ ও দুর্ব্বলতার যেটুকু বাধা তখনও রমেন্দ্রের মনের এক প্রান্তে উঁকি মারিতেছিল, সে দৃঢ়সংকল্পবলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। আজ সে কোন কথাই লুকাইবে না। ইহাতে সরযূ, সুনীল, সুরেশ—সকলেরই শ্রদ্ধা সে হারাইবে, বন্ধু-বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুনীলচন্দ্রের উদ্যত ক্রোধ তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত করিবে—কিন্তু উপায় নাই। আজ তাহার পাপকলুষিত হৃদয়ের নগ্নমূর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত করিয়া মহাপাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। অপরাধনত মস্তক সে সকলের কাছে পাতিয়া দিবে। এমন অবসর সে আর কখনও পাইবে না। সত্যের আলোকদীপ্তি যখন হৃদয়ের ঘনান্ধকারের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। অন্তরের গ্লানি, দৈন্য এবং ঘৃণা অতীতকে মিথ্যার আবরণ দিয়া আর সে ঢাকিয়া রাখিতে

জানাইল, আজ যেন তাহার অন্তর মূক হইয়া না পড়ে, ভাষা যেন আজ তাহাকে প্রতারণা না করে।

রমেন্দ্রের সংকল্পের দৃঢ়তা সম্ভবতঃ তাহার নয়ন ও আননে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্মুখের চায়ের পেয়ালা সরাইয়া দিয়া অমিয়া বলিল, "চা খান, রমেন-দা।"

রমেন-দা!—স্থিরদৃষ্টিতে রমেন্দ্র এক বার মুখ তুলিয়া চাহিল। এ সম্বোধন অমিয়ার মুখে এই প্রথম। কিন্তু কি মিষ্ট লাগিল!

"সুনীল বাবু, আপনি বিস্মিত হবেন না, সত্যই আমি ভণ্ড, প্রতারক। শুধু তাই নয়, আমি মহাপাপী। সুরেশ, আমি বন্ধুত্বের, বিশ্বাসের, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রাখতে পারি নি। আজ সেই কথাই বলব।"

রমেন্দ্রের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে সকলেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল।

স্থিরদৃষ্টিতে এক বার সকলের দিকে চাহিয়া, সুনীলচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া রমেন্দ্র বলিল, "ছদ্মনামে আমি আপনার কাছে পরিচিত, সেটা খুব বড় অপরাধ না হ'তে পারে; কিন্তু তার পর আমি যে কথা বলব, তা আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। কোন ভদ্রসন্তানই তা পারেন না।"

সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে রমেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোমলভাবে তাহার স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "রমেন, তুমি বড় বিচলিত হচ্ছ, ভাই। এমনভাবে নিজেকে ছোট করবার কোন প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন নেই? কি বলছ, সুরেশ? আমি নিজেকে ছোট করছি! ছোট? আমি কত বড় হীন, কত ঘৃণিত জীব আমি, তুমি মহাপ্রাণ, তাই বুঝতে পাচ্ছ না। না—না, আমাকে বলতেই হবে; শুনুন সুনীল বাবু, আপনার কাছেই আমি বিশেষভাবে অপরাধী।"

সরযূ ও অমিয়া তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রমেন্দ্র মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আপনারা যাবেন না।" অমিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "বিশেষতঃ আপনি থাকুন। আমার অপরাধ আপনার কাছেই বেশী।"

অমিয়া স্থিরদৃষ্টিতে প্রশান্তভাবে চাহিয়া বলিল, "রমেন-দা, আমার স্বামীর কাছে আমার নিজের কোন

সুনীলচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "রমেন বাবু যখন না শুনিয়ে ছাড়বেন না, তখন বাধ্য হয়েই আমাদের শুনতে হবে। তবে তোমাদের এখানে থাকার দরকার নেই।"

সরযূ ও অমিয়া ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

রমেন্দ্র অমিয়ার ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়াছিল। এই মমতাময়ী মহীয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

নারীরা কক্ষ হইতে চলিয়া গেলে রমেন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এই বুকের ভেতরটা পাপে ভ'রে গিয়েছিল—"

তাহার পর ধীরে ধীরে একে একে রমেন্দ্র তাহার জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুলিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল। যৌবনের প্রথম উন্মেষে অমিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার আগ্রহ; তাহাতে মাতার প্রবল আপত্তি; অন্যত্র নিজের বিবাহ; মনের অসংযত অবস্থা—পুরীধামে অমিয়ার নিকট ঘৃণিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি—অমিয়ার রাজ্ঞীর ন্যায় সুদৃঢ় ব্যবহার—পাপের যন্ত্রণা, সবই বলিয়া গেল। সেই নিষ্পাপহৃদয়া, মহীয়সী নারীর বজ্রকঠোর বাণী কিরূপে তাহাকে মোহান্ধকার হইতে মুক্তি দিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে করিতে রমেন্দ্রের নয়নযুগল দীপ্ত হইয়া উঠিল। নিজের পাপকথা, দুর্ব্বল চিত্তের কাহিনী এমনই নির্ম্মমভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণনা করিল যে, কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

তাহার পর গাঢ় স্বরে রমেন্দ্র বলিল, "আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জানি না। ক্ষমার প্রত্যাশা থাকতেও অধিকারী আমি নই। সুনীল বাবু, আমায় শাস্তি দিন—দণ্ড দিন। সুরেশ, তুমিও আমায় উপযুক্ত শাস্তি দেও। যে পাপজিহ্বায় নারীর সম্মানের লাঘব করেছি, গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অপমান করেছি, সে জিহ্বা উৎপাটন ক'রে ফেল।"

সুনীলচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমেন্দ্র মাথা নত করিয়া বলিল, "প্রচণ্ড ঘুষিতে আমার মাথা ভেঙ্গে ফেলুন, সুনীল বাবু! আমি দণ্ড গ্রহণ করবার জন্যই এসেছি।"

বাতায়নের ধারে সুনীলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "রমেন

"বিচলিত ?—আপনি এখনও স্থিরভাবে আছেন ? এই ইতর লোকটার সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা বল্‌তে পাচ্ছেন ? আশ্চর্য্য আপনার সহিষ্ণুতা ."

সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "একটা কথা আমি বল্‌তে চাই . স্বামীর জাগ্রত ঈর্ষা, অভিমান, সন্দেহ ও ক্রোধ হ'তে আমিও মুক্ত নই, রমেন বাবু ; কিন্তু আপনার অপরাধ অপেক্ষা আপনার অবস্থাসঙ্কটকেই আমি দায়ী করতে চাই । শাস্তির কথা বল্‌ছেন ? যে শাস্তি—যে প্রায়শ্চিত্ত আপনি কয় দিন ধ'রে ক'রে আস্‌ছেন, তার ইতিহাস আপনার মুখের চেহারাতেই প্রকাশ ."

সুরেশচন্দ্র এতক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবেই দাঁড়াইয়া ছিলেন . রমেন্দ্রের দক্ষিণ করপুট গ্রহণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ক্ষমা চাওয়া আমারই বেশী দরকার, রমেন . আমার অবিমৃষ্যকারিতাই এই সব ঘটনাসৃষ্টির প্রধান কারণ । প্রতীচ্যের ধারাকে বর্জ্জন না করার ফলেই এই দুর্দ্দৈব । তবে একটা সুখের কথা, আজ কবি রমেন্দ্রেরই জয় . ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, প্রয়োজন হ'লে যেন তোমার মত সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারি ."

রমেন্দ্রের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল । ইহারা বলে কি ? এত বড় অন্যায়কারীর সম্বন্ধে এ সব কি ধারণা ? অনন্তলীলাময় ! এ বিচিত্র লীলার মর্ম্ম রমেন্দ্র বুঝিতে অসমর্থ ।

সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "রমেন বাবু, সংসারের পিচ্ছিল পথে পদস্খলন স্বাভাবিক : যার ভাগ্যে সে দুর্দ্দিন আসে না, সে পুণ্যবান্‌ সন্দেহ নেই ; কিন্তু পা পিছলে খানায় প'ড়ে গেলেই যে তাকে পাঁকের মধ্যে চেপে ধরতে হবে, সেটা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয় . মানুষের প্রধান ও একমাত্র কর্ত্তব্য—সহযাত্রীকে হাত ধ'রে তুলে নিরাপদে ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া . আপনি বন্ধুজন—শুধু বন্ধু নন, আপনি আমার ভাই . আপনার কাছে দেশ ও দশের লোক অনেক প্রত্যাশা রাখে . খাঁটি মানুষ—যার মনুষ্যত্ব আছে, এমন লোক সংসারে খুব কম দেখা যায় । আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, আপনি তাদের এক জন ."

রমেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না . দুই হস্তে মাথা টিপিয়া ধরিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল . অস্ফুটকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে সে কি যেন বলিল । তাহার পর মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল : কাহারও নিষেধ না শুনিয়া সে সোজা বাসার দিকে চলিল ।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ ।

পূজা ও প্রেম

স্বামি, আমার মন ভরে না
পূজা ক'রেই শুধু তোমায় ;
প্রণাম দিয়ে ধরছি যারে,
পারব না কি ধরতে চুমায় ?
ধূপ-ধূমের অন্ধকারে
হারাই তোমায় বারে বারে,
আলিঙ্গনে দু'হাত বাড়াই—
শূন্য বুকে কে আর ঘুমায়…
স্বামি, আমার মন ভরে না
প্রণাম ক'রেই শুধু তোমায় !

ধ্যানের ঠাকুর নেমে' এস
বারেক আমার প্রাণের ভুঁয়ে,
সকল অঙ্গ ধন্য করি
তোমার সকল অঙ্গ ছুঁয়ে ;
হাত বাড়িয়ে চরণ-পরশ—
সে-ই কি আমার চরম হরষ ?
নহে, —নহে,—ওহে নিঠুর,
এস আমার বুকের মাঝে,
এস আমার চোখে-মুখে,
আমার সুখের দুখের মাঝে !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ভাব-প্রবাহ

৩

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

এই সমস্ত ব্যাপারের পাঁচ শত বৎসর পরে পৃথিবীতে আবার একটি অভিনব শক্তির প্লাবন আসিয়াছিল। ইহা মোটামুটিভাবে খৃষ্টাব্দ ৪০৫ হইতে ৬৩২ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ফা-হিয়েনের ভারত-পর্য্যটন হইতে মহম্মদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়। এইটি ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের যুগ। মহম্মদ এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কোরাণ ইহার শাস্ত্র। অর্দ্ধ-চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা তুলিয়া তরবারি হস্তে মুসলমান জগৎ জয় করিতে বাহির হইল। কিন্তু ইহা পরের কথা। এই শক্তিপ্রবাহ বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার প্রাথমিক ভাবের কথাসমূহ খুঁজিতে হইবে ভারতবর্ষে।

পঞ্চম শতাব্দী ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। ইহা গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, অমরসিংহ প্রভৃতি নবরত্ন বিরাজমান ছিলেন। গুপ্তরা সকলেই প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি কেহ ছিল না। মহাত্মা অশোকের পরে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং অপ্রতিহত রাজশক্তির প্রয়োগ-সামর্থ্যে গুপ্ত-রাজগণের সমকক্ষ ভারতবর্ষে আর কেহ কখনও হয় নাই।

জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে এই যুগে যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। য়ুরোপীয়রা এই যুগকে Hindu Renaissance আখ্যা দিয়াছে এবং ইহাকে গ্রীসের পেরিক্লিস যুগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটক এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যসকল এই যুগে রচিত হয়। আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির ইত্যাদি জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্ পণ্ডিতগণ এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময়ের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যার যা-কিছু নিদর্শন আছে, তাহা দেখিয়া য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই যুগে অতি উচ্চ অঙ্গের ললিতকলা বিদ্যার অনুশীলন হইয়াছিল। এই যুগে তিন-চারি-শত বৎসরের বৌদ্ধাধিপত্যের পর পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুত্থান এবং তাহার ফলে পুরাণসমূহের একটি নূতন সংস্করণ হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষে একটি সর্ব্বব্যাপী উদ্বোধন ও উদ্দীপনা আসিয়াছিল। সকলের চিত্ত সতেজ, সবল ও অশেষ কৌতূহলপূর্ণ হইয়াছিল। দেশ বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ নানাপ্রকারে ভাবের আদান-প্রদান করিতেছিল। কর্ম্মোপলক্ষে এবং পর্য্যটনোপলক্ষেও বহু লোক ভারতবর্ষ হইতে চীনে এবং চীন হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিতেছিল। চীন ফা-হিয়ান এবং কাশ্মীর রাজকুমার গুণবর্ম্মা ইহার দুইটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নানকিনে গুণবর্ম্মার মৃত্যু হয়। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই যুগে ভারতবর্ষীয় রাজগণ রোমক-সম্রাটগণের নিকট সময়ে সময়ে রাজদূত প্রেরণ করিতেন। নানা প্রকারে, বিশেষতঃ বাণিজ্য-প্রসঙ্গে গ্রীকদের সঙ্গেও এই সময় ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির গ্রীক-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রচিত জ্যোতিষ-গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে—বিশেষজ্ঞরা এই কথা বলেন।

যে মহাপ্রবাহের স্রোতোবেগে ভাসিয়া আসিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য ও বিপরীতমুখগামী বেগবান্ স্রোতের সুবিপুল আঘাতে সে মহাসাম্রাজ্য-সৌধ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সাধারণভাবে 'হূন' বলিয়া পরিচিত, মধ্য-এসিয়ার নানাদেশের অধিবাসী, পর্য্যটন-পরায়ণ, অনিয়ত নিবাস, পাশববলে বলীয়ান্, নানাবিধ জাতির গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ এই বিপরীত প্রবাহ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন ও ললিত-কলাবিদ্গণ সে মহোল্লাসের তরঙ্গ। এই অসভ্য, দুর্দ্দান্ত, নিষ্ঠুর হূনগণও সেই একই প্লাবনের অন্যতম তরঙ্গ। ওদিকে আরবের শুষ্ক মরুভূমিতে কিছু পরে যে তরঙ্গ জাগিয়াছিল, তাহাই হইল মুসলমানধর্ম্ম। এই হূনগণ প্রথমতঃ তাহাদের পূর্ব্বগামী য়ুয়েচি ও শকগণের মতই আমুদরিয়ার চারিদিকে আড্ডা ফেলিল। পরে অল্পদিনের মধ্যেই জলস্রোতের মত পারস্যদেশ প্লাবিত করিয়া দিল। ইহারা ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে শাসানীয়-বংশীয় পারস্যরাজ ফিরোজকে হত্যা করে। পারস্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহারা অনায়াসেই বিভিন্ন স্রোতে সহস্রে সহস্রে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। গুপ্তদের রাজশক্তি পরাভূত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। ৫০২ খৃষ্টাব্দে হূন-নৃপতি মিহিরগুল ভারতবর্ষের অপ্রতিহত অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইল। এই হূনরা এই সময়ে এসিয়া-পৃষ্ঠে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সংস্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ইহার একটি প্রদেশমাত্র ছিল। ইহা খোটান হইতে পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই সময়ে ইহার অনুরূপ ব্যাপার সকল য়ুরোপেও ঘটিতেছিল। চারিদিকে একটি চঞ্চলতা—একটি দুর্নিবার উচ্ছৃঙ্খলতা। য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে ইহা বহির্নিষ্ক্রমণের যুগ। বহু জাতি নিজ নিজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশ-দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছিল। অনেকে বাহির হইল সিংহ ব্যাঘ্রের মত ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য অথবা বাসস্থানের অন্বেষণ করিবার জন্য। কেহ কেহ বাহির হইল, ব্যাধের মত শীকার করিবার জন্য। কোনও কোনও দল বাহির হইল, তাহাদের অতিবর্দ্ধিত স্নায়বিক ও পৈশিক শক্তিরাশিকে ক্রিয়াশীল করিবার জন্য। কতক বাহির হইল—

> নিত্য কেবল এগিয়ে চল রে সুখে,
> বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুকে।

এই যে চঞ্চলতা (যৌগিক ও যোগরূঢ় উভয়ার্থে)—ইহা বিশেষরূপে এবং ভয়ানকরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল বিভিন্ন টিউটনিক জাতির মধ্যে। এই সময়ে ইহারা দুর্দ্দমনীয় বেগে ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যহীন কঠোর শীত-বাত-কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বাসভূমি সকল পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত য়ুরোপের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

দুর্দ্দান্ত গথ্, বর্গণ্ডীয় এবং ফ্রাঙ্কগণ সমস্ত দেশ লণ্ড-ভণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া একটা প্রকাণ্ড তুফানের মত ফ্রান্সের (তখন গল) উপর দিয়া চলিয়া গেল। ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ক্লোভিস নামক এক জন ফ্রাঙ্ক রোমের রাজপ্রতিনিধি স্যাগ্রিয়স্কে খেদাইয়া দিয়া একটি ফ্রাঙ্কীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল। সমস্ত পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরী যে রোম মহানগরী, এই সব বর্ব্বর সেই রোম একাধিকবার লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং তাহার অতুলনীয় শিল্প-শোভা-সম্পদ ধ্বংস করিয়াছিল। ইটালি ছিল সে যুগের স্বর্গলোক। টিউটনিক-দৈত্যগণ এই স্বর্গে বলাৎকার পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু স্বর্গসুখ কেমন করিয়া ভোগ করে, তাহা তাহারা জানিত না। সুরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে বন্যজন্তুসকল প্রবেশ করিয়া যাহা করে, ইহারাও ইটালিতে তাহাই করিয়াছিল।

করিতে আরম্ভ করে। এ-দিকে তিন দল টিউটন-স্যাক্সন্ এঙ্গল্ ও জুট—পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমুদ্র পার হইয়া ব্রিটেন অধিকার করিতে আরম্ভ করে। এই যে দানব-ভাবাপন্ন ধ্বংসকারী টিউটনিক আবর্ত, ইহা যখন ব্রিটেনের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ইহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য দেবভাবাপন্ন আর একটি আবর্ত উদ্রিক্ত হয়। এই আবর্তের নেতা ছিলেন, ব্রিটিশ-পুরাণ বর্ণিত অমিতবীর্য্য রাজা আর্থার। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেলরি ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে টেনিসন্ ইঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি ভাব-প্রবাহের কথা বলিলাম, সমস্তই ন্যূনাধিক ৫ শত বৎসর পর পর ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরের প্রবাহ আসিয়াছিল মোটামুটি ৪ শত বৎসর পরে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী

আমরা দেখিয়াছি, পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতেছিল। কিন্তু তখনও দেশে বৌদ্ধপ্রভাব বহু পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তথাপি এই সময় হইতেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন আরম্ভ হয়। যে বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শ ছিল কঠোর তপস্যা ও ঘোরতর সন্ন্যাস, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের গোঁসাই-প্রভৃতি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে কার্য্যতঃ পঞ্চ-মকার-তত্ত্বের সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাতেজস্বী মহাজ্ঞানী অনুপম-প্রভাববান্ আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব হয়। নবম শতাব্দীর মহাভাবপ্রবাহ এই শঙ্করাচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইনি বেদান্ত-জ্ঞানের যে অনন্ত অগ্নিশিখা প্রজ্বালিত করিলেন, তাহার প্রখর কিরণচ্ছটায় কুজ্ঝটিকার মত বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিতে দেখিতে পশ্চিম ও উত্তর দেশসমূহ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমরা যাহাকে বেদান্ত-দর্শন বলিয়া জানি, তাহার উদ্ভাবয়িতা এবং প্রচারকর্ত্তা এই শঙ্করাচার্য্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-বিরচিত যে ব্রহ্মসূত্র—তাহার শঙ্কর-বিরচিত যে শারীরিক ভাষ্য, তাহাই বেদান্ত দর্শনের শুধু ভিত্তি নহে—তাহাই বেদান্তদর্শন। এই বেদান্ত-দর্শনে যে দুর্জ্ঞের-তত্ত্ব-বিশ্লেষক অসীম জ্ঞানের পরিচয় আছে, তাহা বিশ্বের বিস্ময়জনক এবং তাহা আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহা অতিক্রম করিয়াছিলেন এক জন। কিন্তু তিনি অতিমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত জ্ঞানের বিজয়াভিমান লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। যে সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময়ে কনৌজের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন মিহির নামক এক জন পরিহার-বংশীয় পরাক্রান্ত নৃপতি—যিনি ভোজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি পরম্পর-বিবাদ-পরায়ণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু ভূপতিকে পরাজিত করিয়া একটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সৌরাষ্ট্র ও অযোধ্যা প্রভৃতি বহু রাজ্য ইঁহার অন্তর্গত ছিল। ভোজের প্রভাবে দেশে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চারিদিকে হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। ইনি বরাহ দেবের উপাসক ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাশক্তিশালী পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পালরাজগণ বাঙ্গালী। বঙ্গ ও বিহারের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্মপাল কনৌজরাজকে সিংহাসনচ্যুত করেন। পাল-সম্রাটগণের প্রভাব পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। পশ্চিম-উত্তর দেশসমূহে এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের জাগরণ চলিতেছিল। কিন্তু বঙ্গবিহারে পাল-রাজগণের সহায়তায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নানা প্রকার উন্নতি হইতেছিল। নবম শতাব্দীতে পশ্চিমে ও উত্তরে ভোজ এবং পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল ও দেবপাল যেমন মহাপরাক্রমশালী স্বাধীন সম্রাট ছিলেন, দক্ষিণে তেমনই (৮১৭—৮৭৭)। সে সময়ে বিদেশীয়রাও রোমের ও চীনের সম্রাটের সঙ্গে ইঁহার তুলনা করিত। পশ্চিমোত্তরে মহারাজ ভোজ হিন্দু-ধর্ম্মের জন্য এবং পূর্ব্বে বঙ্গবিহারে পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য যাহা করিতেছিলেন, দক্ষিণে অমোঘবর্ষ জৈন-ধর্ম্মের জন্য তাহাই করিতেছিলেন। এই সময়ে তিন দিকে তিনটি মহাধর্ম্মই জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ভারতবর্ষে যে সময়ে শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের অভিযান লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, সেইসময়ে য়ুরোপে ক্ষাত্র-শক্তির অভিযান লইয়া বাহির হইয়াছিলেন মহাবীর সার্লামান। য়ুরোপের ইতিহাসে যাহা Holy Roman Empire বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট এই সার্লামান। ৮০০ খৃষ্টাব্দে রোম মহানগরীতে ইনি পোপ কর্ত্তৃক সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হন। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সংরক্ষণ ও সুসংস্থাপন কার্য্যে নিজকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহারা পোপের আধ্যাত্মিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন—ইনি তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি স্যাক্সনদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য অধিকার করেন। লম্বার্ডদিগকে পরাজিত করিয়া লম্বার্ড দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ডানিয়ুব দেশের হূন-জাতীয় আবরদিগকে পদদলিত করিয়া তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লন। ডেনরা ইঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে এবং নিজেদের রাজ্য ইঁহাকে উপহার দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইনি জ্ঞান-চর্চ্চা ও শিল্পানুশীলন-কল্পে বহু চেষ্টা ও বহু অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। রোমানদের পরে য়ুরোপে ইঁহার সমকক্ষ সম্রাট আর কখনও আবির্ভূত হন নাই। পরবর্ত্তী যুগের য়ুরোপ ইঁহাকে ক্ষাত্রশক্তির অবতাররূপে পূজা করিয়াছে। ইঁহার অলোকসামান্য কীর্ত্তিকাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া য়ুরোপে একটি সুবৃহৎ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সার্লামান যে একটি বিশ্ব-বিপ্লাবী ভাবপ্রবাহের অদ্ভুত শক্তি-সম্ভূত, তাহার একটি প্রমাণ ইঁহারই রাজত্বকালে য়ুরোপে যাহা Chivalry বলিয়া পরিচিত, তাহার উদ্ভব এবং প্রচার হয়। মধ্য-যুগের য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই Chivalry। ইহার মত সর্ব্বদেশব্যাপী, সর্ব্বজন-সমাদৃত, সর্ব্ববিধ সমুচ্চ আদর্শপরিপূর্ণ, সার্ব্বজনীন ভাব য়ুরোপ আর কখনও লাভ করে নাই। Chivalry কথাটির কোনও বাঙ্গালা নাম দেওয়া যায় না। ইহার শব্দগত অর্থ হইতেছে অশ্বারোহণ-বৃত্তি। কিন্তু এই অর্থে ইহার সর্ব্বতোমুখী তাৎপর্য্যের একাংশও প্রকাশ পায় না। যাহারা Chivalry মন্ত্রের সাধক ছিল, তাহাদের নাম ছিল নাইট। নাইটরা সকলেই অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিত। এই জন্য ইহাদের জীবনব্যাপী ব্রতের নাম হয় Chivalry। ফরাসী Cheval লাটিন Caballus কথার অর্থ অশ্ব। সে যুগে এই Chivalry সত্য সত্যই জীবনের একটি সমুচ্চ ব্রত বা ধর্ম্ম ছিল। ইহা গ্রহণ করিবার নির্দ্দিষ্ট বিধান ছিল। এই ধর্ম্মের ভিত্তি-স্বরূপ কতকগুলি আদর্শ নীতি ছিল। যথা—

(১) ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনার পাপ হইতে চিত্তকে শুদ্ধ রাখা।

(২) সর্ব্বদা সাবধানে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং কোনও অন্যায় অবমাননা সহ্য না করা।

(৩) পরহিত-সাধনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করা।

(৪) সর্ব্বপ্রকার ছলনা, কপটতা, মিথ্যাভাষণাদি ত্যাগ করা।

(৫) জগতের সমস্ত অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়নাদি নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা।

(৬) দুর্ব্বলকে সবলের কবল হইতে রক্ষা করা।

(৭) নির্ভীক চিত্তে প্রাণের মমতা না করিয়া যে কোনও বিপদের

(৮) সংকার্য্যের সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া দেশে দেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করা।

(৯) সমস্ত নারীজাতির প্রতি সর্ব্বাবস্থায় অসীম শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করা এবং অতিশয় সম্মানের সহিত তাহাদের আনুগত্য করা।

(১০) চিরদিনের মত একজন মাত্র কুমারীতে আসক্ত হওয়া; তাহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা চেষ্টা করা; তাহার জন্য আবশ্যক হইলে অসাধ্যসাধন করা এবং আজীবন তাহার নিকট বিশ্বাসী থাকা।

টেনিসনের গুইনিভিয়ার কাব্যে রাজা আর্থার তাঁহার নাইটদিগের কর্ত্তব্য-নিচয়ের বর্ণনায় বলিতেছেন—

I made them lay their hands in mine and swear
To reverence the King, as if he were
Their conscience and their conscience as their King,
To break the heathen and uphold the Christ
To ride abroad redressing human wrongs
To speak no slander, no, nor listen to it,
To lead sweet lives in purest chastity,
To love one maiden only, cleave to her
And worship her by years of noble deeds.

ইহা অপেক্ষা সুন্দর পবিত্র এবং উচ্চ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান য়ুরোপে আর কখনও হয় নাই। ইহাতে একাধারে নিষ্কামকর্ম্মের সাধনা, ভাবরসের অনুশীলন এবং নৈতিক চরিত্র-বিকাশের ব্যবস্থা, তিনই বর্ত্তমান ছিল। কোনও কোনও ধর্ম্মের অপেক্ষা ইহা অনেক শ্রেষ্ঠ জিনিষ। ক্রমান্বয়ে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এই chivalry য়ুরোপীয় সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিল। ১০৯৫ খৃঃ পিটার নামক এক জন তেজস্বী সন্ন্যাসী যখন পুণ্যভূমি পালেস্তাইনকে তুরুকদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য য়ুরোপের খৃষ্টানদিগকে উত্তেজিত করেন, তখন যে সমস্ত সমরাভিযান য়ুরোপ হইতে পালেস্তাইনে যাত্রা করিয়াছিল, তাহাতে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক বীর যোগদান করিয়াছিল, এই সিভালরি ব্রতাবলম্বী নাইটগণই তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ছিল। সার্ল্যামেনের সাম্রাজ্য স্থাপন এবং সিভালরির মত এত বড় একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান এক দিকে আর অন্য দিকে ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যে একই যুগে ঘটিয়াছিল, ইহার একটা অন্তর্নিহিত অর্থ নিশ্চয়ই আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

দেশমন্ত্র

ভারতের যাহা শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ, চল মেনে,
ভারতের যাহা চিরপ্রচলিত, মান তা সত্য জেনে,
বালকের জ্ঞানে বিচার করো না, তর্ক করো না কিছু,
বিচার করিতে শিখেছি ব'লে ত প'ড়ে গেছি এত পিছু!
ভুলো না তোমার নারী-আদর্শ সাবিত্রী আর সীতা,
দময়ন্তীরে ভুলো না ভারত, ভুলো না পুরাণ গীতা,
বেদ, দর্শন, রামায়ণ আর মহাভারতের মত,
সম্পদ যার রহিয়াছে ঘরে কেন সে গরীব এত!
ত্যাগের মন্ত্র ভুলো না ভারত, ভুলো না জীবনে যেন,
শঙ্কর ত্যাগী সন্ন্যাসী যার গৃহের দেবতা হেন,
পারে না, পারে না, থাকিতে পারে না
কোনই অভাব তার,
এর চেয়ে বুঝি গভীর সত্য নাহিক কিছুই আর।
ভুলো নাক—নহে বিবাহ তোমার ইন্দ্রিয়সুখ তরে,
ভাবিও না মনে সম্পদ তব রাখিবে রুদ্ধ ঘরে,
করিও না মনে—এ জীবন শুধু তোমারি সে নিজ ধন,
মায়েরি কারণ বলি এ জীবন দিয়াছি কর এ পণ;
মনে যেন রয় সমাজ তোমার মায়েরি মাত্র ছায়া,
ভুলো না হে কভু—বিশ্বজগৎ মায়েরি মাত্র কায়া।
মূর্খ গরীব, নীচ জাতি বলি রেখেছ যাদের দূরে,
ভুলো না সবাই তোমারি যে ভাই—লহ হৃদয়ের পুরে।
বল দেশবাসী, বল এক বার—বল আমি হব বীর,
দুর্ব্বল আর নাহি রব কভু—উন্নত রবে শির,
বল একবার ভারত আমার, আমি যে ভারতবাসী,
ভারতের তরে দিতে পারি আজি বুকের রক্তরাশি,
বল এক বার যে যেথায় আছ—ভারতই মম প্রাণ,
স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী তুমি তোমারে করিব ত্রাণ।
ভুলো নাক কভু ভারতের দেব, ভারতের দেবী আর,
আরাধ্য মম চির-আরাধ্য নমি আমি বারে বার।
ভারত সমাজ—শিশু শয্যা মোর, যৌবনে উপবন,
বার্দ্ধক্যের সেই বারাণসী মম, দুর্লভ অতি ধন।
ভারতের মাটী মজ্জা আমার, ভারতের জল রক্ত,
ভারতের চিরসেবক আমি গো ভারতের গোঁড়া ভক্ত।
অনুতাপে কেঁদে বল—'বিশ্বনাথ,
করুণা প্রকাশি মোরে,
মানুষের মত মানুষ করিয়া তোল গো শীঘ্র গ'ড়ে,
বল দাও বুকে ঘুচাও শঙ্কা, ভীতি আর মলিনতা,
রক্তে রক্তে প্রতি ধমনীতে দাও ভ'রে সবলতা।"



উপন্যাস পাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা

২

উপন্যাস-পাঠকের মনে অসার ভাবুকতা আনয়ন করে ও অসন্তোষের আগুন জ্বালায়

এইবার উপন্যাসপাঠের অপকারিতা কি, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। জীবনের প্রারম্ভে নানা অদ্ভুত পরিকল্পনা ও মতবাদপূর্ণ উপন্যাসপাঠে অতিমাত্রায় মগ্ন হইলে তাহার কুফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হয় না। অসম্ভব-কল্পনার বোঝা মাথায় লইয়া যেই মাত্র পাঠক সংসার-মধ্যে প্রবেশ করে, অমনই ব্যবহারিক জগতের কঠোর সত্যের সংঘর্ষে তাহার সাধের কল্পনাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। সে যাহা চাহে যা করিতে ইচ্ছা করে, জগতে তাহা নাই এবং জগতের কেহ তাহাকে সাহায্য করে না। স্বপ্ন ও জাগরণে যত দূর পার্থক্য, তাহার জীবন ও কল্পনায়ও তত দূর। সারাজীবন হয় ত সে অপরিপক্ক, অপরিণত, অসম্ভব কতকগুলি ভাব মাথায় লইয়া অসন্তোষের তুষানলে ধিকি ধিকি পুড়িয়া মরিতে থাকে। লাভের মধ্যে এই লাভ হয় যে, স্বপ্নের বদহজমের জন্য এরূপ পাঠকের জীবনটি দুঃস্বপ্নময় ও মোহাশ্রিত হয়। সারভেন্টিসের ডন কুইকজটের মত সে হয় ত বিশ্বজগতে রোমান্সের খোঁজ করিতে বাহির হয়, কিন্তু হায়! রোমান্স ত মিলেই না, বরং সে পদে পদে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়া থাকে। তাই সে নিজ জীবনের ও জগতের প্রতি অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হইয়া উঠে। উপন্যাসপাঠকের মনে অসার ভাবুকতা ও কল্পনাপ্রিয়তা জন্মে বলিয়াই এরূপ ঘটনা ঘটে। যাঁহারা খুব বেশী উপন্যাস পড়েন—তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা থাকে না—তাঁহারা বাক্যবাগীশ হইয়া পড়েন। অলীক কল্পনা তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি লোপ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, উপন্যাসপাঠে সমাজ ও লোকচরিত্রের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অনেক ঔপন্যাসিক কল্পনার অঞ্জন চোখে পরিয়া বই লিখেন বলিয়া কোন কোন উপন্যাসে অনেক সময় অতিরঞ্জিত সত্য বা অর্দ্ধসত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সব সত্য যাচাইয়া না লইয়া, বাস্তবজগতের সহিত তুলনায় না মিলাইয়া লইয়া, তাহার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পাঠকের ভুলভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা ও পদে পদে ঠকিবার সম্ভাবনা। পাঠক বিশেষ বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর না হইলে প্রকৃত সত্যের খোঁজ উপন্যাসপাঠে না-ও পাইতে পারেন।

পাঠক ভাবপ্রবণ হইয়া পড়েন

উপন্যাসপাঠকগণ অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হইয়া পড়েন। অনেক লেখক তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশে জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি করিতে হইলে গ্রন্থকর্ত্তাকে বড় তন্ময়ভাবভাবিত হইতে হয়, নহিলে চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয় না। ভিতরে প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিয়া বাহির হইতে ধার করা মনোভাব সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে আরোপ করিতে গিয়া ঔপন্যাসিকগণ একটি কৃত্রিম ভাবপ্রধান মনোরাজ্য গঠন করেন। পাঠক এই মনোরাজ্যের সংস্পর্শে আসিয়া নিজের মনোভাবকে ভাবপ্রবণ করিয়া ফেলে। নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ, বিরহ, মানভঞ্জন প্রভৃতি পালার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এই ফল হয় যে, পাঠকের নিজজীবনেও অজ্ঞাতসারে এই সব পালার অভিনয় সুরু হইয়া যায়। করুণা, স্নেহ, প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের আতিশয্যে পাঠকের ধীর স্থিরভাবে কোনও কিছু বিচার করিয়া লইবার ক্ষমতা আর থাকে না। জেন্ অষ্টেনের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ন্যায় পাঠক হয় ত প্রণয়িনীর ক্ষণিক অদর্শনে জগৎ অন্ধকার দেখিবেন। সেণ্টিমেণ্টেলিজমের চরম পরিণতিতে লোক ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইতে পারে বা গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মৃত্যুতে চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইতে পারে—ইহা অসম্ভব নহে। অনেক পাঠক-পাঠিকা উপন্যাস পড়িতে পড়িতে নায়ক-নায়িকার অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া কাঁদিয়া থাকেন। অতএব উপন্যাসপাঠকের মনে যাহাতে ভাবপ্রবণতা প্রাধান্যবিস্তার করিতে না পারে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপন্যাসের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পল্লবগ্রাহিতা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা দর্শন-বিজ্ঞান-প্রচারের পথে বিঘ্নস্বরূপ

অবিরত উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে পাঠকের এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে, সে আর তখন কোন চিন্তাশীল লেখকের লেখা পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। গভীর চিন্তা বা অধ্যয়নে তখন আর তাহার রুচি থাকে না। সে তাহা ধারণাও করিতে পারে না। গুরু চিন্তা ও প্রণিধানযোগ্য বিষয়গুলিতে সে মস্তিষ্কপরিচালনা করিতে চাহে না। চিকিৎসকগণ ইহাকে মস্তিষ্কের তরলতা-ব্যাধি আখ্যা দিবেন কি না জানি না, কিন্তু ইহাতে যে উপন্যাসপাঠকের চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। Light literature বা কথা-সাহিত্য ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে পাঠকের সর্ব্ববিষয়ে লঘু বা চপল হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। পল্লবগ্রাহিতা নামক আর একটি বিশেষ দোষ তাহার জন্মে; কোন বিষয়েই তলাইয়া বুঝিবার অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি তাহার থাকে না। যে কোন জটিল বিষয়ই সে পাঠ করিতে আরম্ভ করুক না কেন, তাহা ধৈর্য্যের সহিত অধ্যয়ন, নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক আত্মসাৎ না করিয়া শুধু একটা ভাসা ভাসা জ্ঞানলাভ করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকে। আজকাল এই পল্লবগ্রাহিতা ব্যাধি এত কঠিন ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, অদূর-ভবিষ্যতে ইহার প্রতীকার না হইলে ইহা

ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি গুরু বিষয়গুলি উপন্যাসের সহিত প্রতিযোগিতায় আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। পাঠক সমাজে অনাদৃত হইয়া তাহারা ধূলিমণ্ডিত কলেবর হইয়া লাইব্রেরীর শেল্‌ফে মাথা গুঁজিয়াছে। অন্যান্য দেশে অবস্থা এত সঙ্গীণ না হইলেও "নভেল-প্লাবিত বাঙ্গালা দেশে" দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি সৎসাহিত্যকে সাহিত্যের আসর হইতে পাঠকসমাজ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে—ইহা খাঁটি সত্য কথা। ঔপন্যাসিক ভিন্ন অন্য কোনওরূপ সাহিত্যিক যে সাহিত্যসেবা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া বাঙ্গালার মাটীতে তিষ্টিতে পারিবেন, সে আশা সুদূরপরাহত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে অনেক প্রতিভাবান্ সুকবিও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জীবন পাত করিয়াছেন। সেকালের মাইকেল ও একালের কান্তকবি, স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের কথা সকলেই জানেন। উপন্যাসের বহুল প্রচারে বা সার্ব্বজনীন সমাদরে আমরা ঈর্ষ্যাবোধ করি না, কিন্তু উপন্যাসপাঠকগণ যে কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রতি মনোযোগী হন না, ইহাই আমাদের অভিযোগের বিষয়। ইহা উপন্যাসপাঠের অপকারিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস পাঠকের মনে কৌতূহলবৃত্তি অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি করে। উহা চরিতার্থ হইবার নহে

গুপ্ত প্রেম, গুপ্তখুন, নিমখুন, চোর-ডাকাতের অসমসাহসিক কাহিনী, সার্লক হোমস্—রবার্ট ব্লেক—সুরেন্দ্র বিজয় প্রভৃতি সবজান্তা সর্ব্বশক্তিমান্ গোয়েন্দাদের কাহিনী ইত্যাদি যে সকল উপন্যাসের প্লটের উপাদান, সেই সকল উপন্যাসকে কৌতূহলোদ্দীপক বলা যাইতে পারে। ইংরাজ ঔপন্যাসিক বুলওয়ার লিটন, মেরী করেলী, হ্যাগার্ড, কনান ডয়েল, ফরাসী ঔপন্যাসিক ডুমা, লা কোয়েন্স ন্যাবলাক্ প্রভৃতির উপন্যাস এই শ্রেণীর। বাঙ্গালা উপন্যাসের মধ্যে পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের "মায়াবী" "মনোরমা" ইত্যাদি, দীনেন্দ্র রায়ের 'রহস্যলহরী' সিরিজের "মেয়ে বোম্বেটে" "রণরঙ্গ" ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই সব উপন্যাস পড়িতে পড়িতে পাঠকবর্গের কৌতূহলবৃত্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়—কিছুতেই তাহা চরিতার্থ হইতে চাহে না। শেষে তাহারা রীতিমত sensation-mongers হইয়া পড়ে। কোন্ স্থানে গিয়া যে এই কৌতূহল বৃত্তি শেষ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ইংরাজ কবি কীটসের মত এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পাঠক এক দিন হয় ত বলিয়া বসিবেন "Oh, for a life of sensations"! আজকালের পাঠকসমাজে এই উপন্যাসের চাহিদা খুব বেশী, বাজারে ইহার কাটতিও বেশ। Continental novels নামক যে উপন্যাসসমূহ য়ুরোপ হইতে এ দেশে বিরাটভাবে আমদানী হইতেছে—তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর উপন্যাস। এই জাতীয় উপন্যাসের প্রচারবাহুল্য না কমিলে পাঠকসমাজের কৌতূহল-কণ্ডুয়ন উপশমিত হইবে না, ভাল ভাল উপন্যাসের আদরও বাড়িবে না।

অশ্লীল উপন্যাসপাঠে নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে

কতকগুলি অপরিণামদর্শী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য লেখক লজ্জা, শালীনতা, ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া অশ্লীল উপন্যাস রচনা করিয়া থাকেন। দুশ্চরিত্রা নারী বা বারাঙ্গনা, কামোন্মাদ লম্পট এই সকল উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। শিশ্নোদরের তাড়নায় ইহারা সমাজের ভিতরে ও বাহিরে যে তাণ্ডব-নৃত্য করে, যে বীভৎস কুৎসিত কাণ্ডকারখানা করে, তাহাই এই সকল উপন্যাসে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সকল উপন্যাসকে নিকৃষ্টতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজকাল পুস্তকের বাজারে ইহাদের আমদানী নেহাৎ কম নহে। ফরাসী উপন্যাসগুলি প্রায়ই এই শ্রেণীর। এ দেশের প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে যে রাশি রাশি পুস্তক বিক্রীত হয়, খোঁজ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর উপন্যাস। অবশ্য এই শ্রেণীর পুস্তকের যাহারা খরিদ্দার, তাহারা প্রায়ই শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গ আমাদের দেশে ও সমাজেও অশ্লীল উপন্যাসের পাঠক অনেক আছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও অশ্লীল উপন্যাস ভূরি ভূরি প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ভুবন মুখোপাধ্যায়ের "হরিদাসের গুপ্তকথা" "যোসেফ উইলমটের" মত বেশী দামের বড় বইএর গ্রাহকের অভাব হয় না। প্রবীণ সাহিত্যিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত "মডেল্ ভগিনী"কেও আমরা এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে গণ্য করি—যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল। ইংরাজ লেখক রেণল্ডসের "Joseph Wilmot" প্রভৃতি উপন্যাসও অশ্লীলতাদোষদুষ্ট। অনেক সুশিক্ষিত বিজ্ঞ লেখকও আজকাল Art for art's sake নীতির ধূয়া ধরিয়া শালীনতা-বর্জ্জিত উপন্যাস লিখিতেছেন। অশ্লীল উপন্যাস যে পাঠকের নৈতিক চরিত্রের উপর কম বা বেশী মন্দ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রেমিকের ছদ্মবেশে কামুকের কদর্য্য লীলা-খেলা, কামকামনাময় হাবভাব, ন্যক্কারজনক আচার-ব্যবহার পাঠকের মনকে যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে অধঃপতনের দিকে টানিয়া লইতে পারে। এই আশঙ্কা অমূলক নহে, কারণ, সাধারণ পাঠক সকলেই কিছু আর ব্যাস বশিষ্ঠ নহেন। আবার অনেককে দেখিয়াছি, ভাষা-শিক্ষা করিবার ছল করিয়া "Mysteries of the Court of London" নামক জঘন্য পুস্তক পাঠ করেন। এই সব অশ্লীল উপন্যাস পাঠ করিলে পাঠক অবশ্যই নিম্নগামী হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে এইরূপ উপন্যাসপাঠ বর্জ্জনীয়।

উপন্যাসপাঠে বালক ও যুবকের ক্ষতি

সুকুমারমতি বালকগণ অনেক সময় ভালমন্দ বিচার না করিয়া উপন্যাস পড়িয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়া বসে। উপন্যাসের ভাল ও শিক্ষণীয় যে টুকু, তাহা বালকগণ ধরিতে, বুঝিতে পারে না, কিন্তু যে অংশটুকু বর্জ্জনীয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রেমিক-প্রেমিকার আদিরসপূর্ণ কাহিনীই তাহাদের মনে বেশী ধরে এবং ইহাতেই মহা-অনর্থের সৃষ্টি হয়। কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিলে যে অবস্থা হয়, অনেক উপন্যাস-পাঠাসক্ত চপলস্বভাব বালকের সেই অবস্থা হয়। অনেক ছেলে জ্যাঠামি শিখে, অনেকে আবার সংযমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরিণত বয়সে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়। ফলতঃ বালকবালিকাগণকে নির্ব্বিচারে সকল রকম উপন্যাস পাঠ করিতে দিলে তাহাদের ভাবী জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। যুবকগণের চরিত্রেও উপন্যাস-পাঠের কুফল ফলিতে দেখা যায়। পাঠ্য অপাঠ্য বিবেচনা না করিয়া, সকল প্রকার উপন্যাস পাঠ করিয়া অনেক যুবকের অধঃপতন হয়। পূর্ব্বে উপন্যাসপাঠের যে সব অপকারিতা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। উপন্যাস প্রধানতঃ যুবাসমাজেরই প্রিয়পাঠ্য। তাই উপন্যাসের প্রভাব যুবক-সম্প্রদায়েই বেশী পরিলক্ষিত হয়। কাযেই যে সকল যুবক পদস্খলিত বা বিকৃতরুচি হইয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই যে জঘন্য উপন্যাসপাঠের ফল, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। একেই "যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে," তাহাতে আবার প্রেমিক-প্রেমিকার উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমের আখ্যানযুক্ত উপন্যাস পাঠ করিয়া অনেক যুবক আর জীবনতরণীর হাল ঠিক্ রাখিতে পারে না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে" ইত্যাদি—এই সকল যুবকের দশাও এইরূপই হয়। কোন কোন যুবক হয় ত উপন্যাস হইতে কোন utopian আদর্শের ভাব

গ্রহণ করিয়া জীবনে তাহা পরিণত করিতে গিয়া সময় ও সামর্থ্যের অপচয় করে। অনেকে আবার কল্পিত প্রেমের নেশায় মসগুল হইয়া শেলীর Witch of Atlasএর মত কল্পনারথে চড়িয়া মানসী পরী সুন্দরী লাভের আশায় স্বপ্নময় নক্ষত্রলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যর্থতার তীব্র আঘাতে তাহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। অতএব বিবেচনাশূন্য হইয়া উপন্যাসপাঠে আত্মনিয়োগ না করাই যুবকগণের কর্ত্তব্য।

উপন্যাসপাঠে মহিলা পাঠিকার অবনতি

উপন্যাস পড়িয়া পাঠকগণের যত না অপকারের আশঙ্কা, পাঠিকাগণের ততোধিক। কারণ, পুরুষগণের হৃদয়-মন ততটা কোমল নহে, কোন নূতন ভাব সহজে পুরুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; কিন্তু নারীর দুর্ব্বল মন অতি সহজে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। প্রলোভনকে তাহারা পুরুষের মত অবলীলাক্রমে জয় করিতে পারে না। অশ্লীল উত্তেজনাময় উপন্যাস পড়িয়া নারীগণ যে কোন মুহূর্ত্তে লক্ষ্যভ্রষ্টা হইয়া পড়িতে পারে। নূতন ফ্যাসান, নূতন ভাবের মোহে পড়িয়া পাঠিকাগণকে হাবুডুবু খাইতে দেখা যায়। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে, উপন্যাস পাঠ করিয়া কোন কোন মহিলা পরিবারের মধ্যে পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্ব্বক স্বাধীনতা দাবী করিয়া বসেন। অনেক পারিবারিক কলহ, স্বামিস্ত্রীর মনোমালিন্য ইত্যাদির মূলে উপন্যাসের অনিষ্টকর প্রভাব বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গনারীগণের উপন্যাসপাঠের আর একটি অপকারিতা আছে। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া উপন্যাসপাঠে দিবারাত্রি কাটাইয়া দেন। অনেক শিক্ষিতা মহিলার উপন্যাসই ধ্যান, উপন্যাসই জ্ঞান! আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের পক্ষে ইহা কোন ক্রমেই শ্লাঘার কথা নহে। তাহার পর যাহা অবশ্য শিক্ষণীয় ও পঠিতব্য, সেই কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহারা মোটেই মন দেন না। তাঁহাদের মনের রুদ্ধদ্বারের ফাঁক দিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে, তাঁহাদের মত অশিক্ষিতা বা কুশিক্ষিতা নারী অন্য দেশে নাই। উপন্যাসপাঠের এই অপকারিতা দূর করিতে হইলে ভালরূপ বাছাই করিয়া আদর্শ চরিত্রের চিত্রপূর্ণ উপন্যাস মেয়েদের হাতে দিতে হইবে।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য এই, উপন্যাসপাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা প্রায় সমপরিমাণ। তবে বিদ্যা-বুদ্ধি সহায়ে সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক পড়িতে পারিলে পাঠকের উপকারের সম্ভাবনাই অধিক। "সারং ততো গ্রাহ্যং ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ"—ধীমান্ পাঠক অবশ্য জল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু পান করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিণতবুদ্ধির এই বিপদ-নিবারণের একমাত্র উপায় কেবলমাত্র অবিকৃতরুচি অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের নির্ব্বাচিত উপন্যাস পাঠ করা।

শ্রীবিধুরঞ্জন দাস।

সংগঠনের সদুপায়

৮

সামাজিক দলাদলি, মতবিরোধ, মামলা-মোকর্দ্দমাদির কথা

দেশবাসীর সমাজনৈতিক গোলযোগেও—প্রকৃত কার্য্যের ক্ষতি বড় কম হইতেছে না এবং বড় কম হইবে না। বৃথা মামলা-মোকর্দ্দমাতেও দেশের সর্ব্বনাশ যতদূর হইবার, হইয়া চলিয়াছে। এ সব [illegible] দেশবাসীর সময় ও কর্ম্মশক্তির অতি শোচনীয়রূপ দারুণ অপচয় সংঘটিত হইতেছে। ইহার অতি আশু প্রতীকারের প্রয়োজন। কর্ম্মহীন নিষ্কর্ম্মা দরিদ্রদের দেশে ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী সত্য, তবে এই ব্যাধি একেবারে দুরারোগ্য নহে; ইহা প্রতীকার-সাধ্য।

কর্ম্মবিহীন মানুষের বিকৃতবুদ্ধি ও অলস হস্তকে অর্থোৎপাদক কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দিলেই উক্ত রোগের প্রতীকার হইতে পারে।

স্বভাবতঃই মানুষের মন কর্ম্মপ্রবণ; সুকার্য না পাইলে বাধ্য হইয়াই কুকর্ম্মের প্রতি মানুষের মন ধাবিত হইয়া থাকে। এই নিত্যকর্ম্মপ্রয়াসী চঞ্চল মনকে—ভোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান অর্থের উৎপাদক কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দিতে পারিলে, অর্থলুব্ধ মন প্রায়ই তাহা ছাড়িয়া আর অন্য দিকে যাইতে চাহে না—যায়ও না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সামাজিক গোলযোগের অপচয়সাধন পক্ষে—মানুষের মনকে অর্থোৎপাদক কর্ম্মে সর্ব্বদা সংলিপ্ত রাখাই—প্রকৃষ্ট উপায়।

দেশ-কর্ম্মের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা শুধু বাচনিক উপদেশাদি দ্বারা বা প্রত্যক্ষভাবে উক্ত সামাজিক ব্যাপারে যোগদান দ্বারা—ঐ সকল আপদ-নিবারণের চেষ্টা না করিয়া অর্থোৎপাদক কর্ম্মের বিধান দ্বারা যদি তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থায় ব্রতী হয়েন—তবে অল্পসময়ে অল্প আয়াসেই সফলমনোরথ হইতে পারিবেন। এইরূপ বিধানে জাতীয় সম্পদের অপচয়স্থলে উপচয়ও বিশেষভাবে সংসাধিত হইবে।

মানুষের উপক্ষুধার খোরাকী ও তাহা সরবরাহের কথা

বর্ত্তমান কালের রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতির ফলে, শ্রমিক কর্ম্মীদের শ্রমমূলক কষ্টার্জ্জিত অর্থের বহুলাংশ ব্যক্তিবিশেষদের হস্তগত হইতেছে, সম্ভবতঃ আরও বহুকাল ধরিয়া হইতে থাকিবে।

এই ব্যক্তিবিশেষরাই সভ্য-সমাজে ধনী আখ্যায় আখ্যাত।

মুষ্টিমেয় কয়েক জন কৃপণ ধনী ব্যতীত অন্য আর সকল ধনীদের ধনই বিবিধ সূত্র অবলম্বনে তাহাদের তহবিল হইতে পুনঃ বহির্গত হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিলাসিতারূপ উপক্ষুধাটা উক্ত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সবিশেষ প্রবলভাবে প্রকটিত হইতে দেখা যায়। এই উপক্ষুধার পরিতৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহ সূত্রেই ধনীদের সংগৃহীত ও সঞ্চিত অর্থ বিশেষভাবে বহির্গত হয়। ধনীদের অর্থ-বহির্গমনের উক্ত স্রোতঃপথ দরিদ্র, কৃষি ও শিল্পসাধক কর্ম্মীদের সমাজমুখে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারিলে—ধনি দরিদ্রের সংঘর্ষজনিত গুরু সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হইতে পারে।

বিলাসিতা-ভোগের যে সকল পণ্যোপকরণ-সংগ্রহের সূত্র-পথে ধনীদের অর্থস্রোত প্রবাহিত হয়, বিশেষরূপ তথ্যানুসন্ধান দ্বারা সেই সব পন্থা প্রথমে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। পরে যথাবিহিতরূপ উপায় অবলম্বনে সেই সকল পণ্যোপকরণের প্রস্তুতোপায়-বিধান করিয়া দেশের কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে তত্তাবৎ প্রস্তুতকরণে বা আহরণের প[illegible] সেই সব পণ্য যাহাতে ধনীদের গৃহগত হইয়া, তদ্বিনিময়ে মূল্যাখ্যরূপ অর্থ কর্ম্মীদের হস্তগত হইতে পারে, তদনুরূপ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য পরিচালনের বিধিব্যবস্থা

প্রবর্ত্তনের কথা

দেশবাসীদের যাবতীয় অভাব যাহাতে দেশবাসী কর্ম্মীদের শ্রমাহৃত ও শ্রমোৎপন্ন পণ্য দ্বারাই পূরণ হইতে পারে, প্রথমেই কর্ম্ম কর্ত্তৃগণকে তদনুরূপ অন্তর্ব্বাণিজ্যের বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে। আবশ্যক বোধে প্রয়োজনসাধক যন্ত্রপাতি এবং এ দেশে দুর্ল[illegible]

উপাদানসমূহ পণ্যাদি উৎপাদনোদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে বর্ত্তমানে সংগৃহীত হইবে; কিন্তু কালক্রমে এ দেশেই যাহাতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইতে পারে, সাধ্যমত তাহার চেষ্টা ও বিধিব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। যন্ত্রপাতি উপাদানাদি সাময়িকভাবে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইলেও, এই দেশে এই দেশীয় মনুষ্য কর্ম্মীদের শ্রম-সাধ্য ও হস্তোৎপন্ন পণ্য ব্যতীত অন্য কোনওরূপ পণ্য যাহাতে সামান্যরূপেও ব্যবহৃত হইতে না পারে, সে দিকে সর্ব্বদা অতি সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

উক্ত অন্তর্বাণিজ্যের পরে—বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে হইবে। বিশেষজ্ঞসমিতি সমূহের সংগঠন করিয়া প্রথমেই তথ্যানুসন্ধান করাইতে হইবে যে—

(ক) এ দেশের কোন্ কোন্ পাকা পণ্য বিদেশের বাজারে সাদরে গৃহীত হইতে পারে।

(খ) এ দেশীয় কাঁচা মালের সাহায্যে বিদেশীদের প্রয়োজনীয় কোন্ কোন্ পণ্য, বিদেশীয়দের অনুসৃত প্রণালী ও পদ্ধতিমতে—এ দেশীয় কর্ম্মীদের দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া বিদেশের বাজারে রপ্তানী হইতে পারে।

(গ) বিদেশ হইতে আনীত উপাদানে হয় দেশীয় কর্ম্মীদের প্রতিভা ও শ্রমবলে, না হয় বিদেশীদেরই উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সহায়তায় এ দেশীয় কর্ম্মীদের শ্রমমূলে—বিদেশীদের ব্যবহার্য্য কোন্ কোন্ পণ্য এ দেশে প্রস্তুত হইয়া বিদেশের বাজারে প্রেরিত হইতে পারে।

উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, তৎসমুহ সাধনোপযোগী বিধিব্যবস্থার প্রণয়ন ও প্রচলন, ক্রমে আবশ্যক পণ্যের উৎপাদনপূর্ব্বক তৎসমুদায়ের সরবরাহ সূত্রের অবলম্বনে বহির্বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে, উৎপাদন ও আহরণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, জাহাজাদির সাহায্যে সব পণ্য বিদেশের বাজারে সরবরাহপূর্ব্বক তদ্বিনিময়-মূলক অর্থ দেশে আনয়ন পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্য যথাসম্ভবরূপে দেশীয় কর্ম্মীদের কর্ম্মশক্তির সহযোগিতায়ই সুসম্পন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জাতীয় মহাসংসদই বিশেষভাবে ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।

দেশীয় রায়তদের দেয় রাজস্ব কর প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থার কথা

মুখ্যভাবে এ দেশীয় অশিক্ষিত অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যয়ভার, রুগ্নদের চিকিৎসাদির ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব হইতে যেরূপ অব্যাহতি দিতে হইবে, রাজস্ব ও সর্ব্ববিধ করভার বহনের দায় হইতেও মুখ্যতঃ তেমনই মুক্তিদান করিতে হইবে।

শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়বহনের ভার সংসদসমূহ যেমন নিজ-দায়িত্বে গ্রহণ করিবেন, রাজস্বাদি যথাকালে প্রদানের দায়িত্বভারও তেমনই সংসদ-সমূহই গ্রহণ করিবেন।

দেশীয় রায়তদের আয়-ব্যয়মূলক সর্ব্ববিধ অর্থনৈতিক ব্যাপার সংসদ-সমূহের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইলে, তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থেরই কিয়দংশ পৃথক্ তহবিলে জমা করিয়া রাখিয়া, তৎসাহায্যে কর্ম্মকর্ত্তারা অনায়াসেই মুখ্যভাবে রায়তদিগকে উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিদান করত নিজেরাই সব সমাধান করিতে পারিবেন।

প্রজাদের রাজস্বাদি প্রদানের দায়িত্ব সংসদসমূহ গ্রহণ করিলে পর, এই রাজার গঠিত মামলা-মোকর্দ্দমার সংখ্যা বহুলাংশে কমিয়া যাইবে। ইহাতেও দেশবাসীদের লাভ বড় কম হইবে না।

অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ক্রেয় পণ্যের সরবরাহ এবং যথাকালে যথাযথ মূল্যে বিক্রেয় পণ্যের মুখ্যতঃ বিনাব্যয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসা-বিধান, প্রভৃতি বিষয়ব্যবস্থায় দেশবাসী যেরূপ সংসদসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, রাজস্বাদি প্রদানের ব্যবস্থায় তদপেক্ষা অধিক সমাকৃষ্ট হইবে। ব্যয়ের বন্ধন হইতে যতই মানুষ মুক্তিলাভ করিয়া, আয়ের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের সুযোগ প্রাপ্ত হইবে, ততই সে সেই মুক্তিদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাভরে আকৃষ্ট হইতে থাকিবে,—মানুষের ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মসূত্রের আকর্ষণেই জন-নেতৃগণ—জনমণ্ডলীকে উন্নতির দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইবেন।

নিরুপায় অক্ষমদের গ্রাসাচ্ছাদন যোগানের কথা

জন-সমাজের অন্যতম অংশ বলিয়া দেশের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বধির, মূক, বৃদ্ধাদি অক্ষমদের গ্রাসাচ্ছাদনের বিধিব্যবস্থাও সংসদসমূহকেই করিতে হইবে।

অর্থনীতির মূলভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংসদসমূহ একের অর্থ অন্যকে অনর্থক দানাদি করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রত্যেকেরই আয়ের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া সংসদ-সমূহ প্রত্যেকের অভাবাদি দূরীভূত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

কৃষি-শিল্পের যে সকল কার্য্য উক্ত অক্ষমদের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই সকল কার্য্যেই যোগ্যতানুসারে, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে অন্ধ অন্য কার্য্যে অক্ষম হইবে, তাহাকে হয় ঢেঁকিতে ধান ভানিবার বা কোন কলের চক্রাদি অংশ পরিচালন করিবার কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। চলিতে অক্ষম খঞ্জাদিকে সেলাই প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত রাখিতে হইবে। স্তিমিত-দৃষ্টি শিথিলহস্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কর্ম্মশালাদি গৃহে প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। ফল কথা, দেশের আপামর সাধারণ আবালবৃদ্ধ-বনিতা—সকলেই যাহাতে কিছু না কিছু কার্য করিয়া খাইতে পারিতে পারে, বিধিমত তাহার সুব্যবস্থা অবশ্য করিয়া দিতে হইবে। অক্ষম, অনাথ, অসহায় বলিয়া এক জন নর কিংবা নারী, বালক কিংবা বালিকা, বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা যেন ভাতকাপড়ের অভাবে কষ্ট না পায়, অথবা পরের দয়াদির উপর নির্ভর করিয়া কষ্টে জীবনযাপনে বাধ্য না হয়, সে দিকে সদা সতর্ক-দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সংসদসমূহকে কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

দেশের অর্থনৈতিক-বৈষম্যের সাম্য-সমাধানের কথা

দেশে অর্থনৈতিক-বৈষম্যজনিত গোলযোগ অত্যন্ত প্রবল এবং বর্দ্ধিষ্ণু। বাজারে নিত্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবই ইহার প্রধান হেতু। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় পণ্যাদিসংগ্রহের জন্য এ দেশবাসী সর্ব্বসাধারণমধ্যে যে পরিমাণ মুদ্রার প্রচলন থাকা আবশ্যক, মুদ্রার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক কম; তুলনায় বিনিময়কারী ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী, কাযেই বিষম বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে।

প্রধানতঃ ভারতবর্ষে এখন একমাত্র কৃষকদের শ্রমোৎপন্ন কৃষিজ-পণ্যবিনিময়েই যৎসামান্য কিছু অর্থ উৎপাদিত হইতেছে। এই কৃষকদের প্রাপ্য সামান্য অর্থই, বর্ত্তমান যুগের অর্থনীতির বেড়াজালে পড়িয়া বহুলাংশে বিভক্ত হইতেছে। ছলে-বলে, কল-কৌশলে সেই সব খণ্ডাংশ আয়ত্ত করিয়া দেশ-বিদেশের অন্য আর সকলেই নিজ নিজ অভাব পরিপূরণের প্রয়াস পাইতেছে। তাহাতেই গোলযোগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতের কৃষিজ পণ্যের বিনিময়মূলক অর্থও সবটা ভারতের বাজারে প্রচলিত হইতে বা থাকিতে পারিতেছে না। সেই অর্থের কতকাংশ—

(১) দেশের ঋণদাতা মহাজনরা সুদ-স্বরূপে গ্রাস করিয়া আটকাইয়া ফেলিতেছে ;

(২) দেশের বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী কারবারের মূলধনে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে ;

(৩) বিদেশীয় বণিকরা তাহাদের স্বদেশজাত প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিনিময়ে স্ব স্ব দেশে টানিয়া লইতেছে ;

(৪) কর ও রাজস্বাদির অধিকারীরা নানাবিধ উপায়ে গ্রহণ করিতেছেন।

উক্তরূপ ৪ দফাতে আবদ্ধ হইবার পর, যে যৎসামান্য অর্থ অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহাতেই কোনও রূপে ভারতের সর্ব্বসাধারণ, বাজারে তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিনিময়ব্যাপার সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে।

প্রয়োজনীয় মুদ্রার এই যে দারুণ অভাব, অতি আশু ইহার প্রতীকারের দায়িত্বভার সংসদ-সমূহকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত বিধানমতে সংসদসমূহের কার্য্য পরিচালিত হইলে, উক্ত ৪ দফার প্রথম ৩ দফাতে উক্ত আপদ ক্রমে আপনা হইতেই উপশমিত হইয়া যাইবে। তাহার পর পূর্ব্বপ্রস্তাবানুসারে দেশের কর্ম্মীমাত্রই পণ্যোৎপাদন কর্ম্মে নিয়ত নিয়োজিত থাকিলে, বিনিময়মূলক অর্থের অস্বচ্ছলতা অনতিকালমধ্যেই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

দেশবাসী প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদনাদি পণ্যসংগ্রহের উপযোগী অর্থ স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারে, তবে বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্য পুঞ্জীভূত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, মানুষকে অভাবের দারুণ কশাঘাত সহ্য করিতে হয় না। এই বিরাট বিশ্বের বাজারে পণ্যের দুর্ভিক্ষ নয়,—দুর্ভিক্ষ বিনিময়মূলক অর্থের। এই অর্থনৈতিক দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত বলিয়াই এ দেশবাসী আজ বাজারে আবশ্যক পণ্য স্তূপীকৃত থাকা অবস্থায়ও অভাব-অনটনের নিদারুণ নিপীড়নে মুহ্যমান ও মরণোন্মুখ। এই অতি অনিষ্ট-উৎপাদক অরিষ্ট যাহাতে আশু এ দেশ হইতে চিরতরে অপসারিত হইতে পারে, সংসদসমূহকে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার বিধিব্যবস্থা অবশ্যই করিয়া লইতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

অগ্নি-দরিয়া

যতই যতন কর না, কখনো মরুভূমে ফুল ফোটে না—
পাষাণ-শিলারে ভালোবেসে কভু চুম্বিলে, জল যোটে না!
এটনা যাহারে দিয়াছে জনম, সাহারা পালন করিল ;
বিগলিত সেই তরল অনল বসুধার সুধা হরিল!
সে কভু নহে গো পুত-প্রেমধারা মন্দাকিনীর বক্ষে!
ক্ষুধাতৃষাতুরে সুধা দেয় নাকো, চাহে না করুণ চক্ষে!
সে যেথা বহিছে, শষ্প দহিছে ; জ্বলিছে পুষ্প, পত্র!
সে যেথা বহিছে, সেথায় চলিছে মৃত্যু-দহন সত্র!
জীব উদ্ভিদ ধূম্র হইয়া আশ্রয় মাগে গগনে,
অগ্নি-গিরির দুলালী দুলিছে দীপ্ত দহন-লগনে!
চলেছে সে তা'র বিজয়-দর্পে দগ্ধ করিয়া ধরণী,
হৃদয় বিদারী ক্রন্দন ওঠে মুখরিয়া তা'র সরণী!
শিলায়, মরুর সন্তান চলে, ভ্রূক্ষেপ নাহি কিছুতে ;
শ্যামল ভূতল মরু হয়ে গেল! হাহাকার উঠে পিছুতে!
সে চলে হাসিয়া, সে হাসি তাহার অনলের মত দীপ্ত!
কোমল হৃদয় জ্বালায়ে পুড়ায়ে তাহার হৃদয় তৃপ্ত!
নাচি' নাচি' চলে শৈল-দুলালী, মরু-জননীর কন্যা!
কোমলে করিয়া শৈল কঠিন, ঢালিয়া অনল-বন্যা!
ভীম-মাতঙ্গ, নাগ, কুরঙ্গ, শার্দ্দূল, পড়ে লুকায়ে—
বিশ্ব-জগৎ ছাড়ি' দেয় পথ, নিদারুণ ভয়ে শুকায়ে!
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ তারাদল ভীতি-পাণ্ডুর চক্ষে,
শঙ্কা-বিভল করে টলমল আপন আপন কক্ষে!
চলিছে মরণ! টলিছে চরণ, চলে ত্রিভুবন মথিয়া—
অনল উগারি' ধিকি ধিকি ধিকি, চলেছে তরল দরিয়া!
কে তীরে দাঁড়ায়ে! স'রে যাও! যাও! ঐ সে পড়িল আসি গো!
ছুটিয়া পালাও! শ্যামল-স্বপন অনলে যাইবে ভাসি' গো!
তুমি ভালবাসো আলোর ধরণী, আঁখি তব পিয়ে মাধুরী ;
শীতে ফোটে ফুল, তোমার বাদলে করে মঞ্জুল দাদুরী!
কণ্টকে তব ধন্য করিয়া কমল নয়ন খোলে গো!
বিশ্ব-ভুবন তব সুশোভন, সুষমা-স্বপন দোলে গো!
তুমি হের নাই ধরণীর ধূলা ; কুসুমের কীট দেখনি'—
কনক-মাধুরী নিমেষে নাশিয়া অনক জাগিবে এখনি!
কুসুম—পেলব হৃদয় তোমার অঙ্গার হ'বে জ্বলিয়া!
সোনার মুরতি মরণের কূলে চরণ পড়িবে টলিয়া!
হায় হায় ওগো খেয়ালী কিশোর! কি দেখিছ তীরে দাঁড়ায়ে?
সরল হৃদয়ে গরল ভরিবে ; মাধুরী ফেলিবে হারায়ে!
ও অতি ভীষণ সুষমা-নাশন ত্রিলোক-ত্রাসন দরিয়া
মুগ্ধ! উহাতে নরকের জ্বালা! তীর হ'তে পড় সরিয়া!
ঐ সে চলেছে ভৈরব ভীম! পৈরিক-দাহ হাসিছে!
কুৎসিত করি' সুন্দর ধরা, উদ্গারি' বিষ আসিছে!
কে আছ দাঁড়ায়ে মোহ-বিমুগ্ধ বিশ্ব-ভুবন ভুলিয়া!
অগ্নি-দরিয়া দগ্ধ করিয়া এখনি লইবে তুলিয়া!

শ্রীরামেন্দু দত্ত



হতভাগা

১

পরাণ মুচীর ছেলে গগন মুচী দিনে জুতা সেলাই করিয়া, আর রাত্রিকালে বাঁশী বাজাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, এমন সময় প্রতিবেশী ভোলা মুচীর মেয়ে রাসমণি ওরফে রাসী হঠাৎ বিধবা হইয়া পিত্রালয়বাসিনী হওয়ায় গগনের স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রাটা যেন একটু অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল।

খুব ছেলেবেলাতেই মা মারা গিয়াছিল; সুতরাং বাপের নিকট হইতে কখন স্নেহ, কখন বা তাড়না পাইয়া গগন কোনরূপে মানুষ হইয়াছিল। তাহার পর সে যখন অনেকটা সাবালক চোদ্দ-পনের বৎসর বয়স, তখন বাপও মারা গেল। গগন সংসারে নিতান্ত একা হইয়া পড়িল।

গগনের মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিয়া যাইবার জন্য বাপের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। এ জন্য সে ভোলার আট বছরের মেয়ে রাসীর সহিত গগনের বিবাহের কথাবার্ত্তাও কতকটা পাকা করিয়া ফেলিয়াছিল। সাড়ে তিন গণ্ডা টাকা পণ ছাড়া মেয়েকে রূপার তাবিজ, চুড়ী ও মল দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিল। আগে কাঁসার মল বা চুড়ীর চলন থাকিলেও এখন উহা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং পবন পুত্রবধূকে কাঁসার পরিবর্ত্তে রূপার গহনা দিয়া সমাজে বাহাদুরী লইবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু তাহার আশা ফলবতী হইল না; পূজার মরসুমে জুতা চালান দিয়া গহনার টাকা হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই ভাদ্রের প্রথমেই যম আসিয়া তাহাকে ইহলোক হইতে চালান করিয়া দিল।

পরাণ শুধু নিজে জুতা গড়িয়া বেচিত না; পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিনখানা গ্রামের মুচীদিগকে দাদন দিয়া, তাহাদের প্রস্তুত জুতা লইয়া কলিকাতায় চালান দিত এবং কলিকাতা করিত। ইহাতে লাভ যথেষ্ট হইত বটে, কিন্তু সে লাভের পয়সা প্রায়ই তাহার বাক্সে উঠিত না; তাহা হাতে হাতেই শুঁড়ীর দোকানে বা তাড়ীর আড্ডায় চলিয়া যাইত। তবে ছেলের মাথায় জল দিতে হইবে বলিয়া পরাণ ইদানীং একটু সাবধান হইয়া পড়িয়াছিল; প্রাণপণ চেষ্টায় লোভ-রিপুটাকে দমন করিয়া পণের ও গহনার টাকা সঞ্চয়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

কিন্তু টাকা সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই পরাণ মারা গেলে গগন বাপের বাক্স ঝাড়িয়া যাহা পাইল, তাহাতে পিতার সৎকারের সময় সে দাহকারীদিগকে এক বোতলের বেশী মদ দিতে পারিল না।

এ দিকে চামড়ার দোকানে বিশ-পঁচিশ টাকা দেনা। দোকানদার করিম মিঞা আসিয়া ঘর চাপিয়া বসিল, এবং ঘরে যে কয়েক জোড়া জুতা প্রস্তুত ছিল, তাহাই লইয়া গগনকে তাহার পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি দিয়া গেল। ভিন্ন গ্রামে যে সকল মুচীকে দাদন দেওয়া ছিল, তাহারা তাহা স্বীকারই করিল না। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর গগন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। দশ টাকা কর্জ্জ করিয়া জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে চারি বোতল মদ দিয়া সে পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইল।

অগ্রহায়ণমাসে বিবাহের কথা ছিল। সুতরাং ভোলা আসিয়া গগনকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিল। গগন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আমাকে যদি একটা বছর সময় দাও, তা হ'লে আমি পেরে উঠি। তা ছাড়া এক বছর ত আমার বিয়েও হবে না।"

ভোলা ইহাতে সম্মতি দিয়া বলিল, "কিন্তু আমাকে কিছু দাদন দিয়ে রাখতে হবে। এক বছর পরে তুমি যদি জবাবই দাও।"

গগন মাঘমাসে ভোলাকে তিন টাকা দাদন দিয়া এবং

শাড়ী কিনিয়া দিয়া বিবাহ-সম্বন্ধটা যেন পাকা করিয়া ফেলিল। বিবাহের জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গগন প্রাণপণে খাটিতে লাগিল। বাপের কাছে থাকিয়া সে জুতা সেলাইয়ের কায বেশ ভাল রকমই শিখিয়াছিল। তাহার প্রস্তুত জুতা দেখিয়া পরাণ সগর্ব্বে বলিয়াছিল, "আর বছর-খানেক পরেই তোর হাতের জুতো আমি দেড়া দামে বেচে আসবো, গগন।"

ভাল হইলেও গগনকে কিন্তু চারি টাকা দামের জুতা আড়াই টাকায় দিতে হইত। ব্যাপারী তাহার প্রস্তুত জুতা নাড়িয়া চাড়িয়া মুখ মচকাইয়া বলিত, 'এর নাম কি জুতো! শুধু পরাণের ছেলে বলেই এ জুতো আড়াই টাকা দিয়ে নিচ্ছি, অন্যের হ'লে ফেলে দিতাম।' গগনকে বাধ্য হইয়া আড়াই টাকাই লইতে হইত। ইহাতে যে মজুরী পোষাইত, তাহাতে খাওয়া-পরার খরচ ছাড়া সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকিত। কাযেই বছর ঘুরিয়া গেলেও পণের টাকা ও একখানিমাত্র গহনার দাম ছাড়া গগন আর বেশী জমাইতে পারিল না। সে কাকুতি-মিনতি সহকারে ভোলার কাছে আরও কয়েক মাস সময় চাহিল।

ভোলা কিন্তু সময় দিল না। রাসী দেখিতে একটু সুশ্রী ছিল। অন্যত্র সাড়ে চারি গণ্ডা টাকা পণ পাইয়া ভোলা সেইখানেই রাসীর বিবাহ দিয়া ফেলিল। ইহাতে গগন হতাশ হইয়া পড়িল। সে বাপের সঙ্গে থাকিয়াই তাড়ী ও মদে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেবেলায় বাপ তাহাকে কোলে বসাইয়া তাহার মুখে একটু একটু মদ ঢালিয়া দিত। বড় হইলে ত তাহাকে ভাগ না দিয়াই খাইত না।

অভ্যস্ত হইলেও বিবাহের আশায় গগন এই একটা বছর তাড়ী বা মদের নাম পর্য্যন্ত করিত না। কেহ পয়সা দিয়া খাওয়াইলেও খাইতে চাহিত না।

কিন্তু যে দিন রাসীদের ঘরে রাসীর বিবাহের শাঁখ বাজিয়া উঠিল, গগন সে দিন আর কাযে মন দিতে পারিল না। সে হাতের কায ফেলিয়া, টাকা তিনটা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাত্রিতে বিবাহ-বাড়ীতে খাইবার জন্য ভোলা তাহাকে ডাকিতে আসিয়া দেখিল, গগন তাহার ঘরের দাবায় ধূলার উপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; পাশে মদের খালি বোতলটা গড়াগড়ি দিতেছে।

ইহার পর হইতে গগন যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অধিকাংশই মদের দোকানে বা তাড়ীর আড্ডায় দিয়া আসিত। অনেক সময় এমনও হইত যে, রাত্রিতে নেশা ছুটিলে ক্ষুধার তাড়নায় ভাত চাপাইতে গিয়া সে হাঁড়ীতে এক মুঠা চাউলও দেখিতে পাইত না, পয়সার থলি ঝাড়িয়া এমন একটি পয়সাও পাইত না যে, এক পয়সার মুড়ী কিনিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। নিজের উপর রাগে নিজে তর্জ্জন করিতে করিতে গগন উনানে জল ঢালিয়া দিত। তাহার পর জুতা প্রস্তুতের সরঞ্জামগুলা পা দিয়া এক পাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া, কাঠের বাঁশীটি লইয়া বাজাইতে বসিত। গভীর নিশীথে বাঁশীর করুণ সুর বেদনা-হত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস লইয়া মুক্তপ্রান্তরে যেন হা হা রবে ছুটিয়া বেড়াইত।

এমনই করিয়া আট দশ বৎসর কাটিয়া গেল। কেহ গগনকে নেশাভাঙ ছাড়িয়া দিয়া বিবাহের জন্য উপদেশ দিলে, গগন মাথা নাড়িয়া উত্তর করিত, "উহুঁ, বেশ সোয়াস্তিতে আছি আমি।"

কিন্তু রাসী যে দিন আঠারো বছর বয়সে ভরা যৌবনে বৈধব্য-বেশ লইয়া বাপের ঘরে আসিল, সে দিন গগনের এই সোয়াস্তি বা স্বচ্ছন্দতার মধ্যে যেন একটা ভয়ানক অসোয়াস্তি বা অস্বচ্ছন্দতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া রাসী এক দিন তাহার দরজায় আসিয়া তিরস্কার করিয়া বলিল, "হ্যাদে গগন, মদ খেয়ে খেয়ে মরবি নিতুই?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া গগন উত্তর করিল, "আমি ম'লে কেউ কাঁদতেও ত নাই, রাসী।"

কত দুঃখে গগন যে কথাটা বলিল, তাহা বুঝিতে রাসীর বিলম্ব হইল না। সে সহানুভূতির গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "কাঁদতে নাই ব'লে এমন ক'রে মরবি তুই?"

গম্ভীর মুখে গগন বলিল, "মত্তে কে আমাকে মানা করে, রাসী?"

রাসী বলিল, "মানা করি আমি।"

চকিত দৃষ্টিতে তাহার সহানুভূতিকোমল মুখের দিকে চাহিয়া গগন যেন বিস্ময়জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল "তুই?"

রাসী বলিল, "হাঁ, আমি মানা করি। খবরদার গগন

এমন ক'রে মদ-ভাঙ খাস যদি, তোর সাথে আর কথাও কইবো না।"

রাসী চলিয়া গেল। গগনের মনে হইল, কঠোর সংসারটা সহসা যেন একটু কোমলতার মুখোস পরিয়া গগনকে কোলের দিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরবক্ষে মেঘের একটু ক্ষীণ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

সেই দিন গগন বোতলের মদে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া বেজো শুঁড়ীকে গালি দিতে দিতে বোতলটা দূরে নিক্ষেপ করিল; তাড়ীর ঝাঁপীটাকে এক আছাড়ে চুরমার করিয়া দিল। সেই দিন হইতে তাহার বাঁশীর আওয়াজ কেহ বড় একটা শুনিতে পাইত না।

২

"হ্যাদে গগন!"

"ক্যানে রাসী?"

"তুই যে একবারে বড্ড ভাল মানুষ হয়ে গেলি।"

ঈষৎ হাসিয়া গগন বলিল, "তাও তোর সজ্যি হয় না না কি?"

ঘাড় দোলাইয়া রাসী বলিল, "সজ্যি হবে না ক্যানে, তবে বাড়াবাড়িটা টিক্‌লে হয়। আর যে তোর বাঁশী শুন্‌তে পাই না?"

"বাঁশী আর বাজাই না আমি।"

"ক্যানে রে? বাঁশীটা তোর করলে কি?"

মুখ ফিরাইয়া গগন উত্তর করিল, "করেনি কিছু। তবে বাজাতে আর ভাল লাগে না।"

ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া রাসী বলিল, "মদ খেতে ভাল লাগে ত?"

ঘাড় নাড়িয়া গগন বলিল, "ভাল না লাগলেও খাই একটু একটু।"

"ক্যানে খাস?"

"না খেলে পরাণটা ধড়ফড় করে।"

"মুয়ে আগুন তোর ধড়ফড়ানির! তা এক কায কর, বিয়ে কর না।"

"টাকা কোথায় পাব?"

"মদ খেতে টাকা জোটে, বিয়ে কত্তে জোটে না?"

"মদ ছু' এক টাকায় পাওয়া যায়, বিয়ে ত ছু' এক টাকায় হবে না।"

"একটা সাঙা করলেও ত পারিস।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গগন বলিল, "কি হবে সাঙা ক'রে?"

ঈষৎ রাগতভাবে রাসী বলিল, "হবে তোর ছরাদ। তোকে এক মুটো চাল ফুটিয়ে দিতেও ত পারবে।"

উপেক্ষার স্বরে গগন বলিল, "আমি নিজেও ফুটিয়ে নিতে পারি।"

এ কথায় রাসী নিরুত্তর হইল। গগন বলিল, "এসেছিস যদি, দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে। বোস না, রাসী।"

গগন কাঠের একটা ছোট পীঁড়ি রাসীর দিকে ঠেলিয়া দিল। রাসী বলিল, "বোসবো না। ছাগলগুলো এ দিকে তাড়িয়ে দিতে এলুম, তা বলি, দেখে যাই, কি কচ্ছিস তুই।"

সহাস্যে গগন বলিল, "তবু ভাল, আমাকে দেখতে এসেছিস তুই। আমার ভাগ্যি!"

রাসী পীড়িখানা দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া দরজা চাপিয়া বসিল। পশ্চিমাকাশ হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্নিগ্ধ রক্তিম রেখা আসিয়া তাহার গণ্ডদেশ রঞ্জিত করিল। গগন সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া রাসীর মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। বলিল, "একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করবো রাসী?"

রাসী বলিল, "তা কর না।"

"তুই না কি সাঙা করবি?"

মুখ নীচু করিয়া রাসী বলিল, "মা ত সেই কথা বলে। বলে, আমি একা মেয়েমানুষ, দুখ্যু-মেহনৎ ক'রে নিজের পেটই চালাতে পারি না, তোর পেট চালাব কোত্থেকে?"

"এতে তোর মত কি?"

"আমার মত—ভেবে চিন্তে দেখি।"

যেন একটু আগ্রহপূর্ণ স্বরে গগন জিজ্ঞাসা করিল, "ভেবে কদ্দিনে তুই বল্‌বি?"

একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া রাসী বলিল, "ক্যানে, শোনবার লেগে তোর তাড়া আছে না কি?"

লজ্জিতভাবে গগন বলিল, "না না, আমার এমন তাড়া কি!"

কঠোর হাস্তসহকারে রাসী বলিল, "তাড়া থাকলেও কিছু হবে না গগন। তোর মতন নেশাখোর মাতালকে সাঙা করার চেয়ে গলায় দড়ী দিয়ে মরাও ভাল।"

রাসী উঠিয়া ধীর-গম্ভীর-পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া আসিয়া গগনের ঘরখানাকে অন্ধকারে ঢাকিয়া দিল। গগন হাতের কায ফেলিয়া অন্ধকারেই তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। ঘরের কোণে তাড়ীর ঝাঁপী বসান ছিল; তাহা হইতে ভর্ ভর্ করিয়া তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। গগনের ইচ্ছা হইল, ঝাঁপীটাকে এক নিশ্বাসে গলায় ঢালিয়া দেয়। কিন্তু গগন উঠিল না, নড়িল না; দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

এক দণ্ড, দুই দণ্ড করিয়া প্রহরেক রাত্রি হইল। গগন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটা গভীর হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে অন্ধকারটা সে দিন যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ, স্থানে স্থানে নক্ষত্রগুলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। তেঁতুলগাছের মাথায় জোনাকী জ্বলিতেছিল। গগন ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারেই হাতড়াইয়া বাঁশীটাকে খুঁজিয়া লইল। তাহার পর দাবার উপর বসিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল। বাঁশী কিন্তু আজ বড়ই বেসুরে বাজিয়া উঠিল। গগন অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহার ভিতর হইতে মনোমত স্বর বাহির করিতে পারিল না। বিরক্ত হইয়া গগন বাঁশীটাকে দূরে ছুড়িয়া দিল। তাহার পর ঘরের ভিতর হইতে তাড়ীর ঝাঁপীটা আনিয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাড়ীর উগ্র প্রভাব তাহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্ককে অবসন্ন করিয়া দিল। গগন বসিতে পারিল না, সেইখানেই ধূলার উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া গগন বিকৃত-মস্তিষ্কে যেন দেখিতে পাইল, আকাশে চাঁদ উঠিয়া অন্ধকারকে সরাইয়া দিয়াছে; শুভ্র-জ্যোৎস্না-সাগরে স্নান করিয়া উঠানের লম্বা লম্বা ঘাসগুলা হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে। সহসা সেই জ্যোৎস্না-সাগর হইতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত কে এক জন আসিয়া উঠানে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কে ও, রাসী না? হাস্যপ্রফুল্ল কণ্ঠে রাসী বলিল, "আমি তখন রাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিলাম, গগন, তাই আবার আমি এসেছি।"

গগনের বুকটা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। সে উঠিয়া রাসীকে সংবর্দ্ধনা করিয়া বসাইতে ইচ্ছুক হইল, কিন্তু উঠিতে পারিল না, তাড়ীর নেশায় মাথাটা টলিয়া পড়িল। লজ্জা-কাতর কণ্ঠে বলিল, "এসেছিস্ যদি, কাছে আয়, রাসী।"

রাসী হাস্যপ্রফুল্লমুখে দুই পা অগ্রসর হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখের হাসি অন্তর্হিত হইল; মুখখানা রাগে যেন কালো মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে তিরস্কারপূর্ণ তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "আবার তুই তাড়ী খেয়ে মরেছিস্? তবে মর্ তুই, আমি চললুম।"

কথাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাসী যেন বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হইল। গগন কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "রাসী, রাসী!"

রাসী উত্তর দিল না। শুধু স্তব্ধ প্রকৃতি উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, হি হি হি হি।

চাঁদ ডুবিয়া গেল, সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকার আকাশ, পৃথিবী ঢাকিয়া দিল। সেই নিবিড় অন্ধকার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া গগন চীৎকার করিয়া ডাকিতে গেল, "রাসী, রাসী!" কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর বহির্গত হইল না, শুধু একটা অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া গগন অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

৩

সকালে নেশা ছুটিয়া গেলে গগন উঠিয়া বসিল এবং আপনার অবস্থা দেখিয়া আপনিই লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছি, ছি, সারা রাতটা সে এই ধূলার উপরেই পড়িয়া কাটাইয়াছে! শুধু ধূলা নয়, নেশার ঘোরে রাত্রিতে বমি করিয়াছে, আর সেই বমির উপরেই পড়িয়া সে গড়াগড়ি দিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে কি বিকট দুর্গন্ধ! কিন্তু কালু মিঞার মালটা কাল খুব তেজী ছিল। নতুবা এক ঝাঁপীতে তাহাকে এমন অঘোর করিতে পারে? এবার তাড়ী যদি আনিতে হয়, তবে কালু মিঞার দোকান হইতে। তবে একেবারে এতটা আর কখন সে খাইবে না।

মনে মনে কালু মিঞার মালের প্রশংসা করিতে করিতে গগন উঠিয়া মুখ-হাত ধুইতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রতিবেশী জিতু উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ও পারে কখন্ যাবি রে, গগনা?"

ও পারে জুতার মহাজন বদরুদ্দীন সেখের বাড়ী। সপ্তাহান্তে প্রতি রবিবারে তাহার নিকট প্রস্তুত জুতা দিয়া আসিতে হয়। সোমবারে তাহার মাল কলিকাতায় চালান যায়। রবিবারে মাল পৌঁছাইয়া দিতে না পারিলে সে সপ্তাহে মাল আর গৃহীত হয় না। গগন ছাড়া গ্রামের অনেক মুচীই বদরুদ্দীন সাহেবকে প্রস্তুত মাল দিয়া কতক নগদ টাকা, কতক বা চামড়া লইয়া আইসে।

জিতুর কথায় গগনের চৈতন্য হইল। সর্ব্বনাশ, আজ যে মাল পৌঁছাইয়া দিবার দিন। অথচ গগনের দুই জোড়া জুতাই অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কা'ল খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিলেই উহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বৈকালে রাসী আসিয়াই যত গোল বাধাইয়া দিল; গগন কাষ ভুলিয়া, তাড়ী খাইয়া পড়িয়া রহিল। এখন সাত দিন সে খাইবে কি? গেল হপ্তার যে চারি গণ্ডা পয়সা হাতে ছিল, তাহা দিয়া কা'ল সে ঝাঁপীটা কিনিয়া আনিয়াছে। গগনের ইচ্ছা হইল, ঐ খালি ঝাঁপীটা নিজের মাথায় মারিয়া মাথাটা ফাটাইয়া দেয়।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জিতু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, চুপ ক'রে রইলি যে? কখন্ যাবি; বল্ না।"

ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়িয়া গগন উত্তর করিল, "আজ আর আমি যাব না।"

"ক্যানে, মাল তৈরী হয় নি বুঝি?"

"হয়েছে, তবে এখনও এক দুপুরের কাষ বাকী।"

"দূর শালা! তা হ'লে সাত দিন তুই করলি কি? শুধু নেশা ক'রে পড়ে ঘুমিয়েছিস্ বুঝি?"

গগন এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। জিতু এখন তিরস্কারভরা স্বরে বলিল, "নাঃ, তুই শালা নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া! দেখ গগনা, আমরাও নেশা করি, কিন্তু তোর মন কাষ ভুলি নি। তুই না করলি বিয়ে, না করলি সাঙা! চেরকালটা উড়ুম্বরে হয়ে রইলি।"

দুঃখিত স্বরে গগন বলিল, "কি করবো?"

জিতু বলিল, "তোর মাথা করবি! বিয়ে না হয়, একটা সাঙা করলেও ত পারিস্। কা'ল তোর কথাই হচ্ছিল। হয় ত রাসীর মা রাসীর সাঙা দেবে। তা মাগীকে গোটা পাঁচ ছয় টাকা আর জাত-ভাইদের বোতল দুই মদ দিতে পারলেই ...

আগ্রহচঞ্চল কণ্ঠে গগন জিজ্ঞাসা করিল, "হয়?"

জিতু বলিল, "খুব হয়। তা হ'লে বল্, রাসীর মা'র সাথে কথা কই। শালুকগাছির রূপো দাসের মাগ ম'রে গিয়েছে। সে না কি রাসীকে সাঙা কত্তে চাইছে। তা তুই যদি রাজি থাকিস্, তা হ'লে এক কথায় রূপোকে হটিয়ে দেব।"

জোরে মাথা নাড়িয়া গগন বলিল, "আচ্ছা, আমি রাজি।"

জিতু বলিল, "বেশ, মোটের ওপর গোটা দশেক টাকার জোগাড় কর, আমি রাসীর মাকে ঠিক করি।"

দশ টাকা খরচ করিলেই সে রাসীকে পাইবে? আকাশের চাঁদটা হাতের এত কাছাকাছি না কি? উৎসাহ-প্রফুল্ল কণ্ঠে গগন বলিল, "আমি দশ দিনের ভেতর দশ টাকার জোগাড় করবো।"

"দেখিস্, শেষকালে আমাকে যেন ঠক্‌তে না হয়।"

বলিয়া জিতু চলিয়া গেল। গগন তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া কাযে বসিল।

৪

গগনের হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দ ধরে না। সে কত দিন হইতে যে রাসীকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, যাহাকে না পাইয়া তাহার হৃদয়টা মরুভূমির মত উদাস হইয়া গিয়াছে, জীবনটা ব্যর্থ অসার জ্ঞানে মদ ও তাড়ীর সহায়তায় তাহাকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই রাসী তাহার হইবে? গগন স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? না, জিতু যখন আশা দিয়াছে, তখন সন্দেহের কোনই কারণ নাই। জিতু তাহাদের সমাজের প্রধান, তাহার কথা রাসীর মা কখনই ঠেলিতে পারিবে না। এখন মা মনসার কৃপায় রাসী মত করিলে হয়। তাহা হইলে গগন আগামী বৎসরে দশহরার সময় জোড়া পাঁঠা দিয়া মায়ের পূজা দিবে।

গগন মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া সেই যে কাযে বসিল, একবারের জন্যও উঠিল না, কোন দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কায শেষ করিয়া যখন উঠিল, সূর্য্য তখন মাথার উপর হইতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। গত রাত্রিতে কিছুই খাওয়া হয় নাই, ক্ষুধায় সর্ব্বশরীর ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে,

গগন বলিল, "তোর-সাথে ত আমার সাঙ্গ হয়ে গেছে রাসী। তাই ত আজ স্ফূর্ত্তি ক'রে পেট ভ'রে মদ খাচ্ছি। আজ আর আমাকে পায় কে ?"

বলিয়া গগন গ্লাসের মদটা এক নিশ্বাসে গলায় ঢালিয়া দিয়া পুনরায় গ্লাস পূর্ণ করিতে উদ্যত হইল। রাসী ছুটিয়া গিয়া বোতলটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "রক্ষে কর, গগন, এত খেলে বাঁচবি না তুই।"

গগন বাঁ হাতে বোতলের গলাটা চাপিয়া ধরিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আলবৎ বাঁচবো না। যে বাঁচতে চায়, তার বাবার মাথায় মারি জুতো।"

রাসী বলিল, "বোতলটা ছাড়, গগন।"

মাথা নাড়িয়া গগন বলিল, "কভি নেহি। প্রাণ ছাড়বো, তবু বোতল ছাড়বো না। আজ পেট ভ'রে মদ খাবো।"

রাসী দেখিল, মাতালের সহিত বলপ্রয়োগ বৃথা। ইহাতে তাহার ইজ্জতের হানিও হইতে পারে। কাজেই সে বোতলটা ছাড়িয়া দিয়া দুঃখ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "ভেবেছিলুম, তোকে আর একটু সায়েস্তা ক'রে নিয়ে যা হয় করবো। কিন্তু তোর কপাল!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাসী ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। গগন পুনরায় এক পাত্র উদরস্থ করিয়া উচ্চকণ্ঠে গান ধরিল —"আমার সাধ হয়েছে করবো পিরীত বাদ সেধো না সই।"

* * * *

পরদিন সকালে প্রতিবেশীরা দেখিল, গগনের প্রাণহীন দেহ তাহার ঘরের ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছে। মদের বোতল, তাড়ীর ঝাঁপী দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, অতিরিক্ত নেশায় দম ছুটিয়া গগন মারা গিয়াছে। তাহারা দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা, ছোঁড়াটা এমনই হতভাগা যে, তিন কূলে কাঁদবার কেউ নাই।"

কিন্তু এই হতভাগার উদ্দেশে একটি অনুতপ্ত হৃদয়ের অনেক অশ্রু যে বহু দিন পর্য্যন্ত গোপনে বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শক্তি-পূজা

জাগরণের সাড়া যে আজ ছড়িয়ে গেছে সকল মনে
তোরা শুধু থাক্‌বি কি আজ আঁধার ঘরের এক কোণে ?
সেথায় ব'সে অন্ধকারে বুনবি কি রে স্বপন-জাল
নূতনেরে বাদ দিয়ে কি ভাব্‌বি শুধু অতীত কাল ?

অতীত সে ত ফুরিয়ে গেছে তারে কেন আঁকড়ে রাখা
নূতন খাতা শূন্য তোদের তাই ত তোদের অতীত সখা।
ইতিহাসের খাতায় না হয় আছে তোদের নামটা ঘোর,
তাতেই কি রে ঘুচে যাবে বর্ত্তমানের দৈন্য তোর ?

না হয় ছিল তোদের মাঝে ভগবানের অধিষ্ঠান,
আজ ত দেখি মূর্ত্তি তাঁহার ধূলায় গড়াগড়ি যান।
শক্তিমান্ ছিলেন তিনি কি ক'রে আজ বলি তবে,
ভক্তের দল দেখি যে তাঁর ভেড়ার পালের সম ভবে।

পুতুল-পূজো ক'রে ক'রে হয়ে গেছিস্ পুতুল সম
'কোনমতে বেঁচে থাকাই' কাম্য যেন শ্রেষ্ঠতম।
অত্যাচারে চুপটি ক'রে ঘরের কোণে ব'সে থাকিস্
কিংবা কোথাও পালিয়ে গিয়ে আপন মানটি বজায় রাখিস্।

কিংবা কেঁদে ধাতায় বলিস—'রাখ প্রভু এ বিপাকে
দুর্ব্বলেরি তুমিই প্রভু,—তুমি বিনা কেই বা রাখে।'
অন্তরীক্ষে ব'সে ধাতা উত্তরে ক'ন মৃদু হাসি ;—
'দুর্ব্বলের নই রে আমি,—শক্তিমানেই ভালবাসি।'
শক্তি ব'লে যেই নারীরে করেছিলি অর্ঘ্য দান
নীরব হয়ে দেখবি আজি সেই নারীত্বের অপমান ?
এ হ'তে ত আত্মহত্যা —সে যে ওরে অনেক ভাল
দেখ্‌তে নাহি হবে তবে মায়ের, বোনের অশ্রুজল।
কিংবা যদি পারিস্ ওরে শক্তিমানের ভক্ত যত
শক্তি-পূজার অর্ঘ্য দিয়ে আশিস্ নে রে মনের মত।

অসুর-জাতি

বেদপন্থী ও আবেস্থাপন্থীদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে এক স্থানে একসঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাহাকে তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া পরিচয় দিবার প্রথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যেঠা বুঝায়, তখন তেমনই ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয় দলের মধ্যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে সুরু করিলেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শতপথ ব্রাহ্মণ তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ' (১—৫-৫-২৬)। অসুররা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্য্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা 'অসুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা, পর্জ্জন্য—ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক 'অসুর'-পদবাচ্য ছিলেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

মরুৎ (৬৪।২)—তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য মর্যাসুরাঃ অরেপসঃ।

দ্যৌঃ (৩১।১)—ইংদ্রায় হি দ্যৌরসুরো ইত্যাদি।

ইন্দ্র (৫৪।৩)—বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হনা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি যঃ।

বরুণ (২।২৭।১০)—ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্ত্তাঃ।

ত্বষ্টা (১।১১০।৩)—ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং ইত্যাদি।

অগ্নি (৫।১২।১)—প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় মন্ম।

বায়ু (৫।৪১।৩)—শুণোত্বভূর্তপংথা অসুরো ময়োভূঃ।

পূষা (৫।৫১।১১)—স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি ইত্যাদি।

সবিতা (৫।৪৯।২)—প্রতিপ্রয়াণমসুরস্য বিদ্বান্ত সূক্তৈর্দেবং সবিতারং দুবস্য।

পর্জ্জন্য (৫।৬৩।৩)—চিত্রেভিরিভ্রৈরুপ তিষ্ঠথো রবং দ্যাং বর্ষয়থো অসুরস্য মায়য়া।

ইন্দ্র পূর্ব্বে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। শুষ্ণাসুর তাঁহার প্রতি মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রতিমায়ায় বধ করিয়াছিলেন। "মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।"—১।১১।৭

বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দ আছে, সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত, কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যত দিন দেব ও অসুরে মিল ছিল, তত দিন 'অসুর' বলিলে মর্য্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল, তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক এক জন অসুরের সঙ্গে এক এক জন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিত। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে কৌশলে জয়ী হইলেন। এ সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্পর্কে (১।৭।১০) দেবতারা বলিয়াছেন—"অস্মাকমস্তু কেবলঃ।" অসুরদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বারবার ডাকিয়াছেন (৮।৮৫।৯)।

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০।৫৩।৪)

অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্ততঃ ৯০টি (১।১৩০।৭) কিংবা ৯৯টি দুর্গ (২।১৯।৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও খুব তিনি দুর্দ্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এই সব দুর্দ্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভরও করিতে হইত (১০।১৫।১৩)। যখন যুদ্ধ বাধিত, ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্য দেবতার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপ্রুর কেল্লা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০।১৩৮।৩)। ইন্দ্র-বিষ্ণু অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন (৭।৯৯।৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ইন্দ্র (৬।২২।৪), অগ্নি (৭।১৩।১) ও সূর্য্যের (১০।১৭০।২) নাম হইয়াছিল—'অসুরহা।' রুদ্র ছিলেন নিজে মহা অসুর (৫।৪২।১১); অসুররা তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন (১০।১৫৭।৪), তখন দেবতারা অসুরদের শত্রু বলিয়াই উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদের ভ্রাতৃব্য বলিয়া ভৎসনা করিতেন। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে তাই দেখিতে পাই—

"এতয়া বৈ দেবা অসুরাংস্তৎ ক্রামন্নতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।"

এ সময় আর ভ্রাতৃব্য ভাই ছিল না ; ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থ শত্রু। পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না।

অসুরদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহারা গুহ্যবিদ্যা জানিতেন। এই বিদ্যার নাম ছিল—মায়া। ইহারই প্রভাবে তাঁহারা অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যখন দেবতারা অসুরদের নিকট হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, সেই সময়ে বা তাহার পরে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, সেগুলি অসুরদিগকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, দিন দেবতাদের, আর অসুরদের সঙ্গে অন্ধকার। (২-৪-২-৫)। তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলেন, রাত্রি অসুরদের (১-৫৯-২)। তবে এ কথা সকলেই বলেন, অসুররা প্রজাপতির সন্তান। পূর্ব্বে তাঁহারা দেবতাদের সমান ছিলেন। বৈদিক যুগের শেষাশেষি অসুর বলিলে আর দেবতা বুঝাইত না ; পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুর শব্দের একবারে অর্থ পরিবর্ত্তিত অসুরদিগকে রাক্ষস বলা হইয়াছে। ইহারা দেবনিন্দক। তবে প্রজাপতি যে দেব ও অসুরের পিতা, শতপথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শতপথ অসুরদিগকে মেরুনিম্নবাসী বলিয়াছেন। মায়া অসুরদের বেদ। পরাবসু ইঁহাদের হোতা। ইহাতে নমুচি অসুর, স্বর্ভানু অসুর, কপিল অসুর, কালকাঞ্জ অসুর প্রভৃতির কথা আছে। কালকাঞ্জ অসুর রাশীকৃত অগ্নিবেদী করিয়া স্বর্গে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাণে অসুরদিগের অনেক কথা আছে। পুরাণ বর্ব্বরদিগকে অসুর ও রাক্ষস এই সাধারণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অসুরগণ রুদ্রোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের শৈবও বলা যাইতে পারে। লিঙ্গপুরাণ বলেন, অসুর ও রাক্ষসগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেবাদিদেব শিবের নিকট কয়েকটি বর পান। শিবের রক্ষিত হইয়া তাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবের নিকট এক জন বিঘ্নবিনাশকারী বিঘ্নেশ্বরকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। বিঘ্নেশ্বর অসুর ও রাক্ষসদের পুণ্যসঞ্চয়ে বাধা জন্মাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর শিবের নিকট বর পাইবেন না। শিব সন্তুষ্ট হইলেন। পার্ব্বতীর গর্ভে শিবাংশ বিঘ্নেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে ও দেবতাদের শুভফল উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

মৎস্যপুরাণ বলেন, দেবাসুরে ১২ বার যুদ্ধ হয় (৩৯—৫২ অঃ)। (৫৮ অঃ) প্রহ্লাদ যখন পরাজিত হয়েন, তখন ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হয়েন। অসুরগুরু শুক্র অসুরদের ত্যাগ করিয়া দেবতাদের কাছে যান। অসুরগণ প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ না করেন। শুক্র সাহায্য করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করেন (৬০ অঃ)। কিন্তু দেবতারা আবার অসুরদিগকে আক্রমণ করেন। অসুররা শুক্রের নিকট গমন করায় আক্রমণকারীরা চলিয়া যান। শুক্র তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া সৌভাগ্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, 'যাও, শিবের ধ্যান কর ; শিবের নিকট কয়েকখানি শস্ত্র প্রার্থনা কর, তাহাদেরই প্রভাবে তোমাদের জয় হইবে (৬৫ অঃ)

আর শত্রুতাচরণ করিবেন না ; তাঁহারা তপ করিবেন। শুক্র মহাদেবের নিকট গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে একটি কঠিন অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। ১ হাজার বৎসর ঊর্দ্ধপদ হইয়া তাঁহাকে তিনি তপ করিতে বলেন। শুক্র তাহাতেই রাজি হইলেন। অসুরদের এই নিঃসহায় অবস্থায় সুযোগ পাইয়া দেবতারা তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। অসুররা শুক্রের মাতার নিকট গেলেন। তিনিও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু দেবতারা আবার আক্রমণ করিলেন। শুক্রমাতা তখন মায়াবলে ইন্দ্রকে অসহায় করিলেন। ইত্যাদি।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, অসুর হয়গ্রীব ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করেন ; বিষ্ণু তাঁহাকে হত্যা করেন। ভাগবত পুরাণে দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের কথা আছে। কল্প ও বায়ুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর কাহিনী আছে। ইনিও অসুর। এইরূপ পুরাণাদিতে অসুরদের বহু কথাই আছে। মহাভারতে বাণাসুরের কথা আছে। বাণাসুর রুদ্রো-পাসক ; তিনি বাণপ্রতীকে লিঙ্গোপাসনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাণ' হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ তাঁহাকে শিব রুদ্রোপাসক বলিয়াছেন। হরিবংশ, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ তাঁহাকে 'বাণরাজ' বলিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে "ইষুক্রিকাণ্ড" বলিয়াছেন। বাণরাজ ও তাঁহার অনুরক্ত অসুররা বাণেরই রুদ্রোপাসনা করি-তেন। মূর্ত্তিতত্ত্বে যেখানে অসুর থাকে, তাহার হাতে একটি বাণ দিবার ব্যবস্থা আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রতীচ্য সম্প্রদায়গণ সম্পর্কে বলিয়া-ছেন, -"দুরুক্তং বাচো বদন্তি।" ইঁহারা পবিত্র ভাষা বলিতেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্যগণের ভাষা জঘন্য বলিয়া তাহার নিন্দা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (৩—২।১।২৪) অসুরদের ভাষার নিন্দা করা হইয়াছে আর ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ভাষা ম্লেচ্ছিত না করেন, তজ্জন্য উপদেশ করা হই-য়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উক্তি তাই "ন ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছেৎ।" শ্রুতিও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয়ো ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ম্লেচ্ছিতং বৈ নাপভাষিতং বৈ।" পাণিনি (৬।১।১৬০) করিয়াছেন। পাণিনির সময়ে অসুররা বিশেষ যোদ্ধ্-জাতি ছিল। যোদ্ধ্, পশু জাতির সঙ্গে পশুগণের ম্লেচ্ছভাষাভাষী অসুরের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছ বলিতে 'বর্ব্বর' (Barbarian) বুঝাইত।

সংস্কৃতে 'অসুর' শব্দের ব্যাখ্যা

পুরাণে অসুর শব্দ অসু (অর্থাৎ প্রাণ) হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। বায়ুপুরাণের নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতির জঘন হইতে অসুরদের উৎপত্তি।

"ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।

অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানস্ততোঽসুরাঃ॥"—৪

ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। ১।৩৫।৭. ঋকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"অসুরঃ অসু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রূন্ ইত্যসুরঃ। অসেরুরন্। উ, ১।৪৩ নিন্দা-দাত্র্যদাতৃত্বম্। যদ্বা। অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইত্যসুরঃ।"

আরও আমরা পাই—

সমৎসরেণাসুর ইত্যুপেয়ুষা চিরায়

নাম্নঃ প্রথমাভিধেয়তাম্।

ভয়স্য পূর্ব্বাবতরস্তরস্বিনা মনঃসু

যেন দ্যুসদাংন্যধীয়ত॥—৪-৩

যে উড়াইয়া দেয়, তাহাকে অসুর বলে। বহুকাল পরে এই বলবান্ দানব অসুরনামের প্রকৃত পাত্র হইয়া উঠিল ; হিংসায় দেবগণের মনে ভয়ের প্রথম সঞ্চার হইল।

যাস্কের নিরুক্তে (৩-৮) অসুর শব্দের একটি নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যাস্ক বলেন, ব্রহ্মা 'সু' অর্থাৎ যাহা ভাল, তাহা হইতে 'সুরে'র উৎপত্তি করিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ। আর 'অসু,' অর্থাৎ খারাপ ধাতু হইতে 'অসুরের' সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অসুররা আর্য্যদিগের সঙ্গে পৃথক্ হইয়া পড়েন এবং ভারতের গণ্ডী পার হইয়া পারস্য বা তুর্কীস্তানে গিয়া বাস করেন। আর্য্যগণ যখন ভারতে বেশ জাঁকিয়া বসিলেন, তখন যে সমস্ত অসুর ভারতের বাহিরে যাইবার উপায় করিতে পারিলেন না, তখন হটিতে হটিতে প্রয়াগ, ছোটনাগপুর, মির্জাপুরের দিকে গিয়া আড্ডা

হইলেন। কতক দক্ষিণ-ভারত পর্য্যন্ত গিয়া আশ্রয় লইলেন। যাঁহারা ভারতের বাহিরে গেলেন, তাঁহাদের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইলে এখন হইতে ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ব্যাবিলনের শত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের নাম হয় অসুর বা আসিরিয়া। টাইগ্রীস নদীর উপকূলে অসুর নামে ইহার রাজধানীও স্থাপিত হয়। এসিয়ামাইনর হইতে ককেসস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই অসুরদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে সুবীররা সুমেরিয়া স্থাপন করেন। মেসোপটেমীয় জাতিরা দ্রাবিড় সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিল। দ্রাবিড়রা ভারতবাসী। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা, ভারতবাসীরা বিদেশীয় সভ্যতা ধার করিয়া আত্মসাৎ করিতে খুব পটু। আবার কাহারও বা বিশ্বাস, ভারতবাসী সভ্যতাব্যাপারে গ্রীস ও বাকৃট্রিয়ার নিকট অনেকাংশে ঋণী। ইহাদের মধ্যে আবার এক শ্রেণীর লেখক বলিয়া থাকেন যে, পারস্যপ্রভাব ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এক সময়ে যে সুমেরগণ পারস্যোপসাগরের অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এ কথা কিন্তু অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আর এই সুমেররাই যে দ্রাবিড়জাতীয়, তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেসোপটেমিয়ায় বাবিলনীয় ও আসিরীয় জাতির প্রাচীন সভ্যতার যে বিস্ময়জনক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই সভ্যতার জন্য তাহারা সুমেরদের নিকটই ঋণী।

দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। দ্রাবিড়রা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন জাতি। কেহ কেহ বলেন, ইহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারতের বাহিরে কোন দেশে বাস করিত। যদি তাহাই হয়, এখন তবে তাহাদের আদিম নিবাসের সন্ধান পাওয়া অতি দুরূহ। ইহাদের আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবস্থিত। হনলি (Hunley) মত প্রকাশ করিয়াছেন, দ্রাবিড়দের অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। স্লেটারও (Solater) অনুমান করেন, পূর্ব্বে একটি বহু বিস্তৃত মহাদেশ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াকে সংযুক্ত করিয়া অবস্থিত ছিল। ইহা এখন ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত। স্লেটারের অনুমান সত্য হইলে দ্রাবিড় জাতির পক্ষে অতি প্রাচীনকালে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা বিচিত্র নহে। কিন্তু স্যর উইলিয়ম টরনর (Sir William Turner) প্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্রাবিড়গণ ভারতবাসী।

বেলুচিস্তানের সুদূরবর্ত্তী উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে ব্রাহুইগণের বাস। ইহাদের ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার নিকট সম্বন্ধ। ইহা ভিন্ন ইহারা যে সুমের-বংশভুক্ত, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীয়ারসনের লিখিত মতগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দ্রাবিড়দিগের মধ্যে ব্রাহুইরাই বিশেষভাবে জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। অতএব সুমেররা যে ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে ঐ প্রদেশে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

ব্রাহুইরা যদি দ্রাবিড়দের জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, দ্রাবিড়রা পূর্ব্বে বেলুচিস্তানেই থাকিত, সেখান হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

ভ্রেড্রেনবার্গের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এক সময়ে বেলুচিস্তানের মরুপ্রদেশ অত্যন্ত উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু পরে জলাভাব হওয়ায় ঐ স্থান অজন্মা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়। সেই জন্য লোক বাধ্য হইয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে। সিন্ধুনদের তীরভূমি উর্ব্বর দেখিয়া অনেকে দলে দলে সেইখানে আসিয়া বাস করে। দ্রাবিড় জাতির অন্য এক শাখা অদৃষ্টান্বেষণে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া ইউফ্রেটিস্ নদের তীরে উপস্থিত হয়। ইহারা হয় পারস্যের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে বাবিলোনিয়ার সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিল, নয় সমুদ্রপথে বেলুচিস্তানের মাকরানের (Makran) সমুদ্রোপকূল হইতে উপস্থিত হইয়াছিল। সুমের ও দ্রাবিড়দের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। *

ইউফ্রেটিস্ উপত্যকার প্রাচীন জাতিরা উচ্চ সভ্যতা লাভ

* Journal of the Mythic Societyতে "First Town Planners," শীর্ষক প্রবন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহা অনুরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

করিয়াছিল। সুমের জাতিই সেই সভ্যতার পথিপ্রদর্শক। হল (H. R. Hall) এই সুমের জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুমের-সভ্যতা বাহির হইতে মেসোপটেমিয়ায় আনীত হয়, এরূপ অনুমান করিবারও অনেক কারণ আছে। সুমেররা যে ভারতবর্ষীয় কোন জাতি, ইহারা যে জলপথে এবং স্থলপথে পারস্যের মধ্য দিয়া ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিসের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম একটি কেন্দ্র, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। যে সকল অ-সেমেটিক ও অনার্য্য জাতি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে সভ্যতা বিস্তার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা এতটা ভারতীয় ভাবাপন্ন যে, তাহাদিগকে ভারতীয় জাতি বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। হল সুমেরদিগকে বিশেষরূপ ভারতীয় ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে করেন। বাবিলোনিয়ার প্রাচীন নগরগুলির ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকগণ সেইগুলির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-বাবিলোনিয়ায় উপনিবেশস্থাপনকারী সুমেররাই বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। নগরের নিম্নতম সমতল ভূমির অভ্যন্তর খনন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সুমের-সভ্যতা এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, লোক তাম্র ব্যবহার করিতেছিল। তেল্লায় (Tella) সুমের জাতির খৃষ্ট-জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বের তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতের মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা যায়, বাবিলোনিয়ায় প্রাপ্ত যন্ত্র সকলের সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুমেররা নগরনির্ম্মাণে ও জলপ্রণালী খননকার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিল। যত দূর ইতিহাসে জানিতে পারা যায়, সুমেররাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের পূর্ব্বে নগরনির্ম্মাণ-কৌশল আবিষ্কার করে।* তাহাদের প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া নগর-দেবতা থাকিত। তিনিই নগরস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দেবতার যিনি প্রধান পুরোহিত, তিনি বংশানুক্রমে নগর শাসন করিতেন। প্রাচীন বাবিলোনিয়ার প্রধান নগর নিপ্‌পুরে যে দেবমন্দির ছিল, তাহা এনিল (Ennil) দেবকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই এনিলদেবের নামের সহিত দ্রাবিড় জাতির চন্দ্রদেবের নামের বেশ মিল আছে। বাবিলোনীয় পুরাণে দ্রাবিড়দের সূর্য্যদেবের নাম Bal পাওয়া যায়। নিপ্‌পুরের মন্দিরে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। সেইগুলির সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইতে পারে যে, খৃষ্ট-জন্মের ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বের সুমেরগণ বহু জনাকীর্ণ সুশাসিত নগরে বাস করিত। ঐ সময়েরও বহু পূর্ব্বে তাহারা সভ্যতাসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়েও তাহারা ধাতু-নির্ম্মিত বস্তু ব্যবহার করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তখনও তাহারা লিখিতে জানিত।

সুমেরদের যে সকল ক্ষোদিত মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেই সকল মূর্ত্তিতে দেখা যায়, সুমেররা মুণ্ডিতমস্তক ও লোহিত পরিচ্ছদাবৃত। তাহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদে দ্রাবিড় জাতিদের সঙ্গে এতটা মিল যে, এই উভয় জাতি যে একই সাধারণ জাতিসম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

এই সুমেরদিগের দ্বারা মেসোপটেমিয়ায় বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। সুমের-আগমনের পূর্ব্বে আসিরীয় সভ্যতা বাবিলোনীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সুমের-সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া আসিরীয় সভ্যতা বাবিলোনীয় সভ্যতা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। এই উভয় জাতির শারীরিক গঠনের পার্থক্য ছিল না। ভাষাতেও সম্বন্ধ নিকটতর ছিল। কিন্তু তাহাও শেষে জাতীয় চরিত্রে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। আসিরীয়গণ সবল, দৃঢ় এবং যোদ্ধৃজাতি, সমরসজ্জাতেই ইহাদের সভ্যতাবিস্তার। ইহাদের বন্দীরা বড় বড় মন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রাচীর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিত। স্ত্রীলোকরা শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি করিত। কৃষিব্যাপার ক্রীতদাসদিগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। আসিরীয়গণ বীরের পূজা করিত। অসসুর বা অসুর ইহাদের জাতীয় দেবতা। ইনি প্রথমে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন, পরে জাতির উপাস্য হয়েন। আসিরীয় প্রভাবের সময় এই দেবতার বলে আসিরীয় রাজা শত্রুজয় করিয়াছিলেন। ইহারা দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিত। ইহাদের লিপি বা অনুশাসনগুলি সুমেরীয় ভাষায় লিখিত। ইহাদের মধ্যে গুরুপুরোহিতের

প্রভাবান্বিত হইয়াছিল যে, তাহাদের শাসনদণ্ড ককেসস্ হইতে ভারতসাগর পর্য্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগর হইতে গঙ্গার উপত্যকাভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বীরজাতির শৌর্য্যবীর্য্যের প্রভাব চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল।

আসিরীয়ার প্রাচীন রাজধানীর নাম 'অস্সুর।' পূর্ব্বে অস্সুর ইহার মাত্র গ্রাম্য দেবতা ছিল আসিরীয়া যেমন মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল, অমনই তাহার গ্রাম্য-দেবতা জাতীয় দেবতায় পরিণত হইল। কিন্তু অস্সুর নাম অক্ষুণ্ণ রহিল। এই দেবতা একটু জটিল রকমের ছিল। ইহার উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল, তাহাও সমস্যার বিষয়।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা নানা রকমে অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, অস্সুর দেবতা সুমেরিয়া হইতে সমানীত হইয়াছিল। এই কথা বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি আছে। বাইবেলের Genesis-এর দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে পাওয়া যায়,—"Out of that kind (shiner) went forth Asshur, and builded Nineveh" Delitzsch ও Jastraw Asshur বা Ashurকে Ashirএর সহিত অভিন্ন মনে করেন। অস্সুর হয় ত Etana বা Gilgameshএর মত এক জন বীর ছিলেন। ইঁহারই নাম হইতে অস্সুর নাম হইয়াছে। আসিরীয় লিপির অক্ষরগুলি শরমণ্ডিত। আসিরীয়গণ 'শ'র স্থানে 'স' উচ্চারণ করিত আর 'অস্সুর' ও 'অসুর' উভয় পদই ব্যবহার করিত। দেববাচক অসুরের বানানে দুইটি শায়িত শর। কিন্তু কোথাও আবার একটি শরও দেখা যায়। ঐরূপ শায়িত শর আমাদের 'স' স্থানেই ব্যবহার করা হইত। কাজেই আসিরীয়গণ যে অসুর শব্দ ব্যবহার করিত, তাহা বলিতে পারা যায়। অসুর শব্দ হইতে আরও অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। "অসরিদ" (asarid), "অসরিদুত" (asariduta), "অসরিদ্দন" (asariddan), "অসুরিতে" (asurite), অসর্‌রিতে (asarrite), "টেলসুর্‌রি (Telasurri) পদগুলি সবই 'অস্সুর' হইতে ব্যুৎপন্ন। এই সকল পদে দুইটি 'স'র একটি সমূলে বিলুপ্ত। সুতরাং অসুর ও অস্সুর লইয়া বিশেষ গোলে পড়িতে হয় না। আসিরিয়ার ভাষায় অসরিদ শব্দের অর্থ প্রধান, বিখ্যাত; অসরিদুতের অর্থ প্রাধান্য, খ্যাতি; অসরিদ্দনের অর্থ প্রধান; অসুরিতে বলিলে প্রধান বুঝায়। অসর্‌রিতের অর্থ উচ্চ; তেলসুর্‌রি একটি উন্নত বা বিখ্যাত দেশের নাম।

ভারতীয় অসুর ও আসিরীয় অসুর যে এক সময় এক জাতি ছিল, তাহা বলিবার পক্ষে কয়েকটি প্রমাণ দিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসিরীয় অসুররা তাঁহাদের শ্মশান করিতেন দুই রকমে। এক রকম শ্মশান ছিল তাঁবুর আকারের; আর এক প্রকার শ্মশান তাঁহাদের ছিল ডিম্বাকৃতি মৃৎপাত্রাকারের। এ দিকে আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি, দেবতাদের শ্মশান ছিল চতুরস্রাকার, আর এক শ্রেণীর অসুরদের শ্মশান গোলাকৃতি ছিল। "যা আসুর্য্যা প্রাচ্যাস্ত্বদ্ যে ত্বৎ পরিমণ্ডলানি (শ্মশানানি কুর্ব্বতে)"—১৩।৮।১।৫। এই প্রাচ্য অসুররা কাহারা এবং কোথায় থাকিত, এখন স্থির করা সহজ নহে। কোন কোন পণ্ডিত প্রাচ্য অর্থে মগধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, শতপথের লেখক মিথিলাবাসী তাঁহার উল্লিখিত প্রাচ্যদেশ বলিলে মিথিলা হইতে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী কোন স্থান বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রাচ্য এবং মগধ পৃথক্ পৃথক্ দেশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ থাকায়, প্রাচ্য অর্থে মগধ ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতীয় অসুর ও আসিরীয় অসুরদের শ্মশান একই রকমে হইত।

দ্বিতীয়তঃ—আসিরীয় অসুররা মার্দুকের প্রতীক পূজা করিত। এই প্রতীক বাণাকৃতি। ইহারা Storm Godএর উপাসনা করিত। ভারতীয় অসুরগণ ছিল রুদ্রোপাসক। বেদে রুদ্রও Storm God। অসুরদের উপাসনার প্রতীক যে বাণ ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বাণাসুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর ভারতীয় অসুরদের বিদ্যা ছিল মায়া। আসিরীয় অসুরগণও ইহার যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে G. Smith 'Assyrian Discoveries' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, এগুলি যাদুতে ব্যবহৃত হইত। British

রক্ষিত আছে। এই মিউজিয়মে আর একটি Bronze রাক্ষস-মূর্ত্তি আছে (No. 574)। এটিও বাড়ীতে ব্যবহৃত হইত। ইহারা যে নানা রকমের রক্ষাকবচ ব্যবহার করিত, তাহার বহু নিদর্শন এখন পাওয়া গিয়াছে। (Western Asiatic Inscriptions 11, 67, r. 29 দ্রষ্টব্য।)

ভারতীয় অসুরগণ দুর্গ-নির্ম্মাণপটু ছিল। বেদে তাহার বহু নিদর্শন আছে। আসিরীয় অসুররাও এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার পর মিটানি রাজ্যের সহিত যে আসিরীয় রাজ্যের যুদ্ধব্যাপার, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। Tel-el-Amarna হইতে Tusratta যে পত্রগুলি মিসরের তৃতীয় Amenhotep-কে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সময় boghas-koi লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুসরত্ত, অর্ত্তম, সুবর্ণ, অর্ত্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন, তাহারও বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। সে অনেক কালের কথা। এগুলি যে আর্য্য নাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার পর ৫ শত বৎসর কাশীয় জাতি (১৭৩৬—১১৮০ পূঃ খৃঃ) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের ও দেবতাদের নাম আর্য্য নাম। ইঁহাদের Shurias Marytas সূর্য্য ও মরুৎ। Simalia আর্য্যদের হিমালয়। অনেক পরে অসুরবনিপালের লাইব্রেরীতে (৭০০ পূঃ খৃঃ) আসিরিয়ার ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন, তাঁহাদের একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে। ৭ জন ভাল angel এবং ৭ জন খারাপ spirit-এর পূর্ব্বেই একটি নাম আছে—Assara-Mazas। Asara-Mazas যে অসুর মজদা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ইঁহার নাম ৭ জন Amesha spentas ও ৭ জন Daivaর সঙ্গে থাকে। এখানেও তাই। ইরাণীদের অহুর শব্দও অসুর শব্দের মত মর্য্যাদামূলক।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আসিরীয় অসুরদিগকে এ কথা স্বীকার্য্য, প্রমাণের জন্য আরও উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এখন একটা মস্ত কথা বিচার্য্য। আসিরীয় লিপিগুলি পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে ইঁহারা তাম্রপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবহার্য্য তাম্র এসিয়া-মাইনর হইতে আনিতেন। বর্ত্তমান ভারতে আমরা একটি জাতি দেখিতে পাই। এই জাতির নামও অসুর। ইহারা ছোট নাগপুরে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা ৪ হাজার ৮ শত ৯৪। ইহারা আজও প্রাথমিক জাতির ন্যায় কাঠের বুমরাং অস্ত্র ব্যবহার করে। জাতিতত্ত্বে ইহারা কোলেরীয়। প্রাচীনকালের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত অসুরদের ইহারা বংশধর কি না, তাহা বলিবার মত কোন প্রমাণ নাই। তবে ইহারা যে প্রাচীন জাতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। উত্তর-পশ্চিম হইতে কোলেরীয় ও দ্রাবিড় জাতি ছোট নাগপুরে প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের কোন স্থান হইতে আর্য্যদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ইহারা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকভাবে এখানে বাস করিত। ছোট নাগপুরে এখনও তামার খনির চিহ্ন পাওয়া যায়। এখানকার প্রবাদ যে, অসুররাই এই তামার খনিতে কায করিত। তামার খনিগুলিও অতি প্রাচীন। যে সময় সে খনিগুলিতে কায হইত, তাহা এখন হইতে ২ হাজার বৎসরেরও কম নহে। কোলরা যখন আর্য্যদের ভয়ে ছোট নাগপুরের পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহারা এখানে এই অসুরদিগকে দেখে।

তমোলুক অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি নামের কারণ এত দিন ঠিক ধরা পড়ে নাই। কেহ কেহ ভাবিতেন, তামল বা দামল জাতিরা এখানে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম তামলিপ্তি বা দামলিপ্তি। এ নামেও যে এক সময়ে তমোলুকের প্রসিদ্ধি ছিল, তাহারও সাহিত্যিক প্রমাণ আছে। তামল-দ্রাবিড়গণ এক সময়ে তমোলুক অধিকার করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ইহাদের অধিকারেরও পূর্ব্বে তমোলুকের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। তামার লেপা (তাম্র দ্বারা লিপ্ত) বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল তাম্রলিপ্তি। কিছু কাল পূর্ব্বে তমোলুকের নিকট সিংভূম ও ধলভূমের

সিংভূম হইতে 'গাঙপুর ষ্টেট্' পর্য্যন্ত ৪০ ক্রোশ ব্যাপিয়া তামার খনি ছিল। ভূতাত্ত্বিকরা এই তামার খনিগুলির নিদর্শন মাটী খুঁড়িয়া পাইয়াছেন। অনেক Dolmenও পাইয়াছিলেন। এই ১০ ক্রোশ স্থানকে স্থানীয় লোক 'অসুরগড়' বলে। 'অসুরগড়' দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। পুর্ণিয়াজিলার জলালগঞ্জ গ্রাম হইতে ইহা ৪ মাইল ও মহানন্দার সামান্য একটু পূর্ব্বে। দুর্গটি খুব প্রাচীন। এই সমস্ত স্থানের তামা তমোলুক বন্দর দিয়াই যাইত। তমোলুক বন্দরে তামা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিত। নিজামরাজ্যেও ঠিক এইরূপ তামার খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানেও অনেক dolmen আছে। বর্ত্তমানে মুসলমানরা এই যায়গাকেও 'অসুরগড়' বলে। দ্রাবিড়গণ ইহাকে 'রাক্ষসগুড়িয়ম্' বলে। সুপ্রাচীনকালে এখানকার তামাও তমোলুক বন্দরে আসিয়া জমা হইত। তমোলুক-বন্দর দিয়া যে তামা ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাইত, তাহা অনুমান করিবার কারণও আছে।* আমরা দেখিতে পাই যে, আসিরীয় অসুররা তামা ব্যবহার করিত। তাহারা যে ভারতীয় অসুরদিগের ন্যায় তাম্রপ্রিয় জাতি, এসিয়া-মাইনর হইতে তাম্র-আনয়নই তাহার প্রমাণ।

তাম্রশাসনেও অসুরদের রাজত্বের কথা পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত আমি দুইটি অনুশাসনের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কীলহর্ণ ১০৮৪ বিক্রমাব্দের পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর রাজ্যপালদেবের পাদানুধ্যাত ত্রিলোচন পালের তাম্রশাসন সম্পাদন করেন। ত্রিলোচন পাল প্রয়াগ-সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাসকালে অসুরাডকবিষয়ান্তর্গত লেড়ুণ্ডাক গ্রামে যে সমস্ত রাজপুরুষ ও ব্রাহ্মণোত্তরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ প্রদান করেন। তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁ স্বস্তি শ্রীপ্রয়াগসমীপ-গঙ্গাতটাবাসে পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীবিজয়পালদেব-পাদানুধ্যাত-পরম-ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীরাজ্যপালদেব-পাদানুধ্যাত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীমত্ত্রিলোচন-পালদেবঃ অসুরাডকবিষয়ে লেড়ুণ্ডাকগ্রামে সমুপগতান্ রাজপুরুষান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ।

কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের দ্বিতীয় তাম্রশাসনেও অসুররাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অনুশাসনে ২০শ ছত্রে আমরা পাই :—

"অসুরেশপত্তলায়াং কমৌলীগ্রামবাসিনো নিখিলজন-পদানুপগতানপি চ রাজরাজ্ঞী-যুবরাজ-মন্ত্রি-পুরোহিত-প্রতীহার, সেনাপতি——————"

বেহারের অন্তর্গত রাজগিরে "জরাসন্ধকী বৈঠক" আছে। ইহা অতি প্রাচীন। ফর্গুসনের মতে ইহা প্রাক্-মৌর্য্যযুগে নির্ম্মিত। আসিরিয়ায় Birs Nimrudএর ইহা ঠিক নকল বলিলেও চলে। আসিরিয়ার অসুরদের সঙ্গে ভারতীয় অসুরদের আদান-প্রদান ছিল। ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

* তাম্রলিপ্তি নাম যে তামার লেপা বলিয়া হইয়াছিল, তাহার সন্ধান ও কারণগুলি আমার বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রথমে আমাকে বলেন। তাঁহার এই সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। দ্রাবিড় সম্পর্কেও তিনি কয়েকটি উপকরণ দিয়াছেন। সেই উপকরণগুলিও এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্যও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

* Indian Antiquary ১৮৮৯ পৃঃ ৩১।

অবজ্ঞাত

কতই কমল পদ্মবনে,
ফুটে উঠে সঙ্গোপনে,
সব কি তপন জানে ?
চন্দ্র কি তার খবর রাখে,
কলমী-লতার ফাঁকে ফাঁকে,
কত কুমুদিনী চাহে
তাহার বদন পানে ?

মোর হৃদয়ে কত আশা
কত যে প্রেম-ভালবাসা,
জানলে না ক' তুমি ;
জানতে যদি হে মোর প্রিয়,
পাষাণ হ'ত হৃদয় কি ও ?
অবাক্ করে দিতে আমায়
সোহাগভরে চুমি'।



ত্রিবেণী

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মানুষের মনের ভিতরের নিভৃত কোণে কোথায় যে কাহার কতখানি দুর্ব্বলতা লুকানো থাকে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার কোন খোঁজ-খবরই হয় ত থাকে না। আবার হঠাৎ এক দিন এমনই একটা তুচ্ছ ঘটনায় সেটার এতই আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ হইয়া পড়ে যে, সে অভিব্যক্তিতে আর পাঁচ জনের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার নিজেরও মনে ইহাতে বড় কম বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়া পড়ে না। এমন নীরবে, সঙ্গোপনে যে কেমন করিয়া এই তুচ্ছ বস্তুটা বাড়িতে বাড়িতে আজ এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, মাসেক আগেই বা এ খবরটা কে জানিত! আসল কথা, সকল মানুষের ভিতরেই দুইটা দিক্ আছে—তাহার মধ্যে একটা বাস্তবের দিক্, আর একটা কল্পনার দিক্। তাহার মধ্যে কাহারও একটা, আবার কাহারও ভিতর অপর অংশটাই সমধিক প্রবলতর। নিছক বস্তুতান্ত্রিক বা নিছক ভাবতান্ত্রিক লোক সংসারে কম। ভীম লোকটিকে লোক এবং সে নিজেও এত দিন ধরিয়া সোজাসুজি বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া জানিয়া রাখিলেও হঠাৎ সে দিনের সেই ঘটনায় তাহার বাহিরের বহিরাবরণ খসিয়া পড়িয়া গেল। আর ভিতরের দিক্ হইতে যেন একটা উদ্দামভাবের স্রোত পর্ব্বতমালার প্রচণ্ড বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া দুর্জ্জয় বেগবান্ নির্ঝরধারার মত আতপতপ্ত মরুবক্ষে সুশীতল সলিলপ্রবাহী তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল। জীবনের সেই দিব্যক্ষণে চিরপরিচিতার এই নবপরিচয়ের মুহূর্ত্তে জীবনকে তাঁহার আজ যেন সম্পূর্ণ নবীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইল। সন্ধ্যার শুভশঙ্খ যেন তাহাদের এই মিলন-মুহূর্ত্তটিকেই শুভতর করণের সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পুনঃপুনই সান্ধ্য-গগনকে আনন্দ-চকিত করিয়া তুলিল। দূরস্থ সঙ্ঘারাম মঙ্গল-মিলনের মন্ত্রপাঠ বলিয়াই তাহার বোধ হইল। মনে মনে সে নিজের ইষ্টদেব-দেবী শিব-ভবানীর চরণোদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল।

দুই জনে পাশাপাশি পথ চলিতেছিল। ক্ষুৎপিপাসা দুই জনকেই কতকটা কাতর করিলেও এই নবোন্মাদনার নবীনতর অভিব্যক্তিতে তাহারা সেই তুচ্ছ অসুবিধাটাকে সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। মন যখন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, ভরানদীর বিশাল বক্ষের মতই তখন তাহাতে স্বতঃই অসীমের ছায়া পতিত হইয়া তাহাকেও সেই ছায়ানুপাতে উদারতর করিয়া দেয়। ক্ষুদ্রতার সহিত তখন যেন তাহার সকল সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। চপলতা তাহাকে তখন কোনমতে আর স্পর্শ করিতে পারে না।

কথাবার্ত্তা তাহাদের মধ্যে বেশী কিছু হয় নাই। নির্জ্জন পথের শেষে জনবহুল বিপণি-পরিশোভিত সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াই উজ্জ্বলা তাহার মোটা ঠেঁটীর আঁচল তাহার চরণবিলম্বী কেশের রাশির উপর দিয়া মাথায় ভাল করিয়া টানিয়া দিল এবং চুপি চুপি ভীমের উদ্দেশ্যে কহিল,—"একটু আগ বাড়িয়ে চ'লে চলো গো, আমি একটু পাছ ক'রে যাই, কে কোথা দিয়ে বন্ধু-কুটুমে বান্ধব-সজ্জনে দে'খে ফেলবে।"

ভীম হাসিয়া তাহার নাকের নতনিখানায় দোলা দিয়া দিল—"এমন অবুঝপানা দেখিনি। ও তোর মিছে লজ্জা। যখন বাড়ী ছেড়ে লাফ পাড়তে পাড়তে এই পথটা দিয়েই ছুটেছিলি, তখন বন্ধু-কুটুম বান্ধবসজ্জনের ডর-ভয় কার চালের বাতায় গুঁজে রেখে দিয়েছিলি বল্ ত?"

উজ্জ্বলা স্বামীর প্রতি সপ্রেম অনুযোগে কুটিল কটাক্ষ হানিয়া হাসিয়া জবাব দিল,—"তখন যে আমায় ভূতে পেয়েছিল, তখন কি আর আমি, আমি ছিলুম গো!"

সারাদিনের পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করিল। সে গৃহ তখনও কলরবমুখর হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া শিশু তারস্বরে চেঁচাইয়া কাঁদিতেছে, "আমার দাদা বউ কোটা লে! আমায় লূপ কথা বল্তে আয় না লে!"

তাহার মা তাহাকে চুপ করাইতে না পারিয়া ক্রমান্বয়ে দুই জনেরই উদ্দেশ্যে গালির বান ডাকাইয়া দিয়াছেন এবং হস্ত-সীমানার অভ্যন্তরে যেটাকে পাইয়াছেন, দু'জনকার ভাগের সারটা তাহারই উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। রান্নাঘরের দিক হইতে আরও একটা মৃদু করুণ ক্রন্দনধ্বনি হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া প্রেতিনীজাতীয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ অবিশ্বাসীর চিত্তেও সন্দেহোদ্রেক করিতেছিল।

উজ্জ্বলা ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে সাপটাইয়া ধরিয়া শিশু দেবরটিকে কোলে তুলিয়া লইল, আঁচল দিয়া তাহার অশ্রুধারার সমপরিমাণে ধূলিলিপ্ত মুখখানা মুছিতে মুছিতে স্নেহ-বিগলিত সম্ভাষে তাহার কানের কাছে কহিল, "এই যে আমি এলাম রে বিশে। রূপকথা আমিই তোরে শোনাব, আয়।"

শিশু আনন্দে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল; "ওলে আমাল নাঙ্গাবউ এরেচে লে! তোলা দেখ্বি আয় লে।" বলিয়া একটা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিয়াই তাহার গলাটা দুই হাত দিয়া দৃঢ় করিয়া জাপটাইয়া ধরিল।

"দুত্তু ছেলে! কেন টুই পালিয়ে গিইছিলি! লাবি? আর কক্কণো দাবি? শীগ্‌গির বল! ডলি দিয়ে টোকে বেঁদে লেকে ডোব না। টোকে মালবো না! টোকে গালি দেব না—"

সে যে অপরাধীকে লইয়া কত শাস্তিই দিবে অথবা কি করিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাহার আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত গালের উপর ফোঁটাকয়েক অশ্রুবিন্দু দেখিয়াই গভীর অনুতপ্ত লজ্জায় একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া গিয়া সাশ্চর্য্য বেদনায় চমকাইয়া বলিয়া উঠিল, "টুই কাঁদ্‌চিস্ বৌ! না—না, টোকে মালবো না, টোকে কিছু বলব না, টুই চুপ কল!" বলিয়া মিনতি-ভরা চোখে চাহিয়া তাহার সেই অশ্রুসিক্ত গালের উপর পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল এবং তাহার নিজের চোখেও আবার জল দেখা দিল।

উজ্জ্বলাও গভীর কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে আদর করিয়া ভুলাইয়া কোলে করিয়া দাওয়ায় উঠিল।

"আই, আই! কি লজ্জা লো! বলি পাড়াঢলানি! পাড়া জ্বালিয়ে তোর হ'ল না, শেষে কি না দেশ ঢলালি! কোন্ মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকলি লো, চলোমুখি!"

দিদিশাশুড়ীর এই সাদরসম্ভাষণে পরম আপ্যায়িত বোধ না করিয়া উজ্জ্বলা ইহাতে কর্ণপাতমাত্র না করিয়াই ক্রোড়স্থ শিশুকে কহিল, "বারেকের তরে নেমে দাঁড়াও ত দাদা, আগুন দেখছি করা হয়নি, একটু ক'রে দিই।"

বিশু তাহাকে দুইটা লম্বা লম্বা হাতের কাঁকড়ার দাঁড়ার মত সরু আঙ্গুল কয়টা দিয়া সাপটিয়া ধরিয়া রাখিল, প্রবল আপত্তিতেও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "টুই আমায় কোলে নিয়ে আগুন জ্বাল, আমি টো নাম্‌বো না।"

অন্য দিন হইলে এই অসঙ্গত আবদারের প্রশ্রয় নিশ্চয়ই উজ্জ্বলা দিত না, কিন্তু আজ সে স্নেহসকরুণ মৃদুহাস্যের সহিত তাহার অকৃত্রিম ভালবাসার কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল।

"চল্, তবে তাই সই"—বলিয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণেরও জন্য রাক্ষসী মূর্ত্তি দিদিশাশুড়ীর সান্নিধ্য এড়াইল।

"বলি, সেই ত মল খসালি, তবে লোকটা ক্যানে হাসালি? বলি, সেই ঘরেই যদি ফিরলি, তবে দেমাক দেখিয়ে মদ্দর মত সাত হাত বুক ক'রে পথে বেরুলি ক্যানে?"

"ওলো দিদি! হাঁ লো, তোর সঙ্গে সঙ্গে মরদপারা কাকে যেন দেখছিলাম না, বলি, আবার একটা মিন্‌ষে জোটালি কমনে থেকে লো? ও কি রাজবাড়ীর দরওয়ান না কি লো? তোকে পৌঁছে দিতে এয়েছে?"

উজ্জ্বলা দুই জায়ের দুই রকম প্রিয়ভাষের উত্তরে একটুখানি অন্তর হাস্যমাত্র করিয়া সে জার কথারই উত্তর দিল, "মরণ! বলি, জলজ্যান্ত ভাসুরটাকেও চিন্‌তে পার্লিনে ছুঁড়ী! চোখে কি তোর চাল্‌সে ধরল না? সেজ দেওরকে বলিস, বদ্দির কাছকে গিয়ে ফোঁটারু পদ্মমধু এনে দেয়।"

ভীম যে নিজেই তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া সেজবৌএর বুকে যেন ফুটন্ত ভাত-শুদ্ধ হাঁড়িটাকে চুল্লীর উপর হইতে টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে, এমনই তাহার বোধ হইল। মুখখানা

কেন্দে চাঁড়ীর মত ভারী করিয়া, কণ্ঠের মধ্যে এক মণটাক বিষ ভরিয়া সে তাহার প্রতি সেই বিদ্বেষে একটা সুতীক্ষ্ণ শরক্ষেপ করিয়া বসিল।

"কি জানি, ভাই! আজকাল না কি রাজারাজড়ার সাথেই শুনতে পাই তোমার ভাবসাবটাই বেশী, তা আমার গরীব-ফকির ভাসুরের বরাতে যে তোমার সাথে পথ চলার সুখ ঘটেছে, তা আর কেমন ক'রে জানব বল্!"

এই তীক্ষ্ণ এবং নিহিতার্থক বিদ্রূপবাণে উজ্জ্বলার নির্ভীক ও নবপ্রাপ্ত সুখ-লঘু চিত্তকে সে বাস্তবিকই বিঁধিতে পারিয়াছিল। উজ্জ্বলা সহসা চঞ্চল-বিমনা হইয়া উঠিল, এ সংবাদ কেমন করিয়া ইহাদের কর্ণগোচর হইল! বিশু ভিন্ন সে দৃশ্যের ত সাক্ষী কেহই ছিল না? আর বিশুও কিছু তাঁহাকে চিনিত না, তবে?—এ কি প্রহেলিকা!

কিন্তু এ সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাটি করিয়া কোন কথাই উঠাইবার ভরসাও উজ্জ্বলার নির্ভীক মনের মধ্যে আদৌ হইল না। স্বামীর কাছে সে ত সকলই জানাইয়াছে, কিন্তু এদের? অসম্ভব! কে তাহার কথায় প্রত্যয় করিবে?' কপালে তাহার ঘাম দেখা দিল।

আর সব যাই হোক, স্বামীর আদর, স্বামীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া উজ্জ্বলার বুকখানা আজ এতই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল যে, সেখানে ভয়, চিন্তা, বিদ্বেষ, অপমান কিছুরই যেন ভাল করিয়া স্থান হইতে পারিতেছিল না। শাশুড়ী আসিয়া দেখিলেন, রান্নাঘরের মধ্যে উজ্জ্বলা ডালে কাঠি দিতে দিতে দ্বারে উপবিষ্ট এক দল ছোটমেয়েকে রূপকথা বলিতেছে। যেমন সে রোজই করে, ঠিক তেমনই। মনে হইতেছিল যে, যেন কোন কিছুই ঘটে নাই; সে যেন ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই,—কিছুই না। এ দৃশ্যে যদিও এক দিকে শাশুড়ীর মনটা একটুখানি ঠাণ্ডা হইল, অর্থাৎ গতর খাটাবার মানুষটাকে তাহার নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ও-দিকটার সম্বন্ধে মন নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু আজ না কি শুধু ঐটুকুতেই সাঙ্গ করার অবস্থা ছিল না, তাই মনে মনে খুসী হইয়াও তাঁহার খুসী হওয়া চলিল না। কি একটা নূতন কথা মনে পড়িয়া দাওয়াতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আলো কালামুখি! বলি, দেশশুদ্ধ ত গুণ-গৌরব সব চাক মেরে গেছে। বলি, তারই জন্যে বুঝি অত বড় বুকের পাটা হয়ে উঠেছিল, যা লো বারুণ-খাকি! তা গেছলি যখন, তখন রাজার রাণী হয়ে পাটশালে গিয়ে বস্‌লিই ত হ'ত! ছোটনোকের ঘরকে ফিরে আলি কেনে বল ত, নোক হাসাতে? নে, আশুরকে করতে চাস ত উঠে লহড় দে; নৈলে হেঁতালীর বাড়ি থেকে আজ তোরে যোমার ঘরকে পাঠিয়ে দোব।"

সেজ বধূর মুখে যে আসন্ন ঝড়ের আভাস সে বাড়ী ঢুকিয়াই পাইয়াছিল, এখন তাহাকেই উদ্যত দেখিয়া উজ্জ্বলার যেন মাথা ঘুরিয়া গেল। এই যে ভীষণ কলঙ্ক তাহার রটাইয়া তোলা হইতেছে, ইহার এতটুকু আভাস ইঙ্গিতও যে তাহার কোন দিন সহ্য হয় নাই, আজ সকালেও সে শাশুড়ীকে এই হীন ইঙ্গিত দিতে উদ্যত দেখিয়া তাহার জিভ টানিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিতে গিয়াছিল। আর ইহারই মধ্যে এত বড় ভয়ানক কথা কেমন করিয়া রটিয়া উঠিল, তাহা ভবানীই জানেন। আজ এতখানি গ্লানিরও সে ভাল করিয়া একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছিল না। অথচ তাহার মন ত ভাল করিয়াই জানে যে, ইহার মধ্যে একটুখানি সত্য সংবাদ থাকিলেও এই ভয়ঙ্কর অপবাদের কতখানিই মিথ্যা।

চিরমুখরাকে নির্ব্বাক্ ও অধোমুখী দেখিয়া সনকা যেন বিজয়োল্লাসে নাচিয়া উঠিল। "আলো বারুণ (ঝাঁটা)-খাকি! আমি তোরে আগে হতেই চিনেছিলুম, মন্তর দিয়ে শেকড়-মাকড় দিয়ে 'পো'ড়ারে আমার বশ কর্‌লি, তাই তোর এত দেমাক চল্‌লো। নৈলে তোর ঐ যে কথাকে বলে,—

> 'ঘরে আকা বাইরে র'াধে
> অল্প কেশ ফুলিয়ে বাঁধে,
> ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়,
> এ মেয়ে হ'তে ঘর উজাড়।'

এ আমি শতেক দিন হ'তেই জানি। তোমাকে এমন কথা আমি বলেওছি, কতেক দিন,—আদি রে ভীমে! শোন কথা! আজ লেদ্দা সিদ্ধা, মেজুনি সেজুনি সব মইপাল দীঘির জলকে যেয়ে সৈখানথে শুনে এসেছে যে, তোর ওই খণ্ড-কপালী সোহাগে বউ রাত-বিরেতে জলকে যেয়ে মহা-রাজাধিরাজের সঙ্গে ঠাট্টা-হাঁসি ক'রে আসে, এ না কি কেউ

কেউ আপন চোখে দেখে তবে বলেছে। আমি তোকে বলেছিলুম, ভীমে, ও কটা চামড়া তোর জন্যে নয়। মায়ের বাক্যি কি মিছে হয় রে হাবা!"

স্বামীকে আসিতে দেখিয়া উজ্জ্বলার দুশ্চিন্তাভীত ব্যাকুল চিত্ত কতকটা শান্ত হইয়াছিল। সে উচ্ছলিত অশ্রু নিরোধ পূর্ব্বক উপবাসক্লশ পরিম্লান মুখে ঈষৎ ঘোমটা খসাইয়া কাতর আত্মসমর্পণের ভাবে স্বামীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ চক্ষুতে চাহিল। তাহার ভাগ্য এখন শুধু তাহার স্বামীর মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করিয়া আছে। সে যদি এই সময় বুকে একটু বল করিতে না পারে, তবেই অভাগিনীর সকল আশা জন্মের মতন ফুরাইয়া যায়। নব-জীবনের জীবন-প্রভাত কতটুকু আগেই বা তাহার তরুণ চিত্তকে তরুণ ঊষার সোনালী রঙ্গে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল! ইহার মধ্যেই কি তাহার সকল সুখের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে?

ভীম মায়ের এই নিদারুণ অভিযোগে একটুখানিমাত্র নীরব থাকিয়া একবার দুঃখস্নিগ্ধ করুণ চোখে বধূর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার পরে বাস্তবিকই আজ সে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া সংক্ষুব্ধ চিত্তে মায়ের প্রতিবাদে কহিল,—"ও সব কথা মন্দ লোকের রটনা, তোরা সকল কথাই শুনিস্ কেন? নে, এখন গাল-মন্দ তুলে ধ'রে দুমুটো কিছু খেতে দিতে বল্ দেখি, সারাদিনটে যে উপস দিচ্ছি, সেটা কি একবার ভাবিস্ নে?"

ছেলের জবাবে মা'র মনে বিস্ময়ের সহিত ক্রোধ সমান ওজনেই দেখা দিল, তিনি অবাক্ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জবাব করিলেন,—"আই লো আই। হেঁরে পোয়ে! বউটোর বিজুলীর পারা রংডাই কি তুই বড় করলি রে? গড়ো করি তোর পরবিত্তিকে! বউ ছিনালপানা ক'রে বুল্লেও তোর গোঁস্সা আসে না রে! এ যে ডুম্বের ঘরের অধিক হলো!"

বনের বাঘিনীকে ধরিয়া তাহাকে পিঁজরায় পুরিয়া খোঁচা মারিলে তাহার যেমন ধারা অবস্থা হয়, উজ্জ্বলারও সেই দশা হইয়াছিল। কিন্তু এমনই সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে গভীর ভালবাসার মধ্যে যে, উপবাসক্লিষ্ট স্বামীর কথা সে তাহার এত বড় ক্ষোভের মুহূর্ত্তেও আজ কোনক্রমে ভুলিতে পারিল না, আরও একটা প্রবল চিন্তা তাহার সেই সংক্ষুব্ধ সাগর সদৃশ অপমান ও ক্রোধে তরঙ্গিত বক্ষের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল, ছাড়িয়া গিয়া বুঝিয়াছে, স্বামীকে সে কোনমতেই ছাড়িতে পারিবে না। ইহার জন্য তাহাকে যত অপমানই সহিতে হয়, সে সহিবে। কিন্তু এত বড়টা ' এই অসতী নামটাতেই যে সে সবচেয়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে, এটাকে যে সে কোনমতেই সহিতে পারে না। এও কি সহিতে হইবে? ভবানী! এ কি তাহার দুর্দ্দশা করিলে? সেই রাজ-উপকারকের প্রতি সকল কৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধা তাহার একই নিমেষে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল এবং একটা তীব্র বিদ্বেষে মনটা তাহার কঠিন হইয়া উঠিল। নিশ্চয় এ তাঁহার কায! আর ত কেহ সেখানে ছিল না। কিন্তু সহ্য করিবে, সব সহ্য করিবে, এ কথাটা জোর করিয়া মনে করিতে থাকিলেও সেটা তাহার পক্ষে যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই অসহ্যতর হইয়া উঠিতেছিল, অথচ এ কি এ সম্মোহন যন্ত্র তাহার সম্মুখে! ঐ যে অনুত্তেজিত প্রশান্ত স্মিতমুখ, উহার উপর চোখ পড়িতেই যে তাহার বুকের মধ্যের সহস্র নাগিনী স্তব্ধ হইয়া তাহাদের উদ্যত ফণা নত করিয়া ফেলে ও ক্রোধের রুদ্র আগুনে বর্ষার সহস্র ধারা বর্ষিত হইতে থাকে। ঐ স্থির দৃষ্টি যে তাহাকে জানাইয়া দিতেছে যে, সে যাহাই বলুক না, আমি জানি, তুমি সতী।

ভীম কহিল, "মা, ডোমের ঘর ঝগড়া-কচকচিতেই হয়ে ওঠে, তা কি ভেবে দেখ নি? পোয়ে উপোসী রয়ে গেল, সে তোর খেয়াল হলো না, মিথ্যে বউটার বদনাম করছিস পরের রটানে কথা শুনে। ও সব কথা আমি জানি, বউ-ই আমারে কয়েছে, যা সত্যি ঘটেছিল। সে দোষ যে তোদেরই। ভরা বয়েসকালে সাঁজ-সন্ধ্যেয় কোন্ শাশুড়ী পোয়ের বৌকে তিন ক্রোশ পথ জল আনতে পুকুরে পাঠায়? ও যেই খুব ডাকাবুকো মেয়ে, তাই ডর-ভয় করেনি, ইজ্জত রেখে ফিরে এয়েছিল, তোমার মেজুনি সেজুনি হ'লে তাও পারতো কি?"

স্বামীর এই পক্ষসমর্থনে গভীর কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বলার চোখ দিয়া ঝর-ঝর ছড়-ছড় করিয়া এক গাদা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে তখন ফিরিয়া বসিয়া ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া আবার আগুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপাইয়া দিল।

দিয়া সেই ভাত স্বামীকে দু'টি বাড়িয়া দেয়, কিন্তু শাশুড়ীর অনুমতি বিনা ত তেমন দুষ্কার্য্য করিতে পারে না। মনে মনে স্বামীর উদ্দেশ্যে গড় হইয়া প্রণাম করিল, কৃতজ্ঞতায় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, "ঐ চরণে মতি রেখে তোমার পায়ে যেন আমি মরতে পারি।"

সনকা ছেলের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিল, আজই যে উজ্জ্বলা তাহার স্বামীর উদ্দেশ্যে নূতন কিছু মন্ত্র করিয়া আনিয়াছে, সে কথা বুঝিতে তাহার বাকী থাকিল না। একেবারে হতাশ হইয়া গিয়া সে কপালে ঘা মারিল। "মরেছিস্ ভীমে! কালামুখীটা তোরে একেবারে দাঁতে ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে! রাতবিরাতে গবুরাণী তোর বৌকে আমি তিন কোশের মাথায় পুকুরঘাটে জলকে পাঠাই? কি অধৃষ্মে রে তোরা? বলে,—

'নিয়র পোখরি দূরে যায়,
পথিক দেখিয়ে আইড়ে চায়;
পর সম্ভাষে বাটে থিকে;—
এ নারী কখন ঘরে না টিকে।'

তার চেয়ে আমার কথাটা নে, এখনও মানে মানে ওরে ছেড়ে দে, ও যাক্ রাজার পাটশালায়, তুই মুগলী ছুঁড়ীটাকে বিয়ে কর, সুখ হবে। মেয়ে ভাল। কটা চামড়ায় আছে কি? মেয়েমানুষের চামড়া কটায় ছিনাল হয়, তুই কি জানিসনে? কোট্টে ধরেছি, মা ত বটি, কথাটা নে।"

ভীমের মুখে-চোখে জলন্ত ক্রোধের তীক্ষ্ণরশ্মি বিদ্যুদ্-বেগে ফুটিয়া ছুটিয়া গেল, ক্ষণকাল সে ক্রোধস্তম্ভিত থাকিয়া পরে সখেদে উত্তর করিল, "ঐখানেই ত তুই আমায় মেরে রেখেছিস্! তাই ভাবি, কেন যে তোর পেটে আমি এসেছিলুম!"

এইটুকু শুনিয়াই উজ্জ্বলার বুক গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, "হেঁই গো!—তা ব'লে আমায় তুমি দূর ক'রে দিও না গো!"

ভীম তাহার ভীতিবিহ্বলতা দেখিয়া ঈষৎ দুঃখের হাসি হাসিয়া তেমনই দুঃখ-গম্ভীর স্বরে কহিল, "বিদায় তোকে সেই এক দিনই করব জেনে রাখিস! যে দিনে তোকে বিদায় করতে! মা, তোরে বলি, শোন্! ছড়ার উপর ছড়া কাটানো ভুলে ধ'রে ছেলের পেটে দুটো ভাত দেওয়া দেখি! তোর রকম দেখে আমার সন্দ হয় যে, তুই হয় ত আমার মা নোস, আমার সৎমা-ই বা হবি। বাপাকে আজ ভাল ক'রে কথাটা পুছতে হবে।"

ছেলের দত্ত এই ভীষণতর অপবাদে মা'র মনে বুঝি হঠাৎ একটা লজ্জা দেখা দিল; রুদ্ধ মাতৃত্ব বুঝি অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। তখন বিচারকার্য্যে আপাততঃ ইতি টানিয়া তিনি বধূকে আদেশ করিলেন, "কানের ত মাথা খাসনি বাপু, শুনতে কি আর পাচ্ছিসনে, দে না চারটে ভাত ফেলে, ছেলেটা খাক। আর ভীমে! জলঘটটে দে ঘা ত ছোটুনী। আই আই! এখনও শাঁকচুনির মত চিঁ চিঁ করতে নেগেছে! দেখ ত সেই সাঁজ জ্বালাবার আগে গাই দোয়াতে গিয়ে দুধ-ঘোট্টটে ফেলে দিলি ব'লে চ্যালার বাড়ি ঘা দুত্তিন বসিয়ে দিলুম, তা সেই থেকে আর কান্না থামেনি! বলি আলো ছুঁড়ী! অমন কত চ্যালার উপর চ্যালা যে বড়্কির পিঠে-গায়ে সাতখান ক'রে ভেঙ্গে ফেলেছি, তার চোখে একটা ফোঁটা জল পড়েছে কি? বলি, ঐ ক্ষেমা গোদার মায়ের মতন কালো মোষের চামড়া, ও কি তার চাইতে অতই নরম না? তোর গায়ে ত রক্ত পড়লেও অন্ধকারে তা মিলিয়ে থাকে, তার গায়ে যে রাঙ্গা হয়ে শালুক ফুটে ওঠে, সে ত কাঁদে না।"

ছোটবধূর প্রতি ক্রোধের মুখে বেফাঁস হইয়া এত বড় সত্য কথাটাকেও আজ সঙ্গে সঙ্গেই সনকাকে স্বীকার করিতে দেখিয়া উজ্জ্বলা ও ভীম দু'জনই দু'জনের চোখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সুখের হাসি হাসিল। অর্থাৎ সত্য চিরদিন গোপন থাকে না।

—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সে দিন রাজোদ্যান হইতে অবমানিত ও ভগ্নমনা হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় মহাকুমার রামপালদেব এতই অন্যমনে অশ্বচালনা করিতেছিলেন যে, তাঁহার তেজস্বী অশ্বও যেন তাঁহারই মত হতোদ্যম হইয়া সংশয়জড়িতপদে

পূর্ব্বাকাশ তখন অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের অভাব-বেদনায় ালিমাময় হইয়া পড়িয়াছে। আকাশের পশ্চিমপ্রান্তভাগে খনও একটি ক্ষীণ পাণ্ডুরাভা মানবজীবনের শেষ আশারশ্মি-কুর মতই অতি মৃদুভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাও নে প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষীণতর হইয়া চারিদিকের নিবিড় ালিমার মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। রাম-ালদেবের ললাটে নেত্রেও সেই গাঢ় অন্ধকার-নিরাশার ালিমা যেন ঐ গগনব্যাপী অন্ধকারের মতই তাঁহার আঁধারে রা চিত্তের প্রতিচ্ছায়া মাখিয়া প্রতিক্ষণেই অধিকতর মাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। সেই অন্ধকাররাত্রির মধ্যে াঁহার গতিপথ ও গমনের উদ্দেশ্য ও আগ্রহ পর্য্যন্ত সবই যেন অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল। অনি-শ্বসিত একটা দারুণ বেদনা তাঁহার মনটাকে পীড়িত মথিত করিয়া কেবলই যেন তাঁহার কানের কাছে অস্ফুট গর্জ্জনে গুমরিয়া বলিতেছিল—

"ধিক্—ধিক্—রামপাল!—"

অর্দ্ধদণ্ডের পথ চলিতে বোধ করি সে দিন অশ্বরাজ "হিমগিরির" দণ্ডাধিককালই লাগিয়া থাকিবে! অবশেষে যখন বাশিডা সঙ্ঘারামের দ্বারদেশে পৌছিলেন, মহাকুমার যন্ত্রচালিতের মত চির-অভ্যাস-প্রযুক্তই সসম্ভ্রমে যোড়করে দেবমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে নীরব প্রণাম নিবেদন করিলেন, অন্ত-স্তল ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল, "এ রাজ্যের কি পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছ—হে শাস্তা!"

তরুণ নাগরিকের দল সঙ্ঘারামের বিশাল তোরণপথে বাহির হইতেছিল। সকলের নেত্রে আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ ভ্রূকুটি, ললাটে তীব্র হতাশার ক্রুদ্ধ ছায়া। সহসা তাহারা সমবেতকণ্ঠে সহর্ষ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

"মহাকুমার রামপালদেবের জয় হোক!"

কুমার শিথিল অশ্বরশ্মি শ্লথতর করিলেন, অশ্ব তাহার মৃদুগতি সংবরণ করিল।

"এইবার আমরা উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাইয়াছি!"

"না, আমরা খুঁজিব কেন? যিনি খুঁজিয়া দিবার, তিনিই খুঁজিয়া পাঠাইয়াছেন। নতুবা আমরা অস্থানে অপাত্রেই ত বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া বৃথাই দিনের পর দিন ঘুরিয়া মরিতেছিলাম।" এই ত যথার্থ যোগ্য ব্যক্তির দর্শন মহারাজকুমার রামপালদেবের জয় হোক! আমরা আপ-নার কোদণ্ড তুল্য বিশাল বাহুযুগলের ও আত্মপ্রত্যয়শীল উদার চিত্তের শরণাশ্রয়ী হইলাম। শরণাগতগণের রক্ষা রাজধর্ম্ম, বিশেষতঃ বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি প্রথিতযশা পাল সম্রাটগণের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন সর্ব্বজন-বিদিত। এ বিষয়ে উত্তরে হিমগিরির তুষারশৃঙ্গো-পরিস্থ তিব্বতবাসী, উত্তরপূর্ব্বে মহাচীন ও চীনদেশজগণ, পশ্চিমে যাবনিকদল এবং দক্ষিণে মহাসাগরমধ্যবর্ত্তী সিংহলবাসী সিংহলীগণ সকলেই অবগত আছে, আমরা আর অধিক কি বলিব? তাই ভরসা হয়, মহাবীর রামপালদেব তাঁহার কুলধর্ম্মরক্ষার্থ আমাদের দুঃখ-নিবেদনে কর্ণপাত করিবেন এবং রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার প্রতিবিধান-চেষ্টাতেও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।"

মহারাজকুমার রামপালদেব সূচনা শুনিয়াই বক্তা-দলের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহার অশান্ত হৃদয় এই নূতন আর একটা অশান্তির পূর্ব্বাভাসে যেন ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিল। অসন্তুষ্ট জনসাধারণ যে ভিতরে ভিতরে একটা বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিবার চেষ্টা করি-তেছে, সে সংবাদ তিনিও জানিতে পারিয়াছিলেন; তবে তাহা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, অথবা এখনও মাত্র স্ফুলিঙ্গাবস্থাতেই উহা আছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তিনি জানিতেন না। এখন নিজের সম্মুখেই সেই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকে বহ্নিশিখারূপে পরিবর্ত্তিতাকারে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে বিস্ময়ের সহিত হয় ত বা ঈষৎ বিভীষিকারও উদ্রেক করিয়াছিল। তিনি এত শীঘ্র যেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

তরুণদলের দলপতি স্থানীয় দুই জন যুবক অগ্রসর হইয়া আসিল। যশোবর্ম্মা ও ইন্দ্রবর্ম্মা মহামাণ্ডলিক কৃতি-বর্ম্মার পুত্র। রামপালদেবের বিশেষ পরিচিত। ইন্দ্রবর্ম্মা কহিল,—"আপনাকে আমাদের পরিচালনার ভার নিতে হবে। এ কার্য্যে আপনিই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে যে এই মহাসাম্রাজ্যের সকল ব্যক্তিই একমত হবেন, তাতে আমাদের এক বিন্দুও সংশয় নেই, অতএব আমরা আপনাকে আমাদের মহানায়কপদে বরণ

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক ব্যক্তি কদলী-পত্রে জড়িত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মাল্য আনিয়া ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তে প্রদান করিল, ইন্দ্রবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ সেই মালা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া সহাস্য গম্ভীর মুখে ধীর কণ্ঠে কহিল,—"'জাগরণ' সমাজের মহানায়করূপে এই মাল্য দ্বারা আমরা আপনাকে বরণ করলেম—কিন্তু হয় আপনি নেমে আসুন, না হয়, এই মালা নিয়ে নিজের হাতে কণ্ঠে ধারণ করুন, আপনি যে এখনও আমাদের থেকে অনেক উর্দ্ধেই রয়ে গেলেন।"

রামপালদেব ততক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রসারিত সম্মান-মাল্য গ্রহণ না করিয়াই ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া আসিলেন। তাঁহাকে নামিতে দেখিয়া নবজাগ্রত তরুণদল গভীর উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ইন্দ্রবর্ম্মা স্মিতগম্ভীর মুখে মালা লইয়া অগ্রসর হইতেছিল, মহাকুমার ইঙ্গিতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া গম্ভীর শান্ত স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হও না, ভাই, এখনও আমাদের যথেষ্ট সময় আছে। এস ত ভাই, প্রথমতঃ শুনে নেওয়া যাক্, তোমাদের এই জাগরণ সমাজের উদ্দেশ্য কি? এবং আমার মত তুচ্ছের দ্বারা তোমরা কোন্ ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কার্য্যের সমাধান আশা করছো?"

ইন্দ্রবর্ম্মা মাল্যধৃত কর নত রাখিয়া হাসিয়া কহিল,—"মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত শ্রীবিগ্রহপালের প্রিয় পুত্র তীক্ষ্ণধী পরম ভট্টারক রামপালদেবের কি এখনও আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে বাকী আছে? না এটা চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর পৌনঃপৌনিকত্ব হিসাবেই উচ্চারিত হচ্ছে? তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই বল্‌তে বাধ্য হব। কিন্তু সব কথা ত এখানে দাঁড়িয়ে বলা হবে না, তা হ'লে আপনাকে কৃপা ক'রে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

রামপাল ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"সে না হয় পরে শুনব, শুধু মূল উদ্দেশ্য?"

কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই ইন্দ্রবর্ম্মা ও যশোধর্ম্মা স্বচ্ছন্দ স্বরে একসঙ্গে উত্তর করিল,—"রাজপরিবর্ত্তন! আপনাকে পাল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আমরা স্থাপিত করতে চাই।"

পরে দীর্ঘশ্বাস লইয়া কহিলেন,—"রাজাধিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত ক'রে? সেও কি তোমাদের দ্বারা সম্ভবে?"

ইন্দ্রবর্ম্মার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি তরুণ বীরক্রম ঈষৎ ব্যগ্র হইয়া উত্তর দিল,—"কেন নয়?"

মহাকুমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"কিন্তু এত বড় প্রবল রাজশক্তিকে তোমরা পরাভব করতে পার ব'লে তোমাদের ভরসা হয়?"

অসঙ্কোচে উত্তর হইল, "আপনাকে সহায় পেলে নিশ্চয়ই হয়, এবং নিশ্চিত সাফল্যের সম্পূর্ণরূপ ভরসাই করতে পারি। আপনি হয় ত জানেন না, কিন্তু আমরা ত জানি যে, কত আগ্রহের সহিতই সমস্ত রাজ-অত্যাচার-অধ্যুষিত প্রজা-সাধারণ আপনাকে তাহাদের রাজা দেখতে চাইছে। আপনার জন্য তারা প্রাণপণ করবে।"

রামপাল পুনশ্চ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অত্যাচার-নিপীড়িত তাঁহার পিতৃপ্রজাবর্গ তাঁহাকে কাতর হইয়া ডাকিতেছে! অত্যাচার! হাঁ, প্রবল অত্যাচার! সে যে কত বড় অত্যাচার, তাহা হয় ত তাঁহার নিজের মত অপর আর কেহই তাহার সকলটুকু সংবাদ জানে না। তিনি নিজে শুদ্ধ এই স্বেচ্ছাতন্ত্রতার অতি নিকৃষ্ট হীনতম অবিচারে অবিচারিত, আর সেটা এ রাজ্যের অতি দীনতম প্রজার প্রতি কি পরিমাণেই না ব্যবহৃত হইতেছে! তথাপি মৃদু সংশয়ে কহিলেন যে, "এ রাজশক্তি যে কত বড়, তাহার কোন ধারণা তোমাদের আছে, না কেবলমাত্র মানসিক উত্তেজনার প্রবল উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে এই বিপৎ-সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গোপরি ঝাঁপ দিতে এসেছ? এ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় প্রথিত, বিমানবিনির্ম্মিত নয়, কোন ক্ষুদ্রশক্তি একে নষ্ট করা ছেড়ে টলাতেও সমর্থ হবে না।"

বীরক্রম সহসা সতেজে কহিয়া উঠিল, "মহাকুমার! সামান্য এতটুকু একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাণ্ড জনপদ ও বিশাল অরণ্যানীকে দহন করতে সমর্থ হয়, তা কি ভুলে গেছেন? তবে যত ক্ষুদ্রই হোক, সেটুকু যদি প্রকৃত, আগুনেরই ফুল্‌কি হয়!"

রামপাল নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন তাঁহার মৌনকে সম্মতিলক্ষণ বোধ করিয়া উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে ইন্দ্রবর্ম্মা কহি-

অজস্র স্রোত ব'য়ে চলেছে, এই যে দুর্ভিক্ষ মহামারী অপ্রতিবিধেয় হয়ে বারো মাস এ দেশে বসবাস করতে চললেও রাজপক্ষ নীরব নিশ্চলভাবে করের উপর কর ধার্য্য ক'রে দরিদ্র প্রজাকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে ফেলছেন, এই যে ঘরে ঘরে অনাহারে আর্ত্তনাদ উঠলেও তাতে কর্ণপাত না ক'রে তাদের মরণ-মূল্যে ক্রীত রাজা ও রাজসখা-সখীদের প্রকাণ্ড প্রাসাদমালা, বিপুল সৈন্য-সামন্ত, বিলাস-দ্রব্যের সমাবেশে ও সমারোহে চোখ ধাঁধিয়া যাচ্ছে, এই যে রাজার অনাদরে দেশের শিল্প নষ্ট হচ্ছে, বাণিজ্যপোত সকল বণিকদের অর্থহীনতার জন্য ও রাজসৈন্যদের সাহায্য না পাওয়াতে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে আছে, এর ফলে দু'দিন পরে আর্য্যাবর্ত্তের চিরপ্রসিদ্ধ বিশাল বাণিজ্যতরীগুলি হয় ত এক দিন সুদূর-ভবিষ্যতের পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার স্থল হয়েই দাঁড়াবে। আর্য্য-সভ্যতা, শিল্প, ধর্ম্ম ঐ বাণিজ্যব্যপদেশেই এত দিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিতরিত হচ্ছিল, এই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতের সেই মহাগৌরবান্বিত কারবার উঠিয়ে দিতে হবে, এ কি সামান্য ক্ষতি, মহাকুমার? এ ক্ষতির জন্য শুধু আজ কেন, সমস্ত অনাগতকাল ধ'রে সমস্ত ভবিষ্য জাতিটাই হয় ত চিরদিনই এ মহাক্ষতিকারকগণের বিরুদ্ধে অক্ষমণীয় তীব্র অভিশাপ বর্ষণ করবে। জগৎসমাজে আর্য্যজাতির যে শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব এত দিন ধ'রে অপ্রতিহতভাবে চল-ছিল, যে ধর্ম্মগৌরবে তারা অর্দ্ধ-জগতের ধর্ম্মাচার্য্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সে সবই যে এই সমুদ্রপথে বাণিজ্য-তরী প্রেরণ করার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, এ সবও কি আপনাকে আমা-দের বুঝিয়ে বলবার দরকার ছিল? আমরা জানি, আপনি সদ্বিদ্বান্, সুচরিত্র, প্রতাপশালী এবং রাজনীতিতে পাল-সাম্রাজ্যের আপনিই যোগ্য সম্রাট! অনর্থক কেন কালক্ষেপ করছেন, আমরা নায়ক চাই, রাজা চাই, আপ-নার কোন আপত্তি আমরা শুনব না, আপনাকে আমাদের ভবিষ্যৎ মহারাজাধিরাজরূপে আমরা বরণ করলেম।"

রামপাল কহিলেন, "আমি তোমাদের রাজা হ'তে পারব না, ইন্দ্রবর্ম্মা!"

ইন্দ্রবর্ম্মা অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ?"

রামপাল কহিলেন, "তা হ'লে আমার আমার ভাইয়ের

ইন্দ্রবর্ম্মা হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাজনীতিতে ভ্রাতৃত্বের স্থান কোথায়, মহাকুমার?"

বীরদ্রুম ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "আর ভাই ত আপনার উপরে কতই স্নেহশীল! জানেন কি মহাকুমার! তিনি যে কোন মুহূর্ত্তেরই সুযোগে আপনার শিরকে স্কন্ধচ্যুত করতে বা করাতে এর এক কড়াও দ্বিধা দেখাবেন না। এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য। আপনিই কি তা জানেন না বলতে চান? আপনি সেরূপ নির্ব্বোধ হ'লে আপনাকে আমরা এত ক'রে চাইতাম না।"

মহাকুমার রামপাল শুধু কহিলেন, "আমি জানি।"

তবে আপনি কার জন্য নিজের রাজধর্ম্মে, ক্ষাত্রধর্ম্মে এবং মানুষেরও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে চান? কিসের মূল্যে এত বড় ত্যাগ?"

রামপাল নীরব রহিলেন।

যশোধর্ম্মা ও ইন্দ্রবর্ম্মা রামপালের পায়ের কাছে ধূলির উপর নতজানু হইয়া কহিল, "মহাকুমার! নিজের জন্য না-ই'বা হ'ল, দেশের জন্য এ ভার আপনাকে নিতে হবে। এর জন্য সকল স্বার্থই বিসর্জ্জন দিন। অবশ্য জানি না, কোথায় আপনার তত বড় স্বার্থ নিহিত আছে—যার জন্য এত বড় সাম্রাজ্যকে পায়ে ঠেলে প্রত্যাখ্যান করতে পারছেন। আপনার এ চরিত্র যে দেবতারও অজ্ঞেয়! সত্যই কি এটা ভ্রাতৃনিষ্ঠা? এ কি সম্ভব?"

রামপাল পাষাণ-রচিতের মতই অস্পন্দ হইয়া রহিলেন, তাঁহার গভীর লজ্জাহত চোখের তারা মৃত্তিকান্তর ভেদ করিয়া গেল কি না বলা যায় না, অন্ততঃ তাহার দৃষ্টির ভাষাটা ঐ সমুৎসুক জনগণের দৃষ্টির অদৃশ্য রহিল।

"মহাকুমার! উত্তর দিন। গৌড়রাজ্যের রাজপরি-বর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—ইহা একেবারে অনিবার্য্য! তবে কথা এই যে, আমাদের পিতৃগণ আপনার পিতৃপিতামহা-দির কাছে বহু স্নেহ-ঋণে সংবদ্ধ। পাল-সম্রাটগণের অখণ্ড প্রতাপ তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জমধ্যে অক্ষুণ্ণ হয়েছে তাহাদের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমানভাবে প্রজাপালনগুণে। তাই বৈদিক বৌদ্ধ সকলেই তাঁদের প্রতি সমকৃতজ্ঞ, তাই আমরা আপনাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি যদি আমা-দের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন, আমরা নিরুপায়!

সে পরিবর্ত্তনে পাল-সম্রাটদের সব কিছুই হয় ত ভেঙ্গে পড়তে পারে, হয় ত তার ফলে আপনার ও আপনার পরিজনবর্গও বিপন্ন হ'তে পারেন, বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজের জীবন সম্বন্ধে ত সর্ব্বপ্রথমেই যথেষ্ট সংশয়। ভেবে দেখুন, কি আপনি চান ?"

এই ভয়াবহ ভবিষ্য চিত্রখানা আশাহত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা তীব্র আশানন্দের সঞ্চার করিয়া দিল,—ইহার পর কখনই আর মহাকুমার রামপালদেব তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সেই নতমুখ স্তব্ধ-মূর্ত্তি হইতে যে স্খলিত জড়িত অস্ফুট উত্তর শুনা গেল, তাহা বোধ করি, তাহাদের প্রত্যেকেরই ধারণার অতীতই ছিল। তাহাদের তখন এমনও ধিক্কার বোধ হইল যে, যেন এত দিন তাহারা দেবতা বলিয়া একটা বানরেরেই বা পূজা করিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ আজ অকস্মাৎ সেই দারুণ ভুলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে !

রামপাল অত কথার ঐ একই উত্তর দিলেন— "অসম্ভব !"

জনতা গর্জ্জিয়া উঠিল—"ধিক্ ধিক্ মহাকুমার রামপাল-দেব !"

ইন্দ্রবর্ম্মার দুই চক্ষুতে অবমানিত ক্ষোভের একটা সমুজ্জ্বল জ্বালা বিচ্ছুরিত হইল। চিরক্ষমাহীন কঠোর হাস্য করিয়া তিনি গাত্রাকালে কহিয়া গেলেন, "এর জন্য এক দিন আপনাকে গভীর অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হবে, মহাকুমার, কাযটা ভাল করলেন না।"

তাঁহারা সদলবলে চলিয়া গেলে, আরও একটুক্ষণ তেমনই সংজ্ঞাহীন, শক্তিহীন, প্রাণহীনবৎ অভিভূতাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার পর একটা বেতালগ্রস্ত মৃত-দেহের মতই বিবর্ণ মুখে ও প্রায় অস্পন্দ শিথিল শরীরে রামপাল অশ্বারোহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখ হইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

মালী

আমি নিতি নিতি ফুল তুলি আর রচি নব নব মালা
মোর সেই হার নেয় যে আদরে রাজার কিশোরী বালা।
কুমারী আদরে সোনা দিতে চায় মালার বদলে মোরে
ব্যথার হাসিতে প্রণমিয়া আমি ফিরিয়া যাই গো ঘরে !
গোলাপের সাথে রাজার মেয়ের দেখেছি তুলনা ক'রে
হাজার গোলাপ সে রূপের কাছে মলিন হইয়া পড়ে !
আমি শুধু মালী, পথের ভিখারী, মোর এই সাধ কেন ?
বামনের মত চাঁদেরে হেরিয়া ভাবিয়া মরি গো যেন।
মোর মালাগাছি, মোর ফুলগুলি শোভে তার গলে, বুকে ;
ফুল হয়ে উঠে এ ভাবনাখানি আমার সকল দুখে।
রাজার বাগানে রাজার মেয়ের রাজার ফুলের পাশে ;
লোকে বলে মোরে "হায় রে ভিখারী, আছ তুমি কোন্ আশে ?"

রাজার কুমারী ঘরের বাহির হয় না এখন আর,
মাসেকের মাঝে শুনিতেছি আমি বিয়ে না কি হবে তার।
বাগানে এখন আসে না বেড়াতে হাসে না ফুলের সাথে,
মোর কাছে আর নেয় না যাচিয়া মালাগাছি এক হাতে।
মাঝে মাঝে কেন, জানি না এখন হয়ে যায় বড় ভুল,
কাঁটাই কেবল তুলে নিয়ে আসি তুলিতে গোলাপফুল।
ফুল প'ড়ে যায়, ডোর ছিঁড়ে যায়, হলো যে বিষম জ্বালা,
"ভাল মালা নয়"—বলি', অভিযোগ পাঠায় রাজার বালা।
কা'ল তার বিয়ে,—শুনিতেছি যত নগরের লোক বলে ;
রাজার বাড়ীতে হাজার কাঙাল প্রসাদ পাইতে চলে।
"তুই কেন গিয়ে আনিস্ না ধন ? —রাজার মেয়ের বিয়ে,"—
সুধায় আমারে, যা'রা চ'লে যায় মোর কুঁড়ে-পাশ দিয়ে !"

রাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে রাজার ছেলের সাথে ;
মোর তোলা ফুলে সেজেছিল তারা সুখের বাসর-রাতে !
যাই না এখন রাজার বাগানে করি না ত আর কায,
ফুলগুলি যেন শূলের মতন বিঁধে রে বুকের মাঝ।
দিনগুলি আর উঠে না কাটিয়া বিনে কাযে শুধু ঘুরি ;
এত লোকজন,—তবু মনে হয় শূন্য রাজার পুরী !
রাজবাগানের নূতন মালীটি বড়ই গর্ব্বভরে,
আমার পানেতে বারেক তাকায়ে ঈষৎ হাস্য করে।
এখনো সেথায় আগের মতন হাজার হাজার ফুল,
ফুটিয়া লুটিয়া, গন্ধ বাটিয়া বাতাসে দেয় গো দুল !
স্বজন আমার যারা দেখে মোরে দেয় যে বিষম গালি,—
"রাজার বাগানে চাকুরি খোয়ালি হায় রে মূর্খ মালী !"

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় চিন্তা করিলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। বিশ্বের বিশালতা আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবেষ্টনী আমাদিগকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে যে, বিশ্বের বিরাটত্বের কল্পনাও আমাদের পক্ষে দুরূহ। আ-কুমারিকা হিমাচল যিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই জনপদবহুল ভারতের বিস্তীর্ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; অথচ ভারতের আয়তন সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তনের কিঞ্চিৎ অধিক ১/৫০ অংশ মাত্র! অপর পক্ষে মহাসমুদ্র পৃথিবী-পৃষ্ঠের যত পরিমাণ স্থান অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশ মাত্র স্থলভাগ কর্ত্তৃক অধিকৃত। কাযেই পৃথিবীর সুবিশালতার সঠিক ধারণা যখন আমাদিগের নিকট পরিস্ফুট নহে, তখন সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের বা সূর্য্যাদি নক্ষত্রবর্গের বিশালত্বের সম্যক্ ধারণা কিরূপে সম্ভবপর? রাত্রিকালে নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হই, কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে, বিধির অলঙ্ঘ্যবিধানে যদি কখনও গ্রহ-উপগ্রহাদি সমেত সূর্য্যের ধ্বংস হয়, তাহা হইলে বিশ্বের ভূগোল (?) হইতে মাত্র একটি তারকার জীবন-চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে হইবে; কোটি কোটি নক্ষত্রমধ্য হইতে একটিমাত্র নক্ষত্রের তিরোধানকালে সমগ্র বিশ্বের ক্ষতি অত্যল্প হইলেও পৃথিবীবাসী জীবদিগের নিকট তখন মহাপ্রলয়ের তাণ্ডবলীলা ঘোষিত হইবে।

পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থাপ্রাপ্তি আমাদের আলোচ্য বিষয় হইলেও নেবুলা (নীহারিকা ?), নক্ষত্ররাজি ও আমাদিগের সৌর-জগতের অন্যান্য গ্রহাদি পৃথিবীর উৎপত্তির সহিত এরূপ সংশ্লিষ্ট যে, তাহাদিগের বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট হয়। নক্ষত্রাদি পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। আমাদিগের সৌরজগৎ অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ; অতিদূরে নক্ষত্রাদি অন্যান্য জগৎ অবস্থান করি-য়া আছে। ...

বহির্ভূত কোন বস্তুই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না; কাযেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে বহু দূরে অবস্থিত নক্ষত্র নেবুলা ইত্যাদির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমরা অবগত ছিলাম না। গ্যালিলিও প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; জ্যোতির্বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে দূর-বীক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে সঠিক কিছু আমরা অবগত নহি। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বুন্‌সেন্ ও কারচফ স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া জ্যোতিষে যুগান্তর আনয়ন করেন। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট ঐ বৎসরদ্বয় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ যন্ত্রে দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কদিগের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগের প্রকৃতি, রাসায়নিক উপাদান, পৃথিবীর বিমুখে অথবা অভিমুখে তাহাদিগের গতির পরিমাপ ইত্যাদি বহুবিধ তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই যন্ত্র-সাহায্যে স্থির হইয়াছে যে, যে যে উপাদানে পৃথিবী গঠিত, সেই সেই উপাদানে নক্ষত্রাদি সকল জ্যোতিষ্কই সৃষ্ট।

নেবুলা (নীহারিকা ?)

পৃথিবী যে একটি নেবুলা (Nebula) হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে সাদা মেঘখণ্ড তুল্য যাহা দেখা যায়, উহাই নেবুলা, তবে সাধারণ মেঘখণ্ডের সহিত তাহাদের পার্থক্য বিস্তর। মেঘখণ্ড সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত হওয়ায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, প্রতি ঘণ্টায় পরিবর্ত্তিত হয়, উহা পৃথিবী হইতে মাত্র অল্প দূরে অবস্থিত ও আকারে বহু পরিমাণে ক্ষুদ্র। অপর পক্ষে নেবুলা স্বীয় আলোকে ভাস্বর ও অপরিবর্ত্তনশীল। ক্ষুদ্রতম নেবুলাও পৃথিবী হইতে বহুগুণে বৃহৎ ও দূরে অবস্থিত। তাহাদিগের সংখ্যা উপস্থিত কয়েক লক্ষ; তবে দূরবীক্ষণ

দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সমুদ্রতীরে সংগৃহীত রাশি রাশি উপলখণ্ডের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে—বর্ণে, গঠনে, আয়তনে ও প্রকৃতিতে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকেই সমুদ্র-বারি-বিধৌত বলিয়া পরস্পরের



শ্বেত মেঘখণ্ড তুল্য নেবুলা

মধ্যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য বিদ্যমান, সেইরূপ নেবুলাদিগের মধ্যেও বহুবিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও গণ-সম্বন্ধীয় সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।* ১৮৬৯ খৃঃ অঃ হিউজিন্স ও মিলার নেবুলাদিগের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া বাষ্প, জল ও হিলিয়মের উপস্থিতি প্রমাণ করিয়াছেন। এখানে দুই প্রকার নেবুলার চিত্র দেওয়া হইল। † (চিত্র ১)

অতি সূক্ষ্ম ভাস্বর পদার্থবিশেষ নক্ষত্র-মণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে অবিন্যস্তভাবে পরিব্যাপ্ত। এই প্রকার নেবুলা ছায়াপথের কতিপয় স্থানে দেখা যায়। (চিত্র ২) পেঁচান শ্রেণীভুক্ত নেবুলা (Spiral Nebula)। ইহাদিগের কেন্দ্রীয় বস্তু হইতে বক্রাকার বহির্ম্মুখ দুইটি বাহু বিপরীত দিকে বহির্গত হইয়া থাকে। বাহুদ্বয় স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ও গ্রন্থিবদ্ধ ‡;

উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে এই শ্রেণীভুক্ত প্রায় দেড় লক্ষ নেবুলা গণনা করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, ইহাদিগের যথার্থ সংখ্যা আরও অধিক। অন্যান্য নেবুলার মত ইহারা ছায়াপথে অবস্থান করে না; পৃথিবী হইতে ইহাদিগের দূরত্ব



সপ্তর্ষির সন্নিকটস্থ পেঁচান নেবুলা

অত্যন্ত অধিক। ইহাদিগের বর্ণচ্ছত্র অন্যান্য নেবুলার বর্ণ-চ্ছত্রের তুল্য নহে; কতকাংশে নক্ষত্রদিগের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ। বর্ণচ্ছত্র ও বাহ্য অবয়ব পরীক্ষা করিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে যে, বাষ্পীয় অণু দ্বারা ইহারা গঠিত নহে; পরন্তু ইহাদিগের উপাদান তরল অথবা দৃঢ় অণুসমষ্টি। গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেরূপ আবেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সম্ভবতঃ ইহাদিগের প্রত্যেক অণু মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রীয় বস্তুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তবে ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। এই প্রকার নেবুলা হইতে আমা-দিগের সৌরজগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই চেম্বারলেন্ ও মোল্টন-কৃত বর্ত্তমান মতবাদ। পৃথিবীর উৎপত্তিমূলক মতবাদগুলি পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। লাপ্লাস-কৃত পৃথিবীর উৎপত্তিমূলক মতবাদের বহুপূর্ব্বে হার্শেল অখণ্ড নিয়ম (Law of continuity) অনুসারে স্থির

* Geology by Chamberlain and Salisbury.
† The Story of the Heavens by Sir Robert Ball.
‡ The Origin of the Earth by Joseph Barell.

করিয়াছিলেন যে, নেবুলা অবস্থা-পরিবর্ত্তনে কখনও সঙ্ঘ (cluster), কখনও যুগ্ম (twin) ও কখনও একক নক্ষত্রে পরিণত হয়। *

নক্ষত্র

এক একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র জ্যোতিষ্মান্ এক একটি সূর্য্য। আকারে, উজ্জ্বলতায় সূর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বহু নক্ষত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিব্যাদি গ্রহগণ অহরহঃ যেরূপ ঘূর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ উহাদিগের প্রত্যেককে গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষে আবেষ্টন করিতেছে; তবে ইহা অনুমানমাত্র। কারণ, পৃথিবী হইতে নক্ষত্রের দূরত্ব এত অধিক যে, কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেই নক্ষত্রদিগের গ্রহাদিকে প্রত্যক্ষ করিয়া উপরি-উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে। †

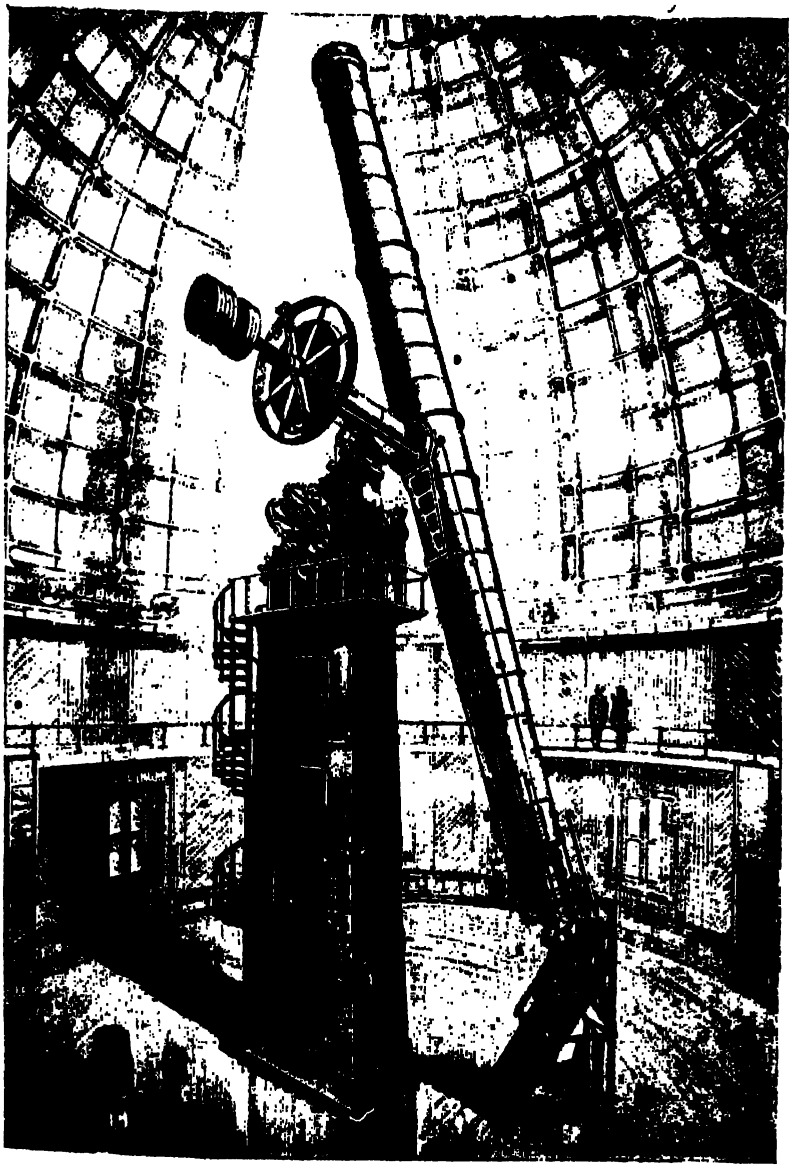
বর্ণ ও উজ্জ্বলতায় নক্ষত্রদিগের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি বহুকাল পূর্ব্বেই ফলিতজ্যোতিষীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। হার্শেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উজ্জ্বলতার তারতম্যানুসারে নক্ষত্রদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বর্ণ অনুসারে নক্ষত্রদিগের শ্রেণীবিভাগে অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রাচীন ফলিতজ্যোতিষিগণ নক্ষত্রদিগের (১) লোহিত (২) শ্বেত (৩) নীল,—এই তিনটি বর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। স্পেকট্রস্কোপ যন্ত্র সাহায্যে নক্ষত্রদিগের বর্ণ ও আলোকপ্রদানের ক্ষমতার বিভিন্নতার কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সূর্য্যাদি নক্ষত্রদিগের অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র (continuous spectrum) বর্ত্তমান। তবে তাহাদিগের বর্ণচ্ছত্র (spectrum) আলোকমণ্ডল (photosphere) স্থিত ধূমাত্মক পদার্থনিচয়ের কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন রেখা দ্বারা কতিপয় স্থানে খণ্ডিত। এইরূপ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট রেখা ফ্রাণহোফার রেখা নামে অভিহিত। গ্রহাদি ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক যাহারা সূর্য্যালোকে প্রতিফলিত হইয়া আলোকিত হয়, তাহাদিগের বর্ণচ্ছত্রে ফ্রাণহোফার রেখা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ্যাঞ্জেলো সিচি বর্ণচ্ছত্র অনুসারে নক্ষত্রদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) শ্বেত ও নীল; (২) পীত; (৩) লোহিত ও কমলালেবু বর্ণ; (৪) রক্ত-লোহিত। সিচি, ভোগেল ও শাইনার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের মতে প্রত্যেক নেবুলা শীতল হওয়াকালীন বিভিন্ন অবস্থা অবলম্বন করায় বিভিন্ন বর্ণসম্পন্ন নক্ষত্রে পরিণত হয়। তাঁহাদিগের মতে শ্বেত ও নীল নক্ষত্রবর্গ উষ্ণতায় ও উজ্জ্বলতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ সকল নক্ষত্রের উত্তাপ এত অধিক যে, তাহাদিগের আলোকমণ্ডলস্থিত ধাতুজ বাষ্প (metallic vapours) ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ-(gas) নিচয় অতি সামান্য শোষণক্ষমতা (absorbtive power) প্রয়োগ করার ফলে তাহাদিগের বর্ণচ্ছত্র সরল অথবা ক্ষীণ রেখা-সমন্বিত হইতে দেখা যায়। পীতবর্ণসম্পন্ন নক্ষত্রগণ শ্বেত ও নীল নক্ষত্র অপেক্ষা অধিকতর ঘনীভূত। আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যস্থিত নক্ষত্র অর্থাৎ সূর্য্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের বর্ণচ্ছত্রে বহু তীব্র কৃষ্ণবর্ণের রেখার উপস্থিতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সকল নক্ষত্রে ধাতুজ বাষ্প, বায়বীয় পদার্থনিচয় ও অন্যান্য ধাতু বিদ্যমান আছে। লোহিত নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রে ফ্রাণহোফার রেখার বিস্তৃতি হইতে ঐ সকল নক্ষত্রে ধাতুজ যৌগিক পদার্থের (metallic compound) উপস্থিতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহাও অনুমান করা হয় যে, এই শ্রেণীর অন্তর্গত নক্ষত্রদিগের উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলস্থিত বিভিন্ন ধাতুজ বাষ্প বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক মিলনে মিলিত হইয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট করিয়া থাকে। লোহিত নক্ষত্রদিগের পরেই তথাকথিত নূতন ও পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রগণ একটি নূতন শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীস্থ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সহসা কোন রজনীতে আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই ইহার উজ্জ্বলতা হ্রাস পাইতে থাকে ও সহসা লোকলোচন হইতে অপসৃত হয়। অনুমান করা হয় যে, এই শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদিগের উত্তাপ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের সহিত সংঘর্ষ অথবা আভ্যন্তরিক কোন বিক্ষোভের ফলে অল্পকালের জন্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও জলন্ত বায়বীয় পদার্থ এবং দ্রবীভূত প্রস্তরাদি উদ্গিরণ করিতে থাকে। * গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বহু নিষ্প্রভ নক্ষত্র

* General Astronomy by Young.

† "In Starry Realms", by Sir Robert Ball.

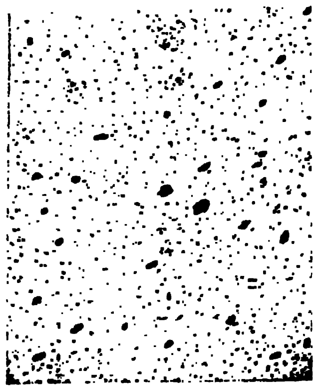
* History of Geology and Palaeontology by Karl Von Zittel.

অদৃশ্যভাবে আকাশপথে বিচরণ করিতেছে, কেন না, তাহাদিগের উত্তাপ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত। আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে যে তারকা আছে, তাহারও দূরত্ব এত অধিক যে, সেখান হইতে দেখা সম্ভবপর হইলে সূর্য্য ধ্রুব-তারার মতই ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইবে ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ সাহায্যেও আমাদিগের সৌরজগতের পৃথিব্যাদি কোন গ্রহকেই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সমগ্র নভোমণ্ডলে সাধারণ চক্ষুতে ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্য লইলে নক্ষত্র গণনা করা সম্ভবপর। লিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র (চিত্র ৩) সাহায্যে প্রায় দশ কোটি তারকা গণনা করিতে পারা যায়। * বহু প্রাচীনকাল হইতেই কয়েকটি নক্ষত্র কুম্ভ, মেষ, সিংহ ইত্যাদি দ্বাদশ রাশিতে শ্রেণীবদ্ধ। ইহা ব্যতীতও অধিকাংশ প্রধান নক্ষত্র কৃত্তিকা, ভরণী, রোহিণী ইত্যাদি কোন না কোন নামে পরিচিত। প্রত্যেক নক্ষত্র আপাতদৃষ্টিতে গতিহীন বলিয়া বোধগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে গতিশীল। তাহাদিগের গতি দ্বিবিধ;—সাধারণ ও প্রকৃত। সূর্য্য পৃথিব্যাদি গ্রহগণকে লইয়া অন্যান্য নক্ষত্রদিগের মত অন্তরীক্ষে বিচরণ করে। সার উইলিয়াম হার্শেল প্রথম এই গতির দিক স্থির করেন। প্রত্যেক নক্ষত্র হইতে পৃথিবীবাসী প্রাণিবর্গ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। একটি প্রথম শ্রেণীর তারকা হইতে সূর্য্যালোক অপেক্ষা [illegible] গুণ পরিমাণ কম আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বহু যুগ্ম তারকা দৃষ্টিগোচর হয়; সাধারণতঃ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র তারকা বলিয়া ভ্রম হয়। বহু যুগ্ম তারকার পরস্পরের দূরত্ব এত অল্প যে, সমুন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও তাহাদিগের যুগ্মতা ধরা যায় না; স্পেকট্রসকোপ যন্ত্রে তাহাদিগের যুগ্মতা প্রমাণিত হয়। তিন চারিটি অথবা অধিকসংখ্যক তারকা একত্র মিলিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এক একটি সঙ্ঘে সহস্র সহস্র তারকা অবস্থান করে; তীক্ষ্ণদৃষ্টি সাহায্যে কতিপয় সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বতন্ত্র নক্ষত্র বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। অন্যান্য সঙ্ঘের স্বতন্ত্র নক্ষত্র দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ছায়াপথ (Galary) আকাশে



Elements of Astronomy by

অবস্থান করিয়া রাত্রির শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কতিপয় স্থানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র (চিত্র ৪) অন্যত্র তারকাসঙ্ঘ আবার কোথাও শ্বেত নেবুলা ছায়াপথের উপাদান। * নক্ষত্রগণ আকাশমার্গে বিভিন্ন পথে দ্রুত বিচরণ করিয়া থাকে। নক্ষত্রবর্গ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম-এর (Law of gravitation) বশীভূত কি না ও নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করে কি না, এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। বহু বৈজ্ঞানিকের মতে নক্ষত্রগণ একটি বৃহৎ সূর্য্যকে আবেষ্টন করিতেছে ; অধুনা এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।



ছায়াপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র সহস্র নক্ষত্র

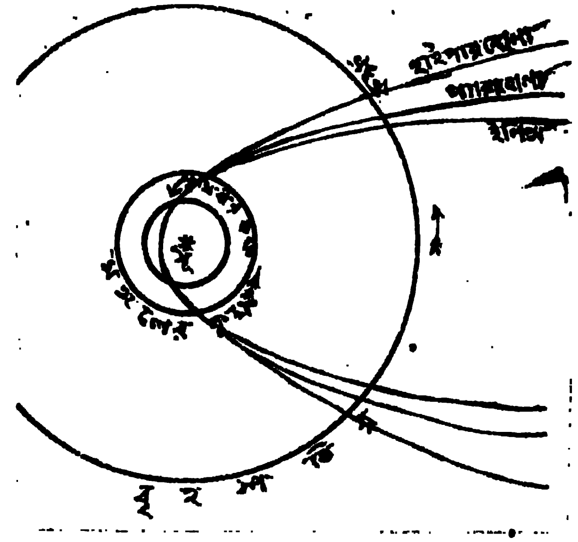


ধূমকেতু (১৮৯১)

ধূমকেতু

নক্ষত্র ও গ্রহাদি হইতে বিভিন্ন অন্য এক প্রকার জ্যোতিষ্ক আকাশমার্গে সহসা আগমন করে, কয়েক মাস অবস্থান করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করে ও সহসা অন্তর্হিত হয়। ইহারাই ধূমকেতু নামে অভিহিত। একটি ধূমকেতু সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে যেন ভাস্বর ধূম দ্বারা পরিবেষ্টিত সপুচ্ছ একটি তারকা। আকারে বৃহৎ ধূমকেতু উজ্জ্বলতায় সান্ধ্য-তারকার সমকক্ষ। কোন কোন ধূমকেতু দিবাভাগেও দৃষ্টিগোচর হয় ও তাহাদিগের পুচ্ছের দৈর্ঘ্য পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের সমান। এরূপ ধূমকেতু কচিৎ কখনও দেখা যায়, অধিকাংশই দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয়। একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধূমকেতুর (চিত্র ৫) মস্তকের মধ্যবর্ত্তী স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও অন্যান্য অংশ হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত ; এই মধ্যস্থ উজ্জ্বল পদার্থকে কতিপয় ভাস্বর স্তর বেষ্টন করিয়া থাকে। সমগ্র মস্তকটির ব্যাস ২০ হাজার হইতে ১০ লক্ষ মাইল। ইহার মস্তক হইতে পুচ্ছ বহির্গত হয়। কোন কোন ধূমকেতুর শিরোমধ্যস্থিত উজ্জ্বল পদার্থ থাকে না। বৃহৎ ধূমকেতুদিগের পুচ্ছ একটি প্রধান অঙ্গ হইলেও অপেক্ষাকৃত আকারে ক্ষুদ্র ধূমকেতুর পুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায় না। একই ধূমকেতু ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। আয়তনে কখনও বৃদ্ধি, কখনও হ্রাস, কখনও সপুচ্ছহীন ইত্যাদি পরিবর্ত্তন ইহার স্বাভাবিক অঙ্গ। সুতরাং বাহ্যদৃশ্যে ধূমকেতুর পরিচয় সম্ভবপর নহে। তাহারা পৃথিবীর নিকট গড়ে প্রায় ৩ মাস কাল অবস্থান করে। উজ্জ্বলতায় তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অল্প-বিস্তর প্রভেদ থাকে। প্রত্যেক ৫টির মধ্যে ১টি সাধারণ চক্ষুতে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি শত বৎসরে ৪।৫টি এত উজ্জ্বল হইয়া থাকে যে, দিবাভাগেও তাহাদিগকে দেখা যায়। ধূমকেতুদিগের কক্ষ তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা ;—(১) প্যারাবোলা, (২) হাইপারবোলা, (৩) ইলিপ্স। (চিত্র ৬) কতকগুলি ধূমকেতু ইলিপটিক্যাল্ অর্থাৎ আমাদিগের সৌরজগতের গ্রহাদির অনুরূপ কক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। হ্যালি প্রথম এই তথ্য আবিষ্কার

অন্তর পৃথিবী হইতে দেখা যায়, ইহা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষে দেখা গিয়াছিল।, এন্‌কে একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, সেই ধূমকেতুটি প্রতি ৩ বৎসর ও কয়েক মাস অন্তর পৃথিবীর নিকট প্রত্যাগমন করে। ইহার পূর্ব্বে এত অল্প সময়ে



ধূমকেতুদিগের বিভিন্ন কক্ষ

প্রত্যাগমনশীল ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্যারাবোলিক্ অথবা হাইপারবোলিক্ কক্ষে ভ্রমণশীল ধূমকেতুগণ সৌর-জগতের অতিথিমাত্র। ইহাদিগের বিষয়ে বিশেষ কিছু আমরা অবগত নহি। একটিবারমাত্র তাহাদিগকে দেখা যায়; পুনরায় তাহারা প্রত্যাগমন করে না। যে সকল ধূমকেতু ৩ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহারা বৃহস্পতির কক্ষের নিকটেই পরিভ্রমণ করে; তাহারা বৃহস্পতির ধূমকেতু নামে অভিহিত। শনি, ইউরেনাস্ ও নেপচুন্ এই তিনটি গ্রহের বিভিন্ন কক্ষের নিকট কয়েকটি ধূমকেতু বিচরণ করিয়া থাকে। ধূমকেতুদিগের কক্ষের বিভিন্নতার কারণ বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে প্রত্যেক ধূমকেতুই প্যারাবোলিক্ পথে বিচরণ করে; কিন্তু কোন গ্রহের নিকট আসিবামাত্র তাহার পথ বিচলিত হয়; গতিবেগ বৃদ্ধি পাইলে পথ প্যারাবোলা হইতে হাইপারবোলা হইয়া যায়; ফলে সে ধূমকেতুটি পুনরায় প্রত্যাগমন করে না। অপর পক্ষে গতিবেগ হ্রাস হইলে ধূমকেতুটি যে স্থানে প্রথম উহার পথ বিচলিত হইয়াছিল, সেই স্থানে গতিবেগ হ্রাস হয়, তাহা হইলে উহার কক্ষ ইলিপ্স আকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়; পুনরায় বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।* একটি সমগ্র ধূমকেতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) অত্যন্ত অল্প। পৃথিবী হইতে নক্ষত্রদিগের দূরত্ব ধূমকেতুদিগের দূরত্ব অপেক্ষা অধিক, কাজেই কোন একটি ধূমকেতু পৃথিবী ও একটি নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র নক্ষত্রটি কিয়ৎকালের জন্য অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। চন্দ্র মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া নক্ষত্রটিকে ক্ষণকালের জন্য লোকলোচন হইতে অপসৃত করিয়া দেয়। সাধারণ কথায় এরূপ ঘটনাকে নক্ষত্র-গ্রহণ বলা যাইতে পারে। হার্শেল একটি ধূমকেতুকে এক নক্ষত্রসঙ্ঘকে অতিক্রম করিতে দেখিয়াছিলেন; সেই সঙ্ঘের নক্ষত্রগুলি এরূপ ক্ষুদ্র যে, সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ সাহায্য ব্যতিরেকে তাহারা দৃষ্টিগোচর হইত না; সামান্য কুয়াসা বা এক খণ্ড পাতলা মেঘ সম্মুখে আসিলেই নক্ষত্রগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সহস্র সহস্র মাইল গভীর ধূমকেতুটি সম্মুখে আসিলেও নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা কিয়ৎপরিমাণেও হ্রাস পায় নাই, তাহারা পূর্ব্ববৎ দেখা গিয়াছিল। † ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, ধূমকেতু মেঘ হইতে কত পরিমাণে সূক্ষ্ম। সূর্য্যাদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কের ওজন স্থির হইলেও ধূমকেতুর ওজন এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ধূমকেতুর সহসা কখন্ কোথায় আকাশে আবির্ভাব হয়, তাহা বলা দুষ্কর। এক বিষয়ে ধূমকেতুদিগের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান; বৎসরের যে কোন সময়ে রাত্রির যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বদা ইহাদিগের পুচ্ছ সূর্য্যের বিপরীত দিকে লম্বমান থাকে। স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ যন্ত্রে ধূমকেতুতে যৌগিক অঙ্গার (Hydro Carbon) ও অন্যান্য বাষ্পের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। অনেকের মতে ধূমকেতু অতি সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থবিশেষ নহে। বাষ্পাবৃত কতকগুলি দৃঢ় পদার্থের একত্র সমাবেশমাত্র। ধূমকেতুর পৃথিবীর নিকট আগমন সাধারণের নিকট অশুভ চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়,

* General Astronomy by Young.

কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নাই। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ধূমকেতুবিষয়ক এত অধিক নূতন তথ্য আমরা অবগত হইয়াছি যে, এই অতিথিটির আগমনে ভীত বা সন্ত্রস্ত হইবার অধুনা কোন কারণ থাকিতে পারে না।

উল্কাপ্রস্তর ও নক্ষত্র-পতন

সময়ে সময়ে অন্যান্য জগৎ হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রস্তরাদি পতিত হয়। খৃষ্ট-জন্মের ৬ শত ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে পতিত প্রস্তরাপেক্ষা প্রাচীন কোন পতিত প্রস্তরের বিবরণী লিপিবদ্ধ নাই। ফিনিসীয়, ইজিপ্সীয় ও গ্রীক জাতি নিক্ষিপ্ত উল্কা-প্রস্তরকে ভগবৎ-প্রেরিত বস্তু বলিয়া মন্দিরে স্থাপনা করিয়া পূজার্চ্চনা করিতেন। কনসল্ ফন্ লরিনের মতে মক্কার সুবিখ্যাত কাব্বা-প্রস্তর একটা উল্কাপিণ্ড। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উল্কাপিণ্ড অদৃশ্য হইয়া থাকে। রাত্রিকালে উল্কাপাত হইলে দেখা যায়, একটি প্রকাণ্ড অগ্নি-গোলক সশব্দে চতুর্দ্দিকে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে; কিছুক্ষণ পরেই তাহা ভীষণ শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়, কখনও নিঃশব্দে আগমন করে। পতিত উল্কাপ্রস্তর সংখ্যায় একটি হইতে কয়েক সহস্র পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রস্তরখণ্ডই নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে অমিশ্র লৌহগোলক অথবা অল্পবিস্তর নিকেল-(nickel) মিশ্রিত লৌহ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উল্কা-প্রস্তরদিগের রাসায়নিক উপাদান হাওয়ার্ড প্রথম স্থির করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন উল্কা-প্রস্তরের উপাদান বিভিন্ন নহে। উপাদান প্রধানতঃ—(১) সিলিসিক দ্রাবক, (২) ম্যাগনিসিয়া, (৩) লৌহ, (৪) নিকেল ও (৫) লৌহ সাল্‌ফিউরেট্। আমাদিগের পৃথিবীতে বহু প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান; কিন্তু উল্কা-প্রস্তরে মাত্র কয়েক প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছে; অধিকাংশই আমাদিগের নিকট নূতন নহে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উল্কাদিগের বিষয় ক্লাদনি স্থির করেন যে, জ্যোতিষ্কদিগের মত তাহারা আকাশ-পথে বিচরণ করে, কিন্তু পৃথিবীর নিকট আসিবামাত্র পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হয়; বায়ুমণ্ডলের বায়ুর সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় তাহারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও উপরিস্থিত আবরণ দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং পরিশেষে বিভিন্ন প্রকার বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তির জন্য বিদীর্ণ হয়। এই মতবাদই এখনও প্রচলিত—যদিও অনেকে অনুমান করেন যে, চন্দ্র অথবা পৃথিবীস্থিত আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরাদিই উল্কাপ্রস্তররূপে প্রত্যাগমন করে।

রাত্রিকালে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে নক্ষত্র পতন হইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, একটি প্রকৃত নক্ষত্রের পৃথিবীপৃষ্ঠে পতন সম্ভবপর নহে। আকারে বড় ক্ষুদ্র উল্কা-প্রস্তরের পতনই তথাকথিত নক্ষত্র-পতন। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আসিবার সময় ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেক রজনীতে এরূপ সংখ্যায় কয়েক কোটি প্রস্তরখণ্ড বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে আগমন করে। [ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ

দিগন্তে উঠিল ভেসে পুণ্য মন্ত্র-ধ্বনি,
সে শব্দ-তরঙ্গে মুগ্ধ হইল জগত;
জীর্ণ কুটীরের প্রান্তে আচার্য্য বসিয়া
বিস্মিত করিল বিশ্বে বিদ্যার প্রভায়!
সে প্রভায় দূরীভূত অজ্ঞান-আঁধার
পরাভূত সে বিদ্যায় জড় ও প্রকৃতি;
শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন—যজ্ঞ-উপবীত

সমাজ মানিল তবে আচার্য্য-শাসন,
বলবীর্য্য সে শাসনে হইল নমিত;
চতুরঙ্গ, ছত্রদণ্ড সে কুটীর-দ্বারে
কি এক সঙ্কেতে অর্ঘ্য করিল প্রদান।
উপবীত স্কন্ধে বহি' কহিল ব্রাহ্মণ,—
"সমাজের মেরুদণ্ড আমিই এখন!"

পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ

বিখ্যাত ফরাসী দস্যু সর্দার

১

মিঃ এইচ এষ্টন্ উল্ফ (H. Ashton Wolfe) নামক জনৈক ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ কোন বিলাতী সাপ্তাহিক পত্রিকার লাকোম্বি (Lacombe) নামক এক জন বিখ্যাত ফরাসী দস্যুর ভীষণ দস্যুবৃত্তির ও গ্রেপ্তারের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিবরণ অপেক্ষা কোন কাল্পনিক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস অধিকতর লোমহর্ষণ ও বিস্ময়াবহ নহে। এই বিবরণ পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের ভীষণপ্রকৃতি অসমসাহসী দস্যু-তস্কররা পাশ্চাত্য আদর্শে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেও তাহাদের য়ুরোপীয় ওস্তাদগুলির জুতা স্পর্শ করিবারও যোগ্যতা লাভ করে নাই।

লাকোম্বির পিতা ব্যবসায়ে চামার ছিল। কিন্তু লাকোম্বি প্রথম যৌবনেই পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। প্রথমে সে বিখ্যাত মোটর দস্যু (motor bandits) বোনো ও রেমণ্ড-লা-সায়েন্সের দলে মিশিয়া সমগ্র ফরাসী দেশকে সন্ত্রস্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মিঃ উল্ফ লাকোম্বির বিস্ময়াবহ কার্য্য-প্রণালীর আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই কথায় নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মিঃ উল্ফ লিখিয়াছেন,—"লাকোম্বি যদিও ফ্রান্সের এনার্কিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছিল, তথাপি কাহাকেও লুঠের বখরা দিতে তাহার ইচ্ছা না থাকায় সে ডাকাইতী করিবার সময় একাকী যাইত, কাহাকেও সঙ্গে লইত না। এক বার সে একাকী একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে হত্যা করিয়াছিল। আর এক বার সে আমার কর্ম্মচারী ডুক্রের বাসায় গিয়া সারারাত্রি ধরিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে নানাপ্রকার ভয়প্রদর্শনের পর উভয়কেই গুলী করিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অত্যন্ত লোমহর্ষণ।

"ডুক্রেকে আমি আমার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমার চাকরীতে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সে এনার্কিষ্টদের দলের একখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিল। সেই পত্রিকাখানির নাম 'লি-আইডেক লিব্রে।' এই পত্রিকা-সম্পাদন উপলক্ষে বিস্তর এনার্কিষ্ট দস্যু-তস্করের সহিত তাহার সংস্রব ছিল।

"ডুক্রে ছিল সুইস্। সে তাহার স্বদেশে অবস্থানকালে এনার্কিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিল; কিন্তু সে শান্তিপ্রিয় লোক ছিল, কোন বে-আইনী কার্য্যে তাহার অনুরাগ ছিল না। কিছু দিন পরে সে প্যারিসে আসিয়া 'আইডেক লিব্রে'র সম্পাদক ও মুদ্রাকরের পদ গ্রহণ করে।

"ডুক্রে পরে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিল, উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের পর তাহাকে যে সকল লোকের সংস্রবে আসিতে হইত, তাহাদিগকে সে অত্যন্ত ভয় করিত; এবং তাহাদের সহিত না মিশিতে হয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দূরে পরিহার করিবারও চেষ্টা করিত। আমি তাহার মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিলাম। আমার ধারণা হইল—আমার আশ্রয় লাভ করিয়া সে দুর্দ্দান্ত দস্যুতস্করগণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাহার আতঙ্ক দূর হইল।

"কয়েক সপ্তাহ পরে ফরাসী ডিটেক্‌টিভ ব্যানিষ্টার প্যারিস হইতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অঙ্গুলী-চিহ্নের 'ফটো' তুলিবার জন্য আমার একটি যন্ত্র আছে; তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব থাকায়, ব্যানিষ্টার আমাকে সেই যন্ত্রটি লইয়া প্যারিসে যাইতে অনুরোধ করিলেন; কারণ, প্যারিসের কোন অট্টালিকায় একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ব্যাপার।

"প্যারিসের 'রু-রিসেলু' ষ্ট্রীটের কোন অট্টালিকায় মিঃ কার্ণেজি নামক এক জন আমেরিকান নিহত হইয়াছিলেন। তিনি আমেরিকান হইলেও ফ্রান্সের অতীত গৌরবের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ অনেক দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। অনেক বার অনেক শিল্প-প্রদর্শনীতে সেই সকল সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়াছিল।

"দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্ণেজির একটু পাগলামীর ছিট ছিল; তিনি মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লোহার সিন্দুকে না রাখিয়া ঘরের যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিতেন। এই প্রকার অসতর্কতাই তাঁহার অপমৃত্যুর কারণ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। চোর চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ঘরে আসিয়াছিল, শেষে ধরা পড়িবার ভয়ে তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তখন তিনি শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল—তাঁহার মৃত দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত বহুমূল্য নস্যদানীগুলি অপহৃত হইয়াছে। শ্বাস রোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

"এই প্রকার হত্যাকাণ্ড নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার; কিন্তু এই সম্পর্কে একটি রহস্যময় ব্যাপার লক্ষিত হইল। যে কক্ষে উক্ত নস্যদানীগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল, সেই কক্ষের একখানি চেয়ারে একটি তরুণ যুবক উপবিষ্ট ছিল; কিন্তু তাহার দেহে প্রাণ ছিল না। তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল—একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা তাহার বক্ষঃস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই ছোরার আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

"এই যুবকটি গৃহবাসিগণের সম্পূর্ণ অপরিচিত; এমন কি, পুলিস পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সনাক্ত করিতে পারিল না। যুবকটি সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রিকালে সেখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে দেখিয়া কাহারও ধারণা হইল—সে ইংরাজ, কেহ বলিল—সে আমেরিকান। তাহার পকেটে পরিচয়সূচক কোন কাগজপত্র ছিল না; কিন্তু পরিচ্ছদে এক জন ইংরাজ দর্জ্জির নাম ছিল। যুবকটির বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে।

"ব্যানিষ্টারের অনুরোধে কেহ ঘরের কোন দ্রব্য স্পর্শ না করায় আমাদের তদন্তের অসুবিধা হয় নাই। যুবকটি মৃত্যুর সময় যে চেয়ারে বসিয়াছিল, তাহাকে সেই চেয়ারেই উপবিষ্ট দেখিলাম। ছোরা তাহার বক্ষে বিদ্ধ ছিল। ডাক্তার মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, গৃহস্বামী কার্ণেজি ও সেই যুবক ঠিক একই সময়ে নিহত হইয়াছিল।

"অতঃপর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম; আমি যে প্রণালীতে অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটো লই, সেই প্রণালী তখন সম্পূর্ণ নূতন ছিল। রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে আমি সেই ছোরার হাতলের উপর হইতে চারিটি অঙ্গুলীর সুস্পষ্ট ফটো তুলিলাম, এবং যে কাচের আলমারী হইতে সোনার নস্যদানীগুলি অপহৃত হইয়াছিল—সেই আলমারীর কপাটের প্রান্ত হইতেও অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটো তুলিয়া, ফটোগুলি পরে পুলিসের লেবরেটরীতে প্রেরণ করিলাম।

"কয়েক দিনের অনুসন্ধানে প্যারিস পুলিসের অধ্যক্ষ জানিতে পারিলেন, ওয়াল্টারস্ নামক একটি যুবক শিল্পশিক্ষার্থ নিউইয়র্ক হইতে প্যারিসে আসিয়া লাটান পল্লীর রু-ভাভাসুঁ নামক রাজপথ-সন্নিহিত একটি বাসায় বাস করিতেছিল; কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে সে অদৃশ্য হইয়াছিল।

"পুলিসের অধ্যক্ষের অনুমতিপত্র লইয়া আমি ও ব্যানিষ্টার সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম এবং সেখানেও কয়েকখানি ফটো তুলিলাম। সেই সকল ফটোর সাহায্যে জানিতে পারিলাম, ওয়াল্টারসই পূর্ব্বোক্ত নিহত যুবক। কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে কার্ণেজির গৃহে গিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলাম না; তবে বুঝিলাম, তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, কারণ, তাহার যে সকল ইংরাজ বন্ধু ও প্রতিবেশী তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিত, তাহারা সকলেই বলিল, তাহার প্রকৃতি শান্ত ও সুশীল ছিল। শিল্প ও মনস্তত্বের অনুশীলন ভিন্ন সে অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা করিত না।

"অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, ওয়ালটার্সের পিতা নিউইয়র্কের ধনাঢ্য অধিবাসী। তিনি পুত্রের শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ তারযোগে জ্ঞাপন করা হইলে তিনি ফরাসী পুলিসকে হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে ব্যানিষ্টারকে সঙ্গে লইয়া আমি তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

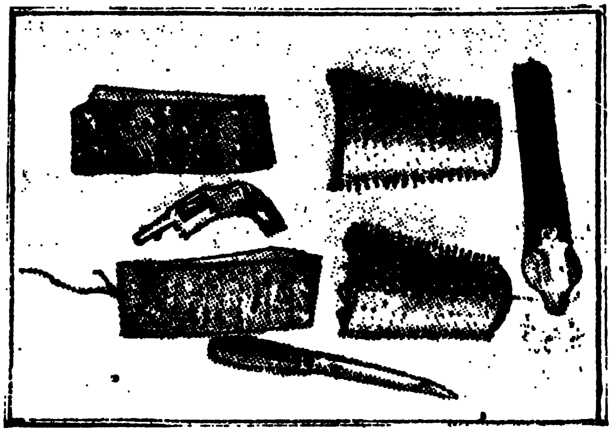
"আমি পুলিস লেবরেটরীতে অঙ্গুলী-চিহ্নের যে ফটো পাইয়াছিলাম, সেই ফটোগুলির সহিত পুলিসের সংগৃহীত

(অপরাধীদের) অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটোগুলি মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে পুলিস সিদ্ধান্ত করিল, উহা প্রসিদ্ধ লাকোম্বির অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটো। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লাকোম্বি দস্যুবৃত্তির জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, এই জন্য পুলিসের সেরেস্তায় তাহার অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটো ছিল।

"লাকোম্বিই যে এই উভয় ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম, লাকোম্বির সাড়া পাইয়া কার্ণেজির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, পাছে তিনি সোরগোল করেন, এই ভয়ে লাকোম্বি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং গলা টিপিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু ওয়ালটার্স সে সময় সেখানে কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিল এবং লাকোম্বি কি কারণে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছিল যে, ওয়াল্টার্সকে যখন হত্যা করা হয়, তখন সে চেয়ারে ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া ছিল।

"অতঃপর ঘোষণা করা হইল, যে কেহ লাকোম্বির সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করা হইবে। যে সকল স্থানে তাহার গতিবিধি ছিল— পুলিস সেই সকল স্থানের উপর লক্ষ্য রাখিল। অবশেষে আমরা জানিতে পারিলাম, লাকোম্বি মধ্যে মধ্যে তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। তাহার এই প্রণয়িনী সুন্দরী যুবতী, কেশের প্রাচুর্য্যের জন্যই তাহার খ্যাতি ছিল, তাহার স্বর্ণাভ নিবিড় কেশরাশির জন্য তাহার নাম হইয়াছিল, 'কাস্ক ডি অর' অর্থাৎ 'স্বর্ণ-কিরীটিনী।' প্যারিসের সেণ্টডেনিসগেট-সন্নিহিত একটি গলীতে তাহার একখানি ছোট 'কাফে' ছিল।

ফরাসী পুলিস এনার্কিষ্টদের সকল আড্ডায় সপ্তাহকাল আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে এক দিন প্রভাতে ব্যানিষ্টার টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিলেন— লাকোম্বি তাহার প্রণয়িনীকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন।



প্রসিদ্ধ ফরাসী দস্যু লাকোম্বির কণ্টকাবৃত চর্ম্ম-নির্ম্মিত কফ, গলাবন্ধ ও অস্ত্রাদি (প্যারিসের পুলিস মিউজিয়মে রক্ষিত)

আমরা লাকোম্বিকে চিনিতাম না, কিন্তু আমার কর্ম্মচারী ড্রুক্রে তাহাকে চিনিত। এই জন্য ড্রুক্রেকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ড্রুক্রে প্রাণভয়ে আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। আমরাও তাহাকে সে জন্য পীড়াপীড়ি করিলাম না। সে লাকোম্বির চেহারার বর্ণনা শেষ করিয়া বলিল, তাহার দক্ষিণ করতলের উল্টা পিঠে উল্কি দ্বারা একটি 'হরতনের টেক্কা' অঙ্কিত আছে।

"আমরা কয়েক জন ডিটেক্‌টিভ সঙ্গে লইয়া 'স্বর্ণ-কিরীটিনীর' 'কাফে'র সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, লাকোম্বি তখন চেয়ারে বসিয়া এক পেয়ালা কাফি ধীরে ধীরে পান করিতেছিল। বেশ নিরুদ্বেগ ভাব। 'কাফে'র ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিলে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, এই সন্দেহে আমরা 'কাফে'র দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরামর্শ লইল, লাকোম্বি কাফের বাহিরে আসিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিব।

"আমরা কাফের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইলে, লাকোম্বি কাফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কাফিপান শেষ করিয়া সে অসঙ্কোচে বাহিরে আসিল। সে দ্বারের বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র দুই জন বলবান্ ডিটেক্‌টিভ দুই পাশ হইতে তাহার উভয় বাহু চাপিয়া ধরিল। লাকোম্বি অবজ্ঞাভরে একটু হাসিল এবং হাত দুইখানি একটু জোরে ঘুরাইয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ডিটেক্‌টিভদ্বয় অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ঘুরিয়া পড়িল। তাহাদের অবস্থা

রহিলাম। ডিটেক্‌টিভদ্বয়ের হাত দুইখানি শতধা বিদীর্ণ হইয়া শোণিতের স্রোত বহিতে লাগিল। লোমহর্ষণ ব্যাপার !"

"অতঃপর ছয় সাত জন পুলিস-প্রহরী লাকোম্বিকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইল এবং থানায় লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। লাকোম্বি হাসিতে হাসিতে তাহাদের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া নিজের দেহ দ্বারা তাহাদের দেহ ঘর্ষণ করিল। সেই ঘর্ষণের ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইল এবং তাহাদের পরিচ্ছদগুলিও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। লাকোম্বি এইভাবে পুলিসের কবল হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া দ্রুতবেগে পথে উপস্থিত হইল। সেই সময় একখানি ট্যাক্সি সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; লাকোম্বি সেই গতিশীল ট্যাক্সিতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া অদৃশ্য হইল। ট্যাক্সিখানি যে তাহারই দলের, ইহাই সকলের ধারণা হইল।

"আমি হতবুদ্ধি হইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বহু দিন হইতে গোয়েন্দাগিরী করিতেছি, অনেক দুর্দ্দান্ত দস্যু-তস্করকে নানা কৌশলে গ্রেপ্তার করিয়াছি; কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। আমরা লাকোম্বিকে অনায়াসে গুলী করিতে পারিতাম, কারণ, আমরা সশস্ত্র ছিলাম; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ না থাকায় আমরা তাহাকে গুলী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি নাই।

"যাহা হউক, অতঃপর লাকোম্বির অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; কিন্তু কেহই তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না, যেন সে বাতাসে মিশিয়া গেল! কিন্তু সে কি কৌশলে তাহার আলিঙ্গনাবদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ও পুলিস প্রহরী-দের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিল, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলাম, সে সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মনির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করিত; সেই বর্ম্মের আগাগোড়া দুই ইঞ্চি লম্বা ইস্পাত-নির্ম্মিত তীক্ষাগ্র কলায় আবৃত! চর্ম্মের বর্ম্মভেদ করিয়া, সেই সকল কলা বহির্ম্মুখী হইয়া তাহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। যে তাহাকে ধরিতে যাইত, তাহারই সর্ব্বাঙ্গ সেই সকল তীক্ষ্ণধার কলায় ক্ষত-বিক্ষত হইত। এই সজারু' (The porcupine of Paris) নামে অভিহিত করিত।"

২

"পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে এক দিন সংবাদ পাই-লাম—প্যারিসের সহরতলীর একটি ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশনে ডাকাইতী হইয়াছে। এক জন পোর্টার বলিল, ষ্টেশন-মাষ্টার দস্যুটাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহার দুই হাত ও মুখ ইস্পাতের কলায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দস্যুর মুখে মুখোস থাকায় ষ্টেশন-মাষ্টার তাহার মুখ দেখিতে পান নাই। দস্যুটা তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিল; তাহার পর ষ্টেশন-মাষ্টারের বাসায় উপস্থিত হইল। ষ্টেশন-মাষ্টারের স্ত্রী-পুত্ররা যে ঘরে ছিল, সে সেই ঘরের মেঝের উপর 'পেট্রল' ঢালিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। নিহত ষ্টেশন-মাষ্টারের স্ত্রী সেই আগুনে পুড়িয়া মরিলেন; তাঁহার দুইটি পুত্র জানালার ভিতর দিয়া অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। ইস্পাতের কলাখচিত বর্ম্মের পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ, দস্যু ষ্টেশনে যে সকল অঙ্গুলীচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল—তাহার 'ফটো' লইয়া বুঝিতে পারিলাম, লাকোম্বি একাকী আসিয়া এই সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল; কিন্তু আমরা আর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পাইলাম না।

"এই ঘটনার পর লাকোম্বির অত্যাচারের ভয়ে প্যারিস ও সন্নিহিত জনপদসমূহের অধিবাসিবর্গ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। লাকোম্বির দুই চারি জন বন্ধুর নিকট তাহার সংবাদ পাইবার আশা ছিল; সে আশাও নির্মূল হইল। কারণ, তাহারা বুঝিয়াছিল—লাকোম্বির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহাদের কাহারও পরিত্রাণলাভের সম্ভাবনা নাই।

"রেল-ষ্টেশনের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কিছু দিন পর লাকোম্বির প্রণয়িনী 'স্বর্ণকিরীটিনী' এক দিন প্যারিসের সদর থানায় উপস্থিত হইয়া আমাদের নিকট অভিযোগ করিল—লাকোম্বির ভয়ে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। তাহার নিকট আরও

ঘরে আসিবে—এরূপ কথা আছে। স্বর্ণকিরীটিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—লাকোম্বি ট্রেণে আসিয়া সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় সহরতলীর বেজন্স্ (Bejons) ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিবে, ইহাও সে জানিতে পারিয়াছে।

"সেই দিন সন্ধ্যা ৭টার পূর্ব্বেই আমি ও ব্যানিষ্টার ছয় জন পুলিস-প্রহরী লইয়া, লাকোম্বিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বেজন্স্ রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সকলের কাছেই পিস্তল ছিল; কিন্তু তাহাকে ধরিতে না পারিলে—পিস্তল ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই।

"আমরা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে স্পন্দিত বক্ষে ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। কয়েক জন যাত্রী ট্রেণ হইতে নামিয়া আসিল; লাকোম্বিকেও প্ল্যাটফর্ম্মে নামিতে দেখিলাম। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; কারণ, সে আমাদিগকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'কেহ আমার কাছে আসিও না; আমার দুই হাতে দুইটি এবং দুই পকেটে দুইটি বোমা আছে। আমার কাছে আসিলেই বোমা ছুড়িব; তোমরা ত মরিবেই, হয় ত আমিও মরিব। সকলে আমার পথ ছাড়িয়া চলিয়া যাও।'

"বুঝিলাম, আমাদিগকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য সে এ কথা বলে নাই, তাহার কথা সত্য। তাহার দুই হাতে দুইটি গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলাম। এতদ্ভিন্ন তাহার দুই পকেটেও ঐরূপ দুইটি বোমা আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল। তাহার কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার নিকট যাইতে কাহারও সাহস হইল না।

"আমাদিগকে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া লাকোম্বি ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, তাহার পর লাইনের পাশ দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন আমরা দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিলাম; কিন্তু সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটা বোমা নিক্ষেপ করিল। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। আমরা পরস্পরের ঘাড়ে পড়িয়া মাটীতে গড়াইতে লাগিলাম;

"আমরা বুঝিতে পারিলাম, যদি কোন কৌশলের সাহায্যে লাকোম্বিকে ধরিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা সফল হইবার আশা নাই; তাহার সম্মুখীন হইয়া প্রকাশ্যভাবে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে আমাদের জীবন বিপন্ন হইবে। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্য আমি ব্যানিষ্টারকে সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে থানায় আসিলাম এবং গোয়েন্দা-পুলিসের অধ্যক্ষ মসিয়ে গয়সারকে টেলিফোনে সকল কথা বলিলাম।

"মসিয়ে গয়সারের আদেশে অবিলম্বে সকল রাস্তায় পুলিস মোতায়েন করা হইল। পুলিস-বিভাগের অধ্যক্ষ মসিয়ে লি পাইন সকল কথা শুনিয়া, লাকোম্বিকে দেখিলেই গুলী করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অবস্থা বিবেচনায় তাহাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তারের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

"অতঃপর ব্যানিষ্টারের সঙ্গে আমি প্যারিসে প্রত্যাগমনে উদ্যত হইয়াছি, হঠাৎ মনে হইল, লাকোম্বির প্রণয়িনীর ভাগ্যে কি ঘটিল, তাহার সন্ধান লইয়া আমাদের প্যারিসে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। আমাদিগকে রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া লাকোম্বি তাহার প্রণয়িনীকেই সম্ভবতঃ সন্দেহ করিয়াছিল, তাহার সন্দেহের ফল কিরূপ সাংঘাতিক হইতে পারে, বুঝিয়া আমি ব্যানিষ্টারকে বলিলাম, মেয়েটার কি দুর্গতি হইল, তাহা না দেখিয়া আমাদের প্যারিসে চলিয়া যাওয়া কি সঙ্গত হইবে?

"ব্যানিষ্টার বলিলেন, 'চলুন, স্বর্ণ-কিরীটিনীকে দেখিয়াই যাই।' আমরা তখন ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিলাম, ট্যাক্সি ঘুরাইয়া লইয়া লাকোম্বির প্রণয়িনীর বাসার অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম এবং কয়েক মিনিট পরেই তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম।

৩

"প্যারিসের সহরতলীতে যে সকল ছোট দোতলা বাড়ী সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, স্বর্ণকিরীটিনীর বাসাটিও সেইরূপ বাড়ী। আমাদের বিশ্বাস ছিল, পুলিসের প্রহরীদিগকে সেই বাড়ীর পাহারায় থাকিতে দেখিব; কিন্তু আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া কোন পুলিস-প্রহরীকে

জানালা দিয়া দীপালোক দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কোন লোকের সাড়াশব্দ পাইলাম না। সম্মুখের দ্বার খোলা পড়িয়া ছিল।

"আমরা পিস্তল হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হইতে লাগিল, অদৃশ্য হস্তনিক্ষিপ্ত গুলী দ্বারা আমরা আহত হইব অথবা আমাদের সম্মুখে বোমা ফাটিবে। কিন্তু দোতলার ঘরে গিয়া সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটু বিস্মিত হইলাম। পাশেই আর একটি কক্ষ; আমি সেই কক্ষে প্রবেশোদ্যত হইয়াছি, এমন সময় ব্যানিষ্টার আমার হাত ধরিয়া টানিয়া মেঝের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন; দেখিলাম, অন্য কক্ষের দ্বারের নীচ দিয়া মেঝেতে রক্তের স্রোত বহিতেছে! আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হইল। বুঝিলাম, যখন আমাদের এখানে আসা উচিত ছিল, তখন আসিতে পারি নাই। আমরা স্তম্ভিত হৃদয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলাম; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ব্যানিষ্টারকে বলিলাম, 'পাশের কুঠরীতে তাহাকে পাওয়া যাইতেও পারে, তবে ঐ কুঠরীতে জানালা থাকিলে সেই দিক দিয়া সে হয় ত পলায়ন করিবে। আমি এখানে একাকী থাকিলাম, আপনি বাহিরে গিয়া দেখুন, কোনও দিক দিয়া সে পলায়ন করে কি না। আমার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইলেই আপনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন।'

"ব্যানিষ্টার আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন পাশের কক্ষের দ্বার খুলিয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। দেখিলাম, 'স্বর্ণ কিরীটিনী' মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার এক কান হইতে অন্য কান পর্য্যন্ত গলার সমস্তটাই কাটিয়া ফেলিয়াছে; তাহার স্বর্ণাভ কেশরাশি রক্তে ভাসিতেছে। দেহ প্রাণহীন! তাহার বুকের উপর এক টুকরা কাগজ দেখিলাম, কাগজখানি জামার সঙ্গে পিন দিয়া আঁটা ছিল। সেই কাগজখানিতে লেখা ছিল, 'বিশ্বাসঘাতকরা সকলেই এই ভাবে মরে। এনার্কি চিরস্থায়ী হউক! (Vive l' Anarchie !) লাকোম্বি।'

"আমরা কোন্ কক্ষে সেই কাপুরুষ নারী-হন্তাকে হইল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। সেই অঞ্চলের অধিবাসিবর্গ পুলিসকে যথাশক্তি সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহাদের ও পুলিসের সমবেত চেষ্টা বিফল হইল। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার উল্লেখ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল, ইহাতে মসিয়ে গয়সার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অধীর হইয়া উঠিলেন।

"এই ঘটনার কিছু দিন পরে এক দিন প্রভাতে টেলিফোনের ঝনঝনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেলিফোনে শুনিলাম, 'আমি ব্যানিষ্টার, এই মুহূর্ত্তেই আপনার এখানে আসা চাই। লাকোম্বি আপনার কর্ম্মচারী মসিয়ে ড্রুক্রেকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। আমাকে অবিলম্বে ড্রুক্রের বাসায় যাইতে হইবে!'

"আমি ড্রুক্রের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম — ড্রুক্রের স্ত্রী একখানি টুলে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহারও মস্তকে একটি গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল। দুই জন ডাক্তার তখন তাহার ক্ষতস্থলে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিতেছিল। ড্রুক্রের মৃতদেহ শয্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহার দেহে তিনটি গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল। ড্রুক্রের স্ত্রী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পূর্ব্ব-রাত্রির দুর্ঘটনার বিবরণ আমাদের নিকট প্রকাশ করিল।

"এনার্কিষ্টরা রাত্রিকালে গৃহদ্বারের অর্গল রুদ্ধ করে না; কারণ, তাহাদের দলের কোন লোক হঠাৎ তাহাদের গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বদিন রাত্রি ৮টার সময় ড্রুক্রে ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। টেবলের উপর একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, ড্রুক্রে টেবলের কাছে দাঁড়াইয়া দীপ নির্ব্বাপিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় লাকোম্বি হঠাৎ সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল। ড্রুক্রে তাহাকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, লাকোম্বি ইহাতে আমোদ বোধ করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং শয্যার দিকে অগ্রসর হইল।

"লাকোম্বি ড্রুক্রেকে বলিল, 'তুমি এখন পুলিসের গুপ্তচর। তোমার ঘরে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম, ভালই হইল। তুমি উপাসনা শেষ করিয়া লও, তোমাকে ও

দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যদি পলায়নের চেষ্টা কর, তৎক্ষণাৎ গুলী করিব।'—সে পকেট হইতে এক-জোড়া পিস্তল বাহির করিল।

"ঘরে গোলমাল শুনিয়া ড্রক্রের স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে লাকোম্বিকে বলিল, তাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। তাহারা বিশ্বাসঘাতক হইলে রাত্রিকালে গৃহদ্বার খুলিয়া রাখিত না।

"লাকোম্বি ড্রক্রের অপরাধের কোন প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া বিনা প্রমাণে তখনই তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সে ড্রক্রে ও তাহার স্ত্রীকে নড়িতে নিষেধ করিয়া ডেস্ক-বাক্স খুলিয়া চিঠিপত্র খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহা না পাইয়া তাহাদিগকে জেরা করিতে লাগিল। সে বলিল, ইচ্ছা করিয়া সে নরহত্যা করে না, বিচার করিয়া অপরাধীদের প্রাণদণ্ড করে। ষ্টেশন-মাষ্টারকে অকারণে হত্যা করে নাই, সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাহার নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করিলে, ষ্টেশন-মাষ্টার তাহার গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল, এই জন্যই তাহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে কখন কোন অন্যায় কায করে নাই! সে স্বর্ণ-কিরীটিনীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, পুলিসে তাহার সংবাদ দিয়াছিল। এই যুবতীর কথা বলিবার সময় লাকোম্বির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল।

"ড্রক্রের স্ত্রী আমার নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিল, 'পশু! পশু! সে আমাদিগকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, আমরা তাহার কোন অপকার করি নাই; তথাপি আমার স্বামী পুলিসের গুপ্তচর—এ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য এক ঘণ্টা ধরিয়া সে তাঁহাকে জেরা করিয়াছিল।'

"যাহা হউক, লাকোম্বি ড্রক্রের বিশ্বাসঘাতকতার কোনও প্রমাণ না পাইয়া, মদের বোতল খুঁজিয়া বাহির করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল, গান করিতে লাগিল। সে কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে কাটাইল, কিন্তু পিস্তল নামাইল না, ড্রক্রে ও তাহার স্ত্রীকে নড়িতে দিল না। অবশেষে প্রত্যূষে ৫টার সময় তাহার মদ্যপান শেষ করিবার সময় আসিয়াছে। তোমাদের সমাধি-স্তম্ভের স্মৃতি-ফলকে কি কবিতা লিখিতে হইবে? তোমাদের সাহায্যে আমি তাহা রচনা করিব।'

"সে পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া কবিতা লিখিতে লিখিতে উচ্চৈঃস্বরে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল। সে যখন টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কবিতা লিখিতেছিল, সেই সুযোগে ড্রক্রে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিল। লাকোম্বির পিস্তল তাহার কব্জীতে ফিতা দিয়া বাঁধা ছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহা টানিয়া লইয়া চারি বার গুলী করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দীপ নির্ব্বাপিত হইল। গুলীর আঘাতে ড্রক্রের স্ত্রী মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে তাহার মুমূর্ষু স্বামীর আর্ত্তনাদ এবং লাকোম্বির উচ্চহাস্য শুনিতে পাইয়াছিল।

"আমি ড্রক্রের স্ত্রীকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম, তাহার পর ব্যানিষ্টারকে বলিলাম, 'চলুন যাই; আমার মাথায় একটা ফন্দী আসিয়াছে। পুলিস যে ভাবে তদন্ত করে করুক, আমরাই লাকোম্বিকে গ্রেপ্তার করিব।'

৪

"আমার বাড়ীতে মধ্যযুগের কয়েকটি লৌহবর্ম্ম এবং লোহার করাবরণ (Gauntler) ছিল। আমি ব্যানিষ্টারকে বলিলাম, সেই লৌহবর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া তাহার উপর কোট পরিধান করিব এবং লোহার করাবরণের উপর দস্তানা ব্যবহার করিব। এরূপ করিলে 'সজারুর' কাঁটায় আমাদের ক্ষতবিক্ষত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না, সে ছুরিকাঘাত করিলেও আমরা আহত হইব না।

"কয়েক দিন পরে এক দিন রাত্রিকালে একটা আড্ডায় লাকোম্বিকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাদিগকে সেই আড্ডায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা মনুষ্যের অসাধ্য। আমরা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুই পাশ হইতে তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিলাম। লাকোম্বি পিস্তল বাহির না করিয়া তাহার গাত্রঘর্ষণে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিবার চেষ্টা করিল। ব্যানিষ্টারের কাঁধের উপর লৌহবর্ম্ম প্রসারিত না থাকায় লাম্বোকির হাতের চাপে তাঁহার কাঁধ হইতে

সহ্য করিলেন। লাকোম্বির বর্ম্মসংযুক্ত লোহার কলা আমাদের লৌহবর্ম্ম বিদ্ধ করিতে পারিল না। তাহার পর তাহাকে মেঝের উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার হাতে হাতকড়া আঁটিয়া দিলাম। লাকোম্বি ধরা পড়িল দেখিয়া তাহার কয়েক জন বন্ধু তাহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু আমরা পিস্তলের সাহায্যে তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া পথে আসিলাম। লাকোম্বিকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া যখন আমরা থানায় আসিলাম, তখন আমাদের সাহস ও কৌশলের কথা শুনিয়া পুলিসের কর্ম্মচারিগণ স্তম্ভিত হইলেন। আমরা লাকোম্বির হাতে যে হাতকড়া দিয়াছিলাম, তাহার উপর ডবল হাতকড়া পড়িল। অনন্তর তাহার দেহ হইতে ইস্পাতের কলা-কণ্টকিত চর্ম্মের বর্ম্ম খুলিয়া লওয়া হইল। তাহার সেই অপূর্ব্ব বর্ম্ম প্যারিসের 'পুলিস মিউজিয়মে' সংরক্ষিত হইয়াছে। লাকোম্বির দেহ কম্বলাবৃত করিয়া তাহার 'ফটো' তুলিলাম। সেই 'ফটো' এখানে প্রকাশিত হইল।



বর্ম্মনির্ম্মুক্ত ফরাসী দস্যু লাকোম্বি—'প্যারিসের সন্ত্রাস'

"বর্ম্মবিহীন হইয়া লাকোম্বি শান্তভাব অবলম্বন করিল। সে তাহার অনুষ্ঠিত সকল অপরাধ স্বীকার করিল, আমাদের অজ্ঞাত অনেক দুষ্কর্ম্মের কথাও প্রকাশ করিল।

"আমি তাহাকে ওয়াল্টার্স সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল। আমার প্রশ্ন শুনিয়া লাকোম্বি হাসিয়া বলিল, 'সেই আমেরিকান ছোঁড়া পাগল, সে যাহার বাড়ীতে খুন হইয়াছিল, সেই বুড়ো আমেরিকানটাও পাগল ছিল। ওয়াল্টার্সের সঙ্গে আমার পরিচয় হইলে সে আমাকে বলিয়াছিল, আমি কি ভাবে লোকের ঘরে ডাকাইতী করি, তাহা তাহাকে দেখাইলে সে আমাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবে। আমি বুড়া কার্ণেজিকে বহু দিন হইতে চিনিতাম, পুলিস আমার মিথ্যা বদনাম দিয়া আমাকে ডাকাইত করিয়া তুলিবার আগে আমি কার্ণেজির জুতা মেরামত করিতাম। সেই সময় তাহার সোনার নস্যদানীগুলি দেখিয়াছিলাম। আমি সেইগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য কার্ণেজির অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার সময় ওয়াল্টার্সকে ডাকাইতীর কৌশল দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। সে বুড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহাকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া সেখানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে বলিলাম। আমি বুড়ার নস্যদানীগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সেই সময় বুড়া হঠাৎ জাগিয়া গোলমাল করিতে উদ্যত হইল। আমি এক লম্ফে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম, দমবন্ধ হইয়া বুড়া অক্কা লাভ করিল। তখন আমি সেই ছোকরার কাছে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছে। আমি ভাবিলাম, তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া যাইলে বেশ একটু মজা হইবে, পুলিস ধাঁধায় পড়িবে, এই জন্য আমার ছোরাখানা তাহার বুকে বিঁধাইয়া তাহাকেও সাবাড় করিলাম।' এই সকল কথা বলিয়া সেই নরপিশাচ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"অনন্তর লাকোম্বিকে হাজতে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে সে তাহার আত্মীয়-বন্ধুদিগকে পত্র লিখিল। সেই

জীবনযাপন করিবার জন্ত তাহার যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও, ঘটনাচক্রে তাহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পুলিস তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছিল, ইহা বড়ই লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয়।

"এক সপ্তাহ ধরিয়া লাকোম্বির বিচার চলিল। এই কয় দিন সে ক্রমাগত রোদন করিয়াছিল, তাহার অপরাধের জন্য পুলিসকেই দায়ী করিয়াছিল। বিচারে 'গিলোটিনে' তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার প্রাণদণ্ডের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এক দিন সে কোন কৌশলে কারাগারের ছাদে উঠিয়াছিল। ছাদের উপর দাঁড়াইয়া সে বলিতে লাগিল, কেহ তাহাকে ধরিবার জন্য ছাদে উঠিলেই সে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবে।

"ওয়ার্ডাররা তাহাকে ছাদ হইতে নামিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে সে বলিল, বেলা ঠিক ১২টার সময় ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িবে। 'গিলোটিনে' প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা এই ভাবে মৃত্যুই তাহার পক্ষে প্রার্থনীয়। সে ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া মরিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ ছাদের চারিদিকে পুরু গদী প্রসারিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। কারাপ্রাচীরের নিকট একটি প্রস্তরস্তম্ভে পতাকা-দণ্ড প্রোথিত ছিল, লাকোম্বি সেই প্রস্তর-স্তম্ভের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আঘাতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হওয়ায় সে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাকে আর 'গিলো-টিনে' মরিতে হইল না।"

কোন্ কাল্পনিক ডিটেক্‌টিভ কাহিনী ইহা অপেক্ষা অধিকতর লোমহর্ষণ?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গায়ের জোরের গরম—



হুমকি দিলে ফুলকো চোখে
সুদের সঙ্গে ফিরিয়ে পাবে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট সবে

"অভিশপ্ত এই জীবনের শূন্য পাত্রখানি"

ওগো, আমার মনের কোণের দ্রাক্ষাবনের সাকী,
আজ বুঝি সব চুকিয়ে দিতে চিরদিনের বাকি
উজাড় ক'রে ঢাল্‌লে তোমার সঞ্জীবনী ধারা!
লুপ্ত-চেতন সুপ্ত-লোকের কোন্ স্বপনের পারা
কিছুই নাহি জানি,
অভিশপ্ত এই জীবনের শূন্য পাত্রখানি
কেমন ক'রে নিবিড় রসে পূর্ণ হ'ল আজ!
নিষ্পেষিয়া নিষ্ফলতার পুঞ্জীভূত বাজ
উৎসারিলে অমৃত-স্রোত দীর্ণ-হৃদয়ভূমে!
চিত্ত-তটের তীর-ভুলানো তিমির-রেখা চুমে
তীব্র মধুর এ কোন্ মধু ছাপিয়ে যেন ওঠে,
ফেনিল উতল শ্বেত-শতদল, দল বেঁধে আজ ফোটে!
দহন-দুখে দগ্ধ আমার দেহের দেউল-সীমা
উপচে পড়ে যৌবন-মদ তরুণ অরুণিমা!
আজ যেন কোন্ উত্তেজনায় হৃদয় উচাটন
প্রেম-আসবেরে উগ্রবাসে মাতিয়ে তোলে মন!
বুকের বিজন পুরে,
অজানা কোন্ উৎসবের এক পাগল বাঁশীর সুরে
উঠ্‌ছে বেজে বিশ্ব-হিয়ার মিলন-রাতের গান!
বেপথু এই প্রাণ
আনন্দে আজ রোমাঞ্চিত কাঁপ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে,
সর্ব্বনাশা যে পিয়াসার তীব্র আকর্ষণে
শুকিয়েছিল বুক
উথ্‌লে ওঠে পাত্র ভ'রে ঈপ্সিত সেই সুখ!
হায় গো, সাকী, হায়,
তবুও আজ রইনু আমি তেমনি নিরুপায়;
ভাগ্যটাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে সাধ ক'রে কি মানি?
মোর বাসনার সুরায় সরস সুধার পাত্রখানি
আর্ত্ত আকুল ওষ্ঠপুটে তুল্‌তে অনুরাগে
কুণ্ঠা যে গো জাগে!
দৈন্য দারুণ দিচ্ছে বাধা,—দুঃখ শোনায় মানা,
জীবনে মোর অমৃত-স্বাদ নাই যে কিছুই জানা!
তাই ত এত ভয়;
দুর্ব্বলতাই আন্‌ছে বুকে অসংখ্য সংশয়
বিশ্বাসে মোর নিঠুর করে কঠোর-কুঠার হানি!
দুঃসাহসের দৃপ্ত-দৃঢ় গভীর অভয় বাণী
তুল্‌লে না কেউ কানে;
দ্বন্দ্ব-দ্বিধার ইতস্ততঃ সন্দেহাকুল টানে
সে দিন আমার সকল সুখের পূর্ণপাত্রখানি
মুখের কাছে এগিয়ে এসেও ব্যর্থ হ'ল রাণী!

* * * * *

আর একবার,—বহু যুগের পর,
দীর্ঘদিনের উপবাসী তৃষ্ণা-সকাতর
অন্তর মোর ছেয়ে—
জীর্ণ-মরু-হৃদয়-হ্রদের দু'কূল যেন বে'য়ে
প্রেমের প্রবল তরল ধারায়
পাত্র আমার প্রান্ত হারায়,
আচম্বিতে কানায় কানায়
উঠ্‌ল আবার ভরি',
উজল্ করি' এ জীবনের আঁধার-বিভাবরী!
সে দিন আমার দূর-অতীতের করুণ অভিজ্ঞতা
সাহস দিল বক্ষে আনি', চক্ষে আকুলতা,
ব্যগ্রতা এক ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল যেন বুকে—
আগ্রহে তাই পাত্রখানি তুলে নিলেম মুখে!
কিন্তু, ওগো, শাশ্বত মোর কল্পলোকের সাকী,
তোমার দয়ার বিপুল দানেও পড়ল না ত ফাঁকি
বিধির দেওয়া জন্মাবধির দুরদৃষ্টের গ্লানি,
মোর আনন্দের অশ্রুজলে সুধার পাত্রখানি
লবণাক্ত লাগ্‌ল শুধু ভাগ্যদোষে হায়!
এ জীবনের অমৃত-স্বাদ সবাই কি গো পায়?

শ্রীনরেন্দ্র দেব।



১

সতীশের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর প্রকাণ্ড সম্পত্তি তার হস্তগত হয়। সম্পত্তি ছাড়াও পিতার কাছ থেকে সে তার চেয়ে যে বড় জিনিষটি পেয়েছিল, অর্থাৎ শীলতা এবং শিক্ষা, সেই তাকে এই মস্ত বড় প্রলোভনের মধ্যে অনুকূল-বাতাস-পাওয়া নৌকার মত অবাধে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী, কিন্তু সে বাড়ী, সে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কাযের ভার আমলাদের হাতে এক রকম ছেড়ে দিয়ে নদীর ধারে পল্লী-লক্ষ্মীর একেবারে অন্তরের মাঝখানটিতে স্থিত তার নিজের তৈরী করা বাড়ীতেই থাকতে ভালবাসত। এখানে তার ডিস্পেপসিয়া ভাল থাকত, এবং মনও প্রসন্ন থাকত; তা ছাড়া আরও একটা কথা, এখানে সে যে সুগভীর শান্তি পেত, কলকাতায় তা পাওয়া যায় না।

পাড়ার ছোট মেয়েদের অবস্থা দেখে সে আশ্চর্য্য হয়েছিল। তাদের শিক্ষা দেবার এখানে কোন ব্যবস্থাই ছিল না। খুব হৈ-চৈ ক'রে কায করা তার স্বভাবের অনুকূল নয়; সেই জন্যে সে তার বাড়ীর প্রকাণ্ড বারান্দার এক ধারে আপাততঃ মেয়ে স্কুল সুরু ক'রে দিয়েছিল। পড়ার ব্যবস্থা—সহজ সহজ বাঙ্গালা বই, কিছু অঙ্ক আর চরকা। আপাততঃ স্কুলে গুটি ১৫।২০ পড়ুয়া, তাদের পড়াবার জন্যে কলকাতা থেকে সে যে শিক্ষয়িত্রী আনিয়েছিল, তার নাম সুপ্রভা। বয়সে কাঁচা হ'লেও সুপ্রভা তার এই শিক্ষার কাযটুকু অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল; এবং তার পড়ুয়া এই মেয়েগুলি অল্পদিনের মধ্যেই তার

সে দিন সকালে সমস্ত আকাশ ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল, নদীর ঢেউগুলো বাতাসে সির-সির ক'রে উঠছিল, আর জলো হাওয়া বইছিল। নদীর জলের ওপর মেঘের কালো ছায়া প'ড়ে সমস্তটা পরিপূর্ণ অন্ধকার ক'রে তুলেছিল।

বারান্দার ধারে একটা আরাম-কেদারার উপর হেলান দিয়ে সতীশ প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য রূপ দেখছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রুদ্র-লীলার ভিতর অলক্ষ্যে যে রসের সঞ্চয়কার্য্য চলছিল, আজ বর্ষায় সেই অপূর্ব্ব রস-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে প্রকৃতি মাতৃরূপে তাঁর কালো অলকদাম দিগ্-দিগন্তে ছড়িয়ে অন্নপূর্ণার মত অযাচিত দান আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন! সন্তানের ক্ষুধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন মাতৃবক্ষের ক্ষীর-ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে, বুভুক্ষু ধরণীর ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য এ যেন জননীর তেমনই বিপুল আয়োজন!

আজ রথের জন্য স্কুলের ছুটী থাকলেও গুটিকতক উৎসাহী মেয়ে চরকার মোহ কাটাতে পারেনি, সুতরাং সেই সঙ্গে সুপ্রভাকেও আসতে হয়েছে। বারান্দার ও-ধারে তারা কাযে লেগে গিয়েছে—একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা চরকার ঘর্ঘর আওয়াজ, যেন কেমন একটা মোহ সৃষ্টি ক'রে তুলছিল। সুপ্রভা তাদের মধ্যে ব'সে গিয়ে যেমন তাদের সুতার দিকে নজর রেখে তাদের সংশোধন ক'রে দিচ্ছে, তেমনই নিজেও সুন্দর সরু সুতা কেটে তুলছে।

পরনে তার কালাপেড়ে মোটা শাড়ী, সদ্যঃস্নানের পর চুলগুলো অবিন্যস্ত, মাঝে মাঝে শাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পাচ্ছে। স্নানের পর মুখখানি সদ্য-ফোটা ফুলের মত।

তার পর বল্লে, "সুপ্রভা, আমিই বা কেন ব'সে থাকি, আমাকেও একটা চরকা দেও না।" সুপ্রভা হেসে একটা চরকা এনে, সতীশের ছোট টেবলটি আরাম-কেদারার কাছে টেনে দিয়ে, তার ওপর চরকাটা রাখলে। তার পর তার এক জন ছাত্রীকে বল্লে, "রমা, তুলো নিয়ে এসো ত খানিকটা।" সতীশ চরকার দিকে চেয়ে দেখে বল্লে, "সুপ্রভা, তুমি যে বলেছিলে, এক রকম কি উন্নত চরকা বেরিয়েছে, সেই গোটাকতক আনিয়ে নেও না!"

সুপ্রভা হেসে বল্লে, "সে উন্নত-চরকার কাগজে খুব জমকালো বিজ্ঞাপন দেখে আমি একটা চরকা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলাম, উন্নতির মধ্যে দেখতে একটু সুশ্রী, কিন্তু তার আওয়াজ যেমন ঘোরতর, সুতোও তেমনই কেটে যায়। আওয়াজ না হয় বরদাস্ত করা চলে, কিন্তু যাতে সুতো ক্রমাগত কাটতে থাকে; তা নিয়ে কি ক'রে চলে বলুন ত। তার চেয়ে আমাদের এই একটু বিশ্রী দেখতে সনাতন চরকাই ভাল।" শুনে সতীশ একটু হাসলে।

সুপ্রভা নিজের আসন গ্রহণ ক'রে বল্লে, "আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আমাদের দেশের কাণ্ড দেখে! চরকার ওপর যদি বা অনেক কষ্টে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ল, কিন্তু সেটাকে ভাল ক'রে তোলবার দিকে কারুর নজর নেই, শুধু মিথ্যা কথার আড়ম্বর! কেমন ক'রে যে আমরা এগোবো, তা ত জানিনে।"

সতীশ হেসে বল্লে, "এইটুকুতেই নিরাশ হ'লে চলবে কেন, সুপ্রভা! এই ত সবে আরম্ভ।"

সুপ্রভা বল্লে, "আরম্ভটাই যে ভাল হওয়া দরকার।"

সতীশ বল্লে, "হবে। অনেক ব্যর্থতার পরে তবে সার্থকতা আসে; অনেক মিথ্যের পর সত্য। কত রোদ, কত বৃষ্টি, কত পাতা ঝরানর পর ফুল ফোটে দেখেছ ত, সুপ্রভা! গাছ পুতেই কেমন ক'রে ফুলের আশা করতে পার?"

সুপ্রভা বললে, "তাই হবে বোধ হয়, কিন্তু সবই এমন বিশৃঙ্খল, এমন অদ্ভুত যে, মন যেন দ'মে যায়। এই দেখুন না, গেল রবিবার আমি আমাদের কাটা সুতো নিয়ে চটোর ষ্টীমারে কলকেতায় যাই বঙ্গ-মহিলা-বয়ন-বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার কাছে। এই রকম শুনা গিয়ে- মূল্য দিয়ে নেন। গোড়ায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই অপেক্ষা করতে হ'ল এক ঘণ্টা, তার পর কোনও ক্রমে যদি বা দেখা হ'ল, তিনি বললেন, আপাততঃ তাঁদের সুতো নেওয়া বন্ধ। হাতে টাকা কম, কায ভাল চলছে না, বিস্তর সুতো অমনি প'ড়ে আছে ইত্যাদি। সন্ধ্যার ষ্টীমারে ফিরে এলাম, কিন্তু মনে বড় দুঃখ হ'ল। হয় ত তিনি যা বলেছেন, সব সত্য, কিন্তু কাযের গোড়াতেই যদি এই রকম ঘটল ত আশা কোথায়?"

সতীশ বললে, "তুমি ঠিকই বলেছ, আশা ক'মে যায় বটে, কিন্তু সুপ্রভা, বড় কাযের ঐখানেই মহত্ব, ঐখানেই বিশেষত্ব। যে সে কায করবে, তা'কে সহস্র বাধার মধ্যেও আশাটা রেখে যেতে হবে, নইলে ত তার কাযই ফুরিয়ে গেল! তুমি আমি একবার কলকাতা থেকে ফিরে এলে হতাশ হয়ে যাই, কিন্তু যাঁরা বড় কায করেছেন, তাঁদের জীবনেতিহাস যদি অনুসন্ধান কর ত দেখবে, এই সব বাধাগুলোই তাঁদের জিদ্ বাড়িয়ে দিয়েছে।"

সুপ্রভা একটু হাসলে, বললে, "কিন্তু সেই বড় কাযের লোকটিকে পাওয়া যায় কোথায়?" সতীশ বললে, "তাঁকে খুঁজে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই, সুপ্রভা। তিনি আছেনই কোথাও। মনে কর, তিনি ভগবান্। পুল যখন বাঁধা হয়, তখন এঞ্জিনিয়ার তার ঘরে থেকেই সব ঠিক করছে, ক্বচিৎ বা দেখে গেল। কাযের মহত্ত্বের উপর বিশ্বাসই হচ্ছে আসল। পড়েছ ত, একটা কাঠবিড়ালী অত বড় সাগর-বন্ধনে এক মুঠো বালি দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার মনে সেই বৃহৎ কাযটির সম্বন্ধে ভক্তি ছিল অচলা, তাই ত সে দ্বিধা করেনি। কাযের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহ না থাকে ত মনকে কিছুতেই দমতে দিও না—সাগরবন্ধন যখন শেষ হবে, তখন তোমার এক মুঠো বালিই হয়ে থাকবে অমর।"

এমন সময় দূরে নদী-বক্ষে ষ্টীমারের আওয়াজ হ'ল, ভোঁ—

সতীশ উঠে পড়ল, বললে, "আমাকে এখন একবার ষ্টীমারঘাটে যেতে হবে—ছোট পিসীমা আসছেন।"

সুপ্রভা বললে, "আপনার ত এক পিসীই আছেন শুনেছি এবং দেখছি। ছোট পিসীমা কে?"

বাঙ্গালাভাষায় ওঁর আর কোনও নাম পাওয়া যায় না ব'লে অগত্যা ছোট পিসীমাই বলি।"

তার পর সে ডাকলে—"পিসীমা, পিসীমা!"

এক বর্ষীয়সী বিধবা বেরিয়ে এলেন। ইনিই পিসীমা, সতীশের সংসারের একমাত্র অবলম্বন।

পিসীমা এসে বললেন, "কি বাবা?"

সতীশ বললে, "ষ্টীমার আসছে, আমি ঘাটে যাচ্ছি। এইতেই ত ছোটপিসীর আসবার কথা, তুমি একটা চাকর পাঠিয়ে দাও। আমি এগোচ্ছি।"

পিসীমা বললেন, "আচ্ছা।"

ষ্টীমারঘাট বেশী দূরে নহে, পল্লীগ্রামে হেঁটেই যাওয়া-আসা চলে। সতীশ বেরোতে বেরোতেই ষ্টীমার স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হয়ে উঠল, আর তার প্রকাণ্ড নলের মুখে সাদাটে ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে প'ড়ে কালো মেঘে ঠিক যেন এক সার পাখীর মত দেখাতে লাগল।

খানিক পরে সতীশের সঙ্গে এলেন তার ছোটপিসী আর তাঁর মেয়ে। ছোটপিসী মানদার বয়স বোধ করি ৩০এর কিছু উর্দ্ধ; মুখ কোমল, পরনে বিধবার বেশ। মেয়ে লীলার বয়স পনের কি ষোল; গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, কোঁকড়ান চুল খানিকটা কপালের উপর এসে পড়েছে। পরনে তার যে আশমানী রঙের শাড়ীখানি ছিল, সে যেন তার উজ্জ্বল বর্ণকে আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। চোখের দৃষ্টি গভীর শান্ত।

পিসীমা বারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলেন, মানদা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন। মেয়েটি ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

মানদা ছ'মাস আগে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন, তার পর বড় 'যা'-র সঙ্গে এই প্রথম দেখা। পিসীমাও চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মানদাকে তিনি স্নেহ করতেন নিজের বোনেরই মত, সুতরাং তাঁ'র এই অবস্থায় পিসীমার দুঃখ হয়েছিল অকৃত্রিম।

প্রথম শোকের বেগ একটু কমলে পিসীমা তাঁদের বসালেন; বললেন, "দুঃখ ক'রে আর কি হ'বে বোন্? মানুষের ত ওর ওপর হাত নেই। এই দেখ না আমার দশা।"—বলতে বলতে তাঁর গলা কেঁপে উঠল।

সতীশ এইবার মানদাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো থাক, বাবা।" লীলা তার জ্যেঠাইমাকে প্রণাম করলে।

সতীশ বললে, "লীলা খুব বড়-সড় মানুষের মত হয়ে উঠেছে যে! 'এই ত সে দিন দেখেছিলাম ছোট্টটি!"

লীলা লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল। মানদা বললেন, "ওকে নিয়েই ত ভাবনায় পড়েছি, বাবা।"

বছর চারেক আগে পিতার মৃত্যুর পর পিসীমাকে নিয়ে আসবার জন্যে সতীশ গিয়ে যে ক'দিন ছিল, সেই ক'দিনেই এঁদের সঙ্গে আলাপ। সে সময়ে মানদার স্নেহ সতীশ ভুলতে পারেনি। তাই তিনি যখন তাঁর এই দুঃখের সময় সতীশকে লিখেছিলেন যে, তিনি দিনকতক সতীশের কাছে এসে থাকতে চান, তখন সতীশ তার উত্তরে তাঁকে আসবার জন্য অনুরোধ ক'রে লিখেছিল যে, তিনি এলে সে বড় সুখী হয়। পাড়ার একটি আত্মীয় ছেলেকে সঙ্গে ক'রে মানদা আজ আসবার কথা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়েছিলেন।

তাঁদের যখন কথাবার্ত্তা চলছিল, তখন সুপ্রভা এসে মানদাকে প্রণাম করলে।

মানদা সতীশের দিকে চেয়ে বললেন, "এ মেয়েটি কে, চিনতে পারলাম না ত, বাবা!"

সতীশ বললে, "ওর নাম সুপ্রভা দেবী। পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে এই যে চরকা-স্কুল করেছি, উনি ওর শিক্ষয়িত্রী।"

মানদা সুপ্রভার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন, "বেঁচে থাক, মা। তোমাকে দেখে আমার বুক যেন উঁচু হয়ে উঠছে। মেয়েমানুষ যে নিজের পায়েও ভর ক'রে দাঁড়াতে পারে, সে-ও যে দুনিয়ার উপকারে আসতে পারে, এ যে আমাদের দেশে নতুন। তোমার স্কুলে ক'টি মেয়ে, মা?"

সুপ্রভা বললে, "এখন ২০ জনের বেশী নয়, তবে ক্রমেই বাড়ছে।"

মানদা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্কুলটি কোথায়?"

সতীশ বললে, "দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ বারান্দাতেই স্কুল বসে। ওতে সুবিধে এই যে, ঘরের পেছনে টাকা কতকগুলো নষ্ট না ক'রেও ওদের বেশ মুক্ত-বাতাস আর আলোর মধ্যে পড়াশুনা হয়। আর সে টাকাটা অন্য বিষয়ে খরচ করলে অনেক লাভ হয়। এ স্কুলে কাউকে

মানদা বললেন, "বাবা, এ সব শুনেও আমার আমোদ হচ্ছে। আমাদের গাঁ'টা এমন যে, তারা কেবল কোঁদল, ঝগড়া, পরের মন্দ নিয়েই আছে;—এ সব কথা জানেও না!"

পিসীমা বললেন, "মানদা, তোমরা মুখ-হাত ধোবে চল, বেলা অনেক হ'ল যে!" আপাততঃ সভাভঙ্গ হ'ল।

২

দিন দুই পরে বিকালবেলা সতীশ তার লাইব্রেরী-ঘরটিতে লেখাপড়া করছিল। এই ঘরটির চারদিকে বড় বড় জানালা—দোর, আর সামনেই প্রকাণ্ড নদীর অনুপম দৃশ্য।

ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গুটি তিনেক বইয়ের আলমারী, গোটা দুই হোয়াটনট, একটা টেবল, খান দুই চেয়ার, দুটো সোফা এবং নদীর দিকের জানালার ধারে চৌকীর ওপর পরিষ্কার ফরাস বিছানা। সতীশ তার লেখাপড়ার জন্য ফরাসই পছন্দ করত বেশী, তাই এইটিকেই রাখা হয়েছিল সব চেয়ে ভাল যায়গায়।

দরজার পাশ থেকে সুপ্রভা বল্লে, "আমি আসতে পারি কি?"

সতীশ বল্লে, "এসো।"

সুপ্রভা উপবেশন ক'রে বল্লে, "আমি একটু দরকারে এসেছি যে।"

সতীশ বল্লে, "বল।"

সুপ্রভা বল্লে, "এক দল মেয়ের দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়ে এলো, এর পরে এদের কি বই পড়ান আপনি উচিত মনে করেন?"

সতীশ বল্লে, "এর পরে কথামালা, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কথামালা যখন খানিকটা এগিয়ে যাবে, তখন ওদের ধারাপাত ধরিও। একটু অঙ্কও দরকার। কথামালা শেষ হ'লে বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চারুপাঠ। গদ্যে একটু এগুলে পদ্যপাঠ ধরাতে হবে। নতুন নতুন অনেক বই হয়েছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, আমাদের পুরোনো যে শিশু-পাঠ্য বইগুলো অনেক দিন আগে হয়ে গেছে, তাদের চেয়ে ভাল এখনও হ'ল না। ওরা যখন একটু এগোবে, তখন ওদের রামায়ণ, মহাভারতও সুরু করিয়ে দিতে হবে, ছেলেদের জন্যে বেশ ভাল ভাল

সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করলে,—"ইংরাজী?"

সতীশ বল্লে, "ইংরাজীর তাড়া নেই,—যদিও ইংরাজীর ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধার অভাব নেই। আমাদের সমাজের মেয়েদের তের-চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, সেইখানেই ওদের লেখাপড়া শেষ। সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের ইংরাজীর কোনও দরকার হয় না, সুতরাং তাদের পড়বার বড়-জোর যে ৫।৬ বছর সময় পাওয়া যায়, তাতে যতটা সম্ভব, ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের দরকারী জিনিষই ওদের দিতে হবে। ইংরাজী একটু সুরু করিয়ে দেওয়া মন্দ নয়, কিন্তু সে আরও একটু বড় হ'লে। নিজের সাহিত্যে খানিকটা শ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া, রামায়ণ-মহাভারতের গল্পটা মোটামুটি জানিয়ে দেওয়া, এবং ধর্ম্মের প্রতি ভক্তির অঙ্কুর দেওয়া, এর চেয়ে বেশী ঐ ৫।৬ বছরে হয় না, সুতরাং খুব বড় আদর্শ রেখে কায করতে গেলে শেষকালে কিছুই হয় না। আমি আপাততঃ একটা নতুন কাযে লেগে গিয়েছি—কি জান?"

সুপ্রভা বল্লে, "কৈ না।"

সতীশ বল্লে, "গীতার গোটা পঞ্চাশেক উৎকৃষ্ট শ্লোকের বাঙ্গালায় পদ্য অনুবাদ করছি—ওদের জন্যে।"

সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা গীতা বুঝতে পারবে?"

সতীশ বল্লে, "অনুবাদ যদি খুব সহজ হয় ত তারা কিছু কিছুও ত বুঝবে। অনুবাদ হয়ে গেলে এক জন ভাল লোককে দেখিয়ে নিতে হবে। আমার মনে হয়, মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় সম্বল হচ্ছে—ভাল কথা, ভাল দৃষ্টান্ত। এরাই মানুষের দিবারাত্রির গোপন সঙ্গী। অথচ আমাদের চৌদ্দ আনা মেয়েরা গীতা ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, তাও জানে না। আমার উদ্দেশ্য—সেইটে তাদের জানিয়ে দেওয়া—তার ভিতর যে কত ভাল কথা আছে, তার একটা আভাস দেওয়া। সেইটুকু যদি হয়, তা হ'লেই যে হ'ল। এখন তাদের গীতা বোঝবার সময় নয়, এ আশাও কেউ করে না। কিন্তু যখন সময় আসবে, যখন জীবনে হয় ত গীতার প্রয়োজন হবে, সেই সময়টি লক্ষ্য করেই ত আমি তাদের এখন থেকেই তোয়ের করতে চাই। তখন তারা নিজেরা প'ড়ে হৃদয়ঙ্গম করবে, কিন্তু তার উপায় যে এই ৫।৬ বছরের ভিতরেই করতে হবে।"



"লয়ে হাতে ফুলসাজি, কবরীতে ফুলরাজি,
চলে বালা প্রেম-অভিসারে !"

শিল্পী -- শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী।

সতীশ বললে, "বাঃ, লীলা যে কায করতে সুরু ক'রে দিয়েছো। আর এই চা জিনিষটা যে আমার কত প্রিয়, তা এই একটা কথাতেই বুঝতে পারবে যে, ডিস্‌পেপসিয়া সত্ত্বেও আমি একে ছাড়তে পারিনি। চা তোয়ের করেছে কে—তুমি ?"

লীলা সলজ্জ হেসে বললে, "হাঁ।"

এক চুমুক খেয়ে সতীশ বললে, "বা! চমৎকার হয়েছে। ভোলার তৈরী চা খেতে খেতে পেটে চড়া প'ড়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার থেকে চা করার ভার রইল তোমার উপর, কেমন ?"

লীলা হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়লে। তার পর সুপ্রভার কাছে এসে বললে, "আপনাকে এক পেয়ালা এনে দেব কি ?"

সুপ্রভা তার হাত ধ'রে বসাতে বসাতে বললে, "না বোন্, এখন দরকার নেই। আর খেলেও এখানে নয়, বাড়ীর ভেতরে গিয়ে খেয়ে আসতাম।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "লীলা, তোমার এখানে কেমন লাগছে ?"

লীলা বললে, "বেশ চমৎকার লাগছে। এমন হাওয়া—এত বড় নদী; আর অনেক বইও আছে। তা ছাড়া আমি আর একটা কথা মনে ক'রে আছি, আমি সুপ্রভা দিদির কাছ থেকে চরকা-কাটা শিখব, আমাদের ওখানে ত এ সব নেই।"

সতীশ হেসে বললে, "সুপ্রভা, তোমার আর একটি ছাত্রী জুটলো তা হ'লে!"

সুপ্রভা হাসতে হাসতে বললে, "আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করলুম। এমন ছাত্রী জুটলে ত আমারই সুবিধে, কারণ, এঁকে দিয়ে অনেক কায করিয়ে নিতে পারব।"

তার পর লীলার দিকে ফিরে বললে, "চল না বোন্, আমরা ঐ নদীর ধারে একটু বেড়াই গে, আর ভাব ক'রে নি।"

তারা দু'জনে হাসতে হাসতে চ'লে গেল। সতীশ তার কাযে আবার মন দিল।

খানিক পরে ছোটপিসী মানদা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "সতীশ ঘরে আছ বাবা ?"

মানদা ঘরে ঢুকে বললেন, "বাঃ, বেশ চমৎকার ঘরটি ত তোমার। একেবারে সামনেই মা গঙ্গা, দেখেও পুণ্যি হয়।" ব'লে তিনি দু হাত কপালে ঠেকালেন।

সতীশ বললে, "সত্যি ছোটপিসীমা, এর লোভেই কলকাতা ছেড়ে এখানে আছি।"

মানদা ব'সে এ-কথা সে-কথার পর নিজের দুঃখের কথা তুললেন। ছ'মাস আগে কেমন ক'রে তাঁর স্বামী মাত্র দু'দিনের জ্বরে অকস্মাৎ তাঁদের কাঁদিয়ে চ'লে গেলেন, সেই কথা বলতে বলতে তাঁর স্নিগ্ধ চোখ দু'টি জলে ভারাক্রান্ত হয়ে এল, তার পর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "বাবা, এত হঠাৎ এই কাণ্ড হয়ে গেল যে, তোমাদের খবর দেওয়ারও সময় হ'ল না—পাঁড়াগেয়ে ডাক্তার। সে যে কি চিকিৎসা করলে, তা সে-ই জানে, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল।"

সতীশ বললে, "ছোটপিসীমা, মানুষের মন কিছুতেই বোঝে না, তা নইলে ওতে কি মানুষের হাত আছে? তিনি ডান হাতে দেন—বাঁ হাতে নেন; এই কথা ভেবেই আমাদের স'য়ে যেতে হবে। তা ছাড়া উপায় ত নেই।"

মানদা বললেন, "তার পর এই মেয়ে আমার গলায়। হিন্দুর ঘরে ওকে ত আর রাখা চলে না। বাবা, ওকে নিয়ে যে কি ভাবনায় পড়েছি, তা তোমাকে কি বলব? মৃত্যুর আগে উনি খোঁজ-খবর আরম্ভ করেছিলেন, একটি পাত্র জুটেও ছিল, সাধারণ গেরস্থ, কিন্তু দোজবরে, বয়সের অনেক তফাৎ হয়। টাকায় আটকাত না, আমার যা কিছু গহনাপত্তর আছে, তাই বেচে কোনও রকম ক'রে হয়ে যেত, কিন্তু বাবা, মেয়ের মুখ দেখে আমার মায়ের প্রাণ কিছুতেই দোজবরে বিয়ে দিতে চাইলে না। তার পর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল; এখন ত অথৈ জলে প'ড়ে আছি। এখন মনে হয়, চোখ-কান বুজে যদি তখন দিয়ে দিতাম।"

সতীশ বললে, "না দিয়েছিলেন, সে ভালই হয়েছে। ওর বিয়ে এক দিন হবেই, কিন্তু মনের মতন না হ'লে যে তার দুঃখ চিরদিন থেকে যেত।"

মানদা বললেন, "বেঁচে থাক, বাবা, তোমার মত এই বয়সে এত বুদ্ধিমান্ ছেলে আমি আর দেখিনি।"

তার পর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, "বাবা,

মনে হ'ল। তাই তোমার আশ্রয়ে এলাম। তুমি যা হয় একটা দেখেশুনে, ওর ব্যবস্থা ক'রে দাও, ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, তার পর আমিও শান্তিতে হু'চোখ বুজতে পারব।"

সতীশ বল্লে, "ছোটপিসীমা, আপনি এখানে এসে ভাল কাযই করেছেন। আমি ওর জন্যে চেষ্টা করব নিশ্চয়ই, তবে আমি এ সব কাযে বড় অপটু. এই যা ভয়। কিন্তু তা বল্লে ত চলবে না। হাঁ, আমাকে একবার কলকাতায় যেতে হবে, দেওয়ান খবর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এক আধ যায়গায় খোঁজ ক'রে আসব। ঠিক কথা মনে পড়েছে, আমার এক বন্ধু আছে; তার বিয়ের কথা হচ্ছে, অবস্থা ভাল, দেখতে শুনতেও ভাল, ছেলেটিও বিদ্বান্। সেই বেশ হবে। আমি কাল-পরশুই কলকাতায় যাব।"

কৃতজ্ঞতায় মানদার চোখ ছল-ছল ক'রে এল, বল্লেন, "বাঁচালে, বাবা।"

এমন সময় দোরগোড়া থেকে লীলা ডাকলে,—"মা, তুমি এখানে?"

মানদা বল্লেন, "হাঁ মা, আয়।"

লীলা আসতে তাকে বসিয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে তার মুখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চুলগুলো সরিয়ে মানদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় ছিলি, লীলা?"

লীলা বল্লে, "সুপ্রভা দিদির সঙ্গে ঘাটের ধারে একটু বেড়াচ্ছিলাম।"

মানদার মুখ হঠাৎ যেন মলিন হয়ে গেল, বল্লেন, "না, আমাদের সঙ্গে ভিন্ন আর কারুর সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিও না।"

কথার স্রোত হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল। মানদা সতীশকে বল্লেন, "তোমার কায কর বাবা, আমরা যাই।"

ব'লে মানদা আর লীলা চ'লে গেলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সার্থক প্রেম

নহে মন নিরমম, নহে উদাসীন;
হৃদি নহে প্রেমহীন বাসনার বশ।
যেথা প্রেম নিরমল, প্রাণ নিশিদিন
ফিরে সেথা লুব্ধ আশে পাইতে পরশ।

আঁধার না রহে সেথা নীলিমার গায়,
মলয় নিয়ত সেথা পুলক নাচায়,
মনের কালিমা যত ধুয়ে মুছে যায়,
ভেসে আসে বিমল হরষ।

ধরে না গোষ্পদে প্রেম; সে যে সিন্ধু প্রায়,
বিশ্বেরে ধরিতে পারে নিজ বক্ষোমাঝে।
প্রেমী শুধু প্রেম যাচে; হতাশা কোথায়?
প্রেমের আনন্দ-লোকে ব্যথা নাহি বাজে।

রহে না গোপনে প্রেম, ব্যপ্ত চরাচরে;
কোথা চিহ্ন বিরহের প্রেম-সরোবরে?
নাহি আদি, নাহি অন্ত, শাশ্বত সুন্দর,
এ যে চির অপরূপ জগতের মাঝে।

প্রেমের পরশে যাঁর ভরে গেছে প্রাণ,
দূর পর ভেদাভেদ ঘুচে গেছে তাঁর।
কোথা শোক, ব্যর্থতার ভয় অপমান?
নিয়ত সে শোনে নিজ হৃদয় মাঝার,—

সার্থক প্রেমের গান করুণ মধুর।
সে যে চির-বিশ্বজয়ী, মরতের সুর!
নিত্য পূজি সেই প্রেম প্রীতি-জবা-ফুলে,
নাহি অন্ত দেবতা আমার!

কবি আনন্দ শিরোমণি

আনন্দচন্দ্রের জন্ম বাঙ্গালা ১২০৫ সাল ইং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে। জীবনকাল ৮৪ বৎসর সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী বলিলে বলা যাইতে পারে। এই দীর্ঘকালে বাঙ্গালাদেশের মধ্যে যে সকল ভাঙ্গাগড়া অদল-বদল হইয়াছে, তিনি সে সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি এক দিকে যেমন মেডিকেল কলেজে প্রথম হিন্দু ছাত্রের প্রবেশ উপলক্ষে দেশব্যাপী কুসংস্কারকে উড়াইবার জন্য গড়ের মাঠে তোপদাগা দেখিয়াছেন, আবার অন্য দিকে ব্রাহ্মণের ছেলে দলে দলে ইচ্ছাপূর্ব্বক যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে ব্রতী হইতেছে—তাহাও দেখিয়াছেন। এক দিকে সতীদাহের পুণ্য চিতাধূমে গগনাঙ্গন প্লাবিত দেখিয়াছেন, অন্য দিকে আবার বিধবা-বিবাহের শঙ্খধ্বনিও শুনিয়াছেন। এক দিকে পদব্রজে ৬।৭ ঘণ্টা হাঁটিয়া হাঁটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভাটপাড়া হইতে কলিকাতায় গিয়াছেন; আবার অন্য দিকে রেলগাড়ীতে বসিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে এক ঘণ্টায় কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ফল একটা গোটা শতাব্দী দেশের বুকের উপর দাঁড়াইয়া যাহা কিছু ওলট-পালট, হরণ-পূরণ, গড়ন-ভাঙ্গন করিয়াছে, তৎসমুদয়ই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পাঁচালীর এক স্থানে যৌবন-জেল বর্ণনাপ্রসঙ্গে অতি সুচারুভাবে ইংরাজ শাসনাধিকারে নূতন প্রতিষ্ঠিত জেলখানা, কাঠগড়া, নাজীর, হাকিম প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শন করিব।

শিরোমণি মহাশয় যৌবনে বিপত্নীক হইয়া দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া এক দিকে যেমন পুত্রত্রয়ের শিক্ষার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন, অপর দিকে নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ-বেশ বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার অন্তরের উপলব্ধ মূর্ত্তি কিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, দেখুন,—

"ব্রজরাজ গো-চারণে যায়—কি রূপ হায়!
রঙ্গে-ভঙ্গে প্রমথ তরঙ্গে—
ত্রিভঙ্গেরি সঙ্গে সঙ্গে কত শত ধেনু ধায়।
গুণ গুণ ঘুঙুরে—রুণু ঝুণু নূপুরে—
বাজে বারে বারে—নেচে চলে তালে তালে
ভুবন ভুলালে তায়॥"

গানের পর যে কথা বা ছড়া, তাহাতেও ঐ ভাব পরিস্ফুট,—

"গো-চারণ সাজন এমনি সাজিয়ে দেছেন রাণী।
জন্মের মত কেনা থাকে যে দেখে যখনি॥
চাঁচর চিকুর চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়।
কুটিল কুন্তল বেড়া মণিমুক্তাময়॥
অলকা-তিলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল।
প্রবাল প্রদীপ্ত তায় মকর-কুণ্ডল॥
অধরে ধরেছে বেণু ধেনু রাখা হেতু।
বেণু-রবে ধেনু-রবে বাবে কুলসেতু॥
গলে মণিময় হার নাসায় বেশর।
তাহে দোলে বনমালা সেজেছে কিশোর॥
একে নীলকান্ত মণি নবঘন রূপ।
কটিবেড়া পীতধড়া তড়িতস্বরূপ॥
চরণে চরণ দিয়া সে যদি দাঁড়ায়।
সে ভাবে যে ভাবে সে ত ভবেতে এড়ায়॥"

পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ভক্ত থাকেন, তবে সাধক কবির অঙ্কিত নীলকান্তমণি বা নবঘনের মত শ্যামতনু পীতাম্বর, বনমালাধারী—শিখিপুচ্ছমণ্ডিত বদন,—অধরধৃত বেণু, চরণে চরণ দিয়া দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি অন্তরে ক্ষণেকের জন্য ধ্যান করিয়া আনন্দিত হইবেন। ইহার সহিত পুরাণোক্ত ঋষিকৃত সুপ্রসিদ্ধ ধ্যানের সাদৃশ্য মিলাইয়া লউন,—

"ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতম্
গোবিন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥"

এক্ষণে কথা হইতে পারে, শিরোমণি মহাশয় ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠ বংশের কুলপ্রথানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার এত টান কেন? এবং কেনই বা কৃষ্ণলীলা-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ইহার উত্তর এই যে, নিম্ন স্তরের উপাসকগণ ভেদজ্ঞান দ্বারা নিজেদের সাধনায় পথ পঙ্কিল করে, তাহাদের ফলও তদ্রূপ হয়। কিন্তু উচ্চ মার্গের সাধকের নিকট সে ভেদজ্ঞান নাই, তিনি কৃষ্ণ, রাম বলিয়া পৃথক্ দেখেন না। এক্ষণে সাধক কবির প্রস্তাবনা-গীতিকা শুনিয়াই আপনারা এই তত্ত্বটি বুঝিতে পারিবেন;—

"ঐ দাঁড়ায়ে কালিন্দীকূলে শ্রীনাথ আমার
রূপে চিনেছি—ভবজলধির উনিই কর্ণধার।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা শ্রীপদে পেয়েছি দেখা
শ্রীবৎসলাঞ্ছন রেখা নইলে শোভে কার॥
ভৃগুচরণ-সরোজ-চিহ্ন অন্যে নাহি আর
কেবল ভঙ্গী ভিন্ন ভূষণ অন্য কিন্তু সেই আকার॥
তাজে কৌস্তুভ-ভূষণ বনফুলের আভরণ
গোপীর প্রেমে ব্রজধামে বিচিত্র ব্যভার
আবার রাখাল সনে গো-চারণে বিপিনে বিহার।
বেদে না পায় সীমা ও মহিমা অনন্ত অপার॥"

এই গীত দ্বারা দেখাইয়াছেন,- "আমি আজ কালিন্দীকূলে কদম্ব-মূলে বনমালা গলে যে বাঁকা বংশীধারী মূর্ত্তি দেখিতেছি, ইনিই গোলোকবিহারী শ্রীহরি। ভঙ্গীতে ও ভূষণে ভিন্ন হইলেও ইনিই স্বয়ং ভেদাতীত শ্রীভগবান্ বিষ্ণু।" সাধক কবি জোর গলায় বলিতেছেন—"রূপে চিনেছি।" সুতরাং ইঁহার নিকট রাম ও কৃষ্ণের ভেদ-জ্ঞান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

আজকাল অনেক রুচিবাগীশ বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা—গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অবাধ ক্রীড়া-কৌতুক ও বিহার কুরুচিপূর্ণ বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করেন, এই হেতুই অনেকে ঐ লীলার একটা আধ্যাত্মিক, যৌগিক ইত্যাদি নানা আজগুবি ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় যিনি পাঠ করিয়া-

প্রেমলীলা—যমুনাজলকেলি ও কুঞ্জবিহারের প্রতি দৃঢ়ভক্তি পোষণ করত সুধাবর্ষিণী ভাষায় "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধক কবি আনন্দচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেমের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিয়া জয়দেবাদি পূর্ব্বতন বৈষ্ণব কবিগণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রস্তাবনায় কহিয়াছেন—শ্রীভগবান্‌কে যে ভাবেই ভাবা যাউক, তাহাতেই মুক্তি করতলগত। ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে ভজিলে মুক্তিলাভ ঘটিবে, এ ত ধরা কথা। নন্দ ও নন্দরাণী তাঁহাকে বাৎসল্যভাবে ভাবিয়া এবং গোপগণ সুহৃদ্ভাবে ভাবিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এমন কি, বৈরিভাবে ভাবিয়াও জরাসন্ধ, রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিও মুক্তির অধিকারী হইয়াছিল; সুতরাং শ্রীহরিকে কামভাবে ভাবিয়া গোপীগণই বা মুক্তিলাভ না করিবেন কেন? এই বিষয়ে কবির নিজের যুক্তি শুনুন:—

"পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার জীবজন্তু সবাকার
করিতে পরম উপকার।
কৃষ্ণরূপে অবতার দীনবন্ধু গুণাধার
ধরেন মনোরঞ্জন আকার॥
সাধু সব করিয়ে যুক্তি সার করিলেন কৃষ্ণভক্তি
মুক্তি তাঁদের দাসীর সমান।
শুধু ত এ যুক্তি নয় ভক্তিভাবে মুক্তি হয়
কত ভাবে কত জন নির্ব্বাণ॥
দেখ জরাসন্ধ আদি জন বৈরিভাবে দিয়ে মন
স্নেহভাবে নন্দ নন্দরাণী।
বৃন্দাবনে যত রাখাল সুহৃদ্ভাবে ভেবে গোপাল
পরকালে পেলে চক্রপাণি॥
আর এমন কত ভাবে কত জন মাধবে ভেবে
ম'রে ভবে নাহি এল আর।
গোপিকা ভেবে অন্তরে কামভাবে শ্রীনাথেরে
ব্রহ্মপদ পেলেন পরাৎপর॥"

রাধাকৃষ্ণলীলা কুৎসিতভাবাপন্ন বলিয়া যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া কবি কহিতেছেন।—

"যাঁরা বলেন—না ঘুচিলে কামভাব তাঁরে পাওয়া অসম্ভব
প্রেমতত্ত্বে মর্ম্ম তাদের নাই।
শুন নাই কি চমৎকার কামভাব ভাবের সার
বৃন্দাবনে সার করেছেন কানাই॥"

শ্রীভগবান্ যখন দেহ, মন, প্রাণ—সর্ব্বস্বের স্বামী, তখন তাঁহাকে সেই বুদ্ধিতে সব সমর্পণ করাতে, ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমেরই বিকাশ প্রতিপন্ন করে। কবির ইহাই অভিপ্রায়। কৃষ্ণানুরক্তা শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা বর্ণন করিতে গিয়া কবি দেখাইয়াছেন—শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের কামাসক্তি একটা যোগসাধনারই রূপান্তরমাত্র।

বৃন্দার উক্তি—"শ্রীমতী সম্প্রতি ভাব হয়েছে এমন।
উৎকণ্ঠালক্ষণে তোমায় করেন নিরীক্ষণ॥
যেমন ঘনহীন দুখে থাকে চাতক চাতকিনী।
সুধাংশু বিহনে যেমন চকোর চকোরিণী॥
নিশিতে নলিনী যথা দিনে কুমুদিনী।
অপ্রফুল্ল ফণী যেমন হারাইলে মণি॥
তেমনি মন-আগুনে সন্ত জলিছে কমলিনী।
ওহে—যোগী যেমন যোগে থাকে ত্যজে বাহ্যজ্ঞান।
ব্রহ্মেতে তৎপর কেবল ব্রহ্মেরই সন্ধান॥
তেমনি শ্রীমতী এখন সকল ঘুচাইয়ে।
দিবানিশি আছে বসি তোমারে ধেয়ায়ে॥"

বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা বুঝিতে হইলে—এইটি সতত মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি, প্রেম বা কামভাব সবই সমান। তাঁহার প্রতি ভক্তি, বাৎসল্য, সৌহার্দ্দ বা কামভাব যে, ভাবই পোষণ করা যাউক, তাহাতেই মুক্তি সুনিশ্চিত। আবার কবি কহিতেছেন, ভগবান্ সম্বন্ধে কাম ও প্রেম তুল্য। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতীত হইবে:—

"যার প্রেমেতে নারদ মত্ত, শম্ভু শ্মশানবাসী।
পেট থেকে প'ড়ে অমনি শুকদেব সন্ন্যাসী॥
বলি দিল সর্ব্বস্ব—হয়ে তার প্রেমে ভোর।
প্রহ্লাদের প্রমাদ কতই, দুঃখের নাইক ওর॥
তবু তারে ভুলতে নারে সে যে এম্‌নি কুহক জানে।
ছেলেবেলা ছেড়ে খেলা ধ্রুব গেল বনে॥
যার প্রেমে অস্থির ধীর বীর হনুমান্।
দাস্যকর্ম্মে কাল কাটাল ত্যেজে অভিমান॥
আরো এমন কত ভাবে কত জন ছাড়িয়ে বন্ধন।
নাগর নাগরী ছেড়ে সার করেছে বন॥
সেই কালাচাঁদের প্রেম-ফাঁদে পড়েছেন রাধিকে।
আজন্ম সে মর্ম্মে থাকবে ভোলা তার তাকে॥"

ভগবানের প্রতি প্রেম ও কাম এক ভাবাত্মক হইলেও, মনুষ্যসাধারণের পক্ষে তাহা নহে। শ্রীভগবৎপ্রেমের অনুকরণে পরকীয়া-রসাস্বাদ যাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়াছে—সেই শ্রেণীর লোক যে অতীব বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়, ইহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গসাহিত্যে পাঁচালী নামটি কিরূপে আসিল, তাহা বলা যায় না। আমার মনে হয়, পঞ্চ আলি বা সখীর একত্র আলাপন—ইহা হইতে 'পাঁচালী' নাম আসিয়া থাকিবে।* পাঁচ জন সখী একত্র বসিলে যেমন রুচিভেদ বশতঃ নব রসেরই অবতারণা হইয়া থাকে এবং তাহাও আলাপের উপযোগী আড়ম্বর বা অলঙ্কারশূন্য চলতি ভাষা হয়। পাঁচালী-সাহিত্যের লক্ষণই হইল চল্‌তি ভাষা Colloquoalism এবং তাহাতে নব রসের সমাবেশ। আমরা শিরোমণি মহাশয়ের পাঁচালীতে এই দুইটি লক্ষণই পুরামাত্রায় দেখিতে পাই। পাঠকগণকে ইহার রসাস্বাদন অবশ্যই করাইব। পাঁচালী নাম শুনিয়া আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় নাসিকা কুঞ্চন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ পাঁচালী সেরূপ তাচ্ছীল্যের জিনিষ নহে। সেকালে পাঁচালী একটি আদরের বস্তু ছিল। সে জন্য কাশীরাম, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ স্বকৃত মহাভারত ও রামায়ণকে অনেক স্থলে পাঁচালী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে পাঁচালী নামে প্রবন্ধগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) সখের (২) পেশাদারী। প্রথম শ্রেণীর পাঁচালীগুলি কবির লড়াইরূপে সৃষ্ট; কেবল প্রতিপক্ষ-পরাভবই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রোতৃবর্গের পরিতোষসাধন আনুষঙ্গিক লক্ষ্য মাত্র। সুতরাং সেগুলি অস্থায়ী। এইরূপ অনেক পাঁচালী একণে বিলুপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঁচালীগুলি স্থায়ী। দাশু রায়ের পাঁচালী, রসিকলালের

---

* কেহ কেহ বলেন—পাঁচ জন লইয়া যে কাম হয়, তাহাকে পাঁচালী কহে। যেমন বারওয়ারী বা বারওয়ালী—(দ্বাদশয়োয়ারঃ) —দশটি কয়জনকে লইয়া যে আমোদ-আহ্লাদ বা উৎসব হয়—

পাঁচালী, ব্রজ রায়ের পাঁচালী, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর পাঁচালীওয়ালারা অর্থ লইয়া গান করিতেন, সুতরাং দাতাদিগের মনস্তুষ্টিই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং লোকের মন যোগাইতে গিয়া তাঁহারা অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতেন। যেমন রামের বনবাসের পালায় কৈকেয়ীর কথায়—

"দেখ পুরুষের মধ্যে ঘটে যার শেষ দশাতে সংসার।
তার বাড়া সঙ্কট কি আছে?
রস-কস থাকে না শেষে মন যোগান বড় ক্লেশে
বুড়ো ব'লে সে ঘৃণা করে পাছে।
এ দিকে যমের বাড়ী তলপ্ তবু গোঁফে দেন কলপ
নইলে নারীর মন ভুলান দায়।
যা মিলে না অবনীতে তা যদি চান বনিতে,
হয় আনিতে থাকে প্রাণ কি যায়।"

এইরূপ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার" কথা তুলিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের পাঁচালী উক্ত দুই শ্রেণীর পাঁচালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতেই রচিত। ইহাতে বিপক্ষপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গোক্তির প্রাদুর্ভাবও নাই, অপ্রাকৃতের প্রসঙ্গও নাই। আগাগোড়া প্রকৃত রসের পুষ্টির দিকেই লক্ষ্য। তিনি স্বাভাবিক ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া পরমেশ্বরের ভজনার অঙ্গরূপেই পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। সে ভক্তির পরিচয় আপনাদিগকে দিয়াছি। জিগীষা বা অর্থ-লালসা তাঁহাকে পাঁচালী-রচনায় প্রণোদিত করে নাই। তাঁহার পাঁচালী শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। (১) সুবল সংবাদ (২) মানভঞ্জন (৩) কলঙ্কভঞ্জন (৪) অক্রূর-সংবাদ—এই চারিটিই পালাতে শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইতে রাধিকার কলঙ্ক দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া ব্রজলীলার ইতি করিয়াছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, শিরোমণি মহাশয়ের এই পাঁচালী আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাঁহার এই চারিটি পালার মধ্যে বহু বৎসরের চেষ্টায় সুবলসংবাদ পালাটিই সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রামের প্রবীণ মজলিসপ্রিয় সামাজিক বৃদ্ধ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ অবকাশমত বসিয়া তাঁহার কণ্ঠস্থ উক্ত পালাটির অনেক অংশ তাঁহার মুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া "সারথি" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহার পর গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলেরই প্রিয়—সকলেরই বন্ধু—সুরসিক সদানন্দ পুরুষ প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট হইতে তাঁহার বালকবয়সে নকল করা, এক্ষণে কীটদষ্ট একখানি পুথি প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত অবিনাশবাবুর মৌখিক পাঠ মিলাইয়া এই সুবল-সংবাদখানি সাহিত্যিক সমাজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। এই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সুবল-সংবাদ জিনিষটা কি? ইহার সংবাদ ভাগবত বা বিষ্ণু-পুরাণাদিতে নাই। ইহাতে কবি আপন কল্পনাবলে নূতন আকারে অতি সুন্দরভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি কুলবতী রাধার বিরহ-বিকার উপস্থিত। ইহাতেই পালা আরম্ভ। বৃন্দা দূতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। গোষ্ঠে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার 'চারি চক্ষুর' মিলন হইল। কৃষ্ণ গলিয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্যামলী ধবলী ধেনুতে অযত্ন দেখা গেল, প্রাণের সাথীরা ডাকিলে সাড়া পায় না, গোচারণে মন নাই, বাঁশী হাত হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল, মুখে সে মৃদু হাসি নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া সুবল নামে অন্তঃপুরে একটি বাছুর-হারান ছুতায় প্রবেশ করে।' রাধিকার সহিত পরামর্শ করিয়া নিজে রাধিকার বেশে অন্তঃপুরে রহিয়া যায়, আর রাধিকা তাহার বেশ পালটাইয়া সুবলের বেশে একটি বাছুর বুকে লইয়া বাহির হইয়া নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে চলিল। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ব-রাগেই পালা আরম্ভ আর মিলনেই শেষ। পূর্ব্বরাগ জন্য বিরহই হইল ইহার প্রাণ। দুই পক্ষের বিরহই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। আনুষঙ্গিক গোষ্ঠলীলাদির বর্ণনও ইহাতে আছে।

আনন্দচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী কবি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"খাঁটি বাঙ্গালা কথায় খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না, তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালার কবি। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গলা কবি"। আনন্দচন্দ্রও বঙ্কিম বাবুর ভাষায় খাঁটি বাঙ্গালা কবি। তিনি খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আনন্দচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে ও পুরাণাদিতে অগাধ পণ্ডিত হইলেও, তাঁহার রচিত পাঁচালীর ভাষায় সংস্কৃতের ভাঁজ পর্য্যন্ত নাই। এমন নিছক বাঙ্গালা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের রচনায় হয় না।

এ স্থলে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। ১২৮১ সালের আশ্বিন সংখ্যার "নবজীবনে" কবিবর হেমচন্দ্র হুতোম পেঁচার গান বা 'কলির সহর কলিকাতা' নাম দিয়া কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তারানাথ তর্কবাচস্পতির উদ্দেশে এইরূপ সুরে গান বাঁধা হইয়াছিল—

"কার গোড়াতে অগ্র্ বেণী আসর জুড়ে যায়
পাঁও লাগে বাচস্পতি এমত সভায়।
জীবন্ত ভাষার কোষ পাণিনির মই
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই—নহে টুলো কই।"

ইহাতে হেম বাবুর মত নব্য শিক্ষিত বাবুদিগের অগ্রণী টোলের পণ্ডিতদিগের উপর মনের ভাব স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। "কই" মাছের মাথা যেরূপ নীরস অস্থিতে ভরা, কোনও রস-কস নাই, টুলো পণ্ডিতদিগের মাথাও যে সেইরূপ নীরস অস্থিময়—কবি ইহাই স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন। তাঁহার কথায় বুঝা যাইতেছে, তিনি প্রকৃত টুলো পণ্ডিতের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। প্রকৃত টুলো পণ্ডিতের মধ্যে অনেকের মাথা যে রসে ভরা, বিশেষতঃ প্রাচীন টুলো পণ্ডিতদিগের মাথা যে শিক্ষিত নব্য বাবুদের অপেক্ষা অনেকগুণ সরস ছিল, তাহা ভাটপাড়ার প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। ভাটপাড়ার অনেক পণ্ডিতই সুকবি ও সুরসিক ছিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। অনেকেই মাতৃভাষায় সরস কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের পরিচয় দিবার এ ক্ষেত্র নহে। কেবল আনন্দচন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারা যায়, তিনি টুলো পণ্ডিত হইলেও "কই" ছিলেন না, পরন্তু সরস রচনায় সুপক্ক "রুই" ছিলেন।

তাঁহার খাঁটি বাঙ্গালার একটু পরিচয় দিতেছি। নৈষধকার ৪র্থ সর্গের ১ম শ্লোকে দময়ন্তীর নলের প্রতি পূর্ব্বরাগরচনা বর্ণনা করিয়াছেন:—

"অথ নলস্য গুণং গুণমাত্মভূঃ
সুরভি তস্য যশঃ কুসুমং ধনুঃ।
শ্রুতিপথোপগতং সুমনস্তয়া
তমিষুমাশু বিধায় জিগায় তাম্।"

অর্থাৎ মদন নলের গুণ দিয়া ধনু নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাঁহার

নলকে শররূপে তাহাতে যোজনা করিয়া শ্রীমতী দময়ন্তীকে জয় বা বশীভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আনন্দচন্দ্রের এইটির অনুরূপ খাঁটি বাঙ্গালায় রচিত একটি সঙ্গীত শুনুন—

"তাই শ্রীমতীর আতঙ্ক শ্রীহীন শ্রীঅঙ্গ
পরাজয় করেছে তার অনঙ্গ।
অঙ্গে হেনেছে তাই শরের স্বরূপ শ্যামাঙ্গ
কৃষ্ণের যশ লয়ে ধনু নিরমিয়ে
কৃষ্ণগুণ—গুণ তাহে বাঁধিয়ে
করে রাই-বধের কারণ মদন এই রঙ্গ।"

আর একটি স্থান দেখুন—শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন—

"নিবিশতে যদি শূকশিখা পদে
সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্।
মৃদুতনোর্বিতনোতু কথং ন তাম্
অবনিভৃৎ তু বিবিশ্য হৃদি স্থিতঃ॥" (৪র্থ ১১ শ্লো)

অর্থাৎ যদি কাহারও পদে কণ্টকের অগ্র ফুটিয়া যায়, তাহাতে তাহার কতই না বেদনা হয়। আর সেই কোমলাঙ্গী দময়ন্তীর একটা "অবনিভৃৎ" (পাহাড় বা রাজা নল, অবনিভৃৎ-শব্দের অর্থ রাজাও হয়, পাহাড়ও হয়) বিদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার কি ব্যথাই না হইয়াছিল!

আনন্দচন্দ্রের অনুরূপ উক্তি শুনুন—

"যদি কারুর চরণেতে কুশাঙ্কুর ফুটে,
তার জ্বালায় শরীর অস্থির হয়ে ছোটে।
"শ্রীমতী অবলা জাতি জানে না দুঃখের লেশ
তার প্রাণে ফুটে রইলো বাঁকা হৃষীকেশ।
কি হবে, ত্রিভঙ্গ রাধার অন্তরেতে র'লো।
বাহিরে কিসে হেসে রাধা কথা কবে বল।
প্রাণ হ'তে কিরূপে সে রূপ বাহির করা যায়।
কেমনে বাঁচাব রাধায় বল সই উপায়।"

এক্ষণে নৈষধকারের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখুন, আনন্দচন্দ্রের অনুবাদ মূল হইতেও উচ্চস্তরের, আর এই অনুবাদে সংস্কৃতের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, সম্পূর্ণ খাঁটি বাঙ্গালা। নৈষধকার "অবনিভৃৎ"-কথাটির দ্ব্যর্থ ধরিয়া দময়ন্তীর হৃদয়ে পাহাড়ের মত রাজা নলকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, শ্লেষালঙ্কার দ্বারা পাঠকগণের চমক লাগাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে একটু অস্বাভাবিকতা রহিয়া গিয়াছে, পাহাড় কি কখন বুকের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? কিন্তু আনন্দচন্দ্রের বর্ণনায় সে অস্বাভাবিকতা-দোষ ঘটে নাই। অসাবধানতা বশতঃ টাগরায় একটা বাঁকা গোছের মাছের কাঁটা বিঁধিয়া গেলে—কিরূপ বিষম যন্ত্রণা হয়, তাহা ভুক্তভোগী অনেকেই জানেন। কিন্তু রাধিকার কোমল হৃদয়ে—যেখানে শলা বা চিমটা কোনও অস্ত্রপ্রবেশের পথ নাই, সেইখানে প্রবেশ করিয়াছেন কি না শুধু এক জায়গায় বাঁকা নহে, একবারে ত্রিভঙ্গ—তিন জায়গায় বাঁকা—হৃষীকেশ। তাঁহাকে ত রাধার হৃদয় হইতে বাহির করাই যাইবে না, চিরকালের জন্যই গাঁথা রহিলেন। সুতরাং শ্রীমতী আর কি পূর্ব্বের মত হাসিয়া কথা কহিতে পারেন?

আনন্দচন্দ্রকৃত নৈষধের আর একটি শ্লোকের অনুবাদের উল্লেখ করিতেছি। এই অনুবাদে সংস্কৃতের নাম-গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

"দহনজা ন পৃথুর্দবথুর্ব্যথা
বিরহজৈব পৃথুর্যদি নেদৃশম্।
দহনমাশু বিশন্তি কথং স্ত্রিয়ঃ
প্রিয়মপাসুমুপাসিতুমুদ্ধুরাঃ॥ (নৈষধ ৪র্থ সর্গ ৪৬ শ্লোঃ)

অর্থাৎ অগ্নিদাহজনিত ব্যথা তেমন প্রবল নহে, যেমন বিরহ-জনিত ব্যথা প্রবল হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সতী রমণীগণ মৃত প্রিয়তমগণের সহিত মিলিবার জন্য কোনও রূপ বাধা না মানিয়া অবিলম্বে কি অগ্নিতে ঝাঁপ দিত? তাহারা বিরহজ্বালা জুড়াইবার জন্যই জ্বালাময় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া থাকে।

এক্ষণে আনন্দচন্দ্রের গান শুনুন—

"দারুণ বিরহানল যতই জ্বলে
গৃহদাহ-দাবানল তত কি জ্বলে?
অপ্রকাশ আগুন প্রবল! প্রাণের জ্বালায় কেবল
এ জ্বালা নিভে না সকল সাগরজলে।
এ জ্বালা নিভাবার কারণ একমাত্র আছে মরণ
মিলে না তার দরশন সময়ের কলে।
বুঝি বিরহীর অঙ্গ ভয়েতে করে না সঙ্গ
মরণের মরণ আতঙ্ক বিরহানলে।"

নৈষধকার অপেক্ষাও আনন্দচন্দ্র বিরহজ্বালার অতি তীব্রতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণপ্রিয়া পত্নীর বিয়োগে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করিয়া বিরহ-জ্বালা তিনি সারা জীবন হাড়ে হাড়েই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিরহের তীব্র অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজস্ব। শ্রীহর্ষ কহিতেছেন—বিরহ-জ্বালা জুড়াইবার জন্য সতী রমণীরা অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মরণকে আলিঙ্গন করে। আর আনন্দচন্দ্র কহিতেছেন, বিরহ-জ্বালা নিভাইবার একমাত্র কারণ মরণ বটে এবং বিরহী অহরহঃ মৃত্যু কামনা করে সত্য, কিন্তু মরণ যেন ততই দূরে পলায়, পাছে বিরহানলের আঁচে মরণ নিজেই পুড়িয়া মরিয়া যায়—এই ভয়ে বিরহীর যে সই লয় না। এক্ষণে মিলাইয়া দেখুন—বিরহজ্বালার তীব্রতা বর্ণনায় আনন্দচন্দ্র ও শ্রীহর্ষ—এই উভয়ের মধ্যে উৎকর্ষ কাহার?

এক জন অতি প্রাজ্ঞ পণ্ডিত কাব্যের অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিবার ছলে কহিয়াছিলেন,—"কাব্য ত ঘোড়া বাভিচার জায়।" যে কাব্যে এই ব্যভিচার বা আদিরসের উল্লেখ নাই, সে কাব্য কাব্যই নহে। আনন্দচন্দ্রের পাঁচালীর উদ্বোধন ভক্তিরসে সুরু হইলেও তাহাতে স্থানে স্থানে আদিরসের তুফান উঠিয়াছে, পাঠকগণ তাহাতে হাবুডুবু না খাইলেই হয়। একটু পরিচয় না দিলে আপশোষ থাকিয়া যাইতে পারে, তাই এখানে কয়েকটা স্থান উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমেই দেখুন, মদনের প্রভাব কি ভাবে কবি বর্ণন করিয়াছেন,—

"মৃত্যুঞ্জয় জয় যখন করেছে মদন।
সে মদনারে জয় করে কে আছে এমন?
কি কণেতে পঞ্চশর ধরে পঞ্চ শর।
চরাচর করে রাজ্য অলি রাজ্যাকর।
* * * *
দেখ সমাধি ঘুচায়ে শিব মত্ত কামানলে।
নারীর পায়ে ধ'রে হরি ভাসেন নয়নজলে।"

অপর পাঠ এই যে,—

(নারদ ঋষি কাঁথা কাঁধে ভাসেন নদীর জলে)
"গুরুর রমণী হরণ করিয়ে শশাঙ্ক।
অদ্যাপি ঘুচাতে নারে সে পাপ-কলঙ্ক।
অহল্যার উপপতি সুরপতি হ'ল।
যার জন্যে ব্যাকুল সেটা সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল।
রামের রমণী হরণ করিয়া রাবণ।
সবংশে পাইল ধ্বংস কামেরই কারণ।
কীচক কি চুকলো দেখ ভীমকে ভেবে নারী।
বলি হারি যাই ভেবে মদন-চাতুরী।"

শ্রীমতী রাধিকা দূতী বৃন্দাকে কিরূপ সরস ভাষায় খোসামোদ করিতেছেন,—

"তুমি অতি রসবতী রসিকের ধন।
দিবানিশি রসে থাক ভুলিয়ে ভুবন॥
রসিকের শিরোমণি—শিরোমণি তুমি। *
জেনে শুনে প্রেম-বিপদে শরণ নিলেম আমি॥
প্রেমসিন্ধু তরণীর তুমি ত কাণ্ডারী।
প্রেমধনে বিধি তোমায় করেছে ভাণ্ডারী॥
প্রেমের মূলাধার তুমি প্রেমের কল্পতরু।
প্রেমমন্ত্র কানে দিয়ে হও প্রেমের গুরু॥
প্রেমের সৃষ্টি স্থিতি লয় তোমার কটাক্ষেতে হয়।
তুষ্টিতে প্রেমের পুষ্টি রুষ্টিতে প্রলয়॥
প্রেমপথের সাথী তুমি, প্রেমপথের সেথো।
তোমার আশ্বাস পেলে হৃদ্ভ জুটে কত॥
তখন এরূপ মিনতি স্তুতি করিলে শ্রীমতী।
কুটিলতা ছেড়ে দূতী সরল হলেন অতি॥"

বাৎস্যায়নের কাম-শাস্ত্রে দূত ও দূতীর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। কেন না, ইহারা প্রেম-বেসাতির দালাল। যাহার দ্বারা কায হাসিল করিতে হইবে, তাহাকে খোসামোদ না করিলে চলে না। কামসূত্রের পঞ্চমাধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে দূতীর প্রতি নায়িকার আদরের একটু নমুনা দিতেছি,—"অভিহসিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষতে, আসনে চোপনিষন্ত্রয়তে—ক্বাসিতং ক ভুক্তং ক চেষ্টিতং ইতি পৃচ্ছতি, প্রীতিদায়কং দদাতি—পুনর্দর্শনানুবন্ধং বিসৃজতি।"—দূতীকে আসিতে দেখিয়া নায়িকা হাসি হাসি মুখে সাদরে সম্ভাষণ করিবে, আসন দিয়া বসিতে বলিবে। কোথায় ছিলে, কোথায় খাওয়া-দাওয়া হইল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আত্মীয়তা দেখাইবে। প্রীতি-উপহার দান করিবে। বিদায়কালে আবার আসিও বলিবে। কালিদাসের বিরহী যক্ষও দূত মেঘকে "জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাম্" বলিয়া যতটা বাড়াইবার বাড়াইয়াছেন। আনন্দচন্দ্রের রাধিকাও দূতী বৃন্দার মন রাখিবার জন্য কহিতেছেন,—"প্রেমের মূলাধার তুমি প্রেমের কল্পতরু, প্রেমমন্ত্র কানে দিয়ে তুমি হও প্রেমের গুরু।" কানে মন্ত্র দিয়া গুরুগিরী করিয়া যে আদর ও সম্মান পাওয়া যায়, ভাটপাড়ার গুরুবংশীয় কবি তাহা ভালরূপই বুঝিতেন। তিনি দূতী বৃন্দাকে ঠেলিয়া একেবারে ঐ পদে উঠাইয়াছেন। আর কোনও কবির নিকট দূতীর কপালে এমন গুরুর আদর ঘটিয়াছে কি না, ঠিক জানি না।

বাৎস্যায়ন নায়িকাদের মান বজায় রাখিবার জন্য সূত্র করিয়াছেন,—"ন চৈবান্তরাপি পুরুষং স্বয়মভিযুঞ্জীত। স্বয়মভিযোগিনী হি যুবতিঃ সৌভাগ্যং জহাতীত্যাচার্য্যাঃ।" আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে কহেন যে, কামিনীগণ স্বয়ং কখনই প্রেম-প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে না, বুক ফাটিবে, তথাপি মুখ ফুটাইবে না। কেন না, স্বয়ং প্রস্তাবকারিণী রমণী কখনই সৌভাগ্য লাভ করে না। (কামসূত্র, ২য়াধিকরণ, ৪ অঃ, ৪০ সূঃ।) কবি আনন্দচন্দ্র বাৎস্যায়নকে কিরূপ অনুসরণ করিয়া বৃন্দার মুখে রাধিকাকে উপদেশ দিতেছেন, শুনুন ;—

"ও রাই পরকে দিলি আপন মন না জেনে পরের মন
এমন রীত অনুচিত রাই।
আগে কর পর বশ পরে প্রকাশিবে রস
পরে মহিলে ঘটিবে বালাই॥
পরের চঞ্চল ভাব আগে কর অনুভব
পরে ভাব প্রকাশিবে তায়।
সে যদি রজনী-দিবে তোমারে অন্তরে ভাবে
তবে ভাব জানাতে কি ভয়?
(এখন) সতত উৎসুকে থাক মনের কথা মনে রাখ
শেখ ধনি! পীরিতের রীত।
করেছ মলিন মুখ ব্যক্ত হবে মন-দুখ
হেন চুক তোমার অনুচিত॥
(আর) যারে সদা প্রাণ চায় তারে ত জানান নয়
জানাইলে একে হয় আর।
শুন শুন রাজকুমারি নয়নে চাতুরী করি
আগে কর মন চুরি তার॥
নইলে তার অন্য মন তোমার যে এত যতন
অরণ্যে রোদন হবে সুধু।
পুরুষের নানা মতি জেনেও কি ভোল শ্রীমতি
আগেভাগেই তারে বল বঁধু?"

বৃন্দা অন্য এক স্থলে কহিতেছে,—

"এ কি ধনি! বিনোদিনী দেখালি নূতন।
ভাল—ভাল—ভালবাসায় হয়েছ নিপুণ॥
সরোবরের আগুসার পিপাসার কারণ।
ভ্রমরের অন্বেষণে পদ্মিনীর গমন॥
চাতক লাগিয়া মেঘের উৎকণ্ঠিত মন।
যাচকেরে যেচে বেড়ায় অমূল্য রতন॥
চকোরেরে সুধা দিতে ভূমে নামল চাঁদ।
নদীর নিকটে যেতে সমুদ্রের সাধ॥
লৌহ-সন্নিধানে ধায় অয়স্কান্ত মণি।
নারী যায় পুরুষের কাছে তেমনি বাখানি॥"

ঘটকালী। ছি ছি রাই স্ত্রীলোকের যে গৌরব, তা তোমা হ'তেই দেখছি সব নষ্ট হ'ল—কেন বলি শুন,—

"আমরা ডাগর ক'রে কইলে কথা দেমাকেতে থাকি।
কারু পানে চাইনে, কেবল আপনি আপনায় দেখি॥
অনিমিখে বুকে আঁখি রাখি দিবানিশি।
মদগর্ব্বে খর্ব্ব দেখি পদ্মিনী কি শশী॥
যখন ঠমকে ঠমকে চলি ঠাকরা ঢাকরা ক'রে।
যৌবনের আতসে কত ডাকরা জ্ব'লে মরে॥
খটাস পানা চেয়ে থাকে আমি ত না চাই।
চাইলে তারে মদনের বাণে অমনি জ্বালাই॥
রঙ্গে ভঙ্গে কোন কথা কব সঙ্গে যার।
আমার আশায় ব'সে রবে শিকড় নামবে তার॥
পিরীতে কটাক্ষ একবার লক্ষ্য করি যারে।
কলুর ঘানির গরুর মত সেটা ঘুরে ঘুরে মরে॥
কথা কইলাম ত ত্যাড়া কল্লেম রাখলাম নিজ ক'রে।
গরুড় হইয়া থাকে সে ত মরতে বল্লে মরে॥"

কবি যে নিজেকে পূর্ব্বে "রসিকের শিরোমণি" বলিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা? তাঁহার সরস গান ও ছড়ার আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব,—

বাহার—আড়খেমটা।

আজ মন-চোরা, পড়েছ হে ধরা,

---

* এখানে কবি নিজেকে রসিকের শিরোমণি বলিয়া একটু গর্ব্ব করিয়াছেন, তাঁহার এ গর্ব্ব নিরর্থক বাক্যমাত্র নহে—সত্য সত্যই

কেমনে পালাবে পালাও দেখি বঁধু
প্রহরী করেছি নয়নেরি তারা।
(শ্যাম) তোমার লাগিয়ে কুলবতী হয়ে
পথে পথে ভ্রমি ত্যজি লাজ
কি করি হে হরি আর ত সইতে নারি
তোমার হইল নারী-বধেরি ধারা॥"

ভ্রমরকৃষ্ণ তারাযুগল—উভয় অপাঙ্গের মধ্যে ক্ষিপ্রতরভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, এমন কোন চটুলনয়না যদি সম্মুখে আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে নয়নের তারা প্রহরী হয় কি না হয়, তাহা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহার রস তিনিই উপলব্ধি করিতে পারেন। এক্ষণে ইহার পর একটা ছড়া শুনুন,—

"তোমার বাঁশীটি নয় ত সিঁদকাঠী উটি রমণী খুন করা।
মনচোরা আজ হাতে নাতে প'ড়ে গেছ ধরা॥
নিত্যি নিত্যি ফাঁকি দিয়ে ফের মন-চোর।
নজরে নজরবন্দী করেছি নাগর॥
তোমার পায়ে দিব পীরিতির বেড়ী ছাড়াছাড়ি নাই।
যৌবন-জেলেতে বন্দী করিব কানাই॥"

যদি বল, যৌবন-জেল অতি কোমল, ভেঙ্গে পলায়ন করবে, তা মনেও ক'র না—কেন তা বলি শোন,—

"যৌবন-জেল ভেঙ্গে নাগর কোথায় পলাইবে?
মদন রইল নাজীর জামিন হাজির ক'রে দিবে॥
আর জেল-ভাঙ্গা হ'লে নাগর সাজা বাড়াবাড়ি।
অভিমান চাবুক বুকে হানবে ঘড়ি ঘড়ি॥
তখন কেটকোড়া মন-পোড়ার জ্বালায় জ্বলতে হবে বঁধু
উকরুতে মুকরুতে নেই ধন! হাকিম কুলবধূ॥"

এইখানে এক দিকে যেমন অতি সরসতার পরিচয় পাইলেন, তেমনই অপর দিকে বৃটিশ-শাসনের প্রবর্ত্তিত জেল, নাজীর, জামিন, চাবুক, কাটগড়া, হাকিমের উল্লেখ পাইলেন। তবে কবি যে জেল, হাকিম ও চাবুকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশের জেলের আতঙ্ক নষ্ট করিয়া পাঠকমাত্রেরই মনে তিনি যত বড় প্রবীণ ও গম্ভীর হউন, ঐ হাকিমের হুকুমে আজন্ম ঐরূপ জেলের সশ্রম কয়েদ বরণ করিয়া লইবার বাসনা জন্মাইয়া দেয়।

এইখানে কবি অতি কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত * সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন।

"তখন এমন যে লম্পট শঠ চতুর-চূড়ামণি
চোর ব'লে ধরেছে তাইতে কতই অভিমানী।
(শ্যামের) ভয়েতে কাঁপিছে অঙ্গ পরাণ চঞ্চল—"

এইখানে স্পষ্ট "বেপথু" বা কম্পনের অভিব্যক্তি।

"কথাবার্ত্তা এড়িয়ে গেল আঁখিটি ছল ছল"

এই স্থলে "স্বরভঙ্গ" ও "অশ্রু" দেখিতে পাইলেন।

"তখন ঢোঁক গেলেন আর কথাটি কন মাথাটি হেঁট করা।
কাযেই বুদ্ধি হয়ে গেল যার রমণী হাত ধরা॥"

এখানে "স্তম্ভ" স্পষ্ট প্রতীয়মান।

"তখন তোত্‌লা হয়ে পড়লেন বঁধু কথা কইতে যায়" ইত্যাদি।

এই স্থলে "খেদ" বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা মনে করিবেন যে, চোর বলিয়া ধরিয়াছে বলিয়া বালককাল হইতে "ননীচোরা" শ্যাম আজ ভয়ে অমন থতমত খাইয়াছেন—তাঁহাদের মত অরসিকের নিকট রসের নিবেদন বিড়ম্বনামাত্র।

শ্যাম তাঁহার সাধুতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাফাই গাহিলেন, তাহার উত্তরে বৃন্দা গান ধরিলেন,—

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

ওহে আ মরি শ্যাম বড় সাধু হয়ে বসিলে
বঁধু শিখলে কোথায় এ চাতুরী
অবলা সরলারি মন নয়নে করি হরণ কথায় যেন
কতই সুজন তোমার ও কথায় কে ভুলবে হরি॥
যারা তোমার বাঁশী শুনে, প্রাণ সঁপেছে শ্রীচরণে,
তাদের এ বঞ্চনা কেনে, ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীধারী॥
ও শ্যাম কথায় যেমন সাধু হয়ে বুঝালে আমায়
মনচোরের চাউনি বঁধু লুকাবে কোথায়
যে যেমন তা জানা যায় কটাক্ষে একবার
প্রেমের প্রেমিক বুঝতে পারে অঙ্গে বুঝা ভার॥
তোমার চাউনিতে চোর মালুম করলুম ওহে কমল আঁখি।
কথা ক'য়ে আমায় কি আর দিতে পার ফাঁকি॥
একে নটবর বেশ কি বঙ্কিম ঠাম।
ও রূপে মজেছে কৃষ্ণ বৃন্দাবনধাম॥
বিশেষ মজেছে নাগর! যত নারীজাতি।
তাদের কাছে বাঁশী তোমার দুপরে ডাকাতী।
বাঁশীতে উদাসী করলে ব্রজবাসী জন।
ধেনু বৎস শিশু পশুর হ'রে নিলে মন॥
ও শ্যাম! বৃক্ষ নাকি হেলে দোলে স্পন্দহীন নয়।
যমুনা উজান বয় শুনে বাঁশীর স্বর॥
তোমার বাঁশী, হাসি, কালশশি! রূপ কি কটাক্ষ।
ভুবন ভুলাতে এরা একে একে দক্ষ॥
এ সবগুলি বনমালি! হইয়ে কু-মত।
সেই ব্রজের মাঝে রাজকন্তে তায় ধরালে কু-পথ॥

কবি রাধা ও কৃষ্ণের চারি চক্ষুর মিলনে যে প্রেম-রণ বা প্রেমের ডুয়েল (Duel) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে একটু রকমারি আছে, এ গানটি পড়িবার মত বলিয়া এখানে উঠাইলাম,—

গারা-ভৈরবী—যৎ।

বিরোধ বিরোধ প্রেম-রণে—
বন্দী দু'জনে দু'জনার গুণে
আবার পরস্পর হানে শর আঁখির সন্ধানে।
নিতে উভয়ে উভয়ের মন করে যতন
তাহে উভয়ে যন্ত্রণা দেয় মদন
বুঝি দু'জন হারায় মন, দু'জনায় হানে॥
আবার হাসিয়ে আশার ফাঁসি করে প্রকাশ
দিলে চকিতে দোঁহাতে দোঁহারি ফাঁস
একে পরাজয় হওয়া দায় সমান জনে॥

সংস্কৃত কবিরা বিরহী নায়কের জ্বালা জুড়াইবার জন্য অনেক সময় নায়িকার প্রতিকৃতি বা মূর্ত্তি-গঠন ইত্যাদি উপায়নিরূপণ দ্বারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় দেখিতে পাই, ষষ্ঠ অঙ্কে অনুতপ্ত রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রতিকৃতি আঁকিয়া বিরহ-বিনোদন করিতেছেন। আবার উত্তরচরিতেও বিরহী রাম কহিতেছেন,—

"চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ।

---

* সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ আটটি যথা।—"স্তম্ভঃ স্বেদোহথ রোমাঞ্চঃ

প্রবাস বা বিরহাবস্থায় প্রিয়জনকে নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে তাহার মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে সদাই স্পষ্ট আকারে ভাসিতে থাকে এবং ঐ মূর্ত্তি তখন হৃদয়ের অনেকটা জ্বালা জুড়াইয়া থাকে।

কবি আনন্দচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জ্বালা জুড়াইবার জন্ত তাঁহাকে দিয়া শ্রীরাধার একটি কুসুম-মূর্ত্তি গড়াইয়াছেন,—

"এইভাবে বনমালী ভাবিছেন তখন।
শ্রীমতীর স্বরূপ-রূপ * করিব গঠন॥
কোকনদে প্রপদগড়ে পদে পদ্ম দিয়া।
চম্পক-কলিতে তব অঙ্গুল নিরখিয়া॥
মল্লিকা-পাপড়ী ছিঁড়ে নখের বিধান।
চম্পক-কোরকে গ'ড়ে তব উরুস্থান॥
কটি খাঁটিবার তরে না পাইল ফুল,
দেখে শেষ মধ্যদেশ শূন্য সমতুল।
ফুলের স্তবকে করে কুচের আকার,
কান্ত কিন্তু গড়িল হৃদয় পাষাণে তোমার,
আবার মৃণালেতে ভুজলতা, পদ্ম করে কর।
জবাদল দলনী ক'রে করে ওষ্ঠাধর।
কুন্দেতে গড়িল দন্ত নাসা তিল-ফুলে,
ইন্দীবরে আঁখি করে, আঁখি রইল ভুলে।
আর যত ভাল ভাল ফুল ছিল ব্রজে,
তাহাতে গড়িল অঙ্গ—যে অঙ্গে যা সাজে।"

সর্ব্বাঙ্গই ফুল দিয়া তৈয়ারী হইল, কিন্তু কটিদেশের জন্ত ফুল পাওয়া গেল না, তাহা শূন্য সমতুল, ইহাতে কটির ক্ষীণত্বই পাওয়া যাইতেছে; আর হৃদয়খানা পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া বিরহীর তীব্র বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে। আর ওষ্ঠাধরের স্থানে প্রাচীন বন্ধুক ইত্যাদি পুষ্প না লাগাইয়া জবাদল দ্বারা কায সারিয়া কবি খাঁটি বাঙ্গালারই মান রাখিয়াছেন।

এক তরফা শুনিয়া কৃষ্ণকে আপনারা পাগল ঠাওরাইবেন না। রাধিকার মুখে তাঁহার বিরহ-বেদনার একটু নমুনা শুনুন—

"আমার ইচ্ছা করে পাখী হয়ে আকাশে উড়ে যাই,
শ্যামরায় কোথায় হায় কি রূপেতে পাই।
ইচ্ছা করে সাগরপারে করি সং গমন,
ইচ্ছা করে সাগর ছেঁচে তুলি সে রতন।
ইচ্ছা করে এ সংসারে দিয়ে সই আগুন,
অরণ্যে নির্জ্জনে গিয়ে ভাবি তার গুণ।
ইচ্ছা করে কাজল ক'রে কালায় চোখে রাখি,
ইচ্ছা করে কুসুমে তায় মিশাইয়া মাখি।
ইচ্ছা করে হারে তারে গাঁথিয়া স্বজনি,
হৃদয়-মাঝারে রাখি দিবস-রজনী।
ইচ্ছা করে বুক বিদরি বাহির ক'রে প্রাণ,
প্রাণের স্থানে রেখে তারে ত্যজি আপন প্রাণ।"

ইহাই Self-effacing love বা identity in love অর্থাৎ স্বার্থ-গন্ধশূন্য প্রেমের চরম অবস্থা (climax)। কোন সংস্কৃত কবি "আবয়োরঙ্গযোর্ভিদে ভূয়ো বিরহবিক্লবঃ" এই চরণটিতে এই ভাবটির একটু নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। আনন্দচন্দ্র ইহাকে যেমন সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন, এমনি আর কোথাও কোন কবি করিয়াছেন কি না, জানি না।

* Life like image.

হাজার হৌক, রাধিকা কুলবধূ, তাই বৃন্দা তাহাকে কুল-মান বজায় রাখিবার জন্ত ঐ পথ হইতে নিবারণ করিতেছে। বৃন্দার এই কথাগুলিতে অতি সরল ভাষায় সাধারণের উপদেশ আছে।

"করবে কি রাই কুলবতী করেছে বিধাতা,
অন্তরে মিলাতে হবে অন্তরের ব্যথা।
কুলবতী জনার এমন ইচ্ছা কিছু নয়,
ইচ্ছা তুচ্ছ কর নইলে ঘটিবে প্রলয়।
কুলবতীর প্রেমে ইচ্ছা যেমন দরিদ্রের ইচ্ছা ধনে,
বামনের চাঁদ ধরা ইচ্ছা—পঙ্গুর ইচ্ছা গুণে।
কুঁজোর ইচ্ছা চিৎ হয়ে শোয়, খোঁড়ার ইচ্ছা ছোটে,
বোবার ইচ্ছা কথা কয় সতত মুখ ফুটে।
কালার ইচ্ছা শোনে, তেমনি কাণার ইচ্ছা চায়,
ইচ্ছা ক'রে হবে কি রাই বিধি বাদী তায়।
মূর্খের ইচ্ছা মান বাড়াতে দুঃখীর ইচ্ছা সুখ,
চোর করে ধর্ম্মে ইচ্ছা সে কেবল তার চুক।
বয়স গেলে বয়স ইচ্ছা সে কেবল তার ভ্রম,
প্রাণ লয়ে প্রাণ কখন ফিরে দিয়েছে কি যম?
তেমনি প্রেম ক'রে লুকাতে ইচ্ছা সে কেমন তা জান,
অলন্ত অনলী যেন বসনে লুকান।
দাঁড়ের পাখী ইচ্ছা করে উড়ে যায় কানন,
সে যেমন বুঝে না পরে নিগড়-বন্ধন।
তেমনি শ্রীমতি! তোমার কুলরূপ কুলুপ,
বিধাতা দিয়েছে,—কিসে ভেটিবে সে রূপ।"

ইচ্ছা ত অনেকের অনেক রকমই হয়, মেঘে আকাশে গন্ধর্ব্বনগর নির্ম্মাণ করে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত সাধ মিটে না। আর অসম্ভব রকম ইচ্ছা করিয়া তাহা মিটাইবার চেষ্টা করিতে গেলে অনেক সময়েই বিড়ম্বিত হইতে হয়। তাই কবি সংযমের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মানিবে কে? রাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, তিনি উত্তরে কহিলেন—

আড়ানা-বাহার—যৎ।

হায়! কেমনে পাসরি হরি করি কি উপায়,—
করেছে কি গুণ—
যদি থাকি আঁখি মুদে—অন্তরে উদয় হয়।
জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, নয়নে শ্রবণে বচনে কি মনে
বিরাজিত শ্যাম রায়॥
পড়েছি এ কি দায়—
আমার যে মন—সে ত নহেক মোর বশীভূত
সদা তারি অনুগত—ভালবেসে তায়॥

রাধিকার মতই ভক্ত কবি কৃষ্ণ-প্রেমে তদ্গত থাকিতেন। শ্রীরাধার মুখ দিয়া নিজের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

এইরূপে কবি আনন্দচন্দ্রের পাঁচালীর যে অংশটিই আলোচনা করা যায়, সেই অংশটিই মধুর বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমগ্র পাঁচালীখানি কি খাঁটি বাঙ্গালায়, কি ভাষার লালিত্যে, কি কবিত্ব-মাধুর্য্যে, কি অনুপ্রাসে, কি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের রসভাবের পরিপোষণে, কি ভক্তির সুধা-তরঙ্গে যেন এক অপূর্ব্ব জিনিষ। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বঙ্গ-সাহিত্যের এই উজ্জ্বল মণিটি আজ বিলুপ্ত। ইহার একটু ক্ষুদ্র অংশের পরিচয়মাত্র দেওয়া গেল।

গৌড়—পাণ্ডুয়া

শুনিয়াছি যে, গৌড় কায়স্থ-বীর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বাল্যলীলার স্থান এবং গৌড়ের অনুকরণে যশোহরের মন্দির ও মসজেদাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভীষণ মহামারী দ্বারা মদীয় পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি বিখ্যাত উলার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। শুনা ছিল যে, সেই প্রকারের মহামারী দ্বারা বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। গৌড়ধ্বংসের বহু কাল পরে বঙ্গের অপর কায়স্থ-বীর ভূষণার বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুর ঐ একই প্রকারের মহামারী দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

গৌড়—পাণ্ডুয়া দেখিতে হইলে মালদহ জিলার সদর ইংরাজবাজারে থাকিবার স্থান ঠিক করা আবশ্যক। আমি মালদহ জিলার চাঁচল-রাজের রামনগর কাছারীর খাজাঞ্চী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পাঁড়ে মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করিয়া গৌড় দর্শন করিয়াছিলাম।

পদ্মা পার হইয়া যখন আমরা গোদাগাড়ী ঘাটে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা সাড়ে ৯টা। ঘাটে মালদহ অভিমুখে যাইবার জন্য ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীগুলি ছোট। আমরা ট্রেণে স্থানসংগ্রহ করিলে এক ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া সাড়ে ১০টার সময় ট্রেণ ছাড়িল। বেলা প্রায় ১টার সময় মালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রেল-ষ্টেশন হইতে মহানন্দা নদী অর্দ্ধমাইল দূরে পশ্চিমদিকে অবস্থিত। চাঁচলের রাজার রামনগর কাছারীর উদ্দেশে মহানন্দার উপর দিয়া নৌকা করিয়া চলিলাম। মহানন্দার পূর্ব্বতীরে পুরাতন মালদহ সহর এবং রেল-লাইন অবস্থিত। পুরাতন মালদহের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মহানন্দার পশ্চিম-তীরে মালদহ জিলার সদর ইংলিস-বাজার সহর অবস্থিত। ইংলিস-বাজার সহরের দক্ষিণপ্রান্তে রামনগর পল্লী অবস্থিত।

ইংলিস বা ইংরাজ-বাজার

অপরাহ্ন সাড়ে ৩টার সময় ইংলিস-বাজার সহর দেখিতে চলিলাম। নদীর ধারের রাস্তা দিয়া উত্তরদিকে যাইতে নয়নগোচর হয়। ইহা রাস্তার পার্শ্বে এবং জেলখানার সন্নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইংরাজ-আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে এই বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া ফাঁসী দেওয়া হইত। ইহার পশ্চিমদিকে জেলখানা এবং উত্তরদিকে পুলিস হাঁসপাতাল ও পুলিস-লাইন অবস্থিত। তাহার উত্তরে মুকদ্দমপুর নামক পল্লী ও তদুত্তরে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ যে পাকা রাস্তা আছে, উহার উত্তরদিকে খাসমহল। নদীর ধারের রাস্তার সন্নিকটস্থ যে বাটীতে এক্ষণে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা পূর্ব্বে স্কুল-বাটী ছিল। এই বাটীর উত্তর-পশ্চিমদিকে ডাকবাংলা অবস্থিত। পুলিস-সাহেবের বাটীর উত্তরে ফাঁকা মাঠ ও মাঠের পশ্চিমে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটী আছে। এই মাঠের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ ও প্রাচীন একটি দেখিবার যোগ্য আম্রবৃক্ষ আছে। মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠদিগের ত্যক্ত পুরাতন ভিটায় কয়েকটি প্রাচীন ও বৃহৎ আম্রবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, বোধ হয়, সেরূপ আম্রবৃক্ষ আর কোথাও নাই। কিন্তু এই অতিকায় আম্রবৃক্ষটি দেখিয়া বুঝিলাম যে, ইহার তুলনায় সেগুলি নগণ্য। এই বৃক্ষটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রায় এক বিঘা জমী জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাপিয়া দেখিলাম যে, ইহার কাণ্ডের বেষ্টন ১১ হাত। ইহার ফল অতি সুমিষ্ট ও বিখ্যাত। শুনিলাম, ইহার অদূরে এই প্রকারের আর একটি আমগাছ ছিল, তাহা ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে। এই বৃক্ষটির আম্র প্রতি বৎসর ২৫০। ৩০০ টাকায় বিক্রয় হয়।

এই মাঠের পূর্ব্বপার্শ্বে নদীর ধারে য়ুরোপীয়দিগের ক্লাব-গৃহ এবং মাঠের উত্তরদিকে দ্বিতল বাটীতে কালেক্টরী অবস্থিত। এককালে এই বাটীতে ইংরাজদিগের নীলকুঠী ছিল। কালেক্টরীর উত্তরদিকে চতুর্দ্দিকে গৃহবেষ্টিত একটি উঠান আছে। এই উঠানের দক্ষিণদিকে একটি স্তম্ভ আছে, উহার স্মৃতিফলকে ক্ষোদিত আছে—"Erected by Thofmas Henchman Anno 1771" অর্থাৎ টমাস

উঠানের পূর্ব্বদিকে দেওয়ানী আদালত ও পশ্চিমদিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দ্বিতল আফিস-গৃহ। তদুত্তরে বাজার।

উক্ত বাজারের কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নুটু ক্ষ্যাপা নামক জনৈক ব্যক্তির একটি আশ্রম আছে। শুনিলাম, উক্ত বৈষ্ণবের পূর্ব্বনাম নুটবিহারী চট্টোপাধ্যায়। এই আশ্রমের একটি চালা ঘরে নানা বিগ্রহ ও মৃন্ময় পুত্তলিকা সজ্জিত আছে। উক্ত বৈষ্ণব এবং স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী গৌড়ের অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতনের ভিটা ও কীর্ত্তিগুলি রক্ষাকল্পে সচেষ্ট আছেন।

ক্ষুদ্র ইংলিসবাজার সহর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিবার সময় মোহান্ত শ্রীযুক্ত বলদেবানন্দ গিরির দ্বিতল বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যে সকল ব্যক্তি গৌড় ও পাণ্ডুয়া দেখিতে আইসেন, তাঁহারা অনেকে 'গিরি' মহাশয়ের আশ্রয়ে কয়েক দিবস কাটাইয়া যান।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীর পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ যে রাস্তা আছে, উহার পার্শ্বে পশু-চিকিৎসালয় অবস্থিত।

মালদহ জিলার সদর বা হেড-কোয়ার্টার ইংলিসবাজারে অবস্থিত। ইহার অপর দুইটি নাম—ইংরাজ-বাজার বা আংরেজাবাদ। মহানন্দা নদীর অপর পারে ইহার যে রেল-ষ্টেশন আছে, উহার নাম মালদহ। এককালে ইংরাজদিগের নীল ও রেশমের কুঠী এই স্থানে অবস্থিত ছিল।* এখানে দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা-বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা, একটি গুরু-ট্রেণিং বিদ্যালয়, বালিকাদিগের জন্য দুইটি মহাকালী পাঠশালা, একটি বয়ন-বিদ্যালয়, রোগীদিগের জন্য একটি ছোট হাঁসপাতাল ও ৩টা ব্যাঙ্ক আছে। এখানে ভাল মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে গোলাকার খাজা অতিশয় বিখ্যাত। এখানকার পিতলের ঘটী 'সাদুল্লাপুরের ঘটী' বলিয়া খ্যাত। বাজারে ভাল গামছা সস্তায় পাওয়া যায়। এই স্থানের 'ফজলী' আম অতিশয় বিখ্যাত। কথিত আছে যে, 'ফজল্ বিবির' নাম অনুসারে 'ফজলী-আম' নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানের প্রধান পণ্য পিতলের ঘটী, রেশম ও আম্র। আমের সময় মহানন্দার তীরে শত শত নৌকা লাগিয়া থাকে; নৌকা, রেল ও ষ্টীমারে ক্রমাগত আম্র বোঝাই হয়। সে সময় স্থানীয় টেলিগ্রাফ আফিসে লোক বাড়াইতে হয়। অসংখ্য আমবাগান মালদহের স্বাস্থ্যের অবনতির অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে এখানে নীলের ব্যবসায় ছিল, তাহা বহু দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এতদঞ্চলে গালার ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। এই সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৫ শত। এখানে মহানন্দা নদীর সন্নিকটে মাড়োয়ারীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত একটি ধর্ম্মশালা আছে। মাড়োয়ারীগণ এই স্থানে প্রধান ব্যবসাদার। মালদহ রেলষ্টেশনের সন্নিকটে সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র একতালা ধর্ম্মশালা আছে। উহার তত্ত্বাবধানের ভার ষ্টেশনের মিঠাইওয়ালার উপর ন্যস্ত আছে।

* ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংরাজদিগের কুঠি পুরাতন মালদহ সহরে ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কুঠি এই স্থানে স্থানান্তরিত

গৌড়

ইংরাজী ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার প্রত্যুষে বাঙ্গালা ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রিতে আমরা গো-যানে গৌড় যাত্রা করিলাম। প্রায় সাড়ে ৭ মাইল পথ অতিক্রম করার পরে অরুণোদয়কালে রাস্তার বামপার্শ্বে তার দিয়া ঘেরা এক স্থানে দুইটি চৌকা প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিলাম। এই স্তম্ভদ্বয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। (Protected monument of the Archoeological Department)। এই স্তম্ভ দুইটি এককালে গৌড়েশ্বরের কোন দেওয়ানের বাটীর স্তম্ভ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ হইতে এই সকল সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্ত্তির নাম কীর্ত্তিগুলির গাত্রে লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা হইলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইত। তাহা না লিখিয়া লেখা হইয়াছে যে—কেহ কোন জিনিষ নষ্ট করিবে না বা উঠাইয়া লইয়া যাইবে না, অন্যথা আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে ইত্যাদি।

গৌড়ের পথে নবাবগঞ্জ রোড ধরিয়া আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অষ্টম মাইলের সন্নিকটে রাস্তার বামপার্শ্বে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর ডাক-বাংলার একতলা কোঠা-ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকবাংলার পাদদেশে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সুবৃহৎ পিয়াসবাড়ী দীঘি আছে। ইহা হিন্দু রাজত্বকালে খনিত; ইহার বেষ্টন প্রায় ১ মাইল হইবে। ক্রাফলীন

পূর্ব্বকালে ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল। আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে এই দীঘির জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল; যে সকল অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত, তাহাদিগকে এই দীঘির জল ব্যতীত অন্য কোন জল পান করিতে দেওয়া হইত না, ফলে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত। বাদশাহ আকবর এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আজিও এই বৃহৎ দীঘিতে অগাধ স্বচ্ছ জল ও অসংখ্য মনুষ্যখাদক কুম্ভীর আছে। কুম্ভীরের ভয়ে কেহ ইহার জলে অবতরণ করে না। ইহাতে প্রচুর মৎস্য আছে ও তীরে স্থানে স্থানে বেত ও অন্যান্য গাছের বন আছে তাহাতে ব্যাঘ্র বাস করিতে পারে।

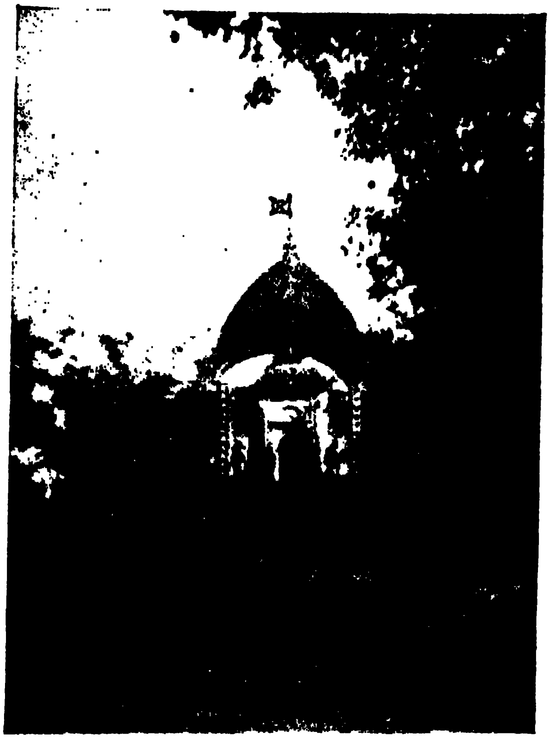
রামনগর কাছারী হইতে গৌড় দেখিতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তথাকার লোক সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন যে, গৌড়ের সর্ব্বত্র ছোটবড় প্রত্যেক জলাশয়ে কুম্ভীর আছে; এ কারণ আমরা যেন কোন কারণে কোন জলাশয়ে অবতরণ না করি।

পিয়াসবাড়ী ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে নবাবগঞ্জ রোডের বাম বা পূর্ব্ব পার্শ্বে বনাকীর্ণ আর একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম "কুম্ভীরপীর।" ইহার পাড়ে ধ্বংসস্তূপ ও বনজঙ্গল আছে। অজ্ঞ মুসলমানদিগের ধারণা এই যে, এই পুষ্করিণীর কুম্ভীরগুলির মধ্যে একটিতে কোন মুসলমান পীর কুম্ভীর-দেহ ধারণ করিয়া আছে। র‍্যাভেনশ (Ravenshaw' "Gaur—its ruins and inscriptions") এইরূপ একটি প্রবাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উক্ত পোষা কুম্ভীরকে স্থানীয় মোল্লা বা খাদিম "আও বাবা খিজির" বলিয়া ডাকিলে সে আহার্য্য লইতে আসিত, কিন্তু যদি না আসিত, তাহা হইলে ইহা প্রচার করা হইত যে, আহার্য্যদাতা যাত্রীর পাপের জন্যই সে আসিল না। এখানে কুম্ভীর দেবতার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। খুলনা জিলায় খাঁ-জাহানের মসজেদের সন্নিকটস্থ কোন পুষ্করিণীতে এই প্রকারের কুম্ভীরপূজা হইয়া থাকে শুনিয়াছি। এই স্থানটি এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, এই স্থানের ডাঙ্গায় ব্যাঘ্র ও জলে কুম্ভীর বিচরণ করিয়া থাকে।

এই স্থানের কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ

পূর্ব্বোক্ত পিয়াসবাড়ীর উত্তর ও পশ্চিমদিকে দূরে প্রাচীন ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে "ফুলবাড়ী" নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম প্রভৃতি অনেকে মনে করেন যে, এই স্থানে বল্লালসেনের প্রাচীন দুর্গ ছিল। ইহার প্রায় ৪ মাইল দূরে উত্তরদিকে বল্লালবাড়ী নামক স্থানে (ইহা ইংলিসবাজারের নিকটে অবস্থিত) চারিদিকে উচ্চ বাঁধ দেওয়া পরিখাবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে হিন্দু-রাজত্বকালের একটি রাজপ্রাসাদের বা দুর্গের স্তূপ আছে। কানিংহামের মতে সেন রাজাদিগের সময় গৌড়-রাজধানী ফুলবাড়ী হইতে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে বড় সাগরদীঘি, সাদুল্লাপুরের প্রাচীন গঙ্গাস্নানের ঘাট ও বল্লালবাড়ীর স্তূপ প্রভৃতি বর্ত্তমান। বড় সাগরদীঘির প্রায় অর্দ্ধ-মাইল দূরে উত্তরপশ্চিমদিকে কমলবাড়ী নামক স্থানে গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৌড়েশ্বরীর মন্দির আছে; এই স্থান "দ্বারবাসিনী" নামে প্রসিদ্ধ; কমলবাড়ীর সন্নিকটে উত্তরদিকে গৌড়ের প্রাচীন উচ্চ বাঁধের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারবাসিনী দরওয়াজার স্থান আছে। এখানে বৈশাখ,





সাদুল্লাপুর ঘাটের প্রাচীন শিবমন্দির ।

মাঘ ও কার্ত্তিক মাসে বিশেষ পূজা হয়। পূর্ব্বোক্ত ফুলবাড়ীর এক ক্রোশ দক্ষিণে পরবর্ত্তী কালে (অর্থাৎ মুসলমানরাজত্ব-কালে) গিয়াসউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গে দাখিলদরওয়াজা ও বাইশগজী প্রাচীর প্রভৃতি শোভা পাইতেছে, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

পিয়াসবাড়ী ডাক-বাংলা ছাড়াইয়া একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে যাইলে গৌড়ের রামকেলি নামক পল্লীতে উপস্থিত হওয়া যায়। রামকেলি পল্লীর মধ্যে যে স্থানে রাস্তা বাঁকিয়া বারদুয়ারীর দিকে গিয়াছে, সেই স্থানে বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান অবস্থিত। এই স্থানে রাস্তার দক্ষিণদিকে শ্যামকুণ্ড নামক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, ইহার দুই দিকে শাণ-বাঁধান ঘাট আছে। ইহার উত্তরে রাধাকুণ্ড নামক আর একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ইহা-দিগের জলে কুম্ভীর আছে, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু পুষ্করিণীর ঘাটে জলের সন্নিকটে বসিয়া স্ত্রীলোকরা বাসন মাজিতেছে দেখিয়া বুঝিলাম যে, ইহারা কুম্ভীরের ভয়ে গিয়াছে। রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে সুরভিকুণ্ড নামক একটি ডোবার খাত মাত্র আছে, তাহাতে জল নাই। এই সকল পুষ্করিণীর সন্নিকটস্থ ভূমিতে জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি তিথিতে বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব ও তিন দিবসব্যাপী মেলা হয়।

সুরভিকুণ্ডের দক্ষিণদিকের সরকারী রাস্তার দক্ষিণে বঙ্গদেবীর কুণ্ড ও তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ইন্দুরেখাকুণ্ড নামক দুইটি পুষ্করিণী আছে। এই সকল ডোবা সদৃশ জলাশয় যে বহু প্রাচীন, তাহা আদৌ মনে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত রাস্তার মোড় ফিরিতে দক্ষিণদিকে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান একটি উচ্চ বেদী আছে। ইহার পরিমাপ ১২ × ১ হাত। ইহা ভূমি হইতে প্রায় ৩ হাত উচ্চ। এই বেদীর মধ্যস্থলে একটি অতি প্রাচীন তমালগাছ ও উহার দুই পার্শ্বে কেলিকদম্বগাছ থাকায় এই স্থানটি ছায়া-শীতল কুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে চৈতন্যদেব বিশ্রাম করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালে বৃন্দাবন যাইবার পথে চৈতন্যদেব রামকেলিতে উপস্থিত হয়েন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের সংবাদ পাইয়া হুসেন শাহ কেশব খাঁকে বলিয়াছিলেন :-

"সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন॥
কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবনে॥"

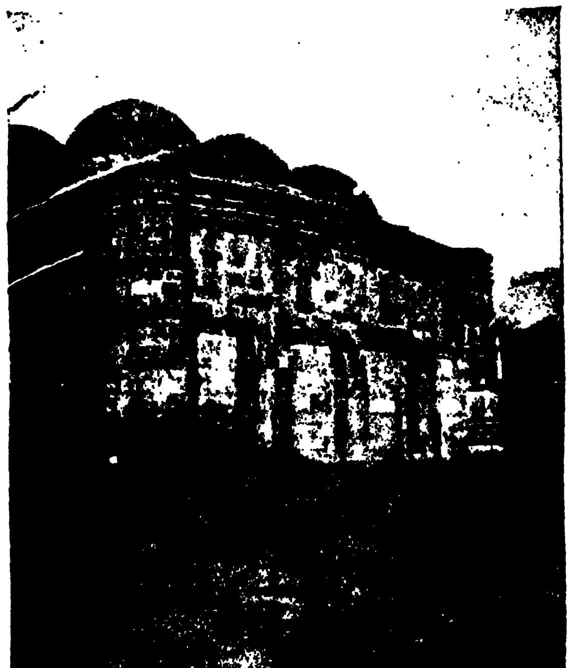
এই সময় যশোহর জিলার ফতেহাবাদের অধিবাসী রূপ ও সনাতন নামক ভ্রাতৃযুগল রামকেলি গ্রামের এই স্থানে বাস করিতেন। সনাতন হুসেন শাহের অধীনে "দবীর খাস" (বর্ত্তমান কালে যাহাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী কহে, ইহা তদনুরূপ পদ) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রূপও এই সময় হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও "সরকার মল্লিক" উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের অপর ভ্রাতা অনুপ গৌড়ের টাঁকশালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দর্শন করিবার পর

র্ত্তৃক হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার দর্শনে রাজকার্য্যে তাঁহাগের ঘৃণা জন্মিয়াছিল। রাজকার্য্যে অবহেলার জন্য সেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিলে তিনি কারাধ্যক্ষকে ২কোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া পলায়ন করেন। তৎপরে প ও সনাতন উভয়ে বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কেলিকদম্ব ও তমালবৃক্ষ-শোভিত বেদীর াত্রে এবং উহার সম্মুখস্থ উদ্যানের অপর দিকে রূপসাতনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরের ারের উপরে ও গাত্রে গৌড়ের কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত অতি সুশ্রী গালাপপুষ্প ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড সকল গাঁথিয়া াখা হইয়াছে। রূপ-সনাতন-প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনের নিত্য সবার ব্যবস্থা আছে।

উক্ত বেদী ছাড়াইয়া রাস্তা দিয়া দক্ষিণদিকে যাইতে ক্ষিণদিকে প্রথমে ললিতা ও পরে বিশাখা-কুণ্ড নামক দুইটি ডাবা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের মধ্যে সামান্য জল ও শবাল এবং ঘাস আছে। রামকেলির এই সকল কুণ্ড বা ডাবার প্রত্যেকটি প্রায় ১ বিঘা জমীর উপর অবস্থিত। যার কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে রাস্তার বামপার্শ্বে একটি উচ্চ উটা জমীর উপর একটি বড় খড়ুয়া ঘর আছে। এই ারের মধ্যে কৃষ্ণনগরের কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত অনেকগুলি ্ময় পুত্তলিকা আছে—এগুলি চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনা-সম্বন্ধীয়। এই স্থান ছাড়াইয়া আর কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে যাইলে রাস্তার বামপার্শ্বে ঘাস ও শৈবালাদি পূর্ণ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ রূপসাগরদীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীঘিটি ১১ বিঘা জমীর উপর অবস্থিত। ইহার পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। এই দীঘির পশ্চিমদিকে একটি বড় ঘাট আছে, উহা ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। ঘাটের গাত্রে বামপার্শ্বে একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, সন ১২৮৬ সালের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ এই ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দীঘির পূর্ব্বদিকে গেরদা নামক স্থানে রূপ গোস্বামীর বাটী ছিল। রামকেলি গ্রামে সনাতন গোস্বামীর নামে আর একটি জলাশয় আছে, উহার নাম সনাতন সাগর। এই জলাশয় দুইটি এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত কেলিকদম্ব ও তমালকুঞ্জ ব্যতীত রামকেলি গ্রামে যে সকল হইল। এই স্থানে কতকগুলি বৈষ্ণব গৃহস্থের বাস আছে। গৌড়ের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার সময় এরূপ বসতি কদাচিৎ নয়নগোচর হয়। অধিকাংশ স্থলে জনমানবহীন বনাকীর্ণ শ্মশান দেখিয়াছি, কদাচিৎ কোথাও ২।৪ ঘর লোকের বাস দেখা গিয়াছে।

রূপসাগর দীঘির অদূরে দক্ষিণদিকে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বারদুয়ারী বা গৌড়ের বড় সোনা মসজেদ



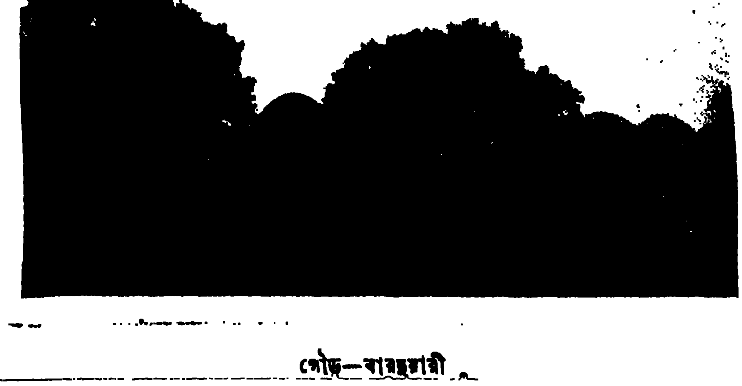
গৌড়—ছোট সোনা মসজেদ

অবস্থিত। এই উচ্চ ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক দিকের মাপ প্রায় ২শত ফুট। ইহা ছাড়া গৌড়ের কোতোয়ালী দরওয়াজার বাহিরে একটি ছোট সোনা মসজেদ ও পাণ্ডুয়ায় একটি বড় সোনা মসজেদ আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে তারের বেষ্টনী আছে। ইহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। র‍্যাভেনশ ইহাকে গৌড়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইমারত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বৃহৎ এবং সুন্দর বটে, কিন্তু ইহার কারুকার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কারুকার্য্য-শোভিত ইমারত গৌড়ের অন্য স্থানে দেখিয়াছি। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত ও চতুষ্কোণ এবং উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। ইহাতে যে প্রস্তর



গৌড়—বারদুয়ারীর একটি সদর দ্বার

বলিলেই হয়। ইহার মাপ—দীর্ঘ ১৬৮´ × প্রশস্ত ৭৫´ × কার্ণিশ পর্য্যন্ত উচ্চ ২০ ফুট। ইহার পশ্চিমাংশে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি হলঘরের ন্যায় ঘর আছে। উহার মধ্য দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে দুই সারি প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ ছিল, তাহার কয়েকটির কিয়দংশ আজিও বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক সারিতে ১০টি করিয়া দুই সারিতে কুড়িটি স্তম্ভ ছিল। এই দুই সারি স্তম্ভ দ্বারা হলঘরটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই হলঘরের ঊর্দ্ধদেশে এক্ষণে ছাদ বা গুম্বজ কিছুই নাই, কিন্তু উপরের ভগ্ন খিলান দেখিয়া বুঝা যায় যে, প্রত্যেক সারির উপর ১১টি করিয়া তিন সারিতে মোট ৩৩টি ছোট গুম্বজ ছিল। এই সকল গুম্বজ যে সুবর্ণপত্র দ্বারা মণ্ডিত ছিল, তাহার চিহ্ন ক্রেটন ১৮০১ খৃষ্টাব্দে দেখিয়াছিলেন। উক্ত হলঘরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের মধ্যে প্রস্তরমণ্ডিত ১১টি ক্ষুদ্র কুলঙ্গী বা মিম্বরের ন্যায় আছে, উহাদিগের কয়েকটির সর্ব্বাঙ্গে আজিও কারুকার্য্যক্ষোদিত প্রস্তর আছে। এই হলঘরের দক্ষিণদিকে তিনটি দ্বারের খিলান আছে এবং উত্তরদিকে একটি দ্বার ও দেওয়ালের উচ্চস্থানে দুইটি জানালার ন্যায় (balcony) আছে। এই দুইটি জানালার মধ্যে যেটি পূর্ব্বদিকে বা দেওয়ালের মধ্যস্থলে আছে, উহার নীচে দেওয়ালের মধ্যে একটি কুলুঙ্গী বা মিম্বরের ন্যায় আছে। সম্ভবতঃ উপরের জানালায় গৌড়াধিপতি আসন গ্রহণ করিতেন, কারণ, উক্ত জানালায় পৌঁছিবার নিমিত্ত বারদুয়ারীর বাহিরে উত্তরদিকে একটি ঢালু ও প্রশস্ত সিঁড়ির ন্যায় গাঁথনি আছে। হলঘরের পূর্ব্বদিকে ১১টি খিলান করা দ্বার আছে। এই মসজেদের দ্বারগুলি ১০ ফুট উচ্চ ও ৫ ফুট ১১ ইঞ্চ প্রশস্ত। এই খিলানগুলি মুসলমান ধরণের (Saracenic style)। কলিকাতার হাইকোর্টের বারান্দাগুলি যে প্রকার দেখিতে, ইহার দ্বারগুলির খিলান সেই প্রকারের। এই ১১টি দ্বারের পূর্ব্বদিকে একটি বারান্দা আছে, উহার উপরে ১১টি গুম্বজ আছে। এই বারান্দার পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বোক্তরূপ আরও ১১টি দ্বার আছে। পূর্ব্বকালে বারদুয়ারীর উপরে ৪৪টি গুম্বজ ছিল। এক্ষণে তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গুম্বজগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত, দেয়ালের ভিতরে ইষ্টকের গাঁথনি আছে,



গৌড়—বারদুয়ারী

হার উপরে প্রস্তরের গাঁথনি করিয়া ইষ্টক ঢাকিয়া দেওয়া য়াছে। এ কারণ দেখিলে মনে হয় যে, এই ইমারত গাগোড়া প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে ঝিনুকের চূণ বালি মিশ্রিত করিয়া সিমেন্টের ন্যায় এক প্রকার লার গাঁথনি করা হইয়াছে। এক্ষণে এই মসজেদে গন স্মৃতিফলক নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেজর ফ্রাঙ্কলিন্ গার ৪টি মিনারের মধ্যে ৩টি অবশিষ্ট দেখিয়াছিলেন। ক্ষণে কোন মিনার নাই। হুসেন শাহ ইহার নির্ম্মাণ রম্ভ করেন ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে অনুমান ২২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। মেজর াঙ্কলিন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ইহার স্মৃতিফলকে গরা অক্ষরে লিখিত ছিল যে, আশরফাল হুসেনী নসরৎ হ ৯৩২ হিজিরায় ইহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। এই মসদের পূর্ব্বদিকে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। এই াঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত এক কটি বৃহৎ দরওয়াজা আছে। দক্ষিণদিকের দরওয়াজাটি াঙ্গিয়া গিয়াছে, উত্তরদিকেরটি অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় আছে, বং পূর্ব্বদিকেরটি অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই



গৌড়—দাখিলদরওয়াজা

দ্বার কয়টির খিলান ২৬ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট প্রশস্ত। বারদুয়ারীর পশ্চিমে ২।১টি অতি প্রাচীন ও বৃহৎ তেঁতুলগাছ আছে; তাহার পশ্চিমে সরকারী রাস্তা ও ঐ রাস্তার পশ্চিমে ব্যাঘ্র ও শূকরের আবাস দুর্ভেদ্য উচ্চ কাঁটাবন।



যখন আমরা বারদুয়ারী দেখা শেষ করিলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে ৯টা। সে সময় অদূরে বনের মধ্যে ফেউ ডাকিতে লাগিল। অনেক সময় বাঘ বাহির হইলে ফেউ ডাকে। এখানে দিবসে ব্যাঘ্র বিচরণ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। বারদুয়ারীর সন্নিকটে একটি বাংলা ঘর আছে, উহা দেখিতে ডাকবাংলার ন্যায়। বারদুয়ারীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ও সরকারী রাস্তার পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার পরে অন্য একটি রাস্তা দিয়া দক্ষিণদিকে যাইলে মুসলমান আমলের গৌড় দুর্গের উত্তরদ্বার ও প্রধান প্রবেশদ্বার দাখিল-দরওয়াজার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যায়। দাখিল-দরওয়াজার সন্নিকটে দুর্গের পরিখার বাহিরে এক জন হিন্দু কৃষকের একটি বেগুনের ক্ষেত্র ও কুটীর রহিয়াছে।

করিলাম। এখানে চতুর্দ্দিকে বন, জঙ্গল ও জলাশয়। এই দুর্গ প্রাচীন ভাগীরথী নদীর উত্তরদিকে অবস্থিত। ইহা ১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ শত হইতে ৮ শত গজ প্রশস্ত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের গাঁথনিযুক্ত ৪০ ফুট উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার ছিল। প্রাকারের গাত্রের প্রস্তরের গাঁথনি এক্ষণে নাই, কিন্তু পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার আজিও আছে। এই প্রাকারের পাদদেশ ১ শত ৮০ ফুট প্রশস্ত। প্রাকারের উপরে অশ্বত্থ ও তেঁতুল প্রভৃতি অতি প্রাচীন ও বিশাল বৃক্ষ এবং বন-জঙ্গল আছে। এই প্রকারের উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার মহারাজা প্রতাপাদিত্য যশোহরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও তাহা খুলনা জিলার ঈশ্বরীপুরে ও কালীগঞ্জের নিকটে দণ্ডায়মান আছে। র‍্যাভেনশ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে উক্ত মৃন্ময় প্রাকারের শিখরদেশে গৃহাদি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্ন নাই। প্রাকারের বহির্দ্দেশে দুর্গ বেষ্টন করিয়া কমলদল ও শৈবালপূর্ণ যে বিস্তৃত পরিখা আছে, উহার জলে কুম্ভীর দৃষ্ট হয়। এই দুর্গমধ্যে ২২ গজী প্রাচীর ও পরিখা-বেষ্টিত 'হাসেলিখাস' নামক রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, "বাদশাকে কবর" নামক সমাধির স্থান, কদম রসুল, চিকা মসজেদ ও গুমটি মসজেদ প্রভৃতি আছে। কানিংহাম অনুমান করেন যে, এই দুর্গ ১ম মামুদ ও তদীয় বংশধরগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। "রিয়াজুস সালাতিনের" মতে ইহা নসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা গিয়াসউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই গৌড়-দুর্গের উত্তরদিকের প্রধান প্রবেশদ্বার "দাখিল দরওয়াজার" আর এক নাম "সেলামী দরওয়াজা।" এই দরওয়াজা দুর্গের উত্তরদিকের মৃন্ময় প্রাকার ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান আছে; ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম গাত্রের সহিত সংলগ্ন দুর্গের মৃন্ময় প্রাকার ছাদের খিলান পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া আছে। এই দরওয়াজার সম্মুখভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু পশ্চাৎ বা দক্ষিণদিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে স্থানে স্থানে প্রস্তরের গাঁথনি আছে। এই দরওয়াজার মধ্যস্থ পথের দুই পার্শ্বের দেওয়ালের প্রান্তভাগে, কোণায়, উপরে, নীচে একটি করিয়া মোট চারিটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ বলয় বা অঙ্গুরীয়ের ন্যায় পদার্থ দেওয়ালের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে। এই বলয় বা অঙ্গুরীয় চারিটির মধ্যে দ্বারের উপরের ও নীচের লৌহ-নির্ম্মিত স্থূল আল প্রবিষ্ট থাকিয়া বর্ত্তমান কালের কব্জার কার্য্য করিত। উক্ত মধ্যস্থ পথের দুই পার্শ্বের দেওয়ালের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটি বৃহৎ গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে দরওয়াজা অর্গলবদ্ধ করিবার জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ কড়িকাঠ প্রবিষ্ট থাকিত এবং উহা হুড়কারূপে ব্যবহৃত হইত। দরওয়াজার বহির্দ্দেশে উহার ললাটে ও গাত্রে ইষ্টকের উপর নানা প্রকার কারুকার্য্য এবং কয়েকটি বৃহৎ গোলাপপুষ্প ক্ষোদিত আছে। দরওয়াজার চারি কোণায় মিনারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার অভ্যন্তরভাগ দেখিলে মনে হয়, যেন দুর্গ-প্রাকার ভেদ করিয়া একটি প্রশস্ত পথ বিদ্যমান; উহা ১ শত ১২ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রশস্ত। ইহার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি অপেক্ষাকৃত সরু পথ আছে। ইহাদিগের উপরের খিলান কলিকাতা হাইকোর্টের বারান্দার খিলানের ন্যায় দেখিতে এবং ত্রিতল সমান উচ্চ। দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রহরীদিগের থাকিবার প্রকোষ্ঠ সকল ছিল এবং তথায় প্রবেশ করিবার জন্য আজিও প্রত্যেক দিকে



য়টি করিয়া দ্বার আছে। আমরা দরওয়াজার পার্শ্বস্থ হাড়ের ন্যায় উচ্চ মৃন্ময় প্রাকারের শিখরদেশে উঠিয়া খিলাম যে, দরওয়াজার ছাদের খিলানের উপরিভাগ গামত করা হইয়াছে। প্রাকারের উপরের প্রাচীন গাছ-গতে অসংখ্য মর্কট রহিয়াছে। ইহাদিগের বদনমণ্ডল ও াদভাগ রক্তবর্ণের। আমাদিগকে দেখিয়া উহারা ক্ত হইয়া মুখভঙ্গী সহ লম্ফঝম্প ও চীৎকার করিতে গল, যেন বলিতে লাগিল,"আমাদের এ নির্জ্জন শান্তিময় লয়ে তোমরা কেন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছ?" ড়ের বনে কেবল মর্কট নহে, পরন্তু বন্যকুক্কুট ও ময়ূর তি শিকারীদিগের লোভনীয় অনেক প্রকারের পক্ষী ছ শুনিয়াছি। র‍্যাভেনশ অনুমান করিয়াছেন যে, য় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারবক শাহ কর্ত্তৃক দাখিল-য়াজা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু "রিয়াজুস-সালাদিনে" ও দহের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ০ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা এক্ষণে মেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

দাখিলদরওয়াজা হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে হইলে বন-ল ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এতদঞ্চলে কয়েকটি সোম্মুখ পুষ্করিণী আছে। বনজঙ্গল ভেদ করিয়া দুর্গের । দক্ষিণদিকে যাইলে প্রথমে চাঁদ-দরওয়াজা, তৎপরে -দরওয়াজা ও তৎপরে আর একটি দরওয়াজার বশেষ স্তূপ ও ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই য়াজাগুলি ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। ফ্রাঙ্ক-

চাঁদদরওয়াজাকে রাজপ্রাসাদের পশ্চিমদিকের শদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু র‍্যাভেনশ ার মানচিত্রে উহাকে তদ্রূপ অঙ্কিত করেন নাই। ১ খৃষ্টাব্দে ক্রেটন এই দ্বারের চিত্রাঙ্কন করিয়া ছেন।

এই কয়টি স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে সম্মুখে ময় বিশাল "বাইশগজী দেওয়াল" ও পরিখা-পরিবেষ্টিত ভ্যন্তরস্থ রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া য়। উহা ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। স্থান এক্ষণে ব্যাঘ্র ও বন্য শূকরের আবাসভূমি। এই প্রাসাদের অপর নাম "হাবেলি খাস।" ইহা ৭ শত গজ বেষ্টনীর বহির্ভাগে একটি জলপূর্ণ পরিখার বেষ্টনী ছিল, এখনও তাহার স্থানে স্থানে জল আছে।৹ ফ্রাঙ্কলিন এই প্রাসাদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :— (১) প্রথম অর্থাৎ উত্তরদিকের অংশে দরবার-গৃহ ছিল। র‍্যাভেনশ এই অংশ দুই ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছেন, উহার একাংশে একটি পুষ্করিণী ও অপর অংশে একটি স্তূপ ছিল। (২) উক্ত প্রথম অংশের দক্ষিণদিকের অংশে অর্থাৎ মধ্যের অংশে রাজপ্রাসাদ ছিল। র‍্যাভেনশ এই অংশে ধ্বংসস্তূপ ও পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন। (৩) সর্ব্ব-দক্ষিণদিকের অংশে অর্থাৎ প্রাসাদের শেষ অংশে হারেম বা রাজ-অন্তঃপুর ছিল। র‍্যাভেনশ এই স্থানে একটি প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো পুষ্করিণী ও ধ্বংসস্তূপ দেখিয়াছিলেন। জলাশয়টি আজিও আছে। কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, উহা টাঁকশালের পুষ্করিণী ছিল এবং উহার মধ্যে ধনরত্ন রক্ষিত হইত। রাজপ্রাসাদের এই সকল স্থান এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তথায় দিবাভাগে হিংস্রজন্তু মনের সুখে বিচরণ করে। পথ না থাকায় এবং সঙ্গে কোন আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় আমরা ২২ গজী প্রাচীর-বেষ্টিত এই প্রাসাদের দুর্গম স্থানগুলি দেখিতে পারি নাই। এই রাজ-প্রাসাদের বেষ্টন ২২ গজী প্রাচীর আজিও অর্দ্ধ-ভগ্ন অব-স্থায় বহু দূর পর্য্যন্ত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রাচীর দেখিতে হইলে দাখিল-দরওয়াজা দিয়া না গিয়া দুর্গের পূর্ব্ব-দিক দিয়া ঘুরিয়া কদম রসুলের নিকট দিয়া দেখিতে যাওয়াই সহজসাধ্য। ইহার বিষয় পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

উক্ত রাজপ্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্বদিকে, প্রাসাদের বাহিরে সপরিবার হুসেন শাহের কবর ছিল, উহাকে ফ্রাঙ্কলিন "বাদশা কি কবর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধা-রণ লোক ইহাকে "বাঙ্গালাকোট" কহে।* এই হুসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেব গৌড়ে আগমন করিয়া-ছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে—১৪০৬ শকাব্দে ফুল্লশ্রী গ্রামের বিজয়গুপ্ত "মনসা-মঙ্গল" রচনা করেন। সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবি পরমেশ্বর

---

* গেজেটিয়ারে লিখিত আছে যে, এই "বাঙ্গালাকোট" নামক স্থানে খাজাকিখানা ও টাঁকশাল দীঘির ১০০ গজ উত্তরপূর্ব্বদিকে

"মহাভারতের" আদি হইতে স্ত্রী-পর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। কুলীনগ্রামের কায়স্থকুলতিলক মালাধর বসু "ভাগবতের" ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ করিয়া ইঁহার নিকট হইতে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করেন এবং বিপ্রদাস নামক এক ব্রাহ্মণ "মনসামঙ্গল" রচনা করেন। হুসেন শাহ বাঙ্গালা ভাষার উৎসাহদাতা ছিলেন। যাহা হউক, এই "বাদশা-কি কবর" সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কলিন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই সমাধিবাটীর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর দরওয়াজা ছিল। সমাধিগৃহের দ্বারের সম্মুখ ও পার্শ্বদেশে শ্বেত ও নীলবর্ণের মিনা বা এনামেল করা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ছিল ও দ্বারের চারি কোণায় চারিটি বৃহৎ গোলাপফুল ক্ষোদিত ছিল। বৃক্ষ ও পুষ্পাদিক্ষোদিত ৪টি ছোট মিনার ইহার চারি কোণায় শোভা পাইত। শ্বেত ও নীলবর্ণের এনামেল করা ইষ্টকের একটি বড় বেষ্টনের মধ্যে হুসেন শাহ ও রাজবংশের কতিপয় ব্যক্তির কবর ছিল। ক্রেটন হুসেন শাহের সমাধিস্থানের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। র‍্যাভেনশর সময় এই মকবরা বা সমাধিবাটীর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। হুসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের সমাধি এক্ষণে কোথায় অবস্থিত আছে ও আছে কি না, তাহা স্থানীয় লোক বলিতে পারিল না। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী কালে ঔরঙ্গজীব বাদশাহের আদেশ অনুসারে নবাব মুজম খাঁ এই স্থানের রাজ-সমাধির উপরে প্রদীপ দিবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৫০ বিঘা ভূমির যে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে।

দাখিলা-দরওয়াজা দিয়া দুর্গের বাহিরে অর্থাৎ উত্তরদিকে আসিয়া আমরা গৌড়-দুর্গের উত্তরদিক বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হইলাম। দুর্গদ্বার হইতে প্রায় ১ মাইল পথ হাঁটিয়া "ফিরোজ মিনার" বা ফিরোজ শা মিনারের পার্শ্বদেশে উপনীত হইলাম। স্থানটি নির্জ্জন ও বনাকীর্ণ, পূর্ব্বদিকে একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। ইহা দেখিতে [illegible] কলিকাতার অক্টরলনি মনুমেণ্টের মত। ইহা একতলা সমান উচ্চ মাটীর ঢিপির উপর অবস্থিত। মিনারটি ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার নিম্নভাগে প্রস্তরের গাঁথনি ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্কলিন ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইহার নিম্নভাগ প্রস্তরমণ্ডিত দেখিয়াছিলেন। দক্ষিণদিকে ইহার প্রবেশদ্বার। সমতল ভূমি হইতে ইহার পাদদেশে উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। ইহার দ্বারের চৌকাঠ নীলাভ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দ্বারের সম্মুখে প্রস্তরে ক্ষোদিত তিনটি বৃহৎ গোলাপফুল আছে, র‍্যাভেনশ ইহার দ্বারে কোন হিন্দুমন্দির হইতে সংগৃহীত কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর দেখিয়াছিলেন। এই মিনার ৮ ফুট উচ্চ। ইহার পাদদেশের ব্যাস ৩০ ফুট। ইহার উর্দ্ধদেশের এক-তৃতীয়াংশের গাত্র গোলাকার এবং নীচের দিকের বাকী অংশের গাত্র দ্বাদশটি কোণবিশিষ্ট। প্রাচীনকালে ইহার শিখরদেশে যে একটি গুম্বজের ন্যায় আচ্ছাদন ছিল, তাহা ক্রেটনের চিত্রে দেখা যায়। বর্ত্তমানে ইহার শিখরদেশে খিলান-করা ছাদের ন্যায় আচ্ছাদন দেখিলাম। মিনারের উপরে উঠিবার জন্য ভিতর দিয়া কলিকাতার মনুমেণ্টের ঘোরাল (Spiral) সিঁড়ির ন্যায় সিঁড়ি আছে। আমরা সিঁড়ি গণিতে পারি নাই, কিন্তু কাহার মতে ৭৩টি সিঁড়ি আছে, কেহ বলেন, ৬৭টি সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেওয়ালের স্থানে স্থানে জানালা থাকায় মিনারের মধ্যে যথেষ্ট বায়ু ও



[illegible] সমাধি-গৃহ



কা‌দম-রসুলের এক গুম্বজবিশিষ্ট মসজেদ

লোক প্রবেশ করে। উপরের প্রকোষ্ঠের মধ্যে দেওয়া-র গাত্রে বহু পর্য্যটক আপনার নামধাম লিখিয়া বা ছুরী য়া ক্ষুদিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে মুসলমানগণ ফিরোজশা মিনার" এবং কোন কোন হিন্দু 'ত্রিশূল মন্দির' হইয়া থাকে। ষ্টুয়ার্টএর মতে ২য় ফিরোজ শাহ ৩ হিজিরার (১৪৮৮ খৃষ্টাব্দের) নিকটবর্ত্তী কোন য় ইহা নির্ম্মাণ করেন। কেহ বলেন যে, আলাউদ্দীন সন শাহ আসামদেশ জয় করিয়া উহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্তু নির্ম্মাণ করেন। ফার্গুসন অনুমান করেন যে, ইহা ১০২ হইতে ১৩১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। মুসল-নদিগের অনেকে বলিয়া থাকে যে, পীর আশা নামক নক ফকীর ইহার উপরে বাস করিত। ঐ ব্যক্তির নাম নুসারে ইহার নাম পীরোজ শা বা ফিরোজ শা হইয়াছে। ভেনশ লিখিয়াছেন যে, ইহার উপরে দাঁড়াইয়া মুসল-নদিগকে উপাসনার্থ আহ্বান করিবার জন্য উহা নির্ম্মিত । স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির নিকট শুনা যায় যে, এই নারের উপরে ও পুরাতন মালদহের অপর পারে স্থিত মাসরাইয়ের মিনারের উপরে রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালিয়া ক্ত দ্বারা গৌড়, নিমাসরাই, মালদহ ও পাণ্ডুয়ার ধ্য সংবাদের আদান-প্রদান হইত। এই মিনার গবর্ণ-ন্টের পূর্ত্তবিভাগ দ্বারা সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। মিনারের উপরে উঠিলে গৌড়ের বহু দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—শুধু বন ও স্থানে স্থানে প্রান্তর বা জলা দেখিলাম, এক ব্যক্তি দুর্গের প্রাকারের উপরে কুঠার দ্বারা একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে। এই জনমানবহীন স্থানে লোকটিকে দেখিয়া একটা আরাম অনুভব করিলাম।

ফিরোজ-শা মিনার হইতে অর্দ্ধ-মাইল দক্ষিণদিকে যাইলে দুর্গের প্রাকার ভেদ করিয়া নির্ম্মিত একটি পথ দিয়া দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব খোজের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানে "কদম-রসুল" মসজেদ আছে। পূর্ব্বমুখী হইয়া 'কদম রসুলের' বাটীতে প্রবেশ করিতে (১) বামদিকে একটি ছাদবিহীন গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি মকবরা বা সমাধিস্থান। ইহার সম্মুখের দেওয়াল সম্পূর্ণ আছে, অন্য তিন দিকের দেওয়ালের কতকাংশ পড়িয়া গিয়াছে। এই ভগ্ন গৃহটি কদমরসুল মসজেদের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন। এই গৃহের মধ্যস্থলে কয়েকটি ছোট বড় ইষ্টক-নির্ম্মিত কবর আছে। একটি কবরের উপরের আচ্ছাদন বাঙ্গালা ঘরের দোচালার আকৃতিবিশিষ্ট। অনেকে অনুমান করেন যে, এই কবরগুলি হুসেন শাহের সময়ের। কদম রসুলের প্রাচীর-বেষ্টিত বাটীতে প্রবেশ করিলে সম্মুখে ইষ্টক দিয়া বাঁধান উন্মুক্ত উঠান দেখিতে পাওয়া যায়। (২) এই উঠানের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে উন্মুক্ত আকাশতলে ২।৩টি ইষ্টকনির্ম্মিত কবর আছে। উঠানের পূর্ব্বদিকে (৩) একটি অনুচ্চ দোচালা বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি-বিশিষ্ট পাকা গৃহ আছে। গৃহের পশ্চিমদিকে একটিমাত্র দ্বার আছে। গৃহমধ্যে ফতিহার খাঁ বা ফতে খাঁর কবর আছে। এই ব্যক্তি ঔরঙ্গজীব বাদশাহের সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্র। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ফকির শাহ নিয়মাতুল্লা ওয়ালি ঔরঙ্গজীবের ভ্রাতা শা সুজাকে বিদ্রোহী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন, ঔরঙ্গজীবের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হয়। এ কারণ বাদশাহ উক্ত ফকিরের

শিরশ্ছেদের জন্য সেনাপতি দিলীর খাঁকে হুকুম দেন। এই অনুমতি পাইবার পরে দিলীর গৌড়ে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার পুত্র ফতিহার খাঁর হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক ঘটনার পরে দিলীর উক্ত ফকিরের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কদমরসুলের বাটীর পূর্ব্বোক্ত উঠানের উত্তরদিকে একগুম্বজ বিশিষ্ট কদমরসুলের চতুষ্কোণ মসজেদ আছে। এই গৃহ বা মসজেদ অনুমান ১৬ ফুট উচ্চ, ইহার প্রত্যেক পার্শ্বের মাপ অনুমান ৩৫ ফুট। ইহার উপরে চারি কোণে চারিটি মুগুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কাল পাতরের ছোট মিনার আছে। ছাদের মধ্যস্থলে একটিমাত্র বৃহৎ গুম্বজ আছে, কিন্তু গুম্বজের উপরিভাগে কোন চূড়া বা কলস নাই। এ অঞ্চলে পাঠান আমলের কোন গুম্বজের উপরে চূড়া নাই। বঙ্গবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্য গৌড়ের অনুকরণে যশোহরে (ঈশ্বরীপুরে) ও পরবাজপুরে যে দুইটি বৃহৎ মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহাদিগের গুম্বজ ও ভিতরের পিলান গৌড়ের পাঠান আমলের মসজেদের ন্যায়, গাথনির মসলাও তদ্রূপ, অর্থাৎ কোন ইমারতের গাঁথনির মসলা অতি মিহি সুরকী ও ঝিনুকের চূণ, এবং অপর কোনটির মসলা বালি ও চূণ-মিশ্রিত সিমেণ্টের ন্যায় পদার্থ। উভয় স্থানের গাথনি আজিও বজ্রের ন্যায় মজবুত আছে। মুসলমান রাজাদিগের গৌড়ে ও পাণ্ডুয়ায় এবং হিন্দুরাজা প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরীপুরে ও পরবাজপুরে যে সকল মসজেদ আছে, তদুপরি গুম্বজের চূড়া না থাকায় ইমারতগুলি সুশ্রী হয় নাই। কদমরসুলের ছাদ হইতে বৃষ্টির জল পড়িবার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত নালা আছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বারান্দাবেষ্টিত একটি গর্ভ বা প্রকোষ্ঠ আছে; উহার উপরে উক্ত গুম্বজটি দেখা যায়। উক্ত গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে মধ্যস্থলে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী বিদ্যমান। উহা দেখিলে কবর বলিয়া ভ্রম হয়। এই বেদীর উপরে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি ছোট চৌবাচ্চার ন্যায় আছে; উহার মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র বেদী আছে। এই বেদীর উপরে কৃষ্ণবর্ণের মসৃণ কষ্টি-প্রস্তর-নির্ম্মিত একজোড়া পদচিহ্ন দ্রষ্টব্য। রাজগৃহের বৈভার গিরির শিখরদেশস্থ জৈন মন্দিরে যেরূপ পদচিহ্ন দেখিয়াছি, ইহা সেরূপ নহে। প্রস্তর-নির্ম্মিত পদচিহ্ন বা পাদপদ্মের মাপ অনুমান—১১ ইঞ্চ দীর্ঘ × ৫½ ইঞ্চ প্রশস্ত × ৪½ ইঞ্চ স্থূল। ইহাই কদমরসুল বা মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া মুসলমানদিগের দ্বারা পূজিত, হিন্দুরাও ইহাকে গৌরাঙ্গের পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। এখানে মূর্ত্তিপূজা না হইলেও তাহার অনুরূপ পদচিহ্ন-পূজা চলিয়াছে। গর্ভগৃহের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে একটি করিয়া দ্বার আছে, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট তাহাতে তারের জাল দেওয়া কবাট বসাইয়াছেন। এই গর্ভগৃহের তিন দিকে যে বারান্দা আছে, উহার ছাদ পিলান-করা। উত্তর ও দক্ষিণদিকের বারান্দার বহির্দ্দেশে একটি করিয়া খিলান-করা ছোট দ্বার আছে। পূর্ব্বদিকের বহির্গাত্রে প্রস্তর-নির্ম্মিত খিলান-করা তিনটি বড় দ্বার দেখা যায়। পূর্ব্বদিকই এই মসজেদের সম্মুখদেশ। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রে ইষ্টকের উপর নানাবিধ সুন্দর নক্সা ও কারু-কার্য্য ক্ষোদিত আছে এবং মধ্যের দ্বারের ললাটে একটি কষ্টিপাতরের স্মৃতিফলকে লিখিত আছে যে, এই মসজেদ নসরৎ শাহ ৯৩৭ হিজিরায় (১৫৫০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন। র‍্যাভেনশ লিখিয়াছেন যে, হুসেন শাহ উক্ত পদচিহ্ন-অঙ্কিত প্রস্তর মদিনা হইতে আনয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, উহা পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার বড় দরগায় শাহ জালালউদ্দীন তাব্রেজীর চিল্লাখানায় ছিল, তথা হইতে হুসেন শাহ ইহাকে গৌড়ে আনয়ন করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা উহা মুর্শিদাবাদে লইয়া যান, পরে মীরজাফর উহা গৌড়ে ফেরত পাঠাইয়া দেন।* এক্ষণে ইহা স্থানীয় জনৈক খাদিমের তত্ত্বাবধানে আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

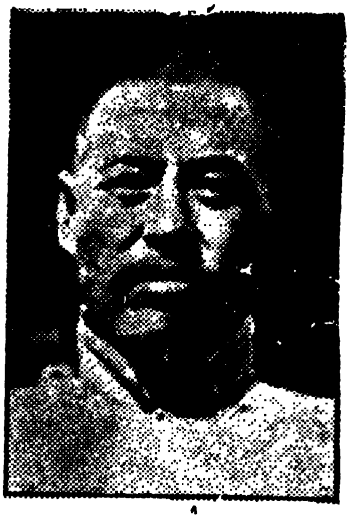
* ওয়ালসের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ গৌড় হইতে মালমসলা আনাইয়া মুর্শিদাবাদে কোন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং গৌড় হইতেই কদমরসুল আনীত হয়। উক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত পদচিহ্ন বাসন্ত আলি খাঁ নামক কোন ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের কদমরসুল মসজেদে রক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদে আজিও উক্ত মসজেদ আছে।



মহাচীনে স্বাধীনতার অন্তরায়

সকল পরাধীন জাতি মুক্তি-কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে, খা যায়, প্রায় তাহাদের মুক্তির সময়ে প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হয়। ই অন্তরায় যে বহিঃশত্রুর উপস্থিতি ও বাধাপ্রদান, তাহা নহে, রর শত্রুতাই এ পথে প্রবলতম অন্তরায়। আয়ার্লাণ্ডের সিন-নের মুক্তিসমরে আল-রের বাধা যত প্রবল ইয়াছিল, বিরাট টশ শক্তিও তত প্রবল ইতে পারে নাই। রতে হিন্দু-মুসলমান রোধ অথবা স্পৃশ্য ও স্পৃশ্য হিন্দুর মধ্যে বিরোধ রতের মুক্তিসমরে যেরূপ বল অন্তরায় হইয়া ড়াইয়াছে, সার্ব্বভৌম রাজ ব্যুরোক্রেশীর াধাপ্রদান তাহার সহিত লনায় সামান্ত বলিলেও ত্যুক্তি হয় না। মিশরে াদলি পাশার মন্ত্রি-ভাগঠন জগলুলের মুক্তি-রের যতটা অন্তরায় ইয়াছিল, জেনারল লেনবির সর্ব্বময় কর্তৃত্বগ্রহণ তত প্রবল অন্ত-র বলিয়া মনে হয় নাই।


জেনারল চাঙ্গ-সো-লিন


জেনারল উপেইফু

মহাচীনেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতি-ম হয় নাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে খাইয়াছি যে, দক্ষিণ-চীনে ডাক্তার সান-য়াট-সেনের প্রবর্ত্তিত সাধারণতন্ত্র গভর্ণ-ন্ট প্রকৃত জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নের মুক্তি-সমরে আত্ম-নিবেদন করিয়াছে। াজ সান-ইয়াট-সেন নাই, কিন্তু তাঁহারই ব্যানুশিষ্যয় তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত ইয়া চীনের বন্ধন-মোচনে বদ্ধপরিকর হই-াছে। কিন্তু সে পথেও বাধা উপস্থিত হই-াছে। প্রথম বাধা,—য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ। াহারা নিজ নিজ স্বার্থসংরক্ষণ জন্য দক্ষিণ-ীনের এই জাগরণের সাড়াকে বলশেভিক াভিপ্রেত বলিয়া অভিহিত করিতেছেন এবং াহাদের প্রত্যেক মুক্তির চেষ্টায় বাধাপ্রদান



অন্তরায় উত্তর ও মধ্য-চীনের War-lords বা সামরিক নিয়ামক জেনারল চাঙ্গসোলিন ও উপেইফুর সমবেত চেষ্টা।

এই চাঙ্গ ও উপেইফু পূর্ব্বে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। চাঙ্গ মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছিলেন, জাপান তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। কিন্তু চাঙ্গ তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। জাপের পরামর্শেই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, তিনি মধ্য-চীনের (পিকিংয়ের) কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, চীনের যে অংশেই যিনি কর্তৃত্ব করুন, মধ্য-চীনে অর্থাৎ রাজধানী পিকিংয়ে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ "চীন গভর্ণমেণ্ট" বলিয়া মানিয়া থাকেন। এ জন্য পিকিং-য়ের গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু উপেইফু সেখানে তাঁহাকে দন্তস্ফুট করিতে দেন নাই। পিকিংয়ের কর্তৃত্ব লইয়া চাঙ্গ ও উপেইফুর মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছিল। উপেইফুর দক্ষিণ হস্ত খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গের উপর পিকিং রক্ষার ভারার্পণ করিয়া উপেইফু মাঞ্চুরিয়ার দিকে চাঙ্গের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে গেলেন। সেই অবসরে ফেঙ্গ মধ্য-চীন দখল করিয়া বসিলেন এবং আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, চাঙ্গ ও উ উভয়েই স্বার্থপর, চীনের যথার্থ মঙ্গল তাঁহারা চিন্তা করেন না, কেবল নিজ নিজ কোলে ঝোল টানিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ দিকে উ উত্তরে শত্রু চাঙ্গের প্রচণ্ড বাধা এবং দক্ষিণে সহকারী ফেঙ্গের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া এক সময়ে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর তিনি পরে আবার শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং ফেঙ্গের উপর প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে চিরশত্রু চাঙ্গের সহিত মিলিত হয়েন। বস্তু

নিকট পরাজিত হইয়া মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গায় পলায়ন করেন এবং তথা হইতে মস্কো সহরে গিয়া রুসিয়ার বলশেভিকদিগের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। বর্ত্তমানে তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমানায় চাঙ্গ ও উর প্রধান শত্রুরূপে অবস্থান করিতেছেন।

যে সময়ে ফেঙ্গ তাঁহার দলপতি উর বিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, সে সময়ে এক ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করেন,—কি নিমিত্ত তিনি চীনে গৃহবিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। উহাতে তিনি এই কয়টি কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন :—

(১) তিনি ও তাঁহার 'কুওমিনচুন' দল চীনের মুক্তিকামী, চীনের মুক্তিসাধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য, কোনরূপ স্বার্থসাধন করা তাঁহার অভিসন্ধি নহে।

(২) চাঙ্গ-সো-লিন চীনের স্বাধীনতার শত্রু; উপেইফু স্বার্থান্বেষী। প্রথমোক্ত War lord জাপানের ক্রীড়নক, জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মাঞ্চুরিয়ার আপন উদ্দেশ্যসাধন করিতেছেন, জাপানের পরামর্শে মাঞ্চুরিয়ার রেল সম্পর্কে রুসিয়ার সহিত বিবাদ বাধাইতেছেন; উপেইফু দেশ স্বাধীন করিবার অছিলায় সমস্ত কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং পরে চীনে Dictator বা সর্ব্বেসর্ব্বার নিয়ামক হইবার দুরভিসন্ধি পোষণ করিতেছেন।

(৩) এই হেতু তিনি (ফেঙ্গ) এই দুই জনের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। যাহাতে এই দুই জন স্বার্থান্বেষীর হস্ত হইতে তিনি তাঁহার আরাধ্য জন্মভূমিকে মুক্ত করিয়া চীনের স্বাধীনতা-সমরে জয়লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য সকল দেশভক্ত চীন তাঁহার সহায়তা করুন।

এই ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে উত্তর-চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কতক আভাস পাওয়া যায়। তবে এ কথা ঠিক যে, চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও চীন War lord এর স্বপক্ষের কথা একবারে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু দক্ষিণ-চীনের কুওমিনটাঙ্গ দলের সহিত উপেইফুর সংঘর্ষের যে পরিচয় আমরা ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছি, তাহা হইতে জানা যায়, উপেইফু কি প্রকৃতির লোক। ডাক্তার সানের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কুওমিনটাঙ্গ দলের উচ্ছেদসাধনে তিনি যেরূপে বৈদেশিক শক্তি-সমূহের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারা যায়। মুক্তিকামী কুওমিনটাঙ্গের তিনি যে প্রবল অন্তরায়, তাহা ইয়াংসি নদীর তটস্থ ভূখণ্ডের নানা যুদ্ধে জানা যায়। তাঁহার বর্ত্তমান মিত্র চাঙ্গ-সো-লিন কিরূপ প্রকৃতির লোক, এইবার তাহার একটু পরিচয় দিব।

রুসিয়ান জারের আমলে পিকিং সহর হইতে মস্কো পর্য্যন্ত যে stratagic রেল-লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই রেলের স্বত্ব-স্বামিত্ব উপলক্ষে বর্ত্তমানে জেনারল চাঙ্গ-সো-লিনের সহিত রুসিয়ার মস্কো গভর্ণমেন্টের বিষম বিবাদ বাধিয়াছে। এই বিবাদের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে চাঙ্গের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মার্শাল চাঙ্গ উত্তর-চীন ও মাঞ্চুরিয়ার শক্তিশালী সেনাপতি। তাঁহার রক্ষিত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ জাপানের কোরিয়া ও লাইওইয়াঙ্গ রাজ্য ও রুসিয়ার সাইবিরিয়ার মধ্যে Buffer state বলিয়া পরিগণিত। ঠিক এই ভাবেই আফগানিস্থান রুসিয়ান মধ্য-এসিয়া ও বৃটিশ ভারতের মধ্যে Buffer state. এই হেতু তাঁহাকে নিজের দলে টানিবার জন্য জাপান ও রুসের উভয়েরই সমান আগ্রহ থাকিবার কথা। জার-শাসিত রুসিয়ান রাজ্য পতনের পর বলশেভিক বিপ্লবের গোলযোগকালে জাপান মার্শাল চাঙকে নানা উপায়ে আপন পক্ষভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। এই সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিক দাবাখেলায় জাপান চাঙ্গকে হস্তগত করিয়া রুসিয়াকে চাল মাৎ করিয়া দিয়াছিল। ফলে হঠাৎ চাঙ্গ মস্কো সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের শাসনকালে ইষ্টার্ণ চাইনিজ যে, অতঃপর তাঁহাদিগকে ঐ রেলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং তৎসংক্রান্ত কতকগুলি সম্পত্তি তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। রুসিয়ান পক্ষ বলেন, জারের গভর্ণমেণ্ট বহুপূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার এই রেল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এক রুস-চীন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে স্থির হয় যে,—

(১) এই রেল-লাইনের তত্ত্বাবধান করিবেন এক মিলিত রুস-চীন কর্ত্তৃপক্ষ (Directorate),

(২) ইহার রুস কর্ম্মচারীরা মাঞ্চুরিয়ার স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার উপভোগ করিতে পারিবেন।

সুতরাং রুস কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, চাঙ্গের এই দাবী ন্যায্য নহে, আইনসঙ্গতও নহে। সোভিয়েটের বৈদেশিক মন্ত্রী মুসিয়ে চিচেরিণ এই হেতু পিকিংএর সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে এ সম্বন্ধে চাঙ্গকে বুঝাইয়া বলেন এবং তাঁহাকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু তবী ভুলিবার নহে। চাঙ্গ পিকিং কর্ত্তৃপক্ষকে ভয় করিবার পাত্র নহেন; তিনি তাঁহাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে সুঙ্গারী নদীতে রুসিয়ার জাহাজগুলি ধৃত করিলেন, মাঞ্চুরিয়ার রেলের বিস্তর রুসিয়ান কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন, হার্বিণ সহরের অনেকগুলি রুসিয়ান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেন এবং হার্বিণের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বহু রুসিয়ান অর্থ আত্মসাৎ করিলেন। এতদ্ব্যতীত চাঙ্গ বহু রুসিয়ানকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। এ সম্বন্ধে সোভিয়েট রুসিয়ান কর্ত্তৃপক্ষ বহু প্রতিবাদ করিয়াও কোনও ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। চাঙ্গ এখনও পর্য্যন্ত রুসিয়ান অর্থ প্রত্যর্পণ করেন নাই, অথবা রুসিয়ান বিদ্যালয় খুলিতে দেন নাই; পরন্তু তিনি যে সকল রুসিয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন বা কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থারও কোনও প্রতীকার করেন নাই।

এখন রুসিয়ান পক্ষ বলিতেছেন, চাঙ্গ যদি জাপানের ইঙ্গিতে চালিত না হইবেন, তাহা হইলে হঠাৎ রুসিয়ার শত্রুতা করিবেন কেন,—রুসিয়ান-চীন সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিবেন কেন? কেবল ইহাই নহে, রুসিয়ান পক্ষ ইহার ভিতরে আরও গভীর রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—

"চাঙ্গ যদি যথার্থ দেশপ্রেমিকরূপে তাঁহার দেশকে বৈদেশিক প্রভাবশূন্য করিবার উদ্দেশে এরূপ করিতেন, তাহা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু যথার্থ কথা তাহা ত নহে। তাঁহার পশ্চাতে এক জন বৈদেশিক বসিয়া কল টিপিতেছে, আর তিনি নড়িতেছেন চড়িতেছেন। তিনি দেশপ্রেমিক হইলে পিকিং গভর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বৈদেশিকের অন্যায় প্রভুত্ব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু চাঙ্গ পিকিংকে 'থোড়াই কেয়ার' করেন। তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বৃটেনের বৈদেশিক মন্ত্রী সার অষ্টেন চেম্বার্লেন কল টিপিতেছেন।

"সার অষ্টেনের বৈদেশিক রাজনীতির মূলমন্ত্র হইতেছে, রুসিয়ান সোভিয়েটকে একঘরে (isolation) করা। কি প্রতীচ্যে, কি প্রাচ্যে, সর্ব্বত্রই তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। প্রতীচ্যে বাল্টিক সাগরোপকূলের রাজ্যসমূহে তিনি রুসিয়ার বিপক্ষে এই ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন, আবার প্রাচ্যে তিনি পারস্য, তুর্কী, আফগানিস্থান ও চীনে রুসিয়ার বিপক্ষে সেই একই ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন। চীনে তাঁহার ষড়যন্ত্রের দুইটা দিক আছে;—

(১) কাণ্টনের দক্ষিণ চীন গভর্ণমেণ্টের (কুওমিনটাঙ্গের) জাতীয় অভ্যুত্থানের উচ্ছেদসাধন করা,

(২) চীনে রুসিয়ান সোভিয়েট প্রভাব ধ্বংস করা।

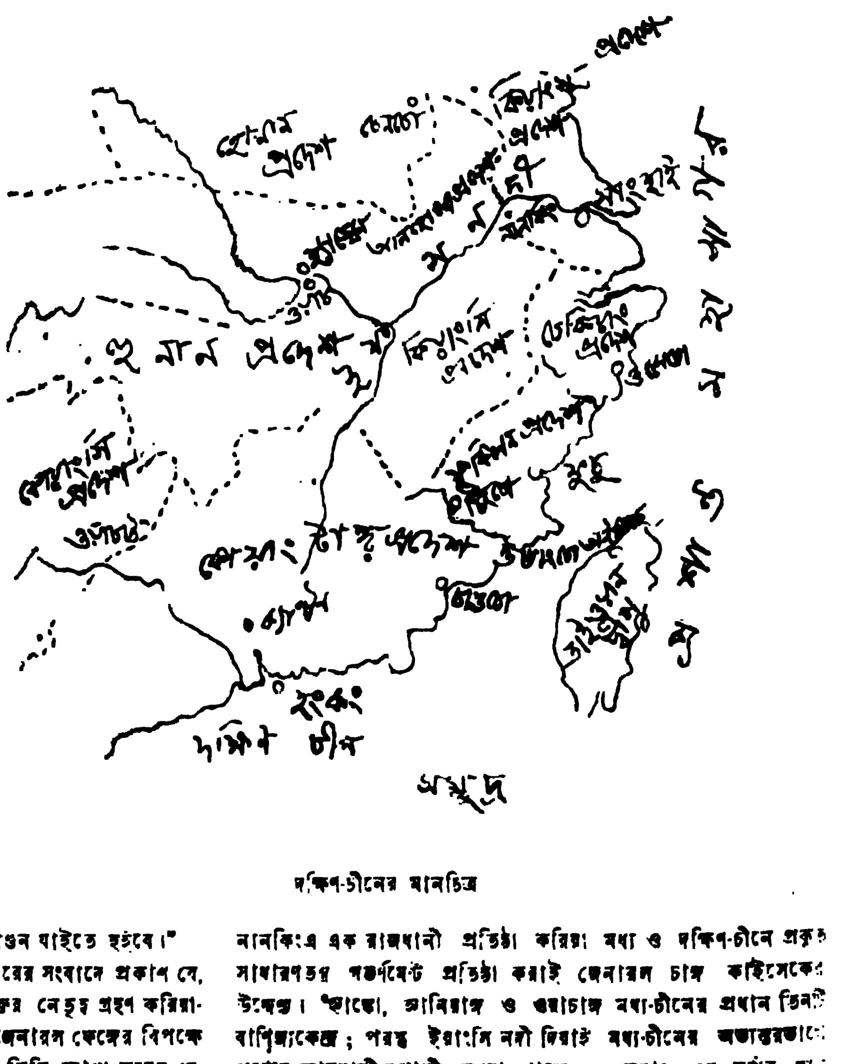
"সার অষ্টেন চেম্বার্লেন চীনের বর্ত্তমান স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী

করিয়া লইতেছেন। তিনি যাহাতে চীনে এইরূপ জাতীয়তাধ্বংসী কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সর্বেসর্বা হইয়া উঠে, তাহার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সার অষ্টেন তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্ম চীনের সহিত সোভিয়েট রুসিয়ার সকল সম্বন্ধ ঘুচাইবার যোগাড়-যন্ত্র করিতেছেন। এই সম্বন্ধ ঘুচাইতে মাঞ্চুরিয়ার রেলকে উপলক্ষ করিয়া গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করার প্রয়োজন। তাই আজ চাঙ্গকে উপলক্ষ করিয়া সার অষ্টেন রুসিয়ার অঙ্গে সেই অস্ত্রাঘাতের ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছেন। আজ যদি ইংরাজ রুসিয়ান সোভিয়েটকে চাইনিজ ইষ্টারণ রেলওয়ে হইতে বিতাড়িত করিতে ও মুকডেন সহরকে চীন ও রুসিয়ার মধ্যে Buffer city রূপে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে সুদূর প্রাচ্যে রুসিয়ার প্রভাব একেবারে ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু দক্ষিণ-চীনের মুক্তিকামী জাতীয় কুওমিনটাঙ্গেরও আশা-ভরসা চিরতরে অবসান করিয়া দিবার পরম সুযোগ উপস্থিত হয়। এই হেতু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উপেইফু ও চাঙ্গসোলিনের পক্ষপাতিতা করিতেছেন।" ইহাই মস্কো সহরের সোভিয়েট সংবাদপত্র "ইসভারেসটিয়ার" অভিমত।

এই পত্র আরও লিখিয়াছেন,—"বৃটিশ সেনাপতি জেনারল সেটন বর্ত্তমানে মার্শাল চাঙ্গসোলিনের পরামর্শদাতা হইয়াছেন। তিনি কোন এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, 'চীনে একতা এবং শান্তি আনয়ন করিতে একমাত্র মার্শাল চাঙ্গই উপযুক্ত লোক।' সুতরাং বুঝিতে হইবে, মার্শাল চাঙ্গের রুসিয়ান বিদ্বেষের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে লণ্ডন যাইতে হইবে।"

লণ্ডনের ২১শে নভেম্বরের রয়টারের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, চাঙ্গ চীনের যাবতীয় বলশেভিক-বিরোধী শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কাণ্টনের জাতীয় দলের এবং জেনারল ফেঙ্গের বিপক্ষে বিরাট অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। তিনি আশা করেন যে, এই দুই বলশেভিক মন্ত্রে দীক্ষিত দলকে পরাজিত করিয়া চীনে এমন এক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবেন, যে গভর্ণমেণ্ট চীনে এক জাতীয় শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে এবং বৈদেশিকদিগের সহিত সখ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে। এ জন্ম তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন।

কিন্তু কাণ্টনের কুওমিনটাঙ্গ দলও নিশ্চিন্ত নাই। মার্কিণ পত্রে প্রকাশ, গত দুই মাসে চীনে যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, কাণ্টনের জেনারল চাঙ্গ কাইসেক দ্রুতগতি উত্তর-চীনে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার সেনা হুনান প্রদেশ দিয়া ইয়াংসি সাংহাই বন্দরের দিকেও অগ্রসর হইতেছে। ১০ই অক্টোবর তাঁহার আক্রমণে ওয়াচাঙ্গ সহরের পতন হইয়াছে। তাহার পর সাংহাইয়ের পালা। ইয়াংসি নদীর উপত্যকা ও সাংহাই তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি মধ্য-চীনের অধিকাংশ স্থলের প্রভুত্ব হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন। তাহা হইলে দক্ষিণ ও মধ্য-চীন চীনের জাতীয় দলের দ্বারা অধিকৃত হইবে। নিউইয়র্কের "হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্র বলিতেছেন, আপাততঃ পিকিংয়ের দিকে নজর ছাড়িয়া দিয়া ওয়াচাং বা



দক্ষিণ-চীনের মানচিত্র

নানকিংএ এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া মধ্য ও দক্ষিণ-চীনে প্রকৃত সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করাই জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের উদ্দেশ্য। হ্যাঙ্কো, হ্যানিয়াঙ্গ ও ওয়াচাঙ্গ মধ্য-চীনের প্রধান তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্র; পরন্তু ইয়াংসি নদী দিয়াই মধ্য-চীনের অভ্যন্তরভাগে পণ্যের আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল স্থান চাঙ্গ কাইসেকের হস্তগত হওয়ায় চীনের বাণিজ্য একরূপ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে। ইয়াংসির তটস্থ এক নানকিং সহর ব্যতীত অন্য সকল বাণিজ্যকেন্দ্র যখন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তখন তাঁহাকেই এখন মধ্য ও দক্ষিণ-চীনের সর্ব্বময় কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এ দিকে জেনারল উপেইফু যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে হটিয়া যাইতেছেন। তিনি যেন demoralised হইয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহার উপরেই রাজধানী পিকিনের রক্ষার ভার!

করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার অধীনস্থ সানটাঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে সসৈন্যে মধ্য-চীনে উপেইফুকে সাহায্য করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর-চীন হইতে অধিক সৈন্যও মধ্য-চীনে প্রেরণ করা বিপজ্জনক, কারণ, মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মার্শাল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ সসৈন্যে প্রস্তুত থাকিয়া অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে না হউক, কায়মনে দক্ষিণ-চীনের কাণ্টন-সেনার শুভাকাঙ্ক্ষী। কার্য্যক্ষেত্রেও তিনি জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের সহিত যোগদান করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন।

মাঞ্চুরিয়ার চাঙ্গসোলিন, উহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ, মধ্য-চীনে উপেইফু; সাংহাই ও নানকিংএ জেনারল সান এবং দক্ষিণ-চীনে চাঙ্গ কাইসেক এই কয় শক্তি এখন পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে চাঙ্গ-সোলিন ও উপেইফু পূর্ব্ব-শত্রুতা ভুলিয়া "ভাই ভাই" সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেঙ্গের উপর প্রতিশোধ লইতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন। ফেঙ্গ কিছুকাল অদৃশ্য হইলেন। তখন তাঁহারা ভাবিলেন,—আর কি, এইবার লঙ্কা ভাগ করা যাউক! তাঁহারা তাঁহার পিকিং অধিকার করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া জগতের অন্যান্য শক্তিকে জানাইলেন যে, তাঁহারাই এখন চীনের কর্ত্তা, এখন বৈদেশিকরা তাঁহাদের সহিত সন্ধিসর্ত্ত করুন। অমনই কোথা হইতে "বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!" বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দক্ষিণ-চীনের কাণ্টন হইতে চাঙ্গ কাইসেক তাঁহাদের উপর আপতিত হইলেন, তাঁহাদের আকাশে দুর্গ-নির্ম্মাণের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

এ হেন চাঙ্গ কাইসেক যে সে লোক নহেন। তিনি দেশ-প্রেমিক ডাক্তার সান-ইয়াট সেনের মন্ত্রশিষ্য। ডাক্তার সানকে কেহ কেহ Dreamer আখ্যা দিয়াছেন, তিনি না কি চীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন! কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এইরূপ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ-কারীরাই বহু দেশে স্বদেশের মুক্তিসাধন করিয়াছেন। ম্যাটসিনি, কাভুর, রবার্ট এমেট, দাঁতো সকলেই স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেন। ডাক্তার সান মরণান্তকাল পর্য্যন্ত পিকিংয়ের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে সম্মত হয়েন নাই। কেন না, তিনি জানিতেন, পিকিং বা উত্তর-চীনের কর্ত্তারা দেশের মুক্তির জন্য চেষ্টিত নহেন, তাঁহারা বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জের মন যোগাইয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনেই তৎপর। এই হেতু তিনি দক্ষিণ-চীনকে উত্তর-চীন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া তথায় যথার্থ সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যের ভিত্তি-পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্রশিষ্যরা তাহার উপর তাহার সৌধ গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাব-ধারা ক্যাণ্টনে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

জেনারল চাঙ্গ কাইসেক আজ এক বৎসর যাবৎ কাণ্টনে ও দক্ষিণ-চীনে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। অবশ্য ডাক্তার সানের মৃত্যুর পর হইতে তিনি আরও দুই জন সান-শিষ্যের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তার সানের অতি নিকট-আত্মীয় (Brother-in-law) টি, ভি, সুঙ্গ এবং রাসিয়ান রাজনীতিক মুসিয়ে বোরোডিন এ যাবৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ-চীনে সানের মুক্তি-মন্ত্রের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। সুঙ্গ পূর্ব্বে মার্কিণের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং পরে দেশে ফিরিয়া ইণ্টারন্যাশানাল ব্যাঙ্কিং করপোরেশানে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার সানের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বোরোডিন এক উচ্চাঙ্গের Propagandist বা প্রচারক, তাঁহার প্রচারের ফলে দক্ষিণ-চীনে সানের মুক্তিমন্ত্র জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। চাঙ্গ কাইসেক শক্তি-শালী কৌশলী সেনানী, তিনি রাসিয়ার বড় বড় সেনাপতির নিকট একটি স্থায়ী নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চাঙ্গ রণ-কৌশলী, সুঙ্গ অর্থনীতিবিশারদ এবং বোরোডিন প্রচারক। সুতরাং এই তিন জনের সমবেত চেষ্টায় দক্ষিণ-চীনে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সহজে ভিত্তিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার উপর সানের নামের গুণ আছে। আমাদের দেশের মুক্তিসমরে এক সময়ে যেমন মহাত্মা গন্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে বিসর্পিত হইয়াছিল এবং এখনও যে প্রভাব অল্প-বিস্তর জনসাধারণের মধ্যে বিসর্পিত আছে, তেমনই চীনে ডাক্তার সানের নামের প্রভাব বিসর্পিত। বস্তুতঃ চীনে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-চীনে Sainted সানের নামে জনসাধারণের মধ্যে একটা উন্মাদনা উত্তেজনা আসিয়া থাকে। দেশপ্রেমিক চীনামাত্রই তাঁহার নামে সর্ব্বত্যাগী হইয়া জন্মভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে অগ্রসর হয়। ফলে এই তিন প্রধান তাঁহার নাম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আজ তাঁহাদের কার্য্য প্রায় সর্ব্বত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে। ইঁহাদের তিন জনের সুশাসনে চীনে এই প্রথম রীতিমত রাজস্ব আদায় হইতেছে, সেনাদল রীতিমত বেতন ও সাজসরঞ্জাম পাইতেছে, আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রচারকার্য্য রীতিমত চলিতেছে। ফলে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে ইহাদের শাসনপ্রণালী জনসাধারণের প্রীতি, শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। যদিও রাসিয়ান বোরোডিন এই প্রচারকার্য্যের নিয়ন্তা, তথাপি দক্ষিণের চীনারা রাসিয়ার কমিউনিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করে নাই; তাহারা বরং রাসিয়ার নিকট যতটুকু সাহায্য লওয়া আবশ্যক, তাহা লইয়া আপনাদের জন্মভূমির মুক্তিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দক্ষিণের তিন প্রধানের আর একটি গুণ এই যে, তাঁহারা বিদেশীর শত্রু নহেন। কেবল রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহারা বিদেশীয়ের প্রভুত্ব ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প। যদি বিদেশীয়রা সাম্রাজ্যিকতার ও স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুভাবে সমানে সমানের ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের স্বার্থহানির কোনও আশঙ্কা নাই।

জেনারল চাঙ্গ কাইসেক অতি সাদা-সিধা লোক। "খৃষ্টান সায়েন্স মনিটার" পত্রে মিঃ গ্রীণ লিখিয়াছেন, "চাঙ্গ কাইসেক আদৌ বল-শেভিক কমিউনিজমের পক্ষপাতী নহেন। তিনি গুরু ডাক্তার সানের মত আন্তরিক দেশ-প্রেমিক; সুতরাং তিনি রাসিয়া কেন, কোনও বৈদেশিক শক্তিরই উপাসক নহেন। সুতরাং তাঁহার জয় হইলে বৈদেশিকদিগের সর্ব্বনাশ হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। রাসিয়ার বলশেভিকদিগের সহিত তাঁহার কোনও সন্ধিসর্ত্ত হয় নাই; তিনি মস্কৌয়ের ইঙ্গিতে চালিত হইবার পাত্র নহেন। জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের নেতা হইবার উপযুক্ত অনেক গুণ আছে। তিনি আন্তরিক দেশ-প্রেমিক, তিনি স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়েন না, তিনি লুণ্ঠনকারীও নহেন,—তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য,—দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করা এবং জন্মভূমির মুক্তিসাধন করা। ইতোমধ্যেই তিনি দক্ষিণ-চীনের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছেন। মস্কৌয়ের বলশেভিকরা নানা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া-ছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—He will really inaugurate a new and better era in the chaotic republic and possibly stabilise things entirely. তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"দেশে কয় বৎসর যাবৎ যে ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে, যাহার ফলে আমার দেশের বহু লোক হতাহত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, আমি সেই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলোৎপাটন করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি।

নাই, আমি সেই সকলেরই অবসান করিতে চাহি। আমার গুরু ডাক্তার সানের কথায় বলি, আমি আমার জন্মভূমি হইতে সাম্রাজ্যিক সামরিক অনাচারের অবসান করিতে চাহি। আমি বৈদেশিকগণের প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার অনাচার আচরণ করিতে অভিলাষী নহি, বরং আমি তাহাদের সহিত একযোগে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে চাহি।" মিঃ গ্রাণের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে হইবে, এত দিনে চীনের যথার্থ মুক্তিকামী এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

এ হেন শক্তিশালী পুরুষের বিপক্ষে উত্তরের মার্শাল চাঙ্গসোলিন ও উপেইফু অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। সে যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে, তাহা আর দুই এক মাসের মধ্যেই নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে। দক্ষিণের চাঙ্গ কাইসেকের একমাত্র বন্ধু উত্তর-পশ্চিমের জেনারল ফেঙ্গ। তিনি কুওমিনচিনের (North Revolutionary Party and Army) নেতা। এই উভয় দলের মধ্যস্থলে চাঙ্গ সোলিন ও উপেইফুর সেনা-সমাবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের বন্ধু জাপান ও অন্য কয়টি সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপীয় শক্তি। কেন তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহার কারণ আছে। তাঁহাদের ভয়, চেঙ্গ জয়লাভ করিলে চীনে বলশেভিক প্রভাব দৃঢ়মূল হইবে। পরন্তু কাণ্টনের চাঙ্গ চীনের প্রভুত্ব লাভ করিলে তাঁহাদের বহু বাণিজ্যবন্দর ও বহু স্বার্থের ক্ষতি হইবে। নিউইয়র্কের "নিউ রিপাবলিক" পত্র এ কথাটা বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন। এই পত্র বলেন ;—

"চীন আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। চীন দেখিতেছে, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ তাহার সমুদ্র ও নদীতটবর্ত্তী ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি সহরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বৈদেশিকরা তাহার বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধিধারা বাঁধিয়া দিয়াছে, বাণিজ্যশুল্কাদি আদায় করিতেছে এবং বাণিজ্যরক্ষার্থ স্থল ও নৌ-সৈন্য নিয়োজিত করিয়া বাণিজ্য-সংক্রান্ত রাজস্বের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। চীনের একরূপ অরক্ষিত উপকূলে তাহাদের রণতরীসমূহ গর্ব্বভরে পতাকা উড্ডীন করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের গান-বোট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রণতরীসমূহ চীনের অভ্যন্তরস্থ নদীবক্ষে শান্তিরক্ষার অছিলায় প্রহরা দিতেছে। সমুদ্র হইতে রাজধানী পিকিং পর্য্যন্ত এক শত মাইল পথ তাহারাই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সমুদ্রোপকূলে ও দেশের অভ্যন্তরে নানা স্থানে তাহারা বিরাট দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া Strategic points অথবা আসল ঘাঁটি সমূহ দখল করিয়া রহিয়াছে। চীনের জলে স্থলে রণসম্ভার আদান-প্রদানের সমস্ত অধিকার তাহারা হস্তগত করিয়াছে। গত ৮০ বৎসরের মধ্যে চীনে যে সকল আধুনিক নগর বা বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় তাহারা চীন রাজকর্ম্মচারী-দিগকে কোনওরূপ কর্তৃত্ব করিতে দেয় না। চীনের বাণিজ্যাধিকার চীনের হস্তে নাই, তাহা বিদেশীয়ের হস্তগত হইয়াছে। মধ্য-চীনে ইংরাজের বিরাট স্বার্থ নিহিত আছে। সেখানে জেনারল উপেইফু দেশের শিক্ষা, বাণিজ্য, খনি, কারখানা বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করেন না, তিনি সেখানে Military tyrant অথবা সামরিক স্বেচ্ছাচারী শাসকরূপে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন।

"কিন্তু এখন কাণ্টনের জাতীয় দলের অভ্যুদয়ে এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাই বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। তাহাদের ভয়,—পাছে চীনের জনসাধারণ এই জাতীয় দলের পৃষ্ঠপোষকরূপে সাহায্য দান করিয়া তাহাদের নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

"বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ চীনের সর্ব্বত্র আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। তাহারা চীনের সার্ব্বভৌমত্বের কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা চীন রাজ্যের বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী শাসক বা গোলযোগ ও অশান্তির আগুনে বাতাস দেয়। তাহাদের বাণিজ্য-বন্দরগুলি ষড়যন্ত্র ও জুলুমের প্রধান আড্ডা।

"কিন্তু অকস্মাৎ এক নূতন শক্তি এই অশান্তি ও অরাজকতার দিনে নববলে বলীয়ান্ হইয়া দেখা দিয়াছে, উহা কাণ্টনের কুওমিনটাঙ্গ ও তাহার নেতা চাঙ্গ কাইসেক। ইহারাই গত বৎসর বৃটেনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, বৃটিশ বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ইংরাজের সুরক্ষিত বাণিজ্য-দ্বীপ হংকংয়ের বিরুদ্ধে বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিয়াছে এবং প্রায় তাহার বাণিজ্য-জীবন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে।"

এ হেন শক্তির প্রতি নানা দোষারোপ করা ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আজ চাঙ্গ কাইসেকের উপর "Red influence"-এর কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু নিরপেক্ষ বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ লেখকগণের কথায় বুঝা যায়, চাঙ্গ কাইসেক বলশেভিক প্রভাবান্বিত নহেন, বরং তিনি বলশেভিক প্রভাবের বিরোধী ; তিনি স্বার্থান্ধ লুণ্ঠনপ্রয়াসী বর্ব্বর সেনাপতি নহেন, তিনি স্বদেশের মুক্তিকামী বীর ; তিনি কূট-কৌশলী রাজনীতিক নহেন, তিনি sincere patriot—ডাক্তার সানের উপযুক্ত মন্ত্রশিষ্য। তাই মার্কিণের "সিয়াটল টাইমস" বলিতেছেন, "এই অশান্তি, অরাজকতা ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য হইতে এক একতাবদ্ধ মিলিত চীন জাতির উদ্ভব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কবে হইবে, তাহা কেহ এখন নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারে না। হয় ত সেই সুদিন উদিত হইবার পূর্ব্বে চীনের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পরিণামে চীন তাহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে। এই স্বাধীনতা-সমরে কোনও বৈদেশিকেরই হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, সকলেরই চীনকে স্বয়ং তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।"

অবশ্য মার্কিণ চীনকে শক্তিশালী দেখিতে চাহেন, কেন না, তাহা হইলে তাঁহার জাপ-ভীতির কতকটা অবসান হয়, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার শুভ কামনা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

—

ফিলিপাইনের মুক্তির কথা

জগতের পরাধীন দেশসমূহের মধ্যে ফিলিপাইন অন্যতম। যুগধর্ম্মে বর্ত্তমানে জগতের শ্বেত জাতিরা অশ্বেতগণের উপর আধিপত্য করিতেছে। ফিলিপিনো জাতি অশ্বেত—শ্বেত মার্কিণ জাতি তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্তার পদ অধিকার করিয়াছে। অশ্বেত আমরা যেমন নাবালক জাতিরূপে শ্বেত ইংরাজ জাতিকে আমাদের "দেবদত্ত" অভিভাবকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, ফিলিপিনোরাও তেমনই "ঈশ্বর-প্রেরিত" মার্কিণ জাতিকে অভিভাবকরূপে প্রাপ্ত হইয়া 'ধন্য' জ্ঞান করিতেছে।

বস্তুতঃ ফিলিপাইন ও ফিলিপিনোদের সহিত ভারত ও ভারত-বাসীর বহু সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবশ্য এই সৌসাদৃশ্য অন্য বিষয়ে নহে, কেবল উভয়ের রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে পরিদৃশ্যমান বলা যাইতে পারে। কেন, তাহা বুঝাইতেছি।

মার্কিণ স্পেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়েন। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং স্পেন কর্তৃক অধিকৃত ছিল। বিজয়ী হিসাবে মার্কিণ জয়লব্ধ দ্বীপ শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু মার্কিণ জগতে প্রচার করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা স্বাধীনতাপ্রিয় উদার জাতি, স্বয়ং বহু কষ্টে নিজের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং অপরের স্বাধীনতায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। এই হেতু ফিলিপাইন অধিকারের পর তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহারা ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা প্রদান

ফিলিপিনো দেশপ্রেমিক আগুইনাল্ডোর মুক্তি-সমরের কথা বোধ হয় কেহ বিস্মৃত হয়েন নাই। আগুইনাল্ডোর অসাফল্যের পর ফিলিপাইনের স্বাধীনতার আশা স্বপ্নমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মার্কিণ কিন্তু ফিলিপাইনকে স্বাধীনতাপ্রদানের প্রতিশ্রুতির কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছেন। মধ্যে এমনও রটিয়াছিল যে, মার্কিণ ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পাইলে রক্ত-শোষণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতে আর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। মার্কিণও জগতের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতির মত ফিলিপাইনের প্রভুত্বাধিকার আস্বাদন করিয়া সেই অধিকারের আকাঙ্ক্ষানল উপশমিত করিতে পারেন নাই; বরং উহা হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের মত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফিলিপিনোর স্বাধীনতা-লাভের কথা অলীক স্বপ্নমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কি ভাবে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাই এইবার বর্ণনা করিব।



আমেরিকার নূতন প্রেসিডেন্ট কুলিজ

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কুলিজ কিছু দিন পূর্ব্বে কর্ণেল টমসনকে ফিলিপাইন দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কর্ণেল টমসন ঐ দ্বীপে থাকিয়া সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে কি না, নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে রিপোর্ট দিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য। আগামী ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ কংগ্রেসের শীতের মরসুমের উদ্বোধনকালে কুলিজ যে বক্তৃতা করিবেন, তন্মধ্যে মার্কিণের সহিত ফিলিপাইনের সম্বন্ধের কথাও থাকিবে। কাজেই কর্ণেল টমসনের রিপোর্টের উপরেই তাঁহার বক্তৃতা নির্ভর করিবে। সে এখন দূরের কথা। কিন্তু ইতোমধ্যেই মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্ট সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছেন। ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে কি করা না করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে তাঁহারা অগ্রিম অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল মতামত হইতে ফিলিপাইনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মার্কিণ জনসাধারণের মতামত জানিবার সুবিধা হয়।

"নিউইয়র্ক হেরাল্ড" পত্রে রয় বেনেট নামক মার্কিণ লেখক লিখিয়াছেন,—"কর্ণেল টমসন প্রেসিডেন্ট কুলিজকে নিঃসন্দেহ জানাইবেন যে, ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দিবার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ফিলিপাইন দ্বীপের অধিবাসীরা স্বাধীনতালাভের উদ্দেশে তাঁহাকে দেখাইয়া অনেক আন্দোলন (Demonstrations) করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি ভুলেন নাই।"

ফিলাডেলফিয়ার "বুলেটিন" নামক পত্র বলিতেছেন, "বর্ত্তমান মার্কিণের সমর-বিভাগের উপর ফিলিপাইন শাসনের ভার অর্পিত রহিয়াছে। কর্ণেল টমসন হয় ত পরামর্শ দিবেন যে, ঐ বিভাগের হস্ত হইতে আর এক সরকারী বিভাগের হস্তে ঐ শাসনভার অর্পণ করা হউক।" অর্থাৎ অভিভাবকত্বের ভার হস্তান্তরিত হইবে মাত্র, ফিলিপিনোদিগকে আপনাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অবসর প্রদান করা হইবে না।

নিউইয়র্কের "হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রে লিখিত হইয়াছে :—

ফিলিপিনো নেতাদের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়েন। জোনস এ্যাক্ট অনুসারে মার্কিণ ফিলিপাইনে যে প্রভুত্বের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং জেমস বার্টন হ্যারিসনের শাসনকালে যে প্রভুত্বের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন সেই পূর্ব্ব-প্রভুত্ব আবার দৃঢ়মূল করাই ফিলিপাইনে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।" যিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নাম টমাস ষ্টিপ। তিনি হেরাল্ড ট্রিবিউনের সংবাদদাতারূপে কর্ণেল টমসনের দলভুক্ত হইয়া ফিলিপাইনে গিয়াছিলেন। তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখুন, ফিলিপাইনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কি ভাবে হইবার সম্ভাবনা!

কর্ণেল টমসন স্বয়ং কিরূপ মতের আভাস দিয়াছেন, তাহাও দেখুন। তিনি ফিলিপাইনে ৬৬ শত মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সকল অবস্থার লোকের সহিত মিলামিশা করিয়াছেন, সকল শ্রেণীর ফিলিপিনো রাজনীতিকের মনোভাব অবগত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা ত্যাগকালে তিনি বিদায় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"অতীব দুঃখের সহিত আমি ফিলিপাইন ত্যাগ করিতেছি। মার্কিণ ও ফিলিপিনো উভয় জাতিই একটা গঠনমূলক শাসননীতি নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত উৎসুক, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি প্রেসিডেন্টকে যে রিপোর্ট দিব, আমার বিশ্বাস, উহার ফলে উভয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

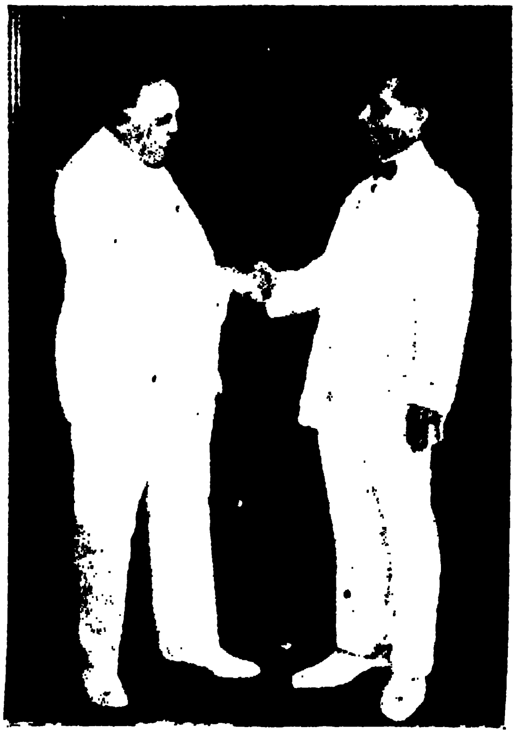
"আমার বিশ্বাস, ফিলিপাইনের ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা উজ্জ্বল। দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ্ অপরিমিত, ফিলিপিনোরা তাহা এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিজ, খনিজ এবং ধাতুজ সম্পদ্ সংগ্রহ করা কেবল মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। যখন সে উন্নতির দিন আসিবে, তখন ফিলিপিনোরা আরও ভাল ভাবে জীবনযাপনে সমর্থ হইবেন; তাঁহাদের উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হইবে; দেশের স্বাস্থ্য, দিনমজুর ও অন্য কর্ম্মীর বেতন এবং শ্রমের সম্মান সম্বন্ধে বহু উন্নতি সাধিত হইবে।"

পাঠক দেখিবেন, ইহার মধ্যে রাজনীতির কথা একটিও নাই। সব কথা ভাসা ভাসা, মুক্তির কথা কিছুই নাই। ঠিক এই ভাবেই কি ভারতেও আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা বক্তৃতায় সুধাবর্ষণ করেন না?

কিন্তু কর্ণেল টমসন কোন আশার আভাস না দিন, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ কিন্তু ফিলিপিনোদের ধৃষ্টতার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। মিঃ পোর্টার নামক এক জন সংবাদদাতা তাঁহার সহিত ফিলিপাইনে গিয়াছিলেন। তিনি "টাইম্‌স" পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"আমরা দ্বীপপুঞ্জের যে অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছি সেই অঞ্চলেই দেখিয়াছি, শক্তিশালী দেশীয় রাজনীতিকরা 'এই মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই' বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়াছেন। অথচ গোপনে বলিয়াছেন, এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার সময় আপাততঃ মুলতুবি রাখিতে হইবে। এমন কি, দেশের প্রধান পেটরিয়ট ও শক্তিশালী চরমপন্থী ম্যানুয়েল কোয়েজনও বলিয়াছেন, তিনি আগামী

বলেন, তাঁহারা এখনও এক পুরুষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয়েন নাই।

"কর্ণেল টমসন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে,ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিণ্ডানাও জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনসম্পদশালী স্থান, এই স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদের এ যাবৎ কোনওরূপ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা হয় নাই। ইহার সদ্ব্যবহারের ফলে অচির-ভবিষ্যতে মার্কিণ ও ফিলিপিনো—উভয় জাতিই প্রচুর লাভবান্ হইবে সন্দেহ নাই। ইহার ক্ষেত্রে যে রবার উৎপন্ন হয়, তাহা মার্কিণের প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ অনায়াসে সরবরাহ করিতে পারে। ফলে রবারের ব্যবসায়ে ইংরাজ ও ওলন্দাজরা যে একচেটিয়া অধিকার দখল করিয়া বসিয়া আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে। এতদ্ব্যতীত মিণ্ডানাওয়ের কাফিও উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমানে ব্রাজিল এই ব্যবসায়ে



কর্ণেল টমসন ও ফিলিপাইনের পেটরিয়ট ম্যানুয়েল কোয়েজন

মার্কিণে যে একচেটিয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাও মিণ্ডানাওয়ের কাফির জোরে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে। মিণ্ডানাওয়ের ভূগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫০ কোটি টন (এক টন=২৭। মণ) লৌহ পাওয়া যাইতে পারে। উহার ভূগর্ভস্থ কয়লার পরিমাণ অফুরন্ত, ইহাও বিশেষজ্ঞরা স্থির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া গাঁজা, নারিকেল এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় ফলমূলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।

"এ দিকে কর্ণেল টমসন দেখিয়াছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্য প্রতি বৎসর হু হু বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯১৩ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাচ্যের বাণিজ্য ৪ শত কোটি ডলার হইতে ৮ শত কোটি ডলারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১৩ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণের প্রতীচ্য দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য শতকরা এক শতকরা ৩ শত টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে মার্কিণের ফিলিপাইনের সহিত বাণিজ্য শতকরা ৫ শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং আপাততঃ ফিলিপাইনের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখুন, এই স্বার্থের দিক না দেখিয়া মার্কিণ কি এখন ফিলিপাইনের মুক্তিসাধনের দিকে নজর দিবেন? যে ফিলিপাইন মার্কিণের পক্ষে কামধেনু, সেই ফিলিপাইন কি মার্কিণ সহজে পরিত্যাগ করিবেন? এই হেতু ম্যানিলা সহরের উচ্চপদস্থ মার্কিণ পুরুষরা কর্ণেল টমসনকে মার্কিণ-স্বার্থরক্ষার্থ ফিলিপাইনের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব সংরক্ষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"ব্রুকলিন ঈগল" পত্র আরও স্পষ্টবাদী। তিনি লিখিয়াছেন, "যদি মার্কিণের হাওয়া গাড়ীর টায়ার-টিউবের জন্য রবারের প্রয়োজন না হইত,—যদি মার্কিণকে এই রবারের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে না হইত, তাহা হইলে কর্ণেল টমসনকে ফিলিপাইনে পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না।" আবার বাল্টিমোরের "ইভনিং সান" পত্র বলিয়াছেন,—"যদি মার্কিণের রবারের চাহিদা প্রতি বৎসর হু হু বাড়িয়া না যাইত, তাহা হইলে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইত।"

ইহা হইতে স্পষ্ট কথা কি হইতে পারে, জানি না। স্বার্থ বড় ভয়ানক চীজ! এই স্বার্থের খাতিরে ফিলিপাইনের স্বাধীনতালাভ যে সুদূরপরাহত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কারণে জিব্রাল্টার, মাল্টা, পোর্টসৈয়দ, সুয়েজ ও এডেন সুরক্ষিত, সেই কারণেই যে ফিলিপাইন মার্কিণের মুষ্টিবদ্ধ, তাহা অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই বুঝিবেন।

মায়ের সন্তান

বাঙ্গালীর ছেলে উদরান্নের সংস্থানে ঘর ছাড়িয়া দেশবিদেশে যায়, কিন্তু দুর্গাপূজার সময় সে যেখানেই থাকুক, মায়ের কোলে ফিরিয়া আইসে। অন্ততঃ বৎসর ২০।২৫ পূর্ব্বে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। মায়ের কোলে আসিয়া যে যাহার এক বৎসরের সুখ-দুঃখের কথা নিবেদন করে, মা সন্তানগণের হাসি-কান্নায় হাসেন কাঁদেন। বৎসরান্তে শারদীয়া অবকাশে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই মধুর মিলন হইত।

আজ কয় বৎসর যাবৎ (জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে) জননী বৃটানিয়ার সন্তানসন্ততিগণ বৎসরান্তে একবার করিয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া আসে, মায়ের কাছে সুখ-দুঃখের কথা কয়, মা তাঁহাদের হাসি-কান্নায় হাসেন কাঁদেন। এই বৎসরান্তে মিলনের নাম Imperial Conference, আর Overseas Dominions বৃটানিয়ার সন্তানসন্ততি। মার্কিণ লেখক লোয়েল এক দিন তাঁহার 'Study windows' কেতাবে বৃটানিয়াকে আর এক ধাপ উপরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন, Grand-Mother আখ্যা দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা জরাজীর্ণা পিতামহী অথর্ব্ব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু আদরের নাতিগুলিকে বড় আপনার ভাবিয়া বুকে তুলিয়া চুম্বন করিতে তাঁহার বড়ই সাধ। কিন্তু নাতিপুতি এখন বড় হইয়াছে—নাবালক নাবালেক আর নাই, তাহারা সে আদর সে সোহাগ আর পছন্দ করে না। লোয়েল এই চিত্রটা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরমা, চশমা পর। সে কাল আর নাই, আর গিন্নীপণা চলিবে না, এখন যে নাতবৌরা বড় হইয়াছে!"

সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর আটলান্টিকে অনেক জল বহিয়া গিয়াছে। বড় নাতি মার্কিণ ত বহু দিন সাবালক হইয়া তাহার আপনার ঘর-সংসার বুঝিয়া লইয়াছে। এখন আবার কানাডা,

নাতি সাবালক হইয়াছে, তাহারা আর ঠাকুরমার গিন্নীপণা—ঠাকুরমার শাসন মানিতে চাহিতেছে না। কেন তাহা বলিতেছি।

জার্ম্মাণ-যুদ্ধের বিপদ্‌কালে এই সব সাগরপারের আপনার জন বৃটানিয়াকে অর্থ ও লোকবলের দ্বারা সাহায্য করিয়াছিল। সে দাবীর কথা তাহারা ভুলে নাই। তাই যখন যুদ্ধজয়ের সময় হইতে বৃটানিয়া বৎসরান্তে আপনার জনকে সলা-পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন বাঙ্গালীর বৎসরান্তে শারদীয়া পূজার সময় ঘরে ফিরার মত সাগরপারের সন্তানরা বৃটেনে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। জগতের লোক বুঝিল, British Commonwealthএর অংশীদাররা একত্র মিলিত হইয়া আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা পিতামহীর সহিত আলোচনা করিতেছে। এ ত ভাল কথা।

কিন্তু নাতিরা সাবালক হইয়াছে। তাহাদের নিজেদের ঘরসংসার হইয়াছে, নাতবৌদের মুখ চাহিয়া তাহাদিগকে সংসার চালাইতে হয়। স্বদেশ তাহাদের পত্নী। সুতরাং পিতামহীর সহিত যে পরামর্শই হউক, তাহারা স্বদেশের মনস্তুষ্টি সাধন না করিয়া ত পিতামহীর মন যোগাইতে পারে না। তাই প্রতি বৎসর মিলনকালে তাহারা আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইল। ফলে একটা ছাড়াছাড়ি আড়াআড়ির ভাব—পৃথগন্নে বাস করিবার ভাব ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতে লাগিল। এবার সেই ভাবটা যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা একগুঁয়ে নাতি দক্ষিণ-আফ্রিকা। সেখানে ঘরের ছেলের অপেক্ষা পরই বেশী। সে পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃটানিয়াকে দক্ষিণ-আফ্রিকার ঘর বজায় রাখিতে হইয়াছিল, সেই বুয়ারদের বড় কর্ত্তা জেনারল হার্টজগ এক দিন বৃটানিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার যুনিয়নের প্রধান মন্ত্রী। তিনি আর নাবালক থাকিতে সম্মত হইলেন না।

বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সাগরপারের অংশীদারদের সম্বন্ধ কিরূপ? তাঁহারা প্রকৃতই সাম্রাজ্যের সমান অংশীদাররূপে পরিগণিত হইতেন। তাঁহাদের নিজের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে বৃটানিয়ার কোনও কর্ত্তৃত্ব ছিল না। দক্ষিণ-আফরিকার প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে বৃটেন নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তাহা হইলেও একটু খোঁচ ছিল। যুদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে, বিদেশে দূতপ্রেরণের ব্যাপারে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত সম্বন্ধের বিষয়ে এবং অন্যান্য কয়েকটা বিষয়ে বৃটানিয়ার কর্ত্তৃত্ব মানিত হইত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও পার্লামেণ্ট স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বৃটিশ রাজার প্রেরিত গভর্ণর জেনারেলের উপনিবেশসমূহে কতকটা কর্ত্তৃত্বের অধিকার ছিল। উপনিবেশসমূহ এ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বও আর মানিতে চাহিলেন না। তাঁহারা এ অবস্থারও পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী হইয়া উঠিলেন। পরিবর্ত্তন-প্রয়াসীদের মধ্যে জেনারল হার্টজগই অগ্রণী। এক সময়ে এমন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হয় ত দক্ষিণ-আফ্রিকা একবারে সাম্রাজ্যের অংশচ্যুত হইয়া যাইবে। এই হেতু এবার সাম্রাজ্য-বৈঠকের সম্মিলন আশু প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সকলে মায়ের কোলে মিলিয়া এ বিষয়ে একটা আপোষ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে উৎসুক হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে উপনিবেশ-সমূহের মন্ত্রীরা বৈঠকে সমবেত হইলেন। অবশ্য লেফাপাদোরস্ত মত ভারতের "প্রতিনিধিরাও" (মন্ত্রী ত নাই!) অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের মন্ত্রীদের সহিত সে সভায় আহূত হইয়াছিলেন। অন্যতম "প্রতিনিধি" বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ British Connectionএর গুণগানে কিরূপ মুখর হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় 'বাসিক বসুমতীর' পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

বৈঠকের সলাপরামর্শের ফলে পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। অবশ্য ভারত এখনও স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশে পরিণত হয় নাই, কিন্তু তাহা হইলেও বৈঠকে আমাদের সমস্ত Minor difficulties পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ চাঁদ হাতে পাইবার আর ভারতের বড় বিলম্ব নাই! সে যাহা হউক, প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ-সমূহ যে বৈঠকের ফলে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, বৃটানিয়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের যে সকল বিরাট পরিবর্ত্তন সংঘটিত করা হইয়াছে, তাহা wise and inevitable, ইহাতে যে বৃটানিয়া বিশেষ 'জ্ঞানের' পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই কেন না, যাহা inevitable, যাহা আজ না হউক দুই দিন পরে অবশ্যই হইত, তাহা সময় থাকিতে করিয়া বৃটানিয়া বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছেন। এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হইলে হয় ত অন্যান্য উপনিবেশও মার্কিণ যোয়েন্দের মত পিতামহীকে 'চশমা পরিতে' উপদেশ দিত!

এখন পরিবর্ত্তনগুলি কি, একবার দেখুন,—

(১) সাম্রাজ্যের প্রত্যেক সত্তা অতঃপর এক Sovereign state বা সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকের হদ্দার মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্বে কার্য্য করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক উপনিবেশ যে কোনও বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসর্ত্তের কথা কহিতে ও সন্ধিসর্ত করিতে পারিবে। রাজার হইয়া উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিরা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(৩) কোনও বিশেষ উপনিবেশের সম্পর্কিত ব্যাপারে রাজা সেই উপনিবেশের প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবেন। রাজা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুসারে সে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

(৪) উপনিবেশের গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হইবে। তিনি কমনওয়েলথের সকল অংশীদারের সাধারণ রাজার প্রতিনিধি রূপে কার্য্য করিবেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া গ্রেটবৃটেনের সাগরপারের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৫) এই সকল নূতন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনানুসারে রাজার খেতাবের পরিবর্ত্তন করা হইবে।

কেমন, এখন বুঝিলেন ত, সমান অংশীদার কাহাকে বলে? উপনিবেশসমূহে বৃটিশ পার্লামেণ্টের বা গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া কোনও কার্য্য করিতে হইবে না। পরন্তু বৃটিশ রাজাকে তাঁহাদের প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহারাও স্বয়ং বিদেশের সহিত সন্ধিসর্ত করিতে পারিবেন। এক বিন্দু রক্তপাত করিতে হইল না, অথচ কেমন নির্ব্বিবাদে জোরের সহিত আপনাদের প্রাপ্য গণ্ডা—জন্মগত অধিকার আদায় করিয়া লওয়া! এ সম্বন্ধে ত রাজদ্রোহের কোনও কথা উঠিল না! আর আমাদের? পদে পদে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও গভর্ণমেণ্ট আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবেন। তাই বলা হইয়াছে,—"যেহেতু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে, সেই হেতু ভারতের কথা এ সম্পর্কে উঠিল না।" আমাদের যে ঘাস জল, তাহাই বরাদ্দ রহিল। যে সময়ে উপনিবেশের মন্ত্রীরা সাম্রাজ্য-বৈঠকে বসিয়া তাঁহাদের জন্মভূমির মুক্তির ইতিহাস গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমাদের "প্রতিনিধিরা" বৃটিশ রাজনীতিকদিগকে (রেডিং-বার্কেণহেড সম্প্রদায়কে) ভোজ দিয়া পরস্পর পরস্পরের গুণগানে আকাশ-মেদিনী প্রকম্পিত করিতেছিলেন। এ দুই চিত্রের একত্র সমাবেশের কি তুলনা আছে? উপনিবেশসমূহের নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে বৃটিশ পার্লামেণ্টের "ভিটো" চলিবে না, বৃটিশ মন্ত্রীর sweet will চলিবে না। ইহাকেই বলে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন, ইহাকেই বলে স্বরাজ। ভারতের "প্রতিনিধিদিগের" এই আবহাওয়ায় থাকিয়া



একাদশ পরিচ্ছেদ

২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা

গিরিগুহাশায়ী মরণাহত ষ্ট্রোভিলের কথা শুনিয়া জোসেফ কুরেট গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একসঙ্গে অনেক কথা বলিয়া ষ্ট্রোভিল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, সে মুদিতনেত্রে স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার কোটরগত চক্ষু ও বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া জোসেফ বুঝিতে পারিল, তাহার জীবন-দীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে।

জোসেফ যে গিরিগুহায় ষ্ট্রোভিলের অন্তিমশয্যা প্রসারিত করিয়াছিল, তাহা পার্ব্বত্য প্রকৃতির সুগম্ভীর দৃশ্যমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ; গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গগুলি অস্তগামী তপনের লোহিত কিরণে অনুরঞ্জিত; তাহাদের ছায়ায় বিশাল অরণ্যানী; গিরিকন্দর ভেদ করিয়া নির্ঝরের সলিলরাশি সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ উপলখণ্ডে বাধা পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে গিরি-প্রাচীরে প্রতিহত হইতেছিল, তাহার পর জলপ্রপাতের রূপ ধারণ করিয়া মহাশব্দে ভীমবেগে গিরিপাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাহাদের কিছু দূরে অরণ্যবেষ্টিত দুই একখানি বিক্ষিপ্ত পল্লী; কৃষকরা সেখানে চাষ-আবাদ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই সকল কৃষকের অধিকাংশ কসাক বা তাতার। তাহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র ও ক্রূর; সাহসী ও বীরপুরুষ হইলেও পরস্বাপহরণে তাহাদের কুণ্ঠা ছিল না; অনেকে দল বাঁধিয়া সন্নিহিত জনপদ-সমূহের অধিবাসিবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এমন কি, কখন কখন তাহারা তুর্কিস্থানে ও মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করিয়াও নানাপ্রকার উপদ্রব করিত।

ষ্ট্রোভিলের অবস্থা দেখিয়া এবং এই ভীষণ সীমান্ত-প্রদেশ হইতে একাকী উদ্ধার লাভ করা কিরূপ কঠিন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জোসেফ অত্যন্ত চিন্তিত হইল। সে ষ্ট্রোভিলের মুখের দিকে চাহিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। কয়েক মিনিট পরে ষ্ট্রোভিল চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ-স্বরে বলিল, "আমি বুঝিতেছি, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, আমার সকল কথা শেষ হইলে তুমি এই স্থান ত্যাগ করিও। নতুবা তোমার পরিত্রাণের আশা বিলুপ্ত হইবে। এই সীমান্তপ্রদেশে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে তুমি শত্রুহস্তে বন্দী হইবে। যদি গোপনে এই অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ধরা পড়িবার আশঙ্কা দূর হইবে; তখন তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সকলেরই সহায়তা প্রার্থনা করিতে পারিবে।"

জোসেফ বলিল, "তুমি বলিতেছ, তোমার আসন্নকাল উপস্থিত। তোমার এই অনুমান সত্য হইতেও পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেই তোমার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে; অনাহারে তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ। আমি অদূরবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনি। কিছু খাইতে পাইলে তুমি একটু বল পাইবে।"

ষ্ট্রোভিল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না বন্ধু, পেটে কিছু পড়িলেই আমার জীবনরক্ষা হইবে—সে আশা নাই। আমার ক্ষত পচিয়া দেহের রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে, এই জন্য আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। যদি যথাসময়ে উপযুক্ত ঔষধাদি ব্যবহারে ক্ষত শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইতাম; কিন্তু এখন আর কোন আশা নাই। আমার মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিতেছে।"

জোসেফ আর কোন কথা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল; ষ্ট্রোভিলও চক্ষু মুদিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল, বোধ হয়, তখন তাহার ঘুম আসিতেছিল। জোসেফ গুহার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—নৈশ অন্ধকারে সেই পার্ব্বত্য অরণ্য সমাচ্ছাদিত হইলেও নবোদিত শশি-কলার ক্ষীণ রশ্মিসম্পাতে অদূরবর্ত্তী মুক্ত প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছে। জোসেফ ধীরে

ধীরে উঠিয়া গিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং গুহাস্থিত অগ্নিকুণ্ডে কয়েকখানি কাঠ চাপাইয়া ষ্ট্রোভিলের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল। সে ষ্ট্রোভিলকে নিদ্রিত দেখিবার আশা করিয়াছিল, কিন্তু ষ্ট্রোভিল তখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। জোসেফ তাহাকে সান্ত্বনাদানের জন্য তাহার পাশে বসিয়া হাতে হাত বুলাইতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ষ্ট্রোভিল অস্ফুটস্বরে বলিল, "উঃ, বড় কষ্ট! তাহার উপর বিবেকের দংশন আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে! তুমি আমাকে একাকী রাখিয়া এখন কোথাও যাইও না, আমার পাশে শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

জোসেফ তাহার পাশে আরও আধ ঘণ্টা বসিয়া রহিল, তাহার পর অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় দেখিয়া তাহাতে আরও কিছু কাঠ দিয়া আসিল। অতঃপর জোসেফ শয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; সে অগ্নির আলোকে দেখিল, যন্ত্রণায় ষ্ট্রোভিলের মুখ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। জোসেফ তাহার অবস্থা দেখিয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিল, কোমল-স্বরে বলিল, "তোমার যন্ত্রণা কি খুব বেশী হইতেছে?"

ষ্ট্রোভিল অস্ফুটস্বরে বলিল, "উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা! বন্ধু জোসেফ, ঈশ্বর কেহ আছেন বলিয়া কি তুমি বিশ্বাস কর?"

কিরূপ স্থানে কি অবস্থায় কি প্রশ্ন! তখন নৈশ-অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া আরণ্য প্রকৃতি ভীষণ শোভা ধারণ করিয়াছিল; অদূরে জলপ্রপাতের জলরাশি প্রচণ্ড বেগে নিম্নভূমিতে নিপতিত হইয়া শত বজ্রনিনাদবৎ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিতেছিল; শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে ক্ষুধিত নেকড়ের তীব্র চীৎকার ও পর্ব্বতচর ভল্লুকদলের সঘন হুঙ্কারধ্বনি, আর ঐ গিরিগুহায় মৃত্যুশয্যাশায়ী মহাপাপিষ্ঠ অনুতপ্ত ষ্ট্রোভিল! এই সময় তাহার এই প্রশ্ন! তাহার প্রশ্নে জোসেফ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল; বায়ুতাড়িত বৃক্ষপত্রের সর্-সর্ শব্দ এবং ঝিল্লীর অশ্রান্ত ঝঙ্কার—জোসেফের কর্ণমূলে যেন কোন দূরাগত রহস্যের আভাস বহন করিয়া আনিতেছিল, সে একটু অন্যমনস্ক বিস্মিত হইয়া বলিল, "হাঁ, পরমেশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন; কেন, তাঁহার অস্তিত্বে তোমার কি সন্দেহ আছে?"

ষ্ট্রোভিল ক্ষীণস্বরে বলিল, "হাঁ, সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন আর নাই, মনে হইতেছে, ঈশ্বর আছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। দেখ, প্রথম-যৌবনে আমি ক্যাথলিক ছিলাম, আমি ধর্ম্মভীরু ভগবদ্ভক্ত পিতামাতার সন্তান। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দিন পরে আমি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যাইতে বাধ্য হইলাম। মানুষ হইবার আশায় সেখানে গিয়া পশুত্ব লাভ করিলাম; আমার সকল শিক্ষা ব্যর্থ হইল। আঃ, আজ যদি সুইট্‌জারল্যাণ্ড-প্রবাসের স্মৃতি আমার হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে মৃত্যুকালে বিবেকের শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা সহ্য করিতে হইত না। উঃ, আমি কি পাপিষ্ঠ! আমি মানুষ নহি, শোণিত-লোলুপ রাক্ষস!"

জোসেফ ব্যথিত স্বরে বলিল, "পরমেশ্বর করুণাময়, তিনি মহাপাপিষ্ঠেরও সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। তুমি পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া কাতর হইও না; আর কথা কহিও না, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর। আমিও তোমার পার্শ্বে শয়ন করিতেছি।"

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, জোসেফ কয়েক মিনিট পরেই সুপ্তিমগ্ন হইল, ষ্ট্রোভিলও তন্দ্রাঘোরে অবশিষ্ট রাত্রি-টুকু কাটাইয়া দিল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে জোসেফ দেখিল, প্রাতঃসূর্য্যের কনক-কিরণে আরণ্য-প্রকৃতি উদ্ভাসিত হইয়াছে, বনবিহঙ্গেরা মধুরস্বরে গান করিতেছে, সুশীতল সমীরণ-প্রবাহে বৃক্ষপত্র কম্পিত হইতেছে; চতুর্দ্দিক শান্তিপূর্ণ। ষ্ট্রোভিল জাগিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, তাহার যাতনা-বিকৃত মুখের ভাব তখন অনেকটা স্বাভাবিক; দেহের যন্ত্রণাও অনেক কম, তবে দুর্ব্বলতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল।

জোসেফ বলিল, "তুমি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, তোমাকে কিছু খাওয়াইতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না, বিশেষতঃ, আমিও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি। যেরূপে পারি, কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া আনি।" সে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল।

এখানে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও যাইও না, ভাই!"

জোসেফ বলিল, "ভয় নাই, আমার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। এখানে বসিয়া থাকিয়া কিরূপে আহার সংগ্রহ করিব? জঙ্গলে গিয়া দুই একটা পাখী শিকার করিব; নিকটে কোন গ্রাম থাকিলে সেখানে গিয়াও কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিব।"

ষ্ট্রোভিল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে যাও, আমার জন্য তুমিই বা অনাহারে কষ্ট পাইবে কেন? কিন্তু এখানে ফিরিয়া আসিও, ভাই!"

জোসেফ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তোমার কি সন্দেহ হইয়াছে, তুমি জীবিত থাকিতেই তোমাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিব?"

ষ্ট্রোভিল আগ্রহভরে বলিল, "না, না, ও রকম অন্যায় সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি জানি, মরণাহত বন্ধুকে মৃত্যুশয্যায় ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করা তোমার অসাধ্য। তোমার মত উদার-প্রকৃতি হিতৈষী বন্ধু আমি জীবনে কখন লাভ করিতে পারি নাই; মৃত্যুর প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। এরূপ অসহায় অবস্থায় আমার একাকী থাকিতে ভয় হইতেছে।"

ষ্ট্রোভিলের মাথায় হাত বুলাইয়া গাঢ়স্বরে জোসেফ বলিল, "তুমি ভয় পাইও না, আমি খাবার লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; আহার ভিন্ন আমরা কি করিয়া বাঁচিব?"

জোসেফ গিরিগুহা হইতে বাহির হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল; অরণ্যে পক্ষীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রথমে পক্ষী শিকার না করিয়া অন্য প্রকার খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্যই তাহার আগ্রহ হইল। সে অরণ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সমতল কর্ষিত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিল, সে বহুদূরস্থিত শস্যক্ষেত্রের অন্য প্রান্তে কুণ্ডলীকৃত ধূম দেখিতে পাইল, সেই ধূমরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। জোসেফ বুঝিল, যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নিও আছে এবং অগ্নি থাকিলে মানুষও আছে। কোন চতুষ্পদ প্রাণী আগুন জ্বালিতে পারে না। জোসেফ সেই

জোসেফ সতর্কভাবে পূর্ব্বোক্ত ধূমকুণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধা এক খণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া চরকায় শণের সূতা কাটিতেছে; তাহার অদূরে একটি অগ্নিকুণ্ড, সেই আগুনে সে কাঠ জ্বালাইয়া কয়লা প্রস্তুত করিতেছিল। জোসেফ সেই বৃদ্ধার নিকট অন্য লোক না দেখিয়া আশ্বস্ত হইল, এবং তাহার সম্মুখে আসিয়া রুসীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?"

বৃদ্ধা জোসেফকে দেখিয়া চরকা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, এক ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম নাই। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? কোথায় যাইবে? তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি ভিন্ন দেশের লোক।"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, আমি বিদেশী বণিক। আমি আর এক জন বণিকের সঙ্গে পারস্যে যাইতেছিলাম; পথিমধ্যে দস্যুদল আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার সঙ্গীকে তাহারা সাংঘাতিকভাবে জখম করিয়াছে। তাহার জীবনের আশা নাই; সে একটি গিরিগুহায় পড়িয়া আছে। দীর্ঘকাল আমরা অনাহারে আছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়। তুমি কিছু খাবার দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর। তোমার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন না হইলে, আশা করি, আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে না।"

বৃদ্ধা কোমল স্বরে বলিল, "না বাছা, আমার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন নহে, কিন্তু আমি বড় গরীব, আমার ঘরে এমন কোন খাদ্যসামগ্রী নাই—যাহা দিয়া তোমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারি। এই দেখ, আমি কাঠ জ্বালাইয়া কয়লা করিতেছি; আমার অকর্ম্মণ্য স্বামী ও পঙ্গু ছেলেটা এই কয়লা গ্রামে বিক্রয় করিতে যাইবে; যাহা পাইবে, তাহাতে আমাদের তিনটি প্রাণীর দুই সন্ধ্যার আহার জুটিবে কি না সন্দেহ। এই ত আমার সংসারের অবস্থা; তুমি দীর্ঘকাল অনাহারে আছ বলিতেছ; আমরা অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও আমাদের খাবারের এক অংশ তোমাকে খাইতে দিতে পারি। তাহার অধিক কিন্তু দেওয়া আমার অসাধ্য।"

করিতে আসি নাই ; তোমরা অর্দ্ধাহারে থাকিয়া তোমাদের খাদ্যসামগ্রী দ্বারা আমার ক্ষুধা দূর কর—ইহাও আমার প্রার্থনা নহে। আমি মূল্য দিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিব, এই আশায় তোমার নিকট আসিয়াছি।"

বৃদ্ধা জোসেফকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া অদূর-বর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিল ; অরণ্যটি দুর্গম বা গভীর নহে, আম-কাঁঠালের বাগানের মত স্থান, ভিতরে কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর। বৃদ্ধা সেই কুটীরের সম্মুখে আসিয়া জোসেফকে বলিল, "আমার স্বামী একটু কাযে গিয়াছেন, আমার ছেলেটা অসুস্থ হইয়া ঘরের ভিতর পড়িয়া আছে ; তুমি দরজার কাছে একটু অপেক্ষা কর।"

বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল, জোসেফ উন্মুক্ত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কুটীরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিল ; কুটীরের মধ্যস্থলে প্রসারিত পশুচর্ম্মের উপর একটি কৃশকায় যুবককে শায়িত দেখিল, যুবকটির দেহ পশুচর্ম্মাবরণে আবৃত থাকিলেও তাহার মুখ ও মাথা অনাবৃত ছিল। মুখ দেখিয়া জোসেফের অনুমান হইল—যুবকটির বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক নহে।

বৃদ্ধা তাহার পুত্রের মাথার কাছে বসিয়া তাহাকে কি বলিতে লাগিল ; কথাগুলি জোসেফ শুনিতে পাইলেও সেই ভাষা তাহার অজ্ঞাত বলিয়া, একটি কথাও সে বুঝিতে পারিল না। জোসেফ দেখিল, বৃদ্ধার কথা শুনিয়া যুবকটি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিল, এবং হাত, মুখ ও মাথা নাড়িয়া যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়া আতঙ্কে বৃদ্ধার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

পুত্রের কথা শেষ হইলে বৃদ্ধা জোসেফকে কুটীরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। জোসেফ অস্বচ্ছন্দ চিত্তে, কুণ্ঠিত-ভাবে কুটীরে প্রবেশ করিলে যুবকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল ; তাহার দৃষ্টি ক্ষুধিত বন্য পশুর দৃষ্টির ন্যায় ক্রূর ও লোলুপ !

যুবক বৃদ্ধাকে আরও দুই একটি কথা বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তখন বৃদ্ধা জোসেফকে বলিল, "আমার ছেলে বলিতেছে—তুমি ফেরারী আসামী, জেলখানা হইতে পলাইয়া আসিয়াছ। তোমাকে খাইতে দিলে আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না। জানিতে পারিলে পুলিস

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া জোসেফ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, সে তাহার হাতের পিস্তল যুবকের ললাটে উদ্যত করিয়া বৃদ্ধাকে কঠোর স্বরে বলিল, "শোন বুড়ী ! ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়, আমার সঙ্গী জঙ্গলের ভিতর মরণা-পন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমাদের খাবার চাই, যেরূপে পারি—তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব। যদি তুমি আমাকে খাবার বাহির করিয়া না দাও, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই গুলী করিয়া তোমার ছেলের মাথার খুলী গুঁড়া করিয়া দিব। তাহার পর জোর করিয়া তোমার ঘর হইতে খাবার কাড়িয়া লইয়া যাইব। অনাহারে মানুষ ক্ষেপিয়া যায় ; আমারও এখন সেই অবস্থা !"

জোসেফের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া যুবক প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিল, এবং দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু বৃদ্ধা আতঙ্কে বিহ্বল না হইয়া জোসেফকে অচঞ্চল স্বরে বলিল, "অপরিচিত পথিক ! তোমার পিস্তল সরাইয়া লও, তুমি আমার রোগা ছেলেকে ভয় দেখাইও না ; উহাকে খুন করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে বলিয়াছি—আমার হৃদয় পাতরের মত কঠিন নহে ; তোমাকে আহারদানের অনিচ্ছা থাকিলে, তোমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিতাম না। আমরা দরিদ্র বটে, কিন্তু অসভ্য বর্ব্বর নহি। আমাদের সামান্য খাবার আছে—তাহাই তোমাকে দিতেছি, আমার আতিথেয়তার অসম্মান করিও না।"

জোসেফ হাতের পিস্তল নামাইয়া রাখিল ; বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সে লজ্জিত হইল। বৃদ্ধা সেই কুটীরের এক কোণে গিয়া একটা কাঠের সিন্দুক খুলিল, এবং তাহার ভিতর হইতে একটা থলি বাহির করিল। সে কয়েক মুঠা চাউল, একখান কাল রুটী, একদলা পনীর, অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক কয়েক খণ্ড ছাগমাংস, এবং এক খণ্ড বরাহমাংস সহ সেই থলিটা লইয়া জোসেফের সম্মুখে আসিল। সে থলিটা জোসেফের হাতে দিয়া বলিল, "গরীবের যে কিছু সম্বল ছিল, তাহা তোমাকে দিলাম ; ইহার অধিক আর কিছু দান করা আমার অসাধ্য।"

জোসেফ আগ্রহভরে থলিটি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, তোমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা

সকল খাদ্যসামগ্রীর উপযুক্ত মূল্য তোমাকে দিয়া যাইতেছি।" সে দুইটি "রুবল" (এ দেশের চারি টাকা) বাহির করিয়া বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিল। বৃদ্ধা সেই খাদ্যসামগ্রীগুলির আশাতিরিক্ত মূল্য পাইয়া আনন্দ ও বিস্ময় গোপন করিতে পারিল না। 'রুবল' দুইটি দেখিয়া বৃদ্ধার পুত্রের চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটি রুবলের বিনিময়ে এক শত 'কোপেক' (তাম্রমুদ্রা) পাওয়া যায়। সেই দরিদ্র পরিবার কয়লা বিক্রয় করিয়া কোন দিন সিকি রুবলের (২৫ কোপেক) অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না; অর্দ্ধ-রুবল মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে তাহার চারিগুণ মূল্য লাভ করিয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল না হইবে কেন? মাতা ও পুত্র উভয়েই মনে করিল, লোকটা কি নির্ব্বোধ!'

জোসেফ খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ থলিটি কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেই কুটীর ত্যাগ করিল। কিন্তু সে যে গিরিগুহায় স্ট্রোভিলকে রাখিয়া গিয়াছিল, সহজে সেই গুহায় প্রত্যাগমন করিতে পারিল না; পথ ভুলিয়া অন্য দিকে উপস্থিত হইল। অবশেষে অনেক বন জঙ্গল, মাঠ ঘুরিয়া কয়েক ঘণ্টার পর সে সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—স্ট্রোভিলের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্তপ্রায়; অসহ্য যন্ত্রণায় সে ক্রমাগত মাথা নাড়িতেছিল। জোসেফ কাঠের আগুন জ্বালিয়া তাহার সংগৃহীত বরাহ-মাংসের এক টুকরা সেই আগুনে ঝল্‌সাইয়া লইল। জোসেফ অর্দ্ধ-দগ্ধ মাংস স্ট্রোভিলের মুখে গুঁজিয়া দিলে, সে তাহা তৃপ্তিভরে ভক্ষণ করিল। ক্ষতের বেদনা সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হওয়ায় তাহার হাত নাড়িবার শক্তি ছিল না। জোসেফ ক্ষত ধৌত করিয়া তাহার উপর ভিজা নেকড়ার পটি বাঁধিয়া দিল। অতঃপর স্ট্রোভিল কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জোসেফও শয়ন করিয়া অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইল।

অপরাহ্ণে জোসেফের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে আকাশের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। গগনমণ্ডল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুতের লোলজিহ্বা প্রসারিত হইতেছিল এবং মুহূর্ত্তে আসন্ন প্রলয়ের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল। অল্পকাল পরে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল; বৃষ্টির তোড়ে শিলাখণ্ডগুলি ক্রমনিম্ন গিরিপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বৃষ্টি বন্ধ হইল বটে, কিন্তু প্রচণ্ড ঝটিকা আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দিক লণ্ড-ভণ্ড হইবার উপক্রম! কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখা ভগ্ন হইল, তাহার সংখ্যা নাই। শৃঙ্খলমুক্ত সহস্র উন্মত্ত দানবের গর্জ্জনের ন্যায় ঝটিকার হুঙ্কারধ্বনিতে ধরাতল কম্পিত হইতে লাগিল।

এই ভীষণ দুর্য্যোগে স্ট্রোভিলের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল; তাহার আশঙ্কা হইল—সয়তান শত শত সঙ্গী লইয়া তাহারই অনুসন্ধানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে নরকে লইয়া না গিয়া এই প্রাকৃতিক বিক্ষোভের শান্তি হইবে না!

সন্ধ্যার পর প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিলে খণ্ড-বিখণ্ড মেঘস্তরের অন্তরাল হইতে শশধরের কিরণ সিক্ত প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গে রজতচ্ছটার বিকাশ করিতে লাগিল। স্ট্রোভিল যেন মহাভয় হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া মুদিত নেত্রে স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল। জোসেফও স্ট্রোভিলের পার্শ্বে জড়বৎ বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। স্ট্রোভিল হঠাৎ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "উঃ, বড় শীত!"—তাহার আর্ত্তনাদে জোসেফের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল; সে দেখিল—স্ট্রোভিলের দেহের উপর হইতে পশুচর্ম্মখানি পদপ্রান্তে সরিয়া গিয়াছে। জোসেফ তদ্দ্বারা স্ট্রোভিলের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি পুনঃপ্রজ্জালিত করিল। সেই সময় স্ট্রোভিল মৃদুস্বরে জোসেফকে আহ্বান করিল।

জোসেফ শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, 'আমাকে কি ডাকিতেছিলে?"

স্ট্রোভিল মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, আমার পাশে বসিয়া, আমার যাহা বলিবার আছে—শোন। আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে; তোমাকে যে কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম, এখন না বলিলে আর তাহা বলা হইবে না। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, ঈশ্বর আছেন। হাঁ আমি তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। তিনি আমার

কুরেট।—আমি কি তোমার কোন উপকার করিতে পারিব ?

ষ্ট্রোভিল।—হাঁ, অন্তিমকালে ভজনালয়ের আচার্য্যের নিকট যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যায়, তুমি আমাকে সেই সান্ত্বনা দান করিতে পার। আমি আমার জীবনের একটি ঘটনার বিবরণ তোমার নিকট প্রকাশ করিব। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা; তখন আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে ছিলাম। আমি চঞ্চলমতি, নির্ভীক ও দুর্দ্দান্ত যুবক ছিলাম, বিপৎ-সঙ্কুল দুরূহ কার্য্যে আমার বড়ই অনুরাগ ছিল; তাহার ফলে আমি সুইট্জারল্যাণ্ডের নিহিলিষ্ট ও সোসালিষ্ট দলে যোগদান করিলাম এবং অল্পদিন পরে নিহিলিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম। এই সময় পোলাণ্ডের একটি নির্ব্বাসিত ভদ্রলোক জেনিভা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম—পলিটস্কে। একখানি পরিচয়-পত্র লইয়া আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে জেনিভায় উপস্থিত হইলাম।"

জোসেফ অস্ফুটস্বরে বলিল, "পলিটস্কে! আমি ত তাঁহাকে চিনিতাম; তিনি 'সোসাইটি-ডিলা-লিবার্টি' সভার সভাপতি ছিলেন। বোধ হয়, এখনও আছেন।"

ষ্ট্রোভিল।—তিনি এখনও আছেন কি না, জানি না; কিন্তু যে সময় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমার ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার জীবন কোন দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। আমি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে না পারিলেও শুনিয়াছিলাম—য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সোসালিষ্টদের যে সকল সমিতি আছে, সেই সকল গুপ্ত সমিতির সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহার ন্যায় অত্যুৎসাহী, নির্ভীক, দৃঢ়চিত্ত সোসালিষ্ট নেতা আর কোথাও দেখিতে পাই নাই; সম্প্রদায়ের কার্য্যে তিনি দেহ-মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার গোঁড়ামী দেখিয়া মনে হইত, তিনি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন! তিনি কিছু দিন আমাকে কাছে রাখিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং যখন বুঝিলেন, অন্যান্য নিহিলিষ্টদের অসাধ্য কার্য্য আমা দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে, তখন আমি অনেক দুরূহ কার্য্যের ভার পাইলাম; কোন কোন কার্য্য এরূপ কঠিন ছিল যে, মানুষের হৃদয় লইয়া,—দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি বিসর্জ্জন না করিয়া—কেহ সে সকল কায করিতে পারে না। কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য অনেক সময় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু কোন দিন আমাদের অর্থের অভাব হইত না; জলস্রোতের মত সর্ব্বদা অর্থের স্রোত বহিত, কিন্তু সেই বিপুল অর্থ কোথা হইতে আসিত, তাহা কোন দিন জানিতে পারি নাই।

"এই সময় কাউণ্ট মাটুস্কি নামক এক জন সম্ভ্রান্ত লোক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী পত্নী ও একটি শিশু পুত্র লইয়া জেনিভা নগরে বাস করিতেছিলেন। তিনিও পোলাণ্ডের অধিবাসী। নিহিলিষ্ট সন্দেহে তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ হইলে তিনি পত্নী-পুত্র লইয়া য়ুরোপের নানা দেশে গোপনে বাস করিতেছিলেন; অবশেষে তিনি বিপ্লববাদীদিগের প্রধান কেন্দ্র জেনিভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কোথায় কি কারণে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিন জানিতে পারি নাই; কিন্তু রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন; এ জন্য নিহিলিষ্টরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। কিন্তু কিছু দিন পরে নিহিলিষ্টরা তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহাদের ধারণা হইল, তাঁহারা রাজপ্রসাদ-লাভের আশায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, কাউণ্ট রুস গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের সম্প্রদায়ের কোন কোন গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিলে তাঁহাদের নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে। এই জনরব সত্য কি না, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না; কিন্তু তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ও তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শাদি শুনিবার জন্য এক দল গোয়েন্দা নিযুক্ত হইল। গোয়েন্দারা দলপতিকে সংবাদ দিল - তাঁহাদের স্বামি-স্ত্রীর গোপনীয় কথোপকথন শুনিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই সন্দেহ হইয়াছে। সেই সময় আমরা একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম; কাউণ্ট রুস গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাঠাইবেন,—আমাদের এইরূপ ধারণা হওয়ায় এক দিন আমরা সমিতির একটি অধিবেশনে স্থির করিলাম—বিশ্বাসঘাতক কাউণ্টকে গোপনে হত্যা করিতে হইবে। যে তিন জনের উপর

এই নিষ্ঠুর কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইল, আমি তাহাদের অন্যতম।"

জোসেফ রুদ্ধ নিশ্বাসে ষ্ট্রোভিলের কথা শুনিতেছিল; সে আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "তোমরা কাউণ্টকে হত্যা করিয়াছিলে?"

ষ্ট্রোভিল। নিশ্চয়ই; আমাদের সঙ্কল্প কি ব্যর্থ হয়? আমরা এক দিন রাত্রিকালে কাউণ্টকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া জেনিভা হ্রদের তীরে আনিলাম, এবং একখানি নৌকায় তুলিয়া হ্রদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। আমি স্বহস্তে তাঁহার গলায় রজ্জুর ফাঁস দিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলাম; তাহার পর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া, মৃতদেহ বস্তায় পুরিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলাম। দুই এক দিন পরে পুলিস কাউণ্টের মৃত দেহ হ্রদ হইতে তুলিয়া থানায় লইয়া গেল। নগরবাসীরা মৃত দেহ সনাক্ত করিতে পারিল না বটে, কিন্তু কাউণ্টপত্নী ছদ্মবেশে থানায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বামীর মৃত দেহ চিনিতে পারিলেন। নিহিলিষ্টদের ভয়ে তিনি মৃত দেহের দাবী করিলেন না বটে, কিন্তু আমি কিছু দূরে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলাম, কাউণ্টপত্নী অন্যের অলক্ষ্যে তাঁহার মৃত স্বামীর মুখচুম্বন করিলেন। তখন আমার ধারণা হইল—কাউণ্টপত্নী নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন; সুতরাং তাঁহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলাম। তদনুসারে আমি থানা হইতেই তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য হ্রদের ধারে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। তখন রাত্রি হইয়াছিল, স্থানটিও নির্জ্জন, আমি সেই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কাউণ্টপত্নীর পশ্চাতে গিয়া, তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিলাম।"

জোসেফ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ, কি ভয়ানক! কি পৈশাচিক কাণ্ড!"

ষ্ট্রোভিল। হাঁ পৈশাচিক কাণ্ড! এ ভাবে নরহত্যা করিতে সয়তানেরও হাত কাঁপে; কিন্তু আমি অকম্পিত হস্তে এই দুষ্কর্ম্ম করিলাম; পরন্তু এই দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি অহরহঃ আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। তাঁহাদের অন্তিম আর্ত্তনাদ এই পঁচিশ বৎসর পরেও আমার কর্ণমূলে ধ্বনিত হইতেছে! সেই ভীষণ দৃশ্য প্রতি মুহূর্ত্ত আমার মানস-নেত্রে প্রতিফলিত দেখিতেছি।

জোসেফ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আহা! তাঁহাদের শিশু পুত্রের কি দশা হইল?

ষ্ট্রোভিল। জানি না। আমাদের মন্ত্রণাসভায় স্থির হইয়াছিল, কাউণ্টের শিশু পুত্রটির প্রতিপালনভার পলিটস্কে গ্রহণ করিবেন; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে নিহিলিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করা হইবে। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই; আমরা শিশুটিকে হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই কাউণ্টের দাসদাসীরা গোপনে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সন্ধান পাই নাই।

এই শোচনীয় কাহিনী শেষ করিয়া ষ্ট্রোভিল এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, তাহার আর একটি কথাও বলিবার শক্তি রহিল না; সে মুদিত-নেত্রে মৃতের ন্যায় তাহার চর্ম্মশয্যায় পড়িয়া রহিল। সকল কথা শুনিয়া জোসেফ স্তব্ধভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। সে জানিত, নিহিলিষ্টরা দলপতির আদেশপালনের জন্য অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করে, কর্ত্তব্যবোধে তাহারা অনেক অন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার পৈশাচিকতা—বর্ব্বরতা ক্ষমার অযোগ্য। উঃ, কি নররাক্ষসকে সে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে! তাহার অন্তিম শয্যায় এখনও পুত্রের ন্যায় তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে! সে কি কোন দিন জানিতে পারিয়াছিল—ষ্ট্রোভিল পিশাচেরও অধম? আহা! সেই পিতৃমাতৃহীন শিশুর কি হইল? কাউণ্টের শিশুপুত্রের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বেদনায় তাহার হৃদয় টন্ টন্ করিতে লাগিল।

হঠাৎ ষ্ট্রোভিলের অস্ফুট আর্ত্তনাদে জোসেফের চেতনাসঞ্চার হইল। সে উঠিয়া ষ্ট্রোভিলের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ষ্ট্রোভিলের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে; দারুণ অনুশোচনায় যেন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল!

ষ্ট্রোভিল অতি কষ্টে জোসেফের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে অনেকবার ডাকিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার ডাক শুনিতে পাও নাই। এত কি চিন্তা করিতেছিলে, বন্ধু? এত দিন মনে হইতেছিল, মৃত্যুতেই সুখ, মরিলেই শান্তি লাভ করিব; কিন্তু মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, জানি না। যদি পরলোকে

আরও অধিক কষ্ট, অধিক যন্ত্রণা পাই, তাই এখন বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছে; কিন্তু এ আশা পূর্ণ হইবার নহে। বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। হিংস্র জন্তুর মত আমাকে সর্ব্বাপদবেষ্টিত এই গিরিগুহায় মরিতে হইল? কি কষ্ট!"

জোসেফ বিকৃতস্বরে বলিল, "কিন্তু তোমার ত বিশ্বাস হইয়াছে, পরমেশ্বর আছেন; তাঁহার দণ্ড অমোঘ! জীবনে যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছ—তাহা স্মরণ করিয়া এখন আক্ষেপ করা বৃথা! তুমি যতই পাপিষ্ঠ হও—তোমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না; তুমি এখন খানিক ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

ষ্টোভিল মুদিত নেত্রে বলিল, "হাঁ, এখন ঘুমাইব, সে নিদ্রা স্বপ্নবিহীন; সে নিদ্রা এ জীবনে আর ভাঙ্গিবে না। সেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে মানুষের নিন্দা, কুৎসা, ঘৃণা আর আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

জোসেফ আর কোন কথা বলিল না। সে নিজের চিন্তায় বিভোর হইল। অবশেষে সে ষ্টোভিলের কোন সাড়া না পাইয়া চর্ম্মশয্যায় শয়ন করিল, এবং নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শত্রু-কবলে

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে জোসেফ চতুর্দ্দিক্ নিবিড় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন দেখিল, যেন সমগ্র পার্ব্বত্য-প্রকৃতি শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত! ষ্টোভিলেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। জোসেফ তাহাকে প্রভাতে জীবিত দেখিবার আশা করে নাই; তখনও ষ্টোভিলের মৃত্যু হয় নাই দেখিয়া জোসেফ বিস্মিত হইল। ষ্টোভিলের আহত হাতখানি তখন তিন গুণ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হওয়ায় যন্ত্রণাবোধের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল, এ জন্য সে স্থিরভাবে পড়িয়া ছিল; কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তাহা দেখিয়া জোসেফ বুঝিতে পারিল—দীপনির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই।

জোসেফ তাহার মুখে এক টুকরা রুটী দিল; কিন্তু বাহির হইয়া পড়িল। তখন আর তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। জোসেফ বুঝিতে পারিল, অতঃপর তাহার আর কিছুই করিবার নাই, কিন্তু ষ্টোভিলের মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই গিরিগুহা ত্যাগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। দীর্ঘকাল ষ্টোভিলের পরিচর্য্যা করিয়া এবং সেই গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিয়া জোসেফ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার সেখানে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল এবং সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহার আহার ও বিশ্রামলাভের সম্ভাবনা ছিল না।

জোসেফ দীর্ঘকাল চিন্তার পর গিরিগুহা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপরিচ্ছেদ-বর্ণিত কয়লাওয়ালী বুড়ীর বাড়ীর দিকে চলিল। বুড়ী প্রান্তর-প্রান্তে কাঠ সংগ্রহ করিয়া সেই স্থানেই কয়লা করিত; তাহার পর কয়লাগুলি বস্তায় পূরিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। জোসেফ দূর হইতে পূর্ব্ববৎ ধূমকুণ্ডলী দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের কিছু দূরে থাকিয়া সে দেখিল, বৃদ্ধার পরিবর্ত্তে একটি পুরুষ সেখানে দাঁড়াইয়া কাঠ পোড়াইতেছে। লোকটি প্রাচীন, তাহার উপর তেমন বলবান্ও নহে। তাহা দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া জোসেফ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, সেই কয়লাওয়ালী বুড়ী তাহার স্ত্রী।—স্ত্রী? বুড়ীর বয়স অনেক বেশী! কিন্তু জোসেফ এ সংবাদে বিস্মিত হইল না, কারণ, য়ুরোপের অনেক বৃদ্ধার স্বামী যুবক।

লোকটি জোসেফকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। জোসেফ বৃদ্ধাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহাকেও তাহাই বলিল। বৃদ্ধার স্বামী জোসেফকে তাহার কুটীরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। জোসেফ তাহার প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলে, সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত কুটীরে উপস্থিত হইল। বুড়ী কুটীরে বসিয়া তখন চরকা কাটিতেছিল এবং তাহার ছেলেটা কুটীরমধ্যে চর্ম্মশয্যায় পড়িয়া ছিল। সেই যুবক জোসেফকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত স্বরে কি বলিতে লাগিল। জোসেফ তাহার কথা বুঝিতে না পারিলেও অনুমান করিল, সে তাহাকে

কয়লাওয়ালী বৃদ্ধার সহিত তাহার স্বামীরও কি কথা হইল; তাহার পর পুরুষটি জোসেফকে বলিল, "তুমি আর এক দিন এখানে আসিয়াছিলে?"

জোসেফ। হাঁ, আমি অনাহারে কষ্ট পাইতেছিলাম, কোথাও খাবার সংগ্রহ করিতে না পারায় অবশেষে এখানে আসিয়া তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে কিছু খাবার লইয়া গিয়াছিলাম।

কয়লাওয়ালা। তুমি কোথায় যাইবে?

জোসেফ। তোমাকে ত বলিয়াছি, আমি বিদেশী সদাগর, পারস্যে যাইতেছিলাম; দস্যুরা আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া, আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল; কোন কৌশলে পলাইয়া আসিয়াছি। আমার সঙ্গী তাহাদের গুলীতে আহত হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার জীবনের আশা নাই। পারস্যে আমার দুই একটি আত্মীয় আছে, আমি সেই দেশেই যাইব।

কয়লাওয়ালা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা বিশ্বাস করা কঠিন! পারস্যদেশ কি এখানে? তোমার মত যাহারা উত্তরের মুলুক হইতে আসিয়া এই পথে পারস্যে যাইবার চেষ্টা করে, তাহারা সকলেই ফেরারী আসামী, প্রহরীদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া সাইবেরিয়া হইতে পলাইয়া আসে।"

জোসেফ বুঝিল, তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই; এই জন্য মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "হুঁ, আমি সেই অঞ্চল হইতেই আসিতেছি বটে, তবে আমি ফেরারী আসামী নহি, এ কথা তুমি বিশ্বাস না করিলে আর উপায় কি?"

কয়লাওয়ালা। সঙ্গে টাকা আছে ত?

জোসেফ। দস্যুতে যাহার সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াছে, তাহার নিকট টাকা থাকিবে কিরূপে?

কয়লাওয়ালা। তোমার ও লুঠ-তরাজের গল্প আমি বিশ্বাস করি না। তোমার কাছে টাকা না থাকিলে কি আমার স্ত্রীর নিকট খাবার লইয়া তাহার মূল্য দিতে পারিতে? আমি বুঝিয়াছি—তুমি নির্ব্বাসিত কয়েদী; সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলে, প্রহরীদের ঘুষ দিয়া পলাইয়া আসিয়াছ। তোমার কাছে টাকা নাই, এ কথা দেখিতে দেখিতে—এই দেখ আমার দাড়ি-গোঁফ পাকিয়া গিয়াছে; কেহই সত্য কথা বলে না। এখন যাহা বলি, মন দিয়া শুন। যদি তুমি আমাকে দশ রুবল দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে সোজা পথে এই সীমান্ত-প্রদেশের বাহিরে রাখিয়া আসিতে সম্মত আছি। যদি না দাও, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তুমি নিজের চেষ্টায় একাকী এই প্রদেশের বাহিরে যাইতে পারিবে না, পথ হারাইয়া ভয়ানক বিপদে পড়িবে; তোমাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। এই পথে পারস্যে পলায়ন করিতে গিয়া অনেকেই মারা পড়িয়াছে।

জোসেফ মনে মনে বলিল, "এত দিন গ্রৌভিস আমার সঙ্গে ছিল, এখন আমি একাকী, পথ অতি দুর্গম, তাহার উপর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ অবস্থায় এই লোক-টিকে সঙ্গে লইতে পারিলে উহার সাহায্যে আমি নির্ব্বিঘ্নে সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করিতে পারিব; কিন্তু দশ রুবল ত আমার কাছে নাই, দেখি কত আছে।"

জোসেফ টাকাগুলি রুমালে বাঁধিয়া, রুমালখানি কোমরে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। সে রুমালখানি খুলিয়া দেখিল—সাতটি রুবল মাত্র তাহার সম্বল। সে তাহা কয়লাওয়ালাকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখ, সাতটি রুবল মাত্র আমার সম্বল; ইহাই লইয়া যদি 'সেথো' হইতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার পারিশ্রমিকস্বরূপ ইহা তোমাকে দিতে পারি।"

রুবলগুলি দেখিয়া লোভে লোকটার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাত রুবল তাহার এক মাসের উপার্জ্জন; তাহা আত্মসাৎ করিবার সুযোগ কি সে ত্যাগ করিতে পারে? সে উৎসাহভরে তাহার স্ত্রী ও পুত্রের সহিত কি পরামর্শ করিল, তাহার পর জোসেফকে বলিল, "দেখ, তুমি বিদেশী লোক, তাহার উপর বিপন্ন, টাকা না লইয়া তোমার উপকার করাই উচিত; কিন্তু তুমি ত দেখিতেছ, আমরা বড়ই গরীব, ছেলেটি রুগ্ন। সংসার প্রতিপালনের জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়; তোমার 'সেথো' হইতে হইলে তোমাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া যত দিন বাড়ী ফিরিতে না পারি, তত দিন আমার উপার্জ্জন বন্ধ; সে

রুবল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সাত রুবলের অধিক যখন তোমার সম্বল নাই, তখন আর উপায় কি? আমি ঐ টাকাতেই রাজী।"

জোসেফ বলিল, "সীমান্তপ্রদেশ পার হইতে কত সময় লাগিবে?"

কয়লাওয়ালা। পুরো পথে যাইতে হইলে সাত আট দিন; কিন্তু আমি তোমাকে এমন এক রকম সোজা পথে লইয়া যাইব যে, তিন দিনের মধ্যেই এই এলাকার বাহিরে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে; তোমার সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে। ভাল ভাল লোকের অতিথি হইবে, পথের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না।

জোসেফের মনে হইল, লোকটা একটু বেশী বাচাল; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? সুদীর্ঘ পথ, কথাবার্ত্তায় সময় কাটিবে। সে বলিল, "কবে যাইতে পারিবে?"

কয়লাওয়ালা। যে দিন তোমার খুসী যখন বলিবে, তখনই বাহির হইয়া পড়িব; আমাকে ত সে জন্য বোঁচকা বাঁধিতে হইবে না।

জোসেফ। বেশ কথা; আমি এখন চলিলাম; কবে রওনা হইতে পারিব, সে সংবাদ শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

জোসেফ কয়লাওয়ালার কুটীর ত্যাগ করিল। সে স্থির করিয়াছিল, স্ক্রোভিলের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবে না; কিন্তু স্ক্রোভিলের যে অবস্থা সে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা বড়ই আশঙ্কাজনক। সে গুহায় প্রত্যাগমন করিয়া স্ক্রোভিলকে জীবিত দেখিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

জোসেফ চিন্তাকুল চিত্তে গিরিগুহায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল—স্ক্রোভিল তখনও মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ইহাতে সে বিস্মিত, এমন কি, একটু দুঃখিত হইল। সে ভাবিল—লোকটার কি কঠোর প্রাণ! এত কষ্টেও প্রাণ বাহির হইতেছে না? যাহার জীবনের কোন আশা নাই, দিবারাত্রি দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুই প্রার্থনীয়; এ অবস্থায় জোসেফ তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু 'মড়া আগলাইয়া' আর কত দিন সে সেখানে বসিয়া থাকিবে? জোসেফ অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া স্ক্রোভিলের নাম ধরিয়া দুই তিনবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। স্ক্রোভিল শূন্য দৃষ্টিতে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না। তাহার অন্তিম মুহূর্ত্তে জোসেফ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই—ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখমণ্ডল শান্ত ভাব ধারণ করিল। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা মুমূর্ষুর নিকট যে ভাবে উপাসনা করেন, জোসেফ স্ক্রোভিলের মাথার কাছে বসিয়া সেই ভাবে উপাসনা করিয়া, তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিল। সেই প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে স্ক্রোভিলের নিষ্প্রভ নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং তাহার উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া অস্থিচর্ম্মসার বিবর্ণ কপোল সিক্ত করিল; কিন্তু সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ক্রমে তাহার চক্ষু 'ঘোলাটে' হইয়া আসিল। বক্ষের মৃদুস্পন্দন ভিন্ন জীবনের অন্য কোন নিদর্শন লক্ষিত হইল না। এই ভাবে সারা দিন অতিবাহিত হইল; সন্ধ্যার পরও সে জীবিত আছে দেখিয়া জোসেফ গুহার দ্বার-প্রান্তে চর্ম্মশয্যায় শয়ন করিল। সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, প্রভাতের পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

জোসেফ শয্যাত্যাগ করিয়া স্ক্রোভিলের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল। সে স্ক্রোভিলের প্রাণহীন দেহ চর্ম্মশয্যায় নিপতিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; রাত্রিকালে কোন্ সময় স্ক্রোভিলের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল।

জোসেফ স্ক্রোভিলের মৃত দেহের পার্শ্বে জানু অবনত করিয়া কয়েক মিনিট নিঃশব্দে প্রার্থনা করিল; তাহার পর উঠিয়া স্ক্রোভিলের চর্ম্মশয্যা দ্বারা তাহার মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিল। সে সেই গুহার বাহিরে আসিয়া কয়েক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর পদাঘাতে গুহামুখে ঠেলিয়া দিয়া গুহাদ্বার রুদ্ধ করিল।

জোসেফ যখন কয়লাওয়ালার কুটীরে প্রত্যাগমন করিল, তখনও বেলা অধিক হয় নাই। সে সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিল যে, কয়লাওয়ালাকে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সহিত যাত্রা করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু কয়লাওয়ালা বলিল, সে কতকগুলি কাঠ কাটিয়া

জন্ম না দিয়া যাইতে পারিবে না। জোসেফের পীড়াপীড়িতে সে আর কাঠ কাটিতে যাইতে পারিল না; তাহাকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

কয়লাওয়ালা একটা থলির ভিতর কয়েক প্রকার খাদ্য-সামগ্রী লইয়া থলিটা কাঁধে ঝুলাইল; কোমরবন্ধে একখানা প্রকাণ্ড ছোরা বাঁধিল, ছোরাখানা চর্ম্মনির্ম্মিত কোষে আবদ্ধ ছিল; একটা লম্বা গিঠে বন্দুক কাঁধে লইল; তাহার পর একখানা মোটা লাঠী হাতে লইয়া জোসেফকে বলিল, "চল, আমি প্রস্তুত।"

কয়লাওয়ালার পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া জোসেফের মনে সন্দেহের উদয় হইল, লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিবে কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তখন তাহার সহায়তা-গ্রহণে অস্বীকার করিতেও জোসেফের সাহস হইল না। কয়লাওয়ালা গৃহত্যাগে উদ্যত হইলে, তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া বলিল, "টাকা কোথায়, তুমি টাকা না দিলে এ কয় দিন আমরা খাইব কি?"

কয়লাওয়ালা জোসেফকে বলিল, "গিন্নী ত সত্য কথাই বলিয়াছে, তুমি আমাকে কয়লা করিবার সুযোগ দিলে না, আমাকে কয়েক দিনের মত লইয়া চলিলে; এ কয় দিন উহারা খায় কি? রুবল সাতটা বাহির করিয়া দাও, গিন্নীকে দিয়া যাইব।"

জোসেফ বলিল, "আমাকে এই এলেকার বাহিরে রাখিয়া যখন ফিরিয়া আসিবে, তোমার মজুরী সেই সময়ে পাইবে। কাম শেষ না করিয়া আগেই মজুরী চাহিতেছ? এখন কেন দিব? তাহা ত অগ্রিম দেওয়ার কথা নাই।"

কয়লাওয়ালা রাগ করিয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া পড়িল; জোসেফকে বলিল, "টাকা না দিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না; ইচ্ছা হয়, তুমি একাকী যাইতে পার; কিন্তু তোমাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। আজ রাত্রেই পাহাড়ে নেকড়ের দল তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইবে; না হয়, সীমান্তের প্রহরীরা তোমাকে ধরিয়া আবার সাইবেরিয়ায় পাঠাইবে। তুমি যাইতে পার।"

কয়লাওয়ালার কথা শুনিয়া জোসেফ ভীত হইল, এবং আর কোন আপত্তি না করিয়া রুবলগুলি কয়লাওয়ালার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া কুটীর ত্যাগ করিল; জোসেফ নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

তাহারা নির্ব্বাক্‌ভাবে পাহাড়ের ধারে ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যাসমাগম হইল; পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রালোকে তাহারা নিভৃত দুর্গম পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইল। অবশেষে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তাহারা একটি সঙ্কীর্ণকায়া বেগবতী পার্ব্বত্য-নদীর তীরে উপস্থিত হইল।

কয়লাওয়ালা বলিল, "আজ এখানেই বিশ্রাম করিতে হইবে। এখান হইতে নদীর ধারে ধারে যাইতে হইবে। সম্মুখেই দুর্গম অরণ্য, সেই অরণ্যে নেকড়ের পাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রিকালে সে দিকে যাইলে বিপদ ঘটিতে পারে। ঐ গাছের তলায় আমরা আগুন জ্বালিয়া রাত্রিবাস করিব।"

জোসেফকে তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। কয়লাওয়ালা নদীতীরস্থ বৃক্ষমূলে আগুন জ্বালিয়া শুষ্ক শূকরমাংস ঝলসাইতে লাগিল। অগ্নিকুণ্ডের অগ্নির আলোকে কয়লাওয়ালার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার মুখকান্তি অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জোসেফের মন আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইল, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে—তাহা হইলে জোসেফ কি কৌশলে আত্মরক্ষা করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

আহারান্তে কয়লাওয়ালা নৈশ উপাসনা শেষ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে চর্ম্মশয্যা প্রসারিত করিল; সে তাহাতে শয়ন করিয়া জোসেফকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু জোসেফ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না; তাহার আশঙ্কা হইল—সে নিদ্রাভিভূত হইলে দুর্দ্দান্ত কসাকটা ছোরা দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করিবে!—জোসেফ শয়ন না করিয়া চর্ম্মশয্যায় বসিয়া রহিল। কয়লাওয়ালা শয়নের অব্যবহিত পরেই গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল, এবং বন্যজন্তুর গর্জ্জন ধ্বনিবৎ তাহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। জোসেফ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল; রাত্রিজাগরণের ইচ্ছা থাকিলেও ঘুমঘোরে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিল। ঘণ্টাখানেক সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিল, তাহার পর চর্ম্মশয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতে

পরদিন প্রভাতে কয়লাওয়ালার আহ্বানে জোসেফের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। জোসেফ জাগিয়া দেখিল, কয়লাওয়ালা ছুরিকাঘাতে তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করে নাই বরং তাহার জন্য এক পেয়ালা চা ও কয়েকখণ্ড রুটী রাখিয়া দিয়াছে। তখন জোসেফের মনে হইল—লোকটার কোন দুরভিসন্ধি নাই, তাহাকে সন্দেহ করা অন্যায় হইয়াছে।

দুর্গম ও বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে সে দিন তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না; পথের অবস্থা দেখিয়া জোসেফ বুঝিতে পারিল—পথিপ্রদর্শকের সাহায্য ভিন্ন একাকী সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করা তাহার অসাধ্য হইত।

তাহারা আরও তিন দিন এই ভাবে চলিয়া, তৃতীয় দিন সায়ংকালে একটি হ্রদের ধারে উপস্থিত হইল। সেখানে লোকালয়ের কোন চিহ্ন ছিল না সেই স্থানে রাত্রিযাপনের উদ্দেশে কয়লাওয়ালা শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিল। এই কয় দিনে তাহার ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রতি জোসেফের অবিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়াছিল। কয়লাওয়ালা হ্রদের তীরে নৈশ-ভোজনের আয়োজন করিয়া জোসেফকে বলিল, "আমরা আমাদের এলাকার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি; কা'ল তোমাকে তুর্কিস্থানের সীমায় ছাড়িয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিব। তুর্কিস্থানে প্রবেশ করিলে আর তোমার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।" এই সংবাদে জোসেফ আনন্দিত হইল; তাহার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

নৈশভোজন শেষ হইলে কয়লাওয়ালা জোসেফকে বলিল, "দেড় ক্রোশ তফাতে একখানি ছোট গ্রাম আছে, সেখানে আমার কয়েক জন আত্মীয়ের বাস; বহু দিন তাহাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই; তাহাদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাইব; থলিটাও লইয়া যাই, কিছু খাদ্যসামগ্রীও লইয়া আসিব। যে কিছু সম্বল সঙ্গে ছিল, তাহা ত ফুরাইয়া গেল। আমি কা'ল প্রত্যূষেই ফিরিয়া আসিব; তুমি শুইয়া ঘুমাও, কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

কয়লাওয়ালা প্রস্থান করিলে জোসেফ চর্ম্মশয্যায় শয়ন করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রিশেষে জনকোলাহলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সভয়ে শয্যায় উঠিয়া বসিল; অগ্নিকুণ্ডের অগ্নির নির্ব্বাপিত-প্রায় আলোকে তাহার শয্যার অদূরে কয়েকটি দীর্ঘকায় মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে তাহাদিগকে দস্যু সন্দেহে লাফাইয়া উঠিয়া পিস্তল তুলিল; কিন্তু গুলী চালাইবার পূর্ব্বেই সেই লোকগুলি তাহাকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। সে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই তাহাদের হস্তে বন্দী হইল।

জোসেফ রজ্জুবদ্ধ হইবার পর তাহার আততায়িগণের বেশ-ভূষা দেখিয়া বুঝিতে পারিল, তাহারা দস্যু নহে; সীমান্তপ্রদেশে সংরক্ষিত কসাক সৈন্য। সে রুস গবর্ণমেণ্টের সৈন্যহস্তে বন্দী! তীরে আসিয়া তরী ডুবিল; আবার তাহাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইতে হইবে! জোসেফের চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইল।

কয়লাওয়ালা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি আমার ছেলেকে গুলী করিয়া মারিতে চাহিয়াছিলে, স্মরণ হয় কি? আর তোমার কোন চিন্তা নাই; এখন তুমি চোখ বুজিয়া তোমার মোকামে পৌঁছিতে পারিবে। আমার কায শেষ হইয়াছে, এখন আমার ছুটী।"

বিশ্বাসঘাতক কয়লাওয়ালা কিঞ্চিৎ পুরস্কারের লোভে কসাক সৈন্যদের ডাকিয়া আনিয়া জোসেফকে ধরাইয়া দিল। জোসেফ বুঝিতে পারিল, আর তাহার নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "পরমেশ্বর, সত্যই কি তুমি আছ?"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভ্রান্তি

আমি বুঝিয়াছি ভুল, করিয়াছি ভুল, হয়েছি আকুল নিরাশায়,
শুধু কোনমতে, রয়েছি জগতে, একান্ত তোমার ভরসায়।
তুমি কত দিন এসে, মৃদু মধু হেসে, বলিয়াছ মোরে কত কি,
আমি কিছু শুনি নাই, শুকাইছে তাই চিত্ত-কানন-কেতকী।



জম্বীর শ্রেণীয় ফল-মূলক শিল্প

জম্বীর অথবা জামীর যে উদ্ভিদ্‌বর্গের অন্তর্গত, উহাকে রুটাসি (Rutaceae) বলা হইয়া থাকে। উক্তবর্গীয় বৃক্ষাদির সাধারণ লক্ষণ এই যে, উহাদের পত্রে অল্প-বিস্তর স্বচ্ছ তৈলগণ্ড (Oil glands) আছে। জামীর, পাতি, কাগজী, কমলা, বাতাবী প্রভৃতি সমস্ত লেবুই সাইট্রাস (Citrus) গণের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের পত্র ব্যতীত ফুল ও ফলত্বকেও সুগন্ধযুক্ত বায়ী তৈল রহিয়াছে। Citrusগণের মোট সাতটি জাতীয় গাছের দুইটি অষ্ট্রেলিয়াবাসী এবং পাঁচটির আবাসভূমি এসিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলে। শেষোক্তের মধ্যে কামকোয়াট (C. Japonica) এবং বাতাবী (C. Decumana) বাদ দিলে অবশিষ্টগুলির উৎপত্তি ভারতে হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। ভারত হইতেই যে নানা জাতীয় লেবু আরবগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-য়ুরোপে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু ভারত এই সমস্ত লেবুর জন্মস্থান ও পৃথিবীর নানা স্থানে লেবু-চাষ প্রচারের আদি কেন্দ্র হইলেও বর্ত্তমান সময়ে লেবুজাত নানাপ্রকার দ্রব্যাদির শিল্পে ইহা নিতান্তই পশ্চাৎপদ। ভূমধ্যসাগরের তটদেশ ও সিসিলি দ্বীপ জম্বীর-চাষে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ পাতি-শ্রেণীর লেবু উৎপাদনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উক্ত দেশসমূহ লেবু ও লেবু-জাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করিয়া যে প্রচুর ধনলাভ করে, ভারত তাহার একাংশও পায় না; ভারত হইতে এই প্রকার দ্রব্যের রপ্তানী একবারেই নাই; বরং সামান্য পরিমাণে অষ্ট্রেলীয় লেবুর আমদানী আছে।

নানা জাতীয় লেবু

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কতিপয় জাতীয় লেবুর উল্লেখ দেখিতে Materia Medica নামক পুস্তকে কয়েকটি জাতির বৈজ্ঞানিক নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সকলগুলিই যে সঙ্গত, তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক, ব্যবসায়ের হিসাবে আলোচনা করিলে ভারতজাত চারি জাতীয় লেবুর মধ্যে দুইটি বাদ দিলেও চলে— অর্থাৎ বাতাবী লেবু এবং খাসিয়া-পর্ব্বতবাসী C. Hystrix নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র বন্য লেবু। যে সমস্ত লেবুর বহু বিস্তৃত চাষ করিয়া জগতের নানা দেশে ব্যবসায় চলিতেছে, সেগুলি কমলা লেবু ও সাধারণ লেবুর অন্তর্গত। এ স্থলে এই দুইটি জাতিরই বিশেষরূপ আলোচনা করা হইতেছে।

কমলালেবু

কমলালেবুর উৎপত্তি ভারত অথবা চীনে হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতে বন্য কমলা-লেবু বহুকাল হইতে রহিয়াছে এবং ইহার সংস্কৃত নাম 'নাগরঙ্গ'ও নিতান্ত আধুনিক নহে। ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে, কমলালেবুর উৎকর্ষ-সাধন প্রথমতঃ চীনদেশেই হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজরা তথা হইতে গাছ লইয়া গিয়া নিজ দেশে চাষ করে এবং লিসবনের নিকটবর্ত্তী সিন্ত্রা (Cintra) উপত্যকা উৎকৃষ্ট লেবু উৎপাদনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হইয়া উঠে। পর্ত্তুগীজগণ এই লেবু আনিয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতে প্রবর্ত্তন করে। তাহা হইতেই মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশোৎপন্ন কমলা-লেবু 'সান্তারা' নাম লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, আজকাল ভারতের মধ্যে যে সমুদয় কেন্দ্র কমলা-লেবু চাষের জন্য বিখ্যাত, তন্মধ্যে বোম্বাই, নাগপুর, দার্জ্জিলিঙ্গের নিম্নদেশ, শ্রীহট্ট ও খাসিয়া পর্ব্বতই অন্যতম। স্থান ও প্রকারভেদে কমলা-লেবুর স্বাদ, গন্ধ, আকৃতি ও ওজনের তারতম্য হইয়া থাকে। সমতল দেশজাত যে ক্ষুদ্র জাতীয় কমলালেবু পাওয়া যায়, তাহাকে অনেক স্থলে 'নারাঙ্গি' বলে।

পরিমাণে মাড়োয়ারীগণের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গদেশের পক্ষে এই উক্তি বিশেষরূপ প্রযুজ্য। শ্রীহট্ট ও আসামের অন্যস্থানজাত লেবু মাড়োয়ারী মহাজনগণ বহুল পরিমাণে ক্রয় করিয়া আবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণকে বিক্রয় করে এবং তাহারা উক্ত লেবু বাজারে চালান দেয়। ফল বাছাই, উত্তম প্যাকিং এবং উপযুক্ত ব্যবস্থায় সত্বর চালানের অভাবে অনেক লেবু নষ্ট হয় এবং রেল অথবা নৌকাপথ হইতে সুদূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে ফসলের কিয়দংশ বাজারে আইসে না। আধুনিক প্রণালী প্রয়োগ পূর্ব্বক আসাম হইতে লেবু চালানের কার্য্যে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টাটকা কমলা লেবু ব্যবসায়ের যথেষ্ট পরিসরবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

উপর প্রচুর আলোক ও বায়ুপ্রবাহযুক্ত স্থানে শুষ্ক করিয়া লইলে উহার বর্ণ এবং গন্ধ অবিকৃত থাকে, অধিকন্তু বাজারে উপযুক্ত দরেও বিক্রয় হয়। লেবু উৎপাদনের অথবা চালানের কেন্দ্রে এই কার্য্য চলিতে পারে।

খোসার তৈল ব্যতীত কমলালেবুর ফুল হইতেও সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়; উহাই সুপ্রসিদ্ধ বহুমূল্য নিরোলি তৈল (Oil Neroli)। নিমজ্জন (Maceration) প্রথা দ্বারাই উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়; জলের সহিত ফুল দিয়া চোঁয়াইলেও ঘনীকরণ (condensor) পাত্রে জলের উপর নিরোলি তৈলের স্তর পড়ে। উহা কিন্তু নিমজ্জন প্রণালব্ধ তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যদিও এই প্রথায় সুবাসিত জলও (Orange flower water) পাওয়া যায় এবং তাহা ঔষধ প্রস্তুত ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এ

কমলালেবু-সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে তিনটি প্রধান—গাঢ়রস, খোসা ও তৈল প্রস্তুত। কমলালেবু শুধু খাইতেই যে রসনাতৃপ্তিকর, তাহা নহে; ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন থাকায় ইহা পুষ্টির সহায়তা করে; সেই জন্য বালক-বালিকাগণকে ইহার রস খাইতে দেওয়া হয়। গাঢ় রস (Concentrated juice) বায়ুপ্রবেশরুদ্ধ পাত্রে ফুটাইয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলে উক্ত রস অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। কমলালেবুর ফলত্বকে যে তৈল আছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন; খোসার সদগন্ধ এই তৈলজনিত। ঔষধপ্রস্তুতে, রন্ধনকার্য্যে, মিষ্টান্নাদি পাকে ও গন্ধ প্রস্তুতে কমলালেবুর খোসার অনেক চাহিদা আছে। শুষ্ক খোসার মূল্যও নিতান্ত কম নহে—প্রায় ২০।২৫ টাকা মণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ভাল খোসা পাওয়া যায় না। খোসার ভিতরদিকের শ্বেতাভ স্তর কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কার করিয়া মৃত্তিকা হইতে দেড় অথবা দুই হস্ত ঊর্দ্ধে দরমার মাচানের



মিষ্ট কমলালেবু



তিক্ত কমলালেবু

স্থলে বলা আবশ্যক যে, কমলালেবুর একটি 'ভেদ' (variety) আছে, যাহার নাম Bigaradia—উহা তিক্ত; এই তিক্ত কমলারই ফলত্বক্ ও ফুল যথাক্রমে খোসার তৈল ও নিরোলি প্রস্তুতের জন্য সমধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়। ইতালী ও স্পেনদেশে তিক্ত কমলালেবু বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশে নীলগিরি পর্ব্বতেও তিক্ত কমলালেবুর বন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। গন্ধ-জগতে যাহাকে পেটিট গ্রেণ (Petit grain) তৈল বলে, তাহা নানা প্রকারের লেবুর পত্র ও অপক্ব ফলত্বক্ চোঁয়াইয়া পাওয়া যায়; কমলালেবুজাতি এই সমস্ত

দ্রব্যের মধ্যে কোনটিই এতদ্দেশে প্রস্তুত হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

পাতি-জাতীয় লেবু

জামীর ও পাতি, কাগজি প্রভৃতি লেবু Citrus Medica জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতির ৫টি ভেদ দৃষ্ট হয়,—

(১) C. Medica proper,—ইহার সংস্কৃত নাম মহালঙ্গ। সাধারণতঃ ইহা তুরঞ্জ অথবা Citron বলিয়া পরিচিত। গারো পর্ব্বতে ইহার বন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভারতের নানা স্থানে ইহা বাগানেও চাষ হইয়া থাকে। গাছ দেখিতে হরিদ্রাভ; ফল বৃহৎ, ওজনে দেড় সের পর্য্যন্ত হয়, ত্বক পুরু, অমসৃণ এবং সুগন্ধযুক্ত। ইহার খোসায় আচার প্রস্তুত হয়।

(২) Var. Limonum,—জম্বীর, অম্লজামীর—আপাততঃ ইহার ব্যবহার প্রায় নাই এবং চাষের অভাবে ফলও নিতান্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল কমলা-লেবুর



জামীর

'চোখ' কলম প্রস্তুত করার জন্য ইহার চারা ব্যবহৃত হয় এবং সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও অন্যান্য স্থানে অসভ্য জাতিরা জামীর-রস সহযোগে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে। অনেকে গোঁড়া লেবুকে জামীর বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। জামীরের আয়তন প্রায় গোঁড়া লেবুর ন্যায় হইলেও উহার ত্বক্ পাতলা ও আলগা।

(৩) Var. Lumia.—মিষ্ট জামীর—ইহা পূর্ব্বোক্ত জাতি অপেক্ষা বিরল; ত্বক অমসৃণ ও 'বুটি'যুক্ত। শাঁস মিষ্ট, কিন্তু গন্ধহীন। উভয় প্রকার জামীর কুমায়ুন অঞ্চলে বন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) Var. Acida—Sour Lime,—ইহাই আমাদের সুপরিচিত সাধারণ লেবু; ইহার কতিপয় উপভেদের (sub-varieties) মধ্যে কাগজি ও পাতি বঙ্গদেশে বিশেষ পরিচিত। টাবা, চীনা, সরবতি প্রভৃতি ভেদও বাজারে সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি সমস্তই অম্লরসযুক্ত।

(৫) Var. Limetta—Sweet Lime,—মিঠা লেবু, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা মধু-কর্কটিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ইহা বন্য অবস্থায় দৃষ্ট হয়; অন্যত্র কর্ষিত। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রসিদ্ধ বার্গামট তৈল (Oil Bergamot) মিঠা লেবুর ফলত্বক্ হইতে প্রস্তুত হয়।

Citrus Medica জাতীয় উক্ত কয়েক প্রকার লেবু ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বন্য অথবা কর্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। স্বাদ ও গন্ধের বিশিষ্টতায় কোন কোন স্থানের লেবু—যেমন জৌনপুর ও আজিমগঞ্জের পাতি লেবু সুবিখ্যাত, পঞ্চনদের জলন্ধর, সিরহিন্দ প্রভৃতি স্থানের গোঁড়া লেবুরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কিন্তু মোটের উপর মিষ্ট ও অম্লজামীরের (Lemon) স্থানবিশেষে খুব প্রাচুর্য্য থাকিলেও ইহাদের অতি সামান্যই কাটতি আছে। জামীর-চাষ ভারতে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। জামীর ও পাতি লেবুর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। জামীর অপেক্ষা পাতি লেবু ছোট। পক্ষান্তরে, জামীর ফলের ওজনের অনুপাতে রসের মাত্রা শতকরা ৩৭·৫ এবং পাতি লেবুতে ৫৯·০ ভাগ; প্রতি ১ শত কিউবিক সেন্টিমিটার জামীর-রসে ৪·৫ গ্রাম এবং পাতি লেবুর রসে ৫·৭ জম্বীরাম্ল (Citric acid) পাওয়া যায়; জম্বীরাম্ল প্রস্তুতের জন্য জামীর ও পাতি উভয় লেবুর রসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চাষের উন্নতি

বর্ত্তমান সময়ে জামীরের চাষ প্রায় নাই; পাতি-জাতীয় লেবু কিন্তু সমধিক মাত্রায় উৎপাদিত হয়। ভারতের সকল প্রদেশেই লেবু-ব্যবসায় ও শিল্পের প্রধান অন্তরায় এই যে, কোন এক স্থানে কচিৎ বহু বিস্তৃত চাষ (Plantation) দেখা যায়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে কেবল হুগলীর সন্নিহিত সুগন্ধ্যা গ্রামেই লক্ষাধিক পাতি-লেবুর গাছ আছে। অন্যান্য প্রদেশেও লেবুর বড় বড়

বাগিচা বিরল। সাধারণ বাগানের গাছ হিসাবে প্রায় প্রত্যেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাটীতে ২।৪টি লেবু-গাছ আছে। ফোড়েরা সে সমুদয় বাগান হইতেও লেবু সংগ্রহ ও একত্র করিয়া বাজারে আনে, কিন্তু তাহাতে মাল নির্দিষ্ট শ্রেণীর হয় না এবং পরিমাণেরও ন্যূনতা হয়। জামীর (Lemon) এবং পাতি-কাগজী (Lime) ইত্যাদি লেবুর উৎকৃষ্ট জাতি ভারতে জন্মান খুবই সম্ভবপর এবং এতদ্দেশে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে উভয় প্রকার লেবুরই ক্রোশব্যাপী বাগিচা প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু যত দিন না তাহা হইতেছে, তত দিন লেবুজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের বিশেষ সুবিধা হইবার আশা নাই,—যদিও বর্ত্তমান বাজার-প্রাপ্ত মাল লইয়া দুই একটি লেবুমূলক শিল্প ক্ষুদ্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সিসিলি দ্বীপ জামীর-চাষে সর্ব্বাগ্রগণ্য। সেই জন্য তদ্দেশের চাষ-প্রণালী অধ্যয়ন-যোগ্য। উৎকৃষ্ট-জাতীয় জামীর উৎপাদন করিতে হইলে পাতি-লেবুর চাষ অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হয়। দেশীয় জামীর খুবই কষ্ট-সহিষ্ণু গাছ; বিলাতী জামীর আনিয়া ইহার সহিত কলম বাঁধিলে, যেমন এক দিকে ফলের উৎকর্ষতা সাধিত হইবে, তেমনই অন্য দিকে খাস বিলাতী গাছ অপেক্ষা এইরূপ সঙ্করগাছ আমাদিগের জলবায়ুর অধিক উপযোগী হইবে। সিসিলিতে সাধারণ বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া চারা ক্ষেত্রে (nursery) তিন বৎসর রাখা হয়; তৎপরে ক্ষেত্রে তুলিয়া বসাইলে গাছ ফলপ্রসবক্ষম হইতে আরও তিন বৎসর লাগে। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে জল-সেচন এবং তুষারপাতের ভয় থাকিলে তাহা হইতে গাছগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা উচিত। ধারাবাহিকরূপে উন্নতি সাধিত হওয়ায় সিসিলিতে ফলনের হার খুব অধিক দাঁড়াইয়াছে। প্রতি গাছে গড়ে ৫ শত ৮০টি লেবু হয় এবং এক একর (প্রায় সাড়ে তিন বিঘা) জমীতে ২৭ হাজার ৪ শত ৬০ পাউণ্ড (৮২ পাঃ = ১ মণ) লেবু উৎপাদিত হইয়া থাকে। উক্ত পরিমাণ লেবু হইতে ১০ হাজার ৫ শত ৬০ পাউণ্ড রস এবং রস হইতে ৬ শত ৩৪ পাউণ্ড জম্বীরাম্ল ও ৮৮ পাউণ্ড বাষ্পী তৈল পাওয়া যায়। দেশীয় জামীর সম্বন্ধে এইরূপ কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, কিন্তু মেদিনী-করিয়া যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে উৎপাদনের হার সিসিলির অনুপাতে দুই-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। বন্ধুর অনুর্ব্বর জমীতে অবশ্য ইহা অপেক্ষা অধিক ফসল আশা করা যায় না। সিসিলি দ্বীপে যে সমস্ত বাগিচা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সেগুলির মৃত্তিকা সরস, সারযুক্ত এবং দোঁয়াস শ্রেণীর।

পাতি, কাগজী প্রভৃতি লেবু চাষের জন্য তত উৎকৃষ্ট জমী আবশ্যক হয় না। সাধারণ অল্পসারযুক্ত ডাঙ্গা জমীতে উক্ত প্রকার লেবুচাষ করা চলে। ব্যবসায়ের জন্য উৎপাদন করিতে হইলে উপযুক্ত প্রকারের লেবু নির্ব্বাচন করিয়া একত্রে অন্ততঃ ৫ বিঘার এক একটি ক্ষেত্র রচনা করা আবশ্যক। সকল প্রদেশেই এইরূপ বাগিচা প্রতিষ্ঠার স্থান পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে এইগুলির উপর নজর রাখিলেই চলিবে যে, বৎসরে মোট বারিপাত ৮০ ইঞ্চির কম না হয়; সময়ে বারিপাত হইলে ৬০ ইঞ্চিতেও চলিতে পারে, উত্তাপ ৮০° ডিগ্রী ফারেণহিট্ হইলেই যথেষ্ট; তদ্ভিন্ন জল-নিকাশের যেন ভাল বন্দোবস্ত এবং প্রবল বায়ুপ্রবাহরোধ করিবার জন্য সন্নিকটে উচ্চ তরুশ্রেণী থাকে। গুটি অথবা চোখ কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত করিলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পসময়ের মধ্যে ফসল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বড় বড় বাগিচায় সেরূপ প্রথা অবলম্বন করিলে যথেষ্ট ব্যয়বাহুল্য হয়। সেরূপ স্থলে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। ক্ষেত্রে বসাইবার সময় প্রত্যেক চারার চতুর্দ্দিকে ১৫ ফুট ব্যবধান রাখা দরকার। সতেজ গাছ হইলে একই গাছ হইতে ৪০ বৎসর ফসল পাওয়া যাইতে পারে; অবশ্য উপযুক্ত চাষ ব্যতীত এরূপ ফসল হয় না। লেবুর ফুল সাধারণতঃ ফাল্গুনমাসে হইয়া থাকে এবং আষাঢ়মাস হইতে ফল হইতে আরম্ভ হয়; বিভিন্ন শ্রেণীর লেবুতে রস ও রসে জম্বীরাম্লের পরিমাণ নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	ফলনের সময়	রস, লেবু প্রতি কিউবিক সেণ্টিমিটর	জম্বীরাম্ল শতকরা হিঃ
টাবা	কার্ত্তিক	১০০	৬.৩
চীনা	শ্রাবণ	৪০–৫০	৬.৫
কাগজী	আষাঢ়	১৮–২৫	৬.৪
পাতি	ঐ	১০	৭
গোঁড়া	ভাদ্র	৪০–৫০	৫.৩

এক একর জমী হইতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ২৪ হাজার পাউণ্ড লেবু পাওয়া যায়; উক্ত পরিমাণ লেবু হইতে ১১ হাজার ৫ শত পাউণ্ড রস এবং রস হইতে ৯ শত ১৪ পাউণ্ড জম্বীরাম্ল ও ৬৫ পাউণ্ড বায়ী তৈল প্রস্তুত হয়।

পাতিলেবু-চাষ সম্বন্ধে আরও জানিয়া রাখা উচিত যে, উহাদের মূলসমূহ জমীর উপরিভাগের সন্নিকটেই থাকে এবং সেই জন্য লেবুক্ষেত্রে কোন বহুপ্রসবী ফসল উৎপাদন করা অনুচিত। যে সকল সজী অল্পসময়ের মধ্যেই উঠিয়া যায়, তৎসমুদয়ই চাষ করা যাইতে পারে। আগাছা নিড়াই ও শুষ্ক এবং নিস্তেজ শাখাপ্রশাখাদি কর্ত্তন করা বাগিচার অন্যতম কায। বাগিচা সহরের নিকটবর্ত্তী হইলে সহরের আবর্জ্জনাজাত সার প্রয়োগই ভাল; নতুবা শণ, ধঞ্চে প্রভৃতির সবুজ সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কমলালেবুর যেরূপ মূল অনাবৃত করা আবশ্যক হয়, পাতিলেবুচাষে তাহা সচরাচর দরকার হয় না, কিন্তু গাছ যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্প প্রসব না করিলে, কিংবা অপুষ্ট ফল ঝরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে ন্যূনাধিক এক মাসকাল জলসেচন বন্ধ রাখিয়া, তৎপরে মূল অনাবৃত করিয়া সার প্রয়োগ পূর্ব্বক পাইট করিলে গাছগুলি আবার প্রকৃতিস্থ হয়।

পাতিলেবুজাত দ্রব্যাদি

জগতের পাতিলেবু-চাষের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রে অর্থাৎ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে লেবু ব্যতীত লেবুজাত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও প্রস্তুত হয় ও তথা হইতে বহুল পরিমাণে বিদেশে চালান যায়,—

১। **টাট্‌কা লেবু**—গাছ হইতে তুলিবার পর বায়ুপ্রবাহযুক্ত গুদামে লেবুগুলি কতিপয় দিবস রাখা হয়, তাহাতে ফলত্বকের জলীয়াংশ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পায় এবং চালানের সময় ফল খারাপ হইয়া যায় না। উক্তরূপ ফলকে আয়তন অনুসারে বাছিয়া, কাগজে মুড়িয়া এবং বায়ুপ্রবেশরন্ধ্রযুক্ত পিপায় প্যাক করিয়া চালান দেওয়া হয়। এতদ্দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই; কাযেই অনেক ফল পচিয়া নষ্ট হয়।

২। **লেবুর আচার**—বাগিচাওয়ালাগণ সাধারণতঃ কারখানা আছে এবং প্রণালীও নানারূপ। মার্কিণ বাজারে বহুল পরিমাণে যে আচার বিক্রয় হয়, তাহা আমাদের লেবুর আচার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টতর।

৩। **কাঁচা রস**—১ শত ৬০ পাউণ্ড লেবু হইতে ৯৫ পাউণ্ড রস পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ফলে কার্য্যতঃ তাহা না হইয়া গড়ে ৭৫ পাউণ্ড রস পাওয়া যায়। রসের প্রতি ১০ পাউণ্ডে ১২½-১৪ আউন্স জম্বীরাম্ল থাকে। উৎকৃষ্ট কাঁচা রস অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত রঞ্জনশিল্পে আবশ্যক হয়; ইহার বর্ণ উজ্জ্বল হরিতাভ এবং ইহাতে অতি সামান্য পরিমাণেই ফলের শাঁস ও তৈল দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দ্রব্যটি রস-সংরক্ষণের সহায়তা করে। রসকে কোন প্রকারে লৌহসংস্পর্শে আসিতে দেওয়া হয় না।

৪। **গাঢ় রস**—জম্বীরাম্ল-প্রস্তুতকারকগণের সুবিধার্থ ইহা তৈয়ারী করা হয়। কাঁচা রসকে জ্বাল দিয়া এরূপ মাত্রায় গাঢ় করা হয় যে, প্রতি ১০ পাউণ্ডে ৬৪—১ শত আউন্স জম্বীরাম্ল থাকিতে পারে। ইহা দেখিতে অনেকটা ঝোলাগুড়ের মত। এইরূপ রস পিপা করিয়া বিদেশে চালান যায়। প্রতি পিপায় ১ হাজার ৮০ পাউণ্ড রস থাকে এবং এক একটি পিপা প্রায় ৩ শত ১৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়।

৫। **পানীয় রস** কমলালেবুর রসের ন্যায় পাতিলেবুর রসেও ভাইটামিন থাকায় ইহা স্কার্ভি প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদানের অভাবজনিত রোগে (Defeciency disease) বিশেষ ফলপ্রদ। বিশেষতঃ নাবিকগণের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক। বিশেষ প্রথায় রস নিষ্কাশিত ও সংরক্ষিত করিয়া পানীয় রস তৈয়ারী করা হয়। পানীয় রস অথবা lime juiceএর যথেষ্ট কাটতি আছে। পরলোকগত ডাক্তার কানাইলাল দে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় lime juice প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে অনেক লোক ইহা প্রস্তুত করিতেছে। সাধারণতঃ পাতি অথবা অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করা লেবু হইতেই এতদ্দেশে রস প্রস্তুত হয়।

৬। রস-চূর্ণক (Citrate of Lime)। ফুটন্ত রসে অসিক্ত চূণ ফেলিয়া দিলে চূণ বড় বড় চাপ বাঁধিয়া অধঃস্থ হয়। উহা জলে ধুইয়া শুষ্ক করা হইয়া থাকে; এই

Citrate of lime পাওয়া যায়। ইহা হইতেও জম্বীরাম্ল প্রস্তুত হয়।

৭। বারী তৈল। হস্ত দ্বারা চাপ দিয়া অথবা চোলাই করিয়া এই তৈল নিষ্কাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রথায় ১ শত ৬০ পাউণ্ড লেবু হইতে ২ আউন্স এবং শেষোক্ত প্রথায় ১ হাজার পাউণ্ড কাঁচা রস হইতে ৪ পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায়। তৈল খুব সতর্কতার সহিত উৎকৃষ্ট টিনের কেনেস্তারা করিয়া চালান দেওয়া হয়। কেক্, বিস্কুট, মিষ্টান্ন ও প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রস্তুতে লেবু-তৈলের ব্যবহার আছে। চোলাই করা অপেক্ষা হস্ত-নিষ্কাশিত তৈলের মূল্য অনেক অধিক। যথাক্রমে গড়ে প্রায় পাউণ্ড প্রতি ২৲ টাকা ও ১২৲ টাকা।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের এক একটি দ্বীপ হইতেই ২৫।৩০ লক্ষ টাকার লেবু ও লেবুজাত দ্রব্যাদি আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে চালান যায়। সুতরাং ইহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ লেবু ফসল হইতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। কমলালেবু চাষের পক্ষে অনেক স্থান উপযুক্ত না হইতে পারে; বর্ত্তমান সময়ে যে নিকৃষ্টজাতীয় জামীর দেশে পাওয়া যায়, তাহা লইয়া ব্যবসায় চলে না এবং উন্নত শ্রেণীর জামীর উৎপাদনও প্রচুর সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ; কিন্তু পাতি, কাগজী প্রভৃতি লেবুর বহু বিস্তৃত চাষ ও উৎপন্ন ফসলকে শিল্পে প্রয়োগ যে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব্যাপার, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। চেষ্টা করিলে ভারতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সর্ব্বপ্রকার লেবুমূলক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা আদৌ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহার ভিত্তি লেবু-চাষ কেন্দ্রীভূতকরণ। যদি উদ্যোগী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় উত্তরোত্তর ফসলের উন্নতিসাধন করেন, তাহা হইলে লেবু-শিল্প ভারতে গঠিত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।



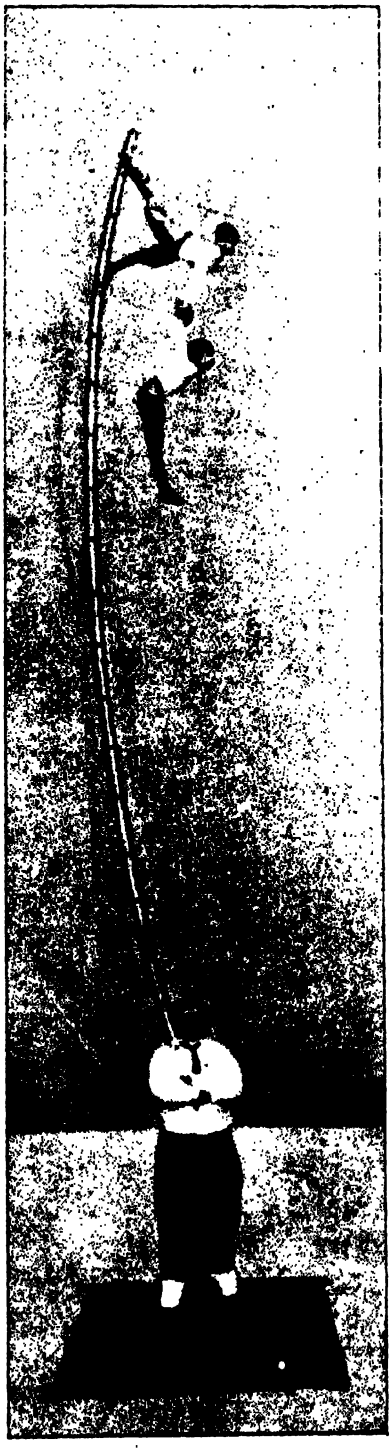
ব্যায়াম-বীর মাষ্টার বসন্ত

বঙ্গবীর মাষ্টার বসন্ত ব্যায়ামাচার্য্য গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেণিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির ছাত্র। এই সমিতি আজ পঞ্চবিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।

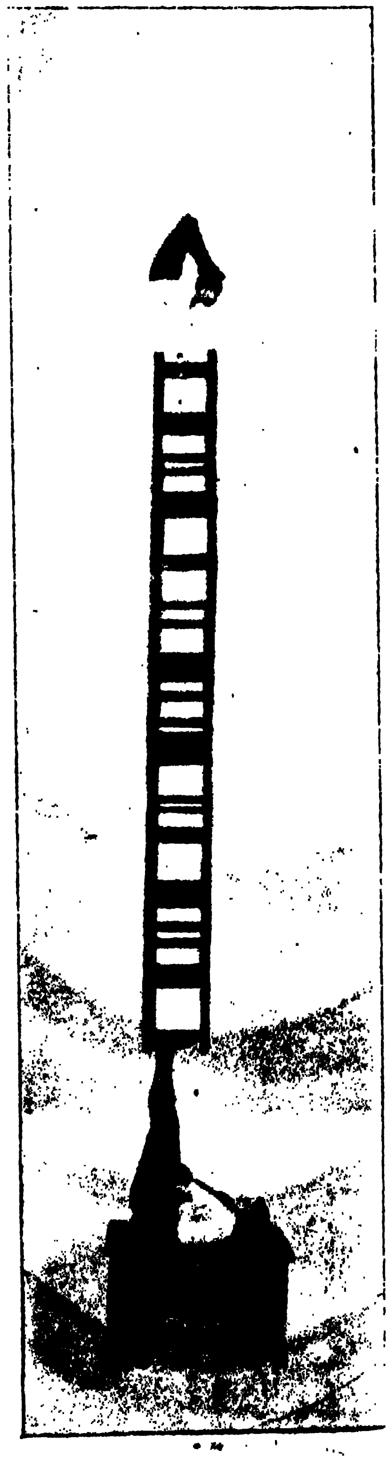
ব্যায়াম-বীর মাষ্টার বসন্ত যে সকল ক্রীড়া অভ্যাস করিয়াছেন এবং যে সকল নব নব ক্রীড়া বহু চেষ্টায় অভ্যাস করিতেছেন, তাহা ব্যায়াম-জগতে বিরল। সম্প্রতি তিনি কতকগুলি ক্ষমতাপরিচায়ক ক্রীড়া অভ্যাস করিয়াছেন। একই দিকে ধাবমান দুইখানি মটরগাড়ীর গতিরোধ, একখানি ৩০ মণ ওজনের প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড বক্ষোপরি ধারণ করত তাহার উপর নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন, কঠিন লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্নকরণ, হস্তের উপর দিয়া লোকসহ মটরগাড়ীর অতিক্রমণ, বক্ষের উপর দিয়া ভার-বোঝাই গরুর গাড়ী ও রোলার গমনাগমন, একগুচ্ছ নূতন তাস হস্ত দ্বারা ছিন্ন করন প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্রীড়া দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার পশুশিক্ষা-প্রদানও অভিনব। মাষ্টার বসন্ত কতকগুলি পশুকে এরূপভাবে শিক্ষাদান করিয়াছেন যে, তাহাদের ক্রীড়াদর্শনে বাস্তবিক স্তম্ভিত হইতে হয়। এরূপ জন্তুর খেলা ভাল ভাল সার্কাসেও দেখা যায় না।

গতপূর্ব্ব বৎসর লণ্ডনের ওয়েমব্লি প্রদর্শনীতে এই

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাষ্টার বসন্তের একমাত্র ভগিনীর অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার শোকসন্তপ্তা জননী তাঁহাকে সুদূর বিলাতযাত্রায় বাধা দেওয়ায় সমিতি এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বসন্তকুমার তাঁহার শিক্ষিত ক্রীড়কবৃন্দকে লইয়া বহু প্রসিদ্ধ ইংরাজ সার্কাসে ও অন্যান্য সার্কাসে



(যাভা, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ-আফ্রিকা, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে) যোগদান করিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চগুলিতেও সপ্তাহে এক দিন করিয়া ক্রীড়া দেখাইবার জন্য মাষ্টার বসন্ত আহূত হইয়াছিলেন। এতৎকার্য্যে মাষ্টার বসন্ত বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন, কিন্তু অধ্যয়নশীল বসন্ত তাঁহার পিতামহের পেশা ডাক্তারী শিক্ষা হইতে বিরতির অনাস্থা দেখাইয়া বহুল অর্থোপার্জ্জনের লোভ ত্যাগ করিয়া সেই সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বসন্তকুমার কলিকাতা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ডাক্তারী শিক্ষার কঠোর কর্ত্তব্য-সমষ্টির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও বসন্তকুমার সহরে মফঃস্বলে নানা স্থানে ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়া থাকেন এবং বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। মাষ্টার বসন্ত ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কাপ ও পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালার তরুণগণ শারীরিক শক্তিসঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করিলে দেশের ও দশের মঙ্গল।



রয়্যাল কৃষি-কমিশন

সম্প্রতি ভারতের কৃষি-পদ্ধতির আলোচনা এবং তাহার উন্নতিসাধনের উপায়বিধান করিবার জন্য ভারতে একটি রয়্যাল কৃষি-কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। বিলাতের কৃষিবিদ্যা-বিশারদ, এডিনবরা এবং ইষ্ট স্কটল্যাণ্ড কলেজের প্রেসিডেণ্ট মার্কুইস্ অব লিন্‌লিথগো এই কমিশনের কর্ত্তা হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন এই কমিশনে আর ৯ জন সদস্য আছেন। যথা—

(১) সার হেন্‌রী লরেন্স; (২) সার টমাস মিডিলটন; (৩) সার গঙ্গারাম বাহাদুর, (৪) সার জেমস্ ম্যাক্‌কেন্না; (৫) মিষ্টার কালভেট; (৬) পালকামিডির রাজা; (৭) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; (৮) ডাক্তার হাইদার এবং (৯) মিষ্টার বি, এস, কামাট।

কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষিবিদ্যা-বিশারদ। ১৯১৬-১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতে সার গঙ্গারাম বাহাদুর যে লিখিত মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি 'Agriculture Problems of India' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। সার জেমস্ ম্যাক্‌কেন্না এক সময়ে ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী বা পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'Agriculture in India' নামক এক পুস্তিকা লিখেন। তাহাতে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সার হেন্‌রী লরেন্স বোম্বাই অঞ্চলের সিভিলিয়ান। ইনি ঐ অঞ্চলে কিছু কাল কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। সার টমাস্ মিডিল্টন বরোদা কলেজের কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। এখান হইতে ইনি বিলাতে যাইয়া ওয়েল্‌সের ইউনিভার্সিটী কলেজের কৃষিবিদ্যার লেক্‌চারার হয়েন; পরে ডারহাম কলেজ অব সায়েন্সে এবং কেম্ব্রিজে কৃষিবিদ্যার অধ্যাপকতা করিয়া বিলাতের বোর্ড অব এগ্রিকালচারের সহকারী সম্পাদকতা করিয়া খাদ্য-শস্য বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারল হইয়াছেন। পাশ্চাত্য কৃষি-বিজ্ঞানে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে।

এখন প্রশ্ন, সরকার এই কৃষি-কমিশন কেন বসাইলেন? ভারতে কৃষির উন্নতিসাধন যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ভারত এখন প্রায় কৃষিমাত্রসম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কৃষির অবস্থাও ভাল নহে। বহু স্থানে কৃষির অবস্থা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দই হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতে প্রায় ২৫ কোটি একর জমীতে চাষ হয়, তন্মধ্যে গড়ে প্রায় প্রতি বৎসর ৪ কোটি একর জমীতে চাষ বন্ধ থাকে। ভারতে অন্ততঃ ৮ কোটির অধিক লোক হাতে-হাতিয়ারে হলকর্ষণে নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ এখানকার প্রকৃত কৃষীবলের সংখ্যা (অনুজীবী এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যে রত ব্যক্তি বাদে) ৮ কোটির অধিক। সুতরাং গড়ে প্রতি হলকর্ষী চাষীর যোতের জমী আড়াই একরের অধিক নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতে এক জন চাষীর যোতে গড়ে ১৭·৩ একর এবং জার্ম্মাণীতে এক এক জন কৃষকের চাষে ৫·৪ একর জমী ছিল। সুতরাং ভূমিসম্পদে ভারতীয় কৃষীবলের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, ভারতের জমী স্বভাবতঃ উর্ব্বর হইলেও কৃষিপদ্ধতির হীনতাহেতু এ দেশে অনেক অল্পপরিমাণ ফসল জন্মে। ইংলণ্ড এবং ভারত এই দুই দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে গম ও যব জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উভয় দেশের উৎপন্ন ফসলের তারতম্য যে কত হয়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাতে এক একর জমীতে ১ হাজার ৯ শত ১৯ পাউণ্ড গম এবং ১ হাজার ৬ শত ৪৫ পাউণ্ড যব জন্মে। আর ভারতে ঠিক ঐ পরিমাণ জমীতে গড়ে ৮ শত ১৪ পাউণ্ড গম এবং ৮ শত ৭৭ পাউণ্ড যব উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এ দেশে এক বিঘা জমীতে গড়ে যত গম জন্মিয়া থাকে, বিলাতের এক বিঘা জমীতে গড়ে প্রায় তাহার আড়াই গুণ গম উৎপন্ন করা হয়। আর যব প্রায় দ্বিগুণ জন্মে। জাপানেও ধানের চাষ হয়, ভারতেও উহার চাষ হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতের চাষী এক বিঘা জমী চাষ করিয়া যত ফসল পায়, জাপানের চাষী ঠিক তাহার দ্বিগুণ ফসল পাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য সভ্যদেশের কৃষকদিগের ভূসম্পদ ও উৎপন্ন ফসলের হার ভারতীয় কৃষীবলের জমীর ও জমীর

চাষীদিগের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সকল সুসভ্য সরকারের এই অবস্থার প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রজার আয়বৃদ্ধি হইলে সরকারেরও আয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বৃটিশ সরকার এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ প্রদান করেন নাই। আর্ল অব মেয়ো প্রথমে ভারতে কৃষি-বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া যায়েন। ভারতীয় কৃষকদিগের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার রুসিয়ার কৃষকদিগের কথা মনে পড়ে। তিনি কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে ভারতবাসী কৃষকের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া যায়েন। তিনিই লিখিয়াছিলেন যে, "ভারতের কৃষীবলকে য়্যামোনিয়ার সার কিংবা গুয়েনো, সুপারফসফেট অথবা অন্যবিধ কৃত্রিম সার দিবার উপদেশ প্রদান আর তাহাদের জমীতে স্যাম্পেন ছড়াইয়া উহার উর্ব্বরতাসাধন করিবার উপদেশপ্রদান সমান নিরর্থক।" কিন্তু লর্ড মেয়োর প্রবর্ত্তিত কৃষিবিভাগের দ্বারা ভারতীয় কৃষিজীবীদিগের কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। ব্যুরোক্রেশী এবং পরবর্ত্তী বড়লাটদিগের এই বিষয়ে ঔদাসীন্যই তাহার কারণ। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে সরকারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের ভারতের হিতসাধক কার্য্যে দীর্ঘসূত্রিতা হেতু কয়েক বৎসর বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। শেষে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত-সচিব ভারতীয় কৃষকদিগের উন্নতিসাধনকল্পে অনুসন্ধান করিয়া অবস্থানুসারে উপদেশ দিবার জন্য ডাক্তার ভয়েলকারকে (Dr. Voelcker) ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তার ভয়েলকার বিলাতের রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটীর বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ভারতের নানা স্থানে যাইয়া কৃষির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং তদনুসারে যাহা করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন,—সরকার তখন কার্য্যতঃ তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। মার্কিণের সিকাগো (Chicago) সহরের অধিবাসী মিষ্টার হেনরী ফিপস্ ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে ভারতীয় বড়লাটের হস্তে ৩০ হাজার পাউণ্ড বা পুনায় কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন; পরে ঐ দানের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া ২৪ লক্ষ টাকায় পরিণত করা হয়। সেই জন্য কৃষি-কলেজগুলি পুনর্গঠিত এবং পুণায়, কানপুরে, সাবুরে, নাগপুরে, লায়ালপুরে এবং কোয়েম্বাটুরে কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের মধ্যে কৃষিশিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সরকার অর্থব্যয় করিয়া সেচের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলে গোধূম ও কার্পাস চাষের অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সরকার যে হলগু কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিশন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। সেই রিপোর্টে তাঁহারা সরকারকে কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এই স্থানে তাঁহাদের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

"We take this opportunity of stating in the most emphatic manner our opinion of the paramount importance of agriculture to this country, and of the necessity of doing everything possible to improve its methods and increase its output. (Indian Industrial Commission's Report, para, 84)"

ইহার মর্ম্মার্থ:—"এ দেশে কৃষিকার্য্য যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে কৃষিপদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং ফসলের পরিমাণবৃদ্ধি একান্তই প্রয়োজনীয়, এই অবসরে আমাদের এই মতটি আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করিতেছি।" ইহাতেও সরকারের দীর্ঘনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

তাহার পর অধ্যাপক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী নামক জনৈক কৃষিবিদ্যাবিশারদ বাঙ্গালী বিলাতে যাইয়া ভারত-সচিবকে ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে বিশেষভাবে অবহিত করেন। লর্ড রেডিংও তাহাতে অনুকূল বায়ু সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কমিশন-নিয়োগ

কতকগুলি বিশেষ কারণও এই কমিশন-নিয়োগের আনুকূল্য করিয়াছে। ভারতে এখন তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতবাসীর দারিদ্র্যই ঐ অসন্তোষের আংশিক কারণ—ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। সেই দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমিত করিতে হইলে ভারতবাসীর প্রধান বৃত্তি কৃষির উন্নতিসাধন আবশ্যক। এই কারণটি ভারত-সচিবের মনের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে, তাহা তাঁহার কথার আভাসেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন কেহ কেহ উহার আরও একটি কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। সে কারণটি এই,—যুদ্ধের পর বিলাতে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিলাতী পণ্য ভারতে আর পূর্ব্বের মত বিকাইতেছে না। ভারতীয় কৃষীবলের ক্রয়-শক্তির অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভারতীয় কৃষকদিগের অর্থবল বর্দ্ধিত করিতে পারিলে ভারতে বিলাতী পণ্য অধিক কাটিবে। বিলাতের বেকার-সমস্যারও আংশিক সমাধান হইবে। সেই জন্য ভারত-সচিব এই রয়্যাল কমিশন বসাইয়াছেন। এই শেষোক্ত কারণটি ঠিক নহে বলিয়াই মনে হয়। আর যদিও উহা সত্য হয়, তাহা হইলে উহা দোষের বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কৃষকদিগের যদি স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলেই পরম মঙ্গল।

নিখিল ভারতের জন্য একটিমাত্র রয়্যাল কৃষিকমিশন নিয়োগে অনেকে আপত্তি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ একটি বিস্তীর্ণ দেশ। ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দেশের স্থানভেদে মৃত্তিকার গুণভেদ ত আছেই, অধিকন্তু আর্ত্তব অবস্থার বিভিন্নতাও বিদ্যমান। সুতরাং এ দেশের সর্ব্বত্র কৃষিপদ্ধতি সমান নহে। তাহার উপর এক স্থান হইতে অন্য স্থানের সামাজিক অবস্থা, সমাজবিন্যাস, রীতিনীতি এবং কৃষকদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরূপ অবস্থায় একটি রয়্যাল কমিশনের পক্ষে এই মহাদেশতুল্য বিস্তীর্ণ ও বৈচিত্র্যবিশিষ্ট দেশের বিভিন্ন ভাবের কৃষিপদ্ধতি আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। সমস্ত য়ুরোপের জন্য একটিমাত্র কৃষিকমিশন বসাইলে যে অসুবিধা ঘটে, এই রয়্যাল কমিশনের পক্ষে সে অসুবিধা ঘটিবেই। এই তাঁহাদের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তখন এ আপত্তি করা অনর্থক।

বিগত অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১১ই অক্টোবর) শিমলা শৈলশিখরে এই রয়্যাল কমিশনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে এই কমিশনের প্রেসিডেন্ট মার্কুইস অব লিন্‌লিথগো অন্যান্য কমিশনারদিগকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এত বড় বিস্তীর্ণ দেশের কৃষিসম্পর্কিত ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান এবং বিচিত্র সমস্যার সমাধান করা যে দুরূহ ব্যাপার, তাহা তিনি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং সকলকে এই বিষয়ে কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই রয়্যাল কমিশন বসিবার পূর্ব্বে লর্ড আরউইন শিমলাতে একটি কৃষিবিষয়ক পরামর্শসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী এবং ডিরেক্টারগণ সেই পরামর্শ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই পরামর্শ-সভার উদ্বোধন-কালে লর্ড আরউইন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, লর্ড লিন্‌লিথগো তাহা হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সেই উক্তিটি এই :—

"Indian agriculture is the foundation upon which the whole economic prosperity of India rests and upon which the structure of her social and political future must, in the main, be built."

ইহার অর্থ, "কৃষিই ভারতের সমস্ত আর্থিক সমৃদ্ধির বনিয়াদ, এই বনিয়াদের উপরই ভবিষ্য সামাজিক ও রাজনীতিক সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

কৃষিই সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব অবস্থায় যে সমৃদ্ধির মূল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যে শিল্প এবং বাণিজ্যসেবা বর্ত্তমান যুগে প্রতীচ্যখণ্ডের উদ্যোগী জাতিদিগকে অতুল সমৃদ্ধির অধিকারী করিয়া দিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে যে শিল্পবাণিজ্যসেবা এত সমৃদ্ধিলাভের অমোঘ উপায়, কৃষির উপরই সেই শিল্পবাণিজ্য অত্যন্ত অধিক মাত্রায় নির্ভর করে। যথা—কৃষিজাত পাট ব্যতীত চট প্রস্তুত করা যায় না, কৃষিজাত কার্পাস অভাবে তন্তুবায়ের কাষ লোপ পায়। সুতরাং কৃষিই যে সমৃদ্ধির মূল, তাহা স্বীকার্য্য।

করিয়া আসিতেছে। কোন্ স্মরণাতীত যুগে ভারতে কৃষি-কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় সামাজিক এবং রাজনীতিক জীবন কতটা গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়, জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়া জাতীয় সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কখনই মঙ্গলজনক হইবে না—হইতে পারে না। লর্ড আরউইন "কৃষির উন্নতি হইলে তাহাকে বনিয়াদ করিয়া ভারতবাসীর ভবিষ্য সামাজিক ও রাজনীতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে", এই কথা ঠিক কিরূপ ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। মানব-জীবনের সকল বিভাগই পরস্পর অনুবন্ধী। উহার একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ ছিন্ন করা যায় না। কৃষির উন্নতির উপর যেমন ভারতবাসীর সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, সেইরূপ রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতির উপরও কৃষির উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। স্বাধীন জাতিরা কৃষির এবং শিল্পের যেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, পরাধীন জাতিরা তাহা পারে নাই। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস, সরকারের বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলেই ভারতীয় কৃষির উন্নতি বিশেষভাবে প্রতিহত হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস, কৃষির উন্নতিসাধন করিবার পর ভারতীয় সামাজিক এবং রাজনীতিক অবস্থার উন্নতিসাধনকল্পনা সমীচীন নহে। কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

তাহার পর সভাপতি ভারতীয় কৃষির কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বহু শতাব্দীব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে, পরীক্ষার এবং ভ্রান্তির অমোঘ পথ ধরিয়া এই পদ্ধতি বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা উচিত; যুগযুগান্তরব্যাপী পরীক্ষার দ্বারা ইহার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ হইয়াছে; যাঁহারা এই কৃষি-পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই পদ্ধতিকে অবিবেকিতার সহিত নিন্দা করিতে পারেন নাই। তবে উহার যে উন্নতিসাধন করিতে পারা যায়, সে কথা কেহই অস্বীকার করেন না।" লর্ড লিনলিথগো যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আজকাল অনেক সিভিলিয়ান এই পদ্ধতিকে বর্ব্বর যুগের বলিয়া ইহার নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, পাশ্চাত্যখণ্ডে যেরূপ বাষ্প-চালিত লাঙ্গল প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে, ভারতেও তাহা অবাধে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে ভারতীয় কৃষির উন্নতি সাধিত হইবে। সে ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই সুধীজনসম্মত নীতি। ডাক্তার ভয়েলকার তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন :—

"The ideas generally entertained in England, and often given expression to in India, that Indian agriculture is, as a whole, primitive and backward, and that little has been done to try and remedy it, are altogether erroneous......Taking every thing together, and more especially considering the conditions under which Indian crops are grown, they are wonderfully good."

ইহার মর্ম্মার্থ এই :—

"ইংলণ্ডের লোকের মনে সাধারণতঃ এই ধারণা আছে, এবং ভারতেও সে কথা প্রকাশ করা হইয়া থাকে যে, মোটের উপর ভারতীয় কৃষিপদ্ধতি আদিম যুগেরও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এবং ইহার উন্নতিসাধনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা বা ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিশেষতঃ ভারতীয় কৃষীবল যেরূপ অবস্থায় শস্যাদি উৎপন্ন করে, তাহা ভাবিলে বুঝা যায় যে, উহার উৎকর্ষ বিস্ময়জনক।" ডাক্তার ভয়েলকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার বহু পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ওয়ালিকও বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"Bengal husbandry, although in many respects extremely simple and primeval in its mode and form, yet is not so low as people generally suppose it to be, and I have found, the very sudden innovation in them has never led to any good

ইহার মর্ম্মার্থ:—যদিও বাঙ্গালার কৃষির পদ্ধতি অত্যন্ত সাদাসিধা এবং উহার ধরণ ও রকম মান্ধাতার আমলের, তাহা হইলেও লোক ইহাকে যতটা হীন মনে করে, উহা ততটা হীন নহে। আমি দেখিয়াছি যে, হঠাৎ উহার একটা নূতন ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহা কখনই সুফলপ্রদ হয় নাই।

বাঙ্গালায় ধানের চাষ সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়ালিক কি বলিয়াছেন, দেখুন :—

"If we were to live another thousand years we should hardly see any improvement under that branch of cultivation."

অর্থাৎ "আমরা যদি আরও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমরা এই ধানচাষের কোন উন্নতি দেখিতে পাইতাম না।"

এই সকল মন্তব্য দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার কৃষিপদ্ধতি অত্যন্ত সরল, সাদাসিধা ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইলেও উহা নিতান্ত হীন নহে। উহার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যখণ্ডের নিতান্ত ব্যয়বহুল ও আড়ম্বর-পূর্ণ কৃষিপদ্ধতি এ দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কমিশনের সদস্যগণ অধি-কাংশই পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন। ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই ভারতীয় কৃষিপদ্ধতির সহিত সম্যক্-ভাবে পরিচিত আছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পাশ্চাত্য কৃষিপদ্ধতির উপর অনুরাগ স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় ভূমির এবং কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কৃষি-পদ্ধতির উন্নতির পন্থা নির্দ্দিষ্ট না করিলে কৃষি-কমিশনের সর্ব্বকার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইবে।

য়ুরোপে অল্প শ্রমে অধিক কাজ করিবার জন্য বাষ্প-চালিত লাঙ্গল, শস্য ঝাড়িবার কল, বিচালী প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখিবার কল আছে। উহার সাহায্যে এক জন লোক দশ জন লোকের কায করিতে পারে। উহা ব্যবহার করিলে চাষের খরচা অনেক অল্প পড়ে; অধিক মজুর-মাইনদারের খোসামোদ করিতে হয় না। সেই জন্য এ দেশের অনেকে ঐ সকল পাশ্চাত্য কৃষিযন্ত্র প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। অনেক সিভি-লিয়ানও বলিয়া থাকেন এ দেশের বলদের আয়তের লাঙ্গলে জমী চষা হয় না; উহাতে জমী আঁচড়ান মাত্র হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস, গভীর চাস দিলেই ফসল ভাল হইয়া থাকে। তাঁহাদের সে ধারণা ভুল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ওয়ালিক লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালায় য়ুরোপের লৌহ-লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার ফল ভাল হয় নাই, বরং মন্দই হইয়াছে।" উহার ফল কি হইয়াছে? ডাক্তার ওয়ালিক স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন,—

"That the soil which is extremely superficial......has generally received the admixture of the under-soil, which has deteriorated it too much."

অর্থাৎ "এখানকার জমীতে উপরের মৃত্তিকা অধিক বেধশূন্য থাকায় নিম্নস্থিত মৃত্তিকা উপরের মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়, ফলে উহার উর্ব্বরাশক্তির অত্যন্ত হানি ঘটে।"

ইহার পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পরে আর এক জন বিশিষ্ট ইংরাজ কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন,—

"It has been shown, beyond much risk of refutation, that deep ploughing, such as is profitable in high farming practised in England, is positively detrimental to the land generally found in India, because a sterile subsoil is turned up, for the fertilisation of which, the peasant cannot find manure enough."

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—"বিলাতে ভালভাবে চাষ করিতে হইলে গভীর চাষ দিতে হয় এবং তাহা লাভজনক হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতে তাহা হয় না। ভারতে সাধা-রণতঃ যেরূপ জমী দেখা যায়, তাহাতে গভীর চাষ দিলে জমীর বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা এরূপ ভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহা খণ্ডন করিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ, এখানে জমীতে গভীর চাষ দিলে নিম্নস্থ উৎপাদিকা-শক্তিবিহীন মৃত্তিকা উপরে উঠে, উহাতে উর্ব্বরাশক্তির সঞ্চার করিবার মত সার দিবার ক্ষমতা কৃষকদিগের নাই।"

ইহার কয়েক বৎসর পরেই ডাক্তার ভয়েলকার ভারতে আসিয়া ভারতীয় কৃষিপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনিও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করা হইল না। সুতরাং বাষ্পচালিত বহুমূল্য কলের লাঙ্গল য়ুরোপে যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, ভারতে উহার প্রয়োজনীয়তা অধিক নাই। হয় ত কোন কোন স্থানে ইহার প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। বিলাতের বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি পরিচালনে ধানঝাড়া, বিচালী পালা দেওয়া প্রভৃতির কল হইয়াছে; উহার সাহায্যে বিশ জনের কায এক জন করিতে পারে, কিন্তু উহার প্রবর্ত্তন ব্যয়সাধ্য। তদ্ভিন্ন উহার আর একটা দোষ আছে। যদি ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে বিশ জনের কায এক জনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ১৯ জন কি করিবে? সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ভারতের শতকরা ৭১ জন লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; যদি বৃটিশ-শাসিত ভারতের মোট অধিবাসিসংখ্যা সাড়ে ২৫ কোটি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে প্রায় সওয়া ১৮ কোটি লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া সজীব থাকে। তন্মধ্যে বৃটিশশাসিত ভারতে যাহারা হাতে লাঙ্গল ধরিয়া জমী চষে, তাহাদের সংখ্যা ৮ কোটির অধিক হইবে না, সুতরাং অবশিষ্ট প্রায় ১০ কোটি লোক কৃষকদিগের পরিবারভুক্ত অন্নজীবী অথবা কৃষিক্ষেত্রের মজুর। অধিকাংশ কৃষকের জমী অল্প, সেই জন্য তাহারা স্বয়ং অথবা পরিজনের সাহায্যে অনেক কার্য্য সাধিত করিয়া লয়; যাহাদের জমী অধিক, তাহারা মজুরের সাহায্যে সেই কার্য্য সাধিত করে। সেই জন্য বহু অকৃষক কৃষিক্ষেত্রে মজুরী করিয়া আপনাদের সংসার চালায়। যদি শ্রমলাঘবজনক কল (Labour-saving machines) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এ দেশে অকর্ম্মার সংখ্যা বাড়িবে। ইতোমধ্যে কলে ধান সিদ্ধ ও ধান ভানা আরম্ভ হওয়ায় অনেক গরীব 'ভাড়ানীর' অন্ন উঠিয়াছে, আর নরনারির মুখেও চাউলের টান বাড়িয়াছে। এইরূপ বেকার-সংখ্যাবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে হিতসাধক হইবে কি না, তাহাও বিশেষভাবে বিচার্য্য। সেই জন্য সকল দিক বিবেচনা না করিয়া ভারতীয় কৃষিপদ্ধতির যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের সমর্থন করা সঙ্গত হইবে না। অবস্থা বুঝিয়া উহার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

কৃষিপদ্ধতির আর একটি দিক্ আছে; সেটি রাসায়নিক দিক্। জমীতে কি প্রকার সার দিলে অধিক পরিমাণে ফসল জন্মে এবং সেই ফসল উৎপাদন করিলে উহা লাভজনক হয়, তাহার অনুসন্ধান ও প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা বিধেয়। অবশ্য, বিভিন্ন স্থানের ভারতীয় কৃষকদিগের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অনুসন্ধান-বিভাগের কার্য্য। এই দিকে উন্নতি করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তাহার পর কৃষির আর্থিক দিক্। কৃষি বৃত্তিকে একটি লাভজনক বৃত্তিতে পরিণত করিবার ব্যবস্থাই সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। যে সকল বিষয়ের উপর কৃষির আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে, সেই সকল বিষয়ের পূর্ব্বাপর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে; চাষীদিগের সুবিধা এবং অসুবিধা কি, তাহারও বিচার করা এবং কি উপায়ে তাহার প্রতীকার হইতে পারে, তাহারও উপায় নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

জমীই কৃষির প্রধান অবলম্বন। সেই জমীর অবস্থা কিরূপ, তাহাই প্রথম এবং প্রধান বিবেচ্য। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতের সর্ব্বত্রই কৃষকের জমী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ম্যান্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চলের এক এক জন কৃষকের যোতে অন্ততঃ গড়ে ৪৪ একর (একর ৩ বিঘার কিছু অধিক) জমী ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক কৃষকের যোতে গড়ে ৭ একর জমী দাঁড়াইয়াছে; কোন নদীতে গড়ে হাঁটু জল হিসাব করিয়া নদী পার হইতে গেলে যেমন অনেক স্থলে ডুবিয়া মরিবারই বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক কৃষকের যোতে ৭ একর করিয়া জমী আছে, অতএব কৃষকের অবস্থা চলনসই, এরূপ হিসাব করিতে গেলেই ভ্রান্তিসাগরে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোন চাষীর যোতে ৩০ একর জমীও আছে, আবার কোন চাষীর যোতে অর্দ্ধ একর জমীও নাই। তবে ডাক্তার হ্যারল্ড ম্যান্ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের কোন গ্রামে শতকরা ৬০ জন কৃষকের যোতের জমীর পরিমাণ ৫ একরও নহে। উক্ত গ্রামের

৭ শত ২০টি স্বতন্ত্র বন্দে বিভক্ত, তন্মধ্যে ৪ শত ৩৫টি বন্দের জমী ১ একরেরও কম আর ১ শত ১২টি বন্দের জমীর পরিমাণ সিকি একরও হইবে না। ডাক্তার শ্লেটার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাদ্রাজ প্রদেশে কোন এক কৃষিপ্রধান গ্রামে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১০ টাকা বা তদপেক্ষা ন্যূন খাজনা দিতে হয়, এরূপ ক্ষুদ্র যোতের জমীর সংখ্যা ছিল ১ শত ১২ মাত্র; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ ক্ষুদ্র যোতের জমীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ শত ৬৬টি। সুতরাং বড় বড় বন্দের জমী কিরূপ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। এক্ষণে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালায় যেমন অনেক স্থলে জমীদারের জমীর বিঘাকরা ৮ আনা, ৪ ১ টাকা খাজনা ধার্য্য আছে, মাদ্রাজের খাসমহলে তাহা নাই; তথায় প্রতি বিঘায় অন্ততঃ ৩ টাকা খাজনা ধার্য্য আছে। সুতরাং ঐ সকল জমীর পরিমাণ কত অল্প, তাহা বিবেচ্য। বাঙ্গালায় মিষ্টার টমসন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, গড়ে প্রত্যেক চাষীর যোতে ২'২১৫ একর জমী আছে, পঞ্চা-পুরে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, গড়ে প্রতি চাষীর জমীর পরিমাণ দাঁড়ায় সওয়া ২ একর। বাঙ্গালার জমীদারী অধিকারের মধ্যে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ একর জমীতে চাষ হইয়া থাকে। চাষী কৃষকের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। সুতরাং প্রতি কৃষকের যোতের জমীর পরিমাণ গড়ে সওয়া ২ একরের অধিক হইবে না। অধিকাংশ কৃষকের যোতের জমা ২।৩ বিঘার অধিক নাই। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ অবস্থা ছিল না; অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গড়ে প্রত্যেক কৃষকের যোতের জমী অনেক অধিক ছিল।

যেখানে জমী এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেখানে চাষীর অবস্থা কখনও স্বচ্ছল হইতে পারে না এবং চাষের অবস্থা উন্নত করা যাইতে পারে না। কৃষিবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার কীটিঞ্জ বলিয়াছেন যে,কোন যোতের জমীকে লাভ-জনক করিতে হইলে অন্ততঃ তাহাতে ৩০ হইতে ৪০ একর জমী থাকা চাই, এবং সেই জমী সম্পূর্ণ ১ বন্দে হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তাঁহার মতে অন্ততঃ এক এক বন্দে ১ শত বিঘা জমী না হইলে উহাতে প্রযুক্ত কৃষিকার্য্য বিশেষ সেচেরও সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। উহার মধ্যে একটি থাকিবার মত বাড়ীও থাকা চাই। ইহা বিলাতের কথা। আমাদের দেশের কৃষীবলের নিকট ১ বন্দে ১ শত বিঘা যোতের জমী 'নিশার স্বপন সম' এবং কল্পনারও অতীত। সুতরাং এ দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে বহু লোকের দ্বারা নিষ্পাদ্য কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ যন্ত্র-সাহায্যে কৃষির উন্নতিসাধন এখন কল্পনার অতীত।

কমিশন তাঁহাদের সপ্তম দফা প্রশ্নাবলিতে কৃষকের যোতের জমীর ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে এবং কৃষকদিগের যোতের জমা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগের প্রতীকারের উপায় কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ দেশের শিল্প লোপ পাওয়াতে অনেক জাতির জাতীয় বৃত্তি লোপ পাইয়াছে। সুতরাং অনেকে এখন বৃত্তিহীন হইয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতেছে। সেই জন্য কৃষিক্ষেত্রের চাহিদা (demand) এবং জমীর দাম বৃদ্ধি পাইতেছে। যত দিন দেশে শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হইবে, তত দিন এই সমস্যার সম্পূর্ণ-ভাবে সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

এই দোষ যে কেবল ভারতেই ঘটিতেছে, তাহা নহে। পৃথিবীর অন্য দেশেও বহু পুত্রের মধ্যে পিতার সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া এই দোষের উদ্ভব করিয়া দিতেছে। তবে ভারতের বাহিরে অন্যান্য রাজ্যে লোকের পক্ষে অন্য বৃত্তি অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত থাকায় এই সমস্যা ভারতের ন্যায় জটিল হইয়া পড়ে নাই। অন্যত্রও এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের মধ্যে বরোদা সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন যে, কৃষিক্ষেত্রের অধিকারীর মৃত্যু হইলে তাহার কৃষিক্ষেত্র নীলাম করিতে হইবে। উহার উত্তরাধি-কারীরাই সেই নীলাম ডাকিতে পারিবেন। তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উহা উচ্চতম হারে ডাকিয়া লইবেন, তিনিই জমী পাইবেন। বিক্রয়লব্ধ ধন সকলের মধ্যে বণ্টিত হইবে। ইহাতে কৃষিক্ষেত্র আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় না, উহা অখণ্ডই থাকে। ইহার একটা দোষ এই হয় যে, যাহারা জমী না পাইয়া জমীর মূল্য পায়, তাহারা সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে এবং শেষে দৈনিক মজুরে পরিণত হয়। বেলজিয়মে অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। কোন বহুপুত্রক কৃষকের মৃত্যু হইলে তাহার কোন এক পুত্র

মাত্র পায়। ডেনমার্কে এবং জার্ম্মাণীতে সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষেত্রস্বামীর অধিকারীরা সকলে মিলিয়া এক জনকেই ভূ-সম্পত্তির অধিকারী নির্ব্বাচিত করে। দক্ষিণ-আমেরিকায়, বিশেষতঃ বোলিভিয়ায়, প্রজাতন্ত্র রাজ্যে বহু ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র একত্র সম্মিলিত করিয়া তাহার কৃষিকার্য্য একটি সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সকলে আপন আপন অংশমত ফসল বা লাভ গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে কোন পদ্ধতি অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বনীয় কি না, তাহাও বিচার্য্য। কেহ কেহ পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রগুলিকে সম্মিলিত করিয়া তাহাতে চাষ করিতে বলেন।

আর্থিক দিক্ দিয়া আর একটি সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। আজকাল কৃষকরা অধিক অর্থ পাইবার লোভে জমীতে খাদ্য শস্য উৎপাদন না করিয়া শৈল্পিক শস্য (Industrial crops) উৎপাদন করিতেছে। চাউল, দাইল, কলাই, তরকারী, ফলমূল প্রভৃতির তাদৃশ চাষ না করিয়া পাট, তুলা, তিসি, তামাক, বা কফি প্রভৃতির চাষ আনুপাতিক হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এক দিকে লোকবৃদ্ধি ও রপ্তানীবৃদ্ধি, অন্য দিকে আনুপাতিক হিসাবে খাদ্য শস্য চাষের স্বল্পতার ফলে লোকের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-শাসিত ভারতে যত জমীতে চাষ হইয়াছিল, তাহার শতকরা সাড়ে ১৩ ভাগ জমীতে শৈল্পিক শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল; তাহার পর ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ, তৎপর হইতে বরাবরই শতকরা ১৭ ভাগ জমীতে শৈল্পিক শস্য বা বাণিজ্য-শস্য উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য এই আনুপাতিক হিসাবের সামান্য কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। বিদেশে ভারতীয় কাঁচা মালের কাটতি ও আদর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পত্তি। য়ুরোপে এবং পৃথিবীর অন্য কয়েকটি দেশে ভারতজাত চা এবং কফির আদর বাড়িতেছে। লাঙ্কাশায়রের তন্তুবায়গণ ভারতীয় তুলায় বিলাতী কাপড় প্রস্তুত করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে; কারণ, মার্কিণীরা স্বদেশজাত তুলায় তাহাদের দেশেই বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে অবহিত হইতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে ভারতজাত কৃষিজ খাদ্যেতর পণ্যের কাটতি বিদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে বলিয়া আশা জন্মিতেছে। ভারতীয় চাষীরা ভাল ভাল জমীতে বিশেষ যত্ন সহকারে কৃষিজ বাণিজ্য পণ্য উৎপাদনে যত্নশীল হইবে। এরূপ অবস্থায় এ দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন কমিবেই কমিবে। ইতোমধ্যেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য শস্য জন্মিতেছে, তাহাতে কোনরূপে ভারতের প্রয়োজন মিটিতে পারে। উহাতে মানুষের বুভুক্ষা কোন রকমে নিবৃত্তি করা যায়। কিন্তু খাদ্য শস্য হইতে কিছু বিদেশে চালান যায়। তদ্ভিন্ন পালিত পশুদিগকে খাইতে দিতে হয়। ভারতে গৃহপালিত পশু (পক্ষী বাদে) ১৭ কোটি বৃষভের তুল্য। ইহাদিগকে শস্যও খাইতে দিতে হয়। সেই জন্য ভারতের ৫ কোটি লোক অদ্ধাশনে থাকে। তথাপি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইদানীং ভারতে গম আমদানী আরম্ভ হইয়াছে।

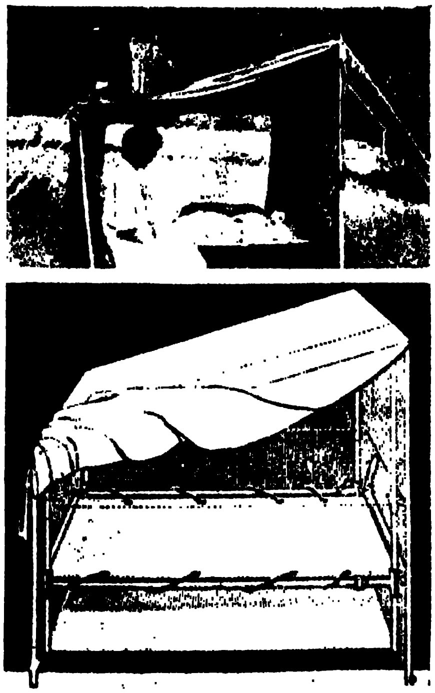
এখন প্রশ্ন—খাদ্য শস্য চাষের সঙ্কোচসাধন করিয়া 'অখাদ্য' শস্য চাষের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না, কমিশনের ভারতবাসীর স্বার্থের দিক দিয়া তাহার বিশেষভাবে বিচার করা বিধেয় কি না। তাঁহাদের একাদশ দফার প্রশ্নাবলিতে শস্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নাই। বরং রপ্তানীর জন্য শস্যবৃদ্ধির অনুকূল প্রশ্ন আছে। এখন ভারতবাসীর সমস্যা ভারতবাসী না ভাবিলে কে ভাবিবে?

কৃষি-কমিশনের বিচার্য্য বিষয় বহু; তৎসম্বন্ধে বলিবার কথাও অনেক আছে; কিন্তু এবার এই পর্য্যন্ত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



অভিনব বস্ত্রাবাস ও শয্যা



অভিনব বস্ত্রাবাস ও শয্যা

মোটরগাড়ীযোগে যে সকল পর্যাটনকারী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এক প্রকার বস্ত্রাবাস-সংযুক্ত শয্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বস্ত্রাবাস ও শয্যা সরঞ্জাম সহ সমগ্র পদার্থটির ওজন মাত্র ৩৫ সের। দুই ব্যক্তি অনায়াসে এই শয্যায় শয়ন করিতে পারে। এই সম্মিলিত শয্যা ও শিবির দশ মিনিটের মধ্যে যে কোনও প্রসাধনের স্থানও আছে, সে দিকে জানালা এবং পর্দার ব্যবস্থাও আছে।

ভিনিসে মোটর-বোট



ভিনিসে মোটর-বোট

ভিনিস নগরীর সলিলপূর্ণ পথগুলির উপর দিয়া গণ্ডোলা বা নৌকা করিয়া গমনাগমন করিবার ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি গণ্ডোলাগুলির পরিবর্ত্তে মোটর-চালিত নৌকার প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে স্বল্পসময়ে লোক গন্তব্য স্থানে গমনাগমন করিতে পারে। কোন কোন হোটেলওয়ালার এইরূপ অনেক মোটর-বোট আছে। তদ্দারা যাত্রীদিগকে ষ্টেশন হইতে হোটেলে বহন করিয়া আনা হয়, দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও তাহারই সাহায্যে দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্সি বা ভাড়াটিয়া মোটর-গাড়ীর যেমন আড্ডা থাকে, এই মোটর-বোটগুলিরও তেমনই স্থানে স্থানে আড্ডা আছে। ইচ্ছামত

জেব্রাবাহিত গাড়ী

জেব্রা সহজে পোষ মানে না, কিন্তু মানুষের অধ্যবসায়ের ফলে জেব্রাগুলিকে অশ্বের ন্যায় গাড়ীতে জুড়িয়া কার্য্যোপযোগী করাও সম্ভব হইয়াছে। সানফ্রান্সিস্কোর গোলডেন গেট পার্ক নিবাসী জনৈক পুলিস-কর্ম্মচারী বহু চেষ্টার পর এক জোড়া জেব্রাকে ঘোড়ার মত আজ্ঞাবাহী করিয়াছে। একখানি গাড়ীতে জেব্রাযুগলকে জুড়িয়া যখন রাজপথে বাহির করা হয়, তখন সে দৃশ্য দেখিবার জন্য বহু ব্যক্তির সমাগম হইয়া থাকে।



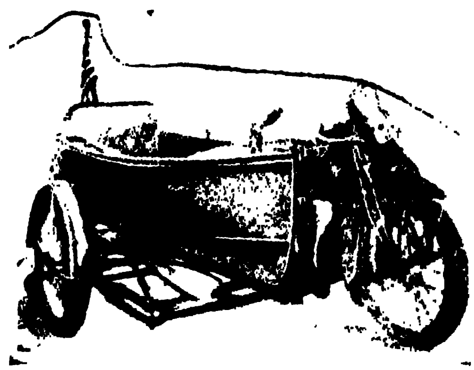
জেব্রাবাহিত গাড়ী

নিস্তরঙ্গ সলিলে 'স্কী' পরিচালন

জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক জলের উপর দিয়া হাঁটিবার জন্য এক প্রকার 'স্কী' (Ski) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই 'স্কী'গুলি ছোট ছোট নৌকার আকারবিশিষ্ট। চরণতলে চর্ম্মবেষ্টনীর দ্বারা স্কীগুলি আবদ্ধ করিতে হয়। যখন প্রকৃতি শান্ত অবস্থায় থাকে, জলের উপর দিয়া এই স্কী সহযোগে অনায়াসে সলিলরাশি উত্তীর্ণ হওয়া যায়। দুই পার্শ্বে দুইটি দণ্ড থাকে, তাহার সাহায্যে লোক আপনাকে জলের উপর সুস্থির রাখিতে পারে।



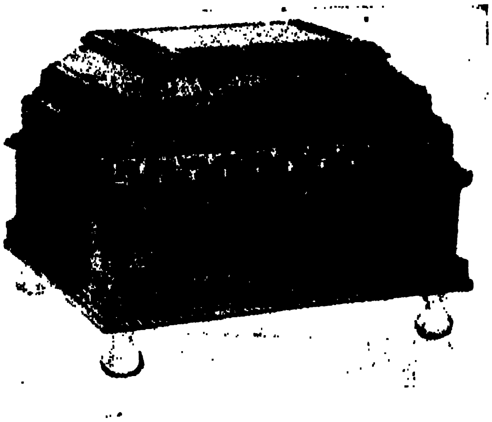
বিচিত্র উভযান



মোটরবাহিত দ্বিচক্রযান-সংলগ্ন উভচর গাড়ী

দ্বিচক্রযান-সংলগ্ন এক প্রকার বসিবার গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গাড়ীতে দুই জন আরোহী অনায়াসে বসিতে পারে। ইচ্ছামত এই গাড়ী দ্বিচক্রযান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া জলে ভাসাইতে পারা যায়। নির্ম্মাণ-কৌশলের গুণে এই গাড়ী মোটর-চালিত হইয়া সলিলরাশি অবাধে ভেদ করিয়া নৌকার কায করিয়া থাকে। কয়েক মিনিটে এই গাড়ী সংযুক্ত ও বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়।

অভিনব পেটিকা



অভিনব দারুনির্ম্মিত পেটিকা

জনৈক ইটালীয় কারিগর ১২ বৎসর ধরিয়া খণ্ড খণ্ড কাষ্ঠের সাহায্যে এক বিচিত্র পেটিকা বা বাক্স নির্ম্মাণ করিয়াছে। বাক্সটি এক ফুট দীর্ঘ ও এক ফুট চওড়া। ইহার উচ্চতা ৮ ইঞ্চ মাত্র। ৫ প্রকার বিভিন্ন কাষ্ঠের ১১ হাজার ৯ শত ৬৮খানি টুক্‌রা সাহায্যে শিল্পী উহা বিচিত্র কৌশল সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আর্দ্র বস্ত্র ও কেশ শুষ্ক করিবার যন্ত্র



আর্দ্র বস্ত্র ও কেশ শুকাইবার যন্ত্র

স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্র ও কেশরাজি অল্পসময়ের মধ্যে শুষ্ক করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। তাড়িত-পরিচালিত, অভিনব প্রণালী নির্ম্মিত পাখার মত যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্পকালমধ্যে আর্দ্র বস্ত্র ও কেশ শুকাইয়া যাইবে। এই যন্ত্র ঘরের যে কোনও স্থানে সন্নিবিষ্ট করা চলে।

রবারের মুখোস



রবারের মুখোস

যাহারা চর্ম্মরোগ অথবা স্নায়ুঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে, তাহাদের জন্য রবার-নির্ম্মিত একপ্রকার মুখোস নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রবার বিনির্ম্মিত মুখোসের অভ্যন্তরে জল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। মুখোসের মধ্যে এক পাইট জল ধরে, কিন্তু যখন জল ঢালিয়া ফেলা হয়, তখন তাহার ওজন মাত্র ১২ আউন্স হয়। মুখোসের মধ্যে জল সর্ব্বত্র সমানভাবে থাকে, কোথাও উচ্চনীচ হয় না। গরম অথবা শীতল—উভয়প্রকার জল ব্যবহার করিতে পারা যায়।

রাজপথে মনুষ্যবাহিত সোডার উৎস

বেলজিয়মের নগরগুলির রাজপথে মানুষের পৃষ্ঠদেশে সোডা-পূর্ণ আধার বিলম্বিত থাকে। সোডা-পানেচ্ছু পথিক তাহার নিকট হইতে সোডার জল কিনিয়া পান করিয়া থাকে।



মনুষ্যপৃষ্ঠদেশে সোডার উৎস

সোডা ফিরি করিয়া বেড়ায় ব্যবসা কত রকমে করা যাইতে পারে, ইহা তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত। এক জন সোডাবাহক একসঙ্গে দুই জন লোককে একই সময়ে সোডা ঢালিয়া পানার্থ দিতে পারে। এইরূপ পৃষ্ঠবিলম্বিত আধারে যতক্ষণ পানীয় পদার্থ থাকে, ততক্ষণ লোকটি ফিরি করিয়া বেড়ায়। তাহার পর আবার উহা পরিপূর্ণ করিয়া লয়।

সুবৃহৎ তাম্রদানা

মার্কিণের কোনও গবেষণাগারে প্রায় ৬ সের ওজনের, ১৭ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং কিঞ্চিদধিক দুই ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট একটি অখণ্ড স্বচ্ছ তাম্রদানা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি ঘণ্টায় সওয়া ইঞ্চ করিয়া এই অখণ্ড দানাটি অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করা হইয়াছিল। অখণ্ড দানার একটি বিশেষ গুণ এই যে, সাধারণ ধাতু অপেক্ষা ইহা শতকরা '৭৩ গুণ অধিক



করিতে সমর্থ। ইহার আরও একটি গুণ এই যে, তাম্র-দানাদণ্ডটি সহজে নমনীয় হয়; কিন্তু দণ্ডটিকে বাঁকাইতে গেলে উহা ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট দানায় পরিণত হইবে। তখন সাধারণ তামার ন্যায় উহা কঠিন হইয়া পড়িবে।

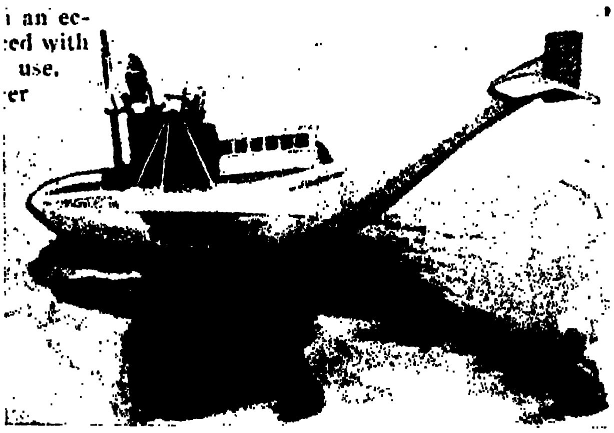
একাধারে চুরুটিকা ও দীপশলাকা



একাধারে চুরুটিকা ও দীপশলাকা

জনৈক ইংরাজ কারিগর সম্প্রতি একই আধারে চুরুটিকা ও দীপশলাকা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বাজারে উহা বিক্রয় করিতেছে। ১৪টি দীপ-শলাকার কাঠি ও চুরুটিকা প্রতি বাক্সে থাকে। বাক্সের এক দিকে কাঠি ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি উৎপাদিত হইবে। ইহাতে ধূমপায়ীর পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে চুরুটিকা ও দীপশলাকা রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কাঠিগুলি ফুরাইয়া গেলে আধারের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবার কাঠি ভরিয়া লওয়া চলে।

অভিনব জাপানী পোত



অভিনব জাপানী পোত

মোটরগাড়ী ও বিমানপোতের গঠন সম্বন্ধে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের মোটরগাড়ী ও বিমানপোত ইদানীং দৃষ্ট হইতেছে। জাপানে জলযানেরও এইরূপ আকারগত পরিবর্ত্তন সম্প্রতি সংসাধিত হইয়াছে। জাপান গবর্ণমেণ্ট এই নব-নির্ম্মিত পোতের নির্ম্মাণ-কৌশলের বিবরণ অত্যন্ত গোপনে রাখিয়াছেন। যতটুকু সংবাদ জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই পোত পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পোতের পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখভাগ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। ইহাতে না কি অগ্নিবর্ষণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

—

অষ্টভুজ ও মানুষের লড়াই



অষ্টভুজ ও মানুষের লড়াই

জেমস্ ডেম্যান্ নামক এক ব্যক্তি ভিনিসের সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভ হইতে একটি অষ্টভুজ তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। একটি ডুবুরীর পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া তিনি উহার সহিত বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিধান করায় তিনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারেন যে, অষ্টবাহু দ্বারা উক্ত রাক্ষস তাঁহাকে বিত্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

—

মূষিক-বধ যজ্ঞ



খালি হাতে ইন্দুর ধরিবার চেষ্টা

মূষিকের প্রভাবে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃত হয় বলিয়া প্যারী মিউনিসিপালিটী মূষিককুল জীবিতাবস্থায় ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্যারী মিউনিসিপালিটীর ইঁদুর-ধরা শ্রমিকগণ শুধু হাতে, পৃষ্ঠদেশে বাক্স বাঁধিয়া নর্দ্দমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ইঁদুর ধরিয়া পৃষ্ঠদেশস্থ বাক্সের মধ্যে ভরিয়া ফেলে। এই উপায়ে ইঁদুর ধরিবার ব্যবস্থা থাকিলেও মূষিকের বংশবৃদ্ধি কমিতেছে না। তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ সংক্রামক ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র



(১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বাদ্যযন্ত্র বিশেষভাবে আদৃত ছিল। মধ্যস্থলের তিনটি বাদিত্র একসঙ্গে বাজাইয়া সঙ্গীতকারিণী অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিতেন।

(২) উপরের দিকে বামে যে যন্ত্রটি দেখা যাইতেছে উহা একটি বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে ৭টি শৃঙ্গ আছে এবং দুইটি চাবিকল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক সময়ে এই যন্ত্রের অত্যন্ত আদর ছিল।

(৩) উপরের দক্ষিণদিকস্থ চিত্রটি প্রাচীন ক[illegible] হারমোনিয়মরূপে ব্যবহৃত হইত।

(৪) নিম্নস্থ বামভাগে যে চিত্র দেখা যাইতেছে. সপ্তদশ শতাব্দীতে সঙ্গীতজ্ঞদিগের বিশেষ প্রিয় ছিল।

(৫) নিম্নস্থ দক্ষিণদিকের যন্ত্রটি প্রাচীনকালে [illegible]লার অভাব পূর্ণ করিত। কোনও রুসীয় সঙ্গীতজ্ঞ বাজাইতে বিশেষ ভালবাসিতেন।

গুরুদাস-স্মৃতি

[ইং]রাজী ১৯ শতকের মধ্যভাগে সার গুরুদাসের জন্ম [হ]য়। তাঁহার পিতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি মোক্তারী [প]রিবার আশায় নারিকেলডাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন। [র]াজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের এক মন্দিরের পুরোহিতের বাড়ীতে [ত]িনি বিবাহ করেন, ইঁহারাও খুব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। [গ]ুরুদাস বাবুর মামা কেল্লায় চাকুরী করিয়া আপনাদের [অ]বস্থা একটু ফিরাইয়াছিলেন। গুরুদাস বাবুর মুখে তাঁহার [ম]ামার অনেক কথা শুনিতে পাইতাম, মামার চরিত্রের [অ]নেক ছায়া তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। অল্পবয়সেই সার গুরুদাসের পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার মা'ই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, মায়ের উপর গুরুদাস বাবুর অচলা ভক্তি [ছ]িল। তাঁহার মা-ও খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং পাকা গিন্নীও [ছ]িলেন, গুরুদাস বাবুর সকল উন্নতির মূলই তাঁহার মা।

সার গুরুদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সেটা হিন্দু [স]মাজের পক্ষে ঘোর বিপ্লবের সময়। সে বিপ্লবটা বাঙ্গালায় [য]ত ফুটুক আর না ফুটুক, কলিকাতায় অত্যন্ত ফুটিয়াছিল। এক দিকে বাপ, মা, আত্মীয়স্বজন ছেলেদের হিন্দু করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহাদিগকে আচার-বিচার শিখাই-[ত]েন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে শিখাইতেন, দেবতা-ব্রাহ্মণে [ভ]ক্তি করিতে শিখাইতেন, আর এক দিকে স্কুলে মাষ্টাররা বলিতেন, ইংরাজী শেখ, ইংরাজের মত চালচলন কর, দেবতাটা কু-সংস্কার, ব্রাহ্মণরা জুয়াচোর, আচার-বিচার বৃথা পরিশ্রম। এই দোটানায় পড়িয়া সে কালের লোক বড়ই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিল, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সভ্যতার কোন্‌টা টিকিবে, তখনও তাহা স্থির হয় নাই, অধিকাংশ ছেলেই মাষ্টারদের কথাই শুনিত। মাষ্টার হয় ইংরাজ, নয় ইংরাজের চেলা, ছেলেদের চালচলন সব ইংরাজী ধরণের হইয়া পড়িত, ইংরাজী শিখিলেই মদ খাইতে হইত, মদ না খাইলে সভ্যতাই হয় না।

এই বিষম সঙ্কটের সময় সার গুরুদাস ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। যে সকল মাষ্টার তাঁহাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, ভর্ত্তি করার জন্য গুরুদাসকে পরীক্ষা নীচের ক্লাসেই ভর্ত্তি করা হইল, তখন নীচের ক্লাসে উঠা-নামা হইত। গুরুদাস প্রথম দিনেই ফার্ষ্ট হইয়া বসিল, তাহার পর কখনই সেখান হইতে নামিল না, স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে ইউনিভারসিটীতে ফার্ষ্ট হইয়া পাশ হইল, কলেজেও তাই, বরাবর ফার্ষ্ট, এম-এতেও ফার্ষ্ট। গুরুদাস বাবুর হেয়ার স্কুলের উপর বড়ই টান ছিল, হেয়ার স্কুলের সকল প্রকার উৎসবেই তিনি আসিতেন। যখন হেড মাষ্টার গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয় পেন্সন লয়েন, তখন গুরুদাস বাবুকে প্রেসিডেন্ট করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ চেষ্টা করা হয়। কার্য্যটি ছোট হইলেও গুরুদাস বাবুর তাহাতে বেশ আগ্রহ ছিল।

সমাজ-সঙ্কটের, সভ্যতা-সঙ্কটের সময় গুরুদাস বাবু ছেলেমানুষ হইয়াও খুব ধীরভাবে কায করিয়াছিলেন। ইংরাজী চালচলন তাঁহাতে একেবারেই প্রবেশ করে নাই, তাঁহার মা তাঁহাকে খাঁটী হিন্দু করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন, তাঁহার মা তাঁহাকে কিছুই বাদ দিতে দিতেন না; ঠাকুরপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা গুরুদাস নিজেই করিতে পারিতেন এবং অনেক সময় করিতেন, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিও যথাশাস্ত্র করিতেন, তাঁহার ক্লাসের ছেলেরা তাঁহাকে অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে করিত।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাস বাবু দিন কতক জেনেরল এসেম্ব্লীতে প্রফেসারী করেন, তাহার পর উকীল হইয়া বহরমপুরে যান। সেখানে, শুনিয়াছি, কোন ভদ্র শূদ্র তাঁহার বাড়ী খাইতে আসিলে তিনি খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন, কিন্তু থালাখানি পুড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার আফিসের কাপড় বাহিরের ঘরে থাকিত। সে কাপড় লইয়া তিনি বাড়ীর ভিতর যাইতেন না। তিনি যখন হাইকোর্টের উকীল, তখন তিনি ১০টা ১১টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেন, কোর্টের কায সারিয়া, অনেক মিটিং সারিয়া, বাড়ী যাইতে তাঁহার ৭টা ৮টা বাজিত, কিন্তু আফিসের কাপড়ে তিনি এক বিন্দু জলও পান করিতেন না। শুনিয়াছি, তিনি আদালতেই বাড়ীর জল ও ভাল ভাল ফলমূল কিনিতেন; কিন্তু কেহ শুঁকিয়া



গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস অঙ্কশাস্ত্রে, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবেন। আপনার আপনার বিষয়ে দুই জনই ধনুর্দ্ধর, দুই জনই ফার্ষ্ট হইবার জন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনিতে পাইয়া গুরুদাস বাবুর মা এক দিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "কি গুরুদাস, তুই আর নীলাম্বর না কি রেষারেষি করিয়া লেখাপড়া শিখিতেছিস্, ছিঃ!" গুরুদাস বাবু আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন—"এই কথা শোনার পর আমি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব মনেও রাখি নাই; যেমন রীতিমত পড়িয়া যাই, তেমনই করিতে লাগিলাম্, দুজনেই ফার্ষ্ট ক্লাসে ফার্ষ্ট হইয়া পাশ হইলাম।"

এখনকার ইংরাজীওয়ালাদের প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থালীর দিকে অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই। ভাঁড়ার যে একটা রাখিতে হয়, ইহা অনেকের ধারণাই নাই, দিন পয়সা ফেলিয়া বাজার হইতে জিনিষ আনিয়া তাঁহারা আহারাদি করেন। কিন্তু গুরুদাস বাবু বাড়ীর চারিদিকে বাগান করিতেন, বলিতেন, চাকর-বাকরের হাতে দিলে তাহারা কি করিতে কি করিয়া বসে, ঠিক নাই, নিজে করাই ভাল। এক দিন বাড়ীর পাশেই দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড মাচা দেখাইলেন, তাহাতে শিম, শশা, ধুন্দুল, সব ফলিয়া রহিয়াছে। গাছপালার সখও তাঁহার বেশ ছিল, কোথা হইতে একটি ভাল আমের কলম আনাইয়াছিলেন। দুই এক মাসের মধ্যেই কলম বা কলমের গাছটিতে একটি আম ফলিল। ছেলেরা আমটিকে তুলিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত তিনি বলিতেন, "না, ওটি পাকিলে ঠাকুরদের দিয়া খাইতে হইবে।" তিনি অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে আমটি কে চুরি করিয়া লইয়া গেল, ঠাকুরদেরও দেওয়া হইল না, খাওয়াও হইল না।"

তিনি যখন বহরমপুরে উকীল এবং সেখানকার ল-লেকচারার, তখন সর্ব্বপ্রথমে প্রেমচাদ-রায়চাদ পরীক্ষা হয়। য়ুনিভার্সিটীর রেজিষ্ট্রার মিঃ সাট্‌ক্লিফ তাঁহাকে এই পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই স্কলারসিপটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পান। ইনি সার আশুতোষ নন, তাঁহার অনেক আগের লোক। গুরুদাস বাবু কিন্তু পরীক্ষা দিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মিঃ সাট্‌ক্লিফ বলিলেন—"তুমি এখানে কেন?" পরীক্ষা হইয়া গেল, আশু বাবুই প্রথম প্রেমচাদ-রায়চাদ স্কলারসিপ পাইলেন। গুরুদাস বাবু জন্মের মধ্যে একবার ফেল হইলেন, তিনি আর এ পরীক্ষা দেন নাই।

কলেজে এম্, এ, পরীক্ষা দিবার সময় নীলাম্বর মুখো-

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মায়ের প্রতি তাঁহার বড়ই ভক্তি ছিল। তিনি মাকে দিয়া সবরূপ তীর্থধর্ম্ম করাইয়াছিলেন একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। মায়ের শ্রাদ্ধে

বিদায় দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথাও বিদায় লইতেন না, কিন্তু গুরুদাস বাবু তাঁহাকে একটি রূপার গ্লাস লওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে অনুষ্টুপ্ ছন্দের দুই চরণ কোদা ছিল। মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি য়ুনিভারসিটীতে কিছু টাকাও দিয়াছিলেন—যাহা হইতে বৎসর বৎসর একটি মেডেল দেওয়া হয়।

গুরুদাস বাবু প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজা করিতেন। প্রথম প্রথম নিজেই গিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন, শেষে ছেলেরা যাইতেন। জগদ্ধাত্রীপূজা কিছু কঠিন, প্রায় দুর্গাপূজারই মত; কিন্তু সব এক দিনে করিতে হয়। পুরোহিত পূজা করিতেন, কিন্তু গুরুদাস বাবু সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। পূজার ব্যাপার সমস্তই শাস্ত্রমত ঠিক হইত, সে বিষয়ে কোনরূপ বিত্তশাঠ্য করিতেন না। দালানের সামনে তাঁহার যে উঠান ছিল, তাহার উপর ছাদ দেওয়া ছিল; সুতরাং যায়গা অনেক ছিল। অনেক লোক বসিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমা দর্শন করিত। কলিকাতার মান্যগণ্য লোক সকলেই গুরুদাস বাবুর নিমন্ত্রণ পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। খাওয়ারও নানারূপ উদ্যোগ চলিত। যাহারা আচমনীয় জিনিষ খাইতেন না, তাঁহাদের জন্য এরারুট দিয়া অথবা পানফলের পালো দিয়া নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। আর যাহারা আচমনীয় খাইতেন, তাঁহাদের জন্য সুজী, ময়দা প্রভৃতি দ্বারা মিষ্টান্ন তৈয়ারী হইত। যাহারা বসিয়া খাইতেন না, তাঁহাদের জন্য হয় সরায়, না হয় হাঁড়ীতে মিষ্টান্ন গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইত। গুরুদাস বাবু সকলকেই সমানভাবে আপ্যায়িত করিতেন, এবং সকলকেই কিছু খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। নিজে সমস্ত দিন উপবাসী হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এত খাটিতে পারিতেন, সেটা একটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

হিন্দুয়ানীর কথা উঠিলে গুরুদাস বাবু বলিতেন যে, "স্রোত ফিরান কঠিন। আমি ত বিশেষ যত্ন করিয়া ছেলেগুলিকে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু করিয়া তুলিয়াছি; কিন্তু সব নাতিগুলিকে বোধ হয় পারিলাম না।" পারিবেন কেমন করিয়া? তিনি যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন দোটানা একটু একটু আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার শেষ বয়সে সমস্ত দেশ ইংরাজীতে আচার-বিচার আর কতক্ষণ টিঁকে? আর বাস্তবিক কথাও বটে, ছেলেরা করিবেই বা কি! তাহারা ইংরাজী ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, জ্যামিতি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পরিমিতি, ড্রইং করিবে, ফুটবল খেলিবে, ক্রিকেট খেলিবে, না শিখিবে ত্রয়োদশীর দিন বেগুন খাইতে নাই, নবমীতে লাউ খাইতে নাই, দশমীতে কল্মীশাক, একাদশীতে শিম খাইতে নাই? তাহার পর আচার-বিচার বাড়ীর মেয়েরা অথবা বুড়রা শিখাইত। এখন মেয়েরা বেথুন কলেজ থেকে আসেন আর ছেলেরা বুড়দের মতই ইংরাজীওয়ালা, শিখাইবেই বা কে? তবে গুরুদাস বাবু নিজে যতটুকু পারিতেন, মানিয়া চলিতেন।

এক দিন গুরুদাস বলিলেন, "দেখুন, ভাষাটাই বদলে যাচ্ছে (সেটা বোধ হয় আশ্বিনমাসে), এই দেখুন, এখন লক্ষ্মণতর্পণ বলিলে কেহ আর বুঝিতে পারে না। আশ্বিনমাসে অপর পক্ষে সকলকেই তর্পণ করিতে হয়। রামচন্দ্র তর্পণ করিতেন, দুইটি অনুষ্টুপের শ্লোক পড়িয়া তর্পণ করিতেন, কিন্তু লক্ষ্মণ বলিতেন, আমি অত পারিব না। তিনি শুধু বলিতেন, 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' ইহারই নাম লক্ষ্মণতর্পণ। কোন কায সংক্ষেপে সারিতে হইলে সে কালের লোক বলিত, লক্ষ্মণতর্পণ করিয়া ফেলুন, এখন ও কথাটাই উঠিয়া গিয়াছে। কোন পূজা-অর্চ্চনার সংকল্প করিতে গেলে তাহার শেষে কর্ত্তা বলিতেন, 'করিষ্যে' বা 'করিষ্যামি।' এক জন ব্রাহ্মণ সেখানে বসিয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, 'কুরুষ।' ইঁহার নাম উত্তরসাধক ছিল। এখন উত্তরসাধক কথাটা কেহই বুঝেন না।" কথাটি খুব ভাল, কোন রিজলিউশান করিতে গেলেই এক জন তাহাকে সেকেণ্ড করা চাই। সেকেণ্ড করার নাম উত্তরসাধকতা। এখনকার লোক দিনকতক চেষ্টা করিল, "দ্বিতীয় করিল" বা "দ্বিতীয়িল"; কিন্তু সেটা চলিল না, সেকেণ্ড করাই চলিল। এমন একটি সুন্দর কথা "উত্তরসাধকতা" লোপ হইয়া গেল। এখন আর "দক্ষিণা" নাই, তাহার বদলে "ফি" হইয়াছে। সুতরাং গুরুদাস বাবু যে দুঃখ করিতেন, ভাষাটাই বদলাইয়া যাইতেছে, সেটা বড় মিথ্যা নয়। শুধু ভাষা কেন, আমাদের খাওয়া পরা সবই ইংরাজী ধরণে হইয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে গুরুদাস বাবু খুব মান্য করিতেন।

ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বাড়ী ছিল, ছেলেবেলা হইতেই জয়নারায়ণের প্রতি গুরুদাস বাবুর খুব ভক্তি ছিল। ক্রমে বয়স যত বাড়িতে লাগিল, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি তাঁহাদের যথেষ্ট মান্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার এ জ্ঞান ঠিক ছিল যে, ইংরাজী পণ্ডিতরা ইঁহাদের অপেক্ষা ঢের বড়। এক দিন তাঁহার বাড়ীতে কি কাজ, অনেকগুলি হাইকোর্টের উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহই নাই, সংস্কৃত-জানা লোক একটিমাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা উঠিলে গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আমাদের দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা বেশ intelligent. দেখুন, এক দিন হাতীবাগানের এক জন বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'বিষুব মানে যে দিন দিনরাত্রি সমান, তা যদি হয়, তবে বিষুবসংক্রান্তি ত ১০ই চৈত্র হওয়া উচিত, ওটা আপনারা চৈত্র মাসের শেষে লইয়া গিয়াছেন, ঠিক হয় নাই।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"তুমি এখন যে গলিতে বসিয়াছ, এ গলির নাম কি ?" আমি বলিলাম, "রাজা নবকৃষ্ণের লেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা নবকৃষ্ণ কোথায় ?" আমি বলিলাম, "অনেক দিন মরিয়া গিয়াছেন।" পণ্ডিত বলিলেন, "তাঁর নামে গলি থাকে কেন ? তা যদি থাকিতে পারে, তবে ৩১শে চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি হলই বা ?" দেখুন দেখি, কেমন intelligent answer. যে সংস্কৃত-জানা লোকটি সেখানে বসিয়াছিলেন—তিনি একটু ঠোঁট-কাটা; তিনি বলিলেন, "মশায়, আপনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যেরূপ patronisingভাবে কথা বলছেন, তাঁহারা বোধ হয়, সে ভাবের লোক নন। তাঁরা ৩।৪ হাজার বৎসর ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষটা চালিয়া আসিয়াছেন, আর তাঁদের আপনি intelligent ব'লে Certificate দিচ্ছেন; আর দিতে পারছেন, কারণ, এখানে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁদের কেহই বোধ হয় তা'দের জানেন না।" গুরুদাস বলিলেন, "হাঁ, আপনি বলেছেন ঠিক বটে। এ কথাটাই বোধ হয় ঠিক, তাঁরাই ৩।৪ হাজার বৎসর দেশটা চালিয়ে এসেছেন।"

খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে গুরুদাস বাবু বড়ই 'কটকেনা' করিতেন। তিনি কাহারও বাড়ী অন্নগ্রহণ করিতেন না, শ্বশুরবাড়ীও খাইতেন না, ভগিনীপতির বাড়ীও খাইতেন না, বলিতেন, "আমাদের বংশের ধারাই এই, আমরা কখনও কোথাও খাই না।" এক দিন এইরূপ কথা হইতেছে, এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভগিনীপতির বাড়ী খান না, ভায়ের বাড়ীও খান না বোধ হয়।" উত্তর হইল, "আজ্ঞে, তা কেমন ক'রে হয়, হ'তেই পারে না।" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিলেন, "আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের বংশের কেহ মরিলে ভায়ে ত তেরাত্রিতে তার শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করে। সে কি ভাতের পিণ্ডি দেয়, না লুচির পিণ্ডি দেয়, না সন্দেশের পিণ্ডি দেয় ?" গুরুদাস বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনি ঠিক বলেছেন, মরলে যার ভাত খেতে হবে, জ্যান্তে তার ভাত খাব না, এটা অসঙ্গত বটে; কিন্তু আমরা কি করব, আমাদের এটা কুলপ্রথা।"

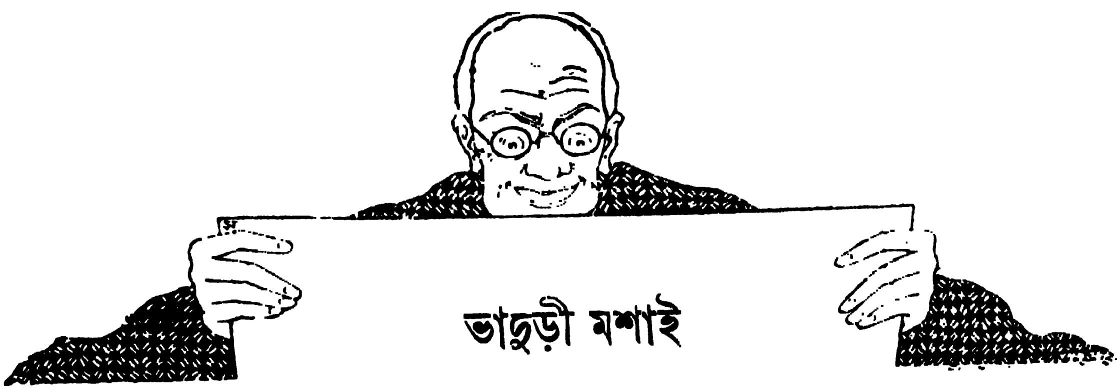
[ক্রমশঃ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মিলন-বিরহে.

মিলনে পাই সদা দেখিতে আঁখি পুরে,
বিরহে থাক বঁধু আমার হৃদি জুড়ে।
মিলনে অহমিকা আনে যে অভিমান,
বিরহ-যমুনায় ছোটে গো প্রেমবান।
মিলন তটিনী যে উছল—ছল-ছল,
বিরহ-পারাবার গভীর অচপল।
মিলনে জেগে থাকি চাঁদিনী মধুরাতি,
বিরহ জেলে দেয় আঁধারে আশাবাতি।
মিলনে বাসনা যে জাগিছে দিবাযামি,

মিলন মুখর যে—জানে না নীরবতা,
বিরহে পুড়ে যায় হৃদয়-মলিনতা।
মিলনে দুই জনে শুধু সুখ নাই জ্বালা,
বিরহে গাঁথি শুধু স্মৃতির ফুলমালা।
মিলন উজ্জ্বল যে অরুণ আলো-লেখা,
বিরহ প্রাণে আঁকে কনক-প্রেম-রেখা
মিলনে ব্যথা নাই ঝরে না আঁখিজল,
বিরহে আছে প্রিয় কত না পরিমল !



১১

সকলের চলা এক রকমের নয়,—চা চুমুকে চুমুকে চলতে লাগল।

স্বর্ণ বাবু আচার্য্যের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "মধুপুরে আরও দু' একবার আসা হয়েছে, একটু মুখ বদলে ফেরা হয়েছে, বড় জোর কিঞ্চিৎ রক্তমাংস সংগ্রহ ক'রে। দেখা হয়েছে শালগাছ, মহুয়া গাছ আর বেড়ানো হয়েছে বেশীর ভাগ—ইষ্টেশনে।"

আচার্য্য বল্‌লেন, "আজ্ঞে, অমন স্থান কি আর আছে, মর্ত্ত্যের বৈতরিণী বললেই হয়। কড়ি ফেল্‌লেই পাস পাওয়া যায়, তা যে দিকে যাবেন। আর একটা সুবিধে—মাল শুদ্ধু! শাস্ত্রীয় বৈতরণীর বাবা, সেখানে স্থূচ গলে না, কেবল পাপটুকু সাফ সঙ্গ নেয়। এখানে সস্ত্রীক যেতে পারি—নাই বা তিনি 'সতী' হলেন, অস্থাবরের আটক নেই! কলির প্রধান তীর্থ, প্রায়ই দেব-দর্শন ঘটে, তেমন ভাগ্য হ'লে স্পর্শনও পাওয়া যায়। সেটা অবশ্য প্রকাশ করতে নেই। বেড়াতে যাবেন বৈ কি। শ্রীক্ষেত্রে কেবল রাঁধা ভাত-ডাল মেলে। এখানে যা চাবেন,—'কেলে-নর' আছেন। যাবেন বৈ কি। মহা'মোহ'-পাধ্যায়ও যান।"

সকলে অবাক্ হয়ে শুনছিলেন, স্বর্ণ বাবু বিবর্ণ মারতে মারতে সামলে বল্‌লেন, "আপনি যা বল্‌লেন, সবই ঠিক, আর ততোধিক উপভোগ্য। তবে আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য, এ বারে এঁদের পেয়ে পরম আনন্দে কাটাচ্ছি। একলা ঘুরে আর কতটুকু দেখতুম। এবার এঁদের দেখাগুলোও উপভোগ করছি। এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আর প্রত্যেকেই এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এ দের-ডায়ারীই এক অপূর্ব্ব বস্তু।"

"বলেন কি—ডায়ারী! ও যে ভারী দরকারী জিনিষ। ডায়ারী রাখাটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অভ্যাস। ঐটি না থাকাতেই ত আমরা মাথা তুলতে পারলুম না—আমাদের প্রকৃত ইতিহাসই বেরুলো না। ভগীরথ কোন্ পথ দে কবে স্বর্গে উঠলেন আর কবে কোন্ পথ দে গঙ্গাকে নিয়ে নামলেন, তার ডায়ারী থাকলে আজ ভাবনা কি! ভানুমতীর জন্মমৃত্যুর তারিখই মিললো না। মন্থরা বংশ ছেড়ে গেছেন বটে, তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর মূল্যবান্ মাদুলীরও ব্যবসা চল্‌ছে, কিন্তু তিনি যে কোন্ বস্তির বাস্তু ছিলেন, তার পাত্তা লাগে না। এই সে দিনের কথা—আশানন্দেরই কি ডায়ারী আছে! ছেলেগুলো ঢেঁকি ঘুরিয়ে বাঁচতো, 'স্থাণ্ডো' কি 'মুলার মুলার' ক'রে মরত না। দুর্ভাগ্য! ঃঃ, ডায়ারী,—ভারী জিনিষ মশাই, ভারী জিনিষ। এঁরা রাখছেন না কি? বাঃ, বেশ ত! আর 'ভারত কৈ?' বলবার জো-টি থাকবে না। কি ভুলই সব ক'রে গেছেন! হ্যাঁ, বুদ্ধিমানদের আবার দু'কাপি রাখতে হয়—সদর মফঃস্বল আর কি; যেমন মহাজনী খাতা।"

অক্ষয় বাবু বল্‌লেন, "আপনাকে যখন পাওয়া গেছে, একটু কষ্ট দেবো, এঁদের সকলেরই ইচ্ছে, আপনার কাছে শোনেন,—ডায়ারী লেখার ভাষা আর ভঙ্গী কি হ'লে বেশ smart হয়।"

আচার্য্য। অর্থাৎ flat না হয়? প্রশ্ন বটে! একটু কষ্ট দেবো বলায় ভেবেছিলুম, আর এক কাপ চা খেতে বলবেন বুঝি! পাড়াগেঁয়ে লোক কি না, ভয় পেয়েছিলুম। যাক্, উত্তম প্রশ্নই করেছেন।

মীরা নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

"কঠিন নয়। বিষয়গুলো নিজেরাই ভাষাভঙ্গী যোগায়। যৌবনের সখ সীমা বোঝে না, প্রিয় কিছু পেলেই প্রতিমা বানায়। তাতে জন্মান মহাভারত, ডায়ারী হচ্ছে ঘট-প্রতিষ্ঠা। উচ্ছ্বাস বাদ দিলেই হবে। তবে বেগবান্‌দের অর্থাৎ যাঁদের বেগ আসে, তাঁরা নিয়মের দাস নন, কবিরা নিরঙ্কুশ!"

মীরা এক কাপ চা এনে দিলেন, আচার্য্য সহাস্যে দু'হাত বাড়িয়ে নেবার সময় বললেন, "এ দয়া ভুলবো না মা—তা দেখে নিও।"

সকলে হাসলেন।

মীরা লজ্জায় অধরাঙ্গা হয়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে যেই চেয়েছে, নবনীর চোখ হাঁ ক'রে ছিল, তাতে ঠেকেই একদম লাল।

মতি বাবুর মুখের মামুলী হাসিটা কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে।

আচার্য্য বক্তব্যটা বজায় রেখে বললেন, "বড় জিনিষকে ছোটোর মধ্যে বন্দী করা আর কি। তবে সমজদার চাই, তা না ত বিলকুল বেকার! একটা উদাহরণ শুনলেই সাফ হয়ে যাবে:—

"এই অধমের প্রদাদা মশাই রাজা রামমোহন রায়ের ঊর্দ্ধ একাদশ অহোরাত্রের অসম-সাময়িক হলেও, তাঁর মাল-গুজারির খাতায় এক তারিখে দেখতে পাই টোকা আছে—'অদ্য রোজ বাড়ীতে ও হাঁড়িতে চাউল না থাকা নিবন্ধন-অরন্ধন এবং ব্রাহ্মণীর সবেগে পিত্রালয়গমন' ব্যস্‌-এই-টুকু। সাধারণে এ থেকে এই বুঝবে—তিনি পেটের জ্বালায় জ্ব'লে পুড়ে, সরোষে বাপের বাড়ী পাড়ি মারলেন। কিন্তু তেমন তেমন মানুষের হাতে পড়লে অর্থাৎ বিশেষজ্ঞের হাতে পড়লে এর প্রকৃত অর্থ, কি না—ঐতিহাসিক সত্য সড় সড় ক'রে বেরিয়ে আসবে। অতি সোজা, কেবল ডায়ারী লিখতে আর দেখতে জানা চাই। ঐ যে দুটি কথা—'সবেগে' আর 'গমন' বসানো হয়েছে, ঐতেই সব খোলসা হয়ে রয়েছে। 'সবেগে' না লিখে 'ধীরপদে' লিখলে সেটা হ'ত সাংঘাতিক আর 'গমন' না লিখে 'প্রস্থান' লিখলে ত চুকেই যেত। তা তিনি লেখেন নি। শব্দতত্ত্বের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘট বুঝে নেবেন—তখন ব্রাহ্মণী স্বামিঘর বজায় রাখবার জন্যে বাপের বাড়ী থেকে চাল আনতে ছুটেছিলেন। গজেন্দ্র-গমনে গেলে, মহেন্দ্রক্ষণ পেয়ে—নিকটস্থা অপরা ঝটিতি চাল এনে চুলো দখল ক'রে কুলো বাজিয়ে দিত। এই হ'ল বাঙ্গালার খাঁটি ইতিহাসের ধারা।

"অনুসন্ধানে জানা যায়—প্রদাদা মশাইকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর চারি ভিতে সাতটি ব্রাহ্মণী তখনও বর্ত্তমান! হ'ল ত? লিখে রেখেছিলেন, তাই না! একে বলে ডায়ারীর ভাষা;—ফ্যাণাও না হয়েও ফলপ্রসূ। তবে সমঝদার চাই। যাক্—আপনারা এই যে কাযটি নিয়েছেন, এই হ'ল আসল স্বদেশী। পরদা আছে কি?"

অক্ষয় বাবু ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চাইতে আচার্য্য বললেন—"ব্যস্ত হবেন না, আপনারা কি ধরণে ডায়ারী লিখছেন—শুনতে বাধা আছে কি?"

"ওঃ—না, কিছু না। আপনাদের শোনার মধ্যেই ত ওর সার্থকতা, আমাদেরও লাভ—কত Intelligent suggestion (ইঙ্গিত) পাওয়া যায়।"

স্বপন বাবু এইটিই চাচ্ছিলেন,—বললেন—"তা ত বটেই।"

অব্যক্ত বাবু "one minute please" বলেই পকেটবুক বার ক'রে 'সবেগে' আর 'গমন' কথাদুটি টুকে রাখলেন।

অক্ষয় বাবু কোরক বাবুকে বললেন, "তুমিই আরম্ভ কর—কালকেরটুক শুনালেই হবে।" আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—"ইনি কবি,—দেখতে প্রাচীন না হলেও, অনেক দিনের—বোধোদয় থেকে। সতীর্থদের ব্যবহারে চিত্ত চ'টে যাওয়ায় নিভৃত-নিবাস নিয়েছেন! সাঁওতালদের আজও যা অস্পৃশ্য আছে, তার ওপরেই ওঁর একান্ত ঝোঁক্।"

কোরক বাবু সবিনয়ে ডায়ারীখানি খুলে বললেন,—"এখন কেবল নোটই নিচ্ছি, লিখতে সময় নেবে না!" পড়লেন—"প্রভাতটা ঘোমটে গোধূলির মত। কোন কিছুরই নগ্ন সৌন্দর্য্য নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ করা চলে না ভাব আসছে, কিন্তু ভুল করতে চাই না। ভুল নিশ্চয়ই হয়ে যেতো, ফাউন্টেন পেন চলল না—কালি নেই। বুঝলুম, বাণীর ইচ্ছা নয়। দিনটা কিন্তু ভাল—পঞ্চমী। যা দিনরাত আমার চোখে পড়ছে, মনে ঢুকছে, যে সম্বন্ধে

"কবিতায় পাঁচ লাইন! বাঃ, আপনি নতুন লাইন নিয়েছেন দেখছি! •এই ত দরকার!"

"না, শেষ চরণটা—"

"অসদাচরণ করছে? ওকে মিলতেই হবে দেখবেন। আজকাল ওট হবার জো নাই। পড়ুন দিকি।"

"লিখবো কি মশাই—সব এক চেহারা! ক'দিন ধ'রে ভাবছি, ঝি থেকে আরম্ভ করি, কিন্তু যাকে দেখি, সেই 'সুখিয়া!' তাই লিখছিলুম—

মখমল মোড়া নিটোল, যেন কনসার্টের ঢোল!

হেরিলে হাতের গুল--মনে পড়ে বিত্র-শূল!

চিত্তে হেন অনুমানি—

এইখানে এসে কাল আর এগুতে চাইলে না! আমিও laboured (টেনে বোনা) জিনিষ চাই না কি না,—থেমে গেলুম।"

"বেশ করেছেন, এ ত আর হেলে গরু নয় যে, এগুবার process এক হবে। অনুমানি কথাটির উপযুক্ত মিল চাই ত। 'জ্ঞানী' লাগালে গাঁট প'ড়ে যায়, ব্রহ্মাণী, সর্ব্বাণী,--উঁহু, যতি সামলানো যায় না—পাল্লা ঝোঁকে। আচ্ছা,—চিত্তে হেন অনুমানি, স্যাণ্ডো কি ভীমভবানী।

কেমন লাগে?"

"চমৎকার, উঃ, একদম Titting (লাগসই), এক মিনিট,—নোটটা ক'রে নি।"

"কবিতা এমন জিনিষ (প্রেমের বস্তু কি না), একবার গোঁ ধরলে রোকা দায়! তা না ত কি, আড়াই সের তিন সের ওজনের মহাকাব্য জন্মাতো। ঠেল্ মেরে হুড়মুড় ক'রে আসে।"

"বলুন না—বলুন না।"

লিখুন,—বার্ণ কোম্পানীর ঘড়া—এক ছাঁচে সব গড়া।"

কোরক। উঃ, আপনার ত,—আপনি এখন আছেন ত—

আচার্য্য। যদি থাকতে দেন।

সকলে হাসলেন।

আচার্য্য। যা আরম্ভ দেখছি, এ যদি চাগিয়ে শেষ করতে পারেন, একটা স্থাবর সম্পত্তি দাঁড়িয়ে যাবে। পারবেন নাই বা কেন? তবে ঐ আটপিটে ছন্দটা কিছু প্রাচীন—এই যা। আজকাল "মেরেকেটে" ছন্দটারই

"একটু hint যদি—"

আচার্য্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপত্তি কি। ওতে মিলটা যেখানে সেখানে সুবিধামত ঘ'টে যায়। যেমন,—

শুনিছ কি তুমি, বোসেদের ভূমি, —হবে নিতে।

আর,—এই নব বর্ষে—তাতে,—বুনতে হবে সর্ষে—

মকর-সংক্রান্তিতে।

এ যদি না পারো,—তবে

আবার হীনতা, আমার দীনতা, রবে—

বিশ্ব জোড়া।

মুখ পোড়া, যত—যে যেখানে আছে

দুনিয়ার মাঝে,—হাবাতে—

হাসিবে,—সাঁঝে কি সকালে

উপু হয়ে ব'সে দাবাতে।

গুড়ুক—খেতে খেতে ভুড়ুক্ ভুড়ুক্।

কোরক বাবু শুনে এক দম লাড্ডু বনে গেলেন। "ভারী উপকার করলেন। এরূপ help কারুর কাছে পাই নি, কেউ ছন্দ ছাড়ে না মশাই! আপনি লেখেন না কেন?"

"সে অনেক কথা,—এর পর জানতে পারবেন।"

অক্ষয় বাবু বল্লেন, "এই আমাদের আলেখ্য বাবু। ইনি চিত্র-শিল্পে অল্পে তুষ্ট নন, তুলির এক টানে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ফুটিয়ে তুলতে চান। কোথা থেকে টানটি ধরবেন, সেই খুঁটটি খুঁজছেন। খাটুনিটে মাথার মধ্যেই চলছে, হাতে নামছে না। ওঁর ডায়ারী তাই কোরাই রয়েছে, ফিরে গিয়ে ফেরৎ দিতে পারেন। বড়ই মনমরা হয়ে আছেন। বলছেন, পায়ে পায়ে চীন পেরিয়ে জাপানটা হয়ে আসি, তারা না কি এক আঁচড়ে অনন্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে যায়।"

আচার্য্য। বেশ, ইচ্ছা যখন এসেছে, বাধা দেওয়া উচিত নয়। বিদ্যার্জ্জন করতে লোক পরলোক পর্য্যন্ত গিয়েছে, অর্জ্জুনও ধাওয়া করেছিলেন,—জাত যায় নি। তবে টান্টার সঙ্কেত শিখতে চীনই না কি প্রশস্ত, ওস্তাদ খুঁজতে হয় না,—প্রায় সকলেই। চিত্রবিদ্যা সঙ্কেতমুখী। একটানে সাঁওতাল-ভূমির পরিচয় প্রস্ফুট করবার সহজ উপায় কিংশুক বাবু ত অনেকক্ষণ ব'লে দিয়েছেন,—অবশ্য ইসারায়। অথচ উনি চিত্র-শিল্পী ব'লে ধরা দেন নি!

শুনে কিংশুক বাবু 'মূঢ়ের মত' চেয়ে বল্লেন, "কৈ, আমি ত কিছু—"

"না, আমরাও ত অপরাধ বলছি না। তবে আপনিই না সেই মহিলাটির, I mean শ্রীমতী শুভ্রার অবস্থিতি—আলেখ্য বাবুর কক্ষে সন্দেহ করলেন! ওর চেয়ে আর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কি হ'তে পারে। এক আঁচড়ে সাঁওতাল-ভূমির পরিচয়—শ্রীমতীটিকে বা তাঁর চরণ চারখানি আঁকলেই এসে যাবে না কি? তাঁর গতিবিধি ঘরে ঘরে, বনে বনে; তাঁর দর্শন ষড়দর্শনের চেয়ে বড়, কোনও কোনও খিওজফিষ্ট বলেন, ওঁদের তৃতীয় চক্ষুও আছে। তিনি ধনুর্বিদ্যা না জানলেও শিকারপটু; তাঁর আঁচড় সাঁওতাল-ভূমির সর্ব্বাঙ্গে। আপনার এক আঁচড়ে সবগুলিই এসে যাবে। তার পর চিত্র-পরিচয় দিলেই সাফ্! নবনী কি বলো?"

নবনী চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে চাইতে গিয়ে মীরার মুখে চেয়ে ফেললে। সে চাউনি মীরার মুখে যেন ফাগ ছড়িয়ে দিলে! আবার লাল!

আলেখ্য। আপনি আমাকে বাঁচালেন।

আচার্য্য। ও কি কথা,—যাক! up to date চান ত রবি বাবুর যে কোনও কবিতা থেকে নীচে দু'চার লাইন লাগিয়ে দেবেন। যেমন:—

"গ্রামে গ্রামে এই কথা রটি গেল ক্রমে,
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে।"

বস্। চিত্র এক দম জল হয়ে যাবে।

অক্ষয় বাবু বল্লেন, "এই আমাদের বেলোয়ারী বাবু, খুব শক্ত বিষয় নিয়ে রয়েছেন। সব বাজনা বাজিয়ে ফেলে এখন তেলেগু গানের স্বরলিপি বানাচ্চেন। মোজার্ট কি বিটোভানের ধারা উল্টে দিতে চান। কালকের progressটা শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

"বাঃ বেশ ত, এক একটি রত্ন বল্লেই হয়। খুব এসে পড়েছি ত। মতি বাবুকে শত ধন্যবাদ।"

মতি বাবু চুপ-চাপ—কানে শোনেন না।

আচার্য্য ব'লে চললেন—"বিষয়টি খুব কদরের, এর সাড়া অনেক দূর পৌঁছুবে। একটু শুনবো যে।"

বেলোয়ারী বাবু একটু গলা সাফ ক'রে সুরু করলেন,—"আমাদের ভারতবর্ষটি একটি রকমারী জাতের জোট-স্বর, টানটোন সবই বিভিন্ন। একমাত্র সঙ্গীতের সুরই একতা রক্ষা ক'রে আসছে। দেশ বেলায় বেইমান, তাই এই একমাত্র গৌরবের জিনিষের দিকে দৃষ্টি নেই। এটা বোঝে না, এই সঙ্গীতবিদ্যাই এদের মধ্যে একতা এনে দিতে সমর্থ, নান্যঃ পন্থা। যাক,—আমার সুর নিয়ে কথা। যত দূর পারি, তাকে খাঁটি রাখবার উপায় উদ্ভাবন করাই আমার ব্রত। এ জিনিষটির জন্ম দাক্ষিণাত্যে। বহু প্রাচীন,—সেই ত্রেতার কথা। এর উদ্ভব বিজয়ানন্দে। সীতাকে এ পারে পৌঁছে দিয়ে আনন্দের উত্তেজনায়,—উল্লাসের যে সব শব্দ, সুর, টানটোন, গিটকিরি বেরিয়ে পড়েছিল, রামচন্দ্রকে সেগুলি মিষ্টি লাগায় সৃষ্টি ব'লে থেকে গেল। আবার অগ্নি-পরীক্ষার সময় বিষাদের সুর বেরিয়ে এল। শ্রীহনুমান্ সে সব অযোধ্যায় বা আর্য্যাবর্ত্তে পৌঁছে দেন।

"ফল কথা, দাক্ষিণাত্যেই এ জিনিষ জন্মায়। তেলেগুতে এর উৎকর্ষ। সেই সব বস্তুর মৌলিক আস্বাদ গুণী আর গুণগ্রাহীদের দেবার জন্যেই এই স্বরলিপি নিয়ে পড়েছি।

"এখানে বলা আবশ্যক,—তেলেগু ভয়ঙ্কর গিটকিরি-প্রধান। সকলের সহজ-বোধ্য করবার জন্যে, অনেক চিন্তার পর গিটকিরির স্থানে চিহ্নরূপে এক একখানি করাত বসিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু 'বিলোম' বোঝাই কি ক'রে?"

আচার্য্য। কেন, যে উমদা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যথাস্থানে এক একটি নেড়া মাথা বসিয়ে যান। কোন্ মূর্খ না বুঝবে!

বেলোয়ারীলাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "মার দিয়া" ব'লে উঠলেন। তার পর—"কিন্তু আর একটা প্রধান জিনিষ বোঝাবার পথ যে পাচ্ছি না, সেটি না হ'লে সব মাটী। এক একটি পদ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার ভাঁজতে হয়, তাতে ভারী জ'মে ওঠে, একদম শুড় ক'রে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে পদগুলি বার বার লিখে বলতে গেলে স্বরলিপি বেজায় বেড়ে যায়। একটা সহজ উপায়—"

আচার্য্য। আছে বই কি। আপনি অতিরিক্ত ভাবছেন কি না, তাই মাথায় ঢোকবার পথ পাচ্ছে না। আর পায়ের জিনিষ মাথায় আসেই বা কি ক'রে! যেমন করাত বসিয়েছেন, তেমনই স্থানবিশেষে এক এক পা "লপেটা" লাগিয়ে দিন

আচার্য্য। "ধপ্‌ধপে ধোয়া" বলছেন? 'সন্‌-লাইট' ব্যবহার করি যে!"

সকলে প্রশংসা ক'রে হাসলেন।

নবনীর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু মীরার চক্ষুতে পড়তেই,—ফের লাল! মীরা জড়সড়।

মতি বাবু অর্দ্ধসমাপ্ত চায়ের কাপ রেখে হঠাৎ উঠে পড়লেন। কারণ,—একটা জরুরি কায ঝাঁ ক'রে মনে প'ড়ে গেছে।

অক্ষয় বাবু ভীত হয়ে বললেন—"উঃ, মুখের চেহারা একদম বদলে গেছে; বোধ হয়, বাসায় কারো শক্ত ব্যায়রাম। এতক্ষণ বাইরে রয়েছেন, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে। অতি ভাল লোক, তেমনই মিশুক, বাড়ী বয়ে এসে আলাপ করেন। উনিই আমাদের প্রথম দিনের বন্ধু। সেই এসেছি মাত্র,—লগেজ খোলা হয় নি,—এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাদের এক জন হয়ে পড়লেন। বললেন, এতটা পথ কষ্টের পর একটু বিশ্রাম করুন, ও সব আমি খুলছি। আমাদের হাত দিতে দিলেন না, নিজেই সব খুলে ফেললেন। শক্তি, সহৃদয়তা দুই সমান। এসেই—বিদেশে ওরূপ লোক লাভ করা ভাগ্যের কথা। ওঁর কাছে আত্মপর নাই। সেই দিন থেকে নিত্য খোঁজ নেন, দু'দণ্ড না ব'সে যান না। মাটীর মানুষ।"

কবি কোরক রায় বললেন—"বড় দুঃখ হয়, কানে শুনতে পান না। অমন লোকের জন্মটা বৃথা হয়ে গেল; ভ্রমর-গুঞ্জন কি কোকিলের ডাক কানে গেল না।"

আচার্য্য গম্ভীরভাবে বললেন,—"কষ্টের কথা বটে। এর চেয়ে আর দুঃখ কি আছে; কানে কোনও বোলই নিলেন না, সেরেফ্‌ খোলই বইলেন। আমার ত বোধ হয়, অমন লোকের এমনটা বেশী দিন থাকতে পারে না।"

ইরাণী আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, বললেন—"ওঁর নিজেরও দৃঢ় বিশ্বাস তাই।"

"বটে! নিষ্পাপ অন্তরাত্মা যে ব'লে দেয় মা। ওঁ কি ভুল হবার জো আছে!"

পরে নবনীর দিকে চেয়ে—"আমরা একসঙ্গে এসেছি, আমরাও তা হ'লে"—

সুবর্ণ বাবু। সে কি কথা, এখনও বেলা হয় নি। দেখুন, আপনাদের পেয়ে আজ সকলে যে শুধু পরম আনন্দই উপভোগ করছেন, তাই নয়, উপকৃতও হচ্ছেন। আমাদের কিংশুক বাবুর বিষয়টি বড়ই জটিল, আপনারা থাকলে আর ওঁর ডায়ারী শুনলে, আশা করি, সেটির কোনও উপায় বেরিয়ে আসতে পারে।"

সুবর্ণ বাবুর অনুরোধ এসে পড়ায় আচার্য্য একবার সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে, তাঁদের সমর্থনের আভাস পেয়ে বসতে বাধ্য হলেন।

মীরা আর ইরার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ্তি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ঠিক এই সময়—এক পরাৎ সিঙাড়া, নিমকি আর সন্দেশ নিয়ে সুবর্ণ বাবুর চাকর উপস্থিত হ'ল।

"এ কি!"

"মা পাঠিয়ে দিলেন।"

আচার্য্য। মায়েরা চিরদিনই অন্তর্য্যামী। ঠিক এইটিই আশা করছিলুম। মিষ্টিমুখ যে করতে হয়। দাও ত মা, আমাদের।"

মীরা মাথা হেঁট ক'রে নুয়ে রইল।

সুবর্ণ বাবু ইরাণীকেই ভারটা দিলেন।

অক্ষয় বাবু বললেন—"ইস—এ যে প্রচুর!"

আচার্য্য। আমরাও কোন্‌ দু একটি। টেবলে তেরো জন থাকলে পাছে অনর্থ ঘটে, তাই মতি বাবু উঠে গেছেন। ভালো লোক অজ্ঞান্তেও ভালো ক'রে থাকেন।

"আহা, তিনি এ সময়"—

ইরাণী প্রত্যেকের সামনে ডিস্‌ সাজিয়ে দিতে লাগলো। কিংশুককে দেবার সময় আচার্য্য ব'লে উঠলেন—"ওখানে ডবল্‌ দেওয়া চাই, মা, উনি সকলের ছোটো, তায় ওঁর বিষয়টিও না কি সকলের চেয়ে জটিল।"

ইরাণী হাসতে গিয়ে, একেবারে "মেরি রেডি!"

আচার্য্য। নবনীও ছেলেমানুষ, মা।

ইরাণীর হাত থেকে দু'তিনটে বাড়তি সিঙাড়া সন্দেশ ত কিংশুকের ডিসের উপর পড়েই গিয়েছিল, কিন্তু তার রাগটার ভাগ নবনীর ডিসেই ভর করলে।

কাযটা হাসি মুখে চললো।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবোল-তাবোল

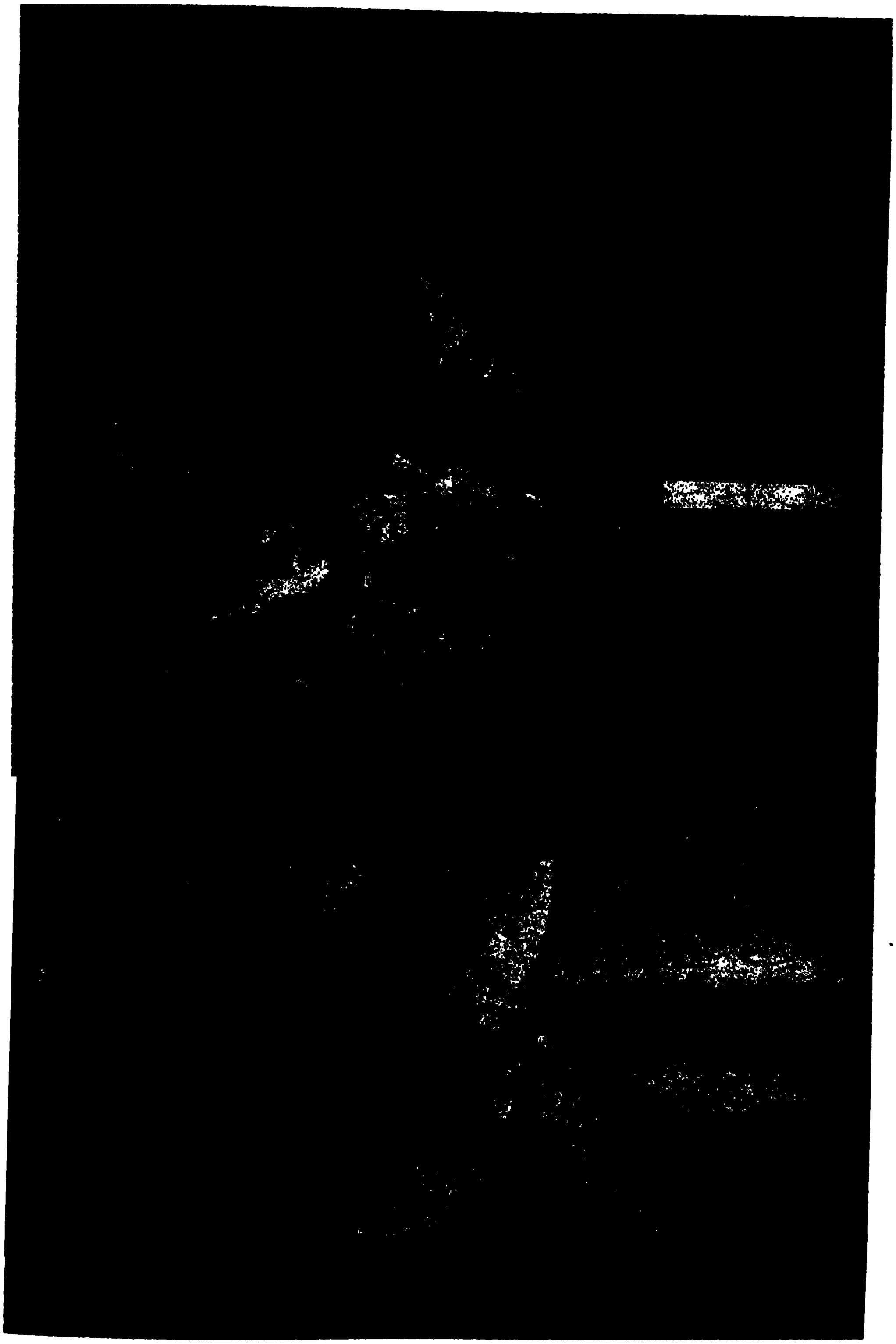
ইংরাজের অধীনে প্রভু-পরিবর্ত্তনের নূতন সুখে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। ইদানীং অনেক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক মুসলমান-রাজত্বে একটা-আধটা মানসিংহ-টোডরমল বা রাজবল্লভ-নন্দকুমার দেখাইয়া আমাদের হিন্দু-জাতিটার রাজার হালে থাকার কথা ইতিহাসে, বাগ্মিতার ভাবে বা কবিতা-প্রকাশে বুঝাইয়া দিলে-ও ছোট ছোট চাচাদের এই ঢোঁড়া অবস্থার চক্র দেখিয়া গোখুরা-লীলার বিষের কথা স্মরণ করিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে। ভাল মন্দ যাহাই হউক, সাধারণতঃ তখন-ও আমরা কাঠ কাটিতাম, জল তুলিতাম, এখন-ও কাঠ কাটিতেছি, জল তুলিতেছি। তবে তখন লাখে এক জন লোক গায়ে জোড়া চড়াইয়া মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া জল তুলিত, বাকী সব গামছাপরা; আর এখন অন্ততঃ হাজারে দশ জন হিন্দু চাপকান কোট পরিয়া কাঠ কাটে বা জল তুলে, এটা বেশ দেখা যায়। মোছলমান বড় লোকরা পড়া-শুনা করাকে মর্য্যাদা-হানিকর কার্য্য মনে করিতেন, অথচ একটা বড় রকম খামদানীর পরিচয় না থাকিলে লম্বা অঙ্কের তঙ্কাযুক্ত পদ বা চাকরী অপরের পক্ষে পাওয়া দুষ্কর হইত; পার্শি-পড়া হিন্দুরা ঐ সব সুবাদার, মন্সবদার, ফৌজদার, কাজী, কোটাল প্রভৃতির অধীনে মস্তিষ্কের শক্তি ব্যবহার করিতেন; কর্ত্তাদের হাতে থাকিত চাবুক বা তরোয়াল; তদধীনরা অতি সামান্য বেতনে কাগজ, কলম ও মাথা লইয়া বিব্রত থাকিতেন।

বীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু চৌর্য্য-বিদ্যার খাদ না মিশাইলে ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না, জীব-জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দেবতারা সমুদ্র-মথিত অমৃত পানানন্তর ক্ষুধার দায় হইতে এক রকম নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু রমণীর অধর-গলিত সুধা মানবের প্রেম-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিলেও উদরের ক্ষুধা দূরীভূত করিতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই।

অধীন কি স্বাধীন—প্রভু কি ভৃত্য, সকলের-ই ক্ষুধা সেকালে-ও ছিল—একালে-ও আছে এবং কাহার কাহার-ও অনুনাসিকস্বরে জীবিত মনুষ্যের নিকট মৎস্য-ভিক্ষা করার গল্প সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য এ দেশের গৃহস্থরা প্রায় সকলে-ই চাষের জমী রাখিতেন আর জাতিগত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বস্ত্রবয়ন হইতে ক্ষৌর-কার্য্যকরণ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা অন্ন-সংস্থানের উপায় করিতেন।

ইংরাজ আসিয়া এ দেশে দেখিলেন যে, এখানে ভূমি-খণ্ড অতি বিস্তীর্ণ ও উর্ব্বর, অধিবাসীর সংখ্যা-ও গণনাতীত, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা বড়-ই কম। সমাজে জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজন এরা এত সংক্ষেপে সারিতে পারে যে কোন সামগ্রীর জন্য-ই ইহাদিগকে পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না। সভ্যতার বিষম শত্রু সন্তোষকে বাঙ্গালীরা সুখ বলিয়া ভ্রান্তিবশে বরণ করিয়াছে বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ ইংরাজ ইহাদিগের মন আলোকিত করিবার জন্য বিলাত হইতে একটি লণ্ঠন আনাইলেন। সেই লণ্ঠনটির নাম এ, বি, সি। যদি জ্বলনশীল পেট্রলের নাম বি, ও, সি হইতে পারে, তবে লণ্ঠনের নাম এ, বি, সি হওয়া বিচিত্র নয়, এ কথা পাঠক অবশ্য বুঝিবেন।

এ, বি, সির আলো যখনই ভাল করিয়া আমাদে[র] প্রাণে প্রবেশ করিল, তখন-ই আমরা বুঝিতে পারিলা[ম] যে, এই নরদেহ একটা অশ্লীলতাব্যঞ্জক কদর্য্য পদা[র্থ]; পরস্পরের চক্ষু হইতে ইহাকে যতটা আবৃত করিয়া রাখি[তে] পারা যায়, ততটাই সভ্য রুচিসম্মত কার্য্য করা হইবে। নারীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে-ই অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকিত; এক্ষণে নরের মধ্যে-ও অনেকে দাড়ী রাখিয়া অশ্লীল মু[খের] লজ্জা নিবারণ করিলেন। সভ্যতার সরস তীর্থ সহ[র]বাসী ঘোড়া-গরুর-ও লালবাধা থাকে দেখিয়া আ[মরা] নগ্নপদে নিজ নিজ গৃহাঙ্গনে-ও পদচারণ করিতে লজ্জি[ত] হইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লজ্জা দিল আমাদের পল্লী[র] পুকুর, বাগান, বন, মাঠ, উলুর চালা আর ধানের গোলা[,] পাইখানার সংলগ্ন রান্নাঘরে বসিয়া অন্ন-ভোজনে আন[ন্দ] লাভের জন্য দলে দলে বাঙ্গালী গ্রামের বাস্তু শৃগাল-স[...]



ঢালো তবে ঢালো——"

[শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার]

সহরাভিমুখে ধাবিত হইল। সাধারণ গৃহস্থঘরে ভোজ্য-বস্তুর সঞ্চয় পর্য্যাপ্তের অধিক পরিমাণে থাকিলে-ও নগদ টাকাটা কাহার-ও বড় বেশী ছিল না; সেই রজতের ইজ্জৎ ইংরাজ আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইংরাজী পড়িতে লিখিতে পারিলে-ই টাকা যেন আপনা-আপনি-ই ঘরে আসে। লাঙ্গল ধরিতে হয় না, জন খুঁজিতে বা সার সংগ্রহ করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয় না; ধূলা কাদা রৌদ্র বৃষ্টি কিছুর-ই বালাই নাই, কেবল ধোপদস্ত কাপড় জামা বুকযকরা জুতা পায়ে দিয়া yours most obedient servant (ভবদীয় আজ্ঞাধীন দাস) বলা, আর হাতে হাতে টাকা পাওয়া।

লোয়ার প্রাইমারী পাশ—অমনি এক টাকা ক'রে জলপানি; মাইনার পাশ—চার চার টাকা; এনট্রান্সে ১২।১৪; ক্রমে জলপানির উপর জলপানি। এ-পাশ ও-পাশ ফিরিয়া শেষ সেই হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইতে শিখিলে, অমনি চাকরী! হাজা-শুকা নেই—লাভ-লোক-সান খতাতে হয় না; প্যাণ্ট-কোট-চাপকান-টাপকান প'রে পাখার নীচে চেয়ারে ব'সে দশটা পাঁচটা কলম চালানো আর মাসে মাসে নগদ টাকা;—কুড়ি, চল্লিশ, ষাট, শ,—তার-ও উপর চার শ' পাঁচ শ' ছ শ';—ও বাবা, এ সুখ ছেড়ে কে যায় তাঁত চালাতে, ছুরী-কাঁচি গড়তে, ঘটী-বাটি পিটতে, রাঁধা ধরতে! ধীরাজ গান বেঁধেছিলেন:—

'রাঁধা ছেড়ে যত ভেড়ে
ইংরিজীর অলরাইট প'ড়ে
অহঙ্কারের সীমা নাই।"

বাস্তবিক-ই বাঙ্গালী বড় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাইতে চাহিত না, তাই যখন প্রথম ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে খুলে, তখন রেল কোম্পানীকে মোটা মাহিনার লোভ দেখাইয়া অনেক 'অলরাইট পড়া রাঁধা ছাড়া ভেড়েকে' রাজমহল, মুঙ্গের, জামালপুর পাঠাইতে হইয়াছিল।

স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যত চাকরীর খদ্দের বছরের পর বছর প্রস্তুত করতে লাগল, ইংরাজ-ও তত চাকরীর ক্ষেত্র প্রসারিত করতে লাগলেন। রাইটার্শবিল্ডিং, ট্রেজরি, সেক্রেটারিয়েট, মিলিটারী, সিভিল, সার্ভে, ডাকঘর, তার-আদালতের উপর আদালত খোলায় দাওয়ানী ফৌজদারী ছোট হাকিম উকীল মোক্তারের-ও অন্নার্জ্জনের বিবিধ স্থান প্রস্তুত হ'ল; চাকরে তৈরী করবার চাকরে মাষ্টার প্রফেসর ত আছে-ই।

পৌরোহিত্য থেকে কাপড় কাচা পর্য্যন্ত বৃত্তি-বিভাগে এ দেশে কতকগুলি জাতির অস্তিত্ব ছিল; ক্রমে ইংরাজী-পড়া লোক নিয়ে একটা নতুন জাতি সৃষ্টি হ'ল—যার নাম বাবু। বাবু হ'লে-ই সমাজে সম্ভ্রম আর অল্প শ্রমে অর্থাগম।

প্রায় এক শত বৎসরের অভ্যাসে আমাদের এখন একটা এমন সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে, "সাহেবরা" যখন আমাদের ইংরাজী-পড়ার বন্দোবস্ত করেছে, তখন ওর ভিতর এমন একটা অ-লিখিত চুক্তিপত্র আছে যে, সে আমাদের চাকরী দিতে একান্ত বাধ্য। ইংরাজ এ কথাটি যে মনে মনে বোঝেন না, তা নয়; কিন্তু পড়েছেন মুস্কিলে, চাকরী আর জোটাতে পারছেন না।

একা রাবণ-ই যে নিজের মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে রেখেছিলেন, তা নয়; যদি একটু ঠাউরে দেখি ত বেশ বুঝতে পারি যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার মৃত্যুবাণ আপনি নিজের অজ্ঞাতসারে তৈরী ক'রে রেখেছি বা রাখছি। ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতি, স্বার্থ-সিদ্ধির পোষ্টাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতি বুদ্ধি খাটিয়ে আপনাদের নষ্ট করবার যষ্টি গাছটি-ও আপনার হাতে-ই চেঁচে-ছুলে তৈরী ক'রে রাখছে।

একটা টাট্‌কা দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখেছি ব'লে এখানে ব'লে যাচ্ছি। সে বছর ট্রামওয়ের কণ্ডাক্টর ড্রাই-ভার প্রভৃতি মিলে একটা ধর্ম্মঘট ক'রে এই কলকাতা সহরে ট্রামওয়ের চলাচল কয়েক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ক'রে দেয়। প্রথমে ঘোড়া দেখেই আমরা খোঁড়া হয়েছিলুম, তার পর তড়িতের তাড়নায় একেবারেই চলচ্ছক্তিরহিত, এই বুঝে খানকতক মাল-বহা লরী বাবুদের ত্রিপল ঢাকা দিয়ে কলেজে ও কর্ম্মস্থলে পৌঁছে দিতে সুরু করলে। প্রায় মাস তিনেক পরে যখন ট্রামওয়ে ও কর্ম্মীদের মধ্যে মিটমাট হয়ে ট্রাম আবার অপ্রার্থিত বিশ্রাম ত্যাগের সুযোগ লাভ করলে, তখন কে জানে কার আবেদনে বা অনুরোধে

রাস্তায় লরী চলা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার, সুতরাং নর-বাহী যানরূপে ঐ লরীব্যবহার বন্ধ হোক।

ট্রামওয়ে ভাবলেন, সব আপদ গেছে—বাঁচা গেছে, এইবারে আমরা খানকতক 'ব্যস্' আনিয়ে যে সব রাস্তায় ট্রাম পাতা নেই, সে সব রাস্তায় কিছু পয়সা কুড়িয়ে নেই। বাস্! ট্রামওয়ে তৈরী করা একটা অনেক লক্ষ টাকার ব্যাপার, কিন্তু একখানা 'বাস্' হাজার দুই আড়াই টাকায় কেনা চলে, কিস্তিবন্দীতে-ও সওদার ব্যবস্থা আছে। এখন 'ব্যসে ব্যসে' ধূলো পরিমাণ, ধূর্ত্ত ট্রাম গড়েছেন নিজের মৃত্যুবাণ।

চাকরীর চার ফেলে ইংরাজ বামুনের ছেলের শাঁখ-ঘণ্টা কেড়ে নিলেন; তাঁতি তাঁত ছাড়লে; ছুতারের র‍্যাঁদা গোবরগাদায় গেল; চাষী ভুললে খামার, হাতুড়ী ফেলে দিলে কামার; চাক ফেলে দিয়ে কুমার লালদীঘির চার-ধারে ঘুরতে লাগল। এক দিকে এঁটে তুলে, কাঁসা-পেতল পিটে, থালা-ঘটী গড়া ছেড়ে, ইংরাজী বুলী কেড়ে পয়সা আনার যেমন মজা, অন্যদিকে তেমনই এই বাবুদের প্যাণ্ট্‌-লেন কোটের কাপড়, চিরুণী, ক্রস, চা, চুড়ী, সিল্কের সাড়ী আর এনামেলের বাসন, মাস্থিলি টিকিটের আসন বেচার তেমন-ই মজা।

কিন্তু এই মজার যমুনার এক পাড়ের ধ্বস্ ভাঙ্গতে দেখেই আমাদের মন ইংরাজ গোকুলের প্রতিকূলে ফিরে দাঁড়িয়েছে। যে চাকরীর দান-লীলায় আমরা দধির পসরা মাথায় ক'রে "শ্যামের পিরীতি যেন পাই নিতি-নিতি" গাইতে গাইতে এ-পার ও-পার করছিলেম, সেই শ্যাম 'হালি পানি পান না'দেখে সুর ফিরিয়ে গাইতে আরম্ভ করেছি,—"আমার অঙ্গনে যেন ত্রিভঙ্গ আর আসে না।" করচূর্ণ-মেকার' পদভ্রষ্ট ইংরাজ বেকারের চোখে কেন শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতিপন্ন হবে?

কেতাবতী লেখাপড়া শেখা একমাত্র যে অন্নের উপায় ব'লে আমাদের কাছে দাঁড়িয়েছে, তা নয়, ভদ্র ব'লে গণ্য হবার-ও পন্থা একমাত্র ঐ। ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের আচার আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সাধু সচ্চরিত্র হ'লে-ই ভদ্রতা রক্ষা হয় না; বেশ-ভূষা, বাসা, যাওয়া-আসার সরঞ্জাম প্রভৃতির খাসা বন্দোবস্ত থাকা চাই, তবে

পুরাকালে ছিল বাহুবলের প্রভাবে-ই রাজদণ্ডের অস্তিত্ব; কালে বণিকের সমক্ষে সৈনিক মস্তক নত করিয়াছে, এক্ষণে বাণিজ্যেরই রাজ্য। বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিতে হইলে, বাণিজ্যের অন্যতম পরিচারক বিজ্ঞান সৈনিকের করে পলকে প্রলয়করী মেকানিকের কল ও রাসায়নিক বল প্রদান করে। 'ব্যক্তির' শক্তির হ্রাস করিতে না পারিলে বাণিজ্যের ভোজ্য আয়োজনে প্রাচুর্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। বৈশ্যের দ্বারে অবশ্যপোষ্যের ফর্দ্দ যত সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইবে, ততই তিনি শ্রেষ্ঠী বা শেঠ উপাধি ধারণের উপযুক্ত হইবেন; সহস্র অধমর্ণ যাহার নিকট জোড়হস্ত—তিনিই উত্তমর্ণ; লক্ষ অভাজন যাঁহার কৃপাচক্ষুর কটাক্ষপ্রার্থী ভিক্ষুক—তিনি-ই মহাজন। সুতরাং যেমন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিতে না পারিলে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি হয় না, তেমন ই কোটি অন্নদাসের সৃষ্টি না করিলে শত সৌভাগ্যবান শ্রেষ্ঠিত্বের মহত্বে ভূষিত হইবার সুযোগ পান না। ক্রমে শ্বেত-সমাজে পেট বাড়িতে বাড়িতে এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক অন্নদাস হইতে পারিলেও আপনাকে ধন্য মনে করিতে বাধ্য।

এই কারণেই বলিয়াছি যে, ইংরাজ আপনার মৃত্যুবাণ আপনি-ই সৃষ্টি করিয়াছে। আলঙ্কারিক প্রয়োগে মৃত্যু অর্থে কেবল দেহ প্রাণের বিচ্ছেদ-ও নয়, প্রভুশক্তির ক্ষয়-ও নয়, শাসনদণ্ডের চণ্ডতার হ্রাসপ্রাপ্তি-ও নয়। কাহারও কাহার-ও মতে মানুষ যদি মানুষের বিশ্বাস, মানুষের ভক্তি, মানুষের প্রেম হারাইল, তাহা হইলে তাহার মনুষ্যত্বের মৃত্যুর আর বাকী কি রহিল?

হায়! এখন-ও পঞ্চাশ বৎসর বোধ হয় পূর্ণ হয় নাই, এক দিন এই কলিকাতার ইংরাজ তাঁহাদের রাজশক্তি প্রেমের শক্তি বুঝিয়া সগর্ব্বে জগৎকে জানাইয়াছিলেন আমরা এ দেশের জন-মনে এতটা আধিপত্য লাভ করিয়াছি যে, বীরবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত রাজপুতদল মুক্ত অসিকরে এক্ষণে আমাদের প্রধান রাজপ্রতিনিধির শরীররক্ষীর কার্য্য করে; আমাদের বহু মূল্যবান জীবন আমরা অধীন জাতির করে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। আর আজ? লজ্জায় আমার ক্ষীণজ্যোতি চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যে পুলিসকে বিজ্ঞাপন বাহি

মহামান্য 'ভাইসরয়ের' চতুরশ্ববাহিত শকট সদলে শোভাযাত্রা করিয়া বাহিত হইবে, সেই সেই পথিপার্শ্ববাসী দেশীয়গণ যেন, জামিন লইয়া ঐ সময়ে অতিথিকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন।

আমি বাঙ্গালী, সাধারণতঃ মানব-পরমায়ুর পরিমাণ তিন কুড়ি দশের পানে অনেক দিন হইতে পাছু ফিরিয়া চাহিতেছি; আমি জোর গলায় বলিতে পারি, আমরা খুনে নই, গুপ্তহত্যা আমাদের জাতির রক্তে নাই। তবে এক দিন ইংরাজকে আমরা বড়-ই ভালবেসেছিলেম, এখন-ও বাসি; কিন্তু জান না কি 'সাহেব', যেখানে ভালবাসা—সেইখানে-ই অভিমান! আমরা বৈষ্ণব, কৃষ্ণ-প্রেম আমাদের মজ্জায় মজ্জায়; কিন্তু শ্রীরাধা-ও আমাদের আরাধ্যা, সেই রাধার চরণতলে লুটাইয়া আমরা মান করিতে শিখিয়াছি।

তুমি বাঁশী বাজাতে কুঞ্জে আসতে, আমরা নিশার আঁধারে অভিসারে এসে তোমার জন্য মালা গাঁথতাম, আকুল নয়নে তোমার আসার পথপানে চাইতাম। তুমি 'সাহেব'-কৃষ্ণ, কেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও, কুব্জাকে রাণী ক'রে বামে বসাও! আগে আমাদের কুল মজালে, লাজ মজালে, ঘুচিয়ে দিলে আমাদের উলুর চালা, ধানের গোলা, ভেঙ্গে দিলে তাঁতের হাত, ভুলিয়ে দিলে হাতুড়ীর আঘাত! মাস মাইনের চাকরীর প্রেমে প'ড়ে আমরা কলঙ্কিনী হলুম। ব্রজের গোপীরা নানা বেশে কৃষ্ণসেবা করেছেন, নবনারী-কুঞ্জর সেজে মদনমোহনকে বহন করেছেন, তিনি বস্ত্র হরণ করেছেন, তাতে-ও তাঁ'রা কথা কন নি, শুধু একটু লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিলেন, আর কিছু নয়। তুমি বংশীবদন-ও আমাদের বস্ত্র হরণ করেছ, আমরা চুপটি ক'রে থেকেছি; ডেপুটী সেজে তোমাদের কালেক্টরকে ঘাড়ে ক'রে বয়েছি; সবজজ সেজে কত বিদ্যাদিগ্‌গজ জজ সাহেবের পদরজে মোহনবেণী লুটিয়েছি; কেরাণীরূপে তোমার কুঞ্জ সাজিয়েছি, শ্রীদাম-সুবোল হয়ে তোমার গরু-বাছুর তাড়িয়েছি; আর আজ 'সাহেব', চারটে পাশের রাস-লীলাতে-ও নেচে আমরা পাইনে পেটের অন্ন—হইনে লোকের মাঝে গণ্য! তবে কেন বলব না মানভরে "কালো রূপ আর দেখব না, কালো কেশ আর বাঁধব না, কালো যমুনায় জল আনতে যাব না, সামিয়ানা খাটিয়ে দেব, তবু কালো আকাশ পানে চাইব না।" সতী হয়ে পতির কোল ছেড়ে তোমার প্রেমে মজলুম, আর ছি 'সাহেব'! তুমি এমন-ই বে-রসিক যে, আমাদের এই মান-টুকুর মর্ম্ম বুঝলে না!

প্রোপাগাণ্ডার পাণ্ডানাগণ্ডা বুঝে নিয়ে যে সব মারীচ-টারীচ আমাদের রাম-লক্ষ্মণ যুবকদলকে সোনার হরিণের লোভ দেখিয়ে কাঁটাবনে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা-ও যেন একটু মনে মনে সাবধান হয়েন; এরা যে দিন নৈরাশ্যের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাবে, সে দিন সব নষ্ট হবে। ব্রজলীলায় সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল রাধার মান, কিন্তু লঙ্কালীলায় বাকল-পরা রাম দেন ধনু ধ'রে টান, লক্ষ্মণ ছাড়েন অগ্নিবাণ!

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

তুমি

রূপের মাঝারে তুমি না রহিলে ভুলিত কি আঁখি তায়?
তুমি না মিশিলে গন্ধেতে মোহ লাগিত কি নাসিকায়?
ধ্বনির আড়ালে তুমি না কহিলে কভু কি শুনিত কান?
দ্রব হ'য়ে তুমি না বহিলে কভু রসে কি মজিত প্রাণ?
বিশ্ব-ভুবনে যে আছে যেখানে, বিশ্ব-ভুবন হরি,
সকলেরি মাঝে রেখেছ তোমার গোপন পরশ ভরি।
প্রেম প্রীতি ক্ষমা, পুণ্য করুণা; পাপ-তাপ-মোহ-ভুল,
আসে সব হ'তে গন্ধ তোমার মন্দার সমতুল।

গন্ধের পথ অনুসরি যত অন্ধ কীটেরা ধায়,
কুরূপ ভৃঙ্গ তোমার অঙ্গ পরশ করিতে চায়।
তুমি যে রয়েছ লিখিয়া রেখেছ সকল ঋতুর গায়;
শীতের আতপে নিদাঘের তাপে বরষার বন্যায়।
ছন্দেতে তুমি কর আগমন, ছন্দেতে তোল তান,
আঁক ক্ষণ তরে চিদাকাশ'পরে রামের ধনুক বাণ
সুন্দর তুমি, সুন্দর তুমি, আর কিছু নাহি মানি,
বড় ভাল লাগ অনুভবে শুধু এইটুকু ভাল জানি

সাময়িক প্রসঙ্গ

নির্ব্বাচন-সমর

তিন বৎসর পরে এবার কাউন্সিল নির্ব্বাচনের ঘোর সমর বাধিয়াছিল। এবার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোট-প্রার্থীদের মধ্যে—বিশেষতঃ স্বরাজী ও রেস্পনসিভিষ্টদিগের মধ্যে যে ভীষণ বাহ্বাস্ফোট, সমরাহ্বান, রণদুন্দুভি-নাদ, কবির তর্জ্জা ও ভোটের লড়াই লাগিয়াছিল, তাহার তুলনা এ দেশে ত নাই-ই, বোধ হয়, ভোটাভুটির ব্যাপারে অগ্রণী জাতিসমূহের ভোটের দ্বন্দ্ব তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ বাঙ্গালায় উভয় দলের পালারম্ভের পর হইতেই চিতেন উতোরের বহর দেখিয়া জনসাধারণ হকচকাইয়া গিয়াছিল। উভয় দলেরই 'মুখপত্র' তারস্বরে দিনের পর দিন চীৎকার করিয়া জানাইয়াছিলেন যে; তাঁহাদের পক্ষেরই ভোটে অপর পক্ষকে 'ডুবিয়ে দেওয়া জয়' হইবে, অপর পক্ষ একবারে ধূলিসাৎ হইবে। এক পক্ষ বলিতে লাগিলেন,—আমাদের শতকরা ৮০ ভোটে জয় হইবে; অপর পক্ষ ঢেঁড়া পিটিলেন,—আমাদের শতকরা ৯০ ভোটে জয় হইবে। এক জন নিরপেক্ষ গ্রাম্য লোক ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা মশাই, যদি এক পক্ষ শতকরা ৮০ ভোট পায়, আর অপর পক্ষ শতকরা ৯০ ভোট পায়, তা হ'লে দু'পক্ষ জড়িয়ে শতকরা ১ শত ৭০ ভোট পাবে কি ?" উভয় পক্ষের কাগজে তর্জ্জার লড়াই, হ্যাণ্ডবিল, প্ল্যাকার্ড, ফড়িয়া, দালাল, এমন কি, গাড়ী করিয়া ব্যাণ্ডবাদ্য,—কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। আবার চূড়ার উপর ময়ূর-পাখার মত পোলিংয়ের দিনে গালাগালি হাতাহাতি পর্য্যন্তও হইয়া গিয়াছিল! কি মজার কাউন্সিল আর ভোটের

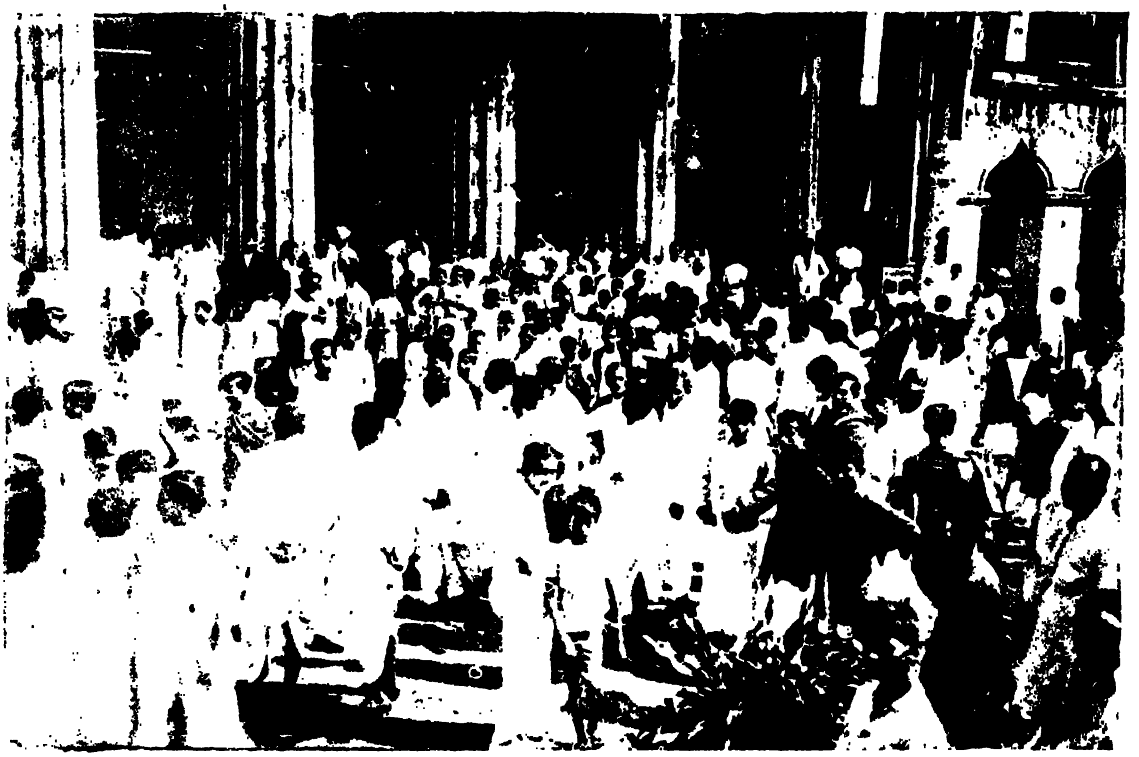




মূক ও বধির বিদ্যালয়ে নির্ব্বাচনের দৃশ্য

লড়াই আমদানী করিয়াছেন এ দেশে ইংরাজ বাহাদুর! এ দেশে প্রথম রেলের আমদানীর দিনে দিন-ভিখারীর মুখে গান শুনা গিয়াছিল, "কি কল করেছে কোম্পানী!" আর আজ লোকের মুখে মুখে শুনা যাইতেছে, "কি চীজ এনেছে কোম্পানী!" ইহার আমদানীর ফলে হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থের লাঠালাঠি, পরন্তু মতবিরোধ, বন্ধুবিচ্ছেদ, কত কি না গজাইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যদর্শী যুগমানব মহাত্মা গান্ধী দিব্য দৃষ্টিতে এই ভবিষ্যৎ দেখিয়াই বুঝি কাউন্সিল-মোহ ঘুচাইতে দেশবাসীকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই মোহের আকর্ষণে দেশবাসী যে অর্থ, যে শ্রম ও যে সময় নষ্ট করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও যদি মহাত্মার প্রদর্শিত দেশ ও মানুষ গঠনে অনুসৃত হইত! ভোটপ্রার্থীরা ভোটের জন্য কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কথাও শুনা গিয়াছে। এই অর্থ যদি দেশের প্রকৃত গঠনকার্য্যে ব্যয়িত হইত!

যাহা হউক, বাঙ্গালায় ভোটদ্বন্দ্বের পরিণামফল দেখিয়া স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের নামে ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের দলের বহু প্রার্থীরই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, দেশের লোক এখনও কংগ্রেসের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ইহা আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কংগ্রেস দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ব্যুরোক্রেশী ও তাঁহাদের পোঁ-ধরা 'পলিটিসিয়ানরা' কায়মনে কংগ্রেসের পরাজয় কামনা করিয়াছিলেন। সকল বিষয়ে না হইলেও এখনও অনেক বিষয়ে কংগ্রেস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত; সুতরাং সহযোগকামী ব্যুরোক্রেশী ও তাঁহাদের পোঁ-ধরার দল যে কংগ্রেসের পরাজয়কামনা করিবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য নাই। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ও তস্য সহকারী লর্ড উইণ্টার্টন পর্য্যন্ত রাজপুরুষরা নানাভাবে নানা সময়ে এদেশবাসীকে সহযোগ গ্রহণ করিয়া 'রিফরম আইন' সফল করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন এবং করিলে ছেলের হাতে মোয়া দেওয়ার মত আর এক কিস্তি 'রিফরম' দিবেন বলিয়া আশ্বাস



বাগবাজার বসুদিগের গৃহে নির্ব্বাচনের দৃশ্য

"যদি ভারতবাসীরা 'রিফরম' সফল করিবার জন্য প্রকৃত আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং আমরা যদি তাহার পরিচয় পাই, তাহা হইলে আমি উদারতার সহিত এবং কৃপণতা-রহিত হইয়া (generously and in no niggardly spirit) তাহাদের এই আগ্রহের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিব।" কংগ্রেসকে এই প্রলোভন প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ফল হয় নাই। যে আইনে সাগরপারের পার্লামেণ্ট ও পিপল আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, কংগ্রেস সেই আইনকে এ যাবৎ মাকালফল বলিয়াই ধারণা করিয়া আসিয়াছে। তাই কংগ্রেসের উপর ব্যুরোক্রেশী ও তাঁহাদের পোঁ-ধরাদের এত বিরাগ! "ষ্টেটসম্যান পত্র" ব্যুরোক্রেশীর ও তথা ব্যুরোক্রেশীর প্রধান সমর্থক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মুখপত্র। এই পত্রের দিল্লীস্থ বিশেষ প্রতিনিধি নানা স্থানের নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া গত ২৭শে নবেম্বর তারিখে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "গত বৎসর লর্ড রেডিং যখন লর্ড বার্কেনহেডের সহিত সলা-পরামর্শ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি রয়াল কমিশন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বসিবে, এই কথা ঘোষণা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন (কারণ, তখনও কংগ্রেস অসহযোগ মন্ত্র ত্যাগ করে নাই)। যদি কানপুর কংগ্রেস সরকারের কটন এক্সাইজ ডিউটি তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থায় ভারতকে যথার্থ আর্থিক স্বাধীনতা দিবার প্রচেষ্টার প্রমাণ পাইয়া অসহযোগ মন্ত্র ত্যাগ করিত, তাহা হইলে এত দিন ভারতকে আর এক দফা রিফরম দিবার জন্য রয়াল কমিশন বসিত। কিন্তু এখনও সময় আছে। কংগ্রেস দল এবারও নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। এই জয়ের যদি তাঁহারা সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে এখনও ভারতের মঙ্গল হইতে পারে। বড়লাটের ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের সরকারী আর্থিক অধিকার সম্পর্কে প্রাদেশিক স্বাধীনতার কথা, প্রাদেশিক গভর্ণরদের উপর বড়লাটদের কর্তৃত্বে পরিমাণের কথা এবং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কথা মীমাংসা শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা। ইংরাজ রাজনীতিকরা

এ সম্বন্ধে এখন হইতেই গভীর চিন্তা করিতেছেন। কংগ্রেস পক্ষ (স্বরাজ্য দল) যদি এখনও তাঁহাদের সেই একঘেয়ে অসহযোগ মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন, যদি তাঁহারা এখনও বাধাপ্রদান করিতে থাকেন, তাহা হইলে ভারতেরই ক্ষতি, কেন না, তাহা হইলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রয়াল কমিশন বসিবে না। তাহার পর যেরূপ ভাব-গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অতি শীঘ্র শ্রমিক দল বিলাতের মন্ত্রিত্ব ও শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবে। উহারা



হেয়ার স্কুলে নির্ব্বাচনের দৃশ্য

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে ভারতের আর্থিক স্বাধীনতালাভ করা স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, কেন না, ল্যাঙ্কাশায়ারের অসন্তুষ্টিসাধন করিয়া তাহারা ভারতকে সন্তুষ্ট করিতে যাইবে না। ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিক দল ভারতে সস্তা শ্রমের পারিশ্রমিক এবং সস্তা পণ্য আদৌ পছন্দ করে না। কন্‌জারভেটিব ও লিবারলরা লেবার দলের এই মতের পাষকতা করে না। সুতরাং তাহারা ক্ষমতাশালী থাকিতে থাকিতে ভারতের পক্ষে সহযোগ দ্বারা কায

এইরূপে লোভ ও ভয়প্রদর্শন,—কোনও কিছুরই ত্রুটি হয় নাই, হইতেছেও না। কিন্তু তৈল-সিন্দুরে ভবী ভুলে নাই। কংগ্রেস এ যাবৎ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন-লাভের উদ্দেশে ব্যুরোক্রেশীর সহিত যত রফার কথা কহিয়াছে, দেশের ব্যবস্থাপরিষদের প্রতিনিধিরা এ যাবৎ একমত হইয়া যে সকল সর্ত্তের প্রস্তাব করিয়াছেন, বিলাতের সরকার ও এ দেশের ব্যুরোক্রেশী তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছেন কি? বেশী দিনের কথা নহে, গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মন্তব্যে ব্যবস্থা পরিষদ (Assembly) ভারতের যে দাবীর কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন, তাহার কিরূপ উত্তর ব্যুরোক্রেশী দিয়াছিলেন? সেই মন্তব্যে মাত্র এইটুকু দাবী করা হইয়াছিল যে, "সকাউন্সিল বড় লাট ভারতে অখণ্ড দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের পরিবর্ত্তন করিবার উপায় অবলম্বন করুন। এ জন্য তাঁহারা শীঘ্র একটি মিলিত বৈঠকের (Round Table Conference)

অধিকার ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের শাসনপ্রণালীর একটা খসড়া প্রস্তুত করিবার পরামর্শ প্রদান করুন। সরকার ব্যবস্থাপরিষদ উঠাইয়া দিয়া এই খসড়া (scheme) বৃটিশ পার্লামেণ্টের অনুমোদনের এবং ভবিষ্যতে উহা এক ষ্ট্যাটিউটে পরিণত করিবার জন্য বিলাতে প্রেরণ করুন।" ইহাতে অন্যায় দাবী কিছু ছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না বিলাতের পার্লামেণ্টকে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়াই ইহাতে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দাবীতে দেশের লোকের নির্ব্বাচিত ৭৬ জন প্রতিনিধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং বে-সরকারী য়ুরোপীয় প্রভৃতি ৪৮ জন ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। অথচ ইহার ফল কি হইয়াছিল? ব্যুরোক্রেশী—আমলাতন্ত্র সরকার ইহার উত্তরে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন,—"না।" তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিব সার ম্যালকম হেলি বলিয়াছিলেন, "বাপ রে! তাও কি হয়? গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের 'প্রিএ্যাম্বল' কি অমান্য করা যায়? বৃটিশ পার্লামেণ্টই নির্দ্ধারণ করিবেন, কবে কোন্ কোন্ ধাপ দিয়া অখণ্ড দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের মনুমেণ্টে ভারতকে উঠিতে হইবে। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের পরামর্শমত ত আর পার্লামেণ্ট চলিতে

কিন্তু তাহার উত্তরে পাইয়াছিলেন অসহযোগ! আজ তবে 'অসহযোগের' অপরাধে কংগ্রেস ও তথা স্বরাজ্যদলকে এত অনুযোগ কেন—'সহযোগের' জন্য তাহাদিগকে এত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা কেন? তাঁহাদের এ 'সহযোগের' স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে বাকী নাই। সে সহযোগের গুণগান ভারতের 'প্রতিনিধি' বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ প্রাণ ভরিয়া করিতে পারেন, কিন্তু দেশের লোক তাহাকে সাত শত সেলাম করিয়া দূরে থাকিতে চাহিবে। এবার তাই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের জয় আনন্দের কথা, কেন না, ব্যুরোক্রেশী ইহাতে হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন, (যদিও মুখে স্বীকার না করুন) দেশের লোক কি চায়। দেশের লোক যে সাগরপারের দয়াদত্ত উচ্ছিষ্টকর সহযোগ চাহে না, তাহারা যে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখি[য়া] আপনাদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আপনাদের ভাগ্যনিয়[ন্ত্রণ] করিতে চাহে, এই কথা এবারের নির্ব্বাচনফল বুঝাই[য়া] দিতেছে। আজ না হউক, দুই দিন দশ দিন পরেই হউক, ইহাই দেশবাসীর লক্ষ্য। অবশ্য এ জন্য যে সাধনার পথ গ্র[হণ] করা আবশ্যক, হয় ত অনেকে সে পথ হইতে লক্ষ্যচ্যু[ত] হইয়াছে, কিন্তু ভ্রম অপনোদিত হইলে পর যখন দে[শ]



শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত



শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

প্রবেশ করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবিতকালে যাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, আজ তাহা সম্ভবপর করা কি সম্ভব হইবে? তখন স্বরাজ্যদলের নেতার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও স্বরাজ্যদলের শক্তির পরিমাণ যেরূপ ছিল, এখন তাহা নাই। শক্তি-ক্ষয়ের ফলে বাধাপ্রদানের শক্তিও হ্রাস হইবে। দেশবন্ধু এক দিন রোগে শয্যাগত থাকিয়াও আপনার অদ্ভুত শক্তিবলে শত্রুকেও স্বমতে আনয়ন করিয়া সরকারের পরাজয় সম্ভবপর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইবে।

তাহার পর ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস নামের ছাপ লইয়া যাঁহারা প্রবেশ লাভ করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যাই কংগ্রেসপক্ষীয়দিগের অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে সকলেই যে মন্ত্রিমণ্ডলগঠনে সহায়তা করিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রতিদানমূলক সহযোগী ও স্বতন্ত্র দলের মধ্যে অনেকেই যে সরকারী চাকুরী লইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, তাহা নিশ্চয়। তাহার পর নন-পার্টি সদস্য আছেন, মুসলমান (অ-স্বরাজী, স্বরাজী মুসলমান মাত্র ২ জন) আছেন, য়ুরোপীয় ও আংলো ইণ্ডিয়ান আছেন, মনোনীত সদস্য আছেন, সরকারী সদস্য আছেন। হয় ত মুসলমান-দের মধ্যে মাত্র ২।১ জন এবং মনোনীতদের মধ্যেও দুই এক জন মন্ত্রিমণ্ডলগঠনের বিরুদ্ধে মত দিতেও পারেন। কিন্তু

ততঃ কিম্?

কিন্তু তাহার পর? কংগ্রেস পক্ষের জয়লাভের পর কর্ত্তব্য কি? শুনা যাইতেছে, লর্ড লিটন রহিমী এবং অন্যান্য মুসলমান ও বে-স্বরাজী দল লইয়া বাঙ্গালায় দ্বৈত-শাসন পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবেন, মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনে সচেষ্ট হইবেন। সেই মন্ত্রি-মণ্ডলে ২ জন মুসলমান ও ১ জন হিন্দু থাকিবেন, এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই-রূপ হওয়াই সম্ভব। এই দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তনে, কাউন্সিলের কংগ্রেস দল কি বাধা দিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারি-বেন? তাঁহারা বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির হয় সংস্কারসাধন,

সত্ত্বে কংগ্রেস দল যে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

তর্কের খাতিরে, ধরিয়া লওয়া যাউক যে, কংগ্রেস দল কাউন্সিলে জয়লাভ করিবেন। তাহার ফলে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে না, মন্ত্রীদের বেতন না-মঞ্জুর হইবে, দ্বৈত-শাসন চলিবে না। কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল হইবে? একটা কথা আছে, Moral effect. জগতের নিরপেক্ষ দায়রায় সিদ্ধান্ত হইবে যে, সরকার প্রজার জন্য যে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী এ দেশে প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাহা



রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

না, তাহা হইলে সরকার নিশ্চিতই পূর্ব্ববৎ নিজহস্তে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করিয়া কার্য্য চালাইবেন। বড় জোর বলিতে পারা যাইবে যে, সরকার শাসিতের মতের অনুযায়ী শাসনপ্রথা অবলম্বন করিলেন না। কিন্তু তাহাতে সরকারের ক্ষতি কি হইবে? যে সরকার ব্যবস্থা পরিষদের



শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

তাঁহাদের মরজি-মত, প্রজার মতের পোষকতা অনুযায়ী নহে। কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল হইবে? গত বার যখন বাঙ্গালায় দ্বৈতশাসন অচল হইয়াছিল, তখন সরকার নিজের হাতে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ যাবৎ সেই শাসনই চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে গঙ্গার জল যেমন প্রবাহিত হইতেছিল, তেমনই হইতেছে। স্বৈরাচার-মূলক আমলাতন্ত্র-শাসনের প্রকৃতিই এই যে, তাহার মতের



Round Table Conferenceএর ন্যায্য প্রস্তাব অনায়াসে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, সেই সরকার কি Moral effect-এর তোয়াক্কা রাখেন? কাউন্সিল-কামী কংগ্রেস দল অবশ্য প্রমাণ করিবেন যে, সরকারের শাসনসংস্কারের প্রস্তাব আন্তরিক নহে, উহা ছেলের হাতে মোয়ার মত। এ বিষয়ে অবশ্য স্বরাজীদলের কৃতিত্ব-পরিচয় পরিস্ফুট হইবে।



মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়

কিন্তু তাহার পর? সে পরিচয় ত বহুদিনই পরিস্ফুট হইয়াছে। দেশবন্ধু জীবিতকালে তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সে প্রমাণের জন্য আবার কি বৎসরের কাউন্সিল পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল? স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"কংগ্রেসের জয়লাভে কংগ্রেসের আত্মসম্মান অক্ষুন্ন হইল, এ কথা সত্য। কিন্তু দেশের লোকের দ্বৈতশাসনের



মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী

নমিত হইবেন না, এখনও কি জাতীয় দাবী উপেক্ষা করিয়া চলিবেন? অথবা প্রকৃত রাজনীতিকের মত আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিবার নিমিত্ত আন্তরিক চেষ্টা করিবেন? যদি অতীতের কার্য্য ভবিষ্যতের কার্য্যের অনুসূচনা করে, তাহা হইলে বলিতে হয়, আমরা বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আশাই করিতে পারি না।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? 'ফরওয়ার্ড' এ কথার জবাবও দিয়াছেন, বলিয়াছেন, "গোড়ায়ই আমাদের



আমাদের নিজ হস্তে আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা উচিত। আমরা যাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আমাদের নিজের চেষ্টায় দেশের অনিয়ন্ত্রিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমলাতন্ত্র সরকারের হস্ত হইতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাজনীতিক শক্তি কাড়িয়া লইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"



ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কথা হইতেছে, এই অনিয়ন্ত্রিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় কি, পথ কি? 'ফরওয়ার্ড' বলিতেছেন, "আমাদের জয়ের দিনে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের কায এখনও অনেক বাকী। আমাদের জনশক্তিকে (Mass energy) জাগ্রত করিতে হইবে। কাউন্সিলের ভিতরের যে কায আছে, তাহা অপেক্ষা কাউন্সিলের বাহিরের কায শতগুণ অধিক। যদি আমরা বৈদেশিক স্বৈরাচারকে বাধা দিবার কামনা করি, তাহা হইলে কাউন্সিলের বাহিরে জনমতকে গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নির্ব্বাচনকাণ্ডের প্রচারকার্য্যের দ্বারা জনমত কতকাংশে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অপেক্ষা আরও অনেক অধিক চেষ্টার প্রয়োজন। দেশের যাহারা নির্ব্বাচন-গণ্ডীর মধ্যে আইসে নাই, তাহাদিগকে কংগ্রেসের দলভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

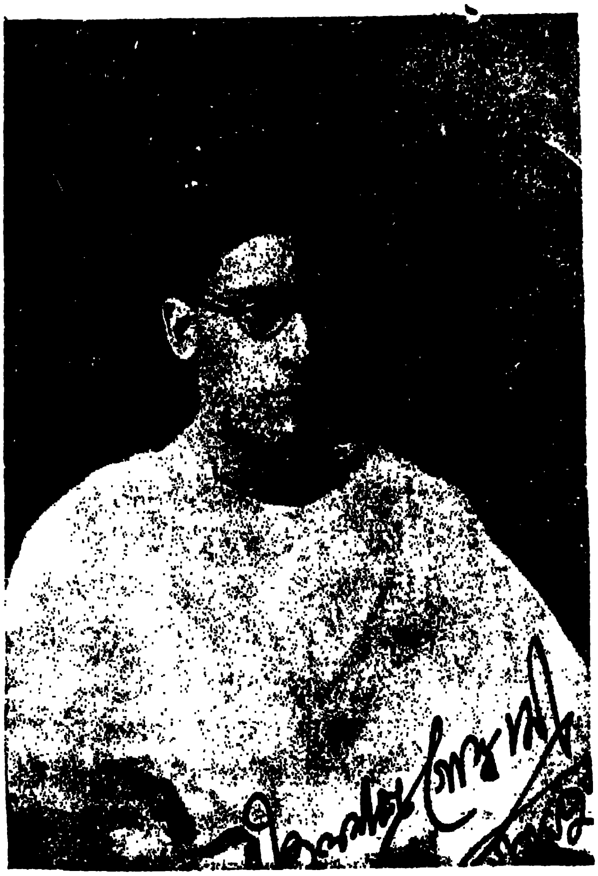
আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ফরওয়ার্ডের এ কথার অনুমোদন করি। কাউন্সিলের মোহে আমরা কয় বৎসর যে শক্তির অপচয় করিয়াছি, তাহার জন্য বৃথা অনুশোচনায় ফল নাই।



যুগাবতার মহাত্মা গন্ধী ভবিষ্যদর্শী বলিয়াই কাউন্সিলবর্জ্জন নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে শক্তির ক্ষয় হইবে মাত্র। কাউন্সিলে একবার প্রবেশ করিলে, চাকুরীর মোহ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিবে, ফলে গ্রামগঠনের কার্য্য, জনমত জাগ্রত করিবার কার্য্য



তাহাই। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। এখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমাদিগকে অবধারণ করিয়া লইতে হইবে। গ্রাম বা জাতিগঠন যে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা এখন বোধ হয় সকল শ্রেণীর রাজনীতিকই বুঝিয়াছেন; যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুসারে তিনি সেই-মত ইহাতে অবহিত হউন। কিন্তু এ কার্য্যে কংগ্রেসের কার্য্যভারই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। কংগ্রেস দেশের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের লোক এখনও কংগ্রেসের



শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

নির্দ্দেশকে জাতীয় আহ্বান বলিয়া মনে করে। এবার নির্ব্বাচনেও কংগ্রেসের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসের মারফতে গ্রাম ও জাতিগঠনের কার্য্য ত দ্রুত ও অধিক অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা, তত আর কিছুতে নহে। স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের অনুজ্ঞা লইয়া কাউন্সিলের কার্য্যে অগ্রসর। তাঁহারাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা নিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী রাজনীতিক দল। তাঁহারা যদি



শ্রীযুত বসন্তকুমার লাহিড়ী

শক্তি নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে দেশ কি তাহাতে সাড়া দিবে না? নিশ্চিতই দিবে।

এ বিষয়ে আশার কথাও পাওয়া গিয়াছে। স্বরাজ্য দলের মুখপত্র বলিয়াছেন,—"সুদূর পল্লী-মফঃস্বলের অজ কোণে—অজানা গ্রামেও যে কেন কংগ্রেস-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতি লাভ করিবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। অতি দরিদ্র ও অতি নিম্নশ্রেণীদের পক্ষেও কেন যে কংগ্রেসের আদর্শ বোধগম্য করান যাইবে না, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহার এক কারণ এই যে, এত দিন আমরা কেবল আদর্শ লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম, পদ্ধতি বা কার্য্য-প্রণালীর দিকে ততটা নজর দিই নাই। আমরা এখনও ঠিক সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি নাই যে, আদর্শ সফল করিতে হইলে উহাকে



খাড়া করিতে হইবে। অতি অজ্ঞও যাহা সহজে বুঝিতে পারে, আমরা আমাদের আদর্শটাকে সেই ভাবে তাহাকে বুঝাইতে পারি নাই। গ্রাম্য লোকের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের সহিত সামঞ্জস্যসাধন করিয়া আমরা তাহাদিগকে স্বরাজের স্বরূপ বা প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি নাই।"

মহাত্মা গন্ধীর রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ দেশের রাজনীতি জন কয়েক শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিই প্রথমে জনগণের মধ্যে উহার প্রভাব বিসর্পিত করিবার উপায়বিধান করেন। যে ভাবে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি সে কার্য্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে মাল-মশলার অভাবে অসম্পূর্ণ সৌধ ভূমিসাৎ হইল, তাহা এখন ইতিহাসের কথা। তবে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়াও ভারতবাসী এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে, জনগণের সংহতি-শক্তিই জাতির আত্মসম্মানের ও আত্মপ্রত্যয়ের মূল উপাদান—সেই শক্তি হইতে যে জন্মগত দাবীর উৎস উদ্গত হয়, তাহার গতি রুদ্ধ করিবার বন্দুক-বেয়নেটের সাধ্য নাই। আমরা হেলায় অথবা ভ্রমবশে সেই শক্তিসঞ্চয়ের শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছি। স্বাবলম্বনের পথে, আত্মপ্রত্যয়ের পথে, আত্মসম্মানের পথে অগ্রসর হইবার যে সকল সম্বলের কথা যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল সম্বল সংগ্রহের জন্য আবার আমাদিগকে গোড়া হইতে সচেষ্ট হইতে হইবে, আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অন্য পন্থা নাই।

—

জীবন-মরণের সংঘর্ষ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহারই আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদের প্রাণশক্তির কথা সপ্রমাণ করিয়া শিক্ষিত-সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। তিনি নিত্য নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া সেই তথ্য বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই ভাবে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন, ইহা প্রত্যেক স্বদেশ-

বিগত ২৯শে নভেম্বর তিনি তাঁহার বসু বিজ্ঞানাগারের নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে সন্দেহ নাই। সাধারণ মানুষ সহজ বুদ্ধিতে ধারণা করে যে, উদ্ভিদ্জাতি নিষ্ক্রিয়, তাহাদের কোনওরূপ কার্য্য করিবার শক্তি নাই, কোন অনুভবের ক্ষমতা নাই, কোনও আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি নাই; পরন্তু তাহাদের প্রাণশক্তির কোনওরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। এই হেতু সাধারণ মানুষ জানে যে, উদ্ভিদের প্রাণ নাই, তাহারা অচেতন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সে দিন তাঁহার বক্তৃতাকালে তাঁহারই উদ্ভাবিত বিবিধ যন্ত্রসাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্থাবর জীবের এবং উদ্ভিদের প্রাণশক্তি একই প্রকারের, এতদুভয়ের কার্য্যপদ্ধতির ও দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে কোনওরূপ পার্থক্য নাই। জীবের যেমন হৃদয়ের স্পন্দন ও নাড়ীর গতি আছে, উদ্ভিদেরও ঠিক সেইরূপ হৃদয়ের স্পন্দন ও নাড়ীর গতি আছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার Electro-magnetic Phytograph যন্ত্রসাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আকাশের সহিত সমরান্তরাল ভাবে বিস্তৃত বৃক্ষপত্র মানুষের বিস্তৃত হস্তের সহিত তুলিত হইতে পারে এবং উহা উহার উচ্চ নীচ গতির দ্বারা উহার রসের (sap) 'পাম্প' করিবার শক্তি নির্দ্দেশ করে। ভূমাকর্ষণী শক্তি দ্বারা ঐ 'পাম্প' ক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং বৃক্ষপত্র মস্তক অবনমিত করে। আবার কোনও উত্তেজক শক্তির প্রয়োগ করিলে উহার পাম্পিং শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বৃক্ষপত্র মস্তক উত্তোলন করে। এক মাত্রা পটাসিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগ করিলে বৃক্ষপত্র অবনমিত হয়। আবার এক মাত্রা কফির আরক উহাকে জীবন্ত করিয়া তুলে।

আচার্য্য জগদীশ আরও দেখাইয়াছিলেন যে, উদ্ভিদেও জীবন ও মরণের সংঘর্ষ হয়। যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদের মধ্যে বিষ অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইলে আলোকের একটি উজ্জ্বল রেখা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, ইহা দেখান হইয়াছিল। ইহার প্রতিষেধক ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা দেখান হইয়াছিল যে, মৃত্যুর দিকে গতির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোক-রশ্মির রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

মরণের সংঘর্ষের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন যে, জীবন-মরণের সন্ধি-ক্ষণে জীবের এবং উদ্ভিদের দশা একইরূপ হইয়া থাকে। তিনি Thermal Bathএর মধ্যে উদ্ভিদ্‌কে রক্ষা করিয়া উত্তাপ ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত চড়াইয়া দেখাইয়াছেন যে, উত্তাপ উদ্ভিদের পক্ষে প্রাণ-হানিকর হয়। সেই সময়ে উদ্ভিদের মধ্যে অত্যধিক আক্ষেপ বা 'খেঁচুনী' উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থা জীবের মৃত্যুকালীন আক্ষেপের অনুরূপ। এই অবস্থায় উদ্ভিদের দেহ হইতে অতি তীব্রভাবে বিদ্যুৎ-নিঃস্রাব হইতে থাকে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্প্রতি এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার জন্য এক পর্য্যবেক্ষণকালে মনুষ্যের আত্মার ওজনের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। তিনি বলেন যে, শুনা যায়, কোন মুমূর্ষু রোগীকে অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে স্থাপিত করিলে দেখা যায় যে, এই সন্ধিক্ষণে মানুষের ওজন কমিয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, উহা আত্মারই ওজন, ঐ আত্মা মানুষের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে দেহের ওজনও আত্মার অভাবে কমিয়া যায়। লোক বলে, আত্মার ওজন গড়ে ৬ গ্রেণ মাত্র। আচার্য্য বলেন, এ সকল চমকপ্রদ উক্তি অতি-বিশ্বাসীদিগের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে।

উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, উষ্ণ জলে উদ্ভিদ্‌কে নিমজ্জিত করিলে উহার সজীবতার লক্ষণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। উহা হঠাৎ তখন ভাসিয়া থাকিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং ঐ সাংঘাতিক উত্তাপে ডুবিয়া যায়।

এ যাবৎ উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। পূর্ব্বকালের একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, লজ্জাবতী লতার উপর ছুরিকাঘাত না করিলে তাহার উত্তেজনা হয় না, কিন্তু আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, উত্তেজনার জন্য ছুরিকা-ঘাতের কোনও প্রয়োজন নাই। বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা লজ্জাবতী লতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে উত্তেজিত করিতে পারা যায়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদ্-দেহে রসের সঞ্চালন জীবদেহের রস-সঞ্চালনের মত। উত্তেজক অথবা অবসাদজনক ভেষজ-প্রয়োগ জীবের রক্ত অথবা উদ্ভিদের রসসঞ্চালনের উপর একই প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে। পূর্ব্বে কাহারও কাহারও ধারণা ছিল যে, লজ্জাবতী লতা-শ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্গে ছুরিকাঘাত করিলে ক্ষত হইতে একটি উত্তেজক পদার্থের নিঃসরণ হয়—যাহা নলের মধ্য দিয়া জলের

এই উপপত্তি ভ্রমাত্মক। এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অম্লজান লজ্জাবতী লতার সর্ব্বোচ্চ অগ্রভাগে প্রয়োগ করিলে ইহা সপ্রমাণ হইবে। এখানে রসের উর্দ্ধগতির বিরুদ্ধে নিম্নদিকে যাইবার প্রবৃত্তিজনক একটা গতির উদ্ভব হইবে। নলের জলের সহিত গতি এরূপে প্রভাবিত হয় না।

এমফিয়ক্সাস আদি নিম্নস্তরের জীবদিগের একটি সঙ্কীর্ণ ও দীর্ঘ হৃদ্‌যন্ত্র আছে। তাহার কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ তাহার আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা জীবের দেহে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। উচ্চতর স্তরের ভ্রূণেরও ঐরূপ সঙ্কীর্ণ ও দীর্ঘ হৃদ্‌যন্ত্র আছে, তাহার আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা তাহার দেহে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদের সর্ব্বত্র বিসর্পিত সূক্ষ্ম আঁশ আছে, তাহার স্পন্দনপ্রভাবে তাহার দেহে রস সঞ্চালিত হয়। উহা হৃদ্‌যন্ত্রের ও রক্তসঞ্চালনকারী শিরার কার্য্য একাধারে সম্পন্ন করে। এই তথ্য তিনি তাঁহার ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফাইটোগ্রাফ যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, এলকালয়েড ও অন্যান্য বিষ জীবদেহে ও উদ্ভিদদেহে একই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। কর্পূর ও মৃগনাভি উভয়ের উপর উত্তেজনা আনয়ন করে। মর্ফিয়া উভয়ের উপর অবসাদ আনয়ন করে। অল্পমাত্রায় ষ্ট্রীকনাইন উত্তেজনা আনয়ন করে, অথচ অধিক মাত্রায় উহা বিষের ন্যায় অব-সাদ আনয়ন করে।

গোখুরা সর্পের বিষ অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, উভয়ের পক্ষেই উহা প্রাণদানিকারক হইয়া থাকে। অতি অল্পমাত্রায় এই বিষ হইতে সূচিকাভরণ নামক যে কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা অনুসারে হৃৎ-পিণ্ডের উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদের উপরেও এই ঔষধ উত্তেজক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে।

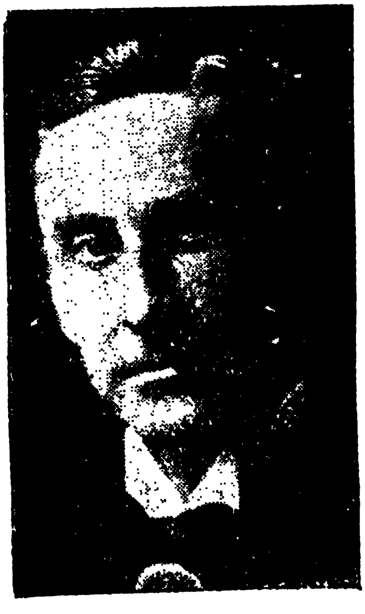
জীবনের অন্তর্নিহিত রাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব, এ কথা এত দিন বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। সার জগ-দীশ কিন্তু তাঁহার অটোম্যাটিক রেকর্ডার যন্ত্র সাহায্যে উজ্জ্বল আলোক-রেখা পতিত হয়, উহা কখনও বামে, আবার কখনও দক্ষিণে ধাবমান হয়। যখন বামে উহা ধাবমান হয়, তখন উহা হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুর করাল ছায়ায় জীব বা উদ্ভিদের জীবন ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। আবার যখন দক্ষিণে উহা ধাবমান হয়, তখন জানা যায় যে, জীব বা উদ্ভিদের জীবন সতেজ ও সবল হইয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন যে, তিনি উদ্ভিদের উপর সামান্য বিষ-প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার মেট্রোনোম যন্ত্র তাহার ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি দেখিয়াছেন, বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ দ্রুতবর্দ্ধনশীল গতির সহিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। জীবন-মরণের এই ভীষণ সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? তখনই যদি কোনও প্রতিষেধক ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা মৃত্যুর দিকে গতি রুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহাও কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? সেই অভাবনীয় ঘটনাও যন্ত্রসাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপে মানুষ জ্ঞানবলে জীবনের উত্তেজনা ও অবসাদ ঘটাইবার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

আজ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানবলে এই অদ্ভুত তথ্য সপ্রমাণ করিয়া জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ভার-তের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিশ্বাসের অভাব

কলিকাতার প্রবাসী স্কচদিগের বাৎসরিক সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজের বক্তৃতায় নিমন্ত্রিত গভর্ণর লর্ড লিটন অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"১৯১৯ খৃষ্টাব্দের রিফরম এ্যাক্ট বিধি-বদ্ধ হইবার পর আমি ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়া এই আইনের প্রবর্ত্তকদিগের উদ্দেশ্য ও আশা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। যে সকল সমালোচক বলিয়াছিলেন যে, এই আইন উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত জাতিকে অত্যধিক দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে, আমি পার্লামেণ্টে তাঁহাদের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আইনের সমর্থন করিয়াছিলাম। আমি

নাই। বাঙ্গালার শাসনকালের ভূয়োদর্শনে আমার সেই বিশ্বাস কখনও বিচলিত হয় নাই। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারের বিপক্ষে আমার যদি কিছু অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে বলিব, অনেক বিষয়ে দায়িত্ব ভাগাভাগি করা হইয়াছে বা দায়িত্বের অনেক বাঁধন-কসন করা হইয়াছে। তাহার পর আমি ভারতে আসি। আমার তখন এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, কিসে এই আইন ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করি। আমার একমাত্র আশা ছিল যে, যখন আমি স্বদেশে ফিরিয়া যাইব, তখন যাঁহারা ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশ্বাস সফল হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিব এবং দেখাইব যে, বৃটিশ স্বার্থ ও ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরস্পর বিরোধী নহে।"



লর্ড লিটন

কিন্তু লর্ড লিটন সখেদে বলিয়াছেন, তাঁহার এই বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছে, তিনি অনেক বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার কথা এই:—"আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গত ৫ বৎসরের বাঙ্গালা-শাসনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, শাসন-সংস্কারের সমালোচকদিগের কথাই ঠিক, উহার পক্ষসমর্থকদিগের অভিমতই ভ্রান্ত। এই সময়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের কথা, অনেক বিষয়েই অসাফল্য দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ সংস্কার-আইন সফল করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়াছেন। অপরে ইহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়া (প্রথমে নিষ্ক্রিয় অসহযোগ দ্বারা এবং পরে হাতে-কলমে বাধা প্রদান দ্বারা) বিফল হইয়াছেন। কারণ, বঙ্গে দ্বৈতশাসন ধ্বংসের মূল কারণ ইহার শত্রুদিগের চেষ্টা নহে, ইহার বন্ধুদিগের কার্য্য-শৈথিল্য। কেহ কেহ তাহাদের মতবাদ বলপূর্ব্বক চালাইবার জন্য অনাচার ও ভীতিপ্রদর্শনের পথ অবলম্বন করিয়া বিফল হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমান শান্তিরক্ষার জন্য এবং জন্য চেষ্টা করিয়া গত ৬ মাসের মধ্যে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন।"

কেন এমন হইল? সকল বিষয়ে বিফলতা দেখা দিল কেন? লর্ড লিটন এ কথার জবাবে বলিয়াছেন, "ভারতে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ফলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে, এই বিফলতার মূল কারণ পরস্পর বিশ্বাসের অভাব। দেখিয়াছি, বৃটিশ জাতির অভিপ্রায়ের ঐকান্তিকতায় ভারতীয়ের বিশ্বাস নাই এবং বৃটিশ জনসাধারণের ভারতীয়ের বন্ধুতায় বিশ্বাস নাই। বৃটিশ স্বার্থের অনুযায়ী না হইলে ভারতীয়ের দাবী বৃটিশ জনসাধারণ কখনও মানিয়া লইবে না; আর এ দেশের যাহারা বৃটেনকে শত্রু বলিয়া মনে করে, তাহারা ভারতের প্রতি বৃটিশ জাতির সহানুভূতির অভিব্যক্তি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিবে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে উভয় দেশের রাজনীতিক নেতৃবর্গকে উভয় দেশের সম্মানের অনুকূল একটা পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। স্বদেশের মঙ্গল-সাধনের আগ্রহকেই দেশপ্রেমিকতা বলিয়া থাকে। কি ভারতে, কি বিলাতে, জাতীয় স্বার্থের অবমাননা কখনও কেহ সহ্য করিবে না।"

লর্ড লিটন প্রায় ৫ বৎসর এ দেশ শাসন করিবার ফলে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ৫ বৎসর দীর্ঘকাল নহে, সুতরাং এই অল্পসময়ের মধ্যে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তাঁহার পক্ষে প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বিশ্বাসের অভাবই যে নানা অসাফল্যের কারণ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ পক্ষ এই অভাবের জন্য দায়ী? লর্ড লিটন উভয় পক্ষকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি তাই?

মহারাণীর ঘোষণাপত্রের পর হইতে ও তথা কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে এ যাবৎ বৃটিশ জাতির প্রতিশ্রুতির কথায় কবে ভারতবাসী অবিশ্বাস করিয়াছে, লর্ড লিটন তাহা প্রমাণ-

কথা নহে—অতীত যুগের ইতিহাস নহে—মাত্র কয় বৎসরের কথা, যে মহাত্মা গন্ধী বৃটিশ প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আস্থাবান্ ছিলেন, তিনি কি নিমিত্ত বিশ্বাসহারা হইয়াছিলেন, তাহা লর্ড লিটন বলিয়া দিবেন কি? দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতবাসীর প্রতি শ্বেত শাসকদিগের ব্যবহারের কথা সর্ব্বজনবিদিত, অথচ মহাত্মা সেই ব্যবহারের প্রতিবাদকল্পে আন্দোলনের সময়ে বুয়র-যুদ্ধ বাধিলে সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তথায় ভারতীয় ডুলীবাহক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া রণস্থলে আহত বৃটিশ সৈনিকগণের সাহায্য করিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই মহাত্মা গন্ধী বৃটিশ আমলাতন্ত্র শাসনের প্রতি বিরূপ হইলেন কেন? বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁহার কি অবিশ্বাস ছিল? ইহার প্রমাণ লর্ড লিটন দিতে পারেন কি?

প্রথম অবিশ্বাস কিসে সঞ্জাত হইল, তাহা নিরপেক্ষমাত্রেই জানেন। রাউলাট আইনের সৃষ্টিই কি এই অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিবার প্রধান কারণ নহে? মহারাণীর ঘোষণার অমর্য্যাদা (লর্ড কার্জ্জন ত ইহার অদ্ভুত ব্যাখ্যাই করিয়াছিলেন), পর পর নানা বৃটিশ রাজপুরুষের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, বহু শাসকের ভারতীয়ের আবেদন-নিবেদনের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন,—এ সকলও বৃটিশ ন্যায়বিচারে মহাত্মাজীর বিশ্বাস টলাইতে পারে নাই। মহামতি এণ্ডরুজ "Shadow of Amritsar" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন,—"The first revolt against the government headed by Mahatma Gandhi really came to a head owing to the insistence of the Indian Government on putting more power into the hands of the police under the notorious Rowlatt Act." সরকার যখন রৌলট আইনের আশ্রয়ে পুলিসের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার জন্য ধনুর্ভঙ্গ পণ করিলেন, তখনই মহাত্মা গন্ধী সরকারের বিপক্ষে বিদ্রোহধ্বজা উত্তোলন করিলেন। তাহার পূর্ব্বে সমস্ত কাকুতি-মিনতি বিফল হইয়াছিল।

যে পুলিসের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি ও স্বরূপ কিরূপ? মিঃ এণ্ডরুজই বলিতেছেন, যখন মিঃ মণ্টেগু এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন চাহিলে তিনি নির্ভীকভাবে বলিয়াছিলেন, "জঘন্যভাবে দূষিত (ঘুষখোর) পুলিস, কারাগার ও গোয়েন্দা প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিতে গণতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তন করাও যেরূপ সম্ভবপর, ভিত্তিহীন ইমারতের উপর ছাদ নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ সম্ভবপর।" মিঃ এণ্ডরুজ নিজের ভূয়োদর্শন হইতে এমন কড়া কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাকেও গোয়েন্দা পুলিসের হস্তে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি মণ্টেগুকে জানাইয়াছিলেন। মিঃ মণ্টেগু বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে চাহেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য?" স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত ও পুষ্ট মিঃ মণ্টেগুর পক্ষে মিঃ এণ্ডরুজের কথা বিস্ময়কর হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ ঘটনা কি বিস্ময়কর? পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পর্য্যন্ত কেহই যে এ দেশের গোয়েন্দা পুলিসের 'সু-নজর' হইতে বাদ পড়েন নাই, তাহা অতীতের সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিলেই জানিতে পারা যায়।

বিদেশীয় আমলাতন্ত্র সরকার এ দেশের লোককে কিরূপ বিশ্বাস করেন, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ লর্ড লিটন বলিতেছেন,—উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাসের অভাব ভারতীয়ের পক্ষে হয় নাই, প্রথমে হইয়াছে বিদেশীয় আমলাতন্ত্র সরকারের পক্ষ হইতে। মহাত্মা গন্ধীর বিশ্বাস-ভঙ্গ হইতেই এ কথা সপ্রমাণ হইবে।

কেবল কি মহাত্মা গন্ধী? সরকারের পরম প্রিয়—সরকারের good books এর "অনারেবল" শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও এক দিন (রৌলট আইন প্রণয়নসময়ে) সরকারের বিপক্ষে rebel বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, সরকারের ব্যবস্থা পরিষদে বিদ্রোহের ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসের অভাব হইয়াছিল কেন?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এ দেশের বৈদেশিক শাসকগণ খোলাখুলিভাবেই বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করিতেন, কোম্পানী স্পষ্টই এক exploiting agency ছিল। বিলাতী পণ্য এ দেশে কাটাইবার এবং এ দেশ হইতে বিলাতে অর্থসম্পদ লইয়া যাইবার বিষয়ে কোম্পানী সর্ব্বদা

ভারগ্রহণ। কিন্তু শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণকালে মহারাণী তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, এ যাবৎ বৃটিশ-শাসনের আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা "অসত্য অঙ্গীকার ও ভঙ্গ প্রতিশ্রুতির" ইতিহাস। ভারতীয় নেতৃবর্গের ন্যায্য দাবী বারংবার অগ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার স্থানে 'রিফরম' মাকাল প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বাসের অভাব কোন্ পক্ষ হইতে প্রথম সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

লর্ড লিটন এক স্থানে মনের কথা কহিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "Concessions to Indian demands will never be acceptable to British opinion unless they are shown to be compatible with the national interests of Great Britain." আমরা তাঁহার স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করি। বস্তুতঃ ইংরাজ এ দেশে তীর্থ করিতে আইসেন নাই। তাঁহারা এ দেশের Divine Trusteeship অথবা ভগবদ্দত্ত অভিভাবকত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া থাকেন। সে অভিভাবকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে যে গ্রেট বৃটেনের জাতীয় স্বার্থের অনুযায়ী না হইলে তাঁহারা ভারতীয়ের দাবী গ্রাহ্য করিতে পারেন না, এ কথা ঠিক। বৃটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বহুস্থলে যে ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে, তাহাও এ দেশের লোক জানে। বৃটিশ ব্যবসাদার ও শ্রমিকের স্বার্থ, সিবিল সার্ভিসের স্বার্থ, সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সামরিক স্বার্থ, ইত্যাদি নানা স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা অভিভাবকত্বের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, তাহাও এ দেশে অবিদিত নহে। এ স্বার্থের সহিত ভারতীয়ের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কোন্ স্বার্থ বিদেশীয় শাসকের বরণীয় হইবে, তাহাও এ দেশবাসী বুঝে। দুঃখ এই, কথাটা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া "ভারতীয়রা এখনও স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হয় নাই," বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদিগের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হয়।

ভারতীয়রা বৃটিশ "জাতীয় স্বার্থের" অনুকূল অধিকারের দাবী করিলে বোধ হয় বিশ্বাসের অভাবের কথা উঠিত না। যত গোল, জন্মগত অধিকারের দাবীতে!

বিশ্বাসের অভাব না হইলে এত দিন জনমতের বিরুদ্ধে থাকিত না, বিশ্বাসের অভাব না হইলে বাঙ্গালার শত শত কর্ম্মী যুবক এত দিন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ থাকিত না, বিশ্বাসের অভাব না হইলে সীমান্ত-নীতি ও গোরা-সেনার পাষাণ-চাপ এ দেশের উপর চাপিয়া বসিত না, বিশ্বাসের অভাব না হইলে সরকারী কাযে ভারতীয় নিয়োগের সঙ্কল্প দীর্ঘসূত্রিতার অতলতলে তলাইয়া যাইত না।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা এবং বাঙ্গালা মানচিত্র-প্রকাশকদিগের অগ্রণী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় গত ১৭ই অগ্রহায়ণ ৮৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। এ দেশে সাহিত্যিকের উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া যাঁহারা প্রভূত ধন ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, শশিভূষণ তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি হুগলী জিলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এক সামান্য অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়গুণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিরবিবাদ ভঞ্জন করিয়া সাহিত্যসেবকদিগের মনে আশার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধ-শতাব্দীর পূর্ব্বে এ দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী বাঙ্গালা গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। শশী বাবু এ জন্য পাঠ্য পুস্তক-রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাসের" অনুকরণে "রামের রাজ্যাভিষেক" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকের রচনা শেষ হইলে তিনি উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা আগাগোড়া পাঠ করিয়া বলেন, "শশি! তুই যে বেশ বই লিখিয়াছিস্, আমি ঐ গ্রন্থ লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তোর এই বইয়ের পর আর তাহার প্রয়োজন হইবে না।" সাহিত্য-গুরু বিদ্যাসাগরের এই উৎসাহসূচক বাক্য শশিভূষণের জীবনে বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও পাঠ্য পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন, বিশেষতঃ "রামের রাজ্যাভিষেক" সর্ব্বত্র সমাদৃত হওয়ায় তাঁহার অন্যান্য পুস্তক



শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক প্রণয়নেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি ইতোমধ্যে একখানি ভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেখিলেন, দেশে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা মানচিত্রের অত্যন্ত অভাব। কেবল তাহাই নহে, বিদেশী পুস্তক-প্রকাশকরা এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে মানচিত্র বিক্রয় করিয়া দেশের বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে। তিনি ইহার প্রতীকারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং প্রথমে বাঙ্গালায়, পরে হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় মানচিত্র প্রকাশ করিয়া বিদেশী করিলেন। ইহাতে ঐ সকল প্রকাশক তাঁহার মানচিত্র সকল ভ্রমপূর্ণ বলিয়া দোষারোপ করিতে লাগিলেন এবং তদ্দ্বারা শশী বাবুর মানচিত্রের প্রচার খর্ব্ব করিয়া দিলেন। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ শশিভূষণ ভগ্নোৎসাহ হইলেন না, তিনি তাঁহার মানচিত্রের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটীর মতাপেক্ষী হইলেন। উক্ত সোসাইটী কেবল শশিভূষণের মানচিত্রের নিরক্ষবৃত্ত, দ্রাঘিমা প্রভৃতি নির্ভুল বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন না, তাঁহাকে সোসাইটীর 'ফেলো' পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিলেন। ইহার পর হইতে ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার মানচিত্র ও ভূ-গোলক প্রভৃতির প্রচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু কেবল এই সকল কার্য্যে শশী বাবু তাঁহার শক্তি নিয়োজিত রাখেন নাই। সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনেও তিনি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আলীপুরের পরলোকগত উকীল বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন "সোম প্রকাশের" সংস্রব ত্যাগ করিয়া একখানি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হন, তখন শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিপ্রদাস বাবুর সহিত এক-যোগে "সহচর" নামক পত্র প্রকাশ করেন। এই "সহচর" অল্পদিনেই "সোম-প্রকাশের" কিরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া-ছিল, তাহা এখনও অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু বিপ্রদাস বাবু তদীয় ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অধিক মনোযোগ দিতে বাধ্য হওয়ায় তিনি "সহচরের" সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন

শশী বাবুর সম্পাদনে "সহচরের" গৌরব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল। বড়লাট লর্ড লিটন যখন দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দলনের জন্য আইন বাহাল করেন এবং সম্পাদকদিগের নিকট হইতে জামীনস্বরূপ টাকা জমা রাখিবার আদেশ করেন, তখন "সহচরই" প্রথমে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কাগজ বন্ধ করেন। পরে অন্যান্য সংবাদপত্র সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করায় জামীনের টাকা জমা দিবার নিয়ম রহিত হয়। এইরূপে "সহচর" বহুদিন দেশসেবা করিয়া সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে বার্দ্ধক্যের ভারে অবসন্ন হইয়া এবং উপযুক্ত সহায়কদিগের অভাবে শশী বাবু "সহচর" তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও সাহিত্যের ব্যবসায়ে শশী বাবুর পদাঙ্ক অনেক নিরুৎসাহী সাহিত্যিককে যে আলোক প্রদর্শন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিরাট সাহিত্য ব্যবসায়ের প্রত্যেক কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, ধনোপার্জ্জন করিয়া জীবনের শেষকাল আলস্যে অতিবাহিত করা তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি যেমন ধনশালী হইয়াছিলেন, তেমনই আত্মীয়কুটুম্ব-প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার গৃহে কেবল তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ ও তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততি ও জামাতৃগণ বাস করিতেন না। প্রত্যুত: বহু নিঃস্ব দূর-আত্মীয়রাও প্রতি-পালিত হইত। এ জন্য তাঁহাকে একাধিক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। আমরা আশা করি, তাঁহার পুত্রগণ পিতার এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক আদর্শ হিন্দু গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় যে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার যথানিয়মে স্বাস্থ্য-বিধি পালনের ফল। তাঁহার বিয়োগে সাহিত্য-সমাজের একটি প্রাচীন স্তম্ভ স্খলিত হইল। সাহিত্যিকমাত্রই তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

স্পষ্টবাদিতা

জগতে যদি স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার জন্য নোবেল প্রাইজ থাকে, তাহা হইলে তাহা ডাক্তার বেণ্টলিরই পাওয়া উচিত। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের বড় কর্ত্তা বেণ্টলি চির-লিনলিথগোর কৃষি-কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে যে সকল স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন, তাহা সুবর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া ভারতের ও জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—"My hands and feet are tied. If there is cholera raging in Bengal and if I could devise measures to prevent its ravages, I cannot proceed with work at once." অর্থাৎ "আমার হাত-পা বাঁধা; যদি বাঙ্গালার কলেরায় গ্রাম-জনপদ উজাড় হইয়া যায়, অথচ যদি আমি এই ব্যাধি-নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি, তাহা হইলেও আমি তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করিতে পাই না।" কেন, তাহার কৈফিয়ৎও তিনি দিয়াছেন,—"It would take about 18 months to get the sanction. Meanwhile people would be dying." অর্থাৎ "আমার কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য সরকারের অনুমতি লইতে ১৮ মাস লাগে। ইতোমধ্যে বহুলোক মরিতে থাকে।" কি চমৎকার আমলাতন্ত্র শাসনের সরকারী বন্দোবস্ত! এমন Red tape বা লেফাফাদোরস্ত কাযের বন্দোবস্ত জগতে আর কোনও সভ্য সরকারের আছে কি? সাধে কি মিঃ মণ্টেগু বলিয়াছিলেন, এই সরকার too wooden, too iron, too inelastic? যেখানে প্রজার জীবন-মরণের সমস্যার কথা, সেখানে এমন হৃদয়হীন তাচ্ছীল্যের ভাব আর কোথাও দেখা যায় কি? এই গুরু অভিযোগ কোন বিকৃতমস্তিষ্ক চরমপন্থী ভারতীয় রাজনীতিকের মুখ হইতে বাহির হয় নাই, স্বয়ং সরকারের কর্ম্মচারী স্বাস্থ্য-বিভাগের বড় কর্ত্তা এই অভিযোগ করিতেছেন। এ কথার উত্তরে সরকার কি বলিতে চাহেন? প্রজার জীবন-মরণ লইয়া এমন খেলা আর কত দিন চলিবে? ডাক্তার বেণ্টলি আরও বলিয়াছেন যে, "If an annual provision of less than a pice per head of the population of Bengal could be made, then the whole of Bengal could be saved from the clutches of epidemics and fell disease of which they were victims." অর্থাৎ "যদি বাঙ্গালার লোক-প্রতি বাৎসরিক ১ পয়সারও কম কর ধার্য্য করা যায়, তাহা

লোক উজাড় হইয়া যাইতেছে, সেই সকল রোগ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা যায়।" কিন্তু করে কে? এ তুচ্ছ বিষয়ে মনোযোগ দিবার আমলাতন্ত্র সরকারের অবসর কোথায়? হাওড়া সেতুর জন্য নূতন কর বসিতে পারে, টার্মিনাল ট্যাক্স, জুট ট্যাক্স, লবণ-শুল্ক প্রভৃতি দুর্ব্বহ ভার প্রজার স্কন্ধে বসিতে পারে, নূতন রেল-নির্ম্মাণের জন্য করবৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে প্রজা বাঁচিয়া থাকিয়া অবস্থার উন্নতি করিয়া সেই কর যোগাইতে পারে, তাহার জন্য লোক প্রতি ১ পয়সারও কম কর বসাইবার কথা সরকারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না!

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে লোক উজাড় হইয়া যাইতেছে, অথবা শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। সে দিকে সরকারের প্রতীকারোপায়ের জন্য কিরূপ আগ্রহ, তাহা ডাক্তার বেণ্টলির সাক্ষ্য হইতে বুঝা যাইতেছে। কমিশনের সদস্য মিঃ জে, এন, গুপ্ত ডাক্তার বেণ্টলির মুখ দিয়া স্বীকার করাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার জনসাধারণ যদি স্বাস্থ্য-সংস্কারের জন্য কিছু অতিরিক্ত কর দিতে স্বীকৃত হয়, তবেই বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি করা যাইতে পারে। কিন্তু ডাক্তার বেণ্টলি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, স্বাস্থ্যসংস্কারের জন্য সরকারেরই আরও টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। জলসরবরাহ ও জলসেচের দ্বারা যে বাঙ্গালার কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, এ কথা ডাক্তার বেণ্টলি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার জিলাবোর্ডগুলির উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। ডাঃ বেণ্টলি বলিয়াছেন যে, এই নীতি অনুসারে কার্য্য হইলে বাঙ্গালার জলসরবরাহ ও জলসেচের ভাল বন্দোবস্ত ত হইবেই না, উপরন্তু জিলাবোর্ডগুলি দেউলিয়া হইয়া যাইবে। অথচ ডাক্তার বেণ্টলির মতে জলসরবরাহ ও জলসেচের ব্যবস্থা কৃষির উন্নতি সাধিত করিবে এবং ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি নিবারণ করিবে। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিতেছে কে? সরকার এই বাবদে অর্থদানে কাতর। গোয়েন্দা-পুলিসের বাবদে অর্থব্যয়ের সময়ে তহবিলে অর্থের টানাটানি হয় না; রেলপুল-নির্ম্মাণে, ব্যবসায়ীদের সুবিধাবিধানে, সিবিল সার্ভিসের সাগরপারের ভাতা ও বাটার ক্ষতিপূরণে অর্থের অর্থযোগানের অভাব হয় না,—যত অভাব প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষাবিধানে! এই জন্যই আমরা স্বরাজ কামনা করি। যদি দেশবাসীর হস্তে শাসনভার থাকিত, তাহা হইলে কি এই ঔদাসীন্য দেখা যাইত?

নারী-নির্য্যাতন

বাঙ্গালায় দুর্ব্বৃত্ত কামান্ধ পশুপ্রকৃতির গুণ্ডার হস্তে নারী-নির্য্যাতন কাণ্ডের কি কোনও কালে অবসান হইবে না? অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, মুসলমানপ্রধান স্থানে দরিদ্র সংখ্যায় অল্প হিন্দুর ঘরের উপরই এইরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়া থাকে। এই হেতু প্রায়ই এই সকল ক্ষেত্রে প্রতীকারোপায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল কাণ্ডের কথা সাধারণে প্রচার হয় না। তথাপি যেগুলির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা কলিকাতার নারীরক্ষা সমিতি প্রদান করিয়াছেন। উহা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে,—

(১) ময়মনসিংহে দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান গুণ্ডারা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া নিদ্রিতাবস্থায় মুখে কাপড় বাঁধিয়া ২২।২৩ বৎসরবয়স্কা হিন্দু বিধবা অহল্যাকে হরণ করিয়া মাসাধিককাল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। এ যাবৎ ৩০ জন সশস্ত্র মুসলমান এই অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। অহল্যার উদ্ধারসাধন হইয়াছে।

(২) যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার দরিদ্র ব্রাহ্মণ পূর্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কমলাকে কোন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান গুণ্ডা বাড়ী হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া বালিকাকে হরণ করিয়াছে, অভিযোগে এইরূপ প্রকাশ। গুণ্ডা ধৃত হইয়া হাজতে আছে। বৃদ্ধের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বালিকার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(৩) কলিকাতায় বেলেঘাটায় ১৩ বৎসরবয়স্কা বিবাহিতা বালিকা আন্নাকালীকে মুসলমান গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গিগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, এইরূপ অভিযোগ শিয়ালদহের

(৪) কালীঘাট হইতে ১৪ বৎসরবয়স্কা বিবাহিতা বালিকা বীণাপাণিকে গুণ্ডা মুসলমান অপহরণ করিয়া ঢাকায় লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, এইরূপ অভিযোগ। আলিপুরে সেই মোকর্দ্দমা বিচারাধীন।

(৫) হুগলী জিলার খানপুরের বিবাহিতা দুখী ও কুসুম-কুমারীর উপরেও এইরূপ ভীষণ অত্যাচার হইয়াছে। চুঁচুড়া আদালতে ইহার মামলা চলিতেছে।

(৬) জয়নগরে ১৩।১৪ বৎসরবয়স্কা বিবাহিতা বালিকা সুশীলাবালাকে দুর্ব্বৃত্তরা হরণ করিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই মামলাও আলিপুরে চলিবে। নারীরক্ষা সমিতি বালিকাকে বালেশ্বর হইতে উদ্ধার করেন।

(৭) ফরিদপুরের ২০।২১ বৎসরবয়স্কা বিধবা বালিকা রাধারাণীকে ৬।৭ জন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান তাহার শ্বশুরালয় হইতে রাত্রিকালে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া ঢাকায় লইয়া যায়, অভিযোগ এইরূপ। ফরিদপুর দায়রা আদালতে ইহার বিচার হইবে।

ইহা ছাড়া চট্টগ্রামের রজনীকান্ত নাথের স্ত্রী যশোদা-সুন্দরীর হরণের মামলা আছে। ইহাও এক্ষণে বিচারাধীন। সুখের বিষয়, একটি মামলায় দুর্ব্বৃত্ত পশুরা আদালতের বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে। গত ৬ই জুলাই তারিখে পাবনা জিলার বেলকুচি থানার এলাকাস্থ নেতুয়ালি গ্রামের হেলু প্রামাণিক ও মাহেরউদ্দীন সর্দ্দার উত্তমাসুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। পাবনার অতিরিক্ত দায়রা জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং প্রত্যেকের ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করিয়াছেন। ইহা ২৭শে অক্টোবরের সংবাদ।

বিচারপতি রায়ে বলিয়াছেন যে,—"দুর্ব্বৃত্তরা একটি হিন্দু বিবাহিতা মহিলার উপর নিতান্ত পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে।"

এমন কত নির্য্যাতনের ঘটনার কথা সাধারণে প্রকাশ হয় না। কেহ বা লোক-লজ্জার ভয়ে, কেহ বা অর্থাভাবে বিরাম নাই। এই অবস্থায় ইংরাজ-শাসনে প্রতীকার নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আদালতের কঠোর দণ্ড পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার উপর ততোধিক শাসন চাই। যে সম্প্রদায়ের লোক এই অপরাধে বিশেষ অপরাধী, সেই সমাজের গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ যদি এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং দুর্ব্বৃত্তগণের কঠোর সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করেন, তবেই এ অবস্থার প্রতীকার হইবে। কিন্তু তাঁহারা এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! যতক্ষণ তাঁহারা তাঁহাদের সমাজের এই কলঙ্কের কথায় সময় নষ্ট করিবেন, ততক্ষণ মসজেদের সম্মুখে বাদ্যের আন্দোলন জাগাইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে পারিলে বোধ হয় সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন।

এ সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজেরও বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করি। তাঁহারা এ বিষয়ে নারীরক্ষাকল্পে অর্থ ও লোকবল দিয়া সমিতিকে সাহায্য করিতে পারেন। সমিতির দ্বারা কার্য্য হইতেছে না, এমন নহে। যাহাতে সেই কার্য্য আরও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, সে জন্য প্রত্যেক হিন্দুর কি অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে?

রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত

বাঙ্গালার প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকগণের অন্যতম রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত গত ১০ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার তারিখে পরলোকগত হইয়াছেন। জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ১২৭২ সালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছু দিন "কর্ণধার" নামক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া তিনি "বঙ্গবাসী" পত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করেন। অল্পবয়স হইতেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পরিণামে কতকাংশে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসীর" সেবাকালে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বারা তিনি নানারূপে উপকৃত হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের উৎসাহ ও সাহায্যপ্রাপ্তির ফলেই তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতে যশঃ ও মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরামর্শে এবং দার্শনিক ও সাহিত্যিক বেনোয়ারীলাল সামন্তের আনুকূল্যে তিনি

সেক্সপিয়ারের অনুবাদ করেন। ইহা হইতে সরকারের দরবারে তাঁহার সম্মান হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সরকার তাঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি প্রদান করেন। তিনি বহু উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'কামিনী ও কাঞ্চন', 'রাণী ভবানী', 'বঙ্গের শেষ বীর,' 'মন্ত্রের সাধন', 'জ্যোতির্ম্ময়ী', 'প্রতিভাসুন্দরী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতিভাসুন্দরী এক সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিল। তাঁহার 'কামিনী ও কাঞ্চন' উপন্যাস নাট্যাকারে পরিণত হইয়া 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁহার রচনার মধ্যে এখনকার 'নবীন' দলের উদ্ভট ভাষার কসরতের পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি বঙ্কিমপন্থীই ছিলেন। তিনি সদালাপী, বিনয়ী এবং নির্ব্বিরোধ লোক ছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা বিদ্যমান। পরিণত বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্যে অনুরাগের অভাব ছিল না। তাঁহার পরলোকপ্রয়াণে সাহিত্যিকসমাজ দুঃখানুভব করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু

গত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য ও পরীক্ষা-নিয়ামক রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অতি আকস্মিক ও অতর্কিতভাবে দেহান্তর সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনার দিন বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে সিনেটের একটি সভাধিবেশনের কথা ছিল। সভার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে অন্যতম সিনেট-সদস্য শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভামধ্যে সংবাদ দেন যে, রায় বাহাদুর অবিনাশ হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তৎক্ষণাৎ সভা বন্ধ হয়। সভামধ্যে ডাক্তার সার নীলরতন প্রমুখ বহু বিশিষ্ট স্বনামধন্য চিকিৎসাব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য সাহায্য দান করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, রায় বাহাদুর মুহূর্ত্তকাল পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যু বিরল। অবিনাশ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অক্লান্তকর্ম্মী মেধাবী ছাত্র ছিলেন, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং কৃতিত্বে বহু পারিতোষিক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে বিদ্যামন্দির হইতে তাঁহার বিদ্যালাভ, তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাপ্রীতির অন্ত ছিল না। এ জন্য তিনি তাঁহার সাধ্যমত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের কার্য্য ত্যাগ করিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়



পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার পরলোকগত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র এবং স্বনামধন্য 'প্রচার' সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র পুরেন্দুসুন্দর গত ২০শে অগ্রহায়ণ লোকান্তরিত হইয়াছেন। পুরেন্দু বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি সুদর্শন, মিষ্টভাষী ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আজ তাঁহার শোকার্ত্তা বিধবা জননী ও পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। আমরা তাঁহার



সতীর পতি

(উপন্যাস)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পত্রের প্রতীক্ষায়

"চুনি, বাবা, যা না—সদর দরজায় গিয়ে একটু ব'সে থাক গে—যদি পিয়নকে দেখতে পাস।"

আমাদের হীরালালের পিতৃব্যপুত্র বালক চুনিলাল বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া সম্মুখে স্লেট রাখিয়া বালির কাগজে বাঁধা খাতায়, যেমন কষা অঙ্ক নকল করিতেছিল, সেইরূপই করিতে লাগিল, কোনও উত্তর দিল না। চুনির মা ছোট গিন্নী ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, "যাও বাবা, ওঠ, জ্যেঠাইমা বলছেন, কথা শোন।"

বালক রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আঃ, তোমরা যে দিক্ ক'রে মারলে দেখছি! আঁকগুলো কষবো না? কালকে ইস্কুল গিয়ে দেখাতে না পারলে 'সার' যে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেবে!"

ছোট গিন্নী বলিলেন, "আজ ত রবিবার, সারাদিন তুই আঁক কষিস্ না বাছা, কে তোকে মানা করবে?"

চুনিলাল বলিল, "সারাদিন বুঝি আর অন্য কায নেই! দুপুরবেলা কটুকেদের বাড়ী ক্যারম খেলতে যেতে হবে না? চিঠি যদি থাকে, তবে পিয়ন ত আপনিই ডাকবে। না থাকলে সে কোত্থেকে দেবে শুনি?"

"এ বাড়ীতে কোনও দিন চিঠিপত্র ত বড় আসেনি, পিয়নের ত ভুল হ'তে পারে! তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে একবার চিঠিগুলো খুঁজে দেখবে। তোর হীরুদাদা আজ ছ' সাত দিন হ'ল কলকাতায় গেছে, এখনও একখানি পৌঁছন চিঠি এল না, তায় আবার কলকাতার যে রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে শুনছি, আমরা যে ভেবে ভেবে মরছি বাবা! যা, বাইরে গিয়ে ব'সে থাক গে, পিয়নকে যদি দাদা?'—এই কথাটি খালি জিজ্ঞাসা করবি। যা, ওঠ, আর তর্ক করিসনে বাপু—হাঁ!"

অগত্যা তখন বালক উঠিল। গজর গজর করিতে করিতে খাতা-স্লেট ইত্যাদি তুলিয়া রাখিয়া উঠানে নামিয়া বলিল, "যদি চিঠি এনে দিতে পারি ত আমায় কি দেবে বল ত?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "দুটো আম পাবি।"

"আচ্ছা, কিন্তু পেটকাটা গাছের"—বলিয়া বালক সদর-দরজা খুলিয়া বাহির হইল। গত কল্য বাগান হইতে কয়েকটা গাছের আম পাড়ানো হইয়াছে, 'পেটকাটা' গাছের আমই সব চেয়ে বড় ও মিষ্ট।

চুনিকে বাহিরে বসাইয়াও হীরালালের মাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বাহির হইলেন। চুনিলালের দুই জন সঙ্গী জুটিয়াছে, তিন জনে মহা উৎসাহে মার্ব্বেল খেলিতেছে। যত দূর দৃষ্টি চলে, বড় গিন্নী পথের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু পিয়ন মহাশয়ের মোহন মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না।

ক্রমে বেলা ১০টা হইল, ১০॥০টা হইল, তখন, আজ চিঠি আসিবার আশা সকলে পরিত্যাগই করিলেন। রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া তিনটি বিধবা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন উপায় কি? বড় গিন্নী ভারী গলায় বলিলেন, "নিশ্চয়ই বাছার আমার কোনও একটা অমঙ্গল ঘটেছে। নইলে এক দিন নয় দু'দিন নয়, ছ' ছ' দিন হয়ে গেল, একখানা পোষ্টোকার্ট লিখে পৌঁছন খবরটাও দিলে না!"—বলিতে বলিতে তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

চুনি স্নান করিয়া আসিল, হীরুর স্ত্রী সুরবালা অনতিদূরে বসিয়া তাহার জন্য ভাত বাড়িতেছিল, তাহার চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া তাহার বসনাঞ্চলে

বলিল, "মা, এক কায করলে হয় না? ওঁর যে সব বন্ধু-বান্ধব এখানে আছে, তা'দের কারু কাছে কোনও চিঠি-পত্র যদি এসে থাকে! একবার খবর নিলে হয় না? অবিনাশ ঠাকুরপো, কি বিপিন বাবুর কাছে যদি কোনও চিঠি এসে থাকে, বলা ত যায় না।"

ছোট গিন্নী বলিলেন, "বৌ-মা ত ঠিকই বলেছেন, দিদি। চুণির খাওয়া হ'লে ও না হয় সবাইকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে একবার খবর নিয়ে আসুক, কি বল?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তার চেয়ে আমিই না হয় যাই না কেন? ছেলেমানুষকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে? তোমরা ততক্ষণ বৌমাকে খাওয়াও, নিজেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, আমি চট ক'রে ঘুরে আসি।"

মেঝ গিন্নী বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাই না কেন দিদি? এই ঠিক দুপুর রোদ্দুরে একলাটি যাবে তুমি?"

যেমন পরামর্শ, তেমনই কায। দুই জনে দু'খানি নামাবলী গায়ে দিয়া, হাতে হরিনামের ঝুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশের বাড়ী গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সে আহারান্তে পাড়ায় এক বাড়ীতে পাশা খেলিতে গিয়াছে। তবে বাড়ীর লোক বলিল, খুব সম্ভব ওরূপ কোন চিঠিই অবিনাশের কাছে আসে নাই, আসিলে নিশ্চয় তাঁহারা শুনিতে পাইতেন। আরও দুই স্থানে নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর, অবশেষে প্রবীণাদ্বয় খিড়কী-দরজা দিয়া জমীদার বাবুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

জমীদার-পুত্র বিপিন বাবু তখন আহারে বসিয়াছেন, তাঁহার মা, পিসী প্রভৃতি নিকটে বসিয়া খাওয়া তদারক করিতেছেন। হীরালালের মা ও খুড়ীর আগমনসংবাদে পিসীমা গিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আগমন-কারণ অবগত হইয়া, বিপিনের আহার-স্থানে লইয়া আসিলেন। বিপিন ইঁহাদিগকে চিনিত, বলিল, "কি গো খুড়ীমারা, কি মনে ক'রে? বসুন বসুন!"

হীরালালের মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, হীরু কলকাতায় পৌঁছে তোমার কাছে কোনও চিঠিপত্র লিখেছে কি?"

বিপিন বলিল, "কৈ না, আমি ত এখনও হীরুর কোনও

হীরুর মা বলিলেন, "না বাবা, আমরা ত কোন চিঠিই আজও পেলাম না। আজ ছ' ছ' দিন হ'ল ছেলে আসতে গেছে, কি হ'ল বল দেখি? ভেবে ভেবে যে আমাদের মুখে অন্ন-জল যাচ্ছে না, এখন কি উপায় হবে, কি ক'রে ছেলের খবরটি পাই? কলকাতায় গিয়ে কোথায় সে উঠবে, সে ঠিকানা আমাদের ত কিছুই বলে যায়নি, তোমায় কি কিছু ব'লে গেছে বাবা? তা হ'লে না হয় একখানা টেলিগেরাপ করিয়ে দিতাম।"

বিপিন বলিল, "না, খুড়ীমা, কোথায় গিয়ে উঠবে, তা ত কিছু ঠিক ছিল না; বলেছিল, কোনও একটা মেসের বাসা খুঁজে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠবে, উঠে চিঠি লিখবে। তবে খুলেই বলি খুড়ীমা, কলকাতায় যে রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে, হীরুর কোনও চিঠি না পেয়ে আমিও একটু ভাবিত হয়ে পড়েছি। আজকের ডাকেও তার চিঠি এল না দেখে আমি মনে করেছিলাম, ও-বেলা আপনাদের কাছে গিয়ে খবর নেবো, আপনারা কোনও চিঠি পেলেন কি না,—তা আপনারা এসেই পড়েছেন।"

হীরুর মা বলিলেন, "ঐ পোড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেই ত বাবা প্রাণটা আঁৎকে উঠেছে! তারই মধ্যে বাছা গিয়ে পড়েছে—সে আমার প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে কি না, তারই বা ঠিক কি বাবা? শুনছি না কি মুচনমানেরা যাকে পাচ্ছে, তাকেই খুন করছে!"

বিপিন বলিল, "না না, সে ভয় নেই খুড়ী-মা! খুন-জখম প্রায়ই হচ্ছে বটে—কিন্তু যারা খুন-জখম হচ্ছে, পুলিস তাদের তক্ষনি হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের নাম-ধাম সব খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যাচ্ছে; হীরুর সে রকম কোনও বিপদ হয় নি, এ আমি নিশ্চয় ক'রে আপনাকে বলতে পারি। কলকাতা থেকে রোজ আমার খবরের কাগজ আসছে, রোজ আমি সে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি—হীরুর নাম-টাম কোথাও বেরোয় নি।"

"তাই বল বাবা, তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক; বাছা আমার প্রাণগতিক ভাল আছে, এই খবরটুকু পেলেই যে আমি এখন নিশ্চিন্ত হ'তে পারি, তার উপায় কি? কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমি কি যাব বাবা কলকাতায়? গিয়ে তার সন্ধান নেবো?"

কোথায় যাবেন? আর, সে কলকাতা সহর সমুদ্র—ঠিকানা জানা নেই, আপনি সেখানে গিয়ে কোথায় তার সন্ধান পাবেন? আর, কাকে সঙ্গে নিয়েই বা যাবেন? এই হাঙ্গামার সময় কেউ কি কলকাতায় গিয়ে কাঁচা মাথাটা দিতে রাজি হবে? কোথাও আপনাকে যেতে হবে না, হীরু ভালই আছে, ভগবান্‌কে ডাকুন, বোধ হয়, কাল-পশু' নাগাদ চিঠি এসে যাবে। আমি বরং এক কায করতে পারি। কলকাতায় আমার দু' জন বন্ধুর নামে দু'খানি চিঠি লিখে আমি হীরুর হাতে দিয়েছিলাম; হীরু গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে, তাঁরা গণ্যমান্য লোক, হীরুর চাকরী-বাকরী সম্বন্ধে যদি তাঁরা কিছু সুবিধে ক'রে দিতে পারেন—এই জন্যে তাঁদের নামে চিঠি দিয়েছিলাম, তা আমি না হয় তাঁদের দু' জনকেই এক একখানা চিঠি লিখে দিই, হীরু গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছে কি না, তাঁরা আমায় জানাবেন।"

হীরুর মা আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তার চেয়ে টেলিগেরাপই ক'রে দাও বাবা, যা খরচ লাগে, আমি দিচ্ছি। চিঠি ত যেতে দু'দিন আসতে দু'দিন—এ চারদিনে যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাব আমি! টেলিগেরাপের জবাব আসতে কত দেরী হবে?"

"আজকে টেলিগ্রাফ করলে, কা'ল নাগাদ জবাব আসতে পারে।"

"তবে সেই ভাল বাবা। কি খরচ হবে বল, আমি বাড়ী গিয়ে আমার দেওরপো চুনিলালের হাতে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিপিন বলিল, "সে হবে এখন খুড়ী-মা! তার জন্যে তাড়াতাড়ি নেই;—কত খরচ হবে, আমিই বা এখন জানবো কি ক'রে? আমি খেয়ে উঠেই টেলিগ্রাফ লিখে ইষ্টিশানে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের এখনও খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধ হয়? আপনারা যান—বাড়ী যান, খাওয়া-দাওয়া করুন গে। যে রকম খবর আসবে, আমি গিয়ে আপনাদের জানাব। যান, আর ভাববেন না। ঈশ্বর আছেন, ভক্তিভাবে তাঁকে ডাকুন, সব ভালই হবে। যান, আর দেরী করবেন না।"—বলিতে বলিতে আহার শেষ করিয়া বিপিনও উঠিল।

হও, আমার মাথার যত চুল, তত তোমার পেরমাই হোক্,—দেরী কোর না বাবা, টেলিগেরাপ দু'খানি পাঠিয়ে দাও—আর জবাব কখন্ আসবে বল, আমি বরং শোনবার জন্যে এখানে এসে ব'সে থাকবো।"

বিপিন বলিল, "জবাব আসতে কা'ল বোধ হয় বেলা ৯টা ১০টা হ'তে পারে। তা আপনি কেন কষ্ট ক'রে আসবেন, খুড়ীমা, যেমন খবর আসবে, আমি তখনই নিজে গিয়েই আপনাকে বল্‌বো। কিন্তু এ কথাও ব'লে রাখি, যদি ওঁরা তার করেন যে, হীরালাল ব'লে কোনও লোক আমাদের কাছে আসেনি, তা হ'লেও কিন্তু ভয় পাবার কোন কারণ নেই। হীরু সেখানে কোথাও না কোথাও আশ্রয় পেয়েছে নিশ্চয়। এই ডামাডোলের ভিতর সে কি আর এর তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পথে বেরুবে? আর, সেই জন্যেই বোধ হয়, খাম-পোষ্টকার্ডও সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই চিঠিও লেখে নি।"

বিপিন বাবু জবাবী আর্জ্জেণ্ট তার করিয়াছিলেন, উভয় তারেরই উত্তর সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিল। না, হীরালাল নামক কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করিতে আইসে নাই। এক জন লিখিয়াছেন, আসিলে সংবাদ দিব।

সন্ধ্যার পর বিপিন বাবু টেলিগ্রাম দুইখানি হাতে করিয়া হীরালালের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খবর শুনিয়া হীরালালের জননী, পত্নী ও খুড়ীমারা অধিকতর দুশ্চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। বিপিন বাবু অনেক প্রকারে তাঁহাদের প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হইল না। অবশেষে বিপিন বাবু বলিলেন, "দেখি কালকের ডাকটা। চিঠি আসে কি না, তাও দেখি, খবরের কাগজেও দেখি কলকাতার অবস্থা কি রকম; তার পর যা হয় করা যাবে।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

সে রাত্রিতে এ গৃহে আর হাঁড়ি চড়িল না। চুনিলালের আহার দুধে মুড়ি ভিজাইয়া, গুড় ও কলা-সহযোগে সম্পন্ন হইল। ছোট গিন্নীর পীড়াপীড়িতে অপর সকলে একটু একটু গুড় মুখে দিয়া জল খাইয়া শয়ন করিলেন।

হায়, ইঁহারা ত জানিতে পারিলেন না, যে ব্যাগের ভিতর বন্দী হইয়া হীরালালের পত্র গোড়াবাজার পোষ্ট-

ব্যাগবাহী সরকারী মেলভ্যান আক্রমণ করিয়া মুসলমানরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল!

বলা বাহুল্য, পরদিনও কোনও পত্র আসিল না। তবে সংবাদপত্রে দেখা গেল, হাঙ্গামা অনেকটা কমিয়াছে, দোকানপাট আবার খুলিতেছে, পথে লোক-চলাচলও সুরু হইয়াছে।

হীরালালের জননী এত দিনে একেবার হতাশ হইয়া পড়িলেন। অন্ন-জল প্রায় পরিত্যাগ করিলেন বলিলেই হয়।

বিকালে চুনিকে সঙ্গে লইয়া, সুরবালা গিয়া বিপিন বাবুর স্ত্রী সুহাসনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সমবয়সী সখীর চোখের জলে সুহাসের হৃদয় ভিজিল। সুহাস স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল।

বিপিন বাবু আসিলে সুহাস জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, কলকাতার অবস্থা এখন কি রকম?"

"অনেকটা ঠাণ্ডা। কেন?"

"হীরু ঠাকুরপোর বউ এসে বড় কান্নাকাটি করছে।"

"তিনি এ বাড়ীতে এসেছেন না কি?"

"হ্যাঁ, ঐ যে ও-ঘরে ব'সে রয়েছে। আজ ৮ দিন হ'ল ওর স্বামী কলকাতায় গেছে—আজ পর্য্যন্ত একখানা পৌঁছন চিঠি পর্য্যন্ত এল না, ছুঁড়ীর মুখখানি একবারে কালী হয়ে গেছে। আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলতেও পারছে না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, ওর ইচ্ছে, তুমি একবার কলকাতায় গিয়ে ওর স্বামীর খবরটি এনে দাও।"

বিপিন বলিল, "তা তোমার হুকুম হ'লে আমি যেতে পারি।"

সুহাস বলিল, "তারটিও যেমন, আমারটিও ত তেমনই। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে তোমাকেই বা আমি পাঠাই কি ক'রে?"

বিপিন বলিল, "আজকের যে কাগজ আমি পেয়েছি, তাতে পর্শু'কার কলকাতার অবস্থা লেখা আছে, অনেকটা কম হয়েছে। কাল, আজ—দু'দিনে বোধ হয় সব গোলমালই থেমে গেছে। ইংরেজরাজের রাজধানী, ও সব আর কত দিন চলতে পারে?"

সুহাস বলিল, "আচ্ছা, কালকের কাগজে কি খবর আসে দেখ। যদি কলকাতা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তবে না

"আমি বিকেলের গাড়ীতে রওয়ানা হ'তে পারি। কা'ল হীরুর কোনও চিঠিপত্র আসে কি না, তাও দেখা যাক্—কি বল?"

"আচ্ছা, সেই ভাল, আমি তা হ'লে হীরুর বউকে সেই কথা বলি গে?"

"তা বল গে।"—বলিয়া বিপিন স্ত্রীকে আদর করিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিনও কোন পত্র আসিল না; সংবাদপত্রে দেখা গেল, কলিকাতা আরও ঠাণ্ডা হইয়াছে—গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও হাঁসপাতালে কোনও খুন-জখম আইসে নাই। ইহা পর্শু'কার কলিকাতার অবস্থা।

অপরাহ্নের ট্রেণে বিপিন বাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বলিয়া গেলেন, হীরালালের কোনও সংবাদ পাইবামাত্র তারযোগে জানাইবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সতীশের প্রতিহিংসা

ক্রুদ্ধ সতীশ চিৎপুর রোডে আসিয়া বেলগাছিয়ার ট্রাম ধরিবার আশায় সাইনবোর্ডের নিকট দাঁড়াইল। অপমানে সে এখন প্রায় পাগলের মত হইয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু কোন ট্রাম আসিল না। এই সময় সে মনে মনে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। করিমের কবল হইতে দুশ্চারিণী রেবতী ছাড়া পাইল কেমন করিয়া? করিম ত বলিয়াছিল, ওয়াদার সময়মধ্যে জানখালাসী টাকা না আসিলে রেবতীকে সে বেইজ্জৎ করিবে কিংবা খুন করিয়া ফেলিবে; ইহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই কোনও সুযোগে রেবতী করিমের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আসিয়া, আমার উপর রাগ করিয়া, ঐ একটি নূতন জুটাইয়া লইয়াছে। নূতন কিংবা গোপন ও পুরাতন, তাই বা কে জানে! সে চুলায় যাউক,—কিন্তু রেবতীর ঠিকানাটা করিমকে কোনও সুযোগে জানাইয়া দিতে পারিলে কাম হইত। সত্যই রেবতী যদি পলাইয়াই আসিয়া থাকে—তবে, হুবাবা!—করিম গুণ্ডা আসিয়া উহাকে মজাটি

উহার যাহা কিছু আছে, লুটিয়া পুটিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু পাঠাই কাহাকে? সে পাড়ায় কেহ কি এখন যাইতে রাজি হইবে? পথেই যদি কোনও মুসলমান তাহার দফাটি সারিয়া দেয়?

দক্ষিণদিক হইতে একটা হাল্লা শুনা গেল। অনেক লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাস্তার দুই ধারের দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। রব উঠিল, মুসলমান আসিতেছে—মুসলমান আসিতেছে। দেখিয়া, সতীশও প্রাণপণে উত্তরদিকে ছুটিয়া চলিল। ছুটিতে ছুটিতেই শুনিতে পাইল, মেছুয়াবাজারে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে—দাঙ্গা করিতে করিতে মুসলমানগণ এই দিকেই আসিতেছে।

যাহা হউক, সতীশ কোনও ক্রমে প্রাণ লইয়া শ্যামবাজারে তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

রেবতীর প্রতি প্রতিহিংসা লওয়ার মতলব কিন্তু সতীশ পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ স্থির করিল, নিজে তাহার গুণ্ডাপাড়ায় যাওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। কারণ, রেবতীর "জান্" ত তাহার গহনা ও টাকায় খালাস হইয়াই গিয়াছিল, তাহার নিজ জান্-খালাসী পাঁচ হাজার টাকার জন্যই রেবতীকে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী বোধে করিম আটকাইয়া রাখিয়াছিল। জামীনদার পলাইয়াছে বলিয়া, আসামীকে হাতে পাইলে সে ছাড়িবে কেন? সুতরাং এমন কোনও বিশ্বস্ত লোককে করিমের কাছে পাঠাইতে হইবে, যে কোনমতেই সতীশের ঠিকানাটি প্রকাশ করিয়া দিবে না, এবং কোনও মুসলমানকেই পাঠানো উচিত। গেঁড়াতলায় গেলে মুসলমানের কোনও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু এ পাড়ায় সেরূপ লোক কোথায়?

তখন হঠাৎ সতীশের মনে হইল, পূর্ব্বে যখন তাহার গাড়ীঘোড়া ছিল, তখন ইমামুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি দশ বৎসরকাল তাহার কোচম্যানি করিয়াছে। সেই ব্যক্তি এখন এই পাড়াতেই অন্য বাড়ীতে কোচম্যানি করে। সে লোকটি খুবই বিশ্বাসী ছিল,—এমন কি, এক সময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া, সতীশের প্রাণরক্ষা করিয়া নিমকের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। এ দিকে পূর্ব্ব-মনিব বলিয়া পথে-ঘাটে দেখা হইলেই আজিও তাহাকে অবনত হইয়া সেলাম করিয়া থাকে। সেই ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে, তাহাকে কিছু বকশিস দিয়া, করিমের নিকট পাঠানো যাইতে পারে।

পরদিনই সতীশ ইমামুদ্দিনের খোঁজে বাহির হইল। ইমামুদ্দিনের আস্তাবলে গিয়া সতীশ দেখিল, তোলা উনানে ভাত ফুটিতেছে, সে এবং সহিস বসিয়া আছে। সতীশকে দেখিয়াই ইমামুদ্দিন দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিল। সতীশ তাহাকে ডাকিল, "ইমামুদ্দিন, শোন।"

ইমামুদ্দিন বাহির হইয়া আসিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গাড়ী বেরুবে কখন্?"

ইমাম হিন্দীতে উত্তর করিল, "আজকাল ত আর গাড়ী বের করি না হুজুর। হাঙ্গামা হয়ে অবধি আমার বাবু গাড়ীতে কোথাও আর যান না। বাড়ী থেকেই আর বেরোন না।"

"বটে! তা হ'লে ত তোমাদের এখন ছুটী চলছে।"

"কি করি হুজুর!"

"দেখ, ইমাম, আমার একটু বিশেষ কায আছে। সেটা তুমি ক'রে দিতে পারবে? পারলে আমি তোমায় বিলক্ষণ বখশিস দেবো।"

"কি কায বলুন হুজুর। আমি ত আপনার বান্দা। কত কাল আপনার নিমক খেয়েছি।"

"এখানে দাঁড়িয়ে ত সে কথা হবে না। আমার বাড়ীতে এস তা হ'লে।"

"যখন হুকুম করবেন, তখনই এ গোলাম হাজির হবে।"

"ভাত চড়িয়েছ দেখছি। খাওয়া-দাওয়া ক'রে এই বেলা ১২টা কি ১টার সময় এস, কি বল?"

"যো হুকুম, তাই আসবো হুজুর।"—বলিয়া ইমামুদ্দিন অবনত হইয়া সতীশকে সেলাম করিল।

সতীশ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার সারিয়া লইল। ইমামুদ্দিন তাহার চাঁপদাড়ি লইয়া যথাসময়ে আসিয়া দর্শন দিল। সতীশ বৈঠকখানা-ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

সতীশ বলিল, "দেখ ইমাম, গেঁড়াতলায় করিম শেখ

"চিনি না হুজুর, কিন্তু নাম শুনেছি। সে শুধু গুণ্ডা নয়, গুণ্ডাদের এক জন সর্দ্দার।"

"হাঁ, সেই। আমি যদি তার নামে তোমায় একখানা চিঠি দিই, তবে তুমি সে চিঠি তাকে গিয়ে দিয়ে আসতে পার ?"

ইমাম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "এ আর তেমন শক্ত কথা কি হুজুর ?"

সতীশ বলিল, "তা বেশ। দেখ, কোনও একটা বিশেষ কারণে করিমকে একখানা চিঠি লিখতে চাই। কিন্তু আমি যে কে আর কোথায় থাকি, এটা ঘুণাক্ষরে করিম না জানতে পারে। জানলে হয় ত আমার প্রাণই যাবে। যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলবে, রাস্তায় এক জন বাঙ্গালী বাবু এই চিঠি আর আমার মেহনতানা একটি টাকা দিয়েছে, তাই আমি চিঠি এনেছি—সে বাবুর নাম-ধাম আমি কিছুই জানিনে—এমন কি, পূর্ব্বে তাকে কখনও দেখিওনি। বুঝলে ? এই রকম বলতে পারবে ত ইমাম ? অবশ্য তোমার মেহনতানা ১৲ নয়—আমি ১০৲ টাকা তোমায় দেবো। কিন্তু তুমি ১৲ টাকার কথাই সেখানে বলবে। আমার প্রাণ তোমার হাতে।"

ইমাম বলিল, "হুজুর যেমন ফরমায়েস করছেন, ঠিক সেই রকম কথাই আমি বলবো। তার বেশী একটা কথাও আমি বলবো না। এই পশ্চিমমুখে দাঁড়িয়ে হুজুরকে আমি জবান দিচ্ছি, নিমকহারামী আমি করবো না। চিঠি কখন্ নিয়ে যেতে হবে ?"

"আমি চিঠি লিখে রাখবো, তুমি তিনটের সময় এসে নিয়ে যেও।"

"বহুৎ খু"—বলিয়া সেলাম করিয়া ইমাম প্রস্থান করিল।

সতীশ নিজ শয়নঘরে গিয়া যে পত্রখানি লিখিল, বানানগুলি শুদ্ধ করিয়া তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—

"সাহেব,

হুজুরের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, গত পর্শু তারিখে রাত্রে আমি আপনার নিকট এই ওয়াদা করি যে, গতকল্য সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গিয়া হুজুরে দাখিল করিব। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধায় টাকাটা যোগাড় করিতে না পারায় আমার কথার খেলাফ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য মাফ করিতে আজ্ঞা হয়। যে স্ত্রীলোককে জামীনস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নহে—সে এই সহরের এক জন বিখ্যাত নটী—হুজুরের নিকট আসল কথা লজ্জায় প্রকাশ করিতে না পারায় ঐরূপ বলিয়াছিলাম। সে নটী বোধ হয় আপনার সহিত দাগাবাজি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি নিম্নে তাহার আসল নাম ও ঠিকানা দিতেছি। তাহার অনেক টাকা, মোহর, অলঙ্কার ও অন্যান্য ধনদৌলৎ আছে, বাড়ীতে এক দ্বারবান্ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষ নাই। অতএব আপনার প্রাপ্য টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলে ভাল হয়। সে অত্যন্ত দাগাবাজ মেয়েমানুষ, আপনার দয়ার সে যোগ্য নহে। অতএব তাহার যথোচিত শাস্তিবিধান করাই আপনার উচিত। ইতি—

নাম সহি

করিলাম না পরিচয়েই চিনিবেন।"

নিম্নে সতীশ রেবতীর নাম ও জয়মিত্রের গলির ঠিকানা লিখিয়া দিল।

ইমাম যথাসময়ে আসিয়া পত্র লইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সে ফিরিয়া আসিয়া সতীশের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, করিম সাহেবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—তিনি পত্র পড়িয়া বলিয়াছেন, বাবুকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম দিয়া বলিও, তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, শীঘ্রই আমি সেইরূপ করিব। কোনও লিখিত জবাব দেন নাই।

সতীশ বলিল, "আমার নাম কি, ঠিকানা কি, সে সব জিজ্ঞাসা করেছিল না কি ?"

ইমাম বলিল, "না, করেনি। করলে, হুজুর যে রকম শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই রকমই বলতাম।"

"আচ্ছা, বেশ। এই তোমার টাকা নাও, ইমাম।"

ইমাম টাকা লইয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সতীশ আপন মনে বলিল—"হুঁবাবা! ঘুঘু দেখেছিলে চাঁদ! এইবার ফাঁদও দেখ!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।



কল্পনাস্রোতে

বসুমতী প্রেস। শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা।



৫ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৩ [৩য় সংখ্যা

সাহিত্যে শ্রীরাধা

২

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদের দেশে বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে মহাকবি জয়দেব শ্রীরাধিকার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা শ্রীরাধার লৌকিকনায়িকা-ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, জয়দেব-বর্ণিত রাধা-চরিত্রে আমরা দেবভাবের বা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত হ্লাদিনী শক্তির সারভাবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। মহাকবি জয়দেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীরাধা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য; তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই-রূপ :—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—

"হে রাধে! আকাশ মেঘে আবৃত, তমালবৃক্ষ-সমূহের দ্বারা বনভূমিসমূহ অন্ধকারে আবৃত, রাত্রিকাল উপস্থিত, এই কৃষ্ণ নিতান্ত ভীরু, সুতরাং ইহাকে তুমিই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও," নন্দের এই প্রকার আদেশ শুনিয়া পথিমধ্যে যে কুঞ্জগৃহ আছে, তদভিমুখে চলিত শ্রীরাধা ও মাধবের নিগূঢ় কেলিসমূহ বিজয়ী হউক।

এই শ্লোকটির যে প্রকৃত কি উদ্দেশ্য, তাহাও সুস্পষ্ট নহে, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে রাধার নাম নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জয়দেবের পূর্ব্বতন কবিবৃন্দ রাধাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু পূর্ব্ব-প্রবন্ধেও দেখাইয়াছি, কিন্তু ঐ সকল উদ্ধৃত শ্লোকে রাধার চরিত্রে সামান্য পরকীয়াভাবব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, সখীগণ কেবল তাঁহাদিগের এই মিলনের সাহায্য গোপনে করিয়া থাকে, পাছে তাঁহাদের এই মধুর মিলনের বৃত্তান্ত অপর কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহার সখীগণ ও তিনি ব্যাকুল; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ন্যায় অন্য গোপরমণীতেও আসক্ত, এ কথা শ্রীরাধার অবিদিত না হইলেও তিনি সে জন্য কৃষ্ণকে ভাল-বাসিতে বিমুখ নহেন। হাতে-কলমে কৃষ্ণ ধরা পড়িলেও অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে বা প্রত্যাখ্যান করিতে রাধার প্রাণ চাহে না, এইরূপ সপত্নী প্রেমমুগ্ধহৃদয়

অনন্তশরণ লোকশঙ্কাব্যাকুল অল্লাভিমানপরায়ণ রাধাকে আমরা জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কবিগণের কবিতাদর্পণে প্রতিফলিত হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু জয়দেবের এই কবিতায় রাধা আর একভাবে যেন চিত্রিত হইয়াছেন। নন্দ গোপ ব্রজভূমির অধিপতি হইলেও বার্দ্ধক্যবশতঃ ব্রজভূমির নিবিড় অন্ধকারে মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া একাকী শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইতে সাহস করেন না, তাই তিনি ঐরূপ সময়ে হঠাৎ রাত্রিকালে নিবিড় বনমধ্যে অকস্মাৎ রাধাকে দেখিতে পাইয়া বড়ই বল পাইয়াছিলেন। তাই তিনি রাধাকে বলিতেছেন যে, হে রাধে! আমার এই ভীরু বালককে তুমিই সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া যাও, তাড়াতাড়ি যাইও, নহিলে গোপালের ভিজিয়া যাইবার সম্ভাবনা, আমি পরে যাইব, ভিজিতে হয়, আমি ভিজিব, গোপালকে তুমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

নন্দ মহারাজের এই আনন্দপ্রদ আদেশ শুনিয়া রাধা আনন্দিত হৃদয়ে কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন, কিন্তু নন্দের গৃহে না যাইয়া নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা প্রকার কেলিরসে নিরতা হইলেন, এই ভাবের রাধাচরিত্র জয়দেব পাইলেন কোথা হইতে? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কিন্তু রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সমাগম এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি,—

"একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্॥
সরঃসুস্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তৎ পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে॥
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্॥
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ॥
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রয়ং প্রতি।
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৫ অধ্যায়)

এক দিন কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে ভাণ্ডীরবনে তিনি গোসমূহকে বিচরণ করাইতেছিলেন, সরোবর সমূহের স্বাদু জল গো-সমূহকে পান করাইবার পর নিজেও পান করিয়া, বালক কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া, যে সময় একটি বটবৃক্ষের মূলে বসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই মায়াবালকরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়ার প্রভাবে অকস্মাৎ গগনমণ্ডলকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ আকাশ মেঘাবৃত হইয়াছে, বনমধ্য নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের গর্জ্জন, বজ্রপাতের দারুণ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে অতিস্থূল বৃষ্টিধারা হইতেছে, বায়ুবশে কম্পমান বৃক্ষসমূহের স্কন্ধদেশ ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছে, এই সব দেখিয়া নন্দ ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সকল গাভীকে ও বৎসসমূহকে ছাড়িয়া কেমন করিয়াই বা গৃহে ফিরিব, আর যদি না যাই, তাহা হইলে বালক শ্রীকৃষ্ণেরই বা কি দশা হইবে? এইরূপ শঙ্কাকুল হইয়া নন্দ যখন এই প্রকার বলিতেছিলেন, সেই সময় মায়াবশে ভয় পাইয়া শ্রীহরিও রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীরাধা সেই স্থানে আসিয়া দেখা দিলেন।

ইহার পর ১১টি শ্লোকে শ্রীরাধার নবযৌবনোদ্ভাসিত লোকাতীত হাবভাববিলাসমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর কি হইল?

দৃষ্ট্বা তাং নির্জ্জনে নন্দো বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
চন্দ্রকোটিপ্রভামৃষ্টাং ভাসয়ন্তীং দিশো দশ॥
উবাচ তাং সাশ্রুনেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ॥
জানামীমং মহাবিষ্ণোঃ পরং নির্গুণমচ্যুতম্।
তথাপি মোহিতোঽহং চ মানবো বিষ্ণুমায়য়া॥
গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্।
পশ্চাদ্দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্॥
ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্যৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া।

উবাচ নন্দং সা যত্নাৎ প্রকাশ্যং রহস্তকম্।
অহং দৃষ্টা ত্বয়ানেন কতিজন্ম-ফলোদয়াৎ ॥
প্রাজ্ঞস্ত্বং গর্গবচনাৎ সর্ব্বং জানাসি কারণম্।
অকথ্যমাবয়োর্গোপ্যং চরিত্রং গোকুলে ব্রজ ॥
বরং বৃণু ব্রজেশ ত্বং যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
দদামি লীলয়া তুভ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা তামুবাচ ব্রজেশ্বরঃ।
যুবয়োশ্চরণে ভক্তিং দেহি নান্যত্র মে স্পৃহা ॥
যুবয়োঃ সন্নিধৌ বাসং দাস্যসি ত্বং সুদুর্ল্লভম্।
আবাভ্যাং দেহি জগতামম্বিকে পরমেশ্বরি ॥
শ্রুত্বা নন্দস্য বচনমুবাচ পরমেশ্বরী।
দাস্যামি দাস্যমতুলমিদানীং ভক্তিরস্তু তে ॥
আবয়োশ্চরণাম্ভোজে যুবয়োশ্চ দিবানিশম্।
প্রফুল্লহৃদয়ে শশ্বৎ স্মৃতিরস্তু সুদুর্ল্লভা ॥
মায়া যুবাঞ্চ প্রচ্ছন্নৌ ন করিষ্যতি মদ্বরাৎ।
গোলোকে যাস্যথোঽন্তে চ বিহায় মানবীং তনুম্ ॥
এবমুক্ত্বা তু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।
গত্বা দূরে তং নিনায় বাহুভ্যাঞ্চ যথেপ্সিতম্ ॥

নন্দ অকস্মাৎ সেই নির্জ্জন স্থানে কোটি চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বলবর্ণা, কান্তিচ্ছটায় দশদিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমানা সেই রাধাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভক্তিভরে আত্মকন্ধর নত করিয়া সাশ্রুনেত্রে নন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, গর্গের মুখে আমি আপনার পরিচয় পাইয়াছি, আপনি পদ্মা অপেক্ষা শ্রীহরির প্রিয়া, আমার এই যে বালক গোপাল, ইনিও যে মহাবিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই নির্গুণ অচ্যুত, তাহাও আমি জানি; কিন্তু জানিয়াও আমি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া আছি, কারণ, আমি সামান্য মনুষ্য ছাড়া আর কিছুই নহি। হে ভদ্রে! আমার গোপাল তোমার প্রাণনাথ, সুতরাং তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, যেখানে ইহাকে লইয়া তুমি সুখী হইবে, সেইখানে যাও, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে পশ্চাৎ আমার পুত্রকে আমার নিকটে অর্পণ করিও। এই বলিয়া নন্দ রাধিকার হস্তে গোপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই গোপাল তখনও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন, রাধা সেই মনোহর বালককে বড়ই হর্ষের সহিত গ্রহণ করিয়া হাস্য করিলেন, এবং নন্দকে ইহা করিও না, তোমার বহু জন্মের সুকৃতিফলে তুমি আমার দর্শন পাইয়াছ, তুমি বিজ্ঞ এবং গর্গের মুখে শুনিয়া এই সকল লীলার যাহা কিছু কারণ, তাহা তুমি জান, তুমি গোকুলে চলিয়া যাও, কিন্তু আমাদিগের এই নিভৃত সমাগমের কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। হে ব্রজেশ্বর! তোমার মনে যদি কোন বাঞ্ছিত থাকে, তাহাও আমাকে জানাও, আমি তোমাকে সেই বরই দিব। সেই বর দেবতাদিগের দুর্ল্লভ হইলেও আমি অবলীলাক্রমে তোমাকে দিব।" রাধিকার বচন শুনিয়া ব্রজেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের দুই জনের চরণে আমার ভক্তি হউক, এই বরই আপনি আমাকে দিউন, অন্য কোন বরে আমার স্পৃহা নাই। হে জগজ্জননি! পরমেশ্বরি! রাধিকে! তোমাদিগের দুই জনের নিকটে আমি এবং যশোদা যেন সর্ব্বদা বাস করিতে পারি, এই বরটিও আমাদিগকে দিও।" নন্দের বচন শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বরী রাধিকা বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের অভীপ্সিত দাস্যরূপ বর আমি যথাসময়ে তোমাদিগকে দিব। তোমার ভক্তি হউক, আমাদিগের চরণাম্ভোজে তোমাদিগের সর্ব্বদা ভক্তি হউক। আরও বর দিতেছি যে, আমাদিগের স্মৃতি দেবতাদিগের দুর্ল্লভ হইলেও তোমাদিগের প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহা সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুক। আমি ইহাও বর দিতেছি যে, মায়া কখনও তোমাদের দুই জনকে আবৃত করিতে পারিবে না, এবং এই মানবশরীর পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যথাসময়ে দুই জনে গোলোকে যাইয়া বাস করিবে।" এই প্রকার বলিয়া রাধা নিজ বক্ষঃস্থলে গোপালকে আরোপণপূর্ব্বক দুই বাহুর দ্বারা ধরিয়া দূরে নিজ ঈপ্সিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের যমুনাতটে বৃন্দাবনকুঞ্জে নিভৃত বিহারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অনাবশ্যক বোধে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দেখিতে পাই, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী অপেক্ষাও প্রিয়তমা। নন্দ তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এবং তাঁহার চরণে দেবতাগণের দুর্ল্লভ যে ভক্তি, তাহাই বররূপে প্রার্থনা করিতেছেন। গীত-

সংক্ষিপ্তভাবে সূচিত হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত। এই শ্লোকটিকে ছাড়িয়া দিলে গীত-গোবিন্দের রাধা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা গীত-গোবিন্দকার রাধার বিষয়ে এমন কিছুই সূচনা করেন নাই—যাহাতে রাধার পর-মেশ্বরী-স্বভাব সূচিত হইতে পারে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উদ্ধৃত অংশের সহিত গীত-গোবিন্দের এই শ্লোকটির প্রকৃতপক্ষে কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা বলেন যে, এই শ্লোকটিতে যে উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রজেশ্বর নন্দের যে উক্তি, তাহা নহে, ইহা রাধিকার প্রতি প্রণয়ভরে নিজের আত্মসমর্পণসূচক শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি। অর্থাৎ "মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল ও ঘন তিমিরাবৃত বৃন্দাবন বিলোকন করিয়া নির্জ্জন নিকুঞ্জ-বিহারের ইহাই উপযুক্ত সময়, এ সময় রাধার ঈপ্সিত দেশে গমন করিয়া তাঁহার মন-স্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই রাধাকে বলিতেছেন যে—হে রাধে! আকাশ মেঘে আবৃত হইয়াছে, বনভূমি তমালের নিবিড় অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, রাত্রিকাল, আমার বড় ভয় হইতেছে, সুতরাং এই ভীত ব্যক্তিকে অর্থাৎ আমাকে তুমি তোমার অভীপ্সিত গৃহে অর্থাৎ যমুনাপুলিনে অবস্থিত নিভৃত নিকুঞ্জ-কেলিমন্দিরে পথ দেখাইয়া লইয়া চল।" প্রণয়ীর এইরূপ আদেশ স্বেচ্ছাবিহারার্থিনী শ্রীরাধার পক্ষে 'নন্দ-নিদেশ' অর্থাৎ আনন্দদায়ক আদেশ।

এই আদেশ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা নিভৃত নিকুঞ্জ-গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সে নিভৃত কেলিসমূহ করিয়া-ছিলেন, তাহাই স্মৃত হইয়া তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক। ইহাই হইল কোন কোন টীকাকারের মতে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য্য। পরে গীতগোবিন্দে বিস্তা-রের সহিত যে রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে এই প্রকার অর্থই যে প্রথম শ্লোকের অভিমত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সূচনা এই শ্লোকের দ্বারা কেন সূচিত হইল,- এরূপ প্রশ্নের কোন সদুত্তর সমগ্র গীতগোবিন্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, গীতগোবিন্দকার স্পষ্ট কথায় বিস্তৃতভাবে পরে যেভাবে রাধাচরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, গীতগোবিন্দকারের রাধায় বৈষ্ণবগণসম্মত তাঁহার পরাশক্তির স্বভাব সূচিত হয় নাই। পরনায়িকারূপে বর্ণন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি স্থান গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা দ্বারাই ইহা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরহিণী রাধার অবস্থা জানাইতেছেন—

"বহতি চ চলিতবিলোচনজলভরমানন-কমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্তদলন-গলিতামৃতধারম্॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥"

"রাধার আননকমল চঞ্চল বিলোচন হইতে বিমুক্ত অশ্রু-ধারায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, করাল রাহুর দন্তসমূহের দ্বারা চন্দ্র বিদলিত হইয়া অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতেছে। রাধার আর কোন কায নাই, একা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মৃগমদের দ্বারা সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় তোমার মধুর আকৃতি লিখিতেছে, সেই মূর্ত্তি লিখিয়া তাহারই হস্তে শরের ন্যায় নূতন আম্রমুকুল সন্নিবেশিত করি-তেছে এবং সেই মূর্ত্তিরই চরণতলে একটি মকর অঙ্কিত করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে, তুমি বড় দুর্ল্লভ, সাক্ষাৎভাবে তোমাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাই ধ্যানসমাধিতে তোমার মনোহর মূর্ত্তি সম্মুখে পরিকল্পিত করিয়া সে কখনও বিলাপ করিতেছে, কখনও হাসিতেছে, কখনও বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া থাকিতেছে, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি-তেছে, কখনও বা পাগলের ন্যায় এ দিকে ও দিকে ছুটিতেছে, ভীষণ জ্বরাতুর ব্যক্তির ন্যায় তাহার শরীর হইতে দুর্বিষহ তাপ নির্গত হইতেছে, বার বার সেই মনঃকল্পিত ত্বদীয় মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া সে বলিতেছে, 'মাধব! আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যদি বিমুখ হও, তাহা হইলে সুশীতল চন্দ্রও আমাকে তাপিত করে'।"

সখী আবার বলিতেছে—

"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥
শ্বসিত-পবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিগলিতনালম্॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্॥
নয়নবিষয়মপি কিসলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিত-মরণেব নিকামম্॥"

"হে কেশব! তোমার বিরহে সেই কৃশাঙ্গী রাধা তাহার স্তনদেশে বিনিহিত উৎকৃষ্ট হারকেও নিতান্ত ভার বলিয়া বোধ করিতেছে, বিরহতাপ-শান্তির জন্য দেহে অর্পিত সরস ও মসৃণ চন্দনপঙ্ককেও সে সশঙ্কভাবে বিষের ন্যায় দেখিতেছে, তাহার নিজের শ্বাস-মারুত দীর্ঘ হইয়া যদি দেহে কোন স্থানে লাগে, তবে তাহাকেও সে দাহকর মদনাগ্নি বলিয়া বোধ করিতেছে, তোমার আগমনের আশায় অশ্রুজালাবৃত নয়নদ্বয়কে বিগলিতনাল নীলপদ্মের ন্যায় চারিদিকে প্রেরণ করিতেছে। সায়ংকালে নবোদগত স্থির চন্দ্রের ন্যায় নিজের কপোলতল সর্ব্বদাই তাহার করতলে বিন্যস্ত আছে, শয়নের জন্য বিরচিত কিসলয়শয্যা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে সে তাহাকে হুতাশনের মূর্ত্তি বলিয়া গণনা করিতেছে। বিরহে আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, মরণ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ভাবিয়া সর্ব্বদাই জন্মান্তরে পুনর্মিলনের কামনা করিয়া সে কেবলই হরি হরি এই মন্ত্র জপ করিতেছে।"

এই চিত্রে রাধার বিরহ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ বিরহে রাধা সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতিক্ষণে তাঁহার মিলনের আশায় উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে তাঁহারই স্মৃতি-রচিত মনোহর মূর্ত্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে দ্বেষ নাই, অভিমান নাই, আত্ম-সৌন্দর্য্যের গরিমা নাই, আছে কেবল নিজের দৈন্য, বিষাদ, উৎসুকতা ও ব্যাকুলতা। অলৌকিক দেবভাবের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, লোকসিদ্ধ সরল প্রেমের ইহা একখানি নিখুঁত চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

নিত্যানন্দ

বিল্-বাপীতে বন্-বিপিনে ফুল যে হাসে সন্ধ্যা-প্রাতে,
তারি মাঝেই একটি কোণে সেই হাসিটি নিত্য ভাতে।
নীল আকাশের উঠান-ভরা রোজ রাতে যে জ্বলে তারা,
তারি মাঝেই কোথায় ঝলে সেই নয়নের আলোক-ধারা।

পাখীর গানে শিশুর কথায় নিখিল জনের কোলাহলে,
কণ্ঠ তাহার কোন্ সুরে বা কি কথাটি নিত্য বলে।
মধুর মলয় মাঘের বাতাস বকুল কভু গোলাপ বাসে
অদূর হ'তে ধীর ও দ্রুত ভেসে' ভেসে' এই যে আসে,

এরি মাঝেই মিশিয়ে আছে সেই সুদূরের গন্ধ সরস—
নীহার-নীরে জলদ-জলে সেই অমৃতের অঙ্গ-পরশ।

মাঠের রোদে হাটের বাটে নগর-বুকে গ্রামের ছায়ায়
নিত্য যে সব লোকের ধারা তরঙ্গিয়া চলিয়া যায়,

তারি মাঝেই কোন্ ভীড়ে বা মিশিয়া কোন্ যাত্রি-দলে
রৌদ্র-ছায়ায় পথে পথে পথিক আমার নিত্য চলে।
নদীর ঘাটে সাগর-কূলে নৌকা-জাহাজ যে সব ভীড়ে,
তারি মাঝেই মাঝি আমার ভিড়ায় তরী একটি তীরে।

মায়ের চুমায় প্রিয়ার প্রেমে সবার স্নেহে ভালবাসায়,
গভীর প্রাণের প্রণয়খানি প্রেমিক আমার ঢালিয়া যায়।
জন্ম-মরণ জীবন-জরায় দুঃখ-সুখের আলোক-ছায়ায়,
সবের মাঝে সবার মাঝে সেই আনন্দ নিত্য খেলায়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

গুরুদাস-স্মৃতি

২

গুরুদাস বাবু যখন কলেজে পড়েন, তখন বাঙ্গালা সেকেণ্ড Language ছিল, কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই বাঙ্গালা পড়িত, কেবল সংস্কৃত কলেজ, জেমোকান্দি স্কুল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহের স্কুল, প্রসন্ন বাবুর থানাকুলের স্কুল আর হরিনাভির এংগ্লো-সংস্কৃত স্কুলের ছেলেরা সংস্কৃত সেকেণ্ড Language নিত, তাদের কিন্তু এখনকার অপেক্ষা বেশী সংস্কৃত পড়িতে হইত। গুরুদাস বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, তিনি কলেজে সংস্কৃত একেবারেই পড়েন নাই, মাত্র বাঙ্গালা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতী অবস্থায় (বিশেষ বহরমপুরে) তিনি অনেক যত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, বহরমপুর কলেজে তখন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে যথেষ্ট উন্নতিও লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অনেক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখেই আওড়াইতে পারিতেন, স্ত্রীধন সম্বন্ধে যখন আইনের বই লেখেন, তখন তাঁহাকে দায়ভাগখানি খুব ভাল করিয়া পড়িতে হইয়াছিল, দায়ভাগের সংস্কৃত বড় গম্ভীর ও গাঢ়। আইনের বইএর যেমন হওয়া উচিত, দায়ভাগের সংস্কৃত ঠিক তেমনই, সে বইখানি তিনি বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীধন সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখন তাহাই আইন বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই বই লিখিবার সময় তাঁহাকে স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক চর্চ্চা করিতে হইয়াছিল, তিনি ইংরাজীওয়ালা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত শুধু বাগর্থে বিচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কোন পুথি হইতে কিছু উদ্ধৃত অংশ পাইলে তিনি সে পুথিখানি আনাইয়া উদ্ধৃত অংশ ঠিক তোলা হইয়াছে কি না; যে পুথিতে ঐ উদ্ধৃত অংশ আছে, তাহার অর্থের সহিত উদ্ধারকর্ত্তার অর্থের ঐক্য আছে কি না, এ সবগুলি দেখিতেন, এবং এরূপে দেখিতে দেখিতে স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন; সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিকের বই তিনি খুব যত্ন করিয়া ছাপাইয়াছিলেন, শুধু ছাপাইয়াছিলেন না, অর্থবোধ করিয়া টীকা-টিপ্পনীর সহিত ছাপাইয়াছিলেন। হলদে কাগজে দান করিতেন, ছেলেদের পৈতা হইলে অনেকে ঐ পুথি তাঁহার বাড়ী হইতে আনাইয়া ছেলেদের মুখস্থ করাইতেন। অনেকবার চেষ্টা হয়, য়ুনিভার্সিটী হইতে সংস্কৃত উঠাইবার জন্য; গুরুদাস বাবু আড় হইয়া পড়িয়া উঠাইতে দেন নাই। কিন্তু এখন আর তিনি নাই, এখন সংস্কৃত উঠিতে বসিয়াছে। আর না বসিবেই বা কেন? যে টোল সংস্কৃতবিদ্যার কেন্দ্র, সেই টোলেই যখন ছাত্র নাই, তখন য়ুনিভার্সিটীতে আর দুখানা বই পড়াইয়া লাভ কি? কিন্তু গুরুদাস বাবুর সংস্কৃত আর বাঙ্গালার সংস্কৃত একটু তফাৎ ছিল, গুরুদাস বাবুর সংস্কৃতের উচ্চারণ পশ্চিমাদের মত, অক্ষর দেবনাগর,—বাঙ্গালা হইবে না, বাঙ্গালার চলিত বইয়ের উপর তাঁহার বড় শ্রদ্ধা ছিল না। কেন ছিল না, জানি না, তিনি বাঙ্গালার ন্যায়শাস্ত্র অপেক্ষা হিন্দুস্থানী বেদান্ত ভালবাসিতেন, বাঙ্গালার মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, কলাপ তুলিয়া দিয়া পাণিনি চালাইতে ব্যগ্র ছিলেন, বাঙ্গালার চণ্ডী অপেক্ষা পশ্চিমা ভগবদ্গীতায় তাঁহার শ্রদ্ধা বেশী ছিল। যা হউক, তিনি সংস্কৃতের খুব পক্ষপাতী ছিলেন।

বাঙ্গালার সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার ধারণা অন্যরূপ ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়াটা যেন বাঙ্গালায় শেখান হয়, ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিব, এটা যে একটা বিষম ব্যাপার, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ভাইস-চান্সেলার হয়েন, তখন ভাইস-চান্সেলারের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, য়ুনিভার্সিটীতে বাঙ্গালাই মিডিয়াম হওয়া উচিত। এম, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, একটা বিদেশী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এটা অতি শোচনীয় ব্যাপার। কিন্তু তিনি সে দিন সাহস করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার যে বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ততদূর নাই। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা একটু ছাটিয়া ছুটিয়া ছাপাইয়াছি। অনেকে মনে করেন, যেহেতু বাঙ্গালাতে বই পাওয়া যায় না, অতএব বাঙ্গালাতে শিক্ষালাভ হইতে পারে না, গুরুদাস বাবু সে দলে ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন, বাঙ্গালা

পারিবে, তাহাতে জ্ঞানবিস্তারেরও উন্নতি হইবে, ভাষারও উন্নতি হইবে।

গুরুদাস বাবু যখন ছেলেমানুষ, তখন বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম স্কুল-বই লেখা আরম্ভ হয়, স্কুল-বই লেখাটা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের উপরেই পড়ে। তাঁহারা যে বাঙ্গালা লিখিতেন, তাহাতে পার্সী আরবী প্রভৃতি চলিত শব্দ একেবারেই থাকিত না, তাহার বদলে থাকিত দাঁতভাঙ্গা, চোয়ালভাঙ্গা নূতন তৈরী, কড়া কড়া সংস্কৃত শব্দ। ক্রমে এই ভাষার নাম হয় সাধুভাষা, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা যে বাঙ্গালা বই লিখিতেন, তাহার একটা রীতি ছিল, অনেকগুলি গুণ ছিল, বেশ অহঙ্কার ছিল, কিন্তু তাঁরা ছাড়া আর যাঁরা বই লিখিতেন, তাহাতে এই তিনটার কিছুই ছিল না। কেবল বড় বড় সংস্কৃত কথা, আবার তাঁহারা মাঝে মাঝে খুব চলতি আরবী পার্সী কথাও ব্যবহার করিতেন। রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জ্জি, রাজা রামমোহন রায়, গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যি, ঈশ্বর গুপ্ত ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের বই পড়িয়াই গুরুদাস বাবু বাঙ্গালা শিখেন, সুতরাং সংস্কৃতবহুল সাধুভাষার উপর তাঁহার বেশী শ্রদ্ধা ছিল। মাইকেল ও হেমচন্দ্রের বই তিনি খুব ভালবাসিতেন, অনেক সময় লম্বা লম্বা বক্তৃতা আওড়াইতেন। কিন্তু একখানা বড় আশ্চর্য্য বই তাঁহার খুব মুখস্থ ছিল, তিনি সময় সময় সমস্তটা আওড়াইয়া শুনাইতেন, সেই বইখানার নাম ছুচুন্দরী-বধ কাব্য। কার লেখা জানি না, অনেকে বলে, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লেখা, অনেকে বলে, সংস্কৃত কলেজের আর কোন পণ্ডিতের লেখা, উদ্দেশ্য শুধু মাইকেলের মেঘনাদ-বধকে ব্যঙ্গ করা। ছুচুন্দরী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ ছুঁচো, বইখানির এক সর্গ বই লিখা হয় নাই; কিন্তু সমস্ত সর্গটি গুরুদাস বাবু মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি মাঝে মাঝে নিজে কবিতা লিখিতেন এবং অন্যের কবিতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন।

গুরুদাস বাবু সাধুভাষা ভালবাসিলেও নিজে যখন বাঙ্গালা বই লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন কিন্তু তত কড়া সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন না, চলিত কথাই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই সংস্কৃত হইতে নেওয়া, তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম নামে একখানি বই আছে, ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের মত লেখা, ইহার ভাষাটা বেশ পরিষ্কার। শিক্ষাবিস্তার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, প্রণালীও ঐ, রীতিও ঐ, বিষয়গুলিও ঐ। তবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে এবং কোন্ পুস্তকের কি বিষয় পড়াইতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট মতভেদ ছিল। বাঙ্গালা অক্ষর যে দেবনাগরী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একখানা খুব বড় বই লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাষা কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের ভাষার মত সহজ নহে। তিনি বাঙ্গালা যে দেবনাগর হইতে আসিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁহার বিরোধী। তেকোণা অক্ষর গোল অক্ষরের অনেক আগে। অক্ষরশাস্ত্রের যতই আলোচনা অধিক হইতে লাগিল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অক্ষরের লতা অর্থাৎ chart বাহির হইতে লাগিল, ততই ও কথাটা ইতিহাসসিদ্ধ নয় প্রমাণ হইতে লাগিল, কিন্তু সার গুরুদাস শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, দেবনাগরী আদি অক্ষর, তাহা হইতে বাঙ্গালা বাহির হইয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যখন ভাইস-চান্সেলার ছিলেন, তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আদেশ বাহির হইয়াছিল, যে কেহ সংস্কৃত লইবে, তাহাকে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিতে হইবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাময় কান্নাহাটি পড়িয়া গেল, ছেলেরা শ্লেট-পেন্সিল লইয়া ছাপা দেবনাগরী বই দেখিয়া ক, খ, গ, ঘ, কুঁদিতে লাগিল, কারণ, বাঙ্গালাদেশে ত আর দেবনাগরী অক্ষর শিখাইবার গুরু মহাশয় পাওয়া যায় না, কে হাতে ধরিয়া ছেলেদের দেবনাগর অক্ষর লেখা শেখাইবে? যাহা হউক, ৫।৭ বৎসর পরে দেবনাগর অক্ষর পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট হইবার আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও-নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার পর গুরুদাস বাবু ও সারদা বাবু দু'জনে "একলিপি-বিস্তার সমিতি"তে যোগ দিলেন, সারা ভারতবর্ষে একলিপি এক অক্ষর হইবে এবং সে অক্ষর হিন্দী, এই ব্যাপারটা হিন্দুস্থান হইতেই বাহির হইয়াছিল, হিন্দুস্থানীরা খুব খুসী হইয়া গেল। গুরুদাস বাবু অনেক সময় বাঙ্গালা চিঠি দেবনাগরী অক্ষরে লিখিতেন। একলিপি-বিস্তার সমিতি এখনও জীবিত আছে, কিন্তু মুমূর্ষু-প্রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিহার, উড়িষ্যা ও রেঙ্গুণ বাহির হইয়া যাওয়ার পর বাঙ্গালায় আর দেবনাগর

সংস্কৃতই ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উঠিতে চলিল, দেবনাগর অক্ষরের আর দরকার কি? এইখানে বলিয়া রাখি, অনেকের সংস্কার, দেবনাগর অক্ষরই সংস্কৃতের আদি অক্ষর। সেটা বড় ভুল। সংস্কৃত ভাষার অনেক উন্নতি হইলে পর কলমবন্দী হইতে আরম্ভ হয়—বর্ণমালা আরম্ভ হয়, সুতরাং প্রাচীনকালে সংস্কৃত নানা বর্ণমালায় লেখা হইত, যথা—অশোক অক্ষর অথবা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসাদী প্রভৃতি, তার পর কুশান অক্ষর, তার পর গুপ্ত অক্ষর, তার পর সারদা কুটিল ও শ্রীহর্ষ অক্ষর, তার পর বাঙ্গালা, উড়িয়া, ত্রিহুতি, হিন্দী, মাড়োয়ারী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাটী, মারাট্টী, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, সিংহলী, ব্রহ্ম, শ্যাম, নেওয়ারী, তিব্বতী ইত্যাদি ইত্যাদি বহুসংখ্যক। হিন্দীর মধ্যে যেটা একটু পরিষ্কার, তার নাম দেবনাগরী, যেটা জড়ান, তার নাম কাইতি। পাহাড়ে দুই রকম হরপ চলিত আছে;—একটার নাম শাস্ত্রী হরপ, আর একটার নাম দেশী বা পাহাড়ী। শাস্ত্রী হরপে সংস্কৃত লেখা হয়। মহারাষ্ট্রদেশে দুই রকম অক্ষর চলিত আছে;—একটার নাম মোড়ী আর একটার নাম বালবোধ। বালবোধ অক্ষরে সংস্কৃত লেখা ও ছাপা হয়। সুতরাং যাঁরা মনে করেন, দেবনাগরীই সংস্কৃতের আদি অক্ষর, তাঁহাদের কথাটা ঠিক নয়।

গুরুদাস বাবু একখানি পাটীগণিত লিখিয়াছিলেন, বইখানি অল্পবিস্তর বিক্রয় হইয়াছিল। বইখানি যেরূপ পরিষ্কার এবং সরল করিয়া লেখা, অধিক বিক্রয় হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু গুরুদাস বাবু ত শিক্ষা-বিভাগের লোক ছিলেন না, তাই কেমন করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বই চালাইতে হয়, তাহা হয় ত জানিতেন না, নয় জানিয়াও করিতেন না, নয় বা করা উচিত মনে করিতেন না। কিন্তু যখন তিনি Central Text Book Committeeর প্রেসিডেন্ট হইলেন তখন সেই বই ছাপান বন্ধ করিয়া দিলেন। এই Text Book Committeeতে গুরুদাস বাবুর ক্ষমতা আমরা খুব দেখিয়াছি, তিনি ৫টার সময় কমিটীতে আসিতেন, ৭৷৷০টা ৮ পর্য্যন্ত কমিটীর কায করিতেন, একটুমাত্র বিরক্ত হইতেন না। যদিও বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিত, অন্যান্য মেম্বররা বিরক্ত বা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, গুরুদাস বাবু যাইতেন না। আরও এক কথা বলিয়া রাখি, অন্য জাতির মেম্বররা উঠিয়া যাইতেন, ব্রাহ্মণরা যাইতেন না, সারদা বাবু বলিতেন, ব্রাহ্মণদের উপোস করার ধাত, আপনারা থাকতে পারেন, আপনারা থাকুন, আমি চললুম। Central Text Book কমিটীতে একখানি বই পাশ হইলে সেই গ্রন্থকারের কতকটা অন্নসংস্থান হইত এবং অনেকের তাহাতেই চলিত, সুতরাং অনেকেরই মত ছিল, বইখানা নিতান্ত খারাপ না হইলে কমিটীর বই পাশ করা উচিত। এক জনের সে ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন, যখন ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে, তখন ভুল জিনিষ তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, মন্দ জিনিষ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তিনি অত্যন্ত কড়া করিয়া বই পরীক্ষা করিতেন। তিনি আরও বলিতেন, যাহার বই পড়াইবে, তাহার খুব একটা নাম-সম্মান থাকা চাই, "গ্যারাণ্টি অব এ নেম" চাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বই লিখিয়াছিলেন, তিনি দেশের গুরু হইবার উপযুক্ত, তাঁহার বই খুব চলিয়াছিল, তাই বলিয়া ধাপধাড়া গোপীনাথপুরের মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর বন্ধক দিয়া একখানি বই ছাপাইয়াছে, সেখানি যে চালাইতে হইবে, ইহার মানে কি? নির্ভুল ও নির্দ্দোষ সে বই ত হইতেই পারে না। কারণ, সে পণ্ডিতের লেখাপড়ার দৌড় কতটুকু। এই নিয়ে Central Text Book কমিটীতে অনেক ঝগড়া-বিবাদ হইত। গুরুদাস বাবু অনেক সময় অপক্ষপাত বিচার করিতেন, অনেক সময় দয়াপরবশ হইয়া বই পাশ করিয়া দিতেন। গুরুদাস বাবু অনেক বই পড়িতেন, কিন্তু বলিতে কি, ঐ এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ ভাল করিয়া বই পড়িতেন না, উপরোধ অনুরোধ ইত্যাদি নানা কারণে বই পাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। ৫।৬ বৎসর Text Book কমিটীর প্রেসিডেন্টগিরি করার পর লর্ড কার্জ্জনের গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, এ কমিটীগুলি Official হওয়া উচিত, অর্থাৎ Director সাহেব ইহার প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত। গুরুদাস বাবু Presidentship resign করিলেন। তাহার পর হইতেই Director সাহেব প্রেসিডেন্ট। পূর্ব্বে প্রায় কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর fellowরাই Text Book কমিটীর মেম্বর হইতেন। ডাইরেক্টর ক্রফ্‌ট অনেক সময় গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, বাঙ্গালার Text Book কমিটীর মত সম্ভ্রান্ত কমিটী খুব কম আছে। তাহার পর non-Official Chairman থাকিত। সে কমিটীর একটা মর্য্যাদা, একটা মান ছিল, এখন ওটা শিক্ষা-বিভাগের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

বহরমপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করার ২।৩ বৎসর পরেই গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েন। ফেলো হইয়া অবধি তিনি যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনেটের সমস্ত মিটিংএ উপস্থিত হইতেন এবং মিটিংএর কার্য্যে সহায়তা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যে এ বৎসর এ কমিটীর, পর বৎসর আর এক কমিটীর, তৎপরবৎসর অন্য কমিটীর মেম্বর হইয়া সিণ্ডিকেটের মেম্বর হয়েন। সিণ্ডিকেটের মেম্বর হইয়া তিনি তাঁহার কায খুব মনোযোগ দিয়া করিতেন। তখন খুব বড় বড় লোকই সিণ্ডিকেটের মেম্বর হইতেন, যথা—জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, হেন্‌রী কটন। তাঁহারা বড় বড় কথার খুব বিচার করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ বাদানুবাদ প্রায়ই হইত। সিণ্ডিকেটের যা নিত্যকর্ম্ম, তাহার ভার রেজিষ্ট্রারের উপরই ছিল। রেজিষ্ট্রার যাহা করিতেন, তাঁহারা তাহাই মঞ্জুর করিয়া দিতেন। গুরুদাস বাবু সিণ্ডিকেটে গেলে রেজিষ্ট্রার অনেক সময় তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। সুতরাং ক্রমে সিণ্ডিকেটে গুরুদাস বাবুর বেশ প্রতিপত্তি হইল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সার আশুতোষ ফেলো হইয়াই সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করেন এবং সিণ্ডিকেটের অনেক কায তিনি করিতে থাকেন। পরীক্ষক নিয়োগ করা, লোকজন নিয়োগ করা, বই ধরান, Examination moderate করা,—এগুলি আস্তে আস্তে ৮।১০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সার আশুতোষের হাতে পড়িয়া গেল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সার গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার হয়েন। এই উচ্চপদে বাঙ্গালীর নিয়োগ এই সর্ব্বপ্রথম, সুতরাং দেশে একটা খুব সোরগোল পড়িয়া গেল। গুরুদাস বাবু প্রথম ভাইস-চান্সেলার হইয়াছেন এবং লাট 'সাহেবের' পাশে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন! সেকালে লাটসাহেবের পাশে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা একটা মস্ত গৌরবের বিষয় ছিল। গুরুদাস বাবু ৩ বৎসর কাল এই কার্য্য করিয়াছিলেন, প্রথম নিয়োগ হয় ২ বৎসরের জন্য, ২ বৎসর চলিয়া গেলে তাঁহাকে আবার ২ বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হয়, কিন্তু তৃতীয় বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করেন। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোনরূপ মনোমালিন্য ইহার কারণ নহে, কেন না, গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের য়ুনিভারসিটীতে কোন কালেই কেলেঙ্কারীর অভাব নাই। কিন্তু সে যে কি, তিনি কাহাকেও বলেন নাই। লোক তাহাই সন্দেহ করে, উহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ।

সার গুরুদাসের য়ুনিভারসিটীর ক্রিয়াকলাপের কথা সিণ্ডিকেটের মিনিটে যথেষ্ট আছে, আমাদের এখানে সে সকল কথা তোলা পুনরুক্তিমাত্র। তিনি বিচারাসনে বসিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাও সকলের সুবিদিত। তিনি অপক্ষপাত বিচার করিতে খুব চেষ্টা করিতেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই এবং মোকর্দ্দমাটা তলাইয়া বুঝিবারও খুব চেষ্টা করিতেন। তবে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। তাঁহার কোন কোন রায় প্রিভি কাউন্সিল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ২।৪টা নজীর পরের নজীরে নাকচ হইয়াছে। কাযকর্ম্ম করিতে গেলেই এইরূপ হইয়া থাকে।

'সাহেবদের' সঙ্গে ব্যবহারে সার গুরুদাস অনেক সময় খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় সার গুরুদাসও গভর্ণমেণ্টের বিষ-নজরে পড়িয়াছিলেন। সেই সময়কার গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং একটু অশিষ্ট আচরণ করেন। তাহাতে গুরুদাস বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যেমন গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, আমিও তেমন His Majesty's জজেদের মধ্যে এক জন। আমি আপনার নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই এবং আপনি ডাকিয়া পাঠাইলে আমি আর আসিব না।"

কোন মিটিংএ ডাকিলে গুরুদাস বাবু নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে অন্যথা করিতেন না। মহাকালী পাঠশালার প্রাইজ বিতরণে প্রতিবারেই যাইতেন। নারিকেলডাঙ্গার স্কুলটিকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। প্রথম শ্রেণীর ছেলেদিগকে তিনি ২।৩ ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। প্রাইজ ডিষ্ট্রীবিউশানের সমস্ত ব্যবস্থা নিজে করিতেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিতেন, ভাইস-চান্সেলারের পদত্যাগ করার পর তিনি আর কখনও সিণ্ডিকেটের মেম্বর হয়েন নাই। কেহ জিদ করিলে বলিতেন, একবার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়া আর সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। 'সাহেবরা' কেহ এমন যায় না; আমারও যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রত্যেক সেনেটের মিটিংএ যাইতেন, সব বোর্ডের মিটিংএ যাইতেন,

মিটিংএ যাইতেন, আর সাধারণে যে সকল সভা-সমিতিতে ডাকিত, তাহাতেও যাইতেন। তবে পেন্সান লওয়ার পর হইতে তিনি কোন সভা-সমিতিতে আর সভাপতিত্ব করিতে রাজী হইতেন না, এমন কি, স্কুলের পারিতোষিক দানেও সভাপতিত্ব করিতেন না। অনেকে আছেন সভাপতি না হইলে সভায় যাইতে চাহেন না, সার গুরুদাসের কিন্তু তাহা ছিল না, তিনি এমনই যাইতেন। একবার জানি, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গড়পারে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছেলেদের এক সভা হয়। তর্ক হয় জাতির উৎপত্তি লইয়া, সেখানে গুরুদাস বাবু বেশ উৎসাহের সহিত সভার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কেহ কোন বই পাঠাইলে গুরুদাস বাবু স্বহস্তে তাহাকে লিখিতেন,—"আপনার প্রদত্ত উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম" এবং ২।৪টি কথা বলিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি সকল প্রকার সভা-সমিতিতে যাইতেন বলিয়া "বঙ্গবাসী" তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, "গুরুদাস বাবু আলু তরকারী, ঝোলেও চলেন, ঝালেও চলেন, চর্চ্চড়িতেও চলেন।" "বঙ্গবাসীর" ঠাট্টা করাটা ভাল হয় নাই, তাঁহার মত পরম পণ্ডিত ব্যক্তির সভায় গেলে যে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেটা তাঁহার একটা প্রধান গুণ বলিয়া আমরা মনে করি।

সার গুরুদাস যখন য়ুনিভারসিটি কমিশনের মেম্বর ছিলেন, তখন তিনি একাই সকলের রিপোর্টের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বিশেষ দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বেশী পরিমাণে ওকালতী করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কথা খুব আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেবারকার "ডিসেণ্ট" পড়িয়া ভারতবর্ষের লোক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

গুরুদাস বাবু উকীল অবস্থায় এবং জজ অবস্থায় অনেক দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের ফি দিতেন, তাহাতে তাঁহার বেশ দু'পয়সা খরচ হইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অত্যাচার-পীড়িত যুবকদের তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পেন্সন লওয়ার পর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হাত কিছু খাট করিতে হইয়াছিল।

গুরুদাস বাবু যদিও 'সাহেবদের' সঙ্গে অনেক ঝগড়া তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, জার্ম্মাণ যুদ্ধে ইংরাজের মঙ্গলকামনা করিয়া কালীঘাটে যে প্রকাণ্ড যজ্ঞের আয়োজন করা হয়, তাহাতে সার গুরুদাস খুব আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন এবং যত দিন যুদ্ধ ছিল, প্রতি সপ্তাহে কালীঘাটে পূজা দিয়াছেন শুনা যায়।

ছেলেদের জন্য বাপের যা কিছু করা উচিত, গুরুদাস বাবু তাঁহার ছেলেদের জন্য সে সব করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদের লেখাপড়া দেখিতেন এবং পড়াইতেন, ভাল ঘরে সকলের বিবাহ দিয়াছেন, সকলেরই একটি একটি স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া দিয়াছেন এবং বিষয় আশয় যা ছিল, নিজে থাকিতেই ছেলেদের ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যত দিন ছিলেন, ছেলেদিগকে নিজের বাড়ীতে একান্নভুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার পর কি হইয়াছে জানি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার গুরুদাসের গাছপালা এবং বাগান করার খুব সখ ছিল। তিনি কাঁচড়াপাড়ার ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে রাস্তার ধারের উপর এক লপ্তে ৭০ বিঘা জমী লইয়া চাষবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র উপেন বাবু প্রথম প্রথম প্রতি রবিবারেই সেখানে যাইতেন ও সমস্ত দিন থাকিতেন, অনেক পয়সা খরচ করিয়া কাঁটা তার দিয়া সমস্ত জমা ঘেরাইয়াছিলেন এবং য়ুরোপীয় প্রণালীতে চাষ-বাসের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২।৩ বৎসরের পর তিনি সে সমস্ত জায়গা জমা এক সিণ্ডিকেটের হস্তে সমর্পণ করেন, কতকগুলি যুবক তাঁহার সাহায্যে স্বত্ববান হইয়া সেখানে কিছুদিন চাষবাস করে। কাঁচড়াপাড়া অনেক দূর, নিজে দেখিতে পারেন না বলিয়া সেখানকার চাষবাস ভাল হইল না, গুরুদাস বাবুর ইহা ধারণা হইয়াছিল, তাই তিনি আবার বিড়িভি ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে ২০ বিঘা জমী লইয়া বাগান করিতে আরম্ভ করেন। বিড়িভি কলিকাতা হইতে ৭।৮ মাইল, তিনি নিজেই সেখানে যাইতেন, জমা লইতে তাঁহাকে বেশ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারণ, বাঙ্গালার জমীর প্রত্যেক ইঞ্চি জমীতেই নানা রকম স্বত্ব আছে ও নানা রকম বিবাদের বীজ আছে, তিনি সে বাগানটির ভার শেষ এক নাতির উপর দেন। বাগান হইতে টাট্‌কা তরকারী পাইলেই গুরুদাস বাবু খুব খুসী হইতেন, সুতরাং তাঁহাকে খুসী করিতে তাঁহার

প্রথমেই বলিয়াছি, গুরুদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সেটা বিষম দোটানার সময়। গুরুদাস বাবুর টান হিন্দুয়ানীর দিকে বেশী ছিল এবং তিনি মোটামুটী হিন্দুয়ানী ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ কালে দেশে হিন্দুয়ানীর দিকের টানটা খুব কমিয়া গিয়াছিল। তথাপি গুরুদাস বাবু নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন; এই ঘোর বিপ্লবের সময় সমুদ্রের বাতি-ঘরের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়াই হিন্দুরা দিগ্‌নির্ণয় করিয়া লইত, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিত। তিনি কিন্তু বোধ হয় যেন একটু টলিয়াছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে তিনি যেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, একতায় সকল সময় তাহা রাখিতে পারিতেন না, সময় সময় বলিয়া ফেলিতেন, জাতি জিনিসটা না থাকিলেই ভাল হইত। বোধ হয় যেন কতকটা ইংরাজী স্রোতে তিনি গা ভাসান দিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বাড়ীতে একটা বিদায় আসে, সে বিদায় তাঁহার মা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না, বোধ হয় করেন নাই। আশু বাবু যখন আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দেন, তখনও গুরুদাস বাবু বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আশু বাবু এক দিন নিজে আসিয়াছিলেন, এক দিন য়ুনিভারসিটীর রেজিষ্ট্রার ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছিলেন, তখন গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন—ছেলেদের ত হিন্দুয়ানী গেছে, মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি আছে, সে বন্ধন শিথিল হইতে দিলে হিন্দুয়ানী ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজায় তিনি আশু বাবুকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে ছেলেদের বলিয়া গিয়াছিলেন—আমার শ্রাদ্ধে তোমরা যদি আশু বাবুকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইতে না পার, তবে আমার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে না। ইহাতে আমরা সার গুরুদাসের দোষ দিই না। কারণ, তিনি যেরূপ ভীষণ দোটানায় সারা জীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং যে ভাবে হিন্দুয়ানী সম্যক্সুসম্বদ্ধরূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আহারে গুরুদাস বাবু অতি মিতাচারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় শিথিল হয় নাই, এ জন্য অনেকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, আপনি কি খাইয়া থাকেন। তিনি বলিতেন,—হিন্দুয়ানীতে যে সব জিনিসের বিধি আছে, আমি সে সব জিনিসই খাই, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে। সে কত অল্প, অন্য লোকের ধারণা হয় না। এক বার জানি, তিনি চারটি করিয়া আঙ্গুর খাইয়া ২ দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি খুব বৃদ্ধ হয়েন নাই, তখনও তিনি হজিয়তী করেন। মাছ মাংসে তাঁহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু বৃথা মাংস খাইতেন না, কালীঘাটের মাংস পাইলে আপত্তি ছিল না, কিন্তু খাইতেন অতি অল্প। খাওয়ার বাধাবাধি থাকাতেই যে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেক বয়স পর্য্যন্ত তিনি সপ্তাহে এক দিন হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন, তাঁহার বাড়ী হইতে গঙ্গা প্রায় ৪ মাইল তফাৎ। সে জন্য বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তিনি গঙ্গাতীরে ছোট্ট একটি বাড়ী করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরের উপর সে বাড়ীতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুয়ানীতে তাঁহার খুব বিশ্বাস ছিল। হিন্দুদের সংস্কার, গঙ্গাযাত্রা করিয়া সে রোগী যদি বাড়ী ফিরিয়া আসে, সে বাড়ীর অমঙ্গল হয়। প্রত্যেক গ্রামেই লোক এইরূপ ২।১টি বাড়ী দেখাইয়া দেয় এবং বলে, ইহার পিতামহী গঙ্গাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সে জন্য ইহারা উচ্ছন্ন গিয়াছে। সে জন্য গুরুদাস বাবু গঙ্গাযাত্রা করেন নাই, বাগবাজারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সে বাড়ীতে তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই গীতা, চণ্ডী ভাগবত পাঠ হইত। কেহ গেলে গুরুদাস তাঁহার সহিত বেশ গল্প-গুজব করিতেন। শুনিয়াছি, তিনি মৃত্যুর দিন পেন্সনের বিলখানি সই করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নারীত্বের মুক্তি

দাদা আমাদের দিগ্‌গজ পণ্ডিত, তালেবর সাহিত্যিক, ইস্তক "পাখী সব করে রব" হইতে নাগাইত ইবসেন তুর্গেনিভ পর্য্যন্ত সাহিত্যের চুনোপুঁটি রুই-কাতলা দাদার সাহিত্যিক বেড়াজালে কিছু বাদ পড়ে না। দাদা এখন সাহিত্যের দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়াছেন। আরও একটু গুছাইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, দাদা আমাদের সাহিত্যরসে ডুবুডুবু সাহিত্যিক মোরব্বা।

এক দিন বাদল বেলায় ঝুপঝুপে জল-কাদায় আলো-আঁধারে আমরা কয় জন মেসের বাবু ঝরঝরে জানালার পার্শ্বে বসিয়া চালকলাই ও চীনার বাদামের সদ্ব্যবহার করিতেছি, খোসগল্পের আলাপচারিতে আষাঢ়ের মামুলী মান বজায় হইতেছে,—এমন সময় বিপিন ভায়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা দাদা, তোমরা গপ্পো লেখ কি ক'রে বল ত। আমরা ত এত চেষ্টা করেও ২।৪ ছত্তরের বেশী এগুতে পারি নি—সব গুলিয়ে যায়।"

দাদা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অভ্যাস চাই, ভাই, অভ্যাস চাই। কত সাকরিদি ক'রে, কত কাগজ ছিঁড়ে তবে গপ্পো লিখতে শিখেছি, জানিস?"

বিপিন বলিল, "অভ্যাস ত আমরাও করি, কিন্তু কি আশ্চর্য্যি, প্লট ঠিক কল্লুম, ত ভাষা যোগাল না, ভাষা এল ত প্লট জমল না। এর কি ওষুধ বাতলে দাও দিকি—না হয় সাকরিদিই করি দিনকতক।"

দাদা বলিলেন, "কেন, এর আর শক্ত কি? বিশেষ আজকাল। এখনকার কালে ত আর ভাষারও দরকার নেই, সংস্কিড়িমিড়িও চাই নি—ব্যাকরণ ত গাধায় পড়ে আজকাল। সাফ চল্‌তি কথায় যা মনে আসবে, লিখে যাও—সব ন্যাচারাল হবে; ঐটেই হ'ল আর্ট।"

রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তা যেন বুঝলুম, কিন্তু প্লট?"

দাদা 'হে হে' হাসিয়া বলিলেন, "প্লটের আবার ভাবনা? দেখ, এক কায করবি। যাকে হীরো করবি, তাকে সাজাবি একটা সরল সাদাসিধে লোক—যার মানে বোকা। তাকে

বিনোদ ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

দাদা বলিলেন, "আরে শোন না বলি। তোর হীরোটা হবে যেন ন্যাকা, একবারে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না, মেয়েমানুষ যেন তাকে আঙ্গুলে ক'রে ঘুরুতে পারে। আর হীরোইনটা যেন হবে ডাকাবুকো, তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরুন চাই। জগতে সে জানবে না, এমন জিনিষ নেই—তা বেদান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে কথামালা পর্য্যন্ত সব।"

সকলে বিস্মিত হইয়া বলিল, "সব?"

দাদা বলিলেন, "হাঁ, সব। আর তা ছাড়া বিলিতি 'সফ্রেজিষ্ট' অথবা মার্কিনি 'কাষ্ট সেটরা'ও যা এখনও ভেবে উঠতে পারি নি, তাও সে জানবে,—হলোই বা বাঙ্গালী হিঁদুর মেয়ে! কথায় কথায় তার নারীত্বের অভিমান নাক ফুলিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে উঠবে। কেবল তাই নয়, সে কড়ায় গণ্ডায় পুরুষের কাছে তার দেনা-পাওনা চুকিয়ে নেবে।"

বিপিন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "তা হ'লে আমাদের গেরোস্তোর ঘরে যে সব মেয়েমানুষ রাঁধাবাড়া নিয়ে আছে—স্বামীকে দশটায় আফিসের ভাত দেয়, আঁচলের ডগায় ছেলে-মেয়ের নাকের ময়লা মুছিয়ে দেয়—"

দাদা হাত নাড়িয়া বলিলেন,—"আরে রাম! রাম! একবারে মাটী! একবারে মাটী! তা ব'লে কি একবারে সংসার দেখবে না, কেবল পুরুষের সঙ্গে কোমর বেঁধে লেপা-পড়ার লড়াই, অধিকারের লড়াই করবে? না, তা না, তা হ'লে যে বিলিতি বা মার্কিণি আমদানী ব'লে লোকে ধ'রে ফেলবে রে বোকা!"

বিনোদ বলিল, "তবে কি রকম হবে?"

দাদা বলিলেন, "এই ধর না কেন, বেশ সেজে গুজে থাকবে, চাকরকে হুকুম দেবে চা আনতে, জলখাবারের রেকাবী আনতে, আর নিজের হাতে এগিয়ে দিয়ে হীরোর সামনে ব'সে খাওয়াবে,—হাতে ক'রে পানের ডিবে ত এগিয়ে দেওয়া চাই-ই। বাড়ীর লোকের সামনে না হোক,

ভাল হয়। নেহাৎ নাইবার সময় না হয়, তা হ'লে এমন ভাবে কাপড়-চোপড় পরবে বা কথা কবে—যাক্ গে, এটা জেনে রাখিস, যেন কখ্খোনো সেকেলে পতি-ভক্তির আমদানী করিস নি।"

বিপিন বলিল, "বল কি দাদা, সতীত্ব—"

দাদা মুখ বিকৃত করিয়া নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "থুঃ থুঃ! যা ভাবলুম, তাই? সেই বোটকা বিশ্রী গন্ধটা সের করলি? খবরদার, খবরদার! ও নামটা মুখে আনিস নি—আনলিই প্লট একদম মাটী। দেখবি একটা নমুনো? ঐ ডেস্কোর মধ্যে রয়েছে, বিনোদ নিয়ে আয় ত।"

দাদার ম্যানাস্ক্রিপ্ট আনীত হইল; দাদা নিজেই পাঠ করিতে লাগিলেন, সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল :—

নীলার নারীত্ব

১

উপচে পড়া রাতের স্তব্ধতাকে আঘাত ক'রে আগুনভরা চোখে নলিন উঠলো গর্জ্জে,—"এই, ওঠ বলচি এখনই। লজ্জা করল না থাক্‌তে শুয়ে আমার সাড়া পেয়ে?"

নীলা বসল' উঠে ধড়মড়িয়ে শিথিল আঁচল টেনে। আহা! ঘুম-হারা তার চোখের পাতায় তখনও রাতের ম্লানিমা কাঁপচে।

বাইরের জোছনা জানলা গলিয়ে দিয়েছিল ফেলে তার এক ফালি সাজান ঘরের মেঝেটিতে। সেই ফালি-ধোওয়া মুখখানি তার দেখাচ্ছিল যেন সদ্যস্ফুট একটি গন্ধরাজের পাঁপড়ি! স্নিগ্ধ চোখে কি তরল স্নেহ মাখা! দেখলেই তারে ইচ্ছে করে কাছে টেনে বুকের মাঝে নিবিড় স্পর্শে ঠোঁটের কোণে হাসির ফালিটি তুলতে জাগিয়ে।

কঠোর কিন্তু স্বামীটি তার। পরের মনে জাগুক যে বাসনা ইচ্ছে দেখে তার পত্নীকে, মনটা তার কিন্তু ভিজলো না একটুও চাঁদের আলোয় এলিয়ে পড়া নীলার দেহ দেখে।

মুষড়ে পড়া মুখখানি তার সামলে নিয়ে ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসি টেনে বল্লে নীলা, "রাগ হয়েছে কেন, দেবে কি শোনবার অধিকারটুকু?"

নলিনের অন্তরের পশুত্বটা উঠল হয়ে উল্লসিত। সে ব'লে নেই কারও। বলি, আজ বারীণের সঙ্গে থিয়েটার যাওয়া হয়েছিল, অনুমতি নিয়ে কার?"

দুর্জ্জয় দুর্দ্দান্ত ক্ষুব্ধ অভিমানে ভ'রে উঠলো নারীর হৃদয়টা। ছিঃ ছিঃ, এত নীচ! এত ক্রুর! ভারী গলায় বললে সে,—"ওগো চেঁচিও না তুমি, গেছলুম বারীণ ঠাকুরপোর সঙ্গে, আর সঙ্গে ছিল টুনী আর টুনীর জা।"

বিকৃত ক'রে মুখখানা ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করলে নলিন, "কোন্ কেলে ঠাকুরপো সে বারীণ? র‍্যাস্কেল সেটা!"

কি তীব্র জ্বলন্ত কশাঘাত! মূর্খ স্বামী! ঐ কোমল নধর বুকখানিতে লুকিয়ে রয়েচে দেওরের প্রতি কি মমতা, তা ত দেখলে না খুঁজে তুমি! হ'লই বা সেই বারীণ ছোঁড়াটা পাড়ার সুবাদে তোমার ভাই, হ'লই বা টুনী তার বোন,—তা হ'লেও তাদের মধ্যে রয়েচে যে একটা নিবিড় স্পর্শ—যার মধ্যে দিয়েই তারা নিঃশেষ করতে চায় তাদের অন্তরের সমস্ত গোপনতাটুকু! আহা, এর পরে ডাকবে এসে যখন সে খিলখিল ক'রে হেসে ঝরণার মত—'বোঠান! বোঠান!' তখন আর কি উছলে উঠবে তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে খুসী? হায় মনে হ'ল তার, নারী এই হিন্দুর ঘরে কতখানি অসহায় দুর্ব্বল!

বল্‌লে সে তবুও ভাঙ্গা গলায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে, "ওগো, কেন মিথ্যে সন্দেহ করচো? জান না কি আছে আমার একটা বড় জিনিষ, যা তোমাদের সতীত্ব থেকেও বড় অনেক—সেটা আমার নারীত্ব?"

উঠলো ক্ষেপে নলিন ক্ষেপা একটা কুকুরের মত। পশুর মত বল্‌লে, কর্কশ নীরস কণ্ঠে, "হুঁ, তুমি ত পণ্ডিত মস্ত, পাশ করেছ কটা জলপানি নিয়ে। পুরুষের সঙ্গে তর্ক চালিয়ে শুনিয়ে দেবে পাঁচ কথা, তা ত জানি। কিন্তু দেওর কবি, বোঠান কবি,—এই দুই কবির ছড়া কাটাকাটি গোপনে চলচে ক'দিন হ'তে, পুরুষের আছে কি না তা জানবার অধিকার শুনি।"

নীলা একেবারে কাঠ। তার নিষ্পাপ তেজস্বী মনটি উঠলো ফুলে বাণবিদ্ধ আহত নারীমর্য্যাদায়। তখনই তার নারীমর্য্যাদা তুলত ফণা দলিতা ফণিনীর মত, কিন্তু আঘাতের পর আর এক আঘাত দিলে না তাকে ফণা তোলবার অধিকারের অবসরটুকু। সেকেলে নলিন দিলে না

"পরশু রাতে হচ্ছিল যে সব কাব্যি কাড়াকাড়ি বাড়ীর ছাতের চাঁদনীর আলোয়, ভাব কি তুমি ধূলো দিয়ে চোখে সবার, যাবে এড়িয়ে বোঠান-দেওরের সে সব কাব্যিখেলা ?"

আর মানলে না বাধা তার নারীত্ব এই পুরুষ-পশুর অত্যাচারের পীড়ন ! দৃপ্তা সিংহীর মত গর্জ্জে উঠলো তার নারীত্ব—সতীত্বের এই পাষাণ-চাপে। ভেসে উঠলো আকাশে বাতাসে তার মুক্তির স্বপ্ন নারীত্বের। ভেঙে ফেলো এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন সতীত্বের! অন্তঃপুরের বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপাতে লাগলো তার লজ্জা-নম্র শান্ত সুন্দর কবিতামাখা প্রাণখানি—খোলা হাওয়ার খোলা আলোকের অনন্ত বিশ্ব ডাকতে লাগলো হাতছানি দিয়ে তাকে 'আয় আয় !' বদ্ধ হাওয়ার তিক্ত বিরক্ত বিকট গন্ধ প'ড়ে রইলো তার পশ্চাতে—সামনে তার নাচতে লাগলো বিশাল বাইরের বেদনাহীন বাধাহীন অনন্ত পুলক ঘাটে মাঠে গাছে গাছে। গর্জ্জে উঠলো সে অমনই,—"কী ! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ! নাও তুমি সব কেড়ে আমার—পত্নীত্ব, গৃহিনীত্ব, সতীত্ব—এ মুখে শুনবে না একটি কথা। কিন্তু নারীত্ব ! উঃ, আঁচড়টি লাগলে তার গায়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে সমস্ত মনটা।"

দাঁড়াল না নীলা আর একটি মুহূর্ত্ত—বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে যেন ঝড়ের মত। আর নারীত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পশুত্ব প'ড়ে লুটুতে লাগলো সেই বদ্ধ ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় কালীঘাটে বলির পশুর মত !

২

নেমে আসছিল শান্ত ধরণীর বুকে ঝরণার মত চাঁদের আলো। ভাবছিল ব'সে একা বারীণ ফুলবাগানে তাদের, আকাশ-পাতাল কত কথা। গেছে কত মুহূর্ত্তই কেটে তার সঙ্গে! তার অরুণ তনু ঘিরে নবীন যৌবনের তরল খেলা, তার লজ্জা-নম্র কোমল কণ্ঠের 'ঠাকুরপো' সম্ভাষণ, তার অন্তঃস্পর্শী কালো চোখ দুটির মিনতির আহ্বান, কুচুনো কোটার তালে তালে তার হাতের চুড়ির মিষ্টি সুরে গান, তার ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির তান! আহা হা! রত্ন পেয়েও চিনলে না তার গৌরগোবিন্দ দাদা !

ভেতর দিয়ে উঠচে ফুটে যেন ব্যর্থতার বেদনার একটা সজীব চেহারা! মনে হচ্ছে যেন পড়েচে তার আলোকময় প্রাণে একটা কালছায়া। এ কি বিবাহিত জীবনের সঙ্গে অহরহ দ্বন্দ্ব ক'রে মুষড়ে পড়ার জীবন্ত ছবি? তার ঠোঁটের কোণের হাল্কা হাসি এখন যেন হাসি নয়—সেটা যেন বেদনার একটা দীপ্ত প্রকাশ। আহা হা! তার স্নিগ্ধ দুটি চোখে কি তরল স্নেহ মাখা! দেখলেই ইচ্ছে করে কাছে টেনে বুকে ক'রে মুচিয়ে দিই তার বেদনার নিবিড় স্পর্শ!

বারীণের ভাবনা উঠলো বেড়ে—সেই জোছনা রাতের মিঠে হাওয়ায়। আহা! বাসন্তী পূর্ণিমায় জোছনা হাওয়া ফুটিয়ে তুলেচে কি সন্ধ্যা-মালতী! মরি! মরি! এ সময়ে যদি থাকতো সে কাছে!

পৌঁছুতেই এ ভাবটা বারীণের মনের ডগায়, মনে-ভাসা সে যেন এসে তাতে চাঁপার কলির মত আঙুলের ঘা দিয়ে দিলে সাড়া। এ কি! এ যে নীলার উপচে পড়া অগোছাল চুলের মধ্য দিয়ে সত্যি সত্যিই দেখা যাচ্ছে তার ম্লান মুখের একটি পাশ! সফল করলেন কি পরম দয়াল দীন বারীণের স্বপ্নের খেয়াল? কি সুন্দর! কি মহান্! কি পবিত্র! ব্যর্থতার বেদনায় মুখখানি তার থাকলেও ভরা বারীণ ঠাকুরপোকে দেখে তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে খুসী পড়ল উছলে। তাড়াতাড়ি তার হাত দুটো ধ'রে নীলা ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় ব'লে যেতে লাগলো ঝড়ের মতো, "ঠাকুরপো! এ চাঁদনি রাতের আনন্দ আজ বাজচে আমার লাঞ্ছিত যৌবনে বড় মর্ম্মান্তিক ভাবে। সইবো কি চিরদিন লাঞ্ছনা অপমান? না, অনেক কিছু দাঁড়িয়েচে তার অন্তরায় হয়ে। নারীত্ব আমার মাথা কাড়া দিয়েছে আজ। বুকে তোলপাড় করচে এসে অনেক কথা। ঘরের কোণে পুঁটুলী সেজে ব'সে থেকে বুঝতে পারিনি এত দিন এই খোলা পৃথিবীর কাছ থেকে আমি কতটুকু কি পেতে পারি। মুক্ত আজ আমি—আজ ঘরের কোণের সঙ্গে সব দাবীদাওয়া—দেনাপাওনা—হিসেব-নিকেশ সব শেষ ক'রে চাই ফেলতে। পৃথিবীর সেই বদ্ধ ঘরের সকল বন্ধন কেটে যেতে চাই আমি খেয়াঘাটে। আমি বাইরের আলোবাতাস চাই পেতে। পাওয়ার মাঝে দরকার যে কতখানি ত্যাগস্বীকার, বুঝতে পারিনি আগে

সুরু হ'ল অগ্ন্যুৎপাত আগ্নেয়-গিরি চৌচির হয়ে। একটা উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের আচমকা ঝাপটা খেয়ে শিউরে উঠলো পাশের আমগাছের পাতা কটা। ডেকে গেল বিকট রবে গাছ থেকে একটা কালপেঁচা। বারীণ পারল না থাকতে আর চুপ ক'রে—দারুণ উত্তেজনায় বুকখানি দুলিয়ে দ্বিধাহীন বাধাহীন সরস কণ্ঠে সে ফেল্লে ডেকে,—"বোঠান! বোঠান!" বলেই সে অমনি বাড়িয়ে দিয়ে হাত দু'খানা অনুভব করাল তার অঙ্গে তাদের নিবিড় স্পর্শ!

নীলার চোখে উঠলো ক'রে টলমল একটা আনন্দভরা বেদনা প্রভাতের শিশিরের মতো। সুরু হ'ল তার উচ্ছ্বসিত যৌবনের তরল রক্ত-কণিকার ভেতর দিয়ে ঢেউয়ের মাতন। সে পড়ল লুটিয়ে তার গায়ে ঝরণার মত খিলখিল ক'রে হেসে! বল্লে, "ওঃ, বাইরের মুক্তি! এস, এস, তোমায় তুলে নি আঁকড়ে বুকে ক'রে। মুক্তির ডাকে দিয়েচে আজ সাড়া আমার দুর্জ্জয় মন—বাহির ডাকচে আমাকে। কুৎসিত পঙ্গু সমাজের বীভৎস বন্ধন ভেঙে নেমে আসছে আজ আমার মনে ভাঙনের প্রলয়। পুরুষের কৃপার দুয়ারে ব'সে চিরদিন কি কুড়াবে লাঞ্ছনা আর অপমান নারী? কেঁপে উঠচে মন ভেবে এ অত্যাচারের একটা বীভৎস নির্ম্মম ভীষণতা। আজ আমি বেরিয়েছি ছুটে ছিটকে পড়া উল্কার মত লক্ষ্যহীন ক্ষিপ্রতায়।"

মুছিয়ে দিয়ে নিবিড় স্পর্শে বারীণ তার ব্যর্থতার বেদনা বল্লে, "লক্ষ্যহীন কেন, নীলা? অন্দরের বদ্ধ কোণ ছাড়া আরও অনেক মহৎ লক্ষ্য আছে নারীত্বের, জেনে রাখ, নীলা। রয়েছে প'ড়ে সামনে তোমার বাধাবন্ধন-ভয়-লজ্জাহারা অনন্ত উন্মুক্ত জীবন। এই দেখ, গুঞ্জরিত হচ্চে এই বিশাল বক্ষের ভেতর মুক্তিমন্ত্রের জয়গান। উন্মুখ আকুলতায় বলচে প্রাণটা,—ওরে তুলে নে জয়যাত্রার পথিক! ভেসে আসচে যা বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ছলাৎ ছলাৎ ক'রে।"

সামলে নিয়ে বাইরেটাকে তার বল্লে নীলা ফুলতে ফুলতে রাগে নারীত্বের, "বাইরের হাওয়ায় বেরিয়ে প'ড়ে বুঝচি আজ ভাল ক'রে, ফুটতে পায় না পূর্ণতাটুকু নারীত্বের, ব্যর্থতায় মধ্য দিয়ে সতীত্বের। সে ব্যর্থতার নিবিড় চাপে হয়েছিল সীতার পাতাল প্রবেশ, হয়েছিল দময়ন্তীর স্বয়ম্বর দ্বিতীয়বার। হয়েছিল সেটা তাদের জীবনের মস্ত ভুল। দিত উত্তর যদি সীতা পরিহার ক'রে সতীত্বের আড়ষ্টতা, হ'ত না খর্ব্ব তা হ'লে নারীত্বের মান খামখেয়ালের কাছে স্বেচ্ছাচারী রাজা রামের।"

লুফে নিয়ে নীলার দৃপ্তা নারীত্বের ওজস্বিনী বাণী, ব'লে ফেল্লে হেসে খিলখিল করে ঠাকুরপো বারীণ, "এই ত নারীত্ব! এই ত ন্যাচারাল! নারী কি থাকবে চিরদিন বেড়ায় ঘেরা চেলীর পুঁটুলী? কি হোলো ফল, তা হ'লে শিক্ষার দানের? বেরিয়ে পড়েচো গর্জ্জে নারী ঘরের কোণ থেকে ছুটে, আহত হ'ল যখন তোমার নারীত্ব-মর্য্যাদা। বেচে নাও এখন চায় যা মন তোমার। বিবাহ ত একটা মানুষের গড়া কনভেনশান! খোলা হাওয়ার মতো চায় যদি সে মন বেড়াতে উড়ে ডানা মেলে ঐ প্রজাপতিটির মতো, বাধা কেন মানবে সে? মন যদি না চায় তোমার থাকতে হয়ে বদ্ধ ছেঁড়া পচা ঐ বিবাহ ডোবায়, থাকতে যদি না চায় মনটি তোমার বদ্ধ হয়ে এই নলিনের বুভুক্ষু বাহুর নিবিড় স্পর্শে, ছুটে যাক সে বাঁধনহারা হয়ে নদীটির মতো লোক-সমুদ্রের উদ্দেশে! ছুটুক সে মন 'সন্তান' চাই ব'লে অনন্তজগতে। আসচে বিশ্বের আহ্বান তোমায় নিতে টেনে তার বিশাল বুকে… যাক টুটে সে ডাকে তোমার সমাজের বাধা, ধর্ম্মের বাধা, যত কিছু আছে অন্ধ সংস্কারের জঘন্য বাধা!"

থমকে দাঁড়িয়ে চমকে যাওয়া দৃষ্টি হেনে বললে নীলা, "সব কিছু অস্বীকার ক'রে ছুটে বেরিয়েচি আজ নিজেকে বাইরের আলোয় বাইরের বাতাসে বিলিয়ে দিতে। ঠাকুরপো!"

নিবিড় স্পর্শ নিবিড়তর ক'রে বললে বারীণ গদগদ কণ্ঠে "বোঠান!"

* * * * *

গল্পটি শেষ করিয়া দাদা আত্মপ্রসাদের বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল আননে হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন, "কি রে, কেমন হ'ল?"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাইয়া রাধানাথ বলিল, "এতখানি আছে তোমার পেটে দাদা? দাও কিছু বেঁটে এ বিদ্যে তোমার আমাদের গোবর-পোরা এই ঘটে!"

দাদা বলিলেন, "বা রে! এই ত মেরে নিলি তোরা বিদ্যে আমার গল্প লেখার!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

পতী-ঘাতিনী ফরাসী রঙ্গিনী

১

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমরা মাদাম ফামি নাম্নী ফরাসী মহিলার স্বামি-হত্যার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ জানিতে পারিয়াছিলেন, এই যুবতী লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ হোটেলে অবস্থানকালে তাহার স্বামী মিশর-রাজকুমার আলি ফামিকে গুলী মারিয়া হত্যা করিয়াছিল, এবং ইংরাজ জজ ও জুরীর বিচারে সে নিরপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। বিচারফল শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদি বিপরীত ঘটনা ঘটিত, অর্থাৎ প্রাচ্য মিশরের রাজকুমার তাঁহার ফরাসী পত্নীকে ঐ ভাবে গুলী করিয়া মারিতেন, এবং পত্নী-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে য়ুরোপীয় জজ ও জুরীর বিচারের ফল কিরূপ হইত? যাহা হউক, সে সময় এই হত্যা-রহস্যের আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। ওল্ড বেলীর উচ্চ বিচারালয়ের যে দোভাষী এই মামলার বিচারক বিচারপতি রিগবি সুইফটের এজলাসে উপস্থিত থাকিয়া অভিযুক্তা ফরাসী যুবতীকে জেরা করিয়াছিলেন, এবং এই লোমহর্ষণ হত্যা-রহস্যের সকল বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, তিনি লণ্ডনের কোন পত্রিকায় এই দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল। দোভাষী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

২

"গত বৎসর ১০ই জুলাই তারিখের রাত্রিকালে লণ্ডনে যেরূপ ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল, সেরূপ ভয়াবহ দুর্য্যোগ লণ্ডনবাসিগণের পক্ষে নূতন। সেই রাত্রিতে শ্রবণবিদারক মেঘগর্জ্জন কিছুকালের জন্য বিরত হইলে লণ্ডনের স্যাভয় হোটেলের নিম্নতলে তিন বার বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইয়া সেই বিশাল অট্টালিকার প্রতি কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল।

হোটেলের নিম্নতলের এক জন নৈশ-কর্ম্মচারী দ্রুতবেগে দালান পার হইয়া রাজকুমার ফামি ও তাঁহার পত্নীর অধিকৃত প্রকোষ্ঠসমূহের একটি প্রকোষ্ঠদ্বারে উপস্থিত হইল। সে সভয়ে দেখিল, সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারসন্নিধানে সুকোমল স্থূল গালিচার উপর একটি যুবকের প্রসারিত দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে! রাজকুমারের সুন্দরী পত্নী তাহারই পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। তাঁহার পরিহিত শুভ্র মসলিনের কয়েক স্থান তাঁহার স্বামীর হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিত। একটি ব্রাউনিং পিস্তল যুবতীর পাশে তখনও পড়িয়া ছিল।

"ইহার প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে নৈশ দ্বাররক্ষী সেটী সেই দ্বারের নিকট দিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের স্বামি-স্ত্রীকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতভাবে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে দেখিয়াছিল। তখন সেটী এই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিল যে, যে দম্পতির এত রূপ, এত ঐশ্বর্য্য, আর এরূপ নবীন বয়স, তাহারাও ক্রুদ্ধ হইয়া ঝগড়া করে! পরমেশ্বর ত তাহাদের মস্তকে মুক্ত হস্তে অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন; তবে ইহাদের কলহের কারণ কি?

"হোটেলের ম্যানেজার এই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র দৌড়াইয়া আসিলেন, এক জন ডাক্তারও কয়েক মিনিট পরে আসিয়া পড়িলেন; তিনি ভূতলশায়ী নিস্পন্দ দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'সব শেষ!'

"তিন বার পিস্তলের আওয়াজ হইয়াছিল; তিনটি গুলীর একটিও ব্যর্থ হয় নাই। প্রথম গুলী রাজকুমারের ঘাড়ে লাগিয়া কণ্ঠ ভেদ করিয়াছিল। দ্বিতীয় গুলী দক্ষিণ স্কন্ধের নীচে বিদ্ধ হইয়া, বাম বগলের নীচ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় গুলী মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিয়াছিল।

"সৈয়দ ইউনানী রাজকুমারের সেক্রেটারী হইলেও তাঁহার বহুদিনের বন্ধু। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে ডাকিয়া আনা হইল। দুর্ঘটনার কথা শুনিবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"নিহত রাজকুমারের পত্নী মেরী মার্গারেট ফামিকে

হইল। এক জন ডিটেক্‌টিভ যৎসামান্য ফরাসী ভাষা জানিতেন; তিনিই আসামীকে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইলেন, তাহা লিখিয়া লইলেন।

"এইরূপে এই বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হইল। কিন্তু এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের কারণ জানিতে হইলে পূর্ব্বকথার আলোচনা করিতে হইবে। মেরি মার্গারেটের বিচারকালে আমি যে সকল বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।"

৩

"রাজকুমারের সহিত সৈয়দ ইউনানীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়—প্যারিসে। রাজকুমার তখন আলি কামেল ফামি নামে পরিচিত ছিলেন। অতি অল্পদিনেই সৈয়দ ইউনানীর সহিত আলি কামেল ফামির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। উভয় বন্ধু স্ফূর্ত্তির আশায় প্যারিসের প্রমোদাগারসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; আমোদ-প্রমোদই তখন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য; কিন্তু তখন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ফামি তাঁহার পিতার নিকট হইতে মাসহারা পাইতেন এবং তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল।



পত্নীহস্তে নিহত মিসর-রাজকুমার আলি ফামি বে

"মণ্টমার্টারে একটি বিখ্যাত 'কাফে' আছে, তাহা 'লা আব্বে থেলিম' নামে প্রসিদ্ধ। আলি এই কাফেতে স্ফূর্ত্তি করিতে যাইতেন। তিনি তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধু সৈয়দ ইউনানীর নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন, ম্যাজি মেলরের নাচ দেখিবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারেন না। এই ম্যাজি মেলর সুরসিকা চতুরা ফরাসী নর্ত্তকী। সে 'লা আব্বে থেলিমে' সপ্তাহের অধিকাংশ দিন পানাহার করিত, এবং নৈশ মজলিসে নৃত্য করিয়া আমোদলিপ্সু যুবকদলের চিত্তরঞ্জন করিত।

"সৈয়দ ইউনানী বন্ধুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ম্যাজি মেলরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ফামি এই যুবতীর সহিত পরিচিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন, ম্যাজি মেলর অসামান্য বিলাসিনী, বিলাসলালসা-পরিতৃপ্তির জন্য সে দুই হাতে টাকা উড়ায়; তিনি পিতার নিকট যে টাকা মাসহারা পাইতেন, ততগুলি টাকা ম্যাজি মেলরের দুই দিনের ব্যয়-নির্ব্বাহের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। সুতরাং তিনি এই বিলাসিনী নর্ত্তকীর মনোরঞ্জনের আশা ত্যাগ করিয়া, দূর হইতে তাহার বন্দনা করিয়াই কৃতার্থ হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা প্রশমিত হইল না।

"কিছু দিন পরে ফামি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তিনিই পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন; তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য ৮০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ১২ কোটি টাকা) রাখিয়া গিয়াছেন। ম্যাজি মেলর সে সময় 'ডুভিলে' নামক স্থানে বাস করিতেছিল; বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া আলি ফামি তাঁহার মোসাহেব সৈয়দ ইউনানী সহ তাহার অনুসরণ করিলেন। সৈয়দ ইউনানী এই সময় আলি ফামির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

"সহসা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়ায়, আলি ফামির সকল বাধা দূর হইলেও, তিনি যে নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, সে কিছু দিন তাঁহাকে কাছে ভিড়িতে দিল না। সে তখন স্তাবকবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল; যে তরুণ অতিথি তাহার কৃপা-কটাক্ষলাভের আশায় তাহার প্রমোদ-ভবনের চারিদিকে লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার দিকে সে ফিরিয়া চাহিল না।

"আলি ফামি তখন সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া মাদাম মেলরকে জানাইলেন, তিনি পিতৃপরিত্যক্ত যে বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, তাহা দখল করিবার জন্য মিশরে যাইতেছেন; তাঁহার ইচ্ছা, মিশর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার 'হৃদয়ের রাণী'কে বিবাহ করিবেন।

"বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া মাদাম মেলরের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; আলি ফামির প্রতি তাহার ঔদাসীন্য যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইল। ম্যাজি মেলর অঙ্গীকার করিল, সে কায়রো নগরে গমন করিয়া আলি ফামিকে বিবাহ করিবে। আলি ফামি তাঁহার 'হৃদয়ের রাণী'র এই প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া মনের আনন্দে মিশরে প্রত্যাগমন করিলেন।

"কিন্তু আলি ফামির দুর্ভাগ্য, তাঁহার মিশরযাত্রার পর মাদাম মেলর স্তাবকবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া প্যারিসে ফিরিয়া আসিল, এবং সেখানে দিবারাত্রি মজা লুঠিতে লাগিল; আলি ফামির নিকট সে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইল। আলি ফামি মিশর হইতে কায়রো নগরে আসিয়া বিবাহের আশায় তাঁহার প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাদাম মেলর নির্দ্দিষ্ট সময়ে কায়রো নগরে উপস্থিত না হওয়ায় তিনি তাহাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়ের প্রণয়োচ্ছ্বাস বিফল হইল। মাদাম মেলর প্রেমিক যুবকের আশা পূর্ণ করিতে কায়রো নগরে আসিল না। অগত্যা আলি ফামির আদেশে তাঁহার সেক্রেটারী মাদাম মেলরকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল, তাহার 'বর' অত্যন্ত অসুস্থ এবং তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। এই টেলিগ্রাম পাইয়া সুন্দরী ম্যাজি মেলর বন্ধু ও উপাসকবর্গের নিকট বিদায় লইয়া ভগিনীসহ কায়রো নগরে যাত্রা করিল।

"ম্যাজি মেলর ও তাহার ভগিনী কায়রো নগরে উপস্থিত হইলে আলি ফামি তাঁহার 'হৃদয়ের রাণী'কে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিবার জন্য বহু অনুচর ও ছয়খানি মোটর-গাড়ী সঙ্গে লইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন এবং মহাসমারোহে উভয় ভগিনীকে কায়রো নগরের রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রণয়িযুগলের বিবাহে বাধা উপস্থিত হইল; মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের ও প্রচলিত আইনের বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না। আইনব্যবসায়ীরা আইনঘটিত বাধা দূর করিবার জন্য দিবারাত্রি আইন গ্রন্থগুলি ঘাঁটিতে লাগিল; মৌলভী-মোল্লার দল আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাধা খণ্ডন করিবার হদিস্ খুঁজিতে লাগিলেন। বিবাহের বিপুল আড়ম্বরে নগরবাসিগণ স্তম্ভিত হইল; সেরূপ সমারোহের ব্যাপার কায়রো নগরে কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। প্রতিদিন জলস্রোতের ন্যায় অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল।

"তথাপি বিবাহের বাধা দূর হইল না; রাজকুমারের হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহাকে আর কিছু দিন সবুর করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রাজকুমার ফামি অধীর হইয়া উঠিলেন; তিনি কয়েক দিন পরে তাঁহার প্রণয়িনীর ভগিনীকে প্যারিসে প্রেরণ করিয়া প্রণয়িনীসহ একখানি সুসজ্জিত জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজখানি প্রণয়ি-যুগলকে বক্ষে লইয়া নীল নদের সুনীল জলে ভাসিয়া চলিল। তাঁহাদের গন্তব্য স্থল লক্সার।"

৪

"জাহাজে আশ্রয়গ্রহণের পর প্রণয়িযুগলের মধ্যে স্বামি-স্ত্রীবৎ ব্যবহার আরম্ভ হইল। জাহাজের কর্ম্মচারীরা সকলেই মাদাম মেলরকে রাজ্ঞী বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার প্রধানা পরিচারিকা এবং রাজকুমারের সেক্রেটারী সৈয়দ ইউনানী তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। রাজকুমার মাদাম মেলরের বশীভূত হইয়া তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইতেছেন দেখিয়া সৈয়দ ইউনানী ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তিনি প্রণয়িযুগলের মধ্যে বিরোধ উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। মাদাম মেলর বলিয়াছিল, এই সময় হইতে তাহার সুখশান্তির অভাব হইল এবং জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

"জাহাজে কৃষ্ণকায় ভৃত্যবর্গ দ্বারা সে পরিবেষ্টিত থাকিত, তাহাদের একটি কথাও সে বুঝিতে পারিত না। তাহার প্রণয়ীর প্রভুত্ব তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তাঁহার সেক্রেটারী তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। তাহার বিরুদ্ধে যখন মামলা আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় সে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া যে জবানবন্দী দিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ, তাহার প্রণয়ী তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করিতেন এবং আরবী ভাষায় সৈয়দ ইউনানীর সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া কি পরামর্শ করিতেন। তাহাকে জাহাজে বন্দিনীর ন্যায় কালযাপন করিতে হইত। রাজকুমার আলি তাহার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতেন; এমন কি, তিনি তাহাকে কয়েক বার প্রহারও

বেগে আঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

"মাদাম মেলরের অপরাধের বিচারকালে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সার এডওয়ার্ড মার্শাল হল তাহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন; তিনি নিহত রাজকুমারের সেক্রেটারী সৈয়দ ইউনানীকে জেরা করিবার সময়, তাঁহার মক্কেলের প্রতি এই পাশবিক অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রণয়ীকে নরপশু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"আমার বিশ্বাস, হঠাৎ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আলি ফামির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল; ধনমদে মত্ত হইয়া তিনি অসঙ্কোচে যথেচ্ছাচার করিতেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার ইচ্ছা অপ্রতিহত, তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘ্যনীয়, সকলেই তাঁহার অন্যায় আদেশও নতশিরে পালন করিতে বাধ্য। মাদাম ফামি বিচারালয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিল, এবং অন্যান্য সাক্ষীরা তাহার উক্তির সমর্থন করিয়াছিল; সেই ঘটনাটি রাজকুমার ফামির যথেচ্ছাচারের উজ্জ্বল নিদর্শন।

"জাহাজ চালাইবার সময় হঠাৎ একখানি পালের নৌকা জাহাজের সম্মুখে আসিয়া পড়ায় জাহাজের গতিরোধ হইয়াছিল, এবং জাহাজখানিকে এক পাশে সরাইয়া লইতে হইয়াছিল। এই ঘটনায় রাজকুমার ফামি এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তিনি জাহাজ থামাইয়া নৌকার মাঝিকে পালন না করিলে তাহার নৌকা ডুবাইয়া দিবেন বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন। নৌকার মাঝি প্রাণভয়ে তাঁহার জাহাজে উঠিয়া আসিলে, তিনি স্বহস্তে চাবুক মারিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। আর এক দিন তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলেন, তাহাকে খুন করিবেন। মাদাম মেলর ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া, রাজকুমার ফামির দেশীয় উকীল মাষ্টরে আস্সুরের নিকট পত্র লিখিয়া এই দুর্ব্যবহারের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।



স্বামিঘাতিনী মেরী মার্গারিটা ফামি—(ম্যাজি মেলর)

"বিচারকালে এই পত্রখানি আদালতে 'দাখিল' করা হইয়াছিল; বিচারকের আদেশে আমিই ইংরাজী ভাষায় সেই পত্রের অনুবাদ করিয়াছিলাম। এই পত্রে মাদাম মেলর আলি ফামির উকীলকে লিখিয়াছিল, যদি হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে জন্য আলিকেই দায়ী করা হইবে। এগুলি বিবাহের পূর্ব্বের ঘটনা। এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনার পরও মাদাম মেলর আলি ফামিকে বিবাহ করিয়াছিল, ইহা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার!

"যাহা হউক, জাহাজে জলবিহার শেষ করিয়া প্রণয়ি-যুগল কায়রো নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। মাদাম মেলর ক্যাথলিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। আলি ফামি তাহাকে বলিয়াছিলেন, সে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন না। অগত্যা

সে পতিত্যাগের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিল, এবং তাহার স্বামী আরও তিনটি মহিলার পাণিগ্রহণ করিলে তাহার আপত্তি করিবারও উপায় ছিল না। পক্ষান্তরে, আলি ফামি দুই জন সাক্ষীর সম্মুখে তিনবার 'তোবা' করিয়া তাহাকে 'তালাক' দেওয়ার অধিকার লাভ করিলেন।

"বিবাহের চুক্তিনামা অনুসারে মাদাম ফামিকে দুইটি সর্ত্ত দেওয়া হইল। তাহার স্বামী তাহাকে 'তালাক' দিলে সে ছয় হাজার পাউণ্ড নগদ পাইবে; তাহার স্বামী তাহার য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণে আপত্তি করিতে পারিবেন না।"

৫

"বিবাহের পর নব-দম্পতির কলহ-বিবাদ এক দিনের জন্যও বন্ধ ছিল না; কাহার দোষে নিত্য তাহাদের কলহ বাধিত, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; তবে মাদাম ফামি আদালতে প্রকাশ করিয়াছিল, সৈয়দ ইউনানীর প্ররোচনায় তাহার স্বামী তাহার সহিত কলহ করিতেন; তিনি কতকগুলা কালা আদমীকে তাহার পাহারায় রাখিয়াছিলেন, তাহারা দিবা রাত্রি তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল; তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহার এক পা চলিবার উপায় ছিল না। আদালতে আর একখানি পত্র দাখিল করা হইয়াছিল; রাজকুমার সেই পত্রখানি তাঁহার পরিবারস্থ কোন লোককে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি মেরীকে প্রাচ্যের রাজান্তঃপুরের মহিলাদের মত পর্দ্দানসীন হইবার উপযুক্ত 'শিক্ষা' দিতেছেন! এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পারিবারিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

"যাহা হউক, বিবাহের কিছুকাল পরে তাঁহারা বহু নগর পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। লণ্ডনে আসিয়া রাজকুমার ফামি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, যদি সে তাঁহার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে 'তালাক' দিবেন। মুসলমানধর্ম্মের বিধান অনুসারে তাঁহার এরূপ করিবার অধিকার আছে। তাঁহাদের জীবনের দিনগুলি অদ্ভুতভাবে কাটিতে লাগিল। প্রত্যেকেই পিস্তল পাশে লইয়া শয়ন করিতেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাদাম ফামি যে পিস্তলটি কাছে রাখিত, তাহা সে তাহার তাহার ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়াছিলেন। মাদাম ফামি এ সকল কথা আদালতে প্রকাশ করিয়াছিল।

"দুর্ঘটনার দিন রাত্রিকালে আহার করিতে বসিয়া, ঝগড়া করিয়া মাদাম ফামি ভোজন-টেবল পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে একাকী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার সময় দ্বাররক্ষীকে বলিয়াছিল, 'আমি আমার স্বামীর সহিত আহার না করিয়া আগেই চলিয়া আসিলাম; সে আমাকে খুন করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।'

"আলির সেক্রেটারী সৈয়দ ইউনানীও তাঁহাদের সঙ্গে আহারে বসিয়াছিল। সে আদালতে হলফ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার মনিব তাঁহার স্ত্রীকে খুন করিবার ভয়প্রদর্শন করেন নাই। আলি আহার শেষ না করিয়াই তাঁহার পত্নীর অনুসরণ করেন। তাহার পর যে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ভীষণতা বহু দিন লণ্ডনবাসীদের স্মরণ থাকিবে।

"যাহা হউক, দম্পতিযুগলের সেই বিবাদের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় মাদাম ফামি তাহার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার গুলী করিয়াছিল। সেই তিন গুলীতেই রাজকুমার আলি ফামির ইহজীবনের অবসান হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীকে 'তালাক' দেওয়ার প্রস্তাবেরও সেইখানে 'খতম!'"

৬

"দুঃসংবাদ শুনিয়া হোটেলের ম্যানেজার দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে মাদাম ফামি ফরাসী ভাষায় বলিয়া উঠিল, 'হা পরমেশ্বর! আমি এ কি করিলাম! কি সর্ব্বনাশ করিলাম!' ম্যানেজার উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, 'কি করিয়াছেন, তাহা ত আপনি ভালই জানেন।'

"অতঃপর তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্বামি-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। লণ্ডনের দুই জন শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার সার এডওয়ার্ড মার্সাল হল এবং সার হেনরী কুর্টিস্ বনেট্ তাহার পক্ষসমর্থনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। মিঃ পার্সিভাল ক্লার্ক সরকারপক্ষে মামলা চালাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারও উভয় পক্ষের সহায়তা

"এই আদালতে বহুদিন হইতে দোভাষীর কায করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এই মামলায় দোভাষীর কায করিবার সময় আমি যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলাম, জীবনে আর কখন সেরূপ বিচলিত হই নাই। এই মামলার বিচারের সময় ওল্ড বেলীর সুপ্রশস্ত বিচারকক্ষ যেরূপ মহাসম্ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, জীবনে আর কখন কোন বিচারালয়ে সেরূপ অগণ্য সম্ভ্রান্ত দর্শকের সমাবেশ লক্ষ্য করি নাই। কোন দিকে বিন্দুমাত্র স্থান খালি ছিল না। মিঃ জষ্টিস্ রিগ্‌বী সুইফট এই অসাধারণ মামলার বিচারভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"যথানিয়মে দোভাষীর শপথ গ্রহণের পর আসামী দোষী কি নির্দ্দোষ, ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বিচারপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইলাম। সেই সময় সর্ব্বপ্রথম আমি আসামীকে প্রথম দেখিবার সুযোগ পাইলাম। মাদাম ফামির চেহারা কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব না। বিচারের পর সে আমাকে তাহার যে 'ফটো' উপহার দিয়াছিল, তাহার অনুলিপি এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল। দেখিলাম, তাহার মুখ মলিন, শোকসূচক কৃষ্ণ পরিচ্ছদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। সে স্বয়ং যাহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহারই শোকে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই।



বিচারক মিঃ জষ্টিস্ রিগ্‌বি সুইফট

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি দোষী না নির্দ্দোষ?' মাদাম ফামি অনুচ্চ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'নির্দ্দোষ!' অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল।

৭

"মিঃ পার্সিভাল ক্লার্ক সরকারপক্ষ হইতে মামলা আরম্ভ করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সংযতভাবে পরিস্ফুটরূপে সকল কথা বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, রাজকুমারের পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে গুলী করা হইয়াছিল, এবং হঠাৎ যদি কোন গুলী ব্যর্থ হয়, এই আশঙ্কায় তিনবার গুলী করা সে মিশরে বাস করিয়াছিল; ফামি বের সহিত জাহাজে জলবিহার করিয়াছিল। সে যে ভীষণ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার গুরুত্ব সে বুঝিতে পারে নাই, এ কথা বলা চলে না।

"ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী সৈয়দ ইউনানী। তিনি হলফ করিয়া জবানবন্দী দিলেন, নিহত রাজকুমার আসামীর প্রতি কোন দিন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু জেরায় তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, তাঁহার মনিব এক দিন আসামীর মুখে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন।

"স্যাভয় হোটেলের নৈশ দ্বাররক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; সে বলিল, পিস্তলের আওয়াজ শুনিবার অল্পকাল পূর্ব্বে রাজকুমার তাঁহার ঘরের দরজায় পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার পোষা ছোট কুকুরটিকে শিস্ দিয়া ডাকিতেছিলেন, ইহা সে দেখিয়াছিল, এবং শিস্ শুনিতে পাইয়াছিল।

"এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কিছুই বলিবার ছিল না; আমার কায আরম্ভ হইল,—যখন সার মার্সেল হল জলদগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিলেন, 'মেরী মার্গারিটা ফামি!'

"সেই দীর্ঘাঙ্গী, অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী তরুণী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া যখন সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিল, তখন দর্শকগণের বিস্মিত নেত্র তাহার মুখের উপর সন্নিবদ্ধ হইল, এবং বিচার-কক্ষ মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া ফরাসী ভাষায় তাহাকে শপথ পাঠ করাইলাম। তাহার পর তাহার কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সময় আসিল; যে পিস্তলে সে স্বহস্তে স্বামিহত্যা করিয়াছিল, সেই সাংঘাতিক পিস্তলটি তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সেই পিস্তলটি দেখিবামাত্র মাদাম ফামি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে, এবং তাহা লইবার সময় তাহার হাত কাঁপিবে; কিন্তু পিস্তলটি গ্রহণ করিবার সময় তাহার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না; তাহার শুভ্র ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না। মাদাম ফামি মৃণাল তুল্য

গ্রহণ করিল এবং তাহার কৌসিলীর আদেশে চোঙ খুলিয়া পিস্তলটার ব্যবহার-প্রণালী দেখাইয়া দিল। অবশেষে সে বলিল, তাহার স্বামীর কঠোর উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনে তাহার জীবন নরকতুল্য অশান্তিপূর্ণ হইয়াছিল; তাহার স্বামী পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিত। সেই ঘৃণিত ব্যবহারের বিবরণ কোন পুরুষের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে বলিয়া বিচারপতির আদেশে প্যারিসের একজন মহিলা ব্যারিষ্টার আমার পরিবর্ত্তে দোভাষীর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মাদাম ফামির উক্তি তিনিই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।"

৮

"মাদাম ফামি তাহার পৈশাচিক নির্য্যাতন-কাহিনী শেষ করিয়া অবশেষে হত্যাকাণ্ডের আনুষঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করিল। সে বলিল, 'সেই রাত্রির ভীষণ দুর্যোগে ও মুহুর্মুহুঃ শ্রবণ-বিদারক বজ্রনাদে তাহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল, তাহার পর 'ডিনার টেবলে' বসিয়া তাহার স্বামী তাহাকে হত্যা করিবার ভয়প্রদর্শন করিলে সে প্রাণভয়ে তাহার ঘরে পলায়ন করিল। তাহার ধারণা হইল, তাহার স্বামী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিবে।

"মাদাম ফামি তাহার স্বামী কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় শয্যাপ্রান্তস্থিত টেবল হইতে পিস্তলটি তুলিয়া লইল, এবং জানালার দিকে তাহা প্রসারিত করিয়া 'ঘোড়া' টানিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর শব্দে গুলী বাহির হইয়া গেল; তখন সে জানিতে পারিল, পিস্তলে টোটা ছিল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাদাম ফামি আত্মসমর্থনের জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিল, সে জানিত না যে, ব্রাউনিং পিস্তলের টোটা আপনা হইতেই পুনর্ব্বার যথাস্থানে আসিয়া পড়ে; সুতরাং একবার গুলী চলিবার পর তাহার ধারণা হইয়াছিল, পিস্তল খালি, তাহার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তাহার সাহায্যে তাহার স্বামীকে ভয়প্রদর্শনে কোন বাধা থাকিতে পারে, ইহা তাহার বোধগম্য হয় নাই।

"যাহা হউক, আলি ফামি অল্পকাল পরেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অত্যাচারের নিদর্শনস্বরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অধিকতর উৎপীড়নের ভয়ে, তাঁহাকে আর কাছে আসিতে দিবে না, এই উদ্দেশ্যে পিস্তল তুলিয়া ঘোড়া টানিতেই উপর্য্যুপরি তিন বার আওয়াজ হইল! প্রাণভয়ে সে এরূপ ব্যাকুল ও বিহ্বল হইয়াছিল যে, কখন্ সে ঘোড়া টানিয়াছিল, আর কয় বারই বা আওয়াজ হইয়াছিল, তাহা তাহার বুঝিবার শক্তি ছিল না। আলিকে ভূতলশায়ী ও শোণিতে প্লাবিত হইতে দেখিয়া মাদাম ফামির মোহ দূর হইল; সে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামীর পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিল, এবং তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বৃথা হইল, দেহে তখন প্রাণ ছিল না।"

৯

"শুক্রবার অপরাহ্নে সকলেরই ধারণা হইল সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিচার শেষ হইবে; কিন্তু পরদিনের জন্য মামলা মুলতুবী রহিল। পরে শুনিয়াছিলাম, আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায় সেই রাত্রিতে না কি মাদাম ফামির সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

"পরদিন শনিবার। যথাসময়ে আদালতের কায আরম্ভ হইলে জুরীরা পরামর্শ করিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। জুরীরা এজলাসে প্রত্যাগমন করিলে আমি স্পন্দিত বক্ষে বিচারপতির আসনের নিম্নে দণ্ডায়মান হইলাম। মাদাম ফামি পাণ্ডুরমুখে ও বিস্ফারিত-নেত্রে আমার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার তখন শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল; আমার পুরোবর্ত্তিনী সেই রূপ-যৌবন-সম্পন্না, প্রস্ফুটিত শতদল তুল্য শোভা-সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপিণী তরুণীকে কোন্ বাণী শুনাইতে হইবে?—জীবনের, না মৃত্যুর?

"আসামী নিরপরাধ—এই রায় শ্রবণমাত্র দর্শকবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিল; আনন্দাতিশয্যে তাহাদের সংযম বিলুপ্ত হইল, বিচারালয়ের গাম্ভীর্য্য ও শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হইল।

"বিচারপতি মেঘমন্দ্রস্বরে আদেশ করিলেন, 'সকলে এজলাস হইতে চলিয়া যাও।'—অনন্তর তিনি আমাকে বলিলেন, 'আসামীকে বল, জুরীরা রায় দিয়াছেন, সে নিরপরাধ, এ জন্য তাহাকে মুক্তিদান করা হইল।'

"মাদাম ফামি মুক্তিলাভ করিয়া আদালতের বাহিরে

ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহাদের অভিনন্দন অগ্রাহ্য করিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া তাহার ভগিনী প্রিন্সেস্ হোটেলে বাসা লইয়াছিল। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মাদাম ফামি তখন মূর্চ্ছাপন্না। ডাক্তারদের সেবা শুশ্রূষায় সে প্রকৃতিস্থ হইয়া সমাগত আত্মীয়বন্ধুগণের উৎকণ্ঠা দূর করিল, এবং কোচে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া এক গ্লাস মদ্য পান করিল, তাহার পর একটি সিগারেট ধরাইয়া লইল। আমাকে দেখিয়া অতি মধুর হাস্যে বলিল, 'ধন্যবাদ, মিঃ দোভাষী!' কয়েক মিনিট পরে জেলখানার ডাক্তার টেলিফোনে তাহাকে তাহার স্বাস্থ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উঠিয়া টেলিফোনে ইংরাজী ভাষায় বলিল, 'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ ডাক্তার! ওঃ, আমি বড় সুখী হইয়াছি।'

"মাদাম ফামি কয়েকদিন পরে লণ্ডন হইতে প্যারিসে যাত্রা করিল।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সতীদাহ

বিয়ের বছর পার না হ'তে মুছল সিঁদুর, ঘুচল শাঁখা,
এই জীবনের সকল আশা এক নিমেষে হ'ল ফাঁকা।
এত আদর যতন সোহাগ কোথায় যেন গেল ভেসে,
চিত্ত সুখের বিত্ত আমার লুঠলো সে কোন্ দস্যু এসে।
ভেঙে গেল প্রেম-প্রতিমা রইল কেবল কাঠামখানি,
কাঙাল বেশে বসন্ত পথে গরবিনী রাজার রাণী।

স্বামী গেলেন, আমার যা তা সব গেল তাঁর সাথে সাথে,
হাতা বেড়ি হাঁড়ী হাতা উঠলো এসে আমার হাতে।
ঝি চাকরের জবাব হ'ল, আমিই হলেম বাড়ীর দাসী,
মাইনে আমার পাওনা হ'ল মিষ্টি বকা রাশি রাশি।
স্বামীর চিতা নিভে গেছে জ্বলছে চিতা প্রাণের পরে,
সতীদাহ উঠল তবু বলছ সবাই কেমন ক'রে?

দিবস নিশি জায়ের জ্বালায় পরাণ করে ত্রাহি ত্রাহি,
তাহার উপর দেবর ভাসুর শ্বশুরেরও কসুর নাহি।
নিত্যি তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় দেন পরিচয় ব'সে ব'সে,
আমিই নাকি অলক্ষুণে, স্বামী ম'লো আমার দোষে।
পাণ থেকে চুণ খসলে পরে বাড়ীর সবাই বকেন যা তা;
ননদিনী রোজ শত বার সাত পুরুষের মুড়ান মাথা।
বাপের ভাইয়ের পিণ্ডি দিতে শাশুড়ীও পিছপা নহে,
এমনি শত লক্ষ জ্বালায় নিত্য আমার চিত্ত দহে।
সতীদাহ উঠলো তবু বলছ সবাই কেমন ক'রে?—
বাঙ্‌লা দেশে সতীদাহ চলছে প্রতি ঘরে ঘরে।

পাখী ডাকার অনেক আগে শয়ন ছেড়ে জেগে উঠে,
দুয়ার নেপে বাসন মেজে স্নান ক'রে যাই রাঁধতে ছুটে।
আপন হাতে বাটনা বাটি, কুটনা কুটি, জলও তুলি,
ভাঁড়ার-ঘরে দেখে শুনে তুলে রাখি জিনিস গুলি।
খোকা-খুকীর নাওয়া, খাওয়া, ঘুমপাড়ান এরই মাঝে,
তবু আমি নইকো ভাল, দোষ পড়ে মোর সকল কাজে।
সারাটা দিন, রাত দু' পহর এই খাটুনী খেটে খেটে,
সবার খাওয়ার পরে দু'ট বাসি পান্তা যা দেই পেটে;
শাশুড়ী মা বকেন তবু, সংসারেতে উপায় যাহা,
আর কেহই ত ছোঁন না কিছু, আমার পেটেই যাচ্ছে তাহা।
সতীদাহ উঠলো তবু বলছ সবাই কেমন ক'রে?
বাঙ্‌লা দেশে সতীদাহ চলছে প্রতি ঘরে ঘরে।

কোথায় আছ দীনের বন্ধু, দেখা দাও হে এসে তুমি,
নাশিতে দুষ্কৃতি, প্রভু, উদ্ধারিতে ভারত-ভূমি!
ঘুচাও এ যন্ত্রণা বিষম—নারীর উপর জুলুম, জারি,
দেখছ না কি ঘরে ঘরে চোখের জলে ভাসছে নারী!
কই গো দেশের হিতৈষীরা স্বদেশ-সমাজ-হিত-ব্রতী,
দেশ বাঁচাবে? আগে তবে চাও ফিরে ঐ নারীর প্রতি।
দেও মুছায়ে মায়ের জাতির অশ্রুমাখা মুখখানিরে,
তবেই দেশের বিপদ যাবে, সুখ সুভাগ্য আসবে ফিরে।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

অভিভাষণ *

১

চিঠি লিখতে বসলেই, সর্ব্বাগ্রে তার পাঠ লিখতে হয়। এ পাঠ অবশ্য নিজে রচনা করতে হয় না। তা পূর্ব্ব থেকেই সমাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়ে রয়েছে, সেই বিধিবদ্ধ বাক্যসমূহ আমরা নির্ব্বিচারে মুখস্থ ক'রে পত্রস্থ করি। এ পাঠ অবশ্য সকল ভাষায় সকল সমাজে এক নয়। দেশভেদে, কালভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, পত্রের মুখপত্র নানা আকার নানা রূপ ধারণ করে।

কিন্তু এ সকলের বাহ্য আকারে যে প্রভেদই থাকুক না কেন, সকলেরই বক্তব্য এক। সকলেরই উদ্দেশ্য লেখকের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা। যিনি যে ভাষাই ব্যবহার করুন, যতই না কেন শ্রুতিমধুর বাক্য প্রয়োগ করুন, সকল পাঠেরই নির্গলিতার্থ হচ্ছে "সবিনয় নিবেদন।" অর্থাৎ নিবেদনটা আসে পরে, তার আগে আসে বিনয়,—এই আশায় যে, লেখকের নিবেদনটা যদিও পাঠকের মনঃপূত না হয়, বিনয়টুকু ত হবেই। বিনয় ঘুস্ দিয়ে পাঠকের মেজাজ খুস্ করাই এর ধর্ম্ম।

বক্তৃতা অর্থাৎ লোক-সমাজে মৌখিক নিবেদনটাও এই একই নিয়মের অধীন। সভামাত্রেরই সভাপতির পক্ষে প্রথমেই বিনয় প্রকাশ করাটা একটা অবশ্যকর্ত্তব্যের ভিতর দাঁড়িয়ে গিয়েছে এবং এ কর্ত্তব্য পালন করবার উপযুক্ত বাঁধিগতেরও সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতিকে কার্য্যারম্ভ আগে এই কথা বলে মুখ খুলতে হয় যে, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করবার যোগ্যপাত্র নন। আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত মামুলি বিনয়ের অভিনয় করতে পরাঙ্মুখ। ও হচ্ছে আসলে বৃথা বাক্যব্যয়। যে কথা একশ'বার শুনেছি, সে কথা আবার শুনলে শ্রোতার তা এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, তার মরমে প্রবেশ করে না। যুগ যুগ ধরে পুনরুক্তির ফলে কথা মাত্রেই কথার কথা হয়ে যায়।

তা ছাড়া এ জ্ঞান আমার আছে যে, আমার মত সাহিত্যিকের মুখে বিনয় শোভা পায় না, শোভা পায় শুধু সাহিত্যরাজ্যের রাজারাজড়াদের মুখে। এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ দিচ্ছি। কালিদাস রঘুবংশের প্রথমেই লিখেছেন—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

অর্থাৎ—আমি মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে হাস্যাস্পদ হব, কেন না, আমার পক্ষে এ প্রয়াস বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মত।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি হচ্ছে সাহিত্যিক বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এ কথা কালিদাস কখন বলেছিলেন—যখন তিনি সেকালের বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হয়েছিলেন। রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কাব্য। মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ রচয়িতার মুখে এ বিনয় শোভা পায়। কে না জানে যে, বড়লোক দুটি হেসে কথা কইলেই আমরা মুগ্ধ হই। আভিজাত্যের সঙ্গে সৌজন্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিম্বদন্তি এই কাল্পনিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরপক্ষে কালিদাস তাঁর প্রথম কাব্যে যে আত্মপরিচয় দেন, তার ভিতর বিনয় নেই—যদি কিছু থাকে ত আছে স্পর্দ্ধা। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথমেই তিনি সূত্রধারের মুখ দিয়ে সভাসদ্‌দের শুনিয়ে দিয়েছেন যে—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

অর্থাৎ কাব্য পুরোনো বলেই সাধু হয় না, আর নূতন বলেই গর্হিত হয় না। সাধু ব্যক্তিরা কাব্যের নূতনত্ব প্রাচীনত্ব নয়, তার গুণাগুণ পরীক্ষা করেই তার ভজনা করেন। কেবল মূঢ় ব্যক্তিরাই পরের মুখে ঝাল খায়।

কালিদাসের প্রথম বয়েসের ও তাঁর শেষ বয়েসের উক্তি

লেখকের মুখে বিনয় যেমন ভূষণ, নবীন লেখকের মুখে স্পর্দ্ধাও তেমনই অস্ত্র। কিন্তু যে নবীন লেখকও নয়, বড় লেখকও নয়, তার মুখে ও দুইয়ের কোনটিই শোভা পায় না। যেহেতু, লেখায় আমার হাতে-খড়ি কাল হয় নি, আর আজও পাকা লেখক হয়ে উঠিনি, সে-কারণ, আমার পক্ষে আমার সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। তা ছাড়া যখন ভোটের প্রসাদে এ পদ লাভ করেছি, তখন আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচারসহ নয়। ইলেক্‌সন্ জিনিসটিই ত যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের অভ্রান্ত বিলেতী কল।

২

আমি যে আপনাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে মহা আনন্দিত হয়েছি, তার প্রমাণ আপনাদের আহ্বানে আমি দ্বিধা না ক'রে একটানা ন'শ' মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এ সভায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এ রকম দেশভ্রমণ আমার পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা নয়। আমি আমার বন্ধু শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের মত ভ্রাম্যমাণ নই, অপরপক্ষে আমি হচ্ছি বাঙ্গালায় যাকে বলে 'কুণো' লোক। এমন কি, কলকাতা সহরেও, ঘর ছেড়ে সভা-সমিতিতে উপস্থিত হ'তে আমি স্বতঃই নারাজ। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই আমার বদ্ধমূল অভ্যাস। আর এই একঘরে হয়ে থাক্‌বার যুগসঞ্চিত অভ্যাস এখন স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া আমার এখন দেহের কলকব্জা সব ঢিলে হয়ে এসেছে। আমি যে এই বিকল দেহযন্ত্রটাকে ফিন্‌ফিনে গরমের দেশ থেকে কন্‌কনে শীতের দেশে টেনে নিয়ে এসেছি, সে দিল্লীর টানে নয়, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের টানে।

এই দিল্লী সহরটার সঙ্গে আমার মনের নাড়ীর কোনও যোগ নেই। দিল্লী সাহিত্যের রাজধানী নয়। অন্ততঃ যে সব ভাষার সঙ্গে আমি পরিচিত, সে সব ভাষার সাহিত্যের ত নয়ই। আমি যদি সাহিত্যিক না হয়ে ঐতিহাসিক হতুম, তা হ'লে অবশ্য এ সহরের মায়ায় চির-আবদ্ধ হয়ে পড়তুম। গত হাজার বৎসরের ইতিহাস নামক ট্রাজেডি এ নগরীর পৃষ্ঠে ক্ষোদিত পাষাণের আরক্ত অক্ষরে লিখিত রয়েছে। এ সহরের আবেদন লোকের কানের কাছে নয়, চোখের কাছে। Archaeologist-দের কাছে, অর্থাৎ যাঁরা পাষাণের পেটের প্রস্তরলিপি। সে লিপি আমার কাছে আরবী ও ফার্সি হরফের মতই অপরিচিত। আমি যখনই দিল্লীর সম্মুখস্থ হই, তখনই শুনতে পাই যে, এখানকার গম্বুজে, মস্‌জেদে, মিনারে, কবরে, শতমুখে একটিমাত্র বাণী ঘোষণা করছে; আর সে বাণী এই—Vanity of vanities, all is vanity।

এ বাণীর উপর একালের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা এ সত্যের প্রতি বিমুখ হয়েই অগ্রসর হ'তে চাই। তাই মানুষের বিরাট অহঙ্কারের এই স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে আমাদের সরস্বতী ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। বাঙ্গালা দেশে আমার নিজ হাতে গড়া এবং হাতধরা জনৈক সাহিত্যিক আছেন, যিনি এখানে এলে সম্ভবতঃ নানাবিধ পূর্ব্বস্মৃতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে আনতে পারিনি—তিনি অনিমন্ত্রিত ব'লে। তাঁর নাম হচ্ছে বীরবল।

৩

আমি যে আপনাদের ডাক শুনে এখানে ছুটে এসেছি, সে কেবল বিদেশে বঙ্গ-সরস্বতীর পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য এবং তাঁর উৎসবে যোগদান করবার জন্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের লম্বা ইতিহাস আমাদের পিছনে প'ড়ে নেই—প'ড়ে আছে আমাদের সুমুখে। এ সাহিত্যের স্মৃতিতে মগ্ন থাকবার সুযোগ আমাদের নেই, এর ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কারবার। কারণ, বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দির আমাদের নিজহাতে কায়ক্লেশে গ'ড়ে তুলতে হবে—আর তার জন্য চাই বহু শিল্পী এবং এ যুগে বহু স্বেচ্ছাসেবক। যেমন পুরাকালের ধর্ম্ম-মন্দির সব ভক্তের দল গ'ড়ে তুলেছে, এ যুগের সরস্বতীর মন্দিরও তাঁরাই গ'ড়ে তুলবেন, যাঁদের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি পরা প্রীতি অর্থাৎ অহৈতুকী প্রীতি আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের ভাবী উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল রূপ আমি কল্পনার চক্ষুতে বরাবরই দেখে আস্‌ছি। এ মন্দির অবশ্য মেঘরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর গোড়াপত্তন বাঙ্গালীরা বঙ্গভাষার জমীতেই করেছে। সুতরাং একে সুগঠিত ক'রে তুলবার কোনই অন্তরায় নেই—একমাত্র আমাদের ঔদাসীন্য ব্যতীত। বহু লোকের মনে যদি এই নবভক্তি স্থান পেয়ে থাকে, তা হ'লে বঙ্গ-সাহিত্য যে অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করবে, সে বিষয়ে তিল-

মিলে এই সাধনায় ব্যাপৃত ছিলুম। বাঙ্গালার বাহিরেও যে বঙ্গ-সরস্বতীর এত ভক্ত আছে, দু'দিন আগে সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমার নিজের মনে একটা ধারণা ছিল যে, প্রবাসী বাঙ্গালীরা শুধু দেশ হিসেবে প্রবাসী হন নি, মনেও প্রবাসী হয়েছেন। এ ধারণার মূলে একটি ছোট্ট ঘটনা আছে। কত ছোটখাটো ঘটনার বীজ থেকে কত বড় বড় ভুল ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তারই পরিচয় দেবার জন্য এই ভুল ধারণার মূলস্বরূপ একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ করছি।

৪

এ ঘটনা এত দিন পূর্ব্বে ঘটেছিল যে, সেটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এক দিন একটি ভারতবর্ষীয় যুবকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনিও বিদ্যার্থী হিসেবেই সে দেশে গিয়েছিলেন, আর আমরা দু'জনেই একই বিদ্যা অর্জ্জন করতে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলুম। তাঁর নামরূপের পরিচয় থেকে বুঝলুম যে, তিনি আমারই স্বজাতি—অর্থাৎ বাঙ্গালী। তিনি যে বাঙ্গালী নন, এমন ভুল করা কোনও বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব ছিল; কারণ, তাঁর দেহযন্ত্রটি মামুলী বাঙ্গালী ছাঁচেই ঢালাই করা হয়েছিল। সে মূর্ত্তির রেখা ও বর্ণ আমাদের অনুরূপই ছিল। প্রথম প্রথম আমরা উভয়ে ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করি—কারণ, অপরের কাছে শুনেছিলুম যে, তিনি বাঙ্গালী হলেও এক জন প্রবাসী বাঙ্গালী। শেষটা তাঁকে মুখ ফুটে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনি বাঙ্গালা জানেন?"—তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "সে হামি ভাল জানি।" বলা বাহুল্য যে, এ উত্তর শুনে আমি একটু চমকে উঠেছিলুম। তাঁর মুখের "ভাল জানি" কথাটা আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রাহ্য করতে অবশ্য পারি নি। আমি শুধু ভাবতে লাগলুম—দন্ত্য "স" সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করলে, আমাদের কানে তা এত বিসদৃশ ঠেকে কেন? শেষটা বুঝলুম, সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার মত উচ্চারণ করলে তা যেমন অসংস্কৃত হয়, বাঙ্গালা শব্দও সংস্কৃতের মত উচ্চারণ করলে তাদৃশ অ-বাঙ্গালা হয়। কিন্তু "আমি" যে কি ক'রে "হামি"তে রূপান্তরিত হয়, স্বরবর্ণের আদি অক্ষর কি ফিকিরে ব্যঞ্জন-বর্ণের শেষ অক্ষরে যাই হোক, এই নব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ এক কথাতেই বন্ধ হ'ল। অতঃপর উভয়েই ইংরাজী ভাষার আশ্রয় নিলুম। কারণ, ও ভাষায় আমাদের উভয়েরই জবান যখন সমান দুরস্ত, দু'জনেই যখন ইংরাজী ব্যাকরণ ও উচ্চারণের শ্রাদ্ধ করছি, তখন কার ভুল কে ধরবে! আমাদের স্বপ্ন-কল্পিত লাট-দরবারের বক্তারা কি কেউ কারও ইংরাজীর খুঁত ধরে?

৫

সেই থেকেই আমি ধ'রে নিই যে, প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখের বাঙ্গালা আমাদের মুখের হিন্দীর অনুরূপ। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দী আমরা একদম শিখি নি, অপরপক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা একদম ভোলেন নি। ফলে হিন্দী-সাহিত্যের আদর আমাদের কাছে যদ্রূপ, বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর তাঁদের কাছেও তদ্রূপ।

উনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত আমার উক্ত ধারণা বিংশ শতাব্দীতে যে সম্পূর্ণ অচল, সে সত্যের পরিচয় আমি বছর পাঁচ ছয় আগে পাই। আমার সেই বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধুটি সে যুগের প্রবাসী বাঙ্গালীর একটি খাঁটি নমুনা কি না, জানিনে; যদি হন, তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মনোরাজ্যে যুগান্তর ঘটেছে। এমন কি, আমার সময়ে সময়ে এ সন্দেহ হয় যে, আপনাদের কাছে বঙ্গ-সাহিত্যের যতটা আদর আছে, বাঙ্গালাদেশে ততটা নেই। জানিনে, এ কথা ঠিক কি না; কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আপনারা যে উৎসাহের সঙ্গে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করছেন, তা যথার্থই অপূর্ব্ব। আর এক কথা, আপনারা এ যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যকে যতটা আমল দিতে প্রস্তুত, বাঙ্গালার লোক সম্ভবতঃ ততটা নয়। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ এই যে, মাদৃশ লেখককেও আপনারা সাহিত্যিক ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি।

৬

অবশ্য আজ থেকে বোধ হয় ১০।১২ বৎসর আগে আমি উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির উচ্চ পদ লাভ করি। কিন্তু সে আসন গ্রহণ ক'রে আমি নিজেকে তাদৃশ ধন্য মনে

কারণ, উত্তরবঙ্গ আমাকে যে এতাদৃশ সম্মানিত করেন, আমার বিশ্বাস, তার ভিতর একটু অসাহিত্যিক কারণ ছিল।

উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আমার স্বদেশ। সুতরাং সে সভার কর্ম্ম-কর্ত্তারা "দেশকো ভাই" ব'লে আমার প্রতি একটু পক্ষপাত যে দেখান নি, এমন কথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি নে। তৎসত্ত্বেও তাঁদের নিমন্ত্রণের ভিতর একটু কিন্তু ছিল।

আমাকে তাঁরা আমার অভিভাষণের গায়ে পোষাকী ভাষা পরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য তাতে স্বীকৃত হই—এই ভয়ে যে, অসাধু ভাষায় লিখলে উত্তর-বঙ্গ পাছে আমার প্রতি অদক্ষিণ হয়ে ওঠেন। লোকে লোক-লাঞ্ছনা মেরেকেটে একরকম সওয়া যায়, কিন্তু ঘরে গুরুগঞ্জনা অসহ্য। ফলেই সে অভিভাষণ লিখে আমি নিয়ে যেতে পারিনি, "তাহা আমাকে লিখিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল।" ফলে আমার বক্তব্য তাঁদের মনোমত হয়েছিল কি না, জানিনে, কিন্তু তা তাঁদের কর্ণশূল হয় নি।

সে যাই হোক, আপনারা যে আমাকে এখানে ভাষার সাধুবেশ ধারণ ক'রে আসতে আদেশ করেন নি, এর জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ, সাহিত্যরাজ্যেও বারবার বহুরূপী সাজাটা কষ্টকর না হলেও লজ্জাকর।

এ পুরাকাহিনী শোনাবার উদ্দেশ্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আমরা যাকে নব-সাহিত্য বলি, তার ভাষারও একটু নবীনতা আছে। সাহিত্যের ভাষার এই মোড়-ফেরানোর ব্যাপারে আমার কতকটা হাত আছে, আর প্রধানতঃ সেই হিসেবেই সাহিত্য-সমাজে আমি নিন্দিত ও প্রশংসিত অর্থাৎ বিখ্যাত। আমাদের এ ভাষা চল্‌তি ভাষা বলেই পরিচিত। যখন এ ভাষাকে আমরা প্রথমে সাহিত্যে প্রমোশন দিই, তখন জনকতক বাঙ্গালা সাহিত্যের দলপতি এবং তাঁদের দলবল মহা হৈ-চৈ সুরু করেন এই ব'লে যে, সাহিত্য গেল, সমাজ গেল, ধর্ম্ম গেল। "করিয়া" "ক'রে" রূপ ধারণ করলেই, ক্রিয়াপদের লেজ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হলেই, সে লেজুড়ের শক্তি যে এতদূর প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠে, এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। কোনও জিনিষেরই সৃষ্টি ও প্রলয় অত তড়িঘড়ি হয় না। কিন্তু সমালোচকের তাড়নায় আমরা পাঠকের মহামান্য উচ্চ আদালতে সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষার মামলা রুজু করতে বাধ্য হই। তার পর বছর পাঁচেক ধ'রে নানারূপ বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অদার্শনিক সওয়ালজবাবের ফলে এ ফেরা আমরা সে মামলায় জয়লাভ করেছি। তথাকথিত চল্‌তি বাঙ্গালা এখন সাধুভাষার সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে এক পংক্তিতে বসবার অধিকার লাভ করেছে। যা আজ হয়েছে, তাকে ভাষার dyarchy বলা যেতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ, কারণ, সাধুভাষার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা আমরা আনিনি; সুধু চলতি বাঙ্গালারও যে সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আছে, তাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম।

৭

আমাদের ভাষার অন্তরে যে নবীনতা আছে, তার প্রমাণ, নবীনের দলই ছিলেন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আপনাদের ঘাড়ে গতানুগতিক মতামতের চাপ ততটা নেই, যতটা আছে আমাদের উপরে; কারণ, বাইরে যেতে হলেই অনেক পৈতৃক আসবাবপত্র ঘরে ফেলে আস্‌তে হয়, মনের আস্‌বাবপত্রও। সুতরাং আশা করছি যে—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং"

কালিদাসের এ উক্তির সত্যতা আপনারা যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করবেন, যে সব বাঙ্গালীর কাছে "ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ", তারা তত সহজে করবে না।

ভাষার গুণাগুণ প্রয়োগসাপেক্ষ। একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক বলে যে—"বীণা বাণী অসি ও নারীর" নিজস্ব কোনও গুণ নেই; যার হাতে তা পড়ে, তার উপরই তার গুণাগুণ নির্ভর করে। ও শ্লোকের অন্তর থেকে নারীকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করলে বাদবাকী কথা আমরাও নির্ভয়ে গ্রাহ্য করতে পারি, বিশেষতঃ বাণী সম্বন্ধে। কারণ, ভাষা জিনিষটি অসি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, বীণা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তা যে যায়, তা তিনিই জানেন, যাঁর রবীন্দ্রনাথের গল্পপদ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্য যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে, তাঁর গল্প হেলায় তাঁদের হৃদয় বিদ্ধ করতে পারে।

আসল কথা এই যে, সাধুভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তাঁরাও যে সর্গম নিয়ে কারবার করেন, আমরাও সেই সর্গম নিয়ে কারবার করি। প্রভেদ এই যে, সাধুভাষার অচল ঠাটের পরিবর্ত্তে আমরা

সচল ঠাটে সাধনা করছি। তবে এ তর্ক যে বাঙ্গালাদেশে উঠেছিল, সেটি এক হিসেবে আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কারণ, এ আলোচনার ফলে সকলেরই বঙ্গভাষার উপর দৃষ্টি পড়েছে; এবং ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন। যেমন বাঙ্গালাদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন।

৮

মাতৃভাষার মাহাত্ম্যের বিষয় আপনাদের কাছে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আপনাদের সঙ্গে আমাদের মানসিক ঐক্যের প্রধান বন্ধনই ত এই ভাষার বন্ধন। ভাষাই হচ্ছে একটি জাতির পরস্পরের মনপ্রাণের অপৌরুষেয় যোগসূত্র। আমি অপৌরুষেয় বিশেষণটি ব্যবহার করছি এই কারণে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পৃথিবীর কোন ভাষাই সৃষ্ট হয় নি, আমাদের ভাষাও হয় নি। একটা সমগ্র মানবসমাজ যুগ যুগ ধ'রে অলক্ষিতে একটা ভাষা গ'ড়ে তোলে। সামাজিক মন যে ভাবে দিনের পর দিন গ'ড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও তেমনই গ'ড়ে উঠেছে। একটা জাতির মন যে কারণে যে উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে, সে জাতির ভাষাও সেই কারণে সেই উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে। জাতির মন যখন একটি বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, তখনই তা সাহিত্যে বিকশিত হয়। সাহিত্যে দীক্ষিত হয়েই ভাষা তার দ্বিজন্ম লাভ করে, অর্থাৎ দ্বিজ হয়। সাহিত্যের মূল উপাদান কি? মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনা, কল্পনা, কামনার চিত্রই ত সাহিত্য। যখনই একটি জাতির ভিতর সাহিত্যের দর্শন লাভ করা যায়, তখনই বুঝতে হবে, সে জাতির মন আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, ও তার অন্তরে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়েছে। কারণ, সাহিত্য প্রবুদ্ধ জ্ঞানেরই সৃষ্টি। মানুষের মন ও ভাষাকে দেশ ও কাল, দুজনে দু' হাত মিলিয়ে তৈরী করেছে। আমরা যদি কোন কারণে দেশের বন্ধন কাটাই, তা হলেও কালের বন্ধন ছিন্ন করতে পারিনে। মানুষ উদ্ভিদের মত জিওগ্রাফির অধীন নয়; তার মন নামক জিনিষ আছে বলে সে মুখ্যত হিষ্টরির অধীন। সে অধীনতা-পাশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করলে সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যাকে জাতীয়তা বলি,

৯

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে এই বলে আক্ষেপ করেন যে,—"আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই।" আপনারা শুনে সুখী হবেন, বাঙ্গালীরা তাদের ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এখন আর উদাসীন নয়। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীমান্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—"The Origin and Development of the Bengalee Language" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেছেন। এই বিরাট গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করতে এবং সেই উপাদান দিয়ে এই ইতিহাস রচনা করতে, এক যুগ ধ'রে তাঁকে কি একান্ত, কি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবতে গেলেও আমাদের মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এখানি ভাষা-বিজ্ঞানের একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। বিজ্ঞানের একটা মস্ত গুণ এই যে, ও শাস্ত্র অনেক তর্কের একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রে দেয়। তার একটি চমৎকার প্রমাণ আমি বহুকাল পূর্ব্বে পাই। জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে—"চৌধুরী মশায়, এ কথা কি সত্য যে, য়ুরোপের পণ্ডিতরা সূর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করেছে?" আমি উত্তরে বললুম, "হাঁ, এ কথা আমিও শুনেছি।" এ উত্তর শুনে তিনি হেসে বল্লেন, "মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, সূর্য্য যে প্রমেয়, তাই প্রমাণ করবার আগে বেটারা সূর্য্যকে মেপে সারলে।" আমি মনে মনে বললুম,—যখন তারা সূর্য্যকে মেপে সারা করেছে, তখন তা প্রমেয় কি অপ্রমেয়, এ তর্কের আর অবসর নেই। তা ছাড়া সূর্য্য প্রমেয় কি অপ্রমেয়, এই তর্কই যদি চালানো হ'ত, তা হ'লে মাপ আর কখনই নেওয়া হত না; কেন না, ও তর্কের আর শেষ নেই, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর চলতে পারে।

আমরা পাঁচ জন সাহিত্যিক মিলে যে ভাষার তর্ক করেছি, সে কতকটা ঐ গোছের। চলতি বাঙ্গালা লিখিতব্য কি অলিখিতব্য, তাই নিয়ে আমরা বাগ্‌বিতণ্ডায় ব্যাপৃত ছিলুম। শ্রীমান্ সুনীতি এ তর্ককে খতম ক'রে দিয়েছেন। তিনি বঙ্গভাষার যে পুরাতত্ত্ব আমাদের শুনিয়েছেন, তা

আমি করতে পারিনে যে, ঐ দু' হাজার পাতার বই ধৈর্য্য ধ'রে আপনারা প'ড়ে উঠতে পারবেন। ওতে সব আছে। আমার সেই পুরোনো সমস্যা "অ" কি করে "হ" হয়, তার সন্ধানও এ পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভয় নেই, সে সব কথা আপনাদের বল্‌তে যাচ্ছিনে। আমি উক্ত গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক খোসা ছাড়িয়ে ও বীচি বেছে আপনাদের কাছে তার শাঁসটুকু শুধু ধ'রে দেব। আশা করি, তা আপনাদের তাদৃশ মুখরোচক না হোক্, নিতান্ত কটুকষায় হবে না।

১০

সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই লক্ষ্য করেছেন যে, ও নাটকের নায়কনায়িকা সকলেই সংস্কৃতে কথা কন না, স্ত্রী-শূদ্রের ও ভাষায় অধিকার নেই। এর কারণ, ও দেবভাষা আয়ত্ত করতে শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করতে হত। সে ক্লেশ যাঁরা করতে নারাজ ছিলেন, তাঁরা সে কালের প্রচলিত মৌখিক ভাষাতেই কথোপকথন করতেন। এ কালে স্ত্রী-শূদ্ররা যেমন ইংরাজী ভাষায় গুক্‌ তণ্ড না ক'রে দেশভাষাতেই কথাবার্ত্তা কয়। তবে এ কালে যেমন জনকতক বিদুষী মহিলা ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা ক'রে তুলেছেন, সে কালেও তেমনই জনকতক বিদুষী মহিলা সংস্কৃত ভাষাকে সমান কণ্ঠস্থ করেছিলেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারা রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করলে সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু বলতেন না। মৌখিক ভাষা প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা ব'লে তার নাম হয়েছিল প্রাকৃত।

এই প্রাকৃত মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসবামাত্র ব্যাকরণের অষ্ট বন্ধনে প'ড়ে গেল এবং আলঙ্কারিকদের কল্পিত বিধিনিষেধের অধীন হয়ে পড়ল। নাটক-কাররা অলঙ্কারের বিধি অনুসারে গদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন শৌরসেনী প্রাকৃতে, আর পদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল, যে দেশে এখন আমরা উপস্থিত, সেই দেশের সে কালের লৌকিক ভাষা। আর মহারাষ্ট্র ত অদ্যাবধি স্বনাম রক্ষা ক'রে এসেছে। গদ্য কেন শৌরসেনীর দখলে এল, আর পদ্য মহারাষ্ট্রীর? সম্ভবতঃ দিল্লী বক্তৃতার পীঠস্থান ব'লে, আর মহারাষ্ট্র গানের দেশ ব'লে। সে যাই হোক, এ দুই ছাড়া সংস্কৃত নাটকে আর চোর, ধীবর প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোকের মুখে যে প্রাকৃত শোনা যায়, সে প্রাকৃতের নাম মাগধী প্রাকৃত। এই মাগধী প্রাকৃতই রূপান্তরিত হয়ে কালক্রমে বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গভাষার আর যে গুণই থাকুক, তার বংশ-মর্য্যাদা নেই। সে বড়ঘরের সন্তান নয়। আসলে খান-দানি ভাষা হচ্ছে "ব্রজভাখা", কেন না, সে ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের বংশধর। "ব্রজভাখা" যে সাহিত্যে মাথা তুলতে পারে নি, সে বিদেশী ভাষার বাদশাহী চাপে।

১১

প্রাকৃত হচ্ছে মৌখিক ভাষার লিখিত সংস্করণ, অর্থাৎ মুখের ভাষা পুঁথিগত হলেই তা হয় প্রাকৃত। ও হচ্ছে সেকালের সাধুভাষা। ভাষা মানুষের মুখে মুখে বদলে যায়। চলতি ভাষার প্রধান গুণ অথবা দোষ এই যে, তা চলৎশক্তিরহিত নয়। অপর পক্ষে লিখিত ভাষা বাণীর গুরুপুরোহিতদের শাসনে বইয়ের মধ্যে জড়সড় ও আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকে। সমাজ বদলায়, মানুষের মন বদলায়, কিন্তু পুঁথিগত প্রাকৃতের আর বদল নেই। কিছু দিন পরে দেখা যায় যে, যে প্রাকৃত এককালে মুখে মুখে চলত, সে প্রাকৃতও শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ ক'রে শিক্ষা করতে হয়।

মৌখিক প্রাকৃতের স্রোত কালের সঙ্গে বয়ে গিয়ে যখন নব রূপ ধারণ করে, তার নাম হয় তখন অপভ্রংশ। শৌরসেনী প্রাকৃত যেমন কালক্রমে শৌরসেনী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল, মাগধী প্রাকৃতও তেমনই কালক্রমে মাগধী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল।

মাগধী প্রাকৃত অবলীলাক্রমে তার রূপ পরিবর্ত্তন করে, কেন না, মাগধী প্রাকৃত কস্মিন্‌কালেও লিখিত ভাষা হয়ে ওঠেনি। কেতাবী ভাষার চাপে তার মুক্ত গতি কখনই রুদ্ধ হয় নি। বৌদ্ধধর্ম্ম অবশ্য মগধেই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র মাগধী ভাষায় লিখিত নয়। পালি বেহারী ভাষা নয় মালবের ভাষা। জৈনধর্ম্মের জন্মস্থানও ঐ অঞ্চলেই। কিন্তু জৈন শাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত হয়েছে, সে ভাষা মাগধী নয় অর্দ্ধ-মাগধী। অর্থাৎ তা কাশী-কোশলের ভাষা, আজকাল আমরা যাকে আউধের ভাষা বলি। মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশ যুগ যুগ ধ'রে সাহিত্যের

বুলি ও জেনানা বুলি রূপেই বিরাজ করছিল ; শেষটা বাঙ্গালায় এসে তা সাহিত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১২

এই মাগধী ভাষা বহুকাল যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্য-ভাষা অর্থাৎ পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষা ব'লে পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ৎ সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নিজ কানে শুনে গিয়েছেন যে, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন সুবায় একই ভাষা প্রচলিত ছিল।

শ্রীমান্ সুনীতিকুমার পুরোনো দলিলপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গভাষা বেহারা ভাষা থেকে পৃথক্ হয় এবং সেই শুভক্ষণে সে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করে ; আর এত দিনে সে তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা সেকেলে মহারাষ্ট্রী ভাষার মত পদ্যের দখলেই ছিল। মাত্র গত শতাব্দীতে গদ্য তাকে জবর দখল ক'রে নিয়েছে। সংক্ষেপে আমাদের ভাষার বয়েস হাজার বৎসর, আমাদের গদ্য সাহিত্যের বয়েস একশ বছর। এই হচ্ছে তার উৎপত্তির বিবরণ।

এখন তার প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, দেশভাষামাত্রই মিশ্র ভাষা, কেন না, সে সব ভাষা তিনটি উপাদানে গঠিত। সে তিনটি উপাদান তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ ও দেশী শব্দ। যে সব সংস্কৃত শব্দ আমাদের ভাষায় স্বরূপে বিরাজ করছে, তারাই তৎসম, যথা "বিবাহ" ; যাদের চেহারা ফিরেছে, তারাই তদ্ভব, যথা "বিয়ে" ; আর যাদের কুলশীল জাতি-গোত্র জানা নেই, তারাই দেশী। আমরা আজ দেখতে পাই, এ তিন ছাড়া অনেক বিদেশী শব্দও বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। শ্রীমান্ সুনীতিকুমার গণনা ক'রে দেখেছেন, যে, আমাদের ভাষার অন্তরে অন্ততঃ ২ হাজার ৫ শত ফার্সি শব্দ আর শ'-দুয়েক য়ুরোপীয় শব্দ বেমালুম ঢুকে গিয়েছে। এতে যদি সে ভাষা যবনদোষে দুষ্ট হয়ে থাকে, তাকে সে দোষ হ'তে মুক্ত করবার কোন উপায় নেই। ভারতচন্দ্র বলেছেন "অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল" ; আমাদেরও তাই করতে হচ্ছে, এবং হবে। সঙ্গীতের ভাষায় মিশ্র রাগিণীকে বলে জংলা। বঙ্গভাষা যদি জংলা ভাষা হয় ত আমাদের ঐ জংলারই চর্চ্চা করতে হবে।

১৩

আমরা ভাষা নিয়ে পূর্ব্বে যে বাদানুবাদ করেছি, তা আসলে শব্দঘটিত কলহ। শুদ্ধি-বাতিকগ্রস্ত সাহিত্যিকরা চান যে, সাহিত্যের ভাষা থেকে প্রথমতঃ দেশী বিদেশী শব্দসমূহকে বহিষ্কৃত করা হোক্, তার পর যতদূর সম্ভব তদ্ভব শব্দগুলিকে তৎসম করা হোক ; তা হলেই তার লুপ্ত পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা হবে। কারও পক্ষে "জুতো-পাওয়াটা" অবশ্য লজ্জার বিষয়, কিন্তু "বিনামা ভক্ষণ"টি কি হিসাবে সাধুজনোচিত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আর তদ্ভবকে তৎসম করা অসাধ্য। এত বড় গুণী কি কেউ আছেন, যিনি "বামন"কে ব্রাহ্মণ করতে পারেন, আর "বোষ্টম"কে বৈষ্ণব? আসল কথা এই যে, আমরা যদি এই অসাধ্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করি, তা হ'লে আমরা বঙ্গ-সরস্বতীকে কাঙ্গাল করব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। "বন্ধু, বধু ও ইয়ার", এ তিনের রূঢ়ি অর্থ একই, অথচ এ তিনের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর কোনটিকে বাদ দেবার যো নেই, কিংবা এর একটির স্থানে আর একটি বসাবার যো নেই। শুনতে পাই যে, কোমল গান্ধার সুরটি অতিশয় শ্রুতিমধুর। কিন্তু যেখানে "পা" লাগানো উচিত, সেখানে কোমল "গা" লাগালে সুর যাদৃশ সঙ্গতি লাভ করে, যেখানে "বন্ধু" বসবে, সেখানে "ইয়ার" বসালে ভাষাও তেমনই সঙ্গতি লাভ করে। সুতরাং সাহিত্যিকদের ছুঁৎমার্গ পরিহার করবার পরামর্শ আমি নির্ভয়ে দিতে পারি। শুনতে পাই, হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করতে পারলেই আমরা স্বরাট হয়ে উঠব। এ মত কত দূর সত্য জানিনে, কিন্তু বঙ্গভাষায় অস্পৃশ্যতার চর্চ্চা করলে, বঙ্গ-সরস্বতী তার স্বরাজ্য হারিয়ে বসবে, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। আপনারা শুনে খুসী হবেন যে, শব্দের কুল-বিচার না ক'রে তার অর্থ বিচার করাই প্রাচীন পণ্ডিতদের অভিমত। ভারতচন্দ্র বলেছেন যে,

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য-রস লয়ে॥"

ভারতচন্দ্রের এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ভোজরাজ বলেছেন :—

"সংস্কৃতে নৈব কোঽপ্যর্থঃ প্রাকৃতে নৈব চাপরঃ।
শক্যো বাচয়িতুং কশ্চিদপভ্রংশেন বা পুনঃ॥"

আর ভোজরাজের চাইতেও অনেক প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী বলেছেন :—

"তদেতৎ বাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।

অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যা চতুর্ব্বিধম্॥"

এ স্থলে আপনাদের আর একটি বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের, তথা বঙ্গ-ভাষার অতীত এমন লম্বাও নয়, বড়ও নয় যে, সেই অতীত গৌরব-কাহিনী শুনে আর ব'লে আমরা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাহিত্য তার গৌরব লাভ করবে ভবিষ্যতে। অতীত আমাদের কাছে প'ড়ে পাওয়া জিনিষ—ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাদের নিজ-হাতেই গ'ড়ে তুলতে হবে। লেখকরা সমাজের আনুকূল্য লাভ না করলে এ ব্রত উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হবেন না। আর সে আনুকূল্য যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করবার আশা করতে পারি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সভা।

১৪

আমি এতক্ষণ ধ'রে আপনাদের কাছে ভাষার বিষয় যে বক্তৃতা করলুম, তার কারণ মানুষের ভাষা তার মনের পরিচয় দেয়। আমরা যাকে ভাষার উন্নতি অবনতি বলি, তা মনের উন্নতি-অবনতির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। কোনও জাতির ভাষা যখন নবরূপ ধারণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে জাতির মনও নব কলেবর ধারণ করেছে। তা ছাড়া ভাষার আলোচনা করা সহজ। ভাষা ভাবের স্থূল-দেহ, সূক্ষ্ম-শরীর নয় ; আর সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর সব জিনিষের স্থূল-দেহ নিয়েই নাড়াচাড়া করা সহজ, কারণ, তা ধরাছোঁয়ার বস্তু। কোনও পদার্থের সূক্ষ্ম-শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মনোগ্রাহ্য। তাই কাব্যবস্তু কি, তার বিচার করতে হ'লে দর্শনের রাজ্যে ঢুকতে হয়। এ ক্ষেত্রে সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হবে, কারণ, আমি এ সভার দার্শনিক শাখার সভাপতি নই। আর যদি বিদ্যা দেখাবার লোভে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তা হ'লেও ধৈর্য্য ধ'রে আপনারা তা শুনতে পারবেন না। বাজারে গুজব এই যে, হিন্দুমাত্রেই দার্শনিক। যদি এ কথা সত্য হয়, তা হ'লে তার অর্থ আমরা জাতকে জাত স্বভাব-দার্শনিক, স-তর্ক দার্শনিক নই। কিন্তু এ যুগের দর্শনের টানা-পড়েন দুই

আপনারা বোধ হয় জানেন যে, এ কালে আমরা যাকে সাহিত্য বলি, সংস্কৃত ভাষায় তার নাম ছিল কাব্য। এই 'সাহিত্য' শব্দ বাঙ্গালায় কোথা থেকে এল, জানিনে। ও শব্দ সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ সাহিত্য-দর্পণের মলাট থেকে উড়ে এসে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্তরে জুড়ে বসেছে।

কাব্য ও সাহিত্য এ দুটি শব্দের যে শুধু নামের প্রভেদ আছে তাই নয়, ও দুয়ের অর্থেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। কাব্যের চাইতে সাহিত্যের এলাকা ঢের বেশী বিস্তৃত। কাব্য বলতে বোঝায় শুধু কবিতা ও আখ্যায়িকা। সাহিত্য বলতে আমরা ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা রকমের রচনা বুঝি। অবশ্য গল্প ও কবিতা আজও সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়ে রয়েছে ; শুধু যে রয়েছে, তাই নয়, কবিতা না হোক্, গল্প আজ সাহিত্যরাজ্যের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে। পৃথিবীর সকল লিখিয়ে দেশেই দেখা যায় যে, গল্প-সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে ; সুতরাং খুব সম্ভব, তা বাঙ্গালাদেশেও কালক্রমে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হয়ে উঠবে।

১৫

এই বিপুল পৃথিবী ও নিরবধি কালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন যে, যাঁরা সাহিত্য-জগতের মহাপুরুষ ব'লে মানবসমাজে গণ্য হয়েছেন, তাঁরা সকলেই হয় কবি, নয় গল্প-রচয়িতা ; আর সেই ব্যক্তিকেই আমরা মহাকবি বলি, যিনি একাধারে ও দুই।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ যুগে কাব্য সম্বন্ধে একটা কু-সংস্কারের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। যাঁরা নিজেদের কাযের লোক ব'লে মনে করেন, অথবা তাই ব'লে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা ফাঁক পেলেই বলেন যে—"আমরা কবিতা ফবিতা বুঝিনে।" সম্ভবতঃ তাঁরা সত্য কথাই বলেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সকল সত্য প্রচার করা ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। মানুষ সেই ভাবেই মানুষের কাছে আত্মপরিচয় দিতে উৎসুক, যাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং "আমি কবিতা বুঝিনে"—এ কথা অহঙ্কারের সুরেই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বক্তা "কবিতা বুঝিনে" এই কথার দ্বারা

"বাঙ্গালা ভাল জানিনে" এ কথা বলেন, শুধু এই প্রমাণ করতে যে, তিনি ইংরাজী খুব ভাল জানেন। উভয়েই এরূপ উক্তির দ্বারা সমান সুবিবেচনার পরিচয় দেন। বলা বাহুল্য, কোন বিষয়ে অক্ষমতা অপর কোন বিষয়ে ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। উপরি উক্ত কু-সংস্কারের মূলে আছে এই ধারণা যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনও সম্বন্ধ নেই। এ কথা সত্য হ'ত, যদি জীবন মনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হ'ত। তা যে নয়, তা সকলেই জানেন। আর মন অর্থ যে শুধু ব্যবহারিক মন নয়, তার প্রমাণ, কর্ম্ম দিয়ে আমরা সকল জীবন ভরাট ক'রে দিতে পারি, কিন্তু সমগ্র মন পূর্ণ করতে পারিনে; তার অনেকটা শূন্য থেকে যায়। মানব-মনের সকল ক্রিয়াশক্তি তার সংসারবাসনার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নয়। তা যদি হ'ত, তা হ'লে মানবসমাজে ধর্ম্ম বলেও কোন জিনিষের সৃষ্টি হ'ত না। বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং দৈনন্দিন সাংসারিক ভাবনা থেকে মুক্ত মানবী শক্তির লীলাই আর্ট, ধর্ম্ম, কাব্য প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়। আমরা প্রতি-জনেই এ জাতীয় সৃষ্টির কর্ত্তা না হই, ভোক্তা ত বটেই। কাব্য মনের এই অতিরিক্ত ও মুক্ত অংশেরই খোরাক। সে অংশটা অনেক কল্পনা, অনেক স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখতে হয়। যাঁরা মানব-মনের সেই সব অস্পষ্ট ও অনিত্য কল্পনাকে স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করতে পারেন, তাঁরাই কবি।

আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোনই সম্বন্ধ নেই, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের দৈনিক কর্ম্মজীবন কি এতই সুন্দর, এতই মনোরম ও এতই প্রিয় যে, আমরা এক দণ্ডের জন্যও তা ভুলে থাকতে পারিনে? কাব্যের আর কোনও গুণ না থাকুক, অন্ততঃ এই মহাগুণ আছে যে, তা অন্ততঃ দু দণ্ডের জন্যও আমাদের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দিতে পারে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মহা লোক-হিতৈষী; সমাজের অর্থাৎ পরের কিসে উপকার হয়, সেই ভাবনাতেই তাঁরা মশগুল। যে সাহিত্য সমাজের ধন্না-ছোঁয়ার মত কাযে লাগে, তদতিরিক্ত সাহিত্যকে তাঁরা অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখেন। সকলেই জানেন যে, তেল নামক পদার্থটা সমাজের বহুতর কাযে লাগে, যথা—খেতে, মাখতে, কল চালাতে, চাকায় দিতে—এমন কি, progressএর দিতে চান আর তাতে যে গররাজী হয়, তাকে সৌখীন, বিলাসী, অলস, অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করেন। এঁদের কথার উত্তর দেওয়া বৃথা, কেন না, জনগণ সে কথা কানে তুলবে না। কারণ, তেল আমাদের সকলেরই চাই; সুতরাং তা যোগানো যে মহৎ কার্য্য, সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই।

তবে সামাজিক জীবনের উপর কাব্যের প্রভাব যে কি, তা আমাদের জীবনের উপর রামায়ণ ও মহাভারত নামক দু'খানি কাব্যের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

সত্য কথা এই যে, আমাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ও ব্যক্ত বাসনাই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের অসাংসারিক মনই মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক সূত্রে আবদ্ধ করে। আমাদের জীবনের মূলে যা আছে, তা তেল নয়—রস। জীবনের এই মূল ধাতু নিয়েই কবির কারবার। বঙ্গসাহিত্য কাব্যে যে অপূর্ব্ব গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ বাঙ্গালার রবি আজ সমগ্র সভ্যজগৎকে উদ্ভাসিত করেছে।

১৬

আমি এখন বঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ কাব্যাংশের কথা ছেড়ে দিয়ে তার অপরাংশের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বঙ্গ-সাহিত্য শুধু উঁচু দিকে বাড়ছে না, সেই সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হচ্ছে। এ ভাষায় বহুলোক আজ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আজকের দিনে দেশের ইতিহাসের পরিচয় লাভ করতে হলে আমাদের আর পরের ভাষার দ্বারস্থ হ'তে হয় না, আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাইনে যে, ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে হেরডোটাস, থুসি-ডিডিস্, লিভি, ট্যাসিটাস্ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালাতে যখন ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় নব গিবন মমসেনের জন্মের আশা আমরা করতে পারি।

য়ুরোপে essay নামক এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে, যার বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার ইত্যাদি। এ শ্রেণীর সাহিত্যও বাঙ্গালাভাষায় স্থান পেয়েছে। আমাদের রচিত essay প্রভৃতির মূল্য যে কি, সে প্রশ্নের উত্তর

অন্তলগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তা হলেও বলতে হবে যে, সে সব লেখা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কারণ, এই সব লেখাই এ সত্যের দলিল, যে আমাদের মন আজ সজাগ হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মুখও ফুটেছে। বাঙ্গালীর আজ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলবার আছে, এবং সে কথা তারা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে শিখেছে। মনের বহু অব্যক্ত ভাব আজ ভাষায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

১৭

যাকে মানুষ কাযের কথা বলে, তা-ও সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। ধরুন এই পলিটিক্সের কথা। আজকের দিনে অনেকের বিশ্বাস এই যে, এর চাইতে বড় কাযের কথা ভূভারতে নেই। বাঢ়ম্‌! কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, দু'খানি সাহিত্যগ্রন্থ যুগ যুগ ধ'রে সে দেশের পলিটিকাল মনের উপর প্রভুত্ব করেছে। মাকিয়াভেলির Prince এবং Rousseau's Social Contract হচ্ছে সে ভূভাগের পলিটিকাল চিন্তার পূর্ব্ব-মীমাংসা আর উত্তর-মীমাংসা। গত দু'শ' বৎসরের ভিতর য়ুরোপে কম করেও দু' লক্ষ পলিটিক্সের গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করেছে; কিন্তু সে সব গ্রন্থই ও দুখানি বইয়ের হয় অনুবাদ, নয় প্রতিবাদ—আর না হয় ত ও দুই মতবাদের একটা মীমাংসামাত্র। এর কারণ কি?—কারণ এই যে, মাকিয়াভেলি ও রুসো উভয়েই মানুষের পলিটিকাল মনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মর্ম্ম উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে কাযের কথা মাত্র, তা তাঁদের কাছে মানব-মনের চিরন্তন ভাবের কথা হয়ে উঠেছে। যাঁর কথা কর্ম্মের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের সন্ধান আমাদের দেয়, তাঁর কথাই অমরত্ব লাভ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পলিটিক্সের কথা আমাদের মুখের কথাই থেকে যাবে, প্রাণের কথা হবে না, যত দিন না তা বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়। কাযের কথা জ্ঞানের দ্বারা, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা পরিষ্কৃত ও হৃদয়-রাগে রঞ্জিত না হ'লে তা সাহিত্যে স্থান পায় না। পরের কাছ থেকে ধারকরা মনোভাব আমাদের শুধু উত্তেজিত করতে পারবে, কিন্তু আমাদের আত্মশক্তি প্রস্ফুটিত করতে পারবে না, যত দিন না সে ভাবকে অন্তরের বকযন্ত্রে চুঁইয়ে আমরা আমাদের মনের রক্তমাংসে পরিণত করতে পারি। যে অন্তর্গূঢ় রাসা-করতে পারব, সেই প্রক্রিয়ার ফলে এ বিষয়ে নব সাহিত্যের সৃষ্টি হবে। পলিটিক্স যে কবে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা বলা কঠিন। কারণ, তার আগে তা বঙ্গভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। ও বস্তু আজও সম্পূর্ণ ইংরাজীর দখলে। এ দেশের পলিটিক্সকে মনের ধনে পরিণত করতে হ'লে তাকে এই পর-ভাষার অধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। যত দিন আমরা তা করতে না পারি, তত দিন তা খবরের কাগজের দখলেই থেকে যাবে—অর্থাৎ তা হবে যুগপৎ অনুকরণ ও অনুবাদ। সংক্ষেপে জ্ঞানমার্গের ও কর্ম্মমার্গের সকল বিষয়ই আমাদের ভাষার অন্তর্ভূত করতে হবে, নচেৎ বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হবে না।

১৮

জর্ম্মাণ দেশের বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের যথার্থ মনের কথা তার সজ্ঞান মনের কথা নয়; সে কথা তার মনের গোপন কথা। আর সে কথা ধরা পড়ে তার স্বপ্নে, তার জ্ঞানমূলক কর্ম্মে নয়। কথাটা শুনতে যতটা নতুন শোনায়, আসলে কিন্তু ততটা নতুন নয়। যুগ যুগ ধ'রে বহুলোকের মনে এ সত্যের একটা অস্পষ্ট ধারণা যে ছিল, তার পরিচয় বিশ্ব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ফ্রয়েডের মত যে মূলতঃ সত্য, সে বিষয়ে য়ুরোপের বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

যেমন ব্যক্তিবিশেষের, তেমনই জাতিবিশেষেরও যথার্থ মনের কথা তার কাব্য থেকেই জানা যায়; কারণ, কাব্য হচ্ছে তার কল্পনার সৃষ্টি—ভাষান্তরে তার দিবা-স্বপ্নের ভাষায় গড়া প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। আমরা প্রত্যেকেই যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের সুষুপ্ত মন কাব্য রচনা করে। সে ক্ষণস্থায়ী ও অস্পষ্ট কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যের কাব্যের প্রভেদ এই যে, এ কাব্য সুস্পষ্ট আর চিরস্থায়ী।

বাঙ্গালীর মনের বিশেষ প্রকৃতি ও গতির যদি পরিচয় নিতে হয় ত তা' নিতে হবে বাঙ্গালীর রচিত গল্প ও গান থেকে। আজকের দিনে এলিজাবেথের যুগের ইংরাজী মনের সন্ধান জানবার জন্য আমরা যেমন Bacon-র দ্বারস্থ হইনে, হই Shakespeareএর; ভবিষ্যতে লোক তেমনই অতীত বাঙ্গালী-মনের পরিচয় লাভ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের

আবার আমরাও যদি আমাদের জাতের ভবিষ্যৎ মানসিক প্রকৃতির বিষয়ে কৌতূহলী হই, তা হ'লেও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রবৃদ্ধ নব-ধারার দিকে নজর দিতে হবে।

১৯

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ যুগে যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাচ্ছে, তা হচ্ছে গল্প। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, যুগধর্ম্ম অনুসারে পৃথিবীর সাহিত্য-রাজ্য এ যুগে গল্পের অধিকারে আস্‌ছে। এ সব গল্পের গুণ বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে, এ ব্যাপার আমাদের আশার কথা। যে জমীতে ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে জমী যে উর্ব্বর, সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই। এই গল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনাতীত উৎপত্তিই প্রমাণ যে, বাঙ্গালীর মনের জমী দিন দিন বেশী উর্ব্বর হয়ে উঠছে।

এই গল্প-সাহিত্যের প্রতিপত্তি দেখে অনেকে ভয় পান। তাঁদের ধারণা যে, গল্প-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি সৎসাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আগাছার উপদ্রবে যেমন ভাল গাছ মারা যায়, তেমনই সাহিত্যের এই আগাছা উঁচুদরের সাহিত্য ব'লে যদি কোনও সাহিত্য থাকে, ত কোনরূপ পারিপার্শ্বিক নীচু সাহিত্য তার বিনাশসাধন করতে পারবে না। যে সাহিত্য সকল বাধা অতিক্রম ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, ও মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, তা উঁচুদরের সাহিত্য নয়।

গল্প-সাহিত্যের যে অনেকের কাছে যথোচিত মান্য নেই, তার একটি কারণ এই যে, অনেকের বিশ্বাস, ও-শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করা অতি সহজ। ঠুংরী যে সঙ্গীতরাজ্যে উচ্চপদ লাভ করে নি, তারও কারণ, এই যে, অনেকের ধারণা, ও গান গাওয়া অতি সহজ; কারণ, ঠুংরী শেখবার জন্য তাদৃশ কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না, যতটা করতে হয় ধ্রুপদ শিক্ষা করবার জন্য। কথা সত্য, কিন্তু সঙ্গীত বা সাহিত্য এর কোনটিরই শ্রেষ্ঠত্ব, কে কতটা মেহন্নত করেছে, তার উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে রচয়িতার স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর, শাস্ত্রে যাকে বলে প্রাক্তন সংস্কার, তারই সদ্ভাবের উপর। সঙ্গীতপ্রাণ শ্রোতামাত্রেই জানে যে, যথার্থ ঠুংরী শুধু আছে সুরেলা কান ও সুরেলা প্রাণ। লোককে মেরেপিটে হয় ত চলনসই অর্থাৎ অচল ধ্রুপদী বানানো যেতে পারে, কিন্তু ও উপায়ে ঠুংরী-গায়ক বানানো যায় না। ও বস্তু যেমন-তেমন ক'রে গাওয়া যেমন সহজ, ভাল ক'রে গাওয়া তেমনই কঠিন।

পৃথিবীর সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য্য দেখেই লোকের মনে এ ভুল ধারণা জন্মেছে, এবং তার ফলে অনেক লেখকও স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়েছেন। যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তিনি তা না লিখে যে নিকৃষ্ট গল্প লিখছেন, অর্থাৎ গল্প-সাহিত্যের শরৎচন্দ্র হ'তে গিয়ে নষ্টচন্দ্র হচ্ছেন,—এর দৃষ্টান্ত বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল নয়। কথায় বলে "গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে।" এরূপ আনন্দধ্বনিও বাঙ্গালায় নিত্য শোনা যায় এবং সে ধ্বনি অবশ্য শ্রোতার আনন্দবর্দ্ধন করে না।

এই সব কারণে আমি বঙ্গ-সাহিত্যের তরফ থেকে এ দাবী করতে পারিনে যে, আমাদের মাসিকপত্রে মাস মাস যত গল্প বিকশিত হয়, তা সবই কাব্য-কুসুম। তার বেশীর ভাগই কাগজের ফুল, অর্থাৎ তাতে প্রাণ নেই, মন নেই; আর সম্ভবতঃ এ-জাতীয় অনেক ফুল বিলেতী কাগজ কেটে বানানো। তবে পৃথিবীর কোন্ সাহিত্যের এই একই অবস্থা নয়? আমার বিশ্বাস, সকল সাহিত্যেই অমূল্য কাব্যের সংখ্যা অতি কম, আর যার কোন মূল্য নেই, তাই অসংখ্য। অসাধারণকে সাধারণ করা তেমনই অসম্ভব, সাধারণকে অসাধারণ করা যেমন অসম্ভব।

২০

এ সত্ত্বেও আমি এই গল্প-সাহিত্যের আতিশয্য বঙ্গ-সাহিত্যের একটা সুলক্ষণ ব'লে মনে করি। দশে মিলে যে জমী তৈরি ক'রে যাচ্ছেন, তার উপরেই ভবিষ্যতে কাব্যের যথার্থ ফুল ফুটবে। আজকের দিনে বহু লেখকের রচিত গল্প যে কাব্য নয়, তার কারণ, তাঁদের কল্পনা তেমন পরিস্ফুট ও পরিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু এই নব সাহিত্যকে আর এক হিসাবে দেখা যেতে পারে। গল্প-সাহিত্য থেকে জাতির নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যদি এই সাহিত্যকে আমাদের মনের শুধু দলিল হিসেবে দেখি, তা হ'লে দেখতে পাই যে, এর অন্তরে একটি নূতন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সে

নানা প্রকার চিরাগত আচার ও সংস্কারে বদ্ধ। বাঁধাধরা আচার-বিচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের কল্পনাই এই নব-সাহিত্যের মূল কল্পনা। এ সাহিত্য আকারে কতকটা বস্তুতান্ত্রিক হলেও, বাস্তব-জীবনের প্রতিকৃতি নয়। কেন না, নব-সাহিত্যের কল্পনা বাস্তব-জীবনের epi-phenomenon নয়, তার থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ উড়ো-কল্পনা। যে কল্পনার ভিত্তি জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কখন কাব্যের সামগ্রী হ'তে পারে না। কিন্তু আমাদের যুবকরা আজ যে স্বপ্ন নিজেরা দেখছেন, সে স্বপ্ন তাঁরা বহু লোককে দেখাচ্ছেন। ফলে জাতির মন এই সব নূতন স্বপ্নে ভরে উঠবে। এর ফল আমাদের সামাজিক জীবনের উপর যা-ই হোক, আমাদের মানসিক জীবনের সুর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দেবে। যারা সামাজিক জীবনের উপর সাহিত্যের ফল সু কি কু, তাই বিচার করতে যান, তাঁরা সামাজিক লোক ভবিষ্যতে বেশী সুখী হবে কি দুঃখী হবে, তারই হিসেব করতে ব্যস্ত। এ ভাবনা সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ, সুখদুঃখ পৃথিবীতে চিরকাল ছিল, আজও আছে, এবং চিরকাল থাকবে। বদল হয় শুধু তার নাম-রূপের। সুখদুঃখ মনের জিনিষ এবং মনই প্রতি যুগে তার বিভিন্ন রূপ দেবে। সে যাই হোক্, সাহিত্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট ক'রে তার স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তা আপনারাই বিবেচনা করবেন।

২১

আমি এতক্ষণ ধ'রে আপনাদের কাছে যে বাগ্‌বিস্তার করলুম, তার ভিতর হয় ত কোনও সার কথা নেই। আমি এ সভায় কোনও নব-বাণী ঘোষণা করবার জন্য উপস্থিত হই নি, এসেছি শুধু আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে এবং সেই উপলক্ষে আপনাদের পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে। সুতরাং আমার কথা যথাসাধ্য আলাপের অনুরূপ করতে চেষ্টা করেছি। যদি অনেক বাজে কথা ব'লে থাকি ত সে প্রগল্‌ভতা আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে সাহিত্যের কথা সুহৃৎ-সম্মিতবাণী, প্রভুসম্মিতবাণী নয়। এ মত আমি চিরকালই প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য ক'রে এসেছি। প্রভুসম্মিতবাণী অর্থাৎ শুধু ধর্ম্ম-গুরুদের ও রাজপুরুষদেরই আছে। যারা লোক-মান্যও নয়, রাজমান্যও নয়, তাদের অর্থাৎ আমাদের মত সাহিত্যিকদের সে অধিকার নেই। তাই আমরা আমাদের বাণী এমন কোনও মন্ত্রাকারে প্রকটিত করতে পারি নে, যে মন্ত্র জপ ক'রে লোক মোক্ষ লাভ করবে; এমন কোনও সূত্রাকারে পরিণত করতে পারি নে, যে সূত্র লোক ভক্তিভরে বক্ষে ধারণ ক'রে দ্বিজত্ব লাভ করবে।

মন্ত্র রচনা করা ও সূত্র রচনা করা হচ্ছে ধর্ম্মপ্রচারক ও পলিটিকাল প্রচারকদের ব্যবসা। সত্য কথা এই যে, সাহিত্য-জগতে কোনও প্রচারক নেই এবং থাকতে পারে না। এ রাজ্যে যিনি যে মুহূর্ত্তে প্রচারকার্য্য সুরু করেন, তিনি তন্মুহূর্ত্তে সরস্বতীর রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হন—স্বাধিকার প্রমত্ততার অপরাধে। এর কারণ, সাহিত্য কোন বিষয় প্রচার করে না, সব জিনিষই প্রকাশ করে। তাই পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সাহিত্য ব'লে এক জাতীয় সাহিত্য আছে, যা ধর্ম্মের মন্ত্রভাগ নয়, আর পলিটিকাল সাহিত্য বলেও এক জাতীয় সাহিত্য আছে, যা পলিটিক্সের যন্ত্রভাগ নয়; এ রাজ্যে প্রকাশই প্রচার, কেন না, সাহিত্য আলোকধর্ম্মী। আর আলোর ধর্ম্মই এই যে, তা আপনা হতেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

২২

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে একটা মস্ত বড় আশা আছে; সে আশা যে দুরাশা নয়, আপনাদের কাছে তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েছি কি না, বলতে পারি নে। মনে রাখবেন, ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোনও বর্ত্তমান প্রমাণ নেই। সে বিষয়ে আমাদের আশাই একমাত্র প্রমাণ।

মানুষের ভাষা একটা স্রোত, মানুষের মনও একটি স্রোত; এবং এই দুই স্রোতে মিলে যে স্রোতের সৃষ্টি করে, তার নাম সাহিত্য-স্রোত। অবশ্য এ স্রোতের অন্তরে কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাহিত্যের অন্তরে এখন জোয়ার এসেছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান একটা শুভলগ্ন।

রামপ্রসাদ বলেছেন যে,—

"প্রসাদ বলে থাক ব'সে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।"

(যখন) জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে,

ভাটিয়ে যাবে, ভাটার বেলা॥"

ধর্ম্মের দিক্ থেকে দেখতে গেলে, এ উপদেশ যে খুব বড় কথা, তা আমি মানি। এ হচ্ছে ভগবানে আত্মসমর্পণের চরম উক্তি। আর দর্শনের দিক্ থেকে দেখতে গেলেও দেখা যায় যে, এ সত্য কথা। মানুষের আকাশ-জোড়া অহঙ্কার নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, যখন সে জানতে পায় যে, মানুষের ক্ষুদ্র অহং সৃষ্টি প্রবাহের উপরে ভাসমান খড়কুটো মাত্র। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই অনন্ত রহস্যের ভাবনায় অভিভূত হ'লে মানুষের সকল ক্রিয়াশক্তি এক দম পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাই মানবজীবনের কোন ব্যাপারেই রামপ্রসাদের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, সাহিত্যিক জীবনেও নয়। মানুষকে জোয়ারের সময় ভেটিয়ে যেতে হয়, ভাটার সময়েও উজিয়ে যেতে হয়, যদি তার কোনও নির্দ্দিষ্ট গম্য স্থান থাকে। আমরা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের স্বরাজ্যলাভ করতে চাই ত আমাদের হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। কে জানে কখন্ আবার ভাটা আসবে? বর্ত্তমান জোয়ারের উপর বেশী ভরসা রাখা যায় না। কেন না, তা এসেছে বাইরে থেকে। আমরা যাতে এ জোয়ার চ'লে গেলে কাদায় না পড়ি, তার জন্য বঙ্গসাহিত্যে আমাদের অন্তরের জোয়ার বওয়াতে হবে। তা বওয়ানো, সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। এ ইচ্ছা আমাদের মনে জন্মলাভ করেছে, এখন তাকে শক্তসমর্থ করবার দায়িত্ব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হাতে। আশা করি, এ দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা বাঙ্গালীরা উদাসীন হব না,—"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সন্ধ্যা

রক্ত-কিরণ ছড়ায়ে তপন হাসি' জলদের গায়,
অস্ত অচলে পড়িছে ঢলিয়া সুন্দর হেমাভায়!
পাতায় পাতায় মধুর লালিমা—
ছড়ায়েছে, নাহি মাধুরীর সীমা
কুসুম-কলিকা হিল্লোলে ধীরে মন্দ-মধুর-বায়।

তটিনীর নীর ক্ষেত্র-হরিৎ শ্যামল-শষ্পরাশি
স্বর্ণ-ময়ূখে আবরিল কায়—মধু-শোভা পরকাশি'!
সরিতে—কুমুদ বিকশিয়া উঠে
উন্মুখ হিয়া ধীরে ধীরে ফুটে,
আশা-প্রেম ধরি' বক্ষেরি পুটে হাসিছে মধুর হাসি!

স্বর্ণ-কিরণ অপসারি' পুন নামিল ধরণী 'পরে—
শ্যামলা সন্ধ্যা, শ্যামলাঞ্চল দুলায়ে শ্যামল-করে।
কুন্তলে শোভে তারকার মালা
নীবিবন্ধেতে পুষ্প-মেখলা
নিশি-গন্ধার কর্ণভূষায় সাজিয়া পুলক-ভরে।

গোষ্ঠ হইতে ফিরিছে রাখাল গৃহে, ধেনুপাল লয়ে,
দিগন্ত ভরি' কাকলীতে চলে পাখিকুল নির্ভয়ে;
চকোরীর প্রাণে ওঠে আশা জাগি'
চন্দ্রিকা-সুধা-আস্বাদ-লাগি'
মিটিবে পিয়াসা-সঞ্চিত, চারু চন্দ্রমার উদয়ে।

উদিল গগনে শশধর ওই ঢালিয়া রজত-কর,
সোহাগী সরসী ধরিল বক্ষে মাধুরী সে মনোহর!
রোষ-কম্পিত কুমুদের দল
হরিল সরসী তার সম্বল,
উদ্ধেতে পুন চাহিয়া পুলকে কম্পিল থর থর!

হাস্য-লহরে মুখরিয়া তুমি পল্লীর বধূ ধীরে,
ওই আসে সবে নর্ত্তন-তালে কলস ভরিতে নীরে।
বুঝি বা কাহারো দয়িত প্রবাসী
আসিবে ফিরিয়া, তাই এত হাসি?
চল-চঞ্চল-চরণে আবার ঘরে যেতে হবে ফিরে!

সহসা তিমিরে ছাইল ধরণী প্রলয়ে ছনিবার!
চন্দ্র লুকায় কালো মেঘ-জালে, বিশ্ব-অন্ধকার!
কোথা তারা-মালা কোথা শোভারাশি—
কোথায় লুকাল কুমুদীর হাসি?
ছায়া-বাজি প্রায় লুকাল কোথায় জ্যোৎস্না চমৎকার?

ওরে বধূ কারো রবে না এ দিন, সে দিন আসিবে ত্বরা,
জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইবে যবে, শোভাময়ী এই ধরা—
এমনি করিয়া ছাইবে আঁধারে
যাবে অনুভূতি—বিস্মৃতি-পারে,
পাথেয়-বিহীনা! শূন্য কলস সময় থাকিতে ভরা!

শ্রীমতী বীণাপাণি রায়।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আগন্তুক

জোসেফ কুরেটকে রুসিয়ার সীমাপ্রান্তে কসাক সৈন্যদলের হস্তে সমর্পণ করিয়া পাঠকপাঠিকাগণকে সেণ্টপিটার্সবর্গে রেবেকা কোহেনের সন্ধানে যাইতে হইবে।

কালনকির সহিত বিবাদের পর রেবেকার মন অশান্তি ও উদ্বেগে পূর্ণ হইয়াছিল। রেবেকা জানিত, কালনকি তাহার স্বাক্ষরিত যে একরারনামাখানি হস্তগত করিয়াছিল, তাহার সাহায্যে তাহাকে ও তাহার বৃদ্ধ পিতাকে অতি সহজে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিতে পারিত। কালনকির হস্তে সে আত্মসমর্পণ না করিলে কালনকি তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে—এ কথাও তাহাকে জানাইয়াছিল; সুতরাং কালনকিকে বশীভূত করিতে না পারিলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া রেবেকা তাহাকে বশীভূত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন উপায় সে স্থির করিতে পারিল না। যে অপমান ভদ্ররমণীর অসহ্য, কালনকি ভৃত্য হইয়াও রেবেকার নিকট সেইরূপ অপমানজনক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। রেবেকা তাহার অশিষ্ট উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছিল; আবার সে কোন্ মুখে কালনকির করুণা ভিক্ষা করিবে? রেবেকা পুনর্ব্বার তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলে, কালনকির ধারণা হইবে, সে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছে। এই ভাবে আত্মসম্মান নষ্ট করা অপেক্ষা মৃত্যু সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় বলিয়াই রেবেকার ধারণা হইল। কালনকির ন্যায় ঘৃণিত জীবের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে রেবেকার অত্যন্ত ঘৃণা হইল। তথাপি কালনকি যাহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল।

হইয়া তাহার মৃত্যুবাণ কালনকির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল বিষময় হইবে, ইহা সে পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছিল, কালনকি ভয়ঙ্কর স্বার্থপর। সেই বিশ্বাস-ঘাতক প্রভুদ্রোহীকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া সঙ্কল্পচ্যুত করা তাহার অসাধ্য; যদি এই ব্যাপারে রেবেকার বৃদ্ধ পিতার স্বার্থ বিজড়িত না থাকিত, যদি তাঁহার নির্ব্বাসনের আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে রেবেকা নিজের বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইত না। উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ রাজ-রোষ সে নীরবে মস্তকে ধারণ করিত, বিপদের খরস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু স্নেহময় পিতার বিপদের আশঙ্কায় রেবেকার স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা বিলুপ্ত হইল। দুই সপ্তাহ দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া সে অসুস্থ হইল; কিন্তু দুই সপ্তাহমধ্যে কালনকি তাহাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিল না দেখিয়া তাহার মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। তাহার অনুমান হইল, সম্ভবতঃ কালনকির মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু দুই দিন পরেই তাহার এই আশা শূন্যে বিলীন হইল। রেবেকা এক দিন সায়ংকালে নগর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র কালনকি তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "রেবেকা, তুমি কি মনে কর, মানুষের ধৈর্য্যের সীমা নাই? আমার কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গত দুই সপ্তাহ হইতে আশা করিতেছিলাম, নিজের অবস্থা বুঝিয়া তুমি অহঙ্কার ত্যাগ করিবে, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে; কিন্তু এখনও আমার প্রস্তাবে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তোমার ভাগ্য-নিয়ন্তা, ইহা জানিয়াও আমাকে অবজ্ঞা করিতে তোমার সাহস হইতেছে, ইহা তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার নিদর্শন ভিন্ন আর কি? যদি তুমি তোমার প্রণয়ী জোসেফ কুরেটকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ না করিতে, কপট ব্যবহারে আমাকে প্রতারিত না করিতে, তাহা হইলে

প্রণয়ীর স্বার্থরক্ষার জন্য আমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সে আমার নিকট বিন্দুমাত্র দয়ার প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

কালনকির কথায় রেবেকার দেহের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয় ঘৃণায় পূর্ণ হইল; তাহার মুখে কথা ফুটিল না। রেবেকা অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল। ক্রোধে ও অপমানে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

রেবেকার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কালনকি বলিল, "আমার কথা শুনিয়া তুমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছ; কিন্তু নিষ্ফল ক্রোধে বিচলিত হইয়া তোমার কোন লাভ নাই। তুমি বলিতে পার, জোসেফ কুরেটই তোমার মনের মানুষ, আমাকে তোমার মনে ধরে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি কোন বিষয়েই তোমার প্রণয়ী জোসেফ অপেক্ষা হীন নহি, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ,—হাঁ, বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এখন তোমার সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে;—একটি পথ ধ্বংসের, আর একটি পথ—আমার আশা পূর্ণ করিয়া সুখশান্তি-লাভের। এই দুইটি পথের কোনটি তুমি অবলম্বন করিবে, তাহা শীঘ্র স্থির কর। তুমি আমার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, এরূপ আশাকে মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিও না।"

কালনকির এই অশিষ্ট উক্তিতে রেবেকার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল; সে আর ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দেখ কালনকি, যদি তোমার ধারণা হইয়া থাকে, কাপুরুষের মত ভয়প্রদর্শন করিয়া বা চাবুক মারিয়া রমণীর হৃদয় জয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তোমাকে মহামূর্খ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, আমি অন্যের বিবাহিতা পত্নী। যদি তুমি আশা করিয়া থাক, আমাকে উপপত্নীরূপে লাভ করিবে, তাহা হইলে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আমি শতবার মৃত্যুকে বরণ করিব, তথাপি ব্যভিচারিণী হইব না। তোমার ছায়াও আমার অস্পৃশ্য।"

রেবেকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল। কালনকি দুই এক মিনিট স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "উঃ, কি দর্প! কি তেজ! আমাকে উপেক্ষা করিয়া স্পর্দ্ধাভরে চলিয়া গেল! যাও সুন্দরি! আমিও দেখিব, আমার আলিঙ্গন অপেক্ষা মৃত্যুর আলিঙ্গনই তোমার বাঞ্ছনীয় কি না।"

রেবেকা অতঃপর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল; বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে কয়েক মিনিট নিঃশব্দে রোদন করিল; মনে মনে বলিল, "হে পরমেশ্বর, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে নির্ম্মমভাবে একটা রাক্ষসের কবলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমার উন্নত মস্তক মাটীর ধূলায় লুণ্ঠিত করিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন প্রভু? এই নবীন বয়সে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, আমার বৃদ্ধ পিতা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হউন, অথবা ঘাতুকের তরবারিতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হউক, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? এ সকল কথা ত এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করি নাই, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় এত দিন নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। এখন অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ না করিলে আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না। এখন আমি নিরুপায়, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি, যদি তিনি এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় স্থির করিতে পারেন।"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া রেবেকা তাহার পিতার খাস-কামরায় প্রবেশ করিল। সলোমন কোহেন তখন ডেস্কের নিকট বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বিস্মিত হইলেন। রেবেকা তাঁহার সম্মুখস্থিত একখানি চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল এবং কোন ভূমিকা না করিয়া তাহাদের আসন্ন বিপৎ-সংক্রান্ত সকল কথাই তাঁহার গোচর করিল।

সলোমন কোহেন নিস্তব্ধভাবে রেবেকার সকল কথা শ্রবণ করিলেন, আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। দারুণ বিস্ময়ে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল; কিন্তু তিনি রেবেকাকে একটিও কঠিন কথা বলিলেন না, তাহাকে তিরস্কার না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ যে বড়ই বিষম ব্যাপার রেবেকা! কিন্তু অর্থ দ্বারা সকলই ক্রয় করিতে পারা যায়; আমার বিশ্বাস, কালনকিকে ক্রয় করাও অসাধ্য নহে। হয় ত এ জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু অর্থব্যয়ে ...

চলিবে না, তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

সেই রাত্রিতেই সলোমন কোহেন কালনকিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কালনকি অসঙ্কোচে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রেবেকার সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছে, এবং যে সকল কথা বলিয়া তুমি তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা সমস্তই আমি শুনিয়াছি; কিন্তু তুমি আমাদের অনিষ্টসাধনের জন্য সত্যই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; কারণ, আমাদের শত্রুতাচরণ করিয়া, এমন কি, আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াও তুমি যে যথেষ্ট লাভবান্ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। হয়'ত গোয়েন্দাগিরীর পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু টাকা পাইবে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এরূপ অধিক নহে যে, তাহাতেই তোমার সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। তুমি রেবেকার নিকট হইতে যে একরারনামাখানি লইয়াছ, তাহাতে সে নাম স্বাক্ষর করিয়া অত্যন্ত মূঢ়তার পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু সে জন্য এখন আক্ষেপ নিষ্ফল। সেই একরারনামা তোমার কাছে আছে, তাহার একটা মূল্যও আছে। তুমি কত টাকায় তাহা আমাকে বিক্রয় করিতে পার বল, যত টাকা চাহিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।"

কালনকি অচঞ্চল স্বরে বলিল, "সেই একরারনামার বিনিময়ে আপনার কন্যাকেই চাই। এ কথা আমি তাহাকেও বলিয়াছি।"

বারুদের স্তূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শে যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কালনকির কথায় সলোমন কোহেন সেইরূপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; মুহূর্তের জন্য তিনি সংযম হারাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "যদি পরিহাস করিয়া এ কথা বলিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিহাস; আর যদি পরিহাস না হইয়া ইহা তোমার অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নরাধমকে আমার কন্যার মানসম্ভ্রম বিলাইয়া দিব, এত বড় স্পর্দ্ধিত আশা তোমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

কালনকি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, বা কটূক্তিতে আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইবে, তাহা হইলে আপনি এখনও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে; আমার ইচ্ছা বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনার ধারণা যাহাই হউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

সলোমন কোহেন।—কত টাকা পাইলে তুমি আমাদের অনিষ্টচেষ্টায় বিরত হইবে?

কালনকি।—আমাকে ক্রয় করিতে পারেন, তত টাকা আপনার ধনভাণ্ডারে নাই, এবং আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও তত অর্থ আপনি সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। টাকা ঢালিয়া আপনি আমার মুখ বন্ধ করিবার আশা ত্যাগ করুন।

কালনকির অবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সলোমন কোহেন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, অতঃপর ধৈর্য্য ধারণ করা তাঁহার অসাধ্য হইল; তিনি ক্রোধে কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তুমি নিমকহারাম, কাপুরুষ, নরাধম!"

কালনকি অচঞ্চলস্বরে বলিল, "আপনি একটিও নূতন কথা বলেন নাই; আপনার কন্যা ঠিক ঐ কথাগুলি বলিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিল।"

সলোমন কোহেন ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমার কন্যা সত্য কথাই বলিয়াছিল; সেই কথা আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তুমি বিশ্বাসঘাতক, ইতর, বর্ব্বর, ঘৃণিত জীব। যদি তুমি আশা করিয়া থাক, তোমার প্রসন্নতালাভের জন্য, তুমি আমাদের অনিষ্টসাধনে বিরত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে, এই প্রত্যাশায় আমার স্নেহময়ী দুহিতাকে তোমার মত পশুর হস্তে সমর্পণ করিব, তাহা হইলে আমি ইস্রায়েলের পরম দেবতার নামে শপথ করিয়া, পরমেশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, তোমার আশা সফল হইবে না। এই মূল্যে আমাদের স্বাধীনতা ক্রয় করিব না। তুমি আমাদের অনিষ্ট করিবে, আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে? যাও, তোমার যাহা সাধ্য—কর। কিন্তু আলেকজান্দার কালনকি! আমার এ কথাও তুমি স্মরণ রাখিও, তোমার বিশ্বাসঘাতকতায়, তোমার সয়তানীতে যে দিন আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সে দিন রুস গবর্মেণ্টের সহস্র গুপ্তচর এবং

ভীষণ প্রতিহিংসানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না; সেই অনলে তুমি ভস্মীভূত হইবে! আমি আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ দুর্ব্বল বৃদ্ধ—তুমি আমাকে চূর্ণ করিতে পার, আমার কন্যা অসহায়া বালিকা—তুমি তাহাকে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত করিতে পার; তাহার সম্মান নষ্ট করাও তোমার অসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু এ কথা তুমি স্থির জানিও যে, নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা তোমার অসাধ্য; কেবল তুমি কেন, রুসিয়ার বিপুল রাজশক্তিরও সাধ্য নাই, তাহা চূর্ণ করে। এই সম্প্রদায়ের প্রভাব বহুদূর-ব্যাপী, তাহাদের জটিল ষড়যন্ত্র অন্তের দুর্ব্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য; তাহাদের প্রতিহিংসার অনল চির-প্রজ্বলিত, তাহা হইতে পরিত্রাণলাভের শক্তি কাহারও নাই। তাহাদের চক্ষু অসংখ্য, কেহই তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে এরূপ স্থান কোথাও নাই—যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিহিলিষ্টের প্রতিহিংসানল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে। যাও, তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করিতে পার।"

তরল বহ্নিস্রোতের ন্যায় এই বাক্যস্রোতে কালনকি অভিভূত হইয়া পড়িল; তাহার মুখ মলিন হইল, তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সলোমন কোহে-নের বাক্যে এবং বর্ণনা-ভঙ্গীতে এরূপ ভীষণ সত্যের ছাপ ছিল যে, তাহা কালনকির কর্ণকুহরে অমোঘ দৈববাণীবৎ প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার ক্রোধ যে সমগ্র নিহিলিষ্ট সম্প্র-দায়ের বিশাল দাবানল তুল্য ক্রোধেরই একটা স্ফুলিঙ্গ এবং তাহার দাহিকাশক্তি কিরূপ ভীষণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কালনকি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু তাহার বিচলিত ভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কালনকি অবিলম্বে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল, "আপনার মাথা গরম হইয়াছে; এখন আপনার মুখ হইতে কোন যুক্তিসঙ্গত কথা বাহির হইবে না, আপনি মন স্থির করুন।"

সলোমন কোহেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমার কথা অযৌক্তিক? না, যে নরাধম ভয়প্রদর্শন করিয়া আমার কন্যার সম্মান নষ্ট করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহার চৈতন্যোদয়ের জন্য যেরূপ যুক্তি অপরিহার্য্য, তাহাই আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা অপ্রাসঙ্গিক নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের দুর্জ্জয় শক্তি ও ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা কালনকির অজ্ঞাত ছিল না; সে মেজাজ একটু নরম করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে চরম কথা শুনাইয়া দিলেন। রেবেকা আমাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া, তাহার অনুরোধে অসাধ্যসাধন করিয়াছি; আর আমাকে লইয়া সে পুতুল-খেলা করিয়াছে! সে ত জানিত, সে অপরের বিবাহিতা পত্নী, তথাপি সে তাহার প্রণয়ী জোসেফ কুরেটকে নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কপট প্রেমের অভিনয়ে আমাকে প্রলুব্ধ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এখন সে আমাকে নিরাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, আমি অগত্যা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি।"

সলোমন কোহেন উভয় হস্ত সবেগে ঊর্দ্ধে তুলিয়া, ক্রুদ্ধ নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে কালনকিকে বলিলেন, "ওরে মিথ্যাবাদী সয়তান! মুখোস খুলিয়া তুই যে মূর্ত্তি বাহির করিয়াছিস্—তাহা কিরূপ কুৎ-সিত, কত দূর জঘন্য—তাহা কি জানিতে পারিস্ নাই? আমি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তিনি যেন অবিলম্বে তোর অভিশপ্ত মস্তক চূর্ণ করেন। তোর চক্ষু দৃষ্টিহীন হউক, জিহ্বা খসিয়া পড়ুক। আমার কন্যা প্রেমের অভিনয়ে কোন দিন তোকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই; জোসেফ কুরেটও তাহার প্রণয়ী নহে।"

কালনকি ভয়ে বিস্ময়ে দুই হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, বিবর্ণমুখে বলিল, "আপনি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন! আপনার অভিসম্পাত আমি গ্রাহ্য করি না, আপনার ভয়প্রদর্শনেও আমার কোন ক্ষতি হইবে না। আপনি যখন প্রকৃতিস্থ হইবেন, তখন আপনার সঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব, তাঁহার পূর্ব্বে নহে।"

কালনকি সলোমন কোহেনকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সেই কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। রেবেকা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার পিতার ও কালনকির সকল কথাই শুনিতেছিল। কালনকি প্রস্থান করিলে, রেবেকা ব্যগ্রভাবে তাহার পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল; তাহার চক্ষু হইতে

অনেকবার বিপদের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রেবেকা আর কোন দিন তাঁহার এরূপ উত্তেজিত ও বিহ্বল ভাব দেখিতে পায় নাই; তাহার নির্ব্বুদ্ধিতায় তিনি হৃদয়ে কি প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছেন, তাহা বুঝিয়া রেবেকা অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইল।

রেবেকা তাহার পিতাকে একখানি কৌচে শয়ন করাইল এবং পাশে বসিয়া নিঃশব্দে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কয়েক মিনিট উভয়েই নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা সরিল না। অবশেষে সলোমন কোহেন প্রকৃতিস্থ হইয়া রেবেকাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "রেবেকা, এই কুটিলপ্রকৃতি কৃতঘ্ন খল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে এবং অত্যন্ত সাংঘাতিক অস্ত্র সে হাতে পাইয়াছে; আমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিব কি না, জানি না। সৌভাগ্যক্রমে আমার অধিকাংশ অর্থ রুসিয়ায় না রাখিয়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়াছি; তথাপি এ দেশে আমার যে সম্পত্তি আছে—তাহার পরিমাণও অল্প নহে; এই সম্পত্তি গবর্মেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইলে আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইব; তাহার উপর পুলিস যদি আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং এই সয়তানটা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রথমে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোন কৌশলে উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই।"

সলোমন কোহেন আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য যে উপায় স্থির করিলেন, তাহাই যে একমাত্র উপায়, এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত রেবেকার মতভেদ না হইলেও কি কৌশলে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, রেবেকা নতমস্তকে বসিয়া ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। রেবেকা বুঝিয়াছিল, কালনকির সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে, রেবেকা তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ না করিলে তাহার মুখ বন্ধ হইবে না, সে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবেই; অথচ রেবেকা তাহার ঘৃণিত প্রস্তাব সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অপমানিত হইয়া কালনকিকে সলোমনের গৃহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এখন রেবেকা কোন্ মুখে তাহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে? রেবেকা কোনও পন্থা দেখিতে পাইল না। যদি সে কোন কৌশলে তাহার স্বাক্ষরিত একরারনামা কালনকির নিকট হইতে ফেরত লইতে পারিত, তাহা হইলে কালনকি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারিত না; কারণ, সলোমন কোহেন রুস-সম্রাটের অনুরক্ত প্রজা, ইহা গবর্মেণ্টের সকল কর্ম্মচারীর সুবিদিত ছিল, তাঁহার অটল রাজভক্তিতে তাঁহাদের সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না; এতদ্ভিন্ন রাজধানীর সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য অধিবাসী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, বহু উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, এরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিনা প্রমাণে কেবল মুখের কথায় নিহিলিষ্ট বলিয়া গ্রেপ্তার করাইবার চেষ্টা করিলে কালনকিকেই হাস্যাস্পদ ও বিড়ম্বিত হইতে হইত; এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কালনকি রেবেকার নিকট হইতে তাহার স্বাক্ষরিত একরার-নামাখানি গ্রহণ করিয়াছিল। রেবেকা কি কৌশলে কালনকির কবল হইতে তাহা উদ্ধার করিবে, ইহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে ভাবিল, প্রাণপাত করিয়াও তাহার অনুরোধ রক্ষা করে, এরূপ কোন সাহসী, সুচতুর ও কর্ম্মঠ হিতৈষী বন্ধু থাকিলে সে তাহার সাহায্যে কালনকির নিকট হইতে একরারনামাখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিত এবং সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইত; কিন্তু রেবেকা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিবে? যে বন্ধুকে সে বিশ্বাস করিবে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার প্রমাণ কোথায়? তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়া বিপদের আশঙ্কা বর্দ্ধিত করিতে রেবেকার প্রবৃত্তি হইল না। অবশেষে তাহার মনে হইল, কোন নিহিলিষ্ট বন্ধুর সহায়তা গ্রহণ করিলে, তাহার বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না; কারণ, নিহিলিষ্টরা শত্রুর আক্রমণ হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে বাধ্য। কালনকি তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়া-ছিল, এ কথা নিহিলিষ্টগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা কালন-কিকে হত্যা করিবে, এ বিষয়ে রেবেকার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু কালনকি নিহিলিষ্ট-হস্তে নিহত হইলে, তাহাদের বিপ-দের আশঙ্কা দূর হইবে, ইহাই বা রেবেকা কি করিয়া বিশ্বাস করে? কালনকি গবর্মেণ্টের গোয়েন্দা, সে নিহিলিষ্ট-হস্তে

পুলিস হত্যা-রহস্য ভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের তদন্তের ফলে রেবেকার স্বাক্ষরিত একরারনামাখানি বাহির হইয়া পড়িলে তাহারা অধিকতর বিপন্ন হইবে।

রেবেকা সেই রাত্রি নানা দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিল, মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দীর্ঘকালেও সে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিল না। রেবেকা হতাশ হইয়া পড়িল; অতি কষ্টে সে দিন কাটাইতে লাগিল। এই সময় একটি লোকের কথা পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল; এই সঙ্কটকালে যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে তাহার নিকট আসন্ন বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারিত, হয় ত তাহার দ্বারা বিপদ্‌নিবারণের ব্যবস্থা হইত; কিন্তু সে কোথায়, কত দূরে? রেবেকা বহু দিন তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারে নাই।

কিন্তু দৈবের বিধান যেরূপ বিচিত্র, সেইরূপ বিস্ময়কর। কালনকির সহিত সলোমন কোহেনের বাগ্‌বিতণ্ডার পর পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। ষষ্ঠ দিন প্রভাতে সলোমন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন, রেবেকা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, তাহার বসিবার ঘরে বসিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাদের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল; সেই সময় এক জন ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, এক জন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আফিসে বসিয়া আছে। রেবেকা এই সংবাদে বিস্মিত হইল না, কারণ, অনেকেই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত; কিন্তু রেবেকা আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়াই আগন্তুককে দেখিয়া বিস্ময়ে এরূপ অভিভূত হইল যে, সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

আগন্তুক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হার রডলফ মোজে—কাউণ্ট ভন আয়েনবার্গের পরম বন্ধু।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-পরিচয়

রডলফ মোজে কাউণ্ট ভন আয়েনবার্গের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া পর আমরা তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। এই দীর্ঘকাল সে কোথায় কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছে, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু এত দিন পরে হঠাৎ তাহাকে রুস-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে সলোমন কোহেনের বাসভবনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ রেবেকা কোহেনের মতই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য রডলফ মোজের পূর্ব্ব-পরিচয় প্রকাশিত করা আবশ্যক।

রডলফ মোজে ইহুদী, সলোমন কোহেনের স্বজাতি। সে দীর্ঘকাল সেণ্টপিটার্সবর্গে বাস করিয়াছিল এবং কোহেন-পরিবারের সহিত তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। রাইন নদীর তীরবর্ত্তী মেয়েন্স নগর তাহার পৈতৃক বাসস্থান; কিন্তু সে মেইন নদীর তীরবর্ত্তী ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরবাসিনী একটি জার্ম্মাণ ইহুদী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। রডল্‌ফ মোজে সেণ্টপিটার্সবর্গে চালানী কারবার করিত, এবং চর্ম্ম, চর্ব্বি ও শস্যাদি ক্রয় করিয়া ইংরাজ ও জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের আড়তে প্রেরণ করিত। দীর্ঘকাল রুসিয়ায় বাস করায় সে রুসীয় প্রজার অধিকার লাভ করিয়াছিল; এ জন্য ব্যবসায়কার্য্যের উন্নতি করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল। রুসিয়ার আইন অনুসারে বিদেশী বণিকদিগকে সেই সকল সুযোগ দেওয়া হয় না। তাহার বয়সের তুলনায় তাহার স্ত্রীর বয়স অনেক কম ছিল; তাহার স্ত্রীর রূপের খ্যাতি সেণ্টপিটার্সবর্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল; মোজে সুপুরুষ না হইলেও তাহার কন্যা মায়ের ন্যায় রূপবতী হইয়াছিল। মোজে লোকের সঙ্গে মিশামিশি করিতে ভালবাসিত, অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, মেজাজও দরাজ ছিল; এ জন্য তাহার বিস্তর ইয়ার-বন্ধু জুটিয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীতেই তাহাদের আড্ডা বসিত। মোজের স্ত্রী তাহাদের সকলের সহিত অসঙ্কোচে মিশিত; মোজে সে জন্য রাগ করিত না বা স্ত্রীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিত না। সে তাহার স্ত্রীর চরিত্রে কোন দিন সন্দেহ করে নাই। তাহার স্ত্রী কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া যখন ইচ্ছা বন্ধুগণের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইত; তাহাতেও মোজের আপত্তি ছিল না।

এক দিন মোজে হঠাৎ একখানি বেনামা পত্র পাইল,

কোন লম্পটের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে; তাহার কুলে কালী দিয়াছে। তাহার কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিলে এরূপ অসতী স্ত্রীকে সে চাবুক মারিয়া সায়েস্তা করিবে এবং তাহাকে ঘরের ভিতর কয়েদ করিয়া রাখিবে। পত্রখানি পাঠ করিয়া মোজে হো হো করিয়া হাসিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তাহার ধারণা হইল—কোন রসিক বন্ধু পত্নীর প্রতি তাহার অনুরাগ ও বিরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য এই পত্রখানি লিখিয়াছিল। তাহার পত্নী অসতী, পরপুরুষের প্রতি অনুরক্তা! তোবা! সে তাহার স্ত্রীকে সেই পত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না; তাহাকে সতর্ক করাও আবশ্যক মনে করিল না।

এক মাস পরে ঐরূপ আর একখানি পত্র তাহার হস্তগত হইল; কিন্তু মোজে পত্রখানি এবার আর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ না করিয়া তাহার পত্নীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, পত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা কি সত্য? মোজের স্ত্রী পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল এবং তাহার সতীধর্ম্মে মিথ্যা কলঙ্কারোপের জন্য মিথ্যাবাদী ইতর অভদ্র পত্রলেখকের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার স্বামী বুদ্ধিমান হইয়াও এরূপ অসম্ভব কথা কি বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে মোজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। না বুঝিয়া সুহাসিনী সুভাষিণী সরলা সাধ্বী পত্নীর মনে কষ্ট দিয়াছে ভাবিয়া, মোজে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সেই পত্রখানিও অগ্নিকুণ্ডের অনলে দগ্ধ করিল। তাহার পর সে চাবুক লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল; তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী বলিল, "চাবুক লইয়া কোথায় যাও?" মোজে বলিল, "যে হতভাগা তোমার মিথ্যা গ্লানি করিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, চাবুক মারিয়া সায়েস্তা করিব, এ রকম পত্র আর কখন সে না লেখে। তাহার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার স্ত্রীকে বলে অসতী, পরপুরুষে আসক্তা?"

অপরাধীর সন্ধান না পাইয়া মোজে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিল এবং পরদিন অপরাধীর পিঠে বেত ভাঙ্গিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া আহারাদির পর শয়ন করিল। মন প্রফুল্ল করিবার জন্য সে একটু অধিক মাত্রায় সুধাপান করিয়াছিল, শয়নের অল্পকাল পরেই তাহার নাসাগর্জ্জন করিবার কয়েক মিনিট পরে বুঝিতে পারিল, 'অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্!" কারণ, রাত্রিকালে তাহার সাধ্বী পত্নী কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া তাহার উপপতির সহিত পলায়ন করিয়াছে, এই সুসংবাদ অবিলম্বেই তাহার কর্ণগোচর হইল।

মোজের একটু রাগ হইল। তাহার স্ত্রী তাহাকে বিদায়-চুম্বন দান না করিয়া, এমন কি, একটি কথা পর্য্যন্ত না বলিয়া চলিয়া গেল! যে তাহার স্ত্রীর সতীত্বগর্ব্ব-স্ফীত অজেয় হৃদয়টি জয় করিল, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটি কে, ইহা জানিবার জন্য মোজের প্রবল আগ্রহ হইল; অবশেষে সে অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, তাহার পত্নী যাহাকে কাণ্ডারী করিয়া অকূলে যৌবন-তরী ভাসাইয়াছে, সে যে-সে লোক নহে, রুসিয়ার সাম্রাজ্য-তরণীর এক জন নবীন কর্ণধার। মোজের মনে হইল, আর যাহাই হউক, তাহার স্বচ্ছন্দটা বেশ!"

স্ত্রী তাহার নিকট বিদায় লইয়া যায় নাই বলিয়া মোজের দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে জানিতে পারিল, তাহার স্ত্রী সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিল, মুখের কথায় বিদায় না লইলেও পত্র লিখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল, "তোমার মত বিকটাকার ভল্লুকের সঙ্গে ঘরকন্না করা যে কি ঝকমারি, তা আমিই জানি। আমি তোমার স্ত্রী, ভদ্রলোকের কাছে এ পরিচয় দিতে লজ্জায় মরি! যাহাকে আমার হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছি, নয়নে না ধরে এত রূপ তাঁহার; তাঁহার তুলনায় তুমি, কি বলিব? ভল্লুক, উল্লুক, গাড়োল না বনমানুষ? তোমার সঙ্গে আর কিছু দিন বাস করিতে হইলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইত, আমার জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এত দিনে বাঁচিলাম, অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইলাম। তুমি আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিও না, আমার সন্ধান পাইবে না, যদি সন্ধান পাও ও আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলে, আমি বিষ খাইয়া মরিব। তোমার মত জানোয়ারের সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। আমার মেয়েকেও আর তুমি পাইবে না।"

এই পত্র পাঠ করিয়া মোজে তাহার পত্নীর ও কন্যার অনুসন্ধানে বিরত হইল। সে যাহাকে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা

ন্যায় পরিত্যাগ করিল দেখিয়া নারীজাতি সম্বন্ধে তাহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। তথাপি স্ত্রী-কন্যার জন্য তাহার হৃদয় হাহাকার করিত। তাহার স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার পর তাহার গৃহ শ্মশানের ন্যায় নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল, বন্ধুগণ আমোদ-প্রমোদে সন্ধ্যাযাপনের জন্য তাহার গৃহে আসিত না, অনেকে তাহাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। সকলেই তাহাকে উপহাস করিত। এই সকল কারণে সে দিবারাত্রি মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিল, ছয় মাসের মধ্যে সুস্থ সবল যবক জীর্ণদেহ বৃদ্ধের আকার ধারণ করিল। তথাপি তাহার সংসারের একটি অবলম্বন ছিল, তাহার দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে নিঃশব্দে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছিল, কিন্তু তাহার পত্নী ও কন্যা গৃহত্যাগ করিবার আট মাস পরে এক দিন তাহার পুত্র ক্রনষ্টাড' নামক স্থানে কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, দুই এক দিন পরে সে কয়েকটি বন্ধুর সহিত গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতে জলবিহার করিতে করিতে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া যায়, কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার মৃতদেহ নদীতীরে উত্তোলিত হইল।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মোজে ক্ষেপিয়া উঠিল। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মে তাহার স্পৃহা রহিল না, তাহার কারবার নষ্ট হইল। মনের কষ্ট ভুলিবার জন্য সে বোতল বোতল মদ গিলিতে লাগিল। তখন সে দিবারাত্রি মদের আড্ডায় পড়িয়া থাকিত।

এই সময় ক্রুড ওপেনহেম নামক একটি যুবকের সহিত মোজের পরিচয় হয়। এই যুবকটি কয়েক মাস পূর্ব্বে সেণ্ট-পিটার্সবর্গে আসিয়া বাস করিতেছিল, সে বলিত—রুসিয়া ভাষা শিখিবার জন্যই তাহার সেণ্টপিটার্সবর্গে আগমন, কিন্তু তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহই জানিতে পারে নাই। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল, তাহার অতীত জীবন রহস্যবিজড়িত ; কিন্তু যাহাদের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা সেই রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। ক্রুড ওপেনহেম রূপবান্ যুবক, তাহার রুচি মার্জ্জিত, আলাপে, গল্পে, রসিকতায় সে সকলকে মুগ্ধ করিতে পারিত। সে অত্যন্ত বিলাসী ছিল। বিলাসে ও ব্যসনে সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত, কিন্তু তাহার আর্থিক তাহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সেই অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী ঋণজালে বিজড়িত হইলেও কি কৌশলে উত্তমর্ণগণকে ভুলাইয়া অর্থসংগ্রহ করিত, কেনই বা লোক তাহাকে বিশ্বাস করিত, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। তাহার গল্প শুনিয়া শ্রোতাদের ধারণা হইত—জার্ম্মাণীর কৈসর হইতে তুরস্কের সুলতান, এমন কি, চীনের বাদশাহ পর্য্যন্ত তাহার 'এক গ্লাসের ইয়ার!'—বোধ হয়, এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়াই লোক তাহাকে টাকা ধার দিতে কুণ্ঠিত হইত না। যাহারা এই ভাবে লোক ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদিগকে পৃথিবীর অনেক খবর রাখিতে হয়। ক্রুড ওপেনহেমও 'সবজান্তা' ছিল।

সেণ্টপিটার্সবর্গের একটি মদের আড্ডায় ওপেনহেমের সহিত মোজের পরিচয় হইয়াছিল ; তাহারা উভয়েই পাকা মাতাল, এ জন্য তাহাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। এই সময় ওপেনহেম অর্থকষ্টে অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছিল ; নূতন শিকার পাইয়া সে অত্যন্ত আশ্বস্ত হইল এবং বাকচ্ছটায় মোজেকে এরূপ মুগ্ধ করিল যে, মোজের কারবারের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও সে যথা-সাধ্য চেষ্টায় অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা ঋণস্বরূপ ওপেনহেমের হস্তে প্রদান করিল। মোজে অল্পদিনেই ওপেন-হেমের এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিল যে, এই ঋণ পরিশোধের জন্য ওপেনহেমকে অনুরোধ করিতে কোন দিন তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই ; কেবল তাহাই নহে, ওপেনহেমকে ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণের নিকট পরিচিত করিবার জন্যও সে চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

এই সময় সেণ্টপিটার্সবর্গে যে সকল ইহুদী-পরিবার বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কোহেন-পরিবারের সহিত মোজের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল ; সলোমন কোহেন ব্যবসায়কার্য্যে মোজেকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন ; এবং তাহার দুর্দ্দিনেও তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। মোজে তাহার সুসময়ের বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও সলোমন কোহেন ও রেবেকার সহানুভূতিতে সে বঞ্চিত হয় নাই। সলোমনের সহিত তাহার বহুদিনের পরিচয় ; এই উপলক্ষে সে সর্ব্বদা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত এবং সলোমনের মাতৃ-হীনা কন্যা রেবেকাকে তাহার শৈশবকাল হইতে নিজের

বঞ্চিত হইলেও সে কোহেনের গৃহে আসিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিত। রেবেকার তখন বয়স হইয়াছিল, সে মোজের মনের কষ্ট বুঝিতে পারিত এবং কথায় ও ব্যবহারে তাহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিত। এই সকল কারণে মোজে কোহেন-পরিবারের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ ছিল।

ক্রুড ওপেনহেমের সহিত মোজের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইলে মোজে এক দিন তাহার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সলোমনের গৃহে উপস্থিত হইল। ওপেনহেমের অসাধারণ বাক্‌পটুতায় ও শিষ্ট ব্যবহারে সলোমন এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, ওপেনহেম তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণের সময় পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহে আসিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইল। সে সন্তুষ্টচিত্তে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। এইরূপে সলোমন ও রেবেকার সহিত ওপেনহেমের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল এবং কয়েক সপ্তাহমধ্যেই ওপেনহেম সলোমন কোহেনের 'ঘরের ছেলে' হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া ওপেনহেম রেবেকার হৃদয় জয় করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিল। নারীর মনো-রঞ্জনবিদ্যায় সে সুপণ্ডিত ছিল; আরও কয়েক সপ্তাহমধ্যে সে রেবেকাকে বশীভূত করিল; সংসারজ্ঞানহীনা তরুণী তাহার প্রণয়ে আত্মহারা হইল, তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিল।

মোজে রেবেকার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল কি না, বলা যায় না; তবে সে প্রণয়িযুগলের মনের ভাব বুঝিয়া থাকিলেও তাহাদের প্রণয়ে বাধাদানের চেষ্টা করে নাই, সলোমনকেও সতর্ক করে নাই; কিন্তু সলোমন রেবেকার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া, সে ওপেনহেমের পক্ষপাতিনী হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। রেবেকা পিতার নিকট মনের ভাব গোপন করিল না; তাঁহার নিকট স্বীকার করিল—সে এই বিদেশী যুবককে ভালবাসিয়াছে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছে যে, তাহাদের মিলনে বাধা উপস্থিত হইলে তাহাদের উভয়েরই প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন!

রেবেকার কথা শুনিয়া সলোমন কোহেন ক্রোধে অধীর হইলেন, রেবেকার মনে কষ্ট হইতে পারে, এরূপ কঠিন কথা তিনি কোন দিন তাহাকে বলেন নাই, সে দিনও বলিলেন না, কিন্তু ওপেনহেম যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার এ জন্য তিনি ওপেনহেমকে সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। ওপেনহেম কিরূপ যুক্তিতর্কের ধারাপাতে তাঁহার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিল, ওপেনহেমের পরমবন্ধু মোজেও তাহা জানিতে পারিল না! কিন্তু তাহার ফল প্রণয়িযুগলের অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিকূল হয় নাই। সলোমন কোহেন যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের উপশম হইয়াছিল। ওপেনহেম তাঁহার গৃহে পূর্ব্ববৎ যাতায়াত করিতে লাগিল এবং প্রণয়িযুগলের প্রেমচর্চ্চাও অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল; সলোমন আর তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

এই সময় মোজে জানিতে পারিল, রেবেকা তাহার পরম বন্ধু ওপেনহেমের প্রেম-সরোবরে সন্তরণ শিক্ষা করিতেছে। মোজে এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া সলোমনকে বলিল, ওপেনহেম তাঁহার জামাতৃপদলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি; রেবেকার পরম সৌভাগ্য যে, সে এরূপ রূপগুণসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত যুবককে ভুলাইতে পারিয়াছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এরূপ জামাতা মিলাইতে পারিতেন না। শুনিয়া সলোমন আশ্বস্ত হইলেন এবং সন্ধান লইয়া তিনি যখন জানিতে পারিলেন, মোজে তাঁহাকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করে নাই, তখন ওপেনহেমের হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতাকে সমর্পণ করিতে তাঁহার আর আপত্তির কোন কারণ রহিল না। কিন্তু ওপেনহেম ও রেবেকা তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই এক দিন গোপনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। সলোমন এ কথা জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কন্যাজামাতাকে তিরস্কার করিলেন না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তিনি যখন তাহাদের প্রণয়ে বাধা দান করেন নাই, তখন গোপনে বিবাহ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? ওপেনহেম তাঁহার ক্ষোভ দূর করিবার জন্য বলিল, তাঁহার কন্যাকে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিলে তাহার বংশ-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত এবং আত্মীয়-সমাজে তাহাকে অপদস্থ হইতে হইত; এ জন্য যে পর্য্যন্ত সে এই অসবর্ণ বিবাহে তাহার আত্মীয়বন্ধুগণের সম্মতি লাভ করিতে না পারে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহের সংবাদ গোপন থাকাই প্রার্থনীয়; নতুবা তাহার 'একঘরে' হইবার আশঙ্কা আছে। সলোমন তাহার যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিতে

রাখিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু আদেশ করিলেন, বিবাহের সংবাদ যত দিন পর্য্যন্ত প্রচারিত না হয়, তত দিন ওপেনহেম রেবেকাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ওপেনহেম জানিত, রেবেকাই সলোমনের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং সলোমনের প্রস্তাবে তাহাকে সম্মত হইতে হইল; কিন্তু সে নানা ছলে তাঁহার নিকট টাকা আদায় করিতে লাগিল। সলোমন কিছু দিন তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, অবশেষে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপব্যয়ের পরিচয় পাইয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতে অসম্মত হইলেন; ওপেনহেম অর্থাভাবে বিপন্ন হইল। সে আরও কয়েক সহস্র মুদ্রার জন্য সলোমনের তোষামোদ করিতে লাগিল; এবং অনুনয়-বিনয় নিষ্ফল হইলে, তাঁহাকে অভদ্র ভাষায় গালি দিতে লাগিল; সলোমন তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; তখন ওপেনহেম তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিল।

এত দিন পরে সলোমন তাঁহার জামাতার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন; রেবেকাও বুঝিতে পারিল, ওপেনহেম অর্থলোভেই তাহাকে প্রণয়ের অভিনয়ে মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না। ওপেনহেমের উত্তমর্ণরা টাকার জন্য তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল; সে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায় না দেখিয়া অবশেষে এক দিন অদৃশ্য হইল। সে কোথায় পলায়ন করিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় রেবেকার হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সে জীবন ব্যর্থ মনে করিল। জামাতার ব্যবহারে সলোমন কোহেন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতক প্রতারককে তিনি পদতলে নিষ্পেষিত করিবেন, তাহাকে চূর্ণ না করিয়া নিরস্ত হইবেন না। যে তাঁহার স্নেহময়ী আদরিণী কন্যাকে অনন্ত দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সকল সুখশান্তি হরণ করিয়াছে, কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সহস্র সহস্র রুবল আত্মসাৎ করিয়াছে, সে তাঁহার জামাতা হইলেও তাহার অপরাধ তিনি মার্জ্জনার অযোগ্য মনে করিলেন। কিন্তু তিনি রুসিয়ার বিভিন্ন নগরে অনুসন্ধান করিয়াও যখন সেই বিশ্বাসঘাতক ওপেনহেম চিরদিনের জন্য রুসিয়া ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে।

সলোমন কোহেন তাঁহার এই অপমান ও ক্ষতির জন্য, সরলা রেবেকার দুঃখ, দুর্গতি ও মনস্তাপের জন্য রডলফ মোজেকেই দায়ী করিলেন; কারণ, মোজেই ওপেনহেমকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার ও তাঁহার কন্যার সহিত পরিচিত করিয়াছিল; মোজের কথায় নির্ভর করিয়াই তিনি প্রবঞ্চক 'ফেরারী'র হস্তে কন্যা-সম্প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। সলোমন মোজেকে কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং তাহার সহিত দীর্ঘকালের আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। সলোমন কর্ত্তৃক এই ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া মোজে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। ওপেনহেম তাহারও বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সলোমন এই ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ওপেনহেমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তাহার সন্ধান পাইলেন না।

মোজে দেখিল, সেণ্টপিটার্সবর্গে তাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই; তাহার পরম বন্ধুও তাহার প্রতি বিরূপ, অর্থাভাবে তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ, সে নিরুপায় হইয়া সেণ্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিল এবং য়ুরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে মেইন নদীর তীরবর্ত্তী ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই নগরে সে তাহার সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে মহাজনী আরম্ভ করিল। তাহার কারবারের নাম হইল, 'পণ্টন প্রতিষ্ঠান।' পণ্টন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন; সে তাহার 'প্রতিষ্ঠান' হইতে সমর বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে অত্যন্ত অধিক সুদে টাকা ধার দিত। সেনানিবাসের সন্নিকটে দুশ্চরিত্রা রমণীর অভাব ছিল না; মোজে তাহাদের দলে মিশিয়া প্রেতলীলা আরম্ভ করিল এবং দুর্নীতির রসাতলগর্ভে নিমজ্জিত হইল। এরূপ কোন পাপ—কোন দুষ্কর্ম্ম ছিল না, অর্থলাভের জন্য যাহা করিতে সে কুণ্ঠিত হইত। সে নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা লালসা পরিতৃপ্ত করিত। সে তখন মনুষ্যচর্ম্মাবৃত পিশাচ।

ফ্রাঙ্কফোর্টে সামরিক কর্ম্মচারিগণের একটি আড্ডা ছিল; সেখানে তাহারা মদ খাইত ও আমোদ-প্রমোদ করিত।

হওয়ায় এক দিন সায়ংকালে মোজে সেই আড্ডায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সৈনিক যুবকটি তখন মদ্য পান করিতেছিল, মোজে তাহার পাশে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল।

সৈনিক যুবকটি মদ্য পান করিতে করিতে অন্য একটি টেবলের দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! আমার পুরাতন বন্ধু কাউণ্ট ভন আরেনবর্গকে বহুকাল পরে আজ এই আড্ডায় দেখিতেছি। ছোকরা এত দিন কোথায় ছিল?"

মোজে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, ক্রোধে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনি কি ঐ গুঁফো লম্বা লোকটার কথা বলিতেছেন?"

সৈনিক যুবক বলিল, "হাঁ, ঐ ত কাউণ্ট ভন আরেন-বর্গ।"

মোজে বলিল, "কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যে উহাকে সেণ্টপিটার্সবর্গে দেখিয়াছিলাম; উহার নাম ওপেন-হেম!"

কথাটা বলিয়াই মোজের মনে হইল, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা সঙ্গত হইবে না; এ জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, আমারই ভুল। আপনার ঐ বন্ধুটির অঙ্গে—রেজিমেণ্টের পোষাক দেখিতেছি! আমি জানি, ঐ রেজিমেণ্টের সকল কর্ম্মচারীই বিশিষ্ট ভদ্রলোক।"

মোজে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু কাউণ্ট ভন আরেন বর্গ ও সেণ্টপিটার্সবর্গপ্রবাসী ওপেনহেম যে অভিন্ন ব্যক্তি —এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল। সে বুঝিতে পারিল—পল্টনে চাকরী লইবার সময় ছদ্ম নাম ব্যবহার করিতে তাহার সাহস হয় নাই; সেণ্টপিটার্সবর্গে সে ওপেনহেম নাম ব্যবহার করিলেও তাহার প্রকৃত নাম কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ।

মোজে মনে মনে বলিল, "ওরে ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক! তোর সয়তানী আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুই বিলাসলালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য রুসিয়ায় গিয়াছিলি, সেখানে বহু লোকের টাকা মারিয়া কোহেন-পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়া দেনার ভয়ে এ দেশে পলাইয়া আসিয়াছিস্। তোকে নানা দেশ খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছি; এত দিন পরে এখানে তোকে দেখিতে পাইলাম। তোর সকল কীর্ত্তিই আমার জানা আছে; আমার সমস্ত টাকা সুদে আসলে আদায় করিব, তোর কুকর্ম্মের প্রতিফল দিব; যদি তাহা না পারি—তাহা হইলে আমার নাম রডলফ মোজে নয়।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মোজে সেই সৈনিক যুবককে বলিল, "আপনার ঐ বন্ধুটির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন? নূতন লোক, আলাপ-পরিচয় করিয়া রাখা ভাল; কোন দিন হয় ত উহারও টাকার প্রয়োজন হইতে পারে।"

সৈনিক যুবক হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি শিকারের সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়াও? বেশ, চল; ভারি রসিক লোক—উহার সঙ্গে আলাপ করিয়া খুসী হইবে।"

সৈনিক যুবকটি মোজেকে সঙ্গে লইয়া কাউণ্টের টেবলের নিকট উপস্থিত হইল; সেখানে পল্টনের আরও পাঁচ ছয় জন পদস্থ কর্ম্মচারী বসিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছিল।

কাউণ্ট তখন মদের গ্লাসে চুমুক দিতেছিল, মোজের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত হস্তে সে গ্লাসটি টেবলের উপর নামাইয়া রাখিল; তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল এবং শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; কিন্তু মোজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে বা তাহার সহিত পরিচয় ছিল, এরূপ ভাব প্রকাশ না করায়—কাউণ্ট কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং তাহার মিলিটারী বন্ধুরা তাহার আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই সে সামলাইয়া গ্লাসটা টেবল হইতে তুলিয়া লইল।

কয়েক মিনিট পরে কাউণ্টের ইয়ারের দল টুপী ও দস্তানা পরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, মোজে কাউণ্টের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "বন্ধু ওপেনহেম! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম। তোফা স্ফূর্ত্তিতে আছ দেখিতেছি। তোমাকে আমার কার্ড দিতেছি; আমার বাসায় গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে। তাহাতে আমাদের উভয়েরই লাভ আছে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

হিম-ঋতু

[সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে রচিত]

এলো হিমঋতু লয়ে গিরি-শিরে সিতিমা,
পাণ্ডুতা লয়ে বনে লোধ্রে,
পক্ক শালির শীষে লয়ে নব পীতিমা
পিঙ্গতা বিস্তারি' রৌদ্রে।
প্রান্তর শোভে আজি ঘন শ্যাম যিস্তে,
বাপী আর শোভে নাক পদ্মে
আশা-শতদল ফুটে কৃষীবল-চিত্তে
এলো রমা হিমবতী ছদ্মে।
মক্ষীরা জুটে আজি তালীরস-কলসে
পক্ষীরা জুটে শালিক্ষেত্রে।
বিম্বাধরের ছিটি শীতরূপে ঝলসে,
অঞ্জন আঁকে তাই নেত্রে।
শেষ বিদায়ের গীতি গাহে আজি শেফালি
জল-ছল-ছল ম্লান চক্ষে
একে একে নিভে আসে কৌমুদী-দীপালী
দীপদশা ধূমায়িত কক্ষে।
কুঞ্জ ছাড়িয়া যায় মীনকেতু ক্ষুণ্ণ,
গৃহে পশি রহে নিঃশঙ্কে।
শিঞ্জিনীকশা হানে, ভূণ তার শূন্য,
ঝষকেতু লীন তার পঙ্কে।
ব্যোমে নাই প্রেমলীলা চন্দ্রিকা চকোরে,
ছাড়াছাড়ি স্বর্গে ও মর্ত্যে,
মিত্রতা হলো আজি কর্কটে মকরে
পশে ভেক কচ্ছপ-গর্তে।
রবি দক্ষিণে চলি' দক্ষিণ নয়ানে
তপ্ত মদিরা করে বৃষ্টি,
বহ্নির রক্তিমা তন্বীর বয়ানে
নবীন সুষমা করে সৃষ্টি।
ঝিল্লিকা গায় আজি কুঞ্জের পূরবী,
খদ্যোতে শোভে নূন ধূপ,
কস্তুরী হলো আজ বিলাসের সুরভি,
পুষ্প ফুটে না চিরদিন ত।
অঙ্গে মগ্ন করি' মঙ্গল শিশিরে
'পর্ব্ব'-সিনান করে ইন্দু,
সারা বছরের শ্রমফল দেয় কৃষীরে
আজ সে কার বা কৃপা-ভিক্ষু?
গুটাও শীতল পাটি, ছুড়ে ফেল ব্যজনী,
তূলায় তনুটি কর লগ্ন,
দিন আজি ক্ষীণতনু, পীন আজ রজনী,
দীর্ঘ স্বপনে হও মগ্ন।
কামিনীগণও শোভে কালীয়ক-তিলকে,
ধূপ-সুরভিত কেশগুচ্ছ,
শুক মালিকা দুলে বাতায়নে, কীলকে
অনাদৃত চমরীর পুচ্ছ।
রাজ্য ফিরাতে গেছে গিরিরাজ, ফিরিছে
উত্তর-বায়ু তার ভৃত্য,
পীড়ক পালক আজি, পালকেরা পীড়িছে
কৃপণ বিলায় কৃপাবিত্ত।
মিত্র-দেবতা আজি সত্যই মিত্র
কৃপা নাই বরুণের বক্ষে,
বৃত্রারি নিজে হলো অকরুণ বৃত্র,
বহ্নিই জীবগণে রক্ষে।
ক্ষেত্রের ডালি শোভে আজি শালিধান্যে,
আলি তার শোভে ক্রৌঞ্চ অঙ্কে।
শালি শোভে পিষ্টকে মধু পরমান্নে
জাগে ভোগ কোটি মধুপঙ্কে।
হিম-বায়ু বাড়াইল বিরহজ বিকারে,
বিরহীর কিবা অবলম্ব?
পরাণ বাঁচাতে স্মরে আজি প্রাণাধিকারে
স্মরে তাঁর ঘন পরিরম্ভ।
দীর্ঘ রজনী পেয়ে প্রণয়ের নাটিকা
অভিনীত ছত্রিশ অঙ্কে,
নানা নায়িকার রূপ ধরে গৃহ-নায়িকা,
মানভান করে নিঃশঙ্কে।
সহজ রমণীরাগ এ নিশীথ প্রকাশে,
মুগ্ধা সে সহসা প্রগল্ভা,
নব মধুরিমা ভোগ পুরাতনী-সকাশে,
স্বীয়া আজি পরকীয়া-কল্পা।
শুষ্ক, তরুণাধর অকরুণ বায়ুতে
সিক্ত সরস মধুচুম্বে,
শিশির সিন্ধু তরে যুবজন ব'হতে
ভর করি' উরসিজ-কুম্ভে।
বঁধু চায় কান্তারে আরো ভালবাসিতে
গাঢ়ালিঙ্গনে টানে অঙ্গে,
অশ্রু, বেপথু, স্বেদ, সীৎকার, হাসিতে
সড়ঋতু লীলা বধু সঙ্গে।
পট্ট বসন আজ পরিহিত শরীরে,
পট্টবিলাস নাই বস্ত্রে,
জল কৌতুক শেষ, পরিত্যক্ত তরীরে
শিল্পী পীড়ন করে অস্ত্রে।
তাম্বূল সবল বিলাসোপকরণে,
কম্বল সুখাসন অস্ত্র,
নারিকেল-ক্ষীর আজি হেয়, তৃষাহরণে
পেয় নারীকুল-মুখ-মদ্য।
সুখ নাই হীরামণি মৌক্তিক হিরণে,
কিরণে নায় না হিম-খরতা,
পীবর তরুণীতনু সুনিবিড় পীড়নে
ঘুচে যুবজন-তনু-জড়তা।
স্মরশর আজি বিঁধে গাঁথে তনু তনুতে
দৈহমিলন অবিভাজ্য,
নিশ্বাস-বিনিময়ে অণু মিশে অণুতে
যুগ্মে ভরিল প্রেমরাজ্য।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভাব-প্রবাহ

৪

পঞ্চদশ শতাব্দী

ইহার কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত বৎসর পরে পৃথিবীতে আবার একটি সুবিশাল ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। এইটি য়ুরোপের Renaissance-এর বা আধ্যাত্মিক পুনর্জ্জন্মের যুগ এবং ভারতবর্ষের শ্রীচৈতন্য-লীলার যুগ। এই চৈতন্য-যুগও প্রকৃতপক্ষে Renaissanceএরই যুগ। সে যুগে যে দিগন্তব্যাপী ভাবের স্রোতঃ জগতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার এক দিকে ছিল চৈতন্যের অভিনব-প্রেম-ধর্ম্ম, আর এক দিকে ছিল Renaissance এবং Reformation; একটা দিক্ ছিল খুব বিস্তীর্ণ, আর একটা দিক্ ছিল অতলস্পর্শ।

মধ্যযুগে অর্থাৎ দশম হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপের সাধারণ মানসিক গতি ছিল পরলোকাভিমুখী। তখনকার হিতোপদেশ ছিল—জগতের দিকে চাহিয়া দেখিও না; জগৎ লক্ষ প্রলোভনে পরিপূর্ণ—সয়তানের লীলা-নিকেতন। পৃথিবীর সকল ভোগ-বিলাস—সুখ-সম্পদ—চাকচিক্য—কৃত্রিম প্রাকৃতিক যা কিছু সমস্তই সয়তানের ফাঁদ। পা দিলেই মজিতে হইবে, আর উদ্ধার নাই; সুতরাং ও-দিকে চাহিয়া দেখিও না। ও-দিকে চলিও না। যীশু তোমাদের জন্য স্বর্গ রাজ্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহারই যোগ্য হও। প্রবৃত্তির গতিপথ রুদ্ধ কর। সন্ন্যাস অবলম্বন কর। সংসারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিও না। ধ্যান কর চির-সুখময় অমরধামের। প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক যা কিছু সমস্তই পাপের আধার। এই ধারণা-নিচয়ের মধ্যে অনেকখানি সত্য এবং অনেকখানি ভ্রম আছে। সত্য খুব কম উপদেষ্টাই উপলব্ধি করিতে পারিত। অন্য পরে কা কথা। ফলে দুই চারি জন ত্যাগী মহাপুরুষের জীবন ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির দমন ও নিবৃত্তির সাধন কিছুই হয় নাই। শুধু কর্ম্মপথ রুদ্ধ হইয়াছিল। সমস্ত দেশ অর্দ্ধ-জাগরণ ও অর্দ্ধ-নিদ্রার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া নানা রং-বেরঙের স্বপ্ন দেখিতেছিল। য়ুরোপীয়রা এই যুগে যে যোগ-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে যোগের ফল কিছুই হয় নাই। লাভ হইয়াছিল শুধু যোগশাস্ত্রোক্ত অন্তরায়গুলি।—"ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তি-দর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।"

পাতঞ্জল-দর্শন। ১।৩০

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রস-বর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।—গীতা।"

কিন্তু সেই পরমার্থদর্শনের উপায় ইহারা জানিত না। কাযেই ভোগ না থাকিলেও বাসনা ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মহা ভাব-প্রবাহ এই প্রকারে অর্দ্ধনিদ্রাগত য়ুরোপীয়গণকে জাগাইয়া তুলিয়া নূতন সঞ্জীবনী শক্তি দান করিয়াছিল। তাহারা জাগিয়া উঠিয়া নূতন প্রাণ, নূতন দৃষ্টি পাইয়া দেখিল—সংসার কি বিচিত্র সুন্দর! মানুষের জীবন কি মহীয়ান্! প্রকৃতি কি অপূর্ব্ব রূপময়ী! মানব-চিত্তের পাপ-পুণ্য সমস্তই কি মনোহর! এই ভাবাবেশেই সেক্সপীয়রের হ্যামলেট বলিতেছে—

This most excellent canopy the air, look you, this brave overhanging firmament, this majestical roof fretted with golden fire!......What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form and moving how express and admirable! In action how like an angel! In apprehension how like a God! The beauty of the world! The paragon of animals!

এই উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আসিল কর্ম্মের উদ্দীপনা—অসীম উদ্যম—অনন্ত কৌতূহল। চারিদিকে ধ্বনি উঠিল—জ্ঞান চাই! কর্ম্ম চাই! ভাব চাই! রূপ চাই! সুখ চাই! কেহ কহিল—স্বাধীনতা চাই! যাহা ইচ্ছা,তাহাই করিতে চাই। কেহ কহিল, জগতে মানুষের অসাধ্য কিছু নাই। কেহ কহিল—ঐ নক্ষত্র-লোকের সংবাদ আনিতে হইবে। কেহ কহিল, ঐ অতলান্তিক মহাসাগরের পর-পারে কি আছে, অন্বেষণ করিয়া দেখিব! Renaissanceএর যুগে মানুষের চিত্ত-ভাব এই প্রকার হইয়াছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের একটি অনুপম্ কবিতা আছে—নাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।' তাহাতে এই Renaissanceএর সমস্ত ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি লাইনই Renaissanceএ পরিপূর্ণ।

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি।
প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি!

* * * * *

মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ-মাঝারে লুটিতে চায়।

* * * * *

ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন।

* * * * *

উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর।

* * * * *

এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে?
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় এই Renaissanceএর সুর আছে। ১৪৫৩খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৬খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মহাযুগের কাল নির্দ্দেশ করা যায়। ১৪৫৩তে গ্রীক কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল তুরুকদের অধিকৃত হয়, আর ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সেক্সপীয়রের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পঞ্চদশ শতাব্দীই নব-জাগরণের যুগ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইটালীতে যে সুক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন হয়—বিশেষতঃ চিত্র ও ভাস্কর্য্যের—পৃথিবীতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। র‍্যাফেলের (১৪৮৩-১৫২০) মত ক্ষমতাশালী সুদক্ষ চিত্রকর কখনও কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) ছিলেন এক অদ্ভুতকর্ম্মা, অনুপম শিল্পী।

তাঁহার অঙ্কিত চিত্র, তাঁহার ক্ষোদিত মূর্ত্তি, তাঁহার নির্ম্মিত সৌধ এবং তাঁহার রচিত কবিতা আজিও সকলের চিত্ত হরণ করে। লিওনার্ডো-ডা-ভিন্সির (১৪৫২-১৫১৯) মত অলৌকিক প্রতিভাবান্ লোক জগতের ইতিহাসে খুব বিরল। একাধারে এত গুণ, এত ক্ষমতার সমাবেশ মানুষে বোধ হয় আর কখনও দেখা যায় নাই। তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, কবি, ভাস্কর, সৌধ-নির্ম্মাতা, এঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রাদির উদ্ভাবনকর্ত্তা এবং বিজ্ঞানবিৎ—অর্থাৎ প্রধান প্রধান ললিত শিল্প ও ব্যবহারিক শিল্প এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্তই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। মহা ভাব-প্রবাহের যুগ ব্যতিরেকে এ প্রকার প্রায় অতিমানুষিক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব। তিসিয়ান, করেগ্‌জো, দোনাতিলো প্রভৃতি আরও অনেক চারু-শিল্পী এই মহাশিল্প-সমাজের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন।

এরিয়স্ত, তাসো প্রভৃতি বিখ্যাতনামা ইটালীয় কবিগণও আগে-পাছে এই যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। টেলিস্কোপ আবিষ্কর্ত্তা গ্যালিলীয় ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে পিসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপারনিকাস্ (১৪৭৩-১৫৪৩) এই সময়ে প্রুশিয়া দেশে আবির্ভূত হয়েন। গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির বহু নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা কেপলার ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে বুর্টেম্বার্গে জন্মগ্রহণ করেন। স্পেনদেশীয় নাবিক সুপ্রসিদ্ধ কলম্বস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে এমন একটা সুমহৎ সমুন্নত মৌলিক সাহিত্য রচিত হইল, যাহা আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যান্বেষিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই সাহিত্য এক দিকে যেমন সরস, স্বাভাবিক ও সুন্দর, অন্য দিকে তেমনই জীবন্ত, তেজস্বী ও গভীর। সিড্নি, মার্লো, স্পেনসার, ড্রেটন, সেক্সপীয়ার, জন্সন্, বেন-জনসন্, বোমণ্ট, ফ্লেচার, ডেকার, চ্যাপম্যান, মার্টিন্ ও ওয়েবষ্টার প্রভৃতি এই যুগের কবি ও নাট্যকার। সেক্সপীয়র জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বিশ্ববিখ্যাত বেকন এই সময়কার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মাণীতে মার্টিন লুথার এক মহা ধর্ম্ম-বিপ্লব আরম্ভ করিলেন। কলুষ-জর্জ্জরিত রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

খৃষ্টান-ধর্ম্মের আমূল পরিবর্ত্তন এবং সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কারের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশে দেশে ভয়ঙ্কর আন্দোলন আরম্ভ হইল। রোমান-ক্যাথলিকের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের প্রতিষ্ঠান হইল। খৃষ্টান-জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

য়ুরোপে যখন এই সমস্ত যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটিতেছিল—তখন ভারতবর্ষে গৌড়ীয় হিন্দুধর্ম্মেরও একটা যুগান্তর সংসাধিত হইতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন এই নবীন যুগধর্ম্মের নায়ক। লুথার আর চৈতন্য ঠিক একই সময়ের মানুষ। চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে, আর লুথারের জন্ম ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে বঙ্গদেশে যে সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

কহিবার কথা নহে, তথাপি বাতুলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়?

গৌরাঙ্গ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ত অনেক বাঙ্গালী হিন্দু পর্য্যন্ত বিশ্বাসই করিতে পারে না। বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায়—তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নূতন প্রাণ দিলেন ও নূতন রূপ দিলেন। তিনি হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন।—নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিলেন। লীলা-কীর্ত্তন বা রস-কীর্ত্তন বলিয়া একটি অমৃত-মধুর [illegible] সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারই শক্তি-প্রভাবে নবীন বৈষ্ণব-শ্রীসনাতন-রূপ জীব-রঘুনাথ-গোপাল কবিকর্ণপুর-প্রকাশানন্দ-কৃষ্ণদাস বলদেব বিশ্বনাথ প্রভৃতি এই সাহিত্যের রচয়িতা। আর তাঁহার লীলা-সংবরণের পর তাঁহার ভক্ত-কবিগণ বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুললিত, অতি সুনিপুণ, অতি মনোরম একটি রস-সাহিত্য রচনা করিলেন—যাহা বাঙ্গালা কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। গৌরাঙ্গ-লীলার অন্তরঙ্গ রূপ যাহা, তাহা আমার জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিব না। কিন্তু কতকগুলি বহিরঙ্গ বিষয় বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। লক্ষ লক্ষ লোক গৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল কবির ভাষায়—

"ভৃঙ্গ যথা—
সহসা কমল-গন্ধে মত্ত হ'য়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে।"

সহস্র সহস্র লোক গৌরাঙ্গের পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। শত শত লোক গৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিল। আর তাহারা কেমন লোক? বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত পরম জ্ঞানী নৈয়ায়িক পণ্ডিত। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত বৈদান্তিক সোঽহংজ্ঞানী সন্ন্যাসী—যিনি এক সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু। প্রতাপরুদ্রের মত প্রবল-পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতি। রূপ-সনাতনের মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রাজমন্ত্রী। এই সমস্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বিষয়। পৃথিবীতে কখনও এমন ঘটে নাই। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালাদেশেই এই সমস্ত সম্ভব—এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইলে চলিবে না। রায় রামানন্দ, প্রকাশানন্দ, প্রতাপরুদ্র, গোপালভট্ট, কাশ্মীরী কেশব প্রভৃতি বাঙ্গালী ছিলেন না। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি সুদূর দেশের বহু যোগী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়াছিল, তাহার কেহই বাঙ্গালী ছিল না।

গৌরাঙ্গের জীবনে যে উদ্দীপ্ত ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা কি প্রকারের জিনিষ? পুরাণাদিতে অনেক প্রেমের কথা পাওয়া যায়। প্রাকৃত ও ভগবদ্বিষয়ক উভয়বিধ। মহাভারতে তপতী-সম্বরণের প্রেমের কথা আছে। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য ত প্রেমেরই ব্যাপার। উর্ব্বশীর জন্য পুরূরবার উচ্ছল উন্মত্ত প্রেম এক অপূর্ব্ব জিনিষ। কাদম্বরী আগাগোড়া প্রেমেরই ইতিহাস। উত্তর-চরিতে শ্রীরামের সীতা-বিরহবেদনায় হৃদয় গলিয়া যায়। আধুনিক কাব্য নাটক উপন্যাস ত প্রেমের অনন্ত অরণ্য। বাইরণের Bride of Abydos, Corsair প্রভৃতি, শেলীর Epipsychidion, কীটসের Endymion, টেনিসনের Maud, স্কটের Bride of Lammermoor, ডিকেন্সের David Copperfield, জর্জ্জ ইলিয়টের Adam Bede, ভিক্টর হুগোর Notre Dame, ইবসেনের Lady from the Sea, মেটারলিঙ্কের Monna Vanna, বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, নবীনচন্দ্রের রৈবতক—সমস্তই প্রেম-বৈচিত্র্য বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আর এ সব ত সহস্রের মধ্যে দুই চারিটি উদাহরণ মাত্র। ভিক্টর হুগোর Toilers of the Sea উপন্যাসে গিলিয়াটের চরিত্রে যে প্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আধুনিক সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত কল্পিত হয় নাই।

এ সমস্তই কাল্পনিক প্রেমের লীলা। কল্পনা ত নির্গুণ—কোনও বাধাবন্ধ নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ কাল ধরিয়া যে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এই সমস্ত প্রেমের উদাহরণই ক্ষুদ্র নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। কোনও প্রকার উপমা দিয়া এই প্রেম বুঝাইতে পারা যায় না। ২০।২৪ বৎসর ধরিয়া যে [illegible] প্রেমোন্মাদ তিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়া

কোনও নরনারী পৃথিবীতে নাই। এই প্রেমের অনন্ত দুর্দান্ত বেগ কোনও মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্গালাদেশের, তথা সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষের জনগণের ভগবচ্চেতনা এক জন আশ্চর্য্য মানুষের প্রভাবে যেমন করিয়া উদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছিল, সাড়ে তিন হাজার বৎসরের মধ্যে তেমন আর কখনও হয় নাই। সেই সুদূর অতীতে বৈদিক যুগে ঋষিরা অনুভব করিয়াছিলেন—সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে ভগবদ্ভাব,—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

আর এই ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অনুভব করিলেন,—

"যত শুনি শ্রবণে সকলি কৃষ্ণনাম,
সকল ভুবন দেখে গোবিন্দের ধাম।"

উনবিংশ শতাব্দী

সর্ব্বশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে একটি বিশ্ব-বিপ্লবকারী ভাব-প্রবাহ আসিয়াছে—যাহার তরঙ্গোচ্ছ্বাস আজ পর্য্যন্তও শেষ হইয়া যায় নাই। এই যে মহাপ্লাবন, ইহার দুই দিকে দুইটি বিশাল বিপ্লব-বিক্ষোভ, একটি ফরাসী বিদ্রোহ-বিক্ষোভ আর একটি বর্ত্তমান য়ুরোপের মহাসমর-বিপ্লব। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেড় শত বৎসর ধরিয়া এই মহাপ্লাবন রহিয়া রহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া গর্জ্জন করিয়াছে ও করিতেছে—কখনও কম, কখনও বেশী। ইহার প্রথম উচ্ছ্বাসটা ফ্রান্সের উপর দিয়া বহিয়া গেল—নররক্তরঞ্জিত বিভীষিকাময়! "শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সম্ভ্রমস্তত্র বিসস্রুবুঃ।" তাহার পর নেপোলিয়নের বিশ্ববিজয়ের অভিযান। য়ুরোপের রাষ্ট্রীক অবস্থা উলোট-পালোট হইয়া গেল। নেপোলিয়নের শোণিতাপ্লুত বিজয়পতাকা দেশে দেশে গগনতলে উড়িতে লাগিল! সমুদ্র-পরিখা-পরিবেষ্টিত বলিয়া ইংলণ্ডকে নেপোলিয়নের সমরদাবানলে দগ্ধ হইতে হইল না। ইংলণ্ডের ভাগ্য-লক্ষ্মী চিরকালই সুপ্রসন্না, তাই বিশ্ববিজেতা নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার গৌরব লাভ করিল ওয়েলিংটন।

এই দিকে এই সময়ে য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটা প্রকাণ্ড যুগান্তর ঘটিয়া গেল। এত কাল জগতের যে ভাব ও সত্তাটুকু মানুষের সর্ব্ববাদিসম্মত গতানুগতিক নিয়ম, রীতি ও ব্যবহারিক বিধান-পরম্পরার মধ্যে ধরা পড়ে—সে অতি অল্পই এবং তাহাও বাহ্য—সাহিত্য শুধু সেইটুকুমাত্র লইয়া বিব্রত ছিল। এইবার জগতের বহিরাবরণের নীচে যে জীবন্ত সত্তাসমূহ নিহিত আছে—পৃথিবীর নশ্বর জড়দেহের অভ্যন্তরে যে চিরন্তন চেতনসত্তা আছে—তাহাই সন্ধান করিয়া নব নব কলাকৌশল সহকারে প্রকাশ করাই সাহিত্যে একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল। সাহিত্য রচনায় চিরপ্রচলিত, চিরকালমান্য, একান্তপালনীয়, অপরিত্যাজ্য প্রণালীনিচয়ের কাষ্ঠ-কাঠামগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রতিভাবান্ নবীন কবিগণ (গেটে ইঁহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রকৃতির, নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গীর, নূতন নূতন ছন্দোবন্ধের কাব্য লিখিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে স্কট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরীজ, বাইরণ, শেলী, কীটস্; জার্ম্মাণীতে গেটে, হয়। হেগেল য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক—আবির্ভাব কাল ১৭৭০-১৮৩১ খৃষ্টাব্দ। তাহার পর সোপেনহার, শেলিং প্রভৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই যুগপ্রবাহ য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়াছিল এবং প্রত্যেকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। ভাবের এমন পরিপূর্ণ পরিপ্লব আর কখনও ঘটে নাই। ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া-যুগে বড় বড় সাহিত্যিকের অন্ত নাই। টেনিসান, ব্রাউনিং দম্পতি, ম্যাথু আর্ণল্ড, মরিস, রসেটি-ভ্রাতা-ভগিনী, সুইনবার্ণ, বার্ণার্ড-সা, ডিকেনস্, জর্জ্জ ইলিয়ট, থ্যাকারে, লিটন্, কার্লাইল, রাস্কিন, নিউম্যান—ইত্যাদি, ইত্যাদি। নরওয়েতে একটি মনোরম সাহিত্য বিরচিত হইল। ইবসেন, বিয়র্ণসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতি ইহার নায়ক। রুসিয়ায় একটি মহাশক্তিশালী সুবৃহৎ সাহিত্য অভিব্যক্ত হইল। টল্ষ্টয় ইহার অধিপতি। টুর্গেনেব, ডষ্টয়েফস্কি প্রভৃতি ইহার রথী। বেলজিয়ামে মেটারলিঙ্ক সমস্ত জগৎ চমৎকৃত করিয়া দিল। ফ্রান্সে ভিক্টর হুগো এমন একটা কাব্য-সাহিত্য এবং এমন একটা উপন্যাস-সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন—যাহার তুলনায় পৃথিবীর অনেক উজ্জ্বল সাহিত্য ম্লান হইয়া গেল। ভিক্টর হুগো এক একখানি উপন্যাস লিখিয়া যেন জগতের সকল সাহিত্যিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার লে-মিজারাবলস্ পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দার্শনিক জেমস্ বলিয়াছেন, "টলষ্টয়ের War and Peace মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস", কিন্তু তাহা হইলেও বলিতে হয়, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের আলোকের অপেক্ষা গোধূলি-আলোক শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণিমার আলোকের অপেক্ষা নক্ষত্রালোক অধিক মনোহর। ভিক্টর হুগোর পর আলেকজাণ্ডার ডুমা। উপন্যাস-সাহিত্যে ভিক্টর হুগোর পর ইঁহারই কল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র-পথগামিনী এবং অপূর্ব্ব উদ্ভাবনপটীয়সী। Monte Christo পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন দিব্যরথে চড়িয়া স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছি। মহাসিন্ধুর পরপারে আমেরিকায় ইমার্শন, লংফেলো, হুইটম্যান প্রভৃতি সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজেরই বদ্ধ বিশ্বাস ছিল, এই পাঞ্চভৌতিক জড়াত্মক জগৎ ব্যতীত আর সৃষ্টিতে কিছু থাকিতে পারে না। মন, বুদ্ধি, আত্মা সবই ত বিরামবিহীন ইন্দ্রিয়ানুভূতির লহরীলীলা। ইহার মূলে আছে শুধু মস্তিষ্ক-পরমাণু-সমূহের স্পন্দন-পরম্পরা মাত্র। জড় পরমাণু হইতেই মানুষের দেহ-মন এবং সাংসারিক সকল বস্তুর সৃষ্টি এবং জড়-পরমাণুতেই সকলের শেষ পরিণাম। স্বর্গ-নরকাদি কল্পনা। আত্মা কল্পনা। ঈশ্বর ত নিতান্তই কল্পনা। সুতরাং যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কারণ, ভস্মীভূতস্য (মৃৎপ্রোথিতস্য বা) দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? যাহারা যীশুর কথা মনে করিয়া বাধা পাইয়া অতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহারাও কার্য্যতঃ জড়জগৎ ব্যতীত আর কিছু বড় জানিত না।

Finite and finished clods untouched by a spark এই অচৈতন্য ভাবের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার বিদ্যুৎস্ফুরণ আরম্ভ হইয়াছিল এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। শুধু মানুষ নয়, জগতের যা কিছু, সমস্তই চৈতন্যসত্তায় পরিপূর্ণ—এই যে অভিনব জ্ঞান ও বিশ্বাস, ইহার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন হেগেল প্রমুখ অন্তর্দর্শী পণ্ডিতগণ। গেটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতির কাব্যের মধ্যে এই বিশ্বাস মনোরম রূপ লাভ করিয়াছিল। কার্লাইল ছিলেন ইংলণ্ডে ইহার ঘোষণাকর্ত্তা, কিন্তু এই যে অভিনব জ্ঞান-বিশ্বাস—ইহা এই ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মাণীর ভিতর দিয়া সমস্ত য়ুরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" এবং 'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্' এই যে নিগূঢ় জ্ঞান, ইহা ভারতের উপনিষদাদি শাস্ত্রের বাহিরে বিশ্ব-

তাঁহাদের অভিনব দর্শনের মূলসূত্র কোথায় পাইলেন, তাহার সন্ধান হইয়াছে কি না, জানি না। সোপেনহার যে উপনিষদ, অধ্যয়ন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা। হেগেল কথাটি স্বীকার করিয়াছেন কি না, জানি না। ফল কথা, জার্ম্মাণীর দর্শনশাস্ত্র ভারতবর্ষের নিকট কি ভাবে কতখানি ঋণী, ইহা একটি আলোচনার যোগ্য বিষয়।

এ দিকে বাঙ্গালাদেশে একটি সুন্দর তরুণ সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, বিহারীলাল, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহার পথিপ্রদর্শক। মাইকেল মধুসূদন ইহার প্রথম উৎসব-দুন্দুভি। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইহার অতুল প্রতিভাবান্ প্রতিষ্ঠাতা। বহু কাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ আপন চিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"বাহিরে আনিনু তাহারে করিতে
হৃদয়-দিগ্বিজয় ;
সারথি হইয়া রথখানি তার
চালানু ধরণীময় !

* * * *

দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তার উঠে চাটু-গান !"

তিনি যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া গিয়াছে। তিনি বিশ্বের 'হৃদয়-দিগ্বিজয়' করিয়াছেন, এবং সত্য সত্যই তাঁহাকে 'দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ।' তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী 'বিরহিণী' হয় ত মুখ ফিরাইয়া বলিতেছে, 'হৃদয় জুড়ায়ে কোনও সুখ নাই।' যাহাই হউক, বাঙ্গালার ইহা অসীম গৌরবের বিষয় যে, বিশ্বের মহামিলনের বাণী—বিশ্বভারতী—আজ বিশ্বে ঘোষিত হইতেছে বাঙ্গালী কবির মুখে!

এইরূপে যুগে যুগে মহাভাবের প্রবাহ পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে কত যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আবার কত গড়িয়া উঠিয়াছে! কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত রাষ্ট্র-বিপ্লব—কত সমাজ-বিপ্লব—কত নূতন নূতন শিল্পের অনুশীলন হইয়াছে! কত নব নব সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এক রাজ্যের জাতি আর এক রাজ্যের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। এক ভাষা ভুলিয়া আর এক ভাষা শিখিয়াছে। এক যুগে যাহারা রাজত্ব করিয়াছে—আর এক যুগে তাহারাই দাসত্ব করিয়াছে। আবার কেহ কেহ দাসত্ব হইতে রাজত্ব লাভ করিয়াছে! কত নূতন নূতন জ্ঞান, কত অভিনব চিন্তা-ধারা মানুষ লাভ করিয়াছে, আবার হারাইয়া ফেলিয়াছে। কত অপরূপ আদর্শ ফুটিয়াছে, আবার কালসহকারে টুটিয়া গিয়াছে! বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ দৃশ্যপট প্রকটিত হইয়াছে। আবার দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সমস্তই আসে আর যায়, থাকে না। কোথা হইতে আসে, কোথায়ই বা যায়, তাহাই ভাবিবার বিষয়। কেই বা পূরণ করে, আবার কেই বা হরণ করে। সমস্তই ত শক্তির ক্রীড়া। সে শক্তি কার? এই যে প্রবাহের কথা বলিলাম, ইহা কিসের প্রবাহ? ভাবের প্রবাহ? ভাব কিসের? পাশ্চাত্যের উত্তর—Behind the Veil, behind the Veil! প্রাচ্য কবি সর্ব্বতত্ত্বদর্শী। তিনি শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি-গণা ইব॥" (গীতা)

আবার,—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥" (চণ্ডী)

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা (অধ্যাপক)।

ক্ষত্রিয়

বেগবান, বীর্য্যবান, উন্মত্ত উদ্দাম,
বর্ম্ম-চর্ম্মে আবরিয়া তনু আপনার ;
দাঁড়াইল রঙ্গভূমে অমিত বিক্রমে—
মণিময় কোষে হ'ল অসি ঝনৎকার !

সে অসির দীপ্তি দেখি' শঙ্কিত সমাজ
অসির প্রাধান্য শক্তি করিল স্বীকার ;
উপেক্ষিল শস্ত্রবল শাস্ত্রবলে তবে
অস্ত্রধারী পরাজিল বিদ্যা-উপাসকে !

অরণ্য নগর হ'ল অস্ত্র মহিমায়,
জগৎ করিল তবে বীরের সম্মান ;
অস্ত্রের আশ্রয়ে থাকি শাস্ত্র ব্যবসায়ী
সংসার-সমাজে সাধে অশেষ কল্যাণ !

বীরের হইল নাম ক্ষত্রিয় তখন,
সভয়ে লইল আর্ত্ত তাহার শরণ !

শ্রীসুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।



ভারতের নবজাগরণ

বর্তমান যুগে দেশে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের প্রচেষ্টা প্রথম ও প্রধান। ইংরাজ এ দেশে আসিয়া যখন বণিকের মানদণ্ড ফেলিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করে, আমরাই তাহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিই। ক্ষাত্রশক্তি-প্রভাবে ইংরাজ এ দেশের অধিকারী হয় নাই—দেশের লোকের দুর্ব্বলতা, দেশের লোকের ভেদবুদ্ধি ও কূটনীতি ইংরাজ-রাজত্ব-স্থাপনের মূলভিত্তি। নন্দকুমারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা, ক্লাইভের কূটনীতির ফলে বাঙ্গালায় ইংরাজ-রাজ্যের পত্তন হয়। কোম্পানীর রাজ্য রামরাজত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া আমরাই ইহার অভ্যর্থনা করি। ইংরাজের সুবিচার ও মুসলমানের কাজির বিচার, ইংরাজের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন ও মুসলমান-যুগের বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারের চিত্র আমাদের হৃদয়পটে সর্ব্বদাই অঙ্কিত থাকে। এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যহই শ্রীদুর্গাস্মরণের ন্যায় ইংরাজ-রাজত্ব যে শান্তির রাজত্ব, সুখের রাজত্ব, সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির যুগ, পুনঃ পুনঃ তাহারই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া থাকি। কোম্পানীর আমলের পূর্ব্বযুগ যে মগের মুলুক, তাহা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। এ সকল কথা মিথ্যা হউক, অতিরঞ্জিত হউক বা সত্য হউক, আমরা আজ সকল শ্রীবৃদ্ধির মধ্যেও বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা যে দাসের জাতি, সেই দাসের জাতিই আছি—কেবল লৌহ-নিগড়ের পরিবর্ত্তে স্বর্ণশৃঙ্খল পরিয়া আছি। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন যে দেশে প্রচলিত, যে দেশে 'হেবিয়াস কর্পাস' নাই, যে দেশের লোককে বিনা বিচারে মগের মুলুকে চালান দেওয়া যায়, সে দেশের শাসনতন্ত্রের কতটুকু উন্নতি হইয়াছে? যে দেশে শাদায় কালায় বিচারে প্রহসনের অভিনয়, সে দেশে কাজির বিচারের অভাব কি? যাহার জলে লবণ, স্থলে লবণ, বৃক্ষপত্রিতে লবণসম্ভার, সে দেশ আজ "নিমকহারা" হইয়া তাহার এক গ্রাস অন্নের একটুকু লবণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে—এমন "নিমকহারামি" দেশকে কে শিখাইল? যে দেশের বস্ত্র জগতে অতুলনীয় ছিল, সে দেশ আজ বস্ত্রহীন হইয়া দিগম্বরের ন্যায় পরের দ্বারে ভিখারী, এ সৌভাগ্যের বেশ দেশকে কে পরাইল? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ভারতে আজ নিত্য অন্নাভাব, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও দারিদ্র্য লাগিয়া আছে। ইহাতেও যদি দেশের উন্নতি না হইয়া থাকে, তবে আর উন্নতি কি? ছেলেদের যতই England's work in India পড়ান হউক, সত্য কথা চাপিয়া রাখা যাইবে না। ফল কথা,—

> "পর ভাষণ, আসন, আনন রে
> পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
> —[illegible]

আমরা আজ বুঝিতেছি, বাহ্যতঃ দেশের যতই উন্নতি হউক, দেশের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। দেশের আজ সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত বটে, কিন্তু আমরা Pax Britannicaর মহিমায় অলস, জড় ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া যাইতেছি। দেশের শাসন দেশের লোক করিবে, দেশ আপনি আপনার ভাগ্যবিধাতা হইবে, ইহাই স্বরাজ, দেশের লোক এখন ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। জনমত পদতলে দলিত করিয়া যেখানে Certification চলে, সেখানে আবার Self-Government এর কি যে থাকে, তাহা ত বুঝি না। স্বরাজ্য আপনার মহিমায় আপনি পূর্ণ, তাহাকে খণ্ডশঃ ভাগ করিয়া transferred বা reserved করা চলে না। দেশের প্রতি কার্য্যে দেশের লোকের হাত থাকিবে, ইহাই স্বরাজ্যের আদর্শ। সময়মাফিক খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে মহামান্য পার্লামেণ্ট বাহাদুর আজ আধখানা আর দশ বৎসর বাদ সিকিখানা স্বাধীনতা দয়া করিয়া ভিক্ষাদান করিবেন, আর আমরা তাহা লইয়া স্বাধীন হইব! ইহা স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, না ইহা স্বাধীনতার ব্যর্থ প্রয়াস? যাচিয়া, ভিক্ষা করিয়া রাজদণ্ড পাওয়া যায় না, তাহাতে স্বার্থসর্ব্বস্ব লজ্জাহীন ভিখারীদের উদর-পূর্ত্তি হইতে পারে—দেশের পক্ষে ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ। ভিক্ষা ত অনেক হইয়াছে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যে দিন প্রথম কংগ্রেস বসিয়াছে, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোর আমল হইতে সেই দিনে পুণার কংগ্রেসে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোর সময় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করা হইল—আবেদন-নিবেদন বহু হইল, কিন্তু আশার ছলনায় ভুলিয়া কোন ফলোদয়ই হইল না। ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় আর চলিবে না। আমেরিকা ও গ্রীস যে ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, সে ক্ষাত্রশক্তি আমাদের নাই, তাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব উন্মাদ কল্পনামাত্র। কি শুভক্ষণে মহাত্মা গন্ধীর উদয়! তিনি বার বার আমাদের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন—দেশের মুক্তি দেশের লোকই করিবে, ইহা ভিক্ষায় পাওয়া যাইবে না। তাঁহার অহিংস অসহযোগ মন্ত্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনতার মন্দাকিনী মর্ত্তে আনিতে হইলে ভগীরথের কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। দেশকে ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া সমূহ স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপঃসাধন করিতে হইবে। গঠনমূলক কার্য্যের কথা মহাত্মা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন: তিনি বক্তৃতার আড়ম্বর দূরে পরিহার করিয়া কর্ম্মের মহিমা স্থাপন করিয়াছেন। স্বাবলম্বনই মুক্তির পথ, দেশ আজ মহাত্মার বাণী গ্রহণ করিবে কি?

নবজাগরণের কথা বলিতে গেলে রাষ্ট্রীক স্বাধীনতার চেষ্টার কথা প্রথমতঃ মনে উদিত হয়, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ইহার একটি অঙ্গমাত্র। নবজাগরণের আর একটি প্রধান কথা ধ্বংসোন্মুখ জাতীয় সভ্যতার সংরক্ষণ। রাজনৈতিক অধীনতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের জাতীয় ভাবের বহু অনিষ্টসাধন করিয়াছে। ইংরাজের Political conquest অপেক্ষা তাহার Cultural con-

শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমরা ভারতীয় সভ্যতা অতি হীন ও বর্ব্বর জ্ঞান করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্তই শ্রেয় ও প্রেয়ঃ মনে করিতেছি। ইংরাজী শিক্ষায় দীক্ষিত "ইয়ং বেঙ্গল" সম্প্রদায় যখন ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার মুখের দিকে তাকান নাই; তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষটাকে দ্বিতীয় বিলাতে পরিবর্ত্তিত করিবেন। সুখের বিষয়, এ বিষয়েও দেশে নবচেতনার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। রাজা রামমোহন যদিও ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মের দিক হইতে হিন্দুধর্ম্মের অতি উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া খৃষ্টান পাদরীদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে এ দেশের ধর্ম্ম কোন অংশে হীন নহে, বরং বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। লর্ড মেকলের বিলাতী সভ্যতার পক্ষ লইয়া সদম্ভ উক্তি এসিয়াটিক সোসাইটীর গবেষণার ফলে আজ উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধিবাসী যখন উলঙ্গ হইয়া গাত্র বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া বৃক্ষপূজায় রত, ভারতবর্ষ তখন জ্ঞানালোকে সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছে। এই ঘৃণিত, পদদলিত, কৃষ্ণবর্ণ জাতি কেবল জগতের ঘৃণার ভার বহিতে আইসে নাই। ইহার দান জগৎ মাথা পাতিয়া লইতে পারে—ইহারা যে জগদ্গুরু জাতি, স্বামী বিবেকানন্দ সে দিন সিকাগোর ধর্ম্মসঙ্ঘে সে পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। য়ুরোপ রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দিয়া কেবল রবীন্দ্রনাথকে সংবর্দ্ধিত করে নাই—ইহা ভারতীয় বাণীর চরণে পাশ্চাত্যের অর্ঘ্য উপহার। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে জাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইবে। ভারতে রাজনৈতিক অধিকারের চেষ্টা ইংরাজী শিক্ষার সুফল বলিতে হইবে; কিন্তু প্রথমতঃ যাঁহারা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে দেশমাতার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় নাই; ইহার প্রথম সাধকগণ কি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কি নৌরজী, কি সুরেন্দ্রনাথ—সকলেই বিলাতী স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের নষ্টপ্রাণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার মূলে আমরা ৩ জন মহাপুরুষকে দেখিতে পাই—ইঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি দয়ানন্দ ও লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক। ভারতের সভ্যতা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সাহিত্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক ইঁহারাই ভারতের গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, উড্রফ, বেণাল্ড, কুমার স্বামী, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই প্রাচীন ভারতের সমুজ্জ্বল চিত্র আমাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে চাহিতেছেন। অপর দিকে পাশ্চাত্যদেশে সোপেনহর, ডয়সেন, ম্যাক্সমূলর, জ্যাকোবি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের কথা ভূয়সী আলোচনা করিয়া ভারতীয় রেনাসাঁর প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ভারতের নবচেতনার মূলমন্ত্র—ভারতীয় সভ্যতার সংরক্ষণ। ভারতের মুক্তিসাধনায় কেবল রাজনীতি লইয়া থাকিলে চলিবে না; পাশ্চাত্য প্রভাবের নাগপাশ আমাদের অঙ্গে অঙ্গে বাঁধিয়াছে, ইহার বজ্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ইংরাজী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া, আমরা দেশের গৌরবময় অতীতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, আকাশপ্রাসাদের ন্যায় স্বাধীনতার কাল্পনিক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলাম। বিলাতী সভ্যতার পীঠস্থানে প্রাচীন কংগ্রেসে তখন স্বাধীনতার কবির লড়াই হইত, তাহাতে স্বাদেশিকতা থাকিত না। স্বাধীনতা লইয়া বক্তৃতা চলিতে পারে, কিন্তু দেশাত্মবোধে বক্তৃতা নাই; ইহা হৃদয়ের বস্তু, অনুভবের সামগ্রী—ইহা ভক্তের ভক্তি, সাধকের সাধনা, ধ্যানীর ধ্যান। ইহার মূলমন্ত্র—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ইহার ভাবায় ব্যাখ্যা,—

এই ভাবের যিনি ভাবুক, দেশাত্মবোধের সাধনার সাধক, দেশ তাঁহার নিকট মৃন্ময় নয়—ইহার মাটী তাঁহার নিকট চিন্ময়ী মা-টি। দেশের ধূলি স্বর্ণধূলি; দেশের জীব শিব, দেশের তরঙ্গিণী মন্দাকিনী, দেশের কানন নন্দনবন—দেশ তাঁহার নিকট স্বর্গ। ইয়ং বেঙ্গল দেশ চাহে নাই—চাহিয়াছিল স্বাধীনতা; সেই জন্য তাহারা দেশের ধর্ম্ম, দেশের সভ্যতা, দেশের সাহিত্য, দেশভাষা ত্যাগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিল। ভারতের কবি-কোকিল ব্যাস ও বাল্মীকির দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহারা দান্তে, হোমার, ভার্জ্জিল, চসার, স্পেন্সার, মিল্টনে মাতিয়াছিল। যে দেশে কালিদাস, ভবভূতি, ভাস নাট্যকার, সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেক্সপিয়র, বেন্‌জনসন্ ভিন্ন আর কাহাকেও চিনিত না। এখনও আমরা কি প্রথম ইংরাজী শিক্ষার সে মোহ কাটাইতে পারিয়াছি? যে দেশে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, ব্যাস, শঙ্করের জন্ম, সে দেশের লোক মিল, হিউম, কোঁৎ, কাণ্টের দর্শন পড়িয়া চক্ষুষ্মান্ হইতেছে! যে দেশে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, কবীর, চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের লোক স্বধর্ম্মের চর্চ্চা না করিয়া বিদ্যালয়ে পরধর্ম্ম আলোচনা করিতেছে। যে দেশের পুরাণ, ইতিহাসের পত্রে পত্রে হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতা, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য্য, ধ্রুবের তপস্যা, প্রহ্লাদের ধর্ম্মপ্রাণতা, সতী, সীতা, সাবিত্রীর পতিভক্তির কথা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত, সেই দেশের বালকদিগকে নীতিশিক্ষার জন্য ঈশপের গল্প ও ডুগালের জীবনচরিত পাঠ করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা আর কি আছে? আমাদের কি না ছিল, কি বা নাই, অথচ আমরা তাহার কতটুকু সন্ধান রাখি? আমাদের সেই গৌরবের মণিমালার মণিগুলি খসিয়া গিয়াছে—আছে কেবল বন্ধনরজ্জু! আজ আমাদের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, স্মৃতি আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আমাদের চিত্রকলা, নাট্যকলা, ভাস্কর্য্য, আমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, শিল্পকলা ও সাহিত্যের নষ্ট মহিমা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। জন্মগত স্বত্বে যেমন আমার দেশের উপর স্বত্ব, জন্মগত স্বত্বে যেমন আমার মাতৃভাষায় অধিকার, জন্মগত স্বত্বে সেইরূপ এই সভ্যতায় আমার অধিকার। এই রত্নভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও আমরা কাচ জ্ঞানে তাহা অবহেলা করিতেছি। নবচেতনার অরুণরাগে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়াছে, দেশে নবজাগরণের সুপ্রভাত হইয়াছে। আত্মবিস্মৃত জাতি আজ এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ধ্যানস্থ হইয়াছে। ভারতের ব্যক্তিত্ব, ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের সাত্ত্বিকতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সত্যই আমরা যদি আপনাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাই, তবে এই 'ছেলের হাতের মোয়া' রাজনৈতিক অধিকার লইয়া কি করিব? আমাদের যে স্থলে যতটুকু বৈশিষ্ট্য আছে—আজ তাহার সমস্তটুকু পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পরাধীন জাতি আমরা, আমাদিগকে "কমঠ কবচ" লইয়া স্বার্থোদ্ধারের নূতন বিধান করিতে হইবে। মুক্তির জন্য ভারতকে ভারত হইতে হইবে—মুক্তির পর নববিধানের রদ-বদল হইতে পারে; মুক্তজীবের নিয়ম ও বদ্ধজীবের ব্যবস্থা এক নয়। এখন অসহযোগই আমাদিগের প্রকৃষ্ট পথ।

নবচেতনার তৃতীয় লক্ষণ—দেশীয় ভাষা সমূহের নব অভ্যুদয়। ইংরাজী কেতায় দীক্ষিত হইয়া আমরা প্রথমেই দেশীয় ভাষাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম। অন্য ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালা ভাষার কথাই বলি। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় উত্তীর্ণ না হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল। বাটীর অভিভাবকগণ বালকদিগের হস্তে বাঙ্গালা পুস্তক দেখিলে তিরস্কার করিতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষাকে "বর্ব্বর ভাষা" জ্ঞানে দূরে পরিহার করিতেন।

ছিল। সুখের বিষয় যে, দেশের বায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও সে উৎকট বায়ুবিকার রোগ ঘুচিয়াছে। আজ আমরা মাতৃভাষার আদর করিতে শিখিয়াছি; আমরা আজ বঙ্গ-ভাণ্ডারের বিবিধ রত্নের সন্ধান পাইয়াছি, আর "পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি" ভিখারীর বেশে ফিরিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্গবাণীর পবিত্র পীঠ আজ কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় আজ দেশীয় ভাষা স্থান পাইয়াছে, স্কুলে কলেজে আজ বাঙ্গালা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মরা গাঙ্গে আজ বান ডাকিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা আজ অবজ্ঞাত, অপমানিত, অনাদৃত নহে; আজ তাহা বিশ্বসাহিত্যের সহিত তাল রাখিয়া চলিতেছে। যে ভাষার কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, সে ভাষা কখন অনাদরের নহে। আজ কেবল ইংরাজী সাহিত্যের দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। ইংরাজী সাহিত্যে যেমন চশার আছে, আমার ভাষায় তেমন মুকুন্দরাম আছে; ইংরাজী সাহিত্যে যেমন সেক্সপীয়র বেনজনসন্ আছে—আমার মাতৃভাণ্ডারে তেমনই গিরীশ, দীনবন্ধু আছে; ইংরাজী ভাষায় যেমন মিলটন, আমার ভাষায় তেমনই মাইকেল; ইংরাজের বাইরণ, শেলী, কীটস আছে—আমার নবীন, হেম আছে; ইংরাজের স্কট, ডিকেন্স আছে—আমার বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র আছে—আমার ভাষা হীন কিসে? মাতৃভাষার তুল্য জগতে আর মধুর কি আছে?

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

এই ভাষায় প্রথম অসহায় শৈশবে অস্ফুট কাতরধ্বনিতে মা বলিয়া ডাকিয়া মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই ভাষায় আমার প্রথম অভাব-অভিযোগের অভিব্যক্তি,—এই ভাষায় আমার প্রথম আনন্দের অভিব্যঞ্জনা। এ ভাষার তুলনা কোথায়? এ ভাষার অবমাননা—মাতার অবমাননা। আমরা এমনই পাশ্চাত্যপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমরা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম। ভাষা জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ, যে জাতি আপনার ভাষা ভুলে, তাহার অস্তিত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হয়। এই বাঙ্গালা দেশেই আর্য্য আগমনের পূর্ব্বে যে অনার্য্যসভ্যতার অস্তিত্বের কথা শুনা যায়, তাহার চিহ্ন কোথায়? সে জাতি স্বীয় ভাষা হারাইয়া বিরাট আর্য্যসভ্যতার আত্মহারা হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে স্কটলাণ্ডে ওয়ালেস, রবার্ট ব্রুস প্রভৃতি বীরবৃন্দ দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্ত হৃদয়ের প্রতি বিন্দুরক্ত দান করিয়া গিয়াছে, সেই বীরের জাতি আজ চিরবৈরী ইংরাজের Brother Scot বনিয়া গিয়াছে. কারণ, এ জাতি স্বীয় ভাষা ভুলিয়াছে। ওয়েলেস্ (Wales) আজ ভাষা হারাইয়া ইংরাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অপর দিকে পোল্যাণ্ড আজ ভাষার বলেই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডে গেলিক ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। যে জাতি মাতৃভাষার অনাদর করে, যে জাতি অতীত গৌরবের দিকে ফিরিয়া চাহে না, সে জাতির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আজ যে দেশে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ভাববন্যা ভাষা-ভাগীরথীর কূল উপচাইয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের ফলে যেমন দেশীয় ভাষার নব-অভ্যুদয়, পুনশ্চ তেমনই আবার সেই দেশীয় ভাষার সহায়তায় এই জাতীয় আন্দোলনের পুষ্টি ও প্রচার। জাতিকে উন্নত করিতে হইলে মাতৃভাষার সাহায্য প্রথমেই আবশ্যক। আজ দেশে শিক্ষার সুবিস্তারের জন্ত চারিদিকে আন্দোলন চলিতেছে; এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রচার। জাপানে যে এত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানে যে কার্য্য ২০ বৎসরে সাধিত হইয়াছে, আমাদের দেশে ৭০ বৎসরেও তাহার সিকি হইল না; ইহার প্রধান কারণ দেশীয় ভাষা অবজ্ঞা করিয়া বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষার প্রবর্ত্তন। কি উচ্চ শিক্ষা, কি নিম্ন শিক্ষা—সর্ব্বত্রই দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। গ্রন্থের অভাব সম্বন্ধে আপত্তি উঠে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে সব অভাবই দূর হইবে। সার আশুতোষের কৃপায় বিমাতার গৃহে মাতৃভাষার স্থান হইয়াছে, কিন্তু বিমাতার গৃহে মাতার স্থান গৌরবের নহে। মাতার গৃহে বিমাতা আশ্রয় লউন—ইহাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কোন সভ্যদেশেই বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফ্রান্সে বা জার্ম্মাণীতে ইংরাজী ভাষা শিখাইতে হইলে ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের দেশে ইংরাজী ত দূরের কথা, এমন কি, বাঙ্গালায় যাঁহারা এম-এ দেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত ইংরাজীতে মাতৃভাষার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দ্বিভাষী জীব ভগবানের রাজত্বে নাই; ইংরাজরাজের কৃপায় আমরা জগতের চিড়িয়াখানায় অদ্ভুত দ্বিভাষী জীব হইয়া আছি। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রচারে কেবল যে দেশীয় ভাষার ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে দেশের আরও বহুবিধ ক্ষতি হইতেছে। প্রথমতঃ ইহার জন্ত দেশে আশানুযায়ী শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছে না, দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষাসৌকর্য্যে প্রভূত ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এইরূপে শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে psychological আপত্তি আছে, তাহা পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা মনে করেন না। পরের ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা কখন মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে না; আজ যদি দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রচারিত হয়, শিক্ষাকার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইবে, শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রবর্গের হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়া বসিবে। অন্য দিকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হইবে এবং অচিরে ভাষা সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। মাতৃভাষার সর্ব্বতোভাবে উন্নতিসাধন জাতীয় আন্দোলনের একটি লক্ষ্য; দেশের লোক দেশের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিবে—পরের ভাষায় নহে। দেশীয় ভাষা কেবল শিক্ষাব্যাপারে নহে, পরন্তু বিচারগৃহে, ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বত্র যে দিন প্রচলিত হইবে, সেই দিন জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের দিন। [ক্রমশঃ।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মহাকবি ভারতচন্দ্র

পরিচয়

কবিকুলকেশরী রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষার এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। ভারতের অমৃতনিস্যন্দিনী কবিতাপাঠে বঙ্গ বিমোহিত। এক দিন যখন বঙ্গভাষার এতদূর উন্নতি সাধিত হয় নাই, সেই যুগে ভারত বঙ্গভারতীকে নবরসে স্নান করাইয়া নানা মনোজ্ঞ অলঙ্কার-ভূষণে অধিকতর মনোহারিণী করিয়া, ভাবের ধারা উজান বহাইয়াছিলেন। এই তৃতীয় যুগ বঙ্গসাহিত্যের সৌখীন যুগ বলা যাইতে পারে। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ইহার সমধিক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। এই সৌখীন সাহিত্যের যুগে ভারতচন্দ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি। কবিবরের কবিত্ব-গুণে প্রকৃতই বঙ্গভাষা সকল হীনতা এবং মলিনতা ত্যাগ করিয়া সাহিত্যের গৌরবময় আসনে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে প্রথম কয়েক বৎসর বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ দৈন্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

"আর কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান,
আর কি এখন সে সুগন্ধময়,
গউড়-নিকুঞ্জে মলয় বয় ?
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ।"

সত্য সত্যই কবির কথায়, ভারতচন্দ্রের কবিতা সুধা-মাখান। সত্যই তাঁহার লেখনী হইতে সুধা ক্ষরিয়াছে। তখন ভারতের যে সুমধুর গান গীত হইয়াছিল, যে ধর্ম্মভাবপূর্ণ গানের মূর্চ্ছনা বীণার ঝঙ্কারের সহিত মিশিয়া এই বঙ্গভূমির 'পর্ব্বতপাথার, সমুদ্র-কান্তার' ভরিয়া দিয়াছিল, সেই এক সঙ্গীতের আকর্ষণবশে সমগ্র বঙ্গ একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল। সেই বড় স্পৃহণীয় মিলন ও একপ্রাণতা, সেই চির-নবীন প্রেম, এই সকলের মূলে ভারতের কবিতার স্বভাবসুন্দর চারুচিত্র। ভারতই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষা-জননীর রাঙ্গাচরণকমলের সন্ধান দিয়া সাহিত্যে অভিনব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারত আজ নিজগুণে বঙ্গবাসীর নিকট পরিচিত।

ভারতচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইতেই সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাহার পর পঞ্চদশবর্ষের কবি দুইখানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একখানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার ভণিতায় বর্ষ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।"

ইহাতে বঙ্গীয় ১১৩৪ অব্দ হয়।

অল্পবয়সে কালের কুটিল আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত রাজপুত্র ভারত সংসারের উপর বীতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন এবং পুরুষোত্তমধামে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি বৈষ্ণবগণের সহিত বৃন্দাবন দর্শন করিতে যাত্রা করেন। এই সময়ে মহাশাক্ত ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিদ্রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়,—

"চল চল যাই নীলাচলে।
রে অরে ভাই,
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে।
মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দেখিব তথায় বটতলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত,
নাচিব গাইব কুতূহলে।"

এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয়।

ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হয়েন। মহারাজের রাজসভায় ভারতের উজ্জ্বল প্রতিভা বিকাশ পায়। চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনকালে তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচিত হয়। মহারাজ কবিকে "রায়গুণাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

কবিত্বপ্রভা- কবিতার আলোচনা

বাণীর বরপুত্র ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথমে তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তন করিয়া ভাষাকে অধিকতর মনোহারিণী করিয়াছেন; তিনিই মধুনিস্যন্দিনী করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত যাবতীয় অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া ভাষাকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এমন গ্রন্থ অতি বিরল—যে গ্রন্থে প্রচলিত অধিকাংশ ছন্দ, নবরস ও যাবতীয় অলঙ্কারের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক 'অন্নদামঙ্গল' সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। 'অন্নদামঙ্গল'ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, যাহা সর্ব্বজন-আদৃত, যাহা সকলের নিকটে সুধার ন্যায় মধুর বলিয়া পরিচিত। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে,—দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম-বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে; দ্বিতীয় ভাগে—বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও তৃতীয় ভাগে—মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহর বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লীগমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল ব্যতীত তিনি "রসমঞ্জরী", অসমাপ্ত "চণ্ডী নাটক" ও বহুবিধ হিন্দী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন। আর ভারত 'চোর পঞ্চাশতে'র শ্লোকগুলির দ্ব্যর্থ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় (কবিতাকারে) দিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যায় বিদ্যাসুন্দরের কবিতাগুলি 'কালীপক্ষে' বা 'শিবপক্ষে' ভক্তের বর্ণ্য বিষয় ঘোষিত হইয়াছে।

ভারতের কি মহীয়সী কবিত্বশক্তি! তিনি যে রসে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, সেই কবিতার প্রত্যেক শব্দটিতে পর্য্যন্ত সেই রস ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাগুলি যেন এক একটি জীবন্ত দৃশ্য। তিনি যে সকল দৃশ্য আঁকিয়াছেন, তাহা লিপিচাতুর্য্য, রচনা-মাধুর্য্য ও পদলালিত্যের একত্র সমাবেশে গড়িয়া তুলিয়া পাঠকগণকে তিনি বিহ্বল করিয়া দিয়াছেন।

দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের শান্ত উন্মাদনা-ভরা আকুল গীতিকা-গাহনি চলউচ্ছল কল-কল তানে যেমন শ্রান্ত মানবের চিত্তে একটা মহাশান্তিপূর্ণ জড়তা, একটা তন্দ্রার আবেশ আনিয়া দেয়, পথিক এক পদে তাঁহার কর্ণকুহর দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি বা ক্লেশ ভুলিয়া তটিনীর 'উর্ম্মি-নূপুরের নর্ত্ত-নর্ত্তনে'র গানে বিহ্বল চিত্তে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; সেইরূপ প্রেমিক-কবি ভারতের মোহিনী বীণার বিনোদ-ঝঙ্কারেও বাঙ্গালীর হৃদয় বিমোহিত ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভারতের বর্ণনাশক্তি অতুলনীয়। তাঁহার বর্ণনা শিশুর কলহাস্যের মত। বিহঙ্গমের বন্য-গীতের মত উদাত্ত এবং আয়াসহীন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র, চিত্রের ন্যায় মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন,' 'বিবাহ-বর্ণন', 'বর্দ্ধমানের গড় ও 'পুরী-বর্ণন', 'ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণ, 'হরিহোড়ের বৃত্তান্ত,' 'মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি,' ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান,' তাঁহার দুই স্ত্রীর 'স্বামী লইয়া দ্বন্দ্ব,' 'মানসিংহের যশোহর যাত্রা,' 'মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ,' প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে মানসপটে ঐ সকল চিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। মনে হয়—যেন সেই সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ ঐ সকল বিষয় দর্শন করিতেছি, তাহা যেন আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উজ্জ্বলভাবে ভাসিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট বিষয় পরিহাস-রসে মধুর ও আমোদপ্রদ হইয়াছে। স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোন কোন মহিমান্বিত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা করা হইয়াছে। কোথাও বা বর্ণনা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন,—

"ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে।
দশ দিক্ অন্ধকার করিল মেঘগণ।

ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হুড়মড়ি মেঘের ডেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের ঝরঝরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী।" ইত্যাদি।

আবার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহেশ্বরের যে ভৈরবসুন্দর চিত্র-খানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্য-সাহিত্যের শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহাতে কবির অদ্ভুত প্রতিভা ও তাঁহার ভাষা ও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে—তাহা এই,—

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক্-ধ্বক্ ধক্-ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলমল দলমল গলে মুণ্ডমালা।
কটি কট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥

*　　*　　*　　*

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥

*　　*　　*　　*

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে—সতী দে—সতী দে॥"

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। গঙ্গা-তরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুন্দর ও মধুর বর্ণনা "ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা" বাঙ্গালার কোন কবি দিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহাতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে;—"ছলচ্ছল",—প্রবাহবাচক, "টলট্টল"—নির্ম্মলতাবাচক, "কলকল"—নিক্কণবাচক।"

আমরা ভারতের বর্ণনাপাঠে, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি। ভারতের কবিত্বে ভাব-গ্রহণে অসমর্থ কেহ কেহ বলিতে প্রয়াস পান যে, "ভারতের কবিত্বে উচ্চভাব নাই, উচ্চ কল্পনা নাই, উচ্চ আদর্শ নাই—ভারতের ভাবের গুরুত্ব নাই।" "তাঁহার কাব্যের কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই।" কেহ আবার বলেন,—ভারতে শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে মাত্র। তিনি কেবল শব্দ-কবি। কিন্তু ভারতের ভাব যে অতিশয় মহৎ, অতীব শ্রেষ্ঠ—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতি উন্নত ভাব দেখিতে পাই তাঁহার কবিতায়। মানব-জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মভাব ভারতের কবিতায় উপাসক—ভারতচন্দ্র ভক্ত-কবি রামপ্রসাদের ন্যায়, অন্নদামঙ্গলের প্রতি কবিতায় ভগবৎ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিতাগুলি যেমনই মধুর—তেমনই ভাবে ঢল ঢল করিতেছে। তাঁহার রচিত নারদের গানে আমরা শুনিতে পাই,—

"জয় দেবি জগন্ময়ি　　দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি　　মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে।
জয় কালি কপালিনি　　মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি　　ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারত-ভীতি-হরে।"

আবার তিনি এক স্থানে অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন,—

"জয় জগদীশ জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিব-জায়া হর হরজায়া।
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে॥
যদি বার মমতা হত হয় যমতা।
দিধি ভূবি মমতা শুহহেরম্বে॥
তব জল সেবা সুরপতি কেবা।
মম দেই সেবা শির পরিলম্বে॥
ভবজল-তরণে রাখহ চরণে।
ভারত স্মরণে করি কাদম্বে॥"

কোথাও বা অন্নদার স্তব শুনি,—

"প্রসীদমাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকি পদ্মপাণি পদ্মযোনি সম্মসম্মদে॥
করস্থ-রত্নদর্ব্বিকা সুপানপাত্রশর্ম্মদে।
পুরস্তভুক্ত ভক্ত শম্ভু-মর্দ্দনে কটাক্ষদে॥
সুধান্বিত প্রভাত-ভানু দন্তবকচ্ছদে।
স্মিত প্রকাশিত ক্ষণপ্রভাংশু মুক্তিকারদে॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পদে॥"

আবার কোথাও ভক্ত কবি গাহিতেছেন,—

"জয়তি জননী অন্নদা।
গিরিশনয়ননর্ম্মদা॥
অখিলভুবনভক্তভক্তিমুক্তিশর্ম্মদা।
করবিলসিত-রত্নদর্ব্বী পানপাত্র সারদা॥
তরুণ কিরণ-কমল-নিহিতচরণ বারদা।
ভব-নিপতিতভারতস্য ভবজলনিধিপারদা॥"

এমন একটি কবিতাও নাই, যাহাতে ভবভয়হারিণী কালীর অভয় নাম স্মরণ করিতে ভারত বিস্মৃত হইয়াছেন। ভারত ভক্তচিত্তে গাহিয়াছেন,—

"আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে।
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণী ফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা।
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে॥
একাহাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ।
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভালে ঢল ঢল এক লোচন, কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন।

কপাল লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে।
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে ॥
দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি।'
আধ জটাজুট গঙ্গাসরসী, আধই চারু কবরী রে ॥
এক কানে শোভে ফণিমণ্ডল, এক কানে শোভে মণিকুণ্ডল।
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধকস্তূরী রে ॥"

ভারত যখন এই গীত গাহিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাব কত উচ্চ, কত মহৎ, ভাবিয়া দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—যিনি নিবিড় তমসাময় কালনিশায় জীমূত-মন্দ্র-নিনাদিত ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলে চঞ্চল চপলা-লীলা দেখিয়া হর্ষোল্লাসে নৃত্য করেন। এই সৌন্দর্য্য তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—যিনি প্রচণ্ড সূর্য্যকরবিদগ্ধ দিগন্তপ্রসারী মরুভূমিতে ক্ষীণাঙ্গী রজত-তটিনী দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হয়েন। ইহার সৌন্দর্য্য তাঁহারই অধিগম্য, যিনি—এই সংসাররূপ ঘোর শ্মশানে মহাশক্তির সহিত সঙ্গত হইয়া উৎকট শবসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা তিনিই বুঝিবেন—যিনি অভ্রংলেহী শৈলচূড়ার ও অসীম মহাকাশের পরস্পরের অনন্ত চুম্বন দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার সৌন্দর্য্য তাঁহাকেই আকৃষ্ট করিবে—যিনি সাগরের প্রেমাকর্ষণবলে অবনত অম্বরপ্রান্তের অর্ণবের প্রেমাম্বুতলে অনন্ত চুম্বন এবং সাগরের উপরে আকাশ, ভিতরে আকাশ দর্শনে বিমুগ্ধ হয়েন। ইহা তিনিই বুঝিবেন—যাঁহার শ্মশানে স্বর্গে, চন্দনে বিষ্ঠায়, শত্রু-মিত্রে সমভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহার প্রেম এই ক্ষুদ্র ধরাধামের গণ্ডী ছাড়াইয়া অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে,—যাহা অনন্তের প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। এইরূপ উন্নত ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কবিতা তাঁহার রচনার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

ভারতচন্দ্রের কবিতায় দেব-চরিত্রের উন্নত চিত্র দেখিতে পাই। কবি লেখার গুণে নিজের উন্নত চরিত্রবল দেখাইয়াছেন। 'নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার' ন্যায় মহাযোগী মহেশ্বরকে ভারত ভোলানাথের অপূর্ব্ব শিশুর মত সরলতাপূর্ণ চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন,—

"ববম্ ববম্ বম বম বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে তাল ॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে ॥

*   *   *   *

কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল ক'রে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটী কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥"

দেবাদিদেব মহাদেব যে "ভোলানাথ", তাহা ইহা পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সকল সামান্য বিষয়ে ভোলানাথ শিবের জ্রক্ষেপই নাই। কি সুন্দর চিত্র!

উমার মাতা মেনকা বাঙ্গালা ঘরের আদর্শ জননী। ভারতের তুলিকায় মেনকা-চিত্র কি অপরূপ মাধুরীই না ধারণ করিয়াছে! ইহার অধ্যয়নে বুঝা যায়, মেনকার অপত্যস্নেহে বঙ্গের স্নেহাতুরা জননীগণের প্রাণের আকুলতা একটি নির্ম্মল দর্পণে কাব্য-সাহিত্যে উপমাতে রূপের চিত্রখানি মনোহর হইয়া উঠে। 'ভারত' বিদ্যার রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা স্বভাবসুন্দর হইয়াছে।

"নব নাগরী নাগর-মোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী ॥
শারদ পার্ব্বণ, সীধু বয়ানন,
পঙ্কজকাননমোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী,
লোচন খঞ্জনগঞ্জনী ॥
কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী,
দ্বীপরিবাদবিধারিণী।
ভারত মানস, মানস সরস,
রাস-বিনোদবিনোদিনী ॥"

আবার অন্নপূর্ণার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"কথার পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারি পাশে ॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
চঞ্চল চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন-খঞ্জনী ॥"

বাল্মীকি এইরূপ রাবণের পুরীর সুন্দরীগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ।
অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥"

কালিদাসও কর্ণাম্বিকন্দ ভ্রমরলাঞ্ছিত শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, দুই একটি ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে সেই চিত্র কেমন সুন্দর হইয়াছে!

ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষায় তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সেই রাগের রঞ্জন করিয়া চিত্রগুলি কেমন উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন!

ভারতচন্দ্রের কাব্যে গৃহস্থালীর অঙ্কের নব দৃশ্য তাঁহার নিপুণ তুলিকাপাতে উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সুন্দর মনোহরণকারী চিত্র দেখিলে চক্ষুর যে অতুল তৃপ্তি সাধিত হয়, ভারতের কবিতাপাঠে সেইরূপ তৃপ্তিই পাওয়া যায়, এবং চিত্রকর হইতেও কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য। চিত্রকরের চিত্র যেমন কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়, ভারতচন্দ্রের তুলি সেইরূপ অভিনব প্রাণ দান করিয়াছে—তাঁহার কবিতায়।

শব্দসম্পদে ভারতচন্দ্র অতুলনীয়। তিনি প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল চিত্র মনোনিবেশ সহকারে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা স্বভাবের প্রকৃত আদর্শ চিত্র হইয়াছে ও তাঁহার বর্ণনা সে স্থলে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রকে "শব্দের তাজমহল" বলা যাইতে পারে। শব্দসম্পদের অধিকারী না হইলে কেহই প্রকৃত কবিপদবাচ্য হইতে পারেন না। শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের শক্তি অভাবনীয়। শব্দই ভাবকে বহন করে। যিনি শব্দের অধিকারী নহেন, তিনি কবি হইতে পারেন না।

যেমন শব্দ-সৌন্দর্য্যে, তেমনই ভাবমাধুর্য্যেও ভারতচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দী। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কারণেই অন্নদামঙ্গলের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেই সংস্করণ ৫ শত খণ্ড গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছিলেন। উহা সিভিলিয়ানদের (civilian) পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবাণীকুমার ভট্টাচার্য্য।

সংগঠনের সদুপায়

পল্লীমণ্ডলীসমূহের বিশিষ্ট পরিচালক সমিতির সংগঠনাদির কথা

প্রতি পল্লীমণ্ডলীতে অন্যূন হাজার জন কর্ম্মী সদস্য থাকিবেন। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই হাজার লইয়া সংগঠিত পল্লীসমাজগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গঠিত কার্য্যপরিচালক সদস্য সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালিত করিবেন। এই কার্য্যপরিচালক সমিতির প্রধান ১০ জন কর্ম্মী সদস্য, অনন্যকর্ম্মা হইয়া পল্লীমণ্ডলীর পরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত রহিবেন। নিজ নিজ মণ্ডলীর কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনের দায়িত্ব এই কর্ম্মী সমিতি নিয়ত বহন করিয়া চলিবেন। প্রতি পরিচালক সমিতিই তাঁহার নিজ মণ্ডলীটিকে তদীয় অনুশাসনাধীন স্বরাজ্যরূপে গড়িয়া লইয়া তদুন্নতিবিধানে জীবনের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন। সমিতির কর্ম্মশক্তি যাহাতে বৃথা বাহিরে বিক্ষিপ্ত না হইয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই স্থায়িত্ব, স্থিরত্ব ও গভীরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, তৎপ্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মীরা কর্ম্মব্রত সাধিয়া চলিবেন। উক্ত ১০ জন বিশিষ্ট কর্ম্মী, গড়ে ১ শত জন সাধারণ কর্ম্মীর সর্ব্ববিধ দায়িত্বভার গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলীকে যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপথে পরিচালিত করিবেন।

পরিচালক কর্ম্মীদের আদর্শ ও উপদেশমূলক ব্যবস্থায় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়া সাধারণ কর্ম্মীমাত্রই যাহাতে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য সমুৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহার বিধিব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। পরিচালক সদস্যের কৃতিত্বগুণে পরিচালিত কর্ম্মী যদি মাসে ১০টি মুদ্রার উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, তবে স্বভাবতঃই কৃতজ্ঞতাভরে সে তাহার উক্ত ১০টাকা হইতে একটি টাকা তাহার পরিচালককে পারিতোষিকরূপে প্রদান করিবে। শত কর্ম্মীর পরিচালক মাসে শত মুদ্রা এই প্রণালীতে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ প্রতি পরিচালক কর্ম্মীই তদ্দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মী শতকের মোট আয়ের দশমাংশ পারিশ্রমিকরূপে প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু এই আয়ের দ্বারা তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের আবশ্যক ভাতাদির খরচ ঋণরূপে মূলধন তহবিল হইতেই যোগাইতে হইবে। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁহারা সুদসহ পূর্ব্বপ্রদত্ত উক্ত প্রাথমিক ঋণ পুনঃ মূলধন তহবিলে প্রত্যার্পণ করিবেন। কর্ম্মীমাত্রেই তাঁহাদের কৃতিত্বের যোগ্য পারিশ্রমিক অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মনির্ভরশীল না হওয়া পর্য্যন্ত যে সব সম্পন্ন কর্ম্মী নিজেদের প্রাথমিক খরচের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ ও বহন করিয়া কায করিবেন, তাঁহারা যথাকালে তাঁহাদের প্রদত্ত মূলধনের আসল টাকার উপর সুদ প্রাপ্ত হইবেন। আসল টাকাও ফিরিয়া পাইবেন। আর দরিদ্র কর্ম্মীরাই জাতীয় মূলধন তহবিল হইতে ঋণ প্রাপ্ত হইবেন। প্রতিষ্ঠানগুলিকে যত সত্বর সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে পারিবেন—তত শীঘ্রই তাঁহারা ঋণমুক্ত হইবেন।

মণ্ডলী ও সংসৎসমূহের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদির কথা

নির্দ্ধারিত উপায় অবলম্বনে গঠনমূলক কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে প্রথমেই গঠনেচ্ছু কর্ম্মী সমবায়ে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সংগঠন করিতে হইবে। গঠনমূলক কার্য্যের সাফল্যলাভেচ্ছু কর্ম্মীরা নিজ নিজ কর্ম্মশক্তির প্রেরণাতে চালিত হইয়াই এক কেন্দ্রে সমবেত হইয়া উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে মণ্ডলী ও সংসৎসমূহের সংগঠন করা।

এই উদ্দেশ্যসংসাধনার্থ তাঁহারা আনুষ্ঠানিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রাহক সমিতির সংগঠন করিবেন। দেশময় কর্ম্মের শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিয়া এই সমিতি যথানির্দ্দিষ্ট শতাংশিকভাবে দেশের সঞ্চিত অর্থ হইতে মূলধন তহবিলে অর্থ আহরণ করিয়া আনিবেন। সংগৃহীত এই অর্থের অবলম্বনেই সংগঠক সমিতি তাঁহার প্রাথমিক সংগঠনমূলক কার্য্যের সূত্রপাত করিবেন।

প্রতি পল্লীমণ্ডলীতে এই কার্য্যবিবরণীর প্রচার বা ইহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া পল্লীবাসিমাত্রকেই মণ্ডলীগঠনে উদ্বোধিত করিতে হইবে। এই উদ্বোধনের ফলে যে সকল পল্লীবাসী মণ্ডলীতে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহিবে, সংগঠন সমিতি সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের সঙ্ঘগঠন কার্য্যে সহায়তা করিবেন। পল্লীবাসীরা মণ্ডলী সংগঠনাদির জন্য উক্ত সংগঠক সমিতিরই সহায়তাপ্রার্থী হইবেন।

সহায়তাপ্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর স্থানীয় পরিচালক কর্ম্মীরা, স্থানীয় আড়তাদির প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পন্ন সাধারণ পল্লীবাসীদের নিকট হইতে শতাংশিকরূপে মূলধনের অংশ আদায়ের চেষ্টা করিবেন। আদায়ী অর্থ সব উক্ত অর্থসংগ্রাহক সমিতির মারফতে জাতীয় মূলধনভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবেন। স্থানীয় আড়তাদির প্রতিষ্ঠা জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন পরে জাতীয় মূলভাণ্ডার হইতে যথানির্দ্দিষ্ট সুদে ঋণরূপে গ্রহণ ও যথাকালে প্রত্যার্পণ করিবেন। স্থানীয় আমানত তহবিলে টাকা জমা হইতে আরম্ভ হইলেই প্রথমে গৃহীত ঋণের ভার বহনের বিশেষ আর কোনও প্রয়োজনীতা উপলব্ধ হইবে না।

উক্ত সংগঠক সমিতির চেষ্টায় আদর্শ মণ্ডলী ও সংসদের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হইলে পর আপনা হইতেই যখন সমগ্র দেশময় মণ্ডলী ও সংসৎসমূহ গঠিত হইতে আরম্ভ হইবে, তখন আর সংগঠক সমিতির অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজনীয়তা রহিবে না। তখন তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

সদস্যদের দেয় মূলধনের অংশ যখন সংসৎসমূহের তত্ত্বাবধানে আপনা হইতেই আদায় হইতে আরম্ভ হইবে; প্রাথমিক সেই পৃথক্ অর্থসংগ্রাহক সমিতিটিও তখন তুলিয়া দিতে হইবে।

উক্ত উভয় সমিতির কর্ম্মী সম্প্রদায় তখন জাতীয় কর্ম্মনির্ব্বাহক সংসদের অঙ্গীভূত হইয়া যোগ্যতানুরূপ কর্ম্মব্রতসাধনে লিপ্ত হইবেন।

সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কর্ম্মিবর্গকে দেশের জনসাধারণের শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী রাখিবার কথা

দেশে সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী কর্ম্মীর অভাব নাই। সাধারণতঃ উক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অর্থোৎপাদক কোনও বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য সমাজকে অর্জ্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় করিতে হয়। সংসারত্যাগী সাধুসন্ন্যাসী ফকির বা বাউলাদি সম্প্রদায়কে অর্থোৎপাদক বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত করা বা রাখাও সমীচীন হইবে না। এরূপ অবস্থায় উক্ত সম্প্রদায় যদি দেশবাসীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া সমাজ-প্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণে তাঁহাদের সুপবিত্র সাধুজীবন যাপন করিয়া চলেন, তবেই সব দিকে সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়। এক দিকে সুশিক্ষার প্রাপ্তিতে সমাজের অর্থব্যয় যেমন সার্থক হয়, অপর দিকে সাধক সম্প্রদায়ের সামাজিক ঋণও সুদে আসলে পরিশোধ করা হয়।

সে যাহাই হউক, উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দেশময় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষাসমিতির সহায়তায় কথিত সাধু সাধক-সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা দেশবাসীর শিক্ষাদানকার্য্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকরা প্রধানতঃ কারিগরী

শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রদানের এবং চরিত্র-সংগঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। প্রতি পল্লীমণ্ডলীতেই যাহাতে একটি করিয়া সাধারণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং অন্ততঃ এক জনও প্রকৃত সাধক শিক্ষক তাহাতে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী থাকিতে পারেন, তাহার বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে। সংসারত্যাগী ফকির-সন্ন্যাসীরাও যাহাতে সানন্দে দেশের শিক্ষাদানকার্য্যে দায়িত্বটি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়েন, দেশের আবহাওয়া এমনই ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

তিব্বতে প্রচলিত ধর্ম্ম

শাক্যবংশীয় গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী-সংবলিত যে সকল গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে পালি ত্রিপিটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ত্রিপিটক তিনখানি গ্রন্থের সমষ্টি—'বিনয়' পিটক, 'সুত্ত' পিটক এবং 'অভিধম্ম' 'পিটক'।

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহ নগরে প্রথম বৌদ্ধসভা আহূত হয়। ত্রিপিটক ঐ সভাতেই সর্ব্বপ্রথম সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩শত ৫০শতাব্দীতে বৈশালী নগরে যশদার তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বৌদ্ধসভা আহূত হয়। বৌদ্ধদিগের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাই ঐ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ২ শত ৫০ অব্দে সম্রাট অশোকের আজ্ঞানুসারে পাটলিপুত্র নগরে মোগলীপুত্রের সভাপতিত্বে তৃতীয় বৌদ্ধসভা আহূত হয়। এই তৃতীয় সভার বিবরণ তিব্বতে প্রচলিত গ্রন্থসমূহে মোটেই পাওয়া যায় না। চীনদেশেরও অধিকাংশ পুস্তকই এই সভা সম্বন্ধে নীরব, কিন্তু তিব্বত ও চীনদেশে সাধারণতঃ এই সভা অজ্ঞাত হইলেও উহাতে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সংশোধিত এবং পুনর্লিখিত হইয়াছিল এবং অধুনা সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্যে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম উক্ত তৃতীয় সভাতে পুনর্লিখিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে জলন্ধর নগরে চতুর্থ বৌদ্ধ-সভা আহূত হয়। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদিগের মহাযান সম্প্রদায় এই সভাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরে উহা অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মত এই যে, উক্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং উহা হইতে অতি ধীরে এবং তাৎকালিক আনুষ্ঠানিকদিগের অজ্ঞাতসারে উদ্ভূত। নব-সাম্প্রদায়িকরা সগর্ব্বে আপনাদিগের মতকে 'মহাযান' নামে অভিহিত করেন এবং আদি বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটকের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক অভিনব মত গ্রহণ এবং প্রচার করেন। যাহারা ত্রিপিটক ভিন্ন অপর মত গ্রাহ্য করিল না, তাহাদের মত 'হীনযান' বলিয়া নূতন সাম্প্রদায়িকরা ঘোষণা করিলেন।

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্যে হীনযান মত গৃহীত ও প্রচলিত। চীন, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, মোঙ্গোলিয়া, ভূটান, নেপাল, সিকিম, এবং তিব্বত মহাযান-মতাবলম্বী।

ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মহাযান মত বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন এত মত উহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে যে, মহাযানের প্রচার্য্য বিষয় নির্দ্ধারণ করা অতি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হইবার পর পালি পিটকত্রয় পরবর্ত্তী টীকাকারদিগের দ্বারা যে অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাদিগের মধ্য হইতে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত এক প্রকার ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ন্যায় পূজিত; যদিও বুদ্ধদেব নিজে কখনও সেরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপরিনির্ব্বাণ-সুত্তোক্ত বুদ্ধের স্বীয় শিষ্যবর্গের প্রতি নির্দ্দেশ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, তিনি মাত্র জনশ্রুতির উপর বিশ্বাসস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রবাদ কেবলমাত্র প্রাচীন এবং বংশপরম্পরাগত বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। কোন কিছু কেবলমাত্র বহুজন-কথিত বলিয়া কিংবা কোন প্রাচীন জ্ঞানী কর্ত্তৃক কিংবা কেবলমাত্র বহু দিন প্রচলিত আচার কর্ত্তৃক কিংবা ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষানুসারে যাহা অভিজ্ঞতা-সমর্থিত, সম্পূর্ণ অনুসন্ধান দ্বারা যাহার যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহ বলিয়া প্রমাণিত, মাত্র তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণীয়।

এই প্রবন্ধে বর্ণিতব্য বিষয় বিবৃত করিবার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল প্রস্তাবগুলি অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে। বস্তুসমূহের উৎপত্তির কারণ—স্রষ্টাবিশেষের সৃষ্টি কিংবা অন্যবিধ কোন হেতু—সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মে গৃহীত কোন সত্য নাই। যে সকল প্রশ্ন মনুষ্যের চিন্তাশক্তির সীমা-বহির্ভূত, উহা তাহাদেরই অন্যতম; সুতরাং শিক্ষাপ্রদ নয়। ইহাই বৌদ্ধমত। বুদ্ধদেব এই প্রকার নিরর্থক চিন্তাসমূহ হইতে মনুষ্যকে নিরস্ত করিয়াছেন। চেতন জগতের উৎপত্তি যেরূপেই হউক না, ইহা অনিত্য, অর্থাৎ মূলতঃ ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং অসার ও অপ্রকৃত। প্রাণিসমূহের 'দুঃখ' এই অনিত্যতা হইতে উদ্ভূত। অবিশ্রান্ত জন্মের মূলে তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণাই প্রাণিসমূহকে কর্ম্মের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। জন্মান্তরে মনুষ্যের রূপ এই কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে। এই অবিরাম জন্ম ও মৃত্যুর 'চক্র' হইতে মুক্তিপ্রার্থিগণের জন্য বুদ্ধ অষ্টবিধ-মার্গ-সংবলিত নৈতিক আচরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই আচরণপালনে সমর্থ ব্যক্তি কর্ম্মের শৃঙ্খল ও পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হইবেন। এই প্রকারে মুক্ত জীব ইহজীবনেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া দেহান্তে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। এই অবস্থা বাক্যে বর্ণনীয় নয়, ইহা কেবলমাত্র অনুভূতির যোগ্য। ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম আদৌ নীতিধর্ম্মপালন। দেবদেবী, ঐশ্বরিক বিধান, শাস্ত্রমত প্রভৃতিতে বিশ্বাস ইহাতে স্থান পায় নাই।

পালিগ্রন্থ সমূহে যে সকল দেবদেবীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মোক্ত। কিন্তু তাঁহাদের উল্লেখের উদ্দেশ্য নীতি-বোধাত্মক আখ্যানসমূহের অবতারণা। তাঁহারা পূজা পাইবার যোগ্য বলিয়া কোন স্থানে কথিত হয়েন নাই। সত্য বটে, তাঁহাদের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু ইহা উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্য ও অপরাপর প্রাণীর ন্যায় তাঁহারাও সান্ত, তাঁহারাও কর্ম্মচক্রের অধীন এবং উৎপত্তি ও বিনাশের চক্র হইতে তাঁহাদেরও নিষ্কৃতি নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণকারীকে কোন দেব-দেবীর শরণ লইতে হয় না। যে বৌদ্ধ 'ধম্ম'-নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া 'অর্হৎ' হইয়াছেন, তিনি সকল দেবদেবীর অপেক্ষা উচ্চে।

বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সংঘর্ষোৎপন্ন ধর্ম্ম-বিপ্লব ভারতে চিরকাল অজ্ঞাত ছিল। আস্তিক ও নাস্তিক একই স্থানে বসিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত নরনারী সমভাবে উভয়কেই সংবর্দ্ধনা করিয়াছে, উভয়কেই ঋষি বলিয়া পুষ্পার্ঘ্য দিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তিভঙ্গ হয় নাই। এ অসাধারণ সহিষ্ণুতার জন্যই যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের অখণ্ড প্রতাপ, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও দর্শন হীনপ্রভ হইলেও প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত নয়। তাহারই ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দু মতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে বৌদ্ধ 'মহাযান' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ...
'মহাযান' বৌদ্ধমত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহাপরিনির্ব্বাণের ১ স...

ক্ষেপার খেয়াল

সে ছিলো একটু ক্ষেপাটে ধরণের। সাধারণ জীবন-যাত্রাটা তার কাছে অত্যন্ত ম্যাজমেজে একঘেয়ে লাগতো; তাই তার মন অনিয়মিত আকস্মিক অদ্ভুত কিছু দেখবার জন্যে সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করতো। জীবনটাকে সম্ভোগ করার জন্যে সে সতত উত্তেজনার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে থাকতো। খবরের কাগজে যখন সে পড়তো, কোথায় একটা এয়ারোপ্লেন ভেঙে প'ড়ে গেছে, তখন সে লাফিয়ে উঠে বলতো—আহা হা! আমি যদি সেখানে থাকতাম, তা হ'লে মজাটা দেখতে পেতাম!

এয়ারোপ্লেন ভেঙে পড়ে, জাহাজ ডুবি হয়, ট্রেণে কলিশন হয়, ভূমিকম্পে দেশ উৎসন্ন যায়, এমন কি, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়, লোকে সর্পাঘাতে মরে, কিন্তু এর একটা ঘটনাও তার চোখের সামনে ঘটে না, এই আপশোষে সে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

সে বায়োস্কোপ দেখতে যায়, চলচ্চিত্র দেখবার জন্যে নয়; সে কাগজে পড়েছে যে, বায়স্কোপে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড হয়, হয় তো তার ভাগ্যে কোনো দিন বায়স্কোপে আগুন লাগা আর ভয়ার্ত্ত দর্শকদের হুড়াহুড়ি দেখার সুযোগ জুটে যেতে পারে, সেই লোভে সে বায়োস্কোপের নিত্য নিয়মিত দর্শক। কিন্তু বায়োস্কোপে অগ্নিকাণ্ড দেখার সৌভাগ্য তার কোনো দিন ঘ'টে উঠলো না। সে প্রায়ই চিড়িয়াখানায় যায়, কোনো দিন একটা বাঘ বা সিংহ খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে লোকের ঘাড় ভাঙছে, এই দৃশ্য দেখতে পাবার আশায়। সে ঘোড়-দৌড়ে যায়—বাজী রেখে জুয়া খেলতে নয়, কোনো ঘোড়-সওয়ার ঘোড়া শুদ্ধ ঘাড় গুঁজে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়বে দেখতে পাবার জন্যে।

কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় মানুষ বা জন্তুর যে বিষম যন্ত্রণা হয়, তাতে সে পরম আনন্দ অনুভব করে। এই উত্তেজনার সন্ধানে তার সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হতো। এই ছিল তার ক্ষেপামি।

চন্দননগর থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত সাঁতারের প্রতিযোগিতা হবে শুনে সে নৌকা ভাড়া ক'রে দেখতে গিয়েছিলো, যদি তার ভাগ্যক্রমে কোনো সাঁতারু ডুবে যায়, তবু মজা দেখা হবে। সেই দিন কোনো সাঁতারুর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি বটে, কিন্তু সাঁতারুদের সঙ্গী ডাক্তারের মোটর-বোট্ মোড় ফিরতে গিয়ে যখন ডুবে গেলো, তখন তার কিছু আনন্দ হলো—যাক্, একটু তবু মজা দেখতে পাওয়া গেলো!

তার পর অনেক দিন কেটে গেলো, তার ভাগ্যে কোনো রকম বিশেষ উত্তেজনার ব্যাপার দেখা ঘ'টে উঠলো না। সে স্ফূর্ত্তির অভাবে মনমরা বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। সে আর আজকাল প্রায়ই বাইরে যায় না, বাড়ীতে ব'সে ব'সে কেবলই ভাবে—হায় রে! এতো বড়ো বিপুলা পৃথিবী অনন্ত-জীবধাত্রী, কিন্তু একটা কোনো প্রাণীর অপঘাত-মৃত্যুর মুহূর্ত্তে যন্ত্রণার আক্ষেপ দেখা আমার ভাগ্যে ঘ'টে উঠলো না! সমস্ত জীবনটা আমার বৃথাই কাটলো!

ক্ষেপার আক্ষেপ ভগবান্ যেনো শুনতে পেলেন, কল্‌কাতা সহরে হিন্দু-মুসলমান মরণ-তাণ্ডবে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সে প্রতিদিনই খবর পায়, হিন্দু মুসলমানকে ঠেঙিয়ে মেরেছে, মুসলমান হিন্দুকে খুঁচিয়ে বধ করেছে। এই সব সুসংবাদের অতি প্রাচুর্য্যে উৎফুল্ল হয়ে সে পরের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখবার প্রলোভনে নিজের জীবনের ভয় ভুলে পথে বেরিয়ে পড়লো; পথে পথে সে দুর্লভ-দর্শনীয় ঘটনার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় আর শুনতে পায়, "এলো এলো" "গেলো গেলো" "মার মার" "মেরে ফেললে মেরে ফেললে" শব্দ, কিন্তু সেই শব্দ অনুসরণ ক'রে ছুটে গিয়ে সে দেখে, কোথায় বা কি—সমস্ত পথ পরিষ্কার জনমানবশূন্য, কোথাও বা দেখে শুধু জনতা, তার মধ্যে না আছে লাঠালাঠি, না আছে মারামারি। এক দিন সে দেখলে, পথের একটা যায়গায় খানিকটা রক্ত জ'মে আছে; এ দৃশ্য দেখেও তার তৃপ্তি হলো না, এ তো সে যে-কোনো দিন কালীবাড়ীতে গেলেই দেখতে পেতে পারে। এক দিন সে দেখলে, একটা লোক রক্তাপ্লুত শরীরে পথের উপর ম'রে প'ড়ে রয়েছে; এই দেখেই তার মন ব'লে উঠলো—আহা হা! একে মারবার সময় যদি আমি এখানে থাকতাম! আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, কাউকে মারা তো দেখতে পেলামই না, কেউ ছোরা

পালাচ্ছি, এমন উত্তেজনার শুভ অবসরও আমার ভাগ্যে ঘট্লো না!

এক দিন সে যেতে যেতে দেখলে—এক জন মুসলমান ড্রাইভার হিন্দুপাড়ার ভিতর দিয়ে প্রাণ হাতে ক'রে শূন্য মোটর-বাস্ হাঁকিয়ে পালাচ্ছে; কতকগুলো রক্তপিপাসু হিন্দু প্রাণভয়ে ভীত ও পলাতক অসহায় একাকী মুসলমানকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে পথের উপর মোটা কাঠের কড়ি ফেলে ও মোটা দড়ির বেড়া দিয়ে তার মোটর আট্‌কে ফেল্লে; মুসলমান ড্রাইভার চলন্ত মোটর থেকে প্রাণভয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লো ও পাশের এক গলি দিয়ে পালাবার চেষ্টায় দৌড় দিলো। কিন্তু তখনই নর-পিশাচরা সেই নির্দ্দোষ প্রাণভয়ে কাতর হয়ে পলাতক মুসলমানকে ঘিরে ফেল্লে এবং কেবল তার ধর্ম্মমত তাদের ধর্ম্মমতের সহিত এক নয়, এই অপরাধে তাকে নির্ম্মমভাবে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো, শাবল দিয়ে খোঁচা দিতে লাগলো এবং দূরে পালিয়ে গেলে ইট ছুড়ে ছুড়ে মেরে আবার নিজে-দের ব্যূহের মধ্যে ফিরিয়ে আন্‌তে লাগলো। সে রক্তাপ্লুত ও সর্ব্বাঙ্গে আহত হয়ে পথপাশের বাড়ীর দ্বারে দ্বারে কাতর বচনে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনো গৃহস্থ তাকে আশ্রয় দিলে না, কারণ, তারা হিন্দু, ও বিপন্ন আশ্রয়-প্রার্থী বিধর্ম্মী মুসলমান; তারা যদিও অকালে আওড়ে থাকে যে, সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ এবং অরাবপ্যুচিতং কার্য্যং আতিথ্যং গৃহমাগতে, কিন্তু কার্য্যকালে তারা নির্দ্দোষ বিপন্নকে বিমুখ ক'রে বিতাড়িত করতে লাগলো, কারণ, তার অপরাধ যে, তার স্বধর্ম্মের কোনো কোনো লোক অন্যায় ক'রে হিন্দুকে আঘাত করেছে, অতএব হিন্দুদেরও অন্যায় অত্যাচার কর্‌বার অধিকার বর্ত্তেছে! কোনো গৃহস্থ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলে, কোনো গৃহস্থ বা আশ্রয়প্রার্থীকে মেরে তাড়ালে। মুসলমানটি ক্রমাগত আহত প্রহৃত হ'তে হ'তে জখম ও পলায়নে অক্ষম হয়ে মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ে গেলো এবং পথের ধুলা রক্তে ভিজিয়ে যন্ত্রণায় লুণ্ঠিত হ'তে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখে ক্ষেপা আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো। তার উল্লাস বর্দ্ধিত ক'রে ভিড়ের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো টিকিওয়ালা ফোঁটা-তিলক-কাটা কণ্ঠীমালাধারী এক জন লোক দু'হাতে একখানা ভারী পাথর বহন ক'রে এবং সে ছুটে এসেই সেই পাথরখানা মাথার উপর উঁচু ক'রে তুলে ভূলুণ্ঠিত মুসলমান লোকটির মাথায় নিক্ষেপ কর্‌লে এবং তার মাথাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। ক্ষেপা আনন্দে অধীর হয়ে লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগলো—বাহবা! বাহবা! এতো আনন্দও ভগবান্ আমার কপালে লিখেছিলেন!

ক্ষেপার আনন্দ আরো বর্দ্ধিত কর্‌বার জন্য সকলে মোটর-গাড়ীখানার উপর পেট্রল ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলে। আগুনের উজ্জ্বল আভায় সেই স্থান যেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, ক্ষেপার মুখও তেমনি আনন্দে উদ্ভাসিত হলো।

কিন্তু ক্ষেপার দর্শনসুখে বাধা উৎপাদন ক'রে ফায়ার-ব্রিগেড্ ও পুলিসের লরী দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। কাযেই ক্ষেপাকেও সেই সুদৃশ্য ছেড়ে পালাতে হলো। শেষ পর্য্যন্ত মজাটা উপভোগ করতে না পারলেও সে যা দেখতে পেয়ে-ছিলো, তার আনন্দেই তার মন পরিপূর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং সে বেশী ক্ষুব্ধ হলো না।

ইহার পর সে এই রকম পরম উপভোগ্য কোনো দৃশ্য দেখবার জন্য অনেক কামনা ও চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার ভাগ্যে তা আর ঘ'টে ওঠে নি। তাকে অত্যন্ত দুঃখিত ক'রে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাও থেমে গেলো। ক্ষেপা আবার মনমরা হয়ে মুষড়ে পড়লো।

শীতকাল। কল্‌কাতার পথে পথে বাড়ীর দেয়ালের গায়ে হল্‌দে, লাল, নীল, কালো বিচিত্র রঙের ছবি টাঙিয়ে টাঙিয়ে লোক-জানানো হয়েছে যে, বোম্বাই থেকে এক বোম্বাই রকমের সার্কাস-দল এসেছে, তারা লোমহর্ষণ বিপজ্জনক খেলা দেখাবে—সিংহের সঙ্গে লড়াই, বাঘের মুখের মধ্যে মাথা প্রবেশ, অগ্নিচক্রের ভিতর দিয়া ঘোড়া দৌড়ানো, এক জন স্ত্রীলোককে একখানা খাড়া তক্তায় পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে ছোরা নিক্ষেপ ক'রে ক'রে তক্তায় ছোরা বিঁধে সেই রমণীকে ছোরার ঘেরায় বন্দিনী করা, বুকের উপর দিয়ে পথের খোয়া-পেটা গড়ানে রোলার ও হাতী চালানো, গাড়ীর সঙ্গে তীক্ষ্ণ বর্শা বিঁধে সেই বর্শাফলকের সূচীমুখে মাথা লাগিয়ে গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাওয়া, উঁচু দোল্‌না থেকে ঝুল খেয়ে শূন্যপথে উড়ে গিয়ে অপর দোল্‌নায় অপর এক জনকে ধ'রে-ফেলে দোল খাওয়া, ইত্যাদি কত রকম বিপজ্জনক সঙ্কটসঙ্কুল খেলা তারা দেখাবে; সর্ব্বোপরি তারা দেখাবে—একটা উঁচু যায়গা থেকে চাজ ক'রে অপরিস

তক্তা পেতে সেই তক্তা ঘুরিয়ে একটা ফাঁস বা চক্রের মত করা হবে, এবং এক জন খেলোয়াড় বাইসাইকেলে চ'ড়ে সেই ঢালুপথে বেগে নেমে সেই গতিবেগে কাষ্ঠচক্রের খাড়া দেয়াল বেয়ে উর্দ্ধে উঠবে এবং মাথা নীচু ও পা উঁচু দিকে ক'রে বাইসাইকেল চালিয়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার খাড়া দেয়াল বেয়ে নীচে নেমে আসবে; সেই কাষ্ঠচক্রের ঠিক উর্দ্ধদেশের মাঝখানে এক হাত পরিমাণ স্থানে কোনো তক্তা থাকবে না; সাইকেলচালক যখন ঘুরপাক খেয়ে নেমে আসবে, তখন ক্ষণকালের জন্য তার মাথা নীচু দিকে ও পা উঁচুদিকে তো থাকবেই, তার বাইসাইকেলের চাকার তলাতেও কোনো আশ্রয় বা কঠিন পদার্থের সংস্পর্শ থাকবে না, সাইকেলখানা সেই সময়টুকুর জন্য আরোহী সমেত শূন্য বাতাসে বিলম্বিত থাকবে, এবং নিরালম্ব নিরাশ্রয় বাইসাইকেল নিজের গতিবেগেই ধরণীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে অস্খলিত গতিতে নীচে নেমে আসবে।

এই বিজ্ঞাপন দেখে ও প'ড়ে ক্ষেপার বিষণ্ণ মুখ আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, সে ভাবলে—এতগুলো অসমসাহসের বিপৎসঙ্কুল খেলার মধ্যে এক দিনও কি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে না? মা কালী যদি দয়া করেন তো রোজ একটা ক'রে মজা দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

ক্ষেপা সার্কাসের আপিসে গিয়ে সমস্ত সীজনের জন্য সামনের একটা বক্স্ একেবারে রিজার্ভ ক'রে ফেললে। কারণ, তাকে তো রোজই সার্কাস দেখতে যেতে হবে, কোন্ দিন কি ঘটবে, তা তো বলা যায় না। বাঘ মুখের মধ্যে মানুষের মাথা পেয়ে কড়মড় ক'রে চিবিয়ে ফেলতে পারে; সিংহ নৃসিংহ-অবতারের মত খেলোয়াড়ের বক্ষ বিদীর্ণ করতে পারে; দূর থেকে নিক্ষিপ্ত ছোরা রমণীর বক্ষে বিদ্ধ হ'তে পারে; বর্শাফলক মাথায় গেঁথে যেতে পারে; হাতী বা রোলারের চাপে লোকটার বুক গুঁড়িয়ে যেতে পারে বা দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে; অগ্নিচক্রের মধ্য দিয়ে যেতে কাপড়ে আগুন ধ'রে যেতে পারে; শূন্যপথে উড্ডীন পরী হাত ফ'স্কে নীচে প'ড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব পেতে পারে; এবং সাইকেলওয়ালা ঘুরপাক খেতে গিয়ে ঘাড়মুড় মুচড়ে আছড়ে পড়তে পারে। সাধারণ আসনে বসলে পাছে পাশের লোক তার একাগ্র মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়, এই জন্য সে হবে; কিন্তু নিরুপদ্রবে একমনে অপঘাতের অপেক্ষা করতে তো কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সে রঙ্গভূমির এক টেরে বক্স্ পছন্দ করেছে; সাইকেলওয়ালা সেই দিকে মুখ ক'রে উপর থেকে নেমে ঘুরপাক খেয়ে ঠিক তার বক্সের সামনে অবতরণ করবে।

সার্কাস খেলার প্রথম রজনীতেই ক্ষেপা গিয়ে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলো। সমস্ত খেলাই তার কাছে কেমন শান্ত অনুত্তেজক ব'লে মনে হলো; শেষ খেলা সাইকেল দৌড়ের। সু-উচ্চ কাষ্ঠচক্র সাদা রং করা; তার তুঙ্গ শীর্ষদেশে শ্বেত ক্ষেত্রের উপর একটি কৃষ্ণবিন্দুর মত কালো-পোষাক-পরা সাইকেল-সওয়ারকে ভালো ক'রে দেখতে না দেখতে সওয়ার হঠাৎ এক ধাক্কায় সাইকেল চালিয়ে তার উপর চ'ড়ে বসলো, চ'ড়ে বসতে সাইকেল নিম্নমুখ ঢালু পথে ঝাঁপিয়ে ছুটে এলো, এবং নীচে এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে আবার এক লাফে খাড়া দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে চললো এবং ঘুরপাক খেয়ে সাইকেলের চাকা উপরে ও আরোহীর মাথা নীচে ক'রে শূন্য দিয়ে ছুটে চ'লে গেলো এবং নিমেষপাত হ'তে না হ'তে সাইকেল-সওয়ার বোঁ ক'রে নেমে এসে ঠিক তার সামনে সাইকেল থেকে লাফিয়ে মাটীতে দাঁড়াল এবং স্মিতমুখে বুকের কাছ থেকে দুপাশে হাত দুলিয়ে মাথা নুইয়ে প্রথমেই পুরোবর্ত্তী ক্ষেপাকে ও তার পর ফিরে ফিরে চারিদিকের দর্শকদের অভিবাদন করলে। দর্শকরা ঘন করতালি-ধ্বনি ক'রে তাকে অভিনন্দিত করতে লাগলো। এক মিনিটের মধ্যে এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সংঘটিত হয়ে গেলো।

ক্ষেপার সমস্ত অন্তর বিদ্যুৎস্পর্শের মত উত্তেজনায় প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

ক্ষেপা খেলার অবসানে দর্শকদের সঙ্গে রঙ্গভূমি থেকে বাহির হয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলো—তা তো হলো, কিন্তু এই দৃশ্য কদিনই বা ভালো লাগবে? দুচার দিন পরে এও তো মামুলি সাধারণ ব্যাপারের সামিলই মনে হবে। দেখতে না দেখতে সব চুকে যায়, উত্তেজনা অনুভব করবার অবসরই তো নেই।

কিন্তু হতাশ ও নিরুদ্যম হবার উপক্রমেই তার এও মনে হলো—অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘটনা নিষ্পন্ন হয় বলেই

দিন হাত কি পা কস্কে' যেতে পারে, বুক কেঁপে উঠতে পারে, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'তে পারে ; সাইকেলের চাকা খুলে যেতে পারে, চাকার শিকল খুলে যেতে পারে, চাকা আট্‌কে যেতে পারে, চাকার বেড় কেটে যেতে পারে ; কাষ্ঠচক্র ভেঙে পড়তে পারে, কোথাও একটা স্ক্রু খুলে গেলেই তো ব্যস্‌!

এক দিন না এক দিন দুর্বিপাক ঘট্‌বার আশা তার মনে প্রবল হয়ে উঠলো, এবং সে যে প্রত্যহই উপস্থিত থাক্‌বে, এ সঙ্কল্প স্থির করতে তার মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হলো না—সেটা তার চিন্তা-পরম্পরার পরের ধাপেই ঠিক কায়েমি হয়ে গেলো!

দু' মাস ধ'রে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সে সার্কাস দেখতে আসে ; যে দিন দুবার খেলা হয়, সে দিন দুবারই উপস্থিত থাকে। সে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে বসে। নির্নিমেষ নয়নে সাইকেল-চালনা দেখে ; চোখের পলক ফেল্‌তে তার ভয় হয়, কি জানি যদি সেই নিমেষে দুর্বিপাক ঘ'টে যায় আর তার দেখা না ঘটে!

সার্কাসের সকল লোকের সঙ্গেই তার একরকম চেনা-পরিচয় হয়ে এসেছে ; প্রত্যহের নিয়মিত দর্শক সে, একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিঃসঙ্গ একাকী রোজ বসে, কাযেই সে সকল লোকের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তারা ভেবে পায় না যে, এই ব্যক্তি কিসের মোহে প্রত্যহ খেলা দেখতে আসে ও এত অর্থ অপব্যয় করে।

সে দিন বুধবার। বৈকালী খেলা হয়ে গেছে। আবার রাত্রি ৯টার সময় খেলা হবে। ৮টা বেজে গেছে। এই অল্পসময়ের জন্য সে আর কোথায় যাবে? সে সার্কাসের মাঠে এক খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে রক্ষিত পিঞ্জরাবদ্ধ পশুদের দেখে বেড়াচ্ছে। এক জন লোক তার দিকে এগিয়ে এসে স্মিতমুখে তাকে সেলাম করলে। ক্ষেপা পশুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখলে, সেই সাইকেল-সওয়ার। ক্ষেপার মুখ সাইকেল-সওয়ারের সঙ্গে পরিচয়-সৌভাগ্যে প্রফুল্ল হয়ে উঠলো, সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সেলাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি আমাকে চেনেন?

সাইকেল-চালক বল্‌লে—বিলক্ষণ চিনি। আপনি এক চেয়ের বক্সে ব'সে খেলা দেখেন, নিত্য আসেন—আপনারই অত্যাশ্চর্য্য বাহাদুরী দেখতে, কিন্তু আপনি আমাকে লক্ষ্য করলেন কি ক'রে?

সাইকেল-চালক হেসে বল্‌লে—আমার খেলা তো লক্ষ্য স্থির রাখারই খেলা। আমি উঁচু মঞ্চে উঠে ঢালু গড়ানে পথে ছুটে নামবার আগে রোজই দেখি, আপনি ঠিক আমার চোখের সাম্‌নে ব'সে থাকেন…

ক্ষেপা বল্‌লে—আশ্চর্য্য! অত উঁচুতে—অমন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময়ও আপনার মন এমন স্বচ্ছন্দ থাকে যে, কোথায় কে দর্শক ব'সে আছে, তাও লক্ষ্য করেন?

—কোথায় কে দর্শক আছে, তা তো আমি দেখি না ; আমার মন বিক্ষিপ্ত হলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই সর্ব্বনাশ! আমার খেলার মধ্যে এই তো একটিমাত্র কৌশল!

ক্ষেপা চমকে উঠলো—কৌশল!

—হ্যাঁ কৌশল, কিন্তু চালাকি মনে করবেন না। আমার খেলার মধ্যে কোনো চালাকি নেই। কেবল লক্ষ্য স্থির রেখে ও সাহস বুকে বেঁধে উঁচু থেকে পেঁচানো পথে ঝাঁপিয়ে পড়া, তার পর আপন বেগেই নিমেষমধ্যে ঘুরপাক খাওয়া সমাধা হয়ে যায়। আমার খেলার প্রধান কৌশল হচ্ছে মনঃস্থির করা ও দৃষ্টি স্থির রাখা। হিন্দু যোগীরা এই জন্য নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে মনঃসংযম অভ্যাস করেন। এই মনঃস্থির করবার জন্য আমি আমার ঠিক সাম্‌নে একটা কিছুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে লক্ষ্য স্থির ক'রে নি ; তখন আমি অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের মত সেই বস্তুটি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না ; যেই আমার নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, সেই মুহূর্ত্ত থেকে নীচে নেমে যাওয়ার পর-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার মন থেকেও সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। আমি সাইকেলের হাতল ধ'রে যেই দাঁড়াই, সেই যাত্রার উদ্‌যোগ-মুহূর্ত্তে আমার কাছে থাকে কেবল সেই আমার লক্ষ্য বস্তুটি ; তার পর আমি লাফিয়ে সাইকেলের বৈঠক জিনের উপর উঠে বসি ও ঢালু পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি ; তখন আমি আমার ভার-সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখি না, পথের প্রতি লক্ষ্য রাখি না ; পথ তো নির্দ্দিষ্টই আছে, আমার দেহ তো আমার মনের বশে সিধা আছে, মন তো স্থির আছে দৃষ্টির শাসনে ; দৃষ্টি বন্দী থাকে লক্ষ্যবদ্ধ হয়ে। আমার দেহ-মনকে চালনা করে দৃষ্টি। তাই আমার একমাত্র ভয়

পড়ে। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা আমি চঞ্চল দৃষ্টিকেও বশ করেছি। যেই আমি কোনো স্থির বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, অমনি দৃষ্টির চঞ্চলতাও তিরোহিত হয়, আমি এখানে প্রথম রাত্রে খেলা দেখাতে গিয়ে সাম্‌নে চাইতেই আমার দৃষ্টি পড়লো আপনার উপর। কি জানি কেন, আপনাতেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, আপনাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। তার পর থেকে প্রতি রাত্রিতেই আপনি ধ্রুব-তারার মত আমার লক্ষ্যস্থল হয়ে বিরাজ করেন। এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, বিনা চেষ্টাতেই আপনার দিকে দৃষ্টি ধাবিত হয় এবং আমার আশা কখনো বিফল হয় না: দৃষ্টি আপনাতে নিবদ্ধ করেই আমি বিপৎসঙ্কুল খেলা নিষ্পন্ন করি। আপনিই আমার সফলতার প্রধান সহায়।"

এই ব'লে খেলোয়াড় ক্ষেপার মুখের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞ হাসি হাস্‌লে।

৯টা বাজ্‌লো। খেলা আরম্ভ হবার সঙ্কেত-ঘণ্টা বাজ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীত বেজে উঠলো।

সাইকেল-খেলোয়াড় ক্ষেপার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য বল্‌লে—সেলাম বাবু-সাহেব।

ক্ষেপা প্রত্যভিবাদন ক'রে বল্‌লে—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বিশেষ খুসী হলাম। কিন্তু আপনার নামটি জান্‌তে পারি নি।

খেলোয়াড় হেসে বল্‌লে—আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম বখশ ইলাহা; কিন্তু আমার খেলার দক্ষতার জন্য লোক আমাকে নাম দিয়েছে বাজ-বাহাদুর।

ক্ষেপা চিন্তামগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে নিজের নির্দ্দিষ্ট বক্সের নির্দ্দিষ্ট আসনে বস্‌লো।

দর্শকের চঞ্চল আলোচনা ও কোলাহল শান্ত হয়ে এলো; সকলে খেলা দেখবার ঔৎসুক্যে স্তব্ধ হয়ে বস্‌লো। খেলা দেখানো আরম্ভ হলো। কতক খেলা দেখানোর পর কয়েক মিনিটের জন্য খেলা দেখানো বন্ধ হলো। আবার দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হয়ে কলরব করতে লাগলো ও স্ব স্ব আসন ছেড়ে উঠে যেতে লাগলো। ক্ষণকাল "চাই কমলা-লেবু, চাই পান-বিড়ি-সিগারেট, চাই চীনাবাদাম" ইত্যাদি রবে রঙ্গভূমি মুখর হয়ে উঠলো। তার পর আবার ঘণ্টা বাজিয়ে সঙ্কেত করা হলো, যে, এইবার দ্বিতীয়ার্দ্ধ খেলা দেখানো আরম্ভ হবে। আবার দর্শকরা যথাস্থানে বস্‌লো ও তাদের কলরব থেমে এলো। খেলা আরম্ভ হলো। একটা ঘোড়ার কসরৎ দেখিয়েই সাইকেল-ঘুরপাক দেখানো হবে; বাজ বাহাদুর সিঁড়ি বেয়ে সুউচ্চ মঞ্চের উপর গিয়ে উঠলো। দর্শকমণ্ডলী নিঃশব্দ স্তব্ধ হয়ে যেন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে তার নীচে ঝাঁপিয়ে পড়া দেখার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। বাজ বাহাদুরের সাইকেল দুজন লোক ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল; বাজ-বাহাদুর সেই সাইকেলের উপর চ'ড়ে ব'সে সাম্‌নের দিকে চেয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে নিলে; সাইকেল-ধারী লোক দুটি বাজ বাহাদুরের ইঙ্গিত পেলেই সাইকেল ছেড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; বাজ বাহাদুর সাইকেলের হাতল চেপে ধ'রে, নিজের ভার-সামঞ্জস্য ক'রে নিয়েছে, তার লক্ষ্য ক্ষেপার উপর নিবদ্ধ ক'রে সে চেঁচিয়ে উঠলো—হাঁ!

সাইকেল-ধারী লোক দুটি তার সাইকেল ছেড়ে দিলে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, বাজ বাহাদুরের সাইকেল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেপা শান্ত সহজ ভাবে নিজের নির্দ্দিষ্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের অপর একখানা চেয়ারে গিয়ে ধীরে ধীরে বস্‌লো।

অমনি চারিদিক থেকে একটা ভয়ার্ত্ত শব্দ উত্থিত হলো। বাজ বাহাদুরের সাইকেল কাষ্ঠচক্রের পথ ছেড়ে শূন্যে ছিট্‌কে এসেছে, এবং চক্ষুর পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে আরোহী সমেত সাইকেলখানা শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে মাটীতে এসে আছড়ে পড়লো। সার্কাসের লোকরা ছুটে এসে লুফে ধর্‌বার সময়ও পেলে না। সকল লোক হায় হায় করতে লাগলো, রঙ্গভূমি চঞ্চল জনতায় বিশৃঙ্খল ও কলরবে মুখর হয়ে উঠলো।

ক্ষেপার মুখ সন্তোষে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে শালখানা খুলে ছড়িয়ে গায়ে দিলে এবং একটা সিগারেট বার ক'রে মুখে চেপে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সার্কাস থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো। সে তাঁবুর বাইরে গিয়ে পরম আরাম অনুভব ক'রে অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—যাক, একটা মজা দেখাও হলো!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌড়—পাণ্ডুয়া

২

কদমরসুল মসজেদের পূর্ব্বদিকে ইষ্টক দিয়া বাঁধান একটি ছোট উঠান আছে। এই উঠানের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি ছাদ-বিহীন কোঠার দেওয়ালমাত্র দণ্ডায়মান আছে। কদম-রসুলের বাটী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা একটি কবরস্থান বা মকবরা। এই বাটী দুর্গের পূর্ব্বদিকের মৃন্ময় প্রাকারের পশ্চিমদিকে উহার পাদদেশে অবস্থিত। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়েক জন মুসলমান রাজমিস্ত্রী ও মজুর এই বাটী মেরামতে নিযুক্ত রহিয়াছে দেখিয়াছি। ইহা এক্ষণে পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।



লুকোচুরী দরওয়াজা

কদমরসুলের বাটীর পূর্ব্বদিকে দুর্গের উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার ও প্রাকারের বহির্দ্দেশে জলপূর্ণ বিস্তৃত পরিখা আছে। কদমরসুলের বাটীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের সন্নিকটে এই মৃন্ময় প্রাকার ভেদ করিয়া যে ইষ্টক-নির্ম্মিত বৃহৎ দরওয়াজা দরওয়াজা।" ইহাই গৌড়-দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রবেশদ্বার। এই দরওয়াজা ইষ্টকনির্ম্মিত ও দ্বিতল। ইহার দুই পার্শ্বে ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন দুইটি করিয়া চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে। দ্বিতলের মধ্যস্থলে যে নহবতের ঘর আছে, উহার উপরে একটি গুম্বজ শোভা পাইতেছে। এই দরওয়াজার সর্ব্বাঙ্গে বালির জমাটের পরিবর্ত্তে মিহি সুরকীর জমাট করিয়া তাহার উপরে চূণকাম করা হইয়াছে। বাদশাহ সাজাহানের পুত্র শা সুজা যখন কিছু দিনের জন্য গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি এই দরওয়াজার সংস্কার করাইয়াছিলেন। উক্ত সুরকীর জমাট ও চূণকাম সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ের। কানিংহামের মতে ১৫২২ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ ইহা নির্ম্মাণ করান।

লুকোচুরী দরওয়াজার সামান্য দূরে দক্ষিণদিকে দুর্গের পূর্ব্বোক্ত মৃন্ময় প্রাকার ভেদ করিয়া একটি গুপ্ত পথ আছে। সম্ভবতঃ বন্দীদিগের গমনাগমনের জন্য এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গুপ্তপথের পশ্চিমদিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত এক গুম্বজ-শোভিত "গুমটি দরওয়াজা" আছে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রে শ্বেত ও নীল প্রভৃতি বর্ণের এনামেলকরা ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। কতকগুলি রাজমিস্ত্রী ও মজুর ইহার সংস্কার করিতেছে দেখিলাম। চারি বৎসর পূর্ব্বে ইহা মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিল।

গুমটি দরওয়াজার পশ্চিমদিকে চিকা বা চামখানা বা চোরখানা মসজেদ আছে। ইহা অতি বৃহৎ ও ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার উপরে একটি অতি বৃহৎ গুম্বজ আছে, কিন্তু গুম্বজের উপরে কোন চূড়া বা কলস নাই। ইহার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে; তন্মধ্যে পশ্চিমের দ্বারটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই মসজেদের বহির্দ্দেশের দেওয়ালের প্রায় মধ্যভাগে শ্বেত ও নীল বর্ণের এনামেল-করা ইষ্টকের সারি গাঁথা আছে। এই মসজেদের সহিত পাণ্ডুয়ার 'একলাখী' মসজেদের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিলে



গুমটি মসজেদ

কারাগার বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। র‍্যাভেনশর মতে ইহা জেলখানা, কিন্তু কানিংহামের মতে ইহা জালালুদ্দীনের পুত্র মামুদের সমাধি-গৃহ। পূর্ব্বে ইহার মধ্যে অসংখ্য চামচিকা বাস করিত। সেই জন্য ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার কোন স্মৃতিফলক নাই। ইহা ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চারিটি দ্বারে এক্ষণে লৌহজালাবৃত কবাট বসিয়াছে। ইহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ দ্বারা সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

বর্ত্তমানে 'চিকা-মসজেদের' দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের বিস্তৃত ভূমি খনন করিবার জন্য পূর্ত্তবিভাগ হইতে কতকগুলি লোক নিযুক্ত হইয়াছে দেখিলাম। এই স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে প্রস্তরের বৃহৎ স্তম্ভ সকল বাহির হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বে কোন বৃহৎ গৃহ বা গৃহের শ্রেণী ছিল বলিয়া বোধ হয়।

লুকোচুরী দরওয়াজার পশ্চিমদিকে ও কদম-রসুলের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পথিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহা বোধ হয় "হামাম" বা স্নানাগার

লাম্বোর্ণ-কৃত "মালদহ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" লিখিত আছে যে, চিকা-মসজেদের নিকট "খাজাঞ্চিখানা" ও "টাঁকশাল পুকুর" অবস্থিত। চিকার নিকটে ধ্বংসাবশেষ ও পুকুর আছে বটে, কিন্তু ঐ স্থানে যে খাজাঞ্চিখানা ও টাঁকশাল পুকুর ছিল, ইহা স্থানীয় কোন লোকের নিকট শুনি নাই। কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ২২ গজী প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ বা "হাবেলী খাসের" সর্ব্বদক্ষিণদিকের মহলের মধ্যে যে প্রস্তর দ্বারা বাঁধান উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ পুকুর আছে, উহাই টাঁকশাল দীঘি ও উহার পশ্চিমদিকে যে ধ্বংসস্তূপ আছে, উহাই খাজাঞ্চিখানার ভগ্নাবশেষ। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন রাজপ্রাসাদের এই অংশকে অন্দর-মহল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

চিকা মসজেদের উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ দূরে এবং কদম-রসুলের পশ্চিমদিকের রাস্তার পশ্চিম পারে একটি শৈবালা-চ্ছাদিত কুম্ভীরসমাকুল পুষ্করিণী আছে; ইহার কোণ দুইটি ঠিক এক মাপের নহে। প্রত্যেক দিক বিভিন্ন মাপের। দুর্গের মধ্যে ইহা এককালে উৎকৃষ্ট জলাশয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা।

লুকোচুরী দরওয়াজা হইতে যে সরকারী রাস্তা পশ্চিম



দিকে গিয়াছে, ঐ রাস্তা দিয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত "হাবেলী খাস" বা রাজপ্রাসাদের ২২ গজী প্রাচীরের পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। 'কদম-রসুল' হইতে প্রায় ১৯।২০ রশী পশ্চিমদিকে যাইয়া প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের পরিখা অতিক্রম করিতে হয়। পরিখায় অনেক স্থানে আজিও জল আছে। শুষ্ক স্থানে পরিখা পার হইয়া আমরা প্রাসাদের পূর্ব্বদিকস্থ ২২ গজী প্রাচীরের একটি ভগ্ন স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাচীর পাতলা ছোট ছোট সিন্দুরবর্ণের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার ভিতরের গাথনি কাদার। প্রাচীরের কার্ণিসের নীচে ইষ্টকের উপর সুশ্রী কারুকার্য্য ক্ষোদিত আছে। ইহার শিখরদেশে ও গাত্রে বহু অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে। প্রাচীরবেষ্টিত এই স্থানে পূর্ব্ব-বর্ণিত রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—ইষ্টক, প্রস্তর ও যেস মাটীর স্তূপ এবং পুষ্করিণী আছে। এই স্থান অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ। এখানে জনপ্রাণী নাই। এই স্থানের কিছু দূরে "চামকুটা মসজেদ" নামক একটি মসজেদ বিদ্যমান।

বেলা প্রায় ১॥০টার সময় এই অঞ্চলের বাদশাহী সড়কের বা গৌড় রোডের দশম মাইলের প্রস্তরচিহ্নের (mile stone) নিকটে উপস্থিত হইলাম।

গৌড়-দুর্গ ত্যাগ করিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত পাকা রাস্তা দিয়া দক্ষিণদিকে চলিলাম। রাস্তার পশ্চিমপার্শ্বে "তাঁতিপাড়া মসজেদ" আছে। পূর্ব্বদিকে ইহার সম্মুখভাগ। মসজেদের পূর্ব্বদিকের উঠানে প্রবেশ করিলে বামদিকে উচ্চ বেদীর উপরে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বড় ও একটি ছোট কবর দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন যে, এই দুইটি উমার কাজি ও তাঁহার কন্যার কবর। কেহ বলেন, উমার কাজি ও তাঁহার ভ্রাতার কবর। কবরের বেদীর সিঁড়ির উপরে একটি ছোট প্রস্তরের স্তম্ভ দেখা যায়। এই কবরদ্বয়ের সন্নিকটেই তাঁতি-পাড়া মসজেদের ভগ্নাবশেষ বিরাজ করিতেছে। তাঁতিপাড়ায় ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ঐরূপ নাম হই-য়াছে। মসজেদটি লালবর্ণের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের গাত্রে ইষ্টকের উপর নানাবিধ কারু-কার্য্য ক্ষোদিত দেখা যায়। ভিতরে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে এক সারিতে চারিটি প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি গৃহাভ্যন্তরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। স্তম্ভগুলিকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক ভাগের উপরে ৫টি করিয়া মোট ১০টি গুম্বজ এই মসজেদের উপরিভাগে শোভা পাইত। বর্ত্তমানে ইহার উপরে ছাদ বা গুম্বজ নাই। গৃহাভ্যন্তরে পশ্চিমদিকের দেওয়ালের মধ্যে ইষ্টক-নির্ম্মিত কারুকার্য্যক্ষোদিত ৫টি কুলুঙ্গী বা সিম্বর বা মেহরাব ছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র ৩টি অবশিষ্ট আছে। মধ্যস্থলের সিম্বরের গাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য ছিল। ভগ্ন গুম্বজগুলির নীচে পশ্চিম-দিকের দেওয়ালের গাত্রে ইষ্টকের উপর নানাবিধ সুশ্রী নক্সা ও কারুকার্য্য ক্ষোদিত রহিয়াছে। মসজেদের উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে ২টি করিয়া ৪টি দ্বার আছে। পূর্ব্বদিকের ৫টি দ্বারের মধ্যে ৩টি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে; তন্মধ্যে মধ্যস্থলের দ্বারের উপরে দেওয়ালের কিয়দংশের ইষ্টকের উপরে বৃক্ষ-লতা ও নানাপ্রকার কারুকার্য্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মসজেদটি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মালদহ গেজেটিয়ারে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত উমার কাজি অনুমান ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে এই মসজেদ নির্ম্মাণ করান। রাভেনশর মতে ইয়ুফ শাহের দ্বারা ৮৮৫ হিজিরায় (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌড়-দুর্গের কমরস্তমের বাটীতে একখানি শিলালিপি আছে, উহা ক্রেটন পূর্ব্বে তাঁতিপাড়া মসজেদে দেখিয়াছিলেন এবং উহা তাঁতিপাড়া মসজেদের শিলালিপি বলিয়া অনেকে অনু-মান করেন। ঐ শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, মহম্মদ শাহের পৌত্র বারবক্ শাহের পুত্র সামসুদ্দীন আবুল মজাফর য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে ৮৮৫ হিজরীর (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) ১০ই রমজান তারিখে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা এক্ষণে পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

তাঁতিপাড়া ছাড়াইয়া আর কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে গমন করিলে একটি অতি প্রাচীন ও বৃহৎ বটগাছের ছায়াশীতল স্থানের সন্নিকটে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে "লোটন মসজেদ" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একাদশ মাইল-পোষ্টের নিকটে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, নাত্তিন বা নাচওয়ালীরা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "লোটন" বা নাথু "মসজেদ।" ইহার উপরে একটিমাত্র বৃহৎ গুম্বজ শোভা পাইতেছে। ইহার বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের গাত্র শ্বেত, নীল, সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণের মিনা বা এনামেল করা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। পূর্ব্বদিক ইহার সম্মুখদেশ। ইহার পূর্ব্বদিকে একটি প্রশস্ত আচ্ছাদিত বারান্দা



ভগ্ন কোতোয়ালী দরওয়াজা

বারান্দার খিলান-করা ছাদের মধ্যস্থলে খড়ের ঘরের চৌচালার আকৃতিবিশিষ্ট একটি খিলান আছে, এই প্রকারের খিলান পূর্ব্বে অন্য কোথাও দেখি নাই। বারান্দার ছাদে এই খিলানের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি করিয়া অর্দ্ধ-গোলাকার, কিন্তু চাপটা গুম্বজাকৃতি-বিশিষ্ট ছোট খিলান আছে। বারান্দার ভিতরে চতুর্দ্দিকের দেওয়াল পূর্ব্বোক্তরূপ এনামেল-করা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। বারান্দার পূর্ব্বদিকে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করিয়া খিলান-করা দ্বার; বারান্দার পশ্চিম-গাত্রে পূর্ব্বদিকের ন্যায় ৩টি দ্বার; তদ্দ্বারা বারান্দার পশ্চিমগাত্রস্থিত বৃহৎ উপাসনা-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই উপাসনা-গৃহের উপরে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ গুম্বজটি আছে। ইহার পশ্চিমদিকে কোন দ্বার নাই, অন্য সকল দিকে তিনটি করিয়া খিলান-করা দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমদিকের দেওয়ালের মধ্যে তিনটি বড় কুলুঙ্গী বা মিম্বরের ন্যায় আছে। গৃহাভ্যন্তরে দেওয়াল ও গুম্বজ এনামেল-করা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু এক্ষণে চটা উঠিয়া এনামেল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মসজেদের মেঝে নানাবর্ণের এনামেল-করা টালি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কলিন এই মসজেদের অভ্যন্তরে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের ক্ষীণ স্তম্ভ দেখিয়া উহাদিগের গঠন-প্রণালীর ও শক্তির বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ক্রেটনের মতে ইহা ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে য়ুসুফ শাহের সময়ে নির্ম্মিত। ইহা পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কলিনের

৫ শত ৮০ ফুট বেড়বিশিষ্ট একটি বৃহৎ জলাধার ছিল। লোটন মসজেদের কিয়দ্দূরে উহার উত্তর-পূর্ব্বদিকে "ছোট সাগর-দীঘি" আছে। ইহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। ইহা হইতে প্রধানতঃ রাজ-প্রাসাদের জল সরবরাহ হইত। ইহার উত্তর পাড়ে যে উচ্চ ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, তথায় পূর্ব্বে মাদ্রাসা ছিল। ইহা হিন্দু রাজত্বকালের দীঘি; এই দীঘির নিকটে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ধনপতি সওদাগর ও তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ সওদাগর বাস করিতেন বলিয়া শুনা যায়। লোটন মসজেদ হইতে দক্ষিণদিকে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে 'বল্লদীঘির' অদূরে ও মহদীপুরের নিকটে খালের উপরে পাঁচ খিলানের একটি প্রাচীন সাঁকো আছে। ইহার নিম্নভাগ প্রস্তর ও উর্দ্ধভাগ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। শত শত বৎসর গত হইয়াছে, কত যান-বাহন ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু আজিও ইহার কিছুই নষ্ট হয় নাই। এই সেতুর প্রান্তভাগে দুইটি শিলায় সংস্কৃত অক্ষরে কতকগুলি ছত্র উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু সেগুলি অস্পষ্ট হওয়ায় বুঝা কষ্টকর। ব্লকম্যান, "Journal of the Asiatic Society of Bengal—(Old series. Vol XLIV 1875)এ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনুমানে ৮৬২ হিজিরায় (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) নসীরুদ্দীন মামুদ শাহের রাজত্বকালে এই সেতু নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে গৌড়-অন্তর্গত মহদীপুরের শেষ।

আমরা পরক্ষে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে আমরা গৌড় মহানগরীর দক্ষিণ



রামকেলি রূপসাগর দীঘির একাংশ

এই প্রাকারটি খুলনা জিলায় কালীগঞ্জের নিকটস্থ মহারাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নির্ম্মিত বৃহৎ মৃন্ময় প্রাকারের ন্যায়। উক্ত মৃন্ময় প্রাকার ভেদ করিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ "কোতোয়ালী দরওয়াজার" ভগ্নাবশেষ দেওয়ালমাত্র দণ্ডায়মান আছে। ইহা গৌড় মহানগরীর দক্ষিণদিকের প্রবেশদ্বার। ইহা লোটন মসজেদ হইতে এক ক্রোশ দূরে ও মহদীপুরের নিকটে অবস্থিত। এই দরওয়াজার মধ্য দিয়া যে ১৭ ফুট প্রশস্ত প্রাচীন সরকারী রাস্তা আছে, উহার দুই পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে উক্ত ভগ্ন দেওয়াল রহিয়াছে। রাস্তার উপরে এই দরওয়াজার যে খিলান ছিল এবং দরওয়াজার দুই পার্শ্বে যে সকল প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া রাস্তার ধারে সেকালের পাতলা ছোট ছোট ইষ্টক স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপযোগী করিয়া এই দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণদিকে দুই পার্শ্বে যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রকোষ্ঠগুলি সহর-কোতোয়াল ও প্রহরীদিগের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে সেগুলির দ্বারের অভ্যন্তরস্থ পথে তীর ও গুলী নিক্ষেপ করিবার জন্য দুই পার্শ্বের উক্ত প্রকোষ্ঠগুলির ঊর্দ্ধদেশে দেওয়াল ভেদ করিয়া জলধারা পড়িবার গা-নালার ন্যায় ঢালুভাবে ছিদ্র করা আছে। অনেকে ইহার গঠন-কৌশল দেখিয়া ইহাকে হিন্দু রাজাদিগের কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। কোতোয়ালী দরওয়াজার অদূরে "পিঠওয়ালী মসজেদের" ভগ্নাবশেষ দেওয়ালের কতকাংশ দণ্ডায়মান আছে মাত্র।

এক্ষণে আমরা গৌড়ের বেষ্টনী প্রাকারের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইহা গৌড় মহানগরীর উপকণ্ঠ। কোতোয়ালী দরওয়াজা ছাড়াইয়া অল্পদূর দক্ষিণদিকে যাইতে রাস্তার বাম বা পূর্ব্বপার্শ্বে বৃহৎ 'বল্লদীঘি' রহিয়াছে। দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এবং পদ্ম ও শৈবালদলপূর্ণ। ইহাতে যথেষ্ট কুম্ভীর আছে। লোক বলিয়া থাকে যে, ইহা বল্লাল সেনের সময় খনিত। ইহাকে কেহ কেহ 'বালিয়া দীঘি' বলিয়া থাকেন। ইহার চতুর্দ্দিকের জনমানবহীন নিবিড় অরণ্য বন্য শূকর ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির আবাসস্থল হইয়াছে। দেখিলাম যে, দুই জন য়ুরোপীয় হস্তী, বন্দুক ও বহু লোকজন লইয়া মৃগয়ায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অনুচর—কতকগুলি



নিম্ন শ্রেণীর লোক—ব্যাঘ্রের অনুসন্ধানে বন ঘিরিয়া "হো হা" করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু ব্যাঘ্র বাহির হইতেছে না। প্রাতঃকালে যখন আমরা পিয়াসবাড়ীর নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, তখন দেখিয়াছিলাম যে, তিন চারি জন লোক একটি বৃহৎ বন্যবরাহ বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে বুঝিলাম যে, এই শিকারী য়ুরোপীয়দ্বয় বরাহটি গুলী করিয়া মারিয়াছেন।

তৎপরে আমরা ত্রয়োদশ মাইল-ষ্টোন অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে চলিলাম। এই অঞ্চলে "বল্লদীঘি" ও "খড়িয়া দীঘি"র মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে 'রাজবিবির মসজেদ' নামক একটি মসজেদ আছে।

ছোট সোনা মসজেদে যাইবার পথে আমাদিগের পশ্চিমদিকে দূরে পাগলা নদী বহিয়া যাইতেছে। বল্লদীঘি ছাড়াইয়া প্রায় এক ক্রোশ গমন করিলে 'ফিরোজপুরে' উপস্থিত হওয়া যায়। ফিরোজপুরে ফকির নিয়ামাতুল্লার কবর আছে। কবরের উপরে গুম্বজবিশিষ্ট মসজেদের ন্যায় ইমারত আছে। সাহনিয়া মাতুল্লা ১০৮০ হিজিরায় (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক ত্যাগ করেন। সে সময় গৌড় পরিত্যক্ত হইলেও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। এই সমাধির সন্নিকটে একটি মসজেদ আছে। এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তোফী।

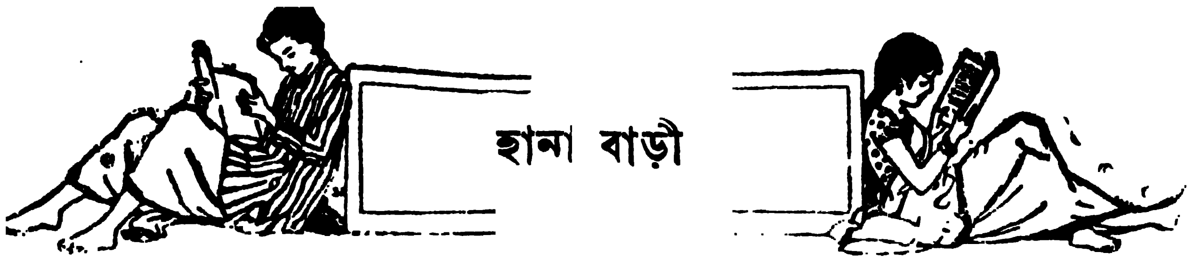
চির-সুন্দর

ওগো সুন্দর, হে মোর তরুণ সুচির-বিরহী প্রিয়,
চকিতে যে দিন দেখেছি তোমার বসন উত্তরীয়,
সেই দিন হ'তে সারা নিশিদিন চলেছি অন্বেষণে,
জন-অরণ্যে খুঁজেছি কখনো, খুঁজেছি কখনো বনে।
কখনও তোমারে লভিয়াছি যেন অজানিত সুখে দুখে,
হাসিটি তোমার কভু দেখিয়াছি অপরিচিতের মুখে।
দূর দিগন্তে তোমারে যেমন দেখিয়াছি ক্ষণতরে,
বাতায়ন-পাশে বধূটির মত অমনি গিয়াছ স'রে।
আবার ছুটেছি সন্ধানে তব, কোন দিকে চাহি নাই,
মন কেঁদে বলে, "ওগো সুন্দর, তোমারে আমার চাই।"

প্রতিদিন প্রাতে আসে নিজ হ'তে ঊষা সে স্বর্ণশিরে,
প্রতি গোধূলিতে আসে গোপনেতে সন্ধ্যা সে অতি ধীরে।
সেই উঠে রবি, সেই হাসে তারা, সেই ভাসে চাঁদখান,
চিরপুরাতন কাকলী-কূজন কোথা হয় অবসান।
দুপুরের রোদে দিগ্‌বধূ চায় সেই বিধবার মত,
একটি দণ্ড ফুটি' শুধু ফুল বৃন্তেতে হয় নত।
সেই আশাহীন ভাষাহীন সব চাহি যাহা নাহি পাই,
দুর্ব্বহ হয় জীবনের বোঝা, কিছু নবীনতা নাই।
এ হেন সময়ে ক্ষণেকের তরে ওগো সুন্দর প্রিয়,
চকিতে যেমন দেখেছি তোমার মুখখানি লোভনীয়।

ক্ষণিকেতে আহা কি যে দেখিয়াছি কিছু তার মনে নাই।
আছে যাহা, তাহা প্রকাশ করিতে সাধ্য বা কোথা পাই
ক'টি মুহূর্ত্ত আকাশ বাতাস শুনায়েছে যেন গান,
চোখে দেখিয়াছি তরুলতা-পাতে হরষ কম্পমান।
জলে পড়া আলো তরুর ছায়াতে কি যেন সে আকুলতা,
অবুঝ কাকলী কল কোলাহলে শুনিয়াছি যেন কথা।
জাতী যূথী বেলা নিশিগন্ধায় ফুটেছে লক্ষহীরা,
মনের কোণের মল্লী-বনের জেগেছে মক্ষিকারা।
মন পানে কভু, বন পানে কভু চেয়েছি সকল ভুলে,
ক্ষণতরে যেন যাদুর দেশের দুয়ার গিয়েছে খুলে।

ওগো সুন্দর, হে মোর তরুণ তোমারে যদি বা পাই,
বৃথা সম্পদ্ তুচ্ছ প্রতাপ কিছু আমি নাহি চাই।
'তোমার তরুণ ও বিপুল রূপ প্রাণ ভরি' করি পান,
ধরণীর এক অজানিত কোণে ব'সে ব'সে গাব গান।
শ্মশানে রচিব বাসর-শয়ন মৃত্যুরে দিব সুধা,
সুর দিয়ে আহা মিটাইব এই ধরণীর যত ক্ষুধা।
মরণ-আতুরে দিব অমরণ, ভীতের ঘুচাব ভয়,
লক্ষ লোকের বক্ষ জিনিয়া করিব দিগ্বিজয়।
জীর্ণেরে পুন করিব তরুণ, কুরূপেরে সুন্দর,
অমৃত আনিয়া স্বর্গ রচিব ধরণীর ধূলি'পর।



৪২

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ঘোষপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছোঁড়াটা কে ?"

"ও ঐ বাড়ীর ইজারাদারের চাকর।"

"ঐটেই বুঝি আপনার সেই কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী ?"

"হাঁ। আর ওর ঠিক পিছনের বাড়ীটাকে লোক ছানা বাড়ী বলে। আপনার স্বামী সেইখানেই খুন হয়েছিলেন।"

"তা ও ছোঁড়াটা আমার কাছে এসে অমন ক'রে দেখ্‌ছিল কেন ?"

"আপনাকে বলি নি কি, যে, ঐ বাড়ীর নীচের ঘরে স্মৃতিরত্ন নামে এক জন ভাড়াটে ছিল ? তাঁর কাছে এক জন সাহেব-সাজা পুরুষ, আপনারই মত পোষাকপরা একটি রমণীকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে এখানে আসত। ছানা বাড়ীতে খুন হবার পরেই স্মৃতিরত্ন এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যায়। কোথায় গেছে, তা এ বাড়ীর কেউ জানে না। সেই সাহেব-মেমও আর সেই থেকে এখানে আসে নি। কিন্তু ঐ ছোঁড়াটা স্মৃতিরত্নের ঘরের কাম-কর্ম্ম করত ব'লে তারা দু'জনে যতবার এখানে এসেছিল, ততবারই তাদের দেখেছিল। মেয়েটিকে নার্স ব'লে তার ধারণা হয়েছিল। সে যা হোক্, ওর কাছে মেয়েটির চেহারা ও পোষাকের বিবরণ শুনে আমার ধারণা হয়েছিল যে, সে আপনিই। ধারণাটা ঠিক কি না, তাই দেখবার জন্যই আপনাকে এখানে এনেছিলাম, আর ঐ ছোঁড়াকে আপনার সামনে গিয়ে দেখতে বলেছিলাম।"

"ওঃ! বটে ?—তা এখন আপনার সে সন্দেহ ঘুচেছে ত ?"

"হাঁ,—তা ঘুচেছে বটে, কিন্তু এই খুনের ব্যাপারে সেই মেয়েমানুষটি যে সংশ্লিষ্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"না, মিঃ দত্ত! আমার স্বামীর খুনের বিষয়ে কোন মেয়েমানুষের সম্পর্ক যে থাক্‌তে পারে, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার স্বামীর ও সব বালাই মোটেই ছিল না,

"কিন্তু যে কারণেই হোক, তাঁর খুনের আগে তাঁর কাছে এক জন মেয়েমানুষ যে আসত, তাতে ত সন্দেহ নাই! আমি তাঁর বসবার ঘরের রাস্তার দিকের জানালার পর্দ্দায় একটা স্ত্রীলোকের ছায়া নিজে দেখেছিলাম।"

"বলেন কি ?—তা হ'লে তাঁরও এ সব মদ্দানী ছিল বলতে হয় ?—কথাটা ভাবতেও হাসি পায়, কিন্তু!"

"হাসিই পাক, আর কান্নাই পাক, তাতে খুনীকে ধরবার কোন উপায় ত হবে না ? আপনার দ্বারা কি সে বিষয়ে কোন সাহায্য হ'তে পারে না ?"

"আমি ত সেই উদ্দেশ্যেই পুলিসকে ৫ শত টাকা বকশিস্ কবলে রেখেছি, তা ত জানেন ? এ ছাড়া আর কি সাহায্য আমি করতে পারি, বলুন ?"

"ও বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি আসত, সে কে, তা হয় ত আপনি স্থির করতে পারবেন না। কিন্তু তার সঙ্গী পুরুষটির সম্বন্ধেও কি আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন না ?"

"তা কি ক'রে করব বলুন ? আমি ত তাকে কখনও দেখি নি, তার চেহারা কেমন, তাও কখন শুনি নি!"

"আমি ঐ ছোঁড়াটার কাছে শুনেছি যে, লোকটা গৌরবর্ণ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মাঝারি রকম, মুখের চেহারা কতকটা চীনা ধরণের, দাড়ি নাই, কিন্তু বেশ ঘন ও পাক দেওয়া গোঁফ আছে। পোষাক ও চাল-চলন সাহেবী গোছের।"

ঘোষপত্নী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ও রকম চেহারা ত অনেক পুরুষেরই হ'তে পারে! এ থেকে আমার চেনা কোন লোককে ত আমি আন্দাজ করতে পারি না।"

"কেন ?—আপনার বন্ধু কান্ সাহেব কি হ'তে পারে না ?"

যমুনা যেন অত্যন্ত চমকিত ও ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অ্যাঃ! বলেন কি ? তা কি সম্ভব ? আপনি কি বলেন যে, সে-ই খুন করেছে ?"

যমুনা পুনরায় নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, না, তা কখনই হ'তে পারে না। চেহারার বিবরণে কতকটা মিল থাক্‌লেও সে এ কায করেছে, তা সম্ভব নয়। কেনই বা করবে? আমার স্বামীকে মেরে তার লাভ কি?"

আমি আবার একটু হাসিয়া বলিলাম, "লাভ,—আপনাকে বিয়ে করার সুবিধা।—আপনাদের দু'জনে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, তা অনেকেই জানে।"

"ওঃ! তাই? কিন্তু সে সব ত অনেক দিন হ'ল খতম হয়ে গেছে, তা বোধ হয় জানেন না? এই খুনের ব্যাপারের ঢের আগেই আমি তাকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু খুনের সময়ে, আর তার পরেও ত আপনার সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল? এখনও বোধ হয় আছে?"

"না, সেটা আপনার ভুল ধারণা। আমি যে তাকে আর আগের মত দেখি না, তা সে জানে।"

"তা হ'লেও সে হয় ত আপনার আশা কখনও ছাড়ে নি।"

যমুনা এবারে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে বলিলেন, "না, মিঃ দত্ত! আপনি যে কারণ দেখালেন, সেটা এতই সামান্য যে, সে জন্যও সত্যিই 'বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়তে' যাবে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

"আজ সেই দোকানে ছাতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে উইলসনের কাছে শুনলেন ত যে, তার এক জন পুরুষ-বন্ধুর অনুরোধে ছাতাটা সে কিনেছিল। উইলসন আগে সেই দোকানের দার্জ্জিলিং শাখাতে কায করত। আপনার কান্ সাহেবও পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং অঞ্চলেই থাকত ও দার্জ্জিলিঙ্গে যাতায়াতও করত। উইলসনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব থাকা সেই জন্যে অসম্ভব নয়। আর তারই কথায় উইলসন ছাতাটা কিনে দিয়েছিল, তাও হ'তে পারে ত?"

ঘোষপত্নী বিচলিত ও উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "এ সব আপনার আন্দাজের কথা বই ত নয়। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি কান্ সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে এ সব বিষয়ে কথা বলেন ত সে নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ দূর করতে পারবে।"

"আর তা যদি না পারে ত কি হবে?"

যদি সে সত্যিই খুন ক'রে থাকে ত নিশ্চয়ই তার সাজা হওয়া উচিত। তার যদি ফাঁসীও হয়, তাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না। আপনারা আমাকে যতই বদলোক মনে করুন,—আমি কিন্তু খুনোখুনীর পক্ষপাতী কখনই নই, তা জানবেন।"

"কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হবে কি ক'রে? তার ঠিকানা ত আপনি আমাকে বলতে পারলেন না।"

"আচ্ছা, কালই আমি কোন রকমে তার ঠিকানা জেনে আপনাকে লিখে পাঠাব।"

আমাদের এই সব বাক্যালাপ শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী ঘোষপত্নীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

৪৩

ঘোষপত্নীর চিঠির পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতা স্বয়ং সেন সাহেব পরদিন বৈকালে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর গাঙ্গুলী মহাশয়ের আফিসে প্রথম আলাপের পর এ পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে আমি দেখি নাই। সেই জন্য আজ এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আমি, কিছু বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সেই নধর কান্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু মলিনভাবাপন্ন বোধ হইল।

যাহা হউক, পরস্পর সাদর সম্ভাষণের পর সেন সাহেব বলিলেন, "ঘোষজার খুনের অনুসন্ধান বিষয়ে আপনি যে রকম অক্লান্তভাবে চেষ্টা কচ্ছেন, তাতে আমার খুব আশা হয় যে, আপনি নিশ্চয়ই এই রহস্যের মীমাংসা করতে পারবেন। কা'ল পর্য্যন্ত আপনার অনুসন্ধানের ফলাফল যা হয়েছে, আমার মেয়ের কাছে সে সব শুনেছি। তার উপর আপনার যে সন্দেহ দাঁড়িয়েছিল, সেটা যে সম্পূর্ণ ভুল ব'লে সাব্যস্ত হয়েছে, তাতে আমি অবশ্যই খুব সুখী হয়েছি। কারণ, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে রকম সদ্ভাব থাকা বাঞ্ছনীয়, আমার যমুনা বেচারীর ভাগ্যে তা ঘটে নি বটে,—হয় ত সে ঘোষজার প্রতি তার কর্ত্তব্যের অবহেলাও ক'রে থাকতে পারে;—কিন্তু তার প্রকৃতি আমি যে রকম জানি, তাতে এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, খুন ত দূরের কথা, কোন রকম নিষ্ঠুর বা কঠোর আচরণও তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। থাক্, এখন তাকে বাদ দিয়ে আপনার

অনুসন্ধানটা আপনি এখন থেকে ঐ দিকেই চালাতে চান, যমুনার কাছে তাও শুনেছি। আশা করি, এবারে আপনি বেশী কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন।"

"কৃতকার্য্য কত দূর হ'তে পারব, তা জানি না। কান্ সাহেব যে নিজেই খুন করেছে কি না, তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু সে যে এই খুনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

"আপনি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ কিছু পেয়েছেন কি?"

"না, নিশ্চয় রকম কিছু এখনও পাই নি বটে, কিন্তু যতটুকু পেয়েছি, তাতে তার উপর সন্দেহ যথেষ্টই হয়।"

"আশা করি, আপনি শীঘ্রই বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন। লোকটা এই খুনের বিষয়ে লিপ্ত ছিল প্রমাণ হ'লে আমি একটা দারুণ উৎকণ্ঠা থেকে নিস্তার পাই, মশাই!"

"কেন বলুন দেখি? আপনার এতে এত উৎকণ্ঠার কারণ কি?"

"কেন, তা জানেন না কি?—আমার মেয়ের তা হ'লে ওর সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনাটা একেবারে ঘুচে যায়। আমিও তা হ'লে এই বিয়ের দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাই।"

"সে কি? তিনি এই বিয়ের জন্য কি এতই উৎসুক না কি? অথচ কা'ল তিনি নিজে আমাকে বল্লেন যে, তিনি নিজে অনেক দিন আগেই কান্‌কে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছেন।"

"আগে তা দিয়েছিল বটে, কিন্তু জানি না কেন, ইদানীং দেখছি, কান্ আবার তাকে সম্মত করিয়েছে। এমন কি, দেখছি যে, কোন বিশেষ রকম বাধা না পেলে বিয়েটা হয় ত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে। যমুনাকে আমি নিরস্ত করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। ও-ই আমার একমাত্র সন্তান। আমার যত কিছু স্নেহ-মমতা সব ওরই উপর ন্যস্ত। ও যাতে সুখে থাকতে পারে, সেই চিন্তাই আমার সব চেয়ে বেশী। কিন্তু কানের হাতে পড়লে যে ও সুখী হ'তে পারবে না, তা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। অথচ কান্ যে বাস্তবিক দুর্ব্বৃত্ত লোক, সেরূপ প্রমাণ কিছু না পেলে যমুনা যে এ বিয়ে থেকে নিরস্ত হবে, তা বোধ হয় না। তাই আপনার এই অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর আমার সমস্ত

"দেখা যাক্ কত দূর কি হয়। আমার ত আশা আছে যে, এবারে আমার চেষ্টাটা নিতান্ত বিফল হবে না। এখন সে যে কোথায় থাকে, সেই খবরটা আপনার কন্যা আমায় লিখে পাঠাবেন বলেছিলেন—"

"ওঃ! বটেই ত! এতক্ষণ আপনাকে আসল কথাটাই বলা হয় নি। যমুনা আজ কানের ঠিকানা জেনেছে। শিয়ালদার কাছে তার যে সাবেক আড্ডা ছিল, সেটা ছেড়ে আজকাল সে—নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকে। সকালে ৯টা নাগাত সেখানে তার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।"

তৎপরে আমি কি প্রণালীতে অনুসন্ধানকার্য্যে পুনরায় অগ্রসর হইব, সেন সাহেব তাহা জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। কিন্তু একে ত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি নিজেই তখনও কিছু স্থির করি নাই, তাহার পর সেন সাহেবের উপর তাঁহার চতুরা কন্যার যে রকম প্রভাব, তাহাতে সেন সাহেবকে আমার কার্য্যপ্রণালীর আভাস দিলে, তাঁহার নিকট হইতে যমুনা সে অবিলম্বে তাহা লইবে এবং কান্ সাহেবকেও তাহা জানাইতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। কাজেই সেন সাহেবের এই কৌতূহল আমি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। তখন আর কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর তিনি আমার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

৪৪

কান্ সাহেবের সহিত এ পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটে নাই। সে যে কি প্রকৃতির লোক, সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু ধারণা করিতে পারি নাই। সেই জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কি উপায়ে তাহার নিকট হইতে সত্য কথা বাহির করিতে পারিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল, ইনস্পেক্টর গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকেই এই কার্য্যের ভার দিব। কিন্তু পূর্ব্বে যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা হইবার কোন কারণ পাই নাই। সেই জন্য পুনরায় তাঁহাকে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত

এই সময়ে কাকলীর সহিত একবার বাক্যালাপ করিয়া কান্ সাহেবের সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে হয় ত কাযের কিছু সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু এখন ত সে পথ বন্ধ। তাহা ছাড়া, বর্দ্ধমান হইতে যোগীন বাবুর সম্প্রতি এক চিঠি পাইয়া জানিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিতে আরও কিছু দিন বিলম্ব হইবে। চিঠি লিখিয়া বা স্বয়ং পুনরায় বর্দ্ধমানে গিয়া, এ বিষয়ে পরামর্শ স্থির করিতে গেলে, কান্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করায় অনেক বিলম্ব হইবে। এইরূপ নানা চিন্তার পর কাহারও আর সাহায্যের অপেক্ষায় কালক্ষয় না করিয়া পরদিন রবিবার সকালেই কান্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিব স্থির করিলাম।

পরদিন যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় ৮॥০টা। নম্বরটা বহুবাজার ষ্ট্রীট-ভুক্ত হইলেও বাড়ীটা ঐ রাস্তার সংলগ্ন একটা সঙ্কীর্ণ গলীর ভিতর একটা ফিরিঙ্গী পল্লীমধ্যে অবস্থিত। সম্মুখে একটু ছোট উঠান পার হইয়া, ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কান্ সাহেব বাড়ীতে উপস্থিত আছেন এবং তাহার হাতে আমার নামের কার্ড পাঠাইয়া দিবার অল্পক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরের একটি কক্ষে লইয়া গেল। ঘরটি ছোট, এবং তাহাও আবার পর্দ্দার সাহায্যে দুই ভাগে বিভক্ত। আমি সম্মুখের যে ভাগে উপস্থিত হইলাম, তাহাতে একটা ছোট টেবল ও দুখানা চেয়ার ছিল। তাহারই একখানাতে আমাকে বসিতে বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

দুই এক মিনিট তথায় অপেক্ষা করিবার পর, পর্দ্দার অপর দিক হইতে এক দীর্ঘকায় ফিরিঙ্গী সাহেব বাহির হইয়া স্মিতমুখে ও ভদ্রোচিতভাবে আমাকে অভিবাদন করিয়া জানাইলেন যে, তিনিই কান্ সাহেব। লোকটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ এবং যদিও নাক ও চোখের গঠন অনেকটা পাহাড়ী লেপচাগণের ন্যায় হওয়ায়, অনেকে তাহাকে "চীনা সাহেব" মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল ও সযত্নে পাক দেওয়া ঘন গোঁফের প্রভাব তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলের যথেষ্ট শ্রী সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রহণ করিলে, কান্ সাহেব বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার দেখা করবার ইচ্ছার কথা আমি মিসেস্ ঘোষের কাছে শুনেছি। কি জন্য দেখা করতে চান, তা-ও জেনেছি।" তৎপরে বেশ সরলভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু, আমার উপর সন্দেহ করাটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে, মিঃ দত্ত!"

কথাগুলা কতক ইংরাজী ও কতক বাঙ্গালায় বলিলেন বটে, কিন্তু দেখিলাম, বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজীটাই তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য। সেই জন্য আমাকেও অধিকাংশ স্থলে ইংরাজীর সাহায্যই লইতে হইল। তাঁহার কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "সন্দেহ করবার কারণগুলাও তাঁর কাছে শুনেছেন বোধ হয়?"

"তা শুনেছি বৈ কি! কিন্তু, তাঁর উপরেও প্রথমে যে সব কারণে সন্দেহ ক'রে পরে সেগুলা যেমন ভুল ব'লে প্রমাণ পেয়েছেন, এখন আমার প্রতি সন্দেহের কারণগুলাও তেমনই সহজে ভুল ব'লে প্রমাণ হ'তে পারে।"

"বেশ কথা; আমি সেই জন্যই ত আপনার কাছে এসেছি।"

"তা হ'লে কোন্ কোন্ বিষয় আপনি জান্তে চান, তা একে একে বলুন।"

"আচ্ছা, তা হ'লে বলুন দেখি, যে রাত্রে ঘোষজা মশায় খুন হয়েছিলেন, সে রাত্রে আপনি কানাই মল্লিক লেনের —নং বাড়ীতে গিয়েছিলেন, এবং—"

"আমি? না, কখনই না! আমি সে রাত্রে কল্‌কাতার ভিতরেই ছিলাম না।"

"কিন্তু আপনি সে দিন বিকালে বর্দ্ধমান থেকে মিসেস্ ঘোষের সঙ্গে ভবানীপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন, তার পর—"

"হাঁ, তা ত সত্যই, কিন্তু তার পরে আমি কল্‌কাতার বাইরে চ'লে গিয়ে সে রাত্রে সেখানেই ছিলাম।"

"তার প্রমাণ দিতে পারেন?"

"তা অবশ্যই পারি; কিন্তু আমি ত ভদ্রলোক? আমার কথাই কি যথেষ্ট নয়?"

"আমার কাছে হয় ত হ'তে পারে, কিন্তু আদালতের কাছে শুধু আপনার কথাই যথেষ্ট হবে না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমার বন্ধু ডাক্তার ভাদুড়ীর দ্বারা

বাড়ীতে ছিলাম ও তার পরদিন সকাল ৭টার সময় সেখান থেকে চ'লে গিয়েছিলাম।"

"এ প্রমাণটা কখন্ হ'তে পারে ?"

"আজই বিকালে বোধ হয় হ'তে পারে। আমি তাঁকে আজ বিকালে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। তাঁর জবাব পেলে, ঠিক যে সময়ে আস্‌বেন, তার পূর্ব্বেই আপনাকে জানাব। আপনি সেই সময় এখানে এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারবে।"

আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কান্ সাহেব তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ভাদুড়ীকে একখানা চিঠি লিখিয়া আমাকে দেখাইলেন। বিশেষ একটু আবশ্যক কার্য্যের জন্য বৈকালে তাঁহার সুবিধামত একবার কান্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার ও ঠিক কোন্ সময়ে আসিতে পারিবেন, তাহা জানাইবার অনুরোধ ব্যতীত চিঠিতে আর কিছু লেখা ছিল না। চিঠিখানা আমার পড়া হইলে, কান্ সাহেব তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া উহা যথাস্থানে লইয়া গিয়া উত্তর আনিবার আদেশ দিলেন। স্থানটা কোথায়, তাহা তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া, শীঘ্র উত্তর আনিবার জন্য তখনই তাহার সাইকেলে যাইতে বলিয়া দিলেন।

৪৫

ভৃত্য প্রস্থান করিলে সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ঐ চাকরটি আমার হীরের টুক্‌রো মশায়! জুতা বুরুষ থেকে রান্নার কায পর্য্যন্ত সবই করতে পারে। তা ছাড়া আবার বেশ রীতিমত সাইকেল চড়তেও জানে।"

"ও রকম চাকর মেলা সৌভাগ্যের কথা বটে। যাক্, এখন আর একটা বিষয়ও আপনার কাছে জান্‌তে চাই। কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে যে মহিলাটি যেতেন, তিনি একটা ছাতা সেখানে ফেলে এসেছিলেন,—"

"হাঁ, হাঁ, ও সব কথাও আমি শুনেছি। আপনি দোকানে অনুসন্ধান ক'রে যা জেনেছেন, তাও শুনেছি,—কিন্তু যে লোকটা তার মহিলা-বন্ধুর জন্য ছাতাটা কিনেছিল, আমি সে লোক নই।"

"তার কি প্রমাণ দিতে পারেন ?"

"মিসেস্ ঘোষের সম্বন্ধে এ বিষয়ে যে উপায়ে প্রমাণ পেয়েছেন, আমার সম্বন্ধেও ঠিক সেই উপায়ই করতে

"দোকানের যে কর্ম্মচারী জিনিষটা কিনে দিয়েছিল, আপনি আমার সঙ্গে তার কাছে যেতে রাজী আছেন ?"

"হাঁ, আপনি কবে কোন্ সময় যাবেন বলুন, আমি তখনি ঠিক প্রস্তুত থাক্‌বো।"

"তা হ'লে আর দেরী করবার দরকার কি ? এখনই চলুন না কেন ?"

"সে কি ? আজ যে রবিবার,—আজ ত সে দোকান বন্ধ।"

"তা হোক,—সে কর্ম্মচারীর বাসার ঠিকানা আমি জেনে নিয়েছি। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করলেই ত আমাদের কায চল্‌তে পারবে। এখনও বেলা বেশী হয় নি, তার বাসায় গেলে নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাব।"

"বেশ; তবে চলুন, আমি প্রস্তুত আছি।"

তৎপরে আমরা উভয়ে কান্ সাহেবের গৃহ হইতে উইলসনের বাসার অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। সেখানে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না এবং সৌভাগ্যক্রমে উইলসনকে হাট ও ছড়ি হস্তে তাহার গৃহদ্বারেই দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলাম। সেও আমাদিগকে দেখিয়া, একটু ইতস্ততঃভাবে অগ্রসর হইল এবং আমার সঙ্গীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া, আমাকেই অভিবাদন করিয়া বলিল, "তাই ত মশাই, আপনি একটু অসময়ে দেখা করতে এলেন দেখছি! আমি এখনই গির্জ্জায় যাব। আমার স্ত্রীও যাবেন ব'লে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি। এখন ত বেশীক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা ক'বার সময় পাব না।"

"আমাকে ক্ষমা করবেন মিঃ উইলসন! একটু বিশেষ কাযে এ রকম হঠাৎ এসে পড়েছি। কিন্তু আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না; আপনাকে শুধু দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

"আচ্ছা, কি বলুন।"

"সে দিন বৈকালে আপনাদের দোকানে সেই যে ছাতাটার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, সেটার কথা আপনার বোধ হয় মনে আছে ?"

"হাঁ, তা আছে বৈ কি।"

"আপনি বলেছিলেন যে, আপনার পরিচিত কোন ভদ্রলোকের অনুরোধে, তাঁর এক মহিলা-বন্ধুর জন্য সেই ছাতাটা আপনি নিজের নামে কিনে দিয়েছিলেন,



দয়িত বিরহে

"হাঁ, খুব মনে আছে।"

যদিও এ পর্য্যন্ত উইলসনের আচরণে কান্ সাহেবের সহিত তাহার পূর্ব্ব-পরিচয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, তথাপি কথাটা এইবারে স্পষ্টতই জিজ্ঞাসা করিতে হইল। বলিলাম, "আচ্ছা, আমার এই সঙ্গীটির সঙ্গে আপনার কি কখনও পূর্ব্বে পরিচয় হয় নি ?"

উইলসন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কৈ, তা ত মনে হয় না।"

"তা হ'লে, ছাতাটা বোধ হয়, এঁর অনুরোধে কেনা হয় নি ?"

"আরে না, না ! সে সম্পূর্ণ আর এক জন লোক।"

"সে যখন আপনার পরিচিত লোক, তখন কোথায় তার সঙ্গে আমার দেখা হ'তে পারে, বলতে পারেন ?"

"দুঃখের বিষয়, আমি তাকে অনেক দিন দেখিনি। সম্প্রতি একটু কাযের উপলক্ষে তার সঙ্গে তার পূর্ব্ব-ঠিকানায় দেখা করতে গিয়ে সেখানে শুনলাম যে, সে সেখানে থাকে না, তার উপস্থিত কোথায় ঠিকানা, তাও সেখানকার কেউ বলতে পারলে না।"

উইলসনকে আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু ছিল না। সুতরাং তাহার নিকট বিদায় লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। পথে আসিতে আসিতে কান্ সাহেব বলিল, "কেমন মশাই, দেখলেন ত ? আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য নয় কি ?"

বাস্তবিকই এ কথার প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না। কাযেই বলিলাম, "হাঁ, —তাই ত দেখলাম বটে।"

অথচ মনের সংশয়টা আমার একেবারেই দূর হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে পুনরায় কান্ সাহেবের বাসার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তখন সবে ১০টা বাজিয়াছে। তখন তাহাকে বলিলাম, "এখনও ত বেশী বেলা হয় নি,—আপনার যদি অসুবিধা না হয় ত চলুন না, একবার সেই কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে যাই।"

কান্ সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সেটা কি এখান থেকে খুব কাছে, না দূরে ?"

"কিছু দূরে বটে, আমি যেখানে থাকি, তার খুব কাছে। আপনার ফিরতে কিন্তু ঘণ্টা খানেকের বেশী লাগবে না।"

কান্ সাহেব কিন্তু অসম্মত হইয়া বলিলেন, "না, তা হ'লে এখন সুবিধা হবে না,—আমার এখন অন্যত্র যাবার একটু দরকার আছে। তা ছাড়া সে বাড়ীতে যাবারই বা আবশ্যক কি ? ডাক্তার ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা হলেই ত জানতে পারবেন যে, আমি ও বাড়ীতে সে দিন যাই নি।"

"তা হ'লেও আপনি যে সেখানে আর কখনও যান নি, তাও সেই বাড়ীর এক জন চাকরের দ্বারা প্রমাণ হ'তে পারে।"

"ওঃ! বুঝেছি! আপনার দেখছি আমার উপর থেকে সন্দেহটা এখনও যায় নি। তা বেশ, আগামী কাল কোন্ সময়ে আপনার সুবিধা হবে বলুন, আমি সেই সময় আপনার কাছে যাব এবং সেখান থেকে আপনার সঙ্গে কানাই মল্লিক লেনে যেতে পারি।"

"আচ্ছা, তাই হবে। আপনি তা হ'লে কাল বিকালে ৫টা নাগাত আমার বাসায় যাবেন। আমার নামের কার্ডে আমার ঠিকানাও লেখা আছে, দেখে নেবেন।"

কান্ সাহেব সম্মতি জানাইলে, আমি তথা হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

৪৬

বেলা প্রায় ৪টার সময় কান্ সাহেব নিজেই আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আপনাকে আমার ওখানে নিয়ে যেতে এলাম। ডাঃ ভাদুড়ী আমার চিঠির জবাবে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তিনি ৫টা নাগাত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমাকে একটু কাযের উপলক্ষে এ অঞ্চলে আসতে হয়েছিল ; তাই ফিরবার পথে ভাবলাম, আপনাকে খবর দিয়ে একবারে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাই। গাড়ীখানাকে সেই জন্য হাজির রেখেছি। কি বলেন ? যাবেন কি এখন ?"

আমি অবিলম্বে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গাড়ীতে উঠিয়া কান্ সাহেব নিজের পকেট-ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "এখনও ত যথেষ্ট সময় আছে, তা হ'লে এ দিকে যখন এসে উপস্থিতই হয়েছি, তখন আপনার সেই কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতেও একবার হয়ে গেলে ক্ষতি কি ? কাল তা হ'লে আবার এ দিকে আসার হাঙ্গামা থেকে নিস্তার পাব। সে বাড়ীটা এখান থেকে কাছেই বলেছিলেন না ?"

"হাঁ, বেশ ত, চলুন না যাই, এখান থেকে খুবই কাছে।"

অল্পক্ষণ পরেই তথায় উপস্থিত হইয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর সদরের কড়া নাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ এ উপায়ে ভিতর হইতে কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া শেষে চীৎকার করিয়া নিতাই ও গোঁসাইজীকে ডাকিতে লাগিলাম। অবশেষে উপরের একটা জানালার অর্দ্ধোন্মুক্ত খড়খড়ির ভিতর হইতে এক নারীকণ্ঠ তীব্রস্বরে উত্তর করিল, "তারা এখানে কেউ নেই, আমরা নতুন ভাড়াটে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারা এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে উঠে গেছে না কি ?"

"হাঁ।"

"কোথায় গেছে, বলতে পারেন কি ?"

"না।"

তখন আর উপায়ান্তর না থাকায় আমি আবার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। কান্ সাহেব যেন একটু ব্যঙ্গচ্ছলে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত! আপনার কষ্টটা বৃথাই হ'ল দেখছি!"

আমি বিরক্তিভরে বলিলাম, "আপাততঃ বটে, কিন্তু আমি বোধ হয় পরে তাদের খুঁজে বার করতে পারব।"

"মিছা কেন আর ভুল ধারণা নিয়ে সময় নষ্ট করবেন ? আপনার যেটুকু সংশয় এখনও আছে, তা এইবারে আমার বাসায় গেলেই মিটে যাবে দেখবেন।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। নিতাই ও গোঁসাইজীর এরূপ আকস্মিক তিরোভাবে এই অনুসন্ধানকার্য্যে আবার একটা নূতন ব্যাঘাত পড়ায় সকল চেষ্টাই কোন না কোন কারণে ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া আমার বাস্তবিক বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। নানা চিন্তার পর শেষে বাড়ীওয়ালা শীল মহাশয়ের কাছে নিশ্চয়ই গোঁসাইজীর সন্ধান পাইব, এই আশায় মনকে কতকটা শান্ত করিলাম।

৫টার কিছু পূর্ব্বেই আমরা কান্ সাহেবের বাসায় পৌঁছিলাম এবং তখনও ডাক্তার ভাদুড়ী আসেন নাই দেখিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় নানারূপ অবান্তরপ্রসঙ্গে সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কান্ সাহেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং চাকরকে চা আনিবার হুকুম করিয়া ডাক্তারের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

ডাক্তারটি বয়সে প্রবীণ, প্রায় বৃদ্ধ বলিলেই চলে। মাথার সম্মুখভাগ প্রায় কেশশূন্য। বেশ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌম্য-মূর্ত্তি। চক্ষুর্দ্বয় আয়তনে কিছু ছোট হইলেও খুব উজ্জ্বল ও একাধারে যেন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ করিতেছিল। লোকটিকে দেখিয়া আমার বেশ শ্রদ্ধা হইল।

চাকর চায়ের সকল সরঞ্জাম টেবলের উপর রাখিয়া প্রস্থান করিবার পর কান্ সাহেব ডাক্তারকে বলিলেন, "আমার নিজের একটা দরকারে আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম, সে অপরাধ মাফ করতে হবে, ডাক্তার মশায়!"

"নাঃ, আমার কষ্ট কিছুই হয়নি। একটি রোগী দেখবার জন্য আমাকে এ দিকে আসতেই হয়েছিল। এখন ফিরে যাবার পথে আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারব না, কারণ, পথে আবার আর একটি লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে হবে। এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি ?"

ডাক্তারের অলক্ষিতে কান্ সাহেব আমার দিকে চোখের একটা কৌতুকপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তারকে বলিলেন, "ব্যাপারটা হাস্যাস্পদ হলেও বিরক্তিজনক বটে। এই উকীল বাবুটি বলেন যে, তাঁর এক মক্কেল গত জানুয়ারী মাসে সরস্বতীপূজার আগের রাত্রিতে শ্যামবাজারে একটা জুয়ার আড্ডায় কোন কারণে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জুয়াখেলা হয়। আর যে কয় জন লোক সেখানে ছিল, তারা সকলেই তার অপরিচিত, তা' মধ্যে না কি এক জন লোক ছিল, সে কতকটা আমার ম' দেখতে। খেলায় তার অনেক জিত হলেও, শেষে রা' ১২টা কি ১টা নাগাদ হঠাৎ খেলা বন্ধ ক'রে আর সক' মিলে জোর ক'রে তার সব টাকা কেড়ে নিলে, আর' উল্টে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে বাড়ী থেকে তা' দূর ক'রে দিয়ে বাড়ীতে চাবী দিয়ে সকলে স'রে পড়ে। পুলিসে খবর দিয়েছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দোষীদের কাউ' ধরা যায়নি। সম্প্রতি উকীল বাবুর মক্কেলটি আমা' পথে দেখে সেই দলের লোক মনে ক'রে আমার অনু' ক'রে এ বাড়ীর ঠিকানা জেনে গিয়ে, আমাকে দোষী

এক জন ব'লে সাব্যস্ত করতে চায়। অথচ সে রাতে আমি সে বাড়ী ত দূরের কথা, এ সহরের ভিতরেই ছিলাম না। নয় কি, ডাক্তার মশায় ?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক, সে রাত্রি ত আপনি শুঁড়ার আমার বাড়ীতে ছিলেন।"

উত্তর শুনিয়া কান্ সাহেব উৎফুল্লভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন. "কেমন, মিঃ দত্ত! এইবারে আমার কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস হ'ল ত ?"

আমি তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া ডাক্তারকে বলিলাম, "সে ত অনেক দিনের কথা হ'ল, এখনও কি আপনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে, ঠিক সেই রাত্রিতেই ইনি আপনার ওখানে ছিলেন ?"

"হাঁ, তা পারি। কারণ, ঐবার ছাড়া ইনি আর কখনও আমার ওখানে রাত্রিবাস করেননি।"

"তা সেটা যে সরস্বতীপূজার আগের রাত্রি, তাও কি আপনার ঠিক মনে আছে ?"

"হাঁ, আছে। আমার এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়ীতে ছেলেরা এবার আমোদ ক'রে পূজা করেছিল। আগের দিন সন্ধ্যার পর তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে অনেকক্ষণ আমার কাছে ছিলেন। যখন চ'লে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় মিঃ কান্ আমার ওখানে উপস্থিত হয়েন। তাতেই আমার মনে আছে যে, সেটা সরস্বতীপূজার আগের রাত্রি।"

এইবার কান্ সাহেব অধিকতর হৃষ্টচিত্তে আমাকে সহাস্তে বলিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করার যদি আরও কিছু কারণ থাকে ত বলুন। নইলে ন্যায়তঃ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার কথাই সত্য।"

"না, অবিশ্বাসের আর কিছু কারণ ত আপাততঃ দেখছি না।" বলিয়া ও প্রসঙ্গের এইরূপ 'হতগজ' রকমে সমাপ্তি করিলাম। কারণ, কান্ সাহেবের কথার সত্যতা এ পর্য্যন্ত যেরূপে সপ্রমাণ হইল, তাহাতে আমার আর আপত্তি করিবার হেতু কিছু না থাকিলেও, সে যে হত্যা-ব্যাপারের সহিত কোন প্রকারেই সংশ্লিষ্ট নহে, এ কথাটা আমার মনে বেশ নিঃসঙ্কোচে স্থান পাইতেছিল না।

যাহা হউক, ডাক্তার বলিলেন, "আপনাদের দরকার যদি শেষ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমি এখন বিদায় হ'তে চাই। আমার এখন আর বসবার বেশী সময় নেই।" বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে কান্ সাহেব তাঁহাকে ধন্যবাদে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় ডাক্তার যেন একটু বিরক্তিভরেই বলিয়া গেলেন, "এই সামান্য কথাটুকুর জন্য আমাকে ডেকে পাঠানোর হাঙ্গামা বা সময় নষ্ট না ক'রে সকালে একবার আমার ওখানে দু'জনে গেলেই পারতেন।"

ডাক্তার প্রস্থান করিবার পরে আমিও সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণি)।

কবি

ফুলবালা! চাহ দল বিকশিত করি
অমন করিয়া আশা ভেঙো না উহার ;
ও ত নহে মধুচোর,—নিঃশেষে আহরি'
যাবে যে দূরেতে চলি কারো পাশে আর!

ও নহে ত রূপময়ী ষোড়শী সুন্দরী,
রূপোন্মত্তা, বিলাসিনী যৌবন-গর্ব্বিতা,
তোমাকে সাজায়ে তার সাধের কবরী
যাবে যে চরণে দলি—প্রিয়-উৎকণ্ঠিতা!

বৈজ্ঞানিক নহে ও যে করি বিশ্লেষণ,
নিরখিবে উপাদান কেমন প্রকার,—
নহে শিশু,—বর্ণমোহে করিয়া গ্রহণ
পরক্ষণে যাবে ফেলি ধূলির মাঝার!

কভু নাহি পরশিবে,—নির্লিপ্তের ছবি—
সৌন্দর্য্যের দস্যু নহে, উপাসক কবি!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।



আয়কর জলজ উদ্ভিদ্

ভারতের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়ের অভাব নাই। বিশেষতঃ নদীমাতৃক বঙ্গদেশ বড় বড় স্রোতস্বতী ব্যতীত খাল, বিল, জলা, ডোবা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এক সময় এইগুলি হইতে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যাইত ; কিন্তু এখন এক দিকে যেমন মৎস্য বিরল হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই অন্য দিকে সংস্কার অভাবে এই সমুদয় জলাশয় আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া মশক-বংশের বিপুল বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। কিন্তু স্থল হইতে যেরূপ আয় হয়, জল হইতেও তদ্রূপ আয় হইতে পারে। মধ্য-য়ুরোপ এবং মার্কিণের জলাশয়সমূহ তাহার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্দেশে জলাশয়ের সদ্ব্যবহার করার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন অনেকের ধারণা আছে যে, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে উদ্ভিদ্ জন্মানই অবাঞ্ছনীয়। বাস্তবিক তাহা নহে, বরং অবাঞ্ছনীয় উদ্ভিদ্ জন্মানই মন্দ। যে সকল উদ্ভিদ্ মানবের ব্যবহারে আইসে, জলাশয়ে তাহাদের চাষ করিলে অন্য প্রকার জলজ আগাছা বৃদ্ধি পাইতে পায় না এবং জলও পরিষ্কার থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যকুলও বৃদ্ধি পায়।

জলের গাছ

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে অকূল পারাবার হইতে গ্রাম্য ডোবা পর্য্যন্ত কোন প্রকার জলাশয়ের জলই উদ্ভিদ্-শূন্য নহে। যত পরিষ্কার স্বাভাবিক জল পরীক্ষা করা যাউক না কেন, তাহাতে দুই চারি প্রকার উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যাইবে। জলে অনেক উদ্ভিদের বাস হইলেও তাহাদের প্রকৃতি এক প্রকার নহে। কোন জাতি গভীর জলে, কোনটি অগভীর জলে জন্মায় ; কোনটি পূর্ণ নিমজ্জিত, আবার এক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ ঠিক জলে বাস করে না বটে, কিন্তু জল ব্যতীত সজোরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপ কিন্তু আমরা প্রধানতঃ এরূপ উদ্ভিদের কথা বলিতেছি—যাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য অল্পবিস্তর স্থায়ী জল আবশ্যক হয়। কতিপয় সুপরিচিত উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, জলজ উদ্ভিদ্ সংগ্রহ অথবা চাষ দ্বারা সামান্য লাভ হয় না।

পদ্ম ও শালুক

বহু পুরাকাল হইতে পদ্মের ব্যবহার ভারতে চলিয়া আসিতেছে। এক সময়ে মিশরেও পদ্ম দেবপুষ্প বলিয়া পরিগণিত হইত। চীনে ইহার যথেষ্ট চাষ হয়। কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে পদ্ম প্রচুর জন্মিলেও পঞ্জনদ ও কাশ্মীর ব্যতীত অন্য প্রদেশে ইহার এত অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। পদ্মমূল (প্রকৃতপক্ষে কাণ্ড) উক্ত দুইটি প্রদেশে একটি বিশিষ্ট আহার্য্য ; ফুল হইবার পূর্ব্বে ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার থাকে। শুধু ডাল্না করিয়া কিংবা মৎস্য-মাংসের সহিত রন্ধন করিয়া পদ্মমূল (স্থানীয় নাম 'ভে', 'নেদ্রু') উত্তর-পশ্চিম-ভারতের অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হয়। পদ্মবীজ ভাজিলে বেশ মুখরোচক হয়। শালুকের মূলও পদ্মমূলের ন্যায় সুখাদ্য, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার পুষ্প ও পুষ্পবৃন্তেরই অধিক আদর। কলিকাতার বাজারে ইহার প্রচুর কাট্‌তি, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন। চীনদেশের বহুসংখ্যক জলবাসী লোকের শালুক একটি প্রধান খাদ্য। পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তৃত জলাসমূহে 'মাখনা' নামক যে বৃহৎ পত্র ও ফলবিশিষ্ট ভাসমান উদ্ভিদ্ দেখা যায়, উহা শালুক-জাতীয় এবং উহার ফল ভাজিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

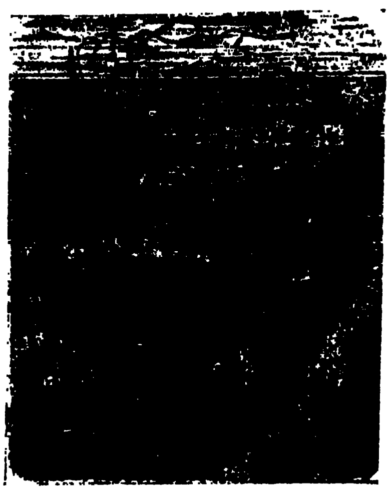
কেসুর ও পানিফল

সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী জলা, বিল প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়া কেসুর কলিকাতার বাজারে আইসে। কন্দগুলি প্রায় দেড় ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না। কেসুরের শাস



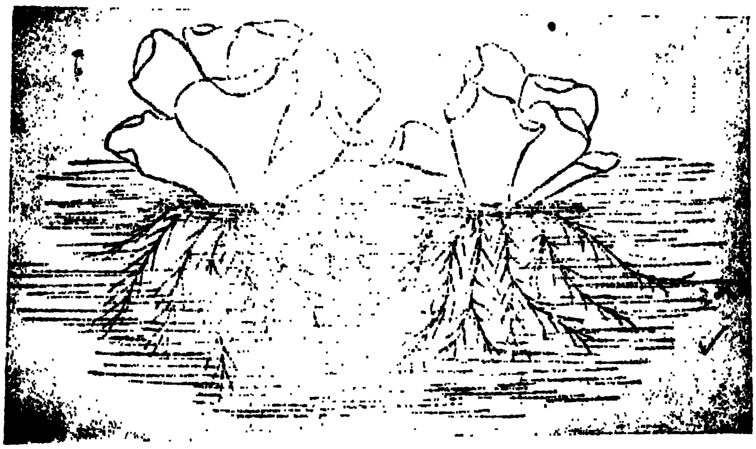
শালুক—পদ্ম

চানা-জাতীয় এবং ৬২ হইতে ৬৮ ভাগ শর্করা-জাতীয় পদার্থ আছে। দেশী কেশুর নিকৃষ্ট-জাতীয় এবং ইহার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য কোন চেষ্টাও করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, চীনা কেশুর নামে যে বড় জাতীয় কেশুর বাজারে আইসে, তাহা বেশ বড় ও মিষ্টতর শাঁসযুক্ত। এগুলি ঠিক চীন হইতে আমদানী করা হয় না, কিন্তু চীনে কেশুরের প্রচুর চাষ হয় এবং খুব উৎকৃষ্ট জাতিও উৎপাদিত হইয়া থাকে। তথায় চাষের প্রণালী মোটামুটি নিম্নরূপ;—চৈত্র-বৈশাখমাসে পুকুরের জল ছেঁচিয়া দিয়া মাটী অল্প শুষ্ক করা হয়; তৎপরে সার সংযোগ করিয়া লাঙ্গল দিয়া কয়েক দিবস রাখার পর পুকুরের মধ্যস্থল ব্যতীত চতুষ্পার্শে চানারা কেশুর-বীজ বপন করে; ইহার পর অল্প অল্প করিয়া জল ছাড়িলে অঙ্কুর উৎপাদিত হইয়া গাছ ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠে। জল যত বাড়িতে থাকে, গাছও



হয়-এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফসল তুলিবার সময় আইসে। একরূপ বিশেষ প্রকারের 'বিদে' দ্বারা কন্দগুলি তোলা হইলে পর তৎসমুদয়ের গাত্রসংলগ্ন মূলগুলি ছাঁটিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া হয়। তৎপরে অল্প শুষ্ক হইলেই ফসল বাজারে চালানের উপযুক্ত হইল।

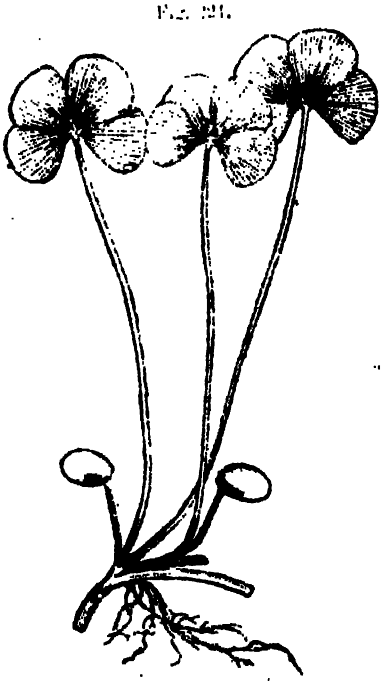
আমাদের দেশে জলজ ফসলের মধ্যে পানিফল অথবা সিঙ্গাড়া অন্যতম। কাঁচা ও সিদ্ধ ফল এবং পালোরূপে ইহা বহু পরিমাণে বাজারে বিক্রয় হয়, কিন্তু পানিফলচাষের প্রধান কেন্দ্র কাশ্মীর। অনেক দরিদ্র কাশ্মীরবাসী পানিফলের আটা দ্বারাই শীতকালে জীবনধারণ করে। প্রসিদ্ধ উলার হ্রদের স্বভাবজাত পানিফল ফসল জমা দিয়া কাশ্মীর সরকার ১০।১২ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র



টোকা পানা

নৌকা লইয়া অনেক কাশ্মীরী স্ত্রীলোক হ্রদ হইতে পানিফল সংগ্রহ করিয়া বেপারীগণের বড় নৌকায় আনিয়া দেয় এবং এই সকল বড় নৌকা আবার সংগৃহীত পানিফল লইয়া ঝিলম-তটস্থ সোপর নামক স্থানে উপস্থিত হয়। সোপরই পানিফল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। ক্রেতৃগণ এই স্থান হইতে পানিফল লইয়া গিয়া খোসা ছাড়াইয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এবং কাঠের বড় বড় উদুখলে কুটিয়া আটা প্রস্তুত করে। আটার বর্ণ মলিন পীতাভ হইয়া থাকে। উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে পানিফল হইতে সুন্দর আটা প্রস্তুত হইতে পারে। উলার হ্রদে দেখা যায় যে, বিঘা প্রতি প্রায় ৫ মণ পানিফল হয়। রীতিমত চাষ করিলে ফলন ইহা অপেক্ষাও অধিক হওয়া

Fig. 21.



শুষ্‌নি শাক

শাক ইত্যাদি

গৌণ ফসল হইলেও কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরের বাজারে কলমী, শুষ্‌নি, হিঞ্চা ইত্যাদি শাকের মূল্য কম নহে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে আর কোথাও এই প্রকার শাক বিনামূল্যে সংগ্রহ করিতে পাওয়া যায় না। সব কচুও বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। অনেক দূর হইতেও নৌকাযোগে জলকচু কলিকাতায় আইসে। ইহার অল্প-বিস্তর চাষ করিতে হয়; একবারে বন্য জল-কচুও বাজারে আইসে বটে, কিন্তু উহার মূল ও পত্রাদি ছোট এবং 'কুট-কুটে' হয়। এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি জলজ উদ্ভিদের উল্লেখ করা গেল, সেগুলি প্রধানতঃ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়। আপাততঃ উহাদের অনেকগুলির চাষ নাই, কিন্তু চাষ করিলে যে উৎকৃষ্টতর ফসল অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে বাজারে 'শাক-পাতাও' যেরূপ দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে চাষ ব্যতীত সুলভ দরে সহরাঞ্চলে 'শাকপাতা' সরবরাহ করাও অসম্ভব হইবে।

শিল্পে ব্যবহার

কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের শিল্পেও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রণায় শর্করা-শোধনপ্রণালী ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক দেশী চিনির কারখানায় এক প্রকার ঝাঁজই শ্বেত শর্করা প্রস্তুতের প্রধান উপায়। অপরিষ্কৃত চিনির উপর এক স্তর ঝাঁজ রাখিয়া দিলে ৩।৪ দিবসের মধ্যেই সকল ময়লা কাটিয়া গিয়া সাদা চিনি প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় যে বালন্দের মাতুর দেখা যায়, তাহার উপাদান মুথা-জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ্। উত্তর-সুন্দরবনে ঝিল, বিল প্রভৃতিতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে এবং ইহার পুষ্পদণ্ড চিরিয়া বালন্দের মাতুর বোনা হইয়া থাকে। ইহার ব্যবসায়ও ক্রমশঃ মাড়োয়ারীদিগের হাতে গিয়া পড়িতেছে। হোগলা হইতে আমাদের দেশে মাতুর হয় না, কিন্তু কাশ্মীরে হোগলাজাত মাতুরের যথেষ্ট প্রচলন আছে। নৌকা ছাউনিতে এবং টাটি, ঝাঁপ প্রভৃতি প্রস্তুতে বহু পরিমাণ হোগলা প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হয়। হোগলার মূল পদ্মমূলের ন্যায়ই খাদ্য এবং ইহার পরাগ-রেণু হইতে সিন্ধুপ্রদেশে মিঠাই প্রস্তুত হয়। ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, হোগলার পশম সদৃশ নরম পুষ্পগুচ্ছ ক্ষত প্রভৃতি ব্যাণ্ডেজ করিতে Cotton wool-এর ন্যায়ই উপকারী। সর্ব্বশেষে এ স্থলে শোলার উল্লেখ করা আবশ্যক। শোলা এত দিন নানাপ্রকার ফুল, খেলনা প্রভৃতি বস্তুতে ব্যবহৃত হইত, এ সকল দ্রব্যের কাটতি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহাদের স্থান শোলাটুপী অথবা হ্যাট দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। শোলা-হ্যাট-প্রস্তুত-কারকগণ যে পরিমাণ শোলা প্রতি বৎসর ব্যবহার করেন, তাহা ধীবরগণ দ্বারা জাল ভাসাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চীনদেশে কতিপয় জলজ উদ্ভিদের চাষ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ চীনে জলবাসী ব্যক্তির সংখ্যা সমধিক হওয়ায় বহু পুরাকাল হইতে চীনারা নানাবিধ জলজাত উদ্ভিদের চাষ করিয়া আসিতেছে এবং তদ্বিষয়ে সুদক্ষ হইয়াছে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য-ফসল উৎপাদিত হয় এবং ধান্য ও তজ্জাতীয় ২।৪ প্রকার ফসল ব্যতীত অন্য কোন গৌণ খাদ্য-ফসল উৎপাদিত হয় না বলিয়াই ধান্য না জন্মিলেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আবার ধান্য-ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য অনাবৃষ্টি অপেক্ষা অতিবৃষ্টি অধিক দায়ী। এরূপ স্থলে কতিপয় জলজ খাদ্য-উদ্ভিদ উৎপাদনে জনসাধারণের মনোনিবেশ করা উচিত। এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে চীনদেশ-প্রচলিত জলজ উদ্ভিদ্-কৃষি বিশেষরূপে অধ্যয়নযোগ্য।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

রূপের মোহ



অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"শিশির বাবু, আপনার বিশেষ কোন কায আছে?"

রমেন্দ্র শয্যায় শুইয়া কি ভাবিতেছিল। গিরীন্দ্রনাথের প্রশ্নে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "না, কায আর আমার কি বলুন?"

"তবে চলুন একবার ষ্টেশনের দিকে যাই। আমার দু'চার জন আত্মীয় আজ আস্‌বেন।"

"রমেন্দ্র তখন নির্জ্জনতা খুঁজিলেও ডাক্তার বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। গাড়ীতে উঠিয়া রমেন্দ্র বলিল, "কাল কিন্তু আমায় বিদায় দিতে হবে, ডাক্তার বাবু। বাড়ী যাবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়েছে।"

গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, "নিশ্চয়; কাল আর আপনাকে আমি বাধা দেব না। আমার স্ত্রীর কায আজই মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর একটা ভোজ আছে। কাল থেকে আপনার ছুটী।"

তখনও ট্রেণ আসিতে কিছু বিলম্ব ছিল। ষ্টেশনে পৌছিয়া উভয়ে প্লাটফরমের একখানা বেঞ্চে বসিলেন। বহু দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রমেন্দ্র শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মন তখন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এইবার সে দেশে গিয়া, মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে—নূতন জীবন লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনাবিল মন ও চরিত্র সে ফিরিয়া পাইবে না সত্য; তথাপি সে যথার্থ মানুষের ন্যায় চলিতে চেষ্টা করিবে। পত্নী,—সে কথা মনে হইতেই গভীর নৈরাশ্যে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হওয়াই তাহার পক্ষে কঠিন কার্য্য। সামাজিক হিসাবে, পারলৌকিক হিসাবে এই পবিত্র দাম্পত্যবন্ধনের গুরুত্ব কিরূপ, তাহা সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু মন এখনও সে দিকে অনুকূল পবনে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না, ইহাই যে পরম পরিতাপের কথা। যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ—সে তাহার কত অপরিচিত, তাহার হৃদয় হইতে কত দূরে অবস্থিত! এত দিনে সে কত বড় হইয়াছে! স্বামীর উপেক্ষায় তাহার চিত্ত কি স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া পড়ে নাই? হওয়াই ত স্বাভাবিক। শুধু সামাজিক বন্ধনই কি মানুষের মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? মন সকল বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া, সকল বিধানকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বন্যাপ্রবাহের বেগে ধাবিত হয়; তাহার নিজের মনের ধারাতেই তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকট। সুতরাং হিন্দুর ঘরের মেয়ে বলিয়াই যে স্বামীর অহেতুক, নিদারুণ উপেক্ষা সত্বেও তাহার পত্নী সমগ্র মন তাহার প্রতি কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবে, এমন প্রত্যাশাও ত সে করিতে পারে না!—রমেন্দ্রের মন এই চিন্তায় আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

যদি তাহার পত্নীর মন এত দিনে অন্যাসক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে কি অপরাধী করা চলে? প্রথম উদ্দাম যৌবন—অবলম্বনহীন চিত্ত আশ্রয়ের সন্ধানই করিয়া থাকে; কিন্তু সে আশ্রয় ত এই নারী পায় নাই! দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া, হতাশ হইয়া সে যদি—। রমেন্দ্র আর ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার ভিতরটা বেদনায় টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিল। নানারূপ উদ্ভট কল্পনার প্রভাবে তাহার হৃদয় যেন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। জন্মগত, সমাজগত চিরন্তন সংস্কার যাহা দাবী করিতেছিল, তাহার প্রভাব অতিক্রম

করিবার শক্তি তাহার নাই ; কিন্তু সে দাবীও যে কত দূর অসঙ্গত, তাহাও ত সে অস্বীকার করিতে পারে না। সে পুরুষ—স্বামী হইয়াও যদি এক দিন সে অন্য রমণীর চিন্তাকে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিয়া থাকে—সেই নিবিড় চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া আপনাকে ও অন্যকে ধ্বংসপথে নিক্ষিপ্ত করিবার উপক্রম করিয়া থাকে, তবে নারীর পক্ষে—উপেক্ষিতা, অনাদৃতা স্ত্রীর পক্ষে তাহা অসম্ভব না-ও হইতে পারে। আর সেরূপ স্থলে অপরাধ নারীর নহে, পুরুষের। যাহা নারীর পক্ষে অপরাধ, তাহা পুরুষের পক্ষেও সমান ওজনের অপরাধ, ইহা সে কোন দিনই অস্বীকার করে না, এখনও করিবে না। হাঁ, যদি তাহার পত্নীর মনে এমন কোনও দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে, সে জন্য ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ সর্ব্বপ্রকারেই সে-ই দায়ী। এ জন্য রমেন্দ্রকে কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বৈ কি। আর হিন্দুর মেয়ে, বাঙ্গালীর ঘরের বধূ বলিয়া ভবিষ্যতের আশায় সে যদি স্বামীর চিন্তায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া থাকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই-রূপই হইয়া থাকে বলিয়া তাহার বিশ্বাস—তাহা হইলে সেই পুণ্যপ্রতিমা দেবীর সন্নিধানে সে অগ্রসর হইবে কিরূপে?

"শিশির বাবু, উঠুন, ট্রেণ আসছে।"

ডাক্তার বাবুর আহ্বানে রমেন্দ্রের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে দেখিল, ট্রেণ মন্দগতিতে ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে। গিরীন্দ্রনাথের পশ্চাতে সে অগ্রসর হইল।

যাত্রীদিগের চীৎকার, কুলীর কোলাহল, ট্রেণের কামরার দরজা খোলা-বন্ধের মহা শব্দ,—লোকের ভিড় ঠেলিয়া রমেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সন্নিহিত হইল।

"এই যে গিরিন, ভাল ত সব, বাবা?"

ডাক্তার আগন্তুক প্রৌঢ়ের চরণতলে প্রণত হইলেন। প্রৌঢ় পার্শ্ববর্ত্তী রমেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইলেন। সহসা তাঁহার আননে আনন্দের দীপ্তি যেন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবাজী, তুমিও এখানে?—বেশ! বেশ!"

রমেন্দ্রও সবিস্ময়ে আগন্তুকের দিকে চাহিল। অকস্মাৎ তাহার চিত্তেও পরিচয়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইনি তাহারই শ্বশুর—স্ত্রীর

সহসা রমেন্দ্রের দৃষ্টি কামরা হইতে বহির্গতা প্রথমা নারী-মূর্ত্তির দিকে পড়িল। এ কি বিস্ময়! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? তাহার চিরারাধ্যা, গর্ভধারিণী জননী এখানে? তাঁহার পশ্চাতে—ও কে? মাধবদার স্ত্রী না? এ সব কি ইন্দ্র-জাল? সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে?

রমেন্দ্র সন্নিহিত গাড়ীর হাতল ধরিয়া পতনবেগ হইতে আপনাকে রক্ষা করিল। পরমুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া মাতার চরণধূলি গ্রহণ করিল।

"বাবা! বাবা!—তুই এখানে?"

মাতা ও পুত্রের নয়নে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রু নামিয়া আসিল। রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি অশ্রুধারা রুমালে মুছিয়া ফেলিল। চারিদিকে জনতা, কে কি ভাবিবে।

ডাক্তার তখন মাল-পত্র নামাইতে ব্যস্ত। কায শেষ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "গিরিন্, রমেন তোমার বাসায় কত দিন?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "রমেন কে? শিশির বাবু কি আমাদের রমেন্দ্র বাবু?"

তাঁহার দৃষ্টিতে কৌতুক-হাস্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রমেন্দ্রও বুঝিতে পারিতেছিল না, ডাক্তার বাবুর সহিত তাহার শ্বশুরের কি সম্বন্ধ; আর তাহার জননীই বা হঠাৎ এখানে আসিলেন কেন?

"শিশির বাবু, আপনার আসল নাম তবে রমেন্দ্র?"

হরগোবিন্দ সবিস্ময়ে বলিলেন, "ব্যাপার কি গিরিন্? তোমরা পরস্পরের পরিচয় অবগত নও না কি? রমেন, ইনি তোমার ভায়রা গিরীন্দ্রনাথ বসু!"

ভায়রা! সে তবে এত দিন শ্যালিকার গৃহেই অতিথি হইয়া আছে! তবে কি, তবে কি—

"বাবা, ইনি তোর শাশুড়ী—প্রণাম কর।"

রমেন্দ্রের মাথা ঠিক রাখা কঠিন হইয়াছিল। এতগুলি বিস্ময়কর ঘটনার আকস্মিক আবির্ভাবে তাহার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলের পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনা মহিলাকে সে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই। সে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইয়া শ্বশ্রূ-মাতার চরণ বন্দনা করিল। তিনি নীরবে, শুধু মাথায় হাত

তাঁহার সুন্দর, সৌম্য-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মন বিস্ময়, উল্লাস ও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ঠিক এমনই যুগল নয়ন, এই বর্ণ, এই মুখশ্রী সে দিন তরুণ প্রভাতালোকে সে আর এক জনের দেহে দেখিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য! শুধু তফাৎ—এক জন নবোদিত অরুণ, অপরা অপরাহ্নের রবি। বিবাহের সময় সে তাহার শাশুড়ীকে দেখিয়াছিল সত্য; কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্য এবং মনের তিক্ততার প্রভাবে সে ভাল করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। তাহা ছাড়া দীর্ঘকালের অসাক্ষাতে সে তাঁহার আকৃতি এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। উদ্যানমধ্যে যাঁহাকে সে দেখিয়াছিল, তিনি যদি ডাক্তার বাবুর পত্নী হন? ছি! ছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!

কুলীরা মোট লইয়া অগ্রসর হইল। মাতা চলিতে চলিতে বলিলেন, "রমু, আমার বৌমা ভাল আছে ত? তুই এখানে আছিস জান্‌লে—"

রমেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। গিরীন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "মা, রমেন্ জান্‌তেনই না যে, আমাদের সঙ্গে ওঁর কি সম্বন্ধ। এখনই উনি জানতে পার্‌লেন। সে অপরাধ আমার—আমাকে ক্ষমা করতে হবে।"

বিধবা সহসা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে ভিতরে যে কিছু আছে, তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। রাধাগোবিন্দ বাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও যথেষ্ট বিস্মিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ষ্টেশনে, পথে আর অধিক আলোচনার সুবিধা নাই, সঙ্গতও নহে। সকলে নিজ নিজ ধারণা লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাই রমেন, আমি সম্পর্কে ও বয়সে তোমার বড়; আমাদের লুকোচুরীতে তুমি রাগ করো না, ভাই। বাড়ী চল, সব বুঝতে পার্‌বে।"

—

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সত্যই পুষ্পমাল্য ও আলোক-সম্ভারে গিরীন্দ্রনাথের বাড়ী আজ উৎসবশোভা ধারণ করিয়াছিল। অল্পসময়ের মধ্যে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া রমেন্দ্র মনে মনে গিরীন্দ্রনাথের প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

নিমন্ত্রিত অতিথিগণ একে একে আসিতে লাগিলেন। সংখ্যা খুব অধিক নহে। সুনীলচন্দ্র, সুরেশ, অমিয়া, সরযূও আসিলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ব্যতীত বাহিরের লোক বেশী ছিল না। ডাক্তার সকলকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন।

গিরীন্দ্রনাথ যে রমেন্দ্রের ভায়রা, এ সংবাদ কেহই জানিতেন না। ডাক্তার হাসিমুখে নিজেই সে সংবাদ সকলকে জানাইতেছিলেন। আজ রমেন্দ্রের অভিনন্দনের জন্যই যে এই উৎসব-সভার আয়োজন, সে কথাটাও তিনি লুকাইয়া রাখিলেন না। বিস্ময়ের প্রথম আবেগ শেষ হইলে, সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে ওঁকে শিশির নামে পরিচয় ক'রে দিয়েছিলে কেন?"

কৌতুকহাস্যে ডাক্তার বলিলেন, "তখন আমার ভাইটি যে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। কি ক'রে বলি, বল।"

রমেন্দ্রের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি আমায় চিন্‌তে পেরেছিলেন কি ক'রে? আগে আপনাতে আমাতে কখন দেখা ত হয় নি। আমি ত আপনার নাম পর্য্যন্ত জান্‌তাম না—মনে ছিল না।"

"তা না জান্‌তে পার; কিন্তু তোমাকে না দেখলেও তোমার নামটি আমার জানা ছিল। তবে সত্যের অনুরোধে বল্‌তে হবে, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নি। তোমার ঠাকুরঝি প্রথম দিনেই সন্দেহ করেছিলেন। তার পর জানই ত ভায়া, 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।' ওঁরা যেটা জান্‌তে চান, তা জান্‌বেনই। সুতরাং তোমার মত বেচারা কবি তাঁর কাছে ধরা প'ড়ে গেল। তার ফলেই আজ তোমারই কল্যাণে আমাদের পাঁচ জনের—বুঝেছ কি না—উপাদেয় ভোজনের আয়োজন। আমি এক জন ঔদরিক, তা ত এই ক'দিনেই বুঝতে পেরেছ, ভায়া।"

অদূরে শ্বশুর মহাশয় উপবিষ্ট, কাযেই গিরীন্দ্রনাথ অতি কষ্টে উচ্চহাস্য সংবরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরেও হর্ষবিস্ময়ের একটা হিল্লোল বহিতেছিল। অমিয়া ও সরযূর সহিত সুরমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। এলাহাবাদে উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু এই প্রতিভা যে সুরমার সহোদরা, এ সংবাদ তাহাদেরও জানা ছিল না। রমেন্দ্রের মাতা তাহাদিগকে দেখিয়া খুসী

বয়স্কারা অন্য কাযে চলিয়া গেলে সরযূ প্রতিভাকে বলিল, "বৌদি,—হাঁ, আপনাকে এখন থেকে বৌদি বলেই ডাকবার অধিকার আমায় দিতে হবে—এত শীঘ্র এমনভাবে আবার যে দেখা হবে, ভাবি নি। আজ বড় আনন্দের দিন। রমেনদা—বীর রমেনদার সহধর্ম্মিণীর জয় হোক্।"

সরযূর আকস্মিক উচ্ছ্বাসের অন্তরালে কোন্ শক্তি কার্য্য করিতেছিল, প্রতিভা তাহা বুঝিতে পারিল না; তাই সে সবিস্ময়ে সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমিয়া সুরমার সহিত আলাপ সারিয়া ধীরে ধীরে প্রতিভার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পর পরম আদরে প্রতিভার দক্ষিণ করপুট আপন করে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দ-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে আমি বড় শ্রদ্ধা করি। আপনি জানেন না, এক দিন আপনি আমার জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সে দিন সন্ধ্যায় তুলসীতলায় আপনার মুখে যে ছবি আমি দেখেছিলাম, তা আমার বুকে গাঁথা হয়ে আছে। আপনার সেই নিষ্ঠাভরা ভাবটি আমি আয়ত্ত করবার চেষ্টা কচ্ছি। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার মত হ'তে পারি।"

এ কথারও অর্থ প্রতিভা বুঝিল না। তাহার কাছে সবই যেন হেঁয়ালী—এখানে আসিবার পর হইতে সে শুধু গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"কিন্তু এ বড় মজা! আপনি যে স্বামীর সন্ধানে হঠাৎ এখানে আসেন, সে দিন আমাদের তা বলেন নি। আমরা অন্য রকম শুনেছিলুম।"

কাজ সারিয়া সুরমা তখনই ঘরের মধ্যে আবার আসিতেছিলেন; কথাটা শুনিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, "তা ভাই, ওকে কিছু বলা ঠিক নয়। ও জানতই না যে, রমেন বাবু এখানে আছেন। এ একটা মিলনান্তক পঞ্চাঙ্ক নাটক—ঘটনার পর ঘটনা হয়ে, শেষে অকস্মাৎ শেষ দৃশ্যে নাট্যকার যেন এই অঙ্কের অভিনয় দেখাচ্ছেন।"

নানাবিধ হাস্য-পরিহাসে তরুণীদের আসর ক্রমে জমিয়া উঠিল।

পান-ভোজন, আলাপ-আপ্যায়ন পুরাদস্তর শেষ হইলে একে একে নিমন্ত্রিতগণ বিদায় লইলেন। প্রগাঢ় আলিঙ্গনের পর সুরেশচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় চাহিলেন। সুনীল-আপনার বন্ধুবর এত দিন পরে চিরকুমার সভার দল থেকে নামটা তুলে নিচ্ছেন। আমি আগে থেকেই আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলুম। গিরিন্, তোমাকে আর কি বলব ভাই, সরযূর বিয়ে অগ্রহায়ণের প্রথমেই স্থির হয়ে গেছে। তোমাদের সকলকেই যেতে হবে।"

এ শুভ সংবাদে রমেন্দ্র খুসীই হইল। আজ চারিদিক্ হইতে আনন্দের সংবাদই আসিতেছে। কিন্তু—কিন্তু, তথাপি তাহার অন্তর মাঝে মাঝে এমন বিরস হইয়া পড়িতেছে কেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাকী। হাঁ, বাকী আছে বৈ কি। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রায়শ্চিত্ত বাকী। তাহার পর—তাহার পর!—

ভৃত্য আসিয়া জানাইল, অন্তঃপুরে তাহার ডাক পড়িয়াছে। সংবাদটা শুনিবামাত্র রমেন্দ্রের হৃদয় নানা ভাবের সংঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। স্পন্দিত হৃদয়ে সে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল। একটি ঘরের মধ্যে দুই জন নারী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রমেন্দ্র চিনিল, পুরোবর্ত্তিনী তাহার শ্বশ্রূমাতা। কিন্তু অপরা?—অবগুণ্ঠনা, আড়ম্বরবাহুল্যবর্জ্জিতা রাজ্ঞীর ন্যায় যে তরুণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে কি না, সহসা মনে করিতে পারিল না। তবে তিনি যে উদ্যানমধ্যবর্ত্তিনী প্রভাতালোকদৃষ্টা তরুণী নহেন, তাহা বুঝিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু ইঁহারও আননে শ্বশ্রূমাতার আদল আছে। তবে ইনিই কি ডাক্তার-গৃহিণী; অম্বিকার উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাহার পত্নীর জ্যেষ্ঠা? নিশ্চয়।

প্রতিভার মাতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, বিয়ের পর ত আর দেখা হয় নি, হয় ত চিনতে পারবে না। এ আমার বড় মেয়ে সুরমা।"

যুবতীর আননে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। রমেন্দ্র নত নেত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"থাক্, থাক্। আপনি বসুন, রমেন বাবু।"

সুরমা একখানি চেয়ার টানিয়া আনিলেন।

রমেন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সম্পর্কে যাঁহারা গুরুজনীয়া, তাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকিতে সে বসিবে কিরূপে?

তাহার মনের কথা যেন বুঝিতে পারিয়াই তাহার শাশুড়ী বলিলেন, "তুমি ব'স বাবা, তাতে দোষ নেই। মা সুর, তুই

মাতা চলিয়া গেলেন। সুরমা সন্নিহিত টেবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বসুন, রমেন বাবু!"

আত্মীয়া, পত্নীর সহোদরা হইলেও পরিচয়ের প্রথম অবস্থায় সে যেন লজ্জায় ও কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

"আমার পরম স্নেহ ও আদরের পাত্র হ'লেও আপনাকে আমি আদর-যত্ন করতে পারি নি; আমার অপরাধ নেবেন না, রমেন বাবু।"

রমেন্দ্র এবার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "বলেন কি দিদি, এখানে আমি যে আদর-যত্ন পেয়েছি, মা'র কাছেও তার বেশী কখনও পাই নি।"

"কিন্তু আপনি আমার ভাই, আপনার সামনে ত আমার আসা উচিত ছিল! সেই কথাটাই আমি এখন বল্‌তে চাই। একটা কারণ ছিল, তাই তখন আমার কর্ত্তব্য পালন করতে পারি নি। তা ছাড়া আপনার কাছে আমার একটা আর্জ্জি আছে।"

রমেন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "আর্জ্জি?—আমার কাছে?"

"হাঁ, আপনারই কাছে—বিস্মিত হচ্ছেন, রমেন বাবু? হবারই কথা। পুরুষই নারীর কাছে আর্জ্জি করবে, এই হচ্ছে সনাতন ব্যবস্থা; কিন্তু সে ব্যবস্থাটা এ যাত্রা বদ্‌লাতে হ'ল। আমি আপনার কাছে অপরাধিনী।"

"কি বল্‌ছেন দিদি? আমার কাছে আপনার অপরাধ? বরং আমিই আপনাদের কাছে নানারূপে অপরাধী—মহা অপরাধী।"

সুরমার সুন্দর অধরে হাস্যের সুধা-সমুদ্র যেন উছলিয়া উঠিল। সুন্দরী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার অপরাধ ত আছেই। সে আপনি যার কাছে অপরাধ করেছেন, তার কাছেই জানাবেন। কিন্তু আমারও কিছু অপরাধ আছে। প্রথমে কৌতূহলবশে তার আরম্ভ, পরে কর্ত্তব্য-ও স্নেহের প্রেরণায় তার শেষ।"

রমেন্দ্র সবিস্ময়ে নির্ব্বাক্‌ভাবে একবার এই আত্মস্থা অথচ পরিহাসরসিকা যুবতীর দিকে চাহিল। উজ্জ্বল আলোকাধারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সুরমা বলিলেন, "আমি কবির অজ্ঞাতসারে তাঁর দিনলিপিটা প'ড়ে ফেলেছিলাম। তাই আজ কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি।"

রমেন্দ্র প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিল—কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ঘটনা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর কোথাও জটিলতা নাই—সবই যেন সরল, সহজ হইয়া আসিল।

মৃদুস্বরে রমেন্দ্র বলিল, "আপনি ভালই করেছিলেন। এ জন্য কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। দিনলিপি ত তুচ্ছ, আমি মুক্ত কণ্ঠে আমার ত্রুটি, দৈন্য, নীচতা—সকল রকম হীনতার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত নই। তাতেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি না, জানি না।"

সুরমার গম্ভীর অথচ প্রসন্ন মুখে যেন একটা আলোক-প্রবাহ বহিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা বলিল না।

অবশেষে সুরমা শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "রমেন বাবু, গলায় রত্নের হার রয়েছে, অথচ মানুষ অনিশ্চিতের রাজ্যে রত্নের সন্ধানে দৌড়ায়—আপনি কবি, বুঝতেই পারেন, তার কি দুর্ভাগ্য।"

উপমাটি রমেন্দ্রের চিত্তে প্রগাঢ় রেখাপাত করিল। এই ত হিন্দু নারী—বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী! কে বলে, ইহারা অর্দ্ধ-শিক্ষিতা, কে বলে, ইহাদের গভীর হৃদয় নাই—প্রবল অনুভূতি নাই! সত্যই সে হতভাগ্য, মূর্খ!

সুরমা রমেন্দ্রের ইদানীং কালের দিনলিপি পড়িয়াছিলেন সত্য; তাহার ভগ্ন হৃদয়ের, বিক্ষুব্ধ চিত্তের নৈরাশ্যবিজড়িত মানসিক অবস্থার বর্ণনাই পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বেশী কিছুই ত জানিতেন না।

রমেন্দ্রের আননে মানসিক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের ছায়া বোধ হয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। স্নেহশীলা নারীর দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিল না। তিনি বলিলেন, "রাত হয়েছে, চলুন, আপনি বিশ্রাম করবেন।"

রমেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু প্রতিবাদ করিতে পারিল না—যন্ত্রচালিতবৎ সে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

খোলা জানালার ধারে প্রতিভা দাঁড়াইয়া ছিল। হেমন্তের বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার

আলোর তরঙ্গ, বাগানে গাছের পাতার হিল্লোল—প্রতিভা কি মুগ্ধনেত্রে নিসর্গের এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল?

সুরমা ভগিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। টেবলের উপর মসৃণ বাতিদানে—কাচের ফানুসের মধ্যে—বাতি জ্বলিতেছিল। তাহার দুই পাশে দুইটি ফুলের তোড়া। ভগিনীর প্রসাধনক্রিয়া মনের মত করিয়া, তাহাকেও নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতিভা একবারও প্রতিবাদ করে নাই, একটি কথাও বলে নাই। তাহার সমগ্র হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও—তাহার আননে বা ব্যবহারে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। যাহা তাহার অন্তরের জিনিষ, বাহিরের কোনও লোকের কাছেই তাহা সে প্রকাশ পাইতে দিবে না, ইহাই তাহার জীবনের শিক্ষা। স্নেহের আতিশয্যে জ্যেষ্ঠা যাহা করিতেছেন, শাশুড়ী ও মাতা যাহাতে সায় দিতেছেন, সে তাহার প্রতিবাদ করিতে চাহে নাই—করেও নাই। কিন্তু এ সমস্তই যে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রূপ ও উপহাস, তাহা যেন সে সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল।

সে যেন নবোঢ়া বধূ—আজ যেন তাহার পুষ্পবাসর! প্রকৃতপক্ষে তাহা যে মিথ্যা, সে কি তাহা অস্বীকার করিতে পারে? তাহার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ ৪টি বৎসর তাহার কাছে দাম্পত্য-জীবনের কোন্ অভিনব সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে! বিবাহ? সে যেন একটা স্বপ্নের কাহিনী! এক দিন ঘুমের ঘোরে সে যেন এক মধু যামিনীর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সেই মধুময়ী রজনীর প্রত্যেক ব্যাপারটি তাহার স্মৃতি-পটে চির-মুদ্রিত, কিন্তু তাহার পর?—শুধু একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তিভরা জীবন! ভিতরের দৈন্যকে বাহিরের প্রফুল্লতার আবরণে সে এত কাল লোকচক্ষুকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে!

তাহার একনিষ্ঠ চিত্ত, স্থির, অচঞ্চল প্রকৃতি, তাহার শিক্ষা ও বংশগৌরব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছিল। দেবতার পবিত্র পীঠস্থান হিসাবে সেই আসনকে, সেই মূর্ত্তিকে পূজার অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছে। তাহার সম্মুখে জননীর পবিত্র জীবনের আদর্শ—সেই পুণ্য আদর্শ তাহার মার্জ্জিত হৃদয়ে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় অনুক্ষণ জাগ্রত ছিল। তাহার সংস্কার, আবেষ্টন ও ভারতভূমির চিরাগত পুণ্যভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ভিন্ন কল্পনার অবসর ও বাসনাই তাহার ছিল না। কিন্তু তথাপি স্বামীর ব্যবহার সমর্থনযোগ্য বলিয়া সে কি মনকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল? বাহিরের যে বাধাবিঘ্নগুলি দাম্পত্য জীবনরাজ্যের মিলনের গান—সুরের ঝঙ্কারকে সুদূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে তাহার অন্তরতম প্রদেশে ভ্রমেও কি সন্দেহের ছায়াপাত হয় নাই? মনকে যুক্তির দ্বারা প্রবোধ দিবার চেষ্টা সে সকল সময়ই করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু মন কি তাহা নিঃসংশয়ভাবে কখনও গ্রহণ করিয়াছিল?

আজ এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে স্বামীর সহিত আসন্ন প্রথম সম্ভাষণের পূর্ব্বাহ্নে—হাঁ প্রথম সম্ভাষণ বই কি, ইহার পূর্ব্বে যে দেখা-সাক্ষাৎ—যে কয়টি প্রাসঙ্গিক বৈচিত্র্যহীন কথা, তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগেই গণনা করা যাইতে পারে—এই সব কথাই প্রতিভার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ, বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। ঘরে আসিয়াই সে দিদির সযত্ন-প্রসাধিত বেশ খুলিয়া ফেলিয়াছিল। বহুমূল্য বসনের পরিবর্ত্তে সে একখানি সাধারণ লালপাড় দেশী শাড়ী পরিয়াছিল; স্বর্ণালঙ্কারের বাহুল্যগুলি খুলিয়া টেবলের এক পাশে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। ছিঃ! বেশভূষার আড়ম্বর দেখাইয়া সে কাহার মনোরঞ্জন করিতে যাইতেছে? রমণীর প্রসাধন তখনই সার্থক, যখন স্বামী সুবেশা পত্নীকে দেখিবার জন্য লালায়িত হয়েন।

মনকে সে এত দিন যতই স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকুক, এ কথাটা ধ্রুব সত্য—স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। তাহার সম্বন্ধে কোন স্মৃতিই তাঁহার নাই। কোনও পুরুষের পক্ষে কি ইহা সম্ভবপর? যদি তাঁহার চিত্তে তাহার সম্বন্ধে এতটুকু আকর্ষণও থাকিত, তাহা হইলে যত কঠোর সাধনায় মত্ত থাকুন না কেন, স্ত্রীর মুখের চেহারা একেবারে বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি স্বামীর যে কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্যই তিনি জানেন। তিনি সুপণ্ডিত, হৃদয়বান্ এবং কবি; তাঁহার পক্ষে জানা আরও সহজ। যদি ভালবাসিতেই না পারিবেন, তবে বিবাহ করা তাঁহার উচিত হইয়াছিল কি?

এমনই অনেক প্রশ্ন প্রতিভার চিত্তকে ব্যাকুল ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোল, উদ্যানের মনো-

অনেকটা শান্ত হইল। কক্ষান্তর হইতে তাহার জননীর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহার শাশুড়ীর সহিত মাতা যেন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন।

মা'র কথা কানে যাইতেই তাহার চিন্তার স্রোত যেন ফিরিয়া গেল। তাহার পিত্রালয়ের কত দৃশ্যই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মাতার অতুলনীয় স্বামিভক্তি, অগাধ স্নেহ ও প্রেমের অভিব্যক্তি শৈশব হইতে কতভাবেই না সে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে! দেবতার মত পুণ্যবান্ পিতা, দেবীর ন্যায় মমতাময়ী, পুণ্যবতী মাতা—তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ, জীবনের দৃষ্টান্ত, তাহার কানের মধ্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, নেত্রপথে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মনে মনে অমনই সে যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মানুষকে বিচার করিবার সত্যই তাহার কিসের অধিকার? তাহার স্বামীর সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করিবার সুযোগ সে পায় নাই—অধিকারও ত সত্যই হয় নাই! তাঁহাকে সে কতটুকু জানে, কতটুকুই বা সে তাঁহাকে দেখিয়াছে? তাঁহার হৃদয়ের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে কোনরূপ প্রতিকূল ধারণা করা তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য। সে শুধু তাঁহাকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। ভালবাসিতে পারিয়াছে কি না, সে পরীক্ষার অবকাশ এখনও আইসে নাই; তাঁহাকে এত দিন পূজা করিয়াছে, কারণ, সে তাহা নিজের ধর্ম্ম বলিয়াই বিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার তাহার হয় নাই। অবশ্য বিচারের অধিকার সে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাঁহাকে জানিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করা অসঙ্গত।

তবে সে কি করিবে? কলের পুতুলের মত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে? সেও ত কম হীনতা ও দৈন্যের কথা নহে! না,—এ বড় লজ্জা, বড় বিশ্রী, বড়ই অশোভন!

দয়াল ঠাকুর! তুমি তাহাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার কি কর্ত্তব্য! তোমার চিন্তা সে ত কোন দিন ত্যাগ করে নাই! তুমিই ত তাহাকে এত দিন পথ দেখাইয়া চালাইয়াছ, তুমিই ত তাহাকে অভয়বাণী শুনাইয়াছ! তোমারই মধুর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া সে জীবনে শান্তি না পাইয়া থাকে, সান্ত্বনা পাইয়াছে! তুমিই ত তাহার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তুলিয়া গানের স্রোত বহিয়া দিয়াছ। স্বামীর কর্ত্তব্য, পত্নীর কর্ত্তব্য, জটিলতর, সঙ্কটসঙ্কুল মুহূর্ত্তে তুমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিও। সে যেন ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, ভালবাসার পথে চলিতে পারে!

এমনই ভাবে যখন মর্ত্ত্য ও আকাশে তাহার মন বিচরণ করিতেছিল, সেই সময় তাহার দিদির কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল। চকিতে সে একবার দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত মস্তকের অবগুণ্ঠনের পরিসর একটু বাড়াইয়া দিল।

"রমেন বাবু, দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবেন।"

প্রতিভার হৃদয়ের রক্ত দ্রুততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে স্পন্দনশব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ককেও শব্দময় করিয়া তুলিল।

মুহূর্ত্ত কি যুগে পরিণত হইয়া যায়?

"প্রতিভা!"

এ সম্বোধন সে শত শত বার কত লোকের মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছে; কিন্তু তিনটি বর্ণের সমবায়ে এমন ব্যাকুলতা, এমন আর্ত্ততা, এমন ব্যথা—এমন মাধুর্য্য এত দিন কোথায় ছিল?—ইহাও কি তাহার বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র?

ধীরে ধীরে সে বাতায়নের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইল।

"প্রতিভা! প্রতিভা!"

টেবলের ধারে স্বামীর ঋজু দীর্ঘদেহ। উভয়ের দৃষ্টি চকিতে একবার উভয়ের প্রতি পতিত হইল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। রমেন্দ্রের ব্যাকুল বাহুযুগল ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া আবার স্থির হইল।

রমেন্দ্র কাব্যে সমুদ্রমন্থনের বর্ণনা পড়িয়াছিল, কিন্তু মানব-হৃদয়ের সমুদ্র মথিত হইয়া যে বিপুল শব্দ উত্থিত হয়, তাহার বর্ণনা ভাষায় কি ব্যক্ত করা যায়?

এই তাহার স্ত্রী?—হাঁ, সে দিন প্রভাতে ঐ বরবর্ণিনী মূর্ত্তিই তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল। অদৃষ্টের পরিহাসই বটে। রূপযৌবনভরা শরীরিণী ঐ বসন্ত-মঞ্জরীই তাহার ইহপরকালের যাত্রাপথের সঙ্গিনী—তাহার একমাত্র পার্শ্ব-চারিণী। দেখ রমেন্দ্র, ভাল করিয়াই দেখ। তোমার তৃষিত চক্ষু কেবল রূপ খুঁজিয়াই ফিরিয়াছে, প্রবৃত্তি শুধু মিটোল, মধুর মাংসপিণ্ডের লোভে, হিংস্র পশুর তীব্র ক্ষুধার মত মত্ত

পরিকল্পনার মধ্যে তোমার মন কি চাহিয়াছিল? বাহিরের রূপ না অন্তরের ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য?

সে যাহাই চাহিয়া থাকুক, ঐ স্থিরা, মহীয়সী মূর্ত্তিতে দামিনীর দীপ্তি না থাকুক, তরুণ অরুণের ঔজ্জ্বল্য না থাকুক, স্তিমিত চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের অভাব নাই। ঐ সুঠাম দেহের অন্তরালে যে প্রাণস্পন্দন—যে অনুভূতিভরা হৃদয়, কলস্বরা নির্ঝরের ন্যায় উৎসারিত হইতেছে, তাহার পরিচয় লইতে এত কাল সে স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, এ কথা মিথ্যা নয়।

ষ্টেশন হইতে ফিরিবার পর সেই দিন সন্ধ্যার পর নির্জ্জনে মাতা-পুত্রের মধ্যে যে কথা হইয়াছিল, তাহা রমেন্দ্রের মনে পড়িল। অনুতপ্ত পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদের সঙ্গে মাতা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সারাজীবনের বিশ্বাস দিয়ে ভক্তি দিয়ে তোকে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করছিলাম। তোর উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তা যেন বজায় থাকে, বাবা! তোর মা'র আর কোন কামনা নেই। আর একটা কথা, আমার সতী লক্ষ্মী মাকে অযত্ন করিস্ না: কষ্ট দিস্ না। অনেক পুণ্যে তাকে তুই পেয়েছিস্। বুঝতে পারিস্ নি ব'লে যত্ন করতে ভুলে গিয়েছিলি। সেটা তোর দুর্ভাগ্য! আশীর্ব্বাদ করি, তুই আমার সাধনাকে সফল ক'রে তোল।"

মাতার সেই কথাগুলি তাহার বুকের মধ্যে ঘন ঘন বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

সে লোভী, ঘোরতর লোভী; কিন্তু লোভের বশে ঐ পুণ্য প্রতিমাকে সে স্পর্শ করিতে পারে কি? না—না। সমাজ ও ধর্ম্মবিধির লৌকিক অধিকার তাহার হয় ত আছে; কিন্তু তাহার কামকলুষিত হৃদয়ের ক্ষতকে গোপন করিয়া সে আর অগ্রসর হইবে না।

এত দিন সে কি অন্ধই ছিল। সত্যই, সুরমা ঠিকই বলিয়াছেন—গলায় দ্যুতিমান্ মণিময় হার থাকিতে মূঢ় মানব রত্নের সন্ধানে অপথে বিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পলকহীন নেত্রে সে যৌবনপুষ্পিতা আড়ম্বরবাহুল্য-বর্জ্জিতা পত্নীর মনোহর দেহযষ্টির প্রতি চাহিয়া রহিল। অন্তর আলোড়িত করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

অধীর আগ্রহকে সবলে ফিরাইয়া দিয়া রমেন্দ্র স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিয়া উঠিল, "তুমি, তুমি প্রতিভা—এত আবার, আবার সেই সৌন্দর্য্যের স্তোত্র!

প্রতিভা নতনেত্র তুলিয়া স্বামীর দিকে আবার চাহিল। সেই সুন্দর মুখে—ও কি! যন্ত্রণার গাঢ় রেখা? নয়নে কি অদ্ভুত আলোকদীপ্তি! কণ্ঠস্বরে কি গভীর আর্ত্তনাদ!

নারীর কোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয় সহসা সহানুভূতি ও করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল। অজ্ঞাতসারে সে এক পদ অগ্রসর হইল।

রমেন্দ্র বলিল, "আমার মনের পাপ তুমি জান না, প্রতিভা। মনের আগুনে, যন্ত্রণার জ্বালায় দিন-রাত পুড়ে মরেছি। আমি তোমার যোগ্য নই—কখনই নই। সেই কথা আজ তোমায় বলব। শুনে যদি তোমার ঘৃণা হয়—হওয়াই স্বাভাবিক—ঘৃণা ক'রে আমার দিক্ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিও। তাই আমার প্রাপ্য। আর—আর—যদি পার, যদি দয়া হয়, তবে তোমার ভাগ্যহীন, বিড়ম্বিত স্বামীর হাত ধরে, তোমার পুণ্যস্পর্শের প্রভাবে—পথ দেখিয়ে তাকে শান্তির রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেও!"

বিস্ময়ভরে প্রতিভা স্বামীর দিকে চাহিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না; কিন্তু তাহার কথার ভাবভঙ্গীতে তাহার হৃদয় যেন শতধা ছিন্ন হইতেছিল।

রমেন্দ্র তখন একে একে তাহার মনের সকল ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল, কিছুই লুকাইল না। গোপন করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। আজ সে যাহার সম্মুখে ... সকল কথা বলিতেছে, তাহার জীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস জানিবার ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত দাবী ও অধিকার সে ছাড়া আর কাহার বেশী?

শুনিতে শুনিতে প্রতিভার হৃদয়তটে ক্ষোভ, অভিমান, বেদনা ও সহানুভূতির এক একটা প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া আছাড় খাইতে লাগিল।

আত্মানুশোচনায় অধীর অপরাধী বিচারকের সম্মুখে যেমন দ্বিধাশূন্যভাবে সকল কথা প্রকাশ করে, রমেন্দ্র আজ ঠিক তেমনই ভাবে আত্মাপরাধ বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইল। ... অপরাধের ইতিহাস নহে, পলে পলে নিদারুণ অনুতাপে ... কেমন করিয়া দগ্ধ হইয়াছে, তাহার কোন কথাই বাদ দি... না। লক্ষ্ণৌ আসিয়া পরস্ত্রীবোধে প্রতিভার গান ও আবৃত্তি শুনিয়া—প্রভাতালোকে উদ্যান-মধ্যে তাহাকে দেখিয়া

এ কাহিনী উপন্যাসের মতই বিচিত্র! হৃদয়রাজ্যের কামনা, নিষ্ফলতা, বেদনা ও নৈরাশ্যের কাহিনী তাহাকে অভিভূত করিল। বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া স্বামী তাহার সম্মুখে বিচারার্থীর মত দণ্ডায়মান! প্রতিভা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার নারী-হৃদয় করুণায় যেন গলিয়া গেল।

পিতার উপদেশবাণী—শত শত বার শ্রুত মহাবাণী অকস্মাৎ তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"মা, যখন বড় হবে, সংসারের ভার ঘাড়ে পড়বে, তখন একটা কথা মনে রেখ, জীবনে কখনও মানুষকে ঘৃণা করবে না। কাকেও ঘৃণা করবার অধিকার কারও নেই। অবস্থার পাকে প'ড়ে মানুষ দোষ করে, তাই ব'লে সে লোককে ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করবে না। মানুষের ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রধান কথাটা কখনও ভুলে যেও না, মা! যদি এক জন লোককেও হাত ধ'রে পাঁক থেকে টেনে তুলতে পার, তবেই মা, জন্ম সার্থক হবে!"

এই অমূল্য কথাগুলি পিতা কত ভাবে, কত সময়ে বলিয়াছেন। এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে উপদেশের সেই মন্ত্রগুলি ভৈরব রাগে তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে স্ত্রী—স্বামীর ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে—তাহার সর্ব্বস্বের অংশভাগিনী। হাঁ, সে পত্নীর কর্ত্তব্য অকুণ্ঠিত চিত্তে পালন করিবে।

ভাবের আতিশয্যে তাহারও নয়ন শুষ্ক রহিল না। কোনও মতে আত্মসংবরণ করিয়া সে ধীর, দৃঢ়চরণে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। এতক্ষণ তাহার প্রথম কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত সে পালন করে নাই। প্রথম সম্ভাষণের মানসিক চাঞ্চল্য এই বিস্মৃতির কারণ সত্য; কিন্তু—

প্রতিভা স্বামীর সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিল, পদধূলি মাথায় দিল। তাহার স্পর্শে রমেন্দ্রের শরীর যেন এক অননুভবনীয় আনন্দরসে শিহরিয়া উঠিল। ইহা কি ক্ষমার নিদর্শন?

বহুদিনের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার হৃদয় চূর্ণ, বিচূর্ণ হইয়াছিল। সবল দেহের অন্তরালে দুর্ব্বল হৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। রমেন্দ্রের দেহ টলিয়া উঠিল।

"ও কি! আপনি—তুমি—অমন কচ্ছ কেন?—"

প্রতিভা কম্পিত বাহুর সাহায্যে স্বামীর শিথিলপ্রায় দেহ সম্মুখস্থ আসনে স্থাপিত করিল। সকল সঙ্কোচ, সকল ব্যবধান তখন কোথায় নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছিল।

রমেন্দ্রের নয়ন প্লাবিত করিয়া তখন অশ্রুর ধারা নামিতেছে। যুগল কর যুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে সে খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

তুমি আছ, সত্যই তুমি আছ, প্রভু! বেদনা-কাতর চিত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে সে ডাকে তুমি সাড়া না দিয়া থাকিতে পার না। তোমাকে প্রণাম, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার অসীম দয়ার কথা রমেন্দ্র জীবনে ভুলিবে?

প্রতিভা তখন একাগ্রচিত্তে অনুতপ্ত স্বামীর অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার কোমল বাহুর স্পর্শানুভূতি রমেন্দ্রের দেহ ও মনে যে শান্ত, আনন্দরসের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাতে মাদকতা নাই, কিন্তু তৃপ্তি আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন পবিত্র, স্বচ্ছ জাহ্নবীসলিল-ধারায় স্নাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চারিদিকে যেন একটা অপূর্ব্ব আলোকের উজ্জ্বল ছটা! অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দলোকের সৌরভ যেন বহিয়া আসিতেছে। রমেন্দ্র মনে করিল, তাহার জীবনের এই পবিত্র শুভ মুহূর্ত্ত যেন অনন্তকালের জন্য এমনই ভাবে স্থায়ী হইয়া থাকে।

সম্মুখে প্রাচীরগাত্রে অন্নপূর্ণার চিত্র ঝুলিতেছিল। জগদ্ধাত্রী মাতা অন্নভাণ্ড হইতে বিশ্বের পরম দেবতাকে—ভিখারী শঙ্করকে, তাঁহার প্রসৃত যুগল পাণিতে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। কি মধুর, কি পবিত্র, কি সুন্দর দৃশ্য! সাধক শিল্পীর কি অভিনব কল্পনা! তাহার মনে হইল, অনন্ত প্রেমরূপিণী জগন্মাতা বিশ্ববাসীর সঙ্গে স্বয়ং বিশ্বনাথকেও প্রেমরূপ জীবনসুধা বিতরণ করিতেছেন। ভিখারী রমেন্দ্র কি সহধর্ম্মিণীর হিরণ্ময় হৃদয়াধার হইতে প্রদত্ত প্রেমের অমৃসুধা অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিবার অবকাশ পাইবে না?

সমাপ্ত।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।



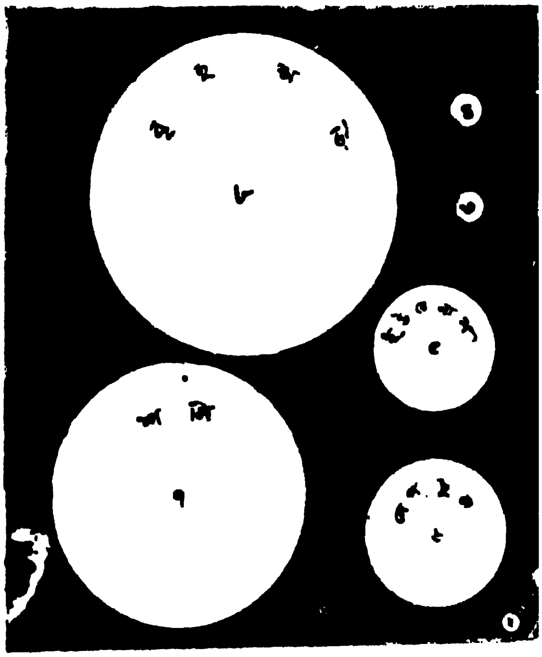
প্রকৃতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৌরজগৎ

সৌরজগৎ যেন একটি একান্নবর্ত্তী বৃহৎ হিন্দু-পরিবার। বাটীর কর্ত্তা সূর্য্য; তাঁহার আদেশে এই পরিবারভুক্ত গ্রহ-উপগ্রহাদি আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ও পরিবর্ত্তে আলোক এবং উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। এই পরিবারের সদস্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন—এই আটটি প্রধান গ্রহ ও ইহাদিগের চন্দ্রাদি ২৬টি উপগ্রহ প্রথম শ্রেণীভুক্ত। প্রায় ৮ শত ক্ষুদ্র গ্রহ ও বহু অতি ক্ষুদ্র গ্রহ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় শ্রেণীস্থ ধূমকেতু ও উল্কাপ্রস্তরাদির বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে গ্রহকে নক্ষত্র বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু কিছু দিন লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নক্ষত্রদিগের মত আকাশের এক স্থানে তাহারা স্থির থাকে না, পরন্তু প্রতি রাত্রিতে আকাশের বিভিন্ন স্থানে উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রগণও গতিশীল,—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু গ্রহদিগের গতির তুলনায় নক্ষত্রদিগের গতি অতি সামান্য। সূর্য্যালোক গ্রহাদির উপর প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহারা উজ্জ্বল, অন্যথা রাত্রিকালে আকাশে তাহারা দৃষ্টিগোচর হইত না; অপরপক্ষে সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হওয়ার ফলেই পৃথিবী, গ্রহস্থ প্রাণিগণ ও উদ্ভিদবর্গ সৃষ্ট হইয়াছে ও দ্রুত বিকাশ লাভ করিতেছে।

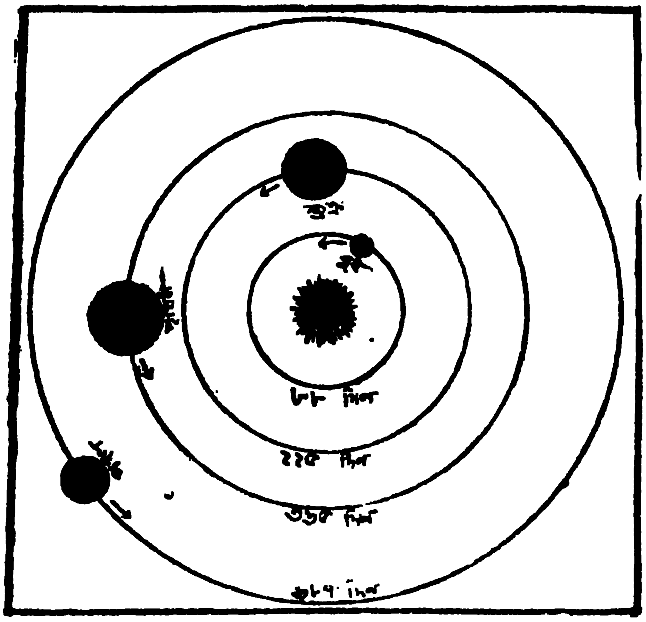
পৃথিবীর আকৃতি গোল; সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহই এক একটি বৃহৎ গোলক। ইউরেনাস, নেপচুন, শনি ও বৃহস্পতি পৃথিবী একত্র করিলে আকারে বৃহস্পতির সমতুল্য। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের তুলনামূলক আকার ১নং চিত্রে অঙ্কিত



১নং চিত্র—সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহগণের তুলনামূলক আকার ১ বুধ; ২ মঙ্গল; ৩ শুক্র; ৪ পৃথিবী

হইয়াছে। এই চিত্রে বৃহস্পতি (৮) ও অপর তিনটি গ্রহের (৫, ৬, ৭) তুলনায় পৃথিবী কত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। পৃথিবী শুক্র অপেক্ষা সামান্য বৃহৎ। সূর্য্যের নিকটতম প্রতিবেশী বুধ (১) সকল গ্রহাপেক্ষা ক্ষুদ্র। আয়তনে মঙ্গল বুধের প্রায় দ্বিগুণ।

সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য্য অবস্থান করিতেছেন। সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী প্রথম চারি গ্রহের—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল—কক্ষ সম পরিমাপে ২নং চিত্রে সন্নিবেশিত হইল।



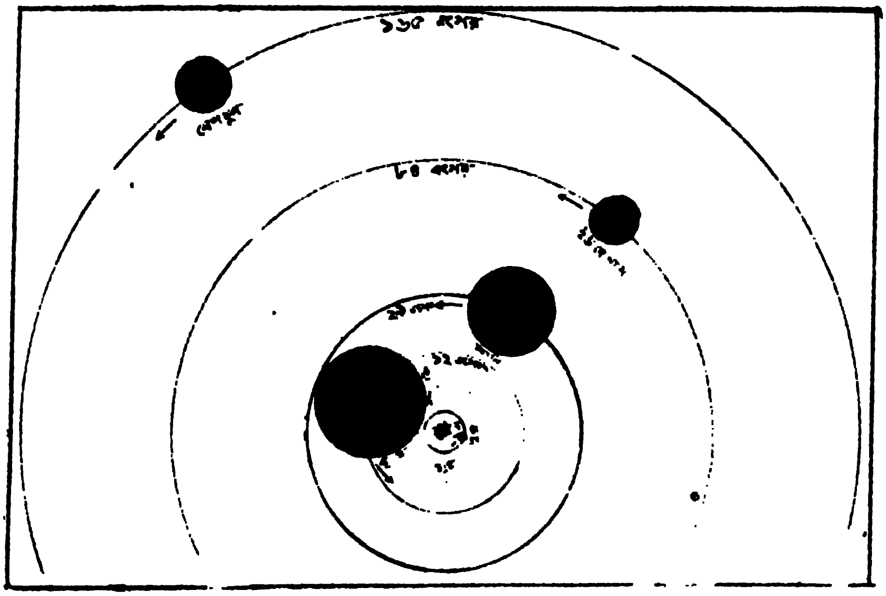
২নং চিত্র—সৌরজগতের প্রথম শ্রেণীস্থ ৪টি গ্রহের তুলনা-মূলক কক্ষ

ত্ত দিনে এক বৎসর পূর্ণ হয়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল যথাক্রমে ৮৮, ২ শত ২৫, ৩শত ৬৫, ৬শত ৮৭ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে; কাযেই ৩ শত ৬৫ দিনে আমাদের এক বৎসর হয়। পুরাণে লিখিত আছে, দেবতাগণের এক বৎসর আমাদের সহস্র বৎসরের সমতুল্য; বৈজ্ঞানিক সত্য সম্ভবতঃ তথায় রূপকচ্ছলে লিখিত। দেবতাগণ যদি নেপচুনের মত কোন সুদূরবর্ত্তী গ্রহের অধিবাসী হন, তাহা হইলে আমাদের ১ শত ৬৫ বৎসরে তাঁহাদের এক বৎসর পূর্ণ হয়। কেন না, নেপচুন গ্রহ ১ শত ৬৫ বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। প্রত্যেক গ্রহের প্রতি সেকেণ্ডের গতি এই পরিচ্ছেদের শেষে সৌরজগতের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহের গতিবেগ দূরবর্ত্তী গ্রহের গতিবেগ অপেক্ষা অধিক। সৌরজগতের প্রথম গ্রহ বুধের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল। কিন্তু অষ্টম গ্রহ নেপচুনের গতি প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ৩½ মাইল; পার্থক্যের কারণ পরে আলোচিত হইবে। আমাদের পৃথিবী গ্রহ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৯ মাইল ভ্রমণ করে। কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানের দূরত্ব প্রায় ৬৭ মাইল; দ্রুতগামী পাঞ্জাব মেল ট্রেণ প্রায় দেড় ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান উপনীত হয়; কিন্তু পৃথিবীর গতিবেগ প্রাপ্ত হইলে ট্রেণটি মাত্র সাড়ে ৩ সেকেণ্ডে উপনীত হইতে পারিত। আমাদিগের অজ্ঞাতসারে পৃথিবী এত দ্রুত ভ্রমণ করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই; কেন না, পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড গোলক; ইহার

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে প্রায় ৮ শত ক্ষুদ্র গ্রহ অবস্থান করিয়া সূর্য্যকে আবেষ্টন করিতেছে; ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের দৃষ্টিপথে প্রথমে পতিত হয় নাই। কিন্তু মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহের থাকিবার সম্ভাবনা, তাঁহাদিগের মনে বহু দিন হইতে উদিত হইয়াছিল। পরে বোড-নিয়ম আবিষ্কারের পর দূরবীক্ষণ-সাহায্যে একটি বৃহৎ গ্রহের স্থানে বহু ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হয়, অনুমান করা হয় যে, একটি বৃহৎ গ্রহ কোন কারণ বশতঃ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রহপুঞ্জের অন্তর্গত সেরিস গ্রহ প্রথমে আবিষ্কৃত হয়; ইহার ব্যাস প্রায় ৪ শত ৮৮ মাইল; প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১ মাইল গতিতে ইহা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। গ্রহপুঞ্জের পরের চারি কক্ষ যথাক্রমে গ্রহরাজ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন কর্ত্তৃক অধিকৃত। ইহাদিগের কক্ষ সমপরিমাণে ৩ নং চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। এই পরিমাণে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী—শুক্র, পৃথিবী, বুধ তিনটি গ্রহের কক্ষ সূর্য্যের এত নিকটে আসে যে, এই চিত্রে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র তিনটি কক্ষরূপে দেখাইতে পারা যায় না। দূর হইতে বিরাটকায় পর্ব্বতকে ক্ষুদ্র স্তূপ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু দূরত্বের হ্রাসের সহিত মনে হয়, তাহার আকার বৃদ্ধি পাইতেছে, পরে গিরিপাদমূলে উপনীত হইলে তাহার বিরাটত্ব আমাদের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। সেইরূপ বিভিন্ন গ্রহ হইতে সূর্য্যের ব্যাস বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, কারণ, গ্রহগণ সূর্য্য হইতে সমদূরে অবস্থিত নহে। বুধ গ্রহ হইতে সূর্য্যের আকার পৃথিবী হইতে সূর্য্যের আকার অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণ বৃহৎ, কিন্তু সুদূরস্থিত নেপচুন গ্রহ হইতে সূর্য্যের আকার মাত্র একটি ক্ষুদ্র সরিষা-পরিমাণ (৪নং চিত্র)।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেপলার গ্রহাদি-বিষয়ক ৩টি নিয়ম আবিষ্কার করেন। গ্রহাদির কক্ষাবলী চিত্রে বৃত্তরূপে দেখান হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা বৃত্ত নহে। বৃত্তাভাসের (Ellipse) পরিধি অবলম্বনে প্রত্যেক গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ও সূর্য্য বৃত্তাভাসের একটি অক্ষে অবস্থান করিতেছে—ইহাই কেপলারকৃত গ্রহসম্বন্ধীয় প্রথম নিয়ম। বৃত্তাভাস বৃত্তের ন্যায় বক্র রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্র। বৃত্তের কেন্দ্র একটি ও কেন্দ্র হইতে পরিধির প্রত্যেক বিন্দুর দূরত্ব সমান অর্থাৎ একটি বৃত্তের প্রত্যেক ব্যাসার্দ্ধের দৈর্ঘ্য অভিন্ন। অপর পক্ষে প্রত্যেক বৃত্তাভাসের দুইটি কেন্দ্র

ইহারা ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত নহে; সুতরাং বৃত্তাভাসের পরিধির প্রত্যেক বিন্দু অক্ষ হইতে সমদূরে অবস্থান করে না। তবে পরিধির প্রত্যেক বিন্দুর অক্ষদ্বয় হইতে দূরত্বের যোগফল অপর যে কোন পরিধিস্থ বিন্দুর অক্ষদ্বয় হইতে দূরত্বের যোগফলের সমান। "ক" ও "কঁ" অঙ্কিত বৃত্তাভাসের দুইটি অক্ষ, "গ" ও "গঁ" পরিধিস্থ দুইটি বিন্দু,—কখ + কঁখ = কগ + কঁগ (৫নং চিত্র)। বৃত্তাভাস অঙ্কন করিবার সহজ প্রক্রিয়া, গ্রন্থিবদ্ধ সূতার মধ্যস্থ দুইটি ক্ষুদ্র কীলক এক খণ্ড কাগজের উপর প্রোথিত করিয়া সূতার অপর অংশে আবদ্ধ লেখনী কীলকদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করিলে কাগজে যে ক্ষেত্র অঙ্কিত হয়, তাহাই বৃত্তাভাস নামে পরিচিত।



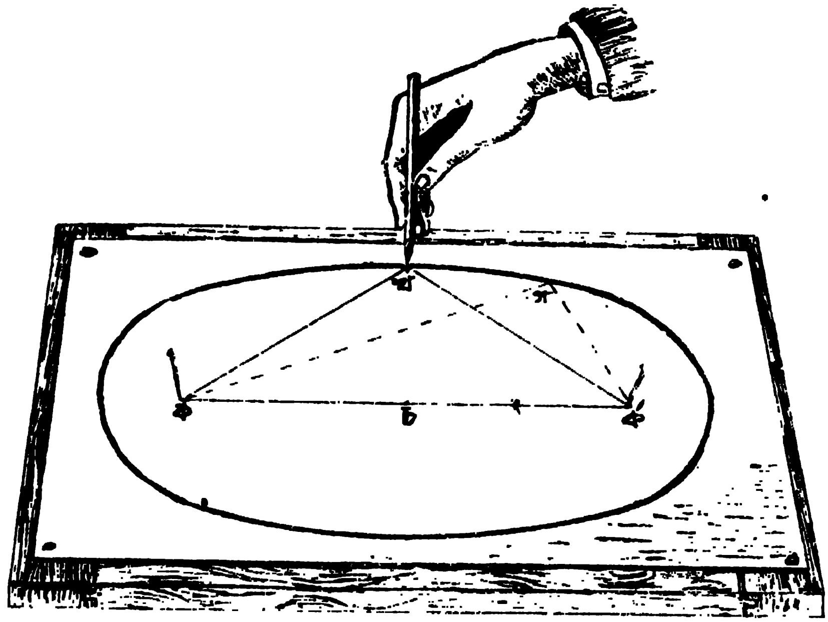
৩নং চিত্র—সৌরজগতের অন্তর্গত ২য় শ্রেণীস্থ গ্রহদিগের তুলনা-মূলক কক্ষ

বৃত্তাভাসের অক্ষদ্বয় "ক" ও "কঁ" পরস্পর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া কেন্দ্রে অর্থাৎ চ বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইলে বৃত্তাভাসটি বৃত্তের রূপ ধারণ করিবে। অপরপক্ষে "ককঁ"এর দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলে বৃত্তাভাস নিজ মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বৃত্তাভাস আকারসম্পন্ন কক্ষে গ্রহবর্গ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সমপরিমাপে কক্ষাবলীর প্রকৃত চিত্র কাগজে অঙ্কন করিলে মনে হইবে, পৃথিবী ও শুক্র সূর্য্যকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কারণ, উভয়ের কক্ষস্থিত অক্ষদ্বয়ের দূরত্ব এত অধিক নহে যে, কাগজে সম পরিমাপে অঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দেখান যাইতে পারে। কিন্তু বুধ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র গ্রহের কক্ষ যে যথার্থ বৃত্তাভাস, তাহা সমপরিমাণে কাগজে অঙ্কিত চিত্রেও পরিলক্ষিত হইবে। বৃত্তাভাসিক কক্ষে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব বৎসরের সকল সময়ে সমান নহে, শীত ঋতুতে দূরত্ব হ্রাস পায় ও গ্রীষ্মকালে দূরত্বের বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য আপাতদৃষ্টিতে সূর্য্যের ব্যাসের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীতকালের সূর্য্য গ্রীষ্মকালের সূর্য্য অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ইহা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য হইতে গ্রহাদির দূরত্বের যেরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, গতিবেগেরও তদ্রূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। সূর্য্য হইতে গ্রহের দূরত্বের বৃদ্ধির সহিত গতিবেগ মন্থর হইতে থাকে; কক্ষের যে স্থান, সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত, গ্রহটি সেই স্থানে আগমন করিলে ইহার গতি দ্রুততম হয়। এই গতির হ্রাস ও



৪নং চিত্র—বিভিন্ন গ্রহ হইতে সূর্য্যের আকার

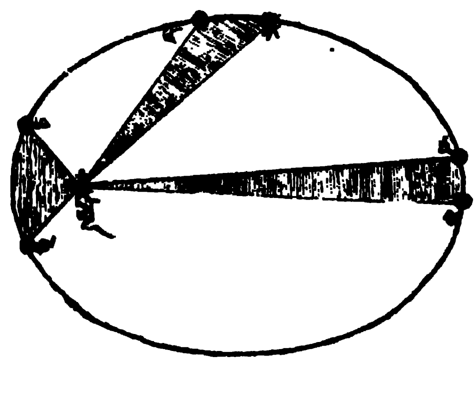
শনি হইতে : ৭ ইউরেনাস হইতে ;



৫নং চিত্র—বৃত্তাভাস অঙ্কন প্রক্রিয়া

হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত প্রসারিত কল্পিত সরলরেখা সমসময়ে সম-পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে। (৬নং চিত্র) ইহাই কেপ-লারকৃত গ্রহ-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় নিয়ম। এই চিত্রে একটি গ্রহের কক্ষ দেখান হইয়াছে; "স" চিহ্নিত স্থান সূর্য্য কর্ত্তৃক অধি-কৃত এবং উহা বৃত্তাভাসটির একটি অংশে অবস্থিত। গ্রহটি যে সময়ে "ক" হইতে "খ" চিহ্নিত স্থানে আগমন করে, সেই পরিমাণ সময়ে "গ" হইতে "ঘ" এবং "চ" হইতে "ছ" স্থানে উপনীত হয়। কেন না, "ক, স, খ" বেষ্টিত স্থান= "গ, স, ঘ"="চ, স, ছ" বেষ্টিত স্থান। "চ" ও "ছ" বিন্দু "ক" "খ" অথবা "গ" "ঘ" বিন্দু অপেক্ষা সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত, কাজেই গ্রহটি কক্ষের "চ ছ" কর্ত্তৃক অধিকৃত স্থানে উপনীত হইলে গতি দ্রুততম হয়। কেপলারের তৃতীয় নিয়ম সাহায্যে দুইটি বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব ও গতিবেগের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ আমরা অবগত হইতে পারি। কেপলার আবি-ষ্কার করেন যে, দুইটি বিভিন্ন গ্রহ সূর্য্যকে যত দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার বর্গসংখ্যাদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সূর্য্য হইতে উল্লিখিত দুইটি গ্রহের গড়ে দূরত্বের ত্রিবর্গ (Cube) সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমান অর্থাৎ প্রথমোক্ত সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে একটি যদি অপরটির দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত সংখ্যা দুইটির মধ্যে একটি অপরটির দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হইবে। বৃহস্পতি ১২ বৎসরে ও পৃথিবী ১ বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের কত গুণ অধিক,

যাইতে পারে। ১২ × ১২ = ১৪৪; ১ × ১ = ১; ১৪৪ সংখ্যা ১ সংখ্যা হইতে ১ শত ৪৪ গুণ বড়। সুতরাং সূর্য্য হইতে বৃহস্পতির যথার্থ দূরত্বের সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা তিন বার গুণ করিলে যে সংখ্যা হইবে, তাহা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের সংখ্যা দ্বারা তিন বার গুণিত সংখ্যা অপেক্ষা ১ শত ৪৪ গুণ অধিক। এই হিসাবে সূর্য্য হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা প্রায় ৫২/ গুণ অধিক। কেপলার এই তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াই নিরস্ত হইয়া-ছিলেন, কোন কারণ দেখান নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, সূর্য্য কর্ত্তৃক গ্রহবর্গ সেইরূপ আকৃষ্ট হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে। পরে স্যার আইজাক নিউটন মহোদয় তাঁহার জগদ্বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গণিতবিদ্যা-সাহায্যে কেপলার-কৃত প্রত্যেক নিয়ম প্রমাণ করেন। তাঁহার মতে সূর্য্য প্রত্যেক গ্রহকে নিজাভিমুখে সরল পথে আকর্ষণ করে, কিন্তু গ্রহাদি গতিশীল বলিয়া



৬নং চিত্র—সম-সময়ে সম-স্থান অধিকার

বৃত্তাভাসরূপ কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হয়। সৌর-জগতের আদিকাল হইতে গ্রহগণ সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, ইহারা গতিহীন হইলে সূর্য্যের উপর

সৌরজগৎ

(সংক্ষিপ্ত তালিকা)

	সংকেত চিহ্ন	ব্যাস (মাইল)	সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে সময় (দিন)*	[illegible] গতি (মাইল)	উপগ্রহ	আপেক্ষিক গুরুত্ব: পৃথিবী=১	জল=১	সূর্য্য হইতে দূরত্ব ১=১০০০০০০ (মাইল)	পৃথিবী হইতে [illegible] ঘণ্টা	মিনিট	অন্যান্য মন্তব্য
(Sun)	☉	৮৬৬,৪০০	....	....	....	০·২৫	১·৩৯	....	৭	১৫	সূর্য্য হইতে [illegible] [illegible]
[illegible]	☿	৩০৩০	৮৮	২৯	×	১·১২	৬·৮৫(?)	৩৬	৭	০০	সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ [illegible]
(Venus)	♀	৭৭০০	২২৫	২২	×	১·০৩	৪·৮৫	৬৭	৬	২৪	উজ্জ্বলতায় সকল গ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ
(Earth)	⊕	৭৯১৮	৩৬৫¼	১৮½	১(চন্দ্র)	১	৫·৫৮	৯৩	০	০০	[illegible]
(Moon)	☾	২১৬০	২৭⅓	০·৬	—		৩·৪০	০·২৩৯	০	০৯	[illegible]
(Mars)	♂	৪২৩০	৬৮৭	১৫	২	০·৭০	৪·০১	১৪১	১	৫১	[illegible]
(Asteroids)	?		?	?	?	?	?	২০০–৪০০	০ হইতে ৩৪	৪২	সংখ্যায় প্রায় ৮০০।
(Jupiter)	♃	৮৬৫০০	৪৩৩২·	৮	৮	০·২৪	১·৩৪	৪৮৩	১	১৯	আকারে সকল গ্রহ অপেক্ষা বৃহৎ।
(Saturn)	♄	৭৩০০০	১০৭৫৯	৬	১০	০·১৬	০·৭২	৮৮৬	২	৩০	বলয়ে বেষ্টিত গ্রহ।
(Uranus)	♅	৩১০০০	৩০৬৮৭	৪½	৪	০·১৯	১·২২	১৭৮২	০	৪৬	হার্শেল কর্ত্তৃক ১৭৮১ খৃঃ অঃ আবিষ্কৃত হয়
(Neptune)	♆	৩৪৮০০	৬০১২৭	৩½	১	০·১৬	১·১১	২৭৯৩	১	৫৭.	১৮৪৬ খৃঃ অঃ [illegible]

* . পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে সময়। † পৃথিবী হইতে দূরত্ব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

দেড় কাঠা জমী



১

কাঠা দেড়েক জমী লইয়া দুই ভাই—চৈতন্য পাল ও নিতাই পালের মধ্যে যখন গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল, তখন গ্রামের লোকরা কেহ চৈতন্যের, কেহ বা নিতাইয়ের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরস্পরের বিপদে-আপদে পরস্পরে সাহায্য না করিলে চলিবে কেন? কেবল দুই এক জন নিরীহ ব্যক্তি সাহায্যদানে বিমুখ হইয়া, মধ্যস্থ থাকিয়া বিবাদটা মিটাইয়া দিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু উভয়ের ধনুক-ভাঙ্গা পণ দেখিয়া অগত্যা দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

পিতা গৌর পাল কিছু দেনা রাখিয়া পরলোকগমন করিলেও দুই ভাই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া শুধু পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিল না, সংসারটাকেও এক রকম গুছাইয়া তুলিল। হাল বাঁধিয়া চাষ আরম্ভ করিল, উঠানে ধানের মরাই বাঁধিল এবং নিতাইয়ের প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনে পাঁচ কুটুম্বকে আহ্বান করিয়া বেশ দশ টাকা খরচপত্র করিল। তাহাদের এই অস্বাভাবিক উন্নতিতে গ্রামের অনেকেই চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। এ যেন আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল। এমন ভাবে বাড়িতে থাকিলে কালে যে ইহারা মহাজন নন্দ ঘোষকেও ছাপাইয়া উঠিবে, ইহা অনেকেই অনুমান করিয়া লইল।

কিন্তু চৈতন্য ও নিতাই ততটা বাড়িবার সুযোগ পাইল না। হঠাৎ ঘটনাচক্রের একটা দমকা বাতাসে তাহারা উন্নতির শিখর হইতে দ্রুত গড়াইয়া পড়িল। চৈতন্যের বিধবা শ্যালিকা এক মুঠা ভাতের অভাবে যে দিন হইতে ভগিনীপতির গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেই দিন হইতেই সংসারে অশান্তির বাতাস যেন একটু একটু করিয়া বহিতে থাকিল।

একে চৈতন্যের পোষ্যসংখ্যা বেশী—ছেলে-মেয়ে চারিটি। করিলে ছোটবৌ তরঙ্গিণী বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে হিসাব করিয়া দেখিল, তাহাদের অপেক্ষা বড়্‌ঠাকুরের খরচের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ। তাহাদের সংসারে স্বামী, স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে এই চারিটি প্রাণী মাত্র, কিন্তু বড়্‌ঠাকুরের সংসারে খাইতে, পরিতে সাত জন। অথচ তরঙ্গিণীকে বা তাহার স্বামীকে খাটিতে হয় সমান, বরং কিছু বেশী। বড় গিন্নীর ত নিত্য অসুখ। কাযেই সংসারের বারো আনা কায তাহাকে টানিতে হয়। পরের জন্য কেন এত কর্ম্মভোগ! খাটিয়া খাটিয়া দেহটা যে মাটী হইয়া গেল।

তরঙ্গিণী শুধু যে মনে মনে এইরূপ হিসাব করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, তাহা নহে, সে এক দিন স্বামীকেও এই হিসাবটা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইহার উত্তরে নিতাই তাহাকে এমন একটা ধমক্ দিয়াছিল যে, তরঙ্গিণী ভয়ে এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে সাহসী হয় নাই।

স্বামীর কাছে চুপ করিয়া গেলেও তরঙ্গিণী কিন্তু সংসারে মুখ বুজিয়া থাকিত না; চৈতন্যের শ্যালিকা গঙ্গামণির কাযের খুঁটিনাটি ধরিয়া প্রায়ই ঝগড়া বাধাইয়া দিত এবং কথার ইঙ্গিতে তাহাকে নিজেদের অন্নদাসী বলিয়া বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করিতেও ছাড়িত না। গঙ্গামণি কখন তাহার কথার উত্তর দিত, কখন বা কাঁদিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকিত। বড়বৌ যমুনা ইহা সহ্য করিতে পারিত না। তখন তরঙ্গিণীর সহিত তাহার বেশ ঝগড়া বাধিয়া যাইত।

এই সব ঝগড়া-বিবাদের কথা চৈতন্য বা নিতাইয়ের কানে যে একেবারেই উঠিত না, তাহা নহে, কিন্তু তাহারা উহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিত।

কিন্তু বেশী দিন হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিল না; তরঙ্গিণীর উপর্য্যুপরি কান্নাকাটি ও অভিযোগে নিতাইয়ের কান ক্রমেই ভারী হইয়া আসিল। পাড়াতেও নিতাইয়ের হিতৈষীর অভাব ছিল না। তাহারাও ক্রমাগত সুপরামর্শ-

পরিশেষে এক দিন মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত দেহে মাঠ হইতে ফিরিয়া নিতাই যখন বাড়ীতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিল, তখন সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। সেই দিনই সে নিতান্ত উদ্ধতভাবে চৈতন্যকে বলিল, "তোমার এই শালীটিকে বাড়ী হ'তে তাড়াও, দাদা।"

কনিষ্ঠের এই আদেশবৎ অন্যায় অনুরোধে ক্রুদ্ধ হইয়া চৈতন্য উত্তর করিল, "আমি তোর মত চামার নই নিতে; এই নিরাশ্রয় মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলে ও দাঁড়াবে কোথায়?"

কি, নিতাই চামার! নিতাই রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিল, "আমি যখন চামার, তখন আমার সঙ্গে তোমার আর থেকে কায নাই। আমাকে আলাদা ক'রে দাও।"

চৈতন্যও বুঝিল, মন যখন ভাঙ্গিয়াছে, তখন আর এক-সঙ্গে থাকিয়া সুখ নাই। কাযেই দুই ভাই আলাদা হইয়া পড়িল। গ্রামের পাঁচ জন ভদ্রলোক মধ্যস্থ হইয়া জমী-জমা, হাল-গরু, ধান-চাল সব চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া দিল। তরঙ্গিণী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু আলাদা হইলেও বিবাদের অবসান হইল না। সামান্য সামান্য কথার ছুতা লইয়া মেয়েলী ঝগড়া প্রায়ই চলিতে লাগিল। সেই মেয়েলী ঝগড়া সালঙ্কারে পুরুষদের কানে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে উভয় ভ্রাতার মধ্যেও বেশ ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে এক দিন দুই ভায়ে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। তখন উভয়েই স্নেহসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। প্রতিবেশীরা উভয়েরই ঈর্ষ্যার আগুনে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল।

চৈতন্যের ঘরের পিছনে কাঠা দেড়েক পতিত জমী ছিল। কতকগুলা কাঁটাগাছ ও আগাছা জন্মিয়া স্থানটাকে জঙ্গলাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। অব্যবহার্য্যবোধে স্থানটার বিভাগ হয় নাই। কিন্তু সেই অব্যবহার্য্য স্থানটুকু লইয়াই বিবাদ বাধিল। সেখানে কাঁটাবনের ভিতর একটা আতাগাছ জন্মিয়াছিল। চৈতন্যের বড় ছেলে হরিশ এক দিন গাছের পাকা-ডাঁশা আতাগুলা সব পাড়িয়া আনিল। দেখিয়া তরঙ্গিণী হরিশকে উদ্দেশ করিয়া যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতে লাগিল। বড়-বৌ যমুনাও ইহার প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়িল না। এই ব্যাপার লইয়া সারাদিন ঝগড়া চলিল।

গেল। চৈতন্য বাধা দিল এবং ঘরের সংলগ্ন বলিয়া সে যায়গাটা যে তাহার, ইহা নিতাইকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। নিতাই কিন্তু বুঝিল না, সে যায়গায় তাহারও অধিকার আছে বলিয়া গাছ কাটিতে উদ্যত হইল। চৈতন্যও কিছুতেই গাছ কাটিতে দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তখন দুই ভাইয়ে ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি, শেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। চৈতন্য অপেক্ষা নিতাইয়ের গায়ে জোর কম, সুতরাং সে-ই বেশী মার খাইল। মার খাইয়া নিতাই কিরূপে এই মারের প্রতিশোধ দিবে, প্রতিবেশীদের নিকট সে সম্বন্ধে যুক্তি জানিতে গেল। গদাই ঠাকুর পরামর্শ দিলেন, "আজ-কাল কোম্পানীর রাজ্যে অপরকে একটা গাল দিয়ে কেউ পরিত্রাণ পায় না, মার ত দূরের কথা। তুমি চৈতন্যের নামে মারপিটের নালিশ রুজু কর। কিন্তু রক্তপাত না হ'লে কেসটা হাল্কা হবে। মাথায় একটা মুগুর কি কাটারী মেরে আদালতে চ'লে যাও। তার পর আমরা পিছনে আছি।"

প্রতিহিংসা-পিপাসায় উত্তেজিত নিতাই নিজের মাথায় নিজে মুগুর মারিয়া মাথা ফাটাইয়া জ্যেষ্ঠের নামে মার-পিটের নালিশ রুজু করিয়া আসিল।

ছয় সাত মাস ধরিয়া মোকর্দ্দমা চলিল এবং পাঁচ সাতটা দিন পড়িবার পর গদাই ঠাকুর প্রমুখ কয়েক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পাইয়া বিচারক আসামী চৈতন্যের ষাট টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। মামলায় জিতিয়া নিতাই পাঁটা কাটিয়া গ্রাম্য দেবতা সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিল। কনিষ্ঠের ব্যবহারে চৈতন্য রাগে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে পাঁচ জন হিতৈষীর পরামর্শে নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করিবার জন্য জিলা-কোর্টে আপীল রুজু করিল।

এ দিকে নিতাই সেই দেড় কাঠা জমীর স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের কতক লোক নিতাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিল; কতক লোক চৈতন্যের পক্ষে আসিয়া তাহাকে পরামর্শ দিল, তাহার হকসবার মধ্যে জমী; আইনে এ জমীর অংশ নিতাই কিছুতেই পাইবে না। তবে শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্যকে সমানতালে লড়িতে হইবে। চৈতন্য ইহাতে যদি স্বীকৃত হয়, তবে পাঁচ জন তাহার পক্ষে দাঁড়াইতে পারে। নতুবা বৃথা তাহা

অপেক্ষা গোড়ায় ছোট ভাইয়ের হাতে ধরিয়া, স্তবস্তুতি করিয়া জমীর অংশ ছাড়িয়া দেওয়া চৈতন্যের কর্ত্তব্য।

কি, চৈতন্য নিতাইয়ের হাতে ধরিতে—তাহাকে স্তবস্তুতি করিতে যাইবে? ইহা অপেক্ষা গলায় দড়ী দিয়া মরাও যে ভাল। চৈতন্য ব্রাহ্মণের পা ছুঁইয়া শপথ করিল, সর্ব্বস্ব যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি বিনা যুদ্ধে সে বিবাদী জমীর এক ছটাক মাটী নিতাইকে দিবে না।

পাঁচ জন চৈতন্যকে বাহবা দিয়া তাহার স্বপক্ষে দাঁড়াইতে প্রতিশ্রুত হইল। তখন উদ্ধব ঘোষ চৈতন্যের এবং গদাই ঠাকুর নিতাইয়ের মোকর্দ্দমা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া পূর্ণ তেজে মামলা চালাইতে লাগিল।

২

যমুনা বলিল, "হাঁ গা, আজ ভোরে হুগলী চ'লে যাবে বলছো, কিন্তু ছেলেটার এমন জ্বর।"

বিরক্তভাবে চৈতন্য উত্তর করিল, "ছেলেটার অসুখ, তা কি করবো আমি? এ দিকে রাত পোয়ালে যে লক্ষ্মণের শক্তিশেল—পরশু মামলার দিন।"

যমুনা বলিল, "পরশু মামলার দিন ত কা'ল যাচ্ছ কেন?"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চৈতন্য বলিল, "এ ত কুটুম্বিতের যাওয়া নয় যে, যথাসময়ে গিয়ে পাত পাড়ব। এক দিন আগে গিয়ে উকীলদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ কত্তে হবে।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে যমুনা বলিল, "আমার ছরাদ কত্তে হবে। কি যে ছাই মামলা নিয়ে পড়েছ, এই মামলা নিয়ে দেখছি, ধনে প্রাণে সারা হবে। দিনে খাওয়া নাই, রাতে ঘুম নাই, জলের মত পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ গয়না বাঁধা, কা'ল ধান বিক্রী,—সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে দেখছি।"

চৈতন্য বলিল, "সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, তাও স্বীকার, তবু নিতেকে না দেখে ছাড়বো না। ও কত বড় মামলাবাজ হয়েছে, তা একবার দেখে নেব।"

যমুনা বলিল, "তুমিই বা মামলাবাজের কম কি? খোরাকীর ধান—সারা বৎসর চলে কি না সন্দেহ, সেই ধান সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, খদ্দের ডেকে বেচে ফেলছো। আজ কত টাকার ধান বিক্রী করলে?"

যমুনা বলিল, "এই কুড়ি টাকা এক দিনের মামলায় খরচ হয়ে যাবে?"

আস্তে আস্তে মাথাটা নাড়িয়া চৈতন্য উত্তর করিল, "না, এত টাকা মামলায় খরচ হবে না, এর ভেতর দশ টাকা ঘোষজা মশাইকে ধার দিতে হলো। ওনাকেও আমার সঙ্গে হুগলী যেতে হবে কি না। তা আজ সকালে উনি বল্লে, চৈতন, পরশু মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী যাবে, তাকে পাঠাতে মিষ্টিতে কাপড়ে-চোপড়ে আট দশ টাকা খরচ। অথচ হাতে একটিও পয়সা নাই। কাযেই মেয়েটাকে পাঠাবার বিলি-বন্দেজ না ক'রে ত যেতে পারি না। কাযেই ধান বেচে ওনাকে দশ টাকা দিতে হ'লো। ঘোষজা মশাই না গেলে মামলা চালাবে কে?"

যমুনা বলিল, "মামলা ত চালালে, কিন্তু এর পর বর্ষাকালে ছেলেপিলেদের মুখে দেবে কি?"

এ কথায় চৈতন্য অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া উঠিল। বলিল, "সে জন্যে একটুও ভাবি না, বড়বৌ। না হয় দশ মণ ধান বাড়ি ক'রে আন্‌বো, তার পর পোষমাসে ফসল ঘরে এনে শুধে ফেলবো। তার জন্যে ভাবনা নাই, এখন মা সিদ্ধেশ্বরীর দয়ায় আপীলের মামলাটা পেলে হয়। জোড়া পাঁটা দিয়ে মায়ের পূজো দেব।"

যমুনা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখ, আমি মেয়েমানুষ, আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তা হ'লেও আমার একটা কথা শুন্‌বে?"

চৈতন্য বলিল, "কথাটা কি, শুনি।"

যমুনা বলিল, "দেখ, এ সব মামলা-মোকর্দ্দমা ছেড়ে দাও। ওই ত পোড়ো যায়গা—ঠাকুরপোকে ওর আধখানা ছেড়ে দিয়ে মিটমাট ক'রে ফেল।"

গর্জ্জন করিয়া চৈতন্য বলিল, "কি, নিতেকে যায়গার ভাগ দেব? জান্ থাকতে নয়, বড়বৌ। 'মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত।' তাতে আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।"

যমুনা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হবে আর কি, দু' ভাইকেই উচ্ছন্নে যেতে হবে।"

জোরে মাথা নাড়িয়া চৈতন্য বলিল, "বহুৎআচ্ছা! নিতেও উচ্ছন্নে যাবে ত? আমিও তাই চাই। ওর

স্বামীর ঐকান্তিক দৃঢ়তা দেখিয়া উপদেশপ্রদান নিরর্থক জ্ঞানে যমুনা চুপ করিয়া রহিল। চৈতন্য বলিল, "তুমি কিছু ভেবো না, বড়বৌ, উচ্ছন্নেও যাব না, আর সর্বস্বান্তও হব না। পরশু দিন পড়েছে, বড় জোর আর একটা দিন পড়বে; তা হ'লেই খতম।"

যমুনা বলিল, "এটা ত খতম, কিন্তু ঠাকুরপো না আর একটা মামলা রুজু করেছে?"

উপেক্ষার হাসি হাসিয়া চৈতন্য বলিল, "দেওয়ানীতে ত? সেটা কিছুই নয়। আমাদের উকীল বলেছে, এ মামলা এক তুড়ীতে উড়িয়ে দেবে। আর যদিই বা মামলা চলে, দেওয়ানীতে খরচই বা কত?"

যমুনা বলিল, "বেশ, তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। এখন ভোরে উঠে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছো, অথচ ছেলেটার এত জ্বর। ডাক্তারই বা ডাকবে কে, ওষুধই বা এনে দেবে কে?"

চৈতন্য বলিল, "ও ম্যালেরিয়া জ্বর, ওষুধ খেতে হবে না। তবে যদি তেমন দেখ, ও-বাড়ীর মাণিককে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিও। এখন একটু তামাক দাও, টেনে শুয়ে পড়ি। রাত থাকতে উঠতে হবে আবার।"

যমুনা উঠিয়া তামাক সাজিয়া রান্নাঘরে উনান হইতে আগুন আনিতে গেল। তাহাদের রান্নাঘরের কাছেই নিতাইয়ের রান্নাঘর। বড় রান্নাঘরের মাঝে ছিটে বেড়ার দেওয়াল দিয়া দুইটা ঘর করা হইয়াছে। যমুনা উনান হইতে আগুন তুলিতে তুলিতে শুনিতে পাইল, নিতাই রান্নাঘরে বসিয়া ভাত খাইতে খাইতে ছোট-বৌকে বুঝাইয়া বলিতেছে, "তুমি রাগ কচ্ছো কেন, ছোটবৌ? এই মামলাটা চুকে গেলেই আমি যে রকমে পারি, ধার-কর্জ্জ ক'রে তোমার মাকড়ী দুটো ছাড়িয়ে দেব। এই লক্ষ্মী হাতে ক'রে বলছি, এ কথার অন্যথা হবে না।"

তরঙ্গিণী বলিল, "এর পর ধারকর্জ্জ ক'রে মাকড়ী ছাড়াবে কেন, এখনই ধারকর্জ্জ কর না।"

নিতাই বলিল, "ধারকর্জ্জ ত এক কথায় পাওয়া যায় না, দু'চার দিন সময়ের দরকার। আজ রাত্রে আমাকে কে দশ পনরো টাকা ধার দেবে?"

তরঙ্গিণী বলিল, "তা মাকড়ী দিচ্ছি আমি, কিন্তু জষ্টি-মাসে আমাকে বাপের বাড়ী যেতেই হবে। তখন যদি

আগুন তুলিতে তুলিতে যমুনার হাসি আসিল। হা ভগবান্, কেহ গোয়ালের ধান বেচে, কেহ স্ত্রীর গহনা বাঁধা দেয়। তবু মামলা করিতেই হইবে। মামলাটা কি অপূর্ব্ব জিনিষ!

৩

বছরখানেক ধরিয়া আপীলের মোকর্দ্দমা চলিল। তাহার পর ইহার নিষ্পত্তি হইয়া গেল। বিচারক প্রমাণের অভাব অনুভব করিয়া চৈতন্যকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন। এই ষাট টাকার দণ্ড হইতে মুক্তিলাভের জন্য চৈতন্যকে দুই শত কুড়ি টাকা খরচ করিতে হইল। তা হউক, সে ত জয়লাভ করিয়াছে। চৈতন্য ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, জোড়া পাঁটা দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিল এবং সেই পাঁটা দুইটার মাংসে যাহারা মোকর্দ্দমায় সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের চব্যচুষ্যরূপে খাওয়াইয়া দিল।

নিতাই দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সে দিন ঘরের বাহির হইল না। গদাই ঠাকুর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "থাম না হে নিতাই, যত হাসি, তত কান্না, ব'লে গেছে রামশর্ম্মা। এখনও আসল মোকদ্দমাই বাকী। এই মামলায় বাছাধনকে চোখে সরষে-ফুল দেখতে হবে।"

নিতাই স্বত্বসাব্যস্তের জন্য দেওয়ানী আদালতে যে মামলা রুজু করিয়াছিল, সে মামলা তখনও চলিতেছিল। কিন্তু দেওয়ানী মামলা মহাজনী নৌকার চালেই চলিয়া থাকে। শমনজারী হইতেই মাস পাঁচেক কাটিয়া গেল। তাহার পর দুই মাস আড়াই মাসের নীচে এক একটা দিন পড়ে না। দুই তিনটা দিন পড়িবার পর প্রতিবাদীর জবাব দাখিল হইতেই এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর বিচার। সে বিচার ফৌজদারী মামলার মত শুধু পাঁচটা সাক্ষীর মুখের কথা লইয়া মীমাংসিত হইতে পারে না; তজ্জন্য দলীল দস্তাবেজ, কাগজপত্র, অধিকার-অনধিকারের অনেক প্রমাণ চাই। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই এই সকল প্রমাণ সংগ্রহে ব্যস্ত হইল।

এই ব্যস্ততার মধ্যে শীত কাটিয়া গ্রীষ্ম আসিল। চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে চাষীরা বীজবপনের জন্য জমী কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু চৈতন্য বা নিতাই উভয়েরই জমীতে চাষ পড়িল না। তাহারা তখন কাগজপত্র বগ

বৈশাখের শেষে তাড়াতাড়ি করিয়া জমীতে চাষ দিয়া বীজ ছড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু অসময়ে চাষের যে ফল, তাহাই ফলিল ;—কতক বীজ বাহির হইল, কতক মাটীর ভিতরে থাকিয়াই শুকাইয়া গেল।

বর্ষা আসিলে চাষীরা যখন আবাদ শেষ করিয়া ফেলিল, তখন চৈতন্য ও নিতাই কোন প্রকারে দুই চারি বিঘা জমী আবাদ করিতে পারিল। বাকী জমী পড়িয়া রহিল।

এ দিকে মোকর্দ্দমায় টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছিল। ঘরে সঞ্চিত ধান বা সোনারূপা যাহা ছিল, সকলই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কাযেই মহাজনের কাছে হাত পাতিয়া মোকর্দ্দমা ও সংসারখরচ চালাইতে হইল। মহাজন প্রথমতঃ হাতচিঠায় সহি লইয়া টাকা দিতে লাগিলেন, কিন্তু টাকার পরিমাণ যখন বেশী হইল, তখন তিনি উপযুক্ত সম্পত্তি বন্ধক না রাখিলে টাকা দিতে অসম্মত হইলেন। এ দিকে হাকিম তখন মোকর্দ্দমা শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক দিনের মোকদ্দমা, পূজার আগে শেষ করিতে না পারিলে তাঁহাকে উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। কাযেই তিনি এবার দশ পনরো দিন অন্তর মোকদ্দমার দিন ফেলিয়া বাদি-প্রতিবাদীর সংগৃহীত প্রমাণ সকল দেখিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষকেই এবার ভাল ভাল উকীল দিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইল। সুতরাং এ সময়ে টাকার বিশেষ দরকার। চৈতন্য টাকার জন্য জমার অধিকাংশ জমীই মহাজনের কাছে বন্ধক দিতে বাধ্য হইল। নিতাইকে এতটা করিতে হইল না। সে আগে হইতেই নিজ অংশের বিঘা দুই উৎকৃষ্ট জমী বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিল, তাহাতেই মোকদ্দমার খরচ কুলান হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করিল।

এখানে বিবাদী জমীর ইতিহাসটুকু বিবৃত করা আবশ্যক। বাস্তুসংলগ্ন হইলেও ঐ জমীটুকু চৈতন্যের পৈতৃক সম্পত্তি নহে। সেখানে এক জেলের বাস ছিল। জেলে মারা গেলে তাহার বিধবা স্ত্রী নাবালক পুত্রকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। জেলের ঘরটুকু বর্ষার জলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ক্রমে ঐ স্থান জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরে জেলের ছেলেটি সাবালক হইলে নিজের ভিটার সামিল বলিয়া চৈতন্য উহার নিকট হইতে জমীটুকু কিনিয়া লইয়া-খরিদ করিবার বছরখানেক পরেই দুই ভাই আলাদা হয়। চৈতন্যের নামে খরিদ হইলেও একান্নবর্ত্তী আইনে নিতাই ঐ জমীর অর্দ্ধাংশের মালিক। কিন্তু চৈতন্য জবাব দিল, পৃথক্ হইবার পর উক্ত সম্পত্তি খরিদ করা হইয়াছে, পূর্ব্বে নহে।

কাযেই নিতাইকে সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করাইতে হইল, যে সালে জমী ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার পরের সালে তাহারা পৃথক্ হইয়াছে। চারি জন সাক্ষীর মধ্যে তিন জন সাক্ষী কিন্তু উকীলের জেরায় সালের গোলমাল করিয়া ফেলিল। হাকিম চৈতন্যের স্বপক্ষেই ডিক্রী দিলেন। সোল্লাস চীৎকারে পথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে চৈতন্য ও তাহার সাক্ষীরা ঘরে ফিরিল।

মামলায় হারিয়াছে শুনিয়া তরঙ্গিণীর আক্ষেপের সীমা রহিল না। সে হাকিমকে গালি দিল, উকীল-মোক্তারদের মুখ পোড়াইল, একচোখো ঠাকুর-দেবতাদিগকেও বাদ দিল না। তাহার পর চৈতন্য যখন জোড়া ঢাক বাজাইয়া সিদ্ধেশ্বরীতলায় পাটা কাটিয়া আসিল, তখন সে স্বামীর অক্ষমতার উল্লেখ পূর্ব্বক সদুঃখে জানাইল, নিতাই যদি আপীলে জয়লাভ করিয়া চারি জোড়া ঢাক বাজাইয়া ঘরে ফিরিতে না পারে, তাহা হইলে তরঙ্গিণী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া এই লজ্জা ও অপমানের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিবেই করিবে।

নিতাইয়েরও দুঃখ বা লজ্জা বড় কম হয় নাই। স্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হইয়া সে পরদিনই মহাজনের নিকট হইতে টাকা লইয়া হুগলীতে আপীল করিয়া আসিল। গদাই ঠাকুর আনন্দে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ, মরদ বাচ্ছার কাযই ত এই !"

৪

"বাবা, আমার কাপড় কৈ বাবা ?"

চৈতন্য মাথা চুলাইতে চুলকাইতে উত্তর করিল, "কাপড় ? এবারে তোর কাপড় কেনা হলো না রে, হরিশ। টাকাগুলোও সব ফুরিয়ে গেল, আর কিন্‌বারও সময় পেলাম না। আসছে মাসের ১০ই আবার ত হুগলী যাচ্ছি। সেই সময়ে তোর কাপড় এনে দেব।"

পিতার উত্তরে হতাশ হইয়া হরিশ ভারীমুখে পরিহিত ছিন্ন মলিন বস্ত্রের দিকে সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যমুনা অগ্রসর হইয়া ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "হাঁ গা, তোমার

টাকা নিয়ে গেলে। সে টাকা শুদ্ধ মামলায় খরচ ক'রে এলে !"

গম্ভীর মুখে চৈতন্য বলিল, "কি করি বল। আদালত যে কি যায়গা তা জান না ত। ওখানকার মাটী পর্য্যন্ত পয়সার জন্যে হাঁ ক'রে থাকে। সব দিয়েও তবু উকীলের কাছে সাড়ে তিন টাকা ধার রইলো। ভাগ্যে যাওয়া-আসার টিকিট কিনেছিলাম, নইলে ফিরে আসাই দায় হতো।"

রোষতীব্র কণ্ঠে যমুনা বলিল, "তা হ'লে ত ভালই হতো, একেবারে মামলা শেষ ক'রে ফিরে আস্‌তে। দু'দিন ছাড়া এত ছুটাছুটি কত্তে হতো না।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক চৈতন্য বলিল, "তাই করাই উচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বড়বৌ। আবার দিন পনরো বাদেই ছুট্‌তে হবে।"

যমুনা বলিল, "যখন মামলার সখ চেগে উঠেছে, তখন ছুট্‌তে হবে বৈকি। তা তুমি স্বচ্ছন্দে ছুটোছুটি কর, বাছাকে কিন্তু পরতে কি দেওয়া যায় বল দেখি? তবু লক্ষ্মী ছেলে, তাই নেকড়া ছেঁড়া গুছিয়ে আজ এক মাসের ওপর পাঠশালে যাচ্ছে। এমন ছেঁড়া কাপড় প'রে কার ছেলে পাঠশালে যায় বল দেখি!"

বিষাদক্ষুব্ধ স্বরে "তা বটে" বলিয়া চৈতন্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। হরিশ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; এবার সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কা'ল থেকে পাঠশালে আমি যাব না।"

যমুনা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "তা না যাস্‌ না যাবি। কাপড় কিনে এনে দিলে তখন আবার যাস্‌।"

হরিশ বলিল, "কাপড়ের জন্যে নয় মা।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি জন্যে রে?"

কাঁদ-কাঁদ মুখে হরিশ বলিল, "গুরুমশায় মাইনের জন্যে যে সব কথা বলে।"

গম্ভীরভাবে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বলে?"

হরিশ বলিল, "গুরুমশায় বলে, 'তোর বাবা মামলা কত্তে মুঠো মুঠো টাকা খরচ কচ্ছে, আর আমার দু'মাসের মাইনে বাকী, তা দিতে জোটে না?'"

গর্জ্জন করিয়া চৈতন্য বলিল, "কি, আমি মামলা কচ্ছি, আমার খুসী, তাতে গুরুমশায়ের কি? আচ্ছা, কালই যাচ্ছি

বলিয়া চৈতন্য হাতের হুঁকায় জোরে জোরে টান দিতে লাগিল। যমুনা হরিশকে ডাকিয়া লইয়া ভাত দিতে গেল। তামাক টানিতে টানিতে চৈতন্য শুনিতে পাইল, তরঙ্গিণী নিজের ঘর হইতে ছেলেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "ওরে ফেলু, ও কাপড়খানা প'রে কোথায় যাচ্ছিস্‌? ওর দুই যায়গা ছিঁড়ে গিয়েছে যে। মা গো মা, এমন ছেলেও দেখি নি। একরত্তি ছেলে—তার বস্তা বস্তা কাপড় ঘরে প'ড়ে, আর ছেলে ছেঁড়া কাপড় প'রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে। লোক মনে করবে, বাপ মামলা ক'রে এত গরীব হয়ে পড়েছে যে, ছেলেকে একখানা কাপড় কিনে দিতে পারে নি। ছিঃ!"

চৈতন্যের চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। সে আস্তে আস্তে হুঁকাটা রাখিয়া হাত-পা ধুইবার জন্য পুকুর-ঘাটে চলিয়া গেল।

হাত-পা ধুইয়া আসিয়া আহারে বসিয়া চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বড়বৌ, সে দিন যাবার সময় আমি আট আনার মাত্র চাল কিনে দিয়ে গিয়েছিলাম। তেলীবৌকে ব'লে গিয়েছিলাম, দরকার হ'লে আর আট আনার চাল দিও। তা চাল আর এনেছিলে কি?"

নতমুখে যমুনা উত্তর দিল, "চাল আনতে হরিশকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে চাল দেয় নি। বলে, আমার আড়াই টাকা বাকী পড়েছে, নগদ দাম না দিলে চাল দিতে পারবো না।"

ভাতের থালা হইতে মুখ তুলিয়া বিস্ময়সহকারে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে সেই আট আনার চালে তোমাদের আজ চার দিন চল্লো কি ক'রে?"

একটু ম্লানহাসি হাসিয়া যমুনা উত্তর দিল, "অমনই এ রকমে চ'লে গেল।"

হরিশ তখনও ভাত খাইতেছিল; সে বলিয়া উঠি[illegible] "চলবে না কেন বাবা, মা এই ক'দিন রেতে কি ভা[illegible] খেয়েছে। দুপুরবেলাতেও যা খেয়েছে, তাও বোধ হয় পে[illegible] ভরা নয়।"

যমুনা তাহাকে ধমক্‌ দিয়া বলিল, "হাঁ, তুই জানিস্‌, পে[illegible] ভরা নয়। ওগো, ওর কথা ছেড়ে দাও, রেতে ভাত খাই [illegible] কেন জান, রোজ সন্ধ্যে হ'লেই গা-হাত কেন মাটী-মাটী

অজগরশ্বাসতুল্য একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চৈতন্য বলিল, "আজও বোধ হয় তাই কচ্ছে?"

যমুনা বলিল, "একটু একটু কচ্ছে বৈ কি। ও কি, তুমি ভাত ফেলে উঠে পড়ছো যে? সারাদিন খাওয়া নাই; আমার মাথা খাও। সর্ব্বনাশ, উঠে পড়লে?"

চৈতন্য কোন কথা না বলিয়া নীরবে হাত-মুখ ধুইল এবং তামাক সাজিয়া, হুঁকা হাতে চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকার দাবায় গিয়া বসিল।

অন্ধকার রাত্রি। গাছের পাতায় পাতায় জোনাকী জ্বলিতেছিল, দেওয়ালের ফাটলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছিল; গোয়ালে একটা অস্থি-চর্ম্মসার বলদ ছিল; সে মাথা নাড়িয়া, লেজের ঝাপটা দিয়া মশা তাড়াইতেছিল। চৈতন্য নক্ষত্র-প্রদীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে হুঁকায় এক একটা মৃদু টান দিয়া চিন্তার গতিটাকে যেন বিভিন্নমুখী করিতে চেষ্টিত হইল।

সেই নৈশ নিবিড় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চৈতন্য আপনার অতীত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে লাগিল। সুখ-শান্তিময় সংসার! গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, আশা ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়। সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিলে আনন্দে প্রাণ যেন উথলিয়া উঠে, স্বয়ং মা কমলা যেন সংসারটার উপর পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়াছেন! হঠাৎ কি দুর্গ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল; গোলার ধান কোথায় যেন উপিয়া গেল, গোয়াল শূন্য হইয়া পড়িল, সংসার ছারখার হইয়া আসিল, কর্ম্মের উদ্দীপনায় মত্ত হৃদয় ঈর্ষ্যা ও আক্রোশে দগ্ধ হইতে থাকিল। সংসারের সুখ-শান্তি, আনন্দ, সজীবতা কাহার অভিশাপে দগ্ধ হইয়া গেল। আজ চারিদিকে অভাব, চারিদিকে দৈন্য; আজ ছেলে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বেড়ায়, গুরুমশায় আট গণ্ডা পয়সা বেতনের জন্য পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়, স্ত্রী অন্নাভাবে উপবাস দিয়া দিন কাটায়! চৈতন্যের বুকের ভিতরটা যেন চড়-চড় করিয়া উঠিল। ওঃ ভগবান্, সাধ করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়াছি, খাল কাটিয়া সুখের সংসারে দুঃখকে ডাকিয়া আনিয়াছি। দোষী আমি নিজে, তোমাকে দোষ দিবার ত কোনই পথ নাই।

অনুতাপে চৈতন্যের বুকটা যেন জ্বলিয়া উঠিল, চোখ

৫

"নিতে, ওরে নিতে!"

বহুদিনের পর জ্যেষ্ঠের স্নেহমধুর আহ্বান শ্রবণে নিতাই চমকিয়া উঠিল; ব্যস্ততা সহকারে উত্তর দিল, "কে, দাদা?"

চৈতন্য বলিল, "হাঁ, আমি। একবার উঠে বাইরে আয়।"

নিতাই তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে বাহিরে আসিল। তখন প্রভাতের স্বর্ণাভ রৌদ্র আসিয়া উঠানটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে, প্রাচীরের গায়ে জাম-গাছে বসিয়া একটা দোয়েল শিষ টানিতেছে। উঠানের মাঝখানে চৈতন্যকে সহাস্যমুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া নিতাই বিস্মিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছো, দাদা?"

চৈতন্য বলিল, "আমার কাছে আয় না, তোকে গোটা-কতক কথা জিগোস্ করবো।"

আজ তিন বৎসরের উপর ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ-দেখাদেখি নাই, কেহ কাহারও সম্মুখ দিয়া পথে চলে না; মাছি হইলে এক জন অপরকে টিপিয়া মারে, এমনই মনোভাব। সুতরাং নিতাই জ্যেষ্ঠের কাছে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। চৈতন্য তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই রে নিতে, দিনের বেলা তোকে খুন ক'রে আমি ফাঁসীকাঠে ঝুলবো না।"

নিতাই লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া জ্যেষ্ঠের পাশে দাঁড়াইল। চৈতন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা নিতে, আমাদের ধানের বড় মরাই দুটো কোন্‌খানে ছিল, বল্‌তে পারিস্?"

নিতাই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিল, "ঐ যে, যেখানে ন'টে শাকের ক্ষেত হয়েছে।"

চৈতন্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক বটে। আচ্ছা, দুটো মরায়ে ত কম ধান ছিল না। তত ধান গেল কোথায় বল্ দেখি?"

মুখ ফিরাইয়া নিতাই উত্তর করিল, "উকীল-মোক্তারদের পেটে।"

"সব?"

"এক রকম সবই বৈ কি।"

"আচ্ছা, গোয়ালের গরুগুলো? গরু নয় ত, যেন এক একটা হাতী।"

"উকীল-মোক্তাররা সেগুলোকেও খেয়ে ফেল্লে না কি ?"

"ধত্তে গেলে তাই বটে। গরুগুলো না খাক্, তার দাম-গুলো খেয়েছে।"

কিয়ৎক্ষণ মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চৈতন্য বলিল, "তাই বটে। আচ্ছা, তোর তেমন অসুরের মত চেহারা—সে চেহারা গেল কোথায় ?"

নিতাই বলিল, "তোমার শিবের মত নাদুস্-নুদুস্ চেহারা যেখানে গেল, সেইখানে গিয়েছে। আদালতের মাটী শরীরের রক্তটুকু সব চুষে খেয়েছে।"

হাসিতে হাসিতে কনিষ্ঠের পিঠ চাপড়াইয়া চৈতন্য বলিল, "বাহবা, ঠিক বলেছিস্ নিতে। ভাল, এত উৎপাতের মূল কি বলতে পারিস্ ?"

নিতাই বলিল, "পারি। মূল ঐ কাঠা দেড়েক পোড়ো জমী।"

চৈত। ঐ দেড় কাঠা জমীর জন্যে আমাদের দু' জনের কত জমী গেল বল্ দেখি ?"

নিতা। দু' জনের জড়িয়ে ১০।১২ বিঘের কম নয়।

চৈত। এই ১০।১২ বিঘে জমী গেল, ধানের মরাই গেল, মেয়েদের গায়ের গয়নাপত্র যা ছিল, তাও গেল। আচ্ছা নিতে, আমাদের মত বোকা লোক দুনিয়ায় আর আছে ?"

নিতা। আছে বৈ কি দাদা, না থাকলে এত মামলা-মোকর্দ্দমা হচ্ছে কেন ?

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চৈতন্য বলিল, "সে কথা ঠিক। তা হোক্ গে মামলা-মোকর্দ্দমা, এখন আমরা যে বোকামী করেছি, তার কি প্রায়শ্চিত্ত করা যায় বল্ দেখি ?"

নিতাই হাঁ করিয়া জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চৈতন্য বলিল, "ঐ দেড় কাঠা জমী নিবি তুই ? তা হ'লে গোটা দুই টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে রেজেষ্টারী আফিসে চল্। আমি তোর নামে জমাটা লিখে দিয়ে আসি। তার পর কা'ল কিছু খরচ ক'রে দু'ভায়ে মিলে মা সিদ্ধেশ্বরীর পূজো দিয়ে আসবো। কিন্তু তুই আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর, জ্ঞান থাকতে মামলা কখনও করবি না।"

নিতাই ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠের পদতলে জানু পাতিয়া বসিল এবং তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদা !"

চৈতন্য তাহাকে উঠাইয়া উভয় বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিল; বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "আমার এক রকম সকলই গিয়েছে নিতে, তা যাক্, তবু তার মধ্যে তোকে যে ফিরে পেলুম, এই ঢের।"

জ্যেষ্ঠের আনন্দাশ্রুধারায় নিতাইয়ের মস্তক অভিষিক্ত হইতে লাগিল। প্রভাত-রবি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণধারা ঢালিয়া দিয়া উভয়ের হৃদয়ের মালিন্য ধৌত করিয়া দিল।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য গদাই ঠাকুর দরজার সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন, "নিতাই !"

কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়কে পরস্পর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ দেখিয়া তিনি যেন ভয়ে কয়েক পা পিছাইয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কন্যা

অনন্ত প্রবাহ-পার ভাসাইয়া তরী
কোথায় চলেছ তুমি একা কোন্ পারে ?
সহাস্য তরঙ্গ নাচে তরীর দু'ধারে
পবনে কুন্তল দোলে উল্লাসে শিহরি !

অশোক অঞ্চল উড়ে শিরে সন্ধ্যাতারা,
কলকণ্ঠে স্ফুরিছে কি মনোহর গীতি,
অধরে হাসির রেখা—নয়নে কি প্রীতি
মণিময় স্বর্ণশঙ্খ শোভে তারাতারা !

ইন্দুমুখ স্বর্ণছবি পড়িয়াছে জলে,
স্বর্ণ তরণীর ছায়া স্বলসে সঘনে,
মন্দ স্রোতে চলে তরী মন্থর গমনে,

সে কবে কবিরে স্বপ্নে দিয়েছিলে দেখা,
মেঘ স্বপ্নময় দিশি, কবি কূলে একা ?



মহাচীনের জয়যাত্রা

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চীনদেশ হইতে যে সকল তারের সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে চীনের অচির-ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হইতেছে। উত্তর ও দক্ষিণ-চীনের গৃহ-বিবাদের হলাহলের মধ্য হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে জরাগ্রস্ত নিদ্রিত চীন যেন মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচ্যদেশবাসিমাত্রেরই হৃদয় নব-উষার নবীন রক্তরাগরঞ্জিত আভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা আনন্দগর্ব্বে বিস্ময়পুলকে উৎফুল্ল আননে আশান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের বীচিবিক্ষোভিত উদয়াচলে প্রাচীন এসিয়ার গৌরব-রবির পুনরুদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

হ্যাঙ্কো, ওয়ানসিয়েন প্রভৃতি স্থানে জেনারল ইয়াংসেন এবং সাংহাই বন্দরে মার্শাল সান উত্তরের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়া গর্ব্বভরে দণ্ডায়মান ছিলেন। এখন কিন্তু তাঁহাদের সেই গর্ব্ব ধূলাবগুণ্ঠিত হইয়াছে, জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের বিজয়ী সেনা হ্যাঙ্কো, ফুচু প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া সাংহাই আক্রমণের জন্য ধাবিত হইয়াছে। ক্যাণ্টনী জেনারল চাঙ্গ কাইসেক এই সকল স্থান শত্রুশূন্য করিয়াছেন, পরন্তু তিনি তাঁহার অবস্থান এত দূর নিরাপদ মনে করিয়াছেন যে, ক্যাণ্টন হইতে তাঁহার রাজধানী হ্যাঙ্কোর পরপারে ওয়াচাঙ্গ সহরে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। হ্যাঙ্কো ওয়াচাঙ্গ এখন তাঁহার প্রধান আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। জেনারল ইয়াংসেন ও মার্শাল সানের প্রায় সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দক্ষিণ-চীন এখন জেনারল



হ্যাঙ্কোয়ে চীনা অঞ্চলের দৃশ্য

পূর্ব্ব-সংখ্যায় বলিয়াছি যে, দক্ষিণের ক্যাণ্টনী কুওমিণ্টাঙ্গ বা জাতীয় দলের নেতা জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের বিজয়ী সেনার বিরুদ্ধে উত্তরের War Lord উপেইফু ক্রমাগত পরাজিত হইয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছেন। এত দিন হ্যাঙ্কো, ফুচু, সাংহাই প্রভৃতি স্থান জেনারল উপেইফু ও চাঙ্গসোলিনের অধিকৃত ছিল; তাঁহাদেরই অধীনস্থ সেনা-চাঙ্গ কাইসেকের করতলগত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র ফুকিয়েন প্রদেশ এখন দক্ষিণ-চীনের জাতীয় দলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, উত্তরের পিকিং গভর্ণমেণ্ট এখন কায়া হারাইয়া ছায়ায় পরিণত হইয়াছে। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের এখন আর পিকিং গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসর্ত্ত করিলে কোনও ফল নাই। কেন না, পিকিং

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বিশদরূপে বুঝাইতেছি। সাধিন নামক স্থানের পোর্টুগীজ দূত অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির দূতগণের মুখপাত্ররূপে পিকিং গভর্ণমেণ্টের দরবারে দক্ষিণী ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের একটা কার্য্যের বিপক্ষে আপত্তি তুলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। পিকিং গভর্ণমেণ্ট সাফ জবাব দেন যে, তাঁহারা শক্তিহীন, দক্ষিণের উপর হুকুম চালাইবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই। এমন কি, এই শক্তিহীনতার ফলে পিকিং গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে।

এ দিকে ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক দূত মিঃ ইউজেন চেন এই নালিশের কথা শুনিয়া পোর্টুগীজ দূতকে বলিয়াছেন,—"আমার গভর্ণমেণ্ট আপনাদের কথা শুনিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আপনারা (বৈদেশিক দূতরা) স্বীকার না করেন যে, বহুদিন যাবৎ পিকিং গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে জাতীয় শক্তি ও কর্তৃত্ব চ্যুত হইয়াছে এবং উহা আমার গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে, তত দিন আমরা আপনাদের কথায় কর্ণপাত করিব না।" শক্তিমানের যোগ্য কথাই



ওয়াচাঙে দক্ষিণী-সেনার বিজয়-দৃশ্য

বটে! এই শক্তির আঘাত যে বৈদেশিকরা একবারে প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন কথা বলা যায় না। কেন না, ইংরাজ এখন ফোটানায় পড়িয়া কোন্ দিকে চলিবেন, স্থির করিতে না পারিলেও তাঁহাদের চীনের নব-নিযুক্ত দূত মিঃ মাইলস লাম্পসন্ কয়েকদিন পূর্ব্বে ক্যাণ্টনের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ চেন ইউজেনের সহিত হ্যাঙ্কো সহরে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ও আপোষ কথাবার্ত্তা কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই শেষ মুহূর্ত্তেও ইংরাজ সরকার একবারে মন খুলিয়া ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে চীনের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন বটে, তবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির সকাশে এ সম্বন্ধে এক মেমোরাণ্ডাম পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেই মেমোরাণ্ডামে উদ্দেশে আহ্বান করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, অতঃপর ক্রমশঃ সকলকেই চীনে "extra-territorial rights and other privileges" ছাড়িয়া দিতে হইবে। এত দিন কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মুখে এই বাণী শুনা যায় নাই। কিন্তু ইহা সত্বেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চীনের সমুদ্রে ও নদীতে বহুসংখ্যক বৃটিশ রণপোত প্রেরণ করিতেও ছাড়েন নাই। সিঙ্গাপুরে প্রাচ্যের বৃটিশ নৌসামরিক আড্ডা স্থাপনের কথাও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে। ইহাকে কি দুই নৌকায় পা দেওয়া বলা চলে না?

আর একটা ঘটনা এইরূপ:—ক্যাণ্টনের কুওমিনটাঙ্গ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে মিঃ সিয়াটিং জেনিভায় "লীগ অফ নেশানের" কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোনও পত্রে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমানে একা ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টই চীন জাতির প্রতিনিধিরূপে জগতের দরবারে কথা কহিবার শক্তি ধারণ করেন। সেই গভর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, এযাবৎ চীনের সহিত বৈদেশিকগণের যে সকল অসমান সন্ধিসর্ত্ত হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে নাকচ করিতে হইবে। পিকিং গভর্ণমেণ্টের সহিত বৈদেশিকগণের সমস্ত সন্ধি বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদিগকে ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের সহিত নূতন করিয়া সন্ধিসর্ত্ত করিতে হইবে।"

যে গভর্ণমেণ্ট শক্তিশালী হন, তাঁহারই প্রতিনিধির মুখে এরূপ কথা শোভা পায়। পিকিং গভর্ণমেণ্টের ঐভাবে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জকে "হুকুমের সুরে" কথা বলিবার শক্তি আছে কি? সুতরাং বুঝিতে হইবে, ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট যথার্থই শক্তিসঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পশ্চাতে শক্তির সম্পদ না থাকিলে আজ তাঁহারা যুরোপীয়দিগের সহিত সমানে সমানের মত কথা কহিতে সাহসী হইতেন না।

হুকিয়েন প্রদেশে তাঁহাদের জয়যাত্রা ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। তাঁহাদের বিজয়ী সেনার সম্মুখে ঝড়ের মুখে তৃণের মত ইয়াংসেন ও সানের বাধাপ্রদান উড়িয়া গিয়াছে।

হুকিয়েন প্রদেশটি হংকং ও সাংহাই নামক দুইটি treaty port-এর মধ্যে বিশাল ভূভাগ অধিকার করিয়া আছে। ফুচু এই প্রদেশের প্রসিদ্ধ বন্দর। এই বন্দর দক্ষিণের জাতীয়দলের হস্তগত হওয়াতে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সহর দখলকালে দক্ষিণীদিগকে একটিও গোলাগুলী বর্ষণ করিতে হয় নাই, স্থানীয় রক্ষীরা বিনা যুদ্ধে তাহাদের হস্তে নগর অর্পণ করিয়াছে। এই বন্দর অধিকারের ফলে বৃটিশ বণিকগণের স্বার্থে বিষম আঘাত লাগিয়াছে।

প্রথমে অধিকার করে। তাহার পর ইয়াংসি নদী পার হইয়া হ্যাঙ্কো অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণী গভর্ণমেণ্ট এখন আমদানী মালের উপর শতকরা ২।০ টাকা অতিরিক্ত কর (surtax) এবং বিলাসের দ্রব্যের উপর শতকরা ৫ টাকা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৃটিশ বণিকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ দুই কর দান করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এ দিকে হ্যাঙ্কো বন্দরের তুলা, তামাক ইত্যাদির কারখানার শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়া বিদেশী মহাজনদিগের নিকট হইতে প্রায় শতকরা ৫০ টাকার হিসাবে পারিশ্রমিক বাড়াইয়া লইয়াছে। ফল কথা, এখন কুকিয়েন প্রদেশে চীনজাতি আপনার গণ্ডা বিশেষরূপে আদায় করিয়া লইতেছে। এখানে বিদেশীয়ের প্রভুত্ব চিরতরে অবসান হইল বলিয়া মনে হইতেছে।

চীনসমুদ্র ও ইয়াংসি নদীবক্ষে বর্ত্তমানে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের মোট ৯৭ খানি রণতরী রহিয়াছে; তন্মধ্যে ইংরাজদের ৫৫ খানা, মার্কিণের ২০ খানা, জাপানের ১৩ খানা এবং ফরাসীর ৯ খানা। চীনের ইংরাজ বণিকদিগের সাহায্যপ্রাপ্ত এ্যাংলো-চীন সংবাদপত্রসমূহ এখনও বৃটিশ সরকারকে এই ৫৫ খানা রণতরীর সাহায্যে ফিউকিয়াং বন্দরের পশ্চিমদিকে সমস্ত ইয়াংসি নদী অবরোধ করিয়া (Blockade) রাখিতে পরামর্শ দিতেছে। কিন্তু এখন যে বৃটিশ সরকার এই পরামর্শ শুনিবেন, এমন ত মনে হয় না। কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা শক্তিপুঞ্জকে যেয়োরাওয়াম দিতেন না।

উত্তরেও চাঙ্গসোলিন বা উপেইফু নিষ্কণ্টক নহেন। সেখানে মার্শাল ফেঙ্গ তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিতেছেন না। কিছু কাল হইতে উপেইফু সিয়ানফু নামক সহর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭ মাস কাল সহর অবরুদ্ধ ছিল। শুনা যাইতেছে, এই অবরোধের ফলে স্থানীয় ১৫ হাজার লোক অনাহারে ও শীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং প্রায় ২০ লক্ষ ডলার মুদ্রা বণিকদিগের ক্ষতি হইয়াছে। উপেইফু এই ভাবে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেছিলেন! স্বার্থসাধনোদ্দেশে War-lord উপেইফু স্বদেশী স্বজাতি চীনগণকে ৭ মাস কাল এই ভাবে জীবন্ত সমাধি দিয়া রাখিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, দক্ষিণের জাতীয় দলের বন্ধু খৃষ্টান জেনারেল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ এত দিন পরে উপেইফুর সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া অবরুদ্ধ নগরের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন।

এইবার আশা হয়, উত্তর ও দক্ষিণের জাতীয় দল (ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ ও চাঙ্গ কাইসেকের দল) দুই দিক হইতে চাপ দিয়া দেশের শত্রু স্বার্থান্বেষীদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

ইংরাজের সহিত মনোবিবাদের ইতিহাস

রুস-জাপান যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজ ও জাপানে প্রাচ্যে এক মিতালী সন্ধি হইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। তাহার পর রুসিয়ার পরাজয় হইল—অসম্ভবও সম্ভব হইল, ক্ষুদ্র জাপ-বামন বিরাট রুস-দানবের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া দিল। প্রাচ্যে রুসিয়া-জুজুর ভয় কিছু কালের জন্ত অন্তর্হিত হইল।

তাহার পর জার্ম্মাণ-যুদ্ধ। সে যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ-রুসে ফরাসী ও ইটালীর সহিত মিতালী করিয়া জার্ম্মাণ-দানবকে ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইল। জার্ম্মাণীর পতন হইল। মার্কিণও সে যুদ্ধে মিত্রশক্তিগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেই যুদ্ধাবসানের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন কনফারেন্স বসিল। সেই কনফারেন্সের ফলে ইংরাজ জাপের সহিত পূর্ব্ব-মিতালীর সন্ধিপত্র নাকচ করিয়া দিলেন।

প্রাচ্যে আপনাকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মহাচীনে ইংরাজের সাহায্য না পাইলে তাঁহার দিন চলিবে না, জাপানের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কি রাজনীতিক দিক দিয়া, কি অর্থনীতিক দিক দিয়া,—যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, জাপান মনে করিতেন, ইংরাজ তাঁহার মিতা থাকিলে প্রাচ্যে তাঁহার শক্তি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু জাপানী লেখক কাওয়াকামী বলিয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়া-ও কানাডার পরামর্শে এবং মার্কিণ সেনেটের চালবাজীতে বাধ্য হইয়া ইংরাজ জাপানকে সন্ধিভঙ্গের নোটিশ দিলেন। য়ুরোপে ইংরাজকে কোন কোন জাতি Perfidious Albion নামে অভিহিত করিয়া থাকে; কাওয়াকামীও এই সন্ধিভঙ্গের অপরাধে ইংরাজকে ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ইংরাজের এই সন্ধিভঙ্গ কতকটা নদী পার হইয়া কুম্ভীরকে কদলী প্রদর্শনের মত।

কাওয়াকামী বলিতেছেন, এই সন্ধিভঙ্গ জাপানের পক্ষে শাপে বর হইয়াছে। কেন না, উহার পর হইতে গত ৪ বৎসরে মহাচীনে জাপানের ব্যবসায়-বাণিজ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে, ইংরাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্রুতগতি ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইয়াছে। চীনের তরুণ দল—বিশেষতঃ দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনী কুওমিণ্টাঙ্গ বা জাতীয় দল ইংরাজের প্রতি বিশেষ বিদ্বিষ্ট ভাব পোষণ করিতেছে। কাওয়াকামী একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে ইংরাজ চীনের বক্সার ইন্‌ডেম্‌নিটি (ক্ষতিপূরণের টাকা) মাপ করিবার সাধু উদ্দেশে পিকিংয়ের চীন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দুষ্ট চীনারা কিন্তু এমন 'সাধু উদ্দেশ্যেও' সন্দেহ করিল, বলিল, "কোন সর্ত্ত না করিয়া যদি ইংরাজ ক্ষতিপূরণের টাকা হইতে চীনকে রেহাই দেন, তবেই তাঁহারা প্রস্তাবে সম্মত হইবেন; অন্যথা যদি ইংরাজ ঐ দেয় টাকা হইতে চীনকে রেহাই দিয়া চীনদেশে নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির গুপ্ত উদ্দেশ্য পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না।"

কাওয়াকামী বলিতেছেন, ইংরাজের উপর চীনের বিশ্বাসের অভাব এত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, ইংরাজের প্রাচ্যে বাণিজ্যের এবং মাল কাটাইবার প্রধান আড্ডা হংকং সহর এ যাবৎ চীনাদের ক্রমাগত ধর্ম্মঘট ও বৃটিশ-পণ্য বর্জ্জনের ফলে একেবারে শুইয়া পড়িয়াছে। ক্যাণ্টন, সোয়াটো ও এময় সহর হইতে ইংরাজের চীনের মাল সংগ্রহের পথেও কাঁটা পড়িয়াছে। ধর্ম্মঘট ও বর্জ্জনের ফলে হংকং ও অন্যান্য বন্দরে ইংরাজের উপনিবেশ সমূহের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হংকংয়ের বাণিজ্য তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকারও কম হইয়াছে। পরন্তু ইহার লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষে নামিয়াছে। হংকংয়ে চিনির কারবার একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহরের জমী ও বাড়ীর দর ক্রমশঃ নামিতেছে। সহরের বহু বৃটিশ ব্যবসাদার ও কারম দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, ফলে উহাদিগের রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজের হোম গভর্ণমেণ্টকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ দিতে হইয়াছে। এমন কি, এ জন্য ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও চায়নার চার্টার্ড ব্যাঙ্কের নিয়ামক বহুদর্শী সার মণ্টেগু টার্ণার বিশেষ ভাবিত হইয়া তাঁহার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, "এখানে (চীনের) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাদাররা ইংরাজ-সরকারের নরম চালে বিরক্ত হইয়া মনে করিতেছে যে, সরকার যদি চীনা ধর্ম্মঘটী ও বর্জ্জনকারীদের উপর প্রথমাবধি কড়া ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে এ অবস্থা ঘটিত না। কিন্তু তাহাদেরও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইংরাজ একাকী চীনে জোর-জবরদস্তি করিতে পারেন না। অন্যান্য শক্তিরও মিলিত হইয়া এ অবস্থার অবসান করা কর্ত্তব্য। রুসিয়ার বলশেভিকরা ক্যাণ্টনীদিগকে উৎসাহিত

রাখিতেছে। সুতরাং অবিলম্বে ইংরাজ ব্যবসাদারদিগকে সাহায্য করা ইংরাজ-সরকারের কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।"

কাওয়াকামী বলিতেছেন, "বলশেভিকরা যে দক্ষিণ-চীনের এই আন্দোলনের মূলে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দিন হইতে সোভিয়েট-সরকার চীনের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদের চীনস্থ দূত ইউলিন, জফ ও কারাখান পর পর ক্রমাগত চীনদেশে ইংরাজের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিতে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। এখন চীনা ড্রাগন ও রুসিয়ান ভল্লুকের মাঝে পড়িয়া বৃটিশ-সিংহ বস্তুতঃই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।"

কাওয়াকামীর এই চিত্রটির সকলাংশ সত্য না হইলেও কতক যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ইংরাজ আপনাকে চীনের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া এত দিন পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, আজ সেই চীন তাঁহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন হইল কেন, এ কথাটা ভাবিবার বটে।

ইংরাজের প্রধান ভয়,—পাছে রুসিয়ান বলশেভিক প্রভাব চীনের উপর বিস্তৃত হয়, অন্ততঃ এই অজুহত দেখাইয়াই ইংরাজ দক্ষিণ-চীনের কুওমিনটাঙ্গ দলের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু সে বিষয়েও তাঁহাদের ধারণা যে ভ্রান্ত, জাপানের কোন কোন রাজনীতিক তাহা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিতেছেন। রাজধানী টোকিওর জাপানী পত্র "হোচি" লিখিতেছেন, "চীনের গৃহ-যুদ্ধের দুইটি মূল কারণ আছে,—(১) চীনের War-Lordদিগের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতা ধ্বংস করা, (২) বলশেভিক Communion হইতে চীনকে রক্ষা করা। চীনের War-Lordরা জাহির করিতেছেন যে, তাঁহারা Red Bandits অর্থাৎ বলশেভিক প্রভাবান্বিত দস্যুদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা জগৎকে জানাইতেছেন যে, চীনে তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন,কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। চীনের যাহাদিগকে তাঁহারা আজ বলশেভিক Red Bandit বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও রাজনীতিক মতামত তাঁহাদের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। যদিও তাহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হয় নাই, তাহা হইলেও তাহাদের একটা রাজনীতিক আদর্শ আছে। এই কোয়াণ্টাঙ্গের (কুওমানটাঙ্গের) রাজনীতিকদিগকে ভাবুক (Idealist) বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা উপেইফু ও চাঙ্গ-সোলিনের মত স্বেচ্ছাচারী নিরঙ্কুশ নহে; শেষোক্ত দুই জন সেনাপতি একবারে খাঁটি War-Lord। চীনারা যে বলশেভিক নীতি গ্রহণ করিবে না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সোভিয়েট সরকার প্রথমে মিঃ কারাখানকে চীনে আপনাদের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে রুসিয়ান বলশেভিক মতবাদ প্রসারের চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে চীন হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল। রুসিয়ান সরকার তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিয়াছেন মিঃ চেনকোভকে। তিনি মধ্যপন্থী প্রকৃতির লোক। তিনি পূর্ব্বে ফিনলাণ্ডের মন্ত্রী এবং লাটভিয়ার দূত ছিলেন। সুতরাং মিঃ ইউলিন ও মিঃ জফকে আর চীনে বলশেভিক মন্ত্র প্রচার করিতে হইল না। তাঁহারা কোদালুর খুঁড়িতে গিয়া গাত্রে প্রচুর মাটি মাখিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। এখন রুসিয়ান সোভিয়েট হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন যে, চীনকে কমিউনিজম মন্ত্রে দীক্ষিত করা সম্ভবপর হইবে না, বরং চীনের প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা রুসিয়ার প্রভাবিত হওয়াই বিশেষ সম্ভবপর।"

সত্য-প্রকাশ

সুতরাং প্রাচীন চীন যে হঠাৎ বলশেভিক হইয়া গিয়া ইংরাজের স্বার্থের বহু প্রাচীন, সে চিরদিনই নিয়মতন্ত্র মানিয়া আসিয়াছে, শান্তি ও শৃঙ্খলার উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। সে যে হঠাৎ "Gone Red" অথবা মস্কোয়ের "Murderous gang" খুনে বলশেভিকদিগের সহিত যোগদান করিয়া অরাজকতা ও অশান্তি আনয়ন করিয়াছে, প্রতীচ্যের বণিকের বিপক্ষে ধর্ম্মঘট ও বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কুলিজ দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মার্কিণ চীনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতেছে এবং করিবে। জাপানও এখন চীনের বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন। ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রীও সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন,—"No French soldier has left or would leave for China, কোন ফরাসী সেনা চীনে প্রেরিত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না।" রুসিয়ান সোভিয়েট ত চীনের সহিত মিতালী করিয়া চীনের সহিত সমানে সমানের ব্যবহার করিতেছে। রুসিয়ার রাজপুরুষ চিচেরিণ সে দিন স্পষ্ট বলিয়াছেন, "আমি ইংরাজ কনজারভেটিভ রাজনীতিক এবং লেখকগণের মনের সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাঁহারা আমাদিগকেই চীনের জাতীয় আন্দোলনের জন্য দায়ী করিতেছেন। অথচ এই আন্দোলন চীন নিজেই নিজের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।" তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, চীনের সম্পর্কিত যে কয়টি প্রধান Treaty Powers আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই চীনের গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, কেবল একা ইংরাজের রণপোত সমূহ মাল্টা ও অন্যান্য স্থান হইতে চীনের উদ্দেশে প্রেরিত হইয়াছে, পরন্তু চীনস্থ ইংরাজ বণিকরা নিজের গভর্ণমেণ্টকে চীনের 'মাথা হাতে কাটিবার' জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। ইংরাজ Imperialist ও Capitalistরা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, অবিলম্বে চীনের এই অরাজকতা বলপূর্ব্বক নিবারণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা অন্ধকারেও একটু আলোক দেখিতে পাইতেছেন, আনন্দভরে বলিতেছেন, "শীঘ্রই যে মাঞ্চুরিয়ার War-Lordএর দল দক্ষিণীদের বিপক্ষে রণযাত্রা করিবেন, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।" তাঁহাদের এই "দক্ষিণী" অর্থাৎ কুওমিনটাঙ্গ দলের উপর বিজাতীয় ক্রোধের ভাব ইহাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। 'ক্যাণ্টনী' চাঙ্গ কাইসেক ও 'মঙ্গোলীয়' ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গকে হাতে পাইলে বোধ হয় তাঁহারা গাঁশ পাড়িয়া কাটিতে ছাড়েন না—"An expedition has already started to checkmate any attempt of Feng Ushiang to sweep down on Pekin, while operations against the Cantonese are in progress." ওঃ, কি আনন্দ! দক্ষিণ-চীনের জাতীয় দল যে জয়যাত্রার পথিক হইয়াছে এবং যাহাদের জয়যাত্রায় জগতের সমস্ত নিরপেক্ষ লোক সমস্বরে বলিতেছে, "শুভাস্তে পন্থানঃ", সেই জাতীয় দলের উপর সাম্রাজ্য-গর্ব্বী ইংরাজ ও ধনী ইংরাজ বণিকের এ আক্রোশ কেন, তাহা কি বুঝিতে বিলম্ব হয়?

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। সত্য স্বতঃই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের মত ইংরাজের দেশের রাজনীতিক দলাদলি অসদ্ভাব নাই। সেখানে কনজারভেটিব ও লিবারল দলে অহি-নকুল সম্বন্ধ। লয়েড জর্জ্জ এক দিন দুই দলের যোগাযোগ (Coalition) করিয়া জার্ম্মাণ-যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। শান্তির সময়ে তাঁহার পতন হইয়াছিল। কনজারভেটিভরা তাঁহার অখণ্ড প্রতাপের ধ্বংসের মূল। লয়েড জর্জ্জ কি প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাহা সকলেই জানে। সুতরাং এখন বাগে পাইয়া লয়েড জর্জ্জ কনজারভেটিভ গভর্ণমেণ্টের 'ভূতের কথা' প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, খুবই ভিতর হইতে [illegible]

struggling for the elementary and fundamental rights of every free and self-respecting nation. The record of Western civilization in China was indeed black and that foreigners there were suffering from their own greed."

যে লয়েড জর্জ্জ আয়ার্ল্যাণ্ডে 'Black and Tan' পাঠাইয়া তত্রত্য স্বাধীনতাকামী আইরিশদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার মুখে এ কথা কি বড় মজার বলিয়া মনে হয় না ? লয়েড জর্জ্জ যে হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিলেও জগতের লোক বিশ্বাস করিবে না। তিনি যে দলাদলির খাতিরে এখন গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতেছে। তবে যে কারণেই হউক, কথাটা সত্য। তাই লর্ড বার্কেণহেড তাঁহার উপর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছেন, সাম্রাজ্য-গর্ব্বী ধনী বণিকদের স্বার্থরক্ষাকারী সংবাদপত্রের দল রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছেন। লর্ড বার্কেণহেড লয়েড জর্জ্জকে গালি পাড়িতে গিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে,—"চীনের বর্ত্তমান আন্দোলনের মূলসূত্র কোথায় এবং উহার শেষ উদ্দেশ্য কি, তাহা গুপ্ত থাকিলেও জানিতে বাকী নাই। মস্কোয়ের চতুর চক্রীরা যে ইহার মূল, তাহা জানা আছে।" অথচ চিচেরিণ কি বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লর্ড বার্কেণহেড লয়েড জর্জ্জের উক্তিকে "দায়িত্বহীন, ভিত্তিহীন, দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও অনিষ্টজনক" বলিয়া অভিহিত করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি বলেন, ইংরাজ চিরদিনই চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অভিলাষী নহে, বরং ইংরাজ শান্তির পথ অনুসরণ করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া (by pacific and persuasive methods) চীনের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু লর্ড বার্কেণহেডের এই উক্তি চীনে সংঘটিত বর্ত্তমান অবস্থার দ্বারা সমর্থিত হয় না। ইয়াংসি নদীতে ইংরাজের সশস্ত্র বাণিজ্যপোত ও গান-বোটের কীর্ত্তি এবং সাংহাই বন্দরে চীনা ছাত্রাদির উপর গুলীবর্ষণ তাঁহার "শান্তির পথ" বা "বুঝানর পথ" সমর্থন করে না।

পূর্ব্বাপর ঘটনা

চীনের সহিত প্রতীচ্যের ব্যবহার ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ বৎসর তদানীন্তন ভারতের বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলি বলপূর্ব্বক মাকাও বন্দর অধিকার করিয়া লয়েন। ঐ বন্দর চীন কর্তৃপক্ষ পোর্টুগীজদিগকে পত্তনী দিয়াছিলেন। পাছে ফ্রান্সের বন্ধু পোর্টুগালের নিকট ফরাসীরা ঐ বন্দর আদায় করিয়া লয়েন, এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেসলি এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সহিত তখন ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া নিরপেক্ষ চীনের বন্দর এইরূপে অধিকার করা কোন্ ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত ? উহা কি pacific and persuasive methodএর নমুনা ? ইংরাজের সেই চেষ্টা সে সময়ে বিফল হয়। কিন্তু পরে ১৮০৮ ও ১৮১৪ ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ঐরূপে চীনের ভূখণ্ড বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়েন। তাহার পর ১৮৪০ ও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের "অহিফেন যুদ্ধ"। ঐ সময়ে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর "বাণিজ্য-স্বার্থ" বিস্তৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই বন্দুক-বেয়নেটের সাহায্যে চীনকে কিছু অহিফেন "গিলিতে" বাধ্য করা হইয়াছিল। পরে মিঃ বনার ল লর্ড বার্কেণহেডের মত মুখে বলিয়াছিলেন, চীনের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই, তবে কার্য্যে দেখাইয়াছিলেন যে, "There are certain places lying next to British possessions or perhaps strategically

কেমন "শান্তি" ও "বুঝানর" কথা ! ব্রহ্ম ও সিকিম চীনের অধীন দেশ ছিল। এগুলিও সম্ভবতঃ এই নীতি অনুসারে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অঙ্গগত হইয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিব্বতটিও এইরূপে "শান্তি ও বুঝানর" বেড়াজালে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল ; তবে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বর্ত্তমানে ইয়াংসি নদীর উত্তর তটস্থ ভূভাগে ইংরাজ বণিক ও ব্যবসায়ীর স্বার্থরক্ষার্থ এইরূপ "শান্তি ও বুঝানর" নীতি অনুসৃত হইতেছে, সে জন্য বৃটিশ গান-বোট ও নৌসেনার সমাবেশ হইতেছে, মাল্টা ও অন্যান্য স্থান হইতে রণতরী প্রেরিত হইতেছে, সিঙ্গাপুরে নৌবহরের আড্ডা প্রতিষ্ঠার কথা স্থির হইতেছে। দক্ষিণী ক্যাণ্টনীদিগের বিপক্ষে স্থানীয় ইংরাজ বণিকদিগের উপেইফুকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রণসম্ভার যোগান দিবার কথাটাও বোধ হয় এই নীতির অন্তর্ভুক্ত !

নিরপেক্ষ ইংরাজ

সৌভাগ্যের বিষয়, সকল ইংরাজ রাজনীতিকই সাম্রাজ্যগর্ব্বী বা ধনী বণিকদিগের সহিত একমত নহেন। লয়েড জর্জ্জ যে কারণেই হউক, সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। লর্ড ইঞ্চকেপ পি এণ্ড ও কোম্পানীর বড়কর্ত্তা ; তিনি ইংরাজের প্রতি চীনাদের বিদ্বেষের কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন,—এই বিদ্বেষ ইংরাজ বণিকদিগের বিপক্ষে নহে, মিশনারীদের বিপক্ষে। এই মিশনারীরাই যত নষ্টের গোড়া, ইহাই তাঁহার অভিমত। সুতরাং তাঁহার মতে মিশনারীদের সরাইলেই যত বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু তাহাই কি ঠিক ? কেবল ইংরাজই যে এ যাবৎ চীনে মিশনারী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। তবে চীনারা কেবল ইংরাজের উপর অসন্তুষ্ট কেন ? তাহার পর দক্ষিণ-চীনের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন স্বয়ং খৃষ্টান ছিলেন ; অথচ তাঁহার মত জনপ্রিয় নেতা বর্ত্তমানে চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পরন্তু মার্শাল ফেঙ্গ য়ুসিয়াঙ্গও খৃষ্টান। তাঁহার প্রতি ত ক্যাণ্টনীরা বিদ্বিষ্ট নহে। তবে ? আসল কথা, লর্ড ইঞ্চকেপ যতই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করুন, চীনাদের ইংরাজ-বিদ্বেষের মূল ধর্ম্মগত নহে, উহা ইংরাজ ক্যাপিটালিষ্ট ও ইম্পিরিয়ালিষ্টদের বাণিজ্যপ্রসারের এবং প্রতিপত্তিপ্রসারের চেষ্টার জন্যই সঞ্জাত হইয়াছে। এ কথা নিরপেক্ষমাত্রেই স্বীকার করিবেন। লয়েড জর্জ্জ ও লর্ড ইঞ্চকেপ ব্যতীত ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং শ্রমিক নেতা জর্জ্জ ল্যান্সবেরী প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরাজ রাজনীতিকরাও চীনে ইংরাজের হস্তক্ষেপনীতির ঘোর নিন্দা করিয়াছেন।

মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন, "ক্যাণ্টন গবর্ণমেণ্ট এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, যাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদিগকে মানিয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এখন এমন সময় আসিয়াছে, যাহাতে শক্তিপুঞ্জের স্বীকার করা উচিত যে, নূতন চীন নূতনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

বিখ্যাত লেখক মিঃ জে, এল, গার্ভিণ "অবজারভার" পত্রে লিখিয়াছেন, "চীনের জীবন-নাটকে যে অভিনয় হইতেছে, জগতের ইতিহাসে এত বড় সঙ্কট-সঙ্কুল অভিনয়ের অবস্থা অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছে। চীনের লক্ষ্য—জাপান এত দিন যে ভাবে অন্যান্য স্বাধীন জাতির সহিত সমানে সমানে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ রাজনীতিক ও বাণিজ্যগত অধিকার লাভ করিয়া অন্যান্য শক্তির সহিত সমান সমান স্থান অধিকার করা। চীনের এই আন্দোলন বলশেভিকনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত নহে, ইহা জাতীয় মুক্তিকামনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজ জাপানের এইরূপ ন্যায্য দাবী পূর্ণ করিয়াছেন, এখন চীনকেও এই দাবী হইতে বঞ্চিত করিবার সাধ্য

নীতি চালাইতে উত্তেজিত করিতেছে। এক দিন তুর্কী'র সহিত ব্যবহারে এই ভাবে 'গাণ-বোট-নীতি' অনুসরণ করিয়া প্রায় সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। চাণক নামক স্থানে তুর্কী'কে বাধা দিতে গিয়া শেষে অপমানের সহিত আমাদিগকে হটিয়া আসিতে হইয়াছিল। চীনেও সেই নীতি অবলম্বন করিতে গেলে আমাদিগকে অপমানের সহিত হটিয়া আসিতে হইবে। 'গান-বোট' পাঠাইয়া ভয় দেখানর দিন চিরকালের জন্য অতীত হইয়াছে। এখন চীনকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত সমানে সমানের ব্যবহার করিয়া বন্ধুত্ব ও সন্ধিশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে।"

বর্ত্তমানে বড় বড় শক্তিশালী ইংরাজ কনজারভেটিভ সংবাদপত্রও চীনের সহিত সমানে সমানের ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেছেন কেন, তাহার কারণ পরে বলিতেছি। আপাততঃ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বহু ইংরাজ চীনের স্বাধীনতা যুদ্ধের জয়যাত্রার পথে অন্তরায় হইতে বিশেষ অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন। ইহা অতীব আনন্দের কথা। একটি প্রাচীন সভ্য জাতির স্বাধীনতার জয়যাত্রায় সকলেরই সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত।



চীনের নূতন বৃটিশদূত মিঃ মাইল্‌স্‌ ল্যাম্পসন

বলশেভিক প্রভাবের কথা সত্য নহে

ক্যাণ্টনীরা বলশেভিক প্রভাবান্বিত বলিয়া তাহাদের উপর যে দোষারোপ করা হইতেছে, তাহা সত্য নহে। কুওমিনটাঙ্গ দলের এক জন প্রধান দলপতি স্বয়ং এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহার নাম ডাক্তার উ। তিনি বলেন, "১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন ডাক্তার সানইয়াটসেন মাঞ্চু রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দেশে সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার দলের নামকরণ করিয়াছিলেন "কুওমিনটাঙ্গ।" এই চীনা কথার অর্থ জাতীয় দল। সেই দল বলশেভিক প্রভাবের আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ করে নাই। এই দক্ষিণের ক্যাণ্টনী দলই এখন চীনে একমাত্র রাজনীতিক দল। ইহার তিনটি মূল নীতি আছে। সেই নীতি কয়টি মানিলে যে কেহ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে ইহার সদস্য হইতে পারে। এই three principles of the people এইরূপ :—

(১) এই নীতি চীনজাতির স্বাধীনতা কামনা করে। যে জাতিগত স্বতন্ত্রতা নীতি অনুসারে ইটালীর মুক্তি হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর পুনর্জ্জন্ম হইল, য়ুরোপীয়রা চীনের সেই নীতি অনুসারে চীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন।

চীনের যে জাতীয় দল মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন, সেই দলের শক্তি সামান্য নহে। সেই শক্তিই এখন চীনের মুক্তির চেষ্টা করিতেছে। বিদেশীর রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অধীনতা-পাশ হইতে চীন এই মুক্তি কামনা করিতেছে। ডাক্তার সান চীনের Father of the Republic, তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তিনি চীন জাতিকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য এই বিরাট চীন জাতি আর কখনও semi colonial অথবা sub colonial অধীন জাতির মত বিদেশীয়ের রাজনীতিক ও ব্যবসায়বাণিজ্যগত সাম্রাজ্যিক প্রভুত্ব মানিয়া চলিবে না। ইহাই হইল প্রথম নীতি।

সংক্রান্ত কোনও কার্য্যের সূত্রপাত করা, ভোট দেওয়া, কোনও বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া, কোনও মন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারী, সেনাপতি প্রভৃতির অপরাধ দেখিলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে ইস্তফা দেওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রজার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইবে। অবশ্য এ বিষয়ে প্রজাকে সম্যক্ শিক্ষাদান করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) প্রজার জীবিকানির্ব্বাহের উপায়বিধান করা হইতেছে, ডাক্তার সানের নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় নীতি। এ জন্য যাহাতে দেশের জমী অল্প কয়েক জনের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত না হয়, তাহা দেখিতে হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যও অল্প লোকের অধিকারভুক্ত রাখা হইবে না, উহাও ষ্টেট সকলের উপকারার্থ নিয়মিত করিবেন।

ডাক্তার উ বলেন, যেহেতু ডাক্তার সানের এই তিন নীতির মধ্যে অল্পের একচেটিয়া অধিকার ভোগের সুযোগের অবসান করিয়া দেওয়ার ইঙ্গিত আছে, সেই হেতু বিদেশী ধনী ব্যবসায়ীরা ইহার মধ্যে কমিউনিজম অথবা বলশেভিজমের গন্ধ পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যখন ডাক্তার সান এই তিন নীতি প্রবর্ত্তন করেন, তখন কমিউনিজম বা বলশেভিজমের জন্ম হয় নাই।

কিসে বিবাদের সূত্রপাত

ডাক্তার উ যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, যথার্থই চীনের জাতীয় দলের কোনও বৈদেশিকের সহিত শত্রুতা নাই। যদি বৈদেশিকরা যথার্থ চীনের মঙ্গলকামী হয়েন, তাহা হইলে ডাক্তার সানের এই নীতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের বলিবার কিছু নাই। কুওমিণ্টাঙ্গ বা জাতীয় দল ডাক্তার সানের পতাকাবাহী, সুতরাং তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের কোন মতবিরোধ বা শত্রুতা থাকিতে পারে না। তবে যদি তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতীয় ধনী ও ব্যবসাদারদের স্বার্থরক্ষার্থ চীনের স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা দেন, 'গান বোট' নীতি অনুসরণ করিয়া মুক্তিকামী চীনকে ভয়প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। চীন তাঁহাদেরই মত স্বাধীন জাতি, এ কথাটা স্মরণ রাখিলে বোধ হয়, তাঁহাদিগের গান-বোট নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হইত না। অশ্বেত জাতিমাত্রেই নিকৃষ্ট আর শ্বেতজাতিমাত্রেই উৎকৃষ্ট, এ কথাটা অনুক্ষণ ধারণা করিলে গোলযোগ বাধিবেই। শ্বেত জাতিরা যে জগদীশ্বরের নির্ব্বাচিত বা মনোনীত জাতি, আর সকল জাতি তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত, অতএব শ্বেত জাতিদিগের অভিভাবকত্ব তাঁহারা ঈশ্বরদত্ত অধিকারবলে লাভ করিয়াছেন, এই মনের চশমা পরিলে অনর্থপাত হইবেই। হইয়াছেও তাহাই। কি ভাবে দক্ষিণী ক্যাণ্টনীদিগের সহিত ইংরাজের বর্ত্তমান মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার দুইটি বিভিন্ন বিবরণ পাঠ করিলেই অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। সাংহাই বন্দরে দর্শ্মঘটী চীন ছাত্রাদির উপর বৃটিশ পক্ষ হইতে গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, ইহাই বিবাদের মূল,—চীন পক্ষ এই কথা বলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যিক ইংরাজ পক্ষ সে কথাটার উল্লেখ না করিয়া, ওয়ানসিয়ানে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহারই উপর জোর দিয়া চীনকে অপরাধী করিতেছেন। বিলাতের "টাইমস" পত্র সেই ব্যাপারের সম্বন্ধে এই বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"ওয়ানসিয়ানের স্থানীয় চুং বা শাসনকর্ত্তা মাঝে মাঝে ইংরাজের

হইতে অন্য নদী-বন্দরে চীনা সেনা প্রেরণ করিতেন। তিনি নামে মাত্র মার্শাল উপেইফুর অধীনে, তাঁহার নাম জেনারল ইয়াং সেন। এক দিন তাঁহার সেনারা ওয়ানলিউ নামক বৃটিশ জাহাজ ধরিল, জাহাজের নঙ্গর ফেলার অবসর না দিয়াই তাহারা অধীর হইয়া জাহাজে উঠিল। ফলে জাহাজের নাবিকরা তাল সামলাইতে না পারিয়া ধাক্কা মারিয়া একখানা চীনা নৌকা ডুবাইয়া দিল। ঐ নৌকায় জেনারল ইয়াং-সেনের সেনা ও কিছু রৌপ্য ছিল। রৌপ্য নষ্ট হওয়ায় জেনারল ইয়াং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার সেনারা ওয়ানলিউর ইংরাজ আরোহীদিগকে ভয় দেখাইল ও অতীব কঠোরভাবে ব্যবহার করিল। তাহারা কাপ্তেনকে জাহাজ চালাইয়া ওয়ানসিয়েন বন্দরে লাগাইতে বাধ্য করিল। সেখানে ইংরাজের রণতরী ককচ্যাফার উপস্থিত ছিল। ইহার কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং চীনা সৈন্য-দিগকে ওয়ানলিউ জাহাজ হইতে নামাইয়া দিলেন। জেনারল ইয়াংসেন ইহাতে বিন্দুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়া আরও দুইখানা বৃটিশ বাণিজ্যপোত আটক করিলেন এবং উহার ইংরাজ কর্ম্মচারী-দিগকে বন্দী করিয়া জাহাজ দুইখানা চীনা সৈন্যে ভর্ত্তি করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যরা বন্দুক ও মেসিন গানে সজ্জিত হইয়া রণতরী কক-চেফারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রাজনীতিক কথাবার্ত্তা দ্বারা এই ব্যাপার আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু পিকিংয়ের বৈদেশিক মন্ত্রী বলিলেন যে, রাজধানী ও তন্নিকটবর্ত্তী কতকটা ভূভাগ ব্যতীত তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব চীনের অন্য কেহ মানে না, কাযেই তাঁহাদের সহিত বন্দোবস্তের কথা কে শুনিবে? পিকিংয়ের বৃটিশ দূত জেনারল উপেইফুকে তার করিলেন, কিন্তু তখন তিনি ক্যাণ্টনীদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া দ্রুতপদে পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছেন, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অপমান হজম করিয়া তখন জেনারল ইয়াংসেনেরই সহিত আপোষে কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইয়াং তাঁহার বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে চাহিলেন না। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বলিলেন,—এ বিষয়ে তদন্ত হউক; কোনও ব্যাঙ্কে ইংরাজ নির্দ্দিষ্ট টাকা গচ্ছিত রাখিবেন; যদি তদন্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, ওয়ানলিউ জাহাজের কাপ্তেন চীনা নৌকা অন্যায়রূপে ডুবাইয়াছেন, তাহা হইলে ইয়াংয়ের নিমজ্জিত রৌপ্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঐ টাকা ইয়াংকে দেওয়া হইবে। ইহাতেও ইয়াং সম্মত হইলেন না। অগত্যা বৃটিশ পক্ষ এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য—বৃটিশ বন্দীদিগের মুক্তিসাধন করা এবং বৃটিশ গানবোট ককচেফারের উদ্ধারসাধন করা। ধৃত জাহাজদ্বয় হইতে চীনারা অগ্নিবর্ষণ করিতে এবং স্থল হইতে টুচুনের সেনারা গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ফলে বৃটিশ পক্ষে ২০ জন লোক হতাহত হইল। অবশ্য চীনাদের পক্ষে ইহার অনেক অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। বৃটিশ বন্দীদিগের উদ্ধার সাধিত হইল, কিন্তু ধৃত বাণিজ্য-তরী দুইখানির মুক্তি সাধিত হইল না। জেনারল ইয়াং সে দুইখানি ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া এখন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, চীনের ব্যাপারে মার্কিণ ও জাপান যে কারণেই হউক, নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং এখন আমাদিগকে একাকী চীনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ইহা হইল বৃটিশ পক্ষের কথা। এ 'শান্তিরক্ষার' অর্থ কি, তাহাও সকলে বুঝে। কিন্তু অপর পক্ষেরও কথা আছে। শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা জর্জ ল্যান্সবেরী "Labour Weekly" নামক পত্রে অপর পক্ষের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মুখবন্ধে বলিয়াছেন, এই মহৎ জাতি (চীন) আজ ৭০ বৎসর যাবৎ প্রতীচ্যের স্বার্থপর সাম্রাজ্য-গর্ব্বী শক্তিগণের দ্বারা নির্য্যাতিত ও লুণ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এইবার সেই বিরাট জাতি জাগিয়াছে। এখন তাহারা প্রতীচ্যের ধূর্ত্ত জাতিদিগের নীচ লোভ ও স্বার্থপ্রণোদিত করিতেছে। এ জন্য তাহারা আমাদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের উপর ধারাবাহিকরূপে কিরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহার আমূল পরিচয় কয় জন উচ্চপদস্থ চীন ভদ্রলোক জগতের নিরপেক্ষ লোকের সকাশে নিবেদন করিয়াছেন। বৃটেন যদিও চীনের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই, তথাপি তাহার রণতরী সমূহ কিরূপে চীনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার বিবরণ এই নিবেদনে বর্ণিত হইয়াছে। যদি বৃটেন, ফ্রান্স কিংবা ইটালীর বিরুদ্ধে এমন ব্যবহার করিত, তাহা হইলে আর একটি ঘোর সমর সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই।

অতঃপর মিঃ ল্যান্সবেরী চীন ভদ্রলোকগণের নিবেদনপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিবেদনপত্রের বিবরণ এইরূপ,—

"ওয়ানসিয়েন, ৪ঠা অক্টোবর,
১৯২৬ খৃষ্টাব্দ।

জগতের ভদ্রমহোদয়গণ,

বৃটিশ অর্ণবপোত সমূহ চীনের নদীতে যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, তন্মধ্যে ওয়ানসিয়েনের অত্যাচারই চরম। মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বাটারফিল্ড ও সয়ার কোম্পানীর বৃটিশ পোত 'ওয়ানলিউ' ইউনিয়াং নামক স্থানে তিনখানি চীনা নৌকা ডুবাইয়া দেয়। ঐ নৌকায় জেনারল ইয়াংসেনের সেনাদলের ৫৮ জন নৌসেনানী ও সেনা ছিল এবং ৮৫ হাজার ডলার মুদ্রা ছিল। জেনারেল ইয়াং-সেন এ বিষয়ে তদন্ত করিতে গেলে ঐ জাহাজের লোকের প্ররোচনায় 'ককচেফার' নামক বৃটিশ গান-বোট ঐ দিন ওয়ানসিয়েন সহরের উপর মেসিন-গান হইতে গুলী বর্ষণ করিতে থাকে। অথচ জেনারল ইয়াং ইহার উত্তরে একটি গোলাগুলীও নিক্ষেপ করেন নাই। এই সময়ে আপোষে মীমাংসার কথা চলিতেছিল। কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতেই ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের বেলা ৪টার সময় 'কক-চেফার' ও 'উইজিওন' নামক দুইখানি বৃটিশ গান-বোট এবং 'কিয়া-ওয়া' নামক সশস্ত্র বৃটিশ বাণিজ্য-পোত হইতে নিরস্ত্র ওয়ানসিয়েনবাসী চীনাদের উপর অতর্কিতভাবে বৃষ্টিধারার মত গুলী-গোলা বর্ষিত হইতে থাকে। ফলে সহর তৎক্ষণাৎ অগ্নিদগ্ধ হয়। অসংখ্য লোক উহাতে হতাহত হয় এবং বহু সম্পত্তি ধ্বংস হয়। আরও কয়খানি বৃটিশ গানবোট ওয়ানসিয়েন আক্রমণ করিতে আসিতেছে বলিয়া শুনা যায়। ভাণ্ডালদিগের বর্ব্বরতার কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এই বৃটিশ অপরাধীরা সেই প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। এই গোলাগুলী বর্ষণের ফলে ওয়ান-সিয়েনের ব্যবসায়কেন্দ্র সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন কি, ফরাসীদের ক্যাথলিক গির্জ্জাটিও এই ধ্বংস হইতে নিস্তার পায় নাই।

"ইহার পর জেনারল ইয়াংসেন এই বর্ব্বরতার সমুচিত উত্তর প্রদান করেন এবং গোলাবর্ষণ করিয়া বৃটিশ গানবোটদিগকে পরাজিত করেন।

'কিয়াওয়া,' 'ককচেফার' ও উইজিয়নে' বলপূর্ব্বক দুইখানা বৃটিশ ষ্টীমারকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। জেনারল ইয়াংসেন বৃটিশ ষ্টীমার 'ওয়ানলিউর' অপরাধের জন্য ঐ দুইখানা ষ্টীমার আটক করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ! গত ৩ মাস ধরিয়া এই ওয়ানলিউ শ্রেণীর বৃটিশ বাণিজ্যপোত ইয়াংসি নদীতে অনেকগুলি চীন নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় প্রতীকার প্রার্থনা করিতে গিয়া জেনারল ইয়াংসেন অপরাধী হইয়াছেন। প্রতী-কারের পরিবর্ত্তে বৃটিশ পোত 'ককচেফার' সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিবর্ষণ করিয়া দুই জন চীন সৈনিককে সাংঘাতিকরূপে জখম করে। ইহা কি যুদ্ধ-ঘোষণা নহে?"

এই নিবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন—(১) ওয়ানসিয়েন জিলা



বৃটিশের সহিত সংঘর্ষে চীনা জাহাজের দুর্দশা

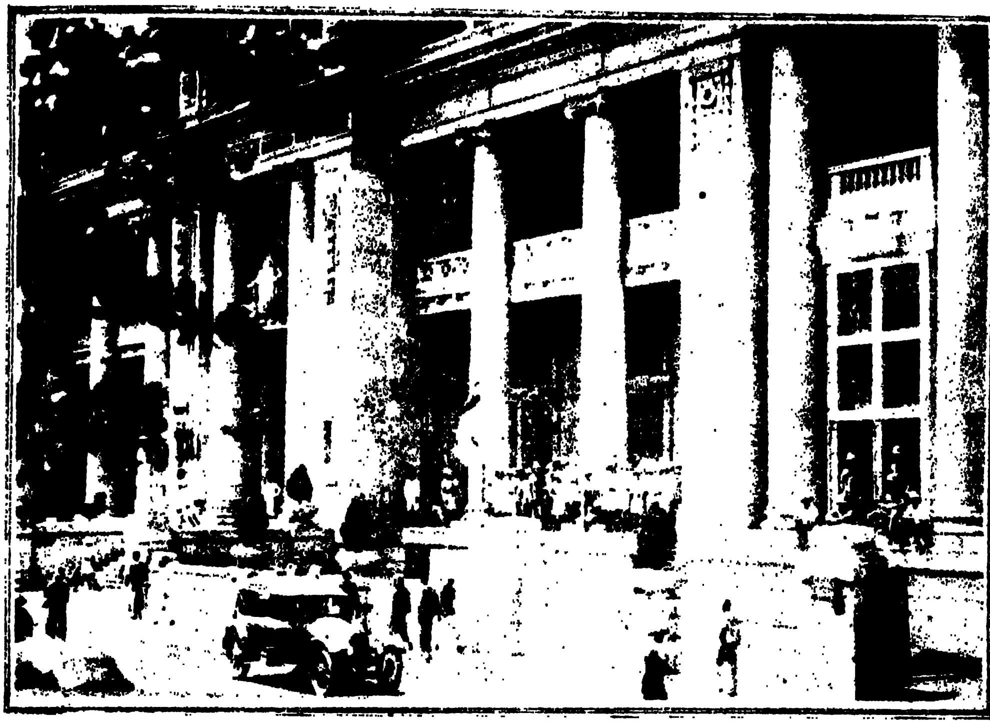
প্রেসিডেন্ট ইয়াং, (৩) কৃষি সমিতির চেয়ারম্যান পান, (৪) বণিকসভার চেয়ারম্যান লাংপেং লিউ, এবং (৫) জনরক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্ট ইউসান হো।

এতগুলি শিক্ষিত উচ্চপদস্থ সুসভ্য চীন ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য, কি 'টাইমস' প্রমুখ সাম্রাজ্যগর্ব্বী ধনী বণিকদিগের স্বার্থপোষক সংবাদপত্র যে বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—তাহা নিরপেক্ষ জনসাধারণ বিচার করিবেন।

এখন কথা এই যে, যে কারণেই হউক, চীন জাতি আর নিজের দেশে পরের অধীনে আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে না। তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের কাষ্টম, তাহাদের আদালতের বিচার তাহাদের হাতেই থাকিবে,—বিদেশী সে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, ইহাই এখন চীনের জাতীয় দলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বিদেশীয়রা এখন কি করিবেন? তাঁহারা কি এখনও স্বদেশের ধনী ব্যবসাদার ও সাম্রাজ্যবাদীর প্ররোচনায় চীনে 'গান-বোট' নীতি আপনাদের চীনে অবস্থিতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইবেন? মার্কিণ, ফরাসী ও জাপান ইতোমধ্যেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, রুসিয়ার ত কথাই নাই। বাকী ইংরাজ। তাঁহারা কি করিবেন?

যদিও ইংরাজ বণিক চীন হইতে এখনও তারস্বরে হাতে চীনার মাথা কাটিবার পরামর্শ দিতেছেন, তথাপি মনে হইতেছে, অবস্থা বুঝিয়া ইংরাজ রাজনীতিক কর্ত্তৃপক্ষের এবং শক্তিশালী ইংরাজ সংবাদপত্রসমূহের সুর ফিরিয়াছে। চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক মিঃ এইচ, এন ব্রেলসফোর্ড এই বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"আমাদের পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী যদি খোলা হাত-পা পাইতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনামত কায করিবার স্বাধীনতা পাইতেন, তাহা হইলে চীনদেশের হ্যাঙ্কো প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ বিপন্ন না হইলে তাঁহারা গান-বোট নীতি অনুসরণ করিবেন না। কিন্তু এই মনোভাবও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আমাদিগকে একবারে 'গান-বোট' নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে চীনে আমরা তিষ্ঠিতে পারিব। চীনে আমাদের গানবোটসমূহের অবস্থিতিই বিপদ ঘটাইবে। যত দিন এই সকল চীনদেশে থাকিবে, তত দিন চীনবাসীরা আমাদের বিপক্ষে অসন্তোষ পোষণ করিবে। তাহারা আমাদের বণিকদের ব্যবসায় উপলক্ষে চীনে অবস্থিতি আপত্তিজনক মনে করিতে না পারে, কিন্তু সেই বণিকরা অন্যান্য প্রজার ন্যায় তাহাদের চৈনিক আইন মানিয়া চলিবে, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারে। বিশেষ অধিকারের (privileges) দিন অতীত হইয়াছে, এ কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। কনশেসন সমূহে বৈদেশিক আইন আদালত এবং বৈদেশিক রক্ষিসেনার অবস্থিতি স্বাধীন চীন আর স্বীকার করিবে না। বস্তুতঃ আমাদের গান-বোটনীতিই সকল অনিষ্টের মূল। অন্য কোনও স্বাধীন দেশে আমাদের গানবোট নদীর মধ্যে শান্তিরক্ষার ছুতায় পাহারা দিয়া বেড়ায় না। নিজের দেশে পরের দ্বারা শান্তিরক্ষা অপমানের কথা মনে করিয়া চীনজাতির আত্মসম্মান যখন একবার উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তখন আর ভয়প্রদর্শনের নীতি অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। বরং তৎপরিবর্ত্তে স্থানীয় চীন কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি চীন কর্ত্তৃপক্ষ সে আশ্রয় না দিতে পারেন, তাহা হইলে কিছু কালের জন্য আমাদের চীনপ্রবাসী স্বজাতীয়গণকে চীন হইতে স্থানান্তরিত করাই উচিত, কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র অভিযান এখন অবিমৃষ্যকারিতার চরম হইবে। এই যে চীনের ইংরাজরা মনে ভুলিয়াছেন যে, তাঁহাদের জীবন ও সম্পত্তি সর্ব্বদাই



হাংকাওয়ে "সাংহাই" ব্যাঙ্কে বৃটিশ নৌসেনার আড্ডা

Capitalist ও Imperialistরা তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা উত্তরের War-Lordদিগের রণযাত্রায় দক্ষিণের জাতীয় দলের বিপক্ষে সাহায্য করিতেছেন। কয়েক জন প্রধান ইংরাজ বণিক উত্তরের War-Lordদিগকে বহু অর্থ ঋণ দিয়াছেন। পাছে উত্তরের দল হারিলে তাঁহাদের সে টাকা মারা যায়, সেই আশঙ্কায় তাঁহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে দক্ষিণের দলের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে প্ররোচিত করিতেছেন। উত্তরের দল দক্ষিণের দলের নিকট বিষম পরাজিত হইয়াছে, তাই আমাদের পররাষ্ট্রবিভাগ তাঁহাদের কথায় সহসা কর্ণপাত করিতেছেন না। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, এখন দক্ষিণের জাতীয় দলের স্বাধীনতার আন্দোলনে বাধা দেওয়া বিফল। তাই তাঁহারা ভবিষ্যতের চীন গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ভবিষ্যতে চীনে বৃটিশ বাণিজ্য ও প্রভাব যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক দিন মিঃ চার্চ্চিল, রুসিয়ার জাতীয় আন্দোলনকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। বোধ হয়, বর্ত্তমান পররাষ্ট্রবিভাগ ইতিহাসের সেই শিক্ষা স্মরণ করিয়া চীনের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করেন নাই। বরং তাঁহারা তাঁহাদের সহিত একযোগে অন্যান্য শক্তিকে চীনের স্বাধীনতা মানিয়া লইয়া নূতন সন্ধিসর্ত্ত করিতে আহ্বান করিতেছেন। যদি তাঁহাদের এই বর্ত্তমান সঙ্কল্প স্থির হইয়া থাকে, তবেই মঙ্গল, নতুবা আবার যদি তাঁহারা বৃটিশ বণিক ও ধনীদিগের প্ররোচনায় উত্তপ্তমস্তিষ্ক হইয়া গান-বোট নীতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে প্রাচ্যে এমন কালানল জ্বলিয়া উঠিবে, যাহা কল্পনা করিতেও মনে আতঙ্ক হয়।"

মিঃ ব্রেলসফোর্ডের উক্তির সারবত্তা নিরপেক্ষমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। জাতির যখন আত্মশক্তিতে অপ্রত্যয় হয়—করিয়া আরাম ও সুখবিলাসে অভ্যস্ত হয়, পরের উপর আপন রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত গতানুগতিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিয়া লয়, তখন তাহাকে শক্তিমান স্বার্থান্বেষী জাতি কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণের মত যেমন ভাবে ইচ্ছা গড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু একবার যদি জাতি আত্মপ্রবুদ্ধ হয়—আপনাকে চিনিয়া লয়, আপনার শক্তিতে তাহার প্রত্যয় জন্মে,—তাহা হইলে জগতে এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহার জয়যাত্রায় বাধা-প্রদান করিতে পারে। জাপান যে দিন কমোডোর পেরির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, শ্বেতজাতির সহিত ব্যবহার করিতে হইলে অশ্বেত জাতিদিগকে হয় শ্বেতজাতির বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা শ্বেতজাতিরই কৌশল ও অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া উহা দ্বারা শ্বেতজাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই দিন হইতে জাপান আপনার ঘর সামলাইয়া লইয়াছে। এই দুই পথ ছাড়া অন্য উপায় নাই। চীন বহু কালের সুষুপ্তির পর জাগরিত হইয়া সেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। চীন তাই এখন আরাম ও ভোগবিলাসের এবং নিশ্চিন্ততার পথ পরিহার করিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিয়া শ্বেতজাতির কৌশল ও অস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছে এবং উহা সম্বল করিয়া জয়যাত্রার পথের পথিক হইয়াছে। এ জয়যাত্রায় সমগ্র দুর্ব্বল পরমুখাপেক্ষী অশ্বেতজাতির সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এখন এসিয়াবাসী জাতিমাত্রেই চীনকে কায়মনোবাক্যে বলিতেছে,—"শুভাস্তে পন্থানঃ !"

জাপ-সম্রাটের পরলোক

জাপানের সম্রাট ইয়োসিহিতো (হারুনোমিয়া) গত ২৫শে ডিসেম্বর

রাজধানী টোকিও সহরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা সম্রাট মৎসুহিতোর মৃত্যুর পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্স কুজোর কন্যা রাজকুমারী সাদাকোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর-বৎসরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রেল তারিখে তাঁহাদের প্রথম সন্তান ক্রাউন প্রিন্স হিরোহিতো ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাঁহাদের দ্বিতীয়



জাপানের মৃত সম্রাট ইয়োসিহিতো

সন্তান প্রিন্স ইয়াসুহিতো, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ইহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স নবুহিতো এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স তাকাহিতোর জন্ম হয়।

জাপানের রাজবংশ অতি প্রাচীন। জাপানের ইতিহাসে আছে যে, ৬৬০ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে সম্রাট জিম্মু তেন্নো জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম সম্রাট। এক সময়ে জাপানের সামুরাই অথবা ক্ষত্রিয়বংশ সম্রাট অপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা এক দিনে তাঁহাদের নানা বিশেষ অধিকার বর্জ্জন করেন এবং দেশের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করেন। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জাপানের রাজবংশ নিয়মতন্ত্রাধীন (constitutional monarch) হইলেও সামুরাই ও অন্যান্য জাপপ্রজা তাঁহাদিগকে দেবতাভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। জাপ জাতির রাজভক্তি দেশ-প্রীতিরই অনুরূপ। সম্রাট ইয়োসিহিতোর সিংহাসনপ্রাপ্তির দুই বৎসর পরে যখন সারা বিশ্বে জার্ম্মাণ-যুদ্ধের কালানল জ্বলিয়া উঠে, তখন সম্রাটের আহ্বানে জাপজাতি প্রাচ্যে জার্ম্মাণ পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সম্রাট মৎসুহিতোর রাজত্বকালে রুস-জাপান যুদ্ধে জাপ প্রজা সম্রাটের আহ্বানে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণে কিরূপ অতুল আত্মত্যাগ করিয়াছিল, তাহা আজিও অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে।



জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট হিরোহিতো সস্ত্রীক

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাপানে Imperial House Law নামক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ঐ আইনের বিধানমতে জাপানের রাজবংশের পুত্রসন্তানদিগের সিংহাসনপ্রাপ্তি চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। যদি রাজবংশের ধারাবাহিক বংশধর বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতির সিংহাসন লাভ করিবার কথা। রাজবংশের বাৎসরিক বৃত্তি ৪৫ লক্ষ ইয়েন জাপানী মুদ্রায় নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজা যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা করিতে পারেন এবং সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে পারেন।

সম্রাট ইয়োসিহিতো ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিষম পীড়িত হয়েন। তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ জন্য রাজকার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর হইতে যুবরাজ (ক্রাউন প্রিন্স হিরোহিতো) 'রিজেণ্ট' নিযুক্ত হয়েন। রিজেণ্ট নিযুক্ত হইবার পর যুবরাজ হিরোহিতো ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী নোগাকোর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি রাজার অভিভাবক ও প্রতিনিধিরূপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সম্রাটরূপে বিঘোষিত হইয়াছেন।

প্রভাত

কুসুম নাচিছে দেখ মলয়ের মৃদু বায়,
সুখের প্রভাত সখি আসিয়াছে এ ধরায়।
মঙ্গল গাহিছে পাখী বসিয়া শাখার 'পরে
কুমুদী বিরহ-দুখে মুদিতা সরসী-নীরে ;

মারুত কহিছে, বালা, কেন এ মলিন মুখ,
রীতি এই জগতের দুখ পরে আসে সুখ।
দেখিয়া বিধুরা তোরে বিধু যে কাঁদিয়া যায়,
বিরহ না হ'লে কি গো মিলনের সুখ হয় ?

মুদ্রামূল্য-সংস্কার

সরকার ভারতীয় প্রচলিত মুদ্রার সংস্কারসাধনে মনস্থ করিয়াছেন। মুদ্রামূল্যের বারংবার বিপর্য্যয়সঙ্ঘটনই তাহার প্রধান কারণ। মুদ্রামূল্যের বিপর্য্যয় ঘটিলেই বাণিজ্যের অসুবিধা ঘটে; বাণিজ্যের অসুবিধা জন্মিলেই অর্থাগমের বাধা জন্মে। ইহাতে জনসমাজের প্রবল অসুবিধা জন্মে, তাহাদের মনে অত্যন্ত বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সেই জন্য সরকার এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা রয়্যাল কারেন্সি কমিশন বসাইয়াছিলেন। এখন সেই কমিশনের পরামর্শ অনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সে জন্য আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে কারেন্সি কমিশন সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমি বলিয়াছি। এখন দেখিতেছি, টাকার মূল্য লইয়াই তুমুল তর্ক উপস্থিত। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা এবং বোম্বাই এবং কলিকাতার রপ্তানীকারক বণিকরা প্রথমে টাকার মূল্য কমাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। সেই জন্য তাঁহারা ইণ্ডিয়ান কারেন্সি লীগ নামে একটি প্রচার-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতায়, মাদ্রাজে, করাচীতে, এলাহাবাদে, লাহোরে উহার শাখাপ্রশাখা স্থাপিত করা হইয়াছে বা করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফলে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার আন্দোলন জনসাধারণের সম্মত করিয়া লইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা হইতেছে। অর্থে, সামর্থ্যে ও জনমতগঠনে কোনরূপ কার্পণ্য করা হইতেছে না।

ইহার একটা প্রত্যক্ষ ফল ইদানীং দেখা যাইতেছে। আচম্বিতে দেশের সর্ব্বত্রই বড় বড় অর্থনীতি-বিশারদ কদম্ববৃক্ষে কদম্বফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছেন। যখন কারেন্সি কমিশন বসিয়াছিল এবং উহার সদস্যগণ এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে বা রাজনীতিক আসরে এ বিষয়ের কোন আলোচনাই হয় নাই। বক্তাদিগের মধ্যে অনেকেই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দেন নাই। এখন তাঁহারা সুদীর্ঘ আমি শুভলক্ষণ মনে করি। কারণ, এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, এই সকল বিষয়ের আলোচনাকালে ভাষার ছটা এবং কোন দিকে কোনরূপ পক্ষপাত না দেখাইয়া প্রকৃত তথ্যের আলোচনার দ্বারা দেশের হিতকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

মুদ্রামূল্য-সংস্কার সম্পর্কে প্রধানতঃ টাকার মূল্য ১৬ পেন্স হইবে কি ১৮ পেন্স হইবে, এই কথা লইয়া তুমুল তর্ক উঠিয়াছে। ঐ ব্যাপারটি মুদ্রা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং প্রয়োজনীয় কথা নহে। দেশের প্রচলিত মুদ্রাকে আসল মুদ্রায় পরিণত করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। মুদ্রার যাহা আসল মূল্য (intrinsic value), তাহাই যদি উহার বাজার-প্রচলিত মূল্যের প্রায় সমান হয়, তাহা হইলে ঐ মুদ্রা আসল মুদ্রা বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। বিলাতী সভারেণ একটি আসল মুদ্রা। ঐ মুদ্রাটির মূল্য আজকাল ১৩ টাকা ৫ আনার কিছু অধিক; ঐ মুদ্রাটি মুদ্রা হিসাবে বিক্রয় না করিয়া উহা পণ্য হিসাবে অর্থাৎ উহা গালাইয়া বিক্রয় করিলেও উহার সোনার মূল্য ঠিক ১৩ টাকা ৫ আনাই থাকিবে, তাহার কম হইবে না, সেই জন্য উহা আসল মুদ্রা; কিন্তু আমাদের দেশের টাকাকে যদি আমি ঐরূপ ভাবে বিক্রয় করি, তাহা হইলে আমি উহার বিনিময়ে আর ১৬ আনা পাইব না। সুতরাং উহা আসল মুদ্রা নহে; উহা নকল মুদ্রা। আমরা উহাকে অভিজ্ঞান-মুদ্রা বা নিদর্শন-মুদ্রা (token coin) বলিয়া থাকি। এই অভিজ্ঞান বা নিদর্শন-মুদ্রা প্রস্তুত করিলে মুদ্রাবিভাগের লাভ আছে। কারণ, ১০ আনা অথবা ১২ আনা খরচ করিয়া টাকা প্রস্তুত করিলে উহা ১৬ আনায় চালান যায়। সেই জন্য সকল দেশের সরকারই এই নকল মুদ্রা চালাইতে অল্পবিস্তর প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে বহুবার ভারত-সরকার অধিক মাত্রায় টাকা চালাইয়া টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগ শুনা গিয়াছিল। স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে একবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সে বিষয়

বেকার তাহার উত্তরে বলেন, সে টাকা ভাঙ্গিয়া ও নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং উহাতে ক্ষতি হইবে না। এ কথা বিচারসহ নহে। কিন্তু টাকা যদি আসল মুদ্রা হয়, অর্থাৎ উহার ধাতুগত মূল্য ঠিক ১৬ আনাই থাকে, তাহা হইলে সরকারের বা মুদ্রা-বিভাগের আর প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা প্রস্তুত করিয়া উহা বাজারে ছাড়িবার প্রলোভন থাকে না। উহাতে মুদ্রা-বিভাগের লাভ নাই, বরং ক্ষতি হইবার শঙ্কা আছে। কারণ, অধিক টাকা প্রস্তুত করিতে হইলে অধিক রূপার প্রয়োজন। রূপার মূল্য যদি অন্য কারণে সুলভ না হয়, ঠিক থাকে, আর সরকার যদি অতিরিক্ত টাকা প্রস্তুত করিবার জন্য অত্যধিক মাত্রায় রূপা কিনিতে থাকেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে উহার দর চড়িবে, অন্য দিকে তেমনই প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকার প্রচলন হেতু টাকার মূল্য হ্রাস পাইবে। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার যাহা ধাতুগত এবং স্বাভাবিক মূল্য, সেই মূল্যে যদি উহা অবাধে চলিত হয়, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্য আমার বিশ্বাস, মুদ্রা-সংস্কার করিতে হইলে আসল ও স্বাভাবিক মূল্যেই মুদ্রা প্রচলিত করা বিধেয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বোম্বাইয়ের ১৬ পেন্সওয়ালারা এই সমস্যার সমাধানে এই দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিতেছেন না। কারণ, মূল গায়ক যে সুরে গীত গাহিবেন, দোয়ারকিরা তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র করিবেন।

"কারেন্সি কমিশন" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা পরিহার করিয়া কেবল রজত-মুদ্রাই প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেই সময়েই এই বিষবৃক্ষের বীজ প্রোথিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তাহার পূর্ব্বেই গ্রেট বৃটেন রজত-মুদ্রা বর্জ্জন করিয়া সুবর্ণ-মুদ্রাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গ্রেট বৃটেনের সহিত ভারতের মুদ্রার ধাতুবিষয়ে পার্থক্য ঘটিল। কিন্তু বিলাতী ব্যাঙ্কের এবং বিলাতী স্বর্ণ-মুদ্রার মারফতে ভারতের বহির্বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়। অগত্যা ঐ দুই দেশের মুদ্রার ধাতুগত পার্থক্য ঘোর অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। এ কথা সত্য যে, কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই রজতের মূল্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। শুনা যায় যে, ক্রমে উহা হ্রাস পাইয়া সুবর্ণ অপেক্ষা অল্পমূল্য হয়। খৃষ্টীয় সহস্র অব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপখণ্ডে সুবর্ণের মূল্য রজতের মূল্যের দশগুণ অধিক মাত্র ছিল। তাহার পর রজতের মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ বা তাহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সুবর্ণ-মূল্য রজত-মূল্যের প্রায় ১৫ গুণ ছিল। রজত-মূল্য এইরূপ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া তীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন গ্রেটবৃটেনই প্রথম (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) রৌপ্য-মুদ্রা বর্জ্জন এবং সুবর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করেন। ভারতে ঐ সময় নানা অঞ্চলে নানারূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ সরকারই প্রথমে ১ তোলা (১৮০ গ্রেণ) ওজনের টাকা প্রবর্ত্তিত করেন। বাণিজ্যব্যবসায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই তখন ভারতের শাসন-তরণীর কর্ণধার। তাঁহারা দেখিলেন, নানা স্থানে নানারূপ ওজনের খাদযুক্ত টাকা থাকায় বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ও হিসাবপত্রে বিশেষ গোল ঘটিতে থাকিল। কাযেই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সমস্ত বৃটিশ-শাসিত ভারতে ঐ মাদ্রাজী টাকার প্রবর্ত্তন এবং ভারতীয় সুবর্ণ মুদ্রাকে বর্জ্জন করেন। ঐ সময়ে বৃটেনে সুবর্ণের তাদৃশ স্বচ্ছলতা ছিল না, বরং রৌপ্য অধিক পাওয়া যাইত। ইংরাজ বণিকরা রূপা দিয়াই ভারত হইতে পণ্য ক্রয় এবং সুবর্ণের বিনিময়ে ভারতে পণ্য বিক্রয় করিতেন। সুবর্ণনির্ম্মিত মুদ্রাকে তাঁহারা মুদ্রার আসন হইতে নামাইয়া দিলেও সুবর্ণ গ্রহণে তাঁহাদের কোনরূপ অরুচি ছিল না। কারণ, ইহার কয়েক বৎসর পরেই (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করেন যে, তাঁহারা সরকারী আফিসে ১৫ টাকা মূল্যে সুবর্ণমোহর লইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা ঐ মূল্যে সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকিবেন না। ইহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুবর্ণগ্রহণে যতটা রুচি প্রকাশ পায়, সুবর্ণদানে ততটা রুচি প্রকাশ পায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে এবং অষ্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ-খনি আবিষ্কৃত হয়। তাহার ফলে সুবর্ণের উৎপত্তি বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পৃথিবীতে সুবর্ণের উৎপত্তি গড়ে বার্ষিক মূল্য হিসাবে ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের কিছু অধিক ছিল, শেষার্দ্ধে অর্থাৎ কালিফোর্ণিয়ার এবং অষ্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ-খনি আবিষ্কারের পর উৎপন্ন সুবর্ণের মূল্য গড়ে বার্ষিক ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

বিলাতে পণ্যমূল্য কিছু বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইংরাজ এবং দেশীয় বণিকরা এ দেশে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ভারতের তদানীন্তন অর্থ-সচিব মিষ্টার স্তামুয়েল লেং সে প্রস্তাবে কতকটা সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারত-সচিব সার চার্লস উড সুবর্ণ-মুদ্রাকে আইন অনুসারে দেনা-পাওনার মুদ্রা বলিয়া গণ্য করিতে একেবারেই অসম্মত হয়েন। তবে তিনি এই ব্যবস্থা করেন যে, কেহ সরকারী রাজকোষে সভারেণ দিলে তিনি তাহার বদলে ১০টি টাকা অথবা ১০ টাকার নোট পাইবেন। এই ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র আজামোঙ্গা ব্যবস্থা হয় নাই,—পরন্ত ইহাতে য়ুরোপীয় বণিকদিগের সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা সভারেণ দিয়া বিনা বাট্টায় টাকা পাইতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ২০ কোটি পর্য্যন্ত মূল্যের সুবর্ণ খরিদ করেন বলিয়া সোনার মূল্য আর বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ইহার জন্য য়ুরোপের সকল দেশে সুবর্ণের টান অধিক হইয়াছিল। এই সময়ে যদি ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত হইত, তাহা হইলে ভারতের এত ক্ষতি হইত না। তখন য়ুরোপীয়দিগের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ভারতবাসীর স্বার্থ বলি দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারণা লোকের মনে স্থান লাভ করিয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সভারেণের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর হইতে রূপার মূল্য ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সরকার ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনের দিকে একটু ঝোঁক দিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে ইতি-কর্ত্তব্যতা অবধারণের জন্য একটি বিভাগীয় কমিটী গঠিত হয়। কমিটী সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দেন। এ দিকে পৃথিবীর নানাস্থানে ভূরি পরিমাণে রজত উৎপন্ন করা হইতে থাকে। রূপার দর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এই সময়ে টাকার মূল্য কিরূপ ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে এবং বাটার হার কিরূপ দাঁড়ায়, ভাদ্র মাসের মাসিক 'বসুমতী'তে 'রয়্যাল কারেন্সি কমিশন' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

সরকার সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিয়া ইহার প্রতীকার করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি তাঁহারা মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিতে না দিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ সমস্তার সমাধান করেন। তথায় বার্ত্তাশাস্ত্র-বিশারদের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহারা কেহই মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবার অনুকূলে মত দেন নাই। পক্ষান্তরে, ভারত-সরকার ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টাঁকশালে অবাধে টাকা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। টাকা অল্প প্রচলিত হইলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পায়,—এই যুক্তি অনুসারে তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে টাকা ভাক্ত মুদ্রায় পরিণত হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সরকার নিয়ম করিলেন যে, সরকারী টাঁকশালে আর রূপার টাকা প্রস্তুত করা হইবে না। সরকার টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স ধার্য্য করিবার জন্য নিয়ম করিলেন যে, তাঁহারা সরকারী রাজকোষে ১৫ টাকা মূল্যে সভারেণ লইতে প্রস্তুত আছেন। তথাপি সভারেণকে আইন-মতে বৈধ-মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। সদর দরজা বন্ধ করিয়া পশ্চাদ্দিকের ক্ষুদ্র দরজা খুলিয়া রাখিবার মত এই ব্যবস্থা অত্যন্ত হাস্যজনক। সরকার সাধারণের নিকট হইতে সুবর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহারা উহা সাধারণকে দিতে বাধ্য থাকিবেন না,—এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। এইরূপ পক্ষপাতপূর্ণ নীতি অবলম্বনে কখনই সুফল জন্মিতে পারে না। সুতরাং এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় ফলপ্রদানে সমর্থ হয় নাই।

এই সময়ে সরকার আর একটা ব্যবস্থা করেন। বিদেশী-দিগকে দেয় টাকা দিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে বাজার-চলন মূল্যে মুদ্রাভাণ্ডারস্থ সুবর্ণ প্রদান করিতেন। ইহা তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছা হইলেই দিতেন। তাঁহারা স্বয়ং যে মূল্যে সুবর্ণ লইতেন, সে মূল্যে উহা দিতেন না। রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয়ের ব্যবস্থার এইখানেই সূত্রপাত। ১৬ পেন্সওয়ালারা ইহাও স্মরণ রাখিবেন।

বিলাতে রূপার দর দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে তথায় রূপার মূল্য দাঁড়ায় প্রতি ঔন্স ২৯ পেন্সের নিম্নে। সুতরাং টাকার দর বৃদ্ধি পায় নাই, বরং কমিয়া ১ শিলিং ১ পেনীর কিছু উপরে থাকে। কয়েক বৎসর টাঁকশাল বন্ধের ফল দেখিবার জন্য অপেক্ষাও করা হইল। কিন্তু উহাতে যে ফল লক্ষিত হইল, তাহা সামান্য। কয়েক

অগত্যা সরকার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাউলার কমিটীর পরামর্শ অনুসারে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করেন যে, বিলাতী সভারেণ ১৫ টাকা মূল্যে আইনমতে আদান-প্রদানের মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইল। ইহাতেই অভীপ্সিত ফল ফলিল। এই সময়ে সরকার কোন কোন লোককে কিছু সভারেণ দিয়াও ছিলেন। তাঁহারা টাকার মূল্য ৭·৫৩৩৪ গ্রেণ সুবর্ণই ধার্য্য করেন। এইবার ব্যবস্থা হইল যে, যদি কেহ ঋণ শোধ অথবা পণ্য-মূল্য প্রদানকালে সভারেণ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি উহা ১৫ টাকা মূল্যে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু লোক উহা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। লোককে উহা প্রদানে বাধ্য করিতে হইলে সরকারকেও উহা সাধারণকে ঐ মূল্যে দিতে বাধ্য হইতে হইত। তখন বিলাতে রূপার বাজার দর প্রতি ঔন্স ২৭ পেন্স। সুতরাং অবাধে লোককে সভারেণ দিতে হইলে সরকারের অনেক ক্ষতি হইত। সরকার যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে ভারতে প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত হইত।

কিন্তু তাহা হইলেও ইহার একটু সুফল ফলিয়াছিল। রূপার মূল্য ইহার পর প্রায় ৫ বৎসর অল্প ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও টাকার মূল্য ১৬ পেন্স অটল ছিল। সরকারের কৌশলের এবং চেষ্টার ফলে যে এই ফললাভ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন সরকার টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তৃত করিতেছেন, টাকার মূল্য কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করিতেন বলিয়া যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দেও সরকারকে ঠিক এই কৌশলই অবলম্বন করিয়া টাকার মূল্য ১৬ পেন্সে অবিচলিত রাখিতে হইয়াছিল, এই তথ্য তাঁহারা সুবিধামতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

১৫ বৎসরকাল ভারতে টাকার মূল্য ১৬ পেন্সে অবিচলিত ছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে টাকা আর প্রকৃত মুদ্রা ছিল না। উহা তাম্র-মুদ্রা বা মুদ্রার নিদর্শন মাত্রে (token coin) পরিণত হয়। তাহা হইলেও টাকার বিনিময়-মূল্য ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠিক ১৬ পেন্সে দাঁড়ায় নাই। উহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা হইলে ভারতবাসীকে এত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে চেম্বারলেন রয়্যাল কমিশন ভারতে অবাধে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সুবর্ণমুদ্রা না চালাইয়াই যখন টাকার মূল্য ১৬ পেন্সে অবিচলিত রহিয়াছে, তখন আর সুবর্ণমুদ্রা চালাইবার প্রয়োজন নাই। আসল কথা, কেবলমাত্র ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ঐ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুবর্ণের এবং রৌপ্যের মূল্য বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সেই জন্য টাকার বিনিময়-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই।

যুদ্ধের সময় রূপার মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য আর টাকার মূল্য ১৬ পেন্সে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই। সরকার অবশ্য প্রথমে উহার ১৬ পেন্স মূল্য স্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সরকার যদি পূর্ব্ব হইতে টাকার বদলে অবাধে ৭·৫৩৩৭ গ্রেণ সুবর্ণ দিতেন অথবা ১৫০·৬৭৪০ গ্রেণ খাঁটি সোনার সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে ভারতে উহার ফল ঠিক ঐরূপ হইত না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটী টাকার মূল্য ২ শিলিং বা ১১·৩০০১৬ গ্রেণ ধার্য্য করিবার উপদেশ দেন। তদনুসারে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৩৬ আইনে নিয়ম করা হয় যে, সভারেণকে ১০ টাকা মূল্যের আইনসিদ্ধ মুদ্রা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু সরকার যদি এইবারও এ দেশে অবাধে সভারেণ চালাইতেন, তাহা হইলে ইহার পরেও আবার ভারতীয় মুদ্রার এমন শোচনীয় অধোগতি হইত না। অন্ততঃ তাঁহারা যদি ২২৬·০০৩২ গ্রেণ খাঁটি সোনার মোহর অবাধে চালাইতেন, তাহা হইলেও ভারতবাসীকে এত দূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। সেই জন্য এ দেশের অনেকের বিশ্বাস যে, সরকার যত দিন এ দেশে অবাধে সুবর্ণ-মুদ্রা না চালাইতেছেন, তত দিন কিছুতেই এই মুদ্রাসমস্যার সমাধান হইবে না।

অবশ্য এ দেশে অবাধে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতে হইলে অনেক সুবর্ণের প্রয়োজন। এরূপ কার্য্যক্ষেত্রে সুবর্ণের বাজারে বিষম টান ধরিত এবং সুবর্ণের মূল্য হয় ত বৃদ্ধি পাইত। এখনও ইহাতে একটু অসুবিধা রহিয়াছে।

করিতে চাহিতেছেন না। দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপের যে সকল রাজ্য বিগত যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল রাজ্য পুনর্গঠিত করিবার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। সুবর্ণই তথাকার অর্থ। এরূপ অবস্থায় ভারতের ন্যায় অতি বিস্তীর্ণ এবং জনাকীর্ণ দেশে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন করিতে গেলে ঘোর অসুবিধা জন্মিবে। ইহা ভিন্ন সুবর্ণের অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পসার (credit) নষ্ট হইবে এবং য়ুরোপের শ্রম-শিল্পগুলি যেরূপ আকারে আকারিত আছে, তাহা (অর্থাৎ সেই organisation) বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। য়ুরোপের এই সকল বিষয়ে অসুবিধা ঘটিলে ভারতেরও বাণিজ্য-ব্যাপারে ঘোর বিপ্লব ঘটিবে, ইত্যাদি। এই সকল কারণে সরকার ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনের ঘোর বিরোধী। সার পুরুষোত্তম দাস প্রভৃতিও সেই মতে মত দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই সকল যুক্তি সমীচীন মনে করি না।

তাহার কারণ, প্রথমতঃ এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতের খনি হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। গত পূর্ব্ব-বৎসর ১৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৫ শত ১ পাউণ্ড মূল্যের সুবর্ণ ভারতীয় খনি হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের পক্ষে যে সুবর্ণ-প্রাপ্তির প্রবল দাবী আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের দাবী ভারত হইতেই পূরণ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, য়ুরোপের পুনঃ সংগঠন জন্য ভারতের একটা অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্কার বিলম্বিত হইবে, ইহা অত্যন্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত যুক্তি।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং বহুজনাকীর্ণ দেশ হইলেও এ দেশের লোক অত্যন্ত দরিদ্র। তাহারা যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সুবর্ণ-মুদ্রা ব্যবহার করিবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন ১ শত টাকার নিম্নে দেনা-পাওনায় রজত-মুদ্রাই legal tender অর্থাৎ আইন অনুসারে দেয় এবং গ্রাহ্য মুদ্রা হইবে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে অতি অল্পপরিমাণ সুবর্ণ-মুদ্রায় কায চলিবে।

চতুর্থতঃ, এককালে ভারতের লোকের সুবর্ণ সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক ছিল; এখন লোকের সে প্রবৃত্তি হ্রাস পাইতেছে। লোক যদি বুঝে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই সুবর্ণ পাইতে পারিবে, তাহা হইলে তাহারা মোহর সহজ-লভ্য, তাহা প্রাপ্তির জন্য লোকের উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে না।

এই সকল কারণে আমরা ভারতে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনেরই পক্ষপাতী। আমরা এক টাকার নোট প্রচলনের ঘোর বিরোধী। মফঃস্বলের দরিদ্র লোকের পক্ষে কাগজের টাকা রাখা অত্যন্ত কঠিন ও ঘোর অসুবিধাজনক। যুদ্ধের সময় সরকার এক টাকার কাগজের নোট প্রচলিত করাতে মফঃস্বলের লোকের সমূহ ক্ষতি এবং অসুবিধা জন্মিয়াছিল এবং লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থলে দোকানদারগণ রাত্রিকালে কাগজের টাকার বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দিতে সম্মত হয় নাই। বিদেশী লোকের কাছে কাগজের নোট থাকিলেও এবং দোকানে খাদ্যদ্রব্য থাকিলেও বহুলোক বাজারে থাকিয়াও উপবাসী রহিতে বাধ্য হইয়াছে। রূপার টাকা ও আধুলি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

তাহার পর মুদ্রার বিনিময়-মূল্যের কথা। এই সম্বন্ধে এতই তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এতই খুঁটিনাটি ধরিয়া তর্ক উপস্থিত করা এবং এত অসংযত ভাষায় লোককে উত্তেজিত করা হইতেছে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে ধীরভাবে ইহার আলোচনা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহার উপর সমাজের সর্ব্বলোকের স্বার্থ বিশেষভাবে নির্ভর করে। বিষয়টি অন্যান্য বহু জটিল ব্যাপারের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত যে, উহার সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন। তাহার উপর যদি লোক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে এবং অসংযত ভাষায় এই বিষয়টির আলোচনা করে, তাহা হইলে সাধারণের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য আমরা সকলকে সংযতভাবে এই বিষয়টির আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইরূপ জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে অনেকের ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ যাঁহারা এইরূপ গুরু বিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহাদের একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নহে। কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপরই অত্যন্ত অধিকসংখ্যক লোকের লাভ ও ক্ষতি বিশেষভাবে নির্ভর করিবে। সেই

হইবে, তাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনায় সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ভারতীয় টাকার মূল্য ১৬ পেন্স হইবে কি ১৮ পেন্স হইবে অর্থাৎ ৭·৫৩৩৪ গ্রেণ খাঁটি সোনা হইবে কি ৮·৪৭৫১ গ্রেণ খাঁটি সোনা হইবে, ইহা লইয়াই তুমুল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বাইওয়ালারা বলিতেছেন—ভারতীয় মুদ্রার মূল্য অল্প করাই কর্ত্তব্য। অপর পক্ষ বলিতেছেন, উহার মূল্য অধিক করাই বিধেয়। মুদ্রামূল্য অল্প করিবার পক্ষে সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ওকালতী করিতেছেন আর মুদ্রামূল্য বর্দ্ধনের পক্ষসমর্থন করিতেছেন সার বেসিল ব্ল্যাকেট। উভয়েই অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তবে সার বেসিল ভারত-সরকারের অর্থ-সচিব; তাঁহার মত সরকারী মত বলিয়া অনেকে উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সকল সময়েই যে সরকারী মত ভ্রান্ত হয়, ইহা মনে করা ঠিক নহে।

(১) এখন সমস্যা এই যে, মুদ্রার মূল্য কমিলে দেশের লোকের সুবিধা বোধ হয়, না বাড়িলে লোকের সুবিধা জন্মে? মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস অর্থে মুদ্রার ক্রয়-শক্তির হ্রাস। টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে লোক যেমন উহার বিনিময়ে অধিক সুবর্ণ পাইবে, তেমনই অন্যান্য পণ্যও অধিক পাইবে। কারণ, সুবর্ণ দ্বারাই সমস্ত পৃথিবীর পণ্য-মূল্যের পরিমাপ হইয়া থাকে। সেই জন্য কোন দেশই সুবর্ণ ছাড়িতে চাহেন না। মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি হইলে ব্যবহার্য্য পণ্য অল্পমূল্য হইবেই। ইহাতে জনসাধারণের সুবিধা কি না, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

(২) মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইলেই যদি জনসাধারণের সুবিধা হইত, তাহা হইলে য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিবিশারদরা অল্পমূল্যে রজতমুদ্রা পরিহার করিয়া তাঁহাদের দেশে মূল্যবান্ হৈমমুদ্রা প্রচলিত করিতেন না। সুবর্ণের মূল্য অনেকটা অচঞ্চল থাকে, তাহা সহজে হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে, রজতের মূল্য অত্যন্ত চঞ্চল এবং ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। সেই জন্য তাঁহারা বাজার দর যথাসম্ভব স্থির রাখিবার জন্য এবং উহার মূল্য যাহাতে ক্রমশঃ হ্রাস না পায়, তাহার জন্য তাঁহাদের দেশে সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিয়াছেন। যদি বুঝা যাইত যে, মুদ্রামূল্যের হ্রস্বতা-সাধনই মার্ক, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি সুবর্ণমুদ্রার খাঁটি সোনার পরিমাণ অল্প করিয়া অথবা উহাতে অধিক পরিমাণে খাদ মিশাইয়া মুদ্রামূল্য সুলভ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতেছেন না। ইহাতে সোজাসুজিভাবে বুঝিতে হইবে, যেন টাকার মূল্য হ্রাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহা অবশ্য সহজ এবং স্থূল বুদ্ধিতেও বুঝা যায়।

(৩) যে দেশের লোককে বিদেশে বিদেশী মুদ্রায় নিয়মিতভাবে অর্থ প্রেরণ করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ, তাহা হইলে সেই অধমর্ণ দেশ উত্তমর্ণ দেশকে অকারণ অধিক অর্থ দিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে হোমচার্জ্জ বাবদ বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে বাধ্য ছিল। যখন টাকার মূল্য ১৬ পেন্স ছিল, তখন ভারতকে ঐ বাবদ ৩৩ কোটি টাকা দিতে হইত। কিন্তু যদি তাহার মূল্য ১৮ পেন্স থাকিত, তাহা হইলে ঐ বাবদ আমাদিগকে ২৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মাত্র দিলেই চলিত। সুতরাং এই বাবদ ভারতের ৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাঁচিয়া যাইত। ইহা নিতান্ত অল্প লাভ নহে। এখনও ভারতকে হোমচার্জ্জ বাবদ বিস্তর টাকা বিলাতে পাঠাইতে হইয়া থাকে। তবে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ভারত-সচিবের বেতন এবং ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয় আর ভারতবাসীকে দিতে হয় না। কিন্তু হাই কমিশনারের বেতন, প্রিভী কাউন্সিলের খরচা এবং জাতিসঙ্ঘের চাঁদা ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপান হইয়াছে, ইহাতে খরচার পরিমাণ প্রায় পূর্ব্ববৎই আছে। সুতরাং টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইলে এই বাবদ অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়।

(৪) গত বৎসর বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ৫৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হয়। ঐ টাকার একটা মোটা অংশ বিলাতে বিলাতী মুদ্রায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই বিভাগের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, কামান, বিমান ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম খরিদ ও প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হওয়াতে সে বাবদও দুই এক কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৫) সরকারের রেলওয়ের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই

বিলাতকে পাউণ্ডের দরে দিতে হইয়া থাকে। টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হওয়াতে ঐ বাবদ আমাদিগকে অনেক টাকা কম দিতে হইতেছে।

(৬) বিলাত ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশ হইতে আমাদিগকে কতকগুলি জিনিষ বাধ্য হইয়া আমদানী করিতে হয়। তাহা পরিহার করিবার উপায় নাই। যথা—ঔষধ প্রভৃতি (প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকার), কাগজ, পেষ্ট-বোর্ড প্রভৃতি (প্রায় সওয়া ২ কোটি টাকার), লবণ (ঐরূপ), কলকব্জা মায় বেল্টিং (প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকার) ইত্যাদির টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হওয়াতে ঐ বাবদ প্রায় বহু লক্ষ টাকা খরচ বাঁচিয়া যাইতেছে। পুস্তকাদি সুলভ হইয়াছে।

(৭) যাহারা টাকায় বেতন বা মজুরী পায়, তাহাদিগের আয় প্রায় শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পায়। আজ দুই বৎসর টাকার মূল্য ১৮ পেন্স আছে; তাহাকে যদি ১৬ পেন্স করা হয়, তাহা হইলে যাহারা মজুরী, ভাড়া প্রভৃতি পায়, তাহাদিগের আয় শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হিসাবে কমিয়া যাইবে। মধ্যবর্ত্তী ভদ্রলোক-সমাজের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে মজুরশ্রেণীদিগেরও বিশেষ আয় কমিয়া যাইবে।

(৮) টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হওয়াতে রাজকোষে অর্থের উদ্বৃত্তি হইতেছে। সেই জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে যে টাকা ভারত-সরকারকে দান করিতে হইতেছে, সেই টাকা হইতে রেহাই পাইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। প্রাদেশিক সরকার এখন ঐ টাকা দেশহিতকর ও জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবেন। টাকার মূল্য ১৬ পেন্স হইলে রাজকোষে অর্থের অভাব ও দেশের উপর নূতন কর ধার্য্যের সম্ভাবনা জন্মিবে।

(৯) টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য করিয়া আইন প্রণীত হইলে পর রেলওয়ের ভাড়া সম্ভবতঃ কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইতোমধ্যে কোন কোন রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়ার হার নামমাত্র কমাইয়া দিয়াছেন। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, আইন না হইলে তাঁহারা ভাড়া কমাইতে ভরসা পাইতেছেন না।

(১০) টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইলে দেশে দুর্মূল্যতা [illegible] তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে

আড়াই বৎসর টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইয়াছে। এই আড়াই বৎসরমধ্যে ঋতুবিপর্য্যয়ফলে ভারতের বহু স্থানেই শস্যহানি হইয়াছে। গত বৎসর পূর্ব্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের কিয়দংশ, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জিলায় শস্যহানি হইয়াছিল; এ দিকে বর্দ্ধমানের প্রায় অধিকাংশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বীরভূম জিলায় বিশেষ শস্যহানি হইয়াছে। বিচালী বা খড়ের অভাবে লোক গো-মহিষাদিকে খাইতে দিতে পারিতেছে না,—এ অবস্থা এখনও তথায় সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয় নাই। পশ্চিম-বঙ্গে খাদ্যাভাবে অনেক পশু কঙ্কালসার ও অনেক গো-মহিষ দেহত্যাগ করিয়াছে, গত পূজার পূর্ব্বে ইহা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

অপর পক্ষে মুদ্রামূল্যবৃদ্ধিতে কয়েকটি বিশেষ অসুবিধাও জন্মে। তন্মধ্যে কতকগুলি অসুবিধা কেবল মতের হিসাবে যতটা ঘটিবে মনে হয়, কাযে ততটা ঘটে না। অন্য কারণে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়া যায়। আর কতকগুলি অসুবিধা ঘটিবেই ঘটিবে। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহা পরিহার করা সম্ভব হইবে না।

(১) রপ্তানী-বাণিজ্যের সঙ্কোচ এবং আমদানী-বাণিজ্যের প্রসার। টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ভারতজাত পণ্য বিদেশীর নিকট দুর্ম্মূল্য এবং বিদেশজাত পণ্য ভারতবাসীর নিকট সুলভ হইয়া পড়ে।

(২) আমদানী-পণ্যের সহিত দেশীয় শিল্পজ পণ্যের অতি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়া থাকে। দেশীয় শিল্পজ পণ্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক সময় আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

(৩) পণ্য উৎপাদকের হস্তে অল্প অর্থের আগম হইয়া থাকে। কৃষকের ঘরেও অল্প অর্থাগম হয়। এই শেষোক্ত কথা লইয়া বোম্বাইয়ের ১৬ পেন্সওয়ালারা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন এবং লোককে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই কথা কত দূর সত্য, তাহা তথ্য দ্বারা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

(১) প্রথমতঃ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই যে রপ্তানী-বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়, ইহা মতের হিসাবে (theoratically) ঠিক মনে হইলেও কার্য্যে ঠিক হয় না। আমদানী-রপ্তানীর তথ্যগত ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। ইহার কারণ কৃষিজ-পণ্যের খরিদ্দারগণ ভারতীয় পণ্য তাহাদের প্রয়োজন

পাইলেও তাহারা উহা পরিহার করিতে পারিবে না। তাহার কারণ, ইচ্ছা করিলে অন্যত্র সুলভে কৃষিজ পণ্য পাওয়া যায় না। মনে করুন, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৬ হইতে ১৭ লক্ষ টন তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। উহা হইতে বিদেশী শিল্পীরা নানারূপ ব্যবহার্য্য পণ্য প্রস্তুত করে। ভারতে যদি ঐ সকল তৈলবীজের মূল্য শতকরা ১৫ টাকা হিসাবেও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেও বিদেশীরা উহা কিনিতে বাধ্য হইবে। না কিনিলে তাহাদের কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, অন্য দেশ হইতে ঐ পরিমাণ তৈলবীজ সংগ্রহ করা সহজ নহে। কোন দেশে কোন পণ্যই অবিক্রীত থাকে না। যে সকল দেশে তিসি, তিল, সর্ষপ, চীনের বাদাম, কার্পাসবীজ, রেড়ী প্রভৃতি জন্মে, সেই সকল দেশে উহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দেশের লোকের ব্যবহারে আইসে, অবশিষ্ট যাহা উদ্‌বৃত্ত হয়, তাহাই তাহারা বিদেশে রপ্তানী করে। তাহাদিগের খরিদ্দারও বাঁধা আছে। যাহারা ভারতে ঐ কৃষিজ পণ্য খরিদ করিয়া থাকে, তাহারা যদি ঐ সকল দেশে নূতন খরিদ্দাররূপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তথায়ও ঐ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি হেতু উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবেই পাইবে। শতকরা ১৫ টাকার অধিক হারেও সেই মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ, ১৬ হইতে ১৭ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপাদন করিবার মত জমী বাহির করা সহজ নহে। অন্ততঃ ঐ পরিমাণ তৈলবীজ উৎপাদন করিতে হইলে অন্য ফসলের চাষ সঙ্কুচিত করিতে হইবে। তাহা করাও সম্ভব নহে। কারণ, কোন দেশই অনাবশ্যক শস্যের চাষ করে না, দেশবাসীরা খাদ্য-শস্যও অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিতে পারে না। কাযেই বিদেশী বণিকদিগকে অধিক মূল্য দিয়া ভারতেই ঐ সকল প্রয়োজনীয় পণ্য কিনিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, হিসাবমত মনে হয় যে, টাকার মূল্য কমিলে বিদেশ হইতে আমদানী পণ্য কমিয়া যাইবে। কারণ, দেশীয়দিগের নিকট উহা দুর্ম্মূল্য মনে হইবে। কিন্তু তাহা ঠিক হয় নাই। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার বিনিময়-মূল্য অধিক হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সময় হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব নিম্নে প্রদত্ত

খৃষ্টাব্দ	আমদানী পণ্যের মূল্য (টাকায়)	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (টাকায়)
১৮৭৩	৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ	৫৬ কোটি ৬০ লক্ষ
১৮৭৪	৩৯ " ৬০ "	৫৬ " ৯০ "
১৮৭৫	৪০ " ৪০ "	৫৮ " • "
১৮৭৬	৪৪ " ২০ "	৬০ " ৩০ "
১৮৭৭	৪৮ " ৯০ "	৬৫ " • "
১৮৭৮	৫৮ " ৮০ "	৬৭ " ৪০ "
১৮৭৯	৪৪ " ৯০ "	৬৪ " ৯০ "
১৮৮০	৫২ " ৮০ "	৬৯ " ২০ "
১৮৮১	৬২ " ১০ "	৭৬ " ০০ "
১৮৮২	৬০ " ৪০ "	৮৩ " ১০ "
১৮৮৩	৬৭ " ৫০ "	৮৪ " ৫০ "
১৮৮৪	৬৮ " ২০ "	৮৯ " ২০ "
১৮৮৫	৬৯ " ৬০ "	৮৫ " ২০ "
১৮৮৬	৭১ " ১০ "	৮৫ " ০০ "
১৮৮৭	৭১ " ৮০ "	৯০ " ২০ "
১৮৮৮	৭৮ " ৮০ "	৯২ " ১০ "
১৮৮৯	৮৩ " ২০ "	৯৮ " ৮০ "
১৮৯০	৮৬ " ৭০ "	১০৫ " ৫৪ "
১৮৯১	৯৩ " ৯০ "	১০২ " ৩০ "
১৮৯২	৮৪ " ২০ "	১১১ " ৫০ "
১৮৯৩	৮৩ " ৩০ "	১১৩ " ৬০ "
১৮৯৪	৯৫ " ৫০ "	১১০ " ৬০ "
১৮৯৫	৮৩ " ১০ "	১১৭ " ১০ "
১৮৯৬	৮৬ " ৫০ "	১১৮ " ৬০ "
১৮৯৭	৮৯ " ২০ "	১০৮ " ৯০ "
১৮৯৮	৯৪ " ২০ "	১০৪ " ৮০ "
১৮৯৯	৯০ " ০০ "	১২০ " ২০ "
১৯০০	৯৬ " ০০ "	১১৭ " ০০ "

আমি আর এই তালিকা সুদীর্ঘ করিতে চাহি না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার বিনিময়-মূল্য ১৬ পেন্সেই অচল রাখা হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে টাকার মূল্য কমিতে থাকে। কিন্তু তাহার ফলে আমদানীর গতিও কমে নাই, রপ্তানীর গতিও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় নাই। ১৮৯২-৯৩ হইতে ১৮৯৭-৯৮ পর্য্যন্ত টাকার মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই হিসাবে আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নাই। বরং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর টাকার মূল্য ১৬ পেন্সে অচল থাকিলে পর ভারতের আমদানী এবং রপ্তানী-বাণিজ্য উভয়ই বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে পণ্য-মূল্য টাকার হিসাবে অধিক ছিল, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। আমদানী-বাণিজ্যও হ্রাস পায় নাই। এই সময়ে পঞ্জাবে, উড়িষ্যায় এবং বিহারে অজন্মা হইয়াছিল।

সত্য,—কিন্তু ঐ সময়ে মাদ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য দেশ, বিহার এবং ব্রহ্মদেশের উত্তর খণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ সময়ে য়ুরোপে গম একেবারেই জন্মে নাই, সেই জন্য ঐ সময়ে ভারত হইতে য়ুরোপে অনেক গম চালান গিয়াছিল। এই সময়ে কৃষকরা কিছু অধিক টাকা পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র কৃষক, মজুর, শিল্পী এবং দুঃস্থ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে দেহত্যাগ করিয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে ৩টি বিস্তীর্ণ এবং লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এক এক দুর্ভিক্ষের জন্য দুর্ম্মূল্যতা প্রায় ২ বৎসর করিয়া থাকে। এ হিসাবে এই ১০ বৎসর কালমধ্যে ৬ বৎসর কাল ভারতের বহু লোক একরূপ অনাহারেই দিন কাটাইয়াছে। সর্ব্বত্রই মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। টাকার মূল্যহ্রাস যে ইহার জন্য অনেকটা দায়ী, তাহা সরকার যে একেবারে বুঝেন নাই, তাহা নহে। তাঁহারা তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভারতের কৃষীবল এই সময়েই অত্যন্ত অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যাপারে চাষীদের কিছু অধিক অর্থাগম হইলেও বিশেষ অর্থাগম হয় রপ্তানীকারক বণিকদিগের। মনে করুন, বিলাতের বণিকরা ১ পাউণ্ড দিয়া ২ মণ গম কিনিতে প্রস্তুত। ভারতে তখন গমের দর প্রতি মণ ৪ টাকা। ভারতে যাঁহারা রপ্তানী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, সমস্ত খরচ-খরচা ধরিয়া তাঁহারা যদি বিলাতে ৫ টাকা মণ দরে অথবা অর্দ্ধ-পাউণ্ড দরে উহা বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রচুর লাভ হয়। টাকার বিনিময়-মূল্য যখন ২ সিলিং অর্থাৎ পাউণ্ডের মূল্য যখন ১০ টাকা, তখন তাঁহারা ঐ চালানী কার্য্যে প্রতি পাউণ্ডে হয় ত ৷৷০ আট আনা লাভ পাইতেন। তাহার পর বাট্টা-বিভ্রাটে পড়িয়া পাউণ্ডের মূল্য ১৭ টাকা হইল। ভারতে সেই সময়ে গমের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া ৪ টাকা স্থলে বড় জোর ৫ টাকা দাঁড়াইল। বিলাতের বণিক তখনও ২ মণ গম বিলাতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলেও তাঁহাদেরই খরচ-খরচা বাদে লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা উহা বেচিয়া পাইলেন ১ পাউণ্ড বা ১৭ টাকা।

অর্থাৎ তাঁহারা প্রতি পাউণ্ডে ন্যায্য লাভের উপর অতিরিক্ত লাভ করিলেন ৫ টাকা। কিন্তু মফঃস্বলের কৃষকরা, অর্থাৎ যাহারা জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, ঐ গম উৎপন্ন করিয়াছে, তাহারা বড় জোর মণকরা ৮ আনা বা ১২ আনা লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে, রপ্তানীকারক বণিকরা এই টাকার মূল্য-হ্রাসের ফলে লাভ করিয়াছেন মণকরা ৩ টাকা। যে সময়ে পাউণ্ডের মূল্য ১৪ হইতে ১৫ টাকা হইয়াছিল। অর্থাৎ যে গম বিলাতী বণিকরা ১ পাউণ্ড মূল্যে কিনিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা দেড় পাউণ্ড মূল্যেই কিনিবার জন্য বায়না করিয়াছিলেন। কাযেই রপ্তানীকারক বণিকদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মফঃস্বলে ঐ সময় গমের দর বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু রপ্তানীকারকদিগের লাভের তুলনায় কৃষকদিগের আয় অতি সামান্যই হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক বণিকরা কৃষীবলের দুঃখে আপনাদের নয়নে সাঁতার পানি বহাইতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে।

ভারতীয় কৃষকরা শস্য বিক্রয় করিয়া অধিক অর্থ পায়, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ হউক, স্থানে স্থানে লোক না খাইতে পাইয়া মরিতে থাকুক, আর কৃষকরা অধিক অর্থ পাউক, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১৯০০, ১৯১৯, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালার অনেক স্থানে কৃষকরা শস্যাদি বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পাইয়াছিল। কিন্তু সে জন্য তাহারা লাভবান্ হইতে পারে নাই। তাহারা যেমন অধিক মূল্যে ক্ষেতের ফসল বেচিয়াছে, তেমনই অধিক মূল্যে অন্য ফসল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের লাভ হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ে বাঙ্গালাতে অনশনজনিত মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষকদিগের এইরূপ অর্থলাভ কি বাঞ্ছনীয়?

যাঁহারা বলিতেছেন যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হইলে কৃষকরা অল্প টাকা পাইবে, তাঁহারা একটা বিষয় আমলে আনিতেছেন না। তাঁহারা বলেন যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এ দেশ হইতে এক পাউণ্ড মূল্যের কৃষিজ পণ্য চালান দিলে কৃষকরা ১৫ টাকা পাইত। টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হওয়াতে তাহারা উহাতে ১৩ টাকা ৫ আনার কিছু অধিক পাইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে পণ্যমূল্য কি সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মতই আছে, না ভারত অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে? পূর্ব্বে ভারতের কৃষক যেখানে ৩ মণ চাউল চালান দিলে ১ পাউণ্ড পাইত, এখন তাহারা ২ মণের কিছু অধিক চাউল দিলেই ১ পাউণ্ড পায়। সুতরাং পূর্ব্বে তাহারা যেখানে ৩ মণ চাউল দিলে ১৫ টাকা পাইত, এখন টাকার মূল্য ১৮ পেন্স হওয়াতে তাহারা সেই ৩ মণ চাউল দিলে ১৬ টাকা হইতে ১৭ টাকা পায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে টাকাটা রপ্তানীকারক বণিক মহাশয়রা গ্রাস করিবেন বলিয়া কি তাঁহারা উহার উল্লেখ করিতেছেন না? টাকার বিনিময়-মূল্য যখন অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল, তাহার অল্প পরেই রপ্তানীকারক বণিকরা এক এক জন ধনকুবের হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই প্রভূত অর্থ নিয়োগ করিয়া কলিকাতায় পাটের কল এবং বোম্বাই অঞ্চলে কার্পাস-

পাটের কল বাঙ্গালায় ছিল, ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩টি ; ঐ সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের কার্পাস-কলের সংখ্যা ৫৮টি হইতে ১৭৪টি হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, এই সময়ে কৃষকদিগের ঋণভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস পাইলে লাভ কাহাদের, এই ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে।

যাঁহারা ১৬ পেন্সের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য করিলে কৃষকদিগের সমৃদ্ধি-হানি ঘটিবে। কারণ, তাহারা পাউণ্ডের বদলে টাকা অল্প পাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুদ্রার সংখ্যার উপর সমৃদ্ধি নির্ভর করে, না উহার ক্রয়-শক্তির উপর লোকের সমৃদ্ধি নির্ভর করে? মনে করুন, এক ব্যক্তির ৫টি টাকা আছে, আর এক ব্যক্তির ১টি মাত্র মোহর আছে। ইহাদের দুই জনের মধ্যে অধিক সমৃদ্ধ কে? ৫ মুদ্রার স্বামী, না এক মুদ্রার অধিকারী? অত্যন্ত নির্ব্বোধও স্বীকার করিবে যে, এ ক্ষেত্রে এক মুদ্রার অধিকারীই অধিকতর সমৃদ্ধ ; কারণ, মোহরের ক্রয়শক্তি অধিক। সুতরাং টাকার মূল্য যদি ১৬ আনার স্থলে কার্য্যতঃ ১৮ আনা হয়, তাহা হইলে তদনুপাতে যদি কৃষক অল্প টাকা পায়, তাহা হইলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? একটা টাকার বদলে যদি কেহ দুইটি আধুলি পায়, তাহা হইলে সে কি অধিক লাভবান্ হয়? না চারিটি সিকির বদলে কেহ একটি টাকা পাইলে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়? মুদ্রা মূল্যের বা ক্রয়-শক্তির মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং ক্রয়-শক্তিই মুদ্রার সর্ব্বস্ব। টাকা এখন তাক্ত বা অভিজ্ঞান-মুদ্রা (token coin)। বিলাতী মুদ্রার সহিত যদি উহার বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে সেই টাকা কাহার মূল্যের নিদর্শন হইবে? সুবর্ণের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তিত হয়। সেই সুবর্ণ যদি তাহারা টাকার বদলে ৭.৫৩ গ্রেণ না পাইয়া ৮.৪৭ গ্রেণ পায়, তাহা হইলে কি তাহাদের লাভ হইবে না?

চাষীরা যেমন অল্প টাকা পাইবে, তেমনই তাহাদের টাকা খরচও অল্প হইবে। তাহারা ৪ পাঁইট কেরাসিনের বদলে ৪॥০ পাঁইট কেরাসিন তেল, ১ সের লবণের বদলে ১৮ ছটাক লবণ পাইবে। এইরূপ কাপড়, ডাইল, কলাই, ঔষধ, বাসন, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র, সূতা, ছাতি, তামাক, গুড়, চিনি, তরি-তরকারী সমস্তই টাকার বদলে অধিক পাইবে। সুতরাং তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? অতএব ১৬ পেন্স-ওয়ালারা কৃষকদিগের ক্ষতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা যুক্তিসহ নহে।

কেবলমাত্র জমীর খাজনা দান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কৃষকদিগের ক্ষতি হইবে না। অথচ যাহাদের জমীর খাজনা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধার্য্য হইয়াছে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বা তাহার পূর্ব্বে যাহাদের জমির খাজনা ধার্য্য হইয়াছে, তাহাদিগকে বরং সেই হিসাবে শতকরা ৭৫ টাকা হিসাবে জমীর খাজনা বৃদ্ধি দিতে হইবে। আবার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ বা তাহার পরে যে সকল জমীর খাজনা ধার্য্য হইয়াছে, তাহাদিগকেও অধিক হারে খাজনা দিতে হইবে। সুতরাং এই প্রশ্ন তুলিলে বাঙ্গালার কৃষক মৌরসী মোকররীদার, পত্তনীদার, গাঁতিদার সকলেরই ক্ষতি হইবে, অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদিগেরও বিশেষ লাভ হইবে না। টাকার মূল্য ১৬ পেন্স ধার্য্য হইলেও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাহাদের জমীর খাজনা ধার্য্য হইয়াছে, তাহারাও ঐ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এ সকল তর্ক তুলিলেই মুস্কিল।

এখন প্রশ্ন—কৃষকদিগের মধ্যে কয় জনের অধিক অর্থাগম হইবে? ভারতের শতকরা ৭১ জন কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। নিখিল ভারতে ২২ কোটি ৯০ লক্ষ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে বহু লোক পশুচারণ এবং ক্ষেতে-খামারে মজুরী করিয়া থাকে। যাহারা ক্ষেতে-খামারে মজুরী করে, তাহাদের পক্ষে মুদ্রামূল্য অল্প হইলেই ক্ষতি। যাহারা পশুপালন করে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। অবশিষ্ট যাহারা হলকর্ষণ করে, তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক যে পণ্য উৎপাদন করে, তাহা তাহাদের সাংসারিক ব্যবহারেই ব্যয়িত হয়, উহারা অল্প মুদ্রা পাইবে না। কারণ, তাহারা কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ই করে না ; পক্ষান্তরে, অন্য কায করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করে। অনেক স্থলে পণ্যের বিনিময়েই তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক অন্য পণ্য খরিদ করে। যাহারা অন্য কায করিয়া আয় করে, তাহাদেরও ক্ষতি হইবে। সুতরাং দেখা যায়, অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই টাকার সংখ্যা হিসাবে (কার্য্যতঃ-নহে) আয় অল্প হইবে।

একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। পণ্যের মূল্য সাধারণতঃ যোগান এবং টানের উপরই নির্ভর করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টাকার মূল্য ১৬ পেন্স থাকিলেও পণ্য-মূল্য সমান থাকে নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় চাউলের মূল্য গড়ে মণকরা ৩৷০ টাকা ছি[illegible], ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উহা গড়ে মণকরা ৬ টাকার উপর দাঁড়া[illegible]। গমের মূল্য মণকরা ৩৸/০ হইতে ৪৷৵০ দাঁড়ায়।

মুদ্রা-মূল্য অল্প হইলে শতকরা ৭০ জনের ঘোর [illegible] হইবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অভাবের পেষণে নিষ্পিষ্ট হইবে। দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইবে। রেল প্রভৃতির [illegible] কমিবে না। ইহা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গাপুর



সিঙ্গাপুরী নরযান বা জিন-রিক্‌সা

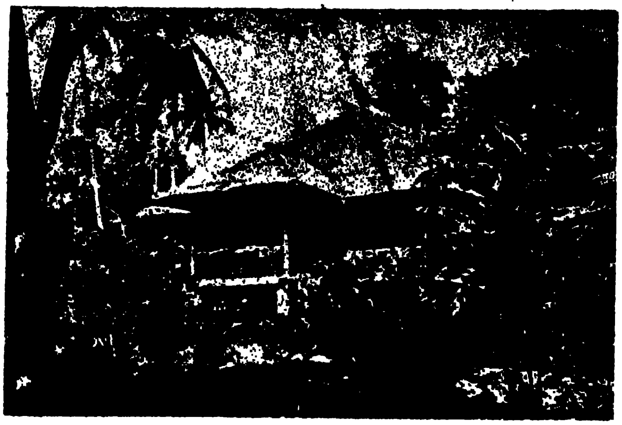
এক শত বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর গহন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। রাত্রিকালে গৃহের বাহির হইলে ভীমকায় ব্যাঘ্র-কবলে মানুষ নিপতিত হইত। কিন্তু শত বৎসরের মধ্যে এই অরণ্য-বেষ্টিত দ্বীপটি এখন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরে পরিণত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের বর্ণনামতে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ বন্দরের মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি। বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুর জন-পরিপূর্ণ বিচিত্র নগর; তাহার বৈশিষ্ট্য দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

মানচিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, সিঙ্গাপুরের অবস্থান অনেকটা জিব্রাল্টারের মত। প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রবেশ করিবার মুখে সিঙ্গাপুর অবস্থিত। সুতরাং সমগ্র য়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের বণিকজাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রাচ্য অঞ্চলে আসিতে গেলে সিঙ্গাপুরকে স্পর্শ করিতেই হইবে। এই কারণেই শত বৎসরের মধ্যে সিঙ্গাপুরের এই বিস্ময়জনক উন্নতি ঘটিয়াছে। গত বৎসর অন্যূন ১০ হাজার জাহাজ মালাক্কা প্রণালীর নীল জল-রাশি ভেদ করিয়া সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যসম্ভার সহ আসিয়া-ছিল। য়ুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান ও আমেরিকার সহিত সিঙ্গাপুর বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ।

এই নগরীর সুখ-সৌভাগ্যের কথা উপন্যাসের ন্যায় মনোরম। মালয়গণ বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মালভূমি প্রদেশে



বিস্তীর্ণ ও শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাকেই ভূগোলকার মালয় প্রদেশ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিছু কাল পরে পর্ত্তুগীজগণ উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করিয়া মালয় সুলতানদিগের দুর্গগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে। পর্ত্তুগীজদিগের পর ওলন্দাজগণ মালাক্কা হইতে ম্যানিলা পর্য্যন্ত সকল স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিল। ইহার পর বৃটিশশক্তি উপনিবেশ স্থাপনের অভিপ্রায়ে এই দেশে আগমন করে।



রবার-চাষীদের গৃহ

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড রাফেল্‌স্ নামক জনৈক ইংরাজ কৌতূহলপরবশ হইয়া সিঙ্গাপুরে আগমন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই প্রাচী অঞ্চলে তিনি একটা উপনিবেশ স্থাপন করিবেন। ইংরাজ এই স্থান জয় করেন নাই বা ক্রমবর্দ্ধনশীল জনপদ দেখিয়া ইহা অধিকার করেন নাই। সার ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড রাফেল্‌স্ উহা ক্রয় করিয়া ইংরাজের ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। জোহরের সুলতানের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য তিনি উহা মূল্য দিয়া কিনিয়াছিলেন। সে সময় সিঙ্গাপুর অরণ্য-সমাকুল একটি দ্বীপমাত্র—মাত্র জনকয়েক মালয় ধীবর দ্বীপমধ্যে কায়ক্লেশে অবস্থান করিত। তখন ভীষণ ব্যাঘ্র ও বিপুলকায় সর্পসমূহ দ্বীপমধ্যে বিচরণ করিত। বহির্জ্জগতের সহিত সিঙ্গাপুরের তখন কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুর বিচিত্র নগরে পরিণত হইয়াছে। মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব-দর্শন ব্যাঙ্ক, প্রস্তররচিত বিশালকায় আদালত, সরকারী ইমারত, খৃষ্টান গির্জ্জাসমূহ—পাশাপাশি মালয় মসজেদ, হিন্দুর ধর্ম্ম-মন্দির, চীনের বিচিত্রদর্শন গৃহসমূহ দেখিলে মনে হয় না, এককালে এইখানে দিবাভাগে নরখাদক শার্দ্দূল বা অজগর সর্পসমূহ নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিত।

পূর্ব্বে গহন অরণ্যমধ্যে হস্তিচলাচলের যে পথ ছিল, এখন তথায় প্রশস্ত, দীর্ঘ রাজবর্ত্মসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে; অশ্বের হ্রেষা এবং মোটরের শৃঙ্গনাদ অরণ্যগুল্মমধ্যস্থিত আক্রমণকারী ব্যাঘ্রের গর্জ্জনকে পরাভূত করিয়া মানবের জয়গান ঘোষণা



করিতেছে। সিঙ্গাপুর হইতে জোহর গমন করিতে হইলে জল পার হইতে হইত। এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। সেতুবন্ধ হইয়া সিঙ্গাপুর এখন মালয় মালভূমির সহিত সংযুক্ত। সিঙ্গাপুর হইতে রেলে চড়িয়া সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী শ্যামরাজ্যে গমনাগমন এখন আর দুঃস্বপ্নের বিষয়ীভূত নহে।



সিঙ্গাপুরে 'কটন' রাজপথ

উন্নতির মূলে মার্কিণদিগেরও হাত আছে।

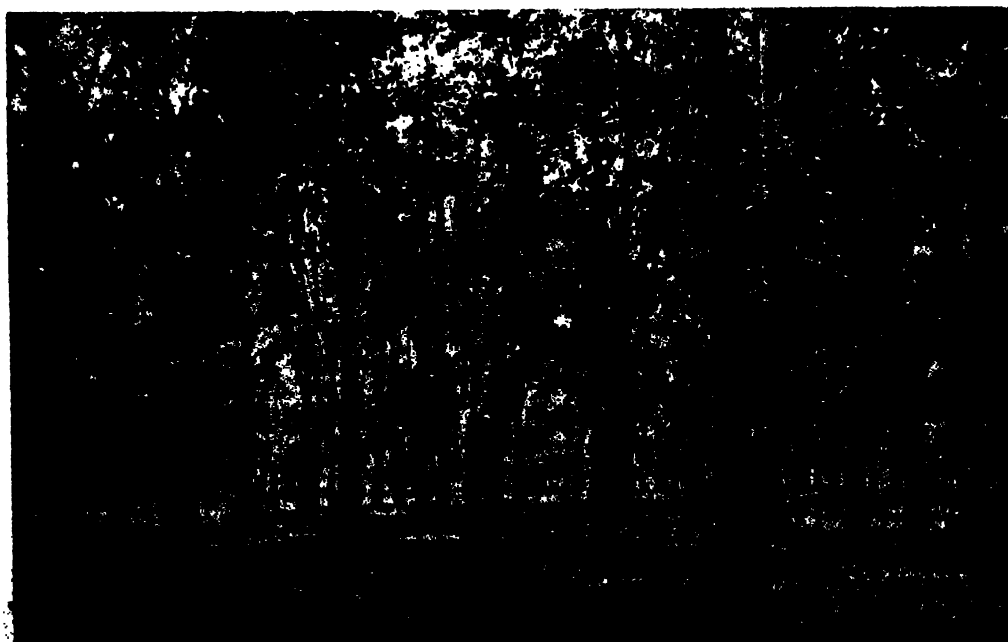
শ্যামদেশের সীমান্ত হইতে মালয় মালভূমির বিস্তার। শত শত মাইলব্যাপী বিরাট অরণ্যানী এখনও বিদ্যমান। এই অরণ্যমধ্যে বন্য হস্তী, সর্প এবং উলঙ্গ মানবের বাসভূমি। মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র, রবারক্ষেত্র এবং টীনের খনি বিদ্যমান। সখের পর্য্যটনের

রেলপথ বিস্তৃত হইয়া ক্রমে রেঙ্গুন ও ভারতবর্ষকেও সিঙ্গাপুরের সহিত শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিবে। মালয়ের উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলি এখন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শস্য-উৎপাদক স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রেজিল হইতে কতিপয় রবার-চারা এই দেশে গোপনে আনীত হইয়াছিল। অধুনা রবারের চাষ এ অঞ্চলে এমন উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, সমগ্র জগতের প্রয়োজনীয় রবারের তিন-চতুর্থাংশ এই প্রদেশ হইতেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই বিরাট

জন্য যাঁহারা মালয়দেশে গমন করেন, তাঁহারা এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁহারা হংকং বা ম্যানিলা দেখিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। অথবা কেহ কেহ সিঙ্গাপুর সহর মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়াই মালয়পর্য্যটনের স্পৃহা নিবৃত্ত করিয়া থাকেন।

সিঙ্গাপুর নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের নামানুসারেই সিঙ্গাপুর নগরের নামকরণ হইয়াছে। ইংরাজের প্রণালী উপনিবেশের (Straits Settlements) রাজধানী সিঙ্গাপুর। মালয় ষ্টেটের অন্তর্গত পেরাক্, সেলাঙ্গর, পাহাং এবং নেগ্রি





চাউলের বস্তাপূর্ণ গো-শকট

দেখিলাম। কুয়ালা লম্পুর উহার রাজধানী। সিঙ্গাপুরের বিপরীত দিকে—ও পারে জোহর স্বাধীন দেশীয় রাজ্য। এখানে এক জন সুলতান আছেন। তিনিই রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন, তবে এই রাজ্যও ইংরাজের আশ্রিত। সিঙ্গাপুরের গবর্ণর মালয় রাজ্যসমূহের হাইকমিশনার। ইনি উত্তর-বোর্ণিও এবং সারাওয়াকেরও বৃটিশ এজেন্ট। পঞ্চাশটি জাহাজ-পরিচালক কোম্পানী, তাড়িতবার্ত্তা এবং রেডিও-বার্ত্তা ষ্টেশন সিঙ্গাপুরে বিদ্যমান। সুতরাং সিঙ্গাপুরের মর্য্যাদা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে সকল দেশের সকল প্রকার লোকই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস করিতেছে। য়ুরোপীয়, চীনা, জাপানী, তামিল, হিন্দু এবং দক্ষিণ-সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপসমূহের অধিবাসিগণ এখানে অসংখ্য। তন্মধ্যে চীনারাই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ক্ষমতাশালী।

মালয়বাসীরা এমনই অলস যে, ধীবরের ব্যবসাতেও তাহাদের দক্ষতা তেমন দেখা যায় না। তাহারা কিছু কিছু ধান্য চাষ করে, নারিকেলের আবাদও যৎসামান্য করিয়া থাকে। প্রয়োজনমত মৎস্য শিকারও যে তাহারা না করে, তাহা নহে। প্রকৃতি মালয়বাসীর প্রতি এমনই অনুকূল যে, এক ঘণ্টার মধ্যে তাহারা যে পরিমাণ মৎস্য সংগ্রহ করিতে

চীনারা দস্তার খনি আবিষ্কার করিয়া তথায় অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। কৃষিব্যাপারে চীনারই প্রাধান্য। বিপণিগুলি চীনাদিগের অধিকারে। শিল্পী, কণ্ট্রাক্টর, মহাজন সকল ব্যাপারেই চীনার প্রাধান্য। তামিল ও হিন্দুরা শ্রমজীবীর স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোলদার হইয়াছে বটে; কিন্তু লক্ষপতি, ক্রোরপতি বলিলে চীনাদিগকেই বুঝাইবে। পীতজাতি ব্যবসায়ে যেরূপ পরিশ্রম ও বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে, তাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না। অরণ্যবেষ্টিত দুর্গম স্থানে, অসভ্য নরের বিষাক্ত বাণ, সর্পের দংশন, ব্যাঘ্রের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া চীনারাই টীনের সন্ধান পাইয়াছিল। কত লোক যে ভীষণ রোগের প্রকোপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না। এইরূপে চীনারা সিঙ্গাপুরকে প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। তাহাদের এই কীর্ত্তি ইতিহাসে তাহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রধান নগরসমূহে মনুষ্যবাহিত যান দেখিতে পাওয়া যাইবে। সিঙ্গাপুরেও 'জিনরিক্স' বা মনুষ্যবাহিত যানের প্রভূত প্রচলন আছে। ১০ হাজারেরও



অধিক ব্যক্তি এই যান লইয়া রাজপথসমূহে গতায়াত করিয়া থাকে। ইহাদের পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। মাথায় তৃণনির্ম্মিত টুপী—বৃষ্টিধারা প্রতিহত করিবার জন্য উহার উপরিভাগ মৎস্য-তৈলে অনুলিপ্ত এবং জানু হইতে কটি পর্য্যন্ত আবৃত নীল পাজামা। বাহু, দেহ এবং চরণের অন্যান্য অংশ অনাবৃত। প্রখর সূর্য্যালোকে তাহাদের স্বেদসিক্ত দেহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পেশীবহুল বাহুযুগল যে কিরূপ সহনক্ষম, তাহা এই পীতদেহ মনুষ্যগুলিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী রিক্সাগুলিতে দুই জন আরোহী বসিয়া থাকে; কিন্তু এই গুরুভার লইয়াও ভারবাহী কুলী ঘণ্টায় ৬ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিনা বিশ্রামে ইহারা রিক্সা বহন করিয়া থাকে। শুধু ভাত ও রৌদ্রপক্ক মৎস্য আহার করিয়া কিরূপে যে ইহারা এমন কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।



স্নানের ঘাট

জাহাজে কয়লা বোঝাই কার্য্য কুলীরা করিয়া থাকে। দুই জন কুলী এক বংশদণ্ডে ঝুড়ি ঝুলাইয়া উহাতে কয়লা ভরিয়া লয়। কুলীর দ্বারা অতি সত্বর জাহাজে কয়লা বোঝাই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সংপ্রতি কোন একখানি জাহাজে ২১ হাজার ঝুড়ি কয়লা (প্রায় ৪১ হাজার মণ কয়লা) ৫ ঘণ্টার মধ্যে তুলা হইয়াছিল।



এময় হইতে এডেন পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানের বিচিত্র আকারের শত শত নৌকা এই প্রণালীর মধ্যে গতায়াত করিয়া থাকে। চীনদেশীয় অজস্র 'জঙ্ক' নৌকা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়দেশীয় অপূর্ব্বদর্শন নৌকা-সমূহ মালয়-মহিলাগণকে লইয়া প্রণালীবক্ষে বিহার করিয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভেই কোচিন চীন হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্ক নৌকা শূকর, চিনি, চাউল প্রভৃতি পণ্যসম্ভারপূর্ণ হইয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হয়। সুমাত্রা দ্বীপ হইতে কেরোসিন তৈলপূর্ণ নৌকাসমূহ বন্দরে উপনীত হয়। জোহর উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে সংগৃহীত বিক্রেয় দ্রব্য-পূর্ণ নৌকা এবং শ্যামদেশের পণ্যসম্ভারসহ পোতসমূহ সিঙ্গাপুরে ক্রয়-বিক্রয়ার্থ আসিতে থাকে। শ্যামদেশজাত মূল্যবান্ সেগুন-কাষ্ঠ বহুল পরিমাণে এখানে আসিয়া থাকে।

শ্যামদেশের সেগুন-কাঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া ব্যবসায়িমহলে ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। পশ্চিম-ভারতের গুহামধ্যস্থ মন্দিরসমূহে সেগুন-কাষ্ঠের কড়ি

২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল কড়ি মন্দিরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। শ্যাম-দেশ হইতে প্রাচীন যুগে ঐ সকল সেগুন-কাঠ সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পরিপক্ক সেগুন-কাঠ কখনও ফাটিয়া যায় না বা ঘুণ-পোকার দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না।



বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

সিঙ্গাপুরে তামাক, সুরা এবং অহিফেন ছাড়া অন্য কোনও পণ্যদ্রব্যের উপর কোন প্রকার কর নাই। এখানকার ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্ব্বপ্রকার করভারমুক্ত। প্রাচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী যাবতীয় দেশ এবং দ্বীপসমূহে ক্রয়-বিক্রয়ার্থ যে সকল দ্রব্য সমানীত হয়, সিঙ্গাপুর হইতেই তাহা প্রধানতঃ রপ্তানী হইয়া থাকে।

শ্বেতজাতিরা সিঙ্গাপুরে পরম আরামে জীবন উপভোগ করিয়া থাকে। এখানে পরিচারক স্বল্প ব্যয়ে নিযুক্ত করা যায় এবং সংখ্যায় অনেক মিলিয়া থাকে। দিবা ও রাত্রি সমান বলিয়া এখানে আপিস-আদালতের কার্য্য অন্য দেশের তুলনায় অল্প-সময়ের জন্য হইয়া থাকে। শ্বেতজাতিরা অধিকাংশ-কাল আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করিয়া থাকে।

সিঙ্গাপুরের জল-বায়ু মন্দ নহে। এখানে শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত অল্প;—নাই বলিলেই চলে। সিঙ্গাপুরকে এ জন্য শিশুর স্বর্গরাজ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মোটর-যানের বাহুল্যবশতঃ সিঙ্গাপুরের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দ্বীপের চারিদিকে সুপ্রশস্ত মনোরম রাজপথসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্যবসায়িগণ নগরের লোকাকীর্ণ স্থান হইতে বহুদূরে—পল্লীমধ্যে সুদৃশ্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে ব্যাঘ্রকবলে প্রায়ই মানুষ নিপতিত হইত। অধুনা হিংস্র শ্বাপদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। শুধু ...



...কুর এবং কিছু কিছু ...রিণ দ্বীপমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই সিঙ্গাপুরের দোকানপাট সবই বন্ধ হইয়া যায়। রাজপথ জনসমাগমবর্জ্জিত হইয়া নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতে থাকে। রাত্রি ১০টার মধ্যে সিঙ্গাপুর সহর সুপ্তিতে মগ্ন হইয়া যায়।



সিঙ্গাপুরী নরসুন্দর

সিঙ্গাপুরের মাছের বাজার দেখিবার জিনিষ। এত অধিকসংখ্যক বিচিত্র আকারের মৎস্য পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সমুদ্রগর্ভে যত প্রকার মৎস্য জন্মিতে পারে, প্রায় সবই এখানে ধৃত হইয়া থাকে।

মাছের বাজারের পার্শ্বেই শাক-সব্জী ও ফল-মূল প্রভৃতির বাজার।

কিন্তু উষার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই দেশীয়গণ শয্যাত্যাগ করিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান দেশীয়গণের নিত্যকর্ম্ম। এখানকার সূর্য্যোদয় প্রকৃতই মনোরম। নিস্তব্ধ অন্ধকার ও সমুজ্জ্বল প্রভাতের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। সূর্য্য যেন অকস্মাৎ দিগন্তর ভেদ করিয়া আকাশপথে লম্ফ দিয়া আরোহণ করে। নভোরেণুজাল মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হয়—রাত্রির স্নিগ্ধ-শীতলতা ইন্দ্রজালের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আর্দ্র রাজপথসমূহ অল্পসময়ের মধ্যে ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হয়।

এই বাজারে চীনারই প্রাধান্য। তাহারাই চাষ-আবাদ করিয়া এ সকল জিনিষ উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রাতঃরাশ-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই চীনা দোকানদারগণ ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য সম্পন্ন করে।

মালয় দ্বীপ হইতে শব্দকারী বন্য বিড়াল এখানে আমদানী হয়। এই জাতীয় বনবিড়াল প্রায়ই জীবিতাবস্থায় দেখিতে পায় না। ইহার শরীরের বর্ণ বাদামী, মস্তক বৃহৎ এবং লাঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা বনে বাস করে। ফাঁদ পাতিয়া অতি কষ্টে ইহাদিগকে ধরিতে হয়। কথিত আছে,



পাশবদ্ধ হইবামাত্র ইহারা এমন অশ্রান্তভাবে ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে যে, চিতা বাঘ প্রভৃতি মার্জ্জারজাতীয় হিংস্র পশু শব্দ শুনিয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হয় এবং পাশবদ্ধ বন্য বিড়ালটিকে ভক্ষণ করে। এ জন্য এই জাতীয় বনবিড়াল ধরিয়া আনা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

সিঙ্গাপুরী মশক বড়ই ভীষণ। ইহাদের দংশন-জ্বালা সাংঘাতিক; কিন্তু প্রকৃতির এমনই মহিমা যে, এখানে এক প্রকার ঘাস জন্মে, তাহার রস মশক-দংশনের প্রতি-ষেধক। উল্লিখিত ঘাসের



রবারগাছ হইতে রবার সংগ্রহ

তৈল এমনই উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট যে, সিঙ্গাপুরীরা উহা হস্ত-পদ ও মুখে অনুলেপন করিলে মশক-কুল দংশন করা দূরে থাকুক—বহুদূরে পলায়ন করিয়া থাকে।

মালয়দেশে এক প্রকার ফল জন্মে, তাহাকে 'ডুরিয়ান' বলে। এই ফলের গাছ ৮০ বা ৯০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। ফলগুলিও বৃহদাকার। উহার উপরিভাগে অনেকগুলি দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র মুখ থাকে। ঝড়ের সময় বা ফলগুলি যখন পরিপক্ব হয়, সেই সময় এই সকল বৃক্ষের তলদেশে অবস্থান করা



আদৌ নিরাপদ নহে। উহা শরীরের উপর পতিত হইলে সাংঘাতিক আঘাত লাগে—অনেক সময় মানুষ মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। ফলগুলি ছাড়া-ইয়া তাহার শস্য সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। ইহার ঘ্রাণ অতি মনোরম। মালয়গণ এই ফলের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

এতদঞ্চলে আর এক প্রকার প্রসিদ্ধ ফল পাওয়া যায়। তাহার নাম 'ম্যাঙ্গো-ষ্টিন।' কিন্তু উহা দূরদেশে রপ্তানী করা অসম্ভব—সহ-জেই পচিয়া যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে একটি 'ম্যাঙ্গোষ্টিন' ফল তাজা অবস্থায় লণ্ডনে লইয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার



সিঙ্গাপুরী পুলিস-প্রহরী

পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই সে কার্য্য সাধন করিতে পারে নাই। এতদ-ঞ্চলে যাহারা বাস করে, শুধু তাহারাই এই সুস্বাদু ফলের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ।

সিঙ্গাপুরে একটি মনোরম রাজপথ আছে—তাহার নাম 'অর্চ্চার্ড রোড।' ঔপ-নিবেশিকগণ অপরাহ্নকালে এই পথে ভ্রমণ-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। রাজপথের ধারে ধারে ঋজুদেহ তালবৃক্ষ-সমূহ দণ্ডায়মান, জলাশয়ে সুবৃহৎ বিচিত্রদর্শন শতদল-সমূহ শোভা পাইতেছে।

পেরাকের সুলতানগণ কচ্ছপ-ডিম্ব শিকার করিতে ভালবাসেন। এই প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত





সিঙ্গাপুরের বুদ্ধ-মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ

আছে। এই ডিম্ব-শিকার-প্রমোদে উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মালয়-মহিলারাও যোগদান করিয়া থাকেন। পেরাক নদীর এক-শতাধিক মাইলব্যাপী স্থানে—ডিসেম্বর মাসে প্রচুর বারি-বর্ষণের পর কচ্ছপ দলে দলে নদীতীরস্থ বালুকা-বিস্তারের উপর সমবেত হয় এবং গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে। প্রত্যেক গর্ত্তে ১৫ হইতে ৩০টি ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কচ্ছপীরা ডিম্বের উপর বসিয়া 'তা' দেয় না;



প্রসবের পর ডিম্বগুলিকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বালুকার উত্তাপে ডিম্বগুলি ফুটিয়া শাবক নির্গত হয়। তাহারা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া নদীর জলে ঝাঁপা-ইয়া পড়ে এবং স্রোতের টানে অন্যত্র নীত হয়।



মালয় শ্রমজীবী

কচ্ছপগুলি সমুদ্রকূলে উপনীত হইলে তামিল… কৌশল সহকারে তাহাদের খোলা ছাড়াইয়া ল… উহা দ্বারা তাহারা চিরুণী অথবা কেশপ্রসাধনে… উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করে। কচ্ছপ তাহ… আবরণচ্যুত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে এবং কালক্র… আবার তাহাদের উপরিভাগে কঠিন আবরণ উ…



বিচিত্র পান্থ পাদপ

তবে ঋণী মালয়, বন্ধুর সাহায্য করিবে, তাহার হইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিবে। বিপদের মূলে যদি কোনও নারী বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

মালয়রা অত্যন্ত অলস ; কিন্তু কেহ যদি তাহাদিগকে একবার কৌশল করিয়া কাযে লাগাইয়া দিতে পারে—যখন তাহাদের মন ভাল অবস্থায় থাকে, সেই সময়ে তাহাদিগের চিত্তে কাযের প্রেরণা দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা অতি মনোরম, কারু-কার্য্যময় দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিতে পারে। সিঙ্গাপুরে সময়ে সময়ে কেশ-রচনার উপযোগী দ্রব্যসম্ভার, কোমরবন্ধ, কোষবদ্ধ ছোরা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য এমনই চমৎকার যে, গ্রীক শিল্পের সহিত তাহাদের তুলনা করা চলে।

মালয়গণ চমৎকার শাল-রুমাল তৈয়ার করিতে পারে। কিন্তু অল্পমূল্যের বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানী-প্রাচুর্য্যে দেশ-জাত এই সকল সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শ ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। প্রতীচ্যের প্রভাবে প্রাচ্য বেশভূষাও ক্রমশঃ হ্যাট-কোটে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

মালয়গণ সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠে। যদি কোনও মালয় মনে করে যে, কোনও লোক তাহার সমূহ ক্ষতি করিয়াছে বা এমন সর্ব্বনাশজনক কায করিয়াছে, যাহাতে তাহার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়, অমনই তাহার মস্তিষ্কের রক্ত এমন উষ্ণ হইয়া উঠে যে, সে ক্ষেপিয়া যায়। সেই সময় হাতের কাছে কোনও অস্ত্র পাইলেই সে উহা লইয়া সমীপবর্ত্তী যে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করিবেই—সে ব্যক্তি যদি নির্দ্দোষ এবং নিজ পরিবারের কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তবুও তাহার পরিত্রাণ নাই। ক্ষিপ্ত মালয়ের সম্মুখে পড়িলেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

বাসগৃহের অভাব এ অঞ্চলে বড় নাই। মালয়গণ দুই তিন দিনের মধ্যে বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণে বিশেষ দক্ষ। তালপত্র, বেত্র এবং বংশদণ্ডের সাহায্যে এই সকল গৃহ সাধারণতঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ৫ বা ৬ ফুট উচ্চ হইলেই হইল। একখানি বড় ঘর, একটা ছোট বারান্দা ও পার্শ্বে একখানি রন্ধনগৃহ—ইহাই মালয়দিগের সাধারণ বাসগৃহ। মাদুর ও কতিপয় রন্ধনোপযোগী তৈজস ব্যতীত

মালয়দিগের সম্বন্ধে কোনও শ্বেতাঙ্গ বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কোনও জাতির ভাষা, রাজনীতি, আচার-পদ্ধতির সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ কেহই দিতে পারেন না। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা সাধারণতঃ দেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার অবকাশ পাইলেও সে কার্য্যে অগ্রসর হয়েন না। অন্তরঙ্গ-ভাবে না মিশিলে মালয়দিগের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। সার ফ্রাঙ্ক সোয়েটেনহাম্ দীর্ঘকাল 'ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টের' গবর্ণর ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মালয়গণ অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ, জাল ফেলিয়া মৎস্য-শিকারে তাহারা বিশেষ দক্ষ। তাহাদের সাহস দুর্জ্জয় এবং দাসত্বকে তাহারা হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। ব্যায়ামক্রীড়ায় তাহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ইহারা রাজভক্ত এবং অতিথিবৎসল। মালয়-দিগের অন্তঃকরণ উদার—মুক্তহস্ততা ইহাদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য।

কোনও অপরিচিত ব্যক্তি যদি কোনও মালয়ের নাম জিজ্ঞাসা করে অথবা তাহার গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তবে মালয়গণ সেই প্রশ্নকারীকে অত্যন্ত অসভ্য বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু একবার পরিচয় হইয়া গেলে সে কখনও কোনও কথা তাহার কাছে গোপন করিবে না—সরল বিশ্বাসে সব কথাই প্রকাশ করিবে। যদি নিজের প্রাণনাশ ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকে, তথাপি পরিচিতের নিকট সে কোনও কথা গোপন রাখিতে পারে না।

টাকা ধার করিয়া কোনও মালয় তাহা পরিশোধ করিতে চাহে না ; কিন্তু উত্তমর্ণের উপকারের জন্য—যদি সে

দরিদ্র মালয়গণের কন্যারা গুরু পরিশ্রম করিয়া থাকে। শস্য চাষ ও ধান ভানা—সকল প্রকার কার্য্যই ইহারা করিয়া থাকে। অধুনা নিম্ন শ্রেণীর বালক-বালিকারাও বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। লেখা-পড়ার চর্চ্চা তাহাদের মধ্যে বাড়িতেছে।

মালয়দিগের বিবাহকালে দম্পতির প্রতি চাউল ও কমলাপুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়। উহাদের বিশ্বাস, এইরূপ আশীর্ব্বাদের ফলে দম্পতি সন্তানসৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।

মালয়গণ নৃত্য ভালবাসে। নর্ত্তকী-দিগকে তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। উহারা কেদারা ব্যবহার করে না। জানু পাতিয়া ভূমিতলে উপবেশনই তাহাদের প্রথা। পাশ্চাত্য প্রভাব এখনও তাহা-দিগের এই সংস্কার দূরীভূত করিতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ মালয়দিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে নাই। মালয়গণ সাধারণতঃ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসী নহে। তাহারা পর-ধর্ম্মমতসহনশীল; তাহাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মে ভণ্ডামীর ভেজাল থাকিলে ধর্ম্ম হয় না—ভণ্ডামীর অভাবই মানুষের মনে ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত আস্থা স্থাপন করে। তাহারা ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসী, আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। স্বর্গ বলিতে নিরব-চ্ছিন্ন আনন্দময় ধাম। মালয়গণের মতে নরক বিভীষিকাপূর্ণ বিবিধ শাস্তিপূর্ণ অশান্তিময় স্থান। কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে এই বিশ্বাস আছে যে, নরকযন্ত্রণা হইতে সে উদ্ধার লাভ করিবেই। এ জন্য নরককে তাহারা ভয় করে না।



রাজপথের অবস্থা

মালয়দিগের বহু গোষ্ঠী পূর্ব্বে জল-দস্যুতার দ্বারা জীবি-কার্জ্জন করিত। সরকারী বিবরণে বহু জলদস্যুর বিবরণ আছে। সিঙ্গাপুরের সন্নিহিত স্থানে দলে দলে জলদস্যু বস-বাস করিত। বাণিজ্য-জাহাজ দেখিতে পাইলেই গোলা-গুলী লইয়া বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিত। অনেক সময় লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্ভার সহ তাহারা সিঙ্গাপুরে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত।

সিঙ্গাপুরের যাবতীয় সন্দেহজনক ব্যক্তির অঙ্গুলির ছাপ পুলিসের নিকট আছে। এই প্রণালী অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

সিঙ্গাপুরে বহু-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। মালয় ও চীনাগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের কেহই জারজ নহে। সাক্ষ্যদানকালে মালয় বাইবেলের পরিবর্ত্তে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোনও আপত্তি প্রকাশ করেন না। চীনারা তাহাদের ধর্ম্মমত অনুসারে শপথ গ্রহণের সুযোগ পাইয়া থাকে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের পশ্চিম বিভাগে গগনস্পর্শী চূড়াবিলম্বিত বাশিডা-সঙ্ঘারাম বিরাজ করিতেছে। ইহার সন্নিকটেই চিরপ্রসিদ্ধ ভারত-সম্রাট অশোকের বিখ্যাত সমুন্নত স্তূপ ও বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি-সংবলিত বোধিসত্ত্ব বিহার। এই দেবমন্দির কৈলাসপর্ব্বতের সম্ভ্রমকেও পরাভূত করিয়া হিমানী-দ্যুতি-সম্পন্ন কুন্দ-সুন্দর যশোরাশির সমুন্নত পুঞ্জরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহার অত্যুচ্চ শিখরাগ্র-নিবদ্ধ শরচ্চন্দ্রের শুভ্র শোভাবিশিষ্ট পতাকায়, নভোমণ্ডল যেন নূতন মঞ্জরী মোচন করিতে করিতে শোভাবিস্তার করিতেছিল। চাতুর্ম্মাস্য-কালে আজকাল নগরের উপনগরস্থ সমুদয় চৈত্য বিহারাদি উজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত করা হইয়া থাকে। আজিও তদনুসারে এই বিহারস্তূপ ও সঙ্ঘারাম অত্যুজ্জ্বল উল্কালোকে আলোকিত। চাতুর্ম্মাস্য অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে দ্বারদেশ সকল পুষ্প-বিভূষিত। স্তূপপাদমূলে ও চৈত্য-সম্মুখে বহুতর এ দেশী ও বিদেশী শ্রমণ ও ভিক্ষু একত্র হইয়া বুদ্ধসঙ্ঘ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যতত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বিহারমধ্যবর্ত্তী দেবপ্রতিমার সম্মুখে ঘৃতদীপ প্রজ্বলিত; কাষায়ধারী মুণ্ডিতমস্তক প্রশান্তমূর্ত্তি মহা স্থবির আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ-শান্তি ভাব-গভীরস্বরে প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠ করিতেছেন, দূর হইতে সেই গাম্ভীর্য্যময় শব্দলহরী জাহ্নবী-করতোয়ার সম্মিলন-কলনাদের ন্যায় আশ্চর্য্য-মধুর শুনাইতেছিল। একটি ভারতেতরপ্রদেশীয় পর্য্যটক একখানি মৃগ-চর্ম্মাসনে বসিয়া বিনয়পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একখানি তুলোট কাগজে লেখনী দ্বারা কিছু কিছু লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার্থ নালন্দ-মহাবিহারে অবস্থিতি করিয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। চাতুর্ম্মাস্য-নিয়মে দর্শনে আসিয়াছেন। পূর্ব্বভারতের বহুতর বিখ্যাত আচার্য্য এক্ষণে এই বাশিডা-সঙ্ঘারামে সমাগত। ইঁহারা অধিকাংশই মহাযানমতাবলম্বী, কচিৎ কোন হীনযানীয় পর্য্যটককে পাইলে উভয় পক্ষে অতি জটিল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মহাতর্কেরও সৃষ্টি হইতেছিল। সে তর্কের আর মীমাংসা হইয়া উঠিবার ভরসা দেখা যাইতেছিল না, বুঝি আজিও তাহার সমাধান ঘটে নাই! হয় ত বা কোন দিনই তাহা ঘটিবে না।

যাহা হউক, এই চাতুর্ম্মাস্যকালে প্রতি বিহার-সঙ্ঘারাম যেন এক একটি রাজপুরীর শোভা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল—সহস্র সহস্র জনাকীর্ণ নগরীর প্রতিচ্ছবি ধারণ করিয়াছিল। শিক্ষক, ছাত্র, আগন্তুক, অভ্যাগতে মিলিয়া সর্ব্বদা পাঠ, পাঠনা, তর্ক, আবৃত্তি ও আনন্দ-কোলাহলে সঙ্ঘারাম মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। আবার এই উৎসবকালেই অনেকগুলি ভিক্ষু শ্রমণকে পর্য্যটনে বাহির হইয়া যাইতে হওয়ায়, তাহাদের বিরহ-দুঃখও সহপাঠী তরুণ শ্রমণদিগের চিত্তকেও গোপনে কথঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ করিতেছিল। সকলেই—যে মুনীন্দ্র জীবহিতপ্রবৃত্ত সাধুচিত্তবৃত্তিপ্রভাবে প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব অধিগত করিয়া ক্লেশনিপীড়িত জনসাধারণের পক্ষে পাপকুম্ভীরসমাকুল দুরতিক্রমণীয় সংসার-সাগর উত্তরণের হেতুরূপে বর্ত্তমান,—তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দিত।

নগরের পূর্ব্বাভিমুখে সিদ্ধপীঠ মন্দারেশ্বর শিবমন্দির ও পাটলাদেবীর মহাপীঠস্থান। মন্দিরপুরোহিত কৌশিক-বংশীয় কেশব দীক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞানপরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রীয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোরাশিবিমণ্ডিত। কেশবের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুকুলশেখর মহারাজাধিরাজ জয়ন্ত বা আদিশূরের নিকট যে কয়খানি গ্রাম দেবোত্তররূপে প্রাপ্ত হন, তাঁহার মৃত্যুর পরের অরাজকতায় মাৎস্যন্যায়ের কালে তাঁহাদিগের হস্ত-

উপরেই দেবসেবা নির্ভর করিয়াছিল। ইহার ফলে সকল দিন দেবতার ভোগ্য বস্ত্র বা দেবসেবকের অন্নসংস্থান হইত না। ইহার পর স্বধর্ম্মপালনে এবং চাতুর্বর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বধর্ম্মের পরিপোষক বিখ্যাতকীর্ত্তি উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরমসৌগত শ্রীধর্ম্মপালদেব তাঁহার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বিনী পট্টমহাদেবী রন্নাদেবীর ইচ্ছানুসারে এই সুপ্রাচীন পীঠস্থানের জীর্ণসংস্কার পূর্ব্বক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষবিষয়ান্তর্গত কয়েকখানি সমৃদ্ধ গ্রাম 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর' এখানের সেবাপূজার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার উপস্বত্বে দেবসেবা ও দেবসেবকগণের ব্যয় সুনির্ব্বাহই হইত। কিন্তু সম্প্রতি এক বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহীপাল রাজাধিরাজ মহীপালদেব এক নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বদান্যতাদত্ত বিস্তর গ্রাম যাহা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরে পরিণত হইয়া নিষ্কর হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপর একটা রাজকর ধার্য্য করা হইবে এবং যাহাদের সম্পত্তির আয় বার্ষিক এক শত নিষ্ক মুদ্রার ঊর্দ্ধ, তাহাদের সম্পত্তি হইতে সেই অংশটা বাহির করিয়া লইয়া উক্ত জমী রাজসরকারভুক্ত করা হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য ঐ পরিমাণ আয় থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। উহার বেশী অর্থাগম হওয়া না দেবতা না ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্থানে স্থানে রাজদত্ত বৃত্তিও লোপ পাইয়া গেল।

বৌদ্ধ বিহারের সম্বন্ধে ঠিক এরূপ ব্যবস্থা না হইলেও বড় বেশী প্রভেদও ঘটে নাই। রাজসাহায্য হইতে প্রায় সমস্ত বিহারই দিনে দিনে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছিল। এমন কি, সুবিখ্যাত বিক্রমশিলা, নালন্দার মহাবিহার সকলে ও বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়েও রাজকোষ হইতে দেয় সুপ্রচুর অর্থসাহায্য অতি হীনসংখ্য হইয়া আসিয়া প্রায় মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। এই সকল অনীতি-কার্য্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী এবং সৌগত, একসঙ্গেই সমপরিমাণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এ দিকে আবার শুধু তাহাই নহে;—রাজার অর্থাভাবের ত শেষ নাই। পাল-রাজগণের বিশেষত্বই এই ছিল যে, তাঁহারা বিদ্বজ্জনপ্রতিপালক ও ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা অভিধর্ম্মী ছাত্র, শ্রমণ, ভিক্ষু অধ্যয়ন করিতে পাইত; তাঁহাদের সহায়প্রাপ্ত শত দেবতায়ন-সংশ্লিষ্ট বিদ্যাগারে শত শত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী বেদবিদ্যা লাভ করিত। ফলে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তাবধি বিদ্বান্ সুধী ব্যক্তির অভাব ছিল না। বিদ্যা ও ধর্ম্ম-গৌরবে দেশ তখন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রিয় শিষ্য মহারাজাধিরাজ...পালদেব পুনশ্চ নবোৎসাহে নূতন নূতন বিদ্যাপীঠের স্থাপনা ও প্রাচীনের সংস্কারকার্য্য সমাধা করিয়া সমগ্র উত্তরাপথেই যেন একটা নবোৎসাহ আনয়ন করিয়াছিলেন। পুরাতন সুগতধর্ম্মও সেই সঙ্গে জীর্ণ-সংস্কৃত হইতেছিল। গুরুর আদেশে তিনি রাজধানীমধ্যে একটি বিশাল চৈত্যবিহার-সমন্বিত ভিক্ষুণীসঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ তারাদেবীর মন্দির তাঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল।

এতদ্ব্যতীত ভূমি-সম্পত্তি প্রদানের প্রশস্তি-রচনা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই রাজ্যকালে রাজসচিবগণের ত নিত্য কার্য্যেরই অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু সে দিন আর নাই। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর সহিত এ রাজ্যে দানধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তবে এখনও যে তাহা সম্পূর্ণভাবেই লোপ পাইতে পারে নাই, তাহার একমাত্র কারণ পট্টমহাদেবী। তাঁহার অশেষ করুণা ও মহাপ্রাণতায় এ দেশে এখনও দয়া-ধর্ম্ম একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই বটে, তবে তাঁহারই বা সামর্থ্য কতটুকু! এমন কি, অনেক সময় দানপ্রাপ্তিকালে অনেকেই বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অভাব ঘুচিল যাহা দিয়া, তাহা সুবর্ণ-নিষ্কের পরিবর্ত্তে পট্টমহাদেবীর অঙ্গের রত্ন-আভরণখণ্ড।

তাঁহার পর রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য আরও নানা প্রকারেই রাজপক্ষীয়ের অশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্যের উপর দ্বিগুণ কর ধার্য্য হইল, জালিকদিগের ধৃত মৎস্যের উপরও যেরূপ পণ্যকর, অশ্বকর, যানকর, হট্টিকা ও বিপণিকর, মানুষের সর্ব্বপ্রকার উৎপন্নের উপরেই সেইরূপ প্রচুররূপে রাজকর বসিল। কেবল বাকী রহিল—মানবরসনা হইতে উৎপাদিত বাক্যাবলীর উপরে কর ধার্য্য হওয়া। তবে সেটাও যে একেবারেই হয় নাই,

জানাইল, তাহাদের অদৃষ্টফল বিশেষ ভাল বলা যায় না। দেশের সর্ব্বত্রই একটা অসন্তোষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূমায়িত হইতে লাগিল।

ভিন্নদেশীয় লোক দেশের রাজা হইলে দেশে অত্যাচার ঘটিয়া থাকে; যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোক অপেক্ষা তাঁহাদের প্রাধান্য ঘটে, তাহাতে সাধারণ প্রজা পীড়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজা দূরদেশে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ সকল কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও ফল প্রায় একই দাঁড়াইয়াছিল। রাজার স্বজাতি বলিতে এখানে রাজার তোষামোদকারিগণকেই বুঝাইত। মহাপ্রতীহার, মহামাণ্ডলিক, দণ্ডোপাসিক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক সমুদয় উচ্চ শক্তিমান রাজকর্ম্মচারী রাজার স্বেচ্ছাচার-স্রোতে ইন্ধন যোগাইয়া দিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। মহামন্ত্রী যোগদেব যথাসাধ্য সদুপদেশ দিয়াও রাজাকে অনীতিকার্য্য হইতে ফিরাইতে না পারিয়া, সম্প্রতি তীর্থবাসসঙ্কল্প লইয়া বারাণসীক্ষেত্রে প্রস্থান করিয়াছেন। যাত্রাকালে আর একবার শেষ চেষ্টা করিতে গেলে অবজ্ঞার শ্লেষযুক্ত হাসি হাসিয়া মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব প্রত্যুত্তর করেন—"আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বানপ্রস্থই এক্ষণে আপনার অবলম্বনীয়। আমারও যখন ঐ বয়স হইবে, ভোগ-তৃষ্ণা আপনিই মিটিয়া আসিবে, আমিও না হয় আপনার দৃষ্টান্তে হয় মৃগদাবে, না হয় বোধিক্ষেত্রের পুণ্যধামে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পরলোকের চিন্তা করিব. আপাততঃ সে বিষয়ে মস্তিষ্কের বৃথা অপব্যয় উভয়তঃই নিষ্প্রয়োজন।"

বৃদ্ধ মহামন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "রাজাধিরাজ! আমার রাজা হলেও আপনি আমার পুত্র তুল্য স্নেহাস্পদ। এই সুবিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র অধীশ্বর আপনি। যে মহা সম্মানিত রাজাসনে চতুর্ব্বর্ণ প্রজাসমূহ দ্বারা সম্পূজিত হয়ে তাদেরই সমবেত চেষ্টায়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যে সিংহাসনে ধর্ম্মপালদেব—যে ধর্ম্মপালদেবের সম্বন্ধে কবিগণের অমর গাথায় গ্রথিত আছে যে, 'ইন্দ্র কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, এবং বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী বর্ত্তমানেও সেই একটি দিকেও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই পূর্ব্ব ক'রে দিয়েছি,' এই ব'লে তাঁর মহামন্ত্রী গর্গদেব বৃহস্পতিকে উপহাস করতেন, রাজন্! সেই গর্গবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে আমি এই শেষবারের জন্য আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, প্রজারঞ্জন ভিন্ন এ রাজদণ্ড কখনই স্থির থাকবে না। যাদের দ্বারা আপনারা এই মহাসম্মানিত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের দ্বারাই আবার তাহা অপহৃত হ'তে পারে, এ কথা স্মরণ রাখবেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষরা বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাঁরা সৌগত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী, শৈব, সৌর, কাহারও প্রতি কোন দিন ভেদবুদ্ধি প্রদর্শন না ক'রে প্রজাগণের মনোরঞ্জনকারী হয়ে সাম্রাজ্য পালন করেছিলেন ব'লে, তারাও তাঁদের জন্য নিজেদের প্রাণপাত ক'রে এই মহা সাম্রাজ্যের পুষ্টিসাধন ক'রে এসেছেন। হে রাজন্! প্রজার চিত্তই যে রাজ্যের মেরুদণ্ড, এ কথা বিস্মৃত হ'লে রাজ্যের সর্ব্বনাশ নিকটবর্ত্তী হবে। এই চির-হিতৈষী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই কথাটা শুধু স্মরণ রাখবেন।"

মহীপাল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে মুক্তির আশা নাই দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন নিতান্ত অভদ্রভাবেই পরুষ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"তবে কি আপনার মতে রাজা প্রজার দাসত্ব করবে?"

মহামন্ত্রী অধিকতর বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া কহিলেন,—"কি আর বলিব। আপনি যখন না বুঝিবারই পথ ধরিয়াছেন, তখন বলাই বৃথা! তবে যে কথা আপনি বিদ্রূপ ক'রে বল্লেন—সে কথা এক প্রকারে ঠিকই। রাজাকে প্রজার দাসত্বই করিতে হয়। নতুবা তাহারাই বা রাজাকে তাঁহার সহস্র অত্যাচার-অনাচার সমেত সহিবে কেন? শ্রীরামচরিত্রে কি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পান না? আপনার পূর্ব্বপুরুষ নৃপতিকুলতিলক পরমভট্টারক ধর্ম্মপালদেব, দেবপালদেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভূপতিবৃন্দকেও কবিগণ ঐরূপ উচ্চ সম্মানভূষণে যে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন, তার প্রধান কারণ—তাঁহারা প্রজাবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট ছিলেন। নিজ হীন স্বার্থ-সাধনকার্য্যে নিরত থাকিলে কখনই তাঁহারা পৃথু, রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি সর্ব্বগুণাধার, প্রজাসুখে আত্মসুখ-বিসর্জ্জনকারী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নরপালগণের সহিত তুলনীয় হইতেন না।"

মহীপালদেব এই যুক্তিপ্রদর্শনের বিপক্ষে ঈষন্মাত্র

মৃত্যুর পরে আমিও অমনই কুন্দেন্দুধবল যশোরাশিতে বিভূষিত হয়ে উঠব এবং যদি ইচ্ছা করি, জীবিত থাকতেও—আপনি কি পরীক্ষা করতে চান ?"

হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস পুনর্মোচন পূর্ব্বক বংশানুগত চির-সুহৃদ্ ও সম্রাটবংশের একান্ত হিতকামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভগ্নচিত্তে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই সকল শাসননীতির নবসংস্কারে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র একটা ঘোরতর অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অপ্রসন্ন প্রজাসাধারণ স্থানে স্থানে প্রকাশ্য ও গুপ্ত সভায় সমবেত হইয়া আপনাদের সেই অপ্রসন্নতা পরস্পরকে বিজ্ঞাপিত করিতে ও ইহার প্রতিবিধান খুঁজিতেও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সকলেই এই কথা বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল যে, এমন করিয়া অত্যাচার সহ্য করিতে থাকিলে অত্যাচারও তাহাদের এমনই করিয়াই পাইয়া বসিবে যে, তাহার আর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিবে না। রাজকীয় অত্যাচারের স্বভাবই যে এই। যদি তাহা প্রথমাবধি প্রশ্রয় পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, প্রশ্রয়প্রাপ্ত আব্দারে শিশুর মতই তাহা নিত্য নিত্য নূতন নূতন বায়না তুলিয়া নব-নব উৎপাতের সৃষ্টি করিতে ছাড়ে না। অতএব যে পর্য্যন্ত অন্যায় সহ্য করা হইয়া গিয়াছে, সেই যথেষ্ট, ইহার বেশী আর তাহারা সহিতে সম্মত নহে।

যখন এই পর্য্যন্ত বলাবলি হইয়া গেল, তখন এই একটা বিশেষ জটিল প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল যে, আচ্ছা, না হয় তাহারা আর রাজকীয় যথেচ্ছাচার সহিতে সম্মত না-ই হইল, সেটা ত সোজা কথাই ; কিন্তু না হইয়াই বা তাহারা করিবে কি ? সমস্যাটা এইখানেই যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। এই সমস্যার সমাধানটাই না যত কিছু দুরূহ ! অত্যাচার সহিতে কোন কালে, কোন দেশে এবং কাহাদেরও ভাল লাগে নাই, আজও না। তবে যে সেটাকে লোক সহ্য করিয়া চলে, তার একমাত্র কারণ—শুধুই তাহারা ইহার প্রতিরোধের উপায় খুঁজিয়া পায় না বলিয়া। নতুবা সাধ করিয়া বা শ্রদ্ধা করিয়া কাহারাও রাজভক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যদি কোন দেশে বা কালে থাকে থাক, সাধারণ মানুষের ইহা ধর্ম্ম নহে। তবে মানুষের হাত-পা না কি ঐখানেই বাঁধা পড়িয়া আছে যে, উপায় কি ? কারণ, দেশের যত কিছু ধন-বল, জন-বল তাহার সবখানিই যে রাজার হাতে। আর সকল মানুষের সুখ, স্বার্থ, রুচি ও প্রবৃত্তিও এক রকম নহে। বিশেষতঃ রাজ-প্রসাদভোজী ধনি-সম্প্রদায় অন্তরে না হইলেও মুখে প্রায়শঃ রাজভক্ত হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ রাজা যতই অত্যাচারী হইবেন, ঐ সম্প্রদায়ের লোকগুলির পক্ষে ততই লাভ। কারণ, ইঁহারাও ত অনেক সময় রাজার পাপের সহপাপী এবং তাঁহার অনাচারের অন্ততঃ অর্দ্ধেকখানির হয় ত স্রষ্টা। কাযেই সাধারণ প্রজা মরিল কি রহিল, সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর লোক বড় একটা প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে করে না এবং নিজের সময়-রত্ন অযথা পরচর্চ্চায় নষ্ট করিয়া ফেলিবার কোন বিষম আগ্রহ ইঁহাদের নাই। দেশ রাজকরে প্রপীড়িত, সেই করভারের মোটা অংশ অবশ্য তাঁহাদেরও বহন করিতে হয়। তা হয় বটে, কিন্তু হইলই বা ? এক দিকে তাঁহাদের যেমন দিতে হয়, তেমন পাওনাও ত আছে! মোটা মোটা বেতন আছে, জমীদারীতে রাজানুকরণে কর ধার্য্য তাঁহারাও করিয়া থাকেন, তাহার উপর যাঁহাদের সুযোগ আছে, রাজকোষের অর্থও তাঁহারা শোষণ না করেন, তাহাও নয়। সেই হেতু প্রজাসাধারণ ও প্রজা-অ-সাধারণ অর্থাৎ ধনিসম্প্রদায় প্রায়শঃই সহজে এক দলবদ্ধ হইতে পারে না এবং কখনও কোন দিনই হয় না। কিন্তু তাহার জন্য খুব বেশী ক্ষতি-বৃদ্ধিও অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায় নাই।

এ দিকে মহীপালদেবের অবিচার ক্রমশঃই তাঁহার অত্যাচাররূপেই বিবৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজার অবিবেচনা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি ছাড়িয়াও তাঁহার অ-নীতি-কার্য্যারম্ভেরও অনেক ছোট-বড় কাহিনী শুনা যাইতে লাগিল। সম্প্রতি এক নূতন গুরুকরণের পর হইতে পঞ্চ-মকার-সাধনা-প্রসঙ্গে অনেক কথাই উঠিয়া পড়িল। সে সকল অনাচারের কাহিনী শুনিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মিগণ কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক উচ্চারণ করিল, "বাসুদেব !"—সৌগতগণ দীর্ঘশ্বাস সহকারে সখেদে কহিয়া উঠিলেন, "হা সুগত !"



মেরো না কো ফুলবাণ

শিল্পী—শ্রীঅখিলভূষণ নিয়োগী।

বসুমতী প্রেস

বেশী এবং মরণকে ভয় যাহাদের কম, তাহারাই একটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ-বিহারে গিয়া সঙ্ঘস্থবিরগণকে, দেবায়তনে গিয়া ব্রাহ্মণদিগকে উত্তেজিত করিতে চাহিল—"এত বড় অন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াও আপনারা নীরব রহিবেন? কেহ কোন প্রতীকারচেষ্টা করিবেন না?"

তাঁহারা তাঁহাদের প্রমা পারমিতার ও বেদের ভাষ্য করা স্থগিত রাখিয়া বিমর্ষমুখে উত্তর করিলেন, "আমরা কি করিতে পারি? বিশেষতঃ রাজা যখন কোন ধর্ম্মই মানেন না, তখন রাজার সঙ্গে লাগিতে গেলে রাজার হস্তে আমাদের ধর্ম্ম শুদ্ধ অত্যাচারিত হইতে পারেন। হয় ত বিহার-মন্দির লুণ্ঠিত হইবে, পুথিপত্র অগ্নিসাৎ হইয়া যাইবে। তাহা ভিন্ন ও সব রাজনীতি, আমরা ত আর রাজনীতিজ্ঞ নহি, ধর্ম্ম এবং নীতি এই দুইটিই আমাদের অস্ত্র—যাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান রাজাধিরাজের কোন সম্পর্কই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

যুবকের দল তথাপি নাছোড়বান্দা, তাহারা তর্ক তুলিল, "এ দেশে চিরদিনই রাজনীতি সমাজনীতি, এমনই কি, ধর্ম্মনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত নয়? ধর্ম্মনীতির সহিত আজ রাজনীতিকে প্রভেদ করিতেছেন?"

মহামান্য ব্রাহ্মণকুলশেখর এক ব্যক্তি সে সময় নিবিষ্ট-মনে একাগ্রচিত্তে কাকচরিত্রের আলোচনায় গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি এই সময় মুখ তুলিয়া সখেদে উত্তর দিলেন, "আমরা এ বিষয়ে যোগ দিব কেমন করিয়া? ঐ শুন, গৃহের বহির্ভাগে তোমাদেরই পশ্চাতের নিমগাছে বসিয়া কাক কোন্ সুরে ডাক পাড়িতেছে! 'কঃ কঃ', ইহার অর্থ বুঝিতে পার? ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, শুধু রাজোপদ্রব! এ যে একেবারে নিশ্চিত অপশকুন, ইহার কি কিছু প্রতিবিধান আছে?' আবার ঐ শুন—শুন! উহারা স্বর বদলাইয়াছে। বলিতেছে, 'কৌলো কৌলো' অর্থ নিষ্ফল বা ক্ষতি! কে তাহা স্বীকার করিবে?"

বাশিড়া সঙ্ঘারামের সন্ধ্যারতি সমাধা হইয়া গিয়াছিল। মন্দির-মধ্যস্থিত ধ্যানমগ্ন ভগবান্ বুদ্ধের সুবর্ণমূর্ত্তি বিরাজমান। অগুরুচন্দন, গুগ্‌গুল, কর্পূরাদির ধূমে এবং অসংখ্য দীপাবলীর উজ্জ্বলালোকে দেবস্থানকে যেন স্বপপং ছায়ালোকে মণ্ডিত ও মূর্ত্তিকে যেন সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল। এই বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পালসাম্রাজ্যের কীর্ত্তিদীপান্বিত পাদপীঠতলে দাঁড়াইয়া আজ যে গৌড়রাজরাণী তাঁহাদের নিকট সমস্ত ঋণজালকেই বিস্মৃতির অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া বিদায়-গ্রহণে সমুদ্যতা—সে জন্যও সেই মহাত্যাগী স্মর-রিপুর চিত্তে যে কোনই বিকার উপস্থিত হয় নাই—তাহা তাঁহার সেই স্মিত হাস্যে অনুরঞ্জিত ও চিরপ্রশান্ত মুখচ্ছবি দ্বারাই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছিল। কেনই বা হইবে? একমাত্র নির্ব্বাণ ব্যতীত যাঁহার চিত্তে স্বর্গাদি ভোগালম্পারও স্থান হয় নাই, জগতের এবং জগদ্ব্যতীত সকল সুখসম্পদই যাঁহার কাছে নশ্বর ও তৃণাদপি তুচ্ছ, শত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে তাঁহার সেই শান্ত-রসাস্পদ চিত্তে বিক্ষোভ কেমন করিয়াই বা আসিবে?

দেবমূর্ত্তির সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত কক্ষের স্তম্ভগুলি জাতকের নানাবিধ ঘটনা-বৈচিত্র্য লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের মাথার উপরকার ছাদ খিলানের ভাবে অর্দ্ধবক্রভাবে অবস্থিত। ভাস্কর্য্যের আদর্শীভূতা মৎস্যনারীগণের হস্তে ধৃত হইয়া সেই সভাগৃহের সুবৃহৎ ছাদ স্থির রহিয়াছে। তাহারও অভ্যন্তরভাগে সুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা উজ্জ্বলবর্ণসমাবেশে শাক্যসিংহ বুদ্ধের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কুশী নগরার উপকণ্ঠস্থ শালবনমধ্যে মহাপরিনির্ব্বাণ-লাভ পর্য্যন্ত সকল দিনের সকল ঘটনাই সুনিপুণ চিত্রণে চিত্রিত রহিয়াছে। এমন কি, ঘৃণ্যা নারী আম্রপালীর স্মৃতির উদ্ধারসাধনরূপ কার্য্যও ইহাতে বাদ পড়ে নাই। সভা-মণ্ডপে সভাচার্য্য মহাস্থবির সর্ব্বজ্ঞ শান্তি আসীন, আর তাঁহাকে ঘেরিয়া অসংখ্য পীতবাসধারী মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শান্তভাবে উপবিষ্ট। শ্রমণ ও শ্রামণের এক জন ইঁহাদের পশ্চাতে আসন লইয়াছেন। বৈদেশিক দিন কয়েক মাত্র এ স্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া সমতটাভিমুখে গিয়াছেন।

এক দল যুবা নাগরিক আসিয়া শাস্ত্রচর্চ্চার মাঝখানে বাধা দিয়া উত্তেজিত ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "পুথিপত্র বন্ধ ক'রে সকলে সমবেত হোন—দেশ যে অরাজকতার অনীতিতে ডুবিয়া গেল, আজ পারমিতা পালন করিবে কে? দোহাই সুগতের! সঙ্ঘ আজ সঙ্ঘশক্তির বল দেখাক।"

মহাস্থবির সর্ব্বজ্ঞশান্তি তখন জগতের নশ্বরত্ব ও নির্ব্বাণের অথহৈতুক শান্তি সম্বন্ধে প্রোজ্জ্বল মুখে ও জ্বলন্ত ভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন। তরুণ বিদ্রোহী দলের নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "পুথিপত্র বন্ধ করিলেই কি সেই অনীতি কার্য্যের চরমে পৌছান যাইবে, বৎস? রাজনীতির সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মনীতির কোন যোগ নাই। হিংসার পরিবর্ত্তে বরং অহিংসাকে আশ্রয় করিবে আইস। ধর্ম্ম লইয়া আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছি, অ-ধর্ম্মে নহে।"

নেতা অসহিষ্ণুতায় উত্তেজিত হইয়া কহিয়া উঠিল,—"আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার চেষ্টা যদি অধর্ম্ম হয়, অরাজকতার উচ্ছেদচেষ্টারহিত পুথিপাঠই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্ম যত শীঘ্র আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, ততই মঙ্গল। যাহাতে মানুষকে জড়ত্ব দান করে, তাহাই অধর্ম্ম, তাহা কখনই ধর্ম্ম নয়।"

মহাস্থবির ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেশ যে অনীতিতে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ তুমিই।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সন্ন্যাসীর আত্মাহুতি

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান !"

জীবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতীক, নির্ভীক, সাহসী, তেজস্বী সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দের দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে জীবনাহুতিদানে কবির এই মর্ম্মস্পর্শী কথাটাই বার বার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে, আর হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-রবির অকালে অস্তগমনে হৃদয় ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, নয়ন বাষ্পাকুলিত হইয়া উঠিতেছে। জানি, তাঁহার মৃত্যু নাই; জানি, হিন্দুর মৃত্যুতে শোক করিতে নাই;—তথাপি যখন মনে হইতেছে, হিন্দুর বিরাট পুরুষ ত্যাগী কর্ম্মী সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দ এক নরপিশাচ মুসলমান ঘাতুকের নিষ্ঠুর হস্তে তাঁহার মূল্যবান জীবন অকালে বিসর্জ্জন দিলেন, তখন দুর্ব্বল মন বাধা মানিতে চাহে না, দুর্জ্জয় ক্ষোভে ও রাগে হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। হিন্দুর সংযম ও সহিষ্ণুতাই আদর্শ, হিন্দুর ত্যাগই আদর্শ, জীবে দয়া হিন্দুর আদর্শ,—সবই জানি। কিন্তু তথাপি এই বজ্রাদপি কঠোর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শ্রবণের প্রথম মুহূর্ত্তে হৃদয় সংযমের বাধা মানিতে চাহে নাই, রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ আমরা, সংযমী সন্ন্যাসীর মনোবল কোথায় পাইব? সেই ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ বিরাটকায় সন্ন্যাসী পরিণতবয়সে রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও মৃত্যুর পূর্ব্বেও জাতির মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—সেই ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আর কাপুরুষ নরকের কীট মুসলমান ঘাতুক তাহার 'ধর্ম্মের' দোহাই দিয়া, তাঁহারই দর্শনপ্রার্থী হইয়া, তাঁহারই গৃহে অতিথিরূপে জলপানের প্রার্থী হইয়া, নির্ম্মম নিষ্ঠুর রাক্ষসের মত তাঁহাকে হত্যা করিয়া হস্ত কলুষিত করিল,—এ বীভৎস জঘন্য চিত্রের তুলনা জগতে আর কোথাও আছে কি?



হত্যাকাণ্ডের বিবরণ

যে জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনকালে হিন্দু-মুসলমানে মিলনের সমস্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল—যে মহাযজ্ঞে সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতীয় ভ্রাতৃভাবে পরস্পর আলিঙ্গন করিবার জন্য আসমুদ্র হিমাচল হইতে সমাগত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বজ্রপাতের ন্যায় ভারতের দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, দিল্লীনগরে হৃদয়-বিদারক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে—হিন্দু শুদ্ধি ও সংগঠনের সমর্থক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক নর-পিশাচ মুসলমান ঘাতুকের গুলীতে নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার এক পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।

গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যার পর দিল্লী হইতে যখন এই তার আইসে, তখন সহসা কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই; কিন্তু যখন তারের উপর তার আসিতে লাগিল, যখন দাবানলের মত সেই নিদারুণ সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন হিন্দুমাত্রেই

হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি ভীষণ সংবাদ! ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পৌনে ৪টার সময় আবদুল বসির নামক এক জন মুসলমান স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। এমন অনেকেই প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত, ধর্ম্মালাপ করিত, উপদেশ লাভ করিতে আসিত, স্বামীজী ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী বিচার করিতেন না—সকলেরই প্রতি তাঁহার উদার মহৎ হৃদয় উন্মুক্ত ছিল। ইহার পূর্ব্বে কয়েকবার তাঁহাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া কোনও কোনও দুর্বৃত্ত পত্র লিখিয়াছিল—যদি তিনি শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন হইতে বিরত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও পণ্ডিত লেখরামের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই পণ্ডিত লেখরাম স্বামী শ্রদ্ধানন্দেরই মত আর্য্য-সমাজের এক জন শক্তিশালী প্রচারক ও নেতা ছিলেন, তাঁহাকে গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু নির্ভীক তেজস্বী সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দ কখনও প্রাণের মমতা করিতেন না। প্রাণের ভয়ে তিনি কর্ত্তব্যপালনে কখনও বিমুখ হন নাই। তাহার পরিচয় বহুদিন পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের নেতৃরূপে তিনি এক শ্রেণীর ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কণামাত্রও বিচলিত হয়েন নাই। তাহার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের গৌরবের দিনে এই দিল্লী সহরেই তিনি গুর্খা সেনার বন্দুক-বেয়নেটের সম্মুখে বক্ষ অনাবৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এ হেন ত্যাগী সন্ন্যাসী কি কাপুরুষ ঘাতকের ভয়ে সাক্ষাৎ-প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন? তিনি তখন রোগশয্যায়। বহু দিন রোগ-ভোগের পর তখন সবে সামান্য সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। বয়স তখন তাঁহার ৭১ বৎসর। কিন্তু এই পরিণত বয়সে রোগশয্যায় শায়িত থাকিলেও যখন তাঁহাকে তাঁহার অনুরক্ত ভৃত্য ধরম সিং অপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিল, তখন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাক্ষাৎপ্রার্থীকে তাঁহার শয়নকক্ষে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার বিরাট সিংহ-হৃদয় কি হীন মূষিকের ভয়ে ভীত হইবে?

হত্যাকারিরূপে ধৃত আবদুল বসির (প্রকৃত নাম রসিদ) সাক্ষাতের পূর্ব্বে জানাইয়াছিল যে, সে ইসলামধর্ম্ম সম্পর্কে কয়েকটি কথা তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছে। সে কক্ষে আনীত হইলে স্বামীজী তাহাকে বলেন, "আমি আজ অত্যন্ত অসুস্থ, আজ কোনওরূপ আলোচনা করিতে পারিব না, তুমি অন্য দিন আসিও।" তদুত্তরে রসিদ বলে যে, সে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত, তাহাকে এক পাত্র পানীয় জল দেওয়া হউক। তাহাকে পানীয় জল দিবার জন্য কক্ষের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। ভৃত্য ধরম সিংহ পানপাত্র অন্যত্র লইয়া গেলে পর রসিদ দ্রুতগতি কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার গুলী করে। একটা গুলী বক্ষে লাগায় স্বামীজীর দেহান্তর ঘটে। ধরম সিং ঠিক সেই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে এবং পশ্চাদ্দিক্ হইতে আততায়ীকে ধৃত করিয়া নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করে। রসিদ তাহাকেও উরুদেশে দুইবার গুলী করে। গোলযোগ শুনিয়া স্বামীজীর সেক্রেটারী ধরম পাল ও অন্যান্য লোক সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন ও আসামীকে ধৃত করেন। তৎপরে তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

আসামী আবদুল রসিদ

আসামী আবদুল রসিদ মুসলমান, সে দীর্ঘাকার ও কৃষ্ণকায়। তাহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। তাহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত। দেখিতে সে হাজীর মত। সে বলিয়াছে, সে দিল্লীর জুম্মা মসজেদের নিকটস্থ কৈজীবাজারে থাকে। কিন্তু পরে পুলিস অনুসন্ধানে জানি-

পুলিসের নিকট সে এজাহারে বলিয়াছে যে, সে এই হত্যার জন্য নিজেই দায়ী। ইহার সহিত আর কাহারও সংস্রব নাই। সে বলে, "কিছু দিন হইতে আমার মনে হইয়াছিল যে, মুসলমানদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দই দায়ী। আমি সে জন্য কিছু দিন হইতে তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমি কাবুলে যখন ৭ বৎসর পূর্ব্বে হিজারৎ করিতে যাই, তখন একটা পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ধরম সিংহকে আক্রমণ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সে আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল বলিয়া তাহাকে গুলী করিয়াছি। আমার আশা আছে, এক জন 'কাফেরকে' মারিয়া আমি স্বর্গে যাইতে পারিব। দুঃখ এই, আমার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। শুদ্ধি ও সংগঠনের সংশ্লিষ্ট আরও কয়েক জনকে মারিতে পারিলে আমার ক্ষোভ থাকিত না।" ইহার পর শুনা যায়, সে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছে, "আমি এক জন গোঁড়া মুসলমান। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি হিন্দু নেতৃগণের প্রতি আমার বিদ্বেষের সীমা নাই। আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই। আমার দুঃখ হইতেছে যে, এখনও অনেক হিন্দু নেতা জীবিত রহিয়াছে এবং ইসলামের অনিষ্ট-সাধন করিতেছে। আমি হিন্দু নেতাদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া হিজারতের ছলে কাবুলে একটি পিস্তল সংগ্রহ করিতে যাই। ঐ পিস্তল সংগ্রহ করিয়া আমি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসি। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি আমার পত্নীকে তালাক দিয়াছিলাম। আমার পিতা তিরস্কার করিলে বলি যে, আমি এমন একটি সৎসাহসের কায করিতে যাইতেছি যে, উহা দ্বারা আমি বিখ্যাত হইব। গত ২৩শে ডিসেম্বর আমি 'তেজ' আফিসে গিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ঠিকানা জানিয়া লই। হত্যার বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সব সত্য।"

তদন্তের জন্য পুলিস তাহাকে তাহার বাসায় লইয়া গেলে যখন তাহার আত্মীয়স্বজনরা তাহাকে দেখিয়া ক্রন্দন করে, তখন সে বলে, তাহার জন্য আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ করাই উচিত, সে মুসলমান-ধর্ম্মকে ধ্বংসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বেহেস্তে যাইবে।

তদন্তে জানা গিয়াছে, এই লোকটার বর্ত্তমান ঠিকানা দিল্লীর কৈজীবাজার হইলেও সে বুলন্দ সহরের অধিবাসী। শুনা যাইতেছে, লোকটা পুলিসের নিকট বলিয়াছে, সে এক দিন মৌলানা মুফতি কেফায়েৎউল্লার সহিত শুদ্ধি ও সংগঠন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিল। প্রকাশ, এই মৌলানা না কি পুলিসের নিকট বলিয়াছেন যে,—"আসামীর সহিত তাঁহার ৪ বৎসরের পরিচয়। সে যে হিজারৎ করিতে কাবুলে গিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু সে দিল্লীতে কবে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল। উহার সহিত শুদ্ধি ও সংগঠন সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল কি না, তাঁহার স্মরণ নাই। ২ মাস পূর্ব্বে উহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সময়ে সে তালাক সম্বন্ধে তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

আসামীর সম্বন্ধে এইটুকু আপাততঃ জানা গিয়াছে।

যে বা যাহারা স্বামীজীর হত্যাব্যাপারের ষড়যন্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারিবে, দিল্লীর হিন্দুরা তাহাকে বা তাহাদিগকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন। ঐ টাকা তাঁহারা পুলিসের হস্তে দিয়াছেন। সুতরাং এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, তাহা হিন্দুরা সন্দেহ করিতেছেন। উহার কারণ যে একবারে নাই, তাহা নহে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কে ?

আজ যে বিরাট কর্ম্মী পুরুষ পাষণ্ড রাক্ষসের হস্তে নিহত হইলেন, তিনি কে ? তিনি পঞ্জাববাসী হিন্দু। তাঁহার জীবন-কথা ইতিহাসোক্ত অথবা উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর ন্যায় বিচিত্র ও মনোরম। সংক্ষেপে তাহা এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নাম ছিল লালা মুনসীরাম। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি এল, এল, বি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার সুনাম হইয়াছিল। ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর ধনাগমও হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার মন চিরদিন সে দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকিবার মত করিয়া গঠিত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের অবনতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি সমাজের ও ধর্ম্মের সংস্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এতদর্থে তিনি আর্য্য-সমাজে যোগদান করিলেন এবং আপনার পুত্র-কন্যার অসবর্ণ বিবাহ দিয়া যাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং পরজীবনে ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মতের সম্মান রক্ষা করিলেন। নিজ জীবনে অনুন্নত অস্পৃশ্য জাতিদিগকে আপনার বলিয়া বুকে তুলিয়া লইয়া তিনি তাঁহার কথায় কাযে মিল দেখাইয়াছিলেন। যৌবনের ভোগ-বিলাসের জীবন দূরে পরিহার করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহারই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে হরিদ্বারে "গুরু-কুল" প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তিনি ভারতের অতীত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যাহাতে প্রাচীন বৈদিক আদর্শে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভারতের ছাত্র-জীবন গঠিত হয়, তাঁহার গুরুকুলের তাহাই ছিল লক্ষ্য। তাঁহার এই মহৎ প্রতিষ্ঠান অচিরে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। তিনি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে তাঁহার এই অতুল কীর্ত্তিটিকে সাফল্যমণ্ডিত দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহার আত্ম-তৃপ্তির কারণ। কিছু দিন হইল, তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত একটি কৃষি-বিভাগ সংযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর ধর্ম্মান্ধ ঘাতুকের হস্তে অকালে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়ায় তাঁহার সেই সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল! হরিদ্বারের গুরুকুল ব্যতীত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীর দরিয়াগঞ্জে মহিলাদিগের জন্য একটি গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে রাউলাট বিল, জালিয়ানওলাবাগ এবং মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তখন দেশ তোলপাড় হইতেছে। কর্ম্মী দেশপ্রেমিক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কি সে সময়ে নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তিনিও সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুলিস যখন দিল্লীর কুইনস গার্ডেনে ভারতীয়দিগের এক সভায় জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে, তখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রতিবাদে অগ্রণী হইলেন। স্বামীজীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে রক্তপাত স্থগিত হয়, হিন্দু-মুসলমান অহিংসার পথে অবিচলিত থাকে। তখন মুসলমান-দিগের এই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উপর এরূপ শ্রদ্ধাপ্রীতি ও গভীর বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিল্লীর বিখ্যাত জুম্মা মসজেদের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বেদী হইতে তাঁহাকে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের মহামন্ত্র ঘোষণা করিতে দিয়াছিল! আর আজ?

তখন এমন ব্যাপার সংঘটিত হইবার কারণ ছিল। তখন জালিয়ান-ওয়ালাবাগ, রাউলাট আইন ও খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ। সে সময় মসলমানের খিলাফৎ উদ্ধারের আন্দোলনে মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র গন্ধীর জয়" এবং "হিন্দু-মুসলমানকী জয়" রবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দের অদ্ভুত আত্মত্যাগ ও হিন্দু-মুসলমানে মিলনচেষ্টা দেখিয়া মুসলমানরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ভারতের মুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে সন্দেহ নাই, উহার তুলনা এ জগতে বিরল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে দিন হরতাল হইল, সে দিন এক মিঠাইওয়ালা রেলষ্টেশনে হরতাল সত্ত্বেও মিঠাই বিক্রয় করিতেছিল। কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক তাহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে যায়। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার ও আটক করে। সেই সংবাদ যখন সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, তখন উন্মত্ত জনতা অনাচার আচরণে উদ্যুক্ত হয়, কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও অন্যান্য নেতা তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখেন। বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ জনতার বিপক্ষে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য ষ্টেশনে সৈনিক পাহারা নিযুক্ত করা হয়। যখন উভয় পক্ষে একটি ভীষণ গোলযোগের সম্ভাবনা, সেই সময়ে জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ষ্টেশনে জনতাকে শান্ত করিতে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু মূর্খ সেনাদল এই শান্তিকামী সন্ন্যাসীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বন্দুকের সঙ্গীন তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমকো ভি মারেঙ্গে।"

নির্ভীক হিন্দু সন্ন্যাসী বন্দুক-বেয়নেট দেখিয়া হাসিলেন মাত্র। যাহারা এই দেহকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় মনে করিয়া হেলায় ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদের মৃত্যুতে ভয় কি? স্বামীজীর এই নির্ভীকতা ও অসম-সাহসিকতা দেখিয়া হিন্দু-মুসলমান শ্রদ্ধাপ্রীতিতে সন্ন্যাসীর সম্মুখে মস্তক অবনত করিল। তাহার পরদিন মুসলমানরা তাঁহাকে চাঁদনীচকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের পবিত্র জুম্মা মসজেদে লইয়া গেল এবং যে বেদীতে এ যাবৎ মুসলমান ব্যতীত কেহ উঠিয়া বক্তৃতা করে নাই, সেই বেদীতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—অসম্ভবও সম্ভব হইল, স্বামীজীর ত্যাগের ইহাই পুরস্কার! আজ কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে মুসলমানের সেই মনোবৃত্তি অন্তর্হিত হইল?

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমৃতসরের বিখ্যাত অধিবেশনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অভ্যর্থনা সমিতির সভা-নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় অগ্নিবর্ষিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর মহাত্মা গন্ধীর সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায় তিনি রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সেই সময় হইতেই তিনি হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে এবং অনুন্নত জাতিগণের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতে থাকেন। ইহার জন্য তিনি প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। ফলে সনাতনী হিন্দু ও মুসলমানরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়। তাঁহার এই আন্দোলনের নাম "সংগঠন।" বিধর্ম্মীদিগকে হিন্দুসমাজের বক্ষে আশ্রয় দান করিবার জন্যও তিনি ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহার চেষ্টায় শত শত মালকানা রাজপুত মুসলমান শুদ্ধ হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে। তাঁহার এই আন্দোলনের নাম "শুদ্ধি।" এই সংগঠন ও শুদ্ধির জন্য তিনি মুসলমানের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় হিন্দুসভা আন্দোলনও বিস্তার লাভ করে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও গুরুকুল

পঞ্জাবের জলন্ধর জিলার তালবন গ্রামে লালা মুন্সীরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বহু দিন যাবৎ কাশীর সহর-কোতোয়াল ছিলেন। এই হেতু মুন্সীরাম বাল্যকালে কাশীতেই বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি ওকালতী পরীক্ষা দেন এবং জলন্ধরে বহু দিন ওকালতী করেন। আর্য্য-সমাজের স্থাপয়িতা স্বামী দয়ানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া মুন্সীরাম আর্য্যসমাজ ও দয়ানন্দের ব্যক্তিত্বের

ান করেন এবং একাগ্রতা ও স্বাধীন মতের অভিব্যক্তির জন্ত শীঘ্রই মাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে াধ্য করিবার সাহস ছিল। ইহার জন্ত সমাজীরা তাঁহার গুণমুগ্ধ য়। স্বামী দয়ানন্দের দেহান্তরের পর পণ্ডিত গুরুদাস বিদ্যার্থীর ায় মনীষী পণ্ডিত আর্য্যসমাজে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ন্সীরাম তাঁহার পরম বিশ্বাসী সহকর্ম্মী হইলেন। গুরুদাস বিদ্যার্থীর ৃত্যুর পর মহাত্মা মুন্সীরাম আর্য্যসমাজের গুরুকুল বিভাগের নেতা হইলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের প্রাদেশিক নির্ব্বাচিত সদস্য-গণের "আর্য্য প্রতিনিধি সভা" নামে এক সভার অধিবেশনে বহুদূর-বিসারী শিক্ষাসংস্কারের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদুদ্দেশ্যে এমন একটি গুরুকুল প্রতিষ্ঠার কথা স্থির হয়, যাহাতে ভারতের প্রাচীন গুরু-গৃহে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদিগের প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃত ভাষা এবং মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে দেশীয় ভাষার সাহায্যে গড়িয়া তুলা ও জাতীয় ভাবাপন্ন করা যায়। আরও স্থির হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের কোনও সম্বন্ধ রক্ষা করা হইবে না এবং ইহার পরি-চালনের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া হইবে না। মুখপাতেই ৩০ হাজার টাকার প্রয়োজন। লালা মুন্সীরাম সেই অর্থসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি উহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, সে পর্য্যন্ত ঘরে ফিরিবেন না। নানা স্থানে ঘুরিয়া ৮ মাসের মধ্যে তিনি ঐ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। সে সময়ে অর্থসংগ্রহ করা যে কি কঠিন, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। তখন সুরেন্দ্রনাথকেও সামান্য দুই এক শত টাকা সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুরুকুলের উদ্বোধন হইল। ইহা লালা মুন্সীরামের বিরাট কীর্ত্তি। এই সময় হইতেই তিনি সাধারণে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হইতে থাকেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রাণপাত পরিশ্রমই ইহার প্রতিষ্ঠার মূল। সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দ এই গুরুকুল এবং শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট হিন্দু কৃতজ্ঞ হইবে না? তাঁহার গুরুকুলের স্নাতকরা এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা উপহার দিবার জন্য সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল। আগামী মার্চ্চ মাসে গুরুকুলের 'রৌপ্য জুবিলি' উৎসব উপলক্ষে ঐ উপহার দিবার কথা ছিল, কিন্তু দেবতার বিধান অন্যরূপ, ধর্ম্মবীরের গৌরবময় মৃত্যু তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থিত ছিল, অগ্রে তাহা কে জানিত?

কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি দিল্লী হইতে 'The Liberator' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছিলেন। উহাতে তিনি অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার হইতে মুক্তির পথ হিন্দুসমাজকে নির্দ্দেশ করিতে-ছিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যই পরার্থে। পরার্থে দেশের ও সমাজের জন্য তিনি কর্ম্মময় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পরার্থেই তাঁহার জীবনের অবসান হইল।

হত্যার অন্তরালে কি আছে?

আজ সারা দেশ জুড়িয়া এই পুরুষশ্রেষ্ঠের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে হাহাকার উঠিয়াছে। কেবল হিন্দু একা নহে, খৃষ্টান, পার্শী, জৈন, বৌদ্ধ, এমন কি যে মুসলমান ঘাতুকের হস্তে তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছে, সেই মুসলমানও আজ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অকাল ও অতর্কিত মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছে এবং হত্যাকাণ্ডকে পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর, বলিয়া নিন্দা করিতেছে। যাহার দেহে এক বিন্দু 'মানুষের' শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে-ই যে এই বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর কাণ্ডের নিন্দাবাদ তাহার উপর মাসাধিক কাল তিনি রোগশয্যাগত, তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনপ্রয়াসী, মৃত্যুর পূর্ব্বেও কংগ্রেসের সকাশে সে কথা তিনি জানাইয়াছিলেন, এ হেন অবস্থায় যে কাপুরুষ পিশাচ আতি-থ্যের ভাণে চোরের মত লুকাইয়া নিরস্ত্র, পীড়িত, শয্যাগত স্বামীজীর গৃহে প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে, সেই নারকীয় কীটের প্রতি কাহার না ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়? তাই আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকল সমাজের লোক তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সংবাদ প্রদান করিতেছে। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং সার আবদর রহিম, হাজী গজনবি এবং



সার আবদর রহিম

আলি ভ্রাতৃদ্বয়ও শোকে মুহ্যমান হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়া-ছেন। কে এক মিঃ আসফ আলি নামক মুসলমান না কি এই হত্যার পশ্চাতে মুসলমানের ষড়্‌যন্ত্র আছে (অর্থাৎ ঐ এক হত্যাকারী মুসলমান রসিদ ছাড়া আরও অনেক মুসলমান নেতার চক্রান্ত আছে) হিন্দুদের ভাবে এমন আভাস পাওয়া গিয়াছে মনে করিয়া কংগ্রেসের সম্পর্কই ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাঁহার মনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাটা এত বিষম বাজিয়াছে!

বস্তুতঃই যদি হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সমাজের, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের নেতারা এমনই ব্যথা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে মঙ্গলের কথা। কেন না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও একতা ব্যতীত স্বরাজ স্থাপিত হইবে না। যদি এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সেই মিলনের আশা সুদূরপরাহত হয়, তাহা হইলে আক্ষেপের কারণ থাকিবে না। এই হেতু আমরা হিন্দুকে এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে অনুরোধ করি। হিন্দু যে এই হত্যাকাণ্ড একটা ধর্ম্মান্ধ নরপিশাচের কৃত মনে করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আছে, ইহা তাহার পক্ষে নিশ্চিতই প্রশংসার কথা। ইহা তাহার স্বাভাবিক, তাহার ধর্ম্ম; তাহার সনাতন ভাবধারা তাহাকে এই শিক্ষাই দেয়। হিন্দু স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি, সহজে সে অপরের অঙ্গে অস্ত্র চালাইতে চাহে না, ধৈর্য্য ও ক্ষমাই তাহার অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু মুসলমানের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় কি? আজ যদি কোনও

কোনও দুর্বৃত্ত হিন্দুর হস্তে এই ভাবে নিহত হইতেন, তাহা হইলে মুসলমান সমাজ এইরূপ ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ দেখাইতে পারিত বলিয়া মনে হয় কি? কলিকাতার দাঙ্গার রিপোর্টে পুলিস কমিশনার মিঃ আরমষ্ট্রং স্বয়ং স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মুসলমানরা পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত হইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

মহাত্মা গন্ধী—যিনি খিলাফৎ আন্দোলন কায়মনে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজের দুই বাহু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—তিনিই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"মুসলমানদের পরীক্ষা উপস্থিত। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা সামান্য কারণে ছুরি ও পিস্তল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তরবারি ইসলামের প্রতীক নহে বটে, কিন্তু যেখানে ইসলামের উদ্ভব, সেখানে তরবারিই প্রধান ছিল—এখনও আছে, অর্থাৎ তথায় বাহুবলই প্রবল ছিল ও এখনও আছে। তথায় খৃষ্টের প্রেমের বাণী—শান্তির বাণী যে বিফল হইয়াছে, তাহার কারণ, সে স্থানের পরিবেষ্টন সেই বাণীর অনুকূল নহে। মহম্মদের বাণীর সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। এখনও মুসলমানরা বাহুবলের বিকাশে উৎসুক। কিন্তু ইসলাম অর্থে যদি শান্তি হয়, তাহা হইলে তরবারি কোষবদ্ধ করিতে হইবে।"

বস্তুতঃ মুসলমান নেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বটে যে, ইসলাম শান্তির মন্ত্র প্রচার করে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অধিকাংশ বাহুবলেরই আশ্রয় লইয়া থাকে। গত কলিকাতার দাঙ্গার সময়ে পুলিসের রিপোর্টেই প্রকাশ পাইয়াছে, মুসলমানরা প্রায় সর্ব্বত্র aggressive part লইয়াছে এবং হিন্দুরা self-defence আত্মরক্ষা করিয়াছে। মুসলমানের নিষ্ঠুরতাচরণের পরিচয় বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে। কোহাট, মালাবার, সাহারাণপুর, পাবনা, ঢাকা, যেখানকারই গোলযোগের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক, সেইখানেই দেখা যাইবে, মুসলমান গায়ের জোরে আপনার ধর্ম্মমত অপরকে মানাইবার চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু মার খাইয়াছে অথবা আত্মরক্ষা করিয়াছে। নারী-নির্য্যাতনের মামলার আসামী শতকরা এক শত জনই প্রায় মুসলমান।

কিন্তু হিন্দু আপন ধর্ম্মমত অপরকে গায়ের জোরে মানাইতে কখনও চেষ্টা করে নাই। ইতিহাসে গুরু তেগ বাহাদুরের অথবা বান্দার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য কোন হিন্দু কর্ত্তৃক মুসলমানের নির্য্যাতনের দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তবে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া শিখ রাজা রণজিৎসিংহের সেনাপতি হরি সিং নাপুয়া মুসলমানের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত শিখরাজার হইলেও মাত্র একটি। তেমনই দেখা যায়, মারাঠা রাজা শিবাজী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন—হিন্দুর মন্দিরের মত মুসলমানের মসজেদও নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি কোথাও কখনও বলপ্রকাশ করিয়া অথবা লোভপ্রদর্শন করিয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্মে আনয়ন করেন নাই, অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে বলপ্রকাশ করিবার উদ্দেশে হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ বা সংগঠিত করিবার প্রয়াস পান নাই। তিনি হিন্দু—হিন্দুধর্ম্মের উদারতা তাঁহার সম্যক্ জ্ঞাত ছিল। হিন্দুধর্ম্ম চিরদিনই উদার। উদার না হইলে সেই বৈদিক কাল হইতে এ যাবৎ সকল অবস্থার ভাবুক ও উপাসককে নিজের বিরাট ক্রোড়ে স্থান দিত না;—ভূতপ্রেতপূজক হইতে ঘোর জ্ঞানী বৈদান্তিক পর্য্যন্ত তাহার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিত না। হিন্দুধর্ম্ম উদার না হইলে আজ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অতি আপনার জন মনে করিয়া তাঁহার অভাবে নিরানন্দ হইত না। একমত নহে, তথাপি হিন্দুমাত্রেই আজ তাঁহাকে আপনার এক জন বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব।

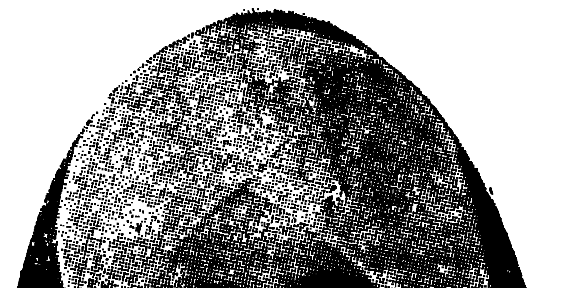
মুসলমানরা কি তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পারেন? তাঁহাদের মৌলভী মওলানাদের গোঁড়ামী ও গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, তাঁহাদের তবলিগ ও তাঞ্জিম আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলা চাই, তাঁহাদের লীগ কনফারেন্সে বসিয়া তাঁহারা তারস্বরে ঘোষণা করিবেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের তিন জন করিয়া বিধর্ম্মীকে মুসলমান করা চাই,—দশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা ১৫ কোটি বাড়ান চাই; তাঁহারা ঘোষণা করিতে পারেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম আগে, দেশ তাহার পরে; তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিতে পারে, ভারতের বাহিরে স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের দিকে; তাঁহারা আবদার ও বাহানা লইতে পারেন যে, কর্ম্মকুশলতার (efficiencyর) ছুতা কিছুই নহে, সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে মুসলমানের interest অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে;—আর যত দোষ, হিন্দু যদি শুদ্ধি ও সংগঠন করে, আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া শক্তিমান হইবার চেষ্টা করে। মুসলমান মৌলভীর যদি হিন্দুকে তাহার ইচ্ছানুসারে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় যদি কেহ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বুঝাইয়া হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিবার অধিকার হিন্দুর অবশ্যই আছে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ইহার অধিক কিছুই করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে একটা পাগল খেয়ালবশে হত্যা করিয়াছে, মুসলমান-সমাজ এ জন্য দায়ী নহে,—এই হেতুবাদ দেখাইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করা বড় রকমের একটা অভিনয় হইতে পারে, কিন্তু উহার কোনও সার যুক্তি নাই। মুসলমান সমাজের সম্পর্কে ষড়্‌যন্ত্রের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, অথচ কোনও হিন্দু নেতা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, পরন্তু শ্রদ্ধানন্দের হত্যার পর দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে যে ছোটখাটো দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাতে এক জন মুসলমান নিহত হইয়াছে, এ জন্য কোন হিন্দু নেতা প্রতিবাদ করেন নাই,—মুসলমান আসফ আলী এই গোঁসায় কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক আর্য্যসমাজী শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়ার ফলে মুসলমানের মসজেদের উপর হিন্দুর ইট-পাটকেল পড়িয়াছিল,—এই ছুতায় যখন মুসলমানরা হিন্দুর শিব-মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, পাবনা বা ঢাকায় যখন মুসলমানরা হিন্দুর ঘরবাড়ী লুঠ করিয়াছিল ও হিন্দুনারীর উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তখন এই মিঃ আসফ আলী অথবা তাঁহার স্বধর্ম্মীদের কয় জন নেতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন? কলিকাতার রথযাত্রাকালে বা মহরমের সময় তাঁহার স্বধর্ম্মীরা হিন্দুর উপর যে অযথা আক্রমণ ও অত্যাচার করিয়াছিল এবং যাহার রেকর্ড পুলিস রিপোর্টে আছে,—তাহার প্রতিবাদ তাঁহারা কয় জন করিয়াছেন? এখনও যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুনারীর উপর পাষণ্ড লম্পট মুসলমান গুণ্ডার অত্যাচারের সংবাদ আসে, তাহার প্রতিবিধানে তাঁহারা কি করিয়াছেন? তবে এ গোঁসা কেন? ইহা কি যাত্রাদলের সাজান অভিনয় নহে? এমন অভিনয় অনেকেই যে করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। এ ভাবের অভিনয় হিন্দুর মনে ব্যথা দেয় মাত্র, ইহার ফল কিছু হয় না। তদপেক্ষা যদি মুসলমান নেতৃবর্গ স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করেন যে, হিন্দুর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনে পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা হইলে প্রকৃত কার্য্য হইতে পারে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে যে কোনও ষড়্‌যন্ত্র নাই, এমন কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। হত্যাকারী রসিদ পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সে বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল নহে, তাহার কার্য্য বা চিন্তাপ্রণালী বেশ ধারাবদ্ধ, সুসংবদ্ধ। সে যাহা করিয়াছে, বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্ব হইতে

প্রবর্ত্তক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাহার মুসলমানধর্ম্মের ভীষণ শত্রু—তিনি ঐ ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাই সে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, সে জন্য সে স্বর্গে যাইবে; দুঃখ এই যে, আরও কয় জন হিন্দু নেতাকে সে মনের সাধ মিটাইয়া হত্যা করিতে পারিল না, তাহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তাহার মনের এই অবস্থা—তাহার জমী এইভাবে কিরূপে প্রস্তুত হইল, তাহা কি হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে? কেহ বলিতেছে না যে, অবিশ্রান্ত শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে হত্যা করিবার জন্য কেহ ঐ ঘাতুক রসিদের হস্তে পিস্তল তুলিয়া দিয়াছিল অথবা হত্যার আদেশ দিয়াছিল, কিন্তু যে ভাবে এ যাবৎ মুসলমানপক্ষ হইতে শুদ্ধি ও সংগঠনের, হিন্দুধর্ম্মের এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ হিন্দু নেতৃগণের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চলিতেছিল, তাহাতে রসিদের মত ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের মন হত্যার্থে উত্তেজিত হইতে পারে কি না? রসিদ ধৃত হইবার পর দিল্লী সহরে তাহাকে 'গাজী' অর্থাৎ কাফের-হত্যাকারী বেহেস্ত-যাত্রাকারী পরম ধার্ম্মিক মুসলমান করিয়া তুলা হইয়াছে, তাহার ছবি রাজপথে প্রকাশ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, দিল্লীর মুসলমানরা এই নরপিশাচের কার্য্যের সমর্থন করেন? দিল্লীর হিন্দুদিগের বিশ্বাস, এই রসিদ এক বিরাট ষড়যন্ত্রকারী মুসলমান দলের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা মাত্র। প্রকাশ, তাহাদের ৩জন প্রতিনিধি দিল্লীর পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন, ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে কোন মুসলমান পত্রে লিখিত হইয়াছিল, "আর্য্যসমাজীরা যদি ইসলাম হসেন সভার (গুপ্ত হত্যার সভার) আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষরূপে সে পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন; পাশ্চাত্য-দেশের বিজ্ঞান ছুরি অপেক্ষাও ভীষণ মারণাস্ত্র সুলভ করিয়া দিয়াছে, এ কথা তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন।" এই ভয়-প্রদর্শনের অর্থ কি? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, এই মুসলমান পত্র পূর্ব্ব হইতেই বন্দুক পিস্তল দ্বারা আর্য্যসমাজীদিগকে গুপ্তহত্যার গুপ্ত আয়োজনের কথা বিদিত ছিল? এ বিষয়ে কি ভিতরে ভিতরে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে?

মিরাট সহরে প্রকাশিত শুদ্ধির বিরোধী এক কবিতা ও উর্দ্দু পুস্তিকার কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। এই পুস্তিকায় লিখিত আছে,—"স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যদি তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন না করেন, তবে তিনি পণ্ডিত লেখরামের পন্থানুসরণ হইবেন (অর্থাৎ পণ্ডিত লেখরাম সেইরূপে নিহত হইবেন)।" ইহা কি স্বামীজীকে সরাসরি হত্যা করিবার জন্য ভয়প্রদর্শন নহে? এইরূপ ভয়প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত আরও আছে। এই বঙ্গদেশেরই 'মহম্মদী' প্রমুখ সংবাদপত্র স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আক্রমণ করিয়া এমন ভাবের কথাও প্রচার করিয়াছিল যে, তিনি হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বাধাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সরকারের দয়ায় কারামুক্ত হইয়াছিলেন।



লালা লাজপৎ রায়

যে সার আবদর রহিম আজ দিল্লী ষ্টেশনে নামিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার সংবাদ পাইয়া 'stunned' হইয়া গিয়াছেন, তিনিই এক দিন আলিগড়ে শুদ্ধি ও সংগঠন এবং শ্রদ্ধানন্দ সম্বন্ধে বলেন নাই কি—"শুদ্ধি ও সংগঠনের কথায় বলিতেছি যে, মুসলমানরা এই আন্দোলনকে—যাহা লালা লাজপৎ রায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ হিন্দু রাজনীতিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত—সেই আন্দোলনকে তাঁহাদের ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘোর প্রতিপক্ষ বলিয়া মনে করেন এবং উহা যে তাঁহাদের রাজনীতিক অবস্থার বিপক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ, তাহাও তাঁহারা মনে করেন?" নিরক্ষর ধর্ম্মান্ধ মুসলমান যদি এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—যদি নিরন্তর তাহাদের মৌলভী মওলানারা গ্রামে গ্রামে অজ্ঞ অসহিষ্ণু অন্ধেই উত্তেজিত মুসলমান জনসঙ্ঘের নিকট এই ভাবের প্রচারকার্য্য পরিচালনা করে, তবে তাহার ফল কি হয়? শুষ্ক তৃণে অগ্নিশলাকা নিক্ষেপ করা, আর এই ভাবের বক্তৃতা করা কি সমান কথা নহে?

সার আবদর ইহা ছাড়া মিথ্যা রটনা করিয়া নিজের সমাজকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"কোন কোন হিন্দু নেতা প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, মুসলমানরা যদি শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু না হয়, অথবা হিন্দুদিগের রাজনীতিক কার্য্য-পদ্ধতিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে স্পেনীয়রা যে ভাবে মুরদিগকে স্পেন হইতে তাড়াইয়াছিল, সেই ভাবে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিবে।" কোন হিন্দু নেতা এ কথা কখনও বলেন নাই, ইহা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা। অথচ এই ভাবের মিথ্যা বানাইয়া মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফল কি হইতে পারে? সার আবদর হিন্দুনেতৃগণকে হিন্দুর নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি উত্তেজিত করিবার অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাবের বক্তৃতা কি মুসলমানের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি উত্তেজিত করার পরিচায়ক নহে?

খিলাফতের সময়ের ন্যাশানালিষ্ট মিঃ মহম্মদ আলি সে দিন কংগ্রেসে বলিয়াছেন, "যদি একটি জীবনদানে—আমার মত নিরপরাধের জীবনদানে এ পাপের (শ্রদ্ধানন্দের হত্যার) প্রায়শ্চিত্ত হয়

প্রস্তুত আছি।" আজ মহম্মদ আলির মুখে এ কথা শুনা গেলেও কোহাটের ও কলিকাতার দাঙ্গার ব্যাপারের সময় কি হইয়াছিল? তিনি নিজ প্রাণদান দেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—হিন্দু-মুসলমান-মিলনের জন্য বলিয়া আজ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কোহাটের ও কলিকাতার দাঙ্গার ব্যাপারের সময় তাঁহার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? যে মহাত্মা গন্ধী তাঁহার 'গুরু'—তাঁহার খিলাফতের প্রধান সহায়—সেই মহাত্মা গন্ধীর সহিত সে সময়ে তাঁহার মতবিরোধ হইয়াছিল। তিনি এক জন সামান্য মুসলমানকেও শ্রেষ্ঠ হিন্দু অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করেন, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার ভ্রাতা মিঃ সৌকৎ আলি—যিনি এক দিন বলিয়াছিলেন—হিন্দু গন্ধীর মত খর্ব্বকায় পুরুষের মুষ্টির মধ্যে তাঁহার ন্যায় বিশাল দেহ অনায়াসে আবদ্ধ থাকিতে পারে—সেই সৌকৎ আলি কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"কলিকাতার কতকগুলি অজ্ঞ হিন্দু বর্ত্তমানে মুসলমানদিগকে সহর হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে।......কাফেরের পক্ষে মৃত্যু একটা বিপদ, কিন্তু মুসলমানের পক্ষে নহে, মুসলমান মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মত মুসলমান নেতারা 'কাফের' হিন্দুদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলে সাধারণ মুসলমানের মনে হিন্দুর প্রতি কিরূপ ভাবের উদয় হয়? আর এক জন মুসলমান নেতা দোজানি খিলাফৎ কনফারেন্সে বলিয়াছিলেন,—"হিন্দুর রক্তে দাসত্ব মিশ্রিত আছে, তাই হিন্দুরা মুসলমানকে স্বাধীন দেখিতে পারে না। দ্বাদশ শত বৎসরের দাসত্বের ফলে হিন্দুর মনোবৃত্তি এইরূপ হইয়াছে। মুসলমানকে মনে রাখিতে হইবে, কাফেরের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বা কাফেরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না। হিন্দুকে বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিলে মুসলমানের পক্ষে তাহা দৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। মুসলমানরা যদি সংখ্যায় অধিক থাকিয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে লালার দল যুক্তকরে দুই ঘণ্টার মধ্যে শান্তিভিক্ষা করিবে।" পরপদানত মুসলমানের এই আস্ফালন হিন্দুর পক্ষে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার হইলেও অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের পক্ষে এই ভাবের উক্তি কি ফল উৎপাদন করিতে পারে?

এই যে অজ্ঞ মুসলমানকে নাচাইয়া তুলিবার চেষ্টা,—ইহার পরিণাম-ফল যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, হিন্দুর মনে কি এ কথা উদিত হইতে পারে না? মুসলমানের যদি হিন্দুকে মুসলমান করিবার অধিকার থাকে, তবে হিন্দুর মুসলমানকে হিন্দু করিবার অধিকার থাকিবে না কেন? মুসলমানের যদি তাঞ্জিম ও তবলিগের অধিকার থাকে, তবে হিন্দুর সংগঠনের অধিকার থাকিবে না কেন? খৃষ্টান মিশনারীরা মুসলানকে খৃষ্টান করিলে—খৃষ্টানের 'শুদ্ধির' ক্ষমতা থাকিলে আবদর রহিমের দল নীরব থাকে, আর হিন্দুর শুদ্ধির বেলা তাহাদের গায়ে জ্বালা ধরে কেন? মসজেদের সম্মুখে গোরা পল্টন ব্যাণ্ড বাজাইয়া গেলে গজনবির দল মুখ 'ভোঁতা' করিয়া থাকে, আর হিন্দু শোভাযাত্রা করিয়া গেলে 'মার মার' করে কেন? তবে কি বুঝিতে হইবে, রহিম গজনবির প্রকৃতির মুসলমান 'নরমের যম আর শক্তের যোম'? ইহাদের ধর্ম্মের দোহাই কেবল কি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য? না হইলে মসজেদের সম্মুখে গোরার ব্যাণ্ড-বাদ্যে ইহাদের ধর্ম্ম যায় না কেন?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলপূর্ব্বক কাহাকেও হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তিনি মুসলমান মৌলভী অথবা খৃষ্টান পাদরী প্রজার ন্যায় সাধারণ প্রজার অধিকারবলে অপরকে বুঝাইয়া নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। পরন্তু মৌলভী মওলানাদের তাঞ্জিম তবলিগ করিবার অধিকারের মত সংগঠন করিবার অধিকার ভোগ করিতেছিলেন। তবে তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্মের দোহাই দিয়া হত্যা করা হইল কেন? ত এ যাবৎ সে কথা বলেন নাই, বরং তাঁহাদের মধ্যে বহু ধর্ম্মভীরু নেতা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, এরূপ নৃশংস হত্যা মুসলমানধর্ম্মের শিক্ষার বিরুদ্ধ। তবে রসিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিল কেন? পরের প্ররোচনা ও বিকৃত শিক্ষার ফলই যে তাহাকে এই ঘৃণিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে ও উহাতে স্বর্গে যাইবার স্বপ্ন দেখাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আহমদিয়া সম্প্রদায় মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী—তাঁহাদের ২৭শে ডিসেম্বরের কনফারেন্সে হজরৎ খলিফাতুল মাসি বলিয়াছেন, "এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে ভীষণ এক ষড়্যন্ত্র আছে। হত্যার দায়িত্ব কেবল হত্যাকারীর নহে, মৌলভীগণের ও অন্যান্য নেতার নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসও এই হত্যার কারণ।"

মৃত্যু নহে—নব-জীবন

নরহন্তারূপে ধৃত রসিদের বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছে—দিল্লীর অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ. ডি. ডেনোটের উপর। ইনি ভারতীয় খৃষ্টান। সুতরাং বিচার নিরপেক্ষভাবে হইবারই সম্ভাবনা।

বিচারে যাহাই হউক, যাহা গেল, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত ত্যাগী, কর্ম্মী, মনীষী পণ্ডিত নেতা সকল সমাজের ভাগ্যে সকল সময়ে লাভ হয় না। তাঁহার অসাধারণ শক্তি বিচ্ছিন্ন পরস্পর-বিরোধী হিন্দুদলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যেটুকু অন্তরায় ছিল, মনে হইতেছে, তাঁহার মৃত্যুতে তাহাও অচিরে দূর হইবে। যিনি জাতির ও ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য এই ভাবে জীবন দান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই মহাপুরুষ। ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—The blood of the martyr is the cement of the Church, ধর্ম্মবীরের রক্তদানে ধর্ম্মমন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। ল্যাটিমার ও রিড্‌লি প্রমুখ খৃষ্টান ধর্ম্মবীররা প্রাণ দান করিয়া ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। Bloody Martyr রাজত্বকালে ইঁহাদিগকে ভূমিতে প্রোথিত দণ্ডে বদ্ধ করিয়া আগুনে জীবন্ত দাহ করা হইয়াছিল। অগ্নিসংযোগকালে ল্যাটিমার রিডলিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "রিডলি! আজ মানুষের মত এস, দুই জনে মরি। আজ আমরা আমাদের মৃত্যুতে যে আগুন জ্বালাইব, তাহাতে আমাদের জন্মভূমির যুগ-যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।" শিখগুরু তেগ বাহাদুর "শির দিয়াছিলেন, তবু শের (ধর্ম্ম) দেন নাই।" তাই আজ শিখধর্ম্ম জীবন্ত শক্তির উৎস। খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশু ক্রুশে প্রাণ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরে প্রথম রোমক খৃষ্টানরা রোমক সম্রাটদিগের অত্যাচারে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন বলিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব জগতের সর্ব্বত্র বিসর্পিত। এইরূপ আদর্শ-ত্যাগের উপরেই জগতের সকল দেশে সকল যুগেই একটা মূলনীতি প্রতিষ্ঠা হইয়া আসিতেছে। সেই নীতির যেমন বিনাশ নাই, তেমনই যাঁহারা আপনাদের পুণ্যপূত চরিত্রের বলে ত্যাগস্বীকার করিয়া সেই নীতির প্রচার ও প্রসার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও বিনাশ নাই। এই হিসাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দেরও মৃত্যু নাই। লালা লাজপৎ রায় তাঁহার মৃত্যু স্পৃহণীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিজের জীবনদানে যে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহা অবিনশ্বর—তাহার প্রভাব দূর-দূরান্তর-প্রসারী। হিন্দু সেই প্রভাবের ফলে মৃতসঞ্জীবনী সুধা লাভ করিবে। শুদ্ধি ও সংগঠনের বিরোধী ধর্ম্মান্ধ মুসলমান যদি মনে করিয়া থাকেন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে এ আন্দোলন রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন। শ্রদ্ধানন্দের আদর্শে শত শত শ্রদ্ধানন্দের উদ্ভব হইবে। হিন্দু এখন সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানন্দের অসম্পূর্ণ কার্য্য দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পূর্ণ করিতে যত্নবান

হামিদের হিম্মৎ

দুইটি কারণে হামিদ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। হামিদ পরিশ্রমী, যত্নশীল, মেধাবী ও সচ্চরিত্র ছেলে; কিন্তু যে কারণে অতি বড় ভাল ছেলেকে-ও ফেল করিয়া ফেলে, হামিদকে-ও সেই কারণে প্রথমবার ফেল করাইয়া দিল; সেটি হচ্ছে—প্রেম। যে সময়ে লর্ড কর্জ্জনের গর্জ্জন বঙ্গদেশকে ফাটাইয়া দুই ভাগ করিয়া দেয়, সেই সময়ে-ই হামিদের ফোর্থ ইয়ার। **স্বদেশ-প্রেম** হামিদকে টানিল 'বেঙ্গলী' অফিসের দিকে, কলেজ স্কোয়ারের দিকে, আর বীডন স্কোয়ারের মাঝখানে। হামিদ সংস্কৃত পড়িতেছে, বাঙ্গালা পুরাণাদি-ও পড়িয়াছে, সর্ব্বভৌম ঠাকুরের কাছে অনেক পৌরাণিক কথাদি-ও শুনিয়াছে; সেই সব পৌরাণিক আখ্যা অলঙ্কার দিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বক্তৃতা করে, আর সহস্র দর্শকের করতালিধ্বনিতে গোলদীঘির জল আর বীডন গার্ডেনের গাছের পাতা কাঁপিতে থাকে। প্রথম প্রথম সে বাঙ্গালা ধুতি-চাদরে হেম সাজিয়া-ই বক্তৃতা দিত; কিন্তু নেতা মহাশয়রা মুসলমান-সহানুভূতির বিশিষ্ট বিভূতি জনসমাজে প্রকাশ করিবার জন্য হেমকে চুড়ীদার পায়জামা, আচকান ও তাহার মাথায় ফেজ পরাইল; এই আধা-তুর্কী আধা-দপ্তরীপাড়াবেশে সুসজ্জিত হইয়া মওলানাজাদা হামিদ-উদ্দীন খাঁ সেরাজু যখন বীডন স্কোয়ারস্থ তক্তপোষ-মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া স্বদেশী অর্থাৎ মিলের বস্ত্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ধড়াচূড়া ও বঙ্গমাতার সঙ্গে মা যশোদার তুলনা দিয়া জাহ্নবী-জলধৌত পলাণ্ডু-রস প্রেমিক হিন্দুর হৃদয়ে ইনজেক্ট করিত, যখন গুরুভক্ত একলব্যের পরম পূজনীয় কুশ-পুত্তলিকার সঙ্গে নেতৃবিশেষের প্রতি ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য বাক্‌সুধা বর্ষণ করিত, তখন করতালিধ্বনির বায়ব্য আন্দোলনে বক্তৃতা যেন গরম হইয়া টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকিত।

এক দিকে স্বদেশ-প্রেম সারস্বত প্রেমের পথে বাধা দিয়া বনিতার শিরঃশোভন এলোকেশ-প্রেম হামিদের একনিষ্ঠ দৃষ্টি বইয়ের পাতা থেকে বউয়ের মুখখানির দিকে ফিরাইয়া দিল। আহা! মনের-ও কি দোষ দেওয়া যায় যদি সে বিশ বছরের বাসার ভিতর থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে প্রভাতে অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের মত পনেরোর চুল-চোখ-চিবুক-জালে আপনাকে হারিয়ে ফেলে।

পরবৎসর কিন্তু সে বি, এ পাশ হইয়া যথাসময়ে বি, এল ডিগ্রী লাভের পর ওকালতী আরম্ভ করিল।

হামিদ উকীল হইল বটে, কিন্তু পলিটিক্স ছাড়িল না। সে হাইকোর্টে উকীল বলিয়া এনরোল্ড হইল, পরে আলিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ছোট আদালত, পুলিসকোর্ট, ইনকমটেক্স পর্য্যন্ত ঘুরিয়া-ও বিশেষ কিছু আয়ের ঠিকানা করিতে পারিল না। খুব পসার-জমা উকীল-ব্যারিষ্টার যদি পলিটিক্সে প্রবেশ ক'রে এক জন নেতা কি ডেপুটী সব-ডেপুটী গোছ নেতা-টেতা হন, তখন তাঁর দরজায় মক্কেলের ভীড় দিন দিন বাড়িতে-ই থাকে; কর্পোরেশনে কাউন্সিলে-টাউন্সিলে ঢুকতে পারলে ত কথা-ই নাই; কিন্তু নতুন উকীল, ট্রামওয়ে বাহন, দুপুরবেলা 'নো টিফিন' অথচ পাবলিক লাইফে ঢুকেছেন ত মক্কেলেরা মনে ক'রে ব'সে আছে যে আদালতে এর কিছু হয় না। যেমন ডাক্তার যদি টপাৎ ক'রে মোটার থেকে নামলেন—রুগীর ঘরে গিয়ে-ই তার হাতখানা ধরে-ই বললেন—জিভ, চোখ,—কাগজ—ডান-হাতে প্রেসক্রিপসনখানা রাখলেন, বাঁ-হাতের চেটোটা বাড়িয়ে ধরলেন—মুটো করে-ই পকেটে ফেললেন, "কাল সকালে খবর দিও" ব'লে গাড়ীতে উঠে বললেন—চোরবাগান, রাজেন্দ্র মল্লিক। রোগীর আত্মীয়রা বললেন, "দেখেছ, কি ডাক্তার—কতটা পসার—রোগীকে ভাল ক'রে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই; আর ঐ যে আমা-

কি না—এই রকম আধ ঘণ্টা ধরেই গল্প জুড়ে দিলেন, ফি দিতে একটু দেরী হ'লে ব'লে বসেন, তা থাক, এখন অসুবিধে হয়, এর পরে না হয় পাঠিয়ে দেবেন,—আদত কথা, ফি পকেটে পোরা অভ্যেসটা-ই নেই।"

এ দিকে সে কালে যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁদের ফণ্ড-ও কম, ক্ষুধাও সর্ব্বগ্রাসী, আবার খবরের কাগজওালারা-ও মাঝে মাঝে হিসেবের তাগাদা ক'রে পসার মাটী করবার চেষ্টা করত, সুতরাং একটা প্রোপাগাণ্ডা-টাণ্ডা কি ভিলেজ রিফরম-টরম গোছ অছিলায় বেকার পেট্রিয়টদের অনেক সময় রাহাখরচ পর্য্যন্ত নিজে যোগাড় ক'রে নিতে হ'ত। আজ কাল কিন্তু স্বদেশের অবস্থা যা-ই হোক, স্বদেশীদের হাত বেশ স্বচ্ছল, আর সরকারকে জব্দ করবার টাকার হিসাব চাইতে নেই, এটাও তাঁরা অনেককে বুঝিয়ে দিয়েছেন। উকীল হবার দু'বছরের কিছু পরে-ই হামিদের দিদিশাশুড়ী মক্কাবুড়ীর মাণিকতলা লাভ হয়, সুতরাং শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত সম্পত্তি-ই হামিদের হস্তগত হয়ে পড়ল।

হামদে এখন একটা মানুষের মতন মানুষ হয়েছে, পাশ-করা উকীল, খবরের কাগজওয়ালাদের দলে মিশে কোম্পানীর কু-নজরে না পড়লে চাইলে-ই একটা হাকিমী পায়া পেয়ে যেতে পারত; তা যা হোক, শ্বশুরের ত একটা সম্পত্তি-ই পেলে, কাযে-ই এখন ঐ পাকা বাড়ীতে বাস করা-ই শ্রেয়ঃ; এই মনে ক'রে বুড়ো সোনাউল্লো কলকাতার কারবারের ঠাটটা তুলে দিয়ে দেশের জমী-জায়াৎগুলো ভাল ক'রে তদারক করবার জন্য পুত্র বসরদ্দীকে সঙ্গে ক'রে স্বদেশের পুণ্যতীর্থ কলকাতা ছেড়ে নিজের দেশে গিয়ে বাস করলে।

ওকালতীতে পয়সা হোক্ আর না হোক্, তাতে হামিদের বড় কিছু এসে যায় নি। শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি-লাভে তাহার নিজের সংসার বাইরের ভদ্রতা রক্ষা ক'রে বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে চলতে লাগল; তার উপর পিতা-মহের বহু কষ্টে বহু যত্নে সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য-ও তাহার নয়ন-পথের অদূরে ঝিক্‌মিক্ করছিল।

কোন না কোন কোর্টে এক আধবার দেখা দিয়ে এলে-ও হামিদ তার সমস্ত উৎসাহ ঢেলে দিলে রাজনীতিতে এবং নেতাদের ইঙ্গিতে সে মুসলমানী ফেজ আচকান পরলে-ও প্রাণের ভিতর এখন-ও সে হেম আছে। কোন লেখাপড়া-পরস্পরের দোষ-গুণ গায়ে পেতে নিয়ে বেশ একটা টলারেশনে মিল-মিশ ছিল। পশ্চিমে হিঁদুদের মধ্যে অনেকে মহ-রমের সময় মোছলমানের ধর্ম্ম-কর্ম্মে যোগ না দিলে-ও জাঁকিয়ে তাজিয়ার শোভাযাত্রা পথে বাহির করত; আবার মোছলমানরা-ও 'জয় রাধারাণী কি জয়' না বলে-ও হোরীর সময় আবির খেলা নিয়ে আমোদ করত। বাঙ্গালাদেশের ত কথা-ই নাই; যাতে হিঁদুর প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, এমন কায এ দেশের মোছলমানরা ক্ষুধার তাড়নায় বা রসনার প্রেরণায়-ও করিতে কুণ্ঠিত হইত, আর হিন্দুরা ত মাণিক-পীরকে নিবেদন না ক'রে কোন-ও নতুন দ্রব্য গ্রহণ করত না; সত্যপীরকে ক্রমে তারা সত্যনারায়ণ ক'রে নিলে এবং এখন-ও পর্য্যন্ত এক জন মোছলমানকে সামনে দাঁড় না করিয়ে কোন হিন্দু ঘরে-ই সুবচনী পূজা সুসম্পন্ন হ'তে পারে না।

*　　*　　*　　*

অন্দরে মেয়েদের মধ্যে ঈর্ষ্যাশূন্য প্রাণে পরস্পরের মধ্যে বেশ মনের মিল থাকলে সংসারের শান্তি অনেকটা বজায় থাকে বটে, কিন্তু বার-বাড়ীর পুরুষদের কর্ত্তামীর ভাবটা তাতে মাঝে মাঝে বোধ হয় ম্লান হয়ে যায়। বোধ হয়, এই তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম করে-ই সেকালের পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতে প্রবৃত্ত হ'তেন। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে যাঁরা কিছু বলেছেন বা লিখেছেন, তাঁরা সতীনের ঝগড়ার উৎপাতে স্বামীর দুর্গতির দিক্‌টা-ই বেশী রং ফলিয়ে এঁকে দিয়েছেন, কিন্তু দুই সতীনের টক্করা-টক্করীতে পতিপ্রভুর যে মাঝে মাঝে ভোজনে প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়, চরণসেবা, প্রেম-নিবেদন, ব্যজনী-ব্যজন প্রভৃতি ভজনের আয়োজনে-ও হারজিতের লড়াই চলে। "তাই ত, তোমায় দিলে বড়বৌ ত চেয়ে বসবে! তাকে-ই বা তখন কি বলি?" এই অজু-হাতে দু'জনকে-ই বাউটী, বেণারসী দিবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত, এ কথা সংস্কারক বা নাট্যকার না বললে-ও তখনকার পতিপ্রভুরা মনে মনে যে বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পারতেন, তার প্রমাণ বাড়ীর ভিতরে সতী-নের মাতন দেখে-ও তাঁরা আনন্দদায়িনীর পাশে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী এনে বসাতেন। পণের প্রলোভনের কথা সকল যায়গায় খাটে না, অনেকে-ই বিনা পণে নিজে সালঙ্কারা

ইংরাজের আদর্শে আজ পর্য্যন্ত আমরা শ্যালিকাকে ভাদ্রবধূজ্ঞানে স্পর্শদুষ্ট না করিয়া মাতুল বা পিতৃস্বসৃ-তনয়াদিগকে বিবাহ করি নি বটে, কিন্তু অপর সকল বিষয়ে-ই ইংরাজ যে সভ্য মানবের উন্নত আদর্শ, এ কথা খদ্দর পরে-ও আমরা মেনে নিই; আবার সেই কথাটা ইংরাজী ভাষার 'লভ্' প্রণয়-কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের মরমে পশিয়া সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী-পরিবারমধ্যে একাধিক বিবাহ-টা একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে; নইলে দুই এলোকেশীর রেষারেষি, বিদ্যে-সাগরের কষাকষি বা দীনবন্ধুর ব্যঙ্গ-হাসি আমরা যে ততটা গ্রাহ্য করতুম তা ত মনে হয় না। তবে এটা হ'তে পারে, যখন এক অবলার বোল্ সামলাবার পুরুষ-শক্তি আমাদের ঘুচে গেছে; মেমরা এক হাতে একগাছা বৈ ব্রেসলেট পরে না, এই প্রবোধ দিয়ে একটি ঠাকরুণকে আধ-সধবা আধ-বিধবা ক'রে রাখবার চেষ্টায় আছি, তখন এর উপর আবার ডবলের বালাই আনি কোথা থেকে?

বঙ্গভঙ্গের পর কিন্তু সার বামফাইল্ড ফুলার ব'লে এক জন জনবুল-রুলার বুঝিয়ে দিলেন যে, ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গির লীলায় দুই সতীনের পতিগিরি মজা মন্দ নয়, আর সুয়োর দিকে একটু ঢ'লে পড়লে-ই দুয়োর ঘেউঘেউনি গলাবাজিতে-ই শেষ হবে; কর্ত্তার নাওয়া-খাওয়া শোয়ার ত্রুটি হওয়া ও দিকে যাক্, বরং সোহাগের ধুমটাই বেড়ে যাবে।

সুয়োর বাপের বাড়ী লোক গেল, কানপুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান থেকে মাসী, পিসী, বড়দি, মেঝদি সেজে জনকতক মতলবী লোক মৌলবী হয়ে বাঙ্গালায় এসে পৌছুলেন।

একে স্বামীর সোহাগ, তার উপর মাসী-পিসীর সদুপদেশ, সুয়োরাণীর চোখের কুয়াসা ঘুচে গেল, বুঝে নিলেন যে, সতীনের সঙ্গে ভাব রাখার মত মহাপাতক আর কিছুই নেই।

এর কিছু পরেই য়ুরোপের মহাসমরানল জ্ব'লে উঠল, স্বোয়ামীর সোহাগে গ'লে অনেক সুয়োরাণী দুয়োদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আল্লার খলিফা তুর্কীর বিরুদ্ধে-ও যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু দেশে ফিরে যখন দেখলেন যে, কর্ত্তারা প্রেমের এত পরিচয় পেয়ে-ও তাদের বেশী ক'রে কিছু গয়নাগাটি গড়িয়ে দিলেন না, তখন রাগের মাথায় অনেধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন। দুয়োরা ত অনেক দিন থেকে-ই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছিলেন, সোহাগী সতীন একটু হাতছানি দিতে-ই, 'বোন্‌টি আমার—দিদিটি আমার' ব'লে সুয়োর গলা জড়িয়ে ধরলেন, তার পর সবুজ আঁচলে শাদা আঁচলে গাঁটছড়া না বেঁধে দু'দলে-ই মান ক'রে বসলেন—স্বোয়ামীর মুখ আর দেখব না। সেবা-শুশ্রূষা ত করব-ই না, পানের ডিবে জলের গেলাস ত এগিয়ে দেব-ই না, এমন কি, গালাগাল দিয়ে-ও প্রেম জানাব না—গালে ঠোনাটা-ঠানাটা-ও মারব না।

কিন্তু নিজের চুলগুলি ঘুরিয়ে বাঁধা, মুখে সাবান ঘষা, খয়ের গুলে টিপ পরা, ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া, কষ্ট ক'রে দোক্তা দিয়ে পান খাওয়া আর একটু মুচকে হাসা ছাড়া সুয়োদের শরীরে কখন-ই কোন পরিশ্রম সহ্য হয় না; সুতরাং দুরমুস-পেটা দুয়োর গতর না হ'লে সংসার ত চলে না, তাই উনুনে আগুন দিতে, ভাত রাঁধতে, রুটী সেঁকতে, বাসন মাজতে দুয়োদের-ই ডাক পড়ে। সুয়ো দেখলে, এ ত ব্যাপার মন্দ নয়, পোড়ারমুখী মাগীরা গতর খাটায় খাটাক, কিন্তু তাতে ত ওদের কিছু কিছু লাভ আছে, তাই দাড়ী চোমরাতে চোমরাতে—শ্রীবিষ্ণু!—চুল কুলুতে কুলুতে দুয়োর কাছে বললে, "দিদি, তোরা ত হেঁসেল থেকে ভাঁড়ার থেকে সরিয়ে সরিয়ে চালটা-ডালটা বেগুনটা-আলুটা তেলটা-ঘিটা যা হোক কিছু কিছু পাস, তা ভাই, আমরা যে তোদের দলে এলুম, আমাদের-ও ত কিছুর পিত্যেশ আছে। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে কথা কইব বোন, অন্যায্য কিছু বলব না, যা পাওনা হয়, আমাদের দিও সাড়ে চোদ্দ আনা, আর তোমরা নিও দেড় আনা, কেমন ভাই, বেশ হ'ল না? কথায় বলে 'দেড় দেড় দেড়, গলায় গলায় বেড়'।"

দুয়োর দরকার পতিকে পথে আনা, কাযে-ই বললে, "হাঁ ভাই, তা বেশ, যখন মিন্‌ষেদের জব্দ ক'রে ফেলব, তখন আমাদের ঐ রকম ভাগাভাগি হবে।"

বাঙ্গালায় 'প' আর 'ফ' পাশাপাশি বসে বটে, কিন্তু ইংরাজী Fএর অনেক পরে ইংরাজীতে Pএর দেখা পাওয়া যায়, সুতরাং প্যাক্টের চুক্তি ফ্যাক্টের যুক্তির বত্রিশ পা পেছনে প'ড়ে গেল। এ দিকে যে তুর্কীর দেখাদেখি ফেজের

বরখাস্ত ক'রে মিয়াদের বন্ধুত্বের দরখাস্ত না-মঞ্জুর ক'রে দিলে ; তখন—তা তখন—তখন—

* * * *

কর্ম্মের বর্ম্ম ভেদ ক'রে, স্বচ্ছলের ছাল ছিঁড়ে, ধর্ম্ম সহজে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় না ; সেই জন্য দুর্ভিক্ষ হলে-ই খৃষ্টানের দল বেড়ে যায়, অন্নকষ্টে সন্ন্যাসীর সংখ্যা পুষ্ট হয়, আর নিজে মুস্কিলে না পড়লে মাঝি-মাল্লারা রাত্রে মুস্কিল-আসান সাজে না।

সোনাগাছী অঞ্চলে আজ বছর পাঁচ ছয় ধ'রে যে লোকটাকে মাঝে মাঝে আলো জ্বেলে 'মুস্কিল-আসান' ব'লে চেঁচিয়ে চলতে দেখা যায়, সে কিন্তু মাঝি-ও নয়, কাজী-ও নয়, গাজী-ও নয় ; সে আসল একটি জীয়ন্ত পাজী। কেউ বলে, তার এক সময় বড়বাজারে ছুরি-কাঁচির দোকান ছিল। কেউ বলে, ঠিক তার মতন কাকে যেন আগড়-পাড়ার গীর্জ্জায় ঘণ্টা বাজাতে দেখেছি, সে খৃষ্টান। কেউ বলে, বাগনাপাড়ার ছোট আখড়ার মোহান্ত বাবাজী যদি ও না হয়, ত তার যমজ ভাই যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেউ বা বলে, সেবার চাঁদপাল ঘাটে যে ধনিয়া সাধু এসেছিলেন, তিনি-ই ও। আবার এ দিকে পুলিসের সন্দেহ যে, ও এক জন কালাপানির পালান দায়মাল।

মুন্সী সদরুদ্দীনের গলির কোন একটা পুরাতন কাফি-খানার সঙ্গে সোনাগাছীর মুস্কিল-আসান মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ; আর গরাণহাটার গরীবউল্লার বিড়ীর দোকানের আসল মালিক যে উনি, এ কথা ঐ অঞ্চলের লোক এক রকম যেন হলফ করে-ই বলে।

মোছলমানদের মধ্যে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ মুস্কিল-আসানটি পরম ধার্ম্মিক ; মুস্কিল সাহেব যে নিয়মিত-রূপে পাঁচ ওক্ত নেমাজ করতেন, বা হিঁদুদের গাল দেবার সময় ছাড়া খোদার নাম মুখে আনতেন, তা বড় কেউ দেখতে-শুনতে পেত না। তবে হিঁদুমাত্রে-ই যে নরকে যাবে, এ কথাটি মুক্তকণ্ঠে যেখানে সেখানে ব'লে বেড়াতেন ; আর মাঝে মাঝে 'আজান' কাযে নিযুক্ত হ'লে তাঁর গলার ডাক যত দূর পৌঁছুত, তত আর কারও পৌঁছুত না। তবে হিঁদুদের একটি ঠাকুরের প্রতি তাঁর সামান্য যা হোক কিছু স্নেহ ছিল। তিনি বলতেন, হিঁদুদের শিব বা মহাদেব তাঁর-ই শিষ্য, মুস্কিল সাহেবের নিকট তিনি প্রথম গঞ্জিকা সেবন শিক্ষা করেন ; আর যাঁরা ঐ আসান মিয়ার গাঁজার চাল-সাজের বহর স্বয়ং দেখেছেন, তাঁরা এ কথায় বিশ্বাস করলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

গোঁড়ামী ও গাঁজাখুরি উভয় উপাদানের একাগ্র মিলনের তপ্ততেজ মানব-মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারলে না ; ক্রমে মুস্কিল সাহেবের আকারে-আচারে কথাবার্ত্তায় বাতুলের লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ হ'ল, তখন লোক ভাবলে, ইনি আর সাধারণ মানুষ নেই, তাঁর ভিতরে কোন দৈবশক্তির আবির্ভাব নিশ্চয়-ই হয়েছে। পাঁচ জনে মিলে একটা শিক-কাবাবের দোকানের পাশে একটি ছোট একচালায় তাঁর এক আস্তানা ক'রে দিলে ; মুস্কিল-আসান নাম ঘুচে তাঁর নাম হ'ল পাগলা পীর। মুসলমানরা মুর্গী জবাই ক'রে পূজা দেয়, হিঁদুরাও বাতাসার সিন্নী মানে।

দাওয়ানপাড়ার দিকে একখানি খোলার ঘরে চন্দুরী ব'লে একটি কালো-কোলো গোল-গাল আঁটা-সাঁটা গোছ আধা-বয়সী মেয়েমানুষ বাস করত ; সে সকাল-বিকাল দর্জ্জিপাড়ার দুই এক গৃহস্থবাড়ী বাসন মেজে আসত, দুপুরবেলা আর রাত্রের ভার নিয়ে রেখেছিল যশোরবাসী ছিদেম দাস ব'লে এক জন বালন্দা-মাদুরের ফিরিওয়ালা। বছর দুই হ'ল ছিদেম দেশে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসার পেতেছে, আর কলকাতামুখো হয় নি ; চন্দুরীর বড় কষ্ট। পাড়ার পাঁচ জনে পরামর্শ দিলে, তুই একমনে গিয়ে পাগলা পীরের দোহাই দিয়ে পড়, ওঁর দয়ায় তোর যা হোক একটা হিল্লে হ'তে পারে। ঝিগিরির পয়সা থেকে চন্দুরী যথাসাধ্য বাঁচিয়ে খরচ ক'রে নতুন পীরের গাঁজা, দুধ, বাতাসাদি যোগায়, আর বলে, "বাবা, তুমি-ই সত্য, তুমি না মুখ তুলে চাইলে আমার একটা মানুষ আর জুটবে না।" বাবার দয়া হ'ল ; টেরিটি-বাজারের এক জুতোওয়ালা চন্দুরীর চোখের ভিতর সৌন্দর্য্যের অন্দরমহল দেখতে পেলে ; চন্দুরী খোলার ঘর ছেড়ে দোতালা কোঠায় উঠল, তার দেয়ালের গায়ে গিল্টী-করা ফ্রেমের আরশী, আর ধবধবে ফরাসের উপর রূপদস্তার ফরসী শোভা পেলে ; পরবর্ত্তী মহরমে তার হাতে উঠল দমদম্, পূজায় পেলে নেকলেস্। সোনাগাছীর অধিবাসীরা সবিস্ময়ে ব'লে উঠল যে, সাক্ষাৎ দেবতা যদি কোথাও থাকেন, তবে ঐ পীর দেবতা, নইলে সদ্য সদ্য চন্দুরীর এমন বাবুর মতন বাবু জোটে! সোনাগাছীর বিরাজমা ঠিক ক'রে দিলেন, বুধবার-ই পাগলা পীরের বার, সুতরাং প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় ভক্তিমতী উপবাসিনী অসতীর ভীড়ে আস্তানার সামনে দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া চলা পর্য্যন্ত দায় হয়ে উঠল।

পাগলা পীরের আস্তানায় কেবল যে ভক্তিমতীদের-ই ভীড় হ'ত তা নয়, অনেক হিন্দু-মুসলমান হাবাতে-পুরুষ-ও গাঁজা এবং গুণ্ডামীর প্রলোভনে আড্ডায় জমায়েৎ হ'তে আরম্ভ করলে। এদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য ; এক জন আব্বাস ব'লে এক জোয়ান, তার কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে বেশ সীঁতিকাটা, গায়ে লম্বা পিরাণ, পরণে চওড়া পাড় ধুতি গাঁটকষা ক'রে পরা, পায়ে ইংরাজী জুতো, হাতে এক কোঁৎকা লাঠী। বাজারে নতুন বাঙ্গালী কাপ্তেন বার বেরুলে-ই যে তার আগা-[illegible]

দাঁড়াত; মেছোবাজার থেকে মিঠে খিলির সোনার কাঁড়ি কিনে বাবুর বিবির বাড়ী যোগান দিত, বেশী রাত্রে মদ দরকার হ'লে যেখান থেকে হোক এনে ফেলত, মুরগীর কারি-কাটলেট ধারে আনত, আর কাপ্তেন বাবুর জাহাজ মাঝ-দরিয়ায় বানচাল ক'রে দেবার জন্ত যে সকল উপায়ের আবশুক, তার অনেকগুলি-ই তার দ্বারা সম্পাদিত হ'ত। আর এক জনের নাম হচ্ছে পীতাম্বর গাঙ্গুলী, এই কুলীন ব্রাহ্মণটি যে ক'দিন জেলে না থাকতেন, সে ক'দিন প্রায়-ই পাগলা পীরের গুণগান ক'রে গঞ্জিকার ধূমপান করতেন। যে হিন্দুশাস্ত্রমতে সপ্তপদমাত্র একত্র গমন করলে-ই পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হয়, সেই হিন্দুকুলের পরম-পূজ্য ব্রাহ্মণ-কুলজাত গাঙ্গুলী মহাশয় পুলিসের সঙ্গে সপ্ত-কোটি পদ গাঁটছড়া বেঁধে গমন করায়, উভয়ের মধ্যে যে একটা প্রেমের সম্বন্ধ পাকা রকম ঘ'টে যাবে, সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। পুলিস যেমন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসা ভাড়া ও খোরাকী খরচ প্রায়-ই বাঁচিয়ে দিত, গাঙ্গুলী-ও তেমন-ই নানা উপায়ে তাঁদের সাহায্য করত। খাতিরে প'ড়ে বা দবদবার জোরে চোরাই আঙ্গটী, গাড়ীর ল্যাণ্ঠান প্রভৃতি খুচরা জিনিষের আস্কারা করা যখন পুলিসের একান্ত দরকার হ'ত, তখন পীতাম্বরকে বললে-ই সে কোথা থেকে যেন মালটি হাজির ক'রে দিত; পুলিসের মানরক্ষার জন্ত তার এতটা স্বার্থত্যাগ ছিল যে, অনেক সময়ে সে কোন কিছু না করেই দোষী আসামী ব'লে স্বীকার ক'রে জেলটা ঘুরে আসত।

সোনাগাছী, দর্জ্জিপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পীরের প্রভুত্বের যখন এমন প্রভাব, হামিদ-ও সে সময় বাল্যাবধি উপেক্ষিত স্বধর্ম্মের দিকে একান্ত মনঃসংযোগ করেছে; দেশহিতৈষিতা সে ছাড়ে নি, কিন্তু বলত, আগে মোছলমানের মান, তার পর বন্দে মাতরম্ গান।

রায় কুমার ব্রজসুন্দর এম, এ পাশ ক'রে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদগ্রহণ করার পর থেকে স্বদেশী হামিদ আর বড়-তার কাছে আসা-যাওয়া করে না। আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে আসে বটে, কিন্তু হেম ব'লে ডাকলে মুচকে মুচকে হাসে। লালু তাকে এখন মৌলানা সাহেব ব'লে ডাকে, তাই তার উপর যেন একটু বেশী রকম খুসী। বাইরে সে আমাদের বড় নিন্দা করে না, তবে শুনতে পাই বলে, মিত্তিররা ভাল লোক বটে, তবে বড় সঙ্কীর্ণচেতা। এর কারণ, বাবা ও জ্যেঠামহাশয় দু'জনে-ই একটু মোটা রকম পেন্সন নিয়ে বাড়ীতে বসেছেন, কাযে-ই তাঁদের দীর্ঘ-জীবন-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজত্বের পরমায়ুবৃদ্ধির প্রার্থনা-ও আমাদের সকলকে করতে হয়। আর একটা কথা, যখন-ই সে আসে, দেখতে পায়, আবার চালের দর চড়ছে, ঘি-তেল যেমন মাগ্যি হচ্ছে—তেমন-ই ভেজাল বাড়ছে, এবার এসেসমেণ্টে আবার টেক্স বাড়ালে, এই রকম সব তুচ্ছ কথাই কই। সিঙ্গাপুরে জাহাজের আড্ডার জন্ত যে কত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, আফ্রিকার কাফ্রিদের স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে কি না, স্বরাজ দল যখন চাকরী নেবে না ব'লে ফেলে ফাঁপরে পড়েছে, তখন কোন দলের কারও আর মন্ত্রী হওয়া উচিত নয়, এই সব গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় আমরা তার সঙ্গে যোগ দিই না।

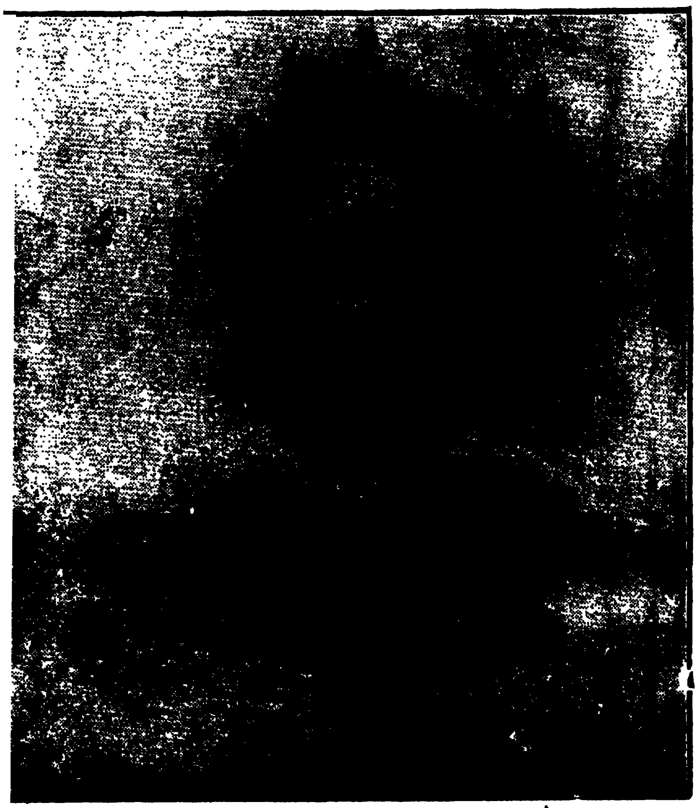
নজিবন্নিশা বা নিশি কিন্তু অন্ততঃ মাসে দু'তিন বার পাল্কী চ'ড়ে এসে বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যায়। শৈশবে মাতৃহারা এই মুসলমানের মেয়েটি যেন ক্ষণজন্মা। রাস্তা দিয়ে লোক বাজনা বাজিয়ে গেলে মসিদের ভিতরকার বায়ু যে কিসে অপবিত্র হয়, সে তা বুঝতে পারে না। নীচপ্রকৃতি মোছলমানের দল গরীব হিন্দুরমণীদের ওপর বলপ্রকাশ করলে খবরের কাগজে সে কথা প'ড়ে তার চোখে জল আসে, আর সম্ভ্রান্ত ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীরা কি ভ্রান্তিবশে যে এর প্রতীকারের চেষ্টা করেন না, তা-ও সে বুঝতে পারে না। বেহেস্তের হুরের রূপ আর মৃতা মাতামহীর পবিত্র প্রাণের দৈবী-ভাব যেন এই নবযুবতীর জীবনকে অমৃতময় ক'রে রেখেছে; সে এখন মা, বছর চারেকের একটি ছেলে তার কোলে।

এক দিন নিশি এসে বাড়ীর ভিতর কথায় কথায় বললে যে, কি একটা ভয়ানক দেশের কাযে তার স্বামী ক'দিন হ'ল দিল্লী চ'লে গেছে। নিশি কাগজে পড়েছিল যে, দিল্লীতে হিঁদু-মোছলমানে মাঝে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হয়ে গেছে। এমন সময় হামিদকে দিল্লীযাত্রা করতে প্রস্তুত হ'তে দেখে সে তাকে নিষেধ ক'রে অনেক কাকুতি-মিনতি, কান্নাহাটী করেছিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি। নিশি বলে, ইদানীং তার স্বামীর মেজাজ অত্যন্ত গরম হয়ে উঠে, আগে আগে উত্তেজিত হ'লে সে বাঙ্গালা সাধুভাষাই বেশী ক'রে কইত, বড় জোর দুই একটা ইংরাজী মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেত, কিন্তু আজকাল অল্প উত্তেজনাতে-ও সে কি ফার্সী-মার্সী, উর্দ্দু-মুর্দ্দু বলে, নিশি বেচারা তার একটাও বুঝতে পারে না; আর কথায় কথায় শোনায় যে, বাঙ্গালা মুল্লুকে পয়দা হ'লে-ও খানদানী তার খোরাসানী। লালুর বৌ তামাসা ক'রে বলেছিল যে, দেখো ভাই নিশি ঠাকুরঝি, তুমি যখন কোনমতে-ই বাঙ্গালিনী ছেড়ে মোগলানী হ'তে পারলে না, তখন কুলমর্য্যাদা রাখতে তিনি না একটি দিল্লীর বাই সাদি ক'রে ফেরেন। নিশি উত্তর করলে, তার আর ভয় কি বৌ, যখন-ই মুসলমানের ঘরে জন্মেছি, তখন-ই জেনেছি যে, চারটে সতীনের লাইসেন্স আছে, তবে যারা ইংরাজী প'ড়ে ভত ধর্ম্ম-টর্ম্ম মানে না, তারা-ই এক বিবিতে রাজী।

[ক্রমশঃ।

কংগ্রেস

আসামের গৌহাটী সহরে এ বৎসরের কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেল। আসামের প্রাচীন রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—নরকাসুর, ভগদত্তের সময় হইতে আসামের শেষ স্বাধীন নরপতিদিগের লীলাভূমি এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুত তরুণরাম ফুকন সদস্যগণকে তাঁহার দেশে সাদর আহ্বান করিবার কালে এই কথা বলিয়া গর্ব্ব ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এ আনন্দ ও গর্ব্বের তিনি প্রকৃতই অধিকারী। যে সহরে



শ্রীযুত তরুণরাম ফুকন

ভারতের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আজিও কালের শাসন সহ্য করিয়া বর্ত্তমান, সেই সহরে নবভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন যে শোভন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তির ভিত্তির উপরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আসাম এক হিসাবে তাহার পূর্ণ প্রতীক, কেন না, এখনও আসাম গৃহশিল্পে উৎপন্ন দেশীয় বস্ত্রের প্রধান জন্মভূমি বলিয়া ভারতে সুপরিচিত। এখনও আসামের নারী ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁতের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন। আসাম দরিদ্র হইয়াও এ বিষয়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল।

তরুণরাম তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, আসামে হিন্দু-মুসলমান-সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছে, আসামের পুণ্যভূমিতে হয় ত দেশের প্রতিনিধিবর্গের সম্মিলনে সকলের আন্তরিক চেষ্টায় সেই বিরোধ-সমস্যা সমাধানের একটা সদুপায় নির্দ্ধারিত হইয়া যাইতে পারে, এই আশায় দেশের লোক গৌহাটীর কংগ্রেসের দিকে উৎফুল্ল-নয়নে চাহিয়া ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র এই আসাম এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে পথিপ্রদর্শন করিতে পারে, এ আশা নিতান্ত দুরাশা ছিল না।

কিন্তু অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দিল্লী হইতে মুসলমান ঘাতুকের হস্তে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার সংবাদ আসিল—হিন্দু-মুসলমান একতার আশাপ্রদীপ ম্লানরশ্মি হইয়া গেল—শীঘ্র যে সেই দীপশিখা পুনরায় প্রজ্বলিত হইবে, এমন আশা রহিল না।

উদ্বোধনের মুখেই যখন এই বিঘ্ন, তখন অধিবেশন যে ঘন তমসামলিন হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তথাপি দেশের লোক কংগ্রেস-তরণীর কর্ণধারের মুখে আশার বাণী শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব। তিনি এক সময়ে মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল হইয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহার নিকট তাহারা সুযুক্তি ও সুতর্ক-সমন্বিত সারগর্ভ অভিভাষণেরই আশা করিতেছিল। এ দেশের এই ঘোর সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে তাঁহার ন্যায় মনীষী পণ্ডিত সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—হিন্দু-মুসলমান-মিলনের সরল সদুপায় নির্দ্দেশ করিয়া স্বরাজের পথ সুগম করিয়া দিবেন,—দেশের লোক তাঁহার নিকট এই প্রত্যাশা করিয়াছিল। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিতের মত নানা বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বরাজলাভের প্রকৃত পন্থা তিনি আমাদিগকে দেখাইতে পারেন নাই, প্রকৃত সাম্প্রদায়িক মিলনের পন্থাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। যাহা তিন বৎসর পূর্ব্বে 'স্বরাজ কাউন্সিল' স্বরাজলাভের সোপান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—যাহা কাউন্সিলকামীরা স্বরাজলাভের কার্য্যপদ্ধতি বলিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—যে নীতি পরীক্ষিত হইয়া কার্য্যকরী বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই, সেই কাউন্সিল-গ্রহণ ও বাধাপ্রদাননীতি আরও তিন বৎসর কংগ্রেসের গ্রহণীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারই জন্য কি এত অর্থ—এত শ্রম ব্যয়িত হইল ?

মিলন-সমস্যায় কংগ্রেস

বস্তুতঃ এবার কংগ্রেসের সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম

চিন্তা-সাপেক্ষ। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই বটে, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানে দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত জ্ঞানী দূরদর্শী প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত হইয়াছেন, সেই প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে অন্ততঃ একটা সুকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া দিতে পারেন না, একথা কিরূপে বিশ্বাস-যোগ্য? তবে এতগুলি বিরাট মস্তিষ্কের একত্র সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা কি?

কংগ্রেস নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, "ব্যাপার যখন গুরুতর তখন উহা এত অল্প সময়ের মধ্যে মীমাংসিত হইতে পারে না। এই হেতু এই বিষয়ে বিচার-আলোচনা করিবার ভার কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার (Working Committee) হস্তে অর্পণ করা হউক। তাঁহারা যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হউন, সেই সিদ্ধান্তের রিপোর্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সকাশে পেশ করিবেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সেই রিপোর্ট আলোচনা করিয়া যৎকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।" ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে, তখন কোন পুষ্করিণী হইতে কি জল আনিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা যায়, সে চিন্তার অবসর কোথায়? অনর্থক কালহরণে ফল কি? সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে—বিশেষতঃ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের ফলে সেই বিরোধ যেরূপ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে জাতীয় একতার সৌধ বুঝি বা ধূলিসাৎ হয়, বুঝি বা জাতীয় স্বরাজের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়! এ সময়ে দীর্ঘসূত্রিতা কোনক্রমেই ফলদায়ক হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, যদি কংগ্রেস এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে সাহসভরে ঘোষণা করিতে পারিতেন যে, সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের শক্তিসঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ কর—শত্রুভাবে নহে, বন্ধুভাবে, সকলেই আপন আপন সম্প্রদায়কে স্বাবলম্বন-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা কর, অথচ সকলেই ভারতকে জন্মভূমি বলিয়া মনে রাখিয়া ভারতের মুক্তি-সাধনে বদ্ধপরিকর হও,—তাহা হইলে মিলনের পথ সহজ ও সুগম হইত। প্রবলে দুর্ব্বলে প্রকৃত মিলন হয় না। এই হেতু ইংরাজ ব্যুরোক্রেসীর 'সহযোগের' আহ্বান আমরা অর্থশূন্য বলিয়া মনে করি। যত দিন মুসলমান বিশ্বাস করিবে, 'কাফের' মরণে কাজর; যত দিন মুসলমানের ধারণা থাকিবে, হিন্দু ১২ শত বৎসরের গোলামখানা, তত দিন শত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী প্রকৃত মিলনের [illegible] বিধান করিতে পারিবেন না। সুতরাং সে চেষ্টা সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে আজ না হউক, অচির-ভবিষ্যতে উভয় সম্প্রদায় পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে অভ্যস্ত হইত। তাহা না করিয়া কেবল অনর্থক কাল-হরণে ফল কি? কংগ্রেস ১৮ মাস ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহাই সাব্যস্ত করুন, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কেহ মানিয়া লইবে না, যতক্ষণ না তাহারা পরস্পরের শক্তিসামর্থ্যে



শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার

শ্রদ্ধা সম্ভ্রম করিতে শিখিবে। এ হিসাবে এবার অধিবেশন ব্যর্থ হইয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—"Let me appeal to you to dream of Swaraj, fill your life with Swaraj, rise in the morning with Swaraj in your brain,



নর্থব্রুক গেট ও শুক্রেশ্বর মন্দির

চেষ্টা করিবেন, সেই সকল আইন বা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

(৪) যাহা দ্বারা জাতীয় জীবনের আর্থিক, কৃষিবিষয়ক অথবা শিল্পবাণিজ্য-সংক্রান্ত উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা, উহার সমর্থক প্রস্তাব বা আইন পেশ বা সমর্থন করিতে হইবে।

(৫) জমীদারদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ দৃষ্টি রাখিয়া ভূমির উপর প্রজার স্বত্বাদির ব্যবস্থা দ্বারা কৃষিজীবীদিগের উন্নতিবিধান করিতে হইবে।

(৬) শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতির স্বার্থের সহিত জমীদার ও মহাজনদিগের স্বার্থের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সকলের অধিকার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

যে কয়টি কার্য্যপদ্ধতি কাউন্সিলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কথা কিছুই নাই, বরং সকলগুলিই দেশহিতকামিমাত্রেরই সমর্থনযোগ্য।

প্রথম তিনটি উপায় অবলম্বন দ্বারা দ্বৈতশাসনকে অচল করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে এবং শেষের তিনটি দ্বারা গঠনমূলক কার্য্য করিবার ইঙ্গিত আছে। প্রথম তিনটি উপায়ের দ্বারা যদি দ্বৈতশাসন অচল করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও কি আমরা ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব? দ্বৈতশাসন অচল যে কখনও হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু তাহাতে ব্যুরোক্রেশীর আহারনিদ্রার কি কোনরূপ ব্যতিক্রম হইয়াছে? যদিই বা ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন কোন স্থানে দ্বৈতশাসন অচল করা সম্ভব হইবে, তাহা হইলেও কি আমরা স্বরাজ লাভ করিব? মানিয়া লওয়া গেল যে, প্রাদেশিক সরকার স্বায়ত্তশাসনশীল হইল, কিন্তু তাহা হইলেও ভারত সরকার ত দেশের লোকের নিকট দায়িত্বশীল হইবেন না। আর ভারত সরকার যদি তহবিলের উপর কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, অর্থাৎ শাসনের সিন্দুকের চাবিকাঠিটি ব্যুরোক্রেশীর হস্তেই থাকিবে। তবে বাধাপ্রদানের জন্য এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? সে নীতি ত শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের পর অবলম্বিত হইয়াছিল। ফল তাহার কি হইয়াছে?

মন্ত্রিত্ব-স্বীকার

এই বাধাপ্রদান নীতির সহিত মন্ত্রিত্ব-স্বীকার ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "সরকার যত দিন মনোভাব পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রদান না করিবেন, যত দিন সরকার জাতীয় দাবী সম্বন্ধে সন্তোষজনকরূপে অবহিত হইবার পরিচয় না দিবেন, তত দিন সরকারের কোনওরূপ (মন্ত্রিত্বও ইহার মধ্যে ধর্ত্তব্য) চাকুরী স্বীকার করা হইবে না।"

যদি ধরা যায়, সরকার মনোভাব-পরিবর্ত্তনের কিছু পরিচয় দিয়াছেন—জাতীয় দাবী সম্বন্ধে সন্তোষজনকরূপে অবহিত হইয়াছেন,—তাহা হইলেই কি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করা হইবে? সভাপতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"দ্বৈতশাসন নষ্ট হইলেও ঈপ্সিত ফললাভ হইতে পারে না। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত তাহা হইতে পারে না।" তবে? পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনলাভ ব্যতিরেকে কিরূপে মন্ত্রিত্ব বা অন্য চাকুরী স্বীকৃত হইতে পারে? আমলাতন্ত্র শাসন অচল করিবার উদ্দেশ্যে এবং ভোটদাতৃগণকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বরাজদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তবে আজ স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় শাসন অচল না করিয়াই তৎপূর্ব্বে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিবেন? করিলে কি প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইবে? কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে অভিমতের কি মূল্য থাকিবে?

গঠনকার্য্য

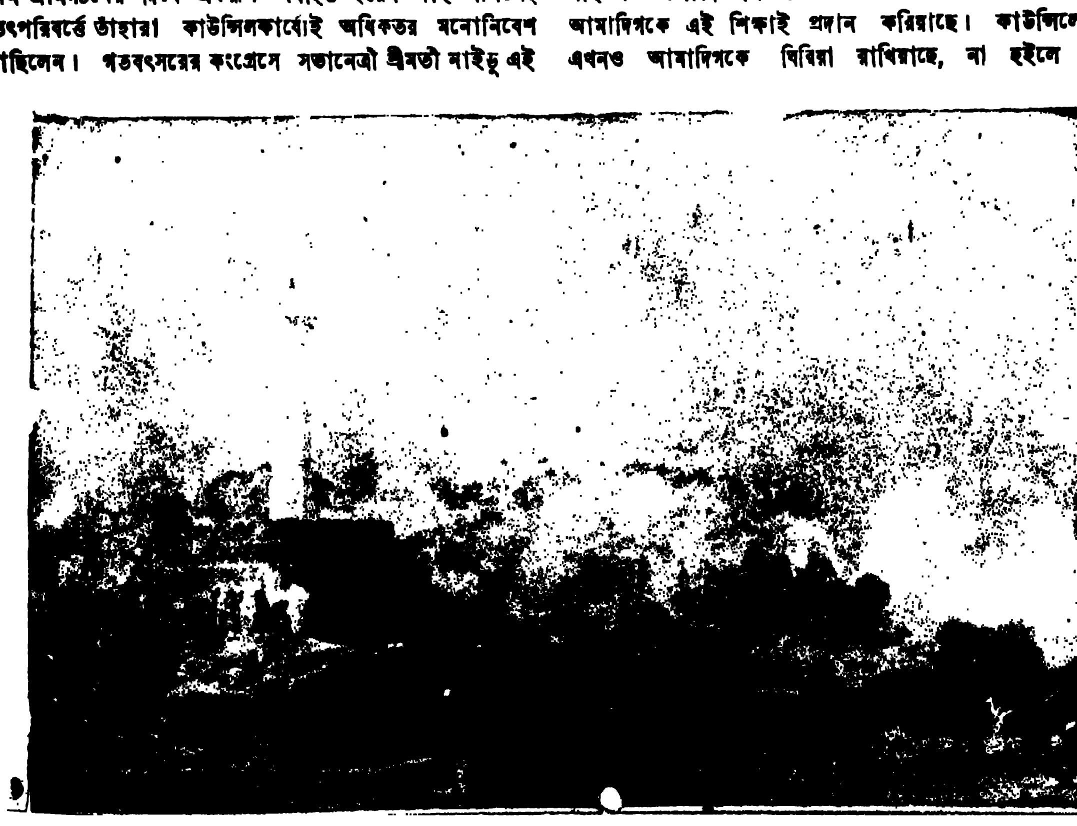
শেষের তিনটিতে গঠনকার্য্যের আভাস আছে। সভাপতি মহাশয়

হইবে। সকল দলের সকল সদস্যই যে তাঁহার কাম্য গঠনকার্য্যের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন, তাহার নিশ্চয়তা কি? শেষ ব্যুরোক্রেশীর ব্রহ্মাস্ত্র 'ভিটো' আছে। সুতরাং এই অনিশ্চিত পথ দিয়া অগ্রসর হইলে গঠনকার্য্যের কি সুবিধা হইবে?

তাহার পর কাউন্সিলের বাহিরের গঠনকার্য্যের কথা ধরিতে হইবে। সভাপতি আয়েঙ্গার মহাশয় গঠনকার্য্যের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন এবং খদ্দরের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সুরা-পান-নিবারণ এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্বন্ধেও অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গত ৩ বৎসর কংগ্রেস যে সময়ে সভাপতির (স্বরাজ্য-) দলের কর্তৃত্বাধীন ছিল, সেই সময়ের মধ্যে এই সকল গঠনকার্য্য কতদূর তাঁহাদের দ্বারা অগ্রসর হইয়াছে? হয় ত তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য যে, যদি ব্যবস্থাপক সভায় সুরাপানরহিতাদিবিষয়ক প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার দল উহা সমর্থন করিবেন। কিন্তু উহা দ্বারাই কি কংগ্রেসের কর্ত্তব্যের অবসান হইবে? পরন্তু যদি তাঁহারা কাউন্সিলে আবার walk out নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কি হইবে?

গ্রামে গিয়া গ্রাম গঠনের কথা সভাপতি মহাশয় বিশেষ কিছু বলেন নাই, কিন্তু উহা কি কংগ্রেসের গঠনকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত নহে? গ্রামের সহিত অর্থাৎ দেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা না রাখিলে, কেবল বৎসরান্তে একবার কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা করিলে কি কংগ্রেস প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে? প্রাচীন কালের কংগ্রেস এইরূপ বক্তৃতাবাগীশদিগের অবসরবিনোদনের ক্ষেত্র ছিল, মহাত্মা গন্ধীই গ্রামগঠনকার্য্য দ্বারা জনগণের সহিত কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনের পথ প্রবর্ত্তন করিয়া প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গত তিন বৎসরে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ গ্রামগঠনের দিকে একরূপ অবহিত হয়েন নাই বলিলেই হয়, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা কাউন্সিলকার্য্যেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গতবৎসরের কংগ্রেসে সভানেত্রী শ্রীমতী নাইডু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"গত বার দেশবাসীর উদ্যম ও উৎসাহ কাউন্সিল-নির্ব্বাচন ব্যাপারেই প্রযুক্ত হইয়াছিল।" তাহার পরে এ বিষয়ে কেহ কেহ অনুযোগ উপস্থিত করিলে কংগ্রেসে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাউন্সিলকামীরা বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এবার গৌহাটীতে স্বরাজ্যদলপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বলিয়াছেন,—"দেশে গিয়া অর্থাৎ গ্রামে থাকিয়া তাঁহাদিগকে কায করিতে বলা সহজ কথা। কিন্তু যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা সেই কায করেন না কেন?" ইহা কি কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বরাজ্যদলপতির পক্ষে শোভন উক্তি হইয়াছে? তিনি বা তাঁহার দল যদি কংগ্রেসের নামে ভোট সংগ্রহ না করিতেন, অথবা যদি কংগ্রেসের তরফ হইতে দেশের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কেহ গ্রাম-গঠনের কথা বলিত না। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের এবং কর্তৃত্বের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া সহজ দায়িত্ব স্বীকারের কথা নহে। সে দায়িত্বপালনে পরাঙ্মুখ হইলেই দেশের লোকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবেই। ক্রোধ বা বিরক্তিভরে ঠেস দিয়া জবাব দিলেই সেই গুরু দায়িত্বের অবসান হয় না।

ফল কথা, একই সময়ে 'দুধও খাব, তামাকও খাব" সম্ভবপর হয় না। এক দিকে ঝোঁক দিলে অন্য দিকের কায শিথিল হইবেই। মহাত্মা গন্ধী এই হেতু বর্ত্তমানে নীচের দিক হইতে গড়িয়া তুলিতে বলিয়াছেন—কাউন্সিলের মোহবর্জ্জন করিয়া প্রথমে গ্রাম ও জাতি গঠন করিয়া প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বোধ হয়, সকলেরই স্মরণ আছে, গয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান বলিয়াছিলেন,—"ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে আমরা জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা হারাইয়া ফেলিব—গঠনকার্য্যে অবহিত হইতে ভুলিয়া যাইব।" কথাটা ধ্রুব সত্য। গত কয় বৎসরের কাউন্সিল লীলা আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছে। কাউন্সিলের মোহ এখনও আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, না হইলে অতীতের





পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

ভূয়োদর্শনেও যখন আমরা কাউন্সিলের ব্যর্থতা বুঝিলাম না—বরং আবার নবোদ্যমে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কাউন্সিলকার্য্যে অবহিত হইতে উপদেশ দিলেন, তখন আর সেই মোহের প্রবল প্রভাবে সন্দেহ আছে কি ?

গত কয় বৎসরে কংগ্রেসের জিলা ও গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে, অর্থাভাবে এবং কর্ম্মীর অভাবে সেগুলি মৃত অথবা মৃতকল্প। ইহার জন্য দায়ী কে ? দায়ী কাউন্সিলের মোহ, ইহা আমরা দৃঢ়স্বরে বলিব। সভা বটে, সভাপতি আয়েঙ্গার মহাশয় বলিয়াছেন,—"দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং তাহার কর্ম্মিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কংগ্রেসের এই প্রভাবের উপরেই আমাদের স্বরাজলাভ নির্ভর করিতেছে।" কিন্তু কিরূপে উহা সম্ভবপর হইবে ? কেবল বক্তৃতায় বা মুখের কথায় উহা ত হইবার নহে। কাউন্সিলে থাকিয়া দ্বৈতশাসন অচল করিবার চেষ্টায় শক্তিসামর্থ্য নিয়োগ করিবার সময়ে এ কথা মনে থাকিবে কি ? উহার জন্য অবসরও থাকে কি ? ইহাই ত সমস্যা। এ সমস্যাসমাধানের উপায় সভাপতি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

যুগ-প্রবর্ত্তক ভবিষ্যদর্শী মহাত্মা গন্ধী ইহা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন—দিব্যদৃষ্টিতে ইহা দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রথমে গ্রাম ও জাতিগঠনে সমস্ত শক্তিসামর্থ্য নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। উহার প্রধান সোপান,—স্বদেশী (চরকা ও খদ্দর), অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, হিন্দু-মুসলমান-মিলন। ব্যবসায়ের হিসাবে নহে, অর্থনীতিক হিসাবে চরকা ও খদ্দর দেশের দারিদ্র্য-নিবারণের প্রধান সহজ ও সরল উপায়, তাহা এখন অনেকে বুঝিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, চরকা ও খদ্দরে গ্রামে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কার্য্যের ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে মিলন সম্ভবপর হয়। আর অস্পৃশ্যতা-নিবারণ ও হিন্দু-মুসলমান-মিলনের চেষ্টায় জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় ? সে কায ফেলিয়া রাখিয়া কাউন্সিলের কাযে মাতিলে কখনই ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না।

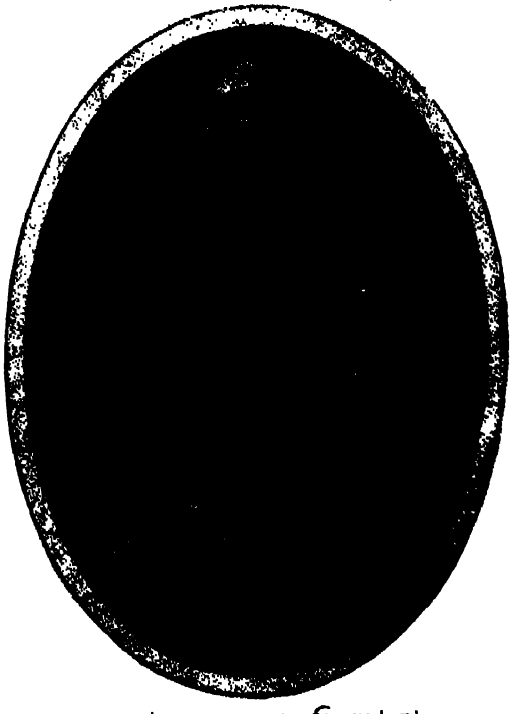
স্বরাজ্য দলপতি পণ্ডিত মতিলাল বলিয়াছেন,—"ব্যবস্থাপক সভার কাযের সহিত গ্রামের কাযের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।" অথচ তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বিলক্ষণ জানেন যে, দ্বৈত-শাসনাধীনে গ্রাম-গঠন-কার্য্য আশানুরূপ হইতে পারে না ; তবে তাহার কার্য্যের সহিত গ্রাম-গঠনের কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে ? দ্বৈতশাসনে গ্রামগঠনের প্রকৃত কার্য্য হয় না বলিয়াই উহা ধ্বংস করিবার জন্য স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের অনুমোদনে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন। যাহা অসার বলিয়া তাঁহারা ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার মধ্য দিয়া গঠনকার্য্য হইবে কিরূপে ? এখানে কথায় ও কাযে সামঞ্জস্য কোথায় ?

তাই মনে হয়, এ বারেও গতবারের কংগ্রেসের মত এক বৎসর বৃথা গত হইল, প্রকৃত কার্য্যের ভিত্তিপত্তন হইল না। এমন আর কত কাল অনর্থক গত হইবে, তাহা অভাগা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। তবে এ কথা ঠিক যে, মহাত্মা গন্ধীর উপদেশমত প্রথমে বনিয়াদ গড়িয়া না তুলিলে সৌধ গঠনের কল্পনা আকাশ-কুসুমেই পরিণত হইবে।



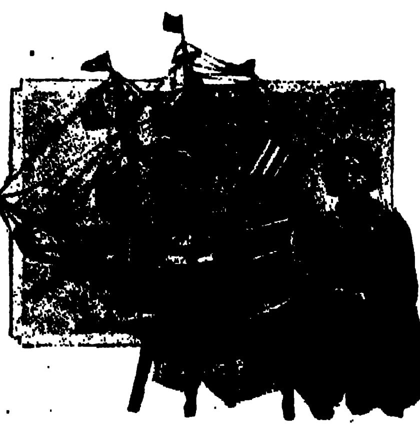
অন্ধের বাহুতে সাঙ্কেতিক আলোকাধার

আমেরিকার অন্ধ ব্যক্তি রাত্রিকালে কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলে, পরিহিত কোটের উপর বাহুতে একটি বিদ্যুতাধার হইতে আলোক বাহির করিয়া সঙ্কেত করিয়া থাকে। এই বিদ্যুতাধার হইতে ইচ্ছামত কল টিপিয়া আলোক নির্গমন ও নির্ব্বাণক্রিয়া অতি সহজেই সমাধা করা যায়। এই বিদ্যুতাধার অঙ্গে ধারণ করিয়া অন্ধগণ রাত্রিতে যদি কোনও কার্য্যে রাজপথে নির্গত হয়, তবে ঐ আলোক জালিয়া তাহারা কোনও আকস্মিক বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্য সঙ্কেত করিতে



অন্ধের বাহুতে সাঙ্কেতিক বিদ্যুতালোক





গ্যাসপূর্ণ ফাউণ্টেন পেন

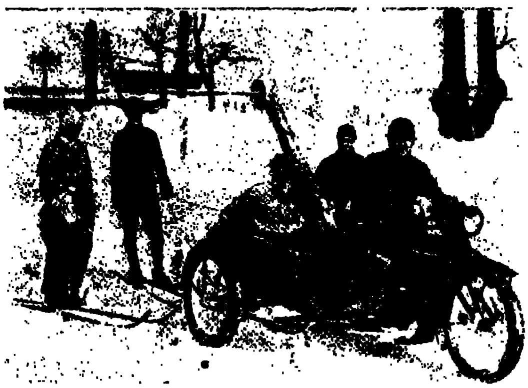
আত্মরক্ষার জন্য এক প্রকার ফাউণ্টেন পেন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফাউণ্টেন পেন এমনই বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত যে, কল টিপিবামাত্র কলম হইতে উগ্র গ্যাস নির্গত হইয়া আক্রমণকারীকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। আত্মরক্ষার এই বিচিত্র অস্ত্রটি প্রকৃতই আততায়ীকে ব্যর্থমনোরথ করিয়া দেয়।

নারীর নির্ম্মিত জাহাজ

লস্ এঞ্জেলেসের এক জন নারী-শিল্পী কতিপয় যন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন যুগের স্পেনীয় জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জাহাজ দৈর্ঘ্যে ৪৮ ইঞ্চ এবং উচ্চতায় ৩৬ ইঞ্চ হইবে। পুত্রের পাঠ্য-

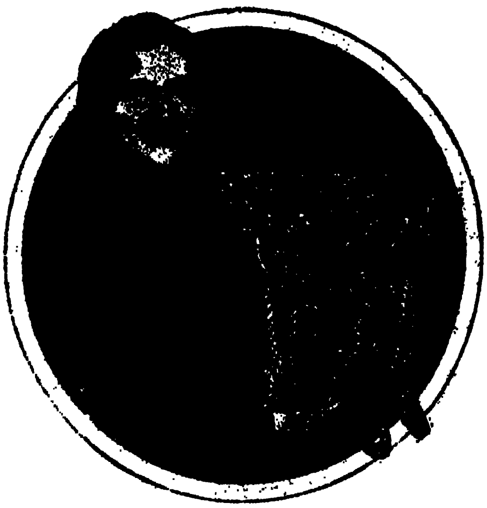
অবলম্বন করিয়াই এই গৃহস্থমহিলা নকল জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। উহাতে শিল্পীর কলাজ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাজখানি নির্ম্মাণ করিতে ৫ ডলার (মার্কিণ মুদ্রা) মাত্র খরচ পড়িয়াছিল।

মোটর দ্বিচক্রযান ও স্কীর দৌড়



স্কী ও মোটর দ্বিচক্রযানের দৌড়

সম্প্রতি শীতের মরসুমে কানাডায় মোটর দ্বিচক্রযান ও 'স্কী'র দৌড়-খেলা হইয়াছিল। তাহাতে মোটর দ্বিচক্রযানের পশ্চাতে 'স্কী' চালাইয়া ঘণ্টায় ৯০ মাইল তুষারাচ্ছন্ন পথ অতিক্রান্ত হইয়াছিল। 'স্কী'-চালকরা মোটর দ্বিচক্রযানের সংলগ্ন রজ্জু ধারণ করিয়া আপনাদের দেহের 'টাল' (balance) রক্ষা করিয়াছিল। এইরূপ দ্রুতগতিতে 'স্কী' পরিচালনক্রীড়া ইতঃপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।



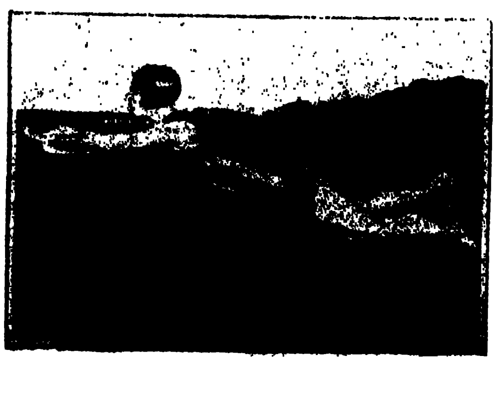
রজ্জুনির্ম্মিত পুষ্পাধার

রজ্জুনির্ম্মিত পুষ্পাধার

জনৈক নাবিক রজ্জুর সাহায্যে একটি সুন্দর আধার নির্ম্মাণ করিয়াছে। নাবিকরা যে ভাবে রজ্জুতে বন্ধন দিয়া থাকে, দেখিতে অতি চমৎকার এবং ইহা ফুলদানী অথবা অন্য কোনও সৌখীন দ্রব্যের আধার হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই রজ্জুনির্ম্মিত পুষ্পাধারটি শিল্পী যত্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সন্তরণ-যন্ত্র

ডেন্‌ভারএর জনৈক যন্ত্র-শিল্পী সাঁতার শিক্ষা করিবার উপযোগী এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। এই যন্ত্রটি বায়ু-পরিপূর্ণ থাকে। বায়ুর চাপ-প্রভাবে যন্ত্রসংশ্লিষ্ট একটি অংশ আবর্ত্তিত হয়। ইহাতে সন্তরণকারী বিনা চেষ্টায় জলরাশি ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্যান্‌ভাস-নির্ম্মিত একটি ব্যাগ সন্তরণকারীর বক্ষোদেশে সংলগ্ন থাকে। ব্যাগটি এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, উহা বক্ষোদেশে ধারণ করিলে সন্তরণকারীকে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সেই ব্যাগের মধ্যে একটি বায়ুপূর্ণ কক্ষ এবং মোটর আছে। চক্রের যে অংশ আবর্ত্তিত হয়, তাহা এমনভাবে অবস্থিত যে, সন্তরণকারীর ঊরুদেশ কোনওক্রমে তাহার সংস্পর্শে আসিতে পায় না। সন্তরণকারীর পৃষ্ঠদেশে একটি রবারের ব্যাগ থাকে। উহা বায়ুপূর্ণ। ইহাতে যন্ত্রের ভার অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়ে। সাঁতার শিখিবার পক্ষে প্রথম শিক্ষার্থীর এই যন্ত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত সুবিধাজনক।



বর্ত্তিকাগৃহ



বিচিত্র বর্ত্তিকাগৃহ

মাসাচুসেট্‌সএর সমুদ্রসৈকতে একটি বর্ত্তিকাগৃহ আছে। এই বর্ত্তিকাগৃহ শুধু আলোকদানের জন্য নহে। উহাকে একটি মনোরম গ্রীষ্মাবাসও বলা যাইতে পারে। ইহাতে দশটি কক্ষ ও তিনটি স্নানাগার আছে। এই গ্রীষ্মাবাস হইতে সমুদ্রদর্শনের বিশেষ সুবিধা আছে। প্রতি বাতায়নপথে সমুদ্রশীকরসিক্ত বায়ুপ্রবাহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

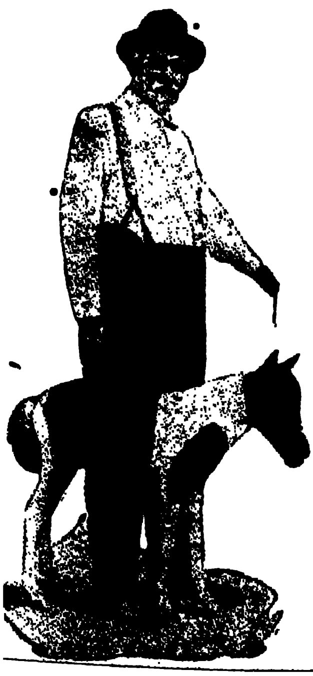
খেলায় বেলুন-সাহায্যে অবতরণ

জনৈক ডুবুরী দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক খেলার বেলুন একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া সমুদ্র-গর্ভে ঝম্পপ্রদান করে। বেলুনগুলির সাহায্যে ডুবুরী অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ১ শত ফুট উচ্চ স্থান হইতে ক্রমে জলের উপর নামিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে দর্শকবৃন্দ প্রকৃতই বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া ডুবুরীর ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শন করিয়াছিল।



বেলুনগুচ্ছ-সাহায্যে ক্রীড়া-প্রদর্শন

ক্ষুদ্রতম টাট্টু ঘোড়া



বালটিমোরবাসী কোনও ব্যক্তির একটি ছোট টাট্টু-ঘোড়া আছে; উচ্চতায় ঘোড়াটি ২৬ ইঞ্চ। ইহার বয়স মাত্র ১৮ মাস। অশ্বটির ওজন ২৮ সের। জগতের মধ্যে এই ঘোড়াটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া অভিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার খুর এত ক্ষুদ্র যে, বিদীর্ণ হয় বলিয়া উহার অধিকারী খুর বাঁধাইতে

চক্রযুক্ত 'সুটকেস্'

সুটকেস্ হাতে ঝুলাইয়া বহন করা কষ্টকর ব্যাপার। বিশেষতঃ মহিলাদিগের পক্ষে নিতান্তই বিরক্তিজনক। এ জন্য জনৈক মার্কিন কারিগর সহজে বহন করিবার নূতন ব্যবস্থা করিয়াছে। সুটকেসের সঙ্গে ক্ষুদ্র চক্র সন্নিবিষ্ট এক



আধার থাকে। এই আধারের উপর সুটকেস্ বসাইয়া অবলীলাক্রমে যে কেহ পথ চলিতে পারে। মানুষের দেহের উচ্চতা অনুযায়ী এই চক্রসমন্বিত আধারটিকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। যখন প্রয়োজন না থাকে, আধারটিকে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়।

গুহামধ্যে আবিষ্কৃত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি



বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি

তিব্বতের পশ্চিমাংশের কোনও গুহা ধ্বসিয়া যাওয়ায় একটি বিরাট বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের দ্যোতক। এমন চমৎকার বুদ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখা যায় না। গুহারক্ষক হিসাবে এই বুদ্ধমূর্ত্তি গুহামধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

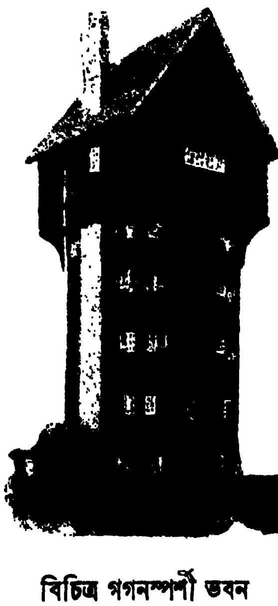
লৌহনির্ম্মিত পুষ্প ও পল্লব



লৌহনির্ম্মিত পুষ্প ও পল্লব

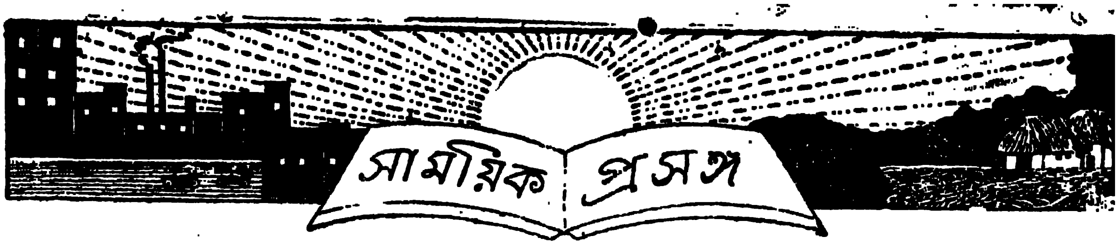
প্লেনফিল্ড (আমেরিকা) নামক স্থানের জেমস্ ক্রীন্ নামক জনৈক কর্ম্মকার সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে লৌহ হইতে অতি সুন্দর পুষ্প ও পল্লব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রথম দর্শনেই মানুষ এই পুষ্পপল্লবগুলিকে সজীব বলিয়া মনে করিবে। কোনওরূপ আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়াই শুধু স্মৃতি হইতে এই শিল্পী উল্লিখিত পুষ্প ও পল্লব নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বিচিত্র গগনস্পর্শী ভবন



বিচিত্র গগনস্পর্শী ভবন

ইংলণ্ডে সফোক প্রদেশে সমুদ্রতীরে একটা পুরাতন 'উইণ্ড মিল' ছিল। উহা অব্যবহার্য্য অবস্থায় থাকিবার পর এক ব্যক্তি বহু অর্থব্যয়ে উহার উপর এক বিচিত্র বাংলো ধরণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। নিম্নতল হইতে উপরতল পর্য্যন্ত অনেকগুলি কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ তলটি বাসের পক্ষে অত্যন্ত মনোরম।



বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাসঙ্ঘ

আমাদের এই সাম্প্রদায়িক আত্মকলহের দুর্দিনে বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাসঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতী নুরন্নেছা খাতুন বাঙ্গালা ভাষায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই উপভোগ্য। বাঙ্গালী মুসলমান মহিলারা যে বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষাজ্ঞানে আদর করিতেছেন এবং সভ বিদুষী মুসলমান মহিলা যে বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের কথা। যে সময়ে আমাদের বাঙ্গালার বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতৃগণ কেহকে শিরস্ত্রাণ করিয়া ভারতের বাহিরে আরব, তাতার, ইরাণ, তুরাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন, সেই সময়ে সভানেত্রী বিদুষী নুরন্নেছা খাতুনের মুখে যখন শুনি, "আমরা বাঙ্গালী মোসলেম রমণী, আমরা বাঙ্গালী, এ কথা ব'লে আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত, বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়াটা কোনও রকমে আমাদের হীনতা-প্রকাশক নয়", তখন হৃদয় আশান্বিত হয়। ভারতীর সেবায় সাম্প্রদায়িকতার অবতারণা কোনও ক্রমেই সমর্থিত হইতে পারে না। যে সময়ে এই বাঙ্গালার বাঙ্গালী মুসলমান সার আবদর রহিম দিল্লীর মুসলমান শিক্ষা-বৈঠকে আরব হরপের ও উর্দ্দু ভাষার জয়গানে বিভোর হইতেছেন, সেই সময়ে এই বাঙ্গালার মুসলমান মহিলার মুখে মাতৃভাষার জয়গান বস্তুতঃই শ্রুতিসুখকর।

শিশুর শিক্ষার হাতে খড়ি অন্দরে মায়ের কোলেই হইয়া থাকে—সেই প্রভাব মরণাবধি থাকিয়া যায়। তাই আশা হয়, বাঙ্গালী মুসলমান মহিলারা যদি এই ভাবে মাতৃভাষার সমাদর করিতে শিখেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব হইবে না। নুরন্নেছা খাতুন বলিয়াছেন, "এক দিকে দেখতে গেলে বাঙ্গালী মুসলমানের জিহ্বার জড়তা আসতেই পারে না। তবে আমাদের সন্তানদের মধ্যে যা কিছু দেখা যায়, সেগুলোর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী তাদের মা আর বাপ।" মাতৃভাষায় মুসলমানের এই যে জড়তা, এই যে ঔদাসীন্য, ইহার অবসান হইবে তখন, যখন মুসলমান জনক-জননী শিশুকে শৈশব হইতে মাতৃভাষায় অভ্যস্ত করিতে শিখাইবেন। মাতৃভাষার অনুশীলনের ফলে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যখন ভাবের প্রকৃত আদান-প্রদান হইবে, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান যখন পরস্পরের সাহিত্যের সাহায্যে পরস্পরের ভাব, ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে,—বুঝন তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে শিখিবে, তখন সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার হলাহল অমৃতে পরিণত হইবে।

সভানেত্রী অন্যত্র বলিয়াছেন, "জাতীয় জীবনকে গ'ড়ে তুলতে গেলে বিদ্যার রাস্তা দিয়েই এগুতে হবে।...জ্ঞানহীন ব্যক্তি মনুষ্যনামেরই অনুপযুক্ত।" কথাটা যদি বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজ সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য লালায়িত হইবেন না। জ্ঞানালোকের সাহায্যে মনের অন্ধকার দূর হইলে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও চাকুরীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না। সভানেত্রীর ভাষায় বলি, "উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা আজ কোন ব্যবসা করতে পরাঙ্মুখ নন; আর আমাদের যুবকদের দোকানের গদীতে বসতে লজ্জা হয়। তাঁরা চাতক পক্ষীটির মত চাকরীর পানেই বসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুর দুরবস্থা দেখিয়া মুসলমানেরা সময় থাকিতে সতর্ক হইলে সমাজের মঙ্গল।

সে যাহা হউক, আমরা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে সভানেত্রীর এই অভিভাষণটুকু পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ইহাতে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ পাইবেন।

—

রাজনীতিক লাঞ্ছিতগণের সম্মেলন

গৌহাটীতে রাজনীতিক লাঞ্ছিতগণের সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণে—ভাবিবার অনেক কথা আছে। অভিভাষণটি যে গভীর চিন্তাপ্রসূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে ইহার মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া মনে হয়,—

"এ দেশের লাঞ্ছিতগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; —(১) যাঁহারা বিপ্লববাদের ভিত্তির উপর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, (২) যাঁহারা অহিংস অসহযোগের ভিত্তির উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত লাঞ্ছিতগণকে এ দেশের রাজনীতিকরা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগকে রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের কার্য্য ও কষ্টবিপৎসহনকে দেশের মঙ্গলজনক বলিয়া ধার্য্য করেন না। শেষোক্ত শ্রেণীর লাঞ্ছিতগণ কংগ্রেস-ভুক্ত বলিয়া কংগ্রেস-নেতৃগণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন।

"দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিতগণই গত ৪০ বৎসর যাবৎ সরকারের বিপক্ষে মুক্তির আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। যখন ১৯১৪—১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (অর্থাৎ জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে) অধিকাংশ মুক্তিকামী ভারতীয় ইংরাজ ক্যাপিটালিষ্ট-ইম্পিরিয়ালিষ্টদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তখন বিপ্লববাদীরা দেশে ও বিদেশে উক্ত ক্যাপিটালিষ্ট-ইম্পিরিয়ালিষ্টদিগের শত্রুতাসাধন করিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকারীরা উহার পর 'সরাসরি কার্য্যের' দ্বারা ইংরাজ সরকারের শাসন অচল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই কার্য্য যে য়ুরোপের সোশ্যালিষ্ট বিপ্লববাদীর কার্য্যের অনুকরণ মাত্র, ইহা ভাবিয়া এ দেশের বিপ্লববাদীরা উহাতে হাসিয়াছিল। এই কার্য্যে অসহযোগীরা জনসাধারণকে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের হরতাল, বর্জ্জন, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য প্রভৃতি আন্দোলন য়ুরোপের strike, passive resitance. sabotage, boycott, mass action, direct action প্রভৃতির নামান্তর। অহিংসা ইহার আবরণ হইলেও ঐ আন্দোলন হিংসা হইতে মুক্ত হয় নাই। উহা দ্বারা কংগ্রেসকে বিপ্লবের পক্ষে পরিচালিত করা হইয়াছিল। এই রাজনীতিক আন্দোলনকে চতুরতার সহিত—ধর্ম্মের সহিত জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উহা দ্বারা জনসাধারণের ধর্ম্মান্ধতা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইলেও উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক ঐ ভাবে খিলাফৎ আন্দোলনে শেখ-উল-ইসলাম প্রভৃতির দ্বারা মুসলমানের Pan Islamism জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। এ ব্যর্থতার মূল অর্থনীতির সমস্যায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

"তবেই বুঝা যায়, গুপ্তসমিতির দ্বারা মুক্তিলাভের পদ্ধতি যদি ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে মধ্যযুগের অনুকরণে

"অতএব বর্ত্তমানে জনগণের সহিত কার্য্য করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই এখন আমাদের একমাত্র উপায়।"

সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত একাংশে সত্য হইলেও সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তিনি যে অসহযোগ আন্দোলনকে য়ুরোপের সোসালিজমের অনুকরণ বলিয়াছেন, ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মহাত্মা গন্ধীর এই আন্দোলন উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এ কথা বহু য়ুরোপীয় মনীষীই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অভিনব বলিয়া বিপ্লবের নেতা জওহরলাল পাশাও ধার্য্য করিয়াছিলেন।

তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের সকল দিক্ কংগ্রেস স্বীকার করেন নাই। চরকা ও খদ্দর দ্বারা জনমত জাগ্রত করা যাইতে পারে, অথবা উহা দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এ কথাও বহু কংগ্রেসকর্ম্মী স্বীকার করেন নাই। এই হেতু কংগ্রেসে দলাদলি হইয়াছে, ফলে অসহযোগ আন্দোলন দুর্ব্বল হইয়াছে। অসহযোগ নামে অহিংস হইলেও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথাও সত্য নহে। অসহযোগ হিংসার পথে চালিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই অসহযোগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী দেশের রাজনীতিক আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পরন্তু অসহযোগের দ্বারা জনগণের ধর্ম্মান্ধতা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাও সত্য নহে। অসহযোগের দ্বারা লোকের সহনক্ষমতা জাগাইয়া তুলিবার এবং শিক্ষিতগণের সহিত জনগণের মিলন-সংঘটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এই কথাই সত্য। কিন্তু উহা পরম কষ্ট-বিপদের পথ, তাই জনসাধারণ ও শিক্ষিতসম্প্রদায় উহা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহাতে অসহযোগ আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রভাব নষ্ট হয় নাই। দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকারে লোককে প্রস্তুত করিবার কার্য্য ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। লোক সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলে পর দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত হইবে না।

সভাপতি বলিয়াছেন, বিপ্লববাদীদিগকে রাজনীতিকরা 'অস্পৃশ্য' বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের কার্য্য বিপৎসহনকে দেশের মঙ্গলজনক বলিয়া স্বীকার করেন না। এ কথারও মূলে ভিত্তি নাই। রাজনীতিকরা বিপ্লববাদীদিগের কার্য্যপন্থা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন মাত্র; সুতরাং ঐ পথ তাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, রক্তের পথে দেশের মুক্তি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, ইংরাজসাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারলাভই তাঁহাদের মুক্তির পক্ষে অনুকূল। অসহযোগের দ্বারা আত্মপ্রত্যয় ও স্বাবলম্বনবৃত্তি লাভ তাঁহাদের লক্ষ্য, রক্তের পথ নহে।

তবে সভাপতি মহাশয় শেষে যে বলিয়াছেন, জনগণের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র উপায়, এ কথায় আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অহিংস অসহযোগপন্থীরা সে কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, এখনও বলিতেছেন। উহাই যথার্থ একমাত্র পথ। সে পথে অগ্রসর হইতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

শিল্প-বাণিজ্য মহাসভা

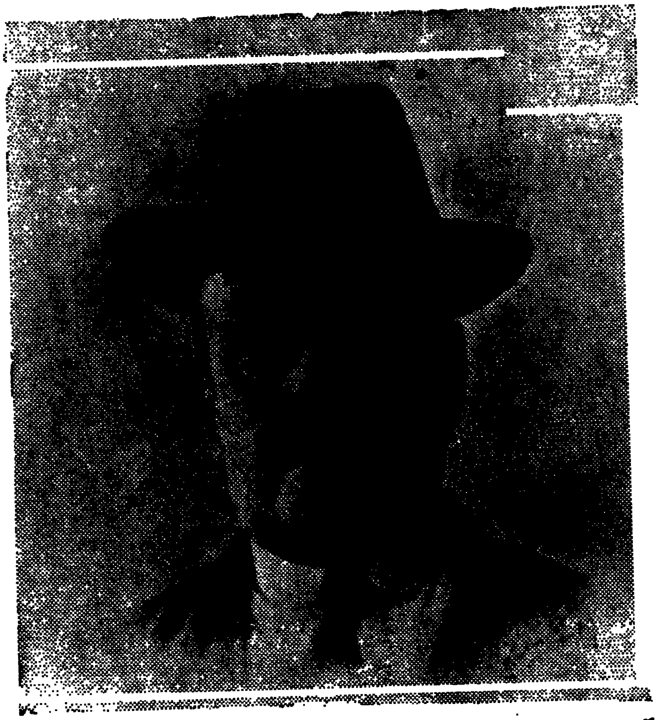
কলিকাতায় যে শিল্প-বাণিজ্য মহাসভার অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে সভাপতি সার দীনশা পেটিট এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস বিরলা তাঁহাদের অভিভাষণে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে অর্থনীতিক শোষণের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। এই প্রয়োজনীয়তা অথবা গুরুত্ব অপেক্ষা কম নহে। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল যে কেবল রাজনীতিক পরাধীনতা, তাহা নহে, অর্থনীতিক পরাধীনতাও আমাদিগকে এই দুর্দ্দশার চরম স্তরে উপনীত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই দুইটি পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত—একের প্রতীকার না হইলে অপরের প্রতীকার হওয়া সম্ভবপর নহে। শাসন ও শোষণ,—এই দুইটি নীতিরই পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। শিল্প-বাণিজ্য মহাসভা আমাদিগের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

শোষণ-নীতির ইতিহাস অতি চমৎকার। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্য ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা সভাপতি সার দীনশা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। এই নীতির ফলে এ দেশের বস্ত্রশিল্প, নৌ শিল্প এবং অন্যান্য বহু শিল্প বিদেশীয় শিল্পের অন্যায় প্রতিযোগিতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সার দীনশা বলিয়াছেন যে, বিদেশীয় বণিকের অবৈধ প্রতিযোগিতার ফলে এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংসই আমাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ। অথচ বিদেশী সরকার দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারসাধনে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতেছেন না।

সকল সভ্য ও স্বাধীন দেশের সরকার দেশের বিদ্যার্থীদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। উহারই ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার এবং নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, কিন্তু এ দেশের বৈদেশিক আমলাতন্ত্র সরকার পৌনে দুই শত বৎসরের শাসনে প্রজাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কেরাণী, উকীল ও ডাক্তার-ব্যারিষ্টার গড়িয়া উঠিয়াছে,—দেশে নিত্য নূতন ধনাগমের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এ যাবৎ এ দেশে কয়টি শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষালয়—কয়টি টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? ফল কথা, কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে কার্য্যকরী শিল্পকলা শিক্ষার দ্বারা দেশের অন্নসমস্যা-সমাধানের সদুপায় বিহিত হয়, তাহার দিকে বিদেশী সরকার প্রয়োজনমত মনোযোগ প্রদান করেন নাই। কাযেই প্রতি বৎসর দেশের প্রয়োজনানুরূপ পণ্য বিদেশ হইতেই এ দেশে আমদানী হইতেছে, বিনিময়ে এ দেশের অর্থ বিদেশে শোষিত হইতেছে। বিদেশী সরকার এ দেশের লোককে বিশ্বাস করেন না, কাযেই দেশরক্ষার দিকে তাঁহাদিগকে সরকারী তহবিলের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ফলে এই প্রয়োজনীয় কারিগরী ও শিল্পকলা শিক্ষাপ্রসারের বেলা সরকারী কোষে অর্থের অনাটন হয়। আজ যদি এ দেশ স্বায়ত্তশাসিত হইত—যদি দেশের লোকের হস্তে সরকারী তহবিলের ও আয়-ব্যয়ের কর্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না, শোষণক্রিয়াও অবাধে চলিত না।

নৌ-সমরপোতের কথা দূরে থাকুক, এ দেশের নিজস্ব Mercantile Marineও নাই। অথচ এ দেশে যে ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইত না, বা এ দেশের লোক বিদেশে নিজের অর্ণবপোতে নিজস্ব পণ্য বহন করিয়া বিক্রয় করিতে যাইত না, তাহাও নহে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, ভারতের পণ্য সুদূর অতীত হইতেই দেশদেশান্তরে ভারতের অর্ণবপোতে বাহিত হইত। এখন আর সে অবস্থা নাই। কেন নাই, তাহার ইতিহাসও অনেকে জানেন। পরলোকগত জামসেদজী নাসরওয়ানজী টাটার নিজস্ব পোতের কারবারের চেষ্টা এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষক পি এণ্ড ও কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতায় সেই কারবারের ধ্বংসসাধনের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

অথচ, অর্ণবপোত না হইলে মাল চালানের (Transportation) সুবিধা হয় না। বিদেশীদের হস্তে এই Transportএর একচেটিয়া



সার দীনশা পেটিট

পূরণ করিয়া মাল চালান দিতে হয় বলিয়া এ দেশের ব্যবসায়ী বা কারখানাওয়ালারা পণ্য প্রস্তুত বা চালান করিতে সুবিধা পায় না—সময়ে সময়ে টাকের দায়ে মনসা বিকাইয়া যায়—এ জন্য দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যপ্রসারে বাধা পড়ে। রেলের কর্তৃত্ব বিদেশীয়ের হস্তে, সুতরাং উহার মারফতে মাল চালানের ঐরূপ অসুবিধা। উহাদের অতিরিক্ত শুল্কও এ দেশের শিল্পবাণিজ্য-প্রসারের অন্তরায়। অধ্যাপক মেহু শিল্প-বাণিজ্য কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিলাতে মাল চালান দিতে যে ব্যয় পড়ে, ভারতের এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে মাল পাঠাইতে রেলের মাশুল তাহা অপেক্ষা বেশী পড়ে। এইরূপ ব্যবস্থা বিদেশী ব্যবসায়ীর বিশেষ সুবিধাজনক এবং দেশীয় শিল্পের পক্ষে সর্বনাশকর।

সার দীনশা আরও দেখাইয়াছেন যে, মেরিণ কমিটী ভারতীয় পোতশিল্পের উন্নতিকল্পে এবং ভারতের উপকূল বাণিজ্যের রক্ষণকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদেশী সরকার সেই প্রস্তাব অনুসারে এ যাবৎ প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্য করেন নাই। অদূর-ভবিষ্যতেও যে কোন কার্য্য হইবে, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

যেখানেই দেখা যায়, বিলাতী বণিকের স্বার্থের সহিত দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থের আঘাতের সম্ভাবনা, সেইখানেই ভারতের স্বার্থ পদদলিত হইয়া আসিতেছে। ফলে শোষণনীতি অবাধে চলিতেছে, দেশও সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। যেখানে পূর্ব্বে সঙ্গতি ছিল, এখন সেখানে অভাব দেখা দিতেছে, লোক ক্রমশঃ পেশার অভাবে চাকুরী-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং চাকুরীর বাজার গরম হওয়ায় বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। এ অবস্থায় আশু প্রতীকার [illegible]

বাণিজ্যসঙ্ঘ গঠিত করা হইবে—উহার উদ্দেশ্য হইবে—দেশীয় শিল্পবাণিজ্য রক্ষা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের এই শুভ উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

চণ্ডীচরণ সেন

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান দ্বিভাষী চণ্ডীচরণ সেন গত ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ব্রহ্মনাথ সেন এক জন খ্যাতনামা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভে বঞ্চিত হইয়াও প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বহু কৃতবিদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পরীক্ষার্থীকে পরাস্ত করিয়া চণ্ডীচরণ কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বিভাষীর পদে নিযুক্ত হয়েন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তথাকার প্রধান ইন্টারপ্রেটারের পদে উন্নীত হয়েন।

হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। মিষ্টভাষিতায়, অমায়িকতায়, সরলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় চণ্ডীচরণ সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে চণ্ডীচরণ স্ত্রী, তিনটি পুত্র, একটি কন্যা, জামাতা, পৌত্র, পৌত্রী প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আমরা তাঁহার মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।



প্রতীচ্যে রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বহু দিন য়ুরোপে পর্য্যটন করিয়া গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, জেকোস্লোভিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে পর্য্যটন করিয়া এথেন্স ও কনষ্টাণ্টিনোপল হইয়া মিশর যাত্রা করেন এবং সেই স্থান হইতে জলপথে দেশে ফিরিয়া আইসেন। বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে—যেখানেই কবীন্দ্র-পদার্পণ, সেই স্থানেই রাজা প্রজা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা



কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিয়াছেন। প্রকৃত প্রতিভা ও গুণের আদরে জাতিভেদ নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীর কবি হইলেও প্রতীচ্য নতমস্তকে তাঁহার প্রতিভার পূজা করিয়াছিল। তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার বাণী শুনাইয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডে রাজকবি রবার্ট ব্রিজেসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেনাপতি ফন হিণ্ডেনবার্গ, ইটালীর বিধায়ক মুসোলিনি, সুইডেনের রাজকুমার প্রিন্স উইলিয়াম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ... [illegible]

এডোয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের "জীবন-কথা" নামক রচনায় বলিয়াছেন যে,—" He (রবীন্দ্রনাথ) faces both East and West, filial to both, deeply indebted to both." কেন, তাহাও মিঃ টমসন বুঝাইয়াছেন,—"তিনি নিজের জাতির বটেন, আবার না-ও বটেন। তাঁহার প্রতিভা ভারতের চিন্তাধারা হইতে প্রসূত, এ কথা সত্য, কিন্তু সেই প্রতিভা প্রতীচ্যের চিন্তাধারা ও ইংরাজী সাহিত্যের পীযূষধারা পান করিয়া পুষ্ট হইয়াছে।" মিঃ টমসন এমনও বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবধারা সেলি, কীটস, বাইরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত।

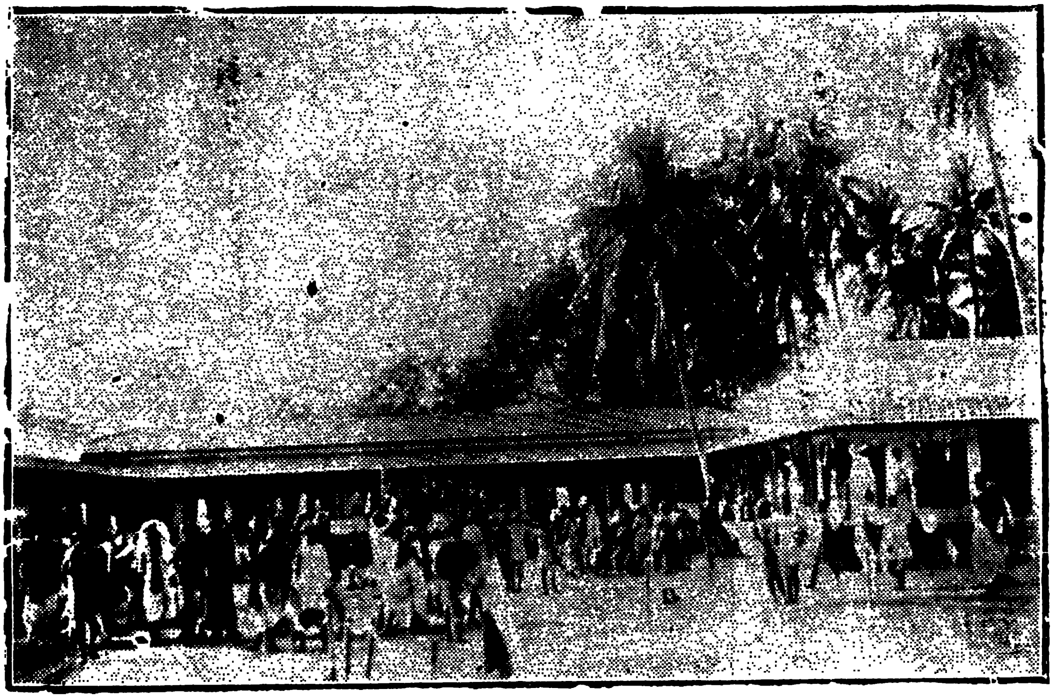
এ বারের য়ুরোপদর্শনে রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্য সম্বন্ধে যে ধারণা লইয়া আসিয়াছেন, তাহা জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। অবশ্য তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক জাতির জ্ঞান ও গবেষণা আমাদিগকে আহরণ করিতে হইবে। য়ুরোপীয়দিগের মনীষা অসাধারণ। আমরা ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত। আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। আমরা আমাদের অতীত গৌরবে সদাই উৎফুল্ল—পরের সমালোচনা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু য়ুরোপীয়গণকে তাহাদের অন্যায়ের কথা বলিলে তাহারা ধৈর্য্যসহকারে তাহা শ্রবণ করে।" রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় চরিত্রের এইরূপ গুণগান করিবার পর কিন্তু বলিয়াছেন, "য়ুরোপের অবস্থা দেখিয়া আমি ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারি নাই। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের বিষম শিক্ষাও য়ুরোপকে বিচলিত করিতে পারে নাই। যদিও কিছু সময়ের জন্য য়ুরোপ শান্তির দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমানে আবার তাহার সমর-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপের বহুদেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আইন ও শৃঙ্খলার নামে এক নূতন বিপদের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে বলপ্রয়োগই মীমাংসার উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কেন না, যে Capitalism, Imperialism, Militarism জার্ম্মাণযুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুরোপে প্রবল ছিল, এখনও উহা প্রবল হইয়া রহিয়াছে; বরং যুদ্ধজয়ের গর্ব্বানন্দে উহা অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় অথবা যুদ্ধবিরতির সময় ভজনালয়ে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেওয়ার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, পৃথিবীকে safe for democracy করিবার লম্বাচৌড়া গালভরা কথা শুনা গিয়াছিল, কিন্তু নদী পার হইয়া মাঝিকে কে কড়ি দিতে চায়? যখন বিবদমান য়ুরোপীয়রা রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল, তাহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের ফলে যুদ্ধের অবসান হয় নাই। . . .

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী এখন বাহুবলকেই প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে; সুতরাং শত লোকার্ণো, সহস্র লেগও তাহাদের সেই ধারণার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারিবে না। যে Imperialism ... [illegible]

প্রতিষ্ঠান কলাশালা

গত ১৮ই পৌষ তারিখে মহাত্মা গন্ধী কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে



সোদপুরে প্রতিষ্ঠান কলাশালা

প্রতিষ্ঠান কলাশালার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। যে খদ্দরের উপর আমাদের স্বরাজসংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে বলিয়া মহাত্মার বিশ্বাস, বঙ্গদেশে সেই লুপ্তপ্রায় দেশীয় বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে এই কলাশালার প্রতিষ্ঠায় যে মহাত্মা আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বঙ্গদেশে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধারে কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ঐ সঙ্গে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। খাদি প্রতিষ্ঠান আচার্য্য রায়ের অতুল কীর্ত্তি। সতীশবাবুর তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালাময় বিস্তৃত হইতেছে, উৎপন্ন দেশীয় বস্ত্রের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। সোদপুরের প্রতিষ্ঠান কলাশালাও আচার্য্য রায় ও সতীশবাবুর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের ফল।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ ও সঙ্কলন করিয়াছেন এবং উহা স্বল্পমূল্যে ধর্ম্মপিপাসু জনসাধারণের পক্ষে সহজপ্রাপ্য করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শ্রীধর স্বামিকৃত সমগ্র সুবোধিনী টীকা অন্বয়সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ।৶৹, ৩১ নং দেব লেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে ও বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে পাওয়া যায়।

"উইলিস নাইট" মডেল "৭০"

নিয়ে অঙ্কিত মোটর গাড়ীতে মিঃ ড্রেভার ম্যানচেষ্টার হইতে কলিকাতায় ৮ হাজার মাইল দুর্গম পথ ৬৫ দিনে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। গাড়ীখানি এক্ষণে ১৮ নং পার্ক ষ্ট্রীটে দর্শকবৃন্দের কৌতূহল-নিবারণার্থ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।





সতীর পতি

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ওস্তাদজী

তিন দিন রেবতীর গৃহে যাপন করিয়া, চতুর্থ দিন প্রাতে উঠিয়া দুই জনে চা পান করিতেছিল। হীরালালের হাতে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র—সেখানি মাঝে মাঝে আপন মনে সে পাঠ করিতেছিল, মাঝে মাঝে পড়িয়া রেবতীকে শুনাইতেছিল। গতকল্য কলিকাতা অনেকটা ঠাণ্ডা গিয়াছে। খুন ও জখম অধিক হয় নাই—দোকানপাটও সব খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চা-পান শেষ হইলে হীরালাল বলিল, "এইবার একবার বেরিয়ে একটা বাসা-টাসার সন্ধান করা যাক, কি বলেন?"

রেবতী বলিল, "দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পূর্ণ আর মিটেছে কৈ? কেন খামকা মুসলমানের হাতে প্রাণটা দিতে যাবেন, হীরালাল বাবু?"

হীরালাল বলিল, "যা দুই একটা খুন-জখম হয়েছে, সে ত ও-দিকে, হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি। এ পাড়ায় ত মুসলমানের কোনও অত্যাচার নেই।"

রেবতী বলিল, "হ'তে কতক্ষণ? না—না,—ও সব মতলব ছাড়ুন। এখন কোথাও বেরুতে পারবেন না। খান-দান, আর চুপটি ক'রে বাড়ীতে ব'সে ব'সে আমার সঙ্গে গল্প করুন। গোলমালটা সম্পূর্ণ থেমে গেলে, তার পর আপনার যা প্রাণ চায়, করবেন। দেখুন, একলা আমি স্ত্রীলোক—বাড়ীর দরোয়ানটি ছাড়া অন্য পুরুষমানুষ নেই। আপনি রয়েছেন ব'লে আমার মনে কত ভরসা রয়েছে। এ সময় আপনি চ'লে গেলে, কখন্ কি হয় কখন্ কি হয় ভেবে ভেবে আমার মুখে আর অন্নজল যাবে না—তা কিন্তু ব'লে রাখছি আপনাকে।"—রেবতী যেন অভিমানভরেই ঠোঁট ফুলাইল।

এক দিন যাক্। কিন্তু আপনার উপর খুব অত্যাচার করা হচ্ছে।"

রেবতী বলিল, "হাঁ, অত্যাচার বৈ কি! এক জন অবলা অসহায়া স্ত্রীলোককে বিপদের দিনে রক্ষা করা—অত্যাচার নয় ত কি? তবে সেই গুণ্ডার আড্ডায়, বাঘের মুখে আমায় ফেলে এলেন না কেন?—সেই ত খুব সদাচার হ'ত!"

শুনিয়া হীরালাল হাসিল। বলিল, "তত দূর সদাচার-পরায়ণ আমি ত নই! আচ্ছা দেখুন—"

রেবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "যান্, আমি দেখব না। আজ তিন দিন ধ'রে কেবল 'দেখুন, দেখুন', 'শুনুন, শুনুন'—কেন, আমার বাপ-মা কি আমার একটা নামও রাখেনি ছাই যে, আপনি আমায় 'দেখুন,' 'শুনুন' ব'লে সম্বোধন করেন?"

হীরালাল আবার হাসিল। বলিল, "আপনাকে আমি রেবতী ব'লে ডাকবো, সেটা কি ভাল?"

রেবতী শ্লেষভরে বলিল, "নাঃ,—আমি আপনার ঠান্‌দি হই কি না—গুরুজন—নাম ধ'রে কি ডাকতে আছে?"

হীরালাল বলিল, "ইংরেজরা যেমন অনাত্মীয়া স্ত্রীলোককে মিসেস্ অমুক কিংবা মিস্ অমুক ব'লে ডাকে, আমাদের দেশে ত সে রকম কোনও প্রথা প্রচলিত নেই, কি করি বলুন? দীনবন্ধু মিত্তির উপহাস ক'রে যে ইঙ্গিত করেছেন—যদি রাজি' থাকেন ত বলুন, আমি আপনাকে রেবতী বাব্বী ব'লে ডাকতে পারি।"

রেবতী বলিল, "তা পারেন বৈ-কি! আপনি যখন একটি অবলা স্ত্রীলোককে বিপদে অসহায় ফেলে স্বচ্ছন্দে বাসা খুঁজতে যেতে পারেন, তখন আপনার অসাধ্য কর্ম্ম পৃথিবীতে আর কি আছে? সাধু—সাধ্বী—বাবু বাব্বী—সধবার একাদশীতে আছে, না হীরালাল বাবু?"

"হ্যাঁ। কেন, আপনি কি সধবার একাদশীতে কখনও

"না। কিন্তু অন্য থিয়েটরে দেখেছি—বইও পড়েছি অবিশ্যি। খাসা নাটকখানি, নয়? বলবো আমাদের ম্যানেজার বাবুকে সধবার একাদশী খুলতে?"

"কার পার্ট নেবেন আপনি?"

"কাঞ্চন। তা ছাড়া আর পার্ট কৈ? ও কুমুদিনী কুমুদিনী আমার পোষাবে না। আচ্ছা, আপনার কোন্ পার্ট পছন্দ?"

হীরালাল বলিল, "আমার পার্ট আপনিই নির্ব্বাচন ক'রে দিন।"

রেবতী বলিল, "নিমে দত্তের পার্টই খুব চমৎকার ওর মধ্যে। কিন্তু বড় শক্ত পার্ট—আপনি পারবেন কি না, তা জানিনে। নিমে দত্তের পার্ট ক'রে গেছেন এক গিরিশ বাবু (রেবতী ললাটে কর লগ্ন করিয়া প্রণাম করিল)—আর, এদানী—ভুনী বাবু। আমি কাঞ্চন সাজবো, আপনি অটল সাজবেন, কি বলেন?" বলিয়া রেবতী একটু মুচ্‌কি হাসিল।

অতঃপর দুই জনে নাটক ও অভিনয়ের প্রসঙ্গেই কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তর্ক-যুদ্ধও যে না বাধিল, এমন নহে—কিন্তু সে 'ফ্রেণ্ড্‌লি ম্যাচ।'

কথাবার্ত্তায় বেলা ১০টা হইল। ঘড়ীর বাজনা শুনিয়া রেবতী বলিল, "ও মা গো! ১০টা বেজে গেল এরই মধ্যে! কলের জল চ'লে গেল, স্নান-টান ত কিছুই হ'ল না! আচ্ছা, এক কায করলে হয় না, হীরালাল বাবু? চলুন না, দু'জনে গঙ্গাস্নান ক'রে আসা যাক্। একখানা গাড়ী ডাকাই, কি বলেন?"

হীরালাল বলিল, "হ্যাঁ, তার পর সেই মুসলমান গাড়োয়ান গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাজির করুক সেই গেঁড়াতলায়!"

"না, দরোয়ানকে ব'লে দেবো, হিন্দু গাড়োয়ান দেখে গাড়ী আনবে।"

"সতীশ বাবুর সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে নেমে, আপনারাও ত 'হিন্দু' ট্যাক্সিওয়ালা দেখে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন!"

"হ্যাঁ, তা বটে!"—বলিয়া রেবতী চিন্তা করিতে লাগিল। বলিল, "তার চেয়ে বোধ হয় হেঁটে যাওয়াই নিরাপদ, কি বলেন? গঙ্গার ঘাট ত এখান থেকে বেশী দূরে নয়—বড় জোর দশ মিনিটের পথ।"

হীরালাল বলিল, "রাস্তায় কোনও মুসলমান যদি বুকে ছুরি বসায়?"

রেবতী বলিল, "হাঃ—এ পাড়ায় আবার ও সব ভয় কোথায়?"

হীরালাল হাসিয়া বলিল, "মন্দ নয়! ঐ ভয়ের জন্যেই ঘণ্টা দুই আগে আপনি আমার বাসা খুঁজতে বেরুতে বারণ করছিলেন, না?—তা যদি ভয় না থাকে, দু'জনে গঙ্গাস্নানটা সেরে এসে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি বাসা খুঁজতে বেরুতে পারি ত?"

রেবতী দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, চলুন ত গঙ্গাস্নান ক'রে আসা যাক্—তার পর সে সব পরের কথা পরে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল; আজ যে রিহার্শাল, বেলা তিনটের সময় থিয়েটরের গাড়ী আমাকে নিতে আসবে। আপনাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

হীরালাল বলিল, "সে ত Bus—আরও পাঁচটা অভিনেত্রী তাতে ব'সে থাক্‌বে,—আমি সে গাড়ীতে যাব?"

রেবতী বলিল, "না না, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলেই, Bus পাঠাতে মানা ক'রে দিয়েছি, ম্যানেজারের নিজের মোটরখানা পাঠাতে বলেছি যে! চলুন, চট্ ক'রে গঙ্গাস্নানটা সেরে এসে, চারটি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। হরি সিংকে ডাকি, তাকে রাস্তাঘাটগুলোর অবস্থা আগে দেখতে পাঠাই।" বলিয়া রেবতী উঠিল, ভিতর-বারান্দায় গিয়া হরি সিং হরি সিং বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

হরি সিং রুটী বানাইতেছিল—মনিবের ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া উপরে আসিল। আদেশ শুনিয়া বলিল, "না মা-জী! এ পাড়ায় কোনও ভয়-ডর নেই। কত লোক ত রাস্তা চলছে। আমার 'ঘিউ' ফুরিয়েছিল, এই ত কতক্ষণ হ'ল শোভাবাজারে গিয়ে আমি ঘিউ কিনে আনলাম।"

রেবতী বলিল, "আচ্ছা—রাস্তা দেখতে আর যেতে হবে না; তবে তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

দ্বারবান্ বলিল, "আলবৎ যাব মা-জী! আমি এখন রুটী বানাচ্ছিলাম—দশ মিনিট যদি দেরী করেন ত ভাল হয়।"

রেবতী বলিল, "দশ মিনিট কেন, আমাদের বেরুতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরী হবে। যাও, তুমি তোমার কায সেরে নাও।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ইহারা গামছা ইত্যাদি লইয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইল। চিৎপুর রোড পার হইয়া, গলির পথে না গিয়া, বড় রাস্তা দিয়া যাওয়াই নিরাপদ ভাবিয়া, শোভাবাজারের রাস্তায় গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল। স্নানের ঘাটে ভিড় তেমন না থাকিলেও, ঘাট একেবারে জনশূন্যও নহে। যাহারা আসিতেছে, তাড়াতাড়ি কোনও রকমে স্নান সারিয়া চটপট উঠিয়া পড়িতেছে। হীরালাল ও রেবতী—পরস্পর হইতে অল্প ব্যবধানেই দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছিল। এক সময় কাছাকাছি অন্য কোনও স্নানার্থীকে না দেখিয়া রেবতী কয়েক পদ নিকটে আসিয়া হীরালালকে বলিল, "সাঁতার জানেন?"

"জানি। কেন?"

"ঐ দেখুন, কতকগুলো ফুল ভেসে আসছে—ও গুলোকে ধ'রে নিয়ে আসতে পারবেন?"

হীরালাল দেখিল, কয়েকটা জবাফুল ভাসিয়া আসিতেছে। "খুব পারবো"—বলিয়া সন্তরণ করিয়া সেই ফুলগুলি ধরিল।

দেখিল, শুধু ফুল নয়—একগাছি মালা। মালাটি রেবতীর হাতে দিল।

রেবতী সেটিকে দেখিয়া হীরালালের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে আপনি আমার হাতে দিন ত!"

"কেন, ব্যাপার কি? কোনও তুক্ না কি?"—বলিয়া হাসিয়া হীরালাল একটি জবা ছিঁড়িয়া রেবতীকে দিল।

রেবতী সেটি মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আপনি হলেন একটি সদাশিব পুরুষ, আমার কি সাধ্য আপনাকে তুক্ করি! তা নয়। আপনি আমার কি ব'লে সম্ভাষণ করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না—আজ মা গঙ্গাকে সাক্ষী ক'রে আমরা দু'জনে 'স্রোতের ফুল' পাতাই আসুন। আজ থেকে আমরা পরস্পরের স্রোতের ফুল। কেমন, রাজি আছেন?"

হীরালাল বলিল, "তা বেশ হ'ল, স্রোতের ফুল। এবার থেকে আমরা পরস্পরকে 'স্রোতের ফুল' বলেই ডাক্‌বো।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়ের স্নান সমাপ্ত হইল। উঠিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার তাহারা শোভাবাজারের রাস্তা দিয়া ফিরিতে লাগিল। ইহারা যখন চিৎপুর রোডের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সময় এক জন হিন্দুচালিত ট্যাক্‌সি পশ্চাৎদিক্ হইতে আসিয়া, ইহাদের দেখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইল। মুণ্ডিতমস্তক, শিখাধারী চালক রেবতীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিকে কি বলিতে লাগিল।

হীরালাল ও রেবতী উভয়ে নিশ্চিন্ত-চিত্তে পথ চলিতেছে। সেই ট্যাক্সি ধীরে ধীরে অল্প ব্যবধানে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

রেবতী সেই ট্যাক্সি বা চালকের প্রতি লক্ষ্য করে নাই, করিলে সম্ভবতঃ চিনিতে পারিত—সে দিন সতীশের সহিত হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া, হিন্দুভ্রমে যাহার ট্যাক্সিতে তাহারা আরোহণ করিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি!

ক্রমে ইহারা জয় মিত্রের গলির মুখে আসিয়া পৌঁছিল। অনুমান বিশ হাত দূরে, সেই ট্যাক্সি পূর্ব্ববৎ আসিতেছে। ইহারা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এ গলিতে ট্যাক্সি প্রবেশ করে না। গলির মুখে ট্যাক্সি দাঁড় করাইয়া, চালক নামিয়া পদব্রজে ইহাদের অনুসরণ করিল। পরে ইহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, লোকটা বাড়ীর নম্বরটি দেখিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আহার্য্য প্রস্তুত ছিল। রেবতী ও হীরালাল, নিশ্চিন্ত মনে হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে আহার সমাধা করিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে, থিয়েটারের মোটরে উভয়ে থিয়েটারে গেল। হীরালালকে ম্যানেজার বাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া রেবতী বলিল, "এমেচারের মধ্যে ইনি এক জন খুব ভাল অ্যাক্টর—এঁকে আমাদের থিয়েটারে নিতেই হবে।"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ ত, এঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখি আগে।"

রিহার্শাল শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রেবতী গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়া ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে হীরালাল বাবুকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন?"

ম্যানেজার বলিলেন, "আজই। উনি একটু বসুন না, এই ত মোটে সাতটা! আরও দু' একটা কায আছে, তা সেরে নিয়ে তার পর ওঁকে দেখবো। ইচ্ছা কর, তুমিও বস।"

রেবতী বলিল, "না, আমি এখন যাই, ম্যানেজার বাবু—আমার মাথাটা ধরেছে, কিন্তু হীরালাল বাবু ফিরবেন কি ক'রে? এই ডামাডোলের বাজার!"

ম্যানেজার বলিলেন, "তোমার বাড়ীতেই উনি আছেন ত? আমার গাড়ীতে ওঁকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো এখন।"

"আচ্ছা, বেশ।"—বলিয়া রেবতী বিদায় লইল।

বাড়ী ঢুকিতেই ঝি সৌদামিনী বলিল, "হাঁ মা, আপনি এক জন ওস্তাদকে কি আসতে বলেছিলেন?"

রেবতী বলিল, "কৈ না।"

সৌদামিনী বলিল, "সন্ধ্যার একটু পরেই মস্ত দাড়িওয়ালা এক মুসলমান, মস্ত এক এস্রাজ হাতে ক'রে এসে বল্লে, 'এই বাড়ীতে কি থিয়েটারের রেবতী বিবি থাকেন?' আমি বল্লাম, 'হাঁ।' জিজ্ঞাসা করলে, 'তিনি বাড়ী আছেন কি?'—আমি বল্লাম, 'না, তিনি থিয়েটারে।' সে বল্লে, 'আমার নাম হেদায়েৎ খাঁ এস্রাজী—পশ্চিমে বিবি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, আপনি যদি কখনও কলকাতায় আসেন ত দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে এসে দু' একটা আলাপ শোনাবেন। ঠিকানাও ব'লে দিয়েছিলেন—তাই আমি এসেছি। তাঁর ফিরতে কি দেরী হবে?' আমি বল্লাম, 'না, বেশী দেরী হবে না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবেন। —আপনি বসবেন কি?'—সে বল্লে—'আচ্ছা।' তাই তাকে আমি উপরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি।"

রেবতী সবিস্ময়ে বলিল, "হেদায়েৎ খাঁ এস্রাজী? কৈ, আমার ত কিছু মনে পড়ছে না!"—বলিতে বলিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

রেবতী বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিতেই—সোফায় উপবিষ্ট ব্যক্তি তাহার কৃত্রিম দীর্ঘ দাড়ী অপসারিত করিয়া হাসিয়া বলিল, "বন্দিনী বিবি সাহেব! চিনতে পারেন?"

ভয়ে রেবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইল। সে দেখিল, আগন্তুক আর কেহ নয়—দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা সর্দ্দার বাবং করিম শেখ। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।





৫ম বর্ষ]　　মাঘ, ১৩৩৩　　[৪র্থ সংখ্যা

রসশাস্ত্র

৬

এই যে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' রসাস্বাদ, তাহাই হইল, কি দৃশ্য-কাব্য, কি শ্রব্যকাব্য, উভয়বিধ কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই রসাস্বাদের যাহা প্রতিকূল, তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই দোষ জানিয়া কবিমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, নিজ কাব্যে ইহার পরিবর্জ্জন করা। দোষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে;—পদগত দোষ, পদাংশগত দোষ, বাক্যগত দোষ, অর্থগত দোষ ও রসগত দোষ।

এই পাঁচ প্রকার দোষের মধ্যে রসগত দোষেরই আলোচনা করা যাইতেছে। কারণ, রসগত দোষের জ্ঞান না থাকিলে বিশুদ্ধ রসের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শব্দদোষ বা অর্থদোষ কয়েক স্থলে বিদ্যমান থাকিলেও রসপরিপুষ্টির পূর্ণতা বশতঃ ঐ শব্দগত বা অর্থগত দোষ কাব্যের সেরূপ হানি করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু রসগত দোষ বিদ্যমান থাকিলে রসাস্বাদই জন্মিতে পারে না বলিয়া, ঐ দোষযুক্ত কাব্য বা নাটক নিতান্ত উপেক্ষণীয় হইয়া উঠে।

এই কারণে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ রসগত দোষকে নিত্য দোষ বলিয়া স্বীকার করেন আর শব্দার্থগত দোষকে অনিত্য দোষ বলিয়া থাকেন। এই রসগত দোষ দেখাইতে যাইয়া কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট কি বলিতেছেন, তাহাই দেখা যাউক। তিনি বলিয়াছেন—

"ব্যভিচারি-রসস্থায়ি-ভাবানাং শব্দবাচ্যতা।
কষ্টকল্পনয়া ব্যক্তিরনুভাববিভাবয়োঃ॥
প্রতিকূলবিভাবাদিগ্রহো দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
অকাণ্ডে প্রথনচ্ছেদৌ অঙ্গস্যাপ্যতিবিস্তৃতিঃ॥
অঙ্গিনোঽননুসন্ধানং প্রকৃতীনাং বিপর্য্যয়ঃ।
অনঙ্গস্যাভিধানং চ রসেদোষাঃ স্যুরীদৃশাঃ॥"

"ব্যভিচারিভাব, রস ও স্থায়িভাব সমূহের নিজ নিজ বাচক শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা, অনুভাব অথবা বিভাবের কষ্ট-কল্পনা দ্বারা অভিব্যক্তি, যে রসের যে বিভাবাদি প্রতিকূল, সেই রসে সেই বিভাবাদি বর্ণন, কোন একটি অপ্রধান রসের বারংবার পরিপুষ্টি, অকস্মাৎ কোন একটি রসের বিস্তার বা পরিত্যাগ, অপ্রধান রসের অতিশয় বিস্তার, প্রধানের অননুসন্ধান, যে রসের যেরূপ পাত্র হওয়া উচিত, সেই রসে সেইরূপ পাত্রের বিপর্য্যয়, যে রসের যাহা অনুকূল

নহে, সেই রসে তাহার অভিধান, এই জাতীয় যে সমূহদোষ, তাহাই রসগত হইয়া থাকে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রসের ব্যভিচারিভাব অনেক প্রকার হইয়া থাকে। শৃঙ্গাররসে যাহা ব্যভিচারিভাব হইবে, তাহাই যে সকল রসে ব্যভিচারিভাব হইবে, তাহা নহে। এইরূপ আবার রসান্তরে যাহা ব্যভিচারিভাব হইবে, তাহাই যে শৃঙ্গাররসে ব্যভিচারিভাব হইবে, তাহা নহে। কোন্ রসে কোন্ কোন্ ব্যভিচারিভাবের উপাদান করিতে হয়, এবং কাহাকেই বা পরিবর্জ্জন করিতে হয়, তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে ব্যভিচারিভাবের স্বরূপ কি. কেন বা তাহাকে ব্যভিচারিভাব বলে, তাহাই দেখান হইতেছে। সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—

"বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্ম্মগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদা॥"

"অনুভাব বা সাত্ত্বিকভাবাদি হইতে বিলক্ষণভাবে যাহা রসের অভিমুখ হইয়া সহৃদয়গণের আস্বাদ্য হয়, যাহা কখনও প্রবল হইয়া রসের উপাদান স্থায়িভাবকেও নিজ সৌন্দর্য্যে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করিয়া থাকে, আবার কখনও বা প্রবল স্থায়িভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া যাহা কোন কোন সময় তাহারই অনুকূলভাবে অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, স্থায়িসহচর সেই মনোবৃত্তিগুলিকে ব্যভিচারিভাব বা সঞ্চারিভাব বলা যায়।

একটি উদাহরণ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ব্যভিচারিভাব কোন্ স্থলে কি ভাবে স্থায়িভাব অপেক্ষা অধিকভাবে আস্বাদ্য হইয়া থাকে। মেঘদূতে একটি শ্লোক আছে, যথা—

"ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াং
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥"

মেঘমুখে বিরহী যক্ষ—প্রিয়তমার নিকট নিজের বিরহদশার বর্ণন করিতেছে—"বিনা কারণে তুমি যে মধ্যে মধ্যে আমার প্রতি কুপিত হইতে, সেই কোপাবেশ-মনোহর তোমার অপূর্ব্ব সুন্দরমূর্ত্তি আমি মধ্যে মধ্যে সম্মুখে শিলাফলকে গৈরিকাদি ধাতুরাগের দ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকি, আশা—তোমাকে ত দেখিতে পাই না, কিন্তু তোমার চিত্রিত সেই প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, বিরহদগ্ধ নয়নদ্বয়কে ক্ষণকালের জন্য শান্তি প্রদান করিব। সেই সঙ্গে এরূপ কল্পনাও হয় যে, তোমার সেই অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইয়া তোমার সেই কল্পিত কোপের প্রসাদন করিব। কিন্তু বিধাতা এতই ক্রূর, আমাদিগের এই ভাবে ক্ষণকালের জন্যও যে সমাগম, তাহাও তিনি সহিতে পারেন না। কারণ, মূর্ত্তি আঁকিবার পর নয়ন ভরিয়া দেখিবার জন্য যেমন সেই দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিতে আরম্ভ করি, অমনই উপচীয়মান দরদরিত অশ্রুধারায় নয়নদ্বয় আবৃত হইয়া যায়, সেই বড় সাধের অঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন জুড়াইবার আশাও অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়।"

মেঘদূতের এই শ্লোকটিতে বিপ্রলম্ভ নামক শৃঙ্গাররস বা আদিরস পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে, বিরহী যক্ষের নিজ প্রিয়তমার প্রতি যে ঐকান্তিক অনুরাগ, তাহাই হইল এ স্থলে সেই বিপ্রলম্ভরসের স্থায়িভাব। দীর্ঘকালব্যাপী অদর্শন, সত্বর দর্শন পাইবার অসম্ভাবনা, দেখিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, অদর্শনের আবেগময় বিষণ্ণতা, এই সমুদয় ভাবগুলি এই শ্লোকে মিলিতভাবে অভিব্যক্ত হইয়া, বিরহী যক্ষের সেই অনুরাগকে রসাস্বাদকারী সহৃদয়গণের হৃদয়ে আস্বাদ্য করিয়া দিতেছে।

কিন্তু ঐ সকল ভাবের মধ্যে আর একটি ভাব এ স্থলে অভিব্যক্ত হইয়া রসপ্রতীতিকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছে, সেই ভাবটির নাম 'অসূয়া।' এই শ্লোকে যক্ষ বিধাতাকে লক্ষ্য করিয়া 'ক্রূর' এই যে শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছে, ইহা দ্বারা যক্ষের তৎকালে বিধাতার প্রতি যে 'অসূয়া' বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই এ স্থলে প্রধান ব্যভিচারিভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বিরহের তীব্র বেদনায় অশান্ত হইয়া যক্ষ কল্পিত প্রিয়তমার মূর্ত্তির পদতলে পড়িয়া তীব্র বিরহতাপশান্তির আশায় ও উৎকণ্ঠায় যখন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ দরদরিত অশ্রুধারার উদ্ভব করিয়া যে বিধাতা তাহার দৃষ্টিশক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিতেছেন, তাঁহার এই আকস্মিক নিষ্ঠুর হঠকারিতায় যক্ষের মনে যে অসহিষ্ণুতার ভাব বা ইংরাজীতে বলিতে হইলে যে Indignation উদিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে অন্যান্য ভাব ও তৎসমন্বিত

যে যক্ষের প্রিয়তমার প্রতি স্থায়িভাব, তাহাকেও যেন ক্ষণকালের জন্য আবৃত করিয়া নিজ রূপকে প্রধানভাবে সকল সামাজিকের আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় আস্বাদ্যমান ব্যভিচারিভাবকে আলঙ্কারিকগণ 'উন্মগ্ন' বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকে যক্ষের দূরস্থিত প্রণয়িনীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিবার জন্য যে আবেগ বা চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবগুলি সহৃদয়গণের আস্বাদ্য হইয়া থাকে, সেগুলি পূর্ব্বদর্শিত 'অসূয়ার' ন্যায় তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ না পাইলেও, যক্ষের প্রিয়তমা-বিষয়ক যে অনুরাগ, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, তাহারই পরিপোষণের জন্য সম্মিলিতভাবে বা অপ্রধানভাবে সহৃদয়গণের আস্বাদ্য হয়। এই কারণে এই জাতীয় ব্যভিচারিভাবগুলিকে 'উন্মগ্ন' না বলিয়া 'নির্মগ্ন' এইরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হয়।

এই ভাবে অর্থাৎ উন্মগ্নভাবে বা নির্মগ্নভাবে রসাস্বাদনের অঙ্কুরস্বরূপ স্থায়িভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া যে সকল মনোবৃত্তি সহৃদয়গণের আস্বাদনীয় হইয়া থাকে, আলঙ্কারিকগণের মতে তাহারাই ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই সঞ্চারিভাব পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তেত্রিশ প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—

"নির্বেদগ্লানি-শঙ্কাখ্যাস্তথাঽসূয়ামদশ্রমাঃ।
আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ॥
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।
গর্ববিষাদ-ঔৎসুক্যং নিদ্রাঽপস্মার এব চ॥
সুপ্তং প্রবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।
মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ॥
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ॥"

তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাব যথা—

'নির্বেদ' নৈরাশ্য—Despair.
'গ্লানি' শ্রান্তি—Exhaustion
'শঙ্কা' সংশয়—Suspicion.
'অসূয়া' অসহনশীলতা—Indignation.
'মদ' মত্ততা—Intoxication.
'শ্রম' পরিশ্রম—Exertion.
'আলস্য' শক্তি থাকিতেও অনুৎসাহ—Idleness.
'দৈন্য' দীনতা—Lowspiritedness.
'চিন্তা'—Thought.
'মোহ'—Swoon.
'স্মৃতি' স্মরণ—Recollection.
'ধৃতি' ধৈর্য্য—Firmness.
'ব্রীড়া' লজ্জা—Modesty.
'চপলতা' উচ্ছৃঙ্খলতা—Frailty.
'হর্ষ' সন্তোষ—Delight.
'আবেগ' উদ্বিগ্নতা—Uneasiness.
'জড়তা' জড়ীভাব—Dulness.
'গর্ব্ব' অহঙ্কার—Pride.
'বিষাদ' বিষণ্ণভাব—Dejection.
'ঔৎসুক্য' উৎসুকতা—Curiosity.
'নিদ্রা'—Sleep.
'অপস্মার' মস্তিষ্কের রোগবিশেষ—Appoplexy.
'সুপ্ত' স্বপ্ন—Dream.
'প্রবোধ'—Awakening.
'অমর্ষ'—Impatience.
'অবহিত্থ' আকার গোপন—Concealment of an Internal feeling.
'উগ্রতা'—Fierceness.
'মতি'—Right Conception.
'ব্যাধি'—Disease.
'উন্মাদ' বাতুলতা—Madness.
'মরণ'—Death.
'ত্রাস' ভয়—Fear.
'বিতর্ক' কল্পনা—Reasoning.

এই যে তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাব অলঙ্কার-শাস্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে নিদ্রা ও মরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই নিদ্রা এবং মরণ ব্যভিচারিভাবের মধ্যে কেন যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। স্থায়িভাবের অনুকূল, অথচ স্থায়িভাবের অধীন যে সকল মনোবৃত্তি বা Feeling, তাহারাই সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাব বলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু 'নিদ্রা' ও 'মরণ' এই দুইটি অবস্থা মনোবৃত্তির মধ্যে

প্রবিষ্ট না হইয়াও, কিরূপে ব্যভিচারিভাব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য।

'মরণ' শব্দের অর্থ—আত্মার সহিত বর্ত্তমান দেহের সম্বন্ধ-নিবৃত্তি। সুতরাং তাহা অভাব পদার্থ, এই কারণে কিছুতেই তাহাকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। এইরূপ নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে 'নিদ্রা' শব্দের অর্থ সকল প্রকার 'জ্ঞানের অভাব।' নিদ্রার সময়ে আমাদিগের কোন প্রকার মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকে না, ইহাই যদি নিদ্রার স্বভাব হইল, তবে সেই নিদ্রাকে ব্যভিচারিভাবের মধ্যে পরিগণিত করা কিরূপে সম্ভবপর, এ বিষয়ে আলঙ্কারিকগণ কোন স্পষ্ট সমাধানের উল্লেখ করেন নাই।

আমার মনে হয়, নিদ্রাকে নৈয়ায়িকগণ যে ভাবে বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের সম্মত নহে। যোগসূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি কিন্তু নিদ্রাকে বৃত্তি বলিয়াই স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা' অর্থাৎ সকল প্রকার বিশেষ জ্ঞানের অভাব, যাহার উদ্রেক হইলে আমাদের অন্তঃকরণে হইয়া থাকে, তাহার নাম 'অভাব-প্রত্যয়।' উদ্রিক্ত যে তমোগুণ, তাহাকে যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বেদব্যাস অভাব-প্রত্যয় শব্দের অর্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ তমোগুণ, অর্থাৎ যে তমোগুণের উদ্রেক হইলে রজঃ ও সত্ত্বগুণের কার্য্যকারিণী শক্তি কুণ্ঠিত হইয়া যায়, সেই সর্ব্ববিষয়ের আবরণস্বরূপ তমোগুণকেই আলম্বন করিয়া আমাদিগের মনোবৃত্তি যদি উদিত হয়, তবে সেই মনোবৃত্তিকেই 'নিদ্রা' বলা যায়, ইহাই হইল উক্ত পতঞ্জলসূত্রের ব্যাসদেব-সম্মত ব্যাখ্যা।

এই ব্যাখ্যানুসারে 'নিদ্রা' আমাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং যোগদর্শনানুসারে নিদ্রারূপ বৃত্তিকে ব্যভিচারিভাবের মধ্যে পরিগণিত করিলেও চলে, আলঙ্কারিক আচার্য্যগণও এইরূপ অভিপ্রায়েই নিদ্রাকে ব্যভিচারিভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ত গেল নিদ্রার কথা।

'মরণ'কে ব্যভিচারিভাবের মধ্যে নির্দ্দেশ করিলে যে অসামঞ্জস্য হইতে পারে, আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ তাহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই অসামঞ্জস্যের পরিহার করিবার জন্য সাহিত্যদর্পণকার একটু প্রযত্নও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"রসবিচ্ছেদহেতুত্বাদ্ মরণং নৈব বর্ণ্যতে।
জাতপ্রায়ন্তু তদ্‌বাচ্যং চেতসা কাঙ্ক্ষিতং তথা।"

(সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

রসবিচ্ছেদের হেতু বলিয়া কবিগণ সাক্ষাৎ মরণকে ব্যভিচারিভাবরূপে বর্ণন করেন না, মরণ 'জাতপ্রায়' (অর্থাৎ এই বুঝি হয় আর বিলম্ব নাই) এই ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। অথবা মরণ চিত্তে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে, এই ভাবেও বর্ণিত হইতে পারে। জাতপ্রায় মরণের কিরূপ-ভাবে বর্ণন কবিরা করিয়া থাকেন, তাহাই দেখাইবার জন্য সাহিত্যদর্পণকার যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"শেফালিকাং বিদলিতামবলোক্য তন্বী
প্রাণান্ কথঞ্চিদপি ধারয়িতুং প্রভূতা।
আকর্ণ্য সম্প্রতি রুতং চরণায়ুধানাং
কিংবা ভবিষ্যতি ন বেদ্মি তপস্বিনী সা॥"

আসিবেন বলিয়া প্রিয়তম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে প্রমোদ-উদ্যানে নিজ বাসভবন সজ্জিত করিয়া আগমনার্থিনী প্রিয়তমা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল, প্রভাত হইয়া গেল, তথাপিও প্রিয়তম আসিলেন না দেখিয়া, সখী স্বয়ং প্রিয়তমের ভবনে যাইয়া প্রিয়সহচরীর সেই রাত্রির অবস্থা ও বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা প্রিয়তমের নিকট বর্ণন করিতেছেন—

"আমার কৃশাঙ্গী প্রিয়সখী রাত্রির শেষভাগে যখন দেখিল, শেফালিকা কুসুমনিচয় একে একে সবগুলি ফুটিয়া উঠিল (এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল), তখনও 'এখনও একটু রাত্রি আছে', 'হয় ত আসিতে পারেন', এই আশায় কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এখন কিন্তু নিশাবসানসূচক কুক্কুটের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে যে' কেমন করিয়া বাঁচবে, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

আকাঙ্ক্ষিত মরণ কোন্ স্থলে ব্যভিচারিভাবরূপে বর্ণিত হইতে পারে, তাহাও দেখাইতে যাইয়া সাহিত্যদর্পণকার যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"রোলম্বাঃ পরিপূরয়ন্তু ককুভো ঝঙ্কারকোলাহলৈ-
র্মন্দং মন্দমুপৈতু চন্দনবনীজাতো নভস্বানপি।
মাদ্যন্তঃ কলয়ন্তু চূতশিখরে কেলীপিকাঃ পঞ্চমং
প্রাণাঃ সত্বরমশ্মসারকঠিনা গচ্ছন্তু গচ্ছন্ত্বমী॥"

প্রিয়তম প্রবাসে চলিয়া গিয়াছেন, আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, এখনও কোনও সংবাদ আইসে নাই, শত আশঙ্কায় বিক্ষুব্ধহৃদয়া, সম্ভাবিতবৈধব্যভীতি-বিহ্বলা প্রিয়তমা বসন্তের উন্মাদনাময় সময়ে এই ভাবে কাতরতার সহিত স্বীয় মনোভাব প্রিয়সখীকে জানাইতেছে—

"ভ্রমরগণ ঝঙ্কার-কোলাহলের দ্বারা দিঙ্মণ্ডলকে মুখরিত করিতে থাকুক, মলয়-পর্ব্বতের চন্দনবন হইতে সমুদ্ভূত মন্দ-মারুত যেমন করিয়া বহিতেছে, এমনই করিয়া বহিতে থাকুক, সহকার শিখরে বসিয়া নূতন আম্রমুকুলের রসাস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া কেলীকোকিলকুল উচ্চৈঃস্বরে পঞ্চমস্বর গাহিতে থাকুক, আর সখি! পাথরের সারাংশের ন্যায় কঠিন এই প্রাণ সত্বর এ দেহ হইতে নির্গত হউক, ইহাই কামনা করিতেছি।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

মাঘ-রাণী

আজি মাঘের প্রভাতে কি রূপ তোমার
হেরিলাম ওগো রাণি,
ফুলের বসন, ফুলের ভূষণ,—
ফুল-তনু, ফুল-পাণি।
গাঁদাফুলে গাঁথা দুকূলাঞ্চল
ঐ ধরাতলে লুটে চঞ্চল,
বক-পুষ্পের মুকুট মাথায়—
মাধবীর বাঁকা বেণী;
কনক-মেখলা শোভিছে শ্রোণীতে
কনক-চাঁপার শ্রেণী!

ভুবন মোহিতে ভুবনে কি এলে
ভুবন-মোহিনি, তুমি?
তাই বুঝি আজি মাতিয়া উঠিল
বন-ভূমি,—মনোভূমি?
কিবা অতসীর অঙ্গাভরণ
অঙ্গে দুলিছে সু-পীতবরণ,
কণ্ঠে মোহন পলাশের মালা—
জ্বলিছে প্রবাল-চুণি;
কোন্ অমরার নন্দন হ'তে
সাজিয়া আসিলে, শুনি?

পৌষ-পীড়নে ধরণীর মুখে
লুকাইয়া ছিল হাসি,
কত যে অভাগী ঢেলেছে দুখের
অশ্রু-শিশিররাশি।
আজ হের' দেবি, তোমার দরশে,
তোমার অমৃত-চরণ-পরশে,
ভাঙ্গা হিয়া তার ভরিয়া উঠেছে
হরষ-গোলাপ-দলে;—
বহুদিন পর আজি হাসে ধরা
তুমি আসিয়াছ ব'লে!

স্বর্গ হইতে এলে কি মরতে
সুর-রাণী তুমি, ও মা?
ধরণী আজিকে দেবতা-অতিথি
পেয়েছে প্রভাতে তোমা।
ধূপ-দানে দিয়ে ধূপ কুয়াসার
ধরা করে মা গো আরতি তোমার;
সমুখে সাজানো থরে-থরে ঐ
কুন্দ-কুসুম-দানী;
কুঞ্জে কুঞ্জে ঐ গাহে পাখী
তব আগমনী-বাণী!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রভুর ইচ্ছা

১

মানুষের কোন ইচ্ছাই সফল হয় না দেখিয়া, রঞ্জনপুরের বলরাম বৈরাগী অগত্যা প্রভুর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতে বাধ্য হইল।

সংসারে প্রবেশ করিয়া বলরাম আশা করিয়াছিল, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সে সুখের সংসার পাতিয়া বসিবে। এ জন্য সে পৈতৃক বৃত্তি নামগান বা ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মালা, ঘুন্‌সী, চুড়ী, চিরুণী প্রভৃতি মণিহারী জিনিষ লইয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিতে আরম্ভ করিল; ইহাতে বেশ দুই পয়সা লাভও হইতে লাগিল। কিন্তু লাভের গুড় পিপীলিকা উদরস্থ করিয়া তাহার এই পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দিল; স্ত্রী রসময়ীর অমিতব্যয়িতার ফলে সে এত খাটিয়াও সংসারের অভাব মোচন করিতে পারিল না। বলরাম হয় ত দশ দিনের উপযোগী চাউল আনিয়া দিল। রসময়ী এক সের চাউল দিয়া তৎপরিবর্ত্তে এক সের চিঁড়া লইয়া ভিজাইয়া খাইল; ভাল মাছ বেচিতে আসিলে পয়সার বদলে চাউল মাপিয়া দিল।

এইরূপে দশ দিনের চাউল পাঁচ দিনে শেষ করিয়া দিয়া রসময়ী যখন স্বামীকে পুনরায় চাউল আনিতে বলিত, তখন বলরাম স্ত্রীর উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু রাগিলে কি হইবে, সে স্ত্রীকে দুইটা চড়া কথা বলিতে গেলে, রসময়ী তাহাকে দশটা কঠিন কথা শুনাইয়া দিত। বলরাম তিন দিনের বাজার আনিয়া দিল, রসময়ী তাহা এক দিনেই নিঃশেষ করিয়া পরদিন কি দিয়া ভাতের গ্রাস মুখে উঠিবে, স্বামীকে তাহার চেষ্টা করিতে বলিত। ভাত-তরকারী পাতে লইয়া তাহার কতক খাইত, কতক পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিত। বলরাম এরূপে অপব্যয় করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রসময়ী বিরক্তি সহকারে উত্তর দিত, "পাতে নিয়েছিলাম খাব ব'লে, তা ও সব ছাই-পাশ মুখে না রুচ্‌লে ত খেতে পারি না। তোমার হয়েছে যত এঁটো-কুড়ানো বাজার ত।"

এই অপচয় নিবারণোদ্দেশে বলরাম প্রত্যহ এক দিনের উপযোগী বাজার আনিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও দিয়া, রাত্রিতে বলরামের সম্মুখে শুধু ভাতের থালা ধরিয়া দিত। বলরাম তরকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে রসময়ী তর্জ্জন সহকারে উত্তর দিত, "তরকারী আমি আমার বাবার ক্ষেত থেকে আন্‌তে যাব না কি? তিনটে বেগুন, পাঁচটা আলু, এক মুঠো শাক এনে দিয়েছিলে, তাতে কি দু'বেলা কুলিয়ে ওঠে? আজকাল যেমন বাজার কত্তে শিখেছ, তেমনই নুণ ছড়িয়ে ভাত খাও।"

বলরাম কোন দিন নুণ ছড়াইয়া ভাত খাইত, কোন দিন বা না খাইয়াই উঠিয়া যাইত। রসময়ী কিন্তু সে জন্য কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিত না।

এমন কত দিন হইয়াছে, বলরাম বাজরা মাথায় ফেরি করিতে বাহির হইতেছে, এমন সময় রসময়ী বলিল, "ওগো, চাল আন্‌তে হবে।"

বলরাম বলিল, "এ বেলাটা চালিয়ে নাও, ও বেলা এসে চাল এনে দেব।"

অতীত মধ্যাহ্নে পরিশ্রান্তদেহে বলরাম ঘরে ফিরিয়া দেখিল, রসময়ী চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, রন্ধন করে নাই। বলরাম ইহার কারণজিজ্ঞাসু হইলে রসময়ী সক্রোধে উত্তর করিত, "কি রাঁধবো, আমার মাথাটা? ঘরে চাল থাক্‌লে ত রাঁধবো।"

বলরাম বলিল, "এমন চাল নাই যে, একটা বেলা চলে?"

মুখ ঘুরাইয়া রসময়ী উত্তর দিল, "হুঁ, থাকবে বৈ কি। দু'মণ দশ মণ চাল এনে ঘরে মজুত ক'রে রেখেছ কি না!"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বলরাম বলিল, "এমনই যদি, তবে খুড়োর ঘর থেকে সেরটাক চাল ধার ক'রে এনে ত রাঁধলে পার্‌তে।"

গর্জ্জন করিয়া রসময়ী বলিল, "ধার কত্তে হয়, তুমি যাবে। আমি অত ধারকর্জ্জর ধার ধারি না। আমাকে এনে দাও, তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

বলরাম গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিত, হা গোবিন্দ, ইহারই নাম সংসারসুখ!

মুখে হাতে জল না দিয়াই বলরাম চাউল আনিতে

অপচয়ের জন্য বলরাম স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে গেলে রসময়ী সদর্পে উত্তর করিত, "দেখ, কাঁধে হাত দিয়ে বিয়ে ক'রে ভাত-কাপড় জোগাবার ভার নিয়েছ। এখন ভাত-কাপড় জোগাতে না পার, স্পষ্ট বল, যে দিকে দু'চোখ যায়, আমি চ'লে যাই।"

রসময়ীর ব্যবহারে বলরাম এমনই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, রসময়ী উভয় চক্ষুর নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া গেলে বলরাম কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করিত না। কিন্তু আড়াই বৎসরের ছেলে কেষ্টা তাহাকে এমনই গভীর মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, শুধু তাহার জন্যই বলরাম রসময়ীর সর্ব্ববিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইত। খুব রাগ ও দুঃখের সময়েও কেষ্টা যখন ধুলা-মাখা হাতে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিত, বলরাম তখন সকল ক্রোধ, সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একটা নির্ম্মল তৃপ্তি অনুভব করিতে থাকিত।

তবে বলরামকে রসময়ীর অত্যাচার আর বেশী দিন সহ্য করিতে হইল না। কেষ্টাকে চারি বৎসরের রাখিয়া রসময়ী সহসা ইহলোক ত্যাগ করিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে বলরাম দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু সেই দুঃখের মধ্যেও যেন অনেকটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল। অনেকেই বলরামকে পুনরায় সেবা-দাসী সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিল। বলরামের কিন্তু এমন ঝকমারীর কাযে আর প্রবৃত্তি হইল না। স্থির করিল, এই গুঁড়াটুকু বাঁচিয়া থাক; ইহার বিবাহ দিয়া, ইহাকে সংসারী করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে বৃন্দাবনবাসী হইব।

চারি বছরের অপোগণ্ড ছেলেকে মানুষ করা পুরুষ-মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। কষ্টসাধ্য হইলেও বলরাম সে কষ্টে ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। প্রাণপণ যত্নে সে কেষ্টাকে মানুষ করিয়া তুলিল। তাহাকে পাঠশালায় দিয়া কিছু বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইয়া, নামগান করিতে, বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী গাহিতে শিক্ষা দিল; মধুর কণ্ঠে চৈতন্য-চরিতামৃত আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতে থাকিল।

ক্রমে কেষ্টা যখন ষোল বছরে পড়িল, তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখমণ্ডলে গুম্ফ-রেখা ঈষৎ দেখা দিল, তখন বলরাম ভাবিল, আর কেন, তাহার সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বলরাম এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরিয়া একটি ভাল মেয়ের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল।

অনেক চেষ্টার পর জাতি-বৈষ্ণবের একটি ভাল মেয়ে পাওয়া গেল। পরস্পর দেখাশুনার পর বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইল, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল। বলরাম স্যাকরা ডাকিয়া পুত্রবধূর জন্য দুই তিনখান গহনা গড়াইতে দিল।

বিবাহের মাত্র দিন দশেক বাকী, এমন সময় বলরাম এক দিন ফেরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া শুনিল, কেষ্টা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পাল-দীঘিতে সাঁতার দিতে দিতে মাঝ-পুকুরে ডুবিয়া গিয়াছে, আর উঠিতে পারে নাই। শুনিয়া বলরাম আছাড় খাইয়া পড়িল। হায় রে মানুষের আশা! কোথায় পুত্র, কোথায় তাহার বিবাহ, কোথায় বলরামের বৃন্দাবন-বাস! বলরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল, মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে, প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই সার।

প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য বলরাম বৃন্দাবনযাত্রার উদ্যোগ করিল। পুত্রবধূর জন্য নির্ম্মিত গহনাগুলি বিক্রয় করিল এবং ঘর-ভিটা, কাঠা দশেক জমী ও তৎসংলগ্ন একটু ডোবা ও কয়েক ঝাড় বাঁশ বিক্রয়ের জন্য খরিদ্দারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কি জানি, এই ঘর-ভিটা আর ঐ ডোবা ও জমীটুকুর মায়ায় যদি আবার দেশে ফিরিতে ইচ্ছা হয়।

২

"আমার কি হবে গোঁসাই?"

উমেশ হাজরার সহিত ঘর-ভিটা ও জমীর দর-দস্তর ঠিক করিয়া বলরাম অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্তে ঘরে ফিরিয়া দেখিল, নিতাই মাইতির মেয়ে অলকা তাহার ঘরের দাবায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অলকা অতিশয় কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি ত বিন্দাবনে যাচ্ছো, কিন্তু আমার কি হবে গোঁসাই?"

বলরাম তাহার অদূরে মাটীর উপরে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আবার কি হ'লো অলক?"

অলকা বলিল, "আমার যা হবার, তাই হচ্ছে। যেমন আমার কপাল!"

বলিতে বলিতে অলকা কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাই মাইতির সহিত বলরামের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। নিতাইয়ের মাকে বলরাম মা বলিয়া ডাকিত, এবং তাহার

কাছে ঠিক যেন পেটের ছেলের মতই আবদার অভিমান করিত। নিতাইয়ের মা-ও তাহাকে কম ভালবাসিত না। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও বলরাম না আসিলে বুড়ী তাহার খবর লইতে ছুটিত। সে প্রায়ই বলরামকে ডাকিয়া দুধ, ঘোল, গুড়মুড়ী খাওয়াইয়া স্নেহাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ও বৈষ্ণব-ভোজনের পুণ্য উভয়ই লাভ করিত। ঘরে ভালমন্দ একটু কিছু জিনিষ আসিলে আগে বলরামকে না দিয়া নিজের ছেলেকেও দিতে পারিত না।

নিতাইয়ের মা মারা গেলে বলরাম ঠিক মাতৃশোকই অনুভব করিয়াছিল। ইহার পরেও নিতাইয়ের সহিত ভ্রাতৃভাব কখনও বিচলিত হয় নাই। গতায়াতও পূর্ব্বের ন্যায় না হইলেও নিতান্ত কম ছিল না।

নিতাইয়ের একমাত্র মেয়ে অলকা। চাষার ঘরের মেয়ে হইলেও অনেক বামুন-কায়েতের ঘরে তেমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। এই টুকটুকে মেয়েটিকে বলরাম বড়ই ভালবাসিত। সে যতক্ষণ নিতাইয়ের কাছে বসিয়া গল্প-গুজব করিত, ততক্ষণ অলকাকে কোল হইতে নামাইত না। মাল গস্ত করিতে গিয়া কচি হাতের ভাল চুড়ী পাইলে বেশী দাম দিয়াও তাহা কিনিয়া আনিত, এবং অলকার কাপড় পরাইয়া দিয়া চুড়ী পরিয়া তাহার হাত দুখানি কেমন মানাইয়াছে, তাহা বাড়ীশুদ্ধ সকলকে দেখাইয়া বেড়াইত। অলকাও বলরামকে দেখিলে আর কাহারও কোলে থাকিতে চাহিত না।

ক্রমে অলকা বড় হইল, এবং বিবাহিত হইয়া সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী বেশী দূরে নয়। বলরাম মধ্যে মধ্যে সেখানে ফেরি করিতে যাইত, এবং চুড়ী, ফিতা, চিরুণী প্রভৃতি অলকাকে উপহার দিয়া আসিত।

বছর পাঁচ ছয় এইরূপে কাটিল। তাহার পর সহসা অলকার কপাল ভাঙ্গিল। নিদারুণ বজ্রাঘাতের ন্যায় সংবাদ আসিল, অলকা বিধবা হইয়াছে। বলরাম মাথায় হাত চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হা গোবিন্দ, এ কি করলে প্রভু!" স্বামী ছাড়া সংসারে আর কেহ ছিল না, সুতরাং বিধবা হইয়া অলকা পিত্রালয়বাসিনী হইল।

ইহার বছরখানেক পরেই নিতাই মারা গেল। মাস কয়েকের ব্যবধানে অলকার মাতাও স্বামীর অনুগমন করিল। অলকা সম্পূর্ণ অনাথ হইয়া পড়িল। খাজানা যোগাইতে না পারিয়া অলকা বলরামের পরামর্শে জমার জমীর অধিকাংশই ইস্তফা দিল। যে দুই তিন বিঘা রহিল, ভাগজোতে বিলি করিয়া তদ্দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বলরাম মধ্যে মধ্যে আসিয়া অলকাকে দেখিয়া যাইত, এবং চাষীদের নিকট হইতে ধান-চাউল আদায় করিয়া দিত, সংসারে যে কাযটা পুরুষমানুষ না হইলে চলে না, বলরামই তাহা সম্পন্ন করিত।

গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা না থাকিলে কি হয়, বিধবা যুবতীর আরও অনেক ভাবনা আছে। যৌবনের—বিশেষতঃ রূপের শত্রু অনেক। অলকারও রূপের শত্রুর অভাব হইল না। গ্রামের দুই একটি ভদ্র যুবকের লোলুপ দৃষ্টি এই অনাথা বিধবার উপরে নিপতিত হইল। তাহারা ভাবে-ইসারায় অলকাকে আপনাদের প্রণয় জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু চাষার মেয়ে তাহাদের প্রণয়ের মর্য্যাদা বুঝিল না; সে আপনার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে চেষ্টিত হইল। ইহাতে ভদ্র সন্তানদের ক্রোধ বা আক্ষেপের সীমা রহিল না। কিন্তু বলরামের ভয়ে সহসা কেহ কিছু করিতে সাহসী হইল না।

অলকার দুরদৃষ্ট—জ্যেঠা মারা গেল। জ্যেঠার মৃত্যুতে বলরাম সংসারের উপর এতটা বীতস্পৃহ হইয়া পড়িল যে, অলকাকে পর্য্যন্ত আপনার হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে চেষ্টিত হইল। তথাপি সে পাঁচ সাত দিন অন্তর এক একবার অলকাকে দেখিতে যাইত, এবং দেখিয়াই দুই একটা কথায় তাহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া আসিত; তাহার কাছে দুই দণ্ড বসিতে বা বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা করিত না। কি জানি, বেশী কথা কহিলে বা বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে যদি আবার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। বলরামের এরূপ ব্যবহারে অলকা কিছুমাত্র বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইত না। কি বিষম শেলাঘাতে তাহার বুকটা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, তাহা অলকা বেশ বুঝিত। বুঝিত বলিয়াই ইহার উপর নিজের দুঃখ-কাহিনী ব্যক্ত করিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারিত না।

এ দিকে বলরামকে বড় একটা গতিবিধি করিতে না দেখিয়া ভদ্র সন্তানেরা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং এবার তাহারা ইসারা-ইঙ্গিত ছাড়িয়া অলকার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইল। কিন্তু তাহারা যখন

বেশ বুঝিতে পারিল যে, অলকা বড় শক্ত মেয়ে, তখন তাহারাও একটু কঠোর ভাবেই আপনাদের প্রণয়-পিপাসা চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইল।

এক দিন গভীর নিশীথে তাহারা দুই তিন জন মিলিয়া পদাঘাতে অলকার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। অলকা ইহাতে ভয় পাইল, কিন্তু জ্ঞান হারাইল না। সে আলো জ্বালিয়া একখানা কাটারী হাতে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সতেজকণ্ঠে বলিল, "দেখ, দরজা ভেঙ্গে যে আগে ঘরে ঢুকবে, এক কোপে যদি তার মাথা না নিই, তবে আমি নিতাই মাইতির মেয়েই নয়।"

তাহার এই তেজস্বিনী উক্তি শ্রবণে যুবকগণ ভীত হইল। তাহারা দরজা ভাঙ্গিতে বিরত হইয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যাইবার সময় শাসাইয়া গেল, "আচ্ছা, তুই কি রকম নিতাই মাইতির মেয়ে, তা আমরা দেখবোই দেখবো। যে রকমে পারি, তোর ধর্ম্ম নষ্ট করবোই করবো।"

অলকা ভাবিল, এখন উপায়? আর ত গোঁসাইকে না বলিলেই চলে না। দেরী করিলে সে হয় ত বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে, তখন কপালে কি ঘটিবে, কে জানে।

পরদিন আহারান্তে অলকা বলরামের ঘরে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া দাবায় বসিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৩

অলকার চোখে জল দেখিয়া বলরাম একটু বিচলিত হইল, ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি, অলক?"

অলকা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় দুঃখকাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া বলরাম গুম্ হইয়া রহিল; রাগে তাহার বড় বড় চোখ দুইটা করঞ্জার মত লাল হইয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সকলই প্রভুর ইচ্ছা! তা কার কার ওপর তোমার সন্দ হয়?"

অলকা বলিল, "সন্দ কি, আমি বেশ জানি, হরি মুখুয্যের ছেলে নীলু আর হাজরাদের শশী, এরা দু'জনেই দলের চাঁই।"

বলরাম বলিল, "জান যদি, ওদের বাপ-মাকে গিয়ে বল্লে না কেন?"

অল। আজ সকালে উঠেই হরি মুখুয্যের কাছে গিয়েছিলাম।

বল। তিনি কি বল্লেন?

অল। তিনি যা বল্লেন, তার ওপর আর কথাই নাই। তিনি রেগে আমাকে গালাগালি দিয়ে বল্লেন, "পাজী নচ্ছার মাগী, আমার সোনার চাঁদ ছেলে, তার নামে এমন দুর্নাম! বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

ঈষৎ হাসিয়া বলরাম বলিল, "তিনি ঠিকই বলেছেন। দোষ ত তোমারই, অলক। অমন সব সোনার চাঁদের গায়ে তুমি কলঙ্ক দিতে যাও কেন?"

বলরামের হাসিটুকু যে শ্লেষের হাসি, ইহা বুঝিতে অলকার বিলম্ব হইল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে এখন কি করবে তুমি?"

"তুমি যা বলবে।"

"আমি যে কি বলবো, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"ভেবে-চিন্তে আমার যা হয় উপায় একটা কত্তেই হবে। তুমি ছাড়া জগতে আমার আপনার কে আছে, গোঁসাই?"

অলকা সজল দৃষ্টিতে বলরামের মুখের দিকে চাহিল। বলরাম ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ভারী গলায় উত্তর করিল, "সংসারে কে কার আপন, অলক? এক গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ আপনার নয়। তিনি যা করবেন, তাই হবে।"

ভারীমুখে অলকা বলিল, "গোবিন্দের ওপর তোমার যতটা বিশ্বাস, আমার ততটা নাই, গোঁসাই।"

বলরাম বলিল, "বিশ্বাস না থাকে, বিশ্বাস কর, অলক। তাঁর ওপর নির্ভর ক'রে থাক, সব আপদ্-বিপদ্ দূর হয়ে যাবে।"

অলকা চিন্তামলিন মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ, অলক?"

অলকা বলিল, "ভাবছি, আমার তা হ'লে জলে ডুবে বা গলায় দড়ি দিয়ে মরা, কি দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। তাই দেশ ছেড়েই বা যাব কোন্ চুলোয়? তিন কুলে আমার কে আছে?"

অলকার চোখ দিয়া ঝর্-ঝর্ অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। বলরাম যে ইহাতে ব্যথা পাইল, তাহা বলাই বাহুল্য। কণ্ঠে

সে ব্যথা বুকে চাপিয়া বলরাম গম্ভীর মুখে বলিল, "আচ্ছা, আজ তুমি যাও, অলক। ভেবে-চিন্তে দেখি, কোন একটা উপায় হয় কি না।"

অলকা চলিয়া গেল। বলরাম দাবার উপর বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

হা গোবিন্দ, এ কি তোমার লীলা! সংসারের কঠোর মায়াপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া নিশ্চিন্তরূপে তোমার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইব, শ্রীবৃন্দাবনের পবিত্র রজে গড়াগড়ি দিয়া দেহ-মন শীতল করিব, কিন্তু যাত্রাকালেই এ কি বিঘ্ন? অধমকে প্রতারিত করিবার জন্য এ আবার কি মায়াজাল বিস্তার করিলে, প্রভু! আমি অতি অধম, অতি পাপী; নতুবা ছলনাজাল বিস্তার করিয়া আমাকে আবার কেন মায়াপাশে জড়াইয়া দিবে দয়াময়?—বলরামের বুক ফাটিয়া যেন কান্না আসিতে লাগিল।

না না, কিসের মায়া—কিসের বন্ধন! অলকা আমার কে? নিজের স্ত্রী-পুত্র কোথায় গেল, অলকা ত পরের মেয়ে। তাহার জন্য বৃন্দাবনবাসের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিব? রূপসনাতন স্ত্রী-পুত্র, ধন, মান, যশ সব ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর আমি এই একটা পরের মেয়ের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সংসার-নরকে ডুবিয়া মরিব? কখনই না। পরীক্ষা—অলকাকে দিয়া প্রভু আমার মনের জোর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হইতেই হইবে।

কিন্তু অলকা? এই অনাথা মেয়েটার কি গতি হইবে? সে যে আমাকে ভিন্ন জানে না। তাই বিপদে পড়িয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। আমি তাহাকে অভয় না দিলে—আমার কাছে আশ্রয় না পাইলে সে হয় জলে ডুবিয়া মরিবে, নয় দায়ে পড়িয়া পাপের সাগরে ঝাঁপ দিবে। ওঃ, কি ভীষণ পরিণাম এই মেয়েটার!

অলকার পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে বলরামের গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল।

তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় গৃহাঙ্গন মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আকাশের গায়ে নক্ষত্রগুলা মিটি-মিটি করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মল্লিকাগাছের ঝোপে বসিয়া ঝিঁঝিঁ পোকা একঘেয়ে সুরে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের চালে বসিয়া পেঁচা বিকটস্বরে ডাকিয়া উঠিল। তাহার ডাকে সচেতন হইয়া বলরাম গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "প্রভু হে, তোমারই ইচ্ছা।"

বলরাম উঠিয়া হাত-পা ধুইয়া ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিল। তাহার পর কাপড় ছাড়িয়া, মালা লইয়া জপে নিযুক্ত হইল। কিন্তু জপের মধ্যেও অলকা। বিরক্তি সহকারে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম জোরে জোরে উচ্চারণ করিতে লাগিল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

কিন্তু মন তাহার সে সতেজ উচ্চারণে কর্ণপাত করিল না। সে বলিতে লাগিল, "হায়, অলকার কি গতি হইবে?" বলরাম সুরের সঙ্গে গাহিতে থাকিল—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

মন বলিল, "অহো, অলকার পরিণাম কি ভীষণ!"

বলরাম ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায় হায়, অলকার চিন্তায় তাহার কি ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে?

সারা রাত্রি ভাবিয়া পরিশেষে বলরাম স্থির করিল, আমার পরকালে যাহা হয় হ'উক, কিন্তু এই অনাথা মেয়েটার ইহকাল পরকাল রক্ষা করিতেই হইবে।

পরদিন সকালে ঘর-ভিটার বিক্রয়-কোবালা লেখাপড়ার জন্য উমেশ হাজরার কাছে যাইবার কথা ছিল। বলরাম সেখানে গেল না, অলকার কাছে গিয়া বলিল, "তোমার আর এখানে থেকে কায নাই অলক, ঘটি-বাটিটা যা কিছু আছে, নিয়ে আমার ঘরে চল।"

৪

হরি মুখুয্যে প্রচ্ছন্নহাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বলরাম, বুড়ো বয়সে আবার সেবাদাসী কাড়লে না কি?"

দাঁতে জিভ কাটিয়া বলরাম বলিল, "অমন কথা কইবেন না ঠাকুর মশাই, অলকা আমার মেয়ের তুল্যি।"

ঈষৎ হাসিয়া মুখুয্যে বলিলেন, "ওঃ, মেয়ের তুল্যি! আমি বলি বা বৃন্দাবনবাসী হবে ব'লে সেবাদাসী সঙ্গে নিচ্ছ।"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলরাম বলিল, "বৃন্দাবনবাস আর হলো কোথায় বলুন।"

মুখুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হলো না কেন?"

বলরামের বলিতে ইচ্ছা হইল, 'তোমাদের জ্বালায়।' কিন্তু তাহা না বলিয়া, নিজের কপালে হাত দিয়া বলিল, "কপালে থাকলে ত। আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যেতে পারে কি, ঠাকুর মশাই ?"

ঠাকুর মশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাগ্যে থাক্‌লে এক দিন হবে হে হবে।"

বলরাম বলিল, "সেটা আপনাদের আশীর্ব্বাদ।"

চিনিবাস ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৈরিগী ঠাকুর, তুমি না কি নিতাই মাইতির মেয়েটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ ?"

বলরাম বলিল, "তাতে দোষ কি হয়েছে, ঘোষের পো ?"

চিনিবাস বলিল, "শুনেছি, মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম বলিল, "বৈষ্ণবধর্ম্মের কাছে পাপি-পুণ্যাত্মা ভেদ নাই ত ঘোষের পো! মহাপ্রভু ঘোর পাপী জগাই-মাধাইকে কোল দিয়েছিলেন। যবন হরিদাসও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে পবিত্র হয়েছিলেন।"

মুখ মচকাইয়া চিনিবাস বলিল, "কে জানে, তোমাদের ধর্ম্ম কেমনতর। তা মেয়েটা ভেক নিয়েছে না কি ?"

বলরাম বলিল, "নেয় নি এখনও। নেবে কি না, তাই ভাবছে।"

কেবল হরি মুখুয্যে বা চিনিবাস ঘোষ নয়, গ্রামের অনেকেরই ধারণা হইল, বলরাম বৈরাগী বুড়া বয়সে নিতাই মাইতির মেয়েটাকে ভেক দিয়া সেবাদাসী করিবে। বলরামকে গ্রামের প্রায় সকলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে বলরামের উপর ঘৃণা পোষণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ ইহা লইয়া বলরামকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িত না। বলরামও যে যেমন লোক, তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিত।

তা একা বলরামকে এই বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু সময়ে সময়ে মেয়ে-মহল হইতেও অলকার প্রতি এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রযুক্ত হইত। অলকা যে ইহাতে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যথাটা তাহার নিজের জন্য যতটা না হউক, বলরামের জন্যই বেশী হইত। হায়, এই নিরীহ নিষ্পাপ বৈষ্ণব তাহারই জন্য এমন দুর্নামের ভাগী হইল! ইহা অপেক্ষা তাহার মরণ যে ভাল ছিল।

এক দিন অলকা নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলরামকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ গোঁসাই, আমি মহাপাপী।"

বিস্ময় সহকারে বলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে তুমি মহাপাপী হ'লে, অলক ?"

অলকা বলিল, "আমার জন্যে তোমাকে কত কষ্টই না সইতে হচ্ছে।"

বলরাম মুখে খানিক আশ্চর্য্যভাব আনিয়া বলিল, "কষ্ট! তেমন কষ্ট ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অলকা বলিল, "তুমি বিন্দাবনে যাবে আশা করেছিলে। আমার জন্যেই ত যাওয়া হলো না।"

বলরাম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "বৃন্দাবনে গেলে আমার কি আর দুটো হাত বেরুত, অলক ?"

অল। তবে যেতে চেয়েছিলে কেন ?

বল। যেতে চেয়েছিলাম দুটি কারণে। এক—শোকে-তাপে সংসারটা আর ভাল লাগছিল না। বৃন্দাবনে গেলে মনটা যদি স্থির হয়। তা ছাড়া বয়স হয়েছে, এ সময়ে নির্জ্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করব, এও একটা কারণ।

অল। তা তোমার সে সাধন-ভজনেরও ত ব্যাঘাত হলো ?

বল। ব্যাঘাত হবে কেন ? বৃন্দাবনে গেলেই সাধন-ভজন হবে, আর এখানে থেকে হবে না, এমন কোন কথা নাই। আসল কথা কি জান অলক, 'মন চাঙ্গা ত কেটোয় গঙ্গা'—মন যদি ঠিক থাকে, যেখানেই থাকি, সেইখানেই বৃন্দাবন। এই মনের ভিতরেই কাশী, গয়া, বৃন্দাবন সব আছে।

বলিয়া বলরাম গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল,—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি ;
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি,
হবে বৃন্দা গোপনারী,
এই দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥"

অলকা বলিল, "কিন্তু লোকনিন্দের যে কান পাতা দায় গোঁসাই।"

সহাস্তে বলরাম বলিল, "নিন্দে! প্রকৃত বৈষ্ণব হ'তে হ'লে নিন্দাস্তুতিতে যে সমান জ্ঞান কত্তে হয়; অলক! আমাদের বৈষ্ণবগুরুর উপদেশ—'লজ্জা, মান, ভয় তিন থাক্‌তে নয়।' সাধনায় সিদ্ধিলাভ কত্তে হ'লে এই তিনটিকে আগে ত্যাগ কত্তে হবে।"

চিন্তামলিন মুখে অলকা বলিল, "তুমি যেন সাধন-ভজন কচ্ছো, কিন্তু আমার যে মুখ দেখান দায় হয়ে উঠেছে। আমি কি করি, গোঁসাই?"

গম্ভীর মুখে বলরাম বলিল, "তুমি? তোমার ভাবনাই আমি ভাবি, অলক। আর লোকগুলোর কি একটু ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান নাই? যা মুখে আসে, তাই বললেই হলো।"

অলকা নতমুখে নিঃশব্দে রহিল। বলরাম বলিল, "এক কায করবে, অলক?"

যেন একটু আগ্রহ সহকারে অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কায, গোঁসাই?"

"ভেক নেবে?"

"তাতে হবে কি?"

"বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে সাধন-ভজন করবে।"

"দু'বেলা মালা ঠক্‌-ঠক্‌ কত্তে হবে ত?"

ঈষৎ হাসিয়া বলরাম বলিল, "মালা ঠক্‌-ঠক্‌—সেটা কি এমন মন্দ কায?"

ভারী মুখে অলকা বলিল, "ভালই হোক্‌, মন্দই হোক্‌, ও কায আমার দ্বারা হবে না।"

বল। কাযটা কি এতই শক্ত?

অল। ও কাযটা তেমন শক্ত নয় গোঁসাই, কিন্তু—

বল। কিন্তু কি অলক?

অল। কিন্তু এতে কেলেঙ্কারী কি আরও বাড়বে না?

বলরাম নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অলকা বলিল, "ভেবে আর কি করবে গোঁসাই, যার বরাতে যা আছে, তাই হবে। কাল তা হ'লে মাল কিনতে যাবে না কি?"

একটা গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলরাম বলিল, "যেতেই হবে। মনে করেছিলাম, চুড়ীর বাজরা আর মাথায় তুলবো না। কিন্তু পেট চালাতে হবে ত।"

লজ্জানত মুখে অলকা বলিল, "আমি আবাগী যদি এসে তোমার ঘাড়ে না পড়তাম, তা হ'লে তোমাকে আর এ কায কত্তে হতো না, গোঁসাই। আমিই হয়েছি যত পাপ।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলরাম বলিল, "কেউ পাপ, কেউ পুণ্যি নয়, অলক। সকলই প্রভুর ইচ্ছা।"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, "কালই ফিরবে ত?"

বলরাম বলিল, "তা কি ফিরতে পারি? পরশু দুপুর নাগাদ ফিরবো। ভয় নাই তোমার, গয়বীকে তোমার কাছে শোবার ব্যবস্থা ক'রে যাব।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বলরাম উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া নামজপে প্রবৃত্ত হইল।

হায়, কোথায় পুণ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী বৃত্তি, আর কোথায় পুনরায় মণিহারীর বাজরা মাথায় লইয়া এ গ্রামে সে গ্রামে ছুটাছুটি। গোবিন্দ হে, এ ছুটাছুটির শেষ কত দিনে হইবে, প্রভু? দিন শেষ হইয়া আসিল, তথাপি ত আমার ছুটাছুটির বিরাম হইল না! বড় অধম—বড়ই পাপী আমি, কিন্তু প্রভু, তুমি যে অধমতারণ, পতিতপাবন!

বলরামের দুই চোখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া হাতের মালাছড়া সিক্ত করিয়া দিল।

৫

মাল ক্রয় করিয়া বলরাম ঘরে ফিরিতেছিল। বৈশাখ মাস; মধ্যাহ্নের রৌদ্রে মাঠটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। রাস্তার ধূলাগুলা পর্য্যন্ত তাতিয়া উঠিয়া আগুনের ফুল্‌কির মত পা দুইটাকে যেন ঝলসিয়া দিতেছিল। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। বিস্তৃত মাঠ শস্যশূন্য—জলবিন্দু-বর্জ্জিত। আরও আধ ক্রোশ পথ না গেলে জল পাইবার উপায় নাই। বলরামের কিন্তু মনে হইতেছিল, এই আধ ক্রোশ পথ যাইতে যাইতেই তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইবে। উৎসুক নেত্রে সম্মুখবর্ত্তী গ্রামের দিকে চাহিতে চাহিতে বলরাম সত্বরপদে মাঠটুকু অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু পা যে আর চলে না, সর্ব্বশরীর ক্রমেই যেন অবশ হইয়া আসিতেছে।

রাস্তার ধারে একটা বড় অশ্বত্থগাছ ছিল। বলরাম মোট নামাইয়া সেই গাছের তলায় গিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না, গাছের একটা মোটা শিকড়ে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

এ কি, বুকের ভিতর এমন করে কেন? ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ যে! তবে কি মৃত্যুকাল উপস্থিত? মন্দ নয়, ব্রজের যমুনাতটের পরিবর্ত্তে এই জনশূন্য প্রান্তরে গাছতলায় পড়িয়া মৃত্যু! গোবিন্দ হে, তবে কি এইবার আমার কর্ম্মের শেষ—ছুটাছুটির অবসান করিয়া দিলে? তোমার ইচ্ছাই সফল হোক্ প্রভু! কিন্তু অলকা—দূর হউক অলকা। এই অলকাই আমার মায়ার বেড়ী, সর্ব্বনাশের মূল। এ সময়ে আর তাহার চিন্তা কেন? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে!

মৃত্যু কিন্তু আসিল না, গাছের পাতাগুলা সর্ সর্ শব্দে বীজন করিয়া বলরামকে ক্রমে সুস্থ করিয়া তুলিল। বলরাম উঠিয়া মোট মাথায় লইয়া পুনরায় গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইল।

ঘরে পৌছিয়া বলরাম যাহা দেখিল, তাহাতে সে বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া পড়িল। দেখিল, তাহার গৃহ ভস্মীভূত; ঘরের দেওয়ালটা অঙ্গারবর্ণ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে ভস্মস্তূপ। স্তূপ হইতে তখনও অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে। বলরাম কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার দুই চারি জন আসিয়া জুটিল। তাহারা নানাবিধ ভূমিকা সহকারে যাহা বলিল, তাহা এই,—গত রাত্রিতে প্রায় আড়াই প্রহরের সময় সহসা আলো দেখিয়া সকলেই তাহার কারণানুসন্ধানে ব্যস্ত হয় এবং বাহিরে আসিয়া দেখিতে পায় যে, বলরামের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আইসে এবং আগুন নিভাইবার জন্য চেষ্টিত হয়। কিন্তু আগুন তখন মটকায় গিয়া পৌছিয়াছে। কাহার সাধ্য তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে অগ্রসর হয়? তথাপি তাহারা প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া ঘরের জিনিষপত্রগুলা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু দরজার কাছে গিয়া দেখে, দরজায় চাবী। চাবী ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতে করিতেই সম্মুখের চাল ধরিয়া উঠিল। কাযেই আর কেহ কিছু করিতে পারিল না।

বলরামের জ্ঞাতি-খুড়া মাধব বৈরাগী দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিল, "আমি তখনই বলেছিলাম বাপু, ও সব নষ্টদুষ্ট মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিও না। এ কায সেই মাগীরই। মাগী ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে স'রে পড়েছে।"

বলরাম কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না; বলিল, "সে স'রে পড়বেই যদি, তা হ'লে ঘরে আগুন দিয়ে যাবে কেন? আগুন দিলেও ঘরের দরজায় চাবী বন্ধ ক'রে যাবে কেন? এ নিশ্চয় অন্য লোকের কায।"

মাধব একটু রাগতভাবে বলিল, "অন্য লোক কে তোমার ঘরে আগুন দিতে এলো?"

বলরাম বলিল, "যারা অলকার উপর অত্যাচার কত্তে উদ্যত হয়েছিল, এ কায তাদেরই। তারা হতাশ হয়ে রাগে ঘর বন্ধ ক'রে অলকাকে পুড়িয়ে মেরেছে।"

কথাটা অনেকেরই মনঃপূত হইল। তখন গৃহমধ্যস্থ ভস্মস্তূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে অলকার দগ্ধাবশিষ্ট মৃতদেহ বাহির হইল। কিন্তু গরবীরও ত শুইতে আসিবার কথা ছিল? অনুসন্ধানে জানা গেল, ভিন্নগ্রামে গরবীর ভাইঝির অসুখ করিয়াছে শুনিয়া সন্ধ্যার আগেই সে ভাইঝিকে দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং অলকা একাই ঘরে ছিল।

দুই বিন্দু অশ্রুধারায় অলকার দগ্ধ দেহ সিক্ত করিয়া বলরাম আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছা!"

ইহার কয়েক দিন পরে ভিটা-জমী বিক্রয় করিয়া বলরাম বৃন্দাবনযাত্রা করিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গান

হৃদি-মন্দিরে তুমি কে!
প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে পরাণে,
আমারে ভুলালে হে।
প্রাণের দুয়ার রেখেছিনু খুলে,
কেন সেথা আসি পশিলে হে॥

হৃদি প্রাণ মন করিয়া আকুল,
আমারে মজালে হে।
তব মুখ চাহি রেখেছি জীবন,
তুমি মম প্রাণ হৃদয়েরি ধন।
আমি দাসী তব জীবন-মরণে,
জনমে জনমে হে॥



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রামপালের শরীর-মনে যেন একটা বিষের বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ঠিক তেমনই একটা আগুনের জ্বালা তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধরিয়া রহিয়াছিল; কোন ক্রমেই এক মুহূর্ত্তেরও জন্য সেটা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইয়া, এতটুকু স্বস্তি পর্য্যন্ত পাইতে দিতেছিল না। এমনই গুরুভারাতুর অথচ অনুপায়হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত হৃদয়-মন লইয়া তিনি গভীর রাত্রিতে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে দিন তখনও পর্য্যন্ত সন্ধ্যা জাগিয়া বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ এই আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যে আনন্দকৃতার্থতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠিয়া তাঁহার বিরক্তিপরুষ চিত্ত ইহাতে যেন নিজেকে বিপন্নই বোধ করিল। এই নির্ব্বোধ শিশু-প্রকৃতি বোবার সঙ্গে আবল-তাবল বকিবার মত মনের অবস্থা আজ তাঁহার একবারেই যে ছিল না।

সন্ধ্যাই আজ প্রথম কথা কহিল। সে একটু অভিমান-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, "সারাদিনটা মশাইএর পথ চেয়ে ব'সে রইলেম, মহাদেবী কত না ব্যস্ত হয়ে তিন তিন বার ডেকে ডেকে পাঠালেন, কিছুতেই আর আসা হলো না যে বড়? আমার জন্য নাই হোক; তাঁর জন্যও তোমার একবার আসা উচিত ছিল।"

রামপাল বিরাগ-কণ্ঠে, নীরস স্বরে উত্তর দিলেন, "এমনও কি হ'তে পারে না যে, তোমাদের আজ্ঞাপালন ভিন্নও জগতে আমাদের অন্য কোন কায আছে?"

সন্ধ্যা স্বামীর এমন রূঢ় উত্তরটাকেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রচ্ছন্ন পরিহাসমাত্র বোধ করিয়া মনে মনে আশ্বস্তা হইল ও সমধিক অভিমানের সহিত ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "থাকে থাক, কিন্তু মহাদেবী আজ ভারী দুঃখিত হয়েছেন, তোমার একবারটি আসা উচিত ছিল, সব কায ফেলে রেখেও আসা উচিত ছিল!"

রামপাল এবার রোষ-গম্ভীর স্বরে সুস্পষ্ট উত্তর করিলেন, "হয়ে থাকেন হয়েছেন, তার জন্য আর করছি কি! তিনিই ত আমার ভাগ্যের শনি, তাঁর মুখ দেখতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই!"

সন্ধ্যারাণী যেন অকস্মাৎ মার খাইল, এমনই করিয়া সে ভীষণভাবে চমকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি বলছ তুমি? ও কি বলছ তুমি? পাগল হয়েছ না কি? দিদি তোমার শনি! যে দিদিকে তুমি দেবতার উপর ক'রে ভক্তি ক'রে মায়ের চেয়ে সুহৃদ্ ভাব, সেই দিদিকে এই অপমান করতে পারলে? 'তাঁর মুখ দেখতে প্রবৃত্তি নেই', এত বড় কথাও বলতে পারলে?"

সন্ধ্যার কণ্ঠে এই কথাগুলি যে ভয়ার্ত্ত বিস্ময়ার্ত্ত স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার রেশ দুঃখে ক্ষোভে রোষে আত্মবিস্মৃত-প্রায় মহাকুমারের কানের তারে গিয়াও বাজিয়াছিল, নিজেরও এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে তিনি সহসা একান্ত বিস্ময়াহত ও স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াও পড়িয়াছিলেন; কিন্তু বুকের মধ্যে সর্ব্বশরীরের রক্তে আজ তাঁহার যে অক্ষমতার, অপমানের ভীষণতর জ্বালা ধরিয়া রহিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল, সে আজ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করিল না। নিরীহ সন্ধ্যাকেও যে মিথ্যা একান্ত অসহিষ্ণুতায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে মিথ্যাকে আজ পরম সত্যের ন্যায় চাপিয়া ধরিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত নূতন রামপাল তাঁহার স্বভাববহির্ভূত ক্রোধকম্পিত উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"তিনি যে আমার কত বড় শত্রু, তাই যদি তোমার বুঝতে পারবার শক্তি থাকবে, তা হ'লে আমার ভাবনাই বা কি? এখন বুঝতে পারছি, এই জন্যই তোমায় বিয়ে করতে আমার যথার্থ হিতৈষীরা আমার পরে বিরক্ত হয়েছিলেন। উচ্চতম মহত্তম রাজবংশের রক্তধারা ত তোমার গায়ে নেই, কেমন ক'রে তুমি জানবে যে, তার

কত বড় মর্য্যাদা, তার কি উচ্চতম মূল্য! পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য কতখানি দিতে হয়, কত বড় বড় স্নেহ প্রেম ভালবাসাকে তুচ্ছ বস্তুর মত অবলীলাক্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে কত বড় আত্মোৎসর্গ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তুমি তার বুঝবে কি? আমার তিনি সে পথটাই জন্মের মত যে রুদ্ধ ক'রে নষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর চেয়ে বেশী শত্রু আমার আর কে?"

স্বামীর এই তীক্ষ্ণ হৃদয়ভেদী স্বর ও নির্ম্মম অবমাননাকর অভিযোগ—এ যে একেবারেই নূতন ও অপ্রত্যাশিত; বিশেষতঃ তাহার অভিজ্ঞতাহীনতার প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে অভিমানিনী ও আদরিণী সন্ধ্যা নিবিড় অভিমানে ও বিস্ময়ে যেন একান্ত অভিভূত ও আহত হইয়া পড়িল। সে কথা কহিতে গেল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার স্বর বাহির হইল না, উষ্ণ জলের প্রবাহে দুই চোখ অন্ধ হইয়া গেল।

রামপাল নিজেও ইহাতে কম অস্বস্তি বোধ করিলেন না, কেমন করিয়া যে এমন নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল, ইহাতেও তিনি প্রচুর বিস্ময়ানুভবও করিতেছিলেন, কিন্তু উথলিয়া পড়া ক্রোধকে তখন আর সংযত করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না, তাই ক্রুদ্ধ ক্রুর কণ্ঠে উত্তপ্ত হাস্য করিয়া আরও একটা বিষোদ্গার করিলেন,—"হ্যাঁ, কাঁদ! আর কি, কেঁদে ফেল! রাঙ্গা চোখে হাসি আর কাল চোখে জল! যথেষ্ট! পুরুষকে কৃতার্থ করতে এর চাইতে তোমরা আর বেশী কি দেবে! বুকে ধ'রে আদর করা, না হয় পায়ে ধ'রে মান ভাঙ্গা! হায় রে বিলাসের ডালি! হায় রে খেলা-ঘরের সাজান পুতুল! এই আমাদের সহধর্ম্মিণী! অর্দ্ধাঙ্গিনী এই!"

সন্ধ্যার কান্না এত বড় অভিযোগেও এবার আর বাধা মানিল না, সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া শয্যাতলে মুখ লুকাইল। দেখিয়া রামপালের নয়নযুগল আরক্তত্র হইয়া উঠিল। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিলেন,—"সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা মুখ তুলিল না, তাহার কান্নার বেগে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আর একটু স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামপাল কহিলেন,—"আমিই আদর দিয়ে দিয়ে তোমায় ননীর পুতুলটি তৈরী হয়ে ওঠবার সাহায্য করেছি। সন্ধ্যা! সবটাই যে তোমার দোষ, তা নয়। তখন ভেবেছিলুম, যখন এ জন্মে আর আমার পিতৃ-রাজ্যের লাভ-ক্ষতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রইলো না, তখন রাজনীতির সকলটা জন্মের মতই পরিত্যাগ ক'রে পরম সুহৃদ মাতুল মদনদেবের সব সংস্রব ছেড়ে দিয়ে তোমার মধ্যেই সকল ক্ষতিকে আমার ডুবিয়ে দিই। তোমার প্রেমেই আত্মহারা হয়ে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভুলে যাই। আর কিছু না হোক, জীবনের একটা দিক ত আমার পূর্ণতর হয়ে উঠুক, সুপ্রচুর ও সুবিমল পারিবারিক সুখসম্ভোগ—সেও ত একটা মস্ত বড় পাওয়া, বিশুদ্ধ সতী-প্রেমের অম্লান পারিজাত-মাল্য ত আমি বুকে রাখতে পেরেছি—আমার এই ঢের, আমার এই থাক, আমি আর কিছু চাই না।"

রামপালের সতেজ ও তীক্ষ্ণ স্বর মৃদু ও সখেদ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা আবার তাহা তীব্রতর হইয়া উঠিল,—"তা হয় না সন্ধ্যা! তা হয় না! এখন দেখছি, সে হয় না। সে হওয়া অসম্ভব! ক্ষত্রিয়ের ছেলে আমি, রাজার ছেলে আমি, একটা তুচ্ছ নাগরিকের মত নারী-প্রেমে মগ্ন থেকে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করবো, আর আমার চিরসম্মানিত পিতৃ-পিতামহের অম্লান যশোভাতি ঘোর মসীলিপ্ত ক'রে দিয়ে সেই বংশে প্রসূত এক কুলাঙ্গার আমারই পিতৃরাজ্যের আশ্রিত প্রজাসাধারণকে অত্যাচারে অনাচারে জর্জ্জরিত ক'রে তুল্লেও আমি তার কোন প্রতীকার করতে সমর্থ হব না; তাই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দুর্ব্ব্যবহারে একান্ত মর্ম্মপীড়িত করভারগ্রস্ত প্রজাপুঞ্জ তাদের দুঃখ-বেদনা জ্ঞাপন ক'রে, কাতর আবেদনে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পায়ে প'ড়ে আর্ত্তনাদ করলেও না, মাথার উপর জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ ক'রে গেলেও না, আমি মূক, আমি বধির, আমার কিছু করবার নাই, আমার কারুকে কিছু বলবারও নাই! ওঃ! কি ভীষণ, কি ভয়ানক এ অবস্থা! এখনও সেই ভীষণ শব্দ হাজারটা বজ্রধ্বনিকেও উপেক্ষা ক'রে আমার দুই কর্ণরন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ধিক্ ধিক্ মহাকুমার রামপালদেব, আর তাদের সেই হীন ঘৃণ্য জঘন্য ধিক্কারকে সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গেই অভিনন্দিত ক'রে আমিও তাদের অনুকরণে বলি, ধিক্ ধিক্ রামপালদেব! তোর জন্মে ধিক্! তোর জীবনে ধিক্! আর এই অকর্ম্মণ্য মিথ্যা জীবনভার বহন ক'রে তোর জীবিত থাকাতেও ধিক্, শত ধিক্—সহস্র ধিক্!"

স্বামীর এই উন্মত্ত প্রলাপের মত ভীষণ দারুণ অভিব্যক্তি অকস্মাৎ সন্ধ্যা-রাণীর ক্ষুদ্র দেহ-মনে একটা নিদারুণ ভীতি-শিহরণ আনিয়া দিল। একটা অকথ্য মহাভয়ে তাহার মস্তকের কেশ হইতে পদাঙ্গুলীর প্রান্তটি পর্য্যন্ত সঘনে কাঁপিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ সেই অভিমানাশ্রু-পরিপ্লাবিত আরক্ত বিশুষ্ক মুখে উঠিয়া বসিয়া সভয় আর্ত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "তুমি এ সব কি বলছ? তুমি কি রাজ-দ্রোহী হ'তে চাও?"

রামপাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই অস্বাভাবিক উচ্চ তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনিতে সন্ধ্যার পালিত পক্ষীটি তাহার নিশীথ-পিঞ্জর-শয্যায় চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সেই স্বরের একটা ব্যর্থ অনুকরণ-চেষ্টা করিল। রামপাল হাসিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, সন্ধ্যা! রাজা চিরজীবী হোন, তাঁহার অশেষ শুভার্থিনী পত্নী ও ভ্রাতৃ-বধূর শঙ্খ-সিঁদুর অক্ষয় হোক—রাজদ্রোহ করবার মত সৌভাগ্য নিয়ে এই হতভাগ্য রামপাল জন্মগ্রহণ করেনি। অত্যাচারী—রাজার পাদ-পূজক হয়েই তাহার এই অভিশপ্ত জন্মটাকে কাটাতে হবে।"

সন্ধ্যা কথা না কহিলেও সে যে মনে মনে কিছু আশ্বস্ত হইয়াছে, তাহা জানা গেল। কারণ, সে একটা রুদ্ধশ্বাসকে ঈষৎ লঘুভাবে মোচন করিল। বোধ করি, তাহার নিশ্চিন্ততার আভাসটুকু রামপালের কাছে অজ্ঞাত ছিল না, তিনি বারেকমাত্র আহত বিরক্তিতে কঠিন দৃষ্টিতে সন্ধ্যার সন্ধ্যা-কমলের ন্যায় ম্লান মুখের দিকে চাহিলেন। মুখে তিনিও তখন কিছু বলিলেন না।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল। পুর-তোরণে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইয়া গেল। প্রহরী হাঁকিতে লাগিল, "প্রভু বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ কর, জীবন ভঙ্গুর, ধনজন সম্পদ সমুদয় পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতই অস্থায়ী, মানকীর্ত্তি এ সকলও অবিনশ্বর নহে, অতএব হে বন্ধুগণ! হে ভ্রাতৃবৃন্দ! হে পুত্র ও পুত্রী সকল! নিশীথ অন্ধকারকে তোমাদের এই প্রতিমুহূর্ত্তে অনিশ্চিত সদাচঞ্চল ধনজন, মান ও জীবনের উপভোগ হেতু পাপকার্য্যের পরিপন্থী না করিয়া এই শান্ত মৌন নির্জ্জনতাকে সেই সর্ব্বত্যাগী চিরসন্ন্যাসীর পদানুসরণ জন্য সুহৃদ্রূপে গ্রহণ করিয়া মানবজন্মকে সফলতা দান কর। ধন্য হও, ধন্য হও!"

রামপাল নীরব নতমুখে দাঁড়াইয়া সেই চিরশ্রুত ঘোষণা-বাক্য কয়টি শুনিলেন, তাহার পর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া আত্মগতভাবেই কহিলেন, "হে সুগত! তোমার পথ—সে তোমারই পথ! আমার পথ কিছুতেই তোমার নির্দ্দিষ্ট পথরেখায় কোন দিনই মিলবে না। তুমি চেয়েছিলে নির্ব্বাণ, তার জন্য রাজ্যধন ছেড়ে দিলে। আমি চাই রাজ্য! সামান্য এই ধূলার ধরণীতে ক্ষুদ্র ছত্রদণ্ড, আর তার ফলে এক আদর্শ মহাসাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে আমার দেশকে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত ক'রে রেখে যেতে চাই। দ্বিতীয় রামরাজ্য আমার আদর্শ! এত ক্ষুদ্র আমার কামনা। তা কি পূর্ণ হবার উপায় নাই?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"মহাকুমার! বলি, ব্যাপারখানা কি বল্‌তে পার? আগে ত আমার মহল ছাড়তেই চাইতে না, এখন সাতবার ডেকে পাঠালেও দেখা পাওয়া ভার! তার উপর কাল রাত্রে ছোটুকে কি কতকগুলো তিরস্কার ক'রে গেছ, সে ত আজ সারাদিন ওঠেনি, খায়নি, কেবলই কাঁদছে।"

মহাকুমার সবিরক্তি ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, "তা ভিন্ন সমতটের মেয়ের আর বেশী কি কর্‌বার আছে? সমতটে লোণা জল খুব সস্তা!"

এই উত্তরে মহাদেবীর চিন্তাভারাকুল চিত্ত ঈষৎ লঘু হইয়া আসিল, তিনিও ঈষৎ হাস্য করিলেন; কহিলেন, "লোণাজল ত আমার বাপের দেশে কল্যাণেও নেহাৎ দুষ্প্রাপ্য নয় ভাই, কিন্তু সত্যি তামাসা নয়, যখন তখন তুমি ছোটুকে বড্ড কাঁদাও।"

রামপাল গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, "যে কাঁদে, তাকেই কাঁদাই, তোমার মত পাষাণ ফাটিয়ে জল ঝরানো ত আর বড় সহজ কাণ্ড নয়, তাই সেই অসাধ্য চেষ্টায় অগত্যাই বিরত থাকি।"

মহাদেবী পুনশ্চ হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "অর্থাৎ আমি পাষাণী।"

রামপাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "তুমি পাষাণী?— না, পাষাণের চেয়েও তুমি বেশী কঠিন! অত বড় কঠিন না হ'লে আমার হাতে পেয়ে আমার এত বড় দুর্দ্দশা তুমি

কখন ঘটাতে পারতে? আমি বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি আর্য্যাবর্ত্ত-সম্রাট ধর্ম্মপাল দেবপালের বংশধর, বিগ্রহপালের প্রিয়পুত্র, আজ তোমার হাতের একটা ক্ষুদ্রতম ক্রীড়নক হয়ে প'ড়ে আছি, এ কার নিষ্ঠুরতায়? এই যে সমস্ত দেশ জুড়ে আমার পিতৃ-প্রজাবর্গ অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে হাহাকার করছে, আর্ত্তনাদে পৃথিবীর সর্ব্বংসহা বুককেও ফাটিয়ে দিচ্ছে, অভি-সম্পাতে চিরবধির আকাশকেও দীর্ণ-বিদীর্ণ ক'রে তুলছে, আর আমি আমার দুই কর্ণদ্বার রুদ্ধ ক'রে বিলাস-ব্যসনে নারী-সঙ্গে হাস্ত-রহস্ত নিয়ে একটা তুচ্ছ ঘৃণ্য হীন নাগরিকের মতই অসার জীবনটাকে কোনমতে অতিবাহিত ক'রে যাচ্ছি, এ কার নির্ম্মম স্বার্থপরতার অনুরোধে, মহাদেবি? তোমার স্নেহের ফাঁস৹ গলায় প'রে জীবন আজ আমার কাছে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। সহস্র মণ পাষাণের প্রকাণ্ড মহাভার তুমি আমার এই বুকের উপর তুলে দিয়েছ! উঃ, তুমি কি পাষাণী!"

মহাদেবী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার স্মিত-প্রফুল্ল মুখ-খানি দেখিতে দেখিতে আতপশুষ্ক পদ্মের মতই পরিম্লান হইয়া আসিল। শান্ত অথচ দীপ্ত নেত্র দুইটিতে একটি উৎ-কট বেদনার তীব্র আভাস ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। বুকের মাঝখানে অকস্মাৎ বড় বেশী ব্যথা গিয়া বাজিলেই বুঝি সেই রকম ত্রস্ত ব্যাকুলতা চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে।

মহাকুমার কহিতে লাগিলেন, "তুমি আমার যা করেছ, তা আমার অতি বড় মহাশত্রুতেও কোন দিন করতে পারত না। এর চেয়ে আর কি করবার আছে? ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে তুমি একটা ভীরুতম, জড়তম, নির্জ্জীব ক্লীবে পরিবর্ত্তিত করেছ। আশ্রিতকে আজ আমার আশ্রয় দেবার উপায় নাই, আর্ত্তকে অভয় দিতে আমি অক্ষম, অত্যাচার-কারীদের অত্যাচারের প্রতিবিধানচেষ্টা আমার সাধ্যাতীত! এই জীবন? এই ক্ষত্রিয়ের—সবলের—পুরুষের জীবন এই? এমনই চিরশৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহপালিত জীবের মত ক'রে তুমি আমার চিরজীবী রাখতে চেয়েছিলে? হায় রে নারীর স্নেহ! এমন নির্বীর্য্য নিরীহ ভালবাসার পাত্র হওয়ার চাইতে শতবার মৃত্যু ভাল, সহস্রবার মৃত্যু ভাল!"

"মহাকুমার!"—এ যেন কাহার কণ্ঠে কে কথা কহিল! বোধ হইল, অতিদূর-দূরান্তর হইতে যেন কাহার চির-অপরিচিত আসিতেছে। কিন্তু সে কথা শেষ হইল না, রামপালদেব তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি বেদনা-তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "মহাকুমার? না না, তুমি আর রামপালকে ও হাস্তাস্পদ নামে সম্বোধন করো না মহাদেবি, ও অভিধান যে আমার কত বড় মিথ্যা, সে কথাটা তোমার চেয়ে আর কেউ বেশী ক'রে জানে না। তবে এ ব্যঙ্গ অভিধানে কেন অভিহিত ক'রে আমায় অপমানের উপর অপমান এবং অহেতুক মিথ্যাকে প্রশ্রয় প্রদান করছ? মহাকুমার! মহাকুমার রামপালদেব তার মর্ম্মপীড়িত পিতৃ-প্রজার কাতর আবেদনে বধিরের মত নীরব থেকে, তাদের তীব্র বেদনায় সম্পূর্ণ ঔদাস্ত দেখিয়ে ফিরে এসে—ফিরে এসে—উঃ, এ কি অভিশপ্ত জীবনই আমার তৈরী ক'রে দিলে, মহাদেবি! তুমি কি এই সহস্রের ধিক্কৃত, কর্ত্তব্যপালনের অসমর্থতায় ক্ষাত্রধর্ম্মবিচ্যুত, ভগ্নহৃদয় রামপালকে শুধু তার ভাইএর দ্বারে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে দেখেই সুখী হ'তে পারবে ভেবেছিলে? তার যে এতে কি হবে, সে এতটাই সইতে পারবে কি না, সে কথাটা কি একবারের জন্তও ভেবে দেখনি? তুমি এত বড় নিষ্ঠুর?"

মহাদেবী এবার কথা কহিলেন, এবার সেই চিরস্থির, শান্ত, সহজ স্বরেই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় কথা কহিলেন। এই কণ্ঠ—এই স্বর তাঁহার একান্ত স্বাভাবিক ও নিজস্ব।

"মহাকুমার! আজ হ'তে তুমি সর্ব্বতোভাবেই প্রতিজ্ঞামুক্ত!"

এ কথায় রামপালের মুখ এক নিমিষের জন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার ঘন মেঘাক্রান্ত সুগৌর প্রশস্ত ললাট প্রভাত-পূর্ব্বাকাশের মতই মুহূর্ত্তকাল দীপ্ত-শ্রীমণ্ডিত দেখাইল; কিন্তু তাহা ক্ষণমাত্র। উষার নির্ম্মল-শ্রীমণ্ডিত গগনপটকে যেমন অতর্কিতভাবে সহসা শরতের মেঘখণ্ড আসিয়া আড়াল করিয়া দেয়, তেমনই করিয়াই তাঁহার সেই মুহূর্ত্তের আনন্দ-জ্যোতিকে পরক্ষণেই একখানা করাল দুশ্চিন্তা-মেঘ আসিয়া ম্লান করিয়া দিল। তিনি শুষ্ক কঠিন নিরানন্দ স্বরে উত্তর করিলেন, "তা আর হয় না, মহাদেবি! আমি কি তোমার হাতের পাশা যে, ইচ্ছা করলেই আবার তুমি ফিরিয়ে তুলে নেবে? যে তীর তূণ থেকে বেরিয়ে গেছে, সে আর শত চেষ্টাতেও তোমার তূণীরে এসে প্রবেশ করতে

মহাদেবী এ কথায় একটুও বিচলিত হইলেন না, শান্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই এর খণ্ডন হবে। কি বল মহাকুমার ?"

মহাকুমার ক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া পরক্ষণে স্তব্ধভাবে একান্ত ম্লান মুখে মাথা নাড়িলেন ; কহিলেন, "তাও কি কখন হয় ? হয় আমার, না হয় তাঁর—এর এক জনের মৃত্যু না ঘটলে আর এর খণ্ডন নেই।" বলিয়াই তিনি একটা অগ্নিগর্ভ সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

মহাদেবীর আয়ত সুন্দর নেত্র অকস্মাৎ অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তবে তাই হোক ! হয় তুমি, না হয় তিনি, এর এক জনই না হয় মর।"

রামপালদেব এবার হাসিয়া উঠিলেন, ভূমিকম্পের পূর্ব্বে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে গলিত, স্খলিত, তরল গৈরিক-নিঃস্রাব যেমন ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া ভূপৃষ্ঠ বিদারণ করিতে ফেনাইয়া উঠে, ভীষণ ঝটিকাকালে উন্মত্ত সমুদ্রতরঙ্গ যেমন সর্ব্বনাশী হাসি হাসিয়া আবর্ত্তে পতিত ভয়ার্ত্ত আরোহিবর্গের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদকে ডুবাইয়া দিয়া অসহায় পোতকে আক্রমণ করে, উন্মত্ত অগ্নিশিখা যেমন চণ্ড হাস্যসহকারে সমগ্র গ্রামকে নিজের ক্ষুধিত জঠরমধ্যে গ্রাস করিতে থাকে, তেমনই উন্মত্ত, তেমনই জ্বালাময় হাসি হাসিয়া রামপাল কহিলেন, "তবে আমাকেই এবার মরতে দাও, কারণ, তাঁকে মারবার অধিকার ত আমার হাতে তুমি রাখনি ?"

মহাদেবী কহিলেন,—অতি শান্ত, স্থিরস্বরেই কথা কহিয়া বলিলেন, "না, তোমার হাতে রাখিনি, কিন্তু আমার হাতে ত আছে। আমিই তোমার পথ মুক্ত ক'রে দেব।"

অকস্মাৎ বিনামেঘের বজ্রাঘাতে সমস্ত বিশ্ব যেন একই কালে বিহ্বল হইয়া পড়িল। পৃথিবীর সচলতা অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গিয়া তাহার মাধ্যাকর্ষণশক্তির বুঝি শেষ হইয়া গেল। রামপালের বোধ হইল, তিনি যেন শূন্যপথে উড়িয়া যাইতেছেন, পৃথিবীর মাটীর সঙ্গে যেন আর তাঁহার কোনই যোগ নাই। উঃ, অত বড় গুরুভার—সে যে এই লঘুত্বের কাছে ভাল ছিল রে। তখন কোনমতে একটু শ্বাস লইয়া তিনি সেই অপরিবর্ত্তিত-মূর্ত্তি, শান্তশ্রী নারীর সহিষ্ণু মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি করিলেন, তাহারই উদ্দেশ্যে কোন কিছু বলিতে গেলেন, কিন্তু কণ্ঠ তাঁহার স্বরোচ্চারণের সহায়তাটুকুও করিল না।

মহাদেবী তখন পুনশ্চ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "এ দিনের প্রজা-নায়ককে শুধু একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। তার পর, সব ভার আমার -"

ততক্ষণে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া রামপালদেবও শান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না, কোন ভারই তোমার নয়। মহাদেবি! মা আমার! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর। আমি জানি, আমার পাষণ্ডাধম ভাইয়ের প্রতিও তোমার ভালবাসার অন্ত নাই। তা ভিন্ন আমি তোমার কারুর জন্য, কারও কোন স্বার্থের জন্য—তা সে যত বড়ই সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য হোক না কেন, স্বামিহন্ত্রী হ'তে দেব না। সীতা-সাবিত্রীর পাশে তোমার স্থান হোক, বরং আরও ঊর্দ্ধ-গামিনী হও। সতীধর্ম্ম আর রাজধর্ম্ম ঠিক এক নয়, তাই স্বার্থের বশে অখ্যাতি—কু-যশের ভয়ে তোমার রূঢ়বাক্য প্রয়োগ ক'রে ফেলেছি, কিন্তু আমার ধর্ম্মে আজ আঘাত পড়েছে বলেই তোমার ধর্ম্মে আঘাত দিয়ে তার শোধ তুলে নেবো, তত বড় নীচ তোমার প্রতিপালিত সন্তান নয়, এও তুমি জেন, মা।"

এই বলিয়া আর কিছুই না বলিয়াই রামপালদেব স্তব্ধ নিশ্চল মহাদেবীর পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক অতি দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কবির উত্তর

"তোর যে কবি বয়স হলো
ধর্‌লো জটায় পাক।
শেষ বেলাতে কাজ ক'রে যা,

কবি—

"আমি যে রে চির-তরুণ গান গাওয়া মোর পেশা,
আসছে মরণ করতে বরণ যায়নি তবু নেশা।"

এক্স-রে (X-Ray) বা রণ্টগেন-রশ্মি

বিগত শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য আবিষ্কার—সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রণ্টগেনের এক্স-রে। খৃষ্টীয় ১৮৯৫ অব্দে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার সাহায্যে মানুষ এখন বহু অস্বচ্ছ জিনিষের ভিতর দিয়া অন্য পদার্থ দেখিতে পাইতেছে। এই আলোক সহজে কাগজ, চর্ম্ম এবং মানুষের শরীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে। য়্যালুমিনিয়াম্ প্রভৃতি লঘু ধাতুর ভিতরেও ইহার অবাধ গতি।

রণ্টগেন তাঁহার পরীক্ষাগারে এক দিন একটি বায়ুশূন্য কাচের বোতল লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এই অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্পন্ন আলোক আবিষ্কার করেন। এই বোতলটির দুই পার্শ্বে দুইটি প্লাটিনামের তার এবং প্রত্যেক তারের বোতলের ভিতরের দিকের মুখে একখানি করিয়া পাতলা এবং ছোট ঐ ধাতুরই তৈয়ারী চাকৃতি ছিল। এইরূপ বায়ুশূন্য নলের ভিতর গুরুচাপযুক্ত বিদ্যুৎধারা চালিত করাইলে কি ব্যাপার ঘটে, নিম্নে তাহার বিবরণ দিতেছি।

আধুনিক পরীক্ষা দ্বারা জে, জে, টম্‌সন্, ক্রুক্‌স্, রাদারফোর্ড প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন যে, তাড়িত-স্রোত বহু অতি সূক্ষ্ম তাড়িতকণা বা ইলেক্ট্রনের সমষ্টি। এই ইলেক্ট্রন কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন প্রকার পদার্থের অতিরিক্ত একটি চতুর্থ প্রকার পদার্থ। প্রতি ইলেক্ট্রন একটি সূক্ষ্ম ঋণাত্মক (negative) তাড়িতকণা। প্রত্যেক য়্যাটম্ (atom) বা পরমাণু একটি অতি ক্ষুদ্র সৌর জগতের ন্যায়। ইহার মধ্যস্থ কেন্দ্রিক পদার্থের নাম প্রোটন অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ধনাত্মক (positive) তাড়িতকণা। ইহার চতুর্দ্দিকে ইলেক্ট্রনগুলি সতত প্রবলবেগে ঘুরিতেছে। জগতের সমস্ত পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ করিতে গিয়া শেষকালে এই সকল ইলেক্ট্রন ও প্রোটনে পৌঁছিতে হয়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কোন মূল পদার্থ (element) বা তাহার য়্যাটম্ অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহারিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে, এক মূলপদার্থ অন্য মূলপদার্থে পরিণত হইতে পারে। এই ক্রিয়ার নাম "ডিস্-ইন্টিগ্রেশন" (dis. integration)। প্রকৃতিতে এই ক্রিয়া সততই হইতেছে। কিন্তু ইহা এখনও মানবের করায়ত্ত হয় নাই। এই ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এখন সাধনা করিতেছেন। এই সাধনা সফল হইলে ধূলিমুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করা বা কাষ্ঠখণ্ডকে হীরকখণ্ডে পরিণত করা আর মানুষের অসাধ্য থাকিবে না।

যাহা হউক, এই তাড়িত স্রোতের সূক্ষ্মকণিকা অর্থাৎ ইলেক্ট্রনগুলি প্রবলবেগে ভ্রমণ করে এবং এই ভ্রমণের কালে ইহারা ঐ বায়ুশূন্য বোতলের প্লাটিনামের তারের ভিতর দিয়া এত ভীষণ গতিতে গমন করে যে, তাহার ফলে তাড়িত স্রোতের ইলেক্ট্রনের সহিত প্লাটিনামের তারের সংঘর্ষ হইয়া তাপ এবং আলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধ্যাপক রণ্টগেন কর্ত্তৃক বহু শূন্য কাচগোলকে ব্যবহৃত এই প্লাটিনাম তার একটি অবিভক্ত লম্বা তার নহে। ইহার দুই দিকে দুইটি তার, তাহাদের মুখে ছোট চাকৃতি এবং মধ্যে ফাঁক। সে জন্য যখন এইরূপ নলে বিদ্যুৎ চালাইয়া দেওয়া হয়, তখন বহুসংখ্যক ইলেক্ট্রন ভয়ঙ্কর গতিতে ঋণাত্মক তার বা ক্যাথোডের (Cathode) য়্যাটমগুলিতে ধাক্কা দিয়া অগ্রসর হইয়া চাকৃতিতে পৌঁছায়। এখন ঋণাত্মক (ক্যাথোড) ও ধনাত্মক (য়্যানোড) তারের ভিতর দিয়া যে ফাঁক আছে, তদ্দারা এই ইলেক্ট্রনগুলির গতি বাধা পায়। কিন্তু ইহারা থামিতে পারে না। কারণ, আবার বহুসংখ্যক ইলেক্ট্রন পশ্চাদ্দিক্ হইতে ইহাদিগকে ঠেলিতে থাকে। ফলতঃ ক্যাথোড চাকৃতি হইতে ইলেক্ট্রনগুলি প্রবলবেগে বাহির হইয়া য়্যানোড চাকৃতিতে উপনীত হয়। এই ক্রিয়া দ্বারা একরূপ আশ্চর্য্য আলোক উৎপন্ন হয়। এই আলোক অতি চমৎকার রঙ্গীন আভা বিকীর্ণ করে এবং য়্যানোডের পাশে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়। নল যদি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়, তবে স্তরগুলি লুপ্ত হইয়া এক প্রকার চমৎকার সবুজাভ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়। এক্ষণে এই সবুজ জ্যোতিঃতেই "এক্স-রে" উৎপন্ন হয় এবং ক্যাথোডের পাশে কোণাকুণিভাবে একটা প্লাটিনামের পাত রাখিয়া তাহাতে উক্ত রশ্মিগুলি প্রতিফলিত করিয়া ইচ্ছানুযায়ী অন্য বস্তুর উপর পাতিত করা যায়।

অধ্যাপক রণ্টগেন এখন এই নল লইয়া অন্যান্য পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ এইরূপ রশ্মি উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। একখানা আবৃত ফটোগ্রাফের প্লেট দৈবক্রমে নিকটে ছিল; উহা এই আলোক-রশ্মির প্রভাবে, খোলা অবস্থায় সাধারণ আলোকে রাখিলে যেরূপ হইত, সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, কোন অজ্ঞাত 'বি-কিরণের' দরুণ এইরূপ হইয়াছে এবং ঐ 'বি-কিরণের' স্বরূপ তখনও জানা যায় নাই বলিয়া উহার নাম দিলেন "এক্স-রে" অর্থাৎ অজ্ঞাত রশ্মি। প্রথমতঃ অধ্যাপক রণ্টগেন একখানা আলোকবিকিরণ-কারী পর্দ্দার সাহায্যে উহার প্রভাব পরীক্ষা করেন। তাহার পর তিনি এই আলোক এবং পর্দ্দার মাঝে মাঝে অনেক দ্রব্য ক্রমান্বয়ে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই আলোক ঐ সমস্ত পদার্থ ভেদ করিতে সমর্থ হয় কি না। দেখা গেল যে, মাত্র কয়েকটি পদার্থ ছাড়া সকলগুলির ভিতর দিয়াই আলোক প্রবেশ করিল। আলোকরশ্মির পথে তাঁহার হাত রাখিয়া তিনি হাতের হাড়ের পরিষ্কার চিত্র এবং সমস্ত হাতের অস্পষ্ট চিত্র পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত দেখিলেন। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, এই নূতন আলোক মনুষ্য-শরীরের অস্থিময় অংশ ছাড়া অন্য সমুদয় অংশ ভেদ করিতে সমর্থ। চিকিৎসাবিদ্‌রা এই রশ্মির এই গুণ বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা মানবশরীরের মধ্যে কোন বহির্দ্দেশস্থ পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে অথবা কোন ভগ্ন অস্থির স্বরূপ পরীক্ষা করিতে পারেন। এইরূপে রণ্টগেন-রশ্মি চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিয়া মানবের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

প্রভাতের তারা

অনাদিকালের তুমি জ্যোতির্ম্ময় উষা-সহচর
হে প্রভাতী নক্ষত্র মহান্!
অনন্ত আনন্দলোকে বাঁধিয়াছ চিরন্তন ঘর
শিখিয়াছ সুদূরের গান!
তামসী শর্ব্বরী-শেষে চাহি দূর পূর্ব্বাকাশ পানে
ভেঙ্গে যায় যবে ঘুমঘোর;
মনে হয় তোমা আমি জন্মে জন্মে হেরিয়াছি ধ্যানে
প্রভাতের ওগো বন্ধু মোর!
আনন্দে আমারে ঘিরি' ফুটে উঠে তরুণ জগৎ—
রহস্যের উষার আলোক!
ইঙ্গিতে দেখাও তুমি দূর নভঃ স্বরগের পথ,
যেথা নাই কোন দুঃখ-শোক!
সমাহিত চিত্ত তব ধ্যানোজ্জ্বল নয়ন তোমার—
প্রভাতের হে ঋষি-প্রবর!
মৌন আরাধনে তুমি আবাহন কর মহিমার—
বুঝি সেই সবিতার কর!
তার পরে আলোকের সীমাহীন সমুদ্রের তলে
ডুবাইয়া দাও আপনারে।
কোন্ গূঢ় নভোলোকে তব জ্যোতির্দীপশিখা জ্বলে
মর্ত্ত্য হ'তে কে বলিতে পারে?
তুমি কে, জানি না কিছু কোথা তুমি কর হে প্রয়াণ
তা-ও আমি চাহি না বুঝিতে।
আনন্দের জ্যোতি তুমি এইমাত্র জানি হে মহান্
দুঃখ তোমা পারে না বুঝিতে!

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যবে সিন্ধুতীরে ব্রহ্ম-ঋষিগণ
রহিতেন সমাধি-মগন।
তুমি কি তাঁদের ধ্যান দূর হ'তে করি নিরীক্ষণ
করিয়াছ শান্তি বরিষণ?
মহাঋষিদের সেই শুভব্রত সাধনার স্মৃতি
তার মাঝে পাই হে তারকা!
তাঁদের সে মহাপ্রাণ, সর্ব্বজীবে সুকল্যাণ প্রীতি
তব চক্ষে দেয় যেন দেখা।
আলো-অন্ধকার যবে মিশে এক মিলনের তীরে
পাপ-পুণ্য হয়ে যায় শেষ!—
সেই মহাসন্ধিক্ষণে আকাশের সুপ্তলোক চিরে
তুমি এস ধরি পূর্ণ বেশ!
উষার উদয়-লক্ষ্মী যেই সুধা করে বিতরণ
আলোকের স্বর্ণময় থালে;—
সে অমৃতপাত্র হ'তে এক বিন্দু করি আহরণ
দিও তুমি আমার সকালে।
তার পরে আর কিছু মাগিব না ধূলির জগতে
দিবসের তাপ-দগ্ধ ঘরে!
মোর দুঃখ, মোর দৈন্য যদি ওই সুদূরের পথে
নিয়ে যাও তুমি আজ হ'রে!
তুমি নহ মর্ত্ত্যবাসী জানো নাকো হেথাকার জ্বালা
স্বরগের হে সখা আমার!
মোরে তুমি নিয়ে যাও পরাইতে নন্দনের মালা
ওই দূর আনন্দের পার!

গাথা-সপ্তশতী

শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল ইতিহাস রচিত হইত, তাহাতে রাজাদিগের কার্য্যকলাপ, রাজ্যশাসনপ্রণালী ও সন্ধি-বিগ্রহাদির বিবরণ ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিত না; সুতরাং তাহাদিগকে মোটামুটি রাজনৈতিক ইতিহাস বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালে আমরা ঐতিহাসিকের নিকট উল্লিখিত বিষয়গুলির বিবরণ ছাড়া মানব-সমাজের আচার-ব্যবহারের এবং আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বা অবনতির বিবরণও প্রত্যাশা করি।

বলা বাহুল্য যে, এই উদারার্থক ইতিহাসের সমগ্র উপকরণ কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থে বা রাজকীয় কাগজ-পত্রে আবদ্ধ নহে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের মানব-সমাজের রীতি-নীতি-সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তত্তদ্‌যুগের সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা যায়। গ্রীকদিগের প্রাগৈতিহাসিক "বীরযুগের" (Heroic age) আচার-ব্যবহার ও লোক-চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা কেবল প্রতীচ্যের কবিগুরু হোমারের প্রসাদাৎ।

এমার্স‌ন্ বলেন যে, রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস হইতে রোমান্‌দের সম্বন্ধে যত না জানা যায়, হরেস্, জুভিন্যাল্ প্রভৃতি রোমান্ কবিদিগের কাব্য পাঠ করিলে তদপেক্ষা বেশী জানা যায়।

চসারের Canterbury Tales নামক বিচিত্র চিত্রশালিকায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংরাজ-জীবনের বিবিধ চিত্র কিরূপ সুনিপুণ হস্তে অঙ্কিত ও সজ্জিত! ষোড়শ শতাব্দীর নবোত্তমপূর্ণ ইংরাজ-চরিত্রও মহাকবি সেক্ষপীয়রের অমর নাট্য-মুকুরে কিরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত!

মধ্যযুগের আরব রীতি-নীতি তৎকাল-রচিত আরব্য উপন্যাসে সমুদ্ভাসিত। সেখ সাদির নীতি-কাব্য হইতেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পারসীক জীবনের কত কথা জানা যায়।

কবিকঙ্কণের রসময়ী লেখনীর গুণে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-জীবনের একখানি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ছবি পাইয়াছি।

সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি হইতেও আমরা আমাদের জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃত কবিগণ রাজানুগ্রহাপেক্ষী ছিলেন বলিয়া সচরাচর নগরে বাস করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের রচনা হইতে গ্রাম্যজীবনের ছবি পাইবার বড় একটা আশা নাই।

ন্যূনাধিক দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে হাল নামক জনৈক কবি (তিনি রাজা সাতবাহন বলিয়াও খ্যাত) 'দেশী' নামক প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার নিজের ও অন্যান্য কবির রচিত সাত শত শ্লোক একত্র গ্রথিত করিয়া "গাথা-সপ্তশতী" নামে প্রচার করেন। গ্রাম্য কবিতা হইতে মধ্যভারতের গ্রাম্য-জীবনের অনেক কথা জানিবার বিশেষ সুবিধা—ইহা বলা বাহুল্য। ষাট বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অধ্যাপক বেবর (Weber) সর্ব্বপ্রথম এই প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহের প্রতি বুধগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু আমি যত দূর জানি, কেহই এ পর্য্যন্ত এই অমূল্য শ্লোকসংগ্রহ হইতে প্রাচীন গ্রাম্য-জীবনের তথ্য সঙ্কলনের চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং আমি এই অভাব পূরণের যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। গাথা-সপ্তশতীর অধিকাংশ শ্লোক আদিরসঘটিত, পরস্পরের সহিত অসম্পৃক্ত এবং ধারাবাহিক বর্ণনাবিহীন। এরূপ স্থলে মৎসংগৃহীত ছবিগুলি অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ, এ কথা বলাই বাহুল্য।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরের সুবিখ্যাত "নির্ণয়-সাগর" প্রেসে মুদ্রিত ও উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশিত "গাথা-সপ্তশতী" অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে যে যে স্থলে কোনও শ্লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা উক্ত মুদ্রিত পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"গাথা-সপ্তশতী"তে বর্ণিত—

নদীর নাম—গোদাবরী, নর্ম্মদা, তাপী (বর্ত্তমান তাপ্তী)।

পর্ব্বতের নাম—বিন্ধ্য।

ফুলের নাম—পদ্ম, কুসুম্ভ (কুসুমফুল), কুন্দ, সপ্তলা বা নবমালিকা, মালতী, শেফালিকা, কুরুবক, অশোক, মাধবী, মধুক, পলাশ, কদম্ব, পাটল, শিরীষ।

কর্ণদ্বয় ভূষিত করিতেন। (তৃতীয় শতক—৯৯ এবং চতুর্থ—২৩)

সুরূপা মালিনীরা ফুল বেচিত এবং ফুল দেখাইবার ছলে নিজের রূপ দেখাইয়া তরুণ গ্রাহকদিগকে আকর্ষণ করিত। (ষষ্ঠ শতক—৯৬, ৯৮)

ফল ও তরকারীর নাম—আম্র, কদলী, জম্বু, বিল্ব, কপিত্থ, করঞ্জ, কর্কটী।

পক্ষীর নাম—বক, কাক, শুক, শারিকা, ময়ূর, হংস, কুক্কুট।

পিঞ্জরাবদ্ধ গৃহপালিত পক্ষী—শুক, শারিকা। (তৃতীয়—২০, ষষ্ঠ—৫২, ৮৯)

অপর জীব-জন্তু—কৃষ্ণসার, হরিণ, হস্তী, ভল্লুক, সিংহ, কুকুর, বিড়াল, সর্প, গো, মহিষ, বানর, মাকড়সা, বৃশ্চিক, বরাহ, ভেক, ভ্রমর।

প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত কুকুরের বিশেষ উল্লেখ আছে। (সপ্তম—৬২)

ফসলের নাম—ধান্য (শালি), তিল, চণক, কার্পাস, ইক্ষু। সর্ষপের ও গোধূমের নাম নাই।

ইক্ষুরসে গুড় প্রস্তুত হইত; খেজুরিয়া গুড়ের উল্লেখ নাই। (ষষ্ঠ—৫৪)

অস্পৃশ্য জাতি দ্বারা খেজুররস সংগৃহীত হয় বলিয়া এখনও অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু খেজুরিয়া গুড় স্পর্শ করেন না।

কৃষক—বর্ষাকালে লাঙ্গল কাদায় বসিয়া যাইত বলিয়া হলিককে গুরু পরিশ্রম করিতে হইত। (চতুর্থ—২৪)

শরৎকালে ধানকাটা হইলে, কৃষক যথেষ্ট অবসর পাইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গান গাহিয়া মনের আনন্দ প্রকাশ করিত। (সপ্তম—৮৯)

কৃষক-কন্যা তখন তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা ধবলীকৃতা হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে সদ্যোত্থিতা লক্ষ্মীর ন্যায় রূপ ধারণ করিত এবং পথিকরা একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। (চতুর্থ—৮৮)

কৃষক যখন তাহার কর্দ্দমাক্ত ও কেবলমাত্র ক্ষীর বা জল দ্বারা সংবর্দ্ধিত শালিক্ষেত্রে জানু পাতিয়া বসিত, তখন বোধ হইত, যেন একটি পঙ্ক-মলিন ও দুগ্ধপোষ্য শিশু তাহার পিতার জানু ধরিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। (ষষ্ঠ—৬৭)

নারীগণ ("কলসগোপী"রা) রাত্রিকালে ধান্যক্ষেত্রে পাহারা দিত। (সপ্তম—৯১)

কালিদাসও রঘুবংশে এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন—"শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ।"

কোনও ফসলের জন্য ক্ষেত্র-কর্ষণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটি শুভদিনে লাঙ্গলে মঙ্গল আলেপন দেওয়া হইত। (দ্বিতীয়—৬৫)

বাড়ী-ঘর—গ্রাম্য-গৃহগুলি সম্ভবতঃ সমস্তই মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হইত—কোথাও ইষ্টকের উল্লেখ নাই। তৃণাচ্ছাদিত চালের খড়কুটা প্রবল ঝড় হইলে উড়িয়া যাইত। তখন বৃষ্টির জল গৃহমধ্যে অবাধে প্রবেশ করিত। (দ্বিতীয়—৭০)

গৃহের দেয়ালে মনুষ্যমূর্ত্তি ও রামায়ণাদির দৃশ্য চিত্রিত হইত। (তৃতীয়—১৭, প্রথম—৩৫)

গৃহস্বামী কত দিন প্রবাসে আছেন, তাহার হিসাব প্রভৃতি স্মরণীয় বিষয়ও গৃহভিত্তিতে অঙ্কিত রেখা দ্বারা সূচিত হইত। (তৃতীয়—৬, ৮)

প্রত্যেক বাটীর চতুর্দ্দিকে একটি সচ্ছিদ্র বৃতি ও বহির্দ্দেশে অভ্যাগতের অভ্যর্থনাদির জন্য একটি অলিন্দ (দাওয়া) নির্ম্মিত হইত। (তৃতীয়—২০, ৫৪)।

পর্ণকুটীরে আগুন লাগিলে মধ্যে মধ্যে গ্রামকে গ্রাম যে পুড়িয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? একটি শ্লোকে গ্রাম-দাহের এইরূপ বর্ণনা আছে:—ভয়ক্রস্ত জনসমূহ মহা কলরব করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া পলাইতেছে এবং ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি হইতেছে। (ষষ্ঠ—৩৫)

তখন দমকলের অভাবে অগ্নি-নির্ব্বাপনের চেষ্টা দুঃসাধ্য ছিল।

খাদ্য—বৈদিক সময়ে যেমন যবই প্রধান খাদ্য ছিল, সেইরূপ "গাথা-সপ্তশতী"-বর্ণিত সময়ে শালিধান্যই গ্রামবাসীদের জীবনের যষ্টিস্বরূপ ছিল। সে সময় আটা-ময়দার ব্যবহার থাকিলে ফসলের মধ্যে গোধূমের উল্লেখ থাকিত।

মৎস্য ও ধীবরের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয়, মনুর নিষেধবিধি অনুসারে সে সময় কেবল নিকৃষ্ট জাতিরাই মৎস্য ভক্ষণ করিত। প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে তাই দেখা যায়, দুর্ব্বৃত্ত শকার বারবধূ বসন্তসেনাকে "মচ্ছাশিনি" (মাছখাকী) বলিয়া গালি দিতেছে।

"গাথা-সপ্তশতী"র অনেকগুলি শ্লোকে ব্যাধের উল্লেখ

আছে; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তখন মৃগয়া-লব্ধ মাংসের অনেক খরিদ্দার ছিল।

দ্বিতীয় শতকের ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে কবি বলিতেছেন যে, শিখি-পিচ্ছাবতংসা ব্যাধবধূ গজমুক্তাময় আভরণে ভূষিতা সপত্নীগণের মধ্যে গর্ব্বভরে বেড়াইতেছে। বাস্তবিক সৌভাগ্যবতী সপত্নীদের দুর্ভাগ্যের প্রতি কবির কিরূপ তীব্র কটাক্ষ!

রূপসীদিগকেও নিজ পরিবারবর্গের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত। এক রূপসী রন্ধন করিতে করিতে তাঁহার মসীমলিন হস্ত দ্বারা গণ্ডদেশ স্পর্শ করায় তাঁহার চাঁদমুখে যে কালিমা পড়িয়াছিল, তাঁহার স্বামী উহাকে চন্দ্রের কলঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। (প্রথম—১৩)

আর এক রূপসী চুল্লীর ধূমায়মান অগ্নিকে মুখ-মারুত দ্বারা প্রজ্বালিত করিবার জন্য বহুক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন —"রন্ধনকর্ম্মনিপুণিকে! তোমার পাটল-ফুলের ন্যায় পাটলবর্ণ অধর হইতে বিনির্গত সুগন্ধি মুখমারুত উপভোগ করিতেছে বলিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না।" (প্রথম—১৪)

এরূপ গার্হস্থ্য চিত্র বড়ই মধুর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ চিত্র অতীব বিরল।

আমি সমগ্র "গাথা-সপ্তশতী"র মধ্যে শিশুজীবনের একটিমাত্র ছবি পাইয়াছি।

কোনও মানিনীর দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহার স্বামী অন্য উপায় না দেখিয়া, যেমনই তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন, অমনই তাঁহাদের শিশু পুত্রটি সুযোগ পাইয়া পিতার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। এই কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া মানিনী কোনও মতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না, এবং সেই হাসির সঙ্গে তাঁহার মানও কোথায় চলিয়া গেল। (প্রথম—১১)

রোগীর সেবায় নারী মূর্ত্তিমতী দেবী।

জনৈক পীড়িত কৃষকের সংবাদ লইতে আসিয়া তাহার প্রণয়িনী দেখিল, রোগী ঔষধ খায় নাই। তখন সে ঔষধে ফুঁ দিয়া তাহাতে এরূপ শৈত্য ও মধুরতার সঞ্চার করিয়া দিল যে, রোগী সেই কটু কাথ এক নিশ্বাসে নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল। ধন্য প্রেমের মহিমা! (চতুর্থ—১৭)

আর একটি গোপের আমরা একটি সজলক্ষা মহিলার

পরিচয় পাই। তিনি এক ভাগ্যবানের প্রিয়তমা স্ত্রী হইয়াও তাঁহার প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা দরিদ্রা প্রতিবেশিনীর সহিত সহানুভূতি প্রযুক্ত বসন্তোৎসবেও উৎসবোচিত বেশভূষা পরিহার করিয়াছিলেন। (প্রথম—৩৯)

"গাথা-সপ্তশতী"তে, "প্রাবরণ" নামক এক প্রকার গাত্রাবরণ বা চাদর ভিন্ন পুরুষের বেশভূষার কোনও উল্লেখ নাই। প্রাবরণই বোধ হয়, জনসাধারণের প্রধান শীতবস্ত্র ছিল। শীতনিবারণের আর এক উপায় ছিল ধূমহীন তুষের আগুন। (তৃতীয়—৩৮)

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ—উত্তরকালের সংস্কৃত কাব্যে "নিচোল" (ঘাগরা) নামক যে স্ত্রী-পরিচ্ছদ এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, "গাথা-সপ্তশতী"তে তাহার নাম নাই। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, উক্ত স্ত্রী-পরিচ্ছদ তখন জনসাধারণে—অন্ততঃ গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত হয় নাই। তখন নারীগণ শাটী বা শাড়ী (দেশী নাম—"সাউলি") পরিতেন। এই বস্ত্রের আর একটি সংস্কৃত নাম "সিচয়।" (দেশী নাম—"সিচঅ")। ইহা সচরাচর নীলবর্ণে রঞ্জিত হইত—বোধ হয়, নীলবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন অবিকৃত থাকে বলিয়া। (ষষ্ঠ—২০)

কিন্তু উৎসবকালে (বিশেষতঃ মদন বা বসন্তোৎসবে) সমস্ত স্ত্রী-পরিধেয় কুসুম্ভ বা কুসুমফুল হইতে প্রাপ্ত লাল রঙ্গে ছোবান হইত। (চতুর্থ—২৮)

কেবল কটিদেশে মাত্র আবদ্ধ শাটী যখন সময়ে সময়ে বাত্যায় আন্দোলিত হইত, তখন উহা দ্বারা স্ত্রীলোকের লজ্জা নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠিত। (ষষ্ঠ—৭, সপ্তম—৫)

ধনাঢ্যরা অনেক সময় পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। (ষষ্ঠ—২০)

স্ত্রীগণের বক্ষঃস্থল কঞ্চুক (কাঁচুলি) দ্বারা আবৃত থাকিত। কঞ্চুকের দুই পার্শ্বে দুই আঙ্গুল চৌড়া "কপাট" বা বন্ধনীযুক্ত ফাঁক থাকিত। উক্ত বন্ধনীর সাহায্যেই পরিচ্ছদটি সহজে আঁটিতে বা খুলিতে পারা যাইত। (সপ্তম—২০)

কঞ্চুক সচরাচর নীলবর্ণে রঞ্জিত হইত, কিন্তু মদনাদি উৎসবে কুসুমফুলের রঙ্গ ব্যবহৃত হইত। (চতুর্থ—১৫, সপ্তম—২০, ষষ্ঠ—৪৫)

অলঙ্কারের নাম—কণ্ঠিকা (গলার হার) (প্রথম—৭৫, পঞ্চম—৪৬) । জাল-বলয় (আওয়াজদার বালা) (প্রথম—৮০) বলয় (বালা সধবার চিহ্ন) (পঞ্চম-৯১, ষষ্ঠ—৭৯) । কুণ্ডল (পঞ্চম—৪৬) । উরোহার (পঞ্চম—২৯, সপ্তম—৬৯) মেখলা (পঞ্চম—৬৬, নূপুর (দ্বিতীয়—৮৮) ।

নারীগণ তখন পদযুগল লাক্ষা-রসে রঞ্জিত করিতেন। (পঞ্চম—৬৪)

তাম্বূলের নাম-গন্ধ নাই । সে সময়ে যদি তাম্বূল ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে সাত শত শ্লোকের মধ্যে (যন্মধ্যে অধিকাংশই আদিরস-ঘটিত) কোথাও না কোথাও "স্ত্রী-মুখ-ভূষণ" তাম্বূলের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। নাগানন্দের তৃতীয় অঙ্কে তাম্বূল ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই।

রমণীগণ কপালে তিলক (ফোঁটা) কাটিতেন এবং চক্ষুতে কাজল পরিতেন। (দ্বিতীয়—৭৯, ৫৩)

একটি শ্লোকে সিন্দুরেরও উল্লেখ আছে। (তৃতীয়—১০০)

চন্দনের প্রলেপ স্ত্রী-পুরুষে ব্যবহার করিতেন (তৃতীয়—৮৮), রমণীগণ তাঁহাদের মস্তকের কেশ সুবাসিত করিতেন এবং গন্ধ-চূর্ণ ব্যবহার করিতেন। (ষষ্ঠ—৭২, চতুর্থ—১২) তাঁহারা শীতকালে অধরে মোম লেপন করিতেন। (পঞ্চম—৫৮)

রাজশেখর-কৃত 'কর্পূরমঞ্জরী'র প্রথম অঙ্কেও এই প্রথার উল্লেখ আছে। রমণীগণ নদ্যাদিতে প্রকাশ্যভাবে দুইবার স্নান করিতেন—একবার পূর্ব্বাহ্ণে এবং দ্বিতীয়বার অপরাহ্ণে। (পঞ্চম—৭৩)

স্ত্রীলোকরা দেহমার্জ্জনার জন্য "স্নান-হরিদ্রা" ব্যবহার করিতেন। (প্রথম—৮০, তৃতীয়—৪৬)। পুরুষরা সেই উদ্দেশ্যে "জম্বূকবার" ব্যবহার করিতেন। (দ্বিতীয়—৮৯)।

করঞ্জাদি বৃক্ষের ক্ষুদ্র প্রশাখা ভাঙ্গিয়া দন্তধাবনের জন্য দাঁতন প্রস্তুত হইত (দ্বিতীয়—৬৭)। রামায়ণেও দাঁতনের উল্লেখ আছে।

শয্যা—রাত্রিযাপনার্থী পথিককে শয়নার্থ তৃণ-শয্যা দেওয়া হইত। (চতুর্থ—৭৯)। সম্ভবতঃ গ্রামবাসীরা সচরাচর তৃণ বা খড়ের শয্যায় শয়ন করিত। আমরা ফ্রুডের ইতিহাস হইতে জানিয়াছি যে, অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালেও ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের শয্যা ঐরূপ ছিল।

ভদ্রমহিলাদিগকে লোক তখন "অজ্জা" (আর্য্যা) বলিত। নারীগণ সুরাপান করিতেন। (দ্বিতীয়—৯৭, ৭০, ষষ্ঠ—৪৩, ৫০)।

নটীগণ অভিনয়কালে মুখে হরিতাল মাখিত। (প্রথম—৯)। হরিতালের একটি আভিধানিক নাম "নটভূষণ"।

স্বামীর পাদ-প্রক্ষালন স্ত্রীর নিত্যকর্ম্ম ছিল। (দ্বিতীয় - ৩৩)

দোহদ—গর্ভিণীর মনের সাধ পূরণ করার প্রথা সেকালেও খুব প্রচলিত ছিল। জনৈক দরিদ্রের স্ত্রী, গর্ভাবস্থায় তাঁহার কি খাইতে ইচ্ছা করে,—এই প্রশ্নের উত্তরে দরিদ্র স্বামীর মান রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"জল"। (পঞ্চম—৭২)।

আর এক প্রেমময়ী আপন্নসত্ত্বা, উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামীর সঙ্গই তাঁহার একমাত্র মনের সাধ। (প্রথম—১৫)

সে-কালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কোনও কোনও পুষ্প-বৃক্ষেরও দোহদ সম্পন্ন না হইলে কুসুমোদ্গম হইবে না। এই ব্যাপারে বরবর্ণিনীদের সাহায্য অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত ; যথা—কুরুবকের দোহদ কোনও সুন্দরী বৃক্ষটিকে যথাসময়ে আলিঙ্গন করিয়া সম্পন্ন করিতেন এবং অশোকের দোহদ তাঁহার পাদপ্রহার-সাপেক্ষ ছিল। (প্রথম—৬, ৭)

উল্লিখিত কবিসময়প্রসিদ্ধির উল্লেখ সাহিত্যদর্পণাদি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থে আছে।

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "সজ্ঞানে তীরস্থ" করার প্রথা তখনও ছিল। প্রবলা প্রবৃত্তি মৃত্যুকালেও প্রবলা থাকে, ইহার উদাহরণস্বরূপ একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক মুমূর্ষু নারী পবিত্র তাপীতীরে নীতা হইয়া স্বীকার করিয়াছিল যে, তখনও তাহার দৃষ্টি তাহার পূর্ব্বতন কেলি-কুঞ্জে ধাবমানা। (তৃতীয়—৩৯)

স্ত্রীলোকের বামাক্ষির স্পন্দন শুভ-সূচক বলিয়া গণ্য হইত। (দ্বিতীয়—৩৭)

নারী-লিখিত প্রেম-লিপির উল্লেখ—কোনও সীমন্তিনীকে তাঁহার প্রিয়সখী একখানি প্রণয়পত্র লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিতেছেন—"সখি ! আমার কম্পমান ও স্বেদক্লিন্ন করাঙ্গুলী দ্বারা ধৃত লেখনীটি লেখ্যমার্গ হইতে স্খলিত হইতেছে বলিয়া দ্বিবর্ণ 'স্বস্তি' কথাটিও সমাপ্ত করিতে পারিতেছি না, কি লিপি লিখিব ?" (তৃতীয়—৪৪)

উপরে উদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাই যে,

হইয়া আসিতেছে (এ প্রসঙ্গে মুদ্রারাক্ষসের পঞ্চমাঙ্ক ও বেণী-সংহারের চতুর্থাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। নারী-লিখিত প্রেম-লিপির উল্লেখ হইতে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, অন্ততঃ কোনও কোনও রমণী লিখিতে জানিতেন, যদিও অনেকেই গৃহভিত্তিতে রেখা টানিয়া স্মারক-লিপির কার্য্য সমাধা করিতেন। (তৃতীয়—৬, ৮)

সে কালের পুরুষরাও অনেকে অশিক্ষিত ছিলেন। একটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বর্ণকার যেমন তাহার নিরক্ষরা (অর্থাৎ অক্ষরেখারহিতা) নিক্তিটিকে স্কন্ধে বহন করে, সেইরূপ অনেক নিরক্ষর ব্যক্তিকেও লোক স্কন্ধে বহন করে, অর্থাৎ তাহারা মূর্খ হইয়াও লোকের উপর প্রভুত্ব করে। (দ্বিতীয়—৯১)

বাদ্যযন্ত্রের নাম—মুরজ (পাখোয়াজ) (তৃতীয়—৫৩)
বংশ (ষষ্ঠ—৫৭)
বীণা (ষষ্ঠ—৬০)
তূর্য্য (ষষ্ঠ—৩৫)
পটহ (সপ্তম—৮৫)

মুরজের ধ্বনিকে মন্দ্র করিবার জন্য উহার দুই মুখে প্রলেপ দেওয়া হইত—সম্ভবতঃ পিষ্টাতকের। (তৃতীয়—৫৩)

এখনকার ন্যায় তখনও ঢাক বাজাইয়া রাজাজ্ঞা প্রচার বা ঘোষণা করা হইত। (সপ্তম—৮৫)

নারীগণ ভিক্ষুকদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দিতেন। (দ্বিতীয়—৬২)

পথিকদের পিপাসা-শান্তির জন্য স্থানে স্থানে প্রপা (পানশালা) স্থাপিত হইত। প্রপা-পালিকা উপরে দাঁড়াইয়া জল ঢালিত ; পথিক সেই জল অঞ্জলিপুটে ধরিয়া পান করিত। (দ্বিতীয়—৬১)

ধর্ম্ম—"গাথা-সপ্তশতী"র প্রথমে ও শেষে হরগৌরীর উদ্দেশে কৃত মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কবি হাল শৈব ছিলেন। একটি শ্লোকে (প্রথম—৬৪) একটি জীর্ণ শিব-মন্দিরের এইরূপ বর্ণনা আছে—মন্দিরটির চূড়ার ত্রিশূলটি কেবল অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে—তাহার চতুর্দ্দিকে কতিপয় পারাবতের কূজন শুনিয়া মনে হয়, যেন কোনও শূল-রোগী ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। অন্যত্রও দেব-মন্দিরের ("দেবকুলের") উল্লেখ আছে।

নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত স্তবটি হইতে অনুমিত হয় যে,সে সময়ে বৈতালিকগণেরও তেমন প্রচলন ছিল না।—

"সেই বিষ্ণুকে প্রণাম কর, যাঁহার বক্ষঃস্থলে সূর্য্য-সন্নিভ কৌস্তভ-রত্নে লক্ষ্মীদেবীর অকলঙ্ক শশিমুখখানি প্রতিবিম্বিত।" (দ্বিতীয়—৫১)

কাপালিকার উল্লেখ—জনৈক কাপালিকা গায়ে চিতা-ভস্ম লেপন করিতেছে। (পঞ্চম—৮)

বৌদ্ধভিক্ষুর উল্লেখ—রক্তাম্বর-পরিহিত বৌদ্ধভিক্ষু-সঙ্ঘ বুদ্ধের চরণবন্দনার্থ ভূতলে পড়িয়া ধরাতলকে যেন শুকমুখের ন্যায় রক্তবর্ণ পলাশকুসুমে আচ্ছন্ন করিয়াছে। (চতুর্থ—৮)

গ্রামণী বা পল্লীপতি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা কর্ত্তা ছিলেন। এক জন পল্লীপতি মৃত্যুকালে পুত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন, সে যেন এমন ভাবে চলে, যাহাতে তাহার পিতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ না হয়। কি উচ্চাঙ্গের উপদেশ ! (সপ্তম—৩২)

মদন বা বসন্তোৎসবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ছিল। (ষষ্ঠ—৩৫, ৪৪, ৪৫)

উৎসবের সময় নারীরা তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া এক প্রকার পিষ্টক (প্রহেণক) প্রস্তুত করিতেন এবং উৎসবোচিতবেশে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া উহা বিতরণ করিতেন। (সপ্তম—২৪, চতুর্থ—২৮)

মহিষ-বলির উল্লেখ—উৎসবোপলক্ষে সুসজ্জিতা কোনও রমণী তাঁহার স্বামীকে অনবধানতাবশতঃ অপর এক বল্লভার নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—"বলিদানের পূর্ব্বে বধ্য মহিষের গলায় যেমন মালা দেওয়া হয়, আমার এই উৎসব-মণ্ডনও সেইরূপ।" (পঞ্চম—১৬)

সতী-দাহ (অনুমরণ) প্রথার উল্লেখ—(পঞ্চম—৭, সপ্তম—৩৩)

করপত্রের উল্লেখ—কোনও বিরহিণীর বিরহরূপ দুঃসহ করপত্র দ্বারা পাট্যমান হৃদয়ে নিপতিত কজ্জল-মলিন অশ্রু-ধারাকে প্রমাণসূত্রের ন্যায় দেখাইতেছে। (দ্বিতীয়—৫৩)

বর্ণচিত্রের ও বর্ণবর্জ্জিত চিত্রের উল্লেখ—(সপ্তম—১২)

আদর্শের উল্লেখ—(তৃতীয়—৪)

সেকালে কাচের পৃষ্ঠে পারদ মাখাইয়া দর্পণের নির্ম্মাণ-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই ; কোনও চাকচিক্যশালী ধাতুর পাত উত্তমরূপে মার্জ্জিত হইয়া দর্পণরূপে ব্যবহৃত হইত। কালিদাসের সময় রাজারা স্বর্ণদর্পণ ব্যবহার করিতেন, (রঘুবংশের শেষ সর্গ দ্রষ্টব্য)

রথ্যা—বর্ষাকালে গ্রামের মৃন্ময় পথের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। একটি শ্লোকে কবি গ্রাম্য রথ্যামুখকে গ্রাম-সীমন্তিনীর সীমন্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পঙ্কময় সঙ্কীর্ণ পথ, দুই পার্শ্বে শ্যান কর্দম। (সপ্তম—৮২)

সে কালে দস্যুভয়ে লোক ধন-রত্নাদি কলসে পূরিয়া মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিত। সেই ধনপূর্ণ কলসগুলিকে "নিধান-কলস" বলিত।

"নিধান-কলসে"র উল্লেখ—(ষষ্ঠ—৭, ৭৫, ৭৬)

"গাথা-সপ্তশতী" হইতে সংগৃহীত কতিপয় প্রবাদ-বাক্য—

(১) "সুই বেহে মুসলং"—সূচীভেদে মুসল (ষষ্ঠ—১) বাঙ্গালা প্রবাদ—"মশা মারতে কামান পাতা।"

(২) "কো জুণ্ণমজ্জরং কঞ্জিএণ বেআরিউং তরই" জীর্ণ মার্জ্জারকে কে দুধের বদলে কাঁজি দিয়া ভুলাইতে পারে ?

এই প্রবাদটি রাজশেখর-কৃত "বিদ্ধশালভঞ্জিকা"র প্রথম অঙ্কেও আছে। বাঙ্গালা প্রবাদ—"দুধের সাধ কি ঘোলে মিটে ?" "ভবী ভোল্‌বার নয়।"

(৩) "সুপ্পং ডড্‌ঢং চণআণি ভজ্জিআ" (ষষ্ঠ—৫৭) কুলা পুড়ে গেল, কিন্তু ছোলা ভাজা হ'ল না। বাঙ্গালা প্রবাদ—"জাতও গেল, পেটও ভরল না।"

(৪) "ভুঁঅাণ বাইও বংসো"। (ষষ্ঠ—৫৭) যেমন কালার কাছে বাঁশী বাজান বৃথা।' বাঙ্গালা প্রবাদ—"বোবার স্বপনের মত।"

(৫) "জহ জহ বাএই পিও তহ তহ ণচ্চামি" (চতুর্থ—৪) যেমন যেমন বাজায় প্রিয়, তেম্‌নি তেম্‌নি নাচি আমি। বাঙ্গালা প্রবাদ—"যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচি।"

রাজা শালিবাহনের উল্লেখ—আপন্ন ব্যক্তির দুঃখ ঘুচাইতে (শিব ছাড়া) কেবল "শালিবাহন নরেন্দ্র"ই জানেন। (পঞ্চম—৬৭)

রাজা বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ—তিনি তাঁহার ভৃত্যের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। (পঞ্চম—৬৪)

মহাভারতের উল্লেখ—ভীম মাধবের সহিত মিলিত হইয়া "কুরুনাথ" দুর্য্যোধনকে দারুণ দুঃখ দিয়াছিলেন। (পঞ্চম—৪৩)

রামায়ণের উল্লেখ—কোনও সাধ্বী কুলবধূ, অশুদ্ধমনা দেবরের তাঁহার প্রতি অযথা আসক্তি দেখিয়া, কুটুম্ব-বিঘটন-ভয়ে স্পষ্ট কিছু বলিতে না পারিয়া, তাহাকে প্রকারান্তরে রামানুগামী সৌমিত্রির চরিত-কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। (প্রথম—৩৫)

শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও রাসলীলার উল্লেখ কয়েকটি শ্লোকে আছে। (প্রথম—৮৯ দ্বিতীয়—১২, ১৪, সপ্তম—৫৫)

বলি ও বামনাবতারের উল্লেখ। (পঞ্চম—১১, ২৫)

কোনও কুমারী প্রথম পুষ্পবতী হইলে তাহার সখীরা তাহার রজোরক্তাক্ত বস্ত্র ("আনন্দপট") সকলকে সানন্দে দেখাইয়া বেড়াইত। (পঞ্চম—৫৭)

পুষ্পবতীর মুখে হরিদ্রা-মিশ্রিত ঘৃতের প্রলেপ দেওয়া হইত এবং সে সময়ে তাহার স্বামীর সহিত একত্র শয়ন নিষিদ্ধ ছিল। (তৃতীয়—৮৯, ষষ্ঠ—১৯, ২৯)

প্রত্যেক বিবাহে মঙ্গলগায়িকারা বিবাহ-মঙ্গলগীত গাহিতেন। (সপ্তম—৪২, ৪৩)

বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক বিবাহ কন্যার বাটীতে সম্পন্ন হইত। বর চতুর্থ দিবসে কন্যার বাটী পরিত্যাগ করিত। (সপ্তম—৪৪)

কুমারী কুলটার উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, কখন কখন কন্যা পুষ্পবতী হইবার পর তাহার বিবাহ হইত (পঞ্চম—৫৭, সপ্তম—৪৩)। কিন্তু অধিকাংশ বিবাহ তৎপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইত।

অজাতরজস্কা কন্যাগমন নিষিদ্ধ ছিল এবং কদাচিৎ ঘটিত (পঞ্চম—৪৪, সপ্তম—১৩)। সুতরাং বিবাহের পর কন্যা যত দিন পর্য্যন্ত বয়স্থা না হইত, তত দিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পিতৃগৃহে বাস করিত। এরূপ বাসকালে সে কখন কখন ব্যভিচারিণী হইত। (সপ্তম—৮৩)

"গাথা-সপ্তশতী" হইতে সেকালের যৌন নীতির যে ছবি পাওয়া যায়, তাহা যদি অতিরঞ্জিত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বড় প্রশংসনীয় ছিল না। তখন বেশ্যাদের নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। (পঞ্চম—৭৪)

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলি অবহিত চিত্তে পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, তখন বেশ্যাদের অস্তিত্ব সমাজের একটি অপরিহার্য্য অমঙ্গল (যাহা কেবল অগত্যা উপেক্ষণীয়) বলিয়া বিবেচিত হইত না। বস্তুতঃ বেশ্যাগণ জনসমাজে একটি নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিত এবং রাজানুগ্রহেরও বড় সামান্য অংশ উপভোগ করিত না। যে সময়ের আলোচনা করা যাইতেছে, সে সময়ে এ সামাজিক অমঙ্গল, বহুবিবাহরূপ কুপ্রথার সহিত মিলিত হইয়া, দাম্পত্যপ্রণয়কে অত্যন্ত ক্ষীণ করিয়াছিল। একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের বাটীর বাহিরে রাত কাটাইতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, এক বার সে তাহার স্ত্রীর সহিত রাত কাটাইয়া প্রভাতের কুকুটে

উন্মত্ত হইয়াছিল। তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে বুঝাইলেন, সে তাহার নিজের বাটীতেই আছে। (ষষ্ঠ—৮২)

সে সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার একটি আনুষঙ্গিক ফল এই হইয়াছিল যে, দেবর কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে কুলবধূর ধর্ম্মনাশ হইত। পাছে সংসারের একতাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে বধূরা দেবরের নামে প্রকাশ্য অভিযোগ করিতে সাহস করিত না। উভয়ের মধ্যে অবাধে যে সকল কুৎসিত পরিহাস-বিনিময় হইত, কেহ তাহা নিন্দনীয় মনে করিত না। দেবরের অবিশ্রান্ত প্ররোচনার পরিশেষে সতীসাধ্বীরও কখনও কখনও অধঃপতন হইত। (প্রথম—২৮, ৩৫, ৫৯, চতুর্থ—১৩, ষষ্ঠ—৭০, সপ্তম —৮৮) প্রোষিতভর্ত্তৃকাদের ধর্ম্মনাশের বিশেষ ভয় ছিল। গ্রামে দুশ্চরিত্র যুবকগণের অভাব ছিল না এবং তাহাদের দূতীরা প্রত্যেক গৃহে অবাধে প্রবেশ করিত।

কতকগুলি শ্লোকে দস্যুকর্ত্তৃক প্রোষিতভর্ত্তৃকাহরণের উল্লেখ আছে। (প্রথম—৫৪, ৫৫, দ্বিতীয়—১৮, ষষ্ঠ—২৭)

শাশুড়ী-বধূর সদ্ভাব সকল বাড়ীতে সমানরূপ ছিল না। কোনও কোনও শাশুড়ী পতি-বিরহিণী বধূকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেন (চতুর্থ—৩৬), কেহ বা তাহাকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিতেন (পঞ্চম—৯৩)। আবার কোনও অসতী শাশুড়ীর কুদৃষ্টান্ত তাঁহার পুত্রবধূ অনুসরণ করিতে লজ্জা বোধ করিত না। সঙ্কেত-স্থান (বাঁশবন) হইতে সদ্যঃ প্রত্যাগতা পুত্রবধূকে লজ্জা দিবার জন্য কোনও অসতী শাশুড়ী তাহাকে বলিলেন—"বৌমা! তোমার মাথায় যে লম্বা লম্বা বাঁশপাতা দেখা যাচ্ছে।"

পুত্রবধূ কিছুমাত্র লজ্জিতা না হইয়া উত্তর দিল—"ঠাক্‌রুণ! আপনারও পিঠ যে সাদা হয়ে গেছে।" (সপ্তম—৭৪)

সাধ্বী প্রোষিতভর্ত্তৃকারা স্বামীর অনুপস্থিতিকালে কোনওরূপ বেশ-ভূষা বা কেশ-সংস্কার করিতেন না, (তৃতীয়—৭৩) কিন্তু দুশ্চরিত্রারা আত্মীয়-স্বজনের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কোনও সুযোগ ছাড়িত না, (প্রথম—৬৬, চতুর্থ—৩৫) এক রাত্রির অতিথি পথিকও তাহাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইত না। (তৃতীয়—৫৪, চতুর্থ—৭৯, সপ্তম—৬৭)

নারীগণ যখন দুই বেলা কোনও প্রকাশ্য স্থানে স্নান করিতেন, তখন তাঁহাদের নগ্নপ্রায় দেহের উপর লম্পটদিগের কুদৃষ্টি পড়ায় যে কি অশুভ ফল ফলিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। (প্রথম—৮০, দ্বিতীয়—২৫, তৃতীয়—৪৬, পঞ্চম—৭৩)

ভ্রষ্টা নারীরা তাহাদের উপপতির সহিত নানারূপ সঙ্কেত-স্থানে মিলিত হইত—গুল্মাবৃত ঝোপে, বাঁশবনে, ভগ্ন দেবালয়ে, শস্যাবৃত ক্ষেত্রে, ঝোপবিশিষ্ট নদীতীরে, গ্রাম্য-বটবৃক্ষের বিশাল ছায়াবিশিষ্ট তলদেশে—এমন কি, মশক-নিনাদিত গৃহিশালাও বাদ পড়িত না। অভিসারিকারা তমিস্রা রজনীর ঘোরান্ধকার বা ঝড়-বৃষ্টি না মানিয়া সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইত। কুলটাদের মধ্যে অবশ্য দুঃসাহস ও লজ্জাহীনতার তারতম্য ছিল। এক জন কুলবধূ অবৈধ প্রেমের প্রথমোন্মাদে তাহার প্রণয়পাত্রকে আসিতে অনুমতি দিয়া তৎপরক্ষণেই সে আসিলে কি করিবে ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল এবং তাহার হৃদয় থর-থর করিয়া কাঁপিয়াছিল (দ্বিতীয়—৮৭)। আর এক জন কুলস্ত্রী অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারে যাইবার পূর্ব্বে নিজ গৃহে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পায়চারি অভ্যাস করিয়াছিল (তৃতীয়—৪৯)। যে দুঃসাহসিকা অর্দ্ধরাত্রিতে বর্ষাকালের স্ফীতপ্রবাহা গোদাবরী নদীতে সাঁতার দিয়া পরপারে প্রণয়ীর সহিত মিলিত হইত (তৃতীয় -৩১), এবং যে নির্লজ্জা কামুকী স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র সঙ্কেতকুঞ্জে নিক্ষেপ করিয়া যেন তাহার অবিনয়ের ধ্বজা উড়াইয়াছিল (পঞ্চম—৬১), তাহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত কুলটাদ্বয়ের কত প্রভেদ!

অসতী স্ত্রী বিবিধ বিধানে স্বামীর দৃষ্টিতে ধূলি প্রদান করিত। এক জন অসতীকে তাহার সখীরা তাহার স্বামীর সাক্ষাতেই বৃশ্চিক-দষ্টাকে বিষ-বৈদ্যের কাছে লইয়া যাইতেছি বলিয়া তাহার জারসমীপে লইয়া গিয়াছিল। (তৃতীয়—৩৭)

আর এক কুলটা হঠাৎ উপস্থিত স্বামীর নিকট পিতৃগৃহ হইতে আগত লোক বলিয়া উপপতির পরিচয় দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিল। (চতুর্থ - ১)

স্বামী কর্ত্তৃক প্রহরীর কর্ম্মে নিযুক্ত কুকুরকেও ভ্রষ্টা স্ত্রী অন্নপানাদি দ্বারা এমন বশীভূত করিত যে, ঐ সুবুদ্ধি জন্তুটি স্বামীর আগমনে চীৎকার করিয়া কুলটাকে সতর্ক করিয়া দিত, কিন্তু উপপতি আসিলে চুপ করিয়া থাকিত। (সপ্তম—৬২)

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন কবিগণ (বিশেষতঃ অস্মদ্দেশীয় কবিগণ) স্ত্রীলোকের দোষকীর্ত্তনে অনেক সময় সত্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাদের রসিকতার ভাণ্ডার খালি করিতেন। সুতরাং "গাথা-সপ্তশতী" হইতে লব্ধ অসতীর চিত্র অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ করা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আদিরসের অবতারণা করিবার উদ্দেশ্যে যে অনেক সময় অবাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এ চিত্র যে প্রকৃত গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। অতিরঞ্জন দোষ সে সময়ে প্রবল ছিল, এ কথাও সকলে জানেন। সে সময় প্রকৃত প্রেমও যে অবিদিত ছিল না, তাহার প্রমাণস্বরূপ বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্রের আলোচনা, কাব্যসমালোচনা ইহার গণ্ডীর বহির্ভূত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ

অষ্ট্রীয় যুবরাজ—প্রেমিক সন্ন্যাসী

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ মিঃ এষ্টন উল্‌ফ কিছু দিন পূর্ব্বে কার্য্যানুরোধে ইন্দো-চায়নার অন্তর্গত কো-চেন বন্দর নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন; সেই স্থানে দৈবক্রমে একটি শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসী যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিয়া তিনি জানিতে পারেন—যুবক সন্ন্যাসী অষ্ট্রীয়ার তদানীন্তন যুবরাজ (জীন অর্থ) জোহান সালভেটর।—('Jean Orth'—the Archduke Johann Salvator of Austria) যুবরাজ পিতৃসিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, পদগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, সুদূর প্রাচ্যদেশের সেই জনবিরল, নগণ্য ও ক্ষুদ্র পল্লীতে একাকী সন্ন্যাসীর ন্যায় কালযাপন করিতেছিলেন। ইহার কারণ জানিবার জন্য মিঃ উল্‌ফ আগ্রহ প্রকাশ করিলে যুবরাজ তাঁহার নিকট যে শোচনীয় আত্মকাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেরূপ মর্ম্মভেদী কাহিনী জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মিঃ উল্‌ফ তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার সেই কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করিয়া নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

১

"এই প্রবন্ধে আমি জীন অর্থের লোমহর্ষণ কাহিনী লিখিতেছি। জীন অর্থের জীবন নিবিড় রহস্যজালসমাচ্ছন্ন; তাহা একটি 'ধাঁধা' বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তাঁহার জীবন প্রকৃতই মনুষ্যত্বে ও মহত্বে পূর্ণ। তিনি প্রেমের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন; ইচ্ছা করিলে যিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কোটি কোটি প্রজার ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিতে পারিতেন, লক্ষ লক্ষ লোক কৃপাবিন্দুলাভের আশায় যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং পৈতৃক সাম্রাজ্যের বহুবিধ কল্যাণ ও উন্নতি-সাধনে যিনি সমর্থ হইতেন, ভাগ্যলক্ষ্মীর কঠোর বিধানে স্বেচ্ছায় তিনি মহাচীনের প্রান্তবর্ত্তী একটি অখ্যাত, সভ্যজগতের অপরিজ্ঞাত পল্লীতে একাকী দুঃসহ নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন! অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

"অষ্ট্রীয়ার আর্ক ডিউক জোহান সালভেটর 'জীন অর্থ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উচ্চ সম্মানপূর্ণ রাজকীয় খেতাবগুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি রাজসিংহাসনের দাবী অম্লানবদনে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি রাজকীয় খেতাবগুলি তুচ্ছ খোলসের ন্যায় পরিহার করিবেন—ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

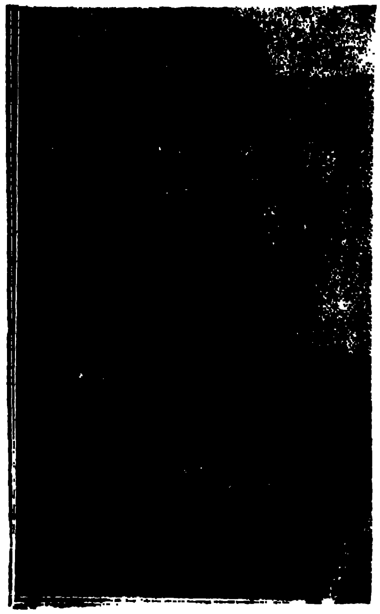
"যুবরাজ জোহান সালভেটর সুবিখ্যাত হাপ্‌সবার্গবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশের উপর বিধাতার কি একটা অভিসম্পাত আছে; এই বংশের লোকরা প্রভূত সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই; জীন অর্থও বিশ্বাস করিতেন, বিধাতা তাঁহাকে সুখভোগের জন্য সৃষ্টি করেন নাই, এই বিশ্বাসেই তিনি সুখের আশা ত্যাগ করিয়া অনন্ত দুঃখকে বরণ করিয়াছিলেন।

"জীন অর্থের শোক-দুঃখ ও অশান্তিপূর্ণ জীবনের স্মৃতি চিরদিন আমার চিত্রপটে সযত্নে সুরক্ষিত হইবে। তিনি তাঁহার বিষাদপূর্ণ জীবনকাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিয়া আমাকে এই অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার আত্মকাহিনী কাহাকেও বলিব না। আমার এই অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ করি নাই। অবশেষে যখন শুনিলাম, তিনি কোনও আমেরিকান হাঁসপাতালে অপরিচিত লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় জীবন-মধ্যাহ্নে ইহজীবন হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তখন এক দিন সায়ংকালে একটি দীপালোকিত কক্ষে আমার পুরাতন খাতাপত্র খুলিয়া তাঁহার অতীত স্মৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার সেই পুরাতন স্মৃতির সঙ্গী—একখানি পুরাতন পীতাভ 'নোটবহি', কয়েকখানি ফটোগ্রাফ এবং একখানি গজদন্ত-নির্ম্মিত চাক্তি—যাহা দৈবক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছিল।"

২

"ফরাসী গবর্মেণ্টের একটি কার্য্যের ভার লইয়া একবার আমাকে সাইগনে যাইতে হইয়াছিল। সাইগন ফরাসী অধিকৃত ইণ্ডো-চায়নার একটি সেনানিবাস। রোমের কোন

সম্ভ্রান্তবংশীয় ইটালীয় যুবক ফরাসী-দের বৈদেশিক চমূতে যোগদান করিয়া ইণ্ডো-চায়নায় প্রেরিত হইয়াছিল। সেই যুবকটি বংশের একমাত্র সন্তান বলিয়া তাহাকে ফরাসী বৈদেশিক চমূ হইতে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার আত্মীয়রা ফরাসী গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিলে, ফরাসী সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সমর-বিভাগের প্রচলিত নিয়মের ব্যতি-ক্রম করিয়াও সেই সৈনিক যুবকের মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু যুবকটির সন্ধান না হওয়ায় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ফসাসী গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আমি সাইগনে প্রেরিত হইয়াছিলাম।

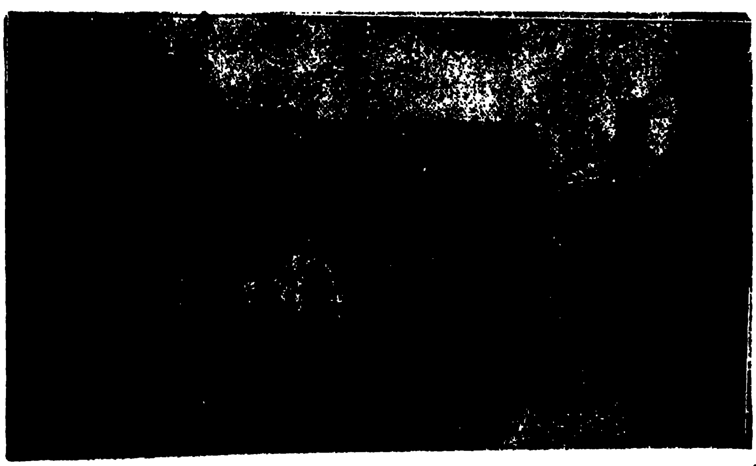


জীন অর্থ—অষ্ট্রীয়ার ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ জোহান সাল্‌ভেটর

"সাইগনে উপস্থিত হইয়া আমার চেষ্টা সফল না হওয়ায়, আমি সমরবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে মাসেনা দুর্গে যাত্রা করি-লাম। এই সময় এক জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহার পরিচালিত সৈন্যদল লইয়া মিদি-বেল-আব্বাস হইতে সাইগনে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। আমি মাসেনায় যাইব শুনিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি-লেন; কারণ, তিনিও সদলে মাসেনা দুর্গে যাইবার আদেশ পাইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে আমরা চীন-দেশীয় নৌকায় আরোহণ করিয়া বক্রগামিনী, ভীষণদর্শন অসংখ্য কুম্ভীরপূর্ণ, পীত নদীপথে ডাণ্টন দুর্গের অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ডাণ্টন দুর্গে উপস্থিত হইতে চারি সপ্তাহ লাগিল। কিন্তু আমাদিগকে প্রথমে যেখানে 'জঙ্ক' হইতে তীরে নামিতে হইল, সেই স্থানটি কোচেন বন্দরের সন্নিহিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম।

সেই স্থানে অবতরণের পর সমরবিভাগের কর্ম্মচারীটি আমাকে বলিলেন—সেই গ্রামে বহু দিন হইতে এক জন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বাস করিতেছেন; সকলেই তাঁহাকে 'চমূপিতা' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। প্রবাসিমাত্রেই তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে এবং তাঁহার প্রদত্ত সুরায় ও খাদ্যদ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়।

"এক জন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বহু কাল হইতে একাকী এই দূরদেশে বাস করিতেছেন, অথচ তিনি কি উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহই তাহা জানে না। কথাটা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এই অদ্ভুত লোকটি কিরূপ ঘটনাচক্রে পড়িয়া সভ্যতার সংস্পর্শবিরহিত এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়া-ছেন এবং বৎসরের পর বৎসর একাকী নিরানন্দময় জীবনের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কি ভাবে অতি-বাহিত করিতে-ছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার সহিত



মিদি-বেল-আব্বাসস্থিত ফরাসী সেনা-ব্যারিক

দেখা করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। আমার মনে হইল, এই লোকটির জীবনের কাহিনী অতীব বিচিত্র এবং রহস্তাবৃত।

"আমরা নদীতীরে আসিয়া এই ভদ্রলোকটির 'বাংলো'-খানি দেখিবার আশায় সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। কয়েক মিনিট পরে সেই 'বাংলো' নহে, 'বাংলো'র মালিককে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। পথ হইতেই দেখিলাম, এক জন দীর্ঘকায় কৃশ ভদ্রলোক বাংলোর সুপ্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে শুভ্র পায়জামা, মস্তকে চূড়াকার তালপাতার টুপী। এই প্রকার টুপী অবস্থাপন্ন স্থানীয় লোকরাই সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদিগকে দেখিবামাত্র ভদ্রলোকটি হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'চম্‌ চিরজীবী হউক!' আমার সঙ্গীরা ভগ্নস্বরে তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিল।'

৩

"এইভাবে আমি সর্ব্বপ্রথম জীন অর্থের দর্শনলাভ করিলাম। তাঁহার নাম শুনিয়া, তিনি কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে নিজের পরিচয় দিলাম; তিনি আগ্রহভরে আমার করমর্দ্দন করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই আমার ধারণা হইল—লোকটি অসাধারণ বুদ্ধিমান্। তাঁহার চক্ষু দুইটি ভাসা ভাসা, চক্ষুতারকা ধূসর। তিনি কয়েক মিনিট শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখবর্ত্তী নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন অতীত জীবনের কত দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি তাঁহার মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হইল। তাঁহার মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন পরিস্ফুট হইলেও তাহা কোমলতাবর্জ্জিত নহে। স্থানীয় লোকরা সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। আমাদের দলে দুই শত লোক ছিল। জীন অর্থ একে একে প্রত্যেকের করমর্দ্দন করিবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন; কে বন্ধুভাবে এবং কে শত্রুভাবে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাই যেন তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সাদর অভ্যর্থনায় বঞ্চিত হইল না।

"সামরিক কর্ম্মচারিবর্গের জন্ত বংশ-নির্ম্মিত একটি সুদীর্ঘ টেবল তাঁহার বারান্দায় সংস্থাপিত হইল। বাংলো-টেবল পাতিয়া দেওয়া হইল। জীন অর্থ অতিথিগণের পান-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া সামরিক কর্ম্মচারীরা যখন নৌকায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইলেও, তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেখিবার আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ-হৃদয়ে তাঁহার বাংলো হইতে প্রস্থানোদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই সময় তাঁহার তামিল ভৃত্য একখানি ক্ষুদ্র পত্র আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। সেই পত্রে জীন অর্থ তাঁহার বাংলোয় রাত্রিবাস করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, আমাদের জকগুলি পরদিন প্রভাতের পূর্ব্বে সেই স্থান ত্যাগ করিবে না।—তামিল ভৃত্যের সহিত আমি অন্য দিকের বারান্দায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জীন অর্থ সেই বারান্দায় একাকী বসিয়া একটি দেশী চুরুটের ধূমপান করিতেছেন। তিনি আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর তাঁহার আদেশে আমাদের সম্মুখস্থিত টেবলে পেয়ালাভরা কাফি এবং সুরাপাত্র সংস্থাপিত হইল।

"কয়েক মিনিট পরে আমি তাঁহার আতিথেয়তার জন্ত ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, সেরূপ বন্তপ্রদেশে এক জন য়ুরোপীয়কে একাকী বাস করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। তিনি আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র এবং দুই এক মিনিট নীরব থাকিয়া আমার সেখানে গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সেই অঞ্চলে গমনের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া, ইটালীয়ান রাজদূত আমাকে সেই নিরুদ্দিষ্ট সৈনিক যুবকের যে ফটোখানি দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখাইলাম এবং সেই যুবকটিকে তিনি দেখিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম।

"জীন অর্থ কয়েক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই ফটোখানি পরীক্ষা করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'না মহাশয়, এই যুবককে আপনি কোথাও পাইবেন না। বৈদেশিক চম্‌ এই সকল উৎসাহী যুবককে আকর্ষণ করে; তাহার পর এ দেশের অসভ্য বর্ব্বরগুলা ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় বিষদিগ্ধ বর্শার আঘাতে তাহাদিগকে নিহত

আমি জানি, আপনি দীর্ঘকাল ধরিয়া যেখানেই উঁহার অনুসন্ধান করুন, আপনার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।'—এই কথা বলিবার সময় তাঁহার গলা ধরিয়া আসিয়াছিল এবং তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

"বিষয়টি অত্যন্ত সকরুণ ও শোচনীয় বলিয়া আমি এ কথা চাপা দিয়া তাঁহার নিজের কথা তুলিলাম; আমার আশা ছিল, তিনি আমার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন; কিন্তু তিনি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিলেও নিজের কথা কিছুই বলিলেন না। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি অতি চমৎকার লোক; সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং চিন্তাশীল।"

৪

"পরদিন প্রভাতে এক জন সৈনিক জীন অর্থের বাংলোয় আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল—'জঙ্ক' ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি জীন অর্থের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলাম; কিন্তু তাঁহার ভৃত্যরা বলিল—তখনও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আমার আর বিলম্ব করিবার উপায় ছিল না। ভৃত্যদিগকে বলিলাম—এই পথে ফিরিবার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব—এ কথা যেন তাঁহাকে বলা হয়।

"কয়েক মাস ধরিয়া আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু সেই ইটালীয়ান সৈনিক যুবকের সন্ধান হইল না। হতাশ-হৃদয়ে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। সেই দুর্গম দেশের বিভিন্ন অংশে আমাকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং যে সকল লোমহর্ষণ বিপদ্ হইতে আমি নানা কৌশলে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম, সে সকল কথার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমি চিরজীবন বিপৎ-সঙ্কটের সহিত যুদ্ধ করিতেই ভালবাসি, কিন্তু সেই ভয়সঙ্কুল রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমাকে যে সকল প্রাণান্তকর বিপদে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল, সে সকল কথা স্মরণ হইলে এখন এত কাল পরেও আমার হৃৎকম্প হয়।

"যথাকালে আমাদের 'জঙ্ক' পুনর্ব্বার ফো-চেন বন্দরে নঙ্গর করিল। নদীতীরে জীন অর্থের যে বাংলোখানি দেখিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার আশায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত দেখিতে পাইলাম না! আমি চক্ষু মুছিয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—জীন অর্থের বাংলো দেখিতে পাইলাম না। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার হৃদয় বিহ্বল হইল। আমি পুনঃ পুনঃ সেই দিকে চাহিয়া, সেই সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত, সুদৃশ্য বাংলোর পরিবর্ত্তে সিক্ত ভস্মস্তূপমাত্র দেখিতে পাইলাম! কতকগুলি কড়ি-কাঠ অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় কয়েক শত গজ দূরে পড়িয়া ছিল; বাংলো-সন্নিহিত উদ্যানের বৃক্ষগুলির শাখাপত্র অগ্নির উত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছিল, এবং নয়নাভিরাম শস্যক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

"উদার-হৃদয় জীন অর্থের অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ 'জঙ্ক' হইতে তীরে নামিলাম। অদূরে কয়েকখানি 'সাম্পান' দেখিয়া সাম্পানের মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে যে শ্বেতাঙ্গ থাকিতেন, তিনি কোথায়?' মাঝিরা হুঙ্কার দিয়া উৎকট ভাষায় বলিল, 'সে নাই, মরিয়া গিয়াছে!' আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে 'জঙ্কে' ফিরিয়া আসিলাম।

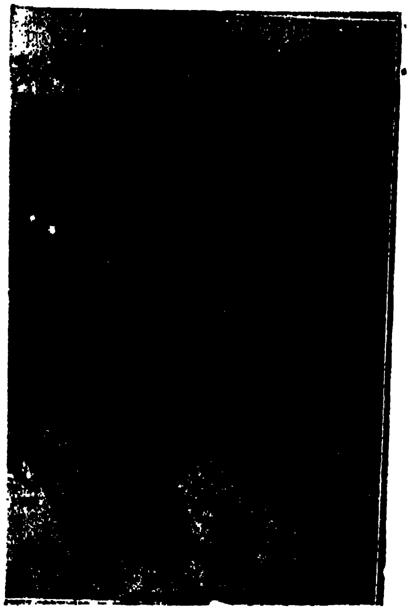
"আমি সাইগনে প্রত্যাগমন করিয়া এই দুঃসংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, সেই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটিকে কেহ হত্যা করে নাই, তিনি সাইগনে আসিয়া ডাকের জাহাজে মার্শেলিসে যাত্রা করিয়াছেন।

"এই স্থানে আসিয়া আমি 'জীন অর্থের' প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলাম। ইটালীয়ান কন্সল আমাকে বলিলেন, জীন অর্থ অষ্ট্রীয় সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী, কিন্তু তিনি ভিয়েনার 'স্বেচ্ছাচারী বৃদ্ধটির (তাঁহার পিতা বৃদ্ধ অষ্ট্রীয় সম্রাট) সহিত কলহ করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার রাজকীয় খেতাব, উচ্চ সম্মান এবং সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"ইটালীয়ান কন্সল বলিলেন, 'যেমন চিরদিন ঘটিয়া আসিতেছে—স্ত্রীলোকই এই কলহের মূল। এই মহিলাটির নাম কাউণ্টেস্ ব্রাডিজিবিল ভন টেহেরেনক্। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যের প্রশংসাধ্বনিতে ভিয়েনা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন, কিন্তু কাউণ্টেস বংশমর্য্যাদায় যুবরাজের সমকক্ষ ছিলেন না। যুবরাজ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য

হইল; তাঁহার অনুনয়-বিনয়, ক্রোধ, অভিমান সকলই নিষ্ফল হইল। স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিক বৃদ্ধটির সঙ্কল্প অটল রহিল। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। শুনিয়াছি, যুবরাজ সম্রাটের অসম্মতিতেই গোপনে কাউণ্টেস্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ বৃদ্ধ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে হঠাৎ এক দিন কাউণ্টেস অদৃশ্য হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে কোথাও 'গুম' করিয়া রাখিয়াছেন, এই সন্দেহে যুবরাজ সম্রাটের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন, ফলে পিতাপুত্রে ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হইল; যুবরাজের ভাগ্যাকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল।'

"'কাউণ্টেস্ শৈশবকালেই পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন, তিনি রাজধানী হইতে অদৃশ্য হইলে অন্য কেহই তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইল না। আমি সেই সময় ভিয়েনার কন্সলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। যুবরাজ যে দিন রাজকীয় খেতাব ও সর্ব্বপ্রকার সম্মান ত্যাগ করিয়া, সিংহাসনের দাবী উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সন্ধানে একাকী রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন, সে দিন ভিয়েনায় কি ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সকলেই কিরূপ বিস্মিত ও বিচলিত হইয়াছিল, তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিব না। যুবরাজ পিতৃপ্রদত্ত নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই দিন 'জীন অর্থ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রবাসে এই নামই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে কোচিন-চীনে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমার অজ্ঞাত, তাই আমার বিশ্বাস, তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সন্ধানেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই, তিনি কোথাও তাঁহার পত্নীকে দেখিতে পান নাই।'



যুবরাজ জোহান্ সাল্‌ভেটরের পত্নী কাউণ্টেস্ রাডিজিবিল্ টেহেরনফ্

২

"সাইগনে আমার আর কোন কায ছিল না। সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—পরদিন প্রভাতে 'পল লেকাট' নামক ডাকের জাহাজ সেখান হইতে মার্শেলিসে যাত্রা করিবে। আমি সেই জাহাজেই মার্শেলিসে চলিলাম। আমার আশা হইল, মার্শেলিসে উপস্থিত হইয়া জীন অর্থের সন্ধান পাইব। 'পল লেকাট' হংকং বন্দরে উপস্থিত হইলে অনেকগুলি আরোহী জাহাজে উঠিল। ঐ সময় এক জন পীড়িত আরোহীকে 'দোলায়' করিয়া জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল।

"এই পীড়িত আরোহীই জীন অর্থ। কিন্তু তখন তাঁহাকে চিনিবার উপায় ছিল না। তাঁহার কৃষ্ণ কেশরাশি এই কয় মাসে তুষার-শুভ্র হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ ও কোটরপ্রবিষ্ট, বংশ-গৌরবের নিদর্শনসূচক সুন্দর মুখ অস্থিসার, শুষ্ক ও মলিন।

"জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিলে আমি জাহাজের ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে বলিলাম—রুগ্ন আরোহীটি আমার পরিচিত; তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আমি জীন অর্থের সম্মুখীন হইলে, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন—এক বিন্দু হাস্য দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিলেন—সে হাসি বিষাদের মেঘে সমাচ্ছন্ন। আমার বুকের ভিতর টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

"জাহাজের উপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল, আমি তাঁহার স্বদেশীয় ভাষায় তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতাম—ইহাও ইহার একটি কারণ। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি ডেকের উপর 'লম্বা চেয়ারে' বসিবার শক্তি লাভ করিলেন। জাহাজের ডেকে বসিয়া এক

ধীরে ধীরে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সেই কাহিনী শুনিবার পূর্ব্বে আমাকে অঙ্গীকার করিতে হইল—অন্ততঃ ১০ বৎসরের মধ্যে সেই কাহিনী আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু তাঁহার যে মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিলাম—তাহা সেই রাত্রিতেই তাঁহার কথাতেই খাতায় লিখিয়া রাখিলাম। তাঁহার আত্মকাহিনী তাঁহারই ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।"

৫

"জীন অর্থ বলিলেন, 'আমার বয়স এখনও ৪০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এই বয়সেই আমাকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেখাইতেছে, আপনাকে ইহার কারণ বলিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে কেন, জানি না। আমার প্রতি আপনার দয়ার পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ আপনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই বলিয়াই বোধ হয়, আপনাকে আমার জীবনের শোচনীয় কাহিনী বলিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। আপনি নীচে আমার কেবিনে গিয়া আমার কোচের উপর চন্দনকাঠের যে বাক্সটি দেখিতে পাইবেন, তাহা আমাকে আনিয়া দিবেন কি? বাক্সটি আপনি খুলিবেন না।'

"আমি তাঁহার কেবিন হইতে চন্দনকাঠের বাক্সটি লইয়া আসিলাম। বাক্সটি তিনি নাড়িয়া দেখিয়া আমার দিকে ঠেলিয়া দিলেন; বলিলেন, 'এখন ইহা খুলিয়া দেখুন।'

"বাক্সটির কারুকার্য্য অতি সুদৃশ্য; উহা সেই দেশেরই কোন শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত। বাক্সের ভিতর ঝিনুক ও গজদন্তের চাক্তির উপর কতকগুলি চিত্র ক্ষোদিত দেখিলাম;—হস্তী, কুম্ভীর, নানাপ্রকার প্রাচ্যদেশীয় ফলমূল প্রভৃতির চিত্র। শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যে সেগুলি যেন জীবন্ত মনে হইতেছিল। প্রথমেই একখানি বড় ছবি দেখিলাম। মনে হইল, তাহা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশুর চিত্র, কিন্তু তাহাতে ক্রুশচিহ্ন দেখিতে পাইলাম না এবং ছবির মুখে যীশুর স্বাভাবিক মিষ্টতা ও ক্ষমাশীলতার পরিবর্ত্তে হৃদয়ের রুদ্ধ যন্ত্রণা, নিদারুণ অন্তর্বেদনা পরিস্ফুট দেখিলাম। তাহা প্রতিভাশালী শিল্পীর প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। আমাকে প্রশংসমান নেত্রে সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া জীন অর্থ বলিলেন, 'এই চিত্র আমারই কাহিনীর কতকগুলি ঝিনুকের চাক্তি দেখিলাম, প্রত্যেকখানি সমচতুর্ভুজ, পরিসর দুই ইঞ্চির অধিক নহে। ঝিনুকের সেইরূপ ঔজ্জ্বল্য আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রত্যেক চাক্তিতেই সুন্দর সুন্দর চিত্র সুকৌশলে ক্ষোদিত।

"জীন অর্থ বাক্সটি টানিয়া লইয়া একখানি চাক্তি আমার সম্মুখে ধরিলেন; বলিলেন, 'এ তাহারই ছবি—যাহার জন্য আজ আমার এই অবস্থা! আপনি বোধ হয়, তাহার কথা শুনিয়াছেন।' কি সুন্দর মুখ, কি অপূর্ব্ব অঙ্কন-কৌশল! আমি মুগ্ধনেত্রে সেই ছবির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"জীন অর্থ বলিলেন, 'শৈশবে যে মুহূর্ত্তে উহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই ভালবাসিয়াছিলাম, কেবল ইহলোকে নহে, পরলোকেও আমার এই প্রেম অটুট রহিবে এবং সেখানে উহার সহিত আমার মিলন হইবে। আমাদের বংশের উপর ভগবানের অভিসম্পাত আছে। হাপসবর্গ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কখন প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবে না। আমার প্রথমে আশা হইয়াছিল—সম্রাটের হৃদয় গলাইতে পারিব, কারণ, তিনিও তাঁহার অপেক্ষা হীন-বংশীয়া নারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার প্রণয়িনীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার ফলে তিনি নির্দ্দয় নির্ম্মম যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আমার সকল আবদার তিনি প্রসন্ন মনে পূর্ণ করিতেন, কিন্তু আমার প্রণয়িনীকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমার অনুনয়-বিনয়, বাগ্-বিতণ্ডা—সকলই বৃথা হইল। বৃদ্ধ সম্রাট কাউণ্টেস্ জন টেহেরনফের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আমরা গোপনে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কাউণ্টেস্ও আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম—বিবাহ করিয়া কিছু দিন ত সুখে কাটাইতে পারিব, তাহার পর ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটিবে।

" 'আমরা স্থির করিলাম, গোপনে অষ্ট্রীয়া ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিব। আমরা অষ্ট্রীয়া-সীমান্তে একটি

তাহার পর প্যারিসে উপস্থিত হইলাম। এক মাস আমরা পরম সুখে কাটাইলাম। অবশেষে এক দুর্দিনে ভিয়েনা হইতে গুপ্তচররা প্যারিসে আসিয়া আমার পত্নীকে কি কৌশলে কোথায় লইয়া গেল, তাহা আমি কোন দিন জানিতে পারি নাই। সে সময় আমি বাসায় ছিলাম না। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

"'আমি সেই দিনই তাড়াতাড়ি অষ্ট্রীয়ায় প্রত্যাগমন করিলাম। ভিয়েনায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—সম্রাটের আদেশে আমাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমার পত্নী সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না বা আমাকে বলিল না। কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলাম, রক্ষী সৈন্যদলের একটি যুবক কর্ম্মচারী কার্ল ভন কুলেঞ্জ সম্রাটের আদেশে তাহাকে অপহরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। আমি তাহাদের সন্ধানে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলাম। অবশেষে দুই বৎসর পরে মার্শেলিসে বৈদেশিক চমূর এক জন সৈনিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে পূর্ব্বে আমার রক্ষী সৈন্যদলের রেজিমেণ্টে কায করিত। কিন্তু কোনও অপরাধের জন্য সামরিক আইন অনুসারে তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডের আদেশ হইল। সে কোনও কৌশলে পলায়ন করিয়া বৈদেশিক চমূতে প্রবেশ করে। সে আমাকে সংবাদ দিল—সাইগনে কার্ল ভন কুলেঞ্জের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে একটি সুন্দরী যুবতী ছিল, এবং স্ত্রী বলিয়া সে তাহার পরিচয় দিয়াছিল। কার্ল ভন কুলেঞ্জ পৃথিবীর কোন স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে না পারিয়া ফরাসী বৈদেশিক চমূতে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে সাইগনে উপস্থিত হইয়াছিল।

"'এইরূপে আমি আমার স্ত্রীর সন্ধান পাইলাম। আমি যত শীঘ্র সম্ভব সাইগনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও নিকট তাহাদের সংবাদ পাইলাম না। যাহারা বৈদেশিক চমূতে যোগদান করে—তাহাদের নামধাম বা কার্য্যস্থানের সন্ধান কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ইহাতেও আমি হতাশ হইলাম না। আমি জানিতাম, বিভিন্ন দেশের যে সকল সৈন্য বৈদেশিক চমূতে প্রবেশ করে, তাহারা অন্ততঃ একবারও টঙ্কিন-চীন-সীমান্তে প্রেরিত হয়। সুতরাং সেই স্থানে একখানি বাংলো ক্রয় করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই বাংলোয় আপনি আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমি সেখানে বৈদেশিক চমূর প্রত্যেক সৈন্যের অভ্যর্থনা করিতাম; আহার ও পানীয় দানে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতাম। আমার আশা ছিল—এক দিন কার্ল ভন কুলেঞ্জকে সেখানে দেখিতে পাইব এবং স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিতে পারিব। প্রাণরক্ষার আশায় সে আমার স্ত্রীর সংবাদ দিতেও পারে, ইহাই আমার ধারণা হইয়াছিল। আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। নিষ্ঠুর সম্রাটের আদেশে এই নরাধম আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।'

"জীন অর্থ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কম্পিত কণ্ঠে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুই এক মিনিট স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আর একখানি চাক্তির ছবির প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এই সেই নরাধম কুলেঞ্জ—বৈদেশিক চমূর কাপ্তেন।'

"অতঃপর তিনি অন্য একখানি চাক্তি আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'ইহাতে যে নরপিশাচের চিত্র ক্ষোদিত দেখিতেছেন—তাহার নাম চ্যাংলু। এই পাপিষ্ঠ বর্ব্বর এক সময় আমার বন্ধু হইয়াছিল; কিন্তু তাহারই হস্তে ভন কুলেঞ্জ ও আমার স্ত্রী নিহত হইয়াছে। চ্যাংলু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী; এই সকল চিত্র তাহারই অঙ্কিত। কে জানিত—সে আমারই সর্ব্বনাশ করিবে? আমার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া এই সয়তান উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে। তাহার মৃত্যু হইয়াছে; আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি'।"

৬

"এ সকল কি ব্যাপার? আমি কি কল্পনা-রথে আরোহণ করিয়া কোন উপন্যাসের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি?—সবিস্ময়ে সভয়ে জীন অর্থের স্বেদসিক্ত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিলাম। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন, 'আমার কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছেন? আমার অবশিষ্ট কাহিনী শুনিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।'

"'চ্যাংলু এই অঞ্চলের রাজা ছিল। এই বর্ব্বর বৈদেশিকগুলার সহিত আমরা কখন সমকক্ষের মত ব্যবহার করিতে না পারিলেও চ্যাংলু আমাদের সমকক্ষ হইবার

ধরিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিল; কিন্তু তাহার মৃত্যুতে সেই প্রাচীন বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। চ্যাংলু সেই বংশের শেষ পুরুষ।

"'চ্যাংলু জাতিতে চীনাম্যান কিংবা মালয় ছিল না। তাহার পূর্ব্বপুরুষরা সমৃদ্ধ রাজ্যের নরপতি ছিল; এখন সেই রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাচীন রাজধানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। সেই স্থানে এখন দরিদ্রপল্লী ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের সমষ্টি। চতুর্দ্দিকস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ তাহার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের নির্ব্বাক্ সাক্ষী। চ্যাংলু তাহার পূর্ব্বপুরুষের ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে না পারিলেও তাহাদের অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। এই রাজবংশের অনেকেই বিখ্যাত শিল্পী ছিল। আপনি এই চাক্তিগুলিতেই তাহার অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইতেছেন। কিন্তু তাহার হৃদয় পশুভাবে পূর্ণ ছিল। আমি প্রথমে তাহার খলতা ও ক্রূরতার পরিচয় পাই নাই; তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইলে তাহাকে বিষধর-সর্পের ন্যায় দূরে পরিহার করিতাম।

"'তাহার সহিত আমার প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইলে, আমি আমার শোচনীয় কাহিনী তাহার গোচর করিয়াছিলাম। তবে আমি যে আমার স্ত্রীকে তখনও প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম এবং তাহাকে ভন কুলেঙ্গের কবল হইতে উদ্ধার করিবার আশায় সেই দেশে বাস করিতেছিলাম, এ কথা তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। আমি আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারিলে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, চ্যাংলু ইহাও জানিতে পারে নাই। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম—কুলেঙ্গকে হাতে পাইলে নিশ্চয়ই হত্যা করিয়া আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিব। কিন্তু যাহার প্রেমে আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহার প্রতি আমার প্রেমের গভীরতা কিরূপ, তাহা সেই বিদেশীর নিকট প্রকাশ করিয়া আমার প্রেমের অপমান করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।'—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর একখানি চাক্তি আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, 'ইহা একটি স্থানের দৃশ্য; এই স্থানে আমার পত্নীর ইহজীবনের অবসান হইয়াছিল।'

"সেই চিত্রখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলাম।—একটি নদীর ভিতর অসংখ্য কুম্ভীর ভাসিতেছিল, তাহার মধ্যে একখানি 'মাড়', তাহার উপর দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি।

"জীন অর্থ বলিতে লাগিলেন, 'এক দিন সায়ংকালে চ্যাংলু বাহক-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আমার বাংলোয় আসিল। সে যখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত—তখনই কতকগুলি স্বহস্তাঙ্কিত চিত্র আমাকে উপহার দান করিত, সে দিনও কয়েকখানি চিত্র আমার জন্য লইয়া আসিয়াছিল। তাহার উপহারের বাণ্ডিল খুলিয়া তন্মধ্যে এই বাক্সটি দেখিতে পাইলাম। চ্যাংলু হাসিয়া বলিল, সে আমার নিকট বিদায় লইবার পর আমি বাক্সটি খুলিয়া দেখিলে আনন্দিত হইব। কারণ, একটি বিস্ময়কর কাহিনী চিত্রগুলিতে অঙ্কিত হইয়াছে। অবশেষে সে আমাকে বারান্দায় লইয়া গিয়া বলিল, আপনার দূরবীণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আমি আপনার শত্রুকে কিরূপ প্রতিফল দিয়াছি! যে সয়তান আপনার সম্মান নষ্ট করিয়াছে—সে তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে।

"'আমি সবিস্ময়ে চ্যাংলুর মুখের দিকে চাহিলাম। সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল; তাহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার অধরোষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমি প্রথমে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু চ্যাংলুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমি ভীত হইলাম; কি একটা আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; তৎক্ষণাৎ দূরবীণ আনিয়া, চ্যাংলু যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়াছিল, সেই দিকে দূরবীণ উদ্যত করিলাম।—কি দেখিলাম? অতি ভীষণ লোমাঞ্চকর দৃশ্য; সেই দৃশ্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার মনশ্চক্ষুতে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত থাকিবে। আমি দীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবী খুঁজিয়াও যাহাদের সন্ধান পাই নাই, তাহাদের উভয়কে—আমার প্রাণাধিকা পত্নী ও যে তস্কর হরণ করিয়াছিল—সেই ভন কুলেঙ্গ উভয়কে একখানি ভেলায় আবদ্ধ দেখিলাম। ভেলা নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কুম্ভীরের দল ভেলার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—তাহাদিগকে ভেলার উপর নড়িতে দেখিয়া বুঝিলাম—তাহারা তখনও জীবিত আছে।

"'আমি তৎক্ষণাৎ দূরবীণটা চ্যাংলুর মুখের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিয়া, এক হাতে চ্যাংলুর ঘাড় ও অন্য হাতে তাহার কোমর ধরিয়া তাহাকে নদীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিলাম এবং আমার ভৃত্যগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান

করিয়া, চ্যাংলুকে প্রচণ্ড বেগে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার পর একখানি 'সাম্পান' লইয়া তাড়াতাড়ি সেই মাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। বহু চেষ্টায় মাড়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র আমি তাহার এক প্রান্ত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলাম।

"'আমি কাতর স্বরে বলিলাম, 'প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি; তোমাকে উদ্ধার করিয়া বুকে তুলিয়া লইয়া যাইব, একবার চাহিয়া দেখ!'—সে চক্ষু খুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ওষ্ঠ মৃদুহাস্তে রঞ্জিত হইল। সেই হাসি তাহার হৃদয়-শোণিতেরই স্ফুরণমাত্র!

"'লৌহ-কীলক দ্বারা তাহার দেহ সেই মাড়ের সহিত আবদ্ধ ছিল। আমি সেই গজালগুলি টানিয়া খুলিয়া আমার প্রিয়তমা পত্নীকে মুক্ত করিলাম। কিন্তু সকলই বৃথা হইল! তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, দুইটি কথা বলিয়া সে আমার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। সে কি কথা বলিল, তাহা আপনাকে বলিব না, বলিতে পারিব না। যে কয় দিন বাঁচিব, আমার অন্তরেই তাহা, গাঁথা থাকিবে। আমি তাহার মৃত্যুকবলিত দেহ ক্রোড়ে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলাম। তাহার কণ্ঠ তখন চির-নীরব হইয়াছিল।

"'তাহার পর আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলাম, আমি আমার বারান্দায় শায়িত আছি; আমার পত্নীর মৃতদেহ আমার ক্রোড়ে নিপতিত রহিয়াছে। তাহার পর?—তাহার অদূরবর্ত্তী তালীকুঞ্জে আমি তাহার সমাধি-শয্যা রচনা করিয়াছি।

"'আমি চ্যাংলুকে হত্যা করিয়াছিলাম; তাহার অনুচরর৷ আমাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবে, এই আশঙ্কায় সেই রাত্রিতেই আমি পলায়ন করিলাম। জীবনের প্রতি আমার মমতা ছিল না; কিন্তু সেই বর্ব্বররা তাহাদের প্রভুহন্তাকে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়াই সেখানে বিলম্ব করিতে আমার সাহস হয় নাই।

"'আমি উন্মত্তের ন্যায় কয়েক সপ্তাহ কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিয়াছিলাম, স্মরণ নাই; অবশেষে আমার কয়েকটি বন্ধু আমাকে এই বাক্সটি ক্রোড়ে লইয়া পথিপ্রান্তে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, সাইগনে লইয়া আসিয়াছিলেন।'"

"এই পর্য্যন্ত বলিয়া জীন অর্থ চাক্তিগুলি কুড়াইয়া লইয়া বাক্সে পুরিলেন। তাহার পর এক জন পরিচারকের সাহায্যে তাঁহার কেবিনে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে মার্শেলিসে উপস্থিত হইয়া তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার এই 'নোটবহি' তাঁহার বেদনাপূর্ণ স্মৃতি বহন করিতেছে,—আর এই গজদন্ত-নির্ম্মিত চাক্তিখানি; ইহা তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে খসিয়া জাহাজের ডেকের উপর গড়াইয়া গিয়াছিল, এক জন খালাসী ইহা কুড়াইয়া আমাকে আনিয়া দিয়াছিল—আমি দেখিলাম—একটি ভীষণদর্শন কুম্ভীর মুখব্যাদান করিয়া নদীকূলে পড়িয়া আছে—তাহারই চিত্র!"

পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের এরূপ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী কি আধুনিক যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ নহে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৈশ্য

স্থান হ'তে স্থানান্তরে অন্ন, বস্ত্র, ধন,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় পারে নাহি ল'য়ে যেতে;
সে ব্যাপার সাধিবারে ধন-উপাসক
বিশ্বহিতে মহাব্রত করিল গ্রহণ!

মুদ্রাশক্তি করে তার—সে সিদ্ধ সাধক,
বিস্তৃত বাণিজ্য বুঝি মধুক্রম তা'র;
লক্ষ জীব অন্ন পায় সেই স্বার্থফলে
স্বার্থবাহ স্বার্থ কিন্তু না ত্যজে আপন!

ওই বাণিজ্যের ফলে ঐশ্বর্য্য দেশের
দশের অনন্ত সুখ—প্রভূত মঙ্গল;
ক্ষত্রিয় ভাণ্ডার পূর্ণ বাণিজ্যের তরে
ব্রাহ্মণের হবি, দধি ওই বাণিজ্যেতে!

স্বার্থবাহ যে বণিক—বৈশ্য তা'র নাম,
সাগর নগর ক্ষেত্রে তা'র পুণ্যধাম।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী



তসর-শিল্পের অবনতি

এতদ্দেশীয় যে সমুদয় শিল্প ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, তন্মধ্যে তসর-শিল্প অন্যতম। পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, উৎকল ও মধ্যপ্রদেশে বহু দিবস হইতে তসরের শিল্প ও ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সমশ্রেণীর নকল দ্রব্যাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং দেশীয় শিল্পের রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠনের অভাবে প্রায় অধিকাংশ তসর-উৎপাদন কেন্দ্রে অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তসর-গুটি সংগ্রহ অথবা পালন, সূতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন দ্বারা পূর্ব্বে অনেক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিছু দিন হইতে উহা উপজীবিকায় পরিণত হইয়াছিল এবং এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, অন্য লাভজনক কার্য্য পাইলে উপজীবিকা হিসাবেও ইহাকে গ্রহণ করিতে অনেক লোক ইচ্ছা করে না। তসর-শিল্পিগণের এইরূপ দুর্গতির কারণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তসর-উৎপাদন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। এ স্থলে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে করা হইতেছে।

তসর-কীট

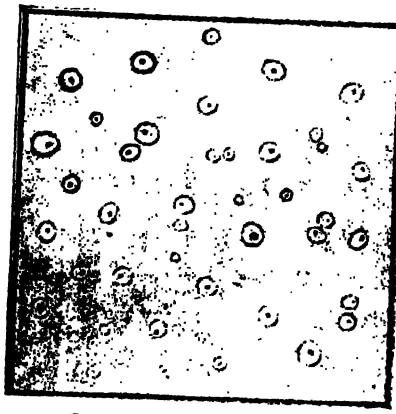
তুঁত-রেশমের সহিত তসর-রেশমের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবুও তসর-রেশম-কীট তুঁত-রেশম-কীটের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তসর-কীট যে গণের অন্তর্ভুক্ত, তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Antheria বলা হয়। ইহার চারিটি জাতি প্রধান, তন্মধ্যে জাপানজাত A. yamamai সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহার হরিতাভ শ্বেতবর্ণ রেশম বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রয় হয়। তন্নিম্নেই চীনদেশীয় Pernyi. ভারতজাত তসরের মধ্যে আসামের মুগা (A. Assama) উৎকৃষ্ট এবং চীনা তসরের সমতুল্য। পশ্চিম-বঙ্গ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের A. mylitta নামক তসর-কীট সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করে; কিন্তু এতদ্দেশীয় তসর-শিল্প প্রধানতঃ এই কীটের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থলে অরণ্যের উপকণ্ঠবাসী সাঁওতাল, কোল, গোন্দ প্রভৃতি জাতি জঙ্গলের গাছ হইতে তসর-গুটি সংগ্রহ করিয়া হাটে অথবা আরণ্য ফসলের ঠিকাদারগণের নিকট বিক্রয় করে। মহাজনসমূহ উক্ত গুটি লইয়া গিয়া আবার তাঁতিদিগকে সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রকৃত তসর-কীট বন্য হইলেও বহু কাল ধরিয়া চেষ্টার ফলে ইহার একটি অর্দ্ধ-পালিত জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য কীটের ন্যায় তসর-কীটও চারিটি অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করে, যথা—ডিম্ব, কীড়া, গুটি ও পতঙ্গ। গুটির মধ্যস্থিত পুত্তলিকা (chrysalis) পূর্ণ পরিপুষ্ট হইয়া পতঙ্গরূপে বাহির হইবার সময়ের কিছু স্থিরতা নাই। গুটি প্রস্তুতের পর ১ মাস হইতে ২ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় পতঙ্গ বাহির হইতে পারে। সাধারণতঃ গুটি যত মোটা ও দৃঢ় হয়, সময় তত অধিক লাগে; সেই জন্য বীজ উদ্দেশ্যে অনেকে পাতলা গুটি পছন্দ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মোটা গুটি হইতে পুত্তলিকা বাহির করিয়া করাতের গুঁড়ার মধ্যে রাখিয়া উহাকে পতঙ্গ অবস্থায় আনিতে পারা যায়। পালিত কীটের গুটি হইতে প্রাপ্ত রেশমের বর্ণ কতকটা ফিকে ও পরিষ্কার এবং সূত্রও সূক্ষ্মতর হয় বটে, কিন্তু অন্য দিকে ইহার অসুবিধা আছে। চাষের গুটি ক্রমশঃ ছোট ও তাহার বোঁটা বড় হইতে থাকে। কীটও হীনবল হওয়ায় উত্তরোত্তর অধিকতর মাত্রায় ব্যাধিগ্রস্ত হয়। এই কারণেই উত্তম ফসল লইতে হইলে মধ্যে মধ্যে বন্য গুটি হইতে বীজ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

কীট-পালন

সাধারণতঃ আসন গাছেই তসর-কীট অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়; কিন্তু শাল, অর্জ্জুন, ধাঁই, কুল প্রভৃতি গাছ হইতে অনেক তসর-গুটি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। যে গাছে তসর-কীট পালন করিতে হইবে, তাহাকে পূর্ব্ব হইতে ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখা উচিত। মৃত্তিকা হইতে ৩।৪ হাতের মধ্যে কোন শাখা-প্রশাখা না থাকাই ভাল। অন্য দিকে

গাছ যাহাতে ৭।৮ হাতের অধিক উচ্চ না হইয়া প্রস্থে বৃদ্ধি লাভ করে, তাহাও দেখা দরকার। পালনের গাছ নির্ব্বাচনের পর সুপুষ্ট গুটি সংগ্রহ করা প্রধান কার্য্য। সচরাচর শ্রাবণমাসে গুটি হইতে পতঙ্গ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে কোন দিন দেখা যাইবে যে, গুটি সমূহ হইতে অপরাহ্নে একটি প্রজাপতি বাহির হইয়াছে। পরে সমস্ত গুটি হইতেই রাত্রি ৯।১০ টার মধ্যে প্রজাপতি বাহির হইয়া পড়িবে। ঘরের ভিতর প্রজাপতি বাহির হইতে আরম্ভ হইলেও পালকরা বারান্দার কোন অন্যোচ্চ স্থানে ধনুকের ন্যায় একটি বক্রাকার যষ্টির উপর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলিকে বসাইয়া রাখে এবং বাদুড়, পেচক ও অন্যান্য নিশাচর পক্ষী, টিকটিকি প্রভৃতি যাহাতে উহাদিগকে নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য চৌকী দেয়। শেষ রাত্রিতে, অর্থাৎ প্রায় ৩।৪টার সময়, পুং ও স্ত্রী প্রজাপতি যোড় বাঁধে ও ঐরূপ অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল থাকে। তৎপরে পৃথক্ হইয়া যায়, কিংবা না হইলেও ছাড়াইয়া দিতে হয়। অতঃপর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলিকে এক একটি ছোট পাতার ঠোঙ্গার মধ্যে আটকাইয়া রাখা হইয়া থাকে। পুং-প্রজাপতিগুলি আর কোন কাযে আইসে না; গৃহ-পালিত পক্ষী প্রভৃতিকে খাইতে দেওয়া হয়। স্ত্রী-প্রজাপতিসমূহ তিন দিবস পরে ডিম্ব প্রসব করে; প্রতি প্রজাপতিতে ডিম্বের সংখ্যা দেড় শত হইতে দুই শত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ডিম্বগুলি যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ঠোঙ্গায় রাখাই নিয়ম। ডিম্ব ফুটিতে ৯ দিবস লাগে। কীড়া বাহির হইতে আরম্ভ হইলেই ডিম্ব সমেত ঠোঙ্গাগুলি পূর্ব্ব হইতে নির্ব্বাচিত গাছের শাখা-প্রশাখার নানা স্থানে আটকাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য গাছের আয়তন হিসাবে অল্প অথবা অধিকসংখ্যক ঠোঙ্গা আবশ্যক হইতে পারে। কীড়াসমূহ আপনা হইতেই গাছের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া যায় এবং পত্র ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। এক গাছের পাতা খাওয়া শেষ হইলে কীড়া সমেত ডাল লইয়া গিয়া অন্য গাছে লাগাইয়া দিতে হয়। যত দিন না কীট পুষ্ট হয় এবং স্বয়ং ভোজন হইতে বিরত হয়, তত দিন এইরূপ গাছ বদলান দরকার।

খাওয়া বন্ধ হইলে গুটি বাঁধিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া সচরাচর বুঝিতে হইবে এবং তখন আর বৃক্ষ-পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। গুটি বাঁধা শেষ হইলে গুটিযুক্ত ডাল কাটিয়া নামাইয়া লইয়া খুব সতর্কতার সহিত গুটিগুলি খুলিয়া লওয়া হয়; পরে উক্ত গুটিসমূহ হাটে অথবা মহাজনের নিকট চালান যায়। কিন্তু যদি গুটি কিছু দিন রাখিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে মারিয়া ফেলা দরকার। সহজভাবে এই কার্য্য করিবার উপায় নিম্নরূপ :—একটি হাঁড়িতে সামান্য জল দিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিতে হইবে; ঐ প্রকারের অন্য একটি হাঁড়িতে কতকগুলি গুটি দিয়া ও মুখের ভিতর দিকে কঞ্চি অথবা পাতলা 'বেকারি' দিয়া এরূপ ভাবে আটকাইয়া দিতে হইবে যে, হাঁড়ি উল্টাইলে গুটি পড়িয়া না যায়। অতঃপর গুটি সমেত হাঁড়ি ফুটন্ত জলের হাঁড়ির উপর উল্টাইয়া রাখিয়া দিলে তপ্ত জলীয় বাষ্প উহাতে প্রবেশ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ তপ্ত বাষ্প সংস্পর্শে থাকিলে গুটির ভিতর সমস্ত কীটই মরিয়া যাইবে। পরে উহাদিগকে বাহির করিয়া উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতে হইবে।



গ্রাসেরি রোগ; অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্ট দানাসমূহ

তুঁত-কীটের ন্যায় তসর-কীটেরও প্রধান ব্যাধি—গ্রাসেরি (Grasserie)। কীটসমূহ যে গাছের পত্র খাইতেছিল, তদপেক্ষা পরিবর্ত্তিত গাছের পাতা যদি অধিক রসাল হয়, তাহা হইলে এই ব্যাধি সহজে জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে বৃক্ষকাণ্ডের আভ্যন্তরীণ রসপ্রবাহ মৃত্তিকা হইতে ৩।৪ হাত উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে এবং নীচের দিকের পত্র অধিক সরস হয়; সেই জন্য উক্ত সীমা পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখা না রাখার নিয়ম। একবার গ্রাসেরি রোগ দেখা দিলে অনেক কীট মরিয়া যায়। রোগের প্রধান লক্ষণ—কীড়া-শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক দানার আবির্ভাব। কীড়ার অন্য প্রকার শত্রুরও অভাব নাই—

তন্মধ্যে পিপীলিকা অন্যতম; ইহাদের আক্রমণ বন্ধ করিতে হইলে বৃক্ষকাণ্ড বেশ করিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার। কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে ৫।৬ অঙ্গুলি-পরিমিত ও ড়া করিয়া তলার তৈল মাখাইয়া দিলে উক্ত বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া পিপীলিকাদি যায় না। বিছা,



বগুই গুটি

কাঁকড়াবিছা, বোলতা, কাঠবেরালী, নানাপ্রকার পক্ষী, 'চাপিয়া', ছাবুঁদিয়া প্রভৃতি কীট ও অন্যবিধ জীবও তসর-কীট নষ্ট করে। তন্নিমিত্ত পালনের গাছ চৌকী দেওয়া অন্যতম কায। আঠা-কাঠি, গুলি, বাঁটুল প্রভৃতি লইয়া সাধারণতঃ পালকের পরিবারস্থ বালকগণ এই কার্য্য এত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকে যে, গুটি-পালনের বৃক্ষাদির নিকট প্রায়ই পাখী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না।



ফসলের শ্রেণীবিভাগ

গুটির আকৃতি ও প্রকৃতিভেদে এবং গুটি প্রসবের সময়ের পার্থক্যে এতদ্দেশে তিন শ্রেণীর তসর উৎপাদিত হইয়া থাকে:—(১) লাড়িয়া,—মুরিয়া বীজ হইতে প্রাপ্ত শ্রাবণে 'আমপাতিয়া', আশ্বিনে 'বর্ষাতি' এবং শীতে 'জাড়ুই' নামক তিনটি ফসল এই শ্রেণীভুক্ত। জাড়ুই গুটি ছোট, গাঢ়বর্ণ-বিশিষ্ট ও বন্য, কিন্তু বন্য বীজ বলিয়া এক এক সময় অর্দ্ধ-পালিত বীজ দিয়াও ব্যবসায়িগণ পালকদিগকে অনেক সময় প্রতারিত করিয়া থাকে। (২) দাবা—ইহার উৎপত্তি সম্ভবতঃ মুদা-মুগা কীট হইতে হইয়াছে; গুটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহা সকল জাতীয় তসর-কীটের মধ্যে সমধিক কষ্টসহ; যে বৎসরে দাবা গুটি হয়, সেই বৎসরের ভাদ্র-মাসে ইহার পতঙ্গ বাহির না হইয়া তৎ-পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বাহির হইয়া একটি 'আমপাতিয়া' ফসল প্রসব করে; ইহারও বর্ষাতি ফসল আছে। (৩) বগুই—ইহার গুটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয় এবং ইহা একবারেই বন্য। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গুটি কাটিয়া পতঙ্গ বাহির হয় এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে নূতন ফসল প্রদান করে। আমপাতিয়া গুটি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট;



দাবা গুটি (বর্ষাতি)

তদপেক্ষা বর্ষাতি গুটি ভাল, কিন্তু বাজারে শীতের গুটিরই আদর অধিক। বর্ষাতি অপেক্ষা শীতের গুটির দর ৩।৪ গুণ অধিক। বর্ষাতি গুটির কাহন (১২৮০টি) ৪ টাকা হইলে শীতের গুটি অন্ততঃ ১২ টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন

যাহারা তসর-বস্ত্র বয়ন করে, প্রায় তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রী-লোকরাই সূতা কাটে। সূতাকাটার পূর্ব্বে গুটিগুলিকে

সিদ্ধ করিয়া নরম করিতে হয়। দেশীয় প্রথায় ৫ শত গুটি যে পরিমাণ জলে সিদ্ধ করা হয়, তাহার সহিত আসন, কেণ্ডা অথবা তিসির ছাই অর্দ্ধ সের কিংবা সাজিমাটী অর্দ্ধ ছটাক হিসাবে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ছাই বারংবার ছাঁকিয়া লইলে এতদপেক্ষা অধিক কার্য্যকর ক্ষার-দ্রাবণ (lye) পাওয়া যাইতে পারে। উহাতে অর্দ্ধঘণ্টা ফুটাইলেই যথেষ্ট হয়। একবার ফুটাইলেই সমস্ত গুটি যে সমানভাবে নরম হইয়া যায়, তাহা নহে, যেগুলি হইতে সূতা সহজে ছাড়ান যায় না, সেগুলিকে পরদিবস আবার অন্য গুটির সহিত সিদ্ধ করিতে দেওয়া হয়। গুটি সিদ্ধ হইয়া গেলে উহাদিগকে একটি বস্ত্রাবৃত পাত্রে রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সূতাকাটা আরম্ভ হইয়া থাকে। ৪।৫টি গুটির সূতা একত্র ধরিয়া লাটাই দ্বারা পাকানই সাধারণ নিয়ম। বিশেষ দক্ষ লোক হইলে দিনে ১ শত গুটির সূতাকাটা অসম্ভব নহে। প্রতিদিন ৫০।৬০টি গুটির সূতা অনেকেই কাটিতে পারে। গুটির গুণানুসারে এক কাহন গুটি ১২ ছটাক হইতে ২ সের সূত্র প্রদান করে। আধুনিক যন্ত্রাদি-পরিচালিত কারখানাসমূহে এক ব্যক্তি ২ শত ৫০টি গুটির সূতাও কাটিতে পারে। এরূপ স্থলে সোডা অথবা পটাস ক্ষাররূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাতে সূতা সহজে খুলিয়া যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা বস্ত্রের স্থায়িত্ব গুণের কোন ক্ষতি যে হয় না, তাহা বলা যায় না।

খাঁটি তসরের বস্ত্র ব্যতীত তসরের সহিত অন্য রেশম, পশম, তুলা, পাট, রিয়া ও অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত করিয়া নানা প্রকারের বস্ত্র আজকাল প্রস্তুত হইতেছে। তসর নামধেয় এরূপ বস্ত্রও বাজারে বিক্রয় হইতেছে, যাহার সহিত তসরের কোন সম্বন্ধ নাই। উক্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। এ স্থলে আমাদের ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, দেশীয় প্রথায় দেশীয় তন্তুবায়গণের দ্বারা যে সমুদয় খাঁটি অথবা বিমিশ্র তসরজাত বস্ত্র উৎপাদিত হইত, তাহার পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে এবং তদ্রূপ অবস্থা সংশোধনের কোন চেষ্টাও হইতেছে না।

বিদেশীয় মালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অন্যান্য দেশীয় শিল্পের ন্যায় তসর-শিল্পের অবনতির মূলেও জনসাধারণের রুচিবিকারের আভাস পাওয়া যায়। স্বল্পমূল্যের আপাততঃ মনোরম বস্ত্রাদি বিদেশীয় বণিকগণ বাজারে আমদানী করিয়া লোককে এতই মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে যে, উক্ত দ্রব্যাদি স্থায়ী হইবে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার তাহাদের আর অবসর নাই। দেশীয় ব্যবসায়িগণও এই বিষয়ে বিদেশীয়গণের সহিত যোগদান করিয়াছে। জর্ম্মণী, জাপান, ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ হইতে Poplin Muslin, Tussorette, Cotton silk প্রভৃতি শ্রেণীর চাকচিক্যশালী বস্ত্রাদি যে রেশমজাত নহে, তাহা অনেক বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বিশেষরূপ জানে; কিন্তু তবুও সাধারণকে উক্ত দ্রব্যাদি রেশমী বস্ত্র বলিয়া বিক্রয় করিতে তাহারা আদৌ পশ্চাৎপদ নহে। বলা বাহুল্য যে, তসরের পরিবর্ত্ত (substitute) খুব কম বস্ত্রেই রেশম থাকে; যেখানে থাকে, সেখানেও অতি নিকৃষ্টজাতীয় রেশম—চশম অথবা রেশম-ছাঁট। এরূপ রেশম ট্যানিক্ এসিড, টিনের যৌগিক অথবা অন্যবিধ রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত হওয়ায় ভাল রেশমী বস্ত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই প্রকার silk waste বা অব্যবহার্য্য রেশম কষ্টিক সোডা সহযোগে সিদ্ধ ও নরম করিয়া বিশেষ প্রকারের কলে বয়ন করা হয় ও তাহাই সুলভ রেশমী বস্ত্র বলিয়া এতদ্দেশে বিক্রীত হয়। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে কাশী এই প্রকার নকল ও অপকৃষ্ট রেশমজাত বস্ত্রাদি ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখানে ক্রমশঃ এই বিপুল প্রতারণা ধরা পড়ায় আজকাল উক্ত কেন্দ্র ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইতোমধ্যেই ভাগলপুরের পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তসর-শিল্প ইহার দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং সময়ে প্রতীকার না হইলে ভবিষ্যতে উহার অস্তিত্ব লইয়া যে টানাটানি হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

বস্ত্রের কথা বাদ দিয়া যদি শুধু সূত্রের কথা বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিদেশীয় বণিকগণের কার্য্যতৎপরতা ও সংগঠনক্ষমতা আমাদিগের কত অনিষ্টসাধন করিতেছে। বিলাতী রেশমী সূতা যত সহজে বাজারে পাওয়া যায়, দেশীয় সূতা তত সহজপ্রাপ্য নহে। তসরের সূতা কাটিতে সময় ও শ্রম লাগে; তদপেক্ষা অল্পমূল্যে বিলাতী নকল তসর-সূতা বাজারে অনায়াসেই পাওয়া যায়। সেই জন্য অনেক তন্তুবায় খাঁটি তসর-সূতা ব্যবহার করিতে চাহে না। বঙ্গদেশ অপেক্ষা বিহারে তসরের অনেক অধিকসংখ্যক কারখানা আছে।

কিন্তু যদি কেহ অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, উক্ত প্রদেশের দুইয়ের তিন ভাগ কলে যে সূত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা বিলাতী এবং অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত রেশমও নয়। এইরূপ সূত্রের ব্যবহার দেশীয় তসর-শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। ইহার ফল এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, যাহারা সুতা কাটিয়া জীবনযাপন করিত, তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে—তসর-কারখানায় গিয়া মজুরী করা ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় নাই।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় তসরের কয়েকটি দোষ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপতঃ সেগুলির উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, তুঁত-রেশমের ন্যায় তসর-সূত্র আটা-যুক্ত নহে। ৪।৫টি গুটির সূতা একত্র করিয়া পাক দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সূতাগুলি একবারে জুড়িয়া যায় না। মাড় দেওয়ার ফলে নূতন বস্ত্র ভালই দেখায়, কিন্তু ধুইলে সূতা আল্‌গা হইয়া গিয়া কাপড় বিশ্রী হইয়া যায়। তসরের প্রায়ই 'ঠাস' বুনন হয় না এবং ইহার ময়লা রং-ও অনেকের পছন্দ হয় না। কিন্তু ইহা সকলে মনে রাখেন না যে, প্রতি-বার ধোপের সহিত তসরের বর্ণ ও আভা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইতে থাকে; পক্ষান্তরে, চীনা অথবা জাপানী তসরে তাহা হয় না। আমরা যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিলাম, সেগুলি যে অসংশোধনীয়, তাহা নহে। তসর অপেক্ষা নিকৃষ্ট তন্তুকেও নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা এরূপ অবস্থায় আনা হইতেছে যে, তৎসমুদয় হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুতের কোন অন্তরায় হইতেছে না। তসর সম্বন্ধেও তাহাই হইতে পারে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। বস্তুতঃ তসর-কীটের বংশোন্নতি, সূতাকাটা ও বস্ত্র বয়নের অভিনব প্রণালী, সূত্র নরম, আটাল ও পছন্দমত বর্ণবিশিষ্ট করার উপায় প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের উপর তসর-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এইরূপ গবেষণায় সুফল লাভ করিতে অবশ্য অনেক সময় লাগিবে। তত দিন তসর-শিল্প ও ব্যবসায়কে জীবিত রাখার একমাত্র উপায়—সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা বড় বড় কেন্দ্রে খাঁটি তসর-সূত্র উৎপাদন ও বয়নকারিগণ যাহাতে উক্তরূপ সূত্র সহজে ও উচিত মূল্যে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। সাধারণ ব্যবসায়ী দ্বারা এ কার্য্য চলিতে পারে না, কারণ, তাহারা আপাততঃ বিলাতী সূত্রই তাঁতিদিগকে দিতেছে এবং তাহাতে তাহাদের লাভও অধিক। শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তসরের ন্যায় একটি পুরাতন শিল্প বিনষ্ট না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সৃষ্টি-পূজা

আমি স্রষ্টার পূজা করি নাক, তাঁর
সৃষ্টির পূজা করি,
আমি জীবে শিব হেরি, তাইতে জীবের
মূরতি হৃদয়ে ধরি।
যবে ক্ষুধিত ক্ষুধায় অন্ধ,
জীবনে-মরণে দ্বন্দ্ব,
তৃষিত যখন নিরাশা-মগন
গৃহ-হারা কাঁদে ফিরি;
আমি সজল-নয়নে তখনি তাদের
আপন বলিয়া বরি।
আমি স্রষ্টার পূজা করি নাক, তাঁর
সৃষ্টির পূজা করি॥
যারা আর্ত্ত, ব্যথিত-চিত্ত,
শুধু হা—হা করি' ঘুরে নিত্য;
ব্যাধির জ্বালায়, যারা ভাবে, হায়,
মৃত্যু নহে ত অরি;
আমি তাদেরি পার্শ্বে যাই গো ছুটিয়া,
বক্ষে তাদের ধরি,
আমি স্রষ্টার পূজা করি নাক, তাঁর
সৃষ্টির পূজা করি॥
অই অন্ধ-কুষ্ঠ-খঞ্জে
আহা! ছাড়িতে চাহে না মন যে;
বলে, "পূজা কর, এরা দামোদর—
ও-পারের খেয়া-তরী।"
আমি তাই মাগি যেন জনমি ধরায়
ওদেরি সেবায় মরি,
আমি স্রষ্টার পূজা করি নাক, তাঁর
সৃষ্টির পূজা করি॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাপীর স্বর্গ

১

বারান্দায় এক পাশে মাদুর পড়িয়া ছিল, শ্রীধর মাটীতে শুইয়া ছিল। সম্ভব প্রথমতঃ সে মাদুরের উপরই শুইয়াছিল, তাহার পর মাদুর ছাড়িয়া কখন্ মাটীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে ধারণা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। কেন না, সে তখন পূর্ণরূপে মাতাল, বোধশক্তি বিশেষরূপে তাহার ছিল না বলিলেই চলে।

রাত্রি তখন অনেক হইয়া গিয়াছে। আকাশের গায়ে ভাসিতে ভাসিতে শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ তখন ঠিক মাথার উপর। তাহার উজ্জ্বল আলো ধরার গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অনেকক্ষণ শ্রীধর চোখ মুদিয়া পড়িয়া ছিল, চোখ চাহিতেই দৃষ্টিতে পড়িল সুন্দর নীল আকাশে ভাসমান সুন্দর চাঁদ। হতভাগ্যের চোখে এ সৌন্দর্য্য বুঝি অসহ্য বলিয়াই ঠেকিল, সে তাই দুই হাতে চোখ ঢাকিল।

আজ কি জানি কেন,—কোন একটু দুর্ব্বলতার ছিদ্র-পথে পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। ভাবিব না মনে করিলেও সেই পূর্ব্বের ভাবনা আইসে, ইহাকে কিছুতেই সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

মনে হইতেছিল, কয়েক বৎসর আগে সে কি ছিল, কয়েক বৎসর পরে সে কি হইয়াছে? কয়েক বৎসর আগেও সে ভাবে নাই, তাহার এক দিন এই অবস্থা হইবে, তাহার সেই উন্নত মনের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন ঘটিবে।

অবশ্য মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল সে অনেক দিন আগে, সে আজ প্রায় ১০।১১ বৎসরের কথা। যখন সে বিবাহ করিয়া সুরমাকে গৃহে আনিয়াছিল, তখন তাহার চরিত্র পবিত্র ছিল, পানদোষকে সে সর্ব্বতোভাবে এড়াইয়া চলিত, মাতালকে তখন সে আন্তরিক ঘৃণাই করিত।

কোন অফিসে সে ৩০ টাকা বেতনে কায করিত, কিন্তু তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের অনটন দূর করিতে তাহাই পর্য্যাপ্ত ছিল। পতিপ্রাণা পত্নী সংসারের কোন কষ্ট-দুঃখকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিত না।

কুক্ষণে রমেশ আসিয়া জুটিল। রমেশ শ্রীধরের পত্নীর পিত্রালয়ের গ্রামের লোক। লেখা-পড়া সামান্য যাহা শিখিয়াছিল, তাহাতে অফিসের কায চলিতে পারে না, সেই জন্য সে কলে কায করিত। মাসিক বেতন যাহাই হউক না কেন, উপরি সে দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করিত।

প্রথমতঃ রমেশকে শ্রীধর বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। রমেশ যেমন অন্তরঙ্গভাবে শ্রীধরকে গ্রহণ করিয়াছিল, শ্রীধর তেমন ভাবে রমেশের সহিত মিশিতে পারে নাই। কিন্তু বেশী দিন সে নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না, শীঘ্রই রমেশের সহিত তাহার প্রণয় গাঢ় হইল।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে—যাহারা পরের ভাল, পরের সুখ সহ্য করিতে পারে না। রমেশও এই শ্রেণীর লোক ছিল। শ্রীধরের সুখের সংসার তাহাকে বড় বেদনা দিয়াছিল, সে এই সংসারকে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় ছিল।

প্রবাদ আছে, চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর হইতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে মাণ্ডব্য মুনিকেও চোরের সহিত শাস্তি লইতে হইয়াছিল। মাতালের সহিত মিশিয়া কচিৎ কেহ সাধু থাকিতে পারে। সুরমা রমেশকে চিনিত, সে তাই স্বামীকে যখন সাবধান করিতে গেল, তখন তাহার স্বামী অধঃপতনের পথে নামিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ফিরান অসম্ভব হইল। রমেশের সাহচর্য্যে শ্রীধর দিন দিন অবনতির পথে নামিয়া চলিল।

মণি যখন জন্মিল, তখন শ্রীধর অবনতির ঘনান্ধকার গহ্বরে এমন ভাবে গড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার উঠিবার উপায় আর ছিল না। চাকরীটা তখনও ছিল। কিন্তু মণি যখন তিন বৎসরের, তখন চুরির অপরাধে চাকরী গেল। শ্রীধরকে জেলেও যাইতে হইত, সুরমার গহনাগুলি তাহাকে সে যাত্রা বাঁচাইল।

প্রথমটা শ্রীধর ভারী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক যায়গায় ঘুরিয়াও সে কায পাইল না, কোথায়ও যদি কায পাইল, সে কায দুই দিনের বেশী রহিল না। হতাশভাবে শ্রীধর বসিয়া পড়িল।

এই সময়ে রমেশ তাহাকে কলের কাযে ঢুকাইয়া দিল। রমেশের হিতৈষিতায় শ্রীধর মুগ্ধ হইয়া গেল; সে জানিল—জগতে যদি কেহ তাহার বন্ধু থাকে, তবে সে রমেশ ছাড়া আর কেহ নহে।

কলের কায গ্রহণ করিতে সুরমা বাধা দিয়াছিল ; স্বামীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"ওগো, কলের কাযে যেও না, শুনেছি, কলে কায করতে গেলে মনুষ্যত্ব থাকে না। চাকরী ক'রে আর দরকার নেই, দেশে ফিরে চল। যা দু'এক বিঘে জমাজমী আছে, তাই চাষ-বাস ক'রে আমাদের সংসার চ'লে যাবে।"

স্ত্রীর কথা শ্রীধর কানে লইল না। কিন্তু আগে এমন দিন ছিল, যে দিন ছোট-বড় সকল কাযে সে স্ত্রীর পরামর্শ লইত।

সুরমার আশঙ্কা সত্য হইল। কলে কুলী-মজুরের সহিত মিশিয়া শ্রীধরের অধঃপতন সম্পূর্ণতার পথে চলিতেছিল। আগে সে মদ খাইত, কিন্তু চরিত্র হারায় নাই, স্ত্রীকে তবুও সে ভালবাসিত ; কলের কাযে আসিয়া সে চরিত্রও হারাইল, দিন দিন স্ত্রীর প্রতি তাহার অনুরক্তিও কমিতে লাগিল।

তথাপি সুরমার প্রতি ভালবাসা শ্রীধর একবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। রমেশ সুরমার কাছে এক দিন কুপ্রস্তাব করিয়াছিল, সুরমা স্বামীকে তাহা জানাইবামাত্র সে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং রমেশকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিল।

অবশ্য তখন শ্রীধর প্রকৃতিস্থ ছিল, তাহার পর মদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সকল কথা ভুলিয়া গিয়া রমেশকে পূর্ব্বের মত বন্ধুভাবে গ্রহণ করিল। রমেশের মনে অপমানের স্মৃতি জাগিয়া ছিল, সে সুরমার সর্ব্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিল।

আগুন ধরাইতে বেশী আয়াস সহ্য করিতে হয় না। মাতাল দুশ্চরিত্রদের মনের দৃঢ়তা থাকে না, সহজেই তাহারা অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাস করিয়া লয়। এই জন্যই রমেশ শ্রীধরকে জানাইয়া দিল, সুরমার চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। কলের বড় বাবু তাহার······ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর হইতে শ্রীধর সুরমার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত, প্রহারে তাহাকে জর্জ্জরিতা করিত। পতিপ্রাণা সাধ্বী-সতী কোনরূপেই স্বামীর মনে পূর্ব্ববিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। প্রহারের ক্লেশে দারুণ ঘৃণায় সে শয্যাগ্রহণ করিল, আর উঠিল না। চারি বৎসরের পুত্র মণিকে স্বামীর হাতে দিয়া—তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া সৎপথে ফিরিয়া সংসার যাপন করিতে বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। মণি আজ ৮ বৎসরের বালক, শ্রীধর আজও সেই কলে কায করে। পত্নীর আর কোন কথা সে রক্ষা করিতে পারে নাই। শুধু একটি কথা সে রক্ষা করিয়াছে, মণিকে সর্ব্বতোভাবে মানুষ করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সে জানে, তাহার এ পঙ্ক হইতে উঠিবার ক্ষমতা আর নাই, ইহারই মধ্যে তাহাকে ডুবিয়া মরিতে হইবে।

সৎজীবন লাভ—সৎপথে চলা, আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়া, কথাটা মনে করিতে হাসি পায়। সবই ত তাহার ছিল, সৎ চরিত্র, সাধুতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুখের সংসার, সে যে সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আবার তাহা অর্জ্জন করিবে,—কিন্তু কেন? যে চরিত্র সে হারাইয়াছে, আর তাহা পাইবে না, যে সাধুতা সে হারাইয়াছে, আর তাহা মিলিবে না, সর্ব্বোপরি যে প্রাণাধিকা পতিপ্রাণা পত্নীকে সে হত্যা করিয়াছে, সে পত্নী আর আসিবে না। না, নদীর যে ধারটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়াই পড়ুক, বাঁধ দিয়া আর কি হইবে? মণিকে মানুষ করিবে সে, মণি যাহাতে সৎ অসৎ বিবেচনা করিতে পারে, সেই দিকেই সে দৃষ্টি রাখিবে। তাহার জীবনের আধার মণি, মণিকে ভগবান্ যথার্থ মানুষরূপে ফুটাইয়া তুলুন।

২

ক্ষুদ্র বালকের মনের মধ্যে তিলমাত্র শান্তি ছিল না। মায়ের কথা মনে পড়ে ; কিন্তু কেন যে তিনি চলিয়া গেলেন, তাহা সে জানে না।

পিতা তাহাকে কুলী-মজুরদের ছেলের সঙ্গে মিশিতে দেন না, অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে পাহারা দেন, যেন সে উহাদের সহিত একটাও কথা না বলে। খুব যত্ন করিয়া তাহাকে লেখাপড়া শেখান, সে যাহা ভালবাসে, তাহাই দেন। প্রত্যহ রামায়ণ-মহাভারত হইতে পাপ-পুণ্যের কাহিনী তাহাকে শুনান, যাহাতে সে সৎ হয়, ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে কত উপদেশ দেন। বালক সবই নীরবে শুনিয়া যায়।

তাহার পিতা সব সময়ে ভাল থাকেন, এক এক দিন

রাত্রিকালে অতিরিক্ত মাতাল অবস্থায় যখন বাড়ী ফিরেন, তখন মণি বড় ভয় পায়। পিতা কত বার পড়িয়া যান, বালক কাঁদিয়া সারা হয়। সে বুঝিতে পারে না, তাহার অমন পিতা কি ছাই খাইয়া এরূপ হইয়া যান, তখন কোথায় যায় তাঁহার বিবেক, ধর্ম্ম-বুদ্ধি!

তবু ভয়ে সে কোন দিনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; কত দিন প্রশ্ন মুখে আসিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। কি জিজ্ঞাসা করিবে সে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে?

সে দিন বড় বাবুর ছেলের সহিত খেলিতে যাওয়ায় ছেলেটি তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া হাসিয়াছিল,—মাতালের ছেলের সহিত সে খেলা করিবে না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। অভিমানে কাঁদিয়া মণি বাড়ী আসিয়াছিল, তথাপি সে পিতাকে সে কথা বলিতে পারে নাই। পিতা যখন তাহাকে ভদ্রলোকের ছেলেদের সহিত মিশিয়া খেলিবার উপদেশ দিত, তখন ধীরে ধীরে সে সরিয়া পড়িত।

সে দিন শনিবার ছিল। শনিবার সন্ধ্যায় তাহার পিতা কোন দিনই বাড়ী আসিত না। হয় ত সমস্ত রাতই সে কুৎসিত স্থানে কাটাইয়া দিত—যদি না মণি থাকিত। প্রচুর নেশা করিলেও—সব কথা ভুলিয়া গেলেও এটুকু মনে থাকিত, মণি একা ঘরে রহিয়াছে, তাহার কাছে কেহ নাই। এই জন্ত সে কোনও শনিবারে ৮টার বেশী দেরী করিত না।

এ শনিবারে ৮টার স্থানে ১০টা বাজিয়া গেল, ক্রমে ১১টা ১২টা বাজিতে চলিল, তথাপি শ্রীধরের দেখা নাই। পিতার নির্দ্দেশমত মণি প্রত্যহ সন্ধ্যায় রামায়ণ পড়িত, শনিবার দিন পিতা যে পর্য্যন্ত না আইসেন, সে পর্য্যন্ত বসিয়া পড়িত। আজ রাত বাড়িয়া চলিল দেখিয়া মণির উৎকণ্ঠাও বাড়িতে লাগিল।

কত বার মণি কুটীরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিতে লাগিল, পিতা আসিতেছেন কি না। পিতার দেখা না পাইয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

পার্শ্ববর্ত্তী কুটীর হরিয়াদের,—কখনও মণি এই নিম্নশ্রেণীর ছেলেটার সহিত কথা কহিত না; আজ বাধ্য হইয়া তাহাকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হরিয়া, আমার বাপ কোথায়, জানিস্ না কি রে?"

হরিয়া প্রথমটা প্রতিশোধ লইবার জন্ত কথা কহিবে না বলিয়াই ভাবিয়াছিল, শেষটা বালকের রোদনে তাহার সে দৃঢ়সঙ্কল্প রহিল না। সে অবহেলার ভাবে বলিল, "বাপের জন্যে ভাবছিস কেনে রে; তোর বাপ এখন স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছে, বগলে বোতল নিয়ে হল্লা করছে। চুপ ক'রে ঘুম দি গে যা, আজ তোর বাপ ঘরকে আসছে নি।"

কাঁদিতে কাঁদিতে মণি ঘরে ফিরিল। বিছানায় শুইয়া পড়িতেও ভয় করিতেছিল, কখনও সে যে একলা শোয় নাই?

দরজার পাশে বসিয়া মণি স্বর্গগতা মাকে ডাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানে না।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, সে দেখিল, তাহার পিতা ও রমেশ বারান্দার ধারে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ করিয়া কি সব কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, মাঝে মাঝে তাহারা একটা বোতল মুখে তুলিতেছিল।

মণি অবাক্ হইয়া শুধু তাকাইয়া রহিল। মদ খাইয়া পিতা বাড়ী আসে, বাড়ীতে কখনও সে তাহাকে বোতল আনিতে দেখে নাই। উঃ, পিতা তাহার কি ভয়ানক মদ খাইতেছে, আজ না জানি কি কাণ্ডই করিবে। এক দিন হরিয়া বলিয়াছিল, বেশী মদ খাইলে মানুষ মরিয়া যায়; কোন্ দিন মণির বাবারও দম ফাটিয়া যাইবে, সেই কথাই আজ মণির মনে পড়িতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া মদের বোতলটা টানিয়া ফেলিয়া দেয়, কাঁদিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—"বাবা, তুমি আর মদ খেও না।" কিন্তু যায় সে কি করিয়া, রমেশ যে পিতার কাছে বসিয়া! রমেশকে সে যমের মত ভয় করে, কে জানে কেন, রমেশকে না দেখিতে পাইলেই সে বাঁচিয়া যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে রমেশ চলিয়া গেল, তখন শ্রীধরের চোখ মণির উপর পড়িল। জড়িত-কণ্ঠে সে বলিল, "ওখানে ব'সে আছিস্ কে, মণি? ঘুমাস নি বুঝি?"

মণি উত্তর দিতে পারিল না, অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

শ্রীধর ডাকিল, "আয় আমার কাছে, এইখানে এই মাদুরটার ওপর শুয়ে ঘুমো। বড্ড গরম পড়েছে আজ, ঘরে শুতে হবে না।"



সীতা

বসুমতী প্রেস]　　　　[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ ।

মণি দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, বিকৃত হাসিয়া পিতা বলিল, "থাক গে দরজা খোলা, ঘর খুঁজলে একটা কাণা কড়িও মিলবে না, কেউ আর চুরি করতে আসছে না।"

মণি পিতার পার্শ্বে বসিল, পিতা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "আজ আমার আসতে বড্ড দেরী হয়ে গেছে, তুই শুস্ নি কেন বোকা ছেলে?"

মণি পিতার গলা জড়াইয়া বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

পুত্রের কান্নায় পিতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, তাহার জমা নেশা ছুটিয়া গেল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কাঁদছিস্ কেন বাবা, একলাটি তোর বড় ভয় করেছিল, তাই? ভয় কি বাবা! আজ রাত হয়ে গেছে, সে যে তোরই ভালর জন্যে মণি। এখন রোজই আমার রাত হবে বাবা, কোন রাতে হয় ত আসতেও পারব না। তোর কাছে শোওয়ার জন্যে লোক ঠিক ক'রে দেব, আমি যে যে দিন না আসতে পারব, সেই সেই দিন সে এসে তোর কাছে শোবে। বেশী দিন তোকে এ ঘরে এ কষ্টে থাকতে হবে না যাদু, তোকে কোঠা-ঘরে নিয়ে যাব, দুই এক জন আত্মীয়-স্বজন এনে রাখব, তোকে স্কুলে ভদ্রলোকের ছেলের মত পাঠাব, তোর ভাবনা কি, বাবা?"

পিতার কথা শুনিতে শুনিতে কি এক অজ্ঞাত ভয়ে মণির বুক কাঁপিয়া উঠিল। পিতা বোতলটা লইবার জন্য হাত বাড়াইবামাত্র সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "না বাবা, তুমি আর মদ খেও না, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক মদ খেয়েছ, আরও মদ খেলে এখনই তুমি ম'রে যাবে, তখন কে আমায় দেখবে?"

পুত্রের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ পিতাকে দমাইয়া দিল। হাত সরাইয়া আনিয়া দুই হাতে পুত্রকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে সে বলিল, "না মাণিক, আর মদ খাব না। ভয় কি, আমি মরব কেন? পৃথিবীতে বরেণ্য লোক ছিলুম, আদর্শে অতুলনীয় ছিলুম, ধাপে ধাপে কোথায় নেমে এসেছি, তবু এখনও এর শেষ হয়নি—এখনও বাকী আছে। সেই শেষটুকু পূর্ণ করবার জন্যে আমায় যে বেঁচে থাকতেই হবে, বাবা! আমার ত মরলে চলবে না। নাঃ, ভয় কি তোর, বুকে সাহস নিয়ে আয়, তোর বাবা মরবে না। পৃথিবীর একটা অমঙ্গল গ্রহ আমি, যখন আমি আকাশে উঠেছি, যতক্ষণ পারব পৃথিবীর অনিষ্টই করব; ভগবান্‌কে দেখাব, আমায় সব দিয়ে কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব সাজানোর প্রতি-শোধ কেমন ক'রে দিতে হয়। ও কি, তুই কাঁদ্‌ছিস কেন বাবা, ভয় করছে? না, আমি পাগলের মত কি বলছি, মদ খেয়ে মাথার ঠিক নেই। তুই ঘুমো বাবা, আমার বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়।"

ঘুমাইতে গিয়া বালক ঘুমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া শ্রীধর দেখিল, সে অপলক দৃষ্টিতে তাহার পানেই চাহিয়া আছে। পিতৃ-হৃদয় আলো-ড়িত হইয়া উঠিল; দুই হাতে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া দিতে গিয়া তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর বান ছুটিয়া গেল; বিকৃতকণ্ঠে সে বলিল, "তুই ঘুমাসনি মণি?"

রুদ্ধকণ্ঠে মণি বলিল, "না বাবা, ঘুম যে আসছে না।"

তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে শ্রীধর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

তাহার বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া মণি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি জ্যেঠার সঙ্গে মিশো না, ওকে দেখলে আমার বড্ড ভয় হয়, মনে হয়, ও আমাদের খেয়ে ফেল্‌বে। তুমি মদ খাও ওরই সঙ্গে মিশে, তা আমি জানি; জ্যেঠার সঙ্গে না মিশলে তুমি ঠিক আমার বাবা হয়ে থাক। আমি কোঠা-বাড়ীতে যেতে চাইনে বাবা, এইখানেই থাকব,. এখান হ'তে প'ড়ে আমি মানুষ হব, বড়লোক হব, তোমায় সুখী করব। তোমার পায়ে পড়ি, বাবা!"

বলিতে বলিতে মণি কাঁদিয়া পিতার বক্ষ ভাসাইয়া দিল।

শ্রীধরের বুকটা অব্যক্ত যাতনায় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, শিশুর কথার উত্তর সে কেমন করিয়া দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মণি শ্রান্ত হইয়া শ্রীধরের বুকে মাথা রাখিল। তাহার ললাটে একটা চুম্বন দিয়া পিতা বলিল, "তুই এত কাঁদছিস কেন বাবা, তুই যা চাস, তাই হবে। তোর ইচ্ছা এখানে থাকতে, তাই থাকিস। তবে লোকের একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। আমি কাল হ'তে উপরি কায পেলে করব, তাতে আরও কিছু বেশী পাব, কাযেই

ফিরতে হয় ত কোন কোন দিন রাতও হ'তে পারে। দেখছিস ত বাবা, স্কুলে যাস, একখানা ভাল কাপড় নেই, ভাল জামাজুতো নেই। আমার কি ইচ্ছে করে না যে, তোকে ভাল ক'রে সাজিয়ে পাঠাই? আজ যদি তোর মা থাক ত রে, তবে হয় ত তোর দিকে আমার এত চোখ পড়ত না, সে নেই বলেই তোর সামান্য অভাব আমার বুকে বজ্রাঘাতের মতই বাজে।"

পত্নীর কথা ভাবিতে আজ এই প্রথম শ্রীধরের চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

৩

প্রথম প্রথম পিতার কোলের মধ্যে শয়ন করিতে না পাইয়া মণির ঘুম আসিত না, কিন্তু ক্রমেই তাহা সহিয়া গেল। একটি বৃদ্ধা রমণী পয়সার লোভে মেঝেয় শুইত, মণি মাচার উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইত।

আগে পিতা কোন দিন ১২টা, কোন দিন ১টা রাত্রিতে আসিত, ক্রমে এমনও হইতে চলিল, সারারাত তাহাকে দেখা যাইত না, ভোরের সময় বাড়ী ফিরিত।

আরও একটা বিষয় মণি লক্ষ্য করিল,—পিতার উদ্বিগ্ন ভাব। কৈ, এতকাল ত সে পিতাকে দেখিতেছে, এমন শঙ্কিত উদ্বিগ্ন ভাব ত কখনও সে দেখে নাই।

আজকাল মণির জুতা, জামা, কাপড়ের অভাব নাই, টিফিনের জন্য দিন চার পয়সা হিসাবে পাইতেছে, কিন্তু সে ত এ সব চাহে নাই। কি জানি কি এক অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা বার বার মণির শিশু-হৃদয়কে ধাক্কা দিয়া যাইতেছিল।

দিন চলিতে লাগিল, মণির ও মণির পিতার কাপড়-জামা, জুতার সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। এক দিন মণি দেখিয়াছিল, রমেশ তাহার পিতাকে ডাকিয়া গোপনে এক অঙ্গুরীয় ও চেন শুদ্ধ একটা ঘড়ী দিয়া গেল।

উৎকণ্ঠিত মণি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, জ্যেঠা তোমায় আংটী, ঘড়ী এ সব দিয়ে গেল কেন?"

হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া শ্রীধর বলিল, "তুই চুপ ক'রে থাক, মণি। যেমন আছিস, স্কুলে যাচ্ছিস, তেমনই কর, এ সব ব্যাপার দেখতে আসিস্ কেন, কথা বলারই বা কি দরকার তোর?"

এই একটা ধমকেই মণি একবারে নিবিয়া গেল, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, মুহূর্ত্তে শ্রীধরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমার কথায় রাগ করিসনে মণি, আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, নইলে তোকেই আমি এমনই ক'রে বকি? আংটী, ঘড়ীর কথা কাউকে বলিস নে বাবা, এ সব তোরই রইল, ভবিষ্যতে তোর জন্যেই রাখলুম।"

এ সব বস্তু যে বৈধ উপায়ে পাওয়া যায় নাই, তাহা মণি বালক হইলেও বুঝিতে পারিতেছিল। সে কথা বলিতে গেলে পিতা তাড়াতাড়ি তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

অতিরিক্ত গাফিলতি করার জন্য শ্রীধরের ও রমেশের দুই জনেরই কলের কায অনেক দিন আগে গিয়াছে। দুনিয়ার সৎকাযের পথ আর না পাইয়া তাহারা দুই অকৃত্রিম বন্ধু মিলিয়া এখন নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনযাপন করিতেছে। এ কথা কি ছেলেকে বলা যায়? শ্রীধর ভাবিতেছিল, একটা মস্ত গোছের দাঁও মারিয়া সে এ ব্যবসা একবারেই তুলিয়া দিবে এবং ভদ্রপল্লীতে গিয়া ভদ্রভাবে বাস করিবে।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পাপের ফল অবশ্যই ফলিবে। তাই তাহারা দুই বন্ধু এক দিন ধরা পড়িল। সে দিন দ্বিপ্রহরে এক জন ভদ্রলোককে একটা গলীর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহারা দুই জনে তাঁহার হীরকাঙ্গুরী, ঘড়ী, চেন ও ব্যাগের মধ্যস্থিত কয়েক সহস্র টাকা লইয়া পলায়ন করিবার সময় ধরা পড়িল। ভদ্রলোকটিকে কিছুতেই কায়দা করিতে না পারিয়া উত্তেজিত রমেশ তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল, সেই আঘাতের ফলে ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন।

আসামী এবং সহকারিরূপে শ্রীধর বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত জেলে আবদ্ধ হইল, তাহাদের সম্বন্ধে রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

রমেশ যে কুৎসিত স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিত, পুলিস সে সন্ধান পাইল, শ্রীধরের কুটীরের সন্ধান পাইতেও বিলম্ব হইল না।

পিতা দুই দিন বাড়ী আসেন নাই, মণির ভাবনার শেষ ছিল না। সে নিজে যতটুকু পারিতেছিল, খোঁজ করিতেছিল,

প্রতিবেশী কুলীদের কাছে কাঁদিয়া পড়িয়া পিতার সন্ধান আনিয়া দিতে বলিতেছিল।

দুই দিন সে স্কুলে যায় নাই। তৃতীয় দিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া সে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর লাল পাগড়ীর দলে ভরিয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটা শুনিতে মণির বিলম্ব হইল না। সে যখন শুনিল, এই খুনীর সহযোগিরূপে তাহার পিতারও কঠিন কারাবাসদণ্ড অদৃষ্টে আছে, তখন তাহার হাত হইতে বইগুলি খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল; তাহার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না, তাহার চোখ দিয়া একটি ফোঁটা জল পড়িল না।

সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিল, পুলিসের দল চলিয়া গেল, তখন অসভ্য নীচ বলিয়া যাহাকে সে ঘৃণাই করিয়া আসিয়াছে, সেই হরিয়া আসিয়া এই মুহ্যমান বালককে বুকে তুলিয়া নিজের কুটীরে লইয়া গেল। বয়সে সে মণির অপেক্ষা চার পাঁচ বছরের বড়, তাই অভিজ্ঞতাও তাহার বেশী ছিল। অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া সে মণিকে সে রাত্রিতে একটু দুধমাত্র খাওয়াইতে পারিল। মণি তাহার গলা ধরিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, হরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল—কাল সে নিজে মণিকে সঙ্গে করিয়া আদালতে যাইবে এবং হাকিমের দুই পা দুই জনে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া জানাইবে, মণির বাপ ছাড়া আর কেহ নাই, অতএব মণির বাপকে মুক্তি দেওয়া হউক। হাকিম মানুষ ত, নিশ্চয়ই মণির প্রার্থনা শুনিবেন এবং মণির বাপকে ছাড়িয়া দিবেন।

সমস্ত রাত্রিটা মণি ঘুমাইতে পারিল না। যাহাকে সে এক দিন নীচ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই ছেলেটিই তাহাকে বুকের মধ্যে ঢাকিয়া লইয়া শুইল; তাহার বক্ষোবদ্ধ থাকিয়াও সারা রাত্রি মণি চমকাইয়া উঠিতে লাগিল, তন্দ্রা স্বপ্নে পিতাকে দেখিয়া কত বার বাবা বাবা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সকালবেলা উঠিয়াই মণি আদালতে যাইতে চাহিল, এক শুষ্কহাসি হাসিয়া হরিয়া বলিল, "এত সকালে আদালত কুথায় আছে রে? আগে ভাত খেয়ে নে, তার পর ত যাবি। সারাটা দিন কেমন ক'রে কষ্ট করবি সেখানে?"

পিতার আদরের দুলাল সে, ভাত কেমন করিয়া যে রাঁধিতে হয়, তাহা ত জানে না। হরিয়াও তাহাকে নিজেদের ভাত দিতে পারিল না। খানিকটা দুধে চিঁড়া ভিজাইয়া মণি খাইতে গেল, চোখের জলে সব ভাসিয়া গেল, সে মোটেই খাইতে পারিল না।

আদালতে হরিয়ার সহিত সে যখন গিয়া পৌঁছিল, তখন আসামীর স্থানে তাহার পিতা ও রমেশ দাঁড়াইয়া। পিতার শুষ্ক-মলিন মুখের পানে তাকাইয়া আত্মসংবরণে অসমর্থ বালক অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

হরিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি বাহিরে লইয়া গেল।

বিচার কয় দিন চলিল। কারণ, অপরাধ এই একটিই নহে, আসামীদের অনেক গুণ্ডামীর কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

বিচারে হত্যাপরাধে রমেশের প্রাণদণ্ডের এবং শ্রীধরের দ্বীপান্তরবাসের আদেশ প্রচারিত হইল।

ঠিক এমনই দণ্ডের প্রত্যাশা শ্রীধর করিয়াছিল, তথাপি সে মাথায় হাত দিয়া হাহাকার করিয়া বসিয়া পড়িল। সে উপযুক্ত দণ্ডই পাইয়াছে, অথবা তাহার রাশি রাশি পাপের পক্ষে এ দণ্ড পর্য্যাপ্তও হয় নাই, সে জন্য ত তাহার দুঃখ নাই; কিন্তু তাহার মণি, ওগো, তাহার মণি আছে যে!

হায় রে, মণির যে পিতা ছাড়া আর কেহ নাই, আজ কয় দিন সে বাড়ী যায় নাই, না জানি, সে কত কাঁদিতেছে, কত ছুটাছুটি করিতেছে, কে তাহাকে দুইটা ভাত দিবে, কে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ঘুম পাড়াইবে? তাহার যে কেহ নাই, ওগো, তাহার যে কেহ নাই!

পাগলের মত দুই হাতে শ্রীধর মাথার চুলগুলা টানিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলিতে গেল,—"হুজুর—"

"চোপ, চোপ।"

প্রহরীরা জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল, প্রাণপণ বলে তাহাদের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া বলিল, "হুজুর, আমার পাপের যোগ্য সাজা হয়েছে, আমার যদি কোন বাঁধন না থাকত, আমি হাসিমুখে শাস্তি নিতে যেতুম। তা যে পারলুম না হুজুর, আমার যে মাতৃহীন একটি শিশু-সন্তান আছে, দুনিয়ায় আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই যে—"

অদূরে হরিয়া আর মণিকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। ক্ষুদ্র বালক তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া পিতার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, ছুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিতাপুত্রের এই শোচনীয় অবস্থা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। বিচারপতি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বালক বলিল, "বাবা, তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমায় কে খেতে দেবে বাবা, অসুখ হ'লে পরে আমার কে দেখবে?"

অভাগা পিতার ছুই চোখ দিয়া অজস্রধারে জল ঝরিতে লাগিল,—"আমার সঙ্গে কোথায় যাবি পাগ্‌লা? আমি যাচ্ছি আমার পাপের ফল ভোগ করতে। তুই কাঁদছিস কেন বাবা, আমি শীগ্‌গির আবার ফিরে আসব।"

পুত্রকে জোর করিয়া বুক হইতে সে নামাইয়া দিল, হাত যোড় করিয়া সমবেত সকলের পানে তাকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "বাপের পাপে অভাগা ছেলেটিকে আপনারা ত্যাগ করবেন না। এই শিশুকে আমি আপনাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি, যিনি হৃদয়বান্ হবেন, তিনি একে নিয়ে যাতে এ যথার্থ মানুষ হ'তে পারে, তার চেষ্টা করবেন। হুজুর,—আপনাকেও বলছি—"

চোখের জলে শ্রীধরের বুক ভাসিয়া গেল, সে হাত ছুইখানা প্রহরীদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "ধর, আমায় বেঁধে তোমাদের কর্ত্তব্যপালন করতে নিয়ে চল।"

ফিরিয়া দেখিল, অভাগা বালক মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, কান্না কিছুতেই সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহার ক্ষুদ্র দেহটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, এক একবার আত্মসংবরণে অসমর্থ সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—"মা গো—"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া শ্রীধর বলিল, "ছুঃখ করিস্ নে বাবা। আজ যাকে ছেড়ে দিতে তোর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, এর পর হয় ত তার কাযের জন্মেই তাকে ঘৃণা করবি। বাপ আমার, তখন এই কথাটি শুধু মনে করিস্, তোর জন্মেই আমি এ সব কায করেছি, কেবল তোর সব অভাব ঘুচাবার জন্মে। আমার উপদেশ মনে রাখিস্, যথার্থ মানুষ হয়ে উঠবার চেষ্টা করিস্। ভগবান্ তোকে দীর্ঘজীবী করুন।"

ছুই বাহুর মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সে প্রহরীদের সহিত চলিল, শিকল বাজিতে লাগিল—ঝন্ ঝন্ ঝন্।

৪

সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সাধুতার সহিত কার্য্য করায় জীবনের শেষ অবস্থায় মুক্তিলাভের কথা যখন বৃদ্ধ শ্রীধরের কানে আসিয়া পৌছিল, তখন হঠাৎ সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, ইহা স্বপ্ন না সত্য।

সেই দেশ—তাহার জন্মভূমি বলিয়া দেশ তাহার কাছে আদরিণী নহে, তাহার বুকের ধন মণি সেখানে আছে বলিয়া দেশের স্মৃতি তাহার কাছে বড় প্রীতিপ্রদ। তাহার শতকর্ম্মের মাঝখানে দেশ তাহার বুকের মাঝে জাগিয়া থাকিত, অবসরকালে সে তন্ময়চিত্তে দেখিত—সেই দেশ, সেখানে মণি এতক্ষণ কি করিতেছে?

কল্পনায় শ্রীধর দেখিতে চেষ্টা করিত, মণি যথার্থ মানুষ হইয়াছে, মণির নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আবার হয় ত সে দেখিত—মণির বিবাহ হইয়াছে, সন্তানও হইয়াছে। এই চিত্রটি তাহার মনে আঁকিয়া সে যে কতখানি তৃপ্তি পাইত, তাহা বলা যায় না।

হঠাৎ মনে হইত—আর মণি যদি না থাকে!

অমনই কল্পনায় সে দেখিত, মণি সেই যে তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, আর সে উঠিতে পারে নাই। উঃ, তাই কি সম্ভব হইতে পারে? না, কখনও নয়। মণি আশ্রয় পাইয়াছে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে, মণি মানুষ হইয়া গিয়াছে।

সে যে কখনও মুক্তি পাইতে পারিবে, এ কল্পনা সে কোন দিনই করে নাই। হঠাৎ কথাটা শুনিয়া সে তাই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

কিন্তু বড় কর্ত্তার মেম যখন নিকটে আসিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, সত্যই তোমাকে মুক্তি দেওয়া গেল, কেন না, তুমি সাধুতার সঙ্গে ২০ বছর কায করেছ। তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত আমি ক'রে দিচ্ছি, আর তোমার সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ দেশে তোমার ছেলের জন্মে আমি এ দেশের নতুন জিনিষ কিছু কিছু দিচ্ছি, নিয়ে গিয়ে তোমার ছেলেকে দিও।"

তখন তাহার অবিশ্বাস করিবার হেতু রহিল না; সে মেম-'সাহেবে'র পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, অজস্র নয়ন-জলে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল।

শ্রীধর দেশে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। মেম-'সাহেব' কিছু টাকা পুরস্কার দিলেন, সেই টাকা লইয়া সে ছেলের জন্য কত কি জিনিষ কিনিল। তখন তাহার এক বারও মনে হয় নাই, ছেলে কোথায় আছে এবং সে যদি বাঁচিয়া থাকে, এই সব শিশুজনোচিত খেলনাগুলি লইয়া সে খেলিতে পারিবে কি না। উৎসাহের আধিক্যে তাহার সে সব কথা কিছুই মনে পড়ে নাই, কেন না, সে তাহার ছেলেকে ছোট দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার মনে সেই শিশুর ছবিই জাগিয়া ছিল।

শ্রীধর যখন ষ্টীমারে উঠিল—তখন তাহার কি আনন্দ! তাহার তখন মনে পড়ে নাই, সে এখন একেবারেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; যতটা উৎসাহ হইতেছে, তাহার উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য তাহার আর নাই। তাহার মাথার সব চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, চোখের দৃষ্টি প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, দেহ সম্মুখের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মনের অদম্য উৎসাহ তাহার ২০ বৎসরের জড়তা বিনষ্ট করিয়া তরুণ যৌবন আজ নূতন করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে।

সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া শ্রীধর দেশের বুকে পা দিল, কিন্তু অন্তর তাহার চির-পুরাতনই ছিল।

প্রকাণ্ড বাক্সেটটা ঘাড়ে করিয়া কলিকাতার পথে পা দিয়া শ্রীধর দিশাহারা হইয়া গেল। ২০ বৎসর আগে সে যাহা দেখিয়া গিয়াছে, তাহার যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, পথ-ঘাট অপরিচিত, লক্ষ লোকের মুখ দেখিয়া তাহার আজ সেই ধারণা হইয়া গেল। আজ এই প্রথম মনে পড়িল, যাহাকে নবমবর্ষীয় বালক রাখিয়া গিয়াছিল, সে এখন ত্রিংশদ্‌বর্ষীয় যুবকে পরিণত হইয়াছে, তাহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে দেখিয়া শ্রীধর চিনিবে কি করিয়া? এই জনসমুদ্রের মধ্য হইতে সেই বাল্যে দেখা মুখখানা সে বাহির করিবে কি করিয়া?

নিজের উপর শ্রীধরের চোখ পড়িল; তাই ত, তাহারও যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। একটা দোকান হইতে গিয়া অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিল। আয়নাখানা এক আছাড়ে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীধরের পরিপূর্ণ যৌবনের উপর দিয়া ২০টা বৎসর যে দণ্ড স্পর্শ করাইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার মুখখানা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে! নবমবর্ষীয় বালক অবস্থায় মণি যে তাহাকে দেখিয়াছিল, আজ সে ত কোনমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না, এই কুৎসিত বৃদ্ধ তাহারই পিতা!

"নারায়ণ—"

বৃদ্ধ তবুও সাহসে বুক বাঁধিল। হাঁ, সে বুঝাইয়া দিতে পারিবে—যে শক্তিবলে বালক যুবক হয়, সেই শক্তিবলে যুবকও বৃদ্ধ হয়, ইহাতে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। এখন তাহার সন্ধান লওয়াই যে প্রধান কায।

যে স্থানে শ্রীধর পুত্রকে শেষ বিদায় দিয়া গিয়াছিল, সন্ধান করিয়া সেই স্থানে আসিয়া সে দাঁড়াইল। তখন বেলা ১২টা কি ১টা, আদালত লোকপূর্ণ। বাক্সেট ঘাড়ে বৃদ্ধ লোকটার পানে অনেকেই তাকাইয়া গেল।

সমীপবর্ত্তী পানের দোকানে বৃদ্ধ বসিল, প্রথমটা পান-বিড়ি যথেষ্ট লইয়া আলাপটা জমাইয়া লইল। শেষে সে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা বলতে পার, ভাই? কুড়ি বছর আগে একটা লোক দ্বীপান্তরে যায়, তার মা-মরা ছেলেটা এইখানেই প'ড়ে ছিল, সে ছেলেটা কোথায় গেল, কে তার ভার নিলে?"

পানওয়ালা লোকটা খানিক শ্রীধরের পানে তাকাইয়া রহিল, বোধ হয়, ভাবিতেছিল, এত কাল পরে যে লোকটা খোঁজ লইতে আসিয়াছে, ইহার অর্থ কি।

পানওয়ালা আজ ৫।৭ বৎসর এখানে দোকান করিয়াছে মাত্র। ২০ বৎসর আগে কি ঘটিয়াছে, সে কথা সে জানে না। সে পুরস্কারের লোভে বৃদ্ধকে বসাইয়া রাখিয়া আর এক জন বৃদ্ধ দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া পানওয়ালা খবর দিল—গ্রে ষ্ট্রীটে গিয়া খোঁজ করিলে সে সন্ধান পাইতে পারে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে সেই ছেলেটিকে ব্যারিষ্টার এ, সি, মিত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে খোঁজ লইলে জানিতে পারা যায়।

নবীন উৎসাহে বৃদ্ধ প্রকাণ্ড বাক্সেটটা আবার পৃষ্ঠে

গ্রে ষ্ট্রীটে এ, সি, মিত্রের প্রকাণ্ড বড় ত্রিতল অট্টালিকা, দ্বারে দ্বারবান্, সে শ্রীধরকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিল। কাতর কণ্ঠে শ্রীধর বলিল, "আমায় একটুখানির জন্যে ভিতরে যেতে দাও, বড় দরকার আছে।"

দ্বারবান্ গম্ভীরভাবে জানাইল, তাহা হইতে পারে না।

প্রায় এক ঘণ্টা শ্রীধর সেই দ্বারের কাছে বসিয়া এক এক-বার ভিতরে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিল, দ্বার-বান্ অচল, অটল। শেষকালে দ্বারবান্ দারুণ বিরক্তিভরে জানাইল, যদি সে কোন বড়লোকের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিতে পারে, তাহা হইলে ভিতরে যাইলেও যাইতে পারে।

শ্রীধরের মনে পড়িয়া গেল, আসিবার সময় 'সাহেব' এক-খানি পত্র দিয়াছেন; সে পত্রখানা দেখাইলে এ বাড়ীতে প্রবেশলাভ সম্ভব হইতে পারে।

তাড়াতাড়ি সেই পত্রখানা ব্যাগের মধ্য হইতে বাহির করিয়া শ্রীধর দ্বারবানের হাতে দিল। পুরস্কারের লোভে দ্বারবান্ ভিতরে চলিয়া গেল, খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"যাও, সাহেব ডাকছেন।"

কম্পিত বক্ষে আবার সেই ভারী বাস্কেট পিঠে ফেলিয়া শ্রীধর ভিতরে প্রবেশ করিল।

হলঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধ চেয়ারে বসিয়া সম্মুখে এক শিশুর খেলা দেখিতেছিলেন। এক জন তরুণী বৃদ্ধের পশ্চাতে চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ ও শিশুর কৌতুক দেখিতে-ছিলেন। দরজার উপর অদ্ভুত বৃদ্ধকে দেখিয়া ৩ বৎসরের শিশু ভয় পাইয়া উপবিষ্ট বৃদ্ধের কোলের মধ্যে ছুটিয়া গেল।

শিশুকে কোলে লইয়া বৃদ্ধ শ্রীধরের পানে চাহিলেন—"কে তুমি, কি চাও?"

বাস্কেট নামাইয়া শ্রীধর মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া এক দীর্ঘ প্রণাম করিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমি—আমি কিছু চাই নে হুজুর, একটা কথা শুধু জানতে চাই, দয়া ক'রে সেইটা যদি জানান—"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ভূমিকার দরকার নেই, কেন না, কথাটা তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ ক'রে নিয়ে তোমার শীগ্গির এখান হ'তে যাওয়াই ভাল। দেখছ না;—তোমায় দেখে আমার নাতি কি রকম ভয় পেয়েছে?"

শ্রীধর শিশুর পানে তাকাইয়া চমকাইয়া উঠিল। ঠিক—ঠিক; ঠিক সেই মুখ, সেই চোখ! তাই ত—তবে কি এতগুলা বৎসর যায় নাই, ২৬।২৭ বৎসর—বৎসর নয়? তাহার মণিও ৩ বৎসর বয়সে ঠিক এমনই ছিল, ভয় পাইয়া এমনই বিবর্ণ মুখে বুকের উপর পড়িয়া থাকিত।

শ্রীধর উত্তেজনায় দুই পা অগ্রসর হইয়া অমনই পিছাইয়া গেল। হাত যোড় করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "একটা খবর জানতে এলুম। ২০ বছর আগে একটা মোকর্দ্দমায় আসামী হয়ে আমি যাবজ্জীবনের জন্যে দ্বীপান্তরে গিয়েছিলুম, আমার একটিমাত্র ছোট ছেলেকে আদালতে সকলের দয়ার পরে ফেলে গিয়েছিলুম, আজ সেই হারাছেলের খোঁজে আমি এসেছি। আপনি কি বলতে পারেন—"

বৃদ্ধ অতুল মিত্র চমকাইয়া উঠিলেন, বিবর্ণ মুখে বলিলেন, "তোমার ছেলে,—সে—"

চোখের জল ফেলিয়া শ্রীধর বলিল, "হুজুর, সে আমারই ছেলে। আপনার এখানে সে আশ্রয় পেয়েছে কি?"

তরুণী কন্যার পানে তাকাইয়া অতুল মিত্র বলিলেন, "কিটী, তুমি ভেতরে যাও মা, এখানে তোমার থাকার দর-কার নেই, খোকাকে নিয়ে যাও।"

মেয়েটি শান্তভাবে চেয়ারখানা ধরিয়া রহিল, শান্ত কণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি সবই শুনতে চাই। আপনার যা বলবার আছে, বলুন না কেন। দেখছেন না—২০ বছর পরে বাপ তার হারাছেলের সন্ধানে ফিরে এসেছে, স্নেহের দাবী যে সব চেয়ে বেশী, বাবা। আপনিও ত বাপ হয়েছেন, এটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমার চেয়ে আপনার বেশী আছে।"

অতুল মিত্র রূঢ়ভাবে শ্রীধরের পানে তাকাইয়া বলিলেন. "হ্যাঁ, তোমার ছেলে আমার এখানেই আছে। যথার্থই মানুষ হয়েছে। যথেষ্ট লেখাপড়া শিখে সে এক জন বড় ডাক্তার হয়েছে।"

"নারায়ণ—"

শ্রীধরের চোখ দিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত শ্রীধর আজ প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"দেখুন দেখি, আজ একটা নতুন খবর কাগজে বার হয়েছে যে, আণ্ডামান হ'তে এক জন কয়েদী ২০ বছর

সাধুতার সঙ্গে কায করার জন্তে মুক্তি পেয়েছে; কথাটা সত্য কি না, তা আমি—"

বলিতে বলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াই দরজায় শ্রীধরের উপর দৃষ্টি পড়িতে যুবক থামিয়া গেল।

কি সুন্দর সুঠাম দেহ তার,—এই কি—এই কি তাহার—না;—ভগবান্, রক্ষা কর, রক্ষা কর!

ব্যারিষ্টার অতুল মিত্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীরভাবে পরুষ কণ্ঠে বলিলেন, "এই তোমার সেই ছেলে। দেখা ত হ'ল। এখন সে ভদ্রসমাজের এক জন। সুতরাং অবস্থা বুঝে তোমার আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত হবে না।"

মণি স্তব্ধ বিস্ময়ে শ্রীধরের পানে চাহিয়া রহিল। শ্রীধর তখন দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া আড়ষ্টের মত বসিয়া ছিল। তাহার ভয় হইতেছিল—নড়িতে গেলে পাছে এ সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

"বাবা—"

ঠিক সেই ছোট বেলার মতই যুবক মণি বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল, তাহার বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল, "এত কাল পরে আবার আমার কাছে ফিরে এলে, বাবা? আমার প্রতিজ্ঞা পালন হয়েছে, আমি মানুষ হয়েছি, কিন্তু মনে বড় ক্ষোভ ছিল, তুমি দেখতে পেলে না; তোমায় সুখী করতে পারলাম না; আমার সে ক্ষোভ মিটাতে সত্যই কি তুমি ফিরে এসেছ, বাবা?"

"মণি!—"

শ্রীধর কাঁদিয়াই আকুল, আর একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

কিটী পুত্রের হাত ধরিয়া শ্রীধরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বুড়ো ছেলেকে অত আদর করছেন বাবা, কচি ছেলেটা দাদুর কাছে এখনও একটু আদর পেলে না। ওকে নামিয়ে দিন, আপনার দাদুকে কোলে নিন।"

বিস্ময় ও আনন্দের অপর্য্যাপ্ত ভারে বৃদ্ধ শ্রীধরের হৃদয় বিমূঢ় হইল। তাহার নেত্রযুগল বিস্ফারিত হইল। এই সুন্দরী, মমতাময়ী তরুণী তাহার জীবনারাধ্য সন্তানের সহধর্ম্মিণী! ঐ অনিন্দ্যসুন্দর বালক তাহার এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের জলগণ্ডুষদানের অধিকারী!

শ্রীধর পৌত্রকে কম্পিত করে বুকে টানিয়া লইল। খোকা প্রথমটা ভয় পাইয়াছিল, যখন দাদুর বাস্কেট হইতে বিচিত্র খেলার জিনিষ বাহির হইতে লাগিল, তখন সে দাদুর ভারী ভক্ত হইয়া পড়িল।

নিরক্ষর হরিয়ার মহানুভবতা মণি ভুলিতে পারে নাই। তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া কাযে লাগাইয়া দিয়াছিল। সে-ও আসিয়া চোখের জল ফেলিয়া শ্রীধরের পায়ের ধূলা লইল।

কিটীর স্নেহপূর্ণ সেবা, পুত্রের আত্মহারা ভালবাসা, নাতির অপর্য্যাপ্ত আদর পাইয়া শ্রীধর গলিয়া গেল, অতুল মিত্রকে রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "আপনার দয়ার কথা আমি জীবনে ভুলব না। আপনি যে আমার জন্তে এখানে যথার্থ স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন, আমি তা স্বপ্নেও এক দিন ভাবি নি।"

অতুল মিত্রের নিস্পন্দ দেহে একটা তাড়িতপ্রবাহ বহিয়া গেল। তাঁহার বিবর্ণ আননে চেষ্টাকৃত একটা হাস্যরেখা মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হইল।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

বাণী-বন্দনা

বাণী! বাণী!
উজ্জ্বলা বেদমাতা জ্ঞানের রাণী!
বাঙ্মুলা চিন্ময়ী কবি-ঋষি-নন্দিতা—
সত্য-সনাতনী সুরগুরু বন্দিতা—
যুগান্ত কল্পিতা ওঙ্কার-ঝঙ্কৃতা—
ব্রহ্মরূপিণী বীণাপাণি!

সপ্তস্বরা করা শ্বেতাব্জ-আসনা—
দিব্যা গীতময়ী হৃদের আননা;—
বাজে বীণা—
সামগীতি-নির্ঝর উচ্ছ্বসে বারংবার—
বুকের কণ্ঠে বাজে বাণী!

রক্ত শতদল ফুটে পদ পরশে
মানস মধুপ লুটে তায় হরষে;—
পূত দরশে—
করুণা স্নেহধারা উছলে শতধারা—
বিকাশে মলিন হিয়াখানি!



মহাকবি ভারতচন্দ্র

২

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "সংস্কৃত ভাষায় যেমন কালিদাস, বাঙ্গালাভাষায় সেইরূপ ভারতচন্দ্র।" পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অনেকে সংস্কৃত ভাষায় ছন্দের অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ন্যায় কৃত-কার্য্যতা কেহই লাভ করেন নাই। শব্দগ্রহনে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব এবং তাঁহার শব্দের ঝঙ্কার অতুলনীয়। যেখানে যে শব্দের প্রয়োগ শোভন ও সুন্দর হয়, তিনি তেমন ভাবেই শব্দ-যোজনা করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় তিনি ভাষা জননীকে শব্দরত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ মাইকেল ও হেমচন্দ্র অনুসরণ করিয়াছেন; কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপরেও অনেক স্থলে ভারতের প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রের এই কবিতার দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়,—

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র,
তুমি চক্রমুখরমন্ত্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ,
ধ্বংস-বিকটদন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্ন-বিজয়-পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল চলনমন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ়
ঘনপিনদ্ধকায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘনলঘুমায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর,
ইন্দ্রজালতন্ত্র।"

আমরা দেখিতে পাইতেছি, শব্দচাতুর্য্যের জন্য বাঙ্গালার সকল কবিই ভারতের নিকট মাথা নত করিবেন এবং তাঁহার আধিপত্য সাহিত্য-জগতে সকলেরই উপর বিস্তার করিয়াছে ও করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সামান্য কবিরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সেই যুগেই তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র যে যুগে জন্ম লইয়াছিলেন, তিনি সে যুগকে ছাড়াইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ সেই যুগে তাঁহার জন্ম, যাহা অতীত কালকে প্রত্যাখ্যান করিত না; অথচ যাহার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান ছিল বলা যাইতে পারে। বহমান গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সমুদ্রের সহিত তাহার যোগ। এই গঙ্গাই আধুনিক বলিয়া পরিচিত। বহমান কাব্য-গঙ্গার সঙ্গেই ভারতচন্দ্রের কবিতা-ধারার মিলন ছিল, এই জন্য ভারত ছিলেন অনেকটা আধুনিক। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের মধ্যে সম্মিলনের সেতু-স্বরূপ হইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কিংবা বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন? তাহার অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্রই ইহার কারণ। বাঙ্গালা ভাষার কোমলতা ও লালিত্যের কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। যেরূপ বংশীর মধুর ধ্বনিতে হরিণ সকল বিপদ ভুলিয়া একমনা হইয়া যায়, ব্যাধ শিকার হারাইয়া প্রকৃতির মধুর লীলার তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, সেইরূপ ভারতের মধুর শব্দ-ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এক সময় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুধী রসগ্রাহী পাঠকবর্গের এইরূপ ভাবই প্রবর্ত্তিত হইত;—

"দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ॥"

যেরূপ উন্মত্ত ভ্রমরের কল-গুঞ্জনে হরিণের প্রাণমন অপহৃত এবং চক্রবাক-মিথুনের মধুর কাকলীতে ব্যাধের অন্তর আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের কবিতাতেও এক বর্ণনাতীত মধুর আকর্ষণ আছে;— যে কবিতা অলিকুলের মনোহর সুধাময় গুঞ্জন অপেক্ষা অধিকতর সুমিষ্ট, অধিকতর মনোমদ। তাঁহার বীণার তারে ঝঙ্কৃত সঙ্গীত পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার মধুরধ্বনি পাঠকের হৃদয়ে অনু-রণিত হইয়া তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল। দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

"হইল বহু নিশি, প্রকাশ হয় দিশি,
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব, ডাকিছে অলি সব,
অনলে দেও দেহ জ্বালিয়া॥
তিমির ঘনতরে সভয়ে বনচরে,
ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া।
অপর সখীরসে, রহিল পরবশে,
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া॥"

তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন;—

"তনু মোর হ'ল যন্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন, মাতালে নাচাও না।
ওহে পরাণ-বঁধু যাই গীত গেও না॥"

এই সকল পদ পড়িতেই সঙ্গীতের মত সুধাবর্ষী; উহাদের ভাব চিত্তে উপলব্ধ হইবার পূর্ব্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

সুন্দর মার্জ্জিত ভাষায় অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভারতের কাব্যগুলি চিরকাল আদরণীয় ও অমূল্য হইয়া থাকিবে। ভারত যখনই একটু

গুণ গুণ করিয়া মধুবিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুণ গুণ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন স্বীয় দেশবাসিগণের অন্তঃকরণ বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গের দূর পল্লীতেও সরল ভক্তি ও প্রেমাশ্রুবিধৌত ভারতের দেবভাবপূর্ণ সঙ্গীতগুলি গীত হইয়া পল্লী-জননীর প্রাণের কামনাভাব পরিতৃপ্ত করিতেছিল। এই সঙ্গীতগুলি পল্লীর সকল স্থানে ধ্বনিত হইয়া সমাজকে সমাদরে আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, ইহাতে আমরা দেখিতে পাই ভাবের নির্ম্মলতা ও আবেগ, কোমলতা ও মাধুর্য্য।

ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষা সাহিত্যের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তাঁহাকে প্রাচীনকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারা যায়। তাঁহার মত কথার চিত্তহরণ করিবার সামর্থ্য প্রাচীনকালের অন্য কোন কবির ছিল না। এই শব্দ-লালিত্য নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবে। অন্নদামঙ্গলে কবি গাহিতেছেন ;—

"কলকোকিল, অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমল, পরিমল, লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুণ-গুণ,
মদন দিলা গুণ ধনুক-হুলে॥
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥"

অন্নদামঙ্গলে কবি 'শিব-বিবাহ' সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"জয় জয় হর রঙ্গিয়া!
কর বিলসিত নিশিত পরশু অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক্ লক্ ফণী জটা বিরাজ তক্ তক্ তক্ রজনী রাজ।
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ বিমল চপল গাঙ্গিয়া॥
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল,
হলু হলু হলু যোগিনী বোল।
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া॥
ভবম্ ভবম্ ববম্ ভাল ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রক্সতালে তাল দেয় বেতাল ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া॥
সুরগণ কহে জয় মহেশ পুলকে পূরিল সকল দেশ,
ভারত যাচত ভকতি লেশ সরস অবশ অঙ্গিয়া॥"

আর একটি দৃষ্টান্ত,—

"জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমল কলরঙ্গে॥
টল টল চল চল চল চল ছল ছল
কল কল তরল তরঙ্গে।
পুলকিত শিরজট বিঘটিত সুবিকট
লটপট কমঠ ভুজঙ্গে॥
তরুণ অরুণ বর কিরণ বরণ কর
বিধিকর নিকর করঙ্গে।
ভুবন ভবনলয় ভজন ভবিকময়
ভারত ভবভয় ভঙ্গে॥"

এবং অন্নদামঙ্গলে ;—

"জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক বিষাণবাদক
হুতাশ ভালক মহত্তর॥
জয় বিধান্ত কণ্টক কৃতান্ত বঞ্চক
ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিনাক পণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতি ভূষিত কলেবর॥
* * * *
জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গ রঞ্জিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥"
* * * *

আর একটি দৃষ্টান্ত ;—

"জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস-দানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন॥
জয় কেশি মর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপ বালক, বৎসপালক, পূতনাবকনাশন॥
জয় গোপবল্লভ, ভক্ত সল্লভ, দেবদুর্ল্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দকমণ্ডন॥
জয় শান্ত কালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্কর-স্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন॥"

এই শেষ পদ দুইটিতে ও তদ্রূপ অন্যান্য বহু পদে দেখা যায়, ভারতের রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অপূর্ব্ব পরিণয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এই মিলন তিনি ঘটাইতে পারিয়াছেন হাসিয়া খেলিয়া। তিনি প্রকৃত কবির ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কল্পনার মোহন বীণার ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায় বঙ্গবাসী-দিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্ব্বত্রই কথার বাঁধুনি প্রশংসার্হ ও পদ মধু মাখান।

দুই একটি ক্ষুদ্র কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—ইহার মধ্যে সবগুলিই রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

এইটি "অনুকূল" শীর্ষক কবিতা,—

"ওলো ধনি প্রাণধন, শুন মোর নিবেদন,
সরোবরে স্নান হেতু যেও না লো যেও না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গনে ঘোমটা তুলে,
কমল-কানন পানে চেও না লো চেও না॥
মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে,
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো পেও না।
তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ,
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেও না লো যেও না॥"

"অভিসারিকা" নামক আর একটি সুন্দর কবিতা,—

"নিকট সঙ্কেত-সময় আইল, শুনে রসময়ী মুরলী গাইল।
ধরি ধনুঃশর মদন ধাইল, চলে নিধুবনে কামিনী॥
পিক কলকলি শারী-শুক-ধ্বনি, ফুটে বনফুল ভ্রমর গুণগুণী।
তাহাতে মিলিত নূপুর রুণরুণ, শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী॥
* * * *
বদন সরসিজ গন্ধযুত মন, মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ,
ভথি মলয়াচল গতি মন্দ পবন, যাওল দ্রুত সখি যামিনী॥

এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্র হিন্দী, পারসীক প্রভৃতি ভাষায় কবিতা রচনা করেন। নমুনাস্বরূপ ভারতচন্দ্রের রচনা উদ্ধৃত দিতেছি ;—

"হিন্দী ভাষায় কবিতা"—

"এক সম বৃকভানু-কুমারী।
মাত পিত সন বৈঠ নেহারি ॥
হয়ে লগ আউসব দূতী জো আয়ি।
ভেট চল নন্দলাল বোলায়ি ॥
দেখ নহি আখ শুন্ নহি কাণা,
কাকুছ আয়ি গো আওল থারি ॥" ইত্যাদি।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসীক এবং হিন্দী ভাষা মিশ্রিত একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

"শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বারদকে গোয়দ্ কবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর বোরোয়কে
বক্ত্রং কেদং চন্দ্রমা চুলালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিয়ে কাছে শোয়কে
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দরজানে মন আয়ৎ খোশি
আমার হৃদয়ে বসে প্রেম কর খোস হোয়কে
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি ইয়াদৎ নমুদা জাঁ কোশি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকীরি খোয়কে।"

অবশেষে ভারতচন্দ্র চণ্ডীনাটক প্রণয়ন করেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, নানা ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কবি ইহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই

ভারতের কবিতার উক্তভাবের কথা অধিক কিছু বলিবার নাই। যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে অনেকে উপেক্ষা করেন, একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে এক উচ্চ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। মহাশাক্ত ভারতচন্দ্র ঐ কাব্যে তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রক্রিয়া আদিরসাত্মক গল্পচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মত এমন নব-রসপ্রধান গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। নবদ্বীপে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পণ্ডিতমণ্ডলী ও কবিগণে অলঙ্কৃত ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহার পারিষদগণও অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সেই রাজসভায় পারিষদরূপে ভারতচন্দ্র যখন প্রতিষ্ঠান্বিত হন, তখন এক দিকে তাঁহার কবিত্বপ্রতিভা এবং অন্য দিকে তেমনই তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়; সুতরাং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তান্ত্রিক সাধনার বিষয় রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ মনে আইসে।

ভারতচন্দ্রের রচনায় এমন এক অভিনবত্ব আছে যে, উহা যেমন পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য রচিত, উহা তেমনই নিরক্ষর কৃষকের জন্যও রচিত হইয়াছে—মনে করা যাইতে পারে। মহাজন-পদাবলীতে সাধারণতঃ এক ভাবের অভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভারতচন্দ্র দুই ভাবে দুই রসে পরিপূর্ণ। তাঁহার সঙ্গীতগুলি সুরচিত এবং সুললিত। তাঁহার কবিতার অনেক স্থলই দ্ব্যর্থক। সাধারণ লোক সহজ দৃষ্টিতে একভাবে উহার রসাস্বাদ করিবে, আবার জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা হইতে অন্য ভাবে রস আহরণ করিবেন।

তাঁহার দ্ব্যর্থ কবিতার একটি উদাহরণ দিতেছি। কালিদাসের ন্যায় ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখে শিবের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাহা এই ;—

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অ-পূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥"

ইহা দ্ব্যর্থক। অন্নদা শিবপক্ষে সমস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। কালিদাস-চিত্রিত কুমারসম্ভব কাব্যেও অনেকটা এই প্রকারের ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলে যেমন অন্নদা নিন্দাচ্ছলেও অনাদিদেব পতির স্তুতি করিতেছেন, সেইরূপ কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর নিকট সন্ন্যাসিবেশ ধারী মহাদেব আত্ম-নিন্দা করিতে থাকিলে পার্ব্বতী তাহা শুনিয়া সবিশেষ চিন্তা না করিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। এখানেও দেখি ;—

"দ্বয়ং গতং সাম্প্রতং শোচনীয়তাং
সমাগমপ্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত
স্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥
বপুর্ব্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যৎ বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে
তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ?…" ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবাণীকুমার ভট্টাচার্য্য।

তিব্বতে প্রচলিত ধর্ম্ম

২

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অতীশ নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বতে গমন করেন। তিনিও মহাযানের অনুযায়ী ছিলেন, কিন্তু যাদুবিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কৌমার্য্য এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতর নৈতিক অনুশাসনের প্রবর্ত্তন করেন। এই সংস্কারের ফলে তিব্বতে 'কদম্পা' অথবা 'জেমুপা' [পীত মস্তকাবরণ] নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্প্রদায় এক্ষণে তিব্বতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছে। 'ঞিংমাপা' [লোহিত মস্তকাবরণ] নামে অভিহিত প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার বিরে। এই দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত এবং এতদুভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ-সংস্কৃত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ধর্ম্মমতসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। পার্থক্য শাসনসম্বন্ধীয়। তিন শত বৎসর পরে সংখাপা নামক নেতার নেতৃত্বে 'গার্মুক্পা' নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ক্রিয়া-পদ্ধতির অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

তিব্বতীয় দেবসমূহের শীর্ষদেশে আদি-বুদ্ধ। তিনি ব্যক্তিত্বশূন্য, অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয়। তিনিই খণ্ডসমূহের উৎপত্তির কারণ এবং প্রত্যক্ষ জগৎ তাঁহাতেই প্রকাশিত। অপরাপর দেবসমূহের মধ্যে 'চেনরেসি' সর্ব্বজনবিদিত। তালাই লামা তাঁহারই

ধ্যানী-বুদ্ধ অথবা স্বর্গীয় বুদ্ধদিগের শ্রেণীভুক্ত এবং আদি-বুদ্ধের বিকাশ বিশেষ। এই সকল দেব অরূপ জগতে স্থিত, আদি-বুদ্ধ হইতে উদ্ভূত এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সহায়। গৌতমের ন্যায় মনুষ্য বুদ্ধ রূপ জগৎস্থ হইলেও পুনর্জন্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত এবং জীবন-সংগ্রামে নিরত মনুষ্যকে সাহায্য করিতে সমর্থ। অপেক্ষাকৃত নিম্নে মনুষ্যদেহে বোধিসত্ত্বগণ; তাঁহারাও রূপলোকস্থ। মৈত্রেয় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান এবং তিনিই আমাদিগের ভবিষ্যৎ বুদ্ধ। ইঁহাদের সকলের নিম্নে সিদ্ধপুরুষরা। গুরুরিম্পশ সিদ্ধপুরুষদিগের শীর্ষে। সর্ব্বনিম্নে প্রেত ও পিশাচগণ। তাহারা বহুবিধ অনিষ্টকরণে সমর্থ, সুতরাং তাহাদের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তাহারা পূজিত হয়। তিব্বতীয়গণ এই সমস্ত প্রেত ও পিশাচের ভয়ে অত্যন্ত ভীত এবং লামাগণ প্রেত সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত পরাক্রমশালী পুরোহিত সম্প্রদায়।

'টাসি' লামা অমিতাভের অবতার। তিনি ধর্মক্ষেত্রে ডালাই লামার শ্রেষ্ঠ। উচ্চপদস্থ লামাগণের সকলেই আদি-বুদ্ধের কোন না কোন মূর্ত্তির অবতার বলিয়া গৃহীত। লামাগণ ক্রিয়াপদ্ধতির অনুষ্ঠানবিশেষ দ্বারা গ্রহশান্তি, প্রেতদূরীকরণ এবং মনুষ্যের মঙ্গল আনয়ন প্রভৃতিতে সমর্থ, ইহাই জনসাধারণের বিশ্বাস। এমন কি, ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা প্রাণি-সমূহের প্রাণবধকরণে তাঁহাদের ক্ষমতাও অস্বীকৃত নহে। ফলে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে।

তিব্বতীয় মন্দিরসমূহের ব্যবস্থাও জনসাধারণের উক্ত বিশ্বাসগুলিকে দৃঢ়ীভূত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্দিরের বারান্দায় প্রবেশ করিবামাত্র দিক্‌পালদিগের চারিটি (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের) ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি এবং প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত স্থানীয় পিশাচসমূহের চিত্র দৃষ্ট হইবে। 'জীবনচক্র', স্বর্গ এবং বিশেষতঃ যাতনা ও ভয়াবহ প্রেতসঙ্কুল নরকের প্রতিকৃতিও চিত্রিত দৃষ্ট হইবে। মন্দিরের মধ্যভাগে সাধারণতঃ কোন মূর্ত্তি রক্ষিত হয় না। সেখানে গমন করিলে, সুকোমল আসনে উপবিষ্ট পুরোহিতসমূহ দৃষ্টিগোচর হইবে। তাঁহারা মধুর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণে রত; মধ্যে মধ্যে খঞ্জনী, শঙ্খ ও ঢক্কার ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ইহার পরেই বেদি—অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞাত ভীতি উৎপাদক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ ও ধূপসমূহের ক্ষীণ আলোকসাহায্যে অভ্যন্তরস্থ সুবৃহৎ মূর্ত্তিগুলি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ঐগুলি ধ্যানবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বসমূহের মূর্ত্তি। নিকটেই সিদ্ধ পুরুষসমূহ ও শিষ্যবর্গের প্রতিমূর্ত্তি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধ গৌতমের মূর্ত্তি এই সকল স্থানে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না এবং যেখানে উহা রক্ষিত হইয়াছে, সেখানেও এমন স্থানে স্থাপিত হয় নাই যে, সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। কোনও কোনও মন্দিরে গুরু রিম্পশের মূর্ত্তি অতিশয় সম্মানের সহিত রক্ষিত। মূর্ত্তিসমূহের সম্মুখে বহুসংখ্যক পাত্র; ঐগুলিতে জল, পুষ্প, চাউল, পিষ্টক, ধূপ প্রভৃতি দ্রব্যাদি রক্ষিত। বেদির উপর শক্তির প্রতিচিহ্ন-স্বরূপ বজ্রাঙ্কুশ, খঞ্জনী এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র স্থাপিত। ঐগুলি পূজার সময় কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের মধ্যভাগে উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভজন-কক্ষ। ঐগুলি বোধিসত্ত্ব কিংবা সিদ্ধপুরুষগণের নামে উৎসর্গীকৃত। কোন কোনটি কোন বিখ্যাত মঠাধ্যক্ষের নাম সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত। প্রত্যেকটিতে সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ রক্ষিত। মন্দির সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক সাধনার জন্য ব্যবহৃত হয়। উহাতে হিন্দুদেবদেবী-গণের ভীষণ মূর্ত্তিসমূহ সংরক্ষিত—যথা প্রলয়কারকবেশে শিব, কালী, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির মূর্ত্তি। মনুষ্য এবং অপরাপর ইতর প্রাণি সমূহের চর্ম্ম, অমঙ্গলসূচক পক্ষিসমূহের মৃতদেহ [উহার অভ্যন্তর নানা-রূপ দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ], বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, অঙ্গার-পাত্র, শিরঃ-কঙ্কাল, ভীষণ-দর্শন মুখোস ও অদ্ভুত পরিচ্ছদসমূহ এবং মায়াবিদ্যার অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও তথায় রক্ষিত।

এখানে প্রচলিত আছে। ঐ সময় একটি পৃথক্ বেদীর উপর পিষ্টক ও অন্যান্য আহার্য্য রক্ষিত হয়। নিকটেই মদ্য ও রক্তপূর্ণ শিরঃকঙ্কাল। আহার্য্য ও পানীয়ের এইরূপ ব্যবস্থা ভূত-প্রেত ও পিশাচগণের জন্য। এই প্রকারের আরও একাধিক বিধি প্রচলিত আছে। কোন কোনটির বজ্রাঙ্কুশ, ঘণ্টা, জলপূর্ণ পাত্র, তীর, দর্পণ এবং বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়।

তিব্বতে এক প্রকার বিচিত্র সৌধ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। উহার নাম "চাংান।" উহার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন-সমূহের রক্ষার জন্যই উহা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তিব্বতীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উহার সুদৃঢ় ভিত্তিমূল পৃথিবী-জ্ঞাপক, তদুপরি গোলার্দ্ধরূপে জল, তদুপরি দণ্ডায়মান স্তম্ভরূপে অগ্নি, তদুপরি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে বায়ু এবং সর্ব্বোপরি ত্রিশূলরূপে আকাশ। 'অগ্নি-স্তম্ভের' উপরিভাগ সাধারণতঃ ছত্রশোভিত। সর্ব্বত্র মধ্যপথে প্রাচীরবিশেষ দৃষ্ট হয়। উহার গাত্রে দেবদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত কিংবা ক্ষোদিত এবং "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" কথাগুলি লিখিত। প্রাচীরে এক কিংবা একাধিক 'প্রার্থনা চক্র' সন্নিবিষ্ট। পথিকগণ পুণ্যার্জ্জনের নিমিত্ত ঐ চক্র ঘুরাইয়া থাকে। প্রার্থনা চক্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পথিকরা চলিবার সময় উহাকে দক্ষিণে রাখিয়া থাকে। উহা বাম হইতে দক্ষিণে ঘুরাইতে হয়। কোন ধর্ম্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ঐ প্রথা—বাম হইতে দক্ষিণে ঘুরিতে হয়।

প্রত্যেক প্রার্থনা-চক্রে "ওঁ মণি পদ্মে হুম্" মন্ত্র ক্ষোদিত। উহার অর্থ পদ্মেস্থিত রত্ন অর্থাৎ বুদ্ধাত্মায় (আদি-বুদ্ধে) বিকশিত সত্য (ধর্ম্ম)। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশবিশেষ চক্রের মধ্যে সন্নিহিত। চক্রগুলি নানা আকারের,—অতি ক্ষুদ্রগুলি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের হস্তমধ্যে অবস্থানে সমর্থ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চক্রগুলি জলের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। প্রার্থনা-চক্রগুলি 'সদ্ধর্ম্ম'-চক্রের আবর্ত্তন-জ্ঞাপক এবং অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া মঙ্গল আনয়নে সমর্থ বলিয়া কথিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই মালা জপ প্রচলিত। তিব্বতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই।

তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যে লামাগণ যোগদান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত উক্ত নৃত্যের কোন সম্বন্ধ নাই। উহা আদিম 'বন্' ধর্ম্ম হইতে গৃহীত।

কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান দেখিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না। ইহার বিচিত্র পদ্ধতিসমূহ অদ্ভুত মূর্ত্তি ও চিত্র ইত্যাদির নিম্নে অতি গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। যে সকল সাধক ত্রিবিধ দীক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছেন, মাত্র তাঁহাদিগেরই নিকট ঐ গূঢ়ার্থ প্রকাশিত। তিব্বতীয় দেবগণের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা প্রকৃতির শক্তিসমূহের বাহ্যবিকাশমাত্র। যে সকল সাধক উচ্চতম দীক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছেন, উক্ত দেবগণ তাঁহাদের আজ্ঞাধীন।

তান্ত্রিক সাধনাও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আধিদৈবিক ক্ষমতা লাভ করা যায়, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

তিব্বত যেরূপ সন্ন্যাসীর দেশ, তথায় মঠের সংখ্যাও তদনুরূপ। নগরে নগরে মঠ। পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া উপত্যকাসমূহের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, উহাদের প্রত্যেক বাঁকের উপর মঠ। মঠগুলি প্রায়শই উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত। সমতল ভূমিতেও উহা দৃষ্ট হয়। তিব্বতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মঠে বাস করিয়া থাকে। সন্ন্যাসিনী-দিগের জন্যও পৃথক্ মঠ আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। লাসা, সিগাট্‌সি এবং গিয়াংসি নগরের মঠগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং তিব্বতের শিক্ষা-কেন্দ্র। ঐগুলিতে বিদ্যালয় সংলগ্ন আছে। বিদ্যালয়ে লিখন, পঠন ও প্রাথমিক গণিত ব্যতীত ধর্ম্মশিক্ষাও হইয়া থাকে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম টাঙ্গ্যুর ও কাঙ্গ্যুর নামক গ্রন্থদ্বয়ে লিখিত।

তন্ত্রশাস্ত্র, তিব্বতের কবি সিলরসের গ্রন্থাবলী, জীবনচরিতাবলী ও ইতিহাসও পঠিতব্য বিষয়। কোন কোন মঠে চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বহু প্রাচীন এবং চীনদেশ হইতে প্রাপ্ত।

টাঞ্জুর ও কাঞ্জুর নামক গ্রন্থদ্বয় মূল সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত। ইহাতে 'বিনয়' নিয়মাবলী, 'সূত্ত' পিটক এবং 'অভিধর্ম' সংগৃহীত আছে। 'বিনয়' ও 'সূত্ত' মহাযান ও হীনযান হইতে গৃহীত, কিন্তু 'অভিধর্ম' সর্ব্বাংশে মহাযান হইতে গৃহীত। উভয় পুস্তকেরই বিশেষত্ব আছে এবং মূল পালির সহিত উভয়েরই পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

লামাদিগের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিত এবং অতি বিশুদ্ধ জীবন যাপন করেন। কিন্তু সাধারণ পুরোহিতরা যদিও সকলেই লিখন-পঠনে সমর্থ এবং মন্দির ও মঠ সম্বন্ধীয় নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তথাপি তাঁহারা যে বুদ্ধিমান্ কিংবা ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণ, তাহা বলা যায় না। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মঠগুলিতে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এক সময়ে মঠে প্রবেশার্থী হইয়াছিল, কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া মঠের ভৃত্যরূপে অবস্থান করিতেছে। লাসার 'যোদ্ধা সন্ন্যাসিগণ এই শ্রেণীভুক্ত। তাহারা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নহে। তাহারা অলস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং সর্ব্বপ্রকার কুকার্য্য—হত্যা, দস্যুতা ইত্যাদি—করিতে সমর্থ। বৈদেশিকগণকে সর্ব্বদা এই 'সন্ন্যাসী' দলের জন্য ভীত হইয়া কালযাপন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এত দুর্দ্দান্ত যে, মন্দির-সংলগ্ন ক্রিয়াপদ্ধতির অনুষ্ঠানের সময় শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য এক জন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। ঐ কর্ম্মচারী বৃহৎ যষ্টি হস্তে শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করিয়া গুণ্ডাশ্রেণীভুক্তদিগের উপর দুই হস্তে যষ্টি চালনা করেন।

কোনও কোনও সন্ন্যাসী পর্ব্বতগুহা এবং অপর নিভৃত স্থানসমূহে অবস্থান করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিতাবস্থায় সমাধি আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই প্রথা অতি বিস্ময়কর। ডংসি নামক স্থানেই এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীদিগকে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। গিয়াংসি এবং সিগাট্-সির মধ্যবর্ত্তী পথের উপর ডংসি স্থিত। স্থানটি একটা জনহীন উপত্যকা এবং মূল পথ হইতে অদূরে স্থিত। গিয়াংসি হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। এই স্থানে বহুসংখ্যক গুহা আছে। প্রত্যেকটির প্রবেশের পথ প্রস্তর-নির্ম্মিত। উহাতে একটি দ্বার সংলগ্ন আছে, তাহা দৃঢ়রূপে বদ্ধ। দ্বারের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, উহা ৫ হইতে ৬ ইঞ্চ পরিমিত একটি দ্বার-সাহায্যে বন্ধ করা এবং খোলা যায়। গুহার মধ্যে সন্ন্যাসী কখন কখন নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বৎসরের জন্য, কখন কখন বা সারাজীবনের জন্য অন্ধকারে একাকী অবস্থান করেন। দ্বারপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ছিদ্র সাহায্যে সন্ন্যাসীকে তাঁহার দৈনিক খাদ্য প্রদান করা হয়। তাহা অতি সামান্য—একটু জল এবং কিঞ্চিৎ অর্দ্ধপক্ক শস্য। হিন্দুযোগীরা এই প্রথার প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রবাদ আছে। বুদ্ধদেব এই প্রকার দেহ ও চিত্তধ্বংসকারী, ভয়ঙ্কর, যন্ত্রণাদায়ক ও নিষ্ফল অনুষ্ঠানকে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

উচ্চতম লামাগণ অধ্যয়ন, ধ্যান এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন। কেহ কেহ লিপিকর, কেহ বা মন্দির ও প্রার্থনাচক্রসমূহে চিত্রকার্য্য করিয়া থাকেন। কোন কোন মঠে ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য মুদ্রাযন্ত্র আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি ভিন্ন অপর কোন মঠের টাঞ্জুর ও কাঞ্জুর প্রকাশের অনুমতি নাই।

যে বালক সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়াসী, তাহাকে সাধারণতঃ ১০ কিংবা ১২ বৎসর বয়সে কোন মঠে প্রেরণ করা হয়। তথায় সে কোন ভিক্ষুর ছাত্ররূপে গৃহীত এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডিত্যবলে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে কিংবা পূর্ব্বোক্ত "যোদ্ধা" "সন্ন্যাসী"দের দল পুষ্ট করিবে, তাহা তাহার নিজের ইচ্ছা ও কার্য্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ছাত্রের পারদর্শিতা সম্বন্ধে অধ্যাপকের যে অমনোযোগিতার জন্য অধ্যাপককে দণ্ডিতও হইতে হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রের বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে। নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিলে কিংবা ছাত্র একবারে কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত বলিয়া বিবেচিত হইলে অধ্যাপক তাহার জন্য দায়ী হয়েন না।

ধর্ম্মযাজকদিগের পালনের জন্য সমগ্র নিয়মাবলীর সংখ্যা ২ শত ৫৩; কিন্তু ঐ সকল নিয়ম কদাচিৎ পালিত হয়। 'পালুক্পা' সম্প্রদায় কৌমার্য্যের অনুবর্ত্তী; কিন্তু 'ঞি-মাপাদিগের' মধ্যে ইহা রক্ষিত হয় না। ইহাদিগের বিবাহ অননুমোদিত হইলেও বিনা বিবাহে স্ত্রীলোকের সহিত সম্মিলনে বাধা নাই। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনীগণও প্রায়শঃই কৌমার্য্য সম্বন্ধে পুরুষদিগেরই অনুসরণকারিণী।

ডালাই লামা ও অপরাপর লামাগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ সুলক্ষণবিশিষ্ট ৫ কিংবা ৬ বৎসরের এক বা ততোধিক বালককে আহ্বান করিয়া মৃত লামার প্রিয় দ্রব্যাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে রক্ষা করা হয়। যে বালক অপর দ্রব্যাদি হইতে মৃতের দ্রব্যাদি পৃথক করিতে সমর্থ হয়, সেই মৃত লামার উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু যদি একাধিক বালক একই প্রকার সাফল্য লাভ করে কিংবা নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগের মধ্যে সংশয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উচ্চপদস্থ লামাদিগের মত গ্রহণ দ্বারা নির্ব্বাচনকার্য্য সাধিত হয়।

তিব্বতীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় ও বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসঙ্ঘ এতদুভয়ের মধ্যে অশেষ প্রভেদ। তিব্বতের ধর্ম্মমত বুদ্ধদেবের বৌদ্ধধর্ম্ম নহে, লামা-ধর্ম্মই তাহার যোগ্যতর নাম।

শ্রীকিরণকুমার রায়।

আহার্য্য-সংস্কার

আহার না হইলে মানুষ বাঁচে না। মানুষ যদি এক দিন নিছক চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, তাহা হইলে সে চব্বিশ ঘণ্টায় ২৫ হাজার ৯ শত কুড়ি বার নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং তাহার হৃৎপিণ্ড ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত ৮০ বার স্পন্দিত হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক বার ৩ সের রক্ত তাহার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়া একবার ঘুরিয়া আইসে। এই যে মানুষ-যন্ত্রটির ভিতরে এত বড় কার্য্য অনুক্ষণই চলিতেছে, তাহার শক্তি (energy) ঐ আহার্য্য দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষ ত আর চব্বিশ ঘণ্টাই হাত-পা না নাড়িয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে না—সে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে। এ জন্য তাহাকে প্রভূত পরিমাণে শক্তির যোগান দেওয়া চাই। তাহা ছাড়া তাহার শরীরের তাপ ৯৮ ডিগ্রীতে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজন। এই উত্তাপশক্তিও (heat energy) ঐ খাদ্য হইতেই আইসে।

এই প্রকার নানাবিধ প্রয়োজনের জন্য যতখানি শক্তি মানুষকে বাহির হইতে আহরণ করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক তাহার পরিমাণও মোটামুটি রকম নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৩ হাজার কিলোগ্রাম (প্রায় ৮৪ মণ) জলকে এক (Centigrade) ডিগ্রী অধিকতর উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ উত্তাপ-শক্তির দরকার, চব্বিশ ঘণ্টায় একটা মানুষের সাধারণ কায-কর্ম্মের জন্য সেই পরিমাণ বা তদনুরূপ শক্তির প্রয়োজন। ইহা হইতে মানুষের দৈনিক আহার্য্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, যেহেতু, বৈজ্ঞানিক প্রায় সকল রকম আহার্য্য বস্তুরই অন্তর্নিহিত শক্তি (potential energy) নিরূপণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য মানুষ এত অঙ্ক কষিয়া, মাপ করিয়া—তাহার আহারের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে না—তাহার প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠ মাপকাটি তাহার

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের খাদ্যে ছয় রকম মৌলিক পদার্থ আছে। সেগুলি এই ;—

প্রোটিন (Protein—আমিষ জাতীয় পদার্থ)।
শ্বেতসার (Carbohydrate)।
বসা (Fat)।
লবণ (Inorganic Salts)।
জল।
ভিটামিন (Vitamine)।

এই ছয়টি জিনিষের প্রত্যেকটিই যে শুধু প্রয়োজনীয়, তাহা নহে, খাদ্যে তাহাদের যথারীতি সামঞ্জস্যও থাকা চাই।

মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। দেহগঠনের জন্য এই প্রোটিন অবশ্য প্রয়োজনীয়। নাইট্রোজেন অস্থি, মাংস, রক্ত, স্নায়ু প্রভৃতি দেহতন্তুর একটা প্রধান অঙ্গ। প্রোটিন ছাড়া অন্য কোন জিনিষে নাইট্রোজেন নাই। এ জন্য তাহার এত আদর, এত মূল্য। জন্মাবধি প্রতিনিয়ত মানুষের শরীর ক্ষয় পাইতেছে। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য প্রোটিন চাই। শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও প্রোটিনের প্রয়োজন। শৈশবে শরীরবৃদ্ধি অনুপাতে বেশী হয় বলিয়া শৈশবের আহার্য্য দুগ্ধে অন্যান্য জিনিষের অপেক্ষা প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে থাকে।

চাল, ডাল, আটা, ময়দা, আলু, ফলমূল, গুড়, চিনি, সাগু, এরারুট, বার্লি, খইকুড় প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রধান। এই জাতীয় আহার্য্য পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মিলে, সুতরাং সস্তা এবং মানুষ খায়ও বেশী। যে দেশ যত বেশী কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র, সেই দেশে এই জিনিষের চলন তত বেশী। নিত্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতের ক্রমশঃ এইগুলিই একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা মঙ্গলের কথা নহে। এই জিনিষগুলি শরীরগঠনের আদৌ উপযোগী নহে। কেন না, মেদোবৃদ্ধি ব্যতীত ইহাদের আর কোন কার্য্য নাই। অবশ্য ইহারা যে নিগুর্ণ, তাহা নহে, এই সকল আহার্য্য শরীরে শক্তি (energy) সঞ্চার করে এবং শরীরের তাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়া থাকে।

বসাযুক্ত খাদ্যের মধ্যে প্রধান ঘি, তেল, মাখন ও ডিমের কুসুম। ইহাদের গুণ ঠিক ঐ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মতই, তবে শক্তি দিবার ক্ষমতা তাহাদের দুই গুণেরও কিছু বেশী। বিশুদ্ধ ঘৃত, তৈল এবং মাখনের মূল্য এত বেশী যে, এ দিকে বাঙ্গালীর ভাবিবার বিশেষ কিছু নাই।

লবণ প্রায় সকল খাদ্যেই আছে; উদ্ভিজ্জ পদার্থেই বেশী। জীবনধারণের জন্য ইহারা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে মানুষ সচরাচর যে পরিমাণ আহার করিয়া থাকে, ততটাই যে দরকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ দিনে এক হইতে দুই তোলা লবণ (Sodium Chloride) গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র খাইয়াও মানুষ বেশ সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারে। উদ্ভিজ্জ পদার্থে বেশী লবণ থাকিলেও ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, নিরামিষ-ভোজীদের মধ্যেই লবণের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভ্রমণকারীদের ইতিবৃত্ত হইতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Bunge দেখাইয়াছেন যে, মাংস খাইয়া দিন কাটাইলে লবণের অভাব বুঝিতেই পারা যায় না, কিন্তু নিরামিষ আহারে লবণের আকাঙ্ক্ষা খুবই প্রবল হয় এবং না পাইলে বড় বেশী অস্বস্তি ভোগ করিতে হয়। শরীরের সর্ব্বাংশেই লবণ আছে। প্রতিদিন প্রস্রাবের সঙ্গে খানিকটা করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। ক্ষতিপূরণস্বরূপ আহারের সঙ্গে তাহা যোগান দিতে হয়। মুরার ও ব্যাক্তির জন্য এই লবণকেই ষাড়শোপচারে পূজা করিয়াছিলেন।

যাইবে যে, মানুষের শরীরের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী জল। শরীরের যন্ত্রপাতি প্রক্ষালন করিয়া দেওয়া জলের একটা প্রধান কাষ।

ভিটামিনের মূল্য মোটেই অকিঞ্চিৎকর নহে। আহার্য্য দ্রব্যে ইহা এতই কম পরিমাণে থাকে যে, রাসায়নিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রেও ইহাকে ওজন করিতে পারা যায় নাই। তবে অস্তিত্ব সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতরা নিঃসন্দেহ। তাজা জিনিষেই এই ভিটামিন পাওয়া যায়ঃ তা শাকসব্জীই হউক, ফলমূলই হউক, আর মাছ-মাংসই হউক। ইহারা বেশীক্ষণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের কাষ শরীরকে ঠিক দস্তুরে রাখা।* যত বিশুদ্ধ আহার্য্যই দেওয়া হউক না কেন এবং তাহাতে প্রোটিন, বসা ও শ্বেতসারের যত নিখুঁৎ সামঞ্জস্যই থাক না কেন, তাহাতে যদি ঐ তিলপরিমাণ রহস্যময় ভিটামিন না থাকে, তবে সে প্রাণীর স্বাস্থ্যহানি এবং পরিশেষে মৃত্যু অনিবার্য্য। নানাবিধ গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিন রকম ভিটামিনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম Fat Soluble A, যাহা ঘাসে এবং প্রাণীজ চর্ব্বিতে—যেমন Cod-liver Oilএ থাকে। ইহার অভাব শিশুদের অস্থি-বিকৃতি রোগের (Rickets) প্রধান কারণ। দ্বিতীয় Water Soluble B, ইহা ডাল কলাইএ ও ডিমে থাকে। ইহার অভাবই বেরী বেরী রোগের অন্যতম কারণ। আর তৃতীয়তঃ Water Soluble C, ইহা প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু এবং গোঁড়ালেবুতে পাওয়া যায়। ইহার অভাব হইলেই Scurvy নামক রোগ হয়। ভিটামিনের অভাবে এই সব বড় বড় স্পষ্ট ধরণের রোগ ত হয়ই, তাহা ছাড়া ইহা হইতে যে কত রকম অব্যক্ত অস্পষ্ট রোগের আবির্ভাব হয়, তাহার আজ পর্য্যন্ত শেষ মীমাংসা হয় নাই। শীর্ণতা (Marasmus), অম্ল, অজীর্ণ রোগ এবং নানাবিধ স্ত্রীরোগ এই ভিটামিনের অভাব হইতেই হইয়া থাকে, এ কথাও আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। এই অতি প্রয়োজনীয় অদৃশ্য অপূর্ব্ব জিনিষটি সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

নীচে একটা তালিকা দেওয়া গেল। ইহা হইতে আমাদের প্রধান আহার্য্যে কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে আছে, তাহা জানা যাইবে। অবশ্য সংখ্যাগুলিকে মোটামুটি ভাবেই ধরিয়া লইতে হইবে ;—

১০০ ভাগ	জল	প্রোটিন	শ্বেতসার (সহজপাচ্য)	Cellulose	বসা	লবণ
মাছ	৭৯	১৮	১	...	১·২	·৮
ছাগমাংস	৭৬	২১	·৩	...	১·৫	১২
খাসি	২০	২৪	...	...	৫০	৬
মাটন	৭৬	১৭	...	...	৫·৭	১·৩
কাউল	৭১	২৩	১	..	৪	১
ডিম	৭৪	১২·৫	...	...	১২	১·১
গোদুগ্ধ	৮৭·৭	৩·৪	৪·৮	...	৩·২	·৭
স্তনদুগ্ধ	৮৯·৭	২	৫	...	৩·১	·২
চাল	১৩	৭	৭৭·৫	·৫	১	১
আটা	১৩·৫	১২·৫	৬৮	২৫	১·৫	১·৫
মসুর	১২·৫	২৫	৫৪·৪	৩৫	২	২·৫
মটর,কলাই	১৫	২৩·৫	৪৯	৭৫	১·৫	৩
ছোলা	১২·৫	১০·৫	৫৮	১১	৫·৫	·৩
আলু	৭৬	২	২০·৫	·৭	·২	১
বার্লি	১৪	১১	৬৫	৫	২	৩

এই তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজনমত স্থানে স্থানে করা হইবে।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলা গেল, তাহা সাধারণ ভূমিকা মাত্র। এইবার বাঙ্গালাদেশের উপযোগী করিয়া বিষয়টা বিস্তৃতভাবে আলোচনা

প্রথমে আমরা চাল ও আটা-ময়দার কথা আলোচনা করিব। কেন না, চালই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। সহরাঞ্চলে আজকাল আটারও অল্প-বিস্তর প্রচলন হইতেছে। উল্লিখিত তালিকা লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহাতে প্রোটিন খুব কমই আছে, বসা নিতান্তই অল্প, আর শ্বেতসার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, চাল শতকরা ৭৬ ভাগ। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইবে যে, শুধু ভাত খাইলে আহার্য্যটা অতিমাত্রায় শ্বেতসারপ্রধান হইয়া যায়। এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, সকল জাতির জন্য প্রোটিনের পরিমাণ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নাই, কিন্তু তাহা হইলেও এই রুগ্ন মস্তিষ্কজীবী বাঙ্গালীজাতির পক্ষে এই একঘেয়ে আহার্য্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙ্গালার কুলি-মজুর অর্থাৎ শ্রমজীবী সম্প্রদায় এই রকম একঘেয়ে খাবার হজম করিতে এখনও বিশেষ বেগ পায় না, কিন্তু পরিশ্রম-বিমুখ মস্তিষ্কজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে এ কথা খাটে না। বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমান অনেক দিন হইতেই একই আবহাওয়ায় বাস করিয়া আসিতেছে, কিন্তু রোগ পিড় মৃত্যুর হার মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যেই বেশী। এ কথাটা বলিলে বিশেষ ভুল হইবে বলিয়া বোধ হয় না যে, ইহার কারণ মুসলমানরা হিন্দুদের অপেক্ষা মাংস খায় বেশী। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের লোকের স্বাস্থ্য ভাল, কারণ, তাহারা বেশী পরিশ্রম করে এবং খায় ডাল রুটী। পূর্ব্বের তালিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আটাতে চালের অপেক্ষা বেশী এবং ডালে মাংসের অপেক্ষা বেশী প্রোটিন থাকে। ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় লিখিয়াছেন যে, গুজরাতীদের মধ্যে সুস্থ ও সবল মানুষ একটাও দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গন্ধী তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গুজরাতীরা নিরুক নিরামিষাশী এবং তাহারা ডালেরও বিশেষ পক্ষপাতী নহে। জাপানীরা অন্নভোজী (অন্ন জিনিষটা মন্দ নহে, তাহার আধিক্যই মন্দ) এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইল না, তাহার সঙ্গে ইহাও জানিতে হইবে যে, জাপানীরা অন্ন কিরূপে খায় এবং তাহার সঙ্গে আর কি কত পরিমাণে খায়। লণ্ডনের কিংস্ কলেজের শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক যশোখ্যাত বৈজ্ঞানিক W. D. Halliburton বলিয়াছেন,—"The recent development of the Japanese is by some attributed in part to the fact that they are accustoming themselves to a richer nitrogenous diet than they took in the past" (Halliburton's Hand book of Physiology, 12th edition, page 481) অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন যে, জাপানীদের আধুনিক অভ্যুদয়ের একটা কারণ এই যে, তাহারা আজকাল পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেনপ্রধান আহার্য্যে অভ্যস্ত। বাঙ্গালীর আহার্য্যে প্রোটিনের অনুপাত আর একটু বাড়াইয়া দিলে সে যে এখনকার তুলনায় বেশী নিরাপদে থাকিবে, এ বিষয়ে মতভেদ থাকা উচিত নহে।

এখন আসল কথা ধরা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চালে শ্বেতসার থাকে শতকরা ৭৬ ভাগ। তাহার মধ্যে সহজপাচ্য শ্বেতসার থাকে ৭১·৫ ভাগ আর দুষ্পাচ্য পদার্থ, অর্থাৎ Cellulose থাকে ·৫ ভাগ। এই Cellulose সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, শ্বেতসার জিনিষটা অসংখ্য ছোট ছোট আকৃতিবিশিষ্ট কণার সমষ্টিবিশেষ। ইহার বাহিরে ঐ দুষ্পাচ্য Celluloseএর একটা আবরণ থাকে, আর ভিতরে থাকে সেই আসল সহজপাচ্য শ্বেতসার (granulose)।

এখন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে জিনিষে যত বেশী Cellulose থাকিবে সেই জিনিষ তত বেশী দুষ্পাচ্য হইবে, কেন না, সেই জিনিষের Celluloseএর আবরণ ততই বেশী পুরু হইবে। এই বিষয়। এক পোয়া চালের ভাতের অপেক্ষা এই জন্য এক পোয়া আটার রুটী পরিপাক করা বেশী শক্ত। কিন্তু আটার অন্যান্য সুবিধা আছে, তাহা পরে দেখান যাইবে।

চালের উপরে যে মসৃণ পীতাভ আবরণ থাকে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম pericarp। এই জিনিষটা বেশ কঠিন (সুতরাং ইহা তত সহজে হজম হয় না) আর ইহার আর এক কায ভিতরের সার পদার্থটাকে বাহিরের জলবায়ু পোকামাকড়ের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা। ঠিক ইহার নীচেই যে স্তর, যেটাকে Subpericarpal layer বলা হইয়াছে, সেইখানেই সেই অশেষ গুণসম্পন্ন ভিটামিন থাকে। মধ্যের জিনিষটা শস্যের সার endosperm, কিন্তু এখানে ভিটামিন বিশেষ থাকে না। আর embryo জিনিষটা অঙ্কুর, ইহা হইতেই পরে গাছ হয়।

এখন ছাঁটার দোষগুণ সহজেই বোধগম্য হইবে। ঢেঁকিতে ছাঁটিলে বাহিরের আবরণটা (pericarp) প্রায়ই নষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার ঠিক নীচের স্তরটা বজায় থাকে—অর্থাৎ ইহাতে ভিটামিন নষ্ট হয় না। খুব বেশী ছাঁটিলেও যাহা নষ্ট হয়, তাহাও সচরাচর মারাত্মক হয় না। কিন্তু কলের ছাঁটায় যাহার ফলে পাতের ভাত একরাশ যুঁই-ফুলের মত দেখায়, ঐ pericarp আর Subpericarpal layerএর অনেকটা উঠিয়া যাওয়ায় মহা অনিষ্ট হয়। অর্থাৎ কলের পালিশ করার ফলে মানুষ আর ভিটামিন খাইতে পায় না। সেটা তখন গরুবাছুরের আহার্য্যরূপে ব্যবহার করা হয়। তাহাতে যে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। শুধু তাহাই নহে। বাহিরের ঐ কঠিন সংরক্ষণী আবরণটা নষ্ট হইয়া গেলে চাল বাহিরের জলহাওয়ায় এবং পোকামাকড়ের দৌরাত্ম্যে শীঘ্রই নষ্ট ও বিষাক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় যে বিষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই Beri-beri, Epidemic dropsy প্রভৃতি রোগ হয়, এইরূপ মত কলিকাতা Tropical School এর Lt. Col Megaw, Major Acton ও Major Chopra অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন। সভ্যতার অভিসম্পাতের কি ঘটা!

সিদ্ধ চাল তৈয়ার করিতে হইলে ধান অনেকক্ষণ ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পর সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে চালের খাদ্যাংশ খানিকটা বাহির হইয়া যায়। চালের যে ভিটামিন (Water Soluble B), সেটা জলে দ্রবণীয় বলিয়া তাহাও খানিকটা নির্গত হইয়া যায়। আতপ চালে এ সব হাঙ্গামা নাই। গরীব বাঙ্গালীর পক্ষে এই অপচয় অনুচিত।

ইহার পর ভাত রান্নার কথা আলোচনা করিতে হইবে। এইখানেই বাঙ্গালীর গলদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কেন এবং ঠিক কোন্ সময় হইতে যে বাঙ্গালী ফেন ফেলিয়া দিয়া ভাত খাইতে সুরু করিয়াছে, তাহা বলা বড় কঠিন। বাঙ্গালা ও বিহারের কিয়দংশ ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে ফেন ফেলিয়া দেওয়ার প্রথা নাই। জাপানেও ফেন ফেলিয়া দেওয়া হয় না। হয় ত বেশী জল দিয়া সিদ্ধ করিলে রান্না করিবার কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষ গুরু। ফেনটা শুধু জল নহে, তাহাতে বহু পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যও থাকে। ইহাতে শ্বেতসার যথেষ্ট থাকেই, পরন্তু চালের প্রোটিন ও (Glutenin) থাকে। সুতরাং ইহার মূল্য সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক আর্কট অবরোধকালে ক্লাইভের ভারতীয় সিপাহীরা কয় দিন ধরিয়া এই ফেন খাইয়াই আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ধনী জাপানীরাও এই ফেন ফেলিয়া দেয় না। আর এই দরিদ্র বাঙ্গালাদেশে যে সেটা ফেলিয়া দেওয়া হয়, ইহার কারণ অজ্ঞতা আর গতানুগতিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য এ কথাটা স্বীকার্য্য যে, ফেন শুদ্ধ ভাত খাইতে সুস্বাদু হয় না, কিন্তু ভাত এমন-ভাবেই রান্না করা যাইতে পারে যে, তাহাতে ফেন এক রকম থাকে না বলিলেই চলে। অল্প জল দিয়া চাপাইয়া যেমনই একবার

মোটামুটি রকম ঝরঝরে হইবে। চাল বাষ্পে সিদ্ধ করিলে আরও ভাল হয়। এ জন্য এমন একটা হাঁড়ি চাই—যাহার তলদেশ ঝাঁঝরার মত ছিদ্রসম্পন্ন। ঐ ছিদ্রগুলি এমন ছোট হওয়া চাই যে, তাহার ভিতর দিয়া চাল নীচে পড়িয়া না যায়। উনানের উপর একটা হাঁড়ি চাপাইয়া তাহাতে অর্দ্ধেকের অপেক্ষা বেশী জল ভরিয়া দিতে হইবে। এই জল ফুটিলে বাষ্প উৎপন্ন হইবে। এই বাষ্পোৎপাদক হাঁড়ির উপরে সেই ছিদ্রময় হাঁড়ি থাকিবে। উপরের হাঁড়িতেই সামান্যমাত্র জলের সঙ্গে অল্প ভিজা চাল থাকিবে এবং নীচের হাঁড়ি হইতে বাষ্প উপরের হাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া চালগুলিকে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করিয়া ঝরঝরে ভাতে পরিণত করিয়া দিবে। উপরের হাঁড়িটা সরা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। জাপানীরা এই প্রণালীতেই ভাত রাঁধে। আমাদের দেশেও অনেকটা এই উপায়েই পুলিপিঠা তৈয়ারী করা হয়। এই প্রণালীতে রান্না আতপচালের ভাত যে কেমন ঝরঝরে এবং সুগন্ধে ভরপুর হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া ইহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় না বলিয়া ইহার অপেক্ষা পুষ্টিকর ভাত আর কল্পনা করা যায় না। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ চালেই প্রয়োজন মিটিয়া যায়। আতপ চালের মহার্ঘতা তাহার প্রয়োজনের পরিমাণের অল্পতায় পুষাইয়া যায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন ভড়।

ভারতের নব জাগরণ

(২)

নব চেতনার চতুর্থ কথা—ধর্ম্ম ও সমাজ সংগঠন।

ভারতে যখন প্রথম জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন এক দল লোক বলেন যে, ধর্ম্ম ভিন্ন জাতীয়তার (Nationalism কথা উঠিতে পারে না। ভারত পরাধীন—পরাধীন জাতির জাতীয়তা কি? ভারত ধর্ম্মপ্রাণ—ধর্ম্মের কথা না থাকিলে কোন আন্দোলনেই তাহার প্রাণের সংযোগ থাকিতে পারে না। ভারত একটি দেশ নয়, তাহাকে মহাদেশ বলাই সঙ্গত; নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা স্তরের সভ্যতা, নানাবিধ আচার-ব্যবহার ভারতবর্ষকে বিচিত্র করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়?—ইহার একমাত্র ঐক্যবন্ধন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দিক্ হইতে ভারতকে জাগাইতে না পারিলে ধর্ম্মপ্রাণ ভারত কদাচ জাগিবে না। এই ভাবের প্রভাব পঞ্জাবে দয়ানন্দ স্বামী ও মারাঠা দেশে ব্রাহ্মণকুলতিলক তিলক প্রথম আরম্ভ করেন। বঙ্গে বিবেকানন্দ স্বামী এই ভাবতরঙ্গ আনয়ন করেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, দেশের উন্নতি বলিলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বুঝিতে হইবে। আজ যদি আমরা স্বধর্ম হারাই, তবে স্বরাজ লইয়া করিব কি? আমাদের বৈশিষ্ট্য কোথায় থাকিবে? সে স্বাধীনতা আমাদের মৌলিকত্ব নষ্ট করিয়া আমাদের ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। ধর্ম্মহীন সাধনা ভারতের সাধনা নহে—তাহা বৈদেশিক ভাবের অনুকরণ মাত্র। বহু দিনের অজ্ঞতা ও অনাচার, যুগ যুগান্তের-সঞ্চিত জড়তা ও স্বার্থপরতা আমাদের ধর্ম্মভাবকে হীন করিয়া দিয়াছে। আমরা ধর্ম্মের প্রাণ ভুলিয়া কেবল আচার লইয়া ব্যস্ত—আমাদের ধর্ম্ম সেই হেতু আজ প্রাণহীন ও আড়ষ্ট হইয়া আছে। নানা দেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণ এ দেশে আসিয়া আমাদের দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়া কত লোককে সমাজের ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। রাজা রামমোহন রায় প্রথমতঃ ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম-সংস্কারের চেষ্টা করেন। তিনি শাস্ত্রানুগ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্কারের চেষ্টা করিয়া ভারতের অতীতের সহিত বন্ধন ছিন্ন করেন তিনি ধর্ম্মানুশীলনের জন্য "ব্রাহ্মসভা" স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু-সমাজের সহিত বন্ধন ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর "ব্রাহ্মসমাজ" হিন্দুসমাজের সহিত বন্ধন ছেদন করিয়া হিন্দুসাধারণের সহানুভূতি হারাইয়া ফেলে। এই সমাজে পাশ্চাত্য ভাবের প্রাবল্য হেতু দয়ানন্দ স্বামী ইহাকে বিলাতী সভ্যতার পত্তন আখ্যা দিয়াছিলেন। ব্রহ্মসমাজের প্রতিকূলে নানা আন্দোলন দেশে সমুপস্থিত হয়; কেশবচন্দ্র সেন যখন বাঙ্গালায় নব উদ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, অপর দিকে তখন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবও যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গবাসী' নব উদ্যমে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে বাঙ্গালায় অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইল। ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। পশ্চিম-ভারতে দয়ানন্দ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করিতে লাগিলেন—তাঁহারা চারিদিকে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিতে লাগিলেন; প্রতিবাদে সনাতনপন্থী হিন্দুগণ চারিদিকে ধর্ম্মসভা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। ফলে আর্য্যসভা ও ধর্ম্মসভার সংঘর্ষে দেশের ধর্ম্মপ্রাণতা নবীভূত হইয়া তথায় দেখা দিল। মধ্যভারতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর চরিত ধর্ম্মের উৎসস্বরূপ হইয়া রহিল আর্য্যাবর্ত্তের এই ধর্ম্মান্দোলন বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ নব জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব, আর্য্যসমাজী ও সনাতনপন্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলেই এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া ভূত ও ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন। এখন ভারতের অতি সঙ্কটসঙ্কুল সময়, বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না; সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে—সংহতি ভিন্ন উন্নতি নাই। হিন্দু মহাসভা আজ এই কার্য্যের ভার লইয়াছেন—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। অপর দিকে মুসলমানগণ অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন—কিন্তু এই দুই সম্প্রদায় ধর্ম্মান্দোলন চালাইলেও ইহাদের স্থিতিস্থাপকস্বরূপ থাকিবেন—ভারত রাষ্ট্রিক মহাসভা বা Indian National Congress

সমগ্র ভারতে যখন ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার সহিত সমাজসংস্কারের কথা উঠে। রাজা রামমোহন রায় যেমন ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ করেন, তেমনই তিনি সেই প্রকার সমাজ-সংস্কারের বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মূলপত্তন করেন। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম ধর্ম্মবিষয়ে উদার মত অবলম্বন করিলেও সমাজব্যবস্থায় অতি কঠোর নীতির পক্ষপাতী। রাজা রামমোহনের তিরোভাবের পর ব্রাহ্মসমাজ যখন বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিরোধী বিবাহাদির ব্যবস্থা করিলেন, তখন হিন্দুসমাজের সহিত ইহার কোন সংস্রবই রহিল না। রাজা রামমোহনের সমাজ-সংস্কারের কার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রহণ করেন; শাস্ত্রানুগ যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের দিক্ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় বিধবার পুনর্বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সকল আন্দোলন যখন সমাজে উপস্থিত, রক্ষণশীল সম্প্রদায় তখন স্থির ছিলেন না। শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। এই সকল সমাজ-সংস্কারের কথা লইয়া সমাজে নানা জাতির মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল; সকল জাতির মধ্যে জাগরণের লক্ষণ পাওয়া যাইতে লাগিল। ব্যাপকভাবে সমাজে যে সমস্ত আন্দোলন চলিতেছিল, প্রতি জাতির মধ্যে সেই সকল কথার আলোচনা হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে আদম সুমারের (census) ব্যাপার দেশে নূতন করিয়া বাঙ্গালী সমস্যা আনিয়া ফেলিল। বৈদ্য

জল চল, কাহারাই বা অচল, এই সকল কথার আলোচনায় সকলেই পুরাতন পাঁজিপুঁথি কুলজীর পাতড়া লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষার ফলে প্রতি জাতির আত্মসম্মান-বোধ পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ প্রখর হইয়াছিল—এখন তাহা চরমে উঠিল। অপর দিকে রাষ্ট্রীক অধিকার লইয়া পতিত জাতির (depressed class) মধ্যে তুমুল আন্দোলন সমুপস্থিত হইল—ইহার ফলে দেশে জনমতের অভ্যুদয় ঘটিল। জনমতের উৎপত্তির ইতিহাসে মহাত্মা গন্ধীর প্রভাবও অসীম। আজ জনমতকে আর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। দেশ বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, দেশের মুক্তি কেবল কয়েক জন ব্যক্তির কার্য্য নহে—দেশের মুক্তি দেশের সমগ্র নরনারীর উপর নির্ভর করিতেছে। দেশে জনমতের নব অভ্যুদয় বাস্তবিকই বড় আশার কথা।

নবচেতনার শেষ কথা—দেশ ব্যাপিয়া কর্ম্মিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। দেশ আজ বেশ বুঝিয়াছে যে, বাগাড়ম্বরের যুগ অতীত হইয়াছে, এখন কার্য্যের সময় আসিয়াছে। অজ্ঞানতা, রোগ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মড়ক সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান। দেশের উন্নতির জন্য এই অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করিতে হইবে। যাত্রা ও কথকতার সাহায্যে, ছায়াচিত্রের সহায়তায় দেশে লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামে ও নগরে কৃষক ও শ্রমজীবীদের শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল পুরুষদের শিক্ষা লইয়া থাকিলে চলিবে না, স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়েও অবহিত হইতে হইবে।

এই সকল কার্য্যে দেশের লোকের মন পড়িয়াছে—নানা স্থানে কার্য্যও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত আশার কথা। দেশে রোগ নিত্য বিদ্যমান—ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, মহামারী যেন নিত্য লাগিয়া আছে। এ দেশের যত লোক এক একটি মড়কে মরে, য়ুরোপের বড় বড় যুদ্ধে তত লোক মরে না। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার পল্লীগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। দেশে শিশুমৃত্যুর কথা ভাবিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। নগরে যক্ষ্মারোগের প্রলয় বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ানিবারণী সভা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সমিতি, পল্লীমঙ্গল সমিতি, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন প্রভৃতি এই সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতেছে। দেশে দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ নিত্য লাগিয়া থাকা সত্ত্বেও জমীদারবর্গ নগরে বিলাসব্যসনে নিরত। প্রজাদিগের মুখের দিকে তাকায়, এমন কেহ নাই। এ ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনই একমাত্র উপায়—দেশের স্থানে স্থানে রায়ৎ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; রায়ৎ-সভা এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন, ইহাও আশার কথা।

দেশের জনসাধারণের অনেকেরই দুই বেলা অন্ন জুটে না। পরিধানে তাহাদের বস্ত্র নাই, মকর্দ্দমায় মকর্দ্দমায় তাহারা সর্ব্বস্বান্ত, পিতৃশ্রাদ্ধে কন্যাদায়ে তাহাদের সর্ব্বস্ব বন্ধক পড়ে, জমীদারের খাজানার অনাদায়ে হাল-গরু ক্রোক হয়; দেশের প্রজাসাধারণের যে অবস্থা, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সমবায় সমিতি, যৌথ ধনভাণ্ডার, ধর্ম্মগোলা স্থাপন, পঞ্চায়েৎ বিচার, চরকার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের দুঃখলাঘবের কার্য্য কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। দেশের পক্ষে এ সকলই শুভচিহ্ন বলিতে হইবে। তবে বিরাট দেশের পক্ষে যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অতি সামান্যই বলিতে হইবে। তথাপি আশা, এই আরম্ভেই বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা লক্ষিত হয়।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সংগঠনের সদুপায়

দেশের রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে লইয়া বিশেষ কর্ম্মিমণ্ডল সংগঠনের কথা

বর্ত্তমানে জগতে প্রবর্ত্তিত অর্থোৎপাদক রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক কার্য্য-প্রণালীকে দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়া এ দেশে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহারও প্রবর্ত্তনের জন্য, অবস্থাবিশেষে উক্ত বিষয়সমূহের মৌলিক গবেষণাদির জন্য—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া কর্ম্মিমণ্ডল সংগঠিত করিতে হইবে। যথোপযুক্ত স্থানে তাঁহাদের কার্য্যের উপযোগী কর্ম্মায়তন, পরীক্ষাগারাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাংসারিক সর্ব্বব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মিসঙ্ঘ এই সকল প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া তাঁহাদের গবেষণামূলক কার্য্যে সর্ব্বদা একনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত রহিবেন। জাতীয় মহাসংসদ তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনাদি যোগাইবার যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। সংসারের সর্ব্ববিধ অভাব-অনটনের বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া উক্ত কর্ম্মব্রতীরা স্বাধীন গবেষণাফলে যে সকল তত্ত্বের প্রচার করিবেন, শিক্ষাদানসূত্রে শিক্ষাসমিতি সে সব তত্ত্ব দেশময় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করিবেন।

বিদেশের নগরে নগরে কর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা

বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতীয় পণ্য-সম্ভারের সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য রুস, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, তুরস্ক, জার্ম্মাণ, ইংলণ্ড, আফ্রিকা, মিশর, আমেরিকা প্রভৃতি জগতের বড় বড় দেশে কর্ম্ম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয় কর্ম্মীদের স্থাপন করিতে হইবে।

বিদেশস্থ উক্ত কর্ম্মীরা সেই সকল নগরে থাকিয়া ভারতীয় শ্রম শিল্পজাত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

তত্তদ্দেশীয়দের প্রয়োজনীয় পছন্দসই পণ্য ভারতীয় কাঁচামালে ভারতীয় কর্ম্মীদের শ্রমে ভারতেই যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে, বিদেশীয়দের কার্য্যপদ্ধতি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিবেন।

শিল্পজ-পণ্য সম্ভার প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া দেশে পাঠাইবেন।

আবশ্যকস্থলে নিজেরাই হাতে-কলমে কার্য্য শিক্ষা করিয়া দেশে আসিয়া সেই সব কার্য্যপদ্ধতি দেশে প্রবর্ত্তিত করিবেন।

বিদেশী ক্রেতাদের রুচির অনুকূল কি কি পণ্য ভারত হইতে রপ্তানী করা যাইতে পারে, সর্ব্বদা তাহার তথ্যানুসন্ধানে তৎপর রহিবেন।

যখন যে দেশে অভিনব কোনও বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক কার্য্যপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয়, তখনই তাহার আমূল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব হাতে-কলমে শিখিয়া এবং তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া দেশে তাহা প্রবর্ত্তিত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

জাতীয় মহাসংসদের কর্তৃত্বাধীনে বিদেশের কর্ম্ম-মন্দিরের কাম-কর্ম্ম পরিচালিত হইবে। বিদেশস্থ কর্ম্মীরাও তাঁহাদের মন্তব্যাদি জাতীয় মহাসংসদেই প্রেরণ করিবেন। মহাসংসদ হইতে প্রাদেশিকাদি সংসদে প্রবর্ত্তিত হইবে।

নাগরিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতার কথা

আবহমানকাল হইতে জাতীয় আন্দোলনমাত্রই নগরে বা সহরে সৃষ্ট হইয়া পরে তাহার স্রোতোধারা গ্রামে-পল্লীতে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ফল কিন্তু ইহার অতি শোচনীয়-

অগভীর ও ক্ষণিক উত্তেজনা যতটা স্পষ্ট ও দৃষ্ট হয়, গভীরত্ব ও স্থায়িত্ব তাহার ততটা দেখা যায় না। কাযেই তাহা রিক্ততা ও বিফলতার মধ্যেই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, নগর বা সহরগুলিতে সামাজিকতার হীনতা, শিথিলতা বা অভাব হেতু ঐক্যেরও নিতান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। দেশস্থ বিভিন্ন পল্লীর বিশিষ্ট প্রতিভাশালী বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত কর্ম্মী'রা কর্ম্মাদিব্যপদেশে অস্থায়িভাবে সহরে আসিয়া বাস করেন। বিভিন্ন পল্লীস্থ বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা কর্ম্মব্যপদেশে অস্থায়িভাবে সহরে বাস করেন বলিয়া গভীর ও নিবিড় একটা সামাজিক বন্ধনের আবহাওয়া তাঁহাদের মধ্যে স্পষ্ট হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। ফলে প্রায় সকলেই এক একটা স্বতন্ত্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া স্বস্বপ্রধানভাবে নাগরিক জীবন যাপন করিয়া চলেন। কাযেই সহরাদিতে জাতীয় ঐক্যের একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি বাধ্য-বাধকতার যেখানে এতটাই অভাব—জাতীয় ঐক্যসংসাধক আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার প্রযত্ন ও প্রয়াস, সেখানেই সর্ব্বৈব ব্যর্থ ও বিফল হইবে—হইতে বাধ্য, ইহা সুনিশ্চিত। কাযেই জাতির প্রকৃত মঙ্গল-সাধন করিতে হইলে নাগরিক আন্দোলনের মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লীতেই প্রাথমিক আন্দোলনের সূত্রপাত করত তাহার স্রোতোধারাকে সহর-মুখে প্রবাহিত করিয়া আনিতে হইবে। আর ইহাই স্বাভাবিক। সমুদ্রের জলস্রোত উজাইয়া গিয়া নদীর প্রবাহের পুষ্টিসাধন করে না, ক্ষীণ ধারাতে নদীস্রোত ভাটি মুখে ছুটিয়া আসিয়াই বিশাল বারিধির পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকে। জাতীয় মহাসংসদের কর্ম্মকর্ত্তৃগণকেও উক্ত স্বাভাবিক গতির কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহ-পন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

মুখ্যকর্ম্ম ও গৌণকর্ম্মনির্ব্বিশেষে কর্ম্মীদের জাতীয়-কর্ম্ম-সংসাধনের কথা

এ দেশবাসী সামাজিক কর্ম্মী'দের সাধনীয় কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত ;—(ক) মুখ্যকর্ম্ম ও (খ) গৌণকর্ম্ম।

(ক) সাংসারিক বা বৈষয়িক নিত্যনৈমিত্তিক কাযকর্ম্মই কর্ম্মী'দের মুখ্যকর্ম্ম। রাজাপ্রজা, ধনি-দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধবনিতা—আপামর সাধারণ সকলেই মুখ্য বৈষয়িক কাযকর্ম্মে নিয়ত লিপ্ত। ইহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে লিপ্ত না থাকিলে জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবারই উপায় নাই বলিয়া সকলেই ইহাতে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য ; তাই অমন নিবিড় নিবিষ্টভাবে ইহাতে সংলিপ্ত সমগ্র দেশপ্রস্থত কোনও সুনিয়ন্ত্রিত সাধারণ বা জাতীয় কার্য্যপদ্ধতি না থাকায়, এই মুখ্য কার্য্য সাধনক্ষেত্রে সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন—প্রায় সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার। স্বাতন্ত্র্যমূলক এই স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারই এ দেশবাসীর অন্ন-অর্থাদি অপহরণজনিত সর্ব্বনাশের অন্যতম প্রধান কারণ। এ দেশবাসী কর্ম্মী'রা বিষয়কর্ম্ম করিয়া উপার্জ্জনও করে যেমন স্বাধীন ও ব্যক্তিগত-ভাবে, ব্যয়ও করে তেমনই বে-পরোয়া স্বাধীন ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বাধীন কাযে নিঃসহায় এই দেশ-বাসীদের অন্নঅর্থাদি কাযেই সঙ্ঘবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত ভিন্নদেশীয়রা অতি অনায়াসেই আয়ত্ত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে সফল-মনোরথ হইবার শুভ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(খ) জাতির উক্ত অনিষ্টসাধক অরিষ্ট দূর করিবার একমাত্র উপায় ঐক্যসূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় ভাবে কার্য্য করা। তাহাই জাতির বর্ত্তমানে গৌণকর্ম্ম। এই কর্ম্মে বিশিষ্ট কয়েক জন মাত্র কর্ম্মী আত্ম-নিয়োগ করিয়া বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। যাঁহারা এই আন্দোলনের জন্মদাতা ও পরিচালক, তাঁহারাও জীবনের মুখ্য কর্ম্মরূপে এই কর্ম্মব্রতটিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। প্রথমে তাঁহারা জীবনরক্ষার্থে জীবিকাদি অর্জ্জনের জন্য পূর্ব্বোক্ত বিষয়মূলক মুখ্য-কর্ম্ম যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়া পরে অবসরক্রমে জাতীয় সেই গৌণকর্ম্মে কথঞ্চিৎ আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। কাযেই অনন্য-কর্ম্মা হইয়া প্রায় কেহই জাতীয় কর্ম্মব্রতসাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়েন না—হইতে পারেন না। ফলে জাতীয় আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসার-শূন্য উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, আর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়াই এমন হয় হইয়া থাকে। এখন গৌণ মুখ্য-নির্ব্বিশেষে কর্ম্মী'-দের জীবনের সর্ব্বসময়ব্যাপী অখণ্ড ও সমগ্র কর্ম্মব্রতকেই একমাত্র জাতীয় কর্ম্মপদ্ধতির নিয়মপ্রণালী-সূত্রে নিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খলিত করিয়া সাধন সরণীতে পরিচালিত করিতে না পারিলে, এ দেশবাসীর মঙ্গল ও কল্যাণমূলক রক্ষণের উপায়বিধান করা সর্ব্বৈব অসাধ্য ও অসম্ভব।

দেশবাসী কর্ম্মিমাত্রেরই আয় ও ব্যয়মূলক কর্ম্মের সাধনক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লোপ করিয়া দিয়া কর্ম্মমাত্রকেই এক সাধারণ সূত্রে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। গৌণকর্ম্ম বলিয়া কোনও কর্ম্মী'রই পৃথক কোনও কর্ম্মের স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্বই রহিবে না। জীবন ব্যাপিয়া কর্ম্মিমাত্রেই একমাত্র জাতীয় কর্ম্মকে মুখ্যকর্ম্মজ্ঞানে তৎসাধনায় চির-লিপ্ত রহিবে—কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে দেশময় এমনই অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তাহারই মাঝে জাতীয় কর্ম্মী ও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যিক বর্ণপরিচয়

অ—এতে অক্ষয় দত্ত, যেবা যতনে
প্রতীচ্যের জ্ঞানরত্ন করি আহরণ
সাজাইলা মাতৃভাষা বিবিধ ভূষণে,
বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের করিলা সৃজন।

আ—এ জয় আশুতোষ, সরস্বতী-বরে
বিদ্বান-সমাজে যশঃ লভিলা অতুল,
স্থাপি' যাঁ'র সিংহাসন বিমাতার ঘরে,
পূজিলা মায়ের দু'টি চরণ রাতুল।

ই—এ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো, রসের সাগর,
সমাজের কপটতা আক্রমিতে যাঁর
তীব্র শ্লেষবাণ তূণে আছিল বিস্তর,

ঈ—এ-তে ঈশ্বরচন্দ্র,—সাগর বিদ্যার,
যাঁ'র পুণ্য-কীর্ত্তি বঙ্গে রবে চিরদিন,
ভাষার প্রসাদ গুণ, ওজস্বিতা আর,
সাহিত্যে দুর্ল'ভ অতি, ভাব অমলিন।

উ—এ-তে উমেশ দত্ত, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত,
স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে যাঁর উদ্যম বিস্তর,
'বামাবোধিনী'র প্রতি পত্রেতে প্রতীত,
ভাষার উন্নতি চেষ্টা ছিল নিরন্তর।

ঊ—এতে উমেশচন্দ্র বটব্যালোপাধি,
বৈদিক সাহিত্যজ্ঞানে জোড়া নাহি যাঁর,
অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, ধী,

ঋ—এ পুণ্যস্মৃতি ঋষি শ্রীরামমোহন,
ভারতের নবযুগ-প্রবর্ত্তয়িতা;
'বাঙ্গালা গদ্যের পিতা' করিলা সৃজন
সরল তর্কের ভাষা যুক্তিসমন্বিতা।

এ—এতে এণ্টনী কবি, ফিরিঙ্গী প্রথিত,
হইলা হিন্দুর ধর্ম্মে ভক্তিপরায়ণ,
গাহিলা মায়ের গান ভক্তি-রসাশ্রিত,
ধন্য হ'ল শুনি তাহা গৌড়বাসিগণ।

ঐ—তরেয় ব্রাহ্মণের সুন্দর ব্যাখ্যাকার
ত্রিবেদজ্ঞ সুব্রাহ্মণ রামেন্দ্রসুন্দর,
বিজ্ঞান দর্শনে যাঁর তুল্য অধিকার—

ও—এ ওঝা কৃত্তিবাস, 'কীর্ত্তির বসতি'
রচিলেন বাঙ্গালায় যিনি পদ্যাকরে
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, করিয়া প্রণতি
লক্ষ লক্ষ হিন্দু আজো পড়ে ভক্তি-ভরে।

ঔ—ঔষধ-বিধানদাতা বৈদ্য বংশ জাত
সুকবি ঈশ্বর গুপ্ত, যশঃপ্রভা যাঁর
প্রভাকর-দ্যুতি-সম, বঙ্গে সুবিখ্যাত
অনুপ্রাসে অদ্বিতীয় রসের আধার।

ক—এ কালী সিংহ নাম, সাহিত্যের চাঁদ,
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করি অকাতরে
বিতরিলা সুধীমাঝে ভারতানুবাদ,
'হুতোমে' শাসিলা ভণ্ডে তীব্র ব্যঙ্গভরে।

খ—এ খেতু বন্দ্যো, খ্যাত নাম ক্ষেত্রনাথে,
সমস্ত জীবন ভরি' করিয়া সাধনা,
সাহিত্যের মন্দিরেতে এল লয়ে সাথে
'অন্তরের কথা' আহা, ভুলে কোন্ জনা?

গ—এতে গিরিশচন্দ্র কবি নাট্যকার,
শতাধিক নাট্যকাব্য লিখিলা হেলায়,
একাধারে বাঙ্গালায় গ্যারিক সেক্সপীয়ার
চরিত্রের বিশ্লেষণে অতুল ধরায়।

ঘ—এ ঘনরাম কবি গৌড়বাসিগণে
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান করা'ল শ্রবণ,
'সত্যনারায়ণ কথা' রচিলা যতনে,
ধর্ম্ম-কীর্ত্তনের মাঝে ত্যজিলা জীবন।

ঙ—তে স্মরণপথে হয় সমুদিত
রেভারেণ্ড লং নাম ভারতের মিত্র,
'নীলদরপণ' ইঙ্গে করি' প্রচারিত,
সংগ্রহ করিলা কত প্রবাদ বিচিত্র।

চ—এ চন্দ্রনাথ বসু, প্রতিভা আভাস,
সূক্ষ্ম সমালোচনায় ক্ষমতা সুন্দর,
'শকুন্তলা-তত্ত্ব' আদি গ্রন্থেতে প্রকাশ,
পৃথিবীর সুখ-দুঃখ লভিলা বিস্তর।

ছ—এ 'ছাতুবাবু', আশুতোষ নামে প্রীত
সঙ্গীতের অনুরাগী, গুণীর পালক,
অসংখ্য সঙ্গীত যাঁর আজো হয়ে গীত
গৌড়জন-হৃদিমাঝে সঞ্চারে পুলক।

জ—এ জগদিন্দ্রনাথ নাটোরাধিপতি,
'নূরজাহান'-চিত্রকর 'সন্ধ্যাতারা'-কবি,
মণিমুক্তা-খচা ভাষা, অতুলনা গতি,
বাঙ্গালার অভিজাত-গৌরব-রবি।

ঝ—এ 'ঝাঁসীর রাণী' আদি গ্রন্থ-রচয়িতা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাম কীর্ত্তিতে অতুল,
সাহিত্যের সেবা ছিল জীবনের গীতা,

ঞ—তে সুবিজ্ঞ (মি) ঞা মশারফ হোসেন,
করুণ 'বিষাদ সিন্ধু' রচিলেন যিনি,
পাঠ করি' কাঁদে সবে, কি হিন্দু মস্লেম্—
ধন্য সে লেখনী তাঁর ক্ষমতাশালিনী।

ট—এ টেকচাঁদ যেই ছদ্মবেশে আসি'
বাণীর কমল বনে, ভাষা-জননীরে,
(উন্মোচিয়া সংস্কৃতের অলঙ্কাররাশি)
সুরভি কুসুম দিয়ে সাজাইল ধীরে।

ঠ—এতে ঠাকুরদাস, 'নালক' লেখক,
সাময়িক পত্রে যাঁর সরস রচনা
নন্দিত করিত বঙ্গে, বিজ্ঞ সম্পাদক,
করিলা জটিল কত তত্ত্ব আলোচনা।

ড-এ ঢ—এ পড়ে মনে সেই গড়াগড়
সৃষ্টি করিলেন যিনি 'স্বর্ণলতা'-মাঝে
গাঙ্গুলী তারকনাথ, কীর্ত্তিতে অমর
আজিও করুণসুর হৃদয়েতে বাজে।

ণ—এতে নবীনচন্দ্র-স্মৃতি বহি' আনে,
'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাসের' কবি
উদ্দাম আবেগ যাঁর মাত্রা নাহি মানে,
সুদক্ষ লেখনী তব, চট্টলের রবি।

ত—এ তারানাথ যেবা লভিলা সম্মান
ত বাচস্পতি নামে, সুপণ্ডিত অতি,
রচিলেন অতুলন যেই অভিধান
ঘোষিবে সে চিরদিন তাঁহার কীরতি।

থ—এতে সংযুক্ত থাক কথক শ্রীধর
প্রচারিয়া ধর্ম্মকথা এই বঙ্গদেশে,
অর্জ্জিলা অক্ষয় যশঃ কত নারী-নর
কাঁদাইয়া, সুখে স্বর্গে গেলা অবশেষে।

দ—এ দীনবন্ধু মিত্র, 'নাটকের পিতা'
'দর্পণে' ভাসা'ল বঙ্গে অশ্রুর প্লাবনে,
আবার হাসাল রঙ্গে লেখনী অজিতা
কতই রহস্যপূর্ণ নাট্য প্রহসনে।

ধ—এতে ধীরাজ কবি, করি বরিষণ
কত রসপূর্ণ গান হাসাইল বঙ্গে,
আজো তার সুর যেন পশিয়া শ্রবণ,
নীরস বাঙ্গালী-প্রাণ ভরিতেছে রঙ্গে।

ন—এতে নরেন্দ্র দত্ত, বিখ্যাত জগতে
'বিবেক-আনন্দ' নামে ভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী,
প্রচারিতে সেবাধর্ম্ম জন্মিলা মরতে,
জ্ঞানরত্নখনি তাঁর উপদেশবাণী।

প—এ পূর্ণচন্দ্র চট্টো,—স্বনাম-প্রথিত
বঙ্কিমের সহোদর, লেখক নিপুণ,
'শৈশব-সহচরী' তাঁহারি রচিত,

ফ—এতে ফকিরচাঁদ চট্টগ্রামবাসী
রচেছিলা বহুযত্নে গীতি মনসার,
মায়ের মন্দিরে পুনঃ দেখা দিল আসি,
সত্যপীর পাঁচালীর খ্যাত কাব্যকার।

ব—এতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট,
লভিলা অক্ষয় যশঃ বলে প্রতিভার,
কি মধুর ভাষা, কিবা কল্পনা বিরাট,
'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র করিলা প্রচার।

ভ—এতে ভূদেব, চিন্তাপ্রসূত যাঁহার
অসংখ্য প্রবন্ধাবলী লভিলা সম্মান,
বাঙ্গালার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
জাতীয় শিক্ষার তরে করিলেন দান।

ম—এতে মাইকেল মধু, তুলনা-রহিত
অমিতাক্ষরের ছন্দ কৈলা প্রবর্ত্তন,
চতুর্দ্দশপদী আদি রচনা-অমৃত
আনন্দে করিছে পান আজো গৌড়জন।

য—এতে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যার ভূষণ
আত্মত্যাগী বীরচিত্র আঁকিলা যতনে,
প্রচার করিলা বঙ্গে 'আর্য্য-দর্শন'
ওজস্বিনী ভাষা তাঁর রহিবে স্মরণে।

র—এতে রমেশ দত্ত ভারত-গৌরব,
ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ করিলা প্রচার,
উপন্যাস ইতিহাস আদি কত কব
রচি' গ্রন্থ মাতৃপদে দিলা উপহার।

ল—এ লোহারাম সুধী, শিরোরত্নোপাধি,
রচিলেন ব্যাকরণ ভাষাশিক্ষাতরে,
সেবিলেন মাতৃভাষা সযতনে সাধি'
'মালতী-মাধব' গ্রন্থ অনুবাদ পরে।

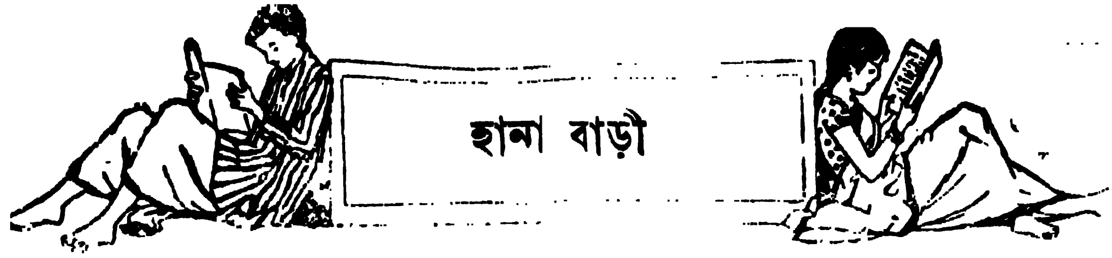
ব—এতে বিহারীলাল, রচনা ললিত,
গীতিকাব্য ইতিহাসে অন্তঃস্থের মত
প্রাচীন ও নবযুগ মাঝে বিরাজিত,
'সারদার' প্রিয় কবি সুসাহিত্যে ব্রত।

শ—এতে শিশির ঘোষ, বৈষ্ণব-প্রধান,
রচিলেন ভক্তিভরে 'নিমাই-চরিত',
আনন্দময়ীর তিনি সুযোগ্য সন্তান,
দেশমাঝে নাম তাঁর মরণ অতীত।

ষ—এ ষষ্ঠীবর কবি, সাধু ধর্ম্মপ্রাণ,
আদিকবি বাল্মীকিরে করিয়া স্মরণ
রচিলেন বাঙ্গালায় রামায়ণ গান,
কৃত্তিবাস মত তাঁরো নাহিক মরণ।

স—এতে সঞ্জীবচন্দ্র স্মৃতি-পথে আসে,
করিলা সম্পদবৃদ্ধি ভাষা জননীর—
'মাধবী' ও 'কণ্ঠমালা' আদি উপন্যাসে
'জাল প্রতাপের' দুখে চোখে আসে নীর।

হ—এ হেমচন্দ্র যাঁর 'ভারত-সঙ্গীতে',
সুপ্ত-বঙ্গ-হৃদি-মাঝে জাগিল চেতনা,
'বৃত্র-সংহারের' কবি স্বরগীয় গীতে
'দশমহাবিদ্যা'-কথা গাহিল যে জনা।



হানা বাড়ী

৪৭

বাড়ী ফিরিয়া পিসীমাকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক জানাইলাম এবং আমাদের অনুসন্ধানের ফলে যে কয়টা সূত্র পাইয়া আমরা যমুনা ও কান্ সাহেবকে এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম, সেগুলা সবই যে আমাদিগকে ভুল সিদ্ধান্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।

সব শুনিয়া পিসীমা বলিলেন, "তা হ'লে এখন উপায় ?"

আমি বলিলাম,"নতুন উপায় মিলবে কি না, জানি না ; কিন্তু যমুনার সম্বন্ধে আমার সন্দেহটা যেমন সম্পূর্ণ মিটে গেছে, কান্ সাহেবের সম্বন্ধে ঠিক তেমন হচ্ছে না।"

"কেন বল দেখি ?"

"কেন যে, তা ঠিক বলতে পারি না। তার সাফাই সাক্ষীগুলার বিরুদ্ধে কিছু যে বলবার আছে, তা ত মনে হয় না ; অথচ সে যে এ বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত, এ বিশ্বাসটাও মনে স্থান পাচ্ছে না।—উইলসনের সামান্য একটু ইতস্তত-ভাব—ডাক্তারের কানের উপর স্পষ্ট একটু বিরক্তি—হয় ত এইগুলাতেই আমার মনে একটু খট্‌কা বেধেছে।"

"ডাক্তার বোধ হয় কানের উপর তত সন্তুষ্ট নয়। হয় ত সে তার বিরুদ্ধে কিছু জানে।"

"কি জানি। হ'তেও পারে। ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আলাপটা জমিয়ে নিলে মন্দ হয় না !"

"ঠিক বলেছ। আপাততঃ তাই ক'রে দেখ, কি হয়।"

দুই এক দিন পরেই ঘটনাক্রমে ডাক্তারের সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয়ও পাইলাম। সে দিন কোর্টে একটা মারপিটের আসামীর কিছু পাগলামীর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, সরকারী ডাক্তারের দ্বারা তাহার পরীক্ষার হুকুম হইল। সেই প্রসঙ্গে এক জন প্রবীণ উকীলের মুখে ডাক্তার ভাদুড়ীর নামোল্লেখ শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ডাক্তার মহাশয় মস্তিষ্কের ব্যাধি সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। বিষয়ে অনেক দিন চর্চা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল, শুঁড়ায় তাঁহার নিজের বাড়ীর সংলগ্ন একটা বিস্তীর্ণ ভূমিতে মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য একটা আশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতি আধুনিক মতে সম্পূর্ণ কঠোরতা-বর্জ্জিত। অবস্থানুসারে রোগীদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া ও তাহাদের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করা এই পদ্ধতির বিশেষত্ব। তিনি নিজেও না কি স্নেহশীল ও চরিত্রবান্ লোক।

এই সকল পরিচয় পাইয়া ডাক্তারকে প্রথম দেখিয়াই তাঁহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন নহে জানিয়া সুখী হইলাম এবং তাঁহার সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর করিবার ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে সেই দিনেই কোর্টের ফেরত একেবারে শুঁড়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ডাক্তারের আশ্রম খুঁজিয়া লইতে কোন অসুবিধাও হইল না, কারণ, সে অঞ্চলে প্রায় সকলেরই তাহা বেশ সুপরিচিত দেখিলাম। স্থানটা শুঁড়ার বাহিরে পল্লীগ্রামের মধ্যে প্রাচীর-ঘেরা এক বিস্তীর্ণ বাগান-বাড়ী।

সেখানে পৌছিয়া দেখিলাম, ফটকের দ্বার বন্ধ এবং দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আজ এখানে আসা বৃথাই হইয়াছে, কেন না, ডাক্তার ঠিক আগের দিন দার্জ্জিলিং গিয়াছেন এবং বোধ হয়, ৭ দিনের পূর্ব্বে ফিরিবেন না। তখন অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

শনিবার বৈকালে যোগীন বাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহারা সকলেই শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন, পরদিন রবিবার তাঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য আমাকে ও পিসীমাকে তিনি আমন্ত্রণ করিলেন। পরে আমি যখন তাঁহাকে জানাইলাম যে, এখানকার কয় দিনের অনুসন্ধানের ফল আমাদের সকল সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হইয়াছে, তখন তিনি আপাততঃ

আহারাদির পর সকলে একত্র সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটু ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গোঁসাইজী ও নিতাইয়ের সন্ধান লইবার অভিপ্রায়ে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীওয়ালার নিকট গিয়া জানিলাম যে, সম্প্রতি ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজী বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া এখন দেশে গিয়াছেন এবং সেখান হইতে না কি বাকী জীবনটা বৃন্দাবনবাস করিতে যাইবেন। গোঁসাইজীর অপর ভাড়াটেরাও চলিয়া গিয়াছে, কেবল এক জনমাত্র সপরিবারে তাঁহার ঘরটা আপাততঃ দখল করিয়া আছে এবং পরে সমস্ত বাড়ীটা সে ইজারা লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

৪৮

রবিবারে যোগীন বাবুর বাড়ীতে সকলের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হইলে কাকীর আহ্বানে আমরা তাঁহার শয়নকক্ষে একখানা খাটের ধারে মেঝেয় পাতা একটা বিছানায় গিয়া বসিলাম। 'আমরা' মানে—সস্ত্রীক যোগীন বাবু এবং পিসীমা ও আমি। কাকলী এ দলের মধ্যে ছিল না। তবে পিসীমা ও কাকী যে দিকে বসিয়াছিলেন, সেই দিকে, তাঁহাদের পশ্চাতে, খাটের অন্তরালে, কাহার যেন খোঁপার উপরে স্থাপিত একটা সোনার প্রজাপতি এক একবার আমার দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল মাত্র।

যাহা হউক, যোগীন বাবুর অনুরোধে আমি বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানবিষয়ে যাহা কিছু করিয়াছিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিলাম এবং ঘোষ-পত্নীর নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে এখন যে আমার আর কোনও সংশয় নাই, তাহাও জানাইলাম। অবশেষে কান্‌সাহেব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যে এখনও সম্পূর্ণ মিটে নাই, তাহার কি কারণ, তাহাও বলিলাম।

আমার কথা শেষ হইলে দেখিলাম, সেই সোনার প্রজাপতিটা একটু নড়িয়া উঠিল এবং কাকী সেই দিকে কিছুক্ষণ মাথা হেলাইয়া পরে আমাকে বলিলেন, "কান্‌সাহেব সে রাত্রে ঠিক কোন্ সময়ে ডাক্তার ভাদুড়ীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তা কি তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

"না, তা করি নি বটে, কিন্তু—"

"কান্‌সাহেব যে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী থেকে চ'লে এসে তার পরে ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়েছিলেন, তা কি হ'তে পারে না?"

"তা হ'লে সাহেব আর তার সঙ্গিনী যখন কানাই মল্লিক লেনের বাড়ী থেকে চ'লে আসে, তখন রাত ৯টার বেশী হয় নি, অথচ খুনটা রাত ১২টার আগে হয় নি, তা মনে রাখবেন।"

আবার প্রজাপতি নড়া, কাকীর এবং পিসীমারও মাথা হেলানো এবং আমার দৃষ্টির বহির্ভূত কোন লোকের সহিত অতি মৃদুস্বরে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ হইল। বস্তুতঃ সে দিনের কথাবার্ত্তার মধ্যে এইরূপ ব্যাপারটা এত অধিকবার হইয়াছিল, ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। এইটুকু বলিয়া রাখিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, সে দিন আমার সহিত প্রবীণাদ্বয়ের কথাবার্ত্তার অধিকাংশ এইরূপেই পরিচালিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, কাকী বলিলেন, "কিন্তু কান্‌সাহেব কিংবা যমুনা যে খুনের সঙ্গে লিপ্ত নয়, এ কথা বুড়ীর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কান্‌সাহেবের সম্বন্ধে তোমার নিজেরই এখনও সম্পূর্ণ সন্দেহ যায় নি বলছ; অথচ যমুনা যে লিপ্ত নয়, সেটা তুমি পুরা বিশ্বাস করতে পারলে কি ক'রে?"

"কেন? সে যে প্রমাণগুলা দেখিয়েছে, তাতে ত সংশয় কিছু থাকতে পারে না যে, শুধু খুনের রাত্রিতে কেন, অন্য কোন সময়েই সে কানাই মল্লিক লেনের বাড়ীতে যায় নি। নিতাইয়ের 'নার্স-মেম' আর যমুনা যে একই লোক নয়, তা নিতাইয়ের দ্বারা যে রকম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়েছে, তাতে আমি ত সন্দেহ করবার কোন কারণই পাই নি।"

"তা হ'লেও যমুনা নিজে তফাতে থেকে কান্‌সাহেবকে এই কাযে লাগিয়েছিল, তা ত হ'তে পারে?"

"কিন্তু কান্ সাহেব যে অন্ততঃ খুনের সময়ে ও অঞ্চলে উপস্থিত ছিল না, সে প্রমাণও ত পাওয়া গেছে?"

"তাতে কেবল এইটুকুমাত্র বলা যেতে পারে যে, কান্ নিজের হাতে খুন করে নি। কিন্তু সে এ কাযের জন্য অপর লোকও ত লাগিয়ে থাকতে পারে?"

"আমার ত তা মনে হয় না। বাইরের কোন লোক যদি ও কায ক'রে থাকে ত সে শুধু ওদের কথার খাতিরে করে নি; নিশ্চয়ই পয়সা নিয়ে করেছে। যে লোক পয়সার

জন্ত খুন করতে পারে, সে কখনই হত ব্যক্তির ঘড়ী, চেন, আংটী ও নগদ টাকাগুলো ছেড়ে যায় না।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "তা হ'লে তোমার মতে হয় ওরা নিজে খুন করেছে, নয় ওরা এতে মোটেই লিপ্ত নয়? তবে যমুনাকেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বিশ্বাস করছ, আর কানুকে তা করছ না কেন?"

"কারণ, কানুকে নিতাইয়ের সামনে হাজির করা গেল না ব'লে এখনও জানা যাচ্ছে না যে, কানু ও বাড়ীতে কখনও যায় নি। যদি নিতাইয়ের 'চীনা-সাহেব' আর কানু একই লোক হয় ত, কানের পক্ষে শুঁড়া থেকে রাত ১১টা নাগাত হানা বাড়ীতে এসে খুন ক'রে আবার শুঁড়াতে ফিরে যাওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নয়। কানের উপর ডাক্তারের বিরক্তির ঠিক কারণ না জানতে পারলে, নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।"

কাকী বলিলেন, "বুড়ী বলছে যে, কানুকে যদি খুনের সন্দেহ থেকে অব্যাহতি দেওয়া না যায়, তাহা হ'লে যমুনাকে অন্ততঃ তার যোগাযোগ সম্বন্ধেও ত অব্যাহতি দেওয়া যায় না? কারণ, হয় যমুনারই কথায়, নয় তার সঙ্গে ষড় ক'রে কানু এ কায ক'রে থাকতে পারে।"

"তর্ক হিসাবে তা হ'তে পারে; কিন্তু আমি যমুনার কথায় ও আচরণে যতটুকু বুঝেছি, তাতে ত আমার ও সন্দেহ হয় না।—তা ছাড়া ঘোষজা মশায়ের মৃত্যুতে যমুনার এত বেশী লাভই বা কি হয়েছে, যার জন্তে তাঁকে হত্যা করানও তার দরকার হয়েছিল?"

"তা ইনসিওরেন্সের অমন মোটা টাকাটা হাসিল ক'রে নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে থাকাটা যমুনার মত লোকের কি কম লাভ? বুড়ীর মতে ঐ টাকা পাবার আগ্রহ তার যে খুব বেশী ছিল, তা খুনের পর থেকে ওর কার্য্যকলাপ থেকেই ত বেশ বুঝা যায়। প্রথম কাযটাই দেখ না কেন? ঘোষজা মশায় নাম বদলে কলকাতার একটা অজানা যায়গায় মারা গেলেন—আর যমুনা দুদিন বাদেই ইনসিওরেন্সের টাকা আদায়ের জন্তে উঠে প'ড়ে লেগে গেল! তা ও মাগী যদি খুনের কোন সম্পর্কেই না থাকত ত বর্দ্ধমানে ব'সে জানলে কি ক'রে যে, মৃত ব্যক্তিই ওর স্বামী?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "কেন? আপনারা বিবরণ খবরের কাগজে ছাপানও হয়েছিল? পাড়ার সকলে তাঁকে কুঞ্জবিহারী নন্দন নামে জানত—তাঁর গোঁফ-দাড়ী কামান, গালে একটা লম্বা ক্ষতের দাগ, বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের দুটা পাব নাই,—এ সবই ত ছাপানো—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রজাপতিটা খুব বেশী রকম নড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাকীর ইঙ্গিতে আমি চুপ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অতিশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের দু'টা পাব ছিল না, এ কথা ত কৈ আমরা আগে শুনেছি ব'লে মনে হয় না।"

"সে কি? আপনারা খবরের কাগজে ছাপানো বিজ্ঞাপনটা কি পড়েননি?"

"না, তাও পড়িনি, আর বোধ হয়, তোমার কাছেও এর আগে ও কথা শুনিনি। তা কাগজে ছাপানো ও বিবরণটা ত তা হ'লে ঠিক হয়নি! কেন না, ঘোষজা মশায়ের ত হাতের সব আঙ্গুলই সম্পূর্ণ ছিল। কোন আঙ্গুলের একটি পাবও নষ্ট হয়নি।"

"বলেন কি? আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের দুটা পাব ছিল না।"

আবার প্রজাপতির দ্রুত আন্দোলন হইল এবং কাকী এবারে কিছু বেশীক্ষণ জনান্তিকে গোপনে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে ত আমাদের সকলেরই গোড়া থেকে সব ভুল হয়েছে দেখছি। যে লোকটি হানা বাড়ীতে খুন হয়েছে, সে তা হ'লে মোটেই আমাদের ঘোষজা মশায় নয়!"

এই কথা শুনিয়া আমি যেন হতবুদ্ধির ন্যায় কিছুক্ষণ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট তিন জনের দিকে স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলাম। পরে তাঁহারাও একে একে খাটের অন্তরালে সেই দোদুল্যমান প্রজাপতির দিকে উঠিয়া গিয়া সেইখানে একটা রীতিমত মন্ত্রণা-সভা বসাইয়া দিলেন।

৪৯

তাঁহারা ৩ জনে আবার যথাস্থানে আসিয়া বসিবার পর যোগীন বাবু বলিলেন, "দেখ অরুণ, কথাটা বাস্তবিকই বড় গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে লোকটা খুন হয়েছে, সে তা

স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে বসেছে যে, তার বাপ মারা যাননি,—এখনও বেঁচে আছেন।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও এ সিদ্ধান্তটা নির্ব্বিবাদে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "কিন্তু সেন সাহেব তাঁর মেয়েকে নিয়ে যখন গাঙ্গুলী মশায়ের আফিসে এসেছিলেন, তখন হত ব্যক্তির কড়ে আঙ্গুলের দুটো পাবের অভাব সম্বন্ধে যমুনা ত এ রকম কোন কথা বলেননি, কিছুমাত্র বিস্ময়ও প্রকাশ করেননি! বরং বলেছিলেন যে, শিকার করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে ঘোষজা মশায় নিজেই আহত হয়েছিলেন; আর তারই ফলে ঐ আঙ্গুলের পাব দুটো যায়, গালেও মস্ত একটা ক্ষত হয়।"

কাকী বলিলেন, "সে তা হ'লে সম্পূর্ণ মিছে কথা বলেছিল। শিকারে গিয়ে যে দুর্ঘটনা হয়, তাতে তাঁর গালেই মস্ত বড় একটা ক্ষত হয়েছিল বটে, কিন্তু হাতে বা আঙ্গুলে অন্য কোথাও কোন আঘাতই লাগেনি।"

"সে বারে না হোক, অন্য বারে ত হয়ে থাকতে পারে?"

"না, না, একে ত শিকারে তাঁর কোন কালেই সখ বা ঝোঁক ছিল না, তাতে সে বারে ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁর বন্দুক ব্যবহার করতেই ভয় হয়ে গিয়েছিল। বুড়ী যত দিন তাঁর কাছে ছিল, তার মধ্যে তিনি আর কখনই বন্দুক ছোড়েননি, কোন শিকারেও যাননি।"

"কিন্তু, তার পরেও ত হয়ে থাকতে পারে?"

"তাও সম্ভব নয়। কারণ, ইদানীং তাঁর মন ভাল ছিল না, মাথাও ক্রমে খুব খারাপ হয়েছিল। আমরা যখন বুড়ীকে বর্ম্মায় নিয়ে যাই, তখন তাঁর মন ও মাথার যে রকম অবস্থা ছিল, তাতে শিকার করার ইচ্ছা তাঁর হতেই পারে না। তবে ঐ মাগী যদি নিজে কখনও তাঁর আঙ্গুলের পাব দুটা কেটে দিয়ে থাকে ত সে অন্য কথা। —কিন্তু মাগী যখন বলেছে যে, ঐ দুটা দুর্ঘটনাই এক সময়ে হয়েছে, তখন তুমি আবার তোমার এ সব নিজের অনুমানগুলা তার মধ্যে টেনে আনছো কেন, বাপু? ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে, ঘোষজা মহাশয়ের কোন আঙ্গুলের কখনও কিছু হানি হয়নি। মাগী শুধু ঐ ইনসিওরেন্সের টাকা হাতাবার জন্যেই যে এই ভীষণ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

"কি কাণ্ড?"

"বুঝতে পাচ্ছ না? ও মাগী কানের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে একটা রুগ্ন মাতালকে ঐ হানা বাড়ীতে পুষেছিল, তার পর তাকে খুন করে; সে-ই যে মাগীর স্বামী, তাই কোন রকমে সাব্যস্ত করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছে!"

"খুন করতেই বা গেল কেন?"

"বোধ হয়, লোকটা যত শীঘ্র মরবে ব'লে আশা করেছিল, সে তত শীঘ্র মরছিল না, তাই।"

"কিন্তু লোকটা খুন হবার পরে পুলিস-দারোগা তার যে ফটো তুলিয়েছিল, তার সঙ্গে ঘোষজা মশায়ের ফটোরও সম্পূর্ণ মিল হলো কি ক'রে?"

"লোকটার মুখের সঙ্গে হয় ত ঘোষজা মশায়ের মুখের কতকটা মিল ছিল;—আর তাই দেখেই হয় ত ওরা সে লোকটাকে পরে বিহারী ঘোষ ব'লে দাঁড় করাবার মতলবে রেখেছিল। কিন্তু ঘোষজা মশায়ের যে ফটোখানা ওরা তোমায় দেখিয়েছিল, তাতে তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলা সব ছিল কি না, তা কি তুমি লক্ষ্য কর নি?"

"সে ছবিতে তাঁর দেহের শুধু উপরের দিকটুকু ছিল; হাতেরও তাই। আমরা দুটা ছবির মুখের সাদৃশ্য দেখেই ঠিক করেছিলাম যে, দুটাই একই লোকের ছবি। গালে ক্ষতের দাগ দুটাতে ঠিক একই রকম বোধ হয়েছিল।"

"ছবিতে মুখের যতই মিল থাক, সে দুটা যে দুজন বিভিন্ন লোকের, তা এখন বেশ বুঝা যাচ্ছে।"

"কিন্তু ওরা যদি এক জন অপর লোককেই হানা বাড়ীতে পুষে থাকে ত তাকে ঘোষজা মশায়ের নামেই পরিচিত না ক'রে একটা আলাদা নাম দিলে কেন, তা ত বোঝা যাচ্ছে না? তাতে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত বৈ সুবিধা হবার ত সম্ভাবনা ছিল না?"

"ঘোষজা মশায় বেঁচে আছেন বলেই ওরা তাঁর নাম দিয়ে ও লোকটাকে পরিচিত করতে সাহস করেনি। আসল নাম দিলে পাছে তিনি কিংবা আমরা কোন গতিকে কোন খবর পেলে ওদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভয়ে বোধ হয় ঐ রকম নাম দিয়েছিল। বুড়ী ত তাই আরও নিশ্চিতভাবে বলছে যে, ঘোষজা মশায় বেঁচে আছেন।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আর যমুনা তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় নাম-বদলের কৌশলটা যেমনভাবে বুঝিয়েছিলেন, তা থেকে এখন বেশ বুঝা যায় যে, ওরা ঐ নামটা বেশ ভেবে চিন্তেই ঠিক করেছিল, যাতে ভবিষ্যতে ঐ নাম থেকেও ওরা কতকটা সপ্রমাণ করতে পারে যে, ঐ লোকটাই বিহারী ঘোষ।"

যুক্তিগুলা সবই অখণ্ডনীয় না হইলেও, আমার বিবেচনায় যথেষ্ট সমীচীন বলিয়াই বোধ হইল এবং সেই যুক্তি অনুসারে ঘোষজা মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, কাকীর এই সিদ্ধান্ত যতই বিস্ময়জনক হউক, একেবারে যে অগ্রাহ্য নয়, তাহা আমাকে স্বীকার করিতে হইল।

তখন এই বিষয়ে আরও অনেকক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল, ডাক্তার ভাদুড়ী দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিলেই তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া কান্ সাহেব সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য সংগ্রহ করা যায় কি না, এবং আগামী বৃহস্পতিবারে কোর্টের ছুটী থাকায় সেই দিন সকালে আমি যোগীন বাবুর সহিত ওঁড়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া সভাভঙ্গ করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাকিয়া ও মাসোলিনি

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, বর্ত্তমানে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয় জন. জীবিত মানুষের নাম উল্লেখযোগ্য, তাহা হইলে অসঙ্কোচে বলা যায়, আপাততঃ সাত জন মহামানবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা,—মহাত্মা গন্ধী, সিনর মাসোলিনি, জেনারল প্রাইমো ডি রিভেরা, জেনারল চাঙ্গ কাইসেক, মুসিয়ে বোরোডিন, গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা ও মহম্মদ রেজা খাঁ পহ্লবী। যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব মনুষ্যলোকের উপর বিস্তার করেন, যাঁহাদিগকে ইমার্সন Representative men এবং কার্লাইল Hero আখ্যা দিয়াছেন, তাঁহারাই মহামানব। ইঁহারা জগতের গতানুগতিক জীবনে নূতন ভাবধারা আনয়ন করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রভাবে মানবের জগৎ নূতন কলেবর ধারণ করিয়া থাকে। এই প্রভাব যে কেবল মঙ্গলের দিকেই বিসর্পিত হয়, এমন কথা নাই। প্রাচীনকালে চঙ্গিস খাঁ, অত্তিলা বা তাইমুর মহামানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বহুদূর-বিসারী হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা মানবের শত্রু বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহারা আধুনিক যুগের নেপোলিয়ানের মত মহামানব।



মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা গন্ধীর ন্যায় মহামানব ঠিক ইহার বিপরীত। ইঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশ্ববাসীর সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনই ইঁহাদের ব্রত। জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহারা জীবের কল্যাণ-কল্পে—বহুর মঙ্গলোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মহামানব সকল দেশে সকল সময়ে আবির্ভূত হয়েন না।

মহাত্মা গন্ধীর মত মহামানবের আবির্ভাব জগতে সুলভ নহে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্যবশে তিনি প্রাচীর পুণ্যক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিনব বাণী প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাবাণী সমুদ্রমেখলা ভারতবর্ষের তপোবন হইতে সমুচ্চারিত হইয়া আজ সমগ্র সভ্যজগতে প্রচারিত হইয়াছে। বিশ্ববীণার তারে মন্ত্রশক্তিপূর্ণ বিচিত্রবাণীর ঝঙ্কার তুলিয়া গন্ধী জগতে অভিনব ভাব-বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। সেই প্লাবন-প্রবাহ—পুণ্যস্রোতোধারার গতিরোধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। গুহামুখনির্গত জাহ্নবীপ্রবাহ যখন বিপুল উচ্ছ্বাসে গ্রাম, প্রান্তর প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে অভিযান করিয়াছিল, প্রবল শক্তিশালী ঐরাবত বাধা সৃষ্টি করিতে গিয়া তখন তৃণবৎ সেই স্রোতোবেগে ভাসিয়া গিয়াছিল; তাঁহার প্রভাব বন্দুক-বেয়নেটের বাধা ভাসাইয়া দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানবের মনোরাজ্যে বিস্তারলাভ করিবে সন্দেহ নাই। মানব সেই ভাব-প্রবাহে স্নাত প্লাবিত হইয়া ধন্য হইবে।

মহাত্মা গন্ধী ব্যতীত এই প্রবন্ধে অন্য যে কয় জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারাও অল্প-বিস্তর মহামানব বলিয়া লোক-বিশ্রুত। কামাল পাশা ও রেজা খাঁ তাঁহাদের জন্মভূমিতে নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছেন, আপনাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তুর্কী ও পারস্য দেশে অভাবনীয় অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছেন, এক কথায় তুর্ক ও পারসীক জাতিকে চালিয়া সাজিয়াছেন। জেনারল চাঙ্গ কাইসেক মহাচীনের কুওমিণ্টাঙ্গ অথবা জাতীয় দলের দলপতিরূপে গভীর নিদ্রামগ্ন চীন-কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করিয়াছেন, তাহাদের প্রাণে একটা নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছেন। অবশ্য, এ বিষয়ে তাঁহার গুরু ডাক্তার সান-ইয়াটসেনই অগ্রণী, তবে তিনি জীবনের ব্রত সাফল্যমণ্ডিত করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য তাঁহার মন্ত্রশিষ্য চাঙ্গ কাইসেক সম্পূর্ণ করিতেছেন। এ বিষয়ে বোরোডিন তাঁহার



কামাল পাশা



রেজা খাঁ পহলবী

দক্ষিণ হস্ত। এই রাসিয়ান দূতের প্রচার-কার্য্য চীনের জাগরণের যে সহায়তা করিয়াছে, তাহা ইতিহাসে চিরদিন লিখিত থাকিবে। বস্তুতঃ তিনি প্রচার-কার্য্যের দ্বারা চীনের 'মরা গাঙ্গে বান' ডাকাইয়াছেন, চীনের গতানুগতিক পরনির্ভরশীল জীবনে নবজীবনের প্রেরণা আনয়ন করিয়াছেন। এই হেতু চাঙ্গ কাইসেকের সহিত তাঁহার নামও মহামানবের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য। জেনারল প্রাইমো ডি রিভেরা স্পেনদেশের নিয়ামক। তিনি একাধারে স্পেনের শাসনতরীর কর্ণধার, সমর-বিভাগের কর্ত্তা এবং সেনাপতি। তিনি স্বজাতির মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে ভাবে বিস্তৃত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার অসহনীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্পেনে একাধিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের শক্তি হইতে স্পেন মুক্ত হইতে পারে নাই।

দুর্ব্বল, অবনত স্পেন তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার আমলে স্পেন পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়া না পাইলেও প্রতীচ্যের স্বাধীন জাতিদিগের মধ্যে সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাসোলিনি

রিভেরা হইতেও আর এক জন বিশিষ্ট মানব বর্ত্তমানে নব্য ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছেন, তাঁহার নাম মাসোলিনি। ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডী যে অবধি পরাধীন বিচ্ছিন্ন ইটালীকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া একতা ও জাতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন, তদবধি ইটালী ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মাসোলিনির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইটালী জগতে প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে পরিগণিত হইত না। জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে ইটালীর জার্ম্মাণপক্ষেই যোগদান করিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে ইটালী মিত্রপক্ষে থাকিয়া জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ানের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। সে সময়ে টাইরল ও কারসো উপত্যকায় ম্যাকেনসনের 'হাতুড়ির ঘায়ে' ইটালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে জার্ম্মাণপক্ষের পরাজয়ের ফলে ইটালী রণজয়ের অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হয় নাই। তদবধি ইটালীর অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে অভ্যুদয়। সে অভ্যুদয়ের মূলে ছিলেন সিনর মাসোলিনি।

এক সময়ে জয়োন্মত্ত ইটালী সোভিয়েট-কমিউনিষ্ট-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময় মাসোলিনির ফ্যাসিষ্টদলের উদ্ভব হয়। এই ফ্যাসিষ্টদলের সাহায্যে মাসোলিনি ইটালী হইতে কমিউনিজম দলন করেন এবং ক্রমশঃ সমস্ত শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। ইটালীর রাজা নামে রাজা থাকিলেও মাসোলিনিই এখন ইটালীর ভাগ্যবিধাতা। তিনি ইটালীর জন্য a space under the sun অন্বেষণে সদাই ব্যগ্র। কিসে ইটালী আবার প্রাচীন রোমক সম্রাট সীজরগণের গৌরবমণ্ডিত ইটালীতে পরিণত হয়, মাসোলিনির তাহাই ধ্যানজ্ঞান—স্বপ্ন। এ জন্য মাসোলিনি এক সময়ে জাতিসঙ্ঘকে ধমক দিয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং গ্রীসকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর নৌবহরকে শ্রেষ্ঠ করিবার স্বপ্নও যে মাসোলিনির নাই, তাহা নহে। এখন মাসোলিনির ইঙ্গিতে চালিত ইটালী এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি ফ্রান্সকেও ভয়প্রদর্শন করিতে অথবা আভাসে ইঙ্গিতে সমরাহ্বান করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। বস্তুতঃ ইটালী এখন ফ্রান্সের সহিত সমান তেজে কথা কহিয়া আপনার গণ্ডা আদায় বুঝিয়া লইতে কাতর নহে।

যে মানব অসম্ভবকেও এমন ভাবে সম্ভব করিয়াছেন, সামান্য তৃতীয় শ্রেণীর শক্তির ইটালীকে আপন প্রতিভাবলে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছেন এবং যিনি ভূমধ্যসাগরে আবার প্রাচীন সীজারগণের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন, তিনি যে সামান্য মানব নহেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি বজ্রাদপি কঠোর স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ নিয়ামক হইতে পারেন, তিনি দাম্ভিক আত্মম্ভরী শস্ত্রোপাসক সাম্রাজ্যবাদী হইতে পারেন,—কিন্তু তিনি যে অসাধারণ মেধাবী মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাসোলিনির পূর্ব্বকথা

এ হেন মাসোলিনি—যিনি আজ ইটালীয়গণের মত উন্নত শিক্ষিত জাতির উপর আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং জগতের অন্যান্য শক্তিকেও আপনার কথা শুনিতে বাধ্য করিতেছেন—তিনি যে কখনও 'হঠাৎ গজাইয়া উঠেন' নাই, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। তাঁহার বনিয়াদ যদি দৃঢ় ও সহনশীল না হইত, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তার সৌধ তাহার উপর গড়িয়া উঠিত না। তিনি এক দিনে মহামানবের পদবীতে উন্নীত হয়েন নাই। জীবনের প্রথম প্রভাতে দারুণ দুঃখ-বিপদের পাঠশালায় তাঁহার হাতে খড়ি হইয়াছিল, কতবার তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল, কতবার তাঁহাকে গভীর দুঃখ-গহ্বরে নিমজ্জিত হইতে হইয়াছিল,—তবে তিনি পরজীবনে অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন। শক্তি ও প্রাধান্যলাভের পরেও তাঁহার জীবন মাত্র এক বৎসরের মধ্যে তিন বার বিপন্ন হইয়াছিল :—

(১) ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের ৬ই তারিখে ভায়োলেট গিবসন নাম্নী এক আইরিশ নারীর রিভলভারের গুলীতে তাঁহার নাসিকা আহত হইয়াছিল।

(২) ঐ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে গিওভ্যানি নামক এক ইটালীয় যুবক তাঁহার মোটর গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে। মাসোলিনি ইহার ফলে আদৌ আহত হয়েন নাই।

(৩) ঐ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে যখন মাসোলিনি বলোনা সহরের বিজ্ঞান কংগ্রেস হলগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে এক অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়ে। এবারও সৌভাগ্যক্রমে তিনি মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

বার বার এইরূপে আশ্চর্য্যভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া মাসোলিনি "Charmed life" পাইয়াছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে। যাঁহারা জীবনে মহৎ কার্য্যসাধন করিতে আইসেন, তাঁহাদের মৃত্যু সহজে ঘটে না।

মাফিয়া

যে পুরুষসিংহ স্বদেশের গৌরবের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দেশের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার বিপক্ষে স্বজাতি স্বধর্ম্মী আততায়ীর হস্ত উদ্যত হয় কেন? মাসোলিনি প্রথম-যৌবনে স্বদেশের গভর্ণমেণ্ট ও রাজনীতিকগণের হস্তে কি লাঞ্ছনা ও কি নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে—উহা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। যিনি দেশের জন্য এরূপ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহাকে দেশের লোকই হত্যা করিতে উদ্যত হয় কেন? ইহার এক গূঢ় রহস্য আছে।

প্রতীচ্যের প্রায় সকল দেশেই রাজনীতিক গুপ্ত সমিতি আছে। যাহারা দেশের অন্যায় শাসনে উৎপীড়িত, তাহারা এই সকল সমিতিতে যোগদান করিয়া থাকে। রুসিয়ার জারদিগের শাসনকালে রুসিয়ায় নিহিলিষ্ট সমিতির অস্তিত্ব ছিল। রুসিয়ান সরকারী গোয়েন্দাবিভাগের চতুর ও দক্ষ গুপ্তচর বিভাগ নানা উপায়ে ইহার অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করিয়া কখনও কৃতকার্য্য হয় নাই। বরং এই নিহিলিষ্ট সমিতির ক্ষমতা আশ্চর্য্যরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণীতে বহুকাল পূর্ব্বে 'ভেম ট্রাইবিউনাল' নামে এইরূপ এক গুপ্ত সমিতি ছিল। প্রাচীন ইটালীর নানা গুপ্ত সমিতির নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন

ইটালীর দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপে এইরূপ এক গুপ্ত সমিতি ছিল, তাহার নাম মাফিয়া। ইহার ন্যায় আশ্চর্য্য গুপ্ত সমিতি বোধ হয় নিহিলিষ্ট ব্যতীত জগতে আর সৃষ্ট হয় হয় নাই। কেহ কেহ মাফিয়াকে নিহিলিষ্ট অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া থাকেন। ইটালীর গভর্ণমেণ্টের ইটালী ও সিসিলির উপর কর্তৃত্ব থাকিলেও মাফিয়ার কঠোর আদেশ অবজ্ঞা করিবার রাজপুরুষদিগেরও পর্য্যন্ত সাহস ছিল না। এই হেতু মাফিয়াকে কেহ কেহ a State within the State, a government within Government আখ্যায় ভূষিত করিতেন।

যে সময়ে ইটালীতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বড় বড় জমীদাররা আমাদের দেশের জমীদারের মত পাইক বা লাঠিয়াল ভাড়া করিয়া রাখিতেন—সেই সকল কর্ম্মচ্যুত পাইক বরকন্দাজ বা লাঠিয়ালই পরে মাফিয়ায় পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জমীদারী স্বাধীনতা (Feudalism) রাজবিধি দ্বারা উঠাইয়া দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে বেতনভুক্ পাইকের দলকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। জমীদাররা কিন্তু গোপনে ইহাদিগকে ভাড়া করিয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক হইলে লুঠতরাজে নিযুক্ত করিতেন। এই 'গোপনতা' হইতেই ক্রমে গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গ্যারিবল্ডি মাফিয়া-দমনে বদ্ধপরিকর হয়েন, কিন্তু তিনি সে কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে বহু কয়েদী জেল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়—তাহারাও মাফিয়াদের দলপুষ্টি করিয়াছিল।

যতই দিন যাইতে লাগিল, মাফিয়াদের ততই দলপুষ্টি হইতে লাগিল। প্রথমে মাফিয়ারা organis tion of criminals অথবা ষ্টেটের নিকট নানা অপরাধে পলাতক অপরাধীদের সমবায় বলিয়া বিদিত ছিল, কিন্তু ক্রমে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহাদের নিজেদের গোয়েন্দা পুলিস ও গোয়েন্দা অনুচর পার্শ্বচর বিভাগের সৃষ্টি হইল এবং 'সরাসরি' বিচারালয় (Rough and re dy justice) প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহারা নিজেদের মনের মত করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। দলের বাহিরের কোনও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে মাফিয়াদের পরস্পর বিবাদ থাকিলে অথবা কোন সদস্যের সহিত বাহিরের

লোকের ব্যক্তিগত (অর্থাৎ সমিতিগত নহে) বিবাদ উপস্থিত হইলে, যদি কোন সদস্য নরহত্যা বা অন্য কোনও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহাকে দণ্ডিত করা হইত না, কিন্তু মাফিয়া সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল—মাফিয়া কাউন্সিল private crimesএর দণ্ডবিধান করিতে লাগিল। তবে সরকারী পুলিসের গোয়েন্দার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল। মাফিয়ার সদস্যরা পুলিসের আইন হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য যে কোনরূপ অনাচার অনুষ্ঠান করিতে পারিত। ইহাকে Government within Government বলা হয়।

সিসিলির উচ্চনীচ, ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—প্রায় সমস্ত অধিবাসীই বাধ্য হইয়া মাফিয়ার সদস্য হইয়াছিল। তবে কারিগর, জনমজুর, কৃষক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকই সমিতির প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক ছিল। ইহারা একযোগে কার্য্য করিত, নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ভোট নিয়ন্ত্রিত করিয়া মাফিয়ার লোককেই সিনেটে (পার্লামেণ্টে) ডেপুটী রূপে প্রেরণ করিত এবং সরকারী পুলিস বিভাগেও আপনাদের লোককে কার্য্য করিতে পাঠাইত। তবেই বুঝিয়া দেখুন, ইহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা ভেদ করা কিরূপ অসম্ভব ছিল। এই হেতু ইটালীর নানা গভর্ণমেণ্ট পর পর নানা চেষ্টা করিয়াও মাফিয়াদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে মাসোলিনি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এখনও তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তবে যদি মাফিয়া-দমন সম্ভবপর হয়, তাঁহার দ্বারাই হইবে বলিয়া মনে হয়। মাসোলিনি মাফিয়ার ভোটের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বেসর্ব্বা নিয়ামক, ইহাই মস্ত বড় একটা অস্ত্র।

মাফিয়ার অর্থ কি ?

ইটালীয়ান ভাষায় মাফিয়ার অর্থ—সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব, পূর্ণতা। সিসিলির সুন্দরী যুবতীকে 'মাফিউস্‌ডো' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে তাহার হাসিতে মুক্তা ঝরিবে—ফলবিক্রেতার ফলগুলিকে 'মাফিউসি' বলিলে সে সানন্দে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে ফল বিক্রয় করিবে। মাফিয়া কথায় শ্রেষ্ঠত্ব, সাহস, নারীর প্রতি সম্মান প্রভৃতি নানা ভাবকেও বুঝায়।

সিসিলিবাসীরা এক দিকে যেমন সাহসী, সৌজন্যপরায়ণ এবং আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, তেমনই অন্য দিকে তাহারা ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহাদের ভাষায় 'ওমার্টা' বলিয়া একটা কথা আছে। উহার অর্থ এই যে, যদি কেহ সিসিলিবাসীকে অসৌজন্য প্রদর্শন করে বা তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করে, অথবা তাহার নারীর অমর্য্যাদা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চিতই 'ওমার্টা' হইবে, অর্থাৎ আত্মমর্য্যাদাহীন মানুষের মত স্বয়ং তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, তথাপি কদাচ সরকারী আইন-আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবে না। অথবা শত্রু-মিত্র কাহাকেও সরকারের শান্তিরক্ষকদিগের হস্তে প্রদান করিবে না। এই মনোবৃত্তিতেই সিসিলির অধিবাসী শিশুকাল হইতে অভ্যস্ত হয় এবং মরণকাল পর্য্যন্ত পুলিসকে গোয়েন্দা ও শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে। কাহাকেও পাহারাওয়ালা বলিলে সিসিলিতে যত অপমান করা হয়, এত অপমান আর কিছুতে হয় না। দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে সিসিলিবাসী ভারতীয় অপেক্ষাও পুলিসবিদ্বেষী। একটি ৮ বৎসরের বালিকাও ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে পুলিসের কয়েদীর বিপক্ষে একটি কথাও বলে নাই, এমন কি, ভয়প্রদর্শন করিলেও নহে, এমন দৃষ্টান্ত সিসিলিতে দেখা গিয়াছে। একটি ভৃত্য পাছে প্রভুর বিপক্ষে কথা বলিতে গিয়া কোনও গুপ্ত কথা বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

লোককে নির্ব্বিবাদে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে মাফিয়াকে রীতিমত কর দিতে হইত। এক সময়ে মারাঠারা যেমন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র চৌথ আদায় করিত, মাফিয়ারাও সেইরূপ স্বদেশের প্রায় সর্ব্বত্র রীতিমত 'চৌথ' অর্থাৎ প্রাপ্য আদায় করিত, অন্যথা লোকের ধনপ্রাণ বিপদাপন্ন হইত। যে অতি দরিদ্র, সে-ও এই চৌথের দায় এড়াইতে পারিত না, কেন না, মাফিয়া তাহাকে খাটাইয়া প্রাপ্য আদায় করিয়া লইত। অনেক সময়ে দরিদ্র ভিক্ষুককেও ধনবান্ জমীদারের বিনা পারিশ্রমিকে জমী চষিয়া দিতে হইত; গাড়োয়ানকে বেগারে মাল বহিয়া দিতে হইত, মুটেকে মোট ঘাড়ে করিতে হইত, উকীলকে ফিজ না লইয়া মাফিয়ার মামলা চালাইতে হইত, ডাক্তারকে বিনা ভিজিটে মাফিয়ার সদস্যের ও তাহার পরিবারবর্গের চিকিৎসা করিতে হইত, দাওয়াইখানার মালিককে বিনা

মূল্যে ঔষধ যোগাইতে হইত, জমীদারকেও মাফিয়াকে খাজনা দিতে হইত; ফল কথা, কর হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। মেষপালক, গোয়ালা, ভারবাহক, ডাক ও তার পিওন,—এমন লোক ছিল না, যাহারা মাফিয়ার হুকুমমত নির্দ্দিষ্টকালে এই সকল দের অর্থ সাধারণের নিকট আদায় না করিত। কিস্তীর সময় উত্তীর্ণ হইলে মাফিয়ার 'স্মারক লিপি' পৌঁছিত—ঠিক যেমন আমাদের দেশে 'কোম্পানীর' প্রথম আমলে ডাকাতের 'লেখন' আসিত। স্মারক লিপিতে মাত্র লেখা থাকিত,—"দেয় ছোট ফুলটি শীঘ্র পাঠাইবে।" 'ছোট ফুলটি' কখনও কোনও নির্দ্দিষ্ট গাছতলায় বা রাস্তার মোড়ে অথবা গোয়ালার মারফতে মার্কামারা খামের মধ্যে প্রেরিত হইত। স্মারক লিপির পরেও যদি লোকের চৈতন্যোদয় না হইত, তাহা হইলে 'হাতে-কলমে স্মারক বার্ত্তা' আসিত,—অর্থাৎ তাহার বাগান লুঠ হইত, না হয় গরুবাছুর চুরি যাইত, অথবা হাঁস-মুরগী মারা যাইত।

পরের গো-মেষাদি চুরি বা লুণ্ঠনের সময়ে ঝটিতি 'মার্কা' বদল করিবার প্রথা ছিল, কাযেই কেহ মার্কা দেখাইয়া নিজের অপহৃত গো-মেষের উদ্ধার-সাধন করিতে পারিত না। এ সকল 'চোরাই মাল' লুকাইবার জন্য ট্রাপানি ও প্যালারমো সহরের নিকটে এমন গুপ্ত স্থানসমূহ ছিল, যাহা অপরে কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। ইহা ছাড়া মাফিয়াদের গুপ্ত 'গোখানা' ছিল, মাফিয়া কসাইরা ঐ স্থানে গো-মেষ বলি দিয়া মাংস মালিকদিগকেই বিক্রয় করিত।

যদি এ সকল 'নরম' উপায়েও অর্থ আদায় না হইত, তাহা হইলে মাফিয়ারা 'গরম' উপায় অবলম্বন করিত। পথে রাহাজানি করিয়া অপরাধীর যথাসর্ব্বস্ব হরণ করা হইত, অথবা গৃহলুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইত। কখনও কখনও অপরাধীকে ধরিয়া আটক করিয়া Ransom অথবা মুক্তির অর্থ আদায় করা হইত। সে সব ব্যাপারে আসলের সঙ্গে রীতিমত সুদও আদায় করা হইত!

মাফিয়ার নেতা

মাফিয়ার দলে সাধারণ লোক থাকিলেও ইহার দলপতিরা একটি গুপ্ত কাউন্সিল ছিল, তাহার সদস্যরা 'আইনকানুন' প্রস্তুত করিতেন, কর নির্দ্ধারণ করিতেন, মাফিয়ার ডালকুত্তাদিগকে (অর্থাৎ গোয়েন্দাদিগকে) লোকের পশ্চাতে লাগাইতেন এবং মফঃস্বলে দস্যুদল পাঠাইয়া মাফিয়ার শত্রুদিগের সর্ব্বনাশসাধন করিতেন।

এই দলপতিদিগের অধীনে মাফিয়ার 'রাজত্ব' কিছুকাল ভালই চলিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময়ে মাফিয়ার অবনতি ঘটিতে থাকে। এই সময়ে প্রাচীনতন্ত্রের দলপতিদিগের স্থলে যে সকল নব্যতন্ত্রের লোক দলপতির পদ অধিকার করিলেন, তাঁহারা প্রাচীনদিগের ভাবপ্রবণতা, প্রতিশ্রুতিরক্ষাপ্রবৃত্তি এবং আশ্রিতবাৎসল্য আদি গুণ হইতে বঞ্চিত ছিলেন,—কেবল আত্মসুখ ও স্বাত্মস্বার্থরক্ষাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বের সৌজন্য ও মিষ্ট কথায় ভয়প্রদর্শনের প্রথা পরিহার করিয়া তাঁহারা দস্যুসুলভ প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শনের পন্থা অবলম্বন করিলেন, ন্যায়যুদ্ধের পথ ছাড়িয়া তাঁহারা ওৎ পাতিয়া গুপ্তহত্যায় রত হইলেন, নারীর প্রতি মর্য্যাদার সহিত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে পাশব অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলেন এবং 'ন্যায্য চৌথ' আদায়ের পরিবর্ত্তে স্বার্থপ্রণোদিত দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। মাফিয়ার দলে আর পূর্ব্বের কঠোর শৃঙ্খলা রহিল না, সময়ে সময়ে দলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমিতির নামে কার্য্য সাধিত হইত, এখন নূতন নূতন ক্ষুদ্র দলপতি গজাইয়া উঠিতে লাগিল, দরিদ্র মেষপালকরা লুঠতরাজ করিয়া ধনী হইয়া উঠিল, ক্ষুদ্র ভুঁইয়ারা বড় বড় জমীদারী করিয়া বসিল। ফলে সমগ্র সিসিলিতে এক ভীষণ আতঙ্কের যুগ উপস্থিত হইল, লোকের ধন-প্রাণ-রক্ষা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, জমীদাররা অহরহঃ প্রাণনাশের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। পথে ঘাটে নারীর উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতে লাগিল। সুন্দরী যুবতীদিগকে হরণ করিয়া পর্ব্বত বা জঙ্গলের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখা হইতে লাগিল এবং তাহাদের 'মুক্তির মাশুলের' জন্য পীড়াপীড়ি চলিতে লাগিল। বহু যুবতীর সতীত্ব অপহৃত হইতে লাগিল; লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অথচ কেহ সাহস করিয়া আইনের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইত না। কেহ পুলিসে খবর দিতে গেলে দূরত্ব ক্রম্য পথ অতিক্রম করিবার সময়ে খুব সম্ভবতঃ পৃষ্ঠদেশে

মাসোলিনির অভ্যুদয়

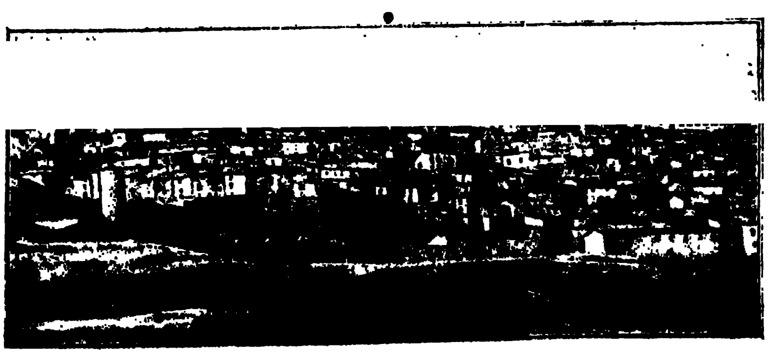
যখন সিসিলিতে এই অরাজকতা ও বিভীষিকার যুগ উপস্থিত, সেই সময়ে মাসোলিনির অভ্যুদয়। তিনি যেন স্বর্গদূতরূপেই দেখা দিলেন এবং দুষ্কৃত-বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সমগ্র ইটালীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার পর মাসোলিনি যে ক্ষুদ্র সিসিলিকে শান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, ইহা হইতেই পারে না। কায বড় সহজ নহে, কিন্তু মাসোলিনিও সহজ মানুষ নহেন। এইখানেই তাঁহার মহামানবত্ব। যাহা অপরের পক্ষে অসম্ভব, মাসোলিনির পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল না, হইতে পারে না। মাসোলিনি কিছু কাল সিসিলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাহার পর হঠাৎ তিনি মাফিয়ার বুকে এমন বজ্র হানিলেন যে, মাফিয়ারা কোথা হইতে কি হইয়া গেল, বুঝিবারও অবসর প্রাপ্ত হইল না।



গাঙ্গীর উপরিস্থ গৃহাদির অবস্থান

মাফিয়ার প্রধান আড্ডা

সিসিলি দ্বীপের ম্যাডোনাই পর্ব্বতমালার মধ্যে একটি দুর্ভেদ্য দুরারোহ স্থান আছে, তাহার নাম গাঙ্গী। এই স্থানে মাফিয়াদের প্রধান আড্ডা ছিল। পাহাড়ের উপর গাঙ্গীর অবস্থান এক দিকে তাহাকে যেমন সুন্দর করিয়াছিল, তেমনই



অভিযান একরূপ দুষ্কর করিয়াছিল। স্তরের পর স্তর পাহাড়—শ্যামল পত্রপুষ্পে শোভিত—যেন চিত্রার্পিত। তাহার মধ্যে একটি শৃঙ্গের উপর গাঙ্গী জনপদটি অবস্থিত। গাঙ্গীর অধিবাসীর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, তাহাদের এই স্বর্গে 'নরলোকের' প্রতাপ বিসর্পিত হইতে পারিবে না।

এক দিন গাঙ্গীর অধিবাসীরা শুনিল যে, সহরের পার্ব্বত্য পথে জয়ঢক্কা নিনাদিত হইতেছে। তাহারা ভাবিল যে, যেমন সচরাচর হয়, তেমনই নূতন কোনও 'লুণ্ঠনের দ্রব্য' আসিতেছে, অথবা 'চৌথের' কোনও নূতন খাজনা ধার্য্য হইতেছে, তাহারই বুঝি ঘোষণা হইতেছে। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহাদের ভুল ভাঙ্গিল। সহরের পথে পথে ঢেঁড়া পিটিয়া বিঘোষিত হইল যে, "রাজধানী প্যালারমোর সহর-কোতোয়াল (Prefect) সিনর মোরি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে গাঙ্গীর সমস্ত মাফিয়া দস্যুকে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, অন্যথা তিনি গাঙ্গী সহরের বিপক্ষে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।" কি সর্ব্বনাশ! দুই তিন পুরুষের মধ্যে গাঙ্গীর অধিবাসী কখনও এমন জোর হুকুম শুনে নাই, সরকারী রাজপুরুষের এমন স্পর্দ্ধা কিরূপে হইল? বোধ হয়, এই প্রথম গাঙ্গীর রাজপথে আইনের জোর তলবের কথা শুনা গেল। দস্যুতা ত মাফিয়ার



দস্যু নিকোলো আণ্ডালোরো

তাহাদের মন্ত্রগুপ্তি আর রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল না। তাহাদের নারীর উপর অত্যাচার ও স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে (মাফিয়ার উপকারার্থে নহে) তাহাদের জমী-জমা ও গবাদি পশুলুণ্ঠন যখন অবাধে চলিতে লাগিল, তখন তাহারা মাফিয়ার নূতন দলপতিদিগের উপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, এই নীচশ্রেণীর দলপতিদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যাজনিত গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইল। ফলে মাফিয়া-দমন ক্রমশঃ সহজসাধ্য হইল।



দস্যু সালভাটোর ফেরারেলো

গৃহ-বিবাদ

লিহুজো নামক মাফিয়া দলভুক্ত এক দস্যুর গৃহে মাফিয়াদলনেত্রী জোসেপিনা সালভোর পুত্রগণ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। ফলে, লিহুজো দলত্যাগ করিয়া স্বয়ং এক স্বতন্ত্র দল গঠন করিল। আণ্ডালোরো ভ্রাতারা তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ডিনো নামক এক দস্যুকে নিযুক্ত করিল। এইরূপে মাফিয়াদের মধ্যে ঘর-ভাঙ্গাভাঙ্গি আরম্ভ হইল।

সুযোগ বুঝিয়া এই সময়ে মাসোলিনি কটরোণ নামক স্থানের স্প্যানো নামক এক জন বিচক্ষণ পুলিস-কর্ম্মচারীকে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পুলিস-কমিশনারী পদে নিযুক্ত করিলেন। স্প্যানো বলিষ্ঠ, ব্যায়াম-বীর ও প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি দস্যুদিগের গুপ্তবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিরূপে তাহাদের গুপ্ত স্থান আবিষ্কার করিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে, কিরূপে তাহাদিগের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া লোক ভাঙ্গাইতে হইবে,—এ সকল বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

স্প্যানো যেমন বলবান্, তেমনই সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি মাফিয়া দলপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তুমি বলিতেছ, আমি বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তায় তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। বেশ, একটা স্থান ঠিক কর। আমি সেই স্থানে রাত্রিকালে একাকী তোমার সহিত যে কোনও অস্ত্র সাহায্যে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" ফেরারেলো কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্টকালে উপস্থিত হইল না। স্প্যানো

কাপুরুষ ভীরু, সে শক্তি-পরীক্ষার আহ্বানে সাড়া দেয় না। কাপুরুষরা দেশদ্রোহী, অতএব ফেরারেলোও দেশদ্রোহী, তাহার সহায়তা করা কাহারও উচিত নহে।

এ দিকে দস্যু ডিনো স্প্যানোর নিকট তাড়া খাইয়া শত্রু লিসুজোর আশ্রয় গ্রহণ করিল। লিসুজো তাহাকে স্প্যানোর হস্তে ধরাইয়া দিল। স্প্যানো এক এক পুলিস দলে ৫০ জন করিয়া লোক রাখিয়া পর্ব্বতের নানা দিক্ ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, দস্যুরা অন্যান্য গুপ্তস্থান ত্যাগ করিয়া গাঙ্গী সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

তাহার পর স্প্যানো মাফিয়ার গুপ্তচরগণকে এবং সংবাদ ও খাদ্যবাহকগণকে ধরিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বহির্জগতের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কূপবদ্ধ মণ্ডুকের মত মাফিয়া দস্যুরা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইল। খাদ্যাভাব, সংবাদাভাব ও অর্থাভাব তাহাদের উপর চাপিয়া বসিল।



পুলিস কমিশনার স্প্যানো

স্প্যানো ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি দস্যুদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে তাহাদের দ্বারা অপহৃত গো-মেষাদির দল কাড়িয়া লইতে লাগিলেন।

প্রিফেক্টের ঘোষণা

এই সময়ে পূর্ব্বে যে পুলিস-ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রচারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসোলিনির প্রায় এক হাজার 'কাল জামার' ফ্যাসিষ্ট (Black shirt fascists) সামরিক পুলিস পর্ব্বতটা ঘিরিয়া ফেলিল। রণসজ্জায় সজ্জিত বিস্তর মোটর গাড়ী (armoured cars) এই অভিযানে যোগদান করিল।

খৃষ্টীন বৎসরের প্রথম দিন—১লা জানুয়ারী তারিখ কুক্ষণে মাফিয়াদের জন্য উদয় হইল। সে দিন ডাকহরকরাদিগকেও ডাক বিলি করিতে দেওয়া হইল না। তার ও টেলিফোঁর তার কাটিয়া দেওয়া হইল। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে মাফিয়ারা চিঠি বা তারের সাহায্যে পুলিস অভিযানের কথা পূর্ব্বাহ্নে বন্ধুবর্গকে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিত। এক বার প্যালারমোর এক মাফিয়া দলভুক্ত লোক এই তার করিয়া বন্ধুদিগকে সতর্ক করিয়াছিল,—"খুড়া রওনা হইয়াছেন। তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিও।" বলা বাহুল্য, 'খুড়া' অর্থে এখানে পুলিসকে বুঝাইতেছে। শুনিয়াছি, আমাদের দেশেও বিপ্লববাদীরা বোমাকে "রসগোল্লা" নামে অভিহিত করিত। এ সকল সাঙ্কেতিক কথা।

কিন্তু এবার 'খুড়া' বেশ সজাগ ছিল। তাহারা এমন করিয়া 'আটঘাট' বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়াছিল যে, একটি বন্দুকও ছুড়িতে হইল না, অথচ মাফিয়া দস্যুরা কোণঠেসা হইয়া একে একে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল এবং বহু কালের মাফিয়া বিভীষিকা অতি অল্পসময়ের মধ্যে দূর হইল।

আত্মসমর্পণ

বৃদ্ধ দলপতি গেটানো ফেরারেলো প্রথমেই আত্মসমর্পণ করিল। সে নিজের গৃহে আত্মসমর্পণ না করিয়া সহরের মেয়রের দরবারে আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া সংবাদ পাঠাইল। সে যখন ধরা দিল, তখন এমন গাম্ভীর্য্য ও আড়ম্বরের সহিত মেয়রের দরবারে উপস্থিত হইল যে, মনে হইল, যেন এক মহাবীর সেনাপতি ন্যায়যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আততায়ী বিজেতা সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছেন! আত্মসমর্পণকালে সে গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমার অভাগিনী দেশমাতৃকার প্রতি প্রীতির সম্মান রক্ষা করিয়া আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি। এখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই কামনা।"

দলপতির এই নাটকীয় অভিনয় বহু অনুচর পর পর অনুসরণ করিল। তাহারা বলিল, তাহারা ঘৃণিত পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছে না, তাহাদের সহরের প্রধান পুরুষ

মেয়রের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছে। এইরূপে 'মান' বজায় রাখিয়া তাহারা একে একে অভাব ও ক্ষুধার তাড়না হইতে রক্ষা পাইল।

এ দিকে ব্যাঘ্রবাঘিনী (Tiger-cat) জোসেফিনা সালভো পুলিসের তাড়া খাইয়া দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত হইল না। তাহার সম্পদের দিনে সে সকলের উপর নিষ্ঠুর রাক্ষসীর মত অত্যাচার করিয়াছে, আজ তাহার বিপদের দিনে তাহার অনুনয়বিনয়ে কেহ কর্ণপাত করিবে কেন? শেষে সে আশ্রয় ত পাইল না, পরন্তু লোক তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দিল।

তাহার পুত্র কার্ম্মেলো আণ্ডালোরো একরূপ নগ্ন অবস্থায় সহর ত্যাগ করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে পলায়ন করিল। সে ১৯ বৎসর বয়সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। ৭ বৎসরকাল মাতার প্ররোচনায় অমানুষিক অত্যাচার-অনাচার করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে সে পাপের উপযুক্ত শাস্তি লাভ করিল। তাহার ক্ষয়রোগ দেখা দিয়াছিল, সে জ্বরে শয্যাগত হইয়াছিল, এমন সময়ে পুলিস তাহার দ্বারে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ সে অসুরের শক্তি ধারণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিল, একটা কুশপুত্তল সংগ্রহ করিয়া শয্যার লেপের নিম্নে নিজের দেহের মত করিয়া শয়ন করাইয়া রাখিল এবং মেঝের মধ্যস্থ এক চোরা কবাটের মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। পুলিস কবাট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাইল বটে, কিন্তু ভাবিল, বুঝি কুকুর-বিড়াল দরজা নাড়িতেছে। কার্ম্মেলো শীর্ণ-দেহে, রক্তশূন্য-মুখে, রুক্ষকেশে ঠিক ভূতের মত পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল—একটা বাঁধা-কপির ডাঁটা তাহার একমাত্র আহারের সম্বল হইল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কুকুরের মত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া সে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ তাহাকে আশ্রয় বা খাদ্য দিল না। বরং গাঙ্গীর ৮০ জন অধিবাসী স্বেচ্ছায় তাহাকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পুলিসের নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। অত্যাচারের এমনই ফল! অল্পকালমধ্যেই এই পর্ব্বতের জুজু ধরা পড়িল।



দস্যু কারমেলো আণ্ডালোরো

বৃদ্ধ ফেরারেলোর নিকট-আত্মীয় সালভাটোর ফেরারেলো এই কার্ম্মেলো আণ্ডালোরোর দলস্থ দস্যু ছিল। নানা অপরাধে তাহার বিপক্ষে ৫৪ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, সে দস্যুদলে মিশিয়া দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। যখন পুলিস গাঙ্গী সহরে ধরপাকড় আরম্ভ করিল, তখন সে তাহার আবাসস্থলে ছাদের চোরা কুঠুরীর মধ্যে ৪ দিন লুকাইয়া রহিল। হঠাৎ এক দিন পদস্খলন হওয়ায় সে পড়িয়া যায়। পুলিস তাহার গৃহের উপর সতর্ক নজর রাখিয়াছিল, আওয়াজ পাইয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন অনাহারে অনিদ্রায় কাতর হইয়া সে মূর্চ্ছা গিয়াছিল।

দস্যুতার সমাপ্তি

যে ৮০ জন গাঙ্গীনিবাসী কার্ম্মেলো আণ্ডালোরোকে ধরিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহাদিগকে ও অন্যান্য কয়েক জন লোককে লইয়া ইটালীয়ান কর্তৃপক্ষ পাপের বিরুদ্ধে এক কার্য্য-সমিতি (Committee of Action) গঠন করিলেন। ইহাদের সাহায্যে পুলিস প্রায় ৪ শত দস্যু গ্রেপ্তার করিল। শীঘ্র ইহাদের বিচার হইবে। এখন এক সমস্যার কথা উঠিয়াছে, এই সকল দস্যুকে লইয়া কি করা হইবে? কেহ কেহ বলিতেছেন, উহাদিগকে দূরস্থ কোনও দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হইবে। কিন্তু এখনও কোন স্থির-সিদ্ধান্তে কর্তৃপক্ষ উপনীত হইতে পারেন নাই। এখন ইহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মাফিয়ার কি হইবে?

মাফিয়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাহা হয় ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু মাফিয়ার মস্তিষ্কের কি হইবে? যে সকল সমাজদ্রোহী দস্যু মাফিয়ার নামে অপরের উপর অত্যাচার-অনাচার অনুষ্ঠান করিয়া জঘন্য স্বার্থসাধন করিতেছিল, তাহাদিগকে তাহাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারী দলপতিদিগের সহিত ধৃত করা

হইয়াছে, তাহাদের দণ্ডও হইবে,—এ কথা সত্য; কিন্তু যে সকল বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাদের পশ্চাতে অদৃশ্য থাকিয়া মাফিয়ার ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহাদের কি হইবে? সত্য বটে, তাহারা সাধারণ জঘন্য লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ বা অত্যাচার-অনাচারের অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু তাহা হইলেও মাফিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়া গুপ্তভাবে রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধন করিতেছে। তাহারাই মাফিয়ার মস্তিষ্ক। ইহাদের ধরা বড় সহজ কথা নহে, উহাতে অনেক কাঠখড়ের দরকার।

মাসোলিনির 'মস্তিষ্কও' সামান্য নহে। তিনি এই 'অসাধারণ' দস্যু দলনের উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা করিতেছেন। এতদর্থে পুলিস হইতে প্রত্যেক আইনভীরু গৃহস্থকে একখানি করিয়া ছাড়পত্র দেওয়া হইতেছে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রত্যেক নরনারীর দুইখানি করিয়া আলোক-চিত্র লওয়া হইতেছে। কোনও অপরিচিত পথিককে পথে দেখিলে সন্দেহ হইলেই পুলিস 'পাশ-পোর্ট' বা ছাড়পত্র দেখিতে চাহে এবং আলোক-চিত্রের সহিত তাহার আকৃতি মিলাইয়া লয়। যদি পরীক্ষায় পুলিস সন্তুষ্ট হয়, তবে পথিককে ছাড়িয়া দেয়, নতুবা তৎক্ষণাৎ আটক করিয়া থানায় লইয়া যায়। এইরূপে গুপ্তচর ও আহার্য্যসংগ্রাহকদিগের সহজ যাতায়াত বন্ধ করা হইতেছে। প্যালারমো প্রভৃতি সহরে লোকের বাড়ী চাকুরী বা দরোয়ানী করিতে হইলে চাকুরীপ্রার্থীকে পুলিসের অনুমতি ও অনুমোদন লইতে হইবে। ইহাতে কোনও গুপ্তচরের সহরে অবস্থিতির পক্ষেও বিঘ্ন ঘটিতেছে। জমীদার-মহাজনদিগের গবাদি পশু পুলিস দাগিয়া দিতেছে; সুতরাং পশু চুরি গেলে শীঘ্র ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে। পথের উভয় পার্শ্বস্থ ঝোপ-জঙ্গল যথাসম্ভব সাফ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে দস্যুরা লুকাইয়া থাকিয়া পথিকের সর্ব্বনাশ করিত। সর্ব্বত্র পুলিস পাহারার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে।

এখন লোকের বিশ্বাস হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যদি শক্ত হয়েন, তাহা হইলে দস্যুতা থাকিতে পারে না। নিষ্ঠুর ক্রূর অসাধু দস্যুদিগকে দমন করাতে মাফিয়ার প্রকৃত দলপতিরাও (মস্তিষ্ক) ভিতরে ভিতরে সন্তুষ্ট হইয়াছে, কেন না, এই সকল দস্যুর আমদানীতে মাফিয়ার শৃঙ্খলাভঙ্গ হইয়াছিল, কেহ কাহাকেও মানিত না, সকলেই মাফিয়ার স্বার্থ না দেখিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধন করিত। ৪ শত দাগী ডাকাত ধরা সহজ বটে, কিন্তু অজ্ঞানা 'মস্তিষ্ক'-দিগকে ধরা সহজ নহে। মাসোলিনি ইহাদিগকেও ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহারা এই ধরপাকড়ের সময়ে এমন গা-ঢাকা দিয়াছে যে, ইহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ঝড়ের সময় গাছপালা শুইয়া পড়ে, কিন্তু ঝড় চলিয়া গেলে আবার খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। মাফিয়া যে আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

মাসোলিনি যুগমানব

এহেন মাফিয়ার বিপক্ষে যিনি অস্ত্রধারণ করিতে পারেন, তাঁহার জীবন বার বার সঙ্কটাপন্ন হইবে না কেন? বিশেষতঃ ইটালীর ভাগ্য-নিয়ন্তৃরূপে তিনি অনেক বিষয়ে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতের হস্তারক হইয়াছেন। স্বাধীন ইটালীয়ান তাঁহার সে অপরাধ ক্ষমা করে নাই। অবশ্য ইটালীর অধিকাংশ লোক ফ্যাসিষ্ট—তাঁহার মতাবলম্বী, কিন্তু ফ্যাসিমিজমের বিরুদ্ধবাদীও আছে ত। তাহারা তাঁহার ঘোর শত্রু। কিন্তু যে যুগমানব জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার এ সকল শত্রুর কথা ভাবিলে চলিবে না।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কনক-কণা

এ জগতে এক ছাড়া নাই কভু দুই,
হায় রে অবুঝ নর, বোঝ দেখি তুই,
কাহার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাস্
অভুক্ত কি র'ন কভু দেব শ্রীনিবাস?

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কৃষি-সঙ্গীত

১

আজিকে আমার ভরেছে খামার সোনার বৈভবে,
বাজাও শঙ্খ, দাও হুলুবর, ছড়াও খৈ সবে।
'বাঁউরী'-বাঁধনে পালায় গোলায় বেঁধেছি লক্ষ্মীরে,
বিদায় দিয়াছি আজিকে সকল ঝামেলা ঝক্কিরে।
কম্পিত কলকণ্ঠে কপোত মেতেছে ধানবনে,
ছাগ হাঁসগুলি করে কোলাকুলি আজি এ প্রাঙ্গণে।

আজিকে ঘুচাবো বাকী খাজনার বকেয়া ঝঞ্ঝাটে,
সুদ সহ দেনা শোধিব, ডরি না নবাবে সম্রাটে।
'কমলার' বিয়ে দেব ঘটা ক'রে আস্‌ছে বৈশাখে,
ঘরে এত কায, চলে নাক,—বেচু আনুক বৌমাকে।
নতুন করিয়া ছাওয়া হবে ঘর এবার ফাল্‌গুনে,
কত কি যে সুখসঙ্কল্পের রেখেছি জাল বুনে।

মা'র সাথে মাসী খাক্ গয়া কাশী গোলায় ধান তুলে,
ভর্‌তি 'করচ', কর্‌তে খরচ পারব প্রাণ খুলে।
আছে আছে মনে বেচুর মায়ের বায়না খোট ধরা,
খোকার কোমরে পাটা দেব আর তাহারে গোট ছড়া।
কঙ্কণ করতালিতে নাচুক স্নেহের ধন ধীরে।
নতুন চা'লের ভোগ দেব আজ মায়ের মন্দিরে।

পথভিখারীকে আন আজ ডেকে দাতার গৌরবে,
তুলসীমঞ্চ কর আমোদিত ধূপের সৌরভে।
গাইগুলি আজ রেখেছি যতনে গোয়ালে চট ঘেরে,
নতুন খড়ের গুণে ঢালে দুধ ভরিয়া ঘট কেঁড়ে।
আজি শুভযোগ লক্ষ্মীর ভোগ পায়সে পিষ্টকে।
খেজুর আখের রসের ভিয়ানে সকলি মিষ্ট যে।

তেল-হলুদের উৎসব আজ সরিষা অঙ্গনে
মটরের চারা পিচ্‌কারী দেয় বেগুনী রঙ্গণে।
আহেরির বেড়া ফুলে ভরা আলু ক্ষেতের আ'ল ভ'রে,
বরবটী-শুটী করে লুটোপুটি ঘরের চাল ভ'রে।
রামধনু লুটে মোর আঙিনায় দোপাটী, শিমফুলে,
অকালের হোলী খেলে গাঁদাবন আবীরে হিঙ্গুলে।

লক্ষ্মীর দয়া হেরি এ গৃহের বিরাজে চৌপাশে,
লাল পেড়ে শাড়ী পরি পাকশালে মোড়ল-বৌ হাসে।
ক্ষেতকুড়ানীরো ঘরে ধোঁয়া ওঠে, পেয়েছে খড়কুটো,
এবার বাদলে ভিজিবে না, তার রবে না ঘর ফুটো।
ঘটভরা জলে ঘুচায়েছে ধূলা দ্বারের 'তালবোনা',
আঁকো লক্ষ্মীর আনাগোনা পথে আজকে আল্‌পনা।

ধানের ধূলায় ঢাকিও না নাক আজকে অঞ্চলে,
মেখে লও গায়ে মায়ের পায়ের ধূসর মঙ্গলে।
লক্ষ্মীর জীবে বলো না'ক কিছু, খাক্ সে পেট ভ'রে।
ইতুঘট ছোঁও ভোরে সাঁঝে নিতি মাথাটি হেঁট ক'রে।
এ গৃহে এখন লক্ষ্মী আছেন বাহিরে অন্দরে,
রহ সবে শুচি নির্ম্মলরুচি বিনীত অন্তরে।
সব তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে রাখ' ঘুচাও মন্-মলা,
কলহ বিবাদ করো না, লক্ষ্মী হবেন চঞ্চলা।

২

আজি,—সুখের লক্ষ্মীমাসে,
শত শত বাঁকী ভরি ঝাঁকা ঝাঁকি পশারা লইয়া আসে
'ইতুর' পাঁচালী 'মুঠের' মন্ত্রে ডাক শুনে বার বার,
এলেন জননী মাঠ হ'তে, ঘাটে পা দু'টি ধুলেন তাঁর।
নবান্নে তাঁর করুণা-সুধার প্রথম আস্বাদন,
পিছে পিছে এলো সারা বছরের সঞ্চয় করা ধন।
আজি, মসীসেবকের দল,
মসীমাখা মুখে দেখে কিবা কৃষি-লক্ষ্মীর সেবা-ফল।

আজ—'বাড়াতে আসেনি মা,—'
হিংসায় কেহ এ কথা বলিলে, মোরা ত শুনিব না।
বেগুনের ক্ষেতে হেরেছি শিশুরে তাঁহার স্তন্য পিতে,
দুলিছে 'কাজল-লতা'গুলি ঐ শিমের মাচানটিতে।
হেরেছি তাঁহার কবরী বিনানো মড়া'য়ের পাকে পাকে,
বরবটীশুটী খোকায় খোকায় আঙুল নেড়ে কে ডাকে?
আজ—মা যদি আসেনি রে
এত দিন পরে ঢেঁকীর উপর 'পাড়' দিল তবে কে?

রাঙা—অতসীর গাছে গাছে
ছেলে ভুলাইতে বাজে ঝুন্‌ঝুনি, নখগুলি ফুটে আছে।
গাঁদাবনে তাঁর সীঁথির সিঁদুর, কুঁদবনে তাঁর শাঁখা,
হাসে ফুটে পই, আলিপনে অই চরণ-চিহ্ন আঁকা।
ভরে রাঙা বীজে পুঁইলতা, চুমি' আল্‌তা চরণমূলে,
হিঙুল আঙুলে ক্ষুদের 'পিটুলী' 'আস্‌কে'তে উঠে ফুলে।
আর—বাড়ীটির আশে পাশে,
উড়ে অঞ্চল বায়ু চঞ্চল শরফুল-বনকাশে।

আর—আসেনি মা আজ যদি,
বাড়ে কেন এত ভাঁড়ারের পুঁজি, ভাঁড়ে কেন এত দধি?
ভাতে ভরা থালা, খড়ে ভরা পালা, গোলা খালি নেই কারু,
খেজুরের গুড়ে জালা-ভরা ঘরে, ডালা-ভরা মুড়ি-লাড়ু।
ভরিয়া মাচান দোচালা উঠান ধরেছে নানান ফল,
লক্ষ্মীর স্নেহ-মমতার মধু ইক্ষুতে টলমল।
আজ—মা যদি আসেনি, সবে
সারাবছরের সুখের বিধান কেমনে পেলাম তবে?

শ্রীকালিদাস রায়।

সিদ্ধাচার্য্য মাতঙ্গ

বৌদ্ধযুগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ভারতের একান্ত গৌরবের বস্তু। ভগবান্ সিদ্ধার্থের সম্বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরে কাশীধামের উপকণ্ঠে মৃগবনে সমবেত শিষ্য ভিক্ষুকদিগের প্রথম সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচারকার্য্যে তাঁহার অমূল্য উৎসাহবাণী স্মরণ করিয়া যে সকল প্রচারক দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাতঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অদ্যাপি পৃথিবীর যে কোন জাতির ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁহার জীবনকথা ও প্রচার-কাহিনী আমাদের গৌরবের ও গর্ব্বের বস্তু, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশে সে সমুদয় কাহিনী এবং সে যুগের সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি সম্পূর্ণ লুপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বলেন, পরবর্ত্তী কালে মুসলমান বিজেতৃগণের অনাচারই ইহার মূল কারণ; জঙ্গিস্ খাঁ, পরে কাবুলের বিজেতৃগণের অনাচারে চারিদিকে ধ্বংসলীলা চলিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতবর্ষকে, তথা সমগ্র পৃথিবীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে কাঙ্গালিনী হইতে হইয়াছে। কোনও ঐতিহাসিক খেদ করিয়া লিখিয়াছেন;—

"Janghis Khan, a stranger to the name of religion, led countless hordes of bloodthirsty Mongals to devastate the world, and then the Musalman conquerors from Cabul filled the lands of the Indian Aryans with unheard of cruelties, such as the massacre of holy men in their covered arcades and monasteries in Aryavarta, the spoliation of the Indian Kingdoms etc etc. Imagine India, the Country of a quiet, mild and meditative people, with its beautiful temples * * * turned into a battlefield by the Moslem Vandals who made ;—

'The sun like blood, the Earth a tomb,
The tomb a hell, and hell itself a
murkur gloom.'

Unable to reason with might and fanaticism, most of the Indian sages, the Budhists particularly fell martyrs * *". শান্তিপ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু, পুরোহিত ও তপস্বীদিগের ধর্ম্মের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

লুণ্ঠন, পবিত্র মঠ-বিহারাদির ধ্বংসসাধন, অমূল্য পুস্তকাগারগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মে পরিণত করা ইত্যাদি দুষ্কার্য্যে তাহারা লিপ্ত থাকিত। এই নির্ম্মম অত্যাচার হইতে উদ্ধারলাভের আশায় কেহ কেহ পলায়ন করিয়া প্রাণ এবং তদপেক্ষা প্রিয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও বিগ্রহাদি বুকে করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া নেপাল, তিব্বত ও চীন প্রভৃতি রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। * তাঁহাদের যত্ন ও আয়াসে নীত বহুমূল্য গ্রন্থ ঐ সকল রাজ্যের মঠাদিতে এবং রাজকীয় গ্রন্থশালায় অদ্যাপি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। এ হতভাগ্য দেশের সে কালের নানা শ্রেণীর গ্রন্থাদি, বিবিধ বৃত্তান্ত, ভারতীয় পণ্ডিতগণের গৌরব-কথা এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের অতুলনীয় কীর্ত্তিকাহিনী, চেষ্টা করিলে ঐ সকল মঠ এবং পুস্তকাগার হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে বা জানিতে পারি। বহির্ভারতে নীত গ্রন্থাদি ব্যতীত মনীষিগণের অনুসন্ধানে বহু অপহৃত রত্নের উদ্ধার হইতেছে। রাজাধিরাজ সম্রাট্ অশোকের সময়ে এবং মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব

---

* 1200 A D. Invasion by Mahomedans. The great monasteries of Odantapuri and Vikramsela were destroyed, the monks were killed or fled to other countries.—

Sakyasri went to Orissa and then to Tibet.

Ratna Rakhit, to Nepal.

Budha Mitra, to south India.

Sanga Srijyan, to Burma, Cambodia etc. Thus the laws of Budha and sacred books became extinct in Maghada." H. Kerns' manual of Budhism.

Sir Oral Steens' "Sand-buried cities & ruins of Khotan" দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত শত শত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক বহির্ভারতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিতেন। চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে অবস্থানকালে তাঁহারা সেই সেই দেশের ভাষাতে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত শত শত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ধ্বংসকারিগণের হস্ত হইতে তাই অনেকগুলি অমূল্য গ্রন্থ রক্ষা পাইয়াছে। ঐ সকল দেশে এবং অন্যান্য সভ্যদেশে এখন পরম যত্নে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় রক্ষিত হইতেছে। 'সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত বহু অমূল্য গ্রন্থ ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের গবেষণার ফলস্বরূপ বহু তথ্য জানিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছে, আমাদেরই লুপ্তপ্রায় রত্নরাজি তাঁহারা কত যত্ন ও কষ্টে উদ্ধার করিতেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিত গবেষকদিগের সেই সেই দেশে গমন ও ঐ অমূল্য গ্রন্থ সমূহ আমাদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া আমাদের জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি ও বৌদ্ধ যুগের ধর্ম্মপ্রচারকাহিনী মানবেতিহাসের অতি মূল্যবান্ বস্তু। মাতঙ্গের কাহিনী যেমনই অলৌকিক, মনোরম, তেমনই শিক্ষণীয় ও অমূল্য। তিনি যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক লোক; ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বের এই কাহিনী সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়াই আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে হইল। মাতঙ্গের অতুলনীয় প্রচারকার্য্যাদির ইতিহাস একটি মনোরম কাহিনী। তাঁহার দ্বারাই বৌদ্ধধর্ম্মের মহাবৃক্ষের বীজ চীনদেশে প্রথম উপ্ত হইয়াছিল। আজ তাহারই ছায়ায় বসিয়া কোটি কোটি চীনবাসী শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। সে সকল অলৌকিক ঐতিহাসিক তথ্য ও কাহিনী আমরা উল্লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃপায় জানিতে পারিতেছি। অদ্বিতীয় পণ্ডিত রেভারেণ্ড সেমুয়েল বিল তাঁহার বিখ্যাত "বৌদ্ধসাহিত্য" নামক গ্রন্থে, চীন-সম্রাট বিখ্যাত হন্ বংশচরিতের "মিং তাইপেন্ নিউচৌএন্" (Ming Tipen niu-Chouen) অধ্যায়ের আখ্যায়িকা অংশে ঐ সকল কাহিনী লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে মাতঙ্গ চীনদেশে গমন করেন। পূর্ব্বাপর খ্যাতিসম্পন্ন যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ৬০ বা ৭০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বাহিরে যাইতে সমর্থ হয়েন নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আচার্য্য নন্দ, কার্য্যকলা ও তৃতীয় শতাব্দীতে আচার্য্য ধর্ম্মকলা প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত চীনদেশে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার, পুথি লিখন ও মূল বহির অনুবাদকার্য্যে সময় নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির প্রামাণ্য ইতিহাস নাই, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যাবলী ও আনুষঙ্গিক ঘটনা দ্বারা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহারা এবং অন্যান্য সকলেই পরিণত বয়সেই বহির্ভারতে গমন করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর জগদ্বরেণ্য পণ্ডিত দীপঙ্কর যখন ভারতের বাহিরে গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স পূর্ণ ৬০ বৎসর হইয়াছিল। শিক্ষা ও সাধনা সম্পূর্ণ করিতে জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাইত, পরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইলেই তাঁহারা বিদেশে গমন করিতেন। এই হিসাবে অনুমান করা যায় যে, যীশু ও মাতঙ্গ উভয়ে এক সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে গমন করেন; সেই সময় তাঁহার বয়সও ৬৭ বৎসর হইয়াছিল অনুমান করিলে কোন দোষ হয় না; হয় ত এক শুভদিনে শুভক্ষণে এসিয়ার পশ্চিম প্রান্ত ও পূর্ব্ব প্রান্ত এই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদ্বয়ের জন্ম ও কার্য্যক্ষেত্ররূপে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, পশ্চিম সীমান্তে ও পূর্ব্ব সীমান্তে উভয়েই জীবোদ্ধার ও সর্ব্বজীবের কল্যাণে জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

মাতঙ্গই চীনরাজ্যে সদ্ধর্ম্মের বীজ সর্ব্বপ্রথম বপন করেন। চীনের তিনি উদ্ধারকর্ত্তা। রাজ্যেশ্বরদিগের তুল্য সম্মান যে তিনি পাইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ইহাই যথেষ্ট যে, এই বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারক, মুণ্ডিতমস্তক, নগ্নপদ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ ও জীবনকাহিনী সম্মানের সহিত সযত্নে রাজবংশ-চরিতমধ্যে ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। উক্ত হন্ রাজবংশ-চরিতের "মিং তাইপেন্ নিউ চৌএন্" অধ্যায়টি একমাত্র তাঁহার ও আনুষঙ্গিক কাহিনীতে পূর্ণ। ঐ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, চীনরাজ্যের প্রথম সম্রাট আখ্যাপ্রাপ্ত রাজা "চেঙ্ ওয়াঙের" রাজত্বকালে, এমন কি, ২২১ খৃষ্টাব্দপূর্ব্বে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারচেষ্টা তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। কথিত আছে যে, তেহ্ রাজবংশের পঞ্চম সম্রাট বিখ্যাত চোওয়াঙের ২৬ বৎসর রাজ্যান্তে চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে এক দিন

অত্যুজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয়। সে স্বর্গীয় আলোকের দীপ্তিতে সমগ্র চীনদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে চীন-সম্রাট রাজসভাস্থ জ্যোতির্বীদিগকে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের চীনরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। এই দিব্য জ্যোতিঃ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই স্বর্গীয় আলোক সেই শুভ সংবাদ পৃথিবীতে প্রচার করিতেছে।" তাঁহারা আরও বলিলেন যে, "এক হাজার বৎসর পরে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম চীনদেশে প্রচারিত হইবে।" সম্রাটের আদেশে এই অলৌকিক ব্যাপার ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই রাজকীয় স্মারক-রোজনামা গ্রন্থে লিখিত হয়। ঐ বৎসরেই অর্থাৎ ৬২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। উক্ত রোজনামা গ্রন্থের অপর এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, হন্ রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাট মিং-তাই, তাঁহার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে, তিনি যখন তাঁহার সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগে রাজধানী লো-ইয়াঙে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোন শুভক্ষণে সম্রাট স্বপ্নে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ যেন চন্দ্র-সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং সেই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি-র্ম্মধ্যে সুবর্ণ-বর্ণ এক উজ্জ্বল দীর্ঘায়ত-দেহ, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি যেন স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকের উপর অবতীর্ণ হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার সিংহাসনের নিকট আসিলেন।" পরদিন অতি প্রত্যূষেই সম্রাট মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন ও উহার অলৌকিকত্ব বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সভামধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী "ফু-ইয়ে" (Fu-yih) সম্রাটকে বলিলেন, "তিনি পূর্ব্বদেশে বুদ্ধাবতারের কথা শুনিয়াছেন; সর্ব্বজীবের ত্রাণের জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়া তিনি ভারত-বর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এই স্বপ্নের সহিত নিশ্চয়ই সে বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।" তিনি আরও বলিলেন, "সম্রাটের স্বপ্নের অনুরূপ কোন মহাপুরুষের জন্মকথার ভবিষ্যদ্বাণী রাজকীয় পুথিতে লিখিত আছে।" এ কথা শুনিয়া সম্রাট রাজকীয় গ্রন্থশালায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার ফলে অনুরূপ লিখিত বিবরণ পাইয়া অত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে মন্ত্রীর সহিত একত্র গণনা করিয়া দেখিলেন, লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী, "এক হাজার বৎসর কথার সহিত মিলিয়া গিয়াছে, ঠিক ঐ সময় ১ হাজার ১০ বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট ও রাজকীয় গ্রন্থে লিখিত বিবরণ এরূপ আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া যাওয়ায়, সম্রাট আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে নিরত হইলেন।

অতঃপর ৬৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও চতুর "ওয়াং স্থনের" (Wang-tsun) কর্তৃত্বাধীনে ১৮ জন কর্ম্মচারী বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মধ্য-এসিয়ার পথে গমন করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাতার ও বাক্‌ট্রিয় গ্রীক্‌দিগের রাজ্যের ভিতর দিয়া ভারত-বর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই পরে আচার্য্যশ্রেষ্ঠ মাতঙ্গ প্রভৃতিকে চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই জানিলেন, তৎকালে মগধের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মাতঙ্গ ও তাঁহার সহচর সুবর্ণ ও ধর্ম্মানন্দ। চীন-রাজদূতগণ ইহা অবগত হইয়া তাঁহাদের সহিত পরিচিত হই-বার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

মাতঙ্গ মধ্যভারতে কাশ্যপগোত্রীয় কোন প্রাচীন ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন; বাল্যেই তাঁহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন বালকের অনন্যসাধারণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বালকের উচ্চাঙ্গের শিক্ষায় ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিয়াছিলেন। বালক অত্যন্ত মেধাবী এবং তাঁহার বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগ যথেষ্ট দেখা গিয়াছিল। যৌবনারম্ভেই তাঁহার পাণ্ডিত্যযশে দেশবিদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সাধারণ বিদ্যার্থীর ন্যায় সাধারণভাবে পাঠাভ্যাস করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তিনি তাঁহার অনন্য-সাধারণ শক্তির প্রভাবে জটিল গ্রন্থাদির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে মনোনিবেশ করিতেন, নতুবা তাঁহার তৃপ্তি হইত না। জ্ঞানার্জ্জন-পিপাসা-নিবৃত্তির আশায় তিনি আর্য্যাবর্ত্তের বিখ্যাত বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করেন। এই সময় তাঁহার যশে আকৃষ্ট হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ও প্রজা তাঁহাকে তাঁহাদের রাজ্যে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছিলেন। "সুবর্ণ-প্রভাস" সূত্রের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য তাঁহার মুখে শুনিবার জন্যই তাঁহাদের এই চেষ্টা

পর সম্রাট মানবের অকল্যাণ, অপবিত্র ও মিথ্যা "তাও" ধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত "সেলন" (Selon) ও "চুসেন" (Chhushen) দ্বয়কে জীবন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিবার আদেশ দেন। তাঁহাদের অগ্নিদগ্ধ পুথিগুলির সহিত একই অগ্নিতে তাঁহাদিগকে জীবন্ত দাহ করা হইয়াছিল।

এই অলৌকিক ঘটনার পর সিদ্ধাচার্য্য মাতঙ্গ ও তাঁহার সহচর পণ্ডিতদিগের যশে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ঐ দিনই সম্রাট, মন্ত্রিগণ এবং অপরাপর বহু লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোন্ শ্রেণীর লোক কত জন ঐ সময় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার যথাযথ হিসাব ও বিবরণ উক্ত পুথিতে লিখিত আছে। "তাও" ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত দেখিয়া সম্রাট এই সময় একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

"সিংহের গুণাবলী শৃগালে থাকিতে পারে না।

মশালের আলোক কখনই সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোকের তুল্য হইতে পারে না।

হ্রদ মহাসাগরের ন্যায় পৃথিবী বেষ্টন করিতে পারে না।

সুমেরুর মহিমা বা সৌন্দর্য্য অপর কোন পর্ব্বতের নাই।

পবিত্র ধর্ম্মের মেঘমালা জীবের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে এবং বারিবর্ষণ করিয়া পবিত্র বীজ হইতে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ফল দান করিবে।

পূর্ব্বে কখন যাহা ছিল না, এখন তাহা প্রকাশিত হইবে।

অতএব চারিদিক হইতে যাবতীয় প্রাণী জন্মীর কাছে উপস্থিত হও।"

এই সময়ের অতি মনোরম এবং কৌতূহলোদ্দীপক অলৌকিক ঘটনাসমূহ এইরূপে বর্ণিত আছে :—

এই অগ্নিপরীক্ষাকালে সিদ্ধাচার্য্য বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যাননিমগ্ন ও যোগাসনে উপবিষ্ট; ও দিকে "তাও" ধর্ম্মপুস্তকগুলি অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল, "তাও" পুরোহিতগণের জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকগুলি অগ্নিস্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। তখন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিতেছিল, ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি হইতে লাল, নীল, লোহিত প্রভৃতি পাঁচটি মূল উজ্জ্বল আভা বাহির হইয়া রামধনুর উজ্জ্বলবর্ণে পরিণত হইল। সে উজ্জ্বল পঞ্চবর্ণের আলোক ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া বিস্তৃত চন্দ্রাতপের মত সমগ্র জনমণ্ডলীর উপর আচ্ছাদনস্বরূপ অবস্থান করিয়া রহিল এবং সূর্য্যমণ্ডলের বেষ্টনীর ন্যায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল রশ্মিজাল মণ্ডলাকারে বুদ্ধমূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া দিব্যালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছিল। এই সময় আকাশ হইতে জনমণ্ডলীর মস্তকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। এই অলৌকিক ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া জনমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময় বুদ্ধমূর্ত্তি-সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট সিদ্ধাচার্য্য মাতঙ্গের ধ্যাননিরত দেহ ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে আকাশে অবস্থিত হইল। নিম্নস্থ জনগণ দেখিলেন, মাতঙ্গ অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ইচ্ছামত শূন্যে আকাশে কখন হাটেন, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া যান এবং শূন্যেই নিদ্রায় মগ্ন হয়েন। মাতঙ্গ যখন এই অবস্থায় শূন্যে অবস্থিত, তখন তাঁহার সহচর সুপণ্ডিত সুবক্তা ধর্ম্মানন্দ উপস্থিত জনগণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন। ঐ সময় দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তী কালের হিত ও বিশ্বাসের জন্য সম্রাটের আদেশে এই ঘটনার যথাযথ বর্ণনা এবং দীক্ষিতদিগের পদবী, শ্রেণী এবং সংখ্যাদি অতি পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত হয়। সেমুয়েল বিলের পুথিতে তদবলম্বনে যথাযথ হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে :—

সর্ব্বাগ্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন সম্রাট স্বয়ং, তিনি শিক্ষার্থী ভিক্ষুশ্রেণীতে ভুক্ত হইলেন। তাহার পরই তাঁহার মন্ত্রিগণ দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাহার পর রাজান্তঃপুরিকাগণ, রাজমাতা, মহিষীগণ ও তাঁহাদের সহচরীবৃন্দ এবং সম্রাটের প্রাসাদের প্রধান কর্ম্মচারী "সিউ" মোট ১ শত ৯০ জন দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সকলেই "চ্যাকিয়া" (Chuhkia) সাধারণ শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকা-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইঁহাদের দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী, সৈন্য ও শাসন-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী, এই দলে ২ শত ৬৮ জন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর চতুঃশেখর নামধেয় "তাও" ধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ জনগণ, লুহ্‌ইন্‌টং (Lu-hwin-tong) প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর জনগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই দলে ৬ শত ২০ জন ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজধানীস্থ রাজকীয় প্রাসাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ দীক্ষা গ্রহণ করেন, ইহাদের সংখ্যা ৫শত ৯১জন। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণ দলে দলে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন।

মাতঙ্গ ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া নিয়ে তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের এই অশ্রুতপূর্ব্ব দীক্ষাব্যাপার নিয়মিত করিতেছিলেন।

বিদেশে ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে অপর একটি ধর্ম্মের প্রচার ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ঠিক এই সময়ে মহাপুরুষ যীশু ও তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণ মানবের ত্রাণের জন্য খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। এসিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে সেই মহাকল্যাণকর চেষ্টা ও উদ্যম এবং ঐ একই সময়েই ভগবান্ বুদ্ধের "জীবে করুণা" ধর্ম্মের বাণী লইয়া মাতঙ্গদেব এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে সদ্ধর্ম্ম প্রচার ও জীবের কল্যাণে প্রাণপাত করিতেছিলেন; তুলনায় সফলতা মাতঙ্গকেই জয়মাল্য দিয়াছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রাজপ্রাসাদস্থ মহিলাগণ—যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথারীতি মস্তকমুণ্ডন করিয়া সংযম ও ব্রতপালনে ৩০ দিন অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক দিন তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক ও ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে বিবিধ পূজা-সামগ্রী উপস্থিত করিয়া পূজার্চ্চনায় রত থাকিতেন, ব্রত উদ্‌যাপনান্তে তাঁহারা নগরের বাহিরে ৭টি ও নগরের ভিতরে ৩টি এই ১০টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, বাহিরের মন্দিরগুলি পুরোহিতদিগের অবস্থানের জন্য ও নগরের ভিতরের মন্দির কয়টিই নারী উপাসিকাদের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সম্রাটও এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার জন্য সঙ্কল্প করিয়া বিখ্যাত বৃহৎ হেনান্‌ফু (He-nan-fu) গড়ের (কিল্লা) বিস্তীর্ণ ভূমিতে ৭টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মধ্যে "পিইমাসি" (Pei-massi) নামক মন্দিরটিই প্রধান মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত উপাসিকা ব্রহ্মচারিণীদের অবস্থানের জন্য আরও ৩টি বাসাগার ও ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্য্য মাতঙ্গের এই প্রচার ও দীক্ষাকালের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা রাজমন্ত্রিগণের সহস্রাধিক অনুচর সহ ভিক্ষুবেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ। সম্রাট রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার-বিষয়ে নানাবিধ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতরা সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় ও জনসাধারণমধ্যে প্রচারকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া শিক্ষাদান এবং দীক্ষাকার্য্যে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

একদা সম্রাট মাতঙ্গ ও তাঁহার সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমার এই বিস্তৃত রাজ্যমধ্যে কোনও স্থানে কি কোন সিদ্ধ দেবতার অবস্থান নাই—যাঁহার কৃপায় রাজ্যের কল্যাণ ও রক্ষা হইতেছে?" উত্তরে মাতঙ্গ বলিলেন, "হাঁ, আর্য্য মঞ্জুশ্রী রেবসেনা (Revatsena) নামক স্থানে পঞ্চাগ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থান করিতেছেন।" আর্য্য মঞ্জুশ্রীর আবাসস্থানের বর্ণনা করিয়া তিনি তাঁহার সহচর পণ্ডিত সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানটির অনুসন্ধানে বাহির হয়েন। বহু পরিশ্রমের পর তাঁহার দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে আর্য্য মঞ্জুশ্রীর মন্দিরের খোঁজ পাইয়া তথায় যাইয়া যথারীতি পূজার্চ্চনাদির পর ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটের নিকট এই শুভ সংবাদ প্রদান করেন।

সম্রাট অশোক যখন ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ চৌরাশী সহস্র অংশে বিভাগ করিয়া সমগ্র পৃথিবীময় চৈত্য ও বিহার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন, সেই সময় আচার্য্যশ্রেষ্ঠ উপগুপ্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে এই রেবসেনাতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বিশুদ্ধ এক খণ্ড দেহাবশেষের উপর যে বৃহৎ চৈত্য নির্ম্মিত হয়, তাহাই আর্য্য মঞ্জুশ্রীর অধিষ্ঠানস্থান। এই তথ্য অবগত হইয়া চীন-সম্রাট মাতঙ্গের উপদেশমত সেই পুরাতন চৈত্যের উপর একটি সুরম্য বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করান, ঐ মন্দিরই "টাবোথা খোরতেন" (Tabotha Chhorten) নামক বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরের নিকট সম্রাটের আদেশে বহু ব্যয়ে চীনরাজ্যের বিখ্যাত ভজনাগার এবং ভিক্ষু ও শ্রমণদিগের জন্য আবাসভবন নির্ম্মিত হইয়া তথায় কত কাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছে। মাতঙ্গ ও তাঁহার বন্ধু পণ্ডিতদ্বয় কেবল ধর্ম্মপ্রচার এবং দীক্ষাদান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহারা কোটি কোটি মানবের ত্রাণ ও শান্তিদায়ক বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন সে দেশে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। কথিত আছে, মাতঙ্গদেবই অতি আয়াসসাধ্য ধর্ম্মসূত্রের ৪২ ধারা সমগ্রই অনুবাদ করেন এবং সুবর্ণের সহিত একযোগে আরও পাঁচখানি বৃহৎ সূত্রপুঁথি অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজধানীতে অবস্থানকালে সুপণ্ডিত সুবর্ণ সুবিখ্যাত "দশভূমি" পুঁথির সমুদয় সূত্র অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালাদেশে আরও পাঁচখানি সূত্রগ্রন্থ

অনুবাদ করিয়া ইঁহারা উভয়ে চীনভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রে মহাত্মা মাতঙ্গের ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়; এই সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহাযান শাখার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ভারত হইতে উত্তরদেশ সমূহে হইতেছিল। তখন মধ্য-এসিয়ায়, গান্ধার, উর্জ্জেন, কাস্‌গর, বহ্লিক ও খোটান প্রভৃতি প্রদেশে মহাযান শাখাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মহাযানই ক্রমে এসিয়া মহাদেশের সমগ্র উত্তরভাগ ও ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধে—অদূর-ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তাই তাঁহারা সেই দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস যে তাঁহাদের দৃঢ় ছিল, ইহা তাঁহাদের অনুবাদ গ্রন্থগুলি হইতেই বুঝা যায়। বিখ্যাত গ্রন্থ "দশভূমি" ও ধর্ম্মসূত্র পুথিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। উক্ত গ্রন্থগুলি মহাযান শাখার অন্তর্গত, সমস্তই সংস্কৃতে লিখিত, কিন্তু হীনযান শাখান্তর্গত পুথিগুলি পালি ভাষায় লিখিত। তাঁহারা পালি ভাষা হইতে কোন পুথি অনুবাদ করেন নাই। এই ভাবে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত মূল হইতে মহাযান শাখার বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচার করিয়া সে দেশে মহাযান শাখার প্রাধান্যস্থাপনে সাহায্য করেন এবং তাঁহাদেরই এই চেষ্টার ফলে ক্রমে মহাযানই চীনরাজ্যের রাজকীয় ও জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।

মাতঙ্গের শেষ জীবন তাঁহার সেই সুদূর কার্য্যক্ষেত্রেই অবসান হয়, এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এমন মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আবশ্যক। আমাদের দেশে কোন পূর্ণাঙ্গ পুথি লিখিত হইয়া থাকিলেও তাহা লুপ্ত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অখণ্ড সাগর তুল্য পূর্ব্ব-মহাদেশের অনুবাদ-গ্রন্থ সমূহ পাঠে এবং চীনদেশে বিশেষভাবে অনুসন্ধান জন্য যদি কোন শ্রদ্ধেয় গবেষক গমন করিয়া এই রত্ন উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক এই অনন্তসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনকাহিনী কেবলমাত্র আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ্‌-স্বরূপ হইবে, তাহা নহে, সমগ্র সভ্যজগতেই এক মহামূল্য বস্তুতে পরিণত হইবে। মাতঙ্গ ও তাঁহার সহচরদ্বয়ের জীবলীলা সে দেশেই শেষ হইয়াছিল, ইহা খুবই সম্ভব। অতি-বার্দ্ধক্যে সে দূরদেশ হইতে দুর্গমপথে ফিরিয়া আসা সম্ভব নহে, আমাদের বিশ্বাস, চীন-রাজধানী পিকিং বা লাইওয়াঙে বা তাহার উপকণ্ঠে মাতঙ্গের দেহাবশেষ কোন চৈত্য বা বিহারে প্রোথিত আছে এবং আজিও হয় ত সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সার ওরেন্‌ ষ্টাইনের ন্যায় কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের চেষ্টায় ইহা হয় ত আবিষ্কার হইতে পারে। কেন না, কৃতজ্ঞ চীনাবাসী তাঁহাদের এমন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতার চিহ্ন মঠ, মন্দির বা পুথিতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ।

বেলা-শেষে

অম্বরে বিরাজে রবি—নিম্নে বহে নদী,
সিন্ধু হ'তে প্রতিহত হয়ে নিরবধি—
তরঙ্গ-বিহীনা লাজে পুনঃ ফিরে আসে;
পিপাসিতা ঊর্দ্ধে ধীরে—চাহে লাজে—ত্রাসে।
কার ওই অনিমিখ আঁখি মনোহর—
অভিনন্দিছে তারে—বর্ষি' নিরন্তর
মধুর কিরণ-ধারা? নীরব আহ্বানে—
কে বাঁচায় তারে—সঞ্জীবনী-সুধা-দানে?

হে রবি তরুণ, তুমি এমনি করিয়া
যুগে যুগে আসি, নভঃপটে উদ্ভাসিয়া—
স্নিগ্ধ হও—অবহেলে করি সমর্পণ
দুর্বিনীতা তটিনীরে—তোমার কিরণ!
উজাড়িয়া দাও ঢালি—ভূষণ-হীনারে,—
শ্রী-বিভূষিতা রবি! করো তুমি তারে।
লহরে লহরে লয়ে ময়ূখ তোমার
যাক্ বহে; ধন্য হোক্ পুলকে অপার।

তার পর—বেলা-শেষে, অস্তাচলে চলি'—
হে তপন, হে মধুর, তুমি গেলে চলি,—
হৃত-বৈভবা পুনঃ—ভিখারিণী-সাজে
কাঁদিবে একেলা সেই নিরালায় সাঁঝে॥



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মোজের জাল বিস্তার

মোজের কথা শুনিয়া কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মোজে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু তাহার অবাধ্য হইতে তাঁহার সাহস হইল না, এই জন্য তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে, তোমার বাসায় গিয়া দেখা করিব।"—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার ইয়ারদের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করা দূরের কথা, কিরূপে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ ওরফে ক্লড ওপেন্‌হেম সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, তিনি কিরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত, কপট ও প্রতারক, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের অবিদিত নহে। যাহার প্রকৃতি এইরূপ হীন, প্রবৃত্তি এই প্রকার জঘন্য, চরিত্র এত দূর কলুষিত, সে রাজনন্দন হউক আর ভিখারী হউক, সকলেরই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পাত্র। কাউণ্ট নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলিতে পারিতেন না; বনিয়াদী ঘরের ছেলে হইলেও তিনি দরিদ্র—এ কথা ভুলিয়া নানা প্রকার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং সেই অর্থ দুই হাতে উড়াইতে না পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। জুয়ায় তিনি কখন কখন লাভবান্ হইলেও অধিকাংশ সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন; এই জন্য উত্তমর্ণের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিতেন না, কিন্তু লোক ভুলাইবার শক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া কখন তাঁহার অর্থাভাব হইত না। তিনি কোন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতেন না।

কাউণ্ট রুসিয়ায় মোজের নিকট প্রচুর অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধ না করিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন, এখানে হঠাৎ মোজেকে আসিতে দেখিয়া তিনি ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মোজে কেবল তাঁহার উত্তমর্ণ নহে, তাঁহার সকল গুপ্ত কথাই তাহার সুবিদিত। এই জন্য তিনি সেনানিবাসে প্রত্যাগমন করিয়া, মোজের কবল হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় কাপুরুষ আত্মহত্যা করিতে পারে না, তিনিও কিছুকাল চিন্তার পর এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, স্থির করিলেন, মোজের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। লজ্জা ও ভয় দুর্ব্বলতার নিদর্শন মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

এইরূপ নানা চিন্তায় দুই দিন অতিবাহিত করিয়া কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ তৃতীয় দিন তাঁহার 'বন্ধু' রডলফ মোজের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাহার আফিসে উপস্থিত হইলেন। মোজে তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার সময় পাইয়াছ দেখিতেছি!"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, সময় পাইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে?—বন্ধুবৎ না শত্রুবৎ?"

মোজে বলিল, "ইহা তোমারই ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে; একটা চুরুট দিব কি? আমার চুরুটগুলি তোমার চুরুট অপেক্ষা অনেক ভাল, আমি বাজে চুরুট ব্যবহার করি না।"—সে চুরুটের বাক্সটি কাউণ্টের সম্মুখে রাখিল।

কাউণ্ট একটি চুরুট তুলিয়া লইয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মূল্যবান্ আসবাবপত্রের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া তুমি বেশ গুছাইয়া লইয়াছ বোধ হইতেছে!"

মোজে বলিল, "বোধ হইতেছে? হাঁ, বোধ হওয়াই চাই। ভিতরে যতই গলদ থাক, বাহিরের ভড়ংটা ঠিক রাখা দরকার। কিন্তু সে কথা যাক, তোমার সঙ্গে বহু দিন পরে দেখা হইল; এত দিন কি করিয়া কাটাইলে? আবার বিবাহ করিয়াছ না কি?"

মোজের প্রশ্নে কাউণ্ট ঈষৎ বিব্রত হইয়া বলিলেন, "না। আবার বিবাহ? রুসিয়ার সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর—"

মোজে নাক দিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "হাঁ, অপ্রীতিকর ঘটনাই বটে!"

কাউণ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোজের মুখের দিকে চাহিয়া, একটু বিদ্রূপহাস্যের আভাস লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার কথার তুমি যে অর্থই কর, আমার পক্ষে সত্যই তাহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই ঘটনার বেদনাপূর্ণ স্মৃতি চিরদিন আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিবে।"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া মোজে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর সরোষে বলিল, "তুমি একটা নর-পশু! তোমার এই সখের কান্না শুনিয়া তোমার গালে একটা থাপ্পড় মারিতে ইচ্ছা হইতেছে। সেই সুশীলা, সরলহৃদয়া, সুন্দরী মেয়েটিকে কপটপ্রেমে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ করিলে, নানা কৌশলে তাহার পিতার বহু অর্থ শোষণ করিলে, তাহার পর তাহাকে ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিলে, তোমার ঠিকানাটা পর্য্যন্ত জানাইলে না; অভাগীর মুখের দিকেও চাহিলে না। এখন ন্যাকামী করিয়া বলিতেছ—তাহার স্মৃতি তোমার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিবে! ধিক্!"

মোজের তিরস্কারে আহত হইয়া কাউণ্ট মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "তুমি যে তাহাদের ওকালতী আরম্ভ করিলে! তবে কি আমার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করাই তোমার উদ্দেশ্য?"

মোজে অপ্রসন্নভাবে বলিল, "তোমার সঙ্গে শত্রুতা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও এখনও তোমাকে বন্ধু মনে করিবার কি কারণ আছে, জানি না!"

কাউণ্ট এ কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "আমি কি জন্য তোমাদের অজ্ঞাতসারে রুসিয়া হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা এরূপ মন্দ হইত না। আমি তোমার বন্ধু-কন্যাকে সত্যই ভালবাসিতাম; তাহার বিরহে আমার প্রাণ এখনও হাহাকার করে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে রুসিয়া হইতে—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া মোজে সরোষে বলিল, "ও সকল বাজে কথায় আমাকে অনর্থক ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ! আমি তত নির্ব্বোধ নহি। তুমি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, শত্রুবৎ না মিত্রবৎ? আমি বলিয়াছি—তাহা তোমার ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি তুমি আমাকে লাঙ্গুলহীন একটি দ্বিপদ গর্দ্দভ মনে করিয়া, আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইব।—আমার কথাটা স্মরণ রাখিলে ভবিষ্যতে তোমাকে পস্তাইতে হইবে না।"

কাউণ্ট বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না! তোমাকে লাঙ্গুলহীন দ্বিপদ গর্দ্দভ মনে করিয়াছি ভাবিয়া তুমি কেন ক্ষুণ্ণ হইতেছ? আমি জানি, তুমি গর্দ্দভ অপেক্ষা অনেক অধিক বুদ্ধিমান্ এবং শৃগাল অপেক্ষা ধূর্ত্ত।"

মোজে বলিল, "তোমার যদি এইরূপই ধারণা হইয়া থাকে, তবে আমার কাছে চালবাজি করিও না। তুমি কত বড় পাপিষ্ঠ, তাহা ত তুমি জান; আমার কাছে সাধুগিরি ফলাইও না। যে সকল অপরাধ করিয়াছ, তাহা গোপন করিয়া নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিও না।"

কাউণ্ট বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে যেরূপ পাপিষ্ঠ মনে করিতেছ, যদি আমি সেইরূপই হই, তাহা হইলে কি তুমি আমায় ফাঁসী দিবে?"

মোজে হো হো শব্দে হাসিয়া বলিল, "আমার সে শক্তি থাকিলে হয় ত দিতাম, কিন্তু সে অভিসন্ধি আমার নাই; তুমি আমার সহিত সরল ব্যবহার করিলে আমাদের কাযের সুবিধা হইবে। অপরাধ স্বীকার করিলে আত্মার উন্নতি হয়, পাদরী তারাদের এই উক্তি কি তোমার অজ্ঞাত?"

কাউণ্ট বলিলেন, "পাদরী বেটাদের অনেক বচন আমার জানা আছে; কিন্তু তুমি আমি যখন একই ক্ষুরে মাথা মুড়াইয়াছি, তখন আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার তোমার কি অধিকার আছে?"

মোজে হাসিয়া বলিল, "তা বটে, কিন্তু তুমি স্বভাবতঃই একটি নরপিশাচ, আর আমি ঘটনাচক্রে সয়তান হইয়াছি; নতুবা আমার এইরূপ অধঃপতন হইত না।"

মোজের কথা শুনিয়া কাউণ্ট সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখ মোজে, আমি এখানে এ ভাবে অপমানিত হইতে আসি নাই। পুনর্ব্বার ঐরূপ

অপমান-সূচক কথা বলিলে আমি তোমাকে খুন করিব। হাঁ, গুলী করিয়া মারিব।"

কাউণ্ট প্রস্থানোদ্যত হইলেন; তাহা দেখিয়া মোজে তাঁহার হাত ধরিয়া সম্মুখে আকর্ষণ করিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "যাইবে কোথায়? আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িলেই কি আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? সে আশা ত্যাগ কর, বন্ধু! বাহিরের লোকরা তোমাকে কাউণ্ট ভন আয়েনবর্গ বলিয়া খাতির করিতে পারে; কিন্তু আমি তোমার খাতির করিব কেন? আমি তোমার কোন্ খবরটা না জানি? তোমার ধাপ্পায় ভুলিব—সে পাত্র আমি নহি। আমার সঙ্গে চালাকী করিলে আমি তোমার কি দুর্দ্দশা করি,—তাহা পরে জানিতে পারিবে।"

মোজের কথায় কাউণ্ট ভয় পাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

মোজে বলিতে লাগিল, "আগে আমার কথাগুলি মন দিয়া শুন; অনর্থক উত্তেজিত হইয়া লাভ নাই। তুমি স্বেচ্ছাক্রমেই হউক, আর ভ্রমক্রমেই হউক, যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছ, তাহা প্রকাশিত হইলে সমাজে বাস করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। যদি তুমি আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার গুপ্ত কথা গোপন রাখিব। আমি টাকা চাই; তাহা লাভ করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন অপকার্য্যেই আমি কুণ্ঠিত নহি। তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছ; যদি প্রয়োজন হয়, এখনও তোমাকে আরও কিছু টাকা দিতে পারি; কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমাকে কতকগুলি শিকার সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। তোমার সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গের নিকট আমাকে পরিচিত করিবে।—তোমার সাহায্যে আমি তাহাদিগকে শোষণ করিব। বুঝিয়াছ?"

কাউণ্ট মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বেশ বুঝিয়াছি। তোমার উদর পূর্ণ করিবার জন্য শিকার ধরিয়া আনিয়া তোমার ফাঁদে ফেলিব। ইহাই তোমার প্রস্তাব।"

মোজে।—কথাটা একটু ভদ্রভাবে বলিলে ঐরূপ শ্রুতিকটু হয় না। অনেক বড়লোকের ছেলে টাকার অভাবে কষ্ট পায়; আমি টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিতে প্রস্তুত আছি। তাহার পর তাহারা সুদে-আসলে সেই ঋণ পরিশোধ করিবে; তবে সুদটা আমি পোবাইয়া লইব। সামরিক কর্ম্মচারীদের টাকা কর্জ্জ দেওয়ায় লাভ আছে, এই জন্যই তোমাকে মুরুব্বী ধরিতেছি।"

কাউণ্ট বলিলেন, "কিন্তু কার্য্যতঃ তুমিই আমার মুরুব্বী হইয়া বসিয়াছ!

মোজে।—ও একই কথা। তুমি রুসিয়ায় কেবল বাক্‌চাতুরীতে বড়লোকগুলাকে ভুলাইয়া যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে, তাহা দেখিয়া তোমার শক্তির প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতাম। তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা! আমার পক্ষাবলম্বন করিয়া এ দেশেও সেই ক্ষমতার পরিচয় দাও; তাহাতে তোমারও লাভ আছে।

কাউণ্ট।—অর্থাৎ আমাকে লুঠের কিঞ্চিৎ বখরা দিবে।

মোজে।—লুঠ বলিতেছ কেন? কথাগুলি মোলায়েম করিয়া বলিতে শিখিলে না?—আমি তোমাকে লাভের বখরা দিব।

কাউণ্ট।—বেশ কথা। আমি শিকার ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দিবে বলিলে না? আজকাল আমার টাকার বড় অভাব।—আমিই তোমার প্রথম শিকার হইতে চাই।

মোজে বলিল, "অর্থাভাবটা তোমার চিরস্থায়ী ব্যাধি! তোমার এই ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে শুনিলেই বিস্মিত হইতাম। যাহা হউক, তোমাকে যখন বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলাম, তখন তোমার অভাব দূর করাই কর্ত্তব্য। তুমি কত টাকা লইবে?"

মোজে কি সত্যই তাঁহাকে টাকা ধার দিবে, না পরিহাসচ্ছলে এ কথা বলিতেছে? তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য কাউণ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মোজের মুখে বিদ্রূপের আভাস না দেখিয়া আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, "টাকা যত পাই—লইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তুমি ত তাহা দিবে না। তোমার সাধ্যই বা কত?—সে কথা থাক, তুমি আমাকে এক হাজার 'মার্ক' ধার দিতে পারিবে কি?"

মোজে বলিল, "উপযুক্ত সুদে টাকা ধার দিব—এক হাজার 'মার্ক' তোমাকে ধার দিতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

মোজে ডেস্কের উপর হাত বাড়াইয়া একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিল; মুহূর্ত্ত পরে তাহার আফিসের একটি কেরাণী তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।

মোজে তাহাকে গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাউণ্ট ভন

প্রদানের অঙ্গীকারে মহাজনদের নিকট টাকা লইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে টাকা ধার দিলে সে টাকা মারা যায় না। অপদস্থ হইবার ভয়ে, যে উপায়ে হউক, তাহারা ঋণ পরিশোধ করে। সামরিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই প্রকার কাউণ্ট বিস্তর আছে; কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের সাহায্যে এরূপ শিকারের অভাব হইবে না। মোজের সঙ্কল্প ছিল, এখানে সে অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য কোন অসাধু উপায় অবলম্বন করিবে না; সাধু উপায়েই সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে।—এই সাধু উপায়, অপরিমিত সুদে ঋণ দান!

যাহা হউক, কাউণ্ট তিন মাস পরে সাড়ে বারো শত 'মার্ক' প্রদানের অঙ্গীকারে হাজার 'মার্ক' কর্জ্জ লইয়া মনে করিলেন—তিন মাসে এই ঋণ পরিশোধ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না; কিন্তু তিন মাস দেখিতে দেখিতে তিন সপ্তাহের মত কাটিয়া গেল। তিনি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, মোজের ঋণ পরিশোধ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। টাকার জন্য পাছে মোজের নিকট অপদস্থ হইতে হয়, এই ভয়ে কাউণ্ট এক দিন মোজের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মোজে তাঁহাকে গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেনার টাকাগুলি দিতে আসিয়াছ বুঝি? বেশ, বেশ, তোমার যে সুমতি হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।"

কাউণ্ট মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "না, তা, কি বলে, ইয়ে—কতকগুলা টাকা একটা বাজে কাযে খরচ হওয়ায় তোমার প্রাপ্য টাকা কয়টি এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। বন্ধুজনের নিকট টাকা ধার লইয়া ঠিক সময়ে দিতে না পারা বড়ই লজ্জার বিষয়; কিন্তু ঐ যে বলিলাম—কি বলে, ইয়ে, তা, তা যদি দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু দিন সময় দাও, তাহা হইলে সেই সময়ের মধ্যে টাকাগুলা নিশ্চয়ই—"

মোজে বাধা দিয়া বলিল, "দিতে পারিবে, এ কথা শপথ করিয়া বলিতে রাজী আছ, ইহাই ত তোমার কথা? তোমার ঠোঁট নড়িতে দেখিয়াই আমি তোমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছি; এখন আমার মনের কথাটিও শুনিয়া লও। তুমি তোমার অঙ্গীকারানুযায়ী ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে না। উত্তম। টাকাগুলি আজ তোমার নিকট পাইলে আমি ঘরে ফেলিয়া রাখিতাম না, তোমার মত আর এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ধার দিতাম; তা মনে কর, টাকাগুলি তোমাকেই পুনর্ব্বার ধার দিলাম, সে জন্য সুদ দিতে হইবে ত। তুমি আমার প্রাপ্য সুদ মিটাইয়া দিলে তোমার পুরাতন দলীলের পরিবর্ত্তে নূতন দলীল লিখিয়া লইতে আমার এক বিন্দু আপত্তি নাই। তবে আর একটা কথাও এই সঙ্গে তোমাকে স্মরণ করাইতে চাই। তুমি তোমার পুরাতন বন্ধুর নিকট হইতে টাকাগুলি লইয়া সেই যে চম্পট দান করিলে, এই তিন মাসের মধ্যে কি একটিবারও আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ? কোনও দিন আমার সংবাদ লইয়াছ? এরূপ ব্যবহার অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন ভিন্ন আর কি? যাহা হউক, যদি আর তিন মাস সময় গ্রহণ কর, তাহা হইলে টাকাগুলি নিশ্চয়ই দিবে ত?"

কাউণ্ট বলিলেন, "নিশ্চয়ই পাইবে।"

বলা বাহুল্য, মোজে এ কথা বিশ্বাস করিল না। মোজে কাউণ্টের নিকট কায আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে যাহাই বলুক, সে তাঁহাকে ঘৃণা করিত; তাঁহাকে দুর্ব্বলচিত্ত, দাম্ভিক ও নির্ব্বোধ মনে করিত। কাউণ্টও মোজেকে যেরূপ ঘৃণা করিতেন, সেইরূপ ভয়ও করিতেন। তিনি জানিতেন, মোজে তাঁহার যে সকল গুপ্ত কথা অবগত আছে, তাহার সাহায্যে সে তাঁহাকে চূর্ণ করিতে পারে; অথচ মোজের কবল হইতে তাঁহার নিষ্কৃতিলাভের উপায় ছিল না। এই জন্য মোজের অসদাচরণ ধীরভাবে সহ্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু মোজেকে ভয় করিলেও, তিনি কোন দিন সতর্কতাবলম্বনের চেষ্টা করেন নাই; চরিত্রগত উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল। আমোদ ও স্ফূর্ত্তির লোভে কোন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। সদনুষ্ঠান দ্বারা প্রশংসাভাজন হওয়া তিনি মানসিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই বীরপুরুষের লক্ষণ বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। 'যে দিন সুখে কাটে, সেই দিনই ভাল'—এই নীতিরই তিনি অনুসরণ করিতেন। ঋণ করিয়া হউক, আর প্রতারণা করিয়াই হউক, অর্থসংগ্রহ করিয়া বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। হাতে টাকা নাই, অথচ আমীরী করিবার লোভ ছাড়িতে পারিতেন না। খাঁটি জার্ম্মাণের মত তিনি বাল্তি বাল্তি বিয়ার পান করিতেন; জুয়া খেলিতে পাইলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতেন। তিনি

সামরিক কর্ম্মচারী হইলেও সমর-বিভাগের কার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। আমোদ-প্রমোদেই তাঁহার সময় কাটিত। তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ছিল না, সে সুযোগও ছিল না; অমিতব্যয়িতার জন্য তিনি কখন ঋণ-শোধ করিতে পারিতেন না, সে জন্য বহু বার বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। মোজে যে আশায় তাঁহাকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহার সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় সে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে মোজে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। মোজের নিকট কাউণ্ট যে টাকা ধার লইয়াছিলেন, তাহা সুদে-আসলে তিন হাজার 'মার্ক' হইলে এক দিন মোজে তাঁহাকে ধরিয়া বসিল; বলিল, এবার তিনি ঋণ পরিশোধ না করিলে তাঁহাকে এরূপ শিক্ষা দিবে যে, তাহা তিনি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

মোজের কথা শুনিয়া কাউণ্টের চক্ষু দুইটি কপালে উঠিল, তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। কারণ, সেই সময় তিন হাজার 'মার্ক' সংগ্রহ করিয়া ঋণ পরিশোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু মোজে যখন টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন কাউণ্ট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং মোজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মোজে ধীরভাবে সেই তিরস্কার শ্রবণ করিল। তাহার পর সংযত স্বরে বলিল, "তোমার কথা শেষ হইয়াছে ত? এখন আমার কথা বলি। তুমি ক্রমাগত আমার সঙ্গে চালাকী করিয়া আসিতেছ; তোমার চালাকী আমি বুঝিতে পারি না—আশা করি, আমাকে তত দূর নির্ব্বোধ মনে কর না। আমি সব বুঝি এবং ঐ রকম ধাপ্পাবাজী পছন্দ করি না। আমার স্বার্থের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, তুমি আমার স্বার্থ প্রথম হইতে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছ; আমার সহিত তোমার যে চুক্তি ছিল—তাহা ভঙ্গ করিয়াছ। উত্তম, আমি তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিতে চাহি না; আমার ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ কর, আমার পাওনা মিটাইয়া দাও।"

কাউণ্ট বিকৃত স্বরে বলিলেন, "হাতে টাকা না থাকিলে কি চুরী করিতে যাইব? আমি তোমাকে বলিয়াছি, এখন তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমার অসাধ্য।"

মোজে বলিল, "তুমি চুরী করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবে কি না, জানি না, তাহা জানিবার জন্যও আমার আগ্রহ নাই। আমি তোমাকে টাকা ধার দিয়াছি, কথা ছিল, তুমি সাধ্যানুসারে আমাকে সাহায্য করিবে, মক্কেল জুটাইয়া দিবে, কিন্তু সেই অঙ্গীকার পালন কর নাই। আমার সাহায্য গ্রহণ করিবে, অথচ আমাকে সাহায্য করিবে না—এ রকম বখরাদারী আমার পোষাইবে না।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমার বন্ধু-বান্ধবদের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন না হওয়ায় এত দিন তোমাকে কোন মক্কেল জুটাইয়া দিতে পারি নাই, এ জন্য তুমি অসন্তুষ্ট হইও না; এবার তোমাকে কয়েকটি ভাল মক্কেল নিশ্চয়ই জুটাইয়া দিব। তুমি দলীলখানা বদলাইয়া দিয়া এ যাত্রা আমার সম্মান রক্ষা কর।"

মোজে বলিল, "নিজের সম্মান নিজে রক্ষা না করিলে পরে তাহা রক্ষা করে না। যাহা হউক, এবারও তোমার অনুরোধ রক্ষা করিলাম, কিন্তু ইহাই শেষ, তিন মাসের পর আর তোমাকে সময় দিব না এবং যেরূপে পারি, আমার প্রাপ্য টাকা আদায় করিব।"

কাউণ্ট পুরাতন দলীল পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন দলীলে স্বাক্ষর করিলেন এবং অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে মোজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মোজে নূতন দলীলখানি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

কাউণ্ট বাসায় ফিরিয়া অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন—যে উপায়েই হউক, মোজের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, কিন্তু কি উপায়ে তাঁহার এই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কোন ফন্দীই তাঁহার মাথায় আসিল না। তিনি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহাকে নিরাশ করিলেন না। কারণ, কয়েক দিন পরেই জুরিচ-নিবাসিনী বার্থা স্মিটের ভ্রাতার সহিত সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইল। এই বন্ধুত্বের কি ফল হইয়াছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

কাউণ্ট বুঝিতে পারিলেন, অর্থাগমের একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত, তিনি জুরিচে গমন করিয়া সহজেই বার্থার হৃদয় জয় করিতে পারিবেন। তাহাকে বিবাহ করিলে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন। এরূপ প্রকাণ্ড

'দাঁও' ছাড়িয়া দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি সেন্টপিটার্সবর্গে সলোমন কোহেনের কন্যা রেবেকা কোহেনকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ অবস্থায় তিনি কি করিয়া বার্থাকে বিবাহ করিবেন ? কথাটা প্রকাশ হইলে বার্থার সহিত তাঁহার বিবাহ অসিদ্ধ হইবে, তাঁহাকে অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হইবে, তাঁহার বিপদের সীমা থাকিবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া কাউন্ট কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিকে লাভের আশা, অন্য দিকে বিপদের আশঙ্কা, দুই বিপরীতমুখী চিন্তার আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার মন আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তাকুল চিত্তে জুরিচে উপস্থিত হইলেন। জুরিচে বার্থার জননীর বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদানের জন্য বুড়ী স্মিটের আগ্রহ দেখিয়া, কাউন্ট আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বার্থার অপরূপ রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হইয়া তিনি বার্থাকে বিবাহ করিলেন। মোজে ও সলোমন কোহেন এই সকল কথা জানিতে পারিলে তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবন কিরূপ বিড়ম্বনা-পূর্ণ হইবে, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি ভাবিলেন, "আমি জুরিচে আসিয়া গোপনে বিবাহ করিয়াছি, এ সংবাদ মোজে বা সলোমন কোহেন জানিতে পারিবে না। তাহারা আমার সন্ধান পাইবে না ; আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল পরমসুখে অতিবাহিত হইবে। রেবেকাকে বিবাহ করিয়া একটু ভুল করিয়াছি বটে, কিন্তু যৌবনকালে ও রকম ভুলভ্রান্তি অনেকেরই হইয়া থাকে ; উহা চিরদিন গোপন থাকিবে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধরা না পড়িলে আর ভয় কি ? অতীত জীবনের স্মৃতি অতীতের অন্ধকারে সমাহিত করিয়া যে নূতন পথ অবলম্বন করিলাম, এই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। আমার দুঃখদৈন্য-পূর্ণ অভিশপ্ত অতীত জীবনের কথা বিস্মৃত হইব। যদি নামটাও পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতাম ! কিন্তু নাম-পরিবর্ত্তন না করিলেও আশঙ্কার কারণ নাই ; বুড়া কোহেন ও রেবেকা আমার প্রকৃত নাম জানে না, তাহাদের নিকট ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া বড়ই বুদ্ধিমানের কায করিয়াছি। ওপেন্‌হেমই যে কাউন্ট ভন আয়েনবর্গ, এ কথা তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। ভাগ্যে বুদ্ধি খাটাইয়া ছদ্মনামে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলাম ! আর আমাকে ধরে কে ?"

কাউন্ট মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি জুরিচে আসিয়া বার্থাকে বিবাহ করিয়াছেন—এ সংবাদ মোজে জানিতে পারিবে না, কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা ছিল, মোজের ঋণ পরিশোধ না করিলে সুদখোর লোভী ইহুদীটা টাকাগুলি আদায় করিবার চেষ্টা করিবে এবং কোন উপায়ে তাঁহার জুরিচের ঠিকানা জানিয়া লইয়া টাকার তাগাদায় হয় ত এক দিন জুরিচে উপস্থিত হইবে। সে যাহাতে তাঁহার সন্ধানে জুরিচে না আইসে, তাহার ব্যবস্থা করাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন এবং বার্থাকে বিবাহ করিয়া বুড়ী স্মিটের নিকট যে টাকা যৌতুক পাইলেন, তাহা হইতে কতক টাকা মোজের নিকট পাঠাইয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি মোজেকে পত্র লিখিলেন—তিনি কার্য্যোপলক্ষে জুরিচে আসিয়া কোন ধনাঢ্য আত্মীয়ের অতিথি হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিলেন, ভবিষ্যতে তাহার সহিত তাঁহার আর কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না। তিনি তাহার সহিত যে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন, ঋণ পরিশোধ করায় সেই চুক্তির 'খতম' হইল।

মোজে যথাসময়ে কাউন্টের প্রেরিত টাকা ও পত্র পাইয়া বিস্মিত হইল। কাউন্টের স্বভাব-চরিত্র, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি মোজের অজ্ঞাত ছিল না। যে ব্যক্তির নিকট পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও সে টাকা আদায় করিতে পারে নাই, সে দেশান্তরে গিয়া বিনা তাগিদে তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা সুদসহ প্রেরণ করিল, ইহার কারণ কি ? কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ভিন্ন কাউন্ট এ কায করেন নাই, ইহাই তাহার ধারণা হইল। কাউন্ট মোজেকে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, বিশেষতঃ, ধনবান্ আত্মীয়ের নিকট টাকা ধার লইয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিলেন, এ কথা মোজে বিশ্বাস করিল না। কাউন্ট কি কৌশলে কাহার নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা জানিবার জন্য মোজের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। কাউন্ট জুরিচে আছেন কি না, এই সংবাদ মোজে সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিল। তাহার পর সে জুরিচে উপস্থিত হইয়া সহজেই জানিতে পারিল, কাউন্ট

অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী বুড়ী স্মিটের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সুখের সীমা নাই। তিনি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার অধিকারী হইয়া সেখানে 'রাজজামাতা'র ন্যায় বাস করিতেছেন—বিলাস ও সুখের স্রোতে ভাসিতেছেন।

এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মোজে হৃষ্টচিত্তে কাউণ্টের বাসভবন 'সাটু'তে উপস্থিত হইল। কাউণ্ট সে সময় গৃহে ছিলেন না, এ জন্য বার্থাই তাহার অভ্যর্থনা করিল। তাহার স্বামীর সহিত মোজের কি সম্বন্ধ, বার্থা তাহা জানিত না। কাউণ্ট বাড়ী আসিয়া মোজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, মোজের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু মোজে হঠাৎ আসিয়া তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল দেখিয়া তাঁহার আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি যে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। মোজে সলোমন কোহেনের বন্ধু, কাউণ্ট সেণ্টপিটার্সবর্গে গমন করিয়া যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা মোজের সুবিদিত। মোজে তাঁহার শত্রুতাচরণ করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য, তাঁহাকে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইতে হইবে। তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গে কোহেন-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া জুরিচে আসিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক বার্থার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এ সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি এরূপ ভীত হইলেন যে, যদি কোন কৌশলে মোজেকে হত্যা করিতে পারিতেন, সেই কৌশল অবলম্বন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু পাছে ধরা পড়িতে হয়, এই ভয়ে তিনি সে চেষ্টা করিলেন না। মোজের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে হাতে রাখাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, মোজের মত মাতাল জালা জালা মদ খাইয়া লিভার পাকিয়া মরিয়া যাইবে, সে মরিলেই তিনি নিষ্কণ্টক হইবেন, কিন্তু যত দিন সেই শুভদিন না আইসে, তত দিন লোকটাকে বশে না রাখিলে চলিবে না। মোজেকে বশে রাখিবার জন্য কাউণ্টকে, এমন কি, বার্থাকে পর্য্যন্ত কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। কাউণ্ট ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার 'বন্ধু' মোজের সকল আব্দার ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছিলেন; এমন কি, মোজের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় বার্থাকেও তিনি তিরস্কার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মোজে জানিত, কাউণ্টের গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলে তাহার কোন লাভ নাই, সুতরাং তাঁহাকে ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অর্থশোষণ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ন্যায় দুশ্চরিত্র লম্পট বার্থার রূপে মুগ্ধ হইয়া শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। কাউণ্ট বার্থার অপমানে উত্তেজিত হইয়া বেত্রাঘাতে তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। অপমানিতা বার্থা অপমানের প্রতিফল প্রদানের জন্য কাউণ্টকে উত্তেজিত না করিলে, তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার ভয়প্রদর্শন না করিলে, কাউণ্ট মোজের অপমান করিতেন না; কিন্তু বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়। দুষ্কৃতের দমনের জন্য ভগবান্ কোন্ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া কি কৌশলে শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ধারণা করিবার শক্তি নাই। মোজে তাঁহাকে চূর্ণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার গৃহত্যাগ করিলে যদিও তিনি আতঙ্কে বিহ্বল ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তথাপি অবশেষে তিনি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, "মোজে যেরূপ অর্থপিশাচ, তাহাতে সে সহসা আমার কোন অনিষ্ট করিবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। আমাকে নষ্ট করিয়া তাহার কোন লাভ নাই; সুতরাং সে আমার অনিষ্ট করিবে না। আমাকে ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু টাকাগুলি ছাড়িয়া যায় নাই, অর্থলোভে পুনর্ব্বার আমার দ্বারস্থ হইবে। যত দিন আমার শাশুড়ী জীবিত আছেন, তত দিন আমার অর্থাভাব হইবে না। এই কামধেনুটিকে দোহন করিয়া ভবিষ্যতেও মোজের দাবী পূর্ণ করিতে পারিব, কিন্তু মোজেকে ও ভাবে তাড়াইয়া না দিলে, বার্থার সহিত আমার সন্ধিস্থাপন করা অসম্ভব হইত, এবং শাশুড়ীও আমার প্রতি বিমুখ হইতেন। সুতরাং উভয় দিক্ রক্ষা করিবার জন্য মোজেকে ও ভাবে বিতাড়িত করা অসঙ্গত হয় নাই।"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কাউণ্ট সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সত্য নহে। প্রথমতঃ, মোজে কিরূপ ভীষণ-প্রকৃতি, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও খল, তাহা তিনি জানিতেন না, তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করা তাঁহার অসাধ্য ছিল। বিশেষতঃ তাহার কন্যাতুল্য স্নেহের পাত্রী রেবেকার অপমান সে চিরদিন নীরবে সহ্য করিবে না, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার শাশুড়ী বিপুল বিত্তের অধিকারিণী হইলেও তাহার সহিষ্ণুতার সীমা ছিল; সে চিরজীবন জামাতার সকল অপব্যয়ের ভার নিঃশব্দে বহন করিবে, হাজার হাজার টাকা প্রার্থনামাত্র জামাতার হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবে, এরূপ আশা করাও সঙ্গত হয় নাই। বৃদ্ধা স্মিট স্থির করিয়াছিল, অতঃপর কাউণ্ট জামাতাকে ঐ ভাবে আর সাহায্য করিবে না। বস্তুতঃ, মোজের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া কাউণ্ট নিশ্চিন্ত হইলেও মোজে তাঁহাকে কি উপায়ে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহা যথাসময়ে জানিতে পারিব। [ক্রমশঃ।



অভিনব কলের বন্দুক

দস্যুর আক্রমণ হইতে ডাক রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এক প্রকার কলের বন্দুক নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ডাক লইয়া যে সকল গাড়ী নগরের ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকে, তাহাতে



নবোদ্ভাবিত বন্দুকসহ সৈনিক

এক জন করিয়া সৈনিক এই নবোদ্ভাবিত বন্দুক লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকে। উরুদেশে এই বন্দুক রাখিয়া সৈনিক অবলীলাক্রমে বহু অস্ত্রধারী আততায়ীর অথচ অসংখ্য গুলী অল্পসময়ের মধ্যে ইহা হইতে নিক্ষিপ্ত হয়।

অস্থিবিনির্ম্মিত জাহাজের মূল্য

নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধকালে বন্দিগণ অস্থিখণ্ড সাহায্যে ছোট ছোট নকল জাহাজ নির্ম্মাণ করিত। উল্লিখিত জাহাজগুলির ভগ্নাংশ মেরামত করিবার অভিপ্রায়ে জনৈক



অস্থিনির্ম্মিত জাহাজ

ইংরাজশিল্পী অধুনা মনোনিবেশ করিয়াছেন। রক্ষনাগারে যে সকল অস্থি সঞ্চিত হয়, তাহারই সাহায্যে তিনি মেরা-

জাহাজের মূল্য ৩ হাজার ৭ শত হইতে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত।

গুলী-প্রতিরোধক বর্ম্ম

জার্ম্মাণ পুলিস বিভাগের জন্ত এক প্রকার শিরস্ত্রাণ ও বক্ষাবরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বর্ম্ম গুলীর আঘাত প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। এই বর্ম্ম সহজে পরিধান করা যায় এবং



গুলী নিবারক বর্ম্ম

অনায়াসেই খুলিয়া ফেলা সম্ভবপর। এই বর্ম্ম পরিধান করিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পরিচালনে কোনও অসুবিধা হয় না, অথচ দেহের প্রধান স্থানগুলি সুরক্ষিত থাকে। জার্ম্মাণ পুলিস-প্রহরীরা অধুনা এই বর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া রাখে।

ভ্রমণ-যষ্টিমধ্যে বাদ্যযন্ত্র

পূর্ব্ব-আমেরিকার জনৈক শিল্পী বেত্র-নির্ম্মিত ভ্রমণযষ্টির মধ্যে তন্ত্রীবিশিষ্ট 'উকুলেলি' নামক বীণযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেত্রদণ্ডের এক দিকে এই তারগুলি গুপ্তভাবে থাকে; আবরণ সরাইয়া লইলেই তারগুলি দেখা যায়। তন্ত্রীগুলির নিম্নস্থিত ফাঁপা স্থানে একটি মুদ্রা রাখিয়া কানে মোচড় দিলেই যন্ত্রটি সুরসংবলিত হইয়া উঠিবে। তখন ম্যাণ্ডোলিন বাজাইবার জন্ত যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সাহায্যে এই 'উকুলেলি' হইতে সুমিষ্ট স্বরলহরী নির্গত করা যায়।



ভ্রমণ-যষ্টির অন্তর্গত বাদ্যযন্ত্র

চরণ-সাহায্যে লক্ষ্যভেদ

প্রতীচ্যদেশে ইদানীং ধনুর্ব্বিদ্যার বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। প্রতীচ্য নরনারীরা যত্নসহকারে তীর-ধনুর সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করিতে শিক্ষা করিতেছেন। কেহ কেহ চরণ ও হস্তসাহায্যে তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিয়া থাকেন। ভূমিতলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ হস্ত ও চরণদ্বয়ের সাহায্যে লক্ষ্যাভিমুখে তীরনিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় ভারতবর্ষ এক দিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। অধুনা এই বিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় হইলেও ভারতবর্ষের নানা স্থানে এখনও

প্রসিদ্ধ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত কোন বাঙ্গালী যুবকের অপূর্ব্ব লক্ষ্যভেদ-প্রণালী অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তিনি শুধু চরণ-সাহায্যেই লক্ষ্যভেদ করিয়া থাকেন। মার্কিণের যে প্রসিদ্ধ ধানুকী চরণ ও হস্তসাহায্যে লক্ষ্যভেদ করিতেছেন, তাঁহার চিত্র প্রদত্ত হইল।



চরণ ও হস্তসাহায্যে লক্ষ্যভেদ

ডাকটিকিট-রচিত চিত্র

মার্কিণ ও সুইডেনের ডাকটিকিট সংযোগে জনৈক সংগ্রাহক নিউইয়র্ক নগরে একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।



টিকিটের বর্ণসমাবেশবৈচিত্র্যে এই চিত্রটি পরম রমণীয় হইয়াছে। চিত্রের পটভূমিও ডাকটিকিটের দ্বারা রচিত। তুলিকার সাহায্যে চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির তুলনায় এই চিত্র কোন অংশে হীন নহে।

নল-নির্ম্মিত ভেলা



নলের ভেলা

জার্ম্মাণীতে নল জুড়িয়া ভেলা নির্ম্মাণের পর যুবকের দল জলক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই নলের ভেলাগুলি ভাঁজ করিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিতে পারা যায়। বাক্সটিকে আবার বসিবার আসনে পরিণত করা চলে। অল্পসময়ের মধ্যে এই ভেলা ভাঁজ করিয়া রাখা যায়, আবার ভেলায় পরিণত করিয়া জলক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করা চলে।

কৃত্রিম সূর্য্যালোকে দন্ত চিকিৎসা



কৃত্রিম সূর্য্যালোক নানা রোগের পক্ষেই বিশেষ উপকারী। সম্প্রতি এক প্রকার আলোকাধার নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে নির্গত কৃত্রিম সূর্য্যালোক মুখবিবরে পরিচালিত করিয়া অধুনা চিকিৎসকগণ দন্তরোগের চিকিৎসা করিতেছেন। রোগী একটি নল ওষ্ঠদ্বয়ের সাহায্যে দন্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে; চিকিৎসক তখন কৃত্রিম সূর্য্যালোকধারা পরিচালিত করিতে থাকেন

সন্তরণশক্তি-পরিমাপক যন্ত্র



সন্তরণশক্তি-পরিমাপক যন্ত্র

প্রশান্ত সমুদ্রকূলে সন্তরণকারীদিগের বাহু ও পদের শক্তি পরিমাপ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রটি একটি ত্রিপাদবিশিষ্ট আধারে সংলগ্ন থাকে। চক্রাকার যন্ত্রে ১ শত পাউণ্ড পর্য্যন্ত পরিমাপ করিবার ব্যবস্থা আছে। সন্তরণকারীর দেহে একটি রজ্জু সংলগ্ন থাকে। সন্তরণকারী যখন বাহু বা পদের সাহায্যে জল মথিত করিয়া অগ্রসর হয়, তখন প্রত্যেক আঘাতে যন্ত্রের কাঁটা চক্রনির্দ্দিষ্ট মাপের সন্নিহিত হয়। তাহাতে বুঝা যায়, সন্তরণকারী কিরূপ শক্তিবলে জল মথিত করিয়া চলিয়াছে।

গাছের গুঁড়ি-নির্ম্মিত আবাসস্থান

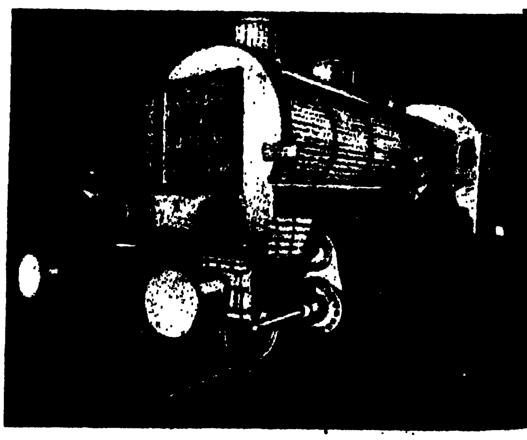
জনৈক মার্কিণ মোটরচালিত গাড়ীতে রাত্রি-যাপনের জন্য এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে একটি আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ



গাছের গুঁড়ির বাসগৃহ

করিয়াছেন। গাছের গুঁড়ির অভ্যন্তরভাগ কুঁদিয়া বাহির করিয়া এই বিচিত্র গৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। শয্যা, রন্ধন-পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই গোলাকার বাস-ভবনের মধ্যে রক্ষিত থাকে। বৃক্ষের গুঁড়ির ব্যাস ৯ ফুট ৪ ইঞ্চ। বৃক্ষটি ৪ শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া অভিজ্ঞগণ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

সাবান-নির্ম্মিত এঞ্জিন



বার্লিনের প্রদর্শনীতে সাবান-নির্ম্মিত একটি এঞ্জিন উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই এঞ্জিনের নমুনা নির্ম্মাণে ভিন্ন ভিন্ন গঠন ও আকারের সাবান ব্যবহৃত হইয়াছে। যে রেলপথের উপর এই সাবানের এঞ্জিন সংস্থাপিত, তাহাও সাবানখণ্ডসমূহ-বিনির্ম্মিত। এঞ্জিনটি ক্ষুদ্রায়তন নহে।

সজীব রাক্ষস

ভ্রমণকারীদিগের ধারণা, আফ্রিকার অরণ্যে ও অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে অনেক অদ্ভুত জীব-জন্তু আত্মগোপন করিয়া আছে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, যে সকল অতিকায় জন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বে অবস্থান করিত, কালের প্রভাবে তাহারা অন্যত্র হইতে বিলুপ্ত হইলেও, আফ্রিকার গহন



অতিকায় রাক্ষস

প্রদেশে এখনও তাহাদের বংশধরগণ নিশ্চিতই বিদ্যমান আছে। দেশীয়গণের নিকট কোন কোন ভ্রমণকারী গল্প শুনিয়াছেন যে, কঙ্গো নদের সমীপবর্ত্তী অরণ্যে বিরাটকায় ও বিচিত্রদর্শন জন্তু তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইহাতেই ভ্রমণকারীরা মনে করেন, দেশীয়দিগের বর্ণনা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এইচ, এফ, ফেন তদনুসারে কঙ্গোপ্রদেশে দলবলসহ যাত্রা করিয়াছেন। চিত্রে বর্ণিত অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীব বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

প্রাচীন রোমক যুগের মুদ্রা

রোমের উপকণ্ঠস্থিত কোনও স্থান হইতে জনৈক নিউইয়র্ক-আনিয়াছে। মুদ্রাটি দেখিলেই মনে হয়, উহা স্বর্ণজাতীয় কোনও ধাতু হইতে নির্ম্মিত। মুদ্রাটির উপরে যে সকল মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল, দীর্ঘ কালের ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, এই মুদ্রা প্রথম রোমক সাধারণতন্ত্রের আমলে প্রচলিত ছিল। ইহার পরিধি ৮ ইঞ্চ এবং ওজন প্রায় এক পোয়া হইবে।



বৃহদাকার রোমক মুদ্রা

বায়ুপূর্ণ বাহুবন্ধনী

সন্তরণকারীদিগের সুবিধার জন্য রবার-নির্ম্মিত এক প্রকার



বাহুবন্ধনী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা বায়ুপূর্ণ করিতে পারা যায়। এই বায়ুপূর্ণ বন্ধনী বাহুতে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলে সন্তরণকারীর জলমগ্ন হইবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। যাহারা প্রথম সন্তরণ শিক্ষা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এই বায়ুপূর্ণ বাহুবন্ধনী বিশেষ সুবিধাজনক।

বিচিত্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র

সম্প্রতি এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র কোনও মার্কিণ প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই যন্ত্রের উপর শয়ন করিয়া

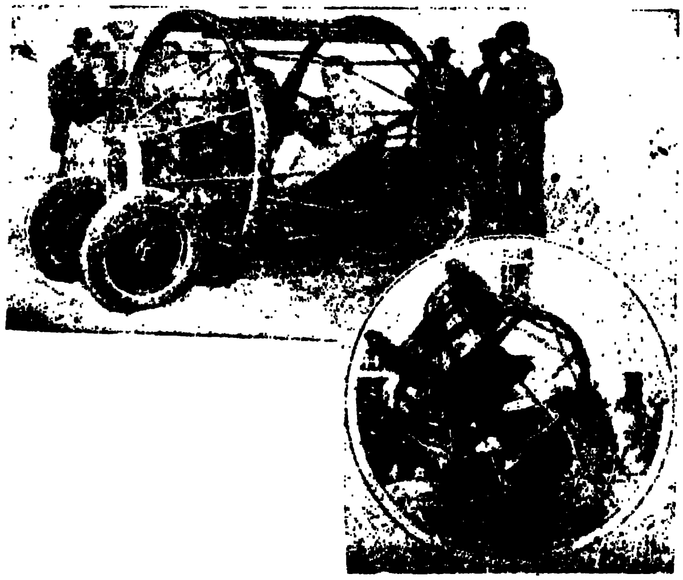


বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উপর ব্যায়ামার্থিনী শায়িতা

শায়িত ব্যক্তি স্বয়ং কল চালাইয়া দিতে পারে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ উভয় দিক্ হইতেই তাড়িত-ক্রিয়াবলে যন্ত্র এমনভাবে কায করিতে থাকে যে, শায়িত ব্যক্তির মাংসপেশীগুলিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই ভাবে ব্যায়াম করিলে শরীর বেশ দৃঢ় হইয়া উঠে।

মোটরগাড়ীর বিচিত্র খেলা

জনৈক ফরাসী মোটরচালক তাহার গাড়ীর চারিদিকে সুদৃঢ় ইস্পাতের লৌহদণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া বিচিত্র খেলা দেখাইতেছে। ঘণ্টায় ৫০ মাইল গতিতে গাড়ী চালাইতে চালাইতে চালক মোটরগাড়ীকে উল্‌টাইয়া দিয়া দর্শকগণকে



মোটরগাড়ীর বিচিত্র খেলা—গাড়ী উল্‌টাইয়া দিয়া চালকের কোন ক্ষতি করে না।

বিস্ময়-চকিত করিয়াছিল। গাড়ী সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া গেলেও চালকের অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই, গাড়ীরও কোন ক্ষতি হয় নাই।

ভোগী ও ত্যাগী

ভোগী এক ত্যাগী জনে ডাকি বলে, ভাই,
নানা ভোগে অবিরত সময় কাটাই।
তথাপি সন্তোষ নাই, এ কি কর্ম্মভোগ,
কি সে ঘুচে জান এই অতৃপ্তির রোগ?
ত্যাগী কহে, "তারি তরে ভোগে নাহি মন,
ত্যাগে পাই তৃপ্তি আর শান্তি অনুক্ষণ।"

রয়্যাল কৃষি-কমিশন

২

অগ্রহায়ণের "মাসিক বসুমতীতে" রয়্যাল কৃষি-কমিশন সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলিয়াছি। কৃষি বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। অন্য বহু ব্যাপারের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সেই জন্য কৃষির আলোচনা করিতে হইলে অন্যান্য বহু বিষয়েরই আলোচনা করিতে হয়। তন্মধ্যে পশুপালন একটি প্রধান। য়ুরোপীয়রা পশুপালনকে কৃষিরই অন্তর্ভুক্ত বৃত্তি বলিয়া গণ্য করেন। বাস্তবিক কৃষি এবং পশুপালন এই দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, উহাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন না করিয়া উহাদিগকে একই বৃত্তির মধ্যে গণ্য করা বিধেয়।

পশুপালন একটি বিশেষ লাভজনক বৃত্তি। অনেক সময় হলকর্ষণ অপেক্ষা ইহা অধিক এবং নিশ্চিত লাভজনক হইয়া থাকে। কৃষির লাভ যতটা বারিবর্ষণসাপেক্ষ, পশুপালনের ফল ততটা বারিবর্ষণের উপর নির্ভর করে না। বারিপাতের সামান্য সাময়িক বিপর্য্যয় ঘটিলে কৃষিজ ফসলের অনেক হানি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পশুপালকের ঐরূপ অবস্থায় বিশেষ ক্ষতি হয় না। পশুপালনের লাভ সমগুণ হিসাবে (Geometrical Progression) বৃদ্ধি পায়, কৃষির আয় কখনই সেরূপ হইতে পারে না। অথচ পশুপালনে অসুবিধাও অনেক আছে। বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে এবং ঐকান্তিকতা সহকারে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে কখনই এই কার্য্যে লাভবান্ হওয়া সম্ভবে না। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে কখনই লাভের আশা করা যাইতে পারে না। যে বৃত্তি যত লাভজনক, সেই বৃত্তির সেবা ততই কষ্টসাধ্য।

আমাদের মনে হয়, এই ভারতবর্ষে এককালে পশুবিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পশুপালন বৈশ্যদিগের বৃত্তি ছিল, তাঁহারা ব্যবসার হিসাবে পশুপালন করিতেন। কিন্তু গোপালন গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক গৃহস্থই অন্ততঃ একটি করিয়া গাভী পুষিতেন, যাঁহার গৃহে গাভী ছিল না, তাঁহার গৃহ অপবিত্র বলিয়াই নিন্দিত হইত, ভিক্ষুকরাও তাহাদের গৃহে ভিক্ষা লইত না। ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঋতনিষ্ঠ সত্যকাম জাবালে গোপরাও গোপালন করিতে করিতে ব্রহ্মাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বালকগণ গুরুগৃহে বাসকালে গোপের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের চিত্তের যেমন একাগ্রতা সাধিত হইত, স্বাধীন ভাবে সমস্যা-সমাধানের যেমন সামর্থ্য জন্মিত, গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য গোপালনবিদ্যায়ও সেইরূপ শিক্ষালাভ হইত।

মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে এ দেশে গৃহপালিত পশু একটি বিশিষ্ট সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। অতি দরিদ্র গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচণ্ডপ্রতাপ রাজগণ পর্য্যন্ত পশুপালন করিতেন। রাজাদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোশালা ছিল। জিগীষু রাজারা সপত্নরাজগণের গোশালা আক্রমণপূর্ব্বক বাহুবলে তাঁহাদের গোধন হরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কৌরব-সেনা কর্ত্তৃক বিরাটরাজের উত্তর গো-গৃহ আক্রমণ তাহার অন্যতম প্রমাণ। গাধিরাজনন্দন বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের হোমধেনু হরণচেষ্টাও তাহার অন্য নিদর্শন। ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে নিজগৃহে পশুপালন করিতেন। তাঁহারা ব্যবসায়ের হিসাবে গোপালন করিতেন না, সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ঐ কার্য্য করিতেন। অধিক দিনের কথা নহে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণরা সরল সংশয়ে যে উচ্চ চিন্তা করিতেন, তাহার ফলে পশুচারণক্ষেত্রে অনেক উচ্চ অঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত ও আবিষ্কৃত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা অনেক সময়ে গোচারণের মাঠে তাঁহাদের গৃহপালিত গো-মহিষাদি ছাড়িয়া দিয়া দার্শনিক তর্কে মনোভিনিবেশ করিতেন। গোচারণের মুক্তপ্রান্তরে ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতির অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। তখন গৃহজাত ক্ষীর, সর, নবনীত খাইয়া বাঙ্গালী দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ দেহ হইত। এখন চপ, কাটলেট খাইয়া সেই বাঙ্গালী

জাতি উৎসন্নের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে, গব্যঘৃত ও দুগ্ধের অভাবে বাঙ্গালী জাতির মেধা ও মনীষা ক্ষয় পাইতেছে, বুঝি বা দুই তিন পুরুষের মধ্যে উহা ক্ষয় পাইবে। কৃষি-কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে সার পি, সি, রায় পূর্ব্বকালে ঘৃত-দুগ্ধের এবং গোচারণের মাঠের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। পূর্ব্বে এ দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বস্ত্রবহুল ছিল না সত্য, কিন্তু তাহাদের ঘৃত-দুগ্ধের অভাব ছিল না'। তখন দেশে গোচারণের মাঠ যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বেই বিস্তীর্ণ মাঠ থাকিত, উহাকে গোরুভূমি বলা হইত। ইহা ভিন্ন তখন কৃষকরা সকল বৎসর সকল জমী 'উঠিত' করিত না। বারংবার চাষে জমীর উর্ব্বরা-শক্তি কমিয়া গেলে চাষীরা দুই এক বৎসর সেই জমী পতিত রাখিত। ঐ সকল জমীতে স্বচ্ছন্দে গোরু চড়িয়া বেড়াইত। চরিষ্ণু গাভী, ষণ্ড, মহিষ প্রভৃতির মলমূত্রে জমীর উর্ব্বরা-শক্তি আবার ফিরিয়া আসিত। জমী দুই বৎসর পতিত থাকিলে যে ক্ষতি হইত, তাহা দুই বৎসরের ফসলেই ওয়াশীল হইত। সুতরাং সমাজের তাহাতে ক্ষতি হইত না, বরং লাভই হইত। সেই লাভালাভের বিচার আমরা পরে করিব।

বৃত্তিহীনতাই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। হলকর্ষণ ও দাসত্ব এই দুইটিই আজকাল আমাদের মুখ্য বৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে দাসত্ব অত্যন্ত হীনবৃত্তি। সেই দাসত্ব বা চাকুরী আজকাল অধিক মিলিতেছে না। সুতরাং আমাদিগের দেশের লোককে অন্য বৃত্তি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কৃষির সহায় ও লাভজনক পশুপালন বৃত্তির অবলম্বন এবং উৎকর্ষ সাধন আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপীয় মহাদেশের কৃষকগণ কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে না। তাহারা প্রত্যেকেই কৃষির সহিত ছাগ প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অনেকে ভেড়া প্রভৃতি জীবও পুষিয়া থাকে। উহাতে তাহাদের অতিরিক্ত আয় হয়। আমাদের দেশের কৃষীবলের ন্যায় তাহারা নিশ্চেষ্ট এবং আলস্য হেতু স্বল্পে সন্তুষ্ট নহে। তাহারা কেবল মাংস এবং দুগ্ধাদির জন্য পশুপালন করে না। তাহারা জানে যে, পশুর মলমূত্রই তাহাদের ধনাগমের উপায়। Muck is the mother of money, অর্থাৎ আর্দ্র গোময়াদি পশুমল ও গলিত উদ্ভিদ্ অর্থের প্রসূতি। আমাদের দেশের কৃষকরা যেমন গোময়াদি দ্বারা ইন্ধনের কার্য্য সমাধা করে, য়ুরোপের চাষীরা তাহা কখনই করে না। এ দেশের চাষীরাও ক্ষেত্রে গোময়ের সার দিয়া থাকে, কিন্তু ওজন হিসাবে গোময় ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহারা ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার দিতে পারে না। উহারা যদি গোময়ের সহিত ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতি জীবের মলমূত্র জমীতে সাররূপে প্রদান করে, তাহা হইলে উহাদের জমীতে সোনা ফলে। এরূপ করিতে হইলে পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় পশুপালন করিবার প্রয়োজন হয়। য়ুরোপীয় কৃষকরা তাহা করিয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকরা ঐ বিষয়ে উদাসীন। পশুপালন দ্বারা সুলভে জমীর সার পাওয়া যায়, কিংবা রাসায়নিক সার খরিদ করিয়া উহা জমীতে দিলে অল্প খরচ পড়ে, য়ুরোপে এবং মার্কিণ দেশে তাহার পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক দেশে পশুপাল প্রতিপালনই অত্যন্ত অধিক লাভজনক বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ সকল দেশের লোক ভাল সার পাইবার জন্য পশুদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ায়। শস্যের ব্যয় সারেই উঠিয়া যায়; দুগ্ধ মাংস প্রভৃতি লাভের অঙ্কে পড়ে। পক্ষান্তরে মোরগ প্রভৃতি পক্ষী প্রচুর পরিমাণে ক্ষেত্রের কীট নষ্ট করে।

পশুপালন কার্য্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ;—

(১) গো, মহিষ, মেষ ও ছাগ-পালন।

(২) অশ্ব, গর্দ্দভ, হস্তী, উষ্ট্র ও শূকর-পালন।

(৩) হাঁস, মুরগী, কপোত প্রভৃতি পক্ষী-পালন। (হাঁস-মুরগী প্রভৃতি পক্ষীকে পশুমধ্যে গণ্য করা হইল বলিয়া বৈয়াকরণিক ও আভিধানিকবর্গ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। সংক্ষিপ্ততার অনুরোধেই এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইল।)

আমাদের দেশে দুগ্ধাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে গো-মহিষ এবং ছাগ যত্নসহকারে পালন করিতে পারিলে লাভ হইবেই হইবে। কিন্তু উহাদিগকে যত্নসহকারে পালন করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা জন্মে। য়ুরোপের বহু দেশ অপেক্ষা এ দেশে পশ্বাদির সংখ্যা অধিক। কিন্তু য়ুরোপে ঐ সকল গৃহপালিত পশু বিশেষ যত্নসহকারে

প্রতিপালিত হয়, সেই হেতু তথাকার এক একটি গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে, আমাদের দেশের একপাল গাভীও সে পরিমাণ দুগ্ধদানে সমর্থ নহে। আমাদের দেশের এক একটি গ্রাম্য গাভী গড়ে অর্দ্ধসের পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া থাকে। য়ুরোপের এক একটি গাভী গড়ে প্রায় অর্দ্ধমণ দুগ্ধ দেয়। সুতরাং তথাকার একটি গাভী আমাদের দেশের প্রায় ৪০টি গাভীর সমান। ভাল ভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলে আমাদের দেশের দেশী গাভীই ছয় সাত সের দুগ্ধ দিতে পারে। গাভীর মধ্যে নানা জাতি আছে। বিহারের গরু ও আমাদের দেশের গোকুল এক জাতীয়। অথচ উহাদের আকৃতি এবং দুগ্ধদানের শক্তির পার্থক্য ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিহার অঞ্চলের এক একটি গরু গড়ে ছয় সাত সের দুগ্ধ দেয়। ইহা হইতেই এই বাঙ্গালাদেশের গোজাতির কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। হিন্দুজাতি গো-পূজক। কিন্তু এই হিন্দুর দেশে হিন্দুর ঘরে গাভীগুলির কঙ্কালসার দেহ দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হয়।

গৃহপালিত মহিষগুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গে অনেক গৃহস্থ মহিষ পালন করিয়া থাকে। মহিষ অত্যন্ত বলবান্ জীব। একজোড়া সুস্থকায় মহিষ প্রায় দুই জোড়া বলিষ্ঠ বলদের কায করিতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মহিষের পাল দেখিলে সত্য সত্যই দুঃখ জন্মে। উহারা কঙ্কালসার দেহ লইয়া চলিতেই অসমর্থ। এক একটা সুস্থকায় মহিষ অন্ততঃ আট নয় সের দুধ দিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল অনশন-শীর্ণ মহিষ দুই সের দুধও দিতে পারে না। গৃহপালিত পশুদিগকে যে জাতি এত কষ্ট দিয়া থাকে, সে জাতি কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা করিতে পারে না।

এ দেশের গোজাতির যে কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল। গত ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার হবিগঞ্জ থানার এলাকাধীন বরিশাল এবং আর কয়েকখানি গ্রামে বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত প্রবলবেগে বাতাস বহিয়াছিল এবং বৃষ্টিও পড়িয়াছিল। সেই সময় ঐ অঞ্চলের গাভীগুলি মাঠে চরিতেছিল। গরুগুলির অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, তাহারা বৃষ্টি ও বাতাসের বেগ সহ্য করিতে পারে নাই। কতকগুলি গাভী সে অবস্থাতে মাঠে মরিয়া পড়িয়াছিল। আর কতকগুলি গৃহে আসিয়া পরে মরিয়া যায়। অধিকাংশ গরুই এই ভাবে পঞ্চত্ব পায়। কয়েকটিমাত্র অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ গরু বাঁচিয়া গিয়াছিল। অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, গরু অভাবে সে বার ঐ অঞ্চলে চাষের কায প্রায় বন্ধ হইতে বসিয়াছিল। শুনিতে পাই, সে বার ঐ অঞ্চলে বহু শত গাভী পঞ্চত্ব পায়। এ দেশের গোজাতি যে কতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে,—এই ব্যাপার হইতেই তাহা বুঝা যায়। উহাদের জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ হইয়াছে যে, বাতাস একটু জোরে বহিলে আর উহারা তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য, গোজাতির এই দুর্দ্দশার কারণ কি?

ইহার কারণ, (১) পর্য্যাপ্ত খাদ্যের ও পরিচর্য্যার অভাব। এ কথা সত্য যে, গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুরা আজকাল পর্য্যাপ্ত আহার্য্য পায় না। অনেক স্থলে তাহারা একরূপ অর্দ্ধাশনে এবং অনশনেই থাকে। গোচরভূমির অভাবই গো-মেষ-মহিষাদির খাদ্যাভাবের প্রবল কারণ। পূর্ব্বে এ দেশে প্রতি গ্রামেই বিস্তীর্ণ গোচরভূমি থাকিত। জমীদাররা প্রতি গ্রামে গোচরভূমি রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বে অনেক জমী পতিত থাকিত। কৃষকরা ইচ্ছা করিয়া পালাক্রমে অনেক জমীর উর্ব্বরা-শক্তি বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে উহা পতিত রাখিত। পূর্ব্বে ঐ সকল জমীতে পশু চরিত। এখন আর গ্রামে গোচারণের মাঠ নাই। সর্ব্বত্রই চাষ-আবাদ হইয়াছে। চাষীরা এখন আর জমী পতিত রাখে না। লোকের অন্য বৃত্তি না থাকাতে তাহারা চাষ-আবাদের দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে। ফলে জমীর অত্যন্ত টান ধরিয়াছে। চাষীদিগকে অধিকমাত্রায় সেলামী দিয়া জমী লইতে হইতেছে। জমীদাররা মোটা সেলামী এবং খাজনার লোভে গোচরভূমি পর্য্যন্ত বিলি করিয়া দিতেছেন। পক্ষান্তরে বিচালী (খড়) প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অদূরদর্শী চাষীরা পশুদিগের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিচালী না রাখিয়া উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। ফলে গবাদি পশুর খাদ্য মিলিতেছে না এবং গৃহপালিত পশুদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছে। সেই জন্য এ দেশে গো-মড়ক চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহিষের জীবন কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও এ দেশে মহিষাদি অল্প মরে না। এই সকল কারণেই এ দেশে দুগ্ধাভাব ঘটিতেছে।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ভারতে গড়ে এক শত লোকের ৫১টি দুগ্ধ দিবার পশু (গো-মহিষ) আছে। বিলাতে এক শত লোকের গড়ে ১৬টির অধিক পয়স্বিনী গাভী নাই। কিন্তু বিলাতের এক একটি গাভী ভারতের এক একটি গাভীর প্রায় চতুর্গুণ দুগ্ধ দেয়। এ ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। এ দেশের পঞ্চনদ, সিন্ধু প্রভৃতি দেশের গাভীরা অনেক অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। ঐ সকল গাভী ধরিয়াই এই হিসাব করা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা-দেশের এক একটা গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া থাকে, য়ুরোপের এক একটি ছাগল তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিলাতে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের সর্ব্বসাকল্যে ৮০ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি থাকিলে ভারত অপেক্ষা, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ অপেক্ষা তথায় দুগ্ধ সুলভ। য়ুরোপের পল্লী অঞ্চলে দুগ্ধের সের কুত্রাপি দুই আনার অধিক নাই। সহরে এক সের দুগ্ধের মূল্য বড় জোর চারি আনা। যে দেশে জীবন-সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র, এ দেশ অপেক্ষা যে দেশে পণ্য-মূল্য অত্যন্ত অধিক, সে দেশে দুগ্ধ এ দেশ অপেক্ষা সুলভ, ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। গত বৎসর প্যারিস সহরে ৫ আনা দুগ্ধের সের বিক্রয় হওয়াতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সংবাদপত্রে বড় বড় লেখকরা প্রবন্ধ লিখিয়া বলিয়াছিলেন,—"এখন বড় বড় রাজনীতিক সমস্তার আলোচনা ছাড়িয়া রাজনীতিকদিগের দুগ্ধ-সমস্তার দিকে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, দুগ্ধের দরের উপর জাতির জীবন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। দেশে দুগ্ধের অভাব হইলে দেশ রুগ্ন, শীর্ণ ও জরাজীর্ণ লোকে পূর্ণ হইয়া যাইবে। শিশুমড়ক বৃদ্ধি পাইবে। যে সকল শিশু জীবিত থাকিবে, তাহারা অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যে জাতি অসুস্থ ও দুর্ব্বল লোক লইয়া গঠিত, সে জাতি কখনই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অতএব ফরাসী রাজনীতিকগণ এখন উচ্চ অঙ্গের রাজনীতির কথা শিকায় তুলিয়া রাখুন এবং যাহাতে ফ্রান্সে দুগ্ধের মূল্য অন্ততঃ প্রতি সের তিন আনা সাড়ে তিন আনা মূল্যে বিকায়, তাহার ব্যবস্থা করুন। জাতিটাই যদি মরিয়া যায় বা জীবন্মৃত হয়, তাহা হইলে উচ্চ রাজনীতির দ্বারা কাহার উপকার সাধিত হইবে?"

প্যারিস সহরে প্রতিদিন প্রায় ৩৫ হাজার মণ দুগ্ধ বিকায়। যুদ্ধের পর এই দুগ্ধ যোগানের অসুবিধা ঘটে। সেই জন্য তথায় হুলস্থূল বাধিয়া যায়। আর আমাদের দেশে এই কলিকাতা সহরে টাকায় আড়াই সের খাঁটি দুগ্ধ পাওয়াই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের যাঁহারা জননায়ক, তাঁহাদের সে দিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বড় বড় প্রশ্ন লইয়াই ব্যস্ত। ছোট প্রশ্ন তাঁহাদের মনে ধরে না। সেই জন্য মনে হয়, আমাদের দেশের রাজনীতিক নেতারা নাম কিনিবার জন্য যত ব্যস্ত, দেশের লোকের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে তত ব্যস্ত নহেন। দেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য তাঁহারা যদি তাদৃশ ব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে যাহাতে দেশবাসীরা সুস্থ শরীর এবং সবল দেহ লইয়া জীবিত থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেন।

মিষ্টার ডবলিউ এইচ হ্যারিসন লিখিয়াছেন—The prosperity of a nation has a direct relation to milch cow, অর্থাৎ পয়স্বিনী গাভীর সহিত জাতির সমৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মিষ্টার হ্যারিসন তাঁহার উক্তির সমর্থনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, গোজাতির উন্নতি-সাধন করিতে না পারিলে কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সামান্য ঘাস ও লতা-গুল্ম খাইয়া গাভীগুলি মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য প্রদান করে। য়ুরোপের দেশগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তথায় যে দেশ যত উন্নত, সে দেশের গাভীর অবস্থাও তত উন্নত। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, সমৃদ্ধির সহিত গাভীর যত্নের একটা নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান।

দুগ্ধের জন্য কেবল গাভীই প্রয়োজনীয় নহে। মহিষ ও ছাগও দুগ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়। য়ুরোপের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ছাগ দরিদ্র লোকের গাভী। এক একটা ছাগ প্রায় অর্দ্ধসের তিন পোয়া দুগ্ধ দিয়া থাকে। যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিলে উহা তদপেক্ষা অধিক দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে। ছাগলের একটা প্রধান গুণ এই যে, উহা সর্ব্বপ্রকার আগাছা নষ্ট করিয়া থাকে। আজকাল পল্লীগ্রামে যেরূপ জঙ্গলের আধিক্য, তাহাতে ছাগল প্রতিপালন করা তত বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে। একটু যত্ন করিয়া ছাগল প্রতিপালন করিলে একরূপ বিনা ব্যয়েই দুগ্ধ পাওয়া যায়। ছাগল জঙ্গলনাশের একটা প্রধান সহায়। সেই হিসাবে ইহার

উপকারিতা যথেষ্ট। ছাগলের মল-মূত্র জমীর উর্ব্বরতা-বর্দ্ধক। কিন্তু ইহার অপকারিতাও যথেষ্ট আছে। ছাগল গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার গাছগাছড়াই নষ্ট করিয়া ফেলে। প্রতিবেশীদিগের গাছগাছড়াও ইহারা নষ্ট করিয়া দেয়। সেই জন্য কেহ সহজে ছাগল পুষিতে সম্মত হয় না। আমাদের দেশের লোকের একটা প্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা আপন আপন তরিতরকারীর গাছ সাবধান করিয়া রাখিবেন না; প্রতিবেশীর পশুগণ কর্ত্তৃক উহা বিনষ্ট হইলে প্রতিবেশীর সহিত কলহ করিবেন। তবে প্রত্যেক গৃহস্থ যদি ছাগল প্রতিপালন করেন এবং সকলে রাখাল রাখিয়া সেই ছাগল চরাইতে দেন, তাহা হইলে লাভ হইতে পারে। যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য ছাগল প্রতিপালন করিবেন, তাঁহারা স্বয়ং যদি উহা চরাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে উহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা যায়। য়ুরোপে গো-দুগ্ধের ন্যায় ছাগ-দুগ্ধও বিক্রয় হইয়া থাকে।

পশুচারণ ক্ষেত্রের অভাবই এ দেশের পশুপালনের পক্ষে ঘোর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেখা যায়, যে অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ও তৃণশস্প-সমন্বিত গোচরভূমি আছে, সে অঞ্চলে গবাদি গৃহ-পালিত পশুদিগের অবস্থা অনেক ভাল। গুজরাটে এবং উত্তর-ভারতের যে স্থানে বিস্তীর্ণ গোচারণ-ভূমি আছে, সেই স্থানে গৃহপালিত পশুদিগের অবস্থা অনেক ভাল। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ-ভারতের যে যে অঞ্চলে বারিপাতের স্থিরতা নাই, ঘন ঘন ঋতু-বিপর্য্যয় ঘটিতেছে এবং গোচরভূমি অল্প, সেই সেই স্থানে গবাদি গৃহপালিত পশুর অবস্থা দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে যত দিন বিস্তীর্ণ গোচারণের মাঠ ছিল, তত দিন আমাদের গোধনের এত অধঃপতন ঘটে নাই। তখনও দেশে প্রচুর ঘটোঘ্নী গাভী ছিল। এখন তাহা আর নাই। ইহাতে আমাদের লাভ হইয়াছে কি ক্ষতি হইয়াছে, আমরা এখন আর সে চিন্তা করিয়া দেখিতেছি না। বাঙ্গালার আমরা "পতিত" জমী "উঠিত" করিয়া তাহাতে পাট বুনিতেছি, কৃষীবলের হস্তে প্রচুর অর্থাগম হইতেছে বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছি, কৃষকরা অধিক টাকা ব্যয় করিয়া বিদেশী বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে এবং তাহাতে বিদেশী শাসকবর্গ আমাদিগের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির লক্ষণ কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু তাহার ফল কি হইতেছে, তাহা একবার দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করিয়া অবলোকন করুন। গবাদি পশুর অস্থি-সম্পাতে এবং দুগ্ধাদি মানবের প্রকৃত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশে শিশুমড়ক বৃদ্ধি পাইতেছে, পুষ্টির অভাবে প্লেগ, ক্ষয়কাস, বেরিবেরি, দৃষ্টিশক্তিহীনতা প্রভৃতি অশেষ রোগ আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। ইহাতেও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারতের লোকসংখ্যা অধিক বলিয়া এ দেশে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। পৃথিবীর অনেক দেশ অপেক্ষা বৃটিশ-শাসিত ভারতের মানবের সংখ্যা ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অল্প। পৃথিবীর কতকগুলি দেশে প্রতি ১ শত একর ভূমিতে গড়ে কত লোক এবং কত গৃহপালিত পশু আছে, তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	মনুষ্য-সংখ্যা	গো-মহিষ-সংখ্যা	মেষ-সংখ্যা
ইংলণ্ড	১০৫	১৬·৩	৪২·৭
বেলজিয়াম	১০৪	২৫	...
হলাণ্ড	৭৫	২৬	১০·৫
ইটালী	৪৯	৯	১৫
জার্ম্মাণী	৪৯	১৭	৪
ওয়েলস্	৪৩	১৬·৫	৭৮
অষ্ট্রিয়া	৩৯	১২·৪	৩·৩
সুইট্জারল্যাণ্ড	৩৮	১৪·৬	১·৬
বৃটিশশাসিত ভারত	৩৩	২০	৭
ডেনমার্ক	২৮·৫	২৬	৫·৫
স্কটল্যাণ্ড	২৫	৬·৪	৩৭

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই বিশাল ভারতবর্ষে জমীর হিসাবে লোকসংখ্যা বা পশুসংখ্যা অধিক নহে। বৃটিশ ভারতে মেষসংখ্যা প্রতি শত একরে ৭টির অধিক তালিকায় দেওয়া হইয়াছে, উহাতে মেষ এবং ছাগ উভয়ই ধরা হইয়াছে। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে কেবল মেষের সংখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রস্তরকঙ্করবহুল তুহিনমণ্ডিত শৈলরাজি-বিরাজিত সুইট্জারল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা ভারত অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু তথায় পশুসংখ্যা এ দেশ অপেক্ষা

অনেক অল্প, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সুইটজারল্যাণ্ড তাহাদের দেশের লোকের দুধ যোগাইয়া এ দেশে বহু টাকার গাঢ় দুগ্ধ যোগায়, কিন্তু আমাদের এই ভারতভূমি সুজলা সুফলা হইলেও আমরা আপনাদের দুগ্ধের অভাব আপনারা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

পাশ্চাত্যদেশে পয়স্বিনী গাভীকে যে কিরূপ যত্ন করা হয়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তথায় গৃহপালিত পশুদিগকে যেরূপ যত্ন করা হয়, অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তানও সেরূপ যত্ন পায় না। তথাকার গোশালা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। গোশালার দেওয়ালগুলিতে চুণকাম অথবা নীলবর্ণে রঞ্জিত করা হয়। উহার মেঝেতে বালুকা বিছান থাকে। গোশালার চতুষ্পার্শ্বে নীল ও শ্বেতবর্ণ বড় বড় উপলখণ্ড আবৃত। গরুগুলির মলমূত্রবাহী নালাগুলি টার বা পীচ দিয়া পালিস করা। গো-শালার মলমূত্র ক্ষণকালের জন্যও রক্ষিত হয় না। পাছে গো-জাতিকে মশক, ডাঁশ প্রভৃতিতে দংশন করে, এই জন্য গো-শালার গবাক্ষগুলি পর্দ্দার দ্বারা আচ্ছাদিত। উহা সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। যে স্থানে পশুগুলির মলমূত্র পতিত হয়, সেই স্থান সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা আছে। হলণ্ডেই এই ভাবের ব্যবস্থা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পশুদিগের খাদ্যের দিকেও বিশেষ যত্ন সহকারে লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে। অথচ শীতপ্রধান দেশে যেরূপ ব্যবস্থা করা হয়, আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও গো-শালাগুলি যাহাতে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে, উহার মেঝে যাহাতে আর্দ্র না হয়, ডাঁশ, মশা, মাছি প্রভৃতি পশুগুলিকে যাহাতে দংশন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা ভাল ভাবেই কর্ত্তব্য। বিলাতে পশুদিগের খাইবার জন্য নানাবিধ ঘাস উৎপন্ন করা হয়; ইহা ভিন্ন খইল ও ভুষি উহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের গাভীগুলিকে খইল পর্য্যন্তও দেওয়া হয় না। ইহাতে গাভীগুলি পয়স্বিনী হইবে কি প্রকারে? আমাদের দেশীয় গাভীগুলি যে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

য়ুরোপে এবং আমেরিকায় অশ্ব দ্বারাই ভার বহনের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বলদ দ্বারাই ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। যে পশু যত অধিক বলবান্ হয়, সেই পশু তত অধিক ভারবহনে বা হলকর্ষণে সমর্থ, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যাহাতে ভারবাহী ও হলকর্ষী বলদ বলিষ্ঠ হয়, সে দিকে আমাদের একবারেই দৃষ্টি নাই। ইহার কারণ অজ্ঞতা, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব এবং আমাদের দারুণ দারিদ্র্য। একটা বলদ মরিলে কৃষক কাঁদিয়া মাটী ভিজাইবে, কিন্তু বলদ যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন তাহার যাহাতে দীর্ঘজীবনলাভ হয় এবং কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায়, সে দিকে সে একবারেই দৃষ্টি দেয় না। অনাহারক্লিষ্ট পশুগুলিকে সে যত দূর সম্ভব খাটাইয়া লইবার চেষ্টা করে, সুতরাং পশুগুলি অতি সামান্য কারণে রোগাক্রান্ত হয় ও পঞ্চত্ব পায়। যাহাতে এই সকল বিষয়ে কৃষকদিগের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দায়িত্ব-বুদ্ধি উন্মেষিত হয়, কৃষি কমিশনের তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারা এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি উন্মেষিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও আজকাল কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও দায়িত্ববোধের অভাব নিতান্ত অল্প অনুভূত হয় না।

আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, যাহাতে প্রতি গ্রামে পশুচারণের মাঠ রক্ষিত হয়, কৃষি কমিশনের সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কঠোর আইন করিতে হইবে। যে স্থানে পূর্ব্বে বাথান বা গোচারণের মাঠ ছিল, সেই স্থান প্রজাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং জমীদার ও গ্রামের লোককে সেই প্রজাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, স্থানীয় অবস্থাভেদে এই বিষয়ে ব্যবস্থাভেদ করা কর্ত্তব্য হইবে। স্থানীয় লোক দ্বারা কমিটী গঠিত করিয়া সেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

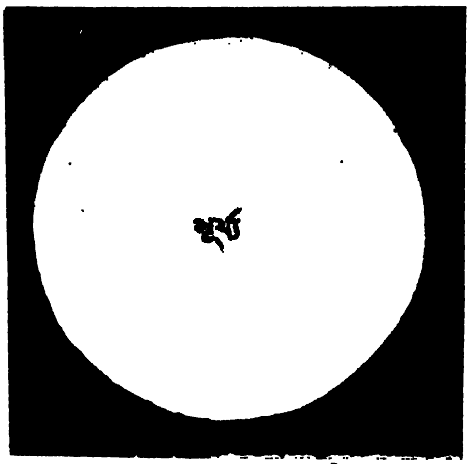
এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে বক্তব্য। এ দেশের শ্রমিকদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধির এবং দায়িত্ববোধের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। এ দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় শ্রমিকরা ঐকান্তিকভাবে কায করিতে চাহে না। তাহারা অভাবের শত বৃশ্চিক-দংশনে ব্যথিত হইবে, তাহাও ভাল, তথাপি মনোযোগ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে চাহিবে না। 'বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর' ইহাই যেন তাহাদের কাযের মূল নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য কলিকাতায় দেশীয় সূত্রধরদিগের কায চীনা মিস্ত্রীরা আসিয়া গ্রহণ করিতেছে, পশ্চিম অঞ্চলের রাজমিস্ত্রী আসিয়া দেশীয় রাজমিস্ত্রীদিগকে স্থানচ্যুত করিতেছে। বাঙ্গালী জাতিকে এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা পল্লীসংস্কারে আত্মনিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের এ কার্য্যটি বিশেষভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

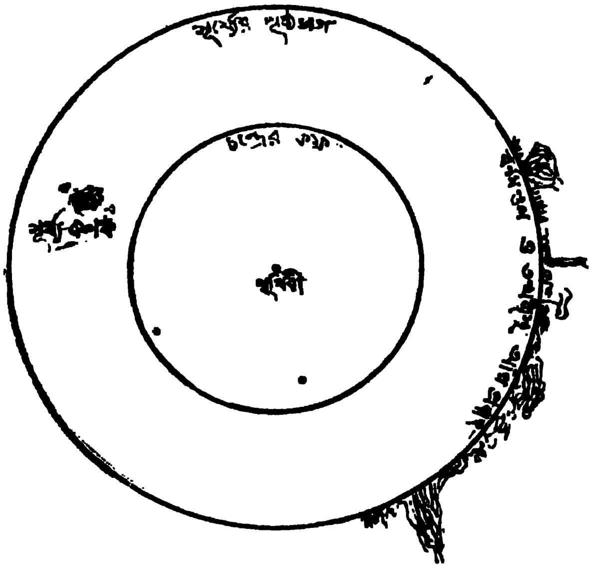
সূর্য্য

বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা করিয়া স্থির করিলেন যে, আকারে ও উজ্জ্বলতায় সূর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বহু নক্ষত্র আকাশে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু তথাপি পৃথিবীবাসী জীবদিগের নিকট সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। কেন না, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবনীশক্তির মূলাধার সূর্য্য; অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থানের জন্য সূর্য্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবীবাসী মনুষ্যাদি প্রাণিগণ এবং তরুলতাদি উদ্ভিদবর্গ সৃষ্ট হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিতেছে; দিন, রাত্রি, ঋতুপরিবর্ত্তন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জ সূর্য্যের উপস্থিতির ফলে সংঘটিত হইতেছে; কাযেই সৃষ্টি-স্থিতি-কারী সূর্য্য মানবের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক বলিয়া পরিগণিত ও বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পূজিত হইয়া আসিতেছে; সূর্য্যবন্দনা আমাদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের অন্তর্গত হইয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রচলনের পর হইতে সূর্য্যসম্বন্ধীয় বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে সূর্য্যের পৃষ্ঠভাগ একটি সমতল



সূর্য্য ও পৃথিবীর তুলনামূলক আকার

বৃত্ত বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে ইহা জলন্ত গোলক তুল্য প্রতীয়মান হয়। সূর্য্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫ শত মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাস হইতে প্রায় ১ শত ৯।৷০ গুণ অধিক। (চিত্র নং ১)। এ সূর্য্যের তুলনায় পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র বিন্দু তুল্য প্রতীয়মান হইতেছে। ১৩ লক্ষ একত্র আয়তনে সূর্য্যের সমকক্ষ। কিন্তু ওজনে মাত্র ৩ শত ৩২ হাজার পৃথিবী সূর্য্যের সমতুল্য; সুতরাং সূর্য্যের সমাংশ পৃথিবীর সমাংশ হইতে লঘুতর। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ২৯ লক্ষ মাইল। কেবলমাত্র সংখ্যা পাঠ করিয়া সূর্য্যের বিশালত্বের এবং পৃথিবী হইতে দূরত্বের সম্যক্ ধারণা সম্ভবপর নহে; কিন্তু দৃষ্টান্ত-সাহায্যে ধারণা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিতে পারা যায়।



চন্দ্রের কক্ষের ও সূর্য্যের পৃষ্ঠভাগের তুলনামূলক আকার

আ-সূর্য্যপৃথিবীলম্বিতবাহুবিশিষ্ট নবজাত শিশু জন্মদিনে সুদীর্ঘ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা যদি জলন্ত সূর্য্যপৃষ্ঠ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার জীবিতকালের মধ্যে অঙ্গুলিটি যে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা সে জানিতে পারিবে না, কারণ, হেল্ম্‌হোলৎস্‌এর মতে অনুভূতির গতি প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ১ শত ফুট; সুতরাং এই গতিতে হস্তমধ্যে ভ্রমণ করিয়া ঐ অনুভূতি ১ শত ৫০ বৎসরে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করিবে।* সূর্য্য এত বৃহৎ যে, শূন্যগর্ভ হইলে পৃথিবী অনায়াসে ইহার কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া ২ শত ৪০ সহস্র মাইল দূরস্থ চন্দ্র কর্ত্তৃক আবেষ্টিত হইতে পারে এবং চন্দ্রের কক্ষ হইতে সূর্য্যের পৃষ্ঠভাগের দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ মাইল হইবে (চিত্র নং ২)।† যদি রেল-লাইন

* Prof. Mendenhall

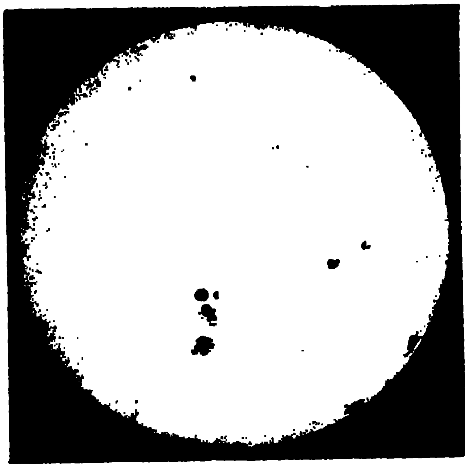
† "The sun" by Toung

সূর্য্যমধ্যে এবং পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বাষ্পীয় ট্রেণ প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতিতে অবিশ্রান্ত চলিলে ১ শত ৯৫ বৎসরে পৃথিবী হইতে সূর্য্যে উপনীত হইবে এবং পূর্ণ ৫ বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে।

সূর্য্যের দৃশ্য পৃষ্ঠভাগ 'আলোকমণ্ডল' নামে পরিচিত, এই আলোকমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমভাবে আলোকিত নহে; প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ অধিকতর আলোকিত (চিত্র নং ৩, ৪); দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অসংখ্য শ্বেত ও কৃষ্ণ বিন্দু দ্বারা 'আলোকমণ্ডল' এরূপ আচ্ছন্ন, যেন ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ স্থানে অসংখ্য শ্বেত চাউল-কণা এক একটি করিয়া সজ্জিত রহিয়াছে, (চিত্র নং ৫।৬)। যদিও প্রত্যেক তথাকথিত চাউলকণার দৈর্ঘ্য ৪ শত হইতে



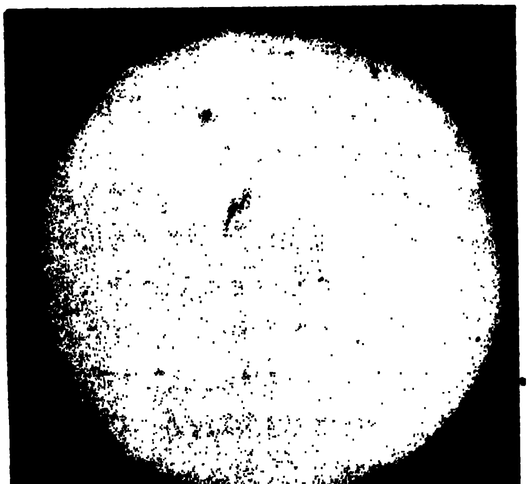
সূর্য্যের পূর্ব্বভাগ ও তন্মধ্যস্থ কয়েকটি ফেকুলা (ইয়র্ক মানমন্দিরে গৃহীত ফটো)



সূর্য্য ও তন্মধ্যস্থ কয়েকটি সূর্য্য-কলঙ্ক—১৮৯২ খৃঃ অঃ, (রাজকীয় মানমন্দির) গ্রীনউইচে গৃহীত ফটো।



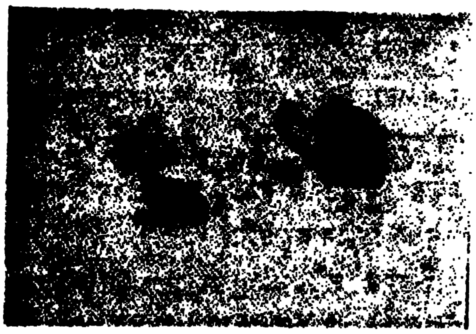
আলোকমণ্ডলের বহিরাবরণ (হিউজিন্স অঙ্কিত)



সূর্য্য ও একটি সূর্য্য-কলঙ্ক—১৯০৫ খৃঃ অঃ, (রাজকীয় মানমন্দির)

৬ শত মাইল। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, ভাস্বর মেঘখণ্ড অপেক্ষাকৃত অল্প ভাস্বর বাষ্পস্তরে ভাসমান বলিয়া উপরি-উক্ত দৃশ্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য, সূর্য্যের মেঘখণ্ডের সহিত পৃথিবীস্থ মেঘখণ্ডের পার্থক্য বিস্তর; কেবলমাত্র জলকণা দ্বারা আমাদের মেঘখণ্ড সৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপর পক্ষে সূর্য্য ভীষণ উত্তপ্ত, দ্রবীভূত রাসায়নিক মূল উপাদানবিন্দু দ্বারা সূর্য্যস্থ মেঘখণ্ড গঠিত। সূর্য্যপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন মেঘখণ্ড দেখা যায়; ইহাই সুপ্রসিদ্ধ তথাকথিত সূর্য্য-কলঙ্ক (চিত্র নং ৩ ও ৪); সূর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু সূর্য্য-কলঙ্ক; কাজেই সূর্য্য-কলঙ্কের সঠিক ইতিহাস অবগত হইবার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও বর্ত্তমানে করিতেছেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ডেভিড ফেব্রিসিয়স্ (David Fabricius) গতিশীল সূর্য্য-কলঙ্ক প্রথম আবিষ্কার করেন; কয়েক মাস পরে অপর তিন জন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত—জার্ম্মান্ শাইনার, ইংরাজ হ্যারিয়ট ও ইতালীয় গ্যালিলিও—সূর্য্য-কলঙ্ক দেখিতে পান। একটি সূর্য্য-কলঙ্কের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছে, পরে ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া লোকলোচন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইতেছে, (চিত্র নং ৭, ৮, ৯)। কতিপয় সূর্য্য-কলঙ্কে আকারের এইরূপ পরিবর্ত্তন কয়েক ঘণ্টার



সূর্য্য-কলঙ্ক (লিক্ মানমন্দিরে গৃহীত ফটো, ৮ই আগষ্ট ১৮৯৩)



সূর্য্য-কলঙ্কের ৩১শে আগষ্ট তারিখের দৃশ্য

মধ্যে সংঘটিত হয়, আবার কোন সূর্য্য-কলঙ্ক কয়েক সপ্তাহ অবিকৃত থাকে। সাধারণতঃ সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্তে বৃত্তাভাস আকারে সূর্য্যকলঙ্ক আবির্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়, সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে ইহার দূরত্বের হ্রাসের সহিত আকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পরে সূর্য্যের কেন্দ্রে আগমন করিয়া বৃত্তাকারে পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্র হইতে সূর্য্যের পশ্চিম ভাগে অগ্রসর হওয়াকালীন আকারের হ্রাস হয় ও পুনরায় বৃত্তাভাসরূপ ধারণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে একটি সূর্য্য-কলঙ্কের প্রায় ১৩॥০ দিন সময় লাগে। অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল সূর্য্য-কলঙ্ক অদৃশ্য হইয়া ১৩॥০ দিনের পর পুনরায় পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। সাধারণতঃ সূর্য্য-কলঙ্কের আকার এরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয় যে, দ্বিতীয় বার উদিত হওয়াকালীন তাহাকে বিভিন্ন সূর্য্য-কলঙ্ক বলিয়া ভ্রম হয়। মাত্র কতিপয় সূর্য্য-কলঙ্ক সূর্য্যকে ৩।৪ বার অবিকৃতভাবে প্রদক্ষিণ করিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর চক্রাকারে ঘূর্ণনের ফলে যেরূপ মনে হয়, সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, সেইরূপ সূর্য্য-কলঙ্কের উদয় ও অস্ত হইতে সূর্য্যের চক্রবৎ গতি আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক শাইনার প্রথম স্থির করেন। সুতরাং ১৩॥০ + ১৩॥০ = ২৭ দিনে সূর্য্য একবার ঘূর্ণিত হয়। সূর্য্যের সর্ব্বত্র সূর্য্য-কলঙ্ক আবির্ভূত হয় না; সূর্য্যের বিষুব রেখার সমান্তরাল পথে ইহারা যাতায়াত করে।



সূর্য্য-কলঙ্কের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের দৃশ্য

কিন্তু বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পথের দিক্ পরিবর্ত্তিত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট সৌর-কলঙ্কের মধ্যস্থানের বর্ণ প্রান্তভাগের বর্ণ অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণ; কৃষ্ণবর্ণের পদার্থটি হইতে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের আলোকচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইয়া থাকে (চিত্র নং ১০)। সৌর কলঙ্কের মধ্যস্থ কৃষ্ণ পদার্থটির ব্যাস ৫ শত হইতে ৫০ সহস্র মাইল পর্য্যন্ত হয় এবং ইহা বহু সহস্র মাইলব্যাপী অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল রেখা দ্বারা বেষ্টিত। কাযেই একটি সৌর কলঙ্ক পৃথিবী হইতে বহু গুণে বৃহৎ। আকারে সর্ব্ববৃহৎ সৌর কলঙ্ক সূর্য্যাস্তের সময় চর্ম্মচক্ষুতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এইরূপ সৌর-কলঙ্কের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সকল বৎসরে সূর্য্যে সৌর-কলঙ্কের আবির্ভাব হয় না। সূর্য্যমধ্যে ইহাদিগকে কয়েক

বৎসর প্রায় প্রতি দিনেই এবং অপর কয়েক বৎসর কচিৎ একটি বা দুইটি দেখা যায়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে শাবে (Sheube) ইহাদিগের সৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট কাল প্রথম স্থির করেন। সাধারণতঃ ৪½ বৎসর সূর্য্যে কোন কলঙ্ক থাকে না; কিন্তু পরের ৬½ বৎসরে বহু সৌর-কলঙ্কের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইতে থাকে।

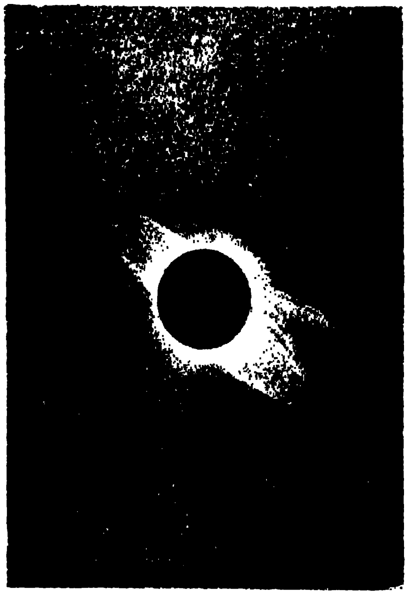


সূর্য্য-কলঙ্ক (ল্যাঙ্গলে অঙ্কিত)

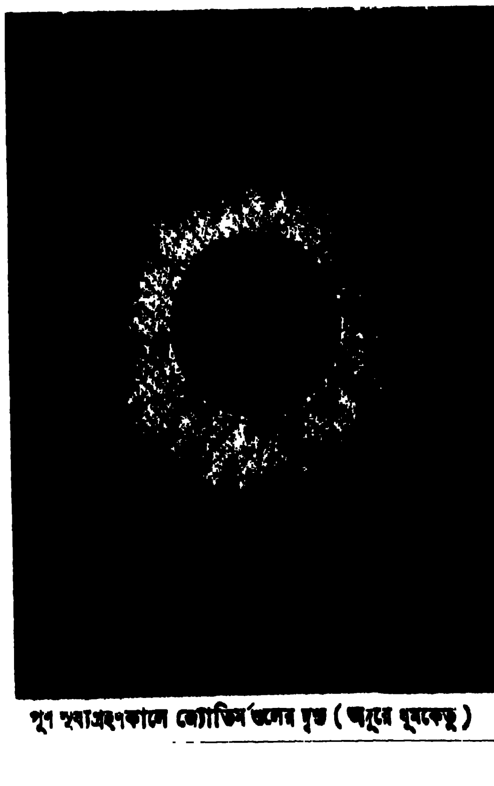
সূর্য্যে ইহাদিগের আবির্ভাবের সহিত পৃথিবীস্থ নৈসর্গিক ঘটনাপুঞ্জের সঠিক সম্বন্ধ অবগত হইবার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন. কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে আশা করা যায় যে, অদূর-ভবিষ্যতে সৌর-কলঙ্কের যথার্থ পরিচয় অবগত হইলে, পৃথিবীস্থ আগ্নেয়গিরির বিক্ষোভ, ভূমিকম্পের উৎপত্তি, মহা-ঝড় ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি ভয়াবহ আকস্মিক ঘটনাগুলির সময় ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যাইবে এবং ফলে আমরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব। সৌর-কলঙ্কের আবির্ভাবের ফলে 'অরোরা'র আবির্ভাব ও চৌম্বক চাঞ্চল্য হইতে দেখা গিয়াছে, যদিও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আমাদিগের নিকট এখনও অজ্ঞাত। সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় বহু মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কোনটি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। ফেব্রিসিয়সের মতে অত্যুত্তপ্ত সূর্য্য হইতে সৌর-কলঙ্ক কোনরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; শাইনার হইতে আসিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু গ্যালিলিওর ধারণা ছিল যে, ইহা সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলের মেঘ-খণ্ড মাত্র। হার্শেল অনুমান করেন যে, বিভিন্ন সৌর-কলঙ্ক প্রজ্বলিত সূর্য্যমণ্ডলের বিভিন্ন গহ্বর এবং ইহার মধ্য দিয়া সূর্য্যের কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। পরে সৌর-কলঙ্কের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া কিরশফ্ (Kirshoff) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সূর্য্যের আলোকমণ্ডলে স্থানীয় উত্তাপের হ্রাসের ফলে মেঘখণ্ড সৃষ্ট হইয়া উপরিস্থ সূর্য্যরশ্মির বহিরাগমনের পথের প্রতিবন্ধক হওয়ায় উপরিস্থ স্তরাবলী শীতল হইতে থাকে ও কিছু কাল পরে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া সৌর-কলঙ্ক নামে পরিচিত হয়। অধ্যাপক ইয়ঙ্গের পুস্তকে লিখিত আছে যে, সূর্য্যমণ্ডলে আভ্যন্তরিক বিক্ষোভের ফলে জ্বলন্ত পদার্থনিচয় উপরে নিঃসৃত হওয়াকালীন নিকটবর্ত্তী স্থানে গহ্বরের সৃষ্টি হয় ও তথায় অপেক্ষাকৃত শীতল বিভিন্ন বাষ্প একত্র হইয়া সৌর-কলঙ্করূপে প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আলোকমণ্ডলের উপরে পদার্থাদি পতিত হইয়া সৌর-কলঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে; আবার কাহারও মতে সূর্য্যের ভিতর হইতে বাষ্পাদি বহির্গত হইয়া উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল পদার্থের সংস্পর্শে আবার তাহাদিগের উত্তাপের হ্রাস হয়; কাযেই শুভ্র আলোকমণ্ডলের তুলনায় ইহাদিগের শুভ্রতা অল্প বলিয়া মনে হয় এবং ইহাদিগকেই আমরা সৌর-কলঙ্ক বলিয়া থাকি। সূর্য্যমণ্ডলে প্রবল 'ঘূর্ণি' ঝড় হয় এবং তাহারই ফলে সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তি, ইহাই রে (Reye) এবং ফার (Faye) মতবাদ। কার্ণেগি মানমন্দিরে সৌর-কলঙ্কের ঘূর্ণায়মান আকার আবিষ্কারের পর হইতে রে এবং ফার সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তিমূলক মতবাদ পুনঃ আলোচিত হইতেছে। মূল কথা, সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তির প্রকৃত রহস্য আমরা এখনও পর্য্যন্ত সঠিক অবগত নহি। অপেক্ষাকৃত আকারে বৃহৎ সৌর-কলঙ্ক অথবা কলঙ্ক-পুঞ্জের নিকটে শ্বেত মেঘখণ্ড তুল্য অন্য এক প্রকার পদার্থ অবস্থান করে। ইহাই ফেকুলা (Facula) নামে অভিহিত হয় (চিত্র নং ৬)। ফেকুলা যেন সৌর কলঙ্কের অগ্রগামী দূত, কেন না, ফেকুলার নিকটে কলঙ্ক প্রথমে না থাকিলে শীঘ্রই সৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে।

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করাকালীন সূর্য্যও পৃথিবী

আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিয়া দেয়; ইহাই সূর্য্যগ্রহণের প্রকৃত কারণ। চন্দ্রের কক্ষের সমতল পৃথিবীর কক্ষের সমতল হইতে বিভিন্ন বলিয়া সাধারণতঃ আংশিক সূর্য্যগ্রহণ হয়; কেন না, সেই জন্য সূর্য্য ও পৃথিবীর কেন্দ্রদ্বয় সংযোগকারী রেখার উপরে চন্দ্র প্রতি বারে উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে চন্দ্র অবস্থান করে, তখন পূর্ণ অথবা অঙ্গুরীয়কবেষ্টিত সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবী হইতে যথাক্রমে এরূপ দূরে অবস্থিত যে, প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য চন্দ্র হইতে বহু গুণে বৃহৎ হইলেও আপাতদৃষ্টিতে আমাদিগের নিকট আকারে চন্দ্রতুল্য প্রতীয়মান হয়; কাযেই চন্দ্রের দূরত্বের সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেই চন্দ্রের ব্যাস সূর্য্যের ব্যাস অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চন্দ্রের কক্ষ বৃত্ত নহে, পরন্তু বৃত্তাভাস। সুতরাং সূর্য্যগ্রহণের সময় যদি চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থান করে, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দেয় এবং ফলে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ হয়; কিন্তু গ্রহণের সময় পৃথিবীর দূরত্ব যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে চন্দ্রের ব্যাস সূর্য্যের ব্যাস অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়ায়—চন্দ্র সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিতে পারে না এবং ফলে সূর্য্যের কতকাংশ অঙ্গুরীয়ক আকারে অদৃশ্য চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগে চন্দ্র অবস্থান করিবে। পৃথিবীর যে স্থানে সূর্য্যগ্রহণ পূর্ণমাত্রায় হয়, তথায় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ অর্থব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিয়া যাইতে কখনও পশ্চাৎপদ হন না; এবং যে সময়—সাধারণতঃ ৩ হইতে ৫ মিনিট, কচিৎ ৮ মিনিট—চন্দ্র কর্তৃক সূর্য্য আবৃত থাকে, সেই মুহূর্ত্ত কয়টিও তাঁহাদের নিকট অতিশয় মূল্যবান্। কারণ—সূর্য্যালোকের তীব্রতার বহু পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় সূর্য্যসম্বন্ধীয় বহু বিষয় স্বচক্ষুতে দেখিয়া আমাদিগের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকেন। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের দৃশ্য এতই সুন্দর যে, দূরবীক্ষণ-সাহায্যে যদি মাত্র একবারও কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে দৃশ্য জীবনে আর কখনও ভুলিতে পারেন না। চন্দ্র পশ্চিমদিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে সূর্য্যকে গ্রাস করিতে থাকে; একটি একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশে ফুটিয়া উঠে; অসময়ে সূর্য্যকে সহসা অস্ত যাইতে দেখিয়া পক্ষিগণ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে নিজ কুলায়ে ফিরিতে থাকে; কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেন এক বিপ্লব-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে খেলিয়া যায়। সে সময়ে কৃষ্ণ চন্দ্রের অন্তরালে সূর্য্য অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও তুষারশুভ্র জ্যোতিঃ বৃত্তাকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দূর পর্য্যন্ত আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে থাকে; (চিত্র নং ১১, ১২, ১৩) ইহাই

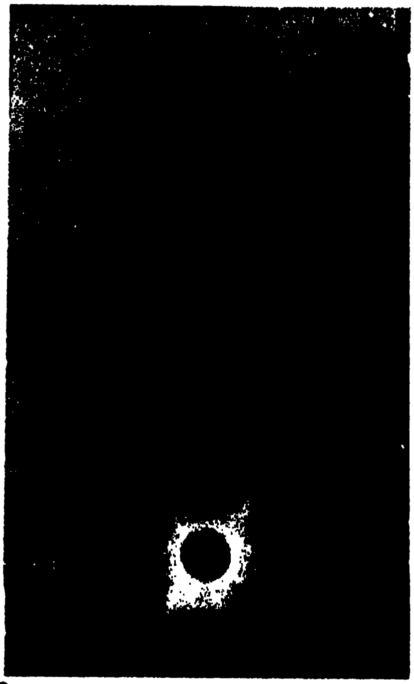


পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ। (হা:নেস্)



পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের দৃশ্য (অদূরে ধূমকেতু)

সূর্য্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল (corona) নামে পরিচিত। রক্তিম-বর্ণ মণ্ডলের (chrogosphere) উপর জ্যোতির্ম্মণ্ডল অবস্থিত দেখা যায়। বর্ণমণ্ডল হইতে অগ্নিপ্রবাহ (Pro-mineive) চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। (চিত্র নং ২, ১৪)। গ্রহণ ভিন্ন অন্য সময়ে সূর্য্যের 'জ্যোতির্ম্মণ্ডল' দেখিতে পাওয়া যায় না; কাযেই ইহার উপাদান ও যথার্থ প্রকৃতি আমরা অবগত নাহ। তবে অনুমান করা যায় যে, ইহা নিশ্চিতই অতি সূক্ষ্ম এবং 'করোনিয়ম' নামক এক অজ্ঞাত পদার্থ দ্বারা ইহা সৃষ্ট। সম্ভবতঃ 'অরোরা' অথবা ধূমকেতুর পুচ্ছের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। বর্ণমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ অগ্নিপ্রবাহ সূর্য্যগ্রহণের সময় প্রথম আবিষ্কৃত হইলেও এখন যন্ত্রসাহায্যে বৎসরের সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকমণ্ডলের উপর বর্ণ-মণ্ডল অবস্থিত; ইহার গভীরতা ৫ সহস্র হইতে ১০ সহস্র মাইল, বর্ণ-মণ্ডল যেন একটি অগ্নি-সমুদ্র; আভ্যন্তরিক কোন শক্তি দ্বারা ইহার মধ্য হইতে অগ্নি-প্রবাহ উপরে উত্থিত হয় (চিত্র নং ১৫,১৬)। বর্ণ-মণ্ডলের ও অগ্নি-প্রবাহের উপাদান



জ্যোতির্ম্মণ্ডলের আলোকচ্ছটা (মিসেস্ মন্‌ডার গৃহীত ফটো)





সূর্য্যের বর্ণমণ্ডলস্থ অগ্নিপ্রবাহ (ক্রভেল অঙ্কিত)

যে বিভিন্ন নহে, ইহা অধুনা স্থিরীকৃত হইয়াছে; সাধারণতঃ হাইড্রোজেন, হিলিয়ম্, করোনিয়ম্ এবং ক্যালসিয়ম্ ইহাদিগের উপাদান; কিন্তু সূর্য্যপৃষ্ঠে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্ট হইলে অন্যান্য ধাতুর—লৌহ, সোডিয়ম্, ম্যাগনিসিয়ম্ ইত্যাদি—আবির্ভাব হয়। একটি অগ্নি-প্রবাহের সম্বন্ধে ইয়ং লিখিয়াছেন—"বেলা সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় বর্ণ-মণ্ডল হইতে অগ্নি-প্রবাহের উচ্চতা ৪০ হাজার মাইল ছিল; কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার পরেই তাহার উচ্চতা দ্বিগুণিত হয় এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল হয়; পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেলা প্রায় সাড়ে ১২ ঘটিকার সময় আকাশে বিলীন হইয়া গেল।" সূর্য্যের প্রকৃত মূর্ত্তি আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয় না; সূর্য্যের কেবলমাত্র আলোক-মণ্ডল আমরা দেখিতে পাই এবং এই স্থান হইতেই সম

আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আলোক-মণ্ডলের নিম্নস্থ পদার্থস্তর অসম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকিলেও, উপরিস্থ স্তরাবলীর বিষয় বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা সম্যক্‌রূপে অবগত আছি। সৌর-কলঙ্ক, ফেকুলা ইত্যাদি আলোক-মণ্ডলে অবস্থান করে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক প্রকার বায়ু-স্তর আলোক-মণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে আলোক শোষণ করিয়া লয়; ফলে সূর্য্যের প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ উজ্জ্বল দেখা যায়; অত্যুত্তপ্ত নানা

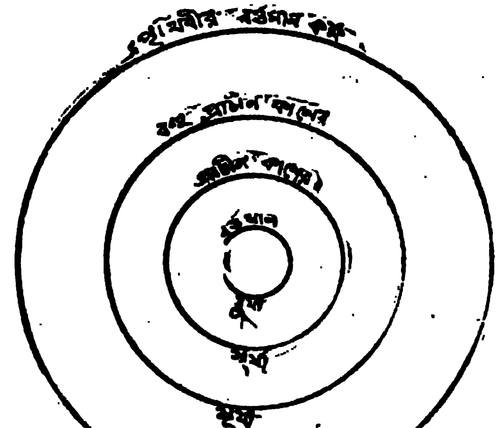


বর্ণমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিপ্রবাহ—উচ্চতা ২৭৫ সহস্র মাইল

প্রকার ধাতুজ বাষ্প দ্বারা গঠিত বিপরীত স্তর (Reversing layer) উপরি-উক্ত স্তরকে বেষ্টন করিয়া সূর্য্যকিরণ শোষণ করিয়া লয়; ফলে সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ফ্রাণহোফার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ অগ্নি-প্রবাহপূর্ণ বর্ণ-মণ্ডল বিপরীত স্তরের উপর অবস্থিত এবং সর্ব্বোপরি জ্যোতির্মণ্ডল (Corona) বিরাজ করে।

সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ বহু মূল উপাদান বাষ্পরূপে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে; এই তথ্য কির্‌শফ প্রথম আবিষ্কার করেন।

সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হয়; পৃথিবী তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ—প্রায় ২ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে; চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ একত্রে সামান্য অংশ প্রাপ্ত হয়; কাযেই অধিকাংশ আলোক পশ্চাতে একাদিক্রমে ২৪টি শূন্য (০) বসাইয়া যে সংখ্যা হয়, তত সংখ্যক মোমবাতি একত্র প্রজ্বালিত করিলে যে আলোক উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণ আলোক আমরা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, সূর্য্যে বাস্তবিক কোন বস্তু দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া আলোক ও উত্তাপ উৎপাদন করে। কয়লার মত কোন দহনশীল পদার্থ দ্বারা যদি সূর্য্য সত্যই গঠিত হইত এবং পদার্থটি উজ্জ্বল হইবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন যদি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে যে পরিমাণ আলোক ও উত্তাপ সূর্য্য আমাদিগকে প্রত্যহ প্রদান করে, সেই পরিমাণে ২ হাজার ৮ শত বৎসরের অধিক প্রদান করিতে পারিত না। কিন্তু সূর্য্যের জীবন অত অল্পকালস্থায়ী নহে; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আমরা সূর্য্যকিরণ লাভ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তথাপি ইহা নিঃশেষিত হয় নাই এবং আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর সূর্য্য কিরণ প্রদান করিয়া পৃথিবীস্থ প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌বর্গকে সঞ্জীবিত রাখিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সূর্য্যমধ্যস্থ কোন দহনশীল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর উৎপত্তিমূলক নেবুলার মতবাদ অনুসারে এক বিরাট নেবুলা হইতে সূর্য্য ও গ্রহাদি উৎপন্ন হইয়াছে, কাযেই সঙ্কুচিত হওয়াকালীন সূর্য্য প্রভূত উত্তাপের সৃষ্টি করে এবং প্রতি ১১ বৎসরে ইহার ব্যাসের দৈর্ঘ্য ১ মাইল হ্রাস পায়, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে (চিত্র নং ১৭)।



সূর্য্যের সঙ্কোচন

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহাই যদি আলোক ও উত্তাপের উৎপত্তির একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের সৃষ্টি প্রায় ২ কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং কিঞ্চিৎ অধিক ১ কোটি বৎসর পরে সূর্য্যের উত্তাপ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। অবশ্য উল্কাপিণ্ডের সূর্য্যপৃষ্ঠে পতনের ফলে কিছু পরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। এ দিকে ভূতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতরা পৃথিবীর বয়স এক শত কোটি বৎসর স্থির করিয়াছেন এবং চন্দ্র প্রায় এক শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, গণনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে ডারউইন উপনীত হন; সুতরাং সূর্য্যের বয়স নিশ্চিতই বহু কোটি বৎসর। কিন্তু উত্তাপসৃষ্টির অপর কোন কারণ বহু দিন পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত না হওয়ায় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সূর্য্যের বয়স সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। রেডিয়মের আবিষ্কারের পর হইতে সে মতভেদও প্রায় আর নাই। রেডিয়ম হইতে উত্তাপ নিঃসৃত হইতে থাকে, ইহা সকলেই জানেন; কাযেই যদি সত্যই সূর্য্যে রেডিয়ম উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কয়েক শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে সূর্য্যের জন্ম হইয়াছিল এবং আরও কোটি কোটি বৎসর সূর্য্য আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিবে, এ বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিকেরই আপত্তি থাকিতে পারে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আগমন

মৃগনাভির গন্ধে যেমন ভ'রে উঠে বন
তুমি তেমনি ক'রে জানিয়ে দাও তোমার আগমন।
জোয়ার আসে যেমন ক'রে
ভাঙ্গা নদীর দুকূল ভ'রে
সজল মেঘে যেমন ঢাকে শ্রাবণ-গগন।

কোকিলেরি কণ্ঠে যেমন আসে কুহুস্বর,
আনে গোটা বসন্ত সে বুকেরি ভিতর।
এস্রাজীর অঙ্গুলির পরশ
তারে যেমন নামায় হরষ
চকোর চেনে যেমন চাঁদের করের পরশন
তুমি তেমনি ক'রে জানিয়ে দাও তোমার আগমন।

অশ্রু-নদীর সলিল বাড়ে উজান বহে হায়
উত্তরায়ণ গঙ্গা আসে, অজয়-কিনারায়।
তমাল কাঁপে ঝুলন-দোলে
চিনায়ে দেয় নূপুর বোলে
আঁধারেতে যেমন প্রিয় করের পরশন
তুমি তেমনি ক'রে জানিয়ে দাও তোমার আগমন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক



প্রথম দৃষ্টি

[illegible]



৩

দিন দুই পরে ছুটোর ষ্টীমারে বেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছে সতীশ নিজের বাড়ীতে গেল। সেখানে দেওয়ানজী তার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি কাযের কথা আপনি লিখেছিলেন?"

দেওয়ানজী বল্লেন, "কায কয়েকটা আছে। কিন্তু যার জন্যে আপনার উপস্থিতি দরকার, সে হচ্ছে এই বাড়ীটার সংস্কার। সমস্ত বাড়ীটা চুণকাম হওয়া দরকার, তার ওপরে মাঝে মাঝে প্লাষ্টার করার দরকার। এক আধ যায়গায় ভগ্ন-সংস্কারও করাতে হবে। হুজুর যদি নিজে এক বার দেখেন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

সতীশ দেওয়ানজীর সঙ্গে সব বাড়ীটা ঘুরে এসে বল্লে, "হাঁ, সংস্কার দরকার হয়েছে বটে। কত আন্দাজ খরচ হ'তে পারে?"

দেওয়ানজী বল্লেন, "আমার আন্দাজ চার পাঁচ শো।"

সতীশ বল্লে, "তা করতে হবে। মেরামত আরম্ভ ক'রে দিন তা হ'লে।"

দেওয়ানজী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে, তার মাথার কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে দিয়ে একবার আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে বল্লেন, "যদি অনুমতি করেন, ত' একটা কথা নিবেদন করি।"

সতীশ বল্লে, "বলুন না।"

দেওয়ান সবিনয়ে বল্লেন, "হুজুর এত বড় ফাঁকা বাড়ীতে আমাদের কায করতে মনে কেমন আপশোষ হয়। বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে। হুজুর যদি এখানে এসে থাকেন ত' আমাদের মন ভরে—আর সংসার ক'রে,—"

সতীশের বাবার আমলের এই প্রবীণ দেওয়ানের মনের ভাব বুঝতে সতীশের দেরী হ'ল না। ছেলেবেলায় সতীশ কত দিন এই লোকটির কোলে-পিঠে উঠেছে; সুতরাং তার ওপর এই যে তাঁর স্নেহের দাবী, সতীশ তাকে সম্মান করত।

উত্তরে সতীশ একটু হেসে বল্লে, "দেওয়ানজী! আমি গাঁয়ের ঐ গঙ্গার ধারের বাড়ীতে ভাল থাকি বলেই ওখানে থাকা, নইলে কলকাতার এই বাপ-পিতামহের বাড়ীর ওপর আমার স্নেহ কম নেই। আপনারা ত আছেন, সেই ত আমার থাকা হ'ল। তার পর মাঝে মাঝে এসে ২।৪ দিন ক'রে ত থাকিই। দরকার হ'লে এখানে এসেই থাকব। আর সংসার? বিবাহ করব না, এমন পণ ত আমার নেই; সে-ও হবে। আর কিছু বলবার আছে কি?"

দেওয়ান বল্লেন, "কুসুমপুরে সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি, তার কাছে প্রায় ৬০।৭০ টাকা খাজনা বাকী। তার ওপরে নালিশ করব কি?"

সতীশ বল্লে, "না দেওয়ানজী। সে এক দিন আমার কাছে গিয়েছিল, তার অবস্থা আমি শুনেছি। গত বৎসর সে সব শোধ করবে ভেবেছিল, কিন্তু অজন্মার জন্যে পারে নি। সে বলেছে যে, ক্রমে ক্রমে সে শোধ করবার চেষ্টা করবে; কিন্তু পারবে ব'লে বিশ্বাস হয় না। ভবিষ্যতে সে বাকী রাখবে না বলেছে, সেই হ'লেই যথেষ্ট; বক্রী যা, তা' আমি মাফই করেছি।"

দেওয়ান সবিনয়ে বল্লেন, "হুজুর একেবারে এমন ভাবে সরাসরি মাপ করলে—"

সতীশ বল্লে,—"চলবে না বলছেন? না, তা চলবে। কজন-ই বা বিধবা রেয়োত আছে যে, তাদের মাপ করলে অচল হবে? আমি ত সকলের খাজনা মাপ করতে বলিনে। তবে অবস্থাবিশেষে না করলে তাদেরই বা চলে কি ক'রে? তার পর?"

দেওয়ান বল্লেন, "তার পর বাখর আলির সেই খতের দরুণ পাওনা। তামাদি হ'তে আর এক মাসটাক আছে, সে কিছুমাত্র দেয় নি।"

সতীশ। সে কি বলে?

দেওয়ান। সে বলে যে, আমরা যেমন ক'রে ইচ্ছে

আদায় করতে পারি, সে দেবে না। কেন না, সে দিতে পারে না।

সতীশ। কেন, তার কি দেবার অবস্থা নেই?

দেওয়ান। তা কেন থাকবে না, হুজুর। অন্ততঃ কিছুও ত দিতে পারে।

সতীশ খানিকটা চিন্তা ক'রে বললে, "আচ্ছা, তাকে ব'লে পাঠাবেন যে, পনর দিনের মধ্যে যদি সব সুদটা দেয়, তা হ'লে এখন নালিশ হবে না। নইলে নালিশ ক'রে দেবেন। আর কিছু আছে?"

দেওয়ান বল্লেন, "এক বার মাসের খাতাপত্রগুলো দেখে সই ক'রে দেওয়া।"

সতীশ বল্লে, "আমি এক বার ভবানীপুরের দিকে যাব, একটু কায আছে। আজ রাত্রে এখানেই থাকব। ভবানীপুর থেকে ফিরে এসে সে কাজগুলো হবে অখন।"

দেওয়ান বল্লেন, "তাই হবে।"

ভবানীপুরের কায, লীলার জন্য পাত্র ঠিক করতে যাওয়া। পাত্রটি তার বাল্য-বন্ধু সুনীল। দুজনে একসঙ্গে এম, এ, পাশ করেছে; সুনীল ওকালতী পড়ছে। তার বাপ প্রকাশ বাবু আলিপুরের উকীল, ছেলেরও কর্মক্ষেত্র সেই-খানেই ঠিক করেছেন।

সুনীলের সঙ্গে দেখা হ'ল। ইদানীং সতীশ গ্রামে থাকার দরুন দেখা-শুনা কম হয়; সুতরাং সে ভারী সুখী হ'ল। তার দৌত্যের কথা শুনে সুনীল বললে, "বাবাকে ত বলতে হবে।" কিন্তু মেয়েটির বিশেষ বিবরণ শুনে নিতেও ভুল করলে না।

সতীশ বল্লে, "এমন মেয়ে যদি পাস্ ত, জান্‌বি, তোর ভাগ্যি।"

প্রকাশ বাবু খবর পেয়ে নীচে নেমে এলেন। সতীশ তাঁকে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, "সতীশ, আজকাল তোমার সঙ্গে আর মোটেই দেখা হয় না, ভাল আছ ত?"

সতীশ। আজকাল আমি কুসুমপুরেই প্রায় থাকি, সে কথা জানেন বোধ হয়। কলকাতায় আসা কম, তাই দেখা-সাক্ষাতের সুবিধে হয় না।

প্রকাশ। সেখানে আছ কেমন, ভাল ত?

সতীশ। আজ্ঞে হাঁ, গঙ্গার কাছেই বাড়ী করেছি, হাওয়াটা বড় স্বাস্থ্যকর; যায়গাও মনোরম। আপনারা এক বার চলুন না, সেই সম্পর্কেই ত আমি এসেছি।

প্রকাশ। কি রকম?

সতীশ। আমায় এক জন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া আছেন, তাঁর মেয়েটি বিবাহযোগ্যা। মেয়েটি দেখতে সুশ্রী। আমার ইচ্ছে, সুনীলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়; এক বার আপনি যদি দয়া ক'রে গিয়ে দেখে আসেন।

প্রকাশ। তোমার কি রকম আত্মীয়া? বাড়ী কোথায়?

সতীশ। দূর সম্পর্কে। বাড়ী পলাশপুর। নদে জিলা।

গড়গড়ার নলের মুখে একরাশ ধোঁয়া বার ক'রে প্রকাশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "অবস্থা কি রকম? দেবে থোবে কি রকম?"

সতীশ বল্লে, "অবস্থা বোধ করি তেমন ভাল নয়। তবে মেয়েটি দেখেই দেওয়া, বড় লক্ষ্মী মেয়েটি। দেওয়া-থোওয়ায় জন্যে আটকাবে না।"

সশব্দে হেসে উঠে প্রকাশ বাবু বল্লেন, "তা ত না আট-কানই উচিত, তুমি যখন মাঝে রয়েছ। হ্যাঁ, সুনীলের বিয়ে দেবো ত মনে করেছি, তা বেশ, যাব। পরশু রবিবার, সেই দিন যাওয়া যাবে। ট্রেণ কখন্—কি রাস্তা?"

সতীশ। ট্রেণে যাওয়াও চলে বটে, কিন্তু ষ্টীমারে যাওয়াই সুবিধে। একেবারে আমার বাড়ীর কাছে লাগে। সকা-লের ষ্টীমারে গিয়ে ঐখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিকালের ষ্টীমারে ফিরবেন। কলকেতা থেকে দেড় ঘণ্টার রাস্তা।

প্রকাশ বাবু আকর্ণ হেসে বল্লেন, "না, খাওয়া-দাওয়া আর কেন? তুমি ত আপনার লোক হ্যাঁ; যাওয়া ত হবেই। খাওয়া-দাওয়ার পর যাওয়া যাবে, কটায় ষ্টীমার সুবিধা?"

সতীশ বল্লে, "তা হ'লে ১২টার ষ্টীমারে যাবেন, ৫টায় ফিরবেন। আমি আমার এক জন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেবো—সেই সব ঠিক ক'রে নিয়ে যাবে। বিকালের জল-খাওয়াটা অন্ততঃ সেখানে হওয়া চাই ত!"

শুনে প্রকাশ বাবু আবার সশব্দে হেসে বল্লেন, "তা বেশ। তা হ'লে ঠিক হ'ল।"

ফেরবার পথে সুনীল ধরলে। বললে, "চা খেয়ে যাও।"

সুনীল বোধ করি এর মধ্যে অনেক স্বপ্ন গড়েছে। চা খেতে খেতে বললে, "কেমন মেয়েটি হে, সত্যি ক'রে বল।"

সতীশ হো হো ক'রে হেসে উঠল, বললে, "এরি মধ্যে

রোগে ধরেছে ? এক কথায় বলতে গেলে এসপ্লেনডিড্। পরীই বল আর পুরীই বল। পরন্তু গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন ত হবেই। আর একটা চমৎকার গুণ, কাযে কর্ম্মে পাকা ওস্তাদ। চা যা করে, পারফেকট। কোথাও খুঁৎ নেই।"

আনন্দে সুনীলের চোখ-দুটো চক্ চক্ করতে লাগলো। তবুও সে বল্লে, "তুমি কবি কি না, তাই এত বাড়িয়ে দেখছ।"

সতীশ বল্লে, "দেখতেই পাবে।"

মোটরে ফেরবার পথে সতীশ ভাবতে লাগলো, 'আশ্চর্য্য এই দুনিয়া! এরি মধ্যে সুনীল যেন তার কতকটা অধিকার স্থাপন ক'রে নিয়েছে, বিশ্বাস তার, জিনিষটিকে আমি রং-ঢং দিয়ে বানিয়ে বলছি। সত্যটা ধরলে সে, আর আমি বললাম বাড়িয়ে! কিন্তু সত্যিই খুসী হবে সে! আর আমি?'

উন্মুক্ত আকাশের দিকে সতীশ চেয়ে দেখলে, বোধ করি, অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়ল।

বাকী কাযগুলো রাত্রিতে সেরে, রবিবার দিন প্রকাশ বাবুদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রে সতীশ তার পরদিনে ষ্টীমারে ফিরল।

৪

সতীশের নদীর ধারে বাড়ীটি সে দিন যেন উৎসবের বেশ ধারণ করেছিল।

প্রকাশ বাবুরা আজ লীলাকে দেখতে আসবেন, তাই সকাল থেকেই ঝাড়া-পোঁছা চলছিল। মাঝের বড় ঘরটিতে নানা-রকম ছবি দিয়ে সাজান হয়েছিল, মেঝের ফরাস বিছানা, তার ওপর কার্পেট পাতা। দুটো একটা ফুলের তোড়াও রাখা হয়েছিল। মানদার মুখে হাসি, চক্ষুতে কৃতজ্ঞতা। পিসীমার নিজের কিছু করবার বড় দরকার হচ্ছিল না, তিনি সকলকে আদেশ কচ্ছিলেন। মেয়ে সাজানর ভার ছিল সুপ্রভার উপর।

যাকে নিয়ে এই আয়োজন, সেই লীলার মুখ দেখে আনন্দ কি দুঃখ, কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। তার উদার গভীর দৃষ্টি যেন আরও গভীর বোধ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মুখে যেন একটা শঙ্কার ভাব দেখা যাচ্ছিল; বোধ করি, বলিদানের দিনে ছাগশিশুর মত। এই সব দিনে, মন থেকে আসল ঘটনাটি মুছে গিয়ে আসন্ন পরীক্ষার বিপদটিই বড় হয়ে ওঠে, বোধ করি তাই এই শঙ্কা।

সতীশ লীলাকে বললে, "লীলা, খুব আমোদ হচ্ছে কি?"

লীলা নির্ব্বাক্‌ভাবে তার স্বচ্ছ চোখ দুটি দিয়ে সতীশের দিকে চেয়ে দেখলে।

সতীশ বল্লে, "লীলা, আজ যদি একজামিনে পাশ করতে পার, তবে ত কেল্লা ফতে। আর আমার মনে হচ্ছে, তুমি পাশ করবে; কেন না, না পাশ করবার ত কোনও কারণ নেই।"

লীলা চুপ ক'রে রইল; পাশ-ফেল সম্বন্ধে তার বিশেষ যে কৌতূহল আছে, এমন বোধ হ'ল না।

সতীশ একটু আশ্চর্য্য হ'ল। মনে হ'ল, বোধ করি বা লজ্জার জন্যেই লীলার মনোভাব বুঝা যাচ্ছে না।

সুপ্রভা এসে বল্লে, "চলো বোন্, তোমাকে এমন ক'রে সাজিয়ে দেবো যে, দেবতার মনও ট'লে যাবে।"

যথাসময়ে ষ্টীমারের বাঁশীর আওয়াজ শুনে সতীশ ষ্টীমার-ঘাটে রওনা হ'ল। ষ্টীমার এসে পৌঁছলে, তা থেকে নামলেন প্রকাশ বাবু, তাঁর সম্বন্ধী, সুনীল এবং সুনীলের ভাই। সে দিন বিকালে সুনীলের চোখে যে আনন্দের আভাস দেখা গিয়েছিল, আজ তা আরও স্পষ্টতর।

সতীশের বাড়ীতে এসে, প্রকাশ বাবু এ-ঘর ও-ঘর দেখে খুব তারিফ করলেন। বল্লেন, "সতীশ, তোমার টেষ্ট আছে হে, বাড়ীর এই অবস্থানটারই যে দাম অনেক। এখন বুঝতে পারছি, তুমি কেন কলকেতা ছেড়ে এখানে থাকো। সামনে এমন গঙ্গা, আর এমন তাজা হাওয়া। ওহে সতীশ, কাছাকাছি আমাকেও একটু যায়গা-টায়গা দাও-না, এখানে মাঝে মাঝে এসে তা হ'লে বেশ থাকা যায়।"

সতীশ বল্লে, "সে ত ভাল কথাই।"

তখন তাঁরা সকলে গিয়ে বড় ঘরে বসলেন। এক বার ঘরের আসবাব-পত্র, ছবি-টবিগুলো দেখে নিয়ে প্রকাশ বাবু বল্লেন, "আর বিলম্ব কেন, নিয়ে এস মেয়েটিকে।"

সতীশ উঠে গিয়ে খানিক পরে সঙ্গে ক'রে লীলাকে নিয়ে এলো।

সুপ্রভা সত্যই বলেছিল, "স্বভাব-সুন্দরী লীলাকে আজ অপরূপ সুশ্রী দেখাচ্ছিল।" তার কোঁকড়ান চুলগুলি গৌর-বর্ণ ললাটে আশ্চর্য্য কমনীয়তার সঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাল মখমল-পাড় গোলাপী রঙের শাড়ীখানি তার দেহকে ফুলের চারিপাশে লাবণ্যের মত ঘিরেছিল। তার

শান্ত চোখে যে সুগভীর দৃষ্টি এসেছিল, তা আনন্দের কি শঙ্কার, না বুঝা গেলেও অপরূপ!

লীলা এসে ব'সে সকলকে প্রণাম করলে।

শ্রাবণের গভীর তমসাকে এক খণ্ড বিদ্যুৎ বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে যেমন একটা সৌন্দর্য্যের ঝলকে দিগ্‌দিগন্তকে স্তম্ভিত ক'রে দেয়, লীলার সৌম্য রূপও যে তেমনই এই চারটি লোককে একান্ত মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল, তা স্পষ্টই বুঝা গেল।

প্রকাশ বাবু লীলার বাম হস্ত আপনার হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, যথেষ্ট নরম কি না, বোধ হয়, সন্তুষ্টই হলেন। তার পর হাতের আঙ্গুলগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, সব ঠিক আছে অথবা ছোট-বড়। সেখানেও অসন্তুষ্টির কোন কারণ পেলেন না বোধ করি। তার পর বল্লেন, "উঠে দাঁড়াও ত মা।" লীলা উঠে দাঁড়ালে পায়ের আঙ্গুলগুলো একবার দেখে নিলেন। তার পর আদেশ হ'ল, "চল ত মা।" লীলা চলার পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হ'লে চুলের পরীক্ষা হ'ল। এখানেও তিনি কোনও দোষ পেলেন না।

লোক জুতা কিনতে গেলেও এতটা পরীক্ষা করে না। কিন্তু বোধ করি, তারা বধূ জিনিষটিকে জুতার চেয়ে বেশী কার্য্যকরী ও টেঁকসই দেখতে চায় বলেই পরীক্ষার এত বাহুল্য। এই সনাতন প্রথা।

তাহার পর বল্লেন, "বসো।"

লীলা বস্‌লে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি নাম মা তোমার?"

"শ্রীমতী লীলাবতী দেবী।"

কথাটা শুনে প্রকাশ বাবু খানিকটা ভেবে বল্লেন, "লীলাবতী দেবী? নদে জিলা পলাশপুর বাড়ী বল্লে না, সতীশ? এঁর বাপের নাম কি হৃদয়—বাবু ছিল?"

সতীশ বল্‌লে, "হাঁ।"

প্রকাশ বাবু খানিকটা চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। একটা বিশেষ চিন্তায় শরীরটা ঈষৎ দুলতে লাগলো, ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তাহার পর সতীশের দিকে চেয়ে বল্লেন, "সতীশ, এই মেয়েটিকেই না মোছলমান গুণ্ডায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল? এই মাস চারেকের কথা?"

সতীশ স্তম্ভিতের মত চেয়ে রইল। প্রকাশ বাবুর মুখ থেকে লীলার মুখের দিকে চোখ ফেরাতে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। দেখলে, লীলার মুখ থেকে মুহূর্ত্তে যেন সব রক্ত স'রে গিয়ে ছাইয়ের মত পাণ্ডু হয়ে গেছে। আর তার চোখ দুটো পাথরের চোখের মত নিষ্প্রভ, স্থির।

সতীশের বুঝতে বাকী রইল না যে, কথাটা বোধ করি সত্য। কিন্তু সে নিজে কিছুই জানে না; বল্লে, "কই, আমি ত জানি নে।"

প্রকাশ বাবু বল্লেন, "হাঁ, আমি কাগজে পড়েছি যে, বেশ মনে আছে। ঐ নিয়ে কাগজওয়ালারা কত হৈ-চৈ করলে। এই মেয়েটিই ত বলতে পারবে।"

সতীশ লীলার দিকে চেয়ে দেখলে যে, তার কপাল দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে—আর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

সতীশ বললে, "থাক্, আমি আপনাকে পরে খবর নিয়ে জানাবো। লীলা, চল" ব'লে লীলার হাত ধ'রে যখন সতীশ তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, তখন সে কাঁপছে।—কোনও রকম ক'রে তার সমস্ত ভরটা নিজের দেহের ওপর নিয়ে সতীশ তাকে ভিতরে পৌঁছে দিলে।

সতীশ ফিরে এলে প্রকাশ বাবু বল্লেন, "বাকী ত সব ভাল, মেয়েটি সুশ্রী, পছন্দ করবার মত। ঐ খবরটা পেলেই যে একটা স্থির হয়ে যেতে পারত, কেন না, যদি সত্যি হয়, তা হ'লে বিয়ে হওয়া অসম্ভব, আর যদি মিথ্যে হয়, তা হ'লে অন্য কথাবার্ত্তা হ'তে পারে।"

এমন অভাবনীয় কথা সতীশ কোনও দিন কল্পনাও করতে পারে নি। সুতরাং এই লোকটি তাড়া দেওয়াতে সে একবার মনে করলে, ভিতরে গিয়ে খবর নিয়ে আসে, কিন্তু সেটা কি অশোভন ব্যাপার হবে, তাই মনে ক'রে তার হাত-পা এগোল না।

সে বললে, "আমি খবর নিয়ে, যদি মিথ্যা হয় ত কাল আপনাকে ব'লে আসব, আর সে সময় বাকী কথাবার্ত্তাও হবে।"

প্রকাশ বাবু বল্লেন, "তাই হবে" ব'লে উঠে প'ড়ে সঙ্গীদের বললেন, "চল হে।"

শুনে সবাই উঠে পড়ল।

সতীশ বল্লে, "ষ্টীমারের এখনও দেরী আছে। কিছু খাওয়া-দাওয়া ক'রে যান, নৈলে কষ্ট হবে। সেই রকম কথাই ত ছিল।"

প্রকাশ বাবু মুখ খুব গম্ভীর ক'রে বল্লেন, "না, থাক্। আমরা ষ্টীমার-ঘাটে গিয়ে একটু বেড়াই গে। ষ্টীমার এলে চ'লে যাব। এখন খাবারের দরকার হবে না।"

ব'লে সকলে বেরিয়ে পড়লেন।

পরিষ্কার বিছানার উপর এক দোয়াত কালি ফেলে দিলে যেমন সে এক মুহূর্ত্তে বিশ্রী নোংরা হয়ে যায়, তেমনই এ আনন্দ-মুখর বাটী নিমেষে কালো-মলিন হয়ে গেল। সব নিস্তব্ধ চুপ—হাওয়ার শব্দটি পর্য্যন্ত শুনা যায়। সংবাদটি যে সত্য, তা লীলার মুখ দেখে সতীশের স্পষ্ট অনুমান হয়েছিল। সে চুপচাপ ক'রে ভাবতে লাগলো। এক দিকে যেমন এই সংবাদটি তার কাছ থেকে গোপন রেখে তাকে অপ্রস্তুত করার ক্ষোভ তাকে দুঃখ দিতে লাগল, অপর দিকে তেমনই এই নিরপরাধ মেয়েটির লাঞ্ছনা তার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ ক'রে দিলে। [ক্রমশঃ।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

গৌড়—পাণ্ডুয়া

ফিরোজপুরে একটি মসজেদ আছে, উহার নাম "ধনচক মসজেদ।" প্রবাদ আছে যে, ধনপতি সওদাগর উহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ধনপতি ও তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ সওদাগর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন পূর্ব্ব-বর্ণিত ছোট সাগরদীঘির নিকটে বাস করিতেন ও গৌড়ের রাজকোষের অর্থ-সরবরাহকারী ছিলেন, সেই সময় তাঁহারা এই মসজেদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। হিন্দু ধনী ও হিন্দু রাজা মুসলমান-দিগের জন্য মসজেদ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অন্য স্থানেও দেখিয়াছি। খুলনা জিলার ঈশ্বরীপুরের অতি বৃহৎ টেঙ্গা মসজেদ ও পরবাজপুরের কারুকার্য্য-খচিত মসজেদ আজিও মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের উদার হৃদয়ের ও কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

ফিরোজপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল যাইলে নবাবগঞ্জ রোডের পূর্ব্বপার্শ্বে "ছোট-সোনা মস-জেদ" বা "জামি মসজেদ" বা "খোজাকি মসজেদ" দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্কলিন লিখিয়াছেন যে, ইহা যে স্থানে আছে, উহার নাম চণ্ডী-গ্রাম। পূর্ব্বদিকে ইহার সম্মুখ। ইহার দেওয়াল প্রস্তরাকারবিশিষ্ট। দেওয়ালের মধ্যে ইষ্টকের ও প্রস্তরের টুকরা চূণ ও সুরকীমিশ্রিত মসলা দিয়া গাঁথিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের গাঁথনি করা হইয়াছে। ইহার দেওয়ালের প্রস্তরে কারুকার্য্য ক্ষোদিত আছে। এই মস-জেদের পূর্ব্বদিকে ৫টি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে ৩টি করিয়া ৬টি প্রস্তরমণ্ডিত খিলান-করা প্রবেশদ্বার আছে। মসজেদের ভিতরে পশ্চিমদিকের দেওয়ালের ভিতরে ৫টি কুলুঙ্গী আছে, তন্মধ্যে মধ্যস্থলেরটি বাদে অন্যগুলি আজিও



আদিনা মসজেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান—হিন্দুমন্দিরের অংশ লইয়া নির্ম্মিত প্রধান উপাসনা-মন্দির

প্রস্তরমণ্ডিত আছে। মসজেদের অভ্যন্তরে উত্তরপশ্চিম কোণে একটি প্রকোষ্ঠের ন্যায় স্থান আছে, উহার স্তম্ভ-গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও উহার ঊর্দ্ধদেশে, মেঝে হইতে প্রায় ৪ হাত উপরে, কয়েকটি প্রস্তরনির্ম্মিত কড়ি পাতা আছে, কিন্তু কড়ির উপরে কোন প্রকার ছাউনি নাই। কেহ বলেন যে, ইহা রাজতক্ত; আবার অপর কাহারও মতে ঐ কড়িগুলির উপরে মসজেদের জন্য সতরঞ্চি প্রভৃতি রাখা হইত। উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রত্যেক সারিতে ৬টি করিয়া দুই সারিতে ১২টি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। এই দুই সারির শেষের চারিটি স্তম্ভ দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা। এই দুই সারি স্তম্ভ গৃহাভ্যন্তরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক ভাগের উপরে ৫টি করিয়া মোট ১৫টি ছোট গুম্বজ এই মসজেদের শোভা বর্দ্ধন করি-তেছে। পূর্ব্বে এই গুম্বজ-গুলি সুবর্ণ-পাত দ্বারা মণ্ডিত ছিল বলিয়া ইহার "সোনা মসজেদ" নাম হইয়াছে এই-রূপ অনুমিত হয়। মসজেদের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকের মধ্যের দ্বারের উপরে একটি শিলা-লিপি আছে, উহাতে লিখিত আছে যে, এই মসজেদ হুসেন শাহের রাজত্বকালে ওয়ালি মহম্মদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বদিকের মধ্যের দুয়ারের দুই পার্শ্বে দুইটি শ্লেট-পাথরের উপরে সুন্দর নক্সা ও কারুকার্য্য ক্ষোদিত আছে। এই মসজেদের বহির্দ্দেশের মাপ ৮২´×৫২´ ফুট, ভিতরের মাপ ৭০´×৪১´ ফুট এবং মেঝে হইতে গুম্বজের উচ্চতা প্রায় ২০´×২১´

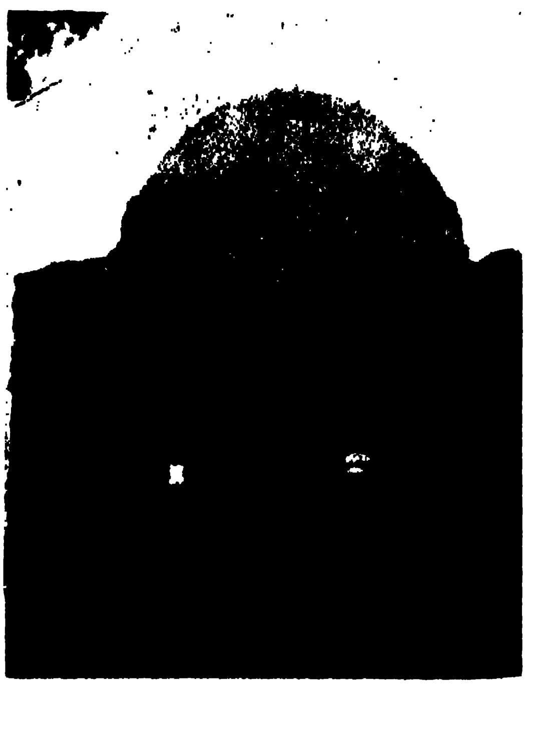


আদিনা মসজেদের একটি ভগ্ন খিলান

ফুট। ইহার ছাদে প্রত্যেক দিকে চারিটি করিয়া জল পড়িবার প্রস্তরের নালা আছে। ইহার উত্তরদিকের গাত্রে একতলা সমান উচ্চ একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার আছে, সিঁড়ি দিয়া উহার ছাদে উঠা যায়। এই ছাদ হইতে মসজেদের ছাদে উঠিবার জন্য পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক একটি পুরাতন বাঁশের মই লাগান ছিল। ছাদের উপরিভাগ কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য আমি যখন মই দিয়া উঠিয়া ছাদের কার্ণিশ ধরিয়া ছাদের উপরে একটি পা তুলিয়া দিতে যাইব, সেই সময় মইয়ের যে সিঁড়ির পায়ার উপরে দাঁড়াইয়াছিলাম, উহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল এবং তাহার ফলে আমি কার্ণিশ ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম। আমার এই বিপদ্ দেখিয়া ললিত দাদা ও সঙ্গিগণ প্রমাদ গণিলেন ও সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তত উচ্চে কাহারও হাত পৌঁছিল না। কিছুক্ষণ ঐরূপ ভাবে ঝুলিয়া অবশেষে একটি পদ মসজেদের দেওয়ালে দিয়া ভগ্ন পায়ার নীচের পায়ায় কোন প্রকারে অপর পদ রাখিয়া নামিয়া পড়িলাম।

এই মসজেদের পূর্ব্বদিকে একটি প্রাঙ্গণ আছে, উহার ইহার গাঁথনি মসজেদের গাঁথনির অনুরূপ, অর্থাৎ ভিতরে ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড চূণ-সুরকী দিয়া গাঁথিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের গাঁথনি করা হইয়াছে। এই দরওয়াজার বাহিরে পূর্ব্বদিকে উচ্চ বেদীর উপরে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত কবর বিদ্যমান। প্রবাদ আছে যে, এই কবর দুইটির মধ্যে ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত মসজেদের উত্তরদিকে পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ একটি পুষ্করিণী আছে, উহাকে কেহ কেহ 'টাঁকশাল পুকুর' কহিয়া থাকে। উক্ত মসজেদ ও এই সকল স্থান গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। ক্রেটন এই "সোনা মসজেদের" কতকগুলি প্রস্তরের পশ্চাদ্ভাগে ভবানী, ব্রহ্মাণী ও বরাহ অবতার প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে এরূপ কোন মূর্ত্তি আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। হয় ত ইতোমধ্যে সেগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে, অথবা ব্যস্ততা বশতঃ আমরা সেগুলিকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এই সকল মূর্ত্তি ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের দেবমন্দির ছিল।

অপরাহ্ ৪½ টার পরে আমরা এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জনমানববিহীন



পথিপার্শ্বে বনের মধ্যে এক প্রকার বনফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিকে সুবাস ছড়াইয়া দিতেছিল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। গাত্রবস্ত্র সঙ্গে না আনায় শীতবোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যাগমে হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব হইবে। অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এই সকল কারণে যথাসাধ্য দ্রুত পথ চলিতে লাগিলাম এবং অবশেষে "বল্ল দীঘি" ও তৎপরে "লুকোচুরী" দরওয়াজায় উপস্থিত হইলাম।

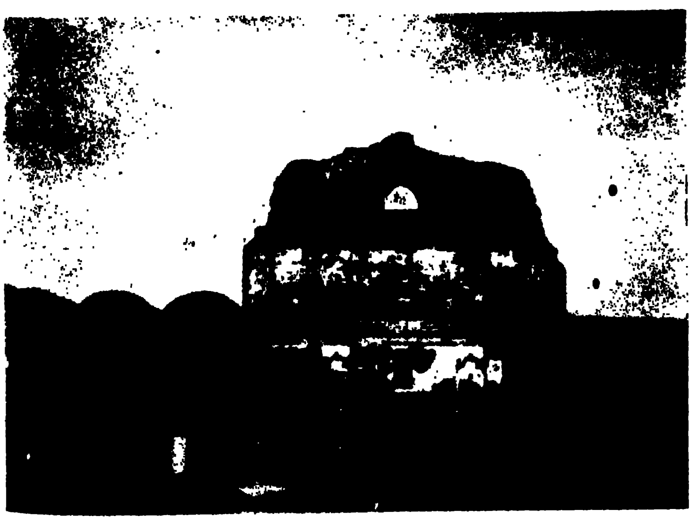


আদিনা মসজেদের ভিতরের একাংশ

বল্ল দীঘির ও কোতোয়ালী দরওয়াজার উত্তরপশ্চিমদিকে কোতোয়ালী দরওয়াজা হইতে প্রায় ¾ মাইল দূরে মহদীপুর নামক গ্রাম আছে। তথায় এককালে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। এখানে একটি পোষ্ট আফিস আছে এবং শনি-মঙ্গল বারে হাট হয়। কোতোয়ালী দরওয়াজা ও এই স্থানের মধ্যে "গুমসণি" বা "গুণমন্ত" নামক একটি মসজেদ আছে। ইহার মাপ ১৫৮´×৫৯´ ফুট। ইহার দেওয়ালের মধ্যের ইষ্টকের গাঁথনির চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের গাঁথনি করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধান প্রকোষ্ঠের উপরে যে গুম্বজের খিলান আছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানে ঈদ ও বকরিদের সময় মুসলমানগণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

ইহার প্রায় অর্দ্ধ-মাইল উত্তরদিকে "বেগম মহম্মদ মসজেদ" নামক একটি ক্ষুদ্র মসজেদ আছে। ইহার ছাদের খিলান রঙ্গীন টালি ও ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার বিপরীত দিকে কয়েকটি কবর বিদ্যমান।

মহদীপুর এবং পূর্ব্বোক্ত ফিরোজপুরের মধ্যে এক খণ্ড ভূমিকে "দরাশরী" বা বক্তৃতাগৃহ বলা হইয়া থাকে। এই গৃহ বা মসজেদটির মাপ ৯৮´×৫৭´ ফুট। ইহার গৃহাভ্যন্তরে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে তিন সারি স্তম্ভ থাকায় গৃহাভ্যন্তর চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগের উপরে ৭টি করিয়া মোট ২৮টি গুম্বজ এই মসজেদের উপরে শোভা পাইত। এই মসজেদ এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ইহার যে স্মৃতিফলক পাওয়া গিয়াছে, উহাতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারবক শাহের পুত্র য়ুসুফ শাহ এই মসজেদ নির্ম্মাণ করেন।



আদিনা মসজেদের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের একাংশ

আমরা যখন এই স্থান হইতে ইংলিশ বাজার অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখন সাড়ে ৬টা হইয়া গিয়াছে। গাড়োয়ানদ্বয় দ্রুত



ইংলিশবাজার—ইংরাজ আমলের ফাঁসি দিবার প্রাচীন বটতলা

গাড়ী চালাইয়া চলিল। রাত্রিকালে পিয়াসবাড়ী ডাক-বাংলার কিয়দ্দূর দক্ষিণে ও সরকারী রাস্তার পশ্চিমদিকে স্থিত একটি ভগ্ন মসজেদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মসজেদটি পূর্ব্বদ্বারী। পূর্ব্বদিকে তিনটি দ্বারবিশিষ্ট যে বারান্দা বা দর-দালান আছে, উহার উপরের খিলান-করা ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই বারান্দার পশ্চিমদিকে উপাসনার জন্ত যে বৃহৎ ঘর আছে, উহার উপরে একটি বৃহৎ গুম্বজ বিদ্যমান। এই ঘরের পূর্ব্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করিয়া দ্বার আছে। এই মসজেদের গুম্বজ দেখিতে চিকা মসজেদের গুম্বজের ন্যায়;—সেইরূপ চূড়া-বিহীন, কিন্তু তত বড় নহে। ইহাও গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। একে এই অঞ্চল জনমানবহীন ও অরণ্যসমাকুল, তায় রাত্রিকালে হিংস্রজন্তুর ভয় আছে। আমাদের সঙ্গে একটিও বাড়ি বা আলোক নাই, এ কারণ নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ মসজেদের ভিতর প্রবেশ না করিয়া জ্যোৎস্নালোকে উহার বহির্ভাগ যথাসাধ্য দেখিয়া লইলাম। তৎপরে পুনরায় গোযানে আরোহণ করিয়া চলিলাম।

যখন আমাদিগের গাড়ী পিয়াসবাড়ী ডাক-বাংলার অদূরে উপস্থিত হইল, সেই সময় আমা-দিগের অগ্রবর্ত্তী গাড়ীর কিয়দ্দূর সম্মুখদিকে রাস্তার এক দিক হইতে অন্য দিকে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়োয়ান কহিল, "বাবু, বাঘ।" ব্যাঘ্রটি বেশী বড় নহে। বাঘ দেখিয়া গাড়ীর গরু থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে গরু শান্ত হইতেছে না দেখিয়া গাড়োয়ান পথিপার্শ্বস্থ ঝোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল, "ঐ যে বাঘ দাঁড়াইয়া আছে।" দেখা গেল যে, বনের মধ্য হইতে দুইটি অগ্নিগোলকসদৃশ প্রজ্বলিত চক্ষু আমা-দিগের গাড়ীর দিকে তাকাইয়া আছে। যাহা হউক, কি ভাবিয়া জানি না, কিছুক্ষণ পরে ব্যাঘ্র আপনিই চলিয়া গেল। তখন গাড়োয়ানদ্বয় দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

রাত্রি প্রায় পোণে ১১টার সময় যখন আমরা ইংলিশ-বাজারের জেলখানার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলাম, তখন আমাদিগের গাড়োয়ান পথিপার্শ্বস্থ একটি অদ্ভুত খেজুরগাছ দেখাইয়া দিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম যে, খেজুরগাছটির কাণ্ড সোজা হইয়া অনেক দূর উঠিয়াছে, তৎপরে উহা হইতে তিনটি মাথা বাহির হইয়াছে। এইরূপ ত্রিশীর্ষ খেজুর-গাছ পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। আর সামান্য দূর অতিক্রম করিয়া যখন রামনগর কাছারীর সম্মুখে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় ১১টা।



আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি প্রায় ১২৷৷৹টা হইল।

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই ইংলিশবাজারের "সবে ধন নীলমণি" মোটরগাড়ীখানি ভাড়া লইবার বন্দোবস্ত করা হইল। বিভূতি বাবু নামক স্থানীয় এক ভদ্রলোক পূর্ব্বদিন হইতে আমাদিগের জন্য মোটরকার ভাড়া করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অদ্য তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল, কার ভাড়া পাওয়া গেল। দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী ব্যতীত অল্পসময়ের মধ্যে গৌড়ের বাকী অংশ পুরাতন মালদহ ও পাণ্ডুয়া দেখা অসম্ভব। সাড়ে ৯টার মধ্যে গাড়ী আসিবার কথা, কিন্তু ১১টা পর্য্যন্ত মোটরচালকের অনুগ্রহ ও শুভাগমন না হওয়ায় আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভাগ করিয়া লইয়া গাড়ীর উদ্দেশে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইলে দেখা গেল যে, মোটরকার আসিতেছে। তখন উহাতে আরোহণ করিয়া প্রথমে গৌড়রোড দিয়া দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ চলিলাম। এই অঞ্চলে রাস্তার দুই পার্শ্বে নিম্নভূমি পড়িয়া আছে, ইহা পূর্ব্বে জলাভূমি বা কোন নদীর খাত ছিল বলিয়া বোধ হয়। উক্ত গৌড়-রোডের যে স্থান হইতে সদুল্লাপুর যাইবার রাস্তা বাহির হইয়াছে, ঐ সঙ্গমস্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে, রাস্তার পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহার শাণবাঁধান ঘাটের প্রস্তরে আহারের পাত্রের অভাব পূরণ করিবার জন্য থালা ও বাটির ন্যায় আধার ক্ষোদিত আছে। উহা মুসলমানদিগের সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

তৃণকুল

সারাটি প্রাণ ভরা গানে
হর্ষে দোদুল দুল,—
ধরার বুকে শুয়ে থাকি
আমরা তৃণকুল।

মন-ভুলানো গন্ধ নাহি,
নহি গো সুন্দর,
মাটীর 'পরেই শয্যা মোদের,
মাটীর 'পরেই ঘর।

গন্ধ নাহি,—মোদের পানে
ফিরায় না কেউ আঁখি,
সকল চোখের তুচ্ছ হয়ে
একটি ধারে থাকি।

তোমরা মোদের করবে হেলা
নাইকো তাতে দুখ;
তপন তারা বাদল-ধারা
ফিরায় না ত মুখ।

ফাগুন রাতের ধীরি ধীরি
মৃদু মলয়-বায়,
মোদের গায়ে প্রেমের পরশ
পুলক দিয়ে যায়।

জ্যোছনা তাহার তরল হাসি
ঢেলে দে যায় দেহে,
ক্ষুদ্র হিয়াখানি শিশির
ভ'রে দে যায় স্নেহে।

দোয়েল শ্যামা শোনায় গো গান
কোয়েলা বুলবুল,
শিশির-ভেজা সারি সারি
আমরা তৃণকুল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ।



জেনারল চাঙ্গ কাইসেক

মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে মহাচীনের এই সেনাপতির নাম কেহ জানিত কি না সন্দেহ। তিনি ঠিক যেন 'বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে' মত প্রাচীর দিক্‌চক্রবালে উদিত হইয়াছেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি কাণ্টন হইতে ন্যূনাধিক হাজার মাইল উত্তরে তাঁহার বিজয়ী বাহিনী পরিচালিত করিয়া বর্ত্তমানে হাঙ্কো সাংহাই আদি বৈদেশিক কনশেসানসমূহ আবার চীনের শাসনাধীনে আনয়ন করিবার জন্ত ইংরাজের মত শক্তিশালী বিদেশীকেও সর্ত্ত দিতেছেন। আজ ৫ বৎসর যাবৎ চীনের যে বিরাট সেনাপতি মধ্য চীনদেশে অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, চাঙ্গসোলিনের বন্ধু সেই জেনারল উপেইফুকে তিনি পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দক্ষিণ-চীন হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এ হেন পুরুষপ্রবরের চরিত্রচিত্রের পরিচয় জানিয়া রাখিতে কাহার না আগ্রহ হয়?

চাঙ্গ বা চিয়াঙ্গ কাইসেক এখনও ৪০ বৎসরে পদার্পণ করেন নাই। চিকায়াঙ্গ প্রদেশের ফেঙ্গ নামক গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চাঙ্গের জন্ম হয়। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁহার মাতা নিজের আত্মীয়গণের গৃহে তাঁহাকে লইয়া গিয়া পালন করেন। তাঁহার আত্মীয়রা নিংপো সহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে চিকায়াঙ্গ প্রদেশের নব-প্রতিষ্ঠিত সামরিক বিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি লইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ধ্বংসোন্মুখ মাঞ্চু রাজ্যের শেষ রাজা শেষ মুহূর্ত্তে প্রজার জন্ত এই সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইহার পর-বৎসর তাঁহার শিক্ষাদাতারা তাঁহাকে জাপানে সমর-শিক্ষা করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। তখন সবে মাত্র রাসো জাপযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। তখন হাজার হাজার চীনা ছাত্র প্রতি বৎসর নিপ্পন দ্বীপে জাপানীদের নিকট আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত হইতে যাইতেছে, তখনও চীনের সরল অধিবাসীরা মিকাডোর প্রজাকে স্বজাতি বলিয়া—ভাই বলিয়া জানে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন চাঙ্গ-কাইসেকও অন্যান্ত চীন যুবকের মত দেশের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। অন্যান্ত চীন সামরিক ছাত্রের সহিত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সাংহাইয়ের এক চীনা ব্রিগেডের সেনানী পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছু কাল যুদ্ধের পর যুদ্ধে আর তাঁহার আগ্রহ রহিল না। দুই বৎসর কাল তিনিও মামুলী চীনা সেনানীর আদর্শরূপে সুরাপানে, দ্যূতক্রীড়ায় এবং নারীসংসর্গে বৃথা কালক্ষেপ করিয়া বেড়াইলেন। একটা উচ্চ আদর্শের অভাব সেই সময়ে চীনে বিশেষরূপ অনুভূত হইতেছিল। তখন জেনারল ইউয়ানসিকাই নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্টকে উঠাইয়া দিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসাধনে ব্যগ্র, দেশের দুঃখের কথা কেহ ভাবে না।

এই সময়ে চীনের ভাগ্যাকাশে এক পুরুষের আবির্ভাব হইল। ডাক্তার সানইয়াটসেন প্রকৃত নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিকরূপে চীনের রাষ্ট্র-বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হয় নাই। তিনি ভাবুক ছিলেন বটে, কিন্তু সামরিক মনীষা বা সংগঠনের ক্ষমতায় বঞ্চিত ছিলেন বলিলেও হয়। রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে মাঞ্চুবংশ সিংহাসন-চ্যুত হইলে পর সান প্রথম সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় সে পদ ত্যাগ করিয়া ইউয়ানসিকাইকে সেই পদে বসাইয়াছিলেন। দেশের মঙ্গল তাঁহার বিরাট হৃদয়ে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বহু উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। তাই তিনি ইউয়ানকে তাঁহার অপেক্ষা দেশশাসনে অধিক উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকেই প্রেসিডেণ্টের পদে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু ইউয়ান কিছু দিন পরেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, নিজেই সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া সম্রাট হইবার প্রয়াস পাইলেন। তখন সানের চক্ষু খুলিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সান, ইউয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিলেন। চাঙ্গের উপযুক্ত অবসর মিলিল। দেশের মঙ্গলের জন্ত চাঙ্গ সেই রণসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। সেই অবধি সানের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চাঙ্গ সুখে-দুঃখে ছায়ার ন্যায় সানকে অনুসরণ করিয়াছেন। সাধারণতন্ত্রের 'পিতা' (প্রতিষ্ঠাতা) সান যে মন্ত্র দিয়া গেলেন, চাঙ্গ তাহাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া মনপ্রাণ ঢালিয়া দেশের মুক্তিসাধনে অগ্রসর হইলেন।

১০ বৎসর কাল চাঙ্গ নিম্নশ্রেণীর সেনানীরূপেই অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তিনি ঘৌড় খেলিয়া ১০ লক্ষ ডলার মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত টাকাটা তিনি দেশের কাজের জন্ত ডাক্তার সানের হস্তে ধরিয়া দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সান তাঁহাকে কাণ্টনের অপর তটস্থ হোয়াংপোয়া সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার সান কয় বৎসর যাবৎ কাণ্টনকে তাঁহার স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত করিতেছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কাণ্টনের সান্নিধ্যে বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ স্ব স্ব রণপোত বহর প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন। সান বিরক্ত হইয়া রাসিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এই সময় হইতেই চীনের স্বাধীনতা-সমরের ভিত্তিপত্তন হইল। রাসিয়া সানন্দে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। রাসিয়া মুসিয়ে মাইকেল বোরোডিনকে কাণ্টনে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন এবং সান তাঁহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর চাঙ্গ কাইসেককে মস্কো সহরে আধুনি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে প্রেরণ করিলেন। চাঙ্গ কিছু কাল মস্কো সহরে শিক্ষালাভ করিয়া হোয়াংপোয়ায় প্রত্যাব ন করিলেন এবং বোরোডিনের সহকারী জেনারল গ্যালেণ্টকে তাঁহার সহকারী শিক্ষ করিয়া দিলেন। এইরূপে বোরোডিনের পরামর্শে ও প্রচারকার্য্যে সহায়তায় চাঙ্গ ও গ্যালেণ্ট কতকগুলি চীন যুবককে ভবিষ্যৎ জাতীয় সেনাদলের সেনানী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। চাঙ্গ নিয়ম করিলেন যে, ২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক যুবক এই সেনানী দলে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। চাঙ্গ এই সকল উৎসাহী যুবককে চীনের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যুবক সেনানীরা কেবল চীনের

হইল। তাহারা ডাক্তার সানের তিনটি মন্ত্রে (যাহা পূর্ব্বের এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে) দীক্ষিত হইল; এই তিনটি মন্ত্র 'সান-ইয়াটসেনিজম' নামে পরিচিত।

ডাক্তার সান শেষ জীবনে বিদেশীদের সহিত অসমান সন্ধির উচ্ছেদ-সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেই মন্ত্রের সাধনে তাঁহার জীবনান্ত হইল। সান দেশপ্রেমিক মুক্তিদূত বলিয়া চীনে পূজা প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

চাঙ্গ তাঁহার গুরুর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। গত বৎসর উত্তর-চীনের ট্রিট্রি পোর্টসমূহে বিদেশীয়গণের সকাশে তাঁহার নাম সুবিদিত হইয়া গেল, কেন না, ঐ বৎসরে তিনি উত্তর-পূর্ব্ব চীনের War-Lord জেনারল চিয়ুং চিংমিংকে রণে পরাস্ত করিয়া কাণ্টন বিভাগের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। এই নূতন সেনা-পতির নাম তখন হইতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল।

চাঙ্গ যখন উত্তরে এই যুদ্ধে লিপ্ত, সেই সময়ে দক্ষিণ হইতে তাঁহার রাজধানী কাণ্টনের এক ষড়যন্ত্রের সংবাদ আসিল। চাঙ্গ তাড়াতাড়ি উত্তরের বিজিত গ্রাম নগর ত্যাগ করিয়া কাণ্টনে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বীয় কও-মিনটাঙ্গ অর্থাৎ জাতীয় দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ দিকে উত্তরে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া চিয়ুং চিংমিং আবার উত্তরকাণ্টন প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চাঙ্গ দ্রুতগতি উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়া চিয়ুং চিংমিংকে দ্বিতীয় বার রণে পরাস্ত করিলেন। তদবধি উত্তর-কাণ্টন প্রদেশে চীনের জাতীয় দলের বিজয় নিকেতন উড্ডীয়মান হইল, চাঙ্গ দেশের মুক্তিদাতা বলিয়া সানন্দে অভিনন্দিত হইলেন।

এই যুদ্ধে জেনারল চিয়ুং কৌশলপূর্ব্বক ওয়াইচো নামক এক দৃঢ় ও সুরক্ষিত নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই নগর হাজার বৎসরের মধ্যে কেহ অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে পারে নাই, ইহা এমনই সুরক্ষিত। কিন্তু যাহারা দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কাতর নহে, তাহাদের নিকট এই নগর অধিকার করা তুচ্ছ কথা। চাঙ্গের তরুণ সেনাদলের নাম ছিল Dare-to-die Corps অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে অকম্পিত সেনাদল। তাহারা একটি একটি করিয়া সারি দিয়া প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে নগর আক্রমণ করিল। তাহাদের উপর মেসিন-গান হইতে অজস্র গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে চিরনিদ্রায় শায়িত হইল, কিন্তু এই দেশপ্রেমিক অজেয় তরুণ চীন সেনাদল একবারমাত্রও পশ্চাৎপদ হইল না। গুলীবৃষ্টির মধ্য দিয়া তাহারা নগরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিল। নগর-বাসীরা ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া মনে করিল, সত্যই ইহারা বুঝি



ডাক্তার সানইয়াটসেনের প্রতিকৃতি

চাঙ্গ ইহার পর যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করিয়া অর্দ্ধ-চীনে তাঁহার জাতীয় দলের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এক জন মার্কিণ সমালোচক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"Chiang's Whampoa trained troops have walked through every army with which they have come in contact and have won a reputation as men who are not afraid of fighting against odds. চীনের অন্যান্য সেনার রীতি এই যে, তাহারা যখন অন্য কোনও প্রবল সেনাদলের নিকট রণে পরাভূত হয়, তখন বিজেতার দলে মিশিয়া যায়, কিন্তু চাঙ্গের হোয়াম্পোয়ার শিক্ষিত সেনাদল সেরূপ নহে: তাহারা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, দেশের জন্য তাহারা প্রাণ দিবে, তথাপি বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তাহাদের স্বভাব এই যে, তাহারা বিজেতার সেনাকেও স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিবে।

চিয়াঙ্গ (চাঙ্গ) মাঝে মাঝে গভীর অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, ইহা তাঁহার স্বভাব। সেই সময়ে তিনি একবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া কোনও পার্ব্বত্য মঠে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রেম এমনই প্রবল যে, ওয়াইচো অধিকারের পর যখন তাঁহার জীবনে এইরূপ এক অবসাদ আইসে, তখন পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার হাতে গড়া অসম্পূর্ণ কায নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি সেই অবসাদকালেও কোনও বৌদ্ধ মঠে না গিয়া কাণ্টনের সেনা-দলের জন্য একটি সেনানী দল গঠিত করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু উহাও তাঁহাকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

এ যেন চাঙ্গ কাইসেক সহজ মানুষ নহেন। কোনও মার্কিণ লেখক তাঁহার সহিত কাণ্টনে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—

"আমি চীন জাতির নেতার সহিত কাণ্টনে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। যাঁহার নামে নবীন চীন উন্মত্ত হইয়া উঠে, যাঁহাকে জাতির মুক্তিদূত বলিয়া তরুণ চীন মনে মনে পূজা করে, সেই চাঙ্গ এখনও ৪০ বৎসরে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে মনে হইবে যে, একটা জাতির নেতা বা রাজনীতিক সেনাপতির সহিত কথা কহিতেছি না। এক জ্ঞানপিপাসু তরুণ ছাত্রের সহিত সম্ভাষণ করিতেছি। দেখিতে তিনি দীর্ঘাকার এবং শীর্ণকায়; তাঁহার বিশাল ললাট চিন্তারেখাগ্রস্ত হইলেও মুখে মৃদু হাস্য লাগিয়াই আছে। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে মনে হয়, যেন চিরপরিচিতের নিকট দাঁড়াইয়াছি, চীনের বিরাট পুরুষের কাছে দাঁড়াইয়াছি বলিয়াই মনে

চাঙ্গের এক বৈশিষ্ট্য এই যে, চীনের কথা বলিবার সময় তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেন না বা কাহাকেও জানিতে দেন না। তিনি যাহা করেন, যাহা ভাবেন,—সবই তাঁহাদের কুওমিনটাঙ্গ দল করিয়াছে বা ভাবিয়াছে, তিনি কিছু করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব তাঁহার জাতীয় দলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। এমন নিরহঙ্কার স্বার্থশূন্য লোক আমি দেখি নাই বলিলেও হয়। যদি কেহ মাঞ্চুরিয়া ও পিকিনের সামরিক কর্ত্তা চাঙ্গসোলিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহা হইলে চাঙ্গসোলিন সিংহাসনে রাজবেশে আসীন হইয়া জাঁকজমকে তাঁহাকে দেখা দিবেন। উপেইফুকে দেখিতে গেলে এক মস্ত প্রাচীন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি বলিয়া মনে হইবে : উপেইফু সর্ব্বদা 'নবরত্নের' দ্বারা মণ্ডিত হইয়া থাকেন। নানকিংয়ে যদি জেনারল সান চুয়ান ফেঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, তাহা হইলে ভেরী তূরী নিনাদিত হইতে থাকিবে, কাড়া-নাগারা বাদিত হইতে থাকিবে, সারি সারি সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে।

কিন্তু আমি যখন কাণ্টনে জেনারল চাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তখন এক জন আমাকে জেনারলের বাড়ী দেখাইয়া দিল। এই বাড়ীটি পথের অন্যান্য বাড়ী হইতে কোনওরূপে জাঁকজমকে বিভিন্ন আকার নহে, যেমন আর সব বাড়ী, ঠিক সেইরূপ সাধারণ একটা ছোট দ্বিতল বাড়ী। একটা যুবক ভৃত্য নীচে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে আমার কার্ডখানা দিবামাত্র সে আমাকে উপরে উঠিবার সোপান দেখাইয়া দিল।

সোপানের শীর্ষদেশে উপনীত হইয়া দেখিলাম, সেখানে একটি সুদর্শন তরুণ সেনানী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পদ নির্দ্দেশক কোনও সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন তাঁহার উর্দ্দীতে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চাঙ্গ কাইসেক কোথায় ?"

যুবক বলিল, "হাঁ, চাঙ্গ কাইসেক।"

আমি বিস্মিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় চাঙ্গ কাইসেক ?"

যুবক একটি শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিল। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলাম। এই সময়ে চেন সু ইয়েন নামক আমার পূর্ব্ব-পরিচিত একটি চীন গ্রাজুয়েট কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'যে সুদর্শন যুবককে আপনি সোপান-শীর্ষে দেখিয়া আসিলেন, উনিই প্রধান সেনাপতি চাঙ্গ কাইসেক।' আমি বিস্মিত হইলাম। সেনাপতির ছোট শয়নকক্ষ, সেইটিই আফিস-কক্ষ। এমন সাজসজ্জাহীন সাধারণ কক্ষ কাণ্টনের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

চাঙ্গ কক্ষে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে পর চা ও অতি সাদাসিধা মিষ্টান্ন ও পিঠা আনীত হইল। চাঙ্গ একবারে মস্তক উন্নত করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং টেবলের উপর হাত দুইটি মুড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

আমি প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আপনার জীবন-কথা কিছু বলিবেন কি ?"

চাঙ্গ হাসিয়া দুই চারিটি মাত্র কথা বলিলেন এবং দোভাষী আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। মোট কথা, "তিনি চিকায়াং বিভাগে জন্মিয়াছেন, জাপানে এবং চীনে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং ডাক্তার সানইয়াট সেনের সহকারিরূপে দেশের রাষ্ট্র-বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন।" বস্! মাত্র এই কয়টি কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাসিয়ানদের এই বিপ্লবে কি হাত আছে ?"

চাঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাহাদের কয় জনকে নানা বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। আমাদের এই আমাদের বিপ্লবে সহানুভূতিসম্পন্ন যে কোন জাতির লোককেই উপযুক্ত দেখিলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে সহায়তা করিতে নিযুক্ত করিয়া থাকি। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রাসিয়া চীনের সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা চীনে ভূমি অধিকারের কল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন, অসমান সমস্ত সন্ধিই বাতিল করিয়া আমাদের সহিত সমানে সমানে নূতন সন্ধি করিয়াছেন এবং extra territoriality ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই হেতু আমরা রাসিয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করি।"

আমি জানি, এই চাঙ্গই কিন্তু ইহার দুই মাস পরে কাণ্টনস্থ অধিকাংশ রাসিয়ান প্রবাসীকে ধৃত করিয়া জাহাজে পূরিয়া অন্যত্র চালান করিয়াছিলেন। এই রাসিয়ানরা চীনের নৌবহরের নৌসেনাগণকে চরমপন্থায় দীক্ষিত করিতেছিল।

সে যাহা হউক, আমি জেনারল চাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার লক্ষ্য কি ? আপনার এই কাণ্টনী আন্দোলনের পরিণাম কি ?"

চাঙ্গের মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল, কি এক অপার্থিব আলোকে উহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমরা চীনের অন্যান্য প্রদেশের কুওমিণ্টাঙ্গ (জাতীয়) দলের সহিত মিলিত হইব, চীনকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিব।"

আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলাম, "ইহা যে অসম্ভব কল্পনা, সেনাপতি !"

চাঙ্গ বলিলেন, "তাহা সত্য বটে, কিন্তু অসম্ভব হইলেও, অসাধ্য হইলেও আমি তাহা সম্পন্ন করিব : আমরা সবেমাত্র তাহার ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আমরা কাণ্টন প্রদেশকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই প্রদেশ চীনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্যের স্থান এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ধনসম্পদে সম্পন্ন। সমগ্র ইংলণ্ডের অপেক্ষা ইহার লোকসংখ্যা অধিক। গত জুন মাসে যখন সামিয়েন নামক স্থানে ইংরাজ ও ফরাসী সেনার মেসিন গানের গুলীতে ৫৩ জন চীন প্রজার প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, তখন হইতে আমরা বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জনের আন্দোলন প্রচলন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছি। তদবধি দেশের সর্ব্বত্র দেশপ্রেমিক চীনপ্রজা আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। তিনটি প্রদেশ ইতোমধ্যেই আমাদের দিকে আসিয়াছে, ক্রমে অন্যান্য প্রদেশও তাহাদের অনুসরণ করিবে। আমাদিগকে হয় ত অধিক যুদ্ধ করিতে হইবে না। হয় ত আর এক বৎসরের মধ্যে আমরা ইয়াংসি নদীর উত্তরে আমাদের কুওমিণ্টাঙ্গের বিজয়কেতন উড্ডীন করিতে সমর্থ হইব।"

আমি চাঙ্গের স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হইলাম বলিলাম, "তাহার পর ?"

চাঙ্গ বলিলেন, "আমরা তাহার পর সমস্ত অসমান সন্ধিপত্র বাতিল করিয়া দিব এবং চীনকে স্বাধীন করিব।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম।

চাঙ্গ বলিলেন, "বিস্মিত হইতেছেন ? বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ইহাতে দুরূহ কার্য্য কিছুই নাই। ২।১ বৎসরে, বড় জোর ৩ বৎসরে আমরা নিশ্চিতই স্বকার্য্যসাধন করিব।"

আমি বলিলাম, "অসমান সন্ধি বলিতে আপনি কি বুঝিতেছেন ? আপনি কি ইংরাজের হস্ত হইতে সাংহাই ও হংকং কাড়িয়া লইবেন ?"

চাঙ্গ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও সব কথা এখন না। ও সব রাজনৈতিক কথা। ও সব কথা স্থির হইবে যখন চীন এক হইবে। স্বদেশে একতা স্থাপন করাই আমাদের প্রধান কার্য্য। অবশ্য ... পুনরধিকার করিবার পূর্ব্বে Extra territoriality ও Custom Control বাতিল করিতে হইবে।"

চাঙ্গের মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। নবীন চীনের আশা-ভরসা জেনারল চাঙ্গ দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের মুক্তিসাধন করুন, ইহা নিরপেক্ষমাত্রেরই আন্তরিক কামনা।

চীনের বর্ত্তমান অবস্থা

চীনের রাজনীতিক গগনে কাল-মেঘের সঞ্চার হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে ইতিহাস প্রদান করিয়াছি, তাহাতে পাঠক নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে, বৃটিশ শক্তির উপরেই দক্ষিণ-চীনের জাতীয় দলের যত ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, অন্যান্য শক্তির সহিত তাহাদের বিরোধ নাই বলিলেই চলে। বৃটিশ শক্তি এ দিকে যদিও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চীন আক্রমণ করা বা চীনে সাম্রাজ্য বিস্তার করা তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা নাই, চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত, চীনকে শক্তিশালী দেখাই তাঁহাদের কামনা, তথাপি তাঁহারা চীনে নৌ ও স্থল-সৈন্য প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। এ কার্য্যের কারণ দেখাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন,—"চীনে এখন অরাজকতা বিদ্যমান; তথায় গৃহবিবাদ চলিতেছে; দক্ষিণে ও উত্তরে রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছে। কখন কোন্ পক্ষ জয়লাভ করে, তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং চীনের কোন্‌টা স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। সুতরাং কাহার সহিত কথাবার্ত্তা বা সন্ধিসর্ত্ত করা কর্ত্তব্য, তাহা এখন স্থির করা যায় না। এ অবস্থায় প্রবাসী বৃটিশ-প্রজা কখন বিপদগ্রস্ত হয়, কখন তাহাদের ধনপ্রাণ আক্রান্ত হয়, অরাজকতা হেতু কখন এক পক্ষের সৈন্য বিজয়ী হইয়া লুটতরাজ আরম্ভ করে অথবা চীন দস্যুরা সুযোগ বুঝিয়া প্রবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, তাহার স্থিরতা নাই। এই হেতু তাহাদের রক্ষাকল্পে চীনে বৃটিশ স্থল ও নৌ-সেনা প্রেরণ করা হইতেছে। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, আমাদের কোনও মন্দ অভিসন্ধি নাই।"

এ দিকে চীন কিন্তু এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হয়েন নাই। দক্ষিণ-চীনের ত কথাই নাই, উত্তর-চীনের War-Lord জেনারল চাঙ্গ-সোলিন ক্রোধভরে ইংরাজকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যদি সাংহাই সহর হইতে সৈন্য অপসারণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত কোনও আপোষ বন্দোবস্ত হইতে পারে না, চীন স্বয়ং সাংহাইয়ে শান্তিরক্ষায় সমর্থ। অবশ্য এই নোটটুকু পিকিং গভর্ণমেণ্টের নামে দেওয়া হইয়াছে, তবে এটা ঠিক যে, ইহার পশ্চাতে চাঙ্গ-সোলিনের ব্যক্তিত্ব আছে। আবার চাঙ্গ-সোলিনের পুত্রও বক্তৃতাদে বলিয়াছেন যে, যদি ইংরাজ হাঙ্কো সহর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উত্তর-চীন দক্ষিণ-চীনের সহিত যোগদান করিয়া হাঙ্কো রক্ষা করিবে। কেবল ইহাই নহে, হাঙ্কো কনসেশান কাণ্টনী সেনাদের হস্তগত হইবার পর পিকিং সরকারও হুকুম করিয়াছেন যে, উত্তরের কনসেশানগুলিও বিদেশীয়দিগকে ছাড়িতে হইবে। কাজেই যদিও উত্তর-চীন দক্ষিণের বিপক্ষে শীঘ্র রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া হাঙ্কো সহরাদির পুনরুদ্ধারে যাত্রা করিবে বলিয়া এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই বলিতে হয়,—"মোষের শিং বাঁকা, যোঝবার বেলা একা।"

হাঙ্কো অধিকারের পর জেনারল চাঙ্গ-কাইসেক তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর নানা স্থানে সমাবেশে মনোযোগ দিয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন, সাংহাই সহরে হাঙ্কোর ঘটনার পুনরাবৃত্তির আয়োজন হইতেছে। অমনই সাজ সাজ রব উঠিল। সাম্রাজ্য-গর্ব্বী ইংরাজ পত্রগুলা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'গেল রাজ্য গেল মান!' সাংহাই সহরে ইংরাজের বহু স্বার্থ নিহিত, উহা ইংরাজ সহজে ছাড়িবে না। অতএব "সাজ সাজ রে রণে!" কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ সহসা সে কথায় নাচিয়া উঠিলেন না। তাঁহারা এক দিকে সাংহাই রক্ষার্থ নানা দিগদেশ হইতে স্থল ও নৌ-সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে কাণ্টনী সরকারের (যদিও সে সরকারকে আজিও তাঁহারা আমল দেন নাই) প্রতিনিধির সহিত আপোষ-কথা কহিতে লাগিলেন। এক হাতে পায়ে ধরিয়া অন্য হাতে গলা চাপিয়া ধরা য়ুরোপীয় রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। ইংরাজ সেই নীতি অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হইলেন না।



পুরোভাগে বামদিকে কাণ্টনের বৈদেশিক সচিব ইউজিন চেন

ইতঃপূর্ব্বে যখন হাঙ্কো কনসেশান সম্পর্কে গোলযোগ চলিতেছিল, তখন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ চীন সম্পর্কে এক 'মেমোরাণ্ডাম' প্রকাশ করেন। ইংরাজ ইহাতে বলেন যে, (১) অতঃপর কোনও বৈদেশিক শক্তি চীনের অন্তর্বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, (২) সকল বৈদেশিক শক্তি চীনের বর্ত্তমান সন্ধিসর্ত্ত চীনকে বর্ণে বর্ণে পালন করিতে জিদ করিবেন না, (৩) যে মুহূর্ত্তে চীনে একটি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান সন্ধির অদল-বদল করিয়া লওয়া হইবে।

কিন্তু এই মেমোরাণ্ডাম ফলপ্রদ হয় নাই। তাহার মূল কারণ এই যে, কাণ্টন গভর্ণমেণ্ট ইহাতে সব পাইলেন, অথচ কিছুই পাইলেন না। তাঁহাদের প্রতিনিধি ইউজিন চেন (বৈদেশিক সচিব) বলিলেন, "সব ত হইল, কিন্তু আমরা কোথায় রহিলাম? বৃটিশ সরকার সব মানিতেছেন, অথচ কাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে মানিলেন না। তবে সন্ধি হইবে কাহার সঙ্গে? অথচ কাণ্টন গভর্ণমেণ্টই এখন চীনের একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট।"

ইহার উপর ইংরাজী সংবাদপত্র 'সাণ্ডে ওয়াকার' যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মেমোরাণ্ডামের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া পারা যায় না। এই পত্র লিখিয়াছেন, "ভূতপূর্ব্ব দস্যুসর্দ্দার চাঙ্গসোলিন পিকিংয়ের রাজপ্রাসাদে কায়েম মোকায়েম হইয়া বসিয়াছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতিনিধি সার মাইলস ল্যাম্পসন নিত্য তাহার সহিত পরামর্শ আঁটিতেছেন। চাঙ্গ ইংরাজের মেমোরাণ্ডামের জোরে পূরা তেজে কর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নিজের দস্যুদলের (সৈন্যমণ্ডলীর) খোরপোষ যোগাইবার



সোভিয়েট-কমিশার বোরোডিন (বামদিকের সর্ব্বশেষে), রাসিয়ান সামরিক পরামর্শদাতা জেনারেল গ্যালেণ্ট (বামদিক হইতে তৃতীয়) ; চীনের জাতীয় দলের সেনাপতি জেনারেল চাং কাইসেক (বামদিক হইতে ৪র্থ)

কাণ্টনীদিগের বিপক্ষে রীতিমত প্রস্তুত হইবার জন্য নহে কি? সাংহাইএর নিকটে চাঙ্গের ও সান চুয়াং ফেঙ্গের সেনাদল সমবেত হইতেছে, সাংহাই রক্ষার জন্য ইংরাজেরও তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কাণ্টনীরা হাঙ্কো লইয়াছে, এইবার সাংহাই লইতে আসিবে, সেই জন্য কি এই সব উদ্যোগ?"

এই বৃটিশ পত্রখানি যাহা লিখিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাণ্টনীরা কেন বৃটিশ মেমোরাণ্ডাম স্বীকার করে নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। চাঙ্গ, উপেইফু ও সান চুয়াঙ্গ ফেঙ্গ,—এই তিন War-Lordই যে কাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গের শত্রু, কাণ্টনের প্রতি ঈর্ষ্যায় ও বিদ্বেষে যে তাঁহাদের অন্তর পূর্ণ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উক্ত মেমোরাণ্ডামের ফলে চাঙ্গের দলই যখন লাভবান্ হইতেছে, তখন কাণ্টনী দল উহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কিরূপে? কাযেই চেন ঐ মেমোরাণ্ডাম স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইলেন না।

তখন চারিদিক হইতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজী পত্রগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দেখ, দেখ, জগৎ দেখ, কি দুষ্ট এই বলশেভিক কাণ্টনীরা, আমাদের গবর্ণমেণ্টের এমন সাধু মেমোরাণ্ডামও মানিয়া লইল না। উহাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ বাধান। ইহার পর যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে আমাদের গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিতে পারিবে না।"

কিন্তু এ থিয়েটারী অভিনয়ে ফল হইল না, মার্কিণ, ফরাসী, জাপান প্রভৃতি বিদেশী শক্তিরা কাণ্টনীদিগের 'সয়তানী' বুঝিলেন না,—তাঁহাদের

ব্যাপার যখন এইরূপ, যখন কাণ্টনীরা মেমোরাণ্ডাম অগ্রাহ্য করিয়া কনশেসানগুলি চীন-রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, যখন হাঙ্কোর পর সাংহাই ও অন্যান্য কনশেসানের আতঙ্কবৃদ্ধি হইয়াছে, তখন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঘন ঘন মন্ত্রণার পর আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের বৈদেশিক সচিব সার অষ্টেন চেম্বালেন যেন মন্ত্রিমণ্ডলের মুখপাত্ররূপে বার্মিংহাম সহরে এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিলেন; বক্তৃতাটা বার্মিংহামে হইলেও করা হইয়াছিল জগতের লোককে শুনাইয়া। এই বক্তৃতাতে ইংরাজের স্বভাবমত সার অষ্টেন নরম গরম দুই ভাব প্রদর্শন করিলেন। এক মুখে বলিলেন, "হাঙ্কোয়ে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার পর সাংহাই রক্ষার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী না হইলে আমাদের প্রবাসী বৃটিশ প্রজার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। এ জন্য অবিলম্বে নানা দিক্ দেশ হইতে সাংহাইয়ে আমরা জল ও স্থল সৈন্য প্রেরণ করিব। ইহা চীনকে আক্রমণ করিবার বা ভয় দেখাইবার জন্য নহে, আপনাদের প্রজার রক্ষার জন্য।" আর এক মুখে বলিলেন,—

"(১) আমরা চীন কর্তৃপক্ষকে ইংরাজ প্রবাসীর মামলার বি[illegible] করিতে দিতে প্রস্তুত আছি;

(২) আমরা বৃটিশ আদালতে চীনের আইনকানুন অনুসারে বি[illegible] কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি;

(৩) আমরা বৃটিশ জাতির পক্ষ হইতে প্রবাসী ইংরাজকে চীনের

(৪) আমরা আমাদের কনশেসানগুলিকে চীন-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

সার অষ্টেনের বক্তৃতার মর্ম্মটা প্রায় এইরূপ। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ চীন-কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সরকারিভাবে এই কয়টি আপোষ-প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন;—

(১) দেশের সাধারণ ব্যবস্থার বহির্ভূত অধিকার সম্বন্ধে বৃটিশ বাদী বা প্রতিবাদী যে সকল অভিযোগের বিচারপ্রার্থী হইবেন, চীনের বর্ত্তমান আদালতসমূহ তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

(২) এক্ষণে চীনে যে সকল বৃটিশ আদালত আছে, তাহাতে চীনের বর্ত্তমানে প্রচলিত দেওয়ানী ও বাণিজ্যসংক্রান্ত বিধি ও নিয়ন্তন আইন-কানুন অনুসারে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া লইতে আমরা সম্মত আছি।

(৩) চীনে দেওয়ানী বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে নূতন বিধি গঠিত হইতেছে, তাহা প্রস্তুত হইলে তাহাও বৃটিশ আদালতে বহাল করিতে আমরা সম্মত আছি।

(৪) বৃটিশ প্রজারা যাহাতে চীন সরকারে নিয়মিত কর ও শুল্ক আদায় দেয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আমরা সম্মত আছি। তবে এ বিষয়ে যাহাতে বৃটিশ পণ্য ও অন্য পণ্য সম্বন্ধে কোনও ইতরবিশেষ করা না হয়, তাহাও চীন গভর্ণমেণ্টকে দেখিতে হইবে।

(৫) পত্তনী এলাকার (কনশেসান) সম্বন্ধে আমরা এরূপ স্থানীয় বিলি-বন্দোবস্ত করিতে সম্মত আছি, যাহাতে নিকটবর্ত্তী চীনা এলাকার সহিত একযোগে ঐ পত্তনী এলাকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ঐ সঙ্গে বৃটিশ প্রজাকেও অন্যান্য প্রজার সহিত নাগরিক অধিকার (ভোটাদি ব্যাপারে) দিতে হইবে।

• বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই উদার (generous) প্রস্তাব প্রকাশিত হইবামাত্র বৃটিশ সংবাদপত্র মহলে একটা 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল—যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হইল, ইংরাজ চীনের আশার অতিরিক্ত দাবী পূর্ণ করিতেছেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? আমাদের ভারতের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রগুলা ত মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল,—"এ্যা! এও কি সম্ভব হয়? চীনারা যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উপযাচক হইয়া তাহাদিগকে তাহাই দিতে চলিলেন? কালে কালে হইল কি? বস্তুতঃ নিকৃষ্ট অশ্বেত জাতির প্রতি প্রকৃষ্ট শ্বেতজাতির এমন ব্যবহার প্রাচ্যে আর কি শ্বেতকায়ের প্রেষ্টিজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে?"

শ্বেতজাতি যে জগদীশ্বরের বাছাই করা (chosen) মনের মত জাতি, উহাদের জন্যই যে পৃথিবীটা সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বর্গটাও প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, জগতের সর্ব্বত্র অশ্বেত জাতিদিগের অভিভাবকতা করিবার জন্য যে জগদীশ্বর তাহাদিগকেই বাছাই করিয়া রাখিয়াছেন,—এ ধারণা সত্যই অধিকাংশ শ্বেতকায়ের (White Imperialists and Capitalists) মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। দেখা যায়, অশ্বেত জাতি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইলেও শ্বেতজাতির গির্জ্জায় স্থান পায় না। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। মার্কিণ দেশের এক নিগ্রো খৃষ্টান এক মার্কিণ পাদরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমিও খৃষ্টান, আমিও খৃষ্টান। তবে তোমার গির্জ্জায় আমি উপাসনা করিতে পাই না কেন?" পাদরী কোন যুক্তি দেখাইতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "যাহার গির্জ্জা, সেই ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিও।" কিছু দিন পরে নিগ্রো ঐ পাদরীকে বলিল, "হাঁ, জবাব পাইয়াছি। ঈশ্বর বলিলেন, তুমি ত স্থান পাও নাই, আমিও এ যাবৎ ওদের গির্জ্জায় স্থান পাই নাই। নানা চেষ্টা করিয়াও ওখানে ঢুকিতে পারি নাই। অতএব দুঃখ কি? তুমি ও আমি একই ক্ষুরে মাথা মুড়াইয়াছি।"

রহস্যের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায়, শ্বেতকায় খৃষ্টানদের মনে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ধারণা এরূপ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে যে, শ্বেতকায় জাতি কিরূপে চীনের ন্যায় 'নিকৃষ্ট' পীত জাতির নিকট এরূপ প্রস্তাব করিতে পারে। পৃথিবীর বারো আনা অনিষ্টের মূল যে এই ধারণা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? কাল এই আত্মম্ভরিতার সমুচিত শাস্তির বিধান করিতেছে।

কিন্তু হায়! গর্ব্বিত শ্বেতজাতির এমন Generous উদার প্রস্তাবেও 'নিকৃষ্ট' পীত জাতির প্রতিভূ মিঃ ইউজিন চেন সম্মত হইলেন না। তাঁহার সহিত বৃটিশ প্রতিনিধি ওমালির আপোষ-কথা ভাঙ্গিয়া গেল। বিনা মেঘে যেন য়ুরোপীয় ডিপ্লোমেসির শিরে বজ্রপতন হইল! সব ঠিকঠাক, শেষ মুহূর্ত্তে এ কি পরিতাপ!

তখন চারিদিক হইতে রব উঠিল,—চীন নিজে এ সয়তানী করে নাই, তাহার পশ্চাতে মস্কোয়ের সোভিয়েট সরকার আছে। সোভিয়েট ইঙ্গিত করিতেছে, চেন ছকের বড়ী টিপিতেছে। অতএব মস্কোকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হউক, উহার সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক।

কিন্তু মস্কো সোভিয়েট নীরব থাকিবার নহেন। তাঁহাদের করেণ কমিশারী মুসিয়ে লিটভিনফ ঘোষণা করিলেন,—"বাঃ, এ ত বড় মজার কথা! তোমরা আপোষ-কথা চালাইতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়-প্রদর্শনের জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করিতেছ, আপোষ-কথা ভাঙ্গিয়া যাইবে না কেন? তোমরা তোমাদের ভুলের দোষ এখন আমাদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ। এখন তোমরা বলিতেছ, সোভিয়েট এজেণ্টদের চক্রান্তের ফলে চীনের জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। অবশ্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চীনের এই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করে; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা সত্য নহে যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের কথা ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কাণ্টন গভর্ণমেণ্টকে দিয়াছে, বৃটেনের সহিত চীনের শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কখনও অন্তরায় হইবে না। সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এ্যাংলো-রুস বাণিজ্য সন্ধির কথা ভুলে নাই, সে জন্য তাহারা কৃতজ্ঞ।"

এ দিকে কাণ্টনের বৈদেশিক সচিব ইউজিন চেনও ধীরগম্ভীর স্বরে জবাব দিয়াছেন। তিনি জাতীয় দলের প্রতিভূ, তাহারা কাহারও অনুগ্রহ-নিগ্রহের প্রত্যাশী নহে, তাহাদের কাম্য দেশের মুক্তি, সে পথে যাহা কিছু অন্তরায়, তাহা তাহারা দূর করিবেই। তাহারা রাসিয়াকেও বন্ধু বলিয়া মাথায় বসায় না, আর ইংরাজকেও শত্রু বলিয়া দূরে ত্যাগ করে না। কোনও বৈদেশিক শক্তিকেই তাহারা আপনাদের গুরুঠাকুরের আসনে বসাইতে চাহে না, তবে যে শক্তি তাহাদের মুক্তিসাধনে সহায়তা করিবে, তাহাকে বন্ধু বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে, আর যে শক্তি তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহার মুক্তি-সাধনে বাধা প্রদান করিবে, তাহাকেও কি সে কেবল ভয়ের খাতিরে বন্ধু বলিয়া কোল দিবে?

• ইউজিন চেন বিলাতের শ্রমিক পত্র 'ডেলি হেরাল্ডকে' এক তার করিয়া তাঁহার মনের কথা জানাইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "আপোষ সন্ধিতে আমি স্বাক্ষর করি নাই বলিয়া রটান হইতেছে যে, • আমি বিদেশী প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছি। ইহা একবারেই ভিত্তিহীন এবং হাস্যকর কথা। আসল কথা এই যে, ইংরাজ আপোষ-কথাও কহিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই সহরে সৈন্য প্রেরণ ও সমাবেশ করিতেছেন। চীনের জাতীয় আন্দোলনকে ভয় দেখাইয়া সন্ধিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে চীন তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারে না।"

চেনের কথায় কোনও মারপেঁচ নাই,—একবারে সাফ সরল সহজ কথা। বিদেশীরা এত দিন যে চীনের সহিত কারকারবার করিয়া আসিতেছেন, চাঙ্ কাইসেক ও ইউজিন চেনের চীন, সে চীন নহে। এ চীন নবভাবে বিভোর, আত্মসম্মানজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ, আত্মশক্তিতে প্রত্যয়-

সুতরাং তাহার নিকট এখন এমন ভাবের স্পষ্ট কথা শুনিবার দিন আসিয়াছে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলে, ধৈর্য্যচ্যুত হইলে সে ক্রোধ, সে ধৈর্য্যচ্যুতি নিষ্ফল হইবে। বোধ হয়, তাহা বুঝিয়াই ইংরাজ কর্তৃপক্ষ আপাততঃ সাংহাইয়ে সৈন্যসমাবেশ করা স্থগিত রাখিয়া হংকংএ সৈন্য-প্রেরণের আদেশ করিয়াছেন। আশা হয়, ইহাতে সুফল ফলিতে পারে, হয় ত আপোষ-সন্ধি হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এক শ্রেণীর সাম্রাজ্যগর্ব্বী ইংরাজের এখনও চৈতন্য হয় নাই—তাহারা এখনও প্রকৃষ্ট নিকৃষ্টের স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহারা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, "চীন আপোষের সুযোগ পাইয়াও দম্ভভরে হেলায় হারাইল, এখন যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে দোষ তাহাদের। তাহারাই প্রথম অপরাধ করিল।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কোনও সংবাদসংগ্রাহককে বলিয়াছেন,—অপরাধ কি চীনের প্রথম? চীনের দেশে গিয়া প্রথম অহিফেন-যুদ্ধ ঘটাইয়াছিল কে? চীন কাহারও দেশে গিয়া কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে কাহাকেও তাহার হুকুমমত কার্য্য করিতে বাধ্য করে নাই। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি বৈদেশিক শক্তিরা অস্বীকার করিতে পারেন?

'সাণ্ডে ওয়া'র' পত্রে এক য়ুরোপীয় জাহাজ-কর্ম্মচারী এ বিষয়ে একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পূর্ব্বে সাংহাই সহরের মিউনিসিপ্যাল পার্কের দ্বারে এক বিজ্ঞাপন লেখা থাকিত। উহাতে বলা হইত—'এই পার্কের মধ্যে চীনার ও কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।' নিজের দেশে কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন জাতি এই অপমান হজম্ করিতে পারে? এত দিন চীনাকে তাহার দেশে এই ভাবেই ব্যবহার করিয়া আসা হইয়াছে। এখন পাশা উল্টাইয়াছে। এখন আমাদের জাহাজ কোম্পানীর 'অর্ডার বুকে' লেখা থাকে,—'জাহাজের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী বা এঞ্জিনিয়ার কোন চীনাকে প্রহার করিলে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত হইবে।' একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মালয় উপদ্বীপের এক জাহাজ কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনিয়ার জাহাজের চীনা ফায়ারম্যানকে প্রহার করিয়াছিলেন। এই ফায়ারম্যান হংকংএর নিকটস্থ হাইলান দ্বীপের 'হাইলাম' সম্প্রদায়ভুক্ত চীনা। জাহাজ বন্দরে নঙ্গর করিলে ঐ ফায়ারম্যান তাহার হাইলাম সম্প্রদায়ের মারফতে মারপিটের অপরাধে ঐ চীফ-এঞ্জিনিয়ারকে অভিযুক্ত করিল। মামলা ডিস্‌মিস্ হইল বটে, কিন্তু হাইলাম সম্প্রদায়ের সমস্ত চীনা ঐ এঞ্জিনিয়ারের অধীনে কার্য্য করিতে অসম্মত হইল। জাহাজের বুলডগ-জাতীয় কাপ্তেন অবজ্ঞাভরে বলিলেন, 'ওঃ, তবে ত বহিয়াই গেল! আমি ভারতীয় নবী লস্কর লইয়া জাহাজ চালাইব।' হাইলামদের উকীল বলিলেন, 'জাহাজ কোম্পানী লস্করদিগকে যে বেতন দিবে, আমরা তাহার দ্বিগুণ বেতন দিয়া লস্করদিগকে বসাইয়া রাখিব।' ফল এই হইল যে, কয়েক দিন বসিয়া থাকিবার পর জাহাজ কোম্পানী তাঁহাদের চীফ এঞ্জিনিয়ারকে বরখাস্ত করিয়া হাইলাম ফায়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া জাহাজ চালাইতে বাধ্য হইলেন।"

অবস্থাটা তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন। যখন যেমন তখন তেমন না করিলে, কালের পরিবর্তন মানিয়া না চলিলে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হয়, বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়। সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা এখন এই কথাটা বুঝিয়া না দেখিলে জগতে তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

নিভৃত শয্যায়

তন্দ্রায়ে পড়েছে বধূ; সুপ্তি-মগ্ন আঁখি,
আনে প্রাণে বার বার, শুধু থাকি' থাকি'
নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্য যেন। ঘন কেশ-দাম
ছড়ায়ে রয়েছে তার সুগোল সুঠাম
মৃণাল-বাহুর পরে; নির্ব্বাক্ অধর
অতৃপ্ত বারতা বহে; নিশি দ্বিপ্রহর।
অষ্টমীর ক্ষীণ চাঁদ মুক্ত-গৃহ-দ্বারে
ঢালিছে আপন রেখা, রজতের ধারে
প্রিয়ার আনন 'পরে। অচেতন দেহ
বক্ষে টানি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের স্নেহ,
ধূলায় লুটিয়া আছে; অমৃত-জীবনে
আরবার বাঁধি আমি রাখীর বন্ধনে;
পুরোহিত এস, তবে, মন্ত্র পড়ি' দাও!—
শান্তি! শান্তি! চিরশান্তি! প্রেয়সী ঘুমাও।

শ্রীমতী অরুণলেখা রায়।

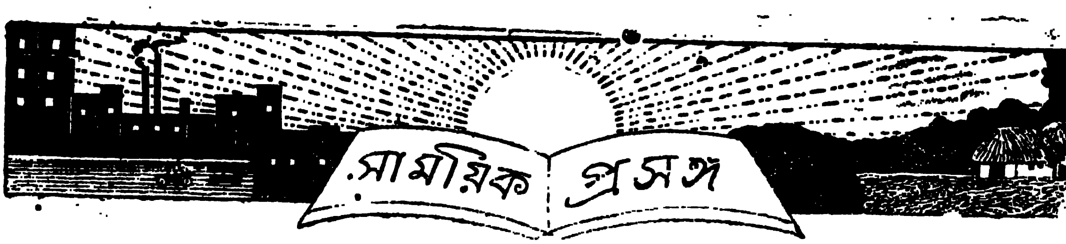
অনুযোগ

সুপ্ত আজি এ হৃদয়-বীণা—
ধ্বনিছে ব্যথার তান।
রবে না মরমে মরমের সাধ,
গাহিব খুলিয়া প্রাণ।

বারেক আসিয়া শুনে যেও নাথ
আমার মরম-রাগিণী,
লাঞ্ছনা যত তুমিই দিয়াছ—
তোমারে শোনাব কাহিনী।

দেখ তবে নাথ ছিঁড়ে যদি যায়
হৃদয়ের তার শিহরি,
বীণাপাণি তবে নীরবে কাঁদিবে
বিষাদ-ব্যথায় গুমরি।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।



থোড় বড়ি খাড়া

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি লর্ড রেডিং যে দিন ভারতে রাজপ্রতিনিধিরূপে—বড়লাটরূপে প্রথম পদার্পণ করেন, সে দিন তিনি নিজে আইন ও ন্যায়বিচারের অনেক আশাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এ দেশেরও অনেক আশা-মুগ্ধ লোক মনে করিয়াছিল, বিলাতের আইনের অবতারের আগমনে বুঝি বা ভারতে আইন ও ন্যায়বিচারের নবযুগের অভ্যুদয় হইবে। সেই এক দিন, আর লর্ড রেডিংয়ের বিদায়ের দিন—মাঝে থোড় বড়ি খাড়া!

কৃষির উন্নতি এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতির বাণী লইয়া লর্ড আরউইন এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। দিল্লীর ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে লর্ড আরউইন তাঁহার শাসননীতির যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতেও আবার ৫ বৎসর থোড় বড়ি খাড়ারই গন্ধ পাওয়া যায়।



লর্ড আরউইন

ফল কথা, ভারতে বৃটিশ শাসননীতির তার এক সুরেই বাঁধা, ইহাতে নিয়ামকের ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ নাই। কথাটা যে খাঁটি সত্য, তাহা লর্ড রেডিংয়ের নিজের কাগজ "ডেলি ক্রণিকল" সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। লর্ড আরউইনের ব্যবস্থা-পরিষদের বক্তৃতা উপলক্ষে এই পত্র বলিয়াছেন,—"রেডিং, রেডিংয়ের পূর্ব্বে চেমসফোর্ড এবং পরে আরউইন—কাহারও নিজস্ব কিছু করিবার যো নাই; সকলেরই তার একই সুরে বাঁধা। যে বাঁধাধরা শাসন-আসিতেছেন, তিনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার মূল কথা এই যে, অসহযোগ কখনও ফলপ্রসূ হইতে পারে না, হইয়াছেও তাহাই; সুতরাং ভারতকে যে সংস্কার আইন দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত সহযোগ করিয়া চলিলে ভারতবাসী লাভবান্ হইবে। এ কথা লর্ড আরউইনের পূর্ব্বের বড়লাটরা বলিয়াছেন, লর্ড আরউইনও বলিতেছেন। তিনি নূতন কিছু বলেন নাই। লর্ড বার্কেণ-হেড ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের বক্তৃতায় ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে গ্রহণযোগ্য কি প্রকার রিফরম দেওয়া যাইতে পারে, ভারতবাসীরা তাহা দেখাইয়া দিউক। লর্ড আরউইনও তাহাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন।"

কাজেই সেই থোড় বড়ি খাড়া। হয়, 'ছোলাভাজা খাও, না হয় তুলিয়া আছাড় দেওয়া হইবে,' ইহাই মোট কথা। মাদ্রাজের লাটও তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, "ভারতবাসীর রাজনীতিক দলসমূহের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন বা আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।" ঠিক কথা, কেন না, তখনও তাহারা অসম্ভব আবদার করিতেছিল, এখনও করিতেছে, চাঁদ হাতে চাহিতেছে। যদিও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপরিষদের অধিকাংশ দেশীয় সদস্য একযোগে ভারতের পক্ষ হইতে কয়েকটা দাবী করিয়াছিলেন, তথাপি উহা ত আর ন্যায্য দাবীর মধ্যে ধরা যায় না—উহা তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের অনুরূপ হইতে পারে: কিন্তু তাহা বলিয়া

লর্ড আরউইন তাঁহাদের বাঁধাধরা নীতির মাপকাঠিতে সংস্কার আইনের অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

সংস্কার আইনের মহিমা আজিও মূর্খ ভারতবাসী বুঝিল না। ব্যবস্থাপরিষদের অন্যতম সদস্য সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেও তাঁহাকে বে-আইনী আটক করিয়া রাখিয়া অধিবেশনে যোগ দান করিতে দেওয়া হইল না, এ জন্য ব্যবস্থাপরিষদ সরকারের প্রতি অনুযোগের মন্তব্য (vote of censure) গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ কথাটাও বড় লাট লর্ড আরউইন তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, সংস্কার আইনের গড়া ব্যবস্থাপরিষদের এমনই মান ও কদর!

লর্ড আরউইনের বক্তৃতায় তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে :—

(১) চীনদেশে ভারত হইতে সৈন্য প্রেরণ,

(২) বে-আইনী আইনে আটক রাজবন্দীদের কথা,

(৩) সংস্কার আইন ও সম্ভাবিত রয়্যাল কমিশন।

চীনদেশে ইংরাজ বণিকদের স্বার্থ অর্থাৎ ধনপ্রাণ রক্ষা করার উদ্দেশে বৃটিশ সরকার নৌ ও স্থলসৈন্য প্রেরণ করিতেছেন, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। ফরাসী, জাপ ও মার্কিণেরও বহু প্রজা চীনে বসবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য ঐ সকল শক্তি জল ও স্থলে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স যে ভাবে চীনে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা দক্ষিণ-চীনের কুওমিণ্টাঙ্গ গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় লাভে নিশ্চিন্ত আছেন। রুসিয়ার ত কথাই নাই, তাঁহারা চীনে তাঁহাদের সমস্ত বিশেষ অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং চীনের সহিত সমানে সমানে বন্ধুতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জাপ ও মার্কিণ বলিতেছেন, তাঁহারা দক্ষিণ-চীনের সহিত নূতন সন্ধিতে সম্মত আছেন, যত দিন তাহা না হয়, তত দিন বর্ত্তমানে যে সন্ধি আছে, তাহা মানিয়া চলিবেন। কেহ প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষার কথা তুলেন নাই। অথচ ইংরাজের অপেক্ষা জাপের স্বার্থ চীনে বেশী। সুতরাং একা ইংরাজই চীনে রণসাজে আগুয়ান হইতেছেন কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

যদিই বা ইংরাজের চীনে সাম্রাজ্যের জন্য সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃটেন হইতে সৈন্য পাঠাইলে কথা উঠিত না। ইংরাজের সাগরপারের জ্ঞাতি-কুটুম্ব কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাও হইতেও যদি সৈন্য প্রেরিত হইত, তাহা হইলেও উহাতে বিস্ময়ের বিষয় থাকিত না। কিন্তু ভারত হইতে চীনে সৈন্য প্রেরণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? ভারতের সহিত চীনের কোনও বিবাদ নাই, বরং ভারত চীনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহার মুক্তিতে সহানুভূতি প্রকাশ করে। তবে যাহার সহিত বন্ধুত্ব ব্যতীত বিরোধ নাই, সেই চীনে ভারতের সেনা প্রেরণ করা হইতেছে কেন? লর্ড আরউইন যুক্তি দিয়াছেন যে, ভারত চীনের নিকট বলিয়া ভারত হইতে শীঘ্র সৈন্য প্রেরণের সুবিধা। অষ্ট্রেলিয়া হইতেও ত চীন নিকট, তবে সেখান হইতে প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করা হইল না কেন? ইহা হইতে কি বুঝা যায়? অষ্ট্রেলিয়া স্বায়ত্তশাসিত স্বাধীন দেশ, তাহার সৈন্য অন্যত্র পাঠাইতে হইলে তাহার জনসাধারণের অনুমতি চাই। আর ভারত? হোয়াইট হল যাহা হুকুম করিবে, দিল্লী-সিমলাকে তাহা নত মস্তকে পালন করিতে হইবে! ইহাতেও যদি ভারতের অবস্থা ও 'রিফরমড কাউন্সিল এসেমব্লির' কদর বুঝা না যায়, তাহা হইলে আমরা নাচার। ভারত হইতে ভারতের অর্থে রক্ষিত দেশীয় বা বিদেশীয় সেনা ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে (ভারতের প্রয়োজনে নহে) প্রেরিত হইবে, অথচ তাহাতে ভারতীয় প্রজার 'প্রতিনিধিদিগের' (ব্যবস্থাপরিষদের) কথা কহিবার কোনও অধিকার নাই—এমন কি, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করাও প্রয়োজন বলিয়া হোয়াইট হল বা হোয়াইটহলের আজ্ঞাধীন দিল্লী মনে করেন নাই। ইহাই আমাদের Indian Parliament!

এখানেও ভারতের ঘৃণিত অবস্থার চরম নিদর্শন প্রতিভাত হয় নাই, ইহার পরেও ভারতকে আরও ধূলিমলিন পঙ্কিল পথে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অসহায় ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ফল ত ভারতকে ভোগ করিতে হইবেই—চীনের দৃষ্টিতে ও তথা জগতের নিরপেক্ষ জাতিগণের দৃষ্টিতে ভারত ত অপদার্থ অসাধু বলিয়া প্রতিভাত হইবেই, অধিকন্তু ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া সরকার যাঁহাদিগকে জগতের সমক্ষে জাহির করেন, সেই ব্যবস্থাপরিষদের ভারতীয় সদস্যদিগের পক্ষ

হইতে এই অসাধু কার্য্যের প্রতিবাদও ব্যবস্থাপরিষদে উত্থাপিত করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই! শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার চীন-সমস্যার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদ মুলতুবী রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরিষদের প্রেসিডেন্ট গভর্ণর জেনারলের অনুমতির অপেক্ষা রাখিয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড আরউইন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই! তাঁহার অজুহত—সাধারণের স্বার্থ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে ক্ষুণ্ণ হইবে!

সুন্দর ব্যবস্থা! এ দেশে কখনও কখনও সাধারণের স্বার্থের জন্য—সাধারণের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বে-আইনী আইনের বজ্র নিক্ষেপ করা হয়, সাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হয়। আবার এ দেশে কখনও কখনও সাধারণের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সাধারণের মতের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণের প্রতিনিধির প্রস্তাবে অনুমতি দেওয়া হয় না, সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া 'সাধারণের' সেনা যখন ইচ্ছা যেখানে সেখানে প্রেরিত হয়!

চীনে সেনাপ্রেরণে 'সাধারণের স্বার্থ' কেমন সংরক্ষিত হইতেছে, তাহা ব্যবস্থাপরিষদে প্রকাশ করিয়া বলিতে না দিলেও পরিষদের বাহিরে সাধারণের প্রতিনিধিরা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লীর কুইন্‌স্ গার্ডেনে জনসাধারণের এক বিরাট সভায় হিন্দু-মুসলমানের প্রতিনিধিরা একবাক্যে এই অসাধু ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং এক মন্তব্যে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা চীন-জাতির জাতীয় আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং বিনা অনুমতিতে ভারত সরকার চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ও অন্যান্য সেনা প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া সেই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই মন্তব্য উত্থাপন করিয়াছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার; পরন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি, মিঃ সাকলতওয়ালা প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়গণ প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই চীনে ভারতীয় সেনা-প্রেরণের ব্যাপারে ভারতীয়গণের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

বড় লাট লর্ড আরউইন্ শাসনের মুখপাতেই সাধারণের মতামতের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার ৫ বৎসরের শাসনকালেও যে 'থোড়-বড়ি-খাড়ার' ব্যবস্থা হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সাধারণের 'প্রতিনিধি সভার' (ব্যবস্থাপরিষদের) কথা সকল সময়ে গ্রাহ্য হয় না, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিনা বিচারে বে-আইনী বিধি-বজ্রের জোরে যাহারা আজ রাজবন্দী, তাহাদিগের মুক্তির সম্বন্ধে এবং ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার প্রদান সম্বন্ধে বড় লাট তাঁহার ব্যবস্থা-পরিষদের মুখপাতের বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার ভবিষ্যৎ শাসন-নীতির পরিচয় পরিস্ফুট। এখানেও সেই 'থোড়-বড়ি-খাড়া'—নূতনত্ব কিছু নাই। অবশ্য, তিনি তাঁহার বক্তৃতার তিক্ত বটিকা চিনির মোড়কে মুড়িয়া দিয়াছিলেন; কেন না, পণ্ডিত মতিলালের ভাষায় তাঁহার বক্তৃতা—"Old story delivered by a thorough gentleman in a gentlemanly manner." তাই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল, "Detentions like those in Bengal, neccessitated with a view to the prevention of terrorist outrages, have no relation with the general question of constitutional advance," লর্ড আরউইনের ইহাই কি প্রকৃত মনের কথা? তিনি কি মনে করেন, বে-আইনী আইনে বিনা বিচারে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের সহিত স্বায়ত্তশাসনাধিকার-বিস্তৃতির কোন সম্পর্ক নাই? দেশের শত শত কৃতী যুবক বিনা বিচারে আটক রহিয়াছে—সুভাষচন্দ্রের মত জন্মভূমির সুসন্তানের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে—ইহা জানিয়াও কেবল আমলাতন্ত্র-সরকারের কর্ম্মচারীর মুখের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া দেশের লোক তাঁহাদিগকে অপরাধী বলিয়া ধারণা করিয়া লইবে এবং সেই সরকারের ওজন-করা দয়ার দানরূপে সংস্কার-আইন মাথা পাতিয়া লইবে? যে শাসনে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা স্বায়ত্তশাসন বলিয়া কোন্ দেশে গৃহীত হয়? শত রয়্যাল কমিশন আসিয়া সংস্কার-আইনের প্রসার-সাধন করিলেও তাহা স্বায়ত্তশাসনরূপে দেশবাসী গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং লর্ড

আরউইন বৃথা ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন,—"Parliament would not be coerced to grant constitutional advance." লর্ড আরউইনের এই যুক্তি এক মুহূর্ত্তও বিচারসহ নহে। ইংরাজের ইতিহাসে ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কানাডা, দক্ষিণ-আফরিকা এবং সম্প্রতি আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। তবে ভারত ভয়-প্রদর্শনের পথে যাইতে চাহে না, ভারত অহিংসার পথই অবলম্বন করিয়াছে, ইহাই কি ভারতের অপরাধ?

লর্ড আরউইনের পূর্ব্বে লর্ড চেমসফোর্ড ও লর্ড রেডিং এ সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। তিনি পার্লামেণ্টের ক্রোধের ভয়টা একটুকু বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব,—"Parliament must inevitably be gravely disquited by the language which appears to be inspired by hostility not only to legitimate British interests but also to British connexion" ইহা কি সত্য কথা? জনসাধারণের পক্ষ হইতে কংগ্রেসকে এ দেশের প্রতিনিধি-সভা এবং সরকারের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা-পরিষদকে এ দেশের প্রতিনিধি-সভা বলা হয়। লর্ড আরউইন দেখাইয়া দিতে পারেন কি, কবে কোথায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বৃটিশ স্বার্থ ও বৃটিশ সংস্রবের সহিত শত্রুতা প্রকাশ করিয়া মন্তব্যাদি গৃহীত হইয়াছে? বরং এবারও কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতার মন্তব্য গ্রহণই করেন নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারলাভই তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বরং ব্যবস্থা-পরিষদ ভারতের যে জাতীয় দাবী লর্ড রেডিংয়ের সকাশে পেশ করিয়াছিলেন, তাহা বৃটিশ স্বার্থ ও সংস্রবের অনুকূল। কথার মারপেঁচে সত্যের অপলাপ করা যায় না। ভারত কোন দিনই ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহার মুক্তির দাবী করে নাই, সে নিয়মতান্ত্রিক পথে থাকিয়া তাহার জন্মগত অধিকারের দাবী করিয়াছে।

লর্ড আরউইন বলিয়াছেন,—"পার্লামেণ্ট ভারতের জন্য যে 'স্বরাজ-সৌধের' কল্পনা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজনের অনুরূপ হইবে কি না, তাহা ভারতীয় রাজনীতিক দলসমূহকে বলিবার জন্য তাঁহার সরকার আহ্বান করিতেছেন।" ইহাকে কি বাঁধিয়া মারা বলা যায় না? ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজনের অনুরূপ যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত করা কর্ত্তব্য, তাহা ত বহু দিন পূর্ব্বেই ব্যবস্থা-পরিষদ লর্ড রেডিংকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেসও ত প্রতি বৎসর তাহা দেখাইয়া দিতেছে। তাহা ছাড়া তাঁহারা আর কি করিতে পারেন?

পার্লামেণ্ট যে 'স্বরাজ-সৌধ' কল্পনা করিয়াছেন, তাহার ভিত্তির উপকরণ ত ভারত-সরকারের স্বৈরাচার ও অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের জগাখিচুড়ী দ্বৈতশাসন। ইহা ত unworkable বলিয়া বহু মন্ত্রী (Ministers) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা হাতে-কলমে কায করিয়াছেন, তাঁহাদেরই যখন এই অভিমত, তখন লর্ড আরউইনের এই "অভিমতের আমন্ত্রণ" কি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের অনুরূপ নহে? তিনি ভারতবাসীকে ক্রোধ ও সন্দেহ বর্জ্জন করিয়া "Play the game" করিতে বলিয়াছেন, ইংরাজকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ইংরাজকে বন্ধুরূপে পাইলে ভারতবাসী যত আনন্দিত হইবে, এত আর কেহ হইবে না। কিন্তু সে বন্ধুতা সমানে-সমানে হইবে ত? এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে 'হুকুম' করিলে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব থাকে ত?

এ সকল কথায় মনে হয়, আবার ৫ বৎসরের জন্য ভারতে থোড়-বড়ি-খাড়ার রাজত্বই চলিল।

আবার দ্বৈত-শাসন

লর্ড লিটন এ দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোককে Parting kick দিয়া যাইতেছেন। অল্প বা অধিক—যে সময়ের জন্যই হউক, এই বাঙ্গালা দেশকে আবার দ্বৈতশাসনের হার গলায় পরিতে বাধ্য করিয়াছেন।

সত্য বটে, এই বাঙ্গালা দেশেই চিত্তরঞ্জনের জীবিতকালে দ্বৈতশাসন অচল হইয়াছিল; সত্য বটে, সরকারকে সংস্কার-মাকালের ভিতরের পচন যথাসম্ভব ঢাকিয়া রাখিয়া আবার স্বৈরাচার শাসনের রুদ্রমূর্ত্তি প্রকট করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যাহাদের চেষ্টায় ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাদের 'অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আবার সরকারের পক্ষে দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইল।

সরকার যে সময়ে দ্বৈতশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইলেন, দেশের লোক যখন সরকারকে জানাইয়া দিল যে, তাহারা এই ভুয়া স্বায়ত্তশাসনের ঠাট বজায় রাখিতে চাহে না, দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া যাইবার পরেও যখন স্বৈরাচার-শাসন অচল হইল না, তখনই কাউন্সিল-কামীদের কাউন্সিলের সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসা কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা যে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছিল—তাঁহারা কাউন্সিলে বাধাপ্রদান-নীতি দ্বারা দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া দিয়া জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, মণ্টেগু রিফরম প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন নহে; উহা লোকভুলান কুহকজাল মাত্র। সেই কুহকজাল তাঁহারা ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর তাঁহাদের মোহে আচ্ছন্ন হওয়া কর্ত্তব্য ছিল না, বাহিরে আসিয়া দেশের ও জাতির গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল।

এইখানেই তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ফলও তাহার অনিবার্য্য। মোহে পাপ, পাপে মৃত্যু, ইহা ত চলিত কথা। কাউন্সিলের আকর্ষণ তাঁহারা এড়াইতে পারেন নাই। সেই মোহের ফলে স্বার্থসংঘর্ষের হলাহলের উদ্ভব, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া এখন দেশবাসী জর্জ্জরিত। দলাদলি, রেষারেষি, ভাঙ্গাভাঙ্গি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, ফলে দেশ অধঃপতনের পথে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে। লোক মুক্তি-সমরের জন্য সজ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয় না করিয়া পরস্পর সংগ্রামে শক্তিক্ষয় করিতেছে। স্বরাজের কথা এখন স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তাই এবার যখন কাউন্সিলের ভোট-সমর বাধিয়াছিল, এবং কাউন্সিলকামী কংগ্রেসদল বাঙ্গালায় জয়পতাকা উড্ডীন করেন, তখন তাঁহারা ভবিষ্যতের পথ কুসুমাকীর্ণ দেখিলেও—আশার আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও, আমরা আশান্বিত হইতে পারি নাই। ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কাউন্সিলে প্রকৃত কায করিতে পারিবেন না, তাহা জানাই ছিল। আমড়াগাছে আম ফলাইতে গেলেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের কাউন্সিলে পুনঃপ্রবেশ না করিয়া দেশগঠনে আত্মনিয়োগ করাই ভাল ছিল। কাউন্সিলের অসারতা ত পূর্ব্বেই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তবে আবার কাউন্সিলে প্রবেশ কোন্ কার্য্যের সার্থকতা সম্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল?



লর্ড লিটন

নানা কারণে ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের আশানুরূপ সংখ্যাধিক্য হয় নাই। সরকারী ও বে-সরকারী য়ুরোপীয়রা ত তাঁহাদের বিপক্ষেই ছিলেন। তাহার উপর লিবারল, রেসপনসিভিষ্ট ভারতীয়রাও তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি এবার সম্প্রদায়গত স্বার্থসংঘর্ষের ফলে যে বিরোধ ও দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বহু হিন্দু তাঁহাদের 'প্যাক্টে' অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, আবার বহু মুসলমানও তাঁহাদের আবদার ও বাহানা বজায় না হওয়ায় তাঁহাদের দল ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাযেই গভর্ণর লর্ড লিটন যখন ব্যবস্থাপক সভায় ২ জন মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুরের প্রস্তাব উত্থাপিত করাইলেন, তখন কাউন্সিলকামী কংগ্রেসদল তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেও ৫৩টি ভোটের জোরে পরাস্ত হইলেন—প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেখা গিয়াছে, ব্যবস্থাপক সভায় মাত্র ৩৮ জন মন্ত্রি-নিয়োগের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের ৩ জন অনুপস্থিত ছিলেন, (১ জন সুভাষচন্দ্র, তিনি বন্দী; অপর ২ জন অসুস্থ)। তাহা হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা ৪১ জনের অধিক হয় না। ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। এ অবস্থায় তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া কি কায করিতে পারিবেন?

মুখপাতেই তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে। লর্ড লিটন আবার বাঙ্গালায় দ্বৈতশাসনের মরা-গাছকে দাঁড় করাইয়া তুলিয়া নিশ্চিতই গর্ব্বানুভব করিতেছেন এবং বাঙ্গালার মাথা হেঁট করিয়াছেন মনে করিয়া আনন্দ উপভোগ

তাহার পর মন্ত্রি-নিয়োগ। লর্ড লিটন প্রথমে প্রকাশ করিলেন, আপাততঃ তিনি ২ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। ১ জন হিন্দু ১ জন মুসলমান। সার আবদর আবদার ধরিলেন, হয় ৪ জন, না হয় অন্ততঃ ৩ জন মন্ত্রী নিয়োগ করা হউক। এই বাহানার অর্থ বুঝা কঠিন নহে। যেন-তেন-প্রকারেণ মুসলমান মন্ত্রিত্বের দিকে পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়া চাই। ৪ জন মন্ত্রী হইলে সার আবদরের ২ জন মুসলমান মন্ত্রীর, ১ জন হিন্দু মন্ত্রীর ও ১ জন য়ুরোপীয়ান মন্ত্রীর নিয়োগেও আপত্তি ছিল না। তিন জন হইলে ১ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমান মন্ত্রী হইতেই হইবে; যেহেতু, মুসলমানরা বাঙ্গালার সংখ্যায় অধিক। অধিকন্তু প্রথমবার মন্ত্রিত্বের আমলে ৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২ জন হিন্দু (সার সুরেন্দ্রনাথ ও সার প্রভাস) এবং ১ জন মুসলমান (নবাব নবাব-আলি) ছিলেন। তাহার পরের বারে যদিও ১ জন হিন্দু (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক) এবং ২ জন মুসলমান (মিঃ ফজলুল হক ও হাজি আবু গজনভি) মন্ত্রী হইয়াছিলেন, তথাপি ব্যবস্থাপক সভার মন্ত্রি-বেতন না-মঞ্জুর হওয়ায় সেই মন্ত্রিত্ব ত অধিক দিন টিকে নাই। কাযেই পাল্লাপাল্লি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এবা'র যখন কাঁচিয়া গণ্ডূষ হইতেছে, তখন মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মুসলমানরা যে সংখ্যায় অধিক হইলেও বিদ্যায় ও কর্দান-ক্ষমতায় হিন্দুদিগের অনেক নিম্নে, এ কথাটা সুবিধামত ভুলিয়া যাওয়াও প্রয়োজন। সার আবদর বাঙ্গালার ২ জনের অধিক মন্ত্রি-নিয়োগের অনুকূলে যুক্তি দিয়াছিলেন যে, কায এত অধিক যে, ২ জনে সে কায করিয়া উঠিতে পারেন না। অথচ মজা এই যে, যখন ইহার পর সার আবদরকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হইল, অথচ তাঁহার হিন্দু 'দোসর মন্ত্রী' জুটিল না, তখন যে কয় দিন গভর্ণর তাঁহাকে হিন্দু মন্ত্রী খুঁজিতে সময় দিয়াছিলেন, সার আবদর তাহারও অধিককাল (সপ্তাহভোর) একাকীই সেই ২ জন মন্ত্রীর কায করিতেও কোমর বাঁধিয়াছিলেন। লর্ড লিটনের সরকার যখন তাঁহার '৪ জন মন্ত্রীর' আবদার রক্ষা না করিয়া ২ জন মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন, তখন সার আবদর গভর্ণরের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, হইবে, ফলে মুসলমানের গোঁসা গজাইয়া উঠিবে। অথচ গভর্ণর যখন ২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১ জন মন্ত্রীর পদ তাঁহাকে অর্পণ করেন, তখন সার আবদর সুড় সুড় করিয়া সেই পদ লইতে অগ্রসর হইলেন। কোথায় রহিল আবদার, আর কোথায় রহিল তাঁহার মুসলমানের গোঁসা!

এই ভাবের মনোভাব লইয়া যিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে যায়েন, বাঙ্গালার লাট তাঁহার মত ব্যক্তিকে যে কিরূপে মন্ত্রিত্বের পদ দিতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা বুঝা যায় না। সে মন্ত্রিত্বের বহর কতটুকু বা দায়িত্ব কিরূপ, তাহাও কিন্তু অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হয় না।

গভর্ণর বলিয়াছিলেন যে,—প্রথমাবধি যে ভাবে কায হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এবার ২ জন হিন্দু এবং ১ জন মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধভাব প্রবল হইয়াছে, তাহাতে যে কোন সম্প্রদায়ের মন্ত্রিসংখ্যা অধিক করিয়া দিলে তাহাতে আপত্তি উঠিবে এবং বিরোধ-বৃদ্ধিও হইতে পারে। এই হেতু গভর্ণর ১ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া ২ জন মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুরী চাহিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায়, গভর্ণর সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বৃদ্ধি এড়াইবার উদ্দেশে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তবে তিনি কি হেতু মুসলমানের মধ্যে বাছিয়া সার আবদরকে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? শুনা যায়, সার আবদর বাঙ্গালার মুসলমানদের নেতা—গভর্ণরকে এই কথা বুঝান হইয়াছিল অথবা গভর্ণর এই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব দিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ জনকতক বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্র হৈ-চৈ করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না যে, সার আবদর বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের নেতা। আমরা শুনিয়াছি, বহু ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তাঁহাকে তাঁহার আচারাদির জন্য তাঁহাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি বাঙ্গালার সকল মুসলমান তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিতেন, তাহা হইলে হাজি আবু গজনবি-প্রমুখ মুসলমানের দল তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইতেন না। সার আবদর চিরকাল বাঙ্গালার বাহিরে সরকারের চাকুরী করিয়াছেন, বাঙ্গালায় তাঁহাকে চিনিত কে? তবে আর হঠাৎ তিনি কিরূপে বাঙ্গালার মুসল-



স্যার আবদর রহিম

তবে ইহার একটা কারণ হইতে পারে। এ কথা সকলেই জানে যে, সার আবদরের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হেতু ভারত সরকার তাঁহাকে অস্থায়িভাবেও বাঙ্গালার গভর্ণরপদে (যদিও আইন ও ন্যায় অনুসারে ঐ পদ তাঁহার প্রাপ্য) নিযুক্ত করেন নাই। মিঃ জিনা এ কথা ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যান্য কয়েক জন সদস্যকে জানাইয়াছিলেন। সার আবদর আলিগড়ের বক্তৃতার লেখক, এ কথাও কেহ ভুলে নাই। সেই বক্তৃতায় হিন্দুর প্রতি তিনি কি হলাহল বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই।

তাহার পর সার প্রভাসের সহিত সার আবদরের পত্রের আদানপ্রদানে রহিমের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন্ আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু তাঁহার সহিত একযোগে মন্ত্রিরূপে কায করিতে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন? হিন্দুরা সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল মুসলমানের মনস্তুষ্টিসাধন করুক, সার আবদরের সম্ভবতঃ ইহাই মনের ভাব। এইরূপ অবস্থায় তিনি হিন্দু মন্ত্রীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া কায করিতে সম্মত ছিলেন।



এ হেন লোককে মন্ত্রীর পদে বসাইলে কোনও হিন্দুই যে তাঁহার সহিত সহযোগিরূপে কায করিতে সম্মত হইবেন না, তাহা গভর্ণর কি জানিতেন না? তিনি জানিয়া শুনিয়াও যখন হিন্দুদের অপ্রীতি, বিরক্তি বা আপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া রহিমকে মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন, তখন এই মন্ত্রিত্বের মূল্য কি এবং ইহা যে পরের দয়াদত্ত পদ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এরূপ সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধ স্বার্থসর্বস্ব (সাম্প্রদায়িক) লোক বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালার বাহিরে জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইলেও কেবল যে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার জন্য এক শ্রেণীর মুসলমানের 'নেতা' হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? ইহাই হয় ত তাঁহার নেতৃরূপে হঠাৎ গজাইয়া উঠিবার মূল।

যাহা হউক, এরূপ অবস্থায় সার আবদরের দোসর হিন্দু মন্ত্রী জুটিল না, এ দিকে 'ওক্ত' ফুরাইয়া গেল, কাযেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব হইতে নাম তুলিয়া লইতে হইল। হিন্দু মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ যখন তাঁহার সহিত কায করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নাম তুলিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি মন্ত্রিত্ব আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। পরে এই মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে সংবাদপত্রে কবির তর্জ্জা চলিয়াছে, চাপান উতোর শুনা গিয়াছে। সে সকলের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমলাতন্ত্র সরকার যে সংস্কারের কল বানাইয়াছেন, তাহা টিপিলে এ দেশের লোক কত খেলা খেলিতে পারে, তাহা এ বারের মন্ত্রিনিয়োগ ব্যাপারে দেখা গিয়াছে। ব্যাপার এত ধিক্কারজনক হইয়াছে যে, উহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবারই সম্ভাবনা।

সার আবদরের নাম

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার মনের মত মুসলমান মন্ত্রী বাছাই করিয়া লইতে বলেন। অতঃপর হাজী আবু গজনবী এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ একযোগে হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রিরূপে কায করিতে সম্মত হয়েন।

অবশ্য এ ব্যবস্থায়ও যে সকল শ্রেণীর লোক সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা নহে। আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত গভর্ণরের ব্যবস্থা বহাল থাকিবে। তাহার পর ব্যবস্থাপক সভায় কি হয়, তাহা বলা যায় না।



মতিলাল নেহরু

সার আবদর ও তাঁহার দল হাজী আবু গজনবীর এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশের অশেষ দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। গজনবীকে চাই না, চাই রহিমকে,—বলিয়া বুক চাপড়ানও হইয়া গেল। গজনবীও যে সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট নহেন, তাহা নহে। মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করার আন্দোলনের সৃষ্টি ও পুষ্টি তাঁহার দ্বারা যে বহুলাংশে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার এলাহাবাদ হইতে 'ভয়প্রদর্শনের তার' এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই। তাঁহার বাজনা বন্ধের আন্দোলনের কুফল এখনও বাঙ্গালার যত্রতত্র কি ভাবে যখন তখন ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাও সকলে দেখিতেছে। সুতরাং তাঁহার সহিত যোগাযোগে চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রিত্বও যে হিন্দু পছন্দ করিবে, এমন ত মনে হয় না।

ফলে বাঙ্গালার মন্ত্রিত্ব ও দ্বৈতশাসনের পরমায়ু যে দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না, এ কথা নিশ্চয় বলা যায়।

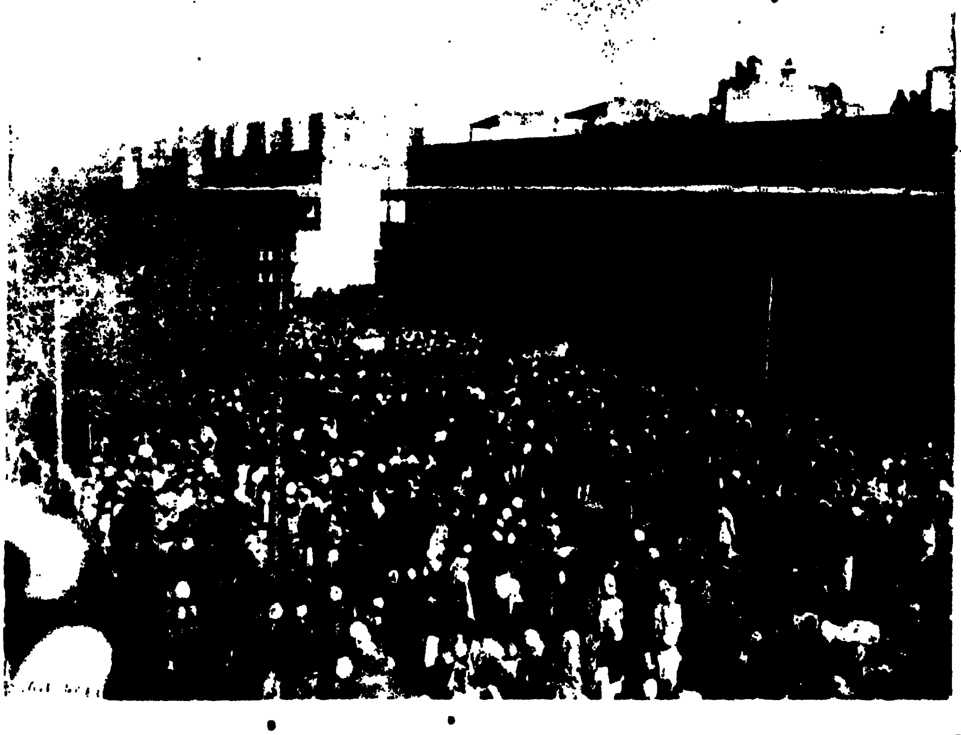
রাজবন্দীর কথা

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ব্যবস্থাপরিষদে রাজবন্দীদের মুক্তি বা বিচারের দাবী করিয়া যে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ভোটে সরকার পক্ষের যে বিষম পরাজয় হইয়াছে, প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত দেশ হইলে সেই সরকারের আর এক দণ্ড স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ। দেশের লোক—অন্ততঃ অধিকাংশ লোক যাহা চাহে না, তাহাও সাধারণের মঙ্গলের জন্য বলিয়া চালান দিবার স্বভাব এই সরকারের আছে, ইহা সকলেই জানে। তাই ব্যবস্থাপরিষদ রাজবন্দীদের মুক্তি অথবা প্রকাশ্য বিচার চাহিলেও এবং ভোটে সরকারের পরাজয় হইলেও সরকার নিজের জিদ ছাড়েন নাই, সরকার পক্ষের সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান মামুলী যুক্তি-তর্ক তুলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, সরকার বিশেষরূপে বুঝিয়া সুঝিয়া সাধারণকে বিপৎশূন্য করিবার জন্য এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, এই শ্রেণীর বিপ্লববাদীরা গোপনে কায করে, সুতরাং তাহাদের বিপক্ষে প্রকাশ্য প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট, কেন না, তাহাদের প্রতিহিংসার ভয়ে কেহ সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয় না; তবে তাহাদের বিপক্ষে অপরাধের অকাট্য প্রমাণ আছে; অতি উপযুক্ত আইনজ্ঞ লোক গোপনে প্রমাণ দেখিয়া তাহাদের অপরাধের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। এই জন্য প্রকাশ্য বিচার না করিয়া তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। যত দিন তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে, তত দিন তাহাদিগকে আটক রাখা হইবে, সে সম্ভাবনা দূর হইলে মুক্তি দেওয়া হইবে। তবে যদি তাহারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে তাহারা কোনওরূপ বিপ্লববাদের কার্য্যে যোগ দিবে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। এরূপ প্রতিশ্রুতিতে তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইল বলিয়া গৃহীত হইবে না। তাহারা অতীতে কোনও বিপ্লববাদে যোগ দিয়াছে বা বিপ্লবের কার্য্য করিয়াছে, এই প্রতিশ্রুতিতে তাহা স্বীকার করা হইবে না। আর যদি কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যভঙ্গের ফলে তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

সার আলেকজাণ্ডার সরকার পক্ষের ওকালতী করিবা-



স্বামীজীর শবের শ্মশান-যাত্রার প্রতীক্ষায় দিল্লীর জনতা



স্বামীজীর শবের প্রতি হিন্দু জনতার শেষ সম্মান প্রদর্শন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ



স্বামীজীর শেষ শয্যা

মাসিক বসুমতী হইতে প্রকাশিত



শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

এবং আরও নানা স্থানে গোয়েন্দা পুলিস অস্ত্র-শস্ত্র বা বোমা বাহির করে কি করিয়া? বিপ্লববাদী-দিগকে আটক রাখিবার পরেও যদি বোমা-রিভলভার ধরা পড়ে, তাহা হইলে আটক আসামীরাই যে বিপ্লববাদী নহে, অপর লোক বিপ্লববাদী, তাহাই বা বুঝিব না কেন?

সার আলেকজাণ্ডার প্রকাশ্য বিচারে রাজী নহেন, পাছে প্রাণের ভয়ে সাক্ষীসাবুদ না পাওয়া যায়! কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের বোমা ডাকাতী হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বোমার আবিষ্কার পর্য্যন্ত কোন মামলায় সাক্ষীর অভাব হইয়াছে, অথবা অপরাধীর দণ্ডের অভাব হইয়াছে, তাহা সার আলেকজাণ্ডার বুঝান নাই। এ সকল সাক্ষী-সাবুদের এক জনেরও এ যাবৎ জীবনের আশঙ্কা হয় নাই, কেহ মারপিট পর্য্যন্ত খায় নাই, কাহাকেও বিপ্লববাদীরা ভয়ও দেখায় নাই। তবে প্রকাশ্য বিচারে এত ভয় কেন? ভারতীয় দণ্ডবিধির এত রকমের ধারা আছে যে, তাহাতে বিপ্লববাদীর বিচারের কোনও অসুবিধা নাই। তবে প্রকাশ্য বিচারের অনুপযোগিতার যুক্তি কেন?

৩ রেগুলেশন্ এবং অর্ডিনান্স বিপৎকালের জন্য বা বিশেষ কোন কারণে কিছু কালের জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু কোন্ সভ্যদেশে বৎসরের পর বৎসর এইরূপে নানা ছুতায় লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচ করা হয়?

ক্রানে দেখাইয়াছেন অথবা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিপ্লববাদীরা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই, তাহারা মাঝে মাঝে তাহাদের হাতের কায দেখাইতেছে, মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের বোমার মত নানা কায ধরা পড়িতেছে; সুতরাং বিপ্লববাদীদের অস্তিত্ব সত্বে আটক আসামীদিগকে ছাড়া যায় না। যে অবধি উহারা আটক পড়িয়াছে, সেই অবধি অপরাধের সংখ্যা কমিয়াছে; দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এ যুক্তির মর্ম্ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি ইহারা আটক পড়ার পর শান্তি বিরাজ করে, তবে আবার দক্ষিণেশ্বরে বোমা বাহির হয় কেন, সুকিয়া ষ্ট্রীটে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে

সার আলেকজাণ্ডার শিহরণের অভিনয় করিয়া বলিতে পারেন যে,—তাঁহারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই গর্হিত কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দেশের লোকের কি সান্ত্বনা? দেশের কৃতী কর্ম্মী উপযুক্ত সন্তানরা—যাহারা দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল, সেই উৎসাহী তরুণগণকে বিনা বিচারে বে-আইনী আইনে আটক রাখিয়া থিয়েটারের অভিনয়ের ভঙ্গীতে "দুঃখিত হইয়াছি" বলিলেই ত দেশের লোকের ক্রোধ ও অসন্তোষ দূর হইবে না। সুভাষচন্দ্রের মত দেশ-প্রেমিক তরুণ কর্ম্মী কয় জন জগতে আছে? এমন এক জন সুভাষচন্দ্রকে নহে, শত শত কর্ম্মী তরুণকে বিনা বিচারে অন্যায় স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থায় আটক করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটান হইয়াছে, দেশ তাঁহাদের নিকট যাহা আশা করিত, তাহা হইতে দেশকে বঞ্চিত করিয়া স্বৈরাচারের পরিচয় দেওয়া হইতেছে না কি?

বিশেষতঃ, সুভাষচন্দ্র, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রাজবন্দীদিগের যেরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে কোন্ হৃদয়বান্ সভ্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে এমন অন্যায়রূপে আটক করিয়া রাখিতে পারেন? সুভাষচন্দ্রের নিত্য জ্বর হইতেছে, তাঁহার ওজন কমিয়া গিয়াছে। এ সংবাদে বাঙ্গালী পিতামাতার প্রাণ কিরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে? পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ যাহাদিগকে এক দিন Bright and brilliant young men বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র কি তাহাদের শ্রেণীরই নহেন? তাঁহার চিরপ্রফুল্ল স্বাস্থ্য কি মান্দালয়ের অন্ধকার কারায় অকালে শুকাইয়া যাইবে? জীবনলাল ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, তাঁহার ঘুষঘুষে জ্বর হইতেছে এবং তিনি প্রত্যহ রক্ত-বমন করিতেছেন। হরিকুমারের দীর্ঘকালীন জ্বর ও মূত্রাশয়ের পীড়া দেখা দিয়াছে। এমন অনেক রাজবন্দীরই অবস্থা।

যৌবনের উদ্দাম আনন্দ, স্বাধীনতা ও প্রফুল্লতা অকালে হরণ করিয়া যদি কাহাকেও অন্ধকারায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আশাহীন, উদ্যমহীন, উৎসাহহীন পশুজীবন অতিবাহিত করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনীশক্তি কত দিন অক্ষুণ্ণ থাকে? কত দিন আর এইরূপে বাঙ্গালার তরুণের মনুষ্যত্ব অন্ধকারায় শুকাইতে দেওয়া হইবে? সার আলেকজাণ্ডার সর্ত্ত দিয়াছেন, প্রতিশ্রুতির;—যে প্রতিশ্রুতি অপরাধস্বীকার পর্য্যায়ে ধর্ত্তব্য হইবে না। কিন্তু ইহাও কি সম্ভব? যে তরুণের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, সে বরং মৃত্যুকে বরণ করিবে, তথাপি এই হেয় প্রস্তাবে সম্মত হইবে না। কোন বিপ্লববাদ বা আন্দোলনে যোগদান করিব না—এই প্রতিশ্রুতির অর্থ কি? যাহার সহিত বিপ্লববাদের কোন সম্পর্ক নাই, সে এই প্রতিশ্রুতিও দিবে কেন?

যদি সার আলেকজাণ্ডার যথার্থ হৃদয়বান্ হন, যদি তাঁহার মানুষিকতা থাকে, তাহা হইলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য আটক তরুণগণের মুক্তিসাধনে বিলম্ব করিবেন না। আর যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে এই পাপের ফল ভারত সরকারকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

পটুয়াখালী

বাঙ্গালার বরিশাল জিলার ক্ষুদ্র পটুয়াখালী গ্রামের নাম আজ জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে পঞ্জাব-শিরোমণি গুরুদ্বারের আকালী শিখের নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছে, যে কারণে দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ভাইকম গ্রামের নাম জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, পটুয়াখালীর নামের খ্যাতিও সেই কারণে সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইয়াছে। এই ত্যাগের দেশে যে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে—যে একটা মূলনীতির জন্য বা স্বধর্ম্মের জন্য কষ্টবিপৎসহন-ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে, সে-ই ধন্য হয়, তাহাকে লোক মাথায় তুলিয়া বরণ করে। পটুয়াখালীর স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা ধর্ম্মের জন্য সেই ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল—কষ্টবিপদকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল,—তাই আজ সমগ্র দেশ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পটুয়াখালীর দিকে তাকাইয়া আছে,—আ-কুমারী হিমাচল সর্ব্বত্র হিন্দুর প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল স্থান হইতে হিন্দু দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া এই ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মাহুতি দিতেছে। এ দৃষ্ট হিন্দুর পক্ষে অচিন্তনীয়—অভাবনীয়। যদি এই পটুয়াখালী ব্যাপারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘবদ্ধতা-বিহীন হিন্দু আবার একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে পারে, তবেই এই আন্দোলনের সার্থকতা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই ব্যাপারে বাঙ্গালা সরকার ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা আত্যোপান্ত যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে যে তাঁহাদের সুনাম বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারক আদ্যোপান্ত ঘটনা পাঠ করিয়া নিশ্চিতই বলিবেন যে, স্থানীয় চিরাচরিত প্রথা অনুসারে হিন্দুরা এ যাবৎ যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল, সরকার হয় ত ভ্রান্ত ধারণার বশে হিন্দুদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং হিন্দুরা এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদরূপে সত্যাগ্রহ করায় তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতেছেন।

মধ্যে পটুয়াখালী সম্পর্কে একখানি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা অন্য কোনও সূত্র হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করিব না। আমরা এই ইস্তাহার হইতেই দেখাইব যে, হিন্দুদের প্রতি কিরূপ অবিচার করা হইয়াছে।

সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ,—স্থানীয় পুরাতন মসজেদের সম্মুখস্থ জিলাবোর্ডের যে রাস্তা আছে, তাহাতে এ যাবৎ হিন্দুরা বাদ্যাদি বন্ধ করিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাতায়াত করিয়া আসিতেছেন। এই রীতি বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রচলিত। স্থানীয় মুসলমানগণ পুরাতন মসজেদ হইতে কিছু দূরে একটি নূতন মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ইস্তাহারে সরকারই স্বীকার করিতেছেন যে, প্রথমে জিলাবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণদিকে একটিমাত্র মসজেদ ছিল। মাত্র ১০ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের প্রাঙ্গণের পার্শ্বে জিলাবোর্ডের রাস্তা হইতে যে মিউনিসিপ্যাল লেন বাহির হইয়াছে, উহার উত্তরে আর একটি নূতন মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পুরাতন মসজেদে ব্যক্তিগত নমাজ (Private prayers) এবং নূতন মসজেদে জনগত নমাজ (Congregational prayers) পড়া হইয়া থাকে, এ কথাও ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে।

অথচ মজা এই যে, যদিও প্রাচীন মসজেদে জনগত নমাজ পড়া হয় না, তথাপি সরকারের স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালা সরকারের পূর্ণ অনুমতিক্রমে হিন্দুদিগকে ঐ মসজেদের সম্মুখ দিয়াও বাদ্যাদি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে দেন নাই, এখনও দিতেছেন না! ইহা কি বাঙ্গালা সরকারের স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রচলিত রীতির সম্মান রক্ষা করার তাহার পর সত্যাগ্রহীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থাও সরকারের স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের নিরপেক্ষতার চূড়ান্ত পরিচায়ক। বর্ত্তমানে নূতন মসজেদের সম্মুখ হইতে কিছু দূরেও ধরপাকড় চলিতেছে।

সরকারী ইস্তাহারে এক স্থানে স্বীকার করা হইয়াছে যে, "There is no evidence that the practise of stopping music in the extended area was ever generally recognised." যদি তাহাই হয়, তবে এই দূরবর্ত্তী স্থানেও সত্যাগ্রহীদিগকে ধরপাকড় করিবার এত আগ্রহ, এত উৎসাহ কেন?

স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুসারে এই extended areaতে যে বাদ্যাদি বন্ধ করা হইত, এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, ইস্তাহারে এ কথা স্বীকার করা হইয়াছে, তবে আবার বহুকাল হইতে স্বীকৃত রীতির (well recognised practice) কথা কোথা হইতে আসিল? যে কথার প্রমাণ নাই, তাহার অস্তিত্ব সরকার স্বীকার করেন কি হিসাবে?

ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, সাধারণের শান্তিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই বাজনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই অতিরিক্ত ভূমিতেও (additional area) বাজনা বন্ধের জন্য মুসলমানের দাবীর মুখ চাহিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করা হয় নাই। এরূপ হাস্যকর যুক্তি কেহ কোথাও শুনিয়াছেন কি? অতিরিক্ত জমীতে বাদ্যাদি বন্ধ করার রীতি ছিল, ইহার প্রমাণ নাই। তবে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা কোথা হইতে আসিল? বাজনা বন্ধ করার রীতি যখন নাই, তখন হিন্দুরা আইন ও রীতি অনুসারে নিশ্চিতই সেই স্থান দিয়া বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারে। এ অধিকার হিন্দু প্রজার অবশ্যই আছে। ইহাতে যদি কেহ বাধা দিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধা ও দণ্ড দিয়া হিন্দুকে রক্ষা করা ও আশ্রয় দেওয়া নিরপেক্ষ সরকারের কর্ত্তব্য, সরকার সে জন্য আইনতঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তবে তাঁহারা শান্তিভঙ্গের ভয়ের কথা তুলেন কেন? ইহারও কারণ অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

ইস্তাহারেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে,—"Patuakhali is in a locality in which there is a large

Hindus, the proprtion being five to one." তবে কি বুঝিতে হইবে, মুসলমানরা পটুয়াখালীতে হিন্দুর ৫ গুণ বলিয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ছিল? বাঙ্গালা সরকার কি তাহা হইলে এই সংখ্যাধিক্যের আশঙ্কায় হিন্দুর চিরাচরিত ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছেন? নিজমুখে এমন অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় আর কোনও সভ্য সরকার এ যাবৎ দিয়াছেন কি না সন্দেহ! প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সরকার এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যের আশঙ্কায় অল্পসংখ্যক অন্য সম্প্রদায়কে আইন ও রীতি অনুসারে ন্যায্য অধিকার উপভোগ করিতে দিতে সাহসী হয়েন না, এ কলঙ্কের কথা ইস্তাহারে জাহির না করিলেই ভাল ছিল।

বাঙ্গালা সরকারের এখন মনে রাখা কর্ত্তব্য, পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ এখন আর পটুয়াখালীতে সীমাবদ্ধ নহে; ইহা সমগ্র হিন্দু ভারতের। আকালী শিখদিগের সত্যাগ্রহের সময়ে যেমন সুদূর বাঙ্গালা ও ব্রহ্ম হইতেও দলে দলে শিখ গিয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছিল, তেমনই আজ সুদূর কাশী, কাঞ্চী, আগ্রা, দিল্লী হইতেও হিন্দু আসিয়া দলে দলে পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহে যোগদান করিতেছে। অহঙ্কারের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া আজ পটুয়াখালীর ক্ষুদ্র সরকারী কর্ম্মচারী বড় ক্ষমতা পাইয়া ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশ গুপ্তের ন্যায় নির্ভীক কর্ম্মী নেতাকে গ্রেফতার করিতে পারেন, কিন্তু ইহার ফল কি বিষময় হইতেছে, তাহা সরকারের কি বুঝা উচিত নহে? নদীয়ার মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র এই সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য। তিনি ত হিন্দু, তিনিও কি হিন্দুর ক্ষোভ, রোষ বা ব্যথার কথা বুঝিতেছেন না? এই ব্যাপার অঙ্কুরে সুমীমাংসিত হইয়া না গেলে, পরিণামে ইহার বিষ কে নীলকণ্ঠ হইয়া ধারণ করিবে?

ভারতের স্বাস্থ্য

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য কমিশনার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা দুই চারিটি রত্ন কুড়াইয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি:—

(১) বৃটিশ ভারতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ঐ বৎসরে জন্মের হার কমিয়াছে এবং মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে। ১৯২৩ হইয়াছে ৩৮·৪৫। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর হার হইয়াছিল হাজারকরা ২৫·০০, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ২৮·৪৯।

(২) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ১৭৬, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ১৮৯।

(৩) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কালাজ্বরে বাঙ্গালায় ৪ হাজার ৫ শত ৬৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৯ হাজার ৯ শত ৯৭। কালাজ্বরের মৃত্যুসংখ্যায় কলিকাতা বাঙ্গালার পল্লী-মফঃস্বল হইতে অনেক অগ্রণী। আর বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার কথা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

এই ভাবে ভারত যদি দিন দিন 'উন্নতির' পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে অচিরভবিষ্যতে সে যে তুরীয় সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রামগঠন

বাঙ্গালার কোনও কোনও স্থানে কয়েক জন কৃতী ও ত্যাগী তরুণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে কয়েকটি আদর্শ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সকল আশ্রমের সংস্পর্শে আসিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ কুটীর-শিল্পের অনুশীলনে এবং নিজ নিজ স্বার্থাদি সংরক্ষণে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইতেই আত্মনির্ভরশীলতার অমৃত উদ্ভূত হইবে সন্দেহ নাই। এই পুণ্যসংস্পর্শের প্রভাব সুদূর উড়িষ্যা-প্রান্তেও পৌঁছিয়াছে, ইহা অতীব আনন্দের কথা। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কটক জিলার চাঁপাপুরহাটে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার নামকরণ করা হইয়াছে "গন্ধী সেবাশ্রম।" নামের পুণ্যপ্রভাব যে আশ্রমের কার্য্যাবলীতে বিসর্পিত হইয়াছে, ইহা আরও অধিক আনন্দের কথা।

এই সদনুষ্ঠানের দ্বারা উড়িষ্যার একটি কেন্দ্রে গ্রাম-গঠনের ভিত্তিপত্তন হইল সন্দেহ নাই। প্রায় ৫০ খানি গ্রামকে বৃত্ত করিয়া এই সেবাশ্রমটি কেন্দ্ররূপে অবস্থান করিতেছে। এই চাঁপাপুরহাট কেন্দ্রে সপ্তাহে দুই বার মেলা বসে। মেলায় এই ৫০ খানি গ্রামের কুটীরশিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। কেন্দ্র-কমিটী হাতে

করিয়াছেন। এতদর্থে তথায় একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নৈশ বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয় প্রভৃতি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমে স্থাপিত করিবার কথা স্থির হইয়াছে। এই ভাবের সদনুষ্ঠান দেশে যত অধিক কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল। তবে ইহাও দেখিতে হইবে, কিরূপে এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা যায়। 'ব্যাঙের ছাতার' মত এই ভাবের প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠা বিচিত্র নহে। প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে অনেকে এমন সব ব্যাপারে নামিয়া পড়েন, কিন্তু পরে দেখা যায়, যতই সময় যায়, আর যতই ত্যাগ ও কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন হয়, ততই লোক পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে এই ভাবে অনেক সদনুষ্ঠানের অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। এ বিষয়ে দেশের লোক দশে মিলিয়া কাজ না করিলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা দায় হইবে, এ কথাটা দেশের লোক যেন স্মরণ রাখেন।

সংগঠনের প্রয়োজন

অধুনা এক শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানগণের সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন যে, শুদ্ধি ও সংগঠনের কোনও প্রয়োজন ছিল না; উহা হইতেই হিন্দু-মুসলমানের যত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহারা এখনও ভাবিয়া দেখেন না যে, মুসলমানের তবলিগ ও তান্জিম আন্দোলন অক্ষুণ্ণ থাকিলে হিন্দুকে বাধ্য হইয়া শুদ্ধি ও সংগঠনের আশ্রয় লইতে হইবে, নতুবা হিন্দু—অন্ততঃ বাঙ্গালার হিন্দু অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। নানা কারণে যে শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রয়োজন, তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি।

হিন্দুজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও ভীরু। অন্ততঃ বাঙ্গালার হিন্দুর পক্ষে এ কথা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। হিন্দু নানা কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না; তন্মধ্যে হিন্দুর স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাই প্রধান। হিন্দুর মধ্যে বিধবা-বিবাহ বিদ্যমান না থাকায় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। হিন্দুর মধ্যে জাতিচ্যুতির ফলে বহু হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। পরন্তু উচ্চজাতির দুর্ব্যবহারের ফলেও বহু হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিধবাদির উপর উৎপীড়ন নির্য্যাতন হয় বলিয়া বহু নারী মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। ফলে হিন্দু দৌর্ব্বল্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা কারণে সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে। সময় থাকিতে ইহার প্রতিষেধ-ব্যবস্থা না হইলে বাঙ্গালায় হিন্দুজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। এই হেতু শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রয়োজন।

মুসলমান শক্তিশালী, সংখ্যায় অধিক এবং সঙ্ঘবদ্ধ বলিয়া বাঙ্গালায় হিন্দু বহু স্থানে নির্য্যাতিত হইয়াছে। প্রতিমাভঙ্গ, গোহত্যা, মন্দির পুষ্করিণী আদি অপবিত্রীকরণ, মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদির জন্য মারপিট, শবযাত্রায় বা হরিনামে বাধা, নারী-নির্য্যাতন, বলপূর্ব্বক মুসলমান করা প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়া দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন হিন্দু অত্যাচারিত হইয়াছে। একে হিন্দু স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, তাহার উপর সংখ্যায় দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহাদের নিজের বা নিজের নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, এ অবস্থায় হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া যদি সংখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে তাহারা কোথায় থাকিবে? শক্তি ও সংখ্যায় সমতুল না হইলে মুসলমানই কেন বা তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে? তুল্য শক্তিশালী হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রীতিশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে এবং তখন প্রকৃত মিলন ও মুক্তির বাতাস বহিবে—এই হিসাবে হিন্দুর পক্ষেও যেমন, মুসলমানের পক্ষেও তেমন শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রয়োজন।

বাঙ্গালা হিন্দুপ্রধান দেশ ছিল, এখন সেখানে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কয় বৎসরের সরকারী লোকগণনার হিসাব হইতে বুঝা যায়। সে হিসাব এইরূপ:—

খৃষ্টাব্দ	হিন্দুর সংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা	মন্তব্য
১৮৭২	১৭০,৫১,৫,৩৩	১৬৬,১৯,১,৯১	হিন্দু ৪ লক্ষ অধিক
১৮৮১	১৮০,৬৭,৮,১৬	১৮০,৯৫,৪,২৩	মুসলমান ২৭ হাজার অধিক
১৮৯১	১৮৪,৭৪,৫,৭৪	২০১,৭৩,২,১	মুসলমান ১৬ লক্ষ অধিক
১৯০১	২০১,৫২,৯,১	২১৯,৫১,৮,১৮	মুসলমান ১৭ লক্ষ অধিক
১৯১১	২০৯,৪৫,৩,৭৯	২৪২,৩৬,৭,৬৬	মুসলমান ৩৩ লক্ষ অধিক
১৯২১	২০৮,৭৯,১,৪৮	২৫৪,৮৬,১,২৪	মুসলমান ৪৬ লক্ষ অধিক

এই হিসাব হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। উহার পরে আদম সুমারীতে প্রতিপন্ন হয় যে,

২৭ হাজার অধিক হইয়াছে। মুসলমানের এইরূপে প্রতি দশ বৎসরে অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৪৬ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। আবার ১৯১১ এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যাগণনা তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এই দশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা ১২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ লক্ষ হ্রাস হইয়াছে।

জিলা হিসাবে লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ :—

উত্তর-বঙ্গ।

	হিন্দু	মুসলমান
রাজসাহী	৩,১৮,৩,৮৫	১.১৪,২,৫৬
দিনাজপুর	৭.৫৭,৮,৬৯	৮,৩৬,৯,০৩
জলপাইগুড়ী	৫.১৫,১,২	২,৩১,৬,৮৩
দার্জ্জিলিঙ্গ	২,১.৩,১৬	৮,৫,১৭
রঙ্গপুর	৭,৯১,১,৪৩	১৭,৬,১,৭৭
বগুড়া	১,৭৪,৪,৬৬	৮,৬৪,৯.৯৮
পাবনা	৩,৩১,৩,৩২	১০,৫৩,৫,৭২
মালদহ	৯,০০,৫,২০	৫.০৭.৬.৮৫

পূর্ব্ববঙ্গ

	হিন্দু	মুসলমান
ঢাকা	১০,৬৮,৯,৪২	২০,৮৩,২,০৩
ময়মনসিংহ	১১.৭৪,০,১৫	৩৬,২৩,৭,১৯
ফরিদপুর	৮,১৫,৬,৩৪	১৪,২৭,৮,৬৯
বাখরগঞ্জ	৭,৫৪,৪,৬০	১৮,৫১.২,৩৯
চট্টগ্রাম	৩,৬৩,৮,৯৫	১১,৭৬,২,০২
নোয়াখালি	৩,২৯,১,৩৭	১১,৪২,৪,৬৮
ত্রিপুরা	৭,০৭,৫,৩৭	২০,৩১,২,৭২

পশ্চিম-বঙ্গ

	হিন্দু	মুসলমান
বর্দ্ধমান	১১,২২,২,৩৯	২,৬৬,২.৮১
বীরভূম	৫,৭৬,৭,৫০	২,১২,৪,৬০
বাঁকুড়া	৮,৮০,৪,৩৯	৪,৬৬,০,০১
মেদিনীপুর	২৩,৫১,৮,৭০	১,৮০,৬,৭২
হুগলী	৮,৮৪,৮,০৯	১,৭৩,৬,৬৩
হাওড়া	৭ ৯০ ৭ ৪১	২.০২.৪.৭৫

দক্ষিণ-বঙ্গ

	হিন্দু	মুসলমান
২৪ পরগণা	১৬,৮৭,৬,৩৩	৯,০৯.৭.৮৬
কলিকাতা	৬,৪৩,০.১৩	২.০৯,০,৬৬
নদীয়া	৫.৮১.৭.৬০	০,৮৯,৫.৯০
মুর্শিদাবাদ	৫,৬৮,৭.৯০	৬,৭৬.২,৫৭
যশোহর	৬,৫৬,৩.৪৩	১০,৬৩,৫,৫৫
খুলনা	৭,২৬,৮.৬৯	৭.২২.৮,৮৭

এখন বুঝিয়া দেখুন, বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জিলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের পরিধি ৮২ হাজার ২ শত ২৭ বর্গ-মাইল. ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর গণনায় লোক-সংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪ শত ৬২ জন হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মোটামুটি ২ কোটি, মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটি ২৫০ কোটি।

১৮৭২ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ বৎসরে বাঙ্গালাদেশে কোন কোন জিলায় হিন্দু-মুসলমান কি ভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা দেখুন :—

শতকরা বৃদ্ধির হার।

	মুসলমান	হিন্দু
পশ্চিম-বঙ্গ	২১'৫	৬'১
উত্তর-বঙ্গ	১২'৯	৭'৪
মধ্য-বঙ্গ	১০'৫	৯'৩
পূর্ব্ব-বঙ্গ		
ঢাকা বিভাগ	৬১'৯	২২'৮
ঐ চট্টগ্রাম বিভাগ	৭৯'৩	৫৬'০

এক মধ্য-বঙ্গ অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগেই মুসলমানের সংখ্যার হার বৃদ্ধি এবং হিন্দুর সংখ্যার হার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

আবার হিন্দুর মধ্যে হাজারকরা মৃত্যুর হার মুসলমান অপেক্ষা কত অধিক হইয়াছে, তাহাও দেখুন :—

খৃষ্টাব্দ	হিন্দু	মুসলমান
১৯১১	৩৩'৪	২৯'৫
১৯১২	৩০'৪	২৭'৬
১৯১৩	২৯'০	২৮'৪
১৯১৪	৩০'১	৩০'২
১৯১৫	২৯'১	৩২'০
১৯১৬	২৯'২	২৮'০
১৯১৭	৩৩'৩	৩১'৯
১৯১৮	৬৪'৬	৫৬'১
১৯১৯	৩৬'৪	৩৩'৬
১৯২০	৩১'০	৩০'৭

সুতরাং গত দশ বৎসর বাঙ্গালাদেশে হিন্দুর মৃত্যুর হার অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ১০ বৎসর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে আর হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, এই ভাবে চলিলে হিন্দু অচির-ভবিষ্যতে জাতি হিসাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই হেতু হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে শুদ্ধি ও সংগঠন গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্যই আমরা সংগঠনের প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভব করি।

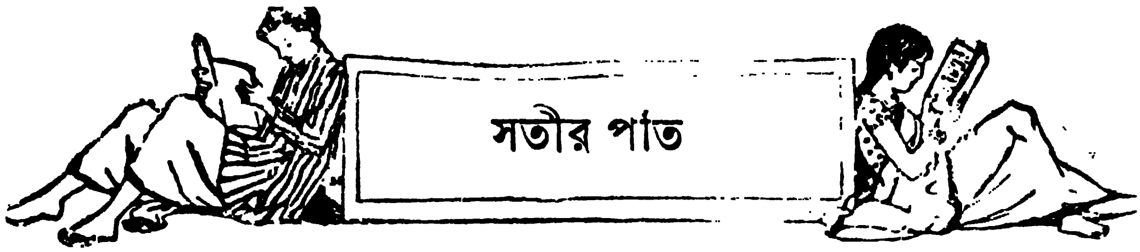
গো-দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা

ডাক্তার হ্যারল্ডম্যান 'বৃটিশ-মেডিক্যাল-রিসার্চ কাউন্সিলের' সম্মুখে বক্তৃতাকালে দেখাইয়াছেন যে, গত ৪ বৎসরকাল প্রায় ৫ শত বালককে গো-দুগ্ধ পান করাইয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, তাহারা অন্যান্য শিশু-খাদ্যের সহিত প্রত্যহ ১ পাইণ্ট দুগ্ধ পান করিতে পাইলে বৎসরে প্রায় ৩ শত ৮৫ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের) ওজনে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং ১·৩৪ ইঞ্চ হইতে ২·৬৩ ইঞ্চ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশুর অভিভাবক দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না ; ইহার উপর শিশু ও বালকের দুর্ম্মূল্য খাদ্য গো-দুগ্ধ যোগাইবে কোথা হইতে ? এ দেশে গো-দুগ্ধ এখন কথার কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সহরের ত কথাই নাই, মফঃস্বলেও গো-দুগ্ধ দরিদ্রের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। গো-সেবার অভাব, গো-চারণের মাঠের অভাব, গো-জাতির আহার্য্যের দুর্ম্মূল্যতা, গো-পালকের অভাব, বৃষের অভাব—এইরূপ নানা অভাবের ফলে দেশে গো-জাতির অবনতি হইয়াছে। গো-খাদকের দেশে পয়স্বিনী গো-জাতির সেবার ব্যবস্থা যেমন সুন্দর, আমাদের গো-পূজক দেশে তাহার এক-চতুর্থাংশও আছে কি না সন্দেহ। এ দেশের খর্ব্বাকৃতি গোজাতি ও সে সব দেশের বৃহদাকার গোজাতির তুলনা করিলে দেখা যায়, আমাদের দেশের গাভী যে স্থলে অর্দ্ধসের অথবা বড় জোর ১ সের দেড় সের দুগ্ধ দান করে, সে স্থলে সে সব দেশের গাভী অর্দ্ধমণ ত্রিশ সের দুগ্ধ দান করে। এই হেতু বালকের খাদ্য গো-দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য হয় না। সুতরাং সে সব দেশের ছেলের বনিয়াদ দৃঢ় হয়, ছেলে পেট পুরিয়া দুগ্ধ পান করিতে পাইয়া পরজীবনে সবল ও সুস্থ হয়। আমাদের দেশেও ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে গোদুগ্ধের এমনই প্রাচুর্য্য ছিল। আর এখন ? শিশুকাল হইতে আমাদের ছেলে-মেয়ে গো-দুগ্ধ প্রায় দেখিতে পায় না, যাহা পায়, তাহাও হয় খড়ি-গোলা জল, না হয় এরোরুট বা বার্লি মিশান জল। ইহা খাইয়া ছেলে-মেয়ের শরীরের পুষ্টি হইবে কিরূপে ? তাই পর-জীবনে তাহারা জীবনসংগ্রামে সহজেই কাতর হয়,—নানাবিধ রোগের আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এ অবস্থার প্রতীকারের উপায় চিন্তা করা দেশের চিন্তাশীলমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

'ফরওয়ার্ড' ও 'আত্মশক্তির' মামলা

উপরি-উক্ত দুই পত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নামে রাজ-দ্রোহের মামলা চলিতেছিল, এ কথা সকলে জানেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাইসন বিচারে 'ফর-ওয়ার্ডের' সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সীর প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ শত টাকা জরিমানার আদেশ করিয়া-ছেন, জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। মুদ্রাকর ও প্রকাশককে তিনি ২ শত ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, জরিমানা অনাদায়ে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজি-ষ্ট্রেট মিঃ টাইসন 'আত্মশক্তির' সম্পাদক শ্রীযুত গোপাললাল সান্ন্যালকে ২ মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ড করিয়াছেন এবং ৩ শত ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। মুদ্রাকরকে তিনি ১ শত টাকা অর্থদণ্ডের এবং অনাদায়ে ২ মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন!

মামলা এখনও বিচারাধীন, কারণ, দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা এখন কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না।



(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রেবতীকে পতনোন্মুখ দেখিয়া, করিম তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোমল স্বরে বলিল, "এ কি! বসুন, বসুন। আপনার কোনও ডর নেই, বিবি সাহেব; আল্লা কসম,—আমি আপনার সাথে দুষমনী করতে আসিনি—দোস্তী করতেই এসেছি।" বলিয়া রেবতীকে ধরিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিল।

করিমের ভাবভঙ্গী ও কথার স্বরে রেবতীর ভয় কতকটা দূর হইল। চেয়ারে বসিয়া সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া করিমের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

করিম সোফায় বসিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাকে দেখে আপনি এত ভয় পেয়েছিলেন কেন? আমি কি শের, না ভালু? আমি একটা গুণ্ডা বটে—কিন্তু ঔরতের গায়ে হাত তুলি না। এক দিন দু'রাত আপনি যে আমার হেপাজতে ছিলেন, আপনার জেওর আর টাকা কেড়ে নেওয়া ছাড়া আপনার সাথে আমি কি আর কোনও বদীয়তি করেছিলাম, বিবি?"

রেবতী অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিল, "না।"

"এই নিন।"—বলিয়া করিম তাহার বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিয়া, রেবতীর সামনে টেবলে রাখিল। সেটি খুলিয়া বলিল, "আপনার সমস্ত জেওর, সমস্ত টাকা আপনাকে ফিরে দিলাম। আমার কসুর আপনি মাফ করুন।"

রেবতী গম্ভীর, তাহার চক্ষু দুটি অবনত। করিম কৌতুকপূর্ণ নেত্রে নীরবে কিয়ৎক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখনও কি আমার পরে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

রেবতী চক্ষু তুলিয়া, করিমের পানে চাহিয়া পূর্ব্ববৎ ক্ষীণ স্বরে কহিল, "হচ্ছে।"

"তবে ওগুলি সিন্দুকে তুলে রাখুন। রেখে আসুন,—আমার আজ একটি আরজ আছে।"

রেবতী প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে করিমের পানে চাহিল। করিম বলিল, "আগে ওগুলি তুলে রাখুন। তার পর বলছি।"

রেবতী গহনা ও টাকাগুলি সিন্দুকে তুলিয়া, ফিরিয়া আসিলে করিম বলিল, "আমার বড় ভুখ লেগেছে। আমায় কিছু খেতে দেবেন?"

এ প্রস্তাবে রেবতী একটু বিস্মিত হইল। করিমের পানে চাহিয়া বলিল, "কি খাবেন, বলুন?"

করিম বলিল, "বেহেতর। তবু একসঙ্গে আপনার মুখে তিনটি লবজ্ শুনলাম। তবে ঝিকে হুকুম করুন, আমায় কিছু খাবার দিক্।"

রেবতী বলিল, "সত্যি খাবেন?"

"সত্যি না ত আমি কি আপনার সাথে বাহানা করছি, বিবি সাহেব?"

"আচ্ছা"—বলিয়া রেবতী উঠিয়া গিয়া সৌদামিনী ঝিকে ডাকিল। সৌদামিনী আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার কিছু তৈরি আছে?"—সৌদামিনী জানাইল, রাত্রির আহারের জন্য সমস্তই প্রায় প্রস্তুত, কেবল লুচি ভাজা বাকী, ময়দাও মাখা হইয়াছে। রেবতী বলিল, "যা, খানকতক লুচি আর কিছু তরকারী মিঞা সাহেবের জন্যে নিয়ে আয়। আর, এক পেয়ালা চা। না—দু' পেয়ালা আনিস।"

সৌদামিনী চলিয়া গেল। রেবতী ঘরের মধ্যে গিয়া পূর্ব্ববৎ নীরবে বসিয়া রহিল।

করিম বলিল, "আপনি কি ভাবছেন, রেবতী বিবি? আপনি বোধ হয় ভাবছেন, এ নালায়েক কি ক'রে এখানে এল, আমার নাম-ঠিকানা জানলে কোথা থেকে? আপনার সেই পিয়ারের লোকটিই আপনার নাম-ঠিকানা আমায় জানিয়ে দিয়েছে। এই দেখুন তার খৎ।"—বলিয়া করিম

উঠিয়া, পকেট হইতে সতীশের সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া রেবতীর হাতে দিল।

রেবতী চিঠিখানা পড়িয়া, সেখানা টেবলের উপর ফেলিয়া বলিল, "উঃ—কি সয়তান!"

করিম বলিল, "এখনও কি তার সাথে আপনি দোস্তী রাখবেন? সে কি আর এসেছিল?"

রেবতী বলিল, "হাঁ—এসেছিল, আমি তাকে ঝাঁটা-পেটা ক'রে বিদেয় করেছি। আমার ঝাঁটা খেয়ে গিয়েই সে বোধ হয় আপনাকে এই চিঠি লিখেছে।"

করিম বলিল, "তাই হবে। সে বোধ হয় মনে খাতির জমা আছে যে, নিশ্চয়ই সেই দিনই আমি এসে, আপনার বুকে ছুরি বসিয়ে, আপনার ধন-দৌলৎ সব লুটে নিয়ে গেছি।"—বলিয়া করিম হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

সৌদামিনী এই সময় প্লেটে সাজাইয়া খানকতক গরম লুচি, আলু-ভাজা, পটল-ভাজা এবং একটা পেয়ালায় খানিকটা আলুর দম আনিয়া মিঞা সাহেবের পার্শ্বস্থিত টেবলে রাখিল। তাহার পর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ও একখানা সাফ তোয়ালে দিয়া বলিল, "চা ভিজিয়ে দিয়েছি, একটু পরেই নিয়ে আস্‌ছি!"

রেবতী নিজ চেয়ারখানা করিমের দিকে সরাইয়া লইয়া বলিল, "মিঞা সাহেব, খান।"

করিম বলিল, "এত কে খাবে? দু'খানা লুচি আর ভাজাগুলো রেখে বাকী সব নিয়ে যাক।"

রেবতী বলিল, "এই যে বল্লেন, আপনার ভুখ্‌ লেগেছে।"

করিম হা হা করিয়া হাসিল। বলিল, "আপনি থিয়েটরে আলিবাবা প্লে করেন—না?"

"হাঁ। আমি মর্জিয়ানা সাজি।"

"দেখেছেন ত, দস্যু-সর্দ্দার সওদাগর সেজে যখন আলিবাবার বাড়ীতে এসে অতিথি হয়েছিল, তখন খানায় কোনও জিনিষে নিমক দিতে মানা করেছিল। যার নিমক খাবে, তার বুকে ত আর ছুরি বসাতে পারবে না, এই জন্যেই নিমক মানা করেছিল, মনে আছে ত?"

"হাঁ, মনে আছে।"

"আপনার নিমক আমি খেলে, আপনি আর আমায় দুষমন মনে করবেন না, এই আশাতেই আপনার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। দু'খানা লুচি খেলেই তা হয়ে যাবে—তাই বলছি, বাকী সব তুলে নিয়ে যাক্‌।"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "আপনার পেটে এত বুদ্ধি! না, কিছু তুলে নিয়ে যাবে না। ও সমস্তই আপনাকে খেতে হবে। যা সদু, চা নিয়ে আয়।"

করিম বলিল, "ইয়া আল্লা! আপনার হাসি মুখখানি দেখবার কিস্‌মৎও আমার হ'ল! আচ্ছা, এ সবগুলি আমি খেলে যদি আপনি খুসী হন; তবে আপনার হুকুম তামিল করতে আমি গাফলৎ করব না।"—বলিয়া করিম আহারে প্রবৃত্ত হইল।

লুচি খাইতে খাইতে করিম জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, রেবতী বিবি, আপনি কি ক'রে পালালেন, বলুন ত?—আপনার কামরার তালা কে ভেঙ্গে দিলে? তার আগের দিন বর্দ্ধমান জেলা থেকে যে এক জন নতুন মুসলমান এসেছিল, সেই কি?"

রেবতী বলিল, "হাঁ, সেই।"

"তাকে, আপনাকে দু'জনকে একসঙ্গে রূপোস্‌ দেখে, আমিও তাই সোবে করেছিলাম। তা, সে মুসলমান হয়ে এমন কাম করলে কেন, তা কিন্তু আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তার সঙ্গে কি আগে থেকে আপনার চিন-পছিন ছিল?"

রেবতী তখন সেই 'নূতন মুসলমান'-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই করিমকে খুলিয়া বলিল।

করিম বলিল, "বড়ই তাজ্জবের কথা—সে মুসলমান নয়, হিন্দু? মুসলমান সেজে এসেছিল? আমরা কিন্তু কোনও সোবে করতে পারিনি। পারবোই বা কি ক'রে? দুই চারটা কথা কওয়া ছাড়া, তার সঙ্গে মেলামেশা ত করিনি। তা সে হিন্দু এখন কোথায়?" রেবতীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া করিম বলিল, "তার উপর আমার কোনও গোস্‌সা নেই—আমি তার কোনও নোকসানী করব না। আমার জানবারও তেমন কোনও জরুরৎ নেই—এম্‌নি আপনাকে পুছ্‌ করেছিলাম। থাক্‌, ও কথা যেতে দিন।"

"তিনি এখনও এইখানেই আছেন।"—বলিয়া রেবতী হাসিতে লাগিল।

"ওঃ"—বলিয়া করিম লুচি ছিঁড়িয়া আলুর দমের বাটিতে

ডুবাইল। রেবতী বুঝিতে পারিল, এ সংবাদে করিম বড় খুসী হয় নাই। করিমের মনটা ভিন্ন দিকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, করিম সাহেব, সে দিন রাত্রিতে ঠনঠনে থেকে আপনারা কখন্ ফিরলেন? ফিরে যখন দেখলেন, আমি পালিয়েছি, কি মনে করলেন আপনি?"

করিম বলিল, "ফিরতে সে দিন বেশী দেরী হয় নি। পথেই আমরা খবর পেলাম, গোরা সৈন্য আগে থেকেই সেখানে পাহারা দিচ্ছে—তখনই দল ভেঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। গোড়াতলার বাসায় ফিরে এসে দেখলাম—তুমি পাখী—আমায় ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেছ।"

"খুব রাগ হ'ল আপনার?"

"রাগ না হোক্, খুব দুঃখ হ'ল। আমি সে রাত্রে অনেক আশা ক'রে বাসায় ফিরে এসেছিলাম—তোমায় না দেখতে পেয়ে, বুঝলাম, আমার কেসমৎই খারাপ! তোমার উপর কোনও জবরদস্তি আমি করতাম না। তুমি যদি খুসী মনে রাজি হ'তে, আমি তোমার কল্মা পড়িয়ে সাদি করতাম।"

রেবতী বলিল, "আপনি ত বলেছিলেন, আপনার আর দুটি বিবি আছে—তাদেরই সুখী করুন, এ বয়সে আর ও সব মৎলব কেন, করিম সাহেব?"

করিম দুঃখিতভাবে বলিল, "হ্যা, উমর আমার একটু বেশী হয়েছে বটে। তোমরা হ'লে নওজওয়ান ছোকড়ী—আমাদের মত বুড়ার পানে তোমরা কি আর ফিরে চাবে? তা কি বুঝি না, বিবি? বুঝি সব; কিন্তু দিল্ যে মানে না। তোমায় আর একটিবার দেখবার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি। শেষে ঐ চিঠিতে তোমার ঠিকানা পেলাম। প্রথমে কিন্তু বিশ্বাস করিনি, ভেবেছিলাম, আমায় ধরবার জন্যে হয় ত কেউ ফাঁদ পেতেছে। সত্যি তুমি এ বাড়ীতে থাক কি না জানবার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম। সেই মাথা-কামানো টিকিওয়ালা আলিজান, যে ট্যাক্সিতে তোমাদের আমার বাসায় এনে ফেলেছিল, তাকেই মোতায়েন করেছিলাম। তারই কাছে আজ খবর পেলাম, তুমি সত্যিই এ বাড়ীতে থাক,—আর এক জন কে পুরুষ মানুষও তোমার আসি—নজর-সানি ত হবে। আর, বেচারীর জেওর গুলিও ফিরিয়ে দিয়ে আসি—মাফীও চেয়ে আসি। পাছে তোমার চাকর-দরোয়ান আমায় ঢুকতে না দেয়, তাই এস্রাজটী সঙ্গে এনেছিলাম।"

"সত্যি আপনি এস্রাজ বাজাতে পারেন, করিম সাহেব? একটু বাজান না, শুনি!"

করিম বলিল, "এস্রাজের সখ এক সময় আমার হয়েছিল—তখন একটু একটু শিখেছিলাম। সেই সময়েই এই এস্রাজটি খরিদ করি। খুব ভাল কারিকরের তৈরী এটি। কিন্তু এ দিকে দশ-বারো বছর একে আমি ছোবারও ফুরসৎ পাইনি। যা শিখেছিলাম, তা ভুলে গেছি। ভাবলাম, আনাড়ীর কাছে থেকে ভাল জিনিষটি কেন নষ্ট হয়,—রেবতী বিবি ত এক জন মস্ত গুণী আওরৎ, তাকেই এটি নজর দিয়ে আসি। এই এস্রাজটি তুমি নাও। মাঝে মাঝে এটি বাজিও—আর এই নাদানের বুড়াকে মনে কোরো।"—বলিয়া করিম আবরণ-বস্ত্রটি খুলিয়া, এস্রাজটি রেবতীর হাতে দিয়া একটি সেলাম করিল।

রেবতীও একটি সেলাম করিয়া, এস্রাজটি লইয়া উহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তারে ছড় দিয়া, পর্দ্দা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "খাসা জিনিষটি বটে!"

"এস্রাজ বাজান আপনি?"

"না। কিন্তু, আপনি মেহেরবানী ক'রে জিনিষটি যখন দিলেন, এক জন ওস্তাদ রেখে বাজাতে শিখবো আমি। আপনার জিনিষের অপমান করবো না।"

"আপনার মেহেরবানী! তুমি ক্লান্ত আছ অনেকক্ষণ তোমায় বিরক্ত করলাম, আমার কসুর মাফ কোরো তুমি। যদি এজাজৎ হয়, আজ তা হ'লে উঠি।"—বলিয়া করিম উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠবেন? ও সদু, আরও গোটাকতক পাণ দিয়ে যা। বসুন, আর দুটো পাণ খেয়ে যান।"

সদু পাণ আনিল। পাণ লইয়া করিম বলিল, "আচ্ছা বন্দিগী বিবিজান্।"—বলিয়া করিম শেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য রেবতীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিল।

রেবতী শেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিল, "আমার কসুরও আপনি মাফ করবেন, করিম সাহেব!"

কি মাফ করবো? আচ্ছা, কোন্ থিয়েটরে তুমি প্লে কর? আমি দেখতে যাব।"

রেবতী বলিল, "আমি অ্যাভিনিউ থিয়েটরে প্লে করি। এই শনিবারে সেখানে আলিবাবা হবে—আমি তাতে মর্জ্জিয়ানা সেজে নামবো। আপনি থিয়েটর দেখতে ভালবাসেন বুঝি?"

"আমি তোমায় দেখতে ভালবাসি।"—বলিয়া করিম দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হীরালালের চাকরী

করিম প্রস্থান করিলে, রেবতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যতক্ষণ সে ছিল, রেবতী বড়ই অস্বোয়াস্তি অনুভব করিতেছিল। গহনাগুলি ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দটুকুও ভাল করিয়া যেন সে উপভোগ করিতে পারিতেছিল না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে হীরালাল ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখখানি হাসি হাসি। রেবতীর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি স্রোতের ফুল, একা ব'সে ব'সে কি ভাবা হচ্ছে?"

রেবতী বলিল, "ভাবছি, দুনিয়ার গতিক। তার পর, আপনার কি হ'ল?"

হীরালাল বলিল, "এই বুঝি! স্রোতের ফুল পাতানো হ'ল, তবুও আপনি মশাই?"

রেবতী হাসিয়া বলিল, "ওহো, আমার ভুলই হয়েছে বটে। তা, ফুলের কি ভুল হয় না? কি হ'ল, বল ত স্রোতের ফুল—পরীক্ষায় পাশ হলে?"

হীরালাল বলিল, "ফার্ষ্টো ডিবিজনে। ম্যানেজার বাবু বেশ খুসী হয়েছেন ব'লেই মনে হ'ল,—আমাকে নেওয়াই স্থির করেছেন।"

"কত মাইনে, কিছু বলেছেন?"

"না, সেটা তোমার সঙ্গে কাল রিহার্সালের পর পরামর্শ ক'রে স্থির করবেন, বলেছেন। কি পার্ট দেবেন, তাও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আমাকেও কাল যেতে হবে।"

রেবতী বলিল, "বেশ, তা ভালই হ'ল। একসঙ্গেই দু'জনে কায করা যাবে। হাত-মুখ ধোবে ত ধুয়ে ফেল—খেতে ব'সে একটা মস্ত খবর তোমায় বল্‌বো।"

হীরালাল বলিল, "কি খবর, আগেই বল না। এ এস্রাজ কার? এটা ত এক দিনও এখানে দেখিনি!"

রেবতী বলিল, "এই কিছুক্ষণ আগে এক জন এসে, এই এস্রাজটি আমায় উপহার দিয়ে গেল। আর অনেক প্রেম ভালবাসার কথাও ব'লে গেল। সেই সব কথাই খেতে ব'সে তোমার কাছে গল্প করবো।"

"ওঃ"—বলিয়া হীরালাল মুখখানি গম্ভীর করিল।

রেবতী মনে মনে হাসিয়া বলিল, "সে তোমার কথাও জিজ্ঞাসা করছিল যে!"

হীরালাল বিস্মিতভাবে বলিল, "আমার কথা? আমাকে সে চিনলে কি ক'রে?"

রেবতী বলিল, "তোমায় সে চেনে বল্লে—তুমিও বোধ হয় তাকে চেনো!"

"তাই না কি!"—বলিয়া হীরালাল বসিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল,—কে এই ব্যক্তি—যে এখানে আসিয়া রেবতীকে এস্রাজ উপহার দিয়া প্রেম-সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছে? কে সেই নরাধম?

রেবতী হাস্যজড়িত স্বরে বলিল, "বলি মশাই, ও স্রোতের ফুল মশাই! মুখখানি অমন পেঁচার মত গম্ভীর ক'রে ব'সে থাকা হয়েছে কেন শুনি!"

হীরালাল রেবতীর মুখ পানে চাহিল। তাহার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া সন্দেহ হইল, রেবতী বোধ হয় একটা কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া পরিহাস করিতেছে। কিন্তু ঐ হতভাগা এস্রাজটা ত কাল্পনিক নয়!

রেবতী কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কি গো! মুখহাত ধুতে-টুতে হবে, খেতে-টেতে হবে? না, মুখ হাঁড়ি ক'রে ব'সে ব'সে ভাবলেই চলবে? তুমি না হয় পরম সংযমী মহাপুরুষ, তোমার ক্ষিদে-তেষ্টা নেই; আমি সামান্য স্ত্রীলোক—আমার যে ক্ষিদেয় প্রাণ যায়!"

হীরালাল বলিল, "তা আমার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছেন কেন? আপনি খেতে বসুন না!"

রেবতী বলিল, "শাস্ত্রে না কি আছে, স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতাদেরও বুদ্ধির অগম্য। আজকাল ত দেখছি, পুরুষ-চরিত্রই বুঝা ভার। এখনও দশ মিনিট হয় নি, হুজুরকে আপনি

মশাই বলেছিলাম ব'লে হুজুর আমায় কত খোঁটাই দিলেন! এখন আবার নিজেই সেই অপকর্ম্ম করছেন! আচ্ছা—সে লোকের নামটাই না হয় প্রকাশ করি!"

হীরালাল বলিল, "তার নাম শুনে কি আমার কোনও লাভ আছে?—আমার বোধ হয়, আমার কাছে সে নাম অপ্রকাশ থাকাই ভাল!"

"কেন, লাভ নেই কেন? তোমাতে আমাতে যখন বন্ধু হয়েছি—তোমার অন্য বন্ধুদের খবর জানাও আমার দরকার, আমার বন্ধুদের খবর জানাও তোমার দরকার!"

"না,—আমার কিচ্ছু দরকার নেই! আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।" বলিয়া হীরালাল উঠিল।

"অ্যাই—ব্যাড বয়! যাও কোথায়?" বলিয়া রেবতী হীরালালের জামার পশ্চাদ্ভাগ মুঠা করিয়া ধরিল। বলিল, "নামটা শুনেই যাও! যে আমায় ভালবেসে অমন সুন্দর এস্রাজটি উপহার দিয়ে গেল, তুমি আমার বন্ধু হয়ে—নামটা তার শুন্‌বে না?"

হীরালাল সংশয়পূর্ণ নেত্রে রেবতীর মুখের পানে চাহিল—নিশ্চয়ই এ সব তাহার পরিহাস। বসিয়া বলিল, আচ্ছা, "বল, তার নাম, শুনেই যাই।"

রেবতী বলিল, "তার নাম হচ্ছে—প্রবলপ্রতাপান্বিত গুণ্ডাপতি, গেঁড়াতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত করিম সেখ বাহাদুর!"

হীরালাল সবিস্ময়ে বলিল, "দূর! কেন মিছে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? এ হতেই পারে না। সে যদি আসতো, তোমার হাতে কি এস্রাজ উপহার দিয়ে যেত? তোমার বুকে দিয়ে যেত ছ' ইঞ্চি পরিমাণ চক্‌চকে ধারালো ইস্পাত!"

রেবতী বলিল, "না ভাই স্রোতের ফুল, সত্যি সে এসেছিল—আর সত্যি সে আমায় প্রেমও জানিয়ে গেছে, আর ঐ এস্রাজটি উপহার দিয়ে গেছে।"

"তা, সে তোমার ঠিকানা পেলে কোথা?"

"এই দেখ।"—বলিয়া রেবতী সতীশ-লিখিত সেই পত্রখানি হীরালালের হাতে দিল।

হীরালাল উহা পড়িয়া বলিল, "অ্যাঁ? বল কি! সেই নরাধম সতীশ এই চিঠি করিমকে লিখেছিল? কি সর্ব্বনেশে লোক সে!"

রেবতী বলিল, "তা ঝাঁটা পেয়ে গেছে, অম্‌নি অম্‌নি আমায় ছেড়ে দেবে? প্রতিশোধ নেবে না?"

"ঝাঁটা খেয়েছে ব'লে এমন প্রতিশোধ নেবে—যাতে তোমার প্রাণটি যেতে পারে? সে চুলোয় যাক্—কি হ'ল আগাগোড়া সমস্ত আমায় বল দেখি, শুনি।"

রেবতী বলিল, "আগাগোড়া সে যে অনেক কথা—সেই জন্যেই ত বলছিলাম, হাত-মুখ ধুয়ে এস, খাবারগুলোও সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,—খেতে ব'সে সে গল্প করবো। ভারি মজার গল্প কিন্তু।"

হীরালাল বলিল, "আমার কিন্তু কিছু ক্ষিদে নেই। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, তুমি খেতে ব'স, খেতে খেতে বল—আমি যখন হয় খাব এখন।"

রেবতী বলিল, "তুমি যে অবাক্ করলে ভাই স্রোতের ফুল! বাড়ীর পুরুষের খাওয়া হ'ল না, আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে আগেভাগে গিলে কুটে থাকবো? মুর্গীটে আসটাই না হয় খাই, তাই ব'লে হিঁদুর মেয়ে কি হিঁদুয়ানি ছাড়তে পারি? যাও যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস লক্ষ্মীটি!'

হীরালাল বলিল, "আচ্ছা, তাই যাই।"

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া হীরালাল দেখিল, অন্য দিনের মতই রেবতী ক্ষুধা-উদ্রেককারী ঔষধ—ঈষৎ পীতাভ বুদ্‌বুদময় তরল পদার্থ পান করিতেছে। হীরালালকে দেখিয়া সে বলিল, "ক্ষিদে নেই বলছিলে, এই ওষুধ একটু খাও না কেন?"

হীরালাল বলিল, "না না—অমন ক্ষিদের আমার দরকার নেই। আমি গরীব লোক, বেশী ক্ষিদে হওয়া কি আমার ভাল?"

"কেন, ভাল নয় কেন? যে জন্যে কলকাতায় আসা, ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন, চাকরী হ'ল, মোটা মাইনে হবে এখন, আবার কিসের ভাবনা? এস, আজ আনন্দ ক'রে আমরা পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করি।"

হীরালাল বলিল, "মাফ করুন।" রেবতী আর পীড়াপীড়ি করিল না।

"মোটা মাইনে হবে"—এই কথাটাই হীরালালের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল। কিন্তু কৈ, ম্যানেজার বাবু ত বেতনের কথা কিছুই বলেন নাই—রেবতীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উহা স্থির করিবেন, বলিয়াছেন। আর রেবতী বলিতেছে—"মোটা মাইনে হবে।" ঐ থিয়েটরে রেবতীর এত দূর প্রতিপত্তি যে, রেবতী যদি বলে, আমার বন্ধুকে এত টাকা বেতন দিতে হইবে, তবে ম্যানেজার বোধ হয় সে কথা ঠেলিতে পারিবে না।

আহার করিতে করিতে রেবতী করিম-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত হীরালালকে শুনাইল। রেবতী নিজ অলঙ্কার ফিরিয়া পাইয়াছে—তার মনটা বেশ খুসী, হীরালালের চাকরী হইয়াছে, তারও মনটা বেশ খুসী—মাঝে মাঝে উভয়ের উচ্চহাস্যে কক্ষখানি ভরিয়া উঠিতে লাগিল। পরস্পর সম্বোধনের জন্য প্রাতে আবিষ্কৃত "ভাই স্রোতের ফুল"—এখন সংক্ষিপ্ত হইয়া "ভাই"-এ দাঁড়াইল।

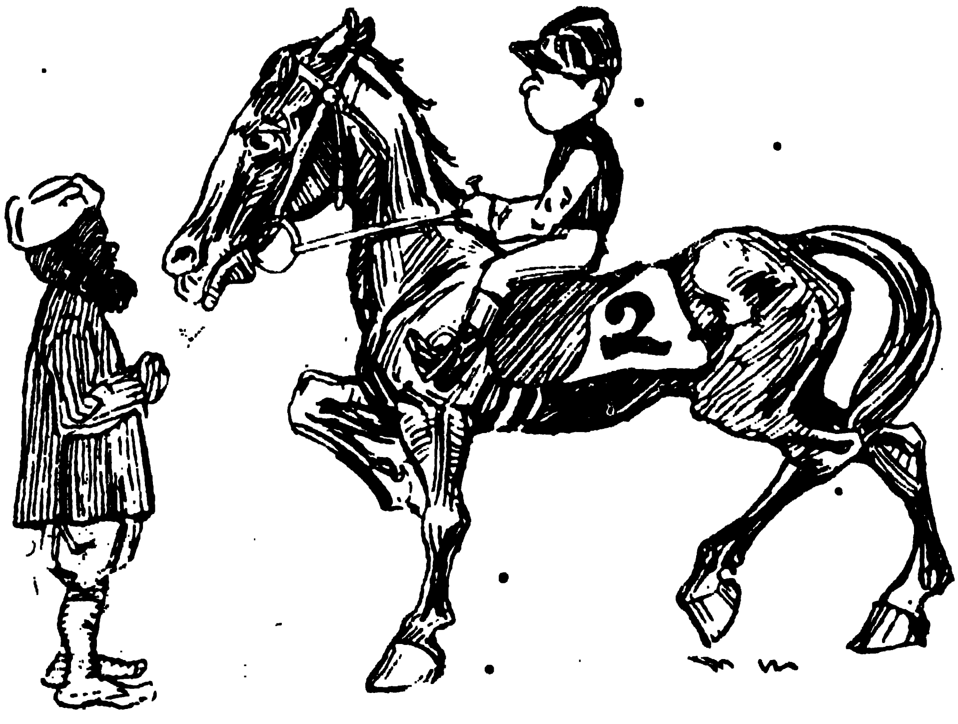
[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঘোড়ার খবর



১ম চিত্র—



দো নম্বর

২য় চিত্র



দো নম্বর জরুর win করে গা

৩য় চিত্র



No. 2. a Certainty.

৪র্থ চিত্র—



আপনার জামা কাপড় বাঁধা রেখে ডু'নম্বর ধরুন—পাকা খবর।

৫ম চিত্র



ডু' নম্বর পাকা খবর—যত পারেন ধরুন—ঠুসে ধরুন!

৬ষ্ঠ চিত্র



ত্ব' নম্বর নিশ্চয়ই জিতেছে

৭ম চিত্র—



আমার গণনা বল্‌ছে ত্ব' নম্বর ঘোড়ায় আপনাকে প্রভূত অর্থ দিবে

৮ম চিত্র—



চল চল—দু' নম্বর বুঝি ফস্কে গেল !

৯ম চিত্র -



দু' নম্বরের পৃষ্ঠপোষকগণ

হামিদের হিম্মৎ

৬

মানবের জীবন-নাটকের অভিনয়ে একটা-আধটা সামান্ত ঘটনাতে-ই তার চিন্তার স্রোত, প্রবৃত্তির গতি, ভাবের প্রবাহ এক পথে যেতে যেতে একেবারে বক্রগামী হয়ে পড়ে। সেক্সপিয়র তাঁর প্রত্যেক নাটকে মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন তত্ত্ব অতি পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন ক'রে গেছেন।

সোনা উল্লোর নাতি, বছরন্দী কাঠুরের ছেলে হামিদ পিতৃপিতামহের কোলে বাঙ্গালী ভাব নিয়ে-ই বাঙ্গালা ভাষা বলেই শৈশব জীবন আরম্ভ করেছিল; প্রতি মুখে বাল্য ও কৈশোর-লীলায় বাঙ্গালীর ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে লেখাপড়া ও খেলাধূলা ক'রে তাদের মাসী-পিসী-দিদিমাদের মাসী-পিসী-দিদিমা ব'লে ডেকে এতটা বাঙ্গালী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, নিজের হামিদ নামটা-ও তার কড়া লাগত, তাই হেম নামে আপনাকে পরিচিত ক'রে বেশী তৃপ্তি লাভ করত।

যৌবনারম্ভে মওলানা হামিজুদ্দীন খাঁ। সেরাজুর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হবার সুবিধার জন্ত ব্রজসুন্দর পার্শিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতির ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে তার যখন এই দেড় ফুট লম্বা নাম তৈরী ক'রে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দিগ্বিজয়ী বংশাবলী প্রস্তুত করলে, তখন-ই তার মনের ভিতর অজ্ঞাতসারে একটু খোরাসানী গন্ধ প্রবেশ করলে; স্বদেশী লেক্চার দেবার সময় নেতা-বাবুরা তাকে ফেজ-আচকান পরিয়ে আর মৌলবী ব'লে ডেকে সেই গন্ধটা আর একটু ঝাঁজিয়ে দিলে, এর উপর উকীল হয়ে আর শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে সে হেম ব'লে পরিচয় দিতে যেন 'এসেম্ড' হয়ে উঠত; ক্রমে নিজেকে-ই এক জন লীডার ব'লে বুঝে তার প্রকৃতি যে মূর্ত্তি ধারণ করেছে, তার সাক্ষাৎ আমরা অনতিবিলম্বেই পাব।

ও দিকে ব্রজসুন্দর যাঁদের ঘরে জন্মেছেন, তাঁরা পল্লী-বাসী গোঁড়া বৈষ্ণব; দোকানদারী থেকে সুরু ক'রে মহা-জন, পরে জমীদার, সকল অবস্থাতেই বুঝেছেন যে, ইংরা-জের সঙ্গে নরম চালে চল্‌লে, তাঁদের তুষ্ট রাখলে-ই জীবন নিরাপদ ও অর্থলাভের পথ সুগম। ইংরাজ মাল কিনলে গায়ে শালের জোড়া উঠে, ইংরাজ রাজা ব'লে ডাকলে পাঁজার পো রাজা হয়, ইংরাজের চৌকীদার চোখ রাঙ্গালে সাতপুরুষে জমীদারকে-ও কাঠগড়ায় খাড়া হ'তে হয়। শোণিতগত এই সংস্কারের উপর যখন গৌরসুন্দর ঠাকুরদাদা রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হলেন, তখন ব্রজসুন্দরের পাশকরা প্রাণও ইংরাজচরণাম্বুজঘ্রাণে শতদলের অস্তিত্ব অনুভব করলে। তার উপর এম-এ, পাশ করে-ই রায় কুমার ব্রজ-সুন্দর হয়ে পড়লেন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। কাজেই সতীর্থ স্বদেশহিতৈষিগণের উপহাস উপেক্ষা ক'রে অবৈতনিক ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট, জাষ্টিস, পিস, সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি নানা কথা ব'লে ইংরাজ-রাজ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করলেন এবং আন্দোলনকারীদের কার্য্যকে দৌরাত্ম্য ব'লে অভিহিত করলেন।

গৌরসুন্দরের স্বপ্ন সফল হয় নি, রাজা উপাধিলাভের পূর্ব্বে-ই পুত্র নরহরি পিতৃনাম লিখনের পূর্ব্বে ৵ পাঁচ পণ জুড়িয়া দিতে বাধ্য হলেন; শ্রাদ্ধ ধূমধামে নিষ্পন্ন হয়ে গেল; কিন্তু নিয়মভঙ্গের দিন সাহেব নিমন্ত্রণ করার প্রথা দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ-ও ধনি-সমাজে প্রচলিত হয় নি, সুতরাং বংশটার রাজা হয়ে যাবার সুবিধা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রইল।

শ্রাদ্ধের পর ব্রজসুন্দর একবার পশ্চিম বেড়াতে গেছল। ফেরবার পথে আলিগড় ষ্টেশনে গাড়ী থামতে, সেকেণ্ড ক্লাসের যে কামরায় ব্রজসুন্দর একা আসছিল, সেই কামরায় জন পাঁচেক সাহেব উঠল। চারটি ফিরিঙ্গি, একটি কাফ্রি, কিন্তু আমাদের কাছে এরা সবাই "সাহেব"। পাঁচ জন-ই রেলওয়ে কর্ম্মচারী, ভাড়া দিতে হয় না, তাই সেকেণ্ড ক্লাস! কাফ্রিটি ফায়ারম্যান। সেই বড় সাহেব-ই গাড়ী চলতে আরম্ভ করা মাত্র প্রথমে ব্রজসুন্দরের জলের কুঁজোটা জানালা গলিয়ে লাইনের উপর ফেলে দিলে; টিকিট-কালে-ক্টর টিলটন ব'সে পড়ল একেবারে ঘুমন্ত ব্রজসুন্দরের বুকের উপর। ব্রজসুন্দর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে-ই ব'লে উঠল—"বেগ ইওর পার্ডন"। তার পর বল্‌লে, "Why did you sit on my chest?" "বেগ ইওর পার্ডন"টা রায় কুমার অভ্যাসবশতঃ এটিকেট রক্ষার জন্ত ব'লে ফেলেছিলেন। সাহেবগুলি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "অল্ রাইট —অল রাইট—চুপ্‌সে বইঠ রহ।"

ব্রজসুন্দর বললে,—"Do you know I am a graduate of the Calcutta University, an M, A,?"

সাহেব এক জন বল্লেন—"Then go and find a third class compartment for you."

ব্রজ। But I have paid a second class fare and have a right to travel in it.

সাহেব। Do you! Well Jack, hear the fellow talk of his rights!

জ্যাক। They are all doing that of late. Right! Right! Right! Where did they learn the word; I wonder! Look here, fellahy, that's an English word. You don't find any "right" in your Tulseram.

জ্যাক সাহেব পশ্চিমে লাইনে-ই অনেক দিন কায করে-ছেন এবং তুলসীদাস সবা-ই পড়ে শুনেছেন; তুলসীদাসকে তিনি তুলসীরামে বদলে নিয়েছেন এবং ঐ একখানি বই-ই

তিনি বিশ্বাস করেন, মোছলমানদের একখানি মাত্র পড়বার বই আছে, তার নাম 'ব্যাগ ও ডার্কেশ' অর্থাৎ বাগবাহার ও চাহার দরবেশের ঘণ্ট।

ব্রজসুন্দর বললেন, I am an Honorary Magistrate and a Zeminder. I shall report—

জ্যাক। Send your grandmother to the pillory and shut up you fool of a Magistrate saheb. No, no, let's give the nigger his rights. এই ব'লে ক'টি সাহেব মিলে ব্রজসুন্দরকে টানাটানি ক'রে, এ বলে "হামরা পাঁও দাবো", ও বলে "হামরা পাঁও দাবো।" জ্যাক ছিল ৬ ফুট লম্বা একটা অস্থিমস্ত ফিরিঙ্গী; সে একটা বার্থের উপর লম্বা ঠ্যাং ছড়িয়ে দিয়ে ব্রজসুন্দরের ঘাড় ধ'রে পায়ের কাছে টেনে বসালে; বাকি ক'জন চোখ কটমট ক'রে ঘুষী বাগিয়ে এমন ক'রে দাঁড়াল যে, নিরুপায় জমীদারপুত্র হাকিম সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ট্রেণটা একটা মাঝারি গোছ ষ্টেশনে থামল, ততক্ষণ সেই দেড়শো টাকা মাইনের ফিরিঙ্গীর পদসেবা করতে বাধ্য হলেন; গাড়ী থামতেই পোর্টম্যাণ্টো আর বিছানার বাণ্ডিলটা প্লাটফরমে ফেলে দিয়ে-ই নিজে নেমে গেলেন; হুইশল্ দিতে-ই ব'লে উঠলেন— "I shall write all about this in the Calcutta papers, you have insulted a gentleman—"

"And he is going to advertise it—Hoorray! ব'লে সাহেববৃন্দ হো হো ক'রে হেসে উঠল।

কষ্টে-সৃষ্টে একখানা ইণ্টার গাড়ীতে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে সারা রাত্রি জেগে রায়-কুমার ব্রজসুন্দর মনের মধ্যে এই ঘটনার-ই আলোচনা করতে লাগলেন। প্রথমে ভয়ানক দুঃখ; "যদি আজ গায়ে জোর থাকত, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুসী লড়াটা-ও শিখে নিতুম, তা হ'লে আজ এক এক বেটাকে—যাক্, সে দুঃখ করলে আর হবে কি? যাক্, কলকেতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সব কথা খুলে বলব। তিনি তা হ'লে গবর্ণরকে জানিয়ে এক জন ম্যাজিষ্ট্রেটের—, আর ম্যাজিষ্ট্রেট! হাকিম-ই হই আর যা-ই হই, তবু ত কালা চামড়া! ওঃ, কি কাল সে কাফ্রিটে, তবু সে সাহেব! আর আমি এক জন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের—, আরে ভ্রস্ত মন, সম্ভ্রান্ত ত নিজের সমাজে, স্বজাতির সমক্ষে; কিন্তু ঐ ফিরিঙ্গীগুলোর বুকের ভিতর আমাদের নাম আঁকা 'নেটিভ' ব'লে অক্ষয় ক'টিতে। উঃ, পা টিপিয়ে নিলে—পা টিপিয়ে নিলে! একটা হাঁক দিলে বত্রিশটে চাকর হাত জোড় ক'রে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আদালতে মোটর থেকে নামলে কনেষ্টবলরা আমাকে সেলিউট দেয়, আর রেলের কাম্রারম্যানি টিকিট-কালেক্টাররা আমাকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিলে! বাড়ী ফিরে আমি স্বদেশী হব—স্বদেশী হব, এতে অনারারী চাকরী থাক আর যাক্!" চিন্তার শেষ দিক্টা ব্রজসুন্দরের বুকের ভিতর থেকে উচ্চ কণ্ঠে স্ফুরিত হয়ে পড়ায়, মুদ্রিত-নয়ন ঢুলামান সহযাত্রী ক'টি সহসা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে ব'লে উঠল, "কি হয়েছে মশায়, কি হয়েছে?" ব্রজসুন্দর কোন উত্তর করলে না, যাত্রীরা ব'লে উঠল, "ওঃ, দুঃস্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন!"

৭

পাগলা পীরের সে খোলার ঘরের আস্তানা নেই; সোনাগাছীর একটা দোতলার লম্বা ঘর চাঁদায় ভাড়া নেওয়া হয়েছে, আর সেখানে "বাজনা-বারণ সমিতি" নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যার পর সমিতির বিরাট পঞ্চম অধিবেশন। একটি চৌকিতে দোসুতি পাতা, তার উপর বিবিধ রংএর আলখেল্লা প'রে দীর্ঘশ্মশ্রুমান্ পাগলা পীর স্বয়ং উপবিষ্ট, চক্ষুগোলকে শার্দ্দুল, ওষ্ঠাধরে রুষ্ট বিষধর, কপোল-যুগলে বুদ্ধিভ্রংশের আত্মম্ভরিতা। সম্মুখে প্রাপ্ত উপহারের প্রদর্শনী; যথা:—বারকোশভরা গাঁজা, থালাভরা সাদা বাতাসা, ঘটী ঘটী দুধ, এক শানক সির্ণী আর সাত পাঁইট খাটী দোয়াস্তা মদ; একখানি ব্রিটানিয়া মেটালের ট্রেতে পয়সার কাঁড়ি, মিণ্ট মেটেলের আনি দুয়ানি সিকি, বেশী ভক্তিমতীদের প্রদত্ত পাঁচ সাতটা টাকাও ঝিক্‌মিক্ করছে। সভারম্ভে পীরসাহেব কি একটা জগতের অবোধ্য ভাষায় মঙ্গলোদ্বোধন পাঠ করলেন—যাতে "ং" আর "ল্ল" এরই অধিক বাহুল্য। পীরের কৃপায় টেরিটি বাজারের সেই জুতোওয়ালার সাহায্যে চন্দুরীর বরাত ফেরার পর থেকে সোনাগাছীবাসিনী প্রায় সমস্ত রমণী-ই পীরের দোহাই দিত, এ কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে; আপাততঃ ২৭।২৮টি নারী ঐরূপ মোছলমান দোকানদারের আশ্রিতা হওয়ায় তাদের হৃদয়-মন্দির-ও খানিকটা মসজেদের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে; এরা বাবা তাড়েশ্বরের হুকুমের চেয়ে-ও পাগলা পীরের হুকুম সেলাম ক'রে মাথা পেতে নেয়। পীতাম্বর গাঙ্গুলী ও আব্বাসের নেতৃত্বে এই নারী কয়টি মিলিত হয়ে উক্ত "বাজনা-বারণ সমিতি" গঠিত হয়েছে। পীর প্রচার করেছেন যে, হাঁদুর ঢোল ঢাক শাঁখের বাজনা কাণে গেলে পবিত্তির মোছলমানকে কবরে গিয়ে-ও খাজনা দিতি হয়, বল্‌কে এই হালার হাঁদুর বাজনা মকুব করতি বেশক্ দরকার। এই মেয়েগুলি মাঝে মাঝে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় বাজনা বন্ধের জন্য গান ক'রে বেড়ায় আর পীরের গঞ্জিকা সেবনাদি মহৎ কার্য্যের জন্য দান ভিক্ষা ক'রে এনে আস্তানায় জমা দেয়। এই গানের শোভাযাত্রার সময় ইংরাজী বাজনা বাজাবার হুকুম পীরের দেওয়া আছে; কারণ, তাঁর বিশ্বাস যে, ইংরাজ জাতিতে নাকরাজ, সুতরাং তাদের বাজনায় কোন দোষ নেই। রমণীদের কৃপাপ্রাপ্ত কয়েকটি বঙ্গসন্তান শোভাযাত্রার সময় হারমোনিয়ম, ভায়োলিন, ক্লারিওনেট, কর্ণেট প্রভৃতি বাজিয়ে ভিক্ষার সঙ্গীতকে রংদার ক'রে তোলেন। পীরহাটির মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চমমানের ছাত্র জগদ্বিখ্যাত কবি, যাঁর গ্রামের লোক তাঁকে রবি বাবুর পরেই উদীয়মান ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছেন, তিনি একটি সুন্দর সঙ্গীত রচনা

ক'রে দিয়েছেন, যেটি পীরসাহেবের মঙ্গলাচরণ পাঠের পরেই ক্লারিওনেট, কর্ণেট প্রভৃতির সুরসংযোগে নারীসম্প্রদায় কর্তৃক গীত হ'ল।

(গীত)

যদি বাজে বুকে বাজে, স্বদেশ-ভ্রাতা ভ্রাতাকুল বুকে বাজে।
তবে কেন ওগো কেন হারাইয়া গ্যান, বাজনা নিয়ে কর মিছে গোল।
ওহে হিন্দু, যবে সিন্ধুতীরে উদাত্তস্বরে, উঠেছিল সামগান—
কোথা ছিল কাঁসি ধাঁশী জগঝম্প বিদ্যমান; সে মূর্চ্ছনা সঙ্গে অর্চ্চনা রঙ্গে
কখন কি কভু বেজেছিল ঢোল।
আর কভু কি রে শানাই তোদের কানাই, ফুঁকেছিল ব্রজভুবনে।
সে যে শুধু বাঁশের বাঁশরী রাসেরি রাতে, খালি লুকায়ে কেঁদেছে বনে বনে।
করেছিল মাত্র বলে কবি ছাত্র, গোপীপ্রাণপাত্র প্রেমে উতরোল।
বিনা স্বাধীনতা-ধন কি স'হি বেদন, জানে বাবামাতা এ নব্য সভ্যতা
আর জানে তা মদন, কেটে নিজ নাম ভাঙ্গ ঢাক ঢোল
মস্‌জিদে তস্‌লিম কর ব'লে মিঠে বোল,—
যত অ-মুসলমান পাব স্বাধীনতা দান, মিঞাজান যদি দেয় কোল।

গানের ভাবোচ্ছ্বাসে অনেকের-ই অশ্রুধারা বিগলিত হ'ল, ক্লারিয়নেট ও কর্ণেটবাদক "ভারত ভারত" ব'লে কেঁদে উঠল, নারীর করুণকণ্ঠে "পাগলা পীর, তুমি-ই সত্য—বাবা, তুমি-ই সত্য" উচ্চারিত হ'ল, পীরসাহেব "আল্লা হো আকবর" ব'লে গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, সমবেত হিন্দু-মুসলমান ভক্ত-রসনায় সেই গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হ'ল, পীতাম্বর গাঙ্গুলী ব'লে উঠলেন, "চলুক আর একবার গাঁজা।"

প্রায় ২০ মিনিট কেটে গেল গাঁজার কল্কে হাতে হাতে ঘুরতে, ঘরের ধোঁয়া পরিষ্কার হ'তে আর-ও প্রায় ১০।১২ মিনিট। তার পর পীরসাহেব পীতাম্বর গাঙ্গুলীকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন, "ওরে হালা বামুন, এইবার মুই কি করমু!"

পীতাম্বর বললে, "তুমি যে আজ একটা নেকচার ঝাড়বে বলেছিলে।"

পীর। কইছিলাম ত, লেকিন্ মোর বাত সমঝাবে, ইমন সমঝদার এহানে কয় হালা-হালী আছে? তোর সেই হাটখোলার বাবু হালার এহানে আজ সাঁজে আসবে কথা ছ্যাল না?

পীতা। আসবে—আসবে; সে যখন কথা দিয়েছে, তার আর নড়চড় নেই। তবে কি জান কত্তা, সে একটা মস্ত ইংরাজী পড়া দিগ্‌গজ বড়মানুষের বেটা; তারা কি তোমার আমার মত টাইন ধ'রে কায করে?

পীর। আরে হাদে ও আব্বাস মিঞা, তোর সেই মক্কাবুড়ীর জামাদ, সেই যে হামিদ না কি, সেটার নাম,—ও—ওই বেটা বাঙ্গালী হালাদের সঙ্গে-সাথে মিলে-মিশে কাফের ব'নে গিছল, সেটার-ও ত আসবার বাত ছ্যাল।

আব্বাস। আজ গোঁড়াতলার মাঠে তার এক লেকচার আছে, সেখানকার শ্রোতা এখানে আসবে। তুমি ততক্ষণ যারা এসেছে, তাদের দু'টো ভাল কথা সমঝে দাও।

পীর। আরে সমঝাচ্ছি ত হররোজ, বোঝ নানে কোন্ হালা? শোনবার চাও ত সবাই কাণ খাড়া কর। এই যে, হাঁদু হালাদের ক্যাষ্টো ব'লে একটা ঠাউর আছে, সেটা আসল সয়তান, সেটা সবারে কইত, বক্‌রী খাবা না, মচ্ছী খাবা না, পিঁয়াজ খাবা না, আর ফাঁকে ফাঁকে নিজে আস্ত আস্ত ম্যারা পাকরে আগুন জেলে ঝলসে প্যাটে পুরত; সেডা সবারে কইত, সাধু হবা, চুরি করবা না; কেমন পীতে-ম্বর, কইত কি না?

পীতা। হ্যাঁ, বলতেন বৈ কি—বলতেন, যখন চণ্ডীপাঠ করতেন, তখন ঐ কথাই বলতেন।

পীর। কইতেন ত? তবে কও—এই হালাহালীদের কও; সেই ক্যাষ্টো চোরের বেটা আসল চোর ছ্যাল। ক্যাস্তো গোয়ালা মাগীদের ঘরকে ঘুষে দুধের হাঁরা, দইয়ের হাঁরা, মাখনের কলস চুরী ক'রে ক'রে খাইবার লাগত।

পীতা। তা—তা—ও গো, এই ছি কেষ্ট নীলে ক'রে,—

এক জন নারী হাত জোড় ক'রে পীতাম্বরকে বললে, "ঠাকুর, উনি পীর, সব বলতে পারেন, কিন্তু তুমি আর পৈতে গাছটা গলায় থাকতে কেষ্ট-নিন্দে শুনিও না।"

পীর। ও হালীর বিটী হালী, ক্যাষ্টো-নিন্দা শোন্‌বা না। তবে এহানে—

নারী। (যুক্তকরে) বাবা, তুমি পীর, তোমার-ও পূজো দি, সোনাপীরের দরগায়-ও পিদ্দীম দেখাই, দুধ বাতাসা-টাতাসা দি, তবে কি জান বাবা, আমরা হলুম গোঁসাইয়ের শিষ্যি, কেষ্ট-নিন্দে শুনলে আমাদের বুকে বড় বাজে।

পীর। আর রেতের বেলা কবির মধ্যি ভূগীতবল বাজতি থাকে, সে কার বারীতে—হ্যাঁ হালী, সে কার বারীতে? ঐ যে গলায় দোলচে সোনার হেঁসো, ও মুছল-মানের পয়সায়—না ক্যাষ্টোর পয়সায়?

অন্য নারী। তা আমরা ত ছাতে সব ইট জড় ক'রে রেখেছি, দরগার সামনে দিয়ে ঢোল-ঢাক ত ওদিকে থাক্, যে খঞ্জনী বাজিয়ে—

পীর। আরে র বিটি র। ম্যাংরাজী বাজনা বেজিয়ে গেলে তাদের ওপর যেন চাকা মারিস নে।

অন্য মাগী। চাকা কেন গো বাবা, ইট—ঐ ইট।

পীর। অ-হ, বারে তোরা ইট কোস্, মোদের ডাহার জিলায় তারে-ই কয় চাকা।

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় দরজার কাছে একটা মোটরের ভেঁা বেজে উঠল, আধ মিনিটটাক পরে-ই ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন দুই বন্ধু—মওলানা হামিদুদ্দীন খাঁ সেরাজু ও রায় কুমার ব্রজসুন্দর।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।



শিল্পী

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা



৫ম বর্ষ]　　ফাল্গুন, ১৩৩৩　　[৫ম সংখ্যা

সাহিত্যে শ্রীরাধা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের সাহিত্যে শ্রীরাধার চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত রাধা-চরিত্রের সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও, বৈসাদৃশ্যই অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই বৈষ্ণব সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত ;—এক সংস্কৃত, দ্বিতীয় বাঙ্গালা। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থেই ইহার উদাহরণ অধিক পরিমাণে প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত রাধা-চরিত্রের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী॥"

(বিদগ্ধমাধব)

সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধা বলিতেছেন, "যাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া সুখলাভের আশায় গুরুজন হইতে গুরু লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়াছি, হে সখি! প্রাণ হইতে প্রিয়তম হইলেও তোমাদিগকে নানা ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীগণের উপাসিত যে মহান্ পাতিব্রত্যরূপ ধর্ম্ম, তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই ভাবে উপেক্ষিত হইয়া এখনও যে আমি পাপভারাক্রান্ত জীবন বহন করিতেছি, ইহার জন্য আমার ধৈর্য্যকেও ধিক্।"

উপেক্ষিতা, অবমানিতা, কলঙ্কিনী রাধার এই বিষাদময়ী মূর্ত্তি আমরা পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রাচীন কবিগণের কবিতাতে যেমন দেখিয়াছি, এখানেও ঠিক তাহাই দেখিতেছি। এ অবমাননা, এ উপেক্ষা, এ কলঙ্কভারেও কিন্তু রাধার প্রেম সমানভাবে রহিয়াছে, কিছুমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে,—

"অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি! রাধিকে! তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ॥"

(বিদগ্ধমাধব)

রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের সহচরীগণকে দূতীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সহচরীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"হা মেধাবিনি! রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি সদয় হইলেন না, ইহাতে আমরা যে ক্লেশ অনুভব করিতেছি, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার নহে, কলঙ্কের ভার আর বহিতে না পারিয়া আমরা, মনে হয়, শীঘ্রই যমপুরে চলিয়া যাইব, ইহা যে শ্রীকৃষ্ণ বুঝেন না, তাহা নহে, বুঝিয়াও তিনি বঞ্চনা-সমূহের চিরসহচর উপেক্ষাদ্যোতক হাস্ত ক্ষণকালের জন্ম পরিত্যাগ করেন নাই। সখি! এই কৃষ্ণ কে? ইনি আমাদিগের আভীরপল্লীর একটি ধূর্ত্ত লম্পট যুবা, গভীর কপটের দুর্ভেদ্য আবরণে এই কৃষ্ণ সর্ব্বদা আবৃত, সুতরাং সর্ব্বদাই অজ্ঞেয়প্রকৃতি। ইঁহার সকল ব্যবহার আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুমি যে জান না, তাহা নহে, কারণ, তোমার মেধা অসাধারণ। জানিয়াও এই কৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রেম কেন যে উত্তরোত্তর এমন ভাবে বাড়িয়াই চলিতেছে, তাহা আমরা বুঝি না।"

প্রেমময়ী শ্রীরাধার এই উপেক্ষাজনিত বিরসতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মনিবেদনবচনও কেমন স্বাভাবিক ও সকরুণ!

"গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্ত বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা ন হি কিমপি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী॥"

(বিদগ্ধমাধব)

"আমরা অশিক্ষিতা গোপললনা, আজন্মসিদ্ধ অজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্তঃপুরে থাকিয়া খেলা করিয়া থাকি। কি করিলে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, কিসেই বা অমঙ্গল হয়, তাহার কিছুই আমরা বুঝি না। হে নাথ! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহই রক্ষক নাই, আমাদিগকে এমন ভাবে নিরাশ্রয় করিয়া উপেক্ষা করা কি তোমার উচিত? এত আত্মীয়--এত সুহৃদ্ হইয়াও তুমি যে সর্ব্বদা আমাদিগের সহিত উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, ইহা কি তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে?"

সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেমময়ের উপেক্ষায় দিশাহারা হইয়া রাধা যে ভাবে দিনযাপন করিতেছেন, মরণ নিকটবর্ত্তী জানিয়া প্রাণের কথা অন্তিমসময়ে প্রাণপ্রিয় সহচরীবর্গকে যে ভাবে জানাইতেছেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিতায় তাহা বড়ই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা,--

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥"

(বিদগ্ধমাধব)

কৃষ্ণ-প্রত্যাখ্যাতা দূতী সহচরী ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অকরুণ ব্যবহারের কথা শ্রীরাধাকে শোকজড়িতকণ্ঠে নিবেদন করিতেছেন, তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, "সখি! কৃষ্ণের কৃপা হইল না, ইহাতে তোমার অপরাধ কি, এমন করিয়া আর বৃথা কাঁদিও না। আমি ত মরিবই। দেখ সখি, ভুলিও না, মরণের পর তোমাদিগের একটা গুরু কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার মৃতদেহ অগ্নিসাৎ করিও না বা জলে ডুবাইও না; কিন্তু সখি! সেই কৃষ্ণস্পৃষ্ট অভাগিনীর দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া ভাল করিয়া সাজাইও, তাহার পর এই বৃন্দাবনের সেই তমালতরুর স্কন্ধে, সেই দেহের দুইটি বাহু লতিকার ন্যায় জড়াইয়া দিয়া, যাহাতে সে দেহ শীঘ্রই নষ্ট না হয়, সেই ভাবে রক্ষা করিও (আমি জীবিত থাকিতে হয় ত তিনি আমার প্রতি রোষবশতঃ এই বৃন্দাবনে না-ও আসিতে পারেন। কিন্তু আমি মরিয়া গেলে কখনও হয় ত তাঁহার সাধের বৃন্দাবনে তিনি এক দিন আসিবেন। যখন আসিবেন, তখন তাঁহাকে আমার সেই কৃষ্ণ-প্রতিম তমালস্কন্ধে দোদুল্যমান প্রাণহীন দেহকে এক বার দেখাইও)।

শ্রীরূপ গোস্বামীর এই সকল কবিতাতে শ্রীরাধার যে প্রেমময় রূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টভাবে আধ্যাত্মিক রাধাভাবের স্পষ্ট পরিচয় না থাকিলেও, পরবর্ত্তী বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণ এই চরিত্র অবলম্বন করিয়াই যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

কবিরাজ গোস্বামীর অমরকাব্য শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে আমরা এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রাধাভাবের পরিচয় পরিপূর্ণরূপে পাইয়া থাকি। চরিতামৃতকার এই রাধাচরিত্র যে নিজে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে ইহার প্রথম সূচনা, আমরা দেখিতে পাই। প্রথমে শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে কি ভাবে রাধা-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই অগ্রে দেখা যাউক। উজ্জ্বলনীলমণির কথা থাক, তাহা পরে বলিব।

ভগবানের ত্রিবিধ শক্তির বিচার করিতে উদ্যত হইয়া চরিতামৃতকার মধ্য-লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের পরমারাধ্যা রাধার আধ্যাত্মিক চরিত্রের এই কয়টি কবিতাই মূল সূত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি যে রাধারূপে পরিণত হইয়াছেন, এই কয়টি কবিতার দ্বারা সংক্ষেপে তাহাই সূচিত হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদীর অঙ্গীকৃত নির্গুণ, নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্মই নহেন। তিনি সাকার, তিনি সগুণ, তিনি সৎচিৎ এবং আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দের অনুভবিতা এবং নিখিল-জীবকে সেই আত্মানন্দের অনুভাবয়িতা, একই বস্তু একই কালে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া কেমন করিয়া সেই আনন্দের অনুভবিতা হন এবং অপর সকলকেও সেই আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন, এই অতি নিগূঢ় জটিল দার্শনিক রহস্তের সমাধান একমাত্র রাধাতত্ত্বেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদিগের মতে শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শক্তি এক হইলেও পরস্পর ভেদও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভেদের সঙ্গে জড়িত এই অভেদতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রাধাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। চৈতন্ত-চরিতামৃতকার এই কয়টি কবিতায় তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আনন্দরূপ ও চৈতন্তস্বরূপ শ্রীভগবান্ আত্মস্বরূপ আনন্দকে অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল জীবকেই সেই আত্মানন্দ অনুভব করাইবার জন্য যে নিত্যসিদ্ধ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। ইহা যে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই সিদ্ধান্ত, তাহা নহে, পুরাণকর্ত্তা ঋষিগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা বিষ্ণুপুরাণে দুইটি শ্লোকে এই ভাবের সিদ্ধান্তটি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥"

এই দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সভার উপরে ॥
সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিদ্ যারে জ্ঞান করি মানি ॥"

হ্লাদিনীশক্তি ভগবান্‌কে এবং জীবসমূহকে কি ভাবে আনন্দ অনুভব করাইতে সমর্থ হয়, তাহাই ইঙ্গিতে সূচনা করা হইয়াছে,—

"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥"

যে অংশের সাহায্যে হ্লাদিনী উল্লিখিত নিজ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাই হইল হ্লাদিনীর সার অংশ। চরিতামৃতকারের মতে তাহাকে প্রেম বলা যায়। প্রেম বলিলে ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুসারে কি বুঝা যায়, চরিতামৃতকার তাহাও বলিয়াছেন—

"আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান"।

এখানে যে "রস" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ— যাহার দ্বারা চিন্ময় আনন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ 'অভিলাষ।' এ কিসের অভিলাষ? আনন্দকে, চিন্ময় বস্তুকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিবার জন্য জীবের আজন্মসিদ্ধ যে সুখভোগবিষয়ক অভিলাষ, তাহাই হইল এ স্থলে "রস" শব্দের অর্থ। প্রেম বা প্রীতির স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রধানতম পুরুষ শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উল্লাসময়, প্রকাশময় যে অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা, তাহাই হইল প্রেম বা প্রীতি শব্দের মুখ্য অর্থ। প্রেম না হইলে আনন্দের অনুভব পূর্ণভাবে হইতে পারে না বলিয়া, সর্ব্বদা সকলের আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য প্রবৃত্ত যে হ্লাদিনীশক্তি, তাহাই সকল জীবের হৃদয়ে আনন্দানুভব করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষারূপ যে প্রেম, তদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

মনুষ্যমাত্রের চরিত্র অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই যে, সকলেই আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সুখভোগের লালসা বা আকাঙ্ক্ষায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই যে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, ইহা জীবনে কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না। নিত্য নূতন নূতন ভোগ্যবস্তুর লাভে ক্ষণিক তৃপ্তি অনুভব করিবার পরক্ষণে আবার নূতন করিয়া সুখাস্বাদনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈষয়িক আনন্দের আস্বাদনে কিছুতেই এ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করে না। কেন এমন হয়? সুখের জন্য লালায়িত জীব, বহু দিন হইতে সঞ্চিত বড় আশার বিষয় ভোগ্যবস্তু পাইয়াও, সুখের আস্বাদন করিয়াও, আপনাকে যে তৃপ্ত বা চরিতার্থ বলিয়া বোধ করে না, অজ্ঞাত নূতন সুখের আশায় পরক্ষণে আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে, কেন এমন হয়?

ইহার উত্তর দিতে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, আমরা যে সুখের আশায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকি, সেই সুখ বাস্তবিকপক্ষে প্রাকৃত বিষয় হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। যাহা অপ্রাকৃত, যাহা নিত্যসিদ্ধ, ... সর্ব্বত্র বিরাজমান সেই অপরিচ্ছিন্ন অনাদিনিধন ভগবান্‌ই বাস্তবিক সেই সুখ। অপরিচ্ছিন্ন ভগবৎস্বরূপ সেই সুখকে আস্বাদন করিবার জন্য আমাদিগের আজন্মসিদ্ধ যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা পরিচ্ছিন্ন, পরিণামবিরস এবং বিনাশভীতি-সমাকুল বৈষয়িক সুখের আস্বাদনে চরিতার্থ হইতে পারে না। যে সকল বস্তুকে আমরা সুখের সাধন বলিয়া বিবেচনা করি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে সুখের সাধন নহে। কিন্তু সুখাভাসেরই তাহা সাধন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জীবের দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মভাব বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত মানবের এই সকল প্রাকৃত বিষয়েই সুখ-সাধনত্ব-জ্ঞান হইয়া থাকে। যাহা বাস্তবিক সুখের সাধন নহে, তাহাকেই সুখ-সাধন বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি বলিয়াই, ঐ সকল বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখী হইলাম বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। যে পর্য্যন্ত জীবের সেই পরমাত্মরূপ নিত্যসুখের দিকে মনোবৃত্তি ধাবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত অতৃপ্তি বিদ্যমানই থাকে, কখনই নিবৃত্ত হইতে পারে না, একবার কিন্তু তাঁহারই কৃপায় সেই ভগবান্ যদি নিজ আনন্দস্বরূপ চিন্ময় মূর্ত্তির আস্বাদন করুণাবশতঃ করাইয়া দেন, তাহা হইলে আর মানব কখনও বিষয়সম্পর্কজনিত সুখাভাসের প্রাপ্তি-লালসায় ব্যাকুল হয় না। তখন তাহার আজন্মসিদ্ধ বৈষয়িক সুখবিষয়ক যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই বিষয়াবেশ পরিহার করত সেই নিত্য-সুখরূপ ভগবদ্‌বিগ্রহের নিরন্তরানুভূতির জন্য যে 'আকাঙ্ক্ষা' বা 'রতি', তদ্রূপেই পরিণত হইয়া থাকে, এই রতিই হইল শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি।

চরিতামৃতকার ইহারই স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, "হ্লাদিনীর সার প্রেম।" এই প্রেম যে পর্য্যন্ত ভাবরূপে পরিণত না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব সাধারণ ভক্ত বা বৈধভক্তরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। নিজ নিজ অধিকারের অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এই রতি বা নিত্য সুখস্বরূপ ভগবদ্দর্শনবিষয়ক লালসা জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই আবার যখন ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়, তখনই তাহাকে আচার্য্যগণ 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই 'রাগাত্মিকা ভক্তি' আবার যখন সর্ব্বপ্রকারের স্বার্থসম্পর্কবিরহিত হইয়া মোদন নামে প্রসিদ্ধ মহাভাব-রূপে পরিণত হয় তখনই তাহাকে ...

'মধুরভক্তি' বা 'মহাভাব' এইরূপ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব কবিগণ এই মোদনাখ্য মহাভাবকেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'সাধ্যভক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভগবানের মধুর লীলাবিষয়িণী যে ইচ্ছা নিত্যসিদ্ধভাবে বিরাজমান আছে, সেই ইচ্ছাবশতঃ এই মোদনাখ্য মহাভাবে যখন স্বয়ং অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃত আকার ধারণ করিয়া সংসারে মধুর রসের পারাবার সৃষ্টি করে, সেই অবস্থাতেই এই মোদনাখ্য ভাব রাধারূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তানুসারে বাস্তব রাধাতত্ত্ব। কত প্রকারে কত অপূর্ব্বভাবের মধ্য দিয়া এই আধ্যাত্মিক রাধার স্বরূপ ভক্তিরাজ্যে আত্মবিকাশ করিয়া, ভগবানের মধুর লীলাশক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করে, ভক্ত কবিগণের কবিতাসমূহে পরবর্ত্তী কালে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, এইবার তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ঝাউ

ঝাউ—ঝাউ—ঝাউ, বিরাট বিপুল যৌবন-ভরা বিটপি-রাজ!
আছ চিরকাল পরিয়া ভয়াল কালভৈরব ভীষণ-সাজ!
বনে কান্তারে অদ্রির 'পরে
রুদ্রের তুমি মহারূপ ধ'রে
শুরু গম্ভীর, ওগো ধ্যানবীর, আছ ওই শির উচ্চ করি!
আসন্ন-ঝড় মেঘের মতন প্রলয়-করাল-মূরতি ধরি!

ডালে ডালে তব পাতায় পাতায় শন্ শন্ শন্ প্রলয়-শীষ্!
বাজে যেন কোন্ বিদ্রোহ-ভরা হৃদয়ের ব্যথা অহর্নিশ!
শোঁ শোঁ-শোঁ কি যে আফ্‌শোস
কি যে বুক-ফাটা বিপ্লব-রোষ—
অনন্ত কাল কি অসন্তোষ, কি যে অশান্তি বাজিছে তোর!
কালভৈরব, বাজাইতে চাও, কোন্ ভৈরব রাগিণী ঘোর!

শাখে শাখে তব লুকায়ে রয়েছে কাল-বৈশাখীর রুদ্রবীণ!
ঝঞ্ঝার তুমি ঝঙ্কার তোল দাঁড়াইয়া পথে হে উদাসীন!
তুমি চির দিন ডেকে আন বনে
গ্রীষ্মের সেই খর যৌবনে,—
প্রলয় রাগিণী-জননীর তুমি গাও আগমনী-দীপক গান!
বজ্রের আলা প্রদীপের তুমি পলিতার ছায়া মূর্ত্তিমান্!

তব কালো ছায়ে কাঁপে মাঝে মাঝে ভারতের সেই অতীত স্মৃতি!
স্বপনের সম সেই স্বাধীনতা, এই হতভাগা দেশের প্রীতি!
আজ সেই কথা অসার নাটক,
মোরা শুধু তার বিলাসী পাঠক;
কোথা স্বাধীনতা? পাগলের কথা! অভিধান লেখা আখর শুধু!
সেই ইতিহাস ফেলিতেছে শ্বাস, অতীতের কোলে জ্বলিছে ধূ-ধূ!

মাঝে মাঝে তব ডালে ডালে হেরি নাচে মোর সেই করালী কালী!
পাতায় পাতায় দাও করতালি সাজায়ে প্রলয় ঝড়ের ডালি!
মাঝে মাঝে তুমি মোরে আশা কহ
ওগো যৌবন-বার্ত্তাবহ,
মুক্তির তুমি দূতরূপে যেন নেচে উঠ মহা উল্লাসে!
শোঁ-শোঁ শোঁ বাজে সেই ধ্বনি প্রাণে প্রাণে কি যে জয়-আশে!

মনে পড়ে আমি প্রথম জীবনে যেতাম যখন গ্রামান্তরে,
এই হৃদয়ের অর্ঘ্য সাজায়ে বাণীর চরণ সেবার তরে;—
সম্মুখে তুমি পথ রোধ করি'
শোঁ-শোঁ করি শাসাইতে যেন খালের ওপারে বালুর চরে!
গ্রামের শ্মশানে সেই ধ্বনি যেন বাজিত কি এক ভয়াল স্বরে!

বিস্ময় ভয়-ব্যাকুলিত চোখে চাহিতাম তব রূপের পানে!
কালো ভীমকায়, আদিম পুরুষ—চুমিতে চাইতে নীল বিমানে!
আমি ভীত হ'লে তুমি স্নেহভরে
সুশীতল ছায়া বিস্তার ক'রে
মৃদুল বীজনে অভয় দানিতে পিতামহ-সম আদর করি—
মানব নাতিনে, মহান্ বিটপি! তোমার সে স্নেহ আজিও স্মরি।

সেই কৈশোরে করিয়াছ কত ভয়-কৌতুক রসের খেলা!
ওগো পিতামহ, আজ যৌবনে ফিরায়ে দাও সে হাসির বেলা!
নিশীথে তোমার শোঁ শোঁ স্বরে
চমকিয়া উঠি শয্যার 'পরে
অমনি লজ্জা ঘিরে আসে মোর নিদ্রা বিহীন নয়ন-পাতে!
ভারত এখনো রয়েছে অধীন! কাঁদি এই বুক চাপিয়া হাতে!

ওগো ঝাউবন! ঝরা-যৌবন ফিরিবে কি পুনঃ ভারত-বুকে?
তোমার বীণার রুদ্র রাগিণী বাজিবে কি গাঢ় উগ্র সুখে?
কাল বোশেখীর রোমহর্ষণ
ছুটিবে কি ঝড় জ্বালা-বর্ষণ—
রবি-শশী-সোমে মহাব্যোমে ব্যোমে নৃত্য চলিবে উন্মাদিনী!
উল্কার মুখে রক্ত ঝলকে কালপুরুষের ফুটিবে হাসি?

পত্রে পত্রে ফাগুনের সেই রক্ত-রঙিন্ চিত্রখান।
কালের শিল্পী তুলিকা ধরিয়া দিবে নাকি তার রেখায় টান?
ঊর্দ্ধ বিষের নিশ্বাস ছাড়ি'
সহিষ্ণু এই ধরণী কি ভারি
গ্রীষ্মের সেই মহাকাশ্মুকে টঙ্কার পুনঃ দিবে না আর?
কর্ম্মযোগের ধ্বনি-ঝঙ্কারে ভাঙ্গিবে না জড়-অহঙ্কার?

তব বুকে বুকে জাগে যেই রোল যুগ-বিপ্লব-প্রলয় তৃষা!
এই ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই ক্রন্দন-ধ্বনিরে মিশা!
ঘাটে মাঠে পথে গিরি-ঘন-বনে
শন্ শন্ শন্ গুরু নিঃস্বনে
বাজুক আবার লাঞ্ছনাজয়ী হিংসার ঝড় ঝাপট্-রোল!
ওরে ঝাউ, তব ডালে ডালে পুনঃ দীপকরাগিণী রাগিয়ে তোল!

মহাভারতের প্রসিদ্ধ চরিত্র

প্রাচীন পুরাণসমূহের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান সর্ব্বোচ্চ। রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কি না, ইহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এখনও অনেক তর্কবিতর্ক চলিতেছে। কাব্যাংশে কোন্‌খানি শ্রেষ্ঠ, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু নীতিগ্রন্থ হিসাবে মহাভারত যে অতুলনীয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দু রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি ও লোকাচার সম্বন্ধে এই বিরাট পুরাণখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া বহুকাল পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল এবং এখনও সেইরূপ বিবেচিত ও সমাদৃত। এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে পঞ্চম বেদ বলিয়া থাকেন। এখনও কথায় বলে—"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।"

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মূল মহাভারতের আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল—উহাতে নীতিবিষয়ক উপদেশ ও আখ্যায়িকা-নিচয় সময়ে সময়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার কলেবর সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। এইরূপে মহাভারতের মূল আখ্যান বস্তুটির ধারাবাহিকতার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। কিন্তু মহাভারতের মূল গল্পটি এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া মূল গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রধান প্রধান চরিত্রের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

আদিপর্ব্বের অনুক্রমণিকায় মহাভারতের আখ্যান বস্তুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপে প্রদত্ত :—

"বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যক্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্।
দুর্ব্বৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্ ভগবানৃষিঃ॥"

কুরুবংশের বিবরণ, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সত্যতা এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা মহর্ষি দ্বৈপায়ন সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥"

"বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন পুষ্প ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদ।)

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটি হইতে মহাভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তির নাম পাওয়া গেল :—

কুরুপক্ষীয়—ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি।

পাণ্ডবপক্ষীয়—শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব।

নামের তালিকাটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমরা পাণ্ডবপক্ষে কেবল কৃষ্ণার নাম এবং কুরুপক্ষে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নাম যোগ করিব। তবেই দাঁড়াইল ;—

কুরুপক্ষে—ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য।

পাণ্ডবপক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা।

ভীষ্ম

শান্তনু রাজার তনয় দেবব্রত যৌবনে দাসরাজের কন্যা সত্যবতীর সহিত স্বীয় পিতার বিবাহ-সংঘটনার্থ যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কারণেই তিনি তদবধি ভীষ্ম নামে

খ্যাত হইয়াছিলেন। সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রই শান্তনু রাজার উত্তরাধিকারী হইবে, এই আশ্বাসে দাসরাজকে এই সর্ত্তে কন্যাদানে সম্মত করিবার জন্য দেবব্রত বিনা বিচারে নিজের উত্তরাধিকার-স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দাসরাজ ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পাছে দেবব্রতের কোনও অপত্য ভবিষ্যতে রাজ্যপ্রার্থী হয়। তখন দেবব্রত এই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

"রাজ্যং তাবৎ পূর্ব্বমেব ময়া ত্যক্তং নরাধিপাঃ।
অপত্যহেতোরপি চ করিষ্যেঽস্য বিনিশ্চয়ম্॥
অদ্য প্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যাপি মে লোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি॥"

"পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ইতঃপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ।)

সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র জন্মে—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য।

শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন, কিয়ৎকাল পরে গন্ধর্ব্ব-সমরে নিহত হন। তখন বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন এবং বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী পরম রূপবতী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ সম্পাদন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিচিত্রবীর্য্যের নিঃসন্তান অবস্থায় অকালমৃত্যু হয়। তখন সত্যবতী বংশরক্ষার জন্য ভীষ্মকে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদনে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

মহাত্মা ভীষ্ম চিরকৌমারব্রত পালন পূর্ব্বক "কুরুবৃদ্ধ পিতামহ"রূপে কুরুরাজ-সংসারেই চিরজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর পুত্রগণকে নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। পরে যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা পাণ্ডবদিগের প্রতি দান করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। পরিশেষে যখন উভয় পক্ষের মধ্যে মহাসমর উপস্থিত হইল, তখন তিনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে কুরুপক্ষীয় প্রধান সেনাপতির পদে বৃত হইয়া দশম দিনের যুদ্ধে পরাজিত হন ও শরশয্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার পরাজয়কাহিনীও তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। ভীষ্মকে কোনও মতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, যুধিষ্ঠির অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীষ্মকেই তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করেন। আত্মত্যাগী মহাপুরুষ তদুত্তরে বলিলেন, "তোমার সৈন্যমধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ দ্রুপদতনয় আছেন, উনি যেরূপে স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ; বর্ম্মিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নিশিত বিশিখজালে আমারে প্রহার করুন। শিখণ্ডী অমঙ্গল্যধ্বজ, বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্ব্ব, অতএব উঁহারে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শর দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করুন।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত)

"কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ এইরূপ উপায় অবগত হইয়া কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বশিবিরে আগমন করিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় প্রাণপরিত্যাগে সমুদ্যত পিতামহের বাক্যশ্রবণে দুঃখ-সন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'মাধব! বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-ধূসরিত-কলেবরে যাঁহারে ধূলি-ধূসরিত করিতাম, অঙ্কে আরোহণ করিয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে যিনি কহিতেন, আমি তোমার পিতা নই, তোমার পিতার পিতা,—সেই বৃদ্ধ পিতামহের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে বধ করিব?' "

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত)

বাসুদেবের উপদেশে অর্জ্জুন পরে ভীষ্মবধে সম্মত হইয়াছিলেন এবং মহাযুদ্ধের দশম দিবসে শিখণ্ডীর পশ্চাতে থাকিয়া নিশিত শরজালে পিতামহকে এরূপ বিদ্ধানুবিদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি ব্যথায় কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"নিকৃন্তমানা মর্ম্মাণি দৃঢ়াবরণভেদিনঃ।
মুষলা ইব মে ঘ্নন্তি নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ॥"

এই যে দৃঢ়াবরণভেদী মর্ম্মচ্ছেদী বাণসমূহ মুষলের ন্যায়

অবশেষে ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিলেন। দিবাকর তখন দক্ষিণায়নে অবস্থিত থাকায় পরলোকগমন সুখদ হইবে না বলিয়া ইচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষ সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রায় দুই মাসকাল শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। এই সময়ে তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সংসারযাত্রার উপযোগী বিবিধ অনুশাসন বিবৃত করিয়াছিলেন। ভীষ্মের শরশয্যার অপূর্ব্ব দৃশ্য জগতের সাহিত্যে আর কোথাও নাই। সে সময় মহাপ্রাণ ক্ষত্রিয়বীর মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও অমর্ত্ত্যের ন্যায় রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

"লম্বমানমস্তক কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব আমারে উপধান প্রদান কর।' ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম, কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, 'হে পার্থিবগণ! এ সকল উপধান এই বীর-শয্যার উপযুক্ত নয়।' অনন্তর পুরুষপ্রধান পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! হে মহাবাহু! হে বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে, অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।'"

ধনঞ্জয় গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "হে পিতামহ! আমি আপনার ভৃত্য, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে; তুমি সমর্থ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রধর্ম্মের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, অতএব উপযুক্ত উপধান প্রদান কর।"

ধনঞ্জয় তথাস্তু বলিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ, গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নত-পর্ব্ব শর সমুদায় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগ সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে শরত্রয় তাঁহার মস্তককে বিদ্ধ হইয়া উপধানস্বরূপ হইল। সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম পরিতুষ্টচিত্তে উপধান দানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে সভাজন করিলেন। * * * * । ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পার্শ্বস্থিত রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! দেখ, ধনঞ্জয় আমার উপধান আহরণ করিয়াছে; সূর্য্যের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। * * * *।'

অনন্তর শল্যোদ্ধারণকুশল সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! সৎকারপূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে ভূপালগণ! শরশয্যাগত ভীষ্মের এরূপ ধর্ম্ম নয়; এক্ষণে আমারে এই সমুদায় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে।'

ধৃতরাষ্ট্র

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলাভ ও অযথা পুত্রস্নেহই কুরুকুলধ্বংসের মূল কারণ। প্রব্রজ্যাশ্রয়ী রাজা পাণ্ডু বনবাসে মৃত্যু হইলে তাপসগণ যখন কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে লইয়া যান, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজ তনয়গণের সহিত পাণ্ডুপুত্রদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। প্রজারা অচিরাৎ পাণ্ডবগণের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল—

"যুধিষ্ঠিরস্য শৌচেন প্রীতাঃ প্রকৃতয়োঽভবন্।
ধৃত্যা চ ভীমসেনস্য বিক্রমেণার্জ্জুনস্য চ॥
গুরুশুশ্রূষয়া কুন্ত্যা যময়োর্বিনয়েন চ।
তুতোষ লোকঃ সকলস্তেষাং বীর্য্যগুণেন চ॥"

"যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল-সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রজারা অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদ)

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষি[illegible] করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, পাণ্ডব[illegible] বিক্রমাতিশয়ে পররাষ্ট্র জয় করিয়া কুরুরাজ্য বৃদ্ধি[illegible]

করিতেছে, তখন তাঁহার পাণ্ডবগণের প্রতি সদ্ভাব দূষিত হইল এবং দুশ্চিন্তায় নিদ্রাত্যাগ হইল।

শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ মন্ত্রণা করিয়া মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে এককালে ভস্মসাৎ করিবার জন্য তথায় পাঠাইয়াছিলেন। কেবল বিদুরের সতর্কতায় দুরাত্মাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই।

দ্রৌপদীলাভে পাণ্ডবগণের পুনরভ্যুদয়ের কথা শুনিয়া ভীত ও লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের কুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও বিদুরের ন্যায়ানুগত পরামর্শানুসারে পাণ্ডবগণকে পাঞ্চাল নগর হইতে হস্তিনা-পুরে আনাইয়াছিলেন। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে খাণ্ডবপ্রস্থে (যাহা পরে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে খ্যাত হইয়াছিল) পাণ্ডবদিগের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই বন্দোবস্ত বজায় থাকিলে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু পাপমতি দুর্য্যোধন কুক্ষণে কপট দ্যূতকুশল শকুনির পরামর্শে, পাণ্ডবদিগকে হৃতশ্রী করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধরাজকে শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজ্যলোলুপ মূঢ়মতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তৎক্ষণাৎ বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর দ্যূতক্রীড়ায় কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলাতেও ধৃতরাষ্ট্র নিরস্ত হন নাই। যুধিষ্ঠির দ্যূত যে কলহের আকর, তাহা জানিয়াও কেবল জ্যেষ্ঠতাতের আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুরে গেলেন এবং সানুজ দ্যূতসভায় উপস্থিত হইলেন। শকুনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল। শকুনির কপট অক্ষপাতে যুধিষ্ঠির একে একে রাজ্যধনাদি হারাইয়া প্রত্যেক ভ্রাতাকে এবং অবশেষে আপনাকে পণ রাখিয়া পরাজিত হইলেন। শকুনি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "ধন অবশিষ্ট থাকিতেও যে আত্মপরাজয় ঘটায়, সে পাপানুষ্ঠান করে। তুমি পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে পণ রাখিয়া পুনরায় আত্মজয় কর।"

"পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জ্জয়।"

তখন যুধিষ্ঠির দ্যূতমদে মত্ত ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"এবমুক্তে তু বচনে ধর্ম্মরাজেন ধীমতা।
ধিগ্ধিগিত্যেব বৃদ্ধানাং সভ্যানাং নিঃসৃতা গিরঃ॥
চুক্ষুভে সা সভা রাজন্ রাজ্ঞাং সঞ্জজ্ঞিরে শুচঃ।
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত॥
শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ।
আস্তেধ্যায়ন্নধোবক্ত্রো নিশ্বসন্নিব পন্নগঃ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত॥
জহর্ষ কর্ণোঽতিভৃশং সহ দুঃশাসনাদিভিঃ।
ইতরেষান্তু সভ্যানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্॥
সৌবলস্ত্বভিধায়ৈবং জিতকাশী মদোৎকটঃ।
জিতমিত্যেব তানক্ষান্ পুনরেবান্বপদ্যত॥"

"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণ পূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গতসত্ত্বের ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া 'জয় হইল কি ? জয় হইল কি ?' এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্য অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ)

অতঃপর রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দুঃশাসন কর্ত্তৃক সভাস্থলে আনাইয়া দুর্য্যোধন ও তাঁহার কর্ণাদি সহযোগিগণ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে কৃষ্ণা ও পাণ্ডবগণের যে অকথ্য অপমান করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া, কিরূপে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় পরিশেষে মুক্তিলাভ

করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া কেবল তাহাই দেখাইব।

"তাঁহাদের এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমন সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র-গৃহে গোমায়ু ও গর্দ্দভ-গণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং ভয়ানক পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল। তত্ত্ববিৎ বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিদ্বান্ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী ঐ ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।"

"তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'অরে দুর্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একেবারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু কুরুকুলকামিনী, বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস্।' পরম প্রাজ্ঞ বান্ধবগণ-হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, 'হে দ্রুপদ-তনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

দ্রৌপদী কহিলেন, 'হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি সদয় হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উঁহার দাসপুত্র হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।' ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।'

"দ্রৌপদী কহিলেন, 'হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব-মোচন হউক।' ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 'হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনারূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর; এই দুই বরদান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

"দ্রৌপদী কহিলেন, 'হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না।'

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। দ্যূতক্রীড়ার বিষময় ফল এইখানেই বিফল হইত, যদি পুত্রপক্ষপাতী অন্ধরাজ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরাদির নিষেধ না মানিয়া, দুর্য্যোধনের অনুরোধে যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার দ্যূতে আহ্বান না করিতেন।

যুধিষ্ঠির দ্যূতসভায় আসিবামাত্র শকুনি তাঁহাকে বলিলেন, "বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন পণ অবধারিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক মহারণ্যে দ্বাদশ বৎসর ও জনসমাকীর্ণ প্রদেশে অজ্ঞাতভাবে এক বৎসর বাস করিব এবং অজ্ঞাতবাস প্রকাশ হইলে আরও দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকে অজিন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণার সহিত দ্বাদশ বৎসর বনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে হইবে। এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করি।"

(কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত)

এবারের কপটদ্যূতেও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, তন্নিবন্ধন পাণ্ডবগণের কৃষ্ণাসহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এবং তৎপরে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, প্রার্থিত পাঁচখানি গ্রাম দিতেও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন অস্বীকৃত, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য লোকক্ষয় ও কুরুকুলের ধ্বংসের কথা কে না জানে? পুত্রশোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রের তখনও দুর্ম্মতি দূর হয় নাই। তিনি পুত্রহন্তা ভীমসেনকে আলিঙ্গনচ্ছলে বধ করিবেন বলিয়া সস্নেহে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাসুদেব তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎসমীপে ভীমের এক লৌহময় প্রতিকৃতি উপস্থিত করিয়াছিলেন। অন্ধরাজ সেই লৌহভীমকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া এরূপ সজোরে নিষ্পেষিত করিয়াছিলেন

যে, উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি নিজেও সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। ইহার পর ভীমের সহিত তাঁহার আর কখনও আন্তরিক সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্র শেষ-বয়সে তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিবার পঞ্চাশ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বনমধ্যে আকস্মিক দাবানলে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা পাণ্ডু প্রব্রজ্যাবলম্বন করায় পরে বিস্তীর্ণ কুরুরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি যদি পাণ্ডবগণের প্রতি প্রথমে যেরূপ সদ্ভাবাপন্ন ছিলেন, বরাবর সেইরূপ থাকিতেন এবং তাঁহার দুর্বিনীত পাণ্ডববিদ্বেষী পুত্রগণকে অন্যথা প্রশ্রয় না দিতেন, তাহা হইলে ন্যায়নিষ্ঠ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে আজীবন পিতৃসম্মান প্রদান করিতে কদাপি ত্রুটি করিতেন না। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধু-বেদনা

হে উদার নীলসিন্ধু, করুণার মহাপারাবার,
হে বিরাট বিশাল জলধি!
অজ্ঞ জনে ভাবে মনে সৃজনের প্রারম্ভ হইতে
তুমি বুঝি আছ নিরবধি।
বিক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদি, উদ্বেলিত উচ্ছলিত প্রাণ,
বক্ষে লয়ে অনন্ত কল্লোল
ভৈরব ভ্রূকুটিভঙ্গে মহারঙ্গে ভীম অট্ট হেসে
তরঙ্গে তরঙ্গে খেয়ে দোল,
উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে মথিত করিয়া ধরণীরে
লক্ষ বাহু তুলি' ঊর্দ্ধপানে
বিস্মিত সন্ত্রস্ত করি' নিখিল এ বিশ্ববাসী
উচ্ছ্বসিত বিচ্ছেদের গানে
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, হা হুতাশ, নাই নাই রব
দিখিদিকে করিয়া প্রচার,
হে নিত্য ব্যথিত সিন্ধু, নিরাশার অশান্ত প্রতিমা,
বিরাজিছ মূর্ত্তি বেদনার।

নহে নহে হে বারিধি! চিরদিন ছিল না তোমার
শ্রান্তিহীন বিপুল এ ব্যথা,
মর্ত্ত-ভূমি ধন্য করি' এক দিন এনেছিলে
স্বর্গ হ'তে শান্তির বারতা,
অনন্ত বৈভবে পূর্ণা, সগৌরবে ছিলে এক দিন
ছিলে তাই সুখে নৃত্যপরা,
কনক-অঙ্গনে তব সঙ্গোপনে করিত বসতি
মনোহরা উর্ব্বশী অপ্সরা,
উচ্চগ্রীব উচ্চৈঃশ্রবা, বাসবের বাঞ্ছিত বাহন
ঐরাবত বৈরি-চিরত্রাস,
ব্যাধি-অরি ধন্বন্তরি, পারিজাত অম্লানযৌবনা
গৃহে তব করিত হে বাস,
তোমারি ভাণ্ডারে ছিল বারুণী সে বিশ্ব-বিমোহিনী,
ছিল মৃতসঞ্জীবনী সুধা,
লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি, খনি তুমি কৌস্তুভ মণির ;—
দীপ্ত হ'ল তস্করের ক্ষুধা—

তোমার ঐশ্বর্য্যে যবে,—মসীলিপ্ত সে কলঙ্ক-কথা,
রাহুগ্রস্ত সে ঘোর দুর্দ্দিন,
হে জননী-জলরূপা, সন্তানের চিত্তপটে কভু
সেই চিত্র হবে না মলিন।
দ্বন্দ্ব ভুলি' সুরাসুর, পর ধনে হয়ে লোভাতুর,
দুর্ব্বলেরে করিয়া বঞ্চন
হরিতে তোমার বিত্ত, কুণ্ঠাহীন চিত্তে করেছিল
লুণ্ঠনের কত আয়োজন,
মন্দার মন্থন-দণ্ড, জয়োল্লাসে বর্ব্বর দস্যুর
কি প্রচণ্ড ঘর্ঘর ঘর্ষণ,
বাসুকি বেষ্টন-রজ্জু নিশ্বাসে নিশ্বাসে তার শুধু
তপ্ত তীব্র গরল-বর্ষণ।
গর্জ্জিয়া উঠিলে তুমি, বাড়বাগ্নি বক্ষোমাঝে তব
রুদ্র তেজে উঠিল শ্বসিয়া,
প্রলয়ের কাল গণি' সমগ্র তারকা-গ্রহ লয়ে
নভস্তল পড়িল খসিয়া,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে তব শঙ্কাতুর পাণ্ডুর বদনে
কম্পমান দেবতা-দানব,
নিদারুণ এ সঙ্কটে জননীর করুণ আহ্বানে,
সাড়া শুধু দিল না মানব!
কাপুরুষ পুত্র তব শত্রু সনে যুঝিল না হায়,
দাঁড়া'ল না তোমারে ঘিরিয়া,
সে ঘৃণ্য হীনতা হেরি, রোষে ক্ষোভে রুদ্ধ অভিমানে
বক্ষ তব গেল মা চিরিয়া,
লুকালে করাল মূর্ত্তি, মরমের ব্যর্থ বেদনায়
সংবরণ করি' আপনারে,
শত্রুরে করিলে দান, কুপুত্রের প্রায়শ্চিত্ত লাগি',
যাহা ছিল তোমার ভাণ্ডারে।
সে মুহূর্ত্ত হ'তে মা গো! হতভাগ্য মর্ত্ত্যবাসী 'পরে
টুটিয়াছে তোমার বিশ্বাস,
দগ্ধ হৃদয়ের তব অনির্ব্বাণ আগ্নেয়গিরি হ'তে
অবিশ্রাম উঠিছে নিশ্বাস।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।



অধিকার

১

নিদ্রাতুর বালকের মত তাহার জীবনের একটি উৎসব-রাত্রি কেমন কলরব করিতে করিতে হঠাৎ কিসের ভয়ে কেন যে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তর প্রতিমার চিন্তাশ্রান্ত মন কোনমতেই দিতে পারিল না। সে দিন গৌরীদানের তুচ্ছ উপহারের মতই সকলে তাহাকে সাজাইয়াছিল, কিন্তু তাহার কেবলমাত্র এইটুকু স্মরণ আছে যে, সেই রাত্রিতে সেই সাজেই সজ্জিত হইয়া সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়াছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপিও প্রতিমা প্রদীপ জ্বালিল না। সুখ-দুঃখের পট-পরিবর্ত্তনের মত আলোক ও আঁধারের খেলা লইয়া আকাশে চাঁদে ও মেঘে শক্তিপরীক্ষা চলিয়াছে, প্রতিমা তাহার অন্ধকার ঘরের জানালা হইতে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার মনটি যেন ভূমিকম্পের ধ্বংস-স্তূপ; সুখ-দুঃখ তাহাতে নিহিত আছে, কিন্তু বাছিয়া লওয়া শক্ত। মাত্র কয়েক দিনের সুখস্মৃতি! তাহার পর ভগ্নহৃদয় পিতার গম্ভীর মুখ ও মাতার স্নেহাশ্রু, তাহাও যেন অতীতের কুয়াসায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশেষে তাহার চলা পথই যে কৃষ্ণকিশোরের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, তাহাই আজ বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু যে অশান্তির তাড়নায় সে এক দিন মুক্তির জন্য কাতর অপেক্ষায় ছিল, আজ সেই অশান্তির মালাই যে কৃষ্ণকিশোরের গলায় দুলাইয়া তাহার আত্মীয়-বিচ্ছেদের সূত্রপাত করিল। প্রতিমা ভাবিল, সমাজ ত রূপবিহীন অঙ্গ-সৌষ্ঠবশূন্য প্রাণহীন কঙ্কাল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে! সে না হয় কঙ্কালই থাকিত! কেন কৃষ্ণকিশোর সেই কঙ্কালে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিল? অলক্ষিতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, প্রতিমা তাহা অঞ্চল দিয়া মুছিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ ক'রে ব'সে কি ভাবছিলে,

ইতোমধ্যে কখন্ যে কৃষ্ণকিশোর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, প্রতিমা তাহা জানিতে পারে নাই। সে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া ম্লান হাস্যে বলিল, "বেশ যা হ'ক,—কখন্ বেরিয়েছিলে বল দেখি।" তাহার পর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ও বাড়ীতে গিয়েছিলে?"

কৃষ্ণকিশোর নৈরাশ্যভরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হাঁ— দেখা দিয়ে বেশী ক'রে চটিয়ে দিয়ে এলাম।"

উদাসনেত্রে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া প্রতিমা বলিল, "কেন?"

কৃষ্ণকিশোর বলিল, "তোমাকে ত্যাগ করতে পারব না ব'লে।"

এই চিন্তাই কয়েক দিন ধরিয়া প্রতিমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

"আচ্ছা, এ দুর্ভাগ্যের বোঝা কেন তুমি বইবে?" বলিতে বলিতে প্রতিমা কাঁদিয়া ফেলিল। "আমাকে আশ্রয় দিয়ে তুমিও কেন আমার কলঙ্কের ভাগী হ'তে চাইছ?"

বিষণ্ণমুখে কৃষ্ণকিশোর বলিল, "দুর্ভাগ্যটাই আমার সয় ভাল, প্রতিমা,—তা না হ'লে এত অল্পবয়সে বাপ-মা-হারা হব কেন?"

প্রতিমা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কৃষ্ণকিশোর ডাকিল, "প্রতিমা", কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

কৃষ্ণকিশোর হতাশভাবে বলিল, "দুর্ভাগ্যের বোঝা বওয়ার কি এই পুরস্কার প্রতিমা? তোমার চোখের জল কি তার সান্ত্বনা?"

প্রতিমা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বলিল, "চল, খাবে চল।"

কৃষ্ণকিশোর ক্লিষ্টহাসি হাসিয়া বলিল, "বেশ,—সমস্ত জিনিষটা ভাল ক'রে পরিপাক হবার অবসর কি দেবে

তোমার অশ্রু ! এর বিপক্ষে হঠাৎ খাওয়ার প্রবৃত্তিটা কোথা ধার করতে যাব বল।"

প্রতিমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণকিশোর প্রতিমাকে টানিয়া বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া শুইয়া পড়িল। প্রতিমা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দেখ, তুমি আবার বিয়ে কর, ওঁরা যা বলেন, তাই শোন।"

কৃষ্ণকিশোর সে কথার কোন উত্তর দিল না। শুইয়া শুইয়া কৃষ্ণকিশোর তাহার দাদার কথা ভাবিল। সর্ব্বদিক্ দিয়াই তাহার দাদাকে যেন স্নেহপ্রাণ সরল মানুষ বলিয়া তাহার মনে হইল। পিসীমার জন্যই ত প্রতিমাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, নচেৎ—

কম্পিত স্বরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার একটা কথা রাখবে ?"

অন্যমনস্কভাবে কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

প্রতিমা বলিল, "আমাকে একবার ও বাড়ীতে নিয়ে যাবে ?"

কৃষ্ণকিশোর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দেখ, তোমার মান-অপমানের সঙ্গে আমার জীবনের অনেকখানি জড়িত, তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পার,—অতএব তাঁরা যে তোমায় কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তা ভেবে কায করা উচিত নয় কি ?"

কৃষ্ণকিশোরের কথায় প্রতিমা নিরুৎসাহ হইয়াও দৃঢ় স্বরে বলিল, "শ্বশুরের পীঠস্থানই যে আমাদের মহাতীর্থ, তাকে দূর থেকে একটা প্রণাম ক'রে আস্‌বারও কি অধিকার আমার নেই ?"

কৃষ্ণকিশোর এ কথায় নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল প্রতিমার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল, তাহার পর এ কথার প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

২

প্রতিমার নিকট স্বীকার করিলেও এই ব্যাপারে একাকী অগ্রসর হইতে কৃষ্ণকিশোরের সাহস হইল না,—সেই জন্য পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণকিশোর তাহার বৌদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং দুই জনে মিলিয়া যাহা পরামর্শ করিল, তাহা অপর কেহই জানিল না। সেই দিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণকিশোর প্রতিমাকে তাহাদের বাটীর খিড়কী দরজার ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া নিজে সদরের দিকে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে প্রতিমা কয়েক পদ অগ্রসর হইতে সাহস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে একাকিনী পাইয়া তাহার শতকুণ্ঠা তাহারই পদে গুরুভার বাঁধিয়া দিল। এই বাড়ীর প্রত্যেক ধূলিকণাও যে তাহার বড় আকাঙ্ক্ষিত, বড় প্রিয় ! কিন্তু,—সে যে মূর্ত্তিমতী অনাচার ! অভিশপ্ত দেহ লইয়া এ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার যে তাহার নাই। যদি কেহ আসিয়া পড়ে,—যদি কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে কি বলিবে সে ? তাহার বক্ষ দুরু দুরু কম্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রজকিশোরের স্ত্রী উমাসুন্দরী ব্যস্তভাবে আসিয়া উল্লাসভরে বলিলেন, "এসেছিস্ বোন্ ! আমি কত ভাবছিলাম।"

প্রতিমা সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

উমাসুন্দরী সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আয়, —বাড়ীর ভিতর আয়।"

প্রতিমা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আমি—"

বাধা দিয়া উমাসুন্দরী বলিলেন, "আমি জানি,—চ'লে আয় বোন্ চট্ ক'রে, কেউ আবার দেখতে পাবে" বলিয়া উমাসুন্দরী চকিতে একবার এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া প্রতিমার হাত ধরিয়া টানিলেন।

প্রতিমা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি—?"

হাসিয়া উমাসুন্দরী বলিলেন, "আমি তোর দিদি,—আর দেরী করিস্ নি, চল্।"

এই অনাবিল স্নেহের স্রোতে প্রতিমার সকল কুণ্ঠা, সকল দ্বিধা ভাসিয়া গেল। তখন সে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল।

উমাসুন্দরী প্রতিমাকে রন্ধন-কক্ষে লইয়া গেলেন এবং তাহার সম্মুখে ময়দার তাল ও কলাই-সিদ্ধ ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "নে, খপ ক'রে বেল্ দেখি, আমি ভেজে নিই।"

প্রতিমা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

উমাসুন্দরী প্রতিমাকে ধমক্ দিয়া বলিলেন, "তোকে কি এখানে বসিয়ে মুখ দেখবার জন্য ডেকে এনেছি ?—শীগ্‌গির বেল্, কড়া কামাই যাচ্ছে।" তাহার পর উমাসুন্দরী সাজাখানি কড়ার কাণায় দুই বার ঠুকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপোর কচরী খেতে সাধ গেচে নেই

জন্য তোকে আনতে পাঠিয়েছিলুম,—একলা কি পেরে উঠি—বেল্ না।"

এই সরলা "দিদিটিকে" প্রতিমার ভাল লাগিলেও যেন "অদ্ভুত" বলিয়া মনে হইল। এতটা অপরিচয়ের মাঝে এতটা অপ্রত্যাশিত অধিকার যে সহজে বিশ্বাস করা যায় না!

সে যন্ত্রচালিতের ন্যায় কচুরী বেলিতে লাগিল।

৩

এক হাতে জপমালা ও অন্য হাতে কুশাসন লইয়া বৃদ্ধা পিসীমা আসিয়া রন্ধন-কক্ষের দ্বারের নিকট কুশাসনখানি পাতিয়া বসিলেন এবং আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিলেন, "যত মনে করি, ওদের কথায় থাক্‌ব না, ততই যেন ওদের কথাই আমায় জড়িয়ে ধরে। ভগবানের নাম না ক'রে ওদের মঙ্গলের ইষ্টমন্ত্র জপ করলেই আমার পরকাল হবে কি না"—বলিতে বলিতে মালাটি দুই বার ঘুরাইলেন। পুনরায় মালা ঘুরান বন্ধ করিয়া বলিলেন, "একেই বলে 'মুষলম্ কুলনাশনম্' ছেলে, ধন্য সাহস! অমন শিবতুল্য দাদা, তার মুখের দিকেও একবার চাইলে না গা,—ছ্যাঃ!"

পুনরায় মুখে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া পিসীমা মালাজপে মন দিলেন।

রন্ধনকক্ষের ভিতর হইতে উমাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার কথা বলছ, পিসীমা?"

পিসীমা মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘোর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এই তোমার গুণধর দেওর, আর কে?"

উমাসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ,—যা বলেছ পিসীমা। তোমারই খাচ্ছে ত? অন্ততঃ তোমার মুখ চেয়েও ত মানুষ কায করে?"

মালাটি কপালে ছোঁয়াইয়া পিসীমা উমাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার কথা ছেড়ে দাও না বৌমা, ওর মায়ের পেটের ভাইয়েরই মুখ রাখ্‌লে, তা আমার! আর সেই ধেড়ে মাগীটাই বা কি রকম? একবার যখন কপাল পুড়েছে, তখনই ত বুঝা উচিত। তা ত নয়,—আমার কেষ্টর মাথাটি খাবার জন্য ওত পেতে বসেছিলেন আর কি!"

ঘরের ভিতর প্রতিমা পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রতিমা ভাবিল, এই লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইবার তাহার শক্তি কোথায়? সেই জন্যই ত কৃষ্ণকিশোর তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেন সে নিষেধ শুনিল না? প্রতিমার সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল।

উমাসুন্দরী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া অনুচ্চস্বরে প্রতিমাকে বলিলেন, "এই,—এই! নাঃ, তুই আমার মাথা খেলি দেখ্‌তে পাচ্ছি।" তাহার পর প্রতিমাকে ইঙ্গিতে চক্ষু মুছিতে বলিয়া পিসীমাকে শুনাইয়াই বলিলেন, "নে, থপ্ থপ্ ক'রে বেলে নে না ভাই।"

পিসীমা মালা জপিতে জপিতে উমাসুন্দরীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মাথা নাড়িয়া শব্দ করিলেন, "উঁঃ,—উঁঃ।"

উমাসুন্দরী মধুর হাসিয়া বলিলেন, "ও আমার সম্পর্কে বোন্ হয়। এই সে দিন মাত্র বিয়ে হয়েছে। আজ এই পাড়াতে উঠে এসেছে কি না, তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" তাহার পর প্রতিমাকে বলিলেন, "যা প্রতিমা, পিসীমাকে প্রণাম ক'রে আয়।"

প্রতিমার বড় ভয় হইল, সে প্রথমে উঠিতে পারিল না, কিন্তু উমাসুন্দরীর চক্ষুর শাসনকে সে কিছুতেই অমান্য করিতে পারিল না, ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া ঘোমটা দিয়া গিয়া পিসীমাকে প্রণাম করিল।

পিসীমা ঘোমটার উপর হইতেই চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এস মা, এস,—হাতের নোয়া অক্ষয় হোক! তা মা, আমার কাছে আবার ঘোম্‌টা কেন?"

ভিতর হইতে উমাসুন্দরী ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খোল্ ঘোম্‌টা, খোল, - পিসীমার কাছে আবার ঘোম্‌টা!"

এত শীঘ্র কি মধুর শাসনের বাধ্য হওয়া যায়? প্রতিমা ঘোমটা খুলিল না।

"আমাকে দেখে লজ্জা কি মা, আয়, আমার কাছে বোস্" বলিয়া পিসীমা তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইলেন এবং "কৈ, মুখ দেখি" বলিয়া ঘোমটা খুলিয়া দেখিয়া প্রশংসা-সূচক স্বরে বলিলেন, "প্রতিমাই বটে, বৌমা,—আহা, যদি আমার কেষ্টর এই রকম একটি বৌ হ'ত!"

উমাসুন্দরী প্রতিমার সলজ্জ বিষণ্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

প্রতিমাও হাসি লুকাইবার জন্য মুখ ফিরাইল।

পিসীমা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ

এসেছে, তা তুমি একটু কিছু খেতে দাও নি মা। আহা, বাছার আমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে!"

প্রতিমার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া উমাসুন্দরী বলিলেন, "বোনের বাড়ীতে বুঝি কেবল খেতেই আসা?"

"পিসীমা শুনেছ—" বলিতে বলিতে হঠাৎ তথায় কৃষ্ণকিশোরের দাদা ব্রজকিশোর আসিয়া প্রতিমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া ক্ষিপ্রপদে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছিস্ কি? প্রতিমাকে চিনিস্ না? ও যে আমাদের বৌমার সম্পর্কে বোন্ হয়, কখনও দেখিস্ নি বুঝি?—কি হ'ল গো!"

ব্রজকিশোর অনেক ভাবিয়া দেখিলেন। তিনি তাঁহার অতীতের অনেকখানি অন্বেষণ করিয়াও প্রতিমার নাম বা পরিচয় পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয় ত তাঁহার রহস্যময়ী স্ত্রী উমাসুন্দরীর এ এক নূতন রহস্য হইবে। তাঁহাকে বহুবার উমাসুন্দরীর নিকট ঠকিতে হইয়াছে, সেই জন্য এ ক্ষেত্রে উমাসুন্দরীর কথা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ—হাঁ,—তা, এত বড় হয়েছে!"

ঘরের ভিতর উমাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া কোন রকমে হাসির বেগ রোধ করিলেন।

পিসীমা মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

প্রতিমা ভাবিল, সে যেন ক্রীড়ার পুতুল—হাতফিরি হইতেছে। একবার তাহার মনে হইল, এঁরা বোধ হয় সব জানেন, সেই জন্য প্রথমটা উপহাসচ্ছলে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই উমাসুন্দরীর মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিল যে, সেই শান্ত সরল মুখখানিতে ছলনার চিহ্নটিও নাই।

ব্রজকিশোর বলিলেন, "শুনেছ পিসীমা, কেষ্ট আজ এসে আমাদের পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ ক'রে নিয়ে যাবে। বাড়ী আর বাসন ছাড়া সবই ত তোমার, কাযেই বাড়ী ও বাসন ভাগ করতেই সে আসবে।"

পিসীমার মালা আর ঘুরিল না, তিনি ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন, "কি,—আসুক না একবার!—তার হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব না!"

সেই সময় ধীরে ধীরে কৃষ্ণকিশোর আসিয়া পিসীমার নিকট বসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি করেছি, পিসীমা?"

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "স'রে যা আমার সামনে থেকে,—বেরো বলছি!"

কৃষ্ণকিশোর পিসীমার ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "এখন একটু শুই, তার পর না হয় বেরিয়ে যাব।"

পিসীমার যত রাগ তখন মালার উপর পড়িল, তিনি সজোরে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত দিন কোথায় ঘুরছিলি? এসে কিছু খেয়েছিস্?"

কৃষ্ণকিশোর রন্ধন-কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, "নাঃ,—এখনও দেরী আছে!"

এমন সময় উমাসুন্দরী অবগুণ্ঠনবতী প্রতিমার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহার কানে কানে কি বলিলেন।

প্রতিমা গলায় অঞ্চল দিয়া ভক্তিভরে ব্রজকিশোরকে প্রণাম করিল। কিন্তু পদস্পর্শ করিল না।

উমাসুন্দরী দরজার পাশে দাঁড়াইলেন।

ব্রজকিশোর কি বলিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। উমাসুন্দরী নিজের ভগিনী বলিয়া ইহার পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তাহার সম্মুখে ঘোমটা দিয়া বাহির হয় কেন?

বিপদ হইল প্রতিমার! তাহার দিদি যেন কি? তাহাকে এইরূপ বিব্রত অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া তাঁহার ভাল হয় নাই কিন্তু। সে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইতোমধ্যে পিসীমার জপ শেষ হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয়, কৃষ্ণকিশোরকে দেখিয়া প্রতিমা ঘোমটা দিয়াছে, সেই জন্য ব্রজকিশোরকে বলিলেন, "কে তোকে প্রণাম করলে, তা দেখ্‌লি, ব্রজ?"

দুই বার ঢোক গিলিয়া ব্রজকিশোর বলিলেন, "হাঁ—তা—," তাহার পর, মূঢ়ের মত দরজার দিকে চাহিতেই উমাসুন্দরী তাঁহাকে দরজার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

ব্রজকিশোর দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই উমাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "আমার উপর খুব রাগ হচ্ছে না? আমি কিন্তু মিছে কথা বলি নি। ও সত্য সত্যই

বোন্ হয়, ঠাকুরপোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছি যে! এর পর যা করবার তুমি কোরো, কিন্তু এটা আমার আব্দার বলেই জেনো।"

সংবাদটি ব্রজকিশোরের বড় প্রিয় হইলেও তিনি একেবারেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না. সেই জন্য অবাক্ হইয়া উমাসুন্দরীর মুখের প্রতি চাহিলেন। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি কি রকম বল দেখি! যদি হু' একটা ঠাট্টাই ক'রে বসতাম, তা হ'লে কি হ'ত বল দেখি?"

"তা তুমি পারতে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উমাসুন্দরী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন।

প্রতিমা কম্পিতপদে পলাইয়া রন্ধন-কক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিল।

আশ্চর্য্য বোধ করিয়া পিসীমা বলিলেন, "সন্ধ্যার সময় ত একবার শাঁক বাজান হয়েছে,—আবার এখন কিসের—"

বাধা দিয়া ব্রজকিশোর বলিলেন, "তোমার স্নেহের উপর দাবী করবার জন্য আমাদের আজ এক নূতন অংশীদার এসেছেন, পিসীমা!"

সাশ্চর্য্যে পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন. "কে রে,—কে?"

উৎফুল্ল-চিত্তে ব্রজকিশোর বলিলেন, "ছোট-বৌমা! আমাদের গৃহলক্ষ্মী!"

কৃষ্ণকিশোর ভয়ে ও লজ্জায় পিসীমার কোলেই মুখ লুকাইল।

পিসীমা নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, "এঁ্যা—কেষ্ট যে বিধবা-বিয়ে করেছে রে!"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ব্রজকিশোর বলিলেন, "কি বলছ পিসীমা! ঐ লাল শাড়ী, শাঁখা ও সিঁদুরে বৈধব্য মনে করা যে পাপ!"

"ঐ যা বললে বাবা,—আসল কথাই ঐ", বলিতে বলিতে বসু-গৃহিণী তথায় প্রবেশ করিলেন।

"যে বিধবা নয় তাকে বিধবা মনে করাও পাপ। ওর যে বিয়েই হয় নি, তা বৈধব্য কি ক'রে হবে? ওর খবর আমার ত আর জানতে বাকী নেই!"

যেরূপ রঙ্গমঞ্চের উপর এক নির্দ্দিষ্ট ঘটনার জন্য দর্শকবৃন্দ রুদ্ধনিশ্বাসে উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করে এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কোন এক নাট্যচরিত্র সেই দৃশ্যে প্রবেশ করিয়া ঘটনার ও চিন্তার স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিয়া উদ্বেগ-বেদনা হইতে দর্শকবৃন্দের একত্রীভূত মনকে রক্ষা করে এবং চক্ষুর নিমেষেই তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়, সেইরূপ তথায় উপস্থিত সকলের প্রশংসাসূচক কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি বসু-গৃহিণীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল।

উৎফুল্ল চিত্তে বসু-গৃহিণীকে আহ্বান পূর্ব্বক পিসীমা বলিলেন, "আয় না ভাই, বোস্ না। মা গো, কি ভাবনায় যে পড়েছিলাম, তার ঠিক নেই। ভাগ্যে তুই ছিলি, তাই রক্ষা, তা না হ'লে আমাকে পাগল হয়ে যেতে হ'ত।"

উমাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন, "পিসীমা, তোমার ছেলের মনোমত বৌ পেয়েছ, আমার ঘটকালীটা দিও।"

কৃষ্ণকিশোর স্থাবর অস্থাবর ত্যাগ করিতে আসিয়া সস্ত্রীক তাহার দাদার এবং পিসীমার স্থাবর সম্পত্তিভুক্ত হইল।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

শূদ্র

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সেবা—দাসত্ব বৈশ্যের
শূদ্র যদি না করিত ভক্তিতে, স্বেচ্ছায়;
রহিত কোথায় তবে প্রাধান্য সবার,
ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার কোথা' রহিত পড়িয়া?
হায় শূদ্র তথাপিও ঘৃণ্য সকলের,
ভাবে সবে তা'রা বুঝি পশু—ভারবাহী;
পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত দীন শূদ্র তবু
কায়মনোবাক্যে সাধে কর্ত্তব্য আপন!

এক দিন যদি তা'রা একতার বশে,
বহিবারে গুরুভার করে অস্বীকার;
হাহাকার উঠে তবে এ বিশ্ব-সংসারে
ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ চূড়া যায় চূর্ণ হয়ে!
শূদ্র নহে—সাধু তা'রা, পরার্থে ব্যাকুল,
দশ দেশ রক্ষিবারে তাহারাই মূল।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

নীতি *

এ যুগে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, বিশেষভাবে তাঁহারা আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসন কাহাকে বলে, আমরা কখনও তাহা জানিতাম না। ইংরাজরা এবং পাশ্চাত্যের সকলেই পূর্ব্বদেশীয় বলিতে কেপিটেল O দিয়া সকলকে এক ছাঁচে ঢালিয়া ফেলেন। অরিয়েন্টেল নামক যে একটি কথা তাঁহারা জানেন, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, সব অরিয়েন্টেলই এক রকম। তাহাদের প্রকৃতি এক, সমাজগঠন এক, ইতিহাসের অভিব্যক্তি এক, সবই এক। পূর্ব্বদেশীয়দের মধ্যে যাহাদিগকে সেমেটিক জাতি বলে, যেমন ককেসিয়েন, ইহুদী, আরবীয়, পাশ্চাত্যরা বিশেষভাবে তাহাদিগকে জানেন। আর এ কথা সত্য, সেমেটিক জাতির সমাজগঠনে একতন্ত্রী বা অটোক্রেসী ছিল। যিনি সমাজপতি, তিনিই রাজা ছিলেন। ইহুদীদিগের সমাজতন্ত্রে যদিও একতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,—যে মান অটোক্রেসী প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি থিওক্রেসী বা দেবতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাও এক হিসাবে একতন্ত্রতা বটে। মুসলমানদের যেমন আল্লা, সেইরূপ ইহুদীদের জিহোবা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি। তিনি যে হুকুম করেন, তাহাই আইন, ইহাই তাহাদের ঈশ্বরের আদর্শ ছিল। সুতরাং যখন তাহারা এই থিওক্রেসী প্রতিষ্ঠিত করিল, অর্থাৎ পরম ঈশ্বরের একতন্ত্রতা যখন সমাজতন্ত্রের ভিতর আনিয়া ফেলিল, এবং সেই ভাবে সমাজ গঠন করিল ও সমাজনীতি সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল, তখন ঐ সূত্রে তাহাদের মধ্যে অটোক্রেসীও রহিয়া গেল। এই জন্য আরবদেশে ও আরবদেশ হইতে যাহারা সভ্যতা ও সাধনা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র অটোক্রেসী দেখিতে পাই। রাজা যা ইচ্ছা করেন, তাহাই আইন। Will of the King is the Law, তাহার অতিরিক্ত কোন আইন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে কখনও তাহা ছিল না। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে যাঁহারা রাজনীতি আলোচনা করিয়াছেন ও তাহার সূত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাঁহারা নীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা প্রথম হইতে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন, আইন ও বিধান স্বতন্ত্র জিনিষ। কথাটা বিধান নয়, ধর্ম্ম। যাহার দ্বারা সমাজশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, তাহা স্বতন্ত্র জিনিষ। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজার উৎপত্তি কিসে হইল, কিরূপে রাজধর্ম্মের সৃষ্টি হইল? তাহার উত্তরে ভীষ্ম বলিলেন,—প্রথমে রাজাও ছিল না, দণ্ডও ছিল না, কিছুই ছিল না। সকল লোক মিলিয়া পরস্পর নিজদিগকে সংযত করিয়া চলিত, স্বভাব অনুসারে ধর্ম্মপথে আসিত; সুতরাং সমাজশৃঙ্খলার জন্য দণ্ডের প্রয়োজন ছিল না। ক্রমেই কতকগুলি লোক নিজেদের ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিতে লাগিল, আলস্য বশতঃ আপন আপন ধর্ম্ম অনুসরণ করিল না বা ইচ্ছা করিয়া করিল না। তখন ক্রমে সমাজে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অরাজকতা উপস্থিত হইল। পৃথিবী সেই ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আমাকে রক্ষা করুন। তখন ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া প্রথম আইন বা ধর্ম্মবিধান সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর তিনি আপনার মানস পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং ঐ বিধান প্রচলিত করার ও বিধান অনুযায়ী সমাজ-শাসন করার ভার তাহার উপর অর্পণ করিলেন, তিনি প্রথম রাজা হইলেন। এই প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, আমাদের দেশে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা নিয়মতন্ত্র ছিল, অটোক্রেসী কখনও ছিল না, বিধান বা ধর্ম্ম ঈশ্বরকৃত ছিল, মনুষ্যকৃত ছিল না। ধর্ম্ম নিত্য, সত্য নিত্য, ধর্ম্ম অনুযায়ী রাজা প্রজা উভয়েই শাসিত হইত, রাজা সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রজা শাসন করিতেন।

শাসন ও ব্যবস্থার স্বতন্ত্রীকরণ

য়ুরোপে আধুনিক ব্যাপার। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত য়ুরোপের রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে ইহা ছিল না। এখনও তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়, যেমন রাজার "ভিটুইং পাওয়ার।" ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পার্লামেণ্ট আইন পাশ করিতেন, রাজা তাহা "ভিটু" করিতে সাহস পান না বটে, কিন্তু সে অধিকার তাঁহার আছে। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা না-মঞ্জুর করিতে পারেন। আগে তিনি সে অধিকার

খুব চালাইতেন। এখন সহজে পারেন না। কারণ, প্রজা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। চালাইতে গেলে প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাঁহার সিংহাসন থাকে কি না থাকে, এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে। ভাইসরয় এবং প্রভিন্সিয়েল গভর্ণর-দেরও সেরূপ অধিকার এ দেশে আছে। কাউন্সিল বা এসেমব্লিতে যে আইন পাশ হইবে, তাঁহারা তাহা না-মঞ্জুর করিতে পারেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এরূপ অদ্ভুত কথা কখনও শুনি নাই, আমাদের দেশে রাজার এমন সাধ্য ছিল না. তিনি আইন না-মঞ্জুর করিতে পারেন। আইন বা ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে আমাদের সমাজ শাসিত হইত. শাস্ত্রকর্ত্তারা আইনের ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাতে সমাজ-শৃঙ্খলা ও সমাজের ক্রমোন্নতি সাধিত হইত।

তাহা ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রনীতির আরও একটা বিশেষত্ব ছিল। যেখানে রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে সাম্রাজ্য কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য ছিল। ভারতবর্ষে কেবল এক রকম শাসন-প্রণালী ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর উল্লেখ আছে, যেমন স্বরাজ্য, জনরাজ্য, গণরাজ্য, বৈরাজ্য, তেমনই পূর্ব্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য ছিল। এখন সাম্রাজ্য মানে এম্পায়ার। জার্ম্মেণী যে এম্পায়ারের লোভে হাত বাড়াইয়া বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে; ফ্রান্স চেষ্টা করিতেছে, আফ্রিকায় এম্পায়ার গড়িয়া তুলিতে পারে কি না; অথবা ইংলণ্ডে যেরূপ এম্পায়ার আছে, আমাদের দেশে তেমন এম্পায়ার ছিল না। এক জন বিশেষ রাজার একতন্ত্র শাসনাধীনে বহু দেশ যখন আইসে, তখন তিনি সম্রাট হয়েন, সাম্রাজ্য লাভ করেন। সম্ আর রাজ এই দুইটি কথার যোগে সাম্রাজ্য, সম্রাট্ প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সম্, রাট্ মানে রাষ্ট্রের সহিত, রাজ্যের সহিত সংহতি. কতকগুলি রাষ্ট্রপতি একত্র হইয়া এক জনকে তাঁহাদের নেতা মনোনীত করিতেন। তিনি সম্রাট হইতেন। ইংরাজীতে বলিতে গেলে বলিব— Federation of many monarchies. Samrajya is not Empire in the modern sense of the term. রোমান এম্পায়ার যে ধাতুর ছিল, সে ভাবের নহে, বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র স্ব স্ব স্বাধীন রাজ্যের সমাবেশে, একীকরণে, সমীকরণে বা সংহতিতে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইত।

হইতেন। কি ভাবে মনোনয়ন হইত, তাহাও পাওয়া যায়। কেবল ঐতিহাসিক বিবরণে পাওয়া যায়, তাহা নহে, বেদে, ব্রাহ্মণে, জাতকে, এমন কি, পুরাণে পর্যান্ত আমরা তাহার প্রমাণ পাই। যে ভাবে রাজার অভিষেক হইত, অভিষেকের যে পদ্ধতি, প্রণালী ও মন্ত্রাদি ছিল, তাহা হইতে আমরা উহা জানিতে পারি। প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলে রাজা রাজপদে অধিকারী হইতেন না। রাজার পুত্র হইলেই কেহ রাজা হইতে পারিতেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন না হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইবেন. ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজপুত্র অথবা রাজার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কেহ রাজা হইতে পারিতেন না। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে প্রজাসাধারণের দ্বারা প্রত্যেক রাজার বরণ হইত. অভিষেকের পদ্ধতি ও মন্ত্র হইতে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে—একবার দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যুদ্ধে দেবতারা হারিয়া গিয়াছিলেন। তখন দেবতারা বলিলেন—আমাদের মধ্যে রাজা নাই বলিয়া অসুররা আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দেবাসুরা বা লোকেষু সময়ন্ত ত······তাং স্ততে সুরা অজয়ন্ দেবা অক্রবন্ রাজতয়া বৈ নো জয়ন্তি রাজানং করবামহা ইতি তথেতি॥

অতএব এখন হইতে আমরা রাজা করিব। তখন সকল দেবতা বলিলেন,—তথাস্তু, তথাস্তু। এই ভাবে দেবতাদের মধ্যে রাজার প্রতিষ্ঠা হইল।

রাজার বরণের বৈদিক মন্ত্র অতি সুন্দর, সেই মন্ত্র এই:—

সা ত্বাহর্ষ মন্তু বভূধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলৎ
বিশস্থা সর্ব্বা বাঞ্ছন্তু মাত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ।

হৃষ্ট চিত্তে তুমি আমাদের মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হও. স্থির হইয়া আমাদের মধ্যে থাক, সকল লোক তোমাকে ইচ্ছা করিতেছে।

ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্ব্বতইবাবিচাচলৎ
ইন্দ্রে হৈব ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয়।

ইন্দ্রের ন্যায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া রও।

পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রহ। তাহার পর আর এক শ্লোকে আছে,—

ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবাঃ পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্।

যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন, বিবাহের মন্ত্রে দেখিবেন (যদি তখন আত্মস্থ হইয়া থাকেন, তবে মনে থাকিতে পারে), আছে—পৃথিবী ধ্রুব, আকাশ ধ্রুব, এই সমুদয় বিশ্ব ধ্রুব। এই সকল পর্ব্বত যেমন স্থিরপ্রতিষ্ঠ, সেইরূপ এই কন্যা পতিকুলে ধ্রুব হউক, সেইরূপ স্থির হইয়া থাকুন। আর অভিষেকের মন্ত্রে কন্যা শব্দের স্থানে রাজ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার পর শেষ শ্লোকে আছে :—

ধ্রুবোঽচ্যুতঃ প্রমৃণীহি শত্রুঞ্ছত্রূয়তোঽধরাণ পাদয়স্ব
সর্ব্বা দিশঃ সংমনসঃ স ধ্রুবো ধ্রুবায়তে সমিতিঃ কল্পতামিহ।

সকল লোক যে সভায় একত্র হইয়া বিচারাদি করিতেন, তাহার নাম সমিতি. এই সমিতি অর্থাৎ জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছে, 'ইচ্ছা করিতেছে, সংকল্প করিতেছে,—যাহা মন্ত্রে উল্লিখিত' হইল।

অভিষেকের সময়, যজ্ঞে যেমন আহুতি দেওয়া হয়, সেইরূপ আটটি পুরোডাশ লইয়া রাজা বাড়ী হইতে বাহির হইতেন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে একটা দিতেন, তাহার পর পত্নীকে, সেনাপতিকে, প্রধান মন্ত্রীকে একটি করিয়া আট জন প্রতিনিধিকে আটটি পুরোডাশ দিতেন। তাহাদের মধ্যে এক জন গ্রামণী ছিল. তাহাকেও একটি দিতে হইত। পুরোডাশ দিয়া তাহাদের অনুমতি চাহিতেন। অনুমতি চাহিতে হইলে ভেট লইয়া যাইতে হয়। পুরোহিতের কাছে গিয়া বলিতেন, আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, আপনার অনুমতি চাহিতেছি। সেইরূপ ভাবে সেনাপতি, মহিষী, গ্রামের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ গ্রামণী, তাহাদেরও অনুমতি চাহিতেন। ইহাদের অনুমতি বা সম্মতি না পাইলে রাজা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। অনুষ্ঠানের সময় যাহাদিগকে ৮টি পুরোডাশ বা মণি দেওয়া হইত, ব্রাহ্মণে, বেদে, রামায়ণে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে রাজকৃৎ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি রাজা করেন, রাজার কর্ত্তা, তিনিই রাজকৃৎ। রামায়ণে আছে—রাজকর্ত্তাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ভরত এই এই বাক্য বলিলেন। রাজকর্ত্তার অর্থ রাজমন্ত্রী, আর মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছিলেন, তাহা নহে, শূদ্ররা পর্য্যন্ত ছিলেন। ৪ বর্ণের ৪ জন প্রধান মন্ত্রী থাকা প্রয়োজন ছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, বিদুর শূদ্র হইয়াও ধৃতরাষ্ট্রের সভার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বিদুরের পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য চলিতে পারিত না, ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য মন্ত্রীর পরামর্শের যেমন প্রয়োজন ছিল, রাজকার্য্য-পরিচালনে বিদুরের পরামর্শেরও সেইরূপ প্রয়োজন ছিল। সুতরাং অভিষেকের সময় যে ৮ জন লোককে পুরোডাশ দেওয়া হইত, তাঁহারাই রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মতি লইয়া রাজা রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন।

অনুমতি লইবার পর রাজা পৃথিবীকে অর্ঘ্য দান করেন, সকল দেবতার পূর্ব্বে পৃথিবীকে অর্ঘ্য দিতে হয়। অর্ঘ্যের মন্ত্র এই—

"নমো মাত্রে পৃথিব্যৈ নমো মাত্রে পৃথিব্যা।

ইহা অভিষেকের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। ইহা না হইলে অভিষেক আরম্ভ হইতে পারে না। তাহার পর দেবতাদের অর্ঘ্য দিতে হয়, তাহার অর্থও আছে, সবিতাকে বীর্য্যের জন্য অর্ঘ্য দিতে হয়। অগ্নি গৃহপতি ; গৃহস্থ-ধর্ম্মলাভের জন্য অগ্নিকে অর্ঘ্য দিতে হয়। প্রাচীনকালে সোমলতাকে খুব অর্চ্চনা করা হইত। সোম ওষধির রাজা, সেই জন্য তাহাকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। রাজার অনেক বন আছে, তাহা বনের অন্তর্গত ; সেই জন্যও বনস্পতি সোমলতাকে অর্ঘ্য দেওয়া হইত। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতিকে বাক্‌শক্তিলাভের জন্য অর্ঘ্য দেওয়া হইত। সমিতি বা সভায় রাজার অভিমতে লোককে আনা প্রয়োজন, সেই জন্য বাগ্মিতা আবশ্যক। কার্য্যদক্ষতার জন্য ইন্দ্রকে অর্ঘ্য দেওয়া হইত। শক্তির জন্য—সাধারণ শক্তি নয়, গোরক্ষার জন্য শক্তির প্রয়োজন, সেই জন্য রুদ্রকে অর্ঘ্য দেওয়া হইত। সত্যলাভের জন্য মিত্রকে ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য বরুণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইত। বৈদিক যুগে বরুণ ছিলেন ধর্ম্মের রাজা। টীকাকার বরুণের অর্থ করিয়াছেন—ধর্ম্মপতি। অভিষেকের আর একটা অঙ্গ আছে। কলিকাতায় আছে কি না জানি না, পল্লীগ্রামে আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, বিবাহ, চূড়াকরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে মেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে ৭ ঘাটের জল আনিতে যায়।

তাহাকে জলভরা বলে। ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যসহকারে মেয়েরা কন্যা অথবা বরকে স্নান করাইতে লইয়া যায়। ৭ ঘাটের জল লইয়া আসিতে হয়, এই ভাবের একটা জল আহরণ-পদ্ধতি রাজার অভিষেকের সময় ছিল। রাজাকে যে জল দিয়া অভিষেক করিতে হইবে, তাহা শুধু নদীর জল হইলে হইবে না, সমুদ্রের জলও হওয়া চাই। প্রথম আর্য্য উপনিবেশ যেখানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিকে জাগরিত রাখিবার জন্য সরস্বতী নদীর জল প্রয়োজন। অন্যান্য নদীর জলও চাই। ইহা গেল নদী আর সমুদ্র-জলের কথা, কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই—আর তাহার ভিতর অতি নিগূঢ় অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—কূপের জল না হইলে অভিষেক হইতে পারে না। সেই জল আহরণ করিবার যে মন্ত্র, তাহার অর্থও বুঝা যায়। বড় বড় নদী ও সমুদ্রের জল আহরণ করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়:—

স্বরাজস্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্য দত্ত……

বৃষসেনোঽসি রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্য দেহীতি

সমুদ্র সকল, তোমরা আপনার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত আছ, তোমরা অমুককে রাষ্ট্র দান কর।

ডোবার জল আহরণ করিবার মন্ত্র এই:—

মান্দাস্থ রাষ্ট্রদা রাষ্ট্রমমুষ্য দদাতি তাভিরভিষিঞ্চতি

স্থাবরাননপক্রমণীং করোতি

তোমার গতি নাই, তুমি স্থির, তুমি অমুককে রাজা কর। এই জন্য কূপের জলের দ্বারা অভিষেক করা হয়—কূপের জল যেমন স্থির, তার স্রোত নাই, তেমনই ভাবে তুমি (রাজা) প্রজাদের মধ্যে স্থির থাক, চঞ্চল হইও না, কূপোদক যেমন আপনার গণ্ডীর ভিতর স্থির থাকে, তুমিও সেইরূপ স্থির থাক। ৪ জন লোক জল ছিটাইয়া এই অভিষেক করেন, (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য, (৪) জন্য বা জনের অর্থাৎ সাধারণ লোকের প্রতিনিধি। ব্রাহ্মণরা অথবা ক্ষত্রিয়রা কিংবা বৈশ্যরাই যে কেবল রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা নহে, শূদ্র বা জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত রাজা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না, শূদ্ররাও রাজাকে নির্ব্বাচন করিবে। এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইংরাজ রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় বলিতে গেলে—ইহাদিগকে ষ্টেট বলা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ষ্টেট ৩টি Lords Spiritual, Lords Temporal আর Commons. আজকাল সংবাদপত্রকে ফোর্থ ষ্টেট বলা হয়, বাস্তবিক রাজতন্ত্রে, রাষ্ট্রনীতির আইন-কানুনে ফোর্থ ষ্টেট বলিয়া কিছু নাই। সেইরূপ আমাদের ৪ ষ্টেট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এখানে শূদ্র পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, শূদ্র মানে সাধারণ জনমণ্ডলী। এই জন্য শূদ্র শব্দের পরিবর্ত্তে জন ধাতু হইতে উৎপন্ন জন্য শব্দ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ৪ ষ্টেটের সম্মতি না হইলে রাজা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না।

তাহার পর আবেদ মন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞাপন মন্ত্র। রাজা ইলেক্টেড বা নির্ব্বাচিত হইলেন, ইহা জ্ঞাপন করিতে হয়। যশোওয়ালের 'হিন্দুপলিটি' নামক গ্রন্থ হইতে আবেদ মন্ত্রের অনুবাদ দিতেছি:—

"তোমাদের উপর যদি আমি কোন অত্যাচার করি অথবা তোমাদের কোন অনিষ্ট করি, তাহা হইলে আমার পুণ্য, আমার জীবন ও আমার বংশধর যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ইহাই রাজার প্রতিজ্ঞা, তিনি নিজের উপর ঐ অভিশাপ দিতেছেন।"

এই আবেদ বা জ্ঞাপন মন্ত্রের পর ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্তীর্ণ একটা কাঠের আসনে রাজা আরোহণ করেন। তখন কতকগুলি মন্ত্র আছে, ষ্টেটের যে ৪ অঙ্গের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহারা এই মন্ত্র আবৃত্তি করিবেন। রাজা পূর্ব্বদিকে পা দিয়া আসনে (তখন সিংহাসন হয় নাই) উঠিলেন। তখন তাঁহারা যে মন্ত্র আবৃত্তি করিবেন, তাহার অর্থ এই—বসন্ত ঋতু তোমাকে রক্ষা করুক, তুমি আমাদের মহার্ঘ্য বস্তু, তুমি রাজা, ব্রাহ্মণরা তোমাকে রক্ষা করুন।

তাহার পর রাজা দক্ষিণদিকে কাষ্ঠাসনে আরোহণ করেন। তখন যে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা এইরূপ—ক্ষত্রিয়রা তোমাকে রক্ষা করুন, তুমি আমাদের বহুমূল্য সম্পত্তি। তাহার পর পশ্চিমদিকে আরোহণ করিতে হয়, তখন বলিতে হয়—বৈশ্যরা তোমাকে রক্ষা করুন, তুমি আমাদের মহামূল্য বস্তু। সর্ব্বশেষে রাজা উত্তরদিকে আরোহণ করেন। তখন বলিতে হয়—শূদ্র বা জন্যরা তোমাকে রক্ষা করুন। এই ভাবে রাজা সিংহাসনে বা কাষ্ঠাসনে উঠিলেন, তখন পুরোহিত সচ্ছিদ্র সোনার পাত্রের ভিতর দিয়া রাজার মাথায় জলসেচ করেন; তখনকার মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ—

"সোমের জ্যোতি, অগ্নির ভাস, সূর্য্যের তেজ ও ইন্দ্রের বীর্য্য দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, তুমি রাজন্যের অর্থাৎ যাঁহারা তোমাকে রাজা করিলেন, তাঁহাদের রক্ষক হও।"

তাহার পর আছে :—

হে দেবতাগণ! তোমরা রাজাকে শাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট কর, জাতীয় শাসনের উপযুক্ত কর।

অভিষেকের পর ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি রাজাকে তরবারি দিতেন। ব্রাহ্মণ তরবারি দিতেন কেন? ক্ষত্রিয় দিবে, কারণ, তাহারা অসিব্যবসায়ী। এখানে তাহা না করিয়া নিয়ম হইল—ব্রাহ্মণরা অসি দিবেন। কেন? কারণ, গীতায় আছে :—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

ব্রাহ্মণের শিক্ষা-দীক্ষা ঐ ভাবের ছিল, সুতরাং তাঁহাদের হস্ত হইতে প্রদত্ত অসি কাহাকেও হিংসা করিবে না, অন্যায় ভাবে সে অসি কাহারও উপর পড়িবে না, অধর্ম্ম ও অন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে না। এই ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণরা রাজাকে অসি দান করিতেন।

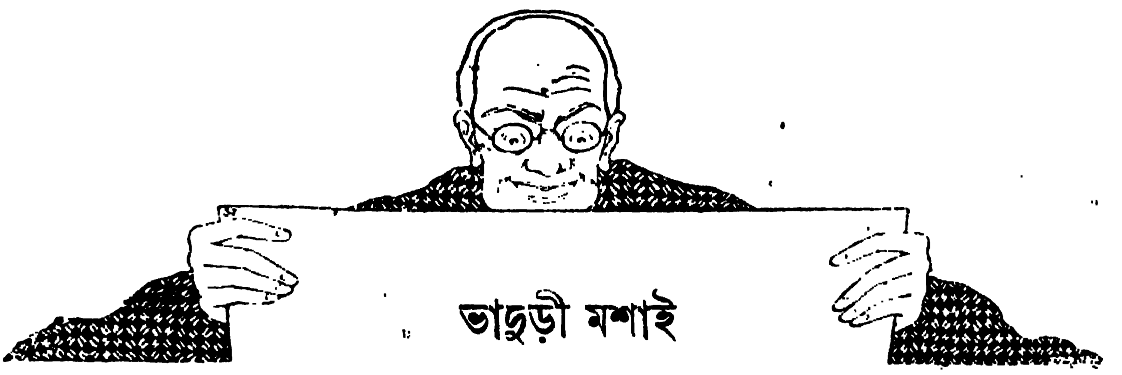
ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের প্রাচীন রাজতন্ত্রে অটোক্রেশী ছিল না। য়ুরোপীয়রা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কি জিনিষ, প্রাচ্যদেশীয় লোক তাহা জানে না। এ কথা সত্য নহে। এক সময় আমরা তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু জাতীয় চরিত্রের সন্ধান পাইয়া দেখিলাম—য়ুরোপের যে সকল জাতির ভিতর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রকৃতি, শরীর, মন ও সমাজগঠন যেরূপ ছিল, আমাদের প্রকৃতি এবং আমাদের শরীর, মন ও সমাজগঠন ঠিক সেইরূপ। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষায় পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। গ্রীকদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের ভাষা ও আমাদের ভাষা অনেকটা এক। তাহাদের চিন্তার ধারা ও আমাদের চিন্তার ধারা অনেকটা একরূপ। তাহাদের মুখের গঠন ও আমাদের মুখের গঠনে সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষা একরূপ। গ্রীকদের ও আমাদের সমাজগঠন একরূপ ছিল। তাহাদের মত আমাদের ভিতরও স্বাধীনতার ভাব অনাদিকাল হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রও সেই ভাবের অনুযায়ী ছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমাদের প্রাচীন নীতিতে রাজা ছিলেন প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি ছিলেন শাসনকর্ত্তা। আইনের কর্ত্তা তিনি কখনও ছিলেন না। তিনি আইনের অধীন হইয়া শাসন করিতেন। একতন্ত্রী বা স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজা তিনি ছিলেন না। বেদ, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধযুগের জাতক ও পুরাণ হইতে এখন বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি—আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল গণতন্ত্র, একতন্ত্র কোন দিনই ছিল না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বৃন্দাবনে

কোথা সে বসন্ত-শোভা নিখিল-দুর্ল্লভ,
মঞ্জরী-মধুপমেলা রসালে তমালে?
পলাশে অশোকে হাসি, কৃষ্ণ ফুলমালে,
কুঞ্জে কুঞ্জে হোলিখেলা কুঙ্কুম বিভব?
নিস্তব্ধ কানন-সভা, নীরব কোকিল,
শীর্ণ শষ্পপুষ্পে ম্লান মৌন বনবীথি,
বন-কপোতেরা গায় সকরুণ গীতি,
দূর বাংলার বনে শিহরে অনিল।
চন্দ্রকে চিত্রিত পুচ্ছ নীলকণ্ঠশিখী,
জাগায় মনের মাঝে মাধবের স্মৃতি,
কিশোরীর প্রেম-স্বপ্ন, মধুর আকৃতি,—
ইন্দু ইন্দ্রজালে নব প্রেম-মন্ত্র লিখি।
শুভ্র বালুতটতলে দূরে যায় দেখা,
নীল যমুনার ধারা, দীর্ঘ অশ্রুরেখা।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।



ভাদুড়ী মশাই

১২

কিংশুক বাবু ডায়ারীখানি খুলে সবিনয়ে বললেন,—"আমার আর ডায়ারী কেন, কিসের জন্যেই বা ডায়ারী! লিখবই বা কি;—বিষয়ই নেই।"

'খুক্' ক'রে একটু মিহি আওয়াজ হ'ল।

বোঝা গেল, ইরাণীদেবী হাসি সামলাচ্ছেন। কিংশুক চাইতেই সলজ্জ রক্তবর্ণ।

কিংশুক বাবু একটু দ'মে গেলেন, বললেন,—"এতে কতকগুলো এলোমেলো নোট আছে মাত্র। আমার এখানে আসবার উদ্দেশ্য, অক্ষয় বাবু কষ্ট স্বীকার ক'রে ঝিকে পর্য্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা থেকে অনুমান ক'রে নেওয়া বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, আপনাদেরও তিনি বলেছেন। কোন ভাল সাধু-সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ লাভ ক'রে এই ঝামড়ো-পড়া জীবনটাকে পরমার্থ-পথে মোড় ফিরিয়ে ফেলবো, অধুনা এই সঙ্কল্প নিয়েই আছি। তার পর এস্পার কি ওস্পার—যা ঘ'টে যায়।"

আচার্য্য বললেন,—"বাঃ, মনুষ্যজন্মের সেরা সঙ্কল্পই খুব সকাল সকাল আপনার মাথায় চ'ড়ে বসেছে দেখছি! পূর্ব্ব-সংস্কারের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! ভাববেন না, এস্পারই ঘটবে। যেহেতু, যা শুনলাম, সন্ধ্যালোকে বাগ্‌দত্তার আবছায়ামাত্র দর্শনে এতটা বৈরাগ্যের নজীর ভবে কি নভে—দুষ্প্রাপ্য। বাঃ, এই বেলা সাধনা সুরু ক'রে দিলে কি জিনিষই দাঁড়াবেন! আমাদের পোড়া বরাত, কোন দিকেই বাড়লুম না।"

"এমন কথা বলবেন না, আমায় দ্বারা কতটুকুই বা সম্ভব! বড় কঠিন পথ।"

"না না, দ্বিধা রাখবেন না। অদৃষ্ট অনুকূল থাকলে, রয়েছেই ত, দিক্‌শূলও ভোঁতা মেরে যায়।"

"একটু আঁলো যদি দেখতে পাই—"

"ভাবছেন কি, সম্মুখেই অরুণোদয়—"

কিংশুক বাবু মুখ তুলে চাইতেই ইরাণীদেবীর হাসি-ঢাকা মুখ—সুরুখ!

"অর্থাৎ সন্নিকটেই। একটু সাধনা-সাপেক্ষ। বুঝলেন? কিছু কিছু বুঝি ত।"

"নিশ্চয়ই, আপনারা আর বোঝেন না! তা এই কয়েক দিন কিছু কিছু যা আরম্ভ ক'রে ফেলেছি, সেটা লিখেও রেখেছি। একেবারে ত সম্ভব নয়।"

"পড়ুন পড়ুন, ও সব শুনলেও পুণ্য আছে।"

"এখন কেবল এই ছ' দফা নিয়ে পড়েছি।

(১) পুরোপুরি গৈরিক গ্রহণ, গোড়াগুড়ি শাস্ত্রসম্মত নয়, তাই যোগীরা রংয়ের একখানি সিল্কের রুমাল পাঁচ সিকে দে কিনে ব্যবহার করছি।"

"এইখানেই ত সৌভাগ্যের সোপান সুরু হয়ে গেছে। এক টাকাও নয়, আঠার আনাও নয়, ঠিক পাঁচ সিকে! এইখানেই ত জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্—দেবতার গণ্ডীতে টেনে নে গেছে। আপনি ঠিক মেরে দেবেন। পড়ুন—পড়ুন—"

(২) "স'পাঁচ টাকায় সিল্কের চাদর খানার—"

"এখানেও লক্ষ্য করবেন, স'পাঁচ টাকার! এ কি মানুষের খেলা! বলুন।"

"আধখানা নিয়ে এক দিন কৌপীন পরিধান ক'রে শয়ন করি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা রক্ষার জন্যে চিত হয়ে শুচ্ছি। কিন্তু পেছনে কৌপীনের পেল্লেয়ে গাঁট ফুটো পড়ায়, সারা রাত অস্বস্তিতে আর অনিদ্রায় কাটলো। তাই ওটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, কাছায় এখন গিনি বেঁধে শুয়ে—সইয়ে নিচ্ছি। সয়ে গেলেই কৌপীন চড়াবো।"

"ইয়াঃ,—একেই বলে 'যোগ-ক্ষেম' অর্থাৎ অলব্ধ লাভ আর লব্ধের রক্ষণ। গিনির পরেই গ্যাঁট, এইটাই সনাতন রীতি—মহাপুরুষরা বরাবরই তাই ক'রে আসছেন।

"(৩) মুক্ত-কচ্ছ হতেই হবে,—তাই এখন সকাল থেকে স্নানের শেষ পর্য্যন্ত কাছাটা দিচ্ছি না। এ ঝোঁকটা আমার অনেক দিনের।"

"বলেন কি! আপনি ত মেরে দেছেন দেখছি। গ্রহ আজ্ঞাচক্রে আসন গেড়েছে। ওটা খুব সুলক্ষণ। দেখেছেন ত‍‍ঁ—যখন রাগের মাত্রাধিক্যে এই মারি ত এই মারি এইরূপ রাজসিক অবস্থা, তখন ঘন ঘন মুক্ত-কচ্ছ হওয়ায় ক্রমে সাত্বিক ভাবের স্ফুরণ দেখা দিয়ে 'যা বেটা বেঁচে গেলি, তা না ত আজ'—ইত্যাদি বলিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দেয়। কাছা না খুললে এ ক্ষমা, এ শান্ত ভাব আসে না। যাঁর অহোরাত্র খোলা, তিনি ত—আহা! বাঙ্গালীর এই এক ভরসা! বলুন, যা শুনছি, সবই মধুর!"

(৪) "অগ্নিস্পর্শ ত্যাগ করেছি, স্পিরিটে—কুকারে রাঁধছি। বুদ্ধ-গয়ার বিশুদ্ধ কষ্টিপাথরের পাইপে সিগারেট টানি।"

"উঃ—অত্যন্ত কঠোরে গিয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, যিনি সামলাবার, তিনি এগিয়ে আসছেন। চিন্তা নেই।"

(৫) "মাছ-মাংস ত্যাগ ক'রে ডিমেই নির্ব্বাহ করছি।"

এতক্ষণে অক্ষয় বাবু বললেন,—"যোলটি।"

আচার্য্য বললেন,—"পারমার্থিক পথে ভুল হবার যো কি! যোড়শোপচার শাস্ত্রবচন। যাঁর হবার হয়, ঘাটে ঘাটে মিলে যায়।"

(৬) "টাকা-কড়ি সব গুণে ব্যাঙ্কে ফেলে দিয়েছি। চুলোয় যাক্—আর কেন? কোন স্বার্থই রাখিনি। একদম লিখে দিয়েছি—আমার বিনা দস্তখতে যেন সিকি পয়সাও না আমাকে দেওয়া হয়। ব্যস্—"

"তাই ত, এটা যে সবসে কঠোর ক'রে বসেছেন দেখছি! শুনেছি, কুবেরের কৃপায় বার্ষিক আমদানী হাজার ষাটেক।"

কিংশুক বাবু বাধা দিয়ে বললেন—"আর কি হবে মশাই, সবই যখন গেল—যেতে দিন।"

"এ সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিতে নেই বটে, তবে—"

"না মশাই, আর লোভের দিকে—"

"ঠিক,—যখন পূর্ব্বসংস্কার নিয়ে পাকা হয়ে এসেছেন, আপনাকে রোখে কে? এত দিন যে কোথায় আটকে ছিলেন—সেইটাই দেখছিলুম। সাধনা ত আরম্ভই ক'রে ফেলেছেন;—যে 'ছয় দফা' শোনালেন, ঐতেই ষট্‌চক্রভেদ এগিয়ে আসবে। তবে উপলক্ষ হিসেবে একটি সন্ন্যাসী গুরু জুটলেই যেন ভাল হয়।"

"তাও মিলেছিল মশাই।"

আচার্য্য সবিস্ময়ে বললেন—"কি হ'ল,—দেহ রাখলেন না কি?"

"আজ্ঞে না, সেই কথাটাই ডায়ারীতে লিখে রেখেছি,—কেনই বা!"

"সে কি কথা! আমাদের ধর্ম্মের ঝোঁকই পরলোকের দিকে। 'পরলোক' মানে আর কি,—এই আমরা—ইতরে জনা।"

অক্ষয় বাবু অবাক্ হয়ে চেয়ে, মাথাটা দ্রুত চুলকে,—চুল টেনে বললেন—"কি ধাঁধায়ই বানিয়ে গেছে, সোজা কথাগুলো বোঝায় বুদ্ধি বিগড়ে দিয়েছে!"

"হ্যাঁ—তা দিয়েছে বই কি। সে অনেক কথা, আর এক দিন হবে। এখন সাধুসম্বাদ শোনা যাক্।"

কিংশুক বাবু ডায়ারী খুললেন—

"মধুপুরে আসা পর্য্যন্ত সাধুর সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যা—ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণের ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীখানি দেখা, আর বড়-লোকদের বাংলোর ধারে ঘোরা ছিল আমার কায। মানসিক বৈরাগ্যে বেহুঁস্ থাকতুম। এক এক দিন আনকোরা এক এক টিন 'three castle'এর একটিও বাসায় ফিরত না—বেমালুম ভস্ম।

"আন্তরিকতায় ফল আছেই। এক দিন দেখি, একটি ভস্মমাখা হাস্যমুখ বলিষ্ঠ যুবা সাধু রায় সাহেবের বাংলোয় ঢুকলেন। আর যাবে কোথায়! দাঁড়া-হত্যে দিয়ে খাড়া রইলুম।

"আধ ঘণ্টা পরে প্রত্যাবর্ত্তন,—হাতে একটি নূতন হাঁড়ি। করযোড়ে পৌঁছে পাকড়াও করলুম। প্রসন্নমুখে কথা কইলেন—'আমি সিদ্ধমহাত্মার চেলা, বহু ভাগ্‌সে এই সাত বরিষ তাঁর সঙ্গলাভ ক'রে ধন্য হয়েছি। কুছু প্রার্থনা থাকে ত—আশ্রমে গিয়ে সাক্ষাৎ কোরো,—কৃপা করতে পারেন। বাধক-আধক থাকে ত সোভি আচ্ছা ক'রে দেবেন। রিক্তহস্তে সাধুদর্শন নিষিদ্ধ—কিছু ঘিউ নিয়ে যেও,—কমসে কম এক পউয়া। তোমারে কল্‌কাত্তার সাথ্ সাথ্

আধভুকে কৌশল্যা (advocate, counsel) তক্ আসে। এই দেখিয়ে না রায় সাহেব পাঁচ সের গেইয়া ঘিউ ভেজিয়ে দিলে। মহাত্মা সব কুছ করতে পারেন,—মনোবাঞ্ছা পুরে যাবে। সারি রাত হুমন্ করেন, কুছ খায়েন না,—ঘিউ-রস পিয়ে থাকেন। ভীষ্মদেবকা সহপাঠী,—ইচ্ছামৃত্যু।'

"নাম শুনলুম—চোঁড়া বাবা। চেলার নাম পট্টিলাল। আশ্রম দেড় মাইল দক্ষিণে।

"প্রণাম ক'রে এক-বুক আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলুম।

"পরদিনই দু'টাকার ঘি নিয়ে গিয়ে হাজির। পথে দু'খানা মোটর-বোঝাই মেয়ে-পুরুষ ফিরে চলেছে দেখলুম। গিয়ে দেখি, সেখানেও বহুৎ ভক্ত গরুড়-মেরে ব'সে রয়েছে। পট্টিলাল ঘি ভাংড়াচ্ছে,—ক্যানেস্তারা ভ'রে উঠলো!

"মন একটা পাপ ক'রে ফেললে,—মহাপুরুষের মূর্তিদর্শনে ঠাওরালে সেদ্দো হলে কি সিদ্ধ হয়, অথবা মানুষ পোচে দেবতা হয়! বোধ হয়, নরের আয়ু ফুরিয়ে ফেলে বেঁচে থাকলে—মানুষ ক্র্যামেন্টই পোচতে থাকে, এঁর বোধ হয় সেই বিবর্তনের অবস্থা, এখন না-মানুষ না-দেবতা। দেবতার পাকে চড়েছেন, খোলোস ছাড়ছেন।' এখন নিশ্চয়ই দেব-বীজে দাঁড়িয়েছেন। বীজের বহিরাবরণ পোচে গাছ বেরুয়, এঁ থেকে দেবতা দেখা দেবেন।

"ঘিয়ের হাঁড়ি সামনে রেখে প্রণাম করলুম। একটু হাসি মাখিয়ে বললেন—'বাঙ্গালী! বাঙ্গালা হামার বড়া প্রিয় আসে (আছে), এত্না ভক্তি কোই জাতের নেহি। বিচ্বিচ্মে আও।'

"চেহারা যতই দেখতে লাগলুম, ততই মন ফিরতে লাগলো, শেষ দাঁড়ালেন—'খাঁটি জিনিষ।' কারণ, এ ত সাধারণ মানুষের চেহারা নয়, একদম নির্লোম মাংসপিণ্ড! চুল, চোখের পাতা, ভ্রূ ঝ'রে গেছে বা পচের মুখে দিয়েছেন। দুই কসে মাত্র দুটি বহির্মুখী গজদন্ত। প্রথম দর্শনে চারু-পাঠের সেই সুশিল্পীর আঁকা সিন্ধুঘোটকই মনে পড়েছিল। বস্তুতঃ তা নন, mammoth (মান্ধাতার) যুগের মানুষ হবেন। কৃপা ক'রে আমাদের জন্যে এখনও বুঝছেন, দেহ দোরস্ত রেখেছেন। মনে মনে ক্ষমা চেয়ে, কৃতার্থ হয়ে ফিরলুম।

"ফেরবার পথে দেখি—বাবুদের একটি ছেলের তড়কায় মত ভরেছে. দাসী সামলাতে পাচ্ছে না। আমাকে দেখে বললে—'ঐ কি সাধুর মূর্তি গা! তা হ'লে আমাদের নফর সামন্ত কি দোষ করেছে? তাকে দেখলেও ত বড় বড় বীর হনুমান্ পালায়!—এখন ছেলে বাঁচলে হয়! এরা আঙুর খায়—আপেল-খেকো গোপাল, এদের কি বনমানুষ দেখাতে আনে!'

"বললুম—'চুপ চুপ, অমন কথা মুখে আনতে নেই।'

"সে আমার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে বললে—'ওঃ, তোমারও 'সুতিকে' বুঝি! ও মিন্ষে ওর ওষুধটাই ভালো জানে, একেবারে ধন্বন্তরি'।"

ইরাণী হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে মুখে আঁচল গুঁজে হাসি সামলাতে লাগলো।

আচার্য্য বললেন—"সাধুর কৃপায় কি না হয় মা, ভাগ্যে থাকলে সব হয়। শাস্ত্র খুঁজতে হবে কেন, ভক্তিভরে খবরের কাগজ দেখলেই সন্দেহ মিটে যাবে। হ্যা—তার পর?"

"হাবাতে কপাল কি না,—রাত্রে স্বপ্নে দর্শন পেয়েও—মওকা মাটী হয়ে গেল! আৎকে চেঁচিয়ে উঠলুম, গা ছম্ছম্ করতে লাগলো।"

আচার্য্য বললেন—"দুঃখু করবেন না, পার্থই পারেন নি, —মুখ শুকিয়ে আমাস, এক জালা জলের চেষ্টা! সে তবু দিনের বেলায়। যা শুনছি, অন্য কেউ হ'লে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ভাববেন না—আপনার হবে। বলুন—"

"দ্বিতীয় দিন ঘি নিয়ে যেতেই প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুছ দেখা'?"

আচার্য্য বললেন—"উনি নিজের প্রভাব জানেন ত।"

"আমি ত মশাই শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম!—তবে ত ঠিক, স্বপ্ন নয়—স্বয়ং! পদানত হয়ে বললুম—'অজ্ঞান আমি—বুঝতে পারি নি বাবা, চেঁচিয়ে মাটী করেছি। ক্ষমা করুন।' বললেন—'ডরো মত্ হো যায় গা। চৌসেরা চড়াও!'

"বললুম—'যাতে মনটি স্থির হয়, এমন ক'রে দিন বাবা, বড় ব্যথা বেজেছে!'

"বললেন—'আরে, বিন দুধ্ না মিলে নন্দলালা, কস্তুরীকা দস্তরই হায় মরকে ভি সুগন্ধ ছোড় যাতা। দরদ ভি মর যায় গা—আনন্দ ছোড় যায় গা। দেখে—রণছোড়জী প্রসন্ন হোয়ে ত—মন থির হোনেকা ক্রিয়া বতা দেঙ্গে।'

"এই ব'লে চোখ বুজতে বললেন। তার পর খাড়ে আট

আঙ্গুলের ঠেকো আর দু' চোখে দুই বুড়ো আঙ্গুলের মোক্ষম চাপ,—পোঁটা বেরয় আর কি! নড়বার যো নেই—ত্রাহি ত্রাহি!

"একটু আলগা দিয়ে বললেন—'রংছোড়জীকা জ্যোৎ কুছ দেখাই দেতা?'

"বেদনা ভুলে গেলুম; সত্যিই ত নানা রং দেখছি—লাল, নীল, হরিৎ, হলদে একেবারে বিদ্যেসাগরের 'বোধোদয়!' আনন্দ আর ধরে না। রংছোড়জী যান আর আসেন।"

আচার্য্য বললেন—"সেই ছেলেবেলাকার পড়া মুখস্থর মত,—come আইসেন—go যান, আবার go যান, come আইসেন, না?"

"আজ্ঞে, ঠিক তাই।"

"আবার ঘুরতে ঘুরতে?"

"এই যে আপনার তা হ'লে—"

"থাক্, পরে হবে। গুহ্য কথা গুরুভাই ভিন্ন—"

"ওঃ, তা বটে। বাবা খুসী হয়ে বললেন—'তুম ত পুরা তাপস হায়, দশ রোজ-মে বস্। চৌসেরা পূরা করলে বেটা। পহলে ভ্রমন, তব চারি ধাম ভ্রমণ, পিছে গদ্দি লেকে ঋদ্ধি আওর সিদ্ধি সেবন।' কিছু উপদেশও দিলেন।—

"পট্টলালকে জিজ্ঞাসা করলুম—'চৌসেরাটা কি?' সে বললে—'ভ্রমনকা জগি চার সের করকে ঘিউ। তুমি ত ভেইয়া বড়া ভাগ্‌বান আছে, দশ দিনমে পরমার্থ পৌছতে হামি কোইকে দেখে নি। কলকুত্তার গুজ (ঘোষ) সাহেব তিন মাহিনা চৌসেরা চড়াচ্ছেন। মুরগীর আণ্ডা ছোড়তে পারে না। বাবা গঙ্গাজলমে উজলকে খেতে কইয়েছেন, সর্ব দোখ (দোষ) ধুলাই হয়ে যাবে। থোড়া বাকী। প্রভু সব কুছ শোধন ক'রে দেন, ভগবতী ভি উড়ায় দেন।'—

"যাক্, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মশাই—কস্তুরীকা পর্য্যন্ত—আর তার সুগন্ধ পর্য্যন্ত—আ্যাঃ! অনির্ব্বচনীয় কথাটা চারুপাঠে পড়াই ছিল, সেই দিন তার মানে বুঝলুম। সে যে একটা কত বড় আশার আস্বাদ—একদম অনির্ব্বচনীয়! ঐরাবতের বল এসে গেল, বোধ হয়, পাহাড়গুলো এক ফুঁয়ে তুলোর মত উড়ে যায়! এক এক টানে একটা আস্তো সিগারেট ছাই হয়ে যায়!"

আচার্য্য বললেন—"যোগবল—যোগবল। সর্প মহাযোগী, অনাহারে ছ' মাস সমাধিস্থ থাকেন—সেরেফ কুম্ভকের জোরে। ঢোঁড়া আবার সবার ওপর, জলে-স্থলে সাধন-ভোজন। তাঁর কৃপায় আপনার তখন ঐশী শক্তি এসে গেছে কি না।"

"কিন্তু চোখ টন্-টন্ করছে—ধোঁয়া দেখছি।"

"তা হয়, চক্ষু স্থির না হ'লে ত মন স্থির হয় না।"

"ওঃ—তাই বোধ হয়। তা না হ'লে আর—চোখ বুজলেই, আহা—সেই রংছোড়! কভু সুবর্ণ-জ্যোতি, কভু নীলাভ দ্যুতি, কভু নবঘনশ্যাম। কিন্তু ঘুমুতে পারি না—ষ্টোভ জ্বালি, চা খাই আর সেঁক্ চালাই।

"একটু সামলে উঠে মাটীর নতুন হাঁড়ি কিনে চৌসেরা নিয়ে যেতে সুরু ক'রে দিলুম। সামনে রেখে স'রে বসি, নাগালের বাইরে থাকি, পাছে বাগিয়ে ধ'রে রংছোড় দেখান। চোখ তখনও পাকা ফোড়া—অমনই রং ছাড়ছে!"

আচার্য্য বললেন—"মহাপুরুষের মক্ষম স্পর্শ, প্রভাব পাকা হয়ে ধরেছে। তার পূর্ব্বসাধনাও ছিল কি না।"

"তা হবে। দু'দিন গেল। পট্টলালকে বল্লেন—'যোগ্য পাত্র, তুরন্ত।'

"শুনে মনটা আশায় উৎফুল্ল হয়ে নাচতে থাকে। ফেরবার পথে ডেপুটী ফকির বাবু বল্লেন—'আপনাকে দেখলেও পুণ্য আছে, না—পায়ের ধুলো দিতেই হবে। চেহারা ভারী চিজ মশাই, আপনার হবে না ত কার হবে? আমার পরিবারেরও ঐ কি না। তাঁর জন্যে ঘি বইছি, এক মট্‌কি গেছে। তাঁর হ'লে সেই পুণ্যে আমার হওয়া কাছিয়ে আসবে বলেছেন। তিনিও রংছোড়জীর দর্শনলাভ করেছেন। তাঁর হবে না কেন, মস্ত বনেদী বংশের মেয়ে। এখনও ঘরের মেঝেয়, দেলের গায়ে, পুকুরে মড়ার মাথা পাওয়া যায়, সবাই সাধক ছিলেন।'

"বললুম—'তিনি আসেন নি?'

"তিনি আসবেন কি ক'রে? মেডিকেল কলেজের ইন্‌ডোর পেশেণ্ট হয়ে Eye-Infirmaryতে বহুৎ হেফাজতে আছেন। চক্ষু সর্ব্বক্ষণই সেই ঘনশ্যাম দর্শন করছে। বলেন—'কি আনন্দ!' বাবা বলেছেন—'রূপ লাগ গেই নয়নে উহারি। চৌসেরা চালাতে যাও, প্রকট হোতেছি—ছুট্ যায়গা।' আমার মশাই এ বেডৌল মূর্ত্তি আর বদরং

দেখলে কুকুর-বেড়াল কাছে ঘেঁসে না,—ঠাকুর-দর্শন দুরাশা! দিন, পায়ের ধুলো দিন। এখন শুধু ঐ আর শ্রীমতী কুক্কবক গড়গড়ীই ভরসা।'

"ব্যারিষ্টার মিষ্টার রে দেখা হলেই টুপী খোলেন। আশায়—আনন্দে টনটনানি ভুলে যাই।"

আচার্য্য বললেন—"ও ভুলতেই হবে,—ধর্ম্মে টেনেছে যে—"

"তৃতীয় দিন তিন চেরে বারো সেরে ঘা দিলে। ভিড় জমায়েতের আগেই গিছি। দেখি প্রলয়কাণ্ড! পট্টিলাল টেনে ছুটছে—পড়ে ত মরে। পশ্চাতে এক পোড়াকাঠ হাতে ঢোঁড়া বাবা ধাবমান। কি বীভৎস দৃশ্য! আমাকে দেখে—রুদ্রহাসি হেসে ফিরলেন। ধুঁকছেন আর গজরাচ্ছেন। বললেন—'শালা সাত বরিষমে হঠযোগে হুঁসিয়ার হ'ল না, বদনামী করনে আয়া! শাসন না করলে আসন ঠিক হবে না। শরণ যব লিয়া, উপায় ত করনে হোগা'।"

আচার্য্য বললেন—"দুর্লভ জিনিষ, সেকালের কি না! দেহ রাখলে ও ডিপার্টমেণ্টটি ডুবে যাবে। অনেক পোষ্ট আপিস উঠে যাবে।"

স্মুবর্ণ বাবু সবিস্ময়ে বললেন, "পোষ্ট আপিস উঠে যাবে?"

আচার্য্য বললেন, "তা যাবে বই কি। গুরু ভাই ভিন্ন যেন—আচ্ছা, কিংশুক বাবুই শোনাবেন।"

স্মুবর্ণ বাবু। ওঁকে আর পাব কোথায়?

আচার্য্য। খুব নিকটেই।

কিংশুক বাবু ব'লে চললেন, "তার পর নিকটস্থ ঘন-জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দেড় কাঠা করোগেট ঘেরা হুমন-ছেত্র (ক্ষেত্র), বাইরে থেকে দেখালেন। বললেন, 'ইসকা মধ্যে রাতমে হুমন হোতা। স্বয়ং ব্রহ্মাজী আতা, কভি কভি বিষ্ণুজী ভি আ-যাতা।'

"জিজ্ঞাসা করলুম,—'শিব আসেন না?' হেসে বললেন—'শিউজী ত হিয়াই হায় বেটা?'

"আমি একেবারে গড়িয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলুম। বললুম—'এক দিন তবে আসবো, বাবা।'

"বললেন—'খবরদার বেটা, শিউজীকা বাঘ বাহারমে রহতা, মার দেগা! পহলে অধিকারী হো লেও,—ঘবড়াও মত,—বনা দেঙ্গে।'

"বিদায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে ফিরলুম—এ সৌভাগ্যের কথা কা'কে ক'ব,—আজ যদি—।

"উঃ—চোখ যে যায়, কোন্ দিক সামলাই, Infirmary তেই যাব না কি? না,—বোধ হয়, দিব্য-দৃষ্টি হবার পূর্ব্ব-লক্ষণ!

"যা হয় হবে, বাঘ থাকে ত সাম্নের দিকে; হুমন ছেত্রে গমন করবই। পেছন দিকে ছোট্টো একটা ফুটো দেখে এসেছি। একবার একটু দর্শন পেলেই মার দিয়া—হাতটা, পাটা, আঙ্গুলটা যা হয়। দেবতার তো।—

"ক'দিন জোর সাধনা চালালুম, ডেভিলো নয়, ডিমও নয়। চক্ষু করমচা। আচ্ছা,—দর্শন পেলেই সাফ হয়ে যাবে।—

"আজ অনেকক্ষণ জোচ্ছনা আছে, কিন্তু জঙ্গলের রাস্তা, রিভলভারটা সঙ্গে নিলুম। দু'-কাপ চা চড়িয়ে রাত দশটার পর দুর্গা বললুম। দেব-দর্শন, গা ছম্-ছম্ করতে লাগলো।"

আচার্য্য বললেন, "তন্ত্র একেই বলে বীর-সাধক। সিদ্ধি এঁদের ঘরে রাসই মেলে, মিলবেও, তা দেখে নেবেন।"

"ফোকোরে চোখ দিয়েই চমকে গেলুম, আলোয় কুর কুণ্ডি। গা কেঁপে উঠলো! সামনে দেখলুম, প্রকাণ্ড চুলি জ্বলছে, তদুপরি বিপুল কটাহ! ঋষিরা তা'তে ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা হব্যাদি নিক্ষেপ করছেন। ঢোঁড়া বাবা আর এক জন, বোধ হয় ব্রহ্মাই হবেন, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, 'স্বাহা-স্বাহা' বলছেন। ধোঁয়ে ধোয়াক্কার। তাই বোধ করি, ঋষিদের জটা দেখা যাচ্ছিল না, দাড়ি বেশ প্রমাণ। ব্রহ্মা কিন্তু চতুর্ম্মুখ নন।"

আচার্য্য বললেন, "ওটাও সেই 'পরলোকের' মত গুলিয়ে আছে। চতুর্ম্মুখ অর্থাৎ চতুর-মুখ,—তা নয় কি?"

অক্ষয়বাবু মাথা চুলকে বললেন, "জন্মটা বৃথা হয়ে গেছে, এই সব সোজা কথাগুলো কি জোট পাকিয়েই দিয়েছে! পুরাণগুলো আগাগোড়া ঢেলে সাজা চাই।"

আচার্য্য বললেন, "ভাববেন না, লোক জন্মে গেছে; মাসিকপত্র দেখেন না বুঝি?"

কিংশুকবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বেশ ধারালো। মুখ বটে, চোখ যেন কথা কচ্ছে, বজরং মেকার্ টাইপ আর কি, ওয়ারল্ড-মেকার কি না!"

"তা হোক, কিন্তু দুর্গন্ধে দাঁড়ানো দায়। ভাবলুম, দেখে ত নিয়েছি, ব্যস্, স'রে পড়ি। মাথা ঘুরতে লাগলো, অন্যমনস্কে একেবারে বাঘের লাইনে! সঙ্গে সঙ্গেই বিকট গর্জ্জন! চমকে রিভলভার বার করতেই—'হাম-হাম' বলতে বলতে বাঘের মুখের ভেতর থেকে পটি্লালের মাথা বেরিয়ে পড়লো! গর্জ্জন শুনতে পেয়ে ঢোঁড়া বাবাও ছুটে এলেন।—

"কাছে এসে বললেন,—'আমি জানতে না পারলে এখনই ত গিয়েছিলি! ওকে পটি্লালে রূপান্তরিত করতে করতে ছুটে এসেছি, তাই বেঁচে গেলে। কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিলে বল দিকি! খবরদার, আর কখনও এ কাম কোরো না। ভজনে বিঘ্ন দিলে দেব-রোষে প'ড়ে যাবে। আজ যেন আমি সামলে নেব, শিষ্য হামারা সন্তান। চলো, এগিয়ে দি।'

"তার পর অনেক আশ্চর্য্য কথা আর আশার কথা শোনালেন। সন্দেহ মিটে গেল, ক্ষমা চাইলুম। বাসায় এসে চা খেয়ে শুয়ে পড়লুম। চাপা আনন্দোচ্ছ্বাসের ধাক্কায় ঘুম হবে কেন?

"ভোরেই উঠে পড়লুম। বাগানে বেড়াতে গিয়ে দেখি, ফটকের বাইরে বিমর্ষবদন, কাতরদৃষ্টি পটি্লাল! কি খবর?

"বেচারা কেঁদে ফেললে। ঢেলা মেরে তার সর্ব্বাঙ্গ ফালা ফালা ক'রে দিয়েছে। বললে, 'আমাকে আধমারা ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে, শিব, ব্রহ্মা, দু'জনেরই বিশ্বাস, আমি আপনাকে সব ব'লে দিয়েছি। এখন আমাকে দয়া ক'রে ঘর ভেজিয়ে দিন।' পা জড়িয়ে কান্না।

"বলে, 'সয়তানদের সঙ্গে আর থাকব না। যা শিখেছি, ক'রে খেতে পারবো। কুছ না হোয়ে, মাহিনামে দো-শো রূপেয়া হোই যায়গা। রাম চাহে ত, আরাম সে পানশো ভি আ শকতা!' বলে কি!

"তার কান্না আর দুর্গতি দেখে ভারী কষ্ট হচ্ছিল, আহা, পতটা এগিয়ে—"

আচার্য্য বল্লেন, "না, সে ভাববেন না, গীতায় খাস্ ভগবানের শ্রীমুখের আশ্বাস দেওয়া আছে। আপনিও কম এগিয়ে রইলেন না। ব্রহ্মা কি শিবের ভয়ে ত আর জীভ উলটাতে হবে না, বিষ্ণুই এক বাকী। একটু সহিষ্ণু হলেই সাক্ষাৎ।"

কিংশুক বাবু ব'লে চললেন, "কে আবার বেরিয়ে পড়বেন, তাই চট্ পটি্লালকে সরিয়ে নিয়ে বাজারের রাস্তা ধরলুম। ভয় অবাক্ বাবুকে, ধরলে রক্ত বার ক'রে ছাড়বেন। অক্ষয় বাবুও প্রবন্ধের জন্যে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ান।

"সে আধ সেরের সন্দেশ আর তিন ছিলিম গাঁজা খেয়ে মানুষের মত হ'ল। তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললুম, 'ভেইয়া, তোমারি সঙ্গেই আমার প্রথম দোস্তি, তুমি সদয় না হ'লে মহাপুরুষের পাত্তাই পেতুম না। তুমি যতটুকু আধ্যাত্মিক রহস্য মালুম করতে পেরেছ, আমাকে বাৎলে দাও ভাই।'

"সে তখন এদের ওপর জ্ব'লে ছিল, বোধ হয়, ফেরবার পথও ছিল না। বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে,—'ঢোঁড়া সেই সে দিন আমাকে তাড়া করেছিল কেন, জানেন? আপনি নতুন হাঁড়ি ক'রে ঘি নিয়ে যান, তাতে সে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'যোগ্য পাত্র, তুরন্ত!' ওটা সঙ্কেত বাক্য, অর্থাৎ শীগ্‌গির ক্যানেস্তারায় ঢালো, নতুন হাঁড়ি, ঘি শুষবে। আমি নানা কাযে, ওটা ভুলে যাই। তাই, এই পিঠ দেখুন না; 'পাণ্ডের বরবাদ কিয়া' ব'লে পাণ্ডের খুন্ লে লিয়া! বলে, ঘিউ জীউ, ওর জান্। রোজ প্রায় দু'শো দেহাতী গরীব আসে, পাণ্ডের না আনলে কথা কয় না। সকলেই আনে, আপনারা ত 'চৌসেরা'—অমন দশ বিশ জন হররোজ আসেন। নূতন ঘৃতভাণ্ড ভেঙ্গে তার খোলামকুচি জলে সিদ্ধ ক'রে 'ঘিউ-রস' বার করতে হয়, এক ফোঁটা না বরবাদ যায়।'

"জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাতেও কি হুমন্ হয়?'

"সে হেসে বললে, "উসকা মুড় হয়! হামি ত যাচ্ছে, আপনি সব শুনেন। ওর নাম ঠক্কনলাল, আর ঐ ব্রহ্মার নাম চোট্টামল, দোনো দোস্ত। আগে রেড়ির দালালী করতো, বেশী হ'ত না। এক সাগরযাত্রী ভাল সাধুকে পাকড়ায়, তিনি সোনা বানাতে জানতেন। তাঁকে খুব তোয়াজ ক'রে, সাগর দেখিয়ে খুস ক'রে আনলে। তিনি কঠিন কঠিন রোগের ওষুধও জানতেন, সেই সব মেরে নেবার মতলব। তিনি কিছু কিছু ঔষধ বলে দেন, পয়সা নিতে মানা করেন; কিন্তু সোনা বানাবার হিকমৎ

রুকতে পারবিনি !' এরা অনেক চেষ্টা করলে, সাধু বনতে চাইলে ; তিনি হাস্‌লেন—দিলেন না।

"এরা দেখলে—আর রাখা বেফায়দা। তিনি ছিলেন সাঁচ্চা সাধু, তাঁর কাছে আরও দশ জন চেলা জুটলো। তখন এই সয়তান দুবেটা তাদের বললে—'চলুন প্রভু, কামাচ্ছা-মাই দর্শন করিয়ে আনি, চন্দ্রনাথভি হো যায়গা।'

"এক জন পাক্কা আড়কাটির সঙ্গে এদের আলাপ ছিল, এরাও বিচমিচয়ে ও কাযও করতো। সেই আড়কাটিও হ'ল সঙ্গী, 'সেত্তো'র কায করবে। এরা সবাইকে শিয়ালদার গাড়ীতে বসিয়ে দিলে ; দুই দোস্ত—উঠছি উঠছি ক'রে উঠলো না, গাড়ী ছেড়ে দিলে। তারা আড়কাটির সঙ্গে চা-বাগিচায় রওনা হয়ে গেল। এরা সাধু পিছু পঁচাশ টাকা ক'রে আগাম নিয়ে রেখেছিল।

"সেই সাধু-বিক্রীর টাকায় এই 'হুমন্-ছেত্র'—ঘিউর কারবার চলছে। চোট্টামল কলকাত্তায় থাকে—রাত্রে আসে, ভোরে চালান নিয়ে যায়। এটা চর্ব্বির কারখানা বাবুজী। ঠক্কনলাল সাধুগিরী করে, দাওয়াই দেয়, ঘিউ কামায়, চর্ব্বি চালায়। রোজ মনিওড়ার ভি করিব করিব দেড়শো রূপেয়ার আসে। সাত বরিষমে চার লাকের উপর কামিয়েছে।

"শিষ্যসেবকরা ওই হুসেনী হুমনের প্রসাদ কলকত্তায় দুটাকা সের প্রণামী দিয়ে নেয়,—জাতভি সাঁচ্চা থাকে, ধরমভি কাচ্চা না পড়ে, করমভি আচ্ছা হোয়। এখানে যে দোকান থেকে ঘিউ আনেন, সেওভি ঠক্কনলাল চোট্টামল কোম্পানীকা।

"খুব হুঁসিয়ার রইবেন বাবুজী,—আপনাকেও আড়কাটির হাতে ঝেড়ে দিতে পারে।' ইতি—

"তাকে গয়ার টিকিট কিনে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়েছি—সে রওনা হয়ে গেছে। যাক—চোখ দুটো যে যায়নি"—

আচার্য্য বললেন—"হ্যাঁ, এখন এসপার চলবে, সে পথটা আছে। কিন্তু যা শোনালেন, এ যে একদম 'কাশীরাম দাস কহে'—। ইচ্ছা ছিল দিগ্বিজয়ে বেরুবো, আমায় যে দমিয়ে দিলেন। সাধু-বিক্রী—বাঃ, এমন সেরা জিনিষটা মাথায় আসে নি ! আহা, তা'বড় তা'বড় ওস্তাদ সব রয়েছেন। কাল চলুন একবার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি,—যতটা এগনো যায়।"

সকলে অবাক হয়ে শুনছিলেন, এইবার সশব্দে হাসলেন।

ইরাণী দেবী বললেন—"না, সেখানে আর যাওয়া হবে না।"

কথাটায় যেন সরকারী সুর বাজলো। আচার্য্য সুরজ্ঞ লোক, তিনি বললেন—"কিংশুক বাবুকে আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাব মা—সে ভার আমার—"

ইরাণী—টক্‌টকে।

মীরা বললেন—"না না, আপনাদেরও গিয়ে কায নেই।"

আচার্য্য মুরুব্বীয়ানা ভাবে বললেন, "নবনী ছেলেমানুষ, ও এর মধ্যে সাধু দেখবে কি ! ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না।"

মীরা—জবাকুসুম !

"আচ্ছা, আজ তবে ওঠা যাক্, বেলাও হয়েছে। সুধী-সঙ্গে ভারী আনন্দ পেয়ে যাচ্ছি, আবার আসবার লোভ বোধ হয় সামলাতে পারব না। আসতে ত হবেই, সব শোনাও হয়নি। কিংশুক বাবুকে অনেক কথা বলবারও রইল।"

সকলে একবাক্যে বললেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের পেয়েছি। আমাদের অনেক কথা জানবার আর জিজ্ঞাসা করবার রয়েছে, অনুগ্রহ ক'রে আসা চাই-ই ! এখানে এসে এমন আনন্দ কোন দিন পাই নি, এই লাভও কোন দিন ঘটে নি। মতিবাবু খুবই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাঁকে ভগবান্ মেরেছেন, সুখ হয় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আচার্য্য বললেন, "তিনি আমাদের সকলেরই সমান আত্মীয়, তফাৎ পাবেন না। ভাল হয়ে যাবেন, ভাল হয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, তাই হোন।"

ইরাণী সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "কিন্তু ঐ ঢোড়া পোড়ারমুখোর ঐ দিকে যেন যাবেন না।"

আচার্য্য বললেন, "না মা, আমিও যাব না, কারুকে যেতেও দেব না। ওর কাছে আমার শেখবার নতুন কিছু নেই মা !" (হাসলেন) সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন।

বাগান পার হয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, "ঐ পাশেই বাসা একবার পায়ের ধুলোটা দিয়ে যাবেন না ?"

"আজ যে বেলা ক'রে ফেলা গেছে, নবনীর কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।"

নবনী তাড়াতাড়ি বললেন, "আমায় আর—"

"ওঃ তবে চলুন।" [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৎকথা *

১। জনৈক ভক্ত ও শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ।

ভক্ত। মহারাজ, আপনি সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন করেছেন, প্রাণ-মন দিয়ে তাঁর যথেষ্ট সেবা করেছেন, আবার দেখি, দিবারাত কঠোর সাধন-ভজনে মগ্ন থাকেন। আপনাদের আবার সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি?

লাটু মহারাজ। ভগবান্ দেখলে যদি একেবারেই সব লাভ হয়ে যেত, তা হ'লে আর কিছু ভাবনা ও অভাব থাকত না। সে কালে দস্যু রত্নাকর সাধুর রাজা নারদকে আর তার বাবাকে (ব্রহ্মাকে লক্ষ্য ক'রে) কেবল দর্শন ক'রেই একেবারে বাল্মীকি হয়ে যায় নাই। তাঁকে অনাহারে অনিদ্রায় এমন কত কাল কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল যে, গায়ের চারদিকে বল্মীকের স্তূপ হয়ে গেছল। তিনি যে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করেছিলেন, সেই সব কাজের এক একটি সংস্কার তাঁর মনে ছাপ-মারা হয়ে গেছল। সেই সব দাগ (ছাপ) তুলতে তাঁর যাট হাজার বছর লেগেছিল। তবে কি জান, ভগবান্ ও মহাপুরুষদের দর্শনলাভ ও কৃপালাভ করতে পারলে আমাদের জীবনের গতির পরিবর্তন হয়ে যায়, তাঁরা ভগবানের পথের মোড় ফিরিয়ে সাধককে অনেকটা এগিয়ে দেন, কাজটা অনেক হাল্কা হয়ে পড়ে। যেটা দশ বছরে হ'ত, সেটা তাঁদের দয়ায় দশ দিনে হয়ে যাবে।

২। শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট ভক্তটি এক প্রাচীনা স্ত্রীলোককে লইয়া যাইয়া বলিলেন, "মহারাজকে প্রণাম কর ও ইঁহার পদধূলি গ্রহণ কর। ইনি সাক্ষাৎ শিব।"

মহারাজ। আরে শিব ত সেই একটি আছে। তোর আমার মত কি দশ বিশটা শিব হবে?

ভক্ত। সকলের মধ্যেই ত এক আত্মা বর্তমান; সুতরাং যত জীব, তত শিব হবে না কেন?

মহারাজ। শিব একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি অনাদিকাল থেকে একই রয়েছেন, তিনি স্বয়ম্ভু। তবে তিনি বহুরূপে সেজে বহু হয়ে লীলা করছেন কি না, এদের মধ্যে কারুর কর্মক্ষয় হয়ে আত্মস্বরূপ বোধ হ'লে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়।

৩। জনৈক ভক্তের আত্মীয়া তাঁর পুত্রের বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন, নানা রকম ভাবে তাঁকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করেন। এক জন ৫ শত টাকা আর এক জন ১ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করেছিল। ভক্তটি কিছুক্ষণ পরে মহারাজের নিকট যান। মহারাজ তাঁকে দেখেই অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, অনেকে ছেলের বিবাহের জন্য তোমাকে অনেক টাকার লোভ দেখাবে। কেউ বলবে, ৫ পাঁচ শত টাকা দিব, কেউ বলবে, হাজার টাকা।" এই কথা শুনে ভক্তটি শিহরিয়া উঠলেন। মহারাজ কিরূপে তাঁদের গোপনীয় কথা জানতে পারলেন, তিনি নির্ণয় করতে পারলেন না। মহারাজ আরও বললেন, "দেখ, তোমার ছেলের বয়স এখন অল্প, লেখাপড়া বেশী করে নাই, রোজগার করতে অক্ষম, তাতে তোমার অবস্থাও ভাল নয়, খেটে খেতে হবে, এখন যদি ছেলের বিবাহ দাও, দুচার বছর পরে যখন তার দুচারটে ছেলে হবে, তখন সে না পারবে ছেলেদিগকে দুটো খেতে দিতে, না পারবে নিজে পেট ভ'রে খেতে, উঠতে বসতে কেবল বাপ-মাকে গালাগালি দিবে। সে দুঃখে প'ড়ে যত কাঁদবে, তার চোখের জল তোমার তত শাপের কারণ হবে।" ভক্তটির এক ভাইপো ছিল, তারও বিবাহ দিতে বারণ কল্লেন। ভক্তটি মহারাজের কথা শুনে সরলভাবে তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য কল্লেন এবং বড়ই সুখের বিষয় যে, আজও পর্য্যন্ত তাঁর ছেলে কোন বিশিষ্ট আফিসে কায করা সত্ত্বেও তাকে অবিবাহিত রেখেছেন। মহারাজের অযাচিত কল্যাণময় উপদেশ এইখানেই শেষ হইল না। তিনি ভক্তটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন, "দেখ, যাহারা খুব বড় লোকের ছেলে, ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে, চাকর-চাকরাণী, কোটা-দালান, বাগান-বাগিচা প্রভৃতি ধনদৌলত আছে,

---

* শ্রীমৎ লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পার্শ্বচররূপে তাঁহার অমৃতবাণী শুনিবার অনেক অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং যে সব কথা তাঁহার শিষ্য ও সুহৃদবর্গকে বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও সৎকথারূপে গ্রথিত হইয়া থাকিবার যোগ্য। তাহা হইতে কয়েকটি

তারা সাধ-আহ্লাদ ক'রে অল্পবয়সে তাদের আদরের ছেলের বিবাহ দিলেও দিতে পারে। তোমরা গৃহস্থ, ছেলের বিয়ে ত দিবেই, আগে ছেলে মানুষ হ'ক, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারুক, দুটো মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হউক, তখন তার বিবাহের কথা, নচেৎ নয়। এখন তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিও না, দিও না, দিও না। আমি পুনঃ পুনঃ মানা করছি, তোমার কল্যাণের জন্য।"

৪। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অহেতুকী দয়ার তুলনা ছিল না। যখন যে কোন ব্যক্তি তাঁর নিকটে আসিতেন, তাহাকে কিছু না কিছু খাওয়াইয়া অমনি যেতে দিতেন না। এই সম্বন্ধে একটি ভক্তের কথা উল্লেখ করা গেল। ভক্তটি বলতেন যে, যখনই তিনি শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে যেতেন, মহারাজ তখনই একটি হাঁড়ির ভিতর হইতে একটি গজা, জিলাপী, মিহিদানা বা লাড্ডু তাঁর হাতে দিতেন। ভক্তটি মহারাজের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে, কাশীতে যে কয়েক দিবস থাকতেন, তিনি মহারাজের কাছ-ছাড়া হতেন না। মহারাজও অন্তরে অন্তরে তাঁকে ভালবাসতেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাবার দিন উপস্থিত হলেই মহারাজ আপন মনে বলতেন—"শালাকে এবার এখান হ'তে তাড়াব।" ভক্তটি ঠিক সেই সময় এক দিন উপস্থিত হইয়া মহারাজকে এরূপ কথা বলিতে যখন শুনিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি আজ কলিকাতায় রওনা হইব। আমার কাশীতে থাকার সময় (পরমায়ু) ৺বিশ্বনাথের পূজাদি কার্য্য শেষ ক'রে আশ্রমে আর ২।৩ ঘণ্টা মাত্র। আপনি তাড়াবেন কি? আমি ত তাড়া খেয়েই আছি।" মহারাজ তাহা শুনিবামাত্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমায় তাড়াব বই কি; তুমি কি আমার দুঃখ বুঝ? আমার দুঃখ ভগবান্ রামচন্দ্র বুঝেছেন। আমি তোমার নাম ক'রে ক'রে ভরত রাজা যেমন হরিণ ভেবে ভেবে হরিণ হয়ে গিয়েছিলেন, আমিও তোমার কথা ভেবে ভেবে আবার তাই হব না কি?" আবার পরক্ষণেই তাঁহার সেবককে ডাকাইয়া ভক্তটির খাবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে স্বয়ং মহারাজ নীচে নামিয়া একার পিছু পিছু কয়েক পা এগিয়ে দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, বাড়ীতে পৌঁছিয়াই যেন চিঠি দেওয়া হয়। এই নিঃস্বার্থ, অহেতুকী ভালবাসার আস্বাদন আর কোথায় পাইব?

৫। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ যোগেন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের পত্নী কাশীতে বাস করিবার সময় এক দিন পূজ্যপাদ শ্রীলাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁর স্বামী যত দিন সংসার আশ্রমে ছিলেন এবং ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, তখন তিনি একটি দিনের জন্যও তাঁর সঙ্গে বসিয়া রসালাপ (ফষ্টিনষ্টি) করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন না, অথচ তাঁর সঙ্গে কদাচ রূঢ় ব্যবহার করিতেন না। তিনি তাঁকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখিয়া বরং শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, মনে হইত, তিনি অপর এক জন ভদ্রলোকের স্ত্রী। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াও যোগেন মহারাজের ন্যায় এইরূপ পবিত্রভাবে কয় জন জীবন যাপন করিতে পারে? এই কথা জনৈক ভক্তের নিকট উল্লেখ করিয়া মহারাজ বলেছিলেন যে, ভগবানের বিশেষ দয়া না থাকলে সাধু মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয় না। সৎসঙ্গ করতে করতে তার এমনই একটা সংসংস্কার হয়ে যায় যে, তার ফলে অসংসংস্কার নাশ হয়ে যায়, তখন সংসারে পথ চিনে চলতে পারা যায় এবং পবিত্রভাবে জীবন কাটান যায়। তা নইলে সংসার-পথকে দুর্গম বলে কেন? এ পথে হুঁসিয়ার হয়ে চলতে না পারলে মুস্কিলে পড়তে হয়, পদে পদে বিপদ, জীব "নাস্তানাবুদ" হয়ে শেষে মারা যায়, তাই সংসারে সাধুসঙ্গ খুব শ্রেয়ঃ বলতে হবে। যৌবনকাল হ'তে সংসংস্কার করেছিল ব'লে, সদ্গুরুর কৃপালাভ ক'রে যোগেন পূর্ব্বাশ্রমে বিবাহ ক'রেও স্ত্রীর সহিত নিঃসঙ্গ ও পবিত্রভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। পরে সন্ন্যাস লয়ে কত লোকের কল্যাণ করলে। এইরূপে নিজেও বেঁচে গেল এবং কত লোককেও বাঁচিয়ে দিলে। যার স্ত্রী তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে এত উচ্চ Certificate দিলে, সে কত বড় ত্যাগী। যোগেন মহারাজের পবিত্র জীবনের কথা চিন্তা করলেও মনে কুচিন্তা আসে না। যথার্থ পবিত্র জীবনের মূল্য কে বুঝিবে? তাঁর দয়া না হ'লে কেউ বুঝতে পারবে না। সকলই তাঁর দয়া।

৬। এক দিন কোন ভক্তের দুইটি আত্মীয়া বিধবা শ্রীশ্রীলাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়া উভয়ে তাঁর শ্রীমুখ হ'তে অনেক সহানুভূতিসূচক কথা ও সদুপদেশ শ্রবণে

পরম পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁর নিকট হ'তে বিদায় লওয়ার পূর্ব্বে তাঁর চরণের নিকটে দুই জনে দুই টাকা প্রণামী দিলেন। ইহা দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "আমাকে টাকা প্রণামী দিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাধুকে শুধু প্রণাম করলেই যথেষ্ট, যদি হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকে। শ্রদ্ধাই হ'ল জিনিষ। আমি কি গুরু, গোঁসাই, মোহান্ত যে, আমাকে প্রণামীর টাকা দিতে হইবে? টাকা তোমরা তুলে লও। তোমরা গরীব বিধবা, তোমাদের কে দিবে? আমার ত তোমাদের সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই, উল্টে আমি তোমাদের কাছ থেকে টাকা লব? আমি ভক্তটিকে ব'লে দিব, যদি পারে ত বরং তোমাদিগকে সাহায্য করবে। তিনি (ঠাকুর) কত গরীব অনাথকে সময়ে সময়ে সাহায্য করতেন, আমার মনে আছে, আমার হাত দিয়েও কাউকে কাউকে সাহায্য পাঠিয়ে দিতেন। এ সব আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। আমি কোন সাহায্য করতে না পেরে উল্টে গরীব বিধবার কাছ থেকে নিতে পারি কি?"

এই কথা শুনিয়া সেই দুটি বিধবা কাঁদ-কাঁদ ভাবে মহারাজের চরণ বন্দনা করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন যে, "মহারাজ, আমরা গরীব হ'লেও আমাদের যৎকিঞ্চিৎ কি আপনার সেবাতে আসবে না? গরীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ের পূজা সাধু মহাত্মারা যদি দয়া ক'রে গ্রহণ না করেন, তা হ'লে তাদের আর উদ্ধারের উপায় হবে কি ক'রে? আমাদের সেইরূপ সৌভাগ্য কোথায় যে, মনের সাধে আপনার সেবার্থে সাহায্য করিতে পারি, আপনার সেবায় ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং উহা ফেরত দিলে আমাদের মনে বড় কষ্ট হবে। উহা আপনার সেবাতে এলে আমরা কৃতার্থ বোধ করিব।" মহারাজ তাদের অকপট হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দর্শনে প্রীত হইলেন এবং যে ভক্তটির সঙ্গে ঐ দুজন বিধবা আসিয়াছিলেন, তাহাকে উঁহাদের প্রসাদ দিবার আজ্ঞা দিলেন।

৭। আর একবার কলিকাতার এক জন ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তি মহারাজকে কাশীর আশ্রমে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁর পদপ্রান্তে ৫টি টাকা প্রণামী রাখিয়া চুপি চুপি চলিয়া যাইতেছিলেন। প্রণামীর টাকা যে দিয়েছে, ইহা মহারাজ প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই; পরে ছাদ হ'তে নীচের ঘরে আসিবার সময় ঐ পাঁচটি টাকা প'ড়ে আছে দেখে মহারাজ তৎক্ষণাৎ ঘরের বারান্দা হ'তে উচ্চৈঃস্বরে সে ভদ্রলোকটিকে ডাকিতে লাগিলেন। পুনরায় ঐ লোকটি আসিলে মহারাজ ঐ টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আমি কি গুরু না মোহান্ত যে প্রণামী লইব? আমি যদিও গাছতলার ছাই-ভস্ম-মাখা সাধু নহি, তবু তাঁর (ঠাকুরের) কৃপায় আমার কোন রকমে চ'লে যাচ্ছে। তাঁর নাম ক'রে ত কাশীতে প'ড়ে আছি। তিনি আমার কোন অভাব রাখেন নাই। আপনি টাকা ফিরিয়ে নিন।"

এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি কুণ্ঠিতভাবে মহারাজকে বলিলেন, "যদি ঐ অর্থ আপনার সেবার জন্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তা হইলে আপনার আশ্রমের কোন সদ্‌ব্যয়ে উহা আমি দিলাম। কিন্তু দয়া ক'রে ফেরত লইতে বলিবেন না।" তৎপরে মহারাজ আশ্রমে ভোজন করাইবার জন্য তাঁহার সেবককে অনুমতি করিলেন।

এইরূপে মহারাজ কারুর নিকট হ'তে দর্শনী প্রণামী গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ (অনিচ্ছুক) ছিলেন। তিনি এমনই নির্লোভ ছিলেন যে, কারুর কষ্ট করিয়া দেওয়া অর্থ-সাহায্য লইতে নিষেধ করিতেন এবং নিজেও লইতে পারিতেন না। কাশীতে অবস্থানকালে যে কতিপয় ভক্ত তাঁকে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাঠাইতেন, তাঁদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে দু তিন মাস কাল সাহায্য পাঠান বন্ধ করিত, তিনি তাকে সাহায্য পাঠান স্মরণ করাইয়া তাগিদার চিঠি দিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন যে, ঐরূপ করিলে উহাকে লজ্জা দেওয়া হবে। সে গেরস্থ লোক, আইল-গোইল সংসারের আপদ-বিপদ অনেক আছে, এর মধ্যে প'ড়ে বেচারা হাবুডুবু খাচ্ছে, সে নিজেই সামলাতে পাচ্ছে না, তার উপর টাকার তাগাদা ক'রে তাকে চিঠি লিখলে তার মনে কষ্ট দেওয়া হবে। আগেকার সাধুদের টাকার কোন দরকারই হ'ত না; ইদানীং গেরস্থদের মত সাধুদেরও টাকা নইলে চলে না। তিনি (ঠাকুর) ছিলেন সব সাধুর রাজা। টাকা ছুঁলে তাঁর হাত বেঁকে যেত। তাঁর জীবন প্রত্যক্ষ দেখে ও শুনে কয় জন সাধু তাঁর আদর্শ-পথে চলতে পারবে? তিনি কেমন দীন-হীনের মত সামান্য সাজে থেকে দিনরাত ঈশ্বর চিন্তা ক'রে পবিত্র জীবন কিরূপে কাটাতে হয়, তা দেখিয়ে গেলেন এবং আমাদের কয় জনকে সেই ভাবে গ'ড়ে

তুলতে লাগলেন। তাঁর হাতের বনেয়া আমরা কয় জন যে কটা দিন আছি, তার পর ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে সব ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। কালের এমনই মহিমা। এক সময়ে বিবেকানন্দ স্বামী ও আমরা আর সব গুরু ভাই অনেক সময় পায়ে হেঁটে ও ভিক্ষা ক'রে খেয়ে, আবার কখন কখন অনশনে থেকে কত দেশ ভ্রমণ করেছি। এখনকার আমাদের ভিতর কয় জন সে রকম কষ্ট সহ্য করতে পারবে? দুঃখের কথা, ইদানীং সাধুদের ভিতরেও গেরস্থদের লাক্সারী (luxury) ঢুকেছে। ঠাকুরের ও স্বামীজীর ভাবের মত এখন সকলে কি জীবন কাটাতে চেষ্টা করছে? সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে যত দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে সামান্য মোটা কাপড়ে ভিক্ষান্ন গ্রহণ ক'রে দিনরাত ধ্যান-জপে এখন কয় জন সন্ন্যাসী আদর্শ-জীবন কাটাচ্ছে? সে কালে এক জন আদর্শ-মহাযোগী সাধুর দর্শন পাওয়া বড় দুর্লভ ছিল, বহু ভাগ্যে কদাচিৎ লোক তাঁদের দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হ'ত, আর এখন অলি-গলিতে, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে দেখলেও এবং রেলের গাড়ীতে দেড়া ভাড়া দিয়ে গায়ের পাশে ব'সে গেলেও কোন গেরস্থ ভদ্র লোক সাধুকে দেখে প্রণাম করা দূরে থাকুক, একটুও সমীহ করে না। সাধুর সঙ্গে আলাপ করতেও তাদৃশ প্রবৃত্তি ও শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখা যায় না। এর কারণ কি? সাধুদের মধ্যে কেউ কি এটি লক্ষ্য ক'রে ভেবে দেখেছ? লাল কাপড় পরলেও যেমন অনেকেই বড় আদর্শের উঁচু ধাপ থেকে ক্রমে ক্রমে নীচের পৈঠেতে নেমে পড়ছে, গেরস্থরাও ঐহিক সুখভোগে মত্ত হয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে ও সাধুদের প্রতি দিন দিন তেমনই শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য ও বিলাসী হয়ে পড়ছে। বাঙ্গালাদের ভিতর এই রোগ খুব বেড়ে উঠেছে, তারা অনেকে সাধুদের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং সাধুদের এক মুঠো ভাত বা দু'খানা রুটী খেতে দিতে কাতর হয়, কিন্তু হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীদের ভিতর এইরূপ শ্রদ্ধাশূন্য ভাব নাই। তাদের মধ্যে গরীব গেরস্থরাও নিজেদের জন্য প্রস্তুত অন্ন হ'তে সাধুদের ভিক্ষা দিবার জন্য এক মুঠো অন্ন, দু'খানা রুটী রেখে তবে খায়। হাজার বাঙ্গালী গেরস্থর মধ্যে এক জনও ঐরূপ করে কি? সেইরূপ শ্রদ্ধা কোথায়? তাই ত স্বামীজী সময়ে সময়ে দুঃখ ক'রে বলতেন যে, আমাদের দেশের লোক সব শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে পড়েছে ব'লে এত কষ্ট পাচ্ছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কাযে তাদের শ্রদ্ধা নাই; কিন্তু নিজের দেহসুখের জন্য এবং স্ত্রী-পুত্রাদির ভোগ-বিলাসের জন্য কষ্ট ক'রে উপায় করা টাকা জলের মত খুব খরচ করতে মজবুত। সাধুরা এক মুঠো অন্ন খেয়ে দেশের ও দশের জন্য প্রাণ দিয়ে কত কল্যাণ করবেন, সেটা বাঙ্গালী গেরস্থরা একবার ভেবেও দেখে না। সাধুদের যে এত কষ্টের জীবন, তার জন্য তাদের প্রাণে একটু দরদও নেই। সেই জন্য সংসারে হাজার ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও তাদের প্রাণে এতটুকুও শান্তি নেই। আসল সুখের পথের সন্ধান তারা পায় না। তারা কেবল জানে এবং সার করেছে :—

"টাকা ধর্ম্ম, টাকা কর্ম্ম, টাকা হি পরমন্তপঃ।
যস্য গৃহে টাকা নাস্তি, তস্য গৃহে কুছ নাস্তি॥"

৮। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ কখন কখন ঠাকুরের ভক্তদের বাড়ীতে অনিমন্ত্রিত ও অযাচিতভাবে মধ্যাহ্নে গিয়া পড়িতেন এবং উপস্থিতমত যাহা কিছু ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এইরূপভাবে হঠাৎ ভিক্ষা করিতে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে, নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়ে গেলে ভক্তরা নানা প্রকার খাবার আয়োজন করিবে। ভক্তরা যে কি অবস্থায় থাকে, নিত্য কিরূপ খায় দায়, সেটা জানা যায়, আর তারা সাধুকে ভিক্ষান্ন দিতে কাতর বা বিরক্ত হয় কি না, সেটাও জানা যায়, যদি হঠাৎ (পূর্ব্বে না জানিয়ে) তাদের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য যাওয়া যায়।

৯। বেলুড় মঠে না থাকিয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজ বলিতেন যে, তিনি অনেক বেলা পর্য্যন্ত আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে প্রথম প্রথম নূতন মঠ হ'লে ঘরে প'ড়ে থাকতেন। সেই দেখে ছোকরা নূতন সাধু ব্রহ্মচারিগণ তিনি অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাচ্ছেন, এই মনে ক'রে ঠেলে তুলে দেবার জন্য বিরক্ত করত। তারা ত বুঝত না যে, তাঁহার ভাব কিরূপ। তারা মনে করতো যে, সাধু খুব ভোরে ঘুম থেকে না উঠে বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছে দেখলে বাহিরে থেকে যে সব লোক মঠ দর্শন করতে আসে, তারা মঠের সাধুদের নিন্দে করবে এবং একটা কুধারণা করবে। যেখানে দশ জন মিলে গুলতনী হয়, সেখানে ধ্যান-ভজনের ব্যাঘাত হবে, এই ভেবে আমি বরাবর তফাৎ থাকি।

১০। দুটি ভিক্ষান্ন যোগাড় করতে যেটুকু সময় লাগে

তা ছাড়া সর্ব্বক্ষণ (দিন-রাত) সন্ন্যাসী ঈশ্বর-চিন্তা করতে থাকবে—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে ; তবে ত বস্তু লাভ হবে ; নইলে গেরস্থদের মত কেবল হেসে খেলে হো হো ক'রে দিন কাটালে কি কখন কায হবে ? ভজন-সাধন ব্যাপারে সন্ন্যাসীকে সর্ব্বক্ষণ লেগে থাকতে হবে ; তবে তাঁর (ভগবানের) দয়া হ'লে আত্মজ্ঞানলাভ হবে। ভজন-সাধনে একটু আলগা দিলে (ফাঁকি দিলে) সন্ন্যাসীর মাপ নেই ; কিন্তু গেরস্থরা দিন-রাত সংসারের নানা কাযের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থেকেও যদি ওর মধ্যে একটু সময় ভগবানের নাম জপ বা স্মরণ মানস করে, তা হ'লে তাদের সাত খুন মাপ জানবে। কথাটা হচ্ছে এই, গেরস্থই বল আর সাধু-সন্ন্যাসীই বল, যত দিন পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানলাভ না হচ্ছে, তত দিন এই ভবে আসা-যাওয়া বন্ধ হবে না। যতই সংসারে স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াও, জন্মমৃত্যুরূপ যাতনা হ'তে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই—যত দিন পর্য্যন্ত না জীবের আত্মস্বরূপবোধ হয়। আগে আপনি কে, এইটে পাকা বোধ (জ্ঞান) হ'লে তবে জগৎ-রহস্য ব্যাপারটা বুঝে সাধকের জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ হয়। আগে এই রকম জীবন্মুক্ত সাধুর দর্শন কদাচিৎ কারুর ভাগ্যে মিলিলে তার জীবনের মোড় ফিরে যেত। সেই জন্য যাঁর বস্তুলাভ হয়েছে—সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে যে পেয়েছে, তাঁর ভাবে সেই পরমানন্দে যে সর্ব্বক্ষণ বিভোর হয়ে রয়েছে, সেই রকম সাধুর সেবা ও সঙ্গ করতে করতে এক দিন তাঁর কৃপা হ'লে সারা জীবন ভজন-সাধন ক'রে যাহা না হবে, তাহা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। ইদানীং দেখা যায়, বস্তুলাভ না হ'তে হ'তেই কেহ কেহ দু'খানা বই প'ড়ে বিনা চাপরাসে (ভগবানের আদেশ না পেয়ে) লোককে ধর্ম্ম-বিষয়ে লেকচার (lecture) দেয়, খুব বিদ্যে বুদ্ধির দৌড় (জোর) থাকলে কেউ কেউ হয় ত একটি নূতন মত চালিয়ে দিয়ে সম্প্রদায় গ'ড়ে তুলছে। এ রকম হিন্দুধর্ম্মের কত ডালপালা জন্মাচ্ছে ; আবার কিছু কাল স্ফূর্ত্তি করবার পর সেই ডালপালাগুলো কালের মহিমাতে আপনি শুকিয়ে যায় কিংবা ভেঙ্গে প'ড়ে যায় ; কিন্তু আসল গুঁড়ি গোছেরা চিরকাল ঠিক রয়েছে—যাহা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, ব্যাস বাল্মীকি কত কঠোর তপস্যা ক'রে লিখে গেছেন। এখনকার দিনে কঠোর তপস্যা বা সাধন-ভজন ক'রে আগে বস্তু লাভ না ক'রে, নিজে না বুঝে, দু'খানা বই লিখে জগৎকে বুঝাতে চায় ; তাই তেমনি কাযও হচ্ছে। লোক রাশি রাশি বই পড়েও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পাচ্ছে না ; কেবল এই রকম লোকের লেখা বই পড়লেই কি ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভ হয় ? না হয়, বাহিরের লোকের কাছে ধার্ম্মিক ব'লে বাহবা পাওয়া যায়,—তাইতেই বা হলো কি ? সংসারের জন্মমৃত্যুর হাত থেকে এড়ান যায় কি ? যাতে ভবে আনাগোনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তার জন্য ঠাকুর বলতেন, নির্জ্জনে থেকে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্তা, ধ্যান-ধারণা করতে হবে, তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কত কাঁদতে হবে, মানুষ পাগল হয়ে যাবে ; তবে তিনি সদ্গুরু মিলিয়ে দেন, যাকে বলে—তিনি নিজেই গুরু সেজে আসেন। সেই গুরুর কৃপা হ'লে গুরুদত্ত বীজ লয়ে অনেক ভজন-সাধন করলে পরে তবে আনন্দলাভ হয়। তখন আপনাকে আপনি চিনতে পেরে মন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যায় ; তখন সে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে আরও কত লোককে ভগবানের পথে টেনে নিয়ে যায়। লোকের জীবনের গতির মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে। যেমন ভাগবতে আছে, পিঙ্গলা নামে বেশ্যার জীবন এক রাত্রির মধ্যে কোন মহাপুরুষের কৃপায় পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়ে সে উদ্ধার হয়ে গেল, তার বিবেক-বৈরাগ্য উদয় হ'লো। বিবেক, বৈরাগ্য উদয় না হ'লে কি সংসারের মোহ-অন্ধকার দূর হয় ? সব ধর্ম্মের গোড়াতে বিবেক, বৈরাগ্য চাই, নইলে ধর্ম্মজীবনই গঠন হয় না। বিবেক, বৈরাগ্য হচ্ছে প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনের বনিয়াদ। এই পাকা বনিয়াদের উপর সাধক যত বড়ই বাড়ী তুলুক, কিছুতেই ট'লে প'ড়ে যাবে না। এই বিবেক-বৈরাগ্যশূন্য অবস্থায় সাধক যতই উঁচুতে উঠতে চেষ্টা করুক, সফল হবে না, এক দিন তার পতন হয়ে যেতে পারে। প'ড়ে যাবার পরে হুঁসিয়ার হ'লে আবার সাধককে গোড়া থেকে নূতন ক'রে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করতে হবে। বিবেক-বৈরাগ্যের সহায়ে হবে, নচেৎ টিকবে না, পতনের খুব সম্ভাবনা আছে।

[ক্রমশঃ।

স্বামী সিদ্ধানন্দ।



কষায়-সার-শিল্প

নানাবিধ পশুর চর্ম্ম ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে তাহাকে কষ করিতে (tanning) হয় এবং অধিকাংশ কষ-দ্রব্যই (tan-stuff) উদ্ভিদ্-জাত। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক জগতে চর্ম্ম অশেষ প্রকার কার্য্যে ব্যবহার করা হইতেছে। বস্তুতঃ চামড়ার চাহিদা প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, যে সকল কাঁচা মাল হইতে কষ তৈয়ারী হয়, সেগুলির উপর ক্রমশঃ অধিক টান পড়িতেছে। ভারতের অরণ্যরাজি বহু বিস্তৃত এবং তৎসমুদায়ে কষোৎপাদক উদ্ভিদেরও অভাব নাই। কিন্তু কিছু দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবলমাত্র কয়েক জাতীয় উদ্ভিদই দেশীয় চর্ম্মকারগণ কর্ত্তৃক চামড়া কষে ব্যবহৃত হইত। প্রথমেই সেগুলির আলোচনা করা আবশ্যক; তৎপরে আধুনিক গবেষণার ফলে অন্য কোন্ কোন্ ভারতীয় উদ্ভিদ কষায়-সার (Tannin extract) প্রস্তুতের উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে পারা যায়।

প্রচলিত কষ-সমূহ

দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতে বিভিন্ন প্রকার কষ ব্যবহৃত হয়। উত্তর-ভারতে বাবলার প্রচলনই সমধিক। সাধারণ বাবলা (Acacia arabica) মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা শীঘ্র বৃদ্ধি পায় ও কতক পরিমাণে মৃত্তিকা আটকাইয়া রাখিতে পারে বলিয়া রেল-লাইন, খাল ও অন্যান্য জলাশয়ের ধারেও অনেক পরিমাণে বাবলাগাছ রোপণ করা হইয়া থাকে। সিন্ধুপ্রদেশ, পঞ্চনদ ও মধ্য-প্রদেশে বন্য বাবলার সংখ্যা খুব বেশী। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারত হইতে বিপুল পরিমাণে চামড়া রপ্তানী করা হইয়াছিল; তখন হাজার হাজার বাবলাগাছ কাটিয়া ফেলায় আজকাল কোন কোন স্থলে বাবলার অভাব ... বাবলা-ছালের চাহিদা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এক কানপুরের চামড়া-কারখানা-সমূহে অন্যূন ৫ লক্ষ মণ বাবলা-ছাল আবশ্যক হয়। কানপুর অবশ্য চামড়া কষাণের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র; কিন্তু বোম্বাই পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশের চামড়া-কারখানাসমূহেও বাবলাছালের কাটতি নিতান্ত সামান্য নয়। বাবলা-ছাল সংগ্রহ করিতে হইলে গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয়। জীবন্ত গাছের ছাল উঠাইয়া লইলে ক্ষত সারিতে অনেক সময় লাগে এবং গাছও তেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। বৃক্ষের বয়স হিসাবে ছালের কষ-মাত্রার ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। বিলাতী চর্ম্মকারগণ তরুণ গাছের ছালই পছন্দ করে; কিন্তু এতদ্দেশে পুরাতন গাছের ছাল অধিক ব্যবহৃত হয়। বাবলার ছাল ব্যতীত ইহার ফলেও যথেষ্ট কষ আছে। ছাল অপেক্ষা ফল দ্বারা চামড়ার রং আরও ভাল করিতে পারা যায়। কিন্তু ফলের প্রচলন নিতান্ত কম এবং বর্ত্তমান সময় রপ্তানী একবারেই নাই।

খদিরবৃক্ষ (Acacia catechu) ভারতের অনেক স্থলে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে এবং ব্রহ্মদেশে জন্মিয়া থাকে। ইহার গুঁড়ির কাঠের মধ্যাংশ (Heart-wood) ছোট ছোট টুকরা করিয়া জলে ফুটাইয়া যে ঘন ক্বাথ প্রস্তুত করা হয়, তাহা শুষ্ক করিলেই খদিরে পরিণত হয়। সাধারণতঃ তিন প্রকারের খদির প্রস্তুত হয় এবং অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত কষরূপেও খদিরের ব্যবহার আছে। মোটামুটি হিসাবে ৯ মণ খয়ের-কাঠ হইতে প্রায় ১ মণ খদির পাওয়া যায়। ভারত হইতে যে সমস্ত কষ রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে খদির অন্যতম এবং খদিরের মোট রপ্তানীর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ রেঙ্গুণ ও ৪ ভাগ কলিকাতা বন্দর হইতে যায়।

ভারত-জাত সর্ব্বপ্রকার কষের মধ্যে কিন্তু হরীতকীই প্রধান। পশ্চিম-ভারতের উষর স্থানসমূহ ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর পরিমাণে হরীতকী (Terminalia chebula) জন্মিয়া থাকে। ফলের পরিপুষ্টি হিসাবে কষ-মাত্রার তারতম্য হয়। অণ্ডাকৃতি, সূচ্যগ্র

নিরেট ফলই ভাল; পক্ষান্তরে, গোল ও স্পঞ্জ-সদৃশ শাঁস-যুক্ত ফল অপকৃষ্ট। উৎপত্তিস্থানের নামেই বিলাতী বাজারে নানা শ্রেণীর হরীতকী পরিচিত। গোটা ফলের কষের মাত্রা শতকরা ৩৫·৪২ অংশ এবং আঁটি হইতে শাঁস ৫০·৫২ অংশ। পূর্ব্বে গোটা হরীতকীই রপ্তানী হইত; কিন্তু তাহার জন্য অনর্থক জাহাজ ভাড়া দিতে হয় বলিয়া আজকাল আঁটি-ছাড়ান ফলেরই অধিক চালান হইতেছে।

দক্ষিণ-ভারতের কষ সমূহের মধ্যে তারবাড় (Cassia auriculata) ছালই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহা উত্তরে রাজপুতানা পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছে। তারবাড় গুল্ম বন্য ও কর্ষিত, উভয় অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং উত্তর-ভারতে কানপুর ও কালকার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষের চেষ্টাও সফল হইয়াছে। জলসেচন করিলে তৃতীয় বৎসরেই ছাল সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা না হইলে পঞ্চম বৎসরের পূর্ব্বে ছাল পাওয়া যায় না। তারবাড় ছালের প্রধান গুণ এই যে, ইহার কষে চামড়া যেমন শক্ত, তেমনই আলগা (porous) হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আলগা অর্থাৎ সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল হওয়ার জন্যই ইহা চর্ব্বি ও তৎশ্রেণীর দ্রব্যাদি শোষণ করিয়া ওজনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এই গুণই চর্ম্মকারগণের লাভের হইয়া থাকে। তারবাড় সহযোগে প্রস্তুত অর্দ্ধকষিত চামড়ার (half-tan) যথেষ্ট চাহিদা আছে। চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশেও তারবাড় গাছ উৎপাদন করিতে পারা যায়।

এক সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে দীবিদীবি ফলের (Caesalpinia Coriaria) ফলের যথেষ্ট কাটতি ছিল। প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এই বৃক্ষ দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত করা হয়। এক্ষণে মালাবার ও পশ্চিম উপকূলের অরণ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মূল্য হ্রাস পাওয়ায় দীবিদীবি ফল সংগ্রহ এখন অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ফলের কষায়-সার প্রস্তুত করিতে পারিলে উহার খুব কাটতি হওয়া সম্ভব; কারণ, তদ্রূপ সারের কতিপয় বিদেশীয় বাজারে এখনও যথেষ্ট চাহিদা আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের কষোৎপাদক উদ্ভিদ

উপরি-উক্ত কয়েকটি কষ ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও কয়েকটি গাছের ফল, ত্বক্ ইত্যাদি কষের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বঙ্গের বাহিরেও চামড়া কষানর জন্য এই সমুদয় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোঁদালের উল্লেখ করিতে পারা যায়। সোঁদালের ছালকে য়ুরোপীয়রা সুনরি (Sunari bark) বলিয়া থাকেন, তাহা হইতে অনেকে ইহাকে সুঁদরীগাছের ছাল বলিয়া ভ্রম করেন। কলিকাতায় খিদিরপুর চামড়া-কারখানাসমূহে সোঁদাল-ছালের কাটতি কম নয়। বাঙ্গালার কষ-উৎপাদক উদ্ভিদের প্রধান ভাণ্ডার সুন্দরবন। গরাণ-ছালই বঙ্গদেশে কষছালের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। বড় গরাণ (Rhizophora mucronata) ও সাধারণ গরাণ (Ceriops Roxburghiana)—উভয়ই গরাণের অন্তর্ভুক্ত এবং ইংরাজীতে এই সমুদয় গাছ Mangrove নামে অভিহিত। চামড়ার জন্য যে পরিমাণ কষ দরকার, গরাণে বরং তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় কষ আছে। বঙ্গ, ব্রহ্ম ও আন্দামান উপকূলে গরাণ খুবই সুলভ। সুন্দরবনের গামায় (Carapa obovata) এবং কাঁকড়া (Brugiera gymnorhiza) গাছেও যথাক্রমে শতকরা ৪১ ও ১৮ ভাগ কষ-পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। জারুল, জিউলী ও বন্য করমচাও কষ প্রস্তুতের উপযোগী। জঙ্গলী কুল (Zizyppus xyloporus) কুটিয়া জলের সহিত মিশাইয়া দিলে এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ বাহির হয়; পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উক্ত প্রকার জলে পরিষ্কৃত চামড়া ভিজাইয়া রাখিলে চামড়ার দানা বাঁধিয়া উৎকৃষ্ট Crust leather প্রস্তুত হয়। অর্জ্জুনগাছ পশ্চিম-বঙ্গের অনেক স্থলেই দেখা যায়। অর্জ্জুনের ন্যায় একক কষ কমই আছে। অন্য ছাল প্রয়োগের সময় উহার সহিত এক অথবা একাধিক ছাল মিশ্রিত করা প্রয়োজন হয়; কিন্তু এক অর্জ্জুনছাল হইতেই অর্দ্ধ-কষিত, আলগা, হাল্কা চামড়া, খুব ভারী ওজনের চামড়া এবং দ্বিতীয়বার কষিত অর্দ্ধ-কষিত চামড়া—এই তিন প্রকার চামড়াই প্রস্তুত হইতে পারে। এই সমুদয় কারণে অর্জ্জুনছালের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে।

চামড়া কষ করিবার প্রথা

পূর্ব্বে কষ-উৎপাদক ত্বক্ ইত্যাদি শুধু জলে ভিজাইয়া সেই জল দ্বারা চামারগণ চামড়া কষ করিত। এখনও সেইরূপ প্রথা দেশীয় অনেক কারখানায় চলিতেছে। যখন চামড়ার চাহিদা কম ছিল এবং কষ-ছালের মূল্যও যৎসামান্য ছিল, তখন অবশ্য এরূপ প্রথায় কার্য্য ভাল হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। চামড়ার চাহিদা যেরূপ বাড়িতেছে, শীঘ্র শীঘ্র চামড়া কষানও সেইরূপ দরকার হইয়াছে। অন্য দিকে বিদেশীয় বাজারে ভারতীয় কষ-উৎপাদক পদার্থসমূহের কাটতি বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু বণিক্গণ সামান্য মাত্রা কষের জন্য বহুল পরিমাণ ছাল, পাতা, ফল ইত্যাদির অধিক জাহাজ ভাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং দিলেও প্রস্তুতীকৃত চামড়ার দর বাড়িয়া যায়। অন্যান্য বাণিজ্যপ্রধান দেশেও বৃক্ষ-ত্বক্ প্রভৃতি ভিজান জলের পরিবর্ত্তে ত্বক ইত্যাদি হইতে নিষ্কাশিত কষায়-সারের দ্রাবণই চামড়া কাযে অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হইতেছে। রপ্তানীর জন্য এইরূপ কঠিন কষায়-সার (Solid Tan-extract) যে সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশেও কষশিল্পকে সভ্য জগতের কষ-শিল্পের সহিত সমান অবস্থায় আনিতে হইলে কষায়-ক্ষার প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই শিল্পের প্রতিষ্ঠান ও উন্নতি সাধিত হইলে এক দিকে যেমন দেশমধ্যেই বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট চামড়া প্রস্তুত হইতে পারিবে, তেমনই অন্য দিকে আমাদের কষ-উৎপাদক বৃক্ষাদি হইতে কষায়-সার প্রস্তুত ও বিদেশে রপ্তানী করিয়া যথেষ্ট ধনাগমও সম্ভব হইবে।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এতদ্দেশের কষ-শিল্পও সভ্যজগতের কষ-শিল্পের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ব্রহ্মদেশে গরাণ-জাতীয় উদ্ভিদ হইতে কষ-নিষ্কাশনের জন্য রেঙ্গুণে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ শ্রীযুত পূরণ সিংহের গবেষণার ফলে উৎকৃষ্ট কষায়-সারও প্রস্তুত হইয়াছিল। সে কারখানা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বরং বে-সরকারী চেষ্টায় রাণীগঞ্জ বিনা আড়ম্বরে প্রথমতঃ যে হরীতকী হইতে কষায়-সার প্রস্তুতের যে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা রূপান্তরিতভাবে এখনও টিকিয়া আছে। আমরা পূর্ব্বেই মাইহারের কষ-তত্ত্ব-গবেষণাগারের উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত গবেষণাগারে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ভারতীয় কষোৎপাদক উদ্ভিদসম্বন্ধীয় আমাদিগের বর্ত্তমান জ্ঞান অনেকটা উক্ত স্থললব্ধ তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতায় পাগলাডাঙ্গায় যে কষ-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা মাইহারের দৃষ্টান্তের ফল। এই গবেষণাগারেও কতিপয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেগুলি এ পর্য্যন্ত অফিসের ফাইলে কিংবা সরকারী রিপোর্টের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাহাদের উক্ত তথ্যাদি অবগত হইলে উপকার হইতে পারে, সেরূপ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐ সমুদয় প্রচারের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কষায়-সার প্রস্তুত যে নিতান্ত সোজা নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কষায়-সার প্রস্তুতের সময় অনেক অবাঞ্ছনীয় বর্ণ উহার সহিত বাহির হইয়া আসে; উক্ত বর্ণগুলিকে অপসৃত করিয়া বিশুদ্ধ কষ প্রস্তুত করার প্রথা উদ্ভাবন করিতে যথেষ্ট সময় লাগে এবং সকল কষোৎপাদন উদ্ভিদও এরূপ বিশুদ্ধ সার প্রস্তুতের উপযোগী নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ভারতীয় উদ্ভিদাদির মধ্যে অন্ততঃ ১২।১৪টি কষায়-সার প্রস্তুতের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহাদের কষায়-সারও উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইলে বিলাতী বাজারে খুব কাটতি হইতে পারে।

কষ-শিল্পের ভবিষ্যৎ

সুশৃঙ্খলার সহিত গঠন করিতে পারিলে ভারতের কষ-শিল্প অন্য কোন দেশের কষ-শিল্প অপেক্ষা হীনতর হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারত হইতে যে পরিমাণ কষ-উৎপাদক পদার্থ বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা (১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ;—

নাম	মূল্য, হাজার টাকা হিঃ
কষায়-ছাল	৩৫
খদির	১১৪০
হরীতকী	৭৯৩৫
হরীতকী-কষায়-সার	৫৩৬
	মোট—৯৬৪৬

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, এতদ্দেশ হইতে কষ-উৎপাদক কাঁচা মালই প্রধানতঃ বিদেশে চালান যায়। কষায়-সারের মাত্রা শতকরা ৪ ভাগের কিছু অধিক। রপ্তানীর হিসাব বাদ দিলেও দেশমধ্যে ব্যবহৃত কষায়-ছালের পরিমাণ যে রপ্তানীর মাল অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। বিদেশ হইতে এতদ্দেশে যে অর্দ্ধ ও পূর্ণ প্রস্তুতীকৃত চামড়া আইসে, তাহার পরিমাণ খুব অধিক না হইলেও মূল্য অর্দ্ধলক্ষ টাকার কম নহে। কষায়-সার ও ব্যবহারযোগ্য চর্ম্ম (leather) প্রস্তুতের শিল্প যদি যথাযোগ্য প্রসার লাভ করে, তাহা হইলে শুধু যে বিলাতী চামড়া আমদানী বন্ধ হয়, তাহা নহে, অধিকন্তু ভারতে প্রস্তুত কষায়-সার এবং চামড়াও নানা দেশের বাজারে কাটতি হইতে পারে। সামান্য মূলধনে অবশ্য কষায়-সার প্রস্তুতের কার্য্য চলে না এবং সরকারের, বিশেষতঃ বন-বিভাগের এ বিষয়ে সাধারণের সহিত সহযোগিতা আবশ্যক। যথেষ্ট মূলধন ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এই দুইটি পাইলে কষায়-সার উৎপাদনও জগৎ-বাণিজ্যে উহার উপযুক্ত স্থান লাভ করার আপাততঃ যে সমুদয় অন্তরায় আছে, সেগুলি সহজেই বিদূরিত হইতে থাকিবে। ফলতঃ এ বিষয়ে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ফাল্গুনি

হে ফাল্গুন! যৌবনের চির নব ছবি,
আজি কেন এলে পান্থ এ ভারতভূমে;
মরুসম ভারতীর এ ভগ্ন অঙ্গনে?
হে অতিথি, বল আজি কোন্ উপচারে—
তুষিব তোমারে দেব? চেয়ে দেখ এবে
রিক্ত শূন্য ভারতের রতন ভাণ্ডার।

গিয়াছে সে এক দিন, যে দিন ভারতে
রত্ন মুক্তা ভরা ঐ ফেনিল জলধি
পেয়েছিল রত্নাকর নাম। নগশ্রেষ্ঠ
হিমাচল-বিন্ধ্যাচল আদি ধরিত ও
সুবিশাল বক্ষ 'পরে সদা কত মণি,
মহামূল্য ওষধি সকল। অবিরত
ভারতের অঙ্গ 'পরে জাহ্নবীর ধারা
দুলিত যেন বা শুভ্র উত্তরীয় সম
বিশ্বদেবতার! নিত্য সেই গঙ্গাতীরে
তপস্যায় দীপ্ত আর্য্য ব্রাহ্মণের দল
গাহিত সামের মন্ত্র সুকল্যাণময়।
ত্রিলোক ত্রাসিত সেই ক্ষাত্র তেজ সেথা
শাসিত ভারতভূমি ধনুক টঙ্কারে।
নিজে ভগবান্ যেথা আসি বন্ধুরূপে
দেখাইল সে নিষ্কাম মুক্তিপথখানি—
সরাইয়া ভবিষ্যের অন্ধ-যবনিকা।
প্রেম যাঁর উছলিয়া যমুনার জলে,
ভাসাইল বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল,
আসমুদ্র হিমাচল ভারতভুবন;
গাহিত সে প্রেম গাথা সুখে শুক সারী,
বাজাইত বেণুরবে গোষ্ঠে রাখালেরা।
পরাণের প্রীতিভরা রঙ্গিন কুঙ্কুমে
হইত রঞ্জিত দোল নর দেবতার,—
হর্ষে ভরা ভারতের প্রতি ধূলিকণা!
আজ কি হেরিবে বল, কি আছে হেথায়?

এলে যদি হে ফাল্গুনি, হে চির জাগ্রত,—
ছিন্ন কর, ছিন্ন কর নিমেষের মাঝে
জড়াতুর শুভ্র শীর্ণ মৃত্যু কুহেলিকা,—
আজি এই ভারতের জীবন্ত উষায়!
চরণ সঞ্চারে তব নূপুর-নিক্কণে
মরাল মধুপ ভৃঙ্গ উঠুক ঝঙ্কারি—
ভাঙ্গি দীর্ঘ মৌন অবসাদ। পূর্ণ কর
প্রকৃতির শূন্য পাত্রখানি—গন্ধরাজ,
বেল চম্পা গোলাপ-বকুলে। মৃদু মন্দ
পবন হিল্লোল মাখি' গায় গন্ধভরা
প্রেম-পরিমল বহি যাক্ দিকে দিকে।
ও রূপমাধুরী ঝরিয়া পড়ুক আজি
নীলাম্বরে, শূন্যলোকে, শ্যাম ধরাতলে,
সুন্দর চঞ্চল নীল জলধির বুকে!
নূতন প্রভাতে আজি হে ফাল্গুনি মোর,—
মুখরিত করি তোল ভারত-অঙ্গন,
সূর্য্যকরোজ্জ্বল ওই প্রশান্ত গগন,
মুক্তির মোহনমন্ত্রে জলদগম্ভীরে,—
প্রকম্পিত করি ধরা—বিশ্ব-চরাচর—
নূতন পুলকে—হর্ষে—দৃপ্ত গরিমায়!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায়-চৌধুরী।



৫

খানিক পরে সতীশ বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ্‌লে, এক দিকে প্রকাশ বাবুদের জন্য খাবারের থালা সাজানো, আর তার পাশে ছোট-পিসী মানদা স্তম্ভিতের মত চুপটি ক'রে ব'সে আছেন। স্পষ্টই বোধ হ'ল, তিনি সেই সময় থেকে আর এ স্থান ত্যাগ করেন নি।

সতীশ খানিকটা চুপ ক'রে রইল। তার পর বল্লে, "আমাকে এ ব্যাপারটা জানান উচিত ছিল।"

মানদা স্পষ্ট পরিষ্কার উত্তর দিলেন, বল্লেন, "বাবা, দরকার মনে করিনি, তাই জানাইনি।"

সতীশ বিস্মিত হয়ে বললে, "দরকার মনে করেন নি? কি রকম?"

মানদা বল্লেন, "ব্যাপার ত এমন বিশেষ কিছুই নয়। মাস চারেক আগে লীলা এক দিন বিকালবেলায় পুকুরে গিয়েছিল। পারত-পক্ষে আমি তাকে একলা যেতে দিতাম না, কিন্তু ঘটনা-চক্রে সেদিন সে একলাই যায়। ভিন-গাঁয়ের চার জন মুসলমান ছোকরা তাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় সত্য, কিন্তু ওর চেঁচামেচিতে লোকজন জুটে যায়, আর এক জন মুসলমান ভদ্রলোকই তাদের কাছ থেকে রাস্তা থেকেই ওকে উদ্ধার করেন। তাঁর কাছে সেই চার জন শাস্তিও পায় যথেষ্ট। এই ত ঘটনা বাবা, একে কাগজ-ওয়ালারা হৈ-চৈ ক'রে কি ক'রে তুলেছিল, তা ত' জানিনে।"

সতীশ বললে, "কিন্তু এও ত একটা ঘটনা। বিশেষ যখন সেটা সব কাগজে বেরিয়েছিল শুনছি। যখন এমন একটা ঘটনা, তখন আপনি যেটুকু বললেন, লোক হয় ত সেইটুকু বিশ্বাস করেই নিরস্ত হবে না। কাগজে কি বেরিয়েছিল, তা আমিও জানি না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে জবাব দেবার জন্যে আমার এ বিষয় জানা থাকা দরকার ছিল।"

এ ধারণা ত আমার ছিল না. আর এটা যে দোষের নয়, তাও ত বুঝছ?"

সতীশ বল্লে, "আপনার আমার কাছে দোষের না হ'তে পারে, কিন্তু সমাজের কাছে হ'তে পারে।"

মানদা বল্লে—"কাদের সমাজ ব'লছ?"

সতীশ বল্লে—"আমাদের।"

মানদা স্পষ্ট স্বরে বল্লেন, "আমাদের সমাজ তোমার আমার, না আর কারুর?"

সতীশ বল্লে—"সকলেরই। তার ভেতর আমরাও আছি, বাকী হিঁদু সমাজের লোকও আছে। প্রকাশ বাবুও ত তারই ভেতর।"

মানদা বল্লেন—"বাবা, মিথ্যা সমাজকে তুমি এখনও এত ভয় কর দেখে আশ্চর্য্য হলুম। তুমি একবার বিবেচনা ক'রে দেখেছ কি, এ ঘটনার মধ্যে লীলার কি দোষ? আর মোটের উপর কোনও দোষই ত হইনি। জোর ক'রে চা'র জন গুণ্ডা তাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তা থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল। এর মধ্যে কি অপরাধ থাকতে পারে—যাতে লীলাকে সমাজ বহিষ্কৃত ক'রে দেবে?"

সতীশ বল্লে—"অপরাধ ত কিছুই ওর নেই, কিন্তু ঐ যে চার জন মুসলমান ধ'রে নিয়ে গেল, এইটে সমাজের কাছে দুষণীয়।"

মানদা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, "সতীশ, তোমার কাছেও এই সব কথা শোনবার প্রত্যাশা আমি যে করিনি! বাঙ্গালার যে ছেলেরা বাঙ্গালার ভবিষ্যতের অগ্রদূত, আমিও যে তোমাকে তারই মধ্যে এক জন ভাবতাম! কে সমাজ? সমাজ যে তুমি, সমাজ যে তোমরা! তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে কি বলে, এ দোষ? যদি না বলে ত আর কারুর কথা মেনো না বাবা; সত্য মিথ্যা বোঝাবার যে ক্ষমতা তোমাকে ভগবান্ দিয়েছেন, তাকে অপমান ক'রো না। তোমার সামনে দেখছ যে, সমাজ অন্যায়

গলিত সমাজের তুমিও এক জন—যাকে ভগবান্ বড় দৃষ্টি দিয়েছেন ; তোমার চেষ্টা হোক সমাজকে সত্য পথে, ঠিক পথে আন্‌তে।"

সতীশ বল্লে—"ছোট-পিসীমা, আপনি হয় ত ঠিক কথাই বলছেন ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ত আমি নই, এ ক্ষেত্রে যে আর এক জনের ওপর এর বিচার নির্ভর করছে, তিনি প্রকাশ বাবু।"

মানদা বল্লেন, "সতীশ, প্রকাশ বাবু এখনও এর যথাযথ বিবরণ শোনেন নি। শুনলে তিনি কি বলবেন, তা ত আমিও জানি না, তুমিও জান না।"

সতীশ বল্লে—"আপনি কি মনে করেন যে, প্রকাশ বাবু সত্য বিবরণ শুনলে রাজী হবেন ?"

মানদা বল্লেন, "আমি ত মনে করি, তাঁর না রাজী হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি যদি প্রকাশ বাবু হতাম ত আমি নিশ্চয়ই সম্মত হতাম।"

সতীশ। ছোট-পিসীমা, আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্য রকম। এই যে একটু আঁচড় লাগা, এইতেই যে সব লোক পিছিয়ে যাবে।

মানদা। সব লোক নয়, সতীশ। এমন লোককেও আমি জানি, যারা এর চেয়ে বড় আঁচড়কে গ্রাহ্য করে না, যারা অপরাধকেও ক্ষমা ক'রে নেয়।

সতীশ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "ছোট-পিসীমা, আপনার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে ত কালই আমি প্রকাশ বাবুর কাছে গিয়ে যা আপনার কাছে শুনলাম, বলবো, তিনি যদি সম্মত হন ত তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হ'তে পারে ?"

মানদা বল্লেন, "না বাবা, এ কাযটা শুদ্ধ আমার খাতিরে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে যাচ্ছো মনে কর ত তাঁর কাছে গিয়ে দরকার নেই।"

সতীশ বল্লে, "না ছোট-পিসীমা ; একবার ব'লেই দেখা যাক না, তিনি যদি সব কথা শুনে রাজী হন। তিনি আমার বাবার বন্ধু, তাঁর কাছে আর মান-অপমান কি আছে ? তা ছাড়া আজ খবর দেবার কথাও ত ছিল। বেশ, আমি কালকের ষ্টীমারেই চ'লে গিয়ে তাঁকে সব কথা ব'লে আসি গে।"

তার পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর সতীশ কলিকাতায় চ'লে গেল। মানদা মনে মনে দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন, প্রকাশ বাবুর রাজী না হওয়ার উপর অনেকখানি নির্ভর করছে। তিনি যদি রাজী না হন, তার মানে বাঙ্গালাদেশের এই ধরণের লোকই বেশী, তাঁরাও রাজী হবেন না। তার পরে এই কারণে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ার পর এই নিয়ে যে কুৎসিত কথা মুখে মুখে রটবে—তাকেই বা ঠেকান যায় কি ক'রে ?

আর লীলা ? তার পাংশু মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ আঘাতের জ্বালা তাকে কতখানি আঘাত করেছে ! হায়, বাঙ্গালাদেশের নিরপরাধী মেয়ে !

সন্ধ্যার সময় রোয়াকের ওপর ব'সে মানদা তাঁর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, আর ভূত-ভবিষ্যতের কথা, অনেক সম্ভাবনা তাঁর মনের ভেতর তোলপাড় করছিল।

এমন সময় সতীশ ফিরে এল।

তার মুখ দেখে মানদার বুকের ভেতরটা ধক্ ক'রে উঠল, তবুও মজ্জমান ব্যক্তির মত শেষ আশাটুকু ছাড়তে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হলো সতীশ ?"

সতীশ বল্লে, "হলো না, পিসীমা।"

মানদা সতীশের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে রইলেন। সতীশ বল্লে, "তাঁকে সব কথা খুলে বল্লাম, তিনি শুনে এ কথা স্বীকার করলেন যে, লীলার এতে কোনও দোষ হয় নি, কিন্তু তিনি তাকে ঘরে নিতে রাজী হলেন না। বল্লেন, সাধ ক'রে এ একটা সন্দেহজনক ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে গোলমালে পড়ি কেন ?"

মানদা জিজ্ঞাসা করলেন, "সন্দেহজনক কি ?"

সতীশ। সন্দেহজনক এই হিসাবে যে, সমাজ যে একে কি ভাবে গ্রহণ করবে, তা ত জানা নেই।

মানদা। বাবা, শিক্ষিত লোকরাও যদি অজ্ঞাত সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের সাফাই করতে চেষ্টা করে ত তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হ'তে পারে ?

সতীশ। কিন্তু প্রকাশ বাবুর তরফ থেকেও এ কথাটা বলা যেতে পারে যে, তিনি যদি ঝঞ্ঝাট কাটিয়েই চলতে চান ত তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

মানদা বল্লেন, "তোমরা পুরুষমানুষ—বুদ্ধিমান্। আমি মেয়েমানুষ, আমি তোমাদের কাছে কি যুক্তি দেখাতে পারি, বাবা ? তবুও আমার মনে হয় যে, ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে চলাই পুরুষত্ব নয় ; অনেক সময়ে ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হয়ে সে যে

মিথ্যে, সে যে ভুয়ো, এইটে দেখানই পুরুষের কায। পুরুষের কায থেকে আমাদের দেশের পুরুষরা ত অনেক দিন বিমুখ, এখন চারিদিকে নতুনের হাওয়া বয়েছে, আমি ভেবেছিলাম যে, এখন দু' এক জন মানুষ দেখতে পাবো। কিন্তু বাবা, আমার সে আশাও যে ক্রমে চ'লে যাচ্ছে।"

সতীশ বল্লে, "তুমি যে সব কথা বললে, হয় ত সব ঠিক, কিন্তু সমাজ যে এখনও সমাজ।"

মানদা উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "কোথায় সমাজ? কেন, তোমার চোখের সামনে প্রতিদিন দেখতে পাও না সতীশ, কত শত শত নর-নারী, বিশেষ ক'রে পুরুষরা, সমাজকে পদাঘাত ক'রে চলছে, উচ্ছৃঙ্খলতা-অন্যায়ের পরাকাষ্ঠা করছে, আর সমাজ হাসিমুখে তাই সহ্য করছে? কে মানছে সমাজকে, কোথায় সমাজের ন্যায়নিষ্ঠা? তার যত কঠিন বিচার নিরপরাধ দরিদ্র নারীর সম্বন্ধে। বাবা, তোমরা তবে করছ কি? চরকা যদি সুতো মাত্রই তৈরী ক'রে নিরস্ত হয় ত আমি বলব, সে চরকায় কোনও দরকার নেই, তাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিতে পার। কিন্তু চরকা ত শুধু সুতো কাটা যন্ত্র নয়—সে যে তার চেয়ে ঢের বড়। সে যে মনের স্বাধীনতার প্রতীক, সে যে দীর্ঘ পুরানো মোহ কাটানর অগ্রদূত। তুমি হয় ত ভাবছ, আমার মেয়ে ব'লে আমি এত কথা বলছি। কিন্তু সতীশ, তা নয়। আমার মেয়েকে যদি চিরকুমারীই থাকতে হয়, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই; মনে করব, ভগবানের তাই ইচ্ছে। তোমার বাড়ীতে ঢুকে যখন চরকা চলছে দেখলাম, তখন ভাবলাম যে, আজ মনের মুক্তির হাওয়ার ভেতর এসে পড়েছি; কিন্তু বাবা, এ কি দেখলাম! প্রকাশ বাবুর সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার নেই, তিনি আমার কেউ নয়, কিন্তু বাবা, সত্যি বলছি, আমি তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে ঢের ভাল কথা শুনব আশা করেছিলাম। আমার কপাল।"

সতীশ চুপ ক'রে রইল। তার মনের ভেতর যে কি হ'তে লাগল, তা সে ঠিক বুঝতে পারলে না। ভেবে দেখলে, মানদার কোনও কথাই মিথ্যা নয়, কিন্তু এই সত্য কথার জ্বালাও যেন তার মনকে অশান্ত, ভারী ক'রে তুললে।

রাত্রিবেলা সতীশ মানদার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দেখলে তিনি জিনিষপত্র গুছোচ্ছেন। এটা এতই আকস্মিক যে, সতীশ না জিজ্ঞাসা ক'রে পাল্লে না; বল্লে, "ছোট-পিসীমা, জিনিষ-পত্র গুছোচ্ছেন যে?"

মানদা বল্লেন, "কাল যাব মনে করছি বাবা।"

সতীশ বল্লে, "কালই? এত শীগ্র ত যাবার কথা ছিল না?"

মানদা হাসবার মত ক'রে বললেন, "কথার মতই কি সব কায হয়, সতীশ? আর থাকবার দরকার কি? শুধু তোমার ভার বাড়ান।"

সতীশ বললে, "কিন্তু ছোট-পিসীমা, আপনার শরীর ত একটুও সারল না!"

মানদা বললেন, "ছাই শরীর, বাঙ্গালী বিধবার শরীর!"

সতীশ আস্তে আস্তে বললে, "আরও দু' চার দিন থাকলে হ'ত না?"

মানদা সতীশের দিকে ফিরে যখন বললেন, "না—বাবা, খুসী মনে আমাদের বিদেয় দেও," তখন তাঁর দুই চোখে স্পষ্ট জল। আকস্মিক একটা ঝড়ে যেমন প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য নিমিষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তেমনই এই একটা ঘটনা এই ক্ষুদ্র পরিবারের সমস্ত শান্তিকে মুহূর্ত্তে লোপ ক'রে দিলে। সকলের মুখে অপরিসীম আনন্দের পরিবর্ত্তে বেদনার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সকালবেলা সতীশ তার লাইব্রেরী-ঘরটিতে ব'সে চুপচাপ ক'রে ভাবছিল। কোথাকার উপদ্রব কেমন ক'রে কোথা দিয়ে এসে তাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলে, যা সে কোনও দিন কল্পনাও করে নি! ওরা হয় ত আজকের ষ্টীমারেই চ'লে যাবেন। কিন্তু চারিদিকে পাঁকের মত যে নিরানন্দ ছড়িয়ে উঠল, সে ত আজই যাবে না! ঐ নিরপরাধ মেয়েটি তার ফুলের মত সদ্য প্রস্ফুট হৃদয় নিয়ে এসেছিল। আজ যখন চ'লে যাবে, তখন তার উপর যে মলিন কদর্য্যতার ছাপ নিয়ে ফিরবে, তার কালিমা বোধ করি, কোনও দিনই যাবে না! তার উপর এই যে একটা মস্ত বড় অবিচারের কলঙ্ক। সতীশ তার সঙ্গে নিজেকে জড়িত মনে ক'রে কোন স্বস্তিই পেলে না। লীলার সমস্ত জীবনটাই হয় ত শূন্য বা... হয়ে যাবে, কিন্তু কি তার দোষ?

সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগল, মানদার কথাগুলো যতই কঠিন হোক, মিথ্যা নয়। এ দিকটাও... কোনও দিন ভেবে দেখেনি, চরকাকেই সে যখন পরম ... বস্তু ব'লে গ্রহণ করলে, তখন তারও চেয়ে কঠিন কঠিন ...

যে সমস্যা রয়েছে, সে কথা ত সে ভাবে নি। অথচ এই সবই ত সে জীবনের ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে! তার আহত মন যতই ভাবতে লাগলো, ততই তার কাছে মানদার এই কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, দুর্ব্বলের প্রতি কঠিন বিচারক এই সমাজ! কত না উচ্ছৃঙ্খলতা, কত না ব্যভিচার নীরবে সহ্য করছে! অথচ এর উপর কারুর হাত নেই? কারুর না থাক, তার ত থাকা উচিত ছিল। কেন না, সমাজকে তার ভয় করবার কিছুই নেই। আর মানদা সত্যই বলেছেন, তারা যদি সে কাজ সুরু না করে ত কে করবে?

সতীশ ভাবলে, না, যেমন ক'রে হোক, এই মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। ভাবতে ভাবতে সতীশের মনে পড়ল—লীলার শুষ্ক রক্তহীন মুখ আর তার নীরব দুটি চোখ। আর তার পর মনে হ'ল, ঘণ্টা কতকের মধ্যেই তারা তাঁর হৃদয়হীন আশ্রয় ছেড়ে চ'লে যাবে। অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

এমন সময় লীলা ঢুকতেই তার মুখের দিকে চেয়ে সতীশ যেন নিজেই শিউরে উঠল। বললে, "লীলা, তোমরা আরও কয়েক দিন থেকে যাও না।"

লীলা সে কথায় উত্তর না দিয়ে বললে, "মা'র বড্ড জ্বর হয়েছে।"

সতীশ। জ্বর হয়েছে কখন্ থেকে?

লীলা। বোধ হয়, আজ সকাল থেকেই হয়েছে, এখন উঠতে কষ্ট হচ্ছে।

সতীশ বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখলে যে, একটা চাদর মুড়ি দিয়ে মানদা শুয়ে রয়েছেন। জ্বরের প্রকোপে তখনও তাঁর শরীর কাঁপছে।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "জ্বর হয়েছে, ছোট-পিসী-মা?"

তাঁর রক্ত-চক্ষু দুটি দিয়ে দেখে মানদা সতীশকে বললেন, "হাঁ বাবা, আজ ত আর আমাদের যাওয়া হ'ল না।" বোধ করি বা অভিমানেই মানদা আজ যাওয়াটাকেই সব চেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করছিলেন, আর তাই এই না যেতে পারার দুঃখই তাঁর কাছে খুব বড় হয়ে উঠেছিল।

সতীশ উত্তরে বললে, "যাওয়ার কি তাড়াতাড়ি ছোট-পিসীমা? ওর জন্যে ভাবনা কি? হঠাৎ জ্বর হ'ল যে, কোনও অত্যাচার হয়েছিল কি?"

কিছুই হয় নি। মানুষের শরীর। কখন ভাল, কখন খারাপ। এখন খুব জোরে এসেছে, ক'মে যাবে অখন।"

দিন দুইয়ের পরও যখন জ্বরের বিরাম হ'ল না, তখন সেই গ্রামের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে ডাকা হ'ল। তিনি এসে দেখে তাঁর একটি জীর্ণ বইয়ের সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে অবশেষে একটা ওষুধ ঠিক ক'রে তাই ব্যবস্থা করলেন এবং এমন সম্ভাবনা জানিয়ে গেলেন যে, বোধ করি, কাল বিজ্বর হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কাল, পরশু এবং তার পরদিনও যখন জ্বর ছাড়ল না, তখন এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকা হ'ল। ইনি বহু দিনের প্রবীণ ডাক্তার, রোগী দেখেই বল্লেন, রোগটা বেড়ে গেছে, নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। সাবধানে রাখতে হবে, এবং সেবা আর চিকিৎসা উভয়ই চাই।

সেবার কোনও ত্রুটি হ'ল না। লীলা মা'র বিছানা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করত না এবং চিকিৎসা চলতে লাগল সেই এলোপ্যাথিক ডাক্তারটিরই। কিন্তু তাতেও কোন উপকার দেখা গেল না; জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগল, এবং শরীর নিস্তেজ, দুর্ব্বল হয়ে পড়ল।

দিন চৌদ্দ পনর পরে ডাক্তার দেখে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, "সতীশ বাবু, ভরসা বড় কম।"

তার কিছুক্ষণ পরে শ্বাসের স্পষ্ট লক্ষণ সুরু হ'ল। মানদা ইসারা ক'রে সতীশকে তাঁর কাছে বসতে বললেন।

সতীশ বসলে তার ডান-হাতটি আপনার দুই হাতের ভিতর নিয়ে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে রইলেন, তার পর ধীরে ধীরে বল্লেন, "বাবা, এবার একেবারে চল্লুম।"

সতীশের দুই চোখ জলে ভ'রে এল। সে তার হাত তাঁর কপালে বুলোতে বুলোতে বল্লে, "ভয় কি ছোট-পিসীমা, সেরে উঠবেন।"

ছোট-পিসীমা অস্তের পূর্ব্বে সূর্য্যের মত ম্লান হাসি হেসে বল্লেন, "সে প্রার্থনা করো না বাবা। আমার সেরে উঠে কি লাভ? আমি যেতে পারলেই বাঁচি।"

শুনে লীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মানদা বল্লেন, "দুঃখ করিস্ নে মা। এর হাত থেকে কেউ এড়াতে পারে না মা। এক দিন ত আসবেই।" তার পর সতীশের দিকে ফিরে

সেই যাবার দিনের সকালটিতেই না হ'ত ত কি বিপদেই পড়তাম। তোমার উপর অভিমান ক'রে চ'লে যাচ্ছিলাম—সেই অভিমান ভগবান্ আমার ভেঙ্গেছেন। এখন আমি ভাবি, আমি কার উপর অভিমান কচ্ছিলাম? তুমি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই—আর আমার এই দুঃখী মেয়েটি—"

শুনে লীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল, মানদার দুই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সতীশের হাত আবার দৃঢ় ক'রে ধ'রে মানদা বল্লেন, "বাবা, মরবার আগে তোমাকে ব'লে যাই যে, লীলা আমার নির্দ্দোষ—এর ভিতরে এতটুকু মিথ্যা কথা নেই। বিশ্বাস করো বাবা।"

সতীশ বল্লে, "ছোট-পিসীমা, আমি সে কথা জানি। ও সব কথা মনে ক'রে কেন কষ্ট পাচ্ছেন?"

মানদা ম্লান হাসি হেসে বল্লেন, "বাবা, হিসেব-নিকেশের সময় যে এল, আমি ত আর সময় পাব না। এরই মধ্যে যে বলা চাই। হাঁ, ও ফুলের মত নির্দ্দোষ। বাবা, সংসারে আর ওর কেউ রইল না, এই বয়সে ও সকলকে হারালো। ওর উপর দয়া করো, বাবা। আমি যদি কোন দোষ ক'রে থাকি তোমার কাছে—" বলতে বলতে চোখ থেকে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সতীশ বললে, "ছোট-পিসীমা, আপনি বৃথা মনে কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার কোনও দোষ হয় নি; ভুল আমারই। ভ্রান্ত আমাকে যদি আপনি তিরস্কার ক'রে থাকেন—সে ত ভালই করেছেন।"

মানদার মুখে আবার ম্লান হাসি দেখা দিল। বল্লেন, "বাবা, দীর্ঘজীবী হও! আমার শেষ কথা, শেষ অনুরোধ, শেষ ভিক্ষে এই যে, অভাগা মেয়েটিকে আমি তোমার আশ্রয়ে রেখে গেলাম, তুমি তাকে আশ্রয় দেবে, তার মঙ্গলের জন্যে তুমি যথাসাধ্য করবে, তা জানি, বাবা, তবু ত একবার তোমার মুখের কথা শুনলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি!"

সতীশ চেয়ে দেখলে যে, এই পরিপূর্ণ দুঃখের মুহূর্ত্তেও লীলা তার অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখ তারই দিকে নিবদ্ধ ক'রে রয়েছে।

সতীশ বল্লে, "ছোট-পিসীমা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পরের ভাল করাই আমি জীবনের ব্রত ব'লে যখন গ্রহণ করেছি, তখন লীলা আমার আত্মীয়া, তার মঙ্গলের জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য করব। এর জন্যে অনুরোধ করতে হবে কেন, ছোট-পিসীমা, এ যে আমার নিজের কর্ত্তব্য।"

পরিপূর্ণ আনন্দের জ্যোতিতে মানদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি সতীশের হাতের উপর নিজের হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগলেন ঠিক তেমনই ভাবে, যেমন ক'রে স্নেহময়ী মা তার সন্তানকে আদর করেন। অনেকক্ষণ পরে যখন তিনি বল্লেন, "বাবা, আমার আর কোনও দুঃখ নেই," তখন তাঁর মুখ থেকে সমস্ত গ্লানিমার মেঘ কেটে গিয়েছে।

তার পরদিন বেলা চারটা আন্দাজ চিতা জ্ব'লে উঠল। মানদার ইহজীবনের সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকল বাসনা, কামনা, আশা-নিরাশার অবসান ঐখানে!

লীলা চুপচাপ ক'রে চিতার এক ধারে ব'সে আগুনের এই মর্ম্মান্তিক খেলা দেখছিল। তার পক্ষে সকল স্নেহ, সকল ভালবাসা হয় ত ঐ চিতার সঙ্গে লোপ পেয়ে গেল! মা, যে মা তাঁর পক্ষপুটে একান্ত সহায়হীন তাকে জড়িয়ে ধ'রে রেখেছিলেন, আজ নিঃশব্দে তিনি তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন! অথচ তার আর দ্বিতীয় সহায় নেই! লেলিহান আগুনের শিখা যখন উর্দ্ধে জিহ্বা বিস্তার ক'রে উঠছিল, তখন তার রোরুদ্যমান হৃদয় কেবল এই কথা বলছিল, "মা গো, আর কেন, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল!"

চিতা যখন নির্ব্বাপিত হয়ে গেল, তখন চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার সুনিবিড় হয়ে এসেছে। চারিদিক স্তব্ধ, শুধু গঙ্গার মৃদু কলকল শব্দ অবিরাম কানে আসছে। চিতা যে নিবে গেছে, তার শেষ চিহ্নটুকুও যে ধুয়ে ফেলা হয়েছে, লীলার সে জ্ঞান ছিল না। সে সেইখানে ব'সে ব'সে ভাবছিল তার মা'র কথা। মনে হচ্ছিল যেন, তাঁর অশরীরী স্নেহের আহ্বান এখনও সে শুনতে পাচ্ছে! আকাশ, চিতা, শ্মশান তার চোখের সামনে থেকে যেন ধুয়ে মুছে গিয়েছিল, শুধু সে যেন দেখতে পাচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা তাকে ঘিরে রয়েছে! আর শ্মশানের এই বিস্তীর্ণ শুভ্র বালুকারাশি যেন তার এই শূন্যতাকে উপহাস ক'রে অবিচ্ছিন্ন কলহাস্য ক'রে উঠছে! সতীশ ধীরে ধীরে তার কাছে এসে বললে, "লীলা, চল!" লীলার মনে হ'ল যে, এই শ্মশান থেকে আবার কোন্ শ্মশানে সে যাবে? অবরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দুই হাতে মুখ ঢেকে লীলা কেঁদে উঠল, "মা গো!"

সতীশ তাকে ধ'রে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে নিয়ে গেল

[ক্রমশঃ।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।



সংগঠনের সদুপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পল্লীমণ্ডলী সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা-বিধানের কথা

মানুষের সর্ব্ববিধ দৈহিক খোরাকীর উপকরণই প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে অফুরন্তভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে এবং কালচক্রের আবর্ত্তনে অবিরামভাবে সমুৎপন্ন হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। বুদ্ধিমান্ মানুষ পরিস্থানে নানা কৌশল খাটাইয়া সেই সব খোরাকী আহরণ, সংগ্রহ ও সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রয়োজনানুরূপভাবে রূপান্তরিত করিয়া নিজ নিজ দৈহিক ক্ষুধা ও উপকরণের নিবৃত্তিসাধন করত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে বা সম্প্রদায়গতভাবে যে বা যাহারা উক্ত খোরাকীর আহরণাদি কার্য্যে যতটা সফলকাম, কঠোর জীবনসংগ্রামে সে বা তাহারা ততটাই জয়ী। উক্ত খোরাকীর আহরণাদি কার্য্যে আত্মনির্ভরশীলতাই সাফল্যমণ্ডিত জয়লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

"অপরে সকল বিষয় সংগ্রহ করিলে পর আমরা তাহাদের নিকট হইতে কিনিয়া লইব"--পরনির্ভরশীলতার দোষদুষ্ট এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া, জীবনযাত্রার পথে যাহারা অগ্রসর হইয়া চলিতে চায়, অধঃপতন, ফলে অকালমরণ তাহাদের অবশ্যম্ভাবিরূপে অবধারিত। এ দেশবাসী এই মতবাদ গ্রহণ করাতে বা দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রহণে বাধ্য হওয়াতেই তাহাদের আজ এই মারাত্মিকা দুর্দ্দশা সমুপস্থিত।

পরনির্ভরতার এই মরণ-মন্ত্র ত্যাগ করাইয়া, আত্মনির্ভরতার জীবন-মন্ত্রে ইহাদিগকে সঞ্জীবিত না করিয়া তুলিলে, অদূর ভবিষ্যের নিঃশেষ ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষার আর কোনও উপায়ই থাকিবে না।

উক্ত অকালমৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেশবাসিমাত্রেই যাহাতে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দৈহিক খোরাকার উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, বিধিব্যবস্থা তাহার করিতেই হইবে।

মানুষের প্রয়োজনীয় যাবৎ উপকরণ সংগ্রহাদি করা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর নহে; তাই পরস্পরসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া একের প্রয়োজনীয় উপকরণ অপরে আহরণাদি করিয়া দিতে বাধ্য হয়। ঐরূপ বিচ্ছিন্নভাবে সব সংগৃহীত হইয়া মুদ্রার সহায়তায় বিনিময় মূল্যে প্রত্যেকেরই অভাব সম্পূরণ করে। ব্যক্তিগতভাবে দেশবাসিমাত্রেই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারিলেও বিনিময়ের জন্য উপযুক্তরূপ মুদ্রা যাহাতে উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

মানুষ যদি মাত্র তাহার নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ বা মুদ্রাই সংগ্রহ করিতে থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই সংগ্রহে সমর্থ না হয়, তবে প্রতিযোগিতায় কখনই সে জয়ী গণ্য হইতে পারে না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নতরূপে জয়লাভ করিতে হইলে কর্ম্মী মানুষমাত্রকেই তাহার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাদিসম্পদ তাহার নিজের শক্তি-সামর্থ্যানুযায়ী লাভ করিতেই হইবে।

এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য দেশবাসী কর্ম্মিমাত্রেই যাহাতে কোন বিষয়েই পরের উপর নির্ভর না করিয়া স্বশক্তিবলে নিজ নিজ অভাব-পূরণের পরও অতিরিক্ত কিছু না কিছু আহরণে সফলকাম হইতে পারে, এমনই মন্ত্রে প্রত্যেককে দীক্ষাদান করিতে হইবে।

ব্যক্তির পরই পরিবার। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক পরিবারই যাহাতে অন্য পরিবার হইতে কিছুই গ্রহণ না করিয়া প্রদান পূর্ব্বক জয়ী হইতে পারে, তদনুরূপ সাধনায় লিপ্ত হইবে।

পরিবারের পর তৎসমষ্টিভূত পল্লীমণ্ডলীসমূহ। প্রতি পল্লীমণ্ডলীতেই যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য সমুৎপাদিত হইয়া, প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক মণ্ডলীকেই জয়যুক্ত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাউল, ডাইল, তরীতরকারী, ফলমূল, শাকশব্জী, তৈল, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি কোনও কিছুর জন্যই যাহাতে এক পল্লী অপর পল্লীর মুখাপেক্ষী না হয়, অধিকন্তু প্রত্যেক পল্লীমণ্ডলীই যাহাতে নিজেদের কাজ সারিয়া অতিরিক্ত কিছু রপ্তানী করিতে পারে, পল্লীমণ্ডলীর পরিচালক কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে সর্ব্বদাই তদনুরূপ কর্ম্মব্রত সাধনায় লিপ্ত থাকিতে হইবে।

উক্তবিধ প্রতিযোগিতাই উন্নতিলাভের সুগম সোপান। পর্য্যায়-ক্রমে যাবতীয় সংসদকেই উক্ত প্রতিযোগিতার শুভ মন্ত্রটি গ্রহণ করিয়া কর্ম্মব্রতসাধনায় সংলিপ্ত থাকিতে হইবে।

বিশ্বের আদর্শস্বরূপা বিশাল এই ভারতভূমিতে, দেশের কর্ম্মব্রতীদের অপরিচ্ছিন্ন সাধনার ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্তরূপ শস্যসম্ভার আহরিত, সংগৃহীত ও রূপান্তরিত হইবার পর বিশ্বের বাজারে রপ্তানী হইয়া, বিবিধ স্রোতঃপথে অর্থরাশি যাহাতে এ দেশে প্রবাহিত করিয়া লইয়া আসিতে পারে, বিবেচনা সহকারে জাতীয় মহাসংসদকে তদনুরূপ বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় এ দেশকে জয়ী করিয়া তুলিতে না পারিলে, উন্নতি ইহার অদৃষ্টে ঘটিবে না।

শ্রমিক কর্ম্মীদের অর্থোৎপত্তির কথা

শ্রমিক কর্ম্মীদের শ্রমমূলক কর্ম্মকলাপ প্রকৃতিভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ-ভাগে বিভক্ত :--

(ক) উৎপাদন,

(খ) আহরণ

(গ) উৎপাদিত ও আহৃত দ্রব্যের রূপান্তরিতকরণ।

(ক) সভ্য সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি পণ্য যথা—ধান, পাট, কার্পাস, গম, ইক্ষু প্রভৃতি—শস্যাদি মানব কর্ম্মীদের শ্রম যোগে প্রকৃতির ভূমি, জল ও তাপের সহায়তায় উৎপাদন করিয়া লইতে

(খ) আবার কতকগুলি দ্রব্য—যথা—কয়লা, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহাদি খনিজ ধাতু, মুক্তা প্রবালাদি সামুদ্রিক দ্রব্য, মৎস্য মাংসাদি খাদ্য, মধু প্রভৃতি কতকগুলি পণ্য প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে শ্রমযোগে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

উক্ত দ্বিবিধ উপায়ে উৎপাদিত ও আহরিত দ্রব্যের অনেকগুলিকে মানুষের মনোমত ও রুচির অনুযায়িরূপে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয়। ইহারই নাম শিল্পবিভাগ। কর্ম্মের এই বিভাগটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। শুধু দৈহিক শ্রমে ইহার কার্য্য চলে না, প্রতিভামূলক মানসিক শ্রমেরও প্রয়োজন। কাজেই এই বিভাগে মানসিক ও দৈহিক উভয়বিধ শ্রমে শ্রমিক, শ্রম-শিল্পী কর্ম্মীর প্রয়োজন।

উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মে কর্ম্মী শ্রমিকদের শ্রমযোগে সমুৎপন্ন পণ্যের বিনিময়সূত্রেই বিশ্বের বাণিজ্যব্যাপার পরিচালিত হয়। এই বাণিজ্য ব্যাপারটি যথাযথভাবে পরিচালিত করিবার জন্যই অর্থ বা মুদ্রার পরিকল্পনা ও প্রবর্ত্তন। কাজেই দাঁড়াইতেছে এই :—

(১) প্রথমে অর্থের আদিপুরুষ বা পিতামহ শ্রমিকের সার্থক শ্রম।

(২) অর্থের পিতা বা জনক উক্ত শ্রমজ পণ্য।

(৩) পণ্যের পুত্র—মুদ্রারূপী অর্থ।

সুতরাং স্বতঃসিদ্ধরূপে ইহা স্বীকৃত যে—অর্থ স্বয়ম্ভু নহে,—অর্থ জাত পদার্থ, পণ্য জন্য পদার্থ—জনক তার শ্রম। পুনঃ মুদ্রারূপী অর্থ জন্য পদার্থ—জনক তাহার পণ্য। অর্থনীতির এই মূল সূত্রটির সমাধান সাধনের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জাতীয় কর্ম্মপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

আহার্য্য-সংস্কার

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

এইবার আটা ও ময়দার কথা আলোচনা করা যাউক। এই শ্রেণীর আহার্য্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যাঁতা-ভাঙ্গা আটা, দ্বিতীয় সাধারণ আটা আর তৃতীয় ময়দা। গমের গঠনও চালের অনুরূপ। সুতরাং চালের দৃষ্টান্ত হইতেই গমের সকল কথা সহজে বুঝা যাইবে। ইহাতেও ভিটামিন থাকে—প্রধানতঃ আবরণের নীচেই Subpericarpal Layerএ। বাজারে যে যাঁতাভাঙ্গা আটা বিক্রয় হয়, তাহাতেও গমের প্রায় সব জিনিষই বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তাহাতে ভিটামিনও যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে। সাধারণ আটাতে ভিটামিন অপেক্ষাকৃত কম থাকে, কারণ, ইহা চাঁকা জিনিষ, চালুনী দিয়া ভুষি এবং তাহার সঙ্গে ভিটামিন বহুল পরিমাণে চাঁকিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। ময়দা সকলের অধম। কারণ, ইহাতে ভুষি মোটেই থাকে না। আর কলের নির্ম্মমতম পেষণে যেটুকু ভিটামিন থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইহার মূল্য প্রধানতঃ সৌখীনতার জন্য—খাদ্য হিসাবে ইহার মূল্য অন্য দুই রকম আটার অপেক্ষা কম। এ হিসাবে যাঁতার আটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবশ্য যাঁতার আটায় বেশী পরিমাণে ভুষি থাকায় ইহা অপেক্ষাকৃত বেশী দুষ্পাচ্য, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন আহার্য্যকে রোগীর পথ্যের সামিল করিয়া ফেলা উচিত নহে। অল্পপরিমাণে আরম্ভ করিয়া ক্রমে এই জিনিষটাকেই হজম করিতে অভ্যাস করা উচিত। ইহার আর একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার অপেক্ষাকৃত ভাল হয়।

অপেক্ষা বেশী প্রোটিন থাকে (শতকরা ১২.৫ ভাগ)—অনুপাতে ডেড়-গুণেরও বেশী। ইহার একটা মস্ত সুবিধা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভিটামিন বেশীক্ষণ উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালী যে প্রণালীতে রুটী তৈয়ারী করে তাহাতে বেশীক্ষণ আগুনের অর্থাৎ উত্তাপের সংস্রব থাকে না। সুতরাং এই প্রস্তুত প্রণালীতে ভিটামিন বিশেষ নষ্ট হয় না, কিন্তু ভাতে তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ, চাল ন্যূনপক্ষে ৪৫ মিনিট সিদ্ধ করিলে তবে ভাত হয়। ইহাতে ইহার ভিটামিন অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এখানে এ কথাটাও বলিয়া রাখা ভাল যে, সিদ্ধ করার একটা নিজস্ব সুবিধা আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্বেতসার কণার (Starch granule) একটা করিয়া Celluloseএর আবরণ থাকে। খানিকক্ষণ সিদ্ধ করার ফলে শ্বেতসার কণা স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার আবরণটা ফাটিয়া যায়। তাহার ফলে জিনিষটা সহজপাচ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই রুটী ভাতের অপেক্ষা পুষ্টিকর হইলেও দুষ্পাচ্য বেশী।

এইবার ডাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত মসূর, মুগ, অড়হর, ছোলা, কলাই, মটর, খেসারী প্রভৃতি। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, এই সকল জিনিসে বেশী প্রোটিন থাকে। পূর্ব্বোক্ত তালিকায় লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, মাছ মাংসের তুলনায় এই সব জিনিষে প্রোটিন থাকে বেশী। সুতরাং খাদ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য বড় কম নহে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা যে মাছ-মাংসের অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর, এ কথা বলা চলে না। কারণ, সকল উদ্ভিজ্জ আহার্য্যেই ঐ Celluloseএর আবরণের বালাই আছে, যাহার জন্য ইহারা মাছমাংসের অপেক্ষা দুষ্পাচ্য। এই সকল জিনিষের অনেক অংশ হজম না হইয়াই—সুতরাং শরীরের পক্ষে কোন কাজ না করিয়াই প্রায় অবিকৃত অবস্থায় মলের সঙ্গে বর্হির্গত হয়। অবশ্য জীবাণুর (Bacteria) সাহায্যে অন্ত্রে Celluloseএর আবরণ গলিয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা হয় খুব কম। এই হিসাবে ডাল-কলাইএ এত প্রচুর প্রোটিন থাকিলেও তাহা কাজে খুবই কম আইসে। কিন্তু তাহা হইলেও 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও' ত ভাল। এই সব জিনিষের আর একটা গুণ এই যে, ইহাদের মধ্যে ভিটামিন (Water Soluble B) থাকে খুব বেশী। ছোলা দুই দিন ধরিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দিলে যখন ছোট ছোট অঙ্কুর নির্গত হয়, তখন তাহাতে এত বেশী ভিটামিন থাকে যে, জিনিষটা (germinating gram) বেরি-বেরি রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কেহ কেহ সকালে উঠিয়া কিছু ছোলা বা মুগ ভিজান খাইয়া থাকেন। শরীরের পরিপুষ্টির জন্য ইহা যে একটা উৎকৃষ্ট পন্থা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। রন্ধনকালে উত্তাপে ডালেরও ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু এই প্রণালীতে আহার করিলে সে আশঙ্কা মোটেই থাকে না। অবশ্য এ উপায়ে বেশী খাওয়া যায় না, হজম হইবে না। তবে ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া বাড়ান যাইতে পারে। একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার যে, মানুষ অভ্যাস দ্বারা পরিপাকশক্তি বাড়াইতে পারে, কিন্তু শত চেষ্টাতেও ভিটামিন সৃষ্টি করিতে পারে না। সে জিনিসটা তাহাকে অন্য যায়গা হইতে আহরণ করিয়া লইতে হইবে।

ডালের মধ্যে মসূর ডালই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে শ্বেতসার যথেষ্ট আছে, প্রোটিন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিদ্যমান। আর Cellulose এর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই জন্য সুসিদ্ধ মসূর-ডালের ঝোল রোগীর পক্ষে এত উপকারী ও পুষ্টিকর। এই ডালের প্রচলন বেশী হওয়া উচিত। মুগের ডাল ঠাণ্ডা অর্থাৎ সহজপাচ্য; দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহার খুব প্রশংসা করিয়া থাকেন। খাদ্য হিসাবে ছোলার ডাল তেমন ভাল নহে। ইহাতে প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, কিন্তু Cellulose

চলনও আমাদের দেশে তত বেশী নাই। খেসারীর ডাল বেশী খাওয়া উচিত নহে। ইহা হইতে এক প্রকার পক্ষাঘাত-ব্যাধি (Lathyrism) হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে এই ডাল বেশী ব্যবহৃত হয়—সেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী।

ডাল রান্না সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সিদ্ধ করিলে ইহাদেরও cellulose-এর আবরণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফাটিয়া যায়।

দেহপুষ্টির জন্য যে প্রোটিনের মূল্য এত বেশী, তাহার কথা বলিতে গেলে মাছমাংসের কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রোটিন অমূল্য সামগ্রী, কিন্তু বাঙ্গালার অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে মহার্ঘতার দরুণ মাছমাংসের স্থান ডালের নীচে নামিয়া আইসে। ইহা শুভলক্ষণ নহে। প্রোটিন জাতীয় আহার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্মূল্য। মাছ-মাংস যতই মহার্ঘ হইতেছে, দেশ যতই দরিদ্র হইতেছে, দেশের স্বাস্থ্য সেই পরিমাণে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহানির কারণ একটা নহে, কিন্তু আহার্য্যের অনুপযুক্ততা যে একটা প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে, এখন বিষয়টা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে। প্রোটিন জিনিষটা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, থাকিতেও পারে না। দৈনিক কতখানি প্রোটিন পাইলে মানুষ সুস্থতম অবস্থায় থাকিতে পারে, সেই সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ আছে। খানিকটা মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, কেন না কোন জাতির কিংবা কোন মানুষের প্রোটিন অথবা স্নেহসারের পরিমাণ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। কিন্তু তথাপি সাধারণতঃ কতখানিতে মানুষ স্বাস্থ্যবান্ থাকে, কোন মাত্রা অতিক্রম করিলে অনিষ্ট ঘটে, আর কতটুকু কম পাইলে মানুষ জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটায়, সে বিষয়ে খানিকটা আলোচনা করা যাইতে পারে।

অধিকাংশ পণ্ডিতই দৈনিক ১ শত গ্রামের (প্রায় আধ পোয়া) কম প্রোটিনের পক্ষপাতী নহেন। Ranke, Atwater, Moleschott, Forster প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ দৈনিক ১ শত হইতে ১ শত ৩০ গ্রামের পক্ষপাতী, কিন্তু Chittenden নামক আমেরিকার বিশেষজ্ঞ বলেন যে, দৈনিক ৩৬ গ্রাম হইতে ৪০ গ্রামই যথেষ্ট। ইনি পাঁচ জন অধ্যাপক, ১৩ জন সৈনিক এবং ৮ জন ছাত্রকে অল্পমাত্রায় প্রোটিন খাইতে দিয়াছিলেন। কয়েক মাসেও তাঁহাদের কোন স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, উপরন্তু উন্নতিই হইয়াছিল। তাঁহার সমালোচকগণ বলেন যে, জীবন কয়েক মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; উল্লিখিত অধ্যাপক, সৈনিক এবং ছাত্রগণ প্রত্যেকেই পরে Chittenden-এর মাত্রা ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাঁহাদের পূর্ব্ব-অভ্যস্ত আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অসুস্থ হইলে যুঝিবার জন্য বাড়তি শক্তি (reserve energy) ইহাদের ছিল কি না, তাহা Chittenden-এর সীমাবদ্ধ পরীক্ষা প্রণালী হইতে জানা যায় না। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ডাক্তার এবং অধ্যাপক D. McC. কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই কথা বলেন যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণ খায়, তাহার অপেক্ষা অনেক কম আহার করিলে অনিষ্ট ত হইবেই না, পরন্তু মঙ্গল হওয়াই সম্ভব। আহারের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ান যাইবে, আহার্য্যের অংশবিশেষ সেই অনুপাতে অব্যবহৃত অবস্থায় মলের সঙ্গে নির্গত হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া মস্তিষ্কজীবী বাঙ্গালীর এই অতিরিক্ত আহার তাহাদের মধুমেহ (Diabetes) রোগের অন্যতম কারণ। ইনি কম আহারের বিশেষ পক্ষপাতী। জেলের কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিয়া কয়েদীদের উপর কাজে লাগাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই এবং তাঁহার এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ভারত সরকারের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কথাটার অনেকখানি অবশ্য সত্য। প্রোটিন ব্যবহার করে। কিন্তু তিনিও যে সত্য সত্যই এত কম প্রোটিনের পক্ষপাতী, তাহা মনে হয় না। কারণ, তিনি একটু পরেই এ কথা বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ বাঙ্গালী য়ুরোপীয় অপেক্ষা শরীরে এবং কর্ম্মশক্তিতে নিকৃষ্ট। আহার্য্যের নিকৃষ্টতাই তাহার কারণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। (Scientific memoris, Medicat Department, Government of India, No, 34 & 37)। আমাদের ছাত্রজীবনে তিনিই এ কথা বলিয়াছিলেন যে, অন্যান্য বিষয়ে একই অবস্থায় পাশাপাশি বাস করিয়া মুসলমানরা বেশী মাংস খায় বলিয়া রোগের সঙ্গে তাহাদের যুঝিবার শক্তি হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী। অত্যল্প শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে অতিমাত্রায় স্নেহসারযুক্ত আহারই বাঙ্গালীর মধুমেহ রোগের অন্যতম কারণ বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করেন—প্রোটিনের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। বেশী মাত্রায় প্রোটিন খাওয়াটাই বৃক্ক প্রদাহের (Kidney inflammation) কারণ, এ ধারণা ভিত্তিহীন। বাঙ্গালীও এই রোগে যথেষ্ট ভোগে।

এ বিষয়ে আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Johns Hopkins University-র অধ্যাপক W. H. Howell-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"..It must be remembered, that mankind, left to the guidance of the natural appetites and the eliminating influence of natural selection, has always, when possible, adopted the high protein level of 90 to 100 gms. per day. Indeed, the uniformity with which this level has been unconsciously maintained, is a striking fact. Among the rich as well as the poor, and in races very differently placed as regards quantity of available food, substantially the same amount of protein (80 to 100 gms.) is consumed daily by each individual.........That mankind has made a mistake in adopting the higher protein level can hardly be claimed on the basis of our present knowledge." (Text Book of Physiology, Howell, 4th; edition, page 880).

অর্থাৎ এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ তাহার নিজের ক্ষুধা এবং স্বাভাবিক নিকাচন শক্তির ফলে সুবিধামত দৈনিক ৯০ হইতে ১ শত গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মাত্রা সে অজ্ঞাতসারে যে কি নির্দ্দিষ্ট নিখুঁতভাবেই বজায় রাখিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। কি ধনী কি দরিদ্র, আহার্য্যপ্রাপ্তির সুবিধা অসুবিধা হিসাবে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই দৈনিক ঐ ৯০ হইতে ১ শত গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এমন কথা বলাই চলে না যে, মানুষ এই উচ্চমাত্রায় প্রোটিন খাইয়া ভুল করিয়াছে।

ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার W. D. Halliburton কম প্রোটিনের পক্ষপাতী নহেন। আমাদের দেশেরও কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়নাধ্যাপক রায় শ্রীচুণিলাল বসু বাহাদুর এই মতেই সায় দেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক সাধারণ সভায় তিনি বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, প্রোটিন জিনিষটা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া চাই; ডাল আরও বেশী করিয়া খাইবেন, তাহাতেই উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে।

"Among the rich as well as the poor, and in races very differently placed as regards quantity of available food, substantially the same amount of protein (80 to

প্রতি অবহেলার দরুণ কি যে অনর্থ আজ বাঙ্গালী ঘরে আনিয়াছে, তাহা আর বোধ হয়, কাহারও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালী আজ আর সভ্যের সহচর নয়, natural selection আজ আর তাহাকে পথ দেখায় না, আজ সে গতানুগতিকতার ক্রীতদাস—দাসমাত্র নয়, ক্রীতদাস। এই হিসাবে যে অর্থনৈতিক কারণে এ বিষয়ে খানিকটা বাধাবাধকতা বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিতেছে। চতুর বাঙ্গালীর দেশে আজ মাত্র ৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া যাহা ঘটিয়া আসিতেছে, তাহা আবহমানকাল হইতে অর্থাৎ মনুর আমল হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে, সুতরাং সেটা যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচের বাহিরে। ৫০ বৎসর আগে বাঙ্গালার পুষ্করিণী এত চটাল, এত নধর ঘাসে, পুষ্পশোভিত পদ্মদলে, কচুরিপানায়, শ্যাওলা এবং উদ্ভিজ্জতত্ত্বের অজ্ঞাত নানাবিধ লতা-গুল্মে পূর্ণ হইয়া দূর হইতে মটরশুঁটির ক্ষেত বলিয়া ভ্রম জন্মাইত না। তখনকার মৎস্যকুল সেই গভীর জলাশয়ে নির্ম্মল জলতলের অদৃশ্য শোভা বৃদ্ধি করিয়া পরমায়ুশেষে পঙ্কক্ষবরে চির বিশ্রামলাভ করিবে, তাহা মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পরন্তু তাহারা যে পুষ্করিণীস্বামী এবং গ্রামবাসিগণকে অভিপ্রায়মত ভোগ করাইয়া তামসিক ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করাইত, ইহা ধরিয়া লওয়াই স্বাভাবিক। উদার হিন্দুশাস্ত্রে মাছ মাংস খাওয়ার পক্ষেই না কয়টা শ্লোক দেখা যায়, আর সাত্ত্বিক আহারের পক্ষেই বা কয়টা শ্লোক পুঁথিবদ্ধ আছে, তাহার জন্য বৃথা অনুসন্ধান না করিয়া চোখ তুলিয়া বাহিরের দিকে একটু চাহিয়া দেখিলেই অনতিবিলম্বে দেখা যাইবে যে, সাধারণতঃ নিরামিষাশী জাতির অপেক্ষা মাংসাশী জাতিই বেশী শক্তিসম্পন্ন। প্রাণি-জগতেও এই নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। উন্নত জাপানের দৈনন্দিন আহার্য্যে কত প্রোটিন থাকে এবং যেটুকু থাকে, সেটুকু বাঙ্গালীর আহার্য্যের প্রোটিনের সমান, না তদপেক্ষা কম, অথবা বেশী; পূর্ব্বের তুলনায় তাহারা এখন তাহাদের আহার্য্যে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইয়াছে কি না, জাপানীদের সহিত বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা প্রণালীর কোন পার্থক্য আছে কি না, যাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিতে পারে, এ সব কথার আলোচনা না করিয়া অন্নভোজী জাপানীদের দৃষ্টান্ত দিলে যুক্তিটা চরম হয় না। অবশ্য এ কথাটা ঠিক নহে যে, বাঙ্গালীর অধঃপতনের একমাত্র কারণ ই মাছ-মাংস সম্বন্ধে অসীম কার্পণ্য, কিন্তু এটা যে একটা প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে? নিকৃষ্ট আহার্য্যই আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার একমাত্র কারণ, এ কথা বলিলেই অমনই এক দল ব্যক্তি বলিয়া উঠিবেন যে, "ওটা ভুল; সাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রায় সাত্ত্বিক আহার কি কখনও অনিষ্টের কারণ হইতে পারে?"

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন ভড়।

ইন্দ্রাণী

এমন এক দিন ছিল, যে দিন বাঙ্গালীমাত্রেই 'ইন্দ্রাণী' ক্ষেত্রকে পুণ্যতীর্থ বলিয়াই মনে করিতেন এবং ইন্দ্রাণীর "বার ঘাটে" ভাগীরথীর পূতসলিলে অবগাহন করিয়া "ইন্দ্রেশ্বর" মহাদেবের পীঠস্থলে চন্দনলিপ্ত বিল্বদল অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ইন্দ্রাণীর বার ঘাট ও তের হাট নামমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে। কাশিমবাজারের পুণ্যশীল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কৃপায় দাঁইহাট প্রবেশ-মুখে একটি কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর ! সেই ঘাটটিই 'কাজ বাবর ঘাট' ছিল কি না, তাহা আমি অবগত নহি। কালের কি অমোঘ প্রভাব! ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছিলেন,—

"মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বম্।
হরতি নিমিষাৎ কালঃ সর্ব্বম্॥"

মহাকাল অনেক দিন হইল, ইন্দ্রাণীর বিপুল গৌরব-গর্ব্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। আজ ইন্দ্রাণীর নাম অনেক বঙ্গসন্তানের অজ্ঞাত। ইন্দ্রাণীর স্থানে "কাটোয়া" নগরীই আজকাল সাধারণের নিকট সুপরিচিত। কালপ্রভাবে কাটোয়ার ইতিহাসই আজ 'ইন্দ্রাণীর' ইতিহাস বলিয়া লোকলোচনে প্রতিভাত। আমরা ইন্দ্রাণী তথা কাটোয়ার অতীত গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার মানসে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

এক দিন কাটোয়ার কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রাণীর নামই করিতে হইত। আজ ইন্দ্রাণীর কথা বলিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই কাটোয়ার নামই করিতে হইতেছে। ইন্দ্রাণীর ইতিহাস আজ কাটোয়ার ইতিহাস বলিয়াই পরিচিত।

কাটোয়া বহু দিনের প্রাচীন স্থান। ইহা ইন্দ্রাণীরই অন্তর্গত। কাটোয়া নামটি আধুনিক নাম। 'এরিয়ানের' ইতিহাসে কাটোয়া কাটদ্বীপ নামে পরিচিত। তাহারও পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল কণ্টকনগর। বৈষ্ণব কবিগণ 'কাটঞা' বলিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইহার চন্দ্রবিন্দু গড়াইতে গড়াইতে বাঁকুড়া জেলায় নির্ব্বাসিত হইয়া কাটোয়া নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগীরথীর পুণ্যতীরে অবস্থিত বলিয়া কাটোয়া বহুকাল হইতেই বাণিজ্যবহুল স্থান। বর্ত্তমানে কাটোয়া নগর বঙ্গের মধ্যে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। চৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥

প্রসিদ্ধ অজয়নদ ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের উত্তরে উদ্ধারণপুর ও শাঁখাই গ্রাম অবস্থিত। দক্ষিণে কাটোয়া ও পশ্চ মুরসিদপুর। কবিকঙ্কণ "চণ্ডী" গ্রন্থে ইন্দ্রাণীর পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন;—

বামেতে উদ্ধারণপুর দেহাটা মন্তেশ্বর
শাঁখাই ঘাট দিল দরশন।
খাইয়া গঙ্গার পানি মহাপুণ্য মনে গণি
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ॥
মঙ্গল হাট ডাহিনে আছে থাকিব ঘাটের কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী ভুবনে দুর্লভ জানি
দেব আইসে যাহার সদন॥

অন্যত্র,—

ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়ে ফুল পানি।
লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি
বাহিয়া অজয় নদ পাইল ইন্দ্রাণী।

প্রসিদ্ধ কবিবর কাশীরাম দাস তাঁহার রচিত মহাভারতের আদি ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥

বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী একটি প্রধান পরগণা। ইহার বাহ্য-গৌরব বর্ত্তমানে লোকলোচনের অন্তর্হিত হইলেও, অন্তর্গৌরব আজিও বিলুপ্ত

হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে এক দিন ইন্দ্রাণীর অপার মহিমা বিদ্যমান ছিল এবং ইন্দ্রাণী বহু তীর্থের মধ্যে একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল, উহা ঐ সকল লেখা হইতেই আমরা জানিতে ও বুঝিতে পারিতেছি। কবিবর কাশীরাম দাস্ ইন্দ্রাণীর বার ঘাটকে লক্ষ্য করিয়াই "দ্বাদশ তীর্থ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও "দেব আইসে যাহার সদন" বলিয়া ইন্দ্রাণীর পুণ্যপ্রদ মহিমাই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্য ভাগবতকারের লেখক বৃন্দাবনদাসের পরবর্ত্তী সময়ের লোক হইলেও মুকুন্দরাম এবং কাশীরাম দাস কাটোয়া নগরের নাম উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাণীর নামই করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান জন্য বেশী দূর যাইতে হয় না। সে সময়ে ভাগীরথীতীরস্থিত ইষ্টকপ্রস্তরাদিতে নির্ম্মিত পর পর দ্বাদশ ঘাট এবং ইন্দ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গই ইন্দ্রাণীর গৌরবের বিষয় ছিল। তখন কাটোয়ায় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। সেই জন্যই তাঁহারা ইন্দ্রাণী নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাটোয়া ইন্দ্রাণীরই ধ্বংশাবশেষ। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের স্থান এবং তাঁহার সন্ন্যাসমন্ত্রদাতা গুরু শ্রীমৎ কেশব ভারতীর আবাসস্থল হইলেও ইন্দ্রাণীর আড়ম্বর-গৌরবের নিকট তৎকালে কাটোয়া অনন্ত নভোমণ্ডলে ক্ষুদ্র তারকার ন্যায় অতি ম্লানমূর্ত্তিতেই অবস্থান করিত। কালপ্রভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণীর কীর্ত্তিস্বরূপ "বারঘাট" ও "ইন্দ্রেশ্বর" শিবের মাহাত্ম্য খর্ব্বতাপ্রাপ্ত হইয়া লোকলোচনের অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মহিমাও অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, ইন্দ্রাণী এক্ষণেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের দৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। আজিও বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—

"বারঘাট তের হাট, তিন চণ্ডী তিনেশ্বর
ইহা যে মানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥"

মহাভারতে বাচস্পতি মিশ্র-ধৃত বচন হইতে আমরা জ্ঞাত হই,—

"ইন্দ্রাণীনাম তীর্থং প্রাৎ ইন্দ্রাণী যত্র বাসবম্।
তপস্তপ্ত্বা পতিং লেভে সৈব শস্তা প্রয়াগবৎ॥"

ইন্দ্রাণী যে ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া দেবরাজ বাসবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা যে প্রয়াগতুল্য তীর্থ, এবং যে মহাপুরুষের নামানুসারে কাটোয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহ 'ইন্দ্রাণী' নাম ধারণ করিয়াছিল, তাহার মহিমা ও অস্তিত্ব সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। ইন্দ্রাণীর পূর্ব্ব-গৌরব নাই বটে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশতরু ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি কিংবদন্তী রহিয়া রহিয়া কত কথাই না বলিয়া দিতেছে! প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক প্রবলপ্রতাপ প্রজারঞ্জক মহীপতি এই স্থানে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার যশঃসৌরভে সমগ্র প্রদেশ সৌরভান্বিত ছিল। তাঁহারই কীর্ত্তিকলাপ বক্ষে ধারণ করিয়া এই ক্ষেত্র ইন্দ্রাণী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনিই ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব স্থাপন করিয়া ইন্দ্রাণীকে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীতীরে ইন্দ্রেশ্বরীর বাঁধা ঘাটের ভগ্ন ইষ্টকরাজির মধ্য হইতে আজিও যে তপ্ত বায়ু নির্গত হইতেছে, ভাবুকের প্রাণে তাহা কত কথাই না জাগাইয়া দেয়। কাটোয়া নগরীর উত্তর-প্রান্তস্থিত শাঁখাই হইতে দাঁইহাটের দক্ষিণ-প্রান্তস্থিত ভাউসিং পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত স্থানকেই অনেকে ইন্দ্রাণী নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাশীরাম দাস ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যে মধুর তানে ইন্দ্রাণীর যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে এই সুবিশাল ক্ষেত্রের সমগ্র অংশই যে ইন্দ্রাণী নামে সুপরিচিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। পূর্ব্বে যে "তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর" কথা বলিয়াছি, তাহা চন্দ্রেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর, শঙ্খেশ্বর এবং পাতাইচণ্ডী, আকাইচণ্ডী ও কুলাইচণ্ডী—বলেন, ইন্দ্রাণীর সীমানা ইহা অপেক্ষাও বিস্তৃত ছিল। কাটোয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় অবস্থিত কয়েকখানি গ্রামও ইন্দ্রাণী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

বারঘাটের নাম;—(১) বারদুয়ারি ঘাট, (২) কালুর ঘাট, (৩) স্বরূপ পানের ঘাট, (৪) কদমতলার ঘাট, (৫) বক্সীর ঘাট, (৬) গণেশমাতার ঘাট, (৭) শিবের ঘাট, (৮) দেওয়ানের ঘাট, (৯) মনোহারির ঘাট, (১০) কান্ত বাবুর ঘাট, (১১) ইন্দ্রেশ্বরীর ঘাট, (১২) শঙ্খেশ্বরী ঘাট। কান্ত বাবুর ঘাট নামধেয় ঘাটটি আধুনিক নাম। শুনা যায়, ইহার নাম পূর্ব্বে মানের ঘাট ছিল। কান্ত বাবু কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া ঘাটটি পরবর্ত্তী সময়ে কান্ত বাবুর ঘাট নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল সুপ্রসিদ্ধ ঘাটের চিহ্নমাত্রও নাই; তবে স্থানে স্থানে অনুসন্ধান করিলে এই সব ঘাটের অস্তিত্ব জানা যায় এবং কয়েক বৎসর হইল, কাশিমবাজারাধিপতি মহোদয় বহু ব্যয়ে একটি কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের সমস্ত অংশই আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তের হাট;—(১) দণ্ডিহাট (দাঁইহাট), (২) পাতাইহাট, (৩) বিকিহাট, (৪) মণ্ডলহাট, (৫) আকাইহাট, (৬) পাছুহাট, (৭) খাঁর হাট, (বর্ত্তমানে কাটোয়া নগরীর মধ্যে গুড়েহাট নামে পরিচিত), (৮) খোষহাট, (৯) আতুহাট, (১০) বীরহাট (যাহা এক্ষণে বেড়া নামে পরিচিত) অবশিষ্ট তিনটি হাটের পূর্ব্বনাম বিলুপ্ত হইয়া—(১১) নসরৎপুর, (১২) কৃষ্ণচন্দ্রপুর, (১৩) মুরসিদপুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সবই পরিবর্ত্তনশীল, আজ যাহা উপবন, দু'দিন পরে তাহাই আবার বিজন অরণ্যে পরিণত। সুতরাং উপরি-উক্ত হাটত্রয়ের নাম যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ইন্দ্রাণীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত পাছুহাট নামক স্থানে দেওয়ান উপাধিধারী জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বসতি ছিল। তাঁহারই নামানুসারে দেওয়ানের ঘাট এবং দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থানের অভ্যুদয়। ভাগীরথী অনেকটা দূরে সরিয়া যাওয়ায় দেওয়ানগঞ্জ এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট। বর্ণিত তের হাটের মধ্যে দণ্ডীর হাট—যাহা এক্ষণে দাঁইহাট নামে সর্ব্বত্র পরিচিত, কাটোয়ার বিবরণে এই স্থানই কোনরূপে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আজিও বজায় আছে।

যাহা হউক, প্রাচীনত্বে ইন্দ্রাণী বা তদন্তর্গত কাটোয়া কোন অংশে হীন নহে। দুঃখের বিষয়, মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে বঙ্গের কোন ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মাত্র কিংবদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মুসলমান-শাসনের পূর্ব্বে এই সকল প্রাচীন স্থানের অবস্থা কেমন ছিল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ সঙ্কলন করিবার উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। বিশেষতঃ সে সকল বিবরণও যৎসামান্য মাত্র। ১২৬০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে বক্তিয়ারের বঙ্গদেশে আগমনের সময় আবু উমর মিনহাজউদ্দীন ওস্মান্ ইবন, মিরাজুদ্দিন জুজ্জনি তাবৎ কাই-নাসেরী নামক যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে বঙ্গদেশের যৎসামান্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গের মুসলমান প্রণীত সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস। তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং স্থানে স্থানে কাহিনীর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর কথায় পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন মুসলমান আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গের ইতিহাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গের বহু জনপদ, গ্রাম-নগর বহুকালের সভ্যদেশ। আর্য্য পিতামহগণ কোন্ সময়ে কেমন করিয়া বঙ্গদেশে পদার্পণ পূর্ব্বক বঙ্গলক্ষ্মীকে

ছিলেন, তাহা জানিতে ও শুনিতে কোন্ বাঙ্গালীর না চিত্ত আকৃষ্ট হয়? অনুমান ২ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া চাণক্য নীতি-প্রভাবে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনপদে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার রাজসভায় গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস্ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, বঙ্গভূমি স্বতন্ত্র হস্ত্যশ্বপদাতিশোভিত, সৈন্যবলে বলীয়ান্, পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল। সে সময়েও বঙ্গের নৌবল অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে সে সমস্তই কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। অতীতকালের মহাপ্রকৃতির রঙ্গভূমি এই বাঙ্গালার গৌরব-গরিমার অবধি ছিল না। বৌদ্ধাচার্য্য ফা হিয়ান্ ও হিয়েং-সাং বঙ্গ-ভূমিতে আগমন করিয়া মহানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সেই গৌরবের দিনে তাঁহারা তাম্রলিপ্তির লবণাম্বু বেলায় বঙ্গসন্তানের পোতারোহণ দর্শন করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীর বড় বড় অর্ণবগাহী বাণিজ্যপোত বায়ুবেগে চালিত হইয়া কত বিদেশের রত্নভাণ্ডার স্বদেশে আনয়ন করিয়া বঙ্গমাতাকে সাজাইয়াছিল। তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠিগণের সুউচ্চ সৌধচূড়ায় যে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ হইত, তাহা বাঙ্গালীরই প্রবল পুরুষকারের বিভবচ্ছটা এবং গৌরব-গরিমার নিদর্শন। ইন্দ্রাণীর ন্যায় সেই সকল অতীত গৌরব-কাহিনীও আজ স্বপ্ন-কাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা ইন্দ্রাণী—তথা কাটোয়া ও তাহার প্রধান প্রধান স্থানের বিবরণ প্রদান করিয়া পাঠকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্নবান্ হইব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

কাশীর কথা

বিশ্ব-বিশ্রুত বারাণসীর কথা বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, পুরাণ, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত, আখ্যান, আখ্যায়িকা, জ্যোতিষ, অলঙ্কার, সাহিত্য এবং নাটকাদি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিরসদাচার লীলাক্ষেত্রের কীর্ত্তিগাথা অনন্তমুখে অনন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল কথা একত্র যদি কেহ গ্রথিত করে, তবে উহা একখানি মহাভারত হইতেও বৃহত্তর গ্রন্থ হয়।

কাশীকে কাশী, বারাণসী, অবিমুক্ত, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান, আনন্দ-কানন ও বনারস নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপা অথবা জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আশ্রয় বলিয়া ইহার নাম কাশী। অথবা সকলকে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করে বলিয়া ইহার নাম কাশী। অথবা নিখিল পাপহারিণী, এমন কি, গর্ভবাসনাশিনী বলিয়া নাম কাশী। অথবা নিখিল জীবকে দেহত্যাগমাত্রেই মুক্ত করেন বলিয়া ইহার নাম কাশী। অথবা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, মৎস্য, শূরসেন প্রভৃতি দেশের ন্যায় কাশীও কাশীরাজার নামানুসারে হইয়াছে। (১)

কাশি কাশীর সমানার্থ, রামায়ণাদিতে উভয় শব্দেরই সমানভাবে প্রয়োগ দেখা যায়।

বরণা ও অসী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ইহার নাম বারাণসী। (১)

কাশী পাপবর্জ্জিত বলিয়া অথবা বিশ্বনাথ কখনও এই স্থান পরিত্যাগ করেন না, এই কারণে ইহার নাম অবিমুক্ত। (২) নিখিল রুদ্রগণের কাশীতে বাসজন্য ইহার একটি নাম রুদ্রাবাস। (৩) মহাপ্রলয়ে মহাভূত সকল এই স্থানে শবরূপে শয়ন করায় কাশীর অপর নাম "মহাশ্মশান" হইয়াছে। (৪)

এই ক্ষেত্র আনন্দদায়ক বলিয়া ইহার নাম "আনন্দকানন।" (৫) খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই নগরী 'বনার' নামক জয়চাঁদের বংশধর রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তদবধি ইহার নাম বনারস হইয়াছে।

কাশি শব্দ প্রথমে ঋগ্বেদ মং ৩,২,১,৫ সংখ্যক মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাশি শব্দ প্রকাশার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—"হে ইন্দ্র, তুমি দূরপার স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার 'মহা-

---

(১) যাস্কৃত নিরুক্তে কাশী শব্দে মুক্তি, মোহ, মোচন, প্রকাশ, এই কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই অর্থ সকল কাশীখণ্ডে এবং মৎস্য ও ব্রহ্ম বৈবর্ত্তাদি পুরাণে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকাশার্থে,—

"ক কাশিকা বিশ্বপদপ্রকাশিকা"—১৫।

"কাশীং প্রকাশীকৃতপুণ্যরাশিং।"—১৬।

—(কাশীখণ্ড, ৫ম অধ্যায়)

কাশতেঽত্র যতো জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।

—(কাশীখণ্ড)

নির্ব্বাণকাশনাদ্ যত্র কাশীতি প্রথিতা পুরী।

অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং ন মুক্তং শম্ভুনা কচিৎ ॥ ৫ ॥

—(কাশীখণ্ড, ৩০ অধ্যায়)

মহামোহনবিদ্যাসি কাশি ত্বাং পর্য্যবৈম্যহম্ ।৪৩।

পুরাবিদঃ প্রশংসন্তি ত্বাং মহামোহহারিণীম্

কাশীস্থিতি ন জানন্তি মহামোহনভূরিয়ম্।

প্রেরয়িষ্যামাহং সর্ব্বান্ ভবতী মোহয়িষ্যতি।

ইতি সম্যগ্ বিজানামি কাশি ত্বাং মোহনৌষধিম্ ॥৪৭।

—(কাশীখণ্ড, ৫২ অধ্যায়)

"পূর্ব্বজন্মশতকোটিসঞ্চিতং পাপরাশিমতুলং বিনাশয়েৎ।

কাশিকা পরপদপ্রকাশিকা দর্শনশ্রবণকীর্ত্তনাদিভিঃ।"

—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

"বহুজন্মসমভ্যাসাদ্ যোগী মুচ্যেতে বা ন বা।

মৃতমাত্রো বিমুচ্যেত কাশ্যামেকেন জন্মনা।"

—(কাশীখণ্ড, ৩১ অধ্যায়)

(১) "বরণায়াস্তথাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।"

—(কূর্ম্মপুরাণম্)

"নিম্নগাভ্যাং পুরী সা চ নাম্না বারাণসী মুনে।"

—(লিঙ্গপুরাণম্)

(২) "অবিশব্দেন পাপস্তু কথ্যতে বেদবাদিভিঃ।

তেন পাপেন তৎ ক্ষেত্রং বর্জ্জিতং বরবর্ণিনি ॥"

—(লিঙ্গপুরাণম্)

বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।

মহৎ ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ॥

—(মৎস্যপুরাণম্)

ন বিমুঞ্চতি বিশ্বাত্মা অবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্।"

—(পদ্মপুরাণম্)

(৩) যে তু যথৈব ইত্যাদি রুদ্রাবাসস্ততঃ প্রোক্তম্।

—(কাশীখণ্ড)

(৪) মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।

শেরতেঽত্র শবা ভূত্বা শ্মশানঞ্চ ততো বিদুঃ ॥

—(কাশীখণ্ড)

(৫) "আনন্দবনং নাম পুরাকারি পিনাকিনা।

ক্ষেত্রস্যানন্দহেতুত্বাদবিমুক্তং নিরন্তরম্ ॥"

—(কাশীখণ্ডম্)

প্রকাশ'। (১) এই অর্থই প্রাচীন ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ করিয়াছেন, এই মন্ত্রের অর্থ দেশবোধক কাশী শব্দ বলিলেও অর্থের অসঙ্গতি হয় না। যেমন,—"স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অধিকার করিয়াছ, সুতরাং হে ইন্দ্র, কাশীও তোমার।" এই মন্ত্রে ইন্দ্রস্তুতিই প্রতিপাদ্য, তাহার প্রকাশই হউক, বা কাশীদেশই হউক, উভয়থাই মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হয় না। কিন্তু কোন পুরাণে ইন্দ্রকে কাশীপতি বলা হয় নাই, সুতরাং দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণে বিশেষ বল নাই।

তৎপরে কাশী শব্দ যাস্কক্বত নিরুক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"কাশিঃ মুষ্টিঃ কাশিমুষ্টিঃ প্রকাশনাৎ। মুষ্টির্মোচনাদ্বা, মোষণাদ্বা, মোহনাদ্বা।

মুষ্টি কাশী শব্দের অভিধেয়. এই মুষ্টি বা (চৌর্য্য) চারি প্রকার হইতে পারে। যেমন প্রকাশ হইতে অন্ধকারের মোষণ বা নাশ হয়। মোষণ হইতে বন্ধন নাশ হয়, মোষণ,—অপহরণ হইতে পাপাদি নাশ এবং মোষণ হইতে অন্য বিস্মৃতি হইতে পারে। দেশ-বিশেষবোধক কাশীর এই সকল অর্থ কিসে সম্ভব হয়, উহা কাশীখণ্ড ও অন্যান্য পুরাণে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কাশীর নামনির্ব্বাচনে সংক্ষেপে দেখান হইয়াছে। পুরাণ ও ভারত বেদেরই ব্যাখ্যা, ইহা সেই গ্রন্থকারই দেখাইয়াছেন. বেদের অনধিকারী জনগণের বেদার্থাবগতির জন্যই পুরাণাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

এক একটি মন্ত্রে এক একটি বৃহদাখ্যায়িকা সম্পন্ন হইয়াছে। যেমন "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে" এই ভূমিশোধনের মন্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ বামনাবতারের কথা বলা হইয়াছে; যেমন বিষ্ণু তিনবার পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই পাদ এই ভূমিতেও অর্পিত হইয়াছিল। এইরূপ বহু ঘটনা পুরাণে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারে একটি মন্ত্রে অবিমুক্ত এই শব্দ আছে। যথা, "সোম এব নো রাজা রাজেব মানুষী প্রজাঃ। অবিমুক্তচক্র আসীরংস্তীরে তুভ্যমসে।"

হে নদি, তোমার তীরে যে মনুষ্য প্রজাগণ গ্রাম পরিত্যাগ না করিয়া বাস করে, তাহাদিগকে রাজা যেমন রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদের রাজা চন্দ্রও রক্ষক এবং পোষ্টা হউন।" এই অর্থ হলায়ুধ-ব্যাখ্যানুসারে করা যায়। পারস্কর গৃহ্যসূত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র অন্যরূপ দেখা যায়। যথা,—"সোম এব নো রাজেত্যা মানুষীঃ প্রজাঃ। অবিমুক্তচক্র আসীরংস্তীরে তুভ্যমসৌ॥" তাহাদের ব্যাখ্যানুসারে অর্থ "চন্দ্র প্রজাভূত আমাদের রাজা, অতএব এই প্রজাগণকে সৌম্য বলা যায়। হে গঙ্গা নদি! এই প্রজাগণ শাস্ত্র লঙ্ঘন না করিয়া তোমার তীরে অবস্থান করেন।" সীমন্তোন্নয়নের গাথায় রাজা বা বীরের প্রশংসা থাকিবে, এইরূপ পারস্কর গৃহ্যসূত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ যে এই নির্দ্দিষ্ট গাথাই উদাহরণরূপে ব্যবহার করেন, তাহা বলিয়াছেন। (২)

পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ পাঠের মধ্য হইতে এইরূপ অর্থ করা যায় যে, "হে গঙ্গে! তোমার তীরবর্ত্তী অবিমুক্ত নামক রাজ্যের মানুষ প্রজাগণকে রাজা যেমন রক্ষা করেন, চন্দ্রও সেইরূপ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ও পোষণকর্ত্তা হউন।" অথবা "হে গঙ্গে! অবিমুক্ত রাজ্যবাসী মানুষ প্রজাগণ তোমার তীরে আছেন, অতএব চন্দ্রই আমাদের রাজা।"

(১) ইমে চিদিন্দ্র রোদসী অপারে যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে।" ঋ, মং ৩,২,১,৫।

(২) অথাহ বীণাগাথিনৌ রাজানং সংগায়েতাং যো বান্যোবা বীরতর ইতি। নিযুক্তামপ্যেকে গাথামুপোদাহরন্তি, সোম এব ইত্যাদি। পারস্করগৃহ্যসূত্রম্ ১ম কাণ্ডম্।

অথবা "অবিমুক্ত নামক রাষ্ট্র যাঁহার অধিকৃত, সেই রাজা চন্দ্রবংশীয় মাত্র নহেন, তিনিই চন্দ্রমা—তোমার তীরবর্ত্তী মানুষ প্রজাগণের রক্ষক ও পোষক হউন" ইত্যাদি। অর্থাৎ যে রাজ্যের প্রজাগণ অথবা রাজা রাজ্য ত্যাগ না করিয়া সুখে বাস করেন, তাহার রাজা অবশ্যই চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদজনক এবং প্রজাগণ সুখী ও সৌম্য। অবিমুক্তের (কাশীর) প্রজাগণও সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় প্রজারঞ্জক ধন্বন্তরি, দিবোদাস প্রভৃতি কাশীরাজগণ কর্ত্তৃক অতিশয় যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন। এ কথা পুরাণশাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহা পাঠকগণ কাশীরাজগণের বর্ণনাপাঠাবসরে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্র দুইটির মধ্যে অবস্থিত 'কাশী' ও 'অবিমুক্ত' শব্দে বারাণসীকেই বুঝাইবে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে না পারিলেও দেশবিশেষ অর্থও যে বুঝাইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অথর্ব্ববেদে বরণাবতী নদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নদী এখনও কাশীর উত্তরাংশে প্রবাহিতা। ঐ নদীর জল বিষঘ্ন বলিয়া তথায় বর্ণিত হইয়াছে। (১)

উপনিষদ্

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ও শতপথ ব্রাহ্মণে শিশুনাগবংশীয় ষষ্ঠ রাজা অজাতশত্রু কাশীরাজের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে গার্গ্যাচার্য্যের শিষ্য দর্পপূর্ণ বালাকি নামে এক জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট নিজের বিদ্যাবত্তা দেখাইয়া বিস্মিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন,—"তোমার নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব।" ইহার উত্তরে অজাতশত্রু বলিলেন, "এই বাক্যের জন্য এক হাজার তোমাকে দিব, লোক সকল জনক জনক বলিয়া ধাবিত হয়।" ইহার এই অভিপ্রায় যে, হে ব্রাহ্মণ, তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিলে আমি তোমাকে সহস্র গাভী দিব, কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহাতে ব্যর্থ হইয়া জনকের নিকট গমন করে, মৈথিলরাজ জনক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সম্মানকারী ও পোষক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অজাতশত্রুও সেইরূপ হইয়াও তদনুরূপ খ্যাতি লাভ করিতে না পারায় নিজের হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। (২)

উপনিষদ ও ব্রাহ্মণের বর্ণিত ঘটনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ শত বা পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের সময়েও কাশীতে এক জন বিশিষ্ট বিদ্বান্ রাজা ছিলেন, ইনি বিচারে বালাকিকে পরাভূত করিলে বালাকি ঐ ব্রহ্মবাদী রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার ন্যায় উপনিষদে আরও আখ্যায়িকা আছে, যাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, তৎকালেও বারাণসী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বলিয়া আদৃত হইত।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে দিবোদাসপুত্র কাশীরাজ

(১) বারিদং বারয়াতৈ বরণাবত্যামধি।
তত্রামৃতস্যাসিক্তং তেনাতে বারয়ে বিষম্॥
অথর্ব্ববেদ।৪।৭।১।

(২) দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি। বৃহদারণ্যক ২য়াধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ—গার্গ্যো হ বৈ বালাকিরনূচানঃ সংস্পষ্ট আস সোঽবসদুশীনরেষু সংবসন্ মৎস্যেষু কুরুপাঞ্চালেষু কাশীবিদেহেষ্বিতি স হাজাতশত্রুং কাশ্যমেত্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রং দদ্মস্ত এতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি।—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্ ৪র্থাধ্যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণের ৫।১।১ স্থানেও অবিকল বৃহদারণ্যকের মত আছে।

প্রতর্দ্দনের সহিত ইন্দ্রের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। প্রতর্দ্দন পৌরুষবলে ইন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন ও বরলাভ করিয়াছিলেন। (১)

ভস্মজাবালোপনিষদের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণে কৈবল্যোপনিষদের ২য় খণ্ডের ২৪ মন্ত্রে জাবালোপনিষদে কাশী ও অবিমুক্তের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

রামতাপিন্যুপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, শিব বহু বর্ষ তপস্যা দ্বারা শ্রীরামকে প্রসন্ন করেন, রাম শঙ্করকে বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে শঙ্কর কাশীতে মণিকর্ণিকার গঙ্গায় বা গঙ্গাতীরে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হউক, এই বর প্রার্থনা করিলে রামচন্দ্র বলিলেন, হে দেবেশ ! তোমার এই ক্ষেত্রের যে কোন স্থানে কৃমিকীটাদি যেই মরিবে, সেই মুক্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। তোমার অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সর্ব্বজীবের মুক্তি দিবার জন্য তত্রত্য পাষাণপ্রতিমাদিতে অবস্থান করিব। (২)

ভস্মজাবালোপনিষদে আছে, শিব বলিতেছেন, "সেই কাশীতে আমি সর্ব্বদা থাকিয়া শিবভক্তের ত্যক্ত শব আনিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক ভস্মরুদ্রাক্ষ দ্বারা ভূষিত করিয়া স্পর্শ করি ও ইহাদের যেন আর জন্ম ও মরণ না হয়, এই বিবেচনায় তাহাদিগকে শৈব তারক মন্ত্র উপদেশ করি—তাহাতে তাহারা মুক্ত হইয়া আমাতে বিজ্ঞানময় শরীরে প্রবেশ করে ও পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না—যেমন ঘৃত বহ্নিতে প্রবিষ্ট হইলে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না। সেই স্থানে মুক্তির জন্য শৈব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উপদিষ্ট হয়, সেই মুক্তির স্থান"। (৩)

জাবালদর্শনোপনিষদে আছে—"ভ্রূ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে বারাণসী প্রতিষ্ঠিত। বিষুব ও অয়ন সংক্রান্তিতে এবং গ্রহণকালে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে স্নান করিলে মানব শুদ্ধ হয়"। (৪)

জাবালোপনিষদে আছে—"এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে জীবের প্রাণ বাহির হইবার কালে রুদ্র তারকব্রহ্ম বলিয়া থাকেন,—যাহাতে ঐ জীব মুক্ত হয়; সুতরাং অবিমুক্তেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অবিমুক্ত পরিত্যাগ করিবে না। হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপ। সেই অবিমুক্ত এমন উপাসনীয় যে, এই যে অনন্ত আত্মা, তিনিও অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত, সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? বরণা ও নাশীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কে বরণা ও কে নাশী ? সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষ যিনি বারণ করেন, তিনি বরণা, সকল ইন্দ্রিয়কৃত পাপ যিনি নাশ করেন, তিনি নাশী হয়েন"। (১)

পূর্ব্বোক্ত জাবালোপনিষদের ব্যাখ্যা কেহ কেহ জাবালদর্শনের আধ্যাত্মিক ভাবদর্শনে অন্যরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শ্রুতি যখন আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না, এইরূপ বলিয়াছেন, তখন কাশী প্রভৃতি স্থানবিশেষে মরণ দ্বারা মুক্তি কিরূপে হয় ? ইত্যাদি। তাঁহাদের অর্থে অত্র শব্দে দেহ, এই দেহে বর্ত্তমান অবিবেকী জীবের পূর্ব্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম-বশে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়পরাঙ্মুখ হইলে গুরু সংসার-তারক তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য বলেন, উহাতে সে মুক্ত হয়, ইত্যাদি এই সকল ব্যাখ্যান অসঙ্গত। জাবালদর্শনের আধ্যাত্মিক স্থানই কাশী হইলে বিষুবাদি সময়ে তথায় স্নানে বিশুদ্ধ হইবার কথাও থাকিত না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেন অসঙ্গত, তাহা পুরাণপাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কারণ, সকল পুরাণেই একবাক্যে শিব উপদেষ্টা বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাতেই জীব মুক্ত হয়, এই কথা আছে। যে সকল স্থলে শব্দের মুখ্যার্থে বাধা ঘটে, তাদৃশ স্থলে শ্রুতার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুতার্থ কল্পনা করিতে হয়। যে স্থানে যথাশ্রুতার্থে কোন বাধা না থাকে, সে স্থানে এইরূপ কুদৃষ্টি কল্পনা দ্বারা লোকচিত্তে সন্দেহ আনয়ন করা মহাপাপ বলিয়াই মনে হয়। কাশীতে মরিলে কেন মুক্তি হইবে, অন্যত্র কেন হয় না, এই সকল বিচার লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধ নহে। তবে এইমাত্র বলা যায়, ত্রিকালদর্শী জগন্মঙ্গলকামী ঋষিগণ বলিয়াছেন, "ভূমির অদ্ভুত রকম প্রভাবে এবং সলিলের প্রভাবে ও সাধুগণের অবস্থান নিবন্ধন তীর্থের পবিত্রতা হয়।"(২) স্থানের মাহাত্ম্য প্রভৃতি কিরূপে ঘটে, তাহাও এই স্থানে আমাদের আলোচ্য নহে, কাশীমরণে মুক্তি হয়, ইহাতে আমি নিজে বিশ্বাসবান্ এবং তাহার অনুকূলে যত শাস্ত্র পাওয়া যায়, উহা একত্র সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া থাকে, সেই প্রসঙ্গের বিচার প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য—এই গ্রন্থের অপরাংশবিশেষে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।

১। প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন পৌরুষেণ চ ইত্যাদি।

২। শ্রীরামস্য মনুং কাশ্যাং জজাপ বৃষভধ্বজঃ।
মন্বন্তরসহস্রেষু জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করম্।
বৃণীষ্ব যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি পরমেশ্বর॥
অথ সচ্চিদানন্দং শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছ।

মণিকর্ণ্যাং মম ক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বা তটে পুনঃ, ম্রিয়তে দেহী তজ্জন্তো-র্মুক্তির্নাতো বরান্তরম্। অথ স হোবাচ শ্রীরামঃ।

ক্ষেত্রেঽস্মিংস্তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ, কৃমিকীটাদয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা। অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে, অহং সন্নিহিতস্তত্র পাষাণপ্রতিমাদিষু।

৩। তত্রাহমাসীনঃ কাশ্যাং ত্যক্তকুণপাঞ্ছিবানানীয় অঙ্কে সন্নিবেশ্য ভসিতরুদ্রাক্ষভূষিতান্ সম্পাদ্য মাভূদেতেষাং জন্মমৃতিশ্চেতি তারকং শৈবং মন্ত্রমুপদিশামি, ততস্তে মুক্তা মামনুপ্রবিশন্তি বিজ্ঞানময়েনাঙ্গেন ন পুনরাবর্ত্তন্তে। হুতাশনপ্রবিষ্টং হবিরিব তত্রৈব মুক্ত্যর্থং উপদিশ্যতে শৈবোঽয়ং পঞ্চাক্ষরঃ, তন্মুক্তিস্থানম্।—জাবালোপনিষৎ।

৪। বারাণসী মহাপ্রাজ্ঞ ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য মধ্যমে। বিষুবায়নকালেষু গ্রহণে চান্তরে সদা। বারাণস্যাদিকে স্থানে স্নাত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।—জাবাল-দর্শনোপনিষৎ।

১। অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেদেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য।

সোঽবিমুক্ত উপাস্যো য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি।—(জাবালোপনিষৎ)

২। প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥—কাশীখ

মহাকবি ভারতচন্দ্র

৩

কবিবর ভারতচন্দ্র কাব্যসাহিত্যের পুরাতন রীতিনীতির আবেষ্টনের মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। ইহাতেই তাঁহার কবিত্বের অপূর্ব্বত্ব ও অসাধারণত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা genius, যাঁহারা প্রকৃত প্রতিভা, সেই প্রতিভাবান্ প্রবরেরা অতীত যুগের বিধি-নিষেধে অবরুদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে নীরবে পুরাতন রীতি মানিয়া চলেন না। অতীতের জড়-বাধা-লঙ্ঘনকারী সাহিত্যজগতের মহারথিগণের প্রধান অগ্রগণ্য ছিলেন কবি ভারত। তিনি প্রবহমান কবিত্বধারায় এক নূতন স্রোত বহাইয়া দেশের চিত্তকে ও তৎকালীন বা পরবর্ত্তী

কবিগণকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার প্রধান সারথি ছিলেন—নিঃসন্দেহ।

মাইকেল মধুসূদনও কাব্যসাহিত্যে এক নূতন ধারা বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুদূর ফরাসী দেশে ভার্সেলিস্ সহরে মধুসূদন শ্যামা বঙ্গজননীর স্বপ্ন দর্শন করেন। সেই স্বপ্নে স্বদেশের গৌরব-স্মৃতি তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠে। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় সে ভাব প্রকাশ পায়। ইংরাজী-শিক্ষিতের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থে জাতীয়ভাবের উন্মেষ এই যেন প্রথম! তাহার তুলনায় এখন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। কিন্তু ভারত ইহার বীজ উপ্ত করিয়া দিয়া যান। কবিত্বধারাকে তিনি সঙ্গত নীতি দিয়া থাকেন। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার একটি সুসংবদ্ধ নিয়ম বা রীতির অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। উহাতে কবিত্ব বা উচ্চ ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু উহার অধিকাংশ স্থলেই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্কৃতবহুল ভাষার ঝঙ্কারও বিরল ছিল না। তাহা কাশীরাম দাসের মহাভারতীয় দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে:—
"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি, পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥"
তথাপি বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন পদ্যকাব্যগুলিতে অনেক স্থলেই সংস্কৃত বর্জ্জিত দেশভাষারও (Provincial language) বাহুল্য দৃষ্ট হয়। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তদানীন্তন কালে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্য-রচনার একটি প্রণালী, একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—এ কথা ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালা ভাষার রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই ক্রমে প্রশস্ত হইয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাপ্রণালীতে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরই বলিতেন,—"ভারতচন্দ্র বাঙ্গালাভাষার রচনা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন।" কবিত্বের বিচার না করিয়াও কেবল ইহার দ্বারা বুঝা যায়—বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ভারতের নিকট কত ঋণী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাসাগর বলিয়া গিয়াছেন, "ভারতচন্দ্র বাঙ্গালাভাষার কালিদাস।" কথাটা বড় ঠিক। সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় ভারত একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী ছিলেন। কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস ইঁহারাও ভাষাজননীকে অমূল্যভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, ভারত কর্ত্তৃক সে অলঙ্কার অধিকতর দ্যুতিমান হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র জাতীয় জীবনের অপূর্ব্ব চিত্র। ভগীরথ যেমন মর্ত্ত্যে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, ভারতও সেইরূপ নব ভাবগঙ্গার অপূর্ব্ব প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধার কুসুম ও চন্দনে তাঁহার অর্চ্চনায় আমাদের জাতীয় জীবন ধন্য হইবে। আমরা তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হইব।

'ভারত যেমন ভাষার তাজমহল, তেমনই উহাতে ভাবের প্রাণ বিদ্যমান।' তাজমহলের প্রাণ যেমন শাজাহানের হৃদয়ের অনন্ত প্রেম, ভারতচন্দ্রের ভাষার মধ্যেও সেইরূপ ভাবময় প্রাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিলাতে যেমন পোপ,—তাঁহার কবিতায় যেমন প্রাণ আছে, বাঙ্গালার সেইরূপ ভারতচন্দ্র, তাঁহার কবিতায় সেইরূপ প্রাণ বিদ্যমান। (তবে তুলনাটা ঠিক হইল কি না বলিতে পারি না।)

ভারতের মত নিপুণ চিত্রকর বাঙ্গালাভাষায় অতি বিরল। তিনি ভাবের তুলিকাপাতে ভাষা বা শব্দের রঙের সাহায্যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। উপযুক্ত পদ বা শব্দের দ্বারা ভাবকে মূর্ত্ত করিতে যে কবি যত সিদ্ধহস্ত, তিনিই কবির তত উচ্চ আসনে বসিবার যোগ্য। এই বিষয়ে এবং এবম্প্রকার বিচারে ভারত—কেবল ভারতের কেন—জগতের কবিগণের মধ্যে এক অতি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার সিংহাসন টলাইতে পারিবে না।

অযথা শব্দ প্রয়োগ করা আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যেও বিরল নহে। কেবল মহাকবি কালিদাসের লেখাতে দেখা যায় যে, ব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ বলিতে পারা যায় যে, তিনিও কোনও স্থলে ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; যদিই বা করিয়া থাকেন, তাহা অতি বিরল। তিনি এমন কোন উপমা বা বিশেষণ দেন নাই—যাহার দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের অর্থ অধিকতর প্রস্ফুট হয় নাই। এই বিষয়ে ভারত কালিদাসের একমাত্র সফল-পথানুগামী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

শ্লীলতা ও অশ্লীলতা

এক্ষণে ভারতচন্দ্রের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে art এবং artist কি সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ, তাহা দুই এক কথায় বলিব। artist চিরসুন্দরের উপাসক, সুন্দর দ্রব্যেরই তাঁহারা সৃষ্টি করেন। যাহা প্রকৃত সুন্দর, যাহার আচরণে হয় ত ভাবের মনোহারিত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু যাহার অন্তরালে খুঁজিয়া দেখিলে সুন্দরের মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা কখনও কুৎসিত হইতে পারে না। যাঁহাদের প্রকৃত Cultureএর অভাব, তাঁহারাই বলেন, ও art বীভৎস art, উহা অশ্লীল। তাহা হইলে তাঁহারা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

"The artist is the creator of beautiful things. To reveal the art and conceal the artist is the artist's aim...

Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This is a fault. Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated......They are the elect to whom beautiful things mean only beauty..........There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all."

কোন্ art perfect, তাহা ঠিক বলা যায় না। অনেক সময়ে আমরা বলিয়া থাকি—এ art কুৎসিত। ইহাতে দেশের moralityর স্বাস্থ্যহানি হয়। কেন? কারণ, artist যে imperfect mediumএর সাহায্যে perfect চিত্র ফুটাইতে প্রয়াস পান, তাহা বোধ হয় তাঁহার নিজের অনিপুণ তুলিকার দোষে বীভৎস কদাকার দৃশ্য ধারণ করিয়া থাকে। এইখানেই artistএর বিফলতা—সেইখানেই artistএর art কুৎসিত। কিন্তু যে artist সুনিপুণ তুলিকাপাতে imperfect mediumএর মধ্য দিয়াও মধুর চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই ত প্রকৃত artist! Oscar Wilde বলেন,—

"The moral life of man forms part of the subject-matter of the artist, but the morality of art consists in the perfect use of an imperfect medium. No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved......No artist is ever morbid. The artist can express everything.......Thought and language are to the artist instruments of an art........ From the point of view of form, the type of all the arts is the art of the musician. From the point of view of feeling the actor's craft is the type."......

যিনি প্রকৃত artist, তিনি আপনার অঙ্কিত চিত্রের মধ্য দিয়া সত্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাহা যদি তিনি না পারেন, তবে তিনি artistই নহেন। আমরা সকলেই জানি, artist সত্যের পূজারী, তথ্যের দিকে তাঁহার বেশী লক্ষ্য থাকে না।

আমাদের কবি ভারত ছিলেন এক জন অভিনব artist। তিনি সুন্দরের উপাখ্যানের মধ্য দিয়া সত্য ফুটাইয়া তুলিতে ও যথার্থ art ফুটাইতে পারিয়াছেন।

পারে, কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্রে কিংবা তন্ত্রে আমার একেবারেই অধিকার নাই। সুতরাং তান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। তবে অশ্লীলতার আলোচনা করিতে গিয়া অনেক তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি উহাকে তন্ত্রের রূপান্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আমি সাধারণের অবগতির জন্য সেই ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"কুলচূড়ামণিতে কথিত আছে যে, রজকী, ব্রাহ্মণী, গোপালক ও মালাকার-কন্যা প্রভৃতি নয়টি কুলনায়িকা। বীর সাধক সুন্দর মহা-বিদ্যালাভের জন্য মালিনীকে উত্তর-সাধিকা করিয়াছিলেন। মণি-মাণিক্যের দ্বারা উজ্জ্বল সুড়ঙ্গপথ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর প্রভৃতি ষট্‌চক্র শোভিত সুষুম্না নাড়ী। শক্তি সাধক সুন্দর স্বীয় শক্তি উদ্বোধিত করিয়া ক্রমান্বয়ে এক একটি চক্রভেদের সময় উজ্জ্বল দীপ্তি দর্শন করেন এবং মহাবিদ্যালাভের জন্য উত্তেজিত হইয়া ষট্‌চক্রের শেষ চক্র আজ্ঞা-চক্রে উপস্থিত হইলে, শিবশক্তির সংযোগ হয়। ইহাই বিদ্যার সহিত বিহার। ইহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা আছেন, তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু, তদূর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ী এবং তদূর্দ্ধে অধোমুখ সহস্রদলপদ্ম, তাহার পঞ্চাশৎ দলে অকারাদি ক্ষ-কার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, তন্মধ্যে পরম শিব অবস্থিতি করেন। যখন শক্তি মস্তকস্থিত সহস্রদল-পদ্মে উঠিয়া পরম-শিবের সহিত সঙ্গত হয়েন, তখনই বিপরীত বিহার।......ভারত বিপরীত বিহারারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"আজি দিন দ্বিপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বাদ্ধিয়াছে করী।
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রঙ্গ দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে।"

তন্ত্রসারে ভূতশুদ্ধি ও ষট্‌চক্র ভেদের যে প্রক্রিয়া আছে, তদনুসারে ইহার এই অর্থ হইতে পারে;— আদিত্য-দ্বার অর্থাৎ পিঙ্গলা দ্বার ভেদ হইলে সহস্রদলপদ্মে পরমশিবের উপর শক্তি সঙ্গতা হয়েন দৃষ্ট হয়। এই সঙ্গম-সুখ-লাভেচ্ছায় মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী হৃদয়স্থিত প্রদীপ-কর্ণিকা জীবাত্মার সহিত যুক্ত হইবার জন্য হৃদয়াকাশে আরোহণ করে এবং জীবাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া সুষুম্না-পথে অবতরণ করে। পরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র—এই ষট্-পদ্ম বা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরস্থিত অধোমুখ সহস্রদল-পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবে বা পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়।

যাঁহারা দুই এক পাতা সেক্সপীয়র, মিল্‌টন পড়িয়াই উচ্চ সাধনার ধার ধারিতে চান না, যাঁহারা বেদকে Shepherd song বলিতেও পশ্চাৎপদ হয়েন না (কারণ, যাহারা এই জ্ঞানসাগরের তীরে সামান্য একটি বালুকণার মত জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজেকে সবিশেষ জ্ঞানী মনে করেন, তাঁহারাই ঐরূপ বলিতে বা ভাবিতে পারেন), তাঁহারা ভারতের কবিতায় নিহিত এই উক্ত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহাদের নিকট ইহা অশ্লীল বলিয়া প্রতীত হইবে।

আর এক স্থান আমি উদ্ধৃত করিতে চাই। সুন্দরের মশানটা কি? সে বিষয়টা আমাদের জানা উচিত। তান্ত্রিক বলিতেছেন,—

"ভারতের সুন্দর মশানে নীত হইয়া পঞ্চাশৎ মাতৃকাক্ষরে কালীর স্তব করিতেছেন। সাধনা করিতে করিতে সাধকের ষট্‌চক্রস্থিত সমস্ত শক্তি যখন মস্তকস্থিত সহস্রারে আরোহণ করে, তখন সাধকের বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়। কেবল পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা কালীই তাঁহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়া পড়ে। এই সময় দেহস্থ শক্তি সকল যদি সহস্রার হইতে অবতরণ না করে, তবে যোগীর দেহধ্বংস হয়। সেই জন্য এই

ভারতের অশ্লীলতা লইয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শ্লীলতার আদর্শ যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভারত-চন্দ্রই বলিয়াছেন,—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।" কথাটা ঠিক নয় কি? ভারতের কবিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই লোক তাঁহার প্রতি অশ্লীলতার দোষ আরোপ করেন।

ভারতচন্দ্র যে স্থলে অশ্লীলতার অবতারণা করিয়াছেন, এমন কি, বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিপরীত বিহার প্রভৃতি বর্ণনাস্থলে ও ঐ সকল বর্ণনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি ভগবানের অভয় নাম স্মরণ করিয়াছেন। এই সঙ্গীতগুলি ঐ স্থানে কেন রচিত হইয়াছে, তাহা চিন্তনীয় ও বিচার্য্য। তাহার পর যাহা অধুনা অশ্লীল বলিয়া মনে হইতেছে —দেশ কালপাত্র ভেদে তাহা অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইত কি না? ইহা ভাবি-বার বিষয়। পূর্ব্বে পূজাপার্ব্বণে পাঁচালী খেউড় গান হইত। প্রাচীন কালে লিখিবার রীতিই অন্তরূপ ছিল। জগন্নাথদেবের মন্দিরে অশ্লীল মূর্ত্তি বিদ্যমান দেখা যায়। পুরীর নিকট মার্কণ্ডেয় দোলমঞ্চে অশ্লীলতা প্রকট আছে। যে সমাজে এই সকল দ্রব্যের অভাব ছিল না, ভারত সেই সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তাই তিনি বিদ্যা সুন্দরের ভাবা (...এর খাতিরে) উহারে বিশেষ মার্জ্জিত করেন নাই। ভারত যে সময় আবির্ভূত হন, তখনকার রচনায় দেববন্দনা প্রথম স্থান অধিকার করিত। বন্দনাদির পর বিষয়বিশেষের অবতারণা হইত।

সুতরাং শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়—তৎ-কালীন আদর্শ অন্যরূপ ছিল। ভারতচন্দ্রের যুগ—তান্ত্রিকতার যুগ। বৃটিশ আগমনের পূর্ব্বের সামাজিক নৈতিক প্রকৃতি ভারতচন্দ্রে যথাযথ প্রতিফলিত। সেই তান্ত্রিকতার যুগে সাধনার দ্বারা মহাবিদ্যালাভের পথ ঐ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, সামাজিক অবস্থা অনুসারে শ্লীলতা অশ্লীলতার কতকটা নির্দ্ধারণ হয়। Shakespeare, Milton এবং বড় বড় artistএর পুস্তকে কি অশ্লীলতা নাই? Don Juan বা Venus and Adonis বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা কম অশ্লীলতাপূর্ণ নহে, বরং বেশী হইলেও কম নহে—ইহা জোর গলায় বলা যাইতে পারে।

* * * *

ভারতচন্দ্র অনেক স্থলে বহু প্রাচীন কবি হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। সমালোচক বলেন—সকল কবিই "পুচ্ছগ্রাহী।" ভারতও এক জন ছিলেন। ভাবের ভাণ্ডার হইতে চুরি সকলেই করিয়া থাকেন; যাঁহারাই বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই অপরের ভাব গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়—Shakespeare ও কালিদাস,—তাঁহারাও ভাবের ভাণ্ডার হইতে প্রভূত ভাব আহরণ করিয়াছেন, অপরের কথা ছাড়িয়া দিলাম।

কিন্তু ভারত প্রাচীন কবির ভাব লইলেও, তিনি উপরি উক্ত মহা কবিদের ন্যায় তাঁহার সময়ে কবিতা-রচনায় এক নূতনত্বের ভাব ফুটা-ইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, এবং তাহাতেই তিনি অমর হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নূতন নূতন ছন্দের প্রথম সৃষ্টি তিনি করিয়াছেন। সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে "ভারতচন্দ্র" একটি অভিনব নূতন কাব্যগ্রন্থ তাহাতে নূতনত্ব খুব বেশীই দৃষ্ট হয়।

ভারতচন্দ্র পাঠ করিলে ভাষায় যে সম্যক্ অধিকারলাভ হয়, বিষয় বর্ত্তমান বঙ্গের প্রধান প্রধান কবি ও লেখকগণ সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—তিনি অন্নদামঙ্গল অতি যত্নের সহিত বার বার পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ও অনেকবার পড়িয়াছেন শুনি। স্বর্গীয় প্রতিভাবান্ সত্যেন্দ্র-নাথ ভারতের পদানুসরণ করিয়া—বাঙ্গালাভাষায় ছন্দের এক অপূর্ব্ব এক অভিনবত্ব দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে



মাত্রেরই পড়া উচিত। ইহার অধ্যয়নে ভাষার অধিকার লাভ করিবে, শব্দসম্পদের অধিকারী হইবে।"

* * * *

এক দিন কত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের শ্যামাকুঞ্জে বসিয়া ভারতচন্দ্র গান ধরিয়াছিলেন; আর আজও সেই সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসের ছন্দে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া বঙ্গবাসীর প্রাণে কেমন এক তন্দ্রার সঞ্চার করিতেছে। কোন্ দিন শুভ মুহূর্ত্তে বাঙ্গলামায়ের স্নিগ্ধ বনানীর কোমল অঞ্চলে বসিয়া পিকবরের কুহু কুহু গীতির সুরে সুর মিশাইয়া ভারত তান তুলিয়াছিলেন—আজ বঙ্গজননীর তার সে নিকুঞ্জ নাই, (কল্পনারাজ্যের) সে পিকবরও নাই; কিন্তু সেই স্বপ্নময়—আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। এখন কবিগণের কণ্ঠে সেই সুর যেন বাজিতেছে। বাণীবরপুত্র ভারত না থাকিলেও তাঁহার স্মৃতি বঙ্গের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও।

এক দিন ভারতের পাদস্পর্শপূত তাঁহার পুণ্য জন্মভূমি ও তাঁহার পদরেণুপূত নদীয়া বঙ্গের সাহিত্যসাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান তীর্থ হইয়াছিল। পরম পুণ্যাত্মা তপস্বী ভারত তপস্যার ফলে নিজে ত অমর হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরতা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের মর্ম্মমন্দিরকে 'মর্ম্মর স্বপ্ন' করণপ্রভায় মূর্ত্তি বিকশিত তাজমহলের মত রমণীয় করিয়াছেন। ভারত সাহিত্যে যে রস দিয়া গিয়াছেন, সেই রসের আস্বাদ আজও সর্ব্বত্র প্রশংসিত, সর্ব্বত্র আদৃত।

ভারতের তুলিকায় যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা স্বভাবসুন্দর হইয়াছে। অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের রঙ্গকমলবনে তুলিখানি স্থাপন করিয়া যে রসে অঙ্কিত, সে সাজ দিতে তুলনা জগতে আর কোথায় আছে? মা সারদা সেই রত্নপ্রদীপে ভারতে আবির্ভূতা হউন, জননীর বীণা এখন ভারতের সুরে বাজুক, মা আমার ভারতের জীবনে আবার অমর প্রসাদ বর্ষাইলেন; 'অন্নদামঙ্গল'ও সার্থক হউক।

* * * * *

হে ভারত, তুমি ধন্য কবি—হে বাণীবরপুত্র, হে চিরনবীন, কি বলিয়া আমরা তোমার জয়কীর্ত্তন করিব? কি অপূর্ব্ব প্রতিভা তোমার! তুমি নিজের কঠোর শক্ত সাধনশক্তিকে কি মধুর আদি রসাত্মক কাব্যে পরিণত করিয়াছ! তোমার গ্রন্থে বঙ্গবাসীকে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গলাভের পন্থা বলিয়া দিয়াছ। আর তুমি বঙ্গ প্রাঙ্গণে বিচিত্র রেখায় অমর আলিম্পন আঁকিয়া, তাহার উপর শ্রদ্ধার স্রক্-চন্দনে দীনা হীনা একবস্ত্রা বিবসনা বঙ্গভারতীকে নবরসে স্নান করাইয়া বিবিধ মনোজ্ঞ অলঙ্কার বিভূষণে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছ। হে বাণীকণ্ঠ, বঙ্গ কাননের প্রান্তে, এ যুগে তোমার আনন্দের হিন্দোল রাখিয়া গিয়াছ। বঙ্গভূমিকে নবরসে পূর্ণ করিয়া তোমার 'গানের পাথেয়' রাখিয়া গেলে। চিন্ময়-বন্ধনে গ্রন্থি দিয়া, অনাগত যুগের সঙ্গেও ছন্দে ছন্দে নানা স্বরে 'ছন্দের ডোর' বাঁধিয়া গেলে। হে সত্যের পূজারী! তুমি বঙ্গভারতীর কণ্ঠে জয়মালা রচনা করিয়া অমৃতলোকে চলিয়া গেলে,—আজ দেখিয়া যাও হে 'বঙ্গভারতীর ভর্গ' উপরে অপূর্ব্ব ভঙ্গ! আজ নবছন্দে, নূতন আনন্দের গানে তোমার সাজি পূর্ণ করিয়া এস, তোমার চিরবন্দিতা ভাষা-জননী আজ বিশ্বসাহিত্যে এক উচ্চ আসন পাইতে বসিয়াছে—আজ অর্চ্চনা করিবে এস।

হে মহান! তোমায় ভক্তিশ্রাদ্ধের মজুরী দিতে চাই না। যত দিন ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন হে ভারত, তুমি জীবন্ত মূর্ত্তিমান থাকিবে। বাঙ্গালার বিহঙ্গের কলগুঞ্জনে, পিককণ্ঠে ও শিখীর কেকায় তোমার অপরূপ সুর বাজিবে। তোমার আসন অটল, তোমার স্মৃতি চিরসমুজ্জ্বল। তোমার পুণ্যস্মৃতি সম্মানের চেষ্টায় তুমি গৌরবান্বিত হইবে না, কিম্বা তোমার পুণ্যকীর্ত্তির উপর অত্যাচার করিলে, তাহাতে তোমার মহত্ত্বের কিছুই হ্রাস হইবে না। তোমার প্রতিভা বুঝিতে না পারিয়া যদি আমরা অসম্মান করি,—তুমি 'না পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই বিভূষিত হইবে।' বিধাতা তোমায় এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহার আশীর্ব্বাদ দিয়া। 'সেই দেবদত্ত গৌরবের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলে।' কারণ, মহাপুরুষ যাঁহারা, 'বাহিরের অগৌরব তাঁহাদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলে; অসম্মানই তাঁহাদের পুরস্কার।' সকল দিক দিয়াই দেখিতে গেলে গৌরব আমাদেরই বাঙ্গালী জাতিরই গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

* * * * *

ভারত এক যুগের সহিত অন্য যুগের সন্ধিলনে সাধনা করিয়াছিলেন—তাঁহার কাব্যের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া। ভারতের আধুনিকতার গৌরব ছিল। কাব্যজগতে তাঁহার নবীনতাই আমাদের এই যুগের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়, কারণ তিনিই আমাদের দেশে কবিতাধারার এক মুক্ত, এক আনন্দ গতি দিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাচীন আবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া ভাবী যুগে যাত্রা করিবার পথ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, প্রত্যেক দেশের মহান্ কবি 'বর্ত্তমানের সঙ্গে বর্ত্তমানের অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করিয়া দেন।' তিনি প্রাচীন প্রণালীর আবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া নবপথ আবিষ্কার করেন এবং তাহাতেই তিনি কবিশক্তির অপূর্ব্ব মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা বড় কবি, তাঁহারা বিরাট স্কন্ধে উঠিয়া ক্ষুদ্র জন ছাড়াইয়া কত ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন—তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। আমরা ক্ষুদ্র, তাই তাঁহাদের মহত্ত্ব বুঝিতে পারি না। আমরা বড়র ত্রুটি ধরিতে প্রয়াসী হই। যাহারা ছোট, বড়র বড়ত্বকেই তাহারা সকলের চাইতে বড় অপরাধ বলিয়া গণ্য করে', যে দিকেই হউক, সাহিত্যে কিম্বা শিল্পে, কি বিজ্ঞানে, অথবা রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কার কার্য্যে। এই কারণেই 'গৌরব আঘাতই বড়র পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।'

আজ ভারতের জন্যই এই সাহিত্য জগতে বঙ্গভাষা এরূপ বিজয়যাত্রা করিতে পারিতেছে। অতীত ও ভবিষ্যতের মিলন-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ভারত অতীতের সম্পদ্ সঞ্চিত না রাখিয়া বর্ত্তমান কালের মধ্যে তাহার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করিতে উদ্যমশীল হইয়াছিলেন—তাই আজি তিনি চিরস্মরণীয়। যাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন করিয়া সকলের চলার পথ সরল করিয়া দেন—তাঁহারাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক।'

ভারত কাব্য-জগতের এই জ্যোতিষ্মান্ ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অতি প্রত্যূষেই জাগ্রত হইয়াছিলেন।

ধন্য হে ভারত! তোমার তপস্যা সফল হইয়াছে। তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি অমরতালাভ করিয়াছে। নবীনযাত্রের পথিক হইয়া তোমার অমর সাধনার সকাল বেলায় যে মধুচক্র রচিয়া গিয়াছ তাহা শুধু গৌড়জন নহে—'বিশ্বজন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

কবে কোন্ দিন সেই শুভক্ষণ আসিবে? বিজয়ের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিবে? কবে কোন্ মাহেন্দ্র লগ্নে বিশ্ববাসী 'অন্নদামঙ্গল' আনিয়া ভক্তির ধূপ সৌরভে তোমার পদতলে শ্রদ্ধার চন্দনাচর্চ্চিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইবে?

শ্রীবাণীকুমার ভট্টাচার্য্য।



প্রাচীন কবিদের বসন্ত

আজি লবঙ্গ-লতাবলী-পরিশীলন সুরভি মলয়-বায়
কুঞ্জকুটীরে মধুকরঝঙ্কৃত মিলন-গীতিকা কোকিলা গায়।
মদির কুসুমে অধীর মধুপে সুরভি আকুল বকুলতরু,
পথিক বধূর বিরহবিধুর ধু ধু করে শুধু হৃদয় মরু।
নব-কিসলয়দল কম্পমান, উজলে তমাল-বনের তমঃ,
স্ফুট কিংশুক তরুণের বুক চিরিতে স্মরের নখর সম।

মদনরাজের কনকদণ্ড জাগে ঐ নাগকেশর বনে
সারা-দেহে অলি অরুণ পাটলি স্মর তূণখানি স্মরায় মনে।
মাধবিকা-নবমালিকামুকুলপরিমলময়ী মাধবীরমা,
মুনিমনোহরা, যুবতীজনের আজি অকারণ বন্ধুসমা।
মাধবীলতার পরিরম্ভণে রসাল পুলকে শিহরি উঠে,
সেথা কোকিলের কুহুলোৎসবে মধুসম্ভোগে অলিরা জুটে।
অহির কবলে দহিয়া গরলে চন্দনবনে মলয়াচলে,
ছুটে মলয়জ হিমালয় পানে জুড়াতে সে জ্বালা তুষার জলে।

আজি বসন্তে চিত্রার যোগ,—যৌবন যেন নারীর বুকে,
কিসলয়ে ফুল, ফুলে মধুকর, মকরন্দ যেন মধুপ-মুখে।
মলয় মারুতে উড়ে পত পত মকরকেতুর রথের কেতু,
অশোক তরুতে চরণতাড়ন করে তরুণীরা দোহদ হেতু।
দাক্ষিণ্য কুসুমগন্ধে ভ্রমরেরা করে কলঙ্কিত,
লতার দোলায় ভ্রমরীরা দোলে—মধুপানে আঁখি বিঘূর্ণিত।
লবলীর বনে মধু বরষিয়া পিকেরা অকাল বরষা আনে,
হুংকার রবে গগন ভরিয়া আজি অনঙ্গ সায়ক হানে।
স্মর-শরে ক্ষত গলিত রুধিরে পিচ্ছিল বন-পন্থাগুলি,
পথের পঙ্ক করিতে নিবিড় মধুতরু ঢালে ফুলের ধূলি।

মলয় পবনে ঘূর্ণিত শাখা ভঙ্গপ্রলাপে জড়িত কথা,
কিসলয়ে আঁখি অরুণ, তরুর মধুমদে আজি প্রমত্ততা।
তরুণীগণের গণ্ডূষাসব বকুলাঞ্জলি বাসিত করে,
মধুপানাবেশ গণ্ডের ভাতি চম্পা ফুটায় সরম ভরে।
অশোক-অঙ্গে নূপুরশিঞ্জ ভৃঙ্গের মুখে জাগায় গীতি,
নব-মালিকার লতে নাক হরা ফুটে সে না মানি ঋতুর রীতি।
পথের দু'ধার ভরা চম্পক বকুল পাটল সিন্ধুবারে,
পান্থ আজিকে নিশীথ পান্থে পন্থা চিনায় অন্ধকারে।

বিরহিণী আজি পরাণ কাঁপিতে বুক ফেটে দেয় কুহুর বাণে,
চেয়ে রয় আজি চূতাঙ্কুরের স্মরাঙ্কুশের ফলার পানে।
বকুলবাসিত মলয়-বায়ুর অকূল প্রবাহে অঙ্গ সঁপে,
দাবানল ভেবে নগ্ন দেহটি ঢেলে দেয় রাকা-চন্দ্রাতপে।
মনোজ আজিকে বিজয়ী, বিরহী চরণ শরণ লইবে কার?

সুরভি সায়ক, চূতমঞ্জরী,—রসময় বাণ মধুক-সীধু
ধ্বনিময় শর কোকিলের স্বর, রূপময় বাণ-তূণীর, বিধু।
স্পর্শ দারুণ শর অকরুণ মলয় মারুত পৃষ্ঠে ধরে,
পঞ্চসায়কে মনসিজ আজি তরুণ বিরহি-জীবন হরে।

ধারাযন্ত্রের ঝঙ্ক রনাঙ্কে চঞ্চরীতালে নূপুর রণে,
বেণুবীণাতানে শুকপিক গানে ধরা ভরা আজি মধূৎসবে।
সীৎকার তুলে 'শৃঙ্গক' ফণা মণিমণ্ডিত নাগরী-করে,
আবিরে আঁধার পুরন্দর ভুবনপুরীর কান্তি ধরে।
স্বচ্ছ ধবল গৃহশিলাতল অচ্ছোদজল প্রতিম ভায়
অরুণ তরুণী চরণ পঙ্ক চারু পঙ্কজ ফুটায় তায়।
আগে সীধু নিয়ে মধুমান করে অবশ হৃদয় তরুণ-জদি
পরে মনসিজ জয়ী হয় আজি নিজ কুসুমশরে সংজ্ঞে বিঁধি।
অশোক-গুচ্ছে মুকুলিত চূতা, চূতমঞ্জরী রঞ্জিনী,
মধুককুঞ্জে দশাননিকতে মধু মধু আজি নিতম্বিনী।
সবে সাবধান, দক্ষিণ চোর আজিকে হরিছে ফুলের নিধি,
ভূর্জপত্র পত্রলিপিকা, কটির দুকূল, বিরহি হৃদি।

রসাল মুকুল সায়ক যাহার, স্মৃতিগান যার কোকিলকণ্ঠ,
অলিমালা যার চাপশিঞ্জিনী, মলয়জ যার দক্ষিণমুখ,
চন্দ্রমা যার ধবল ছত্র, শরাসন যার পলাশ-পাঁতি
মদনসারথি সেই ঋতুপতি জয় গৌরবে উঠেছে মাতি।
অভিনয় করে বনতরুগুলি কুসুম পরাগে অঙ্গ মাজি,'
নব কিসলয় অঙ্গুলি নাড়ি' মুকুল কুসুম ভূষণে সাজি,'
কোকিলের রবে রচিয়া বচন মলয় পবনে নৃত্য করে,
অলি ঝঙ্কারে সঙ্গীত গাহি আজি নিখিলের চিত্ত হরে।

কুসুম চয়নে উন্মত্ত করে পঞ্চকেশর নাগর-বধূ,
নয়ন সরোজে যোগায় লতিকা অনিমিষ আর পরাগ মধু।
পুষ্পাহরিণী রজোত্তয়ে নব-কলিকা তুলিয়া কুটায়ে লয়,
রোষে অলি তাই দংশিতে চায় কলিকাগুলিরে আঙুলি রয়।
পুষ্পচয়নে পুষ্পিতা হয় সীমন্তিনীর শ্রীকর-লতা
শাঁখার শোভায় লভে তরুশাখা যজ্ঞোপবীতে পবিত্রতা।

আজি নারীকর রসাঞ্চলে যে তরুর শাখা হয় না নতা,
শোক কুসুমিত তবু সে ত শ্রীন পৌরব তার কথার কথা।
পুষ্পিতলতা ভাবি অলি বসে নারীর উরোজ তটের প্রান্তে,
অঙ্গরাগের প্রসাধন রচে প্রকারান্তরে পাখার রঙ্গে।
মধুকরে ভরি' ছুটিয়া নাগরী নাগরে তাহার আঁকড়ি ধরে,
অঙ্গের রজ বক্ষপীড়নে দয়িত বক্ষ পিঙ্গ করে।
অলি উড়ে যায়—শুধু রজ নয়, রেখে যায় ধ্বনি কাঞ্চীদামে,

আজি বসন্তে দিনে ছায়া লাগি নিশীথে জুড়াতে তনুর জ্বালা,
গগনে তন্দ্রাতপ বাঞ্ছিত—অঙ্গনই আজি চন্দ্রশালা।
শৈলেয়-জালে ভরেছে শৈল, অলি চুম্বনে সিন্ধুবার,
শুক-চঞ্চুতে শোভে কিংশুক, অগ্নিশিখায় কর্ণিকার।
বালাশোক-বধূ-চরণে লাক্ষা, পরণে রক্ত-দুকূল ধরে,
অশোক-হৃদিরে সশোক করিয়া কাজল নয়নে সজল করে।
ফুলের স্তবকে লগ্ন ভ্রমর মগ্ন সে মকরন্দ পিতে,
লতাবধূ যেন গর্ভিণী হলো কৃষ্ণ চুচুক স্তনশ্রীতে।
অরুণ-কুসুম ঝলমলি ফুটে শাল্মলীদেহে, নয়ন ঝলে,
যেন অপর্ণা শাখায় শাখায় শিখায় শিখায় অনল জ্বলে,
দুশ্চরতপে কঙ্কালসারা যেন অপর্ণা গণ্ড'পরে,
হর-চুম্বন নব জীবনের শোণিতপুঞ্জ সৃজন করে।

কুসুম-পরাগে 'পরাগত' আজি নবীনপলাশে পলাশ-বন,
মুহু-লতায় মধুলতায় সুরভি সুলভ হরিছে মন।
মুছায়ে ললাটে শ্রমজল-কণা, দুলায়ে লুলিত অলকরাজি,
বহিছে সমীর তড়াগবাপীর সলিল-নীর পরশি আজি।
স্ফুট স্তবক নব কুরবক পরাগে ভূষিত রঞ্জিত,
চারুলোচনার আঁখিতারা সম মধুকরগণ বিলোলায়িত।
পুষ্প-কনক চারুচম্পক দিয়েছে অশোক-গুচ্ছে কিবা,
বিরহি-হৃদয় বিক্ষত লভেছে যেন শ্মশানে কপিশ বিভা।
স্মর-মুগ্ধুর চূর্ণের রূপে আম্রমুকুল পরাগ গুলি,
পথিকজনের পথ ধরি পড়ি তাতায় তাহার পথের ধূলি।

প্রিয়সখীসম কোকিলা আজিকে মানিনীর কাণে কহে কি কথা,
শুনি তা' বনিতা ত্যজি অভিমান অর্পে দয়িতে অঙ্গলতা।
গড়িয়া তূণীর নব বসন্ত চূত কিসলয় মুকুলদলে,
অলিপংক্তিরে বসালো তাহায় মনোজের নাম লেখার ছলে।
নব শশিকলাসম বঙ্কিম অরুণ পলাশ মুকুল যত,
বনস্থলীর উরসে জাগিল যেন ঋতুরাজনখ-ক্ষত।
রবিকর ঝলে কিসলয়ে, দুলে অলিরা তিলকে মধুর লোভে,
যেন তার ঠোঁটে রক্তিমা, চোখে কাজল, গণ্ড তিলকে শোভে।
পিয়ালের রজে ব্যাহত দৃষ্টি আয়ত নয়নে রুদ্ধ করি'
শুষ্কপত্রে মর্ম্মরি তুলি' ছুটে চলে মৃগ কানন ভরি'।
চূত-মঞ্জরী কষায়-কণ্ঠে কোকিল নায়ক কি গায় গান?
মনোজের বুঝি নিদেশ ঘোষিছে? শাসনে ভাঙায় মানিনী মান।

কাহার নিদেশে আজিকে নিমেষে সখী সখা সাথে মিলিছে এসে,
একই ফুলে বসি' মধুকর তুষি প্রিয়ারে মধুতে, পিইছে শেষে।
মৃগীগাত্রের কণ্ডুতি হরে শৃঙ্গে সাদরে কৃষ্ণসার,
আবেশ-আলসে মৃগাঙ্গনার আঁখি ঢুলে পড়ে পরশে তার।
কর্ণপবনে করিয়া বীজন, দন্তে হরিয়া কণ্ডু পীড়া,
শল্লকীদল মুখে তুলে করী করিণীর আজ ভাঙায় ব্রীড়া।

কমল-সুরভি গণ্ডুষ-বারি—সরোবরে নামি' পিয়ায় সুখে,
অর্দ্ধ-ভুক্ত মৃণাল-খণ্ড চখা তুলে দেয় চখীর মুখে।
আজিকার মধু-মিলনোৎসবে তরুলতারাও পড়েনি বাকী,
নত করি' শাখা লতিকা-বধূর ভুজবন্ধন লভেছে শাখী।

ষোড়শীরা আর মদনানুলেপ রচে না শুষ্ক বিম্বাধরে,
সুরভি তৈলে বাঁধেনাক বেণী, খোঁপায় এখন মালতী পরে।
চন্দনে এবে লভে আনন্দ কুঙ্কুম মুখে মাখে না আর,
তনু আবরণী ত্যজি তনুখানি পদতলে জড়ো নিত্রিতার।
লোলবিলোচনা গোল বধূদের দোল কৌতুকে আবির মাখি,
কর্ণাটীদের কর্ণালকের এলা-পরিমল লইয়া ঢাকি',
কাঞ্চী-নারীর কাঞ্চী দোলায়ে পাণ্ডা-নারীর গণ্ড চুমি',
দেশে দেশে চলে দখিণ মারুত তেয়াগি মলয়-ভূধর ভূমি।
স্মর-সায়কের চালক চতুর, বরনায়কের সেবক-মিতা,
কীচকবনের গায়ক সমীর মধুদতিকার পালক পিতা,
তাম্বুল-বনে করিয়া বিহার কঙ্কোলিকার বাড়ায়ে আয়ু,
তাম্রপর্ণী-সলিলে নাহিয়া চলেছে সুরভি মলয়-বায়ু।

ফুটিল চম্পা নেপালী-নারীর কুঙ্কুমমাখা মুখের মত,
অবন্তিকার দন্তের রুচি বহিছে মল্লীকলিকাব্রত।
রচেছে নারীর কর্ণভূষণ সজীব কনকে কর্ণিকার,
বহু দিন পরে রচে পয়োধরে শ্রমজল কণা মুক্তাহার।
গুরুনিতম্ব বহনের শ্রমে ফুটি স্বেদকণা ললাট'পরে,
সুরভি মলয়ে মলয়জ হয়ে নিতম্বিনীর শ্রান্তি হরে।
নবীনা নাগরী চূত-মঞ্জরী সঁপে অনঙ্গে পূজার ছলে,
সায়ক হয়ে তা ফিরে আসে মনে, মধু হয়ে তার মাধুরী জ্বলে।
চূতবনে পশি হয়ে বিতাড়িত কোকিলের রুহু-শাসন রবে,
চঞ্চরীকুল মঞ্জরী ত্যজি চম্পকদলে শরণ লভে।
বাজায়ে ভৃঙ্গে মৃগয়াশঙ্খ পথিক মৃগেরে ভুলায় স্মর,
দাবানল ভেবে শলভেরা সব কিংশুক বনে হয়েছে জড়ো।

শ্যামলবৃন্ত নিলীন ভৃঙ্গ—কিংশুকগুলি নয়ন হরে,
অলি অলি-বধূ দুই দিকে মধু এক সাথে যেন সেবন করে।
অশোকে যাহার অধর-শোণিমা, পুন্নাগে যার তিলক আঁকা,
কুরবকে যার পত্ররচনা চম্পার বিভা অঙ্গে মাখা,
মাধবী-লক্ষ্মী নানা ফুলে সেজে দাঁড়ায়ে, রূপসি, তোমার পাশে,
কি সাজে সাজিবে আজি বসন্তে? হেলা-ভরে সে যে বেলায় হাসে।
নিন্দে সে তব দশনে কুন্দে, অলি পিকরবে বাণীরে তব,
নব কুরবকে তব কর নখে নবপল্লবে পাণিরে তব।
তা' বলে কেঁদো না, সকল ঋতুতে আঁখি শোভে বটে অশ্রুলবে।
আজি তা দূষণ,—নহেক ভূষণ,—এনো না অশুভ মহোৎসবে।

শ্রীকালিদাস রায়।

গৌড়—পাণ্ডুয়া

সদুল্লাপুর রোড ধরিয়া কিয়দ্দূর পশ্চিমদিকে যাইয়া রাস্তার উত্তরদিকে অবস্থিত বিখ্যাত "বড় সাগরদীঘির" দক্ষিণপাড়ে উপস্থিত হইলাম। চারি পাড়ের উপরে নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া স্থানে স্থানে সরিষার চাষ ও কলার গাছ রোপণ করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থানে এখনও ব্যাঘ্র ও শূকরের আবাস নিবিড় জঙ্গল। দীঘির জলে অসংখ্য কুম্ভীর আছে, ইহাতে অগাধ জল ও প্রচুর মৎস্যও আছে। ইহার



সহর হইতে ফিরোজ শা মিনার

জল স্বচ্ছ। শুনিলাম যে, ইহা এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয়দাতা চাঁচলের রাজার জমীদারীভুক্ত। এই দীঘি মায় ইহার চারিদিকের পাড় ১ মাইল দীর্ঘ ও ½ মাইল প্রশস্ত। ইহার জলকর ১৬০০ × ৮০০ গজ। গৌড়ের অধিকাংশ জলাশয়ের ন্যায় ইহা হিন্দু রাজত্বকালে নির্ম্মিত। র‍্যাভেনশ লিখিয়াছেন যে, ৫২০ হিজিরায় (১১২৬ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক ইহার খননকার্য্য আরব্ধ হয়, কিন্তু অপর কোন কোন ব্যক্তির ইহার পূর্ব্বপাড়ে দুইটি শাণ-বাঁধান বৃহৎ ঘাট ছিল এবং ঘাট দুইটির সম্মুখে পশ্চিমপাড়ে অনুরূপ আর দুইটি ঘাট ছিল। এতদ্ব্যতীত উত্তর ও দক্ষিণপাড়ে এক একটি করিয়া ঘাট ছিল; ঘাটগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, ৬০ গজ করিয়া প্রশস্ত। কথিত আছে যে, এই স্থানে পূর্ব্বে গৌড় মহানগরীর ইষ্টকের পাঁজা ছিল। লাম্বোর্ণ-কৃত মালদহ ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে ইহাকে মনুষ্য কর্ত্তৃক খনিত বাঙ্গালার অন্যতম বৃহৎ জলাশয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই দীঘির দক্ষিণদিকের রাস্তা দিয়া পশ্চিমদিকে সদুল্লাপুরের প্রাচীন ভাগীরথীর ঘাটের উদ্দেশে চলিলাম। এই



হাতিপাড়া মসজেদ

রাস্তার কিয়দ্দূরে দক্ষিণদিকে বনাকীর্ণ উচ্চ প্রাকার শোভা পাইতেছে। আমরা এক্ষণে গৌড়ের বহু দূর উত্তরদিক দিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়াছি। সাগরদীঘি হইতে প্রায় ১ মাইলের উপর পশ্চিমদিকে সদুল্লাপুরের গঙ্গাস্নানের ঘাট আছে। বামে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার শোভা পাইতেছে। সদুল্লাপুর বাজারের পশ্চিম বা পশ্চাদ্দিকে প্রাচীন ভাগীরথীর ত্যক্ত খাতের মধ্যে অবতরণ করিলাম। এখানে ভাগীরথীর পূর্ব্বপাড়ে ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি শাণবাঁধান প্রাচীন ঘাটের শেষ চিহ্ন ইষ্টকের পৈঠাগুলির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া থাকিয়া পথিকের মনে শত শত

অদূরে দক্ষিণপার্শ্বে আর একটি ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত নব-সংস্কৃত ঘাট আছে। ভাগীরথীর পাড়ে জলের উপরে এই ঘাটের ২৫টি সিঁড়ি দেখা যাইতেছে। এই ঘাটের কিয়দ্দুর দক্ষিণদিকে ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পাড়ে শব-দাহের স্থান মহাশ্মশান আছে। বহু দূর হইতে শবদেহ আনিয়া এই শ্মশানে দাহ করা হয়। এখানে এক জন শ্মশানরক্ষক চণ্ডাল বা মুর্দ্দফরাস আছে। লোকমুখে শুনিলাম যে, অনেক হিন্দুধর্ম্মধ্বজ প্রতি শবের জন্ত উক্ত চণ্ডালের নিকট হইতে চারি আনা করিয়া মাশুল আদায় করিয়া থাকেন। ভাগীরথীর খাতে যে সঙ্কীর্ণ জল-স্রোত আছে, উহার উপর দিয়া একটি বাঁশের সাঁকো আছে। ভাগীরথীর জল ললাটে স্পর্শ করিয়া সাঁকোর উপর দিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে উপস্থিত হইলাম। পশ্চিম-পাড়ে উন্মুক্ত প্রান্তর ব্যতীত আর কিছুই নাই। তৎপরে পুনরায় সাঁকোর উপর দিয়া পূর্ব্বপাড়ে আসিয়া সদুল্লা-পুরের বাজারে প্রবেশ করিলাম। এখানে কয়েকখানি চালাঘরে মিষ্টান্ন ও চাউল, ডাইল প্রভৃতির দোকান আছে। এতদঞ্চলের লোক সদুল্লাপুরের এই প্রাচীন ঘাটকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করে। এখানে পৌষ-সংক্রান্তি, ভাদ্র-পূর্ণিমা ও ভাদ্র-সংক্রান্তি তিথিতে এবং দশহরা গঙ্গা-স্নান উপলক্ষে মেলা হয় ও নানা দূরদেশ হইতে বহু লোক-সমাগম হয়। ঘাটের উপরে বাজারের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে এবং ইহার সামান্ত দূরে পূর্ব্বদিকে একটি একচূড়াবিশিষ্ট মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছেন। র‍্যাভেনশর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দুগণ এই স্থান ব্যতীত গৌড়ের অন্ত কোন স্থানে হিন্দু-ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন ক্রিয়াকলাপ করিবার অধিকার পাইতেন না। এতদঞ্চলের কোন কোন লোকের বিশ্বাস যে, আজিও কদাচিৎ কখনও দুই এক জন পথিক সদুল্লাপুরের নিকট দিয়া যাইবার সময় গভীর রজনীতে কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনির কোলাহল শুনিতে পাইয়া থাকেন এবং উহা ভৌতিক ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। চাঁচল-রাজার কর্ম্মচারিগণ বলিয়া থাকেন যে, সদুল্লাপুর এক্ষণে চাঁচলের রাজার জমী-দারীভুক্ত। কিন্তু সদুল্লাপুরের ঘাট ফুলবাড়ীর মোহান্ত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ গিরির নিকর।

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর হইতে একটি বনাকীর্ণ উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার পূর্ব্বদিকে মহানন্দা নদীর দিকে গিয়াছে, ইহাকে "কাঁচা-গড়" কহে। ইহা গৌড় মহানগরীর বহির্দ্দেশের অন্যতম উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার। ইহার উপরে বনের মধ্যে স্থানে স্থানে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান পথের ও নালার ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার শিখরদেশ এরূপ প্রশস্ত যে, ইহার উপর দিয়া কয়েক জন ঘোড়সোয়ারীর ঘোড়া ছুটাইয়া পাশাপাশি যাইতে পারে। এই প্রাকারের দক্ষিণদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আর একটি বনাকীর্ণ উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার আছে, ইহাকেও "কাঁচা-গড়" কহে। এই প্রাকার গোমাস্টি কুঠীর দক্ষিণদিকে অদূরে এবং প্রাচীন ফুলবাড়ী দুর্গের উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে "লোহাগড়া" নামক একটি স্থান আছে, উহা পূর্ব্বকালে গৌড়ের একটি পোতাশ্রয় বন্দর ছিল। লোহাগড়া পরিখার দক্ষিণ পারে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। এই জলাশয় পূর্ব্বে গঙ্গার খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই জলাশয়ের ধার হইতে পাকা পোস্তা গাঁথা ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পোস্তার মধ্যে সুড়ঙ্গের ভিতর পূর্ব্বকালে "পাতালচণ্ডী" ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বর্ত্তমানে এখানে কোন মূর্ত্তি নাই, সুড়ঙ্গের চিহ্নমাত্র আছে। এই স্থান হইতে এক মাইল পূর্ব্বদিকে মহারাজপুর গ্রাম অবস্থিত।

সদুল্লাপুরের বাজার হইতে একটি অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে যাইলে পূর্ব্বোক্ত সাগর-দীঘির উত্তরপশ্চিম কোণে "জানজান মিঞার (যাহাকে সাধারণ লোক ঝনঝনিয়া মসজেদ কহিয়া থাকে) মসজেদ" আছে। মসজেদের ছাদে নানা প্রকারের লতা ও অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। একটি চতুষ্কোণ উচ্চ ভূমি খণ্ডের উপরে এই মসজেদটি অবস্থিত। মসজেদটি ইষ্টক-নির্ম্মিত। পূর্ব্বে ইহার উঠান শাণ-বাঁধান ছিল ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। ইহার সম্মুখভাগ পূর্ব্বদিকে। ইহার পূর্ব্বদিকের দেওয়া-লের বহির্গাত্রে ইষ্টকে নানা প্রকার কারুকার্য্য কোদিত আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করিয়া খিলান-করা দ্বার আছে। গৃহাভ্যন্তরে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ থাকায় উহা



জানজান মিঞার মসজেদ

তিনটি করিয়া মোট ছয়টি গুম্বজ মসজেদের উপরে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ছাদের উপরে চারি কোণে চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মিনার আছে।* গৃহাভ্যন্তরে উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালের ছুই স্থানে সুন্দর কারুকার্য্য ক্ষোদিত এবং পশ্চিমের দেওয়ালের মধ্যে তিনটি কুলুঙ্গী বা মিম্বর দৃষ্ট হয়। মধ্যস্থলের মিম্বরটির ছুই পাশে ছুইটি সুশ্রী কারুকার্য্য-খচিত কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি-পাথরের ক্ষুদ্র ও সরু থাম আছে। মসজেদটির অভ্যন্তরের মাপ—উত্তর দক্ষিণে ৩০ × পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১২ হাত। ইহার ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়াল প্রায় ৫ হাত স্থূল। পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলের দ্বারের উর্দ্ধভাগে একটি কষ্টি-পাথরের স্মৃতিফলকে লিখিত আছে যে, "যে ভগবানের জন্য একটি মসজেদ নির্ম্মাণ করে, সে স্বর্গে তদনুরূপ একটি গৃহে বাস করিতে পায়।" এই মসজেদটি সুলতান গিয়াসউদ্দীন ওয়াদ্দীন আবুল মোজফ্ফর শাহের রাজত্বকালে ৯৪১ হিজিরায় (১৫৩৪।৩৫ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। কথিত আছে যে, জানজান মিয়ান নামক জনৈক রমণীর অর্থে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

* এই মিনার কয়টির গঠন কদমরসুলের ক্ষুদ্র মিনারগুলির ন্যায়।

এই মসজেদের সন্নিকটে ও ইহার পূর্ব্বদিকে "বড় সাগরদীঘির" উত্তরপশ্চিমভাগে কোণে "মুখদুম আখি সিরাজুদ্দীন" নামক জনৈক ফকিরের কবর আছে। এই স্থান বনাকীর্ণ। র‍্যাভেনশ এই সমাধির ছুইটি পিলান-করা দ্বার দৃষ্টে উহা সুশ্রী, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার উত্তরদিকের দ্বারের উপরে স্মৃতিফলক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, উক্ত দ্বার আলাউদ্দীন ওয়াদ্দীন আবুল মোজাফফর হুসেন শাহ ৯১৬ হিজিরায় (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন।

বড় সাগরদীঘির উত্তর পাড়ে একটি অশ্বথবৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে একটি প্রস্তর প্রবিষ্ট আছে। উহা ৭।৮ হাত দীর্ঘ ও প্রায় ২ হাত প্রশস্ত। উক্ত প্রস্তরটি চতুষ্কোণ ও দেখিতে কতকটা প্রস্তরের কড়ির ন্যায়। উক্ত প্রস্তরের এক দিকে সূর্য্য ও অপর দিকে চন্দ্র খোদিত আছে। লোক ইহাকে "চন্দ্রসূর্য্যের পাথর" কহে এবং এই স্থানকে হরির ধাম কহে।

এই স্থানের কিয়দ্দূর উত্তরে "কমলবাড়ী" নামক একটি স্থান আছে। তথায় "গৌড়েশ্বরীর মন্দির" দেখা যায়। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। কমলবাড়ীর উত্তরদিকে পূর্ব্বপশ্চিমে



পুরাতন মালদহ—প্রাচীন ভগ্ন দরওয়াজা

দীর্ঘ উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার আছে। উক্ত প্রাকার ভাগীরথীর খাতের পূর্ব্ব-তীরের যে স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহাকে "দ্বারবাসিনী" কহে। পূর্ব্বোক্ত হরির ধামের পশ্চিমে এক মাইল দূরে চণ্ডীপুরের পারে দ্বারবাসিনী দেবী আছেন। নাম হইতে বুঝা যায় যে, এই স্থানে গড়ের একটি দ্বার ছিল। এই স্থানে বনাকীর্ণ মৃন্ময় প্রাকারের উপর অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীর উপরে কয়েকটি শিলাখণ্ড আছে। তন্মধ্যে একটি শিলা দেখিতে কতকটা কোন মূর্ত্তির মুণ্ডের ন্যায় এবং উহাই দ্বারবাসিনী দুর্গা বলিয়া খ্যাত। এখানে বৈশাখ, মাঘ ও কার্ত্তিকমাসে সমারোহের সহিত পূজা হয়। বৈশাখমাসে শনি-মঙ্গলবারে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে এই স্থানে দুর্গার পূজা দিয়া থাকে, এইরূপ শুনিলাম।

তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করিয়া বেলা ১২॥০টার সময় আমরা সদুল্লাপুর হইতে মোটর-গাড়ী করিয়া ফিরিয়া চলিলাম। আমরা সুলতান গিয়াসউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত উচ্চ বাঁধের উপর দিয়া ক্রমে ইংলিশবাজারে ফিরিলাম।

পূর্ব্বোক্ত রামনগর কাছারী-বাটীর প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে "জহরাবাসিনী" দেবীর স্থান আছে। তথায় একটি দক্ষিণদ্বারী কোঠাঘরের মধ্যে একটি মৃন্ময় স্ত্রীমুণ্ড দেখা যায়। দেবীর গৃহটি মহানন্দা নদীর পশ্চিমপাড়ে মৃন্ময় প্রাকারের উপরে দেখা যায়। এই প্রাকার গৌড়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে দুর্গার পূজা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই স্থানে পূজা দেয়; বিশেষতঃ বৈশাখমাসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এই স্থানে মেলা হয় ও দেবীর বিশেষ পূজা হয়। শুনা যায় যে, পূর্ব্বকালে মুসলমানগণ এই স্থানে বহুবিধ অত্যাচার করিত এবং হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তিসকল ভাঙ্গিয়া ফেলিত। এক্ষণে সে সকল উপদ্রব আর নাই, কিন্তু প্রাচীন দেবমূর্ত্তিও আর নাই।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Report on Nadia Rivers" (Major F. C. Hirst কৃত) নামক গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে গঙ্গা গৌড়ের নিকট হইতে সরিয়া যায়। উহার প্রাচীন ত্যক্ত খাত আজিও ভাগীরথী নামে অভিহিত এবং যে স্থান হইতে গঙ্গার নাম পদ্মা হইয়াছে, উহা তথা হইতে বাহির হইয়াছে। উহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পদ্মার দক্ষিণদিকে বর্ত্তমান ভাগীরথী আছে এবং উহার জলরাশি হুগলী নদী দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভাগীরথীর এই দুইটি প্রাচীন ও নূতন খাতই পূর্ব্বে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল। ভূমিকম্পে ও অন্যান্য কারণে ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের তলদেশ উচ্চ হইয়া যাওয়ায় ক্রমে চড়া পড়িয়া গিয়াছে।

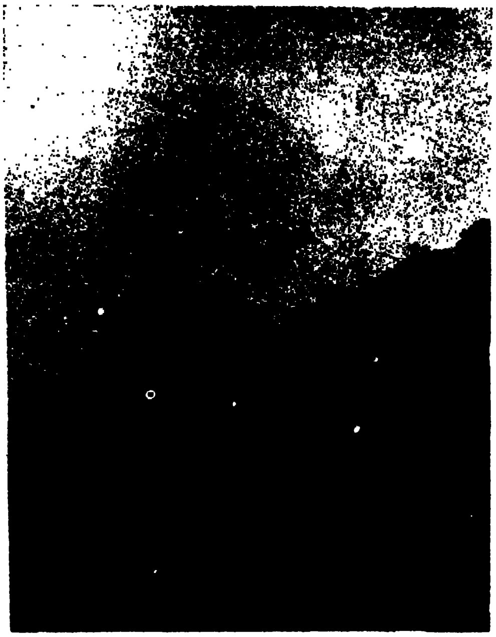
গৌড়ের কতকাংশ দেখা বাকী রাখিয়া ২৭শে ডিসেম্বর প্রভাতে সাড়ে ৮টার সময় রামনগরের কাছারী-বাটীর দ্বারে মোটর-গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা উহাতে আরোহণ করিয়া পরিখা ও প্রাকার-বেষ্টিত সেন রাজাদিগের প্রাসাদের স্থান "বল্লালবাড়ী" ও "রমাভিটা" বা "রমাবতী" দেখিতে চলিলাম। ইংলিশবাজারের উত্তরদিকের প্রান্তভাগে অবস্থিত মনস্কামনা রোড দিয়া পশ্চিমদিকে যাইতে রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল আম্র-বাগিচা দেখা যায়। মনস্কামনা রোডের উত্তর গাত্র হইতে গয়েসপুর রোড বাহির হইয়া উত্তরদিকে "গয়েসপুরে" গিয়াছে। গয়েসপুর এই স্থানের সামান্য দূরে অবস্থিত। চৈতন্যদেব গৌড়ে আসিয়া এই স্থানে



কোতোয়ালী দরওয়াজায় যাইবার পথে প্রাচীন সাঁকো

গয়েসপুর গ্রামের আম্র-বাগিচায় নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র সেই কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনস্কামনা রোডের যে স্থান হইতে গয়েসপুর রোড বাহির হইয়াছে, সে স্থান হইতে আর সামান্য দূর পশ্চিমদিকে যাইলে "মনস্কামনা শিবের" একটি উচ্চ মন্দির ও উহার পশ্চিমদিকে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের অভ্যন্তরে একটি গুহা রচিত রহিয়াছে দেখা যায়। এই গৃহের বহির্দেশে পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে পাদানিরূপে ব্যবহার করিবার জন্য দুইটি টালি বাহির করা



বড় দরগার সংলগ্ন একটি বাঙ্গালা ঘরের আকৃতিবিশিষ্ট সোনামসজিদ দরওয়াজা প্রবেশদ্বার

আছে ও তাহার কিঞ্চিৎ উপরে একটি ডিম্বাকৃতি বড় জানালা বা ঘুলঘুলির ন্যায় আছে। এই জানালা দিয়া গৃহাভ্যন্তরে উপস্থিত হওয়া যায়। গৃহাভ্যন্তরে দেওয়ালের এক স্থানে একটি ঘুলঘুলির ন্যায় দ্বার আছে, উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নীচে নামিবার সিঁড়ি পাওয়া যায়। এই সিঁড়ি নীচে যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি নির্জ্জন অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বা গুহা আছে। এই গুহার মধ্যে পরমহংস বিশ্বম্ভর গিরি সাধনা করিতেন। ইঁহার চেষ্টায় ও সাধারণের চাঁদায় মালদহ রেল-ষ্টেশনের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র একতল ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় বিদেশী পর্য্যটক ও পথিকগণ থাকিতে পান।

মনস্কামনার মন্দির ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে যাইতে হয়; তৎপরে রাজমহল রোড ধরিয়া পশ্চিমদিকে যাইলে দেখা যায় যে, উচ্চ বাঁধের উপর দিয়া রাস্তা হইয়াছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে নিম্নভূমি, পরিখা ও দূরে মৃন্ময় প্রাকার আছে। এই অঞ্চলে "বাগবাড়ী" নামক স্থানের যেখানে বর্ত্তমানে ঘোড়া ও গরু প্রভৃতির জন্য পৌণ্ড



বড় সোনা মসজেদের বহির্ভাগের একাংশ

বা খোঁয়াড় আছে, উহার উত্তর-পূর্ব্বদিকে বক্র রাজমহল রোড। এই স্থানে রাজমহল রোডের উত্তর-পূর্ব্বদিকে "বল্লালবাড়ী" বা "বল্লালগড়" নামক একটি বিস্তৃত স্থান আছে; র‍্যাভেনশ তাঁহার মানচিত্রে এই স্থানের ভগ্ন প্রাসাদের ও উহার প্রধান দ্বারের অবস্থানস্থান অঙ্কিত করিয়াছেন। বল্লালবাড়ীতে কয়েকটি উচ্চ ধ্বংসস্তূপ, জলপূর্ণ পরিখা ও মৃন্ময় প্রাকার আছে। বল্লালবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ভেদ করিয়া রাজমহল রোড বাহির হইয়া

গিয়াছে। এই স্থানের একটি স্তূপ খনন করিয়া মুসলমান-দিগের ইষ্টক-নির্ম্মিত ২১৩টি কবর বাহির করা হইয়াছে। কবরগুলির সন্নিকটে ২।৩ ঘর নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের বাস আছে। বল্লালবাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে পরিখা ছিল, তাহার অনেক অংশ আজিও বর্ত্তমান আছে এবং উহাতে যথেষ্ট জল আছে বলিয়া শুনা যায়। এই স্থানে রাজমহল রোডের দক্ষিণদিকে সামান্য দূরে একটি উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার আছে। শুনা যায় যে, মুসলমানগণ গৌড় অধিকার করিবার পূর্ব্বে এই বল্লালবাড়ীতে সেন রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ ছিল।

এই স্থান হইতে একটি হাঁটা পথ দিয়া প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যাইলে "রমাভিটা" নামক একটি নিম্ন-ভূমি ও মাঠে উপস্থিত হওয়া যায়। এই মাঠের স্থানে স্থানে সামান্য ধ্বংসস্তূপ ও ইষ্টকাদি আছে। স্থানীয় কোন কোন লোকের মুখে শুনিলাম যে, "রমাভিটার" শুদ্ধ নাম "রমাবতী।" কথিত আছে যে, সেন রাজাদিগের সময় বন্যার প্লাবন হইতে রাজধানী রক্ষার্থে তাঁহারা যে উচ্চ মৃন্ময় বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহা পরবর্ত্তী কালে সুলতান গিয়াস উদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাঁধগুলির সামিল হইয়া গিয়াস উদ্দীনের বাঁধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। বল্লাল-বাড়ীর অদূরে গিয়াস উদ্দীন নামক বাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী "সোমদহ" বা "সামদা বিল" ও এতদঞ্চলের নিম্নভূমি ও জলাগুলি পূর্ব্বকালে গঙ্গার খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে যখন সদুল্লাপুরের পার্শ্বদেশে ভাগীরথী প্রবলা ছিল, তখন উহা এই স্থান দিয়া অর্থাৎ বল্লালবাড়ীর সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল বলিয়া বিবেচিত হয়।

কানিংহামের মতে সেন রাজাদিগের প্রাচীন গৌড় রাজধানী গৌড়ান্তর্গত বর্ত্তমান "ফুলবাড়ী" অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং ফুলবাড়ী ও উহার উত্তর-দক্ষিণে এই রাজধানী প্রায় ৪ বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের দ্বারা খনিত উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত "ছোট সাগর-দীঘি", "বড় সাগরদীঘি" ও "কাজলদীঘি" প্রভৃতি অসংখ্য দীঘি ও পুষ্করগুলির, "দ্বারবাসিনী" ও "জহরাবাসিনী" প্রভৃতি দেবস্থানগুলির, প্রাচীন দুর্গ "ফুলবাড়ীর" এবং রাজপ্রাসাদ

হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ৪ বর্গমাইলের অধিক স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, ইংলিশ-বাজারের নিকটস্থ নিমাসরাইয়ের নিকটে যেখানে কালিন্দী নদী মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে, ঐ স্থানের নিকটে কালি-ন্দীর দক্ষিণে "পিছলী গঙ্গারামপুরের" যে কাঠাম আছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে পাল-রাজাদিগের রাজধানী ছিল, ইহা সেন-রাজাদিগের রাজত্বের পূর্ব্বের কথা। গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় ক্রমে রাজধানী উহার সহিত দক্ষিণদিকে সরিয়া গিয়াছিল ও পরবর্ত্তী কালে সেন-রাজাদিগের সময় "ফুলবাড়ী", "রমাবতী" ও "বল্লালবাড়ী" প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া রাজধানী, রাজদুর্গ ও রাজপ্রাসাদাদি অবস্থিত ছিল।

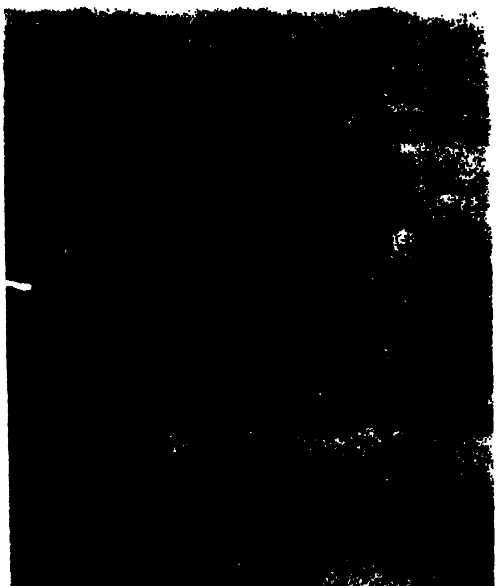
হিন্দু-রাজাদিগের সময়ের কীর্ত্তি-চিহ্ন "ফুলবাড়ী দুর্গ", "পাতালচণ্ডী", "সদুল্লাপুরের ভাগীরথীর প্রাচীন ঘাট", "বড় সাগরদীঘি", "দ্বারবাসিনী", "বল্লালবাড়ী" ও "জহরাবাসিনী" প্রভৃতির প্রতি কাহারও কোনও যত্ন না থাকায়, এগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। "দ্বারবাসিনী", "জহরাবাসিনী", "গৌড়েশ্বরী" ও "পাতালচণ্ডী" প্রভৃতি গৌড়ের হিন্দু-দেবী গুলির নাম হইতে বুঝা যায় যে, এক কালে গৌড়ে শাক্তদিগের প্রাধান্য ছিল। বর্ত্তমানকালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মুসলমান রাজত্বকালের মসজেদাদি রক্ষায় ব্যস্ত। মুসলমানগণ অনুগ্রহ করিয়া হিন্দু কীর্ত্তি সকলই ধ্বংস



একলাখী মসজেদ

বিশাল কীর্ত্তিগুলি ধ্বংস করা অসম্ভব, বলিয়াই ধ্বংস করে নাই। আজিও হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তির যে স্থানগুলির নামমাত্র অবশিষ্ট আছে, সেগুলি রক্ষাকল্পে কাহারও বিশেষ কোন চেষ্টা নাই। যশোহরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিগুলি ও মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তিগুলি দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, ঐ দুই স্থানের উক্ত হিন্দু বীরদ্বয়ের কীর্ত্তিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, লোক ইষ্টক ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু শিক্ষাভিমানী, সুসভ্য, দুর্ব্বল ও শিথিলপ্রতিজ্ঞ হিন্দু সেগুলিকে নষ্ট হইতে দেখিয়াও তাহার রক্ষার কোন চেষ্টা করিতেছে না।

গৌড়ের হিন্দু-তীর্থগুলির মধ্যে সদুল্লাপুরের একটি ঘাট সংস্কৃত হইয়াছে ও রামকেলিতে রূপসনাতনের কীর্ত্তিগুলি রক্ষার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, কিন্তু হিন্দুর অন্য কীর্ত্তিগুলি রক্ষার কোন চেষ্টা নাই।



আদিনা মসজেদের পূর্ব্বদিকে প্রস্তর নির্ম্মিত মকর মুখ

গৌড়ে বর্ত্তমানে যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ইমারত আছে, তাহা মুসলমান রাজাদিগের আমলের। এগুলির অধিকাংশ ইংলিশবাজারের প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের পূর্ব্বপারে প্রায় ১২।১৩ মাইল দীর্ঘ ভূভাগের স্থানে স্থানে অবস্থিত আছে। প্রাচীন ভাগীরথীর অন্য নাম "ছোট ভাগীরথী।" ইহা রাজমহলের প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পার্শ্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পরে পাগলা নদীতে পড়িয়াছে। পাল-রাজগণ গৌড় মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন। বিহারের কতকাংশ ও বঙ্গদেশের অধিকাংশ লইয়া পাল-রাজাদিগের যে রাজ্য গঠিত হইয়াছিল, গৌড় তাহার রাজধানী ছিল।

পাল-রাজাগণ তাহার কয়েক মাইল উত্তরে এবং কালিন্দী নদীর দক্ষিণদিকে পূর্ব্বোক্ত পিছলী গঙ্গারামপুরের জাঙ্গালের স্থানে তাঁহাদিগের গৌড় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ের বৌদ্ধ কীর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া মুসলমান-রাজগণ অন্য কার্য্যে লাগাইয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন মসজেদাদির অঙ্গে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

পালরাজাদিগের প্রায় ৩ শত বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে সেনরাজবংশের প্রথম ব্রহ্মক্ষত্রিয় সামন্ত সেন অনুমান খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার পৌত্র বিখ্যাত বল্লালসেন ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, ইহা জানা যায়। আবুল ফজল "আইনি আকবরীতে" লিখিয়াছেন যে, বল্লালসেনই গৌড়ের দুর্গ (সম্ভবতঃ "ফুলবাড়ীর" দুর্গ) নির্ম্মাণ করেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, সদুল্লাপুরের নিকটস্থ বৃহৎ মৃন্ময় প্রাকার ও বিখ্যাত "সাগরদীঘি" বল্লালসেনের অথবা তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের কীর্ত্তি। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সময় গৌড়ের উত্তরদিকের সহরতলীর "লক্ষ্মণাবতী" নামকরণ হইয়াছিল। ইংলিশবাজারের নিকটস্থ "রাণবাড়ীর" "বল্লালবাড়ীতে" বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। বল্লালসেন নদীয়াতে একটি রাজপ্রাসাদ ও দীর্ঘিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, সেনরাজাদিগের আর একটি রাজধানী ঢাকা জিলার রামপালে ছিল। সেন-রাজগণ যখন যেখানে থাকিতেন, তখন সেইখানে রাজপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী করিয়া বসিতেন। কিন্তু তাঁহা

আমলের গৌড় আছে. যেখানেই যে রাজপ্রাসাদ বা রাজধানী করিয়া থাকু

তাহাদিগের কোনটিই গৌড়ের সমকক্ষ ছিল না বলিয়া মনে হয়।

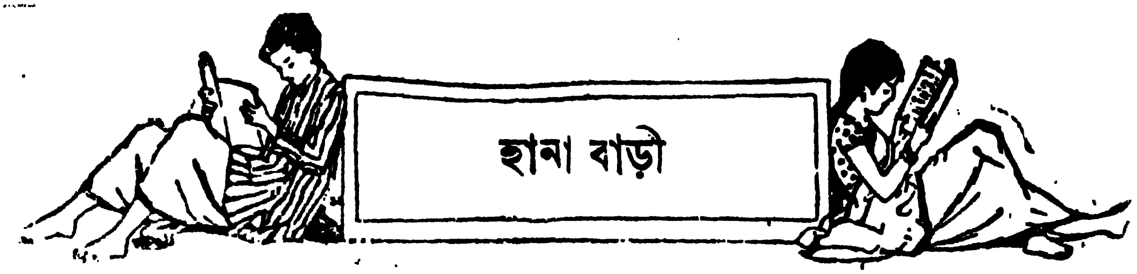
সে যাহা হউক, লক্ষ্মণসেন ৫৯৬ হিজিরায় ৮১ লক্ষ্মণাব্দে ১২০০ খৃষ্টাব্দে (র‍্যাভেনশর মতে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ও মালদহের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের মতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) নদীয়ায় মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও তথা হইতে বিতাড়িত হয়েন। তৎপরে যবন বিজেতাদিগের দ্বারা নবদ্বীপ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু তখনও উহা বিজিত হয় নাই। মিনহাজের "তাবক-ই-নাসিরী" নামক গ্রন্থে বক্তিয়ার খিলিজীর লুণ্ঠনের বর্ণনা আছে। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বক্তিয়ার "লক্ষ্মণাবতী" বা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপরে লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ বক্তিয়ার কর্ত্তৃক গৌড়জয়ের ৮ বৎসর পরেও দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বক্তিয়ার কর্ত্তৃক গৌড় মুসলমানদিগের পদানত হইবার পর হইতে তথাকার হিন্দু-কীর্ত্তিগুলি মুসলমানগণ অন্যান্য স্থানের প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তিগুলির ন্যায় একে একে সকলই ধ্বংস করিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে শেরশাহ গৌড় জয় করিয়া উহার নাম "জন্নতাবাদ" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ইহা প্রধানতঃ "লক্ষ্মণাবতী" নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। মোগলদিগের দ্বারা গৌড়-বিজয়ের পূর্ব্বে পাঠানদিগের রাজত্বকালেই গৌড়ের সমৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে গৌড়ে যে প্রাচীন মিনার, দরওয়াজা ও মসজেদাদি আছে, তাহার অধিকাংশ পাঠানদিগের আমলে নির্ম্মিত। তৎকালে গৌড় বলিলে দাখিল দরওয়াজা, কদম-রসুল ও বাইশগজী প্রাচীর-বেষ্টিত রাজ-প্রাসাদাদি দ্বারা শোভিত পূর্ব্বোক্ত গৌড় দুর্গ ও দুর্গের বহির্দ্দেশস্থ, কিন্তু প্রায় উহার অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট, মৃন্ময় প্রাকার-বেষ্টিত বিস্তৃত নগর বুঝাইত। রাজপ্রাসাদাদি-শোভিত উক্ত গৌড় দুর্গ এবং প্রাকার ও ভাগীরথী-বেষ্টিত গৌড় নগর দশ মাইল দীর্ঘ, ও দেড় মাইল প্রশস্ত ছিল। এই মৃন্ময় প্রাকারগুলি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ ও উহাদের পাদদেশ ১৮০ হইতে ২০০ ফুট প্রশস্ত। প্রাকারগুলির গাত্র ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে প্রাকারগুলির উপরে হর্ম্ম্য-শ্রেণী শোভা পাইত। গৌড়ের পূর্ব্বদিক দুইটি মৃন্ময় প্রাকার ও ১ শত ৫০ গজ প্রশস্ত একটি পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল ও ইহার মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি প্রধান পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; উক্ত পথ আজিও বর্ত্তমান আছে। নগরের পশ্চিমদিকে উহার পাদমূল ধৌত করিয়া ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। নগরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের মৃন্ময় প্রাকারের মধ্যস্থলে যাতায়াতের জন্য যে পথ বা দ্বার ছিল, তাহার চিহ্ন দক্ষিণদিকের কোতোয়ালী দরওয়াজার ভগ্নাবশেষ আজিও দণ্ডায়মান আছে।

মৃন্ময় প্রাকারের বাহিরেও গৌড় মহানগরীর বিস্তৃতি ২০ মাইল দীর্ঘ ও [illegible] মাইল প্রশস্ত ছিল। নগরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে আরও কয়েকটি উচ্চ মৃন্ময় প্রাকার বা বাঁধ বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই বাঁধগুলির কোনটি নগরে প্রবেশ করিবার প্রধান রাজপথরূপে, আবার কোনটি বর্ষার প্লাবন নিবারণার্থ বাঁধরূপে ব্যবহৃত হইত। এই বাঁধগুলির কোন কোনটি হিন্দু রাজাদিগের দ্বারা ও অপরগুলি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকালে মুসলমানদের দ্বারা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও গৌড়ের প্রাধান্য বজায় ছিল। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফারিয়া-ই-সুজা (Frria-y-soyja) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে গৌড়ের জনসংখ্যা ১২ লক্ষ ছিল। তৎকালে গৌড়ের রাজপথগুলি সরল ও প্রশস্ত ছিল এবং পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী শোভা পাইত। উক্ত সুজা লিখিয়াছেন যে, কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজধানীর পথে এত জনসমাগম হইত যে, নিষ্পেষিত হইয়া বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তোফী।



ছায়া বাড়ী

৫০

বৃহস্পতিবার সকালে আমরা বেলা প্রায় ৯টার সময় ডাক্তার ভাদুড়ীর "আশ্রমে" উপস্থিত হইলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দেখাও পাইলাম। তাঁহাকে বলিলাম যে, কান্ সাহেবের বাড়ীতে সে দিন তাহার সহিত সামান্যমাত্র পরিচয়ের পরে তাঁহার সম্বন্ধে ও তাঁহার কৃত এই পাগলের চিকিৎসালয়ের বিষয়ে আমার এক উকীল বন্ধুর নিকট সুখ্যাতি শুনিয়া স্বচক্ষুতে তাঁহার এই "আশ্রম" ও ইহার ব্যবস্থাদি দেখিবার কৌতূহল হওয়ায় আজ অবসর পাইয়া সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছি। শুনিয়া ডাক্তার মহাশয় বেশ প্রীত হইলেন এবং আমাদের যথেষ্ট সমাদরও করিলেন।

পরে যোগীন বাবুকে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম এবং দুই জনে বয়সে প্রায় সমকক্ষ বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে আলাপটা শীঘ্রই বেশ জমিয়া উঠিল। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীদিগের চিকিৎসাপদ্ধতি ও ডাক্তারের আশ্রমের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে নানা কথার পর, আমি একবার সুযোগ পাইয়া কান্ সাহেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। তখন জানিলাম যে, আমেরিকায় উহার সহিত ডাক্তারের প্রথম পরিচয় হয় এবং পরে কয়েক-বার দার্জ্জিলিঙ্গেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আলাপটা একটু ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত ডাক্তারের বিশেষ সদ্ভাব বা সৌহার্দ্দ কখনও হয় নাই, এবং এই সামান্য আলাপেই কানের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যতটুকু ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ওরূপ হইবার সম্ভাবনাও বড় ছিল না। শেষে তিনি বলিলেন, "তবু তার অনুরোধে আমি কয়েক মাস আগে তার সাধুতার উপর বিশ্বাস ক'রে একটা কায করেছিলাম। কিন্তু এখন যে রকম ধারণা জন্মাচ্ছে, তাতে বোধ হচ্ছে যে, ওকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। আমার এখনকার ধারণাটা যদি ঠিক হয়, তা হ'লে লোকটা যে ভয়ানক দুর্ব্বৃত্ত, তাতে আর সন্দেহ

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সে দিন যখন তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন, তখন কি আপনার এ ধারণা হয়নি?"

"একেবারে হয়নি, তা নয়, কিন্তু ক্রমে সেটা যেমন দৃঢ় হয়েছে, তখন ততটা হয়নি। ওর উপর তখন অবিশ্বাসের সূত্রপাত হয়েছিল মাত্র. আর বোধ হয়, সেই জন্যই সে দিন ও যে ঘটনাটার কথা বল্লে, সেটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয়নি। কোন একটা বিষয়ে ওর নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে আমার সাহায্য নেওয়া আবশ্যক হয়েছিল ব'লে আমাকে ডেকে পাঠালে. অথচ আসল ঘটনাটা আমার কাছে গোপন করলে, এই রকম ধারণা হয়েছিল। সেই জন্যে সে দিন তার উপর আমার বিরক্তিও যথেষ্ট হয়েছিল।"

"আপনার ধারণাটা ঠিকই হয়েছিল। ঘটনাটা ও সে দিন আপনাকে যা বলেছিল, তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর, ও যে আপনার কাছে সত্য গোপন ক'রে ঐ রকম একটা কাল্পনিক কিছু বলবে, তার কোন আভাষও আমাকে পূর্ব্বে দেয়নি। সেই জন্যে আমি তার কথার প্রতিবাদ করবার অবসরও পেলাম না।"

"তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখন আমাকে আসল ব্যাপারটা জানাতে কিছু আপত্তি আছে কি?"

"কিছু না, বরং সেটা আপনাকে জানানই উচিত মনে করি। ঘটনাটা এই;—আপনি বোধ হয় জানেন যে, গত জানুয়ারী মাসে সরস্বতী-পূজার আগের রাত্রিতে রামপাল লেনে একটা লোক খুন হয়েছিল। পুলিসের অনুসন্ধানে খুনীর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায়নি। যে বাড়ীতে হয়েছিল, সেটা আমার বাসার প্রায় সম্মুখেই; হত ব্যক্তি যখন বেঁচে ছিল, তখন তার সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল, সেই জন্য এই খুনের তদন্তে আমি স্বেচ্ছায় অনেক লিপ্ত হয়েছিলাম। সে সময়ে খবরের কাগজে এই ব্যাপারের সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশ হয়েছিল। আপনি বোধ হয়,

"হাঁ, পড়েছিলাম বৈ কি? খুনটা বড় রহস্যময় ব'লে বৃত্তান্তগুলা পড়তে খুব আগ্রহও হয়েছিল। তদন্তের ব্যাপারে আপনার নামটাও বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছিল, মনে পড়ছে বটে! তা সে খুনের সঙ্গে মিঃ কানের কিছু সম্পর্ক ছিল না কি?"

"ছিল কি না, তা নিশ্চয় ক'রে এখনও বলতে পারি না। কিন্তু আমার অনুসন্ধানের ফলে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমার সন্দেহ হয় যে, এ ব্যাপারে ও লোকটা কোন না কোন রকমে জড়িত ছিল। যে বাড়ীতে খুন হয়েছিল, ঠিক তার পিছনের বাড়ীতে মিঃ কানের মত এক জন লোক মাঝে মাঝে যাতায়াত করত আর খুনের রাত্রিতে প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত সেখানে ছিল; এমন কি, ঐ বাড়ী থেকে খুনের বাড়ীতে গোপনে যাবার চেষ্টাও করেছিল, সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু, তার পরে সেই রাত্রির মধ্যে ঐ লোকটাই আবার কোন সময়ে ওখানে গিয়ে খুন করেছিল কি না—"

"না, তা হ'লে যে খুন করেছিল, সে যে কান্ নয়, তা আমি নিশ্চিত বলতে পারি। কারণ, আপনাকে ত পূর্ব্বেই বলেছি যে, কান্ সে রাত্রিতে, প্রায় ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্য্যন্ত এখানেই ছিল।"

"কিন্তু রাত ১২টা নাগাত সে গোপনে এখান থেকে সেখানে গিয়ে ঐ কায ক'রে আবার এখানে ফিরে এসেছিল, তা কি হ'তে পারে না?"

"আমার অজ্ঞাতে তা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, দ্বারবানের উপর কড়া হুকুম আছে যে, আমার অনুমতি ভিন্ন রাত্রিতে সে কোন লোককেই ফটক খুলে দেবে না। এখানকার ফটক ও পাঁচীল কত উঁচু, তা ত দেখেছেন? মই, সিঁড়ি ভিন্ন শুধু টপ্‌কে পার হওয়া যায় না।"

কান্‌সাহেব সম্বন্ধে আমার যেটুকু ক্ষীণ সংশয় ছিল, তাহা পোষণ করিবার এখন আর কোন হেতু রহিল না। কাযেই যোগীন বাবুকে ক্ষুণ্ণভাবে বলিলাম, "তা হ'লে ত আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানই পণ্ডশ্রমে দাঁড়ালো দেখছি!"

যোগীন বাবুও হতাশ কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ত! অনুসন্ধানটা তা হ'লে আবার কোন্ সূত্র ধ'রে চালানো যাবে,

৫১

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, যে লোকটা খুন হয়েছিল, সে কে, তা কি এখনও জানা যায়নি?"

আমি বলিলাম, "কেন, আপনি কি জানেন না, খুনের কিছু দিন পরে হত ব্যক্তি বর্দ্ধমানের বিহারীলাল ঘোষ ব'লে সাব্যস্ত হয়েছিল?"

"হাঁ, কাগজে তখন তাই পড়েছিলাম বটে, কিন্তু সম্প্রতি কিছু দিন থেকে আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে, হত ব্যক্তি বিহারী ঘোষ ব'লে সাব্যস্ত হলেও আসল বিহারী ঘোষ মোটেই খুন হননি,—তিনি এখনও বেঁচে আছেন।"

কাকলীরও ঠিক এই বিশ্বাসের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি ও যোগীন বাবু উভয়েই অত্যন্ত উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলেন কি? তিনি এখনও বেঁচে আছেন?—আপনি কি ক'রে জানলেন?"

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কথা পরে বলছি। কিন্তু বিহারী ঘোষের বিষয়ে আপনাদের এ রকম উৎসুক হবার কারণ কি, বলুন দেখি? তিনি কি আপনাদের পরিচিত লোক?"

যোগীন বাবু বলিলেন, "হাঁ, শুধু পরিচিত নয়, তিনি আমার খুব নিকট-কুটুম্ব।"

"ওঃ, বটে? তা ভালই হয়েছে। তা হ'লে তাঁকে নিশ্চয়ই আপনি দেখলে চিনতে পারবেন, আমারও যেটুকু সংশয় এখনও আছে, তা এখনই মিটে যাবে!"

যোগীন বাবু অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "বেশ ত!—তা হ'লে চলুন না কেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যাক? তিনি এখন কোথায় আছেন?" বলিয়া যোগীন বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না, মশায়; তিনি আমার এই আশ্রমেই আছেন; আমি এখনই তাঁর কাছে আপনাদের নিয়ে যাব। কিন্তু এখন একটু বসুন; আমি আগে গোটাকতক কথা আপনাদের ব'লে রাখতে চাই। কেন না, তাঁর মানসিক অবস্থা আগের চেয়ে আপাততঃ অনেক ভাল হলেও এখনও বেশ স্বাভাবিক হয় নি। সেই জন্য তাঁর সঙ্গে একটু

যোগীন বাবু পুনরায় আসন গ্রহণ করিলে ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "গত অগ্রহায়ণমাসে আমার কাছে এক দিন কান্ সাহেব এসে বলেন যে, উমাপতি সরকার নামে তাঁর বাপের এক জন বন্ধু বুড়া-বয়সে একমাত্র সন্তান হারিয়ে শোক ভুলবার আশায় কুসঙ্গের আশ্রয় নিয়ে নানা রকম নেশা করতে আরম্ভ করে। ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে গিয়ে বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হয়; তার উপর মদ, গাঁজা ও আফিমে সর্ব্বদা বিভোর হয়ে থেকে ক্রমে মাথা বিগড়ে গিয়ে সম্প্রতি কয়েক মাস থেকে প্রায় সম্পূর্ণ উন্মত্ত হয়ে প'ড়েছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, যদিও শরীর রোগে শীর্ণ, তবু উন্মত্ততার প্রভাবে সময়ে সময়ে তাকে ঘরে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ঘরে একমাত্র তার স্ত্রী ছাড়া আর অন্য কোন পরিচর্য্যা করবার লোক নাই। তিনিও এই সব শোকে-কষ্টে ও বিপত্তিতে এত কাতর যে, ও রকম রোগীর সেবা করতে বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে ক্রমেই অক্ষম হয়ে পড়েছেন। আর্থিক অবস্থাও এত হীন হয়েছে যে, ঐ সব করবার জন্য লোক রাখা বা ভাল চিকিৎসা করান তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেই জন্য কান্ সাহেব তাঁদের বন্ধুভাবে সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে এইখানে আমার চিকিৎসায় রাখতে ইচ্ছা করেন এবং বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি নিজেই খরচ যোগাবেন ব'লে সেটা যাতে খুব কম হয়, সে জন্যও আমাকে অনুরোধ করেন। আমি এ দুই প্রস্তাবেই সম্মত হবার পর আরও কিছু দিন বাদে কান্ সাহেব আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে জানালেন যে, হঠাৎ তাঁকে অন্য কাযে স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল ব'লে সেই রোগীটিকে এখানে আনতে পারেন নি। রোগীর অবস্থা এখন আরও শোচনীয় হয়েছে। এখন অধিকাংশ সময় একেবারে বাক্যহীন হয়ে নির্জীব অবস্থায় প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকে। যখন কথা কয়, তখন বুঝা যায় যে, সে নিজেকে অপর লোক ব'লে মনে করে, নিজের উমাপতি সরকার নামটাও ভুলে গেছে, স্ত্রীকেও নিজের স্ত্রী ব'লে চিনতে পারে না, বরং নিজের শত্রু মনে করে। কান্ সাহেবকে মাঝে মাঝে চিনতে পারে বটে, কিন্তু তাকেও শত্রু মনে করে।

"ঠিক ঐ রকম আর দুটি আত্মবিস্মৃত সে সময়ে আমার আশ্রমে ছিল। একটি তখন বেশ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছিল, আর দ্বিতীয়টিও অনেকটা সুস্থ হয়ে এসেছিল। সেই জন্য প্রায় তাদেরই মত লক্ষণাক্রান্ত এই নূতন রোগীর বৃত্তান্ত শুনে তাকে এখানে রেখে চিকিৎসা করতে আমার বেশ একটু উৎসাহ হলো। তাই আমি কান্ সাহেবকে আর সময় নষ্ট না ক'রে রোগীকে শীঘ্রই এখানে আনতে ব'লে দিলাম। সে-ও সেই দিনই সন্ধ্যার সময় রোগীকে এখানে নিয়ে এলো। রোগীর স্ত্রীও তার সঙ্গে এসেছিলেন এবং রোগীকে আমার আশ্রমে রেখে চিকিৎসা করতে রাজী হয়েছিলাম ব'লে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানালেন। রোগীর অবস্থা কান্ সাহেবের মুখে যা শুনেছিলাম, প্রত্যক্ষও তাই দেখলাম। সংজ্ঞা থাকলেও জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল ব'লে বোধ হলো না। শরীরও নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল; মুখে কথাও কিছু ছিল না, কথা বলবার চেষ্টা করলেও বিরক্ত হতো। যা হোক, তাকে এখানে রেখে চিকিৎসা করবার ভার সেই দিন থেকে আমি নিলাম; তাঁরাও দু'জনে নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলেন। তার পর থেকে এ পর্য্যন্ত মাসে এক বার কি দু' বার কান্ সাহেব কখনও একলা, কখনও বা রোগীর স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে রোগীর সংবাদ নিয়ে যেতেন, তার খরচের টাকাও দিয়ে যেতেন।

"রোগী প্রথমে যে অবস্থায় এসেছিল, প্রায় মাস দুই অনেকটা সেই রকমই ছিল। তার প্রধান কারণ দেখলাম যে, তার আফিমের নেশাটা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল; দুবেলাই খুব বেশী পরিমাণে আফিম খাওয়ার অভ্যাস এমন হয়েছিল যে, তাতেই তাকে সর্ব্বক্ষণ অতিরিক্ত মুহ্যমান ক'রে রাখতো। আফিম একেবারে না খেতে দিলেও অনেক রকম গোলযোগ বেড়ে উঠতো। আমি সেই জন্য রোগী যাতে বুঝতে না পারে, এই ভাবে অল্পে অল্পে আফিমের মাত্রাটা কমাতে লাগলাম। মাসখানেকের মধ্যে বেশ আশাপ্রদ ফলও হ'তে লাগলো। শেষে যে সময় আপনাদের ঐ রাম পাল লেনের খুনটা হয়েছিল, তার কিছু দিন আগে থেকে সে উঠে হেঁটে বেড়াতে আরম্ভ করলে, মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তাও কতকটা বেশ সহজভাবে কইতে লাগলো, এমন কি, একটু-আধটু পড়াশুনাও করতে আরম্ভ করলে। অবশ্য এই রকম উন্নতি যে বেশ একটানা ভাবেই হ'তে থাকলো, তা নয়; সময়ে সময়ে থামা পড়তো, কখন কখন আবার সাবেক ভাবও অল্পাধিক দেখা দিত, বিশেষতঃ তার স্ত্রী কিংবা কান্ সাহেবকে দেখলেই তার মেজাজ কিছু বেশী রকম বিগড়ে

যেতো। এই অবস্থায় খুনটা হবার পরে খবরের কাগজগুলায় যখন সেই সংবাদ নিয়ে খুব আলোচনা চলছিল, বিশেষ যখন হৃত ব্যক্তিকে বৰ্দ্ধমানের বিহারী ঘোষ ব'লে সাব্যস্ত করা হ'লো, সেই সময় থেকে রোগী আমায় মাঝে মাঝে বলতো যে, ও-ই বৰ্দ্ধমানের বিহারী ঘোষ, ওর নাম উমাপতি সরকার নয়—লোক জোর ক'রে ওকে ঐ মিথ্যা নামটা দিয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সব কথাগুলা সে অন্য পাঁচ রকম অবান্তর কথার সঙ্গে এমন গোলমেলে ভাবে বলতো যে, ওগুলা ঠিক সহজ মানুষের কথা ব'লে আমার মনে হ'তো না, বরং আমার উল্টা ধারণাই জন্মাতো। ও রকম আত্ম-বিস্মৃত রোগীর পক্ষে গল্প বা সত্য ঘটনার বিবরণ শুনে নিজেকেই তার নায়ক মনে ক'রে অপরের কাছে তাই প্রচার করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা বিরল ঘটনা নয়; তাতে বিস্মিত হবার বা ঐ সব কথাগুলাকে সজ্ঞান অবস্থার কথা মনে করবার কোন কারণ নেই ব'লে আমি ওগুলা তখন প্রলাপ ব'লে অগ্রাহ্য করিতাম।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ফাল্গুন

ফাল্গুন আজি সুপ্তির পর,
জাগি' জাগরণ প্রভাতে
দিল যৌবন টীকা আঁকি নিখিলের,
ললাটে কিরণ শোভাতে।
শীত নিষ্পিষ্টা মালিনী ধরণী,
রাঙ্গিয়া উঠিল নলিনী-বরণী,
রক্তিম রস 'কাঞ্চনে'—কম
শিমুল-শিরীষ-পলাশে;
পীড়িত হিয়াটি উঠিল ভরিয়া
বিপুল হরিষ-বিলাসে।

ফাল্গুন আজি বাজাইল আসি'
কি সুরে যে চল-বংশী,—
কোকিল মাতিল মুহু কুহু-তানে,
কল-গানে জল-হংসী।
হাসিল চটুল কি হরষ-হাসে,
ভাসিল মৃদুল কি যে রস-ভাষে,
ছুটিল মলয় মর্ম্মরি' মৃদু,
কাননে উঠিল অলি-রব;
মধুর তানে সে হাসি ও গানে সে
হাসিয়া ফুটিল কলি সব।

পলিত-পত্র রিক্ত বনানী
কি পরশে উঠে আজি ও
নবীন মুকুলে কিশলয় দলে
নব শ্যামিকায় সাজি' গো!
কি হেম-কিরণ-রূপ-তূলিকায়
কালো মেঘরাশি মিলি' মিলি' যায়,
কিবা অপরূপ আলো-ভরা নভ
শোভে ও অতুল গরিমায়;—
তৃষিতা ধরার তৃপ্ত কামনা
অযুত বকুল ঝরি' যায়।

শুধু বনে নহে, আমারো মনে এ
ফুটে যে আবীর-লালিমা।
নভেরি নভে ও মরমে মম
টুটে যে নিবিড় কালিমা।
বাহিরই নয়, ভিতরো পূরিত
বর্ণে গন্ধে; সম-মুখরিত
কথা আর গানে হাসি-বাঁশী-তানে
ভিতর বাহির আজ···
সম মনে বনে আসিল মাধব—
হাসিল মিহির-রাজ!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বরদার অবৈতনিক গ্রন্থালয় *

মহানুভব গাইকোবাড় উদারতা ও প্রজারঞ্জন-তৎপরতা-গুণে দেশীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতিবৃন্দের অন্যতম। জনসাধারণের মধ্যে ধনি-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে অবৈতনিক শিক্ষা প্রচার তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি বলা যায়। জাতিধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করত তিনি সর্ব্ব-প্রথম এ দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত করেন। শিক্ষাভিমানী, অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের সহিত অস্পৃশ্যদিগকে একাসনে বসাইতে বর্ত্তমান মহারাজাই সুচিন্তিত বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে-ছেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র অবৈতনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিতেছেন। অস্পৃশ্যদিগকে উচ্চজাতিসমূহের সমতুল্য করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রভাবেই উহা সম্ভব; শুধু একটি উত্তেজনার মুখে সাময়িক একত্র আহার-বিহারের দ্বারা স্থায়ী শুভফল কখনই আশা করা যাইতে পারে না। এত যত্ন সত্ত্বেও জনসাধারণ যথেষ্ট অশিক্ষিত রহিয়াছে; এমন কি, অধিকাংশ প্রজা এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষর প্রকৃতিপুঞ্জের যথাসম্ভব সৎশিক্ষা-বিধানার্থ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা দ্বারা মূর্খ জন-সাধারণকে স্বাস্থ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া



বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গাইকোবাড়

থাকেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায়, অর্থ ও সামর্থ্য এ দুইটি জিনিষের সংযোগে সংসারে যে সকল উৎকৃষ্ট কা করা সম্ভবপর, বরদারাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অন্তত তাহার আভাস পাওয়া যাইবেই।

বর্ত্তমান গাইকোবাড়ই যে এ দেশে অবৈতনিক সার্ব্ব জনীন গ্রন্থালয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, ইহা নিঃসন্দেহে বল যায়। বাধ্যতামূলক অবৈতনি প্রাথমিক শিক্ষাও তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ভারতে কার্য্যকরী স্থায়িভাবে প্রচলিত করেন অবশ্য পুরাকালে এক হিসা (গণতান্ত্রিক সমাজের অনু শাসনে জাতিবিশেষের প্রতি অপ্রত্যক্ষভাবে বাধ্যতামূল অবৈতনিক শিক্ষাই আমাদে দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বল যায়। তখনকার দিনে শিক্ষ দান করিয়া নগদ কোনরূ মূল্য লওয়া পাপজনক অখ্যাতিকর বলিয়া পরিগণি হইত। কিন্তু দেশের সে শু যুগ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই বিলু হইয়াছিল। এখানে প্রধান ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি কথাই বলা হইতেছে। প্রাচী ও আধুনিক বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাপ্রথার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈষম্যও আছে। তখনক দিনে সাধারণ শিক্ষা প্রায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তথাকথিত অন্ত্য

---

* "মানুষ সর্ব্বদাই অবস্থার অনধীন থাকিলে। উচ্চতর জ্ঞান তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, ইহা যেন তাঁহারা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহাদিগকে গ্রন্থপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষার প্রভাবে তাঁহারা যেন গ্রন্থপাঠকে জীবনের একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করিতে পারেন তখন গ্রন্থালয় ও পাঠাগারসমূহ জনসাধারণের নিকট বিলাসের সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত না হইয়া বরং বাঁচিয়া থাকিবার অন্যতম প্রধান উপায়রূপে পরিগণিত হইবে।"

উল্লিখিত অংশটি মহারাজ গাইকোবাড়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত। [লেখক।

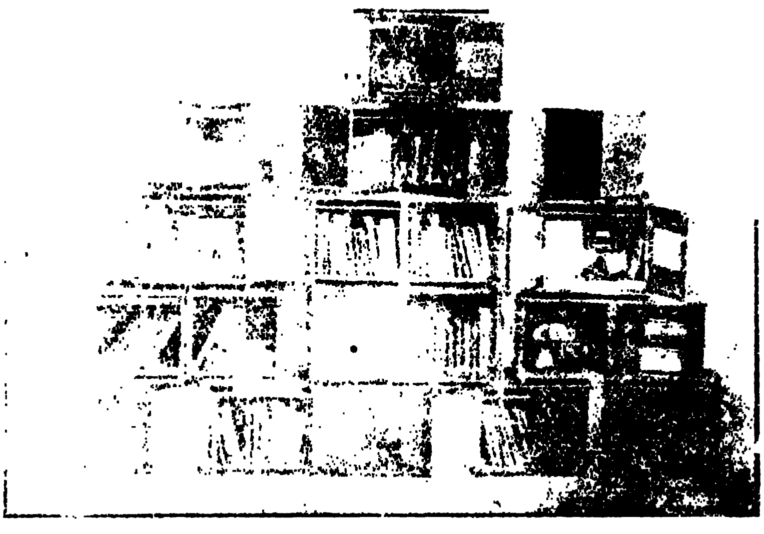
নিম্নজাতীয়রা স্ব স্ব জন্মগত অধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষারই সুযোগ পাইত মাত্র। কিন্তু বরদায় নব-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে জাতিধর্ম্ম বা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেই সাধারণ শিক্ষা লাভের সুযোগ সমভাবেই পাইতে পারে।

নূতন সর্ব্বত্রই পুরাতনের স্থান অধিকার করে। তবে সকল সময় এই পরিবর্ত্তনটি মঙ্গলের দিকে না যাইতেও পারে। বরদার আদর্শে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেশের সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিলে শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না, আশা করা যায়।

১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণকালে মহারাজ সয়াজী রাও গাইকোবাড় সর্ব্বপ্রথমে তথাকার জনসাধারণের শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হন। তদবধি তিনি নিজের প্রজা-সাধারণকে যথা-সম্ভব শিক্ষিত করি-বার জন্য আগ্রহা-ন্বিত ছিলেন। কি করিয়া তাঁহার প্রজাসাধারণ অলস, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বিষহ জীবনের বিনিময়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, ইহাই যেন সমগ্র রাজের একমাত্র ভাবিবার বিষয় ছিল। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে পন্থা আবিষ্কৃত হইতে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না। অবশেষে মহারাজ স্থির করিলেন যে, নিজ রাজ্যের সর্ব্বত্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা-প্রচলনের অবাধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে ও সহরে যথেষ্ট পরিমাণে অবৈতনিক গ্রন্থালয় ও পাঠাগার স্থাপন করিতে হইবে। এতৎসত্ত্বেও যদি আত্মজ্ঞানহীন জনসাধারণ স্বাভাবিক জড়তা ত্যাগ করিয়া শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে কুণ্ঠিত হয়, এমন কি, অবৈতনিক গ্রন্থালয় বা পাঠাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়াটাও বিরক্তিকর মনে করে, তবে অবৈতনিক যাযাবর গ্রন্থালয় জাতিধর্ম্ম বা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে তাহাদের দ্বারে নিমন্ত্রিতরূপে উপস্থিত থাকিবে। বরদার বিরাট গ্রন্থালয়-প্রতিষ্ঠান এই অতি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য লইয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজের ঘোষণাপত্রে সর্ব্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত যে কোন গ্রন্থালয় বা পাঠাগার জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে বৈতনিক এবং অবৈতনিক সভ্যরা সমভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

গঠনপ্রণালী

গ্রন্থালয়-প্রতিষ্ঠান বরদা রাজ্যের একটি সুগঠিত ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগ। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য রাজধানী এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য সহরে যেমন সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে, তেমনই দূরবর্ত্তী অপরিচিত অসংখ্য গ্রামবাসীরও একইকালে সাহায্য করিতেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনিয়ন্ত্রিত গঠনপ্রণালী আমাদের দেশে অনুকরণযোগ্য। এই সুচিন্তিত বিধিব্যবস্থার ফলে গ্রামবাসী ও সহরবাসীর মধ্যে গ্রন্থালয় আন্দোলন সমভাবেই কার্য্যকর হইয়াছে। বরদার গ্রন্থালয় আন্দোলনের ইহাই বিশেষত্ব। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ব্যাপকভাবে উক্ত গ্রন্থালয় বিভাগ স্থাপনার্থ প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাপত্রে (নং ৬৯, তাং ২৭-৬-১৯১১ ইং) প্রাথমিক নিয়মাদি অতি সুন্দররূপেই লিখিত আছে। নিম্নে মাত্র বিশেষ কয়েকটি বিধিব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতেছে :—



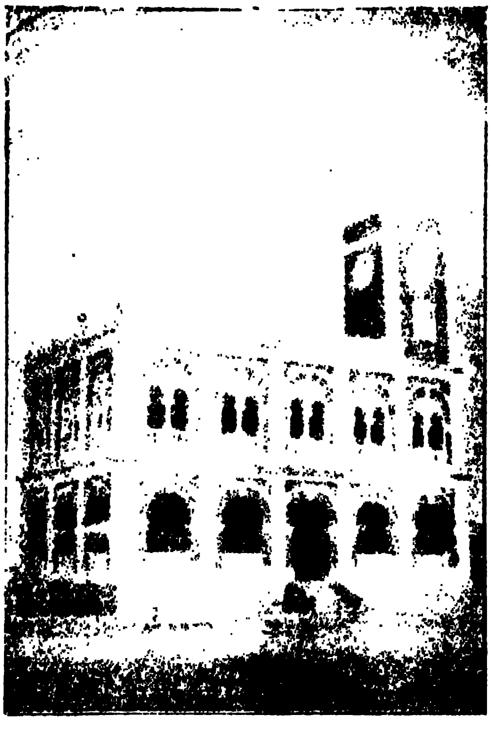
'যাযাবর' গ্রন্থাগার

(ক) পল্লীগ্রন্থালয়

১। অবৈতনিক গ্রন্থালয় বা পাঠাগার স্থাপনার্থ (অথবা

উভয়ের জন্য) যদি কেবল গ্রামের অধিবাসীরা বাৎসরিক ৫০ টাকা মাত্র সংগ্রহ করিতে পারে, তবে স্থানীয় পঞ্চায়ত তহবিল (অভাবগ্রস্ত না হইলে) এবং বরদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় তহবিল প্রত্যেকের নিকট হইতে সমান পরিমাণ টাকা পাইবে। কিন্তু বাৎসরিক ৫০ টাকার কম সংগৃহীত হইলে পঞ্চায়ত ও কেন্দ্রীয় তহবিল হইতেও তদনুপাতে কম সাহায্য পাইবে।

২। যদি গ্রামিকরা চাঁদা, দান অথবা অন্য কোন উপায়ে মাত্র ২৫ টাকা সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিতে পারে, তবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় হইতে তাহারা ১ শত টাকা মূল্যের স্থানীয় (গুজরাটী) ভাষার পুস্তক পাইবে। স্বয়ং দেওয়ান কর্ত্তৃক মনোনীত ৩ জন উপযুক্ত সভ্য একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়া স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ঐ বইগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থালয় বা পাঠাগার গ্রামবাসিমাত্রেই অবৈতনিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। তবে চাঁদাদায়ী সভ্য অথবা স্থানীয় পরিচালক সমিতি-কৃত বিধি-ব্যবস্থা সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে।



সাউনর অবৈতনিক গ্রন্থাগার

৩। উক্তরূপ গঠিত প্রত্যেক গ্রাম্য গ্রন্থালয় বা পাঠাগার কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় হইতে যথারীতি ভ্রাম্যমাণ পুস্তকাগারের সাহায্য পাইবে। ঐ সকল ভ্রাম্যমাণ পুস্তকাগারেও সাধারণতঃ স্থানীয় ভাষার পুস্তকই থাকে।

(খ) পুরগ্রন্থালয়

১। চারি হাজারের অধিক অধিবাসিবিশিষ্ট যে কোন গ্রাম বা সহরের লোকরা যদি অবৈতনিক গ্রন্থালয় স্থাপনার্থ চাঁদা, দান বা অন্য কোন উপায়ে বাৎসরিক ৩ শত টাকার অনধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তবে সেই গ্রাম বা সহর স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী (বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত) এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় প্রত্যেকের নিকট হইতে সমান পরিমাণ অর্থ-সাহায্য পাইবে।

২। ঐ সমুদয় পুর-গ্রন্থালয় যথারীতি ভ্রাম্যমাণ পুস্তক-ভাণ্ডারের সাহায্য পাইবে। উল্লিখিত পুস্তকভাণ্ডারে স্থানীয় ভাষার ও ইংরাজী ভাষার উভয়বিধ পুস্তক থাকিবে।

৩। কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের আদেশমত প্রত্যেক পুরগ্রন্থালয় চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্যপুস্তকালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্থানীয় ভাষার পুস্তক-সংবলিত ভ্রাম্যমাণ পুস্তকভাণ্ডার গ্রাম্যগ্রন্থালয়গুলিকে যথারীতি সাহায্য করে কি না, তাহা পরিদর্শন করিবার ভারও পুরগ্রন্থালয়ের স্কন্ধেই ন্যস্ত থাকে।

৪। কোন পল্লী বা পুর-গ্রন্থালয় হইতে অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব প্রেরিত হইলে কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় বিভাগ তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(গ) প্রান্ত (জিলা) গ্রন্থালয়

১। যদি কোন জিলাবাসী অবৈতনিক গ্রন্থালয় স্থাপনার্থ চাঁদা, দান বা অন্য কোন উপায়ে বাৎসরিক ৭ শতের অনধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তবে স্থানীয় পঞ্চায়ত বা মিউনিসিপ্যালিটী (তহবিলে অর্থের অভাব না থাকিলে) এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় প্রত্যেকের নিকট হইতে বাৎসরিক সমান পরিমাণ সাহায্য পাইবে। এই প্রান্তপুস্তকালয় উক্ত প্রান্ত-বর্ত্তী সরকারী প্রধান কার্য্যালয় যে সহরে থাকিবে, সেই সহরেই স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক প্রান্তগ্রন্থালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে।

২। পল্লী বা পুর-গ্রন্থালয়সমূহ পরিচালনের সাধারণ ক্ষমতা প্রত্যেক প্রান্ত গ্রন্থালয়ের থাকিবে।

(ঘ) পল্লী, পুর ও প্রান্ত গ্রন্থালয়-ভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

১। স্থানীয় লোকরা চাঁদা, দান বা অন্য কোন উপায়ে গ্রন্থালয়-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এক-তৃতীয়াংশ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে (যদি গৃহনির্ম্মাণের মোট ব্যয়ের তালিকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় হইতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়) অপর দুই অংশ যথাক্রমে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী (বা পঞ্চায়ত) এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় হইতে বহন করা হইয়া থাকে।

(ঙ) গ্রন্থালয় বিভাগের সংবাদ সংগ্রহ ও ক্ষমতা পরিচালনের ব্যবস্থা

১। গ্রন্থালয়গুলির ত্রৈমাসিক কাজের হিসাব সেই গ্রন্থালয়-সমূহের তত্ত্বাবধায়ককে নিকটবর্ত্তী পুর-গ্রন্থালয়ে পাঠাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় হইতে প্রাপ্ত নির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত তালিকায় এ হিসাব লিখিতে হইবে।

২। প্রত্যেক পুরগ্রন্থালয় নিজের এবং তাহার অধীনস্থ পল্লীগ্রন্থালয়-সমূহের ত্রৈমাসিক হিসাব নির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত তালিকায় কেন্দ্রীয় প্রান্ত গ্রন্থালয়ে পাঠাইয়া থাকে।

প্রত্যেক কেন্দ্রীয় প্রান্ত গ্রন্থালয়কে নিজের এবং তাহার অধীনস্থ পুরগ্রন্থালয়গুলির ত্রৈমাসিক হিসাব যথারীতি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত তালিকায় লিখিয়া বরদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় বিভাগে পাঠাইতে হয়।

৪। যদি কোন তালুকে পুরগ্রন্থালয় না থাকে, তবে সে অঞ্চলের পল্লীগ্রন্থালয়গুলির হিসাবপত্র প্রান্তগ্রন্থালয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে।

৫। কেন্দ্রীয় প্রান্তগ্রন্থালয়ের অভাবে সাধারণ প্রান্ত গ্রন্থালয়গুলির হিসাবপত্র মূল কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ে প্রেরিত হয়।

(চ) ব্যয়ের ব্যবস্থা

অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগের সাহায্যপ্রাপ্ত পল্লী, পুর বা প্রান্ত গ্রন্থালয়ের ব্যয় নিম্নলিখিত হারে সাধারণতঃ হইয়া থাকে—

	প্রান্ত বা পুর শতকরা	পল্লী শতকরা
পুস্তকের জন্য	২৫৲	২৫৲
পত্রিকাদির জন্য	১৫৲	৩০৲
গৃহভাড়া ও সাজ-সরঞ্জামের জন্য	১০৲	২০৲
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	২৫৲	৫৲
পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কোন বিষয়ে বা সকল বিষয়ের উন্নতি-কল্পে অথবা অন্য কোন অতিরিক্ত সাময়িক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে		

(ছ) গ্রন্থাগার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ

১। প্রত্যেক পল্লী-গ্রন্থালয় স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক



বালকবালিকার গল্প শুনিবার ও চলচ্চিত্র দেখিবার কক্ষ

বা অন্য কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে থাকিবে। ঐ ব্যক্তি চাঁদাদাতা সভ্যগণ বা স্থানীয় পরিচালক সমিতি দ্বারা যথারীতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

২। পল্লী, পুর বা প্রান্তের প্রত্যেক গ্রন্থালয়ের সংরক্ষণ-ভার স্থানীয় সমিতির উপর ন্যস্ত থাকে। সভ্যরা (৩—৯ জন মাত্র) সমগ্র চাঁদাদাতা সদস্যের সাধারণ সভায় মনোনীত হইয়া থাকেন।

৩। সরকারের সম্বন্ধরহিত স্বাধীন, সম্মিলনী বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ও মূল কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের অনুমতিক্রমে

স্থানীয় ভাষার এবং ইংরাজী ভাষার উভয়বিধ পুস্তক যাযাবর গ্রন্থভাণ্ডারের সাহায্যে পাইতে পারে।

৪। এই সকল নিয়মাধীনে যে সকল গ্রন্থালয় স্থাপিত হয় অথবা যাহারা (প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে) যে কোন উপায়ে সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই জাতি, ধর্ম, বা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের দ্বারাই অবৈতনিকরূপে ও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

বাৎসরিক গ্রন্থালয়-শুল্ক এক আনা কি দুই আনা ধরা যাইতে পারে।

ঘোষণাপত্রের প্রত্যেকটি বিধি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং কোনটিকেই অবহেলা করা যায় না। সমগ্র ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করা এখানে অসম্ভব। কিন্তু এ সব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিধি-ব্যবস্থা আমাদের অনুসন্ধিৎসু তরুণ সম্প্রদায়ের বড়ই প্রিয় বস্তু। মোটামুটি হিসাবে প্রত্যেক অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানের মোট



বরোদা গ্রন্থাগারের বালকগণের পাঠের কক্ষ

৫। একটি গ্রামে বা ক্ষুদ্র সহরে একাধিক গ্রন্থালয়ে সরকারী সাহায্য সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া যে কোন প্রতিষ্ঠানের সরকারী সাহায্য বন্ধ করা বা কমান যাইতে পারে।

৬। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থালয়গুলি সরকারের পরিদর্শনাধীনে ও শাসনাধীনে পরিচালিত হয়।

৭। কোন স্থায়ী সমিতি বা পঞ্চায়ত যদি গ্রন্থালয়-স্থাপনের জন্য সামান্যমাত্র বিশেষ শুল্ক স্থানীয় লোকের নিকট হইতে আদায় করিবার প্রস্তাব করেন, তবে সরকার তাহার যথাসম্ভব অনুকূল ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত

ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও কম স্থানীয় অধিবাসীর বহন করিতে হয় এবং বাকী সমস্ত ব্যয়ই সরকারপক্ষ বহন করিয়া থাকে। স্থানীয় লোকের নিকট হইতে এই সামান্য অংশ গ্রহণ করার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিষ্ঠানের সহিত স্থানীয় লোকের আর্থিক সম্বন্ধ থাকাতে ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ববিধানে তাহাদের আন্তরিক (বাধ্যতামূলক?) যত্ন আশা করা যাইতে পারে। ঘোষণাপত্রে লিখিত সংক্ষিপ্ত ব্যয়ের হারে ও আপাত-দৃষ্টিতে বৈষম্য দেখা যায়। গৃহ-ভাড়া ও সাজ-সরঞ্জামের জন্য সহরে শতকরা ১০৲ টাকা এবং গ্রামে ২০৲ টাকা ধরা হইয়াছে। আবার রক্ষণা-

মোটেই খরচ ধরা হয় নাই। এই দুইটা হার দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। সহরে নিয়মিতরূপে গৃহ-ভাড়া দিতে হয় বটে, কিন্তু আসবাব-পত্রের জন্য অতি সামান্যই ব্যয় করিতে হয় (অন্ততঃ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে)। কারণ, স্থানীয় লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ায় এবং সহরে অধিক মাত্রায় আসবাব-পত্রের প্রচলন থাকায় এমন সহৃদয় এবং অবস্থাপন্ন উপযুক্তসংখ্যক ব্যক্তি প্রায়ই পাওয়া যায়, যাঁহারা ২।১ খানা টেবল, বেঞ্চ বা চেয়ার দিয়া প্রতিষ্ঠানকে স্থায়িভাবে সাহায্য করিতে পারেন। বিশেষতঃ সহরের লোক আপনা হইতেই অবসরসময়ে গ্রন্থালয়ে বা পাঠাগারে যোগদান করে ; তাঁহাদিগকে সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। কিন্তু গ্রামের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত। সেখানে গৃহ-ভাড়া প্রায়ই দরকার হয় না ; কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আড়ম্বরের দ্বারা লোকসমাজকে প্রথমতঃ আকৃষ্ট করিয়া পরে নিয়মিত পাঠকশ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত স্থায়িভাবে সামান্য সাজ-সরঞ্জাম ও প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে পারে, এমন ব্যক্তি গ্রামে অতি বিরল (বিশেষ আজ-কালকার দিনে)। সুতরাং গ্রামে প্রত্যেক আসবাব-পত্র প্রতিষ্ঠানের নিজের খরচে করিতে হয়। অন্য দিকে, পল্লী-প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়িভাবে বেতন দিয়া লোক রাখিবার মোটেই প্রয়োজন হয় না। কারণ, গ্রামের লোকের যথেষ্ট অবসর আছে। এমন কি, গ্রামের প্রতিষ্ঠানটি রাত্রিতেও অরক্ষিত অবস্থায় থাকিতে পারে, ইহার পুস্তকাদি অপহৃত হইবার ভয় থাকে না। কিন্তু সহরে এ সব কাযের জন্য স্থায়িভাবে বেতন দিয়া অন্ততঃ এক জন লোক রাখিতেই হয়।

সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, একটা আন্দোলনের শুভ ফলকে স্থায়ী করিতে হইলে প্রারম্ভেই এতদপেক্ষা অধিকতর বিধি-ব্যবস্থা সাধারণতঃ আশা করা যায় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পল্লী-গ্রন্থালয়সমূহকে পুর-গ্রন্থালয়ের অধীনে, পুর-গ্রন্থালয়গুলিকে প্রান্ত-গ্রন্থালয়ের অধীনে এবং প্রান্ত-গ্রন্থালয়গুলিকে বরদাস্থিত মূল কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের অধীনে রাখা হইয়াছে। এইরূপে রাজ্যের সর্ব্বত্র অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগের শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হইয়া রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত গ্রামবাসী ও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ সহরবাসীর সমভাবেই উপকার সাধিত হইতেছে। অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগের এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত গঠনপ্রণালী থাকাতে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য রাজ্যময় জনসাধারণের মধ্যে গত কয়েক বৎসরেই ব্যাপকভাবে প্রকৃত আগ্রহ দেখা দিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গঠনপ্রণালীর বিশেষত্বগুণে সুদূরবর্ত্তী মফঃস্বল প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ-ভাবে সরকার, পঞ্চায়ত এবং জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তির সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা সুপরিচালিত হইয়া থাকে। ঘোষণাপত্রের মর্ম্মানুসারে প্রান্ত, পুর এবং পল্লী গ্রন্থালয়গুলি বাৎসরিক ব্যয়ের সাহায্যার্থ মোটামুটি হিসাবে যথাক্রমে ৭ শত, ৩ শত ও ৫০৲ টাকা এবং এতদতিরিক্ত গৃহনির্ম্মাণের জন্য এক-তৃতীয়াংশ অর্থ সরকার হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। কোন একটা আন্দোলনের প্রারম্ভেই এরূপ উচ্চহারে সাহায্যদান বস্তুতঃই দাতার আন্তরিকতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ইহাতে আশু অনেক শুভ ফল আশা করা যায়। কর্ম্মীরা সর্ব্বত্রই উৎসাহ লাভ করে, স্থানীয় তালুকদার-জমীদাররাও সহানুভূতি দেখাইবার সুযোগ পায়। মাসিক চাঁদা দিবার মত অবস্থাপন্ন মধ্যম ও স্থানীয় লোকরাও আকৃষ্ট হইতে পারে এবং সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে দ্বিধাযুক্ত মনের অকারণ সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কনক-কণা

নদ-নদী-সরোবরে জলের অভাব
হয় না হয় না কভু—যোগায় স্বভাব ;
তরু-কোলে কত শত ফলের উদ্ভব,
শাক-পাতা বসুধার শাশ্বত বৈভব।

ঘুরিয়া মরিবি তবু ওরে ভ্রান্ত নর,
মিটাতে জঠর-জ্বালা নিত্য—নিরন্তর ;
প্রতারণা প্রবঞ্চনা করি অবিরাম—
ভুলেও নিস্ না মুখে ঈশ্বরের নাম !

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বড় গিন্নী



১

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নামের মত ছাতিমপুরের রায়েদের বড় গিন্নীর নামটাও দোষে-গুণে মিশাইয়া সে প্রদেশে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে কর্ত্তব্যপরায়ণা বলিয়া তাঁহার সুযশ গান করিত, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই কৃপণপ্রকৃতি ও উগ্রস্বভাবা বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে ছাড়িত না। মোটের উপর নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে তাঁহার নামটা দেশে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

গণেশ রায় বাঙ্গালা লেখাপড়ার সাহায্যে নিম্ন-আদালতে মোক্তারী করিয়া যে টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আজকাল অনেক এম-এ বি-এল চাপরাশধারী উকীল বাবু উক্ত আদালতে গতিবিধি করিয়া, তাহার এক আনা পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। সুচতুর বুদ্ধিজীবী গণেশ রায় টাকাটা যেমন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কমলার স্বভাবচাঞ্চল্য স্মরণে তেমনই তাহা বংশপরম্পরায় যাহাতে ভোগ হইয়া আসিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি গৃহে শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাবতীয় ভূসম্পত্তি সেই গৃহদেবতা রঘুনাথ জীউর নামেই খরিদ করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকালে উইল দ্বারা স্বীয় নিঃসন্তানা বিধবা পত্নী চাপা দাসীকেই সেই দেবোত্তর সম্পত্তির একমাত্র অছি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে ছোট ভাই কার্ত্তিক অনেকটা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ব্যবস্থার উপর কথা কহিবার অধিকার তাহার ছিল না। বিশেষতঃ বড় গিন্নীই সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হওয়ায় তাহার আর টুঁ শব্দ করিবারও উপায় রহিল না।

শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় বড় গিন্নীই কার্ত্তিককে মানুষ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার আবদার-অভিমান, অন্যায় অত্যাচার ঠিক মায়ের মতই সহ্য করিয়া তাহার মাতৃস্থান কার্ত্তিককে তিনি ঠাকুরপো বলিয়া সম্বোধন করিতেন না, নাম ধরিয়াই ডাকিতেন এবং অন্যায় দেখিলে ঠিক এই ছত্রিশ বছরের যুবাকে ঠিক পাঁচ সাত বছরের ছেলের মতই ধমক দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কার্ত্তিককেও তাঁহার শাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। বৌদিকে (ছেলেবেলায় কার্ত্তিক তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত, বড় হইলে বড় গিন্নীই তাহাকে বৌদি বলিয়া ডাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন) কার্ত্তিক শুধু মায়ের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত না, রুক্ষপ্রকৃতি শাসকের মত ভীতির দৃষ্টিতেও নিরীক্ষণ করিত। সতের বা আঠারো বছর বয়সেও সে স্কুল হইতে পলাইয়া বৌদির নিকট যে কানমলা পাইয়াছিল, তাহার আস্বাদ সে এখনও ভুলিতে পারে নাই।

কাজেই দাদা বৌদিকেই সম্পত্তির একমাত্র অছি নিযুক্ত করিলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও কার্ত্তিক মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

সম্পত্তির আয়ও নিতান্ত অল্প নহে। রঘুনাথ জীউর মধ্যাহ্নকালীন সেবার এক সের আতপ চাউল এবং সন্ধ্যাকালীন ভোগের আরতির এক মুঠা ছোলা ও এক পয়সার বাতাসার খরচ বাদে বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। এই উদ্বৃত্ত টাকার অত্যল্প অংশমাত্র সংসারের খরচে দিয়া বাকী টাকা বড় গিন্নী রঘুনাথ জীউর নামেই সুদে খাটাইতেন এবং সুদের সুদ তস্য সুদে দেবতার প্রাপ্য গণ্ডা হিসাব করিয়া লইয়া আপনাকে দেবস্ব হরণের পাপ হইতে বিমুক্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। এই সুদের টাকায় বড় গিন্নী দেবতার সান্ধ্যভোগের জন্য অর্দ্ধ সের পরিমিত দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সে দুগ্ধের অর্দ্ধেক পুরোহিত লইয়া যাইতেন; অর্দ্ধাংশ বড় গিন্নী প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতেন।

বড় গিন্নী লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং খাতকাদি

খাজানার রসীদ বা চেক-দাখিলা কার্ত্তিককেই বকলমে সহি করিয়া দিতে হইত। কিন্তু লেখাপড়া না জানিলেও বড় গিন্নীর স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, কোন্ প্রজার নিকট কত টাকা খাজানা পাওনা, তাহার কিস্তী-খেলাপী সুদ কত, কোন্ খাতক কোন্ সালের কোন্ মাসে কত টাকা লইয়াছে, এবং সে কোন্ সময়ে কত টাকা সুদ আদায় দিয়াছে, এ সমস্তই তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারিতেন। হিসাব-নিকাশেও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। কত টাকার সুদ কত, এবং সেই সুদের টাকা আসলের সহিত মিলিত হইলে তাহার সুদ কত হইতে পারে, এ সমস্তই তিনি কাগজকলমের সাহায্য ব্যতিরেকেও মুখে মুখেই হিসাব করিয়া দিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহাকে একটি পয়সা ফাঁকি দিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

এক বার কার্ত্তিক জনৈক গরীব খাতকের কাঁদাকাটায় দয়ার্দ্র হইয়া সুদের সাড়ে পাঁচ টাকা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং হিসাবে গোঁজামিল দিয়া বড় গিন্নীকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বড় গিন্নী কিন্তু তাহার গোঁজামিল ধরিয়া ফেলিলেন এবং প্রতি টাকায় দেড় পয়সা হিসাবে ত্রিশ টাকার সুদ বৎসরান্তে আসলে পরিণত হইলে দুই বৎসর সাত মাসে সুদে আসলে কত টাকা হইতে পারে, মুখে মুখে তাহা হিসাব করিয়া দিয়া কার্ত্তিককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এই জন্যই কি তোকে মারধর ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, কার্ত্তিক? আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কান ধ'রে তোকে আবার পাঠশালে পাঠিয়ে দিই।"

কার্ত্তিক লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল। বড় গিন্নী কঠোর তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "এর পর এমনই করেই তুই টাকাকড়ি আদায় করবি, জমীযায়গা রক্ষা করবি? না, আমি ম'লে দেখছি, তোর হাড়ে অন্ন জুটবে না।"

বড় গিন্নীর তাড়নায় খাতককে পুনরায় সাড়ে পাঁচটি টাকা দিতে হইয়াছিল। তদবধি কার্ত্তিক বৌদির কাছে একটি পয়সার তঞ্চক করিতে সাহসী হয় নাই।

খাতকরা যতই কাঁদাকাটা করুক, বড় গিন্নী কখনই তাহাদিগকে সুদের একটি পয়সা ছাড়িয়া দিতেন না। কেহ বেশী জিদ করিলে তিনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "রঘুনাথজীর ত হাত-পা নাই বাছা যে, তিনি রোজগার ক'রে দু'পয়সা নিয়ে আসবেন। এক জন রোজগার ক'রে তাঁকে দিয়ে গিয়েছে, তাতেই তাঁর সেবা চলে। তোমাকে একটি পয়সা ছেড়ে দিলে, তাঁর এক দিনের শীতলের বাতাসা হবে না।"

ঠাকুরের শীতলের বাতাসা বন্ধ হইবে শুনিয়া কেহই আর বেশী জিদ করিতে পারিত না।

এতটা কঠোরতা সত্ত্বেও খাতকদের প্রতি বড় গিন্নীর এইটুকু দয়া ছিল, যাহার কাছে যত টাকাই পড়িয়া থাকুক, কেহ বিপদে পড়িয়া আসিয়া ধরিলে বড় গিন্নী তাহাকে বিমুখ করিতেন না, অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় প্রয়োজনমত টাকা কর্জ্জ দিতেন। তাহার পর পৌষমাসে তাহাদের ক্ষেতে-খামারে যখন ধান উঠিত, তখন তিনি হাজার কায ফেলিয়া, এমন কি, এক এক দিন নিজের খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও লক্ষ্য না করিয়া, খামারে গিয়া চাপিয়া বসিতেন এবং আসল না পাইলেও সুদের টাকার ধান মাপিয়া লইয়া তবে উঠিয়া আসিতেন। চাষ-আবাদের সময় তিনি প্রত্যেক খাতককে ডাকাইয়া বলিয়া দিতেন, "বেশ ভাল ক'রে জমী আবাদ করবে। টাকার দরকার হয়, নিয়ে যাও। কিন্তু ফসল ভাল না হ'লে এর পর হাত পাতলে একটি কাণা কড়িও আমি দিতে পারবো না।"

সুদ রেহাই না পাইলেও শুধু অসময়ে হাত পাতিলেই টাকা পাওয়ার জন্য খাতকরা বড় গিন্নীর অনুগত হইয়া থাকিত।

শুধু খাতকদের প্রতি নয়, সংসার সম্বন্ধেও বড় গিন্নীর কঠোরতা বড় কম ছিল না। প্রাত্যহিক বাজার-খরচের জন্য তিনি আটটি পয়সার বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাতে কাহারও পেট ভরুক আর নাই ভরুক। কুটুম্ব-সজ্জন আসিলেও তাহাতেই চালাইতে হইত; তজ্জন্য তিনি আর একটি পয়সাও বাহির করিতেন না। নুণ-তেল মাস কাবারে যাহা আনিয়া দিতেন, তাহাতেই সারা মাসটি চালাইতে হইত। গোলাভরা ধান, কিন্তু গোলার চাবী বড় গিন্নীর হাতে। নিজে চাবী খুলিয়া বসিয়া থাকিয়া চাকরের দ্বারা দুই মাস বা তিন মাসের ধান হিসাব করিয়া মাপিয়া পাড়িয়া দিতেন। কখন যদি কিছু অকুলান পড়িত, তাহা হইলে তিনি ছোট বৌকে শাসাইয়া বলিতেন, "যা কম পড়েছে, তা হয় তোমার বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এস, নয় কার্ত্তিক বাবুকে বল, তিনি রোজগার ক'রে এনে

দিবেন। তুমি যে ধান-চাল বেচে ভাল মাছ খাবে, বেশী বাজার করবে, রঘুনাথজী তা যোগাতে পারবেন না।"

ছোটবৌ তাঁহার পায়ে হাত দিয়া শপথ করিলেও বড় গিন্নী কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না যে, ছোটবৌ ধান-চাল বাজে নষ্ট করে নাই।

বড় গিন্নীর এই কঠোরতায় বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিক যদি বলিত, "আচ্ছা বৌদি, তুমি যে এতটা টানাটানি ক'রে পয়সা জমাচ্ছো, তুমি ম'লে এই পয়সা ভোগ করবে কে?"

বড় গিন্নী রাগে মুখ বিকৃত করিয়া বলিতেন, "ভোগ করবে তুমি। তখন তুমি দু'হাতে পয়সা উড়িয়ে দিও, আমি দেখতেও আসবো না, বারণও করবো না। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে সেটি হবে না। ঠাকুরের গচ্ছিত ধন নিয়ে তোমাদের বাবুয়ানা চলবে না।"

বড় গিন্নী নিজে এক সন্ধ্যা এক মুঠা আলো-চাল ফুটাইয়া খাইতেন, সুতরাং তাঁহার নিজের খরচের সম্বন্ধে কোনই বালাই ছিল না।

২

"হাঁ গা ছোট গিন্নি, বলি তোমাদের মতলবখানা কি?"

ছোটবৌ মালতী ভীতিবিনম্র স্বরে উত্তর দিল, "আমাদের কি মতলব, দিদি?"

ক্রোধগম্ভীরস্বরে বড় গিন্নী বলিলেন, "তোমাদের মতলব হচ্ছে, আমাকে ফতুর ক'রে দেশত্যাগী করা। তা আমি দেশত্যাগী হ'লে তোমাদের কি সুখটা হবে শুনি? তোমাদের কি আর দুটো হাত বেরোবে?"

শঙ্কা-বিবর্ণ মুখে মালতী বলিল, "কেন দিদি, আমি কি করেছি?"

মুখখানাকে অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "করেছ খুবই ভাল কায। পরের পয়সায় দানছত্র বসিয়ে পুণ্যি সঞ্চয় ক'রে নিচ্ছো। তা পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খেলে তাতে পুণ্যি হয় না, ছোটবৌ, বরং পাপই হয়। বিশেষ আবার দেবতার পয়সা।"

এতক্ষণে মালতী বুঝিতে পারিল, সে কি অপরাধ করিয়াছে। মধ্যাহ্নকালে জনৈক ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর সকাতর প্রার্থনায় তাহাকে এক মুঠা ভাত দিয়াছে। সে সময়ে বড় গিন্নী প্রায়ই ঠাকুরঘরে বসিয়া জপ-আহ্নিকে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু আজ কি জানি কেন, সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিজে ভিখারীকে আহার করিতে দেখিয়াছিলেন। দেখিলেও সে সময়ে তিনি কিছুই বলেন নাই; সারাদিন গুম্ হইয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর মালা জপিতে জপিতে সে কথাটার উত্থাপন করিয়াছেন। মালতী জানিত, এরূপে ভাত-মুড়ীর অপব্যয় বড় গিন্নীর দৃষ্টিতে বিষম অপরাধ বলিয়া গণ্য। ভিখারী আসিলে তাহাকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহার উপর ভাত দাও, মুড়ী দাও, পয়সা দাও, কাহার কাপড় নাই, তাহাকে একখানা ছেঁড়া কাপড় দাও, এ সব যেন বাড়াবাড়ি। বড় গিন্নী এই সকল বাড়াবাড়ির দিক দিয়া যাইতেন না। মালতী কিন্তু থাকিতে পারিত না। গরীব-দুঃখীর সকাতর অনুনয়-বিনয়ে তাহার প্রাণটা স্বতই বিচলিত হইয়া উঠিত এবং বড় গিন্নার সরোষ তিরস্কার বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাকে লুকাইয়া, ঘরে যাহা থাকিত, তাহাই দিয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধাশান্তি করিয়া দিত। কত দিন কত গরীব ভিখারীকে খিড়কী দরজার আড়ালে বসাইয়া নিজের ভাতগুলি তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার পর ধরা পড়িয়া বড় গিন্নীর নিকট কঠোরভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে—হইলেও মালতী কিন্তু নিজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। এই স্বভাবের বশে আজও সে এক জন ভিখারীকে খাইতে দিয়া বড় গিন্নীর নিকট অপরাধী হইয়াছে।

অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া মালতী শঙ্কাজড়িত স্বরে উত্তর করিল, "কি করি দিদি, খেতে পাই না ব'লে ভিখারীটা কাঁদতে লাগলো। তা বলি, দুকুর বেলা—"

রোষবিকৃত মুখে বড় গিন্নী বলিলেন, "হাঁ, দিন দুই আগেও দুকুরবেলা একটা পাগলীকে বসিয়ে চব্যচুষ্য খাওয়ালে, আজও দুকুরবেলা ভিখারীটার পাতে সেরখানেক চালের ভাত ঢেলে দিলে। ভাল, এই ভাতগুলো আসে কোথেকে ছোটবৌ?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। বড় গিন্নী তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মনে ক'রো না ছোটবৌ, তোমাদেরই দয়ার শরীর, আর আমার শরীরটা লোহা দিয়ে তৈরী। তুমি দয়ায় টলে গিয়ে এক জনকে ভাত ঢেলে দিলে, কিন্তু আমি মনে করলে রোজ এমন দশটা ভিখিরীকে ভাত দিতে পারি। কিন্তু সে ক'দিন? তার পর নিজেরা এক মুঠো

ভাতের তরে কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াব? শুধু দয়া করলেই হয় না দিদি, আগাগোড়া ভেবে দয়া কত্তে হয়।"

মালতী বলিল, "তা আমি ভিখিরীর জন্তে ত আলাদা চাল নিই নাই, দিদি। আমার যে ভাত ছিল, তাই তাকে দিয়েছি।"

তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বড় গিন্নী বলিলেন, "ভারী বাহাদুরীই করেছ! নিজের ভাত এক জন ভিখিরীকে খাইয়ে নিজে উপোস দিয়ে রয়েছ, এ কি কম বাহাদুরীর কায! তা জিজ্ঞেস করি, ও-বেলা উপোস দিয়েছ, কিন্তু এ বেলা খাবে ত?"

মাল। এ বেলা খাব না কেন?

বড়। তা হ'লেই এ বেলা সুদে আসলে ও-বেলাকার উপোস পুষিয়ে নেবে। পুষিয়ে নেবে কি, হয় ত মুড়ী, চালভাজা, কলাইভাজা দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছ। যে যত উপোস দিয়ে থাকে, তা আমি ছোটবৌ, বেশ জানি। রঘুনাথের কৃপায় ঘরে ত ধানচালের অভাব নাই। সময়ে সময়ে চাল দিয়ে দোকান থেকে এক সের আধ সের মুড়কীও আসে, এ খবরও আমি রাখি, ছোটবৌ।

কাঁদ-কাঁদ মুখে মালতী বলিল, "আমি চাল দিয়ে দোকান থেকে মুড়কী আনিয়ে খেয়েছি, দিদি?"

উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "আজ যে তুমি আনিয়ে খেয়েছ, এমন কথা কি ক'রে বলবো বল। আমি ত আনতে দেখি নাই। তবে মাঝে মাঝে এই রকম আসে, তাই বলছি।"

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে মালতী বলিল, "আমি যদি কোন দিন চালধান দিয়ে মুড়কী আনিয়ে খেয়ে থাকি, তবে যে মুখে খেয়েছি, সেই মুখ খ'সে যাবে। যে হাতে চাল-ধান মেপে দিয়েছি, সেই হাতে কুষ্ঠব্যাধি হবে।"

ধীরগম্ভীর স্বরে বড় গিন্নী বলিলেন, "আমি ত তোমাকে অত দিব্যি-দিলেসা কত্তে বলছি না। তবে আমার কথা এই, রেখে ঢেকে খাও, তোমাদেরই থাকবে। আমি আর ক'দিন, বয়স ত চারের কোঠা পার হয়ে গিয়েছে। এখন গেলেই হ'লো। তবে যদ্দিন না যাবার সময় হয়, তদ্দিন থাকতেই হবে, আর লোকের শাপ-মন্যিও কুড়ুতে হবে আমাকে। কপাল আমারই!"

নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণে বড় গিন্নী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মালা ঘুরাইতে থাকিলেন। মালতী ধীরে ধীরে নিজের কাযে চলিয়া গেল।

৩

একটু পরেই কার্ত্তিক বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "বৌদি!"

"কে রে, কার্ত্তিক?"

"হাঁ, রাজু সরকারটা ম'রে গেল, বৌদি।"

চমকিতভাবে বড় গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা, রাজু সরকার ম'রে গেল! কেন, কি অসুখ হয়েছিল তার?"

কার্ত্তিক বলিল, "অসুখ এমন কিছু নয়। দু'দিন একটু একটু জ্বর হচ্ছিল। আজ বিকেলেও উঠে হেঁটে বেড়িয়েছে। সন্ধ্যার সময় বল্লে, বুকের ভিতরটা কেমন কচ্ছে। ব'লে যেমন শুয়ে পড়া, অমনই শেষ।"

বড় গিন্নী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি রে, শুলো আর মলো! আহা, একেই বলে মানুষের জীবন পদ্মপাতার জল, এই আছে, এই নাই। রঘুনাথ, তুমিই সত্য।"

কয়েকটা মালা ঘুরাইয়া বড় গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজুর কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে না?"

কার্ত্তিক বলিল, "কিছু কেন, এক শো'র কাছাকাছি।"

চিন্তাগম্ভীর মুখে বড় গিন্নী বলিলেন, "তাই ত, টাকাগুলো ডুবে যাবে না কি? রাজুর দু'টি ছেলে আছে না?"

কার্ত্তিক বলিল, "আছে, কিন্তু দু'টিই নাবালক। একটির বয়স বছর দশ, একটির বয়স বছর ছয়।"

কুঞ্চিত মুখে বড় গিন্নী বলিলেন, "যাক্, রঘুনাথের মনে যা আছে, তাই হবে।"

কার্ত্তিক বলিল, "তা ত হবে, এখন লোকটার যে গতি হয় না।"

বড়। গতি হয় না কেন?

কার্ত্তি। পয়সার অভাবে। ওর না কি আট দশ বছর আগে একবার অর্শের ব্যারাম দেখা দিয়েছিল। সে ব্যারাম সেরে গিয়েছে অনেক দিন, কিন্তু সবাই বলছে, প্রায়শ্চিত্ত না করলে কেউ মড়া ছোঁবে না। প্রায়শ্চিত্তও বড় কম নয়। টোলে জানতে গিয়েছিলাম। হারু ভট্টচায্যি বল্লে, ত্রিশ কাহন প্রায়শ্চিত্ত। তা হ'লে ত্রিশ কাহনে ত্রিশ সিকে সাড়ে সাত টাকা। ওর ঘরে কিন্তু সাড়ে সাতটা পয়সা নাই।

গম্ভীরভাবে বড় গিন্নী বলিলেন, "হুঁ:।"

কার্ত্তিক বলিল, "রাজুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে খান দুই থালা, একটা পিতলের কলসী, দুটো ঘটী বের ক'রে দিয়ে আমাকে ধরলে এইগুলো কোথাও রেখে প্রায়শ্চিত্তের টাকাটা জোগাড় ক'রে দাও, ঠাকুরপো। তা রেতের বেলা পেতল-কাঁসার বাসন নিয়ে কোথায় যাব? তাই বলেছি, বৌদিকে আগে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।"

দ্রুত মস্তকসঞ্চালনে অসম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বড় গিন্নী ব্যস্ততা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "না না, ও সব পেতল-কাঁসার বাসন আমি রাখি না। ওতে অনেক ঝঞ্ঝাট। সোনা-রূপো হলেও না হয় দেখা যেতো।"

ঈষৎ হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল, "সোনা-রূপোর গন্ধও ওদের ঘরে নাই।"

মুখ বাঁকাইয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "নাই, তা আমি করবো কি?"

কার্ত্তিক বলিল, "তুমি কিছু না করলে মড়াটার যে গতি হয় না বৌদি।"

দৃঢ়স্বরে বড় গিন্নী বলিলেন, "গতি হোক্ আর নাই হোক, ও সব পেতল-কাঁসার বাসন রেখে আমি টাকা দিতে পারবো না।"

একটু ভাবিয়া কার্ত্তিক বলিল, "আচ্ছা, সোনা-রূপো রাখলে দিতে পারবে ত? তা হ'লে আমার এই আংটাটা রেখে দশটা টাকা দাও।"

কঠোর দৃষ্টিতে কার্ত্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া বড় গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরের জন্যে তুই নিজের আংটী বাঁধা রাখবি?"

জোরে মাথা নাড়িয়া কার্ত্তিক উত্তর করিল, "হাঁ ত। নইলে লোকটার যে গতি হয় না।"

বড় গিন্নী ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তার গতি হ'লো না, সে জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন বল্ ত?"

কার্ত্তিক বলিল, "মাথাব্যথা এই জন্যে যে, সে-ও মানুষ, আমিও মানুষ। আজ রাজু সরকার মরেছে, কাল আমাকেও মরতে হবে।"

ক্রোধকঠোরকণ্ঠে বড় গিন্নী বলিলেন, "মরতে হয়, যেখানে ইচ্ছে গিয়ে মর। আমার কাছে কিছু হবে না।"

মতে পোদ্দারের কাছেই যেতে হ'লো। আংটীটা রাখলে সে তখনই দশটা টাকা দেবে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তা দেবে না কেন? একশো টাকা দামের আংটী রেখে দশটা টাকা কে না দেবে? কিন্তু তার পর ওটা ছাড়াবি কি ক'রে?"

উপেক্ষার স্বরে কার্ত্তিক বলিল, "ছাড়াতে পারি ছাড়াব, না হয় যাবে।"

বড় গিন্নী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "যাবে! অমন দামী আংটীটা দশ টাকার জন্যে খুইয়ে ফেলবি?"

ঈষৎ হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল, "যদিই খুইয়ে ফেলি, তাতেই বা কি এমন ক্ষতি বৌদি? লোকের এমন বিপদে যার দশটা টাকা সাহায্য করবার শক্তি নাই, একশো টাকা দামের আংটী হাতে ঝুলিয়ে বেড়ানো, তার পক্ষে খুব লজ্জার কথা নয় কি?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "আচ্ছা, আংটীটা না হয় আমিই রাখছি। কিন্তু আজ যে লক্ষ্মীবার, টাকা দেব কি ক'রে?"

সহাস্যে কার্ত্তিক বলিল, "লক্ষ্মীবারে তুমি মারা গেলে সিন্দুক থেকে টাকা বা'র করে নাই ব'লে তোমার বোধ হয় গতি হবে না, বৌদি।"

ক্রোধ ও বিরক্তিতে মুখখানাকে কুঞ্চিত করিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "দেখ্ কার্ত্তিক, আজকাল তুই বড়ই বেয়াড়া হয়ে উঠেছিস্। তোর দেখাদেখি ছোটবৌটাও সব শিখ্ছে। এমন করলে কিন্তু আমি পেরে উঠবো না।"

কার্ত্তিক বলিল, "না পেরে ওঠো, সে তখন বোঝা যাবে। এখন টাকাটা দিতে হয় ত শীগ্‌গীর দাও।"

বড় গিন্নী কার্ত্তিকের আংটী লইয়া দশটা টাকা আনিয়া দিলেন। টাকা পাইয়া কার্ত্তিক এক প্রকার ছুটিয়া চলিয়া গেল। বড় গিন্নী মাথা হাতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কার্ত্তিক ও ছোটবো উভয়েই যেরূপ অপব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ইহাদের পরিণাম কি হইবে? ইহাদিগকে ত একটু শিক্ষা না দিলে চলে না? কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হইবে কি প্রকারে? এক উপায়—উহাদিগকে নিজে দেখিয়া শুনিয়া খাইতে বলা। দিন কতক দেখিয়া শুনিয়া খাইতে হইলেই পয়সা যে কি জিনিষ, তাহা

শুনিয়া খাইতে বলিলেই আলাদা করিয়া দেওয়া হইল। বড় গিন্নী প্রাণ ধরিয়া কার্ত্তিককে কিরূপে আলাদা করিয়া দিবেন? দিলেও উহারা কষ্ট পাইলে তাহা চোখে দেখিতে পারিবেন কি? কিন্তু ইহা ছাড়া শিক্ষা দিবার অন্য উপায় ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রঘুনাথ, একটা উপায় আমাকে দেখাইয়া দাও!

৪

আহ্নিক শেষ করিয়া বড় গিন্নী নিজের হবিষ্যান্ন চাপাইতে যাইতেছিলেন, কার্ত্তিক ভাত খাইতে বসিয়াছিল, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "একটা কথা শুনে যাও বৌদি!"

"কি কথা রে?" বলিয়া বড় গিন্নী রান্নাঘরের দাবার নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কার্ত্তিক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমার খাতা-পত্র সব বুঝে নাও বৌদি!"

বড় গিন্নী কতকটা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে, খাতা-পত্তর বুঝে নেব কেন?"

কতকগুলা ভাত কোলের দিকে টানিয়া লইয়া নতমুখে তাহা মাখিতে মাখিতে কার্ত্তিক উত্তর করিল, "আমাকে বিদেশে যেতে হবে।"

"বিদেশে কোথায় যাবি?"

"কোথায়, তা এখন ঠিক বলতে পারি না। আপাততঃ কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা দেখবো।"

সবিস্ময়ে বড় গিন্নী বলিলেন, "চাকরী করবি তুই?"

কার্ত্তিক মাথাটা একটু হেলাইয়া উত্তর করিল, "তাবেই। পুরুষমানুষ, দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা না ক'রে শুধু শুধু ব'সে খাব?"

বড় গিন্নীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাল কথা। পুরুষমানুষের পয়সা রোজগারের চেষ্টা করাই দরকার। এই যে তোর দাদা যা হয় দু কাঠা পাঁচ কাঠা ক'রে গিয়েছে, সে ত নিজে রোজগার ক'রে। নইলে আমার শ্বশুরের কি ছিল? তবে রোজগারের মত রোজগার কত্তে পারলে হয়।"

কার্ত্তিক বলিল, "দাদার মত রোজগার আমি কি কত্তে পারবো? তবে নিজের পেটটা চালিয়ে মাসে দুটো টাকা

"কেন রে, এখানে থেকে কি তোর পেট চলছে না?"

"পেট চলছে, কিন্তু একটা পয়সার দরকার হ'লে পরের কাছে হাত না পাতলে উপায় নাই।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "তা বটে, পরের কাছে হাত পাতা লজ্জার কথা বৈ কি। তবে দরকারের মত দরকার হ'লে হাত পাততে হয় না, বাজে দরকার হ'লে হাত পাতলেও পাওয়া যায় না।"

কুঞ্চিত মুখে কার্ত্তিক বলিল, "তুমি যেটাকে বাজে দরকার মনে কর বৌদি, আমি সেটাকে আসল ব'লে মনে করি। সকল লোকের মন সমান নয় জান ত।"

একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "জানি বৈ কি। তা হ'লে ছোটবৌকে, ছেলেপিলেদের নিয়েও যাচ্ছিস্ ত?"

কার্ত্তিক বলিল, "ওদের কোথায় নিয়ে যাব? আমি কি দু'শো পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী কত্তে যাচ্ছি যে, স্ত্রী-পুত্র সব সঙ্গে নিয়ে যাব?"

"তা হ'লে একাই যাবি?"

"হাঁ।"

"বেশ। তবে আমি মনে কচ্ছিলাম যে, বেশী না হোক, একবার গয়া, কাশী, বিন্দাবনটা ঘুরে আসবো। তা তুই যখন বিদেশে যাচ্ছিস্, তখন আমি আর যাব কি ক'রে?"

ঈষৎ হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল, "তুমি ত অনেক দিন থেকেই যাব যাব কচ্ছো বৌদি, কিন্তু যাচ্ছো কৈ?"

মুখখানাকে ভারী করিয়া অভিমানগম্ভীরকণ্ঠে বড় গিন্নী বলিলেন, "তোদের ত ইচ্ছে, এক্ষুনি যাই। আমি হয়েছি সংসারের মত পাপ; এ পাপ বিদেয় হলেই তোরা বেঁচে যাস্। কিন্তু তোদের ইচ্ছে ব'লে আমি যাব বললেই যেতে পারি না। আমাকে সকল দিক্ গুছিয়ে তবে যেতে হবে।"

কার্ত্তিক বলিল, "বেশ, তুমি সকল দিক্ গুছিয়ে নিয়ে আমাকে খবর দিও। আমি না হয় দু মাস এসে ঘরে থাকবো।"

কতকটা ক্রোধ—কতকটা অভিমানপ্রদীপ্ত কণ্ঠে বড় গিন্নী বলিলেন, "তোমাকে ঘরে থাকতে হবে না। যেতে হয়, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে যাব।"

গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন এবং উনান জ্বালিয়া হবিষ্যান্ন চাপাইয়া দিলেন।

বড় গিন্নী নিজের হবিষ্যান্ন নিজেই রাঁধিয়া খাইতেন। ছোটবৌ ছেলের মা, হাজার শুদ্ধাচারে থাকিলেও সে নোংরা না হইয়াই থাকিতে পারে না। কাযেই বড় গিন্নী তাহার হাতের জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। বলা বাহুল্য, বড় গিন্নী কতকটা শুচিবায়ুগ্রস্তা ছিলেন। স্পর্শ-দোষটাকে তিনি ভয়ানক ভয় করিয়া চলিতেন। ছেলে-পিলেদের তাঁহার কাছে ঘেঁষিবার যো ছিল না, যেখানে রাঁধিয়া খাইতেন, তাহার ত্রিসীমায় কাহাকেও যাইতে দিতেন না। রাস্তায় চলিবার সময় পথের প্রত্যেক ধূলিকণাটুকুকে পর্য্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া তবে পদক্ষেপ করিতেন। পাদস্পৃষ্ট কোন একটা পাতা-কুটির মধ্যে অপবিত্রতার সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া আসিয়া আপনাকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন।

হবিষ্যান্ন চাপাইয়া দিয়া বড় গিন্নী দেখিলেন, নুণের বাটীতে নুণ নাই। তিনি সৈন্ধব লবণ খাইতেন। হাট-পাড়ার দোকান ছাড়া সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায় না। এত বেলায় সেখান হইতে কে নুণ আনিয়া দেয়? কার্ত্তিককে অনুরোধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। চাকরটাও মাঠে রহিয়াছে। পোড়া পেটে আগুন লাগুক! আজ নুণ ব্যতিরেকেই আহার সম্পন্ন করিবেন। ভারী ত খাওয়া! এক মুঠা আলো চালের ভাত, আর আধ-খানা কাঁচাকলা এবং এক মুঠা মটর-দাল ভাতে। কিন্তু ইহাই খাইয়া ত দিন-রাতটা কাটাইতে হইবে। রাত্রিতে রঘুনাথের প্রসাদী দুধ এক পোয়া আর একটু গুড়মাত্র সম্বল। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাইলে নিজেকেই যে ঠকিতে হইবে। রাত্রিতে বড় গিন্নী দুইটা পয়সা লইয়া বাহির হইলেন এবং পাড়ার নিমু ঘোষের ছেলে সতীশকে রঘুনাথের প্রসাদী বাতাসা দুইখানা দিবার লোভ দেখাইয়া নুণ আনিতে পাঠাইয়া দিলেন।

সতীশকে পাঠাইয়া দিয়া বড় গিন্নী ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন; বাড়ীর দরজার কাছাকাছি আসিলে জনৈকা মলিনবেশা জীর্ণ-ছিন্ন-বসনা রমণী এক শীর্ণকায় বালকের হাত ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিতান্ত আমরা খেতে পাই না মা। এক মুটো ভাত দিয়ে আমা-দের জান্ বাঁচাও।"

কঠোর দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া বড় গিন্নী বলি-লেন, "হাঁ, ভাত অম্নি রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে, দিলেই হলো। যা যা মাগী, স'রে যা।"

মাগী কিন্তু সরিল না; অধিকতর কাতরতা সহকারে বলিল, "দোহাই মা, আমাকে না দাও, আমার এই ছেলে-টিকে একটি মুঠো ভাত দাও মা। নইলে এ আর বাঁচবে না। কাল থেকে এর পেটে কিছু পড়ে নি।"

রুক্ষ কণ্ঠে বড় গিন্নী বলিলেন, "পেটে কিছু পড়ে নি, তাই আমাকে পেট ভ'রে ভাত দিতে হবে। কেন, দোরে দোরে মুষ্টি ভিক্ষে করলে ত পারিস্।"

রমণী বলিল, "রোজগারী মারা যাবার পর তাও সুরু করেছিলুম মা। কিন্তু কে রোজ রোজ ভিক্ষে দেবে? দু' চার দিন দিয়ে সব্বাই জবাব দিলে, তুই মুচীর মেয়ে, তোকে রোজ রোজ ভিক্ষে দিয়ে লাভ কি? বামন-বোষ্টমকে দিলে ফল আছে।"

মুচীর মেয়ে শুনিয়া বড় গিন্নী আতঙ্কে যেন শিহরিয়া উঠিলেন; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আ মরণ, মুচীর মেয়ে তুই, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিস্? স'রে যা মাগী, স'রে যা, দূর হ।"

বড় গিন্নীর গর্জ্জনে ভীত হইয়া রমণী তাড়াতাড়ি করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া ছেলেটার হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটা একে অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর অন্য-মনস্ক থাকায় মাতার আকস্মিক আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া ধুপ করিয়া মাটীর উপর পড়িয়া গেল। পতন-কালে তাহার হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগটা যেন বড় গিন্নীর পরিধেয় বস্ত্রকে স্পর্শ করিল। বড় গিন্নী রাগে জ্বলিয়া উঠি-লেন। তিনি রাগে যাহা মুখে আসিল, তাহাই মুচীর ছেলেটার অপরাধের দণ্ড দিতে থাকিলেন। ভিখারিণী রমণী যোড় হাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা গো, দৈবিতে প'ড়ে গিয়েছে। অবোধ ছেলেকে শাপ-মন্যি দিও না মা।"

কিন্তু তাহার কাতরোক্তি কে শুনে? বড় গিন্নী সে অবোধ ছেলেটার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিতে করিতে স্নান

স্নান করিয়া ফিরিবার সময় বড় গিন্নী দেখিলেন, মুচীর মেয়েটা তাঁহাদের পুকুরধারে জামতলায় গিয়া বসিয়াছে। সে কতকগুলা কাঁচা জাম পাড়িয়া ছেলেটাকে খাইতে দিয়াছে। ছেলেটা যেন উপাদেয় বোধে তাহাই স্বচ্ছন্দে চিবাইয়া খাইতেছে। তাহাদের দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বড় গিন্নী বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

শুচিবায়ুগ্রস্তার স্নান বড় সত্বর সম্পন্ন হয় না। খুব তাড়াতাড়ি করিয়া শেষ করিলেও আধ ঘণ্টার এ দিকে তিনি ফিরিতে পারিলেন না। তিনি উনানে ভাত চাপাইয়া গিয়াছিলেন। ততক্ষণে ভাত ধরিয়া পুড়িয়া গিয়াছিল; পোড়া ভাতের দুর্গন্ধে বাড়ীখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল। মালতী ইহা জানিতে পারিলেও উহার প্রতীকারে সাহসী হয় নাই। হাড়ী নামানো বা হাঁড়ীতে জল দেওয়া দূরের কথা, সে উনানের কাছে গেলেই বড় গিন্নীর আর খাওয়া হইবে না। কাজেই ভাত ধরিয়া পুড়িয়া গেলেও সে চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বড় গিন্নী ঘরে ফিরিলে মালতী ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ভাত চাপিয়ে দিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে দিদি? তোমার ভাত যে ধ'রে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।"

বিরক্তিসূচক স্বরে বড় গিন্নী বলিলেন, "যমের ঘরে গিয়েছিলাম, আর যাব কোথায়? যম যে আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুলোয় যাক ভাত! যেমন পোড়ারমুখো দেবতা, তেমনই তার ছাই আঙার নৈবিদ্যি।"

সে ভাতগুলো ফেলিয়া দিয়া পুনরায় ভাত চাপাইবার জন্য মালতী তাঁহাকে অনুরোধ করিল। বড় গিন্নী কিন্তু তাহা শুনিলেন না। বলিলেন, "হ্যা, এই আধ সের চাল পুড়িয়ে ফেললুম, আবার আধ সের চাল চাপাতে যাই। তার ওপর বেলা তিন পহর হয়ে গেল। তার পর ভাত চড়িয়ে সন্ধ্যে বেলা খেতে যাব। চুলোয় যাক খাওয়া—পেটে দ পড়ুক!"

বড় গিন্নী সেই পোড়া ভাতই ঢালিয়া লইয়া খাইতে বসিলেন। কিন্তু দুই এক গ্রাসের বেশী মুখে তুলিতে পারিলেন না; দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিল। বড় গিন্নী চোখের জল চোখে চাপিয়া ভাতগুলো পুকুরের জলে ঢালিয়া দিতে চলিলেন।

যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এই আধ সের চাউলের ভাত জলে ঢালিয়া না দিয়া সেই মুচীর মেয়েটাকে দিলে ক্ষতি কি? ইহাতে তাহাদের পেট ভরিবে, চাউলগুলারও অপচয় হইবে না। কিন্তু এমন ভাত তাহারা খাইতে পারিবে কি? যদি পারে, তাহা হইলে বুঝিব, হাঁ, তাহাদের ক্ষুধা সার্থক।

বড় গিন্নী ঘাটের ধারে গিয়া দেখিলেন, মেয়েটা তখনও জামগাছের তলায় বসিয়া রহিয়াছে। ছেলেটা মায়ের কোলে মাথা দিয়া কাঁচা জাম চিবাইতেছে। বড় গিন্নী তাহাদিগকে ডাকিয়া পোড়া ভাত খাইবার কথা বলিলে রমণী আনন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইল। সে কাপড়ের আঁচল দিয়া একটু যায়গা পরিষ্কার করিয়া লইলে বড় গিন্নী সেইখানে ভাতগুলা ঢালিয়া দিলেন। ঢালিয়া দিবামাত্র তাহারা এমন আগ্রহ সহকারে সেই পোড়া ভাতগুলা উদরস্থ করিতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে বড় গিন্নী যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। ওঃ, মানুষের ক্ষুধার তাড়না কি ভয়ানক! পেটের জ্বালায় ভালমন্দ, সুখাদ্য-কুখাদ্য কোনই জ্ঞান থাকে না!

দেখিতে দেখিতে ভাতগুলা নিঃশেষ করিয়া ছেলেটা উৎসুক দৃষ্টিতে বড় গিন্নীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার যেন ইচ্ছা, এইরূপ পোড়া ভাত আরও দুই মুঠা পাইলে ভাল হয়।

বড় গিন্নী হাত-মুখ না ধুইয়াই পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মালতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হাঁড়ীতে ভাত আছে ছোটবৌ?"

"আছে। কেন দিদি?"

"থাকে ত শীগ্‌গীর নিয়ে আয়।"

মালতী দুই জনের পরিমিত ভাত লইয়া গিয়া বড় গিন্নীর আদেশমত ভিখারিণীর সম্মুখে ঢালিয়া দিল। ভিখারিণী মাতাপুত্রে ভাতগুলা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং একটা আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তৃপ্তিপরিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আঃ, বাঁচালে মা!"

বড় গিন্নী একদৃষ্টে তাহাদের তৃপ্তিপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিতে চাহিতে তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটা আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি রজতমুদ্রার ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া মনে করিতেন, এমন মিষ্ট শব্দ পৃথিবীতে আর নাই আজ কিন্তু

ভিখারিণীর মুখে "আঃ, বাঁচালে মা" কথাটা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, এমন শ্রুতিমধুর শব্দ জীবনে তিনি শুনেন নাই, রজতমুদ্রার সুমিষ্ট ঝনৎকার ইহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। ঐ দীনহীন অতিথি দুইটির মুখে যে একটু তৃপ্তির হাসি দেখা দিয়াছে, মার্জ্জিত স্বর্ণালঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য উহার নিকট ম্লান হইয়া যায়। বড় গিন্নী নীরবে দাঁড়াইয়া জীবনে প্রথম অনুভূত এই সুখের আস্বাদটা যেন প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ভিখারিণী রমণী দাতার জয়গান করিতে করিতে শিশু-পুত্রের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। বড় গিন্নী চিন্তিতমনে কাপড় কাচিয়া ঘরে ফিরিলেন।

৬

সেই রাত্রিতে বড় গিন্নী স্বপ্নে দেখিলেন, রঘুনাথ আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আজ তুই আমার বেশ সেবা করেছিস্ চাঁপা, আমি তোর উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।"

বড় গিন্নী ঈষৎ শঙ্কিতভাবে উত্তর করিলেন, "আজ তোমার সেবার ত্রুটি হয়েছে ঠাকুর। দুধটা ভাল জ্বাল দেওয়া হয়নি, বাতাসাগুলোও পিঁপড়ের ঝাঁঝ্রা ক'রে ফেলেছিল।"

রঘুনাথ ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "তুই কি মনে করিস্ চাঁপা, উত্তম জ্বাল দেওয়া দুধ হ'লে বা ভাল বাতাসা-সন্দেশ দিলেই আমার সেবা হয়?"

ভয়ে ভয়ে বড় গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কিসে তোমার ভাল সেবা হয় ঠাকুর?"

রঘুনাথ বলিলেন, "আমার সেবা হয় দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। তুই আজ যা করেছিস্।"

"বুঝতে পারি না। আমি আজ কি করেছি ঠাকুর?"

"আজ তুই দু'জন ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীকে পেট পূরে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিস্।"

"গরীব ভিখারী দুটোকে ভাত এক মুঠো খাইয়েছি, তাতে তোমার সেবা কিসে হ'লো ঠাকুর? ভিখারী দুটো ত জাতে মুচী।"

"মুচী তোদের কাছে, আমার কাছে নয়। আমার কাছে মুচী বামুন সব সমান। মুচীই হোক, চাঁড়ালই এক মুঠা খেতে চাইলে—তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে এসে একটু জল চাইলে তাকে যদি এক মুঠা ভাত বা একটু জল দিস্, তাতে আমার যে তৃপ্তি হয়, ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভোগ দিয়ে আমার সাম্নে ধ'রে দিলে তাতে আমার কিছুই তৃপ্তি হয় না; সে নৈবেদ্য—সে ভোগ আমি গ্রাহ্যই করি না।"

বিস্ময় সহকারে বড় গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে তোমার এই যে পুজো, ভোগ, এ সব কিছুই নয়?"

রঘুনাথ বলিলেন, "একেবারে যে কিছুই নয়, এমন কথা আমি বলছি না। এগুলো হচ্ছে পূজারীর মনের ময়লা পরিষ্কার হবার জন্যে—তার নিজের প্রাণে ভক্তিসঞ্চারের জন্যে। কিন্তু আমার প্রকৃত সেবা হচ্ছে দরিদ্রনারায়ণের সেবা। যদি পারিস্ চাঁপা, এই রকমে সেবা ক'রে আমার তৃপ্তিসাধন কর্। নইলে শুধু দুধে জ্বাল দিলে বা ভাল বাতাসা-সন্দেশ খুঁজে আনলে তাতে আমার কিছুই তৃপ্তি হবে না।"

মেঘগম্ভীর নিনাদে কথা শেষ করিয়া রঘুনাথ অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা গাঢ় অন্ধকার আসিয়া বড় গিন্নীর দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি ভয়ে ভয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "রঘুনাথ, রঘুনাথ!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বড় গিন্নী বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ভয়ে যেন কাঁপিতে লাগিলেন।

পরদিন স্নানান্তে ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া রঘুনাথের দিকে চাহিতেই বড় গিন্নী সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, শিলামূর্ত্তিকে চিরদিন তিনি একই ভাবে দেখিয়া আসিতেছেন, আজ যেন তাহার ভাবান্তর সংঘটিত হইয়াছে—সেই জড় শিলামূর্ত্তির মধ্যে যেন এক সচেতন দেবতা আবির্ভূত হইয়া স্নিগ্ধমধুর হাস্যচ্ছটায় মন্দির আলোকিত করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ-নিঃসৃত স্বর্গীয় সৌরভে গৃহ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া বড় গিন্নীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া, দেবতার সম্মুখে মাথা কুটিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, আমি অজ্ঞান মেয়ে-মানুষ, টাকার মায়ায় আমি অন্ধ হয়ে রয়েছি। আমার সে মায়া কাটিয়ে দিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও দয়াময়!"

সেই দিন মধ্যাহ্নে কার্ত্তিক খাতা-পত্র বুঝিয়া লইবার

"আমার মনটা বড়ই অস্থির হয়ে রয়েছে। আমি ভাল মন্দ একটা ঠিক ক'রে নিই, তারপর যা হয় করা যাবে।"

৭

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বড় গিন্নী স্থির করিলেন, দূর হউক, আর কেন? ইহকাল ত গিয়াছে, এখন পরকালের পথটা ত পরিষ্কার করা দরকার। টাকা—টাকা কি তাঁহার সঙ্গে যাইবে? তবে তিনি এত টানাটানি করিয়া মরেন, কাহার জন্য? সংসারে তাঁহার কে আছে? কার্ত্তিক—সেও তো তাঁহাকে পর মনে করে। তবে পরের মায়ায় জড়াইয়া তিনি পরকাল নষ্ট করেন কেন? তিনি যাহা জমাইয়াছেন, তাহাতে কাশী বা বৃন্দাবন যেখানেই গিয়া থাকুন, সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। আর কত দিনই বা তিনি বাঁচিবেন? বড় জোর দশটা বছর। বছরে পাঁচশো টাকা খরচ হইলেও সঞ্চিত অর্থে দশটা বছর অনায়াসেই চলিয়া যাইবে। মাসে পঞ্চাশ টাকাই বা লাগিবে কেন? বড় জোর বিশ না হয় পঁচিশ। তা যতই লাগুক, টাকার জন্য তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহার পর বিষয়-সম্পত্তি—কার্ত্তিক রাখিতে পারে রাখিবে, না পারে, যাহা হইবার হইবে। তবে দেবতার নামে সম্পত্তি বেচিয়া কিনিয়া নষ্ট করিতে পারিবে না।

বড় গিন্নী কার্ত্তিকের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে কার্ত্তিক তাহাতে আপত্তি না করিয়া, বরং উৎসাহ দিয়া বলিল, "তা বৌদি, তুমি যদি ভাল বুঝে থাক, তবে তাই কর, আমি তোমার মহৎ উদ্দেশ্যে বাধা দিতে চাই না। সংকল্পে বাধা দেওয়া মহাপাপ।"

বড় গিন্নী ভাবিয়াছিলেন, কার্ত্তিক মুখে যাহাই বলুক, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সহজে সম্মত হইবে না। কার্ত্তিক যে তাঁহাকে মায়ের মতই ভালবাসে। কিন্তু কার্ত্তিকের কথায় তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। হায় রে, এই কার্ত্তিককে তিনি পেটের ছেলের মত মানুষ করিয়াছেন, ইহারই মঙ্গলের জন্য নির্ম্মমভাবে সুদের সুদ আদায় করিয়া তিনি নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছেন! নিদারুণ অভিমানে বড় গিন্নীর হৃদয়টা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; তাঁহার বৃন্দাবনবাসের সঙ্কল্পটা অধিকতর দৃঢ় হইয়া আসিল।

স্থির হইল, আষাঢ়ের মাঝামাঝি বড় গিন্নী বৃন্দাবন-তাঁহাকে রাখিয়া আসিবে এবং সঞ্চিত ৫ হাজার টাকা কোন একটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া যাহাতে তিনি মাসে মাসে প্রয়োজনীয় টাকা পাইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বড় গিন্নী বৃন্দাবনবাসিনী হইবেন শুনিয়া অনেক খাতক কার্ত্তিকের নিকট হইতে সুদ রেহাই পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; অনেকে কিন্তু বিপদে আপদে পড়িয়া হাত পাতিলেই কাহার নিকট টাকা পাইবে, ইহাই ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। তাহাদের হর্ষ বা বিষাদে কিছুই আসে যায় না। বড় গিন্নী এই অকৃতজ্ঞ সংসার হইতে দূরে চলিয়া যাইবার বাসনায় তৎপরতার সহিত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

যাত্রার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতে এমন বর্ষা নামিল যে, বর্ষার জলে মাঠ-ঘাট প্লাবিত হইয়া গেল। কার্ত্তিক এক দিন বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌদি, দামোদরের বাঁধ ভেঙ্গে কল্যাগাছা, গোবিন্দপুর, উদয়গঞ্জ—পাঁচ সাতখানা গ্রাম ভেসে গিয়েছে। কত মানুষ, কত গরু-বাছুর যে মরেছে, তার সংখ্যা নাই। যারা পেরেছে, তারা কেউ বা গাছে, কেউ বা ঘরের চালে উঠে ব'সে আছে।"

আতঙ্কে শিহরিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "বলিস্ কি রে, গাছে উঠে ব'সে আছে, তারা খাচ্ছে কি?"

কার্ত্তিক বলিল, "খাবে আবার কি ছাই-পাশ। শুধু কোন রকমে প্রাণটাকে বাঁচিয়েছে, এই মাত্র। তা বানের জল যদি দু' চার দিনের মধ্যে নিকেশ হয়ে না যায়, তা হ'লে তাদেরও মারা যেতে হবে। না খেয়ে লোকে ক'দিন বাঁচবে?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তা নৌকা-পান্সী নিয়ে গিয়ে তাদের কেউ বাঁচাবার চেষ্টা করে না?"

কার্ত্তিক বলিল, "দু' একখানা নৌকো-পান্সীর কর্ম্ম নয় ত। অন্ততঃ বারো চোদ্দখানা কি তারও বেশী দরকার। এত নৌকার ভাড়া দেয় কে? তা ছাড়া শুধু ত লোকগুলোকে নিয়ে এলেই হবে না, তাদের খেতে দিতে হবে ত?"

বড় গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দাজ কত লোক হবে?"

থেকে আসছিল, সে বলেছে, চার পাঁচশোর ত কম নয়, বেশী হ'তে পারে। নৌকো দেখে লোকগুলো এমন চীৎকার কত্তে লাগলো, সতীশ বললে, তা শুনলে পাষাণও ফেটে যায়।"

বড়। তা সতীশ নৌকো নিয়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করলে না কেন?

কার্ত্তি। একখানা নৌকো নিয়ে ক'জনকে উদ্ধার করবে?

বড়। যত জনকে পারা যায়।

কার্ত্তি। তাও কি হয়? এক একটা গাছে বিশ পঞ্চাশ জন লোক ব'সে রয়েছে। নৌকো সেখানে গেলে সকলেই হুড়মুড় ক'রে নেমে নৌকায় উঠবার চেষ্টা করবে। শেষে কি সতীশ নৌকোশুদ্ধ ডুবে মরবে?

বড় গিন্নী নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক বলিল, "তোমার ত পরশু যাওয়া হচ্ছে। তা হেঁটে যাবার ত উপায় নাই। আমি নৌকা একখানা ঠিক ক'রে এলুম। ইছেপুর ইষ্টিশনে পৌঁছে দেবে, দেড় টাকা ভাড়া নেবে।"

বড় গিন্নী সে কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "তুই এক কায কত্তে পারবি কার্ত্তিক?"

"কি কায বৌদি?"

"যতগুলো নৌকায় দরকার, ভাড়া ক'রে এই লোক-গুলোকে আজ সন্ধ্যায় এ দিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে পারবি তুই?"

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বড় গিন্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক যেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল, "তা পারবো না কেন বৌদি? তবে শুধু তাদের নিয়ে এলেই ত হ'লো না, সেই পাঁচ সাতশো লোককে খেতে দেওয়া—"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সে জন্তে তোকে ভাবতে হবে না, তার ব্যবস্থা আমি করবো। পাঁচ হাজার টাকায় এই লোকগুলোর আট দশ দিনের খোরাক হবে না?"

মাথা নাড়িয়া কার্ত্তিক বলিল, "আট দশ দিন কি, পনেরো কুড়ি দিন খেতে পাবে। কিন্তু সব টাকা খরচ ক'রে ফেললে তোমার—"

বড় গিন্নী বলিলেন, "আমার বৃন্দাবনে যাওয়া ত? বৃন্দাবনে যাওয়া এখন পায়ে রইলো। আগে ত এই মরণাপন্ন লোকগুলোকে বাঁচাই, তার পর গয়া, কাশী, বৃন্দাবন।"

* * * * * *

বন্যাপ্রপীড়িত নিরন্ন ও নিরাশ্রয় পাঁচ সাত শত লোক আশ্রয় ও অন্ন পাইয়া বড় গিন্নীর জয়গানে যখন বর্ষার মেঘ-মলিন আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল, কার্ত্তিক তখন বড় গিন্নীকে সম্বোধন করিয়া হর্ষগদগদকণ্ঠে বলিল, "আহা, বৌদি গো, তোমার দয়ায় এতগুলো লোক প্রাণে বেঁচে গেল।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "আমার দয়ায় নয়, বাবা রঘুনাথের দয়ায় বল্। আরে হতভাগা, তোরা যে ভাল খেতে ভাল পরতে পাস্ না ব'লে দুঃখু কত্তিস্। কিন্তু বাবুয়ানী ক'রে খেয়ে প'রে টাকাগুলো বরবাদে দিলে আজ এই লোকগুলো বাঁচত কি ক'রে বল্ দেখি।"

কার্ত্তিক লজ্জানত মস্তকে বড় গিন্নীর পায়ের ধুলা লইতে লইতে বলিল, "আমরা তোমাকে চিন্‌তে পারি নাই বৌদি! শক্ত পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যে এমন ঝরণা ঝ'রে যাচ্ছে, তা আমাদের জানা ছিল না।"

সহাস্যে বড় গিন্নী বলিলেন, "পাথরের বুক চিরে এ ঝরণা যিনি বইয়ে দিয়েছেন, সেই রঘুনাথকে প্রণাম ক'র কার্ত্তিক, আমাকে নয়।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

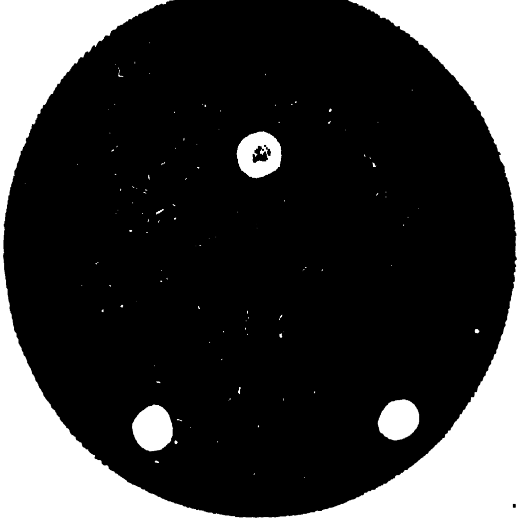
মানস-প্রিয়া

ওগো আমার মানস-প্রিয়া, আজ তুমি কোন্ গাঁয়ে?
তরুণী কিংবা নেহাৎ খুকী, কোলে কাঁকে নেয় মায়ে।
দেখতে তুমি কেমন হবে, কতই আসে কল্পনা;—
সবার সাথে তোমায় নিয়ে অনেক করি জল্পনা।
হয় ত তুমি পড়ছ কভু, বুদ্ধি আছে অতিশয়;
মাথায় তোমার মস্ত খোঁপা, অথবা চুল নেই মোটে,—
পরীর মত দেখতে হবে, কিংবা কালো বিদ্‌ঘুটে!
সব ত সবই মিথ্যা হবে, গৃহে তুমি আসবে না;—
সারা জীবন বিফল হবে মিলন-বাতি জ্বলবে না।
নাই বা হলো মধু-মিলন ওগো আমার মানসী!
যৌবন-প্রভাত মানস আলো জেলে তোমায় রূপসী!

প্যায়োরিয়া এল্‌ভিওল্যারিস্

আজকালকার দিনে সভ্য-সমাজে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকেরই দৃষ্টিপাত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দন্ত সম্বন্ধে যদি কিছু আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের দেশে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে শতকরা ৮০।৯০ জনেরও অধিক লোক প্যায়োরিয়া এল্‌ভিওল্যারিস্ (Pyorrhoea Alveolaris) নামক দন্তরোগে ভুগিয়া থাকে। সভ্য-সমাজে যদিও কিছু কম, তাহা হইলেও শতকরা ৭০ জনের অধিক লোক এই রোগে কষ্ট পায়। এই রোগের কারণ, লক্ষণ, ফলা-ফল ও দেশের লোকের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে এই রোগ যে কি দারুণ অনিষ্ট করিতেছে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বয়স্থ লোকের প্রত্যেকেরই ৩২টি দন্ত দুই পংক্তিতে সাজান থাকে। প্রত্যেক দন্তের জন্ম উপর ও নিম্ন চোয়ালে অস্থির ভিতর গর্ত্ত আছে। আর দুই সারিরই সম্মুখে ও পশ্চাতে মাড়ী (Gum) আছে। এই সমস্ত মাড়ী সর্ব্বদাই রক্তে অতিশয় পুষ্ট থাকে। মনে করুন, কেহ আহারের পর যদি ভাল করিয়া মুখ পরিষ্কার না করেন, তাহা হইলে খাদ্যের অনেক ছোট ছোট অংশ এই সমস্ত দন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জমা হয়; ফলে মাড়ীগুলিতে ক্ষত প্রস্তুত হয় এবং খাদ্যগুলি কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একরূপ বিষাক্ত পদার্থে (Toxin) পরিণত হয়। পদার্থ শোষিত হইয়া প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) রোগের সূত্রপাত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দন্তের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান শিথিল হইয়া গিয়া আরও বড় বড় আধার (Pocket) প্রস্তুত হয় ও তাহাতে আরও খাদ্যাদি জমা হইয়া রোগ বাড়াইয়া তুলে। অতএব দেখা গেল, অপরিচ্ছন্নতা যে এই রোগের প্রথম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্ম এই রোগ দরিদ্রদিগের মধ্যে এত অধিক। তাহারা উত্তমরূপে মুখধাবন করে না, দন্ত পরিষ্কৃত করে না, তাহাদের মুখের ভিতরের দিকে চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়।



অণুবীক্ষণ সাহায্যে দন্তমূলের আবর্জনা পরীক্ষার ফল, শ্বেতবর্ণের রেখা ও বিন্দুগুলি কীটাণুর সমষ্টি

আজকাল ভদ্রসমাজেও এই রোগের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসকরা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই রোগের উৎপত্তি খাদ্য হইতে হইয়া থাকে। অধুনা আমাদের খাদ্য এমন ভাবে প্রস্তুত হয় যে, তাহা সহজেই আমাদের দন্তে লাগিয়া থাকে এবং তাহা হইতে পচন-ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। এতদ্ব্যতীত খাদ্য অধিকক্ষণ চর্ব্বণ না করিলে দন্তের পার্শ্বস্থ মাড়ীর রক্তের ভাল চলাচল হয় না। ইহাতে মাড়ীগুলির জীবনীশক্তি (Vitality) কমিয়া যায় এবং লোক সহজেই প্যায়োরিয়া রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। যাহারা মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্মুখের দন্তের মাড়ীতে সহজেই

এই রোগের উদ্ভব হইতে পারে। আজকাল আবার ডাক্তাররা বলেন যে, উপযুক্ত পরিমাণে ভাইটামিন্ (Vitamin) না খাইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

সাধারণতঃ এই রোগের লক্ষণ এই যে, প্রথমতঃ মাড়ীগুলি হইতে অতি সহজেই রক্ত পড়িতে থাকে। তাহার পর মাড়ীগুলি ক্ষয় হইয়া দন্তের মূল বাহির হইয়া পড়ে, দন্তের পার্শ্বস্থ চোয়ালের অস্থি আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। দন্তমূল শিথিল হইলে উহাতে পূয-রক্ত জমা হয় ও মাড়ী একটু টিপিলেই উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে পূয-রক্ত বাহির হয়। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর অনেক সময়ে দেখা যায়, উপাধানে পূয-রক্তের দাগ লাগে এবং মুখে এক প্রকার দুর্গন্ধ ও বিকৃতিভাব অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ এই রোগের চিকিৎসা না করেন, তাহা হইলে দন্তগুলির অবস্থা মন্দ হয় ও সেগুলি ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়া খসিয়া পড়ে। অনেকের আবার এই রোগ থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে দুই এক বৎসর কিছুই বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের দন্ত হইতে একটু একটু রক্ত পড়ে ও দন্তগুলি সামান্য নড়িতে থাকে। ক্রমশঃ দন্তগুলি যখন অধিক পরিমাণে নড়িতে থাকে ও যন্ত্রণাদায়ক (Neuralgic Pain) হয়, তখন রোগের আবিষ্কার হয়। প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) রোগ প্রথমে দুই একটি দন্ত আক্রমণ করে ও পরে একে একে সমস্ত দন্তে বিস্তৃত হয়। এই সমস্ত রোগীর দন্তমূলের পূয-রক্ত সামান্য পরিমাণে লইয়া এক প্রকার উপায়ে (Dark Ground Illumination) যদি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে কত কীটাণুর (Micro-organism) আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। শরীরের অপরাপর ব্যাধি অপেক্ষা এই রোগ যদিও অতি ক্ষুদ্র মনে হয়, তথাপি মানুষের অজ্ঞাতসারে ইহা হইতে যে কত ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

আমাদের মুখের ভিতর সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু সর্ব্বদা অবস্থান করে। তন্মধ্যে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ (Streptococcus) নামক একরূপ কীটাণুরই সংখ্যা অধিক, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী। এই সমস্ত কীটাণু খাদ্যের ও লালার সহিত অনবরত পাকাশয়ের (Stomach) মধ্যে আকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষকে বাঁচিতে হইলে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। ঐ সমস্ত কীটাণু আমাদের পাকাশয় হইতে নির্গত রসের (Secretion) সংস্রবে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও আমাদিগকে অনেক রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করে। যাহাদের প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) হয়, তাহাদের মুখে সর্ব্বদা এত বেশী কীটাণুর উৎপত্তি হয় যে, তাহাদের পাকাশয়ের রস সেই সমস্ত কীটাণুকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারে না। অধিকন্তু পাকাশয়েরও কীটাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঐ সমস্ত কীটাণু এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) প্রস্তুত করে এবং ইহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত রক্তকে দূষিত করে। ইহাতে শরীরে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয় ও আমাদের জীবনীশক্তি (Vitality) কমিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) হইতে কি কি রোগ হইতে পারে। যথা :—

১। উদরাময় (Dyspepsia)
২। পাকাশয়ের প্রদাহ (Gastritis)
৩। পাকাশয়ের ক্ষত (Gastric ulcer)
৪। পাকাশয়ের ক্যান্সার (Gastric cancer)
৫। বাত (Chronic Rheumatism)
৬। কক্ষীসমূহের প্রদাহ (Chronic Arthritis)
৭। চোখের রোগ
৮। হৃৎপিণ্ডের রোগ
৯। শরীরের বিকৃতি (General malnutrition)
১০। মুখগহ্বরের পশ্চাদ্বর্ত্তী স্থানে ও গলার ভিতর এক প্রকার প্রদাহ (Pharyngitis & Laryngitis)
১১। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহের রোগ (Glandular Disease)
১২। বিভিন্ন প্রকার রক্তাল্পতা (Anaemia)
১৩। চর্ম্মরোগ
১৪। মস্তিষ্কের রোগ

আজকাল অনেকেই উদরাময়ে বহু কষ্ট পায়। ইহার একটি কারণ যে, প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea), তাহা ডাক্তাররা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। প্যায়োরিয়া

কীটাণুসমূহ লালার সহিত ও খাদ্যের সহিত পাকাশয়ের মধ্যে গিয়া তথায় খাদ্যসমূহকে দূষিত (Fermentation) করে। ইহাতে পাকাশয়ের আভ্যন্তরীণ পর্দ্দার (Gastric mucous membrane) প্রদাহ হয় ও গ্যাসট্রাইটিস্ (Gastritis) রোগের উৎপত্তি হয়। তখন অজীর্ণ, পেট-ফাঁপা, চোঁয়াঢেকুর, পেটে ব্যথা প্রভৃতি রোগে মানুষ কষ্ট পায়। যাঁহারা এই অবস্থায় উপযুক্তরূপে চিকিৎসা না করান, তাঁহাদের ঐ রোগ স্থায়ী হইয়া পাকাশয়ের ক্ষত (Gastric ulcer) নামক রোগে পরিণত হয়। ইহার ফল অত্যন্ত ভয়ানক; ইহাতে মানুষ পেটে অত্যন্ত ব্যথা পায়, আহারের পর প্রায় তাহার বমন হয় ও শেষে এমন কি, রক্তবমি হইয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাঁহারা



প্যায়োরিয়া রোগদুষ্ট দন্তের প্রথমাবস্থা

এই রোগে স্থায়িভাবে ভুগিতে থাকেন, তাঁহাদের শেষ-বয়সে ক্যান্সার হইবার খুব সম্ভাবনা। ইহারও ফল অত্যন্ত ভয়ানক। পাকাশয়ের ক্ষতের চিকিৎসার একটি অঙ্গ হইল যে, দন্তের যাবতীয় দূষিত পদার্থ এবং প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) ইত্যাদি নির্ম্মূল করা।

ডাক্তাররা অনেক গবেষণার পর ঠিক করিয়াছেন যে, চক্ষুর অনেক রোগে দন্তের দূষিত পদার্থ (Dental Sepsis) যে একটি প্রধান কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহাদের চোখে ছানি পড়িয়াছে, তাঁহাদের দন্তে প্রায় সব সময়েই প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ছানির জন্য চোখে অস্ত্রোপচার করিতে হইলে আজ-কাল সকল ডাক্তারই রোগীর দন্ত পরিষ্কার করাইয়া থাকেন ও প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) থাকিলে তাহাও নির্ম্মূল করেন, নতুবা অস্ত্রোপচার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, অস্ত্রোপচারের পর দন্তে যে সমস্ত কীটাণু থাকে, তাহা রক্তের মধ্য দিয়া আসিয়া চক্ষুকে দূষিত (Septic) করে ও তাহার ফলে চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অস্ত্রোপচারের ফল ত কিছুই হয় না, বরং ডাক্তারকে শেষে দোষের ভাগী হইতে হয়। ইহা ছাড়া আজকাল সকল ডাক্তারই যে কোন অদূষিত (Aseptic) অস্ত্রোপচারে প্রথমে দন্তের চিকিৎসা করেন। কারণ, দন্তে দূষিত পদার্থ থাকিলে সকল অস্ত্রোপচারই দূষিত (Septic) হইতে পারে। বাতের, শরীরের কব্জিসমূহের প্রদাহের (Arthritis) ও ভীষণ রক্তাল্পতার (Pernicious Anæmia) আর অন্য



দ্বিতীয় অবস্থা—দন্তমূল স্ফীত ও ক্ষয়প্রাপ্ত

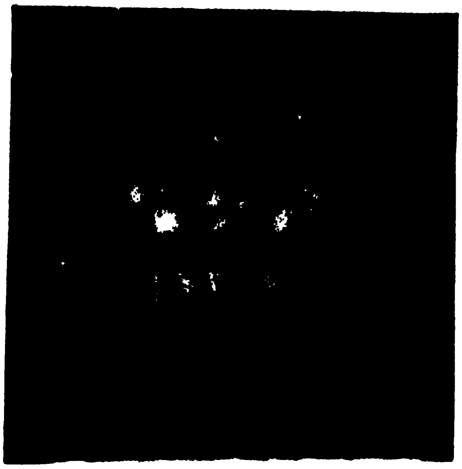
কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়া ডাক্তাররা দন্তরোগ-কেই ইহার জন্য দায়ী করিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ঐ সব রোগীর দন্তমূলে পূয-রক্ত পাওয়া যায়।

সর্ব্বদা রক্তে দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হওয়ায় মানুষের শরীরের এক প্রকার বিকৃত (General malnutrition) ভাব দেখা যায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুস্থ বোধ করেন, তাঁহার শরীরের শক্তি কমিয়া যায়, দিনের শেষে কেমন একটা ক্লান্তি বোধ হয়, শরীরের ত্বকের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে ও পেটের একটা না একটা রোগ লাগিয়াই থাকে। এইরূপ অবস্থায় শরীরের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। তখন অপরাপর রোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কঠিন হইয়া পড়ে। মনে করুন, কেহ যদি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েন এবং তাহার

সহিত যদি তাঁহার প্যায়োরিয়াও (Pyorrhoea) থাকে, তাহা হইলে এই রোগে তাঁহার জীবনীশক্তি এত কমিয়া যায় যে, যক্ষ্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোনমতেই হইয়া উঠে না ও তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

প্রসূতিদের প্যায়োরিয়া (Pyorrhoea) থাকিলে তাঁহাদের স্তনে দুগ্ধ কমিয়া যায়। যেটুকু থাকে, তাহার সহিত দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া শিশুর অনেক পীড়ার কারণ হয়। দন্তের যাবতীয় দূষিত পদার্থ হৃৎপিণ্ডের আভ্যন্তরীণ পর্দার প্রদাহ (Endocarditis) করিতে পারে ও তাহাতে হৃৎপিণ্ডের বহু অনিষ্ট সাধিত হয়। আপনারা অনেকেই জানেন, আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever) হইলে ডাক্তাররা রোগীর মুখ-গহ্বর পরিষ্কার রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাহার কারণ এই যে, মুখের কীটাণু রোগীর অন্ত্রের (Intestine) মধ্যে গিয়া একরূপ প্রদাহ প্রস্তুত করে, তাহার ফলে রোগীর অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (Hæmorhage) ও অন্ত্রের ছিদ্র (Perforation) হইয়া রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে।

এইবার প্যায়োরিয়ার (Pyorrhoea) চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। এই ব্যাধি যখন একবার দেখা দেয়, তখন ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। যাঁহারা মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভাল ডাক্তারের নিকট ইহার কারণ জানিয়া লইয়া তাহার যথাযথ প্রতীকারচেষ্টা করিতে পারেন। যাঁহাদের রোগের সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রথমতঃ দন্তে যে সমস্ত ময়লা (Tartar) জমা থাকে, তাহা চাঁচিয়া ফেলা দরকার। তাহার পর দন্তের চারিধারে যে সমস্ত আধারে (Pocket) পূয জমা হয়, তাহা পূরণ করা দরকার। গুঁড়া ট্যানিক এসিড (Tannic acid) দিনে একবার করিয়া দুই মিনিটের জন্য দাঁতের গোড়ায় লাগান উচিত। এইরূপ চিকিৎসা অন্ততঃ দুই মাসের জন্য করা দরকার। দন্তমূলের পূয, রক্ত দূরীভূত করা এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। প্রথমতঃ দন্তমূলে যে সমস্ত খাদ্যের কণিকা জমা হয়, তাহা খড়িকা দিয়া পরিষ্কার করা দরকার তাহার পর অঙ্গুলির সাহায্যে মাড়ীগুলি টিপিলেই সমস্ত পূয বাহির হইয়া পড়ে। ইহার পর গরম জলে কিছু হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (Hydrogen Peroxide) মিশাইয়া কুল্‌কুচা করা উচিত। এইরূপ দিনে চার পাঁচবার করা দরকার। অনেকে আবার টিংচার আইওডিন (Tinc. Iodine) তুলিকার সাহায্যে মাড়ীগুলিতে লাগাইতে বলেন। আজকাল আবার ভ্যাক্‌সিন্ (Vaccine) ইন্‌জেক্‌সানের ব্যবস্থা হইতেছে। উপরি-উক্ত চিকিৎসায় যদি দুই এক মাসের মধ্যে কোন সুফল না পাওয়া যায়, তবে এই রোগের শেষ চিকিৎসার ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিকিৎসার অধীন হওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্ত হইতে পূয নির্গত হয়, সেইগুলিকে এক জন ভাল ডাক্তারের দ্বারা অথবা কোন ডেণ্টিষ্ট (Dentist) দ্বারা উঠাইয়া ফেলা দরকার। ডাক্তাররা বলেন একবার যখন এই রোগ আরম্ভ হইয়াছে, তখন ইহা কিছুতেই ভাল হয় না। এ কথা খুব সত্য, কারণ, এমন অনেক রোগী দেখা গিয়াছে, যাঁহারা প্যায়োরিয়া রোগের জন্য অনেক ব্যয় করিয়া অনেক চিকিৎসা করাইয়াছেন; কিন্তু কিছুই উপকার পান নাই। অবশেষে যতক্ষণ না দন্তগুলি উঠাইয়া ফেলেন, ততক্ষণ এই রোগ হইতে শান্তি পান না। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেকে দন্ত তুলিয়া ফেলিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, দন্ত উঠাইলে বড় কুৎসিত দেখায় ও একটি দন্ত উঠাইলে সমস্ত দন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। দন্ত উঠাইলে মানুষকে অবশ্য সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া কুৎসিত দেখায়, কিন্তু ঐ দন্ত হইতে যে কত রোগের আবির্ভাব হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। শরীরে স্থায়িভাবে রোগ বহন কর



শেষ অবস্থা—দন্তমূল হইতে পূয নির্গত হইতেছে

অপেক্ষা দন্ত তুলিয়া রোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যে শ্রেয়ঃ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা কিছু খরচ করিতে পারেন, তাঁহারা অনায়াসে কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়া সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে পারেন।. একটি দন্ত উঠাইলে অপর দন্তগুলি যে শিথিলমূল হইয়া যায়, ইহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এ রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার চিকিৎসা করান অপেক্ষা যাহাতে ইহা না হয়, তাহার কোন উপায় আছে কি না, দেখা যাউক। এক কথায় বলিতে গেলে ইহার উপায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। প্রভাতে উঠিয়া যদি দন্তকাষ্ঠ, টুথব্রস ও টুথপেষ্ট কি টুথ-পাউডার দিয়া দন্তগুলি পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে অনেক ময়লা দূরীভূত হয়। একটা টুথব্রসের দাম পাঁচ ছয় আনা মাত্র, একবার একটা কিনিলে অনেক দিন চলে। আর যাহারা টুথ পাউডার কি পেষ্ট কিনিতে না পারেন, এক পয়সার সাদা খড়ি কিনিয়া তাহা গুঁড়া করিয়া ছয় সাত ফোঁটা বিশুদ্ধ কার্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে এক জন লোকের তিন সপ্তাহ অনায়াসে চলে। বাঙ্গালা দেশে পান খাওয়ার খুব প্রচলন আছে। ইহার উপকারিতা যাহাই থাকুক না, দন্তের পক্ষে ইহা বড়ই অপকারী। পানের চূণ দন্তমূলে জমা হইয়া দন্তে এক প্রকার শক্ত কাল কিংবা লাল রঙের জমাট (Tartar) বাঁধিয়া যায়। এই জমাট আমাদের লালা হইতেও প্রস্তুত হয়। দন্তগুলি ইহাতে বড় অপরিষ্কার দেখায় ও ইহাতে খাদ্যের ছোট ছোট অংশ জমা হইয়া প্যায়োরিয়া রোগের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মাসে এই জমাটগুলি চাঁচিয়া ফেলা দরকার। তাহাতে দন্তগুলি মুক্তার মত ঝক-ঝক করে এবং উহাতে মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়। পরন্তু ইহাতে রোগেরও প্রতীকার হয়। পান কম খাইলে ও টুথ-ব্রুস ব্যবহার করিলে দাঁতে জমাট বাঁধিতে পারে না। আহারের পর খড়িকা দিয়া দন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি পরিষ্কার করা যেন আমাদের নিত্যকর্ম্মে পরিণত হয়। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের দন্তের কোনও ব্যাধি হইতে পারে না। আমরা তখন অনেক রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, মুখে দুর্গন্ধ হয় না, দন্তগুলি মুক্তার ন্যায় ঝক-ঝক করিয়া আমাদের মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, আমরা সমাজের উপযুক্ত লোক বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারি। 'দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা রাখিতে হয়', এই কথা যেন আমরা অনুক্ষণ স্মরণ রাখি।

শ্রীজগৎরাম গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচিকাভরণ

দেশের ভরসা তোমরা তরুণ,—অরুণ আখরে আঁকিবে কোথা,
নারীর মূরতি, নারীর মহিমা, নারীর গরিমা, নারীর কথা ;
মায়ের বোনের মনের মাধুরী গাঁথিয়া সূত্রে কল্পনার,
দেবী ভারতীর চরণে সঁপিবে পূজার অর্ঘ্য—পুষ্প-হার ;
তরুণী বধূর নিগূঢ় মধুর গহন-গোপন বুকের বাগে,
লাজের আড়ালে ফোটে যে গোলাপ প্রণয়-প্রগাঢ় রক্ত-রাগে,
কাব্যশ্রীর দেউল-দুয়ারে সে ফুলে রচিয়া শতেক নরী
শতেক ছন্দে দুলাইয়া দিবে—শতেক কবিতা-কেতন 'পরি ;

তা' না করি' এ কি কু-পটু পটুয়া তুলিছ তুলিতে পাঁকের গ্লানি,—
কালি-কলমের কালির কলুষ দিলে যে বাণীর আননে টানি'।
কোথা সুরধুনী-কল্লোল ?—এ যে কোলাহলময় মদের ভাঁটি ;
কই বাল্মীকি ?—কোথা রামায়ণ ?—এ যে কামায়ন, বিষের বাটি !
এ যে উপবাসী শৃঙ্গার-হিয়া মাগিছে রমণী-রমণ-রণ,—
নিদ্রা-বিহীন উতলা রজনী,—কৃমি-সঙ্কুল কিশোর-মন।
এ কি আমন্দ গাহে সঙ্গীত—কুন্দকান্তি কামিনী-গণে
জর্জ্জর করি' লজ্জাশূন্ত পরুষ বাহুর নিষ্পেষণে !

কামনা-অশ্বে আরোহি', যুবন্, 'বেদে'র মতই বেড়াবি কি রে ?—
যাযাবর হয়ে ফিরিবি শুধুই ভুলে' পরিবার-গোষ্ঠীটিরে ?
পথে পথে ফেরা—সে-ই কি চরম ? কাম্য কি নয় দেশের ঘর ?
বাসনা-বিমলা নিখিলেশ-পানে কিসে চায় তারি চেষ্টা কর।

হায় বিদ্রোহী, এ কি বিদ্রোহ করিছ আপন আত্মা-সনে,—
কাম কর্দ্দমে শুধু দলিয়া ফিরিবে মানস সরসী-পদ্মবনে ?
সংযম-হীন হায় দিবাকর,—তোদের গৃহে কি উপীন নাই ?
পরশ-মণিরে ধূলাতে ফেলিয়া আস্তাকুঁড়ের কুড়াবি ছাই ?

সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে যে কথাটি ছিল ধাতার মনে,
সে কি নহে প্রেম ?—কামেরি তার কাম-কুৎসিত ভাষ্য ভণে।
অমৃত-আধার রমণীর স্তন—বিশ্ব বাঁচে যে অমৃত পানে,
রাউজের ফাঁকে ছাগ-আঁখি সেথা কামনা-মলিন দৃষ্টি হানে !
বরাঙ্গনারে নিয়ে এল এরা বারাঙ্গনার দুয়ারে প্রায়,
সীতা সাবিত্রী সতীর এ দেশ—এ কি লাঞ্ছনা দেশের হায় !
গণতন্ত্রের নাম করি' যারা গণিকাতন্ত্র প্রচার করে,
কে আছে চাবুকী —চাবুক হানিবে তাদের কুটিল কথার 'পরে ?

দেশের ভরসা তোমরা তরুণ, তোমরা আমার দেশের ভাই,
তোমরা না হ'লে মানুষ—দেশের দুঃখ ঘুচাতে কেহ ত' নাই।
মায়েরা তোদেরি মুখ চেয়ে আছে, মেয়েরা তোদেরি দিকে যে চায়,
মনের ময়লা ধুয়ে-মুছে' ফেলে' শুচি বাস পরে' এবার আয়।
পূজার লগন বয়ে যাবে না কি ?—পুষ্পচয়ন করিবি কবে ?
প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া দেবীর আরতি কখন্ হবে ?
নারীর মূরতি মাতৃমূরতি—তাহারে গ'ড়ো না কামিনী ক'রে ;
অমল মর্ম্মকমলপুষ্পে দাও নারী-মার চরণ ভ'রে !

শ্রীচন্দ্রশেখর কবিরাজ।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কুহকিনীর বংশীরব

কাউণ্ট 'ভন আরেনবর্গ' ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের ব্যাঙ্ক নোটের বাণ্ডিলটি মোজের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিলে, মোজে নোটের তাড়াটি পকেটে ফেলিয়া লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় কাউণ্টের গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিল; সে এই ভাবে অপমানিত হইয়া কাউণ্টকে চূর্ণ করিবার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—তাহা বোধ হয়, পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ আছে। ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক অল্প অর্থ নহে। কাউণ্টের নিকট হইতে এতগুলি টাকা একসঙ্গে আদায় করিয়া সে তাঁহাকে অনায়াসে মুক্তি দান করিতে পারিত, তাঁহার সকল সংস্রব ত্যাগ করাও তাহার পক্ষে অসঙ্গত হইত না; কিন্তু বেত্রাহত হওয়ায় তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল; আত্ম-সংবরণ করা তাহার অসাধ্য হইল। বার্থার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সে তাহার প্রতি পশুবৎ আচরণ করিয়াছিল, কাউণ্টের আতিথেয়তার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছিল, এ জন্য তাহার লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু মোজে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে বুঝিতে পারিল না। তাহার বিশ্বাস হইল, কাউণ্ট ধনমদে মত্ত হইয়া অকারণে তাহার অপমান করিলেন। সুতরাং সে কাউণ্ট ও বার্থার সর্ব্বনাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কাউণ্টের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ও নানা দোষের কথা তাহার অজ্ঞাত ছিল না, এ জন্য কাউণ্টকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার উপায় স্থির করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। বার্থার ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া তাহারও সর্ব্বনাশসাধনে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। অথচ সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বার্থার অপমান করিয়াছিল, বার্থা তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং বাধ্য বার্থার অপরাধ। এ জন্য বার্থার প্রতি আতক্রোধ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া কত দূর ইতরতার পরিচায়ক, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। মোজে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, অবিলম্বে সে সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইয়া কাউণ্টের বৈধ পত্নী রেবেকা কোহেনের নিকট কাউণ্টের সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে এবং রেবেকার সাহায্যে তাহাকে দুর্গতির রসাতলগর্ভে নিক্ষেপ করিবে।

মোজে যে কেবল তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের উদ্দেশ্যেই সেণ্টপিটার্সবর্গে গমনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, এরূপ নহে; বৈষয়িক কারণও ছিল। ফ্রাঙ্কফোর্টে তাহার মহাজনী কারবারের অবস্থা ক্রমশঃ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; অধিক সুদের লোভে কয়েক জন সামরিক কর্ম্মচারীকে টাকা ধার দিয়া তাহার আসল টাকাও মারা গিয়াছিল। এই অবস্থায় কাউণ্টের নিকট হইতে একসঙ্গে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সংগৃহীত হওয়ায় তাহার ইচ্ছা হইল, সে ফ্রাঙ্কফোর্টের কারবার বন্ধ করিয়া এই মূল ধনের সাহায্যে সেণ্টপিটার্সবর্গে নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সে সেণ্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেখানে নূতন কারবার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেখানকার সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য করা ও পুরাতন বন্ধুগণের সহিত যুক্তি-পরামর্শ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই তাহার মনে হইল। এইরূপ দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মোজে সেণ্টপিটার্সবর্গে যাত্রা করিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রেবেকা যে সময় বিশ্বাসঘাতক কালনকির কৌশলজালে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় মোজে সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইয়া সলোমন কোহেনের আতিথ্য গ্রহণ করিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মোজে রেবেকাকে তাহার শৈশবকাল হইতেই কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত, তাহার স্নেহে

আন্তরিকতার অভাব ছিল না। দীর্ঘকাল পরে নানা দুর্ঘটনায় ও ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে মোজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল, সে ঘোর স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু রেবেকার প্রতি তাহার পূর্ব্বস্নেহের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তথাপি সে রেবেকাকে তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারের সকল বিবরণ বলিয়া তাহার মনে কঠোর আঘাত করিতে উদ্যত হইল—ইহাও তাহার স্বার্থপরতারই নিদর্শন। স্বীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্নেহের পাত্রীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইল না এত দূর তাহার অধঃপতন হইয়াছিল।

রেবেকা দীর্ঘকাল পরে মোজেকে তাহাদের গৃহে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; বহু দিন তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় রেবেকা মনে করিয়াছিল, সে জীবিত নাই। বহুকাল পরে দেশান্তর হইতে মোজেকে রুস রাজধানীতে প্রত্যাগত দেখিয়া সলোমন কোহেনও আনন্দ লাভ করিলেন; কারণ, পরিণত বয়সে মোজে মাতাল ও অসচ্চরিত্র হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেও, এই পুরাতন বন্ধুর প্রতি তাঁহার উদার হৃদয়ে কোন দিন প্রীতির অভাব হয় নাই; তাহার অধঃপতনে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াও সর্ব্বদা তাহার কল্যাণ কামনা করিতেন। বস্তুতঃ, তিনি মোজের অকপট বন্ধু ছিলেন। তিনি মোজেকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং রেবেকা সেই দুর্দ্দিনে তাহারই সাহায্যে কালনকির কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশা করিল। এই জন্ত রেবেকা সেই প্রথম দিনেই তাহার সঙ্কটের আদ্যোপান্ত বিবরণ মোজের গোচর করিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল।

মোজে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে রেবেকার সকল কথা শুনিল বটে, কিন্তু রেবেকার কথা শেষ হইলে সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

রেবেকা মোজের ভাবভঙ্গী দেখিয়া হতাশভাবে বলিল, "আপনি আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন না?"

মোজে চিন্তিতভাবে বলিল, "এই শঠ, বিশ্বাসঘাতকটা তোমাকে মুঠায় পুরিয়াছে; তুমি এখন কি উপায়ে তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সে গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, প্রবল রাজশক্তি তাহার সহায়; ইচ্ছা করিলে সে অতি সহজে তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। ইহার প্রতীকার আমার অসাধ্য।"

রেবেকা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "এই দুর্দ্দান্ত লোকটার কবল হইতে আমাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই? আমি যে আপনার শক্তি ও কৌশলের উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া আছি।"

মোজে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এখান হইতে পলায়ন ভিন্ন তোমাদের নিষ্কৃতিলাভের অন্ত কোন পন্থা নাই।"

রেবেকা। কিন্তু কি উপায়ে পলায়ন করিব?—আমরা পলায়নের চেষ্টা করিলেই কালনকি পুলিসের সাহায্যে আমাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবে। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

মোজে কি বলিবে, স্থির করিতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কোন কঠিন সমস্যায় পড়িলে, সে দুই হাতে মাথা চুলকাইয়া সমস্যাসমাধানের চেষ্টা করিত। অবশেষে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "হাঁ, তা বটে, কালনকি তোমাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবে। বেটা তোমাদের উপর পুলিস লেলাইয়া দিবে। কিন্তু ঐ কার্য্যটি সে যাহাতে করিতে না পারে, তাহার একটা ব্যবস্থা করা কি অসম্ভব?"

রেবেকা জিজ্ঞাসু নেত্রে মোজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার মতলবটা খুলিয়া বলুন।"

মোজে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি তোমার বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ তোমাকে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। আপাততঃ এ সকল কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই, অন্ত প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাউক। ভাল কথা, তোমার গুণবান্ স্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ কি?"

রেবেকা মোজের মুখের দিকে চাহিয়া, চোখ-মুখ লাল করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "না, তাহার কোন সংবাদ জানি না।—আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

মোজে বলিল, "আমি তাহার সংবাদ জানি কি না, এই জন্তই ও কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।"

রেবেকা সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি তাহার সংবাদ জানেন?"

মোজে সোৎসাহে বলিল, "হাঁ, জানিই ত। তাহাকে পাইবার জন্য এখনও কি তোমার আগ্রহ আছে? এখনও তাহাকে ভালবাস?"

মোজের প্রশ্নে রেবেকা হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল; ঘৃণাভরে সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "তাহাকে পাইবার জন্য এখনও আমার আগ্রহ? এখনও তাহাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যে শঠ, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক আমার জীবনের সকল সুখশান্তি হরণ করিয়াছে, আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গোপনে দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে—তাহাকে পাইবার জন্য এখনও আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব? তাহাকে ভালবাসিব? অসম্ভব! না, আর আমি তাহাকে চাহি না। সে আমার মহাশত্রু।"

মোজে খুসী হইয়া বলিল, "আমিও ঐ রকমই মনে করিয়াছিলাম; তোমার ঐ কথাই শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। সেই প্রতারক পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তোমাকে প্রতারিত করিয়াছে; কিন্তু তুমি তাহার দ্বারা কি পরিমাণে প্রতারিত হইয়াছ—তাহা এখনও জানিতে পার নাই; সে কিরূপ নরপিশাচ, তাহা তোমার ধারণা করিবারও শক্তি নাই। যদি তাহার বিশ্বাসঘাতকতার, কপটতার ও প্রতারণার এবং পৈশাচিক ব্যবহারের জন্য তাহাকে শাস্তিদানের কোন সুযোগ পাও, তাহা হইলে সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

রেবেকা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপত্তি? না, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। যদি তাহাকে সম্মুখে পাই, তাহা হইলে ছুরিকাঘাতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইব না। যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে, আমার জীবন ব্যর্থ করিয়াছে—তাহাকে আমি কখন ক্ষমা করিব না; তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা আমি আনন্দের সহিত উপভোগ করিব। তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিতে পারিলে আমি কতকটা শান্তিলাভ করিব।"

মোজে উৎসাহভরে বলিল, "তোফা! ইহাই ত চাই। কিন্তু তাহাকে তোমার স্বহস্তে হত্যা করিবার আবশ্যক হইবে না। তুমি আমার সাহায্যে তাহাকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা দিতে পারিবে; তাহার মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য ধূলায় লুটাইবে। সুখ-শান্তি হারাইয়া পথের কুকুরের মত অসহায়ভাবে তাহাকে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রতিদিন সে তিল তিল করিয়া মরিবে। ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করা অপেক্ষা এই ভাবে তাহার সর্ব্বনাশসাধনই বাঞ্ছনীয়। তাহার অশেষ দুর্গতি ও শোচনীয় অধঃপতনই প্রার্থনীয়।"

রেবেকা রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "কোথায় সে? এখন সে কি করিতেছে?"

মোজে বলিল, "ওহো! সে কথা তোমাকে এখনও বলা হয় নাই! সে রুসিয়া হইতে পলায়ন করিয়া জুরিচে গিয়া একটি বড় লোকের সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিয়াছে; তাহার এই স্ত্রী বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং ধনীর জামাই হইয়া সে টাকার পাহাড়ের উপর বসিয়া আছে; তাহার সুখের সীমা নাই।"

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রেবেকার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, মুহূর্ত্তে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। সে আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিট নিদারুণ উত্তেজনায় তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না; অবশেষে সে মোজের সম্মুখে আসিয়া চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া বলিল, "আপনার কথা সত্য হইলে আমি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিব। পরমেশ্বর! আমার ভাগ্যে এত কষ্টও লিখিয়াছিলে!"

মোজে ধীর স্বরে বলিল, "শান্ত হও মা! মন স্থির কর। এ ভাবে উত্তেজিত হইয়া ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই, এ কথা তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়েকেও কি বলিয়া দিতে হইবে? তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া ধীরভাবে সকল কথা শ্রবণ কর; তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। তোমার স্বামীর অনন্ত কীর্ত্তির কিছুই এখনও তোমাকে বলা হয় নাই; সেই সকল কথা আগে তোমাকে শুনিতে হইবে।"

রেবেকা বিপুল চেষ্টায় উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া মোজের সম্মুখে বসিয়া পড়িল; তখন মোজে ধীরে ধীরে কাউণ্ট ভন আরেন্দবর্গের সকল কাহিনী সবিস্তার তাহার গোচর করিল। রেবেকা যখন জানিতে পারিল, কাউণ্ট

প্রথম হইতেই তাহাকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে, প্রকৃত নাম গোপন করিয়া ছদ্মনামে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সে তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্ম ভালবাসে নাই, তাহার পিতার অর্থের লোভে প্রেমের অভিনয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন তাহাকে নরপিশাচ, মনুষ্যচর্ম্মাবৃত সয়তান বলিয়াই রেবেকার ধারণা হইল; ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে অধীর হইয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে মানসিক যন্ত্রণা গোপন করিতে পারিল না। তাহার আত্মসংযমের শক্তি বিলুপ্ত হইল। সে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি তাহাকে সেই টাকার পাহাড় হইতে পথের ধূলায় টানিয়া আনিব। সে যাহা আমার করিয়াছে, আমার পদাঘাতে তাহা উদ্গিরণ করিবে, তাহার পর তাহাই পুনর্ব্বার কুকুরের মত গ্রাস করিবে।"

মোজে বলিল, "হাঁ, এইরূপ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ইহা তোমাকে করিতেই হইবে। যেমন কুকুর, সেই রকম মুগুরের ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। এখন যাহা বলি, শুন। আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে তুমি এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিবে। এখন এখানে তোমাদের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এখানে তোমার বা তোমার পিতার দীর্ঘকাল নিরাপদে বাস করা অসম্ভব; সুতরাং গোপনে তাড়াতাড়ি এই দেশ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার প্রস্তুত হওয়াই উচিত। ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে; কিন্তু যতই ক্ষতি হউক, তাহা সহ্য করা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়।"

রেবেকা বলিল, "এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাবার কি মত, তাহা জানিতে হইবে। সুযোগ পাইলে আমি আজই এই দেশ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

মোজে সেই দিনই সলোমন কোহেনকে কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিল। তিনি জামাতার গুণের কথা শুনিয়া ক্ষোভে লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন; তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও রেবেকার ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। সেই নরাধম তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বুঝিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি ক্ষণকাল নতমস্তকে চিন্তা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আহা, মা আমার! এত কষ্টও তোমার অদৃষ্টে ছিল! পরমেশ্বর তোমাকে অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসাইলেন। এখন আর আমরা কি করিতে পারি?"

কথাগুলি রেবেকা শুনিতে পাইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমরা কি করিতে পারি? হার মোজে আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদনুসারে কায করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা অবিলম্বে এই দেশ পরিত্যাগ করিব। আমরা জুরিচে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিব। তাহার পর আমার স্বামী—সেই কাউণ্টকে তাহার উচ্চাসন হইতে ধূলার মধ্যে টানিয়া আনিয়া যথাযোগ্য শিক্ষা দান করিব, নতুবা আমার মনের আগুন নিবিবে না।"

সলোমন কোহেন ধীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু কালনকি যে আমাদিগকে মুঠায় পুরিয়াছে, সে কথা ত ভুলিলে চলিবে না, মা! তোমার বুদ্ধির দোষে আমার চতুর্দ্দিকেই যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন্ দিক্ সামলাইব?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আগুন না থাকিলেও তাঁহার কথা শুনিয়া রেবেকা ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সে আত্মসমর্থনের চেষ্টা না করিয়া বলিল, "সত্যই বাবা, আমি না বুঝিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি; কিন্তু এখন ত আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই, এই বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করিতে হইবে।"

মোজে বলিল, "কালনকির শত্রুতাকেই এখন আপনাদের প্রধান ভয়। কিন্তু সে যাহাতে আপনাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার কোন ব্যবস্থা করা কি অসম্ভব? যদি আমরা নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহায়তা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কি তাহারা আপনাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইবে? আপনি বহু দিন হইতে তাহাদের বহু উপকার করিয়া আসিয়াছেন, আপনার নিকট তাহারা নানাভাবে উপকৃত; তাহাদের জন্য আপনি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; আর আপনি তাহাদের সহায়তা প্রার্থনা করিলে তাহারা সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে? তাহারা কি এতই অকৃতজ্ঞ?"

সলোমন কোহেন বলিলেন, "তুমি তাহাদের নিকট কিরূপ সাহায্যের আশা কর?"

মোজে। মনে করুন, অর্থ-সাহায্য। অর্থ দ্বারা কি কালনকির মুখ বন্ধ করা অসম্ভব ?

রেবেকা। হাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব। অর্থ দ্বারা তাহাকে ক্রয় করিবার আশা নাই। আমি তাহাকে অর্থে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

মোজে নিরুৎসাহচিত্তে বলিল, "তবে ত বড়ই সমস্যার কথা! যাহার অর্থলোভ নাই, তাহাকে বশীভূত করা কঠিন। কালনকির ব্যবহার সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, লোকটার প্রকৃতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে। আপনার অপরাধ, আপনি দীর্ঘকাল হইতে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের হিতসাধন করিয়া আসিয়াছেন, এই জন্য সে আপনার শত্রু। সুতরাং প্রকারান্তরে সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের শত্রু, বিশেষতঃ সে গবর্ণমেন্টের গুপ্তচর, তাহারই শত্রুতায় জোসেফ কুরেট ধরা পড়িয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য নিহিলিষ্ট-গণের সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহারা চেষ্টা করিলে কালনকিকে আপনার অনিষ্টসাধনে বিরত করিতে পারিবে। কি কৌশলে তাহারা কালনকিকে দমন করিবে, তাহা আপনিই তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন, তাহারা সেই কৌশল অবলম্বন করিবে।"

সলোমন কোহেন মোজের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না। তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বৃদ্ধের মন নানা সংশয়ে পূর্ণ হয়; যদি নিহিলিষ্টদিগের চেষ্টা বিফল হয়, যদি কালনকি তাহাদের ষড়যন্ত্রের সন্ধান জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাঁহাকে আবার কি নূতন বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি মোজের প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন না; কিন্তু মোজে তাহার জিদ ছাড়িল না, মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিল। অবশেষে স্থির হইল, রেবেকা কয়েক দিন পর্য্যন্ত কালনকিকে ভুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে, সেই অবসরে তাঁহারা কালনকির মুখ বন্ধ করিবার একটি উপায় উদ্ভাবন করিবেন। সেই উপায় সফল হইলে রুসিয়া পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

পরদিন রেবেকা কালনকির সহিত সাক্ষাতের উপায় চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কালনকি স্বয়ং তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল।

কালনকি অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে রেবেকাকে বলিল, "দেখ রেবেকা, হার মোজে নামক একটা লোক তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া জুটিয়াছে। লোকটা কে ?"

অন্য সময় হইলে রেবেকা কালনকির এইরূপ অনধিকার-চর্চ্চার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত, কঠোর বাক্যে তাহাকে বিতাড়িত করিত, কিন্তু রেবেকা বুঝিল, সেরূপ ব্যবহারে তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে, কালনকিকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে, মিষ্ট কথায় তাহাকে ভুলাইতে না পারিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। এই জন্য সে মনের ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন ? সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া তোমার ঈর্ষ্যা হইয়াছে না কি ?"

কালনকি গম্ভীরস্বরে বলিল, "তোমার মত সুন্দরীর সহিত যে কেহ ঘনিষ্ঠতা করে, তাহাকে দেখিয়াই আমার ঈর্ষ্যা হয়, এ কথা অস্বীকার করিবার কারণ দেখি না।"

রেবেকা কালনকির মুখের উপর কটাক্ষবর্ষণ করিয়া বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে, আমাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সম্মান করিবে না, অথচ কেহ আমার সহিত আত্মীয়তা করিলে তোমার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার আগুন জলিয়া উঠিবে, ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

কামুক কালনকি রেবেকার কটাক্ষের আঘাতে জর্জ্জরিত হইল, আত্মসংযমের শক্তিতে বঞ্চিত হইয়া সে কোমল স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, ইহা কি তুমি জান না ? আমি তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তুমিই আমাকে ক্রমাগত মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া আসিতেছ। আর তুমি আমার সঙ্গে চাতুরী করিও না। তোমার কপট ব্যবহারে আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছে।"

রেবেকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমার একটা কথাও সত্য

তোমার সঙ্গে কোন দিন চাতুরীও করি নাই। যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতদূর ব্যস্ত না হইতে, তাহা হইলে আমাদের সদ্ভাবের অভাব হইত না; কিন্তু প্রথম হইতে সকল বিষয়েই তুমি আমাকে সন্দেহ করিয়া আসিতেছ। এখন হার মোজে পর্য্যন্ত তোমার ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের পাত্র। তিনি আমার পিতার বহুদিনের বন্ধু, আমার বাল্যকাল হইতে তিনি আমাকে তাঁহার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে তিনি এখানেই বাস করিতেন; আবার ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন। যাহা হউক, যদি আমাকে লাভ করিবার জন্য তোমার আন্তরিক আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে এরূপ একটি সংবাদ দিতে পারিব, যাহা তুমি প্রকৃতই সুসংবাদ মনে করিয়া আনন্দিত হইবে।"

কালনকি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সংবাদটা কি শুনি।"

রেবেকা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "হার মোজে আমাকে এরূপ কোন সংবাদ দিয়াছেন, যাহার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতে আমি স্বাধীনভাবে জীবনের গতি পরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিব।"

কালনকি বলিল, "তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; তুমি কি তোমার মনের কথা সরলভাবে বলিতে পার না? সহজে বুঝিতে পারা যায়, এরূপ ভাষায় কথা বলিতে দোষ কি?"

রেবেকা হাসিয়া বলিল, "তোমার মন কুটিল বলিয়াই আমার সরল কথা তুমি সরলভাবে গ্রহণ করিতে পার না।"

কালনকি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "হইতে পারে, আমার মন কুটিল, কিন্তু তোমার ব্যবহার সরল হইলে আমার কুটিল মনও সরল পথ অবলম্বন করিত। তুমি এইমাত্র যে কথা বলিলে, তাহার অর্থ খুলিয়া না বলিলে, আমি কিরূপে বুঝিব? হার মোজে তোমাকে কি বলিয়াছে, আর তাহাতে তোমার স্বাধীনভাবে চলিবারই বা কি সুবিধা হইবে, আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

রেবেকা। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি তোমাকে বলিয়া-বিশ্বাস করিয়াছিলে কি না, জানি না, কিন্তু কথাটা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে।

কালনকি। হাঁ, স্মরণ আছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে কালনকি উৎফুল্ল হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "মোজের নিকট তোমার সেই 'খসমটা'র মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছ কি?"

রেবেকা হাসিয়া বলিল, "তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইলে তুমি খুব খুসী হইতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে মরে নাই, এখনও বাঁচিয়া আছে; তবে সে বাঁচিয়া থাকিলেও তাহার সহিত আমার বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয় নাই, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

কালনকি মনের আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া বলিল, "তোমার এ কথা কি সত্য? না, আমার সঙ্গে চালাকী করিতেছ?"

রেবেকা সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে বলিল, "আমার কথায় সন্দেহ করিয়া আবার আমার অপমান করিতেছ? আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

কালনকি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার বিবাহ যে অসিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিবে কি?"

রেবেকা। নিশ্চয়ই।

কালনকি। যদি তোমার বিবাহ আইনানুসারে অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?

রেবেকা। আমি স্বাধীনতা লাভ করিব। যে আমাকে বিবাহ করিয়াছিল, সে আমাকে তাহার বিবাহিতা পত্নী বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না।

কালনকি। দেখ রেবেকা, পূর্ব্বে নানা কারণে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথান্তর হইয়াছে, আমরা পরস্পরকে অনেক অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে বিপন্ন করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর সেই সকল অতীত ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া তুমি কি আমাকে একটু আশা দিয়া সুখী করিবে না?

রেবেকা। তোমাকে সুখী করা না করা তোমার কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তুমি যে সকল কঠোর বাক্যে ও অশিষ্ট ব্যবহারে আমার হৃদয়ে বেদনা

আমি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একটি কথা তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি আমার হৃদয় জয় করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার পূর্ব্ব-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তোমাকে. আমার মনোরঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোন পুরুষ ক্রমাগত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বা ভয় দেখাইয়া কোন নারীকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে না। তুমি প্রতিনিয়ত আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, নানা প্রকার ভয়প্রদর্শন করিয়াছ, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার?

কালনকি। আমি তোমার ব্যবহারে বিচলিত হইয়া কখন কখন অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, তোমাকে বশীভূত করিবার আশায় এক আধটু ভয়প্রদর্শনও করিয়াছি, ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য; কিন্তু তুমিই আমাকে সেরূপ রূঢ় আচরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলে, ইহাও কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? তুমি আমাকে অবজ্ঞা না করিলে, আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে আমি তোমার গোলাম হইব।

রেবেকা হাসিয়া বলিল, "আমি তোমাকে আমার গোলাম হইতে বলিতেছি না, যদিও গোলামের গোলামী লজ্জার বিষয় নহে; তুমি আমাকে বিশ্বাস করিলে, আমার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিলে আমার হৃদয় তোমার প্রতি বিমুখ হইবে না। জোর করিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা আদায় করিতে পারে না। যাহা হউক, আমি তোমার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম। অতীতের অপ্রীতিকর বাক্য ও ব্যবহার বিস্মৃত হও, কিছু দিনের জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন কর, এবং তুমি যে আমার শত্রু নহ, আমার হিতৈষী বন্ধু, আমার মঙ্গলই তোমার লক্ষ্য, ইহা তোমার প্রত্যেক ব্যবহারে সপ্রমাণ কর; তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমার স্নেহে তুমি বঞ্চিত হইবে না। তোমার নিকট সদয় ব্যবহার পাইলে আমার হৃদয় স্বতঃই তোমার পক্ষপাতী হইবে।"

রেবেকার কথা শুনিয়া কালনকি তাহাকে সতর্ক হইবার অবসর না দিয়া তাহার প্রসারিত হাত ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল এবং দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে পুনঃপুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তাহার হইয়া উঠিল, কালনকির উষ্ণ ওষ্ঠের স্পর্শে রেবেকা বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি সে কালনকির অসহ্য ধৃষ্টতা নীরবে সহ্য করিল, তাহার কার্য্যে বাধা দান করিল না। তাহার মনে হইল, কালনকির বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাহাকে অভিনয় করিতে হইতেছে। এই অভিনয়ে যথাযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে, কালনকির প্রতি বিরাগবশতঃ তাহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি প্রকাশিত হইলে তাহার শোচনীয় পরাজয় অপরিহার্য্য, তাহার ও তাহার পিতার জীবন বিপন্ন হইবে, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। যাহা হউক, রেবেকা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কালনকি তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া কিছুকাল পরে ভুজবন্ধন অপসারিত করিল, কিন্তু রেবেকার রূপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া চিত্তের স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইল। রেবেকা যেন তাহাকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করিল। মোহাকৃষ্ট শার্দ্দূল শৃঙ্খলিত হইল।

কয়েক মিনিট পরে কালনকি প্রফুল্ল অন্তরে রেবেকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সে অদৃশ্য হইলে রেবেকা ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে অধীর হইয়া আরক্ত মুখে বলিল, "ওরে সয়তান, আমার হৃদয় জয় করিয়াছিস ভাবিয়া আজ তোর বড় আনন্দ! কিন্তু সে কালে সামসন যেমন মোহাকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুপথে অগ্রসর হইয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোকে বংশী-রবে আকৃষ্ট করিয়া তোকে মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করিব। এক দিন তুই আমাকে মুঠায় পুরিয়া আমার দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলি, এক দিন তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিব, সে দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া, তুই সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাক, যথাকালে পদাঘাতে তোর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তোকে মৃত্যুর অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করিব।"

* * * * *

সলোমন কোহেনের গৃহে মোজের আবির্ভাবের পর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গোপনে যে সকল উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল, বাহিরের জনপ্রাণীও তাহা জানিতে পারিল না। সলোমন কোহেন পূর্ব্বে কোন দিন কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার ও তাঁহার কন্যার সম্মান ও প্রাণরক্ষার জন্য

পলায়ন করিতে হইবে; কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি অগ্নিগর্ভ আগ্নেয় গিরির শিখরদেশে উপবেশন করিয়া সুখ-শান্তির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে গিরিমুখনিঃসৃত তরল অগ্নি-স্রোতে তাঁহাকে সজীব অবস্থায় দগ্ধ হইতে হইবে, তখন নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় থাকিবে না। বহু বর্ষকাল তিনি গোপনে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়াও নিরাপদ ছিলেন, তাঁহাকে রাজকর্ম্মচারিবর্গের সন্দেহভাজন হইতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার আশ্রিত জোসেফ কুরেট অত্যুৎসাহী নিহিলিষ্ট বলিয়া ধৃত হওয়ায় এবং কালনকি তাঁহার সকল গুপ্ত রহস্য আয়ত্ত করায় রুস-রাজধানীতে আর তাঁহার নিরাপদে বাস করিবার সম্ভাবনা রহিল না। তাঁহার সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন, গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ যখন তাঁহাকে রাজভক্ত প্রজা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সেই সময় তিনি ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভাবে তাঁহার বাণিজ্য-ব্যবসায় পরিচালনের জন্য তাঁহার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সে কিছু দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার বৈষয়িক কাযকর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল; তিনি কোন কারণে রুসিয়া পরিত্যাগ করিলে সে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার কারবার বিক্রয় করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গোপনে তাহাকে তাঁহার আম-মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ বাহিরের কোন লোক কোন দিন জানিতে পারে নাই। রুসিয়ার কোন কোন ব্যাঙ্কে তাঁহার টাকা ছিল এবং চলতি কারবারেও তাঁহার অনেক টাকা খাটিতেছিল, তথাপি তিনি কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কে তাঁহার অধিকাংশ অর্থ ই গচ্ছিত করিতেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এক দিন তাঁহাকে রুসিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তাঁহাকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী না হইলেও ধনবান্ ছিলেন। সুতরাং সেণ্টপিটার্স বর্গে তাঁহার যে কারবার ছিল, তাহা কোন কারণে নষ্ট হইলেও তাঁহার নিরাশ্রয় হইবার আশঙ্কা ছিল না।

সলোমন কোহেন গোপনে দেশত্যাগের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন, সেই সময় মোজে কালনকির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার হৃদয় জয় করিবার জন্য অদ্ভুত দক্ষতার সহিত তাহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল; এইরূপ কপটতার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহার মন এক এক সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, কিন্তু সে সঙ্কল্পসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তাহার কয়েক দিনের ব্যবহারে কালনকির সকল সন্দেহ দূর হইল। কালনকি বুঝিল, রেবেকা ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রেবেকার হৃদয় জয় করিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে রেবেকার প্রসন্নতালাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। রেবেকা বুঝিয়াছিল, এবার যদি সে কালনকিকে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার সকল সুযোগ নষ্ট হইবে।

এই ভাবে চারি মাস অতীত হইল। শীতের পর গ্রীষ্ম আসিল; মোজে সলোমনের গৃহেই বাস করিতে লাগিল; সলোমনের গৃহ ত্যাগ করিয়া অসুবিধায় পড়িবার জন্য তাহার আগ্রহ হয় নাই। বিশেষতঃ সলোমন গোপনে দেশত্যাগের জন্য যে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, মোজেও তাহাতে যোগদান করায় সলোমন তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে দিলেন না। মোজে নানাপ্রকারে সলোমনকে সাহায্য করিতে লাগিল। নূতন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করা তাহার সেণ্টপিটার্সবর্গে আগমনের অন্যতর উদ্দেশ্য হইলেও সলোমনের সহিত পরামর্শ করিয়া সে সেই চেষ্টায় বিরত হইল; সে বুঝিতে পারিল, সলোমন সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে পলায়ন করিলে তাহারও সেখানে বাস করা কঠিন হইবে। সে স্থির করিল, সলোমন কোহেন সেণ্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিলে সে ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রত্যাগমন করিবে।

অবশেষে এক দিন সলোমন রেবেকা ও মোজের নিকট প্রকাশ করিলেন, তাঁহার উদ্যোগ-আয়োজন শেষ হইয়াছে! কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কালনকিকে অকর্ম্মণ্য করিবার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় সলোমনের আশঙ্কা হইল, শেষ মুহূর্ত্তে সে কোন অসুবিধা ঘটাইতে পারে। এই জন্য স্থির হইল, যে রাত্রিতে সলোমন রেবেকাকে লইয়া সেণ্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিবেন, সেই রাত্রিতেই রেবেকা কালনকিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



দক্ষিণ-চীনে রাসিয়ার প্রভাব

চীনদেশে বর্ত্তমানে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহার [illegible] পরিচয় [illegible] পূর্ব্বে কয়েক সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি। [illegible] দুর [illegible] বিদেশ [illegible] হইতে চীন [illegible] দক্ষিণ-চীনের [illegible] জেনারেল চাঙ্ কাইসেক [illegible] জেনারেল [illegible] প্রমুখ দক্ষিণ-চীনের আন্দোলনের নেতৃবর্গ কোথা হইতে চীনের [illegible] জন্য [illegible] উত্তরে সামরিক দলপতি (War-Lords) চালাইতেছিলেন, [illegible] চাঙ্ [illegible] তাঁহাদের বিরুদ্ধে [illegible] উপস্থিত হইল, [illegible] দক্ষিণ-চীনের [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হইবে [illegible] [illegible] ছিলেন, [illegible] কর্ত্তৃত্ব [illegible] [illegible] করিয়াছেন, [illegible] সুযোগ পাইলেই তিনি দক্ষিণের [illegible] দলের সহিত তাঁহার [illegible] [illegible] করিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন



[illegible] (১) [illegible], (২) [illegible] (৩) [illegible] (৪) [illegible], (৫) [illegible] (৬) [illegible], (৭) [illegible] [illegible] পুত্র

[illegible] Autocracy and privilege উঠাইয়া দিবার জন্য [illegible]

[illegible] করিতেছেন [illegible] চীন [illegible] করিতে না, [illegible] কোনও বিদেশের বিরুদ্ধে [illegible] করিতেছেন না, কেবল [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] করিতেছে। [illegible] [illegible] বলশেভিকদিগের [illegible] আছে, [illegible] চীন [illegible] রাসিয়ার বলশেভিকেরা [illegible] বিস্তার করিয়াছে

এ সকল কথার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন কথা উঠিয়াছে দক্ষিণ-চীন ইংরাজের উপর সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] কেন? দক্ষিণ-চীনপক্ষ বলিতেছেন, কোনও বিদেশীর উপর তাঁহাদের আক্রোশ নাই; যে কোনও বিদেশী তাঁহাদের সহিত সমানে সমানে ব্যবহার করিয়া বাণিজ্যাদি করিয়া এবং চীনকে স্বাধীন জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া চীনের [illegible] চীনের [illegible] থাকিয়া [illegible] বসবাস করিতে চাহেন, চীন-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাদরে চীনে বসবাস করিতে দিবে, অন্যথা সেই বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সহিত চীন গভর্ণমেণ্টের মনের মিল হইবে না, চীন যেরূপেই হউক নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবেই। ইংরাজ পক্ষ (অন্য কোনও বিদেশীর [illegible]) কেন [illegible] তবে চীন রাসিয়ার দ্বারা [illegible] কি প্রকারে?

কথাটা [illegible] বুঝিতে হইলে প্রথমে ইংরাজ ও চীনের [illegible] ব্যাপারের [illegible] উদ্দেশ্যটা [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] পক্ষে স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন (বৈদেশিক সচিব) [illegible] তারিখে জাতিসঙ্ঘের সকাশে যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহার মর্ম্ম [illegible] পারিলেই ইংরাজ পক্ষের কথাটা খোলসা হইয়া যায়। [illegible] তিনি চীনদেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের [illegible] নীতির ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন :—

"[illegible] ওয়াশিংটন নগরে (মার্কিণ যুক্তরাজ্যের [illegible]) পূর্ব্বের যে বৈঠক বসে, সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ যাবৎ চীন

সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, সমস্ত শক্তি একযোগে কার্য্য করেন নাই এবং চীনেও কোনও একটা সর্বজনমান্য কেন্দ্রশক্তির অস্তিত্ব নাই।

তুঙাগানমেং [illegible] খৃষ্টাব্দ হইতে চীনে দলাদলি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ গভর্ণমেণ্ট [illegible] খৃষ্টাব্দে মাত্র ক্যাণ্টন সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, তখনও ঐ গভর্ণমেণ্ট পিকিং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। সুতরাং পিকিং গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ওয়াশিংটন বৈঠকে যে বন্দোবস্তে সহি করিয়াছিলেন, ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট তাহা সমগ্র চীন গভর্ণমেণ্টের বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বর্তমানে ক্যাণ্টন-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসনের সীমানা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অধিকাংশ ভূভাগে তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহারা এখন বলিতেছেন যে, তাঁহারাই চীনে একমাত্র গভর্ণমেণ্ট।

ইঁহা ছাড়া ক্যাণ্টনের [illegible] দলের চরমপন্থীরা বাহির হইয়া ইংরাজের বিপক্ষে বয়কট প্রচার করিতেছে এবং ইংরাজের পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিবার আন্দোলন চালাইতেছে। বস্তুতঃ ইংরাজবিদ্বেষই চীনের জাতীয়তার আন্দোলন সফল করার পক্ষে প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া জাতীয় দলের মধ্যে [illegible] নিশ্চিত হইয়াছে।

[illegible] আন্দোলনকারীদের এক বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ [illegible]। [illegible] সময়ে সাংহাই সহরের আন্তর্জাতিক ভূখণ্ড মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন পুলিসের সহিত চীনা জনতার এক সংঘর্ষ হইয়া [illegible]। চীনা জনতা এমন [illegible] আচরণ করিতে লাগিল যে, [illegible] গুলি করিতে বাধ্য হইল। এই পুলিসের কয় জন [illegible] কর্ম্মচারী ছিলেন। আন্দোলনকারীরা এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিল, ইংরাজেরা অনর্থক চীনা প্রজার উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই পুলিসের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের [illegible] কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

[illegible] এই ভাবেই ক্যাণ্টনের নিকটস্থ শামীন কনসেসনে (আন্তর্জাতিক ভূখণ্ড) [illegible] এক [illegible] চীনা ইংরাজ ও ফরাসীর উপর গুলীবর্ষণ করিল, ফলে কনসেসনের সৈন্যরা আত্মরক্ষার্থ বাধ্য হইয়া চীনাদের উপর গুলী চালাইল, এখন চীনা আন্দোলনকারীরা [illegible] যে, ইংরাজেরাই সর্ব্ব নষ্টের মূল। অথচ এই ব্যাপারে একা ইংরাজ নহে, ফরাসীও লিপ্ত ছিল।

[illegible] বৃটিশ পণ্য বর্জ্জিত হইল। পরে উত্তর চীনে বর্জ্জন পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু দক্ষিণ-চীন তখনও বৃটিশ পণ্য বর্জ্জননীতি পরিত্যাগ করিল না। ক্যাণ্টন-গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যতই মধ্য-চীনের দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই সমস্ত ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচারিত হইতে লাগিল। শেষে অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল যে, দক্ষিণ ও মধ্য চীনে ইংরাজের বসবাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। [illegible] কিউকিয়াঙের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ঐ দুই স্থানে বৃটিশ-প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিল না, কাজেই ইংরাজ নারীদিগকে সাংহাইয়ে স্থানান্তরিত করিতে হইল।

এরূপ অবস্থায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি তাঁহাদের প্রজাবর্গকে অসহায় অবস্থায় চীনের গুণ্ডাদের হাতে ফেলিয়া রাখিবেন? চীনের বহু স্থানে ইংরাজের অগাধ স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, ইংরাজ অনেক সম্পত্তি ও অর্থ চীনের নানা স্থানে রাখিয়াছেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কি সে সকল অমনই ছাড়িয়া দিয়া আসিবেন? তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পারেন না। এই হেতু সাংহাইয়ের ইংরাজ বাসিন্দাদিগের ধনপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সাংহাইয়ে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ইংরাজ আত্মরক্ষার্থ সেনা প্রেরণ করিতেছে। মিঃ চেনের মনস্তুষ্টির জন্য অধিকাংশ সেনাই হংকংয়ে নামানো হইবে, কেবল ভারত হইতে প্রেরিত সেনা সাংহাইয়ে নামিবে।

ইংরাজ পক্ষের এই কথাগুলি শুনিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ইংরাজ চীনের সহিত কোনও দুর্ব্যবহার করেন নাই। যদি তাহাই হয়, তবে চীন বাছিয়া বাছিয়া ইংরাজের উপর বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে কেন? রাসিয়ান সোভিয়েট যদি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে তাহাই বা সম্ভব হয় কেন?

এ কথার জবাব দিয়াছেন এক জন মার্কিণ লেখক। তাঁহার নাম এম ম্যাককুক রটস। তিনি চীনে থাকিয়া চীন নেতাদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, মস্কো সহরে সান-ইয়াট সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে একটি রক্তবর্ণ পতাকা আছে। পতাকায় চীন ও রাসিয়ান ভাষায় লিখিত আছে,—"এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যে দিন সোভিয়েট রাসিয়া এক শক্তিশালী ও স্বাধীন চীনকে বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করিতে পারিবে। এই দুই মিত্র হাত ধরাধরি করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এবং জগতের নিপীড়িত জাতিদিগের মুক্তিসাধন করিবে।"

চীনের মুক্তির অগ্রদূত ডাক্তার সান-ইয়াট-সেনের স্মৃতিসম্মানরক্ষার্থ তাঁহার নামে মস্কো সহরে সোভিয়েট রাসিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে চীন যুবক-যুবতীরা নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় পরলোকগত ডাক্তার সান ইয়াট সেনের উক্ত কথাগুলির সার্থকতা এত দিন পরে উপলব্ধি হইতেছে। চীন রাসিয়ায় পরিণত হইয়াছে, এ কথা বলা হইতেছে না, তবে চীনা স্বাধীনতালিপ্সুর গত শরৎকাল হইতে এ যাবৎ ক্যাণ্টনের রাজ্য যে ভাবে দ্রুত বিস্তৃত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, স্বাধীন শক্তিশালী এক বিরাট চীন সাম্রাজ্যের' প্রতিষ্ঠার অধিক বিলম্ব নাই।

ডাক্তার সানের আর একটা কথাও কতকটা সত্য হইয়াছে। চীনও রাসিয়ান সোভিয়েটের মত নিপীড়িতগণের মুক্তিসাধনে তৎপর হইয়াছে। এ বিষয়ে রাসিয়ান সোভিয়েট তাহার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। এই হেতু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যে ভাবে ফরাসীকে দেখিত, এখন চীন সেই ভাবে রাসিয়াকে দেখিতেছে। ফরাসী সেই সময়ে মার্কিণকে তাহার বিদ্রোহে সাহায্য করিয়াছিল, এখন রাসিয়া চীনকে তাহার বিপ্লবে সাহায্য করিতেছে। তাই চীন রাসিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ দিকে চীনের জাতীয় দল যতই কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে, রাসিয়াও তত গর্ব্বানুভব করিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন জাতীয় দল উত্তরের দলকে পরাজিত করিয়া মধ্যচীনের তিনটি প্রধান সহর অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সময়ে মিঃ রটস সাইবেরিয়ান রেল লাইনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি সাইবিরিয়ার প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে রাসিয়ানদিগকে আগ্রহের সহিত চীনের গৃহযুদ্ধের সংবাদ পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন। এমন কি, মস্কো হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছিল, তাহা তাহারা পরে পাঠ করিবার জন্য রাখিয়া দিয়া অগ্রে চীনের খবর পাঠ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। মিঃ রটস মস্কো পৌঁছিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে চীনের খৃষ্টান সেনাপতি জেনারল ফেঙ্গ উট্রোকলে মস্কো হইতে তাড়াতাড়ি চীনযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, সে সময়ে চীনের দক্ষিণের জাতীয় দল উত্তরোত্তর রণে জয়লাভ করিতেছে। জেনারল ফেঙ্গ ইহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। সে সময়ে মস্কোয়ের বিখ্যাত রাসিয়ান পত্র 'প্রাভডা' ও 'ইসভেসটিয়' বড় বড় হরপে ইয়াংসি নদীর তটে দক্ষিণ চীনের জাতীয় দলের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল। [illegible]



দক্ষিণ-চীনে রাসিয়ার প্রভাব

চীনদেশে বর্ত্তমানে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার আমূল পরিচয় আমরা পূর্ব্বে কয়েক সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি। এ ব্যাপারের মূল কোথায়, কিসে কোথা হইতে চীনে ডাক্তার সান ইয়াট-সনের কুওমিংটাং দলের উদ্ভব হইল, জেনারল চাঙ্গ কাইসেক, বোরোডিন জেনারল গ্যালেণ্ট প্রভৃতি দক্ষিণ-চীনের আন্দোলনের নেতৃবর্গ কোথা হইতে চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন, উত্তরের সামরিক দলপতি (War-Lords) চাঙ্গসোলিন, উপেই-ফু ও সান চুয়াঙ্গ ফেঙ্গের সহিত তাঁহাদের কিরূপে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, উত্তর পশ্চিমের মঙ্গোলিয়া সীমান্তে খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ কিরূপে পিকিং হইতে বিতাড়িত হইয়া মস্কৌয়ের সোভিয়েটের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন ও পরে উত্তরের জেনারলদের কর্ত্তৃকরূপে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আড্ডা স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, আবার সুযোগ পাইলেই তিনি দক্ষিণের কুওমিংটাং দলের সহিত তাঁহার কুওমিনচুন্ দলের যোগাযোগ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন,— এ সকল কথার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।



সামরিক হইতে—(১) বোরোডিন, (২) কুয়োসিং (কুওমিংটাং প্রচার কার্য্যের কর্ত্তা) (৩) মিসেস বোরোডিন (৪) মিসেস লিয়াও চুকাই, (৫) মিসেস চাংকাইসেক, (৬) জেনারেল গ্যালেণ্ট, (৭) জেনারেল চাংকাইসেক,— সম্মুখে চাংকাইসেকের বালক পুত্র

এখন কথা উঠিয়াছে, দক্ষিণ চীন ইংরাজের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট কেন? দক্ষিণ চীনপক্ষ বলিতেছেন, কোনও বিদেশীর উপর তাঁহাদের আক্রোশ নাই; যে কোনও বিদেশী তাঁহাদের সহিত সমানে সমানে ব্যবহার করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যাদি করিয়া এবং চীনকে স্বাধীন জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া চীনের আইনকানুন মানিয়া চীনের প্রজা থাকিয়া চীনদেশে বসবাস করিতে চাহেন, চীন-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাদরে চীনে বসবাস করিতে দিবে, অন্যথা সেই বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সহিত চীন গভর্ণমেণ্টের মনের মিল হইবে না, চীন যেরূপেই হউক, নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবেই। ইংরাজ পক্ষ (অন্য কোনও বিদেশীর নহে) বলিতেছেন, চীন অন্য কোনও বিদেশীকে কিছুই বলিতেছে না, চীনের শ্রমিক জনসাধারণ অন্য কোনও বিদেশীয়ের বিপক্ষে ধর্ম্মঘটাদি করিতেছে না, কেবল ইংরাজের বিপক্ষেই করিতেছে; ইহার কারণ এই যে, চীনের পশ্চাতে রাসিয়ান বলশেভিকদিগের ইঙ্গিত আছে, তাহাদের পরামর্শে চীন চালিত হইতেছে, নতুবা এত দিন চীন সমস্যা মিটিয়া যাইত; রাসিয়ান বলশেভিকরা প্রাচ্যে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য এইরূপ ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়াছে।

উভয় পক্ষের এইরূপ 'চাপান উতোর' চলিতেছে। মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করে কে? চীন একটা যুক্তি দেখাইয়াছে, ইহার উত্তর আজিও কেহ দিতে পারে নাই। চীন বলিতেছে, ডাক্তার সান ইয়াট-সেন যখন কুওমিংটাং দলের সৃষ্টি করিয়া চীনে বিপ্লব উপস্থিত করেন এবং নিজের 'তিন নীতি' প্রচার করেন, তখন বলশেভিকরা কোথায় ছিল? তখন ত রাসিয়ায় জেরেরই রাজ্য [illegible] নাই; কারণ [illegible] না মরা পর্যন্ত [illegible] [illegible] ডাক্তার সান চীন হইতে জারের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি—Autocracy and privilege উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তবে চীন রাসিয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল কি প্রকারে?

কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইলে প্রথমে ইংরাজ ও চীনের তরফের লড়াইয়ের চাপান উতোরটা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইংরাজ পক্ষে সার অষ্টেন চেম্বারলেন (বৈদেশিক সচিব) গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতিসঙ্ঘের সকাশে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই ইংরাজ পক্ষের কথাটা খোলসা হইয়া যায়। সেই পত্রে তিনি চীনদেশে বৃটিশগভর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন;—

"১৯১২ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন সহরে (মার্কিণ যুক্তরাজ্যের) শক্তিপুঞ্জের যে বৈঠক বসে, সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ যাবৎ চীনে [illegible]

সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, সমস্ত শক্তি একযোগে কার্য্য করেন নাই এবং চীনেও কোনও একটা সর্ব্বজনমান্য কেন্দ্রশক্তির অস্তিত্ব নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে চীনে দলাদলি অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ গভর্ণমেণ্ট ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ক্যাণ্টন সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, তখনও ঐ গভর্ণমেণ্ট পিকিং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল। সুতরাং পিকিং গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ওয়াসিংটন বৈঠকে যে বন্দোবস্তে সহি করিয়াছিলেন, ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট তাহা সমগ্র চীন গভর্ণমেণ্টের বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বর্ত্তমানে ক্যাণ্টন-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসনের চৌহদ্দী বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অধিকাংশ ভূভাগে তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এখন বলিতেছেন যে, তাঁহারাই চীনে একমাত্র গভর্ণমেণ্ট।

ইহা ছাড়া ক্যাণ্টনের ন্যাশানালিষ্ট দলের চরমপন্থীরা বাছিয়া বাছিয়া ইংরাজের বিপক্ষে কুৎসা ও গ্লানি প্রচার করিতেছে এবং ইংরাজের পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিবার আন্দোলন চালাইতেছে। বস্তুতঃ ইংরাজ-বিদ্বেষই চীনের জাতীয়তার আন্দোলন সফল করার পক্ষে প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া জাতীয় দলের মধ্যে সম্প্রদায়ের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আন্দোলনকারীদের এক বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ঘটিল। ঐ সময়ে সাংহাই সহরের আন্তর্জ্জাতিক ভূখণ্ডর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন পুলিসের সহিত চীনা জনতার এক সংঘর্ষ হইয়া গেল। চীনা জনতা এমন অনাচার আচরণ করিতে লাগিল যে, পুলিস অবশেষে গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হইল। এই পুলিসের কয় জন বৃটিশ কর্ম্মচারী ছিলেন। আন্দোলনকারীরা এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিল যে, ইংরাজরা সম্পূর্ণ চীনা প্রজার উপর অনাচার অত্যাচার করিয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই পুলিসের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

ঠিক এই ভাবেই ক্যাণ্টনের নিকটস্থ শামীন কনশেসনে (আন্তর্জ্জাতিক ভূখণ্ড) যখন এক দল সশস্ত্র চীনা ইংরাজ ও ফরাসীর উপর গুলীবর্ষণ করিল, ফলে কনশেসনের সৈন্তরা আত্মরক্ষার্থ বাধ্য হইয়া চীনাদের উপর গুলী চালাইল, তখন চীনা আন্দোলনকারীরা রটাইল যে, ইংরাজরাই যত নষ্টের মূল; অথচ এই ব্যাপারে একা ইংরাজ নহে, ফরাসীও লিপ্ত ছিল।

চীনে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জিত হইল। পরে উত্তর চীনে বর্জ্জন পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু দক্ষিণ-চীন তখনও বৃটিশ পণ্য বর্জ্জননীতি পরিত্যাগ করিল না। ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যতই মধ্য-চীনের দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই সর্ব্বত্র ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচারিত হইতে লাগিল। শেষে অবস্থা এমন সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল যে, দক্ষিণ ও মধ্য চীনে ইংরাজের বসবাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। হাঙ্কো ও কিউকিয়াঙ্গের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ঐ দুই স্থানে বৃটিশ-প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিল না, কাজেই ইংরাজ নারীদিগকে সাংহাইয়ে স্থানান্তরিত করিতে হইল।

এরূপ অবস্থায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি তাঁহাদের প্রজাবর্গকে অসহায় অবস্থায় চীনের যত্র তত্র ফেলিয়া রাখিবেন? চীনের বহু স্থানে ইংরাজের অগাধ স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে—ইংরাজ অনেক সম্পত্তি ও অর্থ চীনের নানা স্থানে রাখিয়াছেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কি সে সকল অমনই ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিবেন? তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পারেন না। এই হেতু সাংহাইয়ের ইংরাজ বাসিন্দাদিগের আত্মরক্ষার্থ সেনা প্রেরণ করিতেছে। মিঃ চেনের মনস্তুষ্টির জন্য অধিকাংশ সেনাই হংকংয়ে নামানো হইবে, কেবল ভারত হইতে প্রেরিত সেনা সাংহাইয়ে নামিবে।

ইংরাজ পক্ষের এই কথাগুলি শুনিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ইংরাজ চীনের সহিত কোনও দুর্ব্যবহার করেন নাই। যদি তাহাই হয়, তবে চীন বাছিয়া বাছিয়া ইংরাজের উপর বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে কেন? রাসিয়ান সোভিয়েট যদি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে তাহাই বা সম্ভব হয় কেন?

এ কথার জবাব দিয়াছেন এক জন মার্কিণ লেখক। তাঁহার নাম জন ম্যাককুক রুটস। তিনি চীনে থাকিয়া চীন নেতাদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি বলেন,—মস্কো সহরে সান-ইয়াট সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে একটি রক্তবর্ণ পতাকা আছে। পতাকায় চীন ও রাসিয়ান ভাষায় লিখিত আছে,—"এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যে দিন সোভিয়েট রাসিয়া এক শক্তিশালী ও স্বাধীন চীনকে বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করিতে পারিবে। এই দুই মিত্র হাত ধরাধরি করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এবং জগতের নিপীড়িত জাতিদিগের মুক্তিসাধন করিবে।"

চীনের মুক্তির অগ্রদূত ডাক্তার সান-ইয়াট-সেনের স্মৃতিসম্মানরক্ষার্থ তাঁহার নামে মস্কো সহরে সোভিয়েট রাসিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে চীন যুবক-যুবতীরা নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় পরলোকগত ডাক্তার সান-ইয়াট-সেনের উক্ত কথাগুলির সার্থকতা এত দিন পরে উপলব্ধি হইতেছে। চীন রাসিয়ায় পরিণত হইয়াছে, এ কথা বলা হইতেছে না, তবে চীনা ন্যাশানালিষ্টরা গত শরৎকাল হইতে এ যাবৎ ক্যাণ্টনের রাজ্য যে ভাবে দ্রুত বিস্তৃত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, 'স্বাধীন শক্তিশালী এক বিরাট চীন সাম্রাজ্যের' প্রতিষ্ঠার অধিক বিলম্ব নাই।

ডাক্তার সানের আর একটা কথাও কতকটা সত্য হইয়াছে। চীনও রাসিয়ান সোভিয়েটের মত নিপীড়িতগণের মুক্তিসাধনে তৎপর হইয়াছে। এ বিষয়ে রাসিয়ান সোভিয়েট তাহার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। এই হেতু ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যে ভাবে ফরাসীকে দেখিত, এখন চীন সেই ভাবে রাসিয়াকে দেখিতেছে। ফরাসী সেই সময়ে মার্কিণকে তাহার বিদ্রোহে সহায়তা করিয়াছিল, এখন রাসিয়া চীনকে তাহার বিপ্লবে সহায়তা করিতেছে। তাই চীন রাসিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ দিকে চীনের জাতীয় দল যতই কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে, রাসিয়াও তত গর্ব্বানুভব করিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন জাতীয় দল উত্তরের দলকে পরাজিত করিয়া মধ্যচীনের তিনটি প্রধান সহর অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সময়ে মিঃ রুটস সাইবেরিয়ার রেল লাইনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি সাইবিরিয়ার প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে রাসিয়ানদিগকে আগ্রহের সহিত চীনের ঘরোয়া যুদ্ধের সংবাদ পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন। এমন কি, মস্কো হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছিল, তাহা তাহারা পরে পাঠ করিবার জন্য রাখিয়া দিয়া অগ্রে চীনের খবর পাঠ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। মিঃ রুটস মস্কো পৌঁছিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে চীনের খৃষ্টান সেনাপতি জেনারল ফেঙ্গ উড়োকলে মস্কো হইতে তাড়াতাড়ি চীন-যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, সে সময়ে চীনের দক্ষিণের জাতীয় দল উত্তরোত্তর রণে জয়লাভ করিতেছে। জেনারল ফেঙ্গ ইহাতে এত আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বদেশ-যাত্রা করিয়াছিলেন। সে সময়ে মস্কোয়ের বিখ্যাত রাসিয়ান পত্র 'প্রাভডা' ও 'ইসভেসটিয়া' বড় বড় হরফে ইয়াংসি নদীর তটে দক্ষিণ-চীনের জাতীয়

রাসিয়ান ও চীন অধ্যাপক ও ছাত্ররা ঘিরিয়া ধরিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কারল রাডেক তাঁহাকে প্রথম প্রশ্ন করিলেন, "আমার মনে হয়, দক্ষিণের জাতীয় দলের সেনানীরাই ভবিষ্যতে চীনের নেতা হইবেন। আপনি ত এত দিন চীনে ছিলেন। আপনি কি এ বিষয়ে আমার সহিত একমত ?"

ইহা হইতেই বুঝিয়া দেখুন, রাসিয়া মনে চীন কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখন রাসিয়ানরা চীনকে আপনার জন বলিয়া মনে করে, চীনের জাতীয় দলের জয়ে তাহারা গর্ব্বানুভব করে। এই জন্য আজ তাহারা চীনের মুক্তিকামী জাতীয় দলের ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রীতি ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইংরাজ, জাপ বা ফরাসীর ত কথাই নাই, এমন কি, মার্কিণও এ বিষয়ে রাসিয়ানের সহিত কণামাত্র প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। রাসিয়ার সহিত আধুনিক চীনার ভাবের আদান প্রদান এত অধিক এবং ঐ দুই জাতি পরস্পর এত ঘনিষ্ঠ যে, বর্ত্তমানে চীনা জাতীয় দল যাহা বলে, অমনই সকলে বলে, উহাদের কার্য্যের মূলে রাসিয়ানরা আছে। ... যুরোপীয় অন্যান্য জাতি এবং মার্কিণ ও তাদের ধারণা, ... চীন রাসিয়ার বন্ধু বলিয়া, চীন যাহা করে, রাসিয়ার পরামর্শ ... লইয়া করে ...।

এখন জিজ্ঞাস্য, এ ধারণা কেন হইল ? উত্তরে প্রথমে এই নীতির কথা ... ... পূর্ব্বে ইংরাজ, মার্কিণ ও রাসিয়া এক চুক্তিবলে চীন সরকারকে কে ... বাধ্য করিতে বাধ্য করে ... ঐ চুক্তিতে স্থির হয় যে, (১) ইংরাজ, মার্কিণ ও রাসিয়ান প্রজা চীনে ব্যবসায়ার্থ বা কার্য্যের জন্য বসবাস করিলে তাহাদিগের বিচার তাহাদের নিজের আদালতে হইবে, (২) উপরিউক্ত তিন শক্তি চীনের কাষ্টম্‌স্‌ আদায়ের তত্ত্বাবধান করিবে, (৩) এবং উহারা কয়েকটি কনসেসন উপভোগ করিবে, অর্থাৎ চীনের রাজ্যে কতকগুলি স্থানের প্রায় মৌরসী মকরারী উপস্বত্ব উপভোগ করিবে।



ক্যাণ্টনে বন্দী জাতীয় সেনাদলের লোক ... ...

বলা বাহুল্য, অতীতে এক যুগে চীন যাহা বিদেশীর 'ফ্যানসেট' বা দেবর মধ্যে ভয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, বর্ত্তমান নবজাগ্রত চীন তাহা আপনার স্বাধীনতার পক্ষে—আত্মসম্মানের পক্ষে অপমানকর বলিয়া মনে করে। রাসিয়ান সোভিয়েট এ কথা বুঝিয়াছিল। তাই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ চীনকে বলিল, "ভাই ! আমরা বিনা ওজর-আপত্তিতে—বিনা সর্ত্তে স্বেচ্ছায় ইম্পিরিয়াল জারশাসিত রাসিয়ার এই সকল অন্যায় সন্ধির অধিকার ছাড়িয়া দিতেছি, তুমি আমাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ কর।" পর্ব্বিত যুরোপীয় জাতির মুখে এই কথা শুনিয়া চীন বিস্মিত হইল—এমন ভাষা তাহার কানে নূতন বোধ হইল ... তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল—সে বুঝিল, সেও অন্যান্য শক্তির ন্যায় স্বাধীন। সোভিয়েট রাসিয়ার ডিরেক্টরগণ তখন বলিয়াছিলেন যে, চীনে বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিলে তাঁহার মিত্রশক্তিগণের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ হয়, তখনই চীনের সহিত উক্ত সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল ; পরন্তু চীনকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইলে রাসিয়ার বিশেষ লাভ।

চীনের সাধারণ প্রজা যুরোপীয় রাজনীতির এই সমস্ত কূট অর্থ বুঝে না। তাহারা রাসিয়ানের সহিত অন্য পাশ্চাত্যের তারতম্য করে এই ভাবিয়া যে, যে স্থলে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি চীনের পক্ষে অপমানকর অধিকার এখনও উপভোগ করিতেছে, সে স্থলে রাসিয়ানরা উদার হৃদয়ে সকল অন্যায় সত্ত্ব নাকচ করিয়া চীনকে সমান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এই হেতু চীনও রাসিয়াকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

এই মনোভাব চীনের দক্ষিণভাগে বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেখানে ইংরাজ ও মার্কিণকে বিদেশী শত্রু বলিয়া লোক মনে মনে বলে, কিন্তু রাসিয়াকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করে। এই জন্য সেখানে রাসিয়ানের সর্ব্বত্র আদর, কিন্তু ইংরাজ ও মার্কিণের প্রতি সেখানে ... হইতেছে, তাহাদের বিপক্ষে বিরাট ধর্ম্মঘট হইতেছে, চীনারা তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতেছে। এমন যে চাষাগণরা ... উপর যে মার্কিণ ... ... করিয়াছিল, তাহাদিগকেও রাসিয়ানের মত ... ... চীনের দক্ষিণে সকল চীন ... ... ফিরাইয়া দিয়া সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহারা ... রাসিয়ানদের মত চীনকে সমান বলিয়া মনে করিতেছে। ইংরাজের সহিত ত কথাই নাই, মার্কিণের প্রতি কিন্তু চীন উহার ঠিক বিপরীত ব্যবহার করিতেছে। সম্প্রতি ক্যাণ্টনের প্রধান বন্দরে কয়েক জন মার্কিণ জাতীয় অধ্যাপক সাংসারিক অবকাশকালে রেলগাড়ীতে অন্যত্র বেড়াইতে যাইতেছিলেন। গাড়ীতে এত ভিড় যে, তাঁহাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একটা ষ্টেশনে কয়েক জন চীনা রেলকর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নামাইয়া তাঁহাদের বিশ্রাম কামরায় লইয়া গিয়া চা, খাবার ইত্যাদি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাবার্ত্তার সময় প্রকাশ পাইল যে, তাঁহারা মার্কিণদেশীয়, অমনই চীনা কর্ম্মচারীদের মুখমণ্ডল বিকৃত হইল। তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে রাসিয়ান মনে করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে আবার গাদাগাদির মধ্যে গিয়া স্থান করিতে হইল। এমনই অবস্থা!

চীনারা এ যাবৎ শক্তি আর ... ... হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা এখন আর কথা চাহে না, কাষ ... রাসিয়া কাষে বিশেষ অধিকার ছাড়িয়াছে, তাই রাসিয়ার প্রতি এত প্রীতি। মার্কিণের প্রতি যে চীনের বিশেষ অপ্রীতি, তাহা ... তবে যদি মার্কিণ অন্যায় সন্ধিগুলি বাতিল করিয়া চীনের সহিত সমানের ব্যবহার করেন, তাহা হইলে চীনের সহিত মার্কিণের ...

রাসিয়ান সোভিয়েট বহুদিন যাবৎ চীনের মনস্তুষ্টিবিধান করিতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চিরেরিণ ক্যাণ্টনের নেতা ডাক্তার সান ইয়াট সেনের সহিত পত্রের আদান প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ডাক্তার সান উত্তর-চীনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া পিকিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন। ইংরাজ, মার্কিণ, ফরাসী বা জাপানের মত রাসিয়া তখন পিকিংয়ের সহিত সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ নহে। চিরেরিণ পিকিংকে চীনের রাজধানী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ইহা হইতে ক্যাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গদলের সহিত রাসিয়ার বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সান হোয়ামপোয়ার সামরিক বিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব অনুভব করিয়া প্রথমে মার্কিণের দ্বারস্থ হয়েন। তাঁহার নিজের শিক্ষা মার্কিণ দেশে, উঁহাই মার্কিণের সাহায্য প্রার্থনার মূল। সান তাঁহার কানাডাবাসী পারিষদ মরিস কোহেনকে মার্কিণ দেশে শিক্ষকের সন্ধানে প্রেরণ করেন। কোহেন মার্কিণে গিয়া শিক্ষকের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু extra-territorial বিধিনিষেধের অস্তিত্ব হেতু শিক্ষক সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। মার্কিণ সরকার পিকিংয়ের সরকারের বিপক্ষে ক্যাণ্টনের বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদান করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ডাক্তার সান অনন্যোপায় হইয়া রাসিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপূর্ব্বে সাংহাই সহরে মাইকেল বোরোডিনের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের উভয়ের বন্ধুত্ব নিবিড় হইয়া উঠিল। বোরোডিন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আহূত হইয়া আরও কয়েক জন রাসিয়ানকে সঙ্গে লইয়া ক্যাণ্টনে উপস্থিত হইলেন। এই রাসিয়ানরা ক্যাণ্টনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের উপদেশক মণ্ডলীতে পরিণত হইলেন।



ক্যাণ্টন ও সামীনের মধ্যে ইংরাজের সেতু

বোরোডিন তদবধি দুই দিক দিয়া চীনের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তিনি চীনে (১) বিদেশী ধনশালী ও সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রভাব ধ্বংস করিতে লাগিলেন, (২) ডাক্তার সানের প্রতিষ্ঠিত কুওমিণ্টাঙ্গ বা জাতীয় দলকে নানা উপায়ে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। রাসিয়ার কম্যুনিষ্টদলের অনুরূপ এই কুওমিণ্টাঙ্গ দল, বোরোডিনের ইহাই ধারণা ছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য সহজ হইল। বস্তুতঃ বোরোডিনের প্রচারকার্য্যের ফলে, যে চীনের জাগরণ বহু পরে সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর ছিল, তাহা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস চীনের জাতীয় জাগরণের পক্ষে স্মরণীয় দিন। ঐ দিন কুওমিণ্টাঙ্গ দলের দ্বিতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইল;

"বিদেশীয় সাম্রাজ্যগর্ব্বের (Imperialism) অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়ার অর্থই চীনের জাতীয়তা। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক হইতে দেখিলে বিদেশীয় আর্থিক অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়ার অর্থ জাতীয়তা। কুওমিণ্টাঙ্গের মূলনীতি হইতেছে—প্রবল সাম্রাজ্যবাদীর বিপক্ষে অভ্যুত্থান করা।"

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে সাংহাই সহরে এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে চীনের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। লাউজা পুলিস থানার বাহিরে এক দল চীনা শোভাযাত্রাকারীর উপর ঐ দিন বৃটিশ পুলিস কর্ম্মচারীর অধীনস্থ সাংহাই পুলিস ৪০টি গুলী বর্ষণ করিল। ইহাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। উহার পর হইতে দক্ষিণ-চীন যে মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মূর্ত্তির তুলনা হয় না। ব্যাপার ক্রমে আরও প্রবল আকার ধারণ করিল। ২৩শে জুন তারিখে ক্যাণ্টনের পার্শ্বস্থ সামীন কনশেসনে আর এক ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হইল। ঐ স্থানে ফরাসী ও ইংরাজ শান্তিরক্ষী সেনা গুলী করিয়া ৫০ জন চীনাকে হত্যা করিল এবং শতাধিক চীনাকে আহত করিল। ফলে চীন ও ইংরাজে মনোমালিন্য বদ্ধমূল হইল। ইংরাজ ও ফরাসী পক্ষ হইতে প্রচারিত হইল যে, ক্যাণ্টনে চীনা সেনাদল (দুই সহস্র) সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের এক রাসিয়ান সেনানীই প্রথম গুলী ছুড়িয়াছিল!

যে কারণেই হউক, যখন একবার ক্যাণ্টনের সান্নিধ্যে চীনার রক্তপাত হইল, তখন ইংরাজের সহিত চীনের মনোমালিন্য বর্দ্ধিত হওয়ার পক্ষে আর কোনও বাধা রহিল না। ইহা সত্য বটে যে, ফরাসীও এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, কিন্তু চীন ফরাসীর প্রতি রুষ্ট হইল না; কেবল ইংরাজের বিপক্ষেই চীনার বিদ্বেষ ও ঘৃণা ভীষণ তেজে আত্মপ্রকাশ করিল। কোনও মার্কিণ লেখকই বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "It was the name of England that became anathema throughout China and especially in Kuomitung province. ইহার অর্থ কি? এক দিনে হঠাৎ এই ক্রোধবহ্নি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে নাই, বহু দিনের সঞ্চিত বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপ সামীনের ব্যাপার নিপতিত হইয়াছিল।

ফল এই হইল যে, সমগ্র দক্ষিণ চীন হংকংয়ের বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনকারী এবং বৃটিশ সংশ্রবত্যাগকারী ধর্ম্মঘটীদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইল। চারিদিক হইতে ধর্ম্মঘটকারীদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা আসিতে লাগিল, ক্যাণ্টনে এক ধর্ম্মঘট কমিটীর প্রতিষ্ঠা হইল, নিমিষে হইয়াই সুপরিচালিত হইতে লাগিল। হংকং স্বদেশপ্রেমিক চীনাগণের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল। ধর্ম্মঘটের ফলে হংকংএর বৃটিশ বাণিজ্য সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বস্তুতঃ দক্ষিণ-চীনে এই সময়ে বৃটিশ বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। মধ্য-চীনেও যখন দক্ষিণের কুওমিণ্টাঙ্গরা বিজয়কেতন উড্ডীন করিল, তখন সেখানেও ইংরাজের বহুকালের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইল।

এক দিকে যে পরিমাণে ইংরাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, সেই

তুলিলে—চীনের শ্রমিক ও কৃষকদিগের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মস্বার্থ-বোধ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে বিরাট চীন এক দিন জগতের Imperialism ও Capitalism ভারগ্রস্ত স্বার্থপর শক্তিপুঞ্জের এক প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, এ কথা রাসিয়ার সোভিয়েট বিলক্ষণ অবগত আছে। তাই রাসিয়া চীনের এই বৃটিশ বিদ্বেষের সুযোগ পাইয়া চীনা জনসাধারণের মনে Class conciousness জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। ইহাই রাসিয়ান কম্যুনিষ্টদিগের জীবনের ব্রত; জনসাধারণ জাগিলে কুওমিণ্টাঙ্গ তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে, এ কথাও রাসিয়া বুঝিয়াছিল। তাই সকল বিষয়ে রাসিয়া প্রচারকার্য্যের ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। সে কার্য্যের অগ্রণী নায়ক বোরোডিন।

ডাক্তার সানের প্রতিষ্ঠিত কুওমিণ্টাঙ্গ গভর্ণমেণ্টের আদর্শ ছিল,—Democracy, Constitutional Government, China for the Chinese. এ সকল অতি সহজ উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক কথা। এ কথা জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য ছিল। বোরোডিন প্রচারকার্য্যের দ্বারা কুওমিণ্টাঙ্গ ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করিলেন। কুওমিণ্টাঙ্গ বুঝিলেন, চীনদেশকে উদ্ধার করিতে হইলে জনসাধারণকে সঙ্গে লওয়া চাই, নতুবা কেবল শিক্ষিত ও ভাবুকগণকে লইয়া দেশের মুক্তিসাধন করা যায় না। তাই কুওমিণ্টাঙ্গের কর্তৃপক্ষ বোরোডিনের পরামর্শ অনুসারে জনসাধারণের Trade Unionগুলিকে তাহাদের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সান যে সময়ে শত্রুপক্ষের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সাংহাইয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন, সেই সময়ে তথায় তাঁহার সহিত রাসিয়ার সোভিয়েটের চীন দূত জফের আলাপপরিচয় হয়। পরে তাঁহার মারফতে বোরোডিনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বোরোডিন ও জফের সহিত কথাবার্ত্তার ফলে ডাক্তার সান শ্রমিকদিগের সাহায্যগ্রহণ করিয়া দেশের মুক্তিসাধন করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। তদবধি কুওমিণ্টাঙ্গ দল জনসাধারণের সহিত (শ্রমিক ও কৃষকের সহিত) এক হইয়া মুক্তিযুদ্ধের পথে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যে কুওমিণ্টাঙ্গ দলের দ্বিতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত চীনের সহিত চীনের জনসাধারণের প্রথম যোগাযোগের সূত্রপাত। আমাদের দেশেও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শিক্ষিতের সহিত জনসাধারণের এইরূপ যোগাযোগ হইয়াছিল, তখনই শ্রমিক ও কৃষকগণকে জাতীয় কংগ্রেসের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল হইতে কুওমিণ্টাঙ্গ কর্তৃপক্ষের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকগণের প্রতিনিধিরাও স্থান প্রাপ্ত হইল।

তখন হইতে কুওমিণ্টাঙ্গ সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটীর দুইটি



কুওমিণ্টাঙ্গ দলের প্রধান নায়কগণের সম্মুখে ডাক্তার সানের প্রতিকৃতি

অসংখ্য 'ইউনিয়ান' বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহারা স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের সকলগুলির মূলমন্ত্র, মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রহিল এক। তাহাদের সকলেরই তার এক সুরে বাঁধা, একটিতে টান দিলে সকলগুলি একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এক এক ইউনিয়ানের সদস্যরা এক এক স্থানে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের সঙ্ঘে মালিক, মনিবদিগকে বাধ্য করিতে লাগিল। সাধারণ কুলীও তখন সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, চীনদেশ তাহাদের পশ্চাতে রহিল, কুওমিণ্টাঙ্গ গভর্ণমেণ্টের শক্তিসামর্থ্যের সহায়তা। চীনের এই ভাবটিকে এখন য়ুরোপীয় শক্তিরা স্বার্থে আঘাত পাইয়া বলিতেছে, উহা বলশেভিক পরামর্শে প্রভাবান্বিত।

হংকংএর অসংখ্য শ্রমিক ইংরাজ ব্যবসাদারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ক্যাণ্টনে চলিয়া গেল। সেখানে তাহাদের ভরণপোষণের কোনও অভাব হইল না। তাহারা বিরাট শোভাযাত্রা করিল। চীনের জনসাধারণের মনে স্বদেশপ্রেমিকতা জাগাইতে লাগিল। এ সকল শোভাযাত্রায় ও সভায় বোরোডিন স্বয়ং উদ্যোক্তার অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ এক সভাধিবেশনের পূর্ব্বে কোনও মার্কিণ, চীনা ধর্ম্মঘটকারীদিগের নেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদের সভার স্থানে দেখিলাম, ডাক্তার সানের প্রতিকৃতি রক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু উহার দুই পার্শ্বে লেনিন ও কার্ল মার্কসের প্রতিকৃতি রহিয়াছে কেন? উহারা ত বিদেশী।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "লেনিন ও মার্কস বিদেশী বটে, কিন্তু ইঁহারাও ডাক্তার সানের মত শ্রমিক ও কৃষকের বন্ধু। এই হেতু ইঁহারাও আমাদের নেতা। আজ এখন এই শ্রেণীর নেতার প্রয়োজন।" তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন, চীনে এখন কোন দিকে হাওয়া বহিতেছে, আর কেন বা চীন রাসিয়াকে ও রাসিয়ার বোরোডিনকে এত ভালবাসে। চীনের যে কোনও শ্রমিক-সমিতির পাঠকক্ষে বা পাঠাগারে গেলে টেবলের উপর কিরূপ গ্রন্থ বা পাঠ্য পত্রিকাদি স্থান পাইয়া থাকে, জানেন কি?—(১) ডাক্তার সানের জীবনচরিত, (২) জেনারেল চিয়াং কাইসেক, (৩) বোরোডিনের বক্তৃতা, (৪) সাধীনের পতাকা, (৫) অসমান সন্ধিপত্রসমূহ, (৬) সাম্রাজ্যবাদের মূলমন্ত্র, (৭) চীনের মুক্তি, (৮) কম্যুনিষ্ট ঘোষণা, (৯) জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক দায়, (১০) তরুণ শ্রমিকদিগের সমস্যা, (১১) শ্রমিক ইত্যাদি।

এক একটি শ্রমিক-সভার নিশানে লেখা থাকে,—(১) ধর্ম্মঘট জাতীয় বিপ্লবের প্রথম পর্ব্ব, (২) সকল শ্রেণীর লোকের সংযোগ ধর্ম্মঘটের সাফল্য সূচনা করে, (৩) একতাই শক্তি, ইত্যাদি। বুক ডাবেদীর শিরোদেশে অঙ্কিত থাকে,—হস্তের আকারে হাতুড়ি ও কাস্তে অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকের অস্ত্র। ইহাই রাসিয়ার সোভিয়েট

করিয়াছে। সকল দেশের ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ফরাসীদেশে কৃষকের রুটীর বিপ্লব (Bread-riot) হইতেই ফরাসী-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। ইংলণ্ডে জনসাধারণের উত্থানে—পিম হ্যাম্পডেনের মত লোকের স্বার্থত্যাগে স্বেচ্ছাচারিতার অবসান হইয়াছিল। চীনের জনসাধারণের জাগরণের মূলে ছিলেন ডাক্তার সান-ইয়াট সেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া বোরোডিনকে ও অন্যকে প্রচারকার্য্যের জন্য ক্যাণ্টনে আনয়ন না করিলে চীনের কৃষক ও শ্রমিক জাগিত না, আর তাহা হইলে তাহার কুওমিণ্টাঙ্গ আজ এত প্রবল হইত না। তাই ডাক্তার সান আজ চীনে বিশেষ দক্ষিণ-চীনে দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে চীনের লোকই ভাবুক ও অকর্ম্মণ্য আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। আজ তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনি চীনবাসীর হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা কোনও অবতারের ভাগ্যে ঘটে কি না সন্দেহ। এখন তাঁহাকে চীনবাসী 'দেশের পিতা', 'চীনের ওয়াসিংটন' বলিয়া পূজা করিতেছে। বিশেষতঃ এখন লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক সত্য সত্যই তাহাকে দেবতার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা তাঁহার মূর্ত্তির যে ভাবে সম্মান রক্ষা করে, তাহাকে দেবতার পূজা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না।

রাসিয়ায় লেনিনের মত যেমন, তেমনই দক্ষিণ-চীনে ডাক্তার সানের মন্ত্র এত অধিকসংখ্যক লোক মানিয়া চলে যে, বোধ হয়, জগতের কোনও ধর্ম্মের উপাসিক এত আছে কি না সন্দেহ। ক্যাণ্টনের গৃহে গৃহে সানের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক এমনই ভাবে সোভিয়েট রাসিয়ার প্রতি কৃষিকের গৃহে 'লেনিনের কক্ষ' দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যাণ্টনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রত্যেক আফিসে প্রতি সোমবার প্রাতে ডাক্তার সানের মূর্ত্তির উদ্দেশে ২। মিনিটকাল উপাসনা করা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। কুওমিণ্টাঙ্গের বড় আফিসে ডাক্তার সানের এক বিরাট প্রতিকৃতি আছে। কুওমিণ্টাঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদের কোনও সভার অধিবেশন হইলে সভারম্ভের পূর্ব্বে জাতীয় সঙ্গীত গীত হয় এবং তাহার পর সমস্ত সদস্য ডাক্তার সানের সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে তিন বার মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। তৎপরে ডাক্তার সানের উইল পঠিত হয়; ঐ উইলে তিনি জাতিকে তাঁহার সকল অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সভা ২ মিনিটকাল নীরব থাকে। ঐ সময়ে সদস্যরা আবার ডাক্তার সানের আত্মার কল্যাণ কামনা করেন।

ডাক্তার সানের নাম দক্ষিণ-চীনে যাদুকরের মন্ত্রের মত কাজ করে। ডাক্তার সান রাসিয়ার জফ ও বোরোডিনকে আমন্ত্রণ করিয়া ক্যাণ্টনে আনয়ন করিয়াছিলেন ৩ বৎসর কাল তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৩ বৎসর কাল তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই বোরোডিন ও তাঁহার রাসিয়ান সহকারীদের দক্ষিণ চীনে কেন এত মান, কেন এত প্রসার প্রতিপত্তি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

বোরোডিন অসাধারণ মানুষ—আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় প্রবন্ধান্তরে তাহাকে মহামানব আখ্যা প্রদান করিয়াছি। তিনি চীন ভাষায় অনভিজ্ঞ, তিনি তাঁহার সোভিয়েট সরকারের কোনওরূপ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি কোনও সন্ধি বা বিশেষ অধিকারের জোরেও ক্যাণ্টনে যাইতে পান নাই,—অথচ তিনি চীনের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দেশের মহামানব লেনিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাই তিনি শ্রমিকের ও কৃষকের বন্ধু। তাই আজ চীনের শ্রমিক ও কৃষক তাহাকে ভালবাসে। সর্ব্বোপরি তিনি ডাক্তার সানের বন্ধু ও পরামর্শদাতা, সুতরাং তাঁহার স্থান চীনে বহু উচ্চে।

এখন দক্ষিণ-চীনে মোটের উপর ৩০।৪০ জন রাসিয়ান উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা আছেন। বোরোডিন ও তাঁহার কয়েক জন অনুচর—ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হোয়ামপোয়ার সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

সুতরাং রাসিয়া কি কারণে চীনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝা দুষ্কর নহে। চীন Red বা বলশেভিক হইয়া যায় নাই; চীন রাসিয়ার বোরোডিনকে বন্ধু ও পরামর্শদাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মুক্তির পথে সহায়ক বলিয়া রাসিয়াকে আলিঙ্গন করিয়াছে, রাসিয়া গর্ব্বিত পাশ্চাত্যদেশবাসীর চিরন্তন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সমানে সমানের ব্যবহার করিতেছে বলিয়া রাসিয়াকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর পদে বসাইয়াছে। যাঁহারা বলেন, বলশেভিক রাসিয়া চীনকে অর্থসাহায্য করিতেছে, তাঁহাদের উত্তরে বলা যায়, এ কথার কোনও প্রমাণ নাই। মিঃ রুট নিরপেক্ষ মার্কিণ, তিনিই বলিতেছেন, চীন ও রাসিয়ান কর্তৃপক্ষ এ কথা মিথ্যা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, রাসিয়ান সোভিয়েট স্বয়ং দরিদ্র, সে চীনকে সাহায্য করিবে কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে যে মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান কুওমিণ্টাঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-চীনের প্রকৃত শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার রাজস্ব-সচিব মিঃ সুঙ্গ দক্ষিণ-চীনের আর্থিক উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছেন। তিনি মার্কিণের হারভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে দক্ষিণ-চীনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হইয়াছে যে, বহুকাল চীনের এমন স্বচ্ছল অবস্থা দেখা যায় নাই। কাজেই চীনের রাসিয়ার নিকট অর্থসাহায্যগ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই।

তাই Red বা বলশেভিক অপবাদের উত্তরে চীন স্বদেশপ্রেমিক বলে,—"Red অর্থে যদি উদ্দাম দেশপ্রেমকে বুঝায়, তাহা হইলে আমরা Red; যাহাতে চীনকে সকল স্বাধীন জাতির সহিত সমান আসন প্রদান করে, তাহা যদি Red হয়, তাহা হইলে আমরাও Red। কিন্তু যদি Red অর্থে বিদেশী বিদ্বেষ বুঝায়, তাহা হইলে আমরা Red নহি। আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কাহারও (রাসিয়ারও) সহযোগ চাহি না। যে শক্তি আমাদিগকে সমানে সমানে ব্যবহার করিবে, আমরা তাহার বন্ধু। যদি তোমরা বল, আমরা রাসিয়ান সোভিয়েটের আর্থিক, রাজনীতিক, অথবা ধর্ম্মগত মূলনীতির প্রতি সহানুভূতি অর্থে Red, তাহা হইলে আমরা দৃঢ়স্বরে বলিব আমরা Red নহি—আমরা কম্যুনিষ্ট নহি, আমরা বলশেভিষ্ট নহি, আমরা এথিষ্ট নহি। রাসিয়ান কম্যুনিষ্টরা বন্ধুর মত আমাদিগের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিল বলিয়া আমরা সাদরে সেই হস্ত গ্রহণ করিয়াছি। তাহারা আমাদের মুক্তির কথায় সায় দিয়াছে, সময়ে আমাদিগকে উপদেশ ও সাহায্য দিয়াছে, তাই তাহারা আমাদের বন্ধু। কম্যুনিজম এ দেশের ধাতুসহ নহে। দুই হাজার বৎসরের মধ্যে দুই বার এই কম্যুনিজম এ দেশে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, দুই বারই সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে।"

যিনি চীনের এই মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিবেন, কাহার অপরাধে আজ চীন বিদেশীয়ের অধিকারলোপের জন্য এত আগ্রহান্বিত।

ইউজিন চেনের ঘোষণা

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আমরা জাতীয় দলের নেতা চাঙ্গ কাইসেকের পরিচয় দিয়াছি। চাঙ্গ কাইসেকের যে কয় জন অনুচর ও পার্শ্বচর তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিয়া চীনের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, মিঃ ইউজিন চেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁহার জাতীয় কুওমিণ্টাঙ্গ গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক সচিব। তিনি ক্যাণ্টনে ও পরে হাঙ্কো সহরে থাকিয়া বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের ধূর্ত্ত রাজনীতিকগণের সহিত রাজনীতির

সুযোগ্য নেতা বলিয়াই মনে হওয়া বিচিত্র নহে। ইংরাজের অভিজ্ঞ পররাষ্ট্র সচিব সার অষ্টেন চেম্বারলেনকেও তাঁহার চালে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, নতুবা তিনি পদে পদে ইউজিন চেনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেন না, অথবা তাঁহার কনজারভেটিব দলের বিপক্ষ শ্রমিকদলকে রামজে ম্যাকডোনাল্ড ও লিবারল দলপতি লয়েড জর্জ্জকে ডাকিয়া পাঠাইয়া চীনের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ আঁটিতেন না। ইউজিন চেনকে তিনি অনেক দিন হুমকি দিয়াছেন, কিন্তু চেন আটাশে ছেলের মত জন বুলের হুমকিতে আঁতকাইয়া উঠেন নাই। তিনি মানুষ, তাই মানুষের মত প্রতি পদে চীনের ন্যায্য দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিতে অটল হিমাচলের মত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং প্রতি পদেই নিজের দাবী পরকে মানিতে বাধ্য করিয়াছেন।

চেনের নামও তাই আজ চীন কাইসেকের মত লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। এমন কি, কোনও কোনও ইংরাজ তাঁহাকে শ্বেত-ইংরাজ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। চেনের অপরাধ,—তিনি নাকি বহু দিন ইংরাজের অধিকৃত ট্রিনিডাড দ্বীপে বহু দিন চাকুরী করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাষায় কথা কহেন, ইংরাজী হাবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন; এমন কি, তিনি চীনা হইয়াও না কি ইংরাজী ভাষা ব্যতীত মাতৃভাষায় কথা কহিতে বা লিখিতে জানেন না। জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে যখন জেনারল ম্যাকেনসেন অসামান্য রণকৌশল দেখাইয়া পূর্ব্বপ্রান্তে রাসিয়াকে এবং পশ্চিম প্রান্তে ইটালীকে 'হাতুড়ির ঘায়ে' কাহিল করিয়া ফেলিতেছিলেন, তখনও ইংরাজী কাগজে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইবার এমনই একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল, ম্যাকেনসেন জার্ম্মাণ নহেন, স্কচ, তাঁহার জনক খাঁটি স্কচ এবং জননী আধা জার্ম্মাণ আধা ক্যানোডিয়ান ফরাসী। যে লোককে নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার আগ্রহ শত্রুপক্ষেরও হয়, সে লোক যে সামান্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইউজিন চেন যে সামান্য নহেন, তাহা তাঁহার রাজনীতিক চাল দেখিয়াই বুঝা যায়। তবে তিনি কূটরাজনীতিক হইলেও পাশ্চাত্য রাজনীতিকগণের মত কপটতা-ধূর্ত্ততায় এখনও ততটা অভ্যস্ত হয়েন নাই বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্য ডিপ্লোমাটরা যেমন 'পেটে এক খানা মুখে আর খানা' রাখিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সাজাইয়া জগতের লোককে দেখিতে পাঠাইয়া দেন, চেন সেরূপ এখনও করেন নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহা স্পষ্ট, সরল, সহজ ও সত্য, তাহাতে কৌটিল্যের কুটিলতা নাই। তিনি সম্প্রতি চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের (কুওমিণ্টাঙ্গের) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে ঘোষণাপত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই এ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। তাহার প্রতি ছত্রে যেন সফলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে পাঠক চীনের জাতীয় দলের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা সম্যক্ অবগত হইবেন। ঘোষণাপত্রখানি এইরূপ ;—



ক্যাণ্টনের বৈদেশিক সচিব মিঃ ইউজিন চেন

"ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী শক্তি চীন সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহাদের ধারণা, চীন নিজের স্বার্থ নিজে বুঝিয়া লইতে পারে না এবং এই হেতু ওয়াশিংটন বৈঠকের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীয় শক্তি আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কেবল চীনের মঙ্গলার্থ চীনের স্বাধীনতা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও চীনের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতিসাধন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।"

জাশানালিষ্ট চীনের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। নবীন চীন আজ শক্তিশালী হইয়াছে,—সে জানে, তাহার শক্তি কত। সে বুঝে, অর্থনীতিক উপায়ে (অর্থাৎ বিদেশী বর্জ্জন ও ধর্ম্মঘট আদি দ্বারা) কিরূপে তাহার স্বদেশে যে কোনও বিদেশীয় শক্তির উপর তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়।

সুতরাং এখন দেখিতে হইবে যে, ন্যাশানালিষ্ট চীন ইংরাজ ও অন্যান্য শক্তিকে ন্যায়সঙ্গত কি অধিকার দিতে ইচ্ছা করে। ইংরাজ বা অন্যান্য শক্তি চীন জাতির আইনসঙ্গত ন্যায্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা পূর্ণ করিবে, তাহা দেখিবার এখন আর প্রয়োজন নাই। বিদেশীয় শক্তিগণের চীনদেশে আন্তর্জাতিক প্রভুত্বের দিন চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে।

বিদেশীরা এত দিন চীনে যে আন্তর্জাতিক প্রভুত্ব উপভোগ করিয়া আসিয়াছে,—যে প্রভুত্বের অন্য নাম বিদেশীয় সাম্রাজ্যিকতা,—সেই প্রভুত্বের জন্য চীনের অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও বিচার গত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। যে অবধি ইংরাজ গায়ের জোরে চীনকে নানকিং সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই অবধি চীনের প্রকৃত পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইতিহাস বলিবে,—ইংরাজ চীনকে 'অহিফেন যুদ্ধে' পরাজিত করিয়া চীনের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। আজ এ যুগের ইংরাজের সে কথা মনে নাই, কিন্তু ন্যাশানালিষ্ট চীনের মনে সে কথা শেল সম বিদ্ধ রহিয়াছে। ইহা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক চীনার মনের কথা। এ কথা বুঝিতে না পারিলে চীনের জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না।

ন্যাশানালিষ্ট চীনের প্রধান লক্ষ্য কি? যুদ্ধে চীন ইংরাজের নিকট পরাজিত হইয়া যে স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তাহার উদ্ধারসাধন করা। যত দিন তাহা সম্পন্ন না হয়, তত দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যিকতার ও চীনের জাতীয়তার মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না। যত দিন না

তত দিন ইংরাজ ও চীনে কি 'শান্তি' ছিল না? ছিল বটে, কিন্তু সেই শান্তি প্রকৃত শান্তি নহে,—নকল শান্তি—বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে যে শান্তি বিরাজ করে, সেই শান্তি। যে জাতি মৃতকল্প বা মরণোন্মুখ নহে, সে জাতি কখনও তাহার বিজেতার সহিত শান্তিতে বসবাস করিতে পারে না। সময় উপস্থিত হইলেই সে আঘাত করিবে।

যে দিন ইংরাজের অধীনস্থ বা নিয়ন্ত্রিত সামরিক পুলিসের গুলী চীন ছাত্রগণের উপর বর্ষিত হইতে আদেশ হইল, সেই দিন হইতে চীনের সেই আঘাতের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে দিনের কথা স্মরণ করুন—সেই সাংগাই সহরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখের কথা। তাহার পর কাণ্টনের পার্শ্বস্থ সামীন সহরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে আবার বিদেশীয়ের গুলীতে চীনছাত্র ও শ্রমিকের রক্তপাত হইল। সেই দিন চীনেরও আঘাতের উত্তরে আঘাত দিবার দিন সমুপস্থিত হইল,—সারা দক্ষিণ চীনে বিদেশীয়ের বিপক্ষে চীনের জাতীয়তা হুঙ্কার করিয়া উঠিল, বিদেশীবর্জ্জন ও ধর্ম্মঘট তাহার প্রথম বিকাশ। সেই অর্থনীতিক সংঘর্ষ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে এবং এখনও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। আর যেহেতু জাতি জাগিয়াছে এবং জাগ্রত জাতি এই সংঘর্ষে যোগদান করিয়াছে, সেই হেতু যত দিন চীনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিন এই সংঘর্ষানল নির্ব্বাপিত হইবে না।

কিন্তু ইহাতে বিদেশীয়ের আশঙ্কা কি? যখন ন্যাশানালিষ্ট চীন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন তাহার নিকট ইংরাজ বা অন্য কোনও বিদেশীয় শক্তির ভয়ের কোনও কারণ থাকিবে না। চাঙ্গ-চুঙ্গ-চাঙ্গের বর্ব্বরতা, চাঙ্গসোলিনের জমীদারী প্রভুত্ব (Feudalism) অথবা মাণ্ডারিণদিগের স্বেচ্ছাচারিতার পুনঃপ্রচলন করিবার উদ্দেশে ন্যাশানালিষ্ট চীন স্বাধীনতা কামনা করিতেছে না। চীন মৃত জাতির পর্য্যায়ে পতিত না হয়,—এই হেতু জাতীয় দল স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে। চীনকে নিজহস্তে স্বাধীন চীন গড়িয়া তুলিতে হইলে নিজের ঘরে কর্তৃত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে—চীনের সর্ব্বত্র স্বাধীন চীন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাহাতে চীনের সূচ্যগ্রমাত্র ভূমি কাহারও খাসের সম্পত্তি বা জমীদারী না হয়—যাহাতে চাঙ্গসোলিন বা চাঙ্গ-চুঙ্গ-চাঙ্গের দস্যুবৃত্তিলব্ধ ভূসম্পত্তি স্বাধীন চীন বলিয়া অতঃপর পরিচিত না হয়—যাহাতে ইংরাজ ও অন্যান্য জাতির ভাগ্যান্বেষীরা (adventurers) এই সকল দস্যুকে চীনলুণ্ঠনে সহায়তা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক দস্যুরূপে (International brigands) দণ্ড পায়,—তাহারই জন্য আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম করিতেছি।

চীন স্বাধীন হইলে চীন যেমন নিজের দেশে নিজের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবে, তেমনই বিদেশীয়গণের ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এখন হইতে চীনে বিদেশীয় ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য বিদেশী বেয়নেট ও গানবোটের মুখ চাহিলে চলিবে না; কারণ, ন্যাশানালিষ্ট চীনের দীর্ঘবাহু (অর্থনীতিক অস্ত্র অর্থাৎ ধর্ম্মঘট ও বর্জ্জন) বিদেশী গানবোট ও বেয়নেট হইতে শক্তিশালী হইয়াছে। সকল বিদেশীয়ের অপেক্ষা ইংরাজকে এখন বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, বিদেশীয়ের আর্থিক জীবন অবসন্ন করিবার জন্য চীন ন্যাশানালিষ্টের সেই দীর্ঘবাহু বিশেষ সমর্থ।

ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে, বিদেশীয় সাম্রাজ্যিকতার অধীনতাশৃঙ্খল হইতে চীনকে মুক্ত করিবার জন্য বিদেশীয়ের সহিত চীনের অস্ত্র-পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন হইবে না। সে জন্য আপোষ কথা ও সন্ধিসর্তই যথেষ্ট হইবে। এ কথা—জাতীয় দলের মূলনীতি এবং লক্ষ্যের ও উদ্দেশ্যের কথা, আমি গত শরৎকালে কাণ্টনে মার্কিণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বা একত্র বিদেশীয়দিগের সহিত ন্যাশানালিষ্ট চীন-গভর্ণমেণ্ট আপোষ-সন্ধি করিতে সম্মত আছেন।

ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক ইংরাজ বা অন্য কোনও বিদেশীয়ের অধিকার নষ্ট করেন নাই। কথা উঠিয়াছে, আমরা হাঙ্কোর বৃটিশ কনসেশান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছি। এ কথা সত্য নহে। বরং

(১) আমরা ইংরাজের অনুমতি লইয়া অশান্তি দমনার্থ কনসেশানে আমাদের সৈন্য নামাইয়াছিলাম।

(২) সশস্ত্র বৃটিশ নৌসেনাগণকে কনসেশানে নামান হইয়াছিল বলিয়া চীনজনতা উত্তেজিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে ইংরাজ নৌসেনাগণের ও চীনজনতার মধ্যে সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হইয়াছিল; এই হেতু আমরা ঐ স্থানে সৈন্য নামাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

(৩) হাঙ্কোর বৃটিশ মিউনিসিপাল কাউন্সিল স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ও কর্ম্মত্যাগ করায় সহরের স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে কর্ত্তব্যপালন করিবার নিমিত্ত আমরা কনসেশান অধিকার ও শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

পরিশেষে আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই কয়টি কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে বলি ;—

(১) ইয়াংসি নদীর উভয় তটের বন্দর সমূহে এবং দক্ষিণ-চীনে ইংরাজের বাণিজ্য ও অন্যান্য স্বার্থ যে পরিমাণে নিহিত, চীনের আর কোথাও সেরূপ নহে। এই সকল স্থান ন্যাশানালিষ্ট চীন-গভর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত।

(২) ইয়াংসির দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্ত ভূভাগ এবং কুওমিনচুঙ্গ গভর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গের) অধীনস্থ উত্তরের চীন ও ইয়াংসির উত্তর-তটস্থ কতক ভূভাগ ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের এলাকা-ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

(৩) চাঙ্গসোলিন, সান চুয়ান ফেঙ্গ এবং চাঙ্গচুঙ্গ-চাঙ্গের এলাকাভুক্ত চীনের ভূখণ্ডের অধিবাসিসমূহের যদি অভিমত সংগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, সেখানেও অধিকাংশ লোকই ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট প্রদান করিবে।

(৪) বিশেষতঃ ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টই নবজাগ্রত চীনের প্রকৃত মনোভাবের প্রতিনিধি এবং চীনের বিপ্লবের সাফল্যসাধনে একমাত্র উপযুক্ত শক্তি।

সুতরাং ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সহিত ইংরাজ ও অন্যান্য শক্তির আপোষে সন্ধিসর্ত্ত করাই লাভজনক। বিদেশী সাম্রাজ্যিকতাকে আজি হউক, কাল হউক, ন্যাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ-কথা কহিতে হইবেই। সুতরাং এখন হইতে এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহার সহিত সন্ধি শান্তি স্থাপন করাই কি বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের কর্ত্তব্য নহে?

মিঃ ইউজিন চেন ইহাতে কোনও কথা রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই। তাঁহার ঘোষণায় পাশ্চাত্য রাজনীতিক চালবাজীর গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মিঃ চেনের কথাগুলি পাশ্চাত্য শক্তিগণের ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এ পিঠ আর ও পিঠ

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থলে মধ্য-আমেরিকা অবস্থিত। এই ভূভাগে কয়েকটি সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে মেক্সিকোই প্রধান, নিকারাগুয়া অন্যতম।

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের সহিত মেক্সিকোর সাধারণতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। ফলে প্রবল মার্কিণ সেই দেশে আপনার রণতরী ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া তথায় 'শান্তি-

মার্কিণেরও অজুহতে তেমনই মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় মার্কিণ প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা। শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে জগতে অনেক কায হয়। বিশেষতঃ দুর্ব্বলের দেশে প্রবল সাম্রাজ্যগর্ব্বী শক্তিপুঞ্জের 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার নাম শুনিলেই মনটা কেমন চমকিত হইয়া উঠে না?

মার্কিণের 'মনরো নীতির' কথা সকলেই জানেন। মার্কিণের ভূতপূর্ব্ব কোনও প্রেসিডেণ্টের নাম ছিল মনরো। তিনি আমেরিকার মূলনীতি করিয়া যান যে,—মার্কিণের লোক ব্যতীত য়ুরোপের কি অন্ত কোনও দেশের লোক মার্কিণ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনাদি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মার্কিণ দেশের নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধারণ তন্ত্র সরকার নিজ নিজ নীতি অনুসারে নিজ নিজ দেশ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন, তাহাতে অপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তিশালী রাজ্য, সুতরাং এই রাজ্যই এত দিন অন্তান্ত মার্কিণরাজ্যের 'বড়দাদা' হইয়া এই Hands off নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জগতের সকল জাতিকে বাধ্য করিয়াছেন। এখন মেক্সিকো বলিতেছেন, মার্কিণ নিজেই নিজের নীতি ভঙ্গ করিয়াছেন, নিকারাগুয়ার গৃহবিবাদ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া মধ্য-আমেরিকায় সূচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল হইয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কথাটা মিঃ হেয়া ডিলাটর নামক কোনও মেক্সিক্যান বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'কারে রাখি কারে দেখি?—সব শক্তিই এ পিঠ আর ও পিঠ। মেক্সিকোর প্রতি মার্কিণ যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকেও গণতন্ত্রবাদী না বলিয়া প্রবল সাম্রাজ্যবাদী বলাই কর্ত্তব্য।'

বর্ত্তমানে রাসিয়া ও চীনকে যেমন চারিদিকে ছিপিবদ্ধ করিয়া বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধহারা করা হইয়াছে, মেক্সিকোকেও তেমনই blockade করিয়া রাখা হইয়াছে। এ ব্লকেড বা আটক করিয়াছে মার্কিণের ক্যাপিটালিষ্ট প্রেস বা ধনী সাম্রাজ্যবাদীদিগের সংবাদপত্রসমূহ। তাহাদের মিথ্যা সংবাদসরবরাহের নিমিত্ত জগতের নিরপেক্ষ জাতিসমূহ মেক্সিকোর প্রকৃত অবস্থার কথা কিছুই জানিতে পারিতেছে না, মেক্সিকোয় যে কি ঘোর জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জগতের লোকের মার্কিণ প্রেসের কৌশলে জানিবার উপায় নাই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমাত্রের প্রচারকার্য্য এই প্রকৃতির। কার্ম্মাণযুদ্ধকালে লর্ড নর্থক্লিফ ও লর্ড রেডিং মার্কিণে ইংরাজের পক্ষে কি প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানে। এখনও চীনের ব্যাপারে কি হইতেছে এবং এত দিন রাসিয়ার ব্যাপারে কি হইয়া আসিতেছে, তাহাই বা কাহার অবিদিত!

মেক্সিকোর প্রবাসী মার্কিণ প্রজার স্বার্থরক্ষার অছিলায় বহুদিন যাবৎ এই প্রেসে মিথ্যা সংবাদের সাহায্যে এমন জমী প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, উহার ফলে এখন মেক্সিকোকে বারংবার ভয়প্রদর্শন করিবার এবং তাহার সহিত শত্রুতা করিবার সুবিধা হইয়াছে। জগতের লোক মনে করিতেছে, মেক্সিকো বর্ব্বর, সেখানে কেবল গলা-কাটাকাটি চলে, দয়ালু মার্কিণ না থাকিলে এত দিন মেক্সিকোয় রক্তের সমুদ্র বহিয়া যাইত, ইত্যাদি। এ ভাবের প্রচারকার্য্যে ভারতবাসীরও গা-সহা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে গলা-কাটাকাটির আশঙ্কার অজুহত বহুদিন হইতে প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে।

এই যে মার্কিণ প্রজার স্বার্থ, ইহা আর কিছুই নহে, ইহাকে কেবলমাত্র মার্কিণের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর স্বার্থ বলা যায়।

মেক্সিকোর দুর্ভাগ্যের মূল তাহার অসম্ভব ধনসম্পদ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতের দুর্ভাগ্যের মূলও ঠিক মেক্সিকোর মত তাহার ধনসম্পদ। মেক্সিকোর ধনসম্পদের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই প্রকাণ্ড দেশে প্রকৃতি দুই হস্তে মনের সাধ মিটাইয়া ধনসম্পদ বণ্টন কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং মানুষের আরাম ও বিলাস বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা উপযোগী, তাহা মেক্সিকোয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে ভারতের সহিত মেক্সিকো তুলিত হইতে পারে। জগতে রৌপ্য উৎপাদনে মেক্সিকো প্রথম; পেট্রোল তৈল ও সীসক উৎপাদনে দ্বিতীয়; দস্তা, গম ও কফি উৎপাদনে তৃতীয়; স্বর্ণ উৎপাদনে চতুর্থ এবং তাম্র উৎপাদনে পঞ্চম।

এই সম্পদই মেক্সিকোর কাল হইয়াছে (ঠিক ভারতেরই মত)। স্পেন মেক্সিকোর ধনসম্পদে আকৃষ্ট হইয়া ১৮১০-২১ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোর আদিম নিবাসীদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; কার্টেজের বর্ব্বরতা ইতিহাস প্রথিত হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর বর্ত্তমানে তিনটি শোষক মেক্সিকোর হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিতেছে,—(১) জমীদার শ্রেণী, (২) মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট এবং (৩) রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ। এই তিন শোষক অর্থসম্পদের স্বার্থচালিত হইয়া মেক্সিকোর প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আজ উহাদের জন্য তাহার স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে।

কর্টেজ স্পেনের হইয়া মেক্সিকো জয় করিবার পর দেশীয় আজটেক সাম্রাজ্যের সুন্দর গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার স্থলে হেসেনডাডোস বা জমীদার-শ্রেণী দেশীয় রেড ইণ্ডিয়ানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত করে। জেনারল ডায়াজের নিয়ামকত্বকালে (১৮৭৬-১৯১০) মাত্র ৮ শত ৩৪ জন জমীদার প্রায় ১ কোটি দুঃস্থ 'পিওন' বা দেশীয় ক্রীতদাসকে জমী চষিতে নিযুক্ত করিয়া বা অন্য নানা উপায়ে খাটাইয়া সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়াছিল।

স্পেনের শাসনকালে গভর্ণমেণ্ট ও চার্চ্চের শাসন এক হইয়া যায়। এই হেতু চার্চ্চের সম্পত্তির আকার বিরাট হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোর উদারনৈতিক গভর্ণমেণ্ট উভয়কে পৃথক্ করিয়াছেন। তাঁহাদের ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইন সংস্কারের ফলে চার্চ্চের সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং পাদরীদের সমস্ত বিশেষ অধিকার লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। পোপ ইহার বিপক্ষে বড়যন্ত্র করেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জুয়ারেজ পোপের সাহায্যকারী ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহার পরে ডায়াজ যখন প্রেসিডেণ্ট হয়েন, তখন আবার ধীরে ধীরে চার্চ্চের ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই জমীদার ও পুরোহিতশ্রেণী মেক্সিকোর দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকের রক্তশোষণ করিত বলিয়াই মেক্সিকোয় মাঝে মাঝে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। মাডেরো, ক্যারাঞ্জা, হুয়ের্টা প্রভৃতি কত দলপতিই না বিদ্রোহের ফলে প্রেসিডেণ্টের পদে বসিয়াছেন!

কিন্তু এই দুই শত্রু অপেক্ষা মেক্সিকোর ঘোর প্রবল শত্রু হইতেছে মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের সাম্রাজ্যিকতা। মার্কিণ মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বল প্রকাশ করেন প্রথমে ১৮৪৬-৪৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে। ইহার ফলে মার্কিণ বলপূর্ব্বক মেক্সিকোর প্রায় একার্দ্ধ সমৃদ্ধ ভূমি (নিউ মেক্সিকো, ক্যালিফোর্ণিয়া, নেভাডা ইত্যাদি) অধিকার করিয়া লয়েন।

ইহার পর মার্কিণ প্রকাশ্য যুদ্ধে আর মেক্সিকোকে গ্রাস করেন নাই বটে, কিন্তু নিজের বিপুল অর্থসম্পদের সহায়তায় মেক্সিকোর ধনাগমের উৎস-সমূহ একে একে অধিকার করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। মেক্সিকোর ট্যাম্পিকো ও অন্যান্য স্থানে পেট্রোলের খনি আছে—সে সকল খনির উৎপাদিকা শক্তি জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং মধুলোভে যেমন ফুলের চারিদিকে মধুকরের দল ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ নানা জাতির লোক এই 'পেট্রোল রাজ্যের' টুকরা-টাকরার লোভে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 'তন্মধ্যে মার্কিণ ও ইংরাজ' ধনী ব্যবসাদারই প্রধান। ডায়াজের শাসনকালে ইহাদের মধ্যে পেট্রোলরাজ্যের অধিকার-স্বত্ব লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। ডায়াজ

বিদেশীর সাম্রাজ্যিকতাকে খাল কাটিয়া কুম্ভীরের মত আনয়ন করিয়াছিলেন। ডায়াজের শাসনকালের অন্ত হইলে দেখা যায়, মেক্সিকোর ভূখণ্ডে বিদেশীয় সম্পত্তির মূল্য এইরূপ;—মার্কিণের ১ শত ৫০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, ইংরাজের ৩২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, ফরাসীর ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এবং অন্যান্য বিদেশীয়ের সর্ব্বসাকল্যে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। মেক্সিকোর নিজস্ব সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ মার্কিণ, মেক্সিকোর নিজের দেশে মেক্সিকো অপেক্ষাও মেক্সিকোর ধনসম্পদে অধিক অধিকারিত্ব লাভ করিয়াছেন।

মেক্সিকোর কনষ্টিটিউশনের ২৭ ধারায় আছে;—Only Mexicans by birth or naturaliation and Mexican companies have the right to acquire ownership in lands, waters, etc." অথচ কেবল গায়ের জোরে প্রবল জাতিরা মেক্সিকোর তেলের লোভে ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মার্কিণই প্রধান অপরাধী। মার্কিণ Oil kingরা অথবা ধনকুবের তৈলব্যবসায়ীরা যত বার এই আইনের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে, তত বারই দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া মেক্সিকোয় একটা না একটা গৃহ-বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছে। এই তেলের জন্য ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভেরাক্রুজে ২ শতাধিক মেক্সিকোবাসী হতাহত হইয়াছিল; এই তেলের জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আদেশে জেনারল পার্শিং মেক্সিকোকে 'শিক্ষা দিবার' উদ্দেশে 'সাজাই' অভিযানের (Punitive expedition) কর্ত্তা হইয়া মেক্সিকোর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিলেন, এখনও এই তেলের জন্য মার্কিণ শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার ও প্রবাসী মার্কিণের ধন-প্রাণ রক্ষার অজুহাতে মেক্সিকোর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছেন! পারস্যের অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর স্বার্থের জন্য ইরাকের অভিযানের রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট মেক্সিকোর এই ব্যাপার বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে না। অথচ মার্কিণ আপনাকে গণতন্ত্রবাদী দুর্ব্বলের সহায় ন্যায়বান্ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন! সাম্রাজ্যিকতার প্রলোভন ও প্রেষ্টিজ যে কি চীজ, তাহা দুর্ব্বল জাতিরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে।

অবতরণঃ!



মনুসংহিতায় অহিংসা-ধর্ম্ম

বুদ্ধদেবের অহিংসা-ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে ন্যূনাধিক সকলেই অবগত আছি; কিন্তু মহর্ষি মনু-বিবৃত অহিংসা-ধর্ম্মের আলোচনা হয় নাই, বরং তিনি কালবিশেষে প্রাণিবধের অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বেশ 'বদনামই' আছে। এখন এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব। প্রাণিবধ সম্বন্ধে মহর্ষির বিধি-নিষেধ ও নিম্ন-প্রাণীর প্রতি দয়াপ্রদর্শনের জন্য আদেশবাণী পাঠ করিলে দেখিতে পাইব যে, কালবিশেষে জীবহত্যা সমর্থন করিলেও তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট করুণা বর্ত্তমান ছিল।

মানবমাত্রই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, প্রবৃত্তির দাস—কেহ বেশী, কেহ কম। পৃথিবীতে বহু সদুপদেশ ও ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, কিন্তু মানুষ প্রায়শঃই পশুবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ঘটনাটি শোচনীয় হইলেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর যাহা প্রকৃতিগত, তাহা সাধারণ মানুষ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু তজ্জন্য মানুষ যথেচ্ছভাবে চলিতে পারে না, তাহা হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ই বিনষ্ট হয়। কাযেই মধ্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমশঃ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া লওয়াই সাধারণ মানুষের শ্রেয়ঃ। বুদ্ধদেব বলিলেন—"প্রাণিবধ করিও না", কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গ শুনিল না, ব্রহ্মদেশে ও চীনে অপ্রতিহতভাবে প্রাণিবধ চলিতেছে। *

প্রথমতঃ এতৎসম্পর্কে মনুক্ত বিধিনিষেধ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, তিনি মাত্র কালবিশেষেই প্রাণি-হত্যার অনুমোদন করেন, যথেচ্ছ হত্যা ত অনুমোদন করেন না, বরং তাহার প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় সাধারণভাবে লিখিত আছে—

"যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যা প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যো হ্যাচরৎ পুরা॥" ৫।২২

যজ্ঞের জন্য অথবা অবশ্য-পোষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রশস্ত পশু-পক্ষী বধ করিতে পারেন; পুরাকালে অগস্ত্য মুনি এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। অন্যত্র—

"প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে॥" ৫।২৭

লোক যজ্ঞের হতাবিশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতে পারে; বহু ব্রাহ্মণের অনুরোধে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে; যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত মাংস ভক্ষণীয় এবং ব্যাধিহেতু বা আহারাভাবে প্রাণ যায়, এমন দায়েও মাংস খাইতে পারে; অন্যত্র মনু মৎস্যাহারেরও অনুমতি দিয়াছেন। (৫।১৫-১৬) *

কিন্তু মাংসভক্ষণ এই সকল কারণে মনুর মতসম্মত হইলেও কেবল যজ্ঞাবশিষ্ট মাংসই অনিন্দনীয়—অন্য সকল মাংসই নিন্দনীয়। অন্য জীবের মাংসাহারে মানুষের জীবন বৰ্দ্ধিত হইলেও ইহা অতীব নিন্দনীয়; কিন্তু নিন্দনীয় হইলে কি হইবে, দুর্ব্বল মানব ন্যূনাধিক মাংসলিপ্সু। মনু বলেন—

"যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥" ৫।৩১

যজ্ঞাবশিষ্ট মাংসভক্ষণ দেবোচিত এবং অন্যথা (শরীর-পুষ্ট্যাদির জন্য) মাংসাহার রাক্ষসোচিত।

শরীরপোষণার্থ মাংসাহারের অনুমতি অনিচ্ছার সহিত অনুমোদন করিলেও বৃথা প্রাণিহত্যা তিনি সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়াছেন—

* অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বুদ্ধদেবও মৎস্যাহার করিতেন এবং জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাবীর তাহাতে আপত্তি করিলেও তিনি মৎস্যাহার ত্যাগ করেন নাই। (তেলোবাদ জাতক, Cowel's Jataka Vol II. p, 182.) প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব শূকরের মাংস আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন অনেকে প্রবাদটি স্বীকার করে না। যাহা হউক, প্রবাদটি সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, বুদ্ধদেব মাংসাহার করিতেন, নচেৎ তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে মাংসাহার করিতে দিবে কেন? কাযেই বুঝা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব আহারার্থ প্রাণিবধের

* অতএব প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, উত্তর-ভারতীয়গণ যে বাঙ্গালীকে মৎস্যাহারী বলিয়া ঘৃণা করে, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মৎস্যাহারের বিশেষ বিরোধী এবং এই জন্যই তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে পশুবধেরই নিন্দা করিয়াছেন, মৎস্যাহারের নিন্দা করেন নাই, কারণ, মনু মনে করিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ কেহই মৎস্যাহার করিবে না। যাহা হউক, পরে দেখিব, তাঁহার মতে প্রাণিবধ অন্যায়, কাযেই মৎস্যাহার



"ন মেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন।" ৫।৩৭

বৃথা পশুহত্যা করিতে কেহই কখনও ইচ্ছা করিবেন না।

মনু যে বৃথা প্রাণিহত্যার প্রতি কত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—

"ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ॥ ৫।৩৪
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বেহ মারণম্।
বৃথা পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥ ৫।৩৮
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥ ৫।৪৫
মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" ৫।৫৫

বৃথা মাংসখাদকরা পরলোকে যাদৃশ পাপভোগ করে, অর্থের জন্য পশু হনন করায় ব্যাধাদির তাদৃশ পাপ হয় না। ৫।৩৪

পশুর গাত্রে যতগুলি রোম আছে, বৃথা পশুঘাতী জন্ম-জন্মান্তরে ততবার হত্যাজনিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৫।৩৮

যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে হত্যা করে, সে কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পর, কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে না। ৫।৪৫

ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে আমাকে সে ভক্ষণ করিবে, পণ্ডিতরা 'মাংস' শব্দের এইরূপ নিরুক্তি কহিয়া থাকেন। ৫।৫৫

ব্রহ্মদেশের এবং সিংহলের বৌদ্ধগণের অন্য কর্ত্তৃক নিহত মৎস্যমাংস ভক্ষণে কোন আপত্তি নাই। কারণ, ভক্ষকের প্রাণিহত্যা হইল না। কিন্তু মনু এই বিষয়ে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে,—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥" ৫।৫১

পশুহননে অনুমতিদাতা, মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশু-হন্তা, মাংস-ক্রয়-বিক্রয়কারী, মাংস-পাচক, পরিবেষক এবং ভক্ষক এই কয় জনকেই ঘাতক বলা যায়। ৫।৫১

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, মহর্ষি মনুর মতে বেদ-রাক্ষস (নিন্দনীয়) আর বৃথা হিংসা অমার্জ্জনীয় এবং বেদবহির্ভূত পশুবধে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই সমান পাপী। অধুনা আমরা দেখিব যে, মহর্ষি বেদবিহিত হিংসা পর্য্যন্ত নিঃশংসয়চিত্তে অনুমোদন করেন না,—

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥"

যে ব্যক্তি শতবর্ষ ব্যাপিয়া প্রতি বৎসর অশ্বমেধযজ্ঞ করেন এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন না করেন, উভয়েরই পুণ্যফল সমান।

অশ্বমেধ বৈদিক যজ্ঞ। শতাশ্বমেধ করিলে যে ফল হয়, কেবল মাংসভোজন না করিলে সেই ফললাভ হয়; কাযেই বৈদিক যজ্ঞ না করিয়া অহিংসা-ব্রতাচরণ করিলেও চলে। মহর্ষি বৈদিক যজ্ঞের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন নাই

মনু বেদবিহিত হিংসার সমর্থন করিলেও অহিংসাকে যে কত উচ্চে স্থান দিয়াছেন এবং হিংসার যে কত নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিব। মহর্ষি বলেন—

"ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েন চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥" ৬।৬০
"অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্॥" ৬।৭৫
"নাবেদাবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥" ৫।৪৩
"সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥" ৫।৪৯
"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥" ৫।৪৮
"ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ॥" ৫।৫৪
"হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥" ৪।১৭০
"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥" ৫।৪৫
"যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।

"যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদেবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥" ৫।৪৭
"যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥" ৬।৩৯
"যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥" ৬।৪০
"অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্ ॥" ৪।১৪৮

ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা—এই সকল উপায় দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। ৬।৬০

অহিংসা, ইন্দ্রিয়বিষয়াসক্তি পরিহার, বৈদিক কর্ম্ম এবং উগ্র তপশ্চাচরণ দ্বারা সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়। ৬।৭৫

(কি গৃহস্থাশ্রমে, কি গুরুগৃহে, কি অরণ্যবাসে) বিপদে পড়িলেও বেদবিরুদ্ধ হিংসা করা আত্মজ্ঞ দ্বিজের উচিত নহে। ৫।৪৩

মাংসের উৎপত্তি, দেহিগণের বধবন্ধন-যন্ত্রণা—এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া—কি বৈধ, কি অবৈধ—সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ৫।৪৯

প্রাণিহিংসা না করিলে কখনও মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিবধ স্বর্গজনক নহে; অতএব মাংসভোজন বর্জ্জন করিবে। ৫।৪৮

সম্যক্‌প্রকারে মাংস বর্জ্জন করিলে যাদৃশ ফললাভ হয়, পবিত্র ফলমূলভোজনে অথবা নীবারাদি গ্রহণে তাদৃশ ফললাভ হয় না। ৫।৫৪

(এবং) যাহারা নিত্য হিংসারত, তাহারা কখনও সুখলাভ করিতে পারে না। ৪।১৭০

যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছায় বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে হত্যা করে, সে কি জীবিত অবস্থায়, কি মৃতাবস্থায়, কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে না। ৫।৪৫

যে ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বন্ধনবধ-ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি অত্যন্ত সুখ লাভ করেন। ৫।৪৬

যিনি কাহাকেও হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যে কোনও

যিনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করেন, সেই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি তেজোময় লোক সকল লাভ করেন। ৬।৩৯

যে দ্বিজ হইতে কোন প্রাণী কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হয় না, তিনি দেহত্যাগের পর কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। ৬।৪০

(এবং) সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব দ্বারা দ্বিজ জাতিস্মর হয়েন। ৪।১৪৮

উপরি-উক্ত শ্লোকসমূহ হইতে মহর্ষির অহিংসাধর্ম্ম সম্বন্ধে মত বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মহর্ষি কেবলমাত্র উপদেশদান ও ভয়প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু জীবে দয়া সম্বন্ধে কার্য্যকর উপদেশও প্রদান করিয়াছেন। "হিংসা করিও না" এবং "ভালবাসিও" ইহার মধ্যে অনেক প্রভেদ—একটি নিষেধ, একটি বিধি। অবশ্য সম্পূর্ণ অহিংসা কেবল ব্রাহ্মণগণের পক্ষেই সম্ভব, কারণ, ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণ বৈধ হিংসা এবং যুদ্ধাদি না করিলে ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ই অচল হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের আদেশ অবহেলা করিয়া বৌদ্ধ রাজা এবং প্রজা যুদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই জন্যই মনু কেবল ব্রাহ্মণগণের জন্যই সম্পূর্ণ অহিংসা প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের জীবিকোপায় সম্বন্ধে উপদেশকালে বলিয়াছেন—

"অদ্রোহেণ ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি।" ৪।২

যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়, অথবা অভাবপক্ষে অত্যল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবিকা সংগ্রহ করিবেন। ৪।২

এবং তৎপ্রসঙ্গে তিনি কৃষিকার্য্যকে 'প্রমৃতং' বলিয়াছেন, (প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং ৪।৫, কারণ, "কর্ষণঞ্চ ভূমিগত-প্রচুর-প্রাণি-মারণ-নিমিত্তাৎ বহুদুঃখফলকং প্রকর্ষেণ মৃতামিব প্রমৃতম্" (কুল্লূক)। অন্যত্র মনু স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে,—

"হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ। ১০।৮৩
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্ ॥" ১০।৮৪

হিংসাবহুল পরাধীন কৃষিকার্য্য যত্নে বর্জ্জন করি-

এতদুপলক্ষে হলকুদ্দালাদিসঞ্চালন দ্বারা বহু প্রাণি-হত্যা করিতে হয়। ১০।৮৪

কৃষিকার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হইলেও (৪।৫) নিন্দনীয়, কারণ, ইহাতে বহু প্রাণী হত হয়। অধুনা বহু শিক্ষিত ব্যক্তি মনু ও অন্যান্য সংহিতাকারকে এই নিষেধের জন্য বহু নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, মহর্ষি অহিংসা-ধর্ম্মের কত উচ্চস্তরে বসিয়া এই নিষেধ প্রচার করিয়াছেন।

সাধারণ জীবনে গৃহে—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—পিপীলিকা প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর বধ অবশ্যম্ভাবী। বধ করিব না বলিলেই বধ হইবে না, তাহা নহে। চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণ্ডনী এবং জলাধারকে মনু "পঞ্চ সূনা" (অর্থাৎ পঞ্চ বধস্থান) বলিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, জৈনগণ রাত্রিতে প্রদীপ প্রজ্বালিত করে না এবং ভ্রমক্রমে ছারপোকা হত্যা করিলে জীবিত ছারপোকার আহারের জন্য মানুষ ভাড়া করিয়া আনে। যাহা হউক, মনু ঐরূপ হাস্যকর কোন ব্যবস্থা না করিয়া পঞ্চসূনাজনিত প্রাণিবধের জন্য "পঞ্চ মহাযজ্ঞে"র ব্যবস্থা করিয়াছেন; (৩।৬৮) ইহার মধ্যে ভূত-যজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ উল্লেখযোগ্য। ভূতযজ্ঞ নিম্নপ্রাণীর সেবা এবং নৃযজ্ঞ অতিথিসেবা। অন্যত্রও মনু বলিয়াছেন—"নৃ নন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা" (৩।৮১), অর্থাৎ মানুষকে অন্ন ও অন্য প্রাণীকে বলিদত্ত অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিবে।

মনু দেবতাগণের সন্তুষ্টির জন্য "বৈশ্বদেব" নামক একটি যজ্ঞের বিধান দিয়াছেন (৩।৮৪)। ইহাতে ব্রাহ্মণভোজনের প্রয়োজনীয়তা নাই (৩।৮৩), পরন্তু সমগ্র ভোজ্য পশুপক্ষী ও কৃমি প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর আহারের জন্য বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু বিসর্জ্জনকার্য্য অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত করিতে হইবে; যেন ধূলি না লাগে, এই জন্য পাত্রে দিতে হইবে (৩।৯২)। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও এই নিয়মটি কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে।

"শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ ভুবি॥" ৩।৯২

পরে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী চণ্ডাল, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগের জন্য অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া যেন ধূলি না

এই বৈশ্বদেব হোম প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইহাতে স্ত্রীলোকগণেরও অধিকার আছে (৩।১২১)। গৃহস্থগণ যাহাতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও বৈশ্বদেব হোম সম্পন্ন করেন, তজ্জন্য মনু বহু স্থানে উপদেশ দিয়াছেন। (৩।২৬৫; ৪।২১)।

নিম্ন-প্রাণীর প্রতি যাহাতে দুর্ব্যবহার না হইতে পারে, তজ্জন্য মনু যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন; কেবল খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হয়েন নাই। নিম্নপ্রাণীর অনিষ্ট করিলে প্রায়শ্চিত্ত ও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মনু বলেন—

"মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা মহদ্দুঃখং দণ্ডং কুর্য্যাৎ তথা তথা॥" ৮।২৮৬

মনুষ্য কিংবা পশুদিগকে প্রহার দ্বারা পীড়া দিলে ক্লেশানুসারে রাজা প্রহার-কারীকে দণ্ড দিবেন। ৮।২৮৬

প্রাণিবধ ও অত্যাচারের জন্য মনু যে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্তু পড়িয়া দেখিলে সকলেই দেখিবেন যে, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত কেবল 'কথার কথা' নহে,—তাহা পর্য্যাপ্ত। এতদুপলক্ষে আরও একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। মহর্ষি অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রাণীর জন্য আঘাতকারীর অর্থে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তৎকালে কোন দাতব্য পশুচিকিৎসালয় ছিল কি না, জানি না, কিন্তু তাহাদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিড়াল, নকুল, চাষ পক্ষী, উৎকুন, কৃকলাস, এমন কি, ব্যাঘ্রাদি পর্য্যন্ত মহর্ষির করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। (৮।২৯৩—২৯৮; ১১।১৩২—১৩৮; ১১।১৪১—১৪৪)

"অঙ্গাবপীড়নায়াঞ্চ ব্রণশোণিতয়োস্তথা।
সমুত্থানব্যয়ো দাপ্যঃ সর্ব্বদণ্ডমথাপি বা॥" ৮।২৮৭

অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে আহতের (মানুষ বা পশুর) সুস্থ হইবার জন্য প্রহারকারীকে অর্থ দিতে হইবে। ৮।২৮৭

মহর্ষি কেবল পশুপক্ষ্যাদির রক্ষাবিধান করিয়াই ক্ষান্ত

"বনস্পতীনাং সর্ব্বেষামুপভোগো যথা যথা।
তথা তথা দমঃ কার্য্যো হিংসায়ামিতি ধারণা॥" ৮।২৮৫
"ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্॥" ১১।১৪৩
অন্নাদ্যজানাং সত্ত্বানা রসজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ফল পুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃত প্রাশো বিশোধনম্॥ ১১।১৪৪

বৃক্ষাদির হানি করিলে পত্রপুষ্পফলাদি ও উত্তমাধম বিবেচনা করিয়া রাজা ক্ষতিকারীকে দণ্ড দিবেন। ৮।২৮৫

ফলদ বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা এবং পুষ্পিত বীরুধ ছেদনে শতবার সাবিত্র্যাদি জপে শুদ্ধ হইবে। ১১।১৪৩

কেবল যে বৃক্ষলতাদির ছেদনে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা নহে,—
"কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভেঽনুগচ্ছেদ্ গাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ॥" ১১।১৪৫

কর্ষণ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মে এবং যে নীবারাদি বনে আপনা আপনি জন্মে, উহাদিগকে অকারণ ছেদন করিলে এক দিবস দুগ্ধব্রত হইয়া গরুর অনুগমন করিবে। ১১।১৪৫

অন্যান্য সংহিতার মধ্যেও এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। অন্ততঃ মনুসংহিতা পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে,অহিংসা-ধর্ম্ম বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং মহর্ষি মনু পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদির প্রতি অহিংসা করা যে অন্যায়, তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশের উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাহাদের রক্ষার বিধান করিয়াছেন। যদি এখনও কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেবই অহিংসা-ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক, তবে তাঁহাকে মনুসংহিতাখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তৎকালীন সমাজ যখন হত্যা-বহুল যজ্ঞকার্য্যে আমোদ পাইতে আরম্ভ করিল, মনুক্ত উপদেশ অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল, তখনই মহাবীর * ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বুদ্ধদেব অহিংসা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন—নবজীবনদাতা। †

* মহাবীর বুদ্ধের পূর্ব্বেই অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এই দিক হইতেও বুদ্ধদেবকে অহিংসাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা সঙ্গত নহে, মহাবীরের দাবী অগ্রবর্ত্তী।

† এই প্রবন্ধের শ্লোকসমূহ ও অনুবাদ প্রায়শঃই পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত মনু-সংহিতা হইতে গৃহীত।

শ্রীসতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

চৈত্র-আমেজ

চৈতালী আসে আসে!
মধু চৈতালী আসে আসে!
মত্ত-ফাগুন আবীর-আগুন
ছড়াইয়া চারি পাশে
হিন্দোলা-সুর আন্দোলি' বনে,
ছন্দে নাচায়ে মন্দ-পবনে,
নন্দিল কা'রে সানন্দ-মনে
চন্দন-রেণু বাসে!
গন্ধ-উতল-স্পন্দন কা'র
সান্ধ্য-সমীরে ভাসে!
হের চৈতালী আসে আসে!

সারা বন চঞ্চল!
ওগো সারা বন চঞ্চল!
দক্ষিণ হ'তে দীক্ষা-মন্ত্র
কে আনিয়া দিল বল্!
মাধবী-কুঞ্জে উৎসব সাড়া,
সন্ধ্যামালতী গৃহকোণ-ছাড়া,
মৌলের বনে মধুপের তাড়া,
করবীর অঞ্চল
হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিয়া আজি
কেবা করে কোন্ ছল!
তাই সারা বন চঞ্চল!

বেপথু বকুল-বীথি!
মরি বেপথু বকুল-বীথি!
কোন্ প্রিয়া-মুখমদিরা-সেচনে
ঝরাল' পুষ্প-প্রীতি!
প্রজাপতি-প্রিয়া রঙীন-পাখায়
সুরভি স্বর্ণ-পরাগ মাখায়
নাগকেশরের নিবিড়-শাখায়
জাগে ফুল ফোটা-রীতি!
অনুরাগে গাহে রক্ত-অশোক
দোহদোৎসব-গীতি
আহা বেপথু বকুল-বীথি!

আম্রকুঞ্জে পিক
ঘন আম্রকুঞ্জে পিক!
মুকুল-গন্ধ নেশায় মাতিয়া
মাতাল' দিগ্বিদিক!
মধু-সৌরভে মন্থর-ঘন
উদাসী বাতাস আরও উন্মন
পিয়াস-নয়নে কুসুম-স্বপন
নিরখিছে অনিমিখ!
চাপাস্বরে কহে ভুঁইচাপা-বালা
"—জাগিয়াছি প্রাণাধিক!
গাহে আম্রকুঞ্জে পিক!

বন-মল্লিকা বনে!
নব বন-মল্লিকা বনে!
ব্যাকুল সুখের অসহ-পুলক
জেগে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে!
রাঙা-কাঞ্চন রঞ্জন-তরুণ
কার পরশনে সরমে অরুণ
চম্পক-শাখে সুরভি-করুণ
মর্ম্মরে মনে মনে!
বেতসকুঞ্জে ফাগুন-বাতাস
শ্যামের বাঁশরী রনে'!
জাগে বন-মল্লিকা বনে!

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

এ দেশ ও সে দেশ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন দিল্লীতে ভারতের নানা প্রদেশের পুলিস-কর্ত্তাদিগের এক বৈঠক বসিয়াছিল। এই ভাবের বড় বড় হোমরা-চোমরা পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের বৈঠক এ দেশে সম্ভবতঃ আর কখনও বসে নাই। তবে মনে হইতেছে, লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পুলিস কমিশনের সম্পর্কে সিমলা-শৈলে এমনই এক বৈঠক বসিয়াছিল।

এই ভাবের বৈঠকের যে উপকারিতা নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু পুরাতন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীরা যদি নানা প্রদেশ হইতে বৎসরে অন্ততঃ এক বারও কোনও কেন্দ্রে সমবেত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান করেন এবং এ দেশের পুলিসের কি উপায়ে উন্নতিবিধান হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করেন, তাহা হইলে হয় ত কালে তাহা হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। এ দেশের পুলিস কি ধাতুতে গঠিত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিদেশী আমলাতন্ত্র সরকারের যতই সদুদ্দেশ্য থাকুক, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে এ দেশের লোককে বিশ্বাস করিতে পারেন না। সুতরাং অনেকটা ভয়ের ভিত্তির উপর তাঁহাদিগকে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। জনগণের প্রীতিশ্রদ্ধার উপর যত না হউক, ভয়ের উপরে শাসনের ধারা প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। শাসনের প্রধান যন্ত্র পুলিস ও সেনা। তবে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনে পুলিসের সম্পর্কই বহুল পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। এই হেতু পুলিসের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য সরকার সদাই সচেষ্ট।

ব্যবস্থা যখন এইরূপ, তখন এ দেশের লোকের সহিত পুলিসের সম্পর্ক কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অপ্রতিহত ক্ষমতা-প্রাপ্ত পুলিসকে দূরে রাখিতে পারিলে দেশের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পুলিসকে রক্ষক ও না। মেদিনীপুরের বোমার মামলায়, সিন্ধুবালাদের মামলায় অথবা মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় সাধারণের প্রতি পুলিসের যে ব্যবহারের পরিচয় আদালতে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এখনও পথে ঘাটে জনসাধারণ পুলিসের নিকট সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে পুলিসকে জনসাধারণ সেবক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে বিশেষ অপরাধে অপরাধী করা যায় না।

সুতরাং মাঝে মাঝে পুলিসের বড় কর্ত্তাদের যদি এমন ভাবের বৈঠক বসে এবং সেই বৈঠকে পুলিসকে সাধারণের প্রিয় করিয়া গড়িয়া তুলিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে মন্দ হয় না। এই জন্য এরূপ বৈঠকের উপকারিতা ও উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে।

এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রসচিব সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভাস্থ পুলিস-কর্ম্মচারিগণকে বলিয়াছেন যে, সারা ভারতের পুলিসের উন্নতিবিধানের কথা তাঁহার স্বরাষ্ট্রবিভাগ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। এই উন্নতি কি ভাবে হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ তিনি প্রদান করেন নাই, তবে এমন একটি কথা বলিয়াছেন, যাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বটে। স্বরাষ্ট্রসচিব পুলিস-বৈঠকের সদস্যদিগকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন অতঃপর কনষ্টেবলদিগের শিক্ষাবিধানে (Educating the constabulary) বিশেষ মনোযোগ দেন।

কথাটা ছোট বটে, কিন্তু উহার পশ্চাতে একটা দুস্তর সমস্যাসমুদ্র অবস্থান করিতেছে; সে সমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর। এ দেশের কনষ্টেবল বা পাহারাওয়ালা যে শ্রেণীর লোক হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগকে শিক্ষিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ তাহাদের বেতনের বহর যেরূপ প্রকাণ্ড, তাহাতে তাহাদের কার্য্যে অন্য শ্রেণীর

প্রকৃতি যেরূপ বাঁধাধরা পদ্ধতির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পুলিসকে সাধারণের বন্ধুরূপে গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা দান করা অল্প আয়াসের কথা নহে।

এ কথা সকলেই জানে, এ দেশের সাধারণ কনষ্টেবলকে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহাদের মধ্যে একটা 'মানুষ-মানুষিকতা' বা সহানুভূতির ভাব দেখা যায় না—যেন তাহারা একটা যন্ত্রবিশেষ—একটা মানুষ-কল। এ ভাবটা দূর করিতে হইলে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করা শিক্ষার কথা বলিতেছি না। যে শিক্ষার ফলে তাহারা এ দেশের মানুষকে তাহাদের মত মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই অর্থে তাহারা উদরান্ন সংস্থান করিতেছে, এবং তাহাদেরই সেবার জন্য তাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে, এ ভাবটা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হয়, সেই শিক্ষার কথাই বলিতেছি। বিহারের কোনও উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী পুলিস ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষার্থীদিগকে কিছুদিন পূর্ব্বে উপদেশদানকালে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা মনে রাখিও, তোমরা সাধারণের সেবক, তোমরা প্রভু নহ; তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, তোমরা যে সরকারের কর্ম্মচারী, তাহার প্রতিও তোমাদের কর্ত্তব্য আছে।" আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমানে পুলিসের শিক্ষার্থীকে এই উপদেশের প্রথম ভাগটা অনুক্ষণ শিখান প্রয়োজন, শেষের ভাগটা এখন কিছু দিন উপদেশের শ্লেট হইতে মুছিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। কেন না, শেষের ভাগটা পুলিস-শিক্ষার্থীর মনে প্রথমাবধি বদ্ধমূল হইয়াই আছে, প্রথম ভাগটার অভাবই বিষম। পদস্থ পুলিস-শিক্ষার্থীর পক্ষেই যখন এই শিক্ষার এত অভাব, তাহা হইলেই ভাবিয়া দেখুন, সাধারণ কনষ্টেবলের পক্ষে উহার অভাব কিরূপ!

কিন্তু যে দেশে পুলিস যথার্থই সাধারণের সেবক, যে দেশের জনসাধারণ যথার্থই স্বাধীন, সে দেশের পুলিসের শিক্ষা কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সে দেশের পুলিসকে বলিতে হয় না যে, জনসাধারণই তাহাদের প্রভু, তাহারা তাহাদের সেবক, কেন না, সে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই দেশের শাসক ও কর্ত্তা। এই হেতু সে দেশের পুলিসকে—সামান্য কনষ্টেবল হইতে সহর-কোতোয়াল বা ইনস্পেক্টর-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। সে শিক্ষার প্রণালী কিরূপ চমৎকার, তাহা বুঝাইতেছি।

বিলাতের কথাই ধরা যাউক। লণ্ডনের পুলিস বিলাতের আদর্শ। লণ্ডনের কনষ্টেবল একাধারে সৈনিকের শৃঙ্খলা, ফায়ার বিগ্রেডের নির্ভীকতা, রাজনীতিকের কূটবুদ্ধি, ভিষকের চিকিৎসা-সেবা-কৌশল, উকীলের অভিজ্ঞতা, সেবা-কারিণীর ধৈর্য্য এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান আপনার মধ্যে সঞ্চয় করে। কিরূপে এই অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদিত হয়, এখন তাহাই বলিব।

লণ্ডন সহরের ভিক্টোরিয়া রেল-ষ্টেশনের নিকটে পিল হাউস নামক একটি সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, এই স্থানে কনষ্টেবল হইতে হইলে শিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে হয়। ইহা ঠিক বিদ্যালয় নহে, তবে এই স্থানে ভাবী কনষ্টেবলরা ড্রিল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের এবং মানুষিকতা ও সহানুভূতি অর্জ্জনের শিক্ষা লাভ করে।

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে ২ শত কনষ্টেবলকে শিক্ষা দান করা হয়। এখানে ইহাদের জন্য বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, কনসার্ট হল, জিমনাষ্টিকের আখড়া, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, ভোজনাগার, স্নানাগার, ১৩টি পাঠের শ্রেণী, একটি প্যারেডের মাঠ এবং খেলিবার মাঠ আছে। পাঠের শ্রেণীতে যেমন তাহাদিগকে চুরি, পকেটমারা, ডাকাতি প্রভৃতি নানা অপরাধের আইনগত পার্থক্য শিক্ষা দান করা হয়, তেমনই তাহাদিগকে শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে, কৌশল অভ্যস্ত করিতে, কুকুর অশ্ব গো মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে, পথের গোলমাল সরাইতে, আঙ্গুলের টিপের বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে, দুর্ঘটনার সময়ে ধীরভাবে কার্য্য করিতে, জাল-জুয়াচুরী ধরিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই ভাবে শিক্ষিত হইলে পর সকলকেই পুলিস বিভাগে লওয়া হয় না, প্রায় শতকরা ১৫ জনকে বাছাই করিয়া কনষ্টেবল করা হয়। আর এখানে? এখানে নির্দ্দিষ্ট দৈহিক মাপ ও শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কনষ্টেবল পদ পাওয়া যায়! পিল হাউসে ভর্ত্তি হইতে হইলে প্রথমে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর শরীরের মাপ ও দৈহিক শক্তির পরীক্ষায় তাহাকে

চরিত্র সম্বন্ধে ও দেহের নীরোগতা সম্বন্ধেও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হয়।

তাহার পর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আর একবার তাহাকে এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। সেখানে সামান্ত দোষ থাকিলেই তাহার আবেদন না-মঞ্জুর হয়। এই ভাবে প্রায় শতকরা ৬৫ জনের আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

ইহাতেও নিস্তার নাই। এই পরীক্ষার পরেও এক সিলেকসন কমিটী তাহাকে পরীক্ষা করেন। ফলে শতকরা আরও ১৫ জন বাতিল হয়। এইরূপে একই সময়ে ২০ জনের অধিক শিক্ষার্থী পিলহাউসে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

পিল হাউসে প্রবেশ করিবার পর পর কয়টি শিক্ষার পরীক্ষা হয়। যে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহাকে আরও দুই তিন বার পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা ভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সকল বিষয়েই দেওয়া হয়।

অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টরদিগের হস্তে আঙ্গুলের টিপের শিক্ষা দিবার ভার ন্যস্ত। এ বিষয়ে কনষ্টেবলদিগের কার্য্যের পক্ষে যতটুকু কৌশল প্রয়োজন. ততটুকু কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। দাগী পুরাতন চোর-ছেঁচড় ও গুণ্ডা-বদমায়েসদিগের আঙ্গুলের টিপ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতায় শিক্ষার্থীরা তাহা ক্রমশঃ চিনিতে অভ্যস্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে কনষ্টেবলরা কোন অপরাধীকে ধরিয়া তাহার আঙ্গুলের টিপ লইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করিতে পারে। এই সকল দাগী চোর-ছেঁচড়ের ইতিহাসও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতায় তুলিয়া রাখা হয়; সুতরাং অপরাধীর গুপ্ত আবাসস্থল বাহির করিতেও কনষ্টেবলকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

এই শ্রেণীতে এবং অন্যান্য শ্রেণীতে নারী শিক্ষার্থিনীও আছে। পুরুষ শিক্ষার্থীর সহিত ইহাদিগকে সমান শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল ব্যায়াম-শিক্ষা ও আহতের প্রথম সেবার (First aid) শিক্ষা উভয়ের স্বতন্ত্র। নারীরা সত্বর শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে। বড় জোর ২ মাস শিক্ষাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।



শিক্ষাগারে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার আঙ্গুলের টিপ লইবার সঙ্কেত শিক্ষা দিতেছেন

ভাড়াটিয়া গাড়ী ট্যাক্সির সম্বন্ধে কনষ্টেবলের মোটামুটি আইনজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ জন্য এ বিষয়েও তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন্ ক্ষেত্রে গাড়োয়ানের অপরাধ হয়, আবার কোন্ ক্ষেত্রেই বা আরোহী অপরাধ করে, তাহা জানিবার সহজ উপায় কনষ্টেবলকে শিখান হয়। কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধৃত করা হইবে বা কোন্ ক্ষেত্রে হইবে না, তাহাও শিক্ষার্থী কনষ্টেবলকে শিখান হয়।

কনষ্টেবল শিক্ষিত হইয়া থাকে। পিল হাউসে পাঠ গিলান হয় না। শিক্ষক এমন মনোজ্ঞ করিয়া পাঠ বুঝাইয়া দেন যে, শিক্ষার্থীরা সহজে এবং প্রফুল্লচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিতে



মোটর প্লেট ও মোটর লাইসেন্স সম্বন্ধে শিক্ষাদান

পারে। শিক্ষকরা যে কেবল বিশেষজ্ঞ, তাহা নহে, তাঁহারা মনুষ্যচরিত্র বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। কি ভাবে তাঁহারা শিক্ষা দেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক পরিণতবয়স্ক অভিজ্ঞ সার্জ্জেণ্ট এক শ্রেণীতে পড়াইতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, মনে কর, এক দোকানদার ও খরিদ্দারে বিবাদ হইতেছে। দোকানদার বলিতেছে, খরিদ্দার যে টাকা দিয়াছে, তাহা বাজে না। খরিদ্দার বলিতেছে, হাঁ বাজে, টাকা ভাল। টাকাটা দেখিতে ভাল বটে, কিন্তু বাজে না। সুতরাং কে সত্য বলিতেছে, ঠিক করা কঠিন। সে ক্ষেত্রে তোমরা কি করিবে?"

একটি ছাত্র বলিল, "আমি তখনই খরিদ্দারকে ধৃত করিব এবং উহার নামে নালিশ আনয়ন করিবার দায়িত্ব দোকানদারের উপর ফেলিব।"

শিক্ষক হাসিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তোমরা ভাবী কনষ্টেবলরা কি মনে কর, যেহেতু তোমরা কনষ্টেবল, সেই হেতু তোমরা মনে করিলেই লোককে ধৃত করিতে পার? এ ধারণা কখনও রাখিও না। আচ্ছা, আর কে কি বলিতে ইচ্ছা কর, বল।"

আর একটি ছাত্র বলিল, "আমি দোকানদার আর খরিদ্দার—উভয়কে নিকটস্থ কোনও কেমিষ্টের দোকানে লইয়া

শিক্ষক বলিলেন, "বেশ, এটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর বটে। কিন্তু ধর, যদি কেমিষ্ট পরীক্ষা করিয়া বলেন, টাকাটা খারাপ, তাহা হইলে কি কর?"

কেহ ইহার জবাব দিল না। বোধ হয়, তাহারা মনে মনে ভাবিতেছিল, তাহারা সে ক্ষেত্রে খরিদ্দারকে গ্রেফতার করে। কিন্তু শিক্ষক বুঝাইয়া দিলেন, "গ্রেফতার করা সহজ কথা নহে। এ সব ক্ষেত্রে আসল জানা দরকার—খরিদ্দারের অভিপ্রায় ভাল কি মন্দ ছিল। যতক্ষণ ইহা অবধারণ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ গ্রেফতার করিতে পারিবে না।"



রাজপথে আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রথম সাহায্যদানের শিক্ষাব্যবস্থা

কেমন সুন্দর উপদেশ! আর এ দেশে? সে কথা না বলাই ভাল।

আর এক শ্রেণীতে পথের দুর্ঘটনাকালে পুলিসের কর্ত্তব্য-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একখানা মোটর-গাড়ীতে ও এক বাইসিকলে ধাক্কা লাগিল; ফলে বাইসিকল হইতে আরোহী যুবক পড়িয়া গিয়া আহত হইল।

তাহার জুড়ীদারকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে এবং স্বয়ং আহত যুবককে প্রথম সেবার যথাসম্ভব সুযোগ দিবে' এবং জুড়ীদারকে উপস্থিত দর্শকগণের এবং চালক ও আরোহিগণের বিবরণ নোটবুকে লিখিয়া লইতে বলিবে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটে যেখানে টেলিফোঁ থাকে, সেখানে কাহাকেও পাঠাইয়া এম্বুলেন্স আনিবার জন্ত টেলিফোঁ করিতে বলিবে'। সত্য সত্যই গাড়ীতে গাড়ীতে এইরূপ ধাক্কা, নেকড়ার পুতুল আরোহীর শরীরে আঘাত, এম্বুলেন্স আনয়ন প্রভৃতি দেখান হয়।

রাস্তায় লোক ও গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা দিবার জন্ত পিল হাউসের প্রাঙ্গণের মধ্যে এক কৃত্রিম রাস্তার সংযোগস্থল প্রস্তুত করা হয় এবং তথায় ছাত্রগণকে লইয়া গিয়া হস্তসঙ্কেতে কিরূপে নানা দিকের লোকের ও গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদর্থে সত্য সত্যই কৃত্রিম মোড়ে মোটর, অশ্ববান, বাই-সিকল, বাস, ট্রাম এবং পথিক প্রভৃতি সাজাইয়া পথ চলা-চলের অভিনয় করা



রাজপথে যানাদি চলাচল নিয়ন্ত্রণের শিক্ষাদান

মন্দগামী গাড়ীর চলাচল সম্বন্ধে কিরূপ পৃথক্ নিয়ম অবলম্বিত হইবে, পথিক কিরূপে কোন্ সময়ে রাস্তা পারাপার হইবে, গাড়ী রাস্তার কোন্ পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইবে, এ সব সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়মে ছাত্রগণকে অভ্যস্ত করা হয়। কোন্ গাড়ী বা যাত্রীকে অগ্রসর হইতে বলা প্রয়োজন, কোন্ গাড়ী বা যাত্রীকে অপেক্ষা করিতে বলা প্রয়োজন, রাস্তার অবস্থা বুঝিয়া ছাত্রকে তাহা শিক্ষা করিতে হয়।

চোর ধরিয়া নোটবুকে কি ভাবে অভি-যোক্তার অভি-যোগের কথা-গুলি হুবহু লিখিয়া লইতে হয়, কি ভাবে চোরকে থানায় লইয়া যাইতে হয়, কি ভাবে তাহাকে 'খানাতল্লাস' করিতে হয়, কি ভাবে আদালতে চুরি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়,—তাহা পর-পর নকল চোর ও অভিযোক্তা সাজাইয়া শিক্ষা দেওয়া, চোর দোকানদারের বা গৃহস্থের মাল লইয়া পলায়ন করিতেছে, দোকানদার বা গৃহস্থ 'চোর' 'চোর' করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, এমন সময়ে কনষ্টেবলকে কি ভাবে প্রস্তুত হইয়া তাহাকে ধরিতে হয়, তাহা হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া। কনষ্টেবলের ডিউটি চোর বা বদমাস ধরা ও থানায় তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া, তাহাকে মারা বা অপমান-নির্য্যাতন করা নহে। এ জন্ত বদমাস-গুণ্ডা ধরি-



কনষ্টেবলকে কৌশল কসরৎ অবলম্বন করিতে হয়। সে সব কৌশল ও কসরৎ শিক্ষার্থীকে শিখান হয়। এতদর্থে হাতের পেঁচ, কম্ভীর পেঁচ, জিজিৎসা, কুস্তী, বক্সিং প্রভৃতি সকল রকমের কসরৎ শিক্ষার্থীকে শিখিতে হয়। চোর-বদমাস ছোরা লইয়া আক্রমণ করিলে কিরূপে তাহা কৌশলে কাড়িয়া লইতে হয়, অথবা বদমাস-গুণ্ডাকে কিরূপে আগ্নেয়াস্ত্র-হীন করিতে হয়, তাহাও শিক্ষাদান করা হয়। তবে কোথাও চোর, বদমাস, গাঁটকাটা, গুণ্ডাকে প্রহার করিবার উপদেশ দেওয়া হয় না, বড় জোর রুলের ডাণ্ডা কচিৎ কখনও আপৎকালে ব্যবহার করিতে বলা হয়।

এ বিষয়ে শিক্ষকের উপদেশ এইরূপ :—

"মনে কর, তুমি বিটে পাহারা দিতেছ। ঘণ্টায় আড়াই মাইল বিটে চলা তোমার কর্ত্তব্য, এ কথা মনে রাখিও। ধর, তুমি কোন দোকান হইতে জিনিষ চুরি করিয়া কোন চোরকে পলাইতে দেখিলে, তুমি তখনই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু মনে রাখিও, কদাচ তাহাকে আঘাত করিবে না, কিংবা তাহাকেও তোমায় আঘাত করিতে দিবে না। এ জন্য একটুকু কৌশলের প্রয়োজন। যদি চোর ভালয় ভালয় থানায় যাইতে না চাহে, বলপ্রকাশ করে, তাহা হইলে অবস্থা বুঝিয়া হয় সিটি দিয়া জুড়ীদারকে ডাকিবে, নিতান্ত না হয়, শেষে রুলের ডাণ্ডা ব্যবহার করিবে। এমনভাবে চোরকে ধরিবে যে, সে তোমায় লাথি মারিবার বা কামড়াইবার সুযোগ না পায়। এ বিষয়ে তোমাকে কসরৎ শিখান হইয়াছে। ফল কথা, তোমার শিক্ষানুসারে এমন পেঁচ ব্যবহার করিবে, যাহাতে তাহার কোনওরূপ অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা না থাকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখিবে, কখনও ক্রোধের বশীভূত হইবে না। হয় ত ক্রুদ্ধ হইলে তাহার বা তোমার জীবন যাইতে পারে। যদি এক পেঁচে ধরিয়া রাখিতে পরিশ্রান্ত হও, তাহা হইলে অন্য পেঁচ বদলাইয়া লইবে। এমন পেঁচ দিবে, যাহাতে চোরটা একবারে অবশ হইয়া পড়ে। পথে যাইতে যাইতে যদি চোর বদমায়েসী করে, তাহা হইলে পেঁচ মারিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিবে। কেবল তাহাই নহে, ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর জানু পাতিয়া বসিবে এবং জুড়ীদারকে সিটি দিয়া ডাকিবে। সাবধান, তাহাকে একবার ফেলিয়া দিয়া উঠিবার অবসর দিও না। উঠিতে পাইলে সে 'মরিয়া' হইবে। অতিরিক্ত বদমায়েসী করিলে এম্বুলেন্স ডাকাইয়া তাহাতে পূরিয়া বদমাস চোরকে থানায় লইয়া যাইবে।"



থানায় পুলিসের পক্ষে অভিযোগ আনিবার সম্বন্ধে শিক্ষাদান

আর আমাদের দেশে? এখানে বদমাস বা চোর-ছেঁচড়কে কি ভাবে সদর পথ দিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়, তাহা সকলেই জানে। কোমরে দড়ি, হাতে কড়ি, তাহার উপর দোষ কবুল করাইবার নিমিত্ত ঠাণ্ডা ঘরে দাওয়াই,—সে সব বর্ণনা না করাই ভাল।

হাজত আসামীর পক্ষে লণ্ডন পুলিসের চমৎকার সুবন্দোবস্ত আছে। এ বিষয়েও পুলিসের কনষ্টেবলদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে,—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ আসামীকে দোষী বলিয়া রায় না দেন, ততক্ষণ তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে এবং সেইরূপ ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক হাজত আসামীর কক্ষে একটি করিয়া বৈদ্যুতিক 'কলিং বেল' থাকে; আসামীর কোন কিছু ন্যায্য প্রার্থনা থাকিলে ঐ কল বাজাইলেই পুলিসকে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে উপস্থিত হইতে হয় এবং আইনে থাকিলে 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য আসামীকে সরবরাহ করিতে হয়। তবে যদি কোনও আসামী দুষ্টামী করিয়া ক্রমাগত কল টিপে,

তাহা হইলে ইন্স্পেক্টর তাঁহার কক্ষের সহিত উহার বৈদ্যুতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। কিন্তু হাজত আসামী শান্তভাবে থাকিলে তাহাকে সংবাদপত্র পাঠ করিতে দেওয়া হয় এবং সকল বিষয়ে যথাসম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থী কনষ্টেবলকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে,—A police man is a servant of the public, পুলিসের লোক সাধারণের সেবক। হাজত আসামীদের অপরাধ যে পর্য্যন্ত না সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ তাহারা নিরপরাধ। তাহারা সাধারণের দশ জনের এক জন; সুতরাং পুলিস তাহাদের সেবা করিবে। আর আমাদের দেশে? হাজতের আসামীও যেন দাগী আসামী!



পুলিসের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা-ব্যবস্থা

এই ভাবে শিক্ষিত হইবার পরেও শিক্ষার্থীরা পাকা কনষ্টেবল হইতে পারে না। তাহাদিগকে সেণ্ট জন এম্বুলেন্স সমিতির নিকট 'প্রথম সেবার' পারদর্শিতার সার্টিফিকেট লইতে হয়। পিল হাউস হইতে শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া শিক্ষার্থীরা পুলিস কনষ্টেবলরূপে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নাম রেজেষ্টারী করিতে পায়। তখন তাহাদিগকে 'প্রোবেশানার' বা শিক্ষানবিশীরূপে কোনও পুলিস বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ছয় মাসকাল তাহাদিগকে কোনও বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত ইন্স্পেক্টরের অধীনে শিক্ষানবিশী করিতে হয়। তখনও তাহাকে ড্রিল, পাঠ এবং লেকচারে হাজিরা দিতে হয়, ইহাতেও নিস্তার নাই। ইহার পরেও যদি শিক্ষানবিশীরা আরও দুইটি বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং পুলিস সুপারিন্টেণ্ডের নিকট good conductএর সার্টিফিকেট পায়, তাহা হইলে তাহারা কনষ্টেবল পদে পাকা হয়।

এ দেশে ও সব আপদ-বালাই নাই। রামখেলাওন সিং বিন্ধ্যাচল বা মির্জাপুর হইতে লাঠী ঘাড়ে বাহির হইয়া যদি মাপে ৬ ফুট হইতে পারিল বা দশ হাত ছাতি ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারিল, অথবা সের তিনেক ডাল-রুটীর সদ্ব্যবহার করিতে পারিল, তাহা হইলে তাহার কনষ্টেবলের মবলক ১১ টাকা বা তদূর্দ্ধের চাকুরী মারে কে? বিদ্যার মধ্যে তুলসীদাসের রামায়ণ আওড়ান, বুদ্ধির মধ্যে খইনি খাওয়া। বস্! তাহা হইলেই সে প্রবল-প্রতাপ সরকার বাহাদুরের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ পুলিস কনষ্টেবল! সে দেশ আর এ দেশের ইহাই প্রভেদ। না হইলে, এ দেশের কনষ্টেবলের এমন বুদ্ধি যে, মিনিষ্টারের গাড়ী রোখে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যকে 'উধার যাও' বলে!

আসল কথা, শাসননীতির ধারাটাই মন্দ। ইহার খোল-নলিচা না বদলাইলে কেবল 'educating the constabulary' বলিয়া সভা মাৎ করিলে কায হইবে না। পুলিসকে যন্ত্র না করিয়া উহাতে মানুষের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তবে পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগের ও বন্ধুত্বের আশা করা যাইতে পারিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী গুপ্তরহস্য

যদি কোন ব্যক্তি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়, এবং তাহার অপরাধের বিচারকালে যদি সে সপ্রমাণ করিতে পারে, যে সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সময় সে স্থানান্তরে ছিল, তাহা হইলে আদালত তাহার সাফাই বিশ্বাস করিয়া তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিদান করিতে পারেন। এইরূপ প্রমাণে নির্ভর করিয়া অনেক বিচারক নরহত্যায় অভিযুক্ত আসামীদের মুক্তিদান করিয়াছেন, ফৌজদারী মামলার বিচারে ইহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ ৫১ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় একটি লোক নারী-হত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপরদ্দ হইয়াছিল; তাহার পক্ষে ১২ জন সাফাই সাক্ষী ছিল, তাহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাহাদের প্রত্যেকেই আসামীকে নিরপরাধ বলিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও জুরীরা আসামীকে অপরাধী বলিয়া 'রায়' দিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে এই ৫০ বৎসর পরেও আসামী দোষী কি নির্দ্দোষ, এ রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় নাই। সভ্যজগতের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে এরূপ রহস্যজনক মামলার দৃষ্টান্ত আর একটিও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ব্রুকলিন সহরের অদূরে নিউ লট্স নামক একখানি সমৃদ্ধ পল্লী আছে, সেই পল্লীতে পাসাক রবিনষ্টান নামক এক জন পোল বাস করিত। তাহার পিতার একটি যুবতী পরিচারিকা ছিল। তাহার নাম সারা আলেকজান্দার। রবিনষ্টান কৃশ, দুর্ব্বল, বিশেষতঃ সে যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিল; সারা পূর্ণ-যুবতী, পুষ্টাঙ্গী ও বলিষ্ঠা; তাহার দেহে এরূপ বল ছিল যে, সে ইচ্ছা করিলে রবিনষ্টানকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত! এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, বিচারালয়ে উভয়ের দৈহিক বলের তারতম্য সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছিল।

সহসা এক দিন সারা অদৃশ্য হইল। দুই দিন পরে অদূরবর্ত্তী একটি গোধূমক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামী ও তাহার এক জন সারার মৃতদেহ দেখিতে পাইল। সে দিন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে ক্ষেত্রের গোধূমরাশি কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল, এ জন্য শস্যক্ষেত্রে 'নাড়া' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুপক্ক গোধূমের 'শিষ'গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্ষেত্রের চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অনেক স্থানে নাড়াগুলিও খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; সারার মৃতদেহ যে দিন সেখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে প্রবলবেগে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার পর শীতের আধিক্যে তুষারপাত হইয়াছিল।

ছুরিকাঘাতে সারার মৃত্যু হইয়াছিল, কেহ তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহার কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল। ছুরিকাখানি তাহার মৃতদেহের কিছু দূরে পড়িয়া ছিল। সারার সর্ব্বাঙ্গ তাহার শাল দ্বারা আবৃত ছিল; তাহার পকেটে দস্তানা ও একটি দু'আনী ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই।

করোনারের তদন্তে স্থির হইয়াছিল, পূর্ব্ব-রবিবারে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে সারা নিহত হইয়াছিল। ডিটেক্টিভরা সারার প্রভুপুত্র রবিনষ্টানকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছিল; করোনারের আদালতে সে নীত হইলে, তদন্তের সময় আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য ডিটেক্টিভদের ধারণা হইয়াছিল, সে প্রকৃতই অপরাধী। তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দায়রা আদালতে আসামী রবিনষ্টানের বিচার আরম্ভ হইল। তাহার বিরুদ্ধে পুলিস যে সকল অকাট্য প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিল, তাহার সাহায্যে যে কোন নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিকে ফাঁসীতে লট্কাইবার অসুবিধা হইত না।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম ও প্রধান সাক্ষী ইটন রাসায়নিক বিশ্লেষণে অসাধারণ পারদর্শী ছিল। রবিনষ্টানের জুতার নীচে ও কোটের হাতায় যে সকল জিনিষ লাগিয়াছিল, ইটন পুলিসের আদেশে সেই সকল দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াছিল।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পুলিস রবিনষ্টানকে হাজতে

পুলিস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আরম্ভ করিয়া রবিনষ্টীনের জুতা-জামা হইতে তাহার অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে ডিটেক্‌টিভ হত্যারহস্য আবিষ্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সে সারার মৃতদেহের অদূরে—গোধূমক্ষেত্রে সঞ্চিত তুষার-রাশির উপর জুতার যে সকল দাগ দেখিতে পাইয়াছিল, রবিনষ্টীনের জুতা লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া সে দেখিতে পাইল, তাহা রবিনষ্টীনেরই জুতার দাগ। এতদ্ভিন্ন সেই জুতার উপর পীতাভ কৰ্দম শুকাইয়া লাগিয়াছিল; পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ পীতাভ মৃত্তিকা সেই গোধূমক্ষেত্রে ভিন্ন সেই অঞ্চলের অন্য কোন স্থানে বর্ত্তমান ছিল না। এই শুষ্ক মৃত্তিকা ব্যতীত রবিনষ্টীনের জুতার তলায় সূক্ষ্ম চূর্ণবৎ কতকগুলি জিনিষ লাগিয়াছিল—রসায়নবিৎ ইটন তাহা বিশ্লেষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

ইটন এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিল যে, আসামীর জুতার নীচে যে সূক্ষ্ম চূর্ণগুলি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেগুলি পশমচূর্ণ (পশমের ফেঁসো) এবং সারার শালখানি যে পশমে নির্ম্মিত, তাহার সহিত জুতা-সংলগ্ন পশমচূর্ণের কোন পার্থক্য নাই, উভয় পশমই একজাতীয়। ইটনের জবানবন্দীতে আরও জানিতে পারা গিয়াছিল যে, রবিনষ্টীনের জুতার তলায় সুপক্ব গোধূমের 'শিষ' চূর্ণ অবস্থায় লাগিয়াছিল। যে গোধূমক্ষেত্রে সারার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেখানে শুষ্ক 'নাড়া'র মধ্যে ঐরূপ 'শিষ' বিস্তর পড়িয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন রবিনষ্টীনের জুতার নীচে গোধূমের যে খোলা ও পশমচূর্ণ লাগিয়াছিল, তাহাতে যে রক্তকণার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, উহা মনুষ্য-শোণিত। রবিনষ্টীনের কোটের হাতায় দুই বিন্দু মনুষ্য-রক্তও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আসামীর উকীল বলিলেন, পুলিস আসামীর জুতা ও কোট পূর্ব্বেই সংগৃহীত করিয়াছিল, সুতরাং আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অপরিহার্য্য বলিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, সেই সকল ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু পুলিসের বিরুদ্ধে আরোপিত এই অভিযোগ জুরীরা বিশ্বাস করেন নাই। পুলিস কি আসামীর জীবন বিপন্ন করিবার জন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে পারে? তোবা!

ফরিয়াদী পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী—গ্রাম্য কামারের দোকানদার। সে সাক্ষ্য দিল—সারার মৃতদেহের অদূরে যে ছোরাখানি পাওয়া গিয়াছিল, সে তাহা কয়েক দিন পূর্ব্বে রবিনষ্টীনের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। আসামীর উকীলের জেরায় সে বলিল, ঐ ছোরা যে তাহাদের কারখানায় নির্ম্মিত, ইহার প্রমাণ—ছোরাখানিতে একটি চিহ্ন ক্ষোদিত ছিল; তাহাদের কারখানার অস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্রে ঐ চিহ্ন নাই। সুতরাং রবিনষ্টীনই ঐ ছোরা ক্রয় করিয়াছিল, জুরীরাও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন।

তৃতীয় সাক্ষী—সারার ভ্রাতা। সে এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিল যে, তাহার ভগিনী সারার কোন সন্ধান না পাইয়া সে রবিনষ্টীনকে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। রবিনষ্টীনকে তখনও হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। রবিনষ্টীন তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল—বেদেরা সারাকে কোন নির্জ্জন স্থানে ধরিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে কি না, বলা কঠিন; সম্ভবতঃ বেদেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে সারার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে রবিনষ্টীন সাক্ষীকে বলিয়াছিল, "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি—সারার মৃতদেহ ঐ মাঠে পড়িয়া আছে! স্বপ্নটা ঠিক ফলিয়া গেল!"

অতঃপর আরও পাঁচ জন সাক্ষী আসামীর প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিল—তাহারা সকলেই হলফ করিয়া বলিয়াছিল—যে দিন সারার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে তাহারা সারাকে রবিনষ্টীনের সঙ্গে ট্রামে চাপিয়া যে মাঠের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, সেই মাঠেই সারার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। যে শালে সারার মৃতদেহ আবৃত ছিল, সেই শাল বিচারালয়ে দাখিল করা হইয়াছিল; সাক্ষীরা সেই শাল সনাক্ত করিয়া বলিল—তাহারা ট্রামগাড়ীতে সারাকে সেই শালই ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিল।

ফরিয়াদী পক্ষের এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী আসামীর অত্যন্ত প্রতিকূল হইলেও শেষ সাক্ষীর জবানবন্দীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মারাত্মক হইয়াছিল। এই সাক্ষী হলফ করিয়া বলিয়াছিল—(সাক্ষীর নাম ম্যাক্স লেভি) আসামীর সহিত তাহার পরিচয় না থাকিলেও সে তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছে। দুর্ঘটনার দিন সে আসামীকে মৃতা যুবতীর সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছিল। তাহারা তাহার সম্মুখ দিয়া প্রস্থান করিলে সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল, তাহারা উভয়ে একটি কাঠের বেড়া পার হইয়া পূর্ব্বোক্ত গোধূমক্ষেত্রে

আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল—যেন কেহ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পথিকদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে! কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল, তাহার উপর—সাক্ষী স্বীকার করিল—সে ভীরু প্রকৃতির লোক.এই জন্য সে সেই আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে অন্য দিকে পলায়ন করিল।

বস্তুতঃ, রবিনষ্টীনের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল ঘটনাচক্রের প্রয়োজন, ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী হইতে তাহা সমস্তই সংগৃহীত হইল। পুলিস মামলাটি এই ভাবে সাজাইয়াছিল কি না. বলা অসম্ভব; কিন্তু এই সকল প্রমাণ বর্ত্তমানে আসামী রবিনষ্টীন সারাকে হত্যা করে নাই, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন হইল।

এইবার আসামী রবিনষ্টীনের সাফাই সাক্ষীদের কথা বলিব। তাহার সাক্ষীর সংখ্যা ১২টি; তাহারা সকলেই হলফ করিয়া বলিল, আসামী ঘটনার দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কোন আত্মীয়ের বিবাহে যোগদান করিয়াছিল এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে ছিল। আসামী সেই সময়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানান্তরে গমন করে নাই, সুতরাং সে সেই দিন সন্ধ্যার পর সারার সঙ্গে মাঠে উপস্থিত হইয়া সেখানে তাহাকে খুন করিয়া আসিয়াছে—ইহা অসম্ভব।

আসামীর সাক্ষিগণের সকলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহাদের জবানবন্দী অবিশ্বাস করিবার কারণ ছিল না, অথচ তাহার প্রতিকূলে যে সকল প্রমাণ ছিল, তাহাও অকাট্য, এ অবস্থায় জুরীরা কি রায় প্রকাশ করিবেন, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। আসামীর উকীল ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের প্রমাণ অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত অযৌক্তিক প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তিনি জজ ও জুরীদের বুঝাইয়া দিলেন, আসামী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বলিয়া তাহার কণ্ঠনালী হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে, সুতরাং তাহার কোটের হাতায় যে দুই এক বিন্দু রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা তাহারই নিজের রক্ত। তাহার জুতার নীচে পশমের 'ফেঁসো' লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার পিতার কারখানার মেঝে হইতেই ঐ সকল পশমের 'ফেঁসো' তাহার জুতার বাধিয়া গিয়াছিল। রবিনষ্টীনের পিতার পশমের কারবার ছিল এবং তাঁহার কারখানার মেঝের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশম-সূত্র ও পশমচূর্ণ বিস্তর পড়িয়া থাকিত—রবিনষ্টীনের উকীল আদালতে ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

তিনি আরও বলেন, আসামী দুর্ব্বল, কৃশ, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, প্রতিনিয়ত সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে; যে যুবতীর হত্যাভিযোগে সে অভিযুক্ত, সেই যুবতী অত্যন্ত বলিষ্ঠা এবং আসামীর কবল হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থা। আসামী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে তাহাকেই আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে পারিত—সেরূপ শক্তি তাহার ছিল। রবিনষ্টীন কামারের দোকান হইতে যে দিন যে সময় ছোরাখানি ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া কামারের পরিচারিকা জবানবন্দী দিয়াছিল, রবিনষ্টীন সেই দিন সেই সময় গ্রামান্তরে কোন বন্ধুর গৃহে উপস্থিত ছিল, ইহাও আদালতে সপ্রমাণ হইল।

অতঃপর ফরিয়াদীর উকীল বলিলেন,—তাঁহার সুবিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বীর (আসামীর উকীলের) কোন কথা সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ যে সকল সাক্ষীকে আসামী সাফাই মানিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১০ জন তাহার আত্মীয়, আসামীর প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছে।

কিন্তু আসামীর আত্মীয়ের বিবাহে তাহার অন্য আত্মীয়রা যোগদান করিবে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তি—যে নিজের জীবন লইয়া বিপন্ন, সে কোন যুবতীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিবে, ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। এই জন্য আসামী দর্শকগণের সহানুভূতি লাভ করিল, এমন কি, বিচারকও জুরীদের যে ভাবে মামলা বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতেও আসামীর দিকেই তাঁহার ঝোঁক—ইহাও সকলে বুঝিতে পারিল; কিন্তু জুরী-সর্দ্দার (foreman) যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আসামী স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার অপরাধে অপরাধী", তখন দর্শকগণের এমন কি, বিচারকেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

জুরীর বিচারে রবিনষ্টীনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ফাঁসীর প্রতীক্ষায় সে কারাগারে প্রেরিত হইল। জুরীর বিচার অসঙ্গত হইয়াছে—এই যুক্তিতে রবিনষ্টীনের পক্ষ হইতে উচ্চতর আদালতে দায়রার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করা হইল; কিন্তু আপীল গ্রাহ্য হইলেও আপীল-আদালতে তাহার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পার্থিব বিচারালয়ের বহু ঊর্দ্ধে আর এক বিচারালয়ে মহাবিচারকের নিকট উপস্থিত হইতে হইল। কারাপ্রকোষ্ঠে দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মারোগে তাহার মৃত্যু হইল।



বিচিত্র চীনা জাহাজ

চীনাদিগের সংস্কার, জাহাজের চক্ষু না থাকিলে সে জাহাজ বিপদ অবলোকন করিয়া সতর্ক হইতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক চৈনিক জাহাজে এক জোড়া চক্ষু অঙ্কিত করা হয়। ইহাতে জাহাজের বিচিত্রতা ঘটে। পূর্ব্বে চীনের জলযানে



চৈনিক জাহাজের নেত্র

মনুষ্যমুণ্ড প্রভৃতিও অঙ্কিত হইত। চীনারা মনে করে, এইরূপ মুণ্ড অঙ্কিত থাকিলে বিপদ ঘটে না। তাহারা ক্রুদ্ধ জলদেবতা-[illegible]কে শান্ত করিয়া থাকে। ইদানীং নরমুণ্ডের পরিবর্ত্তে চৈনিক অর্ণবযানে শুধু নেত্রযুগলই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মাছের নীড়

পাখীরাই নীড় বাঁধিয়া থাকে। কিন্তু জলতলবিহারী মৎস্যও যে পাখীর ন্যায় নীড় রচনা করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে কি? সমুদ্রচারী মৎস্যকুলের মধ্যে এক জাতীয় মৎস্য আছে, তাহারা সমুদ্রজাত লতাগুল্ম এবং সৈকত-সন্নিহিত তৃণাদি সাহায্যে সত্য সত্যই নীড় রচনা



রচিত নীড়মধ্যে মৎস্যমাতা

করিয়া থাকে। মৎস্যমাতা এই নীড়মধ্যে ডিম্ব প্রসব করিয়া সযত্নে তার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। বহুরূপীর ন্যায় এই জাতীয় মৎস্য ইচ্ছানুরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্যই তাহারা এইরূপ প্রকৃতি লাভ করিয়াছে।

জলমধ্যে ঘোড়-দৌড়

ব্যাপারটি অভিনব বটে। পাশ্চাত্য জগতে ঘোড়-দৌড় খেলার বাতিক এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বার্লিনের কোনও উৎসবক্ষেত্রে উৎসাহী দ্যূতক্রীড়াসক্তগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত আধারে



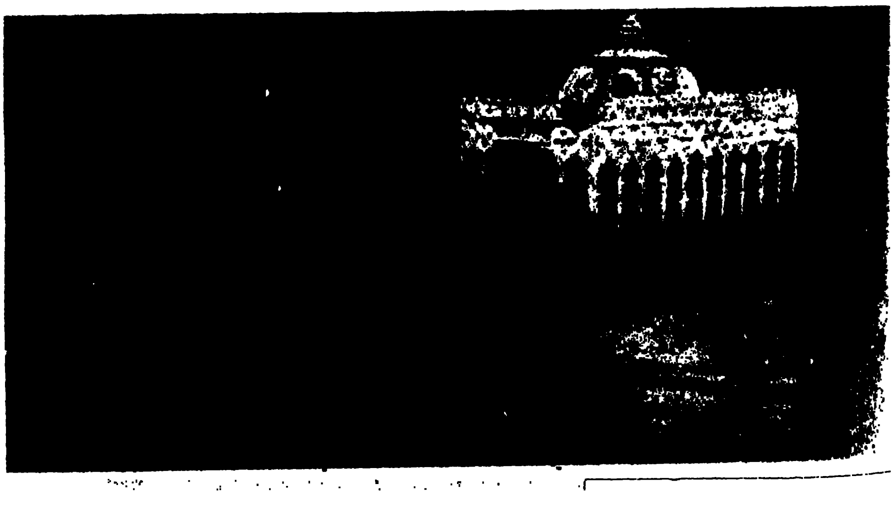
জলমধ্যে ঘোড়-দৌড়

চড়িয়া জলের উপর ঘোড়-দৌড়ের সথ মিটাইয়াছে। প্রত্যেক টবের সম্মুখে দারুনির্ম্মিত অশ্বমূর্ত্তি—যেন দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া গলা বাড়াইয়া দিতেছে—এমনই ভাবে শিল্পী ভাববিন্যাসের সহিত টবগুলি তৈয়ার করিয়াছে। 'জকির' পোষাক পরিয়া প্রত্যেক টবে এক জন করিয়া আরোহী দুই হস্তে দাঁড় ধরিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে এক-সঙ্গে বহুসংখ্যক টবজলের উপর নৃত্য করিতে করিতে দূর হইতে বুঝা যায়, যেন অশ্বগুলি জলের মধ্য দিয়া বাজি জিতিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। অর্থ, অবসর এবং সথ থাকিলে বিশ্বের বাজারে কত রকমেই যে মানুষ তাহার খেয়াল মিটাইতে পারে, ইহা তাহার একটা নিদর্শনমাত্র।

—

আলোকিত গণ্ডোলা

ভিনিসের গণ্ডোলা নৌকা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সম্প্রতি তত্রত্য কোনও জল-উৎসব উপলক্ষে গণ্ডোলাগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করা হইয়াছিল। আলোকিত নৌকাগুলি যখন নদীপথে জলবিহার করিতেছিল, তখন বোধ হইতেছিল, যেন আলোকমালা-সুশোভিত প্রাসাদসমূহ নৃত্যচঞ্চল সলিলের উপর ভাসিয়া



চলিয়াছে। অবশ্য গণ্ডোলাগুলিকে বিচিত্রভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

রুস সম্রাটের মুকুট

রাসিয়ার ক্যাথিরীন দি গ্রেট যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মুকুট মস্তকে ধারণ করিতেন, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সম্প্রতি



মহামূল্য রাজমুকুট

উহা সাড়ে ১৫ কোটি মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছে। উল্লিখিত মুকুটে ১ হাজার ৫ শত ২০ খানা হীরক বিদ্যমান। ইহা ছাড়া অসংখ্য চুণি ও পান্না প্রভৃতি আছে। এরূপ মূল্যবান মুকুট পৃথিবীতে দুর্লভ।

চশমার ফ্রেমে আলোকাধার

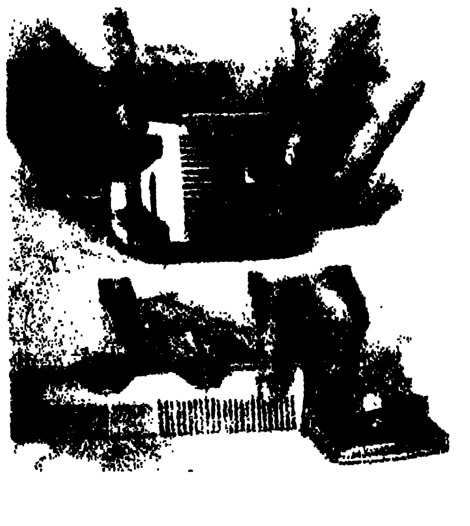
চশমার ফ্রেমে—নাসিকার উপর যে অংশটি অবস্থিত থাকে, তাহাতে শক্তিসম্পন্ন সার্চ্চ লাইট আধার সংলগ্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিকিৎসকগণ এইউপায়ে রোগীর বদন-বিবর এবং দন্ত পরীক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়া থাকেন। এই আধার হইতে আলোকপাত করিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি বেশ লক্ষীভূত হয়, চিকিৎসককে সে জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা ক্ষুদ্র ব্যাটারী সেই আধারে সংলগ্ন পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া দিলেই আলোকধারা নির্ব্বাপিত হয়। সম্মুখদিকে রাখিলে আলো জ্বলিতে থাকে।



চশমার ফ্রেমে আলোকাধার

ভাঁজ করা চিরুণী

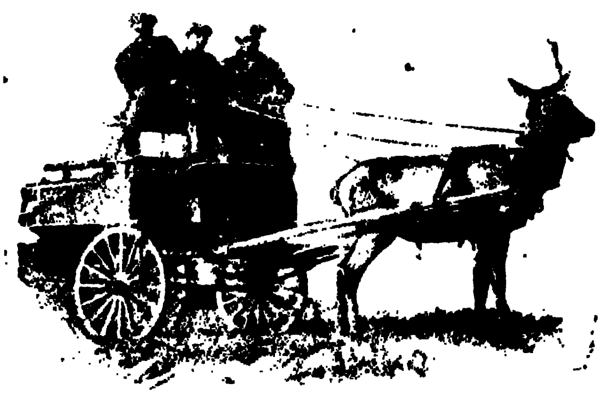
ছোট চিরুণী অনেক সময় বিলাসিনীর কেশপ্রসাধনে মনের মত প্রসাধন-নৈপুণ্যের সহায়তা করে না। বড় চিরুণী হইলে সে অসুবিধা আর তাহাকে ভোগ করিতে হয় না।



কিন্তু বড় চিরুণী পকেটে করিয়া চলা-ফেরা করাও সুবিধা-জনক নহে। শিল্পীরা বিলাসিনীদিগের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভাঁজ করা চিরুণী নির্ম্মাণ করিতেছে। এই বড় চিরুণী অনায়াসে ভাজ করিয়া ক্ষুদ্র আধারে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যাওয়া চলে। চিরুণীগুলি এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, ভাঁজ খুলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করিলে উহা সুদৃঢ় হয়। চিত্রে দুই প্রকার অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

বৃহদাকার মৃগবাহিত গাড়ী

ওহিওতে একটি বিশিষ্ট বিদ্যালয় আছে; তথায় বন্য ও দুর্দ্দান্ত পশুদিগকে মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বৃহদাকার 'এক' হরিণগুলি



হরিণবাহিত গাড়ী

কখনও পোষ মানিতে চাহে না। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক উল্লিখিত হরিণকে এমন পোষ মানাইয়াছেন যে, তাহাকে গাড়ীতে জুতিয়া ঘোড়ার ন্যায় গাড়ী টানাইয়া ছাড়িয়াছেন। এক্ হরিণ এমনই দুর্দ্দান্ত যে, উহাকে পোষ মানাইতে শিক্ষককে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহার শৃঙ্গগুলি সংঘর্ষের ফলে ভাঙ্গিয়াও গিয়াছিল। নেকড়ে বাঘকেও উল্লিখিত বিদ্যালয়ে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। একটি নেকড়ে বাঘ কুকুরের মত পোষ মানিয়াছে।

হাতে ঝুলান ঠেলা গাড়ী

শিশুদিগের জন্য এক প্রকার ঠেলা গাড়ী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ওজন মাত্র ৭ সের। এই গাড়ী ইচ্ছামত ভাঁজ করিয়া ব্যাগের আকারে হাতে ঝুলাইয়া লওয়া যায়। অতি অল্পসময়ের মধ্যে ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিলেই উহা ঠেলা



ভাঁজ করা ঠেলা গাড়ী

গাড়ীতে পরিণত হইবে। শিশু-জননীর পক্ষে উহা সহজে বহনযোগ্য এবং শিশুর বসিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক। পাশ্চাত্য দেশ মানুষকে ঘোর বিলাসী করিয়া তুলিলেও শিশু ও নারীর সুবিধার দিকে বিশেষভাবে অবহিত।

বিচিত্র কেশপ্রসাধন যন্ত্র

ইংলণ্ডে সম্প্রতি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বার বিলাসিনীর কেশ অতি সহজে কুঞ্চিত শোভা ধারণ করে পূর্ব্বে তাড়িত প্রবাহ অথবা অন্য প্রকার উত্তাপ সাহায্যে কেশ রাজিকে তরঙ্গায়িত করা হইত। উহাতে একটা বিঘ্নও ছি বিলাসিনীর কেশ তাহাতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কি



নবোদ্ভাবিত কেশপ্রসাধন যন্ত্র

যন্ত্রমধ্যে ঢালিয়া দিয়া যন্ত্রটি কেশরাজির উপর দিয়া পরিচালিত করা হয়। উপর দিয়া বাষ্প নির্গত হইয়া যায়, কিন্তু জল পড়িয়া যায় না। অবশ্য জলকে নির্দ্দিষ্ট সীমায় উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এক স্থানে বহুক্ষণ যন্ত্রটিকে ধরিয়া রাখিলে উত্তাপের প্রভাবে সেই স্থানের কেশ দগ্ধ হয় না, অথচ কেশদাম স্থায়িভাবে কুঞ্চিত হয়।

মরুভূমিতে ছিপ ফেলা

কথাটা বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্য। ডবলু, এ, রো নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিদ সর্প ও সরীসৃপ-জাতীয় জীবের সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা করিতেছেন। তিনি মাছধরা শিকারীর বেশে মরুভূমিমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে একগাছি সুদৃঢ় ছিপ। দণ্ড-সংলগ্ন রজ্জুর সাহায্যে তিনি জীয়ন্ত সর্প, গিরগিটি প্রভৃতি ধরিয়া থাকেন। ক্যালিফের অন্তর্গত স্থান ফার্ণাডোতে তাঁহার বিস্তৃত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত। সজীব সরীসৃপগুলি ধরিয়া তিনি গৃহে আনিয়া থাকেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এই উপায়ে উহাদিগকে ধৃত করা অত্যন্ত সহজ এবং তাঁহার হস্ত হইতে এ পর্য্যন্ত একটি জীবও পলায়ন করিতে পারে নাই। ছিপ হাতে লইয়া দূর হইতে তিনি সর্প বা গিরগিটির উপরে রজ্জুটি নামাইয়া দেন। বঁড়শীর পরিবর্ত্তে রজ্জুর প্রান্তদেশে একটি ফাঁস থাকে। শিকারের মস্তক গলাইয়া ফাঁসটি পড়িবামাত্রই তিনি উহাকে মাছের ন্যায় টানিয়া তুলেন। তাহার পর সর্পের গলদেশ এমন ভাবে ধারণ করেন যে, উহা তাঁহাকে দংশন করিবার উপায় পায় না।



[illegible]

শৃঙ্গ-সন্নিবিষ্ট বেহালা



শৃঙ্গ-সন্নিবিষ্ট বেহালা

বেহালা যন্ত্রে যদি শৃঙ্গ সন্নিবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে সেই যন্ত্র হইতে অতি মধুর সুরে ঝঙ্কার সমুত্থিত হয়। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ একখানি বেহালা ৫ খানা বেহালা যন্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। শুধু ধ্বনির প্রাচুর্য্য নহে—ইহাতে সুর-মাধুর্য্যেরও বহুগুণ উন্নতি হয়। পাশ্চাত্য দেশের অর্কেষ্ট্রা-বাদকগণ অধুনা বেহালার সহিত এইরূপ শৃঙ্গ-সন্নিবেশে মন দিয়াছেন। শৃঙ্গটি বাদকের দক্ষিণ বাহুমূলের উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহাতে বাদকের ছড়ি পরিচালনা করিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

জলের মধ্যে কুম্ভীরে মানুষে লড়াই

আমেরিকার জর্জ্জ লিঙ্ক নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ দীর্ঘকাল যাবৎ কুম্ভীর ধরিয়া তাহাদের সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কুম্ভীর ধরিতে তিনি এমনই পারদর্শিতা





লাভ করিয়াছেন যে, জলের মধ্যে যে কোনও কুম্ভীরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া তিনি তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন। পোষা কুম্ভীরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা হয় ত সম্ভব হইতে পারে, এ জন্য তিনি কোনও প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে যে কোনও বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। একটি কাচ-নির্ম্মিত বৃহৎ আধারমধ্যে একটি সদ্যোধৃত কুম্ভীর ছাড়িয়া দিয়া জর্জ্জ লিঙ্ক সেই কুম্ভীরের সহিত ১৮ মিনিট যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই যুদ্ধে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কুম্ভীর তাঁহার শরীরের কুত্রাপি কোনও



জলমধ্যে কুম্ভীরের সহিত লড়াই

অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি কুম্ভীরের চোয়াল সুকৌশলে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে জন্তুটি তাঁহাকে দংশন করিবার সুযোগ পায় নাই। এই বিচিত্র সংঘর্ষের চিত্র কোনও বায়স্কোপ কোম্পানী ছায়াচিত্রের যন্ত্র সাহায্যে

ভাসমান পান্থশালা

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর সকল বিষয়েই একটা বৈচিত্র্য আছে। আমাদের দেশে যে নৌকাগুলি 'গাধা-বোট' নামে পরিচিত, প্যারীর সেই শ্রেণীর নৌকাগুলিকে অধুনা প্যারীবাসীরা নদীবক্ষোবিহারী ভাসমান পান্থশালায়



ভাসমান পান্থশালা

পরিণত করিয়াছে। সীন-নদের উপর এইরূপ চলমান পান্থশালার ইদানীং বিশেষ প্রাদুর্ভাব। নদের যে কোনও স্থানে এই পান্থশালাগুলিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক নৌকার মধ্যে অনেকগুলি সুশোভিত কক্ষ নানা-বিধ আসবাবে পূর্ণ। পান্থশালার ছাতের উপর সুরম্য উদ্যান—নানা জাতীয় পুষ্পিত বৃক্ষ-লতায় নয়নমনো-মুগ্ধকর। ভাসমান পান্থশালাগুলি মোটর দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। বিলাসপ্রিয় জনগণ এইরূপ পান্থনিবাসে অবসর-কাল যাপন করিয়া থাকে।

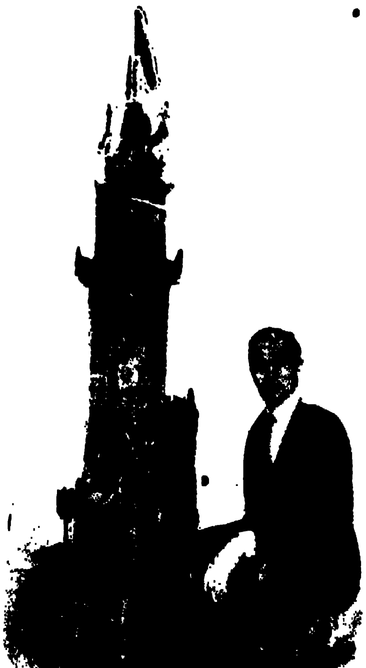
মোটর-চক্রে প্রসাধন-কৌটা

যে সকল মোটর-গাড়ী নারীরা চালাইয়া থাকেন, তাহার পরিচালন-চক্রের মধ্যস্থানে পাউডার রাখিবার কৌটা, পাফ্ প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে। উহার ডালা বন্ধ করিলে একটি বড় বোতামের মত দেখায় এবং উহা চাপিয়া ধরিলে শৃঙ্গধ্বনির কার্য্য সম্পাদিত করা যায়। নারীর দ্বারা পরিচালিত মোটর-গাড়ীতেই এই-রূপ ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্য বিলাসিনীদিগের সখের ইহা বিচিত্র দৃষ্টান্ত নহে কি?



মোটর-পরিচালন চক্রে প্রসাধন-কৌটা

কাগজ-নির্ম্মিত বুর্জ্জ



কাগজ-নির্ম্মিত বুর্জ্জ

জনৈক মার্কিণ শিল্পী পুরাতন সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা নকল বুর্জ্জ নির্ম্মাণ করিতেছে। কাগজ জলে ভিজাইয়া লইয়া যখন নরম হয়, সেই সময় উক্ত কাগজের মণ্ড লইয়া শিল্পী ইচ্ছানুরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত উপায়ে শিল্পী ৬ ফুট উচ্চ একটি বুর্জ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৩ শত কাপি পুরাতন দৈনিক পত্রের সাহায্যে উহা রচিত হইয়াছে। এই নকল বুর্জ্জএর দ্বার, বাতায়ন সোপানশ্রেণী, কক্ষ—প্রত্যেক খুটি-নাটি বিষয় শিল্পীর রচনা-কৌশলে দর্শনীয় হইয়াছে।



ত্রিবেণী *

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিশুতি-নিঝুম রাত্রি। অল্লায়ু চন্দ্রের ক্ষণস্থায়ী কিরণলেখা দূর ঘনবনে মিলাইয়া গিয়াছে, পতিবিরহ-বিধুরা তারকাবলী উদাস-নয়নে পতির প্রয়াণ-পথে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ভীমের শয়ন-ঘরের মেঝের উপর শেজ-মাদুর বিছানো; ভীম কিন্তু আজ তাহাতে পড়িয়াই ঘুমায় নাই। উজ্জ্বলা এক মালা তেল হাতে করিয়া ঢুকিতেই সে আগ বাড়াইয়া আসিয়া তাহাকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহার হৃদয়ের উপরে তাহারই প্রেমের জয়াঙ্কিত বিজয়কেতন উড্ডীয়মান রহিয়াছিল, যে কোমল-লতিকা এই পাষাণে সৌরভ দান করিয়াছিল, তাহাকেই সে সেই পাষাণগলা প্রীতিমন্দাকিনীর পূর্ণধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গভীর স্বরে কহিল,—"ভাল বলি, মন্দ বলি, জেনে রাখিস্, সে আমার ঝলথল্লির মাথায় বলা কথা। মনের ভেতর তুই ছাড়া যে কেউ কখন ঢুকবে না, সেটা ভাল করেই জেনে রাখিস্, উজ্জ্বল! ভীমের সে স্বভাব নয় যে, সে আগুনদেবতা সাক্ষী ক'রে যাকে জন্মমরণের সাথী করেছে, প্রাণ থাকতে তাকে ফেলে আর একটার হাত ধরবে।"

উজ্জ্বলা সে আদরে, সে অভিনন্দনে, সে সোহাগে একেবারেই গলিয়া পড়িল। সে তাহার সেই "বল্লরী-কোমল" বাহুপাশে লতাভুজে শালবৃক্ষকে বন্দী করিয়া আদরে-গলা সুধালস কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার মত স্বোয়ামী যেন জন্ম-জন্ম সকল মেয়েতেই পায়।"

ভীম প্রীত হইয়া স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল, কিন্তু রঙ্গ করিবার লোভ সামলাইতে পারিল না, রহস্যভরে কহিল,—"ইস্! বড় আজ দরাজ যে! একা সুগ্লীর হিংসেয় ফেটে মরছিলেন;

* আমার এই উপন্যাসে দিব্যোক ও ভীম প্রভৃতিকে "জালিক" কৈবর্ত্তরূপে কল্পিত করায় কয়েক জন পাঠক ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন; কেহ বা আবার আমার লেখা প্রত্যাহার না করিলে "তীব্র প্রতিবাদ হইবে" বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, "প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের আর্লি হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে, শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাসে, ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভারতবর্ষের ইতিহাসে দিব্যোক-ভীমাদিকে চাষী কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতি বলা হইয়াছে।" আমি না কি ইহার ব্যতিক্রম করিয়া উঁহাদের মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়াছি।

প্রথমেই একটি কথা বলা আবশ্যক। মাসিক পত্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমালোচনা স্থগিত রাখাই প্রচলিত প্রথা বলিয়া এত দিন শুনিতাম। এক্ষণে তাহারও ব্যতিক্রম হইতে পারে দেখিতেছি। যাহা হউক, ইহা সামান্য ব্যাপার। এ বারে আসল কথা বলি। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিরচিত ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়াই যে সকল কথা অবিসংবাদী সত্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সে দিন আর নাই। "অমুক প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিত এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়াই যে সে মত অভ্রান্ত, এরূপ ধারণার দিন বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বা প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিক-কৃত মতের বিরোধী হইলেও নাম দেখিয়াই যে ভয় পাইতে হইবে বা তাঁহারা যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহার যে বিরুদ্ধ আলোচনা নাই, এরূপ আমি মনে করি না।

কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পরলোকগত পণ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ কোন কালেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না, এমন কি, 'ঐতিহাসিক' বলিতে ঠিক যাহা বুঝায়, তিনি তাহাও ছিলেন না। 'ঐতিহাসিক' ও 'ইতিহাসলেখক' ঠিক এক নহেন। স্মিথ সাহেব প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিলেও তাঁহার সংস্কৃত ও পালি ভাষা এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহের সহিত কোন দিন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি বা প্রাচীন অনুশাসন সমূহের পাঠের জন্য তাঁহাকে অপরের লেখার উপর নির্ভর করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এ-প্রকার গুরুতর ত্রুটি যাঁহাতে বর্ত্তমান, তিনি প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হইতে পারেন না। স্মিথ সাহেবকে "প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক" না বলিয়া "প্রসিদ্ধ ইতিহাস-সঙ্কলক" বলাই অধিকতর সঙ্গত। যাঁহারা স্মিথ সাহেবের "আর্লি হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ কথা অজ্ঞাত নহে যে, স্মিথ সাহেবের নিজের বলিয়া কোন মতই ছিল না, যখন যে মত তিনি অপরের লেখায় সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে সম্পূর্ণ বিরোধী অপর এক মত অধিকতর সঙ্গত বোধ করিয়া তিনি পূর্ব্ব-মত পরিত্যাগ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, আবার কিছুকাল পরেই এই দ্বিতীয় মত পরিত্যাগ করিয়া প্রথম মতে তিনি ফিরিয়াও আসিয়াছেন। তাঁহার এত ঘন ঘন

সব মেয়েতে তোর সোয়ামীকে যদি পেয়ে বসে, তা হ'লে তুই থাক্‌বি কোথায় লো ?"

উজ্জ্বলাও কম যায় না, সে-ও তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল, "পেলেই বা, মনের ভেতর তারা ত আর ঢুকতে পারবে না। সেখেনে ত আমারই রাজ্যি।"

ভীম এই উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হইয়া উত্তরকারিণীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিল।

উজ্জ্বলা রহিল। শুধু রহিল না—বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই সে রহিয়া গেল। কাযকর্ম্ম সে পূর্ব্বের অপেক্ষা উৎসাহের সহিত বেশী করিয়াই করে, পরিজনগণের মধ্যে অনেকটাই বিনীত-ভাবে চলে. বড় একটা শাশুড়ীর মুখের উপর চোপা করে না, বুড়ীটাকে ত এক প্রকার ক্ষমা দিয়াছে। যা-ননদদের সঙ্গেও তাহার চুলোচুলিটা একটু কম হয়। এ সব লক্ষণে সনকা মনে মনে একটু খুসী হইল এবং আন্দাজ করিল যে, এ সেই মহীপালদীঘির আলোচনার ফল। তাই সে একবারেই সেই খোঁটা দেওয়া বন্ধ করিল না এবং এইটুকুই উজ্জ্বলার পক্ষে সব চেয়ে অসহ্য হইয়া রহিল। এমন কি, স্বামীর মুখ চাহিয়া সব কিছু সহ্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেও এই কথাটার অঙ্কুশ তাহার মাথায় খোঁচা দিলেই বুকের মধ্যে তাহার সেই উন্মত্ত বিদ্রোহের আগুনটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অনেক কষ্টেই স্বামীর অজস্র স্নেহবাণী, সরস-রহস্যা-লাপ, অপরিমেয় আদর এ সকলকেই মনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখে। এমন সময় শাশুড়ীর সঙ্গে চটাচটি করিতে গেলেই হয় ত বা একটা কাটা-ছেঁড়া হইয়া যাইবে, আর তাহার সুখের প্রদীপটুকু নিবিয়া গিয়া জীবনটা তাহার অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িবে। সে দেখিত, স্বামীর প্রতি এই ভালবাসার নিবিড় বন্ধন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে, উড়িবার সাধ্য আর তাহার নাই। বিশেষতঃ এখন বাড়ীর বাহির হইবার কথা মুখে আনিতে গেলেই তাহার নিজের মনেই সে যেন কেমন একটা দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে থাকে, হয় ত ইহার প্রত্যু-ত্তরে এমন একটা কথা শুনিতে হইতে পারে—যেটা শুনা তাহার পক্ষে একটুও প্রীতিকর নহে। সে যে সে দিনের সেই দুরন্ত স্মৃতিটাকে লইয়া নিজের লজ্জায় নিজেই নিজের কাছে মরিয়া রহিয়াছিল।

কিন্তু এই দুষ্ট গ্রহের ফের তাহার সম্পূর্ণ কাটিল না। অদৃষ্টে দুঃখ আছে। ভীমও সে ঘটনাকে ভুলিয়া যাইতে

যুক্তিগুলি নিজ হইতে আলোচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্মিথ সাহেবকে পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া বা তাঁহার গ্রন্থের কোন মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় তিনি যাহা করিয়াছেন, সত্যই তাহার তুলনা নাই এবং নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থ ইতিহাসজ্ঞানলাভেচ্ছুর পক্ষে অপরিহার্য্য এবং এখনও দীর্ঘকাল থাকিবে বলিয়াই আমি বিবেচনা করি।

তবে দুঃখের বিষয়, লাহিড়ী মহাশয়ের "পৃথিবীর ইতিহাস" সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আধুনিকতম তথ্যসমূহের সন্ধান না রাখিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল পূর্ব্বে বিরচিত ইংরাজী গ্রন্থাদি অবলম্বন বা অনুবাদ করার ফলে 'পৃথিবীর ইতিহাসে' অনেক স্থলেই ভ্রান্ত বা ভ্রমপূর্ণ পরিত্যক্ত মতাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে কতদূর ইতিহাস বলিতে পারা যায়, তাহা বিবেচ্য।

সুতরাং কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মত এই. বা কোন গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে বলিয়াই যে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিতে হইবে বা তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াই অসঙ্গত, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। "ত্রিবেণী" উপন্যাসের সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন মাসিক পত্রিকার সমালোচক এরূপ কথাও বলিয়াছেন দেখি-য়াছি যে, আমার ইতিহাস জানা বা পড়া নাই, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া সামাজিক উপন্যাস লেখা লইয়াই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সমালোচকগণ যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারেন, সে কথা ইতঃপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। কে কোন্

এই সকল নানা কারণে এত কথা বলিতে হইল। কিন্তু যাবতীয় "প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও ঐতিহাসিকের" ইতিহাসের মূলসূত্র যাহাতে নিহিত, সেই 'মনহলি লিপি' বা রামচরিত কাব্যে এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহা হইতে অবিসংবাদিরূপে বুঝাইতে পারে যে, দিব্যোকাদি জালিক কৈবর্ত্ত ছিলেন না। মূলে তাঁহাদিগকে মাত্র কৈবর্ত্ত বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে 'জালিক' বা 'হালিক' সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন।

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মতকেই দশের দুইয়ের খাতিরে মানিয়া লওয়া গেল। পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই যে, অতঃপর দিব্যো-কাদিকে 'জালিক' কৈবর্ত্ত না ধরিয়া যেন 'হালিক' কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য-জাতিই ধরিয়া লয়েন।

এইখানে প্রতিবাদকারিগণের প্রতি নিবেদন এই যে, দিব্যোক-ভীমাদি যে মহীপালদেবকে নিহত করিয়া রাজা হইয়াছিল, এতটুকু খবর না রাখিয়া এত বড় উপন্যাসখানা লিখিতে আরম্ভ করি নাই। ভীম যে লোক ভালই ছিলেন, রামচরিত কাব্যেই তাহা লিখিত আছে। মনহলি লিপি ও রামচরিত কাব্যকে অবলম্বন করিয়া ঐতি-হাসিকগণ নিজ নিজ বিশ্বাসানুযায়ী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর কোথাও কিছু পান নাই; আমার এই উপন্যাসের ভিত্তিও তাহাই। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে দেখিতে পাইবেন, অভিনেতৃ-গণ নিজ নিজ ভূমিকাভিনয় সময় উপস্থিত হইলেই করিতে বাধ্য হই-বেন। অপ্রাসঙ্গিকভাবে পরের কার্য্য পূর্ব্বেই কেমন করিয়া দেখান

পারে নাই। মহীপালদীঘি হইতে জল আনা সে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। নিজেদের খিড়কীর ডোবাটাকে মাস-খানেকের মধ্যেই সে তাহার দলবল সঙ্গে লইয়া সংস্কার করিয়া দিল; উজ্জ্বলাকে সে কতকটা যেন চোখে চোখে রাখিল। মাছ ধরার সখ তাহার খুব বেশী নহে, পূর্ব্বেও সব দিন সে উহাতে যোগ দিত না, এখন প্রায় ছাড়িয়া দিল। নিন্দা, গঞ্জনা, উপহাস, সব কিছুকেই উপেক্ষা করিয়া যতখানি পারে কাছাকাছিই সে ঘুরিত। দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া সনকা তাহার মনোনীতা পাত্রী সুগলাকে নিজের চতুর্থ পুত্র লখার সঙ্গেই বিবাহ দিয়া ঘরে আনিল।

মনের ভিতর একটুখানি অশান্তির বেসুর যে বাজিয়া রহিল, ভীম সেটুকুকে কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কিছুতে যেন দূর করিতে পারিতেছিল না; যতই সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে যায়, ততই যেন সেটা তাহাকে ঘাড়ে চাপা ভূতের মত জোর করিয়া পাইয়া বসে। এক দিন আর মনের ভাবটাকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সে উজ্জ্বলাকে তাহারই খানিকটা আভাস দিয়া ফেলিল,—"আচ্ছা, বল্ ত উজ্জ্বলা! সে দিন যদি আমি গিয়ে না পড়তুম, আর রাজা তোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চ'লে যেত, তা হ'লে এদ্দিনে তুই কি করতিস? তোর কি আর আমার কথা নিমেষের তরেও মনে পড়তো?"

উজ্জ্বলার বেদনা যেখানে, ঠিক সেইখানে আসিয়াই যেন এ আঘাতটা পড়িল; সে এই কথায় ক্ষোভ-বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রালোকে স্বামীর রহস্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কণ্ঠে যে তাহার ব্যঙ্গের সহিত ঈর্ষ্যার তীক্ষ্ণ কলা লাগান আছে, তাহাও সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু রাগ করিতে গিয়াও হঠাৎ তাহার অত্যন্ত হাসি পাইয়া গেল, একটা বেখাপ কথা মনে পড়িয়া, রাগটা আর সে জন্য তাহার করা হইল না।

"আই গো! অখদ্দে কথাটা শোন একবার! ঘোড়ায় চাপাবে আমায় কেমন করে সে? কও ত কথা? ঘোড়া থেকে প'ড়ে মরবো নি? আমি কি রাজার নাসির সেনা যে, ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে ছুটবো? অমন সব পাগলা কথা কও কেন?"

উজ্জ্বলা হাসিয়া কুটিকুটি হইল। আর তাহার সেই সরল বুঝি ধুইয়া গেল। সে আনন্দে স্মিতনেত্রে চাহিয়া তাহার প্রিয়তমাকে বক্ষে টানিয়া লইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি হইতে মেঘ করিয়াছিল, আজিকার প্রভাত-প্রকৃতিকে তাই নিরাভরণা সদ্যোবিধবার মতই নিরানন্দা ও অশ্রুভার-কাতরা দেখাইতেছে। অরুণরাগরক্ত উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা আজ তাঁহার ললাটে ফুটিয়া উঠে নাই। মাঠ, ঘাট, আকাশ, নদীর জল, দিগন্তের কোলে ঘন বনরাজী নিস্পন্দ নিস্তব্ধ।

দিব্যোক প্রভাতের এই আনন্দলেশহীন বিরস মূর্ত্তি সন্দর্শনে ঈষৎ অপ্রসন্নচিত্তে ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে একাই জনহীন পথের উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মনের ভিতরটায়ও তাহার যেন এই রকমই স্তব্ধতার বিষণ্ণতা ফুটিয়া রহিয়াছিল। পারিবারিক অশান্তিতে মন তাহার বিশেষ ভাবেই উত্ত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। মুখরা উগ্রস্বভাবা পত্নী ও ভ্রাতৃবধূর সর্ব্বদা কোন্দল-কোলাহলে গৃহবাস যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। বিশেষ লক্ষ্মীরূপিণী বধূর প্রতি শাশুড়ী-দের অবিচার আর সহ্য হয় না।

মেঘাচ্ছন্ন অতি প্রত্যূষে রাজপথ প্রায় জনহীন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে কতিপয় পথিক ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণগণই প্রধান। তাঁহারা কেহ স্নানার্থ নদীতীরে চলিয়াছেন, কেহ বা স্নান-সমাপনান্তে সংস্কৃত ভাষায় দেবদেবীসম্বন্ধীয় শ্লোকাবৃত্তি করিতে করিতে নিজ গৃহস্থিত অথবা সাধারণের জন্য স্থাপিত দেবমন্দিরোদ্দেশে পথ চলিতেছেন। ইহাদের সুললিত স্তবাবৃত্তি এবং নির্জ্জন পাষাণপথে ইঁহাদের চরণস্থিত কাষ্ঠ-পাদুকার আঘাতশব্দই আজিকার প্রভাতের একমাত্র স্ফুট-ধ্বনি।

দিব্যোক অপ্রসন্নমনে পথ চলিতেছিল, সহসা তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে ঈষৎ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। সম্বোধনকারী দ্রুতপদে সম্মুখীন হইয়া আসিল।

"আরে, আরে! দিবাই যে! এত সকালে অমন গোমশাপানা মুখটা ক'রে কোথায় চলেছ হে? বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

দিব্যোক প্রিয় সখার প্রশ্নে ঈষৎ সলজ্জ হইয়া উঠিল।

নাই। একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিল, "না; এমন কোথাও না, এই একটু এ দিকে ঘুরে আসছি।"

ধর্ম্মঠ দিব্যোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,— "কোন কায আছে না কি? তা চল না, আমার এখন হাতে কিছু কায নেই, একটু গল্প করতে করতে যাওয়া যাক।"

গল্প ইহাকে ঠিক বলা চলে না, পথ চলিতে চলিতে বৃদ্ধ ধর্ম্মঠই অনর্গল বকিতে বকিতে চলিতেছিল, দিব্যোক তাহার সে প্রগল্ভ বকুনির দিকে না কান দিয়াছিল, না সে তাহার একটা জবাব করিতেছিল। তাহার মনটা সে দিন নিজের সুদূর অতীতের বহুকাল হারানো গৌরবময় দিনগুলার স্মৃতিতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল এবং সেই চির-অপহৃতের শোকটা যেন আবার এই জীবন-সন্ধ্যায় তাহার কাছে নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একান্ত বিরহাকুল করিয়াছিল। সে কি আজিকার কথা! যখন বর্ত্তমান রাজাধিরাজের পিতামহ মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত পরমভট্টারক নয়পালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অশেষমহিমান্বিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এ সেই তত দিনের কথা।

চেদিরাজ কর্ণের ভীষণ আক্রমণে পাল-সাম্রাজ্য তখন টলমল করিয়া উঠিতেছে। পুণ্য বারাণসীধামে চেদিরাজের বিজয়কেতন উড্ডীন হইয়াছে। চেদি-সৈন্য নগরের পর নগরে, গ্রামের পর গ্রামে নিজেদের গৌরব-পতাকা উত্তোলিত করিতে করিতে অবশেষে পালরাজধানীর দ্বারদেশাবধি আক্রমণ করিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী শঙ্কায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও অর্দ্ধমৃত। উঃ! সে কি ভীষণ উৎকণ্ঠা! কি অপরিমেয় উদ্বেগ ও উত্তেজনা! শেষ চেষ্টায় প্রাণপণ বলে চিত্ত স্থির করিয়া রাজা সামন্তচক্রের আহ্বান করিলেন। ক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মিমালার ন্যায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধননাগরিকগণও রাজ্যাধিপতি কর্ত্তৃক আহূত না হইয়াও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া রাজপ্রাসাদের মুক্ত তোরণ-পথকে প্লাবিত করিতেছিল, সে দৃশ্য— বালকমাত্র হইলেও আজিও দিব্যোদকের এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে।

সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য সে দিন সমবেত আবালবৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই আপনার যথাসর্ব্বস্ব প্রদানের ভীষণ শপথ করিয়া আসিল। ধন, প্রাণ, সন্তান কিছুর উপরেই কেহ বিন্দুমাত্র লোভ না রাখিয়াই দেশের জন্য অকাতর-সমরাগ্নিতে সহাস্যমুখে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই এই একাগ্রতা ও সমচিত্ততার ফল যাহা, তাহাই প্রাপ্ত হইল। মহাযুদ্ধে চেদিরাজ পরাস্ত ও পলায়নপর হইলেন; প্রায় অধিকাংশ-ভাগ অপহৃত পালসাম্রাজ্য নয়পাল ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় এতই অপরিমিত হইয়াছিল যে, সে ক্ষতি পূর্ণ তাঁহার জীবনে ত হয়ই নাই, এমন কি, তাঁহার পুত্রের জীবিতকালেও তাহার পূরণ হয় নাই। তাহার পর এখন? তাঁহার পৌত্রের শাসনকালে? সে কথায় আর কায কি? দিব্যোকের বক্ষঃস্থল আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। দেশের সেই মহা দুর্দ্দিনে দেশবৈরীর প্রচণ্ড প্রতিরোধে তাহারাও তাহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। এই দিব্যোকের পিতা পুণ্যক দেশের জন্য নিজের প্রাণ এবং তাঁহার সমস্ত ধনজন, এমন কি, সুবিস্তৃত ভূমিগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই আনন্দের সহিত রাজার কার্য্যে সঁপিয়া দিয়া দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই আজ সে সামান্য দরিদ্র দিব্যোক! নতুবা তাহাদের যে সম্পত্তি ছিল, তাহার অন্ন আজ খায় কে? তাহার ঘরের বধূরা কি তাহা হইলে দিন-রাত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়? উজ্জ্বলার মত বধূ এত কষ্ট সহ্য করে!

তাহার পরের কথা স্মরণ করিতে গিয়া দিব্যোকের নাসা-পথে একটা কণ্ঠরোধকারী দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা যাহা দেশের কার্য্যে দান করিয়াছিল, আর তাহা ফিরিয়া পায় নাই বটে, তথাপি নয়পালের সময়ে দরিদ্রীভূত দিব্যোকের সম্মান কি কম ছিল? রাজরক্ষীদের মধ্যে সে দিনে কিশোর দিব্যোক যে প্রধানতম হইয়াই উঠিয়াছিল! কিন্তু সে খুব বেশী দিন নহে, বিগ্রহপালের রাজ্যারোহণের পর সামান্য কারণেই রাজা ও ভৃত্যে পরস্পর মনোমালিন্য ঘটিয়া দিব্যোককে রাজপ্রাসাদ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। সেই অবধি দরিদ্র কৃষিজীবী তাহার স্বেচ্ছালব্ধ দারিদ্র্য লইয়াই এক প্রান্তে পড়িয়া আছে, আর যাহাদের জন্য তাহার আজ এ দারিদ্র্য, তাহারা স্বপ্নেও কখনও তাহার কথা স্মরণও করে না!

ততক্ষণে তাহারা নদীতীরে আসিয়া পড়িয়াছিল, আঁকাবাঁকা জলের ধারাগুলিও ধূসর বালুকাময় সৈকতকে ডুবাইতে ডুবাইতে নব বর্ষার আগমনী গাহিয়া

শেষে গাছের শ্রেণী। মাঠের মধ্যে মধ্যে নদীর তীরের কাছে কাছে সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতরে কোথাও কোথাও ধনীদিগের বিলাসগৃহ। ইহাদিগের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত উদ্যানপ্রাসাদখানি বর্ত্তমান রাজাধিরাজের বিলাসগৃহ। এ গৃহের সম্বন্ধে অনেক কুৎসা-কাহিনীই দিব্যোকের কর্ণ-গোচর হইতে বাকী নাই। তাহারই কঠিন ও গাঢ় রক্ত-রাগের মতই আকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বৃদ্ধ রাজভক্তের বক্ষঃস্থল আলোড়িত করিয়া একটা গভীর বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই উঠিয়া আসিল। মনে মনে নিজের ইষ্ট ও গুরুকে স্মরণ ও সম্বোধন করিয়া বলিল, "সব অমঙ্গল দূর ক'রে দিও, সুমতি দিও হে ঠাকুর! বয়েসের গরমটা কাটিয়ে যেন আমার রাজা আবার রাজার মতই হয়ে ওঠে। আবার যেন ওঁদের জন্যেও আমাদের ছেলেপিলেরা প্রাণ দিতে পারে।"

ধর্ম্মঠ সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, "এত কি ভাবছো?"

দিব্যোক সচকিতে মুখ ফিরাইল, "কতকগুলো পুরনো কথা।"

"ওঃ" বলিয়া ধর্ম্মঠ ঈষৎ গম্ভীর মুখে কহিল, "পুরনো কথা ভেবে আর ফল কি? তার চেয়ে এখন সামনের কথাই ভাবা দরকার। রাজা যে আমাদের হালের উপর, লাঙ্গলের উপর কর বসাচ্ছেন, ছেলেপিলে নিয়ে এ দিনে দশাটা কি হবে, একবার ভেবে দেখ ত? একে অজন্মায় আধপেটা দাঁড়িয়েছে, তার উপর এইবার শুকিয়ে মরার হুকুম হলো না? এমন ক'রে ভাতে না মেরে, এর চাইতে যে হাতে মারাই ভাল ছিল। সে তবু দশে-ধর্ম্মে দেখতে পেত।"

দিব্যোক এই যথার্থ সত্য অনুযোগে ঈষৎমাত্র গভীর দুঃখের হাসি হাসিল, "সেই বা ভেবে ফলটা কি মিতে? রাজার আদেশ না মান্‌লেই বা চলবে কেন বল।"

ধর্ম্মঠ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, "রাজা যদি প্রাণে মারবার আদেশ দেন, তাও কি মুখ বুজে সহ্যি ক'রে নিতে হবে, মিতে? এমন রাজভক্তির ধার ধারি নে। কি বলবো, আর আগের মতন তেমন জোয়ান শরীর নেই, নইলে যে হতভাগা ভূতগুলো জুটে ছেলেমানুষ রাজাকে এই সব কুমন্ত্রণা দিয়ে দিনকের দিন বেগড়াচ্ছে, একবার দেখে নিতুম তাদের।

"চুপ, ঐ দেখ রাজাধিরাজের ঘোড়া নিয়ে কারা এই দিকেই এগিয়ে আসছে।"

"তাই ত! ঐ যে নদীতেও রাজাধিরাজেরই 'বাজপক্ষী' নৌকাখানা তীরের মত ছুটে আসছে। বিলাসবাড়ীতেই রাত্রে ছিলেন আর কি! দেখলে ত কি রকম অনাচার!"

দিব্যোক কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপিয়া লইয়া শুধু উত্তর করিল, "এখনও ছেলেমানুষ কি না! ওগুলো বয়েসের সঙ্গে শোধরাবে।"

"হঁ, ও সব রোগ বুড়ো হ'লেই কি না যায়! যাকে ধরেছে, তাকে একেবারে খেয়ে তবে ছাড়ে—শাঁকচুন্নীর মতন!"

নৌকা প্রায় তীরসংলগ্ন হইয়াছিল, রাজশিবিকা তীরস্থ হইতেছিল। দিব্যোক শুধু কঠোর কটাক্ষে মিত্রকে এ আলোচনায় বিরত করিয়া দ্রুতপদে নদীর ঘাটে নামিয়া গেল। রাজাধিরাজ বিলাস-তরণী হইতে বাহির হইয়া শিবিকায় সম্মুখ হইবামাত্র চিররাজভক্ত দিব্যোক সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ভক্তিপ্রণতি জানাইল।

যতই অনাচারী হউন, রাজা যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বা মহাদেবতা—অষ্টদিকপালের অংশসম্ভূত বা নরনারায়ণ—রাজদর্শনে যে মহাপুণ্য!

শিবিকায় বসিতে বসিতে রাজাধিরাজ তাঁহার শরীর-সংরক্ষিগণের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কে? ভিক্ষুক? ভিক্ষুক আমার সামনে আসতে পায় কেন?"

রক্ষী ঈষৎ সচকিত হইয়া উঠিল, দিব্যোক এই কথাটা শুনিতে পাইয়াছে কি না, কটাক্ষে তাহা দেখিয়া লইল, তাহার পর সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"ইনি পূর্ব্বতন মহা-রাজাধিরাজের শরীররক্ষীদের মধ্যে কিছু দিন কায করে-ছিলেন, এঁর নাম দিব্যোক।"

মহারাজাধিরাজ কি যেন একটা কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রতিহার কুমার রুদ্রদমনকে ডাকাইয়া মহারাজাধি-রাজ সে দিন এক সময় প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ হে! 'দিব্যোক' লোকটা কে, বল ত? কি যেন একটা কথা মনে পড়ছে পড়ছে, পড়ছে না! কে যেন একটি রূপসীর সঙ্গে যেন ওদের কি একটা সম্বন্ধ আছে না কি, এক সময় খবর নেওয়া

মহাপ্রতিহারই সেই খবরটা দিয়াছিলেন, কাযেই তাঁহারও সেটা জানা ছিল। তিনি উত্তর করিলেন, "ঠিকই ত! এ সেই ভীমের বাপ, কৈবর্ত্ত-দলের কর্ত্তা।"

রাজাধিরাজ কহিলেন, "তবে যে বসুভূতি বল্লে, আগের রাজার এ এক জন দেহরক্ষী?"

কুমার কহিলেন, "সে কথাও ঠিক; শুধু তাই নয়, এর বাপ পুণ্যক তার অনেক জমী-জায়গা ধন-রত্ন মহারাজাধিরাজ নয়পালের সঙ্গে চেদিদের যুদ্ধের সময় রাজকার্য্যে উৎসর্গ করেছিল।"

"পরে আবার ফিরিয়ে পেয়েছিল না কি?"

"সামান্য, রাজকোষ তখন শূন্য, তা ছাড়া শুনেছি, আরও দু'চার জনের সঙ্গে ঐ পুণ্যকও বলেছিল যে, ও সব দেশের কাযে দিয়েছি, দিয়ে ফেরত নেবো না। জীবনধারণের মত সামান্য কিছু পেলেই হবে। ভাগ্যে থাকে, ছেলেরা তৈরী ক'রে নেবে। সেই জন্যই তার বড় ছেলেকে রাজরক্ষীদের মধ্যে খুব ছোট থেকেই রাখা হয়। তবে বেশী দিন ছিল না।"

মহীপাল ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার অধরপ্রান্তে এক প্রকার গূঢ়হাস্যের মৃদুরেখা অতিশয় সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। তিনি রুদ্রদমনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পরমভট্টারক নয়পালদেব যা ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হন নি, আমি তা ওকে ফিরিয়ে দেব। কোন্ ভুক্তির, কোন্ মণ্ডলের, কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত, কোন্ গ্রাম বা শস্যক্ষেত্র, গোপথ, গোচারণভূমি, জঙ্গল বা কি ওদের ছিল, এই সব অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সন্ধান বিষয়-পতির দ্বারা করিয়ে যথাযথ সুব্যবস্থা করাও দেখি। ঐ বিষয় যারই অধিকারে থাকুক না কেন, তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওদের প্রত্যর্পণ করবার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া চাই। ভূমিদান-পত্র, শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হস্তলিখিত হবে, তাতে যথাযথ সকল উৎপাত দূর ক'রে ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর পৃথিবীর অবস্থানকালাবধি প্রতিষ্ঠা করা হোক্। শুভস্য শীঘ্রং, এই বাক্যটি স্মরণ রেখ বন্ধু! এ শুধু আমারই না, পুরানো কালের শাস্ত্রবাক্য। এটা পালন করতে আমরা বাধ্য।"

কুমার রুদ্রদমন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তা রাখবো, রাজাধিরাজ! কিন্তু ঐ ভূমিদান তাম্রপট্টে ভূমিহরণকারীর অনন্ত দুর্গতির কথাগুলোও কি লেখানো হবে, রাজাধিরাজ! হয় ত আবার কোন্ দিন আমাদেরই ওটা ফিরিয়ে পাবার দরকার হ'লেও ত হ'তে পারে!"

এই বলিয়া রাজসখা রুদ্রদমন এক প্রকার চক্ষুর ইঙ্গিত করিলেন ও পুনশ্চ নিজ বাক্যসমর্থনের উদ্দেশ্যে হাসিয়া উঠিলেন, রাজাধিরাজ কিন্তু হাসিলেন না। তিনি গাম্ভীর্য্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না না, যথারীতি পিতামহদের রীত্যনুসারেই এই তাম্রপট্ট লেখানো চাই। এ আর আমি ফিরিয়ে নেবো না। এ কি বলছো? অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য লুটিয়ে দিলেও যদি—আচ্ছা এখন যাও, যা বলা গেল, ক'রে এস।"

কয়েক দিন মাত্র পরেই সমস্ত কৈবর্ত্ত-পরিবার সবিস্ময়ে শুনিল যে, বহু বর্ষ পূর্ব্বে যে বিষয় পুণ্যক রাজকার্য্যে প্রদান করিয়া সম্মানিত হইয়াছিল, এত কাল পরে তাহার সমস্তই বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরমসৌগত পরমকুশলী শ্রীশ্রীমহীপালদেব স্বেচ্ছাপ্ররোচিত হইয়াই তাহার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

গভীর কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে বৃদ্ধ নায়কের দুই চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইয়া আসিল।

"রাজা আমার! তুমি কি অন্তর্য্যামী! কে বলে মহীপালদেব অত্যাচারী? যৌবনের উদ্ধতায় সামান্য অনাচার মাত্র! তবে এ কখনও স্থায়ী হবে না। ক্ষুদ্র প্রজার উপরে এত যাঁর অনুগ্রহ, তাঁকে যারা অবিচারক প্রতিপন্ন করতে চায়, অত্যাচারী ত তারাই!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।



হিন্দুর অধিকার কতটুকু

মাঘে শ্রীপঞ্চমী হিন্দুর প্রাচীন ধর্ম্মোৎসব। এই দিনে শিক্ষার্থী হিন্দু তরুণ, বাণীর চরণকমলে ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। বহু হিন্দুর ঘরে দেবী সরস্বতীর প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজা-আরাত্রিক হয় এবং পূজান্তে দেবীর বিসর্জ্জন হয়। বাঙ্গালী হিন্দুর বিদ্যামন্দিরে ও ছাত্রাবাসসমূহে সরস্বতীপূজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, এই পূজার ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদান না করিলেও বিদ্যালয়ের বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্ররাও আনন্দোৎসবে সানন্দে যোগদান করিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালায় আজ কিছু দিন হইতে সর্ব্বনাশকর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের বিষ বিসর্পিত হইয়াছে, তাহার ফলে এ বৎসরের সরস্বতীপূজায় বাঙ্গালার নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানে বিষম মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ সকল বিরোধ ও মনোমালিন্যের মূল মসজেদের সম্মুখে হিন্দুর গীত-বাদ্য। বরিশাল, কুষ্টিয়া, বসিরহাট প্রভৃতি বাঙ্গালার মফঃস্বলে এই পূজা উপলক্ষে—বিশেষতঃ প্রতিমা-বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে রক্তারক্তির সম্ভাবনাও হইয়াছিল। বরিশালে এক পুষ্করিণীর এক তটে হিন্দু ছাত্রাবাস ও অপর তটে মুসলমান ছাত্রাবাস ছিল। হিন্দু ছাত্ররা তাহাদের হোষ্টেলে সরস্বতীপূজা করিয়াছিল। ইহাতে মুসলমান ছাত্রাবাসে প্রকাশ্য দিবালোকে গোহত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। বলা বাহুল্য, এই মুসলমান ছাত্রাবাসে এ যাবৎ কখনও গোহত্যা হয় নাই। হিন্দুরা শোভাযাত্রা করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে গেলে বরিশাল, কুষ্টিয়া, বসিরহাট, পিরোজপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানরা তাহাতে বাধা দিয়াছিল, বলিয়াছিল, কোনও সময়েই মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য করিয়া মসজেদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুর শোভাযাত্রা যাইতে পারিবে না। কোনও কোনও স্থলে শান্তিরক্ষক সরকারী কর্ম্মচারী সেই অন্যায় অধিকারের দাবী মঞ্জুর করেন নাই,—জনগত নমাজের সময় অতীত হইলে হিন্দুর শোভাযাত্রা মসজেদের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতে দিয়াছিলেন, সে জন্য শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে নানা স্থানের মুসলমানরা ক্রোধে একবারে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে, বরিশাল, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে গ্রাম্য মুসলমান জমায়েৎ হইয়া দলে দলে লাঠী-সড়কী লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করিয়াছিল। কোনও কোনও স্থানে হিন্দু দলপতিদিগের ধন-প্রাণ মান-মর্য্যাদা বিপদাপন্ন হইয়াছিল, এমন তারও জিলার রাজপুরুষ প্রভৃতিকে করা হইয়াছিল। কুষ্টিয়ার পথে পথে গো-অস্থি এবং গো-মাংস নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—পাবনা কাণ্ডের পুনরভিনয় হইবে বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল।

পাবনায় যখন সরকার 'সাজার' কর বসাইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগেরও উপরে তাহার গুরুভার বসিয়াছিল। হিন্দু পাবনায় যত্র-তত্র ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত, অপমানিত হইলেও হিন্দু সে করভার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। পটুয়াখালীতে কেবল হিন্দুদিগের উপর 'সাজার' কর চাপান হইয়াছে। হিন্দুর অপরাধ,—তাহারা তাহাদের ধর্ম্মগত ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইতে চাহিতেছে! অথচ কুহক এই,—পাবনায় মুসলমান অনাচারের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা দিলেও—অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। কুষ্টিয়ায় যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল—সশস্ত্র মুসলমানের জটলা, বিরাট সভায় মুসলমান মৌলভীদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, রাজপথে গো-মাংস ও গো অস্থি নিক্ষেপ—ইত্যাদি যে সব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাহার পরেও যদি মুসলমানের অত্যাচারে সংখ্যায় অল্প হিন্দু প্রপীড়িত হইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে হিন্দু দাঁড়ায় কোথা? হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে ন্যায্য অধিকার তাহা হইলে কিরূপে সাব্যস্ত হইবে?

কলিকাতায় সরস্বতীর প্রতিমা বিসর্জ্জন সম্পর্কে অন্য এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ দিন যাদবপুর কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে প্রতিমা লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া ভাগীরথীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছিলেন। হ্যারিসন রোড দিয়া প্রতিমা লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে সহজ ও সরল পথ। কিন্তু সান্‌কিভাঙ্গার মোড়ে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে পুলিস তাঁহাদিগকে হ্যারিসন রোড দিয়া যাইতে নিষেধ করে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, এ সম্বন্ধে পুলিস কমিশনারের অথবা বাঙ্গালা সরকারের কোনও লিখিত বা বিজ্ঞাপিত আদেশ আছে কি না? পুলিস তাঁহাদিগকে এমন আদেশ দেখাইতে পারে নাই, অথচ তাঁহাদিগকে ঐ পথে শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে বাধা দিয়াছিল। পুলিস জনতাভঙ্গের অজুহতে লাঠী চালাইয়াছিল ও বলপ্রকাশ করিয়াছিল, এমন কথাও শুনা যায়। অধিকন্তু পুলিস দুই জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে অশান্ত আচরণ ও পুলিসের আদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে বালকরা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা বাঙ্গালা সরকারকে ও তথা পুলিস কমিশনারকে উপহার দিতেছি:—

"অভিযুক্ত আসামীরা কোনওরূপ বলপ্রকাশ করিয়াছে, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই হেতু তাহাদিগের বিপক্ষে অশান্ত আচরণের অভিযোগ টিকিতে পারে না। আর আসামীরা হিন্দু, তাহারা তাহাদের প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া যাইতেছিল। সুতরাং তাহারা যদি অন্য কোনও অন্যায় বা বে-আইনী কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা পুলিসের আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ হয় না।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা বুদ্ধিমান্‌মাত্রেই বুঝিবেন। 'অন্য কোনও অন্যায় বা বে-আইনী কার্য্য' অর্থে কি বুঝা যায়? অর্থাৎ হ্যারিসন রোড দিয়া প্রতিমা লইয়া যাইবার সঙ্কল্প ব্যতীত ছাত্ররা যদি অন্য কোন অন্যায় বা বে-আইনী কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা অপরাধী নহে, পুলিসের আদেশ অমান্য করে নাই। হ্যারিসন রোড দিয়া প্রতিমা লইয়া যাওয়ার বিপক্ষে পূর্ব্বাহ্ণে পুলিসের কোনও আদেশ প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় নাই; বাঙ্গালা সরকারও এ বিষয়ে কোনও ঘোষণা প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্বে লর্ড লিটনের সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় কেবল জাকারিয়া ষ্ট্রীটের নাখোদা মসজেদের সম্মুখে কোন শোভাযাত্রা কোন সময়ে গীত-বাদ্য করিয়া যাইতে পারিবে না; অন্যান্য কয়েকটি মসজেদের সম্মুখে জনগত নমাজের কয়েকটি ওক্ত বাদে অন্য সকল সময়ে গীতবাদ্য করিয়া

দূরে কোথাও মসজেদ অবস্থিত নহে। সেখানে দীনু চামড়াওয়ালার এক মসজেদ ও কলাবাগানের নামজাদা মুসলমান বস্তী ছিল, বটে। যে সময়ে বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা যাইতেছিল, সে সময়ে ঐ মসজেদের জনগত নমাজের সময় নহে। সুতরাং তখন ঐ মসজেদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুর শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। পুলিস যদি সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে, তবে সে জন্য পুলিস দায়ী, হিন্দু দায়ী নহে। পুলিস যদি কলাবাগানের ভয়ে হিন্দুর ন্যায্য অধিকারে বাধা দিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা পুলিসের কলঙ্কের কথা এবং পুলিসের প্রভু বাঙ্গালা সরকারের কলঙ্কের কথা!

এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুর অধিকার কতটুকু? হিন্দু দুর্ব্বল ও সঙ্ঘবদ্ধ নহে বলিয়া আজ হিন্দুর ন্যায্য অধিকার পদদলিত হইতেছে, যত্রতত্র হিন্দুর লাঞ্ছনা হইতেছে। অথচ হিন্দু সংগঠন করিতে গেলেই নানাদিকে চীৎকার উঠে! এ সঙ্কট-সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়া হিন্দু দাঁড়ায় কোথায়? বাঙ্গালা সরকার ইহার সদুত্তর দিবেন কি? তাঁহারা সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া হিন্দুর প্রতি ন্যায্য বিচারের কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, হিন্দু কি তাহা জানিতে পারে না?

মিলনের অন্তরায়

পাবনার রায়ৎ বৈঠকের সভাপতিরূপে ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা সাহেব অন্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"হিন্দু-মুসলমান বহুকাল যাবৎ ভ্রাতা ও বন্ধুর মত একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে, আজ তাহারা পরস্পর গলা-কাটাকাটি করিতেছে, ইহার কারণ কি? হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধ যেন কলেরা-বসন্তের মত স্থায়ী মহামারী রোগে দাঁড়াইয়াছে। কেন এমন হইল? হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের প্রচারক আছে। তাহারা সমাজের ও সভ্যতার শত্রু।"

পুনশ্চ:—

"আমাদের সম্প্রদায়ের লোক (মুসলমান) অশিক্ষিত; এই হেতু তাহারা সহজেই সমাজধ্বংসকারী কুপরামর্শদাতার মন্দ পরামর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

ঢাকার নবাব সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান জননায়ক, কিন্তু তাঁহার এ কথাটা নিশ্চিতই অনেক মুসলমানের মুখরোচক হইবে না। 'মুসলমান', 'হানাফি' প্রমুখ মুসলমান পত্রের অমৃতসমান উপদেশের নিকট এই নবাবী উপদেশ বিষবৎ বোধ হইবে।

কিন্তু কথাটা যদি মুসলমান সমাজ তলাইয়া দেখেন, তাহা হইলে ইহার সারবত্তা নিশ্চিতই অবধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, তাঁহাদের সমাজের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ? তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন, এক শ্রেণীর 'খেলাফতী' মৌলভী মওলানা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মিথ্যার প্রচার দ্বারা মুসলমান কৃষক ও জনমজুরকে উত্তেজিত করিয়া বেড়াইতেছে? এই সকল মৌলভী মওলানা কোনওকালে ধর্ম্মের ধার ধারে না, খিলাফৎ আন্দোলনকালে স্বয়ংকৃত মৌলভী মওলানা সাজিয়াছে। প্রকৃত 'ধর্ম্মপরায়ণ কোরাণজ্ঞ মৌলভী মওলানা হিন্দুর প্রতি কখনই বিদ্বেষ প্রচার করেন না, করিতে পারেন না, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সে শিক্ষা দিয়া উঠিতেছে? নবাব সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, নিরক্ষর মুসলমান, চক্রীর কুপরামর্শে সহজেই প্রভাবিত হয়। তাহারই বিষময় ফল ফলিতেছে। এই যে বাঙ্গালায় এত দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু কোথাও মুসলমানকে গায়ে পড়িয়া অগ্রে আক্রমণ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন কি? অথচ কলিকাতার পুলিস কমিশনারের রিপোর্টে আছে,—"মুসলমানরা অগ্রে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, হিন্দু কোথাও মুসলমানকে আক্রমণ করে নাই, মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত তাহাদের মন্দির ও মান-ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছে।" অকারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে আক্রমণ করা হিন্দুর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতার দাঙ্গাকালে মুসলমানরা সহজেই উত্তেজিত হইয়াছিল। কলুটোলায় এক জন নিরীহ ৭০ বৎসর বয়স্ক পথিক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ঠেঙ্গাইয়া মারিয়াছিল। এই সে দিন বোম্বাইয়ের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় প্রায় ১ শত উত্তেজিত মুসলমান এক শিখ যুবককে তাড়া করিয়া এক ট্রামের মধ্যে লাঠি ও ছোরার ঘায়ে হত্যা করিয়াছিল। হিন্দু হয় ত প্রতিহিংসাবশে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল, কিন্তু অকারণে নিরীহ পথিককে এমনভাবে হত্যা করে নাই। এই জন্যই বলিতেছি যে, মুসলমান সহজেই কুপরামর্শে উত্তেজিত হয়।

কথাটা আরও খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি। যে কুষ্টিয়ায় হিন্দু-মুসলমানে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে মনোমালিন্য ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই কুষ্টিয়ায় নানা বক্তা কি ভাবে নিরক্ষর মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিতেছে, তাহা বহু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুসলমান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের শোভাযাত্রা বাদ্যসহ মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে মুসলমানদের এক সভা হয়। প্রকাশ, সভায় আসরফ উদ্দীন নামক এক বক্তা মুসলমানদিগকে বলেন,—

"মুসলমানদিগের পক্ষে সর্ব্বথা হিন্দুর সংস্রব বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মুসলমানরা যখন সহরের রাজপথ দিয়া নিহত গরু লইয়া যাইতে পারিবে, তখনই হিন্দুরা মিটমাট করিতে আসিবে। এ দিনের অধিক বিলম্ব নাই।"

ইহার পর ১০ দিন যাইতে না যাইতে মুসলমানরা কয়টি গরু কাটিয়া তিনটির মৃতদেহ রাজপথের নিকটে গাছে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। ইহারই নিকটে হিন্দু বসবাস করে। তাহার পর কুষ্টিয়ার নানা পথে গো-মাংস ও গো-অস্থি ছড়ান হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ আসিয়াছে।

এখন কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখুন। বক্তৃতার পরই এই কাণ্ড।

বরিশালের নিকটস্থ পোনাবালিয়া নামক স্থানে গত শিবরাত্রি পর্ব্ব উপলক্ষে প্রায় এক সহস্র সশস্ত্র মুসলমান হিন্দুর কীর্ত্তনের শোভাযাত্রায় কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক বাধা প্রদান করিতে গিয়াছিল; ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পুলিস তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে, ফলে কয়েক জন মুসলমান হতাহত হয়। সরকারী বিবরণেই প্রকাশ, স্থানীয় শিবমন্দিরের সম্মুখে প্রতি বৎসর মেলা বসে। স্থানীয় চিরাচরিত প্রথা এই যে, হিন্দুরা কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা করিয়া মেলায় গমন করিয়া থাকে। এবারও যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেলাস্থলে যাইবার পথে মুসলমানরা এক মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ বৎসর সে জন্য মুসলমানরা মসজেদের সম্মুখে হিন্দুদিগকে বাদ্যাদি করিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে নিষেধ করে। হিন্দুরা গোলযোগের সম্ভাবনা বুঝিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সে কথা জানাইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষও সে জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া মসজেদে সমবেত মুসলমানরা স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু পরে মহম্মদ সাহাদউদ্দীন নামক এক 'মৌলভী'র প্ররোচনায়

কয়েক জন অভাগার প্রাণনাশ ! সরকারী ইস্তাহারেই এ সকল কথা প্রকাশ।

তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখুন, এই উত্তেজনার মূলেও এক জন তথাকথিত মৌলভী ছিল ! এমন আরও কত স্থলে হইতেছে, কে তাহার সন্ধান রাখে ?

ঢাকার নবাব সাহেবের মত যথার্থ হিন্দু-মুসলমানের মঙ্গলকামনা করিয়া কয় জন মুসলমান নেতা এ যাবৎ বক্তৃতা করিয়া অজ্ঞ মুসলমান রায়তকে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছেন ? এই যে পূর্ব্ববঙ্গের জিলায় জিলায় হিন্দু-নারী মুসলমান পশুর হস্তে লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হইতেছে, ইহার বিপক্ষে কয় জন মুসলমান নেতার নিষেধবাণী শুনা গিয়াছে ? কিন্তু 'রাজপথ দিয়া নিহত গরু লইয়া যাইবার' উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিবার যথেষ্ট মুসলমান "মৌলভী-মওলানা" জুটে !

এই সকল সমাজ ও সভ্যতা-ধ্বংসকারী বক্তা অম্লানবদনে মুসলমানকে হিন্দু বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু তাহারা বুঝে কি, উত্তেজনার মুখে এ কথা মিষ্ট লাগিলেও বর্জ্জনে কাহার অধিক ক্ষতি ? স্বদেশী আমলে লাল ইস্তাহারের বলে ও ভাড়া করা মৌলভী মওলানার বক্তৃতার ফলে মুসলমানরা কোথাও কোথাও হিন্দু-বর্জ্জন করিতে গিয়াছিল। তাহাতে কাহার ক্ষতি হইয়াছিল—হিন্দুর না মুসলমানের ? উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবনে কে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং কে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল ? এখনও হিন্দু না হইলে মুসলমানের এক দিন চলে না, মুসলমান না হইলেও বরং এক দিন হিন্দুর চলে। কেন না, হিন্দুর অর্থে বহু মুসলমান প্রতিপালিত হয়।

তবে এ সব দুষ্ট আন্দোলনে ফল কি ? বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানকে চিরদিনই পাশাপাশি বাস করিতে হইবে। মুসলমানরা বোখারা খোরাসান বা ইরাণ-তুরাণের দিকে নজর রাখিলেও সেখানে যাইয়া বাস করিতে পারিবে না ; হিন্দুরাও নেপালে যাইয়া বসবাস করিতে পারিবে না। তবে অনর্থক এই রেষারেষি ও বিদ্বেষ প্রচারে ফল কি ?

মিলনের অন্তরায় বস্তুতঃই এই সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংসকারী মিথ্যাবাদী প্রচারকের প্রচারকার্য্য। ইহা অঙ্কুরে বিনষ্ট না হইলে বাঙ্গালায় শান্তি রক্ষিত হইবে না। এ কথা জনসাধারণ ও সরকার জানিয়া রাখুন।

ভারতের ইস্পাতের কারবার

প্রতীচ্যের কল-কারখানার প্রতিযোগিতায় বহু দেশের হাতে গড়া ইস্পাতের কারবার উঠিয়া গিয়াছে। ভারতে টাটা কোম্পানীর উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার যুগেও ইস্পাতের কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার যখন শৈশবাবস্থা, তখন সরকার হইতে ইহাকে এবং ভারতের ইস্পাতের কারবার মাত্রকে 'বাউণ্টি' দেওয়া হইয়াছিল। প্রতীচ্যের প্রায় সকল সভ্যদেশেই এমনভাবে দেশের কারবারকে শৈশবাবস্থায় বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং কারবার বাঁচিলে তাহাকে পুষ্ট করিবার নিমিত্ত দেশের সরকার বাউণ্টি দিয়া থাকেন। জার্ম্মাণীর বাউণ্টি-পুষ্ট বিট-চিনির কারবার বা বেলজিয়ামের বাউণ্টি-পুষ্ট কাচ ও ইস্পাতের কারবারের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসায় এবং নানা ডকের জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবসায় বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ইংরাজ সরকার ঐ সকল ব্যবসায়ের প্রথমাবস্থায় কত সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পরাধীন দেশসমূহের বস্ত্র-ব্যবসায় বা জাহাজ-ব্যবসায়কে কিরূপে আইনের মারপেঁচে হতশ্রী করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্বাধীন দেশের জনমতাধীন সরকারকে বাধ্য হইয়া এইরূপ করিতে হয়। এখনও বিলাতের বে-কারদিগকে যোগাইয়া দেন, তাহা ভারতের রেলগাড়ী ইত্যাদির 'অর্ডার' হইতেই জানা যায়।

কিন্তু ভারত ইংলণ্ড নহে, ভারত পরাধীন। কাযেই এখানে সরকারের জনমতের মুখ চাহিবার প্রয়োজন হয় না। বরং এখানে প্রবাসী ইংরাজ ব্যবসাদারের মতামত মান্য হইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারতকে বাউণ্টি দেওয়ায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা এই বাউণ্টি তুলিয়া দিবার আন্দোলনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা ভারত যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইস্পাত ব্যবসায় সম্পর্কে রক্ষণ নীতি (Imperial protection or preference) অবলম্বন করে, তাহার জন্য চীৎকার করিতেছেন। তাঁহারা অন্য সময়ে ভারতকে সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার করিতে চাহেন না, বৃটিশ উপনিবেশের পর্য্যায়ে ভারতকে তুলিবার এখনও বহু যুগ বিলম্ব আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ বিলাতের মত বলিতেছেন,—"আমরা সাম্রাজ্যের অধিবাসী যদি সাম্রাজ্যের পণ্যকে সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করি, তাহা হইলে ত আমাদেরই লাভ।" যেন ভারত তাঁহাদের মত সাম্রাজ্যের মস্ত বড় একটা অংশীদার।

সাম্রাজ্যের সুবিধা ও আমাদের লাভ কিরূপ, একবার বুঝিয়া দেখুন। সাম্রাজ্যের preference বা protection বলিতে কোনও কালে ভারতের লাভ বা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশের সুবিধা ও সুযোগ বুঝায় না। এ লাভ বা এ সুযোগ ও সুবিধা কেবল বিলাতের কেন, তাহা বুঝাইতেছি।

প্রবাসী ইংরাজ বলিতেছেন,—বৃটিশ ষ্টাণ্ডার্ড ষ্টীলের মত ভাল ইস্পাত কুত্রাপি প্রস্তুত হয় না। কিন্তু এ কথা সত্য নহে, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত। বেলজিয়ামেও ভাল ষ্টাণ্ডার্ড ষ্টীল প্রস্তুত হয়। ইহা কোনও অংশে বিলাতী ষ্টীল হইতে নিকৃষ্ট নহে। অথচ ইহা বিলাতী ইস্পাত হইতে শতকরা ১৫।২০ টাকা সস্তা। ভারতের চাহিদার পরিমাণে ইস্পাত যখন প্রস্তুত হয় না, তখন বিদেশ হইতে ভারতকে ইস্পাত আমদানী করিতে হইবেই। এ ক্ষেত্রে ভারত কোন্ দেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করিবে ? নিশ্চিতই যে স্থান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় ভাল ইস্পাত পাইবে, সেই স্থান হইতে। বস্তুতঃ ভারত স্বাধীনদেশ হইলে—ভারত সরকারকে জনমত মানিয়া চলিতে হইলে তাহাই হইত। কিন্তু প্রবাসী ইংরাজ ব্যবসাদাররা চাহেন যে, বেলজিয়াম বিদেশ বলিয়া উহার ইস্পাত সস্তা হইলেও উহার উপর উচ্চতর শুল্ক বসাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইস্পাতকে রক্ষণনীতির আশ্রয়ে রক্ষা করিতেই হইবে—তাঁহাদের বিলাতের 'ভাই ব্রাদার' ব্যবসাদারের ইস্পাতের কাটতি এ দেশে করিতে হইবে, ইহাতে ভারতের ক্ষতি হইলেও ক্ষতি নাই। কেমন 'সাম্রাজ্যের লাভ' দেখিলেন ত ?

যদি বুঝা যাইত, ভারতের প্রয়োজনানুরূপ ইস্পাত ভারতেই প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু তাহা যখন হয় না—যখন ভারতকে বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করিতেই হইবে, তখন যেখানে সস্তা মাল পাওয়া যায়, সেখানে মাল লওয়ায় কৃত্রিম 'রক্ষণের' বাধা দেওয়া হইবে কেন ? কেবল বিলাতের ব্যবসাদারের পেট ভরাইবার জন্য বেলজিয়াম ও জার্ম্মাণীর সস্তা মাল ফেলিয়া বিলাতের মহার্ঘ্য মাল ভারত গ্রহণ করিবে কেন ?

ধরিতে গেলে শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশী ইস্পাত বিলাত হইতে এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৪-২৫ এবং ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে বিদেশী ইস্পাতের আমদানীর হিসাব এইরূপ ;—

	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫
ইংলণ্ড	১২,২১,৭২০০০ টাকা	১২,০৫,৩০০০০
বেলজিয়াম	২,৮২,২৫০০০ "	৩,৭২,০৪০০০
জার্ম্মাণী	১,১৪,০০০০০ "	[illegible]

টাকা মূল্যের বিদেশী ইস্পাত আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৬৮ ভাগ বিলাতের, আর বাকী শতকরা ১৫ ভাগ বেলজিয়ামের, ৬ ভাগ জার্ম্মাণীর এবং ১০ ভাগ অন্যান্য দেশের। সুতরাং প্রায় ৭০ ভাগ বিদেশী ইস্পাতই বিলাত হইতে এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। এক্ষণে 'রক্ষণ' নীতির সাহায্যে বিলাতের এই ৭০ ভাগ ইস্পাতের উপর শুল্ক হ্রাস করিয়া বক্রী ৩০ ভাগ বিদেশী ইস্পাতের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে ভারতের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। বরং বিলাতী ব্যতীত অন্যান্য বিদেশীয় ইস্পাত শিল্পের শুল্ক কমাইয়া দিলে ভারত সস্তায় ইস্পাত কিনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত। কাযেই Imperial preferenceএর মর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

মহাত্মা গন্ধী ও ভিক্ষু উত্তম

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভিক্ষু উত্তম ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের পর কারামুক্ত হইয়াছেন। ভিক্ষু উত্তম 'রেঙ্গুন মেল' পত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ওজন অর্দ্ধ-মণ কমিয়া গিয়াছে এবং তিনি উৎকট চর্ম্মরোগ ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে জেলে প্রথমে ১১ দিন কঠিন পরিশ্রম করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পর ২ বৎসর ৮ মাস নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইয়াছিল। ভিক্ষু উত্তম বলেন,—"নির্জ্জন কারাকক্ষে আমি কিঞ্চিদূন এক সহস্র দিবস (অর্থাৎ ২ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিন) সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাই নাই। আমার এই জঘন্য চর্ম্মরোগ, আমার অন্ধকারময় স্যাঁৎসেঁতে কারাকক্ষই আমায় প্রদান করিয়াছে। তবে এ জন্য দুঃখের কোনও কারণ নাই। এ অবস্থার জন্য এখানে সকলকেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কেন না, Prisons in India and Burma are meant for bending and breaking you--the more so if you happen to be a 'political.'" ভারতের ও ব্রহ্মের কারাগার তোমাদিগকে—বিশেষতঃ রাজনীতিক অপরাধীদিগকে ভাঙ্গিতে ও মচকাইতে নির্ম্মিত হইয়াছে।"

ভিক্ষু উত্তমের কথায় রাজবন্দী সুভাষচন্দ্র ও জীবনলালের কথা মনে পড়ে। কিন্তু ভিক্ষু উত্তমের কথা সত্য হইলেও কি 'রাজনীতিক' দেশপ্রেমিকের দুর্জ্জয় আত্মবলকে কেহ দমিত নমিত করিতে পারে? ইংরাজ কবিই গাহিয়াছেন,—"প্রস্তর প্রাচীর মনকে আটক করিয়া রাখিতে পারে না।" ভিক্ষু উত্তমের দেহ ভাঙ্গিয়াছে বটে, কিন্তু কারাকক্ষ তাঁহার মন ভাঙ্গিতে পারে নাই। তিনি পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনই ব্রহ্মবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক রহিয়াছেন। ভারতের যেমন মহাত্মা গন্ধী, ব্রহ্মের তেমনই ভিক্ষু উত্তম। তুচ্ছ কারাগার তাঁহার অদম্য মনকে জয় করিতে পারে নাই। তাই যখন উক্ত পত্রের প্রতিনিধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আপনি কি আশান্বিত?" তখন ভিক্ষু উত্তম বলেন,—"নিশ্চয়ই! ব্রহ্মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা এ দেশে রাজনীতিক কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের তরুণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল,—বড় জোর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া। এখন তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবনা-চিন্তা ভিন্নরূপ। তাই সরকার এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহারা এই পরিবর্ত্তন আনয়নকারীদিগকে অপাংক্তেয় করিতেছেন। দেশের লোক অজ্ঞ ও দুর্ব্বল থাকে, ইহাই ভাল। ইতোমধ্যে ব্রহ্মবাসীদের মধ্যে ঘর-ভাঙ্গাভাঙ্গি আরম্ভ হইয়াছে, অথচ আমরা এক জাতি ছিলাম। দেশের সর্ব্বত্র ব্যাঙের ছাতার মত নানা দল গজাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু যদি ইহাই ভিক্ষু উত্তমের আশা-আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভিক্ষু উত্তম মনে যাহাই ছিলেন, তাহাই আছেন, তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সেই অদম্য উৎসাহ, সেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সেই অপরাজেয় আত্মনির্ভরশীলতা—সবই তাঁহাতে সমান আছে। সকল সভ্যদেশে লোকের চরিত্র সংশোধনের জন্য জেলে দেওয়া হয়। সেখানে তাহাদের সহিত এমন ব্যবহার করা হয়, যাহাতে তাহাদের মনের গতি ভালর দিকে ফিরিয়া যায়। এ দেশে সাজা দিবার জন্যই যেন—শিক্ষা দিবার বা শায়েস্তা করিবার জন্যই যেন জেল দেওয়া হয়। ফল তাহার সেইরূপই হয়।

ভিক্ষু উত্তমকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি কি আবার দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন?" তখন তিনি বলিলেন, "আমি নেতৃত্ব করিতে আসি নাই, আমি দেশের কায করিতে আসিয়াছি। ভারত ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ কি জানেন, ভারতের এক বিরাট নেতা আছেন, কিন্তু তাঁহার নেতৃত্ব কেহ অনুসরণ করে না, অথচ ব্রহ্মের লোক নেতা চাহে, কিন্তু তাহাদিগের নেতৃত্ব করিবার কেহ নাই।"

সকলেই বুঝিতেছেন, ভিক্ষু উত্তম ভারতের বিরাট নেতা বলিতে কাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের লজ্জার কথা, আজ দলিত জাতিদিগের নেতৃবর্গ যাঁহাকে বিরাট জননায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন,—আমরা সেই মহাত্মা গন্ধীকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া বৃথা মরীচিকার সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতেছি! যে যুগাবতার বিরাট পুরুষ—ভারতের এই ঘোর অমানিশায় একমাত্র পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাঁহাকে আজ অনেক বুদ্ধিমান্ 'চরকা পাগল' বলিয়া দূরে পরিহার করিয়াছেন। ভারতের দুর্ভাগ্য না হইলে এমন হইত না। ভিক্ষু উত্তম, মিশরের জগলুল, ফ্রান্সের রোমে রোঁলা, মার্কিণের পাদরী হোমস, চীনের জাতীয় দল,—মহাত্মা গন্ধীর গুণমুগ্ধ। সম্প্রতি মার্কিণ দেশের হাভারফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক ডাক্তার রিউফাস জোনস জাপান, চীন হইয়া ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে মহাত্মার সবরমতী আশ্রমে গিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি চীনের তরুণ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আগামী বৎসরের জন্য মহাত্মাকে চীনে আমন্ত্রণ করিয়াও গিয়াছেন। তিনি দেশে ফিরিবার পথে বিলাতে বলিয়াছেন,—"আমি সবরমতী আশ্রমে গন্ধীর ও গন্ধীর শিষ্যাশিষ্যার জীবনযাপনপ্রথা অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গন্ধী সেখানে যথার্থ মানুষ গড়িয়া তুলিতেছেন এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের প্রভূত উপকারসাধন করিতেছেন। তাঁহার চরকা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কুফল ধ্বংস করিতে না পারিলেও তাঁহার মানুষ-গঠনের কার্য্য তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিবে। আমি যে কয় দিন ভারতে ছিলাম, তন্মধ্যে যে কয় দিন মহাত্মা গন্ধীর সহিত কাটাইয়াছি, সেই কয় দিনই আমার জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় ও সুফলপ্রদ বলিয়া মনে করি।"

ভিক্ষু উত্তমও ব্রহ্মের বিরাট পুরুষ—তিনি ব্রহ্মবাসীর সুপ্ত প্রাণে চেতনা আনিয়া দিয়াছেন। তাই তিনি মহাত্মা গন্ধীর বিরাটত্ব বুঝিয়াছেন। চীনে যেমন জেনারল চাঙ্গ কাইসেক নিপীড়িত জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, ভারতে যেমন মহাত্মা গন্ধী প্রাণহীনের মধ্যে প্রাণের সাড়া আনিয়াছিলেন, ব্রহ্মেও তেমনই ভিক্ষু উত্তম প্রাণের সাড়া আনিয়াছেন। তাই তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম দমনের জন্য শক্তিমানের বিরাট শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল।

ভিক্ষু উত্তম বলিয়াছেন, "আমি ব্রহ্মবাসীর মধ্যে একতা আনয়ন করিতে—ব্রহ্মের সহিত ভারতের একতা আনয়ন করিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়াই আমাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। আমি সাম্রাজ্যিকদিগের ভেদনীতির পরম শত্রু ছিলাম, তাই আমি দণ্ডিত

নীতি আমাদের উভয় জাতির হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতেছে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এক—শত শত শতাব্দী যাবৎ এই একতা চলিয়া আসিতেছে। যাহারা আমাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দিতে চাহে, তাহারা দেশের ঘোর শত্রু। আমি এই একতা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত আত্মশক্তি নিয়োজিত করিব। কিছুকালমাত্র আমি মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বাতাসের আনন্দ উপভোগ করিব, তাহার পর কায়-মনপ্রাণে দেশের কাযে ঝাঁপাইয়া পড়িব।"

মনে কি হয় না, ব্রহ্মের বিরাট পুরুষের, ব্রহ্মের আশাআকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীকের বিরাট হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই আশার বাণী নির্গত হইতেছে? তাঁহার অদম্য হৃদয়ের মতের দৃঢ়তা আমাদিগকে মহাত্মা গন্ধীর সহজ সরল সত্য সুন্দর মতের অভিব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রহ্মের এই যুগ-পুরুষ ভারতের যুগ-পুরুষের মত এখনও বহু দিন দেশের নেতৃত্ব করুন, ইহাই কামনা।

ভারত-সরকারের আয়-ব্যয়

মার্চ্চ মাসের প্রথমে সরকার সালতামামি আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিয়া থাকেন, এবারও প্রথামত তাহার ত্রুটি হয় নাই। ভারত সরকারের হিসাব ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অধিক দেখা যাইতেছে। আমাদের সম্পর্ক বাঙ্গালা ও ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের সহিত; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারত-সরকার ব্যবস্থাপরিষদে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পত্রসমূহ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাকে Prosperity Budget আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই prosperity অথবা স্বচ্ছলতার গন্ধ তাঁহারা কোথায় খুঁজিয়া পাইলেন, এ দেশের লোক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অথচ রাজস্ব-সচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেট পর পর চারি বৎসর ক্রমাগত স্বচ্ছলতার বাজেট পেশ করিতেছেন দেখিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ আহ্লাদে একবারে আটখানা হইয়াছেন।

সার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারতের ভবিষ্যৎ-সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিয়াছেন—এই ভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকিতেছে বলিয়া ভবিষ্যতে প্রাদেশিক সরকার সমূহকে পরিণামে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ দেয় টাকার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া ভারত-সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে।

কি ভাবে ভারত-সরকারের আয়-ব্যয় উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা তহবিলে উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু শেষ হিসাব পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। তাহার পর ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের শেষ সংশোধিত আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব এইরূপ:—আয় ১ শত ২৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, ব্যয়—১ শত ২৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে অনুমান ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা।

এই হিসাব দেখাইয়া সার বেসিল বলিয়াছেন,—"পর পর এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ক্রমে (১) প্রাদেশিক দেয় টাকার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে, (২) চামড়ার উপর রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ সম্ভব হইবে।" সার বেসিল পুনরপি আনন্দগদগদস্বরে বলিয়াছেন,—"ভাবুন দেখি, প্রতি বৎসর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ এই ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা হাতে পাইলে আপন আপন বিভাগের জাতিগঠন-কার্য্যে প্রাণ ভরিয়া কেমন খরচ করিতে পারিবেন! ইহা দ্বারা তাঁহারা প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করিতে, রোগের প্রতিষেধ করিতে, অজ্ঞতান্ধকার দূর করিতে এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে ভারতের কোটি কোটি লোকের উত্তম জীবন-যাপনের কতই না সুবিধা ও সুযোগ হইবে!"

সার বেসিল এইরূপে ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যথার্থই কি দরিদ্র জনসাধারণ তাঁহার এই 'স্বচ্ছলতার বাজেটের' দ্বারা উপকৃত হইবে? তিনি স্বচ্ছল আয়-ব্যয়ের অজুহতে চামড়া, চা ও মোটরকারের শুল্কাদি রদ বা হ্রাস করিয়াছেন। ইহাতে জনসাধারণের কি উপকার হইবে? তাহাদের সহিত মোটরকার ও চায়ের সম্পর্ক কি? ইহাতে ধনী ব্যবসাদাররা উপকৃত হইবে বটে—সে জন্য ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ব্যবসাদারের রাজা সার জর্জ্জ গডফ্রে তাঁহার বাজেটকে cheerful খেতাব দিয়াছেন, কিন্তু দরিদ্রের ইহাতে উপকার কি? 'ষ্টেটসম্যান' পত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন, মোটরকার ও টায়ারটিউবের উপর শুল্ক হ্রাস হইলে এ দেশে সস্তায় 'বাস' আমদানী করার সুবিধা হইবে এবং দেশের সর্ব্বত্র বাস চলাচল হইলে দরিদ্র জনসাধারণের তাহাতে যাতায়াতের সুবিধা হইবে। কিন্তু এ দেশের দরিদ্ররা চিরদিন 'পাঁওদলে' চলা-ফিরায় অভ্যস্ত ছিল, একবার সস্তায় যাতায়াতের আস্বাদ পাইলে আর কি তাহারা পায়ে হাঁটিতে চাহিবে? তখন, তাহাদের 'বাস-চড়ার' রোগবৃদ্ধিতে সংসারের দারুণ দরিদ্রতার উপর আর একটা খরচ বাড়িয়া যাইবে, তাহারাও ক্রমে 'খোঁড়া' হইবে। চা সস্তা হইলেও সমান বিপদ। একেই ত চা 'অজ' পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে, তবে এখনও নিতান্ত দরিদ্রের বা প্রাচীন-পন্থীর গৃহে গৃহে প্রবেশ করে নাই। সস্তা হইলে এ বাধাটুকু থাকিবে না। দরিদ্রের পান-তামাকের পরিবর্ত্তে তখন চা ঘরে প্রবেশ করিবে অথবা তামাকের সঙ্গে চা ও ঘরে শোভা পাইবে। দরিদ্র ভারতীয়ের পেটের ভাতই জুটে না, তাহার উপর এই বিলাসিতার পাপের প্রশ্রয় দেওয়া কেন? ইহাতে দরিদ্র জনসাধারণের কোনও উপকার হইবে না, বরং তাহাদের খরচের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

অথচ দরিদ্রের যাহা নিত্য অবশ্য ব্যবহার্য্য, তাহার শুল্ক কমে নাই। লবণ ও ডাকটিকিট ধনীরও যেমন, তেমনই দরিদ্রেরও এক দিন না হইলে চলে না। ধনীর তবু নানা খাদ্যসংগ্রহের সংস্থান আছে, দরিদ্রের 'নুন-ভাতই' মেলা কঠিন। আর দূর-আত্মীয়ের তথ্য সংগ্রহ করা একটি পয়সায় হইলে দরিদ্রের কত সুবিধা হয়! ডাকটিকিটের মাশুল কমাইলে সাহিত্যেরও কত পুষ্টি হয়! এখন যে লোক টিকিটের মূল্য-বৃদ্ধির জন্য ডাকের পার্শেলে কেতাব বা কাগজ লইতে সাহস করে না, সে উহার হ্রাস হইলে তাহা করিতে পারিত। ডাকের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সরকার লাভবান্‌ও হইতে পারেন নাই। এই শুল্কবৃদ্ধি বহু লোক যে পত্র-ব্যবহারের অভ্যাস কমাইয়া দিয়াছে, কেতাব-কাগজ ডাকের মারফতে আনা বন্ধ করিয়াছে, তাহা সকলেই জানে। ... ক্ষতিস্বীকার করিয়াও ডাকটিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে ... কেমন ব্যবস্থা?

সার বেসিল এ দিকে দরিদ্রকে কোনও আশাই দিতে ... নাই। তবে তিনি যে নূতন কোনও কর ধার্য্য করেন নাই, এ জন্য ... প্রজা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।

চামড়া ও চা রপ্তানীর শুল্ক রদ করা হইবে, মোটরের উপর ...
চাকী ... ১০০ টাকা ...

উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটি দ্বারাই দরিদ্র প্রজা উপকৃত হইবে না।

সার বেসিল প্রাদেশিক সরকার সমূহের দেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাসের আশা দিয়াছেন, কিন্তু সে আশাই বা কতটুকু? তিনি এই টাকায় প্রদেশসমূহের কোটি কোটি প্রজার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-বাণিজ্যাদির ক্রমোন্নতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু এ আনন্দের বিশেষ কি কারণ আছে? ভারতে ৮টি প্রদেশ আছে, এই ৮টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বণ্টন করা হইবে। তাহা হইলে প্রতি প্রদেশের ভাগ্যে অনুমান ৬৮ লক্ষের উপর পড়ে না। এই অর্থে কি প্রদেশসমূহের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত দূর হইবে, সুপেয় পানীয় সরবরাহ হইবে, গ্রামে গ্রামে ডাক্তার, ডিস্পেন্সারী, স্কুল, টোল, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইবে? ইহা কি সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মত নহে? আর এই যে টাকা দেওয়া হইবে, ইহার সমস্তটাই কি জাতিগঠনে ব্যয়িত হইবে? তাহারই বা স্থিরতা কি? বাঙ্গালার পণকর কিসের জন্য ধার্য্য হইয়াছিল এবং বহুদিন উহা কিসের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল? আমোদকর কি উদ্দেশে ধার্য্য হইয়াছিল এবং কি জন্য ব্যয়িত হইয়াছে? আসল কথা, সামরিক ব্যয় হ্রাস না হইলে জাতিগঠনকার্য্য কোনরূপেই সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে সার বেসিল কোনও আশা দিতে পারেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামরিক ব্যয় বৎসর বৎসর কমান হইয়াছে। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ছিল ৬৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা, ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক হিসাবে হইয়াছে ৫৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে সামরিক ব্যয় আর কমান যায় না—irreducible minimum! তেমনই লি কমিশনের নির্দ্দেশমত সিবিল সার্ভিসের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি, বিলাতকে ভারতের দেয় অর্থ (Home charges), বাটার ক্ষতিপূরণের দরুণ দেয় অর্থ ইত্যাদি নানা বাবদে ব্যয় সঙ্কোচ করা যায় না। দাদাভাই নওরোজী এক দিন দেখাইয়াছিলেন যে, "স্বচ্ছল ভারতের অর্থ ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীয়ের ভারত, দেশীয়ের ভারত নহে।" নওরোজী বলিয়াছিলেন,—"তাহারা সরকারী কর্ম্মচারী এবং বে-সরকারী বিদেশীয় বণিক ও ধনিরূপে ভারত হইতে প্রতি বৎসর অসম্ভব ধন আহরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়।" এই 'আহরণ' বহু দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ফলে ভারত দরিদ্র হইয়াছে। সার জর্জ্জ (এখন লর্ড) লয়েড বর্ত্তমানে মিশরের হাই কমিশনার। তিনি পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের শাসক ছিলেন। তিনি এক দিন বোম্বাই, কলিকাতা ও করাচীর ব্যাঙ্ক হইতে প্রতি বৎসর চেক কাটার বহর দেখিয়া ভারতের স্বচ্ছলতা ও ধনসম্পদ সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। এ সব চেক কে কাটে, তাহা কিন্তু লর্ড লয়েড বলেন নাই। সে 'চেক কাটার' ভারত আর 'টেনাপরা আধপেটা খাওয়া' ভারত এক নহে; সুতরাং সার বেসিলের 'স্বচ্ছলতার' বাজেট দরিদ্র ভারতের বাজেট নহে, উহা 'চেক কাটা' ধনবান্ বণিকের বাজেট।

বাঙ্গালার বাজেট

এ বৎসরে মিঃ ডোনাল্ড বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় যে সালতামামি হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাকে 'পুলিস বাজেট' বলিলে বিশেষ কিছু অপরাধ করা হয় না। এ বাজেটে উঁহাকে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। তিনি এই হিসাব পেশ করিয়া বাঙ্গালার লোকের কোন উপকার করিতে পারেন নাই—অর্থাৎ যদিও তিনি পুলিসের বাবদে

মিঃ ডোনাল্ড পর পর ৩ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়াছেন। তিনি ১৯২৫-২৬, ১৯২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের প্রকৃত ও আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক আয় হইবে মোট ১৩ কোটি ৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় হইবে মোট ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। সুতরাং তিনি আশা করেন যে, এই বৎসরের শেষে (Budget year) ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা সরকারী তহবিলে মজুত থাকিবে।

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দটা আয়ের পক্ষে মন্দা গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ বৎসরে ষ্ট্যাম্পের আয় অনুমানের অত্যন্ত অধিক কম হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজার মন্দা, পাটের দামে কমতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ খরচবৃদ্ধি এই আয়ের মন্দার কারণ। ষ্ট্যাম্পের আয় কমিয়া যাওয়ার জন্য দায়ী সরকার। সরকার ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া না দিলে ষ্ট্যাম্পের বিক্রয় কম হইত না। পরন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার মন্দা পড়ার দরুণও প্রজা দায়ী নহে, জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পর হইতে এই মন্দা অবস্থা এখনও চলিতেছে। সে জন্যও ষ্ট্যাম্পের আয় কম হইয়াছে। পাটের দাম কমায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার মন্দা পড়া ও অতিরিক্ত পাটের চাষ প্রধান কারণ। এ বৎসরও ষ্ট্যাম্পের আয় কম হইবারই সম্ভাবনা।

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে আবকারীর আয়ও আশার অনেক কম হইয়াছিল। তবে মদে না হউক, গাঁজা ও অহিফেনে কতকটা মান রক্ষা হইয়াছে। এ বৎসর আবকারীর আয় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বাড়িবে, মিঃ ডোনাল্ড এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

যে কয় বাবদে নূতন খরচ হইবে, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাওড়া সেতুর জন্য সরকারের দেয় অংশ, নূতন মেডিকাল স্কুলের খরচ এবং বালির সেতুর জন্য খরচ। আর ব্যয় হইবে দামোদর ও বক্রেশ্বরের সেচের ব্যবস্থায়, কলিকাতা পুলিসের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণে, নূতন কাউন্সিল গৃহ-নির্ম্মাণে, মেহেরপুর মহকুমায় ভৈরব নদের খাতে জল প্রবেশ করান কার্য্যে, মুর্শিদাবাদের গোচরা নালার উন্নতিসাধনে, মাদারীপুর বিলের কার্য্যে, ঘাঁটালে বাঁধসংরক্ষণ কার্য্যে। কিন্তু এই সেচ বিভাগের ব্যয় সর্ব্বসাকল্যে ১৯ লক্ষ ১০ হাজার মাত্র।

শিক্ষা-বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধিও স্বল্প। বাঙ্গালার প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা-বিস্তার উহা দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না। চিকিৎসা-বিভাগে বর্ত্তমান বৎসর (১৯২৬-২৭) অপেক্ষা আগামী বৎসরের (১৯২৭-২৮) এই বাবদে ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ১ লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিভাগেও ইহার অপেক্ষা আরও কম, ২ লক্ষ টাকারও অধিক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই দুই বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধির কত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষি-বিভাগের উন্নতির মধ্যে এক জন বিশেষজ্ঞকে মোটা মাহিনা দিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। শিল্প বিভাগে শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয় নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালার অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিয়াছে!

জাতিগঠনের দিকে—হস্তান্তরিত বিভাগে সেই মামুলী ব্যয়ের কাপণ্য আর অজুহাত তহবিলের অভাব, কিন্তু সংরক্ষিত বিভাগের ব্যয়ের কিছুমাত্র কমতি নাই। মিঃ ডোনাল্ড গর্ব্বভরে বলিয়াছেন, যে ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে কেহ বলিতে পারেন না যে, হস্তান্তরিত বিভাগ অবজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু মোট সরকারী ব্যয়বরাদ্দের অনুপাতে হস্তান্তরিত বিভাগের প্রত্যেক দফার ব্যয়ের হার কিরূপ? তিনি স্বীকার করেন যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বাবদে অধিক অর্থের

তাহাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বজায় থাকুক না নাই থাকুক, তাহাদের শাসন ও বিচার চালাইবার জন্য চাকরীয়ার ও পুলিসের হাঁদা পেট আগে ভর্ত্তি হওয়া চাই ত! স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত দেশ হইলে রাজস্ব সচিবের মুখে এ কথা সাজিত কি?

পুলিসের বাবদে কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বলিতে হইবে, মিঃ ডোনাল্ডের বাজেটটা পুলিসেরই বাজেট। মিঃ ডোনাল্ড স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, চলতি বৎসরের সংশোধিত আনুমানিক পুলিস ব্যয়বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয় অধিক পড়িয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে পুলিসের জন্য যে আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও পুলিসের ব্যয় কুলায় নাই, উহা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল. এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইয়া জাতিগঠনকার্য্যে ব্যয় করিবার কি থাকিতে পারে?

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। বহু স্থানে নূতন পুলিস লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতায় পুলিসের জন্য কর্জ্জ করিয়া গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করা হইতেছে এবং হইবে—এ সকল গৃহ গোরা পুলিস-কর্ম্মচারী ও সার্জ্জেণ্টদিগের সস্ত্রীক বসবাসের উদ্দেশে নির্ম্মিত হইতেছে। কলিকাতার পুলিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে—তার এক দফা নূতন সশস্ত্র পুলিসদল গঠন করা হইতেছে, অন্তঃস্থ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা। এইরূপে নানা দিকে নানা ছজুহতে কেবল 'শান্তি রক্ষার' জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা হইতেছে। যে দেশের সরকার দেশের লোকের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে সাহসী হয়েন না, সে দেশের সরকারকে সাধারণ ও গোয়েন্দা পুলিসের উপর নির্ভর করিতেই হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বিশেষ বিদেশী সরকার ত এরূপ করিবেনই। সে জন্য তাঁহাদিগকে প্রতি বিভাগের উদ্দেশে স্বদেশের চাকুরীয়াকে মোটা মাহিনা দিয়া আমদানী করিতে হয় এবং পুলিসকে অনন্ত প্রসাদে প্রভাবান্বিত করিতে হয়—পুলিসের বাবদে বাজেটের আয়ের ১৫ আনা ব্যয় করিতে হয়। এ অবস্থায় এইরূপ পুলিস বাজেট ভিন্ন কি আশা করা যায়?

তাহার পর 'মেষ্টন বণ্টন' অনুসারে বাঙ্গালার ভাগে যাহা পড়ে, তাহাতে সকল দিক বজায় রাখিয়া খরচ করা চলে না। সৌভাগ্যক্রমে ভারত সরকার এবারের বাজেটে কিছু রেহাই দিয়াছেন, কিন্তু হয় ত চিরদিন রেহাই দেওয়া চলিবে না; তখন কি অবস্থা হইবে? প্রত্যেক প্রদেশের যে আয় হয়, তাহার বেশীর ভাগ ভারত সরকারই গ্রাস করিয়া থাকেন। না করিয়াই বা করেন কি? ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার এক গুপ্ত পত্রে বিলাতে লিখিয়াছিলেন,—

"Millions of money have been spent on increasing the army in India, on armaments and fortification, to provide for the security of India, not against domestic enemies or to prevent incursions of the warlike people of adjoining countries, but to maintain the supremacy of British power in the East."

খোলা কথা! কাজেই প্রবেশ হইতে শোষণনীতি চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার পাট বাঙ্গালার নিজস্ব—অথচ তাহার আয়ও বাঙ্গালার পাইবার উপায় নাই; ভারত সরকার তাহাও গ্রাস করিয়া তাঁহাদের দয়াদত্ত 'বণ্টনের' মুখ চাহিয়া বাঙ্গালাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিয়াছেন। এ অবস্থায় বাঙ্গালার বাজেট যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে এবং প্রতি বৎসরই হইবে—ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

রেলের কথা

ভারতের রেল একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার—ইহার শাসন ও নিয়ন্ত্রণ একটা

বাজেটটি পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অনেকে আশা করিয়াছিল যে, এ দিকে সরকারের ও সাধারণের উপযুক্ত পরিমাণ দৃষ্টি পড়িবে এবং রেল বিভাগের ক্রমোন্নতি হইবে। বিশেষতঃ ভারতবাসী আশা করিয়াছিল যে, 'হরি ঘোষের গোয়ালে' পড়িয়া রেল-বিভাগে ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিযোগ অভাবের কথা সম্যক্ আদর প্রাপ্ত হয় না, পৃথক হইলে হয় ত সুবিধা হইবে। কিন্তু এ বার যে বাজেট পেশ করিলে পর ভারতবাসীরা বুঝিয়াছে, যে থোড়বড়ি খাড়া ছিল, এখনও তাহাই আছে। ব্যবস্থা পরিষদ আশাহত হইয়া রেল বাজেট নামঞ্জুর করিয়াছেন।

নামঞ্জুর করিবার কারণ যথেষ্ট আছে। প্রথমেই বলা যায়, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব সার বেসিল ব্লাকেট এবং ব্যবসায়-সচিব সার চার্লস ইনেস প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, মিঃ সিমের কার্য্যকাল ফুরাইলে তাঁহার স্থানে রেল বোর্ডে এক জন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই, মিঃ পারসন্স সেই পদে বসিয়াছেন। বরং গত বৎসর পরিষদে এ বিষয়ে প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্ক উঠিলে সার চার্লস ইনেস বলেন যে, "প্রতিশ্রুতি যখন দেওয়া হইয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞের দাবী যথেষ্ট পরিমাণে পরিপূর্ণ হয় নাই।" অথচ সার রাজেন্দ্রনাথের মত সুযোগ্য ভারতীয়ও বোর্ডে স্থান পায়েন নাই।

তাহার পর রেলের চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হয় নাই। সরকার এ বিষয়ে যে ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে ভাবে অগ্রসর হয়েন নাই। গত বৎসর ষ্টেট রেলসমূহে গেজেটেড কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় মাত্র [illegible] জন এইরূপ হিসাব পরিষদে পেশ করা হইয়াছিল। অন্যান্য রেল কোম্পানীতে য়ুরোপীয়ান চাকুরীয়ার সংখ্যা ছিল [illegible] এবং ভারতীয় [illegible] জন। [illegible]টি বড় চাকুরী খালি হইয়াছিল, তন্মধ্যে [illegible]টি য়ুরোপীয়রা পাইয়াছিল এবং ৮টি ভারতীয়ের ভাগ্যে পড়িয়াছিল। এ বৎসরেও যে ব্যবস্থা এই ভাবেরই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার চার্লস এ বৎসরের কথায় কেবল মাত্র বলিয়াছেন যে, [illegible]টি ভারতীয়কে গেজেটেড চাকুরীয়ার পদে প্রতিযোগিতা পরীক্ষার পর গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু মোট কত চাকুরী খালি হইয়াছিল অথবা কত জন য়ুরোপীয়কে সেই চাকুরীতে লওয়া হইয়াছে, য়ুরোপীয়দিগকেও প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিতে হইয়াছে কি না, তাহা বলা হয় নাই।

সার ক্লেমেণ্ট হিন্দলে কৃষি কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে [illegible] হাজার উদ্বৃত্ত মালগাড়ীর কথা বলিয়া সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৩০ হাজার মালগাড়ীর মূল্য কম নহে—প্রায় [illegible] কোটি টাকা। [illegible] টাকাটা ভারতবাসীর কষ্টদত্ত কর হইতে বিলাতের কারখানাওয়ালাদিগের ব্যবসায় ফলাও করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, কেন না মালগাড়ীগুলি বিলাতের কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন কথা [illegible] অধিক গাড়ী যদি উদ্বৃত্ত থাকে অর্থাৎ ব্যবহারের প্রয়োজন না [illegible] তাহা হইলে উহা নির্ম্মাণ করিতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল কেন? সার চার্লস ইনেস আমতা আমতা করিয়া ভুলটা সারিয়া লইবার [illegible] করিয়াছিলেন, পরিষদে বলিয়াছিলেন যে, বাস্তবিক অপ্রয়োজনীয় মালগাড়ীর সংখ্যা ঠিক ৩০ হাজার নহে, ইত্যাদি। ব্যবসায় [illegible] মন্দা, আশানুরূপ বৃষ্টিপাতের অভাব ও তজ্জনিত ফসলের [illegible] মহার্ঘতা, কৃষক মালগাড়ীর অভাবে মাল চালানীর অভাব [illegible] করে, এইরূপ নানা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল [illegible] সকল ভিত্তিহীন যুক্তি উড়াইয়া দিয়াছিলেন। লোক বুঝিয়াছে, [illegible] সাধারণের অর্থে ছিনিমিনি খেলা হয়, অথচ অর্থ অভাবে জাতি[illegible] কার্য্য পড়িয়া থাকে; এ কথা সকলেই জানে যে, সরকার [illegible]

বিলাতে অর্ডার দেওয়ার দরুণ সেই ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইয়াছে। যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তখন যুদ্ধের খাতিরে ভারতবাসীর মনস্তুষ্টির জন্য যে ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখন বেশ বুঝা যাইতেছে। সাম্রাজ্যিক অর্থনীতিক বৈঠকে স্যর চার্লস স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শতকরা ৯৫ ভাগ অর্ডার বিলাতে দেওয়া হয় এবং যাহাতে উহা বরাবর দেওয়া হয়, তাহাই দেখা বৃটিশ ব্যবসাদারের কর্ত্তব্য।

আজ যদি ভারত স্বায়ত্তশাসিত হইত, তাহা হইলে সরকার এমন নির্লজ্জ সত্য কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহারা জানেন, তাঁহারা কার্য্যের জন্য জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দায়ী নহেন, তাঁহাদিগকে কেহ চাকরী হইতে ছাড়াইয়া দিতে পারে না। তবে আর এই ভাবে ভারতের অর্থের ছিনিমিনি খেলিতে ভয় কি?

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী দেখাইয়াছিলেন যে, রেল বোর্ডের প্রকাশিত ষ্টেট রেলের সরঞ্জামী খরচের হিসাবে বুঝা যায়, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম রেলে ১ শত হইতে ৭ শত ২০৲ টাকার বেতনের চাকুরীর শতকরা মাত্র ৮৯ ভাগ ভারতবাসীর ভাগ্যে পড়িয়াছে, পরন্তু মোট বেতনের মাত্র শতকরা ৮ টাকা ভারতীয়রা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আউধ রোহিলখণ্ড রেলে ১ শত ৭০৲ হইতে ৯ শত ৫০৲ টাকার বেতনের চাকুরীর শতকরা মাত্র ৭২ ভাগ ভারতবাসী পাইয়াছে এবং মোট বেতনের মাত্র শতকরা ৯ ভাগ ভারতবাসীরা পাইয়াছে। ৭৫০৲ টাকার উপরের চাকুরীর কথা না বলাই ভাল; ইহাতে ভারতীয় চাকুরীয়ার সংখ্যা শতকরা ১ অংশের সামান্য ভগ্নাংশ। নেহাত কুলী-মজুরের কাযে ভারতবাসী না হইলে চলে না, তাই ঐ বিভাগে ভারতীয় চাকুরীয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবেই।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ বাজেট হইতে রেল বাজেট পৃথক করিবার প্রস্তাবে ভারতীয়রাও সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, ইহাতে রেলের কার্য্যে সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহাতে কার্য্যের সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বরং রেলের কার্য্যে সরকারী কর্ম্মকর্ত্তার অযোগ্যতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। স্যর চার্লস ভয় দেখাইয়াছেন যে, পরিষদ রেল-বাজেট নামঞ্জুর করিলে বড়লাটের সার্টিফিকেশান ও ভিটোর ক্ষমতা আছে। ইহা ত জানা কথা, ইহাতে বিস্ময়ের ত কিছুই নাই। তোমাদের রবার কাউন্সিল এসেমব্লির প্রকৃত ক্ষমতা ও অধিকার জানিতে কাহার বাকী আছে?

বিনা বিচারে আটক রাজবন্দী

ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় দেশের লোকের নির্ব্বাচিত দেশীয় প্রতিনিধিরা একবাক্যে আটক রাজবন্দীদিগের প্রতি অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু উভয় সরকারই এ বিষয়ে নিতান্ত নির্লজ্জের মত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বার বার আলোচনা করিয়া দেশের লোক ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছে, তথাপি আশ্চর্য্যের কথা এই, সরকারের নির্লজ্জতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। আটক রাজবন্দীদিগের প্রকাশ্য বিচার হয় নাই, অথচ মিঃ মোবারলির মত রাজপুরুষ কেবল পুলিসের গোয়েন্দার খবরই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন, এখনও দেশে ভীষণ বিপ্লববাদ ও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আছে, তাঁহাকে নানা রাজবন্দী উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছে। অতএব তাঁহাদের 'ধনুকভাঙ্গা' পণ, যতক্ষণ রাজবন্দীরা প্রতিশ্রুতি প্রদান না করে যে,

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যভঙ্গের বিষয়ে নিশ্চিত ডাক্তারী অভিমত প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকারও ততটুকু দয়াও প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা জানেন, ঈশ্বরের সমক্ষে—সারা জগতের সমক্ষে তাঁহারা কত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা চোর ডাকাত বা খুনে-ছেঁচড় নহেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যাবুদ্ধিতে, বংশ-মর্য্যাদায়, পদগৌরবে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইতে কোন অংশে হীন ত নহেনই, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জনপ্রিয়, অনেকে পরহিতব্রতধারী দেশকর্ম্মী, অনেকেই স্বার্থত্যাগী। তাঁহাদের দ্বারা যে কোনওরূপ হীন অপরাধ আচরিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাসযোগ্যই নহে; যদিই বা তাঁহাদের বিপক্ষে অভিযোগ এইরূপ গুরু হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্য আদালতের বিচারে তাঁহাদের দণ্ড অবশ্যই সম্ভবপর। প্রাণভয়ে সাক্ষীর অভাবের অজুহত এ যাবৎ প্রমাণিত হয় নাই। প্রমাণ,—শাঁখারীটোলা পোষ্ট মাষ্টার খুনের মামলা, প্রমাণ,—বরাহনগরের বোমার মামলা। এ সব পুরাতন কথার বার বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এক সময়ে রাজবন্দী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারত-সচিবের নিকট দরখাস্তে গোয়েন্দা পুলিসের গুপ্ত বিদ্যার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, আজিও তাহার প্রতিবাদ হয় নাই। অথচ বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র-সচিব কল্পিত বিপ্লববাদীর পত্রাদি হইতে রচনা উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার বিপ্লববাদ এখনও প্রকাণ্ড কাণ্ড ও শাখা বিস্তার করিয়া দেশ ছাইয়া আছে, উহার মূলোৎপাটিত না হইলে দেশ বিপ্লবের ভীষণ কবল হইতে মুক্ত হইবে না এবং সেই হেতু রাজবন্দীদিগকে আটক করিয়া রাখাই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি এই সকল রচনা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই বলিবেন, জীবনলাল ও ভূপেন্দ্রনাথ যে গোয়েন্দা পুলিসের নীচ চক্রান্ত ও চাতুরীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাহাদের নিকট হইতেই এই অমূল্য পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই কি বিপ্লববাদের অস্তিত্বের প্রমাণ? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের সহিত সেই গোয়েন্দা পুলিসের কল্পিত রচনার যে সম্পর্ক আছে, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সে প্রমাণও কি গোয়েন্দা পুলিসের বাক্সের ভিতর?

যদি ধরা যায়, সরকারের কথামত ইহা সত্য যে, এই সকল রাজবন্দীকে আটক করার ফলে বিপ্লববাদীর বিভীষিকাময় কার্য্য-গতির রোধ হইয়াছে, তাহা হইলে বরাহনগরে বোমার আবিষ্কার হয় কিরূপে, সুকিয়া ষ্ট্রীটে বা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটেই বা বোমাওয়ালা যুবক গ্রেপ্তার হয় কিরূপে? এখনও এখানে সেখানে বাড়ীর খানাতল্লাসী হয় কেন? যাহাদিগকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা যদি বিপ্লব আন্দোলনের 'মস্তিষ্ক'ই হয়, তবে তাহাদের অনুপস্থিতিতেও 'বোমা-রিভলভারের লীলাভিনয় চলিতেছে কিরূপে?

আসল কথা, সরকারের পক্ষে সাফাই গাহিবার কিছুই নাই। সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই, আছে স্বেচ্ছাচার আইন আর গায়ের জোর, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়া দেখিলে উহা সমর্থিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা কাউন্সিলে রাজবন্দীদিগের মুক্তির প্রস্তাবক কাউন্সিল দেখাইয়াছিলেন যে,—

(১) রাজবন্দীদের রোগে যথাযোগ্য চিকিৎসা হয় না,

(২) সে সময়ে তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে তাহাদিগকে দেখিতে দেওয়া হয় না,

(৪) রাজবন্দীর দুঃস্থ পরিবার অনাহারে মৃত্যুযন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়,

(৫) রাজবন্দীদিগকে তাহাদের মরণোন্মুখ আত্মীয়কে দেখিয়া আসিতে দেওয়া হয় না,

(৬) তাহাদিগকে সাধারণ আহার্য্য ও আশ্রয়ও দেওয়া হয় না।

এ সকল অভিযোগের কণামাত্রও সত্য হইলে সরকারের কলঙ্কের কথা। যাহাদের বিপক্ষে কণামাত্র প্রমাণ নাই, তাহাদিগের প্রকাশ্য বিচার না করিয়া স্বেচ্ছাচারমূলক বে-আইনী আইনে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে—কবে তাহাদিগকে মুক্ত করা হইবে, তাহাও বলা হয় না,—অথচ তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারও করা হয়। ইহাকে কি বাঁধিয়া মারা বলে না? কোন্ সভ্য সরকার এমন অনাচার করিয়া থাকেন? যে সরকারের লজ্জা আছে, সে সরকার জনমতে কর্ণপাত না করিয়া এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মত নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না!

আরল উইণ্টার্টন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, রাজবন্দীরা যদি বিপ্লববাদে যোগদান করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তাহাদিগকে মুক্ত করা হইবে। ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব এই কথাই বলিয়াছেন। বাঙ্গালা কাউন্সিলেও মিঃ মোবারলি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা জানেন, যাহারা নির্দ্দোষ অথচ যাহাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, তাহারা কখনও এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। যাহাদের সহিত বিপ্লবের সম্পর্ক আছে বলিয়া প্রমাণ নাই, তাহারা এমন অপমানকর প্রতিশ্রুতি দিবে কেন? তবেই হইল, প্রকারান্তরে বিনা বিচারে বাঙ্গালার তরুণদিগকে জনমতের বিপক্ষেও অনির্দ্দিষ্টকাল আটক করিয়া রাখা হইবে। তাহাদের অপরাধ—তাহারা কর্ম্মী, দেশকে আন্তরিক ভালবাসে।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকার চুক্তি

দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এত দিন পরে গত শীতের 'রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের' সিদ্ধান্তের ফলে ভারত-সরকার ও য়ুনিয়ন সরকার একটা আপোস বন্দোবস্তে সম্মত হইয়াছেন। প্যাডিসন ও হবিবুল্লা ডেপুটেশানের আফ্রিকা-যাত্রার ইহাই ফল। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে;—

(১) জাতিভেদে বাসস্থান নির্দ্দেশবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করা হইবে না, (Class Areas Bill)

(২) য়ুনিয়ন সরকার ভারতবাসীকে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে অন্যত্র বাস উঠাইয়া লইয়া যাইতে সাহায্য দান করিবেন (Assisted emigration).

(৩) বলপূর্ব্বক নাম রেজিষ্ট্রী করার বিধি রহিত করা হইবে।

(৪) ভারতীয় প্রবাসী য়ুরোপীয় প্রথায় বসবাস করিলে তাহার সম্বন্ধে আইনের কড়াকড়ি থাকিবে না।

(৫) এ সকল বিষয়ে ভারতীয়ের স্বার্থ দেখিবার জন্য এবং সকল সময়ে য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য ভারত-সরকারের নিযুক্ত এক জন প্রতিনিধি দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকিবেন।

মহাত্মা গন্ধী, মিঃ এণ্ড্রুজ এবং শ্রীমতী নাইডু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই বন্দোবস্তে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। বিশেষতঃ মহাত্মা গন্ধীর মত কোনও ভারতবাসী নেতা দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকিয়া প্রবাসী ভারতবাসীর অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেন নাই। গন্ধী-স্মাটস্ চুক্তিও তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। সুতরাং তাঁহার অভিমত এ

কিন্তু মহাত্মা গন্ধী ইহাও বলিয়াছেন যে, এক দিকে যেমন এই চুক্তিতে ভারতবাসীর লাভ, অন্য দিকে তেমনই ক্ষতি। কেন মহাত্মা গন্ধী এ কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতেছি।

জাতিভেদে বাসস্থান নির্দ্দেশবিষয়ক আইনের (Class Areas Bill) এবং Ermigration ও Registration আইনের বিপক্ষে ভারতবাসী এ যাবৎ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। য়ুনিয়ন সরকার সেই সকল আইন বিধিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে পরম লাভ। বিশেষতঃ যে হার্টজগ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়ের স্বার্থের পরম প্রতিকূল, সেই হার্টজগ মন্ত্রিত্বকালে এমন অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইল, ইহা নিশ্চিতই সুখের কথা। ডাক্তার মালান এই Class Areas Billএর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনিও যে মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয়। তাই ইহাতে ভারতীয়ের আনন্দ করিবার কথা।

কিন্তু যে সকল ভারতবাসী প্রতীচ্য আদর্শে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বসবাস করিতে অসম্মত, তাহাদিগকে য়ুনিয়ন সরকার ভারতবর্ষ বা অন্যত্র গিয়া বসবাস করিতে সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন, ইহাতে একটু গোলের কথা আছে। সাহায্য কিরূপভাবে করা হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং উহা এ স্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যবস্থা—বলপূর্ব্বক ভারতবাসীকে দক্ষিণ-আফ্রিকা ত্যাগ করাইবার ব্যবস্থার নামান্তর নহে কি?

প্রথমতঃ ধরা যাউক, দক্ষিণ-আফ্রিকা কাহার। উহা স্থানীয় আদিমনিবাসী কাফ্রিদের, য়ুরোপীয়রা ন্যায়ধর্ম্মমতে নহে, অন্যায়পূর্ব্বক পশুবলের সাহায্যে উহা তাহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু নিজের অসামর্থ্যবশতঃ ভারতবাসীর সাহায্য লইয়া ঐ দেশের জঙ্গলকে আবাদে পরিণত করাইয়াছে। ভারতীয়রা ঐ দেশকেই জন্মভূমি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়া ঐ দেশেই পুরুষানুক্রমে বসবাস ও বাণিজ্যাদি করিয়া আসিতেছে। অনেকে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ কখনও দেখে নাই, ভারতকে তাহারা বিদেশ বলিয়াই মনে করে। এখন হঠাৎ গায়ের জোরে তাহাদিগকে হয় য়ুরোপীয়ের মত থাকিতে বলা, না হয় তাহাদের জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা কিরূপ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত?

তাহার পর য়ুরোপীয় প্রথায় ভারতবাসীকে বাস করিতে বলার অর্থ কি? য়ুরোপীয় সভ্যতা অনুযায়ী বসবাস করার ভারতীয়ের সুযোগ মিলিবে, এ কথা বলিলে ভারতীয় সভ্যতার নিকৃষ্টতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় না কি? মাত্র ৪।৫ শত বৎসরের পুরাতন সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা ভারতবাসীকে বলপূর্ব্বক স্বীকার করান কি ন্যায়, ধর্ম্ম ও সভ্যতাসঙ্গত?

তবে একটা কথা, মন্দের ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা যখন পরাধীন বিজিত জাতি, নিজের দেশেই যখন আমরা পরের অনুগ্রহাপেক্ষী, তখন পরের দয়াদত্ত দান যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ, এই হিসাবে এই চুক্তি মাথা পাতিয়া লওয়াই আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ ভারতীয় প্রবাসীর সংখ্যা বা অধিকারবৃদ্ধি কিছুতেই হইতে দিবে না। কোন য়ুনিয়ন গভর্ণমেণ্টই ভারতীয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া এক দিন তথায় তিষ্ঠিতে পারেন না। এ অবস্থায় এই যে সামান্য মনোভাবের পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে, এইটুকুই লাভ। আমরা যত দিন স্বরাজ না পাই, যত দিন আমাদের ফিরাইয়া মারিবার সামর্থ্য না হইবে, তত দিন আমাদিগকে পরের দেশে মার খাইয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। আজ আমরা পরাধীন বলিয়াই দক্ষিণ-আফ্রিকার য়ুনিয়ন আমাদিগকে দয়া করিয়া নিজের সর্ত্তে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বসবাসের অনুমতি দিয়াছেন। আমরা স্বরাজ পাইলে



ঊষার আলো

১

"প্রতিশোধ!—এর শোধ নেওয়া চাই!"

মাসিক পত্রখানা ক্ষীণ মুষ্টিমধ্যে নিষ্পেষিত করিয়া প্রীতিপ্রকাশ ক্রোধ ও ঘৃণাভরে উহা কক্ষতলে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সযত্ন-কুঞ্চিত, কবিজনোচিত কেশদাম ক্ষৌরিত আননের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া, সম্মুখস্থ টেবলের উপর শিরাবিকীর্ণ বদ্ধমুষ্টি রাখিয়া আরক্ত-মুখে সে বিস্ময়চকিত বন্ধুগণের প্রতি চাহিল—তাহার প্রদীপ্ত নেত্রপথ-নির্গত ক্রোধবহ্নি 'পাঁজনে'র পাথর ভেদ করিয়া যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। যদি তাহাতে সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপরের দাহিকাশক্তি থাকিত, তবে মাসিক পত্রখানা ত মুহূর্ত্তে ভস্মেই পরিণত হইত, উহার লেখক ও সম্পাদক প্রভৃতিও স্বশরীরে বা 'বাহাল তবিয়তে' ইহজগতে থাকিবার সুযোগও পাইতেন না।

সঙ্ঘের অন্যতম বিশিষ্ট রথীর এই আকস্মিক উষ্মা ও ভাব-বিপর্য্যয়ে সমবেত সকলেই অসম্ভব বিচলিত হইয়া পড়িল। বিমানবন্ধু চায়ের পেয়ালাটা টেবলের উপর রাখিয়া উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "কি হ'ল?—ব্যাপার কি?"

তর্জ্জনী হেলাইয়া প্রীতিপ্রকাশ কাগজখানা দেখাইয়া দিয়া বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "পড়নি?—প'ড়ে দেখ, চেঁচিয়ে পড়—সকলে শুনুক।"

সভ্যগণ উৎসুকনেত্রে পাঠকের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। বিমানবন্ধু বলিল, "কোন্‌টা পড়ব?"

লীলায়িত গতিতে প্রীতিপ্রকাশ বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "প'ড়ে যাও।"

বিমানবন্ধু পড়িতে লাগিল। চুরুটিকার ধূমজাল এতক্ষণ কক্ষটিকে তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। বিমা-নের [illegible]

পড়া শেষ হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কথা কহিল না। অবশেষে প্রীতিপ্রকাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "এখন বুঝ্‌লে ত? এ শুধু আমাদের লক্ষ্য করেই লেখা। আমাদের তরুণ জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ! এ কি সহ্য করা চলে? তোমরাই ব'ল, এ কি আমরা অম্‌নি ছেড়ে দেব?"

সুবুদ্ধিবিনোদ উদীয়মান কবি। কৈশোরের সীমা ছাড়াইয়া সে সবে যৌবনের পথে পা বাড়াইতেছিল। তাহার সবুজ মনে, সবুজ পৃথিবীর শ্যামায়মান শোভা এবং মানব-মনের সবুজ ভাবগুলিই ওতপ্রোত হইত। ঝঙ্কার তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"না দাদা, এ অসহ্য! আমরা তরুণ যুগের তরুণের দল, এ অপমান সইব না—কোনমতেই না! আমরা পুরানো যা কিছু সব ভেঙ্গে ফেল্‌ব। আমরা সমাজ মানিনে, সংসার মানিনে, সংস্কার মানিনে। দেখ দাদা, কবিতায় এ বার আগুন ছুটিয়ে দেব—আমিই এর শোধ নেব।"

নবোদ্গত শিশুগুম্ফের প্রান্তদেশে সে এক বার বাম ও দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ স্পর্শ করিল। কিন্তু সে সাধ মিটিবার বিলম্ব আছে দেখিয়া তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে কি ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল?

"নিশ্চয়!—গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধরচনায় আমরা চারিদিক থেকে এমনভাবে আক্রমণ করব যে, বাছাধনরা টের পাবেন, আমাদের শক্তি কত! দেখ বিমান, তোমাকেও কলম ধর্‌তে হবে। তোমার এই ঘরটিতে আমরা তরুণের দল মিলবার সুযোগ পেয়েছি। তুমি আমাদেরই দলের এক জন, কিন্তু তোমার রচনা করবার শক্তি নীরব থেকে নষ্ট করা উচিত নয়।"

প্রীতিপ্রকাশ বিমানবন্ধুর পৃষ্ঠদেশে মৃদু মৃদু করাঘাত

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ধনী পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া সে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। তাহার পিতা এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব—ইদানীং অবসর লইয়া কনিষ্ঠ পুত্রের শিক্ষার জন্য কাশীধামের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বিমানবন্ধু কলিকাতার বাড়ীতে—বৈঠকখানা-ঘরে তথাকথিত সবুজ দল আখ্যাধারী কয়েক জন বন্ধু লইয়া অবসরসময়ে সাহিত্য-চর্চ্চা করিত। তাহার প্রাণ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ হইলেও এত দিন পর্য্যন্ত কালি ও কলমের সমবায়ে সাহিত্যিক পর্য্যায়ে উপনীত হইতে পারে নাই। সে যাবতীয় প্রসিদ্ধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের গ্রাহক ছিল। সুতরাং প্রতিদিন অপরাহ্নে তাহার মজলীসে বহু লেখক ও অলেখক সাহিত্যিকের সমাগম হইত। পুরাতন ভৃত্য গোবর্দ্ধন বাবুদিগের পেয় চা ও আপরাহ্নিক জলযোগের ব্যবস্থা করিতে করিতে অনেক সময় হাঁপাইয়া উঠিত। অনায়াসলভ্য, রসাল, তৃপ্তিকর আহার্য্য ও প্রচুর চুরুটিকার প্রলোভনে আকৃষ্ট সবুজ দল মধুচক্রের চারি পার্শ্বে সমবেত মক্ষিকার ন্যায় যে গুঞ্জনধ্বনি তুলিত, বিমানবন্ধুর কর্ণে তাহা মধুবর্ষণ করিলেও বাড়ীর পরিচারকগণ ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। এমন কি, সে কথাটা তাহারা বিমানবন্ধুর কনিষ্ঠ দেবব্রতের গোচর করিতেও ভুলে নাই। দেবব্রত বড়দিনের অবকাশে কয় দিন কলিকাতায় আসিয়াছিল। সে কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম্-এ পড়িতেছিল। দীর্ঘকাল বাঙ্গালার বাহিরে থাকায় ফলে সে বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও বিশেষরূপে চর্চ্চা করিত, কাযেই সে পুরুষের স্ত্রৈণ-সুলভ ভাব-ভঙ্গী বা ন্যাকামী, তাহার জ্যেষ্ঠের ন্যায় বরদাস্ত করিবার মত মনোবৃত্তির অধিকারী হয় নাই।

আজিকার এই সাহিত্যিক মজলীসে সে-ও এক প্রান্তে বসিয়া দাদার বন্ধুদিগের আলোচনা শুনিতেছিল।

বিমানবন্ধু বলিল, "'ধ্রুবতারার' এই লেখকটি কে হে ?"

প্রীতিপ্রকাশ বলিল, "নাম নেই, শুধু শ্রী দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না। তবে মনে হয়, ওটা সম্পাদকের লেখা।"

কুন্তলখা একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল, "আমরা ত অভিমান করব ; কিন্তু বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিক-আমাদের ছোট ছোট কাগজ তাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে কি ?"

বিমানবন্ধু বাতায়নের ফাঁক দিয়া শীতের আসন্ন সন্ধ্যার লঘু সঞ্চরণলীলা বোধ হয় লক্ষ্য করিতেছিল। সে যেন স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই, লেখকের লেখার তারিফ না ক'রে পারা যায় না। তোমরা যেমন বাঁকাচোরা ভাষায়, ক্রিয়াটিকে সামনে রেখে কর্ত্তাকে পেছনে দাঁড় করিয়ে বিচিত্র বাঙ্গালায় লেখ, লেখক ঠিক সেটা নকল ক'রে দেখিয়েছেন !"

সুবুদ্ধিবিনোদ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বিমানবাবু, আপনি ঐ লেখার প্রশংসা ক'রে সবুজ দলকে অপমান করবেন না।"

বিমান হাসিয়া বলিল, "কবি, তুমি আমার কথার মানে বুঝ্‌লে না। আমি parodyর প্রশংসা করছি। তাতে ঐ সম্প্রদায়ের লেখকগণকে প্রশংসা করা বুঝায় না।"

দেবব্রত এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। সে বলিয়া উঠিল, "মাপ করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই ; কিন্তু সাহিত্যের যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন দু' একটা কথা বলবার অধিকার সকলেরই আছে। লেখক ত চমৎকার লিখেছেন। সত্যি যাঁরা বাঙ্গালার ভাব, ভাষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রহীন—শুধু গণিকাতন্ত্র রচনা নিয়ে সাহিত্যিক ব'লে বড়াই করেন—নানাবিধ 'ইজ্‌ম্'এর ধূয়া তুলে নিজেদের পণ্ডিত ব'লে মনে করেন, আর বস্তা-পচা দুর্গন্ধ মাল আমদানী ক'রে বাঙ্গালা সাহিত্যের তপোবনকে ধাপার মাঠে পরিণত করেন,—তাঁদের সম্বন্ধে যাঁরা বিশুদ্ধ পরিহাস করেন, তাঁদের উপর অত খাপ্পা হন কেন ? বাস্তবিক দাদা যে রচনাটা পড়লেন, আমার ত ভারী ভাল লাগ্‌ল। অতি সুন্দর !"

তাহার এই সরল ও নির্ম্মম মন্তব্যে সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িল। প্রীতিপ্রকাশ বলিল, "আপনি তরুণ হয়ে এ কথা বল্‌ছেন ? বিমানের ছোট ভাই আপনি। ছিঃ !"

দেবব্রত মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রীতিবাবু, আমাকে ধিক্কার দিন, ক্ষতি নেই ; কিন্তু আপনারা যা আরম্ভ করেছেন, বাঙ্গালা দেশের লোক তা চায় কি ? তরুণ শুধু আপনারা নন। কাঁচা মাথা হলেই তরুণ হয় না, আর মাথায়

প্রাণের উদারতা, গভীরতা আর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ বয়সের মাপকাঠিতে মাপা যায় কি ?"

বিমানবন্ধু বলিয়া উঠিল, "দেব, তুই থাম্ দেখি। বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করলি তুই কবে ? এ সব কথায় তোর মত ছেলেমানুষের কথা বলা ভাল নয়। চুপ কর।"

দাদার নিষেধবাক্যে দেবব্রত যেন ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে বয়সের বেশী পার্থক্য না থাকিলেও সে জ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট সমীহ করিত। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দীর্ঘ, ব্যায়ামপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দেবব্রত হাসিমুখে, বিনম্রকণ্ঠে বলিল, "আমার অপরাধ আপনারা নেবেন না। আমি বাঙ্গালা দেশের বাইরে থাকি, কলকাতার আব-হাওয়ার সন্ধান রাখিনে। তবে মাতৃভাষার সঙ্গে যোগ নেই, এ কথা সত্য নয়। আপনারা যে মতের উপাসক, কলকাতার বাইরের বাঙ্গালী সমাজে বা বিরাট হিন্দু-সমাজে সে ভাবের ঢেউ এখনও পর্য্যন্ত যে পৌঁছে গেছে, এটা মান্‌তে রাজি নই। আর দুই একটা ঢেউ লাগ্‌লেও তাতে ভেসে যাবার মত আপনাদেরই মত জন কয়েক লোক থাক্‌তে পারে বটে, কিন্তু আর সবাই—থাক্, আপনাদের আলোচনায় বাধা দেব না। আমি দাদা, এক বার ভবানীপুরে মামার বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌ছি।"

সাহিত্যিক দলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দেবব্রত দৃঢ়চরণে বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রীতিপ্রকাশ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

সুবুদ্ধিবিনোদ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কবিতার আগ্নেয়-গিরি-নিঃস্রাবে এবার বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভাসিয়ে দেব।"

কৃষ্ণসখা বলিল, "আলবৎ!"

২

প্রীতিপ্রকাশ কোম্পানীর নবোদ্যমের দুন্দুভিনিনাদ কলিকাতার মোটর, বাস, লরী, ট্রামের বিপুল শব্দকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া লেখক ও পাঠকগণের কর্ণপটহে আঘাত করিল—সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল। স্বাধীনতার বাণী কি শুধু রাজনীতিকে আশ্রয় করিয়া জটিলতর সমস্যার মীমাংসার অবধি থাকিবে? সমাজবন্ধন, চিরন্তন সংস্কার, প্রাচ্যবিধি-বার্ত্তা দেশবাসীকে শুনাইবে না? তবে তাহাদের আবির্ভাব কিসের জন্য? দেশ-নেতৃগণ এ কি করিতেছেন? শুধু খদ্দরের মহিমায় তাঁহারা মুগ্ধ! অপাংক্তেয়কে পাংক্তেয় করিবার চেষ্টা, গণতন্ত্রের সেবায় দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিবার বাসনা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে জাগাইয়া রাখার জন্যই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া কি তাঁহারা ভাল করিতেছেন? দেশ যে রসাতলের পথে অগ্রসর হইতেছে! পতিতাগণকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া লইতে যদিই বা বাধা থাকে, তাহাদিগের সহিত পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিবার বাধা কোথায়? রূপ ও রূপার অভাবে যদি গৃহস্থ-কন্যাগণের বিবাহ না-ই ঘটে, সে দিকে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? জীবন-যুদ্ধে যোগ্যতমেরই জয় হইয়া থাকে। যাহার পাথেয় নাই, সে ত পারের কড়ির অভাবে নদীর ও-পারেই পড়িয়া থাকিবে। আর্টের যুগে রসবেত্তাগণ তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী, তাহাদিগকে বন্ধনের চাপে পিষিয়া ফেলিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীন যুগের অনভিজ্ঞ বিকৃত-বুদ্ধি গুম্ফ-শ্মশ্রুধারী স্বার্থপরায়ণগণ সতীত্বের ধুয়া তুলিয়া, নারীজাতিকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, নারীত্বকে লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছে। মুক্তির আনন্দলাভ করিবার পথে এ কি ঘোর বাধা! এস নবতন্ত্রের সাধকগণ, এই ভীষণ নাগপাশকে 'ইজমের' কুঠারাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেল! নারীকে স্বার্থপর স্বামীর একচেটিয়া অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া স্বাধীনতার দুর্নিবার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চল। পুরুষ গোটাকয়েক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, অগ্নি বা শালগ্রাম নামক পাথরকে সাক্ষী রাখিয়া সুন্দরী তরুণীর একচ্ছত্র অধিকারের দাবী করিতে পারে না, যোগ্যতরের হস্তে বিবাহিতা পত্নীকে সমর্পণ করাই পুরুষত্ব। যে সমাজ তাহার বিরোধী, তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেল, তাহাকে বঙ্গোপসাগরের জলে গুঁড়া করিয়া ভাসাইয়া দাও। ইহাই বিংশ শতাব্দীর বাণী। প্রকৃত অসহযোগ নীতি তখনই সার্থক হইবে, যখন সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বাণী-উপাসকগণ এই ভাবের অসহযোগের সাহিত্য রচনা করিয়া দেশবাসীকে ধন্য করিতে পারিবেন।

উভয়ে ভীষণ বাধা পড়িতে লাগিল। তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া যাহারা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল, তাহাদের ক্ষীণ সুর জড়বৎ বাঙ্গালীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাট জাতির চেতনাসঞ্চারের কোন লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছিল না। প্রতিবাদ-স্বরূপ স্বাস্থ্যরক্ষক সাহিত্যিক রথিগণের আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্বালাময়ী ভাষার তীব্রতা ত সহ্য করা যায় না। যে নারীজাতির কল্যাণের জন্য প্রীতিপ্রকাশের দল এত চেষ্টা করিতেছে, সেই পুরমহিলাগণেরও অনেকে লেখনী ধারণ করিয়া তাহাদের মতের বিরোধী রচনায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রগুলি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এমন সংবাদও প্রীতিপ্রকাশের কর্ণগোচর হইল যে, বহু তরুণীও তাহাদের এমন মধুর যুক্তিপূর্ণ কবিতা, গল্প ও উপন্যাস দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাড়ীর পুরুষ অভিভাবকগণকে তিরস্কার করিয়াছেন। মাতা, স্ত্রী ও কন্যার হস্তে তাঁহারা ঐ সকল রচনা তুলিয়া দিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিকে জীব-বিশেষের রুচির সহিত তুলনাও করিয়াছেন।

প্রীতিপ্রকাশ তাহাতেও দমিল না। যাহারা মহৎকার্য্যের জন্য জগতে আবির্ভূত হয়, লোক-গঞ্জনা বা নিন্দা তাহাদিগকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইতে হইয়া থাকে। বাণীর মন্দিরে সমবেত হইয়া তাহারা যে যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে, তাহা পূর্ণ করিতেই হইবে। নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। সৌন্দর্য্যের পূজারী তাহারা—সুন্দরকে নূতন আকার দিয়া তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবেই।

কিন্তু উৎসাহ-স্রোতের মুখে সহসা একটা বাঁধ গজাইয়া উঠিল। অন্যতম উৎসাহী সভ্য বিমানবন্ধু অকস্মাৎ বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল। পিতার অলঙ্ঘ্য আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া সে কাশীধামে গিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের দলের সভ্যগণের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছিল, কেহ ঐরূপ অশ্লীল ও মর্য্যাদাহানিকর শৃঙ্খলে কখনও শৃঙ্খলিত হইবে না। স্বাধীন প্রজাপতির জীবন তাহারা যাপন করিবে। সৌন্দর্য্যরসপিপাসা মিটাইতে হইলে, জগতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থাপন করিতে গেলে তথাকথিত নীতিজ্ঞান থাকিলে চলিবে না। বাতাসের ন্যায় স্বাধীন, বন্যা-প্রবাহের ন্যায় বাধাবন্ধনহীন হওয়া

বিবাহে বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত সে পায় নাই বলিয়া, বিমানবন্ধু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিল। তবে পিতামাতার অনুমতি লইয়া কিছু দিন পরে সে সস্ত্রীক যখন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া ওকালতী আরম্ভ করিবে, তখন সুদে আসলে সে বন্ধুগণকে পরিতৃপ্ত করিবার সম্ভাবনা রাখে। বিবাহে তাহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার মত সামর্থ্য তাহার নাই এবং যে সুশিক্ষিতা তরুণীকে সে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে, তাহাতে ক্ষোভের অপেক্ষা লাভের অংশই বেশী বলিয়া সে এখন সুখী।

প্রীতিপ্রকাশ বন্ধুর পত্রে বিশেষ আশ্বাস লাভ করিতে না পারিলেও বিমানের সুন্দরী ও শিক্ষিতা পত্নীলাভের সংবাদে নিতান্ত অপ্রসন্ন হইল না। নবীনা বান্ধবীর সহিত পরিচয়লাভে সে হয় ত এক দিন ধন্য হইতে পারে। এই সকল তরুণীকে নবতন্ত্রের বিচিত্র বার্ত্তা শুনাইয়া দীক্ষিত করিতে পারিলে, কালে নারীত্বের মহিমা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

সে দিন সভায় প্রীতিপ্রকাশ বক্তা ছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল, "নারীত্বের মুক্তি।" সে ওজস্বিনী ভাষায় যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিল, তখন সমবেত দ্বাদশ জন শ্রোতা ঘন-ঘন করতালি-ধ্বনিতে প্রীতিপ্রকাশের উদ্দীপনাকে শতগুণ বাড়াইয়া দিল। সে বুঝাইয়া দিল, সতীত্ব ও মাতৃত্ব নারীত্বের মুক্তির ভীষণ পরিপন্থী। এই দুই অবস্থা বা ব্যবস্থাকে বাতিল করিতে না পারিলে, ভারতললনায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালার নারীজাতির জাগরণের কোন সম্ভাবনা নাই। এই দুই পাষাণভারে অবসন্না বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী সমুদ্রতলে নির্ব্বাসিতা হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। সমুদ্র মন্থন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সাধুবাদে ক্ষুদ্র ক্লাব-গৃহ অনুরণিত হইয়া উঠিল। বিমানবন্ধুর বাটীর দ্বার সম্প্রতি রুদ্ধ থাকায়, নবতান্ত্রিকগণ তাহাদের পুরাতন আড্ডা-ঘরেই সভাধিবেশন করিয়াছিল। সুবুদ্ধিবিনোদ বলিল, "দাদা, আমাদের সুকবি বিশ্ববন্ধু আর একটা চমৎকার কবিতা লিখেছেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রেষ্ঠা নটীর উদ্দেশে তিনি যে অনাবিল ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন, তাতে অরবিন্দের প্রতি কবিবর রবীন্দ্রনাথের চির

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রীতিপ্রকাশ বলিল, "বটে! বটে! এই ত চাই!" তাহার পর বিশ্ববন্ধুর স্কন্ধদেশে যুগল বাহু রক্ষা করিয়া বলিল, "তুমি আমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়, দাদা, কিন্তু তোমার প্রাণটি কি সবুজভরা, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাগজে ওটা ছাপিয়ে দিতে হবে।"

বিশ্ববন্ধু কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিল, "তাই হবে। আমি 'ধ্রুব-তারা' 'মাতৃভাষা' ও 'হিতকথা' আপিসে গিয়েছিলুম। তারা আমার অমন কবিতার যা কদর্থ করলে—"

রোষ ও ক্ষোভের অশ্রুভারে বিশ্ববন্ধুর নয়নযুগল আর্দ্র হইল।

"কুছ্ পরোয়া নেহি,আমাদের কাগজে তোমার কবিতা বেরুবে, দাদা। ও সব চোতা কাগজের বোকারাম সম্পাদকরা তোমার মর্য্যাদা বুঝবে কেমন ক'রে বল? যত সব সেকেলে অর্ব্বাচীন!"

দ্বাদশ সভ্যের করতালিধ্বনি ও গান্ধার পর্দ্দার জয়রব প্রস্তাবটিকে সমর্থন করিল।

৩

"কি পড়ছ, দেখি?"

সুন্দরী তরুণী স্বামীর চেয়ারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সম্মুখস্থ বইখানার নাম পড়িবামাত্র তাহার ললাট রেখাঙ্কিত হইল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "এই সব বই পড়া হচ্ছে—কি বিশ্রী নাম!"

বিমানবন্ধু পত্নীর কমলকোমল পাণি বলিষ্ঠ করতলে ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন, নামটা মন্দ কি? 'প্রেমের পিচকারী' বেশ নূতন নাম নয়? বড় চমৎকার ভাব—সুন্দরী যুবতী স্ত্রী রুগ্ন দরিদ্র স্বামীর চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হইল, শেষে দয়িতকে বাঁচাইবার জন্য মনটি স্বামীর জন্য রাখিয়া দেহটা পর্য্যন্ত অন্যের নিকট—"

ঘৃণাভরে তরুণী বলিয়া উঠিল, "থাম, থাম, আমার ঘৃণা পাচ্ছে। এমন কুৎসিত কল্পনা বাঙ্গালী লেখকদের কলম দিয়ে বেরোচ্ছে! আর আমি তোমার স্ত্রী—তাই আমাকে তুমি শোনাচ্ছ? ছিঃ!"

বিমানবন্ধু চমৎকৃতভাবে পত্নীর তরুণ আননে ক্রোধ লজ্জার আরক্ত দীপ্তির লীলা দেখিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণধারা বিদ্যুতালো-

"দেখ, নারীত্বের মহিমা—"

"ওগো, তোমার পায় পড়ি—ওটার জন্য তোমরা আর মাথা ঘামিও না। নারীত্বের মহিমা খুব গাল-ভরা কথা; কিন্তু পুরুষমানুষের কাছ থেকে যদি মেয়েমানুষকে ঐ সব মহিমা-টহিমা শিখতে হয়, তবে আমাদের গলায় দড়ি দেওয়াই দরকার। আমাদের দিক্‌টা আমরাই দেখব—তার জন্য তোমাদের কোন ভাবনাই করতে হবে না। জন্ম জন্ম ধ'রে মা, ঠাকুরমার কাছ থেকে ও সব আমরা শিখে আস্‌ছি।"

পুলকিতচিত্তে বিমান পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর তুমি, বিভা!"

"তোমার কবিত্বশক্তি আবার উছলে উঠলো দেখছি। একটু থাম না গা!"

"বিমান-দা, আমি আস্‌ছি!"

তরুণী বিভা স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্লথ অবগুণ্ঠন তাড়াতাড়ি মস্তকে সুবিন্যস্ত করিল।

"এস ভাই!" বলিয়া বিমানবন্ধু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বাঃ! যুগলে সৌন্দর্য্যরসের চর্চ্চা হচ্ছিল—বড় বাধা দিলাম ত!" বলিতে বলিতে প্রীতিপ্রকাশ পদবিন্যাসে তরঙ্গ তুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দীপ্ত নয়নে মনোবৃত্তির কোন্ প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—প্রথম না তৃতীয়?

বন্ধুর গৃহে প্রীতিপ্রকাশের অবারিত দ্বার ছিল। বিশেষতঃ বন্ধু-পত্নীর আগমনের পর হইতে তাহার বন্ধু-সম্ভাষণের মাত্রাটা অনেক সময় সীমা ছাড়াইয়া চলিত। কিন্তু বান্ধবীর সাক্ষাৎলাভ সময়ে সময়ে ঘটিলেও এ পর্য্যন্ত সে বন্ধুপত্নীর সহিত আলাপের সুযোগ বা সুবিধা পায় নাই। শিক্ষিতা হইলেও বিভারাণীর মজ্জাগত কুসংস্কার এখনও সংস্কারের আগুনে পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইতে পারে নাই বলিয়া প্রীতিপ্রকাশ অভিযোগ করিত। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের কুললক্ষ্মীকে বিমানবন্ধুর মিনতিভরা অনুরোধ অথবা প্রীতিপ্রকাশের রসচাতুর্য্যভরা অনুনয়ে টলাইতে পারিয়াছিল কি?

অভ্যতাশূন্য সরমের সহিত তরুণী বাতায়নের দিকে মুখ

চলিয়া যাওয়া বোধ হয় বিভারাণী সঙ্গত ও শোভন বলিয়া মনে করে নাই। বিশেষতঃ স্বামী যখন তাহাকে অতটা মিনতি জানাইলেন, তখন একটু অপেক্ষা করিতেই হইবে।

"বৌঠান্, এ দিকে মুখ ফিরুলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপনি শুনেছি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন, তবে অত কুণ্ঠিত হয়ে নারীত্বের সঙ্গত অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখছেন কেন?"

বিমানবন্ধু বলিল, "প্রীতি ঠিক বলেছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত লজ্জার পুঁটুলী হয়ে থাকাটা ঠিক নয়।"

সে পত্নীর কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভারাণীর অলক্তক-চিত্রিত সুঠাম চরণযুগল হইতে ললাটের দীপ্ত সিন্দুরবিন্দুর মোহন শোভা প্রীতিপ্রকাশের দৃষ্টিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই লজ্জানত নয়নের মধুর দৃষ্টিলাভ হইতে বঞ্চিত থাকা নিতান্তই বিড়ম্বনার বিষয়! কিন্তু উপায় কি?

বাক্‌চাতুর্য্যে প্রীতিপ্রকাশ অদ্বিতীয় বলিয়া বন্ধু-মহলে তাহার একটা খ্যাতি ছিল। চেয়ারের উপর একটু নড়িয়া চড়িয়া, কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য ঢালিয়া সে বলিল, "বৌঠান, আমরা মানুষ, বাঘ বা ভালুক নই। এ যুগে নারী ও পুরুষের সমস্যা জটিলতর অবস্থায় নেই, তা অবশ্যই জানেন। আপনি ইবসেন, বার্ণার্ডস নিশ্চয় পড়েছেন। তাঁরা নারীর অধিকার যে ভাবে দেখিয়েছেন, আপনারা যদি তার মর্য্যাদা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে বিভারাণী স্বামীর শিথিল মুষ্টি হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া মৃদুগমনে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

বন্ধুযুগল পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিল। প্রীতিপ্রকাশ বলিল, "তোমার স্ত্রীরত্নটি অদ্ভুত। উচ্চশিক্ষিতার লক্ষণগুলি আশাপ্রদ নয়।"

বিমানবন্ধুর মুখ গম্ভীর হইল।

এমন সময় পঞ্চু ঝি আসিয়া জানাইল, ভিতরে দাদাবাবুর ডাক পড়িয়াছে।

"ব'স ভাই, আমি আসছি", বলিয়া বিমান ভিতরে গেল।

বিভারাণী আরক্ত আননে শয়নকক্ষে দাঁড়াইয়া ছিল। বিমান গম্ভীর মুখে বলিল, "কি ছেলেমানুষী করলে বল ত! একটা উচ্চাঙ্গের আলোচনা হচ্ছিল, মাঝপথে তুমি চ'লে—"

স্বামীকে বাধা দিয়া তরুণী বলিল, "ওগো, তুমি থাম।"

বিমান বলিল, "প্রীতিপ্রকাশ এক জন উঁচু দরের সাহিত্যিক—এ যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক। সে কি ভাবলে বল দেখি?"

বিভা বলিল, "তোমাদের আলোচনা কি শুধু পুরুষ ও নারীর অধিকার নিয়েই চলবে? আর কিছু নেই। তার চেয়ে আইনের বইগুলো যদি পড়, ব্যবসার উন্নতি হবে। আচ্ছা, তোমার বন্ধুকে এক বার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ ত, তিনি ঐ সব বড় বড় সাহিত্যিকের বইগুলো ভাল ক'রে পড়েছেন, না শুধু নামই মুখস্থ ক'রে রেখেছেন?"

"বল কি রাণি, তুমি কি বলতে চাও, ও শুধু গালভরা নামগুলো মুখস্থ করেই রেখেছে—সমস্যার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে নি? প্রকাশকে তুমি কেও-কেটা মনে করো না।"

মৃদু হাসিয়া সুন্দরী বলিল, "তা হ'তে পারে। কিন্তু বাবার কাছে অনেক পাশ করা ছেলে বাঙ্গালা লেখা নিয়ে আলোচনা করতে আসে, আমি দেখেছি; অন্য ঘর থেকে তাদের আলোচনাও শুনেছি। কিন্তু মজা এই, বাবা তাদের প্রশ্ন করতেন, তারা অমনি আমতা আমতা ক'রে থেমে যেত। এমন কি, রবি বাবুর বেশীর ভাগ লেখার সঙ্গে কোন পরিচয়ও যাদের নেই, শুধু চয়নিকার দুই চারটা কবিতা আউড়ে তারাও তাঁর সম্বন্ধে এমন মতামত প্রকাশ করত যে, শুনে আমারই হাসি পেত।"

"ওগো, প্রকাশ সে দলের নয়। সে মস্ত লেখক, সে অনেক পড়েছে। এখন ও ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে একটু আলোচনা করলেই বুঝতে পারবে।"

"না, মশাই, আমার তাতে কোন দরকার নেই। তোমার বন্ধুর সঙ্গে তুমিই ব'সে ব'সে আলোচনা কর গে। আমার ঢের কায আছে। আমি তোমার বন্ধুর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

হতাশভাবে বিমানবন্ধু বন্ধুর কাছে ফিরিয়া গেল।

৩

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিভারাণী ড্রয়িংরুমে বসিয়া স্বামীর জন্য একখানি নূতন ধরণের কার্পেটের আসন বুনিতেছিল। বিমানবন্ধু হাইকোর্টে যাতায়াত আরম্ভ করায় মধ্যাহ্নটা

কাটাইতে হইত। পুত্রের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া পিতা-মাতা পুত্রবধূকে কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কাশীর সংসার ছাড়িয়া আসিতে উভয়েরই পক্ষে নানা বাধা-বিঘ্ন ছিল। বিশেষতঃ বয়স্থা ও শিক্ষিতা বধূ জীবনের আরম্ভ হইতেই যাহাতে সংসারের দায়িত্ব ও স্বামীর সেবার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, উভয়ের মনেই সে আকাঙ্ক্ষা ছিল। বন্ধুকন্যাকে তাঁহারা তাহার শৈশব হইতেই দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং বিমানবন্ধু সংসারবিষয়ে অনভিজ্ঞ জানিয়াই বিভার মত কন্যাকেই তাঁহারা পুত্রের জীবনসঙ্গিনী করিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে প্রতিপালিতা বিশ্বস্তা পরিচারিকা পঞ্চুকেও বধূর দোসর করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অলস মধ্যাহ্নে পরিচারক-পরিচারিকারা নিদ্রামগ্ন। স্বামী প্রায়ই সকাল সকাল কোর্ট হইতে ফিরিয়া আইসেন; নূতন উকীলের কাযকর্ম্ম অল্প, বিশেষতঃ অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিমানবন্ধুর তেমন ছিল না; তৎপরিবর্ত্তে তরুণী পত্নীর সাহচর্য্য বহুগুণে লোভনীয়, প্রার্থনীয়। সুতরাং স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বিভারাণী গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে কার্পেটের উপর ফুল তুলিয়া চলিয়াছিল। বসন্তের মধুশ্রী ছাদের উপর সুবিন্যস্ত টবের গাছগুলিতে নবযৌবনের স্বপ্নসঞ্চার করিতেছিল। বিভারাণী এক এক বার নব বিকশিত কচি কিসলয়গুলির উপর দীর্ঘায়ত নয়নের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার সূচিকর্ম্মে মন দিতেছিল।

"বৌঠান্, আপনার নিভৃত সাধনায় বাধা দিলাম, মাপ করবেন। কিন্তু কি মিষ্টি গলা আপনার!"

বিভারাণী চমকিতভাবে ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বসুন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। বিমানদা এতক্ষণে বাড়ী এসেছে মনে করেই আমি এসেছিলুম্। তা থাক্, ততক্ষণ বরং আপনার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।"

বিভার পার্শ্বস্থ আসনখানি প্রীতিপ্রকাশ বেশ সপ্রতিভভাবে দখল করিল।

তরুণী কি তখন ভাবিতেছিল, স্বামীর এই প্রিয় বন্ধুটির সহিত অতঃপর কি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? ইদানীং স্বামীর ঐকান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সে বিমানবন্ধুর বাক্যালাপও করিয়াছে। কিন্তু নির্জ্জন মধ্যাহ্নে এ অবস্থায় সে কি করিবে?

প্রীতিপ্রকাশ উভয় পাণি যুক্ত করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "বসুন, বৌঠান। এতে কোন অপরাধ হবে না। ভয়ই বা কি?"

না, ভয় তাহার নাই। সে রক্ষকহীনা নহে; কিন্তু যাহার সহিত কোনও বিশিষ্ট সম্পর্ক নাই, এমন কোন পুরুষের সহিত নিরাপদায় মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করার শিক্ষাও সে পায় নাই—সঙ্গত বলিয়াও সে কখন মনে করে না। কিন্তু—

তরুণীর সুন্দর আননে বিরুদ্ধভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে যে বিচিত্র বর্ণরাগের লীলাতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, প্রীতিপ্রকাশ একান্ত লুব্ধদৃষ্টিতে তাহা দেখিতেছিল। সঙ্গিনীহীন জীবন সত্যই ব্যর্থ। যে রূপের পূজারী, যৌবনের সেবক—ভোগ যাহার কাছে কাম্য; বন্ধন-শৃঙ্খল যে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া শুধু বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া যাওয়াকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করে, তাহার সম্মুখে লোভনীয় বরণীয় অর্ঘ্যভার!

বিভার ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি মুক্তার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

শাস্ত্রকাররা বলেন, নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কোন কোন কবি ও ঔপন্যাসিক এ কথা মানিবেন না। তরুণীর ইতস্ততঃ ভাবের অর্থ তাঁহাদের মনস্তত্ত্বকৌশলের নিকট সরল ও সহজ ভাবে ধরা দিয়া থাকে। সেই অপূর্ব্ব কলাকৌশলের প্রভাবে প্রীতিপ্রকাশের মনে আশার সঞ্চার হইল। তাহার তরুণ সুন্দর দেহের লাবণ্য, নটজনোচিত কাব্যময় ভাবের অভিব্যক্তি তাহার দৃষ্টিতে, হাসিতে, আলাপভঙ্গীতে লীলায়িত হইয়া কি রমণীর চিত্তকে অভিভূত না করিয়া পারে—বিশেষতঃ যাহারা শিক্ষিতা বিলাসিনী?

"আপনি Severed Knot—ছিন্নবন্ধন বইখানা পড়েছেন, বৌঠান্?"

প্রীতিপ্রকাশ চেয়ারখানা সম্মুখে টানিয়া আনিল।

বিভার হাত হইতে কার্পেটখানা মাটীতে পড়িয়া গেল। প্রীতিপ্রকাশ উহা তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া তখনই বিভার হাতে দিতে গেল।

"কি সুন্দর আপনি, কি মনোহারিণী মু—"

দীপ্তকণ্ঠে বিভা বলিয়া উঠিল, "স'রে দাঁড়ান, কি সব

ক্রোধে তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

প্রীতিপ্রকাশের জানা ছিল, হিন্দু বাঙালী ঘরের কোন ভদ্রগৃহস্থ-বধূ বা কন্যা চীৎকার করিয়া লোক জড় করিয়া এমন অবস্থায় আপনার সম্ভ্রমহানি ঘটাইতে চাহে না।

অকস্মাৎ সে বিভার কম্পিত দক্ষিণ কর ধারণ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমি একান্ত মজেছি, তোমার চরণে—"

"ছোটলোক, ইতর—পশু!"

সবলে হাত টানিয়া লইয়া সে ডাকিল, "পঞ্চু, পঞ্চু, ঠাকুরপো!"

দীর্ঘাকার যুবকের মূর্ত্তি দ্বারপথে দেখা দিল। তাহার নয়নে আগুন জ্বলিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে দৃঢ় মুষ্টিতে প্রীতিপ্রকাশের স্কন্ধদেশ ধারণ করিল। বাম হস্তে কটিদেশ ধারণ করিয়া সে ঔপন্যাসিককে অবলীলাক্রমে ঊর্দ্ধে তুলিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া দিল।

"পাশের ঘরে আমি ঘুমুচ্ছিলাম, বৌদি! রাস্কেলটার গলার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখনই আস্‌তাম, কিন্তু অপদার্থটা কি বলে, শুন্‌বার ইচ্ছে হয়েছিল।"

সেই দিন সকালে পাঞ্জাব মেলে দেবব্রত কলিকাতায় আসিয়াছিল। সে সংবাদ বাড়ীর লোকই শুধু জানিত।

"ব্যাপার কি" বলিয়া বিমানবন্ধু আদালতের বেশে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবব্রত ভ্রূকুটিভঙ্গে বলিল, "তোমার প্রাণের বন্ধুটি বৌদিকে severd knotএর অপূর্ব্ব তত্ত্ব জানাবার জন্যে এসেছিলেন। তাই কিছু পুরস্কার দেওয়া গেল।"

পঞ্চু ঝি গণ্ডগোল শুনিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ও মা! সেই পোড়ারমুখো মিন্‌ষে! দাদাবাবু, তোমরা পেত্যয় না যাবা, ও আমাকে ক' দিন ধ'রে বলছে, পঞ্চু, তোকে দেখ্‌লে আমার মেসের ঝির কথা মনে পড়ে। তুই বেশ! ও মা, লজ্জায় মরি! বৌদি, ঝাঁটা এনে ওর বিষটা ঝেড়ে দি?"

বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে বিমানবন্ধু দাঁড়াইয়া ছিল। এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে, না বাস্তব জগতে সজ্ঞানে রহিয়াছে?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "প্রকাশের এই কায!"

"কেন, এখনও সন্দেহ আছে না কি, দাদা? তোমার এই বন্ধুর রকম্‌টা যে দিন থেকে দেখেছি, আমার ঘেন্না হয়ে ব্যভিচারের ছবি আঁকে, তারা ভদ্র ঘরের স্ত্রীকন্যাদের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জানে, না পারে?—ওঠ্, হতভাগা, পাজি! ঝাঁটা-জুতোও তোদের জন্য নয়।"

পদাঘাতে লাঞ্ছিত প্রীতিপ্রকাশ বিবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যস্থ সযত্ন-রচিত সীঁথাটি তখন বিগতশ্রী, সিল্কের চাদরখানা দলিত, মর্দ্দিত, হাতের রিষ্ট ওয়াচ ভগ্ন! শুধু 'পাঞ্জাবী'খানা স্থানভ্রষ্ট—কাচজোড়া তাজে নাই।

গম্ভীর স্বরে বিমান বলিল, "দেব, ওটাকে বার ক'রে দে। আজ থেকে ও দলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

দেবব্রতের নির্দ্দেশে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রীতিপ্রকাশ বাহিরে গেল। কক্ষ নির্জ্জন হইলে বিমান বলিল, "রাণি! আমায় ক্ষমা করো। ঐ সব পাপিষ্ঠের রচনাভঙ্গীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে যা অন্যায় করেছি, এখন থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার মনের অন্ধকার আজ কেটে গেল।"

বিভারাণী তখনও সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইতে পারে নাই। ক্রোধ ও ক্ষোভের চাঞ্চল্য তখনও তাহার দেহে লক্ষিত হইতেছিল। সে আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার বাবা তাই যত্ন ক'রে ঐ সব রচনার হাত থেকে আমাদের রক্ষা ক'রে এসেছেন। 'ধ্রুবতারায়' ঐ সম্বন্ধে একটা গল্পও বেনামীতে ছাপিয়েছিলেন।"

মৃদু হাস্যরেখা এতক্ষণে তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে উদ্ভাসিত হইল।

চমকিতভাবে বিমান বলিল, "ওটা তাঁ'র লেখা?"

"তুমি জান্‌তে না, ঠাকুরপো জানেন। তোমাদের সে দিনের আলোচনার কথা আমি ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি।"

কাহার উদ্দেশে বিমান তাহার যুগল পাণি উন্নত করিয়া ললাটে স্পর্শ করিল। সত্য বলিয়া, ধ্রুব ভাবিয়া, সুন্দরের প্রতীক মনে করিয়া সে এত দিন যাহার পূজা করিয়াছিল তাহা যে এ দেশের নহে, এ দেশবাসীর পাচ্য নহে,—তাহা যে আলোকের রাজ্যে শুধু ঘনায়িত অন্ধকার, আজ কি সে সত্য সত্যই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে? ঘনান্ধকার হইতে ঐ যে দীপ্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, উহা কি তাহার জীবনে উষার বিমল স্নিগ্ধ আলোক-রেখাপাতের মত পবিত্র ও মধুর নহে?

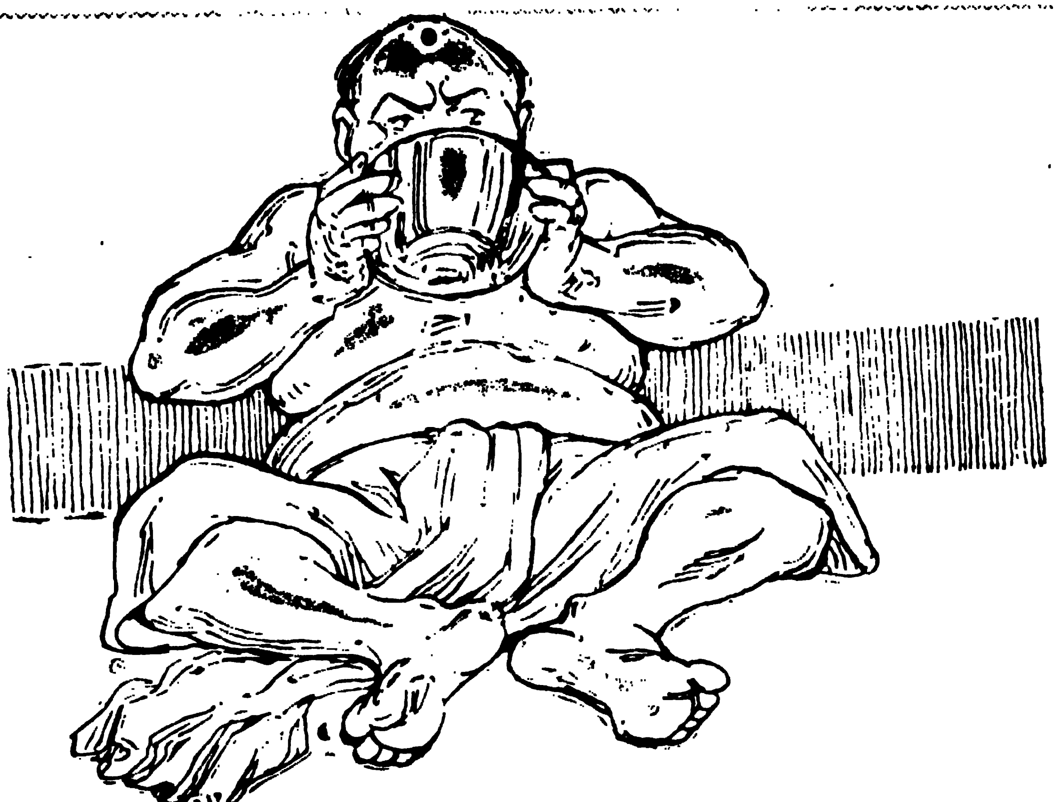
জমীদার বাবুর মন্দাগ্নি



তার পর এক বাটি চা-রুটী আর ডিম



সকালে উঠে একটু মাখন ও দুটো কিসমিস



তার পর একটু (১।৹ সের) দুধ





ভাতে নামমাত্র বসেন



হামিদের হিম্মৎ

(গত মাসের প্রকাশিতের পর)

পয়নালায় পদ্মফুল ফোটার মত ভদ্রবেশে সজ্জিত, ভদ্রভাবে লজ্জিত হামিদ ও ব্রজসুন্দরের মত ছুটি সুশ্রী যুবককে এই ভূতপূর্ব্ব মুস্কিল আসানের নেশার মশানে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই যেন একটু বিস্মিত ও বিচলিত হলো। হামিদের পুরানো কিংখাপের সদরি-ও পীর সাহেব উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ব্রজসুন্দরের গলায় হীরার বোতাম আর বুকের আধ ইঞ্চি মোটা সোনার ষ্টার চেন তাঁকে এমন বিচলিত করলে যে, তিনি নিজে উঠে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁকে এনে আপনার দক্ষিণ পাশে বসালেন ; হামিদ বসল বাম পাশে। মেয়েদের মধ্যে জন কয়েক মাথার কাপড় টেনে দিলে, পীতাম্বর গামছা দিয়ে মুখ মুছে একটু ভদ্র হবার চেষ্টা করলে, আর আব্বাস মিঞা ব্যাধের চোখে ব্রজসুন্দরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

হামিদ বললে, "আজ আপনার সঙ্গে কোন গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ করবার জন্ত আমরা ছ'জনে এখানে এসেছি ; আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম হিন্দুদের উৎপাতে ;—এতে আপনি রাগ করবেন না, রায় কুমার।

ব্রজ। না—না, আমাদের হিন্দুর চোখে কোন ধর্ম্মই নিন্দনীয় নয় ; আর বাস্তবিক ঐ ঢোল-কোলগুলো মহা গণ্ডগোল ; তবে বৈষ্ণবের খোল—রায় বাহাদুর অর্থাৎ আমার দাদা মহাশয় বলতেন—

পীর। রও—রও ; পয়লা এ মজলিসটা বরখাস্ত করি। পীতেম্বর, এনাদের কও আজ ঘর যাতি ; বুঝছি, আজ একটা মফঃস্বলে শলা-পরামর্শ অইব, এই আমাগোর হামিদ গাজী যারে কন পিলেটিটকোল কথা।

ব্রজ। সে কি ?

হামিদ। পীর সাহেবের মনের কথা হচ্ছে পলিটিক্যাল।

ইঙ্গিত বুঝে নারীগণ সসহচর ঘর থেকে উঠে চ'লে গেল। কেবল রইলেন ঘরে পাগলা পীর, মওলানা হামিদ গাজী, রায় কুমার ব্রজসুন্দর, গুণ্ডা আব্বাস মিঞা আর সর্ব্বগুণধর পীতাম্বর গাঙ্গুলী। কপাট বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে একটা মাত্র কথা, লোকের কাণে গেল, তার পর বাইরের লোকে আর কিছু শুনতে পেলে না। সেই কথাটা হচ্চে—"প্যাক্ট।"

৮

পরকালের পথ সুগম হবার পক্ষে অনেক যুক্তি, অনেক প্রলোভন দেখিয়ে-ও পাগলা পীর ব্রজসুন্দর ও হামিদকে গঞ্জিকা ও সুরা সেবনে সম্মত করাতে পারেনি। কিন্তু সুরা ও গঞ্জিকা অপেক্ষা-ও ছুটি তীব্রতর বিষ-বহ্নির জলন্ত শিখা

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, এই অস্পৃশ্য পাজিটি কোন্ নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করেছে, তা ঠিক কেউ বলতে পারে না এবং বোষ্টম থেকে খৃষ্টান পর্য্যন্ত একে একে অনেক ভোল বদলে আপাততঃ সে মোছলমান। হজরৎ মহম্মদ প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের মহত্তত্ত্ব অনেক বাজার-চলন ধার্ম্মিকের মত সে কিছুমাত্র জানে না, কেবল ঠিক ক'রে রেখেছিল, তিনটি গুণ থাকলে-ই লোকে পাকা মোছলমান হ'তে পারে ; এই গুণত্রয় হচ্ছে, প্রথম—শ্মশ্রুদল লম্বীকৃতকরণ, দ্বিতীয়—গোমাংসভক্ষণ, তৃতীয়—হিন্দু-পীড়ন। ইংরাজ-রাজের উপর-ও পাগলা পীরের কতকটা আক্রোশ ছিল, সেটা ট্যাক্স খাজনা দিতে হয় বলে-ও নয়, ইংরাজের ব্যবসায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে বলে-ও নয় ; পীরের প্রথম রাগ—মোছলমানের ছাওয়ালদের তারা এংরাজি পড়িয়ে ধন্ম খোয়াতে বলে, নোকরি দেবে না ভয় দেখায়, আর তারা হাঁদুদের মন্দিরগুলো চুরমার ক'রে তুরে কেলে না আর ভূতের মূর্ত্তিগুলো ফেলিয়ে দেয় না কেন ? তবে ঘাঁটীর পাহারাওয়ালা তামিজুদ্দি তানারে সমজে দেছল যে, সে সরকারী পুলিস, আইন-কানুন সব জানে আর লাট-বেলাটের ভেতরকায় খবর রাখে, কাজে ই বলতে পারে যে,সেকালের বাদশাগোর চায়-ও এই এংরাজরা জাস্তি শিয়ান, তারির জন্যে-ই সরকারি পুইসা তছরূপ ক'রে মজুর লেগিয়ে মন্দিরগুলো তোরবার চায় না, লেকিন হাঁদু হালাদের বেমালুম ইমন এলেম পরিয়ে দ্যাছে যে, তানারা আর ঠাকুর-দ্যাবতা নজরে পড়লি হাত তুলে গড়টা-ও করে না, কেবল বজ্জাতি ক'রে একটা মাটীর মোরদে রাঙতবক মুরে ডাক-ঢোল পিটে আমাগোর মত মিঞাছাহেবদের জান্ ত্যাক্ত করি দিতি থাকে।

স্বকপোল-কল্পিত ইসলামধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম ব'লে পীর ছাহেব হামিদের তরুণ মনে বিষ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে মাস কয়েকের মধ্যে বেচারার মস্তিষ্ক এমন গরম ক'রে এমন বিগড়ে দিলে যে, তার মুখচোখ থেকে মানবশ্রী কোমলতা একেবারে অন্তর্হিত হলো ; ক্রূর চিন্তা তার শান্ত কপোলযুগল কাকপক্ষীর পদাঙ্কে কলঙ্কিত করলে ; চক্ষুর মিষ্ট চাহনি হরণ ক'রে সেথায় বসল নিষ্ঠুর দুষ্ট দৃষ্টির রক্ততৃষ্ণা।

নিশি ভয় পেলে, বড় ভয় পেলে সেই শান্ত মেয়ে নলীবনটি। নিশি ডাক্তার-কবরেজ ডাকতে চায়, হামিদ খিঁচিয়ে ওঠে ; স্বহস্তে যত্ন ক'রে সুবাসিত সরবৎ নিয়ে স্বামীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়; স্বামী পেয়ালা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে

এক দিন বৈকালে হামিদ কোথা থেকে ঘুরে-ফিরে এসে শুনলে যে, নিশি বেলা দু'টোর পর পাল্কী ডাকিয়ে আমাদের বাড়ী গেছে। বে-পর্দ্দা বে-তমিজ মেয়ে ইজ্জৎ লে লিয়া, আর-ও কত কি ব'লে হামিদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছে, এমন সময় নসীবন ফিরে এসে তার সামনে উপস্থিত হলো; বিকৃতমস্তিষ্ক হামিদ দৃঢ় মুষ্টিতে তার কোমল কবরী-বেষ্টন আকর্ষণ ক'রে ব'লে উঠল, "হারাম-জাদি, কসবী!"

নসীবনের গোলাপী মুখখানি সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠে নিমেষমধ্যে ছাইপানা হয়ে গেল, সে কচি ডগাটির মতন লতিয়ে ভূঁয়ে প'ড়ে গেল।

হিমাদ্রি হ'তে আরম্ভ ক'রে সমস্ত উত্তর-ভারতের পাথরের গা থেকে নরম মাটী ধুয়ে ধুয়ে এনে সিন্ধুসঙ্গমে পৌঁছুবার পূর্ব্বে মা গঙ্গা বঙ্গের যে অঙ্গটুকু গ'ড়ে রেখে গেছেন, জাহ্নবী-জলসিক্ত কাদার মত কোমলতা-ই তার দোষ, কোমলতা-ই তার গুণ। বাঙ্গালা কোমল বলে-ই এখানে খিলিজীর গলিজ কায চলেছিল, কোমল বলে-ই বাঙ্গালা ক্লাইভের কারসাজী বুঝতে পারেনি। কলার মতন মিষ্ট কোমল ফল বাঙ্গালাদেশে-ই বেশী, নারিকেলের কঠোর খোলের ভিতরে-ও সুমিষ্ট পানীয়। যে বাঙ্গালার মাটীতে দু'টো আঁচড় দিলে-ই খানিকটা জল ওঠে, সেই বাঙ্গালার চোখে-ও পরের বেদনার বাতাসে জল আসে। মুখে যত-ই কলরব করুক, আরব বাঙালী মুসলমানের প্রাণের দৃষ্টিপথের দূরান্তরে।

মুখে খোরাসানী-কোরাসানী যাই বলুক, হামিদের জন্ম বঙ্গে, তার ভায়া, ভালবাসার ভাষা, বেদনার ভাষা বাঙ্গালায়; আশৈশব বাঙ্গালীর সংসর্গে থেকে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সুধারস আস্বাদন ক'রে সে শেখেনি, তার মনের ভিতরকার মন শেখেনি, স্বর্গের পথে প্রবেশ করতে হ'লে কর্কশ কুঠারের প্রয়োজন; তাই নসীবন অচেতন হয়ে প'ড়ে যেতে-ই হামিদের চোখ দু'টি থেকে ঝর্-ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগল; সে ব'সে পড়ে-ই সেই নবনীতকোমল অঙ্গে হাতখানি রেখে ছিন্ন-বৃন্ত শতদল তুল্য মাথাটি আপনার কোলে তুলে ব'লে উঠল, "কি কল্লেম, কি কল্লেম—মেরে ফেল্লেম না কি! আমার নিশিকে মেরে ফেল্লেম না কি!"

সেই রাত্রে নসীবনের জ্বর হলো, গা যেন ধান দিলে খৈ ফুটে; পাঁচ দিনের দিন প্রাতে গায়ে দু'একটা গুটী দেখা দিলে। হামিদ খেলেছে, পড়েছে, পরে রাজনীতির মাঝে হৈ-চৈ ক'রে বেড়িয়েছে; সংসারে কখন-ও কোনরূপ অভাব বোধ করেনি, আশার অধিক তৃপ্তি পেয়েছে, কোন কাযে-ই কখন-ও, বাধা পায়নি। আর এক জন তার জন্যে দস্তরখানা বিছিয়ে দিবে সে খেতে বসেছে, তুক্তাবশিষ্টে আর পাঁচ জনের পরিতৃপ্তি হয়েছে; নসী তার কাপড়-চোপড় বেরিয়েছে। বাল্যে দু'একবার সামান্য পীড়ায় পিতামাতা পিতামহের যথেষ্ট পরিচর্য্যা পেয়েছে; রোগীর শিয়রে কখন-ও তাকে বস্‌তে হয়নি, রোগীর সেবা কেমন ক'রে করতে হয়, তা সে জানে না; তবে সে শুনেছে যে, বসন্ত বড় বিষম ব্যাধি; তাড়াতাড়ি গিয়ে এক জন ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে আরম্ভ করলে।

নসীর পীড়ার সংবাদ পেয়ে পাড়াশুদ্ধ লোক চঞ্চল হয়ে উঠল। সকলে-ই মনে করেছিল যে, শলা পরামর্শ ও সাহায্যের জন্যে হামিদ আমাদের বাড়ী আসবে, কিন্তু আট দিন হয়ে গেল, রোগের অবস্থার কেউ কোন একটা নিশ্চয় খবর দিলে না, নানা জনে নানা কথা বলে, পিসীমা ভয়ানক উতলা হয়ে উঠলেন।

তিনি বাড়ীর মেয়েদের কারুর কোন মানা না শুনে পাল্কী ডাকতে লোক পাঠালেন। এক সময় এই পাড়ার আড্ডায় দু'সাতখানা পাল্কী আর বিশ বাইশ জন বেয়ারা প্রায়-ই থাকত; ক্রমে এখন সে যায়গায় একখানিমাত্র পাল্কীতে দাঁড়িয়েছে; যে ডাকতে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে বল্লে যে, চারটে বেয়ারার মধ্যে একটার জ্বর হয়েছে আর এক জন মুকুয্যেদের বাড়ী, তাদের বামুন আজ আসেনি ব'লে সেথায় পৈতে গলায় দিয়ে রাঁধতে গিয়েছে; কাযে-ই দু'জনে কেমন ক'রে পাল্কী ব'য়ে নিয়ে যাবে। ব'য়েরা ভাবলে, যাক্, পাল্কী পাওয়া গেল না, ভাল-ই হলো, কিন্তু পিসীমা সেটা ভাল ব'লে বুঝলেন না, তিনি ঝিকে বল্লেন, "একখানা 'রোক-শোধ' ডেকে নিয়ে আয়।" পিসীমা রিক্সাকে 'রোক্-শোধ' বলতেন; মাথার কাপড় টেনে দিয়ে পিসীমা 'রোক্-শোধ'-এ গিয়ে উঠলেন।

শুদ্ধাচারিণী কায়স্থ-ঘরের বিধবা, তাতে যে পিসীমার শুচিবাই আছে ব'লে একটা বদনাম ছিল, তাঁকে একেবারে দুড় দুড় ক'রে সিঁড়ি বেয়ে মোছলমানের বাড়ীর দোতলার ঘরে ঢুকতে দেখে হামিদ অবাক্ হয়ে গেল, সে অভ্যাসবশতঃ পায়ের কাছে একটা ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে-ই ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। পিসীমার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নিশি যেন তাঁকে চিন্‌তে পার্‌লে, তার দু'টি চক্ষু দিয়ে-ই ফোঁটাকতক জল গড়িয়ে পড়ল।

পিসীমা বল্লেন, "হ্যাঁরে, হেমা! তোর হয়েছে কি? তোর কি একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিশির উপর মা'র অনুগ্রহ হয়েছে, বাছা শুনেছি ক'রাত ধ'রে বে-ভুল বকছে, আর তুই একটা কাকের মুখে-ও আমাদের খবর পাঠাসনি; আবার শুনলুম না কি ডাক্তার দেখাচ্ছিস!"

হামিদ। তা পিসীমা, কি করি বলুন, এ অঞ্চলে ত ভাল হকিম পাওয়া যায় না।

পিসীমা। হাকিম-বদ্যিতে করবে কি? আর এ

হামিদ। তবে কি করতে বলেন বলুন ?

পিসীমা। এ ওষুধের শিশিগুলো ফেলে দে, ডাক্তার-টাক্তার কাউকে এ ঘরে ঢুকতে দিসনি; মা'র কৃপা না হ'লে এ ব্যামো সারে না। শুদ্ধাচারে থেকে মাকে একমনে ডাকলে তিনি স্বয়ং এসে শিয়রে ব'সে গায় পদ্ম হাত বুলিয়ে দেবেন, তা হ'লে-ই নিশি আমার শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

হামিদ। কিন্তু পিসীমা, আমাদের ইস্‌লামধর্ম্মে——

পিসীমা। কালকের ছেলে দু' দিন বিয়ে ক'রে একেবারে ভারী বুড়িয়ে গেলি দেখছি যে, হেমা! মেয়েটার এই সঙ্কটাপন্ন পীড়ে, আর ও কি না বলে, এখন সেলাম ধর্ম্ম! নসী আমার ভাল হয়ে উঠুক, তখন যত পারিস সেলাম করিস। তোর ঠাকুদ্দা আমাদের রাজ-রাজেশ্বরের চন্নামেত্ত তোকে কত খাইয়েছে, তা জানিস ?

হামিদ আমতা-আমতা করতে লাগল। পিসীমা যাবার সময় বাড়ী থেকে একটা পিত্তলের ঘটী ক'রে এক ঘটী গঙ্গাজল নিয়ে গিছলেন; সেই ঘটী নিজের মাথায় ঠেকিয়ে মা শেতলাকে প্রণাম করলেন; ঘরের এক কোণের মেঝেটার এক কোণ জল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে ঘটাটি সেখানে স্থাপন ক'রে আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন; ফোঁটা কতক ঘটের জল নিশির মাথায় চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে চক্ষু বুজে মিনিট পাঁচেক ধ'রে রইলেন, কি অস্ফুট রবোচ্চারণে তাঁর ওষ্ঠাধর কম্পিত হ'তে লাগল। ঘরে লোবান ছিল, একটু আগুন ক'রে ধুঁয়া দিয়ে হামিদকে বললেন, "খানিকটা ধুনো আনিয়ে রাখিস, ভুলিস নি, আর লালু ভুলুকে পাঠিয়ে দেবো, তা'রা পালা ক'রে তোর সঙ্গে রাত জাগবে।"

হামিদ। তা' পিসীমা, লালু বাবু, ভুলু বাবু—

পিসীমা। তারা এখানে এলে তোর জাত যাবে ?

হামিদ। আজ্ঞে, তা নয়, তবে এটা ছোঁয়াচে ব্যামো।

পিসীমা। যে একমনে সেবা করে, তার ছোঁচ লাগে না রে—লাগে না, আমি ঢের দেখেছি। হ্যাঁ, ভাল কথা, যদ্দিন না ও নেয়ে ধুয়ে সেরে ওঠে, তদ্দিন যেন বাড়ীর ভেতর মাছ-মাংস, প্যাঁজ-রসুন-কসুনগুলো ঢোকে না, তা হ'লে কিন্তু আমি নয়-নেত্য করব ব'লে রাখছি।

এই ব'লে পিসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পিসীমার মুখের কাছে তাঁর নিজের বাপ পর্য্যন্ত দাঁড়াতে পারতেন না, তা হামিদ ত ছেলেমানুষ; বিশেষ নসীবনের জীবনের ভয় তার সকল রকম মাদকতাকে কাটিয়ে দেছে।

৯

লোকে যেমন লাটসাহেবের-ও তোয়াক্কা রাখিনি বলতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টারকে-ও হয় ত আড়ালে দু'টো গাল দিয়ে নেয়, কিন্তু পুলিসের নাম শুনলেই কেঁপে উঠে জোড় হাত ক'রে ফেলে, তেমনই হিন্দুদের দেবতার মধ্যে ওঁকে বা সকলকে অগ্রাহ্য করলে-ও মা শীতলাকে বড় কেউ ঘাঁটাতে চান না, তা তিনি হিঁদুই হোন, ব্রাহ্মই হোন, খৃষ্টান-ই হোন বা মুসলমান-ই হোন।

ভিখারী ভিক্ষে চাইতে আসছে, কেউ বলছেন, হাত জোড়া, কেউ বলছেন, চাল বাড়ন্ত, কেউ বলছেন, এখন ফিরে দেখ, কেউ বা বলছেন, আমাদের শুভ অশৌচ হয়েছে, কিন্তু একটা ডোমের পণ্ডিত কি নড়েভোলা উড়ে খানিকটে তামা-কের দলাতে সিঁদুর মাখিয়ে শেতলা মা ব'লে মন্দিরে বাজিয়ে এসে দাঁড়াক দেখি—অমনি কোন বউ-মা ছেলের মাথায় ঠেকান বাবা ঠাকুরের পয়সাটি বের ক'রে তাকে দিচ্ছেন, কোন কাছা-গলায় দেওয়া বি, এ পাশ বাবু বাক্সর চাবি খুলছেন, তখন আর অভাব অনাটন অশৌচ কিছুই নেই।

পীতাম্বর গাঙ্গুলীর মুখে নসীবনের আরোগ্যলাভের প্রত্যাশায় হামিদ আপনার ঘরে শীতলার ঘট পাত্‌তে দিয়েছে শুনে পাগলা পীর একেবারে রেগে তেলে বেগুনে জলে উঠেছিল। সে একেবারে ক্ষ্যাপা হয়ে ব'লে উঠল, "কোস্ কি রে বাম্‌না, কোস্ কি ? হালার ঘরের হালা হাম্‌দে, লকড়ী বেচা টৌওয়ের ছাওয়াল কি না, তাই জরুর খাতিরে গরু খাওয়া বন্ধ দিছে, ইমান খোয়াতে বসছে! আ হালা! এড্ডা জরু জাহান্নমে যায়, দশ দশটা বিবি সাদী করতি পারবা। মোগার মজলিস্ থে সব গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পেঁঠইছি যে, মুই খোয়াব দেখছি, জলদি বাদশাই আমল আবার পালটী আস্‌বা; এ বদি মফঃস্বলে তাই ছাহেবরা এড্ডা এড্ডা গাঁয়েথে সাড়ে সাত কাহন ক'রে হাঁদুর আউরৎ পাক্‌রে কাবাব খেইয়ে খোদার নাম বলাতে পারে, তা হ'লেই বিবি পাবার আর দুক্ক কি; ওই হামদেরে মুই তিন গণ্ডা বিবি সাদী করিয়ে দ্যাব, এক এক বিবির প্যাটের থে বদি পাঁচটা ক'রে ছাওয়াল পয়দা হয়, তা হলি-ই তিন গণ্ডা বিবির পাঁচটা ক'রে কত দাঁড়াল রে পীৎমে ?"

পীতাম্বর। তা—তা—তিন গণ্ডায় হলো বার আর পাঁচ, তা হ'লে পাচ বারং পয়ষট্টি।

পাগলা পীর। হঃ—ঐ এক্কা হামদের প্যাটের থেই পাইষট্টিটা মামদো বার হয়ে হাঁদু হালাগোর গর্দ্দানটা মটকে দিতি পারে।

পীতাম্বর। আচ্ছা পীর চাচা, হিঁদুদের উপর তোমার এতটা গোঁসা কেন, বলতে পার? এই আমি ত হিঁদু, যে সে হিঁদু নই, একটা বামুন, সেই আমি-ই ত তোমার কত ফাই-ফরমাস খাটি; আর-ও কত হিঁদুর ছেলে এসে তোমায় সেলাম ক'রে দরগায় সিন্নি দেয়; ঐ অন্ধ বড় ব্রজসুন্দর রায় সে দিন তোমায় পাঁচ-পাঁচ টাকা সেলামী দিয়ে গেল। আর শুনতে পাই, কেউ বলে যে, তুমি-ও না কি এক সময় হিঁদুর ঘরে জন্মেছিলে!

ভ্যাতে অইছে কি রে হালা? অ হালা, মুই যে বুজরুক। বুজরুক কারে কয় হালা, সমঝ্ করিস? যারে ঐ বই-মরা নীলে কয়। মোর আসল খানদানী হচ্ছে কাবুল মুলুকে, মোর নানার মুরা একটা জিনের কাঁধে চাপে সেই মুলুক থে আইসে তাহার জিলার রামপাল পরগণা ফতে ক'রে একটা বেদানার কেল্লা বানায়, তা মালুম করিস্?

পীতাম্বর। আমি ঘটী-বাটি থেকে ঘড়ী-চেন অবধি বেমালুম সরাতে পারি বাবা, কিন্তু তোমায় আজ-ও মালুম করতে পারলুম না।

পীর। পারবা, পারবা, মোর সাথে এক পেয়ালায় সরাব খাইছিস্, যে রোজ এক সানোকে শিখকাবাব খাবা, সেই রোজ মোরে কিছু কিছু মালুম করবা।

পীতাম্বর। না বাবা, ঐটে বাদ দিয়ে আর যা বল্বে, তা করতে পারি। এই দেখ, তোমায় খুসী রাখবার জন্যে বামুনের ছেলে হয়ে বাদিপোতার কাপড় পর্য্যন্ত কাছা খুলে পরছি।

পীর। ঝ্যাহন লুঙী পিনেছিস, তহন ত আধা মোছলমান অইছিস; দিতি পারলি না ঐ হামদের ঘর থে সেই ছাতলা বিবির ঘটটা কানাচে ফ্যালায়ে?

পীতাম্বর শিউরে উঠে দু'কানে আঙুল দিয়ে বল্লে, "ছি ছি বাবা, ও কথা কানে শুনিও না, আমি বলতে গেলে পুলিসের এক রকম দোস্ত, কিছুই মানিনি, তবু তিনটি ঠাকুরকে সত্যি সত্যি ভয় করি; প্রথম মা শেতলা, দ্বিতীয় মা ওলাবিবি, আর—আর মধ্যে মধ্যে পাড়াগাঁ অঞ্চলে স'রে থাকতে হয় ব'লে মা মোনসাকে-ও মনে মনে নমস্কার করি।"

বিরাজ-মা নীলাম্বরী শাড়ী প'রে মাথায় কাপড় দিয়ে এক পাশে ব'সে মালা জপছিলেন, তাঁর পনের বছরের মেয়েটা এক ছোঁড়া বয়াটে বাবুকে ভালবেসে ব'য়ে যাচ্ছে, তা'র মন ফেরাবার জন্যে এক গোছ পান, পাঁচটা সুপুরী, পাঁচ কাঁচ্চা গাঁজা আর নগদ পাঁচ সিকে জানান্ দিয়ে পীরের কাছে আর্জ্জি দাখিল করবেন ব'লে আজ তাঁর এখানে আসা। ক্রমাগত শীতলা-নিন্দে শুনে শুনে তিনি আর থাক্তে পারলেন না, গলায় আঁচল দিয়ে যোড় হাত ক'রে বল্লেন, "বাবা, তুমি দেবতা হ'লেও গায়ে মানুষের চামড়া মুড়ে পিরথিমীতে এসেছ, যেখানে রক্তমাংস, সেইখানেই ব্যামো-পীড়ে; মা শেতলাকে অমন ক'রে অতুচ্ছু করো না বাবা; কোন্ দিন কি হয়ে বস্বে—আর তোমায় টেনে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে; তখন আমাদের দশা কি হবে, বাবা? তোমার আগমনেই এই সোনাগাছীটে যে পীঠস্থান হয়ে উঠেছে পীর সাহেব।"

পাগ্লা পীর বল্লে, "হাম্‌দে হালার পুত শোনছি গোয়াবাগানের এক হালা রাম্‌নাকে ঐ ঘটী-পূজো করবার লাগে হররোজ দু' দুটো ক'রে টাহা দিচ্ছে, আর বাঁদীর বিটা মোর

বিরাজ-মা। তা বাবা, তুমি রাগ কোরো না, আমি আজই গোলাপ, নিস্তার, কাগজি কিরণ, দর্জ্জি-পুঁটী-টুটীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মক্ষা বুড়ীর নাৎজামায়ের হয়ে তোমার জন্যে একটা বড় রকম পূজো তুলে দেব।

পীর। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুই হালীর বিটি গেল জন্মে কি এড্ডা ভারী রকম গুণা করছিলি, তারির লগে কোন নাখোদা-টাখোদার ঘরে না গিয়ে বেণের প্যাটে পয়দা হইছিস্; যে রোজ তোর হাতের ঐ মালার বদলে তসবি দিতে পারমু, সেই রোজ-ই মোর এই পীরির কামের ফতে হবে। খোদার মোবারকে তুই আখেরে নিমতলা পানে না যাইয়ে ঝ্যাতে মাণিকতলা বাগে গস্ত করিস, আমি পাঁচ সাঁঝ তারির লাগে দওয়া করি। যদি হাঁদু হালারা তাগোর পূজোর বন্দোবস্তে যে খরচা পরে, তারির একটা বড় রকম হিস্যে মোর আস্তানায় দাখিল করে, তা হ'লে এই ঢোল-ঢাক নিয়ে যে গোলমাল বাধছে, মুই-ও তার একটা রফা কইরে দিতি পারি।

১০

কে কোথায় কার নিন্দে করছে বা সুখ্যাতি করছে, এ সব খবর হামিদের কাণে কিছু-ই পৌছায় নি; লালু তা'কে জোর ক'রে এক আধবার খেতে বা শুতে পাঠিয়ে দেয়, নইলে সে নসীবনের রোগশয্যার পাশে দিবারাত্রি ব'সে থাকে। সেই তরুণীর যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্ফুট কাতরশ্বাস হামিদের বুকের হাড় কখানা ভেঙ্গে দিয়ে যেন তার অন্তরে বিদ্ধ হ'তে থাকে; এই বিষম বেদনাদায়ক জীবন-সঙ্কট পীড়ার মূল যে সে নিজে, সতত এই কথা মনে ক'রে সে অনুতাপের আগুনে পুড়তে থাকে।

বেদানা, কিস্‌মিস্, মিছুরি-টিছরি নিয়ে ব্রজসুন্দর হামেশা নসীবনের খবর নিতে আসে, আর হামিদকে অনেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দেয়; হামিদ শুনে, কাঁদে, কিন্তু মনকে কিছুতেই বুঝাতে পারেনা, প্রাণ তার কোনমতে-ই শান্ত হয় না।

উনিশ দিনের দিন সকালবেলা নসীর মুখ পানে চেয়ে নতজানু হামিদ জোড়করে ঊর্দ্ধমুখে জয় দয়াময় ব'লে একটা যেন শান্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে।

হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী, ব্রাহ্ম, নানকপন্থী সকলেই যে মধুর মহান্ উপাধি দিয়ে জগৎপিতাকে ডাকতে পারে, সেই দয়াময় নাম হামিদের হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ ক'রে তা'র কণ্ঠ হ'তে নিঃসারিত হলো।

ক্রাইসিস কেটে গেছে, নিশির জীবন আবার স্বাস্থ্যের পথ চিনতে পেরেছে; মৃদু কণ্ঠে ঈষৎ হেসে সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি——"

হামিদ উত্তর করলে, "হ্যাঁ নিশি, আমি তোমার হেম।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পরলোকে শ্রীকালী ঘোষ

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শ্রীকালী ঘোষ মহাশয় গত ২০শে ফাল্গুন বুধবার রাত্রিকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সন ১২৭০ সালে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার গোপালনগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন—সে বয়সলাভ অনেক বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে না, তিনি সেই বয়সে পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার জন্য আমরা শোকানুভব করিতেছি। তাহার কারণ, নব্যবঙ্গের শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাহসী ও সাধু শ্রীকালী বাবুর একটি নির্দ্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থান ছিল; সে স্থান তিনি অর্দ্ধ-শতাব্দীর শ্রমে অধিকার করিয়াছিলেন; সে স্থান পূর্ণ করিবার কাহাকেও আজ দেখিতে পাইতেছি না। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বলিতেন,—"শ্রীকালী বাবুর শোণিতে একবিন্দু অসাধুতা নাই।" ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহা সামান্য কথা নহে। শ্রীকালী বাবুর কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার রাধাবাজারের "ঘোষ মিত্র কোম্পানীর" ছোট আফিসটিই ছিল না। দেশে ব্যবসা-পত্তনের যত প্রয়াস বাঙ্গালী গত ৩০ বৎসরের মধ্যে করিয়াছে, সে সকলেরই সহিত তাঁহার কোন না কোনরূপ যোগাযোগ ছিল। তিনি অকাতরে উপদেশ ও অবসর দিয়া সে সকলের সাফল্যসাধনে সাহায্য করিতেন। গত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালীর শিল্পপ্রতিষ্ঠাদিতে কোন্ কায শ্রীকালী বাবুকে বাদ দিয়া হইয়াছে? স্বদেশী যুগে তাঁতের কায—কলের তাঁত প্রচলন, দিয়াশলাইয়ের কারখানা, পেন্সিলের কারখানা, সাবানের কারখানা, কাচের কারখানা—কোন্‌টিতে শ্রীকালী বাবুর সাহায্য বা উপদেশ বা উভয়ই ছিল না? শ্রীকালী বাবুর উপদেশ ব্যতীত স্যার নীলরতন বা শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতেন কি না সন্দেহ। শ্রীকালী বাবুর সাহায্য ব্যতীত বাঙ্গালী অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ের পথ দেখিতে পাইত না।



শ্রীকালী ঘোষ

শ্রীকালী বাবুকে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি স্বদেশীর সময় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ নেতৃগণের সহিত একযোগে কায করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত পূর্ব্বে যে শিল্প বাণিজ্য সমিতির অধিবেশন হইত, তাহাতেই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল।

শ্রীকালী বাবু ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা প্রবল থাকায় তিনি নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। বাটার মত জটিল বিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনেককে সাহায্য করিত। তিনি দীর্ঘকাল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স—বণিক সভার কার্য্য-নির্ব্বাহকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন এবং তথায় বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীদিগের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সাহস ও সাধুতা থাকায় তিনি কখন বিচলিত বা নিরাশ হইতেন না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে জোয়ার ও ভাঁটা আছে। তাঁহাকেও ভাঁটার টান সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধবয়সেও তিনি তাহাতে নিরাশ হয়েন নাই, পরন্তু পূর্ণোদ্যমে কায করিতেন। কাযেই তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তিনি অন্তরে গীতার উপদেশ অনুভব করিয়াছিলেন—কর্ম্মেই তোমার অধিকার।

তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফল তিনি যতটুকু সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহা সামান্য, কিন্তু তাহার অধিক ফল সম্ভোগ করিবে তাঁহার দেশবাসী। তাহাদের মধ্যে অনেকে শ্রীকালী বাবুর নাম শুনে নাই; উত্তরকালে তাঁহার নাম—এই তেজস্বী, কিন্তু বিনয়ী, স্পষ্টবাদী, কিন্তু মিষ্টভাষ—বাঙ্গালীর নাম বিস্মৃতির অতল তলে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালায় শিল্পপ্রতিষ্ঠায় যুগে শ্রীকালী বাবু যে কায করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা—যাহারা তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়াছি, স্নেহ লাভ করিয়াছি, কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার ন্যায় সামাজিক 'সেকেলে' বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইতেছে। তিনি তাঁহার প্রথম বয়সের বাঙ্গালী সমাজের অনেক কথা জানিতেন। এ বিষয়ে কেন, পৃথিবীর নানা বিষয়ে তিনি 'তথ্যের খনি' ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীকালী বাবুর মৃত্যুতে আমরা এক জন আত্মের বন্ধু হারাইলাম। তিনি ব্যক্তিগত হিসাবেই কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন না। তিনি "বসুমতীর"ও পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও নিয়মিত পাঠক ছিলেন। যখন দৃষ্টিশক্তির হীনতাহেতু তিনি আর বড় বাহিরে গতায়াত করিতেন না, তখনও 'বসুমতী'-সাহিত্য-মন্দিরে তাঁহার আগমন বন্ধ হয় নাই। নিত্য তাঁহাকে "বসুমতী" পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত। এই সকল কারণে আজ আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

আজ তাঁহার স্মৃতি সম্মুখে রাখিয়া আমরা কামনা করিতেছি—বাঙ্গালায় তাঁহার আদর্শ অনুসৃত হউক, বাঙ্গালী সাহসে, সাধুতায়, ব্যবসা-বুদ্ধিতে শ্রীকালী বাবুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার দারিদ্র্য-সমস্যা-সমাধানে সাফল্যলাভ করুক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত



রোহিলা-শৃঙ্গার

প্রাচীন চিত্র।

[শ্রীযুক্ত হরিহর শেট মহাশয়ের সৌজন্যে।



৫ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৩ [ষষ্ঠ সংখ্যা

রসশাস্ত্র

এই তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যভিচারিভাব কোন্ রসে বর্ণনীয়, তাহা জানা আবশ্যক। যে রসে যে ব্যভিচারিভাবের উপাদান করিলে রসপ্রতীতি ব্যাহত হয়, সেই রসে তাহা বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। নিম্নে যে তালিকাটি প্রদত্ত হইতেছে, তাহার দ্বারা কোন্ রসে কোন্ ব্যভিচারিভাবের উপাদান করা হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রস	বর্ণনীয় ব্যভিচারী
১। শৃঙ্গার	উগ্রতা, মরণ, আলস্য ও জুগুপ্সা ব্যতিরিক্ত সমস্ত ব্যভিচারিভাবই বর্ণনীয়।
। হাস্য	নিদ্রা, আলস্য ও অবহিত্থ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৩। করুণ	নির্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ; জড়তা, উন্মাদ ও চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব প্রধান-
৪। রৌদ্র	উগ্রতা, বেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মদ, মোহ ও অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৫। বীর	ধৃতি, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৬। ভয়ানক	জুগুপ্সা, বেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার ও মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৭। বীভৎস	মোহ, অপস্মার, আবেগ, ব্যাধি ও মরণ প্রভৃতি বর্ণনীয়।
৮। অদ্ভুত	বিতর্ক, আবেগ ও হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৯। শান্ত	নির্বেদ, হর্ষ, স্মরণ ও মতি প্রভৃতি বর্ণনীয়।

ব্যভিচারিভাবের ন্যায় কোন্ রসে কোন্ অনুভাব বর্ণ-

রস	বর্ণনীয় অনুভাব
১। শৃঙ্গার	ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষ প্রভৃতি।
২। হাস্য	অক্ষি-সঙ্কোচন ও বদন-স্মেরতাদি।
৩। করুণ	দৈবনিন্দা, ভূমিতে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উচ্ছ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস, স্তব্ধভাব ও প্রলাপ ইত্যাদি।
৪। রৌদ্র	ভ্রূকুটী, ওষ্ঠ নির্দংশন, বাহু আস্ফালন, ভর্ৎসন, আত্মশ্লাঘা করা, অস্ত্র উৎক্ষেপণ প্রভৃতি।
৫। বীর	সহায় ও অন্বেষণাদি।
ভয়ানক	বিবর্ণতা, গদ্গদভাষণ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, এদিক্ ওদিক্ তাকান ইত্যাদি।
৭। বীভৎস	নিষ্ঠীবন, মুখ-কম্পন, চক্ষুঃ-সঙ্কোচন প্রভৃতি।
৮। অদ্ভুত	স্তব্ধ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্গদবাক্য, সম্ভ্রম ও নেত্রবিকাশ প্রভৃতি।
৯। শান্ত	রোমাঞ্চ প্রভৃতি।

অনুভাব কাহাকে বলে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাব অন্তঃকরণে সমুদিত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই কাব্য ও নাটক প্রভৃতিতে বর্ণিত হইলে ব্যভিচারিভাব বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সকল ব্যভিচারিভাবরূপ-মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে 'রতি' প্রভৃতি স্থায়িভাবের যে সকল কার্য্য আমাদিগের দেহে উৎপন্ন হয়, সেইগুলিই অনুভাব বলিয়া কাব্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

যাহার দ্বারা আমরা অপরের হৃদয়স্থিত ভাবনিচয়ের অনুভব বা অনুমান করিতে সমর্থ হই, তাহাই হইল অনুমান অর্থাৎ অনুভবের বা অনুমিতির হেতুই অনুভাব শব্দের যৌগিক অর্থ। কাহারও হৃদয়ে অনুরাগ প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে, তাহার দেহে বা নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহে যে সকল চেষ্টা উদিত হয়, তাহাই অনুভাবপদবাচ্য। কারণ, ঐ সকল চেষ্টা দেখিয়াই লোক অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়ী বা ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের অনুমান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ;—সামান্য অনুভাব ও সাত্ত্বিক অনুভাব। যে সকল চেষ্টা আমাদিগের ইচ্ছা ও প্রযত্নের দ্বারা সাধিত হয়, সেই সকল চেষ্টাকেই সাধারণ বা সামান্য অনুভাব বলা যায়। একটি উদাহরণ দেখিলেই এই সামান্য অনুভাবের স্বরূপ বিস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

> "ভূয়ো ভূয়ঃ সবিধ নগরী রথ্যায়া পর্য্যটন্তং,
> সাক্ষাৎ কামং নবমিব রতির্মালতী-মাধবং যৎ।
> দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ভবন-বলভীতুঙ্গ-বাতায়নস্থা,
> গাঢ়োৎকণ্ঠা-লুলিত-লুলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি।"

মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধব নামক প্রকরণে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে মালতী ও মাধবের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নব অনুরাগ কি ভাবে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাই দেখান হইয়াছে।

মালতীর পিতা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। তাহার প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত সমুন্নত প্রাসাদের সম্মুখস্থিত বারান্দার উপরে গবাক্ষের সম্মুখে মালতী অনেক সময় যেন কাহাকেও দেখিবার আশায় নিকটবর্ত্তী রাজপথে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। কাহাকে দেখিবার জন্য? মালতীকেই দেখিবার জন্য সেই বাতায়নে ন্যস্তদৃষ্টি দিশাহারা ভ্রান্ত বিদ্যার্থী মাধব দিনের মধ্যে বার বার সেই পথ দিয়া যাতায়াত করেন, তাঁহাকেই দেখিবার জন্য মালতী সেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে নিত্য আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কত দিন এই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, মালতীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিরহতাপে অঙ্গসমূহ শিথিল, অবসন্ন ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে।

এই শ্লোকে মাধব ও মালতীর নব অনুরাগ তাহাদিগের দৈহিক ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া ঐ সকল ব্যাপার অনুভাবপদবাচ্য হইতেছে। সে ব্যাপার কি? অবসর পাইলেই মালতী অন্য কার্য্য উপেক্ষা করিয়া পিতৃগৃহের উপরিভাগস্থ বারান্দার উন্মুক্ত বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং অবহিত-হৃদয়ে, একদৃষ্টিতে পথের দিকে সেই সুন্দর যুবার দর্শন পাইবার আশায় নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন। এই চাহনি ও বাতায়নসম্মুখে অব-



৫ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৩ [ষষ্ঠ সংখ্যা

রসশাস্ত্র

এই তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যভিচারিভাব কোন্ রসে বর্ণনীয়, তাহা জানা আবশ্যক। যে রসে যে ব্যভিচারিভাবের উপাদান করিলে রসপ্রতীতি ব্যাহত হয়, সেই রসে তাহা বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। নিম্নে যে তালিকাটি প্রদত্ত হইতেছে, তাহার দ্বারা কোন্ রসে কোন্ ব্যভিচারিভাবের উপাদান করা হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রস	বর্ণনীয় ব্যভিচারী
১। শৃঙ্গার	উগ্রতা, মরণ, আলস্য ও জুগুপ্সা ব্যতিরিক্ত সমস্ত ব্যভিচারিভাবই বর্ণনীয়।
। হাস্য	নিদ্রা, আলস্য ও অবহিত্থ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৩। করুণ	নির্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ ও চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব প্রধান-
৪। রৌদ্র	উগ্রতা, বেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মদ, মোহ ও অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৫। বীর	ধৃতি, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৬। ভয়ানক	জুগুপ্সা, বেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার ও মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৭। বীভৎস	মোহ, অপস্মার, আবেগ, ব্যাধি ও মরণ প্রভৃতি বর্ণনীয়।
৮। অদ্ভুত	বিতর্ক, আবেগ ও হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব বর্ণনীয়।
৯। শান্ত	নির্বেদ, হর্ষ, স্মরণ ও মতি প্রভৃতি বর্ণনীয়।

ব্যভিচারিভাবের ন্যায় কোন্ রসে কোন্ অনুভাব বর্ণ-

রস	বর্ণনীয় অনুভাব
১। শৃঙ্গার	ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষ প্রভৃতি।
২। হাস্য	অক্ষি-সঙ্কোচন ও বদন-স্মেরতাদি।
৩। করুণ	দৈবনিন্দা, ভূমিতে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উচ্ছ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস, স্তব্ধভাব ও প্রলাপ ইত্যাদি।
৪। রৌদ্র	ভ্রূকুটী, ওষ্ঠ নির্দংশন, বাহু আস্ফালন, ভর্ৎসন, আত্মশ্লাঘা করা, অস্ত্র উৎক্ষেপণ প্রভৃতি।
৫। বীর	সহায় ও অন্বেষণাদি।
ভয়ানক	বিবর্ণতা, গদ্‌গদভাষণ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, এদিক্ ওদিক্ তাকান ইত্যাদি।
৭। বীভৎস	নিষ্ঠীবন, মুখ-কম্পন, চক্ষুঃ-সঙ্কোচন প্রভৃতি।
৮। অদ্ভুত	স্তব্ধ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদবাক্য, সম্ভ্রম ও নেত্রবিকাশ প্রভৃতি।
৯। শান্ত	রোমাঞ্চ প্রভৃতি।

অনুভাব কাহাকে বলে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাব অন্তঃকরণে সমুদিত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই কাব্য ও নাটক প্রভৃতিতে বর্ণিত হইলে ব্যভিচারিভাব বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সকল ব্যভিচারিভাবরূপ-মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে 'রতি' প্রভৃতি স্থায়িভাবের যে সকল কার্য্য আমাদিগের দেহে উৎপন্ন হয়, সেইগুলিই অনুভাব বলিয়া কাব্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

যাহার দ্বারা আমরা অপরের হৃদয়স্থিত ভাবনিচয়ের অনুভব বা অনুমান করিতে সমর্থ হই, তাহাই হইল অনুমান অর্থাৎ অনুভবের বা অনুমিতির হেতুই অনুভাব শব্দের যৌগিক অর্থ। কাহারও হৃদয়ে অনুরাগ প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে, তাহার দেহে বা নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহে যে সকল চেষ্টা উদিত হয়, তাহাই অনুভাবপদবাচ্য। কারণ, ঐ সকল চেষ্টা দেখিয়াই লোক অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়ী বা ঔৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের অনুমান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে;—সামান্য অনুভাব ও সাত্ত্বিক অনুভাব। যে সকল চেষ্টা আমাদিগের ইচ্ছা ও প্রযত্নের দ্বারা সাধিত হয়, সেই সকল চেষ্টাকেই সাধারণ বা সামান্য অনুভাব বলা যায়। একটি উদাহরণ দেখিলেই এই সামান্য অনুভাবের স্বরূপ বিস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

> "ভূয়ো ভূয়ঃ সবিধ নগরী রথ্যায়া পর্য্যটন্তং,
> সাক্ষাৎ কামং নবমিব রতির্মালতী-মাধবং যৎ।
> দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ভবন-বলভীতুঙ্গ-বাতায়নস্থা,
> গাঢ়োৎকণ্ঠা-লুলিত-লুলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি।"

মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধব নামক প্রকরণে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে মালতী ও মাধবের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নব অনুরাগ কি ভাবে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাই দেখান হইয়াছে।

মালতীর পিতা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। তাহার প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত সমুন্নত প্রাসাদের সম্মুখস্থিত বারান্দার উপরে গবাক্ষের সম্মুখে মালতী অনেক সময় যেন কাহাকেও দেখিবার আশায় নিকটবর্ত্তী রাজপথে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। কাহাকে দেখিবার জন্য? মালতীকেই দেখিবার জন্য সেই বাতায়নে ন্যস্তদৃষ্টি দিশাহারা ভ্রান্ত বিদ্যার্থী মাধব দিনের মধ্যে বার বার সেই পথ দিয়া যাতায়াত করেন, তাঁহাকেই দেখিবার জন্য মালতী সেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে নিত্য আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কত দিন এই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, মালতীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিরহতাপে অঙ্গসমূহ শিথিল, অবসন্ন ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে।

এই শ্লোকে মাধব ও মালতীর নব অনুরাগ তাহাদিগের দৈহিক ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া ঐ সকল ব্যাপার অনুভাবপদবাচ্য হইতেছে। সে ব্যাপার কি? অবসর পাইলেই মালতী অন্য কার্য্য উপেক্ষা করিয়া পিতৃগৃহের উপরিভাগস্থ বারান্দার উন্মুক্ত বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং অবহিত-হৃদয়ে, একদৃষ্টিতে পথের দিকে সেই সুন্দর যুবার দর্শন পাইবার আশায় নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন। এই চাহনি ও বাতায়নসম্মুখে অব-

মালতী-হৃদয়ের নবোদ্ভূত অনুরাগের অভিব্যঞ্জক হইতেছে। এইরূপ প্রতিদিন একই পথে উপরের সেই বাতায়নের দিকে তাকাইয়া বার বার যাতায়াত প্রভৃতি মাধবের কার্য্যগুলি তাহার হৃদয়ে মালতীর প্রতি যে নব অনুরাগ হইয়াছে, তাহারই কার্য্য বলিয়া ইহাও অনুভাবরূপে পরিণত হইতেছে।

এই সকল কার্য্য করিবার সময় অনুরক্ত স্ত্রী বা পুরুষ নিজের মনের উপর প্রভুতাকে একবারে হারাইয়া বসে না। ইচ্ছা করিলেই তাহারা এই সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়াও থাকিতে পারে। এই কারণে এই সকল দৈহিক কার্য্য সাধারণ অনুভাব পদের দ্বারা বোধিত হয়। ইহা ছাড়া কিন্তু আমাদিগের দেহে অনুরাগের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন কতকগুলি অবস্থা থাকে, যে অবস্থাগুলির উদয় হইলে আমরা ইচ্ছা করিয়া তৎকালে তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হই না। সেই সমুদয় অবস্থা বা অনুরাগের কার্য্যসমূহকে আলঙ্কারিকগণ সাত্ত্বিক অনুভাব বা সাত্ত্বিক অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অবস্থাগুলি আট ভাগে বিভক্ত, যথা—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

স্তম্ভ কাহাকে বলে—

"স্তম্ভশ্চেষ্টাপ্রতীঘাতো ভয়হর্ষাময়াদিভিঃ।"

ভয়, হর্ষ ও রোগ প্রভৃতির দ্বারা শরীরের যে নিশ্চলভাব বা নিশ্চেষ্টতা, তাহাই 'স্তম্ভ।'

স্বেদঃ—"বপুর্জলোদ্গমঃ স্বেদো রতিঘর্ম্মশ্রমাদিভিঃ।"

রতি, ঘর্ম্ম ও পরিশ্রমাদি দ্বারা শরীরে যে জলবিন্দু প্রকাশ পায়, তাহাই 'স্বেদ।'

রোমাঞ্চঃ—

"হর্ষাদ্ভুতভয়াদিভ্যো রোমাঞ্চো রোমবিক্রিয়া।"

আনন্দ, বিস্ময় এবং ভয়াদি দ্বারা শরীরের রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিলে তাহাকে রোমাঞ্চ বলা যায়।

স্বরভঙ্গঃ—

"মদসম্মদ-পীড়াদ্যৈর্বৈস্বর্য্যং গদ্গদং বিদুঃ।"

মদ, হর্ষ ও পীড়াদি দ্বারা কণ্ঠস্বর গদ্গদভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে স্বরভঙ্গ বলা হয়।

বেপথুঃ—

"রাগ-দ্বেষ-শ্রমাদিভ্যঃ কম্পো গাত্রস্য বেপথুঃ।"

রাগ, দ্বেষ ও শ্রমাদি দ্বারা যে শরীরের কম্পন, তাহাই 'বেপথু।'

বৈবর্ণ্যম্—

"বিষাদ-মদ-রোষাদৈর্বর্ণান্যত্বং বিবর্ণতা।"

দুঃখ, মত্ততা ও ক্রোধের দ্বারা শরীরের বর্ণ অন্যথা হইলে তাহাকে বিবর্ণতা বা বৈবর্ণ্য বলা হয়।

অশ্রুঃ—

"অশ্রু নেত্রোদ্ভবং বারি ক্রোধ-দুঃখ-প্রহর্ষজম্।"

ক্রোধে, দুঃখে ও অত্যন্ত আনন্দে চক্ষুতে যে জল আইসে, তাহাই "অশ্রু।"

প্রলয়ঃ—

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।"

সুখ বা দুঃখ দ্বারা বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার নামই "প্রলয়।"

এই সাত্ত্বিকভাবের একটি দৃষ্টান্ত যাহা সাহিত্য-দর্পণকার দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"তনুস্পর্শাদস্যা দরমুকুলিতে হন্ত নয়নে,
উদঞ্চদ্ রোমাঞ্চং ব্রজতি জড়তামঙ্গমখিলম্।
কপোলৌ ঘর্ম্মার্দ্রৌ ধ্রুবমুপরতাশেষবিষয়ং,
মনঃ সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি ঝটিতি ব্রহ্মপরমম্॥"

এই প্রিয়তমার অঙ্গের স্পর্শমাত্রেই দুই নয়নই আবেশে ঈষৎ মুকুলিত হইয়া উঠিল, সমুদয় শরীরে রোমাঞ্চের উদয় হইতেছে, সকল অঙ্গ যেন বিবশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে, গণ্ডস্থল স্বেদবারিপরিপ্লুত হইতেছে, অন্তঃকরণ বাহিরের সকল বিষয় হইতে বিরত হইয়া হঠাৎ নিবিড় আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইতেছে।

এই শ্লোকে জড়তা, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম এই কয়টি অনুভাব বিস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আর একটি বিভাব আছে, যাহাকে 'উদ্দীপন বিভাব' বলে। হৃদয়ে অনুরাগ উৎপন্ন হইলে বাহিরে যে সকল কারণ দ্বারা এই নবোদিত অনুরাগ প্রভৃতি

স্থায়িভাবগুলি উদ্দীপিত বা উত্তরোত্তর পরিপুষ্টিকে লাভ করিয়া থাকে, তাহাকেই 'উদ্দীপন-বিভাব' বলা যায়। সাহিত্যদর্পণকার ইহার লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন যে—

"উদ্দীপন-বিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে,
আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা।"

যে সকল বাহ্যবস্তু 'রস' অর্থাৎ অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে, তাহারাই উদ্দীপন-বিভাব হইয়া থাকে। তাহা প্রায়ই আলম্বনবিভাবের চেষ্টা প্রভৃতি এবং দেশকাল প্রভৃতিও হইয়া থাকে। আলম্বনের চেষ্টাদি শব্দের অর্থ নায়ক বা নায়িকার ভ্রূভঙ্গী, কটাক্ষ, ইঙ্গিত, শারীরিক সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি।

কালাদি শব্দের অর্থ—চন্দ্র, চন্দন, কোকিলালাপ ও ভ্রমর-ঝঙ্কার প্রভৃতি। এইরূপ উদ্দীপন, অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাবের দ্বারা প্রকাশিত যে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব, তাহাই সহৃদয়গণ কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া, রসরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই রস যদি বিশুদ্ধভাবে আস্বাদিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রস বলা যায় না; কিন্তু তাহা রসাভাসই হইয়া থাকে। যে রসের যে ভাবে আস্বাদন বিশুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা জানিতে হইলে রস-শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন কবি ও আলঙ্কারিকগণ কি ভাবে রসাস্বাদের পরিশুদ্ধি রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা সুন্দরভাবে নিজ নিজ গ্রন্থে বা কাব্যে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থের বিশেষ অনু-শীলন ব্যতিরেকে রসাস্বাদের বিশুদ্ধরূপতা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। কোন আলঙ্কারিক আচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।"

অর্থাৎ লোকতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা অনুচিত, তাহাই যদি বর্ণিত না হয়, তাহা হইলে অন্য কোন কারণে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই অনৌচিত্য বা অনুচিত বর্ণন কি প্রকারের হয় এবং কেনই বা তাহাতে রসভঙ্গ হয়, তাহা মম্মটভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বিস্তৃতভাবে প্রতি-পাদন করিয়াছেন। প্রকৃতোপযোগী হইবে বলিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদর্শন করা হইতেছে।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে কি ভাবে রস দুষ্ট হইতে পারে, তাহাই দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—

"ব্যভিচারি-রসস্থায়ি-ভাবানাং শব্দবাচ্যতা।
কষ্টকল্পনয়া ব্যক্তিরনুভাববিভাবয়োঃ॥
প্রতিকূল-বিভাবাদিগ্রহো দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
অকাণ্ডে প্রথনচ্ছেদৌ অঙ্গস্যাপ্যতিবিস্তৃতিঃ॥
অঙ্গিনোঽননুসন্ধানং প্রকৃতীনাং বিপর্য্যয়ঃ।
অনঙ্গস্যাভিধানং চ রসে দোষাঃ স্যুরীদৃশাঃ॥"

ব্যভিচারিভাব রস ও স্থায়িভাবকে তদীয় কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ না করিয়া সাক্ষাৎ বাচক শব্দের দ্বারা যদি নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে উহা রসদোষমধ্যে পরিগণিত হয়।

অনুভাব বা বিভাবের কষ্টকল্পনার দ্বারা অভি-ব্যক্তিও রসদোষমধ্যে পরিগণিত হয়।

যে রসের বা যে ভাবের যাহা প্রতিকূল, সেই রসে সেই ভাবে যদি তাহা গ্রহণ করা হয়, তবে তাহাকেও রসদোষ বলা যায়।

অনাবশ্যক অথবা অনতিপ্রয়োজন যে সকল রস বা ভাব, তাহাদিগকে বার বার উদ্দীপিত করাকেও রসদোষ বলা যায়।

অকস্মাৎ কোন একটি রসের বা ভাবের বিস্তৃতি বা বিচ্ছেদ রসদোষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

কোন একটি অঙ্গের অতিবিস্তৃতভাবে বর্ণনও রসদোষ মধ্যে পরিগণিত।

প্রধানের বিস্মৃতিও রসদোষ।

প্রকৃতিবিপর্য্যয়ও রসদোষের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

যে রসের বা যে ভাবের বর্ণন প্রকৃত রসের অনুকূল নহে, তাহারই প্রকৃত রসে যে বর্ণন, তাহাও রসদোষ মধ্যে পরিগণিত।

এইরূপ নানা প্রকারে রসদোষ হইয়া থাকে, তাহা সুধীগণ নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন। এই কয় প্রকার রসদোষ বুঝিতে হইলে, ইহার প্রত্যেকের এক একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। এই কারণে যথাক্রমে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

প্রথম দোষটির উদাহরণ যথা—

"সব্রীড়া দয়িতাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্ম্মাম্বরে,
সত্রাসা ভুজগে সবিস্ময়রসা চন্দ্রেঽমৃতস্যন্দিনি।

সের্ষ্যা জহ্নুসুতাবলোকনবিধৌ দীনা কপালোদরে,
পার্ব্বত্যা নবসঙ্গমপ্রণয়িনী দৃষ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ ॥"

বিবাহকালে বধূরূপে মহাদেবের সম্মুখে আনীতা পার্ব্বতীর দৃষ্টি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক। সেই দৃষ্টি যখন মহাদেবের মুখের দিকে পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে লজ্জা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মহাদেবের পরিহিত আর্দ্র গজচর্ম্মের উপর পতিত হইয়া সেই দৃষ্টি সকরুণ হইয়াছিল। মহাদেবের অঙ্গসমূহে ভূষণরূপে বিরাজমান সর্পের প্রতি সেই দৃষ্টি যখন পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে ত্রাসের উদয় হইয়াছিল, মহাদেবের ললাটস্থিত অমৃতনিস্যন্দিনী চন্দ্রকলার উপর উহা যখন অর্পিত হইয়াছিল, তখন তাহাতে বিস্ময়রস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আবার মহাদেবের জটাজুটমধ্যে ক্রীড়নশীলা জাহ্নবীর দিকে সেই দৃষ্টি যখন প্রসারিত হইল, তখন তাহাতে ঈর্ষা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। মহাদেবের ললাটের মধ্যে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখা দেখিয়া সেই দৃষ্টি পরক্ষণে দৈন্যের সূচনা করিতে লাগিল।

এই শ্লোকে ব্যভিচারিভাব ও রসের নির্দ্দেশ সাক্ষাৎভাবে 'বাচক' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কোনরূপ কার্য্যের দ্বারা সূচিত করা হয় নাই বলিয়া, এখানে প্রথম-বর্ণিত রসদোষটি বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে বলা হইয়াছে দৃষ্টিতে লজ্জা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এখানে লজ্জা হইল আদিরসের ব্যভিচারিভাব, ইহার 'বাচক' শব্দ হইতেছে "ব্রীড়া।"

'ব্রীড়া' এই শব্দটির দ্বারা লজ্জার বর্ণন করা হইয়াছে বলিয়া, এখানে উক্ত দোষ ঘটিয়াছে। এরূপ না বলিয়া 'ব্রীড়া'র কার্য্য যে দৃষ্টির নম্রতা, তাহা দ্বারা যদি ঐ ব্যভিচারিভাবটির সূচনা করা হইত, তাহা হইলে উহা সুসঙ্গত হইত, অর্থাৎ পার্ব্বতীর দৃষ্টি লজ্জাযুক্ত হইয়াছে, এরূপ না বলিয়া যদি 'পার্ব্বতীর দৃষ্টি অবনত হইয়াছিল', এইপ্রকার বলা হইত, তাহা হইলেই উহা সুসঙ্গত হইত। অর্থাৎ মূল শ্লোকে 'সব্রীড়া' এই পদটির পরিবর্ত্তে যদি 'ব্যানম্রা' এই পদটি বসান হইত, তাহা হইলে উক্ত দোষটি হইতে পারিত না।

এইরূপ মূল শ্লোকে 'সকরুণা' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'মুকুলিতা' এই পদটি যদি বসান হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। এইরূপ 'সত্রাসা' ইহার পরিবর্ত্তে 'সোৎকম্পা' এই পদটি বসান উচিত ছিল. 'সবিস্ময়রসা' এই পদটির পরিবর্ত্তে 'নিমেষরহিতা' এইরূপ করা উচিত ছিল। 'সের্ষ্যা' এই পদটির পরিবর্ত্তে 'নীলদৃক্' এই পদটি বসান উচিত ছিল, এবং 'দীনা' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ম্লানা' এইরূপ পদটি বসাইলে ভাল হইত, এইরূপ করিলে ব্যভিচারিভাবগুলির বাচকশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করারূপ যে দোষ হইয়াছে, তাহার অনায়াসে পরিহার হইত। কার্য্যের দ্বারা মনোবৃত্তির প্রকাশ করিলে. ঐ সকল প্রকাশিত বৃত্তি প্রকৃত রসের যে ভাবে পরিপোষক হয়, এবং রসাস্বাদের চারুতা সম্পাদন করে, 'বাচক' শব্দের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিলে তাহা হইতে পারে না। প্রত্যুত রসের গূঢ়ভাবকে নষ্ট করে বলিয়া এইরূপে সশব্দের দ্বারা বা বাচকশব্দের দ্বারা রস বা ব্যভিচারিভাবের প্রতিপাদন কবিদিগের পক্ষে উচিত নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বসন্ত-প্রভাতে

বসন্ত প্রভাত আজি—রসালে রসালে
মঞ্জুল মুকুলমালা,—মধুবিন্দু ঝরে
কম্পিত শিরীষ-পুষ্প, সম্মোহন শরে
নিখিল আকাশ বিদ্ধ, রবি-রশ্মিজালে
বিজড়িত কুজ্ঝটিকা দিগন্ত রেখায়—
যেন অপ্সরীর দীর্ঘ নীল উত্তরীয়
গ্রথিত কনকতন্ত্রে; হেথা বনপ্রিয়,
চাহিছে চপল নেত্রে, উৎপল লেখায়
লীলায়িত চারুদৃষ্টি ঋষিকন্যাগণ
আহরিছে ফুলরাশি,—কুটীর-অঙ্গনে
চন্দন-সৌরভ শুভ—নিস্তব্ধ পবনে
হয়েছে সুদূর-ব্যাপ্ত—মক্ষিকা-গুঞ্জন
উঠিছে তিমির মাঝে, মূর্চ্ছনার মোহ—
অস্পষ্ট কানন-ছবি—পুষ্প-সমারোহ।

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনের ইতিহাস

বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে আমাদের বহু তরুণ যুবক পুরানো ইতিহাসের বড় একটা খবর রাখেন না. সেই জন্য আমি এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়াছি।

আমরা একটা স্বাধীনতার প্রেরণা অনুভব করিতেছি, জাতিটা স্বাধীন হইবে. দেশটা স্বাধীন হইবে, আমরা স্বরাজ্য লাভ করিব, এই যে একটা আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যে অল্প-বিস্তর জাগিয়া উঠিয়াছে, এই আকাঙ্ক্ষার মূলে দুইটি জিনিষ আছে, সেই দুইটি জিনিষ এই :—(১) ইংরাজী শিক্ষা, (২) ইংরাজের শাসন, ইংরাজী শিক্ষা আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। যদি কেহ বলেন, কেন, জাপানও ত অদ্ভুত অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। এসিয়াতে থাকিয়াও জাপান ত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে নাই, যদি কেহ এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তাহার প্রথম একটা জবাব এই দিতে হয়, আমরা যে ভাবে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছি, জাপান সেই ভাবে লাভ করে নাই বটে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের প্রেরণা জাপান সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছে। এতটা লাভ করিয়াছে—যাহা আমরাও লাভ করিতে পারি নাই, এবং তাহার জন্য অন্ততঃ আমি বিধাতার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, কিছু দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে একটা অ্যাংলো-জাপানিজ একজিবিশান বা প্রদর্শনী হইয়াছিল। তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখিয়াছি, জাপানীরা সেখানে তাহাদের ইতিহাসটা ছবি দিয়া দেখাইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে তাহার কি রকম পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল, মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহা দেখাইয়াছে। দেখিয়া আমার একটি কথা মনে হইল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ইতিহাসের ধারাটা প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া জাপানীরা য়ুরোপের সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে। এটা সত্য না মিথ্যা, অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠিত না, কেন না, যাঁহারা জাপানের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন—ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নহে, তাহার কিছু পরে, জাপান য়ুরোপের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অভ্যুদয় দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিল, আধুনিক জগতে যদি তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে এই জন্য জাপানের নেতৃবর্গ সলা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং কমিটী গঠন করিলেন। প্রথমেই তাঁহারা এই ঠিক করিলেন, জাপানের প্রাচীন সমাজ-ধারাকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইংলণ্ডে যেমন ফিউডেল সিষ্টেম ছিল, জাপানেও সেইরূপ কতকগুলি জমীদার ছিলেন। প্রজাদের উপর জমীদারদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তাহারা প্রজাদের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। প্রজারা জমীদারদের স্বত্বরক্ষার জন্য তাহাদের হইয়া লড়াই করিত, জাপানে গৃহ-বিবাদ সর্ব্বদাই লাগিয়াছিল, জমীদারদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি রেষারেষি প্রবল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কি পরে জাপানের নেতৃবর্গ দেখিলেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকেন্দ্র যদি ভাঙ্গিতে পারা না যায়, গৃহ-বিবাদ যদি বন্ধ না হয়, তাহা হইলে জাপান জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহারা ঠিক করিলেন, ছোট ছোট জমীদাররা আপন আপন অধিকার পরিত্যাগ করিবেন এবং সম্রাটের হাতে সেই অধিকার প্রদান করিবেন। কিন্তু কেবল তাহাতেও হইবে না। জাপানের ভিতর নূতন শক্তি-সঞ্চার করিতে হইবে, তাহাকে নূতন প্রেরণা দিতে হইবে, তাহা করিতে হইলে নিজেদের একটা ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং তাহাদের কয়েক জনের উপর জাপানের ইতিহাস লেখার ভার দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, আমরা যে মনগড়া একটা ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারি, সে সাধ্য নাই, কেন না, আমাদের পশ্চাতে বহু সহস্র বর্ষব্যাপী একটা বিরাট সাধনা রহিয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে হিষ্ট্রী বলে. সে রকম হিষ্ট্রী আমাদের না থাকিলেও আমাদের যে মহাকাব্য সকল রহিয়াছে, আমাদের যে সাহিত্য-ভাণ্ডার ও শাস্ত্রাদি রহিয়াছে, তাহার ভিতর সত্য ইতিহাস, রাজারাজড়াদের জন্ম-মৃত্যুর তালিকা নহে, বাস্তবিক যাহাকে ইতিহাস বলে অর্থাৎ সমাজের অভিব্যক্তির বিবরণ আমাদের রহিয়াছে। এই সকল বিবরণ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া নূতন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে আমরা পারি না, সে সাধ্য আমাদের নাই, সম্ভবও নহে। বোধ হয়, জাপানের পিছনে অতটা কিছু ছিল না, তাই জাপান

আপনার ইতিহাস রচনায় বসিয়া গেল। এমন কি, ইংলণ্ডে যেমন ষ্টেট 'রিলিজান' আছে, তেমন কোন ষ্টেট 'রিলিজান' বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় কি'না, এ প্রশ্নও জাপানে উঠিয়াছিল; সে চেষ্টা সফল হয় নাই। মোট কথা, জাপান যে ভাবে য়ুরোপের অনুকরণ করিতে পারিয়াছিল, আমাদের মত প্রাচীন জাতির সেরূপ অনুকরণ সম্ভব নহে। সুতরাং জাপান য়ুরোপের প্রেরণা পায় নাই, তাহা নহে, অভ্যুদয়ের জন্য সে য়ুরোপের কাছে বিস্তর প্রেরণা লাভ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে য়ুরোপের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে। এখন যাহাকে আমরা নেশন বা নেশনেলিজম্ বলি, এই ভাব আগে আমাদের দেশে ছিল না। আমরা জোর করিয়া জাতি শব্দটাকে নেশন শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক জাতি কথাটা নেশনবাচক নহে। আমাদের পরিভাষায় গোজাতি, মানবজাতি এই রকম শব্দ আছে। কিন্তু হিন্দু-জাতি, মুসলমান-জাতি এই ভাবের জাতিবাচক শব্দ নাই, নেশন কথাটা নাই। এটা যখন ছিল না, তখন নেশন কথাটা যে ভাব অভিব্যক্ত করে, সেই ভাবও ছিল না। ছায়া এবং আতপ যেমন একসঙ্গে চলে, ভাব এবং ভাষা তেমনই একসঙ্গে চলে। সাহিত্যে যে ভাবের ভাষা নাই, জাতির ইতিহাসে সেই ভাব পরিস্ফুট হয় না। আমরা য়ুরোপের কাছে এই নেশন ভাব পাইয়াছি এবং তাহা ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়াই পাইয়াছি। আমরা যে স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করিয়াছি, ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহা লাভ করিয়া সেই শিক্ষা এবং যাহারা শিক্ষা দিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি, ইহাতে অপরাধ নাই, ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়াই প্রথমে যখন এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন ইংরাজ রাজপুরুষরা তাহাতে অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। ভারতবর্ষের লোক, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া পড়ে, ইহা তাঁহারা একবারেই ইচ্ছা করিতেন না। ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাঁহারা আমাদিগকে ইংরাজী শিখাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার ফলে এই স্বাধীনতার আন্দোলন জাগ্রত হইয়াছে। আমাদের স্বারাজ্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে—অতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত তাহা লাভ হইবে, বুঝিতে হইলে এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এ বিষয়ের গবেষণা করিতে হইলে বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতেছি—প্রথমেই ইংরাজী শিক্ষা কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিধি-ব্যবস্থা কি ভাবে হইয়াছে, শাসন-পদ্ধতি কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা জানা প্রয়োজন।

ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস ৩ ভাগে বিভক্ত। ১৭৬৫ খৃঃ মোগলের হস্ত হইতে সুবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ ইংরাজ বণিক—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাপ্ত হয়েন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের এই ধারণা হয় নাই যে, তাঁহাদিগকে রাজ্যশাসন করিতে হইবে। দেওয়ানী মানে ছিল রাজস্ব আদায় করা। তাঁহাদের ধারণা ছিল, রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লীর রাজকোষে তাহা প্রেরণ করিতে হইবে। ইংরাজ ভাবিলেন, তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য রাজস্ব আদায় করা, তাহার ব্যবস্থা করা এবং তাহার তত্ত্বাবধান করা। দিল্লীর সম্রাটের যন্ত্ররূপে তাঁহারা নিজেদের বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সুতরাং দেশের শাসন আগে যেরূপ ছিল, সেই ভাবে চলিতে লাগিল। মুসলমান শাসনের সময় দেশী যে সকল কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের উপর তাঁহারা হাত দিলেন না, তাহাদের পদে নিজেরা বসিতে চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশী দিন চলিল না। ক্রমে ক্রমে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এই শাসনভার তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িল। তখন তাঁহারা দেখিলেন, ইহার জন্য লোক প্রয়োজন। সেই জন্য তাঁহারা নূতন ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইলেন। যেখানে যত ইংরাজ ছিল, সকলকে আনিয়া এই শাসন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের চার্টার অনুসারে গভর্ণর জেনারেলের পদ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নূতন রাজ্য ৩ প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত হইল। তাহার পূর্ব্বে দেশী লোকরা অধীনস্থ কর্ম্মে বহাল ছিল, কিন্তু এখন ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মে উচ্চ নীচ সকল রাজকর্ম্মচারীই বিলাত হইতে আমদানী করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে কি হইল? তাহারা ব্যবসা করিতে এ দেশে আসিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে আইসে নাই। ব্যবসা করিবার জন্য ব্যাপারীর সঙ্গে যাহারা আইসে, তাহারাও দুই পয়সা লাভের জন্য আইসে।

ছোট ছোট কারবার নিজেরা খোলে। ইংরাজের নোকর যাহারা ছিল, তাহারা তাহাই করিত, লাভের জন্য তাহারা ব্যস্ত ছিল। যত ইংরাজ আসিয়াছিল, তাহারা ছোট বড় সব রকম লাভজনক কর্ম্মে যোগ দিল, ফলে শাসন এবং শোষণ মিশিয়া গেল। শাসন করিতে আসিয়া তাহারা শোষণ আরম্ভ করিল। আর উৎকোচ গ্রহণ ও অনাচার আচরণ যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু বিধাতার রাজ্যে রোগ যেখানে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশের বীজও রোপিত হয়। এখানেও তাহাই হইল। এই ভাবে শাসন নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল, ব্যয়ভার অতিকায় হইয়া উঠিল। এই জন্য ১৭৮৪ খৃঃ যখন আবার চার্টার হয়, তখন পার্লামেণ্ট বলিল, ছোট ছোট কর্ম্মে বিলাত হইতে আর কর্ম্মচারী গ্রহণ করা হইবে না। ইয়াঙ্গার পিট পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—কোম্পানীর হাতে ভারত-শাসন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেই জন্য নূতন এক্টে একটা নূতন কথা স্পষ্টভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইল।

ইহার ফলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বিলাত হইতে ছোট কর্ম্মচারী আসা বন্ধ হইল। কেরাণী হইয়া যে সকল ইংরাজ আসিত, তাহাদের আসা বন্ধ হইল, বড় বড় রাজকার্য্যে ইংরাজ রহিলেন বটে, কিন্তু নিম্নপদে দেশী লোক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে একটু মুস্কিল দাঁড়াইল। আমি যখন এক বার প্যারিস দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন ফরাসী ভাষা জানি না বলিয়া আমার যে দশা হইয়াছিল, ইংরাজ কর্ম্মচারীদেরও সেই দশা হইল। আমি প্যারিসে গেলাম, কিন্তু সেখানের লোকের একটি কথাও জানি না, এক বার সখ হইল সহরটা ঘুরিয়া আসা যাউক। গাড়ী ডাকিলাম, ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম, গাড়োয়ান আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতে হইবে? আমি কিছুই বুঝি না, কি করিব? অগত্যা পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলাম, ভাবটা এই—তোমাকে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিব, এই ভাব দেখাইয়া খানিক দূর গিয়া দুই জন ফরাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহারা ইংরাজী জানে কি না, তাহারা যে জবাব দিল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই হইলাম। আড়াই ফ্রাঙ্ক দিয়া আমার প্যারিস-দর্শনের সাধ মিটাইতে হইল। হোটেলে গেলাম, সেই অবস্থা। ইংরাজদেরও ঠিক এই রকম অবস্থা তখন ছিল। আমাদের দেশের কথা বুঝিত না, আমাদের দেশের লোক তাহাদের কথা বুঝিত না, ঠারে-ঠোরে কথা চালাইতে হইত। সেই জন্য দেশীয় কর্ম্মচারীদের কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া এক দিকে যেমন আবশ্যক হইল, অন্য দিকে ইংরাজদেরও কিছু কিছু দেশী ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম যে সকল ইংরাজ কেরাণী হইয়া আসিল, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। তাহাদের জন্য দুইটি কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল (১) কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, (২) মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ কলেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিলেন। আমাদের পণ্ডিতদের কেহ কেহ এখানে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিখাইতেন। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার মহাশয় বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বোম্বেতে কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল না। সেখানে যে সকল ইংরাজ সিভিলিয়ান হইয়া আসিতেন, তাঁহারা মুন্সী রাখিয়া গুজরাটী, মারাঠি এবং হিন্দী এই তিন ভাষা শিখিতেন। মুন্সীদের খরচ বা মাহিনা হিসাবে এই সকল সিভিলিয়ানরা—তখন সিভিলিয়ান বলিত না—ক্লার্ক বলিত—প্রত্যেকে ৩৬ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন। প্রথমে এই ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল—এ দেশের লোককে শিক্ষা না দিলে চলিবে না।

ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোন প্রকার লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—এই ধারণা ভ্রান্ত, তখন দেশে লোক-শিক্ষার প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের জন্য গ্রামে গ্রামে টোল এবং মুসলমানদের জন্য মোক্তব ও মাদ্রাসা ছিল, প্রত্যেক মসজেদে কোরাণ পড়া হইত। গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, তাহাতে লেখা-পড়া ও অঙ্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অফিসিয়েল রেকর্ড হইতে জানা যায়, ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে ৮০ হাজার স্কুল ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক ৪ শত শিক্ষার্থী বালকের জন্য একটা করিয়া স্কুল ছিল। সেই স্থানে আজ ইংরাজ-ব্যবস্থায় স্কুলের সংখ্যা

করিবার পর, কত ডিরেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর, সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত ৬৫ হাজার স্কুলও বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সবে মিলিয়া ৫৩ হাজার মাত্র হইয়াছে। এখন যেমন বাঙ্গালী ইংরাজী শিখে, তখন তেমনই ফার্সি শিখিত। আমার পিতাঠাকুর ইংরাজী জানিতেন না, ফার্সি শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্বে এক মুসলমান মৌলভীর কাছে ফার্সি শিখিবার জন্য বাবা আমাকে পাঠান, কিন্তু আল এফ বে তে সেএর বেশী ফার্সি শিক্ষা আমার হয় নাই। গ্রামে যাঁহারা ভদ্রলোক ছিলেন, কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ যাঁহারা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া ফার্সি ভাষার অভিজ্ঞ শিক্ষকরা—ইঁহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু ছিলেন, কেহ মুসলমান ছিলেন—ফার্সি ভাষা শিক্ষা দিতেন। ছোট ছোট স্কুলও বিস্তর ছিল, কিন্তু ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচীন শিক্ষার ব্যবস্থা একেবারে ধুইয়া-মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রামে যে সমাজ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের নিজেদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অথচ বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার পরিবর্ত্তে কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ইংরাজ করেন নাই।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে যে নূতন চার্টার হয়, তাহার ফলে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করা দরকার হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ইংরাজ অনুভব করেন, কিন্তু কাযে কিছুই হয় না। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আবার যখন চার্টার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাতে পার্লামেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বলেন—তোমরা লোক-শিক্ষার জন্য বৎসরে অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা খরচ করিবে। সে সময় পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

দেশের পুরাতন শিক্ষা রক্ষার জন্য এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলনের জন্য অন্ততঃ ১ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ করিবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পার্লামেণ্টে যখন এ কথা উঠে, তখন সকলে এ প্রস্তাবে রাজী হয়েন নাই। ইহার আগের আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার যখন পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় এবং পার্লামেণ্টে যখন কথা উঠে—কোম্পানী এ দেশের লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বলেন—এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমরা আমেরিকা হারাইয়াছি, ভারতবর্ষও কি সেই ভাবে হারাইব?

এ দেশের লোকের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে, এ বিষয়ের আলোচনা যখন হয়, তখন পার্লামেণ্টের এক জন সভ্য উঠিয়া বলেন—"খৃষ্টান-ধর্ম্ম যদি এ দেশের লোককে শিক্ষা দিই, তাহা হইলে এমন ঝড় উঠিবে—যাহা ভারতবর্ষ হইতে আমাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দিবে।" আর এক জন স্পিকার বলিলেন—"ভারতে এক দল পাদরী ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা আমি এক দল ভূত ছাড়িয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।"

কেরী, মার্সমেন প্রভৃতি মিশনারীরা শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরী এ দেশে আসিবেন, এই কথা যখন খবরের কাগজে বাহির হইল, তখন ইহা শুনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ একটা প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন, তাহা এই—"আমাদের প্রাচ্যের রাজ্যে মিশনারী প্রেরণের সঙ্কল্প পাগলের প্রলাপমাত্র। ইহাতে আমাদের রাজ্যশাসনের সমূহ ক্ষতি হইবে।"

সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, কেরী যখন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হিন্দু-মুসলমানের ছেলেকে ইংরাজী শিখাইতে চেষ্টা করিলেন এবং ধর্ম্মতলায় একটি স্কুল স্থাপন করিলেন, তখন গভর্ণমেণ্ট একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। আজকাল যেমন রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিবার অছিলায় যাহাকে তাহাকে ধরিয়া রেগুলেশনের (১৮১৮ খৃষ্টাব্দের) ভয় দেখান হয়, তেমনই ইংরাজী শিখাইতে গিয়াছে বলিয়া কর্ত্তারা কেরীকে ডিপোর্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। রেগুলেশন উঁহাদের উপরেও প্রয়োগ হইত। ইংরাজী খবরের কাগজের সম্পাদক কেহ কেহ ঐ রেগুলেশনে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেরী স্থানান্তরিত হয়েন নাই, বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এই সব পরিত্যাগ করিয়া নীলকর হইব।" বাস্তবিক কিন্তু তিনি নীলকর হয়েন নাই, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরা ঐ অজুহতে কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে মফঃস্বলে পাঠাইয়া দেন। গোলমাল চুকিয়া গেলে আবার তিনি কলিকাতায় আইসেন, শেষে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা ইংরাজরাজ্যে হইতে পারিল না বলিয়া কেরী ইংরাজ-

রাজ্যের অধীনে ছিল। সেখানকার রাজা খৃষ্টান মিশনারীদিগকে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার এবং মিশন প্রচার-কার্য্যে অনুমতি দিয়া সনদ দেন। যখন শ্রীরামপুর ইংরাজদের হস্তগত হয়, তখন কবালায় লেখা ছিল—শ্রীরামপুর কলেজ এবং মিশন এষ্টাব্লীসমেণ্ট দিনেমারদিগের হাতে থাকিতে পরিচালকবর্গ যে সমস্ত স্বত্ব-স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, তাহা অব্যাহত রাখিতে হইবে। তখনকার ইংরাজ-শাসকদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল, পুঁথিপত্র ঘাঁটিলে তাহা পাওয়া যায়। স্যার টমাস টার্টন নামে পার্লামেণ্টের এক জন সভ্য তীব্র ব্যঙ্গসহকারে বলিলেন, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লোক-শিক্ষায় অনিচ্ছুক।"

তিনি পার্লামেণ্টে বলেন, "তোমরা যে কেন ভারতবাসীকে শিক্ষাদান কর না, তাহার কারণ জানিতে বিলম্ব হয় না। তোমরা তোমাদের অন্যায় শাসনের দিকে তাহাদের চক্ষু ফুটাইতে চাহ না। তোমরা তাহাদের দেশ লুণ্ঠন করিয়াছ, তোমরা তাহাদের রাজন্যদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছ। অবশ্য তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া ভুলাইয়া রাখিবে, অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবে, ইহা জানি। মিঃ ডাণ্ডাসের অভিমতে ভারতবাসীরা মানুষই নহে।"

এখন যেমন, তখনও পার্লামেণ্টে তেমনই দুই পক্ষ ছিল। ভাল-মন্দ সব যায়গায়ই আছে, সকল ইংরাজ যে আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিতে ব্যস্ত ছিল, তাহা নহে। সকলেই যে আমাদিগকে শোষণের জন্য ব্যস্ত ছিল, তাহা নহে। এমন ইংরাজ ছিল, যাহারা ভারতবর্ষে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া অবধি ধর্ম্মের ভাবে প্রণোদিত হইয়া এ দেশের লোকের হিতসাধনে ইচ্ছুক ছিল। তাহাদের মধ্যে মারকুইস অব হেষ্টিংস (ওয়ারেন হেষ্টিংস নহে) অন্যতম। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে সকল ক্লার্ক শিক্ষালাভ করিত, তাহাদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া তিনি বলেন—"ভারতীয়দিগকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, ইহাদের মনুষ্যত্ব বিকশিত করিতে হইবে, ইহারা অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া আছে, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতে হইবে। ইহারা নানা বন্ধনে আবদ্ধ আছে, ইহাদের বন্ধন মোচন করিতে হইবে এবং ইহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দুর্ব্বলের অত্যাচার নিবারণ করা ভাল। কিন্তু জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করা আরও ভাল, উহাতে ভগবানের দয়ার মত কায করা হয়। আর যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রাপ্ত হইলে পাথরের মূর্ত্তি জীবন্ত মানুষ হইয়া দাঁড়ায়, সেই স্বর্গের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একটা স্থবির জাতির ভিতর প্রেরণ করা ঐশ্বরিক কায।"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইল, কিন্তু কার্য্যতঃ বেশী কিছু হইল না। এখানকার কর্ম্মচারীরা কিছুই করিতে রাজী নহেন। কোর্ট অব ডিরেক্টররা ঠিক করিলেন, এই টাকা নূতন স্কুল-কলেজে খরচ করিবেন না, যে সকল স্কুল, মাদ্রাসা ও টোল পূর্ব্ব হইতে দেশে আছে, তাহাতে টাকাটা খরচ করিতে হইবে। আর যাহারা ভদ্রলোক, উচ্চশ্রেণীর লোক,—তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ভাবে টাকাটা খরচ করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিলেন। সুতরাং যদিও পার্লামেণ্ট প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই টাকার সদ্ব্যবহার হইল না। বহুদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কিছুই করিলেন না। বাস্তবিক বলিতে গেলে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে অগ্রসর হয়েন নাই। আমাদের দেশের লোকরাই এই কাযটা নিজেদের মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। কেবল রামমোহন রায় নহেন, তিনি ত নিজে সংস্কারক ছিলেন। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব পর্য্যন্ত—যিনি রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা ছিলেন—তিনিও এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে কলিকাতার হিন্দু-নেতৃবর্গের—রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির সভা হয়। তাহার একটা ইতিহাস আছে। গভর্ণমেণ্ট তখন এ সব বিষয়ে কিরূপ সন্ত্রস্ত ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট তাঁহার বাড়ীতে সভা করিতে দিবেন কি না এবং নিজে সভার সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবেন কি না, এই প্রশ্ন উঠে। তিনি মারকুইস অব হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠান,—"কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকরা ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে আমার বাড়ীতে পরামর্শ-সভা করিতে চাহেন—আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব কি না এবং আমার বাড়ী দিব কি না—পরামর্শ দাও।" মারকুইস অব হেষ্টিংস উদারমতাবলম্বী লোক

ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পার না, কলিকাতার এক জন সহরবাসী বা 'প্রাইভেট ইণ্ডিভিজুয়েল'রূপে যুক্ত থাকিতে পার।" স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট প্রথমেই সভায় দাঁড়াইয়া বলেন,—"এ সম্বন্ধে আমার অবস্থা আমি খুলিয়া বলি—আমি জজরূপে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারি না। কলিকাতার অধিবাসী এক জন প্রাইভেট ইংরাজরূপে যুক্ত থাকিতে পারি।" এই ভাবে তাঁহার বাড়ীতে সভা হইল, সে সভায় ৫০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিল। আজকাল ৫০ হাজার টাকা যখন তখন উঠে। তখনকার ৫০ হাজার আর এখনকার ৫০ হাজার, উভয়ের দামের অনেক পার্থক্য। এখনকার ৫ লক্ষ অপেক্ষা তখনকার ৫০ হাজার বেশী। যাহা হউক, এই ভাবে হিন্দু কলেজের (?) প্রতিষ্ঠা হয়,—যাহা পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইংরাজ আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে রাজী হয়েন নাই। আমরা নিজেরা ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের সমাজপতিগণ এ বিষয়ে অগ্রসর হয়েন এবং প্রথমে কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার কলেজ হয়। ইংরাজ তাহা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, করিয়াছিলেন হিন্দু-নেতৃবর্গ—রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধনীরা। সুতরাং আমরা এক দিকে যদিও ইংরাজের কাছে কৃতজ্ঞ—বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞ, ইংরাজ ত নিমিত্ত মাত্র, অন্য দিকে আমাদের সমাজপতিদের কাছে আমরা অশেষ ঋণে আবদ্ধ।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইল। এই টাকা কি ভাবে খরচ হইবে, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক দলে প্রবল ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। দুই দল লোক দেখা দিল, এক দল লোক বলিলেন—"এই টাকা দিয়া মুসলমানদিগকে আরবী ও ফার্সী, এবং হিন্দুদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হউক; কিন্তু য়ুরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিও না।" ইঁহারা অরিয়েন্টেলিষ্ট। আর এক দল বলিলেন—"তাহা নহে, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হউক।" এই দলের নাম অ্যাংলীসিষ্ট। এই দুই দলে ঝগড়া আরম্ভ হইল। তাহাতে ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বৎসর এই ঝগড়ায় অতিবাহিত। তাহার পর ইংরাজী শিক্ষা রীতিমত প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। অরিয়েন্টেলিষ্ট এবং অ্যাংলীসিষ্টএর ঝগড়া কৌতূহলোদ্দীপক ও আমোদজনক। সে বিষয়ে এবং কিরূপে কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর উৎপত্তি হইল, পরে তাহা বলা যাইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আবাহন

তোমার গোলাপ-কুঞ্জে ফুটেছে গোলাপ আজি
স্তবকে স্তবকে অফুরান,
তোমার পালিত পিক চির মৌন কণ্ঠ মাজি'
ধরিয়াছে মধু-স্বরে গান!

তোমার রাজীব-প্রিয় নৃত্য-লীলাভঙ্গী চারু
শিখিয়াছে আপনা আপনি,
তোমার সরসী-বক্ষে পদ্ম-আলিম্পন-কারু,
নীল নীরে তুলেছে কাঁপনি!

বিশীর্ণা ত্রাক্ষার বল্লী হয়েছে সবুজ-ঘন
পরিপূর্ণ ফল-ভারানতা,
পুষ্পে পুষ্পে গেছে ছেয়ে তোমার কুসুম-বন,
মুঞ্জরিতা নব-মল্লী লতা!

তুষার-শীতল হিম শীত-সমীরণ আজি
দক্ষিণের মর্ম্মগীতি গাহে,
পরাগ-পাটল-পক্ষ দিশাহারা ভৃঙ্গরাজি
মর্ম্মরনে কারে ফিরে চাহে!

বাতাসে বহেছে আজি কুসুম-সুরভি-মাখা
মাধব এসেছে দ্বারে, মধু-পুষ্প বৃক্ষ-শাখা
কুসুমিত আনন্দে বিধুর!

কৃষ্ণা-তিথি অবসানে পূর্ণকলা শশিলেখা
কর্পূর-ধবলা জ্যোৎস্না-নিশা,
ঘুমন্ত বনান্ত-ভালে লেগেছে রঙের রেখা
দিগন্ত হারাল তাই দিশা!

তোমার নন্দনে প্রিয়! ফুটেছে মন্দার-গুচ্ছ
নীড় ত্যজি' উড়েছে চন্দনা,
শিখেছে তোমার শিখী মেলিতে মেচক-পুচ্ছ
জলধরে জানাতে বন্দনা!

ওগো তুমি এসো ফিরে, এসো একবার আজ,—
এসো শুধু ক্ষণিকের লাগি!
বিস্মিতা বাসন্তীনিশা মরমে পেয়েছে লাজ,
গাঢ় ব্যর্থ-প্রতীক্ষায় জাগি!

তোমার ভুবন আজি বৈভব-উজ্জ্বল বঁধু!
তুমি বিনা কে করে গৌরব!
সব হাসি বাণী বীণা গন্ধ গান বর্ণ ছন্দ
ব্যর্থ হায়! বিহীন-সৌরভ!

মহাভারতের প্রসিদ্ধ চরিত্র

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিদুর

মহর্ষি বেদব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের জনৈক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মনিষ্ঠায় কুরুকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পরম হিতৈষী ভ্রাতা ও মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে চলিলে ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইত. কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধৃতরাষ্ট্র অনেক সময়ে বিদুরের সৎপরামর্শ উপেক্ষা করিতেন; দুর্য্যোধন ও কর্ণাদির কুমন্ত্রণাই তাঁহার মনোনীত হইত।

পাণ্ডবরা সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চলিতেন বলিয়া বিদুর কুরু-পক্ষে থাকিয়াও বিধিমতে তাঁহাদের হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন। পাণ্ডবরা কেবল বিদুর কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় প্রদত্ত ইঙ্গিতে এবং বিদুর-প্রেরিত খনকের সাহায্যে জতুগৃহদাহ. হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়ার্থ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক দুই বার আহূত হইয়াছিলেন; উভয় বারেই বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে দ্যূতক্রীড়ায় যে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ হইবার সম্ভাবনা. তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন. কিন্তু তিনি বিদুরের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। প্রথম বারের দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবদিগকে ধৃতরাষ্ট্র ঘোর অনিমিত্ত দর্শনে ভীত বিদুরের ও গান্ধারীর কথায় পরাজয়ের ফলভোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ বনগমন করিলে পর বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করেন, কি করিলে তাঁহার পুত্রগণের মঙ্গল হইবে? বিদুর তদুত্তরে পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য-স্থাপনের পরামর্শ দেওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বিদুরকে কটুবাক্য কহিয়া হস্তিনাপুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বিদুর তখন কুরুকুলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া দীনমনে কাম্যকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন. ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাকে হস্তিনাপুরে প্রত্যানয়ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সন্ধিস্থাপনোদ্দেশ্যে কুরুরাজধানীতে গমন করেন, তখন তিনি দুর্য্যোধনের রাজ-ভোগ্য অন্ন-ব্যঞ্জন অগ্রাহ্য করিয়া বিদুরের অতিথি হইয়া-ছিলেন। এখনও কথায় বলে—"বিদুরের খুদ।" পাণ্ডবদিগের জয় হইবার পর ভ্রাতৃবৎসল বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অন্ধরাজের সহিত বনে গমন করেন এবং কঠোর তপশ্চরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন।

গান্ধারী

গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতার পরিচয় আমরা তাঁহার বিবাহকাল হইতেই পাই। যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, পতিব্রতপরায়ণা গান্ধারী তখন হইতেই বহু বার পাট-করা বস্ত্র দ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বয় বদ্ধ করিয়াছিলেন।

"গান্ধারী ত্বথ শুশ্রাব ধৃতরাষ্ট্রমচক্ষুষম্।
আত্মানং দিৎসিতং চাস্মৈ পিত্রা মাত্রা চ ভারত॥
ততঃ সা পটমাদায় কৃত্বা বহুগুণং তদা।
ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্ পতিব্রতপরায়ণা॥"

গান্ধারী অনন্যকর্ম্মা হইয়া অন্ধ স্বামীর সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পুত্রস্নেহও তাঁহাকে কখনও ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যতা হইলে বেদব্যাস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতঃপূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতিগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসে সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল.

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাঁহাকে কহিয়াছিলে, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।

"উক্তাস্যষ্টাদশাহানি পুত্রেণ জয়মিচ্ছতা।
শিবমাশংস মে মাতর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ।
সা তথা যাচ্যমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা।
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥"

হে কল্যাণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত; তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণসংহার পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে; পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমাগুণ ছিল; আজি তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ? এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সংবরণ কর।"

গান্ধারী কহিলেন, "ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে প্রহার করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বালিত করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণরক্ষার্থ সাধুজনসমুদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীর পুরুষের উচিত কার্য্য?"

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে অনুনয়সহকারে কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ! আমি আত্মরক্ষা করিবার আর অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাকে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমাকে বিনাশ করিলেই রাজ্যগ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাহাকে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! সৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহাকে বিনাশ করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই ঐরূপ অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্যাধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষশূন্য হইয়াছি।"

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভীম, বৈরনির্যাতন মানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত, ক্রূর ও অনার্য্যজনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।" তখন ভীমসেন কহিলেন, "আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরেরও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু বস্তুতঃ আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর এবং ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই; কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল।

নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত; এই নিমিত্তই আমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমাকে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?"

তখন গান্ধারী কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিকেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্র হইবে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।"

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে পুনরায় কহিলেন, "এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়?"

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে গান্ধার-রাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, "দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদ্গণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত)

গান্ধারীর ও লৌহভীম-চূর্ণকারী ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে কত প্রভেদ!

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ

পরিচয়

আঁধার রাতে তোমার সাথে
যেমন পরিচয়
হয় হে প্রভু, দিনের আলোয়
তেমন নাহি হয়!
বিশ্ব যখন সুপ্তি-মগন
করলে স্মরণ তোমায় তখন—
অম্‌নি এসে আমার কাছে
দাঁড়াও প্রেমময়!
স্নেহে আমার হাতটি ধর,
আমার সকল দুঃখ হর,
নিমেষমাঝে পলায় দূরে
সকল শঙ্কা ভয়!

কান্না-মাঝে তোমার যেমন
পাই হে স্নেহের সাড়া,
হাস্য-কলরবের মাঝে
পাই না তেমন ধারা!
তোমার ব্যথার বাঁধন বঁধু
কতই মিঠে, কতই মধু
আছে তাহে—লাগে যেন
ফুলের পরশ পারা!
পরাণ যতই দুখের আঁচে
কাত্‌রে ওঠে—ততই কাছে
পাই হে তোমায় প্রিয় আমার—
হই যে আত্মহারা।

কাঞ্চীপুর

"বর্দ্ধমান কাঞ্চীপুর ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কবির মনোরথ অশ্ব ছয় দিনে কাঞ্চীপুর হইতে সুন্দর কুমারকে কল্পিত বর্দ্ধমানে আনিয়া ফেলিয়াছিল। বর্দ্ধমানবাসী এই অসুন্দরকে এ যুগের বাষ্পীয় রথ যে দুই দিনের পূর্ব্বেই কাঞ্চীপুরে লইয়া যাইতে পারে, তাহা ৯ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি; অল্পকালমধ্যেই আকাশ-গামী পুষ্পরথ অনেক রাজপুত্রকে কেন, কোটালের পুত্রকেও ছয় দণ্ডে কাঞ্চীপুর দেখাইতে পারিবে। অবশ্য অ"বিদ্যা"-লাভার্থ আমার ঐ যাত্রা নহে; বাসনা কেবল দেশ দর্শনের।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

স্কন্দপুরাণের এই সদুপদেশে মোক্ষলাভের নিমিত্ত যাওয়াও নহে; বয়স তখনই পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেও "বনং ব্রজেৎ" কথার সার্থকতায় বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসার পরে অন্য বনের কথা মনে উঠে নাই। দক্ষিণের সুপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় কাশী, চোল-পল্লবাদি প্রাচীন রাজকুলের, তথা মনীষী পণ্ডিত-বর্গের, কোনও মতে শঙ্করাচার্য্যেরও লীলাভূমি কাঞ্চী মাদ্রাজ প্রদেশের অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের অগ্রগণ্য বলিয়াই তখন ধারণা ছিল, এখনও আছে। যাহা দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, তাহার কথাই বলিব; ইহার অনেক কথা ৮ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

সে বার ওয়ালটেয়ার ভিজিগাপত্তন হইতে মাদ্রাজ অঞ্চলে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত দেখিবার প্রয়াসে যাত্রা করিয়া বেজওয়াড়া জংসন ষ্টেশনের ছত্রে রাত্রিযাপন করি। প্রভাতে রেলগাড়ীতে উঠিলে দুই জন মাদ্রাজী যুবক আসিয়া আমার প্রকোষ্ঠেই উঠিলেন। ইংরাজীতে আলাপ আরম্ভ হইলে জানিলাম, দুই জনই ব্রাহ্মণ, শালা-ভগিনীপতি, নিবাস কন্‌জিভেরম্ (মাদ্রাজী স্বরে কাঞ্চীপুরম্ ঐ ভাবেই উচ্চারিত হয়)। শ্যালক শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণমূর্ত্তি প্যাচাপা কলেজে এফ, এ পড়েন, বড়ই নম্রপ্রকৃতির সজ্জন ছোকরা; কাঞ্চীপুর দেখিবার প্রস্তাবে সাগ্রহে বলিলেন, "আমাদের বাটীতে থাকি-

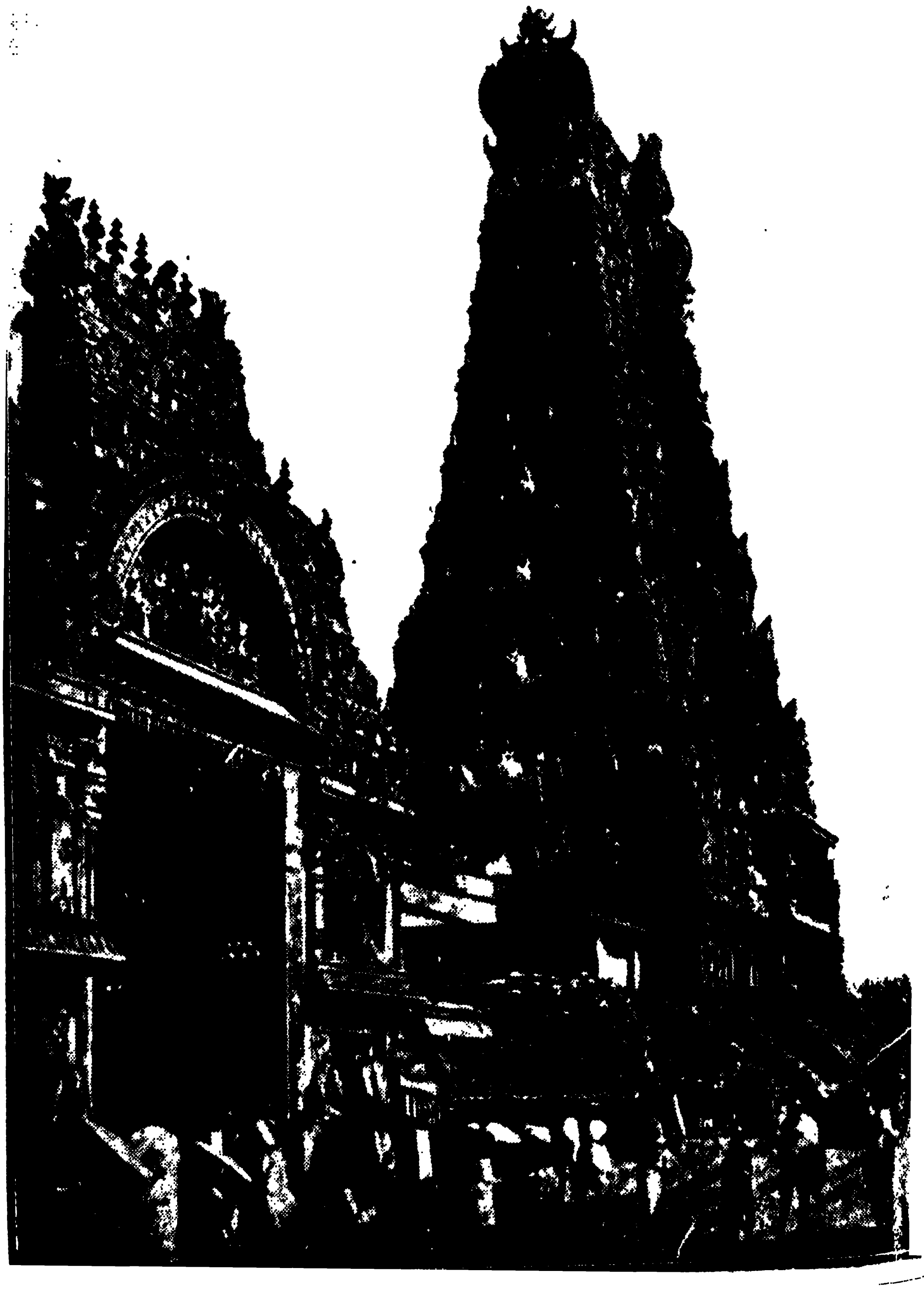
উঠিয়া পরে প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক এবং কাউন্সিল সভ্য নটেশানের বাটীতে ছিলাম। রামেশ্বর দর্শন এবং ধনুষ্কোটি তীর্থে অক্ষয়-তৃতীয়ায় স্নানের পর ফিরিবার সময়ে চিঙ্গলপুট হইতে ছোট লাইনে দুই তিন ষ্টেশনের পরেই কাঞ্চীপুরে পৌছিলাম। কাঞ্চী মাদ্রাজ হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। দূর হইতে ছোট কাঞ্চীর (বিষ্ণুকাঞ্চী) প্রকাণ্ড গোপুরম্ দৃষ্ট হইল। ষ্টেশনে ঝট্‌কা টমটম পাওয়া গেল; বড় কাঞ্চীর লিঙ্গপা ষ্ট্রীটে কৃষ্ণমূর্ত্তির পিতা বেঙ্কট সুব্বায়ার গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। কৃষ্ণমূর্ত্তি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন; এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম। ঐ পল্লীর রাস্তা অতি পরিষ্কার; অনেক গৃহই কতকটা ইটের এবং কতকটা খোলা দিয়া ছাওয়া। অদূরে পশ্চিমদিকে সর্ব্ব-তীর্থ পুষ্করিণীতে স্নান করা গেল। ইহার চতুর্দ্দিক্ পাথরে বাঁধান; অনেকগুলি জলাবতরণের ঘাট, জল সবুজ ডিম্বি-পূর্ণ। সর্ব্বতীর্থের সমবায় বলিয়া এখানে স্নানে মুক্তি অনি-বার্য্য। পুষ্করিণীর চারিদিকে কয়েকটি প্রাচীন শিব-মন্দির; দূরেও কতকগুলি মন্দির দৃষ্ট হইল; এখনও না কি শিব-কাঞ্চীতে ১ শত ৮টি মন্দিরে নিত্য পূজা হয়।

মহাদেবের কটিদেশ সংস্থিত বলিয়া ইহার নাম কাঞ্চী :—

"নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥"
তোড়লতন্ত্র—সপ্তম উল্লাস।

"কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাদবন্ত্যামতিপাবনী।"—বৃহন্নীলতন্ত্র।

দক্ষিণের কাশী বলিয়া কাঞ্চী এবং ভুবনেশ্বর উভয়েরই দাবী আছে। এই দুই স্থানের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন, ইহা লইয়া বিতর্কও চলে। স্কন্দপুরাণ প্রাচীনতর কি উৎকলখণ্ড প্রাচীন, ইহা স্থির হইলে উভয়ের স্বত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। কাঞ্চীতে একাম্রনাথ, ভুবনেশ্বরে একাম্র-কানন। প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রণিধানযোগ্য বহু মূর্ত্তি, মন্দির, স্তম্ভ ও শিলালিপি এই দুই নগরেই বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক আছে। কাঞ্চী-



সাধকবর্গের, এমন কি, শঙ্করাচার্য্যেরও লীলাভূমি বলিয়া কথিত হয়। কাঞ্চীর প্রধান অর্থাৎ একাম্রনাথ মন্দিরের কাল লইয়া পণ্ডিতরা গোল করেন। ফার্গুসন্ লিখিয়াছেন, "কাঞ্চীর প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে কৈলাসনাথ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। নগরের পশ্চিমদিকে মাঠের মধ্যে ইহা স্থাপিত। শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে, উগ্রদণ্ড লোকাদিত্যপুত্র রাজসিংহ বা নরসিংহ বিষ্ণু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগে এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। পূর্ব্বে ইহারই নাম রাজরাজেশ্বর ছিল; তখন কেবল বিমান এবং পৃথক্ অঙ্গনে মণ্ডপম্ ছিল, পরবর্ত্তী কালে এক অর্দ্ধমণ্ডপম্ পুরাতন মন্দিরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমানমধ্যে সাধারণ প্রদক্ষিণ-পথ সহ লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত, মধ্যে আরও কয়েকটি ছোট বড় মন্দির এবং এক প্রকাণ্ডকায় নন্দীবৃষ। মন্দিরগুলির বহির্দ্দেশে হরপার্ব্বতী ও অন্য দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত। কোনটির শিখরদেশে হস্তী বসান। প্রাচীন মণ্ডপের ছাদ পড়িয়া যাওয়ায় সংস্কার করান হইয়াছে; দুই দিকে অনতিবৃহৎ গোপুরম্ আছে।" দ্রাবিড়ী ছাঁদের আর এক প্রাচীন মন্দির কাঞ্চীর পূর্ব্ব-পার্শ্বের বিষ্ণুমন্দির বৈকুণ্ঠ পেরুমল ফার্গুসন্ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই দুই মন্দিরেরই ছবি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকে দিয়াছেন।

বড় কাঞ্চীর প্রধান শিব-মন্দিরের গোপুরমগুলি বা বর্ত্তমান বিমান দেখিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলা উচিত নহে; ফার্গুসন্ নির্ম্মাণ এবং গঠনপ্রণালী লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। একাম্রনাথ প্রাচীন না হইলে তন্ত্রে এবং শৈব-সাধকের নিকট তত আদর পাইতেন না; নবীনের পক্ষে তীর্থ হইয়া উঠা দুষ্কর। একাম্রনাথের প্রাচীন বিমান কতবার সংস্কৃত বা নূতন গঠিত হইয়াছে, কে বলিবে? অনেক রাজা বিভিন্ন সময়ে এই স্থানেই মণ্ডপ এবং বৃহৎ গোপুরম্ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। দক্ষিণের সর্ব্বপ্রধান নয়-তল গোপুরম্ বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৩০) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্য কয়েকটি এবং সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপম্ প্রভৃতি প্রাচীন সন্দেহ নাই। প্রধান গোপুরমের উচ্চতা ১ শত ৮৮ ফুট এবং চতুর্দ্দিকে ৭৫ ফুট প্রশস্ত। ইহার উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া নগর দেখা গেল। তথাকথিত সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপের স্তম্ভসংখ্যা ক্ষেত্রে পূর্ব্বকালের রাজারা যে সকল মণ্ডপ-গোপুরাদি নির্ম্মিত করাইয়াছেন, তাহা শ্রেণীবদ্ধভাবে না থাকিলেও সমগ্র স্থানটি দর্শকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে। এখানে সুন্দর ও গম্ভীরে মিলিয়াছে। মধ্যস্থলের পাতরে বাঁধান পুষ্করিণী, প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, এখানে সেখানে মণ্ডপ এবং ইষ্টক-প্রস্তরে সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত প্রকাণ্ড গোপুরম্ লোককে স্বভাবতঃই স্তম্ভিত করিবে। একাম্রনাথের সুবিখ্যাত আম্রবৃক্ষটির বয়স অনুমান ২ শত ৫০ বৎসর। পূর্ব্বে এই স্থানে অন্য এক বৃক্ষ ছিল কি না, কে বলিবে? জ্যৈষ্ঠ-শেষে দেখিলাম, দুই ডালে ডাঁশা-পাকা আম; উত্তর ও পশ্চিমের কয়েকটি ডালে মুকুল ও কসি। সকলেই বলিল, বারো মাস আম থাকে, প্রত্যহ পাকা আম ভোগে লাগে, বিভিন্ন ডালের আমের স্বাদ বিভিন্ন, ইত্যাদি। একাম্রনাথ ক্ষিতিমূর্ত্তি, জলাভিষেক হয় না। স্থলপুরাণে একাম্রনাথ সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ:—একদা ভগবতী রহস্য-কৌতুকচ্ছলে মহাদেবের চক্ষুত্রয় হস্ত দ্বারা আবৃত করেন। ইহাতে সূর্য্য-চন্দ্র-বহ্নিরূপী ত্রিনয়ন আচ্ছাদিত হওয়ায় সৃষ্টিতে গোলযোগ বাধিল। ভবগেহিনীর এই কার্য্যে পাপ সংঘটিত হওয়ায় শিব তাঁহাকে কাঞ্চীর একাম্রনাথ-সন্নিধানে কম্পা নদীতীরে তপস্যা করিয়া পাপ-ক্ষালনের বিধান দিলেন। ছয় মাস পরে তিনি তথায় আসিয়া দেবীর সহিত মিলিত হইলেন। স্থলপুরাণে অন্যত্র কথিত আছে—"আমি সমগ্র শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষরূপে রাখিয়া লিঙ্গরূপে একাম্রনাথ নামে এই স্থলে বাস করিতেছি। কাঞ্চীতে বাস করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়; প্রলয়েও এই নগরীর বিনাশ নাই, আমি সে সময়ে ত্রিশূল দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিব।" ফল কথা, ইহা দক্ষিণের কাশী।

একাম্রনাথ মন্দির হইতে দক্ষিণাভিমুখে এক সুপ্রশস্ত রাজপথ ভগবতী কামাক্ষী মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখনও এই পথের উভয় দিকে বড় বড় বাড়ী; কিয়দ্দূর গিয়া দক্ষিণভাগের একটি স্থানকে রাজবাড়ী বলে। এখানে পল্লবরাজগণের প্রাসাদ ছিল, মনে হয়। বড় পথটি এক মাইলেরও অধিক দীর্ঘ হইবে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে কামাক্ষী দেবীর ভোগমূর্ত্তি সুসজ্জিত দোলায় চড়াইয়া একাম্রনাথ মন্দির-দ্বার পর্য্যন্ত আনীত হয়। অক্ষয়-তৃতীয়ার পরে পঞ্চমীর রাত্রিতে ঐরূপ এক শোভাযাত্রা

দেবদাসী গান করিতে করিতে চলে। ফাল্গুনমাসে পক্ষব্যাপী উৎসবের সময় দশম দিনের রাত্রিতে কামাক্ষী ভোগমূর্ত্তি একাম্রনাথ মন্দিরে রাখা হয়। কামাক্ষী দেবীর মন্দির নাতিবৃহৎ; বিজয়নগরাধিপ হরিহর দেবী-মন্দিরের প্রকাণ্ড তাম্রকবাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে, মণ্ডপে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এবং নিকটেই শঙ্করাচার্য্যের সমাধি বলিয়া কথিত এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ইনি কি আর এক শঙ্করাচার্য্য? নিকটবর্ত্তী সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের মন্দির দর্শনযোগ্য। দক্ষিণে কার্ত্তিকের বড় আদর; সুব্রহ্মণ্য, ষণ্মুগম্ (মুখম্) আর মুগম্ (ষড়ানন) প্রভৃতি নাম মান্দ্রাজ অঞ্চলে অনেক। নটরাজ শিব এবং যোদ্ধবেশে কার্ত্তিকেয় দক্ষিণের বিশিষ্টতা।

শিবকাঞ্চী হইতে ছোট অর্থাৎ বিষ্ণুকাঞ্চী পর্য্যন্ত এক সুন্দর সুপ্রশস্ত রাজপথ; দুই দিকে নারিকেল-আম্রাদি বৃক্ষশ্রেণী সুসজ্জিত। পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ায় তাঁতিদের টানা, কোথাও বা তাঁতের কায চলে। কিন্তু কাঞ্চীর প্রধান দেবতা বরদরাজ-স্বামী বিষ্ণুর স্থাপনার কাহিনীও স্কন্দপুরাণে আছে। একাদশ শতাব্দের সমকালে শাসনকর্ত্তা গঙ্গাগোপলে রাও নারায়ণের বরে পুত্রবান্ হইয়া এই মন্দির এবং কল্যাণমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একটি শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণের গল্প অকিঞ্চিৎকর। গঙ্গাগোপলে সেবার নিমিত্ত তিন সহস্র মুদ্রা আয়ের বিষয় অর্পণ করিয়া যান। বর্ত্তমানে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট না কি বরদরাজের সেবার জন্য বার্ষিক ৯ হাজার টাকা দেন। সম্ভবতঃ নানা জনের ক্রমশঃ প্রদত্ত বিষয়ের এই আয় দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বরদরাজস্বামী ধনাঢ্য দেবতা, তাঁহার মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের মূল্য না কি এক লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ক্লাইভ-দত্ত এক মূল্যবান্ কণ্ঠাভরণ আছে বলিয়া প্রকাশ। প্রধান মণ্ডপটি শতস্তম্ভ (৯৬), মধ্যভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত এক শৃঙ্খল এক খণ্ড পাষাণ কাটিয়া নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। পাষাণপ্রাঙ্গণের অদূরে সরোবরের (টেপ্পাকুলম্) মধ্যে একটি সুন্দর গৃহ। এখানকার প্রধান গোপুরম্ সপ্ততল এবং প্রায় শত ফুট উচ্চ। দেখিতে সুন্দর হইলেও এখানকার গোপুরম্ ইট, পাথর, মসলা দিয়া সুসজ্জিত চিত্রবিশিষ্ট নহে। ইহা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী বৈষ্ণবগণের প্রধান স্থান ছিল। এখান হইতে ২ মাইল দূরে তিরুপ্পাদিকুরম্ নামক স্থানে এক সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত জৈন মন্দির আছে শুনিয়াছি; কিন্তু সময়াভাবে (হস্তিনা তাড্যমানোঽপি নহে) তথায় যাওয়া ঘটে নাই।

এক্ষণে ইতিহাসের অনুসরণ করা যাইতেছে। প্রাচীনকালে কাঞ্চী চোলমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল; পরে পল্লবরা প্রবল হইয়া সমগ্র দক্ষিণ-কর্ণাট অধিকার করিয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। অশোক অনুশাসনে চোলরাজ্যের উল্লেখ আছে। পল্লবরা কোন্ জাতীয় এবং কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত, এই কথা লইয়া পণ্ডিত-সমাজে এখনও বিতর্ক চলিতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের কেহ কেহ পল্লবকে 'Palhabas—Peloi' এই ভাবে বানান করিয়া লইয়া প্রাচীন পার্থিয়ান্ জাতির বংশধর বানাইয়া অনেকটা পশ্চিমের দিকে টানিতে চান। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণাদিতে যে শক-পল্লবাদির উল্লেখ আছে, তাহারা ভারতের পশ্চিমোত্তরভাগের অধিবাসী বটে। বরাহমিহির যে পল্লবের উল্লেখ করেন, তাহারা কোন্ পল্লব? সভ্যজাতিরা সকলেই পশ্চিম হইতে আগত, এই অনুমান অনেক পাশ্চাত্য ধীমানের স্কন্ধে চাপিয়া আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট অনুসন্ধানে পল্লবের এই কল্পিত পারশীক সম্বন্ধের কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের আলোচনায় সম্প্রতি প্রমাণ হইয়াছে যে, দক্ষিণের পল্লব রাজরা সিংহলের সহিত সংবদ্ধ। তামিল কাব্য মণিমেকলাই এবং চিলাপ্পাটিকরণ হইতে দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন যে, সিংহলরাজ গজবাহু প্রাচীন চোল-রাজধানী পুহার ধ্বংস করিবার পরে চোলরাজরা তাহার উত্তরে ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্ত্তী উড়েয়ার নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। সিংহলী পণ্ডিত রসনায়গম্ উক্ত প্রাচীন তামিল কাব্য হইতে নবরস নিষ্কাশন করিয়া নাম সার্থক করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ দিয়াছেন যে, ঐ নূতন রাজধানী-স্থাপয়িতা কিল্লী বলবানের সহিত সিংহলের কোণাংশে স্থিত বর্ত্তমান জাফনা উপদ্বীপের নাগরাজকন্যা মণিপল্লবের প্রসক্তি হয়, এই সংযোগের ফল পুত্র টোন্ বাইমান্ পিতা কর্ত্তৃক টোণ্ডামণ্ডলমের অধিপতি নিয়োজিত হইয়া আসিয়া কা

শতাব্দীর শেষভাগের; মণি পল্লবের নাম হইতেই বংশের নাম পল্লব। প্রত্নবিদ রিস? 'পল' ভুগ্ধ হইতে নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন; ইহাতে পল্লব-গোপের ব্যাখ্যা হইতে পারে। পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামী আয়েন্‌গার লিখিয়াছেন,—পল্লবরা নাগবংশোদ্ভূত; তামিল জাতি হইতে ভিন্ন। ঐতিহাসিক পল্লবগণ দক্ষিণাপথের শাতবাহন বংশের প্রথমে করদরাজ ছিলেন, সন্দেহ নাই। পল্লববংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হয় যে, করমণ্ডল উপকূলের উত্তরে কলহস্তী হইতে দক্ষিণে পদুকাটা পর্য্যন্ত উঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। কলহস্তী বর্ত্তমান উত্তর-আর্কট জিলায়; বর্ত্তমান আর্কট, চিঙ্গলপট্, ত্রিচিনাপলী ও তাঞ্জোর জিলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার উত্তরাংশ প্রাচীন চোলের এবং দক্ষিণ ভাগ পাণ্ড্যরাজ্যের অধীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, চোল ও পাণ্ড্য উভয় রাজ্য লইয়া এই নব পল্লব গঠিত।

সমুদ্র গুপ্তের প্রয়াগস্তম্ভে ক্ষোদিত শাসনে (৩৫০ খৃঃ) কাঞ্চীর অধিপতি যে বিষ্ণুগোপের নাম আছে, তিনি পল্লববংশীয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গীরাজ হস্তীবর্ম্ম ও সিংহবর্ম্মও (পঞ্চম শতাব্দীর ১ম ভাগ) পল্লব। চালুক্যবংশীয় রাজগণের সহিত পল্লবদিগের বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল, উভয়েই দক্ষিণাপথে প্রাধান্যলাভের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সিংহবিষ্ণু (৫৭৫ খৃঃ) হইতে ৯ জন পল্লব রাজার বংশাবলী নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্র বর্ম্মন্ (৬০০-২৫ খৃঃ) প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন; ত্রিচিনপল্লী এবং আর্কটের পাহাড়কাটা মন্দির এবং অন্যান্য শিলালিপি তাঁহাকে অমর করিয়াছে। মহেন্দ্রবাড়ী নগরের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রকাণ্ড মহেন্দ্র-সরোবর এখনও বর্ত্তমান। এই মহেন্দ্রবর্ম্মার সহিত চালুক্য সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর যুদ্ধ বাধে। আর্কটের মধ্যে পাটলিপুত্রের নামে স্থাপিত পাটলিপুত্তিরম্ নামক স্থানের জৈন মঠ মহেন্দ্র বর্ম্মা ধ্বংস করেন বলিয়া কথিত আছে। মহেন্দ্র-পুত্র নরসিংহ বর্ম্মন্ প্রবলপ্রতাপ নরপতি। তিনি পুলকেশীকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন। অনেকের মতে এই যুদ্ধে সম্রাট্ পুলকেশী নিহত হয়েন। সিংহলরাজ মানবর্ম্মা এই যুদ্ধে নরসিংহের সহায়ক ছিলেন। (এখন মহাবলিপুর বলা হয়) সুপ্রসিদ্ধ সপ্তমন্দির নরসিংহের প্রধান কীর্ত্তি। পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে পল্লব পরমেশ্বর বর্ম্মকে নির্জ্জিত করিয়া প্রণষ্ট পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। এই যুদ্ধকালে চালুক্যরা এক সময় কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমের এক শিলালিপি কৈলাসনাথ মন্দিরে আছে, তিনি রাজরাজেশ্বর-মন্দিরে পূজা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুদ্ধে আবার পল্লবরা জয়লাভ করেন। নন্দী বর্ম্মা পল্লবগণের অপর এক বংশ হইতে প্রজার মনোনয়নে রাজা হন এবং ৬২ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। কাঞ্চীর বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরে যে সকল অসম্পূর্ণ চিত্র ক্ষোদাই করা আছে, তাহা এই যুগের সমাজচিত্র বলিয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন। তাম্রশাসনে প্রমাণ হয়, কৃষ্ণাতীরে অমরাবতী পর্য্যন্ত পল্লব অধিকারে ছিল।

কিয়ৎকাল পরে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ ৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চী অধিকার করেন; আবার কিছু দিন ধরিয়া রাষ্ট্রকূটগণের সহিত পল্লবরাজগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। পরে মহীশূরের গঙ্গবংশের সহিত যুদ্ধ, শেষে দ্বাদশ শতাব্দে নব উদ্যমে উত্থিত চোলবংশীয় রাজকুলের অধীন হইয়া পল্লবের পতন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পল্লবরা চোল রাজাদিগের করদ হইয়া পড়েন। সপ্তম শতাব্দের মধ্যভাগে কাঞ্চী পরিদর্শন করিয়া ইয়ুন্-চাং লিখিয়াছেন,—"ইহা দ্রাবিড় দেশের রাজধানী, এটি এক প্রকাণ্ড সহর। নিকটে যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা অশোকের সময়ের বলিয়া কথিত। কাঞ্চীর বেষ্টন ৬ মাইলের অধিক। কাঞ্চীরাজ্যে এক শত বৌদ্ধমঠ আছে, স্থবির-সংখ্যা ১০ হাজার। ইহা ভিন্ন হিন্দু-মন্দির ৮০ এবং দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মঠও আছে।" কাঞ্চীরাজ্য বহুকাল ধরিয়া হিন্দুপ্রধান ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধে ধর্ম্মকলহের কোন উল্লেখ নাই, এক জৈন মঠ ধ্বংস করার গল্পমাত্র আছে। শীলভদ্রের পূর্ব্বতন নালন্দা মঠের অধ্যক্ষ ধর্ম্মপাল কাঞ্চীতে জন্মগ্রহণ করায় দ্রাবিড়ে বৌদ্ধ মহাযান স্থবির সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ছিল বোধ হয়। পরবর্ত্তী কালের পল্লবরাজগণ সকলেই শৈবমতাবলম্বী ছিলেন; নন্দীবৃষ তাঁহাদের রাজচিহ্ন ছিল। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন কাঞ্চীপতি শৈবধর্ম্মের এতই অনুরাগী ছিলেন যে, তাঁহারা ৬৩ শৈব সাধকের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন।

বাঙ্গালার বিপ্লবকাহিনী

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঘটনাচক্রে বাঙ্গালার আধুনিক ইতিহাসে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন নব্য বাঙ্গালী হৃদয়ের ভাব-প্রবণতা প্রাণপণ ক'রে নতুন কিছু করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সেই শুভক্ষণের যোগ্য আদর্শ ও তাতে যথাযথ প্রেরণা পেলে গতানুগতিকতারূপ কারাগারের সুদৃঢ় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে, এমন কি, তা ধূলিসাৎ করেও বাঙ্গালা যা পেত, তা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না-ও হ'তে পারত, কিন্তু হাজার হাজার বছর ধ'রে শত শত প্রকারে কোটি কোটি মানুষকে যে অমানুষে পরিণত করা হয়েছে, তা থেকেই হ'ত মুক্তি। এই মুক্তি সম্যক্ না পেলে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একেবারে অসম্ভব, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে ঐ মুক্তিসাপেক্ষ, সে কথা তখনকার (এখনকারও) তথাকথিত প্রেরণাদাতা নেতারা সকলেই অগ্রাহ্য করলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেলেই আপনা হ'তে অন্য সব জঞ্জাল চ'লে যাবে। অর্থাৎ কি না, জনসাধারণ যে তিমিরে চিরটা কাল আছে, সেই তিমিরেই যে এখনও থাকবে; সে কথার শাস্ত্রের মারফৎ বিধাতাপুরুষ বিধান ত দিয়েই রেখেছেন। তবে বাস্তববাদী ইহকালসর্ব্বস্ব বিদেশীয়দের শাসন-প্রভাবে এদের মতি-গতি যে অ-ভারতীয় Destructive স্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেলে শাস্ত্রানুমোদিত Constructive আইন-কানুনের কসুনির চোটে আবার ভারতীয় সভ্যতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে, এই হ'ল নেতাদের প্রাণের কথা। ফল কথা, যাদের জন্য স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক এবং যারা সামাজিক স্বাধীনতা না পেলে Nationality ব'লে জিনিষটা এ দেশে সম্ভবই হ'তে পারে না, নেতারা নিজেদিগকে যে তাদের শ্রেণীভুক্ত ব'লে মনে করতেই পারেন না। পরন্তু কোটি কোটি লোককে দাসে পরিণত ঘৃণা করবার সুখ ও সুবিধা ভগবান্ শাস্ত্রের মারফৎ যাদের দিয়েছেন ব'লে দাবী করা হয়, নিজেদিগকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত ব'লে মনে করতে নেতারা অভ্যস্ত।

কাযেই আমরা যে প্রেরণার কথা আগে বলেছি, সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তা না এসে এল ঠিক তার উল্টো। সেই ধর্ম্মভাব বা হিন্দুয়ানী যা কয়েক বছর আগে বিপ্লববাদ-প্রচারকে সার্থক করবার একমাত্র উপায়স্বরূপ ব'লে গৃহীত হয়েছিল, আর আনন্দমঠের অনুকরণে এখন তা উদ্দেশ্যে পরিণত হ'তে চলল, অর্থাৎ এখন সনাতন হিন্দু সভ্যতার উদ্ধার এবং হিন্দুধর্ম্মের একাধিপত্য (শুধু ভারতে নয়, সমস্ত জগতে, বিশেষ ক'রে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে) স্থাপন করাই হ'ল উদ্দেশ্য, আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই হ'ল তার উপায়। এই বৃথা স্পর্দ্ধার কথা বলতে বোধ হয় প্রথমে শিখিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এখন রামা, শ্যামা সকলেই সে কথা ব'লে থাকে। যাই হোক, এখন আমরা দেখাব, সেই উপায় কি রকম ক'রে উদ্দেশ্যে পরিণত হ'তে চলেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে এই হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী প্রসারলাভ করছে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হ'তে দু বছর যাবৎ বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ-প্রচার পাশ্চাত্য উপায়ে সহজসাধ্য না দেখে, ক-বাবু বিপ্লববাদে ধর্ম্মের খোলস পরাবার জন্য ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হন। তার পর স্বদেশী আন্দোলন যখন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন এর সুযোগে বিপ্লববাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচারকার্য্য অপেক্ষাকৃত একটু বেশী হ'লেও ইচ্ছার অনুরূপ একবারেই হয় নি। মতের অনৈক্য, বারীন, যতীন বাবু প্রভৃতি উপনেতা ও কর্ম্মীদের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে ঝগড়াঝাটি, নেতা ও উপনেতাদের অন্যায় পক্ষপাতিতায় আর মতের অনৈক্যতার জন্য নেতাদের মধ্যে ভীষণ দলাদলি আরম্ভ হ'ল। এত দিন যিনি বাঙ্গালায় বৈপ্লবিক সমিতির নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট

সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল। অন্য নেতা উপনেতারা—ইন্দ্র, চন্দ্র, নিখিল, সতীশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুললেন। তার মধ্যে ঢাকার অনুশীলন-সমিতি উল্লেখযোগ্য। ডাকাতীর "honest attempt" করাই ছিল এঁদের তখনকার উদ্দেশ্য, আর কাযের মধ্যে ছিল নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলে চেলাদের ক'সে বাঁধার চেষ্টা।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জিলায় জিলায় নানা প্রকার নাম দিয়ে স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের এক একটি সমিতি ও তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে অনেকগুলি স্বদেশী ভাণ্ডার বা দোকান স্থাপিত হয়েছিল। এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। এই সংস্থানগুলিকে বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত করবার জন্য প্রত্যেক নেতা চেষ্টা করেছিলেন।

ক-বাবুর দলে বারীন তখন প্রধান কর্ম্মী। ক-বাবু না কি এক সিদ্ধপুরুষের নিকট মন্ত্রশিষ্য হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি-লাভের জন্য যোগসাধনা করছিলেন। যে অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে দলে দলে চেলা সংগ্রহের আশা করেছিলেন, সে রকম শক্তিলাভ করতে না পেরেই বোধ হয়, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুরাট কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে বারীন ও উপেনকে এক জন বাস্তব চক্ষুতে দ্রষ্টব্য অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ খুঁজতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পাঠান হয়েছিল। নানা স্থানে ঘুরে ফিরে তাহারা যে কয় জন সিদ্ধ-পুরুষের দেখা পেয়েছিল, তাহার মধ্যে "লেলে মহারাজ" নামক এক জন ছাড়া কারুর না কি আশানুরূপ অলৌকিক শক্তি না থাকাতে অগত্যা তাহাদের ফিরে আসতে হয়েছিল। এই "লেলে মহারাজ" যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাহাতে তখন বারীনের মন উঠে নি। অথচ এখানে দলে চেলা জোটে না; যাহারা জোটে, তাহারাও অনন্তপরায়ণ হয়ে মাথা গুঁজে বেশী দিন থাকে না; আর দু' এক জন যাহারা থাকে, তাহারাও একদম পোষ মান্‌তে চায় না। এই সকল কারণে আবার একটি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন গুরু পাকড়াও করবার জন্য expedition পাঠান হ'ল।

কি ক'রে জানি না, ক-বাবু শুনেছিলেন, নেপালের কোন্ এক পাহাড়ের ওপর এক জন এমন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, যিনি শালগাছে কদলী, আর কলাগাছে মুলো না এই রকম একটা যাত্রা করল। ঐ expeditionএ ছিল বারীন, উপেন, উল্লাস প্রভৃতি ১০।১২ জন কলকাতা থেকে, আর বাঁকীপুর থেকেও ছিলেন কয়েক জন। তার মধ্যে এক জন মহিলাও না কি ছিলেন। এঁর জন্য পাল্কী-বেহারাও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কিন্তু সেই পাল্কী মদ্দপুরুষদের কাযেই বেশীর ভাগ লেগেছিল। আমি তখন প্যারিসে। নইলে নিশ্চয় এঁদের সঙ্গ হ'তে বঞ্চিত হতাম না। অনেক রকম কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগের পর এঁরা পরম বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছে দেখেছিলেন, এঁদের সেই সাধু বাবাজী কয়েক মাসের জন্য অন্যত্র গেছেন। অনেক অনুসন্ধানে শুধু শালগাছে কেন, কোন গাছেই কদলীর অন্বেষণ পেলেন না। অগত্যা ফিরে এলেন।

তখন অনন্যোপায় হয়ে পূর্ব্বোক্ত 'লেলে মহারাজ'কেই ডেকে পাঠান হ'ল। তিনি কয়েক দিন পরে এসেছিলেন। আমি প্যারিস থেকে আসবার পর এক দিন গিয়ে দেখলাম, ক-বাবুর বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে তিনি শুয়ে আছেন; এক জন তাঁর ভুঁড়িতে, আর এক জন পায়ে ঘি মালিস করছে।

তাঁহার অলৌকিক শক্তি ক-বাবু কিছু দেখেছিলেন কি না, তাঁহার কাছে শুনি নি; কিন্তু বারীন ও উপেনের কাছে শুনেছি, তাঁকে স্পর্শ করলে একটা আধ্যাত্মিক শক্তির অনুভূতি হ'ত। যে অলৌকিক শক্তির দ্বারা সম্মোহিত হয়ে লোক দলে দলে এসে বৈপ্লবিক দলে যোগ দেবে, আর চক্ষু বুজে নেতাদের যে কোন আদেশ পালন ক'রে ধন্য হয়ে যাবে ব'লে কর্ত্তারা আশা করেছিলেন, সে রকম শক্তি তিনি দেখাতে পারলেন না।

যাই হোক, তিনি আমাদের বিপ্লববাদের সমস্ত বিবরণ শুনে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরাজের কবল থেকে ভারত স্বাধীন করতে ভারতবাসীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হবে না। ভারতের সিদ্ধদেহী ও বিদেহী মহাত্মারা তার ব্যবস্থা করেছেন; তাতে ক'রে পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটবে, যার ফলে ভারত বিনা যুদ্ধে (এমন কি, বিনা কলম-বাজী ও বিনা বক্তৃতাতে) আপনা হ'তে স্বাধীন হয়ে যাবে। সে জন্য বিপ্লববাদ প্রচার বা বিপ্লবের আয়োজন অকারণ কষ্টমাত্র। তাঁর মতে বিপ্লববাদীদের উচিত তাঁর সঙ্গে গিয়ে স্বর্গের পরম বাঞ্ছিত ধাম গোলোকপ্রাপ্তির জন্য

রেয়ারে জেলখানার ভেতর ব'সে ব'সে তথাকথিত এই সিদ্ধ মহাপুরুষের বাণী সত্য যে হবে, তা ভেবে কয়েক বছর বৃথা আশায় বেশ তৃপ্তিলাভ করেছিলাম।

কিন্তু কেউ তাঁর এ সদ্যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। আমাদের কর্ত্তারা বড়ই হতাশ হয়ে অগত্যা বাবাজীকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কর্ত্তারা হতাশ হ'লেও চেলাদের হতাশ হ'তে দেওয়া হয় নি। তাদের মধ্যে realisation এর competition জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। কে কতদূর progress করল, তার হিসাব নিত্য সকালে নেওয়া হ'ত। ক-বাবু "আদেশ" (ভগবানের ?) পাচ্ছেন ব'লে চেলাদের মধ্যে প্রচার করাও হয়েছিল। যে সকল চেলার সঙ্গে তখন আমার একটু বেশী মেলামিশি করবার সুযোগ হয়েছিল, তাদের কাছে শুনেছি, তারা কিন্তু ঐ আদেশের ব্যাপারটাকে একটু রহস্যের ভাবেই দেখত।

তখন শুধু যে বৈপ্লবিক আন্দোলন হিন্দুয়ানীর আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়েছিল, তা নয়, বাঙ্গালা দেশে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী যদিও সেই সময়ের প্রায় ২৫।৩০ বছর আগে হ'তে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদের (Rationalism) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরম্ভ হয়েছিল, তথাপি তথাকথিত ঐ স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই এর প্রভাব চরমে উঠেছিল। এ দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভাব ও খবরাখবর আদান-প্রদানের ক্রমবর্দ্ধিত সুবিধার ফলে সেই সকল দেশের তুলনায় প্রায় সর্ব্ববিষয়ে যে আমরা হীন অবস্থাপন্ন, সে বিষয়ে ক্রমে আমরা সচেতন হয়ে পড়ছি। আর সেই সঙ্গে ক্রমে তার তীব্র বেদনা ও জ্বালায় আমরা এমনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি যে, সেই বেদনা ভুলবার জন্য হিন্দুয়ানীর অতিরঞ্জিত অতীত গৌরবের নেশায় বিভোর হ'তে বাধ্য হয়ে পড়েছি।

এই অতীত গৌরব হচ্ছে সেই সনাতন আর্য্য-সভ্যতার, যা সম্ভব করতে এখনকার কোটি কোটি জনসাধারণের পূর্ব্বপুরুষদিগকে চিরক্রীতদাসে পরিণত হ'তে হয়েছিল। আর যে শাসনতন্ত্রের দ্বারা এত অসংখ্য মানুষকে এতকাল ধ'রে অমানুষে পরিণত ক'রে রাখা হয়েছে, সেই অভূতপূর্ব্ব শাসনতন্ত্রের নাম হচ্ছে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম (religion)। আজও সেই সনাতন হিন্দু জাতি জগতে বেঁচে আছে, সে না কি কেবল এই হিন্দু-ধর্ম্মেরই মহিমায়।

সনাতন হিন্দু জাতি বেঁচে আছে মানে এই হয় যে, মুসলমান ও ইংরাজ এই দুই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জাতির শাসনতন্ত্রের প্রভাব অতিক্রম ক'রেও হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রের বা তার শাসনের মহিমায় সেকালের দাসদের বংশধর বা শ্রেণীভুক্ত একালের জনসাধারণ এখনও নিজেদিগকে দাস ব'লেই কথায় না মানলেও কার্য্যতঃ মেনে নেয়। এটা জীবনের লক্ষণ যে মোটেই নয়, যারা জীবিত, কেবল তারাও সাক্ষ্য দিতে পারে, কারণ, মৃত যে, সে বলতে পারে না, সে মৃত কি জীবিত। এতে হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রের বাহাদুরী থাকলেও হিন্দু-জাতি শুধু নয়, হিন্দুর সঙ্গে যারা এক স্বার্থে হিন্দুস্থানে বাস করে, তারা সকলেই ম'রে আছে; এমন কি, হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রের প্রবর্ত্তকদের বংশধররাও সমানভাবে ম'রে আছে।

বাঁচন-মরণের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-পরখদার আচার্য্য জগদীশ বোস সকল বস্তুর (উদ্ভিদ ও অচেতনেরও) প্রাণ আছে ব'লে না কি প্রমাণ করতে পেরেছেন। কিন্তু হিন্দুর যে জাতি হিসাবে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ, তাঁর থিওরী (theory) বা তাঁর আবিষ্কৃত বাস্তব যন্ত্রের সাহায্যে হ'তে পারে ব'লে আশা হয় না। তবে আধ্যাত্মিক কোন যন্ত্রের সাহায্যে হয় কি না, জানি না। সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক ঘা (shock) দিলে না কি গাছ-পাথরও যে বিচলিত হয়ে প্রাণের সাড়া দেয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্ততঃ বাস্তব যন্ত্র-সাহায্যে যে কেউ দেখতে পায়। কিন্তু এই বাঙ্গালী জাতি কেবল নয়, কোটি কোটি হিন্দু নামধারী জনসাধারণ যে কত কাল ধ'রে বাহির ও ভেতর থেকে কত shockএর ওপর shock পেয়ে আসছে, তার অন্ত নাই; তবু বেঁচে আছে ব'লে প্রমাণ করবার মত বিচলিত কখনও হয় নি। এত সুদীর্ঘকালের মধ্যে এক আধবার হয় ত বিচলিত হয়েছিল ব'লে ভ্রম হয় মাত্র। এ রকম একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ম'রে থেকে পৃথিবীর আবহাওয়াকে দূষিত করার চাইতে বা দুনিয়ার শেয়াল-শকুনির আবহমানকাল ভূরিভোজন যোগানর চাইতে হিন্দু নামটার অহেতুকী মায়া ত্যাগ ক'রে মানবজাতির দলে মিশে গেলে, আর যাই

এত বেদনা ভোগ করতে হ'ত না। আর আমাদের এই ভারতমাতা মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের এবং ধর্ম্মের (Religion and virtue) নামে মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের নারকীয় কারখানায় পরিণত হয়ে না থেকে, মনুষ্যত্বের বিকাশজনিত ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা হ'তেন। হিন্দুধর্ম্মের মায়াকে অহেতুকী বললাম এই জন্য যে, যারা জনসাধারণকে চিরদাস চির-অস্পৃশ্যে পরিণত করেছে, তাদের গৌরব সত্যিই হোক্ বা মিথ্যাই হোক্—সেই জনসাধারণ কেন অনুভব করে, তার হেতু খুঁজে পাই না ব'লে।

এতে আমরা কারুরই দোষ দিচ্ছি না। যারা সেকালে একালে জনসাধারণকে চিরদাসে পরিণত ক'রে রাখবার এ হেন অকাট্য কৌশল সৃষ্টি করেছে, সেই কৌশলীদের অথবা সেই কৌশলের উত্তরাধিকারী কাউকে দোষ দিই না। আর অন্য পক্ষে জনসাধারণকে আমরা এ জন্য দায়ী করছি না। কথা বলছি শুধু এই দুঃখে যে, এই সকল তথ্য জেনে শুনে এই বিংশশতাব্দীতেও সেই সনাতন কৌশলকে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমাদের বৈপ্লবিক নেতারা অবলম্বন করতে দ্বিধা-বোধ করেন নি। আরও দুঃখ, এখনও তাঁদের কেউ চিনতে পাচ্ছে না। কেন এমন হ'ল? তার কারণ খুঁজলে দেখতে পাওয়া যায়, রোগকীটাণু (Bacilli) যেমন শরীরে প্রবেশ ক'রে শরীরকে নানা প্রকার সংক্রামক রোগগ্রস্ত করে, সেই রকম ভাবরাজ্যেও অনেক রকম কীট আছে, যা আমাদের ভাব-কোটরে ঢুকে বা সৃষ্ট হয়ে আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সংক্রামক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে ফেলে। ইচ্ছা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা সবই ওলট-পালট ক'রে দেয়। এই প্রবন্ধের গোড়াতে নানা রকম নেতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছি। তদনুযায়ী প্রথমে প্রতিহিংসা-কীটের আক্রমণে ক-বাবু হয়েছিলেন প্রতিহিংসা-পরায়ণ নেতা, তাতে তিনি প্রথমে পেলেন লোকের শ্রদ্ধা। তার পর যদি অন্য কোন ব্যাধি না ধরত, তা হ'লে দেশের চিন্তাধারাকে স্বাধীনতার উপযোগী ক'রে গড়বার জন্য নতুন আদর্শে এক বিরাট সাহিত্যের বা দর্শনের সৃষ্টি করতে পারতেন।

কিন্তু তা হ'ল না। অন্য এক রোগের কীটাণু মাথায় ঢুকল। ইংরাজ তাড়াবার ইচ্ছাটা দু' চার বছরে পূর্ণ ক'রে তার ফলভোগ করবার অথবা তার ভাল ক'রে অবতার মহম্মদ, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি অবতাররা ধর্ম্মের সাহায্যে লোককে অন্ধভাবে চালিত করেছিলেন, ক-বাবু দেখলেন, সে রকমটি না হ'লে চলছে না। প্রথমে তাই ধর্ম্মকে উপায়-স্বরূপে ধ'রে নিয়ে বিপ্লববাদপ্রচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন। তখন হলেন আবার ধোঁয়াময় নেতা তাতে পেলেন ভক্তি। ফলে পলিটিক্‌সের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন করতে গিয়ে করলেন ধোঁয়ার সৃষ্টি।

এতেও কিছু হ'ল না। তখন আর এক ব্যাধি এসে জুটল। তার ফলে ক-বাবু বুঝে ফেললেন, অলৌকিক শক্তির পরিচয় না দিতে পারলে, অর্থাৎ লীলা প্রকট না করতে পারলে লোক অন্ধভাবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পাচ্ছে না। তখন আবার হলেন লীলা-ব্যাধিগ্রস্ত অর্থাৎ লীলাময় নেতা। প্যারিসের এক মহা পণ্ডিতজীর প্রদত্ত এই লীলা শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা অনেক পূর্ব্বে দিয়েছি।

এই লীলার হিকমত শেখাবার জন্যই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষদের খোঁজে expedition পাঠান হয়েছিল। তার ফল যা হয়েছিল, তা বলেছি। তার পর নিজেরাই অলৌকিক শক্তিসাধনায় উঠে প'ড়ে লাগলেন। নেতাদের এ হেন সাধ পূর্ণ করবার জন্য দেশের অবস্থা কতদূর লীলার পোষক হয়ে উঠেছিল, তাই এখন দেখা যাক।

"বন্দে-মাতরম্" নামক ইংরাজী দৈনিকখানি ছিল চরমপন্থীদের প্রধান মুখপত্র। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে একে বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর জাতীয় পত্রিকা ব'লে দাবী করত। অথচ তার সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর ছিল একটা মঙ্গলঘটের ছবি। বিপিন বাবুর ইংরাজী নিউ ইণ্ডিয়াও ছিল ঐ রকম একখানি চরম রাজনীতিক সাপ্তাহিক। তারও সুরুতে মনে পড়ছে, যেন ছিল জগদ্ধাত্রীর ছবি। বাঙ্গালা কাগজের মধ্যে যে ক'খানি রাজনৈতিক চরম মত প্রচার করত, তাদেরও শিরোনামায় হিন্দুশাস্ত্রীয় শ্লোক লেখা থাকত। তা ছাড়া ঐ সকল পত্রিকা অত্যন্ত হিন্দু-ভাবাপন্ন ত ছিলই। তাতে হিন্দুর অতীত গৌরব ও অলৌকিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত হ'ত। আমার মনে পড়ছে, "নবশক্তিতে" এ রকম একটা খবর বেরিয়েছিল যে, কলকাতা সহরেই এক গেরস্তের মেয়ের উপর কালীর "ভর" হয়েছিল এবং তার মুখ দিয়ে স্বদেশী

প্যারিস থেকে ফিরে এসে দেখেছিলাম, মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির পূর্ব্বের আড্ডা তুলে দিয়ে সত্যেনের বাড়ীর পাশে একটা ঘর "আনন্দমঠ" নাম দিয়ে তাতে একটা হাতখানেক লম্বা কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করা হয়েছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সত্যেন উত্তর দিয়েছিল, "সকলেই এই রকম একটা কিছু চায়। হঠাৎ কি জানি কেন, দেশটা বেশী রকম কালীভক্ত হয়ে উঠেছে।" ক্ষুদিরাম বলেছিল, "আর যাই হোক, কালীর কৃপায় বেশ পাঁঠা খেতে মিলে, তবে সাদা পাঁঠা না হ'লে বলি দেওয়া হয় না।" মুরারিপুকুরের আড্ডাতে আর আমাদের ভবানীপুরের নতুন আড্ডাতে কালীর প্রতিমূর্ত্তি ঝোলান ছিল। অন্য আড্ডাতে এবং অনেক লোকের বাড়ীতে এই রকম ছবিকে ফুলচন্দন দিয়ে নিত্য পূজা করা হ'ত। এই সময়ের দু তিন বছর আগে কিন্তু এ রকম দেবভক্তির নিদর্শন শিক্ষিত-মহলে কচিৎ চোখে পড়ত। শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ ক'রে কোন ছাত্রমহলে মাথায় টিকি, গলায় তুলসীর মালা স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেখতেই পাওয়া যেত না। ঐ সময় অনেক উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, হাকিম, কেরাণীও শুধু মালা-টিকি নয়, উপরন্তু ফোঁটা-ছিটা কেটে কোর্টে, স্কুল-কলেজে, আফিসে যেতে আর লজ্জাবোধ করতেন না। ব্রাহ্মরা অনেকে ব্রাহ্ম ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতেন এবং হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে গৌরব অনুভব করতেন; এমন কি, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির সামনে মস্তক অবনত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক পৈতাধারী যুবক পৈতাটা অকারণ জঞ্জাল বোধে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে তা তুলে রেখে দিতেন; তাঁদের ঐ সময় আবার তা ধারণ করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। ব্রাহ্মণেতর অনেক জাতের (caste) মধ্যে নতুন ক'রে পৈতা প'রে দ্বিজত্বের বা আর্য্যত্বের দাবী করা ব্যাধি সংক্রামক হয়ে পড়েছিল, আবার অনেক জাত অন্য জাত অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার জন্য কি রকম ভীষণভাবে শাস্ত্রের পিণ্ডি চটকেছিল, তা বোধ হয় কারও অবিদিত নাই। বৈপ্লবিক সমিতির কর্ম্মীরা জাতভেদ বা অস্পৃশ্যতা বড় একটা মানতেন না; কিন্তু ছাত্রদের মেসে, হোটেলে, সামাজিক ভোজনে, জাতভেদের মাত্রা একটু যেন একটা মেসে এই নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখিও চলেছিল।

হিন্দুর অতীত কীর্ত্তির বৃথা গৌরবপূর্ণ অতিরঞ্জিত বিবরণে এই সময়কার বাঙ্গালা সাহিত্য ভ'রে গেছল। কাব্য, পুরাণ, সংহিতা আদি শাস্ত্রের যত কিছু উপাখ্যান অভ্রান্ত ইতিহাস ব'লে শিক্ষিত মহলেও বিবেচিত হ'তে লাগল। হিন্দুশাস্ত্র থেকে জ্ঞান অপহরণ করেই পাশ্চাত্য যত কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে, এ কথার প্রতিবাদ করা তখন বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। মহাভারতের মধ্যে, বিশেষ ক'রে শান্তিপর্ব্বেই দুনিয়ার সার রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্ব যে নিহিত আছে, এ কথা আমাদের বৈপ্লবিকদলের মধ্যেও অস্বীকার করলে উত্তম-মধ্যমের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া যে সকল নেতা বা উপনেতা যত অধিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং politics বলতে যা বুঝায়, সে সম্বন্ধে যিনি যত বড় মূর্খ, তিনি তত অধিক শাস্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করতে বাধ্য হতেন। মজার কথা, এই শাস্ত্রেও ছিল তাঁদের সমান পাণ্ডিত্য। টিকি, তুলসীমালা, গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, গোবর, গোমূত্র প্রভৃতি হরেক রকম দ্রব্যের পবিত্র করবার ক্ষমতা এবং পরলোকে মঙ্গলদায়ক ক্রিয়া কলাপ, যা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে কুসংস্কার ব'লে কয়েক বছর পূর্ব্বে বিবেচিত হ'তে সুরু করেছিল, সে সকলের মহিমা সম্বন্ধে এমন সমস্ত গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বক্তৃতায় ও ছাপার অক্ষরে প্রকট হয়েছিল, যার প্রতিবাদের জন্য কয়েক বছর পরে আচার্য্য পি, সি, রায়কে "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকাপ্রচারে বাধ্য করেছিল। তখন বাঙ্গালার মনোভাব এমন হয়েছিল যে, যত বড় নেতাই হোন্ না কেন, সেই vainglorious মনোভাবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁকে 'দুর ছি' ভোগ করতেই হ'ত। আর যারা এই vaingloryকে যত অবোধ্য বাক্যচ্ছটার মনোহর বাক্‌চাতুরী দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্ব্বিচারে সংমাখিত করতে পেরেছিল, তারাই তত স্বদেশ-প্রেমিক ব'লে লোকপূজা পেয়েছে। আবার অনেকে সেই সঙ্গে ইহলোকের এমন বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে যে, "পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবেক।"

লোক-পূজার মোহিনী মায়া কাটাতে পারলেন না। তখন অবতারত্বলাভের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। বৈপ্লবিক নেতার, বিশেষ ক'রে ভারতের মত দেশে, লোকমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বা প্রকাশ্যভাবে লিখে আত্ম-প্রকাশ করা যে বৈপ্লবিক দলের সর্ব্বনাশের কারণ, তা তিনি লোকপূজার খাতিরে এক বার ভেবেও দেখলেন না। তার ফল যে কি রকম বিষময় হয়েছিল, তা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি।

নেতার পক্ষে লোকপূজা হওয়া দেশের হিতের জন্যই যে নিতান্ত দরকার, তার একটা অজুহত এই দেখান হয় যে, সেনানায়কের আদেশ যেমন লক্ষ লক্ষ সৈন্য বিনা আপত্তিতে অবনতমস্তকে পালন করে, তেমনই দেশের কোটি কোটি লোককে নির্ব্বিচারে সেই রকম অবনতমস্তকে আদেশ পালন করবার জন্যই নেতাদের প্রতি দেশের লোকের অন্ধ ভক্তি না জাগালে দেশ-উদ্ধাররূপ সংগ্রামে জয় অসম্ভব। কিন্তু যে কয়টি কারণে এত সৈন্য এক জন বা মাত্র কয়েক জন সেনানায়কের আদেশ অবনতমস্তকে পালন করে, সে কয়টি কারণ কিন্তু নেতাদের প্রতি অন্ধভক্তির দাবীর বেলায় খাটে না। যে জন্য সৈন্যকে আজ্ঞাপালন করতে হয়, সেই উদ্দেশ্যটা কত মহৎ এবং তাহা সফল হ'লে তাহাদের কি লাভ, আর না হ'লে কি ক্ষতি, তাহা তাহাদের স্পষ্ট ক'রে বোঝান হয়। আর সেই আদেশ করবার একটা আইন-কানুন আছে, যার একটু ব্যতিক্রম হলেই সেনানায়ককে লোকনিন্দা বা বিবেকের গ্লানি ছাড়া কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হয়। ঐ সব আইন-কানুনও এমন যুক্তিসঙ্গত ক'রে গড়া হয় যে, তাহার আবশ্যকতার বিরুদ্ধে বলবার কিছু থাকে না। সেই আইন-কানুন আবার দেশের লোকের নির্ব্বাচিত বহুসংখ্যক প্রতিনিধির দ্বারা বিশেষ বিবেচনা ক'রে গঠিত। বস্তুতঃ সেনানায়ক আদেশ পালন করাবার যন্ত্রবিশেষ। তাহা সত্ত্বেও সৈন্যদের মধ্যে কোথাও একটু অসন্তোষ বা আদেশপালনের অনিচ্ছার ইঙ্গিত পেলেই তাহার প্রতীকার সঙ্গে সঙ্গে করবার ব্যবস্থা হয়। এ ছাড়া আদেশ পালন করবে, এই সর্ত্তে তাহারা মাইনে পায়। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিশেষতঃ ভাল-মন্দ জ্ঞান আর বিবেকবুদ্ধি ব'লে জিনিষটা মোটামুটি অন্য সকল দেশের সৈন্যের মাথায় ঢোকান হয়; যদিও ভারতীয় সৈন্যের পক্ষে আদেশ পালন করাবার জন্য কেবল মাইনে আর কোর্ট মার্শেলই যথেষ্ট)। অন্য পক্ষে আমাদের নেতাদের আদেশ করবার আর তাহা পালন করাবার বেলায় কোন নিয়ম-কানুন নেই। অথবা যদি থাকে, তবে তাহা ব্যক্তি বা নেতাবিশেষের খেয়াল-প্রসূত। যে জন্য আদেশ পালন করতে হবে, তাহার আদর্শ কখনও যুক্তিসহ বা সম্ভবপর কথায় পরিস্ফুট করা হয় না। কখনও শুনি স্বরাজ, কখনও স্বাধীনতা; এ দুটি কথার সঙ্গত ব্যাখ্যা বা ঐ দুইটি জিনি-ষের কোন একটা পেলে দেশটা কি রকম হবে, তার স্পষ্ট ধারণা লোকের মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা কখনও হয় নি। কেন নেতাদের আদেশ পালন করতে গিয়ে যথাসর্ব্বস্ব, মায় প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রে লোক ধন্য হবে, তাহার একটা সঙ্গত হেতু অথবা হেতুস্বরূপ একটা তেমন লোভনীয় আদর্শ তাঁহারা দেশের সামনে স্থাপন করতে পারেন নি। দোষ প্রমাণিত হ'লেও বা দেশের বিশেষ ক্ষতি করলেও তাঁদের দণ্ডের বদলে পূজার ব্যবস্থা হয়, গেরুয়া নিলে ত তার কথাই নাই। নেতাদের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ-পালনকারীদের অসন্তোষ বা আদেশপালনে অনিচ্ছার বিশেষ লক্ষণ দেখেও তার প্রতীকারের ব্যবস্থা হয় না। এ ক্ষেত্রে আদেশ-পালনের জন্য মাইনে নাই, তেমন কোন সর্ত্তও নাই। কাযেই সৈন্যাধ্যক্ষের মত আদেশপালন করিয়ে লওয়ার অজুহতে, শব্দবিন্যাসকলার যাদুশক্তিতে বোকা বুঝিয়ে, ত্যাগের চটক দেখিয়ে বা ধর্ম্মের ভণ্ডামী ক'রে অন্ধ লোক-পূজা পাবার দাবী যেমন নিরর্থক, তেমনই মারাত্মক।

এই ত গেল নেতাদের কথা। এখন কর্ম্মীদের কথা বলি।

মুরারিপুকুর বাগানে তখন যে কয়টি কর্ম্মী জুটেছিল, তার সংখ্যা প্রায় ১৫।১৬ জনের বেশী হবে না। তা ছাড়া অন্যত্রও দু'চার জন ছিল। সমিতির নিয়মে এদের উচ্চ-নীচ শ্রেণী নামে না থাকলেও, কাযে দুটো স্তর ছিল। যারা ধর্ম্মচর্চ্চা আর ধ্যানধারণা নিয়ে থাকত, তারা পড়ত আধ্যাত্মিক স্তরে। আর তারাই বৈপ্লবিক কাযে শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলেই গণ্য হ'ত। এরা পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতিফলে শ্রেষ্ঠতর মানুষ হয়ে আধ্যাত্মিকতার না কি একমাত্র পুণ্যভূমি ভারতে জন্ম নিয়েছিল। এরা ভব-রাজ্যের বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের (Idealistic or

Spiritualistic world) লোক। বৈপ্লবিক ব্যাপারে একমাত্র বোমা তৈরী আর বোমা ছোড়া ছাড়া না কি আর সবই আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তর্গত। এমন কি, "বিধবার ঘটী চুরিও" না কি কতকটা আধ্যাত্মিকতার এলাকাভুক্ত। সেই হেতু তথাকথিত রাজনীতিক ডাকাতীতে এদের অনেককে যোগ দিতে, কাউকে বা তাতে কৃতকার্য্য হতে, কাউকে বা সে জন্য জেলে যেতে আর অধিকাংশকে informer হ'তে দেখেছি।

সাধারণতঃ এদের স্বভাব বড়ই মধুর; এরা সর্ব্বত্র ভাল মানুষ বা সুবোধ ও সুশীল বালক ব'লে পরিচিত। নিজেদিগকে সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চস্তরের লোক ব'লে মনে করা এদের স্বভাব। এই উপলক্ষে একটা ঘটনার উল্লেখ করলে এদের স্বভাবটা বোঝাবার পক্ষে সুবিধা হ'তে পারে।

আমরা যখন আলিপুর জেলে বিচারাধীন অবস্থায় একসঙ্গে ছিলাম, তখন এক দিন এক জন সাধারণ কয়েদী আমাদের বন্দেক্তী দুধ খাওয়াতে এসেছিল। চুরি অপরাধে (বিধবার ঘটী চুরি নয়) তার জেল হয়েছিল। সে গান গাইতে পারত ব'লে বিছানায় বসিয়ে গান গাওয়ান হচ্ছিল। বিছানাটা ছিল সাধারণ কয়েদীর ব্যবহৃত জেলখানার পুরনো কম্বল। এতেই আধ্যাত্মিক স্তরের কর্ত্তাসহ অনেকের সেই কাযটি নিতান্তই অনাধ্যাত্মিক এবং অভদ্রোচিত ব'লে অনুভূত হয়েছিল। এতে তাঁদের আত্মসম্মান-হানি হচ্ছে ব'লেও প্রতিবাদও করা হয়েছিল। অথচ এক জন জোচ্চোর প্রতারণা অপরাধে দণ্ডিত কয়েদী, সাধু-সন্ন্যাসীর মত ভণ্ডামী ক'রে এবং হাত গুণে সাধারণ কয়েদীদের, বিশেষ ক'রে রক্ষীদের কাছ থেকে চরস-আফিং-এর ব্যবস্থা ক'রে নিত। তা আমাদের কর্ত্তারা জেনেও, আধ্যাত্মিক স্তরের লোক ব'লে গণ্য ক'রে তাকে যে নমস্কার করেছিলেন, অভিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী তা তিন প্রকার নমস্কারের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। সেই তিন প্রকার নমস্কার হচ্ছে উত্তম কায়িক, মধ্যম মানসিক ও অধম বাচিক নমস্কার। নমস্কারের সঙ্গে যথাবিহিত দক্ষিণা একটি টাকাও ছিল। আর সেটা যে আফিং ও চরসের মৌতাতেই ব্যয়িত হবে, সে তথ্যও কর্ত্তারা সুবিদিত ছিলেন। দেশ উদ্ধারের রকম আধ্যাত্মিক স্বরাজ হ'ত, এতে তার একটু আমেজ পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেই সকল চেলাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ (sentimental) আর অল্পবিস্তর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'লেও তাদের গুরুভক্তি একেবারে অচলা এবং গুরুর উপদেশ বা অভিপ্রায়মত হঁসে বা বেহঁসে উচিত অনুচিত নির্ব্বিচারে সকল কায করাই ছিল তাদের জীবনের প্রধানতম আনন্দ। গুরুর নিকট এদের "confession"ও দিতে হ'ত। যারা কন্‌ফেসন দিয়ে এই দলভুক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে নরেন গোঁসাইও এক জন।

কোন কিছুর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ জন্য, সে বিষয়ের কোন ঘটনা বা তথ্যের সঙ্গে যাচাই করা এদের স্বভাববিরুদ্ধ। আর অবোধ্য ধেঁায়াটে কিংবা অসম্ভব যত কিছু, তা সহজে বোধগম্য হওয়াটাই এদের বিশেষত্ব; এরা অত্যন্ত সহজে বুঝে ফেলে—এই দৃশ্যমান জগৎ একেবারে মিথ্যা, প্রপঞ্চ; সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পায় যে, ভারত সেই মিথ্যা জগতেরই অংশবিশেষ; এই ভারতের উদ্ধার, তার সনাতন সভ্যতা, ধর্ম্ম, তার কীর্ত্তিকলাপ আর তার এই আধ্যাত্মিক মানুষগুলি সবই অসত্যেরই মধ্যে সত্য।

ভাবপ্রবণ মানুষের ভাবের বিশেষ কোন বিকাশ না হ'লে বা ভাবের খোরাক অভাব হ'লে যে রকম সংসারে উৎকট বিতৃষ্ণা এসে থাকে, এদের অধিকাংশের মধ্যে সেই ভাবের ব্যাপার গোড়াতে বোধ হয় ঘটেছিল। এ দেশে সন্ন্যাসগ্রহণই চিরন্তন প্রথা। এদের অনেকে সেই সনাতন রীতি অনুসারে মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র (অনেকের তা ছিল) ত্যাগ ক'রে একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী সেজে জঙ্গলে বা পর্ব্বতে গেছল। মনের মতন ভাবের খোরাক খুঁজে জুটল না; তাই বাঙ্গালা দেশে ফিরে এসে স্বদেশী আন্দোলনরূপ নতুন হুজুগে মেতে গেল। তখন বৈপ্লবিক দলের সন্ধান পেতে দেরী হ'ল না।

আর যে ভাবপ্রবণ হৃদয়গুলি সন্ন্যাসের সুবিধে ক'রে পারে নি, তারা দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে সুদূর পল্লী হ'তে টানা হয়ে, স্বদেশ উদ্ধারের মত অত বড় গৌরবের কায অত সস্তা যায় দেখে, অন্ধভাবে বৈপ্লবিক দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এসেছিল, তাদের সকলকেই প্রথমে সাধনভজনে যোগ দিতে হ'ত। যাদের মন তাতে পড়ত, আর কর্ত্তাদের আশানুরূপ progressএর লক্ষণ যারা দেখাত, তারা পূর্ব্বোক্ত উচ্চ স্তরের সম্মান লাভ ক'রে ধন্য হয়ে যেত।

এদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল, যারা ভাল ক'রে progressএর লক্ষণ দেখাতে পারত না, যারা দেশ উদ্ধারের সঙ্গে নাক টেপার উপযোগিতা ভাল বুঝতে পারত না, যারা নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য বা সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না, অথবা যারা ভারতের ভাবী ইতিহাসে অমরত্বলাভের জন্যই যৌবনের অমন রঙ্গিন প্রাণটা বলি দিতে এসেছিল, তাদের বেশ একটু লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হ'ত। তারাই নীচস্তরের অনাধ্যাত্মিক মানুষ ব'লে দেশ উদ্ধারের উচ্চ কাযের অনধিকারী ব'লেই গণ্য হ'ত। এই দুঃখে কেউ কেউ দল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বোমা তয়েরী শেখবার জন্য যে পাঁচ জনকে ভবানীপুরের নতুন আড্ডায় পাঠান হয়েছিল, তারাও ছিল নিম্নস্তরভুক্ত। স্বনামধন্য কানাইলালও ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। যে হেতু, সে নিজে ত নাক টিপতই না, অন্যেরও নাক টেপা দেখতে পারত না।

সুশীল কেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের উপর বোমা ছোড়বার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছিল, তার হেতুও পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। কয়েক মাস আগে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় লিখিত রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ বাবু অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাতে বিপিন বাবু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তিনিও অভিযুক্ত হন। তাঁর বিচারের দিন লালবাজার পুলিস-কোর্টের সুমুখে লোকের ভিড়ের উপর এক জন য়ুরোপীয় ইনস্‌পেক্টার বেত চালাতে থাকে। এ সেই সুশীল, যে ১৪ বছর বয়সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ উক্ত ইনস্‌পেক্টারের মুখের উপর ঘুসী চালাবার অপরাধে সেই দিনই উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে দণ্ডস্বরূপ ১৫ ঘা বেত খেয়েছিল।

সুশীলের দ্বারা তার বিচারক নিহত হ'লে, সমস্ত জিনিষটা অন্য ভাবে গৃহীত হবে ব'লে, তাকে বিদায় দিয়ে, মাণিকতলার আড্ডা থেকে আর একজন নিম্নস্তরের কর্ম্মীকে আবার আনা হয়েছিল। এই খুনোখুনির মতলবটা কিন্তু সুশীলকে

মিঃ কিংসফোর্ডের জন্য প্রথমে যে বোমাটা তয়ের হয়েছিল, সেটা হচ্ছে, একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে না কি যায়গা ক'রে বোমাটা এমন ভাবে রাখা হয়েছিল যে, বইখানা খুললেই বোমা ফেটে যেত। বইখানা একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। একখানা লম্বা খামের খানিকটা বইয়ের ভিতর থেকে এক দিকে এমন ভাবে বেরিয়েছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে না কি আসত না।

জানা গেছল, মিঃ কিংসফোর্ড মিসেস মঙ্কের গ্রাণ্ড হোটেলে থাকতেন এবং সাড়ে নটার পর নিজের আফিস-যানে কোর্টে যেতেন। গাড়ীতে ওঠবার সময় ঐ বইখানা এক দিন তাঁর হাতে দিতে গিয়ে জেনেছিল, তিনি ঠিক তার আগের দিন টালিগঞ্জে একটা বাড়ীতে উঠে গেছেন। তার পর টালিগঞ্জের বাড়ী খোঁজ ক'রে—আর এক দিন সন্ধ্যাবেলা তা তাঁর হাতে দিয়ে এল। কিন্তু তাঁর এমনই জোর বরাত, বইখানা না খুলেই আলমারীতে রেখে দিয়েছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত লেফাফাখানাতে কি চিঠি ছিল, তা পড়বার প্রবৃত্তিও তাঁর হয় নি।

পরে আমরা যখন আলিপুর জেলে বিচারাধীন, তখন নরেন গোঁসাইর হত্যার পরে আমাদের মধ্যে না কি নেতৃস্থানীয় এক জন পুলিসকে ঐ সংবাদ দিলে, মজঃফরপুরে উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বইয়ের আলমারী হ'তে বোমা সমেত ঐ বইখানি উদ্ধার করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে যা লিখিত আছে, তা নীচে উদ্ধৃত করলাম।

* * * "The police had received information 10 days before that the murder of Mr. Kingsford was intended, and during the next year a well-known revolutionary, when in custody, said that before this outrage a bomb had been sent to Mr. Kingsford in a parcel. Upon search being made, a parcel was found which Mr. Kingsford had received but not opened, thinking it contained a book borrowed from him. The parcel did contain a book; but the middle portion of the leaves had been cut away and the volume was thus in effect a box and in the hollow was contained a bomb with a spring to cause its explosion if the book was opened.

guilty of conspiracy to wage war against the King-Emperor, including Barindra Kumar Ghose, * * * Hem Chandra Das, * * * and another who made the statement already alluded to and so strikingly confirmed as to the sending of a bomb in a parcel to Mr. Kingsford." (Sedition Committee, 1918 Report. Page 32, Para 37 and 38.)

যাহা হোক, আমাদের ভবানীপুরের বোমার নতুন আড্ডা শীগ্‌গীর তুলে দিতে হয়েছিল। ঐ আড্ডা পত্তনের সপ্তাহখানেক পরে জানা গেল, সি, আই, ডি, আমাদের পেছনে লেগেছে। দিনের বেলায় যে কোন সময় ভবানীপুরে যেতাম ও ফিরে আসতাম, তখনই সঙ্গে থাকতেন সামান্য লোকের বেশে এক জন গুলীখোরের মত লোক; আর কখনও কখনও ভৈরবীবেশধারিণী এক প্রৌঢ়া। এই প্রৌঢ়াটি যে কে, তা জানতে পারিনি। ঐ ভদ্রলোকটি ছিলেন তখনকার স্বনামধন্য পুলিস-ইনিস্‌পেক্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস (এখন নিশ্চয় মস্ত বড় কিছু হয়েছেন)। সভাবাজারে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা তখনও খোলার ঘর থেকে তিনি সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমার চালচলন লক্ষ্য করতেন। এ ছাড়া বাড়ীর অন্য দু দিকে দু'জন ছিল। অন্য সকল আড্ডাতেও এই রকম গোয়েন্দার ব্যবস্থা ছিল।

আবার অনেক খোঁজাখুঁজির পর শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্তের লেনে একটা বেশ সুবিধেমত ছোট্ট বাড়ী মিলে গেল।

আমরা এমনই দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলাম যে, ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজারে জিনিষ-পত্র নিয়ে যারা গরুর গাড়ীর সঙ্গে যাচ্ছিল, তারা পথে খাবার খেতে গিয়ে গাড়ী হারিয়ে ফেলেছিল। সকাল ১০টা থেকে খুঁজে-খুঁজে সন্ধ্যেবেলা শ্যামবাজার পুলের কাছে গাড়ীখানা অবশেষে পাওয়া গেল।

সেই সব মাল নিয়ে অনেক কিছু কাণ্ড ক'রে দু' দিন পরে গোপীমোহন দত্তের লেনে আড্ডা গেড়ে বসা হ'ল। সেখানে থাকত কানাই, নিরাপদ প্রভৃতি ও অন্য প্রদেশের দু'টি শিক্ষার্থী। এখানেও কয়েক দিন পরে জানা গেছল, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত গোয়েন্দা পুলিস পাহারা দিত। আমরা যখন যেখানে যেতাম, তারা কোন না কোন বেশে

তখনকার গোয়েন্দা পুলিসের নিপুণতা ও কার্য্যদক্ষতা যথেষ্ট না থাকলেও আমাদের চাইতে তাদের কাণ্ডজ্ঞান (common sense) ঢের বেশী ছিল। সন্ধ্যের পর তাদের আর দেখ্‌তে পাওয়া যেত না। রাত্রে কেবল রেলওয়ে ষ্টেশন হাওড়া ও শেয়ালদাতে দু' তিন জন ক'রে হাজির থাকত।

এক জন মারহাট্টা ভদ্রলোককে হাওড়ায় এক দিন সন্ধ্যেবেলা গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়ে দেখলাম, প্ল্যাটফরমে দু' জন গোয়েন্দা রয়েছে। বুঝলাম, তারা আমাদের চেনে। আমরা দুজনেই ইণ্টার ক্লাসে ঢুকে উল্টো দিকের দরজা দিয়ে নেমে, জামা কাপড় চেহারা বদলে ফেললাম। তার পর থার্ড ক্লাস গাড়ীর মধ্য দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম, তারা আমাদের তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে। পরে তারা কোর্টে যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তা থেকে জান্‌তে পেরেছিলাম, সেই গাড়ীতে খুঁজে-খুঁজে তারা রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল। এই রকমে আরও অনেক বার রাতের বেলা পুলিসের চোখে ধূলো দেওয়া হয়েছিল।

গোপীমোহন দত্তের লেনে প্রথমে যে তিনটা বোমা তয়ের হয়েছিল, তার একটা পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'ল আশানুরূপ কায দেবে।

তখন মিঃ কিংসফোর্ড মুজঃফরপুরের জজ। পাছে এ বারের চেষ্টাও আগের সকল চেষ্টার মত "Honest attempt"এ পরিণত হয়, সে জন্য অনেক গবেষণার পর দু'জনকেই পাঠান স্থির হ'ল। সম্পূর্ণ পৃথক দু'দলের পরস্পর অপরিচিত দু'জনকে পাঠাতে পারলে, মিথ্যা কোন বাধাবিঘ্নের ওজর নিয়ে কায হাসিল না ক'রে, ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই অন্য এক দলের নেতার কাছে এক জন হত্যাকারী চাওয়া হয়েছিল। পরদিন বিডন পার্কে ঐ নেতার সঙ্গে তাকে দেখে খুব কাযের লোক ব'লে মনে হ'ল। তখন একবারে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবার জন্য তার নেতাকে অনুরোধ দিতে বলেছিলাম। নেতাটি বড়ই বিব্রত হয়ে বলেছিলেন যে, তাকে দু'দিনের ছুটা দিতে হবে। আর কি না, বীরসাজেন্তার ফটো তুলিয়ে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিদায়ভোজে সম্মানিত ক'রে, তবে তাকে শেষ

বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। বড় দুঃখে সে দিনও মনে হয়েছিল, এ দেশে বিপ্লবের আশা সুদূরপরাহত। যাই হোক, এদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে আমাকেই শেষ বিদায় নিতে হয়েছিল।

অবশেষে মেদিনীপুর সমিতির কাউকে কিছু না জানিয়ে খুদিরামকে আনান হয়েছিল। সপ্তাহখানেক তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে মজঃফরপুরে পাঠান হ'ল। এই কাযের ভার পেয়ে যে তারা কৃতার্থ হয়ে গেছল, তা তাদের ভাবে ও কথায় সহজে তখন প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তারা সন্ধ্যেবেলা যাত্রা করেছিল ব'লে পুলিস খোঁজ পায় নি। তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ছিল যে, সেখানে অনুষ্ঠান সব ঠিক হয়ে গেলে কায হাসিল করবার পূর্ব্বে সাঙ্কেতিক প্রথায় আমাদের খবর দেবে। তখন আমরা নিজেদের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকব।

এই অবসরে আমরা প্রস্তুত হ'তে লেগে গেলাম। কথা স্থির হ'ল, সকলে নিজ নিজ বাড়ী বা আড্ডা থেকে বিদ্রোহসূচক জিনিষ-পত্র সরিয়ে ফেলবে। এমন কি, সন্দেহজনক সামান্য চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে ফেলবে। বিদেশী শিক্ষার্থী, আর যাদের সহরের বাইরে নিজের বা আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে থাকবার সুবিধে আছে, তারা সহর ছেড়ে চ'লে যাবে।

পুলিস যে আমাদের পেছনে লেগেছে, তা কিন্তু বারীনকে কিছুতেই তখনও বোঝাতে পারিনি। এই বিষয়েই বাস্তবিক একটুও ভীরুতা বারীনের ছিল না। তার মুখে এই ধরণের কথা প্রায়ই শোনা যেত যে, "পুলিস বেতনভোগী দাস মাত্র। আমাদের এ ব্যাপার বোঝবার মত সুরোদ যদি থাকত, তবে কি আর পুলিসে কায করতে আসে? সেঙ্গাতরা খালি বোকা, চোর, ডাকাত দু'একটা ধ'রে কোন রকমে চাকরীটা বজায় রাখে। এই দেখ না, পাকা সি, আই, ডি, পূর্ণ লাহিড়ী 'যুগান্তর' আপিসে হাঁকডাক ক'রে তালাসী নিতে গেল; আর তারই সামনে দিয়ে কি না কুলি-বরফ-ওলা সেজে অত মারাত্মক কাগজ-পত্র কম্বল মুড়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল।" ইত্যাদি।

"ক"বাবুও বারীনকে সাবধান হ'তে বলেছিলেন। তাতে না কি বারীন বলেছিল, "ও সব মিথ্যে কথা, দেখছ না। ওরা (আমরা) শক্ত কোন কাযে হাত দিতে চায় না ব'লেই দিন-রাত কেবল পুলিসের স্বপ্নই দেখছে" ইত্যাদি। "ক"বাবু অন্য সব কথার মত এ কথাও খুব সঙ্গত বলেই মেনে নিয়েছিলেন। নইলে নিশ্চয় বারীনকে কথামালার গল্প ও চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করিয়ে ছাড়তেন।

এর আগে যে সকল বৈপ্লবিক মারাত্মক ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার পূর্ব্বে বা পরে এ রকম সাবধান হওয়ার কথাই ওঠেনি। এবার অন্যের suggestion মত সতর্কতা অবলম্বনের কথা ওঠাতে বারীন রাজী ত হ'লই না, অন্যকেও সে বিষয়ে মনযোগী হ'তে দিল না।

মুরারি-পুকুর বাগানে, যেখানে যেমনটি ছিল, সেখানে তেমনই রইল। গোপীমোহন দত্তের লেনে যে দু'জন বিদেশী ছিল, তারা সুবোধ বালকের মত স'রে পড়ল। রইল কেবল কানাই ও নিরাপদ। যন্ত্র-পাতি ও সন্দেহজনক সমস্ত জিনিষ পাঁচ-ছটা বাক্সে পুরে ফেলা হয়েছিল। উল্লাস ভায়াকে এই ভার দেওয়া হয়েছিল যে, সে সন্ধ্যের পর ঐ সব মাল সমেত গিয়ে কয়লাঘাটে একখানা নৌকো পৃথকভাবে ভাড়া ক'রে, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তার বাবার ল্যাবরেটারীতে পাড়ী দেবে। উক্ত বাক্সগুলোর দুটোতে এমন অনেক যন্ত্র-পাতি ও মাল-মসলা ছিল, যা যে কোন ল্যাবরেটারীতে থাকলে সন্দেহের কোন কারণ হ'ত না। সেই বাক্সদুটো ছাড়া আর সব মাঝ-গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়ার কথা ছিল।

কার্য্যতঃ কিন্তু তা হ'ল না। বারীনের নির্ভীকতা অন্য সকলের মধ্যেও একটু আধটু সংক্রামিত হয়েছিল। কাযেই গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে অনেক কিছু প'ড়ে রইল। চার পাঁচটা বাক্স দিনের বেলা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে হ্যারিসন রোডে উল্লাসের এক নিরীহ আত্মীয় কবিরাজের বাড়ীতে রাস্তার ধারে বস্‌বার ঘরে খাটের তলায় রেখে গেল। পুলিসও সঙ্গে সঙ্গে এসে সেই দিন থেকে সেখানে গুপ্ত পাহারায় নিযুক্ত রইল। এতে উল্লাস ভায়ার কোন অপরাধ ছিল না; ছিল একমাত্র তার, যে উল্লাসকে এ কাযের ভার দিয়েছিল।

প্রায় এক সপ্তাহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত কেটে গেল। মজঃফরপুর থেকে সাঙ্কেতিক খবর পাওয়া গেল না। হঠাৎ ১লা মে (১৯০৮) সন্ধ্যের পর "Empire"এ সংবাদ বেরুল—

"৩০ শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার সময় মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডী, মজঃফরপুরের জজ মিঃ কিংসফোর্ডের গেটে ঢুকতে বোমার দ্বারা নিহত হয়েছেন।"

আমাদের কর্ত্তা, এ খবর পাওয়া মাত্র বারীনকে ডেকে এনে আদেশ দিলেন, দলের সকলকে এ সংবাদ জানাতে আর সকলকে আড্ডা থেকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিতে। কিন্তু কোন আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোন খবর না দিয়ে মাণিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলবার, গুলী, সেল আদি মাটীতে পুতে ফেলতে সে হুকুম দিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী রাত ১২টা পর্য্যন্ত ঐ সকল জিনিষের ওপর ছুটি ছুটি মাটী ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময় না কি পুলিসের কে এক জন এসে এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, সকালে অনেক পুলিস আসবে। এ দিকে হ্যারিসন রোডের উক্ত বামাল-পূর্ণ বাক্সগুলোও সরান হ'ল না। আমিও রাত ১২টা পর্য্যন্ত কোন খবর না পেয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

নারী

স্বরূপ মূরতি ধরিয়া বারেক
দাঁড়াও আমার সমুখে, নারি!
ভাষার তুলিতে ভাবের বরণে
আঁকিব তোমারে যেটুকু পারি।
লাজুক কবির ভীরু কবিতায়
দাও মা ভারতি, শকতি আজি,—
নারীর আরতি-অর্ঘ্যের সাথে
ভরিয়া উঠুক তোমারো সাজি।

সে কোন্ সুদূর ব্রাহ্ম লগনে
বিধাতা-মনের বাসনা থেকে
বাহিরিয়া এলে হে আদি-জননি,
প্রভাতেরো আগে প্রথম জেগে'।
অন্ধ তিমির-কোরক টুটিয়া
তোমার পুণ্য চরণ-পাতে
পদ্মের মত প্রথম-প্রভাতে
ফুটিয়া' উঠিল গগন-পাতে।

নব নব পথে, সৃজন-রূপিণি,
তব সৃষ্টির উৎসে ভেসে'
চলিল ছুটিয়া বিকাশের ধারা—
রচিল বিরাট সিন্ধু শেষে।
রূপে ও সুখে দলিত-মথিত
নিখিল-মানস-সাগর-তোরে,
প্রেমের অমৃত-পাত্র হস্তে
উঠিলে মানব-লক্ষ্মী হয়ে।

তোমার স্তনের পবিত্রতম
শুভ্র-অমিয়া করিয়া পান,
শিশু ভোলানাথ বাড়িয়া উঠিছে
লভিয়া নবীন শকতি প্রাণ।

স্নেহ-বিহ্বল করুণ আঁখির
দৃষ্টি-ধারায় তোমার ধুয়ে
নির্ম্মল হ'ল গৃহ-অঙ্গন—
পূজার পুষ্প ফুটিল ভুঁয়ে।

হে গৃহ-লক্ষ্মি,—বহুরূপে তুমি
ফিরিছ মানব গৃহের মাঝে,
কিন্তু তোমার মাতৃরূপটি,
সকল রূপেরে ছাপিয়া রাজে।
হে নারি,—তুমি যে মাতা গরীয়সী,
এই পরিচয়ই সবার বড়;
মানব তোমার সন্তান—তুমি
নিত্য মানব কুশল কর'।

বধূ-রূপে তুমি মঙ্গল-দীপ
জ্বালিছ তুলসী-মঞ্চ-তলে,
তোমার ধৈর্য্য ক্ষমায় সেবায়
জননী জাগিছে বধূর ছলে।
বোন্ হয়ে তুমি ভরিয়া রেখেছ
গৃহের কোণটি মমতা দিয়া,
মেয়ে হয়ে তুমি,—ক্ষুদ্র জননি,
স্নেহের পুলকে পূরিছ হিয়া।

জীবনে তোমারে পেয়েছি পেতেছি
নানারূপে, নানা দুখে ও সুখে,
পেয়েছি তোমারে কর্ম্মে বিরামে
পেতেছি তোমারে শিয়রে বুকে।
ব্যাধির পীড়নে দিয়েছ যে তুমি
শুশ্রূষা সাথে স্বাস্থ্য আনি';—
মরণের কোলে চলিয়া পড়িলে
মাথায় ছোঁয়ায়ো অ-মৃত-পাণি।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

পাশ্চাত্য-প্রসঙ্গ

ইংলণ্ডের পুলিসের 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ'

অনেকেই বোধ হয় জানেন না—গ্রেট বৃটেনের কোন পুলিস-কর্ম্মচারী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কর্ত্তব্যপালনের জন্য কোন অসাধারণ সাহসের কায করিলে ইংলণ্ডেশ্বর স্বহস্তে তাহাকে একটি 'মেডেল' প্রদান করেন। এই মেডেলের নাম—'পুলিস ভিক্টোরিয়া ক্রশ।' এই মেডেল সাধারণতঃ 'রাজার মেডেল' নামে পরিচিত। 'হোম সেক্রেটারী'র সুপারিসে রাজা যোগ্য ব্যক্তিকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

কয়েক জন পুলিস-কর্ম্মচারী কিরূপ সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া এই মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই রাত্রিকালে লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ দস্যু-দলপতির কয়েক জন অনুচর লণ্ডনের গ্রেজইন রোড নামক পথ দিয়া সাধারণ পথিকের মত চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া জন রদারফোর্ড নামক এক জন কনষ্টেবলকে দেখিতে পাইল। জন রদারফোর্ড সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। দস্যুরা এই কনষ্টেবলটিকে দেখিয়া, তাহার দিকে না চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এইরূপ সতর্কতাবলম্বন করিলেও জন রদারফোর্ড তাহাদের এক জনকে চিনিতে পারিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

রদারফোর্ডকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া দস্যুরা বুঝিতে পারিল, সে তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছে, যদি ধরিতে পারে, তাহা হইলে শ্রীঘরবাস সুনিশ্চিত। তাহারা পার্টপুল লেনের ভিতর দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল—কনষ্টেবল জন রদারফোর্ড তাহাদের দশ বারো হাত মাত্র দূরে আছে। দুই জন দস্যু তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল, এবং তাহা রদারফোর্ডের দিকে উদ্যত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আর এক পা সম্মুখে আসিলেই তোমাকে গুলী করিয়া মারিব।"

রদারফোর্ড তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সবেগে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পিস্তলের গুলী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষিত হইল; একটি তাহার মাথার ঠিক উপর দিয়া চলিয়া গেল, অন্য গুলী তাহার কোটের আস্তীন ভেদ করিল। রদারফোর্ডকে ধাবিত হইতে দেখিয়া তাহার সেই আততায়ী সঙ্গীদের সহিত পুনর্ব্বার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। রদারফোর্ড তাহাদের অনুসরণ করিয়া যখন ফেটার লেনে উপস্থিত হইল, তখন দুই জন দস্যু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার গুলী বর্ষণ করিল; কিন্তু রদারফোর্ড তাহাতেও নিরস্ত হইল না। দস্যুরা তাহা দেখিয়া হাটন গার্ডেন অভিমুখে পলায়ন করিল; সেই পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাদের দুই জন রদারফোর্ডকে পুনর্ব্বার গুলী করিয়া ভূতলশায়ী করিবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় বারও দস্যুদ্বয়ের গুলী ব্যর্থ হইল। এইবার রদারফোর্ড পলাতক দস্যুদের পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই জনকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু সে একাকী দুই জনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। এক জন তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পলায়ন করিল। দ্বিতীয় দস্যু তাহার আক্রমণে ধরাশায়ী হইল। সেই সময় অন্য দিক হইতে দুই জন কনষ্টেবল আসিয়া রদারফোর্ডকে সাহায্য করিল। রদারফোর্ড তাহার করকবলিত দস্যুটাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার পলাতক দস্যুগণের অনুসরণ করিল; কিন্তু তাহারা তখন বহুদূরে পলায়ন করিয়াছিল, রদারফোর্ড আর তাহাদের সন্ধান পাইল না।

জন রদারফোর্ডের এই সাহস ও বীরত্বের কথা যথাসময়ে কর্ণগোচর হইলে, রাজা বাকিংহাম প্রাসাদে রদারফোর্ডকে সাদরে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে তাহার পরিচ্ছদে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' আঁটিয়া দিলেন।

লণ্ডনের পুলিস ভিন্ন মফঃস্বলস্থ সহরের পুলিস-কর্ম্মচারীরাও বহুবার এই মেডেল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

অল্পদিন পূর্ব্বে বার্মিংহাম সিটী পুলিসের কনষ্টেবল জর্জ্জ ব্লুমফিল্ড রোদে বাহির হইয়া শুনিতে পাইল, জেল-খালাসী একটা দাগী বদমায়েস তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া পলায়ন করিতেছে। ব্লুমফিল্ড যখন এই সংবাদ পাইল, তখন সে বহু দূরে প্রস্থান করিয়াছিল। ব্লুমফিল্ড তাহার অনুসরণে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একখানি মোটর-লরী দেখিতে পাইল, লরীখানি ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে চলিতেছিল। ব্লুমফিল্ডের অনুরোধে লরীর চালক তাহাকে লরীতে তুলিয়া লইল। কিছু কাল পরে লরী পূর্ব্বোক্ত দাগী বদমায়েসের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ব্লুমফিল্ড লরী হইতে সেই গাড়ীতে লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু আসামীটা তাহাকে দেখিবামাত্র গুলী করিল। সৌভাগ্যক্রমে ব্লুমফিল্ড সেই গুলীতে আহত না হওয়ায় সে আসামীকে আক্রমণ করিল এবং অতি কষ্টে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। তাহার কার্য্য-দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ রাজার নিকট সে 'পুলিস ভিক্টোরিয়া ক্রশ' লাভ করিয়াছিল।



বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ কর্তৃক পুরস্কৃত বিভিন্ন স্থানের পুলিস-কর্ম্মচারিগণ

পুলিস-কর্ম্মচারীরা দস্যু, তস্কর বা খুনী আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টায় জীবন বিপন্ন না করিয়া, অন্য প্রকারে দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও 'পুলিস ভিক্টোরিয়া ক্রশ' লাভ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক বার গ্রসপবরোর পুলিসের সন্দেহ হয়, এক জন লোক তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া একটি পরিত্যক্ত কয়লার খনির ভিতর মৃতদেহটি নিক্ষেপ করিয়াছে। মৃতদেহটি খনির অভ্যন্তরস্থ রাবিশের ভিতর প্রোথিত আছে, পুলিসের মৃতদেহটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ হইল। কিন্তু খনি-খনকদের সর্দ্দার তাহাদিগকে জানাইল, সেই পরিত্যক্ত খনির ভিতর এক বার নামিলে দেওয়াল চাপা পড়িয়া মৃত্যু অপরিহার্য্য। এ কথা শুনিয়া কেহই খনির ভিতর নামিয়া মৃতদেহের অনুসন্ধানে সম্মত হইল না। অবশেষে সাম রো নামক এক জন কনষ্টেবল জীবন বিপন্ন করিয়াও সেই খনির ভিতর প্রবেশ করিল; সে মৃতদেহটির অনুসন্ধানে রাবিশরাশি অপসারিত করিবার সময় সকলেরই আশঙ্কা হইল—খনির জীর্ণ দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যে কোন মুহূর্ত্তে রোকে খনিগর্ভে সমাহিত করিবে। রো ক্রমাগত দুই দিন খনিগর্ভে বাস করিয়া রাবিশের স্তূপ অপসারিত করিল; সেই সময় পার্শ্বস্থ রাবিশ-স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সে সতর্ক থাকায় তাহাকে আহত হইতে হইল না; কিন্তু খনিগর্ভে নিক্ষিপ্ত বিড়াল-কুকুরের মৃতদেহ, এমন কি একটি গরুর মৃতদেহ রাবিশের সঙ্গে তাহার সম্মুখে পড়ায় সাম অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। তথাপি সে মৃতদেহের অন্বেষণে বিরত হইল না।

সাম রোর এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; তবে তাহার এই অনন্যসাধারণ সাহসের পুরস্কারস্বরূপ সে বাকিংহাম প্রাসাদে নীত হইয়া রাজা কর্তৃক পুলিসের 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিল, এই সংবাদ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে লণ্ডন পুলিসের কনষ্টেবল হল ও লুইস একটি নিদারুণ দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুলিসের কর্তৃপক্ষ তা

রাখিয়া এই আদেশ প্রদান করেন যে, রাত্রি ১২টা হইতে ১টার মধ্যে একখানি ট্যাক্সি সেই পথে যাইবে; সেই ট্যাক্সির আরোহিগণকে ও ট্যাক্সিচালককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহারা থানায় লইয়া যাইবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং আদেশপালনে কোন ত্রুটি না হয়, এ জন্য কনষ্টেবল হল ও লুইসকে সতর্ক করা হইয়াছিল।

হল ও লুইস সেই পথের প্রান্তবর্ত্তী একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া ট্যাক্সির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা; প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর রাত্রি প্রায় সাড়ে ১২টার সময় একখানি ট্যাক্সি লণ্ডনের দিক হইতে সবেগে তাহাদের নিকট অগ্রসর হইল। ট্যাক্সিখানি সেই বৃক্ষের সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কনষ্টেবল হল একলম্ফে ট্যাক্সিতে উঠিয়া ট্যাক্সিচালককে গ্রেপ্তার করিল। কনষ্টেবল লুইস ট্যাক্সির দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ট্যাক্সির ভিতর হইতে গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল। লুইস কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া এরূপ প্রচণ্ড বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল যে, আরোহীরা গাড়ীর ভিতর অতিষ্ঠ হইয়া ট্যাক্সির বাহিরে আসিল এবং লুইসের উপর ক্রমাগত গুলী চালাইতে লাগিল। ট্যাক্সিতে চারি জন আরোহী ছিল, তাহারা চারি জনই লুইসকে গুলী করায় দুই জনের দুইটি গুলী লুইসের দেহে বিদ্ধ হইল; কিন্তু লুইস এই আঘাতে ব্যাকুল না হইয়া এক জন আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিল। অন্য তিন জন পলায়ন করিল বটে, কিন্তু যে দস্যু ধরা পড়িয়াছিল, সে তাহার সঙ্গীদের গন্তব্য স্থানের



পুলিসের "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" মেডেল (সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকের চিত্র)

পরদিন ধরা পড়িল। যথাসময়ে সেই চারি জন দস্যুর অপরাধের বিচার হইল; বিচারালয়ে তাহাদের অপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাদের প্রতি দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। কনষ্টেবল হল ও লুইস সাহস ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পুরস্কারস্বরূপ বাকিংহাম-প্রাসাদে 'পুলিস ভিক্টোরিয়া ক্রশ' লাভ করিয়াছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লণ্ডন পুলিসের দুই জন কনষ্টেবল মার্টিন ও ম্যাকডোনাল্ড স্ব স্ব জীবন বিপন্ন করিয়া পার্শিভাল লেন নামক একটা দুর্দ্দান্ত দস্যুকে গ্রেপ্তার করায় রাজার নিকট 'পুলিস ভিক্টোরিয়া ক্রশ' পুরস্কার পাইয়াছিল। দস্যু লেনের গ্রেপ্তারের কাহিনী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের কাহিনীর ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক;—তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ভদ্রপরিচ্ছদধারী প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরবয়স্ক একটি যুবক লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন-সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র রেস্তরাঁয় আহার করিতে গিয়াছিল; আহারান্তে সে রেস্তরাঁর যুবতী খাতাঞ্চীর বিলের টাকা দেওয়ার সময় তাহার সহিত কিঞ্চিৎ হাস্য-পরিহাসের লোভও সংবরণ করিতে পারিল না। সেই সময় যুবতী সেই সুরসিক অতিথির ভাবভঙ্গী ও পরিচ্ছদাদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিল; সে দেখিল, রসিক পুরুষটির রসের উপাদান একটি সুবৃহৎ পিস্তল বুকের পকেটে ঠেলিয়া উঠিয়াছে; পিস্তলের কুঁদাটিও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

যুবকটি বিলের টাকা চুকাইয়া দিয়া ও রসালাপ করিয়া যুবতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার ধারণা হইল, যুবতী তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে। এই জন্য সে যুবতীকে

তোমার সঙ্গে অনেক (প্রেমের ?) কথা আছে। আশা করি, শনিবারেই দেখা হইবে।"

যুবক রেস্তরাঁর খাতাঞ্চী যুবতীর কটাক্ষ-শরে আহত হইয়া প্রস্থান করিবামাত্র যুবতী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন-সন্নিহিত পুলিস ষ্টেশনে টেলিফোনে সংবাদ দিল, কিছু কাল পূর্ব্বে একটা লোক তাহাদের রেস্তরাঁয় 'ডিনার' করিয়া গিয়াছে; লোক-টাকে দেখিয়া তস্কর বলিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, যুবকের চেহারা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, যুবতী তাহার চেহারার যে পরিচয় দিল, পুলিস তাহা শুনিয়াই বুঝিতে পারিল, কয়েক দিন পূর্ব্বে যে কয়েক জন দস্যু বণ্ড ষ্ট্রীটের কোন জহরতের দোকান লুণ্ঠন করিয়াছিল, উক্ত প্রেমিক দস্যু তাহাদেরই অন্যতম—পার্শিভাল লেন।

যাহা হউক, পুলিস সেই প্রেমিক দস্যুর সন্ধান লইবার জন্য মার্টিন ও ম্যাকডোনাল্ড নামক দুই জন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, তাহারা সেই রেস্তরাঁর উপর দৃষ্টি রাখিল। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট শনিবারে তাহারা সাধারণ ভদ্র লোকের পরিচ্ছদে রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিয়া অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গে আহার করিতে বসিল। পার্শিভাল লেনও তাহাদের পাশের একটি টেবলে আহারে বসিয়াছিল। লেন আহারান্তে উঠিয়া যখন খাতাঞ্চী যুবতীকে বিলের টাকা দিতে চলিল, সেই সময় মার্টিন ও ম্যাকডোনাল্ড তাড়াতাড়ি টেবল পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল। যুবতী তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল; তাহার এইরূপ ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া পার্শিভাল লেনের ধারণা হইল, প্রেমিকা যুবতী নব অনুরাগে বিহ্বল হইয়াই থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ছদ্মবেশী পুলিস-কর্ম্মচারিদ্বয়কে পশ্চাতে দেখিয়া তাহার প্রেমের নেশা ছুটিয়া গেল! সে তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া মার্টিন ও ম্যাকডোনাল্ডকে গুলী করিল; কিন্তু সে তখন এতই উত্তে-জিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার হাত কাঁপিতে থাকায় গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। মার্টিন ও ম্যাকডোনাল্ড তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইল, এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া চলিল। রেস্তরাঁর সকল লোক এই আকস্মিক বিভ্রাটে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অতঃপর রেস্তরাঁর খাতাঞ্চী যুবতী গবর্মেণ্টের নিকট প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়াছিল এবং মার্টিন ও ম্যাক-ডোনাল্ড সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়া পুলিসের 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিল, সে কথা প্রথমেই লিখিয়াছি।

ইংলণ্ডে পুলিস-কর্ম্মচারিগণের এইরূপ সাহস ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাহারা নানা অপকার্য্যে আইন ও শাসনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জন-সাধারণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য পুলিসের অনেক কর্ম্ম-চারী জীবন বিপন্ন করিয়া থাকে। রাজা যে কোন দিন তাহাদিগকে বাকিংহাম প্রাসাদে আহ্বান করিয়া, পুলিসের 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' মেডেল স্বহস্তে তাহাদের পরিচ্ছদে আঁটিয়া দিয়া থাকেন। ইহা একটি নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানমাত্র এ জন্য কোন প্রকার আড়ম্বর বা সমারোহের ব্যবস্থা নাই কিন্তু যে সকল পুলিস-কর্ম্মচারী এই মেডেল ধারণ করে, সকলেই তাহাদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করে। তাহারা কোন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদের দাবী করিলে তাহাদের সেই দাবীও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পুলিসের উর্দ্দীতে সজ্জিত হইয়া নির্লিপ্তভাবে 'ঘুষ', জমিয়া ও গাড়োয়ানের নিকট সেলামী আদায় করিয়া কোন রকমে চাকরী বজায় রাখিলে পুলিসের 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' লাভ করা যায় না।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাজাজ্ঞায় পুলিস ও 'ফায়ার ব্রিগেডের সাধারণ কর্ম্মচারীদিগকে এই মেডেল দ্বারা পুরস্কৃত করিবার নিয়ম সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক জনও এই মেডেল লাভ করিতে পারে নাই। এই মেডেলের সম্মুখভাগে রাজার মুখ ক্ষোদিত আছে; পশ্চাদ্ভাগে একটি সশস্ত্র প্রহরী বর্ম্ম ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সেই বর্ম্মে ক্ষোদিত আছে—"আমার প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা কর।"—মিঃ জিলবার্ট বেইজ মেডেলের এই চিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। শ্বেতবর্ণের মধ্যে দুইটি নীলবর্ণের ডোরাবিশিষ্ট ফিতা দ্বারা মেডেলটি পরিচ্ছদে আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই মেডেলের এবং পুরস্কৃত কয়েক জন পুলিস-কর্ম্ম-চারীর প্রতিকৃতি এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল।

চীনের কারাকাহিনী

(সেকালের ও একালের)

চিরন্তনের অপরিবর্ত্তনশীল বিরাট চীন জাগিয়াছে, তাহার অসাড় দেহে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে; তাহার বদনমণ্ডল হইতে নৈশান্ধকারের কৃষ্ণাবগুণ্ঠন যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ড স্পর্শে খসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার পীত ললাট আসন্ন উষার অরুণালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও অহিফেনের মোহে তাহাকে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া যাহারা শ্মশানচর গৃধ্রের ন্যায় তাহার শিয়রপ্রান্তে বসিয়া তাহার শোণিত শোষণ করিতেছিল, তাহারা তাহার এই নবজাগরণের লক্ষণ দেখিয়া যে ভীষণ কলরব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্ববাসীর কানে তালা লাগিবার উপক্রম; তাহার প্রতিধ্বনি আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে। সংপ্রতি চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনায় পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহের মাসিকগুলির স্তম্ভ পূর্ণ হইতেছে। এবার আমরা চীনের সেকালের ও একালের কারাকাহিনী পল ডি সেরিক নামক ফরাসী লেখকের প্রবন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

চীনসাম্রাজ্যে যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময় গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের কার্য্যে রাজকিঙ্করগণেরই একাধিপত্য ছিল; সামান্য পদ হইতে তাহারা ক্রমে উচ্চতর পদে উন্নীত হইত, যোগ্যতার অভাবে পদোন্নতিতে বিঘ্ন ঘটিত না এবং বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাদের দাবী নষ্ট করিতে পারিত না। সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রথমে একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আর তাহার কাম মারে কে? প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে রাজকার্য্যের দুইটি শ্রেষ্ঠ বিভাগ—পুলিসে অথবা কারাবিভাগে চাকরী মিলিত। যুবকরা চাকরী পাইয়াই উপরওয়ালা মাণ্ডারিণগণকে খুসী করিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাদিগকে ভেট পাঠাইত। তবে উৎসব-উপলক্ষে ও মাণ্ডারিণদিগের জন্মতিথিতে প্রচুর উপহার দিতেই হইত। জ্ঞাননিষ্ঠ মাণ্ডারিণরাও এই সময় তাঁবেদারদের নিকট ভেট লওয়া নিদর্শন বলিয়া ভেটের দাবী করিতেন। যদি কোন ব্যক্তি মাণ্ডারিণের নিকট কোন দরকারে যাইত, তাহা হইলে মাণ্ডারিণের ঝাড়ুদার হইতে পেস্কার পর্য্যন্ত প্রত্যেককে সে পূজায় তুষ্ট করিতে বাধ্য হইত। মাণ্ডারিণদের পদগৌরব জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের সমান ছিল। তিনি বন্ধু-বান্ধবের ও আত্মীয়বর্গের ভিতর হইতে নিজের আমলা নিযুক্ত করিতেন। সেকালে পুলিসের চাকরীরও খুব খাতির ছিল। কিন্তু শাসন, বিচার বা জেল বিভাগের চাকরীর ন্যায় দুষ্প্রাপ্য ছিল না।

মাণ্ডারিণরা জিলার কর্ত্তা। নিজের জিলায় প্রত্যেক মাণ্ডারিণ সম্রাটের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান ও স্বেচ্ছাপরতন্ত্রভাবে রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ইঁহারা কখন রাজদরবারে কারা-সংস্কারের জন্য আবেদন করেন নাই এবং প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। জিলার বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের জন্য সরকার হইতে যে অর্থ মঞ্জুর করা হইত, মাণ্ডারিণ মহাশয়রা তাহার কিয়দংশমাত্র ব্যয় করিয়া অধিকাংশ আত্মসাৎ করিতেন। কারাগারে যে দুর্ব্যবহার হইত ও দুর্নীতির স্রোত চলিত, তাহা জানিতে পারিলেও মাণ্ডারিণরা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেন না, বরং তাহার সমর্থন করিতেন। কোন নামজাদা দস্যু ধরা পড়িলে মাণ্ডারিণ প্রধান প্রধান নগরবাসীদের হস্তে তাহার বিচারের ভার দিতেন, তাহারা তাহাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিত, না হয় গাছের ডালে লট্‌কাইয়া দিত। যদি কখন তাঁহাকে স্বয়ং এরূপ আসামীর বিচারভার গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি ডাক্তার, পুলিস, উকীল প্রভৃতি কাহাকেও ডাকিয়া সরকারের অর্থের অপব্যয় করিতেন না,—স্বয়ং একতরফা কাজীর বিচার শেষ করিতেন। পুলিসের প্রয়োজন হইলে তিনি নিজের দ্বারবান্ প্রহরীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন, কখন বা সরকারের ফৌজ তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিত।

মাণ্ডারিণ স্বগৃহে যতই কোমল-হৃদয় ও সরল-প্রকৃতি হউন, অপরাধীর তিনি বাঘ। দংশন না করিলেও তাহাকে দুই চারিটা থাবা মারিবেনই। তাঁহাদের আমলে কয়েদীগণকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করা হইত; সেই কারা-প্রকোষ্ঠ বাতায়নহীন, সম্মুখে লোহার গরাদে ঘেরা

আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলে সেই গরাদের ফাঁক দিয়া তাহাদিগকে আহার দেওয়া হইত। বাঘের খাঁচায় খাদ্যদ্রব্য প্রদানের ব্যবস্থা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কয়েদীরা জেলখানায় যে কাম করিত, তাহার বিনিময়ে সরকারের নিকট কিছু কিছু অর্থ পাইত, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে তামাক দেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু কারাপ্রহরীদিগকে উৎকোচ না দিলে তাহা তাহাদের হস্তগত হইত না। এমন কি, খাদ্যদ্রব্যও বিনা উৎকোচে লাভ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইত। কখন কখন য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণ এই সকল কয়েদীদের দেখিবার জন্য জেলখানার পিঞ্জর-দ্বারে উপস্থিত হইতেন। তখন কারা-প্রহরীরা তাহাদের হস্তস্থিত বল্লমের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ কয়েদীদের এরূপ প্রচণ্ড বেগে খোঁচা মারিত যে, তাহারা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া বাতায়নের গরাদের নিকট উপস্থিত হইত; কেহ ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাবার চাহিত, কেহ একটু তামাক চাহিত, কেহ বা তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের দাবী করিত; কিন্তু প্রহরীরা তাহাদের পুনঃ পুনঃ খোঁচা মারিয়া আমোদ দেখিত। এই দৃশ্যে য়ুরোপীয় দর্শকেরা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।



কণ্ঠদেশে ক্যাঙ্গুধারী চীন কয়েদী

লঘু অপরাধে বংশদণ্ডাঘাতে অপরাধীকে জর্জ্জরিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল; কিন্তু অপরাধ একরার করিবার জন্য আসামীদিগকে যে ভাবে লাঠী-পেটা করা হইত, তাহার তুলনা জগতে বিরল। আঘাতে কখন কখন আসামীদের বক্ষঃস্থলের ও পঞ্জরের অস্থি চূর্ণ হইত। প্রহারের প্রণালী অত্যন্ত আতঙ্কজনক।

পূর্ব্বকালে চীনের কয়েদীদের গলায় 'ক্যাঙ্গু' বাঁধিয়া শাস্তি দেওয়া হইত; ইহা একখানি সম-চতুর্ভুজ তক্তা। তাহা কয়েদীর গলায় এ ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হইত যে, তাহা কোন দিকে নড়াইবার উপায় ছিল না। 'ক্যাঙ্গু' লইয়াই এই তক্তা এরূপ প্রশস্ত যে, তাহা অতিক্রম করিয়া কয়েদী মুখে হাত তুলিতে পারিত না; এ জন্য অন্য লোকের সাহায্যে তাহাকে আহার গ্রহণ করিতে হইত। কেহ খাওয়াইয়া না দিলে তাহার খাইবার উপায় ছিল না। ইহার উপর কয়েদীকে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে পথে পথে ঘুরাইয়া আনা হইত। সে সময় মক্ষিকাদল তাহার মুখে বসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত; কারণ, চীনদেশে অগণ্য মাছি। মক্ষিকা-দংশনে বিব্রত হইয়া ক্যাঙ্গু-ধারী কয়েদী আর্ত্তনাদ করিত এবং মুখের মাছি স্বয়ং তাড়াইতে না পারিয়া, তাহা তাড়াইবার জন্য পথিকদের সাহায্য প্রার্থনা করিত। রাত্রিকালে তাহাকে দেওয়ালে ঠেস দিয়া চিৎ হইয়া শুইতে হইত, নতুবা তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিত।

পার্শ্বে 'ক্যাঙ্গু'-ধারী এক জন কয়েদীর চিত্র প্রকাশিত হইল।

কোন কোন অপরাধীকে কাঠের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহ-কীলক দ্বারা বিদ্ধ করা হইত। সে কালে এই ভাবে হত্যা করিবার প্রথাও বিরল ছিল না।

কয়েদীর শাস্তিবিধানের জন্য টবের ভিতর দণ্ডায়মান রাখিবারও ব্যবস্থা ছিল। টবের মাথায় একটি ছিদ্র থাকিত, সেই ছিদ্র দিয়া কয়েদীর মাথাটি বাহির করিয়া রাখা হইত। টবের নিম্নভাগ ইষ্টকবদ্ধ। প্রত্যহ এক একখানি ইট অপসারিত করিয়া সেখানে পাথুরে চূণ ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহার পর সেই চূণে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দিলে তাহা ফুটিয়া উঠিত। সেই বাষ্প কয়েদীর নাকে মুখে প্রবেশ করায় সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিত এবং অবিরত উত্তপ্ত চূণে তাহার পায়ের তলায় ফোস্কা উঠিত; কিন্তু তাহার পলায়নের উপায় ছিল না। এ ভাবে তাহাকে প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কারণ; প্রত্যহই এক একখানি ইট খুলিয়া লইয়া সেখানে

তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া কারাপ্রহরীদের দৈনিক কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

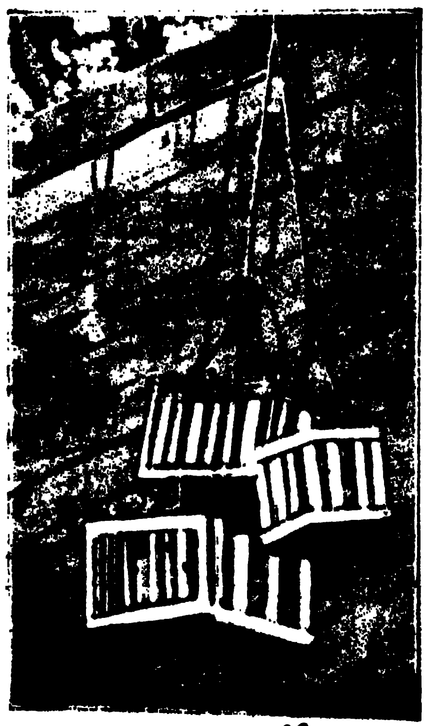
যে সকল অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার বিধান থাকিলেও যাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শিত হইত, তাহাদিগের মস্তক অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা হইত। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের সকল কষ্ট-যন্ত্রণার অবসান হইত। কিন্তু চীনাম্যানরা এই ভাবে প্রাণত্যাগ করিতে বড়ই নারাজ, কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, এই ভাবে মরিলে পরলোকে তাহাদের আত্মার সদ্গতি হইবে না।



মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত চীনা কয়েদীগণের শিরশ্ছেদনের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান অস্ত্রপাণি মাঞ্চু জল্লাদ।

যে সকল জল্লাদের উপর অপরাধীদের মুণ্ডচ্ছেদনের ভার অর্পিত হইত, তাহারা সকলেই ভীমাকৃতি ও বলবান্; তাহারা স্নেহ-মমতা-বর্জ্জিত নরপশু। তাহারা উত্তর-চীনের অধিবাসী ও মাঞ্চুবংশীয় লোক। ইহারা যে প্রণালীতে অপরাধিগণের মুণ্ডচ্ছেদন করিত—তাহা অত্যন্ত সহজ ও ধরিয়া সম্মুখে হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই অপরাধী উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইত, টিকির আকর্ষণে ঘাড়ও প্রসারিত হইত; সেই সুযোগে জল্লাদ তাহার তীক্ষ্ণধার তরবারির বাঁট উভয় হস্তে দৃঢ়রূপে ধরিয়া তরবারি ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া অপরাধীর ঘাড়ে সজোরে আঘাত করিত; সেই অব্যর্থ আঘাতে মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইত। কখন দ্বিতীয়বার আঘাতের প্রয়োজন হইত না। অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদনোদ্যত এক জন মাঞ্চু জল্লাদের প্রতিকৃতি এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

কোন কোন জিলায় দুর্দ্দান্ত দস্যুগণকে গ্রেপ্তার করিয়া



পিঞ্জরাবদ্ধ মুণ্ড।

এই ভাবে হত্যা করা হইত, কিন্তু নিহত হইয়াও তাহাদের নিষ্কৃতি ছিল না; তাহাদের 'কাটামুণ্ড'গুলি বিভিন্ন লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সেই সকল পিঞ্জর সুদীর্ঘ বংশদণ্ডের সাহায্যে নগরপ্রাচীরে ঝুলাইয়া রাখা হইত। মাণ্ডারিণগণ মনে করিতেন,—এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অন্যান্য দস্যু-তস্করের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে এবং তাহারা ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া সাধুতা অবলম্বন করিবে। কোনও মাণ্ডারিণের আদেশে কয়েক জন দস্যুর মুণ্ডচ্ছেদনের পর তাহাদের মুণ্ড

কোন কোন মাণ্ডারিণ দয়া করিয়া সাধারণ তস্করদিগকে মুক্তিদান করিতেন, কারাগারে পাঠাইতেন না। কিন্তু সেই সকল তস্কর বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ করিত না, মাণ্ডারিণের আদেশে তাহাদিগকে বিচারালয়-প্রাঙ্গণে লইয়া গিয়া তাহাদের বন্ধন-মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বংশদণ্ড দ্বারা প্রচণ্ড-বেগে তাহাদের অঙ্গসেবা করা হইত। কাহারও কাহারও পিঠ কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিত, আর তাহারা হাত দিয়া সেই শোণিতধারা মুছিতে মুছিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিত, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া পথিকগণের সহানুভূতিলাভের চেষ্টা করিত। মাণ্ডারিণগণের বিশ্বাস ছিল, এই ভাবে লাঠী খাইলে পুনর্ব্বার চুরি করিতে যাইবার সময় এই শাস্তির কথা তাহাদের স্মরণ হইবে এবং আর তাহাদের চুরি করিতে সাহস বা প্রবৃত্তি হইবে না।

সে কালের চীনের কারাগারগুলি অত্যন্ত কদর্য্য স্থান হইলেও দুঃসাহসী দস্যু ও বোম্বেটেরা তথায় বাস করিয়া কিছুমাত্র অসুবিধা বা কষ্ট অনুভব করিত না। তাহারা দস্যুবৃত্তি দ্বারা যে অর্থ-সঞ্চয় করিত, কারাগারের প্রহরিগণকে তাহার কিয়দংশ উৎকোচ দান করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিত। তাহারা প্রচুর পরিমাণে মদ্য সংগ্রহ করিয়া পান করিত এবং জুয়া খেলিয়া, ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া কারাগারটিকে বাসগৃহ অপেক্ষাও উপভোগ্য করিয়া তুলিত। কত বৎসর তাহাদিগকে কারাগারে বাস করিতে হইবে—এই প্রশ্ন তাহাদের মনে উদিত হইত না।



শিরশ্ছেদনের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান চীনা কয়েদীদল : (মুখমণ্ডলে নিস্পৃহতার ভাব)

যদি কোন চীনাম্যান রাজনীতিক অপরাধে ধরা পড়িত, অর্থাৎ রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হইত। সে নিজের ব্যবহারযোগ্য জিনিষ-পত্রাদি ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে লইতে পাইত না। পরিবারস্থ কোন নরনারী তাহার সঙ্গে যাইবারও অনুমতি করিত, কিংবা স্থানান্তরে পলায়ন করিত, তাহা হইলে তাহার পরিবারবর্গকে দণ্ডভোগ করিতে হইত এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। তাহার পরিজন-বর্গের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত; কখন কখন তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইত। (সৌভাগ্য-ক্রমে এ কালে ইংরাজের মুলুকে দাস বিক্রয়ের প্রথা রহিত হইয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান ভারতে এই দৃশ্য উপভোগ করিবার সুযোগ নাই।) তবে বর্ত্তমানকালে রাসিয়ার মস্কো নগরের বলশেভিক নেতৃগণ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী (Czarist officers) কর্ম্মচারিবৃন্দের পত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামীদের সদাচরণের জন্য জামিন-মুচলেকা দিতে বাধ্য করিয়াছে।

সে কালে চীনাম্যানেরা রাজনীতি-শাস্ত্রে এ কালের মত পারদর্শিতা লাভ না করিলেও রাজনীতিক গুপ্ত সমিতি ('টংস্') সকল প্রদেশেই বর্ত্তমান ছিল। সমিতির সদস্যগণ প্রচলিত রাজবিধান অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের আইনানুসারে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিত এবং তাহাদের সাহস ও শক্তি-সামর্থ্যও অসাধারণ ছিল।

চীনদেশের কয়েদীদের সহিষ্ণুতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; তাহারা যেরূপ উৎপীড়ন ও প্রহার সহ্য করিতে পারে, তাহা কোন শ্বেতাঙ্গ কয়েদীর অসহ্য। লাঠিপেটা করিতে করিতে পথ দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহারা পথিকদের সহানুভূতিলাভের জন্য ষাঁড়ের মত চীৎকার করিলেও, প্রহার বন্ধ করিবামাত্র তাহাদের সকল দুঃখ দূর হয়, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে এবং কেহই যেন তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই—এই ভাব প্রকাশ করে। মানুষ কিরূপ এত দূর নির্লজ্জ হয়—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াও কয়েক জন অপরাধী কারাবক্ষে কিরূপ 'খাতির নদারৎ' ভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করি-

টিনসিনে কতকগুলি প্রজার বাড়ী লুঠ করিয়া ধরা পড়িয়াছিল এবং বিচারে জল্লাদের তরবারিতে ইহাদের মুণ্ডচ্ছেদনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু এই দণ্ডাদেশে তাহারা বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করে নাই।

* * * * *

চীন-সাম্রাজ্যে সাধারণতন্ত্র বিঘোষিত হইবার পর কারাসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। চীনে এখন আদর্শ কারাগারের অভাব নাই। তবে দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে এখনও কয়েদীদের প্রতি যথেষ্ট উৎপীড়ন অত্যাচার লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল দুর্ব্যবহার বর্ত্তমান আইনের অনুমোদিত নহে।

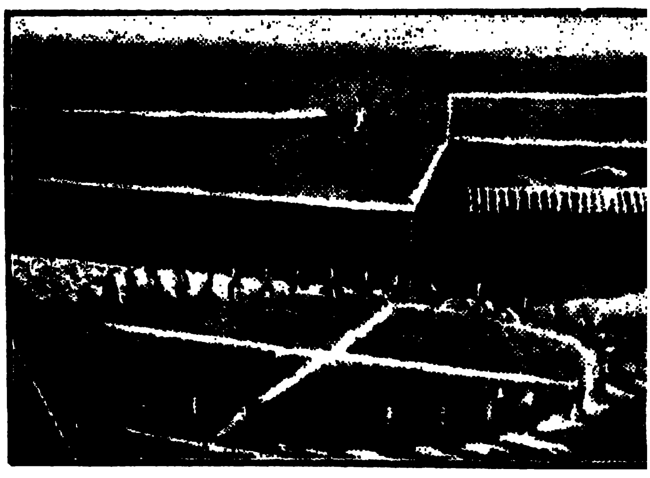


কারা-সংস্কারের পর—পিকিনের ২নং কারাগারের একটি কক্ষ।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে চীনে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সে দেশে যে সকল সংস্কার ও উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, কারাসংস্কার তাহাদের অন্যতম। কয়েদীদের খাদ্যদানের ধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও চীনদেশের ...ও সংস্কারক কারা-সংস্কারের জন্ত বহুবার ...দ্বারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আবেদন ও নিবেদনের থালা বহন করিয়া তাঁহারা কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। চীনের আমলাতন্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন—কারাসংস্কারের উপযুক্ত অর্থ

যাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় চীনদেশে কারাসংস্কারের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাঁহার নাম তাই-হুং-জু (Tai-Hung-tzu)। এখন চীনদেশে ৪০টি আধুনিক কারাগার বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ১৩টিতে নবীন ব্যবস্থানুযায়ী কায-কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। পিকিনে এই নব-পর্য্যায়ের কারাগার ৩টি দেখিতে পাওয়া যায়। এখন জার্ম্মাণ, অষ্ট্রীয় ও রুশীয় অপরাধিগণকেও পিকিনের আদর্শ কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। এই সকল কারাগারের সহিত সে কালের কারাগারের আকাশ-পাতাল তফাৎ; এমন কি, ফ্রান্স, ইটালী ও মার্কিণ যুক্ত-প্রদেশেরও বহু কারাগার চীনের নূতন কারাগারগুলি অপেক্ষা অপকৃষ্ট, ইহা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি এ কথা অসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চীনের নূতন কারাগারের দুইখানি চিত্র এখানে প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

কারাসংস্কার-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়—তাহা সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা-বর্জ্জিত, এমন কি, ফরাসী সেনাবারিকে উদ্ধত ও অবাধ্য



পিকিনের ২ নং কারা-সংলগ্ন—কয়েদীদের বিহারক্ষেত্র।

সৈনিকগণের শাসনের জন্ত যে দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা অপেক্ষাও কোমলতাপূর্ণ। এই সকল কারাগারে কয়েদিগণকে নানা প্রকার শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা শিখাইবার

রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মুক্তি-লাভের পর পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং কুপথে না গিয়া সাধু উপায়ে সমাজের হিত-সাধন করিতে সমর্থ হয়—এ বিষয়ে কারা-কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন না। তাহাদিগকে মানুষ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কয়েদীরা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ও বস্ত্রাদি উপ-হার পাইয়া থাকে; এ জন্য কারাগারত্যাগের পর তাহাদিগকে অর্থাদি সংগ্রহের জন্য অসৎপথ অবলম্বন করিতে হয় না।

এখন চীনের কারাগারসমূহে জার্ম্মাণ জালিয়াৎ এবং অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরী পোল্যাণ্ড ও লাটভিয়া প্রভৃতি দেশের চোর, ডাকাত, বদমায়েসগুলাকে চীনা কয়েদীদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে দেখা যায়। চীনা-আদালতে তাহাদের অপরাধের বিচার হইলেও তাহারা ইচ্ছামত উকীল-ব্যারিষ্টার দ্বারা মামলা চালাইতে পারে এবং তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী দোভাষী নিযুক্ত করা হয়; এই জন্য বিদেশী অপরাধীদের অভিযোগের কোন কারণ বর্ত্তমান নাই।

বিচার-সচিব (Sau Fa Pu) কারাগারসমূহের পরি-চালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর-গণের অভিমত অনুসারে এই পদে লোক নিযুক্ত হয়।

এই প্রবন্ধে পিকিনের ২ নং কারাগারের একটি কক্ষের চিত্র প্রকাশিত হইল। এই কারাগারে প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এক একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ থাকিলেও এখানে দেড় হাজার কয়েদী বাস করে। তাহাদের মধ্যে য়ুরোপীয় কয়েদীর সংখ্যা অল্প নহে। ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সকল প্রহরী নিযুক্ত আছে, তাহারা সেনাদল ও মাঞ্চু প্রহরীমণ্ডলী হইতে সংগৃহীত। হাজতগুলি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও সিভিল পুলিস (Pao Au Tui) দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রহরীদের পরিচ্ছদ বিভিন্ন জিলায় ভিন্ন ভিন্ন রকম দেখিতে পাওয়া যায়। পিকিন জেলের প্রহরীর পরিচ্ছদ ওলন্দাজ পদাতিক সৈন্য-গণের পরিচ্ছদের অনুরূপ।

এ কালে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের মুণ্ডচ্ছেদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখা যায় না। প্রবন্ধলেখক দেখিয়াছিলেন—রাসিয়ার কোনও সদ্বংশজাত সৈনিক যুবক মাঞ্চুরিয়ার কোন চৈনিক রমণীর ধর্ষণের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া চীনের গবর্মেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইলে তাহার ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল।

চীনের প্রত্যেক জিলায় (Fu) ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও আপীল আদালতও আছে। এতদ্ভিন্ন চূড়ান্ত বিচার-নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি হাইকোর্ট আছে। সকলের উপর পিকিনের সুপ্রীম কোর্ট। প্রত্যেক বিচারালয়ে পাবলিক প্রসিকিউটার আসামীর বিরুদ্ধে মামলার তদ্বির করেন।

চীনদেশে যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময় যাহারা মাণ্ডারিণ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান কালে ম্যাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগকে এখন পুলিস কমিশনরের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল আসামীকে কারাগারে প্রেরণ করেন, কারাসংস্কারে তাহারা কথঞ্চিৎ উপকৃত হইলেও, যাহারা সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশের কারাসমূহে প্রেরিত হয়—তাহারা এরূপ অশিক্ষিত ও মূঢ় যে, কারাগারের নূতন নূতন শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা তাহাদের কোন উপকারলাভের আশা নাই; এবং কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া তাহারা সে বিদ্যাও কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। কারণ, কোটি কোটি অশিক্ষিত অসভ্য চীনাম্যানের মধ্যে এখনও সেরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই। তবে আশার কথা এই যে, চীনাম্যানরা মিস্ত্রীর জাতি। ইহাদের অধিকাংশ লোক বিশ্বকর্ম্মার প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে; এবং বর্ণজ্ঞানবিহীন মূর্খ চীনাম্যানরাও প্রকৃতিদত্ত শক্তিতে উৎকৃষ্ট কারিগর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সুশিক্ষা চিরদিন ব্যর্থ হয় না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অনন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বরে অসংখ্য হীরাহার ঝলমল করিতেছে। জ্যোৎস্না তাহার অলস তনুখানি বিশ্রাম-শয়নে এলাইয়া দিয়াছে, তাহার শুভ্র অঞ্চলখানি চঞ্চল পবনের লঘুস্পর্শে করতোয়ার স্নিগ্ধবক্ষে লীলায়িত হইয়া পড়িয়াছিল, এক একটা রাত্রিচর পাখী মাঝে মাঝে মানবের অবোধ্য ভাষায় ডাকিয়া যাইতেছিল। দিনের আলোর অবিচারের বিরুদ্ধে বোধ করি, তাহাদের প্রাণের প্রবল প্রতিবাদই ইঁহারা ঘোষণা করিয়া রজনীকে সুস্বাগত জানাইতেছিল।

প্রাসাদ-উদ্যানের সর্ব্বশেষে পাষাণ-সোপানশ্রেণী তাহাদের দৃঢ়, রূঢ় মূর্ত্তি লইয়া সুবিস্তৃতভাবে একবারে করতোয়ার জলতলে নামিয়া গিয়াছে। জলের মধ্যে কতকগুলি সোপানের শ্রেণী নিমজ্জিত হইয়া আছে। সোপানশ্রেণীর প্রত্যেকটির দুই ধারে দুইটি করিয়া পুষ্পবৃক্ষ। কোনটির দুই দিকেই চম্পক, কোনটির দুই ধারে বকুল এবং কাহারও উভয় পার্শ্বেই কাঞ্চন, শিরীষ, কুরুবক ও কদম্ব। প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্পিত বৃক্ষের ছায়াগুলিও তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে পতিত হইয়া এবং বায়ু-সন্তাড়নে মন্দ মন্দভাবে আন্দোলিত হইতে থাকিয়া যেন সজীব বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। একটা প্রমত্ত কোকিল সেই বৃক্ষশ্রেণীর একতমের মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে মধ্যে মধ্যে পঞ্চম স্বরে গাহিয়া উঠিতেছিল—"কু—কু-উ—কু-উ!" আবার সে মধ্যে মধ্যে কুহু কুহু কুহু রবে নিজের কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলিয়া যেন দূরস্থ শ্রোতাকে নিজের অপূর্ব্ব স্বরমহিমা শ্রবণ করাইতেছিল।

ভর সন্ধ্যায় এই শান্ত-নির্জ্জন নদীতীরে কুমার রামপালদেব একাকী পাষাণ-সোপানোপরি বসিয়া ছিলেন। একবারে জলের ধারেই তিনি বসিয়া ছিলেন। তাঁহার নদীতরঙ্গ মধ্যে মধ্যে চঞ্চল নৃত্যে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে প্লাবিত করিয়া দিয়া আবার তথা হইতে সরিয়া যাইতেছিল।

রামপাল নিতান্তই বিমনা হইয়া বসিয়া ছিলেন। যে তীব্র বেদনার সাড়া রাত্রি-দিন তাঁহার বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে গুরু স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া ঘুরিতেছিল, তাঁহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত তৃষ্ণা-চাঞ্চল্য যে রুক্ষ ব্যথার রুদ্রস্পর্শে 'অশান্ত চাঞ্চল্যে' একান্ত উদ্বেগ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারই জ্বালাময় দুঃখ-দুর্য্যোগ-ভরা কঠোর স্মৃতি তাঁহাকে যেন শোক-মুহ্যমান এবং স্তব্ধ ও নিস্পন্দ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রমত্ত অন্তরের অধীর আবেগকে প্রবল শক্তিপ্রয়োগে সজোরে চাপিয়া ফেলিয়া ভগ্নহৃদয় রামপাল সমস্ত জগতের জনসঙ্গ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একা—একবারে একা এই বিজনতার মধ্যে ডুব দিয়াছিলেন।

রামপালদেবের মাথার উপরে আশে-পাশে সান্ধ্য প্রকৃতির এই শোভাসম্ভার। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে এক চন্দ্রের কোটি প্রতিবিম্ব বক্ষে লইয়া নৃত্যকুশলা লহরীমালা নানা ছন্দে শত-কৌতুকে নাচিয়া, ঢলিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার শ্রান্তিখিন্ন ললাটের স্বেদশ্রুতি জলকণবাহী মন্দ পবন ধীর স্নেহস্পর্শে মুছিয়া লইতেছিল, তাঁহার পিতৃপিতামহ-জননী স্নেহময়ী তরঙ্গিণী কল-কল গদগদ নাদে না জানি কি আশার বাণীই তাঁহার কর্ণকুহরে বলিতে চাহিতেছিল, তথাপি তাঁহার সেই আত্মবিস্মৃত বিহ্বল স্তব্ধতা কেহই একা অথবা তাহাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারাও বিদূরিত করিতে পারিতেছিল না। তাঁহার অন্তরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে দীপ্ত, সজাগ হইয়া রহিয়াছিল, একনিষ্ঠভাবে শুধু ঐ মর্ম্মন্তুদ বেদনার কশা দিয়া লিখিত বাণী—"ধিক্! ধিক্! রামপালদেব!"—আর ঐ প্রবল ধিক্কারের সহিত অত বড় দৃঢ়চিত্ত বীরহৃদয় যেন শতখান হইয়া

চেষ্টাতেও এই দুরন্ত ভীষণ স্মৃতিটাকে তিনি কোনমতেই যেন বিদায় দিতে পারিয়া উঠিতেছিলেন না; দিবার কোনই উপায় যেন তাঁহার হাতের মধ্যেও ছিল না।

কিন্তু তাহা বলিয়াই ত আর রামপালের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় না। তিনি যে তাঁহার রাজভ্রাতার বিরুদ্ধে কোন দিনই বিদ্রোহে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাঁহার সমুদয় আত্মমর্য্যাদা ও সুনামকে বিসর্জ্জন আজ তাঁহাকে দিতেই হইবে। ইহা যে অপ্রতিবিধেয়। অতএব এখন উপায় কি? ইহার আর উপায় কি? দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া নিজেই আসিয়া প্রবিষ্ট হওয়া গিয়াছে, তখন আর তাহার মধ্য হইতে মুক্তির রাজপথ তাঁহাকে কে দেখাইয়া দিবে? তাহার পর আর এক কথা—মহাদেবী—না, নিশ্চয়ই না, অত বড় দস্যুতা করিয়া কাড়িয়া ছিনাইয়া গলায় ছুরি মারিয়া যে নিজের পথ মুক্ত করা—ওঃ—না, রামপাল শতবার সহস্রবারও তেমন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ঘৃণা বোধ করেন। আর সে রকম বা যে রকম করিয়াই হউক না কেন, এখন মহীপালের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যাওয়ার সহজ অর্থই এই যে, তাঁহার স্ব-কৃত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

সজোরে ও সগর্ব্বে রামপালদেব মনে মনে কহিলেন, "মনে আমার যত অশান্তিই থাকুক, যত বড় অভিশাপই আমার মাথার উপরে বর্ষিত হউক, এ আমায় সহ্য করিতেই হইবে। এ আমি সহিব। আর যখন সহিতেই হইবে, তখন সহিষ্ণুতার সহিতই সহিব। আমার বুকের ভিতর ইহার জন্য যত বড় জ্বালাই জ্বলিতে থাকুক না কেন, সে আগুনের তাপ ও দাহে এমন করিয়া আর অপরকে দগ্ধ করিব না। এ কার্য্যের সমস্ত দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা, সবটুকু অপমান—এ আমারই নিজস্ব হইয়া থাক, এ শুধু আমারই বুকের মধ্যে চাপা দেওয়া থাক।"

রাত্রি গভীর হইয়া গিয়াছিল। সচন্দ্র তারকারা প্রাণপণে নিজেদের পূর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া আকাশের, পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মিলন-সন্ধিস্থলসমূহকে জ্যোতিঃপ্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সুপরিস্ফুট অজস্র রজতধারাকারে জ্যোৎস্নালেখা সমস্ত চরাচরকেই ধৌত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছে। সু-উচ্চ প্রাসাদ-শিখর হইতে নদীতলশায়ী সুস্পষ্টীকৃত। রামপালদেব সহসা যামঘোষকুলের কণ্ঠকলরবে রজনীর গভীরতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন।

তখন ত্রস্তপদে সোপানশ্রেণী অধিরোহণপূর্ব্বক রাজোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন, রাজপথে দ্বৈপ্রহরিক ঘোষণা ঘোষিত করিয়া পুরপ্রহরী হাঁকিতেছিল—"তাপিত ও সন্তাপিত বিনিদ্র নর এবং নারীগণ! ক্ষয়শীল যৌবন, ভঙ্গুর জীবন এবং তদপেক্ষাও অচিরস্থায়ী ধন-জন-মান-গর্ব্ব-পদ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষণস্থায়ী প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া বৃথা রাত্রি অতিবাহিত করিও না। এ সকলেরই অপেক্ষা জন্ম-মৃত্যু-জরাই মানবের প্রধানতম শত্রু। এই প্রবলতম অরাতির হস্ত হইতে যদি আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক হও, তবে প্রভু বুদ্ধের শরণাগত হইয়া প্রাণ ভরিয়া বল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!' সকল সন্দেহের সমাধান হইয়া যাইবে। অশান্ত হৃদয় প্রশান্ত হইবে।"

কুমার রামপালের সহসা মনে হইল, তিনি যে দিক্-চিহ্নহীন মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, তাহারই উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভের মধ্যে যেন একখানি ভগ্ন কাষ্ঠ তাঁহার হস্তস্পৃষ্ট হইল। সেইখানে সেই জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল মধুযামিনীর শান্ত-সুপ্ত-মাধুর্য্যভরা সহস্র সুগন্ধ কুসুমের অজস্র সুরভিনন্দিত মুক্ত উদার বিমানতলে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ব্যোমপথবিহারশীল অসংখ্য কৌতূহলী গ্রহনক্ষত্রের দিকে চাহিয়া তিনি আজ মন্ত্রমুগ্ধের মতই উচ্চারণ করিলেন—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!"

তাহার পর নিতান্ত অশক্ত অবশভাবেই তিনি সেইখানে সেই অনাচ্ছাদিত ধূলিকঙ্করমণ্ডিত পথের পরে ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই শান্তির মন্ত্র উচ্চারণে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে হইল, এ জগতের সহিত অদ্যাবধি তাঁহার একটা গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল এ জগতে তিনি যেন এখন হইতে একবারেই একা—একাকিত্বকে লইয়াই, এই নূতন মন্ত্রের সাধনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহ করিয়া জীবনের প্রত্যেকটি পল-বিপলকে ক্ষয় করিয়া লইতে হইবে

তাঁহার একমাত্র পাঠ্য হইল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

একটা নূতনতর নিষ্ঠুর বৈরাগ্যে সহসা রামপালের চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একটা সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা চক্ষুর নিমেষে বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। তবে কেনই বা "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া তিনি তাঁহার সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটনপূর্ব্বক আজিকার এই জনহীনা নিশুতি স্তব্ধ রাত্রিতেই জন্মের মত রাজপুরীর বাহির হইয়া না যান? বিরাগী শাক্যসিংহ প্রাণের তীব্র প্রেরণার দ্বারা যে কার্য্য করিয়াছিলেন, আজ গৌড়-মগধের মহারাজকুমার অনুপায়তার দৃঢ়পাশবদ্ধ অহোরাত্র বিদগ্ধ জীবনের সকল সমস্যার সমাধানহেতু যদি তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করেন, ক্ষতি কি? না, ক্ষতি কিসের? বরং ইহাতে লাভই আছে। যাহারা আজ ভীরু, কাপুরুষ, অক্ষম, অশক্ত রামপালকে ধিক্কার দিয়া গিয়াছে, তাহারাই আবার কাল এ সংবাদ পাইলে তাঁহার ভীরুতাকে বৈরাগ্য,—কাপুরুষের নিস্পৃহা, অশক্ততাকে আসক্তিহীনতা ও অক্ষমতাকে ধর্ম্মজ্ঞতায় পরিবর্তিত করিয়া অনুতপ্ত পরিবাদে গালি ফিরাইয়া লইয়া বলিবে—"ধন্য! ধন্য তুমি মহাকুমার রামপালদেব! এত বড় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ছত্রপতিত্বকে অনায়াস-বিরাগে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক এই যে প্রব্রজ্যা-গ্রহণ, এ আর কাহার সাধ্যে ছিল!"

দ্বিতীয় বুদ্ধাবতার বলিয়া হয় ত কালে এক দিন তাঁহারও স্মৃতি জন-পূজ্য হইয়া রহিবে।

নাঃ! এত বড় প্রলোভন আর রামপাল ছাড়িতে পারেন না। এই তাঁহার পথ! এই তাঁহার ভাগ্যলিপি! এই একমাত্র শরণীয় আশ্রয়ে তাঁহার সকল লজ্জা, সমস্ত ধিক্কার এবং সমুদয় জ্বালারই অবসান হইতে পারিবে।

কুমার রামপালদেব সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

এই জগৎভরা জ্যোৎস্নার বন্যাপ্লাবনে শুধু রাজকীয় উদ্যানই নহে, পরন্তু রাজকীয় কক্ষ সকলও আনন্দ-প্লাবিত হইতেছিল। স্নিগ্ধ-মধুর বাতাস আসিয়া গন্ধদীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই। প্রশস্ত শুভ্র কোমল শয্যার উপরে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর জ্যোৎস্নালোক যেন তরঙ্গায়িত হইতেছিল, আর তাহার উপরে তাহারই মত স্নিগ্ধ, সুন্দর ও কোমল দেহলতা অলসভাবে লুটাইয়া দিয়া সন্ধ্যারাণী একাকী জাগিয়া পড়িয়া আছে।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল, বিশাল রাজপুরী ক্রমশঃ জন-কোলাহল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া স্তব্ধ, শান্ত, প্রসুপ্ত হইয়া গেল, ক্রমে সুদূর রাজবর্ত্মে প্রহরীর ঘোষ-রাব অস্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচর হইল। প্রাসাদ-তোরণে দ্বিপ্রহরিক নহবৎ বাজিয়া বাজিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যার অভিমানাহত ব্যথিত ক্ষুব্ধ চিত্ত এতক্ষণে একটা সন্দিগ্ধ আতঙ্কের তাড়নায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা উগ্র তীব্র ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আতঙ্কে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন বারেক স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াই একেবারে অসাড় আড়ষ্ট হইয়া গেল। এতক্ষণকার নীরব নিষ্ফল অভিমানটা যেন রূঢ় কঠিন হস্তে তাহার গলাটাকে নির্ম্মমভাবেই টিপিয়া ধরিল। এ কি হইল! এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? এত রাত্রি হইয়া গেল, তবু ত দেখা নাই!—আর গত রাত্রির সেই বিবাদ-কলহের পর। না, নিশ্চয়ই কিছু একটা ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটিয়াছে!

সন্ধ্যারাণী আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। উচ্চ পর্য্যঙ্কের আস্তরণ-মণ্ডিত সোপান-শ্রেণী দ্রুত অবতরণ করিয়া সে কিছুক্ষণ উৎসুক উৎকণ্ঠিত চিত্তে কক্ষের মধ্যেই পদচারণ করিতে লাগিল। একবার উগ্র ব্যাকুলতায় ব্যগ্রভাবে আসিয়া বাতায়ন-নিম্নস্থ নদীবক্ষে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিল। তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোৎস্নার নর্ত্তন-লীলা, শুভ্র চন্দ্রকরে হৈম চন্দ্রচ্ছায়ায়, সুবর্ণ-রজতের গলিত জ্যোতি-প্রপাতরূপে সে এক অলৌকিক অনৈসর্গিক রূপ ধরিয়াছে, ক্ষুদ্র সন্ধ্যার এই বিপুল বেদনাতঙ্ক অনুভব করিবার আজ তাহাদের অবসর কোথায়?

অবশেষে দুশ্চিন্তা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, ভয়ের তাড়নায় প্রবল লজ্জাও আজ সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া গেল। অস্থির দ্রুত চরণে প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সন্ধ্যা মহাদেবীর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইল।

ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়তা-বিহীন শান্ত স্বরে প্রশ্ন

সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিল। ঘনশ্বাসে তাহার বক্ষ সঘনে আলোড়িত হইতেছিল, চক্ষুর জলভার অসম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে সকল দ্বিধা ও সমস্ত লজ্জাকে পরিহার পূর্ব্বক ঘনকম্পিত রুদ্ধ-শ্বাসে কহিয়া উঠিল—"দিদি! কি হবে দিদি?"

মহাদেবীর গৃহস্থিত শয্যাস্তীর্ণ দ্বিরদ-রদ-খচিত পর্য্যঙ্কের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইত, সে শয্যা এখনও পর্য্যন্ত অভুক্ত রহিয়াছে। তিনি বাতায়নতলে বাহুর আশ্রয় রাখিয়া তাহারই উপর মুস্তগণ্ড হইয়া বিমনাভাবেই বসিয়াছিলেন। একা—সে কথা আর বলিবার অপেক্ষাই করে না। তাঁহার জীবনে এই একাকিত্ব আজিকার রাত্রিতেই এই প্রথম বারের জন্যই ত নহে। তাঁহার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে তাঁহার স্বামিসঙ্গের হিসাব হয় ত তাঁহার অঙ্গুলীগণনার মধ্যেই পাওয়া যায়। পরম ভট্টারক, পরমসৌগত, মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব নিজের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর নীরস সঙ্গে জীবনের পরমেপ্সিত সুখরাত্রির অপব্যয় করিয়া ফেলিবার পাত্র আদৌ ছিলেন না। বিশেষতঃ এমন চন্দ্রালোক-পুলকিতা মধু-যামিনী! ইহার মধ্যে তাঁর ধর্ম্মপত্নীর স্থান কোথায়?

মহাদেবী যে সুগভীর চিন্তাজালে সমাচ্ছন্না হইয়া গিয়া রাত্রির গভীরতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে সমর্থা হয়েন নাই, এই অসম্ভাব্যরূপে রামপাল পত্নীর গৃহ-প্রবেশে তাহা হইতে তিনি ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিয়া সুকোমল কণ্ঠে কহিলেন—"কি হয়েছে রে, বোনটি? আজ আবার সে তোকে কি বলেছে?"

সন্ধ্যার ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া ঝরে-ঝরে হইল, সে প্রায় ফুঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, "সে বল্লেও ত আমার ঢের ভাল হতো! সে যে এখনও আসেনিই দিদি! ও দিদি! কি হবে?"

"কে আসেনি, রে? তোর বর?"

অন্য সময় হইলে এই "তোর বর" শব্দটুকু কানে ঢুকিলেই লজ্জায় সন্ধ্যার মুখ সন্ধ্যাকাশের মতই লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার সে রকম জাগ্রত অবস্থাই যে বর্ত্তমান ছিল না। সে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার কম্পিত অধরকে দাঁত দিয়া চাপিয়া যে অনিবার্য্য ক্রন্দনকে প্রাণপণে সম্বরণ চেষ্টা করিতেছিল, সহসা অসম্ভববোধে সেই অসাধ্যসাধনে বিরত হইয়া তাহাকে একবারেই মুক্ত ধারায় উৎসারিত হইতে

সে কেন এখনও এলো না? আমার মন যে বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে, দিদি গো! কি জানি, যদি কোন অমঙ্গল হয়ে থাকে?"

এই ক্ষুদ্রা বালিকার অহেতুকী চিন্তাকাতরতা ও অসহায় অশ্রুজল দৃঢ় চিত্তের বাঁধকেও আজ যেন ঈষৎ শিথিল করিয়া তুলিল। অন্য দিন হইলে হয় ত, সর্ব্বত্র অজেয় রামপাল সম্বন্ধে সহসা একটা বিপদচিন্তা তাঁহার চিত্তে স্থান প্রাপ্তই হইত কি না, বলা যায় না। হয় ত এই সরলা শিশুপ্রকৃতি বালিকাকে বুকে টানিয়া তাহাকে সহানুভূতিপূর্ণ সপরিহাসব্যঙ্গে ভুলাইয়া তাহাকে নিজের এই বৃথা ভয়ভাবনার জন্য লজ্জায় রাঙ্গাইয়া তুলিতেন, কিন্তু আজিকার সেই বিদায়-দৃশ্য, সে যে এখনও চোখের উপর জলজল করিয়া জ্বলিয়া রহিয়াছে, সেই ধরিত্রী-হৃদ্-বিদারণ-নিঃসারিত গৈরিকস্রাবতুল্য অগ্নিময় বাণীসকল তাঁহার উভয় কর্ণকুহরে যে নির্ম্মমভাবেই দগ্ধ করিতেছিল, সে স্মৃতির অসহ্য দাহ তাঁহাকেও আজি এই সর্ব্বজনপ্রসুপ্ত তৃতীয় প্রহর রাত্রিতেও বিনিদ্র রাখিয়াছে, তাহারই জন্য এই অশ্রুমুখী বিহ্বলা বালিকার আনীত সংবাদ তাঁহার চিত্তে ভয় এবং ভাবনা এই দুইটাকেই আজ প্রচুরভাবে টানিয়া আনিল। মনের এত বড় অস্থিরতায় সেই অবমাননার পঙ্কলিপ্ত তেজস্বী যুবাকে না জানি আজ তাহার ভাগ্যস্রোত কোন্ পথেই বা টানিয়া লইয়া গেল! প্রতিজ্ঞা যখন তাহার এতই অ-ত্যাজ্য হইয়া রহিল, আবার মহাদেবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় যখন সে বিন্দুমাত্র আঘাত দিতেও অসমর্থ,—তখন অভিমানী অনবনত চিত্ত আর কি করিতে পারে? যদি না সে নিজের পরেই সকল প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া—

লজ্জাদেবী আর ভাবিতে পারিলেন না, তাঁহার সকল ধৈর্য্য যেন একই ক্ষণে টুটিয়া গিয়া তাঁহাকেও সেই মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার অপেক্ষাও অধিকতরই ভয়ার্ত্ত দেখাইল। তথাপি ঈষৎ শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভয় কি রাণি! সে কি তোকে ফেলে সত্যি সত্যি কোথাও যেতে পারবে? এখনি আসবে সে—"

কিন্তু সন্ধ্যা যে আজ তাহার চিরনির্ভরতা হারাই ফেলিয়াছিল। সে এই প্রবোধবাক্যে যেন সম্পূর্ণ নি: রাখিতে না পারিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "

হচ্ছে না, আমার কি হবে দিদি! দিদি গো! আমার যে আর কেউ নেই।"

"এমন পাগলি তুই—ও কে ও?"

মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে একটা দীর্ঘ ছায়াকে সহসা অপসৃত হইতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে মহাদেবী এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উত্তর না পাইয়া দ্রুতপদে দ্বার-সমীপস্থা হইয়া দেখিলেন, কেহ অতিশয় সন্তর্পণে অথচ দ্রুত-পদক্ষেপে অন্ধকারের আশ্রয়ে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া মহাদেবীর চিন্তা-ম্লান মুখ সহসা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি সেই আত্মগোপন-সচেষ্ট ছায়া-মূর্ত্তির পানে ফিরিয়া ডাকিলেন—"মহাকুমার!" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ ডাকিলেন—"রামপাল!"

দীর্ঘ ছায়াকারী এ আহ্বানের পর আর এক পদও নড়িতে সমর্থ হইল না, স্তব্ধ নিঝুম হইয়া সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর ক্ষণকাল তেমনই ভাবে থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

তখন বিস্মিত এবং সস্মিত দৃষ্টিতে মহাদেবী দেখিলেন, বাস্তবিকই এই নম্রপদ, দীনবেশী পলাতক কুমার রামপাল-দেব ভিন্ন অপর কেহই নহেন।

পট্টমহাদেবী স্থির তীক্ষ্ণ নেত্রে তাঁহার মৌন নত মুখের দিকে কিয়ংক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে তখন কি যে ঝড় বহিতেছিল, বোধ করি, তাহা বুঝিতে তাঁহার অর্দ্ধনিমেষেরও অধিক কালবিলম্ব ঘটে নাই। তিনি ধীরপদে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া নিজের শান্ত-শীতল দক্ষিণ হস্ত তাঁহার সেই অশান্ত ঝটিকাক্ষুব্ধ বক্ষতলে অর্পণ করিয়া গম্ভীর মুখে স্থির স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও, মহাকুমার! যদি আমি সতী হই, যদি ইষ্টদেবতার পদে আমার যথার্থই মতি থাকে, আমি তোমায় কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, এ দিন তোমার কখনই চিরস্থায়ী হবে না। এক দিন অব-সানোন্মুখ পালসাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য তোমাকেই আশ্রয় ক'রে পুনরুদিত হবে। কিন্তু আজ যদি তুমি আবেগের বশে একটা কিছু অসঙ্গতাচরণ ক'রে ফেল, হয় ত সে ভুল আর এ জন্মে কোন দিনই শোধরাতে পারা যাবে না। মনোরম বর্ত্তমানটাই আমাদের সব নয়। ভবিষ্যতের যবনিকার তলে আমাদের জন্য কত আশাতীত বস্তুও হয় ত

রামপালদেবের ইচ্ছা ছিল, গোপনে একবার মহাদেবীর রুদ্ধ দ্বারে প্রণত হইয়া একবার অন্তরাল হইতে সন্ধ্যাদেবীর সুখ-সুপ্ত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া লইয়া ইঁহাদের নিকট এ জন্মের মত তিনি মনে মনে বিদায় লইবেন। এত রাত্রি অবধি উভয়েরই জাগিয়া থাকা বা একত্রাবস্থান তিনি তখন কল্পনাও করেন নাই। এখন ধরা পড়িয়া গিয়া, মাথা হেঁট করিয়া কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলেন, কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন ব্যাকুল ক্ষোভে রামপালদেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া মহাদেবী ডাকিলেন, "সন্ধ্যা!"

অত্যন্ত ভয়ের পর মুহূর্ত্তেই প্রত্যাশাহীন আনন্দের আত্যন্তিক আতিশয্যে ক্ষুদ্র সন্ধ্যা যেন কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সঙ্গে আবার তাহার স্বভাবজাত লজ্জা-রও সহসা আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। তাই সে প্রথমটায় মহাদেবীর আহ্বান পাইয়াও সুগভীর লজ্জার তাড়নায় তাঁহার আজ্ঞাপালনে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ শান্ত-শীতল মিষ্ট স্বরের মধ্যে বিজয়ী কর্ণাটেশ্বর-দুহিতার যে দৃঢ় আদেশ নিহিত আছে, তাহা যেন একান্তই অলঙ্ঘ্য! সলজ্জসস্মিতভাবে মৃদু চরণে সন্ধ্যা আসিয়া মহাদেবীর কোলের ভিতর প্রায় ঢুকিয়া দাঁড়াইল। তাহার জলভরা চোখের উপর সুখস্মিত মৃদু হাস্যরেখা যেন বর্ষার সজল আকাশে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রূপের মতই মনোরম শোভায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। একাধারে শোক, ভয় ও হর্ষ এই ত্রিবর্ণ যেন রক্ত, পীত ও নীলের মতই সমুজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল।

তখন স্মিতকোমল হাস্যরঞ্জিত মুখ কুমারের দিকে ফিরাইয়া, সস্নেহে ক্ষুদ্র বালিকার মাথার উপর কল্যাণ-ময় হস্তখানি রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে মহাদেবী কহিলেন,—"মহাকুমার! আমার ভুলের শাস্তি তুমি এই নিরপরাধীর মাথার উপরে চাপিয়ে দিয়ে এর শোধ নিতে চেও না। এর এই মুখের দিকে একবারটি ভাল ক'রে চেয়ে দেখে তার পর যা তোমার সঙ্গত মনে হয়, তাই তুমি কর। আর আমার কিছুই তোমায় আজ বলবার নেই। বালক রামপাল যে এক দিন যুবক রামপাল হবে, এই অত্যন্ত সোজা কথাটা ভুলে গিয়ে আমিই তোমার

তোমায় আমি স্মরণ করিয়ে দেব, এই যে, সহস্র প্রতিজ্ঞার কাছে নিজের হাত বেঁধে রাখলেও সে বন্ধন তোমায় তেমন ক'রে বেঁধে রাখতে পারবে না, যদি তুমি এই—এর প্রতি এতটুকু অবিচার ক'রে এর চোখের জলের বাঁধন দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে না ফেল! এই চির-পুরানো বাক্যটাকে শুধু বচনমাত্র মনে ক'রো না, একে নিশ্চিত সত্য ব'লেই জেনো,—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে,—
রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—

দেবতার আশীর্ব্বাদ যদি চাও,—এই নাও,—এর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে একে প্রসন্ন ক'রে তোল।—যাও সন্ধ্যা! তোমার স্বামীর সঙ্গে ঘরে যাও।"

এই বলিয়া মহাদেবী আর কাহারও দিকে না চাহিয়া শান্ত দৃঢ়পদে আপন কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে পুনশ্চ তাঁহার পরিহাস-স্নিগ্ধ সহাস্য কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"চক্রবাকমিথুন! রজনী-প্রভাতের আর বিলম্ব নাই।"

কুমার রামপালের আনত মুখের বিষাদ মেঘচ্ছায়া সহসা এ কথায় অপসৃত হইয়া গিয়া তাহা আজিকার শরচ্চন্দ্রের মতই বারেক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। তিনি স্নেহ-কোমল স্পর্শে লজ্জাকুণ্ঠিতা অথচ হর্ষবিহ্বলা সন্ধ্যাকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার কানের কাছে নত হইয়া কহিলেন,—"ক্ষমা কর, সন্ধ্যা!"

ঘরে ফিরিয়া সন্ধ্যা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এ বেশ কেন?"

কুমার ঈষৎ লজ্জা পাইয়া লজ্জা-স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—"আমি প্রব্রজ্যা নেবার কথা ভাবছিলেম।"

ইহা শুনিয়াই সন্ধ্যার সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়া উঠিল, চক্ষুর নিমেষে তাহার চোখের কোল দুইটি পতনোন্মুখ অশ্রুজলের ধারায় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তখনও সে প্রাণপণ বলে সে অশ্রু-নিরোধ-চেষ্টা ছাড়িল না। পাছে কান্না বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে জলে ভরা স্তম্ভিত মেঘের মতই নীরব স্তব্ধ হইয়া আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

দিদি বলিয়াছেন,—তাহার চোখে জল পড়িলে তার স্বামীর মঙ্গল হইবে না।—তাই সে এমন করিয়া নিজেকে সম্বরণ-চেষ্টায় পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু এ যে কত বড় অসাধ্য চেষ্টা, এ বোধ করি, সে নিজে ভিন্ন আর কাহারও বোধগম্য হইবার নয়!

"প্রব্রজ্যা নেবার কথা ভাবছিলাম।" স্বামীর এই নির্ম্মম বাক্য—এ যে তাহার বুকের, একবারে হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে একখানা শাণ-দেওয়া ধারালো ছুরির মতই করকর করিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাইবার কথাও ভাবিতে পারিয়াছেন?

সন্ধ্যার মুখখানা দেখিতে দেখিতে একবারে পাথরের মতই কঠোর ও শীতল হইয়া আসিল। তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে টলিয়া পড়িয়াও যাইতেছিল, চক্ষুর পলকে রামপাল দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া চাপিয়া আনিয়া নিজে বুকের উপর ধরিলেন। তাহার উত্তাপহীন শীতল ওষ্ঠাধর অজস্র উদ্দপ্ত চুম্বনের স্রোতে প্লাবিত করিয়া দিয়া গভীরস্বরে কহিলেন,—"দেখলেম, সেটা খুবই সহজ নয়, সন্ধ্যা! এতটুকু ছোট্ট মানুষটি তুমি, তা হ'লে কি হয়, আমার এই এত বড় বুকটার মধ্যের অনেকখানি যায়গা তুমি জুড়ে নিয়েছ।"

তখন স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া সন্ধ্যা মঙ্গলামঙ্গলের সমুদয় হিসাব-নিকাশ ভুলিয়া গিয়া একবারে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

দাস্য-রস *

১

নন্দ বলেন, সন্দেহ নাই ওগো যশোমতি,
পুত্র মোদের স্বয়ং ভগবান্।
অন্ধ মোরা, কতই শাসন করি যে তাঁর প্রতি,
—ভাবলে সে সব শিউরে ওঠে প্রাণ!

পুত্র হয়ে গয়লা বাপের বাধা ব'য়ে শিরে
বাছা মোদের বাঁধল মায়াডোরে,—
শিষ্টভাষে, মিষ্ট হাসে, মুগ্ধ আঁখির নীরে
শতেক ছলে নিত্য ভোলায় মোরে;

তাঁরি কৃপায় সন্দেহ হায়, ঘুচল আমার আজ,
শুন রাণি মনের অভিলাষ!
জগৎ-পিতার সাজ্‌তে পিতা পাই যে বড় লাজ,—
চাই যে হ'তে সেই চরণের দাস।

চাই যে আমি নিতি নিতি প্রাণের প্রীতি দিয়ে
চরণ-সেবার পরম অধিকার,
কাজ কি আমার পিতা হওয়ার মিথ্যা ভরম নিয়ে
মেটে না তায় প্রাণের তৃষা আর।

রাণী বলেন—মিল্‌বে রাজা ক্ষোভ ক'র না মনে—
সেবার ধরম লালন-পালন মাঝে,
দাস্য-রসের সুধাধারা বৎসলতার সনে
পুষ্পমালার সূত্রসম রাজে।

সুবল বলে, ও ভাই সুদাম কানাই মোদের কই,
গোঠের শেষে গড়িয়ে এলো বেলা,
পশ্চিমেতে ডুবল তপন দেখ্ না চেয়ে ওই,
সে না এলে হয় না যে ভাই খেলা!

কাল্‌কে কানাই হেরে গিয়ে পেয়েছিল লাজ,
চড়েছিলাম আমি তাহার কাঁধে,
কথা ছিল সুদ শুদ্ধ, শোধ দেবে সে আজ,
আজকে কেহ পার্‌বে না শ্যাম-চাঁদে।

কানাই যদি সঙ্গে থাকে সবই লাগে ভাল,
প্রাণের মাঝে মন্দাকিনী বয়,
কালোরূপে করে সে ভিতর-বাহির আলো,

* উৎস-সন্ধান

পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য সুখ মাগে করিয়া মিনতি॥

* * * *

অন্যের কা কথা সেই নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥

* * * *

শ্রীদামাদি যত সখা ব্রজের নিচয়।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥

*

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

* * * *

দ্বারকাতে রুক্মিণাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥

খেলা-ধূলার সঙ্গী বটে নর্ম্ম-সহচর,
গান গাই, আর গরু চরাই মাঠে,
তবু মনে হয় সে প্রভু, আমরা যে কিঙ্কর,
সেবার তরে পরাণ মোদের ফাটে ;

কমল-কোমল চরণযুগল অঙ্কে তুলে লয়ে
সম্বাহনে শ্রান্তি তাহার নাশি,
আশ মেটে না পার্শ্বে থেকে, শুধুই সখা হয়ে,
দাস হ'তে তার নিত্য অভিলাষী।

নারায়ণের বক্ষোদেশে লক্ষ্মীমাতার বাস,
তবু তাঁহার লক্ষ্য শ্রীচরণ,
রুক্মিণী ও সত্যভামার কৃষ্ণপদেই আশ,
দাসী হবার কতই আকিঞ্চন।

অন্য গোপীর থাক্ না কথা, স্বয়ং ব্রজেশ্বরা,
যাঁহার নামে শ্যামের বাঁশী সাধা,
যাঁহার প্রেমে মর্ত্ত্যে নেমে গোলোক পরিহরি'
বৃন্দাবনে পড়েন হরি বাঁধা।

তিলেক অদর্শনে যাঁহার শারদ-পৌর্ণমাসী
শ্যামের চোখে অমার মতই লাগে,
বক্ষে চরণ-পদ্ম ধরি নয়ন-নীরে ভাসি
শ্যাম যাঁহারে সাধেন অনুরাগে।

সোহাগিনী সেই রাধিকার মনের গোপন কথা
ললিতা আর বৃন্দা সখী জানে,
শ্যামের চরণ-সেবার তরে গভীর আকুলতা
ফল্গুসম বয় যে তাঁহার প্রাণে।

প্রেম-যমুনা উছল নানা ভাবের সমীরণে,
তরঙ্গে তার গোপী আপনহারা,
এমন মধুর লীলার তলে শিলার আবরণে
দাস্য-রসের বইছে গোপনধারা।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২

নন্দের স্নেহ নির্ঝর ছুটে
গৌরবে শুষ্ক গিরির বুকে ;
শেষে— গিরিধারীপায় প্রপাত-ধারায়
গড়ায়ে পড়ে।

জননী যশোদা বক্ষের সুধা
দিতে ভুলে নীলমণির মুখে,
ধ্বজ— বজ্রাঙ্কুশ- লাঞ্ছিত ধন
বক্ষে ধরে॥

শ্রীদাম সুদাম গাঁথি নীপদাম
কণ্ঠে সঁপিতে, কি যেন ভাবি',
শেষে— অঞ্জলি পূরি সঁপে সে সবার
চরণ'পরে।

বদন-রাজীবে— চরণ-রাজীবে
রাধা-মধুপীর সমান দাবি,
তবু— 'কোকনদে' যত লোভ, নয় তত
'ইন্দীবরে।'

ভাষা শুনে তার আশা মেটে বটে
হাসি শুনে ব্রজবাসীরা হাসে,
আর— বাঁশী শুনে তার গোপবধূ নীপ-
কাননে ছুটে।

পায়ে রুনুঝুনু শুনি নাচে তারা
সব ধ্বনি ভুলি রসোল্লাসে,
তার— নৃত্যমুখর নূপুরে ভৃত্য-
হৃদয় লুটে॥

রসের গোকুলে নানা বরণের
যত ফুল ফুটে 'লতা' বা 'দ্রুমে'
সবি— শ্যামেরি অঙ্গে ঝরি, শেষে পায়
হতেছে জড়ো।

দাস্যের লোভে, নাহি মানি মানা
বিশ্ব তাহার শ্রীপদ চুমে,
করে— নিখিল জীবন বলি হবে তার
বেদীটি বড়।

শ্রীকালিদাস রায়।



আহার্য্য সংস্কার

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কথা উঠিবে বাঙ্গালীর বিধবাদের। তাহারা মাছ মাংস মোটেই না খাইয়া স্বাস্থ্য বেশ অটুট রাখে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মাছ-মাংসের অপ্রাচুর্য্য বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার একটামাত্র কারণ, একমাত্র কারণ নহে। এই একটা কারণকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারা যায়—যদি মানুষের পক্ষ হইতে এক বা ততোধিক অমানুষিক অথবা অস্বাভাবিক কোন রকম চেষ্টা করা যায়। হিন্দুর বিধবা-জীবন অস্বাভাবিক এই হিসাবে যে, নারীর স্বাভাবিক দুইটি ধর্ম্ম, সন্তান ধারণ এবং নিজের শরীরের রসরক্ত প্রভৃতি হইতে স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা জাতসন্তানের পুষ্টিসাধন করা। এই দুইটি স্বাভাবিক অথচ গুরুভার ইঁহাদের বহন করিতে হয় না। এই দুইটি কাজের জন্য যে শক্তি তাঁহারা সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাহা আর বাহিরে চলিয়া যায় না, তাঁহাদের শরীরে সঞ্চিতই থাকে। ইহা স্বাস্থ্য বজায় থাকার প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া তাঁহারা পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, শুচিসম্পন্ন জীবনযাপন করেন বলিয়া নানাবিধ রোগের ধাক্কাও তাঁহাদিগকে সামলাইতে হয় না। উৎসবে, আনন্দে আহারের আধিক্য বলিয়া কোন কিছু ইঁহাদের ইতিহাসে লেখা থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকা বিচিত্র নহে।

পরিশ্রমবিমুখ বাঙ্গালীর পক্ষে অতি মাত্রায় নিরামিষ আহার বিশেষরূপেই অনিষ্টকর। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ-পণ্ডিত Cohnheim দেখাইয়াছেন যে, ১ শত গ্রাম প্রোটিনের জন্য চাই ;—

মাংস	আধ সের	যাহাতে অন্তর্নিহিত উত্তাপশক্তি আছে		৪২৫	Calorie
দুধ	তিন সের	"	"	২০৭৪	"
ডিম	১৬টা	"	"	১১৩৩	"
আটা	সাড়ে তিন পোয়া	"	"	৪৫৫২	"
আলু	সাড়ে চার সের	"	"	৫০০	"
চাল	পৌনে দুই সের	"	"	৫৬০০	"

দৈনিক ১ শত গ্রাম প্রোটিনের যায়গায় যদি কম করিয়া ৬০ গ্রামও (২ ছটাক) ধরা যায়, তাহা হইলে চাউল লাগিবে সওয়া চার পোয়া। ইহাতে উত্তাপশক্তি থাকিবে ৩ হাজার ৩ শত ৬০ Calorie—$৫৬০০ \times \frac{৬০}{১০০}$)। সাড়ে চার পোয়া জলকে এক (Centigrade) ডিগ্রী অধিকতর উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ উত্তাপশক্তি লাগে তাহাই এক Calorie। এখন সাধারণ মানুষের দৈনিক প্রয়োজন ৩ হাজার Calorie, এই হিসাবটা য়ুরোপীয়দিগের জন্য। বাঙ্গালীর দেহের ওজন অনুপাতে কম। ইহার উপর যদি Chittendem ও Mecay কথা আংশিকভাবেও সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর দৈনিক প্রয়োজন ২ হাজার হইতে ২ অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং কেহ যদি চাল হইতেই তাহার দৈনিক প্রয়োজনের ৬০ গ্রাম প্রোটিন আহরণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে প্রত্যহ ১ হাজার Calorieরও বেশী উত্তাপশক্তি অপচয় করিবে, অর্থাৎ অর্থ নষ্ট করিবে। সে যদি শারীরিক পরিশ্রম খুব বেশী করে, তাহা হইলে তাহার এই অপচয়ের মাত্রা খুবই কম হইবে, কিন্তু বাঙ্গালী সচরাচর তেমন পরিশ্রম করে না। সুতরাং তাহার অপচয় ত হয়ই, তাহা ছাড়া সে এই প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্বেতসার আহারের ফলে হয় অম্ল, অজীর্ণরোগে (Amylaceous Dyspepsia) ভুগিবে, নয় যৌবনে মেদবৃদ্ধি করিয়া (Mecayর মতে) প্রৌঢ়াবস্থায় বহুমূত্র রোগে ভুগিবে। শুধু চালের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য নয়, আটার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, যদিও তাহাতে চালের অপেক্ষা বেশী প্রোটিন থাকায় উত্তাপশক্তির অপচয় অথবা অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ অত বেশী হয় না। তাই অনতিপরিশ্রমী জাতির আহার্য্যে মাছ-মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন প্রচুর আহার্য্য অনুপাতে অধিক থাকা চাই। এই সব আলোচনা করিয়াই Howell বলেন যে, "নিরামিষাশী শ্রম-বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তাহার প্রয়োজনমত প্রোটিন পাইতে হইলে এত বেশী শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করিতে হইবে যে, তাহাতে অন্তর্নিহিত উত্তাপ-শক্তি তাহার শরীরের প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী থাকিবে। Cohnheim এই কথাই বলেন যে, যাহারা অপেক্ষাকৃত অলস জীবন যাপন করে, তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্য জান্তব আহারই বিশেষভাবে উপযোগী। (Physiology, Howell, 4th edition, page 923). ঐ পুস্তকের অন্য এক যায়গায় (৮৮০ পৃঃ) তিনি আরও বলিয়াছেন, "আহার্য্যের যে জিনিসটা খুব কমবেশী হয়, তাহা অপ্রোটিন, বিশেষতঃ শ্বেতসারময় জিনিষ। জীবিকার্জ্জনের জন্যই হউক বা খেলা-ধূলার জন্যই হউক, যাহারা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহারা প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য দৈনন্দিন প্রোটিনের মাত্রা ঠিক রাখিয়া, শ্বেতসারময় আহার্য্যেরই পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। আর যাহারা খুব কম পরিশ্রম করে, তাহারা শ্বেত-সার আর বসার মাত্রা কমাইয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের আহার্য্যের প্রোটিন অনুপাতে বাড়ে, যদিও প্রকৃত পরিমাণে বাড়ে না।

এ কথাটা অবশ্য সদাসর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপযুক্ত মাত্রায় প্রোটিন খাওয়া—মানে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রোটিন খাওয়া নয়। তাহা হইলে কিন্তু গরম কড়া হইতে জ্বলন্ত চুলাতে ঝাঁপাইয়া পড়ার মতই ভুল করা হইবে। অতিরিক্ত শ্বেতসার খাইয়া বাঙ্গালী যেমন দেশটাকে মধুমেহ তত্ত্বের গবেষণাগারে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে, পাশ্চাত্য জাতিও ঠিক তেমনই উল্টা ভুলটি করিয়া সারাজীবনভোর ঔষধ-সেবন ও লিনিমেণ্ট লাগাইয়া Gout (গ্রন্থিবাত-বিশেষ) হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

এখন গোড়ার কথা ধরা যাউক। যদিও এই সব জিনিষে ডালের অপেক্ষা কম প্রোটিন থাকে, তবুও ডালের তুলনায় ইহারা সহজপাচ্য

মাংসই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় নানাবিধ পাচক সংযোগে (digestive juices)। এই রসের সংস্পর্শে আসিলে খাদ্যদ্রব্য শাক-শব্জীই হউক, অথবা চাল ডালই হউক, কিংবা মাছ-মাংসই হউক, ক্রমে ক্রমে গলিয়া গিয়া রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইবার উপযোগী হয়। যে জিনিষের অভ্যন্তরে পাচক-রস যত ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে, সেই জিনিষই তত ভালরূপে হজম হইবে। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের শ্বেতসার কণার Cellulose এর আবরণ থাকে বলিয়া সে গুলি শীঘ্র হজম হয় না। বেশী চর্ব্বিযুক্ত মাছ অথবা মাংসও দুষ্পাচ্য, কেন না, চর্ব্বি ও মাছ মাংসের উপর একটা দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে। বেশী চর্ব্বিযুক্ত খাসির মাংস এই হিসাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট আহার্য্য।

মাছ-মাংস ভাজার অপেক্ষা ঝোলই ভাল। সিদ্ধ করিবার সময় অভ্যন্তরে বাষ্প প্রবেশ করিয়া জিনিষটাকে বেশ নরম করিয়া দেয়। তাহাতে পাচক-রস বেশ সহজেই প্রবেশ করে—শীঘ্র জিনিষটাকে গলাইয়া দেয়।

ডিম খুব উৎকৃষ্ট জিনিষ। ইহার বাহিরে একটা কঠিন আবরণ থাকে বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হয় না, কিংবা জীবাণুর প্রভাবে (bacterial action) বিষাক্ত হইতে পায় না। বেশী সিদ্ধ করিয়া শক্ত করিয়া না ফেলিলে ইহার মত সহজপাচ্য আহার্য্য জগতে বিরল। ডিমের আর একটা বড় সুবিধা এই যে, ইহাতে ভেজাল চালাইবার উপায় নাই। ইহাতে ভিটামিনও খুব বেশী থাকে। বসা ইহার একটা প্রধান অঙ্গ। শ্বেতসার নাই বলিলেই চলে। প্রোটিন যথেষ্ট থাকে।

দুগ্ধও উৎকৃষ্ট জিনিষ। ইহাতে প্রোটিন, শ্বেতসার ও বসা তিন রকম মৌলিক পদার্থই আছে। তবে জল ইহাতে এত বেশী আছে যে, বর্দ্ধনশীল শিশুর ইহা একমাত্র আহার্য্য হইলেও কর্ম্মশীল মানুষের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক নহে; কেন না প্রতিদানে পরিমাণে তাহাকে এত বেশী পান করিতে হইবে যে, সে জন্য তাহাকে দারুণ অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হইবে। তবে দুগ্ধ বেশ পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য। ইহাতে ভিটামিনও আছে। সেই জন্য বেশীক্ষণ জ্বাল দেওয়া উচিত নহে; একবার ফুটিয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলা উচিত। দুগ্ধে লৌহ কম থাকে বলিয়া যে শিশু খুব বেশী দিন কেবল ইহার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার রক্ত-স্বল্পতা (anaemia) হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তরিতরকারীর সম্বন্ধে বলিবার বেশী কিছু নাই। এ সব জিনিষ পোটাশ লবণ (Potassium Salts) এই শ্রেণীর জিনিষে খুব বেশী থাকে, কিন্তু খাদ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য তেমন কিছু নয়। তবে কাঁচাকলায় শ্বেতসার থাকে শতকরা ২২ ভাগ (প্রোটিন মাত্র শতকরা ১ ভাগ)। আলুতে শ্বেতসার থাকে শতকরা ২১ ভাগ এবং প্রোটিন থাকে শতকরা ২ ভাগ। কাঁচাকলায় Tannic acid থাকে বলিয়া উদরাময়ের পক্ষে উপকারী। ঝিঙে, পটল, ঢেঁড়স, উচ্ছে, করলা, চাল-কুমড়া, লাউ, শশা, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, ডুমুর প্রভৃতিতে শ্বেতসার থাকে শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগ। জল থাকে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী। প্রোটিন থাকে নামমাত্র। পাকা বিলাতী কুমড়াতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনি থাকে। পাকা ফলেও নানা রকম চিনি প্রধানতঃ Glucose থাকে। সেই জন্য বহুমূত্ররোগীর পক্ষে এইগুলি নিষিদ্ধ। তবে কমলালেবুতে Laevulose নামক চিনি থাকে বলিয়া ইহা নিষিদ্ধ নহে। সকল রকম শাকেই প্রোটিন আর শ্বেতসার এতই কম থাকে যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে শাক-শব্জী এবং ফলমূলে Magnesium Salts বেশী থাকে বলিয়া ইহারা কোষ্ঠবদ্ধতার পক্ষে উপকারী এবং Phosphates এর ভাগ বেশী থাকায় অস্থিবর্দ্ধনের সহায়তা করে।

তৈল, ঘৃত এবং মাখন সম্বন্ধে প্রথমেই যা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। মাখনে ভিটামিন থাকে। উদ্ভিজ্জ তৈলে থাকে না। Cod Liver Oil এও ভিটামিন যথেষ্ট থাকে (Fat Soluble A)।

গুড়, চিনি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খুব কমই খাওয়া উচিত। অম্লরোগীর এ সব না খাওয়াই উচিত। একেই ত বাঙ্গালী অতিরিক্ত মাত্রায় শ্বেতসারযুক্ত দ্রব্য খাইয়া থাকে, তাহার উপর আবার গুড়, চিনি বেশী খাইলে অজীর্ণ, মধুমেহ, কৃমি প্রভৃতি রোগের প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত হইবে। মুড়ির বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। উহা পল্লীগ্রামের বিস্কুট।

বাঙ্গালী সচরাচর যে সকল জিনিষ খাইয়া থাকে, তাহার মোটামুটি রকম আলোচনার পর স্থির করিতে হইবে, সে দৈনিক কত পরিমাণে কয়বার এবং কোন্ কোন্ সময়ে খাইবে। পৃথিবীতে দুই জন মানুষ যখন কদাচিৎ এক রকমের হয়, তখন দুই জন মানুষের আহার্য্য ঠিক একই রকম অথচ সমান উপযোগী হইতে পারে না। তবু সাধারণ ভাবে দুই চারি কথা বলা যাইতে পারে। দৈনিক পরিমাণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী অর্থাৎ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম বেশী করে না, তাহাদের পক্ষে দৈনিক ২ হাজার ২ শত Calorie সম্পন্ন আহার্য্য হইলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রোটিন, শ্বেতসার এবং বসার অনুপাতের সামঞ্জস্য রাখিয়া নীচে একটা তালিকা দেওয়া গেল;—

গ্রাম (grammes)

			প্রোটিন	শ্বেতসার	বসা	[illegible]
চাল	সাড়ে তিন ছটাক	২০০ গ্রাম	১৪	১৫৫	[illegible]	
আটা	পোনে পাঁচ ছটাক	২৭০ "	৩৫	১৮০	৫	
ডাল	তিন ছটাক	১৭৫ "	৪২	৮৭	[illegible]	
মাছ	আধপোয়া	১০০ "	১৮	.	২	
দুধ	সাড়ে চার ছটাক	২২০ "	৬	১২	৮	
আলু	সওয়া এক ছটাক	৭৫ "	২	১৪	.	
শাকশব্জী	এক পোয়া		...	৩১		
গুড় চিনি	আধ ছটাক	৩০ "	...	৩০	...	
তেল ও ঘি	আধ ছটাক	৩০ "	...	...	৩০	
			৮০	৫১৬	৫০	

এই হিসাবে সকালে ৭টার সময় জলখাবার রুটী, মধ্যাহ্নে ১১।০টার সময় ভাত, বৈকালে ৪।০টার সময় ফলমূল, কিছু মুগ ছোলা ভিজান, আর রাত্রিতে ৮।০টার সময় রুটী ধরা হইয়াছে। যাহা খাওয়া যায়, তাহার সবটুকুই শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রক্তের সঙ্গে মিশে না। শতকরা ৭৫ ভাগ প্রবেশ করিলে যথেষ্ট হইল। এই হিসাবে উল্লিখিত তালিকার ৮০ গ্রাম প্রোটিনের মধ্যে মানুষের কাজে আসিবে ৬০ গ্রাম (১ ছটাক), ৫১৬ গ্রাম শ্বেতসারের ৩৮৭ গ্রাম (... ছটাক) আর ৫০ গ্রাম বসার ৩৮ গ্রাম (পোনে ১ ছটাক)। ৬০ গ্রাম প্রোটিন হইতে উত্তাপ-শক্তি (heat-energy) পাওয়া যাইবে ২.. Calorie, ৩ শত ৮৭ গ্রাম শ্বেতসার হইতে পাওয়া যাইবে ১ হাজার ৫ শত ৮৬ Calorie, আর ৩৮ গ্রাম বসা হইতে পাওয়া যাইবে ৩ শত ৫৬ Calorie। সুতরাং ঐ তালিকামত আহার করিলে দৈনিক মোট উত্তাপ-শক্তি পাওয়া যাইবে ২ হাজার ১ শত ৮৬ Calorie। ইহাতে এক জন সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ চলিয়া যাইবে। কেবল ... পক্ষে এটা কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। সকালে মুগ ছোলা ভিজান, ১০টার সময় ভাত, ৩টার সময় জলখাবার কিছু রুটী বা পরোটা আর রাত্রিতে রুটী। নিতান্ত গরীব এবং অসমর্থ পক্ষে মাথা পিছু খাবার জন্যই দৈনিক আট আনা খরচ করা সম্ভব নহে। দুগ্ধ ও ঘৃতের আশা তাহাদের ত্যাগ করিতে হইবে। মা...

অন্ততঃ দিন ৬ পয়সা খরচ করা সম্ভব হইবে না। তাহাদের চাল, ডাল, আর সম্ভব হইলে আটা প্রয়োজনমত অর্থাৎ যে যেমন পরিশ্রম করে, সেইমত বাড়াইয়া লইতে হইবে। তাহাদের সকালে মুড়ি ও ছোলা ভিজান খাইয়া জলখাবারের কায সারিতে হইবে, মধ্যাহ্নে ডাল ভাত, সম্ভব হইলে অপরাহ্নে দুইখানা রুটী, আর রাত্রিতে ডালরুটী—এই রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সচ্ছল ও ধনী ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদেরই মাছ-মাংস অনুপাতে বেশী খাওয়া দরকার। রুচি অনুযায়ী কিছু কিছু পুষ্টিকর জিনিসও উল্লিখিত তালিকায় যোগ করিতে পারেন এবং তৎপরিবর্ত্তে চাল ও আটার পরিমাণ অনুপাতে কমাইয়া নিতে পারেন। তাঁহারা সকালে লুচি, মোহনভোগ আর ডিম খাইতে পারেন, মধ্যাহ্নে ভাত, বৈকালে মুগ ও ছোলা ভিজান, ফল, ঘরে তৈয়ারী সিঙ্গাড়া, কচুরি বা অল্পপরিমাণে মিষ্টান্ন, আর রাত্রিতে রুটী, পরোটা বা লুচি খাইতে পারেন। এ বিষয়ে ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু থাকিতে পারে না। নিজ নিজ রুচি, ক্ষুধা আর পরিপাকশক্তি অনুসারে প্রত্যেককে নিজের আহার্য্য ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। ভাতের বদলে হঠাৎ এক বেলা রুটী বিশেষতঃ আটার রুটী খাইতে আরম্ভ করিলে প্রথমে খুব সাবধানে অর্থাৎ খুব অল্প করিয়া রুটী আরম্ভ করিতে হইবে। নইলে অম্ল ও অজীর্ণ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সহ্য হইলে ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে।

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই সম্ভব হইলে চারিবার আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাত্র দুইবার পেট ভরিয়া খাওয়া উচিত নহে। তাহাতে পাকস্থলী দুর্ব্বল ও স্ফীত হইয়া পড়ে, যাহার ফলে [illegible] অজীর্ণ রোগ (Atonic Dyspepsia) জন্মগ্রহণ করে। নানাবিধ কারণে শতকরা ৭০।৭৫ জন বাঙ্গালী এই রোগে ভুগিতেছে। দুই বারের বদলে দুই বার জলখাবার খাওয়া আর দুই বার পেট কিছু খালি রাখিয়া ভাত বা রুটী খাওয়া উচিত। ইহাতে অনেকেই হয়ত [illegible] অনুকরণের গন্ধ পাইবেন। কিন্তু অনুকরণমাত্রেই খারাপ নহে। বিচারবুদ্ধি অবহেলার বস্তু নহে। ভালকে ভাল বলিতেই হইবে, সত্যকে সত্য বলিতে হইবে। সত্যকে টুঁটি টিপিয়া বাক্‌শক্তিহীন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহা যে শুধু পণ্ডশ্রমমাত্র হইবে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে অনিষ্ট ঘটিবে। চক্ষু থাকিতে চক্ষু বুজিয়া থাকা নির্ব্বোধের কাজ।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা আজ যে রকম দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আহার সম্বন্ধে আলোচনা করা বিড়ম্বনামাত্রে পর্য্যবসিত হবে কি না বলা যায় না, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আর চলিবে না। বাঙ্গালীকে আজ অজ্ঞানের অন্ধকারময় জীর্ণ মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নির্জ্জীব নগ্নমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, আর তাহার পরিবর্ত্তে জ্ঞানের [illegible] শুভ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে পুরুষকারের রুদ্রদেবতা। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষকে ডাকিয়া আনে; আর দুর্ভিক্ষ জাতিটাকে একটা অলস, কর্ম্মবিমুখ, অর্থোপার্জ্জনহীন জীবের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই যে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সব জাতিটা নিষ্পিষ্ট হইতেছে, নির্ম্মমভাবে ইহার বাঁধন ছেদন করিতে হইবে। যুক্তির [illegible], আত্মবলের [illegible] দ্বারা বাঙ্গালীকে সেই কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

শ্রীহরিসাধন [illegible]।

ভাবের মাতৃভূমি

য়ুরোপের পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির প্রধান কারণ। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের এই মত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং আমরা তাঁহাদের কথায় সায় দিয়া যাই। অহঙ্কারদৃপ্ত পাশ্চাত্যগণ য়ুরোপের সীমার বাহিরে কোন জাতির আনুগত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। এই জন্য তাঁহারা টানিয়া বুনিয়া গ্রীসকেই জগতের সভ্যতা ও ললিতকলার লীলাভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। তাঁহাদের মতে প্রাচীন গ্রীস যেরূপ সমস্ত য়ুরোপের ভাব জননী, সেইরূপ আধুনিক য়ুরোপ সমগ্র সভ্য জগতের সভ্যতা ও উৎকর্ষের আদর্শ বিধাতা। য়ুরোপের [illegible] সভ্যতার তীব্র আলোকে সকলের চক্ষু প্রথমে ঝলসাইয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি সেই সভ্যতার করাল কবলে পতিত হইয়া তাহার জাতীয়তা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

এই জন্য মানবমনের সাধারণ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া জাপানও অতিমাত্রায় য়ুরোপ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধাতার কৃপায় সে মোহ জাপানকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই, অন্ধ অনুকরণস্পৃহা বুদ্ধিমান জাপানী জাতিকে তাহার নিজস্ব-ভাব বিসর্জ্জন দিতে প্ররোচিত করিতে পারে নাই। অতএব যাহারা বাহ্যরূপে মোহিত হয়, তাহারা ব্যতীত অপর কেহ য়ুরোপকে জাপানের উদ্ধারকর্ত্তা বা মুক্তিদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবে না কিংবা জাপানকে য়ুরোপীয় সভ্যতার মন্ত্রশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না, [illegible] ও ওকাকুরা নামক জাপানের বিখ্যাত [illegible] পণ্ডিতদ্বয় জাপানের নব-জীবন লাভের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন যে, জাপানের পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা ও [illegible], এই দুইটি জাপানের নূতন জীবনোন্মেষের প্রধান কারণ। [illegible] মাতৃভূমি [illegible] দিকে [illegible] সেই অনন্ত ভাবের আধার, "কত জ্ঞানবৃদ্ধপূর্ণ কাহিনী" [illegible] ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধঃপতন, [illegible] জাপানের বাহিরে [illegible] প্রতিভার সহিত সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহাসিক যুগের কোন্ শুভমুহূর্ত্তে ভাবের মাতৃভূমি ভারত জাপানের হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কিরূপে জাপানের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে সেই জাতির মনোভাবের পরিচয় লইতে হয়, তাহার অন্তরাত্মার সন্ধান লইতে হয়, ভিতরের মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, কারণ, ভাবই জীবন, উহাই লোকের মাপকাঠি। উচ্চচিন্তা ও উচ্চ আদর্শ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের পরিমাপক। বাহিরের বস্তু লইয়া প্রকৃত জীবন নহে, প্রকৃত জীবন চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে। ভারতীয় উচ্চচিন্তার প্রাণ ত্যাগে, মানবধর্ম্মে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ আত্মবিসর্জ্জনকে উচ্চস্থান দিয়া আসিয়াছে। "অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ও অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে" এই দুই মহামন্ত্র আর্য্যসভ্যতার মূল আধার। সম্ভোগ বা সম্ভূতি প্রেয়, কিন্তু জ্ঞান বা ত্যাগ শ্রেয়ঃ। এই মন্ত্র ভারতের দর্শন, [illegible]

গৌতম বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ভারতের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল। বুদ্ধ সনাতন ত্যাগধর্ম্মকে তাঁহার নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে আত্মস্থ করিয়া লইয়া ভারতের চিরন্তন ভাবধারার সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিবার গৌরব বৌদ্ধধর্ম্মের। বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম প্রচারের ধর্ম্ম। বুদ্ধের মহাপ্রাণতাকে ক্ষুদ্র বারাণসীক্ষেত্র আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের শীর্ণ স্রোতোরেখাটি কপিলাবস্তুর শৈল-শিখরে জন্মলাভ করিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বিপুলবেগে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি প্লাবিত করিল। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বেই তাহা কাশ্মীর ও গান্ধারের পথে পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে ধাবিত হইয়া ভূমধ্যসাগরতীরে ও মধ্য এসিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানে ব্যাপ্ত হইল এবং অঙ্গ-বঙ্গের পথে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপ উপদ্বীপে ভারতীয় আদর্শ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য এসিয়ার শক, হূণ প্রভৃতি প্রবল জাতিসঙ্ঘের মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাহাদের ক্ষমতা বিস্তারের সহিত বিভিন্ন দেশে প্রবেশলাভ করিল। বুদ্ধের সমসাময়িক চীনের এক মহাপুরুষ কনফিউশিয়াস সমাজোন্নতির কামনায় চীনবাসীর মধ্যে আত্মত্যাগ মন্ত্র শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন-সম্রাট সংল নামক অধ্যাপককে অষ্টাদশ সহাধ্যায়ীর সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত মধ্য-এসিয়ায় প্রেরণ করেন। মাতঙ্গ ও ভোরান নামক দুই জন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ তাঁহাদের সহিত চীনে আগমন করেন। তাঁহারা চীন-সাম্রাজ্যের রাজধানী লইয়াঙ্গ নামক স্থানে রাজপ্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করেন। সম্রাটের আজ্ঞায় রাজ-প্রাসাদ বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইল এবং ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল। বহু বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। চীনের ভাষা, সাহিত্য ও স্থাপত্য বিশেষ উৎকৃষ্ট হইল।

ক্রমে বৌদ্ধজ্ঞান ও ধর্ম্ম চীন হইতে কোরিয়া এবং কোরিয়া হইতে জাপান দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইল। জাপান যখন দুই বিরুদ্ধ দলের প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন কোরিয়া হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি জাপানে প্রেরিত হয়। সোগাবংশীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক স্থাপিত শাক্যসিংহের মূর্ত্তি দুর্ভিক্ষের কারণ মনে করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণ বলপূর্ব্বক তাহা হ্রদের জলে নিক্ষেপ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজকুমার উম-যাদো জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। বসুবন্ধু রচিত "অভিধর্ম্ম কোষশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বসুবন্ধুর জন্মস্থান গান্ধারদেশে। বসুবন্ধুর শিষ্য মিত্রসেনের নিকট হুয়া-চোয়াং শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি চীনদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য বহু ছাত্র জাপান হইতে চীনে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দোশো নামক শ্রমণ হুয়া-চোয়াং-এর নিকট শিক্ষা শেষ করিয়া ৬৬১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ধর্ম্মসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে আনীত হইলেও বসুবন্ধুর শিষ্য জাপানের ধর্ম্মসংস্কারে প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছিল। এই জন্যই টাকাকাসু ও ওকাকুরা বলিয়াছেন যে, যুগযুগান্তরের ব্যবধান সত্ত্বেও জাপান ভাবের মাতৃভূমির প্রতি ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার মিতোর উদ্যোগে জাপানের ইতিহাস সঙ্কলনের প্রথম চেষ্টা হয়। জাপানের লুপ্ত ইতিহাস সংগৃহীত হইলে জাপান দেখিতে পাইল যে, তাহার ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত। জাপানের মনীষিগণ ভারত-সম্বন্ধবর্জ্জিত জাপানের সহিত বৌদ্ধজ্ঞান-পরিচালিত জাপানের তুলনা করিয়া বুঝিলেন যে, জাপানের জাতীয় জীবন গঠনে ভারতীয় প্রভাব কম হয় নাই। তাঁহারা বুঝিলেন যে, ভারত জ্ঞানের সুধাপাত্র হস্তে লইয়া জাপানের দ্বারে আতিথ্য স্বীকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া পূর্ব্ব-সাগরমধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে দণ্ডায়মান হয় নাই, বস্ত্রান্তরালে বিষের ছুরি লুক্কায়িত রাখিয়া সাধুতার কপটবেশে আবির্ভূত হয় নাই। ভারত চাহিয়াছিল, মৈত্রী ও করুণার অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে, জীবপ্রেম ও মানবতার উচ্চ উদার আদর্শ প্রচার করিতে, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ বিপন্ন জনসমাজে মহা-মিলনের মোহন-সঙ্গীত শ্রবণ করাইতে। জাপানবাসী বুঝিল যে, যীশুখৃষ্টের সন্ন্যাসধর্ম্ম অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যীশু বলিয়াছিলেন,—Sell everything and follow me, সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেল এবং আমার অনুসরণ কর, কিন্তু য়ুরোপ খণ্ডের জলবায়ুর গুণে এই ত্যাগপ্রধান খৃষ্টধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া জগতে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। বিক্রয় করা ত দূরের কথা, য়ুরোপবাসী উচিত মূল্যে ক্রয় করিতেও রাজী নহে, বরং শারীরিক শক্তির সাহায্যে দুর্ব্বলজাতির উপর উৎপীড়ন করিয়া, চোখ রাঙাইয়া গোলাগুলীর অপব্যবহারে তাহাকে ধ্বংস করিয়া, তাহাদের দেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, এমন কি, স্বর্গধামে স্থান দখল করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারকগণ যীশুর ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া এক উদ্ভট মত প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা ঈশ্বর ও সয়তানকে একাসনে পূজা করিতে চাহিয়াছেন, আলোক ও অন্ধকার সদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের দুইটি সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পাপ ও ভোগের সমাবেশে এক অদ্ভুত ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। জাপানে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ সুযোগ বুঝিয়া রাজশক্তি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল, মেক্সিকো ও পেরুতে ধর্ম্মের দোহাইয়ে রক্তনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, শাণিত কৃপাণের সাহায্যে আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওসে-নিয়ার অর্দ্ধসভ্য আদিম অধিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধন ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যবলে জাপান ঐ পুরোহিতদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিল, তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া প্রায় ২ শত বৎসর তাহার দ্বার রুদ্ধ রাখিয়াছিল।

পরমতসহনশীলতা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাপানী চরিত্রের প্রধান গুণ। ইহা চীন ও ভারতের ধর্ম্মজীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই বিষয়ে ভারত, চীন ও জাপান সমধর্ম্মাবলম্বী। জাপানের স্বদেশী ধর্ম্ম শিন্টো নামে পরিচিত, কিন্তু ইহা যে য়্যামেটো জাতির নিজস্ব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। শিন্টো ধর্ম্মের বিশেষত্ব পিতৃপুরুষ পূজা, কিন্তু পিতৃপুরুষ পূজা চীন ও ভারতের ধর্ম্মে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রকৃতিপূজা শিন্টো ধর্ম্মের অন্তর্গত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদের অমল দিবালোকপ্রভৃতি উদাত্ত সঙ্গীতে প্রকৃতির উজ্জ্বল ও সুন্দর বস্তুর উপাসনা করিতেন। চীনে তাও-ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। উপরন্তু আত্মার শ্রীচরণে তাহার পূজা প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপাসনায় ভারত, চীন ও জাপান সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁহার "হিন্দুর চক্ষে চীনাধর্ম্ম" নামক পুস্তকে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে, চীনে তাও, বৌদ্ধ, ও কনফিউশিয়াস ধর্ম্মমত, জাপানে শিন্টো, বৌদ্ধ, কনফিউশিয়াস ও খৃষ্টধর্ম্মমত ও ভারতে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মমতের সমন্বয় হইয়াছে। চীন ও জাপানে একই ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করেন ও প্রত্যেক ধর্ম্মের সার সত্যটুকু গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবনযাত্রাপথ নিয়মিত করেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতে হিন্দুধর্ম্ম কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম পরাজিত হইয়া তাহার জন্মস্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাজিত করে নাই, কৌশলে তাহাকে আত্মস্থ করিয়াছে, নিজের উদার ও বিশাল অঙ্কে তাহাকে স্থান দিয়া আপনার

সম্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ বর্ত্তমান জাপান ও চীনের দেবদেবীগণও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সম্পর্কিত। অতএব বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈবগণ চীন ও জাপানের অধিবাসিগণের সহিত এক ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত। চীন ও জাপানের বৌদ্ধ দেবদেবীগণ এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবদেবীগণ একপরিবারভুক্ত। চীন ও জাপানের বোধিসত্ত্ব ভারতীয় মহাযান সম্প্রদায়ের উক্ত বোধিসত্ত্বের অন্যতম ক্ষিতি-গর্ভ নামে বিখ্যাত। ভারতের আদি বুদ্ধ চীন ও জাপানে ভিন্ন নামে পূজা পাইয়া থাকেন। সঙ্গীত কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী চীন ও জাপানে বহু ভক্ত-সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন। কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও হিমালয়ের পরপারের তারা-মূর্ত্তির প্রতিরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। ওকাকুরা বলিয়াছেন, ভারতীয় শিব জাপানের সমাধির দেবতা ফিউডো নাম গ্রহণ করিয়াছেন; কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ যথাক্রমে করিটেমো, বেনটন, কিচিজোটেন, টেগেম-তুং, শোডেন নামে পরিচিত। ওকাকুরা বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে জোডো সম্প্রদায়ের দুই তৃতীয়াংশ ভারতের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের। বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম অদৃশ্যভাবে স্থানলাভ করিয়া এখনও পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। বাঙ্গালার ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ ত্রিরত্ন বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের অন্যতম। বাঙ্গালা-সাহিত্যেও বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালার শঙ্কর-ঢক্কাকারিণী মা ও বুদ্ধদেবী শীতলা এবং অপরাপর বহু দেবদেবী বৌদ্ধ দেবদেবীর হিন্দু সংস্করণ।

জাপানে ভারতীয় জ্ঞান-প্রচারে বাঙ্গালী কত দূর অগ্রণী, তাহা আজিও সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইলেও একটি বিষয় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সুপণ্ডিত টাকাকাসু ও ওকাকুরা তাঁহাদের "আদর্শ" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,— "Down to the days of Mahomedan conquest went, by the ancient high ways of the sea, the interpid mariners of the Bengal coast, founding theircolonies in Ceylon, Java and Sumatra, leaving Aryan blood to mingle with that of the sea-board races of Burma and Siam and binding Cathay and India fast in mutual intercourse."

অর্থাৎ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলের সাধকগণ সিংহল, জাভা ও সুমাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের জাতির সহিত আপনাদের সংমিশ্রণে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং ক্যাথে ও ভারতের মধ্যে আদান-প্রদানের দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বাণিজ্যব্যাপারে, নৌ-বিজ্ঞানে ও অর্ণবপোত গঠনের কৌশলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের অধিবাসিগণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্গের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলে, সিংহল হইতে জাভা ও সুমাত্রায়, তথা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-দ্বীপান্তরে এবং অবশেষে চীন ও জাপানে যে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতা জলপথে বাহিত হইয়াছিল, তাহার কারণ বাঙ্গালী বণিকের উপনিবেশ স্থাপন-লিপ্সা, সমুদ্র-পর্য্যটনে চিরনিন্দিত "ভীরু" বাঙ্গালীর কৃতোদ্যম। কীটদষ্ট পুঁথি, তাম্রফলক, ভগ্ন মন্দির, মৃত্তিকা প্রোথিত স্তম্ভ প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরব-গাথা দুরন্ত কালের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখনও বাঙ্গালার প্রধান বন্দর প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরের অতীত গুণ-গরিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃদ্ধ রূপনারায়ণ কল কল নাদে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছেন, তাঁহার জঙ্গপ্রবণ তটে বর্গভীমা মন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়া বৌদ্ধপ্রাধান্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে, কৌশল জ্ঞাপন করিতেছে। এই জন্য এসিয়াখণ্ডের নবোদিত ভাস্কর জাপানের বুদ্ধিমান্ সন্তানগণ ভারতীয় ধর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রচারক বাঙ্গালী-জাতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

মঙ্গোলীয় জাতিসঙ্ঘের মনোভাব ও ধর্ম্মধারণা ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ভাব-জননী ভারতমাতা প্রাচ্যখণ্ডে অশীতি কোটি মানবসন্তানের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া এক মহামিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পীতবাসধারী জ্ঞান-গরিষ্ঠ সর্ব্বস্বত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ হিমালয়ের তুষারাবৃত শৈলশ্রেণী ভেদ করিয়া, দিগন্ত-প্রসারী ফেনিল সাগরাম্বু মথিত করিয়া বিশাল প্রাচ্যখণ্ডের মহামানব-সমাজে যে ভাব-বিনিময় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, ত্যাগের, কল্যাণের, জ্ঞানের যে বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনার উচ্ছ্বাস নহে। তাঁহারা যে অসীম প্রেম ও অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, ভারতের সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্যের যে জ্বলন্ত আদর্শ এসিয়াখণ্ডের সুপ্তোত্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে ধরিয়াছিলেন, বাসনাশূন্য, প্রীতিময়, ভক্তিময় ও প্রশান্ত চিত্তের যে পূত ভাবমন্দাকিনী-ধারা চীন ও জাপানের নব-জীবনক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য এখনও বিঘোষিত হইতেছে এবং কালক্রমে তাহা ভারত, চীন ও জাপানের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপন করিয়া অমানিশার অন্ধকার দূর করিয়া দিবে। সে দিন মহাকবির ভাষায়,—

> দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
> জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ।
> পোহায় রজনী, জাগিছে জননী,
> বিপুল নীড়ে।
> এই ভারতের মহামানবের
> সাগরতীরে।

প্রেম, ত্যাগ, সাধনা ও সৌন্দর্য্যানুভূতির নিবিড় গভীর আনন্দ যখন জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, উচ্চ আদর্শের মহিমময় তাহা যখন গরিমামণ্ডিত হয়, তখন তাহা ভৌগোলিক গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া নদ, নদী ও পর্ব্বতের বাধা লঙ্ঘন করিয়া আত্মবিকাশ করে, তখন আর ইহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয় না, তখন ইহা মানবজাতিসঙ্ঘের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং পরিপূর্ণ বিশ্বসভ্যতার মহামিলনের সহিত সমস্বরে গ্রথিত হইয়া যায়।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল।

ইন্দ্রাণী

২

কণ্টকনগর—কাটোয়া

আমি পূর্ব্ব নিবন্ধে বলিয়াছি যে, যে সময়ে কবিবর কাশীরাম দাস মহাশয় মহাভারত রচনা করেন, সে সময়ে কাটোয়ার নাম আদৌ ইতিহাস-বিশ্রুত হয় নাই। কাশীরাম দাস তাঁহার স্বরচিত মহাভারতের স্থানে স্থানে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

> "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
> ... প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।" ইত্যাদি

উহা হইতেও প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে সময়ে ইন্দ্রাণী-ক্ষেত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঘাটগুলি একরূপ তীর্থক্ষেত্রেই পরিণত হইয়াছিল। আমরা উক্ত ছন্দ হইতে আরও অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, শুদ্ধ "বার ঘাট তের হাট"—বাগী স্থানটুকুই ইন্দ্রাণী নামে পরিচিত ছিল না। সমগ্র ইন্দ্রাণী পরগণা ত বটেই, তা ছাড়া আরও অনেক গ্রাম "ইন্দ্রাণী"ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল।

পত্রিকার ভূতপূর্ব মৃত সম্পাদক জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের উদ্যমে কাশীরামের আবাসস্থান নির্ণয় করিবার জন্য কাটোয়া মহকুমার অধীন উক্ত "সুধাসিন্ধু" আধুনিক সিঙ্গীগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত গ্রামকেই কবিবর কাশীরাম দাসের জন্মভূমি বলিয়া স্থির করেন এবং উক্ত গ্রাম ও শ্রীবাটী প্রভৃতি এতদঞ্চলের অনেক স্থান আজিও ইন্দ্রাণী পরগণার অধীন। শুধু ইঁহাদের কথা বলিয়া নহে— কাশীরামের "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ" ইত্যাদির সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে ইন্দ্রাণীক্ষেত্র যে বহুদূরব্যাপী এবং বিশাল ক্ষেত্র ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তৎসঙ্গে ইহাও অনুমিত হয় যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তৎকালে প্রবলপ্রতাপ শৈব নরপতি ছিলেন। বর্তমান কালনা-কাটোয়া রাজপথের দক্ষিণ দিকের স্থানে স্থানে বাঁশবন ও নানা আগাছায় জঙ্গলপূর্ণ যে সুউচ্চ ভূমি নয়নগোচর হইয়া থাকে, তাহারই কোন না কোন এক স্থানে যে নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজভবন অবস্থিত ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? নিকটে বাঁশ-বনের মধ্যে আজিও এক ভগ্নমন্দির দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং বীর-হাট অর্থাৎ বেড়াগ্রামের প্রবেশপথে নারিকেলের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ বহু দিন হইতে প্রোথিত রহি-য়াছে। এতদঞ্চলের অনভিজ্ঞ লোক ইহাকে "হনুমানের লাঠি" বলিয়া নমস্কার করিয়া থাকে। উক্ত স্তম্ভটি যে ইন্দ্রেশ্বরীর মন্দিরের প্রস্তর স্তম্ভ—অভিজ্ঞগণ তাহা বলিয়া থাকেন। ইন্দ্রেশ্বরীর মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত প্রস্তর-স্তম্ভ এবং আরও কতকটা দূরে কয়েক ঘর মুসলমান-বসতির নিকট এক বৃহৎ তেঁতুল গাছের তলায় অনেকগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগীরথী এক্ষণে উক্ত স্থান হইতে অনেকটা উত্তরে সরিয়া গিয়াছেন। চেষ্টা করিলে পতিত স্থানের মধ্যে অনেক চিহ্ন মিলিতে পারে, কিন্তু বিনা সংবাদে নিমজ্জিত, মামলা মোকদ্দমায় বিব্রত হত-ভাগ্য দেশের লোক কি এই পাপে লিপ্ত হইতে পারে? নতুবা এই সমস্ত প্রবল প্রমাণ বিদ্যমান সত্ত্বেও কি ভবনের অবস্থানস্থান নির্ণয় হয় না? যাহা হউক, অন্ততঃ কিন্তু এই সমস্ত চিহ্ন দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রেশ্বরীর মন্দিরের নিকটেই রাজ-ভবন অবস্থিত ছিল এবং উক্ত কুণ্ডের সম্মুখ রাজভবনেরই অন্তর্গত ছিল। কবিগণ কাব্যের সাক্ষী। সেই কালের মধ্যে কবিবর যথার্থ বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।"

এইরূপে কালচক্রের অনবরত ঘূর্ণনে ইন্দ্রাণী [illegible] হইলে মুসলমান নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমল হইতে ইন্দ্রাণীর পুণ্যক্ষেত্র কণ্টকনগরের মুসলমানী আমলে মহাকুমা পরিণত হইয়াছে। ইন্দ্রাণীর ধ্বংসস্তূপ হইতে সেই ইন্দ্রাণীর বক্ষে কণ্টকনগর তথা কাটোয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ইন্দ্রাণীর পুরাতন স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক আর এক ঐতিহাসিক গুণ স্থান সৌভাগ্যে পরিণত হইয়াছে।

কাটোয়া বহু দিনের প্রাচীন স্থান। 'রেনেলের' মানচিত্রে ইহা কাটওয়া নামে অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাচীন কাটোয়ার অনেক ভূমি অজয় ও ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কাটোয়া-পাড়া নামে যে স্থানে মুসলমান পল্লী অবস্থিত, প্রাচীন কাটোয়া সেই স্থানে বিদ্যমান ছিল। ক্রমশঃ লোকসংখ্যার বৃদ্ধিসহ ইহা একটি প্রসিদ্ধ সহরে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে কাটোয়া ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—কাটোয়ার স্বল্প-পরিসর রাজপথ, ক্ষুদ্র গবাক্ষ-বিশিষ্ট অত্যুচ্চ প্রাসাদ, মন্দিরের রচনা-ভঙ্গিমা প্রভৃতি দেখিলে বেশ সহজেই বুঝা যায় যে, ইহা মুসলমান রাজত্বকালে নির্মিত সহর। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যৎকালে মুরশিদাবাদে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, সেই সময়ে কাটোয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজধানী নবাবগণ কাটোয়ায় এক মৃদ্দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেনা-রক্ষা করিয়াছিলেন এবং দেশীয় কর্ম্মকারের দ্বারা নির্ম্মিত কয়েকটি অগ্নিগোলকবর্ষী কামানও উক্ত দুর্গে স্থান পাইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে 'বাগানেপাড়া' নামক স্থানে এবং কাটোয়ার জমীদার মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর সংলগ্ন যে মসজেদটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বহুকালের নির্ম্মিত। উক্ত মসজেদের দ্বারদেশে সংলগ্ন প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত বয়েদটি আরবী ভাষায় লিখিত আছে।

ইব্‌ন মসজিদা কি ইব্‌ল যা কামিল
আজম কি সুলতানিল আকবর মিল
আমজাদে মহম্মদ ফররোখ শেয়র
পাদশাহ গাজি খল্লাদাল্লাহো আল্লা
মলুক হো আসলতানা তাহো মিলেল্
মহরমে সৈয়দ সাহ আলম খাঁ বাহাদুর
আলফা মেয়া তা সব— আ -ঈশ---বিন্
১০০০ + ২০০ + ৭ × ৭ + ১১২ = ২০ হিজরি।

১১২৭ হিজরী সালে আরবের সম্রাট্ মহম্মদ ফররোখ শেয়রের রাজত্বসময়ে সৈয়দ শাহ আলম খাঁ কর্তৃক এই মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১১২৪ হিজরী সালে সম্রাট্ ফররোখ শেয়র খাজা [illegible] জাহান্দারশাহকে পরাভূত করিয়া দিল্লীর রাজসিংহাসন লাভ করেন। আমাদের উল্লিখিত সৈয়দশাহ আলম খাঁ পরাজিত জাহান্দারশাহের উজীর ছিলেন। জাহান্দারের সেনানায়ক জাহান্দারের [illegible] ভূলুণ্ঠিত হইল, নবীন সম্রাট্ ফররোখ শেয়রের [illegible] [illegible] হত্যার পুরস্কারে নবাব [illegible] খাঁ [illegible] সম্রাটের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে, জাহান্দারের প্রিয় উজীর সৈয়দ শাহ আলম খাঁ আর দিল্লীতে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া [illegible] জন বিশ্বস্ত অনুচর সহ পলাইয়া আসিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ [illegible] সদলবলে কাটোয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। [illegible] সমূহের মধ্যে তিনি কাটোয়াকেই [illegible] বাসের উপযুক্ত [illegible] জনমানবশূন্য কণ্টকগুল্ম [illegible] [illegible] স্থানকে পরিষ্কার [illegible] লইয়া উক্ত মসজেদটি নির্ম্মাণ করেন।

সৈয়দ শাহ আলম খাঁ যখন কাটোয়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উপবিষ্ট ছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া শাহ আলমের সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। মুর্শিদকুলী কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া উক্ত সংবাদ [illegible] গোচর করেন, তাহা অপ্রকাশ থাকিলেও, সম্রাট্ কিন্তু [illegible] সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহার মসজেদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ [illegible] ১৭ হাজার টাকা আয়ের এক লাখরাজ ভূসম্পত্তি প্রদান [illegible] উক্ত সম্পত্তি [illegible]টি মৌজায় বিভক্ত ছিল। সৈয়দ শাহ আলম [illegible] সম্পত্তির মালিক হইয়া মসজেদ হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন, নির্ম্মিত বাঁধা ঘাট এবং মসজেদের তিন দিকে [illegible] খনন করিয়াছিলেন। কাটোয়ার বাসোবারীতলা হইতে [illegible] ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গেলে উক্ত পরিখার [illegible] আজিও নয়ন[গোচর] হইয়া থাকে। পরিখার একাংশের উপর বাঁধ দিয়া মিউনিসি[প্যালিটি] পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং উত্তর দিকের অনেকাংশ করিয়া এক্ষণে বাড়ী-ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। মসজেদটি এখনও [illegible] অবস্থায় আছে বটে, কিন্তু সম্রাট্‌প্রদত্ত সে ভূসম্পত্তি এবং অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছে।

সৈয়দ শাহ আলম খাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তদীয় [illegible]

মালিক হইয়াছিলেন। বহরম খাঁর আমল হইতেই সম্রাট্‌ দত্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব ও মসজেদের মুতাওল্লি-পদ বংশানুক্রমে প্রাপ্তির কারণ হইয়া উঠে। সৈয়দ শাহ আলম খাঁ অনৈক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় পরম-ধার্ম্মিক মুসলমান ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-স্পর্শকে তিনি পাপাচার বলিয়া মনে করিতেন। কথা সত্য হইলে বহরম খাঁকে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র বলা যায় না—পালকপুত্র হওয়াই সম্ভবপর।

যাহা হউক, সৈয়দ শাহ আলম খাঁর কাটোয়া মোকামের বংশাবলী প্রদান সুসঙ্গত বিবেচনায় আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম।

সৈয়দ শাহ আলম খাঁ
|
বহরম খাঁ
|
লালন খাঁ
|
মুচি মিঞা — হারি মিঞা

মুচি মিঞা
|
এতিন মিঞা

হারি মিঞা
|
সফিওর রহমান
(নিঃসন্তান)

এতিন মিঞার এক কন্যা, তাঁহার নাম আমাদের অজ্ঞাত। বর্ত্তমানে তাঁহার স্বামী উক্ত মসজেদের মুতাওল্লি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম সৈয়দ শাহ হাফিজ মহম্মদ আবদুল সত্তার। ইনি অত্যন্ত ভদ্রলোক, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে এই বংশের ভূ সম্পত্তি নাই বলিলেই হয়।

সৈয়দ শাহ আলম যৎকালে অনুচর-পরিবৃত হইয়া দিল্লী নগরী পরিত্যাগ করেন, তৎকালে আ৹ মণ ওজনের এক লৌহ-বর্ম্ম তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ সেই সুন্দর ঐতিহাসিক বর্ম্মটির মূল্য না বুঝিয়া স্থানীয় কর্ম্মকারকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কর্ম্মকার তাহা লইয়া আর কি করিবে—সে তাহার অগ্নিকুণ্ড সদৃশ চুল্লীতে ফেলিয়া দা, কুড়ার, কোদাল নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এক দিন যে বর্ম্ম বীরপুরুষের বক্ষোভূষণ ছিল, কালে তাহাই কুড়ার-কোদালিতে পরিণত হইয়া কৃষকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। আমরা ইতিহাসের মর্য্যাদা-রক্ষায় একান্তই উদাসীন। এই ভূমির কত নিভৃত পল্লীতে যে কত রকমের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কোন্ দেশীয় ঐতিহাসিক তাহার কতটুকু সন্ধান করিতে পারিয়াছেন? ক্ষুদ্র পল্লীর কথা দূরে থাকুক, যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান আজিও প্রাচীন কাহিনীর সহস্র জনরব আপনার ভগ্নপঞ্জরে লুক্কায়িত রাখিয়া দিবস-রজনী হা-হুতাশ করিতেছে, তাহার সন্ধানই বা আমরা কোথায় রাখিতে পারিয়াছি? এই ইন্দ্রাণীর—তথা কাটোয়ার বুকের উপর ঐতিহাসিক যুগেও যে সকল জাতীয় ঘটনা-পরম্পরা সংঘটিত হইয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার স্থানই বা কতটুকু? ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান-ফলে ভারতবর্ষের অনেক বিলুপ্ত কাহিনীর উদ্ধারসাধন হইয়াছে, জাতির পক্ষে তাহা যৎসামান্য বলিয়াই মনে হয়। ভারতের প্রাচীনত্বের আবরণ উন্মোচনে ভারতবাসী কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছে, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময় আসিয়াছে। ভারতীয় ঐতিহাসিক আজিও চর্ব্বিত-চর্ব্বণের হস্ত হইতে নিস্তারলাভ করিতে পারেন নাই, প্রকৃত সত্য। যতক্ষণ না বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনভাবে "ধনভাণ্ডার" স্থাপন পূর্ব্বক ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন, ততক্ষণ প্রকৃত ইতিহাস পাইবার আশা, দুরাশা। আমরা যদি যথার্থই ইতিহাসরসের আস্বাদনে আনন্দলাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরব বিলুপ্ত হইলেও, তাহার স্মৃতি ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিত। প্রাচীন পুরাণাদি গ্রন্থ এবং রামায়ণ, মহাভারত কথঞ্চিৎ মান রক্ষা করিলেও, পাশ্চাত্য ইতিহাসের তুলনায় ইহাকে নগণ্য বলিয়াই মনে হয়। আমাদের বর্ণিত 'ইন্দ্রাণীর' ভগ্ন বক্ষের উপর দাঁইহাট প্রান্তে গঙ্গাগর্ভের উপর যে প্রাচীন সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত শিবমন্দির এক্ষণেও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কাপ্তেন ল্যাঙ্গ তাহা হইতে প্রস্তর ফলক উন্মোচন করিয়া লইয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষা করিয়াছেন। সেই ফলকের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্লোক পাঠে জানা যায়—ভগবান্ শ্রীশঙ্করের সময়ে কোনও ভাগ্যবান নরপতি উক্ত মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গের কোনও ঐতিহাসিকই এ তথ্য রাখেন না। তাঁহাদের যদি সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেই ভাগ্যবান্ পুরুষের পরিচয় পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতাম। দাঁইহাটের দক্ষিণ দিকে পরিখা-পরিবেষ্টিত "ফরিদখানার" সুবিশাল স্থান বহুকাল হইতে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কেহই ত বলিতে পারেন না, কোন্ মহাপুরুষের বিরাট কীর্ত্তিরাশি মনোবেদনায় একান্ত কাতর হইয়া ধরণী-গর্ভে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। আজিও ভূগর্ভে প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বারযুক্ত কুঠারী, সুদীর্ঘ অট্টালিকার নানাবিধ চিহ্ন—কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে? উক্ত স্থান যদি য়ুরোপের কোন প্রদেশে হইত, তাহা হইলে দেখিতাম, ইহা কোন্ অক্ষরে ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে? এইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির কত নিদর্শন যে ইন্দ্রাণীক্ষেত্রে রহিয়াছে, কে তাহার উদ্ধারসাধন করিবে? উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই হয় ত বর্ষাকালীন অজয়—তাহার উৎফুল্ল পরিপূর্ণ বিরাট নীরদেহ গৈরিক-বসনে আবৃত করিয়া দীর্ঘশ্বাসে অজস্র ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতে করিতে যখন তাহার বিশাল তরঙ্গ-বাহু উত্তোলনে পূত-ভাগীরথীর দিকে ছুটিয়া চলে, আর মর্ম্মভেদী কলনাদে বলিয়া যায়—"রে হতভাগা বঙ্গসন্তান! সাবধান—সাবধান! আত্মবিস্মৃত তোমরা, আর এমন করিয়া কত কাল কাটাইবে? এখনও সময় আছে, এখনও সময় আছে—ইহার পর হয় ত মুহূর্ত্ত অবসরও মিলিবে না। আমার দুই কূলস্থিত কত গ্রাম-জনপদে—কত কবি, কত সাধক, কত ভক্ত, কত বীর, কত ভাগ্যবান্, কত পুরুষরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার বঙ্গভূমিকে অসংখ্য কীর্ত্তিতে ভূষিত করিয়াছিল, একবার স্মরণ করিয়া দেখ। এখনও আমার বক্ষের ভিতরে বাহিরে তাহার সহস্র নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তোমরা একবার কেবল চাহিয়া দেখ!"

ভাগীরথী-চরণ-চুম্বিত, অজয়-বাহু বেষ্টনে বেষ্টিত কাটোয়ার ইতিহাস বড় সামান্য নহে। এই "কাটোয়া-সন্ধি" নবাব আলিবর্দ্দীর সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিল, আবার ইংরাজ জাতির ভাগ্যাকাশে প্রথম সুপ্রসূর্য্যোদয়ের সূচনা এই কাটোয়া নগরীতেই ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্যদেব কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ইহার প্রতি অণু-পরমাণুকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রাণীক্ষেত্রের দেবদেবীগণ কাল-বিবর্ত্তনে নবমূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক কাটোয়াকে এক পবিত্র জাতীয় ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন।

কাটোয়ার অন্য এক ঐতিহাসিক নাম গঞ্জ মুরশিদপুর। দলিলাদিতে আজিও ঐ শব্দ লিখিত হইয়া থাকে। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ কাটোয়ায় প্রথম গঞ্জ স্থাপন করেন। কাটোয়ার কণ্টক-কানন উৎসাদিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ইহা এক প্রসিদ্ধ গঞ্জে পরিণত হয়। কি ঐতিহাসিক, কি রাজনীতিক, কি শাস্ত্রীয়, কি ব্যবহারিক—সকল দিক্ দিয়াই জাতীয় ইতিহাসে কাটোয়ার স্থান সামান্য নহে। আমরা ক্রমশঃ আমাদের কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে "ইন্দ্রাণী"ক্ষেত্রের সকল প্রধান প্রধান স্থানের প্রাচীন

পীঠস্থান ক্ষীরগ্রাম প্রভৃতির প্রাচীন বিবরণ সম্ভবতঃ বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের অরুচিকর হইবে না।

যাহা হউক, বাঙ্গালার নবাব নাজিমগণ কেবলমাত্র কাটোয়ার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। দস্যুর অত্যাচার নিবারণ ও প্রজাগণের ধনসম্পত্তি রক্ষার্থ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কেঁদুয়াডাঙ্গায় 'আলা' স্থাপন এবং ভাগীরথী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থান খাঁথাই গ্রামে সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ; কুলীন গ্রাম, রামচন্দ্র গড় ও রাণীগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী সেরগড়ের তলবাহিত অজয়নদের উভয় দিকেই দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও ঐ সকল দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কালপ্রভাবে সে সমুদয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও, ইতিহাস অনন্তকাল ধরিয়া তাহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রহিবে।

মহারাষ্ট্রগণের উপদ্রবও এ অঞ্চলে বড় কম হয় নাই।

"ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে॥"

ইহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইলেও, ইহার মধ্যে এক কঠোর ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রগণ কাটোয়া অঞ্চলেই তাঁহাদের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচার-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া অধিবাসিবৃন্দকে কেমন শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণের তাহা অবিদিত নহে। মেদিনী-পুর-সমরে পরাজিত হইয়া প্রবলপ্রতাপ রণপণ্ডিত নরপতি নবাব আলিবর্দ্দী যখন বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ইতিহাসে (১) যাহা "পঞ্চ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার সহিতও কাটোয়া নগর সম্পর্কশূন্য নহে। সে কি ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা! নবাবের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ অর্থ, কিন্তু জঠরানল নির্বৃত্তির কোন উপায়ই নাই! ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন অর্থের অকিঞ্চিৎকরতা এ স্থানে সুন্দর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু কষ্টে, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কাটোয়া-দুর্গে আসিয়া তবে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রগণ দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে আসিয়া নগরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। নবাব সসৈন্যে আসিয়া সেই দগ্ধাবশিষ্ট খাদ্য-শস্য অমৃতবোধে ভক্ষণ-পূর্ব্বক জীবনধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন।' ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বরাবর নবাবের সঙ্গে ছিলেন। তিনি স্বচক্ষুতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপ রণপণ্ডিত নবাবের লাঞ্ছনার একশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। পশ্চাদ্ধাবিত শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ-প্রতিরোধ, খাদ্যাভাবে বৃক্ষপত্র ভক্ষণ, শয্যাভাবে ধরণী-শয়ন, বৃষ্টিতে অনাবৃত স্থানে সময়-ক্ষেপণ প্রভৃতি অসহনীয় যন্ত্রণায় "পঞ্চ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" ইতিহাসে এক অলৌকিক ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। রুস-জাপান যুদ্ধে রুস-সেনাপতি কুরোপাটকিনের মেয়াং হইতে মুকডেনে পলায়ন এবং প্রাচীন পারস্যরাজ সাইরসের পশ্চাদপসরণ ও ম্যারেকাল-ডি বেলিসলের প্রোগ নগর হইতে যাত্রাও ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। সাইরস্ ও বেলিসলের পলায়ন-পথে অনেক পর্ব্বত ও সঙ্গে রসদাদি বিদ্যমান ছিল এবং পলায়নকালে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও হয় নাই। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কোনই সুযোগ ছিল না—উপরন্তু সমতল ভূমির উপর দিয়া দ্রুতগতি-সম্পন্ন, অশ্বারোহণে অত্যন্ত সুপটু মহারাষ্ট্রীয়গণের অতর্কিত আক্রমণ স্মরণেও মহাভীতির উদ্রেক করে। নবাব আলিবর্দ্দী রণপণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্গীর হাঙ্গামার সবিস্তার বর্ণনায় সময়ক্ষেপ করার কোন আবশ্যকতা আমাদের নাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ তাহা জানেন এবং কৌতূহলী পাঠকবৃন্দ কালীবাবুর ইতিহাস হইতে তাহা পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। তবে কাটোয়ার ইতিহাসে যতটুকু স্থান পাইবার যোগ্য, আমরা সংক্ষেপে সেইটুকু বলিয়া যাইব।

মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের প্যারংবার আক্রমণে বঙ্গভূমি অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রণপণ্ডিত এবং অক্লান্তকর্ম্মা নবাব আলিবর্দ্দীর প্রচণ্ড বিক্রমে বিতাড়িত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত সসৈন্যে বীরভূম অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে একান্ত নিরুদ্যম হইয়া ভাস্কর বঙ্গ-বিজয়ের আশা সম্ভবতঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু নবাবের জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মীর হাবিব ভাস্করের উৎসাহ-অনলে পুনর্ব্বার ইন্ধন যোগাইয়া বলিলেন,—"আপনি কাপুরুষতা পরিত্যাগ করুন। বঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্র বীরকুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবেন না। যদি অর্থের দরকার হয়, আমি তাহা পূরণ করিয়া দিব। নবাব এক্ষণে কাটোয়া-দুর্গে রহিয়াছেন, আপনি যদি আমার সাহায্যার্থে সহস্র অশ্বারোহী প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এক্ষণেই মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠের বাটী লুণ্ঠন করিয়া যে অর্থ পাইব, তাহার সমস্তই আপনাকে প্রদান করিব।"

এই মীর হাবিব পারস্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় সামান্য অনুচরবেশে আগমন করিয়া প্রতিভা প্রভাবে ও কার্য্যকুশলতায় এক সম্ভ্রান্ত পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, হাবিব লেখাপড়ার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না, কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিবলে ও কূট-মন্ত্রণায় বড় বড় রাজনীতিকগণও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। ভাস্কর মীর হাবিবকে বেশ ভালরূপেই জানিতেন, সুতরাং তাঁহার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া মুর্শিদাবাদে তৎকালীন জগৎ শেঠ আলমচাঁদের দুর্গ লুণ্ঠনার্থ প্রেরণ করিলেন।

সুচতুর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ গুপ্তচরমুখে হাবিবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে কাটোয়া-দুর্গ-পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ বিবেচনায় সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুঃখের বিষয়, নবাবের আগমনের পূর্ব্বেই ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মীর সাহেব স্বকার্য্য-সাধন অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টাকা ও অন্যান্য বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। নবাব-সেনাপতি আতাউল্লার অধীনে প্রভূত সৈন্য থাকায় হাবিব নবাবের প্রাসাদ আক্রমণে সাহসী হইলেন না। দিবা দ্বিপ্রহরে জগৎ শেঠের বাটী লুণ্ঠিত—আর অপরাহ্নে নবাব সসৈন্যে সমাগত। মীর হাবিব সসৈন্যে পলায়ন করিয়া সমস্ত অর্থ ভাস্করের হস্তে প্রদান করিলেন। মীর হাবিবের উৎসাহে পুনরায় ভাস্কর পণ্ডিত বিপুল বিক্রমে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বালেশ্বর বন্দর, উড়িষ্যা, রাজমহল এবং রাজসাহীর কতকাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। পুনরায় কাটোয়ায় ইহাদের আড্ডা স্থাপিত হইল। বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার প্রবল অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মহারাষ্ট্র-সেনাপতি বীরভূম হইতে কাটোয়ায় শিবির সন্নিবেশ করায় কাটোয়া অঞ্চল মহাত্রাসে নিমগ্ন হইল। বীরপদভরে কাটোয়ার মৃত্তিকা টলমল করিতে লাগিল। এক কথায় কাটোয়া তাহাদের শাসনকেন্দ্ররূপে পরিণত হইল।

কাটোয়ায় আড্ডাস্থাপন, হুগলীর পতন, মহম্মদ ইয়ারের বন্দি-বার্ত্তা প্রভৃতি শ্রবণে নবাব আলিবর্দ্দী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ অগ্নি সহজে নির্ব্বাণ হইবার নহে। জাতিদ্রোহী মীর হাবিব কাটোয়া ও হুগলী ইত্যাদি স্থানে থাকিয়া দেশের অধি-বাসিবৃন্দকে মহারাষ্ট্র-প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের ঘৃণিত অর্থলালসা, মীর হাবিবের কুমন্ত্রণা ইত্যাদি, চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেও, তাঁহার বীর-হৃদয় কিছুমাত্র নিরুদ্যম হইল না। তিনি আজিমাবাদ হইতে ৫ হাজার অশ্বারোহী

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে

প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপে সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্য সংগৃহীত হইলে তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নবাব তাহাদিগকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং গোলা, বারুদ প্রভৃতি উপযুক্ত রণসম্ভারে দুর্গসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রবল বর্ষার অবসান হইল। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অধিপতি প্রবলপ্রতাপ নবাব আলিবর্দ্দীর সন্তোষসাধনার্থ যেন প্রকৃতি রমণীয় বেশে দেখা দিলেন। শুভদিনে নবাব কাটোয়ায় অভিযান করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই কাটোয়ার পর-পারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত দেখিলেন, নবাব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; তিনিও অপ্রস্তুত ছিলেন না।

আবার কাটোয়া অঞ্চলের জলস্থল, আকাশবায়ু এবং অজয় ভাগীরথীর বিপুল বারিরাশি নিকম্পিত করিয়া উভয় পক্ষের রণ-দামামা গম্ভীরনাদে বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের কালানলবর্ষী কামানসমূহের বজ্রনাদে নিরীহ অধিবাসিবৃন্দের কর্ণকুহর বধিরপ্রায় হইয়া উঠিল। পক্ষিকুল আর কলরব করে না, নাগরিকাগণ আর গাগরী কাখে স্নানের ঘাটে আইসে না। ভাগীরথীর উভয় কূল ধূমপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন করিয়া উভয় পক্ষের অগ্নিপিণ্ডবর্ষী দেশীয় কর্ম্মকারনির্ম্মিত কামানসমূহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নবাবের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ সম্মুখ যুদ্ধে যথেষ্ট দৃঢ়পণ, তথাপি এই ভীষণ সমর সপ্তাহকাল সমভাবে চলিয়াও কোন পক্ষ পরাজয় স্বীকার করিল না। অবশেষে মীর হাবিবের মন্ত্রণায় মহারাষ্ট্রগণের গঙ্গাবক্ষস্থিত ছোট ছোট জাহাজ হইতে অবিরাম অগ্নিগোলক বর্ষিত হইয়া নবাব-সৈন্যের অগ্রগমনে প্রবল বাধা উপস্থিত করিল। ভাস্করের শিবিরের উত্তরে অজয়, পূর্ব্বে ভাগীরথী আর কাটোয়া নগরীর সম্মুখে গঙ্গার পরপারে নবাব-সৈন্য। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত স্থানকে "বসন্তপুর" বলা হইয়া থাকে। প্রাচীনগণ এখনও উহাকে "ছাউনির ডাঙ্গা" বলিয়া অভিহিত করেন। শুনা যায়, ভূমিকর্ষণকালে মধ্যে মধ্যে কৃষকগণ উক্ত ক্ষেত্রে লৌহ-গোলক পাইয়া থাকে।

সরলভাবে গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়ায় উপনীত হওয়া সহজসাধ্য নহে দেখিয়া যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী সুচতুর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ "উদ্ধানপুরের" দিকে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সসৈন্যে কাটোয়ার পারে উপনীত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। উদ্ধানপুরের দিকে গঙ্গাপার হইয়া পুনরায় অজয়-নদ উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নবাব সে উপায়ও স্থির করিলেন। মহারাষ্ট্রগণ সুচতুর নবাবের এই চাতুরীজাল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। নিয়ত সংগ্রামে রণশ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল গভীর নিদ্রায় অচেতন। ইতঃপূর্ব্বেই নবাব-সৈন্য পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা কতকটা বিজয়িভাবেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। এই শুভ অবসরে অতি সন্তর্পণে নবাব-সৈন্য গঙ্গাবক্ষে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নীরবে গঙ্গাপার হইতে লাগিল। দ্রুত পার হইবার সময়ে নৌ-সেতুর মধ্যস্থান ভগ্ন হইয়া প্রায় দেড় সহস্র নবাব-সৈন্য সলিল-সমাধি লাভ করিল। ইহাতেও নবাব হতোদ্যম হইলেন না। অচিরে ভগ্নস্থান সংস্কার করিয়া লইয়া অবশিষ্ট নবাব সৈন্য রজনীযোগেই নিরাপদে পরপারে উত্তীর্ণ হইল। যখন নবাব-সৈন্য শত্রু-শিবিরের মাত্র অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে সমুপস্থিত, তখন প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সেনাপতি মুস্তাফা, সামসের, উমার প্রভৃতিকে নৈশ-যুদ্ধে শত্রু-সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখনও বাহ্য-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় নাই,—কেবলমাত্র ভাগীরথী ও অজয়ের কলকলনাদ প্রকৃতির নীরব নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া ধীর-মন্থর-গতিতে বহিয়া চলিতেছিল। অজয়ের উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ নবাব সৈন্যের ভয়ে ভীত হইয়াই যেন অজয়-বক্ষে লুক্কায়িত হইয়াছিল। নবাব-সৈন্য নির্ব্বিঘ্নে অজয়-নদ উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষিপ্রগতি মহারাষ্ট্র-শিবির আক্রমণ করিল। হইয়া শিবিরমধ্যে দারুণ কোলাহল করিয়া উঠিল। প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নবাব-সৈন্য "আল্লা হো আকবর" রবে কাটোয়ার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পলায়মান মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে বিধ্বংস করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বিশৃঙ্খলতা, আর্ত্তনাদ, অশ্বের ঝনঝনা, অগ্নিস্রাবী কামান-বন্দুকের ভীমগর্জ্জন, সৈন্যগণের জয় জয় রব প্রভৃতি একসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক দারুণ বিকট ভৈরব-রব উত্থিত হইতে লাগিল। ভাগীরথীর বিপুল সলিল নর শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কাটোয়া-ক্ষেত্র নর-শোণিতে সিক্ত হইয়া ভবিষ্যবংশকে এই কাহিনী শুনাইবার জন্যই যেন চিরদিন প্রস্তুত হইয়া রহিল। মহারাষ্ট্রগণ কতক নৌকায়, কতক অশ্বে, কতক বা পদব্রজে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও তাহাদের নাই। নবাবের বিজয় পতাকা যখন দুর্গশিরে প্রভাত বায়ুস্পর্শে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান, তখন লোহিত চন্দন-লিপ্ত স্নাত-কলেবর দিবাকর পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া নবাবের জয় ঘোষণা করিলেন। বিহঙ্গকুল নির্ভয়ে প্রভাত-স্তোত্র গাহিতে লাগিল এবং নবাব সৈন্য "জয় আলিবর্দ্দী কি জয়" বলিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বিশ্রামলাভ জন্য শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

সংগঠনের সদুপায়

সর্ব্বকর্ম্ম সংসাধন জন্য আবশ্যকানুরূপ মূলধন সংগ্রহের কথা।

নির্দ্ধারিত যাবতীয় কর্ম্মের পরিচালন জন্য মূলধনরূপে আবশ্যকানুরূপ অর্থের সংগ্রহাদির কথাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু।

অর্থের বিভাগ দ্বিবিধ :—

(১) শ্রমিক কর্ম্মীদের শ্রম সংযোগে সমুৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে লব্ধ—সঞ্চিত বা উৎপন্ন অর্থ।

(২) উক্ত বিধানমতে সমুৎপন্ন বর্ত্তমান এবং ভাবী অর্থ।

প্রথমে শ্রমিক মানুষের (১) মানসিক এবং (২) দৈহিক এই দ্বিবিধ শ্রম সংযোগে সমুৎপন্ন পণ্য, পরে তদ্বিনিময়মূলে মুদ্রারূপী অর্থ।

এই স্বাভাবিক পর্য্যায়ক্রমে যে অর্থ উৎপাদিত হইয়া, নানা ভাণ্ডারে বা কোষে সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, তাহা বাহির করিয়া আনিয়া বর্ত্তমানে কাযে খাটান কতকটা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু উক্ত পর্য্যায়ক্রমেই বর্ত্তমানে যে অর্থরাশি উৎপাদিত হইতেছে এবং কালে যাহা হইবে, সেই বিপুল অর্থকে একাধারে আবদ্ধ করিয়া কায করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব্যাপার।

সমগ্র দেশের সুবিপুল সেই পণ্যোৎপাদিকা শ্রমশক্তিকে অখণ্ড এক কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের অধীনতায় কর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, দেশের সমুৎপন্ন ও উৎপদ্যমান যাবতীয় অর্থই সেই কর্ম্মকর্ত্তৃসঙ্ঘের কোষজাত হইতে পারে। তাহার সহায়তায় তখন সেই সঙ্ঘ, জাতির যাবতীয় উন্নতিবিধায়ক কার্য্যই অতি অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। জাতীয় মহা সংসদকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনের দায়িত্বভার বহন করিয়া চলিতে হইলে, জাতির উক্ত শ্রমশক্তিকেই মূলধনরূপে গ্রহণ করিয়া, নিজের অখণ্ড কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহাকে কর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে হইবে।

ক্ষেত্র হইতে কালে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রথমে যেমন তাহাতে পূর্ব্বাহৃত সঞ্চিত বীজ বপন করিতে হয়, যথাকালে অনুৎপন্ন অর্থের উৎপাদন জন্য তেমনই কতক পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ কর্ম্মক্ষেত্রে বপন

কর্ম্মারম্ভের প্রাথমিক ব্যয় বাবদ দেশের সঞ্চিত অর্থ হইতে আবশ্যকানুরূপ অর্থ জননেতৃগণকে অবশ্যই সংগ্রহ করিয়া লইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রের বীজরূপে ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

উক্ত সঞ্চিত অর্থের সংগ্রহ, দানাদি গ্রহণ নহে। প্রাথমিক একটি ব্যাঙ্ক বা আমানত তহবিলের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতেই সেই অর্থরাশি জমা করিতে হইবে। জাতির স্বার্থ-মূলক বিষয়-ব্যাপারে চাঁদা, দান, খয়রাৎ আদির সম্ভব থাকিতে পারে না; থাকাটাও সঙ্গত ও সমীচীন নহে।

প্রাথমিক বীজরূপে যে অর্থরাশি শতাংশিক হিসাবে গৃহীত হইয়া ক্ষেত্রে বপিত হইবে, পরবর্ত্তী ফসলে বর্দ্ধিত হারে যাহাতে তাহা পুনঃ দাতাদের গৃহজাত হইতে পারে, দস্তুরমত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাদা কথায় দেশের সঞ্চিত অর্থরাশি হইতেই শতাংশিক হিসাবে আবশ্যকানুরূপ প্রাথমিক মূলধন গ্রহণ করিয়া, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

শুধু স্বজাতিপ্রেম আর দেশ-হিতৈষিতার দোহাই দিয়া কর্ম্মী সম্প্রদায়কে নিঃস্বার্থভাবে কাযে খাটিবার জন্য আহ্বান করিলে চলিবে না,—এমন চলে না,—চলিতে পারে না। স্বার্থ সংরক্ষণই যে কর্ম্ম ব্রতের মূল, নিঃস্বার্থতার দোহাই সেথানে নিরর্থক। অর্থ উপার্জ্জনই যে কর্ম্মীদের কর্ম্মব্রতের মূল সংকল্প, অর্থহীনতার মধ্যে তাহাদের কায করিতে আহ্বান করা অসঙ্গত। সেই অর্থহীন আহ্বানে সাময়িক ভাবে সাড়া দিলেও কর্ম্মের প্রেরণা তাহাদের অভাবের তাড়নায় চিরকাল অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয় না, হইতে পারে না। কাযেই প্রথম হইতেই অর্থযুক্ত কাযে কর্ম্মীদের ব্রতী করিবার বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন।

প্রাথমিক ব্যয়ের অর্থের অপ্রাচুর্য্য জন্য দেশের প্রতি পল্লীমণ্ডলীর কার্য্য একসঙ্গে আরম্ভ করা অসম্ভব। আদর্শস্বরূপে বাছিয়া লইয়া সম্ভবমত কতকগুলি পল্লীতে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করাইতে হইবে। সেই সব আদর্শ পল্লীমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভের প্রাথমিক ব্যয়ভার, ঋণ প্রদত্ত মূলধনরূপে কর্ম্মকর্ত্তাদেরই বহন করিতে হইবে। ক্রমে স্থানীয় কর্ম্মী সদস্যদের প্রদত্ত মূলধনের প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রথমে প্রদত্ত মূলধন—সুদে আসলে উঠাইয়া আনিতে হইবে। পরে তাহা পুনঃ পূর্ব্বপ্রথামতেই আবশ্যকমত অন্য পল্লীমণ্ডলীর সংগঠনকাযে নিয়োজিত ও যথাকালে সুদে আসলে উদ্ধৃত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ের মূলধনদাতা যে মূলধনী মহাজনরা বা বিক্রেতারা নহে, মূল্যদাতা ক্রেতারাই যে প্রকৃত মূলধনদাতা, এই তত্ত্বটি দেশবাসী ক্রেতা মাত্রকেই বিশদ ও বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রাথমিক মূলধনদাতা মহাজনরা এককালীন সমষ্টিভাবে প্রথমে মূলধন দিয়া ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় পণ্য নির্দ্দিষ্ট আড়তে আমদানী করে সত্য; কিন্তু পরে মাশুলাদির খরচাসহ লাভযুক্ত মূলধনের টাকাই খণ্ডশঃ ভাবে পণ্যের বিনিময়ে ক্রেতৃগণকেই যোগাইতে হয়। ফলে ক্রেতাদের উৎপাদিত ও প্রদত্ত অর্থমূলক মূলধনেই বিক্রেতাদের কারবার চালিত হয়; প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতারা ক্রেতাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের কতকাংশ লাভরূপে আত্মসাৎ করে।

এখন, প্রতি পল্লীমণ্ডলীর ক্রেতৃগণ সমবায় নীতিতে এক কেন্দ্রে সম্মিলিত হইয়া যৌথ প্রথামতে নিজেরাই যদি নিজ নিজ আয় হইতে ক্রম কিস্তিতে শতাংশিকরূপে আবশ্যক মূলধন যোগাইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় ক্রেয় পণ্যের জন্য নিজেরাই আড়তাদির সৃষ্টি করে, তবে প্রতি সহজেই ব্যবসায়ীদের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। এইরূপ প্রথাতে প্রতিষ্ঠিত আড়তের মূলধনদাতা মহাজনস্থানীয় ক্রেতা বলিয়া, ব্যবসায়ের লাভের অধিকারীও তাহারাই হইতে পারে। এই লাভের টাকাটাকে ক্রমে কারবারের মূলধনে পরিণতি দিলেই পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রাথমিক মূলধন—ক্রমে ক্রমে সুদে আসলে অপসারিত হইয়া, প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ক্রেতাদেরই নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইবার সুযোগ প্রদান করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পল্লীমণ্ডলীর সদস্যমাত্রেরই ক্রেয় পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় পণ্যের বিক্রয়স্থানরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই আপনা হইতে দেশের যাবতীয় অর্থ কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইবে। তখনই আর অর্থের অভাবে কার্য্য পরিচালনে অন্তরায় উপস্থিত হইবে না।

পল্লীমণ্ডলীর কার্য্যালয়সমূহে দেশবাসীর অর্থসমাগম আরম্ভ হইলে প্রধানতঃ দ্বিভাগে সেই অর্থরাশিকে বিভক্ত করিয়া ব্যবহারারম্ভ করিতে হইবে:—

(১) সদস্যমাত্রেরই আয়ের অনুপাতে যথানির্দ্দিষ্ট শতাংশিকরূপে, সম্ভব হইলে প্রতি মাসেই মূলধন ভাণ্ডারে জমা।

এই মূলধন ভাণ্ডারে গৃহীত আসল টাকা কেহই আর কোনও কালে ফিরাইয়া পাইবে না। তন্মূলক লাভের যথানির্দ্দিষ্ট অংশ যথাকালে প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হইবে।

(২) সদস্যমাত্রেরই ব্যয়বাদে ফাজিল আয়ের অর্থ আমানত তহবিলে জমা। এই আমানত তহবিলে গৃহীত টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট সুদ সকলেই প্রাপ্ত হইবে। তাহা ছাড়া যথানির্দ্দিষ্ট বিধানমতে প্রত্যেকেই সেই টাকা তহবিল হইতে তুলিয়া লইতে পারিবে। [ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মধু-প্রভাতে

মধু-বসন্তে এ কি আনন্দ—
এ কি উল্লাস হায়
শিহরি শিহরি অন্তর-মন
কি যেন করিতে চায়
মন্দ আকুল মলয় পবনে,
বসন্ত জেগেছে বনে-উপবনে,
সুরভি কুসুম ফুটিছে নিঝুম,
আনন্দে অলি গায়!

ভেসে আসে মৃদু কুহু কুহু কুহু—
মধুর কুহক তান,—
যৌবন আজি সারা দেহময়
জাগায়ে তুলিছে গান!
আমি কোথা যাই!—আমি কোথা যাই!
আপনারে আমি আপনি হারাই!
আমি যে কোথায় ভেবে নাহি পাই,—
কোথা মোর অবসান!



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শত্রু-হস্তে

সলোমন কোহেন যে দিন গভীর রাত্রিতে সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে দেশান্তরে পলায়নের জন্ত প্রস্তুত হইলেন, সেই দিন সায়ংকালে রেবেকা কালনকিকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার প্রস্তাব করিল। কালনকি তাহার এই প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত হইল না; কারণ, রেবেকা তাহার মনোরঞ্জনের জন্ত পূর্ব্বেও দুই চারি দিন তাহার সঙ্গে থিয়েটারে গিয়াছিল। ইহাও তাহার ষড়যন্ত্রের একটি অঙ্গ। কালনকি আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

যখন তাহারা থিয়েটার দেখিয়া ফিরিল, তখন রাত্রি ১০টা বাজিয়াছিল। রেবেকা গাড়ীতে না উঠিয়া পদব্রজে বাড়ী যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, কালনকি তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে মেঘের সঞ্চার হওয়ায় শীত একটু কম ছিল; স্বচ্ছ মেঘের অন্তরাল হইতে তারকাগুলিকে ম্লান দেখাইতেছিল, যেন তাহারা স্বপ্নজড়িত নেত্রে ধরণীর দিকে চাহিয়া ছিল। পথি-প্রান্তবর্ত্তী 'কাফে' গুলি তখন জনপূর্ণ; রাজপথগুলি নানা আকারের শকটের চক্রধ্বনিতে মুখরিত। অনেক সৌখীন লোক থিয়েটার বা বন্ধুবান্ধবের মজলিস হইতে তখন বাড়ী ফিরিতেছিল।

কালনকি গাড়ীতে বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু রেবেকা সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "রাত্রি ত তেমন অধিক হয় নাই, বিশেষতঃ বেশ গরম পড়িয়াছে, দু'জনে গল্প করিতে করিতে হাঁটিয়া যাইলে বেশ আরাম পাওয়া যাইবে; এমন সুন্দর রাত্রিতে গাড়ীর ভিতর আবদ্ধ থাকিতে কাহার ইচ্ছা হয়?"—রেবেকা একটা ঘুরো পথে যাইবার প্রস্তাব করিলে কালনকি অনিচ্ছার সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল; রেবেকাকে সুখী করিবার জন্ত সে তখন সকলই করিতে পারিত। রেবেকার হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে; বনবিহঙ্গী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে, আর তাহার পলায়নের সামর্থ্য নাই। কালনকি অল্পদিনেই রেবেকার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছিল। রেবেকা তাহাকে বংশীরবে আকৃষ্ট করিয়া মৃত্যুগহ্বরের দিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ সন্দেহ কালনকির মনে স্থান পাইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, রেবেকার স্বাক্ষরিত একরারনামাখানি হস্তগত করাতেই সে নিরুপায় হইয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে, নতুবা রেবেকাকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন হইত। নিজের বুদ্ধির ও চাতুর্য্যের সুফল দেখিয়া কালনকির মন আত্ম-প্রসাদে পূর্ণ হইয়াছিল। মোহান্ধ পুরুষ যতই বুদ্ধিমান্ ও চতুর হউক, সে ছলনাময়ী নারীর কপটতার আবরণ ভেদ করিতে পারে না; কালনকিও রেবেকার চাতুরী বুঝিতে পারে নাই। রেবেকা কালনকির কাঁধে হাত দিয়া প্রেমের কথা বলিতে বলিতে তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। কালনকি স্বল্পভাষী হইলেও তাহার 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট!' তাহার মনে হইল—প্রণয়িনীর সঙ্গে সে প্রেমালোক-উদ্ভাসিত স্বর্গের পথে অগ্রসর হইয়াছে!

নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে কালনকি গাঢ় স্বরে বলিল, "রেবেকা, আমি অবাক্ হইয়া ভাবি, পরমেশ্বর তোমাকে এমন অপরূপ রূপ দিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন?"

রেবেকা কালনকির কাঁধে দস্তানামণ্ডিত আঙ্গুলের একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমাকে আমার গোলাম করিবার জন্ত!"—কিন্তু সে মনে মনে বলিল, "তোমার দফা রফা করিবার জন্ত!"

কালনকি রেবেকার উত্তরে সুখী হইয়া বলিল, "হাঁ, পরমেশ্বর বেটার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; সত্যই আমি এখন তোমার গোলাম। ইচ্ছা হয়, তোমার রূপ-রজ্জু গলায় জড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া স্বর্গে চলিয়া যাই। সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে অনন্তকাল পরম সুখে বিহার করি। কারণ, শুনিয়াছি, সেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, উদরের চিন্তা পর্য্যন্ত নাই।

লাভ করা এক সময় আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। প্রথম-যৌবনে আমার মনে হইত, পৃথিবীতে এরূপ নারী জন্মগ্রহণ করে নাই, যে আমার হৃদয় জয় করিতে পারে; রূপরজ্জুতে আমাকে বাঁধিতে পারে। রমণীর সংস্রব তখন আমার অসহ্য মনে হইত। প্রথম-যৌবনে অনেক যুবকেরই মনের ভাব এইরূপ হইয়া থাকে। সত্যই আমি নারীজাতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম. তাহাদের রূপ অসার ও অনিষ্টকর বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত আমার মনের এই ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমার মনে হইত, পৃথিবীর সকল নারীই কাপট্যময়ী, তাহাদের হৃদয় সয়তানীতে পরিপূর্ণ, এবং কোন নারীই কোন পুরুষকে ভালবাসিয়া তাহার প্রেমে সর্ব্বত্যাগিনী হইতে পারে না। জগতে এরূপ নারী এক জনও নাই, যে প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে। উপন্যাসে পল ও ভার্জিনিয়ার প্রেমের কাহিনী পাঠ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এবং নিছক গাঁজাখুরী গল্প বলিয়াই মনে হইত। মনে করিতাম, তাহা গ্রন্থকারেরই উদ্ভট কল্পনার ফল।"

রেবেকা বলিল, "এখন কি তোমার সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?"

কালনকি চলিতে চলিতে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া বলিল, "হাঁ, এক সময় নারীবিদ্বেষী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি—"

রেবেকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "নারীভক্ত?"

কালনকি বলিল, "এখন তারও বেশী, তোমার গোলাম।"

রেবেকা সকৌতুকে বলিল, "তোমার এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"—মুখে সে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু কালনকির উত্তর শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, সে পথের অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কাহাকেও দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার মানসিক উৎকণ্ঠা ও অধীরতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। পাছে কালনকি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারে, এই আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু মুগ্ধ কালনকি তাহার উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "তুমি, তোমারই জন্য আজ আমার এই পরিবর্ত্তন।"

রেবেকা পথের অন্য দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমি? কেন, আমি তোমার কি করিয়াছি?"

কালনকি আবেগভরে বলিল, "তুমি আমার রুচি, প্রবৃত্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্তই উলটাইয়া দিয়াছ। আমি জানি, নারীজাতির মধ্যে রাক্ষসীর অভাব নাই, তথাপি নারীজাতির প্রতি আমার মনে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ তুমি।"

রেবেকা বিদ্রূপভরে বলিল, "তোমার শ্রদ্ধা ও সম্মানে নারীজাতির গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে, আমাকেও তুমি ধন্য করিয়াছ।"

কালনকি রেবেকার বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "না রেবেকা! তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিও না; তোমার প্রেমে আমিই ধন্য হইয়াছি। প্রেম স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে; এখন বুঝিতে পারি, কি ছিলাম,—আর কি হইয়াছি! আমি স্বার্থপর, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, কপট, ঘৃণিত নরপশু ছিলাম; তোমার প্রেম লাভ করিয়া আমি ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। আমার মনের পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিয়া বিস্মিত না হইয়া আমি থাকিতে পারি না।"

রেবেকা বুঝিল, কালনকি সরলভাবেই তাহার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়াছে, অথচ ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া সে তাহাকে প্রতারিত করিতেছে, তাহার সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছে; এ জন্য রেবেকার মনে একটু কষ্ট হইল, কিন্তু তখন আর তাহার ফিরিবার উপায় ছিল না। কালনকির কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে।

অতঃপর তাহারা নিঃশব্দে চলিতে চলিতে নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদীর অশ্রান্ত কুলুকুলু ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; নদীতীরে আলোকস্তম্ভ-শিরে যে সকল দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাদের আলোকে কিছু দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইলেও তাহার পর দুর্ভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রেবেকার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎও সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন। তাহার ভাগ্যাকাশ হইতে সেই নিবিড় অন্ধকারের যবনিকা কখনও অপসারিত হইবে কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। রেবেকা দাঁড়াইয়া

পথে অগ্রসর হইল। সেই পথের এক প্রান্তে সে একখানি ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে পাইল, গাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল। শকট-চালক কোচবাক্সে স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল, যেন সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। নদীতীর হইতে এই পথের দূরত্ব অধিক নহে; পথের দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম। গুদামগুলি নানা শস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। দিবাভাগে এই সকল গুদাম নানা দেশের ব্যাপারীগণের কোলাহলে মুখরিত হইলেও রাত্রিকালে গুদামগুলির দ্বার তালা-চাবী দ্বারা বন্ধ থাকিত। সেই পথে সে সময় জনমানবের সমাগম ছিল না। রেবেকা চারিদিকে চাহিয়া সেই গাড়ীর কোচবাক্সে শকটচালক ভিন্ন দ্বিতীয় প্রাণী দেখিতে পাইল না। তখন পূর্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র।

রেবেকা চলিতে চলিতে সেই গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল; সে কালনকিকে বলিল, "এই রাত্রিকালে এরূপ নির্জ্জন পথে একখানা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। কোচম্যানটা ঘুমাইতেছে; ঘোড়াটাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয়, নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। এরূপ অসময়ে কে কি উদ্দেশ্যে এই গাড়ীতে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

কালনকি বলিল, "তাহা জানিয়াই বা আমাদের কি লাভ হইবে? কোচম্যানটা বোধ হয়, পেট ভরিয়া ভড্‌কা গাইয়া মাতাল হইয়াছে; আমি উহাকে জাগাইতেছি। হঠাৎ এখানে পুলিস আসিয়া পড়িলে উহার অর্থদণ্ড অপরিহার্য।"

কালনকির কথা শেষ হইবামাত্র পথিপ্রান্তস্থ একটা গুদামের আড়াল হইতে তিন জন লোক তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণ এরূপ আকস্মিক যে, আত্মরক্ষার চেষ্টা দূরের কথা, সে চীৎকার করিবারও সুযোগ পাইল না। আততায়ীরা ক্ষিপ্রহস্তে একখানি শাল দ্বারা তাহার মস্তক আবৃত করিয়া তাহার উভয় হস্ত দেহের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে নিদ্রাভিভূত কোচম্যানটার নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে তাহার কোচবাক্স হইতে তড়াক্ করিয়া নীচে নামিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। তখন কালনকির আততায়ীরা তাহাকে সেই গাড়ীতে পুরিয়া গাড়ীর ভিতর পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়িতেই ঘোড়া গাড়ী লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এই সকল কার্য্য দুই মিনিটের মধ্যে শেষ হইল। গাড়ীর ভিতর সকলেই নির্ব্বাক; রজ্জুবদ্ধ কালনকি বস্তাবন্দী বিড়ালের মত ছটফট করিতে লাগিল। আততায়ীরা তাহার মুখ বাঁধিয়াছিল, এ জন্য সে চীৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিল না।

কালনকি তাহার আততায়ি-ত্রয় কর্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র রেবেকা একটু দূরে সরিয়া গিয়া কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল; গাড়ীখানি সেই স্থান ত্যাগ করিবামাত্র আর এক জন লোক একটি অট্টালিকার অন্তরাল হইতে রেবেকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাহার পিতৃবন্ধু মোজে। রেবেকা তখন ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; মোজে পথিপ্রান্তবর্ত্তী দীপালোকে রেবেকার ভীতিবিহ্বল ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার হাত ধরিল; এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য মৃদুস্বরে বলিল, "আর কোন ভয় নাই, মা! আমরা নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছি; এখন চল, শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।"

মোজে রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই স্থান ত্যাগ করিল। শকটখানি রজ্জুবদ্ধ কালনকি ও তাহার আততায়ি-ত্রয়কে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল; তখন মধ্যরাত্রি। কিন্তু 'কাফে' সমূহে তখনও পূর্ণ উৎসাহে পানাহার চলিতেছিল। নগর-পথে তখনও লোক চলিতেছিল; কিন্তু সেই রুদ্ধদ্বার শকট দেখিয়া শকট-চালককে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; শকটের ভিতর এক জন লোক রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইল না। গাড়ীখানি চলিতে চলিতে একটি পথের মোড়ে উপস্থিত হইলে দুইটি মাতাল পুরুষ দুইটি মদোন্মত্তা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীর গতিরোধ করিল। একটা মাতাল কোচম্যানকে সম্বোধন করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "এই ও কোচম্যান! গাড়ী রাখ, আমরা তোর গাড়ী ভাড়া করিব।"

শকটচালক ঘোড়ার মুখরজ্জু আকর্ষণ করিয়া পথের অন্য ধার দিয়া অগ্রসর হইল, ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া বলিল, "না কর্ত্তা, সারা দিন ভাড়া খাটিয়া আমার ঘোড়ার আর চলিবার শক্তি নাই, আমারও বড় ঘুম পাইতেছে; এখন

শকটারোহীরা একটুও শব্দ করিল না; মাতালগুলার হাত ছাড়াইয়া গাড়ী আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে কালনকির এক জন আততায়ী তাহার ছটফটানী লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "দেখ বাপু গোয়েন্দা! যদি বাঁচিবার সাধ থাকে ত মুখ বুজিয়া স্থির ভাবে পড়িয়া থাক। যদি 'হল্লা' কর, কি পলায়নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুকে ছুরী মারিয়া এই গাড়ার মধ্যেই তোমাকে সাবাড় করিব। তুমি শুধু দেখিয়াছ, ফাঁদ যে কি বস্তু, তাহা এত দিন দেখিতে পাও নাই, এই বার দেখিবে। তোমাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা নাই, যদি নিজের ইচ্ছায় মর, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।"

কালনকি বুঝিয়াছিল, সে চেষ্টা করিলেও সেই সুদৃঢ় বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না; বিশেষতঃ তিন জন বলবান ও সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সে কি করিতে পারে? সে নিষ্কৃতিলাভের আশা ত্যাগ করিল এবং প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁপিতে লাগিল। শকটখানি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিল। কালনকি ভয় ও দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল; প্রেমের পরিণাম এরূপ শোচনীয় হইল ভাবিয়া তাহার উপর শাল দ্বারা তাহার মুখ আবৃত থাকায় তাহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল এবং সুদৃঢ় বন্ধনের বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ টন্‌টন্ করিতে লাগিল। তাহার আততায়ীরা তাহাকে গাড়ীতে পুরিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, কালনকি তাহা বুঝিতে না পারিলেও, সে যে দুর্দ্দান্ত নিহিলিষ্টদের কবলে পড়িয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

অবশেষে একটি ত্রিতল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। কালনকির আততায়ীরা তাহাকে গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল এবং তাহাকে কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইল, ইহাতে সে অনুমান করিল, কোন অট্টালিকার ত্রিতলস্থ কক্ষে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

কালনকি ক্রমে তেতালার একটি নিভৃত কক্ষে নীত হইলে, তাহার মুখাবরণ অপসারিত করা হইল; তাহার দেহের বন্ধনও খুলিয়া দেওয়া হইল। সেই কক্ষের মেঝের উপর কতকগুলি শুষ্ক তৃণ প্রসারিত ছিল; কালনকি অবসন্ন ভাবে তাহার উপর পড়িয়া গেল। এক জন আততায়ী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকায় কালনকি তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সেই ব্যক্তি কঠোর স্বরে কালনকিকে বলিল, "এই ঘরে তোমাকে আট দশ দিন কয়েদ করিয়া রাখা হইবে। তাহার পর তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তুমি পলায়নের চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই নিহত হইবে। আমরা তোমাকে কিছু দিন কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্যই এখানে ধরিয়া আনিয়াছি, তোমার কোন ক্ষতি করিবার ইচ্ছা নাই। সুতরাং তুমি এখানে নির্ভয়ে বাস করিতে পার, তবে যত দিন তোমাকে ছাড়িয়া না দিই তত দিন পলায়নের চেষ্টা করিও না। আমার উপদেশ স্মরণ রাখিও।"

কিন্তু তাহার এই 'উপদেশ' অথবা আদেশ কালনকির কর্ণে প্রবেশ করিল না; দীর্ঘকাল শালে মুখ আবৃত থাকায় সে তখন অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তৃণশয্যায় পড়িয়া হাঁপাইতেছিল, তাহার আততায়ী নিহিলিষ্টরা তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া টেবলের উপর হইতে ল্যাম্পটা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। কালনকি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে তৃণশয্যায় একাকী পড়িয়া রহিল।

দীর্ঘকাল পরে কালনকির নিদ্রাকর্ষণ হইল, সে কতক্ষণ নিদ্রিত ছিল, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও, নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিতে পাইল, বাতায়ন-পথে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষটি আলোকিত করিয়াছে। কালনকি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, পূর্ব্ব রাত্রির সকল কথা তাহার স্মরণ হইল এবং রেবেকার ষড়যন্ত্রেই তাহাকে এইরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছে অনুমান করিয়া সে ক্রোধে, ক্ষোভে, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কালনকি সেই কক্ষে অধীর চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই কক্ষটি দীর্ঘ হইলেও সঙ্কীর্ণ, তাহার ছাদ চালু; একটি দ্বার ভিন্ন তাহার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল। বাতায়নটি দুইটি লোহার গরাদে দ্বারা আ[illegible] কালনকি দ্বার ও বাতায়ন পরীক্ষা করিয়া রুদ্ধদ্বারে প্র[illegible] বেগে কয়েক বার পদাঘাত করিল, কিন্তু সেই সুদৃঢ় দ্[illegible] তাহার পদাঘাতে ভাঙ্গিল না। সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত [illegible] হইয়া সেই কক্ষের দেওয়ালে ও বাতায়নের গরাদেতে [illegible] পুনঃ পদাঘাত করিয়া অবসন্ন হইল। পলায়নের

উপায় না দেখিয়া ক্রোধে ও নিরাশায় সে মাথার চুলগুলি দুই হাতে টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে অস্ফুট প্রলাপবাক্য নিঃসারিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

কিয়ৎকাল সে অভিভূত ভাবে তৃণশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সন্দেহ হইল, রেবেকা ও তাহার পিতা গোপনে দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছে এবং সে তাহাদের পলায়নে বাধা দিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের নিহিলিষ্ট বন্ধুগণের সাহায্যে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া এই স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে. তাহাদের পলায়নের পূর্ব্বে তাহার মুক্তিলাভের আশা নাই। যদি সে কোন কৌশলে মুক্তিলাভ করিতে পারিত—তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতিনী রেবেকাকে, তাহার কপটাচারী বৃদ্ধ পিতাকে অবিলম্বে কি ভাবে চূর্ণ করিত, তাহা মনকে বুঝাইবার জন্য সে সেই কক্ষের মেঝের উপর কয়েক বার সজোরে পদাঘাত করিল, কিন্তু আঘাত-বেদনায় অধীর হইয়া ভালুকের মত দাঁত বাহির করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অবশেষে নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কালনকি উঠিয়া সেই কক্ষের এক কোণে টেবলের উপর খাদ্যদ্রব্য ও মদ্য দেখিতে পাইল। সে বুঝিতে পারিল, কিছুকাল পূর্ব্বে কেহ তাহা সেখানে রাখিয়া গিয়াছে। কালনকি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিল. সে আহারে প্রবৃত্ত হইয়া মনে মনে বলিল, "ইহা মন্দের ভাল, বোধ হয়, উহারা আমাকে হত্যা করিবে না. কিন্তু নিহিলিষ্টদের বিশ্বাস করা কঠিন।"

আহার শেষ হইলে সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল, নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কালনকি ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "রেবেকা রাক্ষসী, শয়তানী, তাহার কদর্য্য-হৃদয় রূপের আবরণে আবৃত। সে মনে করিয়াছে, আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিবে। সে কোথায় পলাইবে? কত দূরে? আমি ত আট দশ দিন পরে মুক্তিলাভ করিব; তাহার পর তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, আর তাহার রূপে ভুলিব না, তাহাকে ধরিয়া স্বহস্তে হত্যা করিব, নতুবা আমার করিতে পারি, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাকে হত্যা করিবার সুযোগ পাইব। না, আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।"

কালনকি উঠিয়া গিয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইল. বাতায়নের বাহিরে ছাদের কার্ণিশ, তাহার বহু নিম্নে মুক্ত প্রান্তর, সে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই কোন দিকে দেখিতে পাইল না। কোন দিক হইতে কোন শব্দও তাহার কর্ণগোচর হইল না, চতুর্দ্দিকে শ্মশানের ন্যায় নিস্তব্ধ!

কালনকি সমস্ত দিন সেই রুদ্ধকক্ষে আবদ্ধ রহিল। সন্ধ্যার পর এক জন লোক একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত এবং দক্ষিণ হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা। সে সেই কক্ষের টেবলের উপর খাদ্যদ্রব্যগুলি রাখিয়া কালনকিকে কোন কথা না বলিয়াই প্রস্থান করিল, কিন্তু সে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিতে ভুলিল না। কালনকি তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "সেই পাপিষ্ঠাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অনাহারে থাকিলে ত বাঁচিব না,' জীবন ধারণের জন্য কিছু খাইতেই হইবে। যাহা দিয়া গেল, খাইয়া লই।"

সেই রাত্রিও সে অতিকষ্টে অতিবাহিত করিল। কিন্তু এই দুই দিনেই তাহার আকারের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল যে, হঠাৎ দেখিলে কেহ তাহাকে চিনিতে পারিত না। পর দিন প্রভাতে সে পলায়নের জন্য অধীর হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের নিকট টেবলখানি টানিয়া আনিয়া তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই বাতায়নের কয়েকখানি শার্সি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, খড়খড়িও জীর্ণ হইয়াছিল। কালনকি সহজেই শার্সি খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিল। বাতায়নে দুইটি স্থূল লোহার গরাদে ছিল; সে অতি কষ্টে উভয় গরাদের ভিতর মাথা প্রবেশ করাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু মুক্ত প্রান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সেই কক্ষের বাহিরে ছাদের ধারে 'আলিসা' ছিল, তাহাতে তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হওয়ায় অট্টালিকার নিম্ন ভাগ

করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা চৌকাঠের ভিতর প্রোথিত থাকায় খুলিতে পারিল না।

কালনকি হতাশ ভাবে টেবলের উপর হইতে নামিয়া পড়িল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যদি কোন উপায়ে একটা গরাদে খুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে ছাদে গিয়া নীচে নামিবার উপায় স্থির করিতে পারিতাম।"

কিন্তু সে সেই বাতায়নের গরাদে অপসারিত করিবার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না। কয়েক ঘণ্টা পরে মুখোসধারী লোকটি সশস্ত্র আসিয়া কালনকির খাবার রাখিয়া গেল। সে দিনও সে কালনকিকে কোন কথা বলিল না।

কালনকি ভোজন শেষ করিয়া পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কোনও উপায় না দেখিয়া সে হতাশ হইলেও পলায়নের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না; এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে সে বোধ হয় ক্ষেপিয়া উঠিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কালনকির নিষ্কৃতিলাভ

কালনকির আততায়ীরা তাহাকে হত্যা করিবে না— এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, সুতরাং প্রাণভয়ে সে কাতর হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে নিহিলিষ্টরা তাহাকে যে সময়ে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময়েই হত্যা করিত; তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়া প্রত্যহ দুই বেলা তাহার আহার যোগাইত না। রেবেকার ও তাহার পিতার পলায়নে সে বাধা দিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই সলোমনের দলের লোক তাহাকে সেই নির্জ্জন কক্ষে আটক করিয়া রাখিয়াছে, এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। রেবেকার ষড়যন্ত্রেই তাহার এই দুর্দ্দশা, ইহা বুঝিতে পারিয়া রেবেকার প্রতি তাহার সুগভীর প্রেম জ্বালাময় জিঘাংসায় পরিণত হইয়াছিল। রেবেকাকে হাতে পাইলে সে তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত, আঙ্গুল দিয়া তাহার চক্ষু দুটি উৎপাটিত করিত, এইরূপ তখন তাহার মনের অবস্থা। রেবেকাকে হত্যা করিবার সুযোগলাভের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও

কালনকি ইহাও বুঝিয়াছিল যে, যাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সেই কক্ষে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, অনুনয়-বিনয়ে বা অর্থলোভে তাহারা বশীভূত হইবে না; তাহাদের যে অস্ত্রধারী অনুচরটা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাহাকে দুই বেলা খাবার দিয়া যাইত, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়াও সে কোন ফললাভ করিতে পারিবে না। নিহিলিষ্ট দলের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করা কিরূপ কঠিন, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

ভোজন শেষ হইলে কালনকি তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের গরাদে দুইটির দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, "ঐ জানালার গরাদে দুইটি বসাইবার কারণ কি? তস্করেরা এই কক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐরূপ করা হয় নাই, কারণ, অট্টালিকার ছাদের উপর এরূপ একটা বাক্সে কুঠরীতে কেহ মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখে না। নিহিলিষ্টরা তাহাদের শত্রুদের ধরিয়া আনিয়া পূর্ব্বেও বোধ হয় এই ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিত এবং তাহারা ছাদ দিয়া পলায়ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে জানালায় ঐ গরাদে দুটি বসাইয়া দিয়াছে।" সে সেই পথেই পলায়নের জন্য আর এক বার চেষ্টা করিবে, স্থির করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে কালনকি তাহার তৃণশয্যা পরিত্যাগ করিয়া সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইল। সে সেই গরাদে দুইটি দুই হাতে ধরিয়া দীর্ঘকাল টানাটানি করিল, কিন্তু তাহা সরাইতে পারিল না; ক্রমাগত ঘর্ষণে তাহার হাত ফুলিয়া উঠিল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সে হাপাইতে লাগিল।

কালনকি হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কি ভাবিতেছিল, বরগার উপর সংস্থাপিত ছাদের টালিগুলির দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেবলের উপর দাঁড়াইয়া ঢালু ছাদ স্পর্শ করিল। তাহাতে করাঘাত করিয়া বুঝিতে পারিল, ছাদ পোড়া মাটীর পাতলা টালি দ্বারা নির্ম্মিত, টালিগুলি 'প্ল্যাষ্টার' দিয়া আঁটা; তাহার উপর শুরকীর অগভীর আবরণ। তাহার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল; সে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা একখানি টালির উপর ক্রমাগত আঘাত করিতে

গেল। তখন সে ছুরির চাপ দিয়া ভাঙ্গা টালির খণ্ডগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিল, টালির উপর যে জমাট চূণ ও শুরকীর আবরণ ছিল, তাহা তেমন পুরু নহে। ক্রমাগত ছুরির খোঁচা দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ছাদে একটি গর্ত্ত হইল। সে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল, অতঃপর সেই গর্ত্তটির পরিসর বর্দ্ধিত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। পাছে কেহ টেবলের উপর টালি ও জমাট চূণশুরকীর চাপ ভাঙ্গিয়া পড়িবার শব্দ শুনিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে পূর্ব্বেই টেবলের উপর কতকগুলি খড় বিছাইয়া রাখিয়াছিল। এই জন্য তাহার উপর ভাঙ্গা টালি ও শুরকীর চাপ ছাদ হইতে খসিয়া পড়িলেও শব্দ হইল না। সে দুই হাতে চূণ-শুরকী ও টালি ভাঙ্গিয়া দুই বরগার ভিতর অনেকখানি স্থান আলগা করিল এবং তাহার ভিতর দিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তাহার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না।

এই ভাবে এক ঘণ্টার অধিক কাল পরিশ্রম করিয়া কালনকি ঘামিয়া উঠিল, তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল, তথাপি সে পরিশ্রমে বিরত হইল না। অবশেষে সে দুই-খানি বরগার মধ্যবর্ত্তী একটি 'খাটালের' টালি খুলিয়া ফেলিল। এই সময় একখানি টালি তাহার হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। কালনকি ভাবিল, শব্দটা কেহ শুনিতে পাইয়া থাকিলে অবিলম্বে সেই কক্ষে উপস্থিত হইবে এবং তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে, তখন আর তাহার প্রাণরক্ষার আশা থাকিবে না। কালনকি টেবল হইতে নামিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল এবং সেই কক্ষে কেহ আসিতেছে কি না, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। কিন্তু চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, সে কাহারও পদ-শব্দ শুনিতে পাইল না।

কালনকি পুনর্ব্বার টেবলে উঠিয়া ভাঙ্গা খাটালটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সে বুঝিতে পারিল, সেই 'ফুকর' দিয়া ছাদে আরোহণ করিবার অসুবিধা হইবে না। তখন সে দুই হাতে দুই পাশের বরগা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল এবং খেলোয়াড়রা সমান্তরাল দণ্ডে (প্যারালাল বার) দুই পা বাধাইয়া, উভয় বাহুর পেশীর বলে সেই দণ্ডে যে ভাবে আরোহণ করে, কালনকিও সেই ভাবে খোলা খাটালের সমান্তরাল বরগার ভিতর দিয়া ছাদে উঠিয়া বসিল। ছাদে সে ললাটের ঘর্ম্মরাশি অপসারিত করিয়া সেই ফুকরের পাশে বসিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিল।

কালনকি তাহার শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে টালি ভাঙ্গিয়া ছাদে উঠিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু তখনও তাহার মুক্তি-লাভের বহু বিলম্ব। কয়েক মিনিট পরে বহুদূরস্থ গীর্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং শব্দে ৯টা বাজিল। সে ছাদে বসিয়া অন্ধ-কারাচ্ছন্ন মুক্ত প্রকৃতির দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, সেই অট্টালিকার নিকটে কোন গৃহ নাই, সেই অন্ধকারেও সে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত কতকগুলি শুভ্র অট্টালিকা দেখিতে পাইল। দক্ষিণে প্রায় ছয়-সাত মাইল দূরবর্ত্তী সেণ্টপিটার্স বর্গের নৈশ দীপরশ্মি ঊর্দ্ধাকাশে লোহিত আভা বিকীর্ণ করিতে-ছিল, কিন্তু উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমের দিক্‌চক্রবাল গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মসীমলিনবৎ প্রতীয়মান হইতে-ছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, সুতরাং চন্দ্রোদয় না হইলেও গগনবিহারী নক্ষত্রপুঞ্জের অস্ফুট আলোকে কালনকি বহু দূরের দৃশ্য অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল।

সে দিন বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী কি ষষ্ঠী। কালনকি অন্ধকারে ছাদ হইতে নামিবার অসুবিধা হইবে বুঝিয়া চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রিকালে তাহার শত্রুরা সেই অট্টালিকার রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাহার সন্ধান লইতে আসিত না; সুতরাং সেই রাত্রিতে কেহ তাহাকে দেখিতে আসিবে, এরূপ আশঙ্কা না থাকায় সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল; খণ্ডচন্দ্রের ক্ষীণপ্রভা মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে প্রতিফলিত হওয়ায় মুক্তিকামী কালনকি সতৃষ্ণ-নয়নে বহু দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রান্তরপ্রান্তে কৃষ্ণবর্ণ কানন-সন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি দেখিতে পাইল। তাহার নিকট চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত নদীজল দূর হইতে তরল রজতস্রোতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

কালনকি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই ছাদ হইতে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে যেখানে বসিয়া ছিল, সেই স্থান হইতে ষাট ফুট নীচে মাটী। কোন উপায়ে নীচে নামিতে না পারিলে তাহার স্বাধীনতালাভের আশা ছিল না। কিন্তু সে কি

রাত্রি ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল, পূর্ব্বাকাশের চন্দ্র তাহার মাথার উপর আসিল। যদি কেহ তাহার সন্ধান লইতে আসিয়া জানিতে পারে, পলায়নের চেষ্টায় সে ছাদে উঠিয়াছে, তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চয়, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। সুতরাং সে ছাদের উপর নিরুদ্যমভাবে বসিয়া না থাকিয়া পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। রেবেকাকে স্বহস্তে হত্যা করিবার জন্য, তাহার পিতাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত সে এতই অধীর হইয়া উঠিল যে, ছাদ হইতে ভূতলে অবতরণের জন্য কোন প্রকার দুঃসাহসের কার্য্য করিতে সে কুণ্ঠিত হইল না। ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কম্পিতপদে ঢালু ছাদের কিনারার দিকে অগ্রসর হইল; দুই হাতে ছাদ ধরিয়া প্রতিপদক্ষেপে তাহার আশঙ্কা হইল, হঠাৎ কোনরূপে পদস্খলন হইলেই তাহাকে ষাট ফুট নীচে পড়িয়া চূর্ণ হইতে হইবে।

সেই ছাদের এক প্রান্তে একটি চিমনী ছিল; কালনকি সেই চিমনী দুই পায়ে আঁকড়িয়া ধরিয়া ছুরীর সাহায্যে ছাদের প্রান্তবর্ত্তী দুইখানি টালি তুলিয়া ফেলিলে সেই ফুকর দিয়া দোতলার একটি বারান্দা দেখিতে পাইল। ফুকরের ঠিক নীচে বারান্দার প্রান্তভাগে একটি কাঠের রেলিং ছিল। কালনকি মনে করিল, যদি সে কোন উপায়ে সেই রেলিঙের উপর নামিতে পারে, তাহা হইলে সেই স্থান হইতে নীচে নামিবার ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু কি উপায়ে সে দোতলার বারান্দার রেলিঙের উপর নামিবে, তাহা প্রথমে সে স্থির করিতে পারিল না। সেই রেলিঙের দিকে চাহিয়া তাহার ধারণা হইল, ছাদ হইতে তাহার দূরত্ব ৯ ফুটের অধিক নহে, রজ্জুর সাহায্যে সে কয়েক হাত ঝুলিয়া পড়িতে পারিলে পা বাড়াইয়া রেলিং স্পর্শ করিতে পারিবে, তাহার পর অবলম্বন-রজ্জু ছাড়িয়া দিয়া দোতলার বারান্দায় নিঃশব্দে নামিবার অসুবিধা হইবে না; কিন্তু দড়ি কোথায়?

কয়েক মিনিট চিন্তার পর সে গায়ের কোট, ওয়েষ্টকোট ও সার্ট খুলিয়া ফেলিল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া লইল এবং সেগুলি পরস্পরের সহিত গ্রন্থি দিয়া জুড়িয়া দেখিল, তাহা কয়েক হাত দীর্ঘ হইয়াছে। রুমালখানি এক বরগার সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহার পরিচ্ছদ-নির্ম্মিত সেই অপরূপ রজ্জুর অন্য প্রান্ত ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত রেলিঙের উপর ঝুলিয়া পড়িল; তাহার কোটটিও ওয়েষ্টকোটের সহিত গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়াছিল; কিন্তু তাহার কোট ও ওয়েষ্টকোট অত্যন্ত পুরু কাপড়ে নির্ম্মিত বলিয়া গ্রন্থিবন্ধন দৃঢ় হয় নাই, পরিচ্ছদের অন্য প্রান্তে তাহার দেহের সমস্ত ভার পড়িবামাত্র সেই গ্রন্থি ফস্ করিয়া খুলিয়া গেল, সুতরাং সে সবেগে রেলিঙের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কাঠের রেলিংটি বহু পুরাতন ও জীর্ণ। সেই রেলিঙের উপর তাহার পদদ্বয় সবেগে পড়িতেই রেলিং সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল; সেই সঙ্গে কালনকি দোতলার বারান্দা হইতে প্রায় ৫০ ফুট নীচে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। তাহার রুমাল ও কোট তেতলার ছাদের বরগায় ঝুলিতে লাগিল, গ্রন্থিচ্যুত ওয়েষ্টকোট ও সার্ট তাহার হাতে রহিল।

রেলিং ভাঙ্গিয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় কালনকি প্রাণভয়ে করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল; কিন্তু পতনমাত্র তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইল। তাহার কপাল ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিল, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল; সে জড়ের ন্যায় অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল। পতনজনিত আঘাতে তাহার মুখমণ্ডল এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, মুখ দেখিয়া তাহাকে চিনিবার উপায় রহিল না। কোথায় গেল তাহার ক্রোধ? কোথায় রহিল তাহার জ্বালাময় সুতীব্র প্রতিহিংসা! সে রেবেকাকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য যে অনিন্দ্যসুন্দর ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেই ফাঁদে পড়িয়া তাহাকেই চূর্ণ হইতে হইল। পরমেশ্বর বিশ্বাসঘাতক হিংস্র খলের দুরভিসন্ধি কিরূপে ব্যর্থ করিবেন, তাহা কি সে পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে?

দুই জন লোক সেই অট্টালিকার নিম্নতলের একটি কক্ষে শয়ন করিয়া ছিল; তাহারা বারান্দার রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়িবার হুড়মুড় শব্দ ও সেই সঙ্গে কালনকির করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিল এবং জ্যোৎস্নালোকে কালনকির অসাড় দেহ ভূপতিত দেখিয়া, ব্যাপার কি, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিল। তাহারা নীচে আসিয়া কালনকিকে তুলিয়া লইয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। কালনকির তখনও শ্বাস বহিতেছিল, এবং

করিতেছিল। নিহিলিষ্টদ্বয় তাহাকে একখানি খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল; তাহাকে ব্রাণ্ডি পান করাইয়া সবল করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কালনকির জীবনীশক্তি তখন বিলুপ্তপ্রায়, সেবাশুশ্রূষায় কোন ফল হইল না। এক ঘণ্টা পরে—দূরস্থ গীর্জ্জার ঘড়ীতে যখন দুইটা বাজিল, আলেকজান্দার কালনকি ভব-কারাগার হইতে চিরমুক্তি লাভ করিল। সলোমন কোহেনের অভিসম্পাত এত দিনে সফল হইল।

গীর্জ্জার ঘড়ীতে যখন ৪টা বাজিল, সেই সময় নিহিলিষ্টদ্বয় কালনকির মৃতদেহ একটি বৃহৎ বস্তায় পুরিয়া, তাহার পর বস্তার মুখ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া বস্তাটি একটি বংশদণ্ডে আবদ্ধ করিল, এবং সেই বংশদণ্ড কাঁধে লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। প্রত্যূষে ৫টা বাজিবার পূর্ব্বেই তাহারা উভয়ে সেই বস্তা শূন্যে তুলিয়া দুই তিন বার আন্দোলিত করিয়া সবেগে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে 'ঝপাং' করিয়া একটা শব্দ হইল, নদীজল কয়েক মিনিটের জন্য আলোড়িত হইয়া পুনর্ব্বার স্থিরভাব ধারণ করিল। কালনকির শোচনীয় পরিণাম ও সলিল-সমাধির কথা কেহই জানিতে পারিল না। নদীর স্রোত যে ভাবে চিরদিন বহিয়া চলিয়াছে, সেই ভাবে বহিতে লাগিল।

সন্ধ্যা ৫টার সময় কালনকি আশা করিয়াছিল, সে যেরূপে পারে, নিহিলিষ্টদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিবে, রেবেকা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পলায়ন করিলেও খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিবে, তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, আর ১২ ঘণ্টা পরে তাহার অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইল। হায় মানুষের আশা, হায় নারীর রূপের মোহ!

বিংশ পরিচ্ছেদ

দীপ-নির্ব্বাণ

কাউণ্ট ভন আয়েনবর্গের চরিত্রের পরিচয় পাঠক-পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার চরিত্রগত দোষ ও দুর্ব্বলতার বহু প্রমাণ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত তিনি নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতেন না। পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবে; কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার আর কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং সে জালা জালা মদ গিলিয়া 'লিভার' পাকিয়া মরিয়াছে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া সুরাদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শাশুড়ীর অর্থে দিবা-রাত্রি তাঁহার স্ফূর্ত্তি চলিতে লাগিল। এক এক সময় তাঁহার মনে হইল, মোজের ধাপ্পায় ভুলিয়া তাহাকে ত্রিশ হাজার ক্রাঙ্ক প্রদান করা বড়ই নির্ব্বোধের কায হইয়াছে; কিন্তু পরের টাকা পরকে দিয়াছেন ভাবিয়া তিনি সান্ত্বনালাভ করিতেন।

কাউণ্ট, মোজের কথা বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু বার্থার সহিত তাঁহার যে মনান্তর হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার ধনবতী শাশুড়ীও তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল, তবে বৃদ্ধা সম্ভ্রান্তবংশীয় 'কাউণ্ট' জামাইকে চটাইতে সাহস করিত না; বিশেষতঃ সে সাধিয়া যাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল, তাঁহার সহিত বিরোধ করিলে লোকে কি বলিবে? সে কন্যা-জামাতার মধ্যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। বার্থা কোন দিনও কাউণ্টকে ভালবাসিতে পারে নাই। প্রথম জীবনের প্রণয় বিস্মৃত হওয়া তাহার অসাধ্য হইয়াছিল; হতাশ প্রণয়ী হতভাগ্য জোসেফের প্রেমময় মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত হইয়াছিল; কাউণ্টের উপাসনায় সে কিছু দিনের জন্য তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই আকর্ষণ মোহ ভিন্ন কিছুই নহে এবং মোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাউণ্টের জঘন্য চরিত্রের পরিচয় পাইয়া বার্থার হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহার এই ফল হইল যে, কাউণ্ট তাঁহার গৃহে বসিয়া মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন, কাউণ্টেস্ বার্থা স্বামীর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া তাহার মায়ের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। স্নেহময়ী জননী ভিন্ন সংসারে তাহার দ্বিতীয় অবলম্বন রহিল না। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিত, "ধনেই যদি সুখ হইত, তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না; কিন্তু জগতে আমার মত দুঃখিনী আর কে আছে?"

কাউণ্ট এক এক দিন শাশুড়ীর বাড়ী গিয়া পত্নীকে

আনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ; কারণ, ইহাতে তাঁহার স্বার্থ ছিল। তিনি জানিতেন, বার্থা দীর্ঘকাল বাকিয়া বসিয়া থাকিলে তিনি শাশুড়ীরও স্নেহ এবং বিশ্বাস হারাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুগ্রহেও বঞ্চিত হইবেন ; খরচের অভাব হইলে চাহিবামাত্র 'চেক' পাইবেন না, লাঞ্ছিত হইবারও আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বার্থা তাঁহার আদরের অভিনয়ে ভুলিত না ; সে তাঁহার প্রতি রূঢ় আচরণ না করিলেও এরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিত যে, কাউণ্ট বুঝিতে পারিতেন, আর তাঁহার ছায়াস্পর্শ করিতে তাঁহার পত্নীর আগ্রহ নাই। কাউণ্ট অগত্যা অন্য পথ অবলম্বন করিলেন, তিনি বার্থাকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পর্য্যন্ত তিনি বার্থার সন্ধান পাইলেন না ; তাহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিলেন না। ইহার ফল বড় অনুকূল হইল না, তিনি দুই এক মাস শাশুড়ীর নিকট 'চেক' পাইলেন না, শুনিলেন ব্যাঙ্কে টাকার অভাব!

অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি পত্নীর উপর স্বামীর অধিকার-স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন। এক দিন বার্থার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ বার্থা, আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার এই বোকামী নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আমারও সহিষ্ণুতার সীমা আছে, তাহা তোমার জানা উচিত।"

বার্থা ধীরভাবে বলিল, "সত্য না কি? আমার বোকামীটা কোথায় দেখিলে শুনিতে পাই না?"

কাউণ্ট সদর্পে বলিলেন, "নিশ্চয়ই বোকামী। তুমি তোমার স্বামীকে মানিতে চাও না, আর বাড়ী ছাড়িয়া মায়ের বাড়ীতেই পড়িয়া আছ, এ সকল কি?"

বার্থা বলিল, "ওঃ, ইহাই আমার বোকামী? কিন্তু সম্মানের পাত্রকে আমি কখন অসম্মান করি না ; আর যদি মায়ের বাড়ীতে বাস করাই আমার বোকামী হয়, তাহা হইলে আমার এই বোকামী ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই।"

কাউণ্ট মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার সংস্রব ত্যাগ করিয়া মায়ের কাছে পড়িয়া থাকিতেই তোমার ভাল লাগে কেন শুনি?"

বার্থা—"যাহা নিজেই বুঝিতে পার, তাহা আমার বাধ্য যে, এরূপও অনেক বিষয় আছে, যাহা তুমি বুঝিতে পার না বা চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাও না।"

কাউণ্ট (সকোপে)—"কি, তুমি আমাকে অন্ধ বলিলে?"

বার্থা বিদ্রূপভরে বলিল, "যাহার কপালের নীচে অত বড় দুটো চোখ জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে, তাহাকে অন্ধ বলিব—আমি কি এতই অন্ধ?"

কাউণ্ট—"অন্ধ না হও, তুমি দিন দিন বেল্লিক হইয়া উঠিতেছ! দেখ বার্থা! আমি তোমার স্বামী, গুরুজন ; তোমার উপর আমার অধিকার আছে—আমি সেই অধিকার স্থাপন করিতে চাহি। ভবিষ্যতে তোমাকে বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে হইবে, আমার বন্ধু ও অতিথিদের অভ্যর্থনার ও আদর-যত্নের ভারও তোমাকে লইতে হইবে।"

রেবেকা—"তোমার সঙ্গে কলহ করিবার জন্ত আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই ; কিন্তু আর তুমি আমাকে তোমার বশে থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিও না। সে আশা তুমি ত্যাগ কর ; তোমার হুকুম আমি মানিতে পারিব না। তুমি আমার স্বামী এবং তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে—তাহাও আমি বিস্মৃত হই নাই ; কিন্তু সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিব, মায়ের বাড়ীর সুখ-শান্তি ছাড়িয়া তোমার কাছেই পড়িয়া থাকিব, তোমার এ আব্দার আমি পূর্ণ করিতে পারিব না।"

কাউণ্ট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বটে! তুমি এত দূর বিগড়াইয়াছ? বেশ, তুমি তোমার মায়ের বাড়ীতেই সুখে বাস কর, আমিও নিজের খেয়ালে চলিব। আমার কোন ব্যবহারে তুমি মর্ম্মাহত হইলে আমি একবিন্দু দুঃখিত হইব না, তোমার মুখের দিকেও চাহিব না।"

বার্থা অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোমার যেরূপ অভিরুচি।"

অতঃপর পত্নীকে আর কোন কথা বলিতে কাউণ্টের সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বার্থার মা বৃদ্ধা স্মিট সে সময় বাহিরে গিয়াছিল, সে বাড়ী ফিরিলে বার্থা তাহাকে কাউণ্টের প্রসঙ্গে কোন কথা বলিল না। কি বৃদ্ধা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিল—কাউণ্টের সহিত কাউণ্টেসের বচসা হইয়া গিয়াছে। তাহার দুঃ

মেয়েটা চিরকালের জন্ত অসুখী হইয়াছে ভাবিয়া সে অনুতপ্ত হইল। খেতাবের লোভে একটা অপদার্থ, নিঃস্ব, দাম্ভিক, ভবঘুরের সঙ্গে বার্থার বিবাহ দিয়া কত বড় ভুল করিয়াছে—ইহা বুঝিয়া সে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। সে আশা করিল, এই দম্পতি-কলহ দীর্ঘস্থায়ী হইবে না, আবার তাহাদের মিলন হইবে। পাছে জামাইকে চটাইলে সে আরও বিগড়াইয়া যায়—এই ভয়ে বৃদ্ধা জামাতার সহিত অসদ্ব্যবহার করিল না; বরং তাহার ব্যবহারে স্নেহ-যত্নই লক্ষিত হইল। কাউণ্ট যথানিয়মে 'চেক' পাইতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিছু দিন চলিল, তাহার পর এক দিন আচম্বিতে সমগ্র পরিবারের উপর এমন বজ্রাঘাত হইল যে, সমস্ত সংসারটাই ওলট্-পালট্ হইয়া গেল! বৃদ্ধা স্মিট একেই অত্যন্ত স্থূলোদরী ছিল, তাহার উপর বয়সও অধিক হইয়াছিল। এই বয়সে এইরূপ অচল দেহ লইয়াও সে কঠোর পরিশ্রম করিত; কারখানার সমস্ত কায স্বয়ং দেখিত এবং সকল কাযের ব্যবস্থা করিত। হঠাৎ এক দিন তাহার কারখানার সহস্রাধিক শ্রমজীবী ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল,—তাহাদের কায কমাইয়া ও বেতন বাড়াইয়া না দিলে তাহারা কায করিবে না। সেই সময় এক জন সোসালিষ্ট প্রচারক জুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। অনেকগুলি কারখানার কুলী-মজুর এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়া কারখানার কায-কর্ম্ম অচল করিয়া তুলিয়াছিল, সোসালিষ্ট প্রচারক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—তাহারাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকারখানা চালাইতেছে, তাহাদেরই কার্য্যদক্ষতায় কারখানার মালিকরা টাকার পাহাড়ের উপর বসিয়া নবাবী করিতেছে; আর তাহারা দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বস্ত্রাভাবে শীত নিবারণ করিতে পারে না, রোগে ঔষধপথ্যের অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করে। এ অবস্থায় তাহারা কারখানাওয়ালা ধনীদের জন্ত কেন পরিশ্রম করিবে? কেনই বা তাহাদের অর্থসঞ্চয়ে সাহায্য করিবে?—এই ধর্ম্মঘটে স্মিট এণ্ড সন্সের কারখানার কায-কর্ম্মও বন্ধ হইল। বৃদ্ধা স্মিট তাহার কারখানার শ্রমজীবীদিগকে অন্যান্ত কারখানার কুলী-মজুর অপেক্ষা অধিক বেতন দিত, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিত; কিন্তু চারিদিকে যখন আগুন জ্বলিয়া উঠে—তখন সুরক্ষিত গৃহও রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বৃদ্ধা স্মিটের কারখানার অবস্থাও সেইরূপ হইল। সে ধর্ম্মঘট বন্ধ করিতে না পারিয়া ধর্ম্মঘটের নেতাদের সহিত মিটমাট করিবার জন্য তাহাদিগকে কারখানায় ডাকাইয়া আনিল এবং বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিল; কিন্তু তাহারা 'নরম' হইল না, বরং স্পর্দ্ধিত ভাবে তাহার মুখের উপর সমান জবাব দিতে লাগিল। বৃদ্ধা ক্রোধে, ক্ষোভে ও অপমানে বিচলিত হইয়া অবসন্ন দেহে বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী আসিয়া সে আর বসিতে পারিল না। তাহাকে ক্লান্ত দেখিয়া বার্থা তাহাকে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া কিছু আহার করিতে অনুরোধ করিল। বৃদ্ধা বলিল, "না মা, এখন আমার ক্ষুধা নাই, বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি; এখন দুই এক ঘণ্টা শুইয়া থাকি, সন্ধ্যার পর উঠিয়া কিছু খাইব।"

সে তৎক্ষণাৎ তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সময় আর কেহই তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। সন্ধ্যা ৭টার পর প্রধানা পরিচারিকা 'ডিনারের' জন্ত তাহার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে, বৃদ্ধার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উঠিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তাহার সাড়া পাইল না; তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল—দেহ তুষার-শীতল; বক্ষের স্পন্দন রহিত হইয়াছে!—দাসী সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বার্থা সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহার জননীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—তাহার মা মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই।

বার্থা আর্ত্তনাদ করিয়া মাতার দেহের উপর আছড়াইয়া পড়িল, ব্যাকুল স্বরে বলিল, "এ কি করিলে মা! তোমার দুঃখিনী মেয়েকে ছাড়িয়া, সকল মায়া কাটাইয়া কোথায় চলিয়া গেলে! মা! মা!"

কিন্তু কে উত্তর দিবে? বৃদ্ধা জীবনের খেলা শেষ করিয়া যে লোকে প্রস্থান করিয়াছিল, সেখান হইতে কেহ সাড়া দিতে পারে না। [দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



বীজ উৎপাদন ব্যবসায়

বীজ, সার ও জল—এই তিনটি কৃষির মূল ভিত্তি। বর্ত্তমান রাজকীয় কৃষি-কমিশন ভারতের নানা স্থানে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সকল প্রদেশেই উৎকৃষ্ট বীজ, সুলভ সার এবং জলসেচনের ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব আছে। কোন কোন ফসল বিনা সারে ও সামান্য জল সাহায্যে উৎপাদন করা যায়; কিন্তু সুবীজ না হইলে কখনই ভাল ফসল জন্মান সম্ভবপর নহে। দীর্ঘকালব্যাপী অবহেলার ফলে ক্ষেত্র ও উদ্যানজাত প্রায় সমস্ত সাধারণ ফসলই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সুবীজ উৎপাদন কৃষির উন্নতিকল্পে যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে জড়তা আমাদিগকে জাতীয় জাগরণের সকল বিভাগেই পরিস্ফুট, কৃষিকার্য্যেও তাহার অভাব নাই। সাধারণতঃ চাষীগণ হাতের নিকট যে বীজ পায়, তাহাই বপন করে; নিজে চেষ্টা করিয়া সুবীজ উৎপাদন করা ত দূরের কথা, যদি সামান্য দূরবর্ত্তী স্থানেও উৎকৃষ্টতর বীজ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহারা সেরূপ বীজ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে না।

ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা

আপাততঃ বীজ-ব্যবসায় বলিয়া এতদ্দেশে যে কোন ব্যবসায় আছে, তাহা কেহ কেহ হয় ত স্বীকার করিতে চাহিবেন না। ইহার পরিসর এত ক্ষুদ্র এবং প্রকৃত বীজ-ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত কম যে, উক্ত প্রকার ধারণা করা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ বীজ-ব্যবসায়ের এইরূপ দীনাবস্থার জন্যই সুবীজের এত অভাব। এতদ্দেশীয় বাজারে সুফসলের মর্য্যাদা খুবই কম; এমন কি, শিক্ষিত লোকও গুণ (quality) অপেক্ষা রাশির প্রতি (quantity) অধিক লক্ষ্য করেন। অনেক কৃষকই তাহার নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদিত দের এবং যাহারা সেরূপ সঞ্চয় না করে, তাহারা মহাজনের নিকট অথবা হাটে যে কোন প্রকারের বীজ কিনিয়া লয়। কলিকাতা সহরেও যে সকল ব্যক্তি অথবা তথাকথিত নর্শরী কোম্পানী বীজের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশের প্রধান অবলম্বন বৈঠকখানার হাট। কোন বীজের বংশপরিচয় পাওয়া একান্ত কঠিন এবং এক বীজ হইতে অন্য গাছ না হইলেও অনেক ক্রেতা প্রতারিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, বীজওয়ালাগণ যাহা বলে, কার্য্যতঃ সেরূপ ফলন হয় না। প্রকৃতপক্ষে বীজওয়ালাগণ বীজের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেই পারে না; কারণ, সে সম্বন্ধে তাহাদিগের স্বকীয় অভিজ্ঞতা নাই। তাহারা ক্ষুদ্র চাষীর নিকট বীজ ক্রয় করিবার সময় যে বর্ণনা পায়, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। আবার ক্ষুদ্র চাষীগণও যে বীজ বিক্রয় করিতে আনে, তৎসমস্তই যে তাহাদিগের স্বক্ষেত্রজাত, তাহা নহে; তাহারাও আর পাঁচ জন প্রতিবাসীর বীজ সংগ্রহ ও একত্র করিয়া পাইকারের নিকট বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। সুতরাং তাহারাও সকল বীজের গুণ অধিক অবগত নহে; তাহার উপর অতিরঞ্জন ত আছেই। অন্য দিকে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র বীজের, দুই চারি প্রকারের (variety) সংমিশ্রণ ক্ষণিক দৃষ্টিতে ধরা যায় না। কাযেই অনভিজ্ঞ সাধারণ সহজেই প্রতারিত হয়। ফলতঃ সাধারণ বীজওয়ালাগণের নিকট কিছু অধিক মাত্রায় বীজ লইয়া যদি কেহ সুন্দররূপে পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন—(১) যে নামে বীজ বিক্রয় হইতেছে, তদ্ভিন্ন উহাতে অন্যান্য ফসল ও আগাছার বীজও আছে; (২) কুটা ও ধুলা-বালির মাত্রা অন্ততঃ শতকরা ২-৫ ভাগ; (৩) প্রকৃত ফসলের বীজগুলিও সমস্ত সুপরিপক্ক এবং সুস্পষ্ট নহে ও তাহা ফলে অঙ্কুরোদগমের হার কখনই শতকরা ৭০-৮০ ভাগের অধিক হয় না; (৪) অনেক স্থলেই বীজ এক প্রকারের

ফসলের গুণাবলী যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। পূর্ব্বে অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ লোকজন রাখিয়া ধান্যাদি ক্ষেত্রস্থ ফসল চাষ করিতেন; তাহাতে সযত্নে সুবীজ সংরক্ষিত হইয়া খাদ্যশস্যের উৎকর্ষ সাধিত হইত। আজকাল অর্থশালী ব্যক্তিগণের সখের চাষ উদ্যানের সীমাবদ্ধ; ইহার দ্বারা কতিপয় জাতীয় বিলাতী সব্জী ও মরসুমী ফুল চাষের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশীয় কৃষির কোন উপকারই হয় নাই।

কৃষি-বিভাগের কার্য্য

লর্ড কর্জ্জনের সময় কৃষিবিভাগ সমূহের সংস্কার সাধিত হইবার পর হইতে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎভাবে ভারতীয় কৃষির যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গল হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান ফসলের উৎকৃষ্ট জাতিনির্ব্বাচন ও প্রজনন অন্যতম। অবশ্য, প্রচলিত শস্যজাতিসমূহ হইতে উৎকৃষ্টতর জাতি পৃথক করিয়া লওয়া ও তাহার বংশানুক্রমিক চাষ দ্বারা লক্ষণাদি সুপ্রতিষ্ঠিত করা (fixing characters) সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইহার মধ্যেই এই বিভাগের কার্য্যে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ। পূর্ব্ববঙ্গ, মাদ্রাজ, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ—এ সমস্ত স্থলেই শতকরা ১০—২৫ ভাগ অধিক ফলন-শীল ধান্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুষার ১২ ও ৪ নং পঞ্চনদের ১১নং গোধুমের উৎকর্ষ গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া লোক উহাদের অধিক পরিমাণে চাষ করিতেছে। উন্নত-জাতীয় ইক্ষুরও প্রসার বাড়িতেছে। নিখিল ভারতের অভাবের এবং প্রচুর অর্থ-ব্যয়ের তুলনায় এইরূপ ২।৪টি উন্নত ফসল আবিষ্কারে যে খুব বেশী কায হইয়াছে, তাহা নহে,—তবে ইহা যে একটি মহৎ কার্য্যের অনুসূচনা, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ভারতকে একটি মহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার নানা প্রদেশের এবং এমন কি, একই প্রদেশের বিভিন্ন জিলার মধ্যে জল, বায়ু ও মৃত্তিকার এত প্রভেদ যে, কোন বিশেষ প্রকারের ফসল সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাকুক, কোন সমগ্র প্রদেশের পক্ষে যে উপযোগী হইবে, তাহা আশা করিতে পারা যায় না। বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট স্থানীয় অবস্থার উপযোগী নানা প্রকার বীজ ব্যবসায়ের হিসাবে প্রত্যেক জিলাতেই সুবীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কার্য্য যখন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইবে, তখনই কৃষির বাস্তবিক উন্নতি হইবে। আপাততঃ যে সমস্ত সরকারী বীজ-ভাণ্ডার (seed stores) আছে, সেগুলির দ্বারা সম্যক্‌রূপে অভাবমোচন হইতেছে না এবং তৎসমুদয় হইতে যে বীজ দেওয়া হয়, মূল্যে অথবা গুণে বাজারের বীজ অপেক্ষা সেগুলি যে অধিক সুবিধাজনক, তাহাও সাধারণভাবে বলা যায় না।

বিদেশীয় বীজ-ব্যবসায়

শিল্পাদির ন্যায় কৃষিকার্য্যেও যে এক সময়ে ভারতে সুশৃঙ্খলা ছিল না, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু শৃঙ্খলার প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। যেখানে প্রতি গ্রামই সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী, সেখানে কৃষিকার্য্য স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু শস্যের সংখ্যা অথবা উহাদের প্রসার অধিক না হইলেও যেগুলির পূর্ব্বকালে চাষ হইত, বহু বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে সেগুলি অধিবাসিগণের অভাব-পূরণের ঠিক অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। • তখন বীজ-ব্যবসায় গ্রামে গ্রামেই চলিত; এখন উক্ত ব্যবসায় গ্রাম হইতে বড় বড় 'গঞ্জে' এবং তথা হইতে ক্রমশঃ সহরে কেন্দ্রীভূত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহাতে বীজে ভেজালের মাত্রা অধিক হওয়া ও তৎসঙ্গে এক প্রকারের বিশুদ্ধ বীজের পরিবর্ত্তে নানা প্রকারের সংমিশ্রণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতীচ্যে কৃষিকার্য্য অনেক স্থলে ব্যবসায়িক হিসাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। কাজেই সে সকল দেশে বীজের বহুল প্রচারের জন্য বিস্তর সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এ স্থলে ক্যানাডার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি;—ইহা এখনও কৃষিপ্রধান দেশ এবং ইহার দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে শস্য সরবরাহ করিয়া থাকে। সরকার ও সাধারণের সমবেত চেষ্টায় তথায় কৃষির এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, নিকৃষ্ট ফসল প্রায়ই দেখা যায় না। কৃষিকর্ম্মোৎসাহী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ক্যানাডার নানা স্থানে বীজ-উৎপাদক মণ্ডলী (Seed-growers' Association) স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট বীজ

মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনেরও প্রধান সহায়। মণ্ডলী নিজে বীজ-ব্যবসায় করে না; পুস্তক, পুস্তিকা ও সচিত্র মূল্য-তালিকাদি প্রকাশ করিয়া এবং কৃষকগণের প্রশ্নাদির উত্তর দিয়া সুবীজ সম্বন্ধীয় আবশ্যক জ্ঞান প্রকাশ করে। নানা স্থানে যে সকল বীজ উৎপাদন-কেন্দ্র আছে, মণ্ডলী তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করে। অন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা নানা স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ, পরিষ্কার ও উপযুক্ত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণ পূর্ব্বক ক্রেতৃগণকে সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহারাও যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ ভিন্ন অন্য বীজ না রাখে, মণ্ডলী তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। এই প্রকার কার্য্যের জন্য বীজ-উৎপাদক মণ্ডলী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পায়। এতদ্ভিন্ন যাহাতে সুবীজ প্রচারের সুবিধা হয়, তদুদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ প্রকারের সুলক্ষণযুক্ত বীজ রেজেষ্টারী করিবার নিয়মও সরকার করিয়া দিয়াছেন। কৃষক যে মার্কা অথবা বর্ণনার বীজ চায়, তাহার স্থলে অন্য বীজ দিলে ব্যবসায়ী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয়। এই সমুদয় ব্যবস্থা ব্যতীত একটি বীজ-ক্রয় কমিশনও (Seed Purchase Commission) আছে। উহা দেশমধ্যে যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট নব উদ্ভাবিত বীজ পায়, তাহা ক্রয় করে এবং যে সমস্ত অঞ্চলে উহার উত্তম চাষ হইতে পারে, তথায় প্রবর্ত্তন করে। ঠিক এইরূপ না হইলেও, ক্যানাডার ন্যায় জাপানেও সুবীজ প্রচারের ও অপকৃষ্ট ফসল উৎপাদন ও রপ্তানী নিবারণের সম্যক্ ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য যে, মার্কিণ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে বড় বড় বীজ উৎপাদন কারবার সংস্থাপন এই জন্য সম্ভবপর হইয়াছে। প্যারী নগরীর উপকণ্ঠে Vilmorin Andrieux কোম্পানীর সুবৃহৎ বীজ-বাগিচা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহুকাল হইতে বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে এই কোম্পানীর বাগিচাসমূহে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদিত ও নব নব জাতির সৃষ্টি হইতেছে। বিলাতের Sutton ও Carter, মার্কিণের Landreth ও জার্ম্মাণীর Erfurt অঞ্চলের কয়েকটি কোম্পানীর নাম এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ ও সরকারের সহযোগিতা

সরকারী কৃষিগবেষণাগার সমূহের কার্য্যের ফলে কয়েক ভারতের ন্যায় সুবিশাল দেশে উহাদের বিশুদ্ধ চাষের বহু বিস্তার একক সরকারের সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে সাধারণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকেই উৎপাদন ও প্রচার-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে, সরকারী চেষ্টায় যেটুকু ফল হওয়া সম্ভবপর, তাহাও হইবে না। দুঃখের বিষয় যে, সরকার এখনও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। পক্ষান্তরে, তাঁহারা সময়ে সময়ে এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন যে, তাহাতে স্বতঃই সাধারণের সহানুভূতি চলিয়া যায়। নির্ব্বাচিত ধান ও পাট-বীজ উৎপাদনের ভার বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ খেতাব বাগিচা-ওয়ালাগণের হস্তে অর্পণ করার দৃষ্টান্ত আছে এবং এমন কি, বিহারের কোন কোন বাগিচাওয়ালা এইরূপ বীজ উৎপাদন করিয়া উক্ত বিভাগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। বঙ্গদেশের জন্য বীজ বিহার হইতে উৎপাদন করাইয়া আনা যে কত দূর হাস্যাস্পদ ব্যাপার, সে কথা ছাড়িয়া দিলেও কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যে বীজ যে অঞ্চলে ব্যবহৃত হইবে, তাহা তদঞ্চলেই কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎপাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলেই উক্ত বীজপ্রসূত ফসল স্থানীয় অবস্থায় সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে। এ স্থলে আরও একটি বক্তব্য এই যে, বঙ্গদেশে শিক্ষিত বেকারের অভাব নাই; যদি সেরূপ ব্যক্তিগণকে বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায় এবং কৃষিবিভাগ যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত পন্থা দেখাইয়া ও তাহাদিগের নিকট বীজ ক্রয় করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কৃষিকার্য্যে অনুরাগ বৃদ্ধি পায় ও সুবীজের অভাবও অনেক পরিমাণে দূর হয়। কিন্তু ইহাও স্মরণযোগ্য যে, অপরাপর বিভাগের ন্যায় কৃষিবিভাগও গবর্ণমেণ্টের একটি বিভাগ এবং কোন সরকারী বিভাগই লাল ফিতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না।

বঙ্গে ফসলের চাষ

ভারতে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা যে অনেক অধিক, তাহা বঙ্গদেশের সাধারণ কৃষির অবস্থা দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মোট আবাদী জমীর পরিমাণ ছিল ২৫৩ লক্ষ একর; ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে উহা কমি

৭ লক্ষ একর কর্ষিত জমী হ্রাস পাইয়াছে। ইহার অবশ্য অনেক কারণ আছে; কিন্তু চাষে লাভ হয় না বলিয়া অনেকে যে কৃষিকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে এবং লাভ না হওয়ার মূলে অধিক ফলনশীল বীজের অভাব যে অন্যতম, তাহা অনুমান করা আদৌ অযৌক্তিক নহে। বস্তুতঃ কয়েকটি প্রধান ফসলের ফলনের হার বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কিরূপভাবে কমিয়া গিয়াছে, সরকারী রিপোর্টেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ফসলের গড়পড়তা ফলন হিসাব করিবার একটি সরকারী পদ্ধতি আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে ধানের ফলন ছিল একর প্রতি ১১৩৪ পাঃ (৮২ পাঃ ১ মণ); ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে উহা ১০২৯ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। যে দেশে এক মুষ্টি অন্নের জন্য সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে দেশের সর্ব্বপ্রধান ফসলের ২০ বৎসরের মধ্যে ১০০ পাঃ অর্থাৎ প্রতি বৎসর প্রায় ৫ সের হিসাবে ফলন কমিয়া যাওয়া সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা জীবন-মরণের সমস্যা এবং অচিরাৎ ইহার প্রতীকার হওয়া যে আবশ্যক, সে সম্বন্ধে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না।

অন্য দিক হইতে দেখিতে গেলেও বঙ্গদেশের কৃষির অবস্থা অতি শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। অনেক ভারতীয় ফসলেরই অন্যান্য দেশের তুলনায় ফলন খুব কম। সেরূপ তুলনা না করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি হারে ফলন হয়, তাহা তুলনা করিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্গভূমির সুফলা বলিয়া গর্ব্ব করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে:—

প্রদেশের নাম	ফসলের ফলন	একর প্রতি	পাঃ হিঃ।	
	ধান্য	সরিষা	ইক্ষু	পাট
বোম্বাই	১২৩০	৬২৫	৬৯৫০	—
মাদ্রাজ	—	—	৬৪২০	—
সিন্ধু	১৩৫২	—	—	—
বর্ম্মা	১৪২০	—	—	—
আসাম	—	৫০৮	—	১৪০০
যুক্তপ্রদেশ	—	৬০০	—	—
বিহার ও উড়িষ্যা	—	৪৯২	—	১২০০
বঙ্গ	১০২৯	৪৮৫	৩০৬৫	১৩৪০

উপরি-উক্ত তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, বিভিন্ন প্রদেশের ফলনের তুলনায় বঙ্গদেশ ধান্যে চতুর্থ, সরিষায় পঞ্চম, ইক্ষুতে বোম্বাই প্রদেশে ইক্ষুর যে ফলন হয়, বঙ্গে তাহার অর্দ্ধেকও হয় না এবং এমন কি, পাট, যাহা বঙ্গের নিজস্ব, তাহাতেও তাহার স্থান আসামের নিম্নে। বঙ্গে কৃষির অধোগতির আর অধিক উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

শিক্ষিত সাধারণের কর্ত্তব্য

কৃষির উন্নতির সহিত নানা বিষয় জড়িত আছে। জল-সেচনের ব্যবস্থা, উন্নত শ্রেণীর কৃষি-যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তন, রাসায়নিক অথবা অন্যবিধ সার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের সূচনা করিতে সময় ও সরকারী সাহায্য আবশ্যক। বীজ উৎপাদন সম্বন্ধেও উক্ত মন্তব্য আংশিকভাবে প্রযুজ্য। বীজ-উৎপাদন উদ্ভিদ-প্রজনন ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু ইহার দুইটি দিক আছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিক হইতে অগ্রসর হইতে হইলে অবশ্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাহা যে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহা স্বীকার করা যায় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উদ্যানপালক অথবা ক্ষেত্র-পালক উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনে সমর্থ। লুথারার ব্যাঙ্ক, যাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভিদসৃষ্টি জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে, তিনিও বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ছিলেন না এবং যে সমুদয় লোক আজকাল ইংলণ্ড, মার্কিণ, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে নূতন রকমের বীজ উৎপাদন করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহারাও কৃতবিদ্য, উদ্ভিদশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নহে। ব্যবসায়িক হিসাবে বীজ উৎপাদনে আবশ্যক—সাধারণ ভদ্রলোকোচিত শিক্ষা, পর্য্যবেক্ষণশক্তি, অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি কৃষিকর্ম্মে উৎসাহ। এই কয়েকটির একত্র সমাবেশ হইলে যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র অথবা উদ্যান লইয়া বিরাট ফললাভ করিতে পারেন। যে জ্ঞান লইয়া বীজ উৎপাদনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দরকার, তাহা অর্জ্জন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে এবং সাধারণ প্রথায় নির্ব্বাচনকার্য্য পরিচালন করিতেও বহুল ব্যয় প্রয়োজন হয় না। বীজক্ষেত্রের (seed farm) আয়তন ও ফসলের প্রকৃতি হিসাবে কারবারের মূলধনের তারতম্য হইয়া থাকে; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা এত অধিক নহে যে, সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের আয়ত্তের সীমা অতিক্রম করে। আমাদিগের ধনী ও অবসরবহুল জমিদারগণ যদি এই কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে দ্রুতগতিতে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সরস্বতীর বিয়ে



১

তাহার নামটা যে কি, এ পর্যন্ত কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। সরস্বতী নামেই তাহার প্রসিদ্ধি; সেই নামেই সকলে তাহাকে চিনিত ও ডাকিত।

সরস্বতীর একটা বাস্তুভিটা ছিল, আর লুকান কিছু অর্থ ছিল। সে অর্থ তেজারতি কারবারে সে খাটাইত, আর বাটীর মধ্যে তিন চারিখানি ঘর সে ভাড়া দিত। তাহাতেই তাহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু সহসা সুদী কারবারে একটা মোটা রকমের লোকসান খাইয়া সে শুইয়া পড়িল, সংসার তাহার অস্বচ্ছল হইল। তাহার মুখ দিয়া তখন "হা-হতোহস্মি" বাহির হইল। সরস্বতী কিছু সংস্কৃত জানে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা, সেই সংস্কৃতটুকু জানার জন্যই বোধ হয় সে সরস্বতী।

জ্যোতিষও সে কিছু কিছু শিখিয়াছিল। তবে তাহার যে শিক্ষা, তাহাতে ঐ শাস্ত্রের বেশ একটা সূক্ষ্ম বিচার করা চলে না। কিন্তু কলিকাতা সহরে সব চলে বলিয়াই সরস্বতী একটা "জ্যোতিষ-গণনালয়" খুলিয়া বসিল, আর তাহাতে দুই পয়সা আসিতেও লাগিল। সাধে কি রসিক কবি গান রচনা করেন—

বলি হারি কল্‌কাতা,
যেথা—চালতা-ফুলও বিকায় হাটে
ঘোড়া কুকুর পায় ভাতা!

পয়সা ত আসিতে লাগিল; কিন্তু সরস্বতীর ভাগ্যে সুখ হইল না। তাহার স্ত্রী-পুত্র সকলই আছে; কিন্তু কেহই তাহার বাধ্য নহে, অন্ততঃ সরস্বতীর তাহাই ধারণা।

পুত্র উপার্জ্জনক্ষম। যাহা কিছু সে উপার্জ্জন করে, সমস্ত অর্থই সে তাহার মাতার হস্তে তুলিয়া দেয়। সরস্বতী সে ব্যবস্থা পছন্দ করে না। সে চাহে, পুত্রের উপার্জ্জনের টাকা তাহার হস্তেই পড়ে। পুত্র বলে— মাতাপিতার মধ্যে হইল। তাহার দুঃখ কষ্টের টাকা গর্ভধারিণীর হস্তে দিয়া সে অপার্থিব সুখ পায়। তাহাতে তাহার পিতার ক্ষুণ্ণ হইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

এই ব্যাপার লইয়াই পিতা-পুত্রে মতান্তর পরে মনান্তর। শেষে সমস্ত রাগটা পড়িল পত্নীর উপরে। সংসারটা অকারণে ভাঙ্গিয়া গেল। ভুল, পিতা-পুত্র দুজনেরই। সংসারের গৃহিণীকেও এ বিষয়ে কতকটা দায়ী করা যায়। জেদের মামলা কোনও পক্ষেই থাকা উচিত ছিল না। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে তাহাই হইয়া পড়িল। স্ত্রী-পুত্র সরস্বতীর পর হইয়া গেল। কেহ বলিল, "বিট্‌কেল সরস্বতী।" আবার কেহ কেহ বা বলিল, "অবাধ্য স্ত্রী-পুত্র।"

২

এই যে কাণ্ডটা হইল, তাহার পর হইতেই সরস্বতী কেমন যেন এক প্রকার হইয়া পড়িল। জ্যোতিষ যদিও সে কিছু জানিত না, তথাপি বুদ্ধি করিয়া ব্যবসায় সে এক প্রকার চালাইতেছিল। কিন্তু এখন চিন্তাসমুদ্রে পড়িয়া সে বুদ্ধি তাহার নষ্ট হইয়া গেল। এখন কেহ হাত দেখাইতে বা কোষ্ঠী-বিচার করিতে আসিলেই সরস্বতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, বিবাহযোগ্যা কোনও কন্যা তাঁহার সন্ধানে আছে কি না।

দুষ্টবুদ্ধি যুবকের সংখ্যা সে পল্লীতে অল্প ছিল না। তাহারা অনুমান করিয়া লইল, বৃদ্ধ সরস্বতী স্ত্রী-পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া হয় ত মাথা খারাপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ফলেই হয় ত সে বিয়ে-পাগলা হইয়া গিয়াছে। সরস্বতীর বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হইবে।

যত দিন যাইতে লাগিল, সরস্বতীর রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর ততই বাড়িতে লাগিল। তখন কাহারও আর অবিদিত রহিল না যে, রোগীর রোগ কিরূপ চরমে উঠিয়া...

ধুতি কোঁচাইয়া পরিধান করে, "সাঁপা কাটে", কাল বার্ণিসের পাম্প-সু পায়ে দেয়, আতর-গোলাব মাখে, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দেয়, মাঝে মাঝে আবার থিয়েটার-বায়স্কোপেও যায়—এক কথায় 'ছোকরা' সাজিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হয়, সরস্বতী এখন তাহা সকলই করিতে লাগিল। এই সকল কাণ্ড করিতে যাইয়া তাহার জ্যোতিষের ব্যবসায় মাটী হইতে বসিল। সরস্বতীর কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে বলে, মনের শান্তি না পাইলে পয়সা রোজগার করিয়া কি হইবে?

সরস্বতী আর লাঠি লইয়া রাস্তায় চলে না, কারণ, লাঠি ব্যবহার করে বৃদ্ধের দল। চসমাও সে আর ব্যবহার করে না—কেন না, তাহাতেও যেন জোর করিয়া বৃদ্ধত্ব আসিয়া পড়ে। তাহাকে আর ঠাকুরদাদা বলিবার উপায় নাই; সে নামে কেহ ডাকিলে সরস্বতী তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, —বয়স তাহার ত্রিশ বত্রিশ হইবে। বিবাহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, সরস্বতী উত্তর দেয়,—হইয়াছিল বটে, কিন্তু পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ভগবান্ তাহাকে বিপত্নীক করিয়াছেন।" আর একটা আধা সংস্কৃত, আধা বাঙ্গালা শ্লোক তাহার মুখে এখন সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়-

"পুত্রাথে কিয়তে ভাজ্জা
পুত্রের পিণ্ড প্রয়োজনম্।"

ছোকরার দল সেই অপরূপ শ্লোক শুনিলেই বলিতে থাকে, "সরস্বতীর বালাই নিয়ে মরি রে!"

ব্যাপার ক্রমেই ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ছেলের দলও সরস্বতীকে সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া বসিল। কেহ বলে, "সরস্বতী ঠাকুদ্দা, নিমবাবুর মেয়েটির সঙ্গে 'এবাউট্ এমের' কি হইল? আমরা চাঁপাতলায় খাটের বায়না দিয়েছি। তোফা খাটে চ'ড়ে যাবে, আমরাও হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাব, কেমন?" সরস্বতী বাপন্ত-পিতন্ত করিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া মারিতে যায়। এবাউট এমের অর্থ—বিবাহের বিষয়ে কি হইল? সরস্বতীর তখন বাটী হইতে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িল।

৩

পাড়ার সাত আট জন প্রবীণ লোক মিলিয়া সরস্বতীর ...র সম্বন্ধ অবশেষে স্থির করিতে বসিলেন। তাহা করা ভিন্ন আর উপায় রহিল না। সরস্বতী তাহার জন্য তাঁহাদের এক প্রকার উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

সরস্বতীর পণ ছিল যে, তাহার ভাবী পত্নী বিত্তশালিনী হইবে, কন্যার ত্রিকুলে কেহ থাকিবে না—যদি থাকে ত একটা বিধবা মাতা থাকিতে পারে। তাহার উপর কন্যাটি সুন্দরী যুবতী হওয়া চাই, বিদুষী হওয়া চাই—তাহার শিল্পকর্ম্ম জানা চাই এবং গীতবাদ্য ও নৃত্য জানা চাই।

এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাট্যকলাটা বাদ দিচ্ছ কেন বাবাজী?"

অধর টিপিয়া হাসিয়া সরস্বতী কহিল, "তা' হ'লে ত ভালই হয়। কিন্তু আমার জ্যোতিষ পাত্রীর নাট্যকলা সম্বন্ধে কিছু বল্ছে না। তবে তা হয় যদি ত আমার আপত্তি নাই।"

আর এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগদ টাকা, অলঙ্কার, বরাভরণ, শয্যা, দানের জিনিষ সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা?"

সরস্বতীর মুখে আবার মধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ও সব কথায় আমার কোনও কথা নাই। তবে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি ত থাক্বেই। আমি সেই সব দেখাশুনা করব, টাকা-কড়ি আদায়পত্র করব, নিজের হ্যাপাজতে রাখব, আর ইচ্ছামত অবশ্য খরচ-পত্রও করব।"

মুরুব্বীদল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা করবে বৈ কি। তখন ত সেটা তোমার পৈতৃক সম্পত্তির তুল্যই হবে। খরচ-পত্র তুমি না করলে ভালই বা দেখাবে কেন, আর তোমার চল্বেই বা কেন?"

হাস্যের বৈদ্যুতিক প্রবাহে বদন-গহ্বর এক কর্ণ হইতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া সরস্বতী কহিল, "এই—এই—আপনারা মুরুব্বী লোক, বোঝেন-শোঝেন, তাই কথাটা তলিয়ে বুঝলেন। আর ছোঁড়ার দল বলে কি না, আমি পরের ধনে পোদ্দারি করতে চাই! ওঃ হারামজাদারা ত বোঝে কত!"

সেই সময়ে একটি যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর উদ্দেশে বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরদা—"

কথা আর যুবককে শেষ করিতে হইল না। সরস্বতী তাহার অভ্যাসসিদ্ধ সাধুভাষার তুবড়ী ছাড়িয়া দিল। সরস্বতী বুঝাইতে চাহে, ঠাকুরদাদা সে কিছুতেই হইতে পারে না—কারণ, তাহার বয়স অল্প আর স্বভাবও বালকের মত।

ঠাকুরদাদা যদি কেহ হয়, তবে সেই ছোকরার বাপ সেই "ছোকরা" স্বয়ং এবং তাহার ঊর্দ্ধ ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ।

সরস্বতী ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আরও বলিতে লাগিল, "ঐ ছোঁড়া কি ছেলে! ওটা পিলে, আরসুলার নাদি, ষাঁড়ের গোবর, হুতোমের ল্যাজ, মাতালের খালি বোতল, জ্বরো রোগীর বমি, পচা ঘায়ের পুঁজ!..হারামজাদা আমাকে বলে কি না ঠাকুরদাদা; আ গেল রে!"

এই দেবভাষা শুনিয়া যুবক আপ্যায়িত হইল। যুবক জানে—গালি না খাইলে রঙ্গ জমিতে পারে না কিছুতেই।

যুবক আর দুই এক বার "ঠাকুরদা ঠাকুরদা" করিতে সরস্বতী শ্রীচরণ হইতে ছিন্ন পাদুকা খুলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল. আঙ্গুল মটকাইয়া অভিসম্পাত দিল। হাসির তরঙ্গ তুলিয়া যুবক একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তখন সরস্বতী বলিল, "অমাবস্যার রাত্রে.কাল গাড়িতে জল রেখে তিন বার এমন তিনটে সং রং বং ডাকিনী মন্তর ঝাড়বো—রক্ত হেগে মরতে হবে তোকে, জানিস্?"

"মুরুব্বীর" দলের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "এঃ সরস্বতী, প'ড়ে গেলে যে হে—বয়সের জন্য নয় ত?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুক চিতাইয়া সরস্বতী কহিল, "আজ্ঞা না।"

"আজ্ঞা না কি হে, তুমি প'ড়ে গেলে যে!"

"আজ্ঞা, ওটা ইচ্ছে ক'রে।"

"কি রকম?"

"আজ্ঞা, ওটা কসরৎ দেখালাম!"

"বেশ, বেশ; কিন্তু আঘাত লাগে নি ত?"

"কিছু নয়। দিনের ভিতর কমন দু'শোবার আমি প'ড়ে যাই। দু' মণ দুটো ল্যাডাম্ দুটো ক'ড়ে আঙ্গুলে ঝুলিয়ে রাখতে পারি।"

"হাঁ, তবে ত ভাল। আচ্ছা, তোমার শক্তির পরিচয় একটু দাও দেখি!"

"তা কি মশায়, সব সময়ে ও পরিচয় দেওয়া যায়! লুচি-পাঁঠা ছ' মাস ভাল ক'রে খাই আগে, তার পর শক্তির পরিচয় দয়া ক'রে গ্রহণ করবেন!"

সকলেই একরূপ দম বন্ধ করিয়া হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিল।

এক জন মুরুব্বী তাহারই কাঁধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সরস্বতী, তোমার ত দেখ্‌ছি সবই ভাল। কিন্তু কিছু কাব্যচর্চ্চা কর কি? আজকালের বিয়েতে ও সব ত দরকার হয় খুব!"

মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে সরস্বতী বলিল, "তা বেশ পারি। এই শুনুন না একটা কবিতে—

আমি সরস্বতী নহি মূর্খ হাতী
পাতিনেবু খেয়ে কাটাই না রাতি;
আছে বুকের ছাতি
মারি যদি লাথি
লেগে যায় দাঁতি
অরাতি কুলের—"

"আরে, ও কি কবিতা হে?"

"আজ্ঞে, ও হ'ল বীররসের কবিতে।"

"আরে রাম, বিয়েতে বীররসের কবিতে কি হবে হে? ওতে চাই মোলায়েম ভাব—"

"তা' ও আমি র'চে দিতে পারি। এই শুনুন—

বদন তুলিয়া চাও—কোরো না রোদন,
জেনো আমি সরস্বতী
আমিই তোমারি পতি
থাম সতি, হবে ক্ষতি—"

মুরুব্বীরা বলিলেন,—"বাঃ বাঃ!"

ছোকরার দল বলিল,—"সাক্ষাৎ কবি কালিদাস!"

ভাবে গদগদ হইয়া সরস্বতী বলিল,—"আজ্ঞে,বক্তৃতেও আসে এ অধমের। সে বার পান্তির মাঠে বক্তৃতে শুনে সুরেন বাঁড়ুয্যে সেকহেণ্ড করেছিল জানেন।"

সকলে বলিল,—"বটে! বটে!"

এক ছোকরা বলিল, "শুধু বক্তৃতে? ঠাকুরদাদার একটিঃ শোনেন নি ত? বলি হ্যাগা—"

সরস্বতী চটিয়া আগুন, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "হ্যাগা কি রে হারামজাদা? হ্যাগা!"

মুরুব্বীরা মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। তাঁহারা সরস্বতীর নিকট হইতে সন্দেশ পাইবেন বলিয়া আশা পাইয়াছিলেন। তাহাতেই সরস্বতীর সকল দোষ খণ্ডন হইয়া গেল। স্থির হইল, তিন চারি দিনের মধ্যেই সরস্বতীর বিবাহ হইবে। পাত্রীটি ভাল—নিমতলার ঘাটে ছাদ-খোলা বাড়ীতে বিবাহের আসর এবং বাসর হইবে।



৪

একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ঠিকা ফিটন গাড়ী ডাকাইয়া তিন চারি জন বরযাত্রী সঙ্গে করিয়া সরস্বতী বিবাহ করিতে চলিয়া গেল। নিতবর হইলেন রসময় বাবু—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ হইবে।

আনন্দময়ীর তলায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া বরযাত্রিগণ পাত্রীর বাড়ী অনুসন্ধান করার অজুহতে গাড়ী হইতে নামিয়া একে একে সরিয়া পড়িল। জন-প্রাণীরও আর দেখা নাই; চেলির কাপড়, টোপর ও পুষ্পমাল্যে শোভিত হইয়া জাঁতি হাতে বর একাকীই সেই গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিল। কিন্তু রাত্রি-প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য আবার যখন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইল, তখন সরস্বতীকে বুঝিতে হইল, সে সময়ে আর বিবাহের আশা নাই। কাযেই তাহাকে সেই বর-বেশেই আপনার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। সমস্ত রাত্রি গাড়ী আটকাইয়া রাখিবার জন্য সরস্বতীকে অর্থদণ্ড দিতে হইল, গাড়ী বাবদে পাঁচ টাকা, গাড়োয়ানের খোরাকী আট আনা ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের ঘাস-দানা প্রভৃতি বাবদে আঠার আনা। এই অর্থ-দণ্ড দিয়া তবে সরস্বতী গাড়ী হইতে নামিতে পাইল। টাকা না পাওয়া পর্য্যন্ত কোচম্যান সরস্বতীকে গাড়ী হইতে নামিতে দেয় নাই।

প্রভাতে সেই অপরূপ বেশে বাড়ী ফিরিয়া পল্লীবাসীর নিকট সরস্বতী অনেক কৈফিয়তের দায়ে পড়িয়া গেল। তাহাতে তাহার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। তবুও কিন্তু সরস্বতীর বিবাহের নেশার ঘোর কাটিল না। পল্লীর লোক বলিতে লাগিল—সরস্বতীর ওটা উদ্বাহ নয়, উদ্বন্ধন। সরস্বতী রাগিয়া বলিল,—"আচ্ছা তাই, তাতে তোদের বাবার কি? বেটাচ্ছেলেরা, আমার যে এ দিকে লুপ্ত-পিণ্ডোদক-ক্রিয়া হবার উপক্রম হয়েছে, সে দিকে কোনও মিয়ার হুঁস নাই।"

রসময় বাবু হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভায়া, কাল রাত্তিরে তোমার কি ভারী কষ্ট হয়েছিল?"

মুখখানা বাঙ্গালা পাঁচের মত করিয়া সরস্বতী বলিল,—"আরে যাও, তোমরা ভারী বেল্লিক। বিয়ে দেবে ব'লে ভিজিয়ে-ভুজিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি না আমাকে নিম-তলার ঘাটে ছেড়ে দিয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে এলে।

"তা একটু অন্যায় হ'ত বৈ কি। তবে কি জান, লাগলে বিয়ে বিবক্ষু হ'ত।"

সরস্বতী বলিল, "কি রকম?"

রসময়ের সঙ্গে যে ছোকরা আসিয়াছিল, সে বলিল, "ঘাটের মড়ার গায়ে মড়ার ধোঁয়া লাগবে,—"

"তবে রে পাজী" বলিয়া সরস্বতী তাহাকে তাড়া করিল, সে পলাইয়া গেল।

রসময় বলিল, "আরে, যেতে দাও, ও সব চেঙ্গড়া চোড়ার কথায় রাগ করে?"

সরস্বতী বলিল, "তা ত হ'ল, কিন্তু বিয়ের কি?"

"আরে, সেই ত হচ্ছে কথা। তোমার সেই 'চাণক্য বন্ধু' সতীশ ভায়াই ত এই সব গোল বাধালে।"

"এঁ্যা—বাধালে?"

"হাঁ—হাঁ, সেই ত যত গোল বাধালে। তোমার জন্য যে পাত্রী আমরা স্থির করেছিলাম, সতীশও সেই পাত্রীকে বিয়ে করতে চায়!"

"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি জানি, ঐ বামনাটা আমার চির-শত্রু! যেখানে আমার বিয়ের কথা হয়েছে, সেইখানেই ও ভাংচি দিয়েছে।"

"অথচ মুখে ত তুমি বরাবর ব'লে এসেছ, সে তোমার বন্ধু।"

"কিছু না, কিছু না দাদা ও শুধু আমার মুখের কথা! বন্ধু যদি কেউ থাকে ত তুমি। তা যা হয়, একটা কিছু কর দাদা! বিয়ের কালটা বইয়ে দেওয়া ভাল নয়—আমার জ্যোতিষও ঐ কথা বলে।"

"তা ত বলে, কিন্তু বিয়ে হয় কেমন ক'রে? ব্যাপার যে ভারী সঙ্গিন হয়ে উঠেছে।"

"উঠেছে না কি? তা হ'লে ত দেখছি, ভারী গোল!"

"খুব—অত্যন্ত—বিসম!"

"তা হ'লে কি হবে, দাদা?"

"একটা উপায় করতে পারা যায়—"

"যায় যদি ত কর না দাদা; ও সব ত তোমারই হাতে।"

"কতকটা হাতে বটে, কিন্তু তোমাকেও একটা কায করতে হয়।"

"আমি তাতে পঁচিশ আনা রাজী। কি করতে হবে

"ঠিক ত ?"

"আমার জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত ঠিক। কি করতে হবে, তাই বল ?"

"তোমার আর পক্ষের ছেলেটাকে কাছে রাখতে হবে, বাড়ীতে ও হাড়িতে স্থান দিতে হবে। পারবে ?"

সরস্বতী সবিস্ময়ে বলিল,—"আমার ছেলে ?"

"হাঁ—হাঁ, ও সব ন্যাকামী রাখ। ঐ ছেলেটাকে কাছে এনে রাখার একটা মতলব আছে। প্রথম মতলব হচ্ছে, তাতে শত্রুসংখ্যা তোমার ক'মে যাবে ; আর দ্বিতীয় মতলব হচ্ছে, তোমার নবীনা স্ত্রী সতীনপোর লাঞ্ছনা দেখে তৃপ্তি লাভ করবে। এই কড়ারটি না দিলে এখানেও তোমার বিয়ে ভেঙ্গে যাবে—হাঁ, তা আমি ব'লে রাখছি। তোমার বন্ধু সতীশচন্দ্র এখানেও আনাগোনা করছে।"

"তাই ত দাদা, ভারি বিপদে ফেললে ত। স্ত্রীর বেটাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছি এখন তাকে ডাকি কি ব'লে ?"

"সে সব আমরা ঠিক ক'রে নেব। তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। বল, তুমি রাজী ত ?"

"রাজী না হয়ে আর কি ক'রি, দাদা ?"

"বেশ, কিন্তু আর একটি কড়ার আছে।"

"আঃ—কড়ারে কড়ারেই আমাকে মারলে দেখছি বল, নাড়ার ডিম, কি কড়ার ?"

"কিছু কাল এখন স্ত্রী তোমার সঙ্গে কথা কইবে না, তুমি তার ঘোমটা খুলে মুখ দেখতে পাবে না। তবে তুমি কথাও বলবে, আর দাঁর সেবাও গ্রহণ করবে, তাতে কোনও আপত্তি নাই। কেমন রাজী ?"

"রাজী না হয়ে আর করছি কি বল ? বিয়ে ত করা চাই-ই !"

কথা পাকাপাকি হইয়া গেল—সরস্বতী সকল কড়ারই স্বীকার করিল। কিছুতেই তাহার আর কোন আপত্তি রহিল না। সরস্বতীও কিন্তু রসময়কে দিয়া এই প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল যে, তিনি সতীশ যেন এ বিবাহের সংবাদ বিন্দু-বিসর্গও না পায়। আর একটা কথাও এই সঙ্গে রসময়ের মুখ দিয়া সে স্বীকার করাইয়া লইল যে, এবার রসময় বা তাহার দল যেন তাহাকে নিমতলা কিংবা কাশী মিত্রের ঘাটে না লইয়া যায়, আর যাত্রার দলের ছেলে কি কাহারও বাড়ীর জরাজীর্ণা গোলচক্ষু দাসীকে পাত্রী সাজাইয়া যেন তাহার চক্ষুতে ধূলা না দেয়। এ ব্যাপারও যে না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। একবার সতীশের কন্যা ও পুত্রবধূ তাহাদের দাসী [illegible] শাড়ী, বসন ও অলঙ্কারপত্র দিয়া বাড়ীর বুড়া ঝি নন্দর মাকে সাজাইয়া কনে দেখাইয়াছিল। সরস্বতী কনে দেখিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, "মেয়েটির অঙ্গসৌষ্ঠব ভাল।"

সেই পাকা দেখায় ছেলেরা সরস্বতীর নিকট ৮০ টাকা খাবার আদায় করিয়াছিল।

সরস্বতীর বিবাহ হইয়া গেল। রসময়ের স্ত্রী আসিয়া সরস্বতীর স্থানে এখন স্বামী বশ করিবার কৌশল শিখাইয়া যায়। আর রসময় স্বয়ং সরস্বতীকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য তালিম দেয়। এই চেষ্টার ফলে সরস্বতী কিছু দিনের মধ্যে অনেকটা মানুষ হইয়া উঠিল, আর সে স্বামী-বধূর [illegible] আনন্দনাদিনী জীবন-সঙ্গিনী হইয়া পড়িল। সরস্বতী পত্নীর সেবায় আর রসময়ের পরামর্শে ক্রমে আর এক মানুষ হইয়া গেল—তাহার জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। কিছুকাল পরে প্রাকৃতিক বধূরাণীর ঘোমটা সরাইয়া সরস্বতী যখন মুখ দেখিতে [illegible] তখন সে দেখিল রাজলক্ষ্মী, তাহার প্রথম বয়সেরই [illegible] হিতা স্ত্রী !

তাহাতে কিন্তু সরস্বতীর ক্ষুব্ধ হইবার কারণ থাকিল না। এখন তাহার সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী দেখা দিয়াছে। [illegible] দুশ্চিন্তাও তাহার দূর হইল। কেবল একটিমাত্র কথা সরস্বতী রসময়কে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি রকম হ'ল, দাদা ?"

রসময় হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার [illegible] ছাউনী নাড়ার একটু দোষ ছিল, এবার সে তাহা [illegible] দিয়াছে।"

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

বরদার অবৈতনিক গ্রন্থালয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কার্য্যবিস্তৃতি

বরদার গ্রন্থালয় বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি প্রথমতঃ সাধারণ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(ক) রাজধানী বরদানগরে সীমাবদ্ধ এবং (খ) বরদা রাজ্যের সর্ব্বত্র।

বরদাস্থিত কেন্দ্রীয় মূল গ্রন্থালয় এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যালয় হইয়াছে। রাজধানীর যাবতীয় কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পাদন করিয়া মফঃস্বলের কার্য্যাদিও আংশিকভাবে যথাযথ পরিচালনা, পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিতে হয়। এই কারণে নিম্নলিখিত উপবিভাগগুলি কেবলমাত্র বরদা নগরের কর্ত্তব্যসম্পাদনেই ব্যাপৃত থাকে (ক)—

১। সাধারণ কার্য্যালয়।

২। পুস্তক আদান-প্রদান বিভাগ।

৩। অনুসন্ধান এবং তালিকা বিভাগ।

৪। সাধারণ পাঠাগার।

৫। বালক-বালিকা এবং মহিলাদের পাঠাগার।

৬। মহিলাদের বিশেষ গ্রন্থালয়।

৭। সংস্কৃত পুস্তক বিভাগ

৮। দপ্তরীখানা (পুস্তক বাঁধান বিভাগ)।

(খ) মফঃস্বল বিভাগে নিম্নলিখিত কার্য্যালয়গুলি উল্লেখযোগ্য—

৯। মফঃস্বল-প্রতিষ্ঠান-পরিচালন বিভাগ।

১০। যাযাবর গ্রন্থালয় বিভাগ।

১১। দৃশ্যাবলীর সাহায্যে শিক্ষাদান-বিভাগ।

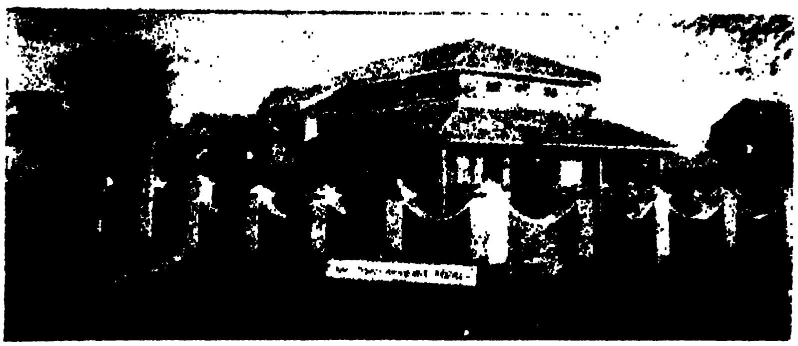
বরদার জনসাধারণের মধ্যে এতাদৃশ দ্রুতগতিতে শিক্ষা-বিস্তারের প্রধান কারণ কয়টি সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) রাজপরিবারের বংশানুক্রমিক বিদ্যানুরাগ এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান মহারাজের আন্তরিক সহানুভূতি, (২) সরকার পক্ষের আশানুরূপ সাহায্যদান, (৩) মিঃ এম্-এন্ আমিনের উদ্ভাবনীশক্তি, জনহিতৈষণা এবং অসাধারণ প্রচারকার্য্য, (৪) মিঃ জে, এস্, কোদালকর এবং মিঃ ডবলিউ এ বর্ডোনএর সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যশক্তি এবং (৫) সর্ব্বোপরি জাতিধর্ম্ম বা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে অবৈতনিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা। এই সমস্তের সম্মিলিত শক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান



বরদার গ্রন্থালয় বিভাগ দৃঢ় ভিত্তির উপর সুগঠিত হইয়া আমাদের আদর্শস্থানীয় হইয়াছে বলা যায়। মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টায় সমগ্র বৃটিশ-ভারত এবং দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে বরদা আজ প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা আমাদেরও গৌরবের বিষয়।

উপরে লিখিত উপবিভাগগুলির মধ্যে ৪,৫,৬,৯,১০ এবং ১১ সংখ্যক শাখা কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীচে যথা-সম্ভব সংক্ষেপে ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বরদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ে (যাযাবর বিভাগসহ) মোট ১১৭,৫০৭ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতে বরদা গ্রন্থালয়ের পাঠকসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই পুস্তকালয় হইতে এক-মাত্র বরদানগরেই বাৎসরিক প্রায় দেড় লক্ষ পুস্তক সাধারণ পাঠকরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বরদানগর ও সেনা-বাসের সমগ্র অধিবাসীকেই অবৈতনিকভাবে গ্রন্থালয় ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। কাযের সুবিধার জন্য মিঃ বর্ডোন পাঠকবর্গের গ্রন্থালয়ে প্রবেশের সকল বাধা উঠাইয়া দিয়াছেন। এখন পাঠকরা কর্ম্মচারীর সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব অভিলাষানুযায়ী পুস্তকাদি নিজেরাই বাহির করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে এক দিকে পাঠকদের যেমন সময় বাঁচিয়া গিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে কর্ম্মচারীদিগের পরিশ্রমও লাঘব করা হইয়াছে। পুস্তকগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন পাঠকের হস্তক্ষেপ হওয়াতেও শৃঙ্খলার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য নূতন পাঠকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারী গ্রন্থরক্ষকরাও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন।



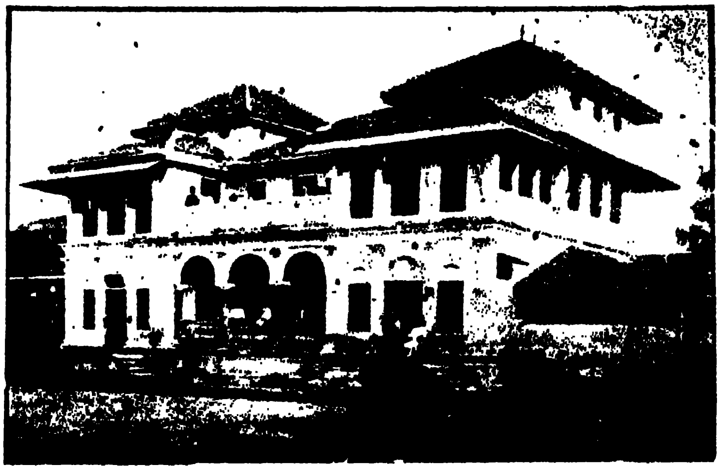
চাঙ্গা—সাধারণ গ্রন্থাগার

সাধারণ খবরের কাগজ এবং মাসিক পত্রিকাদির পাঠাগার দৈনিক ১২ ঘণ্টা খোলা থাকে। উক্ত পাঠাগারে

রাজধানীর বালক-বালিকা এবং মহিলাদের মধ্যে শিক্ষ বিস্তারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক ব উপযুক্তা গ্রন্থরক্ষিকার অধীনে বালক-বালিকা ও মহিলাদ পাঠাগার ও গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিশুগ্রন্থালয়ে হাজারের উপর ইংরাজী পুস্তকই আছে। এতদ্ব্যতীত দে ভাষার হাজার হাজার পুস্তক ত আছেই। ১৯১৩ খৃষ্টা বর্ত্তমান মহারাজা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বালক-বালিকাদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ঐকান্তি যত্নে এই পাঠাগারটি আজ আশানুরূপ সাফল্য লাভ কা য়াছে। গ্রন্থালয় বিভাগের প্রত্যেক কাযটি শৃঙ্খলার সহি পরিচালিত হয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশেষভা শিশুবিভাগেই দর্শকদের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হ ছেলে-মেয়েরা এখানে যেন মায়ের সতর্ক স্নেহদৃষ্টির অভ্যন্ত থাকিয়া ইচ্ছানুযা খেলাধূলা, গল্পগুজব পড়াশুনা করি থাকে। ছোট-অসংখ্য শিশুদ্বারা প পূর্ণ হইয়া সুসজ্জি পাঠাগারটি সর্ব্বদ আনন্দমুখরিত থাবে বালক বালিকা পাঠাগারে বাড় ন্যায় আদর-যত্ন পায় বলিয়া ইহাকে নিজের গৃহ হই ভিন্ন মনেই করিতে পারে না। ছোট শিশুদিগকে বি খেলার সাহায্যে শিক্ষা দিবার জন্য পাঠাগারে এক বিশেষ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সব ছেলেমেয়ে ইংরা পুস্তক পড়িতে জানে না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোব আছে। শিশুদিগের উক্ত খেলা-ঘরটি পাঠাগারের চতুর্থত অবস্থিত। এই কক্ষটি সুপ্রশস্ত এবং তাহাতে অবাধ বা চলাচলের সুব্যবস্থা আছে। কক্ষটি সুসজ্জিত, আসবাব যথেষ্ট। ক্ষুদ্র শিশুদের উপযুক্ত স্থানীয় ও ইংরাজী ভা বহু পুস্তক তথায় সংরক্ষিত আছে। শিশুদের উপযুক্ত বি খেলার সামগ্রী ও আমোদ-প্রমোদের সেখানে অভাব ন বলিলেই চলে। এক সময়ে একটি সমগ্র বিদ্যালয় বা তাহ

দ্বারা উৎসাহিত করা হয়। উপরে লিখিত বিবরণ যে বিন্দু-মাত্রও সত্যের অপলাপ নহে, তাহা শিশুবিভাগের চিত্রগুলির প্রতি (গত সংখ্যায় প্রকাশিত) একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ছোট ছোট বালক-বালিকারা কেমন একাগ্রচিত্তে আনন্দের সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান চঞ্চলমতি শিশুদিগকে পর্য্যন্ত এমনভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিমগ্ন রাখিতে পারে, তাহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতেই পারে না।

সম্পূর্ণভাবে নারীদের পরিচালনাধীনে মহিলা-গ্রন্থালয় বিভাগটি পাইয়া বরদার সৌভাগ্যবতী মাতৃজাতি আপনার কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দিবার সুযোগলাভ করিয়াছেন। মহিলা-গ্রন্থালয়ের নিজস্ব যথোপযুক্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাদি থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনমত ইহা কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের সাহায্য পাইয়া থাকে। গ্রন্থালয়ের বিধিবদ্ধ দৈনন্দিন কার্য্যাদি ব্যতীত এই বিভাগের শিক্ষিতা মহিলারা স্বেচ্ছাসেবিকারূপে দেশের ও দশের কাযও সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বরদার শত শত লোক প্লেগের নিষ্ঠুর আক্রমণে মারা গিয়াছিল। অধিবাসীরা তখন সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিত। সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে উক্ত বিভাগের মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকারা লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া বিশেষভাবে শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অন্যান্য সাহায্য দানের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদিও বিতরণ করিতেন এবং তাহাদিগকে বিবিধ আমোদ-প্রমোদ দ্বারা প্রফুল্ল রাখিতে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শঙ্কাযুক্ত স্থানে তাঁহাদের উপস্থিতি এবং মাতৃহৃদয়-সুলভ স্নেহসিক্ত সেবাকার্য্য কি যেন এক করিয়াছিল। সেবাকার্য্যের এরূপ আশ্চর্য্য সাফল্য কদাচিৎ দেখা যায়।



ফতেসিংহ রাও গ্রন্থাগার

গ্রন্থালয় বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষের দায়িত্বাধীনে মফঃস্বল বিভাগ পরিচালিত হইয়া থাকে। সুদূরবর্ত্তী বিভিন্ন জিলাস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন ইত্যাদি কাযে তিনি শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকবৃন্দের সাহায্য পাইয়া থাকেন। সমগ্র গ্রন্থালয় বিভাগের চাঁদাদাতা সভ্যদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়া মফঃস্বলের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন। উক্ত বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুপরিচালিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্য দেখানও ঐ সমিতিরই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দায়িত্ব। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই বিভাগ স্থাপিত হয়। ইহার কার্য্যকারিতা বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য। বৎসরের পর বৎসর অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নে উদ্ভাবনী-শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার, পঞ্চায়ত (জিলাবোর্ড) এবং জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনটির সাহায্যই অবহেলার বস্তু নহে। এই তিন শক্তির সমন্বয়েই বিধি-ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া থাকে, ইহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখানে ইহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক সহরেই সুদৃশ্য গ্রন্থালয়-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এমন কি, সুদূরবর্ত্তী অপ্রসিদ্ধ অনেক পল্লীতেও নিজস্ব গ্রন্থালয়-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনা রাজ্যময় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৮ শত পল্লী-গ্রন্থালয় এবং পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গ্রন্থালয় কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যয়েই নির্ম্মিত হইয়াছে।

গ্রন্থালয় বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ মিঃ নিউটন দত্ত মহাশয় (অমর কবি মাইকেল মধুসূদনের পুত্র) অতি দুঃখের সহিতই বলিয়াছেন—"গ্রামবাসী জনসাধারণ কর্ম্মীদের সেবাকার্য্যের বিনিময়ে সামান্যমাত্র পারিশ্রমিক দিতেও কুণ্ঠিত হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাসেবকরা পর্য্যায়ক্রমে বিনা পারিশ্রমিকেই গ্রন্থরক্ষণ হইতে গৃহ-পরিষ্কার পর্য্যন্ত সকল কার্যই সুসম্পাদন করিয়া থাকেন।"

কোন সৎকার্য্যে সাধারণ গ্রামিকের এরূপ ঔদাসীন্য আমাদের বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই হৃদয়-বিদারক এবং জাতীয় অপমানকর সৎকর্ম্ম বিমুখতার ব্যাখ্যা না করিলেও চলে।

অনুকম্পাই গ্রামবাসীর এরূপ অকর্ম্মণ্য স্বভাবের পরিচয়, দৈনিক অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি।



বরোদার অন্তর্গত ডাভোর সাধারণ গ্রন্থাগার

দেশে এই প্রথা মহারাজ গাইকোয়াড় কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে নূতন আমদানী হইয়াছে। অনেকের এ বিষয়ে যথাসম্ভব জানিবার আগ্রহ থাকিতে পারে। নিশ্চেষ্ট জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের ইহা একটি উৎকৃষ্ট পন্থা, সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে আমাদের যুবক কর্ম্মীসঙ্ঘের ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়াই মনে করা উচিত। যাযাবর গ্রন্থালয় বলিতে সাধারণতঃ এক জনের বহনোপযোগী একটি বাক্স এবং তাহাতে ২৫-৩০ খানা পুস্তক বুঝায়। এই বাক্সটি এরূপ সুদৃঢ় হওয়া দরকার যে, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রামিকরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও সহজে নষ্ট না হয়। যে কোন পল্লী-গ্রন্থালয়, বিদ্যালয়, সম্মিলনী, কারখানা, প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আবেদন করা মাত্র ঐরূপ একটি বাক্স ৩।৩ মাসের জন্য গ্রন্থালয় বিভাগের অনুমতিক্রমে যে কোন কেন্দ্রীয় শাখা-প্রতিষ্ঠান হইতে বিনাব্যয়ে পাইতে পারে, যদি তাহারা যথারীতি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বইগুলি আদান-প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়। অবৈতনিক গ্রন্থ-

ব্যয় বহন করিতে হয় না। এমন কি, পুস্তকাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য মুটেভাড়া, গাড়ীভাড়া, ডাক-খরচ প্রভৃতিও গ্রন্থালয় বিভাগ হইতে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকের যোগ্যতানুসারে যাযাবর গ্রন্থালয়ের পুস্তকগুলি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে পুরাতন পুস্তক ফেরত দিয়া পুনঃ নূতন গ্রন্থ যাযাবর গ্রন্থালয় পাইতে পারে।

ইহাই যাযাবর গ্রন্থালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এইখানেই পরিষ্কাররূপে উক্ত গ্রন্থালয়ের কার্য্যপদ্ধতি ও কর্ত্তব্যসীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সময় সময় কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়গুলির



কাওয়াসজী পানজি ভাই পজদার গ্রন্থাগার

অভ্যার্থে যাযাবর শাখাগুলি বিভিন্ন স্থানে আদর্শ চিত্রাদি ও খেলার সামগ্রী জনসমাজে বিতরিত করিয়া থাকে।

বিবিধ দৃশ্যাবলীর সাহায্যে অশিক্ষিত জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাকে দৃশ্যাবলীর সাহায্যে শিক্ষাদান বিভাগ বলা যায়। আমাদের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, সুতরাং এই বিভাগটির প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব বর্ণনার অতীত। আমাদের উচিত। উক্ত বিভাগের কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অশিক্ষিত জনসাধারণের যেমন আশু কল্যাণসাধন করা যায়, তেমন আর কিছুতেই আশা করা যায় না।

তুলনা

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অবৈতনিক বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের অমিত সুযোগ যে দেশীরাজ্য দিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার জন্য আমাদের অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়া থাকিতে পারে, তাই নিম্নে শিক্ষাবিষয়ে বরদা ও অন্যান্য স্থানের তুলনামূলক দুইটি তালিকা দেওয়া গেল ;—

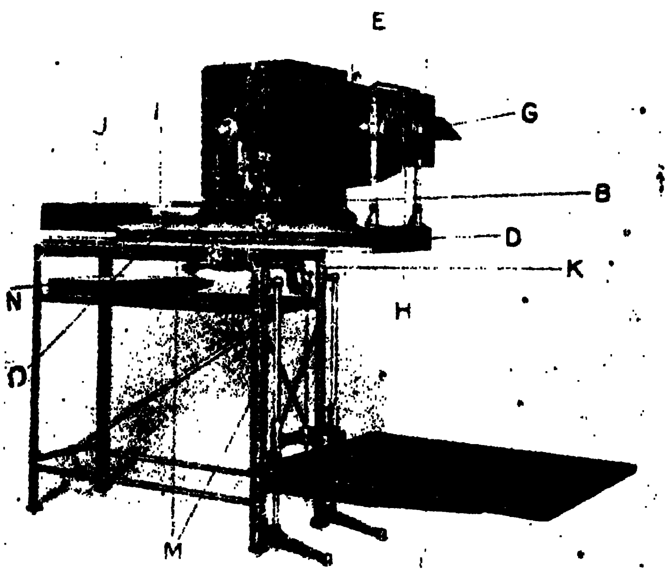
১।

প্রদেশ বা দেশীরাজ্য	সাধারণ শিক্ষা হাজার-করা	ইংরাজী শিক্ষা হাজার-করা
ব্রহ্ম	৩১৪	১০
ত্রিবাঙ্কুর	২৭৯	১৫
কোচীন	২১৪	২১·৩
বরদা	১৭৭	৮·৩
কূর্গ	১৪৪	১০
দিল্লী প্রদেশ	১২১	৩৮
বাঙ্গালা	১০৪	১৯
মাদ্রাজ	৯৮	১১
মহীশূর	৮৪	১২
বোম্বাই	৮৩	১২

২।

	সাধারণ শিক্ষা হাজার-করা	ইংরাজী শিক্ষা হাজার-করা
মাদ্রাজ সহর	৫৭৬	১০৪
রেঙ্গুন "	৪৭৩	১২৭
কলিকাতা "	৪৫১	২০৬
বরদা "	৪০৫	৭১
ঢাকা "	৩৫৩	১৪১
বাঙ্গালোর "	৩৪৩	১২৫
মহীশূর "	৩৩৪	১০৫
পুনা "	৩২৪	৫৩·৪
বোম্বাই "	২৪১	৯৪
করাচী "	১৯৮	৭৮
দিল্লী "	১৯১	[illegible]

উপরের তালিকা অনুসারে বরদা উভয়রূপেই ৪র্থ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা উন্নতিশীল রাজ্যসমূহের অন্যতম নিঃসন্দেহে বলা যায় তথাপি এখনও বরদারাজ্যে অতিমাত্রায় নিরক্ষর প্রজা আছে। যদিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রন্থালয়, পাঠাগার বা ঐ শ্রেণীর অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি নিরক্ষর (এবং প্রকৃতপক্ষে অসহায়) অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জের জ্ঞান লাভার্থে গ্রন্থালয় বিভাগের অপরিমিত কর্ত্তব্য রহিয়াছে। পরম সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকরা ইহাতে খুব আকৃষ্ট হয়। এইরূপে রাজ্যময় যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি অতি সহজ উপায়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, বৃদ্ধ-যুবা, পুরুষ-নারী, সহরবাসী-গ্রামবাসী প্রভৃতি সকলের মধ্যেই সমভাবে প্রসারলাভ করিতেছে। এই বিভাগের কর্ম্মীরা তাঁহাদের যন্ত্রাদিসহ স্থানে স্থানে ঘুরিয়া জনপ্রিয় বক্তৃতা সহযোগে স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি সাময়িক বিষয়ে বিরাট গ্রাম্য সমাজকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই প্রচার-কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যয় গ্রন্থালয় বিভাগ হইতেই বহন করা হয়। স্থানীয় লোকরা বিনা খরচায় অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃশ্যস্থানে উপস্থিত থাকিলেই কর্ম্মীরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, ইহাই তাঁহাদের পারিশ্রমিক। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অনুকম্পার্হ অশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজকে জীবন-দ্বন্দ্বের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে এতদপেক্ষা অধিকতর সুফলপ্রদ অন্য কোন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই কার্য্যকরী বিভাগটি অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে গ্রন্থালয় বিভাগের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অশিক্ষিত জনসাধারণের উপকারার্থে যথাসম্ভব সত্বর এরূপ একটি আদর্শ কার্য্যকরী বিভাগ আমাদের প্রত্যেক জিলা কংগ্রেস কমিটীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে কোন কোন কর্ম্মসংঘের গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় এরূপ বিভাগ কোন কোন স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা ও কার্য্যাবলী উল্লেখযোগ্যই নহে।



ফটোগ্রাফের সাহায্যে পুস্তকাদির সংস্কার রক্ষা করিবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Photostat) ইহার প্রত্যেক অংশ চিহ্নিত করিয়া দেখান হইল

A. পুস্তকাদি রাখিবার স্থান, B. ক্যামেরা-বেষ্টন, C. বেলোজ (Bellows) D. ক্যামেরা-শয্যা, E. যন্ত্রের আবরণ, F. লেন্‌স্ বাক্স, G. লেন্‌স্ ও প্রিজম (Lens & Prism), H. রঙ্গীন পর্দ্দা ব্যবহার করিবার হাতল, I. বিকাশ ও বর্দ্ধন বারকোষ, J. দৃঢ় বারকোষ, K. ধারক, L. প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার আধার, M. আলো সংগ্রহণ মানযন্ত্র, N. সমতল ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার পর্দ্দা, O. বিকাশ বারকোষের ঘূর্ণ্যমান হাতল। ইহার সাহায্যে ছাপানো বস্তু সাজান হয়।

উপকারী গ্রন্থালয় আন্দোলনের সুবিধা সুযোগ যাহাতে সর্ব্বসাধারণে ভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। এই নিরক্ষর জনসমাজকে আদর্শ গৃহস্থ-জীবনযাপনের যথাসম্ভব সহজ উপায়গুলি বহুব্যয়সাধ্য দৃশ্যাবলীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। দৃশ্য-বিভাগের চিত্রাবলী সিনেমা-ফিল্ম, ম্যাজিক লেণ্টার্ণ, ষ্টেরিওগ্রাফিক্ পিক্‌চার, র‍্যাডিও-প্‌টিকন্, পিক্‌চার পোষ্টকার্ড, ষ্টেরিওস্কোপ এবং জনপ্রিয়

পূর্ব্বোল্লিখিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থালয়, পাঠাগার প্রভৃতি ব্যতীত বে-সরকারী (বৈতনিক ও অবৈতনিক) অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করা গেল-

(খ) বরদা সহরের জৈন ও মোস্‌লেম গ্রন্থালয়ে হস্ত-লিখিত ও ছাপানো সংস্কৃত, আরবী, পার্শী এবং উর্দ্দু অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে আমাদের পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, বরদার মত একটি ছোট সহরে কত অসংখ্য গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে :—

বরদা সহরের গ্রন্থালয় সমূহের নাম	ইংরাজী	দেশীয়	মোট
গ্রন্থালয় বিভাগ			
কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়	৪৯,৩২৯	৪৯,৬৩৫	৯৮,৯৬৪
ঐ মফঃস্বল শাখা	৩,৩০০	১৫,০৪৩	১৮,৫৪৩
কলেজ ও (বালক) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	১৭,০০০	৩,০০০	২০,০০০
কলাভবন	৬,৬০৮	৩,২৩৯	৯,৮৪৭
যাদুঘর ও শিল্পমঞ্চ	২,১০০	—	২,১০০
পুরুষের ট্রেনিং কলেজ	১,৪২৬	২৮,১৩	৪,২৩৯
স্ত্রীলোকের ট্রেনিং কলেজ	৪৮৯	২,১৩০	২,৬১৯
মহারাণীর বালিকা বিদ্যালয়	১,৫০০	৩৭০	১,৮৭০
শিক্ষা বিভাগ	২,৫০০	৬,৭০০	৯,২০০
বরিষ্ঠ (উচ্চ) আদালত	৭,৪৩২	১,৫০৫	৮,৯৩৭
লিগেল রিমেম্‌ব্রেন্সার কার্য্যালয়	১,৯০৮	১,০২৪	২,৯৩২
হুজুর রাজনীতি কার্য্যালয়	৩,২৫৩	১৮৬	৩,৪৩৯
সেনাপতি কার্য্যালয়	১,৮৩০	২,৫৮৯	৪,৩৭৯
পুলিশ কমিশনার	৯৯৫	৮৯৭	১,৮৯২
ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ	১,৯২৬	...	১৯২৬
স্বাস্থ্য বিভাগ	৫৪৭	২৪৫	৭৯২
সরকারী গ্রন্থালয়			
(বৈতনিক,১৮৭৭ খৃঃ স্থাপিত)	৫,৫০০	৪,৫০০	১,০০০০
প্রধান মসজেদ (হস্তলিখিত)	—	৫,০০০	৫,০০০
জৈন মন্দির (হস্তলিখিত)	—	৪,৫০০	৪,৫০০

অত্যন্ত আনন্দের সহিত একটি নূতন সংবাদ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সম্প্রতি বরদার গ্রন্থালয় কার্য্যালয়ে আমেরিকা হইতে একটি "ফটোষ্টেট" যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। ফটোগ্রাফের সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য, জীর্ণ, অমূল্য, প্রাচীন গ্রন্থাদির সংরক্ষণ করাই উক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্য। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সম্মিলনী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া গভীর গবেষণার পর সম্প্রতি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই বহু ব্যয়সাধ্য যন্ত্রটির সাহায্যে কার্য্যকরীভাবে আমাদের ক্ষণজন্মা, সুসভ্য, কৃতবিদ্য ও কীর্ত্তিমান পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবময় স্মৃতি রক্ষিত হইবে, আশা করা যায়। এ জন্য বরদার উৎসাহী কর্ম্মিবৃন্দকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। বরদায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। ইহাতে ছাত্রদিগকে কালোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাই বিশেষভাবে দেওয়া হইবে বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে।

বরদার এবং সেনাবাস ছাড়া সমগ্র বরদা রাজ্যে ৩টি জিলা, ৪০টি সহর এবং ২৯৫৩ গ্রাম আছে। রাজ্যের পরিমাণ ফল ৮,১২৭ বর্গ মাইল মাত্র। নীচের তালিকা হইতে বরদার লোকসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন হিসাবে শিক্ষিতের সংখ্যা পাওয়া যাইবে :—

		ইংরাজী	মোট শিক্ষিত	অশিক্ষিত	মোট
বরদা সহর এবং সেনাবাস	পুরুষ	৫,৫৯১	২৬,৩০১	২৫,২৫৪	৫১,৫৫৫
	স্ত্রী	৯১৮	৮,১৬৭	৩৪,৯৯০	৪৩,১৫৭
মোট		৬,৫০৯	৩৪,৪৬৮	৬০,২৪৪	৯৪,৭১২
মফস্বল সহর(৩৩) এবং গ্রাম(২,৯৫৩)	পুরুষ	[illegible]	২০৪,৮২৭	৮৪১,১৯২	১,০৪৯,০০৯
	স্ত্রী	[illegible]	৩৩,১৩৩	৯৪৯,৬৬৮	৯৮২,৮০১
মোট		[illegible]	২৩৭,৯৫০	১,৭৯৩,৮৬০	২,০৩১,৮১০
সমগ্র রাজ্য	পুরুষ	১৪,৭৭০	২৩১,১২৮	৮৬৯,৪৪৬	১১০০,৫৬৪
	স্ত্রী	৮১৭	৪১,৩০০	৯৮৪,৬৫৮	১,০২৫,৯৫৮
মোট		১৫,৬৬০	২৭২,৪২৮	১,৮৫৪,১০৪	২,১২৬,৫২২

বরদার অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগ অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে। আমাদের অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সুবিধার্থে উক্ত গ্রন্থালয়ের কৃতকার্য্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিতেছি।

(ক) বরদা রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৩টি জিলা সহর এবং ৪০টি ক্ষুদ্র সহর। বর্ত্তমানে উক্ত ৪৩টি সহরের প্রত্যেকটিতে গ্রন্থালয় বিভাগের নিয়মাধীনে সুদৃশ্য গ্রন্থালয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক গ্রন্থালয়ের নিজস্ব ১০০০—৯০০০ গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে।

(খ) ৫৮০টি পল্লী-গ্রন্থালয় এবং ৯০টি পল্লী-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিজ ব্যয়ে ৩৯টি গ্রন্থালয়-

পুস্তক আছে। এই সকল গ্রন্থালয় সাধারণতঃ তাহাদের বাৎসরিক রক্ষিত সওয়া তিন লক্ষ পুস্তক হইতে সওয়া দুই লক্ষ পুস্তক পঞ্চাশ হাজার পাঠকের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে।

(গ) যাযাবর গ্রন্থালয় বিভাগ সাধারণতঃ তাহাদের বিশেষ তহবিলে বাৎসরিক ২০ হাজার পুস্তক পাইয়া থাকে, তাহা হইতে ১২ হাজার পুস্তক জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে। মোটামুটি হিসাবে ১০৬টি কেন্দ্রে ৩৪৩টি যাযাবর গ্রন্থালয়ের সাহায্যে প্রায় ৬০০০ পাঠক উপকৃত হইতে পারেন।

(ঘ) দৃশ্যাবলীর সাহায্যে লোকশিক্ষা বিভাগ বাৎসরিক সাধারণতঃ ১২৫ জায়গায় প্রায় এক লক্ষ লোকের মধ্যে ১১৪ দফায় প্রায় ১২০০ দৃশ্যাবলী দেখাইয়া থাকে।

(ঙ) এতদ্ব্যতীত বরদা সহরের মূল কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় হইতে বাৎসরিক এক লক্ষ পুস্তকের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ পুস্তক ৪০০০ পাঠকের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ২১,২৬,৫২২ জনের মধ্যে ১১,২২,৬৩১ জন অর্থাৎ শতকরা ৫২·৭ জন গ্রন্থালয় এবং পাঠাগারের সাহায্যলাভ করিতে পারিয়াছে।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বরদার অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগ যুবকদিগকে গ্রন্থরক্ষণ-প্রণালী বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে কোন স্থানের ইচ্ছুক যুবকের জন্য উক্ত সুযোগ উন্মুক্ত আছে। ইতঃপূর্ব্বেই মহীশূর, ইন্দোর, দেবাস প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি আপন আপন গ্রন্থরক্ষকদিগকে বরদা হইতে শিক্ষিত করিয়া নিয়াছেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠান বা এরূপ অন্য কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানের তহবিল প্রভৃতি অপেক্ষা কর্ম্মসচিবের কার্য্যকরী শক্তির উপর অধিকতর নির্ভর করে। একটি মাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থালয়ে যদি উপযুক্ত সংখ্যক পাঠোপযোগী পুস্তক থাকে এবং বিশেষজ্ঞ গ্রন্থরক্ষকের অধীনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়, তবে একটি মাত্র গ্রন্থালয়ই একটা অঞ্চলবাসী সমগ্র জনসমাজকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে পারে।

অল্পকালের মধ্যে বরদা গ্রন্থালয়-বিভাগের এতাদৃশ সাফল্য বস্তুতঃই বিস্ময়কর। ইহাতে প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, কোন কোন বিষয়ে সরকার উপযুক্ত সাহায্যকারীর অভাবে অকৃতকার্য্য হইলেও জনৈক উৎসাহী বিশেষজ্ঞ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। ১৯১০-১২ এই দুই বৎসরের চেষ্টায় মহারাজ গাইকোয়াড় তাঁহার আশানুরূপ কিছুই উঠিতে পারেন নাই। আশার শেষ সীমায় পৌছিয়া ১৯১৩ সালে মিঃ এম, এন, আমিনের মত এক জন সুযোগ্য কর্ম্মীর আন্তরিক সাহায্যলাভ করিয়া মহারাজ আজ তাঁহার উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অবৈতনিক যাযাবর গ্রন্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা থাকাতে সুদূরবর্ত্তী গ্রামবাসীরও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা-স্পৃহা উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই স্পৃহা ক্রমে গ্রামবাসীকে স্থায়ী গ্রন্থালয়-স্থাপনের জন্য স্বতঃই প্রণোদিত করিয়াছে। ইহাতে আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, অসংখ্য অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মধ্যে যদি এক জন মাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি অবৈতনিক গ্রন্থালয় বিভাগের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনায়াসে পাইতে পারেন। চতুর্থতঃ, যাযাবর গ্রন্থালয়গুলি একদিকে যেমন নূতন স্থানে গ্রন্থালয় স্থাপনের সহায়তা করে, তেমনই অন্য দিকে স্থায়ী গ্রন্থালয়ে পুস্তকের অভাবজনিত অসুবিধা ও সাময়িক পূরণ করিতে পারে। ইহাতে বিশেষ বিশেষ পাঠকরা মফঃস্বলে থাকিয়াও কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয়ের সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রাম্যবিদ্যালয়ের গ্রন্থালয়ে স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদি প্রায়ই থাকে; ইহাতে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকদের জ্ঞানস্পৃহা সন্তোষলাভ করিতে পারে না। গ্রামিকরা সাধারণতঃ জ্ঞানচর্চ্চায় যে সব আয়োজন করিয়া থাকে, তাহাতে উচ্চ-শিক্ষিত শিক্ষকরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন নাও করিতে পারেন। সারাদিন ছেলেদের শিক্ষায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মাঝে মাঝে বড় বড় লেখকদের পুস্তকাদি পড়িতে তাঁহাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছা হয়। এরূপ অবস্থায় যাযাবর গ্রন্থালয়ের সহায়তা তাঁহারা ভগবানের দান বলিয়াই গ্রহণ করেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।



বিচিত্রা

৭

দিন ব'সে থাকে না, অবিরত নদীর স্রোতের মত সে চল্‌ছেই, তাই লীলার দিনও কাটতে লাগলো। কিন্তু কেমন করে যে কাটছিল, তা সেই জানে। সংসারে তার আপনার বলবার কেউ নাই, স্নেহ করবার কেউ নেই। সে একবার বর্ষার দিনে সমুদ্র দেখেছিল, সীমাহীন, অন্তহীন, অগাধ বারিরাশি,—বর্ষার কালো-মেয়ের ছায়ায় মসীময়। তার নিজের জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হ'লো, সেই আগাগোড়া কালো জলে—অন্ধকার বর্ষার মহাসমুদ্র, যা থেকে সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে অন্তর্হিত হ'য়েছে! সে ভাবত, হায়, কোনও রকম ক'রে যদি হঠাৎ তার জীবনের ভরা ডুবি হ'য়ে ঐ অতলের তলায় পৌঁছায়!

মানদার শ্রাদ্ধ-শান্তি সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। সুতরাং লীলার আপাততঃ করবার সব কায শেষ হ'য়েছে। মানুষের ভবিষ্যতই বর্ত্তমানকে সার্থকতা দেয়, বর্ত্তমানের অর্থ ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত। সেই ভবিষ্যৎ যাঁর অন্ধকার, তার বর্ত্তমানও অন্ধকার। ঠিক যেন নদীর স্রোত বন্ধ হ'য়ে গিয়ে আবদ্ধ জলের মত—কোন স্রোত নেই, কোন প্রবাহ নেই। লীলার মুখের সেই গোলাপী আভা চলে গিয়ে এমন একটা পাণ্ডুতা এসেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় এ দীর্ঘকাল রোগ ভোগ ক'রে উঠেছে। একমাত্র স্নেহময়ী মাতা অসময়ে তাকে ত্যাগ ক'রে গেছেন, এখন সে উপেক্ষিতা, অনাদৃতা এবং সমাজের পরিত্যক্তা! পরের আশ্রয়ে কেমন ক'রে সে থাকবে, কত দিনই-বা থাকবে!

সন্ধ্যার সময় সে চুপচাপ ক'রে এই সব কথা ভাবছিল। এই যে একটু আগে সূর্য্য অস্ত গেল। তার লালিমা, তার চোখের সামনে যেন তার মার জ্বলন্ত চিতার মত বোধ হ'চ্ছিল। ভাবতে ভাবতে তার দুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে লাগল।

লীলা জানত না, হঠাৎ সতীশের দিকে চোখ পড়ায়, সে অপ্রস্তুত হ'য়ে তার চোখের জল মুছে ফেললে।

সতীশ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, জিজ্ঞাসা করলে, "লীলা কাঁদছ?"

লীলা চুপ ক'রে রইল।

সতীশ বললে, "লীলা, কেঁদে ত কোনও ফল নেই। ছোট পিসিমার মৃত্যু, আকস্মিক আর খুব দুঃখের বটে, কিন্তু কেঁদে আর লাভ কি? তাঁর আত্মা পরলোকে শান্তি পাক,—এই যদি তোমার কামনা হয়, ত' চোখের জল ফেলে তাঁকে অশান্ত ক'রোনা। এর ওপর ত কারুর হাত নেই, লীলা।"

কথা শুনে লীলার চোখের জল আরও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠিল,—সে কম্পিত-স্বরে বললে, "মনে করি কাঁদবো না, কিন্তু পারি না যে!"

সতীশ সস্নেহে বল্লে, "ছা কেঁদো না! আয়নায় যদি দেখতে লীলা, তা হ'লে বুঝতে পারতে যে, তোমার কি চেহারা, কি হ'য়েছে।"

লীলা মনে মনে ভাবতে লাগলো, ছাই চেহারা, ছাই রূপ! সংসারের অনাদৃত, অবজ্ঞাত, এমনি করেই যদি তার শেষ হয় ত তার চেয়ে আর কি ভাল হ'তে পারে? পরলোক কি তা' সে জানে না, কিন্তু কোনও রকম ক'রে এই ইহলোকের দেহের ভার নিয়ে যে দিন সে চিতায় উঠতে পারবে, সে তার পক্ষে নিশ্চয়ই পরম দিন!

সতীশ বললে, "লীলা, আমি কাল সকালে কলকাতা যাচ্ছি। ফিরতে বোধ হয় ৫।৬ দিন হবে, একটু বিশেষ কায আছে। খরচের টাকা কড়ি সব ওই বাক্সে রইল, এই নাও চাবি।"

লীলা বিস্মিত হ'য়ে সতীশের দিকে চেয়ে বল্লে, "চাবি? কেন জেঠাই-মা ত' রয়েছেন?"

করলেন। এখন তিনি রাজী নন, বল্লেন আমি চোখে ভাল দেখতে পাইনে, লীলাকে দেও, ওই করবে এখন।”

লীলা চাবি তুলে নিয়ে আপনার আঁচলে বেঁধে রাখলে। বেশী প্রতিবাদ করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

সতীশ বল্লে, “লীলা, কান্নাকাটি ক’রে কি হবে? এখন পিসিমা বুড়ো হ’য়েছেন। সংসারের কাজকর্ম্মের ভার আস্তে আস্তে এখন তোমাকেই নিতে হবে।”

মানুষের মন-জিনিষটার চেয়ে অদ্ভুত পদার্থ বোধ করি জগতে আর নাই। যেন একটা স্ফটিক, কখন যে কি আলো দেবে তা কেউ বলতে পারে না। একই সূর্য্যের কিরণ স্ফটিকের ওপর পড়ে, কিন্তু যেমন তার অবস্থান তারতম্যে সে কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও সবুজ আলো দেয়, তেমনি একই ঘটনা মনের অবস্থা বিশেষে তাকে বহু বিভিন্ন বিচিত্র রূপ দেয়। সতীশ বোধ করি স্নেহবশতঃই লীলাকে বাক্সের চাবি দিয়ে গেল, কিন্তু এই ঘটনাই লীলার মনকে অভিমানে পূর্ণ ক’রে দিলে! সে ভাবলে কাঞ্চনের বদলে আজ তাকে কাচ দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করা হ’চ্ছে। পরান্নে লালিত হবার একটা অপমানকে একটু শোভন করা মাত্র। তার জেঠাই-মা অনুগ্রহ ক’রে লীলার কথা বলায়, চাবি লীলাকে দেবার কথা সতীশের মনে হ’ল, তাই দাতার এই দয়া!

সেই দিন রাত্রিতে লীলার মুখে একটা কঠিন সঙ্কল্পের আভাস ফুটে উঠল। সে ঠিক করলে যে, এই অবমানকর অনুগ্রহের মোহ সে কাটাবে। সে স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে স্ত্রীলোকের জন্যও দু’মুষ্টি অন্নের অভাব হবে কি? কেন সে পরের অনুগ্রহে, পরের অন্নে দিনের পর দিন, এমনি করে উদ্দেশ্যহীন হয়ে থাকবে। তার অতি নিকটেই যে মেয়েটি নিজের পায়ের ওপর ভর ক’রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনকে সার্থক করছে, সেই সুপ্রভার কথা মনে হ’ল! লীলা আশ্চর্য্য হ’য়ে গেল, যে এত কাছে এত বড় একটা দৃষ্টান্ত থাকতেও সে অন্ধ হয়েছিল।

সে কাগজে পড়েছিল যে, কলকাতায় এক নারী-মঙ্গল সমিতি আছে, তাঁরা তারই মত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেন, আর তাকে কায শিখিয়ে জীবিকা উপার্জ্জনের উপযোগী করেন। তাই যদি হয় ত তার উপায় ত’ নিজের হাতে।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমি এক নিরাশ্রয় নারী, আমার সংসারের শেষ অবলম্বন আমার স্নেহময়ী মা’কে কিছুদিন পূর্ব্বে হারিয়েছি। আমি আশ্রয় চাই, এবং পৃথিবীতে নিজের পায়ের ওপর ভর ক’রে দাঁড়াবার শক্তি-শিক্ষা ও সামর্থ্য চাই—অপর দশ জনের মত। আপনাদের সমিতিতে আমার স্থান হবে কি না, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে জানাবেন।

তার ৩।৪ দিনের ভেতরেই সম্পাদিকার কাছ থেকে জবাব এলো :—

সুচরিতাসু,

নারীও যে ভগবানের রাজ্যে ছোট এবং অবহেলার যোগ্য নয়, এই উপলব্ধি নিয়ে আমরা এই কঠিন কায আরম্ভ করেছি। আশ্রয়দাতা তিনি, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। আজ আমরা যাকে গ্রহণ করব, কাল তিনিই আমাদের সহায় হবেন। যে কায করতে চায়, তার কাযের অভাব নেই। আপনাকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি যে দিন ইচ্ছা আপনি আসতে পারেন।

আজ এই ছোট চিঠিখানি লীলার মনের মধ্যে অনেকখানি মুক্তির আনন্দ এনে দিলে—এ যেন তার অন্ধকার জীবনের পথের ছাড়পত্র। বাঙ্গালাদেশের যে নারী-জীবন অপরের দুষ্কৃতির জন্যও দায়ী, সেই জীবনের অধিকার সমস্তার ভেতর পড়ে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, আজ এই চিঠিখানি সেখানে অনেকখানি আলো এনে দিলে। আজ উন্মুক্ত জগৎ সভার মধ্যে সে-ও একজন। পরিশ্রম ক’রে তাকে বেঁচে থাকতে হবে বটে, কিন্তু এই পরিশ্রমের আনন্দই আজ তার কাছে পরম আনন্দ। কিন্তু সতীশ যদি যেতে না দেয়, বলে, হিন্দু সমাজে এ চলবে না! এই সম্ভাবনায় তার মন এতটুকু ছোট হ’য়ে গেল, সে ভাবলে, না, সমাজের দোহাই দিয়ে এই নব নব উৎপীড়নের মধ্যে সে আর কিছুতেই থাকবে না!

সন্ধ্যার ষ্টীমারে ফিরে এসে সতীশ হাত মুখ ধুয়ে ডাকলে “লীলা, আমাকে এক কাপ্ চা দেও ত।”

পূজোর ঘর থেকে পিসিমা বল্লেন, “সতীশ আমি থালা নিয়ে যাচ্ছি, বাবা।” লীলা, ততক্ষণ সতীশকে চা দি

সতীশ বল্লে, "পিসীমা, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। এখন চা হ'লেই চলবে।"

লীলা চা দিয়ে এলে সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "লীলা, সব ভাল ত?" লীলা বল্লে, "হাঁ।"

সতীশ বল্লে, "লীলা, আমাদের কলকাতার বাড়ী সারান শেষ হয়ে গিয়েছে—এবার মনে করছি, সবাই মিলে দিন-কতক কলকাতায় থেকে আসি। এখানে তোমার মন ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে সব সময়েই খারাপ থাকে, থাকবার কথাও ত। এই পরিবর্ত্তন তোমার পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছে।"

লীলা বিস্মিত হয়ে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সতীশ বল্লে, "হাঁ, বিশেষ ক'রে তোমার জন্যেই। অবশ্য, তিনি যেমন স্নেহময়ী ছিলেন, তাতে এই বাড়ীর পাখীটি পর্য্যন্ত তাঁর অভাব অনুভব করছে, কিন্তু তোমার মত ত কেউই নয়।"

গরমের দিনে হঠাৎ যেমন অপ্রত্যাশিত ঠাণ্ডা বাতাস শ্রান্ত দেহকে অপরূপ আরাম দেয়, তেমনই লীলার মনের ভিতরও যেন কেমন একটা আরাম বোধ হ'তে লাগল। তার জন্যে? অনাদৃত সে, তবু তার জন্যে? লীলা অনেকক্ষণ চুপচাপ ক'রে ব'সে রইল, এই চায়ের সঙ্গে সতীশকে দেবার জন্যে যে আরও দুটি জিনিষ এনেছিল—তাদের হঠাৎ বার করতে কেমন যেন শঙ্কা বোধ হ'তে লাগল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "কি ভাবছ, লীলা?"

লীলা বাক্সর চাবী সতীশের সামনে রেখে এক টুকরো কাগজ দিলে, বল্লে, "ক'দিনের হিসেব।"

সতীশ সেই চাবীর দিকে, কাগজের দিকে আর লীলার মুখের দিকে চেয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল, বললে, "লীলা, এরই মধ্যে? রোসো, খাই দাই একটু সুস্থ হই, চাবীও পালাবে না, হিসেবও মুছবে না। সারা জীবনই ত হিসেব নিকেশ করবার জন্যে প'ড়ে আছে! এই ক'দিন তারী ঘোরাঘুরি আর পরিশ্রম গেছে—আজ রাত্রের জন্যেও না হয় খাজনার চার্জ্জটা তোমারই থাক না, লীলা। তার পর কাল সকালে লেখাপড়া হবে অথন।" লীলা আস্তে আস্তে চাবীটা তুলে নিলে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে হিসাবের সেই টুকরো কাগজটা উড়িয়ে নিয়ে খোলা জানলাপথে দিয়ে চ'লে গেল, আর তাকে ধরবার জন্যে পরিশ্রান্ত লীলা ব্যর্থকাম হয়ে যখন দাঁড়াল, তখন সতীশ হেসে বল্লে, "ঠিকই হয়েছে, লীলা! হাওয়াও তোমার সঙ্গে একটু তামাসা ক'রে গেল! যাক্, হিসেবে যদি এক-আধ পয়সার এ-দিক ও-দিক হয়ে থাকে ত, তার জন্যে তোমার ফাঁসি হবে না!"

লীলা হাসলে না, কিন্তু চুপও ক'রে রইল না। বল্লে, "বলা যায় না ত, মেয়েমানুষ বই ত' নয়!"

হাস্য পরিহাসের মধ্যে হঠাৎ কাউকে এক ঘা বেত সজোরে মারলে তার মুখের চেহারা যেমন হয়, সতীশের মুখও সেই রকম পাংশু হয়ে গেল। এই কথাটার ভিতর যে শ্লেষ ছিল, তা সতীশের উপলব্ধি হ'তে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'ল না! নারী ব'লে লীলার উপর সমাজের অন্যায় অত্যাচারকে সে দিন সেই যে কতকটা সমর্থন করেছিল, সে কথা সে আজও ভোলেনি। এবং যাঁর উদার তিরস্কারে সে নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরেছিল, সেই পুণ্যবতীর আত্মার কাছ থেকে সে বহু বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তার নিজের ভিতর থেকে সে ত্রুটি সংশোধনের সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই যে মেয়েটির উপর অত্যাচারের অভিনয় সে দেখলে এবং সমর্থনও করলে, তার সম্বন্ধে সে ত কিছুই করে নি! এই অনাদৃতা মেয়েটি উপেক্ষিতাই রয়ে গেছে—আজ সতীশ স্পষ্ট দেখতে পেলে যে, তার ভুলের জন্যে এই মাতৃহীনা মেয়েটি করুণাহীন তার ঘরে কি নিরানন্দ জীবনই না যাপন করেছে! আজ লীলার মুখের চেহারার অর্থ সতীশের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং সে বুঝতে পারলে, হৃদয়হীন দাতার অনুগ্রহের নির্ম্মমতা তার হৃদয়কে কতটা বিদীর্ণ করেছে!

সতীশ মুখ তুলে চাইতে দেখলে; লীলা চ'লে গেছে এবং পাশের ঘর থেকে পিসীমা তাকে ডাকলেন, "খাবার দেওয়া হয়েছে।"

৮

তার পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর সতীশ খানিকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙ্গার পর যখন উঠতে গেল, তখন শরীরটা তার বোধ হ'ল, মাথাও ব্যথা করছে। সুতরাং আর ওঠবার চেষ্টা না ক'রে সে বিছানাতেই শুয়ে রইল।

সতীশ জেগে আছে দেখে লীলা ঘরে ঢুকে তার বিছানায় চিঠিটা রেখে দিয়ে বল্লে, "একটা কথা আছে।"

সতীশ বল্লে, "বল।"

লীলা নারী-মঙ্গল-সম্পাদিকার সেই চিঠিটা দিয়ে বল্লে, "আমি যাব মনে করেছি।"

সতীশ বারম্বার চিঠিটা প'ড়ে বল্লে, "এ সব করবার আগে আমাকে ত একবারও জিজ্ঞাসা কর নি।"

লীলা বল্লে, "না।"

সতীশ খানিকটা চুপ ক'রে রইল। এই মেয়েটির ভিতর অভিমানের দৈত্য যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে। বল্লে, "কিন্তু এ রকম কায ত তোমাদের বংশে কেউ করেন নি লীলা!" লীলা জবাব দিলে, "তাঁদের কারুর দরকার হয় নি বোধ হয়।"

সতীশ বল্লে, "কিন্তু তুমি যদি যাও ত লোকে কি বল্‌বে, —তোমাকে আর আমাকে?"

লীলা স্পষ্টস্বরে উত্তর করলে, "ঐ লোকের বলা নিয়ে ত আর পারি নে! আমার সমস্ত জীবনটাই ঐ লোকের কথা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। মিথ্যা হ'লেও তারা বলবে, সত্য হ'লেও বলবে, ন্যায় হ'লেও বলবে, অন্যায় হ'লেও বলবে। ঐ বলার হাত থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই!"

সতীশ বল্লে, "লীলা, মুক্তি কি এত সহজে পাওয়া যায়? বন্ধন এত বিবিধ, এত বিচিত্রভাবে মানুষকে জড়িয়ে থাকে যে, মনে করলেই ত তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। আর তুমি যেখানে যাবে, সেইখানেই যে তারা তোমার পেছনে পেছনে যাবে।"

লীলা বল্লে, "অত যুক্তি-তর্ক আমি বুঝি না, আমাকে যেতে দিন।"

স। কবে যাবে?

লী। যদি আপনার অমত না থাকে ত আমি কালই যাব।

সতীশ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "আমি কে? আমার মতামতের তোমার ত প্রয়োজন নেই।"

লীলা খানিকটা চুপ-চাপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বোধ করি বা এ কথার উত্তর নেই। কারণ, এই গৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতেই যখন সে সঙ্কল্প করেছে, তখন আর অনুমতির প্রতীক্ষা কেন? তবুও যেন তার মন বলতে লাগল, না, এই লোকটির সম্বন্ধে তোমার অত বড় দাম্ভিকতা শোভা পায় না। এই যে লোকটি সে দিন অসঙ্কুচিতচিত্তে তার বাক্সের চাবী তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেল, তাকে তুমি যত স্নেহহীন ভেবেছ, সে হয় ত তা নয়।

লীলা বুঝতে পারলে, সতীশের এ কত বড় অভিমানের কথা। এ যে তার সত্যকার প্রাণের কথা নয়। এ যে তার ব্যথিত অন্তর থেকে বেরোলো, এ কথা লীলার মন বারংবার বলতে লাগলো। উত্তরে সে কোন কথাই বলতে পারলে না। কিন্তু তার নিজের সমস্ত অন্তরও অভিমানে আর বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো।

ব্র্যাকেটের উপর ঘড়ী অবিরত টক্ টক্ ক'রে যেন এই দুই নরনারীকে উপহাস করতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে সতীশ কথা কইল। বল্লে, "লীলা, কাল তোমার যাওয়া কি বড্ড জরুরী? দুই এক দিন পরে যেতে পার না? তা হ'লে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা এর পরে হবে, কেন না, কিছু কথাবার্ত্তা হওয়া দরকার। তুমি তোমাকে যতটা মুক্ত ভাব, আমি ততটা নিঃসম্পর্ক ভাবতে পারি নে।"

লীলা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "আপনার দয়া।"

সতীশ একটু হেসে বল্লে, "লীলা, আমি ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই, কেন না, একেবারে অক্ষম। আমার খুব জোরেই বোধ করি জ্বর এসেছে, মাথা ছিঁড়ে গেল সুতরাং অক্ষম শত্রুকে ক্ষমা কর।"

লীলা সশব্দে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেল।

লীলা ফিরে গিয়ে যখন তার ঘরে পৌছল, তখন তার মনের ভিতর যে কি হচ্ছিল, তা সে জানে না। এলোমেলো হাওয়ায় যেমন লতার অবস্থা হয়, তেমনই কখন এ দিকে দুলছে, আবার কখনও ও দিকে। আবার কখনও বা মনে হচ্ছে, যেন বায়ুর এ প্রবল বেগ আর সহ্য করতে পারবে না এইবার বুঝি ছিন্ন হয়ে ধূলিসাৎ হয়। গাছের মাথায় মাথায়, নদীর জলে, অস্তমান সূর্য্যের রক্তবর্ণ রৌদ্র ঝিকমিক করছিল, অশ্রুপ্লাবিত তার চোখের সামনে সব যেন একাকার হয়ে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড চিতার মত ধূ ধূ ক'রে জ্বলতে লাগলো। মাটীর উপর প'ড়ে তার কান্নার বাঁধ খুলে গেল।

তার পর অনেকক্ষণ পরে যখন সে উঠল, তখন মন অনেকটা লঘু হয়েছে। ধীরে ধীরে সতীশের ঘরে গিয়ে

দেখলে, সে ঘুমুচ্ছে। তার গায়ে কপালে হাত দিয়ে দেখলে, প্রবল জ্বর। তখন সে সেইখানে ব'সে বারংবার ক'রে তার গায়ের তাপ অনুভব করতে লাগলো, আর এই পীড়িত লোকটিকে কিছুক্ষণ আগে সে যে ব্যথা দিয়েছে, সেই কথা ভেবে তার মন বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

* * * *

রাত বোধ করি তখন ১২টা। সতীশের ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সে অনুভব করলে, তার কপালে কার যেন মৃদু করস্পর্শ। কপালে জলের পটি, তাতে শীতল সুগন্ধি জল দেওয়া হচ্ছে।

সতীশ চোখ খুলে দেখলে, লীলা পরম আগ্রহে তার সুন্দর চোখ দুটি সতীশের মুখের উপর নিবদ্ধ রেখে এক হাতে তাকে বাতাস করছে, আর এক হাতে কপালে জল দিচ্ছে।

মনে হ'ল যেন, প্রভাতের সদ্য জাগরণের পর উষার অনবদ্যশ্রী। সতীশ বল্লে, "লীলা, তুমি?"

তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে লীলা বললে, "ভাল আছ?"

সতীশ বল্লে, "হাঁ লীলা, জ্বর বোধ করি ছাড়ল। সেই পুরানো ম্যালেরিয়া বোধ হয়। এখন অনেকটা ভাল।"

লীলা জ্বরের তাপ অনুভব ক'রে বল্লে, "হাঁ, ছাড়ছে বোধ হয়। ঘাম হচ্ছে।"

সতীশ বল্লে, "লীলা, আমাকে তুমি আশ্চর্য্য ক'রে দিলে যে! আমার অসুখের যে এত বড় সৌভাগ্য আজ হবে, সে কথা কে মনে করতে পেরেছিল?"

লীলা চুপ ক'রে ব'সে রইল। সতীশ ধীরে ধীরে লীলার বাঁ হাত আপনার দুই হাতের ভিতর চেপে ধ'রে বললে, "লীলা, ভুল করো না!"

আজ লীলার অন্তরের ভিতর থেকে যখন সে এই অনুযোগই কেবল শুনছিল যে, তুমি ভুল করছো, ভুল করছো, তখন তার মন ক্রমাগতই সন্দেহদোলায় দুলে এসেছে। সেই সন্দেহ যখন সতীশের এই একটি কথায় ঘুচে গেল, তখন তার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে বুঝতে পারলে, সত্যই সে কোন্ পথে যেতে বসেছিল। মুহূর্ত্তের অনবধানতায় সে হয় ত সমস্তই হারাতে বসেছিল।

সে কোন কথাই বলতে পারলে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল। একবার সতীশের হাতের ভিতর থেকে তার নিজের হাত মুক্ত ক'রে নেবে মনে করলে, কিন্তু এই স্নেহের স্পর্শ তার সমস্ত অন্তর-মনকে এমনই পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছিল যে, সে তা পারলে না, জলভারাক্রান্ত মেঘের মত নিশ্চল নির্ব্বাক্ হয়ে রৈল।

সতীশ বল্লে, "লীলা, রাত অনেক হয়েছে।"

হঠাৎ যেন লীলার একটা চমক ভাঙ্গল। সে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্লে, "কিছু খেতে দেবো কি?"

সতীশ বল্লে, "দাও।"

কিছু মেওয়া আর দুধ পূর্ব্ব থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। লীলা ষ্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম ক'রে নিজের হাতে সতীশকে খাইয়ে দিলে।

সতীশ বল্লে, "লীলা, শোও গে।"

লীলা বল্লে, "যদি রাত্তিরে দরকার হয়। আমি না হয় ঐ ইজি-চেয়ারটাতেই থাকি।"

সতীশ বল্লে, "না লীলা, আমার রাত্তিরে আর কিছু দরকার হবে না। তুমি শোও গে।"

শুনা যায়, এক জন বধির বজ্রপতনের বিপুল গর্জ্জনের পর হঠাৎ দেখলে যে, সে তার বহুদিনের হারান শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে পেয়েছে! কেমন ক'রে সে সেই হারান ধন তার কাছে আবার ফিরে এল, সে তা জানে না, এবং তা জানবার তার আগ্রহও ছিল না, কেন না, সেই ফিরে পাওয়াটাই যে তার কাছে সব চেয়ে বড় হ'ল। আজ এই সতীশ ও লীলার কাছে অকস্মাৎ এই পরস্পরকে ফিরিয়ে পাওয়াও যেন তেমনই অভাবনীয় ও তেমনই বিস্ময়কর হ'ল।

* * * *

এই বাড়ীর সেই ভারী নিরানন্দ বাতাস এখন লঘু হাল্কা হয়েছে; বর্ষার শেষে মেঘ কেটে গিয়ে যেমন নীল আকাশ দেখা দেয়, তেমনই এই পরিবারের গগনও নীলবর্ণ ধারণ করছে। লীলার পাংশু মুখে লালিমা ফিরে আসছে, এবং মনে হয়েছিল, যে শুভ্র হাসিটি তার কমনীয় ওষ্ঠদ্বয় একেবারে ত্যাগ ক'রে গিয়েছে, তার দর্শনও এখন বিরল নয়।

সতীশ পথ্য করেছে। এক দিন সকালে লীলা সতীশের ঘর গোছাচ্ছিল এবং বোধ করি বা গুন্-গুন্ ক'রে গানও করছিল। নিঃশব্দে সতীশ অনেকক্ষণ ধ'রে এই আনন্দ-মূর্ত্তিটিকে দেখে বললে, "লীলা, তুমি গানও গাইতে পার?"

হঠাৎ চমকে উঠে লীলা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

সতীশ বল্লে, "লীলা, সে বার যে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে তোমার জন্তে একটি জিনিষ এনেছি—দেখবে?"

লীলা সতীশের দিকে চেয়ে রইল।

সতীশ আলমারী থেকে একটা কেস্ বার ক'রে তাই থেকে বহুমূল্য একটি হার নিয়ে লীলার গলার পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "পছন্দ হয়?"

সতীশের অসুখের দিন গোপনে লীলার মনের যে অন্ধ দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল, লীলা বুঝলে, আজ প্রত্যক্ষে তার পুনরাবৃত্তির পালা। গোপনে নারী যাকে অন্তরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে, প্রত্যক্ষে সেই তাকে লজ্জা দেয়। এই জগতের নারী-প্রকৃতি।

লীলা গলার হার খুলতে খুলতে বল্লে, "আমার জন্তে কেন?"

সতীশ বল্লে, "লীলা, আমার এই প্রথম দেওয়াটাকে এমন ক'রে অবহেলা করো না। কেন, বুঝতে পারনি?"

লীলা সতীশের দিকে চেয়ে রইল।

সতীশ বল্লে, "আমাদের শাস্ত্রকাররা একটা অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, শুভস্ত শীঘ্রং অর্থাৎ কি না শুভকার্য্যটা শীগ্গির হওয়াই ভাল। শুভকার্যের এই মাসে আর একটি মাত্র দিন আছে ২৫শে, মনে করেছি, সেই দিনই বিয়েটা হয়ে যাক। চেয়ে রইলে যে—আশ্চর্য্য হচ্ছ? হাঁ, আমাদের বিয়ে, লীলা।"

লীলার পা দুটো আর দাঁড়াতে পারলে না, সে ব'সে পড়ল। সতীশ বল্লে; "তুমি বোধ হয় মনে মনে এই তর্ক তুলছ যে, তোমাকে আমি কেমন ক'রে বিয়ে করতে রাজী হলাম। তার একমাত্র উত্তর এই যে, নিজের ভিতর যে প্রাণীটি আছে, আমি তাকে আগে ছোট ক'রে দেখতাম, ভয়ে ভয়ে থাকতাম, এখন তার বিপুলতা অনেকটা বুঝতে পেরেছি। সে সমাজের চেয়ে, কারুর চেয়ে ছোট নয়। তাকে যতক্ষণ আমরা নিজেরা ছোট করি, ততক্ষণ সে ছোট ব'লে বোধ হয়। আমার চোখ অনেকটা খুলেছে লীলা, আর সে তোমার মা'র জন্তে, সেই হেতু তিনি যেমন তোমার, তেমনই আমারও নমস্ত। আর সেই গুণ্ডারা? তা নইলে আমার পরম লোভের জিনিষটি নিঃশব্দে অনিল লুটে নিয়ে যেত!"

লীলা মাটীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

সতীশ বল্লে, "লীলা, মানুষে যা আঘাত পায়, তার সঙ্কীর্ণতার আবরণ ততই খ'সে খ'সে পড়তে থাকে, তাই আঘাতগুলোও পৃথিবীতে অবহেলার জিনিষ নয়। আমি কি ভুলই করছিলাম! তোমার মা'র মনের গোপন কামনা ছিল যে, আমিই তোমাকে গ্রহণ করি, তা এখন আমি বুঝতে পেরেছি। সেই জন্ত আমার এই সঙ্কল্প যে শুধু আমাদের জীবনকে সার্থক করবে, তা নয়, তোমার মা'র কামনাও যে আমরা পূর্ণ করতে পারব, এই ভেবে আমার মন আরও আনন্দ পাচ্ছে।"

তার পরে খানিকটা থেমে সতীশ বল্লে, "হাঁ, তার পর তোমার নারী-মঙ্গল?"

লীলা এক বার তীক্ষ্ণ লজ্জিত দৃষ্টিতে সতীশের দিকে চাইলে।

সতীশ বল্লে, "আপাততঃ ও জিনিষটার আর দরকার রইল না, এখন বরং নরমঙ্গল। আর আমার অসুখের দিন থেকে সেটা যে রকম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সুরু হয়ে গিয়েছে, তাতে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আমার নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। নারী-মঙ্গলের সুযোগ্য সম্পাদিকাকে আমি বহু ধন্তবাদের সঙ্গে সংবাদ দিয়েছি যে; তাঁদের নিরাশ্রয়া আবেদনকারিণীটির আপাততঃ একটা আশ্রয় মেলবার মত হয়েছে; সুতরাং সে সম্বন্ধেও তোমার উদ্বেগের বিশেষ কারণ নেই।"

তার পর খানিকক্ষণ থেমে সতীশ বল্লে, "এ দিকের ব্যবস্থা ত সব একরকম হয়েছে, কিন্তু আমার আসল কথাটাই জানতে বাকী রইল যে! আর সেটা জানতে না পারলে ত আমার সবটাই শূন্তে ইমারত তৈরি করার মত ব্যর্থ হবে।"

লীলা তার নত দৃষ্টি ধীরে ধীরে সতীশের মুখের দিকে স্থাপিত করলে।

সতীশ বল্লে, "আমি ত লম্বা চওড়া অনেক কথা ক'য়ে গেলাম, আমি যে তোমাকে বিয়ে করলে সুখী হব, তা বুঝা গেল। কিন্তু লীলা, তুমি ত চুপ করেই রইলে, আমার

কথাটি না জানতে পারলে ত চলবে না, তা না হ'লে পাঁজির তারিখ যে পাঁজিতেই থেকে যাবে।"

লীলার সমস্ত দেহ ঘামতে লাগল, তার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, নিষ্ঠুর পুরুষ, নারীকে নিয়ে তুমি কত খেলাই খেলতে পার।! যে পরম আরাধ্য ধনকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে সে তৃপ্তির আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কেমন ক'রে মুখ ফুটে তাকে বাইরে প্রকাশ ক'রে বলে, তোমাকে ভালবাসি কি না? লীলা মনে মনে বললে, তা কি তুমি জান না, সে কথা কি আমার মুখ, আমার চোখ, আমার কম্পিত দেহ তোমাকে সহস্রবার ক'রে বলেনি? তবে এ চাতুরী কেন?

হায়, লীলা জানত না যে, যুগে যুগে বৃন্দাবনের লীলার মধ্য দিয়ে, আবীরের লালিমার মধ্য দিয়ে, নব নব বেশে, চিরন্তন নরনারীকে আশ্রয় ক'রে নিত্য এই চাতুরীর খেলাই চলছে!

সতীশ বল্লে, "তা হ'লে,---"

লীলা সতীশের দেওয়া হারটি নিজের গলায় প'রে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠল, তার পর গলায় কাপড় দিয়ে সতীশের পায়ের ধূলো নিতে গেল। সতীশ গভীর স্নেহে তাকে হাত ধ'রে তুলে বল্লে, "হাঁ লীলা, এবার উত্তর পাওয়া গেল।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিব-চতুর্দ্দশী

আজি শিব-চতুর্দ্দশী—আজি ভারতের
বক্ষ জুড়ে অনুপম
"হর, হর, বম্ বম্"
সারা বরষের সুপ্তি উঠিল জাগিয়া!
ভক্তির ধারায় বক্ষঃ যাইল ভাসিয়া!

আজি শিব-চতুর্দ্দশী—আজি উষাকালে,
সদ্যঃস্নাতা রক্তবেশা
মুক্তবেণী সিক্তকেশা
উষারূপী বঙ্গনারী উল্লসিত বুকে
দেখিলাম ঘাট হ'তে চলে গৃহমুখে!

আজি শিব-চতুর্দ্দশী—আজি দ্বিপ্রহরে,
যে নিরম্বু উপবাসী
রহে এই বঙ্গবাসী
তাহার তুলনা দিতে পারে না ভুবন!
ধর্ম্মে ক্লেশ-সহিষ্ণুতা বঙ্গে অতুলন!

আজি শিব-চতুর্দ্দশী—আজি সন্ধ্যাকালে,
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি',
বিল্বদলে ভরি' ডালি,
দেখি পুনঃ জলে দুলে বঙ্গ-রমণীর
শিবপূজা, উজলিয়া শিবের মন্দির!

ধন্য আঁখি! যে দেশের বাতাসে কি জলে
ধর্ম্ম-বীজগুলি, হায়!
এমনি ছড়ায়ে যায়,—
ধর্ম্মের সঙ্গিনী যেথা হয় নারীগণ,
মিলে কি এ হেন দৃশ্য খুঁজিলে ভুবন?

আজি শিব-চতুর্দ্দশী—নিশি দ্বিপ্রহরে
অসভ্যতা নিল শিক্ষা,
নিল ভক্তি, নিল দীক্ষা
সভ্যতার পদমূলে! আজি এ ধরায়
অধর্ম্ম-আঁধার লুপ্ত ধর্ম্মের প্রভায়!

আজি শিব-চতুর্দ্দশী—বুঝি এই দিনে
ভারতের অনার্য্যেরা,
জীবন আঁধারে ঘেরা,
আর্য্যের ধরম নিল মাথায় তুলিয়া!
হিন্দুর সমাজ-দেহে যাইল মিশিয়া!

আজি সারা-নিশিপিনী নিদ্রা নাই চোখে;
চারিদিকে বাদ্যগান,
স্তোত্রপাঠ; আর্ত্তে দান;
গঙ্গাজলে সারা বরষের পাপ-মসী
মুছে হৃদি হ'তে! আজি শিব-চতুর্দ্দশী!

সম্মার্জ্জনী-তত্ত্ব

হে পুণ্যশ্লোকে সম্মার্জ্জনি! তুমি মানবজাতির প্রাতঃস্মরণীয়া। পঞ্জিকায়, এমন কি, শ্রীশ্রীঘণ্টাকর্ণদেবেরও পূজার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তোমার পূজার কোনও ব্যবস্থাই শাস্ত্রকারেরা করিয়া যান নাই? তুমি পুরুষ কি নারী—জানি না, তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব?

আধুনিক যুগে আত্মশ্রাদ্ধ, মাসাত্মিক, বাৎসরিক ও পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ উঠিয়া যাওয়াতে "রমা, শ্যামা, হরেশ" প্রভৃতি কত শত মান্য ব্যক্তিরও জন্মতিথি বা মৃত্যুদিনের বার্ষিক উৎসব হইতেছে, কিন্তু কোনও বক্তা বা সংবাদপত্রসেবীরা এ পর্য্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় তোমার গুণগান করেন নাই, কিংবা তোমার মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য "হাতমারা" নামধেয় পাবলিক ফাণ্ড সংগ্রহ করণার্থ "কো-অপারেটিভ সোসাইটি" নামক স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করেন নাই বা উহাদিগের তোমার ব্রোঞ্জটাচুর অর্ডার পাঠান নাই।

সেনাপতি মুনেম খাঁ মোগল-দরবারে একবার তোমার সহোদর নারিকেলের স্তুতিবাদ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে স্পষ্টতঃ তোমার কোনও কথা উল্লেখ করিয়া যান নাই। উৎকলের 'দশনাথ হাতী, বিশনাথ ঘোড়ার' পাঠানরাজ—দায়ুদ খাঁকে দীর্ঘ অবরোধেও রসদবন্ধ হেতু আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে না পারিয়া সেনাপতি সাহেব বাদশাহ আকবরকে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, "খোদা যত দিন বাঙ্গালার তরুশিরে হইতে দুইখানি চাপাটি ও এক লোটা সরবৎ নামাইয়া না লইবেন, তত দিন বাঙ্গালার পল্টনের রসদ বন্ধ করিয়া লড়াই ফতে করার চেষ্টা বৃথা।"

মুনেম খাঁ তাঁহার গোঁয়ারগোবিন্দ মিলিটারী বুদ্ধি লইয়া তোমার সহোদর নারিকেলেরই স্তুতিবাদ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তোমার কার্য্যপদ্ধতি বা মনস্তত্ত্ব তিনি আদৌ বুঝেন নাই।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ভিন্ন গভীর গবেষণায় কেহই তত সিদ্ধহস্ত নহেন। তাঁহাদেরই গবেষণায় না ইহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—ভারতবাসিমাত্রেই অনার্য্য (দ্রাবিড়ী) এবং তাঁহারাই পবিত্র আর্য্যগণের বংশধর। এরূপ না হইলে গবেষণার মৌলিকত্ব!

কাউপারের মত মনীষী তাৎকালিক জগতের তীব্র কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়াও নির্ভীক বীরের মত তাঁহার আরাম-কেদারার স্তুতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বহরমপুর আশ্রমের (অধুনা রাঁচীর) বাসন্দা হইবার উপযুক্ত বলিয়া যদি তাঁহার কথা পরিত্যাগও করা হয়, তাহা হইলেও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও গতানুগত হইয়া ত তাঁহার আলবোলা সুন্দরীর গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমিও সেই সাহসে তোমার গুণকীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছি।

বর্ত্তমানে স্ত্রী-প্রাধান্যের যুগে বাঙ্গালীর সুখের খনি একান্নবর্ত্তী সংসার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লর্ড রোণাল্ডসে তাঁহার অল্পদিনের প্রবাসেও বুঝিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ পাশ্চাত্যজগতের দুর্ভিক্ষের মত করাল ও মর্ম্মপীড়ক হয় না। কারণ, জয়েণ্ট ফ্যামিলীর অলক্ষ্য শক্তি অপুত্রক বা বিপত্নীক,রুগ্ন বা দুঃস্থ, শত শত বেকারকে সংসারভুক্ত করিয়া সুস্থ শূর বীর রণীদিগের আশ্রয়ে আসন্ন রাগে ও দৈনন্দিন দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করে।

আর, হে পাশ্চাত্যশিক্ষার উদ্গার! আর্থাক বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ! তোমাদের সম্মুখে অহর্নিশ বিচরণ করা সত্ত্বেও সম্মার্জ্জনী দেবীর সংহতিতে কি শক্তি, তাহা দেখিয়াও উপলব্ধি করিতে পারিলে না!

হে সম্মার্জ্জনি! তুমি বিশ্বের প্রতি ঘরে, প্রতি হোটেল বা পান্থ-
[illegible] অহরহ বিচরণ করিয়া লোকহিত-

হে অনাড়ম্বর কৈবল্যময়ি! কত পার্থিব, কত অপার্থিব, কত আধিভৌতিক, কত আধিদৈবিক বিপৎপাত ও সংক্রামকত্ব হইতে তুমি প্রতিনিয়ত বিনিদ্র-নয়নে আমাদিগকে রক্ষা কর, তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাপি আমরা মানবজাতি, দিনান্তেও একবার তোমার স্তুতিবাদ করি না।

হে পরার্থে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ! কর্ম্মময় জীবনের অনন্ত উদ্দামের মধ্যে জীবজগৎ যখন তোমাকে ভুলিয়া যায়, তখন কি তুমিও তাহাদিগকে সমানভাবে ভুলিয়া যাও? শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি মানবজাতিকে কখনও ভুলিয়া যাও না।

সার্দ্ধ পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তোমার অনুগ্রহে একমাত্র কলিকাতা নগরীর আবর্জ্জনায় পুষ্ট হইয়া জলাভূমি "ধাপা" জনপদে পরিণত হইতে চলিয়াছে, সৌধ-কিরীটিনী লণ্ডন নগরীর পার্শ্ববর্ত্তী জলাভূমি সকলও মিডিলসেক্স কাউন্টির সৌষ্ঠবসাধন করিতেছে। আর, যদি তুমি আমাদিগকেও ভুলিয়া যাইতে বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায় এত দিন কি হইয়া যাইত! এত দিন হিমালয়, আল্পস্, মাউণ্ট চাপা পড়িয়া যাইত, এমন কি—স্বর্গের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত যমরাজের জেলখানার প্রাচীরের উচ্চত আরও ১০।১৫ ফুট বাড়াইয়া লইতে হইত; নতুবা কত শত প্রবীণ দুর্দ্দান্ত প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া ভাস্কর-দিবাকালেও কত প্যাণ্ডিমোনিয়ম" বা "ভ্যাগাবণ্ড রেস্তরাঁয়" বসিয়া বসিয়া স্মিতবদনে চপ কাটলেট্ খাইত ও চা-পান করিত।

হে ত্রিকালজ্ঞ! প্রমাণপ্রয়োগে আবিষ্কার করিয়াছি—তুমি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেও বিরাজ করিতে। জ্যোতির্ব্বিদ্ হেলী সাহেব যোগমগ্ন হইয়া তোমার স্বরূপ কতকটা দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়া গিয়াছেন—'অদিবাসী তুমি অণিমা ও লঘিমাগুণে কখন বা উল্কা-ঝাঁটা, কখনও বা ধূমকেতু-সম্মার্জ্জনীরূপে বিরাজ করিতে। তৎকালে তোমার দেবশরীর সুবর্ণময় ছিল এবং তোমার কটিদেশে কত হীরা, মাণিক, মরকত বা নীলকান্তমণি শোভা পাইত। কলিযুগে ক্ষয়গত-শরীর মানুষ তোমাকে হীন "পাটের দড়ির" কটিবন্ধ দিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের নরনারী তোমার আঘাতে অসন্তুষ্ট হন, যাঁহারা উহার দ্বারা আঘাত পাইয়া থাকেন, অভিমানেই হউক বা অন্য কারণে হউক, অকালে "মানবলীলা সংবরণ" করে; কিন্তু তৎকালে এরূপ হইত না। হেলী সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত ধূমকেতু সম্মার্জ্জনীর আঘাত পাইলে জগদ্বাসী হয় ত হতভম্ব হইয়া যাইবে অথবা হাসিতে হাসিতে মারা যাইবে।

জানি না, স্বর্গীয় ঝাঁটা কুহকপেলব কি না, তবে কাঠখোট্টা রাসায়নিকদিগের জড়ত্বময় (Nitrous oxide gas) বা হাসির বাতাসের অস্তিত্বের প্রতি আস্থা-স্থাপন করিয়া কবিত্বকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। জগৎ ধূমকেতুর ঝাঁটা খাইলে নিশ্চয়ই হাসিত, কারণ, কবি রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, শাজাদা সুজার কন্যা আমিনা (তিন্নির) ঝাঁটা খাইয়া আরাকান রাজকুমার দালিয়া নিত্য হাসিয়া কখন কখন হতভম্ব, বধির হইয়া যাইত। হায়! চর্ম্মচক্ষুতে তোমার উল্কা বা ধূমকেতুরূপ হেমময় দেবশরীর কি করিয়া [illegible] আবিষ্কার করি?

হে ভগবন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! তুমি সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলে, আমাদিগকে কি দিবে না? আমরা অকুতোভয়ে সম্মার্জ্জনী দেবীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিব।

ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, শাস্ত্রকারেরা বিচারের
[illegible] বসিয়া ক্রন্দন করিয়াছেন।

তাঁহারা কি না প্রচার করিলেন অজের পদধূলি, অশ্বতরের পদধূলি, সম্মার্জ্জনীর ধূলি ও স্ত্রীজাতির পদধূলি দেবরাজ ইন্দ্রের পর্য্যন্ত শ্রী হরণ করে।

"অজরজঃ খররজস্তদ্বৎ সম্মার্জ্জনীরজঃ।
স্ত্রীপাদরজো রাজন্ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্॥"

কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব? মহাকবি মিল্টনও বলিয়া বসিলেন, Pestilence follows when a comet appears." অর্থাৎ কি না, মহামারী ধূমকেতু সম্মার্জ্জনীর অনুসরণ করে। সকলেই এই ভ্রান্ত ধারণায় উন্মত্ত। হায়! হায়! আমরা গভীর গবেষণায় স্থির করিয়াছি, পূর্ব্ববর্ত্তী সকল প্রকার অশিষ্টবাদই গণ্ডনীয়। এখন তুল্যমূল্য মনীষীরা কে কি বলেন, দেখা যাউক।

উত্তাল-তরঙ্গ-বিধৌত-বিজনদ্বীপবাসিনী, কোমল-হৃদয় মিরাণ্ডা তাঁহার শান্তহৃদয়ের নিভৃত কন্দরে এক দিন যে সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে? সে ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, কন্দর্প-কান্তি ফার্ডিনাণ্ডের এমন নধর রূপের নিয়ে কোনও প্রকার কুট থাকিতে পারে না। মহাকবি সেক্সপীয়রও মিরাণ্ডার হৃদয়ের স্পন্দনকে তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া "টাকাকারূপে" ঠিকই উৎকীর্ণ করিয়াছেন। Nothing ill can dwell in such a temple."

বিশ্বের বিচিত্র আলেখ্য শকুন্তলাতে সেই একই ভাব ও একই ভাষা দেখিতে পাই না? ভারতীর বরপুত্র কালিদাসও কি সেই একই মনস্তত্ত্ব জগতে প্রচারের জন্য রাখিয়া যান নাই? উদ্দামভাবের আলোড়নে বনলতিকা শকুন্তলা যখন মুহ্যমানা, তখন তাহার সঙ্গিনী কি বৃথাই প্রবোধ দিয়াছিল যে, রূপ সে বন-সম্পন্ন দুষ্মন্তের দিব্যকান্তিই দুষ্মন্তের মহত্ত্বের পরিচায়ক? কালিদাস যথার্থ বলিয়াছেন—"ন তাদৃশী আকৃতি গুণবিরোধিনী ভবতি।"

ভগবান্ রূপকে যে গুণেরই অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার এত রূপ, এত কোমলতা, তাহার মধ্যে এত নির্ম্মমতা থাকিতেই পারে না। ধূমকেতুর অমন দিব্যকান্তিতে বিষের কল্পনা করাও মহাপাপ।

আর যদি সেই উক্তির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়া অন্ধ থাকিতে হয়, তাহা হইলে দেবতাদিগের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। কোন্ পৌরাণিক যুগ হইতে সন্তাপহারিণী, শান্তিবিধায়িনী মা শীতলা কোন্ অসমসাহসে ঝাঁটা-হস্তা হইয়া আছেন। তবে ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, মা শীতলা বাহনে আরোহণ না করিলে সর্ব্বদাই যে ঝাঁটা-হস্তা হইয়া থাকিতেন, এমন নহে। যখন তাঁহার রাজকীয়বেশ হইত, তখনকার কোনও মূর্ত্তি হইতে কোনও কবি-কটোগ্রাফার তাঁহার প্রতিকৃতি করিয়া লোকালয়ে প্রচার করিয়া থাকিবেন। মা শীতলার সম্মার্জ্জনী কখন কখন যে কশারূপে ব্যবহৃত হইয়া তাঁহার অনামধন্য বাহনের উৎসাহ বা শক্তি-সামর্থ্য দ্বিগুণিত করিত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কারণ, বর্ত্তমান যুগেও দেখিতে পাই, কত শত গাধা উক্ত সম্মার্জ্জনী-কশার আঘাতে মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া উঠিতেছে।

উপরওয়ালার (Show cause) কারণ দর্শাইবার ইস্তাহাররূপী সম্মার্জ্জনী কশার প্রভাবে কত ঘোড়া হাকিম-ডাক্তার ও কর্ত্তাবানিয়া হইয়া বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াও জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর হইয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন।

কত প্রেম-প্রত্যাখ্যাত নবীন দণ্ডী গৈরিকবসন ও বিষদণ্ড দশাশ্বমেধের ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া পুনরায় পিতৃভক্ত হইয়া কলেজ বা চাকুরীতে চলিয়াছেন।

কত ভাবপ্রবণ উদীয়মান যুবক প্রতিমাসেই দুই একটি করিয়া শুভ বংশবৃদ্ধির তাড়নে অবিচলিত থাকিয়া আলস্ত-উদ্যমে সম্পাতিপাত চাকুরীর উমেদারীতে গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করিয়া অফিসে অফিসে "No vacancy" দেখিয়াও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সাহস করিতেছেন না।

কত উচ্ছৃঙ্খল প্রৌঢ় তাঁহাদের বর্ষীয়সী ভার্য্যার সম্মার্জ্জনী-কশার দাপটে মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছেন।

কত অকালপক্ব সেক্সপীয়কালজিষ্ট "কি মজার শনিবার"রূপ তন্ময় কাব্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিয়াছে। দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্মচারী অকালে দাসত্ব ঘুচিলে সংসার-চক্র অচল অটল হইয়া যাইবে, এই ভয়ে Gallopএ বা Trotএ চলিয়া গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবরে হাজিরা খাতায় নাম সহি করিতেছেন। সম্মার্জ্জনী-কশার গুণাবলী ক্রমশঃ বিবৃত করিব, এক্ষণে পাঠকের ধৈর্য্যের প্রত্যাশী।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দিগন্তব্যাপী ব্যবধান যুগ-যুগান্ত বজায় থাকিলেও" তোমার শক্তির প্রতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মতদ্বৈধ নাই—তবে রুচিভেদ থাকিতে পারে সত্য। প্রাচ্যে যাহা অভিসম্পাত, পাশ্চাত্যে তাহা আশীর্ব্বাদ। বজ্রাঘাতে মৃত্যু প্রাচ্যে অতীব ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সাধুরা বলিয়াছেন,—"He who is touched by lightning is a holy man."

এ বিষয়ে বিরাট মতদ্বৈধ থাকিলেও, হে সম্মার্জ্জনি! হিন্দু তোমাকে অন্তক্ষেত্রে অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছে। তুমি গয়াধামে বিষ্ণুপাদমন্দির বিধৌত করিয়া কর্দ্দমাক্ত দেহে বাহিরে আসিলে ভক্ত হিন্দুগণ সাদরে তোমাকে ললাটে স্পর্শ করাইয়া ধন্য হয়, সানন্দে তোমার বাহককে অর্থদানে তুষ্ট করে, দেহ ও মনকে পূত করিয়া লয়! রোমান্ ক্যাথলিক্ পন্থীরা Confession খাপনে বোধ করি, এত চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতে পারিত না।

হে সম্মার্জ্জনি! দেশ, কাল, পাত্র ও ব্যবহারভেদে তোমার নাম বা রূপভেদ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু সর্ব্বথা ও সর্ব্বকালেই তুমি মালিন্য-মোচনে উন্মেষজয়। এ জন্য তোমাকে কখন দেব, কখন বা দেবীরূপে আখ্যাত করিব। এই জন্য মহাকবির সহিত সুর মিলাইয়া বলিতেছি,—

স্ত্রীপুংসোবাস্বভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ॥
দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু॥

অতএব হে কলুষনাশিনি! তুমি দেশভেদে সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, কোঁস্তা, পোঁচড়া, খাঁংরা, ঝাড়ু, ব্রস্, ব্রাস্, পলিসার ইহার যে কোনও নামেই অভিহিত হও না কেন, বা কাল, পাত্র, রূপ ও ব্যবহার-ভেদে—দীর্ঘ, খর্ব্ব, বর্ত্তুল বা কোণবিশিষ্ট হইয়া যে কোনও কার্য্যেই ব্যাপৃত হও না কেন, জীবের উপকার করাই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম।

সম্মার্জ্জনীরূপে তুমি দেবমন্দির পরিষ্কার কর, ঝাঁটারূপে গৃহস্থলীকে নির্ম্মল কর, কোস্তা বা পোঁচড়ারূপে তুমি তরল দ্রব্যের গতিবিধান কর, খাংরারূপে তুমি অরাতি দমন কর, ব্রসরূপে হোটেল ও ষ্টেশন সাফ কর, ব্রাসরূপে তুমি দশন-পংক্তি বা আমাদের পাদুকাদির সৌষ্ঠব-সাধন কর, পলিসাররূপে তুমি কঠিন, উষর দেহকে সুঠাম, সুডৌল ও লাবণ্যময় কর। যে কোনও ছাঁচেই ছাপা হউক না কেন, সন্দেশ সন্দেশই বটে, যে কোনও নামকরণই করা যাউক না কেন, গোলাপ—গোলাপই বটে।

হে মোহ-মুদ্গর! হে রিপু-দমন! জানি না, মধ্যম-পাণ্ডব দুর্দ্ধর্ষ কীচককে যে দুরস্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে তোমার সাহায্য লইয়াছিলেন কি না! দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা সম্রাট আকবরকে খুসরোজ মেলায় বহু তেজস্বিনী রাজপুত-সতীর ঝাঁটার তাড়নে প্রকৃতিস্থ হইতে

নব্য গ্রীক জাতি, বিদ্রোহী (Rebel) কামালপাশার অব্যর্থ ঝাঁটা ভক্ষণ করিয়া আত্মসংযম শিক্ষা করিয়াছে ও বীর কামাল পাশাকে নব্য তুর্কীর স্থায়সঙ্গত নায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া মহত্বের পরিচয় দিয়াছে, সন্দেহ নাই।

মুকডেনের কান্তারে প্রাচ্য জাতির সম্মার্জ্জনীর ক্ষিপ্রকারিতায় প্রতীচ্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সম্মুখ-সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াও কুরোপাটকিন্ জগতের শূরশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইলেন, আর বেচারা রাণা উদয়সিংহ "কাপুরুষ" গ্লানি শুনিতে শুনিতে গতায়ু হইলেন। নব্য জগতে আরও কত নির্ভীক-পলায়নই (Gallant retreat)ই বা না দেখিব! যাহা হউক, মার্শাল ওয়ামা, কুরোকী, নোগী ও য়্যাডমিরাল্ টোগোর কামানের বিস্ফারিত বদন হইতেও বঙ্গিময় সম্মার্জ্জনী উদ্গীর্ণ হইয়াছিল।

তদ্ব্যতীত গৃহ-প্রাঙ্গণে রামী, বামী, শ্যামী ও প্যারীর ঝাঁটার নিত্য কত বাঙ্গালী, পোট্টা ও উড়ে ভৃত্য বা পাচক এবং পরিরম্য-সৌধে কত আঙ্গুর, বেদানা, ডালিম, বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্ ও আখ্রোট্সুন্দরীর ঝাঁটার বহরে কত বাবু ভয়ে "পত্নীব্রতা" হইয়া পড়িতেছেন, তাহার সংবাদ কে রাখে।

এই জন্যই বলিতেছি—হে স্থায় ও সত্যের অবতার! যীশুখৃষ্টের আত্মত্যাগে, মহম্মদের শিষ্যগণের ধর্ম্ম-তাণ্ডবে, গৌতমের অহিংসায়, শঙ্করের পাণ্ডিত্যে, চৈতন্যের বৈরাগ্যে, কন্ফিউসিয়াসের স্বদেশপ্রেমে, এডমণ্ড বার্কের ওজস্বিনী বক্তৃতায় ভন্ ম্যাকেন্সনের Hammeringএ যে ফল না ফলিয়াছে, যত দুষ্কৃতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে তিরোহিত না হইয়াছে, তোমার নাচুনীছন্দে ততোধিক স্থায় ও সত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হে ঝাঁটে! তুমি গঙ্গা ময়রার প্রকাশ্র ছিলে। ধূলোপড়া, জলপড়া, তেলপড়া, গাঁঠুলী, মাদুলী, কবচ, ক্রমশঃ সরিষাবাণ ধূনাবাণেও যখন কোনও ফল দর্শিত না, তখন তিনি ঝাঁটা-বাণে কত বুড়ো ভূত, খাস্তী পেত্নী, বোকা ব্রহ্মদৈত্য ও চ্যাংড়া ব্রহ্মদৈত্যিকে ভিটাছাড়া করিয়া পুনরায় "নিরালম্ব, বায়ুভুক্" করিয়া ছাড়িয়াছেন।

হে ত্রিকালজ্ঞ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে তোমার কি রূপ বা শক্তি-সামর্থ্য বা পদমর্য্যাদা ছিল, তাহা সম্যক্ অবগত নহি। তবে তোমাতে পঞ্চবাণের সম্মোহন, উন্মাদন, তাপন, শোষণ ও স্তম্ভনশক্তি যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল, তাহা তোমার বার্দ্ধক্যের স্তিমিতপ্রায় শক্তি দেখিয়াও অনুমান করিতেছি। নতুবা যৌবনে তুমি সুর ও অসুরদিগকে সামাজিক শিষ্টতা ও ভব্যতায় আবদ্ধ রাখিতে কি প্রকারে?

কবিপ্রসিদ্ধি আছে,—"Pen is mighter than the sword." আমি আলঙ্কারিক নহি, তথাপি আমার বিশ্বাস—"ঝাঁটা is mightier than sie.e guns and torpedo boats"

হে বৈদ্যরাজ হাকিমখান্! এত দিন জানা ছিল, জগতে এ পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি কার্য্যকরী যত প্রকার দাওয়াই আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'কাবুলী দাওয়াই' (লাঠি) হইতেছে সর্ব্বপ্রকারে আশু ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, কিন্তু তাহাতে Criminal Lawরূপ বিরেচকের ভয় আছে। দুই এক ক্ষেত্রে কাবুলী দাওয়াই ব্যবহার করিলে বা দাওয়াই ঘরে রাখিলে গুণ্ডা আইনেই হউক বা স্বদেশী দমন আইনেই হউক, ভিষগাচার্য্যকে অন্তরীণ করে; পক্ষান্তরে, তোমার প্রতিক্রিয়া বড়ই মোলায়েম। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, সর্ব্বোৎপ্যাথি প্রভৃতি যত প্রকার প্যাথি আছে বা হাকিমী পোলাও, কালিয়া, সেরাজী, বাঈজী কেহই তোমার চিকিৎসার কাছেও লাগে না। তব স্পর্শমাত্রেণ রোগিণো রোগমুক্তাঃ।

কর্ণমর্দ্দন-বটিকা, বেত্রখণ্ড-পাচন, উপানৎ-রসায়ন, পদাঘাত-অরিষ্ট, মহাকিল-প্রহার বিন্দাল-অবলেহ এর কোনওটাই তোমার মত অব্যর্থ বা ত্বরিতফলপ্রদ উত্তেজক পাওয়া যায় না। এ জন্য হে ঝাঁটা-দেব! তোমাকে সসম্মানে পূজা করি।

হে আশ্রিতবৎসল! ছিন্ন কেশগুচ্ছ, পক্ষাদির লোম, পক্ষীর জীর্ণ পুচ্ছ, বিষ্ঠা, নিষ্ঠীবন আদি তোমার Palisade ও Barricade দ্বারা সুরক্ষিত ব্যূহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তুমি তাহাদিগকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে রক্ষা করিয়া থাক। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরক্ত হইয়া তোমাকে ও তোমার উপাসককে কত অসম্মান সূচক গালিবর্ষণ করে। "ঝাঁটার বিঠে" এই শ্লেষবাণীতে যে তোমার ব্যাজ-স্তুতিই করা হয়, মূর্খগণ তাহা বুঝে না।

হে সহৃদয়! পাশ্চাত্য জগতে প্রবাদ,—"God made man after his own image." তোমার কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া আমার কেমন একটা খট্কা লাগিতেছে। ভগবান্ কি তোমাকে তাঁহার মূর্ত্তির অনুরূপেই গড়িয়াছেন? নতুবা তুমি তাঁহার ছন্দে, তাঁহার ধর্ম্ম কিরূপে পাইলে? তুমিও ত তদ্গতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচার করিতেছ,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
শৌচ সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি 'গৃহে গৃহে'।"

হে ত্রিগুণাত্মক! তুমি অহিতুণ্ডিকের ডমরু, wizardএর বক্ষের pentagon figure, খৃষ্টভক্তের চেনের cross লকেট; নবসৌধ-নির্ম্মাণকালে তুমি সৌধ-কিরীটরূপে হিংসা-বিতাড়ক তড়িদ্দণ্ড। বুদ্ধদেবের অস্থি, দন্ত ইত্যাদি বা কনিষ্ক, দিঙ্নাগ, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বিভূতি গৃহে রাখিয়া ধনী বৌদ্ধরা তাঁহাদের পুরী পবিত্র করিয়া মার দৈত্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু হে তন্ন ধ্যানে! তুমি সুদীর্ঘ বংশদণ্ডের উপর ডিগ্‌বাজী খাইতে খাইতেও নব-নির্ম্মিত সৌধে হিংস্রকের হিংসা-বিষকে তেজোহীন করিয়া দূরে প্রক্ষিপ্ত কর। এ জন্য তুমি গুণগ্রাহী বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্গণের নমস্য।

হে সেবাপরমূর্ত্তে! তুমি পরের কার্য্য করিতে করিতে শুষ্কাকার হইয়া "মুড়া ঝাঁটার" পরিণত হও, তথাপি গুরুভার আবর্জ্জনা তোমার সহকর্ম্মী কোদাল তত নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করিতে পারে না। তোমার সগোত্র, সকুল্য, সপিণ্ড সমানোদকবর্গ সকলে তোমার অনুরূপ। পিপাসাশান্তিকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা দড়ি-দড়া, রন্ধনশি, ইন্ধন, বোতাম, চন্দ্রা, তিক্তাওও, এমন কি, অতি পবিত্র হবিতেও পরিণত হইয়া অশেষ প্রকারে মানবের হিতসাধন করেন। এ জন্য হিন্দুমাত্রেই তোমার পিতৃদেব কবিকুমার নারিকেলবৃক্ষের মাথায় কদাপিও কুঠারাঘাত করে না। এ জন্যই বলিতেছি, হে দেব! তোমার উপাসকদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে প্রার্থনা জানাইতে লজ্জা নাই, কারণ, মহতের নিকট ব্যর্থমনোরথ হওয়াও ভাল, কিন্তু অধমের নিকট লব্ধ-কাম হওয়াও লজ্জাজনক। মহাকবি বলেন,—

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

হে অবলাবান্ধব! সর্ব্বদেশেই নারীজাতি অল্প-বিস্তর মনস্তুষ্টিক এ কারণ তাঁহারা তোমার অমোঘ শক্তির কিছু পক্ষপাতী। বিশেষ বিংশ শতাব্দীর কঠোর শাসনপদ্ধতিতে প্রতিবর্ষেই যখন প্রচলিত শাসন আইনের দুই একটি করিয়া নম্বর ও দমন উদ্ভূত হইতেছে, তখন Section, Regulation, Act, Code ইত্যাদির মধ্যে না থাকায় তাঁহারা সরাসরি (Summary) বিচারই করিয়া থাকেন। Penal codeএর section 320 (সাংঘাতিক আঘাত) বা section 50... বাইয়া উদ্দেশ্য বা ভীতিপ্রদর্শন, অবমাননা বা বিরক্তি উৎপাদন (Intimidation Insult & Annoyance) প্রভৃতির কোন চার্জ্জেই পড়েন না বা Arms Act (অস্ত্র আইনের) জন্য Lisense ফি দিয়া কর হইতেও অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

উঠিয়া কত পরিশ্রমই সক্রেটিস্‌কে সময়ে, অসময়ে পথে আনিবার চেষ্টা করাইয়াছ। জ্যানথোপির বা কি দোষ? তিনিও বিধিমতে তাঁহার "বাউরা স্বামী"কে মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হে কোপ্তে! তুমি ত অবগত আছ—তোমারই লীলা-চাঞ্চল্যে বোধ করি বেচারা সক্রেটিসের সংসার-মোহও কাটিয়া বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, ভাস্কর-পুত্র হইয়াও সক্রেটিস্ যে জগতের ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা নারী রত্ন জ্যানথোপি ও তোমারই প্রসাদাৎ।

হে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকে! তোমার আগমন প্রতীক্ষায় কত মানুষ সবেপথু হইয়া অহরহঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতেছে। রেসিডেণ্ট-সার্জ্জনের হস্তে যদি তুমি হঠাৎ উঠিয়া পড়, এই ভয়ে কত শত Night dutyর মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট এবং ষ্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ভয়ে কত টিকিট কালেক্টার, চেকার, চাপরাসী, ভিস্তি শীতের রাতেও লেপ ছাড়িয়া মুমূর্ষু রোগীর পার্শ্বে বসিয়া বা রেলপথে কত বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতেছে। হেডমাষ্টার বা সেক্রেটারীর রিপোর্টের ভয়ে কত শিক্ষক টেবল-চেয়ারে বসিয়াও দিবনিদ্রা হইতে বঞ্চিত; কত "যুবজানি" প্রফেসর, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সম্মার্জ্জনীর ভয়ে কবিত্ব-পদ্মগন্ধিতেও ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে আদিরসের ছড়াছড়ি করিতে সাহস করেন না।

সাধারণ জমাদার হেড কনষ্টেবলের বা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা পুলিস কমিশনারের দাপটে ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, মাঘের জাড় বা কার্ত্তিকের মলয় হিল্লোলের মধ্যে আঁধার পল্লীপথে বা আলোকিত নগরীর রাজপথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পিলুবারোঁয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতেও চমকাইয়া উঠে। ট্রামওয়ে কনডাক্টার চেকারের সম্মার্জ্জনীর ভয়ে ধাবমান ট্রামের আশে পাশে চাহিয়া চাহিয়া ম্যাকবেথের মত 'ডানকান ব্যাঙ্কোর' কাল্পনিক প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে থাকে।

হে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণাত্মক! যবন দরাপ খাঁ পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনীর স্তব রচনা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন; আর হে কলুষনাশিনি! তোমার স্তব রচনা করিবার ভাগ্য কয় জনের জুটে? যে পবিত্র করে, সেই পবিত্র। জাহ্নবীতোয় মালিন্য ও রোগবীজাণু ধ্বংস করিয়া বিশ্বসংসারকে পবিত্র রাখেন, এ কারণে পবিত্র আখ্যায় আখ্যাত। আর তুমি উদারপ্রাণে নিরন্তরই বিশ্বের মালিন্য বিদূরিত করিতেছ, তথাপি পবিত্র না হইয়া অপবিত্র, অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে? যে তোমাকে অস্পৃশ্য বলিবে, তুমি সরোষে তাঁহাদের বদন ও ললাট স্পর্শ কর।

কলিকাতা কর্পোরেশনে তোমার পাণ্ডা মেথর, ধাঙ্গড়, ঝাড়ুদার (Knights of the broom) দিগের ধর্ম্মঘট বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমার শক্তি দুই তিন দিন মাত্র নিষ্ক্রিয় থাকিলে অমরাবতী তুল্য কলিকাতা নগরীর কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই সন্ত্রস্ত বা উৎকর্ণ হইয়া আছি। ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগিলে দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়েন, এ কথা যে সত্য, হে ঝাঁটাদেবি! তুমি একবার তোমার হস্তপদাদি আস্ফালন করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার, চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান, কেরাণী ও হাকিমবৃন্দগণকে বুঝাইয়া দাও—যে ক্ষুদ্র মেথর-ধাঙ্গড়দিগের মজুরীয়ানা হ্রাস বা গ্রাস করিলে তুমিও প্রতিহিংসাকামী হইবে!

হে আয়ুধ-শ্রেষ্ঠ! তুমি বীরের হাতের অব্যর্থ তীর, তোতার পৃষ্ঠে অবোধ দাওয়াই। সোরাব বা রোস্তমের মত ভাতার-বীরের হাতে পড়িলে ঘোড়া ও সওয়ার উভয়েই একসঙ্গে কাটা পড়ে।

এই সম্মার্জ্জনী হাস্তিয়ারের সাহায্যে কর্ম্মীর গোপালকৃষ্ণ গোখেল কত কুটিল রাজনীতিকেও সরল করিয়া দিয়াছিলেন; পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকত জুড়া রথীকে অবনত-মস্তক করিয়া ছাড়িয়াছেন, কর্ম্মীর সার

হে আধিব্যাধির মহারন্! ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সম্প্রতি যে বিশ্বজনীন বৈদ্য সম্মিলনী (All world medical conference) হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভিষগ্মণ্ডলী সহস্র মুখে তোমার সহোদর নারিকেলের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অতঃপর অপত্যপ্রতিপালনে মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ আর চলিবে না। প্রবীণ নারিকেলের শাঁস হইতে নববিধানে নিষ্কাশিত দুগ্ধই সে অভাব মোচন করিবে; তাহা রোগবীজাণুর কোনও দোষেই কখনও দুষ্ট হয় না, কাযেই তাহাতে কান্তি, পুষ্টি ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধন করিবে।

রন্ধনের ভার দেবী অন্নপূর্ণা বা দ্রৌপদীর হস্তচ্যুত হইয়া ঐ অগৌরবময় কার্য্য যখন মহিলাদিগের হস্তে না পড়িয়া উৎকলবাসী পাচক বা বাঁকুড়ার হালুইকারদিগের হস্তে পড়িয়া গৃহস্থালী বেশ সুপ্রতুলেই চলিয়া যাইতেছে, তখন শিশুপালন গৃহধারিণী অপেক্ষা তোমার সহোদর নারিকেলে করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? মেলজান, ম্যালেনবরী, মেলিনস্, হর্লিক্স যদি সন্তানপালনে অব্যর্থ বলিয়া বিলাতী বণিকদিগের দালাল বা ক্যানভাসার এম, বি, এম, ডিদিগের দ্বারা ঘোষিত হইতে পারে, তাহা হইলে তোমার সহোদর নারিকেলের প্রতিপত্তি কেনই বা না হইবে? তবে ভয় হয় যে, প্রকৃত দাবীদার হইলেও "গেঁয়ে ফকির ভিক্ পায় না।"

হে নির্ব্বিকার পরমহংস! বিষ্ঠায় চন্দনে তোমার কোন ভেদজ্ঞান নাই। দেবমন্দিরে তোমার যেরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সুতিকাগারপ্রক্ষালনেও তোমার তদ্রূপ মুক্তপ্রাণ। মাঘের শীতের দাপেই হউক, আর নিদাঘের 'কাঠফাটা' রৌদ্রেই হউক, তুমি সর্ব্বথা মানবের অভ্রান্ত হিতৈষী এবং ইহাও সত্য যে, "Friend of India"র মত পাশ্চাত্য ধরণের স্বার্থান্বেষী হিতৈষীও নহ।

হে সম্মার্জ্জনি! তুমি তড়িৎশক্তিরই মত একরূপে যেমন আহ্বান (Attract) কর, অন্যরূপে তেমনই প্রত্যাখ্যান (Repulse) করিয়া থাক। মর্জ্জিনার ময়ূরপুচ্ছের ঝাঁটা খাইয়াও আবদাল্লা আকৃষ্ট হইল, আর হুসেন প্রত্যাখ্যাত হইল।

হে সভ্যতা-নিদান! দেশের বা জাতির সভ্যতা সাধারণতঃ কাগজ, সাবান ও মহাদ্রাবক (Sulphuric Acid) এর ব্যবহার দেখিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। দেশ বা জাতি সভ্য না হইলে বর্ব্বরে সাবানের উপকারিতা বুঝে না; বিদ্যাচর্চ্চা না থাকিলে কাগজের বিশেষ প্রয়োজন হয় না এবং কলকারখানা, শিল্প, বিজ্ঞান ও রসায়ন চর্চ্চায় মহাদ্রাবক স্বল্প-মূল্য বিধায় নিত্য প্রয়োজন হয়—ইহাই জগতে প্রসিদ্ধি। কিন্তু হে সম্মার্জ্জনি! ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, জগদ্বাসী তোমার উপকারিতে চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধ! ঝাঁটা, ঝাড়ন বা ব্রাসের ব্যবহার না থাকিলে বিশ্ববাসী যে শৃঙ্খলবাসী বরাহের জাতি-কুটুম্ব আখ্যা লাভ করিত। অতএব অতঃপর ইহাই ঘোষিত হইবে যে, Civilisation of a country should henceforth be measured by the statistics of paper, soap, sulphuric acid and ঝাঁটা।

হে শতমুখি! তুমি গাঙ্গেয় প্রদেশের কপিলাশ্রম অপেক্ষাও পুণ্যময়। এ জন্য ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ও পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা তোমার সাহায্য ও সাহচর্য্য কামনা করেন। তোমার সাহায্যে বিষ্ঠাদি স্থানান্তরিত না করিলে কেবলমাত্র 'গঙ্গাজলে' তাহা পবিত্র হয় না। তোমার গমনাগমনে পরিষ্কৃত না হইলে লক্ষ্মীদেবী তথায় পদার্পণ করেন না। এ জন্য এখন ভারতের বৃদ্ধাদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ—

"লক্ষ্মী-শ্রী-ছাড়া যদি।
ঝাঁটা ধর নিরবধি।"

আবর্জ্জনার স্থান ও অলক্ষ্মীরই আবাসস্থল। পাশ্চাত্যের

উড়াইয়া বেড়াইয়া বেড়াইলে বা জ্যোৎস্নার উত্তাপে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়ার মত বাতাসী বিবি হইলে প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে ঘৃণা করেন এবং হিষ্টিরিয়া, অম্লশূল, হৃদ্‌রোগ, স্ত্রীরোগ তাঁহাদের আমরণ সঙ্গী হয়। এই জন্তই বলিতেছিলাম, হে সম্মার্জ্জনি! তোমার মহিমা কীর্ত্তনের ভার মামুলী প্রথা অনুযায়ী সেই একতারাধারী নারদের হাতে না পড়িয়া আমার মত অসমসাহসিক স্পষ্ট বক্তার হস্তে পড়িয়াছে।

হে সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি! এ পর্য্যন্ত তুমি কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দাও নাই, অধিকন্তু তুমি পৃষ্ঠপোষক হইয়া অন্যকে সরল পথে গতি-বিশিষ্ট কর। তীরের ন্যায় সরল দণ্ডও পশ্চাতে পুচ্ছরূপ কাঁটার সাহায্য না পাইলে ঠিক সরল পথে ছুটিয়া লক্ষ্যভেদে অসমর্থ। এ জন্য তোমায় বারংবার প্রণিপাত।

হে বাস্তব! তুমি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইয়া কষ্ট কল্পনার বিষয়ও নহ। তুমি শরীরী, তুমি প্রত্যক্ষ।' আমি অলঙ্কার-শাস্ত্রের Pathetic fallacy রূপের গঠনে অপ্রকৃতে প্রকৃতত্ব আরোপ করিতেছি না।

হে অতৃপ্ত-হৃদয়! সংসার-প্রবেশপথে বাসর-ঘরের দ্বারের পার্শ্বে তোমাকে দিব্য পট্টবস্ত্র-পরিহিতা, অবগুণ্ঠিতা করিয়া আমার চপলা শ্যালিকামণ্ডলী তোমাকে "দোর-ধরী" আখ্যায় অভিহিত করিয়া আমাকে তোমার ভক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হে দেবি! তাঁহাদিগের অশেষ সৌভাগ্য যে, সেই বাজে তুমি রুষ্টা হইয়া অভি-সম্পাত করিয়া বলিয়া উঠ নাই "মুষলং কুলনাশনং।" আমি জানি, তুমি অতৃপ্ত-হৃদয়া, দেবাংশে তোমার জন্ম এবং সংসারপথে তুমি ধনী ও নির্ধনের গৃহদেবতা।

হে সমাধিস্থ মহাপুরুষ! কাকপক্ষী কুলায় নির্ম্মাণকালে চঞ্চুপুটে গৃহপ্রাঙ্গণরূপ নৈমিষারণ্য হইতে একে একে তোমার বক্ষঃপঞ্জর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও তুমি নির্ব্বিকার, মুক্তপ্রাণ দধীচির অপেক্ষাও অটল, অকুণ্ঠ।

এই জন্তই বলিতেছি—জল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র জীবের হিতসাধন করিতেছেন বলিয়া সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আজও পর্য্যন্ত নিত্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক স্তবগান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে হে সম্মার্জ্জনি! তুমিই বা কি অপরাধে অগণ্য হইয়া থাকিবে?

উন্মুক্ত-প্রাণে তোমার যশোগান করিব কি, ওদিকে তোমার অসমাপ্ত স্তুতিবাদ শুনিয়াই কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে বলিয়া সম্পাদক মহাশয়, তথা পাঠকবর্গ এই অধমের জন্ত তোমার সন্ধান করিতেছেন, কাযেই আপাততঃ ক্ষান্ত হইলাম।

কিন্তু ইহাও ঠিক যে, যেখানে তোমার মহিমা-কীর্ত্তনে রিম রিম কাগজ নষ্ট করিলেও সম্পাদকের রক্তচক্ষুর ভয় থাকিবে না এবং যেখানে এই মহাগ্রন্থ সংরক্ষিত হইলে আমার ভাবী তোমার মহিমাতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারা হেতু আমার প্রাণটা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবার ভয় থাকিবে না; সেই স্থানের জন্য আমি তোমার কৃতিত্বের উপর একটা দীর্ঘ Thesis লিখিব।

ভাবিয়া দেখিলাম—বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ই আমার Thesis-এর একমাত্র রক্ষণীয় স্থান। সে হেতু, স্যর আশুতোষ কৈলাসধামে চলিয়া গিয়াছেন, ডাক্তার নীল ও ডাক্তার ব্রিজেন বাঙ্কক্যপীড়িত, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র ("There is spirit in the wood") অর্থাৎ কবি কথিত "অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্তি তে সুখদুঃখসমন্বিতা" তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবি-ষ্কারে উদ্‌ব্যস্ত, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র খদ্দর-প্রতিষ্ঠানে যোগনিষ্ঠ, ডাক্তার রমন তরলের তরলত্বের ভাবে ভাবময়, এমন কি, সরকার যদুনাথও বারাণসী পুরপতি বিশ্বনাথের ভজনে নিযুক্ত। কাযেই এই সুযোগে আমার Thesisটা দীর্ঘ করিতে পারিলেই অর্থাৎ জমীদারী সেরেস্তার নায়েবের দিরস্ত নিকাশি কাগজের দপ্তরের মত বেরাট করিলে আর কেহ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবেও না এবং নির্ব্বিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরখানায় প্রবেশলাভ করিবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাবৎ উহা কীটদষ্ট না হয়, তাবৎ তথায় স্থিতিলাভ করিবে।

হে সম্মার্জ্জনি! আমি তোমাকে ইহাও প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, দেব-অংশে যখন তোমার জন্ম, তখন তোমার স্তবস্তুতি দেবভাষাতেই হইবে। এ কারণ মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর, লঘু বা দীর্ঘ ত্রিপদী, চতুষ্পদী, চতুর্দ্দশপদী, পয়ার, তোটক, মৈথিলী, রাবিন্দ্রী বা নজরুলী ছন্দে তোমার মহিমা ক্ষুণ্ণ করিব না। তবে তোমার এই উপাসকের ভাগ্যে বাল্মীকি বা বেদব্যাসের প্রতিভা নাই, এ জন্য মর্ম্মাহত। তবে ইহাও সত্য যে, উপেন্দ্রবজ্রা, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী বা বসন্ততিলকেও নহে—তোমারই মর্য্যাদার উপযুক্ত শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব।

শ্রীঈশানচন্দ্র মৈত্র।

সাকী

বেলা যায় শুধু বেলা যায়—
যৌবন যায় ফুরায়ে,
জীবন-পেয়ালা পিয়ে লও ত্বরা
ওই বুঝি যায় জুড়ায়ে;

কুসুমের ভাতি কত কাল রবে?
লহ তা'র মধু লুটিয়া—
সুখের স্বপন বুঝি ভেঙে যায়
মোহ তা'র যায় টুটিয়া।

নলিনীর দলে নিশির শিশির
রচিয়াছে মণিহার,
ঝরিবে কখন ধরণীর তলে
বুঝে উঠা তাহা ভার!

গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল
আজি আঙুরের বনে,
রসভারে হের অবনতা লতা
—শ্রাবণে ঝরে কোন ক্ষণে।

কর ত্বরা, তবে কর ত্বরা—
এস মোর বনে, ডাকি,
জীবন-পেয়ালা পিয়ে লও ত্বরা
ওগো প্রিয়! ওগো সাকী!

গৌড়—পাণ্ডুয়া

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ পরাজিত ও মোগলদিগের দ্বারা গৌড় বিজিত হইবার পরে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ভীষণ মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তদ্দ্বারা গৌড় মহানগরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। "আকবর নামায়" ও "তবকাৎ-ই-আঁকবরীতে" উহার বর্ণনা আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকের অনুকরণে মার্শম্যান ইহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মরিতেছিল, লোক আর মৃতদেহের সংকার করিতে না পারিয়া, সেগুলিকে জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল, তাহার ফলে গলিত শবের দুর্গন্ধে ব্যাধির বৃদ্ধি ঘটিল। শাসনকর্ত্তা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সেই হইতে এই মহানগরী জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হইল। ধ্বংস হইবার কালে ইহার বয়স ২ হাজার বৎসর হইয়াছিল। ভারতে ইহার তুল্য সমৃদ্ধিশালী, বিশাল ও সৌধশ্রেণী-শোভিত নগরী আর ছিল না। ইহা শত শত রাজ্যেশ্বরের রাজধানী এবং ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের কেন্দ্র ছিল। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে এই মহানগরী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; বর্ত্তমানে ইহা ব্যাঘ্র ও বানরের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে।

অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, গৌড়ের এই মহামারীর অনুরূপ মহামারীর দ্বারাই ঠিক ঐরূপ ভাবেই খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বঙ্গের বিখ্যাত জনপদ মহম্মদপুর ও উলা প্রভৃতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, মহামারীর দ্বারা গৌড় বিধ্বস্ত হইবার পরে গৌড় হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া প্রথমে অদূরবর্ত্তী তাঁড়ায় ও তৎপরে রাজমহলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই হইতে গৌড় ক্রমাগত ধ্বংসপথে চলিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় মহারাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বঙ্গের ভূঞাদিগকে দমনকালে রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল এবং তৎপরে উহা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে উঠিয়া গিয়াছিল; কিন্তু গৌড়ে রাজধানী পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেহই করেন নাই। উপরন্তু অনেকেই গৌড়ের সৌধশ্রেণীর ইষ্টক ও প্রস্তরাদি খুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রংপুর, রাজমহল, মালদহ, ইংলিসবাজার ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি সহরের অধিকাংশ বাটী গৌড়ের ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আজিও মুর্শিদাবাদ জিলার কিরীটেশ্বরীর ও কালভৈরবের মন্দিরে, মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজেদে ও অন্যান্য ইমারতে তাহার চিহ্ন আছে।

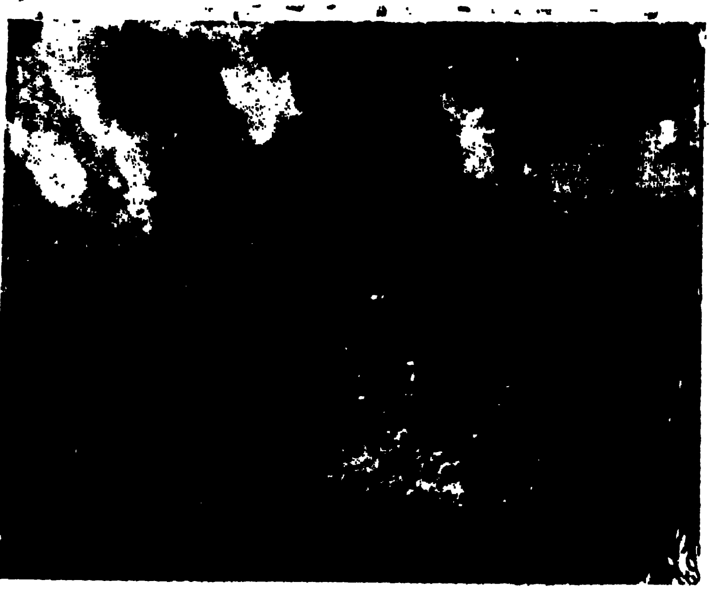


বল্লালবাড়ী

কথিত আছে যে, গৌড়ের এনামেল-করা ইষ্টক ও প্রস্তর ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার জন্য মুর্শিদাবাদের নিজামৎ দপ্তর জমীদারদিগের নিকট হইতে বাৎসরিক ৮ শত টাকা রাজস্ব পাইতেন। বহু বৎসর ধরিয়া ইষ্টক ও প্রস্তর ভাঙ্গিয়া লওয়ায় গৌড়ের কীর্ত্তিগুলির সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহার উপর কালের ধ্বংসলীলা আছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে মুসলমান রাজত্বকালের কীর্ত্তিগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা লর্ড কার্জ্জনের অনুগ্রহে হইয়াছে। গৌড়ে মুসলমানদিগের ভগ্ন ও অভগ্ন,

উল্লেখযোগ্য ও নগণ্য বহু কীর্ত্তি নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে, তাহার অধিকাংশ মসজেদ ও মকবরা বা সমাধি-স্থান। সকল কীর্ত্তি অল্পসময়ের মধ্যে দেখিয়া উঠা ও উহাদিগের বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। আমরা অধিকাংশ কীর্ত্তি দেখিলেও সময়ের অল্পতা হেতু কয়েকটি কীর্ত্তি দেখিবার অবসর পাই নাই।

সর্ব্বপ্রথম নীলকর ক্রেটন ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের কীর্ত্তিগুলির বিবরণ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি কীর্ত্তিগুলি মাপিয়া উহাদিগের চিত্র প্রস্তুত করেন। ইহার পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন এই সকল কীর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিবরণ প্রকাশ করেন। সে সময় গৌড় পূর্ণিয়া জিলাভুক্ত ও পাণ্ডুয়া দিনাজপুর জিলাভুক্ত ছিল। তৎকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়া বনাকীর্ণ ছিল। ইহার পরে র‍্যাভেনশ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ইহার পরে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কানিংহাম ১৮৭৯।৮০ খৃষ্টাব্দে এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন।



বল্লাল-বাড়ী প্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপ

গৌড় দেখিতে হইলে ইংলিসবাজারে থাকিবার স্থান করিয়া গরুর গাড়ী, হস্তী বা মোটরগাড়ীযোগে এক এক দিন এক এক দিকে যাইয়া দেখিয়া আসিলে সুবিধা হয়। বর্ত্তমানকালে গৌড় বনাকীর্ণ ও নির্জ্জন স্থান, তথায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই বাস আছে। এই স্থান শ্বাপদসঙ্কুল ও যদি পৃথিবীতে ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব সত্য হয়, তবে গৌড় ভূত-প্রেতের বাসের উপযুক্ত স্থান। কতিপয় যে, একদা গভীর রাত্রিতে তিনি গৌড়ের নির্জ্জন পথে আলোক ও বাদ্যভাণ্ডসহ একটি বিবাহের মিছিল যাইতে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাস, উহা ভৌতিক কাণ্ড।

গৌড়ের চতুর্দ্দিকে খাল, বিল, জলা ও উহার মধ্যে অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর দীঘি ও পুষ্করিণী এবং নিবিড় অরণ্য ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ থাকায় ইহার স্বাস্থ্যের ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এই সকল খাল, বিল ও দীঘি-পুকুর অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ায় ও যত্র তত্র মকবরা ও কবর নির্ম্মাণ করায় হয় ত মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

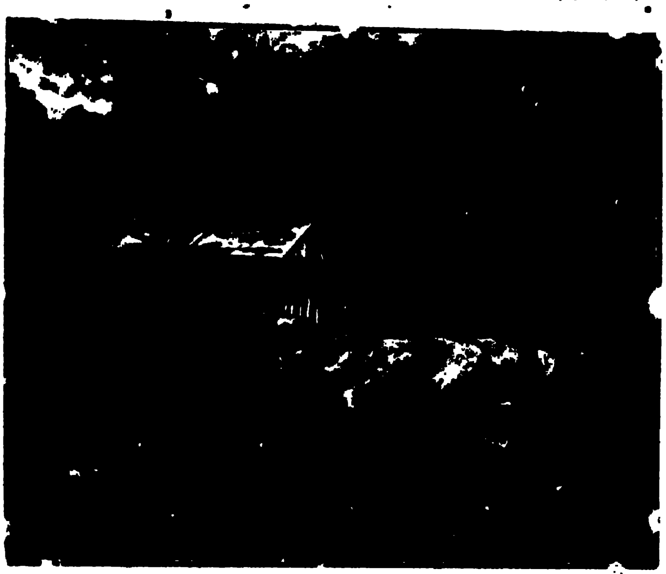
পাণ্ডুয়ার পথে

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, ২৭শে ডিসেম্বরে গৌড় দেখা সাঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই ২৩শে তারিখে আমরা পাণ্ডুয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। ২৬শে তারিখে গৌড়ের বড় সাগর দীঘি ও সদুল্লাপুর প্রভৃতি দেখা সাঙ্গ করিয়া ইংলিসবাজারের খেয়া-ঘাটে নৌকাযোগে মোটরগাড়ীসহ মহানন্দা নদী পার হইলাম। নদী-সৈকত হইতে উচ্চ পাড়ের উপরে গাড়ী উঠিলে আমরা উহাতে স্থান সংগ্রহ করত দ্রুত পাণ্ডুয়া অভিমুখে উত্তরদিকে চলিলাম। এতদঞ্চলের রাস্তা কাঁচা। পাণ্ডুয়া যাইতে হইলে "পুরাতন মালদহ" নামক সহরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। পুরাতন মালদহে যাইতে রাস্তার দুই পার্শ্বে আম্রবাগান আছে। রাস্তা অত্যন্ত অসমান ও বন্ধুর, এ জন্য নক্ষত্রবেগে ধাবমান মোটরগাড়ী বুঝি উল্টাইয়া যায়, এই আশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যুবক মোটরচালক কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

তথায় মুসলমানদিগের কয়েকটি পাথর-বাঁধান কবর আছে। এই স্থান অতিক্রম করিয়া ক্রমে আমরা জনপূর্ণ "বাচামারি" নামক গ্রামের মধ্য দিয়া চলিলাম। এই গ্রামের বাটীগুলি পাতলা ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। সম্ভবতঃ পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ হইতে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া মহানন্দা প্রবাহিত হইতেছে। আমরা মহানন্দার তট দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইলাম। ক্রমে 'তালসাপাড়া' গ্রামের পুরাতন মসজেদের ধার দিয়া কলিকাতার রেলী ব্রাদার্সের পাটের গুদাম এবং গবর্ণমেণ্টের আবগারী আফিসের নিকট দিয়া ও তৎপরে মহানন্দার ধার দিয়া গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

পুরাতন মালদহ

তৎপরে আমরা "পুরাতন মালদহ" সহরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সহরে প্রবেশ করিতে উহার প্রান্তভাগে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একটি বড় মসজেদ ও অপর পার্শ্বে এক স্থানে একটি কবরের স্থান আছে। উহাকে "দরগা" কহে। উক্ত মসজেদটিকে "জুমা মসজেদ" বলা হইয়া থাকে। মসজেদটি চুণকাম করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহার দুইটি বড় গুম্বজ ও একটি বৃহৎ খিলান আছে। মসজেদের চারিটি কোণে মিনার শোভা পাইতেছে। মসজেদের মধ্যস্থলে যে বড় ঘর আছে, উহার মাপ ২২´×১৬´ ফুট। এই ঘরের দুই পার্শ্বে আর দুইটি ঘর আছে, উহাদের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৬´ ফুট। মসজেদটি ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার স্তম্ভশোভিত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারে কারুকার্য্য খোদিত আছে। ইহার বহির্দেশের মাপ ...২´×২৭´ ফুট। ইহার স্মৃতি-ফলকে লিখিত আছে যে, নির্ম্মিত। র‍্যাভেনশ এই মসজেদকে "মালদহের সোনা মসজেদ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।



মহুরাপুরে ত্যক্ত গঙ্গার খাতের উপর দশানঘাট

পূর্ব্বোক্ত কবর কয়টির মধ্যে একটি জনৈক শাহের। এই স্থানে একটি শুক পক্ষীর কবর আছে—এই পক্ষীটি কোরাণের বয়েত আবৃত্তি করিতে পারিত। ইহার অদূরে "দুধ পীরের" কবর আছে, তথায় কবরের নিকটে একটি গর্ত্তের মধ্যে দুধ ঢালিয়া দেওয়া হয়।

পুরাতন মালদহ সহরে প্রবেশ করিতে হইলে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ভগ্ন তোরণ-শোভিত একটি চকের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এই তোরণ দুইটির দুই পার্শ্বে ও চকের চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণীর খিলানের ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকা-মধ্যে অর্দ্ধ-প্রোথিত অবস্থায় আছে। এই স্থানটি দেখিতে একটি "কাটরার" ন্যায়। ইহা পথিকদিগের জন্য সরাইরূপে ব্যবহৃত হইত। সওদাগরগণ মূল্যবান পণ্যসম্ভার লইয়া এই স্থানে আশ্রয় লইত ও পরে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় পণ্য-সম্ভার প্রেরণ করিত। মালদহের যে দুর্গ ছিল, ইহা তাহারই অন্তর্গত। র‍্যাভেনশ লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মসজেদ-নির্ম্মাতা মাসুমের ভ্রাতা এই সরাইটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত পুরাতন মালদহ সহরে "ফুটি মসজেদ" নামক একটি অযত্নরক্ষিত মসজেদ আছে, উহা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। মুরশিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আর একটি মসজেদ আছে, উহাকে "নবাবী মসজেদ" বলা হইয়া থাকে।

সহরের মধ্য দিয়া যাইতে রাস্তার দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ও পাতলা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত, ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট কোঠাবাড়ী আছে। বাটীগুলি সেকেলে ধরণের ও অত্যন্ত

বাটীর ন্যায় স্থানাভাবে প্রকোষ্ঠগুলি জানালা-বিহীন হওয়ায় অন্ধকার, দিবসে প্রদীপ জ্বালিতে হয় এবং এক প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া অপর প্রকোষ্ঠে যাইতে হয়। এই সহরের প্রায় সকল বাটীই গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি-সমূহ হইতে সংগৃহীত ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। সহরের পশ্চিম প্রান্তে স্থিত মহানন্দা নদীর পাড়ের উপরের রাস্তা দিয়া যাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন-সন্নিবিষ্ট কোঠা-বাড়ী-গুলির পশ্চাদ্ভাগের সুন্দর শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সহরটি ইংলিসবাজারের প্রায় এক ক্রোশ উত্তর দিকে মহানন্দার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। সহরের বিপরীত দিকে মহানন্দার পশ্চিমপারে কালিন্দী নদী মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে। এই সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৫ শত জন। অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে ইহা পাণ্ডুয়ার বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্থান তুলা ও রেশম ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এক কালে এই স্থানে ফরাসী, ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের কুঠী ছিল। পরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কুঠী ইংলিসবাজারে স্থানান্তরিত হইলে ইংলিসবাজারের উন্নতি ও পুরাতন মালদহের অবনতি আরম্ভ হয়। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটী ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের বেঞ্চ আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তোফী।



সদুল্লাপুরের ভাঙ্গা গঙ্গার খাতের উপর দিয়া বাঁশের সাঁকো

মাধবিকা

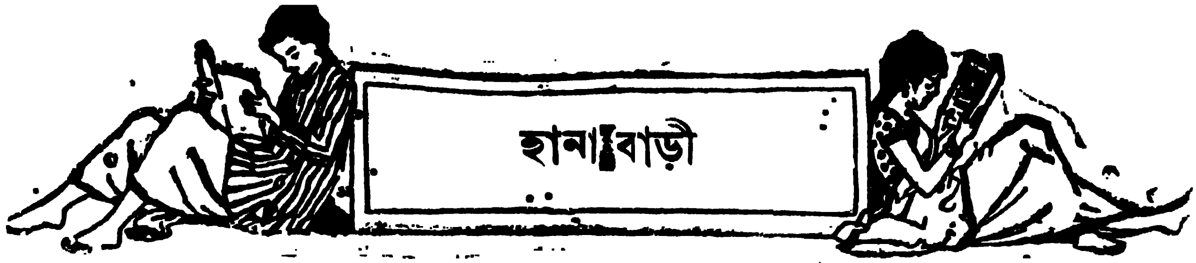
ওগো ও চৈত্র হাওয়া,
দিনেক দুয়ের অতিথি আমার, ওগো এসে চ'লে যাওয়া!
ক্ষণিকের তরে ভুলায়ে আমারে এ কি রঙ্গ সখি,
মাটীর কারায় বন্দী জনায় পরিহাস করিছ কি?
ও তোমার পরশন
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিছে আমার কদম্ব-হরষণ!
করি' প্রাণপণ বাহু মেলে মন আকুল আলিঙ্গনে,—
ওগো স্নেহহীন দিবে না কি ধরা বক্ষের বন্ধনে?
হে পথিক পথবাসী,
খাঁচার পাখীরে কেন ডাকে তব নীল আকাশের বাঁশী?
স্নেহের বাহিরে গতি নাই যার, গৃহের বাতির করি'
মরণের পারে কেন ডাক তারে ওগো চির-পথচারী!
তব উপহাস সহি'
ফুটিছে মুকুল টুটিছে বকুল ব্যাকুল বেদনা বহি',
লুটি ফুলরেণু লুকায়িছ বেণু বন-বীথিকার কাঁকে
মানুষের মন সে কি গো তেমন কেমনে বাঁচিয়া থাকে?
কোন্ সে অচল মলয়ের বুকে কোন্ সে গুহায়ে বাসা,
সেথা কি জাগে না জ্যোৎস্না যামিনী চিরবিরহীর আশা?
ফুল-পাখী-অলি-তারা—
সবি কি সেথায় বিরাজে বৃথায় উদাসীন দিশহারা?
সবি সে কান্নাহাসি
তুমি তার মাঝে চলিবে কি একা বীতরাগ সন্ন্যাসী?

তাই যদি হয়, ওগো নির্দ্দয়, এ কেমন তব ধারা,
পরে কেন চাহ পরাতে বাঁধন নিজে বন্ধনহারা?
পরশ-বেদনা দিয়া
পরখ করিতে চাহ বেদনায় কেমনে বিদরে হিয়া!

যারে বাতায়নে চাহি জনে জনে কেন কর ডাকাডাকি?
মুহু মনমনে মাতাও সঘনে ব্যাকুল বনের পাখী!
বাথায় ব্যথাতে তুমি
গন্ধ লুটিয়া পালাও ছুটিয়া পরিয়া ফুলের ধূলি?

মিলনের বুকে বিরহ জাগাও, বিরহের বুকে ব্যথা,
মানব-চিত্তে আপন নৃত্যে আনহ চঞ্চলতা!
সুধীরে সঁপিয়া দোল
বিশপাতার পাতায় পাতায় কেন তুষ হিল্লোল?

ওগো দেহহীন অতিথি আমার, ওগো ও পথিক হাওয়া,
চিরনির্দ্দয় কপট-হৃদয় ওগো পেয়ে-ও না-পাওয়া
বড় দুখে দিনু শাপ—
চির হায় হায়-এ জুড়াবে না কভু তব ও মনস্তাপ।



৩২

আমরা এতক্ষণ ডাক্তারের কথা নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিলাম। এইবারে যোগীন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি ত হত ব্যক্তির চেহারার বিবরণ খবরের কাগজে পড়েছিলেন? তার গালে একটা লম্বা ক্ষতচিহ্ন, আর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের দুটো পাবের অভাব ছিল।"

"হাঁ, আমার এই রোগীটিরও গালে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাঁর শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের কেন, কোন হাতের কোন আঙ্গুলের একটিও পাব নষ্ট হয় নি। সেই জন্যই হত ব্যক্তি বিহারী ঘোষ ব'লে সাব্যস্ত হবার পর এই রোগীটি যখন মাঝে মাঝে নিজেকে বিহারী ঘোষ ব'লে পরিচয় দিত, তখন ওর ঐ কড়ে আঙ্গুলের পাবগুলার অস্তিত্বই ওর ও কথা প্রলাপ ব'লে মনে করবার পক্ষে আমার একটা বিশিষ্ট কারণ হয়েছিল।"

"কিন্তু হত ব্যক্তি যে বিহারী ঘোষ ব'লে সাব্যস্ত হয়েছিল, তা আপনার এই রোগীটি জানলেন কি ক'রে? তিনি কি খবরের কাগজ নিয়মিত পড়তেন?"

"যখন মাথার অবস্থা ভাল থাকতো, তখন পড়তেন। শুধু খবরের কাগজ কেন, বইও পড়তেন। ক্রমেই দেখছি, ভাল থাকার অবস্থা যতই বাড়ছে, পড়াশুনার ইচ্ছাটাও সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে। লোকটির দেখছি পড়াতেই খুব ঝোঁক; পড়াশুনা নিয়ে থাকতে পেলে আর কিছুই চান না; মনও বেশ প্রফুল্ল থাকে। আমিও সেই জন্য ও বিষয়ে তাঁকে সাধ্যমত প্রশ্রয় দিচ্ছি। আজকাল অনেক দিন থেকে তাঁর মাথার অবস্থা এই রকম বেশ চলেছে। আফিমের মাত্রা কমিয়ে এনে এখন প্রায় দিন পনের হলো একবারে বন্ধ করেছি; তাতে ফল এত ভাল হয়েছে যে, কথাবার্ত্তা বেশ সুসংলগ্নভাবে সহজ মানুষের মত বলতে পারেন, স্মরণশক্তিও অনেক ভাল হয়েছে।"

আমি বলিলাম, "তা হ'লে এখন তাঁকে তাঁর নিজের

"হাঁ, করেছি বৈ কি। এখনকার সহজ ভাবের কথা থেকেই ত বুঝতে পাচ্ছি যে, আগে কান্ সাহেব ওর যে পরিচয় দিয়েছিল, সেটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, নিজের কথা তখন যা বলতেন, তা প্রলাপ নয়, সত্য।"

"এখন পরিচয় কি রকম দেন?"

"এ ক'দিনের ভিতর তাঁকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি, মোটের উপর কতকগুলা বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র ভুল হয় না। প্রথমতঃ তাঁর নাম বিহারীলাল ঘোষ—উমাপতি সরকার নয়। তাঁর বাড়ী বর্দ্ধমানে। যে মেয়েমানুষটা তাঁর স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিয়েছিল, সে বাস্তবিক তাঁর স্ত্রী নয়। এ কথাগুলি তিনি আগেও বলতেন, কিন্তু এখন আগের চেয়ে স্পষ্টতর ও নিশ্চিতভাবে বলেন। তা ছাড়া এখন আরও বলেন যে, তাঁর পূর্ব্বে এক স্ত্রী ছিল, তাঁর নাম অনসূয়া; তিনি একটি মেয়ে রেখে স্বর্গে গেছেন। মেয়েটির গলার স্বর না কি পাখীর গানের মত মধুর; সেই জন্য তার নাম রেখেছেন 'কাকলী।' কিন্তু তার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ ব'লে সবাই তাকে বুড়ী ব'লে ডাকে। সেই মেয়েটিই তাঁর সর্ব্বস্ব; জগতে সে ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। নিজের দুর্ব্বুদ্ধিদোষে আবার একটা বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সে স্ত্রী নয়—রাক্ষসী। তাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন। সে তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে; তার নিজের লোকদের নিয়ে সে তাঁর বর্দ্ধমানের বাড়ী দখল ক'রে বসেছে। তারা যত দিন থাকবে, সেখানে আর যেতে পারবেন না। মোটের উপর এই সব কথা; আর সব চেয়ে বেশী তাঁর সেই মেয়ের কথাই বলেন; তাকে এক বার দেখবার জন্য বড়ই উৎসুক। আর একটু ভাল ক'রে সেরে উঠলেই বর্ম্মায় যাবেন বলেন; মেয়ে না কি ঐ রাক্ষসী বিমাতার ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তার মাসীর কাছে থাকে। সেই মাসী এবং মেসোর খুব সুখ্যাতিও করেন,—"

যোগীন বাবু বাধা দিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমিই

বাস্তবিকই বর্দ্ধমানের বিহারী ঘোষ, তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। তা হ'লে এইবার যদি অনুগ্রহ ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যান—"

"হাঁ চলুন, যাই। কেবল আপনাদের এইটুকু সাবধান ক'রে রাখতে চাই যে, প্রথম সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে আপনারা কোন কথা কইবেন না। তিনি আপনাদের চিনতে পেরে নিজে কি রকম সম্ভাষণ করেন বা কি বলেন, তাই দেখে ক্রমে বাক্যালাপে অগ্রসর হবেন। কেন না, তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হলেও এখনও বেশ সহজ অবস্থায় আসেনি। হঠাৎ কোন মানসিক আবেগ বা উত্তেজনা হ'লে অনেক দুর্ঘটনা হ'তে পারে।"

কথা সাঙ্গ হইলে ডাক্তার আমাদিগকে রোগীদের আবাসের দিকে লইয়া চলিলেন। তাঁহার নিজের বাসগৃহ ছাড়া সেই বিস্তৃত বাগানের মধ্যে রোগীদিগের জন্য বৃক্ষরাজি-বেষ্টিত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বাড়ী আছে। বাড়ীগুলি একতলা ও বিলাতী খোলার ছাদযুক্ত। প্রত্যেকটিতে ৩।৪ জন রোগী ও তাহাদের পরিচর্য্যার লোক থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। বাড়ীগুলির চারিদিকে বেশ সুসজ্জিত ফুল-বাগান এবং সমগ্র জমীর প্রায় মধ্যস্থলে চারদিকে চারিটি পাকা ঘাটযুক্ত একটা বৃহৎ পুষ্করিণী। মোটের উপর স্থানটি দেখিতে এত সুশোভন ও শান্তিময় যে, উহার 'আশ্রম' নাম বাস্তবিকই সার্থক বলিয়া মনে হয়।

আমরা প্রথম দুইখানা বাড়ীর পরে তৃতীয়খানার নিকট উপস্থিত হইলে ডাক্তার আমাদিগকে বাড়ীর দক্ষিণদিকে একটা ছায়াযুক্ত বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে এক জন দীর্ঘকায় পক্ককেশ বৃদ্ধ একখানা আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। তাঁহার মাথা কেশবিরল হইলেও মুখে শুভ্র গোঁফ-দাড়ির প্রাচুর্য্য বিলক্ষণ ছিল। মুখখানা প্রথম দৃষ্টিতে মোটের উপর অনেকটা নন্দন সাহেবের মতই বোধ হইল এবং গোঁফ ও দাড়ীর উপর হইতে যতটা বুঝা গেল, তাহাতে বোধ হইল, ইঁহারও বাম গণ্ডে সেইরূপ একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। তথাচ ইঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখাতে বুঝিতে পারিলাম, যে, দুই মুখের

যাহা হউক, আমরা ডাক্তারের ইঙ্গিতে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী রাখিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে বৃদ্ধের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি পুস্তকে এতই নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, আমাদের সেখানে উপস্থিতি তখনও লক্ষ্য করেন নাই। কাজেই ডাক্তার অল্প একটু কাসির শব্দে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বেশ প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "এই যে, আজ এ নূতন বইখানা খুব একমনে পড়ছেন দেখছি। বেশ ভাল লাগছে বুঝি?"

বৃদ্ধ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখাও দেখা দিল। বলিলেন, "হাঁ, মন্দ নয়; গল্পটা বেশ মজার।"

"তা হলেও কিন্তু একবারে খুব বেশীক্ষণ পড়বেন না। এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমার এই দুটি বন্ধু আশ্রমে বেড়াতে এসেছেন; এঁদের সঙ্গে একটু আলাপ করুন না।" বলিয়া ডাক্তার আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রথমে আমাকে ও পরে যোগীন বাবুকে, বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। বৃদ্ধ প্রথমে আমার দিকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় চাহিয়া পরে যোগীন বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন কিছু বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি একটু বেশী নিবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মু[illegible] মত করিয়া দুই হাতে নিজের মাথা চাপিয়া ধরিলেন। ইত্যবসরে ডাক্তার পার্শ্বের কক্ষ হইতে কয়েকখানা চেয়ার আনিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন এবং নিজেও বসিলেন। তাহার পরেই বৃদ্ধ মাথা তুলিয়া আবার যোগীন বাবুর দিকে চাহিলেন। এবার তাঁহার মুখ হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাকে বোধ হয় আমি চিনি—আপনি কি যোগীন বাবু,—না?"

৫৩

যোগীন বাবুও তখন সানন্দে হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বলেছেন বটে। কিন্তু আমার চেহারা বোধ হয় আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে? তাই বুঝি আমাকে চিনতে আপনার এত দেরী হলো?"

"না, তা নয়। এখানে যে আমার আপনার লোক কাউকে দেখতে পাব, তা ত ভাবিনি কি না। তাই

তবু ঠিক যে তুমি, তা মনে করতে পাচ্ছিলাম না। আমার ভাই স্মরণশক্তিটা ইদানীং বড় ক'মে গেছে বোধ হয়। তুমি কিছু মনে করো না।"

"না—না। মনে করবো কি? বরং চিনতে যে পেরেছেন, তাতেই আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে। আপনার খুব অসুখ হয়েছিল শুনেছি; কিন্তু এখন বেশ সেরেছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, অনেক সেরেছি বৈ কি। কিন্তু এখনও মাথাটা মাঝে মাঝে কেমন করে; সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু ও রকম এখন আর প্রায়ই হয় না। ডাক্তার মশায় আমাকে বড় যত্ন করেন।" বৃদ্ধ এই বলিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাহিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, আবার যোগীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ংবদা ভাল আছে? ছেলেপুলেরা সব ভাল আছে? বুড়ী এখন কোথায়?"

যোগীন বাবু বলিলেন, "তারা সব বেশ ভালই আছে। আমরা সবাই বর্ম্মা থেকে চ'লে এসে এখন কলকাতাতেই আছি যে।"

বৃদ্ধ তখন যেন কিছু উত্তেজিত হইয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও, বটে? বুড়ীও তা হ'লে কলকাতায় আছে?"

"হাঁ, সে যে আমাদের কাছেই আছে,—তা ত জানেন!"

বৃদ্ধ এইবারে আনন্দে ও উৎসাহে একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বুড়ীকে একবার বড় দেখতে ইচ্ছা কচ্ছে;—আমাকে তোমার বাড়ীতে একবার নিয়ে চল না!"

কিন্তু এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া বশতঃ তিনি তখনই আবার নির্জ্জীবভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া, তাঁহার মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আপনি ও রকম ব্যস্ত হ'লে চলবে না ত, বিহারী বাবু! আপনার গায়ে এখনও বেশী জোর হয় নি, তা ত নিজেই বুঝতে পারেন? ও রকম চঞ্চল হ'লে আপনার কষ্ট বাড়বে—আর আপনিই বা কষ্টভোগ ক'রে অত দূরে যেতে যাবেন কেন? যোগীন বাবুই ত

ঘোষজা মহাশয় এ প্রস্তাবে বেশ সন্তুষ্ট হইলেন বোধ হইল। বলিলেন, "তা হ'লে ত ভালই হয়। তাই আনবে যোগীন বাবু?"

যোগীন বাবু ডাক্তারের দিকে চাহিয়া, তাঁহার সম্মতি বুঝিয়া বলিলেন, "হাঁ, আনবো বৈ কি। আজই বিকালবেলা তাকে নিয়ে আসবো।"

"বেশ, বেশ! তা হ'লে আমার প্রিয়ংবদা বোনটিকেও এনো; ছেলেদেরও এনো। অনেক দিন আপনার লোক কাউকে দেখিনি; বড় দেখতে ইচ্ছা করে।"

যোগীন বাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেদের শুদ্ধ এখানে আসায় আপনার কোন আপত্তি হবে না ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, তাতে কোন ক্ষতি হবে না, বরং এঁর মন প্রফুল্ল হ'লে উপকারই হ'তে পারে।"

ঘোষজা মহাশয় তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না, মশায়! আপনাকে কিন্তু আমি এখনও চিনতে পেরেছি ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগীন বাবু বলিলেন, "না, ওঁকে আপনার চিনতে পারবার কথা নয়, ঘোষজা মশায়! আপনি এর আগে ওঁকে আর কখনও দেখেননি। কিন্তু তা হলেও উনি আমার এক সম্পর্কে ভাই-পো হন। আমিও বেশী দিন আগে তা জানতাম না। বর্ম্মা থেকে ফিরে এসে ওঁর সঙ্গে চেনা-পরিচয় হয়েছে; আর সেই থেকে ওঁকে আমরা ঘরের ছেলের মতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ক'রে নিয়েছি। বড় ভাল ছেলে! আপনিও আলাপ করলে খুব সুখী হবেন।"

তাহার পরে যোগীন বাবু আমার নাম, ধাম, বংশ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ব্যবসায় ইত্যাদির পরিচয়-সমন্বিত এক সুদীর্ঘ 'সার্টিফিকেট' দাখিল করিতে লাগিয়া গেলেন। আমি কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রশংসাপত্রের বোঝা নীরবে বহন করা দুঃসাধ্য দেখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া ডাক্তারের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে সেই বাড়ীর ঘরগুলা ও তাহার ব্যবস্থাদি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তৎপরে ডাক্তার, ঘোষজা মহাশয়ের পরিচর্য্যাকারীকে তাঁহার স্নানাহারের আয়োজন করিবার আদেশ দিয়া, আমাকে লইয়া পুনরায় বারান্দায় আসিলেন। যোগীন বাবু তখনও ঘোষজা মহা-

দেখিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও বিদায় লইতে গেলে, তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "যোগীন বাবুর কাছে আপনার সব পরিচয় জেনে বড় সুখী হয়েছি। আমি বোধ হয়, এই বারে শীঘ্রই এখান থেকে ফিরে যেতে পারবো; তা হ'লে তখন আবার আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন ত?"

আমি আগ্রহভরে সম্মতি জানাইলাম এবং যোগীন বাবু আবার বৈকালে সপরিবারে আসিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর আমরা তিন জনে সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

ডাক্তারের সহিত আশ্রমের অপরাপর স্থানগুলিও পরিদর্শন করিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, যে মেয়েমানুষটি আপনার কাছে ঘোষজা মহাশয়ের স্ত্রী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, সে স্ত্রীলোকটি বাস্তবিক কে, তা আপনি জানতে পেরেছেন কি?"

ডাক্তার বিরক্তিব্যঞ্জক ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "না, তা ত কিছু জানতে পারি নি। সে যে কান্ সাহেবের এই দুরাচরণের সহকারিণী, তা ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে। মাগী এখানে অনেক দিন হলো আর আসে নি; বোধ হয়, সেই খুনের পর থেকেই তাকে আর এখানে দেখিনি। ওরা যখন বিহারী বাবুকে এখানে এনেছিল, তখন মাগী বলেছিল যে, সে হাতীবাগানে থাকে। কিন্তু আমার যখন ওদের উপর সন্দেহ আরম্ভ হয়েছে, তখন মাগী আমার কাছে তার যে ঠিকানা লিখিয়ে গিয়েছিল, আমি নিজে সেই ঠিকানায় গিয়ে তার অনুসন্ধান ক'রে জেনেছিলাম যে কিছু দিন পূর্ব্বে সে সেখান থেকে অন্যত্র উঠে গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে, তা আশ-পাশের কোন লোক বলতে পারলে না। তাদের কাছে শুনেছিলাম যে, উমাপতি সরকার নামে একটা লোক সত্যই ঐ বাড়ীতে থাকতো বটে। লোকটা অত্যন্ত মাতাল ও দুশ্চরিত্র; ইদানী বড় রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি থাকত, তাকে সে নিজের স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিত বটে, কিন্তু মাগী বোধ হয়, তার রক্ষিতা; বিবাহিতা স্ত্রী নয়। দু'জনের মধ্যে কিন্তু সদ্ভাব কিছু ছিল না। নিত্যই ঝগড়া, এমন কি, মারামারি পর্য্যন্ত চলত। লোকটা শেষে পাগল হয়ে গিয়েছিল, বাড়ীর বার হতো না। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে সময়ে সময়ে খুব হট্টগোল শুনা যেত। পাড়ার লোক বিরক্ত হলেও, পাগলের হাঙ্গামা মনে ক'রে কিছু বলত না। তারা সেখান থেকে গিয়ে অবধি পাড়ার লোক শান্তি পেয়েছিল। ওদের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী আর কোন খবর আমি সংগ্রহ করতে পারি নি।"

"কান্ সাহেবকে তার পরে কি আপনি মাগীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন নি?"

"হাঁ, করেছিলাম, সে-ও কিছু বলতে পারে না। বলে যে, মাগী ওখান থেকে উঠে যাবার আগে তাকে কিছু জানায় নি। এখন সে যে কোথায় আছে, কান্ তা কিছুই জানে না, বলে।"

"আচ্ছা, সেই খুনের রাত্রিতে কান্ সাহেব আপনার এখানে ছিল কি জন্য?"

"সে যখন এখানে এল, তখন তার কিন্তু মাতাল অবস্থা দেখে, আমিই তাকে ফিরে যেতে দিই নি। আমার বাড়ীর নীচের ঘরে একটা ক্যাম্প খাটিয়ায় তাকে শুইয়ে রেখেছিলাম।"

এতক্ষণে আমাদের আশ্রম-পরিদর্শন শেষ হইল। আমরা তখন ডাক্তার মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সেখান হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। আসিবার সময় আমি তাঁহার নিকট উমাপতির "স্ত্রীর" সাবেক ঠিকানাটা জানিয়া লইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অরূপের রূপ

অরূপের রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে আমি পেয়েছি তারে,
নানা লীলায় সে যে ভুলায়, চিন্‌তে কি গো, সবাই পারে?
শাস্ত্র বলেন চুপি চুপি
এক হয়ে সে ভূমারূপী,
বিশ্ব তাঁহার বিরাট রূপ,—চক্ষু মেলি' দেখেছি তাই;
মনের ভিতর ভাবের ঠাকুর—বাহ্যপূজা তাঁহার নাই।

অন্তরে তিনি, বাহ্যেও তিনি—ব্যাপিয়া সর্ব্বঠাই,
মন্দিরে তিনি, প্রান্তরে তিনি, জানি না, কোথায় নাই।
মনের ভিতর ডুবে একা
ধ্যানে পাই অরূপের দেখা,
একের বহুরূপের লীলা,—ভূমানন্দ তাতেই পাই,
মনের ভিতর ভাবের ঠাকুর বাহ্যপূজা তাঁহার নাই।

কৃষি-কমিশন

এই বার আমরা আমাদের দেশের কৃষকদিগের এবং কৃষক-সমাজের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আমাদের দেশ বলিলে এখানে বাঙ্গালা দেশই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের কৃষীবলের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থা ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষীবলের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা হইতে অনেক বিষয়ে প্রভিন্ন। সেই প্রভেদহেতু বিভিন্ন প্রদেশের কৃষীবলের বিষয় একত্র আলোচনা করা অসম্ভব। সেই জন্য আমরা বাঙ্গালার কৃষকের অবস্থার এই কথা সন্দর্ভে বিশেষভাবে আলোচনা করিলাম।

বাঙ্গালা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত। সেই জন্য অন্যান্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কৃষকদিগকে অল্প হারে জমীর খাজনা দিতে হয়। বাঙ্গালার অনেক স্থলে জমীর খাজনা বিঘা করা ।৷০ আট আনাও ধার্য্য আছে। তবে অধিকাংশ স্থলেই জমীদারের জমীর খাজনা বিঘা করা ১৲ এক টাকার অধিক নহে। জমীদার ফসলের মূল্যবৃদ্ধির হেতুবাদে জমীর খাজনা টাকায় দুই আনা হারে আইনতঃ বৃদ্ধি করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ঐরূপ খাজনা বৃদ্ধি করিতে যেরূপ ব্যয় হয়, আয়বৃদ্ধির অনুপাতে তাহা সামান্য বলিয়া অল্প আয়বিশিষ্ট জমীদাররা তাহা করেন না। কাযেই বাঙ্গালার প্রজাদিগকে জমীর খাজনা অল্প দিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও যে বাঙ্গালার কৃষীবলের অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল, তাহা বলা যায় না। তাহার কারণ, জমীদারকে প্রজা সরাসরি অধিক খাজনা না দিলেও প্রজারা আবার সেই জমী তাহার অধস্তন কৃষককে অধিক হারে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া বিলি করিয়া থাকে। এই প্রকারে বাঙ্গালার নানাবিধ মধ্য-স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে। ফলে হলকর্ষী চাষীদিগের যেরূপ আয় হওয়া উচিত, সেরূপ আয় হয় না। তাহা না হইলেও বাঙ্গালার চাষীদিগের অবস্থা অন্যান্য স্থানের চাষীদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল।

কোন কোন স্থলে হলকর্ষী চাষীরা বিঘা করা গড়ে ৩৲ তিন টাকা হিসাবে জমীর খাজনা দেয়। খাস মহলের জমী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে এক এক বিঘা জমীতে ৮ মণ পাট জন্মিতে পারে। মনে করুন, এক জন কৃষকের দশ বিঘা ভাল পাটের জমী আছে। তাহার সেই জমীতে বার্ষিক ৮০ মণ পাট জন্মে। ভাল পাটের মূল্য গড়ে ১৫৲ পনের টাকা মণ হইলে তাহার পাট হইতেই বৎসর ১২ শত টাকা আয় হইতে পারে। তাহা হইতে তাহাকে বার্ষিক ৩০৲ টাকা মাত্র খাজনা দিতে হয়, যদি আবওয়ার মাথট প্রভৃতি অতিরিক্ত দান ধরা যায়, তাহা হইলেও তাহাকে জমীর খাজনা প্রভৃতি বাবদ বার্ষিক ৪০৲ টাকার অধিক দিতে হয় না, ইহা নিশ্চিত। ইহা ভিন্ন পাট উৎপন্ন করিবার এবং কাচিবার খরচ বিঘা করা ১০৲ টাকা হারে ধরিলেও তাহার ঐ বাবদ খরচা সাধারণতঃ ১ এক শত টাকার অধিক হয় না। কচিৎ কোন কোন বার খরচা কিছু অধিক পড়ে। মোটের উপর জমীর খাজনা ও ফসলোৎপত্তির খরচা ২ দুই শত টাকা ধরিলেও ঐরূপ ১০ বিঘা জমীর মালিক কৃষকের বার্ষিক আয় অন্ততঃ ১ এক হাজার টাকা হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঘরে বসিয়া বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া বার্ষিক হাজার টাকা আয় অনেক শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, লেখক, কেরাণী প্রভৃতিরও আশার অতীত। বাঙ্গালার যে অঞ্চলে পাট জন্মে না, সে অঞ্চলের কৃষিজীবীরাও এইরূপ লাভের আশা করিতে পারে না। যদি জমী তাদৃশ ভাল না হয়, আর তাহাতে পাট ভাল না জন্মে, তাহা হইলে তাহাদের ১০ বিঘা জমীতে বার্ষিক ছয় মাস খাটিয়া ৫ হইতে ৬ শত টাকা আয় হইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জমী যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে চাষীরা অধিক জমীতে পাট বুনে না; ধান প্রভৃতি বুনিয়া থাকে। তাহার কারণ, ধানের চাষে অধিক খরচা করিতে হয় না। ইক্ষুর চাষেও আয় নিতান্ত অল্প হয় না। বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্থানে স্থানে ইক্ষুর চাষে বিঘা করা দুই শত টাকা অনায়াসে আয় হয় শুনা গিয়াছে। তবে ঐ সকল অঞ্চলে বন্যবরাহ, জম্বুক প্রভৃতিতে ফসল নষ্ট করে বলিয়া কৃষকরা ঐ সকল লাভজনক

বিষয়ে কিরূপ তথ্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে তথ্যের অনুসন্ধান এবং তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ, আরণ্য পশুর উপদ্রবে বাঙ্গালায় কত সম্পত্তি যে নষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

ধান্যের জমীতেও আয় নিতান্ত অল্প হয় না। অতি উৎকৃষ্ট জমীতে বিনা সারে বিঘা করা ১৬ মণ পর্য্যন্ত ধান্য জন্মিতে পারে। উহাকে 'ষোল মুনে' জমী বলে। সাধারণতঃ এক এক বিঘা জমীতে ৭ হইতে ১২ মণ পর্য্যন্ত ধান্য জন্মে। ধানের মূল্য যদি সাড়ে ৩ তিন টাকা মণ হয়, তাহা হইলে এক এক বিঘা জমীতে কৃষকদিগের ২১৲ টাকা হইতে ৪২৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইয়া থাকে। যাহার জোতে ১০ বিঘা জমী আছে,তাহার ২ শত ১৭৲ টাকা হইতে ৪ শত ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হয়। এখানে একটা কথা স্মরণ করা আবশ্যক। ধানের চাষে খরচ প্রায় কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ আমন ধানের চাষে খরচ একেবারেই নাই। যে সকল জমীতে অল্প ধান জন্মে, তাহার খাজনা কোথাও বার্ষিক ১ টাকার অধিক নাই। মোটের উপর খেনো জমীর খাজনা অল্প। সুতরাং ১০ বিঘা জমীর চাষী কৃষকের বার্ষিক যেমন তেমন করিয়া বিচালীতে ও ধানে ২ শত ২৫৲ টাকা হইতে সাড়ে ৪ শত টাকা আয় হইয়া থাকে। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। যে সকল জমীতে প্রতি বিঘায় ৫ মণ বা ৬ মণ ধান্য জন্মে, সেরূপ অপকৃষ্ট জমী অতি অল্পই আছে। কৃষকের দোষেই ঐ সকল জমীর ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। কৃষক যদি বিঘা করা পাঁচ ছয় গাড়ী করিয়া গোবর প্রভৃতির সার দেয়, তাহা হইলে সেই জমীতে বৎসরে পাকা ১২ মণ ধান জন্মে। কৃষকরা একটু চেষ্টা করিলেই তাহাদের জমীতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে পারে। আজকাল অনেক সার বিনা খরচায় পাওয়া যায়। যে কচুরী পানা লইয়া দেশব্যাপী এত হৈ-চৈ উপস্থিত হইয়াছে, সেই কচুরী পানা হইতে অতি উৎকৃষ্ট সার জন্মে। এই সার অতি সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। অনেকেই জানেন, কচুরী পানা জল আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। বর্ষার সময়ে জলাশয়ে জলের পরিসর যত বৃদ্ধি পায়, কচুরী পানার প্রসারও তত অধিক ঐ পানা শুকাইতে থাকে। উহার শিকড় মাটীর সহিত মিশিয়া মৃত্তিকার পরিণত হইতে থাকে। উপরের গাছগুলি ফেলিয়া দিয়া নিম্নের মৃত্তিকা যদি ক্ষেতের মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেতে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়ান যাইতে পারে। উহার সহিত যদি গোময় ও সামান্য চুণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। এক এক বিঘা জমীতে ১২ মণ ধান অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে এবং কোন কোন জমীতে দুইটা ফসল জন্মিতে পারে। জমীতে ভাল করিয়া সার দিলে সেই সারের প্রভাব দুই হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে।

ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। ইক্ষুর চাষে প্রতি কাঠায় ভাল করিয়া চাষ করিলে দুই মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতে পারে সত্য, কিন্তু এই ফসলের চাষ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। ইহার জন্য সংবৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। বৈশাখমাসে আখ বুনিয়া ফাল্গুন-চৈত্রমাসে সেই আখ কাটিতে হয়। চৈত্রমাসেই প্রায় গুড় করা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আখের জমী পাইট করিতে অনেক পরিশ্রম এবং উহাতে সার দিতে অনেক ব্যয় হয়। অনেক স্থলে এক বৎসর যে জমীতে আখ হয়, তাহার পর-বৎসর সেই জমীতে আর ভাল আখ জন্মে না। সেই জন্য কৃষকরা পরবৎসর সেই জমীতে কচুরমুখী, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটি ফসল উপর্য্যুপরি দিয়া থাকে। পর-বৎসর আর ঐ জমীতে ঐ সকল ফসলের জন্য কোন সার দিতে হয় না। আখের চাষ করিবার সময় উহাতে যে সার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ফলেই পর-বৎসর ঐ জমীতে ঐ সকল ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উহাতে কৃষকদিগের প্রতি বিঘায় আয় নিতান্ত অল্প হয় না। উহাতে বিঘা করা প্রায় দেড় শত টাকা আয় হয়, চেষ্টা করিলে বরং কিছু অধিক আয় হইতে পারে। আমাদের দেশের চাষীরা সাধারণতঃ অধিক জমীতে আখের চাষ করে না। তাহার কারণ, আখ চাষে এক দিকে যেমন উৎকট পরিশ্রম করিতে হয়, অন্য দিকে উহার ফলন অনিশ্চিত। সামান্য জলাভাব হইলেই আখের গাছ মরিয়া যায়; সুতরাং কৃষকের সংবৎসরব্যাপী উৎকট পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। সেই জন্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কৃষক পাঁচ কাঠা জমীতে

আখের চাষ করিয়া থাকে। এক বিঘা বা দুই বিঘা জমীতে আখ চাষ করে, এরূপ কৃষক বাঙ্গালায় অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকরা বলিয়া থাকে যে, আখ চাষ করিবার উপযুক্ত জমী অধিক মিলে না। উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে আখ চাষ করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কায। মধ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গে আখ চাষে বিঘাপ্রতি গড়ে ৪০ মণ গুড় জন্মে না। এই অঞ্চলে বিঘাকরা ৩০ মণ গুড় জন্মিলেই কৃষকরা তাহা অপ্রত্যাশিত মনে করে। তবে এই অঞ্চলের কৃষকরা জমীতে সারও অল্প দিয়া থাকে। তাহা হইলেও ইক্ষুর চাষ সর্ব্বত্রই লাভজনক।

বাঙ্গালায় কৃষীবলের ধনসম্পদবৃদ্ধি এবং তাহার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদিগকে লাভজনক ফসলের চাষ করিতে উৎসাহিত করিতে এবং ঐরূপ ফসলের চাষ করিবার অসুবিধাগুলি দূর করিতে হইবে। কিন্তু সে কাযটি নিতান্ত সহজ নহে।

আমরা যতদূর হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গদেশে যে সকল চাষীর জোতে অন্ততঃ দশ বিঘা ভাল জমী আছে, তাহাদের অবস্থা সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অবস্থা হইতে কতকটা ভাল। কারণ, ঐরূপ কৃষকপরিবারের আয় বার্ষিক অল্প করিয়া ধরিলেও ৭ হইতে ৮ শত টাকার কম হয় না। কিন্তু চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অতি অল্প লোকেরই বার্ষিক অত টাকা আয় আছে; বিশেষতঃ চাকুরিয়াদিগকে বিদেশে চাকুরী করিতে হয় বলিয়া তাহাদের ব্যয় কিছু অধিক পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও ত কৃষকদিগের দুর্দ্দশা ঘুচে না। তাহার কারণ—তাহাদের অপরিণামদর্শিতা, বিলাসপ্রিয়তা এবং মামলা মোকর্দ্দমায় আসক্তি। ফসল বিক্রয় করিয়া ইহারা যখন হাতে কিছু নগদ টাকা পায়, তখন তাহারা নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় সেই অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে এবং নানারূপে মামলা-মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন ইদানীং বাঙ্গালায় কৃষকগণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অনুকরণে 'বাবু' বা বিলাসী হইয়া উঠিতেছে। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক বস্ত্রের প্রয়োজন না হইলেও ইহারা উহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চজাতির সামাজিক দোষের অনুকরণে আপনাদের সমাজে বরপণ প্রভৃতি কুপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বিষয়ে মুসলমান কৃষিজীবী অপেক্ষা হিন্দু কৃষিজীবীরাই অধিক দোষী। বিহার এবং উড়িষ্যাপ্রদেশের সমবায় সমিতির কর্ম্মকর্তা মিষ্টার এ, রহিম, এম্-এ, হিসাব দিয়াছেন যে, এ দেশের প্রত্যেক কৃষক শিল্পীর গড় সংস্থান ১০ টাকা, ঋণ ১২ টাকা। আজকাল এ দেশের শিল্পীদিগের দুর্দ্দশায় একশেষ হইয়াছে; সেই জন্য তাহাদের সংস্থান (possession) অল্প এবং ঋণও অধিক। কৃষকদিগের সংস্থান কিছু অধিক এবং ঋণ কিঞ্চিৎ অল্প হইলেও সে ঋণের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালার যে অংশে পাট প্রভৃতি জন্মে, সেই অংশে কৃষকদিগের সংস্থান কিছু অধিক এবং ঋণ কিছু অল্প বলিয়াই মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালায় যে সকল কৃষক পরিণামদর্শী ও মিতব্যয়ী, তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঋণমুক্ত হইয়া "গোছাল গৃহস্থে" পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, কৃষকদিগের দুর্দ্দশার জন্য কৃষকগণই দায়ী।

কিন্তু অধিকাংশ কৃষকের জোতের জমী অতি অল্প। নিজ জোতে দুই তিন বিঘা জমী আছে, এরূপ কৃষকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ঐরূপ অল্পপরিমাণ ভূমিকর্ষণ দ্বারা কখনই কোন কৃষক পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না। উহাদিগকে অন্য কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই শ্রেণীর কৃষকরা তাহাদের সংসার প্রতিপালনের জন্য সেই জমীতে ধান্যাদি উৎপন্ন এবং অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া থাকে।

আজকাল আমাদের দেশে কৃষকদিগের দারিদ্র্যের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃষকদিগের মধ্যে যাহাদের জোতে অন্ততঃ দশ বিঘা জমী আছে, তাঁহারা যদি বুদ্ধিমত্তার এবং মিতব্যয়িতার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাদের ঋণগ্রস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ ঘটে না। কারণ, তাহাদের আয় অনেক কেরাণী, উকীল, শিক্ষক

হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ শ্রেণীর কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই ঋণজালে জড়িত। তাহাদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিবার বিশেষ কারণও আছে। নিম্নে তাহার কতকগুলি কারণ লিখিত হইল।

(১) দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা।

(২) কৃষকদিগের মোকর্দ্দমাপ্রিয়তা।

(৩) সহযোগিতার ও সাহচর্য্যের অভাব।

(৪) বিলাসিতা ও ব্যয়বাহুল্য।

(৫) অধিক সুদে ঋণগ্রহণ।

(৬) ভূমির উৎকর্ষসাধনে অমনোযোগিতা।

এই কয়টি কারণের কোন কারণই উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য হেতু বর্ষাকালে কৃষকদিগকে অনেক সময় শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। যাহারা অল্প জমীতে চাষ করে, তাহারা স্বহস্তেই চাষের সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সে জন্য মজুরী খরচ করিতে হইলে তাহাদের পোষায় না। বর্ষাকালই চাষের প্রকৃত সময়। এই সময়ে কৃষকদিগকে উৎকট পরিশ্রম করিতে হয়। যথাসময়ে তাহারা যদি মাঠের কায করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের ফসল ভাল হয় না। দুই চারি দিন কায করিতে না পারিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। কিন্তু ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে বর্ষাকালে, বিশেষতঃ শরৎকালে জ্বরের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এই সময়ে অনেক কৃষক জ্বরাদি ব্যাধির জন্য কাযে অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে চিকিৎসা এবং পথ্যের জন্য অর্থ ব্যয়ও করিতে হইয়া থাকে। যে অর্থ উহারা সারের জন্য ব্যয় করিতে পারিত, সেই অর্থ উহারা প্রাণের দায়ে ঔষধ এবং পথ্যের জন্য ব্যয় করে। এই হেতু অনেক কৃষকই প্রায় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেই ঋণভার তাহাদের পক্ষে এতই দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে যে, পরবৎসর আর তাহারা জমীতে আবশ্যক সার দিতে পারে না। সুতরাং এই ম্যালেরিয়ার প্রভাবে বাঙ্গালার যে কত আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। যাঁহারা আমাদের দেশনায়ক, তাঁহারা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে তাদৃশ অবহিত নহেন বলিয়া [illegible]

পল্লীগ্রামে পর্ণকুটীরেই জাতির বাস। সহর দেখিয়া জাতির অবস্থা বিচার করা উচিত নহে। কিন্তু পল্লীগ্রামে পর্ণ-কুটীরবাসী কৃষকরা জ্বরজ্বালায় কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, কিরূপ ভাবে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ লোক এই দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে শমনসদনে নীত হইতেছে; যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহাদের জীবনীশক্তি ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। কৃষকদিগকে কৃষির সময় মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। ম্যালেরিয়ায় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে দেহ যখন জীর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহারা আর আবশ্যক পরিশ্রম করিতে পারে না; কাযেই তাহাদিগের কাযের এবং বাঙ্গালার ধনাগমের অতিশয় বাধা জন্মে। অধিকন্তু এই সময়ে তাহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের পীড়ানিবন্ধন তাহাদিগকে বিব্রত ও অভাব-গ্রস্ত হইতে হয়। সুতরাং তাহারা শ্রমিক দ্বারাও তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে পারে না। অতএব ম্যালে-রিয়ার প্রভাবে বাঙ্গালার যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কৃষকরা অতিশয় পরিশ্রম করে এবং ম্যালেরিয়াবহুল স্থানে থাকিয়া ঐ আব-হাওয়ার সহিত আপনাদের দেহের কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া লয় বলিয়া তাহারা এখন টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহা হইলেও মধ্য এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইদানীং লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ঐ অঞ্চলে যদি উড়িষ্যা, বিহার, যুক্ত-প্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে লোক আমদানী না হইত, তাহা হইলে যে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা কত কমিয়া যাইত, দেশ কিরূপ ভাবে জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে যে কেবল কৃষীবলের ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে। পরন্তু ইহাতে বাঙ্গালার ধনোৎপত্তির ও ধনাগমের পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। যে জাতি এইরূপ শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে জাতি রাজনৈতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনামাত্র।

কৃষকদিগের মামলাপ্রিয়তা তাহাদের দুর্দ্দশার অন্য কারণ। তাহারা অশিক্ষিত এবং অপরিণামদর্শী বলিয়া এইরূপ মামলাপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। প্রতি মহকুমায় দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয়বিধ মামলাই অ[illegible]

কৃষক। যে সকল মামলা আপোষে নিষ্পত্তি হইতে পারে, সেই সকল মামলা আদালত পর্য্যন্ত না লইয়া যাইয়া ইহারা কোনমতেই ক্ষান্ত হয় না। শিক্ষার অভাব, স্বার্থপর কুচক্রীদিগের পরামর্শ এবং মামলায় জয়লাভ করিলে সম্ভ্রমবৃদ্ধি ঘটে, এইরূপ একটা ভ্রান্তজনক ধারণাই তাহাদের এই সর্ব্বনাশজনক মামলাপ্রিয়তার উত্তেজক কারণ। এক একটি মহকুমায় কত টাকার 'কোর্ট-ফিস' বিক্রয় হয়, তাহার হিসাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যত টাকার কোর্ট-ফিস বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা প্রায় ৫০ গুণ টাকা সাক্ষীদিগের বারবরদারী, সাক্ষীদিগকে ঘুষ, রাহা-খরচ, উকীল-খরচ, মুহুরী-খরচ প্রভৃতি বাবদ বাহির হইয়া যায়। সুতরাং এই মামলা-মোকর্দ্দমা বাবদ কৃষকরা কত লক্ষ টাকা অপব্যয় করিতেছে, তাহা পাঠক ভাবিয়া দেখুন। মামলাপ্রিয়তা যে কৃষকদিগের দারিদ্র্যবৃদ্ধির একটা প্রবল কারণ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সহযোগিতার এবং সাহচর্য্যের অভাবও কৃষকদিগের দুর্দ্দশার তৃতীয় প্রবল কারণ। সকল দেশেই আর্থিক ও সামাজিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও সাহচর্য্য করিয়া থাকে। সাহচর্য্যের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত, উহাই সমাজবন্ধন। সুতরাং ইহাই মানবজাতির উন্নতির আদি কারণ। কৃষিবিষয়ে সহযোগিতা ও সাহচর্য্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে যে দেশে কৃষি ও পশুপালনের উন্নতি হইয়াছে, সেই দেশেরই উন্নতির কারণ যে সহযোগিতা ও সাহচর্য্য, ইহা সেই উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। যে সুইটজারল্যাণ্ডের দুগ্ধে আজ সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত, সেই সুইটজারল্যাণ্ডের এই অসাধারণ উন্নতির কারণ সহযোগিতা ও সাহচর্য্য। এখানে সকলেরই জানা আবশ্যক যে, য়ুরোপের উন্নতিশীল কৃষকসমাজের উন্নতিসাধক এবং সুবিধাজনক কার্য্য হইতেই ইংরাজী Co-operation এই শব্দের জন্ম হইয়াছে। যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুইটজারল্যাণ্ড আজ এই বিস্তীর্ণ ভারতে এত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ যোগাইতেছে, সেই সুইটজারল্যাণ্ডের গোপালকদিগের কার্য্যপদ্ধতি হইতে এই শব্দটির উদ্ভব। ভারতবর্ষে যখন সুইটজারল্যাণ্ডের হইতে পনীর (cheese) প্রস্তুত করিত। কিন্তু প্রত্যেক গোয়ালার যে পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হইত, তাহা হইতে পনীর প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদের খরচা অধিক পড়িত; সুতরাং তাহারা সুলভ মূল্যে পনীর বিক্রয় করিতে পারিত না। সেই জন্য তাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক সকলে এক স্থলে আপন আপন দুগ্ধ আনিয়া জমা করিত এবং ভূরিপরিমাণ দুগ্ধ হইতে পনীর প্রস্তুত করিয়া পরস্পর আপন আপন অংশমত তাহা বিভাগ করিয়া লইত; এই পনীর প্রস্তুত কার্য্যে সকলেই একযোগে কার্য্য করিত এবং সকলেই সম্পূর্ণ সাধুভাবে চলিত। তাহারা সকলে একযোগে কায (co-operation) করিত বলিয়া ঐ কাযকে "কো-অপারেশন" বা সহযোগিতা বলা হইত। ইহাই পাশ্চাত্য Co-operation শব্দের ইতিহাস। সুইটজারল্যাণ্ডের কৃষীবল ও গোপালকগণ এইরূপ সাধুতার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে সমর্থ বলিয়া তাহারা এই বিস্তীর্ণ ভারতে এত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ বেচিয়া এ দেশ হইতে প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে—আর আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই গো-পূজক ও গো-পালক জাতি হইয়াও এই সহযোগিতা-ধর্ম্মের অভাবে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছি। যদি সত্য কথা বলা দোষের না হয়, যদি মিথ্যার আবরণে স্বীয় দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করা পাপজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এ কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের সাধুতার এবং সেই জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর বিশ্বাসের অভাবই আমাদের কৃষিকার্য্যে সহযোগিতা করিবার পথে প্রবল অন্তরায়। এখন এ দেশে পাঁচ জন একত্র হইয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিলে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করে, "আমাকে কেহ ঠকাইবে না ত?" ইহাই সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তির এবং প্রবৃত্তির অভাবে আমাদের কৃষকদিগের যে গুরু ক্ষতি হইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতেছে না। আমরা নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

আমাদের দেশে ইক্ষুর চাষ বিশেষ লাভজনক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আখ চাষের উপযুক্ত ভাল জমী

অধিক, তাহাতেই ইক্ষু উৎপাদন করা হয়। সেই জন্ম সকল কৃষক আখের জমী পাইতে চেষ্টা পায়। সুতরাং উহা প্রত্যেকের অংশে অতি অল্পই পড়িয়া থাকে। প্রত্যেকে আইল দ্বারা চিহ্নিত করিয়া নিজ নিজ জমীতে উহার চাষ করে। ফলে এই আইলের জন্ম অনেক জমী হ্রাস পায়। পনর বিঘা জমীতে যদি ৩০ কিংবা ৪০টি তিন অথবা চারি সীমার আইল থাকে, তাহা হইলে কত জমী সেই আইলের জন্ম আটক হয়, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন। কিন্তু ঐ পনর বিঘা জমীতে যদি ঐ ত্রিশ কিংবা চল্লিশ জন একত্র ইক্ষুর চাষ এবং পালাক্রমে যখন যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ ভাবে কায করে এবং গুড় হইলে নিজ নিজ ন্যায্য অংশ হিসাবে তাহা লয়, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই খরচা অল্প হয়, অধিক গুড় জন্মে এবং লাভও অধিক হয়। কেহ দুই চারি দিন পীড়িত হইলে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকদিগকে তাহা বুঝাইলেও তাহারা তাহা বুঝিবে না। শিক্ষার অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ, আমি তাহা মনে করি না; কারণ, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই দোষের অতীত নহেন। অনেক যৌথ-কারবারের দুর্দশা দেখিলে তাহা বুঝা যায়। যত দিন আমরা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে না সমর্থ না হইব, তত দিন আমাদের এই দুর্গতি ঘুচিবে না।

কৃষিকার্য্যে নানাদিকেই সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাপ্তি, উন্নত যন্ত্রাদির আমদানী এবং ব্যবহার, বীজাদির সংগ্রহ, দ্রব্য উৎপাদন, উহা সংগ্রহের এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং ঋণগ্রহণ ও ঋণদানের ব্যবস্থায় ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। মুলজ ডি লিজ বলেন,—Co-operation for production is the roof of the agricultural structure, co-operation for purchase and sale the foundation and credit the walls. ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, উৎপত্তি বিষয়ে সহযোগিতা কৃষিরূপ সৌধের ছাদ, আবশ্যক পণ্য খরিদ এবং বিক্রয় তাহার বনিয়াদ এবং পণ্যর উহার দেওয়াল। অর্থাৎ কৃষির সর্ব্ববিষয়েই সহযোগিতার প্রয়োজন। ভারতের বা হয়ে বহু স্থানদেশে সহযোগিতার দ্বারা কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বেলজিয়ামে ধর্ম্ম-সাধনের পথিপ্রদর্শক হইয়াছেন। হলণ্ডে, ইটালীতে, হাঙ্গেরিতে সহযোগিতার দ্বারা কত উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি এ স্থলে তাহা সমস্ত বিবৃত করিতে পারিলাম না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে উহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি কৃষীবল সহযোগিতা সহকারে কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হয় এবং চাষীদিগের নিকট হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া যাহারা মহাজনের বা বিক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয় করে, সেই সকল মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের (middlemen) লাভ আপনারাই পাইতে পারে। বহু দেশের কৃষকগণ এই উপায়ে লাভবান্ হইয়াছে। আমাদের দেশের চাষাদিগকে সেই শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষি-কমিশন যদি ইহার একটা উপায় স্থির করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

বিলাসিতা ও কতকগুলি সামাজিক কার্য্যে ব্যয়বাহুল্য আমাদের কৃষকদিগের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রবল কারণ। আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে বস্ত্রের বা পরিচ্ছদের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। বরং উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে চাষীরা সামান্য বস্ত্র পরিয়া দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ লাভ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনকার চাষীরা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লজ্জাবোধ করে। ইহাতে তাহাদের ব্যয়বাহুল্য হেতু দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়বাহুল্যও তাহাদের দারিদ্র্যবৃদ্ধির প্রবল কারণ।

এ দেশের কৃষকদিগকে অত্যন্ত অধিক সুদে ঋণগ্রহণ করিতে হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তাহারা মহাজনদিগের নিকট হইতে শতকরা মাসিক ৩৵০ টাকা হিসাবে টাকা কর্জ্জ লয়। অর্থাৎ তাহারা বার্ষিক ৩৭ টাকা সুদে কর্জ্জ করে। এই ঋণ তাহাদের পক্ষে শোধ করা কঠিন হইয়া উঠে। মিতব্যয়িতার অভাবই তাহাদের এইরূপ ঋণ করিবার কারণ। তাহারা অনেক সময় প্রথম হইতে মহাজনকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই হেতু এখন দেশী মহাজনের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং দেশী মহাজনের স্থান কাবুলী মহাজনরা অধিকৃত করিতেছে। উহারা মাসিক শতকরা সাড়ে ছয় টাকার কম সুদে টাকা

হারে সুদ আদায় করে অর্থাৎ এক বৎসরে এক শত টাকার সুদ ১ শত ৫৬ টাকা হইয়া থাকে। ইহাতে কৃষকদিগের দুর্গতি যে অত্যন্ত অধিক হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? দেশীয় মহাজনরা বরং অনেক সময় অধমর্ণদিগের উপর করুণাপ্রকাশ করিত, কাবুলী মহাজনরা অনেকে তাহা করে না। তাহাদের মধ্যে অনেকে লাঠীর জোরে টাকা আদায় করিয়া থাকে।

ভূমির উৎকর্ষসাধনে আমাদের দেশের কৃষকরা প্রায়ই মনোযোগ দেয় না। তাহারা অন্য সহস্র বিষয়ে অত্যন্ত অধিক অর্থব্যয় করিবে, কিন্তু কিসে জমীর উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিসে অল্প জমীতে অধিক ফসল জন্মে, তাহার জন্য চেষ্টা করে না। এই জন্য ইহাদের দুর্গতি ঘুচে না। যে জমীতে স্বভাবতঃ ৫ মণ ধান্য জন্মে, সেই জমীতে যদি রীতিমত সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে অন্ততঃ ১০ মণ ধান জন্মিতে পারে। কিন্তু উহারা তাহা করিবার জন্য পরিশ্রম স্বীকার ও ব্যয় করিতে চাহে না; শিক্ষার অভাব ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। এই অদূরদর্শিতাই ইহাদের দুর্গতির আর একটি প্রধান কারণ। কিসে ইহার প্রতীকার করা সম্ভব হয়, তাহাও সকলের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



য়ুরোপ।—ওঃ; এত বড়—এত শক্তিমান?



কুওমিনটাঙ্গের জয়যাত্রা

প্রথমে উ-পেই-ফু, তাহার পর সান চুয়ান-ফেঙ্গ, এবং সর্ব্বশেষে চাঙ্গ-চুয়াঙ্গ-চাঙ্গ,—একে একে উত্তর-চীনের সামরিক নেতারা দক্ষিণের জাতীয় দল কুওমিণ্টাঙ্গের কাণ্টনী সেনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। এখন অবশিষ্ট কেবলমাত্র মার্শাল চাঙ্গ-সো-লিন। এই সকল সামরিক নেতা Mandarin War-lord, অথবা Brigand Chief নামে অভিহিত। ইঁহাদিগকে ভাড়াটিয়া সৈন্তের উপর নির্ভর করিতে হয়—এমন কি, চাঙ্গ-সো-লিনের এক দল White Russian শরীররক্ষী সেনাও আছে। যে সেনাদল জাতীয় গর্ব্বের মদিরায় উন্মত্ত না হয়, যাহারা দেশ প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ না করে, যাহারা কেবল প্রভুর দত্ত বেতনাদির মুখ চাহিয়া যুদ্ধ করে,—তাহাদের উপর প্রভু সকল সময়ে সকল অবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন না। পরন্তু এই জাতীয় ভাড়াটিয়া সেনার প্রভু অনেক সময়ে লুঠ-তরাজ ও অত্যাচার-অনাচার দ্বারা সৈন্তের খোরাক যোগাইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের সৈন্তরাও তাঁহাদের অসৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যাচার, লুণ্ঠন ও অরাজকতায় স্বতঃই অভ্যস্ত হয়। এই হেতু উত্তরের এই সকল সৈন্তকে Bandit-army অর্থাৎ ডাকাত-সৈন্ত এবং তাহাদের প্রভুকে Bandit বা Brigand Chief অর্থাৎ দস্যু-সর্দ্দার বলা হয়। এই সর্দ্দাররা স্বয়ং-কর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারী এবং সর্ব্বেসর্ব্বা; এই হেতু তাঁহারা War-lords, পরন্তু তাঁহারা প্রাচীন মাঞ্চু রাজত্বকালের Mandarin-দিগের—নামে অধীন অথচ পূর্ণ স্বাধীন প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদের ন্যায় ধনবান্, আত্মসুখান্বেষী, বিলাসী ও অত্যাচারী বলিয়া তাঁহারা সাধারণ নামেও অভিহিত।

মার্শাল উ-পেই-ফু হ্যাঙ্কো সহরে তাহার প্রধান সামরিক আড্ডা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে তিনি সমগ্র মধ্য-চীনে আপনার শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাতে ও মার্শাল চাঙ্গ-সো-লিনে ঘোরতর শত্রুতা ছিল। একবার তিনি পিকিং হইতে উত্তরে মাঞ্চুরিয়া-প্রান্তে সসৈন্তে চাঙ্গ-সো-লিনের বিপক্ষে রণযাত্রা করিয়া তাঁহার সহকারী খৃষ্টান সেনাপতি জেনারল ফেঙ্গ-উ-সিয়াঙ্গের উপর পিকিন রক্ষার ভারার্পণ করিয়া যান। মার্শাল ফেঙ্গ কিন্তু সেই সুযোগে পিকিংয়ের কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়া লইলেন এবং উ-পেই-ফুকে দক্ষিণদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি সেই সময়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি চীন দেশ হইতে এই সকল দস্যু-সর্দ্দারকে তাড়াইয়া দিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবেন। তিনি তাঁহার দলকে 'কুওমিনচুন' জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করেন।

উ পেই-ফু দেখিলেন, বিষম বিপদ। একে তাঁহার উত্তরে প্রবল শত্রু, তাহার উপর দক্ষিণে ঘরের শত্রু ফেঙ্গ। কাযেই তিনি উত্তরের যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ঘর সামলাইবার জন্য তাড়াতাড়ি দক্ষিণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে সকল সংঘর্ষ হইল, তাহার ফলে তিনি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেন, শেষে পিকিন হইতে জাহাজে করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র পলায়ন করিতে হইল।



সাংহাইয়ে কাণ্টনী সেনাপতি জেনারেল লু-টিপিং

ইহার পর উ-পেই-ফু মার্শাল চাঙ্গ-সো-লিনের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। সন্ধির এক সর্ত্ত হইল যে, উভয়ে মিলিয়া জেনারল ফেঙ্গের উচ্ছেদসাধন করিবেন। তাহাই হইল। উ-পেই-ফু ও চাঙ্গের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ফেঙ্গ মঙ্গোলিয়ায় পলায়ন করিলেন। চাঙ্গ-সো-লিন উ-পেই-ফু আপোষে রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। চাঙ্গ মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিকিংয়ের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং উ-পেই-ফু মধ্য-চীনের কর্ত্তৃত্ব লইলেন, ইয়াংসি নদীতটে হ্যাঙ্কো বন্দরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল।

এ দিকে জেনারল ফেঙ্গ মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গায় সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে তিনি কিরূপে মস্কো যাত্রা করিয়াছিলেন এবং রাসিয়ান বলশেভিকদিগের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উর্গায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাঙ্গ ও উ-পেই-ফুর কণ্টকরূপে চীনের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে মঙ্গোলিয়ার মধ্যে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাহার পরিচয় 'মাসিক বসুমতীর' পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি। তিনি ও তাঁহার কুওমিনচুন দল যে দক্ষিণের কাণ্টনী জেনারল চাঙ্গকাইসেক ও তাঁহার কুওমিণ্টাঙ্গ দলের বন্ধু

দল মঙ্গোলিয়ান সৈন্য পিকিনের চীনরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। পিকিন সরকার (অর্থাৎ চাঙ্গ-সো-লিন) এ জন্য রাসিয়ার বলশেভিকদিগকে অপরাধী করিতেছেন, বলিতেছেন, তাহারা এই আক্রমণের পশ্চাতে আছে। এ কথা বলিবার কারণ যে একবারে নাই, তাহা নহে। এই আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে পিকিন গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের সমুদ্রে একখানা জাহাজ আটক করেন। ঐ জাহাজে ছিলেন শ্রীমতী বোরোডিন ও আর তিন জন রাসিয়ান যাত্রী। শ্রীমতী বোরোডিনের স্বামীর অর্থাৎ মাইকেল বোরোডিনের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তিনি কাণ্টনের কুওমিণ্টাঙ্গ দলের উপদেষ্টা এবং প্রধান প্রচারক; তাঁহাকেই সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা বলশেভিকদিগের এজেন্ট ও চীনে কম্যুনিষ্ট মতের প্রচারক বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহাকে বদমাস, 'রাস্কেল', নাষ্টের গুরু—যত নষ্টের মূল বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মূল অপরাধ, তিনি দক্ষিণের কাণ্টনী কুওমিণ্টাঙ্গদিগের মনে জাতীয়তার ভাব এবং স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইয়াছেন অথবা জাগাইতে জেনারল চাঙ্গ কাইসেককে সহায়তা করিয়াছেন। চাঙ্গ সো-লিন উত্তর চীনের নেতা, কাযেই বোরোডিনের অথবা রাসিয়ান 'রেড' অথবা বলশেভিকদিগের উপর তিনি কিরূপ সন্তুষ্ট, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই তাঁহার পিকিং গভর্ণমেণ্টের আদেশে ধৃত তিন জন রাসিয়ানের প্রাণদণ্ড হইয়াছে এবং শ্রীমতী বোরোডিন এখন পিকিংয়ে বন্দিনী রহিয়াছেন। রাসিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টকে অনুযোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। পিকিং গভর্ণমেণ্ট কোনও জবাব দেন নাই। রাসিয়ার সোভিয়েট সরকার বলিয়াছিলেন, যদি কোনও প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। হয় ত সেই হেতু মঙ্গোলিয়া প্রান্ত হইতে চীন আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে। ফল কথা,—চাঙ্গ-সো-লিনের পিকিং গভর্ণমেণ্টের উত্তর পশ্চিমে দুই প্রবল শত্রু ওৎ পাতিয়া বসিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে, (১) সোভিয়েট রাসিয়া এবং (২) জেনারল ফেঙ্গ-ইউ-সিয়াঙ্গ। তিনিও যে মঙ্গোলিয়ার চীন আক্রমণ ব্যাপারে লিপ্ত নাই, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। চাঙ্গের বন্ধু উ-পেই-ফু কাণ্টনীদের নিকট পরাজিত হইয়া হাঙ্কো হারাইয়া এখন হোনান প্রদেশে লুকাইয়াছেন।



কাণ্টন গভর্ণমেণ্টের অন্যতম নেতা জেনারেল কুপো

সান চুয়ান ফেঙ্গ উত্তরের আর এক War-lord বা Brigand Chief দস্যু-সর্দ্দার। তিনি এত দিন সাংহাই ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ৫টি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি কাণ্টনীদের বিরুদ্ধে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। এমনও শুনা যায় যে, বিদেশীয়রা তাঁহাকে গোপনে উৎসাহ ও সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু মুক্তিকামী প্রকৃত দেশপ্রেমিক কাণ্টনের জাতীয় সেনাদলের বন্যাবেগকে তাঁহার সকল বাধাই জীবনী-স্রোতে খড়-কাগজের মত ভাসিয়া গেল। আশ্চর্য্যের কারিণ জাতীয় দলে যোগদান করিল। সাংহাই সহরে একটা অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদগোলা তৈয়ার করিবার প্রকাণ্ড কারখানা (arsenal) ছিল। প্রকাশ, সেই কারখানাটাই সমগ্র চীন দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট, কাণ্টনীদের বিপক্ষে এখানে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছিল সন্দেহ নাই। জেনারল সান চুয়াঙ্গ ফেঙ্গের দলস্থ কোন নৌসেনানী বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রণপোত হইতে সাংহাই বন্দরের এই অস্ত্রাগারের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া বিষম ক্ষতি করিল এবং পরে সরাসরি ইয়াংসি নদী বাহিয়া কাণ্টনী সেনাদলের সহিত যোগদান করিল। তখন কাণ্টনীরা সাংহাই-সহরে প্রবেশ পর্য্যন্ত করে নাই! এমন কত সেনানী ও সৈনাপতিই জাতীয় দলে যোগদান করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বলিতে গেলে, একরূপ বিনাযুদ্ধেই কাণ্টনীরা সাংহাই অধিকার করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে কি স্বীকার করিতে হয় না যে, দেশের জনসাধারণ জাতীয় দলের স্বাধীনতা-সমরের প্রতি সমধিক সহানুভূতিসম্পন্ন? ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, চীনের জাতীয় দল অচিরে সমগ্র চীনে আপনাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে?

তাহার পর চাঙ্গ-চুয়াঙ্গ চাঙ্গ। ইনি সাণ্টাং প্রদেশের War-lord বা Brigand Chief দস্যু সর্দ্দার। কাণ্টনীদের বিপক্ষে ইঁহার সাংহাইয়ের সান-চুয়ান-ফেঙ্গের সহিত যোগদান করিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি যথাসময়ে প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। অনেকে অনুমান করেন, তাঁহার এক দুরভিসন্ধি ছিল। সান-চুয়ান-ফেঙ্গকে আশা দিয়া শেষ মুহূর্ত্তে নিরাশ করার অর্থ এই যে, চাঙ্গ-চুয়ান নিজের সাহায্যদানে অপরের কৃতিত্ববর্দ্ধনে ইচ্ছুক ছিলেন না! "সানের দর্প চূর্ণ হউক, সে ভূলুণ্ঠিত হউক, তাহার পর আমি আসরে অবতরণ করিয়া একবার কাণ্টনীদিগকে বুঝিয়া লইব, জগতে আমার কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিব," —এই বাসনাই বোধ হয় তাঁহার মনে বলবতী ছিল। কিন্তু গ্রহের দোষে তাঁহার সাধের কামনা পূর্ণ হয় নাই। তিনিও সানের মত (যদিও বিস্তর ধনরত্ন লইয়া জাহাজে জাপানে পলায়ন করেন নাই) কাণ্টনীদের হস্তে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারও বহু সেনানী ও সেনাপতি কাণ্টনীদের দলে যোগদান করিয়াছে। ভাড়াটিয়া সেনাপতির ভাগ্যে এইরূপই ঘটিয়া থাকে!

এই প্রকৃতির সামরিক নেতা বা দস্যুসর্দ্দার নিজের সৈন্যের উপর কখনও পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। হোনান প্রদেশের শক্তিশালী সেনা-নায়ক টাং সেঙ্গ চিং সদলবলে কাণ্টনীদের সহিত যোগদান করিয়াছেন। ফলে উত্তরের সেনাদলের সহিত হোনানের সেনাদলের একটা যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে, তাহাতে হোনানীরাই জয়লাভ করিয়াছে। এড্‌মিরাল ইয়াং কয়েকখানি সমরপোত সহ কাণ্টনীদের দলে যোগদান করিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপে হোনা-

জাতীয় দলের সহিত যোগদান করিয়াছেন। ইহাতে ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে, জাতীয় দলের জয়যাত্রায় অধিকাংশ চীন দেশপ্রেমিকের সহানুভূতি আছে, উত্তরের সামরিক কর্ত্তাদের অর্থবল ও লোকবল থাকিলেও তাহার পশ্চাতে দেশপ্রেমিকতা নাই।

উত্তরের উপর বিদেশীয়ের প্রভাব

উত্তরের সামরিক নেতারা বিদেশীয়দিগের রাজনীতিক চক্রান্ত দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত। চাঙ্গসোলিন্ যে জাপানের ক্রীড়নক, ইহা বহুপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তিনি জাপানের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া মাঞ্চুরিয়ার রেল হইতে রাসিয়ানদিগকে দূর করিয়াছিলেন এবং সে জন্য রাসিয়ান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কঠোর অনুযোগ করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ আছে। এখনও তিনি যে গোপনে জাপানের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন, এ কথা চীনের জাতীয় দল বলিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহাকে আবশ্যক হইলেই বিদেশীয়ের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।



কুওমিণ্টাঙ্গের অন্যতম নেতা—ওয়াং-চিং-ওই

এই প্রকৃতির সামরিক নেতারাও আপনাদিগকে চীনের স্বাধীনতাকামী ন্যাশানালিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। যদি তাঁহারা বিদেশীয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা বিদেশীয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে কোনও আপত্তি করিবেন না; এই হিসাবে তাঁহারা ন্যাশানালিষ্ট। কিন্তু বিদেশীয়ের সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের এক পা চলিবার উপায় নাই, এ জন্য তাঁহাদের ন্যাশানালিষ্ট হইবার স্বপ্ন সফল হইবার নহে। আবার তাঁহারা ন্যাশানালিষ্টের বিরোধীও বটে, কেন না, কাণ্টনী ন্যাশানালিষ্টদিগের তাঁহারা ঘোর শত্রু; বোধ হয়, সাধ্য থাকিলে তাঁহারা কাণ্টনীদিগকে একদিনে টিপিয়া মারিতে ছাড়ে না। ইহার কারণ এই যে, কাণ্টনীরা সমগ্র চীনদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহাদের 'দস্যু-সর্দ্দারী' এক দিনে উচ্ছিন্ন হইবে, সুতরাং তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা, লুণ্ঠন ও অরাজকতার এক দিনে উচ্ছেদ সাধিত হইবে। এই হেতু তাঁহারা বিদেশীয় সাম্রাজ্যিকদিগের ক্রীড়নকরূপে থাকিতে স্বভাবতঃই বাধ্য। দেখিতে পারে না, কেন না, তাহা হইলে কাণ্টনের প্রভাব সমগ্র চীনে বিস্তৃত হইলে চিরতরে তাহাদের বিশেষ অধিকার ও শোষণ-নীতি অন্তর্হিত হইবে। এই হেতু বিদেশীয় সাম্রাজ্যিকদিগের সহিত উত্তরের সামরিক নেতাদের প্রকাশ্যে না হইলে গোপনে একটা প্রীতির বন্ধনের অস্তিত্ব আছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন।

চীনে বিদেশীয়দিগের রাজনীতিক চক্রান্তের জাল ভেদ করা সহজ নহে। কি উপায়ে তাহারা অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল এই চক্রান্তের ফলে দুর্ব্বল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন চীনদেশে আপনাদিগের স্বার্থ, বিশেষ অধিকার, কনসেশান, এক্সট্রা-টেরিটোরিয়াল অধিকার, কাষ্টম কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে, তাহার ইতিহাস মাসিক বসুমতীর পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই "অহিফেন যুদ্ধ" ও "বক্সার বিদ্রোহ" প্রভৃতির ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। বৃটেনের দৃষ্টান্তই এ স্থলে যথেষ্ট। ইয়াংসি নদীর বন্দর সমূহে এবং দক্ষিণ-চীনে বৃটেনের কি প্রচুর স্বার্থ ও বিশেষ অধিকার নিহিত ছিল, তাহার ইতিহাস পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। একা



কাণ্টনের প্রধান সেনাপতি চ্যাং কাইসেক

সাংহাই বন্দরেরই জমীজমা, গৃহ, কলকারখানা, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার এবং বন্দকী কারবারে ইংরাজের নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ৬৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, হাঙ্কো, ওয়ানসিয়েন, চাংশা, নানকিং, চুংকিয়াং ইচাং, হংনং প্রভৃতি স্থানে মোটের উপর ইংরাজের কি বিপুল স্বার্থ নিহিত আছে। জেনারেল উপেই ফু, সান চুয়াঙ্গ ফেঙ্গ এবং চাঙ্গ চুয়ান চাঙ্গ এত দিন এই সকল স্থানের অধিকাংশ বাণিজ্যকেন্দ্রের অধিনায়ক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা যে ইংরাজ সাম্রাজ্যিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত ছিলেন না, ইংরাজ সাম্রাজ্যিকরাও যে তাঁহাদের সহানুভূতির বিনিময়ে তাঁহাদিগকে বন্ধুত্ব ও আশ্রয় প্রদান করেন নাই, তাহা নহে। সুতরাং কাণ্টনীদিগের হঠাৎ অভ্যুদয়ে সে সুশান্তিপূর্ণ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, বলিয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যিক মহলে আজ ঘোর চিত্তচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

যখন কাণ্টনীরা কাণ্টন হইতে হাজার মাইল দূরে যেন চিলের ছোঁ মারিয়া হাঙ্কো ও ওয়ানসিয়েন প্রভৃতি ইয়াংসি-নদীতটস্থ বন্দর



ধর্ম্মঘট ও প্রচারকার্য্যের নিয়ামক জেনারল ইয়েন্কাই

প্রথম আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কাণ্টনীরা কোয়ানটাঙ্গ প্রদেশের মধ্যে তাহাদের স্বাধীনতার আন্দোলন সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ কি—এ যে সর্ব্বনাশ! একবারে ইয়াংসি-তটে ধনী ব্যবসাদার সাম্রাজ্যিকের কড়ি নাড়াচাড়ার কেন্দ্রসমূহে বাড়া ভাতে হাত? সাম্রাজ্যিকদিগের আহার-নিদ্রা অন্তর্হিত হইল—জার্ম্মাণ যুদ্ধকালের মত ঘোর প্রচারকার্য্য চলিল। অর্থ ও লোকবলের তাঁহাদের অভাব নাই। তাঁহার যোগাযোগে জগতের লোক শুনিল, কাণ্টনীদের এ আন্দোলন মুক্তির আন্দোলন নহে, উহা বলশেভিক 'রেড' রাসিয়ার কুপরামর্শে জগতে অরাজকতা ও অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়নের আন্দোলন। কাণ্টনীর জাতীয় আন্দোলন—বিরাট ধর্ম্মঘট ও বর্জ্জন যে সাংহাই ও সামীনের চীন ছাত্র ও শ্রমিকের উপর গুলীবর্ষণের ফল, তাহা অস্বীকৃত হইল। প্রথমে প্রচারের বলে কাণ্টনীদিগকে ভয়প্রদর্শনে অধিকতর আন্দোলনে বিরত করিবার চেষ্টা হইল। ওয়ানসিয়ানে বৃটিশ গানবোটের গোলা চলিল—চীনা প্রজার ক্ষতি হইল।

কিন্তু তাহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, বরং অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার ফলে বৃটিশ মেমোরাণ্ডমের পুনরাবৃত্তি, ইউজিন চেনের সহিত আপোষ-সন্ধি, কাণ্টনীদের হস্তে হাঙ্কোর সমস্ত শাসনাধিকার প্রদান। ইতিহাসের সে অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া গেল, আবার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সাংহাই ও নানকিং সহরের পতন হইল। এখন কাণ্টনীরা সাংহাইয়ের চীনা অংশ অধিকার করিয়াছে। সেখানে জাতীয় দলের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে। বিদেশী কনসেশানের সম্বন্ধে এইবার কথা উঠিবে সন্দেহ নাই।

সাংহাই ও নানকিং অধিকারকালে চাঙ্গ-চুয়ান-চাঙ্গের সহিত কাণ্টনীদের মত না যুদ্ধ হউক, খণ্ডযুদ্ধ ও লুঠতরাজের ফলে বহু চীনার ধনপ্রাণ নষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ইংরাজ ও মার্কিণের সহিত চীনার সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে; ফলে কয়জন বিদেশীয়ের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, অনেক বিদেশীয়ের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। অন্য দিকে বিদেশীয়ের জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণের ফলে ২ লক্ষ [illegible]

আরও শুনা গিয়াছে যে, ইয়াংসি নদীর তটস্থ বন্দর সমূহে বিদেশীয়দিগের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়াছে, অনেকেই স্থানত্যাগ করিয়াছে, অবশিষ্টদিগকে মার্কিণ ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সুযোগমত স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছেন।

এখন আবার সাম্রাজ্যিকদিগের সুর পাল্টাইয়াছে। হ্যাঙ্কো বন্দরে কাণ্টনীদিগের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার পর বৃটিশ পক্ষের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ স্বয়ং প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যাহা হ্যাঙ্কোয় সম্ভব হইয়াছে, সাংহাইয়েও তাহা সম্ভব হইবে। অথচ তাহার পর সার অষ্টেন চেম্বারলেনের মত রাজপুরুষ বলিয়াছেন,—ইহার অধিক অধিকার আর চীনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, অর্থাৎ হ্যাঙ্কোয় যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, সাংহাই নানকিংয়ে তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না, ইংরাজ নিজের বিশেষ অধিকার ছাড়িবেন না।

হঠাৎ এ মতপরিবর্ত্তনের মূলে যে কিছু নাই, তাহা নহে। মার্কিণ এত দিন পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু নানকিংয়ে কয় জন মার্কিণ হতাহত হইয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এই হেতু সাংহাইয়ে মার্কিণ ইংরাজের সহিত একযোগে বিদেশীয়ের স্বার্থরক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। হয় ত মার্কিণের উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

কিন্তু জাপান ও ফরাসীর কি? জাপান চাঙ্গসোলিনকে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, এ কথা সত্য। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের স্বার্থ নিহিত আছে, ইহাও ঠিক। কিন্তু জাপান বুঝে, চীন সত্যই জাগিয়াছে, এখন এই বিরাট জাতিকে তাহার মুক্তি-সমরে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই। কাণ্টনীরা যে তাহাদের নিজস্ব কোয়াণ্টাঙ্গ প্রদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া চীনের বহুদূর পর্যন্ত আপন কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে, সে কথাও জাপান বিলক্ষণ বুঝে। এই হেতু



চাং কাইসেকের সহকারী টাং-সেং-চি

জাপান একরূপ নীরবই ছিল। যতক্ষণ না কাণ্টনীদের সহিত মাঞ্চুরিয়ার প্রভাব লইয়া তাহাদিগের স্বার্থসংঘর্ষ বাধে, ততক্ষণ জাপান [illegible]

অরাজকতা দূর করিবার পর কি করিবে? তাহা ত সহজেই বুঝা যাইতেছে। চাঙ্গসোলিনের সহিত অদূর-ভবিষ্যতে কাণ্টনী জেনারল চাঙ্গকাইসেকের সংঘর্ষ বাধিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তখনই জাপানের পক্ষে সমস্যা উপস্থিত হইবে।

কিন্তু জাপানের আর একটা দিক আছে। তাহারাও ইংরাজের মত সাম্রাজ্যিক বণিক। তাহারা কি কোন কারণে ব্যবসায়ের সুবিধা ছাড়িয়া দিতে পারে? ইয়াংসি নদীর বন্দর সমূহ হইতে যদি ইংরাজের বাণিজ্য উঠিয়া যায়, তবে ত জাপানী বণিকেরই লাভ। সুতরাং জাপান এখন 'তফাতে দাঁড়াইয়া' ঘটনাবলী দেখিতেছেই।

মার্কিণ নানকিং ও সাংহাইয়ে শান্তিস্থাপনে ইংরাজের সহিত একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও সঙ্গে সঙ্গে ইয়াংসি নদীতট এবং অন্যান্য স্থান হইতে আপন প্রজাকে অবিলম্বে চলিয়া আসিতে বলিতেছেন। ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে মার্কিণমাত্রকেই বাধ্য করা হইতেছে। সুতরাং মার্কিণও যে বলপ্রয়োগে কাণ্টনীদিগকে 'সমঝাইবার' চেষ্টা করিবেন, এমন মনে হয় না।

ফরাসীর 'লে টেম্‌স্' নামক সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংবাদপত্র গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখেই লিখিয়াছিলেন, "বৃটিশ বণিকগণের, পাদরীগণের এবং জুয়াড়ীগণের প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চীনে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" সুতরাং বুঝা যায়, ফরাসীও চীনে হস্তক্ষেপ-নীতির পক্ষপাতী নহেন। এ অবস্থায় চিন্তাশীল ধীর শান্তিকামী ইংরাজ রাজনীতিকের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বনীয়?

স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন

ধনী বণিক ও সাম্রাজ্যগর্ব্বীর প্ররোচনায় বিচলিত হইলে এখন বিদেশীয় শক্তিরা প্রকৃত রাজনীতির পরিচয় দিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয়। তাঁহারা কি চীনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখিতে চাহেন না? ইতঃপূর্ব্বে বহুবারই ইংরাজ ও মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের নানা ঘোষণায়





রাসিয়ান পরামর্শদাতা জেকব বোরোডিন্

প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহারা চীনকে প্রকৃতই স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখিতে চাহেন, এই হেতু চীনের গৃহযুদ্ধে তাঁহারা কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। উত্তর-চীনের দস্যুসর্দ্দাররা একে একে দক্ষিণের জাতীয় দলের দ্বারা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। এখন বাকী কেবল একা চাঙ্গসোলিন। কাণ্টনীরা অপরের দ্বারা বাধা না পাইলে তাঁহাকেও যে শীঘ্র পরাভূত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য, চীনে প্রকৃত গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃত শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। সে বিষয়ে তাহারা সফলকাম হইলে বিদেশীয়গণেরও কি লাভ নাই? দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য অবাধে চলিতে পারিবে, এবং তাহার ফলে অরাজকতার ও ধর্ম্মঘটের দিনের প্রচুর ক্ষতি তাঁহারা পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন। কাণ্টনীরা বলশেভিক প্রভাবান্বিত, এ সব মিথ্যা প্রচারে তাঁহাদের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। যদি কাণ্টনীরা তাহাই হইত, তাহা হইলে কয়েক দিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় তারের সংবাদে প্রকাশিত হইত না যে, কাণ্টনীদের নেতা জেনারল চাঙ্গ কাইসেকের সহিত রাসিয়ান প্রচারক মাইকেল বোরোডিনের মতানৈক্য ঘটিয়াছে এবং জেনারল চাঙ্গ কাইসেক তাঁহার গভর্ণমেণ্ট হইতে চরমপন্থীদিগের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আসল কথা, স্বার্থান্বেষী পাশ্চাত্য ধনী বণিক ও সাম্রাজ্যগর্ব্বীরা শক্তিপুঞ্জের ক্রোধ ও বিরক্তি উৎপাদনের জন্য নানা মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকে। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে লর্ড নর্থক্লিফের দল মার্কিণ দেশে গিয়া জার্ম্মাণীর নামে নানা মিথ্যার প্রচার করিয়াছিল। এক জন রটাইয়াছিল,—জার্ম্মাণরা এক কারখানা করিয়া মড়া মানুষের চর্ব্বীর ঘৃত প্রস্তুত করিতেছে এবং তাহা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতে লাগাইতেছে! সেইরূপ এবারও নানা মিথ্যা প্রচারক রটাইতেছে যে, নানকিংয়ে দুইটি মার্কিণ মহিলার উপর পাশবিক

অনাচারই করুক, কোথাও কোনও নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। সুতরাং বুঝা যায়, মার্কিণকে উত্তেজিত করিবার জন্য কি মিথ্যা প্রচারকার্য্যই না চলিয়াছে।

এক কথা, বিশেষ অধিকার—কনসেশ্যান। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ বস্তুতঃ চীনকে হ্যাঙ্কো ওয়ানসিয়েনের মত সকল অধিকার—সকল কনসেশান ছাড়িয়া দেওয়া অপমানজনক মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, চীন যখন দুর্ব্বল ও গৃহবিবাদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন বন্দুক বেয়নেটের জোরে বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট যাহা আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাকে "অধিকার" বা "কনসেশান" বলা যায় না। আজ যদি চীন শক্তিশালী ও একতাবদ্ধ হইয়া সে সকল বিশেষ অধিকার লুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি উঠে কেন? তাঁহারা ত চীনকে প্রকৃত স্বাধীন দেখিতে চাহেন। চীনের অন্যান্য প্রজার ন্যায় তাঁহাদের প্রজারাও চীনের আইন মানিয়া চলুক, চীনের অধিকার উপভোগ করুক, তাহাতে ত চীনের আপত্তি



উত্তর-দলের সেনানায়ক ইয়ান্‌সেন—বর্ত্তমানে দক্ষিণীদলে যোগ দিয়াছেন

নাই। বিশেষতঃ চীনের জাতীয় দল কনসেশানে আপত্তি করে কেন, তাহার এক বিশেষ কারণ আছে। এই কনসেশানগুলি ষড়যন্ত্রের প্রধান আড্ডা। কাণ্টন গভর্ণমেণ্টের বিচার সচিব ডাক্তার জর্জ্জ সু সে দিন বলিয়াছেন যে, "সম্প্রতি টিন্‌সিনের বৈদেশিক কনসেশান হইতে কয় জন কুওমিনটাঙ্গ দলের লোককে ধরিয়া চাঙ্গসোলিনের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। ইহাতে কি নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হয় না? এইরূপ কারণে কনসেশানগুলি আর বিদেশীদের হস্তে রাখা এক মুহূর্ত্তও সমীচীন নহে।" ডাক্তার সু যে সে লোক নহেন। তিনি এক সময়ে ডাক্তার সান ইয়াটসেনের চিফ সেক্রেটারী ছিলেন। তাহার পর ডাক্তার সানের কাণ্টন গভর্ণমেণ্টে বিচার-সচিব হইয়াছিলেন। এখনও তিনি কুওমিনটাঙ্গ দলের অন্যতম নেতা। ডাক্তার সু এমনও বলিয়াছেন যে, যে সকল সন্ধিসর্ত্ত আছে, তাহার কোন মূল্য নাই। দুর্ব্বল চীনকে বাধ্য করিয়া বৈদেশিক শক্তিগণ সেই সকল সন্ধির সর্ত্তে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলেন, এখন কেবল সেই সকল সন্ধির সংশোধন-পরিবর্জ্জন করিলে চলিবে না, সেই সকল সন্ধি বাতিল করিয়া নূতন সন্ধি করিতে হইবে। কেন না, নূতন চীনের আত্মসম্মানজ্ঞান সে সকল সন্ধি মানিবে না। এখন উভয় পক্ষে অর্থাৎ

[illegible]

স্ব স্ব ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া নূতন সন্ধি করিতে হইবে। পুরাতন সন্ধির সংশোধন করিলে হয় ত আপাততঃ সাময়িক সদ্ভাব স্থাপিত হইবে, কিন্তু উহা দ্বারা চিরদিনের জন্য সদ্ভাবস্থাপনের আশা নাই। বৈদেশিকরা অভিযোগ করেন যে, নাশানালিষ্টরা তাহাদের বিপক্ষে বর্জ্জন ও ধর্ম্মঘটের অনুষ্ঠান করিয়া সদ্ভাবস্থাপনে বাধাপ্রদান করিতেছেন। ডাক্তার সু ইহার উত্তরে বলেন যে, নাশানালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের ইহাতে কোনও হাত নাই। ইহা তাঁহাদের নীতি নহে। চীনের জনসাধারণ চীনার উপর বৃটিশ বণিকের অর্থনীতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অহঙ্কার ও সাম্রাজ্য গর্ব্বপ্রসূত অন্যায় নীতির প্রত্যুত্তর। সুতরাং এই বর্জ্জন ও ধর্ম্মঘট নীতির জন্য বৃটিশ জাতিই দায়ী।

জাতিগত অহঙ্কার ত্যাগের প্রয়োজন

সুতরাং বুঝিতে হইবে, বহুকাল যাবৎ বিদেশীরা পশুবলের সাহায্যে



কাণ্টনী শাসনকর্ত্তা কান্‌-না-কোয়াং

স্বাধীন চীনে যে সকল অনাচার আচরণ করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল অন্যায় ও অসঙ্গত বিশেষ অধিকার উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, প্রকৃত সদ্ভাব ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সেই সকল অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে জাতিগত অহঙ্কার ও ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালাইলে প্রাচ্যে চিরদিনের জন্য অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইবে। যেরূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ—বিশেষতঃ ইংরাজ ঠেকিয়াও শিখেন নাই—তাঁহাদের এখনও চৈতন্যোদয় হয় নাই। তাঁহাদের রাজনীতিকরা এখনও চীনে কি নীতি অনুসৃত করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই—তাঁহারা যেন একবার এ দিক, একবার ও দিক করিয়া দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে দিন তাঁহাদের এক রাজনীতিক পার্লামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "চীনে কোন্ পথ অবলম্বন করা হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সহিত অন্যান্য শক্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছে।" অর্থাৎ যদি মার্কিণ নানকিংয়ে মার্কিণ প্রবাসীর উপর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া চীনকে শিক্ষা দিবার জন্য স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন, না হইলে হ্যাঙ্কোয় যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সাংহাই ও নানকিংয়ে তাহাই [illegible]

[illegible]

কিন্তু এই মনোভাব লইয়া প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত করা সম্ভবপর নহে। এই যে দুই নৌকায় পা দেওয়া, এই যে অবসরের প্রতীক্ষা করা—এই যে মনস্থির করিতে না পারিয়া যতক্ষণ সম্ভব পরের দেশে গৃহবিবাদ জাগাইয়া রাখা—এই যে প্রচারকার্য্যের দ্বারা অপরাপর শক্তিকে চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে নামাইবার চেষ্টা করা—ইহা য়ুরোপীয় রাজনীতির নূতন চাল নহে। এমন চাল এইবার চালা হইয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? যে অশান্তি, সেই অশান্তিই বিরাজ করিতেছে, বরং উহা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। বিলাতের "লেবার রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের" অর্থাৎ শ্রমিক-দলের অনুসন্ধান বিভাগের সম্পাদক মিঃ এমিল বার্ণস প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের লেবার গভর্ণমেণ্টের আমলেও ইংরাজ কাণ্টনী গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনের জন্য কাণ্টনী বণিক-দিগকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন ডাক্তার সান ইয়াট সেন (তখন তিনি জীবিত ছিলেন এবং কাণ্টন গভর্ণমেণ্টের প্রধান পুরুষ



জাতীয় দলের মিসেস্ হো-সিয়াং-নিং

ছিলেন) সেই সকল দেশদ্রোহী বণিককে লুকাইয়া বন্দুক আমদানী করার অপরাধে ধৃত করিলেন, এবং যখন তাঁহার কাণ্টনী সেনা স্বল্পদলকে বিদ্রোহীদিগের বিদ্রোহ দমন করিল, তখন স্থানীয় ইংরাজ দূত এবং নৌসেনাপতি সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, যদি ইংরাজের এই সকল আশ্রিতকে দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাণ্টন সহর সমর-পোতের তোপের গোলায় উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আবার ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কাণ্টনী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মার্কিণ ও জাপানী শক্তিকে আসরে নামাইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহারও প্রমাণ আছে।

এখনও সেই ভাবের দো-টানা স্রোতে গা-ভাসান দেওয়া হইতেছে। এমন কি, বিলাতের চিন্তাশীল উদারনীতিক মনীষী লেখকরাও এই দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। জে, এল, গার্ভিন বিলাতের বিখ্যাত লেখক। তিনি 'অবজারভার' নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি উদারনীতিক চিন্তাশীল লেখক। তিনি এ যাবৎ চীন, ভারত, মিশর প্রভৃতি নিপীড়িত দেশসমূহের সম্পর্কে যে সকল সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ হেন মিঃ গার্ভিনও বর্তমান ভৈরবীচক্রে পড়িয়া মাথা গুলাইয়া বসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনিও বোধ হয় কাণ্টনীদের উত্তরোত্তর জয়লাভে এবং বৃটিশ বণিকের উত্তরোত্তর অধিকারলোপে ও লাঞ্ছনায় বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, নতুবা তিনিও কেন চেম্বারলেন-বাৰ্কেনহেড কোম্পানীর মত কাণ্টনীর পশ্চাতে বলশেভিক জুজুর স্বপ্ন দেখিবেন? তিনি সম্প্রতি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে,—"চীনের জাতীয় আন্দোলন সফল হইলে জগতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইবে; প্রাচ্য জাতিদিগের মধ্যে ইংরাজের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবে; সাম্রাজ্যবাদ আহত হইবে; ধনী সম্প্রদায় স্বার্থচ্যুত হইবে এবং শ্রমিকরা ক্ষমতাশালী হইবে; ভারতবর্ষ মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে; বলশেভিকরা সর্ব্বত্র সাফল্য লাভ করিবে। এজন্য আমেরিকাকে যেরূপে হউক নামাইয়া য়ুরোপের সভ্যতাকে রক্ষা করিতেই হইবে।" তাঁহার প্রবন্ধের কতকাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—



ডাক্তার সান্ইয়াটসেনের পুত্র মিঃ সান্‌ফো

"We are convinced that American leadership of concerted action in the Far East is the only course that can steady the Chinese situation, eliminate external dangers, extinguish the mirage of world revolution, bring Moscow into sober and settled intercourse with the rest of civilisation."

ইহার সরলার্থ,—"যদি মার্কিণ চীনের ব্যাপারে প্রতীচ্য শক্তিবর্গের সমবেত প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কাণ্টনী জাতীয় দলকে ঠাণ্ডা করা যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকদিগের চাল ব্যর্থ করাও সম্ভব হইবে, জগৎজোড়া বিদ্রোহ-বিপ্লবের কথাও স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত করা হইবে।" আরও সোজা কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়,—"দাদা, তুমি নামিয়া পড়, তাহা হইলে একবার কুলীগুলাকে দেখিয়া লই।"

এমন আহ্বান নূতন নহে। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে নর্থক্লিফ রেডিং কোম্পানী মার্কিণদেশে গিয়া এই ভাবে মার্কিণ দাদা বা তায়াকে আসরে নামাইয়াছিলেন। ইহা সাম্রাজ্যগর্ব্বীদের নীতি। যখন মিঃ গার্ভিনও এই নীতির উপাসক হইলেন, তখন বুঝিতে হইবে, "আঁতে ঘা লাগিয়াছে।" প্রাচ্যে ইংরাজের ইজ্জতে আঘাত না লাগিলে গার্ভিনের

এখনও সময় আছে

কিন্তু মিঃ গার্ভিনের মত জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল লেখকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কথা কহা উচিত ছিল। এক হাত দূরের জিনিষ সকলেই দেখিতে পায়, কিন্তু যিনি বহু দূরে—চর্ম্মচক্ষুর সীমানার বাহিরে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ভবিষ্যৎ দেখিতে পান, তিনিই মানুষ, তিনিই মনীষী, তিনিই চিন্তাশীল। আজ গার্ভিন নিজের দেশের কয়েক জন বণিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মার্কিণকে চীনের মুক্তিকামী জাতীয় দলের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছেন। হয় ত তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবে। হয় ত মার্কিণ ইংরাজের সহিত যোগদান করিয়া চীনের জাতীয় দলকে 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিবেন। তাহার পূর্ব্বসূচনাও দেখা যাইতেছে। গার্ভিনের শ্রেণীর লেখকের পরামর্শের ফল ফলিতেছে। যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আজ দুই দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, হ্যাঙ্কোয় যে আপোষ বন্দোবস্ত হইয়াছে, সাংহাইয়েও তাহা অনুসরণ করা হইবে, আজ হঠাৎ সেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, সাংহাইয়ে কি করা হইবে, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই. এ বিষয়ে মার্কিণ ও অন্যান্য শক্তির সহিত পরামর্শ চলিতেছে। হয় ত এই পরামর্শের ফলে শক্তিপুঞ্জের রণপোতসমূহ কাণ্টনীদিগকে গোলাবর্ষণে ঠাণ্ডা. করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে, তাহা কি গার্ভিনের শ্রেণীর লেখক বা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন?

মনে করুন. সেই জার্ম্মাণ-যুদ্ধের অবসানের পর Armistice day অথবা যুদ্ধ স্থগিতের দিনের কথা। সে দিনে য়ুরোপ ও মার্কিণ যুদ্ধবিরতির জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। সে দিন মার্কিণের নিউইয়র্ক সহরে পাদরী চার্লস জেফার্শন ভগবানের ভজনাকালে ভাবগদগদকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন,—"ভাই খৃষ্টান! জগৎ হইতে যুদ্ধের বীজ ধ্বংস কর। জার্ম্মাণ যুদ্ধে আমরা একটা কথা শিখিয়াছি, যুদ্ধ 'গৌরবের' (glory) নহে, যুদ্ধ 'সর্ব্বনাশের' (horrors)। ইহাতেই আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। যাহাতে যুদ্ধের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া আর দেখা দিতে না পারে, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তোমরা অপর জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করিও না, অপর জাতির গ্লানি বা কুৎসা রটাইও না, অপর জাতির জন্য অপমানকর আইন-কানুনের শৃঙ্খল গড়িও না, অপর জাতিকে নিজের স্বার্থের জন্য পীড়ন করিও না। তবেই যুদ্ধের বীজ অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবে।"

আজ কাকের গলদেশ হইতে আঁটি নামিয়া গিয়াছে, কাক আর ফল খাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। সাম্রাজ্যিকতা, স্বার্থ, ও ইজ্জতের মোহ এমনই চীজ! কিন্তু বলপূর্ব্বক একটা স্বাধীন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণে



সাংহাই যুদ্ধে অন্যতম কাণ্টনী সেনাপতি হো-ইং-ইয়াং

ভবিষ্যতের ফল কি হইবে? আর এখনই যে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে, তাহারই বা স্থিরতা কি? চীনের লোকসংখ্যা কত, তাহা সকলেই জানে। চীনের জাতীয় দল স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত, তাহারা আধুনিক প্রথায় রণশিক্ষিত। তাহাদিগকে সহজে জয় করা সম্ভব নহে। তাহার পর রাসিয়া সহজে চীনকে বিধ্বস্ত হইতে দিবে না। জাপানও প্রশান্ত বক্ষে মার্কিণকে প্রবল হইতে দিবে না। সে ক্ষেত্রে যদি চীনে বল-প্রয়োগের কথা স্থির হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কালানলের সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার বেগ কে ধারণ করিবে?

কারল র‍্যাডেক প্রসিদ্ধ রাসিয়ান লেখক। তিনি সম্প্রতি মস্কৌয়ের বিখ্যাত সরকারী সংবাদপত্র "ইজভেষ্টিয়া"তে প্রাচ্যের অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এই যে,—"রাসিয়াকে ইংরাজ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু রাসিয়াকে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই রাসিয়ার লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। সুতরাং রাসিয়া চীনকে ইংরাজের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবে কেন? তাহাতে তাহার নিজের স্বার্থেরই হানি হয়। রাসিয়া য়ুরোপে ধনি সম্প্রদায়ের এবং সাম্রাজ্যিকগণের (Capitalists and Imperialists) শত্রুতা করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে বলিয়া রাসিয়াকে অপরাধী করা হয়। কিন্তু রাসিয়া কখনও হিংসার পথে—যুদ্ধ করিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার ধ্বংস করিতে চাহে নাই। প্রাচ্যে বৃটিশের ধনী ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় এত দিন যে শোষণ-নীতি চালাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার সমর্থনে পাশ্চাত্য গভর্ণমেণ্ট সমূহ যে সাহায্য দান করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ফলে আজ চীনে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে—রাসিয়ার পরামর্শে নহে। তোমরা তার, রেল, সিনেমা প্রাচ্যে লইয়া যাইবে, আর মনে ভাবিবে, প্রাচ্য এখনও পূর্ব্বের মত তোমাদিগকে 'সাহেব' 'সাহেব' বলিয়া যোহুকুমদারী করিবে? তাহাদের চক্ষু ফুটে নাই? এ কথাটা তোমাদের গার্ভিন প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকরা প্রথমে বুঝিয়াছিল। গার্ভিন তাঁহার 'রাউণ্ড টেবল' নামক কাগজে সেই সময়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে চীনে নীতির পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন,—গানবোট-নীতি পরিহার করিয়া আপোষ-নীতি, সমানে সমানে ব্যবহার-নীতি অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কি জানি কেন, তাঁহারও সম্প্রতি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন রাসিয়াকে যত অনিষ্টের মূল বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং প্রথমে চীনকে শিক্ষা দিয়া পরে রাসিয়াকে লইয়া পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন।

"ভাল কথা। কিন্তু চীনকে শিক্ষা দেওয়া কি সহজ কথা? চীনের জাতীয় দল এখন চীনে একমাত্র শক্তি, চাঙ্গসোলিনের এমন ক্ষমতা নাই যে, কাণ্টনের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারেন। ইংরাজ ইহা

নিকট মাথা নত করিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চীনে 'গান বোট' অর্থাৎ বৃটিশ সৈন্ত প্রেরণ করিয়া ক্যাণ্টনীদিগকে ভয় দেখাইতেও ছাড়া হয় নাই। তাহার অদ্ভুত রূপান্তর হইয়াছিল,—বলশেভিক বিভীষিকা। মেমোরাণ্ডামে চীনের জাতীয়তার জন্ম এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার কথা স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাকে'গহেড কোম্পানী রাসিয়ার বলশেভিক চক্রান্তে চীন ক্ষেপিয়াছে বলিয়া ক্রোধে রাসিয়াকে গালি পাড়িতে লাগিলেন। গার্ভিনের মত লোকও 'Moscow and the masked war' নাম দিয়া রাসিয়াকে গালি পাড়িয়া প্রবন্ধ লিখিলেন।

"কিন্তু এ সব চালবাজীর কি ফল হইবে? ১৮ই ডিসেম্বরের মেমোরাণ্ডামে যাহা চীনের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, এখন তাহা স্বীকার করা হইতেছে না। তবেই বুঝা যাইতেছে, তখন চীনকে ঐ আশা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া গোপনে প্রস্তুত হওয়া চলিতেছিল। চীনের সহিত চালবাজীতে যাহারা আগাগোড়া পরাজিত হইয়াছে, তাহারা কি আশা করে যে, রাসিয়ার সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া জয়লাভ করিবে? য়ুরোপ হইতে প্রশান্ত-তট পর্য্যন্ত রণস্থলের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া রণজয় করা মুখের কথা নহে, এটা যেন ইংরাজ স্মরণ রাখেন।

"ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিকতার গর্ব্বে মাথা খারাপ হইয়াছে। জাপান মার্কিণ,ফরাসী, জার্ম্মাণী—কেহই চীনের ব্যাপারে ইংরাজের পক্ষ নহে। এ ক্ষেত্রে চীন ও রাসিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে ইংরাজ যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন।"



মিসেস্ সানইয়াটসেন

কারল র‍্যাডেক যখন এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন মার্কিণে ও ইংরাজে একযোগে কার্য্য করিবার কথা উঠে নাই। এখন যেন তাহার সম্ভাবনা হইতেছে। কিন্তু একযোগে কার্য্য হইলেও চীনকে 'ঠাণ্ডা' করা এখন আর সহজ কথা নহে। কেন, তাহা বলিতেছি।

ক্রণো সোয়াজ নামক কোনও সংবাদ-সংগ্রাহক কিছু দিন পূর্ব্বে ক্যাণ্টনের সর্ব্বজনমান্য নেতা 'জেনারল চাঙ্গ কাইসেক'র সহিত চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা কহিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে "মাসিক বসুমতীতে" জেনারল চাঙ্গের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও মতামত প্রকাশ হইয়াছিল। তাহার সহিত এই মতামত মিলাইয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, চাঙ্গ কি ধাতুর লোক এবং তাহার

"রাসিয়ার বর্ত্তমানে যে কমিটী প্রথায় শাসন-তন্ত্র প্রচলিত, ভবিষ্যৎ চীনেও তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে—উহা ডাক্তার সানের 'তিন নীতির' আদর্শের অনুকূল। যে সকল বৈদেশিক শক্তি আমাদের জাতীয় দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহারা নিশ্চিতই কোনও বিশেষ অধিকারের দাবী-দাওয়া না রাখিয়া আমাদিগের জাতীয় দলকেই চীনের একমাত্র গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। যে সকল শক্তি আমাদিগের জাতীয় দলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ না করিয়া বিশেষ অধিকারের দাবী করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরাও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিব না এবং তাঁহারা আমাদিগকে চীনের একমাত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন, আমরা গ্রাহ্য করিব না। স্বীকার করুন বা না করুন, বর্ত্তমান সংঘর্ষের শীঘ্রই অবসান হইবে। আমরা জগতের সকল জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাহি, এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা জগৎ হইতে সাম্রাজ্যিকতার ধ্বংস-সাধন করিতে বদ্ধ-পরিকর। সাম্রাজ্যিক শক্তিপুঞ্জ আমাদিগকে স্বীকার করিবেন, এই আশায় আমরা বর্ত্তমান অসমান সন্ধিসমূহ স্বীকার করিয়া লইব না। বৈদেশিক কনসেশান ও একস্ট্রা টেরিটোরিয়ালিটি সম্বন্ধেও আমাদের ঐ মত। এ সকল বিশেষ অধিকার আমরা আর রাখিব না। যত দিন বৈদেশিকরা চীনদেশে নিজেদের বিশেষ অধিকার উপভোগ করিবেন এবং সেই সকল স্থানে আপনাদের আইন-কানুন মানিয়া চলিবেন—আমাদের আইন মানিবেন না, তত দিন বর্ত্তমান বিপ্লব সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিব না। যত দিন না সে সকল অন্যায় অধিকার দূর হয়, তত দিন আমরা বিপ্লব সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিব না। তাহার পর উত্তরের সামরিক কর্ত্তাদিগের শাসনযন্ত্র যত দিন বিকল করিতে না পারিব, তত দিন আমাদের বিপ্লব সফল হইবে না। বৈদেশিকরা অবসরমত ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিবেন, আমরা তাহা চাহি না—আমাদের নীতি ক্রমবিকাশ (evolution) নহে, সরাসরি বিপ্লব (revolution), আমরা হাত-মস্ত করিবার সময় লইতে প্রস্তুত নহি।"



সাংহাইয়ের পরাজিত সেনাপতি সান্‌চুয়াং ফেঙ্গ

ইহা চীনের বিপ্লবের প্রধান পুরুষের অভিমত। সুতরাং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিতে পারিলে বৈদেশিকগণ শান্তিতে প্রাচ্যে কার-কারবার করিতে পারিবেন না। এ কথাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে প্রাচ্যে শান্তি দেখা দিতে পারে।

বিহার-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে

সভাপতির অভিভাষণ*

তোমায় কি ব'লে আমি সম্বোধন করি প্রবাসী বাঙ্গালি। তুমি যেখানেই থাক, আসামে কি আরাকানে, ব্রহ্মে কি বিহারে, কাশী কি কথিবারে, মথুরা কি মীরাটে, রাজপুতানায় কি পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে কি বোম্বায়ে, য়ুরোপে কি মার্কিণে, জাপানে কি জাভায়, তুমি যে বাঙ্গালী, বঙ্গের সন্তান—আমার মা'র পেটের ভাই—আমার মা'র পেটের বোন্।

সারা ভারতবর্ষটা এক ক'রে আঁকড়ে ধরবার মত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আমার নেই, তাই আমার সমস্ত ভালবাসাটা চিরজীবন ধ'রে বাঙ্গালার নামে—বাঙ্গালীর নামে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে রেখেছি। বাঙ্গালীর রোদন আমার হৃদয়ে বড় বেদনা দেয়, বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে দ্বন্দ্ব বেধেছে শুনলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, বাঙ্গালীর নিন্দা শুনলে আমার অঙ্গ জ্ব'লে উঠে,—আর বাঙ্গালীর আনন্দে, তার হাসির ছন্দে আমার এই প্রাচীন শুষ্ক অধরেও



শ্রীঅমৃতলাল বসু

প্রফুল্লতা বিকসিত হয়। নিজের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করিনি, নিন্দা-প্রশংসার দিকে দৃক্‌পাত করিনি, আপনার দাদারা দিদিরা ডেকেছে, তারা আমায় কোলে ক'রে এনেছে, কোলে ক'রে বাড়ী পৌঁছে দেবে বলেছে, তাই রেলগাড়ী আমায় হিড় হিড় ক'রে টেনে এই মজঃফরপুরে এনে ফেলেছে।

"তুমি" "তোমরা" ব'লে এতক্ষণ সম্বোধন করলুম কেন জান? সমাজ-সৃষ্ট শিষ্টাচারের "আপনি" "মহাশয়" কলা-বিদ্যার বিশেষ বিকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের ভালবাসা—আসল প্রেমকে কদলীপ্রদর্শনের জন্যই বোধ হয় ঐ বার্ণিশ করা শব্দগুলির সৃষ্টি। বাল্যে বাবাকে মাকে বলেছি "তুমি", ভাইবোনদের বলেছি "তুমি", যৌবনে প্রাণের বন্ধুদের বলেছি "তুমি", জীবনসঙ্গিনীকে বলি, "তুমি", আর আজীবন পরমেশ্বরকে ব'লে আসছি "তুমি", তাই আজ এই বিহারপ্রবাসী দাদা-দিদিদের বললুম; "তুমি।"

বলেছি আমি বাঙ্গালীকে ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, যে ক'জন বাঙ্গালী আমায় চেনেন, তাঁরাও আমায় ভালবাসেন। প্রবাস ভালবাসার স্রোতকে খরতর ক'রে তোলে, দূরত্ব আকর্ষণী শক্তিকে সতেজ করে। শিশু অনিবারিত মাতৃ অঙ্কে ব'সে সে স্নেহকোমল স্পর্শ-সুখের মাধুর্য্য তত অনুভব করতে পারে না, পঞ্চম বর্ষ বয়সে পাঠশালে যাতায়াত করবার পর বিকালে বাড়ী ফিরে এসে দৌড়ে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যতটা করে। বিচ্ছেদ না থাকলে মিলন কথাটার মানেই হয় না।

"বাহিরে বিরহ হৃদে অহরহ
কাঁদিয়ে মধুর সুখ।
চোখের চাতকী চিতে চকাচকি,
উড়ে গে' জুড়েছে বুক॥"

বাঙ্গালার কবি রাম বসুর সেই গান—

"প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তাঁরে বলি বলি বলা হ'লো না,

প্রবাসগতপতিপ্রাণা বজান্তঃপুরবাসিনী লজ্জাবতী বধূকেও হাতের বাউটী খুলে কবিকে উপহার দিতে মোহিত করেছিল।

কর্ম্মসূত্রে যে পুত্র-কন্যারা মা'র কোল ছেড়ে আজ বাঙ্গালার বাহিরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, এক দিকে মা'র প্রাণ যেমন তাঁদেরই কাছে বেশী ক'রে প'ড়ে আছে, অপর দিকে সেই সুসন্তানগণও বঙ্গমাতার সঙ্গ-সুখের জন্য যেন অধিকতর লালায়িত ও বাঙ্গালীকে অধিকতর অন্তরঙ্গ ভেবে আদরে আলিঙ্গন করবার জন্য আকুল হয়ে উঠেন।

প্রথমে ভাষাই মানবকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছে। ভাষার গৌরব, ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাষার ঐশ্বর্য্যই জাতিকে মানবসমাজে কৌলীন্যের বরমাল্য প্রদান করে। ইংরাজ মুখে গোলাগুলী বন্দুক কামান যতই বলুন, তিনি মনে মনে জানেন যে, তাঁর ভাষার ভিতর দিয়া ইংরাজী ভাবের আধিপত্যের প্রভাবই আমাদের তাঁর অনুগত অধীন ক'রে রেখেছে। এই যে স্বাধীনতা স্বাধীনতা ক'রে আমরা হাহাকার করছি, স্বরাজ স্বরাজ ব'লে গর্জ্জন আরম্ভ করেছি, এও সেই ইংরাজী স্বাধীনতা—ইংরাজী স্বরাজ। এই লিবার্টি যন্ত্রের হুইল, রড্, পিষ্টন্, ক্র্যাঙ্ক, ক্ল্যাম্প, শ্যাফ্ট প্রভৃতি সব আসবাবই তৈরী বিলাতে, কেবল বসান বম্বে বা বজ্-বজেতে। কামানের গোলা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, মানুষের অঙ্গ বিকল ক'রে দিতে পারে, কিন্তু তা'র জাত মারতে পারে—তা'র প্রাণের কল বিগ্‌ড়ে দিতে পারে বিজাতীয় ভাবের জলন্তোজ্জ্বল ছাপ।

বিবেকানন্দের বাণীতে সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম ও গৌরব শ্রবণ করার পর থেকেই খৃষ্টান মিশনারী মহাশয়রা হিন্দুর দেবনিন্দা প্রকাশ্যপথে দাঁড়াইয়া করতে বিরত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাট্যকাব্য ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়েই পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে; নচেৎ তাঁরা এক দিন সাঁওতাল-কুকীর প্যা-টো-অ-র (patois) মত বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলেই মনে করতেন না। স্তর উইলিয়ম্ জোন্স্ কর্তৃক কালিদাসের শকুন্তলা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হবার পর যেমন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য অনেক পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায়ের মনে আগ্রহ জন্মেছিল, তেমনই বাঙ্গালার প্রাচীন কবি এবং বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষার ভিতর দিয়া বিতরিত হয়, তা হ'লে ইতোমধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যেটুকু সম্মান তাঁদের মনে জাগরিত হয়েছে, তা ভোগের পিপাসায় পরিণত হবে।

নিশার নিদ্রাভঙ্গে কাশীবাসীর মুখ প্রথম দর্শন করিয়ে দেওয়ার সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে বাঙ্গালা ও বিহারকে ঘনিষ্ঠতর প্রতিবেশিসূত্রে মিলিয়ে দিলেও এবং মানচিত্রের রৈখিক ব্যবধানে দুটি প্রদেশ স্বতন্ত্র হ'লেও যশোর-খুলনা, জনাই-বাক্সা, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি যুগ্ম-স্থানের ন্যায় বঙ্গ-বিহার আজ পর্য্যন্ত যেন একটি সমস্ত পদ। বহুশত বর্ষের মুসলমানসংসর্গে বিহার ভাব ও ভাষায় বঙ্গদেশের সঙ্গে এখন যতটা বিভিন্ন হয়ে পড়েছে, এক দিন যে ততটা ছিল, তা মনে হয় না। অতীতের ভূগোলে একটা বিস্তীর্ণ প্রদেশ ছিল—যার নাম গৌড়; মিথিলা ও বঙ্গদেশ সেই পঞ্চ গৌড়েরই অন্তর্গত; সেই মিথিলাই—মগধ, ক্রমে বিহার; সুতরাং এক দিন মৈথিলী ভাষাগত সুধাস্রোতই সুরধুনী তরঙ্গিণীর সহিত প্রবাহিত হয়ে আদি বঙ্গ-কবিগণের কাব্যকে অলঙ্কৃত করেছিল।

পদকল্পতরুর পবিত্র পৃষ্ঠাগুলি অমৃতময় ক'রে চণ্ডিদাসাদি বঙ্গের প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদমালার সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের রচনায় যেমন তৎকালীন প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে ব্রজবুলির সংমিশ্রণ আছে, বিদ্যাপতির কাব্যেও ব্রজভাষার সঙ্গে সংস্কৃতজ ও গ্রাম্য বাঙ্গালার মিশাল আছে। যাক্, এ সব পণ্ডিতী তত্ত্ব আমার স্বল্প বিদ্যার গণ্ডীর বাহিরে। এ সব কথা বলবার একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভাষায় ও ভাবে এক সময়ে এই দু'টি প্রতিবেশী প্রদেশের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের কুলাচার ছিল।

গৃহবাসে বা পরবাসে যেথায় থাকি, বাঙ্গালী ব'লে যদি আমার জাত্যভিমান বজায় রাখতে হয়, তার প্রথম পরিচয় দিতে হবে আমার বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলবার, সেই রসনার ভাষা বঙ্গীয় বর্ণমালার সাহায্যে হস্তাক্ষরে পরিণত ক'রে প্রকাশ করবার সহজ শক্তি দেখিয়ে। জগতের প্রচলিত ভাষা সকলের মধ্যে বঙ্গভাষা তেজে, মাধুর্য্যে,



হীনশক্তিগারিণী মন্দ-মনোহারিণী নয়। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-গণের চেষ্টায় যে সব প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হয়েছে, তাতে গদ্যের অপেক্ষা পদ্যেরই অধিক আধিপত্য দেখা যায়। বাঙ্গালীর ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার পর হ'তেই যে বাঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না। পার্শীর সর্বে ফোড়ন দেওয়া গ্রাম্য গদ্যের সংস্কারের জন্যই প্রথম প্রথম বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, তারাশঙ্কর প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দকে তাঁদের রচনার মধ্যে কিছু বেশী রকম মাথা তুলতে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে এক দিকে জয়দেবে একটু জল মিশিয়ে, অন্য দিকে টেকচাঁদকে ইস্তিরি ক'রে নিয়ে বাঙ্গালা গদ্যকে দোপ্‌দস্ত পোষাকী ধুতি-চাদরে ভূষিত করেন, আর তার মাথার লম্বা টিকিটি একটু ছোট ক'রে কেটে দেন। বাস্তবিক বঙ্কিম বাবুর দৈবী শক্তির প্রভাব যে বাঙ্গালা ভাষাকে কেবলমাত্র সর্বজন-বরেণ্য ক'রে দিয়ে গেছে, তা নয়, যে বাঙ্গালী এক সময়ে জমী ক্রয় করার পাট্টায় দেড়শত কথার মধ্যে অন্ততঃ পঁচানব্বুইটা, জওজে, ওয়ালদে, খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে গোছের না থাকলে দলীলখানা আদালত-গ্রাহ্য ব'লে মনে করতেন না, পরে আবার পিতা-পুত্রে পত্র-ব্যবহারে ইংরাজী ভাষা প্রয়োগ না করলে সভ্যতার ত্রুটি হয় মনে করতেন, তাঁদের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখতে শিখতে পড়তে প্রবৃত্ত করে সেই বঙ্কিমের প্রভাবই।

বিজ্ঞাপনের বাজারে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাহিত্য-সম্রাট্' উপাধি দিয়ে থাকে, আবার কেহ কেহ তাঁর সম্রাট্ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু আমি বলি যে, সাহিত্য-জগতে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্রাট্ ব'লে সম্বোধন করলে তাঁকে খাটো করা হয়; আর কস্মিন্‌যুগে কোন অবতারের উত্তরাধিকারী হয় নি। তাঁরা তৈরী ক'রে রেখে যান ভক্ত উপাসক এবং তাঁহাদের মধ্যে কেউ আচার্য্যপদের বা গুরুগিরীর যোগ্যও হয়ে থাকেন; সিংহাসনই হোক্, আর কুশাসনই হউক, তার অধিষ্ঠানের পীঠটুকু প'ড়ে থাকে সকল ভক্তের কর্মারম্ভের পূর্ব্বে প্রণাম করার জন্যে।

বিকৃত পার্শী-মিশ্রিত অতি গ্রাম্য গদ্যের দিন গেছে; ধমকের চোটে "এইখানে ব'সে থাক্, খবরদার দাওয়াটুকু ছেড়ে উঠনে নাম্‌বিনি" না ব'লে তার সঙ্গে একত্র ব'সে আপনাদের দুঃখের কথা কন, কিন্তু সম্প্রতি ধীরে ধীরে এক নূতন উৎপাত—নূতন ভূতের উপদ্রব বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবই যে বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে নূতন ভাবে গঠিত করেছে, তার আর সন্দেহ নেই; এবং সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ইংরাজী-শিক্ষিত লেখকরাই যে বাঙ্গালায় গদ্য-পদ্যকে দিন দিন উন্নতির পথে পরিচালিত কচ্ছেন, তাও স্বীকার্য্য; তবে দু' এক গ্লাস সিতোপলোজ্জ্বল শ্যাম্পেন্ বা মধু-মদির শেরী, ভাষা-ভোজে ক্ষুন্নিবর্দ্ধক ও পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক হ'তে পারে বটে, কিন্তু তার উপর হুইস্কির বোতল চালিয়ে মাতলামীর অবতারণা করা কি সঙ্গত? তার ফলে যে ভেক্তা, ভোক্তা এবং পরিবেষকের নিজের পর্য্যন্ত নর্দ্দামায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিবার সম্ভাবনা! লেখকমাত্রেরই সাধ নিজের একটা মৌলিকত্ব—নিজের একটা বিশিষ্টতা প্রদর্শন করা; তা ব'লে মা সরস্বতীর হাত-পা ভেঙ্গে ঘাড় মুচড়ে দেওয়া ত মৌলিকত্বও নয়—বিশিষ্টতাও নয়, আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কলা-প্রদর্শনও নয়। "তখন ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল আমাদের গিরিবালা"—এ মন্দ নয়—মন্দ নয় কেন, বেশ। তবে "সন্ধ্যার প্রদীপ অন্ধকারের বুকখানা একটু করুণ দিয়ে চিরে যখন উঠানের এক পাশে দাঁড়ান বো'ঠানের বাঁদিককার গালে আলোর ঈষৎ তপ্ত চুম্বন পৌঁছে দিলে, তখন নীহারবালানাথের মনের ভেতর একটা যে চমকের বেহাগ বেজে উঠল, তা কোনমতেই ঠ্যাকাতে পারলো না. কদলীকান্ত বন্ধুর মনের ভাব বুঝতে পেরে শব্দহীন ভাষায় নীরবে বলল, তা'লে আমি যাব চ'লে কিন্তু এখান থে, ঐ দেখ এখুনি আসছে এখানে, ঝড়ের বেগে মনু ও টুনু দুলিয়ে এলো চুল।" হুইস্কির তুলনা দিচ্ছিলুম কি? সাহিত্য-জগতের এ সব বিক্রমাদিত্য যে গাঁজার মজ্‌গুল। ওর সঙ্গে দ্বিতীয় উৎপাত, প্রত্যেক জেলার লোকের যেন একটা জিদ দাঁড়িয়েছে যে, জোর-জবরদস্তি যা ক'রে পারি, নদীয়া-ইক্ কি যশোর-ইক্ কি ঢাকা-ইক্ ক্রিয়া কর্ম্ম কর্ত্তাগুলোকে ধ'রে নিয়মভঙ্গের পঙক্তিভোজে বসিয়ে দি।

এমন দেশ নাই যে, সেথায় প্রভিন্সিয়ালইসম্ নাই;

একেবারে প্রভিন্সিয়ালইসম্ বাদ দিয়ে লেখা, তাও নয়; কিন্তু শিষ্টসাহিত্যের যে সনাতন একটা স্যাজগোজ অনেক দিন থেকে চ'লে আসছে, তার বিন্যাসে দোষ দৃষ্ট না হ'লে কি হেতু তাকে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করতে যাবো? মেয়েদের কানে মাকড়ি, নাকে নোলক অনেক দিন থেকে দেখে দেখে তাতে লোক একটা সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনুভব ক'রে আসছে। তা ব'লে লক্ষ্মীদের চিবুকটি ফুঁড়ে মুক্তর ঝুড়ি ঝোলানর experiment করার কি আবশ্যক?

গত বৎসর শিউড়ীতে কলার কথা কিছু ব'লে এসেছি; এ টুক্‌টুকে লিচুর মজঃফরপুরে তা আর বেশী ভেঙ্গে চুরে বলবো না। সে কলার শাঁস যে অনেকটা চন্দ্রোদয় মকরধ্বজের অনুপানে ব্যবহৃত হয়, তা এত দিনে অনেকেই বুঝতে পেরেছেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির কথাপ্রসঙ্গে অনেক বিজ্ঞ লোকই ব'লে থাকেন যে, উন্নতি ত ছাই-পাঁশ, কেবল উপন্যাসের ছড়াছড়ি। সৃষ্টিকর্ত্তা কি জানতেন না যে, জীবদেহের পুষ্টির জন্ম নাইট্রোজেন, এলবুমেন, ফ্যাট্, কার্ব্বন, কার্বো-হাইড্রেট্ প্রভৃতি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের অতি প্রয়োজন? তবে তিনি গ্যাস, গুঁড়ো বা অর্ক তৈরী না ক'রে অম্ল মিষ্ট কষায় প্রভৃতি বিবিধ রসযুক্ত আহার্য্য ফল-ফুল সব্জী-শস্যের বন্দোবস্ত ক'রে একটা হাঙ্গামা বাধালেন কেন? সৃষ্টি-রক্ষা সাহিত্যে এই বিবিধ রসযুক্ত আহার্য্য জগদীশ্বরের দৈব কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস। উপন্যাসেই শিক্ষারম্ভ করা যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, তা গ্রীসের ঈসপ্ ও ভারতের বিষ্ণুশর্ম্মা অনেক দিন আগে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। উপন্যাসের ছলে রামায়ণ-মহাভারতের সত্য বিবৃত ক'রে কাশী দাস, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস লোক-শিক্ষার অমর গুরু হয়ে রয়েছেন। এই শেষ বয়সে বাঁধা-ধরা কর্ম্মজীবন থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে আমি কলিকাতার একটি প্রাচীন বিদ্যালয়ের কার্য্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছি; আর সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত কেবল প্রার্থনা করি যে, কবে ভগবান্ শিক্ষা-বিভাগকে সুমতি দিবেন—যাতে ভাল ভাল উপন্যাস বেছে তাঁরা পাঠ্য পুস্তকে পরিণত করেন। এইখানে দাঁড়িয়েও প্রার্থনা করছি,—এই উপস্থিত বিজ্ঞজন-মণ্ডলীর সমক্ষে নারী কি নর! যদি সোনার ছেলে সোনার মেয়ে দিয়ে আপনি বালকবালিকা-পাঠ্য, কিশোর-কিশোরী-পাঠ্য উপন্যাস যথাসাধ্য চেষ্টায় রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। লজ্জার কথা নয় কি—এই সাহিত্য-সম্রাটের ছড়াছড়ির দিনে—নভেল-কাবুলী বীরের আস্ফালনের যুগে Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Midshipman Easy, Peter Simple, Twenty Thousand Leagues under the sea, A trip to the Moon গোছের উপন্যাস লেখেন, এমন বাঙ্গালী এক জনও জন্মান নি। এই রকম বই হ'লে ছেলে-মেয়েদের ডেকে আর জোর ক'রে পড়তে বসাতে হবে না, আনন্দপ্রদ ব'লে তারা বই ছেড়ে সময় সময় ভাত খেতেও যাবে না। অথচ কত নূতন বিষয় জানবার জন্ম তাদের মনে কৌতূহল জন্মাবে।

বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালি! আপনারা যে স্বদেশকে ভুলেন নি, বাঙ্গালা ভাষার ভালবাসা, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রেম আজ পর্য্যন্ত যে আপনাদের প্রাণে পূর্ণ মাত্রায় আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে, তার প্রমাণ আজকের এই মন-বিনিময়ের মধুর মেলা। বিহারবাসী বা বিহার-প্রবাসী হয়েও বঙ্গমাতার কত সন্তান সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক অমূল্য রত্ন দিয়ে গেছেন ও এখনও দিচ্ছেন। নাট্য-শালা নিয়েই আমি আজীবন ব্যতিব্যস্ত ছিলেম, নাট্য-কলাকে সংস্কৃত, শিষ্ট, উজ্জ্বল ও উন্নত করবার জন্ম যে সকল পুস্তক অবশ্য-পাঠ্য ব'লে মনে করেছি, সেইগুলি বেশী অধ্যয়ন করেছি, তাই এদিক্ ওদিক্ চাইবার অবসর পাই নাই, সুতরাং এই বিহারে ব'সে সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন কাব্যাদি রচনায় কত মনীষী যে বঙ্গমাতার পবিত্র অঙ্গ অলঙ্কৃত করেছেন, তার সঠিক তালিকা আমার জানা নাই। পাটনার কথা মনে হ'লে আমার স্মৃতিতে প্রথমে মূর্ত্তিমান হন স্বর্গগত বলদেব পালিত মহাশয়; গত ইংরাজী শতাব্দী সত্তরে (৭০) উত্তীর্ণ হবার প্রারম্ভে তৎকালের পাঠকগণ বলদেব বাবুর কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রথম রচিত কবিতা-পুস্তকখানির নাম "কাব্যমালা"; আদিরস-বহুল হওয়ায় 'বঙ্গদর্শন' ঐ পুস্তকখানির বড় নিন্দা করে। বলদেব বাবু সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা পদাবলী লেখার একটি চেষ্টা করেন। 'ললিত কবিতাবলী' ব'লে একটি পুস্তিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়; সে একেবারে সংস্কৃত; একটা আমার

"সমাচ্ছন্ন আকাশ জীমূতজালে,
জলে স্বর্ণলেখা তড়িন্মালা ভালে,
হৃদে তেমতি "শ্রীমতী রাধিকার
প্রিয়প্রাপণাশা হরে অন্ধকার॥"

কিন্তু পরে তিনি ঐরূপ ছন্দে যে ভর্তৃহরি কাব্য রচনা করেন, সেই 'বঙ্গদর্শন' তার যথেষ্ট প্রশংসার পর জিজ্ঞাসা করে, "তবে কাব্যমালার গ্রন্থকার কে?" এ জিজ্ঞাসার কারণ, বলদেব বাবুর নাম তাঁর কোন পুস্তকেই মুদ্রিত হয় নাই। তিনি 'কর্ণবধ' বা 'কর্ণার্জ্জুন' (আমার ঠিক স্মরণ নাই) ব'লে আর একখানি কাব্য প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গ উপযোগী নয় ব'লে বলদেব বাবুর দীনে দান, অতিথি-বাৎসল্য, সুহৃদ-প্রেম, মধুর চরিত্র প্রভৃতি সদ্গুণের কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

বক্সারে বসেই ডাক্তার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙ্গালাকে তাঁর "স্বর্ণলতা" দান ক'রে গেছেন।

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের প্রতিভার কাছে বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশই ঋণী; কঠোর দর্শনশাস্ত্রকে অতি প্রিয়-দর্শন ক'রে তিনি সাহিত্য-মন্দিরের সুষমা বৃদ্ধি ক'রে রেখে গেছেন। যাঁদের নাম করলেম, তাঁদেরও পূর্ব্বে পাটনা কলেজের এক জন বাঙ্গালী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র শর্ম্মা "বারুণী-বিলাস" ব'লে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন; কলিকাতার তখনকার টেম্পারেন্স সোসাইটী—প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি মহাশয়রা যার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন—সেই সোসাইটী, নাট্যকার পণ্ডিত মহাশয়কে ঐ নাটকের জন্য যথেষ্ট রজত-মুদ্রা পুরস্কার দেন, জলপানি পয়সা জমিয়ে বার আনা ও ডাকমাশুল দিয়ে আমি সেই নাটক একখানি কিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চেন্সালার জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় যদিও তাঁর অমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রবন্ধ-পুষ্পহারে তিনি আজও বাঙ্গালার অনেক মাসিক পত্রকে সুগন্ধে আমোদিত করেছেন। তাঁর পূর্ব্বে বিহারে ব'সে ঐতিহাসিক তত্ত্ব এত আলোচনা কেহই করেন নাই। তবে যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুর থেকে হাত পাকিয়েই আমার পরম স্নেহের হন; 'বসুমতী'তে তাঁর জ্যোতিঃ আরও বিকশিত হয়, ক্রমে অনেক বাঙ্গালা ও ইংরাজী পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা ক'রে গেছেন। ইদানীং উপন্যাস-প্রকাশে যাঁদের নাম প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিহার অঞ্চলেই অনেক দিন কাটিয়েছেন। উপন্যাসকারদের মধ্যে যাঁর নাম আজকাল বাঙ্গালার পাঠকসমাজে অতি পরিচিত, সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিহার থেকেই লেখার বাহার ফলিয়ে তুলেছেন। আমার পরম স্নেহভাজন সুহৃদ্ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মিষ্ট গল্পগুলির কল্পনার সূতিকাগার গয়া।

এই প্রদেশ-সংশ্লিষ্ট আর এক জন সুলেখকের নাম আমি কিছুতেই স্মরণে আনিতে পারিতেছি না; তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী'তে বিহার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বেশ সরস ভাবে লিখতেন; আমার পক্ষে এই বিস্মৃতিটা কেবল দুঃখের নয়, বড় লজ্জার কথা। কেন না, 'ভারতী'তে তাঁর প্রকাশিত মেয়েলী ছড়া আমি এক সময় মুখস্থ ক'রে রেখেছিলুম ও পরে আমার 'নবযৌবন' নাটকে তার কিছু ব্যবহার ক'রে নিজে সুখী হয়েছি।

শেষ বাকী আর একটি নাম। এই প্রাচীন 'চক্ষে', বক্ষে, শ্রবণে সে নামটির স্মৃতি যে পরিতৃপ্তি দেয়, তার তুলনায় নামের দাম নির্ণয় করা যায় না; অধিকন্তু আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই চিরকল্যাণীয়া অনুরূপা দেবী নামটি কাঞ্চনোজ্জ্বল অক্ষয় অমর অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আমার লেখা প'ড়ে অনেকে মনে করেন, আমি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী; খুব সম্ভব, আমার লেখার দোষেই সাধারণকে নিজের ভাব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারিনি। যে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী এখন এ দেশে প্রচলিত, তা আমাদের বালক ও যুবকগণের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের উন্নতিবিধায়ক কি না, তারই মীমাংসা আজকাল একটা বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে সেই শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তনে আবার নারীজীবন গঠন করতে যাচ্ছি কেন, এইটেই আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পাশ্চাত্যজগতে নারীর প্রাধান্য বনিতার আসনে আর প্রাচ্যভূমে তিনি মাতৃরূপিণী মহাদেবী। শ্রুতি, স্মৃতি, লিপি, দর্শন, দৃষ্টান্ত এই সকলের মধ্য দিয়ে

উচিত, যাতে তিনি নারীত্বের পদে উন্নীত হয়ে মাতৃভূমিকে সুসন্তান দান করতে সমর্থা হন। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আনন্দমোহন হেমচন্দ্র, নবীন, গিরিশ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের গর্ভধারিণীদের ঋণ বঙ্গভূমি কি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে?

কোথায় পেতেন পৃথিবী তাঁর ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মিল্‌টন, সাদি, হাফেজ, ওমার খৈয়াম, সিজার, নেপোলিয়ান রাণা প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গন্ধী, সুরেন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ—যদি জগৎ-প্রসূতির মেদিনী-মোদিনী প্রতিমা নারী আপন হৃদয়-পীযূষে তাঁদের না গ'ড়ে দিতেন?

বর্ত্তমান বঙ্গে দেবী স্বর্ণকুমারী হ'তে সুরু ক'রে গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, মানকুমারী, দেবকুমারের মা, প্রভাবতী, সরলা, ইন্দিরা, নিরুপমা প্রভৃতি শ্রীমতীরা সাহিত্য-সরোবরে এক একটি প্রফুল্ল শতদল।

অনুরূপার প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য আমার মানসনয়নে জবার প্রভা ফুটিয়ে দেয়। যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ নিজের হাতে এই দেবীটির কাঠামটুকু গ'ড়ে যান, তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় নামে নব বঙ্গসাহিত্যের আদিগুরুদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব'লে পরিচিত। হিন্দু কলেজে যখন অতুল প্রতিভার সঙ্গে ব্রাণ্ডি-বীফের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রদীপ্ত ছিল, তখন যে মহাপুরুষ নিজের ব্রাহ্মণত্ব আববাদে বজায় রাখিয়া, শিক্ষাবিভাগের উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, এই বিহার ভূমিতেও এক সময়ে তাঁহার আচার্য্য উপাধির গৌরবদীপ্তি প্রকাশ করিয়া যান এবং ভূদেব-পুত্র কল্যাণবর মুকুন্দদেবের নাম, কি ডেপুটীরূপে, কি গ্রন্থকাররূপে এখনও পাটনার স্মৃতি হ'তে বিলুপ্ত হয়নি, শুনিয়াছি, সেই ভূদেবই তাঁর একটি পৌত্রী—মুকুন্দর মেয়েতে ঋষিযুগের আর্য্যনারী গার্গী আদির আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে যাবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু মানব-পরমায়ুর পরিমাণ তাঁর সে স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হ'তে দেয় নাই। তথাপি ক্ষুদ্র চারা পরিণত অবস্থায় পিতামহের মুখ রক্ষা করিয়াছে; অনুরূপার "মন্ত্রশক্তি" বঙ্গের সাহিত্য-অঙ্গে একটা সঞ্জীবনী শক্তি।

আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি, বঙ্গভাষা অতি নিকট-ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন শিষ্ট ভাষা ব'লে আদৃত হবে। বাঙ্গালার ধুতি-চাদরের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাব সুদূর পাঞ্জাবের পঞ্জরের মধ্য পর্য্যন্ত সরলা দেবীর প্রতিভার বৈভববলে প্রবেশলাভ করেছে।

হে আমার সাহিত্যিক সোদর-সোদরাগণ! তোমাদের বড় সাবধানে গন্তব্যপথে অগ্রসর হ'তে হবে; একটু বিপথে গতি সামান্য পদস্খলনেও ভারতের ভাবরাজ্যে তোমাদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা। দায়িত্ব বড় গুরুতর, ব্রত অতি পবিত্র; শক্তি জগদীশ্বরের দান, তিলমাত্র অপব্যয়ে বা অপচয়ে বিপুল ক্ষতি।

এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে যদি প্রগল্‌ভতা ক'রে থাকি, তার জন্য অবনতশিরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি; আমার জাতিকে—আমার ভাষাকে ভালবাসাজনিত শুভ ইচ্ছাই আমার সকল ত্রুটির হেতু।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

মৃত্যু-আহ্বান *

কে ডাকে আমারে হাতছানি দিয়ে? মরণ ডেকেছে ভাই!
বিদায় মাগিয়া তোমাদের কাছে, তোমাদের ছেড়ে যাই
মৃত্যু-কাজল-নদী-পরপারে।
কে ডাকে আমারে? বলে বারে বারে—
"শ্রান্তি শুধুই জাগিছে হেথায় শান্তি হোথায় নাই"
জীবনের ভার বহিতে পারি না, তোমাদের ছেড়ে যাই।

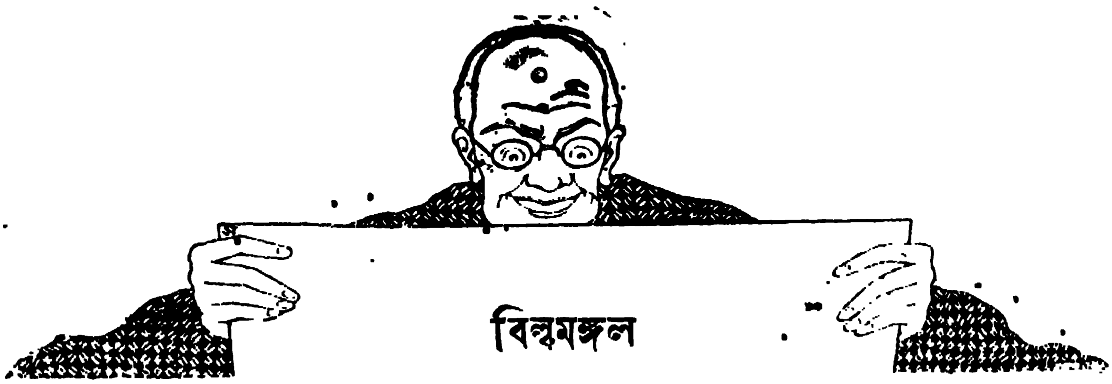
বক্ষ আমার ক্ষত বিক্ষত বেদনা-তীক্ষ্ণ-শরে
আঘাতের পরে আঘাত বেজেছে আমার হৃদয় 'পরে
বহিয়া বক্ষে জ্বালা আর জ্বালা
স্বয়ংবরের গাঁথিয়াছি মালা।
পরাব এবার সে বরমাল্য আমার মৃত্যু-বরে,
তবুও আজিকে বিদায়-ব্যথায় নয়নে অশ্রু ঝরে।

চোখ জ্ব'লে যায়, ব্যথা করে বুক, চক্ষের জল ঝরে,
হৃৎপিণ্ডের শোণিতের ধারা উথাল-পাথাল করে,
আকাশ ভরিয়া রাতে জ্বলে তারা,
আমার বেদনা বুঝে যেন তারা,
চায় মোর পানে, চক্ষে তাদের বেদনা করুণা ভরে,
বরের আমার বাঁশীটি যখন বাজে বুকে মধুস্বরে।

চলিলাম তবে—চলিলাম আজ অনন্ত পথপানে—
চলেছি এবার গভীর রাত্রে মরণের সন্ধানে,
চলেছি যাহার মুখপানে চেয়ে,
শান্তি পাবই কাছে তারে পেয়ে,
বিক্ষোভ জ্বালা ঘুচ'বে আমার অগাধ শান্তি-দানে,
চলেছি এবার গভীর রাত্রে মরণের সন্ধানে!

লীলা মিত্র।

* 'মাসিক বসুমতী'তে লেখিকার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, তিনি টাইফয়েড জ্বরে লোকান্তরিত হইয়াছেন। গতবর্ষে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। "মৃত্যু-আহ্বান" কবিতাটি তাঁহার শেষ কবিতা। ইহা তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশিত হইল।



বিল্বমঙ্গল

১

"বাবা রে, গেছি রে!"

সবেমাত্র ভোর হইয়াছে, আমরা কয় জন রেলের বাবু গোড়োঘরের ভাঙা তক্তপোষে বসিয়া তামাকু-সেবনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় হীরালাল আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল।

তাহার মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ, ললাটে স্বেদবিন্দু ঝরিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, মাথার চুলগুলা শজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—এমন কি, তাহার পরণের ধুতিখানা কোনওরূপে কোমরে জড়াইয়া থাকিলেও কাছাটা তখনও কোমরের সম্মুখভাগে গোঁজা রহিয়াছে।

"কি, কি, ব্যাপার কি হীরালাল?" সমস্বরে আমরা কয় জন চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দুই এক জন দ্বারপথে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্য হীরালালের পশ্চাতে বাঘ আসিয়া ঢুকিতেছে কি না!

কষ্টে শ্বাস টানিয়া হীরালাল রুদ্ধস্বরে বলিল, "সাপ!"

"সাপ?—ওঃ! এই কথা! আরে, সাপ ত আমরা নিত্য দেখি।" হীরালাল নূতন চাকুরী করিতে আসিয়াছে, কলিকাতার ছেলে সাপ দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ তাহার আতঙ্ক দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তখন হীরালাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "হাসতে সবাই পারে—পড়েন নি ত আপনারা তেমন পাল্লায়! সবে পায়খানার ঝাঁপখানা টেনেছি, আর দেখি কি না, দোরের আড়ার ওপর সাপ। বাবা-রে, কুদে কুদে চোখ দুটো মেলে যে ক'রে আমার দিকে চেয়েছিল!"

কেহ কেহ হাসিল বটে, কিন্তু আমরা কয় জন গম্ভীর হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া মনে তিলমাত্র স্বস্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। আমি রাধাপ্রসাদ দত্ত, মায়ের একমাত্র ছেলে, ঝোঁকের মাথায় এই দূর ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের জঙ্গলে রেলে চাকুরী করিতে আসিয়াছি, আমার ত মনে হইল, তদ্দণ্ডেই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাই। কোন্ দিন কি সাপের মুখে প্রাণটা যাইবে!

হীরালালের মুখে যখন ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক শুনা হইল, তখন অনেকেরই হাসির উৎস শুকাইয়া গেল। পেটের দায়ে আসিয়াছে সবাই দেশ-ঘর ছাড়িয়া সাপ-বাঘের মুখে জঙ্গলে চাকুরী করিতে। রেলের কন্‌স্ট্রাকসানে যাহারা চাকুরী লইয়া আসে, তাহারা সে চাকুরীর সুখ বিলক্ষণই জানে। গঙ্গার তটভূমি হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে লাইন নির্ম্মিত হইতেছে, কতকটা লাইন তৈয়ারও হইয়াছে, গাড়ীও চলিতেছে। অবশ্য, জঙ্গল বলিতে কেহ যেন দাক্ষিণাত্যের দণ্ডকারণ্য বা ছোট নাগপুরের কালা জঙ্গল মনে না করেন—এ জঙ্গল আম-কাঁঠালেরই জঙ্গল। নিকটে যে বসতি নাই, তাহাও নহে। মানসী গ্রামের নাতিদূরে খাগারিয়া, বেগুসরাই প্রভৃতি জনপদ আছে, গ্রামও অনেক আছে। সে সব গ্রামে বেহারীরা খোড়োঘরে বাস করে—সময়ে সময়ে তাহারা দুই চারিটা সাপ মারে, বাঘ-ভালুক শীকার করে, আবার সময়ে সময়ে তাহাদেরও দুই চারি জন সাপ-বাঘের মুখে প্রাণ দেয়।

সে আজ প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। তখন ত্রিহুত ষ্টেট রেলের হাজিপুর-কাটিহার লাইন কতক কতক খোলা হইয়াছে। কন্‌স্ট্রাকসান লাইনের রেসিডেন্ট এঞ্জিনিয়াররা এক এক কেন্দ্রে 'আফিস' খুলিয়াছেন, আমরা মানসী কেন্দ্রে আছি। খানিকটা জঙ্গল সাফ করিয়া সাহেবের বাংলো ও

কয় জন রেলবাবুর 'কোয়ার্টার' খাড়া করা হইয়াছে। ছেঁচা-বেড়ার ঘর আর খড়ের ছাদ,—কোয়ার্টার অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে। এমন স্থানে যে সাপ-বাঘের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বাস করিতে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

নন্দী বাবু বলিলেন, "সাহেবকে ব'লে আজই পায়খানা-টার দরজা বানিয়ে নিতে হবে—খঁকপের নীচে ঘাড় নীচু ক'রে যে যাবো পায়খানায়—"

ভোলাদাদা বলিলেন, "হাঁ, যত দোষ নন্দ ঘোষ! ওরে গাধা, শোবার ঘরেও যে সাপ চরে, তার কি করবি ?"

আমি বলিলাম, "তাই, ওর আর চারা নেই—এ চাকুরী ছেড়ে না পালালে কোনও উপায় নেই। আমি ত তাই আজই ইস্তফা দিচ্ছি।"

এতক্ষণ মামা ভাঙ্গা টুলটির উপর বসিয়া থেলো হুঁকায় ফুড়ুক ফুড়ুক তামাক টানিতেছিলেন এবং আফিমের নেশায় একরূপ বুঁদ হইয়া চোখ বুজিয়া বোধ হয় যৌবনের ন্যাকু-পঁচিশির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া খিল খিল হাসির রব উঠিল, কারণ, হুঁকাটা মায় কলিকা সমেত পাশে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। মামা আমাদের কেবল এই মানসীর বাঙ্গালী কলোনির সরকারী মামা নহেন, সারা লাইনের মামা। কোথা হইতে কিসে যে তাঁহার 'মামা' নামকরণ হইল, তাহা কেহ জানে না।

মামা হঠাৎ চোখ মেলিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"মনে ভাবছিলি, বুড়ো বুঝি ঘুমুচ্ছে! তা না রে গাধারা, তা না। আমি চোখ বুজে সব শুনছিলুম আর মনে মনে হাসছিলুম।"

আমি বলিলাম, "হাসছিলে? কেন, হাসছিলে কেন মামা ?"

মামা বলিলেন, "তোদের ভাবগতিক দেখে, আর কি।"

হীরালাল বলিল, "কেন, আমরা করলুম কি ? আমা-দের অপরাধ ?"

মামা বলিলেন, "একটা হেলে দেখে আঁৎকে উঠেছিলি, তাই। ওরে, এখন ত সোনার চাঁদ লাইন, তোরা কোয়া-টার পেয়েছিস, মাগ-ছেলে নিয়ে বাস করছিস, সস্তা-গণ্ডার রাজার হালে কিস্তি মাৎ করছিস। ভাবছি, মাচ্চৈ বাস চেঁচে যখন আমাদের রুজে হাবড়ার বদ উত্তরায় হয়েছিল—যখন সবে এই লাইনের জঙ্গল কেটে জরিপ হচ্ছিল, তখন যদি আসতিস, তা হ'লে কি করতিস ?"

আমাদের কৌতূহল-বৃদ্ধি হইল, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি-লাম, "কেন মামা, তখন কি এর চেয়েও ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে থাকতে হ'ত ?"

মামা হাসিয়া বলিলেন, "সে অনেক দিনের কথা—তখন সবে লাইন জরিপ হচ্ছে। তখন কি সস্তার গণ্ডাই এ দেশে ছিল রে! তাই ত প্রাণের মায়া কাটিয়ে জঙ্গলে প'ড়ে থাকতুম আমরা। চার পয়সা মাছের সের, তরি-তর-কারির দাম ছিল না বললেই হয়, দুধ দু' পয়সা তিন পয়সা সের, ঘি টাকায় দু' সের, সর্ষের তেল টাকায় পাঁচ সের, চাল, আটা—সব সস্তা। চাকর শুকো ১॥০ টাকা ২৲ টাকা, দুটো ভাত দিলে বা একখানা কাপড় দিলে তাদের ঘরসংসারের সবাই মিলে খেটে দিয়ে যেত। তার পর যখন লাইন খোলা হ'ল, তখন কয়লা কিনতে হ'ত না, কেরাসিন তেল, কাঠ, মাছ, তরি-তরকারি সবই ষ্টেশনের মালবাবু বা মাষ্টারবাবুর কাছে ভাগে পাওয়া যেত। ওঃ সে সব যেন স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে। আর তখনকার কালে কি সাহেবই সব আসত!"

সকলে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, "কি রকম, বলই না শুনি, মামা।"

জল পাইলে মাছের যেমন আনন্দ হয়, স্কুলের ছুটী পাইলে ছেলেদের যেমন আনন্দ হয়,—নিজের অতীত জীব-নের গল্প সাতখানা করিয়া বলিবার লোভে মামা তেমনই মহানন্দ উপভোগ করিয়া সেকালের কথা বলিতে লাগিলেন।

২

তখন আমার বয়স সবে আঠারো উনিশ। বাপ-মা গত হইয়াছিলেন, মামার ভাতে, মামীর তাড়নায় আর চোখের জলে মিশাইয়া মুখে গ্রাস আর উঠে না দেখিয়া এক দিন পরনের কাপড় সম্বল করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম। বিদ্যা তখনকার এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত। দূর-সম্পর্কের এক খুড়া জিলহুতর কনস্ট্রাকসান লাইনের এই মানসীর রেসিডেন্ট এঞ্জিনিয়ার আফিসের হেড ক্লার্ক ছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে পরনের কাপড়ের সঙ্গে মামার পকেট হাতড়াইয়া ১০৲ টাকার দুইখানা নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহারই জোরে হাওড়ায় রেলে

টিকিট কিনিয়া একেবারে মুঙ্গের উপস্থিত এবং মুঙ্গের হইতে ষ্টীমারে ৪ ঘণ্টায় গঙ্গা-গণ্ডকের সঙ্গমস্থানে পৌঁছিলাম। তাহারই নিকটে খুড়াদের কন্‌ট্রাক্‌সানের আফিস ও কোয়ার্টার। খুড়া আমায় দেখিয়া অবাক্। আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন তাঁহার স্কন্ধেই ভর করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। তাই সাহেবকে ধরিয়া ১৫৲ টাকা বেতনের এক কপিইষ্টের পদ আমার জন্য মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। খুড়ার ছাব্‌ড়ায় থাকি আর খাই, আর খুড়া ১৪৲ টাকা খোরাক বাবদ কাটিয়া লন, বক্রী ১৲ টাকা আমার ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখেন। এই ভাবেই জীবন কাটিতে লাগিল।

আমার জীবনটা সুখ আর দুঃখের টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়া চলিল। এমন আহারের সুখ জীবনে কখনও পাই নাই। এত মাছ, এত দুধ আমার ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। তেল কি? নাকে দিলে নাক ঝলসিয়া যায়। ভাতে পোড়া সে তৈলে খাইতে অমৃত বোধ হয়। তরিতরকারি টাটকা ক্ষেতের—তাহার আস্বাদও অমৃত তুল্য। মাংস ।১০ অথবা বড় জোর ৴০ আনা সের—আর সে মাংসের স্বাদের কথা মনে পড়িলে এই ফোকলা দাঁতেও লালা-নিঃসরণ হয়। মাছ কত খাইব? খুড়া পয়সায় ২টা ইলিস কিনিয়া পেটী ও ডিম লইয়া বাকী মাছ ফেলিয়া দেন—মাটীতে পচিয়া উহা শব্জীর বাগানের সার হয়। দুই পয়সায় আধ সের রুইকাতলা—সে সব সুখ কি ভোলা যায়!

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। দিনে ভাতে বসিলে পাখা লইয়া মাছি তাড়াইতে হয়। রাত্রিতে মশারি না থাকিলে মশায় টানিয়া লইয়া যায়। আবার মাঠের ঘাস-চাঁচা মেঝে—ফুঁড়িয়া ভাতের থালায় উঠে। সাপ, বিছে, কাঁকড়া বিছে ত আমাদের সঙ্গের সাথী। বাগানে সাপ, পথে সাপ, রান্নাঘরে সাপ, শয়নঘরে সাপ। মাঝে মাঝে 'যা, যা,' করিয়া বিছানার উপর হইতে সাপ তাড়াইতে হয়। প্রথম



টেবলের উপরে গোদুয়া মহারাজ

প্রথম ত আমি ভয়ে কাঁদিয়াই আকুল। খুড়া বলিতেন, "ওদের অনিষ্ট না করলে ওরা কিছু বলে না।" আমার কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হইত না।

এক দিন ছাবড়ার ঘরে এক আম-কাঠের টেবলের সাম্‌নে আম-কাঠের শুঁড়ীর্প টুলে বসিয়া সন্ধ্যার পর একখানা বাঙ্গালা নভেল পড়িতেছি, এমন সময়ে পায়ের

লাফাইয়া টেবলের উপর উঠিয়া বসিলাম, হারিকেনটা এদিক ওদিক দোলাইয়া দেখি, টেবলের নিয়ে প্রায় ৪ হাত লম্বা একটি গোক্ষুরা মহারাজ ফণা গুটাইয়া আড় হইয়া পড়িয়া আছেন! বোধ হয়, তিনিই অথবা তাঁহার লেজের অংশটা আমার পায়ের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। এই কথাটা যখন মনে পড়িল, তখন আমার মনে হইল, আমি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছি, আমার আত্মা অপর লোক হইতে গোক্ষুরা মহারাজকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, আমি আর নাই! কি জানি কেন, প্রভুর দয়া হইল, আলোক দেখিয়া তিনি গজেন্দ্র-গমনে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সেই রাত্রিতে দুই চক্ষুর পল্লব নিমীলিত করিতে পারি নাই।

আর এক দিন রাত্রিতে খাটিয়ায় শুইয়া আছি, এমন সময় ছাবড়ার 'ছাদের' উপর দিয়া খড় খড় আওয়াজ করিয়া কি যেন কি একটা প্রাণী ছুটিয়া আসিল এবং একটা ফাটল দিয়া ঘরের মেঝের উপর ঝুপ করিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমার কুকুরটা তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই ছাদের দিকে 'হিস্ হিস' গর্জ্জন শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলাম, ছাদের ফাটলের মধ্য দিয়া দুইটি ক্ষুদ্র চক্ষু বিদ্যুতের মত জ্বলিতেছে, আর মাঝে মাঝে সেই চক্ষুর অধিকারী মহাশয় আমার বুকের রক্ত জল করিয়া দিয়া গর্জ্জন করিতেছে। বুঝিলাম, ইন্দুর-প্রবরকে তাড়া করিয়া মহাপুরুষের অসময়ে এই অধীনের ঘরে শুভ পদার্পণ হইয়াছে! ইন্দুর পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু আমার কুকুর তাহাকে না পাইয়া উপরে চাহিয়া ভীষণ চীৎকার করিতেছে, আর উপর হইতে মহাপুরুষও ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন! আমার তখন কি অবস্থা, সহজেই অনুমান করিতে পার। কোন্ মুহূর্ত্তে তিনি লাফাইয়া মশারির চালে পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই, মশারি হইতে বাহির হইয়া বাহিরে পলায়ন করিবারও উপায় নাই। তখন ত্রিশঙ্কুর মত ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় আমি যেন শূন্যপথেই ঝুলিতে লাগিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবে না, এই ভাবে আমাকে, কুকুরকে ও সর্প মহারাজকে দুই ঘণ্টা কাল অতি-ক্রম করিতে হইয়াছিল।

এমন কত দিন যে প্রাণটি হাতে লইয়া মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার উপর রাত-বিরাতে ষ্টোর বাবুর ঘর হইতে তাস খেলিয়া বাসায় ফিরিবার পথে বনবিড়ালটা, ভালুকের ছানাটা, নেকড়ে বাঘটা চকিতে সম্মুখে পড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন!

এক দিকে জীবনযাপনে যেমন সুখদুঃখ, অপর দিকে আফিসের কাযেও তেমনই সুখদুঃখ আমার ভাগ্যে সমান-ভাবে বণ্টিত হইয়াছিল। আফিসের কায ছিল জমীদারী সেরেস্তার মত; প্রাতঃকালে এক প্রস্থ, আবার আহারাদির পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর এক প্রস্থ,—ফুরসুত ছিল না বলিলেই হয়। কায থাকুক না থাকুক, হাজির থাকিতে হইত, কেন না, কখন্ সাহেবের ডাক পড়ে, ঠিক নাই। আমি কপি-ইষ্ট হইলেও যখন তখন আমার সাহেবের ঘরে ডাক পড়িত, কেন না, সাহেবের ফাইফরমাজটা আমাকেই প্রায়শঃ পালন করিতে হইত। এ বিষয়ে আমার বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়া নহে, আফিসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া সাহেব খুচরা কাযের জন্য আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করিতেন। ইহা ছাড়া যখনই সাহেব ট্রলী চড়িয়া অথবা ব্যালাষ্ট ট্রেণে চাপিয়া কোথাও যাইতেন, আমায় শীতল চাপরাসীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুগমন করিতে হইত —তাঁহার খাতাপত্র ও বাজার হিসাব আমাকেই রাখিতে হইত। মেম সাহেবের ছাতা মেরামত হইতে কুকুরের টেংরী-মাংস যোগাড়ও আমায় করিতে হইত। বিহারের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ট্রলীতে অথবা ছাদহীন ব্যালাষ্ট ট্রেণে ১২।১৪ মাইল ভ্রমণ যে কিরূপ উপাদেয় ছিল, তাহা ভুক্ত-ভোগী না হইলে বুঝিবে না। পরন্তু মেম সাহেবের কাযে পাণ হইতে চূণ খসিলেই সর্ব্বনাশ! কাযেই আমার কাযে কি সুখ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

তবে যথার্থ যে সুখ একধারে ছিল না, তাহা নহে। সাহেব ভালবাসিতেন বলিয়া আফিসের চুনোপুটী, রুই-কাতলা সবাই আমায় ভাল না বাসুক, ভয় করিত। আমার ১৫ টাকা অপরের ১ শত টাকা হইতেও বড় ছিল। ছুটীর জন্য সাহেবকে সুপারিশ করিতে আমিই অধমতারণ ছিলাম। বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধেও প্রায় তাই। শীঘ্রই আমার নিজের বেতনবৃদ্ধি হইয়াছিল; কেন, তাহা বলিতেছি। এক দিন সাহেব আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্যালিকাট কোথায়, বলিতে পার?" আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম।

যা থাকে কপালে বলিয়া বলিলাম, "কলিকাতার নিকটে হইবে।" সাহেব হো হো হাসিয়া বলিলেন, "What? You rogue! Near Calcutta? কি? দুষ্টু কোথাকার—কলকাতার কাছে? হাঃ হাঃ!" আমি নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বলিলাম, "Fifteen Rupees clerk, Sir, don't expect geography, ১৫ টাকার কেরাণী, সার, ভূগোলের বিদ্যের আশা করবেন না, সার!" সাহেব হাসিয়া লুটোপুটি খাইলেন। এখনকার কালের সাহেব হইলে কি করিতেন, জানি না, কিন্তু তখনকার কালের সাহেব 'নেটিভের' কাছেও রঙ্গরস (Humour) পাইলে সন্তুষ্ট হইতেন। সেই মাসে আমার বেতন ১৫ টাকা ২৫ টাকায় উঠিল। আফিসের অনেক বাবুর তাহাতে চোখ টাটাইলেও ভয়ে কাহারও মুখ ফুটিল না।

ইহার পর গোরখপুরের হেড আফিস হইতে আমাদের আফিসে এক ছোট সাহেব (এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার) আসিলেন। ইনি 'দিশী' সাহেব, আমাদের হার্ণ্ট সাহেবের মত খাস বিলিতী নহেন। ইনিও বড় সাহেবের দেখাদেখি আফিসঘরে ঢুকিবার সময়ে আমার হাতে ভাঙ্গা ছাতাটা দিবার জন্য বাড়াইয়া দিতেন, আমি যেন দেখি নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া কাগজপত্রে গভীরভাবে মন নিবিষ্ট করিতাম। সাহেব কিন্তু তথাপি আমার প্রতি নেকনজর করিতে ভুলিলেন না। এক দিন আমি বড় সাহেবের একখানা দাগ-দেওয়া খবরের কাগজের অংশটুকু কপি করিয়া লইতেছি, এমন সময়ে ছোট সাহেব হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকিয়া কাযের সময় হাতে খবরের কাগজ দেখিয়া প্রথমে মহা গরম হইবার যোগাড় করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বড় সাহেবের মার্জিনের নোট দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভোল ফিরাইয়া লইয়া মুরুব্বীয়ানা চালে বলিলেন, "Well, Deben, any news from home? হাঁ দেবেন, বিলেতের কোনও খবর আছে?" আমিও মুখের দৃষ্টি কাগজের উপর রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, "No, Sir, no news from Chittagong, না, সার, চাটগাঁ থেকে কোন খবর আসে নি।" এই আর যায় কোথা! যেন সাপের লেজে পা পড়িল, ছোট সাহেব চটিয়া আগুন! আমাকে 'Impertinent, Nigger প্রভৃতি নানা মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বড় সাহেবের ক্ষণপরেই বড় সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়িল। আমি অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম—অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়াও ঠোঁটের ও চোখের কোণের হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। কষ্টে গম্ভীর হইয়া সাহেব বলিলেন, "দেবেন, তুমি মিঃ পেরিরোকে কি বলিয়াছ?"

আমি যেন কিছুই জানি না, এই ভাবে বলিলাম, "মিঃ পেরিরো জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দেশ হইতে খবরের কাগজে কোনও নূতন খবর আসিয়াছে কি? আমি বলিয়াছি, না, চট্টগ্রাম হইতে কোনও খবর আসে নাই।"

মিঃ হার্ণ্ট এতক্ষণ বহু চেষ্টা করিয়া যে হাস্যের বেগ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর তাহা বাধা মানিল না—আমার কথাটা যেন জাহ্নবী-স্রোতের মত সে বাধাকে মত্ত-মাতঙ্গের মত ভাসাইয়া লইয়া গেল। সাহেব চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া 'হা হা' করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন—তাঁহার সেই হাসির রবে সমস্ত আফিসবাড়ী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। এক বার উঠিয়া, এক বার বসিয়া, এক বার পেটের কোঁক চাপিয়া ধরিয়া সাহেব এমন ভীষণ হাসিতে লাগিলেন যে, আমার মনে হইল, সাহেব পাগল হইয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু নিপাট ভাল মানুষটির মত—নিরীহ গোবেচারীটির মত যেন কোন অপরাধ করি নাই—এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে সাহেব হাসিতে হাসিতে চোখের জল মুছিয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁধে দুইটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, "You scroundrel! You Rogue! বদমাস কোথাকার! দুষ্টু কোথাকার! যাহা করিয়াছ, আর করিও না। তোমার উপরওয়ালা মিঃ পেরিরো—তাঁহাকে এরূপ বলিলে তোমার সাজা হইবে।" বলিয়া আমায় ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। সে গালি ও ধাক্কা যে আদরের, তাহা আমি শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। কেন না, পরের মাস হইতে আমার বেতন ২৫ হইতে একবারে ৫০শে উঠিয়া গেল। আমি তখন অনেক কায শিখিয়াছি।

৩

প্রথম যে দিন লাইন তৈয়ারী শেষ হইল এবং প্রথম এঞ্জিন

মানসী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, সে দিনের কথা আমার মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত মনে থাকিবে—সে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

শুনিয়াছি, বিলাতে প্রথমে লণ্ডন হইতে বার্ম্মিংহাম পর্য্যন্ত এবং লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত যাত্রি-গাড়ী খুলিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য কয়লা-বহা ট্রাক গাড়ী চলিয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডে প্রথম যাত্রি-গাড়ী চলে। সে দিন এই যাত্রা দেখিতে ষ্টেশনে স্বয়ং ডিউক অব্ ওয়েলিংটন এবং সার রবার্ট পিল প্রমুখ ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রেলের জন্মদাতা ষ্টিভেনসনের যে লোকোমোটিভ এঞ্জিন সেই গাড়ী টানিয়াছিল, তাহার নাম 'রকেট।' গাড়ীর সংখ্যা ছিল ২৯খানা, আরোহী ৬ শত জন। পত্র-পুষ্প-পতাকাদিতে শোভিত হইয়া নানা গীত-বাদ্যের মধ্য দিয়া এঞ্জিন বেলা ১১টার সময় গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল। অমনই চারিদিক হইতে পুষ্প বর্ষিত হইল, শুভ-বাদিত্র বাজিয়া উঠিল, ষ্টিভেনসনের নামে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। কেবল একটি ঘটনা এই প্রথম যাত্রি-গাড়ী চালনার দিন সকলের হর্ষে বিষাদের ছায়াপাত করিল। যাঁহার উদ্যোগে, উদ্যমে, পরিশ্রমে, আন্তরিকতায় এবং অর্থব্যয়ে ষ্টিভেনসন এই অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই মিঃ হাস্কিসন গাড়ীতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার পদদ্বয়ের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া গেল। যে রেলের জন্য তিনি সাধারণের বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেই রেল-দেবতা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই বলিরূপে গ্রহণ করিলেন!

এই কারণেই হউক বা না হউক, ইংরাজ প্রথমে রেল জিনিষটাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই। প্রথম যখন রেল-গাড়ী চলিয়াছিল, তখন গ্রামের লোক তাহার উপর লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিয়াছিল, পরন্তু রেল চলাচলে নানারূপ বাধা দিয়াছিল। এমনও হইয়াছিল যে, পুলিস পাহারা রাখিয়া রেল চালাইতে হইয়াছিল। নানা সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছিল যে, রেলের জন্য (১) মাঠে গো-মহিষ চরিতে পাইবে না, (২) ক্ষেতের জমী নষ্ট হইয়া যাইবে, (৩) হাঁস-মুরগী ডিম পাড়িতে পারিবে না, (৪) এঞ্জিনের বিষাক্ত ধূমে মহামারী হইবে, (৫) পশু-পক্ষী পলাইয়া যাইবে, (৬) এঞ্জিনের আগুনে গ্রামে আগুন লাগিবে, (৭) ছোলা, ঘাস ইত্যাদি আর বিক্রীত হইবে না, কেন না, গাড়ীর ঘোড়া-গরু আর কেহ রাখিবে না, (৮) সমস্ত সরাইখানা উঠিয়া যাইবে, ইত্যাদি।

বিহারেও যখন প্রথম রেল হয়, তখন সে দেশের লোক রেলকে দানা দৈত্য মনে করিয়া তাহার আগমনে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। পরে তাহারা এঞ্জিনকে 'আগ-দেওতা' বলিয়া পূজা দিয়াছিল। মানসীতে যে দিন প্রথম এঞ্জিন ব্যালাষ্ট গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে দিন চিরস্মরণীয়। গাড়ী আসিবে—এ সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। সুতরাং অতি প্রত্যূষ হইতেই বহু দূর-দূরান্তরের লোক দলে দলে কাতারে-কাতারে আসিয়া ষ্টেশনে সমবেত হইতে লাগিল। বেলা ১০টার সময় গাড়ী আসিবার কথা; কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই মানসীতে যেন রথদোলের ভিড় লাগিয়া গেল। মুষ্টিমেয় স্থানীয় পুলিস অতি কষ্টে শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল।

স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কত যে গাঁওয়ারা লোক ষ্টেশনে ও ষ্টেশন-সান্নিধ্যে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যেন সকলে তীর্থ করিতে আসিয়াছে! কেহ পুষ্প-চন্দন আনিয়াছে, কেহ ধূপ-ধুনা, কেহ পূজার উপচার ও নৈবেদ্য, কেহ শঙ্খ-ঘণ্টা, কেহ ঢাক-ঢোল, কেহ সানাই-নহবৎ, কেহ কাড়া-নাকাড়া, কেহ বস্ত্র, কেহ সিন্দুর,—কত বলিব?

ক্রমে ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে এঞ্জিন দূরে দর্শন দিল। অমনই সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "জয় আগ-দেওতা কি জয়!" এঞ্জিন প্লাটফরমে দাঁড়াইলে সহস্র সহস্র লোক আগ্রহভরে অগ্রসর হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে 'আগ-দেওতাকে' প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। সকলে তৈল-সিন্দূরে 'আগ-দেওতাকে' রঞ্জিত করিয়া পুষ্প-চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিল। সে কি উৎসাহ, কি শ্রদ্ধা, কি ভক্তি! এই সরল, ধর্ম্ম-প্রাণ গ্রামবাসীদিগকে বৃক্ষশাখায় হনুমান্‌জীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। তাহাদের বিশ্বাস এত প্রবল যে, পরে এক রেলের দেশীয় গার্ড তাহাদিগকে যখন পরামর্শ দিয়াছিল যে, "আগ-দেওতা আংরেজলোগ্‌কো—অতএব উহাকে কেবল ফুল-চন্দন বা নৈবিদ্যি দিলে পূজো নেবে না, পচাই বা খাঁটি, অথবা তাড়ি আর তার চাট না দিলে দেবতা পূজো নেবে

না," তখন সত্য সত্যই গ্রামবাসীরা আগ-দেবতাকে সেই পূজাই দিয়াছিল—এমন কি, অনেকে জীয়ন্ত ছাগ, কুক্কুট, মেষ ইত্যাদিও পূজা দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই! বলা বাহুল্য, এ সব পূজার উপকরণের ভাগ আমরাও গার্ড-ড্রাইভার আর ষ্টেশন ষ্টাফের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পাইতাম।

তাহার পর যাত্রি-গাড়ী চলিল। মানসী হইতে পূর্ব্বে কাটিহার এবং পশ্চিমে হাজিপুর পর্য্যন্ত গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হইল। প্রথমে দিনে গাড়ী চলিত, তাহার পর রাত্রি-কালেও চলিল।

এক দিন বড় সাহেবের সঙ্গে আমার সমস্তিপুর যাইবার জন্য তলব পড়িল। রাত্রি ৮টায় গাড়ী। তাড়াতাড়ি ছুটি নাকে-মুখে গুঁজিয়া পেঁটরা আর বিছানা লইয়া ষ্টেশনে হাজির। সাহেব তখনও নিজের বাংলোয় খানা খাইতে-ছেন, ষ্টেশনে বলা আছে, গাড়ী আসিলে তাঁহাকে খবর দিবে। তিনিই সেখানকার হর্ত্তাকর্ত্তা—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস—যা বল, তাই।

গাড়ী ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে মাল উঠাইয়া দিয়া শীতল চাপরাসীকে 'সাহেবের' মালপত্র প্রথম শ্রেণীতে তুলিয়া দিতে বলিলাম এবং নিজে প্লাটফরমে পায়চারী করিয়া নানা শ্রেণীর লোককে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এঞ্জিনের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, এঞ্জিনে ড্রাইভার-ফায়ারম্যান কেহ নাই, তাহারা এঞ্জিনের হেড লাইট নির্ব্বাণ করিয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে।

ঘণ্টা, নীল বাতি, সব হইয়া গিয়াছে, গার্ড ব্যস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে,—"গাড়ী ছোড় দেও।" কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! ড্রাইভারও নাই, ফায়ারম্যানও নাই! চারিদিকে তখন ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। ক্ষণপরে দেখা গেল, তাহারা গজেন্দ্রগমনে এঞ্জিনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। গার্ড ও ষ্টেশন-মাষ্টার অনেক বকাবকি করিল,—তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। ফায়ারম্যানটা কেবল ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "আরে ক্যা চিল্লাতা? কিরাসিন আননে গিয়া!" বলিয়া সে একটা তেলের বোতল নাড়িয়া দেখাইল এবং এঞ্জিনের দুই হেড়লাইট হইতে দুইটা ডিপা বা টেমি বাহির করিয়া বোতল হইতে তেল ঢালিয়া পূর্ণ করিল এবং গার্ড বিরক্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ হুইসিল দিতেছে, নীল বাতি দেখাইতেছে, ষ্টেশনমাষ্টার ভীষণ ডাক-হাঁক করিতেছে, কাযেই ড্রাইভার বলিল,—"আরে লেও ভাই জলদি।" ফায়ারম্যান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আরে, ক্যা জলদি! তুম ঘাবড়াও মৎ!" বলিয়া সে হুঁকার জল ফিরাইতে বসিল।

শেষে যাত্রিবর্গের অস্থি-পঞ্জরে মোলায়েম সাড়া দিয়া, ঘড়-ঘড় করিয়া আওয়াজ দিয়া, গাড়ীগুলার সংযোজক চেন প্রায় ছিঁড়িয়া যায় এইরূপ টান মারিয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়াছি, মাঝে মাঝে চেন ছিঁড়িয়াও যায় এবং দড়াদড়ি দিয়া 'জইন' করিতে হয়।

নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, সে ঝাঁকুনি-কুঁত্‌নিতে শক্ত করিয়া কোনও অবলম্বন ধরিয়া না বসিলে প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্মুখের কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট যাত্রীর অঙ্কে স্থানলাভের সম্ভাবনা। কাযেই শুইয়া বিশ্রাম লওয়া অসম্ভব।

দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইল। পরে এক স্থানে হঠাৎ 'তেপান্তর' মাঠের মধ্যস্থলে গভীর অন্ধকারে গাড়ী থামিয়া গেল; আমিও সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতভাবে সম্মুখে উপবিষ্ট শীতল চাপরাসীর অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে-ও আমার ললাটদেশে তাহার দশনপাতির কোমল স্পর্শ অনু-ভব করাইয়া আমার তন্দ্রাগ্রস্ত দেহকে সজাগ করিয়া দিল।

ক্ষণ পরে সাহেবের আওয়াজ পাইলাম "চাপরাসী, চাপরাসী!" কোনরূপে কুষ্টেসৃষ্টে বাদুড়ের মত ঝুলিয়া আমরা দুই জনে মাঠে অবতরণ করিলাম এবং হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া প্রথম শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

সাহেব বিরক্তিভরে বলিলেন, "কি হয়েছে? রাস্কালরা এখানে গাড়ী থামাল কেন?"

আমরা এঞ্জিনের দিকে গেলাম। সেখানে ড্রাইভার একাকী বসিয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে—এখানে দাঁড়ালে কেন?"

ড্রাইভার তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "কি হবে আবার, ফায়ারম্যান কাঠ আনতে গিয়েছে।"

"কাঠ? কাঠ কি হবে?"

"ভাত রান্না হবে—আর কি হবে?"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "চালাকী পেয়েছ! জান,

লোকটা হাসিয়া বলিল, "আমি চালাকী করছি, না তুমি করছ? সাহেব ত এ গাড়ীতে আসে নি। ঐ ফায়ারম্যান আসছে, যাও, গাড়ী চড়ো গে।"

দেখিলাম, সত্যসত্যই ফায়ারম্যান স্কন্ধে এক বোঝা কাঠ ও বগলে কুঠার লইয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এঞ্জিনের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই লাইনের পাশের গাছের ডাল কাটিয়া আনিতেছে।

গাড়ী চলিল। মাঝে একটা ষ্টেশনে কয় জন বাঙ্গালী বাবু চাকুরী করেন। এখানে এক এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের আফিসের আর এক জমীদারের কাছারীর কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী, পরন্তু এক জন বাঙ্গালী ধনী এই স্থানে চাষ-আবাদ করিতেছেন বলিয়া তাঁহারও কয় জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এই স্থানে বসবাস করেন। ফলে, এখানে বেশ একটা ছোটখাটো বাঙ্গালী 'কলোনির' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

হঠাৎ এই ষ্টেশন ছাড়িয়া ডিষ্টাণ্ট সিগনালের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র গাড়ী আবার পূর্ব্ববৎ মাঠের মধ্যে থামিয়া গেল। আবার কি হইল? এবার কি এঞ্জিনের জল ফুরাইল? না, ফায়ারম্যানের নানীর জ্বর হইয়াছে বলিয়া সে চট করিয়া একবার গ্রাম ঘুরিয়া আসিতে গেল? সিগনালে নীল বাতি জ্বলিতেছিল, দেখিয়াছিলাম। তবে? তবে মাঠের মাঝে গাড়ী থামে কেন? এ কথা এক গাড়ীর বিধাতৃপুরুষ ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না। কাযেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর বিরক্তি বোধ হইলে গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিনের দিকে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, সাহেব আমাদের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

এঞ্জিনের দিকে চাহিয়া দেখি, এবার কেবল ফায়ারম্যান নহে, ড্রাইভারও অদৃশ্য! সাহেব আমাদিগকে দেখিয়া মহা গরম হইয়া যেন আমাকেই 'নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা' কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলাম, ক্রোধে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় সাহেব নিজেই বলিলেন, "গার্ড কোথায়? চল তার কাছে যাই। চাপরাশী, লে আও বন্দুক।"

আমরা গার্ডের গাড়ীর দিকে গেলাম, শীতল সাহেবকে সঙ্গ আসিয়া দিল। গার্ডের গাড়ীর কাছে গিয়া দেখি, সে গাড়ীও শূন্য! তখন সাহেবের কাছে থাকিতে আমারও ভয় করিতে লাগিল।

সাহেব নীরবে বন্দুক লইয়া পায়চারী করিতেছেন, আমরা একটুকু পশ্চাতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছি, এমন সময়ে লণ্ঠন হাতে গার্ড গ্রামের দিক হইতে ফিরিয়া আসিল। সাহেবের প্রশ্নে সে কাঁপিতে কাঁপিতে যে কয়টা কথা বলিল, তাহাতে এই মাত্র বুঝিলাম যে, আজ গ্রামে যাত্রা হইতেছে, ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান যাত্রা শুনিতে গিয়াছে। তাহারা বলিয়া গিয়াছে যে, তাহারা ঘণ্টাখানেক শুনিয়াই ফিরিয়া আসিবে। রাত্রিতে আর ত গাড়ী চলিবে না, সুতরাং কোন দুর্ঘটনার ভয় নাই; এক ঘণ্টা পরে পৌঁছিলে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, অধিকন্তু তাহাদের যাত্রা শুনা হইবে। তাহাদিগকে সে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, সাহেব গাড়ীতে আছেন বলিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কোন কথাই শুনে নাই।

শুনিয়া সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি বন্দুকটা হাতে তুলিয়া "ড্যাম সোয়াইন!" বলিতেই গার্ড কোন দিকে না চাহিয়া এক লম্ফে রেলের পগার পার হইয়া মুহূর্ত্তে রাত্রির অন্ধকারে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার হাতের লণ্ঠন লাইনে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নেই, আমি সেই রাস্কেল দুটোর কথাই বলছি।"

কে শুনে সে কথা? সে তখন বোধ হয়, ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে 'রান্' করিতেছিল। তখন সাহেব হো হো হাসিয়া বলিলেন, "ড্যাম কাউয়ার্ড! যাক্, তোমরা আমার মালপত্র নিয়ে তোমাদের গাড়ীতে ওঠ গে, গাড়ী চললে সমস্তিপুরে যেয়ো, আমি ষ্টেশনে ফিরে যাই—ওখান থেকে দেখি যদি একখানা ট্রলী যোগাড় করতে পারি।" এই কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সাহেব লণ্ঠন লইয়া চলিয়া গেলেন।

৩

আমরা দুই জনে সাহেবের আদেশ পালন করিলাম বটে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে এমন করিয়া মাঠের মাঝে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই প্রাণে গিয়া ড্রাইভার-ফায়ারম্যানের তত্ত্ব লইবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিলাম; সত্য কথা বলিতে কি,



এক লম্ফে গার্ডের পলায়ন

সেই সঙ্গে গ্রামের যাত্রা দেখিবার জন্যও মনটা বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাত্রা, বিহারে,—মন্দ কি?

শীতলের ও আর দুই জন রেল-পুলিসের কনষ্টেবলের জিম্মায় আসবাবপত্র রাখিয়া আমি একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া সত্যসত্যই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। গ্রাম নিস্তব্ধ নিঝুম, কিন্তু মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুরের ডাকের সহিত ঢোলের বাজনা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে যতই অগ্রসর হই, ঢোলের ও বাঁশীর আওয়াজ

করিয়া উপস্থিত হইলাম, বুঝিলাম, সেটা গ্রামের বারোয়ারীতলা।

চারিদিকে বাঁশের আড়ায় লণ্ঠন ঝুলান হইয়াছে। মাঝে মাঝে কলাগাছের অর্দ্ধকর্ত্তিত দেহের উপর মাটীর সরায় তেলের পলিতা দাউ দাউ জ্বলিতেছে—মশালের আলোকও নানাদিকে অন্ধকার দূর করিতেছে। সেই আলোকে দেখিলাম, বারোয়ারীতলায় সামিয়ানার নিম্নে আসর হইয়াছে—সেখানে তক্তার ও বাঁশের মাচানের উপর 'সিন্' খাটাইয়া গাওনা হইতেছে। তবে যাত্রা নহে, থিয়েটার! পশ্চিমে রামযাত্রা নহে, বাঙ্গালীর সখের থিয়েটার। এই বেহারী ছাতুর দেশে বাঙ্গালীর থিয়েটার,—কাযেই মনটা বড়ই প্রফুল্ল হইল। আসরে জন কুড়ি-বাইশ বাঙ্গালী শ্রোতা, বাকী সবই বেহারী গাঁওয়ারা লোক। তাহারা কেহ কেহ দশ বিশ ক্রোশ হাঁটিয়া যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। কি যে তাহারা শুনিতেছে, তাহা বুঝিলাম না। কেন না, অভিনয় হইতেছে বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষায়—তাও 'বিল্বমঙ্গল।' একে ত তাহারা বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতেছে না, তাহার উপর যদিও বা রাজারাজড়ার সাজ-পোষাকে রামচন্দ্রজী, লছমন ভাই তীরধনু লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইতেন, অথবা হনুমানজী গাছ-পাথর লইয়া

করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেন,—তাহা হইলে না হয় তাহারা বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয় শুনিয়াও কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিত। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের সাদা কাপড়, সাদা কথা! না আছে হনুমানজী, না আছে লড়াই! ইহারা কি শুনিতে আসিয়াছে? আবার মনে হইল, কন্‌সার্টের ঢোল বাঁশী শুনিতেই তাহারা সমবেত হইয়াছিল, অথবা যাহা হয় একটা কিছু নাচতামাসা দেখিবার লোভে তাহারা এত পথ-হাঁটার কষ্ট স্বীকার করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিল।

বাঙ্গালী দর্শক বাবুদের নিকট শুনিলাম, সমস্তিপুর, হাজিপুর, মজঃফরপুর, শোণপুর ইত্যাদি নানা রেল-ষ্টেশনের বাঙ্গালী কলোনি হইতে এই সখের থিয়েটার পার্টি গঠিত হইয়াছে। এমন কি, যিনি নায়কের অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি গোরখপুর হইতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাবুদের এক স্থানে বসিয়া একযোগে সকলের এক দিনও রিহার্শল হইয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু সখ এমনই প্রবল যে, যে যাহার ভূমিকা স্বস্থানে অভ্যাস করিয়া কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। শুনিলাম, ইঁহাদের আগ্রহ এতই অধিক যে, যিনি নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন, তাঁহার মাত্র দিন তিন চারি হইল পিতৃবিয়োগের সংবাদ আসিয়াছে, তিনি কাচা গলায় দিয়াই গোরখপুর হইতে অভিনয় করিতে আসিয়াছেন! ভাবিলাম, বিল্বমঙ্গল তাঁহাকে মানাইবে ভাল, বিশেষতঃ যখন তিনি আবৃত্তি করিবেন,—"পিতৃশ্রাদ্ধদিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে, ইত্যাদি।"

আমি যখন আসরে উপনীত কনসার্ট বাজিতেছে—কনসার্টও সখের—রেলের বাঙ্গালী কলোনির বাবুদের। ক্ষণপরেই ড্রপ উঠিল, অভিনয় আরম্ভ হইল, আমি ধৈর্য্যধারণ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। বিদেশে আমার বাঙ্গালা মায়ের বাঙ্গালীর অভিনয়—আমার বেশ ভালই লাগিল। শেষে আর এক ড্রপের বা যবনিকাপতনের সময় সমুপস্থিত হইল। সেই দৃশ্যে বিল্বমঙ্গলের জলে ঝম্পপ্রদানের কথা। বিল্বমঙ্গল বক্তৃতা করিতেছেন। আবৃত্তির মধ্যস্থলে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইল, তিনি কাতর-নয়নে 'উইংসের' দিকে বার বার তাকাইতে লাগিলেন। প্রম্‌টার বোধ হয় তখন পুস্তকেই সন্নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন, অথবা হালুয়া-পুরীর সন্ধানে



...সহিত প্রেমিকের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আয়োজন

গ্রীণ-রুমের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, কাযেই তাঁহার কাতর আহ্বানের ইঙ্গিত শুনিতেঁ পাইলেন না।

তখন রঙ্গমঞ্চের উপর এক অভাবনীয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। বিল্বমঙ্গল 'গুটি-গুটি পা-পা' করিয়া উইংসের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং চক্ষুর ইঙ্গিতের সহিত "এই! এই-ও! হিস্!—হিস্!" প্রভৃতি নানারূপ সঙ্কেতের দ্বারা প্রম্‌টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল সঙ্কেতই ব্যর্থ হইল, পর্ব্বত আসিলেন না, কাযেই মহম্মদকে পর্ব্বতের দিকে যাইতে হইল। আরও কতকটা অগ্রসর হইয়া বিল্বমঙ্গল উইংসের দিকে কনুই বাড়াইয়া দিয়া সবলে দুই তিনটা গুঁতা প্রদান করিলেন! তখন আমার দম্ কাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, পাছে অনাহূত আমি—আমার অভদ্রতা প্রকাশ করা হয়, এই আশঙ্কায় আমি মুখে উত্তরীয়ের অর্দ্ধাংশ প্রবেশ করাইয়া দিলাম। যাহা হউক, প্রম্‌টার মহাশয় এ অবস্থাটা সংশোধন করিয়া লইলেন, পেট ধরাইয়া দিলেন। বিল্বমঙ্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"মেঘগর্জ্জন তোমায় আমি ভয় করি না—" কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই যে climax বা অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ প্রকটিত হইল, তাহাতে আমার রুদ্ধ হাসিস্রোত চাপিয়া রাখা সম্ভব হইল না।

হঠাৎ ঢং করিয়া ঘড়ীতে ঘা পড়িল, অমনই সুশব্দে যবনিকা পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে নায়েগ্রাপ্রপাতের নির্ঘোষে ঘোষিত হইল,—"কোন্ উল্লুক ড্রপ ফেল্‌লে? আমার যে এখনও নদীতে ঝম্পপ্রদান করা হয় নি—"। ভিতর হইতে কাহার কণ্ঠে জবাব আসিল "কোন্ বেটা আমায় উল্লুক বলে? দেখে নেব তাকে।" জবাবের জবাব আসিল,—"আও, চলা আও, খুন করবো, ইত্যাদি।" রঙ্গমঞ্চের মধ্যে তখন 'ভূপুন্নে-মাতন' আরম্ভ হইল—ষ্টেজ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে, সে ব্যাপারের বর্ণনা আমার অসাধ্য!

আমার তখন উদরের অন্ত্রগুলি বহির্গত হইবার উপক্রম হইতেছিল আমি দুই হাতে পেট চাপিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে শুনিলাম, আবার ড্রপ উঠিল, আবার সত্যসত্যই বিল্বমঙ্গল রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন, আবার তিনি আবৃত্তি করিলেন, "মেঘগর্জ্জন, তোমায় ভয় করি না"—ইত্যাদি। কেবল নূতনের মধ্যে এইটুকু যে, তিনি নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন!

ইহার পরে সমস্তিপুরে গিয়া শুনিয়াছিলাম, এমন থিয়েটার না কি আর কখনও হয় নাই—পাবলিক ষ্টেজকেও হারি মানাইয়াছে, বিল্বমঙ্গল কি ন্যাচারাল, ইত্যাদি। কলিকাতার একখানা সংবাদপত্রেও পড়িয়াছিলাম—"Billamangal at—a great success! বিল্বমঙ্গল অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বিদায়ে

বিদায়ে কেন সই হৃদয়ে এত ব্যথা?
পলকে এলো বুকে, গভীর ব্যাকুলতা?
লাগে না কিছু ভাল, সদাই আন্‌মনা,
ভাবিয়া হই সারা, দহন-যন্ত্রণা?
নয়নে ঝরঝর অশ্রু পড়ে বেয়ে,
আঁধার-যবনিকা কেন রে ফেলে ছেয়ে?
কেন রে থাকি' থাকি' গুমরি উঠে হিয়া?
তপ্ত নিশ্বাস আসে রে বাহিরিয়া?

কি যেন নাই ব'লে কেবলই মনে হয়,
যে দিকে ফিরে চাই, শূন্য সমুদয়।
শূন্য হৃদিখান, শুকায়ে গেছে মালা,
গলেতে দিব কার সোহাগ প্রাণ-ঢালা?
এ পূজা রবে প'ড়ে, দেবতা নাই ঘরে,
তাই কি এত ব্যথা জাগিছে অন্তরে?

শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য্য।

অভিভাষণ *

আজ উত্তর ভারতের যে অংশে আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, তাহার সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার একটুখানি আলোচনা উপলক্ষে সেই সুপ্রাচীন যুগ ও যুগান্তর হইতেই বহুতর প্রথিতযশা নর-নারী এবং বিদ্বজ্জন-পরিষেবিত সাধক এবং সুধীবৃন্দের চির-পরিচিত এই পুণ্যভূমির বিষয়ে দু' চারিটি কথা বলা বোধ হয় সঙ্গতই হইবে।

বর্ত্তমান ত্রিহুত বা ত্রিহুট পূর্ব্বেকার তীরভুক্তি; ইহা বিদেহ নামে বিখ্যাত ছিল। ভবিষ্যপুরাণে ইহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে কথিত আছে যে, নিমি-পুত্র মিথি স্বীয় নামে তীরহুতের এক ভাগে মিথিলা নামক এক পুরী নির্ম্মাণ করেন, আজ আমরা যে স্থানে অবস্থান করিতেছি, এই মজঃফরপুর যে মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত, তাহা ত ইহার নামের গায়েই যে ছাপ মারা রহিয়াছে, তাহা হইতেই অবিসংবাদিতরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহাও মিথিলারই অন্তর্গত ছিল বলিয়াই আমরা জানিতে পারি। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে তীরভুক্তির সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"গণ্ডকীতীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তগং শিবে।
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতা তৈরভুক্ত্যভিধঃ স তু॥"

অর্থাৎ বিদেহ বা তীরভুক্তি গণ্ডকী নদী-তীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণ্যের (বর্ত্তমান চম্পারণ বা মতিহারি জিলার) শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পঙ্গীধৃত বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে :—

"কৌশিকীন্তু সমারভ্য গণ্ডকীমধিগম্য বৈ।
যোজনানি চতুর্ব্বিংশদ্ব্যায়ামঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
গঙ্গাপ্রবাহমারভ্য যাবদ্ধৈমবতং বনম্।
বিস্তারঃ ষোড়শঃ প্রোক্তো দেশস্য কুলনন্দন॥
মিথিলা নাম নগরী তত্রাস্তে লোকবিশ্রুতা।
[illegible]॥"

কৌশিকী হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত মিথিলা রাজ্যের পূর্ব্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য চব্বিশ যোজন এবং গঙ্গা হইতে হৈমবত বন পর্য্যন্ত বিস্তার ষোল যোজন। ইহাতে জানা যায় যে, মিথিলার পশ্চিমে গণ্ডকী, পূর্ব্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা এবং উত্তরে হিমবদ্বন বা হিমালয় পর্ব্বতের বনরাজি। এই গণ্ডকী-গঙ্গার সঙ্গমস্থল মহাতীর্থ, এই তীর্থে হরিহরনাথ অবস্থিত। এই দেবতার পূজা উপলক্ষে হরিহর ছত্রের বা শোণপুরের মেলার কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই নারায়ণী গণ্ডকী শালগ্রামশিলার বহুলতায় শালগ্রামী নামে বিখ্যাতা। ইহার গর্ভজাত সুপবিত্র শিলা অনেকানেক বঙ্গীয় হিন্দুর ঘরে ঘরে ভগবানের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূজিত এবং হিন্দুমাত্রেরই সকল শুভকর্ম্মে ও যাগযজ্ঞে এই শিলারূপী বিষ্ণুমূর্ত্তিই যজ্ঞেশ্বররূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা সেই গঙ্গা-গণ্ডকী-কৌশিকী-পরিবেষ্টিত, বিদ্বজ্জনপরিষেবিত, রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের একাধারে ধর্ম্ম ও কর্ম্মসমন্বয়ের লীলাভূমি মিথিলা বা বিদেহের পুণ্যস্থলের মধ্যেই আমাদের এই বিদ্বৎ-সমাজকে আহ্বান করিয়া, ইহার চির-গৌরবের অম্লান যশোমাল্যে একটি নূতন কুসুম গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

এই বিদেহ রাজর্ষি জনকবংশীয়গণের আবির্ভাব-গৌরবে চির-গৌরবান্বিত। আমাদের এই স্থানের উত্তরে রাজর্ষি সীরধ্বজ জনকের যজ্ঞভূমি; আজিও তাহা সীতামাড়ি (অথবা মতান্তরে পুনৌরা বা পুণ্যবরা) নামে বিখ্যাত। ইহাই সীতাদেবীর জন্মস্থান। তদুত্তরে জনকবংশীয় রাজগণের রাজধানী

* মজঃফরপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ।

জনকপুর ? ঐ জনকপুরেই সম্ভবতঃ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত জনকবংশীয় রাজর্ষিবৃন্দের কতই দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্বালোচনা হইয়া গিয়া থাকিবে—যাহার উল্লেখ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ভারতের নারীরত্ন-শিরোমণি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর স্মৃতি স্বতঃই সসম্ভ্রমে আমাদের চিত্তপথে উদিত হইয়া আমাদের মাথা নত করিয়া দেয় এবং স্মরণ করাইয়া দেয়,—ভারত-নারী আজ সে দিনের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত দীন! আবার অনেকের মতে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বই নহে, সভ্য মানবের অবশ্যপ্রয়োজনীয় কৃষিতত্ত্বও এই জনকদিগের দ্বারাই উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই অনুমান কতটা সত্য, তাহা অবশ্য সঠিক বলা না গেলেও, রাজর্ষি সীরধ্বজ জনককেও আমরা হল-কর্ষণ করিতে দেখিতে পাই। আবার এই জনকপুরেই এক দিন হিন্দুর চির-উপাস্য বিষ্ণু-রূপী শ্রীরামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গরূপ দুর্দ্ধর্ষ পণপূরণে লক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবী সীতাকে লাভ করিয়া ইহার যশোমাল্যের অম্লান কুসুমদামকে সুগন্ধতর করিয়াছিলেন।

তাহার পর কেবল যে সেই পৌরাণিক যুগেই আমরা মিথিলা বা বিদেহকে পূর্ণ-গৌরবের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাও নহে, যুগে যুগেই এই বিদেহভূমি নিজের যশঃসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের অনতি-দূরে এ স্থান হইতে প্রায় ২২ মাইলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবিখ্যাত বিশালাপুরীর বা বৈশালী মহানগরীর ধ্বংস-স্তূপরাশি ইহার পূর্ব্ব-গৌরবের এবং সর্ব্বধ্বংসী সর্ব্বভক্ষক মহাকালের চণ্ডলীলার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বিশালদেবপ্রতিষ্ঠিত বিশালাপুরীও এক সুপ্রাচীন জনপদ ও সুসমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। রামায়ণের আদিকাণ্ডে আমরা এই বিশালার উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র সহ গঙ্গা পার হইয়া এই বিশালাপুরী দর্শন করিয়াছিলেন।

"উত্তরং তীরমাসাদ্য সম্পূজ্যর্ষিগণং ততঃ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্॥"

সেই সময় বিশালদেবের বংশধর সুমতি বিশালার নরপতি ছিলেন, ইহার উল্লেখও রামায়ণে আছে। এই বৈশালীতে বহু দিন ধরিয়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃদ্ধমল্ল ও লিচ্ছবিগণ গগনস্পর্শী উন্নতশির বালুকারাম নামক মহাবিহারে দাঁড়াইয়া জগতের মহামানবগণের এক শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-জরা-পরিহারের উপায়-নির্দ্দেশক মহান্ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার মহা পরিনির্ব্বাণের শত বর্ষাধিক পরে ঐ স্থানেই বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে বহুলায়াসে একত্র করিয়া পূতচরিত্র স্থবির রেবত ধর্ম্ম মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন সম্পাদন করেন। ইহারই ফলে বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র সুসংস্কৃত হয় এবং বিনয় পিটকের উৎপত্তি ঘটে। ইহার পর এ পুনঃদীক্ষিত সুগতধর্ম্ম পূর্ণতেজে আসমুদ্র হিমাচলকে উজ্জ্বল পূর্ব্বক সমগ্র এসিয়া মহাদেশেই সুবিস্তৃত হইয়াছিল। এই মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা জগজ্জনবন্দিত ভগবান্ বুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতিজালে আমাদের চতুষ্পার্শ্ব বিজড়িত। বেত্তিয়া মহকুমার অন্তর্গত লৌড়িয়া, নন্দনগড় প্রভৃতি স্থানের অশোকস্তম্ভ সকল এবং তাঁহার নির্ব্বাণভূমি মহাতীর্থস্বরূপ গণতান্ত্রিক মল্লগণ-শাসিত কুশী নগরীও এখান হইতে বেশী দূরে নহে।

এতক্ষণ আমরা যে সকল আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহার সহিত আমাদের আজিকার এই বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর যোগ কোন্‌খান দিয়া, তাহা হয় ত আর আমায় স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না। এই শ্রীরাম-জানকীর ও জনকাদির পুণ্যকাহিনী বাঙ্গালার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কাহারও নিকটেই অপরিচিত নহে; বঙ্গভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি বলিতে গেলে রামায়ণের এই মহানায়ক ও মহানায়িকার মধ্য দিয়াই হইয়াছে। যাত্রায় অথবা কথকতায় রামায়ণ-কীর্ত্তিত আখ্যান বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর জীবনের উপর যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়িত সত্য। আজও যে এই স্রোতে কিছুমাত্র টান পড়ে নাই, তাহা বর্ত্তমান কালের সীতা নাটকের রাম-চরিত্রের বিকৃতিতে জনসঙ্ঘের উত্তেজনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। সেই শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীদেবীর আশ্রলীলাভূমি বলিয়া হিন্দু সাধারণ এবং সমস্ত সাহিত্যসেবীর নিকটেই এ প্রদেশ বন্দনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর যাঁহারা উপনিষদ্‌ভক্ত, তাঁহারা জনকগণকে বিদ্বৎসহায়ভাবে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সহিত সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কেন না, প্রকৃতির মধ্যে সামান্য যোগসূত্র থাকিলেও যে একটা সূক্ষ্ম

করিয়াছেন। তাই এখানে সমবেত সাহিত্যিকগণের চিত্তে প্রথমতঃ তাঁহাদেরই সুপবিত্র পুণ্যস্মৃতি জাগরূক করাইয়া দিলাম।

অতঃপর আমরা আর একটা অবশ্য স্মরণীয় বিষয়ের আলোচনা করিব। এই বিদেহভূমি কেবলমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব কৃষিতত্ত্ব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার জন্যই বিখ্যাত নহে, এই সুবর্ণময় ভূমি আবার ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি। ন্যায়দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি গৌতম জনকবংশীয়গণের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই মিথিলায় তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার সময় হইতেই মিথিলায় বিশেষভাবে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা চলিয়া আসিতেছিল। মহর্ষি গৌতম যে স্থানে তপশ্চর্য্যা করিতেন, অদ্যাপিও সেই স্থান গৌতমাশ্রম নামে কথিত হইয়া থাকে। শিবধনু ভঙ্গ করিয়া যে সময় শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করেন, সে সময় অহল্যা-গর্ভজাত গৌতমপুত্র শতানন্দ জনক সীরধ্বজের পুরোহিত ছিলেন। এই প্রদেশেই নররূপী নারায়ণের চরণরেণুকাস্পর্শে পাষাণেও প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

এক সময়ে মিথিলায় আগমন ব্যতীত ন্যায়দর্শন শিক্ষার আর কোনও উপায়ান্তর ছিল না, এ কথা হয় ত অনেকেই জানেন। মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহর্ষি গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শনের "চিন্তামণি" নামক চারি খণ্ড অসামান্য টীকা প্রস্তুত করেন, পরে মুরারি মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি মৈথিল পণ্ডিতগণ ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। মৈথিল পণ্ডিতরা ন্যায়দর্শনের পুস্তক অন্যত্র লইয়া যাইতে দিতেন না।

কিন্তু এক দিন এক ক্ষণজন্মা বঙ্গদেশীয় তরুণ পুরুষ এই মিথিলায় আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন-শেষে মৈথিল পণ্ডিতগণের একান্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, পরিশেষে চারি খণ্ড চিন্তামণিই কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া গিয়া নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনারম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কথা আপনাদের অবশ্যই এ সময়ে একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। ইনি স্বনামধন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম। বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বলকারী বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি এবং শ্রীমৎ চৈতন্যমহাপ্রভু উভয়ে তাঁহারই ছাত্র ছিলেন।

এই রঘুনাথ শিরোমণির জন্যই আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আমার দেশ" গানে ইঁহারই উল্লেখে 'ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি' গাহিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ শিরোমণি নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বলে গুরুর সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া নিরুক্ত নামক টীকার দোষ যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রমাণিত করিয়া দিলে, গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রীত হইয়া তাঁহাকে পাঠসাঙ্গহেতু এই মিথিলায় প্রেরণ করিলেন। মনে আশা এই যে, যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় ত এই রঘুনাথই মিথিলায় পাণ্ডিত্যাভিমানী পণ্ডিতবর্গকে তর্কে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য মিথিলায় স্থাপিত করিয়া আসিবেন। বস্তুতঃ ফলেও বঙ্গবালকের হস্তে এক দিন এই অজেয় মিথিলা বিজিত হইয়াছিল। পক্ষধর মিশ্রের মত অসাধারণ পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যগর্ব্বপরায়ণ অধ্যাপককেও আশ্চর্য্যরূপে সন্তুষ্ট করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রঘুনাথ গুরুলিখিত পুস্তকের দোষ ধরিয়া তর্ক আরম্ভ করেন। এই ঘোরতর তর্ক-সংগ্রামে সমগ্র মৈথিল পণ্ডিতগণই তর্কভূমে উপস্থিত ছিলেন। এই বিচার-বিতর্ক সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা এই স্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। তথাপি মৈথিল গুরুর কঠিন প্রশ্নের জবাবে বঙ্গীয় ছাত্রের কৌশলপূর্ণ উক্তিটুকু মাত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক আমরা সে দিনের সে নির্ভীক বঙ্গযুবকের তর্ক-যুদ্ধে মিথিলায় বঙ্গপ্রাধান্যস্থাপনের কাহিনী সমাপ্ত করিব।

পক্ষধর বলেন :—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণঃ সংশয়ো জাগ্রতি স্ফুটঃ
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ?"

অর্থাৎ বক্ষোজপানকৃৎ তুমি দুগ্ধপায়ী শিশুমাত্র (অপরিপকবুদ্ধি, বয়সেও নিতান্ত তরুণ) কাণ এক চক্ষু [শাস্ত্রে সম্যক্ দৃষ্টিহীনও বটে, আবার রঘুনাথের এক চক্ষু বাস্তবিকই অন্ধ ছিল] সংশয়ের উপর অবস্থিত "সামান্যলক্ষণা" (পক্ষধর মিশ্র লিখিত গ্রন্থ, ইহাকেই রঘুনাথ খণ্ডন করিতে চাহিতেছিলেন) অকস্মাৎ তুমি কিরূপে লোপ করিতে চাহ ?

উত্তরে রঘুনাথ বলেন,—

"যোহন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করেন, বালককে যিনি প্রবোধিত করেন, আমি তাঁহাকেই প্রকৃত অধ্যাপক বলিয়া

ইহার পর তর্ক-সংগ্রামে রঘুনাথ সুস্পষ্টরূপেই পক্ষধরের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তদবধি বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

বঙ্গের গৌরব-কিরীটি ভূষণ প্রবলপরাক্রান্ত পাল-সম্রাটগণের সময়েও মিথিলা ও বঙ্গ এক দিন এক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, মিথিলা ও বাঙ্গালার মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছিল।

এইবার আমরা মিথিলার দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্ব, বৌদ্ধতত্ত্ব, ন্যায়দর্শন, কৃষিতত্ত্বাদির সহিত ইহার অসাধারণ কবিত্ব-খ্যাতির সম্বন্ধেও একটুখানি আলোচনা করিব এবং এই মৈথিল কবির কবিত্বের সহিত বঙ্গীয় কবি ও কবিতার সংস্রব দেখাইব। কবি বিদ্যাপতি যে এই মিথিলারই লোক, এ কথা আপনাদের নিকট নিশ্চয়ই অবিদিত নহে। অত্রত্য সীতামাড়ি মহকুমার অধীন হারইল পরগণার মধ্যস্থ কমলা নামক নদীতীরবর্ত্তী বিসফি নামে গ্রাম বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলাধিপতি শিবসিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার পিতা, পিতামহ, খুল্লতাত ও ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষই সুবিদ্বান্ গ্রন্থলেখক (এখনকার মত তখন গ্রন্থকার হওয়া অনায়াস বা অল্পায়াসসাধ্য ছিল না) ও অধিকাংশই রাজ-মন্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন। এই কবি-কণ্ঠহার মহাপণ্ডিত বিদ্যাপতি ঠাকুর "দানবাক্যাবলী" ও "বিভাগসার" নামক স্মৃতি-গ্রন্থ, "শৈব-সর্ব্বস্বহার", "গঙ্গাবাক্যাবলী", "দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী", "কীর্ত্তিলতা", "ভাগবত" প্রভৃতি নানা বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার বৈষ্ণব পদাবলী পদকল্পতরু আমাদের গৌরবের সামগ্রী. এই পদ-রচনার দ্বারাই তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার নিকটতম আত্মীয়ের মতই সমাদরপ্রাপ্ত, এমন কি, তাঁহার এই পদাবলীর ভাষায় বঙ্গভাষার নিকট-সাদৃশ্য দেখিয়া কোন কোন লেখক তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াও দাবী করিয়াছেন এবং ফলতঃ মিথিলা অপেক্ষা বাঙ্গালাতেই তাঁহার লেখা অধিক সমাদৃত। সে যাহা হউক, বিদ্যাপতির উপর মিথিলার দাবী প্রথম হইলেও বাঙ্গালীর দাবী তাঁহার উপরে নিতান্ত অল্প নহে। বঙ্গদেশের বহু দিনের হাসি-অশ্রু, মান-অভিমান ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সাক্ষাৎসম্বন্ধে মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বলা যায় না, এই দেখা-সাক্ষাতের ফলেই তাঁহার পদাবলীর সুরটি বঙ্গ-নরনারীর এমন হৃদয়দ্রবকারী হইয়াছে কি না। তাঁহাদের পরস্পরের ভাষার মধ্যেও কি মিলন-প্রভাবই প্রবিষ্ট হইয়াছিল! তাঁহার—

"শ্রবণ হুঁ শ্যাম নাম করু গান।
জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥"

এটি কি আমাদের সেই শেষের সম্বল তারকব্রহ্ম নামের মতই পবিত্র ও অমৃতবর্ষী নহে? এ যে আমাদের বুকের ভাষা ও প্রাণের কথা। আবার,—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

এই পদটি আবৃত্তি পূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উন্মাদ নৃত্য তাঁহার রস-রচনায় যে বিহ্বলতা আনিয়া দেয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমাদের অনেকগুলি বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। এই ঋণ স্বীকৃতিস্বরূপে বাঙ্গালার বিখ্যাত এক জন বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস তাঁহার ললিতমধুর ঝঙ্কার তুলিয়া এই মৈথিল কবিবরের যে বন্দনা-গান গাহিয়াছেন, তাহাতেই বাঙ্গালার উপর মিথিলার পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত হইবে,—

"বিদ্যাপতি পদযুগল সরোরুহ নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর, পীবইতে করু অনুবন্ধে॥"

আবার তাঁহাদের পদরচনার মধ্যে মধ্যেও বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব রচনা-মাধুর্য্য যেন তাঁহাদের মধুর রসসিঞ্চনে মধুময় করিয়া দিয়াছে। বিদ্যাপতির,—

"ফুটল কুসুম নব-কুঞ্জ-কুটীর-বন-
কোকিল পঞ্চমে গাওইরে।"

আমাদের বঙ্গীয় কবির,—

"আজু সখি মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।"

—রবীন্দ্রনাথ।

আবার দেখুন, বিদ্যাপতির,—

"ঝঞ্ঝা গরজন্তি সন্ততি, ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত, পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
ডাকে ডাহুকী..মত্ত দাদুরি ফাটি যাওত ছাতিয়া॥"

ইত্যাদি।

আমাদের সাহিত্যে,—

"নৈরাশ-বাসর রজনী দশদিশ গগনে বারিদ কম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী. পলকে কামিনী হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাখী ডাহুকী, ডাহুকে ডাকই ময়ূর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দির অলিন্দ-লোচন জাগি সগরি রাতিয়া॥"

—গোবিন্দদাস।

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই
কুলিশ-পাতন শবদ ঘন ঘন, পবন খরতব বহই।"
"গগন ভরল নব বারিদ হে. বরখা নব নব ভেল,
বাদর দর দর ডাকে ডাহুকী সব শবদে পরাণ হরি নেল।"

—জ্ঞানদাস।

"উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত, ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ,
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত, থর থর কম্পিত দেহ।"

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রভৃতি এবং আরও কত কত অপূর্ব্ব পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে।

বিদ্যাপতির,—

"কহত কহত সখি! বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।"

অথবা —

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"
"জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"
এবং "কতিহু মদন দেহ দহসি হামারি, হম্ নহ শিব নারী।"

এ সকল পদ অপূর্ব্ব এবং বাঙ্গালার শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্ব্বজনসুপরিচিত। তাঁহার "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব" এ গান যে বাঙ্গালী শিশু তার আধ আধ ভাষাতেও উচ্চারণ করে। তাঁহার এই সকল অপূর্ব্ব দান তাঁহার প্রতি আমাদের চিত্তকে সকৃতজ্ঞ ভক্তিতে স্বতঃই পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। তাঁহার অতুল কবি-প্রতিভার মধুময় প্রভাবে প্রভাবান্বিত এই সকল পদরত্নগুলি আমাদের ভাষাকে আজ অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যময় মণিমাণিক্যমণ্ডিত অলঙ্কাররাশিতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছে। এ ঋণ বুঝি পরিশোধ করিবার নহে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালীর পক্ষে মৈথিল শিষ্যত্ব দুই এক দিনের বা দুই এক জনের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। মিথিলার নিকট বাঙ্গালার ঋণ যুগযুগান্তর সঞ্চিত। "বৃজ্জি" নামক মৈথিল ক্ষত্রিয়ের ভাষা এই ব্রজবুলী বঙ্গসাহিত্যের বহুতর পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর মৈথিল ব্রাহ্মণকে আমরা স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল ভাষ্য প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থ, আবার 'উষাহরণ' 'পার্ব্বতী-পরিণয়' 'ভর্তৃহরি-নির্ব্বেদ' 'প্রভাবতী-পারণয়' প্রভৃতি নাটক-কাব্যাদি,'আর্য্যা-সপ্তশতি' নামক বিখ্যাত শ্লোকাবলী প্রভৃতির গ্রন্থকাররূপে দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, বিখ্যাত শঙ্করশিষ্য মণ্ডন মিশ্র মিথিলারই অধিবাসী, কিন্তু ইহা প্রামাণ্য নহে। মিথিলার পণ্ডিত-সমাজে আজ পূর্ব্ব-গৌরবরবি মেঘাবৃত দেখা গেলেও আবার যে কোন দিন কাহারও সুবাতাসে তাহার সেই ক্ষণিকাবরণ অপসৃত হইয়া গিয়া নবরবিকিরণোজ্জ্বল সুপ্রসন্ন দিবস দেখা দিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

অতঃপর আমাদের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষা আমাদের বাল্যাবস্থাতেও ইংরাজী-শিক্ষিত সাধারণের নিকট অনাদৃত হইত,ইহা আমরাও দেখিয়াছি ; কিন্তু সুখের বিষয়,আজিকার দিনে সে ভাবটা আর দেখা যায় না। সামান্য নারী আমি, কিন্তু এ কথাটা বলিতে আমারও বুকটা যেন দশ হাত হয়। সকলেরই মনের মধ্যে সর্ব্বত্র সমানভাবেই না জাগরূক থাকিলেও মুখেও অন্ততঃ মাতৃভাষার সম্মান প্রায় সকলেই এখন করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলে এ সম্মাননা আন্তরিক ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তিসঞ্জাতই। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য আজ নিজের আসন জগতের ভাষা-রাজ্যের ক্রমোচ্চ স্তরেই ক্রমশঃ যে বিস্তৃত করিতেছে, তাহাতে আমরা আজ সন্দেহশূন্য। শ্রীমৎ চৈতন্যদেবের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আজিকার দিন পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ এই ইংরাজ-শাসিত বঙ্গভূমে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বড় সামান্যভাবে হয় নাই। এক দিন কবিবর রবীন্দ্রনাথের

যে গান 'সিঁদূর মাখা কাজল আঁকা' হইবার জন্য 'লোভে কম্পমান' হইত, আজ সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাট দরবারে তাহা সগর্ব্বে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিংশ বর্ষাধিক পূর্ব্বে মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সামাজিক প্রবন্ধ পাঠে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুর সার চার্লস ইলিয়াট এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্টরূপে বলিয়াছিলেন—"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading," অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ কুত্রাপি নাই, যাহাতে একাধারে এত জ্ঞান ও এত অধিক অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উন্নতির কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধা নিয়ম নাই, যতই তাহা বিস্তৃতি লাভ করুক না কেন, তাহাই যে তাহার চরম বা গতিসীমা, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না এবং কেহ তাহা করেও না। জ্ঞান যতই বিস্তৃত হয়, জ্ঞানের পিপাসা ততই বর্দ্ধিত হয়, জানিলেই জানার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়, তৃপ্তি কিছুতেই ঘটে না। তাই আমাদের মনে আশা আছে যে, আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের গতি ও উন্নতি অনাগত নিত্য কালের মধ্যে নিয়তই প্রবর্দ্ধমানভাবে বর্ত্তমান রহিবে, ও এক দিন জগতে ইহার স্থান কাহারও অপেক্ষা নিম্নে হইবে না। আজিকার দিনেও ইহা প্রতিযোগিতায় উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য নহে, তাহা বঙ্গীয় কবির য়ুরোপীয় নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চ উপাধি পরীক্ষা-গুলির ব্যবস্থা হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও আদর এ দুইটিই বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার অনুকরণে অন্যত্রও এই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া সঙ্গত, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা যে ভাবে সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত হইবার চেষ্টায় চেষ্টিত হইতেছে, ইহাকে ঠিক দূরদৃষ্টির ফল বলিয়া আমাদের মনে হয় না, বাঙ্গালা কেবলমাত্র বাঙ্গালার স্থানবিশেষের ভাষা না হইয়া সমস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা হওয়াই সঙ্গত।

বাঙ্গালায় আজকাল নাটক-নভেলের ছোট গল্পের প্রাচুর্য্যের সীমা নাই। কিন্তু শুদ্ধ মাত্র এই নিতান্ত লঘু-ভাবে বিরচিত লঘু সাহিত্যের অজস্র উৎপাদন দ্বারা কোন আমাদিগকে বৈদিক সাহিত্যে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকে আরও বিশেষভাবে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করিতে হইবে; সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির উপযুক্ত ও যথেষ্টরূপ অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় হওয়া উচিত। বৈদিক গ্রন্থাদি ও পুরাণাদি এবং ঐ সকল কাব্য-নাটকাদিতে আর্য্য সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস প্রচুর পরিমাণেই যুগ-যুগান্তর হইতে চির-সঞ্চিত রহিয়াছে। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা বৈদেশিক লেখকগণের নামের ও তাঁহাদের রচনার সঙ্গে সহজেই পরি-চিত হইতে পারে; কিন্তু ভাষ, অশ্বঘোষ, ভারবী, ভব-ভূতির সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? কাহাকেও কাহাকেও কলেজের পাঠ্য হিসাবে কালি-দাসকে বরং একটুখানি আবছা গোছ চিনিতে হয়, কিন্তু এঁদের সহিত পরিচয় বড় একটা উচ্চশিক্ষিতদেরও ঘটে না। নিজের দেশের সাহিত্যের রত্ন-মঞ্জুষা চাবিবন্ধ রাখিয়া আমরা পরের দ্বারের আবর্জ্জনা কুড়াইতে দ্বিধা করি না, এইটিই আমাদের পক্ষে আদৌ গৌরবের বস্তু নহে এবং ইহাতেই আমাদের দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ার ভয়টিও বেশী। স্বদেশপ্রেমের পরিসরেই বিশ্বপ্রেম সম্ভব হয়, আগে নিজের দেশের রত্নরাজিকে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া লইলে তবে বৈদেশিক রত্ন চিনিবার শক্তি অর্জ্জিত হয়, কাচকে মণিভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

মাসিক পত্রিকার কল্যাণে সুপাঠ্য অপাঠ্য সকলপ্রকার রচনাই এক্ষণে আমাদের কাছে অপর্য্যাপ্তরূপে মাসে মাসেই আসিতেছে। সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাও ইহাতে অবশ্য নিতান্ত কম থাকে না, কিন্তু সেগুলি কয় জনের দ্বারা পঠিত হয়, তাহা বলা কঠিন। কারণ, সেই সকল প্রবন্ধাবলী পাঠ করিবার মত করিয়া ত আমাদের ছেলে-মেয়েরা আর বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে পাইতেছে না। রাজা রামমোহন, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির সুচিন্তিত প্রবন্ধা-বলী হয় ত এখন তাহাদের কাছে সংস্কৃত ভাষার মতই কঠিন ঠেকিবে। কারণ, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের যে ভাষা, তাহার সহিত ঐ সকল সুপণ্ডিত ও দূরদর্শী লেখকের ভাষা, ভাব ও আদর্শ কিছুরই বড় একটা সংস্রব নাই বলিলেও

এমনই যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, অভাগীর বুঝি মা-বাপ নাই! অথচ ইহাকে ঠিক অনাথাও বলিতে পারি না, কারণ, ভাষা-জননী সংস্কৃতের সহিত ইহার নিকট-সম্বন্ধকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইদানীং আমরা বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা যেমন নিজেদের অঙ্গ বিবিধ বিজাতীয় বিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত করিয়াছি এবং আচার ও ব্যবহারে নিজেদের বিশিষ্টতা রক্ষা করার দিকে লক্ষ্য রাখিতে লক্ষ্যহীন হইতেছি, আমাদের ভাষাকে লইয়াও আমরা ঠিক তেমনই করিয়াই হেলা-ফেলা করিতে দ্বিধা বোধ করি না। আমাদের অঙ্গভূষণে আর পাকা সোনা রহিল না। তাহার স্থল অধিকার করিয়াছে মরা সোনার উপর বিলাতী এনামেল অথবা তামার খাদে ভরা গিনী সোনা আর কাচ-পাথর ও বাজে মতি। তাই আজ সেই সৌখীন রুচির আমরা "সীতার বনবাসের" বাঙ্গালা দেখিয়া আতঙ্কিত হই। কারণ, পাকা সোনার তাল যেমন আমাদের গায়ে ভারি লাগে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, মাইকেলের, এমন কি, বঙ্কিম, ভূদেবের বাঙ্গালাও আমাদের মনের উপরে তেমনই সাত মণ ভার চাপায়। কারণ, নব্য বঙ্গের সৌখীন ছেলে-মেয়ে আমরা কোন প্রকার গুরুত্বের বা দায়িত্বের ভারই ত স্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের জাতি (Dying race) ধ্বংসোন্মুখ বলিয়াই ডাক্তারীর সার্টিফিকেট পাইয়াছে। তাই এর আহার লঘু, বিহার লঘু, ভাষা লঘু, সাহিত্য লঘু, আশয় লঘু, আদর্শ লঘু। সকলেতেই আজ আমাদের মধ্যে 'লঘ্বী মাত্রা' দেখা দিয়াছে, কারণ, রোগীর পথ্য লঘুই হইয়া থাকে। এই লঘুত্বের মাত্রা আজ এত দূরে আসিয়া পৌছিয়াছে যে, আমাদের পরনে ধনিকুলে জাপানী ও চীনা সিল্ক, দরিদ্রকুলে ফিন্‌ফিনে ম্যানচেষ্টার। আমাদের ভাষায় সংস্কৃতের সহিত অল্প সম্পর্কিত প্রাদেশিক চলিত বাঙ্গালা, আমাদের সাহিত্যে ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও ইংরাজী সাহিত্যের আবর্জনারাশির হীনানুকরণ। খদ্দর আমাদের গায় ভারি লাগে, পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মনের উপর ভার চাপায়, আর উচ্চাদর্শের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এতই সুদূর হইয়া উঠিতেছে যে, সে সকলকে আমরা আর আমাদের কল্পনা-রাজ্যেও একটুখানি স্থান দেওয়া সহ্য করিতে পারি না। আমরা উচ্চ প্রশংসার করতালির সহিত আমাদের সাহিত্য-জগতে ও রঙ্গালয়ে বরণ করিয়া লই। বিদেশী সাহিত্যের উচ্চাদর্শকে গ্রহণ না করিয়া তার যে অংশে অভিনেত্রী-বিবাহ, বিবাহ-বন্ধনবিহীন পবিত্র (!) তরু সম্বন্ধের অথবা পতিতা উদ্বাহ প্রভৃতির সমর্থন দেখি, সাগ্রহে তাহাই অনুকরণ করি। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে আমরা এক সমাজভুক্ত নহি, সে কথাটা ভাবিয়া দেখি না। নিজের ভাল আমরা ত্যাগ করিতেছি, পরের ভালকে অনুকরণ করিতে চাহি না। যাহা হাল্কা, যাহা আপাতমধুর, তাহারই মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হই, ইহা নিশ্চয়ই উন্নতির লক্ষণ নহে।

তবে কি আমরা সেই 'সীতার বনবাসের' ভাষাতেই চির-আবদ্ধ রহিব? উহা হইতে আর কি অগ্রসর হইব না? কিন্তু বদ্ধবারির মত সর্ব্ববিষয়ে অচলতা ত জীবিতের লক্ষণ নহে। এ প্রশ্ন সঙ্গত বটে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পর্ব্বতচূড়ায় উঠিতে বন্ধুর পথই কি আরোহণীয় নহে? সমতল ক্ষেত্রে চলিতে শিখিয়া কেহ কোন দিন স্বচ্ছন্দে গিরি আরোহণ করিতে পারে না। কিন্তু বন্ধুর পথে চড়াই শিখিয়া সে অনায়াসেই আবার প্রয়োজনমত সরল পথে হাঁটিতে পারে। তাই আমাদের মনে হয়, চলিত বাঙ্গালায় অর্থাৎ যে ভাষায় আমাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্ম রাশি রাশি পুস্তিকা রচনা হইতেছে, যে ভাষায় তরুণ-তরুণীর জন্ম নভেল লেখা, প্রবন্ধ রচনা, এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্ত লিখিত হইতেছে, সেগুলির ভাষা ও ভাবের দৈন্য দূর হইয়া এমন ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত, যাহাতে যথার্থ বাঙ্গালা ভাষাই তাহারা শিখিতে পারে।

আমার মনে হয়, ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রথমাবধিই অত্যন্ত লঘু পথ্য; লঘু ভাষা, লঘু ভাবের সহিত অভ্যস্ত করিলে বড় হইবার পর তাহাদের ঐ গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহির হইতে পারা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়ে। ছোট বেলার শিক্ষাই যে চিরজীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়ায়, বাল্যের আদর্শই যে সকল আদর্শের উপর মাথা খাড়া করিয়া থাকে, সে আমি নিজের জীবন দিয়া হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। ছোটকে ছোট বলিয়া করুণার দৃষ্টিতে চাওয়া তাহাদের পরে করুণা নহে, পরন্তু অবিচার। আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে অভিভাবকগণের শৈথিল্য এবং অক্ষমতারই প্রাধান্য বেশী;

ভাষায় বই লেখাটা যত সহজ, পরিশুদ্ধ মার্জ্জিত ভাষার লেখা তেমন নহে; উহার জন্য রীতিমত সাধনার প্রয়োজন আছে। অতদূর পরিশ্রম সকলের পক্ষেই কিছু পোষাইয়া উঠে না, অথচ এ যুগে সকলকারই লেখক হওয়া চাই। অবশ্য এই লেখক হওয়ার চেষ্টার জন্য আমি কাহাকেও দোষ দিতেছি না, বরং ইহাকে অত্যন্ত আনন্দের ও আশার কথা বলিয়াই মনে করিতেছি; তবে আমার বক্তব্য এই যে, যিনিই যাহা লিখিবেন, একটু দূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া সংযতভাবে তাহা লিখিলে সেই রচনাটি দ্বারা তিনি সাধারণের অনেকখানি উপকার করিতে সমর্থ হইবেন ও নিজেও কিছু দিন জগতে স্থায়ী হইতে পারিবেন। কারণ, দূর—অতীত কালের সম্মার্জ্জনী চারি ধারের জাল-জঞ্জাল যখন ঝাঁটাইয়া দিবে, যাহার নিত্য প্রয়োজনীয়তার কখনই শেষ নাই, মাত্র তাহাদেরই সে বাদ দিয়া যাইবে। আর্ট ত বাস্তবপক্ষে আর্টের জন্য নহে, উহা মানুষেরই জন্য। "ঈশ-সৃষ্টং জীবভোগ্যং জগদ্ধাত্র্যাং সমন্বিতং।" কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ আর্টে অপরিণত মানবচিত্তের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় উহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বাজারে পচা মাল বিক্রয় বন্ধের জন্য ব্যবস্থা আছে, সাহিত্যের বাজারেই বা তাহা চলিয়া যায় কেন? এই সাহিত্যিক অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারূপ আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য স্যানিটারী অফিসাররূপী তীব্র সমালোচকের প্রয়োজন। ইহাতে যে ফললাভ ঘটিয়া থাকে, তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষীভূত। আর একটা বিষয়ে আমার মনে কিছু সংশয় আছে। আজকাল রিয়েলিষ্টিক ও আইডিয়েলিষ্টিক বা বাস্তব ও কাল্পনিক এই যে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে, তা বাস্তবচিত্র অঙ্কিত করিতে গেলে বহু স্থলেই ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব জীবনের কতকগুলি ঘৃণ্য দুর্ব্বলতাকে প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, সেটা কি বিশেষ প্রয়োজনীয়? মানুষের বাস্তব জীবনে কোথাও কোথাও কদর্য্যতা আসিয়া পড়া অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়াই ত আর সেটা কাহারও গৌরবের বস্তু নহে। আমাদের বাস্তব জীবনে কতকগুলি ময়লা যায়গাকে আমাদের বাড়ীর সঙ্গে রাখা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলেও আমরা যথাসম্ভব বাড়ীর পিছন দিকেই তাহা ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট হই। আমাদের সামনে থাকে ফুলবাগান ও বৈঠকখানা অথচ আমরা শুধু বৈঠক- ... [illegible]

খাই হউক বা ড্রেণের ময়লাই হউক, নোংরা জিনিষটাকে সাফ করিয়া ফেলা বা ঢাকা দিয়া রাখাই ভদ্রতা। সহস্রের দৃষ্টিতে সেটাকে কেহ তুলিয়া ধরে না।

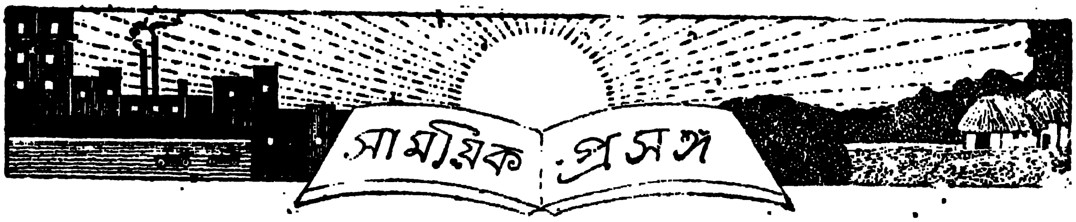
সমষ্টির রুচির উপরেই আর্টের বা ভাষার স্থায়িত্ব এবং সে রুচি দু' দিন বিকৃত হইলেও তাহা যে চিরদিনের জন্যই বিকৃত থাকিবে, নিজের দেশকে এতটা ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখিতে আমাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয় না। তাই বলি, লঘু ভাষা, লঘু ভাব ও লঘু আদর্শের স্থলে আমাদের বঙ্গভাষায় দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভাব, ভাষা ও আদর্শকে আমরা যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি। সর্ব্বত্রই যেন আজকাল পুরাতন সভ্যতার ও সরলতার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। একণে সরল গ্রাম্যিকরা পর্য্যন্ত সহরের আবহাওয়ায় নিজেদের বিশেষত্ব হারা হইতেছেন। কনোগ্রাফের নাকিসুরের কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত এবং শ্লীলতাবর্জ্জিত হাস্য-পরিহাস এখন ইতর-ভদ্র সকলকারই জানা অনিবার্য্য হইয়াছে। জনসাধারণে সমাদৃত মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক প্রভৃতিতে এখন গুরুত্ব ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাদি অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী নায়ক-নায়িকার ও ত্রিবর্ণে অঙ্কিত ও রুচি বিগর্হিত চিত্রাবলীর প্রাচুর্য্যের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে সাধারণের সহানুভূতি যেন পাওয়া যায় না। আজকাল ফ্রেঞ্চ, নরওয়েজিয়ান এবং রাশিয়ান লেখকদের অনুকরণকারী গ্রন্থ-লেখকের সংখ্যাই বাড়িয়া চলিয়াছে। থিয়েটার-বায়স্কোপে হাস্য-রসের যে চিত্র দেওয়া হয়, তাহাতে সুরুচির অংশ নাই বলিলেই চলে। ফ্রেঞ্চ নভেলে যে আদিরসাত্মক রচনার বিশেষত্ব ছিল, সেটা আমাদের গল্প-সাহিত্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে ও অপর পক্ষে স্কান্দিনেভিয়ানের নগ্ন আর্ট ও রাশিয়ান নভেলিষ্টের অশুভবাদও দেখা দিয়াছে। মোটের উপর প্রাচ্যের বিশিষ্টতাটুকু আমরা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সকল জাতির মধ্যেই একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহা স্বাধীনভাবে রক্ষার চেষ্টা সঙ্গত ও আবশ্যক।

এক দল লেখক আছেন, ইঁহারা অবশ্য বিশেষ শক্তিশালী বড় দরের লেখক নহেন, কিন্তু রক্তবীজের শোণিতবিন্দুপ্রসূত অসংখ্য অসুর-সেনার ন্যায় ইঁহারা নিত্যই বর্দ্ধিত- ... [illegible] ... অবশ্য প্রথমটা এঁরা

শক্তিমানেরই অনুসরণ আরম্ভ করিয়া এক্ষণে যে বিদ্যাটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, উহাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ করি, এ দেশে "গুরুমারা বিদ্যা" কথাটির উদ্ভব ঘটিয়া থাকিবে। এঁরা কালিয়দমন বা গোবর্দ্ধনধারণের শক্তি ধরেন না, পরন্তু বস্ত্রহরণের সাধটা রাখেন। ইঁহারা নূতন কিছু সৃষ্টির জন্যই হউক অথবা ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যার প্রভাবেই হউক, অথবা বাস্তবজীবনে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক, কারণ অবশ্য জানি না, তবে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ইঁহারা যে অভিনব ভাষা ও ভাবের আমদানী করিতেছেন, তাহার ফল অতিশয় শোচনীয় বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। আজকাল মাসিকের পৃষ্ঠা (তা সে খুব বিজ্ঞজনপরিচালিত নামজাদা মাসিকেরও বটে, তবে অধিকাংশই ছোটখাট মাসিকেরই) খুলিলেই এই বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত নূতন ভাষায় সেখানের পাতায় পাতায় আমাদের চিরপরিচিত বাঙ্গালী সংসারের যে সকল অত্যদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে নিজের জীবনটাকে যেন একটা দুঃস্বপ্নালোকে অবস্থিত বলিয়াও আমাদের সন্দেহ জন্মিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে! অন্ততঃ স্থান, কাল ও পাত্রদের ত নিঃশেষেই ভুলিয়া যাইতে হয়! সেখানে আমরা দেখিতে পাই, ভদ্রলোকদিগের গৃহ-কন্যা, এমন কি, কুলবধূগণও লাজ-লজ্জায় ধর্ম্মে-কর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ঘর-সংসার আত্মীয়-বন্ধু সব ভুলিয়া, পাশের বাড়ীর জানলায় দরজায় ছাতের "আনাচে কানাচে"র দিকে কটাক্ষসন্ধানরূপ বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাপৃতা আছেন। কদাচিৎ একটি পুরুষের সহিত চোখাচোখি হইলেই তাঁহাদের "বুকের রক্ত আনন্দের তালে তালে নাচিয়া দুলিয়া লাফাইয়া ফেনাইয়া" উঠিতেছে। আর ছেলেদের ত কথাই নাই! বি, এ, এম, এ, ক্লাসেরই হউক, আর এম, বি, এম, এস, সিই হউক আর সদ্য বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা যা কিছুই হউক, তা তিনি যেই হউন বা যাই হউন, প্রতিবেশীর গৃহরন্ধ্রে, স্কুলের বাসে, ট্রেণে, ষ্টীমারে, পথে পাথারে, প্রান্তরে পার্টিতে যেখানে যে ভাবে, যেমন অবস্থাতেই হউক না কেন, একটা মেয়ের গায়ের গন্ধ পাইলেই হইল, অমনই নররক্ত-লোলুপ বাঘের মতই তাহার নাক, কান, চোক সজাগ হইয়া উঠিল; আর রক্ষা নাই! নারী-মাংসের লোভে তার সকল শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি রসাতলে চলিয়া গেল— তা হউক, সে নারী অনূঢ়া বা বিবাহিতা, বিশেষতঃ বিধবা—স্বজাতি বা বিজাতি! হিংস্র পশু শোণিতপানের জন্য কি তার শিকারের জাতি, নীতি, কুল, গোত্র বিচার করিয়া দেখে? গায়ে খানিক রক্ত-মাংস থাকিলেই হইল। এ-ও যেন ঠিক তাই। বাস্তবিকই কি নরনারীর মিলনটা এমনই সামান্য জিনিষ!

আর আমাদের দেশের ছেলেরা কি এতই মন্দ? ভাল মন্দ অবশ্য সর্ব্বত্রই আছে, তা জানি এবং মানিও; কিন্তু ক্রমাগতই এই চিত্র সর্ব্বত্র দেখিলে সন্দেহ জন্মে যে, পড়পড়তায় শতকরা ৭৬ জনই বুঝি ঐ। এ কথাটা মনে করিতে গেলে আমাদের মায়ের প্রাণ যে ধিক্কারে ও হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, মনে হয়, এমন সব সন্তান গর্ভে বহন ও বক্ষশোণিতে বর্দ্ধন না করিয়া সূতিকায় একটু করিয়া নুণ দিলেই ত ভাল হইত! প্রতিবেশীর ঘরগুলি নিরাপদ হইতে পারিত, সধবা-বিধবা-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদাই পুরুষের জ্বলন্ত ক্ষুধিত দৃষ্টির শিকার হইয়া ফিরিতে হইত না। এদের লালসালোলুপ দৃষ্টি হইতে বাঁচাইতে শেষটা আবার মেয়েদের বোরখা ঢাকা দিবার ব্যবস্থা না করিতে হইলে বাঁচি! যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না, তবে এইটুকু বলিতে পারি, জাগ্রত জগতে যখন দেখিতে পাই যে, আমাদেরই ঘরে বাহিরে স্বার্থত্যাগী পরিশ্রমী চরিত্রবান্ যুবকরা সংঘবদ্ধভাবে কঠোর শ্রমসাধ্য সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, দেশের উন্নতির জন্য অসহন দুঃখকে বরণ করিতেছে, নারীনির্য্যাতনের প্রতীকার-চেষ্টায় যথাসাধ্য সচেষ্ট রহিয়াছে; পথে ঘাটে মা বলিয়া সসম্ভ্রমে অপরিচিতাকেও পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতেছে; তখন অন্তরবদ্ধ গভীর দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই আনন্দরূপভাবে মুক্তি গ্রহণ করিতে পায়। তাহাদের উদ্দেশে অজস্র আশীর্ব্বাদের ধারা ঢালিয়া দিয়া মনে মনেই বলি যে, 'আহা বাছারা আমার! নষ্টচন্দ্র দেখিয়া হয় ত তোমাদের উপর এই সব বৃথা কলঙ্কারোপ! বস্তুতঃ দু পাঁচ জন সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মন্দ থাকিলেও তোমরা বাঙ্গালীর ছেলেরা বাস্তবিকই অত বড় রাক্ষস হইয়া উঠ নাই, তাহা আমি জানি ও দৃঢ়রূপেই বিশ্বাস করি; পরের মেয়ে যে তোমাদের মা। আর ভারতীয় এই আদর্শই তোমাদের চির আদর্শ হইয়া চিরদিনই অটুট থাকুক। এই তোমাদের এক জন শুভার্থিনী মায়ের অকৃত্রিম ও আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ! এ দেশের এই আদর্শটুকু যাহারা খর্ব্ব করিতেছে, তাহারা তার মহা শত্রু। যে দেশে বিধবা-বিবাহ, সধবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পত্যন্তরগ্রহণ আইন ও নীতিবিরুদ্ধ, সে দেশে এ শিক্ষার বিষ তরল তরুণ চিত্তে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা কেন? নভেল কি এ নহিলে জমে না—না সমাজ-সংস্কার হয় না?

এই সকল আবর্জ্জনার জঞ্জাল হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার কাল আসিয়াছে, দূরদর্শী ও সাহিত্য-সমাজের প্রকৃত হিতৈষিগণ এ বিষয়ে সচেষ্ট হউন। জননী ভারতী পূতপবিত্র শুভ্র শতদলের উপরেই আসন করিয়া থাকেন; পূতিগন্ধময় পঙ্কিল পঙ্ক সে আসনের অনেক নীচেই পড়িয়া থাকে।



লর্ড লিটনের বিদায়-গ্রহণ

বাঙ্গালার গভর্ণর পঞ্চ বৎসরকাল বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার পর গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে স্বদেশ-যাত্রা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে কর্ণেল সার ষ্টানলি জ্যাকসন বাঙ্গালার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। যাত্রাকালে লর্ড লিটন বোম্বাই সহরে বলিয়া গিয়াছেন যে,—ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে আজ আমারি কষ্ট বোধ হইতেছে, আমি ভারতের সজ্জন অধিবাসীদিগকে আমার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া যাইতেছি।

আজ লর্ড লিটনের এ কথায় ভারতের না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালার লোকের হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত হইবার কথা। পাঁচ বৎসরকাল যিনি তাহাদের সুখ-দুঃখের উন্নতি-অবনতির



লর্ড লিটন

নিয়ন্তৃরূপে তাহাদের দেশে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহার বিদায়ের দিনে এই বিরহে দুঃখানুভূতির কথায় তাহাদের সমবেদনা স্বতঃই উৎসারিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বাঙ্গালী তাঁহাকে সে সমবেদনা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তিনি বিলাতের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে এক জন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন, আর এক জন এক সময়ে ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন স্বয়ং এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। অথচ এমনই বিধির নির্ব্বন্ধ যে, ভারতের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে শাসকের ব্যক্তিত্বকে ঐ দেশে দলিত পিষ্ট করিয়া ফেলে,—উদ্দেশ্য সাধু হইলেও শাসক যাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, সেই আমলাতন্ত্র সরকারের সিবিলিয়ানি ভৈরবী-চক্র লর্ড লিটনের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তিনি ভারতকে ভালবাসেন বলিয়া বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণায় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু অন্তরে এই ভারতপ্রীতি এবং ভারতের মঙ্গলসাধনরূপ সাধু উদ্দেশ্য পোষণ করিয়া এ দেশে আসিলেও এ দেশে পদার্পণমাত্র ভারতের 'হাওয়ার গুণে' তাঁহার সেই সাধু উদ্দেশ্য অন্তর্হিত



বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর সার ষ্টানলি জ্যাকসন

হইয়াছিল—তাঁহার সিবিলিয়ান মন্ত্রণাদাতারা তাঁহাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তিনি তাহাই বুঝিয়াছিলেন, দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী অভাব-অভিযোগ বুঝা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড রোণাল্ডশেও সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও সিবিলিয়ান চক্রব্যূহ ভেদ

বাঙ্গালার মসনদপ্রাপ্তির পূর্ব্বে লর্ড লিটন দুই বৎসরকাল সহকারী ভারত-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার কার্য্য-কলাপে ভারতবাসীরা ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—এ জন্ম তাঁহার লাট-পদে নিয়োগ সম্বন্ধে ভারত হইতে আপত্তি উঠিয়াছিল, এমন কি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান তাঁহার নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বিলাতে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ভারতীয় শাসিতের সকল আবেদনই যেমন বিফল হয়, এই আবেদনও তেমনই হইয়াছিল। তখন অনেকে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, হয় ত তাঁহার মতপরিবর্ত্তন হইয়া থাকিতে পারে, তিনি অভিজাতবংশীয়, সুতরাং রক্ষণশীল হইলেও বয়সের পরিণতির সহিত উদারনীতিক হইয়া যাইতেও পারেন। সত্য সত্যই যখন লর্ড লিটন বাঙ্গালার লাটের পদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"ভারত আমার জন্মভূমি, আমি জন্মভূমির কল্যাণকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না।"আর আজ?

তিনি তাহার পর পাঁচ বৎসরকাল এ দেশ শাসনকালে জনগণের যে সকল অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। আমরা কেবল তন্মধ্যে কয়টির উল্লেখ করিতেছি,—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। লোক বুঝিয়াছিল, তাঁহার গুরু-লঘু-জ্ঞান নাই, পরন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকে সরকারের তাঁবেদারে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই দ্বন্দ্বে সার আশুতোষের নিকট তাঁহার লজ্জাজনক পরাভব ঘটিয়াছিল। ইহাতে তিনি যে কুমন্ত্রণা-পরিচালিত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয় যায়।

(২) ফরিদপুর চরমানাইর মামলা যে সময়ে বিচারাধীন ছিল, সেই সময়ে তিনি ঢাকার পুলিস প্যারেড উপলক্ষে বক্তৃতাকালে এ দেশের মাতৃজাতির কুৎসা রটাইয়া বলিয়াছিলেন,—"সরকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ঘৃণা এ দেশের পুরুষদিগকে পুলিসের অপযশ ঘোষণা করিবার জন্ম তাহাদের মহিলাদিগকে ইজ্জৎ হানির অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেও প্ররোচিত করে।" এই জঘন্য কাপুরুষোচিত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ হইলে তিনি কূট তর্কে আপনার দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উক্তি যে তিনি তাঁহার সিবিলিয়ান গুরুর শিক্ষামত পোষাপাখীর মত আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) বাঙ্গালার অর্ডিনান্স জারি তাঁহার প্রধান কুকার্য্য—ইহা দ্বারা তাঁহার কুকীর্ত্তির কথা সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বে-আইনী বিধিবল দ্বারা তিনি বিনা বিচারে শতাধিক বাঙ্গালী যুবককে কারাবদ্ধ করেন এবং এই স্বেচ্ছাচারমূলক বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর হইলেও তিনি, অন্যায় জিদ বশতঃ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, এমন কি, শেষ মুহূর্ত্তে আশা দিয়াও জাতিকে আশায় নিরাশ করিয়াছেন—যুবকগণের মুক্তির লোভ দেখাইয়াও পরমুহূর্ত্তে এমন সর্ত্ত দিয়াছেন, যাহা কোনও ভদ্র সন্তান তাহা মানিয়া মুক্তি-কামনা করিতে পারে না। এ বিষয়েও তিনি তাঁহার সিবিলিয়ান ভৈরবী-চক্রের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই।

(৪) তাঁহার শাসনকালে বাঙ্গালায় যেরূপ অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল, এমন আর কোনও শাসকের আমলে হইয়াছে কি না সন্দেহ। অথচ এই অশান্তি ও অরাজকতাদমনে তিনি যেরূপ যোগ্যতার অভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে স্বাধীন দেশ হইলে তাঁহার কার্য্যকাল বহু পূর্ব্বেই সাঙ্গ হইত। কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা কলিকাতার ইতিহাসে অপূর্ব্ব। কিন্তু এই দাঙ্গাকালে লর্ড লিটন শাসকরূপে অকর্ম্মণ্যতার উৎকট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের এতই অভাব ছিল যে, যে সময়ে কলিকাতা নররক্তের স্রোতে ভাসিতেছিল, তখনও তিনি দার্জ্জিলিং শৈল-শিখরের সুখ-ক্রীড়াবাসে বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিতে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাহার পর এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের হলাহল যখন পাবনা, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, নদীয়া প্রভৃতি মফঃস্বলের নানা স্থানে বিসর্পিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন, তিনি এই হলাহলের সৃষ্টিকর্ত্তাদিগকে গ্রেপ্তার বা দমন করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। "ইংলিসম্যানের" মত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ মেঘের আড়ালে লুকায়িত এই সমস্ত সমাজ-দ্রোহীদিগকে দণ্ডবিধানের জন্ম তারস্বরে প্রার্থনা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। যে গোয়েন্দা পুলিস লোকের হাঁড়ীর খবর রাখে—যাহারা সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানদিগেরও বিপ্লব-বাদের গন্ধ খুঁজিয়া পায়, তাহারা এই সকল বিরোধের মূল সমাজদ্রোহী-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

(৫) মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য আন্দোলনসূত্রে তিনি কলিকাতায় যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই সমর্থিত হইবার যোগ্য নহে। সকল সময়ে নাখোদা মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া তিনি হিন্দুর ধর্ম্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। পরন্তু এক শ্রেণীর মুসলমানের আবদার ও অত্যাচার দমনে তিনি কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এ জন্ম উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালে বাঙ্গালায় হিন্দু-নারী-নিগ্রহ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ তাঁহারই শাসন কৌশলের অভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তিনি যে তাঁহার শাসনের অসাফল্যের কথা শেষ মুহূর্ত্তে অনুধাবন করিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিদায়কালীন বক্তৃতায় তাহা বুঝা যায়। এ দেশের শাসন পদ্ধতির ত্রুটির আলোচনা করিয়া তিনি ব্যবস্থাপক সভার শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

"ব্যবস্থাপক সভা বিতাড়িত করিতে পারেন না, এমন শাসক মণ্ডলীর, এবং শাসকমণ্ডলী বিতাড়িত করিতে পারেন না, এমন ব্যবস্থাপক সভার স্থিতি উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত করিতে পারে না। অথচ উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব ব্যতিরেকে শাসনকার্য্য সুপরিচালিত হওয়া অসম্ভব। এই সদ্ভাব রাখিতে হইলে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার সঙ্গে যে শাসকমণ্ডলী রাখিতে হয়, সভার তাহা বিতাড়িত করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। আর যদি শাসকমণ্ডলীর বিতাড়ন অসম্ভব করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যনির্ব্বাচন-প্রথা উচ্ছেদ করিয়া মনোনয়ন প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হয়। যে পদ্ধতিতে শাসক মণ্ডলী ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা প্রাধান্য লাভ না করিয়া স্বৈরাচার দ্বারা তাহা লাভ করেন, সে পদ্ধতি পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনের পথে লোককে প্রস্তুত করিতে পারে না।"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। লর্ড লিটন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ দেশের জাতীয় দল এ যাবৎ বহুবারই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার যে মাকাল ফল, ইহার দ্বারা যে প্রকৃত দায়িত্ব-শাসনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, এ কথা বুঝিয়াই মহাত্মা গন্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক নহে বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন।

সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগ সম্বন্ধে লর্ড লিটন বলিয়াছেন,—"সংরক্ষিত বিভাগসমূহের অসুবিধা এই যে, সেগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়; পরন্তু হস্তান্তরিত বিভাগগুলি পুষ্ট করিবার অর্থের অভাবে অসুবিধা ভোগ করে। যে সকল বিভাগে ভাল করিয়া কায করিবার সুযোগ নাই, সে সকল বিভাগের ভার গ্রহণ করিতে কাহারও আগ্রহ থাকিতে পারে না।" এই হেতু এ দেশে মিনিষ্টারী বিফল হইয়াছে এবং সে জন্ম উহাতে ভাল লোক আকৃষ্ট হয় না। যাঁহারা এই অসুবিধা সত্ত্বেও ভারগ্রহণ করেন, তাঁহারা অর্থাভাবে কার্য্য করিতে না পারিয়া দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়েন।

"মেষ্টনী বন্দোবস্তে বাঙ্গালার বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বাঙ্গালার রাজস্বলাভের যে উপায় আছে, তাহা বাঙ্গালার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

এ কথা দেশের লোকও বহুবার বলিয়াছে। কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? যে শাসনপ্রথা প্রচলিত, তাহাতে এ অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে না।

লর্ড লিটন বিদায়কালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি নিশ্চিতই অন্তরে অনুভব করিতেছেন। এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া (তিনি যদি যথার্থই ভারতকে জন্মভূমি বলিয়া ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে) এ বিষয়ে প্রতীকারচেষ্টা করিয়া কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন। অন্যথা তাঁহার অনুশোচনা বৃথা।

সার ষ্ট্যানলি তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রথম হইতে এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলে পারেন। আর এ দেশের লোকও লর্ড লিটনের একটি কথা অনুক্ষণ স্মরণ রাখিলে ভাল করিবেন,—"কোন জাতি অপর জাতিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে পারে না, তাহাকে আত্মশক্তির দ্বারা উহা লাভ করিতে হয়।"

আবকারী নীতি

বাঙ্গালা সরকারের আবকারী নীতির ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে কি সর্ব্বনাশের বিষ বিসর্পিত হইতেছে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই বুঝেন। মার্কিণ প্রভৃতি সুসভ্য দেশ এই বিষ নিবারণে যে সময়ে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছেন, সে সময়ে আমাদের 'মা বাপ' সরকার আবকারী নীতির পূর্ণ প্রসারে এবং ঐ বিভাগের আয়ে গৌরব অনুভব করিতেছেন! ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাঙ্গালা সরকার আবকারী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাহা পূর্ণ সমর্থন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিভাগের বাবদে বাজেটে ২২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুরী করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানেন, জনসাধারণ ও তাহাদের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিরা সরকারের এই নীতির বিরোধী না হইলে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বলিতেন না,—"এই আবকারী বিভাগের ব্যয়-বাবদের প্রস্তাবের বিপক্ষে বিস্তর প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে; ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, জনসাধারণ মাদকদ্রব্য সেবনের (মদ্য, অহিফেন, গঞ্জিকা ইত্যাদি) বিষম বিরোধী।" সরকারও যে এ কথা জানেন না, তাহা নহে। কিন্তু তথাপি সরকারের মন্তব্যে আবকারী নীতির পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, এই বিভাগের আয় সরকারের একটা প্রধান আয়। আবকারীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ও সে কথায় সায় দিয়াছেন, অথচ তিনি এই নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনের ভাব সম্পূর্ণ অবগত আছেন! দ্বৈত শাসনের ইহাই সুফল!

তাঁহার মতে আবকারীর মদ, গাঁজা, অহিফেন ইত্যাদির দোকানের লাইসেন্স দিবার উপর হস্তান্তরিত বিভাগের কর্তৃত্ব থাকিলেই যথেষ্ট। তাহা হইলেই যেন জনসাধারণের মনের মত কায করা হইল! যাম দেখান লোক ছাড়া আর কাহাকেও চণ্ডু টানিতে দেওয়া হইবে না,—কেবল এই ভাবের ব্যবস্থায় লোকের নেশার প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইবার সকল দোষ কি কাটিয়া যায়?

সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, মদ, গাঁজা ও অহিফেন বিক্রয়ের লাইসেন্সের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ সকল মাদকদ্রব্য সেবনও হ্রাস পাইয়াছে। এ কথার কিন্তু কোনও ভিত্তি নাই। ডাক্তার ১৬২৩। ১৯১৭ খৃঃ লোক ৫ লক্ষ ৫ হাজার গ্যালন বিদেশী মদ খাইয়াছিল, ১৯২৫-২৬ খৃঃ খাইয়াছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার গ্যালন। অবশ্য খোলা ভাঁটির মদের কাটতি কিছু কমিয়াছে বটে। কিন্তু বিলাতীর অধিক কাটতি তাহা পোষাইয়া দিয়াছে। ফলে বিদেশী শৌণ্ডিকদিগের পোয়াবারো।

ইহার ফল কি হইতেছে? বিদেশী বণিকের হাঁসের পেট যতই বড় হইতেছে, ততই এ দেশের লোক তাহাদের মাল গিলিয়া স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অর্থ নষ্ট করিতেছে, সংসারের সুখশান্তি দূরে পরিত্যাগ করিতেছে, ধর্ম্ম-নীতি জলাঞ্জলি দিতেছে। সভ্য সরকারের পক্ষে ইহা সুনামের পরিচায়ক নহে। নজীর দেওয়া হইবে, শকুন্তলা-দুষ্মন্তের সময়েও খোলাভাঁটি ও সরাপের দোকান ছিল। না হইলে দুষ্মন্তের পাহারাওয়ালা ধীবরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া মদের দোকানে বোতল কিনিতে যাইত কিরূপে? অন্ততঃ সে সময়ে না হউক, শকুন্তলার লেখক কালিদাসের সময়ে ত ছিলই। তাহা সম্ভবপর বটে, কিন্তু তাহা হইলে 'শকুন্তলায়' এমন কথা কোথাও নাই যে, রাজ্যের সরকার এই সরাপ বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করিত। এইখানেই ত প্রভেদ। এ দেশের সরকার প্রজাকে মদ খাওয়াইয়া নেশা করাইয়া আয়ের চেষ্টা দেখেন, অথচ তাহাতে তাহারা যে পশুতে পরিণত হয়, সে কথা একবারও ভাবিয়া দেখেন কি? অর্থ কি এতই বড় জিনিষ যে, উহার কাছে ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্বই বেচিতে হইবে?

উন্নতিশীল ভারত

বিলাসী ধনী 'ভবঘুরে' প্রতীচ্যবাসী এ দেশে দশ দিন ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়া 'হাতী-হাওদা'র গল্প করেন, ভারতের হাসিতে মুক্তা ঝরে, আহারে চুনী-পান্নার থালা পড়ে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় দেন। আর আমলাতন্ত্র সরকারের নায়েব আমলার ত কথাই নাই, তাঁহারা প্রতি বাজেটেই সম্পন্ন ভারতের স্বপ্ন দেখেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সম্পাদকরা ইংরাজ আমলে প্রজার অবস্থার উন্নতির কথা সাতখানা করিয়া বানাইয়া বলেন। আমরা ইঁহাদের কথাও সমর্থনের জন্য ভারতের অবস্থার একটি চিত্র তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছি। চিত্রটি বোম্বাইয়ের। চিত্রটি এই:—নাথাম কুলকর্ণী গ্রাম্য স্ত্রীলোক, গ্রামে সে কায পায় নাই, বেকার বসিয়া ছিল। এজন্য সে বোম্বাই সহরে কাযের সন্ধানে আইসে। দুই মাস ঘুরিয়াও কায মিলিল না—অভাগী ট্রামের লাইনে মাথা দিয়া ইহকালের সুখ-দুঃখের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিল! সে মৃত্যুর পূর্ব্বে পুলিস-কমিশনারকে লিখিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে, সে নিজেই দায়ী।

কেমন উন্নত সম্পন্ন ভারতের উজ্জ্বল চিত্র! এ দেশের ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও বোরী বন্দরের চিত্র দেখিয়া, তাজমহল বা গ্রাণ্ড হোটেলে খানা খাইয়া, লাট-বেলাটের দরবার লেভিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অথবা রাজা-মহারাজের হাতী-হাওদা দেখিয়া যাঁহারা সম্পন্ন ভারতের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে আর এক বুভুক্ষু কঙ্কালসার অনশনক্লিষ্ট বা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ভারত "ময় ভুখা হুঁ" বলিয়া অহরহ চীৎকার করিতেছে, তাহার খবর কি তাঁহারা রাখেন?—না, বিলাসের একটানা স্রোতের মাঝে গা-ভাসান দিয়া তাঁহারা সে সুযোগ কোথায় পাইবেন? ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কড়ি নাড়া-চাড়ার আওয়াজে সুদূর-পল্লীর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের আর্ত্তনাদ ডুবিয়া যাওয়ারই ত সমধিক

নারীর মর্য্যাদারক্ষায় আত্মদান

নেপালী যুবক খড়্গ বাহাদুর সিংহের ৮ বৎসর কারাদণ্ডে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহার মুক্তির জন্য বহু প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারের শীর্ষস্থানীয়ের নিকট আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে তাহার দণ্ডবিধানে সকলেই দুঃখিত, তাহার গুণে সকলেই মুগ্ধ, তাহার মঙ্গলার্থে সকলেই ব্যগ্র। কেন এমন হয়?

খড়্গ বাহাদুর খুনী আসামী; সে নরহত্যার অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। যদিও বিচারকালে সে অপরাধে তাহার দণ্ড হয় নাই, তথাপি তাহার আত্মমুখে স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, নর হত্যাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এমন লোক সমাজদ্রোহী বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য হইয়া থাকে। তবে আজ তাহার জন্য আপামর সাধারণ—বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ কেন?

এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থার কথাটাও খুনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

রাজকুমারী মায়া পঞ্চদশবর্ষীয়া নেপালী বালিকা, সে বর্ত্তমান নেপাল-রাজবংশের সহিত দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত বলিয়া শুনা গিয়াছে। যাহাই হউক, সে সুন্দরী যুবতী; সুতরাং পশুপ্রবৃত্তি নররাক্ষসের দৃষ্টিতে যে তাহার রূপই কালস্বরূপ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। নানা চক্রান্তের ফলে সে তাহার জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে অর্থ-বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল, কি দুষ্ট শয়তান 'যুবতীর আড়কাঠি' তাহাকে বিলাসী ধনীর কামলালসায় আহুতি দিবার জন্য নানা ছলে ভুলাইয়া আনিয়াছিল, সে কথার আলোচনা করিব না। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সেই বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কলিকাতার বড়বাজারে এক কামুক লম্পট ধনী ব্যবসাদারের কবলে অর্পণ করা হইয়াছিল—তাহার নাম হীরালাল আগারওয়ালা। এই কামান্ধ মাড়োয়ারী পরিণতবয়স্ক, রাজকুমারী মায়ার পিতামহ হইবার উপযুক্ত, উহার একাধিক পত্নী বর্ত্তমান।

ইহার গৃহে পশুবলে মায়ার সর্ব্বনাশসাধন করা হইয়াছিল। হীরালাল একা নহে, কয় জন সঙ্গী সহ তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। নিখিল ভারতীয় গুর্খা লীগের সভাপতি ঠাকুর চন্দন সিংহ কোনও সংবাদ-সংগ্রাহককে বলিয়াছেন যে, বালিকার উপর এমন পাশবিক ও অস্বাভাবিক অত্যাচার হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করিতে লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব হয়!

খড়্গ বাহাদুর সিংহ মাত্র একবিংশতিবর্ষীয় বালক। সে উচ্চবংশজাত, শিক্ষিত, গুর্খা লীগের সম্পাদক। সে সম্মানের সহিত বি, এ, এবধি পাশ করিয়া গিয়াছে, পরন্তু নেপালের রাজবংশের সহিত সে-ও দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত। সে যখন শুনিল, একটি অসহায়া নিষ্পাপা সরলা নেপালী বালিকার উপর এই অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, পরন্তু সেই বালিকা নেপালের রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত, তখন তাহার হৃদয়ের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। নেপালীরা অত্যন্ত রাজভক্ত, এ জন্য মায়ার অপমানে সে রাজবংশের অপমান বলিয়া মনে করিল। পরন্তু সে স্বয়ং রাজবংশীয়, সেই হিসাবে মায়াকে সে ভগিনী বলিয়া মনে করিল। সর্ব্বোপরি নারীর মর্য্যাদাহানিতে সে একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে জানিত, এক শ্রেণীর ধনী লম্পট এই সহরে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে অর্থ ও লোকবলের সহায়তায় এইরূপ অসংখ্য অসহায়া বালিকার সর্ব্বনাশসাধন করে; অথচ এ অবস্থার প্রতীকার নাই! অর্থবলে তাহারা আপনাদিগকে নিরাপদ রাখে। রাজকুমারী মায়ার ব্যাপারেও এইরূপ হইয়াছিল। সে উৎপারে নাই। সে বহুবার পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৃতকার্য্য হয় নাই। শেষে যখন সমর্থ হইয়াছিল, তখনও পুলিস তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই। সে যখন দারুণ অত্যাচারের ফলে হাসপাতালে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়াছিল, তখন তাহাকে সেই অবস্থায় খড়্গ বাহাদুর দেখিয়াছিল; তাহার পর তাহার মুখে তাহার উপর এই সকল অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়াছিল। ইহার ফল যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে।

তাই সে সেই বালিকার উৎপীড়ক লম্পট হীরালালের দণ্ডের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। সে জানিত, রাজসরকার ব্যতীত অপর কাহারও দোষীর দণ্ডবিধানের অধিকার নাই, রাজার আইন এই কথা বলে। কিন্তু সে যখন বুঝিয়াছিল, এই শ্রেণীর অপরাধীর প্রকৃত বিচার রাজসরকারে হইবার উপায় নাই, তখন সে আইন মানে নাই। তাহার ধারণা হইয়াছিল, এইরূপ লম্পটের দণ্ডবিধান করিলে আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মের দৃষ্টিতে হইবে না।

তাহার স্বীকারোক্তিতে এ কথা স্বপ্রকাশ। হাইকোর্টে বিচারকালে সে স্বীকারোক্তিতে হীরালালকে হত্যা করিবার কথা একবারও অস্বীকার করেন নাই; নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিয়া গিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, সে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া হীরালালের আফিসে গিয়াছিল এবং তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল। আর বলিয়াছিল,—

"আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমি আইনতঃ বা ন্যায়তঃ (এই হত্যা করিয়া) কোনও অন্যায় কার্য্য করি নাই। কিন্তু যদি আপনি (বিচারক) এবং জুরিগণ মনে করেন যে, আমার ভগিনীর সম্মান এবং সতীত্ব রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য ছিল না,—যদি আপনারা মনে করেন যে, আমি হীরালালের অপেক্ষা সরকারের অথবা গার্হস্থ্য সুখশান্তির পক্ষে অধিক বিপজ্জনক, তাহা হইলে আমি আমার কৃত কর্ম্মের জন্য পূর্ণ দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।" খড়্গবাহাদুর আরও বলিয়াছিল যে, সে মহাত্মা গন্ধীর অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল, সে নিরামিষাশী ছিল, স্বপ্নেও কখনও প্রাণিহিংসা করিবে বলিয়া মনে করে নাই। কেবল অবস্থাতেই তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখুন, কি ভীষণ নারী-নিগ্রহের ফলে তাহার এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল!

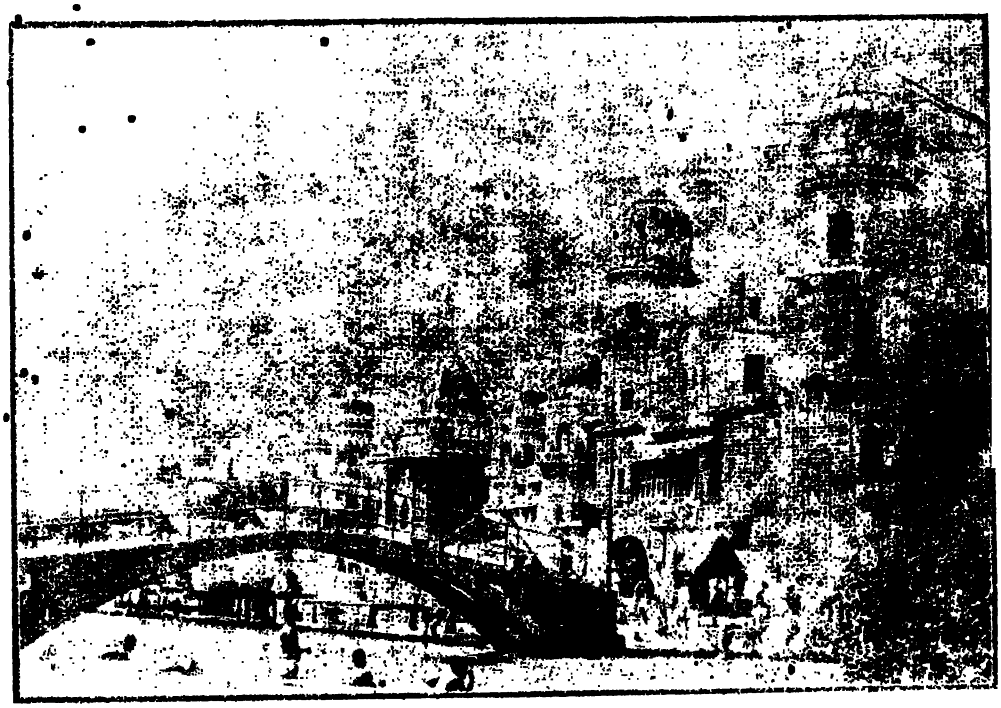
খড়্গ বাহাদুরের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়া সমাজের অঙ্গ হইতে একটা কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল,—"কলিকাতায় ও অন্যত্র সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ধনী আছে, যাহাদের বিরুদ্ধে সামান্য সন্দেহও কাহারও মনে সঞ্জাত হইতে পারে না, অথচ তাহারাই হীরালালের শ্রেণীর লোক।"

এ কথাটা সমাজের পক্ষে ভাবিয়া দেখিবার। এই শ্রেণীর বহু 'হীরালালই' সমাজের বুকের উপর বসিয়া অর্থের জোরে সমাজের সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ কত নিষ্পাপ কুলনারীর সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। এমন লোকও সমাজে আছেন, যাঁহারা গোপনে বাবুর্চ্চি খানসামার হস্তের নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেন, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বারনারী-গমন করেন, অথচ প্রকাশ্যে নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া প্রকাশ্য সভায় হিন্দু-কুলচূড়ামণি সাজিয়া সভাপতিরূপে হীন চাটুকারগণের হস্তে স্রক-চন্দন ও মাল্য উপহার প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ সকল শ্রেণীর ভণ্ডকে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের তরুণগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। খড়্গ বাহাদুরের পবিত্র আত্মোৎসর্গের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগকে নারীর

এদেশের মুখোস খুলিয়া দেওয়া। পরন্তু বাঙ্গালার মফঃস্বলে হিন্দু নারী নির্য্যাতনের বিষয়েও তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। মাতৃজাতির অমর্য্যাদায় জাতির কলঙ্ক। যে ক্লীব, সে মাতৃজাতির—জননী-ভগিনী, দুহিতা পত্নীর মর্য্যাদানাশ প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে। দেশের তরুণগণ জাতির স্কন্ধে সে কলঙ্কের ভার চাপাইতে কখনও সম্মত হইবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কুম্ভমেলা

হরিদ্বারে এবার কুম্ভমেলা। এবার পূর্ণকুম্ভ। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। বিগত ১৩২১ সালে কুম্ভমেলা



হরিদ্বার—ব্রহ্মঘাট [গয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

হইয়াছিল। সুতরাং এবার ১৩৩৩ সালে কুম্ভ। ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তির মহাপুণ্যদিন, ঐ দিন পূর্ণকুম্ভের স্নান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

"পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতো রবিঃ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥
কুম্ভরাশৌ গতে জীবে সর্জ্জনে মেষগে রবৌ।
হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবর্ত্তিবর্জ্জনম্॥

বৃহস্পতি বৎসরকাল কুম্ভে থাকেন। গত অগ্রহায়ণে কুম্ভে সঞ্চার হইয়াছেন। ফাল্গুনে রবি কুম্ভ-রাশিতে উদয় হইতেছেন। তাই ফাল্গুনের চতুর্দ্দশীস্নান হইতেই কুম্ভযোগ হইয়াছে। তদবধি হরিদ্বারে লোক সমাগম হইতেছে। প্রায় পঞ্চলক্ষ হিন্দু এই তীর্থস্নানোপলক্ষে তথায় সমবেত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। রামকৃষ্ণসেবাশ্রম, মালব্যজীর সেবাসমিতি, ভারত সেবাশ্রম এবং অন্যান্য বহু জনহিতব্রতধারী সেবাসঙ্ঘসমূহের স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকিয়া যাত্রিগণের যথাসাধ্য স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিয়াছেন। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগও পুলিসও

সাহিত্যিকের অকালপ্রয়াণ

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। হুগলী জিলার থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটে পোল গ্রামে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অভিধান চিন্তামণি, সুবলমিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। 'কথাকুঞ্জ' 'কুলপুরোহিত' অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া পল্লীমাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া নারায়ণচন্দ্র বাণীচরণ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন—অপরিণত বয়সেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ছোট গল্প-রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব বুঝি বা তাঁহার ঔপন্যাসিকরূপে প্রসিদ্ধিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি পল্লীর সাহিত্যিক, পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামল ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি পল্লীচিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং দরিদ্র, তাই পল্লীর দৈন্য, পল্লীর 'ছোট ঘরের' সুখ-দুঃখের কথা, পল্লীবাসীর শোক-ব্যথার কথা, পল্লীর স্বভাবসুন্দর প্রেমের কথা, পল্লী-সমাজের নির্য্যাতনের কথা নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের 'মাসিক বসুমতী' প্রায় প্রতি মাসে তাঁহার নিপুণ হস্তের তুলিকায় চিত্রিত হইত—সে সকল পল্লীচিত্র সহরবিলাসী শিক্ষিত ধনকুবেরের মনকে সহরের ধূলি-মলিন বিলাসপঙ্কিল জীবন হইতে, পল্লীজননীর স্নিগ্ধ অঙ্কের দিকে মাঝে মাঝে ফিরাইয়া লইয়া যাইত, এ কথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। নারায়ণচন্দ্র সরল সহজ সুষ্ঠু ভাষায় রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এখনকার নব্য-সাহিত্যিক নূতনের মোহে আকৃষ্ট না হইয়া যদি তাঁহার আদর্শে ভাষা-জননীর পদে অর্ঘ্য অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধন্য হইবেন। নারায়ণচন্দ্রের বিয়োগে আমরা সৎসাহিত্য-

মন্দির হইতে প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থাবলী তাঁহার স্মৃতিসম্মান রক্ষা করিতেছে। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, নারায়ণচন্দ্রের নাম তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

ভারত ও আফগানিস্থান

ভারতের তুলনায় আফগানিস্থান কত ক্ষুদ্র দেশ! পরন্তু ভারতের সোনাফলা মাটীর তুলনায় আফগানিস্থানের ধূলিকঙ্করময় উষর ভূমি কিরূপ নগণ্য! এই দুই দেশের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও কত প্রভেদ!

ভারতের সরকার ভারতের উন্নতির জন্য কত কমিটী কমিশন নিয়োগ করিতেছেন—সে সকল কমিটী কমিশন পর্ব্বতের মত মূষিক প্রসব করিতেছে। অধিক দিনের কথা নহে, সম্প্রতি স্কীন কমিটীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপরেও সরকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবল রিপোর্টে ভারতের সৈন্য-শ্রেণীতে ভারতীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির পরামর্শ দিলেই ত হইবে না, সেনানী-নিয়োগ ব্যাপার যখন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে তখন বিলাতের সরকার এ বিষয়ে ব্যবস্থা না করিলে ত কিছু হইবে না। তবে ভারতের টাকা জলের মত ব্যয় করিয়া এই কমিটী নিয়োগের কি প্রয়োজন ছিল, তাহাও ত বুঝা যায় না। 'নেভি-বিলের' ভিতরের কথাও ইহারই মত। এমনই সব কমিটী কমিশনের দুর্দ্দশা! অথচ আফগানিস্থানে এ সব কমিটী কমিশনের বালাই নাই। সেখানকার শাসকরা কমিটী কমিশন নিয়োগ না করিয়াই বহু আফগান যুবককে মস্কো সহরে উড়োকলের বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। কাবুলে এক জন জার্ম্মাণ সেনানীকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া আফগান যুবকগণকে আধুনিক গোলন্দাজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিতেছেন। তুর্কীদেশে বিস্তর সেনানী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে আধুনিক সমর-কৌশলে অভ্যস্ত করিতেছেন। এইরূপে নানাদিকে আফগানদিগকে পাশ্চাত্যদিগের সমর বদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করা হইতেছে।

এমনও জানা গিয়াছে যে দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের সম্যক উন্নতিসাধনে আফগান সরকার যত্নবান্ হইয়াছেন। এতদর্থে আধুনিক প্রথায় শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ এজন্য আফগানিস্থানের প্রাচীন ভাবধারা ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে না, বরং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সেই ভাবধারার অনুযায়ী করা হইতেছে। যাহাতে তরুণ আফগানরা দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয় এবং রাজভক্তির সহিত দেশপ্রেমের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া দেশের উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়, তদুপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে আফগানরা যে অদূর ভবিষ্যতে জগতের অন্যান্য স্বাধীন শক্তিশালী জাতির ন্যায় উন্নত জাতিগণের মধ্যে আপনাদের স্থান করিয়া লইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

আর ভারতবাসী? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতবাসীর তাহার নিজের দেশে উন্নতি করিবার যত সুবিধা আছে, তাহার অপেক্ষা আফগানিস্থানে অধিক আছে। এক জন ভারতবাসী যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে কাবুলের রাজস্ব-সচিব হইতে পারেন, কিন্তু ভারতে তাঁহার সে সুযোগ নাই! কাপ্তেন পটবর্দ্ধন কাবুলে গেলে কালে প্রধান সেনাপতি হইতে পারেন, কিন্তু ভারতে তিনি যাহা আছেন, মৃত্যুকালে তাহাই থাকিয়া যাইবেন। সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, সার শঙ্করণ নেয়ার, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ মনীষী ভারতবাসীর পক্ষে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপদলাভ বিস্ময়ের কথা নহে; কিন্তু আমলাতন্ত্র সরকারের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের প্রভাব বটে, কিন্তু সিবিলিয়ানী ভৈরবীচক্র তাঁহাকে শেষ রক্ষা করিতে দেয় নাই। ভারত যদি আফগানিস্থানের মত স্বাধীন হইত, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিবিলিয়ান উৎপাতের কাঠামোর এবং বিরাট সামরিক ব্যয়ের পাষাণচাপ তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিত না, বরং সেই ব্যয় হ্রাস করিয়া দেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, সমরশিক্ষা ইত্যাদির সুব্যবস্থা হইত, আর তাহা হইলে ভারত আপনার ঘরে প্রধান হইয়া আপনার ঘর সামলাইতে পারিত।

রেলে নবাবী

এ দেশের সরকারী রেলে মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভাড়ার দিকে কর্ত্তৃপক্ষ যে বিশেষ মনোযোগী এমন ত মনে হয় না। এ বিষয়ে লেখালেখি যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই লেখার ফলে মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সুবিধা যত না হউক, উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীর হইয়াছে বটে। তাঁহারা না চাহিতে জল পাইয়াছেন, অথচ যাহাদের অভাব অনন্ত ও প্রকৃত—এবং যাহারা রেলের আয়ের অধিকাংশ সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহাদের অভাব দূর করিবার পক্ষে সরকারের আগ্রহ তেমন দেখা যায় না। তাহারা যেমন dumb driven cattleএর অথবা ভেড়ার পালের মত ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে, এখনও তেমনই ব্যবহার পাইতেছে। রেলের গার্ড, ড্রাইভার তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে না, পরন্তু তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহারা যে তাহাদের চাকুরীর অর্থ যোগায়, এ কথাটা তাহারা মনেই করে না। সামান্য রেলের কুলীর ভয়ে তাহারা জুজু হইয়া থাকে, রেল পুলিস বা ষ্টেশনমাষ্টার টিকিটকালেক্টরের ত কথাই নাই। ভিড়ের সময় তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা অন্য কোনও স্বাধীন সভ্য দেশে হইলে সরকারের তিষ্ঠিয়া থাকা দায় হইত। ঐ অবস্থার প্রতীকার রেল বোর্ড করিতে পারেন না, অথচ সাধারণের অর্থ হইতেই বোর্ডের সদস্যদিগের বেতন যোগান হয়।

মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভাড়া অনায়াসে হ্রাস করা যাইতে পারে, যদি সরকারী রেলের নবাবী খরচা হ্রাস করা যায়। শ্রীযুক্ত দোরাইস্বামী আয়েঙ্গার ব্যবস্থাপরিষদে রেল-বাজেটের তর্কবিতর্ককালে দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ রেলে অযথা নবাবী ব্যয় করা হয়। তিনি সাউথ ইণ্ডিয়ান, ব্রহ্ম ও পূর্ব্ববঙ্গ রেলের সরঞ্জামী খরচা এই ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন:—

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথ ১৮৭৬ মাইল, ব্রহ্ম রেল ১৯৮৭ মাইল এবং পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ ১৯১৯ মাইল। তিনটি রেলের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান, মাত্র ১শত মাইলের মধ্যে কম-বেশী হইতে পারে। অথচ এই তিন রেলের কয়েকটি বিভাগের খরচের পার্থক্য কিরূপ দেখুন:—

	সাউথ ইণ্ডিয়ান	ব্রহ্ম	পূর্ব্ববঙ্গ
এজেন্সি বিভাগ	২৬০০০০০৲	২৪০০০০০৲	৩৩৫০০০০৲
অডিট ,,	৫০৯০০০০৲	৩২৫০০০০৲	৯৪০০০০০৲
ষ্টোরস ,,	৩০০০০০০৲	১৭০০০০০৲	৫৬৪০০০০৲
যাত্রী ও মালগাড়ী	২৪২০০০০৲	২৭৪০০০০৲	৪৭৪০০০০৲
ট্রাফিক ,,	৫৮০০০০০৲	৩৫০০০০০৲	১১৭০০০০০৲
মেডিক্যাল ,,	১৯৭০০০০৲	২৮০০০০০৲	৩৫০০০০
অন্যান্য ,,	৫১৪০০০০৲	৫৪৮০০০০৲	১৫৭০০০০০৲

তবেই দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক বিভাগেই পূর্ব্ববঙ্গ রেল কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য রেল অপেক্ষা কত অধিক খরচ করেন। এই নবাবী খরচ কি হ্রাস করা যায় না? অকারণ ব্যয়ের সঙ্কোচসাধন করিলে যে টাকাটা বাঁচিয়া যায়, তাহাতে ত মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। রেল বোর্ড যদি এ সকল দিকে দৃষ্টি না রাখেন,

শিক্ষা বিস্তারের উপর ট্যাক্স

কলিকাতা কাষ্টম হাউসের অত্যাচার ক্রমেই সীমা অতিক্রম করিতেছে! সরকারের বিরাট শাসনযন্ত্র পরিচালন জন্য বিপুল ব্যয়ভার যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, দফায় দফায় ট্যাক্স তেমনই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে সরকারের অর্থ-সচিব সরাসরি ট্যাক্স না বসাইয়া শিরোবেষ্টন করিয়া নাসিকা-প্রদর্শনের মত প্রকারান্তরে ট্যাক্স বসাইয়া থাকেন তাঁহার বাহাদুরীই সর্বাপেক্ষা অধিক। সার বেসিল ব্ল্যাকেট এই প্রকারান্তরে ট্যাক্স বসান বিদ্যায় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বাহাদুরীর সীমা নাই। তাঁহার দলের শ্বেতাঙ্গসমাজ সায় মোটর-ব্যবসায়ী কোটিপতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁহার কৌশল দেখিয়া সাবাস্ সাবাস্ করিতেছেন।

অধিক দিনের কথা নহে—২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার যে শাসনযন্ত্র পরিচালন এক জন লাটের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইত, তদপেক্ষা অধিক বেতনের এক জন লাট এখন কেবল বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়া উঠিতে পারেন না, ২ জন চৌষট্টি হাজারী মেম্বর ও ২।৩ জন মন্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার উপর লাটের সফর, নফর, খানার নেশা জমাইবার জন্য ব্যাণ্ড ও বডিগার্ড ত আছেই। সামরিক ও পুলিসের বিপুল বাহিনীর ব্যয় হইতে গোরা-সার্জ্জেনের বিবি-বিহার, সৌধ রচনা—কাউন্সিল রঙ্গমঞ্চের নাটাশালা নির্ম্মাণ হইতে পাহারা-ওয়ালার মশারি যোগাইবার ভার বহন করিবার জন্য ধাপে ধাপে ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা ব্যবসায়ীদের অর্জ্জন করিতে হইয়াছে।

যে সরকারের চেষ্টায় আজিও এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হইতে পারে নাই—যে সরকার এই ঘাস, বিচালী, বাঁশের উর্ব্বর রাজ্যে আজও কাগজের কল বসাইয়া শিক্ষাগ্রন্থের সুলভ প্রচারের সহায়তা করিতে পারেন নাই, সেই সরকার তাঁহাদের বিরাট শাসন-যন্ত্রের বিপুল ব্যয় বহনের জন্য কাগজের উপর উচ্চহারে আমদানীশুল্ক বসাইয়াছেন। কাগজের উপরে উচ্চহারে শুল্ক বসানর অর্থ শিক্ষার উপর ট্যাক্স বসান—প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি—যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন—যাঁহাদের ছেলেদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সদ্‌গ্রন্থ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিতে হয়, তাঁহাদের উপর ট্যাক্স বসান একই কথা নহে কি?

যুদ্ধের পূর্ব্বে কাগজের উপর ডিউটী ছিল শতকরা আড়াই টাকা মাত্র। যুদ্ধের সময় কাগজের মূল্য যেমন বাড়িয়াছিল, তাহার উপর ডিউটীও তেমনই প্রথমে ৫ টাকা ও পরে শতকরা ১০ টাকা হইয়াছিল। তাহাও যখন সহ্য হইল, তখন দেশী কাগজের কলকে রক্ষা করিবার অজুহতে সরকার শতকরা ১৫ টাকা ডিউটী নির্দ্ধারিত করিলেন। তাহার পর সেই হারও যখন সহ্য হইল, তখন স্বদেশী শিল্প রক্ষার একটা ধুয়া তুলিয়া—মাছের শোকে বকের চক্ষুতে পানি বহিল। কোন কোন কাগজের উপর—যাহাতে শতকরা ৬৫ ভাগের কম মেকানিক্যাল উড পাল্প আছে, তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডে এক আনা হিসাবে ডিউটী বসিল—অর্থাৎ প্রতি আধ সেরেরও কিছু কম ওজনের কাগজের উপর ডিউটী ৪ পয়সা—অর্থাৎ কাগজের দামের উপর প্রতি শত টাকায় ৪০ টাকা, কোন কোন কাগজের উপর মূল্যের হিসাবে শতকরা ৫০ টাকা ডিউটী বসিল! এত বেশী শুল্ক অন্য কোন সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। মদ—যাহা খাইবার জন্য সরকারকে ২ দফা ট্যাক্স ডিউটী ও লাইসেন্সরূপে দিতে হয়, তাহার উপরও শতকরা ৭॥০ হইতে ১৫ টাকা ডিউটী—আর কাগজ, যাহা শিক্ষিত সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার উপর শুল্ক শতকরা ৪০।৫০ টাকা।

অর্থসচিব ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; ভারতের লৌহশিল্প সংরক্ষণের জন্য যেমন বিদেশী ইস্পাত ও লৌহের উপর সরকার উচ্চহারে কাগজের উপরও উচ্চহারে ডিউটী বসাইয়াছেন। মজার কথা এই যে, ইস্পাত ও লৌহের ডিউটী হইতে বাৎসরিক বহু টাকা কোম্পানীকে দিতে হইলেও তাহার উপর প্রায়ই শতকরা ১০ টাকা হারে ডিউটী বসিয়াছে, আর ভারতের কাগজের শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সরকারের ১ পয়সা সাহায্য না থাকিলেও তাহার উপর সাধারণ কাগজের জন্য শতকরা ১৫ টাকা ও বিশেষ কাগজের জন্য শতকরা ৪০ বা ৫০ টাকা হারে শুল্ক বসিয়াছে। দেশী কাগজের কলওয়ালারা—যাঁহারা সরকারী নগদ টাকার সাহায্যের আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ডিউটীর জন্য বিদেশী কাগজের দাম বাড়িলে তাঁহাদের কাগজের কাটতি বৃদ্ধি হইবে, ফলে তাঁহারা প্রচুর লাভবান্ হইবেন, এই মধুর আশ্বাস লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

মহীশূর ব্যতীত ভারতে ৪টি কাগজের কল আছে বলিয়াই আমরা জানি। একটি লক্ষ্ণৌয়ে। তাহার অনেক অংশ দেশী লোকের। দেশী লোকের তত্ত্বাবধান, দেশী লোকের পরিশ্রম। তাহা অনেক দিন বন্ধই ছিল, সম্প্রতি সরকারের ডিউটীর চাপে চলিতে আরম্ভ করিলেও লাভ হয় না। সে কলের কাগজ কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের মত প্রথম শ্রেণীর সহরে সরবরাহ হয় না, এমন কি, যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাহা অবস্থিত, সে প্রদেশেও কলিকাতা হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে দেশী বিদেশী কাগজ চালান যায়।

আর একটি কল রাণীগঞ্জে, বামার লরী কোম্পানী তাহার ম্যানেজিং এজেন্ট। সে কলের মূলধন ও তত্ত্বাবধান বিদেশী কোম্পানীর—তাহার উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ অতি সামান্য। তাহার দ্বারা দেশের কাগজের প্রয়োজন পূর্ণ হইতেই পারে না।

তৃতীয় কাগজের কলটি—টিটাগড় ও কাকনাড়ায়—তাহার ম্যানেজিং এজেন্ট এফ, ডবল, হিলজার কোম্পানী। তাহার তত্ত্বাবধানে ও প্রায় সকল মূলধনই বিদেশী বণিকের। ভারতবাসী সে কলে শ্রমিকের কায করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। এই কলটিকে সাহায্যের অজুহতেই দেশের শিক্ষিত সমাজের, যাঁহারা সৎসাহিত্যের আদর করেন, তাঁহাদের প্রত্যেক পুস্তক ও লিখিবার কাগজ কিনিবার সময় সরকারকে উচ্চহারে শুল্ক দিতে হইতেছে। সরকার হইতে এই কলের উন্নতির জন্য বিদেশী কাগজের উপর স্থাপিত উচ্চহার ডিউটীর কোন অংশই প্রদত্ত হয় নাই, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। এই কলে উৎপন্ন কাগজে ভারতের শতকরা কত অংশ পূর্ণ হয়, তাহা আমরা ঠিক বলিতে না পারিলেও তাহা যে দশমাংশের এক অংশও নহে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ কলের কাগজ বিদেশী অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও এত উচ্চহারে ডিউটী ও জাহাজ ভাড়া, অসম্ভব জেটী ভাড়া, কমিশন ইত্যাদি বহন করিয়াও এখনও বিদেশী কাগজ যেরূপ মূল্যে পাওয়া যায়, এই কলের কাগজের মূল্য তাহার দ্বিগুণেরও অধিক। ইঁহারা দেশী ঘাস প্রভৃতি হইতে পাল্প কাগজ প্রস্তুত করেন না—স্বদেশী কাগজ বলিয়া কাগজের মণ্ড পরিষ্কারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাত হইতে আমদানী করেন—তাহার জন্য সরকার শুল্ক বাবদ এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। ইঁহাদের কাগজের মূল্য দ্বিগুণ হইলেও ইঁহাদের কলে লাভ হয় না। সামান্য যে কয় জন দেশী অংশীদার আছেন, তাঁহাদের লভ্যাংশ দিতে হয় না।

৪র্থ কলটি এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর। কাগজের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসিবার কিছু কাল পূর্ব্বে বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করার অজুহতে এই কল কিঞ্চিৎ সরকারী সাহায্যলাভ করিয়াছিল।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এ দেশে দেশী কাগজ-শিল্পের বা উন্নতিবিধানের কোন ব্যবস্থাই নাই। যে কয়টি নামমাত্র প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতে সরকারের সাহায্য নাই, অথচ কাগজ ও বহি কিনিবার সময় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি, ব্যবসায়ীর মারফতে [illegible]

ও ধনকুবের মোটর ব্যবসায়ীদের অর্থাগমের পথ পরিষ্কারের জন্য মোটর-গাড়ীর উপর আমদানী শুল্ক কমাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা বিদেশী কাগজের উপর এত উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই—কাষ্টম হাউসে প্রত্যেক কাগজের চালান রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ইনভয়েস নির্দ্ধারিত নিদর্শন বাতিল করিয়া কাগজগুলি অন্য পর্য্যায়ে ফেলিয়া উচ্চহারে শুল্ক আদায় করিতেছেন। সরকারের শুল্কের দায়ে অতঃপর সুলভ সংবাদপত্র তথা সুলভ গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া লোককে সুলভ-সৎসাহিত্যের আধারে সংশিক্ষা বিস্তার কর্ম্মক্ষেত্রে বাধ্য হইতে হইবে। আর এই উচ্চহারের ডিউটির টাকায় সরকারী বিরাট শাসনযন্ত্রের বিপুল ব্যয় চলিতে থাকিবে। আমরা আগামী সংখ্যায় ইহার অন্যান্য রহস্য বিবৃত করিব।

মুসলমান সাহিত্যিকের অভিভাষণ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের নেতা গাজী মুস্তাফা কামালপাশা তুর্কী রাজ্য হইতে বোরখা ও ফেজের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হইয়াছেন বটে।—তিনি বলিয়াছেন বটে যে, এই সমস্ত কুসংস্কার মুসলমানধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মান্ধদিগের দ্বারা বিবেচিত হয় বলিয়া তিনি এ সকলের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তথাপি আমাদের বাঙ্গালার এক শ্রেণীর মুসলমান তুর্কী ফেজের প্রেমে এখন যেন একবারে মশগুল হইয়াছেন, মনে করিতেছেন, যেন এই ফেজ পরিধান করিলেই তাঁহারা প্রকৃত মুসলমান বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারিবেন, অন্যথা তাঁহাদের বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত কোনও প্রভেদ থাকিবে না। অথচ তাঁহারা এটা ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালী হিন্দুই ছিলেন। এমন এখনও দেখা যায় যে, যে সকল গ্রামে এ যাবৎ বাঙ্গালী মুসলমানরা পোষাক-পরিচ্ছদে আচারে ব্যবহারে প্রায় বাঙ্গালী হিন্দুরই অনুরূপ ছিল, সেই সকল গ্রামের ছোকরা মুসলমানরা দুই চারি দিন সহরে বা মফস্বলে যাইয়া মিঃ মুজিবররহমন শ্রেণীর মৌলভীর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া লুঙ্গি ও ফেজের প্রেমে মজিয়া গ্রামে ফিরিয়াছে এবং হিন্দু প্রতিবেশীকে পর মনে করিতে শিখিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সঙ্গে দুই চারিটা ফার্সী উর্দ্দু বয়েৎ অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে বিমাতা বলিয়া দূরে পরিহার করিয়াছে। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী মুসলমানকে আমরা খাঁ বাহাদুর মৌলভী তসদ্দুক আহম্মদ সাহেবের "মুসলিম সাহিত্য-সমাজের" বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত সুচিন্তিত অভিভাষণখানি উপহার দিতেছি।

মৌলভী সাহেব অভিভাষণের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "মাতৃভাষার এমনই মহিমা যে, কথা কয়টাই যেন আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ, তাহা না হইলে আমার নিজের মা কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার এখনও হয় নাই। তবু নাকি শুনি, এই বাঙ্গালা দেশে এমনও অনেক মুসলমান আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন, 'শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদলাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচ জন বিচার করুন, শিক্ষকতা করি বলিয়াই নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব,—'অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদলাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমানজনক হইবে'?"

যাঁহারা উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান বাঙ্গালীর পাঠ্য ভাষায় পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহারা ইহাতে কি বলেন? পাছে বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্রব রক্ষা করিতে হয়, এই হেতু মাতৃভাষাকেও বর্জ্জন করিতে হইবে, এ ধারণা যাঁহাদের মনে বদ্ধমূল, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার জন্য আজ বাঙ্গালায় যে অশান্তির অনল জ্বলিয়াছে, আশা করা যায়, মৌলভী তসদ্দুকের মত যথার্থ সমাজহিতৈষী কৃতবিদ্য মুসলমানের চেষ্টায় তাহা নির্ব্বাপিত হইবে। মৌলভী সাহেব সখেদে বলিয়াছেন, "যখন বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন আমরা কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।" আমরা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান মৌলভীর মুখে এমন কথারই আশা করি। বস্তুতঃ আজ যাঁহারা সমরখন্দ বোখারার স্বপ্নে বিভোর, তাঁহারা কি ভুলিয়াও একবার জন্মভূমির দুঃখের কথা স্মরণ করেন? যাহার জননীর হস্তপদে শৃঙ্খল, সে অপরের জননীর সুখৈশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করে কিরূপে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

"বাঙ্গালা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র সাহিত্য"—কবে আমরা মৌলভী সাহেবের মত সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মুখে এ কথা শুনিব? ভাষায় জাতিধর্ম্মভেদ নাই, ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার। আমাদের বাঙ্গালা মা যেমন আমাদের সকলের—ভাষা-জননীও তেমনই আমাদের সকলের। ভাষার মধ্য দিয়া যেমন পরস্পর ভাবের আদানপ্রদানের এবং সৌহার্দ্দ ও প্রীতি স্থাপনের সুযোগ ও সুবিধা, এমন আর কিছুর মধ্য দিয়া নহে। তাই মৌলভী সাহেব বলিয়াছেন, "যে দেশে আমরা বাস করি, যে দেশের আবহাওয়ায় আমরা প্রতিপালিত, সে দেশের অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত থাকিয়াও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম (সমর্থ?)। ... .চেনা-পরিচয় হইলেই তবে আত্মীয়তা হয়। সাত শত বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে, আমরা একত্র বাস করিতেছি, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে কতটুকুই বা চিনিয়াছেন?" তবে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা ভাষার উপর খড়্গহস্ত কেন? তাহারা কি উভয় সম্প্রদায়ে সদ্ভাব প্রার্থনা করেন না? তবে?

এক শ্রেণীর মুসলমান যে কেন চিনেন না, তাহা মৌলভী সাহেবের রচনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "মুসলিম বলিয়া শুধু গগনভেদী চীৎকার করিলে বা মসজেদের সম্মুখে বলপূর্ব্বক বাজনা বন্ধ করিলেই জীবনটাকে 'সেরাতুল মোস্তাকিম' (সরল পথে) চালিত করা সম্ভবপর হইবে না। আমাদের সমাজে এক দল লোক আছেন, যাঁহারা বাহ্যিক (বাহ্য?) আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনে পাকা মুসলিম, কিন্তু ইসলামকে তাঁহারা বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন; ইসলামের সার্ব্বভৌমিক উদারতা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না। সামান্য কারণেই তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।" সুতরাং এই শ্রেণীর মুসলমানের অস্তিত্ব থাকিতে পরস্পর 'চেনা-পরিচয়' হইবে কিরূপে?

আসল কথা, উভয় সম্প্রদায়কেই সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিতে হইবে, ধর্ম্ম জিনিষটাকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। ধর্ম্মান্ধতা ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, উহার প্রকৃত অনুভব হইলে অন্ধতা আসিতে পারে না।

হামিদের হিম্মৎ

১১

যখন নশীবনের পীড়ার বড় বাড়াবাড়ি, তখন কলিকাতায় এমন একটা লড়ালড়ি হুড়োহুড়ি প'ড়ে গিয়েছিল যে, সে সময় যদি জাহাঙ্গীর বাদশা জীবিত থাকতেন, আর তাঁর তক্ত-তাউসের মূর্ত্তিমতী অভিব্যক্তি মহাশক্তি নূরজাহানের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'ত, তা হ'লে-ও এখানকার লোকের কানে সে খবর পৌছত কি না সন্দেহ, তা নশীবন ত নশী-বন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ইলেক্‌সনের তিন-সনা গাজন আরম্ভ হয়ে গেছে; জীবমাত্রে-ই শিব জ্ঞান ক'রে ক্যানভারসাররা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিজ নিজ মূল সন্ন্যাসীর জন্য ফল পাড়াবার তরে প্রত্যেক ভোটারের দরজায় মাথা চাল্‌তে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু সকল যায়গার চেয়ে গাজনের ধূম বেশী ক'রে জমেছে—ব্রজসুন্দরদের ওয়ার্ডে।

রেলগাড়ীতে ক'টা ইতরপ্রকৃতির ফিরিঙ্গীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকে ব্রজসুন্দরের মনে যাদুকরের আমবৃক্ষের ন্যায় স্বদেশপ্রেম সদ্য সদ্য উদ্গত, পল্লবিত ও মুকু-লিত হ'লে-ও তিনি আজ পর্য্যন্ত রাজনীতিক কোন দলে-ই যোগ দেন নি। আসল কথা, দল না বাঁধলে যে পলিটিক্যাল কল ভাল রকম চলে না, এটা তাঁর একেবারে খেয়াল-ই ছিল না।

রায় কুমারের পার্শ্বচররা এইবার তাঁকে ধ'রে বল্‌লে, "আপনি এবার মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার হয়ে পড়ুন; যখন রেলের সেই ক'টা চুয়াড়ের নামে রিপোর্ট করে-ও কি গবর্ণমেন্টের কাছে, কি রেল-কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে তার কোন-রূপ প্রতীকার হ'ল না, তখন দেশের কাযে মন দিয়ে-ই আমাদের যতটা পারি, ঝাঁজ মেটান চাই।" ব্রজসুন্দর বললেন, "একবার বড় রায় কুমারকে জিজ্ঞাসা করি।"

গৌরসুন্দর বাবু রায় বাহাদুর হবার পর থেকে এঁদের পরিবারের মধ্যে ঠাকুর-দা, বাবা, কাকা, ভাই এ সব গেরস্থের স্নেহ সম্বোধনগুলো উঠে গিয়েছিল; গৌরসুন্দর ছিলেন রায় বাহাদুর, ঠাকুরমাটি রায় রাণী, নরহরি বড় রায় পিতার কাছে প্রস্তাব উত্থাপিত করায় কতকটা এই রকম কথাবার্ত্তা চলল:—

নরহরি। তা তুমি ত মেজেষ্টর হয়েছ, মিউনিসিপ্যাল হ'লে কি এর চেয়ে মানটা বাড়বে? বরং সাহেবদের সঙ্গে একটু মেশা-ঘোষা করলে—

ব্রজ। না বড় রায়, আমায় আর ও কথা বলবেন না। আমি এই ম্যাজিষ্ট্রেটিটা-ও ছেড়ে দেব মনে করছি। পাঁচ জনের পরামর্শে পা-টেপার কথাটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে ফেলেছি, তার পরে আর বেঞ্চে গিয়ে বসাটা-ও আমার লজ্জা ব'লে মনে হয়; উকীলরা আসামীরা সবা-ই ত মনে মনে বলে যে, ইনি ত সেই পিদরু-গোমিশের পা-টেপা হাকিম।

নর। কিল খেয়ে কিল চুরি করা-ই ত বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম, খবরের কাগজগুলো তোমাদের একটা বাই দাঁড়িয়েছে। আমি নিজের জন্য কিছু বলি না, ন'-হাতি পরেই আমি সন্তুষ্ট। তবে রায় বাহাদুরের শেষ সাধটা যদি তোমার বরাতে ফলে; আমি রাজার বাপ হলেই কৃতার্থ।

ব্রজ। ও সব খেতাবের মান বাজারে আর তত নেই; কে বলতে পারে যে, আমি তেমন চুটিয়ে কায করতে পারলে এক দিন একটা স্বদেশী টাইটেল পাব না। আর মিউনিসি-প্যালিটীতে ঢুকতে পারলে অন্ততঃ আমাদের গলির পাশের গলিটার নাম বদলে রায় বাহাদুর রো ক'রে নেওয়ার খুব সম্ভাবনা।

নর। সে একটা কথা বটে—কল্পা বটে; তবে আবার কতকগুলো খরচপত্র; একে ত ধানবাদের কয়লার খনি-টা ঘাড়ে প'ড়ে এক মুস্কিল হয়েছে।

ব্রজ। তা যদি কাউন্সিলার ইলেক্ট হ'তে পারি, তা হ'লে দু' একটা বড় রকম কনট্রাক্ট পাবার সুবিধা হ'তে পারে।

বড় রায় কুমার এক রকম নিমরাজী-ই হলেন, ছোট রায় কুমারের আপনার লোকরা ভোটের মৃগয়ায় বার হলেন। নিজেরা মস্ত মহাজন, আত্মীয়কুটুম্ব, মহকুমাবাসী অনেক মহাজন প্রতিবেশী, দোকানী পশারী খাতক অনেকের-ই ভোট আছে, লোকজনের অভাব নেই, ব্রজসুন্দর যে ইলেক্ট

কিন্তু রায় কুমার পাতা করবার হুকুম দেবার সময় কর্ত্তা-দের বাদ দিয়ে-ই লোক গুণেছিলেন।

আজকাল কি লেজিসলেটিভ, কি মিউনিসিপ্যাল কোন রকম ইলেক্সন এসে পড়লে-ই একটা প্রক্লোমেশন বেরোয় যে, ভোটাররা যদি যথার্থ দেশের মঙ্গল চান, তা হ'লে তাঁদের ভুলে যাওয়া কর্ত্তব্য যে, ভাল উপযুক্ত ধাঁযের লোক নির্ব্বাচনের জন্য তাঁদের কোনরূপ বুদ্ধিবিবেচনা আছে, আর-ও ভুলে যেতে হবে যে, কে কবে কোন্ আপদে বিপদে এসে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়েছে, কার সঙ্গে কোন্রূপ আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, অন্তরূপ সামাজিক বা বৈষয়িক হিসাবে চক্ষুলজ্জার খাতির আছে, কর্ত্তারা যে লোককে ঠিক ক'রে দেবেন, তাকে ভোট না দিলে দেশদ্রোহিতা পাপে প্রত্যেক ভোটারকে নিমগ্ন হ'তে হবে।

১২

সাবাজপুরের মাণিকধন বিশাই বছর আষ্টেক হ'ল কলকাতার ভাগ্য ফিরাতে এসে বিজ্ঞাপন-কলার সাহায্যে বন্ধ্যাবন্ধু ব ঔষধ বিক্রয়লব্ধ অর্থে ঢাকুরেতে খানিক-টা জমী ও কাশ্মীরী বারান্দা বার করা এক দোতলা কোঠা খাড়া ক'রে সেথায় এক রকম সুখস্বচ্ছন্দে বাস কর্‌ছিলেন।

এ দিকে ইণ্ডিয়া স্বাধীন করবার জন্য আজ বছর কয়েক কলিকাতায় "আশুবাড়হো ঝড়াঝ্ঝড় কোং লিমিটেড" ব'লে যে একটি যৌথ কারবার খুলেছে, তার এক জন ডিরেক্টর বিশাই মহাশয়ের প্রতি একটু সদয় ছিলেন। টাকার সঙ্গে সঙ্গে একটু নাম-ডাকের আকাঙ্ক্ষা-টা অনেক মানুষের মনে জেগে উঠে; বিশাইয়ের মনের ভিতর এ ভাব-টা যে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারে, ডাইরেক্টর শ্রীযুত তাঁর কথাবার্ত্তার ধরণে বুঝতে পেরেছিল। শ্রীযুত ডাইরেক্টর মহাশয়ের সঙ্গে মাণিকধন বিশাইয়ের এক দিন যে কথোপকথন হয়, "সহর তোলপাড়" কাগজের সর্ব্বজনবিদিত রিপোর্টার গুজবগোবিন্দ গরাই তার খানিকটা সর্টহাণ্ড নোটে এইরূপ তুলে এনেছিলেন :—

ডাইরেক্টর। ওহে বিশাই! কলকেতায় বাড়ী-ও তুললে, কারবারও চালাচ্ছ, কিন্তু সহরের এক জন লোক না করাতে পারলে কাযকর্ম্ম চালাও করতে পারবে কেন?

বিশাই। আজ্ঞে, ৫।৬ খানা খবরের কাগজে রোজ-ই ত বিজ্ঞাপন বেরোয়, নাম-টা এখন এক রকম অনেকে-ই জেনে ফেলেছে।

ডাই। সে দোকানদার ব'লে, কমান দোকানদার।

বিশাই। আজ্ঞে না, বিজ্ঞাপনে আমার লেখা থাকে ডক্টর বিশাই।

ডাই। আরে, ও রকম ডাক্তার ঢের আছে; চেষ্টা-বেষ্টা ক'রে একটু পাবলিক লাইফে ঢুকে পড়; আজকাল আর শুধু উকীল কি ডাক্তার-ফাক্তারকে লোক খাতির করে না; দান-খয়রাত ক'রে—এমন কি, অতিথশালা খুললে-ও যদি সে পাবলিক ম্যান না হয়, তবে তারে কেউ-ই পৌছে না।

বিশাই। তবে আপনি-ই পরামর্শ দিন, কি করা কর্ত্তব্য।

ডাই। এই ত মিউনিসিপ্যাল ইলেকসন উপস্থিত, দেখ না বেয়ে-চেয়ে, যদি একটা কাউন্সিলার হয়ে ঢুকতে পার।

বিশাই। আজ্ঞে, আমি! আমায় ভোট দেবে কেটা? এই ঢাকুরের ভিতরে-ই আমাকে অনেকে বাসাড়ে মনে করে।

ডাই। ঢাকুরে কেন, যদি আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে কোন রকমে সংসৃষ্ট হ'তে পার, তা হ'লে তোমাকে একটা ভাল ওয়ার্ডের জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়।

বিশাই। তাই না কি?

ডাই। নিশ্চয়; একেবারে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, তোমার নাম সহরময় ছড়িয়ে পড়েছে; প্লাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল, লিডার, প্যারা, এমন কি, মাণিকধন বিশাইয়ের ছবি পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে যাবে।

বিশাই। কিন্তু মুন্সীপোলে গিয়ে করব কি? ইংরাজী ত অতি যৎসামান্য—

ডাই। হাত তুলবে—হাত তুলবে; আমাদের দল যখন যে কথা টা বলবে, খালি ইসারা টা বুঝে নিয়ে হাত তুলবে।

বিশাই। তা হাত আমি খুব তুলতে পারব। মা বিশালক্ষীর দয়ায় আমার হাতের জোর মন্দ নয়; বলতে

মা'র কৃপায় যেমন ক'রে হোক আপাত ভিটেটুকু-ও হয়েছে, নগদে-ও যাহোক যৎকিঞ্চিৎ —

ডাই। তবে লেগে যাও; খান দু'চ্চার ফরম আমার কাছে আছে, সই ক'রে ফেল; একটা মস্ত বড় মানুষের সঙ্গে লড়তে হবে।

বিশাই। আজ্ঞে, বড় মানুষের সঙ্গে লড়াই, তাতে ত বিস্তর খরচ! সে আমি কোত্থেকে—

ডাই। সে সব খরচপত্র আমরা করব হে, আমরা করব, তোমার কোন ভাবনা নেই।

বিশাই। আজ্ঞে, এতই অনুগ্রহ আপনি আমার উপর করেন বটে—

ডাই। তুমি কেবল আমাদের আশুবাড়ু কোম্পানীর কিছু শেয়ার কিনে ফেল।

বিশাই। শেয়ার! টাকা দিয়ে? আমি সামান্য ব্যক্তি।

ডাই। বাস্—বাস্! সামান্য ব্যক্তি ত সামান্য ব্যক্তি-ই থাক। মাসে দু'শ একশ' টাকার ঐ ছাইভস্ম বেচ আর বিজ্ঞাপনের বিল পেমেণ্ট কর।

বিশাই। তা যদি করব হুজুর, তবে আপনাকে ধ'রে প'ড়ে আছি কেন?

ডাই। এই মিউনিসিপ্যালিটীতে যদি ঢুকতে পার, আর কাউন্সিলারদের বঝিয়ে দেওয়া যায় যে, তোমার স্ন্যাবন্ধ্য বটিকার প্রচলন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করদাতাদের-ও বংশ-বৃদ্ধি হবে ও তার ফলে মিউনিসিপ্যালিটীর ৫৫।০ পারশেণ্ট আয় বেড়ে যাবে, তখন হয় ত মিউনিসিপ্যালিটী থেকে-ই ঐ বটিকা কিনে বিতরণের বন্দোবস্ত হ'তে পারে। এই দেখ, এখন স্ত্রীলোকদের-ও ভোটে অধিকার হয়েছে, "বন্ধ্যাবন্ধ" নর-নারী যে কর-দাতা-ই ভূমিষ্ঠ করাক, তাতে-ই মিউনিসিপ্যালিটীর ইষ্ট।

বিশাই। আজ্ঞে, কত টাকার শেয়ার?

ডাই। বেশী নয়, হাজার সাড়ে পাচেক।

বিশাই। ও বাবা! তা হ'লে যে, বাস্তখানি—

ডাই। মর্টগেজ দাও—মর্টগেজ দাও, আমি নাইন পারশেণ্টে করিয়ে দেবো।

"জয় মা বিশেলক্ষী" ব'লে নিজ গৃহদেবতাকে প্রণাম কাউন্সিলার-ক্যাণ্ডিডেটের আবেদনপত্রে পিতৃপ্রদত্ত কায়েমী স্বত্ব নিজনামটি স্বাক্ষর ক'রে দিলেন।

* * * * *

লোকে বলে, বাঙ্গালীর মন থেকে আমোদ, উৎসাহ, উৎসবের ভাব ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে আসছে। দুর্গোৎসবে নব বস্ত্র পরিধানে, দেওয়ালীর দীপদানে, পৌষের পীঠা-পার্ব্বণে, বঙ্গমাতার গানে, হোলীর ফাগ-খেলায়, চৈত্রের গাজন মেলায় কিছুতে-ই যেন একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কাহার-ও যুক্তি—লোকের ধর্ম্মে অভক্তি; কেহ বলেন, দারিদ্র্যই এই জাগ্রত নিদ্রার মূল কারণ। এমন লোক-ও আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রেমের নিশ্বাসে-ই শিক্ষিত বঙ্গযুবকের সমস্ত জীবনী-শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তারা আর অন্য উৎসব আনন্দ করবে কি? কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা ক'রে দেখলে সকলে-ই বুঝতে পারবেন যে, বুটেন-পীঠাধিষ্ঠাত্রী বরদা বরদা দেবী ভোটেশ্বরীর মহাপূজার প্রবর্ত্তনার পর থেকে-ই অন্যান্য জাতীয় উৎসবের আনন্দধ্বনি নীরব হয়ে গিয়েছে। যদি-ও এই দেবীর পূজা তিন বৎসর অন্তর এক দিন মাত্র করা হয়, কিন্তু ঐ এক দিনের ধাক্কা সামলাতে কেটে যায় ছত্রিশটি মাস।

প্রায় তিন সপ্তাহ ধ'রে বোধনের আবেদন, নিবেদন, স্তুতিপাঠ, নিন্দাবাদের পর আজ মহাপূজা, অর্থাৎ রাজনীতি তন্ত্রে যাকে পোলিং বলে।

জগন্নাথের রথের ভীড় আজ কলিকাতার পথের কাছে পরাজয় মেনেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার:—"উকীল-কুল-কোকিল নিখিল বাবুকে ভোট দিয়া জাতিকুল রক্ষা করুন।" "ব্রজ বাবুকে ভোট না দিলে মাদ্রাজে বজ্রাঘাত হইবে।" "যদি আপনাদের মুখ পোড়াইতে চান, তবে দেশের শত্রু দোয়ারী মিত্তিরকে ভোট দিয়া অধঃপাতে যান," —এইরূপ আর-ও ভাষার সৌন্দর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, হিতৈষীর মাৎসর্য্যে ঐশ্বর্য্যমান বিজ্ঞাপনের বাহার। কিন্তু সব প্লাকার্ড, সব পোষ্টার, সব বিল বিজ্ঞাপনকে রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় ম্লান ক'রে জলজল করছে আমাদের মাণিকধন বিশাইয়ের রং-বেরংয়ের প্রাচীরপট;— "বোরোত্রেক্রশী-বধ-কশাই—খুড়দার মা-গোঁসাই ঠাকুরের মনীষি-মুকুর" মিঃ বিশাই এবার দাঁড়িয়েছেন; মনে

বটিকার আবিষ্কারকর্ত্তা বিশাই মশাইকে ভোটদানে পুরস্কৃত করুন"; "হিন্দু ভুলিবেন না শ্রীচৈতন্য দেবের উপদেশ! অমানিনা মানদেন, স্মরণ রেখে আপনাদের বৈষ্ণবত্ব সপ্রমাণ করুন।" এর ওপরে বুকে গোলাপী ফুল, হাতে পাঁচরঙা নিশেন, সব ক্যানভাসার দলে দলে মোটর, বাস্, বা গাড়ী চ'ড়ে ভোটার ধরতে বার হয়েছে। গ্রেফতারী ভোটারকে পাকড়া ক'রে বলিদানস্থলে এনে ফেলছে; পূজা-প্রাঙ্গণে মহা কলরব। ভারত উদ্ধারের উদ্বোধন মন্ত্র কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত :—স্বপক্ষ-কণ্ঠে, "ব্রজসুন্দর বাবুরা দেশে দশটা টিউব ওয়েল বসিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে ভোট দিন"; প্রতিপক্ষ-কণ্ঠে, "স্বার্থপরতা—স্বার্থপরতা; সবগুলি নিজের গ্রামে আর মহকুমায় বসিয়েছে, একটা-ও পাঞ্জাবে পাঠায় নি"; "রায় বাহাদুরের নাতি, গোলাম—গোলাম"; "মনে রাখবেন মশাই—বিশাই মশাই; "মনে রাখবেন ভারতবর্ষ"; "মনে রাখবেন কংগ্রেস—মনে রাখবেন রামমোহন রায়"; "আর মনে রাখবেন রাণা প্রতাপ—ভুলবেন না, শিবাজীর সঙ্গে সাবাজপুরের একটা জাতীয় একতা আছে"; "মনে রাখবেন তানসেন, বেজবাউরা—তাঁরা ও ভারতসন্তান"; "রবি বাবুর ছবি মন থেকে মুছে ফেলবেন না; প্রাচীন বাঙ্গালায় বিশ্বকর্ম্মাকে-ই বিশাই বলিত"; "আব ভুলবেন না সেথ গুর্জ্জরগামিনী কজ্জলকামিনী স্লোকে আর তাঁর দর্পণ বিসর্জ্জনে মহামহিমা।"

বাপ! মন্ত্রশক্তির এই ভয়ানক অভিব্যক্তিতে বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, হেডমাষ্টার বুদ্ধি-শুদ্ধি হারিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েন, তা' সামান্য দোকানী পশারী গাড়োয়ানস্য কা কথা।

এর উপর বড় বড় রংকরা সব ছবি,—একখানিতে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নীচে টিকেন্দ্রজিৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলছে, আর একখানিতে নিমতলার ঘাটে রাজা বসন্ত রায়ের চিতাসজ্জা।

* * * * *

ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে যে, আজন্ম স্বদেশপ্রেমিক করদাতাবর্দ্ধন-বিশারদ বন্ধ্যা-বন্ধু বটিকা-বীর মাণিকধন বিশাই পোলদণ্ডের শীর্ষদেশে বিরাজিত, ব্রজসুন্দর পরাজিত।

গলিতে, মোড়ে মোড়ে ভোঁ ভোঁ রবে মোটর-গাড়ীর ছুটাছুটি। হিপ হিপ হুররে—হিপ হিপ হুররে রবে ব্যোমরাজ্য ভয়ঙ্কররূপে ভাইব্রেটিত! সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছে, "ব্রজসুন্দর সোঁদর বনে পালিয়েছে"; "রায় বান্দর অন্দরে ঢুকে খিল দিয়েছে।"

শেষ স্তুতিপাঠটি যার কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হয়েছিল, সে বালকটিকে ব্রজসুন্দরের পিতা নরহরিসুন্দর পিতৃমাতৃহীন অসহায় জেনে নিজেদের গদীতে রেখে খরচা ক'রে পড়িয়ে, এন্ট্রান্স পর্য্যন্ত পাশ করিয়েছিলেন; এখন সে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, আর যোগাড় ক'রে ঝামাপুকুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থেকে তাদের দুটি ছোট ছেলেকে পড়া ব'লে দেবার বিনিময়ে একটি কুঠরীতে স্থান আর দু'-বেলা দু'-মুঠো অন্নের সংস্থান ক'রে নিয়েছে।

বালকের বিবেক বলেছে যে, দেশমাতার জন্য পিতামাতাও পরিত্যজ্য—তা' অন্নদাতা ত অন্নদাতা।

* * * * *

সেক্রেটারী বন্দনারূপ লম্বালটার ফলে ব্রজসুন্দরের ভাগ্যে দাঁড়াল, ফিরিঙ্গীর অঙ্গসেবা, আবার স্বরাজ-সাধনা করতে গিয়ে যুবক বেদনা পেলে ইলেক্সনে তুয়ো খেয়ে। স্বহস্তে দাঁড়ী ধ'রে লবণ বেচে যে বুদ্ধিজীবী জমীদার হয়েছিলেন, তাঁর বংশধরের মস্তিষ্ক এম, এ পাশ ক'রে কেবল কথার রাশির গুদামে পরিণত হয় নি; তাঁর বসবার ঘরে একখানি ইণ্ডিয়ার ম্যাপ টাঙ্গান ছিল, সেখানি তিনি পল্লীস্থ এক বঙ্গবিদ্যালয়ে উপহার দিয়ে সারভেয়ার জেনারেলের অফিস থেকে একখানি ফরিদপুর জিলার ম্যাপ কিনে নিজ গ্রামে গিয়ে বাস করলেন; সেখানে তিনি পথে বার হ'লে আগে আগে তরোয়াল হাতে ক'রে এক জন আদ্দালা যায়, যত অগ্রসর হন, গ্রামস্থ ইতর-ভদ্র ২০।২৫।৩০ জন লোক ক্রমে তাঁর সঙ্গী হয়, কেউ চাটুয্যেদের সেকেলে পুরাতন পানা-ঢাকা বড় পুকুরটি দেখিয়ে দিয়ে তা পরিষ্কার ক'রে দেবার জন্য অনুরোধ করে; কেউ বলে, ছিদেম মর-মর, আপনি যেতে যেতে একবার উঁকি মেরে গেলে সে বড় আহ্লাদ করবে; কেউ বলে, তুলসী ম'রে গিয়ে অবধি গ্রামে আর ভাল দাই নেই, আপনি যদি ঢাকা থেকে ভাল দাই এনে তার থাকবার একটু বন্দোবস্ত ক'রে দেন, তা' হ'লে সকলের উপকার হয়। পূজার সময় ব্রজসুন্দর আত্মীয়-স্বজন অক্ষম গ্রামবাসীদের বস্ত্র বিলিয়ে, দোলের সময় পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির শোভাযাত্রা সম্পাদন ক'রে আর বালক-বালিকাদের ফাগ বিলিয়ে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে আম-কাঁঠালের সদাব্রত ক'রে হৃদয়ে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তার একাংশ-ও মিঃ মুখার্জ্জি কি মিঃ কলমদ্দী মিনিষ্টারী ক'রে এক লহমার জন্য-ও ভোগ ক'রতে পায় না।

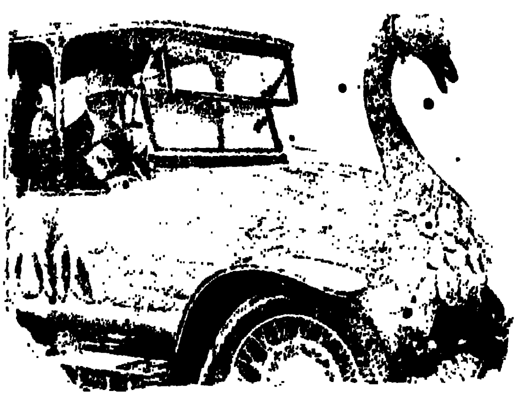
[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।



রাজহংস মোটর

ভারতীয় মোটর অধিকারীরা তাঁহাদিগের গাড়ীতে মৌলিকতা দেখাইবার পক্ষপাতী। জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী রাজহংসের আকারবিশিষ্ট একখানি মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সাধারণতঃ এই কলের রাজহংস মুখব্যাদান করিয়া হংসের ন্যায় 'প্যাক প্যাক' শব্দ করিয়া পথচারীদিগকে সতর্ক করিয়া



রাজহংসাকৃতি মোটর-গাড়ী

থাকে। অবশ্য প্রয়োজন হইলে শৃঙ্গধ্বনি করিবার ব্যবস্থাও এই মোটর-গাড়ীতে বিদ্যমান আছে। সম্মুখভাগে উজ্জ্বল আলোকাধারের পরিবর্ত্তে কলের রাজহংসের শিরোদেশে একটি বর্ত্তিকার আলোকাধার আছে। গলদেশে ছোট ছোট আলোক-বর্ত্তিকার মালাও বিলম্বিত। রাত্রিকালে কণ্ঠবিলম্বিত রত্নহারের ন্যায় সেই আলোগুলি জ্বলিতে থাকে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রপুলিস

বোষ্টনের কোনও উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া এক দল শান্তিরক্ষক ছাত্র-পুলিস গঠিত হইয়াছে। যখন ছাত্রগণ এক কক্ষের পাঠ শেষ করিয়া বারান্দা দিয়া অপর কক্ষে পাঠের জন্য গমন করে, সেই সময় যাহাতে কোনও গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা না ঘটে,



ছাত্র-পুলিস

এই জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র-পুলিসদল তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এই দলের কর্ত্তা হইলেও ছাত্রদিগের মধ্যেও বিভিন্ন পদস্থ কর্ম্মচারী আছে। পুলিসের ন্যায় সকলেরই কোমরবন্ধ এবং পদমর্য্যাদাসূচক 'ব্যাজ'ও আছে।

পুত্তলিকার প্রাসাদ

পুতুল-খেলার জন্য নিউইয়র্ক সহরে একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত



পুত্তলিকার প্রাসাদ

বর্গ-ফুট স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। প্রাসাদের উচ্চতা ২৭ ইঞ্চি। প্রাসাদমধ্যে বিবিধ প্রকার আসবাবপত্রও আছে। বিচিত্র দেশের বিচিত্র সভ্যতা এবং সখের ইহাও একটা নমুনা।

বিচিত্র উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্র

এঞ্জিনীয়ারগণ কোনও অট্টালিকা নির্ম্মাণকালে উহার উপযুক্ত তাপ ও বায়ু-চলাচল-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা সম্প্রতি এক প্রকার তাপপরিমাপক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই নবোদ্ভাবিত



উত্তাপ-পরিমাপক যন্ত্র

যন্ত্রের শক্তিপ্রবণতা এমনই বিচিত্র যে, নারীর গণ্ডদেশ কতটুকু উত্তাপে রক্তাভা ধারণ করে, তাহাও যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল কারণবশতঃ উত্তাপ সঞ্চারিত হয়, এই যন্ত্রের দ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণকালে

অক্ষিপল্লবপ্রসাধন যন্ত্র

উত্তাপ অথবা কস্‌মেটিকের সাহায্য ব্যতীত অক্ষিপল্লবের রোমরাজিকে কুঞ্চিত করিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই



অক্ষিপল্লবপ্রসাধন যন্ত্র

যন্ত্র এমনই উপাদানে নির্ম্মিত যে, মৃদুভাবে চাপ দিলে পল্লবস্থ রোমরাজি কুঞ্চিত হইবে। দুই চারি দিনে কুঞ্চিত অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না। বিলাসিনীরা এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে অক্ষিপল্লবে কুঞ্চিত কেশরাজির সমাবেশ করিয়া সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

গতিভঙ্গী শিক্ষা

মার্কিণ পোষাক-বিক্রেতার প্রসিদ্ধ দোকানে যে সকল কিশোরী টুপী ও পরিচ্ছদাদি ক্রেতৃগণের সম্মুখে উপস্থিত করে, তাহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে গতিভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা করিতে



গতিভঙ্গী শিক্ষা

হইয়া থাকে। পরীক্ষাকারিণীদিগের সম্মুখে তাহাদিগকে প্রথমতঃ শিরোদেশে পুস্তক রক্ষা করিয়া চলাফেরা করিতে হয়। লালায়িত গতিতে ইতস্ততঃ পরিক্রমণকালে মস্তকস্থিত

হস্তপদাদির বিকৃত ভঙ্গী, মুখ-চক্ষুর আড়ষ্টভাব যাহাতে প্রকাশ না পায়, এ বিষয়েও পরীক্ষার্থিনীদিগকে সতর্ক থাকিতে হয়।

মডেল ধর্ম্মমন্দির

জনৈক মার্কিণ শিল্পী অবকাশকালে পরিশ্রম করিয়া দারু-নির্ম্মিত একটি ধর্ম্মমন্দির গড়িয়া তুলিয়াছে। উক্ত ধর্ম্ম-মন্দিরটি ৭ ফুট উচ্চ। ১ হাজার ৮০ টুকরা কাঠ শিল্পী



মডেল ধর্ম্মমন্দির

এই বিচিত্র মন্দির গঠনে ব্যবহার করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ক্ষুদ্র একখানি করাত ও পকেট-ছুরী ব্যতীত শিল্পী অন্য কোনও বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে নাই। ২৭ প্রকার বিচিত্র বর্ণসমবায়ে মন্দিরের অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদিত হইয়াছে। ৯ মাস পরিশ্রম করিয়া শিল্পী উহাতে ক্ষুদ্র ঘটিকা-যন্ত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। ৮ প্রকার বিভিন্ন শব্দ করিয়া ঘড়ীগুলি বাজিতে থাকে। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ৪ জন খৃষ্ট-শিষ্যের মূর্ত্তি ধীরে ধীরে দেখা দিয়া থাকে। মন্দিরটিতে বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থাও আছে।

আলোকবাহী পিস্তল

পিস্তল বা রিভলবারে আলোকাধার এমন সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট করা হইতেছে যে, একটা কল টিপিবামাত্র উজ্জ্বল



আলোকবাহী আগ্নেয়াস্ত্র

আলোকধারা তন্মধ্য হইতে নির্গত হয়। পুলিস প্রহরীর জন্যই এই নবোদ্ভাবিত আগ্নেয়াস্ত্র কর্ত্তৃপক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অন্ধকারে দস্যু-তস্কর বা আততায়ীদিগকে কাবু করিবার পক্ষে এই আগ্নেয়াস্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়।

মনুষ্য-কণ্ঠ অনুকারী শৃঙ্গযন্ত্র

সম্প্রতি এক প্রকার শৃঙ্গ-সমন্বিত বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; উহার স্বরলহরী ঠিক মনুষ্যকণ্ঠের অনুরূপ। নরনারীর কণ্ঠ-সঙ্গীতে ইহার ধ্বনি এমন মিলিয়া যায় যে, শ্রোতৃবর্গ ইহাতে বিমুগ্ধ হইবেন। কোনও প্রসিদ্ধ গায়িকা সম্প্রতি এই যন্ত্রের সহিত গান করিয়া ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দিন দিনই মানবকে মুগ্ধ করিতেছে।



মনুষ্যকণ্ঠ অনুকারী শৃঙ্গযন্ত্র

বিরাট হলঘর

আমেরিকায় সম্প্রতি একটি অতিকায় হল-ঘর বা সভাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। আসন্ন গ্রীষ্মকালে এই সভাগৃহের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইবার কথা। দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থানের বিস্তার ৩ শত ৫০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৬ শত ৫০ ফুট। এই হল-ঘর এমন বৃহৎ যে, এখানে ফুটবল-ক্রীড়া, সার্কাস এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যায়ামক্রীড়া অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারিবে। ভূমিতলে ও রঙ্গমঞ্চে ৩০ হাজার দর্শকের বসিবার স্থান হইবে, ইহা ছাড়া বারান্দায় ১০ হাজার



বিরাট হলঘর

দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব নহে। গৃহমধ্যে স্থানে স্থানে বেতার-যন্ত্র বসিবে, তাহাতে দূরস্থিত শ্রোতৃগণ অনায়াসে বক্তার কথা শুনিতে পাইবে। রঙ্গমঞ্চের দৈর্ঘ্য ১ শত ফুট, বিস্তৃতিও ৫০ ফুট। সাজঘর প্রভৃতিরও ব্যবস্থা আছে। হল-ঘরের বহির্ভাগে মুক্ত স্থানে দর্শনীয় দ্রব্য সমাবেশের প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান। তথায় একটি ছোট হল-ঘর, তাহাতে ৩ হাজার দর্শকের স্থান আছে। প্রাঙ্গণ এত বৃহৎ যে, তথায় ১১ শত মোটর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। ভোজনাগারসমন্বিত রেস্তোরাঁগুলিতে একসঙ্গে এক হাজার নরনারী ভোজন করিতে পারে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

কুজ্ঝটিকাজালে যখন সমুদ্রবক্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া জলযানসমূহ নানারূপে বিপন্ন হইয়া পড়ে। সমুদ্রকূলবর্ত্তী আলোকগৃহ-নির্গত উজ্জ্বল আলোক পর্য্যন্ত কুজ্ঝটিকার ঘনান্ধকার দূরীভূত করিয়া জলযানগুলিকে এক ব্যক্তি নূতন প্রণালীতে এক প্রকার শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই শৃঙ্গ হইতে এমন ভীষণ শব্দ উত্থিত হয় যে, বহু দূর হইতে উক্ত শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বায়ুর চাপ হইতে উল্লিখিত শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের রেস অন্তরীপ-স্থিত আলোকগৃহে ঐরূপ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট



বিরাট শৃঙ্গ

আছে। উহার শব্দ ৪০ মাইল দূর হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

খেলার মুখোস

নিউইয়র্কস্থিত বালিকাদিগের বল-ক্রীড়ার দলে বালিকাগণ মুখোস পরিয়া ক্রীড়ায় যোগ দিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের কেশ ও আনন খেলার সময় সর্ব্বপ্রকার আঘাতের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পায়। মুখোস পরিলে দৃষ্টি ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। মার্কিণ বালিকারা ইদানীং মুখোসের অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়িগণ



খেলার মুখোস



সতীর পতি

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সখের ডিটেক্‌টিভ

হীরালালের সন্ধানে বিপিন বাবু কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় থামিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মোড়ে মোড়ে গুর্খা সৈন্য পাহারা দিতেছে—বিশেষ বিশেষ স্থানে গোরা পাহারা মোতায়েন, সশস্ত্র সৈন্যগণ বোঝাই লইয়া মাঝে মাঝে মোটর লরী রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কলিকাতায় বিপিন বাবুর কয়েক জন আত্মীয়-বান্ধব স্থায়িভাবে বাস করেন; কিন্তু কলিকাতায় আসিলে বিপিনবাবু তাঁহাদের কাহারও বাড়ীতে না উঠিয়া, নব্যতন্ত্রের কোন না কোনও বাঙ্গালী-পরিচালিত হোটেলেই আশ্রয় লইয়া থাকেন। এবারও তাহাই করিলেন।

বিপিন বাবু যখন হোটেলে গিয়া উঠিলেন, তখন সন্ধ্যা সমাগত। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সে দিন আর কোথাও বাহির হইলেন না। সান্ধ্যভোজন সমাধা করিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হীরুর মাকে ও পত্নীকে ভরসা ত দিয়া আসিলাম যে, হীরুর সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব; কিন্তু এই কলিকাতা সহর সমুদ্রবিশেষ,—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি উপায়ে?—নানা উপায় চিন্তা করিতে-করিতে অবশেষে বিপিন বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে, সে দিনকার সংবাদপত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলেন, গতকল্যও কলিকাতার কোনও স্থানে কোনও প্রকার খুন-জখম হয় নাই। পড়িয়া, অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। তার পর পথে বাহির হইয়া একখানা ট্যাক্সি ধরিলেন। যে দুই জন বন্ধুর নিকট হীরালালের চাকরীর জন্য সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল কি না, জানিবার জন্য কয়েক দি হইল তাঁহাদিগকে টেলিগ্রাম করিয়া বিপিন বাবু উত্তর পাইয়াছিলেন—না, হীরালাল নামক কোনও লোক সাক্ষাৎ করি আসে নাই। কলিকাতা এ কয় দিন একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে,—এত দিন হীরালাল হয় ত প্রাণভয়ে তাহার আশ্রয়স্থা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পথে বাহির হইতে পারে নাই—এ কয় দিনে যদি গিয়া থাকে—তাই সর্ব্বপ্রথমে সেই বন্ধুদ্বয়ের সহিত বিপিন বাবু সাক্ষা করিতে চলিলেন। হীরালাল যদি না-ও গিয়া থাকে, বি উপায়ে তাহার সন্ধান মিলিতে পারে, সে বিষয়েও অন্তত তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবেন।

বিপিন বাবু একে একে উভয় বন্ধুর সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া শুনিলেন, তাঁহাদের কাহারও নিকট হীরালাল আজিও আসে নাই। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া এক জন পরাম দিলেন, বড় বড় হাঁসপাতালগুলাতে গিয়া অনুসন্ধান কর আবশ্যক, খুন বা জখম হইয়া হীরালাল সেখানে নীত হইয় থাকিতে পারে।

এই দুই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতেই বেলা সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে বিপিন বাবু বেলা ৩টার সময় হাঁসপাতালে অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন।

কার্য্যটি সহজে সমাধা হইল না। অনেক লোকের খোসামোদ করিয়া, কেবলমাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের খাতাপত্র অনুসন্ধান করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। না, হীরালাল নামক কোনও ব্যক্তি অথবা কোনও অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি—যাহার বর্ণনা হীরালালের সঙ্গে মেলে, খুন ব জখম হইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে আসে নাই।

অপর হাঁসপাতালগুলিতে অনুসন্ধান করিতে সারাটা

থিয়েটরে কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় হীরালাল যদি কোনও থিয়েটরের কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, অতঃপর ইহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপিন বাবু তাঁহার হোটেলে তৃতীয় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন শুক্রবার, একমাত্র মডার্ণ থিয়েটর ব্যতীত অন্য কোনও থিয়েটরে কোনও অভিনয় নাই, ইহা বিপিন বাবু রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ধ্যাকালে তিনি মডার্ণ থিয়েটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ এখানে "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয়। সাড়ে সাতটায় অভিনয় আরম্ভ—এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে—ইতোমধ্যেই থিয়েটর-গৃহে লোক গিস্ গিস্ করিতেছে। কিঞ্চিৎ চেষ্টার পর বিপিন বাবু থিয়েটরের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট নীত হইলেন। ভদ্রলোক, ভদ্রভাবে বিপিন বাবুর সমস্ত কথা শুনিলেন; শুনিয়া উত্তর করিলেন, "না মশাই, ও নামের কোনও লোক ২।১ হপ্তার ভিতর কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে আমাদের কাছে আসেন নি।"

অধ্যক্ষ মহাশয়ের খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া থিয়েটরের সম্মুখে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিপিন বাবু ভাবিতে লাগিলেন, 'এবার কোন্ থিয়েটরে যাই?' যে দিন অভিনয় না থাকে, সে দিন রিহার্শাল থাকিতে পারে, ইহা বিপিন বাবু জানিতেন। কিন্তু রিহার্শালের দিন থিয়েটরের কর্ত্তা মহাশয় উপস্থিত থাকিবেন কি? কাল ত শনিবার, সব থিয়েটরেই অনুসন্ধান করা যাইতে পারে—এইরূপ মীমাংসা করিয়া বিপিন বাবু টিকিট কিনিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" দেখিতে বসিয়া গেলেন। থিয়েটরের নেশা তাঁর খুবই প্রবল, নহিলে নিজ গ্রামে সখের থিয়েটর খুলিয়া অত টাকা ব্যয় করিতেন না। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় কলিকাতায় তিনি পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন দর্শকের চক্ষু লইয়া দেখিয়াছিলেন—আজ দেখিবেন অন্য ভাবে,—নিজ থিয়েটরে এই নাটকখানির অভিনয় করাইলে তাঁহার দলস্থ যুবকগণ কতদূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, ইহাই বিবেচনা করিবার জন্য।

রাত্রি ১২টার পর হোটেলে ফিরিয়া, ঠাণ্ডা পোলাও খাইয়া বিপিন বাবু শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কাল হীরালালের খোজ লইয়া, তার পর ডায়মণ্ড থিয়েটারে যাইতে হইবে। সেখানে হীরালালের খোঁজও লইতে হইবে এবং আলিবাবার অভিনয়টাও দেখিতে হইবে—কারণ, বিখ্যাত অভিনেত্রী রেবতীসুন্দরী মর্জ্জিয়ানার ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

পরদিন যথাসময়ে হোটেল হইতে বাহির হইয়া বিপিন বাবু ট্যাক্সিতে উঠিলেন। বিউটি থিয়েটারের ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। ম্যানেজার বাবু কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এক ঘণ্টা পরে তাঁহার ফুরসুৎ হইল। তিনিও হীরালালের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না।

অতঃপর বিপিন বাবু ডায়মণ্ড থিয়েটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আলিবাবার অভিনয় তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থনা জানাইলে এক জন কর্ম্মচারী বলিল, "এখন কি ক'রে দেখা হবে? তিনি যে প্লে করছেন।"

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সেজেছেন তিনি?"

"তিনিই ত আলিবাবা। প্লে না শেষ হ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই।"

বিপিন বাবু ইহা শুনিয়া, টিকিট কিনিয়া, ভিতরে গিয়া অভিনয় দেখিতে বসিলেন।

ক্রমে সেই দৃশ্য আসিল, যেখানে মর্জ্জিয়ানা কাশেম মিঞার মৃতদেহ শেলাই করিবার জন্য বাবা মুস্তাফা নামক মুচির দোকানে তাহাকে ডাকিতে গিয়াছে। পাকা চুল, পাকা দাড়ি, বৃদ্ধ মুচি—মুখচর্ম্ম শিথিল,—কিন্তু মুস্তাফা কথা কহিতেই বিপিন বাবু চমকিয়া উঠিলেন। ঠিক যেন হীরালালের কণ্ঠস্বর না?—বাবা মুস্তাফা যিনি সাজিয়াছেন, তিনি অবশ্য নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা কহিতেছেন না,—তথাপি বিপিন বাবুর সন্দেহ হইল, এই ব্যক্তিই যেন হীরালাল। কিন্তু আবার মনে হইল, সবে মাত্র কলিকাতায় আসিয়া, হীরু কি এত বড় একটা থিয়েটরে কর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিয়াছে?

বাবা মুস্তাফার কথাবার্ত্তা অধিকক্ষণব্যাপী নহে, শীঘ্রই তাহা শেষ হইয়া গেল। ড্রপ পড়িলে বিপিন বাবু